সচিত্র মাসিক বসুমতী

২০শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৪৯ সাল—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২৯শ বর্ষ] ১৩৪৮ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
সাময়িক প্রসঙ্গ ঃ—(বর্ণানুক্রমিক)		

নক্সা ঃ—

দপ্তর ঃ—

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র — পত্রাঙ্ক

দৃশ্যচিত্র :—

শিল্পিগণের নামানুক্রমক-সূচী

২১শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৯ [১ম সংখ্যা

রস

'প্রবাস'-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে গিয়া ভোজদেব বলিয়াছেন—প্র-পূর্ব্বক বস্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে 'প্রবাস' শব্দ সিদ্ধ হয়। বস্ ধাতুর অর্থ—(১) আচ্ছাদন (যাহা হইতে 'বস্ত্র'-পদ সিদ্ধ হয়), (২) বাস করা, (৩) বাসিত বা প্রভাবিত করা ও (৪) মারণ। 'প্র' উপসর্গের অর্থ প্রতীপ বা বিপরীত। অতএব, প্র-বস্ ধাতুর প্রথম অর্থ ধরিলে দাঁড়ায় আচ্ছাদনের ব্যতিক্রম। যে অবস্থায় অঙ্গনা আত্মদেহ সুবেশে ভূষিত না করেন, তাহাকেই 'প্রবাস' বলে। নায়ক প্রবাসে থাকিলে নায়িকা কখনও নিজ দেহ সজ্জিত করেন না। আবার যুবক নায়ক যখন প্রিয়াসন্নিধানে বাস করেন না, তখনও প্রবাস বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রবাসী নায়কের পক্ষে নায়িকার নিকট বাস করা অসম্ভব। যে অবস্থায় নায়ক-নায়িকার চিত্ত উৎকণ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা বাসিত হইয়া থাকে, তাহাও প্রবাস। এইরূপে চিত্ত বাসিত হইলে শূন্যদৃষ্টি প্রভৃতি অনুভাবের বাহ্য প্রকাশ দৃষ্ট হয়। বস্-ধাতুর চতুর্থ অর্থ 'প্রমাপণ' বা হিংসন। পূরাপূরি মারণের পরিবর্ত্তে মারণের উপক্রম হইলে তাহাকেও মারণ বলা চলে। প্রবাসী নায়ক ও নায়িকা উভয়েই মৃত্যুতুল্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন—ইহা স্বাভাবিক। প্রবাসের পর করুণ। কৃ-ধাতুর উত্তর উণাদি উনন্-প্রত্যয়ে 'করুণ'-পদ সিদ্ধ হয়। কৃ-ধাতুর অর্থ—(১) অবর্ত্তমানের উৎপত্তি, (২) উচ্চারণ, (৩) অবস্থাপন ও (৪) অভ্যঞ্জন। প্রথম অর্থ ধরিলে দাঁড়ায়—যে অবস্থা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উৎপাদন করে, তাহাই করুণ-বিপ্রলম্ভ। যে অবস্থায় নায়ক-নায়িকা বিলাপ করিয়া থাকেন, তাহাও করুণ (দ্বিতীয় অর্থ)। যাহার আতিশয্যে সন্তপ্ত নায়ক বা নায়িকা দুঃসাহসিক মরণাদি কার্য্যে মন অবস্থাপিত (অর্থাৎ মনোনিবেশ) করেন, তাহাও করুণ (তৃতীয় অর্থ)। যে অবস্থায় চিত্ত দুঃখ দ্বারা অভ্যক্ত (অর্থাৎ পূর্ণ প্রভাবিত) হয়, তাহাকেও করুণ বলা হয় (চতুর্থ অর্থ)। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের বিবিধ অবস্থার নিরুক্তি এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভের পর সম্ভোগ। সম্-পূর্ব্বক ভুজ্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে সম্ভোগ-পদ সিদ্ধ হয়। ভুজ্-ধাতুর নানা অর্থ—(১) পালন—নবোঢ়া নায়িকা-কর্ত্তৃক অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ নায়কের ইচ্ছানুবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা রতিভাবের পালনে এই অর্থ পরিস্ফুট হয়। প্রথমানুরাগের অনন্তর সম্ভোগে এই অর্থের প্রকাশ। (২) কৌটিল্য (এই অর্থ অবলম্বনে 'ভুজগ'-পদ সিদ্ধ হয়)—পাদপতিত নায়কের প্রতি পাদতাড়ন প্রভৃতি মানিনী নায়িকার যে ব্যবহার, তাহাতে কুটিলতার অভিব্যক্তি। মানানন্তর সম্ভোগেই এই কৌটিল্যরূপ অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। (৩) অভ্যবহার (বা আহার)

—প্রবাস হইতে প্রত্যাগত নায়কের পক্ষে প্রিয়াসম্ভোগ অনেকটা উপবাসক্লিষ্টের পক্ষে অন্নভোজনের তুল্য। অতএব, প্রবাসানন্তর সম্ভোগেই অভ্যবহার-রূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। (৪) অনুভূতি—করুণ-বিপ্রলম্ভের অনন্তর সম্ভোগে এই অর্থটি প্রকাশ পায়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে একের মরণানন্তর পুনর্জ্জীবন লাভে উভয়ে যে সুখ অনুভব করেন, তাহা অন্য কোন অবস্থাগত সম্ভোগের সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই কারণে করুণানন্তর সম্ভোগে অনমুভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভূত হইতে থাকে।

আবার যদি ভুজ্-ধাতুর অর্থ ধরা হয় ভোগ, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলন (সম্প্রযোগ), তাহা হইলেও 'সম্'-উপসর্গের সহিত সমাসে চারি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—(১) সংক্ষিপ্ত, (২) সঙ্কীর্ণ, (৩) সম্পূর্ণ ও (৪) সম্যক্ ঋদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগানন্তর নবসঙ্গমে যুবক-যুবতী লজ্জা-ভয়াদি বশতঃ প্রায়ই সংক্ষিপ্ত উপচার প্রয়োগ করে, তাই প্রথমানুরাগানন্তর সম্ভোগ 'সংক্ষিপ্ত'। মানানন্তর সম্ভোগে নায়কের শঠতাদির বিষয় স্মরণপথে উদিত হওয়ার নিমিত্ত নায়িকার মনে কিছু রোষের লেশ থাকিয়া যায়। এই রোষমিশ্র সম্ভোগই 'সঙ্কীর্ণ'[১]। প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনের পর উৎকণ্ঠাযুক্ত নায়ক-নায়িকার মিলনে অভিলাষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে বলিয়া এইরূপ ভূয়িষ্ঠ উপভোগ 'সম্পূর্ণ' সম্ভোগ নামে খ্যাত। আর মৃতের জীবন-লাভের পর যে মিলন, তাহাতে নায়ক-নায়িকার যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহার আর সীমা থাকে না। এইরূপ সম্ভোগের নাম 'সমৃদ্ধ' বা 'সমৃদ্ধিমান্'।

প্রথমানুরাগানন্তর যে সম্ভোগ, সেই সম্ভোগের মধ্যে যে অনুরাগের প্রকাশ, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভোজ বলিয়াছেন—প্রথমানুরাগের 'অনুরাগ'-পদটি রঞ্জ্-ধাতু অথবা রাজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রঞ্জ-ধাতুর অর্থ অনুরঞ্জন বা প্রীতি-সম্পাদন। রাজ্-ধাতুর অর্থ শোভা, প্রকাশ বা দীপ্তি। আর 'অনু' এই উপসর্গের অর্থ—(১) সহ, (২) পশ্চাৎ, (৩) অনুরূপ (সদৃশ) ও (৪) অনুগত (যোগ্য)[২]। কখনও কখনও অনুরাগে প্রীতি-সম্পাদন ও শোভা যুগপৎ হইয়া থাকে। আবার এবংবিধ পূর্ব্বানুরাগের পরভাবী সম্ভোগেও এই অনুরঞ্জন ও শোভা অর্থদ্বয় সহভাবেই অন্বিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—পূর্ব্বানুরাগানন্তর সম্ভোগে কখনও কখনও নায়ক-নায়িকার পরস্পর প্রীতি ও দীপ্তি যুগপৎ প্রকাশ পায়। এরূপ অনুরাগ সহভাবী। এই অনুরাগ পূর্ব্বানুরাগেও যেমন, সম্ভোগেও সেইরূপ অভিব্যক্তি লাভ করে। আবার এই অনুরঞ্জন ক্রিয়াটি পূর্ব্বানুরাগে কখনও পশ্চাৎ উদ্ভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—পূর্ব্বানুরাগে নায়ক বা নায়িকার মধ্যে একের অনুরাগ দর্শনের পর তাহার প্রতি অপরের অনুরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই পশ্চাদ্ভাবী অনুরাগ। ইহাও পূর্ব্বানুরাগাবস্থা হইতে সম্ভোগে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, কখনও কখনও পূর্ব্বানুরাগে 'শোভা' অর্থটি নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনুরূপ-ভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ—কোন কোন পূর্ব্বানুরাগের ক্ষেত্রে অনুরাগের বিষয়ভূত নায়িকা বা নায়ক অনুরাগের আশ্রয়ভূত নায়ক বা নায়িকার অনুরূপ (সর্ব্বতোভাবে তুল্য) বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থলে 'অনু' উপসর্গের তৃতীয় অর্থ 'অনুরূপতা' 'রাগ' শব্দের 'শোভা' অর্থের সহিত মিলিত হইয়া অনুরাগ পদটিকে নিষ্পন্ন করে। অনুরাগের এবংবিধ স্বরূপ প্রথমানুরাগ হইতে সম্ভোগেও কখনও অনুবৃত্ত ও অন্বিত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস-কৃত রঘুবংশের ইন্দুমতী-স্বয়ংবরের প্রসিদ্ধ শ্লোক ইহার দৃষ্টান্ত—

"শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা।
ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ
শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ"॥
(রঘুঃ ৬।৮৫)

রঘুসুত অজে মিলিতা ইন্দুমতী মেঘমুক্ত শশীর সহিত সঙ্গতা কৌমুদী ও অনুরূপ জলধিতে প্রবিষ্টা জাহ্নবীর ন্যায়ই শোভমানা হইয়াছেন—এই কথা তুল্যগুণসম্পন্না বরবধূর সমাগমে প্রীত পৌরবর্গ একবাক্যে বলিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দুমতীর পাণিপ্রার্থী হতাশ রাজগণের কর্ণকুহরে সেই কথাগুলি বিশেষ কটু বলিয়া বোধ হইতেছিল।

আর যথায় নায়িকার পক্ষে উত্তম-নায়ক-কামনা অনিন্দিত (যেমন অপর্ণার শিব-সমাগমের আকাঙ্ক্ষা), তথায় 'অনু' উপসর্গের 'অনুগত (যোগ্য)' অর্থের সহিত রঞ্জনার্থক রাগ-শব্দের অন্বয়ে অনুরাগ-পদের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুরাগাবস্থা প্রথমানুরাগ হইতে সম্ভোগেও অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চারি স্থলেই অনু-উপসর্গ-পূর্ব্বক রঞ্জ্ বা রাজ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া অনুরাগ পদ সিদ্ধ হয়। এই চতুর্ব্বিধ অনুরাগ—কি প্রথমানুরাগে—কি সম্ভোগে—উভয় স্থলেই সমান—ইহাই ভোজের অভিপ্রায়।

(১) সঙ্কীর্ণ—মিশ্রিত। 'সঙ্কর' অর্থে 'মিশ্র', যথা—বর্ণসঙ্কর।
(২) রস (৮)—মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৭১, পৃঃ ৫৫০-৫১ দ্রষ্টব্য।

করণবাচ্যের ব্যুৎপত্তি ব্যতীতও ভাববাচ্যে ঘঞ্ করিয়া অনুরাগ-পদ সাধন করা যায়। সহ-পশ্চাৎ-অনুরূপ-অনুগত এই চারিটি অর্থে প্রযুক্ত 'অনু' উপসর্গের সহিত সংযুক্ত (রঞ্জ্) বা রাজ্ ধাতু হইতে ভাববাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন) রাগ-শব্দ রতি বা দীপ্তি অর্থ প্রকাশ করে। পূর্ব্বানুরাগ-গত অনুরাগ-শব্দের নির্ব্বচন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অনুরাগ বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বানুরাগাবস্থা হইতে সম্ভোগ-শৃঙ্গারে পর্য্যন্ত অনুবৃত্ত হইতে পারে। কারণ, সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ—বিপ্রলম্ভের চারিটি অবস্থাভেদের প্রত্যেকটির অনন্তর-ভাবী বলিয়াই সম্ভোগও চারি প্রকার। অতএব, বিপ্রলম্ভের প্রথম অবস্থা-ভেদ পূর্ব্বানুরাগে অনুরাগ যদ্রূপ, পূর্ব্বানুরাগানন্তর সম্ভোগেও উহা যে তদ্রূপই হইবে—ইহা স্বাভাবিক।

বিপ্রলম্ভের দ্বিতীয় অবস্থা-ভেদ মান। মান-শব্দ যে মান্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তাহার চতুর্ব্বিধ অর্থ—(১) পূজা, (২) প্রিয় মনে করা (প্রিয়ত্বাভিমান), (৩) প্রেম বুঝা (প্রেমাববোধ) ও (৪) প্রেমের প্রমাণ (পরিমাণ) নির্ণয় করা[৩]। ভোজদেব দেখাইয়াছেন যে, মানানন্তর-ভাবী সম্ভোগেও মানাবস্থায় পরিস্ফুট এই চতুর্ব্বিধ অর্থের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিপ্রলম্ভের তৃতীয় অবস্থা-ভেদ প্রবাস যে বস্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তাহারও চতুর্ব্বিধ অর্থ—(১) আচ্ছাদন (প্র-উপসর্গের 'প্রতীপ' অর্থাৎ বৈপরীত্য' অর্থ ইহার সহিত সংযুক্ত হইলে আচ্ছাদন বা ভূষণাদির অভাব বুঝায় অর্থাৎ বেশাদির পারিপাট্যের অভাব), (২) বাস করা (প্র-উপসর্গ-যোগে অর্থ দাঁড়াইতেছে—প্রিয়াসন্নিধানে প্রিয়ের বাসের অভাব), (৩) উৎকণ্ঠাদি দ্বারা চিত্ত বাসিত করা, ও (৪) প্রমাপণ (মারণ অর্থাৎ—মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা দান)। প্রবাসানন্তর সম্ভোগের সময়েও প্রবাসাবস্থায় অভিব্যক্ত এই চতুর্ব্বিধ অর্থ অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রথম অর্থটির দৃষ্টান্ত মহাকবি কালিদাস-কৃত শকুন্তলার প্রোষিতপতিকা দশা-বর্ণনায় পরিস্ফুট—

"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামতনুঃ কৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহজ্বরং বিভর্ত্তি[৪]॥"

(শকু ৭।২১)

(৩) মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৪৯, পৃঃ ৫৫১—(রস—৮) দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রচলিত পাঠ—
"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি"।

শকুন্তলার প্রোষিতভর্ত্তৃকা অবস্থায় ধূসর বসনযুগল, ক্ষীণ তনু, ম্লান বদন ও এক-বেণী সকলের দৃষ্টিপথে পড়িত। তিনি বেশের পারিপাট্যবিধানে যত্ন লইতেন না। দুষ্মন্তের সহিত পুনর্ম্মিলনকালেও তাঁহার সেইরূপ প্রোষিতভর্ত্তৃকার বেশ ছিল। ভোজ ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন—এ স্থলে প্রবাসানন্তর সম্ভোগেও প্রবাসদশায় অভিব্যক্ত বস্-ধাতুর অর্থ (বেশভূষার অভাব) অনুবৃত্ত হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভের চতুর্থ অবস্থাভেদ করুণ-বিপ্রলম্ভ। যে কৃ-ধাতু হইতে করুণ-পদের নিষ্পত্তি, তাহারও চতুর্ব্বিধ অর্থ—(১) অনুৎপন্নের উৎপত্তি, (২) উচ্চারণ, (৩) অবস্থাপন ও (৪) অভ্যঞ্জন। করুণানন্তর সম্ভোগেও এই সকল অর্থের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। করুণাবস্থায় দুঃখাতিশয্যে যেরূপ অভূত-পূর্ব্ব মূর্চ্ছাদির উৎপত্তি হয়—করুণানন্তর সম্ভোগেও সেইরূপ মৃতের পুনর্জ্জীবন লাভে অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে উক্ত মূর্চ্ছাদির আবির্ভাব দেখা যায়। অতএব, উৎপত্তিরূপ অর্থের অনুবৃত্তি এ ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। করুণে শোকবশে বিলাপ-শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক—করুণানন্তর সম্ভোগেও আনন্দের প্রাবল্যে উক্ত শোকজনিত বিলাপ সুখজন্য প্রলাপে পরিণত হয়। অতএব, উচ্চারণরূপ অর্থের অনুবৃত্তি এ ক্ষেত্রেও সুপরিস্ফুট। করুণাবস্থায় শোকবশতঃ দুঃসাহসিক আত্মবিসর্জ্জনাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়—করুণানন্তর সম্ভোগেও আনন্দাতিরেকবশে মৃতোজ্জীবিত প্রিয় বা প্রিয়ার একান্ত আনুগত্যে মনের অবস্থাপন করিবার প্রয়াস অতি স্বাভাবিক। অতএব, এ ক্ষেত্রেও অবস্থাপনরূপ অর্থের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। আর করুণাবস্থায় যে চিত্ত শোক-প্রকর্ষে অভ্যক্ত হইয়া থাকে—করুণানন্তর সম্ভোগে তাহাই পরমানন্দ-দ্বারা অভ্যক্ত হইয়া উঠে। অতএব, এ ক্ষেত্রেও অভ্যঞ্জন-রূপ অর্থের অনুবৃত্তি সহজেই বুঝা যায়[৫]।

(৫) এস্থলে একটি বিষয় খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বানুরাগের চতুর্ব্বিধ অর্থ পূর্ব্বানুরাগানন্তর সম্ভোগে যথাযথ ভাবেই অনুবৃত্ত হয়। এ কারণে ভোজমতে 'পূর্ব্বানুরাগানন্তর' এই সমাসবদ্ধ পদে অজহৎস্বার্থা বৃত্তি (অর্থাৎ—এ ক্ষেত্রে স্বকীয় অর্থ মোটেই পরিত্যক্ত হয় নাই)। কিন্তু মানের যে চতুর্ব্বিধ অর্থ (পূজা, প্রিয়ত্বাভিমান প্রভৃতি) তাহা পরিপূর্ণরূপে মানানন্তর সম্ভোগে অনুবৃত্ত হয় না। কারণ, মানকালে পাদপতনাদি দ্বারা যে ভাবে পূজা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, মানভঙ্গানন্তর সম্ভোগকালে ঠিক তত দূর পূজাপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অতএব, মানানন্তর সম্ভোগে মানের অর্থ কিঞ্চিৎ মৃদু ভাবে অনুবৃত্ত হয়। ভোজদেব ইহার বর্ণনা করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত অজহৎস্বার্থা বৃত্তির ক্ষেত্র নহে। প্রবাসের চতুর্ব্বিধ অর্থও (বেশভূষার অকরণ প্রভৃতি) সাধারণতঃ অল্প পরিমাণেই প্রবাসানন্তর সম্ভোগে অনুবৃত্ত হয়। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বিয়োগানন্তর

এইরূপ নানাবিধ বিশ্লেষণের সাহায্যে ভোজ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—স্থূলতঃ ইহা বলা চলে—বিপ্রলম্ভের যে ধর্ম্ম সম্ভোগেরও ধর্ম্ম তাহাই—যথাক্রমে বিরহ ও মিলনের মধ্য দিয়া ঐ একই ধর্ম্ম উভয় দশায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাই বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—উভয়ই একই শৃঙ্গারের দুইটি রূপ—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। সম্ভোগ যেমন বিপ্রলম্ভ ব্যতীত পুষ্টিলাভ করে না, বিপ্রলম্ভও সেইরূপ সম্ভোগ ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ হয় না। সম্ভোগহীন কেবল বিপ্রলম্ভ—শৃঙ্গারের রূপভেদ হইতে পারে না—উহা মুখ্য করুণরসেরই অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপে ভোজ শৃঙ্গার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ শব্দের নানারূপ নিরুক্তি প্রদর্শন ও প্রত্যেকটি নির্ব্বচনের অনুকূল যুক্তি ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সবিস্তর আলোচনা করা অসম্ভব বলিয়া কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

নিরুক্তির পর 'প্রকীর্ণ' পরিচ্ছেদ। প্রকীর্ণের মধ্যে ভোজ কয়েকটি ব্রত, উৎসব ও ক্রীড়ার নাম দিয়াছেন[৬]—

(১) অষ্টমীচন্দ্রক—ব্রতবিশেষের নাম। চৈত্র মাসের চতুর্থী হইতে যে অষ্টম চতুর্থী, তাহাতে যুবতীগণ চন্দ্রের পূজা করিয়া থাকেন।

(২) কুন্দচতুর্থী—ভোজ বলিয়াছেন, যে তিথিতে যুবতীগণ যবাস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া থাকেন, তাহাই কুন্দচতুর্থী[৭]।

(৩) সুবসন্তক—বসন্তঋতুর প্রথমাবির্ভাব-তিথি। কামসূত্রে ইহাকে 'মাহিমানী' ক্রীড়ার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। চৈত্র মাসে (কখনও বা বৈশাখ মাসে) বাসন্তীদুর্গাপূজার যে শুক্লা ত্রয়োদশী পড়ে, সেই চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রিকে 'সুবসন্তক' বলা হইত। কন্দর্পদেবের পূজা মহোৎসব ও তদুপলক্ষে নানারূপ নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে এ রাত্রিটি কাটিয়া যাইত। বর্ত্তমানে ইহা 'মদন-ত্রয়োদশী' নামেই অধিক প্রসিদ্ধ।

(৪) আন্দোলনচতুর্থী—যাহাতে যুবতীগণ দোলা-রোহণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন[৮]।

(৫) একশাল্মলী—একটি কুসুমশোভিত শাল্মলী-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ ক্রীড়া। কখন কখন এক জন চোখ বুজিতেন—অপরে লুকাইতেন। পরে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন—যাহাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিতে পারিতেন সেই হইত চোর। আর কেহ তিনি ধরিবার পূর্ব্বে 'বুড়ি' ছুঁইলে চোর হইতেন না। সম্ভবতঃ শিমুল গাছটিকেই বুড়ি করা হইত। বর্ত্তমানে আমরা যে 'চোর- চোর' খেলা করি, তাহারই অনুরূপ। অথবা, কাহারও চোখ বাঁধিয়া দিয়া 'কানা-মাছি' খেলাও হইত[৯]।

কামসূত্রের 'জয়মঙ্গলা' টীকায় অনুরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। একটি সুবিশাল পুষ্পিত শাল্মলী তরুর (শিমুল গাছের) চারি দিকে মণ্ডলাকারে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে নানারূপ ক্রীড়া। এ খেলায় শিমুল-ফুলের অলঙ্কার তৈয়ারি করিয়া

প্রথম দর্শন-সময়েই শকুন্তলা প্রোষিতভর্ত্তৃকার বেশে ছিলেন। পরেও যে তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন হয় নাই—ইহা ত বলা যায় না। পুনর্দর্শনের ক্ষণে ত বেশ পরিবর্ত্তন সম্ভবই হয় না—কারণ, এ দর্শনই অপ্রত্যাশিত; প্রত্যাশিত হইলে শকুন্তলা নিশ্চয়ই পতির মনোরঞ্জক বেশ ধারণ করিতেন। এই কারণে ভোজমতে প্রবাসানন্তর সম্ভোগে বৃত্তি ঈষৎ অজহৎস্বার্থা। প্রবাসকালীন নিয়মের সংস্কারমাত্র উহাতে কিঞ্চিৎ অনুবৃত্ত হয়। আর করুণের অর্থ করুণানন্তর মোটেই যথাযথ ভাবে অনুবৃত্ত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সমান অর্থের অনুবৃত্তি হইতেছে বোধ হয়। কিন্তু নিপুণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, উহাদিগের মূল কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন (উপরের বিশ্লেষণ পর্য্যালোচনীয়)। অতএব, সূক্ষ্মতঃ করুণানন্তরে বৃত্তি জহৎস্বার্থা (সঃ কঃ ৫।৮১—৯২)।

(৬) বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও এইরূপ কয়েকটি উৎসব ও ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ক্রীড়াগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) মাহিমানী ক্রীড়া—যে সকল ক্রীড়ায় মহিমা বা মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত—এগুলি ছিল সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ ক্রীড়া, (২) দেশ্যা ক্রীড়া—এ খেলাগুলির কোন কোনটি কোন কোন বিশিষ্ট দেশেই প্রচলিত ছিল—এগুলি ছিল প্রাদেশিক ক্রীড়া।

(৭) "যস্যাং যবপ্রস্তরেষবলা লোলন্তি সা কুন্দচতুর্থী"—(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)। বাৎস্যায়ন দেশ্যা ক্রীড়ার মধ্যে 'যবচতুর্থী' বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। যবচতুর্থী বৈশাখ শুক্লা চতুর্থী। পরস্পরের গায়ে সুগন্ধি যবচূর্ণ ছড়াইয়া এ খেলা হইত। ইহা অনেকটা হোলির মত ছিল। তবে পার্থক্য এই যে, ইহাতে রঙ্ দেওয়ার প্রথা ছিল না।

(৮) বাৎস্যায়ন দেশ্যা ক্রীড়ার মধ্যে 'আলোলচতুর্থী' বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। খেলাটির নামের শেষে 'চতুর্থী'-শব্দ আছে বলিয়াই মনে করা উচিত নহে যে, ইহা চতুর্থী তিথিতেই হইত। চার-চার জন মিলিয়া এ খেলা খেলিতেন, তাই ইহার নাম চতুর্থী! তৃতীয়া তিথিতে ইহা হইত। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়াতে যে হিন্দোল বা ঝুলন হইত, তাহারই নাম ছিল 'আলোলচতুর্থী'। এক এক দোলায় চার-চার জন মিলিয়া খেলিতেন। এক জন দোলায় চাপিতেন, আর তিন জন নানা ছন্দে তাঁহাকে দোল দিতেন। এই ভাবে পালা করিয়া দোলায় চড়া ও দোল খাওয়া ছিল এ খেলার অঙ্গ।

(৯) "একমেব সুকুসুমনির্ভরশাল্মলিবৃক্ষমাশ্রিত্য সুনিমীলিতকাদিভিঃ খেলতাং ক্রীড়া"—(সঃ কঃ)

পরিবার রীতি ছিল। সে যুগে বিদর্ভদেশে[১০] এই খেলাটির খুব চলন ছিল।

(৬) মদনোৎসব—ত্রয়োদশীতে কামদেব-পূজা। ইহাও বাৎস্যায়নের মতে দেশ্যা ক্রীড়া। বর্ত্তমানে ইহার প্রচলিত নামান্তর 'মদনচতুর্দ্দশী'[১১]। চৈত্র মাসে (কখন বা বৈশাখ মাসে) যে শুক্লা চতুর্দ্দশী পড়ে, সেই চৈত্র-শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মদনদেবের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করার প্রথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শ্রীহর্ষ-কৃত 'রত্নাবলী'-নাটিকাতেও (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভ) পাওয়া যায়—রাজ্ঞী বাসবদত্তা এই মদনোৎসবে অশোক-তরুতলে মদনের ও তাঁহার স্বামী বৎসরাজ উদয়নের পূজা করিতেন। পূর্ব্বে যে সুবসন্তক বা মদনত্রয়োদশীর উল্লেখ করা হইয়াছে—ঠিক তাহার পরের তিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। উৎসবও অনেকটা সেইরূপ। তবে সুবসন্তক সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ মাহিমানী ক্রীড়া, আর মদনোৎসব অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক বা দেশ্যা ক্রীড়া—ইহাই মাত্র উভয়ের প্রভেদ।

(৭) উদকক্ষ্বেড়িকা—বাঁশের চোঙ্ বা পিচ্‌কারীর মধ্যে গন্ধোদক ভরিয়া পরস্পরের গাত্রে প্রদান—প্রিয়জনকে কর্দ্দমের দ্বারা অভিষেক, ইত্যাদি। ইহা হোলির তুল্য। তবে ইহাতে রঙ্ ব্যবহৃত হইত না—হইত সুগন্ধ জলমাত্র। কামসূত্রে 'হোলাকা' (বা হোলি) একটি পৃথক্ উৎসব। 'ক্ষ্বেড়া' বলিতে বুঝায় 'বংশনাড়ী' বা 'বাঁশের চোঙ্' 'বাঁশের পিচ্‌কারী'। এই খেলায় বাঁশের চোঙে জল ভরিয়া সেই জল ছুড়িয়া অপরের গায়ে দেওয়া হইত। ইহারই অপর নাম 'শৃঙ্গক্রীড়া' বা পিচ্‌কারী-খেলা।

(৮)। অশোকোত্তংসিকা—'উত্তংস' অর্থে শিরোভূষণ বা কর্ণাভরণ অশোকপুষ্পের কিরীট-কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার-রচনার কৌশল প্রদর্শনই এই খেলার মুখ্য বিষয়। ভোজ বলিয়াছেন—উত্তম নায়িকাগণ পাদাঘাতে অশোক পুষ্প বিকশিত করিয়া সেই ফুলের গহনা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঙ্গ শোভিত করিতেন[১২]।

(৯) চূতভঞ্জিকা—যুবতীগণ প্রথমানুরাগবশে আম্র-মুকুল ভাঙ্গিয়া অনঙ্গদেবকে উহা উৎসর্গ করতঃ ভূষণরূপে ধারণ করিতেন[১৩]। কামসূত্রে এতদনুরূপ ক্রীড়ার নামান্তর পরিদৃষ্ট হয়—'চূতলতিকা'। কিন্তু ভোজের 'চূতলতিকা' অন্যরূপ ক্রীড়া।

(১০) পুষ্পাবচায়িকা—যে ক্রীড়ায় যুবতী মদিরাগণ্ডূষ দোহদ দান করিয়া বকুল-পুষ্প বিকাশপূর্ব্বক তাহা চয়ন করিতেন[১৪]। কিন্তু ভোজ 'পুষ্প' বলিতে কেবল বকুল-পুষ্পকেই কেন বুঝিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বোধ্য। ফুল-তোলা, ফুল কুড়ান, ফুল ছড়ান, ফুল সাজান প্রভৃতি নানারূপ খেলা পুষ্পাবচায়িকার অন্তর্ভুক্ত—ইহা স্বর্গত তর্করত্ন মহাশয়ের অভিমত। নানা রঙের ও নানা রকমের ফুল তুলিবার পর ফুলগুলি এক সঙ্গে মিশাইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেওয়া খেলাটির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষা হয়—কে কত শীঘ্র এক এক রকমের ফুল আলাদা করিয়া কুড়াইয়া তুলিতে পারে। তৃতীয় ধাপে—ফুল কুড়াইবার পর নানা আকারে সেগুলি সাজাইতে হইবে। নানারূপ পশু-পক্ষী, লতা-পাতা, গাছ, মানুষ প্রভৃতির ছবি ফুল সাজাইয়া সাজাইয়া আঁকিতে হয়। ইহাতে যাহার যত কৃতিত্ব তাহার তত প্রশংসা।

(১১) চূতলতিকা—যে ক্রীড়ায়—'কোথায় তোমার

---

(১০) বিদর্ভ—বর্ত্তমান বেরার। সেকালের মস্ত বড় একটি রাজ্য—কুন্তল-রাজ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণা হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত ছিল উহার বিস্তার। এ কারণে উহাকে 'মহারাষ্ট্র'ও বলা হইত। 'কুণ্ডিনপুর' (বর্ত্তমান Beder) ছিল উহার রাজধানী। বরদা (Warda) নদী রাজ্যটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করায় উত্তরাংশের রাজধানী হয় 'অমরাবতী' ও দক্ষিণাংশের রাজধানী হইয়াছিল 'প্রতিষ্ঠান'।

(১১) কামসূত্রে তিথির উল্লেখ নাই। জয়মঙ্গলা-টীকায় 'সুবসন্তক'-পদের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে 'বসন্তোৎসব'। পক্ষান্তরে, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় তাঁহার কামসূত্রের সংস্করণে স্পষ্ট বলিয়াছেন—সুবসন্তক—মদন-ত্রয়োদশী আর মদনোৎসব মদন-প্রতিমাপূজা, চৈত্র-শুক্ল-চতুর্দ্দশী।

(১২) কবিসময়ে বলা হইয়াছে—উত্তমা যুবতী নায়িকায় পাদাঘাতরূপ দোহদ (সাধ) দানে অশোক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ঐরূপ দর্শনও আলিঙ্গনে যথাক্রমে তিলক ও কুরবকের পুষ্পোদ্গম। ঐ ভাবে স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু, সীধুগণ্ডূষসেকে বকুল, নর্ম্ম-(শৃঙ্গারভাবপূর্ণ)-বাক্যে মন্দার, মৃদুহাস্যে চম্পক, মুখমারুতে চূত, গীত-দ্বারা নমেরু ও সম্মুখে নর্ত্তন দ্বারা কর্ণিকার পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে—

"পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাং
স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ।
মন্দারো নর্ম্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতা-
চ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ"।

"যত্রোত্তমস্ত্রিয়ঃ পদাভিঘাতেনাশোকং বিকাশ্য তৎ কুসুমবতংসয়ন্তি সা অশোকোত্তংসিকা"—(সঃ কঃ)

(১৩) "যত্রাঙ্গনাভিশ্চূতমঞ্জর্য্যোঽবিরুজ্যানঙ্গায় বালরাগন্দ্বৈনৈব দায়ং দায়মবতংস্যন্তে সা চূতভঞ্জিকা"—(সঃ কঃ)।

(১৪) কবিসময়—"পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ"—সাহিত্যদর্পণ (৭ম পরিচ্ছেদ)। নারীর মুখস্থিত মদ্যগণ্ডূষে বকুলপুষ্প উদ্গত হয়। "যত্র যুবতয়ো মদিরাগণ্ডূষ-দোহদেন বকুলং বিকাশ্য তৎপুষ্পাণ্যবচিন্বন্তি সা পুষ্পাবচায়িকা" (সঃ কঃ)।

প্রিয়তম ?'—এই প্রশ্নকারিগণ-কর্ত্তৃক পলাশাদি নব-লতা-দ্বারা প্রিয়জন আহত হয়, তাহাই চুতলতিকা। কামসূত্র-মতে আমের মুকুল ভাঙ্গিয়া কর্ণাভরণ বা অন্য নানারূপ ভূষণ রচনা ও তাহা পরিয়া ক্রীড়া।

(১২) ভূতমাতৃকা—পঞ্চভূতাত্মক দেহের আনুকূল্য-বিধায়ক ক্রীড়া। ভোজের এই বিবরণটি অস্পষ্ট[১৫]। কামসূত্রে ক্রীড়ার মধ্যে ভূতমাতৃকা ধরা নাই। কিন্তু চতুঃষষ্টি ললিতকলার মধ্যে 'মানসী' নামে একটি কলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত মানসী দ্বিবিধ—(১) দৃষ্টবিষয়া বা দৃশ্যবিষয়া—পদ্মোৎপল প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক দেখিয়া তাহার যথাযথ ভাবে পাঠোদ্ধার, ও (২) অদৃষ্ট-বিষয়া বা অদৃশ্যবিষয়া—ঐ ভাবে লিখিত কবিতা কেহ পাঠ করিতেছে—ইহা শুনামাত্রই তাহার পুনরায় পাঠ—ইহা কেবল শতাবধান বা শ্রুতিধরের পক্ষেই সম্ভব। ইহার অপর নাম 'আকাশ-মানসী' [১৬]।

(১৩) কদম্বযুদ্ধ—বর্ষাকালে কদম্ব-হরিদ্রা-পুষ্প প্রভৃতিকে প্রহরণ-স্বরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক দুইটি দলে বিভক্ত কামিনীগণের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধরূপ ক্রীড়া[১৭]।

কামসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। খেলোয়াড়েরা ইহাতে দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া দুই দল পরস্পর মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইতেন। উভয় দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের হাতে থাকিত কদমফুল। এই ফুল ছুঁড়িয়া যে আপোষে কৃত্রিম যুদ্ধ হইত, তাহারই নাম ছিল কদম্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের অস্ত্র কদম্বপুষ্প বা ঐ জাতীয় অন্য পুষ্প। অস্ত্র হিসাবে কদম্বফুল লইবার উদ্দেশ্য এই যে, এ কৃত্রিম যুদ্ধের অস্ত্রটি বেশ কুসুম-সুকুমার হওয়া প্রয়োজন; যাহাতে কাহারও অঙ্গে কোন আঘাত না লাগে। অথচ অস্ত্রটি গোলকের মত হওয়া চাই, যাহাতে উহা লইয়া লোফালুফি করা বা গড়াইয়া খেলা করা চলে। কদম ফুলের এই দুইটি গুণই আছে, তাই উহার এত আদর। মাটি, কাঠ বা পাথরের ঢিল বা গোলা লইয়া খেলিলে অঙ্গে আঘাত লাগিয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। সেকালে পৌণ্ড্রদেশে[১৮] এই ক্রীড়াটির বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কালের ব্যাড্‌মিণ্টন্, টেনিস্, টেবল্-টেনিস্, রাগ্‌বি, ফুট্‌বল প্রভৃতি গোলক-ক্রীড়ার সহিত এই কৃত্রিম কদম্বযুদ্ধের বেশ তুলনা চলিতে পারে।

(১৪) নবপত্রিকা—প্রথম বর্ষার পর নব তৃণাঙ্কুর গজাইলে বনস্থলীতে নব শাদ্বল অর্চ্চনা-পূর্ব্বক তথায় পান-ভোজন সমাপন করিয়া কৃত্রিম বিবাহাদি ক্রীড়া নবপত্রিকা। এইরূপ ক্রীড়ায় নানারূপ হাস্য-পরিহাস চলিত।

কামসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। বর্ষার প্রথম বারিপাতের পর গাছে গাছে যখন কচি পাতা দেখা দিত, তখন বনভূমির অধিবাসীদিগের মধ্যে এই খেলাটির ধুম পড়িয়া যাইত। সদ্যো-বর্ষাস্নাত বৃক্ষ-বল্লীর নব কিসলয়োদ্গমে যে অপরূপ শ্যামল শ্রী প্রকাশ পায়, তাহাতে মনে হয় নবপল্লব-শ্যামলা বনস্থলী যেন লাবণ্যময়ী নববধূর বেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। এই বর্ষায় নব-পত্রাবলী ছিন্ন করিয়া নানারূপ মণ্ডন-রচনা, আর তাহাতে সজ্জিত হইয়া বনস্থলীতে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও খেলার শেষে নবশস্য রন্ধন করিয়া বনভোজন, ইহাই ছিল সেকালে এ খেলার অঙ্গ।

(১৫) বিসখাদিকা—নায়ক-নায়িকাগণ সরোবরে গমন-পূর্ব্বক নবোদ্‌ভিন্ন বিসাঙ্কুর গ্রহণ করিয়া যে ক্রীড়া করিতেন, তাহাই বিসখাদিকা।

কামসূত্রে ইহারও উল্লেখ আছে। 'বিস' অর্থে মৃণাল। পদ্মফুলের গাছের যে ডাঁটা, তাহার দুইটি অংশ আছে। যে অংশটির রঙ সবুজ ও যাহাতে কাঁটা আছে, তাহার নাম 'নাল'। এ অংশটি কঠিন, ইহা জলে ডুবিয়া থাকে। আর এই সবুজ ডাঁটার শেষ খানিকটা অংশ প্রায় পাঁকের মধ্যে ডোবা থাকে। ইহার রঙ সাদা ধপ্‌ধপে। ইহা যেমন নরম তেমনই মিষ্ট। এই অংশটুকুই 'বিস' বা 'মৃণাল'। কে কত গভীর জলে যাইয়া এক ডুবে কত বেশী মৃণাল তুলিতে পারে, সেই সব কৌশলের পরীক্ষা এ খেলায় হইত। তার পর সদলে

---

(১৫) "পঞ্চাত্মানুনয়ন্তী ভূতমাতৃকা"—(স: ক:)। পঞ্চাত্ম বা পঞ্চাত্মক বলিতে পঞ্চভূতাত্মক শরীরকেই বুঝায়।

(১৬) "মানসীতি। মনসি ভবা চিন্তা। দৃশ্যাদৃশ্যভেদ-বিষয়া দ্বিধা। তত্র কশ্চিদ্বাঞ্জনাক্ষরৈঃ পদ্মোৎপলাদ্যাকৃতির্যথাস্থিতা-নুস্বারবিসর্জ্জনীয়যুতৈঃ শ্লোকমন্যুক্তার্থং লিখতি। অন্যশ্চ মাত্রাসন্ধি-সংযোগাসংযোগচ্ছন্দোবিন্যাসাদিভিরভ্যাসাদতীবাক্ষরং পঠতি। ইতি দৃশ্যবিষয়া। যদা তু তথৈব তানি যথাক্রমমাখ্যাতানি শ্রুত্বা পূর্ব্ব-বদুদ্ধীয় পঠতি, তদা দৃশ্যবিষয়া ন ভবতি। সা চাকাশমানসী-ত্যুচ্যতে"।—জয়মঙ্গলা।

(১৭) "বর্ষাসু কদম্বনীপহারিদ্রকাদিকুসুমৈঃ প্রহরণভূতৈর্দ্বিধা বলং বিভজ্য কামিনীনাং ক্রীড়া"—(স: ক:)

(১৮) পৌণ্ড্র—পৌণ্ড্রদিগের বাসভূমি—বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ—সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম ও হাজারিবাগের উত্তরাংশ। 'পুণ্ড্র' নামে একটি পৃথক্ শ্রেণীও ছিল। ইহারা বাস করিত মালদহ, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে।

সানন্দে মৃণাল ভোজন। কখন কখন বা পদ্মের পরিবর্ত্তে উৎপলের (সালুকের) ডাঁটাও এই ভাবে তুলিয়া খাওয়া চলিত।

(১৬) শক্রার্চ্চা—শক্রোৎসবদিবস। শক্রোৎসব হইত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে। ইহার প্রধান অঙ্গ ছিল ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন।

'ভরত-নাট্যশাস্ত্রে' এই শক্রধ্বজ-সম্বন্ধে বেশ একটি কৌতুহল-জনক আখ্যান দৃষ্ট হয়। পুরাকালে শক্রধ্বজোৎসব-কালে ব্রহ্মার নির্দ্দেশে যখন দেব-দৈত্যগণের সম্মুখে মহর্ষি ভরতের নাট্য-সম্প্রদায় অভিনয় দেখাইতেছিল, তখন উক্ত নাট্যাভিনয়ে দেবগণের বিজয় ও অসুরগণের পরাজয় অভিনীত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মায়া আশ্রয়-পূর্ব্বক নাট্যবিঘ্ন করিতে থাকেন। তাহাতে ইন্দ্র সক্রোধে রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া ইন্দ্রধ্বজটির প্রহার-দ্বারা দৈত্য-গণের দেহ জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি শক্র-ধ্বজের নাম হইয়াছে 'জর্জ্জর'। নাট্যবিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নাট্যাভিনয়ের পূর্ব্বে জর্জ্জর-স্থাপন ও জর্জ্জর-পূজার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল[১১]।

(১৭) কৌমুদী—আশ্বিনের পৌর্ণমাসী। শরৎ-কালের পূর্ণিমা-রজনীতে যে জ্যোৎস্না বা কৌমুদী প্রকাশ পায়, তাহার শোভার তুলনা নাই। তাই ঐ রাত্রিটিরও নাম দেওয়া হইয়াছে 'কৌমুদী'। কামশাস্ত্রে ঐ রাত্রির উৎসবের নাম 'কৌমুদী-জাগর'। ইহা ত্রিবিধ মাহিমানী ক্রীড়ার অন্যতম।

ঐ রাত্রিটি যাঁহারা জাগিয়া কাটাইতে পারেন, মা কমলার কৃপালাভে তাঁহারা ধন্য হন। কিন্তু এক বার ঘুমাইয়া পড়িলে মার কৃপালাভ আর অদৃষ্টে ঘটে না। এ জন্য সারারাত জাগিয়া কাটাইবার ব্যবস্থা। সময় কাটাইবার জন্য দ্যূতক্রীড়ারও ব্যবস্থা এই রাত্রিতে করা হয়। সাধারণতঃ এতদ্দেশে উহা 'কোজাগর-পূর্ণিমা' (৺শারদীয়া দুর্গাপূজার পরের পূর্ণিমা) নামে খ্যাত। কৃপা বিতরণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মা লক্ষ্মী ঐ রজনীতে পৃথিবীর প্রতি ঘরে খোজ করিয়া বেড়ান—'কে জাগিয়া আছে (কো জাগর্ত্তি)'? দোলায় চড়িয়া বা পাশা খেলিয়া ঐ রাত্রি জাগিলে ধনবৃদ্ধি হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(১৮) যক্ষরাত্রি—দীপোৎসব—ভোজমতে। দীপোৎ-সব বলিতে বুঝায় দীপান্বিতা অমাবস্যা—কার্ত্তিকের অমাবস্যা—৺কালীপূজা-লক্ষ্মীপূজার রাত্রি।

কামসূত্রে এই উৎসবটিও ত্রিবিধ মাহিমানী ক্রীড়ার অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যক্ষরাত্রি—সুখরাত্রি। এ রজনীতে যক্ষগণ অদৃশ্য ভাবে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এ রাত্রিটি দ্যূতক্রীড়াতেই কাটাইবার প্রথা ছিল।

যদিও ভোজ ও কামসূত্রের টীকাকার যক্ষরাত্রিকে দীপান্বিতা অমাবস্যা বলিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের মনে হয়—ইহার অন্যরূপ অর্থও করা চলিতে পারে। কার্ত্তিকের অমাবস্যাতে ৺দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা ও ৺শ্যামাপূজা। উহার পরবর্ত্তী শুক্লা দ্বিতীয়া 'যমদ্বিতীয়া' বা 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'—ভাই-ফোঁটার দিন। মধ্যে যে শুক্লা প্রতিপৎ, তাহাই যক্ষ-রাত্রি। উহার অপর নাম 'দ্যূতপ্রতিপৎ'—ইহাতে সারা রজনী জাগিয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে হয়।

(১৯) অভ্যূষখাদিকা—কাঁচা অবস্থায় শমি-ধান্য শূক-ধান্য আগুনে পোড়াইয়া খাওয়া। কামসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। 'অভ্যূষ' অর্থে 'আধপোড়া শস্য'। শীত-কালে ক্ষেতে যাইয়া ছোলা-মটর-খেঁসারি প্রভৃতি কড়াইএর আধ-কাঁচা অথচ বেশ সুপুষ্ট শুঁটি গাছশুদ্ধ তুলিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পরে ঐ শুকনা গাছে দিতে হয় আগুন। আগুন লাগিবামাত্র শুঁটিগুলি চট্-পট্-শব্দে পুড়িতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে কড়াইগুলি চারি দিকে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া যায়। পাঁচ জনের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া সেগুলি খুঁটিয়া খাওয়া যেমন কৌশল-সাপেক্ষ, তেমনই আনন্দদায়ক। হিন্দুস্থানীগণ ঠিক এই ভাবেই কচি ভুট্টা গাছশুদ্ধ পুড়াইয়া খাইয়া থাকেন। শুঁটিতে পাক ধরিবার মুখে গাছগুলি আপনা হইতে শুকাইয়া আসিলেই অভ্যূষ অতি সুস্বাদু হয়। নয় ত, শুঁটিগুলি বেশ পুষ্ট হইবার পূর্ব্বে গাছগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পুড়াইলে অভ্যূষ তত সুস্বাদু লাগে না। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে চলিত ভাষায় এরূপ খেলা ও খাওয়াকে 'হড়া-পোড়া' বলে।

(২০) নবেক্ষুভক্ষিকা—প্রথম ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া ভোজন। কামসূত্রে এই খেলাটির নাম 'ইক্ষুভঞ্জিকা'। আখ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহা হইতে নানা ভূষণ-রচনা ও উহা পরিয়া নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুক। ইক্ষুদণ্ড হইতে তৎকালে অন্যান্য নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও নির্ম্মিত হইত। সে কালে ইক্ষুদণ্ড ও গোলকের সাহায্যে 'দণ্ডগোলক' (ডাঙ্-গুলি) ক্রীড়াও চলিত। এই খেলা এ যুগের হকি, ক্রিকেট বা গল্‌ফ খেলার মতই ছিল।

(২১) তোয়ক্রীড়া—গ্রীষ্মকালে জলে অবগাহন-পূর্ব্বক নানারূপ জলকেলি।

---

(১১) এ সম্বন্ধে ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২২) প্রেক্ষা—নাট্যাভিনয় প্রভৃতি দর্শন।

(২৩) দ্যূত—জুয়াখেলা—প্রায়ই পাশার সাহায্যে খেলা হইত। আলিঙ্গনাদি উপচার পণ রাখিয়া পাশার সাহায্যে নায়ক-নায়িকা দ্যূতক্রীড়া করিতেন[২০]।

(২৪) মধুপান—রাগোদ্দীপনের উদ্দেশ্যে মাধ্বীক প্রভৃতি সেবন[২১]।

ভোজ-বর্ণিত প্রকীর্ণ পরিচ্ছেদ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। এইগুলি সবই শৃঙ্গারের উদ্রেককর বলিয়া শৃঙ্গার-রস-প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। কামসূত্রেও উহাদিগের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে একই উদ্দেশ্যে।

আগামী সংখ্যায় শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ সমাপ্ত হইবে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২০) "আলিঙ্গনাদিগ্লহা তুরোদরাদিক্রীড়া দ্যূতানি"—(সঃ কঃ)

(২১) কামসূত্রে তিনটি মাহিমানী ক্রীড়া—(যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর ও সুবসন্তক) ও সতরটি দেশ্যা ক্রীড়া (সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, আন্দোলচতুর্থী, মদনোৎসব, মদনভঞ্জী, হোলাকা, অশোকোত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চুতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা ও কদম্ব-যুদ্ধ) উল্লিখিত হইয়াছে। ভোজ কয়েকটি নূতন ক্রীড়ার নাম করিয়াছেন। আবার সহকারভঞ্জিকা, পাঞ্চালানুযান, মদনভঞ্জী ও হোলাকার নাম করেন নাই।

সহকারভঞ্জিকা—নূতন আমের গুটি বা কচি আম ভাঙ্গিয়া খাওয়া।

পাঞ্চালানুযান—পাঞ্চাল (বর্দ্ধমান বুদাওন-ফরোখাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল) দেশের লোকদিগের ভাষা, ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতির হুবহু নকল করা। নানা প্রকার পশুপক্ষীর ডাক ও ভাব-ভঙ্গীর নকল করাও এই ক্রীড়ার অন্তর্গত। হরবোলা ও বহুরূপী ইহারই মধ্যে পড়ে।

মদনভঞ্জী বা দমনভঞ্জী—ময়না গাছ বা দমনক (দোনা) গাছের পল্লব ভাঙ্গিয়া মদনদেবের পূজা ও অলঙ্কার নির্ম্মাণ।

হোলাকা—ফাল্গুনী পূর্ণিমার 'হোলি' উৎসব। পরস্পরের গাত্রে আবির-কুঙ্কুমের রং দেওয়া এ উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

সাদা কথা

উপকার করি অপকার যদি পাও
কৃতঘ্নতাকে তবু প্রশ্রয় দাও,
পাবে না জানিয়া ঋণ যদি দিতে পারো,
প্রস্তুত থাকো প্রতারিত হতে আরো,
অবিশ্বাসী ও কুটিলকে ভালোবাসো,
ছলনা এবং চাতুরী দেখিয়া হাসো,
যদি সেজে থাকো অন্ধ বধির বোবা,—
তোফা এ ধরণী, লোকটাও তুমি তোফা!

যদি বলো সব বোকাকে প্রতিভাবান্,
খাঁটি চেয়ে দাও মেকীকেই সম্মান,
হীন নিন্দুকে বলাও স্পষ্টবাদী,
নির্দ্দোষ ভাবো যত দাগী-অপরাধী,
কথা কও নিজ সুযোগ-সুবিধা বুঝি,
ভাণ্ডারে থাকে বহু তোষামোদ পুঁজি,
কুৎসিতকেও ভাবো সে একটা শোভা,—
তোফা এ ধরণী, লোকটাও তুমি তোফা!

যদি তুমি চাও প্রতিশোধ প্রতিদান,
সহানুভূতিতে চঞ্চল হয় প্রাণ,
যদি অবিচার-অন্যায়ে করো ক্রোধ,
ঘুচাতে না পারো আপন বিবেক-বোধ,
মিথ্যাকে যদি ঘৃণা করো ভাবো পাপ,
কমাইতে চাও অত্যাচারীর দাপ,
দেখিবে তোমার বন্ধু অধিক নাই—
এই যে পৃথিবী—বড়ই কঠিন ঠাঁই!

যদি তুমি চলো লয়ে সত্যের আলো
মন্দকে বলো মন্দ, ভালোকে ভালো,
প্রবলের অপযুক্তিতে নাহি ভুলি,
ভাঙ্গাও সে ভ্রম দিয়া চোখে অঙ্গুলি,
বাক্-বিভূতিতে ঢাকা-ছল উদ্ঘাটি
উদ্ধার করো সত্যের রূপ খাঁটি—
দেখিবে তোমার বন্ধু অধিক নাই,—
এই যে ধরণী—বড়ই কঠিন ঠাঁই

শ্রীকরুণারঞ্জন মল্লিক।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

প্রমাণ

রবার্ট ব্লেক ও স্মিথকে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি-বিনিময় করিতে দেখিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড উভয়ের মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর মিসেস্ ফিঞ্চকে বলিলেন, "কিছুই অস্বাভাবিক নহে, মিসেস্ ফিঞ্চ! আশা করি, তুমি আমাকে এ কথা বলিবে না যে, মিঃ কার্ণের লাইব্রেরী সাধারণতঃ এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবেই পড়িয়া-থাকিতে দেখা যায়!"

মিসেস্ ফিঞ্চ ঈষৎ বিলাপের সুরে বলিল, "আপনারা লাইব্রেরীর এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। আমি জানিতাম, এখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে! কিন্তু মনিবকে আমার বড়ই ভয় ছিল। দেখুন, এখন তিনি দোতলায় রহিয়াছেন; অথচ তিনি জানেন না যে—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি ঠিক জান যে, এখন তিনি দোতলায় আছেন?"

উত্তর হইল, "হাঁ, মহাশয়! এ বিষয়ে আমার ভুল হয় নাই।"

"আজ সকালে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে?"—ব্লেকের মুখ হইতে এই প্রশ্ন বাহির হইল।

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "গত রাত্রে তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন—সকালে আটটার সময় আমি যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, এবং—"

"তুমি কি সকালে আটটার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে?"

"হাঁ, মহাশয়!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "লাইব্রেরীর এই অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলে কি?"

"না, মহাশয়!"

"জানাইলে না কেন?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "মনিব মহাশয়ের ঘরের দরজায় আমি ধাক্কা দিয়াছিলাম; তাহার পর কথাটা তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিতেই তিনি আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তখনও তিনি ঘুমের ঘোর কাটাইতে পারেন নাই; মেজাজ অত্যন্ত চটা বলিয়াই মনে হইল, চক্ষু দুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে তাঁহাকে বড়ই ক্ষাপ্পা দেখায়! তথাপি আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে আরও দুই-একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে থামাইবার জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "বিলক্ষণ আশার কথা বটে! আমার অনুমান, মিঃ কার্ণ বোতল বোতল মদ গিলিয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার পর স্বাভাবিক অবস্থা আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার মেজাজ বিগড়াইবার কারণ। আর এক কথা,—তিনি কোন্ ঘরে ঘুমাইয়া থাকেন?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "দোতলার বারান্দা দিয়া কিছু দূর পশ্চিমে গিয়া ডান পাশে যে শয়ন-কক্ষ আছে—সেই ঘরে।"

লেনার্ড বলিলেন, "উত্তম; কিন্তু কথাগুলা একটু আস্তে বলিতে পারিবে না? আর কাঁদাকাটি করিবারই বা কি প্রয়োজন? কার্ণ তোমার কথাগুলা শুনিতে না পাইলেই আমরা খুসী হইব। তুমি ঐ চেয়ারে বসিয়া থাক; প্রয়োজন হইলে আবার তোমাকে জেরা করিব।"

অতঃপর লেনার্ড স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেই স্মিথ সরিয়া-গিয়া সেই কক্ষের দ্বারে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই কক্ষে অল্প অনুসন্ধান করিতেই একটি মোটা ও ভারী ডাণ্ডা মিলিল; তাহার এক প্রান্ত শোণিত-রঞ্জিত।

লেনার্ড তাহা দেখিয়া বলিলেন, "উহার সাহায্যেই কাজ শেষ করা হইয়াছিল। ব্লেক, আপনি ঠিকই আন্দাজ করিয়াছিলেন। আপনার অনুমানে বাহাদুরী আছে!"

ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও-কথা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।—এক এক সময় মনে হয়, আমি ভারী নিরেট।"

"নিরেট?"

"একদম!"

"অর্থাৎ?"

ব্লেক বলিলেন, "অর্থাৎটা এখন মুলতুবি থাক। আমার মাথার ভিতরটা কেমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে! এখানে সকল ব্যাপারই কেমন গোলমেলে! তবে আর এক বার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হইবে। হুম্! আরও প্রমাণ! দেখ লেনার্ড, এটা তোমার নজরে পড়িয়াছে কি?"—তিনি ডেস্কের উপর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

লেনার্ড ভাঁজ-করা এক টুক্‌রা চিঠির কাগজ হাতে তুলিয়া লইলেন; পত্রখানিতে পূর্ব্বদিন রাত্রি একটার সময় দেখা করিবার নির্দ্দেশ ছিল। উহাতে কর্ণেল ক্লাম্পসন ওরফে ওয়াইল্ডের স্বাক্ষর ছিল।

পত্রখানি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "ওয়াইল্ড কার্ণকে মুঠায় পুরিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ? এই উদ্দেশ্যেই সে এই পত্র লিখিয়াছিল। সম্ভবতঃ এ জন্য সে কোন রকম পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াছিল।"

ব্লেক উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "হাঁ, সম্ভব বটে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ওয়াইল্ডের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতেন না; এই জন্য তাঁহার ধারণা হইল—সে লুণ্ঠনের চেষ্টাতেই ফিরিতেছিল। কিন্তু ব্লেক তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য ওয়াইল্ডের নূতন সঙ্কল্প-সংক্রান্ত সকল কথাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন ? কিন্তু ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কি সুস্পষ্ট নহে ? কার্ণের সন্দেহ হইয়াছিল—ওয়াইল্ড হয় ত কোন রকম চাতুর্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিবে। আমার বিশ্বাস, ফিউজ হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইলে তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল; অন্ততঃ এইরূপই আমার ধারণা। কার্ণ ঐ ডাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল; তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, এই ঘরের অবস্থা দেখিলেই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না!"

এ কথা শুনিয়া ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না।

এবার লেনার্ড মিসেস্ ফিঞ্চের নিকটে গমন করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওগো লক্ষ্মী! তোমার সঙ্গে আমার দুই-একটি কথা আছে—তাহা তোমাকে মন দিয়া শুনিতে হইবে। মিঃ কার্ণের সঙ্গে শীঘ্রই আমরা আলাপ করিব; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমাকে কিছু বলিতে চাই।—এই ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি কি জান ?"

মিসেস ফিঞ্চ বলিল, "কিন্তু কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যই আমার জানা নাই মহাশয়! আজ সকালেই ও-সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি; তাহার পূর্ব্বে কিছুই আমার জানা ছিল না! আমি যথানিয়মে আসিয়া জানালা খুলিতেই ঘরের এই অবস্থা দেখিতে পাইলাম!"

লেনার্ড বলিলেন, "ঘরের জিনিসপত্র এইরূপ লণ্ডভণ্ড হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া আছে দেখিয়া সে কথা কি কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ আগ্রহভরে বলিল, "না মহাশয়, ও-কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই! আমার সহকারিণী এলেনকেও আমি এ সকল কথার কিছুই বলি নাই। তাহাকে এখানে আসিতেও দিই নাই। আমার মনিবকে এ কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই; তিনি আমার কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। তাহার পর আমি হলঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেই সময় আপনারা দ্বারে আসিয়া সাড়া দিলেন।"

ব্লেক তাহার সকল কথা শুনিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি টেলিফোনে কাহাকেও কোন কথা বলিয়াছিলে ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বিস্মিত ভাবে বলিল, "কি বলিলেন ? টেলিফোনে ?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ; তুমি টেলিফোনে কাহাকেও ডাকিয়াছিলে কি ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ মিঃ ব্লেকের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না মহাশয়, পুলিশে ত আমি খবর দিতে পারি নাই, কারণ, আমার ভয় হইয়াছিল। এ সকল কি ব্যাপার, তাহা আমার মনিবকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমি—আমি ভাবিয়াছিলাম, ব্যাপারটি এই যে—"

"কি ভাবিয়াছিলে ?"

"দেখুন মহাশয়, আমাদের মনিব আজ-কাল অনিয়মিত ভাবে যখন-তখন বোতল চালাইয়া থাকেন! এক-এক দিন তিনি যে অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া দুঃখই হয়।"—মিসেস্ ফিঞ্চ ক্ষুব্ধ স্বরে এই উত্তর দিল।

"মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিলে তাঁহার মেজাজ কি অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "পূর্ব্বে কখন সেরূপ দেখি নাই মহাশয়! আমার মনে হইয়াছিল, তিনি বেসামাল হইয়া পড়াতেই, আত্মসম্বরণ করিতে না পারায় এইরূপ ক্ষতি করিয়াছেন! আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি নিজেরও ক্ষতি করিয়াছিলেন। মেঝেতে রক্তের এই সকল চিহ্ন দেখিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।"

লেনার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই ডাণ্ডাটা দেখিয়াছ ?"

"কোন্ ডাণ্ডার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

লেনার্ড বলিলেন, "চুলোয় যাক সেই ডাণ্ডা! দেখ মিসেস্ ফিঞ্চ, তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—তুমি যাহা জান, সে সকল কথাই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই ব্যাপার তুমি যত সহজ মনে করিতেছ তত সহজ নয়। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে তোমার মনিবের শয়ন-কক্ষে লইয়া যাইতে হইবে। হাঁ, আমরা সেইখানেই গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

মিসেস্ ফিঞ্চ চঞ্চল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার নীচে নামিয়া-আসা পর্য্যন্ত কি আপনারা বিলম্ব করিতে পারিবেন না ?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড নীরস স্বরে বলিলেন, "না, সেরূপ মনে হয় না। আমরা তাঁহার সুযোগের উপর নির্ভর করিব না; এই জন্য তাঁহার শয়ন-কক্ষেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তিনি সম্ভবতঃ এখনও নেশায় বে-এক্তার হইয়া আছেন; এই নেশা কাটিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে জেরা করা উচিত মনে হইতেছে।"

এই সময় স্মিথ ব্লেকের সহিত কথা কহিবার একটু সুযোগ পাওয়ায় তাঁহাকে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, আমরা এখানে যেরূপ দেখিবার আশা করিয়াছিলাম—সেইরূপই কি দেখিতে পাইতেছি না ?

ব্লেক বলিলেন, "না, যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই এখানে দেখিতে পাইলাম না স্মিথ! বস্তুতঃ, কার্ণের লাইব্রেরী এরূপ ওলট-পালট দেখিব, ইহা আদৌ মনে হয় নাই। এখানে ধস্তাধস্তির যে সকল প্রমাণ দেখিতেছি, তাহাতে আমি ভীষণ ধাঁধায় পড়িয়াছি!"

স্মিথ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধাঁধায় পড়িয়াছেন ? কিন্তু এ সকল কি অকারণ কর্ত্তা!"

ব্লেক বলিলেন. "এখানে এরূপ দৃশ্য দেখিব—ইহা আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই স্মিথ! মাঠে যে প্রমাণ পাইয়াছিলাম,

তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, ওয়াইল্ড পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া মস্তকে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমারও সেইরূপই মনে হইয়াছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "সেই আকস্মিক আঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ ধস্তাধস্তি করিবার কোন সুযোগ জুটিবার কি কোনও সম্ভাবনা ছিল? আমার বিশ্বাস, এ সমস্তই কৃত্রিম প্রমাণ স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু প্রথমে এখানে তাহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা ছিল না?"

ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "থামো। পাগলের মত কি যে আবোল-তাবোল বকো, তার যদি মাথা-মুণ্ডু কিছু থাকে! কিন্তু আমি ভাবিতেছি, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তি হঠাৎ কিরূপে লোপ পাইল? যদি এই কক্ষে সত্যই উহাদের লড়াই হইত, তাহা হইলে কার্ণকে হতবুদ্ধি হইয়া দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতে হইত; তাহার চক্ষু হইতে নিদ্রা পলায়ন করিত, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

স্মিথ বলিল, "তাই ত কর্ত্তা! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। ওয়াইল্ড আক্রান্ত হইয়াছে—ইহা জানিতে পারিলে কার্ণকে সে সহজে ছাড়িত না।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ওয়াইল্ড পলায়ন করিত না, সাইমন কার্ণই পলায়ন করিত, বুঝিয়াছ? তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, কার্ণ এখন কি অবস্থায় আছে—তাহা জানিবার জন্য আমার এতই কৌতূহল হইয়াছে যে, ইচ্ছা হইতেছে—এই মুহূর্ত্তেই তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করি।"

তাহার পর তিনি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিবে লেনু!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? ওয়াইল্ডের মৃতদেহ মাঠের ভিতর পড়িয়া আছে, তাহার পর ওয়াইল্ডের ঐ চিঠি, আর অন্যান্য প্রমাণও কার্ণের অপরাধেরই অকাট্য প্রমাণ, সুতরাং আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে না, আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দোতলায় চলিলাম।"

ব্লেক বলিলেন, "আমরা যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

লেনার্ড মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "আপনার এই কথার কোন অর্থ আছে কি? আপনি কি মনে করেন, পরলোকে আমি ওয়াইল্ডের অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি? কার্ণ এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় আপনি ও স্মিথ আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করিলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি।"

লেনার্ড উঠিয়া মিসেস্ ফিঞ্চের ঘাড় ধরিয়া অল্প একটু ঝাঁকানি দিলেন। মিসেস্ ফিঞ্চ নতমুখে বসিয়াছিল, অন্য কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের করস্পর্শে সে সচকিত ভাবে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

লেনার্ড মৃদু স্বরে বলিলেন, "শোন মিসেস্ ফিঞ্চ! এখন আমরা তোমার মনিবের সঙ্গে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই। তুমি আমাদিগকে তাঁহার শয়ন-কক্ষে লইয়া চল।"

মিসেস্ ফিঞ্চ বিহ্বল স্বরে বলিল, "তিনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আপনারা যদি তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিবেন, কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না; তাঁহার প্রকৃতি অতি ভীষণ হয়।"

লেনার্ড বলিলেন, "তাঁহার প্রকৃতি ভীষণ হওয়া দুশ্চিন্তার কথা বটে! কিন্তু আমরা সরকারের চাকর, তাঁহার খেয়ালের মর্য্যাদা রক্ষা করা আমাদের অসাধ্য। মিঃ কার্ণের নিকট আমরা প্রকৃত ঘটনার বিবরণ জানিতে চাই; তাঁহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই উহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। মিসেস্ ফিঞ্চ! তুমি উত্তেজিত না হইয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল,—ইহাতে তোমার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

মিসেস্ ফিঞ্চ আতঙ্ক-বিহ্বল হইলেও ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির সাহায্যে দোতলায় উঠিয়া, একটি সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লেনার্ডকে মৃদু স্বরে বলিল, "ইহাই আমার মনিবের শয়ন-কক্ষ।"

লেনার্ড বলিলেন, "তুমি দরজায় ধাক্কা দাও, তিনি কি বলেন শুনি। তিনি সাড়া দিলে যাহা করিতে হয় আমরাই করিব।"

মিসেস্ ফিঞ্চ রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিল; কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া পাইল না। পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে ধাক্কা দেওয়া হইল, কিন্তু কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ!

এবার লেনার্ড দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দুই হাতে দ্বার ঠেলিলেন; দ্বার অর্গলরুদ্ধ ছিল না, সবেগে খুলিয়া গেল। লেনার্ড সঙ্গিদ্বয়সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "যা ভাবিয়াছিলাম তাই!... পাখী পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে!"

তাঁহারা দেখিলেন, শয্যা শূন্য, পরিচ্ছদাধারের দেরাজ খোলা। সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষদ্বয়ও নির্জ্জন।

সাইমন কার্ণ পলাতক।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়

চীফ ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আমি এইরূপই অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু এ জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। আমরা নীচের ঘরগুলিতে উহাকে খুঁজিয়া দেখিব, সেখানে দেখিতে না পাইলে আমি আফিসে ফিরিয়া চারি দিকে সন্ধান লইবারই ব্যবস্থা করিব। কার্ণ যদি আশা করিয়া থাকে, এইরূপ কৌশলে সে আমাদের চোখে ধূলা দিতে পারিবে—তাহা হইলে তাহার সেই আশা পূর্ণ হইবে না। সে আমাদের নিকট যথাযোগ্য শিক্ষা লাভ করিবে।"

মিসেস্ ফিঞ্চ সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল; ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া সে বলিল, "মনিব মহাশয় কি ঘরে নাই? তিনি সকালে উঠিয়াই আমাকে ডাকিয়া থাকেন, এবং আমাকে যাহা

করিতে হইবে—সে সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করেন। আমার অজ্ঞাতসারে কোন দিন তিনি শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করেন না।"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার মনিব প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর যে নিয়মে কাজ করেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া তুমি বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছ! কিন্তু আমার মনে হয়, মিঃ কার্ণ আজ সকালে ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনের স্থিরতা ছিল না। যদি আমরা তোমার মনিবকে এখানে খুঁজিয়া না পাই, তাহা হইলে আমি এখানে এক জন পাহারাওয়ালা মোতায়েন করিব। তাহাকে তোমার ভয় করিবার কোন কারণ নাই; সে তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না, মিসেস্ ফিঞ্চ!"

মিসেস্ ফিঞ্চ ভয়কম্পিত স্বরে বলিল, "আপনি পাহারাওয়ালা মোতায়েন করিবেন কি এখানে—এই বাড়ীতে?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, তাহাই করিব; ইহাতে কি তোমার বিস্ময়ের কোন কারণ আছে? পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করিব এক জন নহে, দুই জন। এক জন লাইব্রেরীতে আর এক জন হল-ঘরে পাহারায় থাকিবে। মিসেস্ ফিঞ্চ, তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, তোমার মনিব মিঃ কার্ণ নরহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে; এই জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি সতর্ক ভাবে লোকের সহিত কথা কহিবে, এবং—"

এই সময় স্মিথ লেনার্ডের কথায় বাধা দিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি! দেখুন, দেখুন।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মিসেস্ ফিঞ্চের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে! কিন্তু তাহাকে ধরিবার প্রয়োজন হইল না; সে নিজের চেষ্টায় সামলাইয়া লইলেও আতঙ্কে তাহার মুখ চা-খড়ির ন্যায় সাদা হইয়া গেল! সে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি বলিলেন? নরহত্যা করিয়াছেন—আমার মনিব?"

লেনার্ড দুই-একটি মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া স্মিথকে তাহার পাহারায় নিযুক্ত করিলেন; তাহার পর তিনি ব্লেকের সঙ্গে সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একতলায় যে সকল কক্ষ ছিল, তাহাদের অধিকাংশই অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। অবশেষে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কার্ণ সেই কক্ষে বসিয়া প্রাতর্ভোজন (breakfast) করিত; কিন্তু সেই কক্ষও খালি!

কার্ণের অন্যতম পরিচারিকা এলেন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে একতলার বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাকে কার্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, তাহার মনিব নীচে আসেন নাই; সে খুব সকাল হইতেই হল-ঘরে উপস্থিত ছিল। তাহার মনিব নীচে আসিলে সে তাঁহাকে দেখিতে পাইত। সে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

ব্লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য কোন দিকে দোতলা হইতে নীচে নামিবার সিঁড়ি নাই?"

এলেন বলিল, "আছে বৈ কি মহাশয়! দোতলা হইতে নামিবার-উঠিবার সিঁড়ি পিছন দিকেও আছে; কিন্তু আমাদের মনিব সেই সিঁড়ি ব্যবহার করেন না। আমরা দাস-দাসীরা সেই সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "যে কারণেই হউক, তোমাদের মনিবকে আজ সেই সিঁড়িই ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।—ব্লেক, আসুন, চারি দিক্ আমরা সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করি। পিছনের সেই সিঁড়িও দেখা দরকার।"

অতঃপর তাঁহারা পরিচারকবর্গের বাস-কক্ষগুলি পরীক্ষা করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানশ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নীচে যেখানে সিঁড়ির শেষ হইয়াছিল, তাহার অদূরে একটি দ্বার ছিল। সেই দ্বারের মাথা ও চারি ধার কতকগুলি লতায় আচ্ছন্ন ছিল।

সেই দ্বারের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর লক্ষিত হইল; প্রান্তরটির এক প্রান্তে 'টেনিস্-কোর্ট'। এক জন মালি সেই দ্বারের বাহিরে বসিয়া কাজ করিতেছিল।

লেনার্ড তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—ঠিক উত্তর দাও। তুমি আজ সকালে তোমার মনিব মিঃ কার্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলে কি?"

মালি বলিল, "হাঁ মহাশয়, আজ সকালে তাঁহাকে দেখিয়াছি বৈ কি!"

ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? আজ তাঁহাকে দেখিয়াছ! কখন দেখিয়াছ!"

মালি বলিল, "হাঁ, প্রায় দশ মিনিট আগে মহাশয়! তিনি ঐ পথ দিয়া আসিয়া বাহিরে গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, বাগানের পিছনের দেউড়ি দিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাতে একটা সুটকেস ছিল; তাহাও আমার নজরে পড়িয়াছিল।"

এ কথা শুনিয়া লেনার্ড ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরাও ঐ রকমই মনে করিয়াছিলাম! কার্ণ হয় ত আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল; সব কথা সে বুঝিতে না পারিলেও তাহার মনে সন্দেহ হওয়াতেই ধরা পড়িবার ভয়ে এই দিক্ দিয়া লম্বা দিয়াছে!"

ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; তাহা দেখিয়া লেনার্ড বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার কারণ?"

ব্লেক অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কার্ণকে আজ সকালে এখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ইহা শুনিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারি নাই! আমি ঐরূপ প্রত্যাশা করি নাই।"

অতঃপর তিনি মালির মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ পথ দিয়া তুমি যাঁহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছ, তিনিই যে তোমার মনিব—এ কথা কি তুমি নিঃসন্দেহে বলিতে পার?"

মালি বলিল, "হাঁ, তিনিই যে আমার মনিব মিঃ কার্ণ—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অন্য লোক দেখিয়া তাহাকে মিঃ কার্ণ বলিয়া আমার ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "তোমার ঐরূপ ধারণা হইতেও পারে; কিন্তু তিনি কি সেই সময় তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন?"

"না মহাশয়, তিনি কোন কথা বলেন নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "তিনি মুখ তুলিয়া তোমার দিকে চাহিয়াছিলেন?"

মালি বলিল, "আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করার এখন মনে হইতেছে, তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছে! আমার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমাকে দুই-এক

কথা না বলিয়া মুখ বুজিয়া চলিয়া যান না; তবে তখন তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিলেন।"

ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে না পারায় ইন্স্পেক্টর লেনার্ড কৌতূহল-ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক? আপনি কার্ণকে কি তাহার বাড়ীতে দেখিবার আশা করেন নাই? কেন, ইহার কারণ কি?"

ব্লেক লেনার্ডের সহিত বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "সে কথা তোমাকে পরে বলিব লেনার্ড! কিন্তু তোমাকে ইঙ্গিতে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি—তুমি যে ঘটনা সত্য মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিয়াছ, তাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিলে ভুল হইবে। তদন্ত কার্য্যে সত্যই আমি খুসী হইতে পারি নাই—লেনার্ড!"

লেনার্ড সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি? আপনার মুখের উপর নাকটির অস্তিত্ব যেরূপ সত্য, ইহাও সেইরূপই সত্য। আপনি যাহা বলেন, তাহার অধিকাংশই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং যাহা আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে, আপনি তাহা অনেক সময় সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পান। কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—এবার আমারই ধারণা সত্য, আপনিই ভুল করিয়াছেন! আমি এখন ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইতেছি—কার্ণকে ধরিবার জন্ত সেখান হইতে জাল-বিস্তার করিব। সেই ফাঁদে তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে। আমি এখান হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইব, এবং আশা করি, অবিলম্বেই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

ইহার কুড়ি মিনিট পরে ব্লেক স্মিথসহ তাঁহার মোটর-কার গ্রে-প্যান্থারের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্মিথকে তখন অত্যন্ত নিরুৎসাহ দেখাইতে লাগিল।

স্মিথ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা কি আর বেশী কিছুই করিতে পারি না? আমার মনে হইয়াছিল, আপনি কার্ণের অনুসরণ করিতে কৌতূহল বোধ করিবেন।"

ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে ভার আমরা অনায়াসেই লেনার্ডের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি। কাজের ভিতর সে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে! মৃতদেহটি সে মড়ি-ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে; এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আমদানী করিয়া ঐ বাড়ীর পাহারার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। তাহার পর সে আরও কত ভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা নির্ণয় করা কঠিন! আমরা সেই সকল গণ্ডগোলে মিশিতে চাহি না; আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আহারটা সকালেই শেষ করিব মনে করিতেছি।"

স্মিথ ব্লেকের মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় আপনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সে সকল বিষয় কি? আপনার কি ধারণা—কার্ণ উহাকে হত্যা করে নাই?"

ব্লেক বলিলেন, "যদি সরল ভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে বলিব—আমার ধারণা ঐরূপই বটে।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনি মনে করেন—বজ্রাঘাতেই ওয়াইল্ড নিহত হইয়াছিল?"

ব্লেক সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, উহাও আমি মনে করি না।"

স্মিথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি ইহাও মনে করেন না, উহাও মনে করেন না; তবে কি মনে করেন কর্ত্তা! ওয়াইল্ড যদি বজ্রাঘাতে না মরিয়া থাকে, এবং কার্ণ কর্ত্তৃকও নিহত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিরূপে সে পঞ্চত্ব লাভ করিল?"

ব্লেক বলিলেন, "সে সত্যই পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে কি না, তাহাই ভাবিতেছি স্মিথ!"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, যদি সত্যই এরূপ কোন বিষয় থাকে—যাহা—"

ব্লেক স্মিথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ও-সব কথা এখন কিছু কালের জন্ত মুলতুবি রাখ স্মিথ! আমার বিশ্বাস, এই ব্যাপারে কিছু কিছু বিস্ময়ের অবকাশ আছে।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনার কথা দুর্ব্বোধ্য; আমি রহস্যভেদ করিতে পারিলাম না! আপনি সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিবেন না? ইহার ফল যাহাই হউক, সার রডনে ড্রুমণ্ড এখন নিরাপদ। তাঁহার শত্রুদের মধ্যে শেষ শত্রু কার্ণই এখন অবশিষ্ট আছে; কিন্তু সে এখন এতই বিব্রত যে, সার রডনের প্রতি অত্যাচার করিবে, আপাততঃ সে সুযোগ তাহার নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "সার রডনে এখন দেশে নাই; তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্ত সুইজার্ল্যাণ্ডের হ্রদ-অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, তিনি আমার উপদেশ অনুসারে গোপনে দেশত্যাগ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, তাঁহার জন্ত উৎকণ্ঠার আর কোন কারণ নাই; এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি।"

ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া স্মিথসহ তাঁহার মোটরে বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্লেক যখন তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন—তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল।

ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই টেবলের সম্মুখস্থ আরাম-কেদারা হইতে পরিচিত কণ্ঠে সম্ভাষণ শুনিলেন, "আসতে আজ্ঞা হোক! আপনার ন্যায় সুহৃদের দর্শন-কামনায় অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছি।"

ব্লেক কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চেয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, ওয়াইল্ড তাঁহার চুরুটের বাক্স হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ধূমপানে রত!

স্মিথ ওয়াইল্ডকে সেই স্থানে সেই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া এতই বিস্মিত হইল যে, সে দুই হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল! তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য, ওয়াইল্ড এখানে আসিয়া বসিয়া আছে! কর্ত্তা, আপনি কি উহাকে আপনার প্রতীক্ষায় ঐ ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "একবিন্দুও বিস্মিত হই নাই স্মিথ! তবে এখন উহাকে এখানে দেখিতে পাইব, এ আশা করি নাই বটে! কিন্তু যাহা আশা করা যায় না, তাহাও অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায়।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমার মনে হইয়াছিল, আপনি আমায় স্বাস্থ্য

দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে এ ভাবে আমার দেখা করিতে আসা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া নিশ্চিতই আপনার মনে হয় নাই। আমার আশা ছিল—আমাকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনি সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিবেন।"

স্মিথ কৌতূহলভরে বলিল, "কাহার অভ্যর্থনা করিবেন? যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে—তাহারই? তুমি যে যথেষ্ট আয়োজন করিয়া পরম সমারোহে শিঙা ফুঁকিয়াছ—এ বিষয়ে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে?"

ওয়াইল্ড সংযত স্বরে বলিল, "এখন যে আমি জীবিত দেহে বর্ত্তমান—ইহার অকাট্য প্রমাণ তোমার সম্মুখেই জাজ্বল্যমান! আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে নিরাশ করিতে হইল স্মিথ!—এ জন্ম আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

স্মিথ বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও—তোমার মৃত্যু-সংবাদে আমি খুসী হইয়াছিলাম? ভুল, প্রকাণ্ড ভুল! তুমি বাঁচিয়া আছ দেখিয়া আমি সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাহা আমি আদৌ ধারণা করিতে পারি নাই! তোমাকে সশরীরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—তোমার মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু উইম্বলডনের মাঠে যাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিলাম, সে তবে কে? কাহার মৃতদেহ ওখানে দন্তবিকাশ করিয়া পড়িয়া আছে? আমার বিশ্বাস, তুমি কর্ত্তার চোখে ধূলা দেওয়ার জন্ম ইচ্ছা করিয়াই কি একটা অদ্ভুত চাল চালিয়াছ!"

ওয়াইল্ড বলিল, "কি বলিলে? আমি উঁহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি? কেহ কি কোন কৌশলে মিঃ ব্লেককে প্রতারিত করিতে পারে? উনি প্রতারিত হইয়াছেন—এরূপ ধারণা উঁহারও হইয়াছে কি?—অসম্ভব!"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি—প্রথমটা আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেই বিভ্রম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? কার্ণের মৃত্যু দৈবদুর্ঘটনা হইলেও—তোমার নিজের কার্য্যধারা—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কার্ণের মৃত্যু!—আপনি এ কি কথা বলিতেছেন মিঃ ব্লেক!"

স্মিথ ব্লেকের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বিস্ময়ভরে বলিল, "কি বলিলেন কর্ত্তা! কার্ণ মরিয়াছে?"

ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "সেই মৃতদেহ আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই; তবে উহা ওয়াইল্ডের মৃতদেহ বলিয়াই প্রথমে আমার ভ্রম হইয়াছিল বটে!"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার ভ্রম হইয়াছিল! তবে উহা সত্য বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন নাই? আমার পক্ষে ইহা আনন্দের সংবাদ।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু অবশেষে আমার ধারণা হইয়াছিল—এই ব্যাপারে যথেষ্ট চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।"—অতঃপর তিনি ওয়াইল্ডের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে বলিলেন, "দেখ ওয়াইল্ড, অতঃপর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আশা করি, তুমি সরল ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে, অর্থাৎ ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করিবে না।"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই ঠিক উত্তর দিব; আপনার কি বলিবার আছে বলুন।"

ব্লেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "তুমি কি সাইমন কার্ণকে হত্যা করিয়াছ?"

এ কথা শুনিয়া ওয়াইল্ডের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা অতর্কিত বেদনায় ম্লান হইল; তাহার পর সে ব্যথিত স্বরে বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমার ধারণা ছিল—আমাকে আপনি অন্ত সকলের অপেক্ষা বেশ ভাল করিয়াই জানেন! আপনি কি প্রথম হইতেই জানেন না—নরহত্যায় আমার ঘোর বিতৃষ্ণা, এবং ইহাই আমার অন্তরের খাঁটি কথা?"

ব্লেক বলিলেন, "তবে কি কার্ণের মৃত্যু আকস্মিক?"

ওয়াইল্ড বলিল, "সত্যই কি তাহার মৃত্যু হইয়াছে? আমি তাহা কিরূপে জানিব?"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তবে কি মৃত ব্যক্তি সত্যই কার্ণ, অন্ত কেহ নহে?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার ত সেইরূপই ধারণা।"

অনন্তর তিনি ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "ওয়াইল্ড, তুমি গত রাত্রে কার্ণের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলে। সেখানে রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল। তোমার দেহের শক্তি অসাধারণ; সুতরাং সেই যুদ্ধে তুমি যে জয়লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহার পর তুমি যে সাজানো প্রমাণ রাখিয়াছিলে, তাহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তুমি স্বয়ং নিহত হইয়াছিলে, এবং কার্ণ তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। তুমি তোমার জোগাড়-যন্ত্র শেষ করিয়া কার্ণের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে, এবং সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্তেই তাহা দখল করিয়া বসিয়া ছিলে!"

স্মিথ বলিল, "আশ্চর্য্য! এই সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে নাই!"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "কিরূপে তোমার মাথায় আসিবে? তুমি গোয়েন্দাগিরিতে মিঃ ব্লেকের সাকরেদী করিলেও কোনও দিন কি প্রখর কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছ?"

ব্লেক বলিলেন, "এ সকল বিষয় সম্বন্ধে উপর উপর আলোচনা শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! যাহা হউক, তুমি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নাই ওয়াইল্ড! যদি আমার প্রশ্নে তুমি মনে আঘাত পাইয়া থাক, তাহা অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়,—কিন্তু—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমি কার্ণকে হত্যা করিয়াছি কি না—ইহাই যদি আপনার প্রশ্ন হয়,—তাহা হইলে আমার সুস্পষ্ট উত্তর এই যে,—আমি কার্ণকে হত্যা করি নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "তবে কি তোমার সহিত যুদ্ধে সে হঠাৎ নিহত হইয়াছিল?"

ওয়াইল্ড বলিল, "ধীরে, মিঃ ব্লেক, ধীরে! এখানে কিছু বিভ্রাট ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনি যথেষ্ট সতর্ক না হইলে সেই ব্যাপারের সহিত আমাকে জড়াইয়া ফেলিবেন! মিঃ ব্লেক, আপনার কি ধারণা, কার্ণের মৃত্যু হইয়াছে? অথবা তাহার মৃত্যুর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার ধারণা, তুমি গত রাত্রে কার্ণের বাড়ীতে

গমন করিয়াছিলে, তাহার পর যে কারণেই হউক, তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তুমি তাহার মৃতদেহ ঐ মাঠে লইয়া-গিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলে, যেন বজ্রাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়! এতদ্ভিন্ন, মৃত ব্যক্তি যে তুমিই, এইরূপ ভ্রম জন্মাইবারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি যাহাতে নির্বিঘ্নে মরিতে পারি—এইরূপই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর। তোমার কার্য্য-সূচির ঐ পর্য্যন্ত শেষ করিয়া তুমি কার্ণের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলে এবং তাহার ঘরটি অধিকার করিয়াছিলে। তাহার পর আজ সকালে তুমি বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলে। সেই সময় তোমার ব্যবহারে কার্ণের বাগানের মালিকেও প্রতারিত হইতে হইয়াছিল।"

ওয়াইল্ড তাহার মুখের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা ফেলিয়া-দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ব্লেককে বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমি আপনাকে পরাস্ত করিয়া অহঙ্কার গর্ব্ব প্রকাশ করিতে চাহি না; কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই ব্যাপারে আপনাকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই ভুল করিয়া আসিয়াছেন। আপনার যুক্তি অভ্রান্ত হইলেও কার্য্যতঃ আপনি ভ্রম করিয়াছেন!—কার্ণের সত্যই মৃত্যু হয় নাই।"

ব্লেক বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তাহার মৃত্যু হয় নাই! তুমি বলিতেছ কি?"

ওয়াইল্ড দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ, আমি ঠিকই বলিয়াছি, তাহার মৃত্যু হয় নাই। আজ সকালে তাহার বাড়ীতে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; বিশেষতঃ, তাহার বাগানের মালির সহিত এই ব্যাপারের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমার অজ্ঞাত। তবে সে যদি বলিয়া থাকে—সেই সময় সে কার্ণকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা হইলে সে সত্যই তাহাকে দেখিয়াছিল। সে নিশ্চিতই আমাকে দেখিতে পায় নাই, কারণ, সেই সময় আমি কার্ণের বাড়ীর কাছেও ছিলাম না।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে সেই মৃতদেহটা?"

ওয়াইল্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে বেচারাকে আমি চিনি না।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার—সেই ব্যক্তি সাইমন কার্ণ নহে?"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, ঐ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; সে সত্যই সাইমন কার্ণ নহে। আপনার জানিবার আগ্রহ হইলে সকল ব্যাপার আদ্যোপান্ত আপনাকে খুলিয়া বলিতে পারি। আর সত্য কথা বলিতে কি, আপনাকে তাহা বলিবার জন্যই আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়াছিলাম, এবং আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও টেলিফোনে আমি আপনার নাম ব্যবহার করিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক! বলা বাহুল্য, টেলিফোনে আমি আপনার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়াছিলাম। আমি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে ডাকিয়া তাঁহার সাড়া পাইয়াছিলাম। তাহার পর শুনিলাম, কার্ণ পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তাহা আমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই অগত্যা আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে।"

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "ইহা আমারও ধারণার অতীত; আমার মাথা ঘুরিতেছে!"

ব্লেক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "তোমার মতলবটা কি বল—শুনি। আমি তোমাকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম; এই ভ্রমের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু শেষে আমার মনে হইয়াছিল, মৃত্যুটা প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক—দৈবাৎ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে আমার নির্ম্মিত তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে!"

ওয়াইল্ড বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "সময়ে সময়ে আমাদের সকলেরই ভ্রম হইয়া থাকে; এমন কি, রবার্ট ব্লেকের ন্যায় বহুদর্শী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ভুল করিয়া বসেন! কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—আপনি ভ্রমজালে বিজড়িত হইলেও অবশেষে বুদ্ধিমানের মত তাহা চাপা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সবই শেষে চাপা দিতে পারিলাম কৈ? অনেক ভুলই চাপা দিতে পারি নাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার শুনিবার ইচ্ছা থাকিলে এই কাহিনীর আগাগোড়া আপনাকে শুনাইতে পারি,—আর সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি—এ কথা ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। আমার কথাগুলি সব শুনিলেই আপনার সকল ভ্রম দূর হইবে; তবে মোটামুটি এই মাত্র বলিতে পারি যে, সাইমন কার্ণকে মুঠায় পূরিব—ইহাই আমার সঙ্কল্প—সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা যতই কঠিন হউক। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি তাহাকে কায়দায় পাইয়াছি; কিন্তু সেই ধূর্ত্তটা আমাকে ফাঁকি দিয়াছিল! আমার ধারণা হইয়াছিল, পুলিশ তাহাকে হাতে পাইবে না। আমাকে হত্যা করিবার অভিযোগে পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করিয়াছে—তাহা কি আপনি জানেন না? কিন্তু সে যাহাই হউক, পুলিশ কখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না; তবে আমরা যে তাহাকে ধরিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনার পূর্ব্বে তোমার গল্পটার আগাগোড়া শুনিতে চাই। এই ব্যাপারে আমাদের মিশিবার ইচ্ছা নাই।"

স্মিথ বলিল, "মিশিবার কথা কি বলিতেছেন? রহস্য-পাথারে পড়িয়া আমি যে ডুবিয়া মরি! একগাছা দড়ি ফেলিয়া দিন কর্ত্তা। তাহাই ধরিয়া কূলে উঠিবার চেষ্টা করি।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আর্থিক বৈশিষ্ট্য

বর্ত্তমান যুগের এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে ; ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন যুদ্ধে ঠিক এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নাই। সকল বৈশিষ্ট্যের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে ; এই যুদ্ধে এ দেশের লোকের অর্থকষ্ট কিরূপ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, এখানে তাহারই আলোচনা করিব। ঐ কষ্ট ক্রমশঃ চরমে উঠিয়াছে। সর্ব্বপ্রধান কষ্ট এই যে, যে দুইটি দ্রব্য মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহারই অত্যন্ত অভাব,—অন্ততঃ অনেকের পক্ষে উহাদের অতি উৎকট অভাব অনুভূত হইতেছে। বলা বাহুল্য, সেই দুইটি দ্রব্য—অন্ন ও বস্ত্র। এই দুইটি জিনিসের এমন অভাব—সৃষ্টির আদি-কাল হইতে এ পর্য্যন্ত আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ দেশে খাদ্যশস্যের কিরূপ অভাব হইয়াছে, পূর্ব্বে বহু বার সে কথা আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন জিনিসের প্রকৃত অভাব না হইলেও জনসাধারণ তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বাজারে তাহার আমদানী হইলেও যেন হঠাৎ লোপ পাইতেছে! উদাহরণস্বরূপ চিনির কথা বলা যাইতে পারে। চিনি যাহা আমদানী হইতেছে, তাহা মিলিতেছে না। ক্রেতারা পয়সা হাতে লইয়া, যেন ভিক্ষাপাত্র-ধারী ভিখারীর মত সরবরাহকারী দোকানদারের দোকানের সম্মুখে 'হা প্রত্যাশায়' দাঁড়াইয়া আছে! বালক ও কিশোররা দিন দিন জিনিস না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যাইতেছে। পর্দ্দানশীন বিধবা, সামর্থ্যহীন আতুর প্রভৃতির পক্ষে চিনি সংগ্রহ করা ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কেরোসিন তেল সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায় ; তবে কেরোসিনের সত্যই অভাব হইয়াছে। কেরোসিন তেল এ দেশে আমদানী হইবার পূর্ব্বে লোক প্রদীপে সর্ষপ বা রেড়ির তেল জ্বালাইত ; এখন তাহাই বা মিলিতেছে কৈ? বাজারে কোন জিনিস আমদানী হইলেও তাহা মিলিতেছে না!—সেই জন্য এবারকার এই বাজার "আঁধারে বাজার" (Black market) নামে অভিহিত হইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে, খরিদদারের 'গলা-কাটা' ব্যবসায়ীরা বাজারের সমস্ত মালই সাফাই হাতে চাপিয়া রাখিতেছে, বাহির করিতেছে না। উহারা ভবিষ্যতে আরও চড়া-দরে মাল বেচিয়া লক্ষপতি হইবার সুখস্বপ্নে বিভোর! সরকার ইহার প্রতিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া অযোগ্যতারই পরিচয় দিতেছেন ; কিন্তু এই অব্যবস্থা গরীব গৃহস্থের পক্ষে প্রাণান্তকর।

এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পণ্যের একমাত্র উপাদানের অভাব না হইলেও তাহা হইতে উৎপন্ন পণ্য প্রায় অপ্রাপ্য বা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। দেশের মাটি নিহত বীরপুরুষদের কবর ঢাকিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত না হইলেও মেটে-হাঁড়ি-কলসীর মূল্য অসঙ্গত ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে! অন্য উদাহরণস্বরূপ বস্ত্রের কথাও বলা যাইতে পারে। কার্পাসের দর যদিও চড়ে নাই, তথাপি কাপড়ের দর তিন গুণ বা চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। সরকারের কল্পিত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' কল্পলোক হইতে এই মর্ত্তধামে আর অবতরণ করিল না। কাপড়ে আছে তুলা আর মজুরী ; এই মজুরীর হার অবশ্যই বাড়িয়াছে, কিন্তু এত অধিক বাড়ে নাই—যে, সে জন্য কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ চারি গুণ বাড়িতে পারে। কার্পাসের দর বরং মধ্যে কমিয়াছিল, এখন ত প্রায় সমান আছে। বিশেষজ্ঞদিগের প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে কার্পাস তুলার দর যাহা ছিল, তাহার শঙ্কু-সংখ্যা (Index number) যদি এক শত ধরা হয়, তাহা হইলে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উহার পাইকারী দর ৮৮ টাকা হইয়াছিল ; অর্থাৎ শতকরা বারো টাকা হারে কার্পাস তুলার দর কমিয়া গিয়াছিল! ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঐ তুলার দর আরও নামিয়া ৬৭ টাকা দাঁড়ায় ; অর্থাৎ শতকরা ৩৩ অংশ কমিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা কার্পাস তুলার পাইকারী দর। তুলা উৎপাদনকারী কৃষকরা এবং তাহাদের দেশের লোকরা এক দিকে তুলা বিকাইতেছে না বলিয়া কাঁদিয়াছে, আর এক দিকে বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব মনে করিয়াছে! ইহার পর কার্পাস তুলার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত জুলাই মাসে (আষাঢ় শ্রাবণ মাসে) তুলার শঙ্কু-সংখ্যা ১০৪এর অঙ্কে উঠে ; অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তুলার যে দর ছিল প্রায় তাহাই হয়, কেবলমাত্র শতকরা ৪ টাকা-হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কাপড়ের দর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। কার্পাস-তুলা উৎপাদক চাষীরা যে পরিমাণ কার্পাস-তুলা (পাইকারী দরে) বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বে এক জোড়া কাপড় কিনিতে পারিত, এখন তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ তুলা বেচিয়াও এক জোড়া কাপড় কিনিতে পারিতেছে না! অবশ্য তাহাকে খুচরা দরেই কাপড় কিনিতে হয় ; সুতরাং তাহাদের কষ্ট কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে এই একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে সকল জিনিসের মূল্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কেবল কার্পাস-তুলা এবং পাটের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কার্পাস-তুলার মূল্যহ্রাসের প্রধান কারণ, বিদেশে এই পণ্যের রপ্তানীর হ্রাস। এই তিন বৎসরে উহার রপ্তানী কিরূপ হ্রাস হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

খৃষ্টাব্দ	রপ্তানীর পরিমাণ
১৯৩৯—৪০	২৯,৩৮,০০০, গাঁইট
১৯৪০—৪১	২১,৬৭,০০০ "
১৯৪১—৪২	১৪,৯৬,০০০ "

রপ্তানীর অসুবিধা এবং অভাবের জন্য পাটের দরও কমিয়াছে—এ স্থলে সে কথা আলোচ্য নহে।

যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে এ দেশে বস্ত্র আমদানী হইতেছে না সত্য, কিন্তু দেশীয় কলে অনেক অধিক বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহারও হিসাব উদ্ধৃত হইল,—

খৃষ্টাব্দ	কত গজ কাপড় বোনা হইয়াছে
১৯৩৯—১৯৪০	৪০১ কোটি ২৪ লক্ষ গজ
১৯৪০—১৯৪১	৪২৬ কোটি ৯০ লক্ষ গজ
১৯৪১—১৯৪২	৪৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ গজ

যুদ্ধের গত তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসরে প্রায় সাড়ে ৪৫ কোটি গজ কাপড় ভারতীয় কলে অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল মাত্র বোম্বাইয়ের কলগুলিতেই কত অধিক কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দেখুন।—ঐ সকল কলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ১২০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ১৫০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়া'ছ। সূতার উৎপত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। য়ুরোপীয় যুদ্ধ ঘোষণার কিছুকাল পর হইতে বোম্বাইয়ের কার্পাস-কলে ৩১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সূতা হইত, জাপানী-যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সময় পর্যন্ত ৪৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (ওজন) পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হইতে থাকে। সুতরাং ভারতীয় কার্পাসকলগুলির ঔদাসীন্য নাই; কিন্তু তাহারা সমস্ত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহার কারণ, ভারত-বাসীরা ইদানীং লজ্জা-নিবারণ বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। জাপান এবং বিলাত হইতে আনীত বস্ত্র দ্বারাই তাহাদিগকে নগ্নদেহ আবৃত করিতে হইত। এখন বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ হওয়াতেই আমাদের এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। শুনিতেছি, উড়িষ্যা অঞ্চলে বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ বস্ত্রাভাব ঘটে নাই। কারণ, উহার কোন কোন অঞ্চলে এখনও লোক চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত করে; কিন্তু বাঙ্গালা এ বিষয়ে একেবারে অসহায় বলিলেও চলে।

চাহিদার টান যে যোগানের মাত্রাকে ছাড়াইয়া যাইবে, তাহা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগেই কতকটা বুঝা গিয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরাও বুঝিয়াছিলেন যে, যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ দেশে বস্ত্রাভাব ঘটিবেই; বস্তুতঃ, বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—লোকের নিদারুণ কষ্ট হইবে। সেই জন্য ভারত সরকারের তদানীন্তন বাণিজ্যসচিব সার এ রামস্বামী মুদেলিয়ার ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন। তিনি বলেন, কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে; কারণ, ভারতে প্রায় ৫ শত প্রকার বস্ত্র প্রচলিত আছে, ঐ সমস্ত বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কিছু না করিলে ত চলিতে পারে না। অগত্যা কার্পাস-বয়নসমিতি এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তারা গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে এক পরামর্শসমিতি গঠন করিয়া স্থির করিলেন—সমস্ত কার্পাস-কলের কর্ত্তারা সকল প্রদেশের জন্য ঠিক একই প্রকারের কাপড় প্রস্তুত করিবেন, এবং সেই কাপড় সরকারের নির্দ্দিষ্ট দরে সকলকে বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। সার রামস্বামী বলিয়াছিলেন, উহা না করিলে আর রক্ষা নাই! এখন সমস্ত কলওয়ালারা উহাতে সম্মত হইলেই হইল। উহার বণ্টনাদির ব্যবস্থা সমস্তই কলওয়ালাদিগের হাতে থাকিবে। ইহারই নাম হইবে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' বা সরকারের বাঁধা নিরিখমত কাপড়, সাধারণের কথায় 'নিরিখী কাপড়'। বোম্বাইয়ের সভার ঠিক এক মাস পরেই দিল্লীতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-পরামর্শ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়। ঐ সভায় কাপড়ের কলওয়ালারাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত এস্, সি, ঘোষ বঙ্গীয় কার্পাস-কলওয়ালাদিগের পক্ষ হইতে ঐ পরিষদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ 'ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়' একই মূল্যে বিক্রয় করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, একই নিরিখ-বাঁধা দরে কাপড় বিক্রয় করিতে হইলে সকল কলওয়ালাকে একই দরে কার্পাস তুলা, কলের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি—সমস্তই দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল কলে কেবল কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদিগের সকলকে একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সূতা দিতে হইবে। বাঙ্গালার কলগুলিতে কেবল মিহি-কাপড় বুনিবারই ব্যবস্থা আছে,—মোটা কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা নাই; সুতরাং একটা নির্দ্দিষ্ট দরে ঐ কাপড় বিক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে না।

তাহার পর হইতে কাপড়ের মূল্য অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে সকল কথার আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সরকার অবশ্য অল্পমূল্যে বস্ত্র যোগাইবার জন্য মিলওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফল কিছুই দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় কার্পাস-কলের যে অবস্থা, তাহাতে সকলকে বস্ত্র যোগান অসম্ভব। সর্ব্বাগ্রে সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে সামরিক প্রয়োজনের কাজগুলি করিতে হইবে। এখন সমরাঙ্গনের সৈনিকদিগের অনেক সাজ-পোষাক ভারতীয় কলগুলিতে প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত জুন মাস পর্য্যন্ত ভারত হইতে সরকার ১ শত ২০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় কিনিয়াছেন, আর বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারা ৭০ কোটি টাকার সামরিক পরিচ্ছদের কাপড়-চোপড় কিনিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রতি মাসে ১ কোটি করিয়া পোষাক প্রস্তুত হইতেছে। এখন এক লক্ষ দরজীই পোষাক-সেলাইয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই সমস্ত কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় কলওয়ালারা আর এত অধিক পণ্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না,—যাহা হইতে তাহারা ঘরের এবং বাহিরের জন্য সমস্ত চাহিদা মিটাইতে পারে। এ দিকে সমুদ্র-পথ বিঘ্নসঙ্কুল, এবং জাপান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ায় এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতজাত কার্পাস-বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ আরও কত দিন চলিবে এখন তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে আরও এক বৎসর চলিবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, সুতরাং আর এক বৎসর যে বস্ত্রসমস্যার বিশেষ সমাধান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

কিন্তু কেবল যোগান (supply) এবং টানের (demand) সাম্যনাশই যে বস্ত্র-বিভ্রাটের একমাত্র হেতু, এরূপ মনে হয় না। তবে উহা যে একটা প্রবল হেতু, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। হেতুর উহা দশ আনা অংশ হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত অংশই নহে। কারণ, কেবল কার্পাস তুলা আর পাট ভিন্ন আর সকল পণ্যেরই দাম অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। মফস্বলে যেখানে তরিতরকারী উৎপন্ন হয়, সেখানে বেগুন, শাকসব্জী প্রভৃতির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে তথায় বেগুন দুই পয়সা সের বিকাইত; এখন উহা দশ পয়সা, তিন আনা সের বিকাইতেছে! খুব কম হইলেও দুই আনা সেরের নীচে নামিতেছে না। ঝিঙ্গে, ঢেঁড়স, সোঁদাকচু, এ সব ত আর যুদ্ধে যাইতেছে না; অন্ততঃ আমাদের এখান হইতে

চালান যাইতেছে না,—ইহা সত্য। কিন্তু তথাপি উহা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় চতুর্গুণ মূল্যে, কখন বা ছয় গুণ মূল্যে বিকাইতেছে কেন? যুদ্ধই উহার প্রত্যক্ষ কারণ নহে। মুদ্রামূল্যের হ্রাসই উহার আর একটি প্রবল কারণ। যখন সকল জিনিষেরই দর চড়ে, তখন বুঝিতে হইবে মুদ্রার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এই মুদ্রামূল্য কমিল কেন? যে দিন য়ুরোপে যুদ্ধ বাধে, সেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতে সর্ব্বসাকল্যে ১৮২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ইহার পর দুই বৎসর পরে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি ৩০২ কোটি টাকার নোট চলিত হইয়াছিল। তাহার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ তারিখে ৪৬৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার নোট ভারতের বাজারে বাহির করা হইয়াছে। ইহার পরও বাজারে নূতন নূতন নোট বাহির করা হইতেছে। এখন অক্টোবর মাসের শেষে ৫ শত ২৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার নোট ভারতে চলিতেছে। যুদ্ধের সময় তাহাতে সুবিধা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইদানীং খুজরা মুদ্রাও (আধ আনি, এক আনি, দু-আনি) সবই ভড়ং ধাতুর হইয়াছে। উহার আসল মূল্যের সহিত বাজার-প্রচলিত মূল্যের কোন সম্বন্ধ নাই। উহার আসল মূল্য নাই বলিলেও চলে। সিকি আধুলি ও টাকায় কিছু রূপা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এখন উহাতে রূপার পরিমাণ অল্প দেওয়া হইতেছে। কাজেই ইহারা সবগুলিই ভাক্ত মুদ্রা হইয়া পড়িয়াছে। অত্যধিক নোটের প্রচলন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে। দুর্মূল্যতার ইহাও একটি প্রবল কারণ। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুরীর হার এবং পণ্য প্রস্তুতের উপকরণ এবং যন্ত্রাদির মূল্য বাড়িয়া যায়। বস্ত্র প্রস্তুতের সেই জন্য খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধে ঠেকিয়া শিখিয়া বার্ত্তাবিশারদরা বার্ত্তাশাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত করিতেছেন। এখন বার্ত্তিকগণ বলিতেছেন যে, যদি টাকার সুদের হার স্বাভাবিক যেরূপ হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা কম করা হয়, তাহা হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। উইকসেল নামক বার্ত্তাবিশারদ এ কথা তাঁহার সন্দর্ভে বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন! আর যদি টাকার সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পণ্যমূল্য কমিয়া যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ "থ্রী পারসেণ্ট" যুদ্ধ নামে অভিহিত; কারণ, সরকার এবার টাকার সুদের হার শতকরা তিন টাকার অধিক হইতে দেন নাই। কাজেই পণ্যমূল্য বাড়িয়াছে। বিলাতে টাকার সুদের হার সরকার শতকরা আড়াই টাকা হারে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যুদ্ধের সময় তথায় ঐ সুদের হার আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল। ইহাও মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাহার উপর যুদ্ধের ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সরকারের কল্পলোকের "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" বা নিরিখী কাপড় মর্ত্ত্যলোকে আকার লাভ করিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, আর যদিও উহা মূর্ত্তিমান হইয়া আসে, তাহা হইলেও তাহার সেই মূর্ত্তি এবং মূল্য গৌড়বাসীর লোভনীয় হইবে না। গত চৈত্র মাসে ও বৈশাখ মাসে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, অতি মোটা সূতার ৯ হাতী ধুতির মূল্য হইবে দুই টাকা পাঁচ আনা আর ৪৪ ইঞ্চি বহর দশ হাতী ধুতির দাম হইবে দুই টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা। এখন শুনিতেছি, ঐ দরে মিলওয়ালারা ঐ কাপড় যোগাইতে পারিবেন না। কারণ, সকল জিনিষের মূল্য দিন দিনই চড়িয়া যাইতেছে। অত মোটা সূতার কাপড় বঙ্গদেশের লোক পরিতে অভ্যস্ত নহে। উড়িষ্যার গ্রাম্যলোকেরা ঐরূপ কাপড় কিছুকাল পূর্ব্বে পরিত, এখন ত তাহা প্রায় পরিতে দেখা যায় না। বাঙ্গালী চাষীরা এখন ভদ্রলোক অপেক্ষা অধিক সৌখীন হইয়াছে। কাজেই এই দরিদ্র দেশের অধিকতর দারিদ্র্যপীড়িত লোক, এই কাপড় বিশেষ পছন্দ করিবে না,—উহার সরবরাহও যে অধিক হইবে, তাহাও মনে হয় না। যাহা হউক, নমুনা স্বরূপ কিছু কাপড় বাহির করিলেও বুঝা যাইত।

এখন কিরূপে এই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে? লোক ত দিগম্বর হইয়া থাকিতে পারে না! বরং এক দিন অনাহারে থাকা চলে, কিন্তু উলঙ্গ অবস্থায় থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব! কলগুলি আর অধিক সূতা কাটিতে বা কাপড় বুনিতে পারিবে না। সরকার যে কোন চেষ্টাই করিতেছেন না, এ কথা বলা যায় না; তবে তাঁহারা সামরিক প্রয়োজনের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি করিতে বাধ্য; অধিক সূতা প্রস্তুত করিতে হইলে মিলওয়ালাদিগকে বিদেশ হইতে কলের টেকো আমদানী করিতে হইবে; কিন্তু সাগরপথ বিঘ্নসঙ্কুল, তাহার উপর পণ্যমূল্য অত্যন্ত অধিক। এতদ্ভিন্ন যানবাহনের অভাবে এবং অসুবিধায় তুলা পাওয়া কঠিন। এই অবস্থায় টেকো ও যন্ত্রপাতি অত্যধিক মূল্যে আমদানী করা কলওয়ালারা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছে না। বিশেষতঃ, অনেকেরই বিশ্বাস, হয় ত যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ সকল টেকো অচল হইয়া পড়িবে। সেই জন্য কলওয়ালাদিগের পক্ষে এদেশী তাঁতিদিগকে অধিক সূতা যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

এখন একমাত্র উপায় এ দেশের তাঁতি, জোলা প্রভৃতি যদি চরকায় সূতা কাটিয়া সেই সূতায় কাপড় বুনিতে পারে, তাহা হইলেই কতকটা সুবিধা হইতে পারে। কার্পাসের পাইকারী দর গত আগষ্ট মাসেও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের কার্পাস তুলার দরের সমান ছিল। এখন কিছু বাড়িয়াছে। এখন কাপড়ের মূল্য যেরূপ অধিক, তাহাতে তাঁতিরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন করিয়া লাভবান হইত পারিবে এরূপ আশা করা যায়। তাহাদের যন্ত্রাদি-বাবদ ব্যয় অধিক নহে; উহা দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে সরকারকে কেবল তাহাদিগকে সুলভে তুলা কিনিবার সুবিধা করিয়া দিতে হয়। তুলা না পাইলে তাহারা সূতা কাটিবে কিরূপে? এই সুলভ তুলায় যদি তাহারা ৯ গজ দীর্ঘ ও ৪০ ইঞ্চি বহরের এক জোড়া ধুতি, এবং দশ গজ দীর্ঘ ও ৪২ ইঞ্চি প্রস্থ এক এক জোড়া সাড়ি বয়ন করে, তাহা হইলে খানিক সুবিধা হইতেও পারে। এখন দূরদেশ হইতে তুলার আমদানী করিয়া এ দেশের তাঁতি ও জোলাদিগের পক্ষে কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা অসম্ভব। বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, এ কথা পূর্ব্বে একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে; এরূপ করিলে আজ এত অধিক কষ্ট পাইতে হইত না।

এ কথা সত্য যে, কার্পাসজাত পণ্যের মূল্য ইদানীং যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এত আর কোন পণ্যের মূল্যই বৃদ্ধি পায় নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, 'ক্যাপিটালের' প্রদত্ত শঙ্কসংখ্যার তালিকায় গত মার্চ্চ মাসের পর বস্ত্রের মূল্য কিরূপ আনুপাতিক হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আর প্রদত্ত হয় নাই। কেবল লেখা হইয়াছে যে, উহার

আনুপাতিক মূল্য জানিতে পারা যাইতেছে না। ইহার কারণ, ঐ মূল্য অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেই জন্যই সম্ভবতঃ উহা প্রকাশ করা হয় নাই! ধান, চাউল, গম, ময়দা, আটা প্রভৃতির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে; খুচরা কিনিতে গেলে বরং আরও বেশী দিতে হয়। বলিয়াছি, তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। চিনির দরও প্রায় তিন গুণ। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধে গরিব লোকের জীবনধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। শুধু মূল্য-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইবে না; তবে শুনা যাইতেছে যে, গত ১৭ই অক্টোবর অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১৫ হাজার টন গম ভারতে আমদানী হইয়াছে। আরও অধিক খাদ্যশস্য আমদানী হইবে। তাহা হইলে খাদ্যাভাবের কষ্ট যে কতকটা দূর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই যুদ্ধে দরিদ্র লোকরা অধিকতর নিষ্পিষ্ট হইতেছে। যাহাদের আয় অতি অল্প, যাহারা অল্প পেন্সন পায়, যাহারা সামান্য অর্থানুকূল্যের জন্য পরের উপর নির্ভরশীল, যাহারা অতি অল্প জমিতে চাষ করে, যাহারা দুঃস্থ, বিপন্ন এবং রুগ্ন, যাহারা সাহিত্যসেবী বা বেকার, যাহারা অতি অল্প ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করে, যাহারা দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে—তাহাদের দুঃখের সীমা নাই। এক কথায়, এই যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা কোন প্রকারে দিনপাত করিত, এখন তাহাদিগকে প্রায় প্রতিদিনই 'হরিবাসর' করিতে হইতেছে! যাহাদের কিছু সংস্থান আছে বা কিছু টাকা বাঁচে, তাহারা সরকারী রাজ্যরক্ষা ঋণ-ভাণ্ডারে তাহা ন্যস্ত করিয়া সুদ বাবদ কিছু টাকা পাইবার আশা করিতেছে; কিন্তু সেই সুদের টাকা যোগাইবে কাহারা? সকলকেই তাহা দিতে হইবে, অতি-দরিদ্রও অব্যাহতি পাইবে না। অবশ্য, পরোক্ষ কর-রূপেই তাহা সংগৃহীত হইবে। ফলতঃ, গরিবদিগকেই এই যুদ্ধের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইবে। অধ্যাপক পিগু সম্প্রতি The Political Economy of War নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। টাকার বাজারে টানাটানি নাই,—অধিকাংশ ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতেছে। কেবল সারস্বত-বৃত্তিতেই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিতেছে।

এই যুদ্ধে গরিব লোকের আর একটি ঘোর অসুবিধা হইয়াছে, উহা পয়সার অভাব। গরিব লোক অনেক জিনিস এক পয়সা মূল্যে ক্রয় করে, যথা—শাক, থোড়, ডুমুর, লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি। কিন্তু তাহাদের পক্ষে উহা ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! যাহারা ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদেরও দারুণ অসুবিধা ঘটিয়াছে। তামার পয়সার তিরোধানের সঙ্গে সরকার অন্য কোন ধাতুর এক-পয়সা ও আধ-পয়সা কেন বাহির করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই ঘোর দরিদ্র দেশে ক্ষুদ্র মুদ্রার অনাটন হইলে গরিবেরই যে প্রাণান্ত ঘটে, সরকার এখনও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না? এই কারণে দরিদ্র লোকের কষ্ট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ, এই যুদ্ধের আর্থিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এ দেশের গরিব লোকের প্রাণান্তকর কষ্ট হইতেছে। তিন পয়সার ডাক-টিকিট কিনিবারও উপায় নাই। মফস্বলে পয়সার অভাবে লোকের যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু এ কষ্ট তাহারা আর কত দিন সহ্য করিবে? এ বিষয়ে সরকারের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

স্মৃতি

আশ্বিনে আজ মহামায়ার আগমনীর গানে
বিষাদ-করুণ একটি স্মৃতি জাগছে আমার প্রাণে!

পড়ছে মনে, হাসিমাখা একটি কচি মুখ,
অন্তরে আজ নূতন করে জাগছে যেন দুখ!
একটি ছোট ছেলে হেথায় হারিয়ে গেছে কবে—
হাজার দীপের একটি শিখা, হঠাৎ গেছে নিবে!
সুরে বাঁধা স্বর্ণ-বীণার ছিঁড়েছে হায় তার—
ছিঁড়ে গেছে বিনিসুতার পারিজাতের হার!
এইখানে, এই ছাদের 'পরে তাহার খেলা-ঘর—
পুতুলগুলো ছড়িয়ে আছে ধুলো-মাটির 'পর।

জামা-কাপড় থরে থরে সাজানো রয় সবি—
দেওয়ালে তার হাসি-ভরা কচি-মুখের ছবি!
জুতো জোড়া আজও আছে পায়ের ধুলো মেখে,
সে গিয়েছে; চিহ্ন শত চারি পাশে রেখে!
আসনখানি আজও বহে তারই নামের স্মৃতি,
পোষা পাখী নাম ধরে' তার, আজও ডাকে নিতি!
আজো মা তার ডাক্‌ছে কেঁদে—"খোকন ফিরে আয়!"
কোথায় খোকন? প্রতিধ্বনি শূন্যে কেঁদে যায়!

শ্রীঅমিতা দেবী
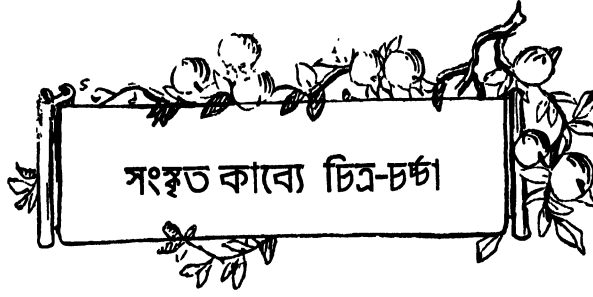
সংস্কৃত কাব্যে চিত্র-চর্চা

অতীত যুগে সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে বাগ্‌দেবীর অর্চনায় যেমন বহুবিধ কাব্যকুসুমের প্রয়োজন অনুভূত হইত, তেমনই বিচিত্র চিত্র-আলিপনার কল্পনাও সমাদৃত ছিল। কাব্য ও চিত্র—কলাশাস্ত্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া চিরদিন সুধীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু এরূপও দেখা যায় যে, কখনও উভয়টি একত্র মিলিত হইয়া বাণীপূজার এক অভিনব উপকরণ-মধ্যে গণিত হইয়াছে।

কবি হইলে যে চিত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না; অথবা চিত্রকলায় কুশল হইলে যে তাহাকে কাব্য রচনা করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নাই, বরং অকবি—চিত্রকরের এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কবির সংখ্যাই অধিক। তথাপি উভয়বিধ কলাবিদের চিত্তভূমিগত একটা সৌসাদৃশ্য আছে। বর্ণ ও ছন্দোময় ভাবাভিব্যক্তি হইতেই কাব্যের বিকাশ, রঙ্গ ও রেখাময় ভাবস্ফুরণ হইতে চিত্র-পরিকল্পনা। উভয়েরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি।

চিত্ত-ভূমি হইতে ভাবের বিকাশ হয় বহু মুখে। যেমন স্বরগ্রাম সংযোগে ভাব বিশেষের উদয় হয়—সঙ্গীতকলা হইতে, এবং স্পন্দনময় ভাববিলাস হইতে নৃত্য-কলার উদ্ভব; আবার এই নৃত্য-গীত দৃশ্যকাব্য সহ মিলিত হইলে অধিকতর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, তেমনই কাব্যের সহিত চিত্রের, ছন্দোবর্ণময় ভাব বিশেষের সহিত রঙ্গরেখাময় ভাববিলাসের সংমিশ্রণে একটা যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলঙ্কারিকগণ বৈচিত্র্যকেই অলঙ্কার বলিয়াছেন, এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য ও চিত্রের মিলনে যে বৈচিত্র্য অনুভূত হয়, তাহাকে 'চিত্র' অলঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। চিত্র অলঙ্কারের বিশ্বনাথকৃত লক্ষণ এইরূপ যে, 'পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে বর্ণানাং চিত্রমুচ্যতে,'—কবি যদি বর্ণগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে পারেন, যাহাতে পদ্ম—খড়্গ—মুরজ প্রভৃতির আকার উদ্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে চিত্র অলঙ্কার বলে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কেবল বর্ণ সাজাইয়া পদ্মাদির আকার নির্ম্মাণ করা যায় না, তাহার উপর রেখা টানিতেই হইবে। এক একটি কল্পিত আকারের (figure) উপযোগী করিয়া সজ্জিত ছন্দোময় বর্ণগুলির সহিত রেখার মিলনে—এক একটি চিত্র নির্ম্মিত হইবে। এরূপ চিত্র বহুবিধ হইতে পারে, তাহার বিভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি বন্ধ নামে বা চিত্রবন্ধ নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।

এরূপ বর্ণ ও চিত্রের মিলনের চেষ্টা কত দিন হইতে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে, ইহার একটা ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে—সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটা মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কবিতা ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে যে একটা মিতালী আছে—বর্ণ, ছন্দঃ ও রেখার মধ্যে যে পরস্পর সঙ্গতি সম্ভবপর হইতে পারে—কবিচিত্তেও যে চিত্রচর্চ্চার আসন প্রতিষ্ঠিত থাকে—এরূপ একটা তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখা যায় যে, চিত্র নামক অলঙ্কার ব্যতীতও চিত্রকাব্য নামে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর (third class) কাব্য বলিলাম কেন? না—ধ্বনি কাব্য হইল উত্তম কাব্য বা প্রথম শ্রেণীর, আর গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইল মধ্যমকাব্য বা দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর চিত্র কাব্য অধমকাব্য বা তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া উল্লিখিত। এই চিত্রকাব্য ও চিত্র অলঙ্কার যে এক নহে, ইহা অনেক আলঙ্কারিকের মত।

আবার কেহ কেহ—চিত্রকাব্য মধ্যেই 'চিত্র' অলঙ্কার পরিগণিত করিয়াছেন। ধ্বনি কাব্যের উৎকর্ষ এই কারণে যে, ইহা পাঠ মাত্রে শব্দসমূহের একটা সাধারণ অর্থ প্রতীত হইবার পর ব্যঞ্জনা শক্তিবলে অন্য একটি সুসঙ্গত সুন্দর

অর্থ প্রকাশি

সাধু প্রায়ই

প্রান্তে একটি

উদ্যান হইতে

—প্রণয়ীর গমনে বাধা হইত, এইজন্য সেই নারী প্রথমে একটা কুকুর রাখিল। সাধুকে দেখিবামাত্র কুকুর চীৎকার করিত, কিন্তু সাধু তাহাতেও ঐ সময়ে পুষ্পচয়ন হইতে নিবৃত্ত হইল না। তখন সেই নারীর ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল—সে একদিন ঐ সাধুকে এই কবিতাটি শুনাইয়া দিল,—

নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রম' উদ্যানমাঝারে
সে কুক্কুর নাই সাধো! মারিয়াছে তারে।
এক তেজী সিংহ; এই গোদাবরী-তটে
গুহায় বসতি করে সে অতি নিকটে॥

কবিতাটি পাঠ করিলে প্রথমে মনে হইবে—সাধুকে উদ্যানে পুষ্পচয়নের জন্য যেন অভ্যর্থনা করা হইতেছে, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, নিকটস্থিত সিংহের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবারই চেষ্টা করা হইতেছে। এই যে দ্বিতীয় অর্থ, ইহাই ধ্বনি; যেখানে এই ধ্বনিই প্রধান—সেই কাব্যের নাম ধ্বনিকাব্য। আবার ধ্বনি গৌণ হইয়া যেখানে বাচ্যার্থ প্রধান হয়, তাহার নাম গুণীভূত ব্যঙ্গ্য; যেমন,—

পল্লীর তরুণ নব অশোক-মঞ্জরী
করে ল'য়ে আসে ঐ তরুণী নেহারি।
থমকি' দাঁড়াল,—তা'র আনন-কমল
মুহূর্ত্তে মলিন কান্তি—হইল শ্যামল।

এই কবিতা শ্রবণে যে সাধারণ অর্থটুকু প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে যে চমৎকারিতা আছে, তদপেক্ষা (ধ্বনি) ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ অস্ফুট, কেন না, এখানকার ধ্বনি হইতেছে যে,—উক্ত তরুণ—ঐ তরুণীকে অশোককুঞ্জে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিলেও তরুণী যায় নাই, তাহার পর হঠাৎ দেখা, তজ্জন্যই তাহার মুখের মালিন্য, এই অর্থটুকু এই কবিতায় অন্তর্নিহিত থাকিলেও তাহা পরিস্ফুট নহে বলিয়া এই জাতীয় কাব্যকে ধ্বনিকাব্য বলা যায় না, ইহাকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই দ্বিবিধ কাব্য ব্যতীত আর এক প্রকার কাব্যের উল্লেখ অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখা যায়—তাহার নাম চিত্রকাব্য।

কাব্যপ্রকাশকার স্পষ্টই বলিয়াছেন,—
'শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যমবরং স্মৃতম্'।

চিত্রকাব্যও দুই শ্রেণির হইতে পারে—(১) শব্দ-চিত্র (২) অর্থচিত্র, কিন্তু ইহাতে ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ থাকে না ও ইহা পরিস্ফুটভাবে অর্থপ্রকাশে অসমর্থ বলিয়া ইহা অধম। শব্দচিত্রের উদাহরণ এইরূপ,—

স্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছকচ্ছকুহরচ্ছাতেতরাম্বুচ্ছটা।
মূর্চ্ছন্মোহমহর্ষিহর্ষবিহিতস্নানাহ্নিকাহ্নায় বঃ।
ভিদ্যাদুদ্যদুদারদর্দ্দুরদরীদীর্ঘাদরিদ্রদ্রুম-
দ্রোহোদ্রেকমহোর্ম্মিমেদুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্॥

(অনুবাদ)

স্বচ্ছন্দে উছলি যার স্বচ্ছবারি অনিবার
কচ্ছগর্ত্তে, ছিটাইয়া কণা।
বিনাশে মহর্ষিমোহ স্নানাহ্নিক হর্ষসহ
সমাপিয়া তাঁরা তৃপ্তমনাঃ।
উদার দর্দ্দুর বিলে পশি 'দীর্ঘা হ'য়ে—বলে
দৃঢ়মূল দ্রুম দ্রোহ করি'।
উর্ম্মিমদে মত্তা যিনি তোমাদের মন্দাকিনী
মন্দ ভাব নাশুন সত্বরি॥

এই কবিতায় আছে শুধু শব্দচ্ছটা—অনুপ্রাসের আড়ম্বর, কিন্তু কোন রস বা ভাবের ব্যঞ্জনা নাই—এজন্য এইরূপ কাব্যের স্থান নিম্নতম।

ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধন বলিযাছেন যে,—
রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি।
অলঙ্কারনিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ।

রস বা ভাবাদি বিষয়ে বিবক্ষা না রাখিয়া যে অলঙ্কার রচনা, তাহাই চিত্রকাব্যের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দের আড়ম্বর বা অর্থের বৈচিত্র্যবহুল কাব্যে যদি রস বা ভাবের উদ্বোধ না হয়, তাহা হইলেই তাহা চিত্রকাব্য মধ্যে গণিত হইবে। এমন কি, যদি শব্দাড়ম্বর অধিক না থাকে, সাধারণ অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার সত্ত্বেও রসের উদ্বোধক না হইলে, তাহাও চিত্র-কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে। ইহার উদাহরণ, যথা,—

বিনির্গতং মানদমাত্মমন্দিরাদ্
ভবত্যুপশ্রুত্য যদৃচ্ছয়াপি যম্।
সসম্ভ্রমেন্দ্রদ্রুতপাতিতার্গলা
নিমীলিতাক্ষীব ভিয়ামরাবতী॥

হয়গ্রীববধ নামক নাটকে হয়গ্রীবের নামে স্বর্গপুরীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে।

(অনুবাদ)

নিজগৃহ হ'তে হ'য়েছে বাহির
যদৃচ্ছাক্রমে সেই দৈত্য বীর।
শুনি, ইন্দ্র নিজে ত্বরায় অর্গল
রুদ্ধ করে, ভয়ে আমরা বিহ্বল॥

ইহাতে অর্থের বৈচিত্র্য আছে সত্য, কিন্তু দৈত্যের যদৃচ্ছাক্রমে বাহির হওয়া বর্ণিত হওয়ায় ইহাতে তাহার কোন বীরত্ব ব্যঞ্জিত হয় নাই। যে কোন কার্য্যের জন্য হয়গ্রীবের গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সহিত যুদ্ধযাত্রার কোন সম্বন্ধ এখানে পাওয়া যায় না, সুতরাং বীররস বা বীররসের স্থায়ী ভাব উৎসাহেরও কোন সূচনা এখানে নাই। একে ত অমরাপুরী অচেতন, তাহার উপর তাহার ভয় বর্ণনা,—তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, অমরাবতীর ভয় এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইলেও শ্রোতৃবৃন্দের তাহা রসবোধের অনুকূল ত' নহেই, প্রত্যুত প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়, অমরাপুরী যে সুখের স্থান বলিয়া সামাজিক শ্রোতৃগণের চিরন্তন সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহার বিরুদ্ধ এই বর্ণনা শ্রবণে রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইয়াই যায়।

নবীন আলঙ্কারিক অপ্পয় দীক্ষিতও তাঁহার চিত্র-মীমাংসা গ্রন্থে কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্রকাব্য; তন্মধ্যে চিত্রকাব্যের স্বরূপ এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

'তদব্যঙ্গ্যমপি চারু তচ্চিত্রম্।'

ব্যঞ্জনাবৃত্তিলভ্য অর্থবিরহিত হইলেও রমণীয় কাব্যই চিত্রকাব্য। তাহাও তিন প্রকার—শব্দচিত্র, অর্থচিত্র ও উভয়চিত্র। শব্দচিত্র বিষয়ে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে,—শব্দচিত্রে প্রায়শঃ নীরস বলিয়া কবিগণ তাহার তেমন সমাদর করেন না, এবং তদ্বিষয়ে বিচারণীয়ও তেমন কিছু নাই, এজন্য শব্দচিত্র অংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্থচিত্র বিষয়ে বিশদ মীমাংসা প্রদর্শন করা যাইতেছে। অতঃপর, উপমা অলঙ্কারকে গ্রহণ করিয়া— সেই উপমাই অন্য বহু অলঙ্কারের মূল—ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ফলতঃ, অর্থচিত্রমধ্যে সমস্ত অলঙ্কারকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপমার অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তদিদং বিশ্বং চিত্রং ব্রহ্মজ্ঞানাদিবোপমাজ্ঞানাৎ।
জ্ঞাতং ভবতীত্যাদৌ নিরূপ্যতে নিখিলভেদসহিতা সা॥

ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যেমন এই বিচিত্র বিশ্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তেমনই এক উপমাজ্ঞান হইতে সমস্ত চিত্রকাব্যের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, এজন্য উপমা ও তাহার সমুদায় অবান্তর ভেদ নিরূপিত হইতেছে। অপ্পয় দীক্ষিতের মতে—প্রধান ও অপ্রধান ভাবে ধ্বনি সম্বন্ধযুক্ত কাব্য ব্যতীত যাবতীয় কবি-রচনা চিত্রকাব্য মধ্যে পরিগণিত। ইহাকে অধম কাব্য বলিয়া তিনি নিন্দা করেন নাই। এ বিষয়ে, কাব্যপ্রকাশকারের সিদ্ধান্ত হইতে ইহার মতবাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'চিত্রমীমাংসা খণ্ডন' নামক গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের মতবাদ ভ্রমপূর্ণ বলিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু, পণ্ডিতরাজের বিচার হইতে ইহা সুস্পষ্ট হয় নাই যে, চিত্রকাব্যের সীমা বিষয়ে তাঁহার কোন মতভেদ আছে। যে চিত্রের প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা, সেই 'চিত্র' অপ্পয় দীক্ষিতের মতে শব্দচিত্র নামক কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার চিত্রকাব্য মধ্যে যে শব্দচিত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত 'চিত্র'কে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। এবং ইহাকে 'চিত্র' অলঙ্কারমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

'তচ্চিত্রং যত্র বর্ণানাং খড়্গাদ্যাকৃতিহেতুতা'

সন্নিবেশ বিশেষে সজ্জিত বর্ণসমূহ—যেখানে খড়্গ, মুরজ, পদ্ম প্রভৃতির আকারকে উদ্ভাসিত করে, তাহাই চিত্র অলঙ্কার। তবে, এরূপ 'চিত্র'কাব্য কষ্টকল্পিত, এজন্য দিগ্‌দর্শনের জন্য অল্প উদাহরণ দেখান হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ—চিত্রকাব্য নামে কোন তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের ভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামে দ্বিবিধ কাব্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শব্দালঙ্কারমধ্যে 'চিত্র' নামক অলঙ্কারকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

কাব্যের এই যে শ্রেণিভেদ বিষয়ে নানা মত দেখা যায়, ইহার হেতু আর কিছুই নহে, সমগ্র ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার বৈচিত্র্য স্বতঃই উদ্ভূত হইয়াছিল—তাহা কাব্যাদর্শ নামক দণ্ডিকৃত অলঙ্কারগ্রন্থ হইতে বেশ অনুমান করা যায়। দণ্ডী স্বয়ং বিদর্ভদেশোদ্ভব ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন—গৌড়দেশের সংস্কৃত ভাষাকে তিনি উপহাস করিয়াছেন। তদানীন্তন কালে (পাণিনি প্রভৃতির অভ্যুদয়ের পর হইতে) সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্য লইয়া বেশ একটা দলাদলি ছিল। গৌড়দেশে সমাসবহুল—ওজোবর্ণময় ভাষার সমাদর ছিল, বিদর্ভদেশে বীররস স্থলেও কোমলবর্ণ ও অল্পসমাসযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত হইত। দণ্ডী বৈদর্ভী ভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ গৌড়ী ভাষার বিকৃত রূপ স্বয়ং রচনা করিয়া লোকসমক্ষে ধরিয়াছেন।

দণ্ডীর প্রভাবে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ প্রভাবিত হইলেও বীররসাদি স্থলে গৌড়ী রীতির যে আবশ্যকতা আছে—তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে, যেখানে রসাদির অনুকূলতা নাই, অথচ আড়ম্বর আছে—সেরূপ কাব্য শুধু গৌড়ী ভাষায় কেন বৈদর্ভী ভাষায়ও থাকিতে পারে, এজন্য শব্দচিত্র ও অর্থচিত্র নামক অধম

কাব্যের শ্রেণিভেদ পরবর্ত্তিকালে স্বীকৃত হইয়াছে। সাহিত্য-দর্পণকার যে এরূপ চিত্রকাব্য স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ, তাঁহার মতে রসই হইল কাব্যের আত্মা, যদি রস না থাকে, তাহা হইলে আত্মসম্বন্ধহীন শবদেহের মনুষ্য নামের মত রসহীন শব্দসমষ্টির কাব্য নাম প্রদান করা একান্ত অসঙ্গত। যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ রসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহা একেবারে 'অব্যঙ্গ্য' ব্যঞ্জনারহিত বলা যায় না, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্য মধ্যেই অন্তর্গত হইবে। বিশেষতঃ কবি জয়দেবের সমাস-বহুল গৌড়ী রীতি সংস্কৃতসাহিত্যে যে অমৃতরস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে গৌড়ীভাষার নিন্দা করিতে তৎপরবর্ত্তী কবি বা আলঙ্কারিকগণ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু দণ্ডীর সময়েও চিত্রকাব্যের বেশ উন্নতি দেখা যায়, যদিও তিনি 'চিত্র' কাব্য এই নামটি ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু শব্দালঙ্কারমধ্যে যমক, গোমূত্রিকাবন্ধ, অর্দ্ধভ্রমক, সর্ব্বতোভদ্র এই কয়টির উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যমকের বাষট্টি প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন এবং তৎপরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগত বৈচিত্র্য লইয়া বহুবিধ উদাহরণ এবং কতিপয় প্রহেলিকা শব্দালঙ্কারমধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি 'চিত্র' অলঙ্কার বলিয়া কোন নাম নির্দ্দেশ না করিলেও—গোমূত্রিকা, অর্দ্ধভ্রমক ও সর্ব্বতোভদ্র এই তিনটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডীর সময়ে পদ্মবন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ, রেখাচিত্রের প্রাথমিক অবস্থা চিন্তা করিলে এই তিন চার প্রকার চিত্রই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এইগুলি সমস্ত সরলরেখার অঙ্কন হইতে উদ্ভূত।

পরবর্ত্তিকালে ক্রমে এই সকল চিত্রবন্ধ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং সরল, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ রেখার আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন মহাকাব্য—কিরাতার্জ্জুনীয় ও ভারবির অনুকরণকারী শিশুপালবধে—দণ্ডীর নির্দ্দিষ্ট চিত্র কয়টির সন্নিবেশ দেখা যায়, শিশুপালবধে—'মুরজবন্ধ'টি কেবল বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাও সরলরেখার অঙ্কন বিশেষমাত্র।

সমজাতীয় বর্ণগুলি একত্র সজ্জিত হইলে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তেমনই মধ্যে মধ্যে রেখার সাহায্য গ্রহণ করিলে যদি সমজাতীয় পদবন্ধ সম্ভবপর হয়, তাহাতেও কবিচিত্ত বৈচিত্র্য অনুভব করিয়াছিলেন। এজন্য বর্ণসজ্জা করিতে করিতেই চিত্রবন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ;—

অনুপ্রাস ও যমকের পরিণতি বিশেষই চিত্রবন্ধ, ইহাই প্রতীত হয়। এই বর্ণের খেলা কতরূপে যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া 'চিত্র' অলঙ্কারের ক্রমবর্দ্ধমান পরিপুষ্টি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ)।

এ কি তব লীলাখেলা

তুমি কৃপাময়ী জননী—এ কথা শুনি শিশুকাল হতে !
কিন্তু দেখি যা চক্ষে, সে-কথা মানি আর কোন্ মতে !
চারি দিকে শুধু ধ্বংসের ছবি—প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
মা বলিয়া ডাকি ! সন্তানে মা'র এতখানি অবহেলা !
শরৎ-প্রভাতে আসিবে জননি, পুলকে ভরিল মন,—
হাস্যময়ীর হাস্য-আভাসে হাসিল কাশের বন !
আসিছে শারদা শুভদা বরদা কণ্ঠে শেফালি-মালা—
আসিলি মা তুই নয়নে ঝটিকা বজ্র-অগ্নি জ্বালা !
কেশপাশে তোর হাজার নাগিনী উদ্যত তার ফণা—
বন্যার ধারা ঝরিল ফণায়,—মরণের ঝঞ্ঝনা !
বন্যায় ধুঁয়ে মুছে গেল মাঠ, ধুয়ে গেল দেশ-গ্রাম !
জীবন-চিহ্ন মুছে গেল সব, মুছে গেল কত প্রাণ !
কোনো মতে মনে সান্ত্বনা রচি ! হয়েছিল কত দোষ—
নির্ম্মম হাতে দিলি মা শাস্তি,—নিবিল মায়ের রোষ !
অভয়-হস্তে আসিবে অভয়া কল্যাণময়ী কালী—
জবা-বিভূষণা মায়ের হস্তে শান্তি-কুসুম-ডালি !
পূজা-মণ্ডপ সুচারু-সাজেতে সাজায় পুলকে সবে !
কত আনন্দে, কত না ছন্দে মাতে পূজা-উৎসবে—
সহিল না তোর সে-আনন্দ হায়, কোথা দোষ পেলি সে যে—
দু'নয়নে তোর জ্বলিল অনল হিংসা-তীব্র তেজে !
চকিতে ভস্ম করে' দিলি প্রীতি, স্নেহ-মায়া, আশা কত !
ভাগ্যবন্ত হলো গৃহহারা, সম্পদ্ অপগত !
শোণিত-পিপাসা সমরাঙ্গনে—তাতে না তৃপ্তি পেলি !
বন্যার জলে, তীব্র অনলে মৃত্যুর বেশে এলি !
মা যদি হয় নির্ম্মম হেন, বেদনা না বাজে বুকে—
কোথা কল্যাণ ? কোথায় শান্তি ? কার কাছে কবো দুখ এ !
এর পরে বলো আশ্রয় আর মাগিব কাহার কাছে ?
জানি না বাঙ্গলা-মায়ের কপালে আরো কি যে লেখা আছে !

কুমারী ভক্তি মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা-নিবেদন

পরলোকে জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

হুগলী সিমলাগড়ের প্রসিদ্ধ জমিদার জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে ২রা কার্ত্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আইন অধ্যয়নের পর কিছু দিন ভারত সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি মহীশূর ও আউধের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। 'মরণরহস্য', 'শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা', 'শ্রীরাধা-চিন্তা', 'পূজনীয় গুরুদাস', 'পঞ্চকণা', 'ধর্ম্মজীবন' প্রভৃতি প্রণয়নে তিনি সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়ে সমাদর ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে কুমারকৃষ্ণ মিত্র

গত ২৫শে আশ্বিন প্রত্যুষে কলিকাতা আহিরীটোলা ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় সামাজিক কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে কর্ম্মময় জীবনের অবসানে লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা হিতৈষী বন্ধুবিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই কুমার বাবুর জন্ম—তাঁহার পিতা ৺ক্ষীরোদগোপাল মিত্র ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থশালী হইয়াছিলেন। কুমার বাবু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'আয়ুর্ব্বেদ-বিস্তার-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়া সুলভে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা সূচনায় ইহুদী বণিকগণ যখন কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের অট্টালিকা সমূহের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়া ফাট্‌কাবাজী করিতেছিলেন, কুমার বাবু সেই সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ধনী সুলতান সিংহের সহায়তায় বহু অট্টালিকা ও জমি ক্রয় করিয়া তাহার উন্নতি-সাধন ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি গিরিডিতে অভ্রের খনি লইয়া অভ্র ব্যবসায়ের ব্যপদেশে দুই বার য়ুরোপ—জার্ম্মাণী—আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা-পূর্ণ ভ্রমণকাহিনীর সচিত্র প্রবন্ধে 'মাসিক বসুমতী' সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেশনের পুঞ্জীভূত অনাচার হইতে কলিকাতার করদাতৃগণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি দেশহিতব্রত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সুপরামর্শে ও সহায়তায় একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া করপোরেশনের সংস্কার সাধনের জন্য প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভাস্কর্য্য ও চিত্র সংগ্রহে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—স্বদেশী মেলা প্রবর্ত্তন—নাট্যকলার উন্নতি প্রয়াস তাঁহার শিল্পানুরাগের নিদর্শন। বহু দরিদ্র গৃহস্থ বিশেষতঃ বিধবাগণকে তিনি নিয়মিত ভাবে গোপনে অর্থসাহায্য করিতেন। 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। আমরা তাঁহার স্নেহমধুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া বেদনাতুর হৃদয়ে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছি।

জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

কুমারকৃষ্ণ মিত্র

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরলোকে

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত থাকিয়া ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ৫৪ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু এরূপ অপ্রত্যাশিত যে, এই সংবাদে অনেককেই বিস্মিত হইতে হইয়াছে।

তাঁহার পিতা উদয়চন্দ্র মিত্র নোয়াখালি জিলার রাধাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্ম্মিরূপে স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; স্বদেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন; অতঃপর স্বদেশসেবাই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়; কিন্তু কাউন্সিল-বর্জ্জন নীতি পরিত্যক্ত হইলে তিনি নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন না করায় তাঁহাকে কংগ্রেসের দণ্ডমূলক ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবনে সত্যেন্দ্রচন্দ্রকে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টে কোন দিন তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অমায়িক ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে তিনি সকল দল ও সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ আন্তরিক ছিল এবং কোনরূপ দুঃখ-কষ্টেই কোন দিন তাহা শিথিল হয় নাই। তাঁহার অকাল বিয়োগে [illegible] হইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

চোখের জলে

[গল্প]

বর্ষাকাল। আষাঢ়ের শেষাশেষি ভোরের দিকে এলার্ম-দেওয়া ঘড়িটা বাজিয়া উঠিতেই মধুপের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! খোলা জানলা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া সে দেখিল, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে!

মধুপ ভাবিল, আজ টিউশনীতে না গিয়ে বাদলা-বেলাটা গল্প-গুজবে কাটালে মন্দ হয় না। পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না, আরামের জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা উচিত নয়; তাছাড়া গরীবের আবার আরাম কিসের? রোদ-বৃষ্টি-বাদলা গরীবের কাছে সমান।

মধুপ ডাকিল—অঞ্জলি!

—দাদা! বলিয়া দশ-এগারো বছরের মেয়ে অঞ্জলি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল;

—তাড়াতাড়ি একটু চা করতে পারিস? এখনি বেরুতে হবে। বৃষ্টি এলো বলে।

চা খাইয়া মধুপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অঞ্জলি বলিল—আজ ফেরবার পথে আমার গল্পের বইটা আনা চাই কিন্তু।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া মধুপ দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল। টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মধুপ কালীঘাট ট্রাম-ডিপোয় আসিয়া শেডের নীচে দাঁড়াইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে টালিগঞ্জ হইতে একখানা ট্রাম আসিয়া থামিল। তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিয়া মধুপ সামনের সিটে বসিল।

রিং-রিং শব্দে ডান দিকে চাহিতেই মধুপ দেখিল, সমস্ত কামরা খালি, শুধু লেডিস-সিটে একটি তরুণী। তাহার এলায়িত কেশের গুচ্ছ খোঁপার মত করিয়া জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অবাধ্য গুচ্ছ কিছুতেই আয়ত্তে আসিতেছে না! বিব্রত হইয়া তরুণী শেষে চুলগুলা পিঠের উপরে ছড়াইয়া দিল।

তাহার ভাব দেখিয়া মধুপ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ-করা তরুণীর পরনে ফিকে আশমানী রংয়ের ব্লাউশ। পরিপূর্ণ কপোলটির পাশ দিয়া মেঘের মত কাজুরি-কেশগুচ্ছ পিঠে ছড়াইয়া পড়ায় মুখখানিকে পাতা-ঘেরা সদ্যফোটা গোলাপের মত দেখাইতেছিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুকে বিজলীর খেলার মত কাণে সোনার দুলদু'টি ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে। তরুণী চুপ করিয়া স্বপ্নাবিষ্ট প্রতিমার মত বসিয়াছিল।

মেঘলা বেলা। মধুপের কবি-হৃদয় ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিল। অতৃপ্ত নয়নে তরুণীর পানে সে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার কাব্যলক্ষ্মী মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে সমাসীন!

—বাবু, টিকিট!

মধুপের চমক ভাঙ্গিল। কণ্ডাক্টরকে মাসকাবারী টিকিটটা দেখাইল। কণ্ডাক্টর তখন তরুণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

তরুণী ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিল। ব্যাগটি একটু এদিক্-ওদিক্ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পয়সা নাই, আছে শুধু ফাউণ্টেন পেন এবং কয়েক টুকরা কাগজ!

মুহূর্ত্তে তরুণীর মুখ বিবর্ণ হইল। তরুণী বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

ব্যাপার বুঝিয়া মধুপ বলিল,—কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে—

কথা শুনিয়া তরুণীর বিবর্ণ মুখে রক্ত আসিয়া জমিল—মুখে কথা ফুটিল না। সে নতমুখে বসিয়া রহিল।

মধুপ বলিল—ভুল এমন অনেক সময় হয়। তার জন্য ভাববেন না।

মধুপ কণ্ডাক্টরকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল। তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথা যাবেন?

লজ্জা-রক্তিম মুখে লজ্জানত দৃষ্টিতে তরুণী মধুপের দিকে চাহিল, তার পর লজ্জা-জড়িত মৃদু কণ্ঠে বলিল—এল্‌গিন্ রোড।

মধুপ চট্ করিয়া মনি-ব্যাগ খুলিয়া কণ্ডাক্টরের হাতে একটা আনি দিল। পয়সা লইয়া তরুণীর হাতে টিকিটটা দিয়া সে দূরে সরিয়া গেল।

তরুণী মৃদু কণ্ঠে বলিল—আজ আপনি আমার মান রক্ষা করেছেন। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়েছি কলেজের একটি মেয়ের কাছে যাবো বোলে। কাপ্‌খানা ধোওয়া হচ্ছে, দেরী করলে চলবে না, তাড়াতাড়িতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি—পাথেয় আছে কি না, দেখিনি।

মধুপ বলিল—আমাদেরো এমন ভুল হয়।

...কিন্তু আপনি যে উপকার করলেন—আপনার পরিচয়?

হাসিয়া মধুপ বলিল—পরিচয়? গরীব ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নেই।

কথাগুলি তরুণীর কাণে বেসুরা বাজিল। সে ভাবিল, এ কি শ্লেষ!

মুখ তুলিতেই মধুপের দীপ্তিপূর্ণ সদা হাস্য মুখ চোখে পড়িল। মুহূর্ত্তে মনের সমস্ত তিক্ততা চলিয়া গেল।

ট্রাম আসিয়া ইতিমধ্যে জগুবাবুর বাজারের সামনে দাঁড়াইয়াছে।

অনুনয়ের সুরে তরুণী বলিল—আমায় এবার নামতে হবে। যদি আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকানা ?

ভ্যানিটী-ব্যাগটি খুলিয়া একখণ্ড কাগজ এবং ফাউন্‌টেন পেন মধুপের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। মধুপ নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া কাগজটি তরুণীর হাতে দিল।

লজ্জাকম্পিত হস্তে ঠিকানাটি লইবার সময় তরুণীর কুসুমপেলব হাত মধুপের হাতে ঠেকিল। এক অনাস্বাদিত পুলকে মধুপের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল !

এল্‌গিন রোডের মোড়। হাসি-মুখে মধুপকে নমস্কার করিয়া তরুণী ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

যতক্ষণ দেখা যায়, মধুপ তরুণীর গতি-পথ লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিল, মেয়েটির নাম-ঠিকানা কিছুই জানা হইল না। তার পর ভাবিল, জানিয়া লাভ ! মেঘলা-বেলায় আমার কবিত্বের খোরাক জোগাড় হইয়াছে ! আর কি চাই ?

দেখিতে দেখিতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে তরুণীর কথা ভাবিতে ভাবিতে মধুপ নিজেকে কোন্ কল্পলোকে হারাইয়া ফেলিল !

এল্‌গিন রোডের উপর সুন্দর দ্বিতল বাড়ী। তাহারই রাস্তার দিকে দোতলা ঘরে সিপ্রা বসিয়া পড়াশুনা করে।

আষাঢ়ের ঘনবর্ষণ প্রাতে সিপ্রার মন কিছুতেই পাঠ্যপুস্তকে বসে না। মন কোন্ স্বপ্নলোকের উদ্দেশে ছুটিয়া চলে ! টেবিলের উপর বই খোলা। উন্মনা সে জানলা দিয়া বাহিরে বর্ষার দিকে চাহিয়া আছে। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আসিয়া গায়ে লাগিতেছে।

হঠাৎ কড়া-নাড়ার শব্দে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। একটু কাণ পাতিয়া শুনিয়া দ্রুত-পদে সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। দরজা খুলিয়া অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল—মঞ্জু ! তুই ! এই বাদলায় ! আয় আয়, শীগ্‌গির ভিতরে আয়। ভিজে একেবারে সারা হয়ে গিয়েছিস্ যে ! ট্রামে এলি বুঝি ! গাড়ী আন্‌লি না ?

—না। সে অনেক কথা, পরে হবে'খন। এখন ওপরে চ, আমার বড্ড শীত করছে।

—চল্, বলিয়া সিপ্রা মঞ্জুরির হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সিপ্রা মঞ্জুরির চিবুকে একটা টোকা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—ভারী চমৎকার দেখতে হয়েছে কিন্তু তোকে ! আমি যদি মেয়ে না হয়ে—

—আঃ, কি হচ্ছে, সিপু ! আমি শীতে কাঁপছি, আর তুই তামাসা পেলি ! না ?

দু'জনে আসিল সিপ্রার পড়ার ঘরে। মঞ্জুরি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—শীগ্‌গির একখান কাপড় আর তোয়ালে আন্ ভাই ! যে শীত করছে !

সিপ্রা দ্রুত ঘরের বাহিরে গেল।

মঞ্জুরি দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। ভিজা শাড়ী-ব্লাউশ লীলায়িত দেহলতার সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নব-যৌবনের প্রত্যেকটি রেখা নিখুঁত-ভাবে সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিপ্রা ফিকে-বেগুনে রঙের একখানা শাড়ী আর ব্লাউশ, সায়া, তোয়ালে আনিয়া দিল, বলিল—নে, কাপড় ছাড়্।

—আগে আমার মাথাটা মুছে দে ভাই ভালো করে। তার পর কাপড় ছাড়বো'খন।

সিপ্রা তোয়ালে দিয়া ভিজা চুলগুলি মুছিতে মুছিতে বলিল—বাব্‌বা কি চুল ! তোর এই মাথা-ভরা এক-রাশ ঠাস্‌বুনুনী ভ্রমর-কালো চুল আর ঐ চোখ যার নজরে পড়বে, তাকে তুই পাগল না করে ছাড়বি নে !

সিপ্রাকে চিম্‌টি কাটিয়া মঞ্জুরি বলিল—পরের সব-তাতে হিংসে হয়, না রে ? কেন, তোর কোথায় কি কম যে আমায় বলছিস্ !

—হ্যাঁ, হিংসে হয়ই তো ! বলিয়া সিপ্রা সশব্দে মঞ্জুরির রক্ত কপোলে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

—তোর আজ কি হয়েছে বল্ তো ?

নাটকের ভঙ্গীতে সিপ্রা আবৃত্তি করিল—

যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে
হরে মুরারে হরে মুরারে।

—তাই দেখছি, যৌবন-জল-তরঙ্গ আজ আর কূলে বাঁধা থাকতে পারছে না, উপচে উঠছে। বলি, এই মেঘমেদুর দিনে কোন বিরহী যক্ষ কি বার্ত্তা পাঠালে ?

সিপ্রা ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিয়া গাহিতে লাগিল—

উন্মনা মন খুঁজিছে সাথী !

মঞ্জুরি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতেছিল, সিপ্রার মাকে সে দিকে আসিতে দেখিয়া বলিল—এই চুপ, মাসিমা আসছেন। তার পর মাসিমাকে শুনাইয়া বলিল—আজ রাস্তায় ভারী বিপদে পড়েছিলুম।

উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—বিপদ ! কি বিপদ ?

রাস্তায় কি বিপদ হইয়াছিল, মাসিমাকে বলিতে লজ্জা হইল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে বলিল—না, এমন কিছু নয়, ট্রামে এলুম, কিন্তু এই বৃষ্টি !

—সত্যি তো ! গাড়ী নিয়ে এলে না ! এই বৃষ্টি ! সিপ্রাও বলছিল, একেবারে নেয়ে এসেছ। আমি যাই—দু'খানা লুচি ভাজতে বলি ঠাকুরকে। গঙ্গাজল ভালো আছে ?

গঙ্গাজল মঞ্জুরির মা। মঞ্জুরি বলিল—হ্যাঁ।

মা চলিয়া গেলেন। সিপ্রার কাছে আসিয়া মঞ্জুরি বলিল—সত্যি ভাই, যে বিপদে পড়েছিলাম !

কৃত্রিমবিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সিপ্রা বলিল—কি বিপদ, সখি ?

মুখ নত করিয়া মঞ্জুরি বলিল—এমন ভয়ঙ্কর বিপদ নয়, তবে বিপদ।

দুষ্টামি-ভরা চোখে মঞ্জুরির দিকে চাহিয়া সিপ্রা বলিল—বিপদ, কি বিপদ নয়, সে মীমাংসার ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে বলে ফেল—কি হয়েছে।

মুখ ভার করিয়া মঞ্জুরি বলিল—কাল রাত্রে মার সঙ্গে একটু কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে।

—কেন ?

স্বরে ঝাঁজ মিশাইয়া মঞ্জুরি বলিল—কিসের জন্য আবার ! বিয়ের জন্য। বিয়ে না করলে মার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না !

হাসিয়া সিপ্রা বলিল—এতে কথা-কাটাকাটির কি আছে ?

তিক্ত কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল—না, কিছু নেই ! তুই বিয়ে কর্ না !

—দিলে করি। বলিয়া সিপ্রা তাহার দিকে চাহিল।

—কাকে বিয়ে করবি ? বলিয়া মঞ্জুরি সিপ্রার মুখের দিকে চাহিতেই কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া সিপ্রা বলিল—তোকে !

—আমাকে বিয়ে করলে দাদার অবস্থা কি হবে ? দাদা তোর জন্য পাগল !

সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়া সিপ্রা বলিল—পাগলের ওষুধ গারদ। কিন্তু ও কথা থাক, যা বলছিলি, বল্।

মঞ্জুরি বলিল—মা বলেন, পাত্র মজুত। বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, পাত্রের বাপ জমিদার, পাত্র সুদর্শন, আরও কত কি ! মা চায়, আজই আমি বিয়ে করি। মা বলেন, এ রকম সুপাত্র না কি বড় একটা মেলে না আজকালকার বাজারে। আমি বলি, এখন নয়, পরে, আই-এ পাশ করার পর। তাছাড়া ডাক্তারদের আমি কেমন দেখতে পারি না।

—কেন, ডাক্তারদের উপর এত বিরাগ কেন ? ডাক্তারী তো স্বাধীন ব্যবসা। তাছাড়া পরের উপকার, গরীব-দুঃখীর উপকার করা হয় এতে !

একটু উত্তেজিত স্বরে মঞ্জুরি বলিল—এর মধ্যে সত্যি আছে মানি, কিন্তু রোগের চিন্তা যাদের পেশা, দেশকে নীরোগ দেখলে যাদের মন খারাপ হয়, দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে যাদের মন খুশীতে ভরে ওঠে, তাদের উপর আমার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। দু' পয়সা পকেটে পড়তে থাকলে দেশের আর দশের কল্যাণচিন্তা যাদের মনে স্থান পায় না, তাদের প্রশংসায় মঞ্জুরি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। তাছাড়া আজকালকার বাজারে আমরা এতই শস্তা হয়েছি যে, বিলেত-ফেরৎ হলেই ছলে-বলে-কৌশলে তার গলা ধরে ঝুলে পড়ে নিজেদের জীবন সার্থক মনে করতে হবে ? কেন, আমরা বানে ভেসে এসেছি না কি যে, আমাদের দাম নেই ?

গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া সিপ্রা বলিল—নিশ্চয় আজকালকার বাজারে তোর মত মেয়ের দাম এখনও পড়ে যায়নি, বেশ চড়া দামেই বিকিয়ে যাবি ! দেহি পদপল্লবমুদারম্ বলে কত বিলেত-ফেরৎ দোরে এসে ধর্ণা দেবে, ভাবনা কি ?

—ঠাট্টা ! বলিয়া মঞ্জুরি অভিমানে মুখ ফিরাইল।

সিপ্রার সানুনয় অনুরোধে মঞ্জুরি সকালের বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সিপ্রা বলিল—আমার কাছে Weekly Examination-এর task জানতে আসছিস্, এ মিথ্যে বল্‌লি কেন ?

—বা রে, আমি বুঝি মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে ঝগড়া করে আসছি এইটেই বল্‌বো ? তার পর ব্যাগ খুলিয়া ঠিকানা বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ তাঁর ঠিকানা বলিয়া কাগজটি সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

সিপ্রা তাহার হাত হইতে কাগজখানা একপ্রকার ছিনাইয়া লইয়া জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। নাম পড়িয়া সিপ্রা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বেশ নামটি ! মধুপ মজুমদার ! চমৎকার মিল রয়েছে নাম দু'টিতে, মধুপ-মঞ্জুরি ! যাত্রা শুভ বলতে হবে ! মধুপের সন্ধান মিলেছে, মঞ্জুরি আর রোদে শুকিয়ে মিথ্যা হবে না।

লজ্জায় মঞ্জুরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সলজ্জে হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—তুই আজকাল ভারী দুষ্টু হয়েছিস্ সিপু !

—সত্যি কথা বললেই দুষ্টু হয় মানুষ ! বেশ ভাই, বলি, চার চোখের মিলন হয়েছে তো ?

ঝাঁজালো স্বরে মঞ্জুরি বলিল—যদি বলি, হয়েছে ?

সিপ্রা বলিল—যদি বলি, মরেছো !

মঞ্জুরি বলিল—আমি মরবো কেন ? তুই মর্।

—আমি তো মরেই আছি। কিন্তু তোকে যে রোগে ধরেছে !

মা ডাকিলেন,—খাবার হয়েছে, দু'জনে আয় রে !

দু'জনে মায়ের কাছে আসিলে মা বলিলেন—মঞ্জু এ বেলা থাক্, কলেজ যেতে হয় দু'জনে এখান থেকে যেয়ো।

মায়ের কথা শুনিয়া মঞ্জুরি ও সিপ্রার মুখে হাসির রেখা ফুটিল

কলেজ হইতে ফিরিয়া মঞ্জুরি ও সিপ্রা পড়ার ঘরে বসিয়া কিসের আলোচনা করিতেছিল। হঠাৎ নীচে মোটরের হর্ণ শুনিয়া জানলার কাছে আসিয়া দু'জনে পথের দিকে চাহিল। মঞ্জুরি বলিল—আমাদের গাড়ী, দেখছি ! দাদা !

মঞ্জুরির দাদা অলক গাড়ী হইতে নামিল।

চা এবং জলখাবার খাইয়া মঞ্জুরি ও সিপ্রাকে লইয়া অলক যখন লেকের দিকে বেড়াইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গাড়ী এল্‌গিন রোডের মোড় ফিরিয়া লেকের দিকে বেগে ছুটিয়া চলিল।

তিন-চার দিন পরের কথা।

অনেক ভাবিয়া মঞ্জুরি ঠিক করিয়াছে, মধুপ বাবুর দেওয়া চারটি পয়সা তাঁহাকে ফেরৎ না দিলে নীচ মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইবে ! আবার দিলে তাঁহার সে উপকারের অসম্মান করা হইবে। তাই তাহা ফেরৎ না দেওয়াই সঙ্গত।

সে-দিন কলেজ হইতে ফিরিয়া মঞ্জুরি দেখিল, অলক ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ বিন্যাস করিতেছে। মঞ্জুরি বলিল—কোথাও যাচ্ছো না কি, দাদা ?

—হুঁ। ইউনিভারসিটি ইন্‌সিটিটিউটে আজ একটা ডিবেট আছে। যেতে হবে। বেশী দেরী নেই।

—ও, মহাসমরে ভারতবর্ষের যোগদান করা উচিত কি না—এই নিয়ে তো ?

—হুঁ। Subject-matter হচ্ছে "Should India join in the world-war ?" যাবি ? All-India Inter-versity debate.

—চলো। সিপ্রাকেও নিয়ে যেতে হবে। না হলে সে রাগ করবে !

সাড়ে ছ'টার সময় ডিবেট আরম্ভ হইবে। মঞ্জুরি এবং সিপ্রাকে লইয়া অলক যখন ইনস্টিটিউটে পৌঁছিল, তখন ছ'টা বাজে।

সমস্ত হল-ঘরটা ছাত্র-ছাত্রীর কল-কোলাহলে মুখরিত। সম্মুখে মেয়েদের নির্দ্দিষ্ট আসন প্রায় সমস্তই অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল একটা বেঞ্চ খালি ছিল, তাহাও ছাত্রদের ঠিক সম্মুখে। মঞ্জুরি এবং সিপ্রা সেইখানে গিয়া বসিল।

পিছনে ফিরিয়া চাহিতেই অলক দেখে, পিছনের বেঞ্চে কয়েক জন বন্ধু বসিয়া আছে। অলককে তাহারা কোন রকমে নিজেদের মধ্যে বসাইয়া লইল। অলক বলিল—আধ ঘণ্টা আগে এসেও একটু জায়গা পেলাম না। তার পর বলিল—হ্যাঁ রে রজত, মধুপ এসেছে?

—হ্যাঁ। এই একটু আগে দেখা হয়েছিল।

অলক উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—মধুপ নিশ্চয় ফার্ষ্ট হবে। তোমার কি মনে হয়?

রজত বলিল—নিশ্চয়, ওরই তো ফার্ষ্ট হওয়া উচিত। ওর যুক্তি-তর্কের কাছে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না, আমি ভবিষ্যদ্‌-বাণী করছি।

পিছন হইতে তপন বলিল—রজত, পাঞ্জাব-ইউনিভারসিটি থেকে একটি মেয়ে এসেছে। সে না কি খুব ভালো ডিবেট করে। জানো কিছু?

তাচ্ছিল্যের সুরে রজত বলিল—আরে রাখো তোমার দিল্লী, পাঞ্জাব! স্বয়ং সিংহী এলেও বাংলার বাঘের কাছে তার নিস্তার নেই।

অলক বলিল—সত্যি তপন, ওর প্রতিভার কাছে অপরের প্রতিভা ম্লান হয়ে যায়। কখন্ পড়ে, কখন্ টিউশন করে ভেবে পাই না, অথচ বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে চলেছে। ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব সব বিষয়েও কি দারুণ ষ্টাডি করে। কবিতায়—কি ইংরেজী কি বাংলা, এরি মধ্যে বেশ নাম করেছে। এমন ছেলে লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ!

রজত বলিল—আমি ভাই ওর কবিতার এক জন একনিষ্ঠ পাঠক। মেয়েদের সঙ্গে ও বড় একটা মেশে না, তবু Love poem আর "My sweet heart" কবিতা দু'টি পড়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম—মধুপ, তুমি তো মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেশো-টেশো না! কিন্তু এই সব Love poem লেখবার inspiration পাও কোথা থেকে! হেসে উত্তর দিলে—গাছে ফুল যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দূর থেকে তাকে দেখতে লাগে অতি চমৎকার, কিন্তু বোঁটা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তার উপর ফুলের মধ্যের কীট আছে, চোখে পড়তে পারে। দূর থেকে যে ফুল দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যেতো, তখন হয়তো তার অতি-কাছে এসে সে-কীট চোখে পড়ায় মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতে পারে।

মধুপের নাম শুনিয়াই মঞ্জুরি ভাবিয়াছিল, এ মধুপ, সেই মধুপ মজুমদার নয় তো? মধুপের প্রশংসা শুনিয়া মঞ্জুরির কৌতূহল বাড়িয়া গেল। সে অদম্য আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া ছেলেদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডিবেট আরম্ভ হইল। মধুপ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত ছাত্রীটির যুক্তি-তর্কের সারবত্তায় উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইল। বিচারকেরা মধুপ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীটিকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ে সমস্ত হল-ঘর আনন্দের আতিশয্যে প্রকম্পিত হইল।

মঞ্জুরির মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সিপ্রা কৌতুক-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—কি রে, আনন্দ যে ধরে না দেখছি!

মঞ্জুরি বলিল—এই, দাদা আছে সামনে।

অলক বলিল—সিপ্রা, একটু দাঁড়াও, মধুপকে congratulate করে আসি।

অলক চলিয়া গেলে হাসিয়া সিপ্রা বলিল—এই মঞ্জু, অলকদা তো তোর মধুপকে চেনে দেখ্‌ছি। বোধ হয় একসঙ্গে পড়ে।

মঞ্জুরি বলিল—হবে! দাদাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যাবে।

একটু পরে অলক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—সিপ্রা, আমার বন্ধু মধুপ আজ ফার্ষ্ট হলো। ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, এটা সিক্সথ ইয়ার, এমন intelligent sweet temperment-এর ছেলে দেখা যায় না! কাল ওকে আমাদের বাড়ীতে invite করেছি, পরিচয় করিয়ে দেবো। দেখবে কি চমৎকার ছেলে!

সিপ্রা মোটরে বসিয়া মঞ্জুরিকে চিম্‌টি কাটিতে লাগিল। অলক মোটরে ষ্টার্ট দিয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে গাড়ী বাহির করিয়া বেগে ছুটাইয়া দিল।

পরের দিন বৈকালে সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে বসিয়া মঞ্জুরি এবং সিপ্রা আমন্ত্রিত অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া উভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলক ও মধুপকে গাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া মঞ্জুরি বলিল—এত দেরী হলো যে? তার পর মধুপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আসুন মধুপ বাবু।

যেখানে মধুপ পূর্ব্বে কখনও আসে নাই, সেখানে এক অপরিচিত তরুণী তাহাকে মধুপ বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মঞ্জুরির দিকে চাহিতেই মঞ্জুরি হাসিয়া বলিল—চিনতে পারলেন না? উপকারীর পক্ষে উপকৃতকে মনে রাখার প্রয়োজন না হতে পারে, কিন্তু উপকৃত উপকারীকে ভোলে না।

মধুপকে কোচে বসাইয়া মঞ্জুরি এবং সিপ্রা আর এক কোচে বসিল। মধুপ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অলক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিল—আস্‌ছি মধুপ, এক মিনিট।

মৃদু হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—আপনার পয়সা চারটে কিন্তু আমি দেবো না।

মধুপ মঞ্জুরিকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিল না। মনে হইতে-ছিল, মুখখানা যেন চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখিয়াছে! কিন্তু এই পয়সার কথায় সে-দিনকার ট্রামের সেই কথা মনে পড়িল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—চারটে পয়সা আমি নেবো না।

সিপ্রা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—এ তোর ভারী অন্যায়, মঞ্জু! সুদ না দিয়ে শুধু আসলের প্রস্তাবে মহাজন রাজি হবে কেন?

মধুপ মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিল। মঞ্জুরি এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল—আপনাদের আসতে দেরী দেখে আমরা বলাবলি কর-ছিলাম যে, আপনি বুঝি গরীবদের বাড়ীতে আর এলেন না!

ড্রয়িং-রুমের ভিতরটায় একবার চোখ বুলাইয়া মধুপ বলিল—গরীবের নিদর্শনই বটে!

মঞ্জুরি বলিল—গরীব নয় তো কি?

—নিশ্চয় ! ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের আসবাবগুলোয় নিদারুণ দারিদ্র্যের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে ! তাই আপনি যখন পয়সার কথা বললেন, তখন নেবো না ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না। মানুষের প্রাণ দুঃখে-দারিদ্র্যে দয়ায় বিগলিত হয়ে ওঠে ! বলিয়া মধুপ হাসিয়া ফেলিল।

হাসিয়া সিপ্রা বলিল—কিন্তু সাবধান থাকিস মঞ্জু ! জানিস তো, মহাজন গরীব প্রজাকে টাকা ধার দেয়, শুধতে দেরী করলে মহাজন প্রথমটা বিশেষ গা করে না। এই গা না করার কারণ দয়া বা করুণা নয়, ভবিষ্যতে একটা বড় দাঁও মারার লোভ ! সুদে-আসলে ধার-দেওয়া টাকা ক্রমে এমন সংখ্যায় এসে দাঁড়ায় যে, গরীব প্রজার পক্ষে তা শোধ করা সম্ভব হয় না ! তখন তার ভিটে-মাটি চাটি করেও দয়ালু মহাজনের আশা মেটে না, ভিটের মালিককে নিয়েও টানাটানি করেন ! তোর অবস্থা যেন—

মঞ্জুরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সিপ্রার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—তুই আজকাল বড্ড বাজে বকিস্ সিপ্রা !

মধুপ বলিল—অলক পালালো কোথা ? তার-পর সিপ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—অলককে আর এঁকে দেখলে ভাই-বোন বলে মনে হয়। কিন্তু আপনার পরিচয় ?

হাসি-ভরা মুখে মঞ্জুরি বলিল—হাঁা, ঠিক ধরেছেন। আপনার বন্ধু আমার দাদা—আর ওর তিনি অলকদা—বলিয়া সিপ্রার দিকে চাহিল।

মধুপ কি বলিতে যাইতেছিল, হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—বুঝতে পারলেন না ? প্রথমে এর পরিচয় আপনাকে দেওয়া হয়নি, ভুল হয়েছে। এর নাম শ্রীমতী সিপ্রা সেন, বেথুন কলেজের কলা-বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, আমার সহপাঠিনী এবং আরও নিকটতম ও মধুরতম পরিচয় হচ্ছে, উনি আমার ভাবী—ভাবী। অর্থাৎ—

ঠিক এই সময়ে অলক প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে বেয়ারা রামজীবন প্রকাণ্ড ট্রেতে করিয়া চা ও খাবার লইয়া ঢুকিল।

সিপ্রার মুখ সিঁদুরে-আমের মত রাঙা হইয়া উঠিল। সে তার শাড়ীর একটা খুঁট লইয়া মুখ নত করিয়া আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল।

মধুপ বলিল—ও-সব কি হবে ?

অলক পেটের উপরে একবার তাহার বাম হস্ত বুলাইয়া বলিল—তোমাদের ওখানে মাসিমার হাতের তৈরী খাবারের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বেচারী পেটের উপর যে অত্যাচার করেছি, এখন সোডা খেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। তার পর বোতল হইতে গ্লাসে সোডা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—আমার ভুলটা তোমরা শুধরে নিয়েছ দেখছি।

—কি ভুল ? বলিয়া মধুপ তাহার মুখের দিকে চাহিল।

—এই তোমাদের মধ্যে introductionটা—

মৃদু হাসিয়া মধুপ বলিল—আমার কথা ছেড়ে দাও, তবে ওঁদের introduction বেশ ভালো রকম পেয়েছি। মঞ্জুরিকে দেখাইয়া বলিল—উনি শ্রীমানের বন্ধুর অর্থাৎ অলক বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী, আর ইনি শ্রীমানের ভাবী ভাবী !

সিপ্রা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। অলক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ভাবী ভাবী কি আবার ?

মধুপ হাসিয়া বলিল—ইংরেজী আর বাঙলা খিঁচুড়ীর মত এটা বাঙলা-হিন্দীর খিচুড়ী—অর্থাৎ ভাবী বৌদি !

হো-হো করিয়া হাসিয়া অলক বলিল—যত নষ্টের গোড়া তুই মঞ্জু, তোর জ্বালায় আর পারা গেল না !

কেটলি হইতে কাপে চায়ের জল ঢালিতে ঢালিতে মঞ্জুরি বলিল—আমি মিথ্যা কথা বলেছি ? তুমিই বলো।

সে কথা চাপা দিয়া অলক বলিল—মধুপ, তোমার পরিচয় আর বিশেষ করে ওদের দিতে হবে না। কাল ইন্‌ষ্টিটিউটে গিয়ে ওরা সে পরিচয় পেয়ে এসেছে। বাকীটা পথে আসার সময় আমি জানিয়ে দিয়েছি। আমার কর্ত্তব্য অনেকখানি শেষ হয়ে গিয়েছে। বাবা বাড়ীতে নেই। বাকী আছেন মা—বলিয়া দরজার দিকে চাহিতেই আনন্দময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আনন্দময়ী কক্ষে প্রবেশ করিতেই সিপ্রা কৌচ ছাড়িয়া বলিল—আসুন মাসিমা।

সকলকে দাঁড়াইতে দেখিয়া আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—বোস, বোস তোমরা।

মধুপ আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। আনন্দময়ী সস্নেহে মধুপের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—থাক্ বাবা, থাক্, বোস। অলকের মুখে তোমার কত প্রশংসাই শুনি !

মধুপ বলিল—ও আমায় খুব ভালবাসে, আমার কথা আপনার কাছে বাড়িয়ে বলবে তো ! আপনারা যা মনে করছেন, আমি তেমন নই। তবে অলকের কথায় আমার লাভ হয়েছে, মায়ের কাছে ছেলের প্রশংসা—তাতে ছেলের উপকার হয়।

আনন্দময়ীর মুখ অপরিসীম স্নেহে ভরিয়া উঠিল। এই সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত অকপট যুবকটি মুহূর্ত্তে তাঁহার সন্তানের স্থান অধিকার করিল।

চা এবং জলখাবার খাওয়া শেষ হইতে আনন্দময়ী বলিলেন—সিপ্রা, একটা গান শুনিয়ে দাও মধুপকে।

সিপ্রা লজ্জানত মুখে বসিয়া রহিল। আনন্দময়ী বলিলেন—গাও মা, গাও। গানে লজ্জা কি ?

সিপ্রা এটা-সেটা বাজাইবার পর ধীরে ধীরে গান ধরিল—

"মাধব ! কৈছন বচন তুহার !
আজি-কালি করি দিন গোঁয়াইত
জীবন ভেল অতি ভার।"

সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সমস্ত ঘর ভরিয়া উঠিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহার গান শুনিতে লাগিল। অলকের সমাহিত ভাব দেখিয়া আনন্দময়ীর অলক্ষ্যে মধুপের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিল।

অলক ভাবিতেছিল, সিপ্রা কি গানের ভিতর দিয়া তাহার প্রাণের কথা আমাকে জানাইতেছে ! তাহার সুরের ঝঙ্কার যেন তার প্রাণের গোপনতাকে তাঁহার কাছে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে।

গান শেষ হইলে হাসিয়া মধুপ বলিল—ভারী সুন্দর গলা আপনার ! আর এক দিন শোনবার দাবী রইলো !

সন্ধ্যা হয়-হয়।

মধুপ বলিল—আজকে উঠি মাসিমা। আবার আসবো। কিন্তু দেখবেন, এরা ভাই-বোনে যেন আমায় হিংসে না করে। কারণ, ওদের অনেকখানি আমি কেড়ে নিলাম কি না !

—শান্তি পুত্র হলে মায়ের স্নেহের অভাব হয় কি কোন দিন? তুমি মাঝে-মাঝে আসবে কথা দিয়ে যাও। যেন ডাকতে না হয়।

—হাঁ মাসিমা, নিশ্চয় আসবো, ডাকতে হবে না। আপনার স্নেহের লোভ সম্বরণ করা চলবে না।

অলক বলিল—চলো মধুপ গাড়ী করে একটু বেড়িয়ে আসি, তার পর ঠিক সময়ে তোমাকে টিউশনীর জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরবো।

আনন্দময়ীকে প্রণাম এবং মঞ্জুরি ও সিপ্রাকে নমস্কার করিয়া মধুপ গাড়ীতে গিয়া বসিল।

প্রণয়রূপী দেবতা কখন্ কি সূত্রে কাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসেন, আগে হইতে বলা শক্ত। মঞ্জুরি এত দিন কত যুবকের সহিত মিশিয়াছে কত টি পার্টিতে গিয়াছে, পিক্‌নিকে গিয়াছে, কিন্তু কখনো কাহারও উপর একটা স্থায়ী আকর্ষণ অনুভব করে নাই। কিন্তু যে দিন সেই অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়া ট্রামে মধুপের সহিত পরিচয়, সেই দিন হইতেই তাহার জীবনে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল। সোনার কাঠির স্পর্শে যেমন রাজকুমার ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, ট্রামে ঠিকানা লইবার সময় মধুপের মৃদু করস্পর্শ তেমনি মঞ্জুরির সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সে নিজের মধ্যে যেন নূতন কি স্পন্দন অনুভব করে।

এ পরিবর্ত্তন আজ তার নিজের চোখেও ধরা পড়িয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সে বারে-বারে লজ্জিত হয়!

সর্ব্ব বিষয়ে যুবক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মধুপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য যেন এক নিগূঢ় আকর্ষণে মঞ্জুরিকে তাহার প্রতি প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

বাদল মেঘের ধূপ-ছায়ায় গোধূলি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। মধুপ অলকদের ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল। ড্রয়িং-রুমের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে এস্রাজের সহিত মঞ্জুরির সুমিষ্ট কণ্ঠের অপূর্ব্ব স্বরলহরী ভাসিয়া আসিল। ড্রয়িং-রুম হইতে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। মধুপ ধীর পদবিক্ষেপে দরজার কাছে গিয়া কারুকার্য্যখচিত যবনিকাখানি একটু ফাঁক করিয়া অস্পষ্ট আলোকে মঞ্জুরির ছায়া দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কৌচে বসিল। সমস্ত বাড়ী যেন সুর-লহরীতে কাঁপিয়া উঠিতেছে। মঞ্জুরি গাহিতেছিল—

"যেন একটি গানে
জীবন আমার বাজিতে চায় করুণ তানে তানে।
কোন কথাটি নাহি জানি
এ জীবনে পায় না বাণী
তারি লাগি সুরটি আমার বিরাম নাহি মানে।
যেন কি ফুল হায়
লজ্জায় তনু-মাঝে কাঁদে ফোটার বেদনায়!
যেন গো কোন্ আঁধার টুটে
সোনার আলো পড়বে লুটে
সজল বেদন মালা হয়ে জড়াবে কার প্রাণে।"

গানের শেষে এস্রাজ নামাইয়া রাখিয়া মঞ্জুরি ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল। সুইচটা খট্ করিয়া টিপিয়া দিয়া সম্মুখের কৌচে এই অসময়ে মধুপকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময় ও হাসিভরা মুখে মঞ্জুরি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি! কখন্ এসেছেন?

মধুপ বলিল—খানিকক্ষণ।

—একলা বসে রয়েছেন! আমায় ডাকেননি কেন?

—আপনার গান শোনা হয়তো হবে না, তাই! ভারী মিষ্টি গলা আপনার।

মৃদু হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—মিষ্টি, না, ছাই!

মুহূর্ত্তে হাসির রেখা কোথায় মিলাইয়া গেল। মঞ্জুরির মনে হইল, যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে! গানের ভিতর দিয়া নির্লজ্জের মত অন্তরের সমস্ত কথা যেন প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে! অলক্ষ্যে থাকিয়া মধুপ সব শুনিয়াছে! হয়তো ভাবিতেছে, কি নির্লজ্জ মেয়ে! ছি! ছি!

মঞ্জুরি গম্ভীর হইয়া বলিল—লুকিয়ে পরের গান শোনা ভারী অন্যায়।

মধুপও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—লুকিয়ে পরের গান শোনা হয়তো অন্যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি?

নিমেষে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, মঞ্জুরি বুঝিতে পারিল না। সমস্ত ড্রয়িং-রুম যেন তাহার পায়ের নীচে দুলিয়া উঠিল। সে নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মধুপ কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়ের সুরে বলিল—সত্যি, ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে! সে জন্য মাপ চাইতে লজ্জা পাই না! কারণ, যে মানুষ যে স্তরের, সে যদি হঠাৎ সে স্তর ছেড়ে উঁচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মেশে, তাহলে তার ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক!

মঞ্জুরি স্থির থাকিতে পারিল না। দুই হাত দিয়া মধুপের এক হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা করুন মধুপ বাবু—আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি!

তাহার সমস্ত দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ইহার পূর্ব্বে মধুপ কখনও এমন ভাবে নারীর স্পর্শ অনুভব করে নাই। আজ এই গোধূলি-লগ্নে নারীর প্রথম স্পর্শ তাহার কৌমার্য্যের নির্ব্বিকার যোগ-নিদ্রা নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিল। রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দু চঞ্চল হইয়া শিরা-উপশিরায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মঞ্জুরির কুসুমপেলব হস্তে মৃদু চাপ দিয়া স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে মধুপ বলিল—তা' আমি জানি, মঞ্জু!

—মঞ্জু, মা একবারটি শুনে যা তো! বলিয়া দোতলা হইতে আনন্দময়ী ডাক দিলেন।

মঞ্জুরির হাত ছাড়িয়া দিয়া মধুপ বলিল—চলুন, মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি। অলক বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছে?

লজ্জারুণ দৃষ্টি মেলিয়া মধুপের দিকে চাহিয়া মঞ্জুরি বলিল—আমায় আবার "চলুন" বলছেন কেন? আমায় নাম ধরে ডাকবেন। বলিয়া মায়ের কাছে চলিল। মধুপ তাহার পিছনে পিছনে দোতলায় উঠিল।

অলকদের বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া মধুপ যখন পথে নামিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া আকাশে চাঁদ আর কালো মেঘে লুকোচুরি খেলা

চলিতেছে। চাঁদের ম্লান কিরণে কলিকাতা সহর যেন স্বপ্নপুরী বলিয়া বোধ হইতেছিল! নির্জ্জন জলসিক্ত পথে চলিতে চলিতে মধুপ আপন-মনের অবস্থা এক বার তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল—আজ আর খাবো না! অলকের ওখানে খেয়ে এসেছি।

মেঘ-ছায়াঘন রাত্রে মধুপের চোখে ঘুম আসিল না। জানালা-গুলি-খুলিয়া দিয়া মেঘ আর চাঁদের খেলা দেখিতে লাগিল। মঞ্জুরির স্নিগ্ধ-মধুর মুখ বারে-বারে মেঘের ফাঁকে চাঁদের উঁকি-মারার মত তাহার হৃদয় আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মাসখানেক পরে।

মধুপ এ-বাড়ীতে নিত্যকার অতিথি। সে আসিলে আনন্দময়ী অনেকখানি খুশী হন—দু'দিন যদি না আসে, আনন্দময়ী বলেন—মধুপের কি হলো রে, অলক? সে আসে না কেন? মায়ের আগ্রহে মঞ্জুরি খুশী হয়। তবু কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বলে—পরকে পেয়ে আমাদের উপর মার স্নেহ কমেছে!

সে-দিন মেঘলা রাত্রি।

স্তব্ধ-গম্ভীর আকাশ জুড়িয়া থমথমে অন্ধকার। মধুপ তাহার পড়ার ঘরে একটি পরিষ্কার খাটের উপর জ্বরে বেহুঁস পড়িয়া আছে। মাথার পাশে বসিয়া মঞ্জুরি মধুপের তপ্ত ললাটে ওডিকোলন মিশ্রিত জলপটি দিতেছে। নীল শেডে ঢাকা ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ঘরখানি স্নিগ্ধ ছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের উপর বি-টাইমপীশ, ঘড়ি এক-সুরে টিক্-টিক্ করিয়া ঘরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

পাশের ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে টং-টং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। ধীরে ধীরে ভেজানো দরজা ফাঁক করিয়া উমারাণী উৎকণ্ঠাপূর্ণ মুখে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। মঞ্জুরি জানিতে পারিল না। জল-পটিটা মধুপের তপ্ত ললাটে বসাইয়া পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। অতি মৃদু স্বরে উমারাণী ডাকিলেন—মঞ্জু!

মুখ তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল—মাসিমা!

—রাত দু'টো বেজে গেল যে মা, এবার তুমি একটু শোও। আমি আছি।

শান্তমুখে মঞ্জুরি উত্তর দিল—না মাসিমা, মা আমাকে রেখে গেলেন! ক'রাত জেগে আপনার শরীর যা হয়েছে! মা বললেন, সেবা করা মেয়ে-মানুষের কাজ! তুই আজ রাত্রে থাক্ মঞ্জু! আপনি যান মাসীমা! আপনার বুকের ব্যথা যদি বাড়ে? ডাক্তার আপনাকে বারণ করেছে বেশী নড়া-চড়া করতে। আপনি যান, শুয়ে পড়ুন।

উমারাণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—তোমারও তো রাত-জাগা অভ্যাস নেই মা! তাছাড়া এতক্ষণ জেগেছো, এবারে তুমি যাও একটু শুয়ে পড়ো। আমার শরীরে সয় মা।

মঞ্জুরি তেমনি ধীর শান্ত স্বরে বলিল—রাত না জাগলে রাত জাগা অভ্যাস হবে কি করে মাসীমা? আজ আমি রাত জাগি। তা ছাড়া আমি তো ঘুমুতে আসিনি, মা আমাকে রেখে গেলেন সেবা করবার জন্য। জানি, আপনাদের মত সেবা আমাদের দ্বারা হবে না! তবু আপনি ভাববেন না! তাছাড়া ওষুধে বেশ কাজ হচ্ছে মনে হয়। হয়তো সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা আর জ্বর কমে আসবে।

সস্নেহে মঞ্জুরির মাথায় হাত বুলাইয়া উমারাণী বলিলেন—তোমার মত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে আমি আর কাউকে দেখিনি মঞ্জু! ক'দিন দিনের বেলাতেও তো দেখছি, ঘড়ির কাঁটার মত এমন নিয়মিত সেবা আমায় দিয়ে হতো না। কিন্তু আর নয় মা, লক্ষ্মীটি। একটু চোখ বুজে গড়িয়ে নাও গে!

মঞ্জুরিকে রোগীর কাছ হইতে নড়ানো গেল না! তার করুণ মিনতি—না মাসীমা, আমার সুস্থ শরীর। আপনি নিজে অসুস্থ! না মাসীমা!

অগত্যা উমারাণী চলিয়া গেলেন।

চারিটা বাজিয়া গেল, মধুপ একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ফিরিয়া শুইল। কপাল হইতে জল-পটিটা বিছানায় পড়িয়া গেল। মঞ্জুরি সেটা তুলিয়া লইয়া আবার জলে ভিজাইয়া মধুপের কপালে বসাইয়া দিতেই মধুপ চোখ মেলিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল—ক'টা বাজে?

চারিটা বাজে শুনিয়া বলিল—এখনও তুমি শোওনি মঞ্জু! শরীর খারাপ হবে! শেষে তুমিও অসুখে পড়বে?

—কিছু হবে না আমার।

—ঘুম পাচ্ছে না?

—না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

করুণ কণ্ঠে মধুপ বলিল—কত আর ঘুমোবো মঞ্জু? ঘুম আসছে না। সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার মত ব্যথা, দিন-রাত বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে।

মঞ্জুরি টেম্পারেচার লইয়া দেখিল, জ্বর একশ'।—একটু বেদানার রস করে দি।

—না, না, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। তুমি একবারটি শোনো।

মঞ্জুরি মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে মধুপ বলিল—ইজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো।

ইজিচেয়ারে বসিয়া মঞ্জুরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মধুপের রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাইল।

মধুপ বলিল—যে-দিন ট্রামে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, সে-দিনকার কথা মনে আছে?

—আছে। চিরদিন থাকবে। তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ আপনার কাছে।

ম্লান হাসিয়া মধুপ বলিল—আর তোমার এই বিরাম-বিশ্রামহীন সেবার কাছে আমি?

মঞ্জু বিপন্ন হইয়া পড়িল। কি উত্তর দিবে সে! শেষে বলিল—ডাক্তার বাবু কথা বলতে বারণ করেছেন। আপনি ঘুমোন।

মঞ্জুরির ডান হাতখানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মধুপ বলিল—কি ঠাণ্ডা! তার পর মঞ্জুরির প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এখন বেশ ভাল আছি। আমায় একটু কথা বোলতে দাও মঞ্জু। তুমিও ডাক্তারের মত শাসন করো না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—আচ্ছা মঞ্জু, আমার অসুখ যদি ক্রমশঃ খারাপের দিকে যায়, তাহলে?

—কিছু হবে না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

বিস্ময়ের সুরে মধুপ বলিল—কারো কিছু হবে না? অঞ্জলির? মার? তোমার?

মঞ্জুরি চমকিয়া উঠিল। কে যেন তাহার বুকে হাতুড়ি পিটিয়া দিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মধুপ বলিল—কথা বলতে বড্ড ভালো লাগ্‌ছে। বারণ করো, কইবো না। বলিয়া মধুপ চিৎ হইয়া শুইল।

মঞ্জুরি উৎকণ্ঠিত হইল। ভাবাধিক্যে উত্তেজিত হইলে যদি জ্বর এবং অন্য উপসর্গ বাড়িয়া যায়! জলপটিটা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডান হাতে সে কপালের তাপ অনুভব করিল।

মঞ্জুরির হাতের উপর নিজের ডান হাতটি চাপাইয়া দিয়া মধুপ বলিল—জলপটির চেয়ে তোমার হাত অনেক ঠাণ্ডা। একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

খুসীতে মঞ্জুরির মুখ ভরিয়া উঠিল। মঞ্জুরি বলিল—নিশ্চয়। আমি হাত বুলিয়ে দি, আপনি ঘুমোন।

—ঘুম আসছে না মঞ্জু!

—লক্ষ্মীটি, চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। ঘুম আসবে'খন।

এই মধুর সম্ভাষণে খুসীতে মধুপের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া

মঞ্জুরি ধীরে ধীরে মধুপের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে চুলের ভিতর আঙুল দিয়া বুলাইয়া দিতে লাগিল। মঞ্জুরির হাতের শীতল স্পর্শে মধুপ চক্ষু মুদিল।

ভোরের দিকে উমারাণীর চঞ্চল নিদ্রা কিসের শব্দে ছাঁৎ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া তিনি আসিয়া মধুপের ঘরের ভেজানো দরজা অতি ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেন—মধুপ ঘুমাইতেছে, আর শ্রান্ত মঞ্জুরি তাহার মাথার দিকে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া মধুপের বালিসের এক কোণে মাথা রাখিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার ডান হাত মধুপের কপালের উপর অবশ ভাবে পড়িয়া আছে। ভাবিলেন, এমন দু'টি না হলে মানায়! যেন দু'টির জন্যে দু'টি জন্মেছে! আনন্দে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইল। তিনি ধীরে ধীরে দরজা ভেজাইয়া দিলেন।

মঞ্জুরি মধুপের বালিসের এক কোণে তাহার দিকে মুখ করিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। একটু পরে মধুপ তাহার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। দু'জনে মুখোমুখি ঘুমাইতে লাগিল। মঞ্জুরির ডান হাত মধুপের কপাল হইতে গড়াইয়া তার গলার উপরে আসিয়া পড়িল।

ঠুং শব্দে মঞ্জুরি চোখ মেলিয়া চাহিল। মুখের কাছে মধুপের প্রশান্ত ঘুমন্ত মুখ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ঘুমের উপর। ভাবিল, ছি, ছি! মধুপ বাবু যদি আগে জাগিতেন, কি ভাবিতেন তিনি!

শশব্যস্তে উঠিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অঞ্জলি পিছন ফিরিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া।

মঞ্জুরি মনে মনে বলিল, পৃথিবী দ্বিধা হও, তোমার কোলে মুখ লুকাই।

অঞ্জলি মেজার-গ্লাস লইয়া ফিরিতেই দেখিল, মঞ্জুদি' জাগিয়াছে। হাসিয়া বলিল—ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম, না মঞ্জুদি'?

মঞ্জুরির মুখে যেন কে সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! সে ঘরের বাহিরে আসিয়া একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—এত বেলা হয়ে গিয়েছে, একটু আগে ডাকতে পারলে না?

অঞ্জলি ভয়ে ভয়ে বলিল—আমার কি দোষ মঞ্জুদি'! আমি তো ভোরে উঠেই ইলার কাছে গিয়েছিলুম আমার গল্পের বই আন্‌তে। এনে পড়তে বসেছি, মা বল্‌লেন—"মেজার-গ্লাসটা আন্‌তো মধুর ঘর থেকে। দেখিস্, মধুর ঘুম যেন না ভাঙ্গে।"

জিভ কাটিয়া মঞ্জুরি বলিল—ছি! ছি! কি পোড়ার ঘুম পেয়েছিল চোখে! তার পর অঞ্জলিকে বলিল—তুমি ভাই তোমার দাদার কাছে একটু বোসো, আমি চট্ করে চান্‌টা সেরেনি। যদি ঘুম ভেঙ্গে কিছু চান, দিও। আমি এই এলুম বলে। তুমি ঘরে বসে বসে পড়ো. আমাকে দাও মেজার-গ্লাস আমি মাসিমাকে দিয়ে চান্ করতে যাবো—বলিয়া অঞ্জলির হাত হইতে মেজার-গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া মঞ্জুরি মধুপের ঘরে ঢুকিল। দেখিয়া মনে হইল যেন, সুরলোক হইতে কোন্ দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে!

অঞ্জলি থার্ম্মোমিটার লইয়া জ্বর দেখিতেছিল। মঞ্জুরি জিজ্ঞাসা করিলেন—কত?

হাসিয়া অঞ্জলি বলিল—একেবারে জ্বর নেই মঞ্জুদি'। তার পর খাপের মধ্যে থার্ম্মোমিটার ঢুকাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া বলিল—ভারী চমৎকার দেখতে হয়েছে কিন্তু তোমাকে মঞ্জুদি'।

—চমৎকার, না, আর কিছু!

অঞ্জলি বলিল—আচ্ছা দাদা, তুমি বলো, ভারী সুন্দর মানিয়েছে না মঞ্জুদি'কে?

মধুপ হাসিয়া বলিল—তোর রূপের গরব ভেঙ্গেছে তো?

অঞ্জলি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—কবে আবার আমি রূপের গরব করেছিলাম?

রূপের প্রশংসায় মঞ্জুরি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মুখ নত করিয়া বলিল—মুখ ধোবার জল দেবো?

—মুখ ধুয়েছি।

—বেদানা ছাড়িয়ে দি?

—দাও।

মঞ্জুরি বেদানা ছাড়াইতে লাগিল। মধুপ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃষ্টির গান বন্ধ করিয়া বর্ষা চলিয়া গেল। শরতের আকাশ-বাতাস দেবীর আবাহন-সঙ্গীত সুরু করিয়াছে। সকলের মুখে হাসি ফুটিয়াছে।

বৈকালে মঞ্জুরি পড়িবার ঘরে একটা বড় আর্সির সামনে দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাস করিতেছিল, অস্ত-রবির রক্তকিরণ পশ্চিমের জানালা দিয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাকে

এক অপরূপ-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই সে বিভোর হইল।

আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া মধুপ মঞ্জুরির উদ্দেশে চলিল। মঞ্জুরির এই তন্ময় ভাব দেখিয়া মধুপ দরজার গোড়ায় চমকিয়া দাঁড়াইল। রূপমুগ্ধা মঞ্জুরি তাহা জানিতে পারিল না।

—মঞ্জু, একবারটি শোনো—বলিয়া আনন্দময়ী ডাক দিলেন। মাতার আহ্বানে কন্যার তন্ময় ভাব কাটিয়া গেল। পাশ ফিরিতেই চৌকাঠের উপর পা দিয়া মধুপকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

চৌকাঠ পার হইয়া মৃদু হাসিয়া মধুপ বলিল—লুকিয়ে পরের রূপ দেখা অন্যায়? না, লুকিয়ে নিজের রূপ দেখা অন্যায়?

মৃদু হাস্যে সরম-জড়িত কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল—দু'টোই অন্যায়।

—আমি মনে করেছিলাম—

—কি মনে করেছিলেন?

—মনে করেছিলাম, লুকিয়ে পরের গান শোনা যখন দারুণ অন্যায়, তখন লুকিয়ে পরের রূপ দেখা—

মঞ্জুরি গম্ভীর হইয়া বলিল—আবার সেই পুরানো কথা! পরকে আঘাত দিয়ে আপনারা কি সুখ পান, বলুন তো?

মৃদু হাসিয়া মধুপ বলিল—আঘাত না দিলে আঘাত দেবার সুখ জানা যায় না।

—চাই না জান্‌তে! আপনি বসুন, মা ডাকছে, শুনে আসছি। বলিয়া মঞ্জুরি দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

একটু পরে অলক আর বিনয় বাবু ঘরে ঢুকিলেন। মধুপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেশ হইতে ফিরিবার পর বিনয় বাবুর সহিত মধুপের বেশ আলাপ হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই বিনয় বাবু মধুপের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন এলে?

—এই খানিকক্ষণ! আপনার শরীর ভালো?

—নাঃ। বিশেষ ভালো নয়, আবার বিগ্‌ড়োতে আরম্ভ করেছে। দেশে বেশ ভালো ছিলাম! এখানে যেন কেমন—

—দেশেই থাকুন না কেন! এখন কোথাও বেরিয়েছিলেন?

—হাঁ, অলককে সঙ্গে নিয়ে একবার ডক্টর রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। দেখে বললেন, কমপ্লিট রেষ্ট চাই। যাই করি না কেন, বৃদ্ধ বয়সের একটা জরাব্যাধি আছে তো! সোত্তোর বছর বয়সে কি আর সতেরো বছর বয়সের মত সুস্থ-সবল থাকবো? তবে স্থান পরিবর্ত্তনে একটু-আধটু তফাৎ হয়, এই যা।

রামজীবন একটা বড় ট্রেতে করিয়া চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। টিপয়ের উপরে ট্রে নামাইয়া সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরি ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

অলক এবং মধুপের সামনে দু' ডিস্ খাবার, দু' কাপ চা বসাইয়া দিতেই বিনয় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া মধুপ বলিল—আপনি?

বিনয় বাবু বলিলেন—ডাক্তারে চা খেতে বারণ করেছে। চা খেলে দেখেছি ক্ষিদে হয় না, তাই ওটার মায়া ত্যাগ করেছি। এখন ক্ষিদে মন্দা হয়। ক্রমে শরীরের যন্ত্রগুলোর গতিও মন্দা হয়ে আসবে। তাই ভাবছি, মঞ্জুর বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

মঞ্জুরি অভিমান-ভরে বলিল—তোমরা আজকাল আর আমাকে ছোটবেলার মত ভালবাসো না। এখন আমায় বিদেয় করতে পারলেই তোমাদের আনন্দ। বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মধুপকে লক্ষ্য করিয়া বিনয় বাবু বলিলেন—শুনলে ওর কথা! বলে, আমরা না কি ওকে বিদেয় করে আনন্দ পাবো! আরে, তোকে সুখী করেই যে আমাদের সুখ! মা-বাপ না হলে মা-বাপের অন্তর বুঝবি না।

পিতৃস্নেহে বিনয় বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মধুপকে বলিলেন—জয়ন্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে মধুপ?

মধুপ বলিল—তাঁর কথা অনেক শুনেছি বটে, তবে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।

বিনয় বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—খুব ভালো ছেলে। এই সে-দিন বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে দেশে ফিরেছে, ফিরেই মেডিকেল কলেজে প্রোফেসরী পেয়েছে। বেশ মোটা মাইনে পায়। প্রায় চার-পাঁচশো হবে। তারই সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। মঞ্জু কিন্তু এখন বিয়ে করতে রাজী নয়। বলে, আই-এ পাশ করবার পর। আমি বলি, শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভালো। তুমি কি বলো?

মধুপ বিপন্ন হইল। ভাবিয়া পাইল না, কি উত্তর দিবে। বিনয় বাবুর কথাগুলি তাহার কাণে যেন গরম সীসা ঢালিয়া দিয়াছে!

অলক বলিল—ও তো এখন পড়ছে। পড়ুক না! জোর করে লাভ কি? পাত্রের কথা বলছেন, জয়ন্ত সুপাত্র, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও যোগ্যতর পাত্র মেলা অসম্ভব নয়।

কথাটা বলিয়া অলক ঘরের বাহির হইয়া গেল।

এই যোগ্যতর পাত্রটি যে মধুপ, তাহা বিনয় বাবু বুঝিতে না পারিলেও অলক মধুপকে উদ্দেশ করিয়াই কথাটা বলিয়াছে, মধুপ তাহা বুঝিল।

চেয়ারটা মধুপের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে বিনয় বাবু বলিলেন—তুমি এক কাজ করতে পারো মধুপ?

মধুপ কুতূহলী দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন—তোমার কথা ও খুব শোনে। তুমি যদি ওকে বলে-কয়ে মতটা করাতে পারো, তা হলে দেশে যাবার আগেই আমি শুভ কাজটা সেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

কথাগুলি মধুপের বুকে শেলের মত বিঁধিল। ম্লান হাসিতে অন্তরের আলোড়ন ঢাকিয়া মধুপ বলিল—বলে দেখবো। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কথা কতখানি শুনবে, বলতে পারি না।

বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন—তুমি বললে ও না বোলতে পারবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল নয় কি?

অন্তর্যামী অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিলেন! বৃদ্ধ যাহাকে শুভ কার্য্যে মত করাইবার জন্য দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া খুশী হইলেন, তাহারই শুভ দৌত্যগিরি যে তাহার আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া 'শুভস্য শীঘ্রং'-এর পথ অন্য দিক্ দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ছোট্ট প্লেটে করিয়া মঞ্জুরি মশলা লইয়া প্রবেশ করিল।

বিনয় বাবু বলিলেন—মঞ্জু, মা, বুড়ো ছেলের খাবার কথা একেবারে ভুলে গেলি!

মঞ্জু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল,—বা রে, কেন ভুলবো! ঠাকুর লুচি ভাজছে। আমি তো ডাকতে এলাম। গরম-গরম খাবে।

—আচ্ছা মা, যাই। তোমরা বোসো। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মধুপের অন্তরে আজ যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা তাহার অন্তরের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিজয়-গৌরবে বহিয়া চলিল। সে মনে মনে বলিল, ওগো অদৃশ্য দেবতা, তোমার এ কি লীলা! মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে যে-বুক আশার রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর ছিল, এখন সেখানে এই অসহ্য দাহ! ওগো হাসি-কান্নার দেবতা, বুকে শক্তি দাও, দুঃখে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ি!

হৃদয়ের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে প্রফুল্লতার আবরণে ঢাকিয়া মধুপ বলিল—বোসো মঞ্জু, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কি কথা? বলিয়া মঞ্জু চেয়ার টানিয়া মধুপের কাছে বসিল।

মধুপ বলিল—শুভ কাজ কবে হচ্ছে? 'শুভস্য শীঘ্রং'! আমাদের আর সবুর সইছে না। বেশ করে এক-পেট খাওয়া যাবে—কি বলো?

মঞ্জুরি বুঝিতে পারিল যে, বাবা বিবাহের কথা মধুপ বাবুর কাছে বলিয়াছেন! তাই মধুপ বাবু এ কথা বলিতেছেন!

হাসিয়া লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে সে বলিল—নিশ্চয়, কিন্তু একটা কথা আগে থাকতে বলে রাখা ভালো। বিয়েব দিন বাড়ীতে খাবেন না, আর না ডাকলে খেতে আসবেন না, কেমন?

মধুপ যতই অন্তরের আগুনকে হাসি এবং রহস্য দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহা দ্বিগুণ শক্তিতে তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—ঠাট্টা নয় মঞ্জু! জয়ন্ত বাবুর মত সুপাত্র আজকাল বড় একটা পাওয়া যায় না। তুমি এ বিয়েতে সুখী হবে। তোমার বাবাও সুখী হবেন।

মুহূর্ত্তে মঞ্জুরির রহস্যোজ্জ্বল মুখ শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ বজ্রভরা মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে সজোর কণ্ঠে বলিল—সুখী হবো, কি করে জানলেন?

—তোমার বাবা তো তাই—

কথার মাঝখানে মঞ্জুরি বলিয়া উঠিল—ও! তাই বুঝি বাবার হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন!

মঞ্জুরির রুক্ষ কণ্ঠ আহত ব্যাঘ্রকে খোঁচাইয়া তুলিল। মধুপ চড়া সুরে জবাব দিল—হ্যাঁ, কতক তাই বটে। তোমার বাবা তোমাকে বলবার জন্য বললেন, তাই বলছি। তুমি না কি আমার কথা শুনবে, অমান্য করতে পারবে না!

—সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনি—মঞ্জুরি আর বলিতে পারিল না, মুখে হাত চাপা দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যাপার এত দূর গড়াইবে, মধুপ স্বপ্নে ভাবিতে পারে নাই। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মঞ্জুরি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। মঞ্জুরির অশ্রু মধুপের মনের সমস্ত তিক্ততা ধুইয়া মুছিয়া দিল। অতি ধীর কণ্ঠে সে ডাকিল, —মঞ্জু!

মঞ্জু সাড়া দিল না। তাহার অশ্রুর উৎস যেন আরও বাড়িল। সে তেমনি ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মধুপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে মঞ্জুরির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল—মঞ্জু, লক্ষ্মীটি, কেঁদো না, বাইরে মাসিমারা রয়েছেন, ভুলে যদি কোন অপরাধ করি—

ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে মঞ্জুরি ধীরে ধীরে বলিল—আঘাত দিয়ে কি সুখ পান, জানি না। আঘাত দেবার ব্যথা কি আপনাদের বুকে বাজে না? এত দিন কি কিছুই—

মঞ্জুরির একখানা হাত নিজের হাতে লইয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে মধুপ বলিল—আমার কথার উপর বিশ্বাস না করে আমার অন্তরের দিকে একবার চাও মঞ্জু! যদি দেখাবার হতো, দেখাতে পারতাম, আমার বুকের মধ্যে মধুপ-মঞ্জুরি মিশে এক হয়ে আছে!

মঞ্জুরি চেয়ার ছাড়িয়া মধুপের বুকে নিজের মাথা রাখিয়া বলিল—তবে জেনে-শুনে এ আঘাত কেন দিলে?

মঞ্জুরির অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মধুপ বলিল—উপায় ছিল না মঞ্জু! ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। আজ এই চোখের জলেই আমাদের প্রেমের পরীক্ষা। তোমার-আমার মিলনের মধ্যে সমস্ত অন্তরায় আজ এই অশ্রুস্রোতে ভেসে যাক্।

খোলা জানালা দিয়া পাগলা জ্যোৎস্না আসিয়া তাহাদের উপর লুটাইয়া পড়িল। পাশের বাড়ী হইতে শাঁখের শব্দ শোনা যাইতেছিল।

মধুপ বলিল—শুনতে পাচ্ছো মঞ্জু!

—পাচ্ছি! বলিয়া মঞ্জুরি মধুপকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

শ্রীসত্যব্রত সরকার (বি-এ)।

মেঘদূত

এ কালের মেঘদূত ও দেশের বার্ত্তা কহে
এ দেশের কানে।
সে কালের মেঘদূত যুগ হ'তে যুগান্তরে
বার্ত্তা বহি আনে।

শ্রীকালিদাশ রায়।

সামুদ্রিক সর্প

(প্রাণীতত্ত্ব)

সামুদ্রিক সর্পের বৈজ্ঞানিক নাম হাইড্রোফাইডি (Hydrophidae) অর্থাৎ 'জলজ ফণী।' এদেশের অনেকেরই জীবন্ত সামুদ্রিক সর্প দেখিবার সুযোগ নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার আলিপুর পশুশালায় সামুদ্রিক সর্প দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই সময় প্রায় পনর-কুড়িটি সামুদ্রিক সর্প পশুশালার সরীসৃপ-কক্ষস্থ আধারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। সেই সামুদ্রিক সর্পগুলির দেহ কৃষ্ণ ও পাংশুবর্ণে চিত্রিত ছিল। সর্পগুলিকে অধিক দিন পশুশালায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পুরীর সমুদ্রতীরে ইহাদিগকে পুনর্ব্বার পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সেই পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহাদের অজ্ঞাত জীবনের যে সকল গূঢ় তথ্য, এবং পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে ইহাদের জীবনধারার যে সকল রহস্য জানিতে পারিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

সামুদ্রিক সর্পের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই ইহাদের পুচ্ছের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পুচ্ছ সাধারণ সর্পের পুচ্ছের মত ক্রমশঃ সরু না হইয়া, সন্তরণের সহায়তার নিমিত্ত ইহার প্রান্তভাগ চেপ্টা ও গোলাকার হইয়াছে। নৌকার দাঁড়ের মত চেপ্টা ও গোলাকার পুচ্ছই সামুদ্রিক সর্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুচ্ছের মত ইহাদের শল্কও স্থলচর সর্পের শল্ক হইতে বিভিন্ন। স্থলচর সর্পের শল্কগুলি খোলার ঘরের চালের খোলার মত তাহার দেহে একটির উপর আর একটি করিয়া সজ্জিত থাকে; সামুদ্রিক সর্পের শল্ক সে ভাবে সংরক্ষিত নহে। এই শল্ক ইহার দেহে ঘরের মেঝের উপর প্রসারিত টালির ন্যায় পাশাপাশি সংস্থাপিত; অর্থাৎ একখানি শল্কের উপর অন্য শল্ক উদ্গত না হইয়া ঠিক তাহার পার্শ্বেই অন্য শল্কের অবস্থান লক্ষিত হয়। ইহাদের শল্কের আকার সাধারণতঃ ষট্‌কোণ হইয়া থাকে। স্থলচর সর্পের মত ইহাদের উদরতল বৃহৎ শল্কে আবৃত নহে। স্থলে চলিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া ইহাদের উদরতলে বৃহৎ শল্কের উৎপত্তি হয় না। সমুদ্রে দ্রুত সন্তরণের নিমিত্ত ইহাদের উদরতল সাধারণ সর্পের মত চেপ্টা না হইয়া নৌকার পুরোভাগের মত বা কালাচ সর্পের পৃষ্ঠের মত কোণাকৃতি।

সামুদ্রিক সর্পকে সমুদ্রের সকল অংশে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সকল সমুদ্রেই ইহারা বাস করে। পারস্যোপ-সাগরে, আরব সাগরে, বঙ্গোপসাগরে, মালয় উপদ্বীপের সন্নিকটে ও অষ্ট্রেলিয়ার চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্রে, জাপান সমুদ্রে, এবং প্রশান্ত মহা-সাগরের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহা-সাগরের যে অংশ বিষুব মণ্ডলের বহির্ভাগে অবস্থিত, সেই অংশে ইহারা বাস করে না। মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে, মধ্য-আমেরিকার উত্তর দিকের সমুদ্রেও সামুদ্রিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। কোষ্টারিকা হইতে সুদূর পানামা উপসাগরে এবং কালিফোর্নিয়া উপসাগরের নিম্নভাগেও ইহাদিগের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর সামুদ্রিক সর্পকে আবার লুজন (Luzon) দ্বীপের হ্রদের মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়। এই দ্বীপটি ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ। এই দ্বীপস্থিত হ্রদের জল লবণাক্ত নহে। এইরূপ স্বাদু জলের মধ্যে এক জাতীয় সামুদ্রিক সর্পই বাস করে। এতদ্ব্যতীত সকল হাইড্রোফাইডি সামুদ্রিক জীব।

সামুদ্রিক সর্প সাধারণতঃ ৪।৫ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর সামুদ্রিক সর্প ৮।১০ ফুটও দীর্ঘ হয়। গোক্ষুর এবং কালাচ সর্পের সহিত ইহাদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই কারণে ইহাদিগকে গোক্ষুর, কালাচের সামুদ্রিক জ্ঞাতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র এবং দেহ প্রায়ই স্থূল হইয়া থাকে; কিন্তু এক শ্রেণীর সামুদ্রিক সর্প অত্যন্ত সরু। ইহারা মোটামুটী সাতটি জাতি, এবং আটচল্লিশটি উপজাতি বা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোনটিরও ফণা নাই। ফণাহীন মস্তক এবং চেপ্টা ও গোলাকার পুচ্ছই সামুদ্রিক সর্পের বিশেষ লক্ষণ। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেই এই জাতীয় সর্পকে সহজে চিনিতে পারা যায়।

সামুদ্রিক সর্পের চক্ষু অত্যন্ত ক্ষুদ্র। প্রথম দৃষ্টিতে মস্তকের পার্শ্বে অনেক সময়েই ইহা নজরে পড়ে না। ইহাদের চক্ষুর গঠন এরূপ যে, তদ্দ্বারা কেবল মাত্র জলের মধ্যে দর্শনই সম্ভবপর। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে তীরের উপর আসিয়া পড়িলে সূর্য্যের কিরণে ইহারা একেবারে অন্ধ হইয়া যায় এবং দৃষ্টিহীন হওয়ায় আর সমুদ্রের জলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। মস্তকের উপর মুখের অগ্রভাগে ইহাদের নাসারন্ধ্রদ্বয় অবস্থিত। এই নাসারন্ধ্রও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। জলে নিমজ্জিত হইবার সময় নাসারন্ধ্রকে ইহারা কুম্ভীরের মত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। অন্যান্য সামুদ্রিক জীব-জন্তুর মত ইহারা ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, এবং এই উদ্দেশ্যে বারংবার সমুদ্রের উপর ভাসিয়া উঠে। সাধারণ সর্পের মত ইহাদের ওষ্ঠে ফাঁক থাকে না। স্থলচর সর্পের মত স্পর্শবোধের নিমিত্ত ইহারা জিহ্বা বাহির করে না বলিয়াই ইহাদের মুখ একেবারে বন্ধ থাকে। শুধু স্থলের উপর আসিয়া পড়িলে ইহারা স্থলচর সর্পের মত ইহাদের ক্ষুদ্র জিহ্বা বারংবার বাহির করিতে থাকে। ইহাদের জিহ্বা ক্ষুদ্র বলিয়া ইহার অল্পাংশ মাত্র এই সময় বাহির হইতে দেখা যায়। জিহ্বা আকারে যেমন ক্ষুদ্র, ইহার অগ্রভাগও সেইরূপ ঈষৎ বিভক্ত। ইহাদের "চোয়াল" সাধারণ সর্পের চোয়াল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। "চোয়ালের" অনুপাতে ইহাদের বিষদন্তের আকারও ক্ষুদ্র।

ইহাদের শল্কের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কতকগুলি সামুদ্রিক সর্পের উদরতলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শল্কের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই কারণে জল হইতে তীরে আসিয়া পড়িলে

উহারা জলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। তবে স্থলচর সর্পের মত উহারা সহজে স্থলের উপর চলিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সামুদ্রিক সর্পের মধ্যে "পিলেমিস বাইকলর্' (Pelamis bicolor) সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদ্র সমূহের সর্ব্বাংশেই ইহারা বিচরণ করে। ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ কৃষ্ণ ও উদরতল হরিদ্রাভ বা পাংশুবর্ণ। এই সকল সর্প বহু দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার কোন শ্বেতাঙ্গ তীর হইতে ৫০ ফুট দূরে তটস্থিত বদ্ধ জল হইতে একটি সামুদ্রিক সর্পের সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্ন বালুকারাশির উপর দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদ্র হইতে ইহারা অনেক সময় নদীর খাঁড়িতেও প্রবেশ করে। নদীর মোহনায় যত দূর পর্য্যন্ত লোনা জল থাকে, তত দূর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে যাইতে দেখা যায়।

সামুদ্রিক সর্পের বর্ণ নানা প্রকার। বঙ্গোপসাগরে সুদৃশ্য বর্ণের ও নানা আকারের বহু সামুদ্রিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলির দেহ শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতি বর্ণে অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। ঝড়-বৃষ্টির পরদিন অতি প্রত্যুষে সমুদ্র-তীরে ভ্রমণ করিলে দুই-চারিটি সামুদ্রিক সর্পকে সমুদ্র-তীরস্থ বেলাভূমিতে নির্জ্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। উষাকালে সমুদ্রতটে ভ্রমণের সময় আমি ইহাদিগকে সেই স্থানে মৃতবৎ নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বেলা একটু অধিক হইলে আর ইহাদিগকে সমুদ্রতটে পড়িয়া-থাকিতে দেখা যায় না। প্রভাতালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইলে সামুদ্রিক চীলেরা (Sea-gull) সমুদ্রতটে আসিয়া তীরে নিপতিত এই সকল প্রাণী ভক্ষণ করে। একবার আমি সমুদ্র-স্নানের সময় একটি সামুদ্রিক সর্পকে জল হইতে সমুদ্রতটে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহার দেহ পরীক্ষার জন্য তাহার নিকট যাইতে না যাইতেই একটি সামুদ্রিক চিল আসিয়া তাহাকে মুখে তুলিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। এই জন্যই দিবাভাগে সমুদ্রতীরে সামুদ্রিক সর্পকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। রাত্রে সমুদ্রে জাহাজ নঙ্গর করিয়া জাহাজের পার্শ্বে আলো জ্বালিয়া রাখিলে ইহাদিগকে সেই আলোর নীচে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সেই সময় জাহাজের নিকটস্থ জলে নৌকা আনিয়া নৌকার পার্শ্বে টর্চ্চ-লাইটের আলো রাখিলে ঐ আলোকে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে উপস্থিত হয়। সে সময় জাল ফেলিলে ইহাদিগকে অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়।

কলিকাতার যাদুঘরে অনেক সামুদ্রিক সর্পের মৃতদেহ আরকে সুরক্ষিত হইয়াছে। আরকে নিমজ্জিত থাকায় উহাদের বর্ণ ও অঙ্গ-শোভা মলিন ও বিবর্ণ হইয়াছে। জীবন্ত সামুদ্রিক সর্পের বর্ণ-সম্পদ ও অঙ্গের চিত্রশোভা যে কিরূপ সুদৃশ্য, তাহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুই-একটি 'মডেল' দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যাদুঘরে ইহাদের অনেকগুলি মডেল আছে। সামুদ্রিক সর্প অপেক্ষা সর্পীর আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এবং উহাদের বর্ণও অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যায়। এক জাতীয় সামুদ্রিক সর্প-মিথুনের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ সর্পের বর্ণ কখন কখন এরূপ বিভিন্ন দেখা যায় যে, উহাদিগকে এক শ্রেণীর সর্প বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না!

ইহাদের ফুসফুসের আকার দেহের ন্যায় দীর্ঘ। এই জন্য ফুস্-ফুস্ বায়ুপূর্ণ করিয়া ইহারা জলের উপর অনায়াসে দীর্ঘকাল ভাসিয়া বেড়ায়। কোন কারণে ভয় পাইলে ইহারা অর্দ্ধ ঘণ্টাকালও ডুবিয়া থাকিতে পারে। শত শত সামুদ্রিক সর্প সময়ে সময়ে সমুদ্রের শান্ত বক্ষে ভাসিয়া রৌদ্র সেবন করে, অথবা অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের মত ক্রীড়ারত থাকে।

ইহাদের বিষদন্ত ও বিষগ্রন্থির আকার ক্ষুদ্র; এবং উহার গঠন-প্রণালী অনেকটা গোক্ষুরাদি সর্পের বিষদন্ত ও বিষগ্রন্থির অনুরূপ। বিষদন্তের আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের বিষ অত্যন্ত উগ্র ও ভীষণ সাংঘাতিক। সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যই ইহাদের একমাত্র ভক্ষ্য। ইহাদের মুখের ভিতর তীব্র বিষের উৎপত্তি হওয়ায় ইহারা সহজেই এই সকল মৎস্য শিকার করিতে পারে। মৎস্য ধরিয়াই ইহারা তাহার দেহ বিষদন্ত দ্বারা বিদ্ধ করে। বিষ-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সর্প-কবলিত মৎস্যের দেহের পেশীগুলি সমস্তই শিথিল হইয়া যায়, এবং তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু হয়। মৎস্যের পেশীসমূহ শিথিল হওয়ায় উহার দেহও কোমল হইয়া যায়; এই জন্য সর্পের মুখ গহ্বর সঙ্কীর্ণ হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৎস্যকেও গলাধঃকরণ করিতে ইহাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

ইহাদের দংশন-চিহ্ন অনেক সময় নির্ব্বিষ সর্পের দংশন-চিহ্নের অনুরূপ দেখায়। এই দংশন-চিহ্ন মশক-দংশনের চিহ্ন অপেক্ষা বৃহৎ নহে। ইহাদের দংশন বেদনাবিহীন, এবং সামান্য হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় নহে। সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং সেই সময়েও প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জলরাশি ক্রমাগত আলোড়িত হইলে কদাচিৎ ইহারা দংশন করিবার সুযোগ পায়। এই জন্যই ইহাদের দংশনের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না।

এক বার কোন জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে তাঁহার জাহাজ নঙ্গর করিয়া জাহাজের অদূরে সন্তরণে রত ছিলেন। সেই সময় সামুদ্রিক সর্প তাঁহার পায়ের গোড়ালির উপর দংশন করে। সর্পটি এতই মৃদু ভাবে দংশন করিয়াছিল যে, কাপ্তেন তখন তাহা বুঝিতেও পারেন নাই! জল হইতে জাহাজে উঠিয়া তিনি গোড়ালীতে ঈষৎ জ্বালা অনুভব করায়, সতর্ক ভাবে পরীক্ষার পর সেই স্থানে মশকের দংশন-চিহ্নের অনুরূপ অতি ক্ষুদ্র দংশন-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করায় তাঁহার দেহে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়; এবং দংশনের পর ৭১ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আর এক সময় একখানি যুদ্ধের জাহাজ গঙ্গার মোহনায় নঙ্গর করিয়া কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিতেছিল। জাহাজের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী হঠাৎ একটি সামুদ্রিক সর্পকে নঙ্গরের শিকলের সাহায্যে জাহাজে উঠিবার চেষ্টা করিতে দেখিলেন। তিনি কৌতূহল বশতঃ সাপটিকে ধরিতে উদ্যত হইলে, সে তাঁহার হস্তে দংশন করিল; তাহার বিষ-প্রভাবে অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মালয় উপদ্বীপের মৎস্যজীবীরা সমুদ্র হইতে তাহাদের জাল তুলিতে গিয়া অনেক সময় সামুদ্রিক সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া থাকে। জালে আবদ্ধ হওয়ায় সাপগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে; সেই অবস্থায় ইহাদের দংশন প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ইহারা তীরে উৎক্ষিপ্ত হইলে ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। তখন ইহাদের নড়িবার শক্তি থাকে না। পুরীর সমুদ্রতটে এই অবস্থায় দুইটি সামুদ্রিক সর্পকে

পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় পতিত কোন সর্পকেই নিরাপদ মনে করা সঙ্গত নহে। এই সময় ইহাদের অতি ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে মুক্ত আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ইহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়, এবং দংশন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড বেগে আস্ফালন করিতে থাকে; এমন কি, এই সময় উত্তেজনা বশতঃ ইহারা নিজের দেহও দংশন করে—এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে।

সামুদ্রিক সর্পী ডিম পাড়ে না, ইহারা একেবারেই পূর্ণাঙ্গ শাবক প্রসব করে। প্রত্যেক সর্পী ২টি হইতে ১৮টি শাবক প্রসব করে। সমুদ্রতটের যে সকল স্থানে নোনা জল বদ্ধ হইয়া হ্রদের ন্যায় অগভীর পল্বলের সৃষ্টি হয়, পূর্ণগর্ভা সামুদ্রিক সর্পীরা ঐ সকল বদ্ধ জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া শাবক প্রসব করে। শাবকগুলি মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াই খাদ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তৎপরে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া মৎস্যকুলে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সদ্যপ্রসূত গোক্ষুর-ছানার ন্যায় সদ্যপ্রসূত সামুদ্রিক সর্প-শাবকের বিষও এরূপ উগ্র যে, ইহাদের দংশনমাত্র ক্ষুদ্র মৎস্যাদির সমগ্র স্নায়ু ও পেশী পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া যায়, এবং অচিরে তাহাদের প্রাণবিয়োগ হয়।

সাধারণ সর্পেরা যেরূপ সম্পূর্ণ "খোলস" ত্যাগ করে, সামুদ্রিক সর্পগুলি সে ভাবে "খোলস" ত্যাগ করে না। ইহাদের নির্ম্মোক-ত্যাগের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খোলস ত্যাগ করিতে স্থলচর সর্প অপেক্ষা ইহাদের অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়; এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যেও ইহারা সম্পূর্ণ খোলস ত্যাগ করিতে পারে না। আংশিক ভাবেই ইহাদের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। নির্ম্মোক ত্যাগের উপরেই সর্পের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সম্পূর্ণ "খোলস" ত্যাগ করিতে না পারিলে সর্পের জীবন অনেক সময়েই বিপন্ন হইয়া থাকে। এ কারণে কৃত্রিম উপায়ে উহাদের খোলস ছাড়াইয়া দিতে হয়। "খোলস" আংশিক ভাবে পরিত্যক্ত হইলেও সামুদ্রিক সর্পের জীবনে কোনও বিভ্রাট ঘটে না।

সুতীব্র বিষের অধিকারী হইলেও সামুদ্রিক সর্পের জীবন সমুদ্রেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের মৎস্যগুলি ইহাদিগকে যেরূপ ভয় করে, ইহারাও সেইরূপ অতি বৃহৎ মৎস্য, হাঙ্গর ও সামুদ্রিক বাজের মত পক্ষীগুলিকে ভয় করে। হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে।

বন্দী অবস্থায় ইহারা অধিক দিন জীবিত থাকে না. আলিপুর প্রাণীশালায় ইহাদিগকে অল্প কালের জন্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এক বার ক্যারোলাইন দ্বীপ হইতে দ্বাদশটি সামুদ্রিক সর্প ক্যানেস্তারায় পুরিয়া নিউ ইয়র্কের সরীসৃপাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। জাহাজে তুলিয়া হইয়া-আসিবার সময় সেই সর্পগুলি স্বাদু পানীয় জলপূর্ণ আধারে সংরক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহই উহাদিগকে সমুদ্রের জলে স্নান করাইতে হইত। নিউ ইয়র্কের প্রাণীনিবাসে আনীত হইলে, একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা সমুদ্রের জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে উহাদিগকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ছয় মাস সেখানে জীবিত থাকিবার পর সাপগুলি ক্রমশঃ একটির পর একটি প্রাণত্যাগ করে। বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও সেখানে উহাদিগকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীঅশোকচন্দ্র বসু (বি-এ)

স্যুইজারল্যাণ্ডে সূর্য্যোদয়

রজতচন্দ্রিকানিভ অভ্রংলিহ গিরিশৃঙ্গ পরিয়াছে তুষার-কিরীট,
স্যুইস্-পর্ব্বতমালা যেন দুগ্ধধবলিত ভাম্যমান্ অনঘ প্রাবৃট!
স্বপ্নে যেন হেরিলাম উর্ব্বশীর অপরূপ নৃত্যতালে রূপের আরতি,
অরূপের পাদপদ্মে পরিপূর্ণ-চিত্তে সেথা রাখিলাম প্রাণের প্রণতি।

অর্দ্ধতন্দ্রাজাগরণে মোহমুগ্ধ দু'নয়নে হেরিলাম নব সূর্য্যোদয়,
কার্ণেশন্, ড্যাফোডিল, রডোডেনড্রনগুচ্ছ বিদেশীর মাগে পরিচয়।
ফলাক্রান্ত দ্রাক্ষালতা, পুষ্পবীথি, কুঞ্জবন, পাইনের অনন্ত বিস্তার,
রক্তিম যৌবনপ্রান্তে সেই শান্ত সূর্য্যোদয়, মনে হয় স্বপ্ন-পারাবার।

ইন্দ্রনীলে-সান্দ্রনীলে হরিতে-পাটলে-স্বর্ণে বর্ণে বর্ণে কি অপূর্ব্ব রূপে,
জ্যোতির হৃদয়পদ্ম খুলিল সহস্রদলে পরিমল বিলাতে মধুপে।
অন্তর্হিত কুজ্ঝটিকা, গলিত রজত দীপ্তি গিরিশৃঙ্গে পড়িল তির্য্যক্,
কলচ্ছন্দে নির্ঝরিণী শৈলগাত্রে নৃত্যরত, স্রস্ত শ্লথ তিমির-নির্ম্মোক্।

কীর্ত্তি যার ইন্দ্রধনু পতঙ্গ-পাখার গায় ক্ষণিকে যা' যায় মিলাইয়া,
তা'রি পরিপূর্ণ রূপে শাশ্বত সৌন্দর্য্য হেরি' রূপমুগ্ধ এ বিদগ্ধ হিয়া।
পুষ্পসম অর্ঘ্য দিনু তনু-মন সেই ক্ষণে জীবনের পরম-প্রভাতে,
হেরিলাম দিনদেব লাবণ্যের স্তরে স্তরে ঝলকিছে তুষার-সম্পাতে।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল)।

(উপন্যাস)

২৪

গ্রামে তেমন নিকট-আত্মীয় কেহ না থাকিলেও আমাদের পাতানো ঠাকুরমা, জেঠাইমা, কাকীমার অভাব ছিল না। বাবার সৌজন্যপূর্ণ সরল ব্যবহারে প্রতিবেশীদের সহিত আমাদের আত্মীয়তা-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইলেও আমাদের গ্রামখানিকে খাঁটি 'পাড়াগাঁ' বলা যায় না। গ্রামে হাট-বাজার, ডাকঘর, ষ্টেশন, ইংরেজী স্কুল এ সকলই ছিল—কিন্তু এক মিশনারী স্কুল ভিন্ন মেয়েদের জন্য পৃথক কোনও বিদ্যালয় ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে পাটের ব্যবসায়ের জন্য ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই গ্রামে আসিয়া 'মিশন' স্থাপন করিয়াছিল। তদবধি গ্রামস্থ বালিকারা 'বাইবেল' গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব ত্যাগের কাহিনী পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। আমার অগ্রবর্ত্তিনীদের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অধিকাংশ বালিকাকে বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী যাইতে হইয়াছে। 'মিশনের' একমাত্র পুরাতন ছাত্রী আমিই কলেজে পড়িতেছি। মিশন-স্কুল হইতে সর্ব্ব-প্রথম আমিই 'ম্যাট্রিক' পাশ করায় মিশনের শিক্ষানেত্রী পূতচরিত্রা সিষ্টার 'ডরোথি' আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

পিসিমার চিঠি শেষ করিয়া আমি বাগানে ঢুকিলাম। পুষ্প ও পুস্তক বাবার অত্যন্ত আদরের জিনিস। প্রভাত ও সন্ধ্যা তিনি বাগানেই অতিবাহিত করিতেন।

নিতাই চাকরের সাহায্যে বাবা স্থলপদ্ম ফুল-গাছের গোড়ার মাটি আলগা করিয়া দিতেছিলেন। ফুল ফুটিবার মরসুম সবে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি-শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি। একটি ক্ষুদ্র শাখায় চারিটি স্থলপদ্ম ফুটিয়া যেন একটি সুন্দর তোড়া রচনা করিয়াছে। গন্ধরাজের পাতা দেখা যায় না, ফুলে ফুলে শাখা-পত্র আচ্ছন্ন। সেফালির মৃদু সৌরভে পুষ্পোদ্যান আমোদিত।

আমি মুগ্ধ—পুলকিত চিত্তে কহিলাম, "কি সুন্দর! আগে তো এত গাছ, এত ফুল ছিল না?"

বাবা হাসি-মুখে বলিলেন, "এ-দিকের এ গাছগুলো নতুন লাগিয়েছি; তুই অনেক দিন পরে এসেছিস কি না তাই দেখিসনি। এ লতাটা সিষ্টার 'ডরোথি' আমাকে দিয়েছেন। বড় সুন্দর এই লতার ফুলগুলি।"

বলিলাম, "ঐ স্থলপদ্মের ডালটা ভেঙ্গে তার সঙ্গে অন্য ফুল মিশিয়ে আমায় দাও না বাবা! আমি এক্ষুনি গিয়ে 'সিষ্টারের' সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিয়ে আসি। লতার নতুন ফুলও দু'টো দাও। এত ফুল, কাউকে না দিলে আমার তৃপ্তি হয় না। এখন না তুললে, পরে রোদের তাতে শুকিয়ে ঝ'রে পড়বে।"

—"ঝ'রে পড়লেও আবার ফুটবে, ফুলের অভাব কি? কত ফুল চাস্? সকালে তোর স্নানের অভ্যাস, করু! তা তুই স্নানও করলি নে, কিছু খেলিও না। আজ না হয় থাক, কাল সকালে যাস্?"

—"না, বাবা, এখুনি একবার ঘুরে আসি। বাড়ী এসে ভোরে স্নান করতে ভাল লাগে না। খানিক বেলা হোক, তখন নাইলেই হবে। এই এখুনি তো পিসিমা এক বাটি গরম দুধ খাইয়ে দিলেন। কাল থেকে তো পাড়ায় পাড়ায় নেমন্তণের পালা চলবে, সময় পাবো না। আমার আসার খবর এখনো কেউ পায়নি কি না! খবরটা পেলে বাড়ী এতক্ষণ লোকে ভরে যেতো।"

—"বিন্দু বিধবা, আমিও তার সমান। বাড়ীতে মাছ আসে না বলেই সকলে স্নেহ করে তোকে খেতে বলেন। সকলের স্নেহ-ভালবাসা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়,

করু! পাড়াগাঁয়ে এখনো এটার অভাব হয়নি; কিন্তু শহরে এর অস্তিত্ব আছে কি না, টের পাবি নে। সবাই ভালবাসে, তাই দেখতে আসে, খেতে বলে; সে জন্যে কি বিরক্ত হ'তে আছে?"

—"না বাবা, বিরক্ত হবো কেন? দেখতে আসেন, খেতে বলেন—সে তো সুখের কথা। কিন্তু ওঁরা এত বাজে বকেন, তা আমার ভাল লাগে না। শহরে ভালবাসাও নেই, বাজে কৌতূহলও নেই। কার ছেলে-মেয়ে বড় হলো, সে জন্যে কারও দুশ্চিন্তা নেই; কারও মাথা-ব্যথাও করে না।"

—"যেখানে মাথাই নেই, সেখানে ব্যথা করবে কি? এদের ছোট গণ্ডী, ছোট কথা; বৃহৎ জগতের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। রান্না, খাওয়া, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এই হলো এখানকার চিন্তার ফিরিস্তী। তোর রাগের কারণ জানি, রাগ করিস নে। যা পল্লীসুলভ তার কোন ব্যতিক্রম দেখলেই প্রশ্ন করা এদের স্বভাব।"—বলিতে বলিতে বাবা ফুলে পাতায় প্রকাণ্ড একটা তোড়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

আমার হাতে তোড়াটা দিয়া তিনি কহিলেন, "সিষ্টারকে এটা দিয়ে আয়। ছোট ফুল-ক'টা তাঁরই দেওয়া লতায় ফুটেছিল—বলিস্। গল্পে মত্ত হ'য়ে দেরী করিস নে। বেশী বেলায় স্নান করলে মাথা ধরবে। নিতাই তোকে রেখে আসুক, কি বলিস্?"

—"নিতাইয়ের দরকার নেই, এইটুকু রাস্তা, আমি একাই যাচ্ছি। নিতাইকে পিসিমা ডাকছেন। তুমি আজ স্কুলে নাই-বা গেলে বাবা! শরীর তোমার ভাল নয়, ক'দিনের ছুটি নাও না। দুপুরে তোমার গল্প শুনবো।"

—"সন্ধ্যাবেলা যত খুসী গল্প শুনো মা! "করুর গল্প-পর্ব্ব" নাম দিয়ে এখন ছুটি নেওয়ার সুবিধা হবে না। গেল সপ্তাহে শরীর খারাপ ছিল—দু' দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কতখানি সময়ই বা স্কুল! চারটেয় তো ফিরে আসবো। তুমি যাও, রোদ উঠছে।"—বলিয়া বাবা আমার সঙ্গে আসিয়া বাগান পার করিয়া দিলেন।

'মিশন' আমাদের বাড়ী হইতে বেশি দূরে নহে, নদীর ধারে নির্ম্মিত খড়ো-বাংলো। বামে প্রকাণ্ড মাঠ—শ্যামল দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত; দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান। ভরা-নদীর পরপারে শুভ্র কাশগুচ্ছ, তাহার সীমারেখা ঘেঁষিয়া বিস্তীর্ণ বালির চর ধু-ধু করিতেছে। বিচরণরত বনহংসের কল-কাকলি শরত-প্রভাতের উদাস বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে।

'বাংলো'-সংলগ্ন বকুলতলার বাঁধানো বেদীতে বসিয়া সিষ্টার 'ডরোথি' বাইবেল্ পড়িতেছিলেন। তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ দেহ এখনও অটুট স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল। প্রশান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি; শুভ্র বরণে, শুভ্র বসনে চিত্তের শুভ্র নির্ম্মলতা যেন পরিস্ফুট। মাথায় সাদা 'হুড্', বুকে রূপার 'ক্রুশ'।

তোড়াটা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া আমি অভিবাদন করিলাম।

তিনি সাদরে, সস্নেহে আমার করতল স্পর্শ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমের তোড়াটি তুলিয়া লইলেন, এবং আমাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া, ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে ইংরেজিতে কহিলেন, "করু, তুমি আজ প্রভাতেই আমাকে আনন্দ দিলে। প্রথম আনন্দ—তোমার আগমনে, দ্বিতীয় আনন্দ—তোমার প্রদত্ত উপহার লাভে; এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কবে এসেছ? আশা করি, ভাল আছ। এবার তুমি 'গ্র্যাজুয়েট্' হবে, আমার 'মিশনে'র বালিকার এই উন্নতিতে আমি গৌরব অনুভব করবো।"

আমি বলিলাম, "আমি বাবাকে দেখতে কাল এসেছি 'সিষ্টার'! এবার পড়া ভাল তৈয়েরী করতে পারিনি। তোমার 'মিশনে'র গৌরব বজায় রাখতে পারবো কি না বলা শক্ত।"

—"নিশ্চয়ই তার মান রাখবে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—প্রভু যীশু তোমার মঙ্গল করবেন। পরীক্ষায় পাশ করে তুমি কি করবে—স্থির করেছ কি?"

কি যে করিব, তাহা নিজেই জানি না; কাজেই চট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না।

'সিষ্টার' ক্ষণেক আমার দিকে চাহিয়া, মাথার হুড ঘোমটার আকারে সম্মুখে টানিয়া সহাস্যে কহিলেন, "তুমি এই করবে করু! আমি তা বুঝেছি। সে কে—কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি? বলতে বাধা আছে কি?"

আমি হাসিলাম, "না সিষ্টার, আপনার অনুমান ঠিক হয়নি। বিয়ে করলে তো ঐ ভাবে ঘোমটা দেওয়া; আমি বিয়ে করবো না। আমার ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কেউ নেই।"

'ডরোথি' সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করে সংসারী হতে তোমার অনিচ্ছা কেন করু? আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি হয়তো কোনো তরুণ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে হৃদয়ের শান্তি হারিয়ে বসেছ!"

—"না সিষ্টার, আমার হৃদয়ের শান্তি হারায়নি। তোমার পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে আমার সাধ হয়—বিয়ে

না ক'রে জগতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করি। আমি যতটুকু শিখেছি, যারা তা জানে না, তাদের সেইটুকু শিখাই।"

—"তোমার সাধু-সংকল্পে খুসী হলাম রুরু! কিন্তু তুমি বালিকা, এ পথ তোমার নয়। আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা হতে জেনেছি—এ বড় কঠিন কাজ। তোমার মা নাই, আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমার মনে হয়—একটি চরিত্রবান, উদার স্বভাবের ক্ষমাশীল তরুণকে বিয়ে করলে তুমি অনেক ভাল কাজ করতে পারবে। তুমি হিন্দু, শুনেছি, তোমাদের সমাজে চিরকুমারী থাক্‌লে নিন্দা হয়; তাই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি হৃদয়কে শান্ত করে বিয়ে করো। যদি নিতান্ত না পার, তাহলে কোথাও যেয়ো না। তুমি 'মিশনের' মেয়ে, মিশনেই তোমার কাজ হবে। আর একটি আমার অন্তরের কথা, তুমি মনে রেখো—তোমার বাবার অমতে কিছু করো না। তিনি অত্যন্ত সাধু-প্রকৃতির লোক। তাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি।"

বিদেশিনী 'ডরোথির' স্নেহসিক্ত উপদেশ আমার প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিল। যদি কখনো প্রয়োজন হয়,—উত্তাল তরঙ্গিণী-স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত যদি আমাকে ভাসিয়া যাইতেই হয়, তাহা হইলে ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আমি সেই উদ্দাম স্রোতোবেগ রোধ করিব। সামান্য খড়কুটার মত ভাসিয়া যাইব না, স্রোতে বিলীন হইব না! এই সকল কথা ভাবিয়া এত দিনে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইল। চিত্তের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল।

বলিলাম, "তোমার হিতোপদেশ, শুভ ইচ্ছাই আমি গ্রহণ করলাম সিষ্টার! তোমার অকৃত্রিম স্নেহের জন্য ধন্যবাদ! এখনো আমি আমার যাত্রাপথের নিশানা পাই নাই,—না পেলে আর কোথাও যাব না; তোমারই কাছে আসবো। জানি, তুমি আমায় ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে।"

আমার আন্তরিক নির্ভরতায় 'ডরোথির' নীল নয়ন দু'টি সজল হইল। তিনি আমার একখানা হাত হাতে লইয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

২৫

'মিশন' হইতে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীতে রীতিমত হাট বসিয়াছে! প্রতিবেশিনী ঠাকুরমা, জ্যেঠাইমা, মাসী-পিসির দল আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিয়াছেন। বাবা স্নানাহার সারিয়া স্কুলে গিয়াছেন। পুরুষশূন্য গৃহ নারী-কণ্ঠের কল-কল, খল-খল শব্দে মুখরিত হইতেছে!

কুণ্ঠিত ভাবে সকলের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। প্রণামের সঙ্গেই 'বড় ঘরে ছোট-বরে বিয়ে হোক', 'সাত ব্যাটার মা, ভাগ্যবতী হও',—ইত্যাদি গামুলি আশীর্ব্বাদধারা আমার মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল।

আমি গ্রাম্য নারী-সম্প্রদায়কে অতিশয় 'সমীহ' করিতাম। অশিক্ষিতা পল্লী-রমণীর প্রতি ইহা আমার অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য নহে। আমার কুণ্ঠিত মন, বেশি আলোচনা-আন্দোলনের মধ্যে থাকিতে পারিত না। জনতা দেখিলে আমার অন্তরাত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ছটফট্ করিয়া মরিত। আমি নির্জ্জনের প্রয়াসী, নিরালায় স্নেহের মাধুর্য্য অনুভব করিতে ভালবাসি।

গ্রামে আমার বয়সের একটি মেয়েও অবিবাহিতা নাই। বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে আর কেহ এমন বন্ধনহীন জীবন যাপন করিতেছে না। এই কারণে সকলের সহিত আমার ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ, না' ভিন্ন আমার যেন আর কিছুই বলিবার ছিল না।

গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরমা আমার নতমুখ তুলিয়া ধরিয়া ঝঙ্কার দিলেন, "দেখি লো নাতনী, সোনা-মুখের কেমন ছিরি হলো? কত দিন দেখিনি, প্রাণটা ঝুরে ঝুরে মরে। আকুলি-বিকুলি আমরাই করি, তুই তো দিব্যি সব্বাইকে ভুলে গেছিস্? নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা না-করেই ছুটেছিলি—সকলের আগে সেই খিষ্টান মাগীর আড্ডায়!"

এ আক্রমণ হইতে পিসিমা আমাকে রক্ষা করিলেন; নির্জ্জলা মিছা কথা কহিলেন, "রুরু কি তোমাদের ভুলতে পারে? বাড়ীতে পা দিয়েই তোমাদের কথা! সকালেই যেতে চেয়েছিল, তা আমি বললাম, 'মেমের' কাছে তোর লেখাপড়ার যা দরকার—সে সব সেরে আয়। মোটে সাত দিন থাকবি, এরা তো তোর আপন-জন, যখন খুসী যাবি-আসবি।—তবে না মেয়ে সেখানে গেল।"

ঠাকুমা প্রীত হইলেন, "তা তো সত্যি, আগের কাজ আগে সারতে হয়। এ-বেলা তুমিই নানানখানা রেঁধেছে—রাতে কিন্তু ও আমার কাছে খাবে। কলকাতায় মাছের যা দশা, তোমাদেরও নিরামিষের ধাঁচা, বাছা প্রাণ ভরে মাছ খেতে পায় না। মাছে-দুধেই বাঙ্গালীর শরীর; তা পায় না বলেই সোমত্ত বয়েসের মেয়ের ছিরিছাঁদ খোলে নি। যেমন ঢেঙ্গা, তেমনি লিক্‌লিকে গড়ন-পেটন। লেখা-পড়াই শেখো—গান গেয়ে আসরই মাত কর, আর যেই

ধেই নেত্য ক'রে পৃথিবী রসাতলে পাঠাও, তাতে কি বাপু ব্যাটাছেলের মন ভোলে ? সকলের আগে চেহারার চটক দেখানো চাই।"

পিসিমা সায় দিলেন, "যা বলেছ কাকীমা, মিছে নয়। এ কালের ছুঁড়ীগুলো বই নিয়েই মত্ত, শরীরের তোয়াজ জানে না। না খেয়ে মেয়ের এমনি ছিরি হয়েছে, তোমরা আদর করে খেতে দাও। সেখানে কে দেবে, কে আছে ? কাল ও তোমার কাছে খাবে কাকীমা, আজ আবার আমি দু'টো পিঠে-পুলি করতে গিয়েছি। চিরকাল রুক্ন তোমাদেরি খাচ্ছে, তোমাদের যত্ন-আত্যিতে এত বড়টি হয়েছে।"

পিসিমার আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন, আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দিনান্তের ম্লানছায়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে না হইতে বাবা ফিরিয়া আসিলেন। বিশ্রামান্তে জলযোগ করিয়া, আমাকে লইয়া তাঁহার ঘরে বসিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিনের আলো নিবিয়া গেল। জানালার নীচের বাগান হইতে ফোটা ফুলের মিশ্র গন্ধ সন্ধ্যার বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমি ইচ্ছা করিয়াই প্রদীপ জ্বালিলাম না। আমার বলিবার যাহা, দীপালোকে তাহা বাধিয়া যায়। অপার স্নেহ-সমুদ্রের উপকূলে, নিঝুম অন্ধকারে মানুষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। চন্দ্রচূড়কে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিবার পর হইতে আমার চিত্তচাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছিল। পিসিমার মনোভাব সুস্পষ্ট, বাবাও অনুকূল। সাত দিনের ছুটিতে আসিয়াছি, দুই দিন থাকিয়া প্রস্থান করিলেও ইহাদের মত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা বলিবার, এখন তাহা না বলিলে নিজেই জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িব, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

বাবার মাথার চুলে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে আমি বলিলাম, "তখন সিষ্টারের কাছে গিয়েছিলাম বাবা! তিনি বল্লেন, আমি বি-এ পাশ করলে তিনি 'মিশনে' কাজ দেবেন। এখন পারিশ্রমিক দিয়েই ওঁরা লোক রাখেন। তোমাকে অসুখ নিয়েই কাজ করতে হয়; আমি ফিরে এসে তোমাকে নিষ্কৃতি দানের জন্য মিশনে চাকুরী নেব। তোমার কাছে থাকবো—অন্য কোথাও যেতে হবে না।"

আমি যেন শুধু বাবার জন্যই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ব্যাকুল হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই অনুমানে বাবা স্নেহে মমতায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, "আমার শরীরের ভাবনায় তুমি এত অস্থির হয়েছ কেন, মা! আমার স্বাস্থ্য সাধারণের স্বাস্থ্যের তুলনায় ভালই বলতে পারি এ বয়সে এক-আধ দিন সর্দ্দি বা জ্বর হলে তাকে অসুখ বলা চলে কি ? তোমার হয়তো বিশ্বাস, আমি কষ্টে পড়ে ছেলে পড়িয়ে খাচ্ছি! কিন্তু সত্যই তা নয়। যাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী, অভাব তাদেরই; আমার অভাব নেই। কাজকর্ম্ম নিয়ে আছি, ভালই আছি, আনন্দে আছি। কাজ না থাকলে আমার থাকা না থাকা সমান রুক্ন! আর যা বলতে হয় বল; তোমার বুড়ো ছেলেকে কাজ ছাড়তে বলো না মা!"

—"কেন বলবো না, বাবা ? আমি যদি তোমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, আর চাকরী নিয়ে ভাল-রকম রোজগার করতাম; তাহলে তখনো কি তুমি চাকরী করতে ?"

—"করতাম কি না, তা অন্যের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নিজস্ব। অকর্ম্মণ্য অলস জীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয় নয়। আর ছেলের কথা বলাই বা কেন ? ছেলে মেয়েতে কিছুই প্রভেদ করিনি। তুমি আমার যা করছ, ছেলে থাকলে এর বেশি পারতো না। আমি তোমাকে পেয়ে সব পেয়েছি, রুক্ন! আমার ছেলের আক্ষেপ নাই।"

আমার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। আমাকে পাইয়া বাবা সব পাইয়াছেন—এ কত বড় দরাজ মনের কথা! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, করুণায়, অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত হইয়াও আমি সন্তাপে জ্বলিতেছি। বাবার মত আমিও কেন বলিতে পারি না—পিতৃস্নেহের অধিকারিণী হইয়া আমি সবই পাইয়াছি; আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই ?

গলা ধরিয়া আসিয়াছিল, তবু কথা কহিতে হইল; কহিলাম, "তোমার আক্ষেপ নাই বলে আমার কি উচিত অনুচিত বোধ থাকবে না বাবা ? তোমার যত-খুসী খাটতে থাকো, আমিও তোমার সঙ্গেই খাটবো। পরীক্ষা শেষ হলেই আমি 'মিশনে' ঢুকবো, আগেই তা বলে রাখছি; তখন কিন্তু তুমি অমত করতে পারবে না।"

বাবা ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'মিশনে' চাকরী নেওয়া ছাড়া আর কিছু কি তোমার মনে হচ্ছে না, রুক্ন! তুমি জান, উপার্জ্জনের উদ্দেশে পুরুষের সাথে মেয়েদের প্রতিযোগিতা আমি পছন্দ করি নে। দায়ে পড়ে অবশ্য অনেককেই অনেক কিছু করিতে হয়। সে ব্যবস্থা পৃথক্। পয়সার লোভে, ইচ্ছা করে ঘরের লক্ষ্মীদের এই ছেঁড়াছেঁড়ি, কাড়াকাড়ি ব্যাপারের আমি সমর্থন করিনে। আদিম কাল থেকে

ঘরে বাইরের পার্থক্যে যে সুন্দর শান্তির ধারাটা বয়ে আসছে, তা নষ্ট হতে দেখলে আমি ব্যথা পাই। দাসত্ব করা ছাড়া করবার কাজ ঢের আছে। লোকের উপকার করতে চাও, শিক্ষা দিতে চাও, দাও না কেন? অর্থের বিনিময়ে সৎকাজের দাম কমে যায়, তা মনে রেখো।"

—"তা হলে আমি কি করবো বাবা? তোমার কি ইচ্ছা—আমি এম-এ পড়ি, না বি-টি? যা হোক্-একটা কিছু করতে হবে তো? যদি তোমার মত থাকে, তাহলে না হয় কিছু না নিয়েই 'মিশনে'—"

বাধা দিয়া বাবা বলিলেন, "আমার মত অন্য। তুমি যদি আরো পড়তে চাও, তাতে আমি অমত করবো না। আমার ইচ্ছা, তোমাকে তোমার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা। তোমার মা নেই, দুই জনার যা করণীয় কাজ, আমাকেই একা তা সম্পূর্ণ করতে হবে। তোমাকে বড় করেছি, লেখা-পড়া শিখিয়েছি; এখন যোগ্য পাত্রে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

লজ্জায় মস্তক অবনত হইল; কিন্তু এটা আমার লজ্জার সময় নয়—মৃদু স্বরে বলিলাম, "তুমি যা ভেবেছ, তা আমি পারবো না বাবা! আমার প্রবৃত্তি নেই। আর কোন বিষয়েই আমি তোমার অবাধ্য হবো না, কেবল ওইটা বাদ। কেনই বা তোমরা চন্দ্রচূড় বাবুকে আনছ? আমার মা নেই বলে তোমরা আমাকে ভার বলে মনে করছ? কিন্তু মা থাকলে এমন তাড়াতাড়ি বিলিয়ে দিতে চাইতে না।" বলিতে বলিতে আমার এত দিনের সঞ্চিত অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল। আমি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

বাবা চকিত হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইলেন। আমার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সংসারী হতে চাও না—তা বলতে এত কান্না কেন, মা! আমি জানি না, আমায় তো কখনো বলোনি। তোমাকে ভার মনে করে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছি, এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমাকে সুখী করতেই আমার যত্ন আগ্রহ। তোমার মা থাকলেও এ-ই চাইতেন। তাঁর চাওয়া আমার চাওয়া ভিন্ন হতে পারে না। বিয়েতে তোমার প্রবৃত্তি নেই কেন—সেটা জানতে চাইলে কি তোমাকে পীড়ন করা হবে? আমাকে লজ্জা করো না মা! মনে কর, তোমার মাকে বলছ, যার কোলে রয়েছ। বল—কেন ইচ্ছা নেই, কারণ কি?"

অশ্রুর প্রথম উৎস-ধারা বর্ষণের পর আমার অশান্ত হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল। বাবার কথায় আমার অবারিত উচ্ছ্বসিত অশ্রুর ধারা সহসা থামিয়া গেল।

আমার দুর্নিবার লজ্জার কাহিনী কেমন করিয়া বলিব? ইহা কি বলিবার কথা? সে নগ্ন কদর্য্যতা বাহিরের নহে, অন্তরের। আমি বাবার কোলে মুখ গুঁজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলাম।

বাবা ধীরে আমার চুলের রাশি গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুকোমল স্পর্শ আমার গোপন বেদনা যেন প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। আজ নানারূপ প্রসঙ্গে একাধিক বার আমার পূতহৃদয়া স্বর্গগতা মায়ের নাম শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা শোনা পর্য্যন্তই! আমি মাতৃস্নেহের আস্বাদ জানি না। মা থাকিলে কি করিতাম বলিতে পারি না; তবে ইহাই বলিতে পারি যে, বাবাকে যাহা লুকাইলাম, জগতে কাহারো কাছে তাহা বলিতাম না। বিশ্বে আমার বাবা অপেক্ষা আর কেহ বড় নাই, থাকিতে পারে না।

অনেক ক্ষণ পর বাবা কহিলেন "তুমি বলতে পারলে না রুরু! আমার কাছেও লজ্জা-সঙ্কোচ? তা না বল্লেও আমি জানি—আমার রুরু-মা লজ্জার কোনও কাজ করতে পারে না।—চন্দ্রচূড় আসবে, তাতে কি? সে বিনুর আপনার জন, আমাদেরও আত্মীয়। আমি কাউকে কথা দেব না, চেষ্টা করবো না।—যখন তোমার ইচ্ছা হবে, সময় আসবে, আমি তার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

২৬

সে-দিন দ্বিপ্রহরে পাড়ার নিমন্ত্রণ সারিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাবা স্কুলে, পিসিমা মেঝেয় পাটী পাতিয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। আমার সঙ্গী সাথী নাই, গোলমালের মধ্যে আমি থাকিতে পারি না। সাধারণতঃ নিজের নিভৃত নীড়ে থাকিতেই আমার ভাল লাগে। মাসীমার ব্যবস্থায় সেখানেও আমি নিজস্ব একটি ঘর পাইয়াছিলাম; এখানেও বাবা আমার জন্য একখানা পৃথক্ ঘর রাখিয়া দিয়াছেন।

গৃহের সম্পদ্ বেশি কিছু নয়। কাঁটাল-কাঠের একখানি ক্ষুদ্র চৌকী, তাহার উপরে বিছানা। দুইটি কাচের আলমারী-ভরা প্রাচীন গ্রন্থ। একটা 'সেল্‌ফে' আধুনিক লেখকদের গুটিকতক বাছা বাছা বই। এক কোণে কাপড় রাখিবার আল্‌না।

বিছানায় বসিয়াই নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ চোখে পড়ে; পর-পারের মসীবর্ণ গ্রাম যেন হাতছানি দিয়া ডাকে। পশ্চাতের

বাঁশঝাড়ের ভিতর হইতে কত শব্দ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মিলাইয়া যায়। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে আমাকে বন-বনান্তরে খুঁজিতে হয় না, আমার ঘরখানিতেই তাহা যেন লুকানো থাকে। তাই এখানে আসিয়া বেশিক্ষণ বাহিরে থাকিতে পারি না। ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিসিমা ডাকিলেন, "করু, খেয়ে এলি? কি দিয়ে খেলি—আয় শুনি। অম্নি একখানা বই নিয়ে আসিস।"

ইতিপূর্ব্বে ছুটির অবকাশে আসিয়া 'সংস্কৃত' কাব্য হইতে পিসিমাকে একটু-আধটু পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। কাব্যের রসের সহিত যত না হোক, গল্পের সহিত পিসিমার পরিচয় হইয়াছিল।

'রঘুবংশ'-খানা বাহিরেই ছিল; আমি তাহাই লইয়া পিসিমার পাটিতে আশ্রয় লইলাম। সময়টি রঘুবংশ পড়িবার মত; শরতের অলস মধ্যাহ্ন, প্রকৃতি গভীর ধ্যানমগ্না। তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইতে বাব্‌লা বনে ঘুঘু করুণ কণ্ঠে ডাকিতেছে।

আমি বই খুলিলাম বটে, কিন্তু পিসিমা সে-দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রান্না-খাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। কি মাছ, তরকারী কি, কে রাঁধিয়াছিল? এমনি ধরণের অসংখ্য প্রশ্নে আমার বই-পড়ার নেশা ছুটিয়া গেল। ভয় হইতে লাগিল, রন্ধন-বিশেষে ফোড়নের বিশ্লেষণ হয়তো আরম্ভ হইবে।

সামান্য বিষয়ের চর্চ্চা করিতে মেয়েরা যে এত ভালবাসেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পিসিমার প্রতি আমার মনে কিঞ্চিৎ অনুকম্পারও সঞ্চার হইল। ইঁহারা যেন পিঞ্জরের পোষা পাখী, অসীমের গান ভুলিয়া গুটিকত মামুলি বুলি শিখিয়া রাখিয়াছেন! জগতের সহিত কোন যোগ নাই; অশান্তি-উদ্বেগেরও আশঙ্কা নাই। যাঁহাদের বিচরণ-ক্ষেত্র আলোকে, তাঁহারা এই অন্ধকারের জীবদের কি চোখে দেখেন জানি না। আমার মনে হয়, ক্ষুদ্র জীবনের এই সঙ্কীর্ণ পরিসর মন্দ কি? এ একটানা হৃদয়-নদীতে জোয়ার-ভাটা না থাকিলেও শান্তি আছে, নির্ভরতা আছে। হাটের মাঝে বেচা-কেনায় অনেক জ্বালা!

পল্লীর সরলা শিক্ষাহীনাদের আমি ছোট ভাবিতে পারি না। নগরের আবিলতায় ইহারা মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ম্মলতা হারাইয়া ফেলে নাই। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়া সন্দেহ-সংশয়কে বরণ করিয়া লয় নাই। ইহাদের প্রকৃতি যেন ছায়াসমাচ্ছন্ন দীঘির শীতল জল—তরঙ্গহীন, স্রোতো-বিহীন।

ইহাদের মধ্যে আমিও প্রথম আঁখি মেলিয়াছিলাম, এখানকার সুস্বাদু নীরে, স্নিগ্ধ সমীরে আমার অস্ফুট জীবন-কলিকা ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আমার স্থান হইল না। ঝড়ে-ছেঁড়া ফুলের মত শহরের জটিলতার মধ্যে উড়িয়া পড়িলাম। রাশীকৃত বই ঘাঁটিলাম, দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহার ফলে চিত্তের সরলতা, সরসতা হারাইয়া ভ্রান্তির পিছনে ঘুরিয়া মরিতেছি! আমার বাল্যসখীরা আজ এক এক গৃহের গৃহিণী, সন্তানের জননী। তাহাদের শিক্ষা সামান্য, আকাঙ্ক্ষা পরিমিত—যাহার ভাগ্য যাহা ছিল, নির্ব্বিচারে তাহাই মানিয়া লইয়াছে। কাহারো সহিত বিরোধ বা বিদ্রোহ করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

পিসিমার টুক্‌রো-টুক্‌রো বাক্যের ভিতর দিয়া কত জনকে আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমার সখীরা এখনো দলভ্রষ্ট হয় নাই, দিক্‌ভ্রান্ত হয় নাই; আমিই কেবল অনেক জানিবার ভাণ করিয়া, অনেক শিখিবার ছলনায় সাথীহারা হইয়াছি!

সংক্ষিপ্ত উত্তরে গল্পের আসর জমে না। ঘণ্টাখানেক পিসিমা আপন মনে বকিয়া-বকিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া কহিলেন, "বেলা গেল, কখন বই শোনাবি করু? আমায় আবার কাজে লাগতে হবে।"

আমি বই খুলিলাম, কিন্তু পড়া হইল না। হঠাৎ পিসিমা চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছি! চন্দ্র এলো বুঝি?"—বলিতে বলিতে পিসিমা ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া তেপান্তরের রাজপুত্রের আবির্ভাব আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। সে-দিন বাবার আশ্বাস পাইয়া চন্দ্রচূড়ের আসন্ন-আগমনের ভীতি আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। সে নামে কেহ যে আছে, আসিতে পারে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পিসিমার ব্যগ্রতায় আমার কৌতূহল প্রবল হইল। আমি বলিলাম, "ধন্য তোমার সাধনা পিসিমা! গাছের পাতাটি নড়লেও কে আসছে, তা বলে দিতে পারো।"

—"পারি বৈ কি? সময় এলে তুইও পারবি। আমি মিছে বলিনি,—চেয়ে দেখ, ওই যে নিমগাছের তলায়!"

পিসিমা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পিসিমার অনুমান-শক্তিতে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ঘোড়াটি পক্ষিরাজ নামের যোগ্য না হইলেও, আরোহীকে রাজপুত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নামের উপযুক্ত রূপ বটে! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ;

উন্নত নাসিকা; আয়ত উজ্জল উদাস নয়ন। সর্ব্বোপরি 'রজতগিরিনিভ' বর্ণ। তরুণ বয়সের কোমলতার সহিত পুরুষোচিত উগ্র সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে চন্দ্রচূড়কে অপরূপ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, বাঙ্গালার অভিজাত সমাজেও এমন রূপ দুর্লভ; পিসিমা সেকেলে হইলেও তাঁহার রুচি প্রশংসার যোগ্য বটে।

নিতাইয়ের হাতে ঘোড়ার ভার দিয়া চন্দ্রচূড় বাবু প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথশ্রমে তাঁহার সুগৌর গণ্ড আরক্তিম, গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে।

পিসিমা অগ্রসর হইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন—"ভাদ্দরের কড়া রোদে বের হয়েছিস্ কেন চন্দর! আহা, ঘেমে নেয়ে উঠেছিস্! আয় বাবা, ছায়ায় এসে বোস্।"

পিসিমাকে প্রণাম করিয়া চন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "রোদে বের না হয়ে কি করি,—তুমি যে ডেকেছ মাসীমা? রোদ-বৃষ্টিকে তোমরা যত ভয় করো, আমরা—চাষাভুষো মানুষ, তত ভয় করি নে। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। মামা বাবু স্কুলে বুঝি? তা এত তাড়া কিসের?"

"কিসের আবার? অনেক দিন দেখিনি কি না, দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল। দাদার সংসার গলায় নিয়ে আমার তো কোথাও পা-বাড়ানোর যো নেই; তবু তুই মাঝে মাঝে আসিস্, তাই তো তোর মুখখানা দেখতে পাই। তোদের খবর সব ভাল তো?—বাবা, মা, ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?" বলিয়া পিসিমা হাঁকিলেন, "রুরু, বারান্দায় একটা মাদুর পেতে দে; আর একখানা পাখা নিয়ে আয়!"

যাঁহাকে কখনো দেখি নাই, সহসা তাঁহার সম্মুখে যাইতে আমার সঙ্কোচ হইতেছিল; তবু পিসিমার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

আমি বাহির হইয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিলাম। মাদুরের উপর পাখা রাখিলাম।

পিসিমা আমার পরিচয় দিলেন, "এই আমার ভাইঝি রুরু,—যার কথা তোকে বলেছিলাম। ক'দিন হোল এসেছে—রুরু, এ-দিকে আয়; চন্দরকে লজ্জা করিস নে, পায়ের ধুলো নে।"

পিসিমার 'পায়ের ধুলো নে'র মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উঁকি-ঝুকি দিতেছিল। মানুষের আশা কি ভ্রমপূর্ণ, কল্পনা মরীচিকা ভাবিয়া আমার হাসি আসিল।

আমি চোখ তুলিতেই চন্দ্র বাবু যুক্তকরে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমাকেও যুক্ত দুই হাত তুলিতে হইল।

"আমি এখানে আজ নতুন আসিনি। আমার আসা-যাওয়া আছে। আমাদের মৌখিক পরিচয় না থাকলেও আমরা অপরিচিত নই, আপনি বসুন।"—বলিয়া চন্দ্র বাবু বসিলেন।

পিসিমা পাখায় হাত দেওয়া মাত্রই তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না, না, আর হাওয়া করিতে হবে না। দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া আস্‌ছে—এর কাছে কি তালপাখার বাতাস!"

—"কিছু না হোক বাপু, তুই খা তোর ঝিরঝিরে হাওয়া। আমি একটু সরবত করে আনি।"

বাগানের পাশের নারিকেল গাছে ডাব ঝুলিতেছিল; চন্দ্র বাবু সেই দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া কহিলেন, "মাসীমা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পিপাসা নিবারণের অমন চমৎকার জিনিস থাকতে চিনি-মিছরীর সরবত আমার রুচবে কেন?"

আমি এতক্ষণ নীরবে ছিলাম, ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলা দরকার মনে করিয়া বলিলাম, "নিতাই তো নারকেল গাছে উঠতে পারে না। রামচরণকে ডাকুক, সে ডাব পেড়ে দেবে।"

—"আপনাদের নিতাই—রামচরণে দরকার নেই; আমি নিজেই ও-সব কাজ পারি। আমাকে একগাছা মোটা দড়ি আর একখান কাটারি দাও তো মাসীমা! দেখি তোমাদের কত ডাবের দরকার।"

পিসিমা কাটারি আনিয়া দিলেন; তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া দড়ি জোগাইতে হইল না, খুঁটীর গায়ে একগাছা মোটা দড়ি ঝুলিতেছিল, চন্দ্র বাবু চক্ষুর নিমেষে সেই দড়ি খুলিয়া-লইয়া বাগানের বেড়া পার হইলেন। সেই বেড়ায় গায়ের পাঞ্জাবীটা রাখিয়া, গেঞ্জির নীচে কোমরে কাপড় জড়াইয়া লইলেন।

পিসিমার ভাগিনার কত গুণ, তাহা আমি জানিতাম না। দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রে ঘোড়ার পিঠে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া কোনও ভদ্রলোক যে বিশ্রামের পূর্ব্বেই গাছে—বিশেষতঃ ডাবগাছে উঠিতে পারে, ইহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

দেখিতে দেখিতে দড়ির সাহায্যে চন্দ্র বাবু ডাবগাছের মাথায় উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর সুরু হইল দুম-দাম শব্দ! পিসিমার চীৎকার,—"ও চন্দর, অতো ডাবে দরকার নেই। ঢের হয়েছে! কে খাবে এত? মিছে-মিছি ডাবগুলো নষ্ট করিস্ নে। আর বাবা, নেমে আয়!"

গাছের উপর হইতে সরল হাসির সহিত গুরুগম্ভীর স্বর ভাসিয়া আসিল, "ও কটা যে আমারি গলা ভিজোতে লাগবে মাসীমা! তোমাদের জন্যে কি থাকবে?"

আমার এ বয়সে কখনো আমি এমন অদ্ভুত লোকের সংস্পর্শে আসি নাই। উনি যেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যেমন রূপের বৈচিত্র্য, তেমনি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। অমন মানুষের কাছে লজ্জা লজ্জায় সরিয়া যায়, দূরত্বের ব্যবধান থাকে না।

আমি উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি কত খেতে পারেন—দেখা যাবে। এখন নেমে আসুন; আর দরকার নেই।"

আমার আহ্বান ব্যর্থ হইল না। শাখাবাহী কাঠ-বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

নিতাই রাশীকৃত ডাব কুড়াইয়া বারান্দায় রাখিয়া দিল। আমি আনিলাম—পাথরের গেলাস, বাটি।

চন্দ্র বাবু ডাব কাটিতে বসিলেন। প্রথম ডাবটা কাটিয়া, পিসিমার সাম্‌নে ধরিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহিলেন, "নাও মাসীমা, চট করে খেয়ে নাও। কাটা ডাব রাখতে নেই;—'তুই আগে খা' বলো না যেন। আমি আরম্ভ করলে সব কিন্তু এঁটো হয়ে যাবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে জোরের আভাস পাইয়া আমি অনুমান করিলাম, উনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহা নিছক মুখের কথা নহে, দৃঢ় হৃদয়ের প্রতিধ্বনি; কেহই তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

পিসিমা বিপন্ন ভাবে আমার পানে তাকাইলেন। আমি বলিব কি? তখনই আমার সাম্‌নে আর একটা ডাব হাজির হইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,—"নিন, এটা খেয়ে ফেলুন; গেলাস লাগবে না। কাটা-জায়গায় মুখ লাগিয়ে এমনি চোঁ চোঁ করে—"

আমি যে ঐ ভাবে খাইতে পারি না, তাহা বলিতে পারিলাম না; চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উদরস্থ হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেকের বেশি জল পড়িয়া গেল! তবে অপর পক্ষ আমার এই অবস্থা টের পাইলেন না। তখন তিনি একটির পর একটি ডাব কাটিয়া উর্দ্ধমুখে তৃপ্তির সহিত গলায় ঢালিতেছিলেন।

২৭

ডাবের জলপানের এই সমারোহের মধ্যে বাবা আসিয়া পড়িলেন। চন্দ্র বাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না; বলিলেন, "চন্দ্র, কতক্ষণ? মাঠে তোমার ঘোড়া দেখেই বুঝলাম তুমি এসেছ।"

—"অনেকক্ষণ এসেছি মামা বাবু! এসেই কাজে লেগে গেছি; এখনো শেষ করতে পারলাম না।"

—"শুধু ডাবের জলেই পেট ভরাচ্ছ—পাগল ছেলে! আর কিছু খাও।"

—"সে হবে স্নানের পরে মামা বাবু! আপনি আর দাঁড়াবেন না, মুখ ধুয়ে আসুন। আমি হাত ধুয়ে আপনার ডাব কাটি।"

বাবা কাপড়-জামা বদলাইতে গেলেন। পিসিমা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আমি চন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি দুই বেলা স্নানের অভ্যাস? ক'টায় স্নান করেন?"

—"ক'টা তা তো বলতে পারবো না। গাছের মাথায় যখন রোদের লেশও থাকবে না, তখুনি আমার স্নানের সময়,—তার আগে নয়।"

—"আপনি রোদ, বৃষ্টি, ছায়া দেখে সময় ঠিক করেন না কি? ঘড়ির অপরাধ কি?"

—"অপরাধ কিছু নয়, কিন্তু বাহুল্য। আমার বন্ধুরা ঘড়ির ধার ধারে না, দিনের আলোয়, রাতের তারায় তাদের সময় নির্দ্দেশ হয়, ওদেরই কাছে আমার শেখা'। দেখুন, যা অযাচিত, অনাহূত ভাবে পাচ্ছি, তা না-নিয়ে আড়ম্বর করবো কেন? আমাদের গরীব দেশ, বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হলে আরো যে বেশি করে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বো। এখন ভাববার সময় এসেছে—দেশের পয়সা কি করে দেশে থাকবে।"

বিলাসিতার প্রতি আমার কোন কালে স্পৃহা ছিল না। সাধারণ বেশভূষাতেই আমি অভ্যস্ত। আজ নিমন্ত্রণ ছিল, এ জন্য আমি স্নানের পরে একখানা বাদামী রংএর 'ভয়েলের' শাড়ী পরিয়াছিলাম। আমি সাদার ভক্ত হইলেও কিছু কাল হইতে-আমার ভিতরে রঙ্গের নেশা ধরিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ এক মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মিলির শাসনে এই শাড়ী আমার অঙ্গে উঠিয়াছিল। এক জনের মুখে এই রংএর স্তবগান শুনিয়া বাদামী রং সকল রঙ্গের চেয়ে আমার প্রিয় হইয়াছে। শাড়ীটা দেশী নহে, তাহা আমি জানিতাম। আমার মনে হইল, চন্দ্র বাবু আমার শাড়ী লক্ষ্য করিয়াই দেশের দুর্দ্দশায় বিগলিত হইয়াছেন।

মেয়েরা অনেক সহিতে পারে, সহিতে পারে না কেবল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। তর্কাতর্কি যদিও আমার স্বভাববিরুদ্ধ, তবু একটু খোঁচা দিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "দেশের জিনিসের আদর করা সকলের উচিত; যা সম্ভব তা করাই দরকার। আগে আর্য্যরা গাছের বাকল পরতেন, আপনারা তা পারেন না বলেই সুতোর কাপড় পরছেন, তাতে খরচ বেড়ে গেছে।

অথচ গাছের বাকল পাছে অনর্থক নষ্ট হচ্ছে—তার আদর নেই।"

চন্দ্র বাবু সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন "ঠিক বলেছেন, আমাদের অক্ষমতায় দেশের কত জিনিস ধ্বংস হচ্ছে, তার সীমা নেই! এ-দিন থাকবে না—আপনি দেখে নেবেন। লুপ্ত যা, ধ্বংস যা, তা আমরা ফিরে পাবো! যত দিন বাকলে কাপড় তৈরির প্রণালী শিখতে না পারবো, তত দিন নিজেদের কাপড়ের সুতো হাতে কেটে, তাঁতে কাপড় বুনে নিতে হবে। ক্ষেতের তুলো, হাতের কাপড়—এ কম তৃপ্তির বিষয় নয়! আমার যা দেখছেন, এ আমি সুতো কেটে তাঁতে বুনে নিই।"

—"ভাল কাজই তো করছেন। তাঁত বোনা, চরকা-কাটা শিখতেই কি আপনি বাইরে গিয়েছিলেন? স্বাধীন দেশের, স্বাধীন জাতের কাছে কি শিখে এলেন? ওদের কাছে না কি ঢের জিনিস আমাদের শিখবার আছে?"

—"থাকতে পারে, আমাদের কাছেও ওদের শিখবার অনেক আছে। তাঁত বোনা, চরকা-কাটা শিখতে কেউ বিদেশে যায় না। আমি গিয়েছিলাম হারানো সম্পদ্ ফিরিয়ে আনতে। রামায়ণে পড়েননি—রাজর্ষি জনক লাঙ্গল চষতে চষতে সীতাদেবীকে পেয়েছিলেন। পুরা-কালের হাল-লাঙ্গলের প্রচলন আমরা ভুলে গেছি, আমাদের গৌরবের অনেক জিনিস চুরি হয়েছে। কলের লাঙ্গল আমাদেরি সৃষ্টি, উড়ো জাহাজও আমাদের। কত বলবো? আমার যতটুকু সাধ্য, করে যাই। আশা আছে, আমার চেয়ে শক্তিমান্ যারা পরে আসবে, তারা জঙ্গল কেটে মন্দির গড়বে, পাথর গুঁড়ো-করে সোনা ফলাবে। হারানো জিনিস কড়ায় গণ্ডায়, সুদে আসলে ফিরিয়ে আনবে।"

আশায়, উৎসাহে চন্দ্র বাবুর চক্ষু মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত জ্বলিতে লাগিল। উদীয়মান্ সূর্য্যের মত সেই দীপ্তিশালী পুরুষের দিকে চাহিয়া আমার কণ্ঠ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, মুখে ভাষা ফুটিল না।

কিয়ৎকাল পর বাবা আসিয়া মাদুরে বসিলেন; বসিয়া কহিলেন, "আগে তোমার ডাব খাই চন্দর! তুমি স্নান করে এলে একসঙ্গে জলখাব।"

পিসিমা এক বাটি সরিষার তৈল আনিয়া তাড়া দিলেন—"চন্দর যা বাবা, চট করে নেয়ে আয়। বর্ষার নতুন জলে সন্ধ্যা বেলা নাইলে অসুখ বিসুখ হতে পারে।"

—"আমার অসুখ হয় না, মাসীমা, তোমার ভয় নেই।"

আমি বলিলাম, "আপনি তেল মেখে আসুন; আপনার জল, সাবান কুয়োতলায় রাখি গে।"

—"আমি তোলা জলে স্নান করি না। এত কাছে নদী থাকতে 'ঘটীগঙ্গায়' কে স্নান করে? আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার কিছু লাগবে না। কাপড় গামছা সঙ্গেই আছে; সাবান তো ব্যবহার করি না।"

—"কেন, দেশে কি সাবান তৈয়েরি হয় না?"

—"তা হয়, কিন্তু এক পয়সার বেশমে পাঁচ দিন চললে পাঁচ আনা দামের একখানা সাবান মাখবো কেন? সব চেয়ে খাঁটী সরষের তেলই আমার ভাল।"

বাবা বলিলেন, "তেলে-জলেই বাঙ্গালীর শরীর। তোমার মত এমন মজবুত শরীর ক'জনের আছে? সাবান-ঘষা, পাউডার-মাখা, মেয়েলি ধরণের বাবুর দল তোমার পাশেও দাঁড়াতে পারবে না। শুধু রংএ মানুষকে সুন্দর করতে পারে না, থাকা চাই স্বাস্থ্যসৌষ্ঠব।"

সত্যই বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান। চন্দ্র বাবুর অনাবৃত দেহ দেখিয়া আমি বাবার উক্তির সমর্থন করিলাম। সেটা মনে মনে করিলাম; প্রকাশ্যে বলিতে পারিলাম না, সঙ্কোচ হইল। কিন্তু তাঁহার নিঃসঙ্কোচ, সরল ব্যবহারে আমি মুখচোরা—এই দুর্নামের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছি। তাঁহার অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনীয় বস্তু বটে, কিন্তু প্রশংসমান নেত্রে সে-দিকে চাহিয়া-থাকা আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ।

আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশ দিনান্তের ম্লান ছায়ায় অবসন্ন, তরুতল ঝরা ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভে রোমাঞ্চিত।

টগর গাছের আড়াল হইতে আমি চন্দ্র বাবুর গমনশীল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাগানের সম্মুখ দিয়া নদীর পথ প্রসারিত, তিনি হরিদ্রা রঙ্গের গামছা কাঁধে লইয়া স্নানে যাইতেছেন। কটিদেশ মাত্র আবৃত, অনাবৃত সর্ব্বাঙ্গ হইতে সুগৌর বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! হাঁ, স্বীকার করি—বিশ্বশিল্পীর রচনার উহা সার্থকতা বটে!

দুঃখ হইতে লাগিল, এই ভীষণ মধুর, রুক্ষ-শীতল চিত্র-পটখানি মিলির চোখের সামনে ধরিতে পারিলাম না! যে মর্ম্মর-ফলকে কখনো কাহারো প্রতিচ্ছবি রেখাঙ্কিত হইতে পারে নাই, সেই মনোমুকুরে এই রূপের প্রতিবিম্ব পড়িত কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতাম।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

ভাগের মা

দশটা নয়, পাঁচটা নয়, দু'টি মাত্র ছেলে, তাহাদের মধ্যেও যখন মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল, তখন জননী করুণাময়ী আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায় চারি দিক্ অন্ধকার দেখিলেন।

কত কষ্টে তিনি যে এই ছেলে-দু'টিকে মানুষ করিয়াছেন, লেখা-পড়া শিখাইয়া দশ জনের নিকট পরিচিত হইবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে তাহা জানে? দুই হাতে নিবিড় দুঃখের রাত্রি ঠেলিয়া ফেলিলেও আজ এই সুখের প্রভাতে আবার এ কি দুঃখের সর্ব্বনাশী অন্ধকার তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল!

রমেশ আট বছরের আর সুরেশ ছয় বছরের; এই দু'টি শিশুর সকল ভার তাঁর মাথায় চাপাইয়া করুণাময়ীর স্বামী যখন তিন দিনের জ্বরেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিনের সুকঠোর মর্ম্মভেদী স্মৃতি কি তিনি ভুলিতে পারিয়াছেন?

নগরের এক প্রান্তে মাথা গুঁজিবার মত একখানা ছোট বাড়ী, ছোট-খাট একটি বাগান, আর স্বামীর জীবন-বীমা হইতে প্রাপ্ত হাজার পাঁচেক টাকা, ইহাই ছিল তাঁহার চরম সম্বল! সেই দুর্দ্দিনে যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া এই দু'টি সন্তানের জন্যই বুক বাঁধিয়া, তাঁহাকে সংসারের কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথে আবার চলিতে হইয়াছিল।

কিন্তু সেই হৃদয়ভেদী নিদারুণ দুঃখের আভাসও তিনি তাঁহার কোমলমতি সংসারজ্ঞানবর্জ্জিত ছেলে-দু'টিকে জানিতে দেন নাই; একাকী তাহাদের সকল সুখ-সুবিধার ভার স্কন্ধে লইয়া, পিতার কঠোর কর্ত্তব্য ও মাতার অনুপম স্নেহ দিয়া তাহাদিগকে নিয়ত সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

সুরেশ আজ উকীল, রমেশ কোন আফিসে একাউণ্টেণ্টের কাজ পাইয়াছে। মায়ের সুখ-দুঃখ তাহারা আর বোঝে না। তাহার কোন প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও বোধ হয় অনুভব করিবার শক্তি তাহাদের নাই!

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সারা-রাত্রি ধরিয়া অবিশ্রান্ত বেগে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়াছে। তথাপি তখন পর্য্যন্ত নিবিড় মেঘে সমগ্র আকাশ সমাচ্ছন্ন; বোধ হইতেছে, এখনই আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিবে।

সবে মাত্র রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাকগুলা তখনও গাছের ঘন পাতার অন্তরালে লুকাইয়া আছে। সেই অস্ফুট প্রভাতে করুণাময়ী রান্নাঘরের ভিতর হইতে পূর্ব্ব-রাত্রির রাশীকৃত এঁটো বাসন বাহির করিয়া, ছাই তুলিয়া-ফেলিয়া উনান পরিষ্কার করিতেছিলেন।

বাড়ীর একমাত্র ঝি মঙ্গলার মা কয় দিন হইতে অসুস্থ; এ জন্য কাজে আসিতেছে না। বড়বধূ কচি ছেলের মা, খুব ভোরে উঠিয়া তাহার এই সব কাজ করা কঠিন। ছোট বৌ বড়লোকের মেয়ে, সে কোনও দিন এ সব কাজ করে নাই; কি করিয়া করিতে হয়, তাহাও জানে না। সে জন্য তিনিই একা এই সব বাসি কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন।

উনান নিকানো হইয়া গেলে, কয়লা ভাঙ্গিয়া আনিয়া উনানে আগুন দিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতেই যখন তিনি কলতলা হইতে বাসনগুলি মাজিয়া-লইয়া ঘরে তুলিলেন, তখন পর্য্যন্ত বধূরা শয্যা-ত্যাগ করে নাই; শুধু বড় ছেলে রমেশ উঠিয়া বকুলের একটা কচি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া দন্তসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মাকে দেখিয়া পুত্র রমেশ বিরক্তির স্বরে কহিল, "মা, আজ রান্নাটা যেন একটু তাড়াতাড়ি হয়। কাল আফিসে যেতে ভয়ানক 'লেট' হয়ে গিয়েছিল! মধ্যে মধ্যে এ রকম হলে কোন্ দিন হয় তো চাকরীটা হাতছাড়া হবে, তখন সারা গোষ্ঠী খাবে কি?"

মা কহিলেন, "সেই জন্যেই তো রাত থাকতে উঠেছি বাবা! যতটুকু পারি আমার এই বুড়া হাড় খাটিয়ে যাতে তোমাদের সুবিধা হয়, সেই চেষ্টাই করি। কাল আফিস থেকে ফিরতে তোমার অন্ধকার হয়ে গেল, তাই বলা হয়নি, রান্নার তেল একটুও নেই। রাত্রিটা কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছি। মুগ আর মসুরির ডালও কিছু এনো; সেগুলোও ঘরে বাড়ন্ত।"

রমেশের মুখ বিরক্তির ছায়ায় কালো হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এরই মধ্যে তোমার তেল ফুরিয়ে গেল? আমার মনে হয়, জিনিষপত্র বড্ডই লোকসান হচ্ছে!"

মা বলিলেন, "যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু দিয়েই কাজ চালাই বাবা! দু'বার খালি রান্না, আর ছেলেমেয়েরা একটু গায়ে মাথে, একটু প্রদীপে পোড়ে।—জিনিষই বা কতটুকু পাওয়া যায়!"

—"বেশ বেশ, তোমার হিসেব আমি শুনতে চাই নে। হিসেব দিয়ে তো আমায় একেবারে রাজা করে দেবে! এখন তেল আনবার একটা যায়গা দাও, বাজে ভ্যান্-ভ্যানানি আমার ভাল লাগে না।"

করুণাময়ী তাড়াতাড়ি একটা সন্ত-মাটি[illegible]

দিলেন।

পুত্র চটিজোড়া পায়ে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে, জননী ব্যথিত-চিত্তে আকাশ-প্রান্তে চাহিলেন। শ্রাবণের মেঘে-ঢাকা নিকষ-কৃষ্ণ আকাশের মত তাঁহার হৃদয়ও দুঃখের মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে! ছেলেদের কঠোর ব্যবহারে প্রত্যেক সময় তিনি মর্ম্মাহত; তাহাদের নির্ম্মম বাক্য ও ব্যবহার বজ্রের মতই তাঁর বুকে পড়িয়া বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়!

কেন এমন হইল? তাঁহার তো সতাত ছেলে নয়, এ ছেলে দু'টি তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাহার কাছে তিনি এই দুঃখ জানাইবেন? একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন এ দুঃখ বুঝিবে—এমন আর কেহই নাই। গোপনে চোখের জল ফেলিয়া তাঁহার অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ব্যথাভরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। স্নিগ্ধ প্রভাতের প্রথম মুহূর্ত্তেই সংসারে কলহ-বিরোধের আরম্ভ, সমস্ত দিনই তাঁর গৃহে বিরক্তি ও ঈর্ষ্যার কোলাহল!

প্রায় প্রত্যহই এইরূপ ঘটে! তিনি ভাবিলেন, "হায়, সংসার কি আজ নূতন করিতেছি? তোরা যখন ছোট ছিলি, তখন কেমন করে ঐ সামান্য পুঁজিতেই তোদের বড় করে তুললাম, লেখাপড়া শিখালাম। তখন তো এ-সব হিসাব কাহাকেও কবতে হয়নি। তোদের উপার্জ্জনের পয়সায় কি আমার দরদ নেই?"

দশটি পাঁচটি নয়, দু'টি মাত্র ছেলে, আজ তাহারা মানুষ হইয়া দশ জনের এক জন হইয়াছে; জননীর মনে কত সুখ-সাধ, কত আশা! তাহাদের লইয়া যাহা পল্লবিত মুকুলিত হইয়া কত কল্পনার মায়া রচনা করিয়াছিল, আজ তাহা অকারণ ঈর্ষ্যা ও স্বার্থসংঘাতে ছিন্নভিন্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

জননীর উপরও যেন আর তাদের একটুও ভালবাসা নাই! মায়ের কথা ছেলে দু'টি আর গ্রাহ্যই করে না। কি করিয়া যে তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিবেন, ভাবিয়া তাহার যেন আর কূল-কিনারা পাইতেছেন না!

ছোট ছেলে সুরেশ ওকালতি করিতেছে; অল্প দিনের মধ্যেই তার বেশ পশার হইয়াছে। মা মনে ভাবিয়াছিলেন, সুরেশকে এম-এ ও আইন পড়াইতে তাঁর যে সামান্য অলঙ্কার বাঁধা দিয়াছিলেন, সুরেশ উপার্জ্জন করিয়া সেই বন্ধকী গহনা ছাড়াইয়া লইবে; বাড়ীখানাও অনেক দিন মেরামত করা হয় নাই, তাহাও সংস্কার করিবেন। তাঁহার স্বামীর ভিটা, তাঁহার পুণ্য তীর্থ, একটু সংস্কার করিয়া লইলেই আবার বহু কাল তাহা বাসের উপযোগী হইবে। ছেলে দু'টি সন্তান-সন্ততিসহ তাঁহার এই সুখের নীড়ে বাস করিবে।

হায় মানুষের মন, শত ঘাত-প্রতিঘাতেও তোমার আশার অবসান হয় না! তাই যে-দিন প্রতিবেশিনীদের মুখে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার সুরো বেশ দশ টাকা রোজগার করিতেছে, কিন্তু পাঁচটি টাকাও কোন দিন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে তাঁর হাতে দিতে দেখা যায় নাই,—সে-দিন বহু কষ্টে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়াছিলেন; পরের নিকট দুঃখ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

এইরূপেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। গৃহ-সংলগ্ন ছোট বাগানে গোপালভোগ আমের নূতন কলমের গাছে কয়েক থোকা আম ফলিয়াছিল; ছোট ছেলে সুরেশ এক থোকা আম মাকে আনিয়া দিয়া কহিল, "এই আম-কটা ভাল করে রাখো তো মা! বেশ রঙ ধরেছে, দুই-এক দিন পরেই খাওয়া চলবে। দেখো, আমরা যেন কিছু খেতে পাই; আদর করে সবগুলোই তোমার নাতি-নাতনীদের দিয়ে সাবাড় করো না।"

মা সভয়ে চারি দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বড়বৌ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার মুখ অন্ধকার! তিনি বুঝিলেন, কথাটা তাহার কাণে গিয়াছে! ইহার ফল প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না। বড়বৌর রাগ খুব বেশী; রাগ হইলে নিরপরাধ ছেলে-মেয়েগুলিকে অকারণে প্রহারে জর্জ্জরিত হইতে হয়। তার পরই একটা কথা সে সাতখানা করিয়া রমেশকে শুনায়। এইরূপেই সে তিলে তিলে তাঁহার ছেলের মন তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সুখে-দুঃখে বহু মনঃকষ্টের ভিতর দিয়া বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোটবৌ প্রভাতী পিত্রালয়ে গিয়াছিল, কয়েক মাসের ছেলে লইয়া ফিরিয়া আসিল। দু'টি সন্তান ও বধূদ্বয়ের কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করুণাময়ী দিবারাত্রি সেই একই ভাবে পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি কাহারও দরদ নাই। তিনি নিজের অদৃষ্টের উপর সকল দোষ চাপাইয়া নীরবে সকল কষ্টই সহ্য করেন। পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে বলেন, "কবে তোমার কাছে আমায় ডেকে নেবে গো! আর কত দিন এ ভাবে········" ইত্যাদি।

প্রত্যহই সেই খাটুনী, সকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া দুইটি উনান জ্বালিয়া রান্না; নিরামিষ উনানেই সকালবেলা সকলের রান্না একসঙ্গে হয়। রাত্রের মাছের ঝোল, ভাত রাঁধিবার ভার বধূদের উপর; কিন্তু সুরেশকে লইয়াই মা মুস্কিলে পড়িয়াছেন! সে কিছুতেই প্রভাতীকে সংসারের কোন কাজ করিতে দিবে না; কাজ করিলে অযত্ন হইবে বলিয়া সে রাগ করে। রান্নার জন্য একটি পাচক নিযুক্ত করাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। সঙ্কীর্ণমনা সুরেশ অন্যের সুবিধা করিতে চাহে না। সে বলে, কেন, বড়বৌএরই তো পাঁচটা ছেলে-মেয়ে, তাঁরই বেশী গরজ; রান্না ও সংসার দেখা তাঁরই কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা অতীত হয়, সব কাজ বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া থাকে দেখিয়া অগত্যা করুণাময়ীকে এ-বেলাও রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হয়। মাছ কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া, রান্না করিয়া নাতি-নাতনী, ছেলে ও বৌদের খাইতে দেন। সেই রাত্রে আবার তাঁহাকে স্নান করিতে হয়; নহিলে একটু জল খাওয়াও যে তাঁহার ঘটিয়া উঠে না!

ছোটবৌ প্রভাতীর মন তত হীন ছিল না; কিন্তু সুরেশের জন্যই তাহাকে হীনতা প্রকাশ করিতে হইত। সে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাহায্য করিতে চাহিত; কিন্তু অতিমাত্রায় পত্নী-প্রেমিক সুরেশ প্রভাতীকে সামান্য কোন কাজ করিতে দেখিলে মাকে এমন কঠোর কথা শুনাইত যে, করুণাময়ী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

পুনরায় কোনও দিন কোনও কাজে সে সাহায্য করিতে আসিলে তিনি সভয়ে ব্যস্ত ভাবে বলিতেন, "থাক্ থাক্, মা! তোমাকে কিছু করতে হবে না। ঘরে যাও মা, সেখানে তোমার অন্য কোন কাজ থাকলে তাই কর গিয়ে।"

প্রভাতী স্বামীকে অনুযোগ করিত, কিন্তু স্বার্থপর সুরেশ সে সব কথায় বিচলিত হইত না। সে বলিত, "এই সারা দিন খেটে-খুটে এলাম প্রভা! একটু কাছে বোস। ভারি তো কাজ, তুমি না করলে কোন ক্ষতি হবে না। এমন সুন্দর নরম হাত দু'খানি কি রান্নাঘরের হলুদ আর কালি-ঝুলি মাখবার জন্যে?" সুরেশের এই স্তুতিবাক্য

প্রভাতীর মন্দ লাগিত না; তবুও তাহার মনে কি সঙ্কোচ যেন কাঁটার মত বিঁধিতে থাকিত! সে হাসিয়া বলিত, "তোমার মত স্বার্থপর আমি কোথাও দেখিনি। নিজের মা উদ্‌ভ্রান্ত খাটেন, তা দেখেও তোমার মনে কষ্ট হয় না? আশ্চর্য্য!"

সুরেশ বলিল, "কষ্ট আবার কি? মা তো চিরকালই আমাদের জন্য কাজ করছেন,—ছোট থেকেই দেখে আসছি। তাঁর অভ্যাস আছে। তাই বলে আমার প্রভারাণীকে ঐ সব বাবুর্চির কাজ করতে দেখলে, আমার কি সহ্য হয়?"

২

শীতের সন্ধ্যা। সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া করুণাময়ী সায়ং-সন্ধ্যার শেষে হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। সে-দিন তাঁহার শরীর তেমন ভাল ছিল না।

বড়বৌ শরৎশশী রান্না করিতেছিল। রমেশ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখ মা, ক'দিন থেকে তোমাকে বলব বলব মনে করেও বলা হয়নি। এ সব কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি; কিন্তু এমন করে তো আর চল্‌তে পারে না। সুরেশ সকল বিষয়েই আমার হিংসা করে। সে ওকালতিতে এখন বেশ রোজগার করছে, কিন্তু সংসারে একটা পয়সাও কোন দিন দিয়েছে কি? কৈ, আমার তো তা মনে পড়ে না। আমি চাকরী আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সকল ভার আমার উপরেই এসে পড়েছে। আমার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে; তাদের জন্য এখন থেকেই আমাকে ভাবতে হচ্ছে। আমার বাঁধা মাইনে কি না, তাই বেশী কিছু বাঁচাতে পারি নে। সুরেশের উচিত, এখন সংসারের ভার কিছু কিছু নেওয়া।—তার কাছে তুমি টাকাকড়ি কিছু পাও কি?"

করুণাময়ী জপ করিতেছিলেন; তাই মাথা নাড়িয়া ইসারায় তিনি জানাইলেন—তাহার কাছে কিছুই তিনি পান না।

রমেশ কহিল, "কিছুই দেয় না! দেবার ইচ্ছাও বোধ করি তার নেই। সুরেশের হয় তো ধারণা—বাবার দরুণ যে সামান্য কিছু জমি-জমা আছে, তারই আয়ে আমাদের সংসারের সব খরচই চলে। এই সব বিষয় নিয়ে সে আমার সঙ্গে অনেক কথা-কাটাকাটি করলো। তার পর গৃহস্থালীর কাজ ছোটবৌমাকে কিছুই সে করতে দেয় না; দেখতে পাইতো, শুনতেও কিছু বাকি থাকে না। বড়বৌকে অনেক কাজ করতে হয়; কিন্তু সেও তো ছোট ছেলের মা! এ সবই আমি বুঝতে পারি, তাই আমার পক্ষে সহ্য করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই স্থির করেছি, আমরা পৃথক্ হব, সুরেশও তাই চায়; কিন্তু তা হ'লে তোমার কি ব্যবস্থা করব, তা এখনও ঠিক করতে পারিনি। তুমি কার কাছে থাকবে? আমার কাছে, না সুরেশের কাছে? আমার তো মনে হয়, তোমার এখন কাশীবাস করাই ভাল।"

করুণাময়ীর মালা-জপ শেষ হইয়া গিয়াছিল; তবুও তিনি কোন উত্তর দিলেন না, স্তব্ধ ভাবেই বসিয়া রহিলেন। আজ আর তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিল না। এত দিন ধরিয়া ইহাই তো তিনি আশঙ্কা করিয়া আসিয়াছেন; শেষে তাহাই ঘটিয়া গেল! দু'টি ভাই—রমেশ ও সুরেশ ছোটবেলা প্রত্যেক বিষয়ে মায়ের আদেশের প্রতীক্ষা করিত; মাকে না বলিয়া, তাঁহার অনুমতি না লইয়া তাহারা খেলা পর্য্যন্ত করিতে যাইত না! দু'টি ভাইয়ের মধ্যে কি গভীর ভালবাসা ছিল! সেই ভালবাসা, স্নেহ আজ কাহার—কোন্ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইল?

ছোটবেলায় সুরেশ এক দিন পড়িয়া-গিয়া কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়াছিল; এ জন্য রমেশের সে-দিন কি কান্না! সে-দিন সে খাইতে শুইতে পারে নাই। সুরেশও কি তার দাদাকে কম ভালবাসিত! যে ভাল জিনিষটি পাইত, তার দাদাকে না খাওয়াইয়া সে তৃপ্তি পাইত না। তার পর মা। এই মা'র উপরেও ছেলেদের আর কোন টান নাই, ভালবাসা নাই! মা'কে তাহারা যেন সহ্য করিতেও পারিতেছে না, তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিতে চায়! স্ত্রী ও সন্তান লইয়া উহারা একা থাকিতে চায়; কিন্তু মা'র তো আর কেহ নাই। মা'র যে এই ছেলে-দু'টি মাত্রই সম্বল। তাহাদের ছাড়িয়া তিনি কোথায় যাইবেন? মায়ের দুঃখ ছেলেরা বোঝে না। মা এখন নিতান্ত অনাবশ্যক ভারস্বরূপ হইয়াছেন!

রমেশ মায়ের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, মায়ের মনে কষ্ট হইয়াছে; তা কষ্ট তো একটু হইবেই। বড়বৌ শরৎশশী রান্নাঘর হইতে তখন হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বামীর কথাগুলি কান পাতিয়া শুনিতেছিল।—হাঁ, এত দিন পরে তার স্বামীর ঘটে শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বটে! কত দিন ধরিয়া তো স্বামীকে প্রতি রাত্রে—যখনই সুযোগ পাইয়াছে তখনই এ কথা বলিয়াছে; এত দিন পরে কি সত্যই ভগবান্ সদয় হইলেন? পূর্ব্ব-দিন রাত্রিতে শাশুড়ী রান্না করিতে আসিয়াছিলেন। অত বড় রুই মাছের মুড়োটা তাঁর ছোট ছেলের পাতেই দেওয়া হইল! কেন, বড় ছেলেকে মুড়োটা খাইতে দিলে কি ভাগবত অশুদ্ধ হইত? এমন একচোখো মা কিন্তু কখন দেখিনি! ছোটবৌ আর ছোট ছেলে যেন ওঁর অন্ধের নয়ন, মাথার মণি! স্বামীর সুমতি এখন স্থির থাকে—তবেই তো!—সে সওয়া-পাঁচ আনার হরির লুঠ মানত করিল। ও-দিকে ছোটবৌ-রাণীর দেহ ননীর মত; এতই কোমল যে, এক দিন আগুনের একটু আঁচ লাগিলেই গলিয়া যায়! এবার পৃথক্ হইলে কি হয় দেখা যাইবে।—সে মনে মনে হাসিল!

* * * *

ইহার পর দুই ভাই পৃথক্ হইল। পৈতৃক ছোট বাড়ীতে ভাগাভাগি করিয়া বাস করা কষ্টকর বলিয়া সুরেশ ভাড়ার বাড়ীতে সংসার পাতিয়া বসিল।

করুণাময়ী নির্ব্বাক্ ভাবে দিনপাত করিতেছিলেন। পাড়াপড়শীরা বলাবলি করিতেছে—"ছেলেদের ব্যবহারে রমেশের মা না পাগল হয়ে যায়! খায় না, ঘুমায় না, কোন মানুষের সঙ্গে একটি কথা পর্য্যন্ত বলে না? বাপ রে! এমন ছেলে, মায়ের দুঃখ ওরা এতটুকু বুঝল না। তোদের পৃথক্ হওয়া কি পালিয়ে যাচ্ছিল? বুড়ো মা আর ক'-দিন? তার পর না হয় পৃথক্ হয়ে চতুর্ভুজ হতিস্। তবে আর এটাকে কলিকাল না বলবে কেন?" ইত্যাদি।

করুণাময়ী সত্যই আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ছেলেদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁহার বুকটা যেন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল! তিনি ছেলেদের সুমতির জন্য দেবতার উদ্দেশে নিত্য মাথা কুটিতেন, মাথা কুটিয়া কুটিয়া তাঁর কপালখানা কালো হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই, তাই পাড়ার শ্যামা-ঠাকুরঝি আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁকে টানিয়া লইয়া-গিয়া স্নানাহার করাইত। দু'টি ভাই মুখে

দিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িতেন ; রাত্রে তাঁহার শয্যা অব্যবহৃত পড়িয়া থাকিত। বিনিদ্র ভাবে তিনি উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইত।

সুরেশের পসার বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার নূতন সংসার মনের মত করিয়া গুছাইয়া লইল। আয়না, সোফা, ছবি ও সৌখীন আসবাবে তাহার বাসগৃহ সুসজ্জিত হইল। রান্নার জন্য উৎকলবাসী পাচক, গৃহকার্য্যের জন্য দাসী ও পুত্রের জন্য বালক-ভৃত্য নিযুক্ত হইল। রমেশের আপত্তি সত্ত্বেও বড়বৌ শরৎশশী গৃহসজ্জার জন্য আসবাবপত্র কিছু কিছু কিনিল। অনেক দিনের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। শুধু মায়ের দিক্‌টাই বিরাট্ শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের বজ্রাহত হৃদয়ের সংবাদ কেহই লইল না,—লওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াও ছেলেদের মনে হইল না!

সুখের সংসারের ইহাই পরিণাম!

৩

রমেশ আহার করিতে বসিয়া বলিল, "ইস্! বড়বৌ আজ যে অনেক রকম রান্না করেছ—দেখছি।"

বড়বৌ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "স্বামি-পুত্রকে পাঁচ রকম রেঁধে খাওয়াতে কার না ইচ্ছে হয়? এত দিন ওদের জন্যই তো কিছু করতে ইচ্ছে হোত না। তা ছাড়া, তোমার মাও তো কম এক-চোখো ছিলেন না; ভাল জিনিষ সব খাবে ছোট ছেলে—ছোটবৌ! ছোট ছেলের উপর অত যে ভালবাসা, কৈ, মাকে এক বার তো একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম না! মাকে নিয়ে গিয়ে সেও তো কাছে রাখতে পারতো। তা কৈ? এখন চাকর-বামুন রেখে খাসা সংসার চালাচ্ছে।"

রমেশ কহিল, "মা কোথায় থাচ্ছেন? সে-দিন তাঁকে বল্লাম, 'মা, তুমি কাশী যাও।'—তা সে কথার একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না! আমি আর কি করব? এত দিন ধরে অনেক রকমই তো করে দেখলাম। চারি দিক্ থেকে সকল লোক আমারই দোষ দিচ্ছে! শুনছি, মা না কি খান না, ঘুমোন না!"

বড়বৌ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, পাড়ার লোকে তো নানা রকম কথা বলবেই। পরকে উপদেশ দিতে অনেক লোককেই দেখা যায়। তা না খেয়ে না ঘুমিয়ে মানুষ ক'দিন থাকতে পরে? খুড়িমার বাড়ী শ্যামা পিসির বাড়ী—যে-দিন যার বাড়ী ইচ্ছে সেখানেই থাকছেন। তারাই খাওয়াচ্ছে—এই রকমই তো শুনতে পাচ্ছি। তিনি বাড়ী ছেড়ে যেখানে-সেখানে কেন থাকেন? আমরা কি তাঁকে আর এক মুঠো ভাত দিতে পারতাম না? হাজারও হোক, নিজের মা তো বটে!"

রমেশ আনমনা হইয়া কি ভাবিতেছিল, অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, "তুমি মায়ের একটু খবর নিয়ো বড়বৌ! আমি তাঁকে কোন রকমে কাশী পাঠাবার চেষ্টা করে দেখি। মাসে পাঁচ টাকা করে দিলেই মার কাশীবাসের খরচ চলে যাবে। এক বেলা এক মুঠো খাওয়া তো? সে জন্যে আর কি ন'শো পঞ্চাশ খরচ?"

৪

সুরেশ আদালত হইতে ফিরিয়াছে। চাকর, পাচক ব্রাহ্মণ থাকিলেও প্রভাতীকে এখন গৃহস্থালীর উপর নজর রাখিতে হয়। নজর না রাখায় চাকর-বামুন কিছু দিন বেশ দু'পয়সা উপরি উপার্জ্জন করিয়াছিল।

যথেষ্ট অর্থব্যয় হয় অথচ কোন সুব্যবস্থাই প্রভাতী করিতে পারে না,—দেখিয়া সুরেশ এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "প্রভা, তুমি একটু দেখা-শুনা না করলে তো ভারী মুস্কিল! এ বেটারা চুরি করেই আমাকে ফতুর করবার যোগাড় করেছে! মা কত সুন্দর ব্যবস্থা করে রাখতেন, তুমি সে রকম করতে পার না? এখন তো গিন্নী হয়েছ, পারা উচিত।"

প্রভাতীর ইচ্ছা হইল, সে বলে, "কখনও কোন কাজে হাত দিতে দিয়েছে কি যে সংসারের কাজকর্ম্ম শিখবো? এখন আবার সেই কথা বলা হচ্ছে!"

সুরেশকে জলখাবার দিয়া, খোকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা পরাইয়া চাকরটার কোলে দিয়া সে বলিল, "দেখ, আজ রাঙা খুড়িমা এসেছিলেন; তিনি বললেন, মা না কি খান না, ঘুমান না, আমরা তাঁর কোন খোঁজ খবর নিইনে! মনের কষ্টে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে—এই রকম না কি তাঁরা ভয় করছেন।"

সুরেশের জলযোগ তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল; সে এক গ্লাস জল পান করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মা'র একটা ব্যবস্থা করতে হবে; আমার তো এক দিনও যাবার মত অবসর হয়নি। আচ্ছা, তুমি পকেটটা খালি করে রাখ; আজ বেশ ভারি আছে! টাকাগুলো গুণে বাক্সে রেখে দাও।"

প্রভাতী টাকাগুলি গণিয়া বাক্সে রাখিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "অনেক টাকা পেয়েছ তো আজ!"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার ঘরে, আমার কি টাকার অভাব হ'তে পারে? সেই সুন্দর নেকলেস-ছড়াটা এবার তোমায় কিনে দেব মনে করছি। সেই যে—সে নেক্‌লেস তোমার ভারি পছন্দ হয়েছিল!"

প্রভাতীর মনের আনন্দ চোখ-মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে আবার বলিল, "এখন যাও না, মাকে একবার দেখে এস; প্রায় দু'মাস হয়ে এলো আমরা এখানে এসেছি, এত দিনের মধ্যে মায়ের খবর একবারও তো নেওয়া হয়নি! আমাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে এলেও তো হয়?"

সুরেশ কহিল, "আমি তো মক্কেল আর আইন-আদালত নিয়েই ব্যস্ত; অন্য দিকে তাকাবো—তা'র অবসর নেই! আর যদি সত্যই মায়ের মাথা খারাপ হয়ে থাকে, তাহ'লে তুমি কি তাঁকে সামলাতে পারবে?"

প্রভাতী কহিল, "আচ্ছা, তুমি এক বার দেখে এসো। এক্কেবারেই তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন? তা তোমাদের ব্যবহারেই যদি ঐ রকম হয়ে থাকে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়, আর লজ্জার কথাও বটে!"

সুরেশ তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, জগতে আমরাই যেন প্রথম পৃথক্ হ'য়েছি! কিন্তু সকল সংসারেই তো অহরহ এ রকম কাণ্ড ঘটছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধের ফলে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বখরা নিয়ে কোর্টে নিত্য কত মামলা মোকদ্দমা করছি। মা'র যেমন বুদ্ধি, তাই তিনি ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে বসেছেন!! কি দরকার প্রয়োজন ছিল? তিনি কাশী চলে গেলেই তো পারতেন, শেষ বয়সে তীর্থ-বাস হতো।"

প্রভাতী কহিল, "সে যা হয় হোক, তুমি এখন এক বার যাও তো ; এক বার তাঁকে দেখে এসো, হাজার হোক মা।"

সুরেশ বলিল, "না, এখন আমার সময় হবে না। আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমাকে গড়ের মাঠে একটা সভায় 'ভারতমাতার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হবে।"

সুরেশ বাহিরে চলিয়া গেল। প্রভাতী একখানা রোমাঞ্চকর নভেলে মনঃসংযোগ করিল। তাহার মনে কর্ত্তব্যের যে ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর ঔদাসীন্যে ও উপেক্ষায় সেই শুভ বুদ্ধি নিষ্ফল হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে ; আকাশে দুই-একটি নক্ষত্র একে একে ফুটিয়া উঠিয়া শুভ্র জ্যোতি বিকাশ করিতেছে। ইংরেজী মাসের আজ প্রথম দিন। রমেশ তাহার আফিসের একাউন্‌টেন্ট। আজ সকলের বেতন দেওয়ার দিন ; সেই জন্য কাজ শেষ করিতে অনেকটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পরিশ্রম অধিক হইলেও তাহার মুখ আজ বেশ প্রফুল্ল। বাড়ী ফিরিয়া সে মাহিনার টাকাগুলি পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে বলিল, "বড়বৌ, মাইনের টাকাগুলো তুলে রাখো ; আজ একটা ভাল খবর আছে। আফিসে হিসাবের একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরায় সাহেব খুসী হয়ে আমাকে উপরের গ্রেডে প্রমোসন দিলেন ; তাতে আমার মাইনে ২০ টাকা বেড়ে গেল। ভুলটা ধরা না পড়লে সরকারের অনেক টাকা ক্ষতি হোত।"

শরৎশশীর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি রমেশের জন্য চা ও কিছু খাবার আনিতে গেল।

রমেশ মুখ-হাত ধুইয়া একখান চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে নিমগ্ন হইল। সে এবার সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছে। তাহার আশা,—ক্রমে ৫০০ টাকার গ্রেডে তাহার উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না।

সেই সময় রমেশের মা আপন মনে অস্ফুট স্বরে কি কথা বলিতে বলিতে পুত্রের গৃহের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "বাবা রমু, তুই আমায় কাশী পাঠাতে চাস্‌, তাই সেখানে পাঠিয়ে দে বাবা ! আমার সব আশাই তো ছাই হয়ে গিয়েছে ; আর কিছু চোল না, সব ভেঙ্গে গেল—সব ভেঙ্গে গেল ! আমার বুকখানাও একবারে ভেঙ্গে-চুরে গেছে !"

জননীর কথাগুলি কানে প্রবেশ করিতেই রমেশের কল্পনার রঙ্গীন চিত্র শূন্যে মিলাইয়া গেল ! সে মায়ের দিকে চাহিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল ; কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বড়বৌ কঠোর স্বরে শাশুড়ীকে বলিল, "আচ্ছা মা ! সমস্ত দিনই তো তুমি পাড়ায় পাড়ায় আমাদের নিন্দে করে মুখ হাসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সমস্ত দিন পরে মানুষটা খেটে-খুটে বাড়ী এসেছে ; ঠিক খাওয়ার সময়টাতেই এলে বিরক্ত করতে ? কি রকম তোমার আক্কেল বল দেখি ?"

জননী উদাস দৃষ্টিতে একবার ছেলে ও পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এখনও কিছু খায়নি রমু ! আহা, খেতে দেও বাছাকে, আমি তো জানিনে মা ! তা আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। কিছু মনে কোর না তোমরা—আমি চললাম মা !"

রমেশের মা টলিতে টলিতে উঠান দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রমেশ কহিল, "মাকে চলে যেতে দিলে কেন ? ওঁর শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হোল।"

বড়বৌ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "আবার এখনই এলেন বলে ! যাবেন আর কোথায় ? তোমার খাওয়াটা হয়ে যাক। সর্ব্বদাই তো এ-বাড়ী ও-বাড়ী করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! পাগলের কি আর দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞান আছে ?"

রমেশ আর কিছু বলিল না ; স্ত্রীর সহিত ভবিষ্যৎ সুখের কথা আলোচনা করিতে করিতে আহার শেষ করিল।

সুরেশ প্রায় রাত্রি ৯টায় যখন বাড়ী ফিরিতেছিল—দেখিল, পথের মাঝে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

সে এক জন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, ব্যাপার কি ? এখানে লোকের এত ভিড় কেন ?"

"যা হয়ে থাকে মশায়, একটি বৃদ্ধা মোটর-চাপা পড়েছে। ড্রাইভারটা এক সেকেণ্ডও দাঁড়ায়নি। গাড়ীখানা আরও জোরে চালিয়ে নিয়ে পালিয়েছে ! স্ত্রীলোকটি মারা গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে ; এম্বুলান্স এসে পড়েছে, হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে তো ?"

সুরেশ কহিল, "কলকাতা সহরে প্রাণ নিয়ে রাস্তায় চলা দায় !" সে বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাতী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এখনও আহার হয় নাই। সে আর কোন দিকে না চাহিয়া চলন্ত ট্রামে উঠিয়া বসিল।

৪

প্রভাত হইতেছে ; যামিনীর অন্ধকার-যবনিকা তখনও ধরণীর বুক হইতে সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। ইতিমধ্যেই পথের উপর দিয়া সহরের ময়লাবাহী গাড়ীর বিশ্রী কর্কশ শব্দ নগরের স্নিগ্ধ শান্তিটুকু যেন বিতাড়িত করিতেছে।

পাড়ার শ্যামা ঠাকুরাণী আসিয়া রমেশকে ডাকিলেন ; বলিলেন, "রমেশ—ও রমেশ ! তোর মা কোথায় ? বাড়ীতেই আছে তো ?"

ডাকাডাকিতে রমেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া কহিল, "কি শ্যামা পিসি ! কি জিজ্ঞাসা করলে ?"

"এই তোর মার কথা ; বলি রাতে সে বাড়ী ছিল তো ? রোজ আমার কাছেই থাকে ; কাল সন্ধ্যা বেলায় বললে,—'আজ বাড়ীতেই থাকি গিয়ে, রমুকে বলি গিয়ে, আমায় কাশী পাঠাবে বলছিল, তাই পাঠিয়ে দিক্‌।' কাল আবার একাদশী ছিল কি না ? আমি আর অন্ধকারে এসে খবর নিতে পারলাম না ; বুড়ো বয়েসে উপোস করে শরীরটা ঠিক থাকে না।"

শ্যামা ঠাকুরাণীর কথায় বাধা দিয়া রমেশ কহিল, "শ্যামা পিসি, মা একবার এসেছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তো চলে গেলেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। আমি তো তার পর আর তাঁকে দেখিনি।"

শ্যামা ঠাকুরাণী চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "তবে কি সুরোর বাড়ী গেল ? মনের,—মাথার তো ঠিক নেই তার ! একবার চল, খবর নিয়ে আসি বাবা ! আমি পুজোর ফুল পর্য্যন্ত আজ তুলিনি। মনে হোল, একবার খবরটা নিয়ে আসি, তার পর সব করা যাবে।"

রমেশ ও শ্যামা ঠাকুরাণী খানিকটা পথ ঘুরিয়া [illegible] গৃহে আসিলেন, সুরেশ তখন কেবল উঠিয়া—পূর্ব্ব-দিনের মিটিংএ সে

কেমন চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিল, তাহার মুখে ভারতমাতার দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়া শ্রোতার-দল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কেমন ধন্য ধন্য করিয়াছিল, সেই গল্পটা সে তখন পত্নীকে সালঙ্কারে শুনাইতেছিল। সেই সময় তাহার দাদার কণ্ঠস্বরে সে বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিল। রমেশ কহিল, "সুরো, মা এখানে কাল এসেছে কি ?"

সুরেশ কহিল, "মা তো কোন দিন আমার বাড়ীতে আসে না। আজ প্রায় দু' মাস এ বাড়ীতে এসেছি ; মা এক দিনও আমার বাড়ী এসেছে বলে মনে পড়ে না। আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, এ বাড়ীতে তাকে আসতে বলব না। মাকে আমি অনেক দিনই দেখিনি।"

শ্যামা ঠাকুরাণী ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আঃ আমার পোড়া কপাল! মা'র খোঁজ নিলে তো তাকে দেখতে পাবি! এই দু' মাস ধরে আমার কাছেই সে শোয়, থাকে। খাওয়া তো তার নেই বল্লেই হয়! মুখে আদৌ রুচি নেই। কাল একাদশী ছিল, খাওয়া দাওয়ার কোন হাঙ্গামাই ছিল না। উপোসী মানুষটা কোথায় গেল কেউ জানে না! তোদের মত এমন ইন্দ্র-চন্দ্র ব্যাটা যার, সেই মানুষটার এত দুঃখ-দুর্দ্দশা! যা সহর, শেষটা মোটর-চাপা না পড়ে থাকে।"

সুরেশের কণ্ঠ দিয়া একটা আর্ত্তনাদের মত শব্দ বাহির হইল! সে দ্রুতবেগে সাইকেলে বাহিরে চলিয়া গেল।

তার পর কি হইল, সেটুকুও লিখিতে হইতেছে! অনেক খোঁজ করিয়া শেষে স্বেচ্ছাসেবকের মুখে শুনিতে পাওয়া গেল—"মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, আঘাতের সঙ্গেই তাঁর প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল! ব্রেণে আঘাত লাগিয়াছিল; বুকের পঞ্জরের একখানা অস্থিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কোন লোককে মৃতদেহের ওয়ারিশ বলিয়া জানিতে না পারায়, তাহারা চাঁদা তুলিয়া মৃতদেহের সৎকার করিয়াছে। মৃতদেহ সনাক্ত করিবার মত একটা রুদ্রাক্ষের মালা বৃদ্ধার গলায় ছিল। এই দেখুন সেই মালা!"

সুরেশ স্বেচ্ছাসেবকের হাত হইতে মালাটি হাতে লইয়াই—"মা! এই তোমার ভাগ্যে ছিল!"—বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমতী উষা দেবী।

নাগেশ্বর

করে না বিচার দেখি বিধাতার দান,
ভরেছে নাগেশ্বরে ভাঙ্গা এ বাগান।
সমীরে সুদূরে ভাসি' যেতেছে পরাগ,
লভে ভাগ পশু পাখী বিপিন তড়াগ,
অনাদরে আছে হেথা নাহি অভিমান।

বিজনে তাহার পূজা চলেছে নীরব—
পরিমেয় প্রান্তর—এই তার সব।
পবন পদবী দিয়ে সিদ্ধেরা যায়
তার মধু-সৌরভে চমকি দাঁড়ায়,
ক্ষণ তরে পায় বুকে মর্ত্তের টান।

পড়েনিক' রাজছাপ মোটে তার গায়
মনীষী নহে সে মহা-মহোপাধ্যায়।
খাঁটি সোনা জহুরীরা চেনে তার দর
ছাপ-মারা আকবরী নহে সে মোহর,
নাম তার টাইটেলে হয় নাই ম্লান।

জনগণ-মনোহারী গোলাপ সে নয়,
ইতিহাসে বড় করে নাহি পরিচয়।
অজয়েতে ঝরে পড়ে ভেসে যায় দল
নিতি করে দূরাগত ভকতে পাগল
স্বরগে মরতে তার আদান-প্রদান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কণারকের পথে
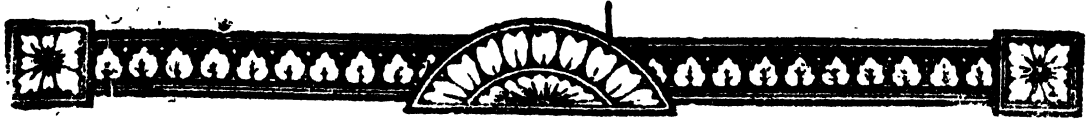
নারী-জাগরণ

যুদ্ধ কেবল দুইটি সজ্জিত সেনাদলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাহার বিশাল শর-তাড়নায় মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে বিশাল আলোড়ন জাগিয়া উঠে। তাই প্রত্যেক মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার পর ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির উপর দিয়া একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের বন্যা আসে। তাহাকে রোধ করিবার মত সৎসাহস বা দুঃসাহস যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শান্তি উপভোগের সময়, কাহারও থাকে না। তাহার পর যখন সেই পরিবর্ত্তনটি সমাজ বা রাষ্ট্রের বক্ষের উপর জগদ্দল পাষাণের মত দৃঢ়রূপে স্থায়ী হইয়া বসে, তখন আমরা হতাশ ভাবে চাহিয়া দেখি ও নিরুপায় হইয়া ভাবি, "তাই ত, এ কি হইল!"

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে যে নারী-জাগরণ দেখা দিয়াছে, যাহারই ফলে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর নারীর মন ও শরীরের মধ্যে যে একটা বিরাট্ বিপ্লবের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে,—তাহা দেখিয়া আমাদিগকে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে! কোথায় এবং কি ভাবে এই নারী-জাগরণের সূত্রপাত হইল, তাহা বলা কঠিন। ভূমিকম্পের মত এই বিশ্ব-বিপ্লব ধরণীর কোন্ অন্ধকার-গর্ভে উৎপত্তি লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ আজ ওলোট-পালোট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বিশ্বের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, নারী জাতি পুরুষের মতই কিছু অধিকার লাভের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মেয়েদের ভোটের জন্য যুদ্ধ ইহার এক চমৎকার উদাহরণ। পাশ্চাত্য বিবাহিতা নারী স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার চাহিতেছিলেন; পুরুষরা যে সকল কার্য্যে নিয়োজিত হয়, সেই সমস্ত কার্য্যেই নারী নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। এমনই সময়ে মহাসমরের রণভেরী নিনাদিত হইল; ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই যুদ্ধে যোগদান করিলেন; তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিল—দেশের নারী-সমাজ। তাহার ফলে প্রতিপন্ন হইল—পুরুষের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মেই নারীর পারদর্শিতা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প বা উপেক্ষণীয় নহে।

রাশিয়ায় ও তুরস্কে অভিনব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ব্বতন সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সেই আবর্ত্তে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। উক্ত উভয় দেশেরই শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি দেশের জনসাধারণের বিরাগ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কি তুরস্কে, কি রাশিয়ায় ধর্ম্মসম্প্রদায় লোকমতের উপর নির্ভর না করিয়া শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ধর্ম্ম বিনিয়োগ করিতেছিলেন। অত্যাচারীরা যতই বাহ্য আড়ম্বরে আপনাদিগকে সজ্জিত করিতেছিল—তাহার অন্তরের ভাণ্ডার ততই শূন্য হইতেছিল। কিন্তু সে কথার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ঐ ভাবে কতকটা দায়ে পড়িয়াই নারী জাতি যুদ্ধের সময় সর্ব্বপ্রথম নিভৃত অবরোধ পরিহার করিল। তৎপূর্ব্বে অন্তঃপুরই ছিল নারীর সর্ব্বস্ব। সন্তান-প্রসব, তাহাদের পরিচর্য্যা ও লালন-পালন, স্বামীর প্রত্যেক সুবিধা-অসুবিধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা; সপ্তাহান্তে এক বার হয় ত মামুলী প্রথায় ভজনালয়ে গমন করিয়া উপাসনায় যোগদান করা,—ইহাই ছিল নারীর ধর্ম্ম ও প্রাত্যহিক কর্ম্ম। সে-কালে পুরুষরা সাধারণতঃ নারী জাতিকে রক্ষাকবচের মত পবিত্র ভাবে ও সম্ভ্রমের সহিত রক্ষা করিত। ইহাই ছিল তাহাদের পৌরুষের দম্ভ ও গৌরব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র লজ্জাই ছিল নারীর ভূষণ। মহিলাদের আসরে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন নীতির আলোচনা হইত বটে, কিন্তু সে সকল নারীদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; তাহাতে জাতির ভাব-সম্পদের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। তখন নারী সাধারণতঃ সরলতা ও অজ্ঞতার আবেষ্টনের মধ্যেই প্রতিপালিত হইত। সেই সময়েই মিসেস প্যাঙ্কহার্ষ্ট, জর্জ্জ এলিয়ট প্রভৃতি মহীয়সী মহিলাগণের নাম সভ্য জগতে খ্যাতিলাভ করে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত ছিল। শারীরবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই অনেক বালিকা বা যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইতেন—যেমন আজিও আমাদের দেশে ঘটিয়া থাকে।

কামানের রসদ যোগাইতে পুরুষ চলিল জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সমর-ক্ষেত্রে, গৃহকোণ পরিত্যাগ করিয়া নারী আসিয়া দাঁড়াইল ধূলি-কঙ্কর-সমাচ্ছন্ন রৌদ্রপ্রতপ্ত রাজপথে,—পুরুষের পরিবর্জ্জিত সাংসারিক কর্ম্ম পরিচালনের উদ্দেশ্যে। শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারী যখন গৃহকোণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের তথাকথিত পঙ্কিলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন শাসনানুগত ধর্ম্ম বা সমাজ বিধি-নিষেধের কোন আপত্তিই তুলিল না। নারী কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া সেই প্রথম উদ্দাম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিল। সে অনুভব করিল, সেখানে পিতা বা পতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংসারে আত্মসম্ভ্রমের হানিকর দাসী-বৃত্তি নাই, মদ্যপায়ী পিতা বা যথেচ্ছাচারী স্বামীর পীড়ন বা অযথা অত্যাচার নাই, মাতার কঠোর অনুশাসন নাই; আর সর্ব্বোপরি নাই অর্থকৃচ্ছ্রতা। সেই সঙ্গে নারী হাতে লইল আশার অতিরিক্ত প্রচুর অর্থ, এবং চারি দিকে আসিয়া জুটিল মনের মত বান্ধব ও বান্ধবীর দল। নারী এই ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া পুরুষ-সমাজের পরুষ দৃষ্টিকে ভ্রূভঙ্গিতে তাচ্ছিল্য করিবার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিল।

এই সময়ে রাশিয়ায় ও তুরস্কে এবং তাহার অল্প পরেই জার্ম্মাণীতেও স্বার্থান্বেষী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র কশাঘাত চলিতে লাগিল। রাশিয়াতে কার্ল মার্কস্ বুঝাইতেছিলেন, ধর্ম্ম জাতির জীবনে অহিফেনের সহিত তুলনীয়। তিনি আরও বলিলেন,—ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনামাত্র; কোনও বাস্তব পদার্থের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। ধর্ম্ম ভিত্তিহীন অনুশাসনবলে মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিকে জড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সুচারুরূপে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোনও অনুপ্রেরণা তাহাতে নাই। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর-ভক্তি মানবের ন্যায়বুদ্ধিকে সংযত করিয়া সৎপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দান করিলেও দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার হইতে মুক্তিদানের জন্য কোনও প্রকার প্রয়াস তাহার নাই। বিজ্ঞান ধর্ম্মের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া জনসাধারণ-সমক্ষে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিল। লোকে বুঝিল, বিজ্ঞানই ইহ জগতে একমাত্র ধ্রুব সত্য। লেনিন্ শিক্ষা দিলেন যে, ত্যাগ ও অনাসক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য নয়,—সকলের সহিত সমান ভাবে দেহের উপভোগই মানবের নিত্যকার মানব-জীবনের অদ্বিতীয় মহান্ ব্রত! লেনিন জনসাধারণকে আরও

বুঝাইলেন, যে শাশ্বত খৃষ্টীয় নীতিতে আমাদের আস্থা নাই, তাঁহার মতে একের অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবার অক্ষমতাই একমাত্র সনাতন নীতি—স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে তাহা অবশ্য-পালনীয়।

রাশিয়াতে স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ-ক্ষেত্রে এই নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফলে নারীর ইন্দ্রিয়-ভোগের লালসা পুরুষের মতই অনিয়ন্ত্রিত অধিকারে পরিণত হইল। কুমারীর মাতৃত্বে বা বিবাহিতা নারীর কলঙ্কিত জীবনযাপনে নিন্দা বা অপবাদের কোনও কারণ রহিল না। সমাজের ও রাষ্ট্রের নিকট এই প্রকার চরিত্রহীনতা অতঃপর দুর্নীতির কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইল না। রাশিয়াতে নারী আর অবলা—পুরুষ জাতির অধীন রহিল না। এখন পুরুষের সহিত সকল বিষয়েই তাহার সমান অধিকার। তাই আজ রুশ-নারী কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, রাষ্ট্র-পরিচালনার কার্য্যে সমস্ত দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে স্বীয় যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

তুরস্কে মুস্তাফা কমাল পাশা চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতকে আক্রমণ করিয়া বজ্র-নির্ঘোষে এই নির্দ্দেশ দান করিলেন যে, পঞ্চ শতাব্দ ধরিয়া এক জন আরবদেশীয় শেখের মত ও অনুশাসন, এবং এক জন অলস, অকর্ম্মণ্য ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক তাহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দ্বারা তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন পরিচালিত হইতেছে; তাহাদের মত লইয়াই দেশের শাসন-পদ্ধতি গঠিত এবং তাহাদের অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেক তুর্কীর সাধারণ জীবন-যাত্রার প্রণালী নিয়ন্ত্রিত। কমাল পাশা বলিলেন, ইস্লাম ধর্ম্ম, মরুচর আরব জাতির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তমান সভ্য জগতে তাহা সম্পূর্ণ অচল। যাহাকে ঈশ্বরের প্রেরণা বলে, সেরূপ কিছুই নাই; ঈশ্বর বলিয়াও কেহ নাই। দুষ্ট শাসক ও ধর্ম্মযাজকদল কল্পনাবলে একটি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া তাহারই মোহে জনসাধারণকে অভিভূত করিয়া রাখে। কমাল খলিফার ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া, 'শেখ-উল ইস্লাম' অর্থাৎ ইস্লাম ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালককে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহার পশ্চাতে পবিত্র কোরাণ নিক্ষেপ করেন। কমাল পাশা নবীন তুরস্কে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং রাষ্ট্র হইতে প্রচলিত পর্দ্দাপন্থী ধর্ম্মমত সমূলে বিসর্জ্জন করিয়া নারীদলকে বিনা-বাধায় অন্তঃপুরের বাহিরে আনিয়া সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দান করিলেন।

জার্ম্মাণীতেও নারী-জাগরণের সাড়া পাওয়া গেল। কাইজারী শাসনমুক্ত দুঃস্থ জার্ম্মাণীর ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অন্নসংস্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা ঝঞ্ঝার মত নাৎসীবাদী হিটলার আসিয়া প্রচলিত সমস্ত নীতিবাদকে পদদলিত করিলেন; কিন্তু জার্ম্মাণীতে নারী ইহার অধিক আর কিছুই পাইল না; নাৎসী জার্ম্মাণী নারীকে রন্ধনাগার দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহাই তোমার ধর্ম্ম।"

তুরস্কের হাওয়া প্রাচ্য-ভূখণ্ডে প্রবেশ করিল। আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা নারী-জাগরণের সহায়তা করিবার চেষ্টায় কণ্টলব্ধ রাজ্য পর্য্যন্ত হারাইলেন। কাবুলেও সেই সময় বহু নারী পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দিনের আলোকে অভিনন্দন করিলেন।

প্রতীচ্যের এই বিস্ময়কর নারী-জাগরণের তরঙ্গ ভারতের নারী-সমাজকেও আলোড়িত করিল। ভারতের বহু অন্তঃপুরিকা পুরুষ-দিগের সহযোগে অন্তঃপুর ও রন্ধনাগার ত্যাগ করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন, এবং অনবগুণ্ঠিত শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়া কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কত নারী স্বেচ্ছায় সহাস্য বদনে কারাবরণ করিলেন। এখানেও দাবী চলিতেছে,—হিন্দু-নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আইন-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাইতে হইবে। সব দেশেই নারী আজ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চায়! বন্ধনকে সে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মানিবে না।

সুদূর আমেরিকাতেও নারী-জাগরণের তরঙ্গ প্রবল বেগেই বহিয়া চলিয়াছে; তথায় নারী জাতি প্রচলিত নীতিবাদকে হীন করিয়া সাহচর্য্য বা সর্ত্ত-বিবাহ প্রচলিত করিয়াছে। আমেরিকার এ আন্দোলন নব সমৃদ্ধ তরুণ এক জাতির স্বাভাবিক জীবন বিকাশ হইতে পারে। তবে মহাযুদ্ধের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সংযোগ নাই।

এই যে সারা গোলার্দ্ধব্যাপী নারী-জাগরণ, ইহার মূলে রহিয়াছে রাশিয়ার বিপ্লবী দলের শিক্ষা। প্রকৃত পক্ষে সারা বিশ্বের নারীর দাবী আজ শিক্ষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মহাযুদ্ধে নারী বুঝিতে পারিল যে, পুরুষের এত কালের একচেটিয়া কার্য্য তাহারাও যোগ্যতা সহকারে পরিচালনে সমর্থ। পুরুষের চিরাচরিত কর্ম্মে সাফল্যের ফলে নারী দাবী করিতে শিখিল যে, সে-ও পুরুষের সমান অধিকার পাইবার যোগ্যা। নারী দাবী করিল যে, পুরুষ যদি প্রবৃত্তির বশে জীবনে প্রবর্ত্তিত নীতির বিরোধী গর্হিত আচরণ করিয়াও সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়, তবে অনুরূপ অবস্থায় নারীর সম্বন্ধেই বা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চলিবে কেন? নারী আজকাল নারী-ধর্ম্মনীতির নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে, সে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছে, ইন্দ্রিয়োপভোগের জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিচার-বুদ্ধিকে প্রতিহত করিবার অধিকার কোন পুরুষ, কোন নারী, সমাজ বা রাষ্ট্রের নাই! বস্তুতঃ, নারীর সতীত্ব বলিয়া যে রক্ষাকবচ যে taboo, তাহার সমস্ত মিথ্যা গৌরব নারীর অধিকারের তাড়নায় আজ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে! এই বিশাল বিস্ময়কর নারী-জাগরণকে কেবল যৌন-আন্দোলন বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইবে; কিন্তু এই ব্যাপক যৌন-জীবনের স্বাধীনতাকেই নারী মুক্তির মাপকাঠি মনে করে!

মানুষ যখন পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ মানবত্বে উপনীত হইল, এবং যখন বর্ব্বরতার সকল নিদর্শন পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া একটি একটি করিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিল, তখন মানব জাতির মনে উপজাত হইল প্রেম; নর-নারীর এই পারস্পরিক আকর্ষণ—তাহা মাত্র শারীরিক ব্যাপার নয়; ইহা আত্মায় আত্মায় অথবা হৃদয়ে হৃদয়ে আকর্ষণ না হউক, ইহা যে এক বিরাট্ মানসিক ক্রিয়া, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নারীর আত্ম-প্রকাশের সম্মুখে যে বিরাট্ তোরণ রুদ্ধ ছিল, নারী তাহা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের সমষ্টিগত জীবনের গণতান্ত্রিকতা ও সাম্যনীতি এবং উন্নত বিজ্ঞানের শিক্ষায় নারীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কোমলতা—যাহা এত দিন পুরুষের দম্ভের উপকরণ ছিল—তাহা আজ এক অভিনব রূপ লইয়া নারীকে রূপায়িত করিতেছে। তাই আজ নারীর রূপের আদর্শ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে! গত শতাব্দীতে নারী ছিল পুরুষের প্রকৃতির দাসী মাত্র। তাই তার রূপের মাপকাঠি ছিল রূপজ মোহের পরিমাণ। আজ সে-দিন চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য (বি-এল)
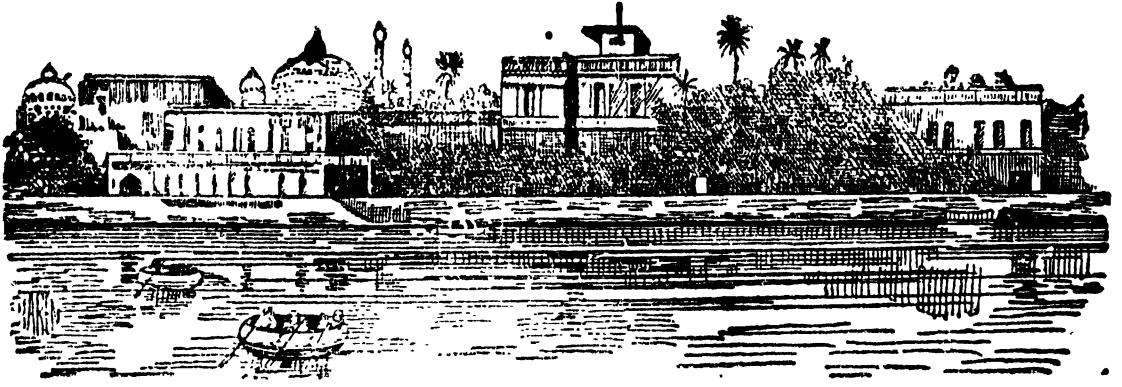
না-জানা জাপান

এক জন মার্কিন লেখক জাপানের সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। সন্দর্ভটিতে অনেক নূতন কথা আছে। সে-কথায় জাপানের সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিব।

তিনি লিখিয়াছেন, যুদ্ধে জাপান এ পর্য্যন্ত যেটুকু সুবিধা করিতে পারিয়াছে তার প্রধান কারণ, তারা আমাদের জানে, কিন্তু আমরা জাপানীদের ভালো করিয়া চিনি না, জানি না! যুদ্ধ-শাস্ত্রে গোড়ার কথা হইতেছে, "শত্রুকে ভালো করিয়া চেনা চাই!" (know thy enemy!)

তিনি বলেন, পাশ্চাত্য জগৎকে গুরু মানিয়া জাপান আজিকার এই জাপান হইয়া উঠিয়াছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতি-নীতিও সে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে!

১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক প্রথম সংস্থাপিত হয়! তার পর আন্তর্জাতিক বিধি-বশে আমেরিকান্ কন্‌শল্ যখন প্রথম জাপানে পদার্পণ করেন, তখন জাপানে আস্তানা পাতিবার পূর্ব্বে তাঁকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিদেশীর সঙ্গে জাপানীরা যত অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশুক, আজ পর্য্যন্ত তারা কোনো বিদেশীকে গৃহে তেমন অন্তরঙ্গ ভাবে গ্রহণ করে নাই। তাই তাদের পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে বিদেশীরা সঠিক সংবাদ জানে না!

লাফকাডিয়ো হার্ণ এক জন জাপানী মহিলাকে দান করিয়াছিলেন। জাপানী পরিবেশের মধ্যে তিনি বাস করিয়াছিলেন। জাপান ও জাপানীদের সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও তাঁর Japan An Attempt At Interpretation নামক শেষ গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন,—বহু কাল পূর্ব্বে আমার অতি-প্রিয় এক জন জাপানী বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন,—আরো চার-পাঁচ বৎসর পরে তুমি বুঝিবে জাপানীদের তুমি কিছুই চেনো নাই। তখন যদি তাদের সম্বন্ধে খানিকটা সত্য-পরিচয় তুমি পাও!

জাপানীদের সঠিক পরিচয়-গ্রহণে মস্ত বাধা তাদের ভাষা! পাঁচ বৎসর জাপানে বাস করিয়া আমি ও আমার স্ত্রী কয়েকটি মাত্র জাপানী কথা শিখিয়াছিলাম। কিন্তু জাপানী ভাষায় না পারিতাম একটি কথা লিখিতে বা পড়িতে! শুধু আমাদের কথা নয়! সব বিদেশীর সম্বন্ধেই এ কথা খাটে! জাপানে আসিয়া এখানকার এক কলেজের আমেরিকান
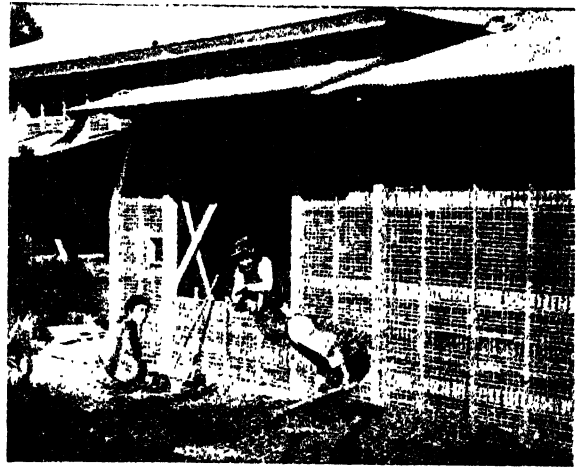
সাধারণ গৃহ

অধ্যক্ষকে (বিশ বৎসর ইনি জাপানে আছেন) বলিয়াছিলাম, আমার জন্য জাপানী ভাষায় কতকগুলা কথা লিখিয়া দিতে। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, আমি জাপানী ভাষার এক বর্ণ পড়িতে পারি না! জাপানী ভাষায় কথা বলি, কিন্তু লিখিতে পারি না!

জাপানীরা কিন্তু ইংরেজী ভাষা ভালো করিয়া শেখে এবং ইংরেজী ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তারা আজ

একেবারে মজ্জাগত করিয়া ফেলিয়াছে। জাপানী ভাষায় তারা বহু ইংরেজী কথাকে 'আপন' করিয়া লইয়াছে। টকি-ছবি জাপানী ভাষায় হইয়াছে 'টোকি'; 'ডিপার্টমেণ্ট' হইয়াছে 'ডিপাটো'; 'মডার্ণ গাল'—মোগা; 'মডার্ণ বয়' —মোবো। ইংরেজী high collar জাপানীতে হইয়াছে "হাইকারা"; 'ওভারকোট'—ওবা; রুমাল বা হ্যাণ্ডকারচিফ হইয়াছে হাঙ্কেচি; 'কেক্'—কেকি; rice curry রাইস্কারি।

পাশ্চাত্য আচার-রীতি এবং পোষাক-পরিচ্ছদও জাপানীরা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীরা বলে, আড়াইশো বৎসর পূর্ব্বে তারা ছিল কূপমণ্ডুক; জাপান ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো-কিছুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। এখন সে কূপমণ্ডুকত্ব ঘুচিয়াছে।

আধুনিক বিপণী (বোমায় ভয় নাই!)—ওশাকা
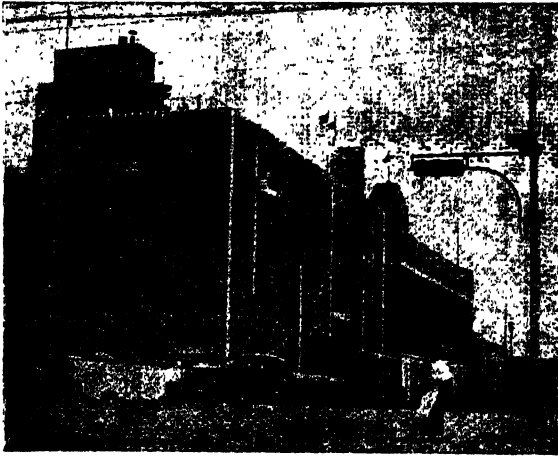
লেখক বলিতেছেন—জাপানীরা প্রথম যখন পাশ্চাত্য রীতিনীতি, বেশভূষা ও সভ্যতার অনুকরণ সুরু করে, য়ুরোপীয়ান এবং মার্কিণরা তখন অনেকখানি গর্ব্ব ও আত্ম-প্রসাদ বোধ করিয়াছিল। কাচ দেখিয়া জাপানীদের বিস্ময়-চমকের অন্ত ছিল না! টেলিগ্রাফের তারের পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিত, ও-তারের মধ্য দিয়া কি করিয়া খবর যায়? কেহ বলিত, ফাঁপা তার—তার মধ্য দিয়া খবর পাঠানো হয়। কেহ-বা বলিত—তার টানিয়া এদিক্কার খবর ওদিক্ হইতে সংগ্রহ করে! অনেকে তার কাটিয়া ছিঁড়িয়া সত্য-নির্দ্ধারণের প্রয়াস পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। প্রথম যখন জাপানে টেলিফোন প্রবর্ত্তিত হয়, রাগিয়া অনেকে বলিয়াছিল, বাঃ! বক্তার মুখের কথা বহিয়া কলেরা এবং নানা রোগের ছোঁয়াচ আসিয়া লাগুক! তার পর শুধু আচার-রীতি বেশভূষা নয়, জাপানীরা পাশ্চাত্য যন্ত্রতন্ত্র কল-কব্জার নকল করিতে উদ্যোগী হইল; প্রথমে বহু গলদ ঘটিয়াছিল। ষ্টীমার তৈয়ারী করিয়া জলে দিবামাত্র সে ষ্টীমার উল্টাইয়া গেল! নূতন-তৈয়ারী বয়লার ফাটিয়া লঙ্কাকাণ্ড ঘটিল। তার পর ষ্টীমার-জাহাজ যদি বা ভাসিল তো ক্যাপটেন সে ষ্টীমার-জাহাজ থামাইতে জানে না! ষ্টীমার-জাহাজ তীরে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! তবু উদ্যোগ কমিল না। এবং সে উদ্যোগ ক্রমে সিদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের মিল দেখিয়া জাপানীরা তুলা হইতে সুতা কাটিতে শেখে। তার পর জাপানে তাঁত বসিল, মিল বসিল; এবং জাপানীরা ধুতি-সার্ট তৈয়ারী করিয়া লক্ষ লক্ষ ডজন হিসাবে নানা দেশে সে সার্ট চালান দিতে লাগিল। প্রায় জলের দামে সে সব সার্ট বিক্রয় করিল।

এবং এমনি উদ্যোগ-অধ্যবসায়ের মধ্যে টয়োডা নামে এক জাপানী খুব ভালো তাঁত গড়িয়া তুলিলেন। সে তাঁতে জটিলতা নাই! সে তাঁত চালানো সহজ; এবং তাহাতে খরচ কম। বহু জাপানী স্ত্রী-পুরুষ লাঙ্কাশায়ারে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারে গিয়া তাঁতের যন্ত্র দেখিয়া ভালো করিয়া কাজ শিখিয়া দেশে ফিরিল। লাঙ্কাশায়ারের মিলে একটি মেয়ে-শিল্পী যে ক্ষেত্রে আটটা মেশিন পরিচালনা করে, জাপানে এক জন মেয়ে-শিল্পী সে ক্ষেত্রে সাটটি মেশিন পরিচালনা করে। জাপানীর কর্ম্মপটুতা এত বেশী! সুতরাং জাপানী মিলে লাঙ্কাশায়ারের চেয়ে কাজও হয় প্রায় আট-গুণ বেশী।

ক' বৎসর পূর্ব্বে জাপানী কাপড়ে পৃথিবীর বাজার ছাইয়া গিয়াছিল। তখন লাঙ্কাশায়ারের বহু মিলওয়ালা জাপানের কর্ম্ম-শক্তির অনুশীলনের জন্য জাপানে গিয়াছিলেন; এবং টয়োডা-প্রবর্ত্তিত তাঁতের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া জাপানী তাঁত কিনিয়া লাঙ্কাশায়ারের মিলে আনিয়া বসাইয়াছেন।

জাপান কিন্তু টয়োডার তাঁত লইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে নাই! সে তাঁতের আরো উৎকর্ষ কি করিয়া হয়, সে সম্বন্ধে সমানে তাদের সাধনা চলিয়াছিল! এবং এ সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে তুলা কিনিয়া মাশুল দিয়া সে তুলা জাপানে লইয়া যাইত; তার পর সেই তুলায় কাপড় তৈয়ারী করিয়া ভারত-সরকারকে ডিউটি দিয়া সে-কাপড় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া যে-দামে সে সব কাপড় বিক্রয় করিয়াছে,

তাহা দেখিয়া লাঙ্কাশায়ার হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল! জাপানের এ সাফল্যে পৃথিবীর কাপড়ের বাজার দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইয়াছিল!

রেশমের ব্যবসায়ে জাপানীদের কোনো জাতি পরাভূত করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে যত সিল্ক ব্যবহার হয়, তার শতকরা ৭০ ভাগ ছিল জাপানী সিল্ক! ইহার কারণ শুধু যে জাপানে প্রচুর গুটি মেলে তা নয়; জাপানীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গুটি পালন করিতেছে; জেলায়-জেলায় গুটি পাঠাইয়া গুটির চাষ বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং প্রতি জেলায় তাঁত আর মিল বসাইয়া অজস্র ভাবে সিল্ক তৈয়ারী করিতেছে!

জাপানী সিল্কের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে শেষে রেয়ন্ বা নকল সিল্ক তৈয়ারী করিতে

রাজ-প্রাসাদ-সন্নিহিত সেতুকে জাপানী প্রজাদের প্রণতি

হয়। রেয়নের আবিষ্কারে প্রথমে জাপান শঙ্কিত হয়, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে জাপানও রেয়ন-রচনায় নৈপুণ্য-লাভ এবং রেয়নের তাঁত-মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে এদিকেও পরাভূত করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জাপান হইতে যত নকল সিল্ক দেশ-বিদেশে চালান যাইতেছিল, আর কোনো দেশ হইতে তত নয়। পাটের চাষেও জাপান আজ বৈজ্ঞানিক কৌশলে সকলের পুরোবর্ত্তী।

শুধু পাট বা সিল্ক কিম্বা সুতির কাপড়ের ব্যবসা নয়, টোকিও হইতে কোবি পর্য্যন্ত বিচরণ করিলে জাপানকে শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র ছাড়া আর-কিছু বলিয়া মনে হইবে না! শূন্য-পথ দিয়া যদি কোনো শত্রু কোনো দিন জাপানকে বিপর্য্যস্ত করিতে যায় তো কোবি হইতে টোকিয়ো পর্য্যন্ত শুধু বোমা-নিক্ষেপ! চকিতে জলবিম্বের মতো জাপানের সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটিবে! এবং এ প্রলয়-সাধনে সময় লাগিবে তিন ঘণ্টা মাত্র!

কিন্তু শূন্য-পথ হইতে টোকিয়োর উপরে কয়েকটি বোমা ফেলিলেই যে জাপান ভস্মসাৎ হইবে, এ ধারণা ভুল! কারণ, নীচে সারা সহর যেন অসংখ্য চক্র-গণ্ডীতে ভাগ করা। প্রত্যেকটি গণ্ডীর চারি দিকে চওড়া রাস্তা, না হয় নদী বা খালের সীমানা রচিত আছে। বোমা-নিক্ষেপে এক একটা চক্র-গণ্ডী বিপর্য্যস্ত হইলেও অন্যগুলি অক্ষত থাকিবে—চক্র-গণ্ডী-রচনায় জাপানীরা এমন কৌশল করিয়াছে! গত-বারের সেই করাল-রূপী ভূমিকম্পের পর এ-ভাবে চক্র-গণ্ডী রচিত হইয়াছে।

বারুদ-কামান-বন্দুকাদি নির্ম্মাণের জন্য যে সব বিরাট্ অস্ত্রশালা, সেগুলি আছে নাগোয়া, ওশাকা এবং কোবিতে। এ-সব অস্ত্রশালা এবং এখানকার প্রত্যেকটি শিল্প-কেন্দ্র পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হইয়াছে। এই অনুকরণ-পটুতার জন্য একটা কথা প্রবাদ-বাক্যের মত চলিত হইয়াছে—The Japanese copy everything, invent nothing (জাপানীরা সব-কিছুর নকল করে, কোনো কিছু উদ্ভাবনী-কৌশলে আবিষ্কার করিতে জানে না)।

কিন্তু গত দশ-বিশ বৎসরে জাপানীরা এ বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। জাপানের রাজকীয় পেটেন্ট-বুরোয় বছরে হাজার-হাজার নব নব আবিষ্কারের বহু পেটেন্ট রেজিষ্ট্রী হইতেছে। বছরে এই সব নবাবিষ্কৃতের সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয়। য়ুরোপ এবং আমেরিকা সাগ্রহে এবং সকৌতূহলে জাপানের এ নবাবিষ্কার লক্ষ্য করিতেছে।

জাপানীরা এক-রকম চুম্বক-ইস্পাত তৈয়ারী করিয়াছে —সে-ইস্পাতে পৃথিবীর বৈদ্যুতিক যন্ত্র-জগতে যুগান্তর ঘটিয়াছে! তাছাড়া যে টাইপ-রাইটার যন্ত্রে ২৬টি মাত্র ইংরেজী অক্ষর,—সেই টাইপ-রাইটারে প্রায় হাজার হাজার বর্ণমালা জুড়িয়া জাপান সারা পৃথিবীকে বিস্ময়-চকিত করিয়া দিয়াছে! তার উপর বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্রকায় টকি-প্রোজেক্টর; গৃহের জন্য টেলিভিশন-শেট; চোখ ঝলশানি-নিবারক নূতন বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব; সর্ব্বদিকে-সঞ্চরমান মোটর-গাড়ীর শক্তিমান হেড লাইট; ডিম ভালো কি মন্দ পরীক্ষা করিবার যন্ত্র; বাসি ও গলা ভাত হইতে গৃহ-নির্ম্মাণের উপযোগী মশলা; সেকেণ্ডে ৬০০০০ এক্স্পোজার হয় এমন জাতের মুভি-ক্যামেরা; আর অতি-সুলভ মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিয়া জাপান অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

টোকিয়োর এঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর কিনোশিটা বলেন—পাশ্চাত্য জগতের কাছ হইতে জাপান অনেক-কিছু শিখিয়াছে ; এবং যে-শিক্ষা পাইয়াছে, তার দাম সুদ-সমেত সে এখন পাশ্চাত্য জগৎকে চুকাইয়া দিতে চায় ! শব্দে ইনি যুগান্তর আনিতেছেন। বহু উর্দ্ধলোকে যে-শব্দের সৃষ্টি, সে-শব্দ আমরা যাহাতে এই মাটির পৃথিবী হইতে শুনিতে পাই, ডক্টর কিনোশিটা

মিলিটারী-সাজে ছেলেদের পার্ব্বণ-প্যারেড

তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। গুপ্ত-সঙ্কেতের কাজে তাহা হইলে আশ্চর্য্য রকম সুবিধা ঘটিবে ! এই বিশ্ব-বিদ্যালয়টি পৃথিবীতে অভিনব। এ শিক্ষায়তনে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ—গবেষণা-অনুশীলন এবং নব নব সৃষ্টি ! এ বিশ্ব-বিদ্যালয় এমন 'বয়া' (buoy) তৈয়ারী করিয়াছে, প্রচলিত এই সব বয়ার সঙ্গে যার তুলনা হয় না ! এই নূতন জাপানী বয়ার জন্য তৈল, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক বাতির কোনো প্রয়োজন নাই ; নিয়ন-টিউব হইতে এ বয়ায় যে-আলোক সঞ্চারিত হয়, সে-আলো নিবিড়-ঘন কুয়াশা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া পরিষ্কার প্রতিভাত হইতেছে। তাছাড়া জাপানী বৈজ্ঞানিক আজ [illegible]ও তৈয়ারী করিয়াছেন, যাহা একশো বছরে মলিন হইবে না বা ঝরিয়া-খশিয়া যাইবে না ! এমন সিমেণ্ট তৈয়ারী করিয়াছে, সে-সিমেণ্ট ফাটিতে জানে না ! বৈদ্যুতিক অর্গান তৈয়ারী করিয়াছে, হাতের স্পর্শ না লাগাইয়া শুধু বাতাসে হাত চালাইলে সে পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কার তোলে !

জাপানের পূর্ত্ত-বিভাগ এমন বৈজ্ঞানিক কৌশলে

তক্তায় ফেলিয়া কাপড়-ইস্ত্রী ; মেয়ে-খরিদ্দারের পিঠে শিশু

জাপানের ঘর-বাড়ী কারখানা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে যে ডক্টর কিনোশিটা বলেন, শূন্যপথে শত্রু আসিয়া জাপানকে আক্রমণ করিতে পারে, এজন্য সহরের বাড়ী-ঘর এমন ভাবে তৈয়ারী হইতেছে যে, কোনো বমারের সাধ্য নাই সে বাড়ী-ঘরের এতটুকু অনিষ্ট সাধন করে ! পূর্ত্ত-বিভাগে এই অলৌকিক অঘটন ঘটাইয়াছেন ডক্টর তানিগুচি। প্রবল ভূমিকম্পেও এ সব বাড়ী-ঘর পড়িয়া গুঁড়া হইবে না !

লেখক বলিতেছেন—জাপানের দোকানদার কুলি-মজুর পর্য্যন্ত—দু'টি চোখের একটি চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, আর এক চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে

আন্তর্জাতিক পলিটিক্সে! ডক্টর কিনোশিটা বলেন—আমাদের প্রথম পরিচয়,—আমরা জাপানী; তার পর আমরা বৈজ্ঞানিক! We are scientists second. First we are Japanese.

জাপানী বিজ্ঞানের মস্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, জাপানের বিজ্ঞান শুধু জাপানের জন্য—সে বিজ্ঞান পৃথিবীর জন্য নয়! বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য, পলিটিক্সের খবর না রাখিয়া মানুষের

শিকারী বাজ-পাখী

জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা। জাপান এ কথা মানে না! জাপানের অতি-বড় বৈজ্ঞানিক যিনি, তিনিও বলেন, সম্রাট্ জন্মিয়াছেন সূর্য্যের অংশে; সম্রাট্ দেবতার অংশ-সম্ভূত; এবং স্বর্গ হইতে তিনি পাইয়াছেন পৃথিবীর শাসন-পালনের ভার!

এ যুদ্ধে জাপানে বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। লৌহ-পিতল ও তামার অভাব—গাছের পাতা-ঘাস প্রভৃতি বাজে জিনিষ হইতে জাপান আজ তৈয়ারী করিতেছে রেডিয়ো-শেট, দরজার হাণ্ডেল, কব্জা, পেরেক প্রভৃতি। চীনা-বাদামের খোশা এবং সামুদ্রিক গুল্ম-লতাদি হইতে তৈয়ারী করিতেছে নকল ফেল্ট; পশম তৈয়ারী করিতেছে মাখন-শীমের খোশা হইতে; ফনোগ্রাফের নীড্‌ল্ তৈয়ারী করিতেছে বাঁশ হইতে; লৌহের অভাবে কার্ডবোর্ড এবং গাছের ছাল হইতে তৈয়ারী করিতেছে বাইসিক্‌ল্; পেট্রলের অভাবে জাপানে আজ মোটর-গাড়ী চলিতেছে কয়লার জোরে!

জাপান যে নকল মুক্তা তৈয়ারী করিয়াছে, দেখিলে কে বলিবে, এ মুক্তা আসল নয়! অথচ এই নকল মুক্তার

তরুণ সমর-শিক্ষার্থী—পরীক্ষায় ফেল হইলে 'হারা-কিরি' করিবে

দাম জাপানে প্রায় এক পয়সার সামিল। এ নকল মুক্তা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সিকিমাটো নামে এক জন জাপানী বণিক্। মুক্তা-কীট (oyster) ধরিয়া তার দেহ-মধ্যে মাদার-অফ-পার্ল ভরিয়া অয়েষ্টারকে আবার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জীবন্ত অয়েষ্টারের দেহ-রসে নকল মুক্তার গায়ে যে লালা জমে, তাহারি দৌলতে নকল মুক্তা হয় কঠিন এবং তাহাতে শুভ্র-দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া ফোটে! এ আবিষ্কারে পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। জাপানে আজ মহা-সমারোহে এই নকল মুক্তার কারবার চলিতেছে। কারখানায় অজস্র জলাশয় আছে। সেই সব জলাশয়ে মেয়ে-ডুবুরীরা ডুব দিয়া বিশ ফুট নীচে হইতে পালিত অয়েষ্টার তুলিয়া আনে; তার পর

প্রত্যেকটি অয়েষ্টারের দেহে নকল মুক্তা ভরিয়া সে অয়েষ্টারকে আবার জলাশয়ে ফেলা হয়। আট বৎসর পরে নকল মুক্তা আসলের রূপ আর শ্রী লইয়া আসলের আসন-অধিকারের যোগ্যতা লাভ করে।

সমরায়োজনের প্রারম্ভে লেখকের সঙ্গে এক জন জাপানীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ।

লেখক বলিয়াছিলেন—তোমাদের চেয়ে আমাদের নৌ-বল অনেক বেশী, বিরাট্ এবং শক্তিমান্।

উষ্ণ প্রস্রবণ—বেপু। গরম-জলের তাপে ডিম-সিদ্ধ

বাসে মেয়ে-কণ্ডাক্টর—ব্যবহারে খুব শিষ্ট ও বিনয়ী

তাছাড়া ওয়াটার-কলার চিত্রাঙ্কনে, ল্যাকারের কাজে, এম্‌ব্রয়ডারির কাজে, বামন-গাছের উদ্ভাবনায়, ট্রের গায়ে নিসর্গ-দৃশ্যাদি অঙ্কনে এবং আরো অনেক ললিত-শিল্পে জাপানী জাতের পটুতার কথা বিশ্ব-প্রসিদ্ধ।

উত্তরে জাপানী বলিয়াছিল—কিন্তু আমাদের একখানা জাহাজে যে কাজ হইবে, সে কাজে তোমাদের ছ'খানা জাহাজ লাগে।

—তার অর্থ?

"আসাহি" খবরের কাগজের অফিস—টোকিয়ো। এ কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা বিশ লক্ষ

সিনেমা-হাউস—য়োকোহামা

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যে জাতির এমন অসাধারণ শক্তি, সে জাতি আজ অসুরের মন লইয়া বিশ্ব-সংহারে মাতিয়াছে —ইহাতে বিস্ময় এবং পরিতাপের সীমা নাই!

—জাপানীরা আকারে বাঁটুল। ডেকের দু' দিকে তোমাদের আট ফুট উঁচু জায়গা রাখা চাই—নহিলে দীর্ঘকায় সেনার মাথা ঠুকিয়া যাইবে। আমরা বাঁটুল—ডেক ছ' ফুট উঁচু হইলেই চলিবে। তাহা হইলে একখানি জাহাজে

তোমাদের লোক যে-জায়গা দখল করিবে, সে জায়গায় আমাদের লোক ধরিবে তার দ্বিগুণ।

জার্ম্মাণীর কাছে জাপান বিমান-বিহারী বিদ্যা শিখিয়াছে। জার্ম্মাণীর কাছে শিখিলেও জাপানীর বিদ্যা হইয়াছে

বোমা-বারণ বাড়ীর কাঠামো—টোকিয়ো। ডক্টর তানিগুচির আবিষ্কার

গুরু-মারা! জাপানী টর্পেডো-প্লেনের শক্তি পৃথিবীতে না কি অতুলনীয়।

তার উপর জাপানীরা আশ্চর্য্য কষ্ট-সহিষ্ণু। যে ঘরে তারা বাস করে, সেগুলা যেন ইঁদুরের গর্ত্ত। যা-তা খাইয়া তারা বাঁচিতে পারে—সুস্থ থাকে। তারা যে ভাবে বাস ও খাওয়া-দাওয়া করে, পৃথিবীর আর কোনো জাতি বোধ হয় তাহাতে বাঁচিতে পারে না।

মুক্তা-কীটের দেহে মাদার-অফ-পার্ল ভরা

লেখক বলিতেছেন—জাপানে দেখিয়াছি, বেশীর ভাগ ঘরে ছ্যাচা-কঞ্চির দেওয়াল; সেই ছ্যাচা-কঞ্চির গায়ে পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। মাটি শুকাইলে তার উপর পাৎলা তক্তা আঁটিয়া দেয়। দ্বার-জানলা তৈয়ারী হয় মোটা কাগজ দিয়া। শীতকালে দ্বার-জানলা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকো! গ্রীষ্মের সময় দ্বার-জানলা খুলিয়া দিয়া হাওয়া খাও! শয়ন করো মেঝেয় চ্যাটাই পাতিয়া—ভোজন হাঁটু-ভোর উঁচু টেবিলে ভোজনপাত্র রাখিয়া।

শীতে কম্বল-মুড়ি

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে দারুণ ঝড় হয়। সে ঝড়ে এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছ'শো সাতান্নখানি ঘর উড়িয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার লোকের মৃত্যু এবং আট হাজার লোক জখম হয়। তাছাড়া বহু স্কুল-ঘরের অপমৃত্যু, সেতুভঙ্গ ও বন্যা হয়।

একে ঐ-সব ঘরে বাস করায় স্বাচ্ছন্দ্য নাই, তার উপর আছে ইঁদুর আরশুলা এবং মশার প্রবল উৎপাত।

মেয়েরা পেট্রোল বেচিতেছে

মানুষ বেশ শক্ত-সমর্থ হইয়া ওঠে, কোনো কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করে না! এই কারণে যুদ্ধে বাহির হইয়া জাপানী ফৌজ কোনো-কিছুতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া কাতর হইতে জানে না—তাদের শক্তিও থাকে অব্যাহত, অটুট!

জাপানীদের মমতা-হীনতার কারণ, জাপানীর কাছে মানুষের প্রাণের কোনো দাম নাই! আমরা দেশের জন্য জীবনকে রক্ষা করিতে চাই। জাপান এ-কথার অর্থ বোঝে না। জাপানীরা দেশের জন্য মরিতে জানে! কাজেই যার কাছে নিজের প্রাণের দাম নাই, অপরের প্রাণের দাম বুঝা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার উপর ছেলেবেলা হইতে জাপানীরা শিক্ষা পায়, ব্যষ্টিগত জীবনের কোনো দাম নাই; সমষ্টিই সব! ব্যষ্টি ভুয়া!

তাই জাপানীরা যা-কিছু করে, মিলিয়া-মিশিয়া করে। ইংরেজীতে যাকে বলে team work—জাপান সেই টীম-ওয়ার্কে পটু।

জাপানের সম্রাট্ মানুষ নন—ঈশ্বরের অংশ-সম্ভূত—অতএব সম্রাট্ স্বর্গের দেবতা! রাজ্য কিন্তু মন্ত্রী-সেনাপতিরা পরিচালনা করেন। এ-ব্যাপারে কোনো কর্ম্মচারী বা মন্ত্রী যদি বিশিষ্ট শক্তিমান্ হইয়া ওঠেন, তাহা হইলে তাঁর অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য্য।

আত্মহত্যা করিতে জাপানী স্ত্রী-পুরুষ এক-মুহূর্ত্ত দ্বিধা বা কিন্তু-বোধ করে না। যদি মনে হয়, না, কাহারো সঙ্গে খাপ খাইতেছি না, তখনি গিয়া উঠিবে আসামা আগ্নেয়-গিরির মাথায়—সেখান হইতে ঝাঁপ খাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে! তার উপর পরাজয় বা গ্লানি ঘটিলেই আত্মহত্যা—জাপানে নিত্য কত ঘটিতেছে, তার সংখ্যা নাই! যুদ্ধে বন্দী হইলে আত্মীয়-বন্ধুরা লজ্জা পাইবে, এ জন্য বিপদ-কালে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করিয়া জাপানী সেনা আত্মহত্যা করে। এ আত্মহত্যার নাম হারা-কিরি!

জাপানীরা প্রাণের দাম বোঝে না—এ সত্য ভীষণ ভাবে প্রতিফলিত দেখা যায় জাপানের কল-কারখানায়। কম মাহিনায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আদায় করা—জাপানীদের তাহাতে বাধে না।

শিল্প-বিজ্ঞানে জাপানের শ্রীবৃদ্ধি শুধু যে জাপানী শিল্প-পটুতার গুণেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে। এত কম মাহিনায় জাপানী শ্রমিকদের কাজ করিতে হয় যে, পারিশ্রমিকের সে-হারের কথা শুনিলে এ যুগে স্তম্ভিত হইবার কথা! তার উপর শ্রমিকদের খাটিতে হয় সপ্তাহে ৪০ বা ৪৮ ঘণ্টার নিয়মে নয়—সপ্তাহে ষাট্ হইতে একশো ঘণ্টা করিয়া তাদের খাটানো হয়। এবং সেই সঙ্গে তাদের উপর ধনিক সম্প্রদায়ের আরো নানা রকমের চাপ ও কষাকষির বাঁধন আছে। এ দুর্গতি মোচনের জন্য শ্রমিকরা এক বার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সে সঙ্ঘ-বন্ধন শাসন-যন্ত্রের চাপে নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।
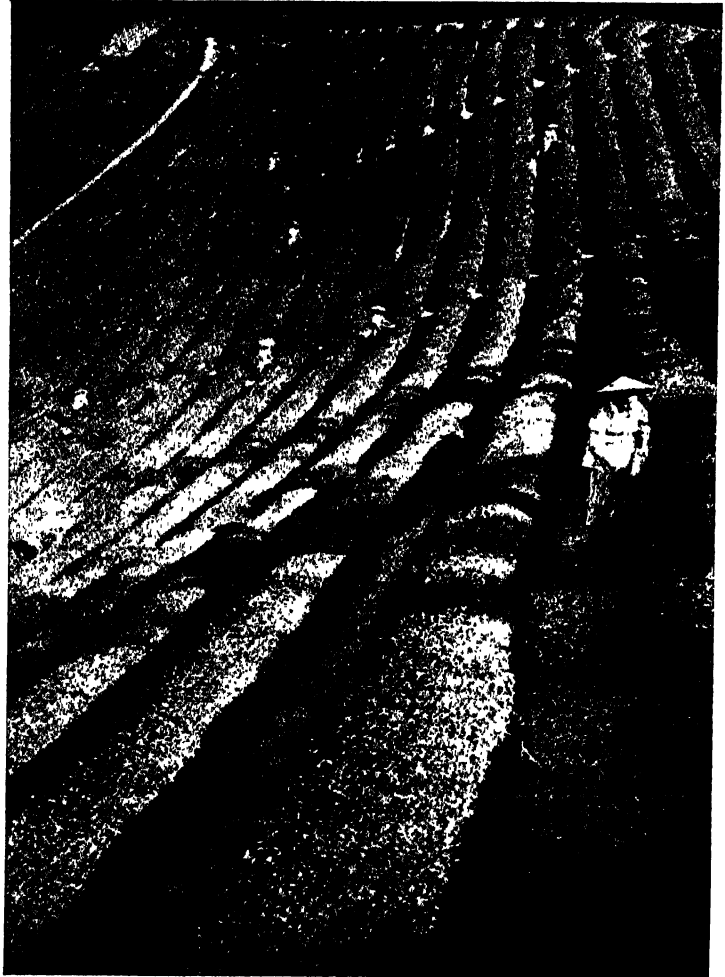
চায়ের ক্ষেত—সিজুয়োকা

চীনা যুদ্ধের সময় হইতে কল-কারখানার যা-কিছু কাজ

মেয়েরা করিতেছে—পুরুষের দল যুদ্ধে গিয়াছে। কারখানার মালিকের দল জাপানের পল্লীগ্রামগুলি উজাড় করিয়া মেয়ে-কারিগর আনিতেছে।

লেখক লিখিতেছেন, ইবারাতি নামে একখানি গ্রামে গিয়াছিলাম। সে-গ্রামে একটিও তরুণ জোয়ান পুরুষ বা তরুণী দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, তরুণরা গিয়াছে যুদ্ধে—তরুণীরা গিয়াছে নানা সহরে কারখানায়। গ্রামে-গ্রামে কারখানা-সমূহের এজেন্ট আছে। তাদের লক্ষ্য মেয়েদের দিকে। চৌদ্দ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের মেয়ে দেখিলেই এজেন্টরা গিয়া মা-বাপ ও অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে; মেয়েদের বেতন ঠিক করে—ঠিক করিয়া মা-বাপের হাতে তিন বৎসরের মাহিনা আগাম চুকাইয়া দেয়। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি টাকার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং এজেন্টরাও খুশী-মনে মেয়ে লইয়া সহরের কারখানায় চালান দেয়। মেয়ের হয়তো অনিচ্ছা—তবু উপায় নাই! যে সব কারখানায় কাজ করিতে হয়, সেগুলায় আলো-বাতাসের বালাই নাই! কদর্য্য ভোজন, মেঝেয় শুইয়া রাত্রি-যাপন। তার ফলে শতকরা পঞ্চাশটি মেয়ের শরীর হয় অসুস্থ; কাজে তারা হয় অপটু। কত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে এমনি করিয়া যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই!

রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-পর্ব্বে অফিসারদের সঙ্গে অফিসার-পুত্রদের প্যারেড

ইহার উপর কারখানায় নিত্য এ্যাকসিডেন্ট ঘটিতেছে! যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী ফৌজ যেমন জানিয়া-শুনিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে যায়, কারখানার শ্রমিকদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই বিধি! তবু ধনী মালিকদের ঘাড় ধরিয়া এ সব এ্যাকসিডেন্ট যাহাতে না ঘটে, সে সম্বন্ধে সতর্ক সচেতন করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। এক কারখানার মালিককে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন—আমাদের শিল্পীরা নিখুঁত ভাবে কাজ করিতে চায়। সে কাজ করিতে যদি প্রাণ যায়, তারা তোয়াক্কা রাখে না!

এই যে মনোভাব, এই মনোভাবের জোরে জাপানীরা বলে—A poor nation can conquer a rich nation—(ধনী-জাতকে যুদ্ধে দরিদ্র জাত পরাস্ত করিতে পারে)। রুশ-যুদ্ধের সময় জাপান ছিল রুশের কাছে ঠিক যেন বলদের শিঙে ক্ষুদ্র মশার মতো! তবু জাপানই তো সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল!

জাপানের অর্থ-বল তেমন প্রচুর নয়। লোক-বলের দিক্ দিয়াও মিলিত-শক্তির তুলনায় নগণ্য! ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে

জাপানী-ক্যাবিনেট পণ গ্রহণ করিয়াছে, বিশ বৎসরের মধ্যে এশিয়ায় জাপান স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে! জাপানের নারী-জাতিকে এ জন্য অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—ঘর-সংসার আর নিজের জীবনের দিকে না চাহিয়া শুধু ষ্টেটের প্রসার-কল্পে দাও তোমরা সন্তান—অগণিত সন্তান—Raise up sons for the State. প্রতি পরিবারে পাঁচটি করিয়া সন্তান চাই! যে-পরিবারে পাঁচটি সন্তান মিলিবে, সে-পরিবারকে রাজ-কোষ হইতে বোনাস দেওয়া হইবে!

জাপানী জাতের চক্ষু-লজ্জা নাই। কোনো বিষয়ে তাদের মনে দ্বিধা জাগে না! তারা বলে, জাপানের যাহাতে প্রসার, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য—তাহাই আমাদের ধর্ম্ম!

স্বজাতির সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে জাপানীরা সাধুতা রক্ষা করিয়া চলে। রাত্রে কেহ ঘর-দ্বার বন্ধ করে না—

সিনেমা-হাউস; সঙ্গে রেস্তর্ঁা

অথচ দেশে চুরি-চামারির উৎপাত নাই! দোকানে জিনিষ-পত্রের দাম একেবারে নির্দ্ধারিত—এক পয়সা ঠকাইয়া লইবে, এমন প্রবৃত্তি দেখা যায় না। পলিটিক্সে ঘুষ বা গর্হিত উপায়-অবলম্বন অবিদিত। স্বজাতির সম্পর্কে

উষ্ণ-প্রস্রবণের বালুকাময় গরম-কূলে শুইয়া বাত সারানো

প্রত্যেকে অপরের হক্ মানিয়া চলে। বিদেশীদের জন্য কিন্তু স্বতন্ত্র বিধি।

বিদেশীরা জাপানীকে তাঁদের আবিষ্কারের পেটেণ্ট বেচিতে পারেন—জাপানে গিয়া স্বতন্ত্র পেটেণ্ট রেজিষ্ট্রী করাতেও বাধা নাই! কিন্তু তাঁর নিজের মাল জাপানে লইয়া গিয়া বেচিবেন—সে জো নাই!

এক জন মার্কিন টুপিওয়ালা তাঁর তৈয়ারী টুপি জাপানে গিয়া বেচিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন-প্রচারে সরকারী অনুমতি চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে-অনুমতি তিনি পান নাই। অবশেষে এক জাপানী ফার্ম্মকে সেই টুপি তিনি বেচিতে দেন—তখন সেই জাপানী ফার্ম্মের পক্ষে টুপির বিজ্ঞাপন-প্রচারের অনুমতি-লাভে আপত্তি ওঠে নাই।

বিদেশী জিনিষের ট্রেডমার্ক কিম্বা গ্রন্থের কপি-রাইটের মর্য্যাদা জাপানে নাই! বিখ্যাত ফরাশী পুষ্প-সার আনাইয়া জাপানীরা ফরাশী ফার্ম্মের নাম মুছিয়া বেমালুম নিজেদের নামে তাহা বিক্রয় করিতেছে—তাহাতে বাধা নাই! নিষেধ নাই!

আদি অকৃত্রিম পুরানো "স্কচ্-হুইস্কি" লেবেল মারিয়া জাপানে-তৈয়ারী মদ জাপানের বাজারে বিক্রয় হইতেছে; কোবির তৈয়ারী দেশলাই 'সুইডেনে প্রস্তুত' লেবেল লইয়া বিক্রয় হইতেছে; বিলাতী জ্যামের খালি বোতলে জাপানী জ্যাম ভরিয়া বিলাতী লেবেল আঁটিয়া বিক্রয় চলিতেছে—তাহাতে জাপানী আইনে নিষেধ বা শাসন নাই!

মার্কিন যুক্ত-রাজ্যে তৈয়ারী বহু দ্রব্যের নকল জাপানের একটি পল্লীগ্রামে তৈয়ারী হইতেছে এবং সে সব দ্রব্য "মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রস্তুত"—এই লেবেলে বাজারে চলিতেছে বলিয়া সে পল্লীগ্রামের নূতন নাম হইয়াছে ইউ-এস্-এ (ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অফ আমেরিকা) !

জাপানী ভাষায় অনূদিত বিদেশী বহু গ্রন্থের অব্যাহত প্রচারের বিরুদ্ধে সে-সব গ্রন্থের মালিক কপিরাইট-আইনের আশ্রয় লইয়া জাপানে এক পয়সা খেশারৎ পান নাই !

লেখক অতঃপর জাপ-সম্রাটের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—সম্রাটের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে বলিবার কিছু নাই। হায়ামা গ্রামে সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস। আমরা সেই প্রাসাদের খুব কাছে বাস করিতাম। আমাদের বাড়ীর পাশে গ্রামের ছোট পোষ্ট অফিস ! খোলা জানলা দিয়া সেই পোষ্ট অফিসের ও-পাশে দেখিতাম প্রাসাদের উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের ধারে সশস্ত্র প্রহরী। প্রাচীরের পরেই রাজ-প্রাসাদের উদ্যান। উদ্যানের তরুশ্রেণী ভেদ করিয়া প্রাসাদের চিহ্নও দেখা যাইত না ! পথে সম্রাট্ বাহির হন না। তাঁকে দেখা যায় শুধু সশস্ত্র বডিগার্ড-বেষ্টিত লিমুশিন-কারে গ্রীষ্ম-আবাস হইতে যখন তিনি টোকিয়োর প্রাসাদে যান, শুধু তখন মাত্র ! পথে একটু বেড়াইবেন বা পাহাড়ে চড়িবেন, নিসর্গ-দৃশ্য উপভোগ করিবেন —সে-অধিকার তাঁর নাই ! তাঁর দশা —মিলিটারী পাহারায় রক্ষিত বেচারী বন্দীর মতো। মিলিটারী-দল দেবতা বানাইয়া তাঁকে প্রাসাদ-কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে এবং নিজেদের খেয়াল-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। এই যে এত বড় সভ্যতা-বিধ্বংসী মহা-মার যুদ্ধ চলিয়াছে, এ যুদ্ধের মূলে আছে মিলিটারী-দলের উৎকট লিপ্সা ! জন-সাধারণের সঙ্গেও মনের দিক দিয়া এ যুদ্ধের যোগ নাই। অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা ভারতবর্ষ জাপানীরা পাইল কি না পাইল—সে সম্বন্ধে তাদের এতটুকু মাথা-ব্যথা নাই ! সম্রাটের নামে যুদ্ধ—তাই তাঁরা নিঃশব্দে এ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে !

সম্রাট্ মনের কথা বলিবেন, সে উপায় নাই। প্রাসাদে সম্রাটের নিজস্ব টেলিফোন পর্য্যন্ত নাই ! মিলিটারী-দল তাঁকে দিয়া যে-কথা প্রচার করে, কণ্ঠে তিনি শুধু সেই কথাটুকু উচ্চারণ করেন।

জাপানীরা নিয়মের বশ। বিধি-নিয়মের শৃঙ্খল ছাড়িয়া এক পা চলিবার সামর্থ্য তাদের নাই। এ নিয়মানুবর্ত্তিতায় এক দিকে যেমন শক্তি মেলে, তেমনি আবার বিধি-নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হইলেই বিপদ !

শিণ্টো-পন্থীদের রথ-যাত্রার পর্ব্ব

জাপানী-জাত আজো প্রাচীন-পন্থী। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিক্ষা-সভ্যতা পাইলেও জাপানীরা তাদের অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। এ জন্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। শিক্ষায় আজো সেই প্রাচীন feudal (ভৌমিক) নীতি ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে জন্য প্রতিহিংসা-স্পৃহা মিটাইতে তাদের নৃশংসতাও অকুণ্ঠ নির্লজ্জতায় প্রকাশ পায় !

তার পর বাহিরে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিলেও জাপান আজ কোনো ধর্ম্ম মানে না। জাপান আজ ধর্ম্ম-হীন। বুদ্ধদেবের উপর শ্রদ্ধা—সে ঐ পুঁথির

লেখায় আবদ্ধ আছে ! নহিলে তাদের পূজ্য শুধু সম্রাট্ এবং পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি ! এ পূজায় মানুষ বশ মানিতে পারে—কিন্তু ইহাতে মনুষ্যত্ব রক্ষা পায় না। যে জাতির ধর্ম্ম নাই, সে জাতির বাহুবল যত প্রচণ্ড হোক্, তার শেষ-জয়ের আশা সুদূর-পরাহত !

জাপানীর এই নির্ম্মম হিংসা ও নৃশংসতা তার সমস্ত শক্তিকে খর্ব্ব করিবে, বিচূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জাপান আজ সদর্পে ঘোষণা প্রচার করিতেছে—এশিয়াকে করিব শুধু এশিয়াবাসীর স্থান—এশিয়ায় য়ুরোপীয়ান বা আমেরিকানের স্থান হইবে না ! এ-কথা শ্রুতি-মধুর হইলেও জাপানের প্রতি গ্রাম ও নগর হইতে আজ পুরুষ-মানুষের ছায়া মিলাইয়া যাইতেছে ! সে জন্য গ্রামে-নগরে প্রতি পরিবারের মনে যে বিক্ষোভ জাগিয়াছে, মনে হয়, এ বিক্ষোভের ফলে জাপানের মিলিটারী-দলের দর্প অচিরে চূর্ণ হইবে এবং এই স্বখাত-সলিলে জাপানের সমাধি ঘটিবে !

কাব্য-আলোচনা

জ্যোৎস্না-রাতে বসন্ত-সমীরে
নীল সাগরের কোল-ঘেঁষা
বালুময় তীরে
মুক্ত দেহে নিশ্চিন্ত-শয়ন
আর নিরুদ্দেশ ভ্রমণ ;
স্বপ্নময় কুলেলী বিলাস,
কল্পনার তীব্র অনুপ্রাস ;
ব্যর্থপ্রেম, হুতাশ-অনল,
বিরহের দীর্ঘ অশ্রু-জল
ছিল সে-কালের কাব্য-রস !
যদিও সরস
বটে গদ্যময় লাবণিক জল—
যেথা অশ্রু-জল
কাব্য-সহচরী !
তবু হায়, হেরি
অশ্রুজলে লবণের ধৃষ্ট-উপস্থিতি !
(এ কি কাব্য-অধোগতি ?)

এ-কালের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র
কাব্যের গোপন অস্ত্র
করে বিশ্লেষণ।
এ-কালের কাব্যে চাই কাব্যের প্রমাণ
বস্তু-বাদী কবি গায় গদ্যময় গাথা ;
হোক্ কাব্য, তবু চাই
প্রামাণিক সত্য আর পরীক্ষিত কথা।
সে-কালে যারা ছিল কল্পনা-বিলাস—
তারা আজ ব্যর্থ-পরিহাস !

* * * *

কোন্ পথে চলি নাহি জানি।
তবু মানি
উপেক্ষিত, অপেক্ষিতা যারা
পৃথিবীর ইতিহাসে চির-সর্ব্বহারা,
তাদের ব্যথার আজ তনি কাব্য-সুর !
ঈডেন উদ্যান কোথা ? কোথা ইন্দ্রপুর ?

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিমকের মর্য্যাদা

লবণ নহিলে আমাদের দিন চলে না। তরকারী-ব্যঞ্জন লবণ-বিনা মুখে রোচে না—এ কথা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে জানি। কিন্তু লবণের

ফাটা ডিম সিদ্ধ

আখরোটের খোলা ভাঙ্গা

আরো কত গুণ আছে, সে পরিচয় জানিলে গৃহলক্ষ্মীরা নিমককে আরো মর্য্যাদা দিবেন। প্রথম,—ডিম যদি ফাটিয়া যায়, এবং সেই ফাটা ডিম যদি সিদ্ধ করিতে চান, তাহা হইলে এক কাজ করিবেন; পাত্র ভরিয়া জল লইয়া সে-জলে এক-চামচ (চায়ের চামচ) লবণ মিশাইয়া দিবেন। মিশাইয়া সেই জলে ফাটা-ডিম ছাড়িয়া দিন সিদ্ধ করিতে। লবণ-জলের গুণে ডিমের মধ্য হইতে তরল পদার্থ টুকু কিছুতেই নিঃসৃত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মশার কামড়ে বা শুঁয়াপোকা কিম্বা বিছুটি লাগিলে যদি কোনো অঙ্গ টাটায় বা ফোলে, তাহা হইলে জলে খানিকটা বাইকার্বনেট অফ সোডা এবং তার সঙ্গে সম-পরিমাণ লবণ মিশাইয়া

কাঠের পিন্

রঙে কাপড় ছোপাইবার আগে

ক্ষত-স্থান সে-জলে সিক্ত রাখুন, তাহা হইলে ব্যথা ও ফুলা সারিবে। তৃতীয়তঃ, বাদাম কিম্বা আখরোট ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে লবণ-জলে সারা-রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবেন, তাহা হইলে হাতের একটু চাপ দিবা মাত্র দেখিবেন খোলা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ভিতরকার শাঁসটুকু গোটা ভাবে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। চতুর্থতঃ, লোহার সামগ্রীতে যদি মরিচা ধরে কিম্বা লৌহপাত্র দাগী হয়, তবে সে পাত্রে বা সামগ্রীতে ভিজা

লবণ ছিটাইয়া কাগজের মুটি পাকাইয়া ঘষিবামাত্র দাগ ও মরিচা নিমেষে ঝরিয়া পাত্রটি ঝকঝকে হইয়া উঠিবে। পঞ্চমতঃ, শুকাইতে দিবার সময় কাপড়ে যে কাঠের পিন্ আটকানো হয়, ব্যবহারের পূর্ব্বে সেই পিনগুলি যদি লবণ-জলে চার-পাঁচ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখেন, তাহা হইলে পিন মজবুত হইবে, চট করিয়া ভাঙ্গিয়া কাজের অযোগ্য হইবে না! ষষ্ঠতঃ, রঙে কাপড় ছোপাইবার পূর্ব্বে রঙ-গোলা জলে যদি খানিকটা লবণ মিশাইয়া লন, তাহা হইলে কাপড়ের রঙ পাকা হইবে—সে রঙ ধোপে ফিকা হইবে না বা উঠিয়া যাইবে না।

ট্রাক হইতে স্থল-মাইন ফেলা

রক্ষা-কোমর-বন্ধ

যারা যুদ্ধে নামিতেছে, তাদের পক্ষে জখম লাগা খুব স্বাভাবিক। ছোট-খাট জখম লাগিলে অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া আপনা হইতে যাহাতে সে সব জখমের দাওয়াই চলে, সে-কারণে প্রত্যেক সেনার জন্য ফার্ষ্ট-এড কোমর-বন্ধ তৈয়ারী হইয়াছে। লম্বা ব্যাগের আকারে এ কোমর-বন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্যাগের মধ্যে থাকে নানা আকারের নানা ছাঁদের ব্যাণ্ডেজ; আঁটিবার ফিতা (টেপ্); কাঁচি; গায়ে চামড়ায় দাগ আঁকিবার উপযোগী পেন্সিল; নোট-পেন্সিল; এবং বিবিধ ঔষধ। এ ব্যাগ কোমর-বন্ধের মতো কোমরে

কোমর-বন্ধ

আঁটা থাকে। প্রয়োজন ঘটবামাত্র ক্ষিপ্র হস্তে ব্যাগ খুলিয়া ব্যাণ্ডেজ কিম্বা ঔষধাদি লইয়া জখমী জায়গায় তাহা যথারীতি প্রয়োগ করা চলে।

ট্যাঙ্ক ধরিবার ফাঁদ
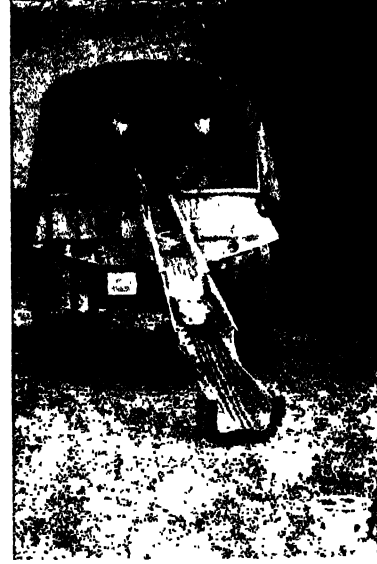
শত্রুর ট্যাঙ্ক বা সেনার অগ্র-গতি রোধ এবং তাদের ধ্বংস-সাধনের জন্য যেমন জলের বুকে, তেমনি ডাঙ্গার জন্যও 'মাইন' তৈয়ারী হইয়াছে। মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের উদ্ভাবনী-কৌশলে এই স্থল-মাইনের সৃষ্টি। ট্রাকে তুলিয়া এ সব মাইন বহিয়া শত্রুর গতি-পথে অনায়াসে ভূগর্ভে তাহা রক্ষা করা যায়। এ সব মাইন মানুষের বা গাড়ীর ঈষৎ স্পর্শ পাইলেই ফাটিয়া কালান্তক-মূর্ত্তি ধারণ করে! একটির উপর আর-একটি, তার উপর আর-একটি অর্থাৎ তিন-চারিটি করিয়া উপরি-উপরি স্থাপন করা যায়। ভূমির বুকে মাইন রাখিয়া পত্র-পল্লবের আবরণে তাহা আচ্ছাদিত রাখা হয়। এ ফাঁদে পা পড়িলে বিপক্ষের ট্যাঙ্ক বা ফৌজ—কাহারো আর রক্ষা থাকে না!

মেঘনাদী অস্ত্র

এবারকারের এ প্রলয়-যুদ্ধে শূন্য-পথই যুদ্ধ জয়ের আসল পথ! রণ-তরী আজ যেমন মস্ত সহায় নয়, তেমনি অশ্বারোহী বা পদাতিক সেনার জোরও এ-যুদ্ধে তুচ্ছ হইতে চলিয়াছে! আকাশ-পথে উঠিয়া সেখান হইতে শত্রুকে যে মারিতে পারিবে, তার জয় সুনিশ্চিত। মার্কিন যুক্ত-রাজ্য তাই

শত্রুর সন্ধান লইয়া

শত্রুর কামান-গাড়ীতে হানা

মায়া-প্যারাশুটের আবরণে পলায়ন

একসঙ্গে ছ'টি শেল্ ফেলা

মেঘনাদী শক্তিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই শক্তির উপরই মার্কিন এ মহাযুদ্ধে বিজয়-লাভের আশা রাখে! বিমান-আক্রমণের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাজ্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে জয়ের আশার কারণ—স্থলপথে এক-হাজার কামান যে-কাজ করিবে, শূন্যপথ হইতে এই একটি বড়-বমার তার চেয়ে ক্ষিপ্র এবং আরো নিশ্চিত ভাবে সে-কাজ করিতে আজ সমর্থ! বিপক্ষ-দলকে সন্ধান করিয়া অতর্কিত আক্রমণে শত্রু-নিপাত—উড়ো বমারের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি অনায়াসে তাহা সংসাধিত হইবে। তার উপর উড়ো-বমার ভূতলবক্ত্র বা ভূতলবাহী সশস্ত্র কামান-গাড়ীকে অতর্কিত-আক্রমণে নিমেষে চূর্ণ করিতে পারে; এবং 'শেল' বর্ষণ করিয়া মায়া-প্যারাশুট নামাইয়া অটুট দেহে আত্মরক্ষা করিয়া উড়ো-বমারের পক্ষে পলায়নের পথও সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার উপর এক-একটি উড়ো-বমার হইতে এক-এক টন ওজনের ছ'টি করিয়া শেল-বোমা একসঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়—এই ছ'টি শেলের ফল ছ'-সাতশো কামানের গোলার মত।

—

সমর-ট্রেলার

এ যুদ্ধে ফৌজের যেমন প্রয়োজন, এঞ্জিনীয়ার এবং মিস্ত্রী-মজুরের প্রয়োজনও ঠিক তেমনি। যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় কোন্ বিমানপোতের কল বিগড়াইল, কোন্ বিমানপোত ভাঙ্গিল, কিম্বা কামান ও ট্যাঙ্কের কি বৈকল্য ঘটিল, তখনি মেরামত প্রয়োজন। অথচ রণক্ষেত্রে ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী-মজুর-এঞ্জিনীয়ারদের বহিয়া বেড়ানো সম্ভব নয়। আবার প্রয়োজন ঘটিলে মিস্ত্রী-মজুর-এঞ্জিনীয়ারও চাই! তাদের বহিবার জন্য অল্প-ব্যয়ে পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা এবং হালকা-ওজনের নূতন ট্রেলার-বাস তৈয়ারী হইয়াছে। এ বাসের সৃষ্টি করিয়াছে মার্কিন ফৌজ-বিভাগ। এ ট্রেলার-বাসে একশো একচল্লিশ জন লোককে অনায়াসে বহন করা চলে। হালকা বলিয়া এ বাস দ্রুত চলে। এ-বাসের কল্যাণে প্রয়োজনমাত্র রণস্থলে মিস্ত্রী-মজুরদের খুব সহজে এবং অল্পক্ষণে পৌছাইয়া দেওয়া চলিবে।
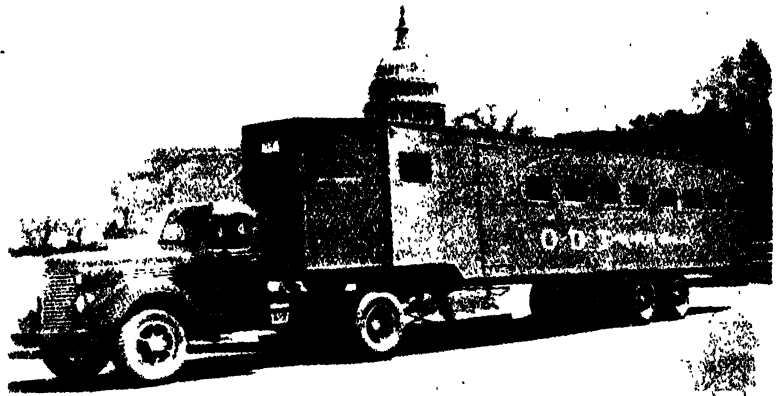
এ বাসে লোক ধরে ১৪১ জন

—

নিরাপদ মুখোশ

যুদ্ধের সময় মারণাস্ত্র-নির্মাণে বড় বিপদ! বড় বিষাক্ত উপাদান ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়; সে জন্য মানুষের নানা ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু

পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। নাকে-কাণে তুলা গুঁজিলেই এ ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকা যায় না। তাই বৈজ্ঞানিক

নাসা-বন্ধ

গ্যাস-মুখোশ

আগুনের হল্‌কানি চোখে লাগে না।

কৌশলে শিরস্ত্রাণ, গ্যাস্-মুখোশ, চোখের ঠুলি, নাসা-বন্ধ, রবারের দস্তানা এবং গ্রীবা-রক্ষকাদি তৈয়ারী হইয়াছে। গ্যাস-মুখোশ আঁটিলে ধাতুচূর্ণ বা বারুদ প্রভৃতির বিষাক্ত বাষ্পের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়; নাসা-রন্ধ্রে বালির অতি-সূক্ষ্ম চূর্ণাদি প্রবেশ করিয়া ফুশফুশ যন্ত্রে বৈকল্য ঘটাইতে পারে না; শিরস্ত্রাণে চোখ এবং ফুশফুশ যন্ত্র নিরাপদ থাকিবে; তার উপর আগুনের হল্‌কা লাগিয়া চোখের দৃষ্টি ব্যাহত হইবে না।

অতিকায় ফৌজ-প্লেন

আমেরিকার ফৌজ-বিভাগ সম্প্রতি এক অতিকায় বিমানপোত নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ বিমানপোতে শীতাতপরোধী যে-কামরা আছে, সে কামরায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সেনা অনায়াসে স্থান পায়—তাহাতে তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে না। এ পোতের শক্তি ৩৫ অশ্ব-শক্তির সমান। এ পোত নামাইতে দীর্ঘ প্রসারিত জায়গার যেমন প্রয়োজন নাই, তেমনি ইহার গতি দ্রুত এবং ইহাকে নিরাপদে ভূতলাবতীর্ণ করা যায়। এ পোতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতন্ত্র। একটা যদি নষ্ট হয় তো নিমেষে সেটি বদলানো চলে। ফৌজবাহী এত বড় বিমানপোত এই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছে।

এ-প্লেনে পঞ্চাশ-জন সশস্ত্র ফৌজ

বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দীর রক্তিম সূর্য্য
পশ্চিম দিক্‌ভালে অবসাদ-ক্লিষ্ট।
ভাবী-কাল হরষেতে বাজাইছে তূর্য্য,
যান্ত্রিক-সভ্যতা বিদলিত, পিষ্ট।

কে কারে রুখিবে বল, কার বেশী শক্তি?
মেঘে শত মেঘনাদ হানে মরণাস্ত্র।
সবাই মেতেছে রণে, কেবা শোনে যুক্তি।
দীন মোরা নাহি পাই অন্ন ও বস্ত্র।

যে পৃথিবী ছিল কাল আজ তার ধ্বংস।
পড়ে আছে চারিভিতে বিশীর্ণ কঙ্কাল।
লোপ পেল কত রাজা, মানবের বংশ।
তাথিয়া তাথিয়া নাচে তাণ্ডব, মহাকাল।

নাচো তুমি মহাকাল, নাচো মহা রঙ্গে,
বিংশ শতাব্দীর হয়ে যাক অবসান।
শত্রু ভুলুক দ্বেষ শত্রুর সঙ্গে,
উঠুক আকাশ জুড়ি সাম্যের মহাগান।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতে অর্থনৈতিক নিয়তি

যুদ্ধান্তে জাতীয় তথা আন্তর্জ্জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটিবে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মন তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বদেশেই যুদ্ধোত্তর-সংগঠন সংকল্পে মহোৎসাহে বিচার-বিতর্ক চলিতেছে! যুদ্ধের ধ্বংসলীলা-প্রসূত পরিস্থিতির ফলে পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধে, অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ও তদনুগামী পরিকল্পনার ঘাত-প্রতিঘাতে অর্থনীতির রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে, এবং তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহাই বিশেষ বিবেচ্য। সম্প্রতি লণ্ডন নগরে 'বৃটিশ এসোসিয়েসান কনফারেন্সে'র এক অধিবেশনে কমন্স মহাসভার গণনায়ক, ভারতের সুপরিচিত স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে আমরা অবশ্যই আমাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধ-যন্ত্রকে অর্থনৈতিক কল্যাণ-কলায় পরিবর্ত্তিত করিব। আমরা কিংবা অন্য কোন জাতি, অন্যের পরিশ্রমে এবং অপরের প্রচেষ্টায় নির্ভরশীল সুবিধাভোগী জনসঙ্ঘরূপে আপনাদিগকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিব না।

নীতি হিসাবে এই সঙ্কল্প অতি মনোরম, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ক্রিয়মাণ কার্য্যপ্রকরণ প্রয়োগ-ব্যাপারে ইহার গতি, প্রকৃতি ও পরিণতি কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি-সম্ভূত আটলানটিক সনন্দের (Atlantic Charter) জটিলতা ও উপলক্ষণের বিষয় সর্ব্ব-প্রথমে স্বতঃই মনে উদিত হয়। যুক্তরাজ্যের ভাগ্যের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, এবং অধুনা যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির উপর সুদৃঢ়রূপে নির্ভরশীল। যুদ্ধান্তে অত্যাবশ্যক কাঁচা মালের উৎপাদন ও বণ্টনের আন্তর্জ্জাতিক বিধিনির্দ্ধারণই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কি ভাবে এই বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ঐকমত্যের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধপরিচালনার সৌকর্য্যার্থ সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মধ্যে কাঁচা মালের ব্যবহার এবং পরিণত দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থাৎ পাকা মালের নিয়োগ-নিয়োজন সম্পর্কে যেরূপ প্রগাঢ় সহযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। যুদ্ধকালে সর্ব্বজনকাম্য সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ, স্বাধীনতা সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে একাভিমুখী ও একাভিসন্ধী হইয়া যেরূপ উপাদান উপকরণের উৎপাদন ও প্রয়োগ-নিয়োগ সম্ভব, শান্তিসমাগমে স্ব স্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংরক্ষণে সেরূপ একনিষ্ঠ একতা সম্ভব কি না, তাহার সাক্ষ্য অতীত ইতিহাসে মিলিতে পারে।

যাহা হউক, এখন আমাদিগকে বুঝান হইতেছে যে, আটলানটিক সনন্দের মূলে এই দৃঢ়বিশ্বাস নিহিত আছে যে, যদি বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে জগতের বর্ত্তমান সম্পদ্-সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বজাতির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ সুপ্রচুর, এবং সকলেই তাহাদের উপযুক্ত স্ব স্ব অংশ পাইবার অধিকারী। কেহ কেহ ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, অতীতে আমরা আমাদের অতুল সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই হেতু আটলানটিক সনন্দের মূলনীতির ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ-কল্পে নূতন উপায় এবং নূতন সংগঠনের প্রয়োজন হইবে। উত্তম উদ্দেশ্য; কিন্তু ইতিমধ্যেই সার্ব্বজনীনতার উন্নত বেদীর পাদমূলে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবসা-চুক্তির (Anglo American Trade Agreement) নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহা এখনও জনসাধারণ-সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মাদ্রাজের কোন সংবাদপত্রে এই গূঢ় চুক্তির যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্য শুল্কঘটিত অন্তরায় লঘু করিতে (Reducing tariff barriers), বিভিন্ন দেশের মধ্যে পক্ষপাতসূচক শুল্কপ্রশমন-সুযোগ-সুবিধা তিরোহিত করিতে (Abolishing preferential treatment between one country and another), এবং অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করিতে (Ensuring free international trade) সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিবেন। এই চুক্তি অবশ্য যুদ্ধান্তে ইজারা ও ঋণ সাহায্য (Lease and Lend aid) পরিশোধ-পরিকল্পে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

"অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য"—ইহা শুনিতে, এবং চিন্তা করিতেও অতি মনোরম। অবাধ-বাণিজ্য নীতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর হইয়াছিল, গত চৈত্র-সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী'তে "শিল্প ও শুল্ক" প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে। অবাধ-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ভারতের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নহে; সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান শিল্প-পরিস্থিতিতে অবাধ-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রবর্ত্তন-সম্ভাবনা ভারতীয় শিল্পনিষ্ঠ ও শিল্পাশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞ-দূত-সঙ্ঘের নায়ক ডা: গ্রাডী অবশ্য ইহার একটি ভাষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, মার্কিণের মুখ্য উদ্দেশ্য বাণিজ্যের বদান্যতামূলক প্রসারণ, (Liberalised trade) এবং শুল্কের পরিমাণ হ্রাস,—বহিষ্কার নহে (Lowering down of tariffs, not their elimination) ।—এই ভাষ্য ভীতিপ্রদ নহে সত্য; বরং ভারতের পরাধীন অবস্থা বিবেচনায় আশাপ্রদ বলাও চলে। কিন্তু আটলাণ্টিক সনন্দের—সর্ব্বরাষ্ট্রের সমান ভাবে জগতের সমস্ত কাঁচা মাল প্রাপ্তি ও অধিকারের ব্যবস্থা-বিধান (the right to enjoyment by all States of access, on equal terms to the raw materials of the world) এবং মার্কিণের রাষ্ট্রসচিব মি: কর্ডেল হালের "পারস্পরিক কল্যাণার্থ ন্যায্য ব্যবহারের" উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধে নূতন ও উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের উক্তি,—আশঙ্কাবর্জ্জিত নহে। ইহার অর্থ এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দৃষ্টি কোন "ঔপনিবেশিক রীতির" (Colonial system) বহির্ভূত নহে। এই রীতির ব্যবস্থা এই যে, কাঁচা মাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী দেশগুলির নিকট

হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই সেই দেশের বাজারে বিক্রয়,—অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে, শিল্পে সমৃদ্ধ কয়েকটি মাত্র দেশে শিল্পের একাধিপত্য। এই নিমিত্তই লর্ড সেম্পিল্ সে দিন বিলাতের লর্ডসভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রাথমিক উৎপাদক দেশসমূহে, বিশেষতঃ, স্বায়ত্ত-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে এবং ভারতবর্ষে, শিল্প-প্রসারণের ফলে পূর্ব্বের ন্যায় উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ আমদানীর অনিচ্ছাই যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান ও প্রবলতম প্রশ্ন হইবে।

সম্প্রতি বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন, কমন্স সভার গণনায়ক সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্, যুদ্ধোত্তর-পুনর্গঠন মন্ত্রী সার উইলিয়াম জোইট, এবং মার্কিণের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল্ এই বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক গণনায়ক ক্রিপসের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। পররাষ্ট্র-সচিব ইডেনকে পরিত্যাগ করিয়া, আমরা সার উইলিয়াম জোইটের পদমর্য্যাদাসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিমতের অনুসরণ ও আলোচনা করিব। সার উইলিয়াম যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যের তিনটি গুরুতর কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম—বাণিজ্য-জমা-খরচে সামঞ্জস্যের পুনরুদ্ধার, (Restoration of Trade balance), দ্বিতীয়—অর্থ ও মূল্য-স্ফীতি নিবারণ (Prevention of inflation) এবং তৃতীয়—জাতির অর্থ-সামর্থ্য ও সঙ্গতি-সম্পদের যুদ্ধ প্রয়োজন হইতে শান্তিকালীন ব্যবহারে নিয়োগ-নিয়োজন (Transfer of British resources from the service of war to the service of peace)। সার উইলিয়াম বলিয়াছেন,—"যদি আমরা রপ্তানী বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা বাণিজ্য-জমা-খরচের সমতা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অপরিহার্য্য আবশ্যকের অধিক আমদানী বন্ধ করিতে হইবে।"

ইহা অবশ্যই সত্য যে, যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্য যদি রপ্তানী ব্যবসায়ে যুদ্ধ-পূর্ব্ব প্রসার ও প্রতিপত্তি পুনরধিকার করিতে না পারে, তাহা হইলে বাণিজ্য-জমা-খরচে সমতা রক্ষা-হেতু আমদানী ন্যূন করিতে হইবে। তাহাতে যে কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যের ক্ষতি হইবে, তাহাই নহে; সমুদ্রপারবর্ত্তী যে সকল উৎপাদক বৃটিশ-বাজারের উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরও অসুবিধা ঘটিবে। অধিকন্তু, পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর (বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা) অস্থির, অথবা অনিশ্চিত মূল্যমান অবাধ নিখিল জগৎ-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পথে বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। অর্থনৈতিক জগতে পূর্ব্বাধিকার পুনঃ-প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গ্রেট বৃটেনকে যে রপ্তানী ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, তাহাই নহে; সমুদ্র পার হইতে লব্ধ যুদ্ধোপকরণের মূল্য দিবার নিমিত্ত, সমুদ্র-পারে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিবদ্ধ মূলধনোৎপন্ন আয়ের ক্ষতিও পূরণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক শাসন-বাক্যের বিভ্রম-বিমুক্ত সাধারণ বুদ্ধির নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধকালে বহু দ্রব্য হইতে বঞ্চিত দেশের পক্ষে 'যুদ্ধান্তে বহু দ্রব্যের বহুল পরিমাণে আমদানী প্রয়োজন। সুতরাং যুদ্ধান্তে আমদানীর মূল্য প্রদানের নিমিত্ত বহুল পরিমাণে রপ্তানীর উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহাতে যুদ্ধ-প্রত্যাগত এবং যুদ্ধশিল্প-বিমুক্ত বহু নরনারীর কর্ম্ম ও অন্নসংস্থান হইবে। যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যের এই পরিস্থিতির যথাযোগ্য ব্যবস্থার চিন্তা এখন হইতেই চলিতেছে, এবং সেই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত যে সকল বিধি-বিধানের আশ্রয় লওয়া হইবে, তাহাদের প্রকোপ ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের উপর কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিবে, তাহাই আমাদের আশু বিবেচ্য বিষয়।

যুক্তরাজ্য শিল্পপ্রধান দেশ। শিল্পই তথাকার লোকের প্রধান উপজীব্য। এই শিল্পের পোষণোপযোগী কাঁচা মাল আসে সমুদ্র-পারবর্ত্তী দেশ হইতে, এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে। ভারত শিল্পে যতই অগ্রবর্ত্তী হইবে, ভারত হইতে কাঁচা মালের প্রাপ্তি ততই কমিয়া যাইবে। এইখানেই বিলাতের সহিত ভারতবর্ষের স্বার্থের সংঘর্ষ। এই স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলে প্রাচীন ভারতের বহু বিশিষ্ট শিল্পই লোপ পাইয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই সংঘর্ষ প্রবলাকার ধারণ করিবে। এই নিমিত্তই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই নিখিল জগতের কাঁচা মালের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ধূয়া তুলিয়াছেন। এই নিমিত্তই যুদ্ধান্তে অবাধ-বাণিজ্যের জয়ধ্বনি। এই নিমিত্তই আটলাণ্টিক সনন্দের এবং বিশেষতঃ ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবসা-চুক্তির উৎপত্তি ও অবাধ-বাণিজ্যের অন্তরায়স্বরূপ রক্ষণ-শুল্কের প্রশমন, এবং কাঁচা মাল বণ্টন ও পাকা মাল, অর্থাৎ পরিণত দ্রব্য উৎপাদনের আন্তর্জ্জাতিক বিধি-বিধানের প্রবল প্রচেষ্টা। এই নিমিত্তই—আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় প্রত্যেক প্রকার প্রভেদ পার্থক্যমূলক ব্যবহার এড়াইবার, এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত দেশসমূহের সাহচর্য্যে জগতে সাধারণ ভাবে অধিকতর অবাধ-বাণিজ্যের সুযোগ ও সুবিধা-সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন। এই ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তির ফলে নিখিল জগতে কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত আমরা মিঃ কর্ডেল হাল-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে পাইয়াছি।

যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অধিকতর অবাধ-বাণিজ্যের প্রয়োজন; সুতরাং অন্যান্য সমধর্ম্মী ও সম-অবস্থাপন্ন দেশগুলিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ভেদমূলক শুল্কের নিরাকরণ ও বর্ত্তমান শুল্ক-হারের হ্রাস, এই চুক্তির অন্যতম সর্ত্ত। পক্ষপাতমূলক প্রশ্রয় প্রশমন এবং একাধিপত্য (Preference and monopoly) বিদূরিত করিবার এবং অনুন্নত জাতির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উন্নত বিধি-ব্যবস্থা (Higher standard of living) উল্লেখও এই চুক্তিতে আছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক জগতের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার মদির-স্বপ্নে এই চুক্তি আটলাণ্টিক সনন্দের আবছায়া হইতে অধিকতর স্বচ্ছ। কিন্তু এই ইঙ্গ-মার্কিণ সন্ধি-সংযোগ দুর্ভাগ্য ভারতের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিবে, এবং তাহার পরিণাম-পরিণতিই বা কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইলেও সহজেই অনুমেয়।

যদিও কংগ্রেসের (মার্কিণ) নিকট তাঁহার পঞ্চম বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন—No financial reckoning will take place at the end of the war অর্থাৎ যুদ্ধান্তে আর্থিক পীড়ন ঘটিবে না; তথাপি, ইহা ন্যায়সঙ্গত যে, মার্কিণ তাহার অমিত ইজারা ঋণ সাহায্যের প্রতিদানে কিছু ফিরিয়া পাইতে চাহে। যুদ্ধান্তে সন্ধি-সর্ত্তে ক্ষতিপূরণের দাবী ও

ব্যবস্থা কিরূপ অনিষ্টকর, তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা সমগ্র জগৎ এবং বিশেষতঃ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র তীব্র ভাবে অর্জ্জন করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি, যে সকল বিধি-বিধানের পীড়নে এই ভীষণ যুদ্ধ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিতে সমুৎসুক। ভারতের পক্ষে এই প্রতিবিধানের ফল কি, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখন এই ইজারা-ঋণ বিধানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সম্পর্কের একটু আলোচনা করিব। এই ব্যবস্থার ফলে, ভারত বর্ত্তমান বর্ষে, ৪৫ কোটি টাকার দ্রব্যাদি মার্কিণ হইতে পাইবে। যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মঞ্জুরী-কৃত ইজারা-ঋণের নিমিত্ত ১২০০০ মিলিয়ন ডলার—স্বতন্ত্র-নিয়োগ-সমষ্টির তুলনায় যৎসামান্য; তথাপি ইহার পরিশোধ-ব্যবস্থা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত মার্কিণের সহিত ভারতের পৃথক্ হিসাব আছে কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। দেশরক্ষা ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ ভারত মার্কিণ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাইতে যেমন উৎসুক, ঋণ-পরিশোধ করিবার নিমিত্তও তদ্রূপ আগ্রহবান্। এইটুকু মাত্র দ্রষ্টব্য যে, এই ঋণ-পরিশোধের প্রকরণ ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর না হয়। শেষ হিসাব-নিকাশের সময় সমবেত মিত্রশক্তির সাধারণ সংরক্ষণ-হেতু ভারত কর্ত্তৃক বিনিময়ে প্রদত্ত প্রতিদান-মূলক সেবা ও সাহায্যের, এবং সুযোগ ও সুবিধার বিষয়ও বিবেচ্য। বিলাতে ও ভারতে মার্কিণ সৈন্য-সমাবেশের পর ইজারা-ঋণ এক-তরফা ব্যাপার নহে,—উভয় পক্ষই আদান-প্রদানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কংগ্রেসের নিকট তাঁহার পঞ্চম বিবৃতিতেও রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, ইজারা-ঋণ আর "one way traffic" (একমুখী চালান) নহে।

যাহা হউক, এই ইজারা-ঋণ পরিশোধ-প্রতিকল্পে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবসা-চুক্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা এবং অন্যান্য সহানুভূতিসম্পন্ন দেশসমূহের সাহচর্য্যে, যুদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রভেদ পার্থক্যমূলক নীতির উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক অধিকতর অবাধ বাণিজ্যের পথ মুক্ত করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি-পরিচালক মিঃ কর্ডেল হাল্‌ও নববিধানের (**New and better system of economic relationship established on a basis of fair treatment for mutual benefit**) একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই সকলের মূলে রহিয়াছে,—সেই চিরন্তন কাঁচা মাল সংগ্রহ ও সংস্থান-নীতি,—"**The right to enjoyment by all States of access on equal terms to the raw materials of the world.**" পার্থক্যের মধ্যে এই যে, পূর্ব্বে যাহা সার্ব্বভৌম-শক্তির একচেটিয়া ছিল, এখন তাহা "**All States**"-এর মধ্যে বিতরিত হইবে! কিন্তু এই কাঁচা মাল যোগাইবে কে? ভারতের ন্যায় জগতের মধ্যে আর কোন্ দেশ কাঁচা মালে এত সমৃদ্ধ, এবং কাহার স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু? কাঁচা মালের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের অছিলায় সেই সুপ্রাচীন যুদ্ধ-পূর্ব্বে প্রচলিত **Coloneal system**-এর নবরূপ ও নবসংস্করণ! এই নীতি, অথবা দুর্নীতির বলে, অত্যুন্নত শিল্প-প্রধান দেশ-সমূহ শিল্পে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশসমূহ হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া পরিণত-দ্রব্যে একাধিপত্য উপভোগ করেন। যে হতভাগ্য দেশ-সমূহ স্বল্পমূল্যে কাঁচা মাল যোগান দেয়, তাহারাই হয়—অতি উচ্চ মূল্যে তদুৎপন্ন পরিণত-পণ্যের শক্তি-সামর্থ্যহীন ক্রেতা! এই ব্যবস্থার ফলে শিল্পে অনুন্নত, অথচ কাঁচা মালে প্রভূত সম্পন্ন দেশ শিল্পোন্নতি ও শিল্প-সম্প্রসারণ দ্বারা তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিস্তারের উপর যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই যুদ্ধোত্তর-উন্নতি নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-প্রসার দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্র তাহার ইজারা-ঋণের কিয়দংশ পুনঃপ্রাপ্তির আশা করিতে পারে বটে, কিন্তু অধিকতর অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য এবং উৎপাদন ও বণ্টনের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম-নির্দ্ধারণ, শিল্পে অনুন্নত ভারতের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে ভারত কৃষি-প্রধান সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে ভারত কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান নহে, শিল্পপ্রধানও ছিল। ভারতের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার অর্থগৃধ্নু শ্যেনদৃষ্টি বিদেশী বণিক্‌কে ভারতে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিরূপে ভারতের এই উভয়মুখী সমৃদ্ধি একাভিমুখী হইয়াছিল, তাহার কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসী-মলিন করিয়া রাখিয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ ও পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই কৃষিজ, বনজ, ও খনিজ কাঁচা মালে সুপ্রচুর সমৃদ্ধি, এবং শিল্পে, বিশেষতঃ গুরু শিল্পে অসামর্থ্য—ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির প্রধানতম দুর্ব্বলতা। ভারত এই দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের পরিপন্থী কোন ব্যবস্থাই ভারতের স্পৃহনীয় নহে। যুদ্ধোত্তর-সংগঠনে—কাঁচা মালের ন্যায়-সঙ্গত বণ্টন, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভারতের সহানুভূতি ও সহযোগিতা সুলভ হইবে,—যদি এই নীতিকে কার্য্যকরী করিবার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ ভারতের অর্থ নৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর হইতে প্রাচ্যগুচ্ছ বৈঠক এবং বৃটিশ যোগান-মন্ত্রিত্ব কর্ত্তৃক প্রেরিত রোজার দূত-সঙ্ঘের আলোচনা ও অনুসন্ধানের এবং প্রাচ্যগুচ্ছ সমিতির কার্য্যপ্রকরণের ফলে ভারতে গুরু ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্তরায় ঘটিয়াছে; কারণ, দ্রুত যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতার্থ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশের মধ্যে যেখানে যে-গুরু ও বৃহৎ শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত, অন্যান্য স্থান হইতে সেই সেই শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল সেইখানে সরবরাহ করা হইতেছে। ফলে, কাঁচামাল-উৎপাদক-দেশে প্রচুর সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং ভারত নূতন নূতন অত্যাবশ্যকীয় গুরু ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ হারাইতেছে। অধুনা আটলাণ্টিক সনন্দ এবং তাহার লেজুড় ইঙ্গ-মার্কিণ বাণিজ্য-চুক্তি কাঁচা মালের তথাকথিত ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, এবং অধিকতর অবাধ-বাণিজ্যের ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবারই উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পীড়নে, বহু প্রচেষ্টার ফলে, ভারত যে যৎকিঞ্চিৎ শুল্কনির্দ্ধারণ-স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল এবং যাহা এখন নামে-মাত্রে পর্য্যবসিত, তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে! রক্ষণশুল্ক ব্যতীত ভারতের ন্যায় গুরু ও বৃহৎ শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতনের সংরক্ষণ-সম্ভাবনা বিরল।

ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন সাধনার্থ ভারতে উৎপন্ন সুপ্রচুর কাঁচা

মালকে ভারতে অতি সুলভ অগণ্য শ্রমিকের আনুকূল্যে যন্ত্রের সাহায্যে নব-নব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকা মালে পরিণত করাই ভারতের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির একমাত্র উপায়। এই উপায় দেশরক্ষা ও জীবন-রক্ষা উভয় উদ্দেশ্যেই একান্ত প্রয়োজনীয়—অপরিহার্য্য। কৃষিপ্রাধান্যের সহিত শিল্পে প্রাধান্য-অর্জ্জন ও সংরক্ষণ ব্যতীত ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি নাই। উভয় পদে সগৌরবে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে জীবনযুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কূপমণ্ডূকত্ব যেমন অনিষ্টকর, বদান্য আন্তর্জ্জাতিকতার মরীচিকার মরু-বিভ্রমও তেমনি অহিতকর। ভারতের ভাবী অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম-পরিণতি যে বন্ধুর পথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা আদৌ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা সুদুর্লভ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুন্তীর খেদ

হায় রাজা দুর্য্যোধন, ঘটালে কি অঘটন
ন্যায়-ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি !
রাজ্যলোভে হয়ে অন্ধ বাধাইলে গৃহদ্বন্দ্ব,
সত্যনিষ্ঠা-পুণ্য দিলে বলি।

সত্যব্রত যুধিষ্ঠির ফাল্গুনি ও ভীমবীর
তব ছলে হ'লো দেশান্তরী ;
পুত্র-পুত্রবধূ তরে চক্ষে মোর অশ্রু ঝরে,
কেমনে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরি ?

শকুনি তোমার কাল, ফেলিল বিপদ্‌জাল
কৌরবের ধর্ম্মরাজ্যময় ;
ভাবিয়াছ—পশুবলে নাশিয়া পাণ্ডবদলে
অধর্ম্মের ঘোষিবে বিজয় !

সূচ্যগ্র-সমান ভূমি বিনাযুদ্ধে কভু তুমি
ভ্রাতৃগণে করিলে না দান ;
গদাধর-পদাঘাতে রাজ্য যাবে অধঃপাতে,
তুমিও পাবে না পরিত্রাণ।

অবিচারে অত্যাচারে রাজ্য যায় ছারেখারে,—
চিরদিন দেখেছে সবাই ;
যেথা নির্য্যাতিতা নারী নিত্য ফেলে অশ্রুবারি,
ধ্বংসের বিলম্ব সেথা নাই।

যে রাজত্বে দুঃশাসন প্রজা করে উৎপীড়ন,
রাজনীতি লাঞ্ছিত সেথায় ;
অক্ষৌহিণী সেনাদল, অগণিত অস্ত্রবল
পতন রোধিতে নারে হায় !

তোমার সমাধিক্ষেত্র রচিতেছে কুরুক্ষেত্র,
পাঞ্চজন্য সঘনে ফুকারে ;
কপিধ্বজে নারায়ণ করিছেন আরোহণ—
দিব্যচক্ষে পাই দেখিবারে।

দাম্ভিক দর্পীর গর্ব্ব যুগে যুগে করে খর্ব্ব
দর্পহারী শ্রীমধুসূদন ;
পার্থ-সারথির বেশ ধরেছেন হৃষীকেশ,
সাবধান হও দুর্য্যোধন !

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।
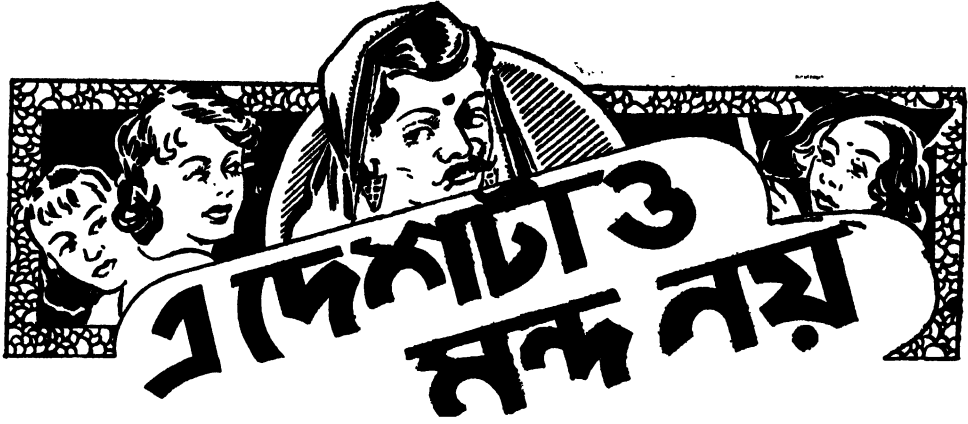
(নক্সা)

একদা গোবিন্দদাস যে কারণে গৃহত্যাগের পর শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়াবলম্বনে অবশিষ্ট জীবন কঠোর সন্ন্যাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমিও সেই কারণেই গৃহত্যাগ করিলাম। এ রকম কারণ প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিতে দেখা যায়—অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য; কিন্তু মনে কঠোর আঘাত পাইয়াই গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু যুবক, সুতরাং মাসিক ষাট্ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি অতিকষ্টে জুটিলেও—দুর্ভাগ্যক্রমে উচ্চ-শিক্ষিতা অর্থাৎ বি-এ পাশ এক ধনী-কন্যাকে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বিবাহ করিয়াছিলাম। সুতরাং কোনরূপে 'দিনগত পাপক্ষয়' করিতে করিতে এক দিন গৃহিণীর ঝোঁক হইল—তিনি সিনেমায় যাইবেনই; তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, এখন মাসের শেষ কি না—পরের মাসে দেখো।

গৃহিণী কুলাপানা-চক্রের মত মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন,—তোমার গলায় মালা দিয়ে সব সুখ-শান্তি ত বিসর্জ্জন দিয়েছিই—কিন্তু ন'আনার পয়সাও যদি দেওয়ার শক্তি না থাকে, তবে আমাদের মত মেয়ে বিয়ে ক'রেছ কেন? একটা পাড়াগেঁয়ে 'বর্ব্বর' মেয়ে বিয়ে ক'রলেই পারতে—যাদের স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই।

—ওই স্বাধীন সত্তাটা ত্যাগ ক'রলেই ত সব গোলমাল চুকে যায়।—আমার এই সজ্ক্ষিপ্ত মন্তব্যে গৃহিণী 'তেলে-বেগুনে' জলিয়া-উঠিয়া যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন; আমার দৈন্য, অক্ষমতা, হীন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বহু কটূক্তি করিয়া, আমাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুশোচনা করিলেন, এবং তাঁহার বিবেচনার ত্রুটি না হইলে এক জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনায়াসেই বিবাহ করিয়া কৃতার্থ করিতে পারিতেন, তাহাও জানাইতে কসুর করিলেন না।

আমি ক্রোধে ক্ষোভে অনাহারেই শয্যা গ্রহণ করিলাম, এবং সঙ্কল্প করিলাম, রাত্রিশেষে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একখানা পত্র লিখিয়া-রাখিয়া গৃহত্যাগ করিব; আর এই অসার সংসারে ফিরিব না। এত লাঞ্ছনা, অপমান—বিশেষতঃ নিজের পত্নীর নিকট—সহ্য করা যায় না!

বান্ধবীসহ গৃহিণীর সিনেমা-দর্শন বন্ধ রহিল না—ইহা বলাই বাহুল্য। ঘরের ভিতর একাকী বসিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম,—হায়, কেন পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম? এইরূপ বাক্যযন্ত্রণা অপেক্ষা গর্ভযন্ত্রণাও ত অনেক ভাল—যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিতাম, তবে এমনি মুখ নাড়িয়া দরিদ্র স্বামীকে দশ কথা শুনাইয়া সিনেমায় চলিয়া যাইতে পারিতাম।—কত পরিশ্রমে কেমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা ভাবিতে হইত না। ঘরে চাউল না থাকিলেও স্নো-পাউডার কিনিয়া মুখে মাখিতাম—কথায় কথায় মুখ নাড়িয়া, কর্কশ বাক্যে স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতাম। পদতলে পড়িয়া শরাহত শোণিতাপ্লুত ক্লান্ত পাখীর মত পুরুষগুলা ডানা ঝাপ্টাইয়া করুণা ভিক্ষা করিত।

গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়াছি—ক্রমাগত চলিয়াছি। কত দুস্তর মরুকান্তার পার হইয়া কত যুগ-যুগান্ত কাল চলিয়াছি, জানি না। কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষের বাসভূমি পার হইয়া বায়ুভরে বায়ুভুকের মত চলিয়াছি। শ্বেত, পীত, লোহিত, ঘোর কৃষ্ণ, বাদামী কত রংএর কত বিচিত্র বেশের মানুষের সঙ্গে মিশিলাম! অবশেষে এক রাজ্যের এক পাশপোর্ট-আফিসের ভাঙ্গা গরাদ দিয়া মাথা-গলাইয়া ঢুকিয়া পড়িলাম—সংগোপনে সিঁদেল চোরের মত।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, একটু আগাইতেই পুলিশে ধরিয়া হাজতে রাখিয়া দিল।—নানা কথা বুঝাইতে

চাহিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না। ভাবিলাম, হাজতে যখন রাখিবেই, তখন ফল যাহাই হউক একটা আশ্রয়ে অন্ততঃ রাতটা কাটিবে।

এ দেশের পুলিশের বেশ একটু অন্য রকমের। কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা পায়জামা, উপরে সাদা হাফসার্ট, সকলেই গোঁফদাড়ি-হীন, এবং 'বব' করিয়া চুলকাটা। মাজার নীচে মাংসবহুল স্থানটা ঈষৎ উদার, এবং সম্পূর্ণ বিশালত্ব-বর্জ্জিত নয়, মধ্য ক্ষীণ এবং বক্ষ অস্বাভাবিক উন্নত, সম্ভবতঃ বিপুল মাংসপেশী-সমাচ্ছন্ন। বেল্টের সঙ্গে এক দিকে বেটন, অন্য দিকে রিভলভার ঝুলিতেছে।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, একটু আগাইতেই পুলিশে ধরিল

থানা নানা কর্ম্মকোলাহলে মুখরিত; কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দারোগা বাবু নানারূপ প্রশ্ন করিলেন,—আমি কেবলমাত্র জবাব দিলাম, যাহা বলিতে হয় কোর্টেই বলিব। সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল—কেন বুঝিলাম না!

বেলা ১০টায় আমার সন্ন্যাস-কৃশ দেহের উপরে একটা চাদর জড়াইয়া, যথাসাধ্য আব্রু রক্ষা করিয়া কোর্টে হাজির হইলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করিলেন,—কোন্ দেশ থেকে এসেছ?

প্রশ্ন ইংরেজিতে, ইংরেজিতেই জবাব দিলাম,—কোন্ দেশ তা ব'লবো না, তবে এ দেশে বসবাস ক'রতে দিলে ক'রতে পারি। আর যদি হুজুরের হুকুম হয়, তবে আমাকে নির্ব্বাসিত করুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কন্‌টেমপট্ অফ কোর্ট!—কিন্তু তিনি হুজুর না হুজুরাণী?

আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম,—সকলেই অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে! পাশে একটি পুলিশ-প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল; সে কহিল,—আপনি ত শিক্ষিত? নয় কি?

ম্যাজিষ্ট্রেটা বলিলেন,—বোধ হয় জানো না, এ দেশে পুরুষমানুষকে অন্তঃপুরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না,—সাধারণতঃই তারা মূর্খ, যদিও সরকার লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। যা হোক্, তোমার শিক্ষা দেখে আমি খুশী হ'য়েছি; কিন্তু তুমি অনাবৃত বক্ষ, মুখ ও আ-হাঁটু কাপড় পরে ৫ আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু ব'লবার আছে?

—আজ্ঞে হুজুরাণী, কিছুই ব'লবার নেই; তবে আমি কোন নিয়মই জানি না, এতে যদি দণ্ড হ্রাস হয়। বিদেশাগত আমি—পূর্ব্বে বুঝিনি যে পুলিশ, উকিল প্রভৃতি সবই স্ত্রীলোক! আমাকে উপযুক্ত বস্ত্র ও বৃত্তি দিলে আমি এই সুন্দর দেশে বসবাস ক'রতে পারি। যেখানে ছিলাম, সে-দেশে কেবল পুরুষলোকেই এই সমস্ত কাজ ক'রে থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেটা হাসিয়া-উঠিয়া বলিলেন,—পুরুষমানুষে এ সব পারে? হাসির কথা! যাক্, গল্প শুনতে চাই নে। সরকারী পুরুষ-অতিথিশালায় থাক্‌তে পারো, এবং যথা-সম্ভব কাপড়-জামা পাবে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে বিয়ে না ক'রলে এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে। এ দেশে পুরুষমানুষ কম, তাই এই আইন।

—হুজুরাণী, আমাকে কে বিয়ে ক'রবে?

—ক'রবে, তোমার মত শিক্ষিত পুরুষ এ দেশে বিরল। সরকারের খরচায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। আচ্ছা, জমাদারনি, এই আসামীকে তফাৎ করো।

মেয়ে-দারোগা আমাকে সরকারী অতিথিশালায় লইয়া গেল। উপযুক্ত কাপড়-জামা আসিল—ব্লাউজ, শায়া, শাড়ী, খুরওয়ালা জুতা, ইয়ারিং, চুড়ি, নীবিবন্ধ প্রভৃতি। মেয়ে-দারোগা একটু ঢোক-গিলিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কহিল,—ওগুলো সরকারের দেওয়া,—আর যদি কিছু মনে না করেন, তবে এগুলো উপহার দিতে চাই।

—কি আছে?

—সামান্ত উপহার।

—দিয়ে যান।

নারী-দারোগা প্রস্থান করিলে বাক্সটা খুলিয়া দেখিলাম,—তাহাতে ক্ষুর, কাঁচি, পাউডার, এসেন্স, স্নো, পোমেড প্রভৃতি নানা প্রসাধন-সামগ্রী।

৫ আইনে পড়িতে হইবে, এবং কিছু দিনের সন্ন্যাসে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকাইতেছিল; অতএব তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাইয়া, স্নো প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিয়া গোঁফটাকে কায়দা করিয়া ছাটিয়া লইলাম; এবং মনের আনন্দে ব্লাউজ প্রভৃতি পরিয়া উল্লাসিত হইয়া বার বার আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিলাম। 'গার্ল' আসিয়া পরদিন দৈনিক কাগজ দিয়া গেল;—বুঝিলাম, আমার বিবাহের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত

উল্লাসিত হইয়া বার বার আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিলাম

হইয়াছে। গোঁফে তা দিতে দিতে কাগজ পড়িয়া ভাবিলাম—এইবার মুখ-নাড়া দিয়া সিনেমায় যাইবার অপমানের সুদে-আসলে ওয়াশীল করিব;—সেই কুশাসিত রাজ্যে পারি নাই, কিন্তু এই মহিলারাজ্যে আমি সম্মানিত বন্দী; জানি না, কে বলিবে—'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!'

এই রাজ্যের ইতিহাস ক্রমে অবগত হইলাম।

আদিম যুগে এখানে পুরুষমানুষগুলি সর্ব্বপ্রকার কাজ-কর্ম্ম করিত এবং স্ত্রীলোকগুলিকে গৃহে আটক রাখিয়া অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করিত। তাহারও অনের পরে রাশিয়া নামক প্রাগৈতিহাসিক রাজ্যে একটা গৃহবিবাদের ফলে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়,—সেই সভ্যতার প্রথম আলোকে—সেই সময় হইতেই বর্ত্তমান সভ্যতার সৃষ্টি।

তার পরে বহু বাক্‌বিতণ্ডা অন্তর্বিপ্লবের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষের একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে হীনবল পুরুষকে পরাজিত করিয়া বিশ্ব-সরকার (Government of the World Fedaration) স্ত্রীগণের দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে সুশাসিত করিতে থাকে। পুরুষের বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি প্রভৃতি কম থাকায় তাহারা গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ত্তমানে বিনা বেতনে সরকার হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে—ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়িয়া খুশী হইলাম—বুঝিলাম, নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনগুলি চলিয়া যাইবে।

পরদিন সকালে আমার পাণিপ্রার্থিনী কয়েক জন রাজ-কর্ম্মচারী উপস্থিত হইল। আমি একে একে তাহা-দিগকে দেখা করিতে আদেশ করিলাম। প্রথম ব্যক্তি আসিল,—এক স্কুলমাষ্টার(ণী)। মৌলিক ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বসিতে বলিলাম,—বসুন। কি করেন?

—আজ্ঞে, মাষ্টারী করি, বেতন দেড়শ' টাকা। সরকারের চাকুরী।

মাথার কাপড় টানিয়া গোঁফে তা দিয়া কহিলাম,—মাত্র দেড়শ'! আমি শিক্ষিত পুরুষ; আমার একটু নাচ-গানও জানা আছে, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য মোটর রাখা দরকার। আপনি আমার খরচ চালাতে পারবেন কি?

স্কুল-মাষ্টারণী স্মার্ট-কলারের সার্টটার বুকের বোতামটা সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবেই খুলিয়া আসিয়াছিল, সেটা আঁটিতে আঁটিতে বলিল,—দেখুন, কেবল টাকাতেই কি সুখ? সত্যিকার শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করলেই পুরুষ সুখী হয়। অর্থ না থাকলেও উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত আমরা উচ্চ মন ও প্রকৃত নারীত্বের গর্ব্ব ক'রতে পারি।

—আমি শিক্ষিত পুরুষ, উদার নারীকে আমি চাইনি; আমি চেয়েছি মোটর, বাড়ী, ফোন, সিনেমা এই সব।—আপনার নাম?

ব্যথিত চিত্তে মাষ্টারণী কহিল,—আমার নাম, ফেলি মুন্সী।

ওঃ, আচ্ছা আসুন।

দ্বিতীয় যিনি আসিলেন, তিনি পুলিস-কর্ম্মচারিণী নাম, বেলি ব্রেনগান।—বসিতে বলিয়া মুখের দিকে চাহিলাম, কালকার সেই দারোগা-বিবি! বলিলাম,

—আপনার উপহারের জন্যে ধন্যবাদ। আজ তবুও একটু পরিষ্কার হওয়া গেছে।

মিস্ ব্রেনগান সম্ভবতঃ একটু আশান্বিত হইয়া কহিল, —আপনার মত শিক্ষিত সুন্দর পুরুষের সঙ্গে আলাপ থাকাও গৌরবের বিষয়। আমার সামান্য উপহার গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ ক'রেছেন।

সে জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু দেখুন, আপনার সামান্য মাইনে, তাতে নির্ভর ক'রে আমাকে বিবাহ ক'রলে আপনার সংসার কেমন ক'রে চ'লবে? আলাপ থাকা, একটু ফ্লার্ট করা, আর বিয়ে করা ত এক কথা নয়।

দারোগা-বিবি মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করিয়া কহিল —তবুও—

আপনাদের চাকুরীটা একটু চাষাড়ে-রকমের; তাতে দিবারাত্রি তস্করণী, ডাকাতিনী—এই সব নিয়েই কারবার, কাজেই মনটা একটু কঠোর।

বিশেষ কিছু বলিতে হইল না, মিস্ ব্রেনগান অত্যন্ত নিরাশ হইয়াই চলিয়া গেল, যেমন করিয়া আমাদের পুরাতন দেশে যুবকগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার নিরাশ জীবন লইয়া ফিরে, এবং কেহ বা আত্মহত্যা করে, আবার কেহ বা কবিতা লেখে!

তৃতীয় পাণিপ্রার্থী(নী) আসিলেন—এক জন সামরিক কর্ম্মচারী মিস্ সুরা মেসিনগান। দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট, ওজন অন্যূন সাড়ে তিন মণ, এবং চর্ব্বিসঞ্চয় ব্যতীতও অবলম্বিত অন্য কারণে উদরদেশ অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত। দেখিয়া ভীত হইলাম, এবং সসম্ভ্রমে বলিলাম,—বসুন—

গোঁফে চাড়া দিতে সাহস হইল না। একে বিপুল তনু, তাহাতে তন্বীদেহে নানারূপ মারাত্মক আয়ুধ সজ্জিত—এবং নানারূপ সম্মানজনক পদকাদিতে সামরিক বেশ আরও সামরিক হইয়া উঠিয়াছে। হাফপ্যাণ্ট, বুটজুতা, এবং ষ্টিল হেলমেট বেশ মানাইয়াছে। টুপি নামাইয়া তিনি উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন,—আমি এক জন কর্পোরালা—ত্রিংশ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ানের অন্তর্ভুক্তা।

আমি আরও সসম্ভ্রমে কহিলাম,—আজ্ঞে আপনি, আমার মত এক জন নিকৃষ্ট নরকে বিবাহ ক'রবেন—এটা কি ভাল হবে?

—আমার আপত্তি নেই; তবে আপনার শরীর অত্যন্ত কৃশ, স্বাস্থ্য ঠিক সামরিক কর্ম্মচারী-গৃহী হওয়ার যোগ্য নয়।

আমি সভয়ে কহিলাম,—সে একটা বড় দুর্ঘটনা সন্দেহ নেই কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারী দেখলে আমার বুকের ভিতর কেমন টিপ্-টিপ্ করে, ধড়-ফড় করে, আর বমি আসে,—হিষ্টিরিয়ার মত হয়!

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বাইরে ও-রকম কঠোর না থাকলে সৈনিকাগণ মানবে কেন? তা হ'লেও আমাদের ত অন্তর আছে, তাকে উপেক্ষা ক'রতে পারেন না। জানেন ত, সৈনিকাগণ আজকাল কি রকম দুর্দ্ধর্ষ—

আমি নতনেত্রে আঁচলের চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিলাম,—দেখুন, আপনাদের অন্তরকে উপেক্ষা করা দূরের কথা, খুব শ্রদ্ধা করি, এবং তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করি শক্তি-শালী তনুকে।—যাকে শ্রদ্ধা করি তাকে দূরে রাখাই ত—

মিস্ মেসিনগান হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বেশ, বেশ, তাই হোক—

ভারী বুট মেঝেয় ঠুকিয়া সামরিক কায়দায় অভিনন্দন করিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন,—সমগ্র বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল; আমার অন্তরাত্মাও কাঁপিয়া কাঁপিয়া শান্ত হইল। যা হোক্! এই সামরিক কর্ম্মচারী যে সহজে মুক্তি দিলেন, সেই ভাগ্য!

পরে যিনি কার্ড পাঠাইলেন, তিনি এক জন সেনা-নায়িকা—মিস্ হায়না হাউইটজার। মেসিনগান দেখিয়াই তটস্থ হইয়াছিলাম; অতএব মিস্ হাউইটজারকে দ্বারপ্রান্ত হইতেই বিদায় দিয়া কহিলাম—নমস্কার, আমায় ক্ষমা ক'রবেন। বর্ত্তমানে একটু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা ক'রছি।

কাগজে পড়িতেছিলাম—বিচিত্র দেশের বিচিত্র কত জনরব।

কোনও এক সহরে অবস্থিত এক সৈনিকাদলের কয়েক জন এক জন পুর-নরকে অসম্মান করিয়াছে। কোর্টে তাহাদের বিচার হইয়াছে,—বেত্রাঘাত ও জেল। অন্যের বিবাহিত পতি ফুসলাইয়া লইবার অভিযোগে দণ্ড—পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কবি-সম্রাজ্ঞী ইলা লীলায়িতার রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে,—পুরুষ-কবির উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভা। কোন পত্রিকা-সম্পাদিকার রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ। পুরুষের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব, প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। তাহার ছবিখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তঃপুরচারীর অপূর্ব্ব সাহস—ডাকাতিনীগণের সহিত যুদ্ধ।

আনন্দে সমস্ত দিনটি ধরিয়া কাগজের আপাদ-মস্তক বার বার পড়িলাম। এমন রোমাঞ্চকর সংবাদ পূর্ব্বে কখনও পড়ি নাই।

আজ ষষ্ঠ দিন—কিন্তু উপযুক্ত পাণিপ্রার্থিনী আজও কেহ আসিলেন না; তবে এইটুকু বুঝিয়াছি, বিবাহের বাজারে আমার দর নেহাত মন্দ নয়। ধৈর্য্য ধরিলে ভাল বিবাহ হইতে পারে।

এই কয় দিনে বহু পাণিপ্রার্থিনীকে নিরাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া দুঃখিত। কিন্তু আমার বি-এ পাশ করা সাবেক গৃহিণী আমাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনুশোচনা করিয়াছিলেন, এবং এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট বিবাহ করিতে পারিতেন বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলেন; অতএব

নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলাম

এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিবাহ করিতে না পারিলে নিরর্থক এই গৃহত্যাগ!

আজ সকালে এক জন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটা পাণিপ্রার্থিনী হইয়া আসিলেন। যতগুলি অস্ত্র ছিল, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়া ভাবিলাম, যাহাতে ইনি অন্ততঃ ফস্‌কাইয়া না যান।

নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলাম,—বসুন। এবং লজ্জাশীলতা দেখাইবার জন্য অবনত নেত্রে আঙ্গুল খুঁটিতে লাগিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেটা কহিলেন,—দেখুন, আপনি বয়স্থ, এবং শিক্ষিত পুরুষ, আপনাকে বেশী কিছু ব'লবার নেই; তবে আমার যা আয় ও জীবন প্রণালী সবই জানেন। উচ্চাদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছিলাম, কাজেই শিক্ষিত পুরুষ গৃহে না পেলে সে গৃহ অশান্তিময় হয়ে উঠবে। তার হাতে সমস্ত অর্থ, চিত্ত এবং সেই সঙ্গে আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজ ক'রতে পারি—

হাতের চুড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিলাম,—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, এবং আমাদের মত সোমত্ত শিক্ষিত পুরুষকে—

সাহেবা জিব কাটিয়া কহিলেন,—না না, কিছু মনে ক'রবেন না, বয়স্থ কথাটা দ্বারা কোনরূপ ইঙ্গিত ক'রবার ইচ্ছা আমার ছিল না, নাই-ও; তাই যদি হবে, তবে আপনার পাণিপ্রার্থিনী হ'য়ে আমি কেমন করে আস্‌তে পারি?

—না, তা আমি ব'লতে চাইনি। বলছিলুম, আমাদের মত বয়স্থ পুরুষকে নিয়ে নীড় রচনা ক'রতে যদি আপনার বাধা না থাকে, তবে আমারই বা কি আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু শিক্ষিত পুরুষের যে খরচা বেশী, তা জানেন, তা নিয়ে যদি—

—না না না, কিছু ভাববেন না। আমার সৌভাগ্যকে আজ বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবে শুভদিন কবে?—আজই আমরা ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রারের কাছে যেতে পারি?

আমি আঁখি তুলিয়া, কাঁধের কাপড়টাকে ঈষৎ টানিয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলাম,—আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন; আমি সলজ্জ হাতখানি বাড়াইয়া কম্পিত হস্তে করমর্দ্দন করিলাম, এবং গোঁফে তা দিতে দিতে ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিলাম,—কখন আস্‌বেন?

—যখন অনুমতি হয়।

—বিকেলে, কি বলেন?

সাহেবা বিদায় লইলেন। মনে মনে ভাবিলাম, এই ম্যাজিষ্ট্রেটা সাহেবাকে যদি নাকানি-চোকানি খাওয়াইতে পারি, তবেই গৃহত্যাগ সার্থক—তবেই সাবেক গৃহিণীর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে। প্রচুর টাকা খরচ করিবার কি কি ফন্দী আছে, তাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম, কেরাণী-জীবনে যাহা করিতে পারি নাই, আজ সেই সমস্ত সাধ পূর্ণ করিয়া লওয়া যাইবে। গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী, গহনার কাঁড়ি।

•

শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

মফঃস্বলে এক জেলার সহরে বাংলো-বাড়ীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবা সম্প্রতি আসিয়াছেন। সঙ্গে বেয়ারা-বরকন্দাজ গাড়ী, গার্ল প্রভৃতি সবই আসিয়াছে। বাংলোর দ্বিতলে পায়চারী করি, সংবাদপত্র পড়ি, গার্ল প্রভৃতিকে

হুকুম করি, ঘুমাই, পথচারিণী নারীগণের প্রতি কখনো দৃষ্টিনিক্ষেপ করি; কুলি-মজুরিণীর প্রতি ঘৃণাভরে চাহিয়া থাকি, তবুও সময় কাটে না! মদীয় পত্নী মাহিনা পাইয়া সমস্তই আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু কেরাণী-জীবনের সংস্কারবশতঃ কিছুতেই সব টাকা খরচ করিতে পারিতেছি না, তবে না করিলেও যে নয়,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবাকে পদানত না করিতে পারিলে এই জীবন ব্যর্থ। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম।

গাড়ী করিয়া জজপতি, মুনসেফপতি ও এক জন ডিপুটি-পতি বেড়াইতে আসিলেন। জজপতির গোঁফ আছে, মুনসেফপতির নাই—কিন্তু স্বর্ণহার কণ্ঠে ঝিকমিক্ করিতেছে, জজপতি সলজ্জ ভাবে কহিলেন,—আলাপ ক'রতে এলাম, আপনারা শিক্ষিত, আলাপ ক'রতে ভয় ক'রে; কিন্তু সঙ্গী ত চাই।

—না না, এ কি ব'লছেন। অল্প দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি একেবারে—আপনারা যদি না আসেন টিক্‌বো কি ক'রে?

জজপতি কহিলেন, আমার উনি আবার সকলের সঙ্গে মেশা ভালবাসে না, কাজেই ভয়ে ভয়ে বেরুতে হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য! আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে নেবার জন্যে উনিই বললেন।

মুনসেফপতিও একটু কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন,—আমার উনিও ত তাই, আপনার মাঝে কি-ই যে দেখেছেন, সকলেই আলাপ ক'রতে ব্যস্ত; আর আপনি ত আমাদের মত নয় যে, মেয়েমানুষ দেখলে লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হ'য়ে পড়েন! বাড়ীতেও ত যাবেন?

—যাবো, যদি উনি মত করেন; তা নইলে যাওয়া ত ঠিক নয়।

মুনসেফপতির হারটা লক্ষ্য করি নাই মনে করিয়া তিনি সেটাকে বার-দুই গলার উপর দিয়া ঘুরাইয়া লকেটটাকে ব্যক্ত করিয়া রাখিলেন। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটাতে আমার অশেষ উপকার হইল।

বিকালে আফিস্ হইতে 'উনি' ফিরিতেই, চা প্রভৃতি গার্ড্ডের হাতে দিয়া উপস্থিত হইলাম এবং কটাক্ষ শরাঘাতে ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া কহিলাম,—জজপতি ও মুনসেফপতি আজ বেড়াতে এসেছিল যে!

তিনি কহিলেন,—তাঁরা আসবেনই ত;—এ বিষয়ে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী।

—কিন্তু তারা এসেছিল নতুন কারে চ'ড়ে; আর মুনসেফপতি তার মুক্তার হার সগর্ব্বে দেখিয়ে গেল! নতুন গাড়ী আর হীরার হার না হ'লে ওদের সঙ্গে মিশতে পারবো না। না, সে অপমান আমার সহ্য হবে না। কেন, আমি কম কিসে? আমার মান-সম্ভ্রম নেই?

তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—তা-ত বটেই; কিন্তু ওগুলো ত এক মাসের মাইনেতে হয় না। এ জন্যে অনেক টাকার দরকার।

টাকা খরচের কথায় সাবেক স্ত্রীর সম্মুখে আমার মুখখানা যেমন করিয়া শুকাইয়া যাইত, তাঁহার মুখও তেমনি শুকাইয়া গেল। করুণা বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু—

অভিমানভরে বলিলাম,—তাই বলে এ অপমান আমি সইতে পারবো না; যেখানে হয় চলে যাবো, এত সুখে আমার দরকার নেই।

চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; কিন্তু পোড়া চক্ষুতে জল নাই—পূর্ব্ব-সংস্কারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি করুণ বেদনাভরা কণ্ঠে কহিলেন,—না না, তুমি দুঃখ ক'রো না। একটা ব্যবস্থা আমি ক'রবই। কর্জ্জ ক'রে হোক্ বা—

—আমি বুঝি তোমায় কর্জ্জ ক'রতে বলেছি! না হয় অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও।

—তা কি হয়? তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো কি ক'রে?

আনন্দিত হইলাম, কিন্তু চোখ হইতে আঁচল সরাইলাম।

গাড়ী ও হীরার হার আসিল।

মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত যথেষ্ট খরচ করিয়া যখন মাহিয়ানার সব টাকা ফুরাইয়া আসিল, তখন তাঁকে জানাইলাম—টাকা ত আর নেই, সংসার চ'লবে কি ক'রে?

—নেই! মানে অত টাকা খরচ ক'রলে কি ক'রে?

আমি গ্রীবাদেশ স্কন্ধে ঠেকাইয়া বলিলাম,—ও-মা, আমি তোমার টাকা চুরি ক'রেছি না কি? তোমার ঘর-সংসার তুমিই ছাখো, আমার দরকার নেই। দিবারাত্রি সমস্ত দেখবো, সংসারের জন্যে খেটে মরবো, আর তার পরে এত অবিশ্বাস! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

—না না না, তা ব'লছি নে; কিন্তু একটু হিসেব ক'রে খরচ ক'রলে—

হিসেব ক'রে খরচ ক'রতে পারে, এমন পুরুষ জুটিয়ে আনলেই ত পারতে। আমাকে বিদায় দাও, যদি এমন অপমান, এত লাঞ্ছনা করবে—

কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল না। তিনি ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন,—মাফ ক'রো, সত্যিই ত, খরচ হ'লে তুমি কি ক'রবে? যা হয় ব্যবস্থা একটা ক'রবো, তবে—

—তবে টবে নেই। তুমি নিজের মত খরচ ক'রো, আমি চাকর-বাকরের মত থাক্‌বো, সেই ভালো—

উনি নিরুত্তর, বেদনায় চোখ দুইটি অশ্রু-সজল। একটু সহানুভূতি দেখাইতে কহিলাম, তুমি রাগ ক'রলে কি ক'রবো? সম্মানের জন্যে যা দরকার তার বেশী কি খরচ করি? জমাখরচ ত আছে? এক সময় দেখলেই পার।

তিনি হাসিয়া কহিলেন,—আমি কি তোমায় অবিশ্বাস করি যে হিসাব দেখবো?

—করো না?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, অর্দ্ধেক মানব তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।

খবরের কাগজে ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

রাজ্যের সামরিক, বে-সামরিক, রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস প্রভৃতি সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ একযোগে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। রাজ্যের নিয়মানুসারে তাহাদের ছুটির কারণকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই—প্রত্যেককেই ছয় মাস ছুটি দিতেই হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে সমস্ত কাজকর্ম্ম, যান-বাহন বন্ধ হইয়া মহা বিশৃঙ্খলা ও অনর্থের সৃষ্টি হইবে।—সরকার এখন নিরুপায়! সকলেই 'মাতৃত্বের কারণে' ছুটি চাহিয়াছেন, সুতরাং আইন অনুসারে সরকার এ ছুটি মঞ্জুর করিতে বাধ্য।

শঙ্কিত হইয়াছিলাম—সমস্তই যদি একযোগে বন্ধ হইয়া যায়, তবে উপায়? সাবেক দেশে ফিরিবারও ত কোন উপায় থাকিবে না!

জনৈক পুরুষ-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক লিখিয়াছেন—তাঁহার কথামত যদি পুরুষকে স্বাধীনতা দান করা হইত, তবে আজ এই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিতে পারিত না। আজ একযোগে নমনীয় পুরুষ জাতিকে সরকারের কাজ চালাইবার উপযোগী করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি।

জনৈক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—যদি পুরুষদিগকে গর্ভ-ধারণের উপযোগী করিবার জন্যে, গবেষণার জন্যে সরকার যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতেন, তবে এ সমস্যার উদ্ভব হইত না।

আর এক জন প্রতিবাদ করিয়াছেন—তাহা হইলে আদিম যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি স্ত্রীগণ পুরুষ হন, এবং পুরুষ স্ত্রী হন—তবে এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? পুরুষই সরকার পরিচালিত করিতে পারে।—শতাধিক বর্ষব্যাপী এই অক্লান্ত সংগ্রাম তাহা হইলে আমরা কেন করিয়াছি? ইত্যাদি নানাবিধ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সারগর্ভ বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। আমার শঙ্কা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল।—হায়, তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া ভাল করি নাই, আর কি ফিরিতে পারিব না? ভাল হোক্, মন্দ হোক্, সেই গৃহিণীর কাছেই ত এত দিন মনটা পড়িয়া আছে—কেবল অভিমান করিয়াই ত চলিয়া আসিয়াছি! বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু নিরুপায়!

আফিস হইতে ফিরিয়া উনি কহিলেন,—ছুটির দরখাস্ত ক'রেছি, আর ত পরিশ্রম ক'রতে পারি নে, শরীর যে ভেঙ্গে পড়েছে—

এত দিন লক্ষ্য করি নাই, আজ ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম,—ছুটি চাহিবার যথেষ্ট কারণই বর্ত্তমান, এবং ছুটির আশু প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না।

—কিন্তু ছুটি কি দেবে? সকলেই যে ছুটি চায়—দারোয়ান, বেয়ারা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সব!

বলিলাম,—তাই ত।

মুখ তাঁহার শুষ্ক, বিবর্ণ, রক্তহীন। তাঁহার নিরুপায় অবস্থাই আমাকে যেন নিষ্ঠুর করিয়া তুলিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—আচ্ছা, শুনব এক সময়। ওদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাবার কথা, সময় হ'লো।

—মাসের শেষ, পরের মাসে দেখলে হ'ত না?

আমি সক্রোধে কহিলাম,—তোমার হাতে পড়ে সব সুখ-সাধই বিসর্জ্জন দিয়েছি; কিন্তু একটা টাকা যদি না দিতে পারবে তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন—আমাদের মত শিক্ষিত পুরুষকে? একটা গেঁয়ো বর্ব্বর পুরুষকে বিয়ে ক'রলেই হ'ত—যাদের স্বাধীন সত্তা নেই।

—ওই স্বাধীন সত্তা ত্যাগ ক'রলেই ত সব গোল চুকে যায়।

ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম,—তোমাকে বিয়ে ক'রে যে কতখানি ঠকেছি, তা' আজ বুঝছি!—ইচ্ছে ক'রলে কোন লাটকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না।

ওঁর শরীর ভাল ছিল না, তাই হয় ত রাগিয়া থাকিবেন। সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—না, আজ

আমার শরীর ভাল নেই; আজ কিছুতেই যেতে পারব না।

আমি গ্রীবাদেশে তর্জ্জনী সংস্থাপন করিয়া কহিলাম,—বা রে! তোমার জোর?

—হ্যাঁ, তোমার ওপর কি আমার কোন দাবী নেই?

—ছিলো, আজ নেই। তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া দুম্‌দাম্ শব্দে উঁচু-হিল জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রুগ্ন শরীর লইয়া তিনি পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলে আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম—তাঁর চেহারা ঠিক আমার সাবেক গৃহিনীর মতই,—সার্ট-কোটের অন্তরালে তাহা চাপা ছিল মাত্র।

চোখ মেলিয়া দেখিলাম,—সাবেক প্রিয়া কহিতেছেন,—ও বাবা! রাগ এখনও পড়েনি? সকলকে বলেছিলাম, তাই তো না-গিয়ে পারলাম না; তা তোমার টাকা খরচ করিনি। ওঠো লক্ষ্মী, রাগ ক'রো না, সারারাত্রি না খেয়ে আছ, উঠে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। না খেয়ে কত কষ্টই পেয়েছ,—ওঠো লক্ষ্মীটি! রাগ ক'রো না

চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম···

স্বপ্নভঙ্গে উঠিয়া-বসিয়া ভাবিলাম,—এ দেশটাও ত তবে মন্দ নয়!

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বি-টি)

শাশ্বত

রাতের আঁধারে নগরীর পথে ঘুরিয়া বেড়ায় যারা
মৃত্যুর বীজ বহন করিয়া চির অধিকার-হারা,
মানুষের ঘৃণা যাহাদের কেশে প্রতিদিন জট বাঁধে
তাহাদের তরে আয়ুর দেবতা সর্পিল পথে কাঁদে!

অর্থবিহীন পথের পাঁচালী সৃজন করার লাগি
ধনীর দুয়ারে বার বার যারা বেড়ায় ভিক্ষা মাগি,
রক্তে তাদের বাসা বাঁধিয়াছে অক্ষমতার ভাগ
পরের অন্নে তাই আজো হয় আত্মার বলিদান!

কত অঙ্কুর জীবন-সূর্য্যে পৃথিবীর ইতিহাস
মহামানবের পথের ধূলায় করে রাখিয়াছে দাস,
গত চেতনার সমাধি-ভূমিতে তাহাদের পাই দেখা
সঙ্গিবিহীন কিসের লাগিয়া আজো ফিরিতেছে একা।

কিছু নাই তবু শাশ্বত যাহা আছে তাহাদের কাছে—
জন্ম-মৃত্যু মিতালি করিয়া ঘুরিতেছে পাছে পাছে,
আর যাহা কিছু মিথ্যা সকলি—সঞ্চয় তার খুলি
দেখিলাম শুধু রাখিয়া গিয়াছে শেষ ভিক্ষার ঝুলি।

বিদ্রূপভরা শেষ দান তার ভিক্ষার ঝুলিখানি
নবাগত কত মানুষের চোখে মাদকতা দেয় আনি,
তমসার ছবি নব-রূপ পায় সৃষ্টির তুলিকায়,
নবীন আশায় আয়ুর দেবতা পিছন ফিরিয়া চায়!

শ্রীঅমর ভট্ট।

ইতিহাসের অনুসরণ

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা কোথায় ছিল এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল,—তাহার নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে স্থানটিতে দ্বারকার অবস্থান লক্ষিত হয়, সেই স্থানেই কি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রতিষ্ঠিত ছিল? না, উহা অন্যত্র ছিল? ইহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় সন্দেহ নাই। পাণ্ডারা এখন যে স্থানটিকে দ্বারাবতী নামে অভিহিত করেন, তাহা যে অত্যন্ত আধুনিক, এ বিষয়ে পুরাতত্ত্বজ্ঞ ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অভিন্নমত। উহা দ্বারকানাথের দ্বারকা নহে—মোক্ষদায়িকা দ্বারাবতীও নহে; অথচ এই দ্বারকাতেই শত শত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভ করিতেছেন। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে স্থানেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না, তাহারও সন্ধান লওয়া প্রয়োজনীয় বটে! কিন্তু নির্ভরযোগ্য সন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে? যাঁহারা পুরাবস্তু লইয়া গবেষণা করেন, তাঁহারা 'পাথুরে'-প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু সকল স্থানের ভূগর্ভ খনন করিয়া পুরাবস্তু বা পুরাতন সহর আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে; আর ভূগর্ভ হইতে কোন প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইলেও উহা মহামানব শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারাবতী কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবারই বা উপায় কি? পুরাতত্ত্বের উপর অনুমানের জঞ্জাল এতই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে, গবেষণা দ্বারা প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা অসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে উহার বিবরণ দেখিয়া যদি কোন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা সফল হইতেও পারে। দ্বারকার বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায়, এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ; কারণ, ইহাতে অনেক অলৌকিক কাহিনী থাকিলেও অনেক সত্য ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায়—সুতরাং তাহা হইতে প্রকৃত তথ্যের উদ্ধার-সাধন করা তেমন কঠিন বলিয়া মনে হয় না। মহাভারত হইতেই এই তত্ত্ব জানিতে পারা যায় যে, মগধপতি জরাসন্ধের ভয়েই যাদবগণ মথুরা হইতে দ্বারাবতীতে গমন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শদাতা ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যাদবদিগের প্রতি জরাসন্ধের অত্যাচার-কাহিনী, এবং মথুরা হইতে যাদবগণের কাথিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্র-অঞ্চলে গমনের বিবরণ শ্রীকৃষ্ণই রাজা যুধিষ্ঠিরের গোচর করিয়াছিলেন। উহাতে দ্বারকার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন,—"ঐ জরাসন্ধের ভয়ে আমরা বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র, জ্ঞাতি এবং বান্ধবদিগের সহিত পলায়ন করিলাম। হে নৃপতে! ঐ পশ্চিম অঞ্চলে রৈবতক শৈল দ্বারা পরিশোভিত কুশস্থলী নামক এক পরম-রমণীয় পুরীতে বাস করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তম করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইলাম। ঐ দুর্গটি দেবতাদিগের অধৃষ্য। তথায় নারীরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণিবংশীয় মহারথদিগের ত কথাই নাই। আমরা এখন নিঃশঙ্ক হইয়া তথায় বাস করিতেছি। মাধবেরা ঐ সংস্থানাদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং মগধরাজ জরাসন্ধের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জরাসন্ধের অনিষ্টাচরণের ভয়েই আমরা প্রয়োজন বশতঃ গোমন্ত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। (১) পরে এই কথার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন,—আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারাবতীতে চলিয়া গিয়াছিলাম। (২) ইহাতে দেখা যায় যে, জরাসন্ধভয়ে ভীত যাদবসম্প্রদায় দ্বারাবতী বা কুশস্থলী নামক নগরে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন! ঐ দ্বারাবতী বা কুশস্থলী রৈবতক নামক পর্ব্বতের অদূরে অবস্থিত ছিল। উহার দ্বিতীয় নাম কুশস্থলী। এই দ্বারাবতীর সান্নিধ্যে যে সাগর ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান কালে যে স্থান দ্বারকাতীর্থ নামে অভিহিত, তাহা রৈবতক গিরি হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ বা তাহারও অধিক দূরে অবস্থিত। উহার নিকট কোন পাহাড়-পর্ব্বত নাই। এই রৈবতক পাহাড়ের আয়তন তিন যোজন। অবশ্য, এই যোজনের পরিমাণ যে চারি পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া একরূপই আছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন বটে! এখন চারি ক্রোশে এক যোজন হয়। তখনও তাহাই হইলেও ক্রোশের দৈর্ঘ্য বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সমগ্র সৌরাষ্ট্র প্রদেশে বর্ত্তমান কালে একমাত্র গিরনার পাহাড়েরই পরিসর ১২ বর্গ-মাইল। এত বড় পাহাড় সমগ্র কাথিয়াবাড়ে দ্বিতীয় নাই; সুতরাং গিরনার পাহাড়ের নিম্নে বা অধিত্যকায় কুশস্থলী বা দ্বারাবতী ছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে; তবে ইহা অনুমান মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২১৯ অধ্যায়ে দেখা যায়, অর্জ্জুন নানা তীর্থ পর্য্যটনান্তে প্রভাস-তীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে গমন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে সোজা রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হন। প্রভাস পত্তন কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে আধুনিক দ্বারাবতী বহু দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তৃতীয় পাণ্ডব (অর্জ্জুন)কে রৈবতকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে দ্বারকাবাসীরা রৈবতক পর্ব্বত উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত করিয়াছিল। সেই স্থানে কয়েক দিন অবস্থিতির পর তাঁহারা দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন দ্বারকায় সুভদ্রাকে দেখিতে পাওয়ায় সুভদ্রাকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করেন। সুভদ্রা রৈবতক-যাত্রার উৎসবে যোগদান করিতে রৈবতক পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি পূজার্চ্চনা ও দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন দ্বারকায় প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত, সেই সময় অর্জ্জুন তাঁহাকে হরণ করেন। এই সংবাদ অবিলম্বেই দ্বারকায় পৌঁছিলে অর্জ্জুনের এই কার্য্যে সকলেই ক্রোধ প্রকাশ করেন, কিন্তু

---

(১) মহাভারত সভাপর্ব্ব ১৪ অ, ৪৮—৫৪।

(২) ঐ ঐ ৬৭ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া ধনঞ্জয়কে দ্বারকায় আনয়ন করেন।—এই বর্ণনাপাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দ্বারকাপুরী রৈবতক পাহাড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্ব্বত হইতে অনতিদূরে সংস্থাপিত ছিল, এবং প্রায় এক শত মাইল দূরবর্ত্তী আধুনিক দ্বারকায় উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ধারণা করা যায় না। প্রভাস বা সোমনাথের দশ ক্রোশ মাত্র পূর্ব্বে একটি স্থানের নাম আছে—মূল-দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে পরবর্ত্তী কালে ইহা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।—কেন, সে কথা পরে আলোচনা করিব।

যে সময়ে অর্জ্জুন তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে প্রভাসতীর্থে (সোমনাথে) গমন করেন, সেই সময়ে মূল-দ্বারকার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দশ ক্রোশ মাত্র দূরস্থ দ্বারকায় লইয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে কি কারণে একেবারে বহু ক্রোশ দূরবর্ত্তী রৈবতক পর্ব্বতে লইয়া যাইলেন? এবং তথা হইতে আবার ঐ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কেনই বা দ্বারকায় আসিবেন? ইহা সঙ্গত বলিয়া ধারণা হয় না। এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহামানব—যিনি অবতার বলিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কর্ত্তৃক পূজিত—তাঁহা দ্বারা এই ভাবে শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-প্রদর্শন কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই প্রতীতি হয়, প্রকৃত দ্বারকা বর্ত্তমান গিরণার পাহাড়ের পশ্চিম দিকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যখন কুশস্থলী বা দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তাহা পরিত্যক্ত প্রদেশ মাত্র ছিল। হরিবংশের ১০ম এবং ১১শ সর্গে এই অঞ্চলের পূর্ব্বকথা লিখিত আছে। কিন্তু এ কালের ইতিহাসবেত্তারা হরিবংশের উক্তিতে নির্ভর করিতে প্রস্তুত নহেন; কারণ, উহা অবিমিশ্র ইতিহাস নহে। কিন্তু হরিবংশেও অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা বোধ হয় বহুদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটা ইঙ্গিত হরিবংশেই পাওয়া যায়। জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার বাস পরিত্যাগ করিয়া যাদবগণের বসবাসের জন্য গরুড়কে কোন নিরাপদ স্থান খুঁজিতে বলিলে গরুড় অনেক অনুসন্ধানে অবশেষে রৈবতক পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে, সৌরাষ্ট্র বা আনর্ত্ত দেশের (বর্ত্তমান কাথিয়াবাড়) কুশস্থলীতে নগর স্থাপন করিয়া যাদবগণের যোগ্য বাসস্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। গরুড় উক্ত প্রদেশ সন্দর্শন করিয়া বলিলেন,—

রৈবতং চ গিরিশ্রেষ্ঠং কুরুদেব! সুরালয়ম্।
নন্দনপ্রতিমং দিব্যং পুরদ্বারস্য ভূষণম্॥
—হরিবংশ ১১২ সর্গ।

হে দেব, আপনি রৈবতককেই সুরালয় (যাদবগণের বাসস্থান রূপে) ঠিক করুন। উহা স্বর্গের ন্যায় দিব্যশোভাসম্পন্ন হইবে, এবং রৈবতক উহার পুরদ্বার হইবে।—গরুড় এই স্থানের যথেষ্ট প্রশংসা করায় শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এখানে দেখা যায় যে, রৈবতককেই উঁহাদের বাসস্থান বলিয়া স্থির করা হয়। স্থানটি যেন যাদবদিগের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। হরিবংশের ১০ম এবং ১১শ অধ্যায়ে ঐরূপই বর্ণিত হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর বংশোদ্ভূত এক জন রাজার নাম ছিল প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র শর্য্যাতি। শর্য্যাতির পুত্র আনর্ত্ত। এই আনর্ত্তের নামানুসারেই ঐ প্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল। আনর্ত্তের পৌত্রের নাম রৈবত। ইঁহারই নাম অনুসারে পাহাড়ের নাম রৈবতক। রৈবত অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি পুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সঙ্গীত-সম্ভোগমানসে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সংবাদে সাহস পাইয়া রাক্ষসরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করে। তাঁহার পুত্রগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে,—প্রজাপুঞ্জও ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিতে থাকে। কিছুকাল পরে রাক্ষসেরা ঐ অঞ্চল হইতে প্রস্থান করিলে কুশস্থলী নগর এবং তৎসন্নিহিত জনপদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অতঃপর যাদবগণ উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া কুশস্থলী বা দ্বারাবতীর প্রাচীন দুর্গের সংস্কার-সাধনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন।

পরিত্যক্ত নগরের সংস্কার-কার্য্য প্রায় শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণের ধারণা হইল,—তিনি নগর-নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষজ্ঞ নহেন; সুতরাং এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করাই সঙ্গত। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—"স্থানটি সঙ্কীর্ণ, উৎকৃষ্ট নগর নির্ম্মাণ করিতে হইলে একটা ফাঁকা জায়গার প্রয়োজন।" তেমন উন্মুক্ত স্থান কোথায় পাওয়া যায়? বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সাগরের নিকট হইতে জমি লইয়া নগর নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" সুতরাং দক্ষিণ দিকে সাগরতটে বিশ্বকর্ম্মা এক নূতন দ্বারাবতী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নূতন দ্বারাবতী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। কারণ, উহার পূর্ব্ব দিকে ছিল রৈবতক পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে ছিল বনবল্লরী-শোভিত পঞ্চবর্ণ বন। পশ্চিমে ছিল গুল্মাদি-সমন্বিত ইন্দ্রধনুতুল্য নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপপূর্ণ অরণ্যানী। উত্তরে ছিল বেণুমান্ পাহাড়। সমুদ্রের কোন নাম গন্ধও নাই! কেবলমাত্র স্থানটি সমুদ্রের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়াই উহা সমুদ্রের সন্নিকটে ছিল, এইরূপ অনুমান হয়।

বিশ্বকর্ম্মা বা পূর্ত্তকার্য্যে বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই নূতন দ্বারকাপুরীও রৈবতকের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রৈবতক পর্ব্বত বা গিরণার পাহাড় দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ১২ বর্গ-মাইল। সুতরাং উভয় স্থানের মধ্যে অধিক ব্যবধান ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কাথিয়াবাড়ে গিরণার পাহাড়ের নিকট সমুদ্র নাই। যুগান্তপূর্ব্বে হয় ত তাহা ছিল। কাথিয়াবাড়ের উত্তর দিকে কচ্ছ উপসাগর, দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর। কিন্তু কচ্ছ উপসাগর আদৌ গভীর না হওয়ায় উহার বহু স্থানেই জল থাকে না, এবং গ্রীষ্মকালে জল প্রায়ই শুকাইয়া যায়। দক্ষিণস্থিত কাম্বে উপসাগর ঐরূপ অগভীর না হইলেও অধিক গভীর নহে। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নূতন দ্বারাবতীর দক্ষিণে ছিল বনলতাবেষ্টিত পঞ্চবর্ণ বন। সাগরগর্ভ হইতে নবোত্থিত সিকতাময় স্থানে প্রথমে এইরূপ বন দেখা যায়। বিশেষতঃ, গিরণার পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে কিছু দূর আসিলে এই অঞ্চলে নিম্নভূমি পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, ঐ অঞ্চল হইতে সাগর-জল বিলম্বে সরিয়া গিয়াছিল। ঐ পুরীর পশ্চিমে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপপূর্ণ নানা বর্ণে সুশোভিত অরণ্যানী। এই অরণ্যও নূতন হইতেছিল, এরূপ সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু ওদিকে তখন সাগর ছিল না। কারণ, তাহার পূর্ব্বে

উহার বহু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রভাসতীর্থ ছিল। উত্তরে ছিল বেণুমান্ পর্ব্বত। বেণুমান্ অর্থে বাঁশবনে সমাচ্ছাদিত। উহা বোধ হয় গিরণারগিরির দুই একটা বহিঃপ্রসৃত উদ্গত শৃঙ্গ (spar)। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপটি সাগরবক্ষ হইতে অধিক উচ্চ নহে। উহা ভারতীয় মালভূমি হইতে অনেক নিম্ন। সাগরবক্ষ হইতে উচ্চতায় উহা প্রায় বাঙ্গালার সমান। সুতরাং চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় কালে ঐ উপদ্বীপের সকল স্থান হইতে সাগর-জল দূরে অপসারিত হয় নাই। কিন্তু ঠিক কোন্ স্থানে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এই নূতন দ্বারকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মিত আদি দ্বারকা কুশস্থলীতেই ছিল; তবে যাদবগণ কর্ত্তৃক পুরাতন ও পরিত্যক্ত দুর্গটির জীর্ণ সংস্কার সংসাধিত হইয়াছিল। এই পুরাতন দুর্গটি পাওয়ায় যাদবগণ আর কোন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন নাই। দ্বিতীয় দ্বারাবতী সাগর হইতে অনতিদূরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা-হরণ প্রভৃতি কার্য্য প্রথম দ্বারাবতীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা রুদ্রদমনের অভ্যুদয়কাল হইতেই এই পর্ব্বতের পার্শ্বেই গিরিনগর নামক পুরী ছিল। উহা হইতে গিরিটির নাম পরে গিরণার হওয়াই সম্ভব। হুয়েন্ সাংয়ের আবির্ভাব কালে পাহাড়টির নাম ছিল উজ্জয়ন্ত। ঐ গিরিটির অতি নিকটেই কাথিয়াবাড়ের রাজধানী ছিল। সুতরাং এই স্থানটি কাথিয়াবাড় অঞ্চলের রাজধানী করিবার উপযুক্ত বলিয়া পূর্ব্বকালে বিবেচিত হইত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে জুনাগড় নগরীও গিরণারের পার্শ্বেই অবস্থিত। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত দ্বারকা সম্ভবতঃ সাগরতীরেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেই স্থান হইতে সাগর এখন দূরে সরিয়া গিয়াছে কি না, বুঝিবার উপায় নাই। উহার পূর্ব্ব দিকে রৈবতক পর্ব্বত বলাতেই এত গোল বাধিয়াছে! সম্ভবতঃ উহা গিরণার গিরির পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত ছিল; ক্রমে সাগরের সহিত পিছাইতে পিছাইতে উহা সাগরতীরস্থ মূল দ্বারকায় পরিণত হইয়াছে। এখন উহা প্রভাস তীর্থ হইতে ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। উহার উত্তরে বেণুমান্ গিরি কোন্ স্থানে তাহা বুঝিলেও স্থান-নির্ণয় করিবার অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ডক্টর ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন স্থান-গুলি কোথায় ছিল তাহা এ পর্য্যন্ত যথাযোগ্যরূপে অনুসন্ধান হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদুবংশ কিরূপে ধ্বংস হইয়াছিল? মহাভারতের মুষলপর্ব্বে উহার যে রহস্যাবৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ তাহাতে নির্ভর করিতে পারেন না। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অনৈসর্গিক উপন্যাস বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির মৃত্যু-কাহিনীর বর্ণনা থাকায় তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, মৌষলপর্ব্বে কাহিনীটি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে চেষ্টা করিলে তাহা হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা যাইতেও পারে।

মহাভারতের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত। উহা এইরূপ। বিশ্বামিত্র, কণ্ব, ও নারদ এই তিন জন ঋষি দ্বারকায় গমন করিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া দ্বারকার কতকগুলি যুবক সাম্বকে গর্ভবতী যুবতী সাজাইয়া ঋষিদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার গর্ভে কি সন্তান হইবে বলুন ত?" ঋষিরা এই বিদ্রূপে কুপিত হইয়া কহিলেন, —"ইহার গর্ভে কুলনাশন মুষল হইবে।" কার্য্যতঃ তাহাই হইল। সাম্বের উদর হইতে যে মুষল বাহির হইল যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় যুবকগণ সেই মুষলটি চূর্ণ করিয়া সাগরজলে বিসর্জ্জন করিল। ঐ মুষলের প্রভাবেই যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ইহা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। মানুষের উদর হইতে লোহার মুষল ঋষির শাপেও বাহির হইতে পারে না; তবে এই ব্যাপারের ভিতরে কোন সঙ্গত কাহিনী প্রচ্ছন্ন থাকিতেও পারে।

চপল ও উদ্ধত যুবকরা কণ্বাদি কয়েক জন মুনিকে উপহাস করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরই সাম্ব ব্রধ্ন-রোগে আক্রান্ত হওয়ায় লোকে উহার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আরোপ করিয়াছিল। ব্রধ্ন-রোগের আক্রমণে যে স্ফীতি হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন, এবং মুষলের ন্যায় তাহার আকার। সাম্বই এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান করিবার একটা প্রবল কারণেরও অভাব নাই। মুষলপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, নগরের পথে পথে অসংখ্য মূষিক দেখা যাইত। হাঁড়ি ও জলপাত্র ভাঙ্গাও লক্ষিত হইত। ঐ সকল মূষিক গৃহমধ্যে সুপ্ত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখর খাইতে আরম্ভ করে। উত্তমরূপে প্রস্তুত অন্নও কীটাকুলিত দেখা যাইত। আমরা ইহাও জানি যে, প্লেগের সময় দলে দলে ইন্দুর গর্ত্তের বাহিরে আসে। প্লেগ উহার কারণ বলিয়া অনুমান করা হয়। প্লেগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার প্রধান উপায় স্থান-পরিবর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য দ্বারকাবাসীদিগকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দ্বারকা হইতে প্রভাসতীর্থের দূরত্ব সম্ভবতঃ ৭০ মাইলের কম নয়। এ কথাও সুবিদিত যে, সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে প্লেগের প্রকোপ হ্রাস হয়, এবং সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাস হইলে প্লেগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়। মৌষলপর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের বিনাশের জন্য প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সূর্য্যকিরণ ধূলায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; প্লেগের আক্রমণকালে প্রায়ই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ঝড় ঝঞ্ঝাবাত হইলে এবং বায়ুমণ্ডল ধূলায় আচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাস হয়। প্লেগের সময় অনেক স্থানে এইরূপ নৈসর্গিক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাও সকলের সুবিদিত।

এইরূপ কথিত আছে যে, ইউফ্রেটিস্ এবং টাইগ্রিস্ নদীর তীরে প্রাচীন কালে বিউবোনিক প্লেগের আক্রমণ হইত। ঐ সময় মেসো-পোটেমিয়া হইতে অনেক বাণিজ্য-জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হইত। সেই সূত্রে দ্বারকায় ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, দ্বারকা সেই সময় প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াও দ্বারকাবাসীরা ঐ দুরন্ত রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। যাদবগণ অগ্নিমুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। উহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি; এই জন্যই লিখিত হইয়াছে, পিতা সন্তানকে এবং সন্তান পিতাকে বিনাশ করিতে লাগিল, অর্থাৎ পরস্পর বিনাশের কারণস্বরূপ হইল। তাহার পর তাহারা পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ইহাও স্বাভাবিক। এই রোগে ৫ লক্ষ বলবান্ যাদব বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মহাভারতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "হতং পঞ্চশতং তেষাং সহস্রং বাহুশালিনাম্" (মৌষল, ৫ম অধ্যায়)। নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন, "পঞ্চশত-সহস্রং", "সহস্রগুণিতং পঞ্চশতম্ পঞ্চলক্ষাণি ইত্যর্থঃ"। অনিরুদ্ধের

পুত্র বজ্র কেবল বিশিষ্ট যাদবগণের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলেন। তিনি এবং সাত্যকির এক পুত্রও স্থানান্তরে বাস করিয়াছিলেন।

যদুবংশ কেবল মুষল-ব্যাধিতেই বিধ্বস্ত হয় নাই। তাহারা প্রভাসে পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে ও অর্জ্জুনকে যদুবংশের অবশিষ্ট লোকসমূহকে দ্বারকা হইতে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগুলিকে ও অবশিষ্ট যাদবগণকে দ্বারকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে অর্জ্জুনকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। হস্তিনাপুরে আনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী, শৈব্যা, গান্ধারী, হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করেন। সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকা সম্বন্ধে অতঃপর আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত যাদবগণকে লইয়া যে সময়ে দ্বারকা ত্যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় সমুদ্র আসিয়া দ্বারকা নগরীকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অর্জ্জুন নগরের অবস্থা ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, ঐ নগরের আর রক্ষা নাই। এই জন্যই তিনি ত্বরিতগতিতে যাদবদিগকে নগর ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। বসুদেব এই সময়ে দেহত্যাগ করেন। এখন জিজ্ঞাস্য, দ্বারকা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলে সমুদ্র উহাকে গ্রাস করিল কিরূপে? ইহার কারণ এই যে, এই অঞ্চলে বাত্যাতাড়িত সমুদ্রজল কখন কখন স্ফীত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করে। উহা Typhoon বা Storm-wave নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন, ১২৭১ খৃষ্টাব্দে ২০ আশ্বিন পূজার পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে ঐরূপ ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্রজল বিপুল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সুন্দরবন ও ডায়মণ্ডহার্ব্বার মহকুমার অন্তর্গত বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই জলপ্লাবনে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। আবার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি ঐ ভাবেই স্ফীত হইয়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ, হাড়িয়া দ্বীপ এবং দৌলতপুর একেবারে পাথারে পরিণত করিয়াছিল। প্রায় লক্ষাধিক নরনারী সেই ঝঞ্ঝায় প্রাণ হারাইয়াছিল, এরূপ নৈসর্গিক উপপ্লব পৃথিবীতে একান্ত বিরল নহে। ইহা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নহে, এবং অবিশ্বাস্যও নহে। তবে ঠিক ঐ ভাবে মহাভারতাদিতে উহা বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু যখন ঐ সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই, তখন সেই সময়ের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে পুরাণই অবলম্বনীয়। উহার অন্য কোন উপায় নাই।" সেই সময়ের শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাইবার উপায় নাই,—তাহার সম্ভাবনাও নাই। এই জন্যই পুরাণাদিতে লিখিত, কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন নানা বিক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস অনুসন্ধান করা অপেক্ষা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন যে অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা না করিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারের আর উপায় দেখা যায় না। গ্রেটবৃটেনের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরলোকগত ভিন্সেণ্ট এ স্মিথ তাঁহার লিখিত Early History of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—Very little has been done yet to reveal the secrets of the most ancient sites in India অর্থাৎ ভারতের অতি-প্রাচীন স্থানগুলির গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। অনেক স্থানে অতি-প্রাচীন অক্ষরে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজের 'ভবন গঙ্গায়' যে দুর্ব্বোধ্য লিপি পাওয়া যায়, তাহারও পাঠোদ্ধার হয় নাই! পাঠোদ্ধার হইবে কি না, তাহাও বলা যায় না। কারণ, উহার অক্ষরগুলি বহু পুরাতন ও অতি বিচিত্র; কিন্তু উহার অন্তরালে নিশ্চিতই প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে।

বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতের বহু প্রাচীন তীর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ—বৃন্দাবন ও মথুরার কথা বলা যাইতে পারে। এই তীর্থ দুইটি বহু কাল অরণ্যে আবৃত ছিল। উহা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, কেহই তাহা জানিত না। অবশেষে রূপ গোস্বামী বহু অনুসন্ধানে উহার আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ দ্বারকা সমুদ্রে বিলীন হইবার পর ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্থানটি নিম্নভূমি ছিল বলিয়া হয়ত তথা হইতে জল নিঃসরণে বিলম্ব হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায়, আসল দ্বারাবতী রৈবতক পর্ব্বতের নিকটেই ছিল।

আর একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান জুনাগড় নগরের যেরূপ গঠন, হরিবংশে বর্ণিত দ্বারাবতী নগরীর গঠন বা আকার অনেকটা সেইরূপ ছিল। 'নাম্না দ্বারাবতী নাম স্বায়তাষ্টাপাদোপমা।' উহার আকার ছিল পাশা খেলার ছকের মত। জুনাগড় নগরীর আকারও অনেকটা ঐরূপ। উহার মধ্যভাগ চতুষ্কোণ, প্রত্যেক দিক্ হইতে পাশা খেলার ছকের মত এক একটা পাদ বা শাখা বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জুনাগড় যে সেই প্রাচীন দ্বারাবতী—একই আকারে ঠিক একই স্থানে বিরাজ করিতেছে, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। তবে জুনাগড়ে একটি পুরাতন দুর্গ আছে। তাহা না কি বিশেষজ্ঞদিগের মতে অতি প্রাচীন—গিরিব্রজের সমকালীন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে যখন সৌরাষ্ট্র দেশ সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি উজ্জয়ন্ত নামক পর্ব্বতের পাদদেশে একটি নগরী দেখিয়াছিলেন। ঐ উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতের উপর একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলেও বৌদ্ধবিপ্লবের তরঙ্গ প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জুনাগড়ের সান্নিধ্যে অশোকের শিলালিপি এবং স্কন্দগুপ্তের লিপিও পাওয়া যায়। বৌদ্ধবিপ্লব যে এই নগরীর সংস্থান-স্থানের বিপর্য্যয় ঘটায় নাই, ইহাই বা বলিবার উপায় কি? তবে সম্ভবতঃ দ্বারাবতী পুরীর অনুকরণে এই অঞ্চলে ঐরূপ নগর-রচনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ভূগর্ভ খনন করিয়া হয় ত শ্রীকৃষ্ণের এই নগরীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। উহা যে গিরণার পাহাড়ের সান্নিধ্যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন ঐ কার্য্য কে করিবে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ইতিহাসে কেবল প্রসিদ্ধ নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার বলিয়া সমস্ত হিন্দু কর্ত্তৃক পূজিত। তাঁহার নগরীর আবিষ্কারের চেষ্টা করা হিন্দুর অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ম্যালেরিয়া এ দেশের একটি ব্যাপক ব্যাধি। প্রতি-বৎসর অসংখ্য লোক এ রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়; এবং যে সকল লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া কোনক্রমে বাঁচিয়া উঠে, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে; অথবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, হয় ত ভুগিয়া ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কত কাল হইতে এই রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সঠিক্ বিবরণ সংগ্রহ করা দুরূহ হইলেও এই জাতীয় রোগ যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে, তাহার বিবরণ বৈদিক যুগের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। নব্যবিজ্ঞানের পথি-প্রদর্শক হিপোক্রেটিস্ খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে যে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য-গণের গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মিশরের এমিন পাশা বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই এ রোগের পরিচয় দিয়াছেন; এবং গ্রীস দেশে, মিশরে ও ভারতবর্ষে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে ভারতে ইহার ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের প্রতি গত অর্দ্ধ-শতাব্দী হইতেই বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত জীবাণুবিজ্ঞানে এনোফিলিশ জাতীয় মশকই এই রোগের বাহন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিশিষ্ট জীবাণু, মশকের মধ্যবর্ত্তিতায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় এ রোগের সৃষ্টি, এবং সিঙ্কোনা-বৃক্ষত্বক্‌জাত কুইনাইনই ইহার একমাত্র প্রতিকারক ও প্রতিষেধক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—যদিও প্রতি বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে, মধ্যে, বা অবসানকালে ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বিশেষতঃ, বাংলা ও আসামে ইহার ব্যাপক আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ বিষমজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরকে এই জাতীয় জ্বরের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এবং তাহাকে সততক, সন্ততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক নামে শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা ঐ জাতীয় জ্বরের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে কথিত এমন কোন বিশিষ্ট, ধারাবাহিক চিকিৎসাপদ্ধতি কেহই এ-কাল পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই—যাহা কুইনাইন-প্রয়োগের ন্যায় ফলদায়ক। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের এই দৈন্যের কথা দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলাম; আমার ব্যবস্থানুযায়ী যথাবিধি ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ বহুলাংশে প্রতিরুদ্ধ হইবে বলিয়াই আশা করি। গত দশ মাসে বহুসংখ্যক ম্যালেরিয়া রোগীকে উহা ব্যবহার করাইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জনসাধারণের উপকার হইতে পারে।

প্রথমতঃ, এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নব্যবিজ্ঞান—জীবাণুবিজ্ঞান। অণুবীক্ষণের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা-বিধানই ইহার মূলতত্ত্ব; কিন্তু আমাদের অবলম্বনীয় আয়ুর্ব্বেদ—ক্ষেত্রবিজ্ঞান। দেহরূপী ক্ষেত্রকে রোগবিকাশের অনুপযোগী করাই আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব। জগতের যাবতীয় সৃষ্টিপ্রবাহ এই বীজ ও ক্ষেত্রের সমবায়ে সম্ভব হইয়া থাকে; সুতরাং আমার বর্ত্তমান আলোচনা ক্ষেত্রবিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতেই করা হইতেছে। সমস্ত জ্বররোগের সাধারণ লক্ষণ কোষ্ঠাগ্নির বহির্নির্গমন। বহিরুত্তাপ এই নির্গমন দ্বারা সম্ভব হয়। আর কোষ্ঠাগ্নি বলিতে—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সাতটি ধাতুগত অগ্নিকে বুঝায়। এই সাতটি ধাতুর অগ্নি স্বস্থানে, স্বভাবে ও স্বমানে থাকিলে এই জ্বরের উদ্ভব হয় না। মূল কারণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—বর্ষার সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। আয়ুর্ব্বেদে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া রোগনির্ণয় ও পথ্যসমস্যার সমাধান হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্ব-রোগের মূল কারণ—বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকা, জল, তেজ, ও বাতাস। ব্যোম ইহাদেরই মধ্যবর্ত্তিতায় বিকারপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং মৃত্তিকা, জল, তেজ ও বাতাসের যে-কোন একটি বা একাধিক বিকারে ইহার উৎপত্তি ঘটে। বহিঃপ্রকৃতির বিকার জীবপ্রকৃতির বিকারের উপর প্রভাব-বিস্তার করে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা ও জল বিকৃত হয়, এবং তাহার ফলে বাতাসও বিকৃত হয়। সূর্য্যতেজও যথোচিত ভাবে তাহার প্রভাব বিস্তার করে না; সুতরাং প্রধানতঃ মৃত্তিকা ও জলগত দোষ আশ্রয় করিয়াই রোগের সৃষ্টি সম্ভব হয়। বর্ষার জলে মৃত্তিকার বিকৃতি ঘটে। জল মৃত্তিকাস্তর ভেদ করিয়া পুষ্করিণী বা নলকূপে সঞ্চিত হয়, এবং আকাশপথে বা পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে গতিবিধির সময় জল নানা প্রকার কীটপতঙ্গ ও লতা-পাতা, উদ্ভিজ্জ বা অন্যান্য ময়লা দ্বারা দূষিত হইয়া নলকূপ, ইঁদারা বা পুষ্করিণীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই দূষিত জল অন্নে, পানে, ও স্নানার্থ ব্যবহারে শরীরে যে বিষক্রিয়া হয়, তাহার ফলে, অথবা দূষিত জলজাত মশকবিশেষের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিষক্রিয়া হয়—তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, বিষক্রিয়ার ব্যাপকতাই যে মনুষ্যশরীরে প্রভাব-বিস্তার করে, এবং তাহারই ফলে সপ্তধাতুগত অগ্নি বিকৃত হয়; আর এই বিকৃত অগ্নির বহির্নির্গমনকেই যদি ম্যালেরিয়া নামে অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—কোন বিজ্ঞানেরই অমর্য্যাদা হইবার আশঙ্কা নাই। আর এই অগ্নিবিকৃতির ফলে দেহ-শোণিতে বিশিষ্ট জীবাণুর সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব; কারণ, ক্ষেত্র জীবাণু-বিকাশের উপযোগী হইলে সেখানে জীবাণুর উৎপত্তি হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। বহির্জগতের ন্যায় দেহজগতে এ সৃষ্টি চলিতে থাকিবে। বায়ুমণ্ডলে, জলমণ্ডলে ও ক্ষিতি-মণ্ডলে এ সৃষ্টি অহরহই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। ক্ষেত্র উপযোগী হইলে সৃষ্টি সম্ভব হয়। বীজ হইতে সৃষ্টিপ্রবাহের চিন্তা না করিয়া দেহরূপী ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া, রোগের কারণ নির্ণয় দ্বারা পাঞ্চ-ভৌতিক তত্ত্বকে ত্রিদোষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেহকে রোগ-বিকাশের অনুপযোগী করিতে চাওয়াই আয়ুর্ব্বেদের লক্ষ্য। দূষিত জল, বায়ু, তেজ ও মৃত্তিকার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধন করিলে এই কার্য্য অনায়াস-সাধ্য হয়। বর্ষাকালে জল অগ্নিতে ফুটাইয়া লইয়া স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে জলের সংস্কার সংসাধিত হয়। গৃহের চতুষ্পার্শ্ব যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে বায়ুরও সংস্কার হয়, এবং বর্ষার জলনিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে মৃত্তিকারও সংস্কার হয়। ঘরের ভিতর যথাসম্ভব রৌদ্রপ্রবেশের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিলে তেজেরও সংস্কার হয়। ইহার মধ্যে জলের সংস্কারই মুখ্য, অন্যান্য সংস্কার গৌণ; কারণ, স্নানান্নপানীয়ের ব্যবস্থায় নিরন্তর জলের ব্যবহার করিতে হয়। তাহার যথোচিত সংস্কারে অর্থাৎ সুসিদ্ধ করিয়া নিত্য ব্যবহারে এ রোগের আক্রমণ হইতে বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া

যায়। প্রতিবেধের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রতিকারের ব্যবস্থার কথাও অল্প বিবেচ্য নহে। রোগের সহিত সংগ্রামে অপটু দেহ, এবং যথাবিধি সংস্কার-বিরহিত উপরোক্ত পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের ব্যবহারে অনভ্যস্ত দেহ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়, তাহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন। কোষ্ঠাগ্নিকে স্বস্থানে আনয়ন, ইহার মূল তত্ত্ব। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মে জ্বরবিরাম সকল জ্বরেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তথাপি জ্বরের সুপ্তিকাল থাকে। বহিরুত্তাপ না থাকিলে তখনও অগ্নি স্বস্থানগত হয় না। বিষক্রিয়া নাশপূর্ব্বক সপ্ত ধাতুগত অগ্নিকে স্বস্থানগত করিতে আয়ুর্ব্বেদমতে ৩৫ দিন সময় লাগে; সুতরাং জ্বরবিরামের পর ৩৫ দিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠাগ্নির বিষক্রিয়া নাশপূর্ব্বক অনুরূপ পথ্যবিধান এবং কোষ্ঠাগ্নি যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে উদ্দীপিত হয় তাহার উপযোগী ঔষধপ্রদানই জ্বরনাশের মূল তত্ত্ব। বিশিষ্ট বিষক্রিয়া অন্নপানাদির মধ্যবর্ত্তিতায়, অথবা জীববিশেষের দংশনবশতঃ যে ভাবেই দেহ-শোণিতে সংক্রামিত হউক,—কোষ্ঠাগ্নি স্বাভাবিক হইলে বিষক্রিয়ার প্রভাব মনুষ্যদেহে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইবে না।

এইরূপ বিষক্রিয়ার প্রভাব আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ তেজোবিকার বা পিত্তবিকার নামে অভিহিত। এই পিত্তবিকারের আনুষঙ্গিকরূপে কফবিকার (ক্ষিতি ও জলগতবিকার) এবং বায়ুবিকার মানুষের স্ব স্ব ক্ষেত্রপ্রবণতা অনুযায়ী উপস্থিত হইয়া বিশিষ্ট রোগলক্ষণ প্রকাশ করে; সুতরাং সকল জ্বরেই এই পাঞ্চভৌতিক বিকৃতি বা ত্রিদোষবিকৃতি অল্লাধিক ঘটিবেই। বিশিষ্ট ভেষজ ও পথ্যপ্রয়োগে এই বিকৃতিকে স্বভাবগত করাই আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বা ক্ষেত্রবিজ্ঞানের মূল কথা। এই প্রবন্ধের উপসংহারে ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে স্বীয় অভিজ্ঞতাফল বিবৃত করিতেছি।

অতিসার, বা কোষ্ঠবদ্ধতা, বা সাধারণ অগ্নিমান্দ্য এই তিনটির যে-কোন লক্ষণ জ্বররোগীর ক্ষেত্রে প্রকটিত হইবেই। সকল ক্ষেত্রেই অগ্নিমান্দ্যবশতঃ এই সকল বিকার লক্ষিত হয়। এই জন্য জ্বরনাশক অথচ অগ্ন্যুদ্দীপক সাধারণ ও সুলভ ঔষধরূপে নিম্নলিখিত ঔষধটি সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রতি মাত্রায়—অতিবিষা তিন রতি হইতে ছয় রতি, ত্রিকটু—শুঁট-পিপুল-মরিচচূর্ণ ৩ রতি, করঞ্জ বীজের শাঁস তিন রতি, শোধিত ধুস্তুরাবীজ সিকি রতি, কজ্জলী ১ রতি, শোধিত অমৃতবিষ—$\frac{1}{2}$ রতি হইতে $\frac{1}{2}$ রতি—ছাতিম ছাল, কুমুরিয়ামূল, অনন্তমূল, কটকী, নিমছাল, গুলঞ্চ, ও চিরতার ক্কাথে মাড়িয়া একটি বটিকা করিয়া ব্যবহার করা চলে। বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে তেউড়ীমূল চূর্ণ ১ দিন বা দুই দিন অন্তর প্রত্যূষে প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ঔষধটি কুইনাইনের ন্যায় শীঘ্র কার্য্যকরী না হইলেও অতি অল্প সময়েই স্থায়ীফল প্রদান করে; তবে পথ্য সম্বন্ধে এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু নিয়ম পালনের প্রয়োজন; কারণ, সেই নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

জ্বর বিদ্যমানে জ্বরের গতি মন্দীভূত থাকিলে বা ক্রমমন্দীভূত হইবার দিকে অগ্রসর হইলে এই বটী জলসহ প্রত্যূষে এক বার ও সন্ধ্যায় এক বার সেব্য। জ্বরের বেগের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক থাকিলে দিবসে মাত্র এক বটী ব্যবহার করিতে হইবে। জ্বরের গতি হ্রাস হইয়া আসিতে থাকিলে, দুধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া (প্রত্যহ আধ সের হইতে এক সের পর্য্যন্ত) দিনে তিন-চার বটী পর্য্যন্ত সেবন করান চলে; তবে দ্রুত জ্বরবন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিবার ঝোঁক নব্য বিজ্ঞানানুমোদিত হইলেও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানসম্মত নহে।

পথ্যস্বরূপে অতিসারাদি লক্ষণে চিঁড়া-ভাজা বা চাউল-ভাজা আড়াই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া উহার পানীয়াংশ ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে খই আড়াই তোলা এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া তাহা মণ্ডবৎ ছাঁকিয়া ব্যবহার্য্য। পুরাতন আতপ চাউল বা সংবৎসরাধিক কালের মানকচু চূর্ণ, শটীর পালো, পানিফলের পালো, কুট্টিত যব প্রভৃতি ঐরূপ মাত্রায় ব্যবহার্য্য। জ্বর-বিরামে দুধ ঐরূপ মণ্ড সহ মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। দ্রববৎ অন্নমণ্ড প্রথম সপ্তাহে অবশ্য ব্যবহার্য্য; তরিতরকারি সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। মুগ, মশুর ও ছোলার ডালের যূষ ব্যবহার করা চলে; কিন্তু দুষ্পাচ্য দ্রব্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ঔষধ প্রয়োগকালে দুধের ব্যবহার নিত্য প্রয়োজন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্নস্বরূপে এক ছটাক চাউলের সুসিদ্ধ ভাত গলিতবৎ দ্বিগুণ মাত্রায় অর্থাৎ এক ছটাক মাত্রায় ব্যবহার্য্য। তরিতরকারি যথাসম্ভব অল্প মাত্রায় মণ্ডবৎ সুপিষ্ট অবস্থায় ব্যবহার্য্য। তৃতীয় সপ্তাহে উহার তিনগুণ মাত্রায় অর্থাৎ দেড় ছটাক চাউলের অন্ন ব্যবহার্য্য। চতুর্থ সপ্তাহে উহার চতুর্গুণ অর্থাৎ দুই ছটাক মাত্রায় চাউলের ভাত সেব্য। পঞ্চম সপ্তাহে উহার পাঁচগুণ অর্থাৎ আড়াই ছটাক মাত্রায় সেব্য। ষষ্ঠ সপ্তাহ হইতে স্বাভাবিক মাত্রায় অন্ন পানীয় ব্যবহার করিতে হইবে। প্রত্যহ দুই বারের বেশী এই অন্ন গ্রহণ করা চলিবে না। অন্নের ফেনাংশ বাদ দেওয়া ভাল নহে, কারণ, তাহাতে সংস্কার করা অন্ন ও পানীয় উভয়ই ব্যবহার করা হইবে। যকৃৎকে কোনরূপে ভারাক্রান্ত হইতে না দিলে এই জ্বরের পুনরাবৃত্তি অথবা কালাজ্বর প্রভৃতি দুরন্ত রোগ আসিতে পারে না। প্লীহাযকৃতাদি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লৌহভস্ম বা পারদঘটিত রসায়ন ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। রোগের সুপ্তিকাল এক মাস। সপ্তাহে এক বার সুসিদ্ধ গরম জলে স্নান ও তাহা সপ্তপানার্থ ব্যবহার। ৩৫ দিন এই ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহারে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। পূর্ণবয়স্কের মাত্রা এক পোয়া চাউল ধরিয়া মাত্রা নির্ণয় করা হইয়াছে। বালকের পক্ষে মাত্রা তদনুযায়ী অথবা শ্রমজীবীর পক্ষে মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ রোগে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন একেবারেই নিষিদ্ধ। রোগের সুপ্তিকালে অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন সুসিদ্ধ জলে উষ্ণস্বেদনবৎ স্নানে লোমকূপ পরিষ্কার থাকে। মস্তকে শীতল জল ব্যবহার বিধেয়।

এ রোগে সাগু, বার্লি, হর্লিক্স প্রভৃতি পথ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। আজকাল এগুলিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। স্বরূপতঃ ইহারা লঘুপাক, এই গুণের অতিরিক্ত ইহাদের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। এগুলির পরিবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রক্তশালি ধান্যজাত চাউল মাত্রাবিচার করিয়া বিভিন্ন আকারে পথ্যরূপে ব্যবহারে পথ্যের অভাব দূর হইবে, এবং দরিদ্রের পক্ষে উহা সহজও হইবে।

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বেদান্তশাস্ত্রী)।

ময়ূরভঞ্জে পুনর্গঠন

গত চৈত্র মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৮) সামন্ত রাজ্য ময়ূরভঞ্জের পুরাতন, বিস্মৃতপ্রায় ও বনাস্তীর্ণ রাজধানী খিচিংএ প্রাচীন মন্দিরের যে পুনর্গঠন-কার্য্য শেষ হইয়াছে, তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কেবল যে এ দেশের রাজনীতিক ও শিল্প-সম্পর্কিত ইতিহাসের নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নহে, পরন্তু যে সকল শিল্পী পুরুষানুক্রমে একইরূপ কার্য্য করায় সেই কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের অনাদৃত বংশধরগণ আজও কিরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পুনর্গঠিত মন্দির যে ভগ্নদশায় পতিত পুরাতন মন্দিরের অবিকল অনুরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অংশে এখনও গবেষণার আলোকপাত হয় নাই। কি কি কারণে ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ-রাজপরিবার খিচিং ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে রাজধানী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে যে ঐ স্থানে এককালে বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অর্দ্ধাংশের, কেওঞ্জরের ও কোলহানের রাজধানী ছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। এই স্থান নদীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় শত্রুর আক্রমণ প্রহত করিবার পক্ষে স্বাভাবিক সুবিধা সম্ভোগ করিয়াছিল এবং ইহার স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, যে সকল শিল্পী মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বিশেষ যাঁহারা প্রধান মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন—তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে আনীত হইলেও মন্দিরের পরিকল্পনা গৌড়ীয় (বাঙ্গালা ও বিহার) শিল্পে শিক্ষিত শিল্পীর; সেই কারণে এবং এ দেশের শিল্পীদিগের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন হইতে আদর্শলাভের স্বাভাবিক প্রবণতায় খিচিংএর মন্দির-শিল্পে অভিনবত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। যিনি এই মন্দিরের কার্য্যে লোকনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বাহিরের কোন সংস্কারকেন্দ্র হইতে আসিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উড়িষ্যার শিল্পীদিগকেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই এবং সেই জন্যই খিচিংএর মন্দিরগুলি ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপই হয় নাই।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি যে বহু দিনের অনুশীলনফল, তাহা বলা বাহুল্য। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি ৫০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত :—

প্রথম—(খৃঃ ৫০০ হইতে খৃঃ ৬০০)
- সিদ্ধেশ্বর
- কেদারেশ্বর
- কপিলেশ্বর

দ্বিতীয়—(খৃঃ ৬০০ হইতে খৃঃ ৭৫০)
- অদস্ত বাসুদেব
- বৃহৎমন্দির
- ভাস্করেশ্বর

তৃতীয়—(খৃঃ ৭৫০ হইতে খৃঃ ৯৫০)
- মুক্তেশ্বর
- কণার্ক
- গৌরীদেবী
- ব্রহ্মেশ্বর
- পরশুরামেশ্বর
- বৈতাল দেউল
- রাজরাণী

চতুর্থ—(খৃঃ ৯৫০ হইতে ১২০০)
- কণার্ক মন্দিরের ভোগমণ্ডপ
- ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপ
- ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির
- পুরীর মন্দির

উড়িষ্যার মন্দিরসমূহ যে চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাও ক্রমাভিব্যক্তির ফল। যদি খিচিংএ মন্দিরগুলি উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের অনুকরণে গঠিত হইত, তবে আমরা সে সকলে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারিতাম না।

১৮৭৪-৭৫ ও ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রত্ন-বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারল মেজর-জেনারল কানিংহামের নির্দ্দেশে পরিদর্শনে যাইয়া তাঁহার সহকারী মিষ্টার বেগলার খিচিংএর গুরুত্ব অনুমান করেন। তিনি ঐ বৃহৎ গ্রামে চারি দিকে পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন লক্ষ্য করেন। তিনি তৎকালেই অযত্নে ও অনাদরে ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলির উল্লেখ করেন।

তাহার বহু দিন পরে নদীর ভাঙ্গনে কতকগুলি পুরাতন মুদ্রা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে এবং খিচিং আবার লোকের

মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তখন মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র ময়ূরভঞ্জের মহারাজা। তাঁহার বিদ্যানুরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি খিচিংএর পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ভারত সরকারের পুরাবস্তু বিভাগে কর্ম্মী চাহিলে তৎকালীন ডিরেক্টার-জেনারলের নির্দ্দেশে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তথায় গমন করেন এবং বর্ত্তমান কালোপযোগী ব্যবস্থায় খনন ও অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ হয়। ময়ূরভঞ্জের প্রত্ন-

কুটাইটুণ্ডী মন্দির—পুনর্গঠিত

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুত পরমানন্দ আচার্য্য ও শ্রীযুত শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বসু চন্দ মহাশয়কে সর্ব্ববিধ সুবিধা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

যাহাতে স্থানটি খনন করা সম্ভব হয়, সেই জন্য মহারাজার নির্দ্দেশে "ঠাকুরাণী"কে স্থানান্তরিত করিয়া একটি ঘরে রক্ষা করা হয়, এবং তীর্থযাত্রীরা তথায় তাঁহাকে দর্শন করিতে ও পূজা দিতে থাকেন। খিচিং অবজ্ঞাত হইলেও সময় সময় তথায় তীর্থযাত্রীর অভাব হইত না। চন্দ্র-শেখরের ও কুটাইটুণ্ডীর মন্দিরদ্বয় সংস্কৃত হইবার পরে বর্ত্তমান মহারাজা—প্রতাপচন্দ্র খিচিংএর স্থাপত্য-পদ্ধতিতে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "ঠাকুরাণীর" মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে নূতন মন্দিরের ভিত্তি রচিত হইবার পর মহারাজা অভিমত প্রকাশ করেন, সম্ভব হইলে—পুরাতন ও ইতস্ততঃ পতিত উপকরণে নূতন মন্দির রচনা করা হউক। চন্দ্রশেখরের ও কুটাইটুণ্ডীর মন্দির অধ্যয়ন করিয়া পরমানন্দ বাবু ও শৈলেন্দ্র বাবু তাহা সম্ভব বলিয়া মত

প্রধান মন্দির—পুনর্গঠিত

প্রকাশ করিলে গঠনকার্য্য আরম্ভ হয়। পুরাতন মন্দিরের প্রস্তর যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়াছে—কেবল যে সকল স্থানে তাহার অভাব ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থানেই নূতন প্রস্তরখণ্ড-সমূহ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু সেগুলিতে কোনরূপ ক্ষোদাই করা হয় নাই। প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

খিচিংএ দুইটি সুরক্ষিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। "ঠাকুরাণী" অর্থাৎ দেবী কিঞ্চকেশ্বরী নামেও অভিহিতা। ইনিই ময়ূরভঞ্জ রাজবংশের কুলদেবী—ইনি চামুণ্ডারূপিণী।

পূর্ব্বে যে মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহারই সম্মুখে "খণ্ডিয়া দেউল" নামে অভিহিত অসম্পূর্ণ মন্দির। মন্দির-প্রাচীর যে পুরাতন ও ভগ্ন মন্দিরের উপকরণ লইয়া

গঠিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত। বোধ হয়, শিখর সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গঠনকার্য্য ত্যক্ত হইয়াছিল।

নিকটে বহু মূর্ত্তি ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় পতিত ছিল। ঠাকুরাণীর মন্দির বেষ্টিত করিয়া এক সময়ে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল—তাহার ভগ্নাংশ তখনও লক্ষিত হইত।

চন্দ্রশেখরের মন্দির তখনও দণ্ডায়মান ছিল। তাহার কটি (ভিত্তি), প্রাচীর (ভিট্টি) ও গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ ছিল—চূড়ার (শিখর) কেবল শেষাংশ পড়িয়া গিয়াছিল। তবে মন্দিরটি হেলিয়াছিল।

মন্দিরসমূহের মধ্যে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। যখন উহা সম্পূর্ণ ছিল, তখন যে উহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য লোককে আকৃষ্ট করিত, তাহা বলা বাহুল্য। উহা যে অবস্থায় ছিল, তাহাতে সমগ্র মন্দিরটি প্রস্তরের পর প্রস্তর খুলিয়া লইয়া পুনর্গঠিত করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

কিরূপ নৈপুণ্যসহকারে প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড চিহ্নিত করিয়া খুলিয়া লইয়া মন্দির আবার গঠিত করা হইয়াছে, তাহা মনে করিলে এই কার্য্যের জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ঠাকুরাণীর মূর্ত্ত অস্থায়ী ঘরে স্থানান্তরিত করার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে মন্দির হইতে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত। ঐ ইষ্টকের মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখা গেল, দেবীমূর্ত্তি যে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা মৃত্তিকার এবং পুরাতন কোন মন্দিরের ভিত্তির অবশেষের উপরে গঠিত। বোধ হয়, যে মন্দিরে এককালে বৃহৎ শিবমূর্ত্তি ছিল, উহা সেই মন্দির। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি দেখিলে বুঝা গেল, মন্দিরটি প্রায় ৩৫ বর্গফিট ও চতুষ্কোণ। মনে হয়, যখন কোন অজ্ঞাত কারণে এই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির ভাঙ্গিয়া যায় তখন—তাহারই উপকরণ লইয়া খণ্ডিয়া দেউল গঠন আরম্ভ হয়। তবে উহা পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর রচিত হয় নাই—সেই মন্দিরের উপকরণ লইয়া তাহার পশ্চাতে রচিত হয়। পুরাতন মন্দিরের ক্ষোদাই করা পাতরের চৌকাট যে এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য প্রস্তরগুলি ব্যবহারে মন্দির-নির্ম্মাণকারীরা যে ভাবে পুরাতন উপকরণের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ঐ সময় বহু মূর্ত্তিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

পুনর্গঠনের পূর্ব্বে মন্দিরগুলির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কুটাইটুণ্ডী মন্দিরের পুনর্গঠনপূর্ব্ব অবস্থার চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মন্দিরের প্রস্তরগুলি যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোন কোন স্থানে মন্দিরের উপর বৃক্ষ জন্মিয়া প্রস্তর স্থানভ্রষ্ট করিয়াছিল।

কুটাইটুণ্ডী মন্দির—পুনর্গঠনের পূর্ব্বে

ঐরূপ অবস্থায় পরিণত মন্দিরের প্রস্তরগুলি খুলিয়া লইয়া মন্দিরের পুনর্গঠনকার্য্যে যে অসাধারণ যত্ন, সতর্কতা ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পরমানন্দ বাবু বা শৈলেন্দ্র বাবু কাহারও এ বিষয়ে পূর্ব্বে আবশ্যক শিক্ষা ও

অভিজ্ঞতা ছিল না—তাঁহারা আপনাদিগের কার্য্যে আগ্রহ-হেতু কায এত যত্নসহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, মন্দিরের পুনর্গঠনকার্য্য আশাতীতরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

যে সকল মূর্ত্তি অযত্নে ইতস্ততঃ পতিত ছিল, সে সকলের কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সকলগুলির সকল অংশ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে ভগ্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া মূর্ত্তিটির পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছে। একটি হরমূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত ছিল এবং মূর্ত্তির বক্ষোদেশের একাংশ খণ্ডিয়া দেউলের প্রাচীরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সন্ধান করিয়া অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া মূর্ত্তিটির একটি পদ ব্যতীত আর সবই পুনর্গঠিত করা সম্ভব হইয়াছে।

খিচিংএ যে ভাবে কায হইয়াছে, তাহার সামান্য উল্লেখ আমরা যাহা করিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়—এ দেশের শিল্পীরা এখনও সুযোগলাভ করিলে তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে—কেবল সুযোগের অভাবেই তাহা সম্ভব হইতেছে না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে পুরাকীর্ত্তি অনাদৃত অবস্থায় ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকলের পরীক্ষা যথা-সম্ভব শীঘ্র হওয়া প্রয়োজন—নহিলে অনেক সুরক্ষিত হইবার উপযুক্ত শিল্পকীর্ত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

সকল ক্ষেত্রে যে ময়ূরভঞ্জ দরবারের মত অর্থব্যয় বা কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন সম্ভব হইবে তাহা না হইতে পারে; কিন্তু যে স্থানে যেরূপ সম্ভব তাহা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মরু-মায়া

মরু ওঠে মুঞ্জরি কোন্ মায়াতে—
বুঝি নবীন পরশ পেয়ে শ্যাম কায়াতে!
হেরি রঙীন্ ধূলার শোভা নাহি সেখানে,—
কেন আবীর-গুলাল তবু ছড়ায় প্রাণে!
সেথা' বর্ষার মেঘে নাচে দিগঙ্গনা,
পুনঃ আলোকের ঝল্‌কানি করে বিমনা।
সেথা' কনক-চাঁপার কোনো নাহি ফুলবন,
নাহি বকুল-ছড়ানো বন-বীথি-আবরণ।
তবু অরুণ-কিরণসনে মাধুরী আসে,
মাতে সন্ধ্যা যে নাম-হারা কুসুম-বাসে।

কিছু সঞ্চিত নাহি রয় মরুভূমিতে,—
কোথা' ঝড় আসি বালু-জাল রহে বুনিতে।
হেথা' মহাকাল করে তপ নিত্য জাগি,—
যেন কঠোর সে-ধ্যান মহামায়ার লাগি'!
যবে শান্ত রহেন তিনি স্তব্ধ মরু,
কভু রুদ্র-ডিমি-ডিমি বাজে ডমরু।
হেথা' এমনি খেলাই নিতি খেলে মহাকাল।
বাজে মোহন বাঁশরী কভু বিষাণ ভয়াল!
তবু কা'র কৃপা-ধারা বহে ফল্গু-সমা!
চির মরু-বুকে লুকানো সে মায়া-সুষমা!

বাণীকুমার।

সাবধান

মুখের মধ্যে আলপিন পোরো? খবর্দার! এমন কাজ করো না! কখন্ শেষে আলপিনটি গিলে ফেলবে! গিলে ফেললে সে-আলপিন তোমার সারা দেহের মধ্যে চলে বেড়াবে—সারা জীবন ধরে; এবং তেমন দুর্ভাগ্য যদি হয়, তাহলে ও-আলপিন এমনি চলতে চলতে কোনো মুহূর্তে যদি ফুশফুশে কিম্বা হার্টে বেঁধে, তাহলে স্বয়ং শিবের সাধ্য থাকবে না যে সে-বিপদে রক্ষা করবেন!

শুধু আলপিন নয়। অনেকের অভ্যাস, সেলাই করতে করতে অনেক সময় ছুঁচটিকে দাঁতে চেপে সেলাই দেখেন, প্যাটার্ণ দেখেন। এ

পাঁজরায় সেফটি-পিন্

সেই আগুন নিয়ে খেলার মত অন্যায়, তা তাঁরা বোঝেন না! দৈবাৎ ও-ছুঁচটি যদি গিলে ফেলেন, তাহলে সর্ব্বনাশ। ও ছুঁচ সারা দেহ-মধ্যে চলে বেড়াতে পারে। এবং আলপিনের মত যদি ও-ছুঁচ ফুশফুশে কিম্বা হার্টে বেঁধে, তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত!

আমেরিকায় এক বার এক ভদ্রলোকের খুব বেশী কাশি হয়েছিল। কাশির সঙ্গে জ্বর। বাড়ীর ডাক্তার দেখে বললেন, ব্রঙ্কাইটিশ। ব্রঙ্কাইটিশের চিকিৎসা চললো, কিন্তু রোগীর অবস্থা দিন-দিন কাহিল হতে লাগলো। অবশেষে বড় ডাক্তারের ডাক পড়লো। তিনি এসে বহু ক্ষণ নানা ভাবে রোগীর পরীক্ষা করলেন; করে বললেন, এক্স-রে ফটো নিতে হবে। ঠিক ব্রঙ্কাইটিশ বলে মনে হচ্ছে না। এক্স-রে ফটো নেওয়া হলে বড় ডাক্তার দেখলেন ব্রঙ্কাইটিশ নয়! বুকে বিঁধে আছে একটি সেফ্‌টি-পিন। রোগী বললেন, আশ্চর্য্য! ক' বছর আগে দৈবাৎ একটি সেফ্‌টি-পিন গিলে ফেলেছিলুম! সেটা আর বার করা হয়নি। তখন সার্জ্জন এসে অস্ত্রোপচার করে সে সেফ্‌টি-পিনটিকে বার করে দিলেন—রোগী তখন সেরে ওঠেন।

একটি মহিলার পায়ে কাচের টুকরো ফুটেছিল। সেই কাঁচের টুকরো বার করতে গিয়ে তার সঙ্গে বেরুলো এক-টুকরো ঘোড়ার বালামচি! মহিলার চক্ষু-স্থির! তিনি বললেন,—প্রায় দশ বৎসর

ঘোড়ার বালামচি

আগে তিনি ঐ বালামচিটি দৈবাৎ গিলে ফেলেছিলেন! অর্থাৎ যখন তিনি বালিকা ছিলেন, তখন তাঁর খেলার জন্য ছিল একটি কাঠের ঘোড়া—সেই ঘোড়ার বালামচি ওটি!

এ-সব কথা শুনে আশ্চর্য্য লাগছে? কি করে এই ছুঁচ-আলপিন আর বালামচি দেহের মধ্যে এমন চলাচলের পথ পায়? তাছাড়া গিলে-ফেলা পিন, ছুঁচ, বালামচি দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যায় কি করে? এ সব ব্যাপারে এমনি নানা প্রশ্ন মনে জাগে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই ছুঁচ-আলপিন আর বালামচি প্রভৃতি ঠিক খাবারের মতো পাকস্থলীতে যায়। তাছাড়া আবার আমাদের দেহের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে, আমাদের শ্বাসনলীর মধ্য

দিয়েও চলাচল করতে পারে। বাতাস যে-পথে আমাদের ফুশফুশে যায়, সে-পথও এদের জন্য মুক্ত থাকে! আধ মিনিটের মধ্যে রক্ত আমাদের দেহের সমস্তটা চক্রাকারে ঘুরে আসতে পারে। হাড়-পাঁজরা ও-সব জিনিষের চলায় বাধা রচনা করতে পারে না। পেশী এবং তন্তুর (tissues) গা পিছলে এ সব সামগ্রীর গতি অব্যাহত থাকে। পেশীর প্রসারে এবং সঙ্কুচনে, হৃদয়ের স্পন্দনে, শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং পরিপাক-ব্যাপারে আমাদের অঙ্গের যে নড়াচড়া হয়, সে নড়াচড়ার দোলা পেয়ে এই সব ছুঁচ-আলপিন বা গলাধঃকৃত ছোটখাট সামগ্রী দেহমধ্যে কোথায় গিয়ে আস্তানা নেবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!

ছুঁচের গতির সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলছি। এক জন ভদ্র-মহিলা সেলাই করবার সময় ছুঁচটি দাঁতে চেপে সেলাইয়ের ঘর গুণছিলেন, এমন সময় একটি হাঁচি! ব্যস্, যেমন হাঁচা, অমনি ছুঁচটি গেল চলে কণ্ঠ-নলীর মধ্য দিয়ে একেবারে দেহের

ইলেক্‌ট্রিক্-বাল্‌ব গেলা

মধ্যে! ডাক্তার এলেন—কোনো উপায় হলো না! শেষে দশ দিন পরে বুকের নীচে পাঁজরার পাশ দিয়ে চামড়া ফুঁড়ে সে-ছুঁচের মুখ বেরুলো। তখন ছুঁচটির উদ্ধার-সাধনে বেগ পেতে হলো না! কোথা দিয়ে কি করে ছুঁচের মুখ বেরুলো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল তার সে গতি-রহস্য সমাধান করতে পারেননি।

আর একটি ভদ্র-মহিলা এমনি ছুঁচ গিলে ফেলবার পর তাঁর দেহ-মধ্যে সে ছুঁচটি তিন-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঐ ভাঙ্গা ছুঁচের তিনটি টুকরো পর-পর তিন বারে দেহের তিন জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথম টুকরোটি বেরোয় এ-দুর্ঘটনার এক মাস পরে—তলপেট থেকে। তার আরো কুড়ি-বাইশ দিন পরে দ্বিতীয় টুকরোটি বেরুলো তলপেটের নীচে থেকে; তার আবার এক মাস পরে তৃতীয় টুকরোটি বেরুলো পাঁজরার পাশ থেকে। এই শেষ-টুকরোটি ছিল ছুঁচের ছুঁচলো মুখ বা ডগা! ডগাটুকু ছুঁচলো হয়েও এত বিলম্বে গায়ের চামড়া ফুঁড়ে বেরুলো কেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল সে সম্বন্ধে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি!

এক জন মিস্ত্রীর পায়ে টিনের একটু কুচি বিঁধে ছিল। বহু চেষ্টায় সে সে-টুকরো বার করতে পারেনি। শেষে এক মাস পরে তার হাঁটুতে হলো ফোড়া—সেই ফোড়া ফেটে বেরুলো সেই টিনের কুচি!

কুকুর নিয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারিওয়ার্দেন বহু পরীক্ষা করেছেন—বহু বার বহু কুকুরের শিরার মধ্য দিয়ে তার দেহে লোহা, টিন, এলুমিনিয়ামের টুকরো সাঁধ করিয়ে প্রত্যেক বারই তিনি দেখেছেন, সেগুলো কুকুরদের হার্টে গিয়ে পৌঁছেছিল! বন্দুকের গুলী যদি কারো দেহ থেকে বার করা না যায়, তাহলে সেগুলিও দেহের যে জায়গাতেই বিঁধুক, শেষে তার হার্টে গিয়ে পৌঁছুবে—অবশ্য লোকটি বন্দুকের সে-গুলী খেয়ে বেঁচে থাকলে।

অষ্ট্রেলিয়ায় একটি দশ বৎসর বয়সের ছেলে এক বার একটি পেরেক গিলে ফেলেছিল! পেরেকটি কোনো ডাক্তার বার করতে

পেটের মধ্যে যেন মিউজিয়াম!

পারেননি। ছেলেটির জ্বর হলো। প্রবল জ্বর। সেই সঙ্গে দারুণ কাশি! ছেলেটি কিছু খেতে পারে না—অর্থাৎ যায়-যায় অবস্থা! ছেলেটির বাপ খুব ধনী। তিনি ছেলেকে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকায় ছুটলেন। হাজার মাইল পথ। আমেরিকায় ছিলেন ডক্টর জ্যাফ। এ সব উপসর্গে তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ডক্টর জ্যাফ ছেলেটির ফুশফুশ থেকে সে পেরেক বার করে দিলেন। এমন অস্ত্রোপচার তিনি করেছিলেন যে ছেলেটির রক্তপাত হয়নি!

এ সব হলো দৈবাতের কথা। কানাডায় এক ভদ্র-মহিলার ভারী বিশ্রী স্বভাব ছিল। তিনি ছুঁচ পিন বোতাম—যা পেতেন, গলাধঃকরণ করতেন। শেষে এক বার পেটের ব্যথায় অস্থির হন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের ডাক্তার এক্স-রে ফটো নিয়ে দেখেন, মহিলার পাকস্থলীটি যেন মিউজিয়াম! অর্থাৎ কি যে সেখানে নেই! অস্ত্রোপচার হলো। এবং অস্ত্র করে' তাঁর পাকস্থলী থেকে পাওয়া গেল প্রায় ২৫৩৩টি জিনিষ! জিনিষগুলি? বোতাম, আলপিন, ছুঁচ, মোজার গাটার-বাঁধা, কাচের একরাশ বীড্, নিব, মায় মাথার কাঁটা পর্য্যন্ত! পাঁচ-সাত বছর ধরে ভদ্র-মহিলা এগুলিকে পাকস্থলীতে পুষে রেখেছিলেন, অথচ তাঁর অস্বস্তি হয়নি এত-কাল!

চিকিৎসকেরা বলেন, বাইরের কোনো জিনিষ পেটে গেলে আমাদের দেহ যদি সে-জিনিষকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে হজম করতে না পারে, তাহলে সে-জিনিষকে যেমন করে হোক ঠাঁই করে দেয়! এল্ পাশো নামে এক জন ম্যাজিসিয়ান্ ম্যাজিক দেখাবার সময় টপটপ করে কাচের মার্বেল, পিতল ও লোহার গুলী, মায় বিজলী-বাতির বাল্‌ব গিলে ফেলতেন—যেন বোঁদে, কিম্বা ক্ষীরের গুঁজিয়া, বা রসগোল্লা গিলছেন! সেগুলি তাঁর পেটের মধ্যেই থাকতো। অথচ ভদ্রলোক সে জন্য শরীরে

এতটুকু গ্লানি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি! চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁর দেহের ভিতরটা এ-সব সামগ্রীকে জায়গা করে দিয়েছিল!

কলকাতায় এবং বাঙ্‌লা দেশের নানা জেলায় বাঙালী ম্যাজেসিয়ান্ খগানন্দ-মশায় ম্যাজিক দেখাবার সময় আস্ত কাচের গ্লাস চিবিয়ে খেতেন—আমরা স্বচক্ষে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। তার উপর লোহার পেরেক, আলপিন গিলে ফেলতেন একেবারে অজস্র ভাবে। বহু বৎসর এ ম্যাজিকে তিনি কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি বোধ করেননি। কিন্তু ক' বছর আগে হঠাৎ এক বার এমনি ম্যাজিক দেখাবার পর তিনি পেটের যাতনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন; এবং হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন! হাসপাতালে তাঁর উদরে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারে তাঁর পেট্র থেকে রাশীকৃত কাচের টুকরো, পেরেক, আলপিন প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছিল। অস্ত্রোপচার করেও ভদ্রলোককে কিন্তু বাঁচানো যায়নি! ঐ দুঃসাহসিকতার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এ-কাজে যত বাহাদুরি থাকুক, এমন বাহাদুরির দুর্ম্মতি যেন তোমরা কখনো করো না। এ বদ্ অভ্যাস যদি তোমাদের মধ্যে কারো থাকে, অবিলম্বে তা বর্জ্জন করো। এর ফল সাংঘাতিক, জেনো।

বাঁচার মতো বাঁচা

বাঁচার মতো বাঁচতে কে না চায়? তোমরাও তা চাইবে, নিশ্চয়! কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচতে হলে শুধু সুস্থ দেহ, লেখাপড়ায় পাশ সেরে বড় চাকরিতে মোটা মাইনে, কিম্বা ওকালতী-ডাক্তারী বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু টাকা রোজগার করে মোটর-গাড়ী, দাস-দাসী, বড় বাড়ী পাওয়া—এ সব হলেই চলবে না। মনকে উদার করা চাই। পৃথিবীতে প্রতিদিন কোথায় কি ঘটছে, সে সব খবর রাখতে হবে; কালের অগ্রগতির সঙ্গে মনকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে। অসংযম নয়, অনাচার নয়, খেয়াল-স্বার্থ নয়, অসাধুতা নয়। এ সব নীচতা-হীনতার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে বাস করতে হবে!

তা করতে হলে কি চাই, জানো?

প্রথমতঃ দেহখানিকে সুস্থ রাখা চাই। তা রাখতে হলে আহারে-বিহারে যেমন সংযত হতে হবে, তেমনি নিত্য একটু-আধটু ব্যায়াম-সাধনা, পায়ে হেঁটে প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যায় নির্ম্মল বাতাসে খোলা জায়গায় খানিকটা বেড়ানো, খেলাধূলায় অনুরাগ—এ সব চাই। খেলাধূলার মানে, বাজি রেখে তাস-পাশা খেলা নয়। সে খেলা কুঁড়ের খেলা! বাজি রেখে যে-খেলা, সে-খেলাকে যতই ভদ্র পোষাক পরাও, সে খেলা জুয়া-খেলার সামিল। তাতে নেশা লাগে। সে নেশায় মনের শান্তি যায়, পয়সা-কড়িও নষ্ট হয়। ও খেলায় এ্যারিষ্টোক্রেশির ছাপ যতই লাগাও, ওতে এ্যারিষ্টোক্রেশি নেই—এ কথা ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখো।

লেখাপড়া শেখা চাই, নিশ্চয়। পাশ করতে হবে। কারণ, পাশ না করলে সংসার-অঙ্গনে কায়েমি ভাবে আসন পাতা শক্ত হবে। তবে চাকরি বা পেশার জন্য যে-লেখাপড়া শেখা, তাকেই যেন শিক্ষার চরম মনে ভেবো না। আমাদের দেশে কত ভালো ভালো 'মাথা' লেখাপড়ার পাশে কৃতিত্ব লাভ করে' পয়সা-রোজগারের জাঁতি-কলের চাপে পড়ে শুধু টাকা-রোজগারের মেশিন বোনে' নিজেদের মাথা খেয়েছেন, তার তালিকা দেখলে শিউরে উঠবে!

যিনি ওকালতিতে খুব পশার করেছেন, তাঁকে দেখবে মক্কেল আর তার মকর্দ্দমার কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। তাঁর চোখের আড়ালে গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত বিচিত্র মনোহর বেশে যাতায়াত করছে, সে-সবের তিনি খবর রাখেন না! ছেলেমেয়ে আনন্দ-হিল্লোল তুলে তাঁর চোখের আড়ালে বড় হয়ে উঠছে! তিনি শুধু তাদের স্কুলের মাইনে, জামা-কাপড়ের দাম আর বই কেনার টাকা জুগিয়ে খালাশ! জগতে কাছারি-আদালত আর মক্কেলের জন্ম লড়াইয়ের বুলিমাত্র নিয়ে তিনি বাস করছেন! একে কি জীবন বলে? এঁরা যতক্ষণ জেগে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্য শুধু ঐ কি করে' পয়সা রোজগার করবেন! পশার আর ব্যবসার মধ্যে যাঁরা এমনি ভাবে ডুবে থাকেন, দেখবে, তাঁদের মনে দিবারাত্রি চিন্তা আর চিন্তা! এ চিন্তায় তাঁরা পাগল হয়ে যেতেন—যদি না ঐ পয়সার মাদুলি হাতে থাকতো!

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" যে ভুবন এমন সুন্দর, সে-ভুবনের সৌন্দর্য্য যদি মানব-জন্ম পেয়ে উপভোগ না করলে, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মাবার কি প্রয়োজন? আহার আর নিদ্রা—সে তো পশুরাও করে। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ,—মানুষের মন আছে,—জীবন্ত মন! সে-মন পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারে।

এ স্বর্গ-রচনার শক্তি মানুষের আছে। এ-শক্তির পরিচয় পাবে যদি চোখ খুলে, মন খুলে পৃথিবীর সঙ্গে মিতালী করতে পারো। এ মিতালী করবার উপায়—লেখাপড়ার বইয়ের বাইরে যে জ্ঞান ও কল্পনার সাগর রয়েছে, সেই সাগরে অবগাহন করা। পড়ো পৃথিবীর যত মনীষীদের লেখা বিজ্ঞান-দর্শন, গল্প-নাটক, উপন্যাস-কাব্য। কাজ-কর্ম্মের মধ্য থেকে খানিকটা সময় করে নাও—এখন, এই বয়স থেকে। এবং সে-সময়টুকুতে পড়ো তোমরা কাব্য-ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি। দেখবে, মনের প্রসার তাতে কতখানি বেড়ে যাবে! নিত্যদিন রুটিন করে খবরের কাগজ পড়ো। এ পড়ায় দেখবে, চিন্তা করতে শিখবে। সে চিন্তা গদ্যে-পদ্যে লেখবার সামর্থ্য হবে। একটি প্রদীপের শিখার স্পর্শে যেমন আর একটি প্রদীপ জ্বলে, তেমনি পরের লেখা বই পড়ে তাঁর চিন্তার শিখা থেকে তোমার মনের চিন্তা প্রদীপ্ত হবে, জাগ্রত হবে!

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "এই সব মূঢ় ম্লান মূখে দিতে হবে ভাষা!" তোমরা জেনো, দেশের চারি দিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যে সব নিরক্ষর নর-নারী বাস করছে—যারা নিজেদের সুখ-দুঃখের উপলব্ধিও করতে পাবে না, তারা তোমাদের মুখ চেয়ে আছে। নিজেদের মনে জ্ঞানের দীপ-শিখা জ্বেলে সে-শিখার স্পর্শে ওদের মনের শিখাকে জ্বেলে দিতে হবে। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বাঁচলে চলবে না—সকলকে বাঁচিয়ে বাঁচতে হবে—তাকেই বলে বাঁচার মত বাঁচা! তোমাদের এমনি বাঁচার মতো বাঁচতে হবে, জেনো!

বিচার

(ঐতিহাসিক গল্প)

রাজপুতানার কথা।

এক পাঠান দস্যুর কাছে যুদ্ধে হেরে টোডার রাজা সুরতান মেবারের এক অংশে বাস করছিলেন। সে রাজ্যের নাম বেদনোর। রাজার এক কন্যা—তারাবাই। কন্যা পরমাসুন্দরী।

মেবারের রাণা রায়মল্ল খুব ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ বলে' সবাই তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতো। আর এই বেদনোর রাজ্য ছিল তাঁর আশ্রিত। রায়মল্লের এক ছেলে। তার নাম জয়মল্ল।

এক দিন—তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। মেবারের ছোট একটি পাহাড়ের কোলে বন। বনে পাখীরা কল-গান করছে। লতা-পাতার ফাঁক দিয়ে সান্ধ্য-সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে। বনের একটি সরু পথ ধরে' শিকারীর পোষাকে সুরতানের কন্যা তারাবাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। তাঁর বাঁ-হাতে ঘোড়ার রাশ, ডান হাতে বল্লম, পিঠে পূর্ণ তূণীর, কাঁধে স্বর্ণ-শরাসন। তারাবাই পিতৃ-দুর্গে ফিরছিলেন।

ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে পথের আর এক দিক থেকে তেজী লাল ঘোড়ায় চড়ে' রায়মল্লের ছেলে জয়মল্ল এসে সেইখানে উপস্থিত হলেন। গোধূলির সোণালী আলোয় গহন বনে রাজ-কন্যাকে দেখে রায়মল্ল মুগ্ধ হলেন! কিছুক্ষণ তারাবাইয়ের দিকে চেয়ে, ভদ্রভাবে তাঁকে একটি নমস্কার করে' আর এক পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে জয়মল্ল চলে গেলেন। রাজকন্যাকে কিন্তু ভুললেন না।

এর কিছু দিন পরে জয়মল্ল এক দিন তার বাবাকে বল্লেন, সুরতানের মেয়েকে তিনি বিয়ে করতে চান। শুনে রায়মল্ল তখনি হাতী সাজিয়ে নিজের এক বন্ধুকে পাঠালেন টোডার রাজার কাছে। বন্ধুর সঙ্গে পাঠালেন খুব দামী হাতীর দাঁতের জিনিষ সুরতানকে নজর দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে সোনার থালায় করে পাঠালেন নারকেল আর একটি ছোরা! রাজকন্যার জন্য পাঠালেন এক ছড়া সাতনরী মুক্তাহার।

বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে হলে রাজপুত রাজাদের মধ্যে প্রথা ছিল, সোনায়-মোড়া নারকেল আর একখানি ছোরা পাঠানো। অপর পক্ষ যদি সে নারকেল গ্রহণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে, এ বিবাহে তাঁর মত আছে। নারকেল না নিয়ে যদি কেউ ছোরাখানা তুলে নেয়, তবে বুঝবে যে, তিনি কুটুম্বিতায় রাজী নন।

যথারীতি বন্দনা করে' রায়মল্লের বন্ধু যখন টোডার রাজার সুমুখে সেই থালা ধরলেন, ধরে মেবারের রাণার ইচ্ছা জানালেন, তখন ছোরা বা নারকেল কোনোটি গ্রহণ না করে' সুরতান সবিনয়ে বল্লেন—রাণাকে বলবেন, আমার দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মত মহৎ ব্যক্তির প্রস্তাব আমি পাবামাত্রই গ্রহণ করতে পারলাম না। এর কারণ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, পাঠান-দস্যুর হাত থেকে যিনি আমার নষ্টরাজ্য উদ্ধার করে' দেবেন, তাঁর হাতে আমি কন্যা দেবো। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙ্গতে পারি না। রাণা বিবেচক। তাঁকে এ কথা বলবেন। তিনি বোধ হয় কিছু মনে করবেন না।

হলো তাই! রায়মল্লকে সব কথা জানাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়ে ছেলেকে ডেকে বল্লেন, শোনো জয়মল্ল, তারাবাইয়ের পিতা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যিনি তাঁর নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করে' দিতে পারবেন, তাঁর হাতে তিনি কন্যা দান করবেন। যদি তারাবাইকে তোমার বিবাহ করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে যাও, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পাঠান-দস্যুকে যুদ্ধে হারিয়ে টোডা-রাজ্য উদ্ধার করে' সুরতানকে দাও গে।

* * * *

হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জয়মল্ল চল্লেন পাঠান-দস্যুকে পরাস্ত করতে। ভীষণ যুদ্ধ হলো। একে একে জয়মল্লের যত সৈন্য ছিল, সব মারা পড়লো। হাতী-ঘোড়া সব নষ্ট হলো। তখন কাপুরুষের মত জয়মল্ল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

রায়মল্লের মাথা হেঁট হলো। রাজপুত-কুলে কলঙ্কের কালি পড়লো! এর চেয়ে জয়মল্ল যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেন, তাহলেও ভালো ছিল। রাজপুতের কাছে প্রাণের চেয়ে মানের দাম অনেক বেশী।

কুলাঙ্গার জয়মল্ল কিন্তু শুধু ভীরুর মত পালিয়ে এসেই ক্ষান্ত হলেন না; চুপি চুপি বেদনোরে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত রাজবাড়ীতে ঢুকে তারাবাইকে চুরি করে' আনবার মতলব করলেন। কিন্তু প্রহরীদের হাতে ধরা পড়তে হলো। তারা তাঁকে ধরে' রাত্রির মত একটা গারদ-ঘরে বন্ধ করে' রাখলো।

সকাল বেলায় সুরতান সভায় বসেছেন। তারা জয়মল্লকে নিয়ে রাজসভায় হাজির হলো। জয়মল্ল যুদ্ধে হেরে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছে, সে-কথা সুরতানের কাণে আগে এসে পৌছেছিল। তার পর যখন তিনি তার এই নতুন কীর্ত্তির কথা শুনলেন, তখন লজ্জায়, ক্ষোভে, রাগে অধীর হলেন। বল্লেন,—রাজপুত-কুলের এমন যে কলঙ্ক, এমন যে নির্লজ্জ নীচ নরাধম, তার মৃত্যুই মঙ্গল। যাও জল্লাদ, ওকে মশানে নিয়ে যাও।

মশানে অসংখ্য রাজপুত-বীরের সুমুখে জয়মল্লের মাথা কেটে ফেলা হলো।

* * * *

এ-কথা মেবারে যে শোনে, সে-ই শিউরে ওঠে! ভাবে, সুরতানের কি সাহস, কি স্পর্দ্ধা! কোথায় মেবারের পরাক্রান্ত পুরুষসিংহ অমিত-তেজা রাণা রায়মল্ল! আর কোথায় লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, রাজ্যচ্যুত ক্ষুদ্র টোডার নগণ্য রাজা সুরতান! সেই রায়মল্লের একমাত্র পুত্র জয়মল্ল—তাকে হত্যা!

সকলেই বললে, শনি রন্ধ্রগত হলে মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি এমনি হয় বটে। কেউ বললে, সুরতানকে শূলে দেওয়া হবে। কেউ বললে, না, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হবে। সবাই ভয়ে-ভয়ে রাজপুত্রের হত্যার কথা নিয়ে কাণাকাণি করে; মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না!

কিন্তু এ-কথা বেশী দিন চাপা রইলো না। টোডার রাজার এক শত্রু এসে এক দিন খুব আড়ম্বর করে' রায়মল্লকে ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়ে দিলে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়মল্লের পলায়নের কথা রাণা গম্ভীর মুখে শুনলেন। তার পর শুনলেন, কি করে' রাত্রিবেলায় চোরের মত সে সুরতানের অন্তঃপুরে ঢুকে তারাবাইকে চুরি করে আনবার চেষ্টা করেছিল!

শুনতে শুনতে তাঁর কপাল কুঁচকে এলো! তার পর সবের শেষে যখন তাঁকে শোনানো হলো যে, সুরতানের হুকুমে তাঁর ছেলের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তখন হঠাৎ তাঁর মুখ প্রশান্ত হলো, দু'চোখে ফুটলো উজ্জ্বল দীপ্তি। তিনি বল্লেন,—বাঁচলাম! টোডার রাজা যথার্থই রাজপুত। বিচার কাকে বলে, তিনি জানেন! আজ থেকে তিনি আমার পরম বন্ধু!

কোথায় শূল, কোথায় ডালকুত্তা, আর কোথায় রায়মল্লের মুখে এই কথা! সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ! দূত গেল টোডার রাজা সুরতানের কাছে রাণার সশ্রদ্ধ নিমন্ত্রণ জানাতে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

যৌবন-সাধনা

একালের ধনী ও বিলাসী ঘরের মেয়েরা বিদেশী আদর্শে আজ গৃহ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেকালে আমাদের দেশে খুব ধনাঢ্য গৃহের মেয়েরাও গৃহ-কর্ম্মকে হীন বলিয়া ত্যাগ করেন নাই। গৃহ-কর্ম্ম করায় দেহের যে-ব্যায়াম সাধিত হইত, সে-ব্যায়ামের জোরে তাঁদের দেহ স্বাস্থ্যের শ্রী-ছাঁদে যেমন সুগঠিত থাকিত, তেমনি সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে তাঁরা ছিলেন দীপ্তিময়ী। আজ আলস্য-বিলাসে গা ঢালিয়া একালের মেয়েরা স্বাস্থ্য হারাইতেছেন, এবং স্বাস্থ্যহানি-বশতঃ তাঁদের দেহের সে শ্রীছাঁদে তারা যেমন বঞ্চিত, তেমনি রূপ-দীপ্তির অভাবে পরিম্লান! গৃহ-কর্ম্ম যখন করিবেন না, তখন বিদেশী আদর্শে ব্যায়াম-সাধনার প্রয়োজন অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে আজ অপরিহার্য্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার কারণ একাধিক। নানা দিকে এ দেশের পুরুষের আজ চেতনা জাগিলেও অন্তঃপুরিকাদের দেহ-মনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের ঔদাস্য এখনো সীমাহীন রহিয়া গিয়াছে! পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্ব্বে বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, অন্দরের সঙ্গে সদরের ছিল শুধু পাওনা আদায়ের সম্পর্ক! মেয়েরা অন্দরের অন্ধকার কোণে বসিয়া পুরুষের সেবার অর্ঘ্য রচনা করিবে, পুরুষের স্বাচ্ছন্দ্য সাধনা করিবে, পুরুষের সুখের জন্য যদি জান্ দিতে হয়, তাও দিবে! মেয়েরা যে জীবন্ত এবং মানুষ, তাঁদেরো দেহ আছে, মন আছে, সে-মনে সুখ-দুঃখ-বোধ আছে, এ কথা পুরুষ যেন বিশ্বাস করিত না!

সৌভাগ্যক্রমে এখন সে-ভাব অনেকখানি ঘুচিয়াছে। আমরা অন্দরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছি, জানলা খুলিয়া দিয়াছি। মেয়েরা আজ মাঠে-ঘাটে বাহির হইতেছেন। কিন্তু তাঁদের দেহ-মনের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ্য নাই! ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, সিনেমা-গৃহে হৃষ্টপুষ্ট স্বামি-পুত্র-ভাইয়ের পাশে জায়া-জননী-ভগিনীর কঙ্কালমূর্ত্তি দেখিলে শুধু লজ্জা নয়, আতঙ্ক হয়! ইঁহাদের উদ্দেশেই কি কবি বলিয়াছেন—

তুমি এসো এসো নারি
আনো তব হেম-ঝারি!

কিন্তু কবিত্ব নয়! বাঙলার অন্তঃপুরিকাদের বলিতেছি, আপনারা চাড় করিয়া স্বাস্থ্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করুন! সিনেমা বিলাস বলুন, বা সজ্জাভূষণের সমারোহ বলুন—দেহকে যদি পরিপুষ্ট স্বাভাবিক ছাঁদে গড়িয়া তুলিতে না পারেন, তাহা হইলে কিসের জোরে বাঁচিবেন! কোনো মতে 'রুগ্ন' দেহ লইয়া বাঁচিলেও মানুষের সমাজে বাহির হইতে হইবে তো! তখন নিজেদের দেহের বিশ্রী ছাঁদের জন্য, অস্বাস্থ্য-জনিত জীর্ণতার জন্য মাথা তুলিতে পারিবেন না যে!

স্বাস্থ্য-চর্য্যায় দেহে জরা ঘেঁষ দিতে পারে না, এবং পারিবে না—এ কথা খেয়ালী বা বানানো নয়—দেহতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞদের কথা! মনের যৌবনকে শিক্ষা-সংস্কৃতির জোরে যেমন চিরস্থায়ী রাখা যায়, দেহের যৌবনকেও তেমনি চিরস্থির রাখা যায় ব্যায়ামে! আজ আমরা সেই যৌবন-সাধনার কথা বলিতেছি—যে-সাধনায় দেহের শ্রী-সৌন্দর্য্য কোনো দিন ঝরিবে না; যৌবন চিরদিন অঙ্গে অঙ্গে লাবণী-লীলায় ললিত ছন্দে আবদ্ধ থাকিবে!
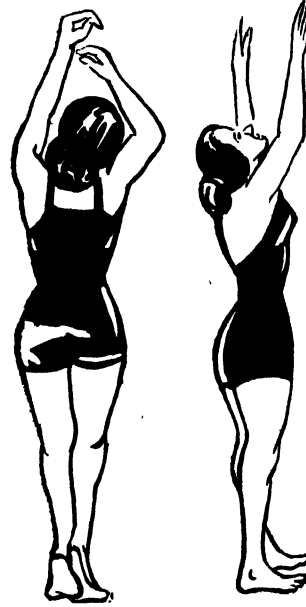
আমাদের দেহকে সবল সিধা রাখিতে হইলে ঘাড়কে মজবুত করা চাই। ঘাড়ের জোর বড় জোর। সে জোর এবং তার সঙ্গে ঘাড় ও সমগ্র দেহকে যদি সুছাঁদে রক্ষা করিতে চান, সেই সঙ্গে দু'টি হাতকে কমনীয় শক্ত-সমর্থ ও কোমল-রমণীয় রাখিতে চান, তাহা হইলে পঞ্চ ব্যায়ামের প্রয়োজন।

১। যেন দড়ি ধরিয়া উপরে   ২। দু' ফুট দূরে

১। যেন দড়ি ঝুলানো আছে, এবং সেই দড়ি ধরিয়া যেন দেওয়াল বহিয়া উপরে উঠিতে চান, এমনি ভঙ্গীতে দেওয়ালের দিকে সামনা-সামনি দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া দু'হাত ঊর্দ্ধে তুলুন। দু'হাতে দেওয়াল স্পর্শ করিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিবার সময় দুই পায়ের গোড়ালি তুলিয়া শুধু পায়ের আঙুলগুলির উপর ভর রাখিয়া (১নং ছবির মতো) দাঁড়াইবেন। তোলা দু'হাত ঊর্দ্ধে মুষ্টিবদ্ধ থাকিবে—যেন দু'হাতের মুঠায় দড়ি ধরিয়াছেন এমনি ভাবে! তার পর এক বার ডান হাত তুলিবেন বাঁ হাত নামাইবেন, তার পরক্ষণেই বাঁ হাত তুলিবেন, ডান হাত নামাইবেন—যেন দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতেছেন! এ ব্যায়াম করিবেন যতক্ষণ না শ্রান্তিভরে দু'হাত অবশ হয়!

২। এবারে দাঁড়ান (২নং ছবির ভঙ্গীতে)। দেওয়াল হইতে দু'ফুট দূরে দাঁড়াইবেন। এবার দু'হাত প্রসারিত করিয়া দিন, দু'হাতে

দেওয়াল স্পর্শ করা চাই। এবার পা দু'খানিকে সুদৃঢ় রাখিয়া অর্থাৎ না নড়িয়া উর্দ্ধ দেহকে সামনে দুলাইবেন। দেহ দুলাইবার সময় এক বার ডান হাত উপরে উঠিবে, বাঁ হাত নীচে নামিবে—পরক্ষণে বাঁ হাত উপরে উঠিবে, ডান হাত নীচে নামাইবেন। এ ব্যায়ামও করা চাই যতক্ষণ না শ্রান্তিবোধ করেন! ব্যায়ামের সময় দু'হাত যেন কোন সময়ে দেওয়ালের স্পর্শ-ছাড়া না হয়। আলতো ভাবে দেওয়াল স্পর্শ করিতে হইবে।

৩। ৩নং ছবির মতো টুলে চেয়ারে বা রোয়াকে বসুন। দুই পা সামনে ঝলাইয়া দিন তাব পর দুই হাত তুলিয়া মাথার উপর রাখুন (৩নং ছবি দেখুন)। ডান হাত দিয়া বাঁ হাতের কব্জী এবং বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের কব্জী ধরুন। তার পর এমনি ভাবে আবার দুই হাত ধীরে ধীরে নামান—তলপেট পর্য্যন্ত। নামাইয়া তার পরক্ষণে আবার মুখের সামনে দিয়া দুই হাত এমনি আবদ্ধ ভাবে মাথার উপর রাখিবেন। রাখিবাব পর এমনি ভাবে আবদ্ধ দুই হাত যতখানি সম্ভব মাথার পিছন দিক্ পর্য্যন্ত যাইবে। বসিবার সময় বাঁ পা থাকিবে ডান পায়ের হাঁটুর উপর (৩নং ছবি দেখুন)। এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ বার।

৩। টুলে বসুন

৪। এবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। দু'পা থাকিবে ৪নং ছবির ভঙ্গীতে! দু'খানি বাঁধানো মোটা বই দু' পাশে রাখিবেন!
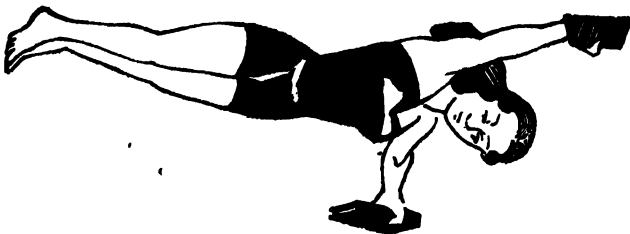
৪। হাতে বইয়ের ভার

শুইয়া বই দু'খানি দু' হাতে নিন (৪নং ছবির ভঙ্গীতে)। এবার বই-সমেত এক হাত তুলুন উর্দ্ধে—বই-সমেত অপর হাত এখন থাকিবে মেঝে স্পর্শ করিয়া। এক হাত যখন উঠাইবেন, অপর হাত থাকিবে নীচে,—ঐ ছবির মতো। এ ব্যায়াম করা চাই যতক্ষণ না দুই হাত শ্রান্তিভরে অবশ বোধ হয়।

৫। এবার দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে লাফ দিতে দিতে এক বার ডান হাত তুলিয়া পিছন-দিক হইতে আনিয়া ঐ ডান হাতে বাঁ কাঁধ চাপড়ান; তার পরক্ষণেই বাঁ হাত দিয়া এমনি ভাবে ডান কাঁধ চাপড়াইবেন (৫নং ছবির ভঙ্গীতে)। পর-পর এবং দ্রুত-তালে এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ পক্ষে দশ বার।

৫। পিঠের দিক দিয়া ডান হাত

এ কয়টি ব্যায়ামের নিত্য সাধনায় হাতের ও কাঁধের গড়ন হইবে সুশ্রী সুছাঁদের, শক্তি-সামর্থ্যও প্রচুর।

অতি-আধুনিকা

একালে মডার্নিজমের নামে আমরা গলা ছেড়ে বলতে সুরু করেছি যে, আমরা পুরুষের দাসী নই, দাস্য আমরা করবো না! না স্বামীর দাস্য, না ভাইয়ের দাস্য, না ছেলেমেয়ের দাস্য! আমরা চাই মুক্তি! আমরা চাই সাম্য! আমরা চাই মৈত্রী!

অর্থাৎ স্বামি-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেব পায়ে নিজেদের বিকিয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে আমরা আর নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে বাস করতে রাজী নই! আমাদের বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আমরাও চাই পুরুষের মতো মেলামেশা করতে। আমরা চাই, বান্ধবীর বাড়ীর পার্টিতে যেতে। স্বামী তখন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে যদি বলেন, ওগো আমার সঙ্গে চলো একটু সিনেমায়! কিম্বা ছেলে এসে বলে, জামার বোতাম সেলাই করে দাও মা,—তাহলে আমরা স্বামীর কথায় সায় দিয়ে স্বামীর মুখ চেয়ে তাঁকে সঙ্গ-সাহচর্য্যে তৃপ্ত করতে সিনেমায় যাবো না বা ছেলেদের জামায় বোতাম আঁটতে বসবো না! বান্ধবীর পার্টির নিমন্ত্রণ রাখতে বান্ধবীর গৃহে যাবো! আমাদের মুখ না চেয়ে স্বামী, পুত্র, ভাইয়েরা যেমন তাদের সখ-খেয়াল চরিতার্থ করতে ছোটে, আমরাও তাঁদের পথ ধরে সেই রীতি মেনে চলবো!

এতে লাভ? বাড়ীতে পরস্পরের মনে-মনে সহযোগিতার সূত্রটুকু ছিঁড়ে যাবে! বাড়ীর সকলে—কেউ কাকেও পাবে না আর! মানে, স্বামীরা যখন চান, আমরা তাঁদের কাছে একটু বসবো, আমরা তখন এনগেজমেণ্ট রাখতে বাইরে বেরুবো! আমরা যখন চাই স্বামি-পুত্রের কাছে একটু বসবো, তাঁরা তখন কোনো মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে বেরুবেন! একেবারে প্রীতি-বাঁধনের সম্পর্ক কেটে সংসার হবে মেশের মত! কোনো পক্ষই অবলম্বন পাবে না! এমন করে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করার মানে, আদিম বর্ব্বর যুগে ফিরে যাওয়া!

সংসারে স্বামী, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, ভাই-বোন—সকলকেই সকলের মুখ চেয়ে বাস করতে হয়। তা না করলে কারো স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না! এবং পরস্পরকে মেনে বাস করতে হলে কারো পক্ষে অবাধ স্বাধীন বা খেয়ালী হলে চলে না! পরস্পরের জন্য পরস্পরকে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। স্বামীর অসুখে স্ত্রী আরাম-বিলাস ত্যাগ করে স্বামীর সেবা করেন, স্ত্রীর অসুখে স্বামী যে স্ত্রীর মাথার শিয়রে বসেন,—এতে দু'পক্ষে মনের প্রীতির সম্পর্কযোগে রোগের যাতনা অনেকখানি লঘু হয়—আরোগ্য-লাভে অনেকখানি সহায়তা মেলে! মা-বাপ ত্যাগ স্বীকার করেন বলেই ছেলেমেয়েরা যেমন মানুষ হতে পারে,—তেমনি ছেলেমেয়ে ডাগর হয়ে শুধু যদি নিজেদের সুখ স্বার্থ আর আমোদ আহ্লাদ নিয়ে মত্ত থাকে, মা-বাপের মুখের পানে, তাঁদের সুখ-দুঃখের পানে না চায়, তাহলে সংসার আর সংসার থাকে না! ছোটখাট প্রত্যেক কাজে যেমন ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে এসে যেখানে সেখানে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলছে, যখন ইচ্ছা বাড়ী ফিরছে, যখন খুশী বেরিয়ে যাচ্ছে, মা যদি তাদের সেই ছাড়া জামা-কাপড়গুলি যথাস্থানে গুছিয়ে তুলে না রাখেন, ছেলেমেয়ে কখন বাড়ী ফিরবে তাদের জন্য খাবার-দাবার ঠিক করে রাখা, তাদের বিছানা পেতে রাখা, নিজের আরাম ত্যাগ করে এ সব কাজ না করে রাখেন, তাহলে ছেলেমেয়ের সাধ্য থাকতো কি অমন খেয়ালভরে যা-খুশী করে বেড়াবার!

মা-বাপ যে এ কাজগুলো করেন, তা শুধু ছেলেমেয়ের উপর ভালোবাসা আছে বলেই না! যে মা খামখেয়ালী, নিজের আরাম-বিলাস-আমোদ-নিয়ে মত্ত, সে-মা ছেলেমেয়ের উপর দরদ করে ওগুলোর দিকে মন দেন না। তার ফলে দেখি, এ-সব মা ছেলেমেয়ের কাছ থেকে দরদ-মায়া স্নেহ-মমতা পান না! এ জীবন মোটে লোভনীয় নয়। আমার জন্য বাড়ীতে কেউ ভাবছে, আমার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে, এ সম্বন্ধে গ্যারান্টি না থাকলে জীবনে কোনো আনন্দকেই আনন্দ-হিসাবে উপভোগ করা যায় না! আমার যা-খুশী তাই করবো, তাতে আর কার কোথায় বাধলো বা কারো মুখ চাইবো না—এ মনোভাবে খেয়ালীর খেয়াল খানিকটা নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তেমন স্বার্থপরের পক্ষে নির্বান্ধব হয়ে বাস করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

ভালোবাসা যেখানে খাঁটি, সেখানে শাসন-বাঁধনের চাপ এতটুকু থাকে না! থাকতে পারে না! ছেলেমেয়ে যা চায়, তাদের সে প্রার্থনা নেহাৎ অসঙ্গত বা অন্যায় না হলে মা-বাপ যে সে-প্রার্থনা-পূরণে অসাধ্য-সাধন করেন, এ অসাধ্য-সাধন করেন ঐ ভালোবাসার জন্য! স্ত্রী যে স্বামীর বিপদে নিজের গায়ের গহনা-পত্র খুলে দেন, সে ঐ ভালোবাসার জন্য। স্বামী যে উদয়াস্ত-কাল খেটে পয়সা উপার্জ্জন করছেন, এ উপার্জ্জনের মূলে স্ত্রীকে ভালোবেসে তিনি চান সকল অভিযোগের আঘাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে। কাজেই এ-সব ক্ষেত্রে দেখি ত্যাগ-স্বীকার। যারা খেয়ালী, স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হয়ে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়, সকলের দরদ-মায়ায় বঞ্চিত হয়ে তারা কোনো দিন সুখী হতে পারে না!

খেয়াল-ভরে যা-খুশী তাই করার মধ্যে স্বাধীনতা নেই। যে লোক প্রবৃত্তির দাস, তার আবার স্বাধীনতা কোথায়? স্বামি-পুত্রের দাস্য ত্যাগ করে তারা ধরে খেয়ালের দাস্য! আসল যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা পেতে হলে গৃহ-সংসারে প্রত্যেকের সঙ্গে মন মিলিয়ে সকলের সুখে নিজের সুখকে গড়ে তুলতে পারলে তবেই শাসন-বাঁধন-হারা মুক্তি মিলবে! এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলে গেছেন, A life of self-renouncing love is a life of liberty. এ কথা খুব সত্য। মডার্ণের নামে অনেকে যে অবাধ-স্বাধীনতা চাইছেন, তার মানে, যা-খুশী তাই করবো, কারো মুখ চাইবো না, তা নয়! সে স্বাধীনতায় নিজেকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ সর্ব্বহারা হতে হবে, সে কথা ভেবে দেখছেন?

মিলন-সন্ধ্যা

স্বপন-ছায়া আলোর বুকে বুকে
শেষ-বিদায়ের সজল আঁখি-কোণে
দু' ফোঁটা জল নির্ঝরিণী সম
মরুর বুকে জাগায় ক্ষণে ক্ষণে।
চাঁপার কলি নিবিড় বাহু-ডোরে,
রাখতে তুমি চাইলে মোরে ধ'রে;
আকুল দিঠি চাইলো বারে-বারে
ফুল ফুটালো চুমুর মধু-মাখা।
স্বচ্ছ-শীতল দীঘির কালো জলে
ঢেউয়ের বুকে কমল যেন আঁকা!

বুকের মাণিক হেলায় অনাদরে
দিলাম ঠেলে—এমনি অভিমানী!
পরাণ আমার তাইতো বারে-বারে
বুকের মাঝে চাইছে তোমায় রাণী।
ঝরণা-ধারার ঝর-ঝরানি গানে,
দখিণ হাওয়া কইছে কানে-কানে,
পুলক-মাখা জ্যোৎস্নাধারা সম
হিয়ার মাঝে আসবে তুমি নামি!
স্মৃতির দীপে প্রীতির আলো জ্বালি
দুয়ার খুলে তাই র'য়েছি আমি।

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩। শ্রীশ্রীমাধবমহোৎসবম্

দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীজীবের বৈয়াকরণিক প্রতিভার পরিচয় যেমন শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে, তেমনই তাঁহার কাব্যকলানৈপুণ্য ও কবিত্বের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন "শ্রীমাধবমহোৎসবম্" নামক কাব্যগ্রন্থে। এই গ্রন্থের শেষে শ্রীজীবের উক্তি—

> ইতি রচিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ডং রসজ্ঞৈঃ
> কথমপি তদুরংশঃ স্বদ্যতে যদ্যমুষ্য।
> ফলতি মম তদানীমেষ কার্ৎস্নেন যত্নঃ
> সকৃদঘরিপুলোকালোকিতানামিবায়ুঃ॥

অর্থাৎ—এই সম্পূর্ণ কাব্যখণ্ড রচিত হইল, রসজ্ঞগণ যদি কোনও-রূপে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অংশও আস্বাদন করেন, তাহা হইলে বারমাত্র হরিভক্তের দর্শনকারিগণের যেমন আয়ু সফল হয়, তেমনই আমার এই সমগ্র প্রযত্নও সফল হইবে।

গ্রন্থশেষে মহাকবি শ্রীজীবের এই বিনয়গর্ভ উক্তি পাঠ করিলে পাঠকালে তাঁহার বৈষ্ণবোচি· বিনয় ও দৈন্যের বিশিষ্ট পরিচয়ই পাইবেন। বস্তুতঃ, এই প্রকার বিনয় তাঁহার ন্যায় প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষেই স্বাভাবিক। কেবল তাহাই নহে, স্বভাবসিদ্ধ দীনতা বশতঃ প্রতিভাবান্ গ্রন্থকার এই শ্লোকে গ্রন্থখানিকে "কাব্যখণ্ড" নামে অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত, তদনুসারে বিচার করিলে শ্রীজীব-রচিত "মাধবমহোৎসব"কে মহাকাব্য নামে অভিহিত করিবার পক্ষে কোন বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থ নয়টি উল্লাসে (সর্গে) বিভক্ত, এবং ইহাতে সর্ব্বসমেত ১১৬৪টি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলিতে নানারূপ ছন্দোবৈচিত্র্য ও অলঙ্কারবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম উল্লাসটিতে প্রধানতঃ ইন্দ্রবংশা বৃত্তি, দ্বিতীয় উল্লাসে ইন্দ্রবজ্রা, তৃতীয়ে বসন্ততিলক, চতুর্থে প্রহর্ষিণী, পঞ্চমে ইন্দ্রবংশা বৃত্তি, ষষ্ঠে দ্রুতবিলম্বিত, সপ্তমে মালিনী, এবং অষ্টমে প্রধানতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নবম উল্লাসে—প্রমাণিকা, মৃগেন্দ্রমুখ, স্বাগতা, রথোদ্ধতা, সুন্দরী, দ্রুত-বিলম্বিত, প্রভাবতী, উদ্গতা, পুষ্পিতাগ্রা, প্রিয়ংবদা, কলহংস, শুদ্ধ-বিরাট, ললিতা, অতিজগতী, উপচ্ছন্দসক, আর্য্যা, পজ্ঝটিকা, চারু-হাসিনী, গাথা, অনুষ্টুপ, রথোদ্ধতা, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, প্রহর্ষিণী, মালিনী, স্রগ্ধরা, বাতোর্ম্মি, হরিণী, সরসী, ইন্দ্রবংশা, মত্তময়ূর, মালতী, পঞ্চচামর, বৈশ্বদেবী, শিখরিণী, মন্দাকিনী, অপরবক্ত্র, আর্য্যাগীতি, চন্দ্রলেখা, ললিত, নারাচ, তূণক, লোলা, নান্দীমুখী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, মত্তমাতঙ্গলীলাকর, শালিনী, নন্দন, নর্দ্দটক, ফুল্লদাম, স্রগ্বিণী, ইন্দ্রবংশা, তারাক্রান্তা, ধৃতি, চিত্র, চণ্ডী, মন্দাক্রান্তা, চিত্রলেখা, মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা, কৃতি, শোভা,—এই বহুবিধ ছন্দে বিরচিত শ্লোকমালা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু কবির গৌরবের বিষয় এই যে, এই জন্য উল্লাসটির বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বা তাহার সাবলীল স্বাভাবিক রসমাধুর্য্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুদক্ষ যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে যেন সমগ্র বিষয়বস্তু যথাযোগ্যরূপে সুবিন্যস্ত হইয়া শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও অপরূপ ভাবগাম্ভীর্য্যের সমাবেশে গ্রন্থখানিকে অতি উচ্চশ্রেণীর মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে। এই গ্রন্থ ১৪৭৭ শকে (সপ্ত সপ্ত মনৌ শাকে) বিরচিত। সেই সময় শ্রীজীবের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মিলন-সময়ে যখন কবির যৌবনসুলভ বিশাল সৃজনীশক্তি অক্ষুণ্ণ, অথচ প্রৌঢ়ত্বের ধীরতা ও অচঞ্চল বুদ্ধিবৃত্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট, সেই সময় শ্রীজীবের ন্যায় সুপণ্ডিত, এবং প্রতিভাবান্ ও কল্পনাকুশল কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠকের মনে হয়—এই বহু-গুণান্বিত রসমাধুর্য্যমণ্ডিত গ্রন্থখানিই শ্রীজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বলরসাত্মক লীলার প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদার অভিব্যক্তিই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের বনরাজ্যে শ্রীরাধিকার অভিষেকের সুন্দর ও সরস বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; মধু-মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাধিকার অভিষেক হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা উহা স্বয়ং মাধব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়াই হউক, গ্রন্থখানির নাম "শ্রীমাধবমহোৎসব।" এই নাম যে কারণেই প্রদান করা হউক, ইহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপরে বলা হইয়াছে, গ্রন্থখানি নয়টি উল্লাসে বিভক্ত; মহোৎসব সংক্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া ইহার সর্গগুলি উল্লাস নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার প্রথম উল্লাসের নাম উৎসুক-রাধিক। এই উল্লাসের প্রথমেই শ্রীরাধিকার অলৌকিক মাধুর্য্য ও রস-নৈপুণ্যের পরিচয়ের সহিত সখীগণের সহযোগে শ্রীরাধিকার পুষ্পচয়ন ও মাল্যগ্রন্থনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইতে পারিলেই আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন। ফলতঃ, পরমানন্দময়ী শক্তি শ্রীভগবানে সংযুক্ত হইলেই অনন্ত কোটি বিশ্ব আনন্দরসে পূর্ণ হয়, আর শ্রীভগবৎপরায়ণ জনগণের চিত্তও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই জন্য সখীগণের ইচ্ছাতরঙ্গের অভিঘাতে শ্রীরাধিকার হৃদয়েও এই মিলন-বাঞ্ছা উদিত হইল। অতঃপর তপস্বিনী নান্দীমুখী আসিয়া শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ ও তিনিও যে শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিলেন। ঐ সময়ে শ্রীললিতাসখী স্বপ্নে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার অভিষেক দর্শন করিয়াছিলেন; এ জন্য প্রকাশ্যেও শ্রীরাধাকে ঐরূপে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারম্ভেই শ্রীবৃন্দাবনের অলৌকিক মহিমা ও অপূর্ব্ব শোভা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রত্যেক শোভাই যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক ও তাঁহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার বর্দ্ধক, ইহা অতি সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাদৃশ বৃন্দাবনের কুসুমোদ্যানের ও বৃক্ষবাটিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীরাধিকার চিত্তে নিরতিশয় ক্রোধোদ্রেক

হইল। এই জন্য এই দ্বিতীয় উল্লাসের নাম উন্মন্যুরাধিক। ইহার উপর শ্রীরাধিকা যখন শুনিতে পাইলেন যে, চন্দ্রাবলী ও তাঁহার সখীগণই এতাদৃশ বৃন্দাবনের আধিপত্য লাভ করিতে চাহেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই যে পরোক্ষ ভাবে ইহার কারণ, এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্জ্জয় মানে তাঁহার চিত্ত অভিভূত হইল।

তৃতীয় উল্লাসের নাম—উৎফুল্লরাধিক। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যের অভিষেক-ব্যাপারে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা দ্ব্যর্থ। এই জন্যই চন্দ্রাবলীর পক্ষাবলম্বিনী সখীগণ উহা দ্বারা শ্রীচন্দ্রাবলীরই শ্রীবৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক হইবে, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীরাধিকা উহা শ্রবণে মান করিয়া বসিলেন। অতঃপর বৃন্দার চেষ্টায় বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে শ্রীরাধিকার অভিষেকের কথা, এবং তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইলে শ্রীরাধিকার মান প্রশমিত হইল; তিনি উৎফুল্ল হইলেন। এই জন্যই এই উল্লাসের নাম উৎফুল্ল-রাধিক।

চতুর্থ উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধিকার অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুলবৃদ্ধাগণ তদ্বিষয়ক আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীচন্দ্রাবলীর ও তৎপক্ষীয় সখীগণের দুঃখ প্রকাশ পাইল। অনন্তর, অভিষেকের অধিবাসকৃত্য আরম্ভ হইল। এই উল্লাসের নাম উদ্যোতরাধিক।

পঞ্চম উল্লাসের নাম উদিতরাধিক। এই উল্লাসে শ্রীরাধিকার অভিষেকের আয়োজন পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবীগণ আসিয়া শ্রীরাধার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোপীবেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ উল্লাসের নাম উন্নতরাধিক। এই উল্লাসের প্রথমেই নিকুঞ্জদ্বারে শ্রীরাধা অভ্যর্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর এই উল্লাসে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জগৃহের বর্ণনাসহ অভিষেকের আসন-সংস্থানাদিও বর্ণিত হইয়াছে। পৌর্ণমাসীর আদেশে দেবীগণও অভিষেকোৎসবে যোগদান করিলেন। অনন্তর অভিষেকের জলানয়নাদি-পর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নির্জ্জন বনপ্রদেশ হইতে শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া যে ভাবে অভিভূত হইলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর পৌর্ণমাসীদেবী সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটন করিলেন।

সপ্তম উল্লাসের নাম উৎসিক্ত-রাধিক। ইহাতে অভিষেক উপলক্ষে গন্ধর্ব্বকন্যাগণের নৃত্যগীত-বাদ্যাদি ও শ্রীউমাদেবী কর্ত্তৃক অভিষেকের পূজাদি এবং সখীগণ কর্ত্তৃক অষ্টমৃত্তিকাদি দ্বারা স্নান এবং নয় বার অভিষেকের বর্ণনা আছে।

অষ্টম উল্লাসের নাম উজ্জ্বলরাধিক। অভিষেকের পর শ্রীরাধার বেশধারণাদির বিষয় এই উল্লাসে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। দেবীগণ ও সখীগণ শ্রীরাধিকার বেশ-রচনা সংসাধিত করিবার পর দেবীগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত মাল্যাদি উপহার আসিল। অতঃপর বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তুতিপাঠ ও তাহাদিগকে পারিতোষিক-দানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নবম উল্লাসের নাম উন্মদরাধিক। এই উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাতে শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দাবনের রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজচিহ্নাদি ধারণ করিলেন। বৃন্দাবনরাজ্যে সখীগণেরও কাহার কি অধিকার, তাহাও স্থির হইয়া গেল। অতঃপর শ্রীরাধাকৃত গুরুপূজাদি শেষ হইলে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত হইল। পৌর্ণমাসী দেবীও তখন কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত মিলন সংঘটিত করিলেন, এবং সখীগণ উভয়ের সেবায় নিয়োজিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল উপাসনা-ব্যবস্থা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই যুগল-উপাসনার পদ্ধতিই প্রকারান্তরে এই মহাকাব্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য, এই গ্রন্থ বিরচিত হইবার পরেই ভক্তগণের অষ্টকালীন স্মরণ-মনন-পদ্ধতিরূপে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থ যে অতিশ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের লীলাকাব্য হিসাবেও এই গ্রন্থখানি ভক্তগণের স্মরণ-মননের সহায়ক।

অতঃপর কাব্যগ্রন্থ হিসাবে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীগোপাল-বিরুদাবলীর আলোচনা করা সঙ্গত।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে বিরুদ কাব্যের মধ্যে এই গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে রচিত হয়। অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামী বিরুদ কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য "সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণং" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই বিরুদাবলী-লক্ষণের অনুসরণ করিয়াই শ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন।

বিরুদকাব্য সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে এক সাহিত্য-দর্পণেই উল্লেখ পাওয়া যায়; বোধ হয়, তাহা যথেষ্ট মনে না হওয়ায় শ্রীরূপ গোস্বামী এই 'সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণং' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী রচনা করেন। তাঁহার কৃতী ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব অতঃপর শ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির এত দিন কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বৈষ্ণব-বেশে শ্রীহরিদাস দাস-বাবাজী নাম ধারণ করিয়া, এই গ্রন্থখানির সন্ধান পাওয়ায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিই পাওয়া গিয়াছে, কি খণ্ডিত অবস্থায় উহার সন্ধান মিলিয়াছে,—তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কারণ, শ্রীরূপ গোস্বামী বিরুদাবলীর যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে চণ্ডবৃত্তের লক্ষণেই এই গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। পরন্তু শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্রন্থে বিরুদলক্ষণে বর্ণিত দ্বিপাদিগণবৃত্ত বা ত্রিভঙ্গীকলিকাবৃত্ত অনুসারে কোনও শ্লোক রচনা না করিয়া গ্রন্থখানি শেষ করিয়াছেন। সুকবি শ্রীজীবের রচনায় কোথাও কুণ্ঠিত ভাব লক্ষিত হয় না—অথচ তিনি যে এই গ্রন্থখানি শেষ করিলেন না, ইহাতে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদয় হয়। যাহা হউক, যদি কখনও এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, তবে শ্রীগোপালবিরুদাবলীর সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিতেও শ্রীজীবের রচনানৈপুণ্য ও কবিত্ব-মাধুর্য্য সুপ্রকাশিত। যাঁহারা সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শী

তাঁহারাই বিরুদকাব্যের লক্ষণাবলীর বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ; কারণ, ইহাতে কবিতার রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত বাঁধাবাঁধি নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। এই জন্য এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য্য সাধারণ পাঠকবর্গ উপভোগে সমর্থ নহেন। সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী রচনা করিতে যাইয়া বিরুদকাব্যের লক্ষণাবলীর পরিচয় প্রদানের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—নাটক রচনা বিষয়ে তিনি সাহিত্যদর্পণকারের মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তদপেক্ষা প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির ও রসসুধাকরের অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং তাহা দেখাইবার জন্যই নাটকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রেই মহাপ্রতিভাশালী শ্রীরূপ সাহিত্যদর্পণকারের অপেক্ষাও প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী হইয়া "সামান্য-বিরুদাবলীলক্ষণং" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বিরুদাবলীলক্ষণের আলোচনা না করিয়া বিরুদাবলী অধ্যয়ন একরূপ নিষ্ফল; অথচ বিরুদাবলীলক্ষণের আলোচনাও সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নহে। এই জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম। তবে ইহাতে শ্রীজীবের কাব্য-প্রতিভা কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে আমরা একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা শেষ করিতেছি;—

"মুহুর্মুহুরপি স্ফুরদ্বিভবমাত্মবেণুক্বণং
বিলক্ষণতয়া দধৎ পরমশিক্ষয়া স্বীয়য়া।
সচেতনমচেতনং বিচলিতং মিথঃ সন্দধে
ভবানিতি পুরা কথং ভবতি যৌবতং বাচিতং॥"

"তুমি নিজে যেমন বিলক্ষণ, তোমার সেই বৈলক্ষণ্য—তুমি তোমার বেণুতে সঞ্চারিত করিয়া তুমি তাহাকে পরম শিক্ষা দ্বারা বারংবারই বেণুর ধ্বনিতে স্বতঃসিদ্ধ বস্তুধর্ম্মপরিবর্ত্তনকারী প্রভাবের দ্বারা সচেতনকে অচেতনে ও অচেতনকে সচেতনে পরিণত করিয়াছ—ইত্যাদি।

৪। শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ

ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার সংক্ষেপে উদ্দেশ প্রদান করিয়া, তাহাতে সাধক কি প্রকারে সখীভাবে সেবার অভিলাষ করিবেন, তাহার ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী কালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম" নামে অনুরূপ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন।) শ্রীজীবের এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বা পরকীয়া নায়িকারূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকায় বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই লীলাচিন্তাকালে শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকারূপে চিন্তা করিতে হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাবে দেখাইবার জন্যই "শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম" গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুতঃ, এই বিষয়ে আপাততঃ মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও মূলতত্ত্বে যে কোনও প্রকার প্রভেদ নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এক বার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা পাওয়া যায় না।

৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ও করচিহ্ন
৬। শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন ও করচিহ্ন

"শ্রীরূপচিন্তামণি" নামক গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাকৃষ্ণের শারীরিক লক্ষণাবলীর ও চিহ্নাদির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থে পদ্মপুরাণ হইতে সুবিস্তৃত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার করচিহ্ন ও পদচিহ্নাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি: তবে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি বহু স্থানেই পাওয়া যায়।

৭। ষট্‌সন্দর্ভ

প্রথম,—তত্ত্বসন্দর্ভ। ইহাতে প্রমাণ কি, তাহা স্থির করিয়া পরে পরতত্ত্ব-স্বরূপ প্রমেয় শাস্ত্র দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়,—শ্রীভগবৎসন্দর্ভ। এই সন্দর্ভে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবানই যে পরতত্ত্বের সম্যগাবির্ভাব এবং শক্তিবর্গের প্রকাশ না থাকায় ব্রহ্ম শ্রীভগবৎ-স্বরূপেরই যে অসম্যগাবির্ভাব, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শক্তিবর্গের স্বরূপ ও ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব ও বিভুত্ব ইত্যাদি সপ্রমাণ করা হইয়াছে। অতঃপর শ্রীভগবান্‌কে জানিবার উপায়স্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে এবং শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই যে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয়,—শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ। ইহাতে অবতার-বিচারের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-অবতারের অবতারী, তাহা খ্যাপন করিয়া তাঁহার ধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ও শক্তিবর্গের মধ্যে ব্রজগোপীগণ ও তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ,—শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ। ইহাতে জীবের স্বরূপ, অহংপ্রত্যয়ের স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, ব্রহ্মের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের বৈশিষ্ট্য, জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও উপাদানত্ব-পরিণামবাদ ও তাহার দ্বারাই যে শ্রুতিসারস্য রক্ষিত হইতে পারে, ইহা দেখাইয়া অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদখ্যাপন, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব ও পাঞ্চরাত্রমতের শাস্ত্রসঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চম,—ভক্তিসন্দর্ভে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ভক্তিযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তির স্বরূপাদি আলোচনার পর শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি ও ভক্তিসাধনার সোপান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভক্তিই যে শাস্ত্রের অভিধেয়, এবং প্রেমই যে প্রয়োজন—তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ,—শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ। ইহাতে মুক্তির স্বরূপ ও প্রকার-ভেদের আলোচনা দ্বারা প্রেমই যে পুরুষার্থ-শিরোমণি, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর ভগবৎপ্রীতির স্বরূপ ও তাহার দ্বারা যে সর্ব্ববিধ মুক্তি তিরস্কৃত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতঃপর ভক্তভেদে প্রীতির তারতম্য ও ক্রমোৎকর্ষ দেখাইয়া শ্রীব্রজগোপীগণে যে প্রীতির চরমোৎকর্ষ, তাহা খ্যাপিত হইয়াছে। ইহার পর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের স্বরূপ বর্ণনার দ্বারা উজ্জ্বলরসে গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই ষষ্ঠ-সন্দর্ভ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এ স্থলে ইহা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। শুনা যায় যে, পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই ছয়খানি সন্দর্ভেরই টীকা রচনা

করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভ ব্যতীত অন্য কোনও সন্দর্ভের টীকা পাওয়া যাইতেছে না। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃকও সমগ্র সন্দর্ভ গ্রন্থের টীকা রচিত হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকামাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ ও চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার দ্বারাই শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের স্বরূপ যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়াই শ্রীজীবসম্মত ব্রহ্মসূত্রের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষ্য বিরচিত হইতে পারে।

৮। সর্ব্বসম্বাদিনী

এই গ্রন্থে শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—ষট্‌সন্দর্ভের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে—প্রমাণবিচার, শব্দশক্তি-বিচার, শক্তিবাদ, চতুর্ব্ব্যূহবাদ, পরিণামবাদ, অদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিতর্ক্য বিষয়গুলির শাস্ত্রমূলে মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এ স্থানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বস্তুতঃ, সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীজীবের সময় পর্য্যন্ত যত দার্শনিক মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অতি সুন্দর ভাবে খণ্ডনমণ্ডনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই একখানি পুস্তকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে যাবতীয় স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, এবং ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

৯। ক্রম-সন্দর্ভ

শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতের যে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ নিখুঁত টীকা রচনা করিয়াছিলেন—তাহাকে তিনি ষট্‌সন্দর্ভের পরিশিষ্ট সপ্তম সন্দর্ভ বা ক্রমসন্দর্ভ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই টীকার প্রথম শ্লোকেই শ্রীজীব ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ, এক দিকে লীলারহস্যের ব্যাখ্যায় ও অন্য দিকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় এই টীকাখানি অতুলনীয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে সমস্ত বেদের সারভাগের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে রচনা করিয়া তাহাতেই তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি কলির জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণরূপে তাহারই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র বেদার্থ এই শ্রীভাগবত মহাপুরাণেই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই মহাপুরাণের টীকা করিয়া শ্রীজীব সমগ্র ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন—এই জন্যই তিনি আর পৃথক্‌রূপে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। সুতরাং এই ক্রমসন্দর্ভকেই একরূপ শ্রীজীবকৃত বেদান্ত-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি কেহ স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীজীবকৃত বেদান্তভাষ্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তিনি এই ক্রমসন্দর্ভ হইতেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

১০। লঘুতোষণী

শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই দশম স্কন্ধের যে সুবিস্তৃত টীকা রচনা করেন, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাস্যতত্ত্বের যাবতীয় লীলারহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১৪৭৬ শকাব্দে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এই টীকা শেষ হয়। অতঃপর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আদেশে শ্রীজীব গোস্বামী এই টীকা সংক্ষেপ করিয়া যে টীকা রচনা করেন, তাহাই অতঃপর "লঘুতোষণী" নামে প্রচারিত হয়, এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা "বৃহত্তোষণী" নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু লঘুতোষণী নামে "লঘু" হইলেও, ইহা কোনও কোনও স্থানে "বৃহত্তোষণী" অপেক্ষাও সুবিস্তৃত। শ্রীজীব যেখানে জ্যেষ্ঠতাতের লিখিত কোনও কথার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সে স্থানে বৃহত্তোষণী অপেক্ষাও ইহা আকারে বৃহত্তর হইয়াছে ; কিন্তু মূলগ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন যে যে ভাব বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা যথোচিত সাবধানে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এই "লঘুতোষণী" বিরচিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

যুগের দাবী

গোলাপের শয়ন তেয়াগি
কর্ম্মের আহ্বানে আজি দিকে দিকে উঠিয়াছে জাগি
লক্ষ লক্ষ বক্ষ আর বাহু।
দুর্ভাগ্যের রাহু
পূর্ণগ্রাসে সমুদ্যত বিরামের চন্দ্রমারে যবে,
তখন কি কবিনামা সবে
বাহির পৃথিবী হ'তে চিত্তলোকে করিবে প্রয়াণ ?
মাটির পরশ ত্যাজি' 'আকাশ-বিহগ'বৎ ইথরের রাজ্যে লবে স্থান ?
জেগেছে পেশল বাহু—দৃঢ় বাহু কর্ম্মের সন্ধানে,—
তারি মাঝখানে
'নবনীত-করলগ্ন সুগোল অঙ্গুলিপ্রান্তে ধরি'
নাই বা জাগালে আর লেখনীতে কবিতা-লহরী।
আজি শোনো কাণ পেতে জাগিতেছে কত শত বাণী।
তব দেহপ্রাণ ঘিরে। হেথা হোথা কত ক্ষীণ প্রাণী
বাণীর পসরা লয়ে আসিতেছে নিতি তব দ্বারে।
তারা অন্ধকারে
পুরাতন সমস্যারে নূতন জটিল করি' তোলে,—
জীবনের প্রয়োজন দিকে দিকে হাসে অট্টরোলে।
"লেখনী থামাও কবি তব"—
কারা যেন ডেকে বলে,—প্রার্থনা তাদের অভিনব।
"বাণী নয়, কর্ম্ম চাই—চাই শক্তি—চাই পরিচয়
বক্ষে ও বাহুতে আজ। বাণীর সঞ্চয়
আর না বাড়ায়ে কবি, কিনে লও কর্ম্মের উত্তম।"
কবিতার বিনিময়ে অভাব মিটাতে '' শ্রান্ত বিশ্ব চাহে দেহশ্রম

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।

(উপন্যাস)

৯

মাসখানেক পরের কথা। কৌমুদীর জন্মতিথি।

গৌরী ঠাকুরাণী আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, সুভাষিণীর যাওয়া চাই। কৌমুদী আসিয়া বলিল—কখনো তো আমাদের বাড়ী গেলেন না, আজ কিন্তু সন্ধ্যার সময় না গেলে চলবে না, পিসিমা!

সুভাসিণী বলিল—যাবো বৈ কি মা, নিশ্চয় যাবো।

সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ। উৎসবে সমারোহ ছিল। সুপ্রসন্ন ধনী। জানকী বাবুর সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। এখানকার বড় চাকুরিয়া-ঘরের ঘরণীরা সকলেই আসিয়াছেন, তাঁদের মেয়েরাও বাদ যায় নাই। মেয়ে-মজ্লির ব্যাপার। কামাখ্যা চ্যাটার্জীর স্ত্রী জয়া আসিয়াছে, সঙ্গে জয়ার মেয়ে শুক্লা; বাসন্তী ইণ্ডাষ্ট্রীজ-সিণ্ডিকেটের চীফ মেডিকেল অফিসার বিলাত-ফেরত এল, আর, সি, পি, ডাক্তার সামন্তর স্ত্রী মিসেস্ সামন্ত, সামন্তর দুই মেয়ে ললি আর মলি; ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী মিসেস্ ভট্চায্যি; এ্যাকাউনটাণ্ট রামহরি সান্যালের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা, প্রিয়ম্বদার মেয়ে দিগঙ্গনা প্রভৃতি; এবং জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচিও আসিয়াছে।

সুভাষিণীর সঙ্গে গৌরী ঠাকুরাণী সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন,—নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন মহেন্দ্র বাবু…তাঁর স্ত্রী সুভা। ভারী ভালো মেয়ে। আমার ছোট বোন। সংসারের কাজ-কর্ম্ম করছে, আর ঘর-দোর কি গুছিয়েই রেখেছে!

বড় অফিসারদের গৃহিণীদের মধ্যে কেহ মাথা নাড়িল; কেহ বলিল, ও; কেহ-বা বলিল—আলাপ হলো কৌমুদীর জন্মতিথির দৌলতে। এ-কথা যে বলিল, তা শুধু গৌরী ঠাকুরাণীর খাতিরে। সুপ্রসন্নর অনেক টাকা। আর সুপ্রসন্ন তার এই দিদিকে একেবারে দেবতার মতো শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া গৌরী ঠাকুরাণী কারো টাকার বা পোজিশনের খাতির করেন না! সত্য কথা বলিতে যেমন তাঁর বাধে না, তেমনি মিথ্যা ও কাপট্যকেও কোনো দিন রেহাই দেন না!

পরিচয়ের পালা চুকিলে সামন্তর দুই মেয়েকে লইয়া পীড়াপীড়ি চলিল—গান শোনাও ললি-মলি…ইংরেজী গান! বাংলা গান শুনে শুনে কাণ পচে গেল! তোমাদের মুখে ইংরেজী গান যা লাগে, আঃ!

সামন্ত এ-গ্রামে সবচেয়ে বড় সাহেব। বাড়ীতে দেশী খানার পাট নাই। দুই মেয়ে ললি-মলি পড়ে কুক্লিক্কার্টার লরেটোয়। থাকে সেখানকার বোর্ডিংয়ে। এবং সেখানকার ফিরীঙ্গি-শ্ল্যাঙ কথা হইতে ফ্যাশনের টুকিটাকিগুলাকে আশ্চর্য্য ভাবে রপ্ত করিয়া এখানে আসিয়া সে-সবের জৌলুশে এখানকার বড় অফিসারদের অন্দরকে সচকিত করিয়া তোলে! বাঙলা গান তারা গায় না, বলে—ও আমাদের বিশ্রী লাগে!

ললি বলিল,—এখানে ইংরেজী-গান কি করে হবে? পিয়ানো ব্যাঞ্জো কি ভায়োলিন না হলে গাইবো কি করে?

রামহরি সান্যালের মেয়ে দিগঙ্গনা এই ললি-মলির একবারে গোলাম! ললি-মলি আজ আসিয়াছে শাড়ীকে স্কার্টের মতো খাটো এবং আঁট-সাঁট করিয়া পরিয়া। দিগঙ্গনা সেই শাড়ীর মোহে একেবারে তন্ময়! সে বলিল—সত্যি, পিয়ানো না থাকলে কি ইংরেজী গান হয়! তার পর সে মাকে ডাকিয়া বলিল,—এমনি করে শাড়ী-পরার নতুন ফ্যাশন উঠেছে মা কলকাতায়, আমিও এবার থেকে এমনি করে শাড়ী পরবো! তাতে তোমার খরচ হবে কম… কম-বছরের সিল্ক লাগবে!

জয়া বলিল,—সত্যি এমনি ফ্যাশন উঠেছে কলকাতায়, হ্যাঁ ললি ?

ললি বলিল,—না, না, দু'-তিনটি বিলেত-ফেরতের ঘরে শুধু। আমাদের সঙ্গে পড়ে রাণু গুপ্টু, রেভেনিউ-সেক্রেটারি মেঘনাদ গুপ্টুর মেয়ে···তাদের বাড়ীতে দেখেছি এ ফ্যাশন ! আর দেখেছি সিভিলিয়ান-জজ স্যার মার্কণ্ড লাহেরির বাড়ীর মেয়েদের এমনি শাড়ী পরতে !

শাড়ী হইতে গড়াইয়া কথা চলিল জুয়েলারিতে, জুয়েলারি হইতে সিনেমা-ষ্টারদের পপুলারিটিতে। বড়-মানুষি জাহির করিবার জন্য পরস্পরে ক্রমে রেশারেশি বাধিয়া গেল।

মিসেস্ সামন্ত বলিলেন,—সে-দিন কলকাতায় যেতে হয়েছিল আমার ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে হলো, সেই বিয়েতে ! তা ভালো লাগলো না মোটে ! এবারে পুজোর সময় কলকাতায় আর যাবো না। ওঁকে বলেছি, পুজোর ছুটীতে বম্বে যাবো। তার পর ইচ্ছা আছে, উনি যদি লম্বা ছুটী পান তো একবার বিলেত ঘুরে আসবো !

এ সব কথার মধ্যে সুভাষিণী চুপ করিয়া বসিয়া আছে ···তার মনে হইতেছিল, ময়ূরের সভায় সে যেন দাঁড়কাকের মতো প্রবেশ করিয়াছে ! কি করিয়া এখান হইতে উঠিবে ? মনে হইতেছিল, গৌরা ঠাকুরাণী খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁর কাছে গেলে বাঁচিয়া যায় ! কিন্তু কি করিয়া যায় !

ভগবান্ যেমন এক দিন দ্রৌপদীর মান রাখিয়াছিলেন, তেমনি আজ তিনি সুভাষিণীর মান রাখিলেন। তিনি পাঠাইয়া দিলেন সুরুচিকে। সুরুচি আসিয়া সুভাষিণীর গা ঘেঁষিয়া বসিল। বলিল,—আপনি নতুন এসেছেন ! কত দিন ধরে ভাবছি, আপনার ওখানে যাবো, তা হয়ে উঠছিল না! লজ্জা করে। ভাবি, চেনা-শোনা নেই, আপনি কি মনে করবেন ! বাবা বলছিল, নতুন হেড-মাষ্টার-মশাই এসেছেন মহেন্দ্র বাবু···চমৎকার লোক রে ! ছেলেদের পড়ান্ ভারী সুন্দর ! এক-মাসে স্কুলের প্রোগ্রেস হয়েছে চমৎকার !··· যেমন পণ্ডিত লোক, তেমন অমায়িক !

বড়র দলে দু'-এক জনের ললাট কুঞ্চিত হইল ! জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচি···সকলকে উপেক্ষা করিয়া সে কি না, একশো টাকা মাহিনার এক স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রীর সঙ্গে গায়ে পড়িয়া শত-ব্যাখ্যানায় আলাপ করিতে বসিল !

রামহরি সান্যালের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা চাহিলেন সুভাষিণীর পানে, বলিলেন,—ভালো কথা, ওঁকে বলছিলুম ছেলেদের জন্য টিউটর রাখতে হবে ! মানে, স্কুলে যিনি হেড-মাষ্টার আসেন, তাঁকেই রাখা হয় ছেলেদের জন্য বাড়ীর মাষ্টার। পুরোনো হেড-মাষ্টার চলে গেছে আজ দু'মাস। ছেলেগুলোর মাষ্টার নেই ! ওঁকে এত করে বলছি, নতুন হেড-মাষ্টারকে ঠিক করো—তা ওঁর সময় হয় না যে গিয়ে কথা কইবেন। তা আপনার সঙ্গে যখন দেখা হলো, বলবেন আপনি, হেড-মাষ্টার-মশাইকে ওঁর সঙ্গে কাল সকালে এক বার বাড়ীতে এসে দেখা করবেন। মানে, দু'টি ছেলেকে পড়াতে হবে। একটি পড়ে ক্লাশ সিক্স-এ, আর একটি ক্লাশ এইট-এ। সে মাষ্টারকে দিতুম কুড়ি টাকা করে'···তাই দেবো। রেট কমাতে চাই না! রোজ সন্ধ্যার সময় এসে দু'-ঘণ্টা করে পড়াবে !

সুভাষিণী জবাব দিবার পূর্ব্বে সুরুচি জবাব দিল। বলিল,—চমৎকার ব্যবস্থা খুড়িমা ! হেড-মাষ্টার মশাই তো ভিখিরী নন যে, তোমার দোরে এসে হাত পেতে দাঁড়াবেন ! মানী লোক···তোমাদের দরকার থাকে, তোমরা যাবে তাঁর কাছে।···সত্যি, আমার এ ভারী বিশ্রী লাগে ! সে-দিন এক জনদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, গিয়ে দেখি, ছেলেদের মাষ্টার-মশাইকে এমন চোখে দেখে, যেন বাড়ীর বামুন, না, চাকর ! কি করে এমন করে সব, বুঝি না। সে-বাড়ীর কর্ত্তাটি আবার···যাকে বলে, গণ্ডমুখ্যু ! লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকদের এমন করে অপমান ! আমি হলে মাটী কুপিয়ে পয়সা রোজগার করতুম, তবু অমন বাড়ীতে মাষ্টারী করতুম না !

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুরুচি চাহিল সুভাষিণীর পানে, বলিল,—না, আপনি বলবেন না। তাঁর মান নেই ? ইজ্জৎ নেই ?

সুরুচি মনিবের মেয়ে···কাজেই এ-কথা সহিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই ! প্রিয়ম্বদা এ কথায় চুপ করিয়া গেলেন—সভার মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে এতটুকু !

সে-দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সুরুচি বলিল—বাবার খুব ভালো লেগেছে হেড-মাষ্টার-মশাইকে। বাবা একখানা বই লিখছে। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোথায় কি সম্ভাবনা আছে সেই সম্বন্ধে। ইংরেজীতে লিখছে। বাবা বলে, বাবার কলমে বাঙলা-লেখা বেরোয় না—শক্ত ঠেকে ! তাই বাবা বলছিল, এক জন সত্যিকারের পণ্ডিত-লোককে কাছে পেয়েছি রে সুরুচি, ওঁকে দিয়ে আমার লেখা ইংরেজীটুকু শুধরে পালিশ করিয়ে নেবো···আমাদের ইংরেজী-লেখা···কোথায় গ্রামারের কি ইডিয়মের কি ভুল হবে, এই ভয়ে সর্ব্বদা হাত কাঁপে, হাতের কলম কাঁপে !

কথার শেষে সুরুচি হাসিল। সে হাসির আলোয় সুভাষিণীর বুকখানা আলোয় আলো হইয়া উঠিল!

স্বামীর কাছেও সুভাষিণী এ-কথা শুনিয়াছে! এ-কথার সঙ্গে মহেন্দ্র বলিয়াছিল—পয়সাওলা লোক, বাঙালীর মধ্যে মস্ত কৃতী পুরুষ…কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই…একেবারে বাঙালীর মেজাজ! সাহেবী ঝাঁজ নেই! স্পষ্ট বললেন, আমরা যে ইংরেজী লিখি, সে দোকানদারের ইংরেজী, ব্যবসাদারের ইংরেজী…বইখানা আমি চাই, বুঝলেন কি না, যাঁরা লেখা-পড়া শিখেছেন, তাঁদেরো পড়াতে…তাই আপনাকে দিয়ে এর ইংরেজীটা ঠিক করে নেবো!…আর সে ঋণ বইয়ের গোড়ার পাতায় আমি স্বীকার করবো! ধনী লোক…আশ্রিত ব্যক্তিকে এতখানি সম্মান-মর্য্যাদা ছাান্, বাঙলা ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না!

সুরুচির কথায় সুভাষিণী হাসিল, বলিল—উনি তোমার বাবার খুব সুখ্যাতি করেন। বলেন, মানুষ বড় হলে তাঁর মন কত বড় হয়, তোমার বাবাকে দেখলে তা বোঝা যায়।…তা তুমি কি পড়াশুনা করছো?

সুরুচি বলিল—আমার এই ক্লাশ সেভ্ন্ চলছে।

সুভাষিণী বলিল—এখানে মেয়ে-ইস্কুল আছে তাহলে?

সুরুচি বলিল,—আছে। সে-স্কুলে মেয়ে-টীচার কিন্তু খুব কম। মোটে চারটি। তাঁরা পড়ান নীচেকার কটা ক্লাশে, বাকী সব পুরুষ-টীচার।

—স্কুলে মেয়ে কত?

—বেশী নয়।…আপনার ছেলে-মেয়ে কটি?

সুভাষিণী বলিল।

সুরুচি বলিল—মেয়ে নেই! ভেবেছিলুম, একটি মেয়ে থাকলে আপনার ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে খুব ভাব করবো।

হাসিয়া সুভাষিণী বলিল—আমার সঙ্গে ভাব করো, আমি তোমার মেয়ে হবো।

লজ্জায় সুরুচির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল!

সুভাষিণী বলিল—আমার বড় ছেলে তোমার চেয়ে চার বছরের বড়। সে ম্যাট্রিক-ক্লাশে পড়ছে। মেজো তোমার বয়সী—তারো চলছে ক্লাশ-সেভ্ন্!

সুরুচি বলিল,—বেশ! তাহলে দরকার হলে পড়াশুনার সাহায্য পাবো।

এমন সময় কৌমুদী আসিল। সুরুচি বলিল—বা কুমু, তোমার জন্ম-দিন, আর তোমার দেখা নেই!

কৌমুদী বলিল—জানো না তো, তুমি এখানে এসেছো, আর আমাকে নিয়ে পিসিমা বেরিয়েছিল যে! মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখলুম…ঠাকুর নমস্কার করলুম। তার পর গেলুম তোমাদের বাড়ী…জ্যাঠা-মশাইকে নমস্কার করে এলুম। জ্যাঠা-মশায়ের বাত হয়েছে…

সুরুচি বলিল—হ্যাঁ…দশ বছর আগে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন…হাঁটুতে লেগেছিল। সেই অবধি হাঁটুটা কম-জুরি হয়ে রইলো। মাঝে-মাঝে হাঁটু ফোলে, হাঁটুতে ব্যথা হয়!

কৌমুদী বলিল—গিয়ে কি লাভ হলো, জানো রুচি! জ্যাঠা-মশাইকে নমস্কার করলুম, জ্যাঠা-মশাই বুকে টেনে নিয়ে আদর করলেন। তার পর কি দিয়েছেন, ছাখো…

বলিয়া কৌমুদী দেখাইল হীরা-চুণী-বসানো একটি ব্রুচ!

বড়র দল ওদিকে নিজেদের বড়মানুষির গল্পে মত্ত ছিলেন …এ-কথায় তাঁরা একবার ফিরিয়া চাহিলেন। সে ব্রুচ তাঁদের বুকে খোঁচার মতো বিঁধিল!

মনে-মনে জয়া বলিল, আমার মেয়ে কমলার জন্ম-দিনে তাকে দিলেন একখানা মামুলি জর্জ্জেট-সিল্কের শাড়ী আর তার সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউশ…

মিসেস্ সামন্ত বলিলেন, আমার স্বামী ওঁর তাঁবে চাকরি করেন কি না, তাই আমার দুই মেয়ের বেলায় এক জনকে দিলেন মাদ্রাজী শাড়ী, আর এক জনকে একখানা গুজরাটী! শাড়ী যেন ওরা চোখে ছাখেনি!…

রামহরি সান্যালের স্ত্রীর মন বলিল—আমার মেয়ে দিগঙ্গনার জন্মদিনে পঁচিশ টাকার একখানা চেক্!

সকলের এক নালিশ, কৌমুদীর জন্ম-দিনে দামী ব্রুচ! কৌমুদীর বাপ চাকর নয়…সমান-সমান ঘর কি না!

সুভাষিণীকে উদ্দেশ করিয়া কৌমুদী বলিল—তুমি এসো। পিসিমা তোমায় ডাকছে।

সুভাষিণী বলিল—চলো মা…

সুরুচি বলিল—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আপনি কৌমুদীর পিসিমা হন্…আমিও আপনাকে পিসিমা বলবো।

তিন জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জয়া বলিল—নতুন হেড-মাষ্টারের কি নাম, প্রিয়ম্বদা?

প্রিয়ম্বদা বলিল—মহেন্দ্র চৌধুরী।

বুকে যেন পাথর পড়িল! মহেন্দ্র চৌধুরী!

জয়া বলিল—কোথায় বাড়ী?

প্রিয়ম্বদা বলিল—তা কে জানে! এসেছে মাষ্টারী করতে…তার কুল-কুলুজীর খপর নেবার জন্য কার কি মাথা-ব্যথা পড়েছে!

জয়ার মুখ গম্ভীর!

মিসেস্ সামন্ত এক বার চারি দিকে চাহিলেন, তার পর কণ্ঠ মৃদু করিয়া বলিলেন—মফঃস্বলে এসে মান-ইজ্জৎ আর রইলো না! ঐ স্কুলের মাষ্টার···তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে খেতে হবে! কলকাতায় যত দিন ছিলুম, এমনটি কখনো ঘটেনি! সেখানকার সোসাইটিই আলাদা, বুঝলে জয়া!

গৌরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে বসিয়া সুভাসিনী দু'-চারিটা সৌখীন রান্না করিতেছিল···কৌমুদী এবং সুরুচি সেইখানে বসিয়া।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তোমরা দু'জনে ওদিকে যাও মা রুচি···ওঁরা যদি কিছু মনে করেন!

সুরুচি বলিল—ওঁদের ও-সব সাজ-ফ্যাশনের কথার মধ্যে আমরা জুজু-বুড়ী হয়ে বসে থাকতে পারি কখনো পিসিমা?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কুমুকে তাহলে ছেড়ে দাও, মা···ওর বাড়ীতে কাজ···ও এখানে সরে বসে থাকলে ভালো দেখাবে না।

কৌমুদী বলিল—বা রে, ওখানে ললি-মলির বিলিতি বুকনি! জানো না তো পিসিমা, লরেটোর মেয়েদের কথা কবার ভঙ্গী, তাদের নাচ, তাদের হল্লা আর চালিয়াতীর ইতিহাস শুনতে শুনতে দম বেরিয়ে যায় যেন!

তবু কৌমুদীকে যাইতে হইল। গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমিও যাও রুচি। পৃথিবীতে সব মানুষ কি মনের মতো হয়! তবু সকলকে নিয়ে সকলকে সয়ে আমাদের বাস করতে হয়। এখন থেকে সব-রকমের মানুষকে সহ্য করতে শেখো!

সুরুচি বলিল—তুমি বলছো পিসিমা, যাচ্ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে ওরা মিশতে চায় না। বাবার মেয়ে বলে আমি যেন মস্ত অপরাধ করেছি!

১০

জয়া বাড়ী ফিরিল, রাত্রি তখন নটা।

কামাখ্যা সাহেব তখন ছেলেদের লইয়া ডিনারে বসিয়াছে।

জয়াকে দেখিয়া চ্যাটার্জ্জী বলিল—ফিরলে!

গম্ভীর কণ্ঠে জয়া বলিল—হ্যাঁ···

বলিয়া টেবলের সামনে একখানা চেয়ারে বসিল।

কামাখ্যা চাহিল জয়ার পানে, বলিল—মেজাজ গম্ভীর দেখছি যে! মানে? খাতির করেনি ওরা?

জয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—খাতিরের কথা নয়।

—তবে?

জয়া বলিল—বলবো'খন। খেয়ে যেন অফিস-কামরায় চলে যেয়ো না। দরকারী কথা আছে!

এ কথা বলিয়া জয়া চলিয়া গেল বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে।

তার পর ভোজন-পর্ব্বের শেষে বারান্দায় দু'জনে কথা হইতেছিল।

কামাখ্যা বলিল—হেড-মাষ্টার মহেন্দ্র চৌধুরী যে তোমার সেই পিসতুতো ভাই মহেন্দ্র···এ কথা তোমায় কে বললে?

জয়া বলিল—মহীনও মাষ্টারী করে। সে ছাড়া ফার্ষ্ট ক্লাশ এম-এ পাশ অন্য মহেন্দ্র চৌধুরী হতে পারে না!

কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী বলিল—এর মধ্যে স্কুল-কমিটির একটি মিটিং হয়ে গেল। তাতে আমি ছিলুম, নতুন হেড-মাষ্টারও প্রেজেণ্ট ছিল···নানা আলোচনা হলো। মহীন্ তো আমাকে চেনে···এ হেড-মাষ্টার তোমার ভাই হলে তুমি ভাবো, আমি না হয় তাকে চিনলুম না, কিন্তু তোমার ভাইও আমাকে চিনতে পারবে না?

জয়া বলিল,—চিনলে কি করতো সে?

—আত্মীয়তার কথা তুলতো! বিশেষ আমি যখন স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট, আমাকে খুশী রাখতে পারলে তার উন্নতির আশা যেখানে, তুমি ভাবো, বাঙালী হয়ে আত্মীয়তার এত-বড় সুযোগ সে নষ্ট করবে? পাঁচ জনের কাছে নিজের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যও তো মানুষ বড়র সঙ্গে আত্মীয়তা জাহির করে বেড়ায়! ছাট্‌স্ হিউম্যান্ সাইকলোজি!

জয়া একাগ্র-মনে কামাখ্যার কথা শুনিল। শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি জানো না! শুনেছ তো জ্যাঠা বাবুর কাছে, আমার পিসেমশায় মানে, মহীনের বাবা···তিনিও স্কুল-মাষ্টার ছিলেন···তাঁরো ছিল দুর্জ্জয় তেজ! মহীনের অন্য কি গুণ আর আছে না আছে জানি না, তেজ কিন্তু খুব। ভাঙ্গে তো মচকায় না!···জ্যাঠা বাবু অত করে বলেছিলেন, অত ভয় দেখিয়েছিলেন, তবু যা ধরলে, তাই তো করলে! বিষয়-সম্পত্তির লোভ ত্যাগ করে অনায়াসে মাষ্টারী-চাকরি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিগারে দীর্ঘ টান দিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী বলিলেন,—সে তেজ নিয়ে তোমার ভাই যদি এখানে হেড-মাষ্টারী করে, আমাদের তাতে

কি এসে যাবে শুনি,...যার জন্য তুমি একেবারে মুখ-খানাকে চক্রাকার করে তুললে!

বিরক্তিতে জয়ার ললাট কুঞ্চিত হইল। জয়া বলিল,—তোমার মতো মানুষ তা কি করে বুঝবে!

এ কথায় একটু চমক!

কুঞ্চিত-ভ্রূ কামাখ্যা চাহিল জয়ার পানে।

জয়া বলিল—মারা যাবার সময় জ্যাঠা-বাবু নতুন উইলের ব্যবস্থা করে গেছলেন,—তুমি তার খশড়াও তৈরী করেছিলে...

কামাখ্যা উচ্চ হাস্য করিল। বলিল—সে কি উইল! হুঁ:!...আমার হাতের লেখা খশড়া! সই হয়নি, কিছু না...সে তো ওয়েষ্ট-পেপার!

জয়া বলিল,—তা হলেও জ্যাঠা বাবুর সে-কথা...

কামাখ্যা বলিল—সে কথা! মারা যাবার সময় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে-অবস্থায় মাথামুণ্ডু যা বলবেন, তাই শিরোধার্য্য করতে হবে? এ-রকম সেণ্টিমেণ্টাল হলে পৃথিবীতে বাস করা যায় না! ও-উইলের কোনো দাম নেই...ও-উইল উইলই নয়! তুমি বুঝি তাই ভেবে সারা হচ্ছো!

জয়ার মাথার মধ্যে একরাশ সরীসৃপ কিলবিল্ করিয়া উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠে জয়া বলিল—রাজু...

কামাখ্যা বলিল,—রাজু!...হ্যাঁ, বলো, রাজু...কি?

জয়া বলিল—রাজু যদি বেঁচে থাকে...তার সঙ্গে কখনো যদি মহীনের দেখা হয়?

কামাখ্যা বলিল—হয়, হবে! তুমি বলতে চাও, রাজু যদি বলে, তোমার জ্যাঠা বাবু মারা যাবার সময় মুখের কথায় বলেছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তোমাকে আর তোমার মহীন্-ভাইকে...সমান দু'-ভাগে দু'জনকে দিয়ে গেছেন! এই তো?

জয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিল; কোনো জবাব দিল না! শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

কামাখ্যা বলিল—রাজু যদি বলে, তাতেই অমনি মহীন্ এসে সম্পত্তি ক্লেম করবে!...ক্লেম করলেই সম্পত্তি তার হবে?...পাগল! প্রমাণ কোথায় যে উইল হয়েছিল? রাজু বলবে, তোমার জ্যাঠা বাবুর ছিল এমনি লাষ্ট উইশ! আর তিনি তা লিখিয়েছিলেন আমায় দিয়ে। আমি বলবো, না...এমন উইশের কথা আমি শুনিনি...এমন কথা তিনি আমায় লিখতে বলেননি! ব্যস্! তাছাড়া ওয়ান্ ষ্টেট্‌মেণ্ট এগেনষ্ট এ্যানাদার ষ্টেট্‌মেণ্ট! সাক্ষী কে? কার কথা আদালত বিশ্বাস করবে? আমার? না, রাজু-খানসামার? আমি এক জন বিলিতি-পাশ এঞ্জিনীয়ার holding high office here! আর রাজু? তোমার মহীনের তরফে এ ক্লেম খাড়া করতে চায় মোটা টাকা বখ্‌শিস পাবে, সেই লোভে! কোন্ হাকিম আমায় ছেড়ে তাকে বিশ্বাস করবে? আমি শিক্ষিত ভদ্রলোক...আর সে একটা মিনিয়াল্ চাকর! তাছাড়া কে মরবার আগে কার কাছে তার কি লাষ্ট উইশ ব্যক্ত করে গেছে, সে-জবানির উপর আইন-আদালত নির্ভর করে না! সে লাষ্ট-উইশ কোনো রকম লেখায় ব্যক্ত করে গেলে আর সে-লেখার যোগ্য প্রমাণ পেলে তবেই আইন-আদালত তা নিয়ে মাথা ঘামায়!...তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! ...ও-সম্বন্ধে তুমি ভাবো, আমি এমনি চুপচাপ আছি? এ সম্বন্ধে বড়-বড় উকিলের পরামর্শ নিয়েছি, তাঁরা বলেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ও-সম্পত্তি ভোগ করো গে!

তবু জয়ার মন মানিতে চায় না। জয়া চাহিয়া রহিল উদাস নেত্রে...বাহিরে চন্দ্র-কিরণে দীপ্ত তরুবীথির পানে। ঘন পত্র-পল্লবের গায়ে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আর সে-জ্যোৎস্নার অন্তরালে অন্ধকারের ছায়া! ও-ছায়ায় যেন অজানা কি নিবিড় রহস্য। সে-রহস্যের পিছনে জ্যাঠা বাবুর দুই চোখের দৃষ্টি যদি...

কামাখ্যা বলিল—উকিলের পরামর্শেই তো তোমার নামে লেটার্স অফ-এডমিনিষ্ট্রেশান নেওয়া হয়েছে! আদালত থেকে প্রমাণ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। তোমার ছেলেরা হলো হিন্দু-আইনে তোমার জ্যাঠা বাবুর সম্পত্তির লিগাল heirs.

জয়া বলিল,—মহীন্?

বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে কামাখ্যা বলিল,—না! তোমার মহীন হলো তাঁর ভাগনে। আইন বলে, ছেলের অভাবে ভাইপো-ভাইঝী! অবশ্য সে-ভাইঝী যদি হয় married! অর্থাৎ ও সব জটিল ব্যাপার বোঝবার দরকার নেই! তুমি জেনে রাখো, তোমার ছেলেরা উমাপ্রসন্ন রায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী!

জয়া কি ভাবিতেছিল...বোধ হয়, অতীত দিনের কথা! জ্যাঠা বাবুর আশ্রয়ে ঐ মহীনের সঙ্গে এক দিন সে বাড়িয়া উঠিয়াছে! তখন কামাখ্যা ছিল না! দুই ভাই-বোন! মহীন তাকে ভালোবাসিত! জয়ার অপকর্ম্মে জ্যাঠা বাবুর ভৎর্সনা হইতে জয়াকে বাঁচাইতে মহীন নিজের মাথায় তার দোষ গ্রহণ করিয়াছে! তার পর জ্যাঠা বাবুর সেই বিরাগ মাথায় বহিয়া মহীন যে-দিন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সে-দিনও জয়ার হাত ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে কম্পিত-কণ্ঠে

বলিয়াছিল, তুমি আমায় ভুলো না জয়া দি, ছোট ভাই বলে মনে রেখো।

সে চোখের জল, সে কণ্ঠ জয়া ভুলিতে পারে নাই! তার পর জ্যাঠা বাবু ডাকিয়া বসাইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে মহীনকে মার্জ্জনা করিয়া বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছিলেন…

জয়া কি করিবে? মেয়ে-মানুষ! মহীনের সন্ধান কি করিয়া সে পাইবে! স্বামীকে বলিয়াছিল…স্বামী বলিল, খোঁজ পাওয়া যায় নাই। তার পর…

স্বামী কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছে, বলিয়াছে, দরকার। সে-ও না দেখিয়া না বুঝিয়া স্বামীর কথায় কাগজে সহি করিযাছে!

মাথার মধ্যে নিমেষে প্রচণ্ড কলরব জাগিয়া উঠিল! …কামাখ্যা বলিল,—এর জন্য এত দুর্ভাবনা! আমায় তেমনি কাঁচা ছেলে পেয়েছো! হুঁঃ…

কামাখ্যা উঠিল! বলিল,—কতকগুলো কাগজ পড়ে আছে…সই করতে বাকী…অফিস-কামরায় খাশ-কেরাণী বসে আছে…রাত এদিকে এগারোটা বাজে!

কামাখ্যা আসিল অফিস-কামরায়।

তার পর কাজ সারিয়া আবার যখন ফিরিল, এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া দেখে, জয়া তেমনি বসিয়া আছে বারান্দায় সেই বেতের চেয়ারে…চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া!

কামাখ্যা বলিল—এখনো তাই ভাবছো!

জয়া বলিল—তা ভাবিনি!

—তবে?

—অন্য অনেক কথা…

—কি, শুনি?

—ওরা তো এইখানেই রইলো! মহীনের সঙ্গে কখনো আমার দেখা হবে না, ভাবো? তোমার সঙ্গে তো আখ্‌চার দেখা হবে!

কামাখ্যা বলিল—দেখা হলেও ও তুচ্ছ এক জন হেড-মাষ্টার…তাকে আমি recognise করবো, ভাবো? তবে হ্যাঁ, ওরা বলে বেড়াতে পারে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা! আমার জীবনের গোড়ার দিক্‌কার ইতিহাস জানে তোমার মহীন…সে কথা পাঁচ জনের কাছে বললে আমার পোজিশনে খানিকটা আঘাত লাগতে পারে! তা তার জন্য আমি ভাবছি, একটা-কিছু ছুতো ধরে ওকে এখান থেকে সরানো শক্ত হবে না!

জয়া শিহরিয়া উঠিল! তার মনের গোপন গহনেও বুঝি এমনি আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল…যদি কোনো দিন জ্যাঠা বাবুর শেষ-দিনের সে মার্জ্জনার কথা শুনিয়া ঐ সুভাষিণী পাঁচ জনের সামনে বলিয়া বসে…

জয়া বলিল—কিন্তু তোমাদের জানকী বাবু মহীনকে খুব ভালো বলে জানেন। মহীনের উপর তাঁর অনেকখানি শ্রদ্ধা। আর সে-শ্রদ্ধা মিথ্যাও নয়! মহীন মানুষ-হিসাবে খুব ভালো…

কামাখ্যা বলিল—Still he is a school-master। স্কুল-মাষ্টাররা অতি নিরীহ জীব। তার পক্ষে goody goody হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই জয়া! জীবনে ওরা কতটুকু scope পায়! ওদের কাজ আর খ্যাতির গণ্ডী কতখানি লিমিটেড!…তুমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করো। সোশ্যালি ওদের সঙ্গ এড়িয়ে চলো। আমার পক্ষে তার সম্ভাবনা খুব বেশী! কিন্তু তোমরা মেয়েরা…মেলামেশায় বাছ-বিচার করো না…এই না মুস্কিল! তা, তুমি হুঁশিয়ার থেকো! এতটুকু প্রশ্রয় দিয়ো না কোনো দিন!

জয়া বলিল—মহীনের বৌকে দেখে মনে হলো, ভালো মানুষ! গৌরী-ঠাকুরঝি, দেখলুম, ওকে মাথায় তুলেছে …খুব ভালোবাসে মহীনের বৌকে!

কামাখ্যা বলিল,—তোমার গৌরী-ঠাকুরঝি তাকে মাথাতেই তুলুন আর মন্দিরেই বসান, বিষয়-সম্পত্তিতে মহীন টুঁ মারতে পারবে না! ওদের আত্মীয় বলে স্বীকার করে মেলামেশা করাটুকু বাঁচিয়ে চললে মান-ইজ্জতেও ঘা লাগবে না!

মুখে এতখানি ভরসা দিলেও কামাখ্যার মনের কোণে অস্বস্তির ছায়া লাগে নাই, তা নয়! আরামে বাস করিতেছিল,—কোনো দিকে ছোট একটা কুশাঙ্কুরের মাথা দেখা যায় নাই! আজ হঠাৎ এখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির! এত-বড় বাঙলা দেশে মাষ্টারী করিবার আর জায়গা ছিল না? তার চাকরির দরখাস্তখানা কামাখ্যার হাত ঘুরিয়াই তো জানকী বাবুর হাতে গিয়া উঠিয়াছিল! কে জানিত, এ মহেন্দ্র…উমাপ্রসন্নর আদরের ভাগিনেয়… জয়ার ছেলেবেলাকার ভাই! জানিলে…

কিন্তু যা হইয়া গিয়াছে, তা লইয়া এখন মাথা-ঘামানো মূঢ়তা!…তাছাড়া ভয় বা কিসের! জয়ার ভাই মহেন্দ্র এখানে মাষ্টারী করিতে আসিয়াছে, করুক মাষ্টারী! …কামাখ্যা চ্যাটার্জী-অফিসারকে ভগ্নীপতি বলিয়া সোহাগ জানাইতে আসিবে, এমন স্পর্দ্ধা তার হইতে দিবে না!

কামাখ্যা বলিল,—রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ো গে… এ কথা বলিয়া কামাখ্যা চলিয়া গেল।

জয়া বসিয়া রহিল। মাথার উপর আকাশে এক-রাশ নক্ষত্র! জয়ার মনে হইতেছিল, নক্ষত্রগুলা যেন নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে স্নেহ-মমতা ভুলিয়া, বিশ্বাস ভুলিয়া জয়া এ কি করিতেছে!

জ্যাঠা বাবু! যে-কথাটি বলিবার পর তাঁর কণ্ঠে আর দ্বিতীয় কথা সরে নাই···সে-কথার কোনো দাম নাই জয়ার কাছে?

নিশ্বাসে বুক ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, নক্ষত্রভরা ঐ আকাশ যেন নীচে নামিয়া আসিতেছে···একেবারে যেন বুকের উপরে! কোনো মতে জয়া উঠিয়া পড়িল! স্বামী···স্বামীর উপর সে নির্ভর করিয়া আছে···

কিন্তু আর পারে না! জ্যাঠা বাবু চলিয়া গিয়াছেন···তিনি কি জয়ার মন বুঝিবেন না? সে কি করিবে? ওদিকে মহীন···এদিকে স্বামী! স্বামীকে লইয়াই তার সব···স্বামীকে না মানিলে জয়া কোথায় থাকিবে!

আকাশে মেঘ···না? তাই! নক্ষত্রগুলা যেন কাঁপিতেছে।

জয়ার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল! ত্রস্ত পায়ে সে গিয়া ঘরে ঢুকিল।

১১

পরের দিন সকালে কৌমুদী আসিয়া সুভাষিণীকে বলিল—রুচি কাল তোমার এখানে বেড়াতে আসবে পিসিমা, বিকেলবেলা।

সুভাষিণী বলিল—বটে! তুমিও এসো তার সঙ্গে···দু'জনে এইখানে জলখাবার খাবে। কেমন?

হাসিয়া কৌমুদী বলিল—আসবো।

—কি খাবে বলো দিকিনি?

হাসিয়া কৌমুদী বলিল—ঐটি আমি বলতে পারবো না পিসিমা। কোনো দিন বলতে পারি না। বাবা আর পিসিমা কাল জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ রে জন্মতিথিতে কি খাবি, বল্? আমি বলতে পারলুম না।···ককৃখনো বলতে পারি না! আমি জানি না, কি খেতে চাই, কি খেতে আমার ভালো লাগবে! খেলে তখন বলতে পারি।

সুভাষিণী হাসিল; হাসিয়া বলিল—পাগলা মেয়ে!

মহেন্দ্র বাড়ী ফিরিল। দেখিয়া কৌমুদী বলিল—আমি আসি পিসিমা।

মহেন্দ্র শুনিল, বলিল—আমি এলুম বলে পালাচ্ছো! মাষ্টারকে ভয় করে, বুঝি?

বলিল—তা নয়! মন্দিরে আজ কথা হবে। পিসিমা যাবে। আমাকে বললে, তুইও যাবি আমার সঙ্গে। পিসিমাকেও নিয়ে যেতুম···তা পিসিমার ঘরকর্ণার কাজ আছে কি না! আসি পিসিমা···

কৌমুদী চলিয়া গেল।

সুভাষিণী তার পানে চাহিয়া ছিল। কৌমুদী চোখের আড়ালে চলিয়া গেলে সস্মিত দৃষ্টিতে মহেন্দ্রর পানে চাহিয়া সুভাষিণী বলিল—চমৎকার মেয়েটি! যেন ভক্ত আপনার!

মহেন্দ্র বলিল—একটা সুখপর আছে।

—কি?

—তোমার দুই ছেলেই কোয়ার্টার্লি এগজামিনে ফার্ষ্ট হয়েছে। এত বেশী নম্বর পেয়েছে যে, স্কুলে সকলে বললেন, এত নম্বর কোনো ছেলে পায়নি এর আগে!···কোথায় তারা?

সুভাষিণী বলিল—বেড়াতে বেরিয়েছে।

স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া মুখ-হাত ধুইয়া মহেন্দ্র আসিয়া বসিল বাহিরের বারান্দায়।

সুভাষিণী জলখাবার আনিয়া দিল।

খাইতে খাইতে মহেন্দ্র বলিল—কাল সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে জয়াদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, বললে! তখন ব্যস্ত ছিলুম, সে-কথা শোনা হলো না! তা তোমাকে চিনলে তো?

সুভাষিণী বলিল—দিদি পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। এখানকার যত বড়-বড় গিন্নীরা এসে-ছিলেন···মেয়ে নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে তোমার জয়াদিও এসেছিলেন···তাঁর মেয়ে কারো সঙ্গে মেশেনি! কথাও কইলে না।

মহেন্দ্র বলিল—জয়াদি তোমার সঙ্গে আলাপ করলে?

—না···

বিস্ময়ে মহেন্দ্রর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। মহেন্দ্র বলিল—সে কি! তোমার সঙ্গে কথা কইলে না?

সুভাষিণী কহিল,—না। ওঁদের সব ফ্যাশনের গল্প চলছিল···আমি একধারে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলুম। ঠিক যেন সেই হংসমধ্যে বকো যথা! এমন সময় জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচি এলো। আমার সঙ্গে সে কথা কইতে লাগলো। সুরুচি মেয়েটিও বেশ ভালো।···কাল এ-বাড়ীতে আসবে···কৌমুদীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে!

মহেন্দ্র বলিল—বলে পাঠানোর মানে?

সুভাষিণী বলিল,—কাজ-কর্ম্ম করি আমি, জানে।

তাই পাছে আমার কোনো অসুবিধা হয়, আগে থাকতে খবর দেছে! বুদ্ধি-বিবেচনা আছে।

মহেন্দ্রর খাওয়া হইয়া গেল। মুখ-হাত ধুইয়া মহেন্দ্র বলিল—আমায় একটু বেরুতে হবে। যে ওষুধটা কিশোরী বাবু খেতে দিয়েছিলেন, ফুরিয়ে গেছে বলছিলে,—আনা হয়নি। স্কুল থেকে ফেরবার মুখে আনবো, ভেবেছিলুম! হয়নি। এখন বেরুচ্ছি সেই ওষুধের জন্য।

সুভাষিণী বলিল—রাত করো না যেন! ইস্কুলে খাটুনি খুব হচ্ছে। একে ঠাঁইনাড়া—তার বিশ্রাম মেলেনি, তার উপর স্কুলকে ঢেলে সাজছো···

মহেন্দ্র বলিল—গোছগাছ সব করে নিয়ে এসেছি। মানে, নামকা-ওয়াস্তে স্কুল-কমিটির মেম্বার হয়েছেন বাবুরা। স্কুলের ভালো-মন্দ কিসে, সে কথা কেউ ভাবেন না, জানেনও না। মিটিং হচ্ছে, আসছেন, রেজলিউশন হচ্ছে! এ-সব শুধু জানকী বাবুর কাছে টান্ দেখাতে!

মহেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

ফিরিল রাত্রি আটটায়। ছেলেরা বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে···সুভাষিণী রান্নাঘরে।

মহেন্দ্র আসিয়া বলিল,—কামাখ্যা বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ ডিসপেন্সারিতে। একখানা চেয়ারে বসে আছেন। ডাক্তার সামন্ত ছিলেন ডিস্পেন্সারিতে! ~~তার সঙ্গে~~ উনি জানকী বাবুর বাড়ী যাবেন। জানকী বাবুর বাতের ব্যথা বেড়েছে, শুনলুম। জ্বর হয়েছে। ডাক্তার সামন্ত দেখতে যাবেন ডিসপেন্সারির ডিউটি সেরে—কামাখ্যা বাবুও ওঁর সঙ্গে যাবেন জানকী বাবুকে দেখতে।

সুভাষিণী বলিল—কামাখ্যা বাবু বললেন বুঝি? হাজার হোক ভগ্নীপতি তো!

মহেন্দ্র বলিল—কথা কইলেন, তবে সে ভগ্নীপতি হিসাবে নয়। তিনি স্কুলের প্রেসিডেণ্ট, আমি হেড-মাষ্টার এমনি ভঙ্গীতে অর্থাৎ আমি যেন ওঁর আশ্রিত! কৃপাপ্রার্থী! কম-মাইনে কি না।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—কম-মাইনে পেতে পারো, তা বলে বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওঁর নীচে তুমি নও, এ-জ্ঞানটুকু যদি ওঁর না থাকে, তাহলে বলবো, বিলেত গিয়ে মুখ্যু গোঁয়ারের মতো উনি শুধু হাতুড়ি-পেটা শিখে এসেছেন···মনের শিক্ষা যাকে বলে, তা ওঁর নেই!

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—পতির অমর্য্যাদায় সতীর নয়নে অগ্নি দেখা দেছে! আর নয়! এক দিন সতীর চোখের এ-আগুনে দক্ষ-রাজার যজ্ঞ পণ্ড হয়েছিল! আজ আবার? না সুভা, এর জন্য তুমি দুঃখ করো না। আমরা যে-সুখে আছি, যে আনন্দে···ওঁদের না-মানায় আমাদের কিছু এসে যাবে না! নাই বা ওঁরা মানলেন! বড়লোক বলে যেচে আমরা পায়ে গড়িয়ে পড়বো, তেমন মন ভগবান্ আমাদের ছ্যাননি, এ তাঁর মস্ত অনুগ্রহ! যে যার নিজের কাজ করে যাবো—এতে দুঃখ কোথায়? কিসের দুঃখ?

এ-কথায় সুভাষিণী ঈষৎ অপ্রতিভ হইল, বলিল—তার জন্য আমি দুঃখ করছি না। তোমার কি দাম, তা আমার অজানা নয়। তবে কাম্যাখ্যা বাবু আর তোমার জয়াদি মানুষ তো! তাই ওঁদের কাণ্ড দেখে আমার আশ্চর্য্য লাগে, দুঃখ হয় না!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রেম-লিপি

কাছে কাছে রহি' শুনায়েছি বহু বাণী
বুক দিয়ে তব শুনেছি বুকের ভাষা
চকিতে তা'-সবে স্মৃতি-মাঝে যবে আনি
প্রীতির আশায় কেঁদে মরে ভালোবাসা।
ভালোবাসা মোর ভাষা পেতে মরে কেঁদে—
লিপির মাঝারে আশা-ভরে তাই কাঁদি,
কাছে কাছে রহি যে-কথা বলেছি সেধে
সে-কথা বলিতে আনমনে সুর সাধি।

মুখে যা' বলেছি লিখে তা' জানাতে পারি!
লিখিতে কি পারি মূক নয়নের বাণী?
সুখ-স্বপনের বেদনা-গলানো বারি,
আঁখিতে এনেছি, লিপিতে কেমনে আনি?
হায় প্রিয়তম, যে-কথা বলিতে চাহি
লিপির ভাষায় কেমনে জানাই তারে?
যাহা লিখি নাই, তারি তলে অবগাহি'
জেনে নিয়ো মোর অকথিত কামনারে।

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

মিত্রশক্তির আক্রমণাত্মক প্রয়াস—

সভ্যতাভিমানী মনুষ্য-সমাজে বিশ্ব-মানচিত্রের অজ্ঞাত মহাদেশ আফ্রিকার গুরুত্ব অকস্মাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে এই মহাদেশেই সর্ব্বপ্রথম মিত্রশক্তির ব্যাপক আক্রমণ-প্রচেষ্টা প্রকট হইল। দুই-একটি গুরুত্বহীন রণক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়া সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে—এত কাল ফ্যাসিষ্টশক্তিই ছিল আক্রমণকারী, আর মিত্রশক্তি সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছেন মাত্র। অর্থাৎ এত দিন যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রণে শত্রুপক্ষই নেতৃত্ব করিয়াছে; আর মিত্রশক্তি সেই গতি অনুসরণ করিয়াছেন। আজ আফ্রিকায় বৃটিশ ও মার্কিণের সম্মিলিত সমর-প্রচেষ্টা সেই নেতৃত্ব গ্রহণের ঐকান্তিক প্রয়াস।

অবনত ও বিধ্বস্ত ফ্রান্সের উপনিবেশে যে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সামরিক সাফল্যে মিত্রশক্তির কোন কৃতিত্ব নাই। বস্তুতঃ এই অঞ্চলের সামরিক সাফল্যের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে মিত্রশক্তির ধুরন্ধরদিগের লজ্জানুভব করা উচিত। হয়ত এই জন্যই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ ও মার্কিণীর সৈন্যের বীরত্বের কথা তারস্বরে প্রচার না করিয়া প্রতিরোধের স্বল্পতার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—ভিসি-ফ্রান্সের সেনাবাহিনী যে মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, এই যুদ্ধে যে তাহাদিগের আগ্রহের নিতান্ত অভাব তাহাই পরোক্ষে প্রকাশ করা। সে যাহা হউক, ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা সম্বন্ধে ফ্যাসিষ্টশক্তির কূটনৈতিক পরাজয়ের কথা অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী উপনিবেশগুলি ফ্যাসিষ্টশক্তির হস্তে পতিত হইবার নিশ্চিত আশঙ্কা আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার প্রকাশ করিয়াছি। এই আশঙ্কা আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে; গত কিছু কালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই দিকে সুনিশ্চিত ইঙ্গিত করিতেছিল। ইতোমধ্যে ফরাসী উপনিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ফ্যাসিষ্টশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার কথা একাধিক বার শ্রুত হইয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলি জার্ম্মাণী ও ইটালীর হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা মিত্রশক্তির রাজনৈতিকদিগকে বিশেষ ভাবে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু কূটনৈতিক চাতুর্য্যের বলে তাঁহাদিগের অভিসন্ধি তাঁহারা গোপন রাখিতে পারিয়াছিলেন; ফ্যাসিষ্টশক্তির আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচর বিভাগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ব্যাপক সামরিক আয়োজনও করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, আকস্মিকতায় ফরাসী উত্তর-আফ্রিকায় এই আক্রমণের সহিত জার্ম্মাণীর নরওয়ে ও রুশিয়া আক্রমণের তুলনা চলিতে পারে। আর, জার্ম্মাণীর ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ-বিরোধী সমরতৎপরতায় নরওয়ের ও হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামের যুদ্ধের সম্বন্ধ যেরূপ, মিত্রশক্তির জার্ম্মাণ-ইটালী-বিরোধী সমর-প্রচেষ্টায় আফ্রিকার এই যুদ্ধের সম্বন্ধও সেইরূপ; ইহা মূল সমর-প্রচেষ্টার সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ গুরুত্বহীন শত্রুতা-সাধন মাত্র নহে।

মিশর হইতে জেনারল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকে এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যের এই তৎপরতাকে মিঃ চার্চ্চিল একই সমর-প্রচেষ্টার দুইটি অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আশু সামরিক প্রয়োজনে এই দুই অঞ্চলের সমরতৎপরতার সম্বন্ধ কত দূর ঘনিষ্ঠ, তাহা মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। এতদ্ব্যতীত, উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার যুদ্ধও যেমন ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিবদমান পক্ষদ্বয়ের শক্তিপরীক্ষা, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়ও তেমনই ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অঞ্চলে তথা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির মুষ্টি শিথিল ছিল বলিয়াই এত দিন লিবিয়ার যুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত হয় নাই; যুধ্যমান পক্ষদ্বয় বিশাল মরুভূমির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একাধিক বার ছুটাছুটি করিয়াছেন মাত্র।

ফরাসী উপনিবেশের সামরিক গুরুত্ব—

উত্তর-আফ্রিকায় অ্যালজেরিয়া হইতে দক্ষিণে কঙ্গো পর্য্যন্ত আফ্রিকার মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া ফ্রান্সের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত। এই সাম্রাজ্যের উত্তর উপকূল ভূমধ্যসাগর দ্বারা এবং পশ্চিম উপকূল আটলাণ্টিক মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। এই সাম্রাজ্যের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স বিধ্বস্ত হইবার পর হইতেই এই সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এবং ফরাসী নৌবহর ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এই সম্ভাবনা নিবারণের জন্য ফ্রান্স পরাভূত হইবার অব্যবহিত পরেই বৃটিশ নৌবহর উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে ফরাসী নৌবহরকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহাতে ফরাসী নৌবহর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণ পঙ্গু হয় নাই। তাহার পর, জেনারল দ্য গলের সাহায্যে ভিসি সরকারের প্রতি ফরাসী উপনিবেশের আনুগত্য নষ্ট করাইবার চেষ্টা হয়। মধ্য অঞ্চলে দুই-একটি গুরুত্বহীন অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও এই প্রয়াস সফল হয় নাই। কাজেই, ফরাসী উপনিবেশ ও ফরাসী নৌবহর ব্যবহারের অধিকার পাইয়া ফ্যাসিষ্টশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দূর হয় না। বিশেষতঃ, গত দুই বৎসরে ভিসি-ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়াছে; ভিসি-ফ্রান্সের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল্ স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি জার্ম্মাণীর বিজয়াকাঙ্ক্ষী।

জার্ম্মাণী ও ইটালীকে যথারীতি ফরাসী উপনিবেশ ব্যবহারের অধিকার প্রদত্ত না হইলেও কোন কোন স্থান তাহাদিগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ডাকারের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের ডাকারই পশ্চিম-গোলার্দ্ধের নিকটতম বিন্দু। এই স্থানের ঘাঁটী হইতে দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিশাল অঞ্চলে প্রভুত্ব করা চলে, য়ুরোপের

সহিত দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রাচ্য অঞ্চলের সংযোগ বিপন্ন করিতে এই ঘাঁটী বিশেষ সহায়ক। এইরূপ নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিকের জার্ম্মাণ সাবমেরিণবহর এই ডাকার হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছে; ইহা ব্যতীত ক্যাসাব্লাঙ্কা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ফরাসী আফ্রিকার অন্যান্য স্থানও জার্ম্মাণ সাবমেরিণবহরকে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ, দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে বিচরণশীল জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ফরাসী-আফ্রিকা হইতে জ্বালানি পাইয়া এবং বিমানবাহিনীর সহযোগ লাভ করিয়া মিত্রশক্তির অত্যন্ত ক্ষতি করিতে পারিয়াছে; তৎপরতার ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এইরূপ সাহায্যকারী ঘাঁটী না থাকিলে সাবমেরিণগুলির প্রাদুর্ভাব এত দূর বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। ইহার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ফরাসী-আফ্রিকায় যদি পরিপূর্ণ জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব স্থাপিত হইত, তাহা হইলে দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিকের পথে পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারিত না। শুধু তাহাই নহে, ফরাসী উত্তর-আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে পশ্চিম গোলার্দ্ধও এক সময় বিপন্ন হইতে পারিত। এই জন্যই কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিণী সৈন্য সাইবেরিয়া অধিকার করিয়াছিল এবং এই জন্যই এখন সমগ্র ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অধিকার-বিস্তারের এই ব্যাপক প্রয়াস।

মঃ লাভাল

জেনারল ফ্রাঙ্কো

তাহার পর, ভূমধ্যসাগরে অধিকার-বিস্তার সম্পর্কে টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কোর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জিব্রল্টরের বিপরীত দিকে অবস্থিত আন্তর্জ্জাতিক নগর ট্যাঞ্জিয়ার ফ্যাসিষ্ট স্পেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় সিউটায় যে সকল জার্ম্মাণ-কামান স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অপসারিত হইবার কথা শ্রুত হয় নাই। ঐ সময় বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ইটালীর বিমানঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছিল; অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তনে জেনারল ফ্রাঙ্কো যে পুনরায় ঐ সকল ঘাঁটী ইটালীকে ব্যবহার করিতে দিবেন, তাহা নিশ্চিত। এইরূপ অবস্থায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের ওরাণ, আল্‌জিয়ার্স, বিজার্টা প্রভৃতি ফরাসী ঘাঁটীও যদি ফ্যাসিষ্টশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে বৃটিশ নৌবহর ঐ অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইত; একমাত্র জিব্রল্টর ঘাঁটীর সাহায্যে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে একমাত্র জিব্রল্টর ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের অন্য ঘাঁটী না থাকায় ঐ অঞ্চলে বৃটিশ নৌবহরের প্রভাব অল্প; এই জন্যই লিবিয়ায় জার্ম্মাণ-ইটালীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই এবং এই জন্যই ফ্যাসিষ্ট বাহিনী একাধিক বার বেঙ্গাজীর পশ্চিম পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইলেও পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গত বৎসর লিবিয়ার জার্ম্মাণ-সেনাপতি রোমেলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি ফরাসী ঘাঁটীও ব্যবহার হইয়াছিল।

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে মিশর হইতে জেনারল আলেক-জাণ্ডারের আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে (৭ই নভেম্বর) ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির ব্যাপক সামরিক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ প্রসারিত করিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে দ্রুত মিত্রশক্তির প্রভাব-বিস্তারই এই দ্বিমুখী অভিযানের উদ্দেশ্য। যেরূপ আকস্মিক ভাবে এই সাঁড়াশী আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ফ্যাসিষ্টশক্তির পক্ষে জেনারল রোমেলের বাহিনীকে আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না; এমন কি, ডানকার্ক অপসারণের পুনরভিনয়ও হয় ত অসম্ভব হইবে।

মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এই আক্রমণের দ্বারা তাঁহারা ফ্যাসিষ্টশক্তিকে আঘাতের জন্য একটি সুবিধাজনক ঘাঁটী স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতঃ, য়ুরোপে ফ্যাসিষ্ট-শক্তিকে আঘাত করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই প্রভুত্বের জন্য ভূমধ্যসাগরের অন্ততঃ দক্ষিণ উপকূলে তাঁহাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব-বিস্তৃতির পর কোন্ দিক্ হইতে ও কি ভাবে ফ্যাসিষ্টশক্তিকে আঘাত করা হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় মিত্র-শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইলে ফ্যাসিষ্ট য়ুরোপ একরূপ সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বৃটেনে যে সমরায়োজন হইয়াছে, তাহার জন্য হিটলার পশ্চিম য়ুরোপে ব্যাপক প্রতিরোধ

ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; পূর্ব্ব য়ুরোপে দেড় বৎসরের চেষ্টাতেও তিনি রুশিয়ার কামানগুলিকে নীরব করিতে পারেন নাই, রুশ ট্যাঙ্ক ও বিমান এখনও নিশ্চল হয় নাই। ইহার পর, দক্ষিণ অঞ্চলেও যদি ভূমধ্যসাগরের জলরাশি হইতে মিত্রশক্তির হাজার গুলি নাসিকা উত্তোলন করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা হিটলারকে উৎকণ্ঠিত করিবে। সম্মিলিত পক্ষ এইভাবে ফ্যাসিষ্ট য়ুরোপকে পরিবেষ্টিত করিবার পর তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার দুর্ব্বল স্থানের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিবেন এবং সুযোগ পাইলেই সেই স্থানে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবেন। এই দিক্ হইতে ফরাসী-আফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই সমরতৎপরতাকে তাঁহাদের প্রথম আক্রমণাত্মক প্রয়াস বলা যাইতে পারে।
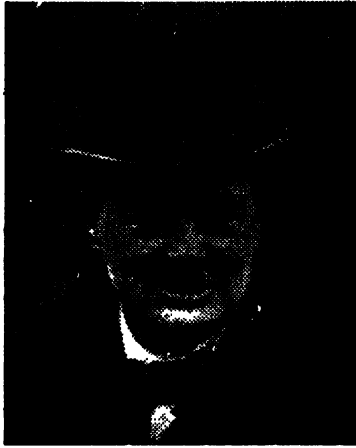
মিঃ চার্চ্চিল

জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়া—

আফ্রিকায় মিত্রশক্তির তৎপরতার সংবাদ পাইবামাত্র হিটলার জার্ম্মাণ বাহিনীকে অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশের আদেশ দিয়াছেন ; অজুহাত—মিত্রশক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণ আরম্ভ করিবে বলিয়া না কি সুনির্দ্দিষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। অঞ্চল-বিশেষ আক্রমণকালে যে অজুহাত প্রদর্শিত হয়, তাহার গুরুত্ব অধিক নহে ; মিত্রশক্তির যদি দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণের সাহস ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই "২৪ ঘণ্টা" বিলম্ব করিয়া তাঁহারা হিটলারকে প্রস্তুত হইতে সময় দিতেন না। যে অজুহাতই প্রদর্শিত হউক না কেন, প্রকৃত কথা এই—হিটলারের পক্ষে অবিলম্বে সমগ্র দক্ষিণ য়ুরোপে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর জার্ম্মাণ-আনুরক্তি সম্বন্ধে ভিসি-ফ্রান্সে অনৈক্য আছে ; ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদিগের এই মতদ্বৈধের রন্ধ্র দিয়া ফরাসী নৌবহর যাহাতে মিত্রশক্তির হস্তে পতিত না হয়, তাহার জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জার্ম্মাণী অবিলম্বে টুলোঁ, মার্শাই প্রভৃতি স্থানের ফরাসী নৌবহর অধিকার করিতে প্রয়াসী হইবে

হের হিটলার

ভূমধ্যসাগরোপকূলে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবে। তাহার পর, স্বভাবতঃ স্পেন ও পর্ত্তুগালের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি পতিত
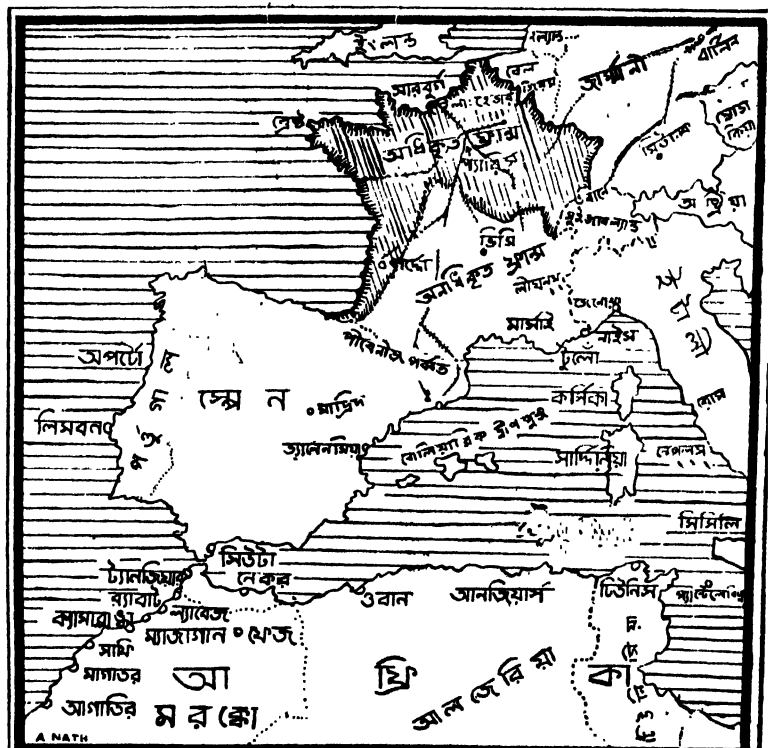
সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতার ক্ষেত্র

হইবে ; ছলে হউক, আর বলেই হউক, আইবেরিয়ান্ উপদ্বীপের (স্পেন-পর্ত্তুগাল) প্রতিরোধ-ব্যবস্থায় তিনি জার্ম্মাণ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাহার পর রোমেলের সেনা-বাহিনী ; ইতোমধ্যে টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণীর প্রচুর ডাইভ বমার ; জঙ্গী বিমান ও কিছু সৈন্য

জেনারল ওয়েগাঁ

মার্শাল পেতাঁ

প্রেরিত হইয়াছে। মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি নিবারণের জন্যই এই তৎপরতা। যত দূর মনে হয়, উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সহিত চরম শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পরিকল্পনা জার্ম্মাণীর নাই ; মার্কিণী সৈন্যের পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি অন্তত: সাময়িক ভাবে রুদ্ধ করিয়া হিটলার রোমেলের সেনাবাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় লিবিয়া হইতে অপসারণের উদ্যোগ করিতেছেন। ফ্যাসিষ্ট পক্ষে আজ "দ্বিতীয় ডানকার্ক" সম্ভব হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইতোমধ্যে শ্রুত হইয়াছে—টুলোঁ হইতে ফরাসী নৌবহর মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগদানের জন্য বহির্গত হইয়াছে। ওদিকে মার্শাল পেতাঁ না কি জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি ভঙ্গ হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন ; তিনি ও জেনারল ওয়েগাঁ কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আল্জিয়ার্সে এডমিরাল্ ডারলাঁ বন্দী হইবার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জনরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে থাকে যে, ফরাসী উত্তর আফ্রিকার সঙ্ঘর্ষ অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে পারে। এই সকল সংবাদ হয় ত পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভিসি-ফ্রান্সে জার্ম্মাণ-অনুরক্তি সম্বন্ধে তীব্র মতদ্বৈধ আছে, মার্শাল পেতাঁ, জেনারল ওয়েগাঁ প্রভৃতি কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর পদানত হইতে চাহেন নাই। বস্তুতঃ, মার্শাল পেতাঁর চেষ্টাতেই এত দিন—নামে মাত্র হইলেও—ফ্রান্সের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রনায়ক এখন সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর পদানত না হইয়া মিত্রশক্তির পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আর এডমিরাল ডারলাঁ ? গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ফ্রান্সকে যখন জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তখন এডমিরাল ডারলাঁ ফরাসী নৌ-বাহিনীর উদ্দেশে শেষ আদেশ দিয়াছিলেন—এখন হইতে আমি আর স্বাধীন নহি, অতঃপর আমার আদেশকে আর অধিনায়কের আদেশ মনে করিও না। এই উক্তি হইতেই ঐ সময় তাঁহার মানসিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য, পরে বৃটিশ নৌবহরের ফরাসী নৌ-বাহিনী আক্রমণে এডমিরাল ডারলাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হন। সে যাহা হউক, ভিসি-ফ্রান্সে জার্ম্মাণ-বিরোধী মনোভাবের কথা বিবেচনা করিলে এবং পেতাঁ, ওয়াগাঁ, ডারলাঁ প্রভৃতির ব্যক্তিগত মনোভাবের কথা স্মরণ করিলে আলজিয়ার্সে ডারলাঁ বন্দী হইবার সংবাদ, যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা সম্পর্কিত জনরব পেতাঁ-ওয়েগাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং টুলোঁ হইতে ফরাসী নৌবাহিনীর অন্তর্দ্ধানের কথায় একটি দীর্ঘ যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

(উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধে প্রাপ্ত শেষ সংবাদ—জার্ম্মাণী সমগ্র অনধিকৃত ফ্রান্স অধিকার করিয়াছে, কর্সিকা ইটালীয় সৈন্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছে ; সম্মিলিত পক্ষের নূতন সৈন্য বনে অবতরণ করিয়া বিজার্টা অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এ দিকে, ফরাসী-উত্তর আফ্রিকায় ভিসি-ফ্রান্সের সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে ; এডমিরাল ডারলাঁই যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেন। ফরাসী নৌবহর টুলোঁ ত্যাগ করে নাই। পেতাঁ-ওয়েগাঁ কোথায়, তাহা অনিশ্চিত।)

মিশর রণক্ষেত্র ও সোভিয়েট প্রতিরোধ—

গত অক্টোবরের শেষভাগে জেনারল আলেকজাণ্ডারের বাহিনী মিশরের এল্-আলামিন্ রণক্ষেত্রে আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম মিশর হইতেই জার্ম্মাণ-ইটালীয় বাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে। মিশরে মিত্রশক্তির এই সাফল্যের সহিত দক্ষিণ রুশিয়ায় সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গত জুন মাসে জেনারল অচিনলেকের বাহিনী যখন লিবিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া মিশরে আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী এল্-আলামিনের স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে আশ্রয় লয়, তখন মিত্রশক্তির বহু ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইলেও বিমান-শক্তিতে তাঁহারা প্রবল থাকে। এল্-আলামিনে আশ্রয় গ্রহণের পর গত ৪ মাস মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী শত্রুপক্ষকে অবিরাম আক্রমণ করিয়াছে, জেনারল রোমেলের সাহায্যার্থ সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণে বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। এ দিকে দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য উত্তর আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ রুশিয়ায় বহু বিমান অপসারণের প্রয়োজন হয় ; ইহাতে রোমেল্ আরও অসুবিধায় পড়েন। মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে তিনি

প্রয়োজনানুরূপ বাধা দিতে পারেন নাই ; ভূমধ্যসাগরের অপর তীর হইতে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য পাইতেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিমান-শক্তিতে শত্রুপক্ষের এই দৌর্ব্বল্য সাধনে সোভিয়েট প্রতিরোধের পরোক্ষ সহযোগের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। তাহার পর, সোভিয়েট বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের ফলেই ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, জার্ম্মাণ-সেনা অবিলম্বে ককেসাস্ ভেদ করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছিতে পারিবে না। এই জন্যই পশ্চিম এশিয়া হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রত্যাহার করিয়া মিশরে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল।

মিশর রণক্ষেত্র

অমীমাংসিত রুশ-যুদ্ধ—

গত এক মাসে ষ্ট্যালিনগ্রাডে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হয় নাই। নগর হিসাবে ষ্ট্যালিনগ্রাডের অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইলেও সামরিক প্রয়োজনে উহা অধিকার করা জার্ম্মাণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। ষ্ট্যালিন্‌গ্রাড অধিকার করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আষ্ট্রাখান পর্য্যন্ত আক্রমণ প্রসারিত করিতে পারিলে সোভিয়েট-প্রতিরোধ-ব্যূহশ্রেণীর দক্ষিণ পার্শ্ব পঙ্গু হইত ; সমগ্র ককেশাস্ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া পড়িত। সুদীর্ঘ ৪ মাস চেষ্টা করিয়াও জার্ম্মাণী ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, এই সর্ব্বপ্রথম ষ্ট্যালিনগ্রাডেই জার্ম্মাণীর সামরিক মর্য্যাদা আঘাত পাইল। গত বৎসর জার্ম্মাণ সেনা যখন মস্কৌর উপকণ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন শীত নিকটবর্ত্তী। কাজেই, মস্কো অধিকারের ব্যর্থতা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব ছিল ; কিন্তু এই বৎসর জার্ম্মাণ সৈন্য ষ্ট্যালিনগ্রাড অধিকারের জন্য সুদীর্ঘ ৪ মাস চেষ্টা করিয়াছে। হিটলার তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ষ্ট্যালিনগ্রাড অধিকৃত হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু এখন নূতন নূতন অঞ্চল সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রয়োজন তাঁহাকে যে ভাবে বিব্রত করিতেছে, তাহাতে ষ্ট্যালিনগ্রাড সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ এইরূপ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় রাখিয়া সম্প্রতি জার্ম্মাণ বাহিনী অকস্মাৎ পূর্ব্ব ককেশাসে তৎপর হইয়াছিল। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা বহু পূর্ব্ব হইতেই মজদক্ হইতে গ্রজনী তৈলকূপে আক্রমণ প্রসারিত করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে নাৎসী-সৈন্য অকস্মাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে নাল্‌চিক আক্রমণ করে। নাল্‌চিক অধিকারের পর উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতে এবং মজদক্ হইতে গ্রজনীর দিকে সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত করিতে প্রয়াস পায়। ঐ সময় আশঙ্কা হইয়াছিল—নাৎসী বাহিনী হয় ত সোভিয়েট-প্রতিরোধ ভেদ করিয়া কাস্পিয়ানের তীরে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে এবং তথা হইতে দক্ষিণ রুশিয়ায় তাহাদের চরম লক্ষ্যস্থল বাকু তৈলকূপে আক্রমণ চালাইতে পারিবে। কিন্তু নাৎসী বাহিনীর পক্ষে সোভিয়েট-প্রতিরোধ ভেদ করা সম্ভব হয় নাই ; মজদকে ও নাল্‌চিকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সোভিয়েট সেনা শত্রুসৈন্যকে সাফল্যের সহিত বাধা দান করিতেছে। পশ্চিম ককেশাসে টুয়াপ্‌সে অধিকারের জন্য জার্ম্মাণীর চেষ্টাও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। নভরোসিস্কের পর টুয়াপ্‌সে কৃষ্ণসাগরস্থিত সোভিয়েট নৌবহরের প্রধান অবলম্বন। টুয়াপ্‌সে অধিকার করিয়া উপকূলপথে বাতুম্ পর্য্যন্ত নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ প্রসারিত হইলে সোভিয়েট নৌবহর নিরবলম্ব হইবে। কাস্পিয়ানের উপকূল ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলপথে যদি জার্ম্মাণ-বাহিনী অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে সাঁড়াশীর আক্রমণে মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের সোভিয়েট বাহিনী নিষ্পিষ্ট হইতেও পারে। কিন্তু দুই দিকের আক্রমণই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। বিশেষতঃ, ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ চূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ককেসাস্ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইতে পারে না এবং ঐ অঞ্চল যত দিন রুশিয়ার অবশিষ্টাংশ হইতে সামরিক রসদ আহরণ করিতে পারিবে, তত দিন ককেসাসের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর অনুকূলে চরম সিদ্ধান্ত হওয়াও সম্ভব নহে।

গত কিছু কাল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠে যে, মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনায়কদিগের পক্ষে এই বিষয়টি আর "চাপা" দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া মনে হইতেছিল। এই জন্যই হয় ত জার্ম্মাণী দক্ষিণ রুশিয়ায় আক্রমণের বেগ শিথিল করিয়া অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর দ্রুত সাফল্যের পথে ইহা হয় ত বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। তাহার পর, এখন মধ্য-প্রাচীতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইল, রুশ রণাঙ্গনে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, আগামী শীতকালের পূর্ব্বে দক্ষিণ রুশিয়ার যুদ্ধে চরম সিদ্ধান্তের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়।

সুদূর প্রাচী—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষ অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চল হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। নিউগিনি ও সলোমান্‌সেই তাঁহাদিগের তৎপরতা অধিক। নিউগিনিতে অষ্ট্রেলিয়ান্ সৈন্য বিশেষ সাফল্য অর্জ্জনও করিয়াছে। সলোমান্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে গুয়াডাল্‌ক্যানারে জাপান সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশিতে জাপানের প্রাধান্য এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নিউগিনিতে জাপানের পরাজয় সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষ হইতেই বলা হইয়াছে—এই অঞ্চল হইতে জাপানের সৈন্য প্রত্যাহার ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। গুয়াডালক্যানার অঞ্চলে জাপানী নৌ-বহর মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাবে আক্রমণ চালাইলেও ঐ অঞ্চল সম্পর্কেও জাপানের চরম প্রয়াস আরম্ভ হয় নাই। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে জাপানের প্রকৃত অভিসন্ধি এখনও প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজিতে সামরিক প্রবাদবাক্য আছে, Attack is the best form of defence—আক্রমণই প্রতিরোধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রবাদবাক্য অনুসারে অষ্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি পূর্ব্ব হইতেই আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন; জাপান এখন সেই আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়াসী মাত্র। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যত দিন জাপানী নৌ-বহরের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ না হইবে, তত দিন অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে না; কেবল বিমানবহরের সাহায্যে নৌবাহিনী প্রতিরোধ করা সম্ভব কি না, তাহা সমরবিশেষজ্ঞদিগের আলোচনার বিষয়। বিমান-শক্তির স্বল্পতার জন্য জাপান যদি অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইতে না-ও পারে, তাহা হইলেও নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সে ঐ দ্বৈপায়ন মহাদেশের শক্তি বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে। এখন জাপান অষ্ট্রেলিয়ার শক্তি বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, না, সেখানে প্রত্যক্ষ আক্রমণের উদ্যোগ করিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি—অবিলম্বে জাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগের সেই ধারণা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ এখনও ঘটে নাই।

জাপানের আক্রমণ-প্রচেষ্টা ও ভারতবর্ষ—

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানী বিমান চট্টগ্রাম, ডিব্রুগড় এবং আসামের আরও কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। গত ৯০শে অক্টোবর দিল্লীতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—জাপানী ও বর্ম্মীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্ব সীমান্তে বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং স্থানীয় অধিবাসীর নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বর্ষা অতীত হইয়াছে; শীত আসন্ন। অতি সত্বর পূর্ব্ব-ভারত যুদ্ধপরিচালনের উপযোগী হইবে। কাজেই, এই পূর্ব্ব-ভারতে জাপানের বিমান আক্রমণকে তাহার প্রত্যক্ষ অভিযানের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সীমান্ত অঞ্চলে জাপানী ও বর্ম্মীদিগের তৎপরতা সম্পর্কে মনে হইতে পারে—জাপান পূর্ব্ব ভারতের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার দুর্ব্বল স্থান সন্ধান করিতেছে। অবশ্য, ইহাও সম্ভব—ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে আক্রমণ পরিচালনের যে আয়োজনের কথা পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতেছে, সেই আয়োজন সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জাপানের এই প্রয়াস।

সম্মিলিত পক্ষের রাজনীতিকগণ আশ্বাস দিয়াছেন—জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। ভারতের প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল্ ও মার্কিণী সেনাপতি বিজেল্ বলিয়াছেন—জাপানের পক্ষে এখন ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। জাপানের সামরিক শক্তির সন্ধান আমরা রাখি না; সে বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকারী আমরা নহি। তবে, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে—এই বৎসরের শীতকালই জাপানের শেষ সুযোগ। পরবর্ত্তী বর্ষার পূর্ব্বে জাপান যদি বাঙ্গালা ও আসাম হইতে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন বিনষ্ট করিতে অথবা অপসারিত করাইতে না পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

সম্প্রতি জাপান নান্‌কিং সরকারের সহিত সন্ধি করিয়া হাইনান্ দ্বীপের ইজারা লইয়াছে; ইহার ফলে চীনের উপকূলপথে ইন্দো-চীন তথা ব্রহ্মদেশে শক্তি বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ সে লাভ করিয়াছে। অবশ্য সম্প্রতি হংকংএ মার্কিণী বিমানের যে তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে, উহাতে এই সরবরাহ-সূত্র বিপন্ন হইতেছে কি না, তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, নান্‌কিং সরকারের সহিত সন্ধিতে জাপান মাঞ্চুকো অঞ্চলের এবং চীনে অবস্থিত সমরোপকরণ নান্‌কিং সরকারকে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ সঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে যে, জাপান নান্‌কিংকে দিয়াই চীনের যুদ্ধ চালাইবার মতলব আঁটিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় চীনা সমর-নায়কগণ মধ্যে মধ্যে এক পক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে গমন করিয়াছেন। কাজেই, জাপান হয় ত আশা করে—চীনে পুনরায় গৃহযুদ্ধ ঘটাইতে পারিলে সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা ব্যতীত, জাপানের সহযোগে নান্‌কিংএর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি দেখিয়া বহু চীনা ব্যবসায়ীর ও পুঁজিপাতির প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু চীনের এই গৃহ-দ্বন্দ্বে নান্‌কিংএর জাপানী তাঁবেদারকে সাফল্যমণ্ডিত করাইতে হইলে চুংকিংকে বাহিরের সাহায্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য ব্রহ্মদেশ জাপানের অধিকারভুক্ত থাকা আবশ্যক এবং এই জন্যই ব্রহ্মদেশ আক্রমণের ঘাঁটী পূর্ব্ব ভারতকে নিরস্ত্র করাও জাপানের প্রয়োজন। সম্মিলিত পক্ষ যে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন, তাহার নিশ্চিত আভাস পাওয়া গিয়াছে। জাপান এই আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য আয়োজন করিয়াই বসিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ইহাও সত্য, ব্রহ্মসীমান্তে কোন্ পক্ষের আক্রমণ প্রথমে আরম্ভ হইবে, তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা চলিতে পারে।

সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকায় ও য়ুরোপে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ফ্যাসিষ্ট-শক্তির অনুকূল নহে। কাজেই, এই অবস্থার ফলে উৎকণ্ঠিত হইয়া জাপান আরও দ্রুত আক্রমণাত্মক প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইতে পারে। উত্তর আফ্রিকায় উদ্ভূত অবস্থা হইতে ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, প্রতীচ্য মিত্রের নিকট হইতে অদূর ভবিষ্যতে পরোক্ষ সহযোগ লাভের আশা জাপানের আর নাই; একই সময়ে মধ্য-প্রাচী ও সুদূর প্রাচীতে "চাপ" দিবার পরিকল্পনা যদি ইতঃপূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপাততঃ উহা ব্যর্থ হইল। কাজেই, এখন আরও প্রতীক্ষায় জাপানের নিজেরই অসুবিধা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন—আক্রমণে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতিরোধে প্রবৃত্ত থাকিলে অনেক সময় অল্প ক্ষতিতে শত্রুর অধিক ক্ষতিসাধন সম্ভব হয়। কাজেই জাপান ব্রহ্মসীমান্তের দুর্গম অঞ্চলে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষাও করিতে পারে।

ইহা নিছক সামরিক কৌশল ও সামরিক সুবিধা-অসুবিধা-সম্পর্কিত গবেষণা। তবে, বোধ হয়, ইহা বলা যায়, জাপানী নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যাপৃত রাখিয়া ব্রহ্মসীমান্তে কেবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে। যদি নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর সহযোগে ভারতবর্ষ হইতে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জাপানী সমর-নায়কদিগকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—জাপান যদি ব্রহ্মসীমান্তে কেবল প্রতিরোধাত্মক
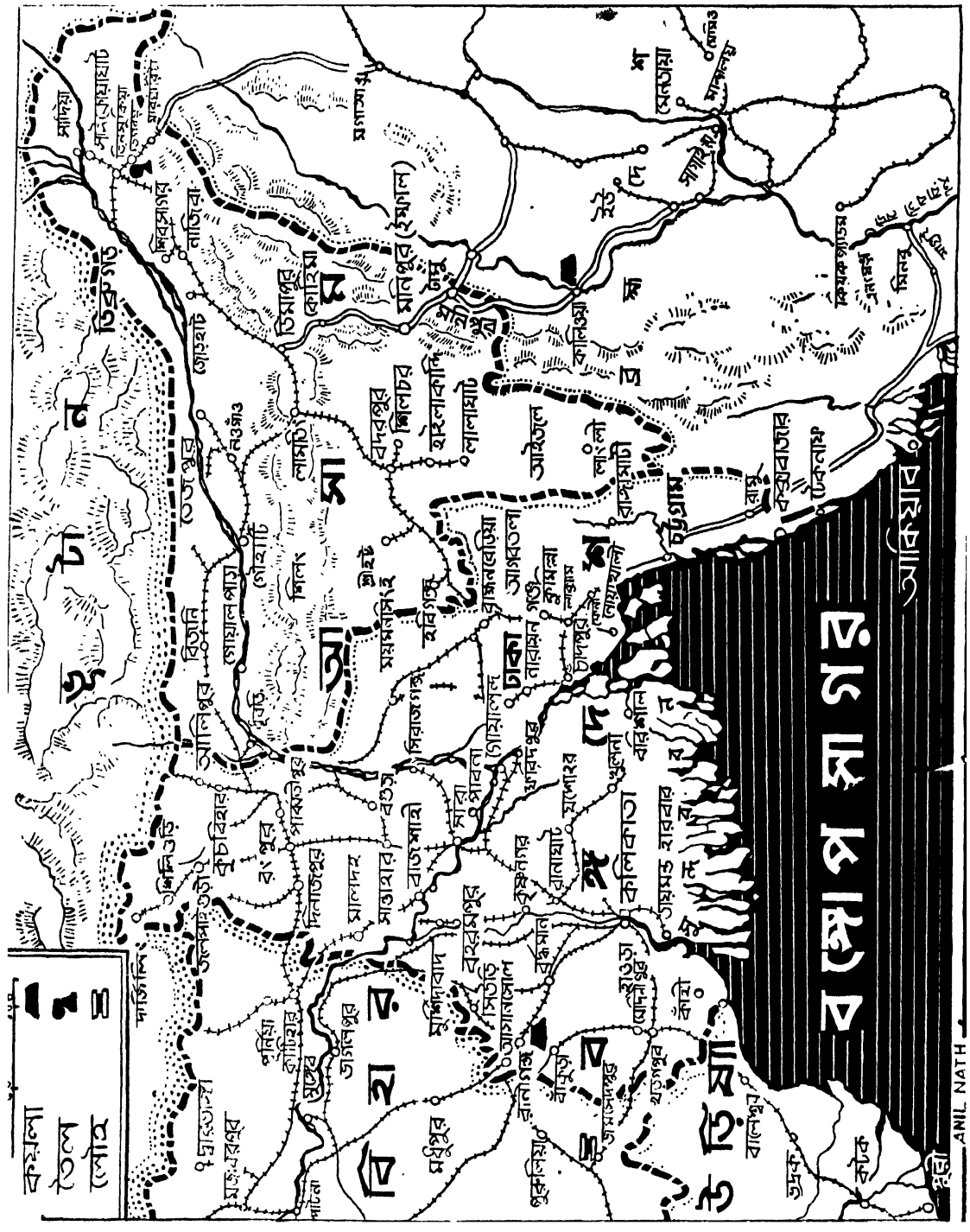
সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলেও সামরিক প্রয়োজনেই পূর্ব্ব-ভারতে তাহার বিমান-আক্রমণ প্রসারিত হইবে। এবং শত্রুর শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধাত্মক সংযোগ-সূত্রে সংগ্রামেরই অঙ্গ।

১১।১১।৪২ শ্রীঅতুল দত্ত।

মিথ্যার প্রচার

উৎকট সাম্রাজ্যবাদী ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের ক্যাক্সটন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া এদেশের লোক ভারত-সচিবের প্রগলভতায় নূতনত্বের পরিচয় না পাইলেও ভারত সম্বন্ধে ও-দেশের লোকের অজ্ঞতার বহর দেখিয়া তাহাদিগকে নিরতিশয় বিস্মিত হইতে হইয়াছে। বিলাতী শ্রোতার দল এই মিথ্যা কথাগুলি নির্ব্বিকার চিত্তে শ্রবণ করিয়া তাহা কি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন? কারণ, কথাগুলি ঐতিহাসিক তথ্য, রাজনৈতিক অভিমত নহে। কথা মিথ্যা হইলেও তিনি লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ঘোর অরাজকতা বিরাজিত ছিল; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক্‌দল সেই সময়ে ঐ দেশ-শাসনের শক্তি ক্রমশঃ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এদেশের ইতিহাসের পাঠকগণ নিশ্চিতই জানেন—অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্ব্বত্র ঘোর অরাজকতা বিরাজিত ছিল, ইতিহাসে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সময়ে সময়ে কোন কোন স্থানে অরাজকতা লক্ষিত হইয়াছিল ইহা সত্য বটে, কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই কোন না কোন সময়ে ঐরূপ অরাজকতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কোন দেশে অরাজকতা স্থায়ী ভাবে বিরাজিত থাকিলে সে দেশের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিই বিলুপ্ত হয়। দারিদ্র্য অরাজকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ব্রুক্‌স্ এডাম্‌স্ তাঁহার বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Law of Civilization and Decayতে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালার অর্থ বিলাতে নীত হওয়াতেই বিলাতের অধিবাসীরা সমৃদ্ধির পথে ঐ প্রকার অগ্রসর হইতে (অর্থাৎ বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে) পারিয়াছেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ যেমন শেষ হইল আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার টাকা লুণ্ঠিত হইয়া বিলাতে রপ্তানী হইতে থাকিল, আর দেখিতে দেখিতে দড়িটানা মাকু, ধাতু গলাইবার জন্য পাথুরে কয়লার ব্যবহার, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীভ্‌দের চরকা (spining jenny), ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্রম্‌টনের সুতা কাটিবার যন্ত্র, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আর্কবাটরাইটের যন্ত্র-চালিত তাঁত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এবং ওয়াটের ষ্টিম-এঞ্জিন প্রভৃতির আবিষ্কারে বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার টাকা লইয়াই ইংরেজ-জাতির বুদ্ধি যেন ইন্দ্রজাল-কৌশলে খুলিয়া গিয়াছিল। এ কথা কি সত্য নহে যে, যাহারা বাঙ্গালা হইতে প্রথম যে সকল লুঠের মাল বিলাতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সেই দ্রব্য-সম্ভার দেখিয়া বিলাতের জন-সাধারণ বিস্ময়ে যেমন বিহ্বল হইয়াছিল, তেমনি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষ্যা, কৌতূহল এবং প্রতিযোগিতা করিবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল? ক্লাইভকে লোকে মেক্সিকো-বিজয়ী কর্টেজের তুল্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় বা মাদ্রাজে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিত, তাহা হইলে এদেশে কি তত অধিক ধন-দৌলত থাকিত? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল কর্ম্মচারী এদেশে কেরাণীগিরি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা এক-এক জন এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিয়াছিল।

বিলাতের লোক এই সকল অভ্রান্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এত শীঘ্র ভুলিয়া মিষ্টার আমেরীর ঐ ভুল তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া কিরূপে পরিপাক করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন!

মিষ্টার আমেরীর স্বীকৃতি

ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী এত দিন পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবল কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা চাহে না, সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল শ্রেণীর রাজনীতিকরাই ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দাবী করিতেছে। কিন্তু তিনি বলিতেছেন যে, সেই দাবী পূরণ করিবার পথে প্রধান বাধা এই যে, সকল সম্প্রদায়ের যাহাতে সুবিধা হয়, কোন সম্প্রদায় অন্য কাহারও প্রতি যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে, সেই প্রকার শাসন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত করা যাইতেছে না। সকলেই জানে—"মনের অগোচর পাপ নাই!" এই বাধা কাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কি মিষ্টার আমেরী ও অন্যান্য ইংরেজের অজ্ঞাত? সাম্রাজ্যবাদী সকল দেশেরই অধিবাসীদের মধ্যে নানা শ্রেণীর নানা সম্প্রদায় বিদ্যমান। মার্কিণে আছে, রুশিয়ায় আছে, কানাডায় আছে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে, চীনে আছে, সমগ্র বলকান রাজ্যেও আছে। কিন্তু সে জন্য কোন দেশেই শাসন-পদ্ধতি রচনায় কোন অসুবিধা হয় নাই! এমন মামুলী আপত্তিও কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই! বিধাতা কেবল ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতি-কল্পেই সমস্ত অসুবিধা ও নানা প্রকার আপত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাধা বিঘ্ন সমস্তই কি ভারতকে চির-পরাধীন রাখিবার জন্য গোড়া হইতেই বিলক্ষণ মুন্সীয়ানার সহিত পরিকল্পিত নহে? অন্ততঃ এ দেশের লোকের এরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

সঞ্চয় নিষিদ্ধ

চাঁদপুরে ঢোল-সহরতে এই আদেশ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত তাহার যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন, তাহার অধিক চাউল সে ঘরে রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাহা রাখে, তাহা হইলে তাহার অর্থদণ্ড হইবে। যাহাদের অধিক চাউল সঞ্চিত আছে, সে কথা তাহারা সরকারকে জানাইবে। সহজ বুদ্ধিতে এই ঢোলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় কি? কেবল চাঁদপুর অঞ্চলেই এই আদেশ প্রচারিত হইবার কারণ কি? ঐ অতিরিক্ত চাউল জাপানীদের উদর পূর্ণ করিবে, এই ভয়? কিন্তু এই সঞ্চয়-ভীতি কি চাঁদপুরেরই একচেটে? চাঁদপুর মেঘনা-তীরবর্ত্তী বাণিজ্য-প্রধান বন্দর। কিন্তু কেবল ব্যবসায়ীই নহে, সর্ব্ব-সাধারণের উপর এই ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে। সুতরাং এ আদেশ হয় সমরনৈতিক

না হয় অর্থনৈতিক। সমরনৈতিক হইলে এ সম্বন্ধে আমরা নির্ব্বাক্; বাঙ্গালায় চট্টগ্রামে এবং আসামের ডিগবয়ে (ডিব্রুগড়ে) জাপানী বোমা দেখা দিয়াছে। কিন্তু কোথাও বিশেষ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তথাপি কি সরকার জাপানী-আক্রমণ আসন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন? তাই জানিতে ইচ্ছা হয়, এই আদেশ কেবল চাঁদপুরেই জারি করা হইল কেন? এখন যোদ্ধবৃন্দের উভয় পক্ষই পরস্পর সন্নিহিত স্থানে কত দূর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের বলাবল কত, তাহা নিরূপণের চেষ্টা করিবে। মার্কিণের ১০ম বিমান-বাহিনীর সেনাপতি বিসেল (Bissel) বলিয়াছেন—চীনে খেয়া দিবার ব্যবস্থার দিকেই জাপানের এখন অধিক মনোযোগ পড়িয়াছে। ফলতঃ, জাপান এখন ভারত আক্রমণ করিবে না বলিয়াই অনুমান হয়। এ অবস্থায় উক্ত ঘোষণা-প্রচার সামরিক কারণ হইতে উদ্ভূত না হইতেও পারে। আর্থিক কারণে এইরূপ ঘোষণা হইয়া থাকিলে সেই আর্থিক কারণটি কি? আর্থিক কারণেই লোকে নিজ-গৃহে খাদ্য-বস্তু সঞ্চিত রাখে। ইহা এ দেশের সনাতনী নীতি। সে নীতি বিপর্য্যস্ত করিবার এমন কি কারণ ঘটিল, তাহা জানা নিষ্প্রয়োজন নহে।

কিন্তু সরকার অর্থনৈতিক কারণে এই আদেশ প্রচার করিয়া থাকিলে আমরা সরকারকে কয়টি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে বলি। প্রথম পৌষ মাসে নূতন চাউল উঠিলে সকলে তাহা পরিপাক করিতে পারে না। এই কারণেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা বৈশাখ মাসের পূর্ব্বে নূতন চাউল ব্যবহার করেন না। দ্বিতীয়তঃ আগামী বারে ফসল কিরূপ হইবে, তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। ঝড়ে-জলে ধানের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। এই জন্যই ধান-চাউল সঞ্চিত রাখা একান্ত আবশ্যক। এখনই চাউলের যেরূপ মূল্য হইয়াছে, তাহাতে অনেক লোক অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। সুতরাং এ-অবস্থায় চাউলের মূল্য হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ আদেশ জারি করা সঙ্গত নহে।

মিল এবং গরমিল

নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিলাতি সাম্রাজ্যবাদীরা যখন যে কথা বলিলে তাঁহাদের সুবিধা হইবে, তখন সেই কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না। উৎকট সাম্রাজ্যবাদীদিগের মুখপাত্র মিষ্টার আমেরী সে-দিন বলিয়াছেন, এইবার চীন জাপান প্রভৃতির সহিত ভারতবাসীদিগের কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য (affinity) নাই, বরং ইউরোপীয়ানদের সহিত সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় হইতে। আবার এই সকল সাম্রাজ্যবাদী দায়ে পড়িয়া সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিয়া থাকেন; বলেন—ভারতবাসীরা এসিয়াবাসী, সুতরাং তাহাদের দেশ স্বায়ত্ত-শাসন গজাইয়া তুলিবার উপযুক্ত নহে। গণতন্ত্রমূলক শাসন বা গণশাসন (Democratic Government) যে আলেকজাণ্ডারের ভারতে আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল, সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার অকাট্য প্রমাণ দেদীপ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নৃতত্ত্বের দিক্ দিয়া সমস্ত ককেসীয় জাতির জ্ঞাতিত্ব বা গোষ্ঠীগত সম্বন্ধ অস্বীকার করি না। আবার ভারতবাসীরা যে এশিয়াবাসী, এশিয়ার জলবায়ু তাহাদের জীবনে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করি না, এই য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও বলেন যে, ভারতবাসীর শোণিতে সামান্য পরিমাণ মঙ্গোলীয় শোণিত মিলিয়াছে। যখন চীনের সহিত ভারতীয় সখ্যের কথা উঠে, তখন তাঁহারা এ কথাটা ভুলিয়া যান। গরজ কি নাহি লাজ!

ডক্টর আম্বেদকরের জল্পনা

ডক্টর বি, আর, আম্বেদকর বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক তফশীলভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক জন নেতা বলিয়া পরিচিত। বরোদার গায়কবাড়ের সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া তিনি মার্কিণ কলম্বিয়ার ডক্টর ছাপ আঁটিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ডক্টরীতে তাঁহার মৌলিকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনুন্নত জাতির মুরুব্বি হিসাবে তিনি তাহাদের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তাঁহার অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান (Depressed Classes Institute) অনুন্নত সম্প্রদায়ের কি উপকার করিয়াছে, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত। জাতি-সম্পর্কিত তাঁহার উক্তি ও সিদ্ধান্ত-গুলি ভ্রান্ত তথ্যে এবং সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই মন্তব্য প্রকাশে তাঁহার সখ বিলক্ষণ প্রবল। সম্প্রতি মার্কিণের কতকগুলি লোক ভারত-সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করায় ইনি বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিতেছেন, তাঁহারা ঠিক খবর জানেন না, অর্দ্ধ-সত্য সংবাদ লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে ভারতের উপকার না হইয়া অপকারই হইবে।" এই কণ্ঠস্বর 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের ন্যায় সুস্পষ্ট। ইহার মতে ভারত স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অযোগ্য। অর্থাৎ "ব্যাঙ্‌ বলে, কত জল?"

আটলাণ্টিক চার্টার

'আটলাণ্টিক চার্টার' নামক সনন্দ কাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, সে বিষয়ে প্রথম হইতেই যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। মিষ্টার চার্চ্চিল এত দিন ধরিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া আসিতেছেন, ইহা এশিয়াবাসী বা অন্য কোন বর্ণ-জাতির প্রতি প্রয়োগ করা হইবে না। অথচ মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট দলপতি মিষ্টার রুজভেল্ট এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্। হিন্দু মহাসভার সভাপতি মিষ্টার সাভারকর তাঁহার মত জানিবার জন্য তাঁহাকে তার করিলেও তিনি নিরুত্তর। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিষ্টার উইলকির বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'Atlantic Charter applies to all humanity।' অর্থাৎ আটলাণ্টিক চার্টার সমগ্র মানব-জাতির সম্বন্ধেই খাটিবে। কথাটা শুনিয়া অনেকেই সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া কোন আশা পোষণ করা সঙ্গত নহে। ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেও আতঙ্কে অভিভূত হয়! আমাদেরও সেইরূপ অবস্থা! অবশেষে এই Humanity শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক আরম্ভ হইবে না ত? পাশ্চাত্য রাজনীতির জটিল তত্ত্ব অনেক সময়েই আমাদের দুর্ব্বোধ্য। Disaffection শব্দের অর্থ লইয়া এক বার বোম্বাইয়ের উচ্চ আদালতে ঘোর বাদানুবাদ চলিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪

দফার পরিণাম কি হইয়াছিল ? এখন আবার Humanity-র কোন্ অর্থ আবিষ্কৃত হয়, তাহা না দেখিয়া এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না।

অপবাদের পর শাস্তি

প্রথমে অপবাদ, পরে শাস্তিদান—দুষ্ট লোকের এই কুনীতি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ইহার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মনীতি পরিচালিত করেন। তাঁহারা হীন স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের দুর্নাম রটনা করিয়া স্বকার্য্য সাধন করেন। ইহাই প্রাজ্ঞোচিত কার্য্য। লণ্ডনের 'নিউজ রিভিউ' নামক পত্রিকাখানি সাম্রাজ্যবাদীদিগের সম্পত্তি। গত ২০শে আগষ্ট এই পত্রিকায় অতি অদ্ভুত কথা লেখা হইয়াছে।—"গত সপ্তাহে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে অতিরিক্ত কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। (১) কংগ্রেসী দলের কোন কোন সদস্যের জাপানী এবং জাপানীদিগের অনুকূল পক্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্রব আছে; ভারত সরকারের নিকট তাহার প্রমাণ আছে। (২) কতকগুলি ধনী দেশীয় কাপড়ের কলওয়ালাদিগের অর্থেই আইন-অমান্য আন্দোলন চলে। উহাদের বিশ্বাস, তীব্র জাতীয়তার ভাব জাগাইতে পারিলে দেশীয় শিল্পাদি সংগঠনের সুবিধা হইবে। এবং (৩) মহাত্মা গান্ধী এবার বড় বুদ্ধিমত্তা দেখাইতে পারেন নাই। ভারতে বৃটিশ শাসন ধ্বংস করিবার কল্পনা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কাগজগুলি পুলিশের হাতে পড়িয়াছে।" এই তিন দফা অভিযোগের কোন দফাই কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাঁহারা অনেক বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতের সমর্থন করেন না, তাঁহারাও এই প্রকার অমূলক অভিযোগ শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। প্রথম দুই দফা অভিযোগের কথা ভারত সরকার তাঁহাদের বিশ্বস্ত সচিবগণকে বলিয়াছেন কি? উহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এত দিন তাহা প্রকাশ করিতেন। সুতরাং উহা বে বনিয়াদ! আর তৃতীয় অভিযোগটি হাস্যোদ্দীপক। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা কত দূর নামিতে পারেন, ইহা কি তাহারই প্রমাণ নহে ?

সিংহলে চাউল রপ্তানী

সিংহলকে ভারত হইতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টন অর্থাৎ অন্ততঃ ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ চাউল যোগাইতেই হইবে। তাহা ভিন্ন যদি আর কিছু অধিক পাওয়া যায়, তাহাও দিতে হইবে। সিংহলের রাষ্ট্রীয় পরিষদে সিংহলের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার ব্যারণ জয়তিলক এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এত চাউল ভারতবাসী কোথায় পাইবে ? সিংহলে যখন ধানের চাষ অধিক হইত, তখন ভারতেও ধানের চাষ অধিক হইত। সিংহল যেমন তাহাদের দেশে ব্রহ্মদেশের চাউলের ভরসায় ধানের আবাদ কমাইয়া চা, কোকো, তামাক, রবার, সিঙ্কোনা, লবণ, এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, তৈলবীজ এবং নারিকেলের চাষ করিতেছে, ভারতও তেমনি ঐ ব্রহ্মদেশের ভরসায় বাণিজ্যপণ্য উৎপন্ন করিয়া ধানের চাষ কমাইয়াছে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে কত চাউল আমদানী করা হইত, তাহা দেখিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। ফলে সিংহলেরও যে দশা হইয়াছে, ভারতেরও ঠিক সেইরূপ দুরবস্থা। এই দুই দেশ কি উপায়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে? তবে কি ভারতবাসীরা অনাহারে মরিয়াও সিংহলকে চাউল যোগাইতে বাধ্য হইবে? এরূপ অসঙ্গত আবদার মানুষ কখনও করিতে পারে কি? ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশে যেখানে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে সিংহলবাসীরা চাউল আমদানী করিবার চেষ্টা করেন না কেন? তাহারা সিংহলে ধানের চাষ বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিতে পারেন ত! ভারতের লোককে না খাইতে দিয়া সিংহলে চাউল চালান দিতে হইবে, এ বড় অদ্ভুত আবদার! এ দেশে আটা, ময়দা, চাউল প্রভৃতির মূল্য এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা ক্রয় করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতেছে। এ দেশের বহু লোককে অনাহারে দিনপাত করিতে হইতেছে।

চার্চ্চিলের কথা

বিলাতের ম্যান্সন হলে সম্প্রতি সম্রাটের প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চিল যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আশাবাদী ভারতবাসীদিগের সকল আশা নৈরাশ্যের পারাবারে নিমজ্জিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ডুবাইয়া দিবার সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সম্রাটের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি নাই। বৃটিশ-সম্রাটের ছায়াতলে যে স্বাধীন রাজ্যসমষ্টি এবং জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাতে এক জন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি।" সাম্রাজ্যবাদীরা বচনে বৃহস্পতি হইয়া থাকেন! Commonwealth of Nations প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়া অধীন রাজ্যগুলিকে অভিহিত করা সাম্রাজ্যবাদীদিগের স্বার্থসাধনের একটা কৌশল। সাম্রাজ্যবাদীদিগের শ্রেষ্ঠ মিষ্টার চার্চ্চিল সে কথার কৌশল খুবই জানেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের বেশ বুঝা উচিত যে, বিধাতার রাজ্যে চিরকালই ভণ্ডামি করিয়া কার্য্যোদ্ধার সম্ভব নহে। তবে আমাদের দেশের লোকের ইহা মনে হইতেছে যে, বৃটিশ জাতি এখন বা অচির-ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে সম্মত নহে। অতএব তাঁহাদের অধীর হওয়া সঙ্গত নহে। বিধাতার কৃপা হইলেই ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে। আর উহা পাইবার জন্য ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে হইবে। বিধাতার কৃপা হইলেই বৃটিশ জাতির ভারতকে স্বাধীনতা দিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে;—অন্যথা নহে।

সেবা প্রতিষ্ঠান

কল্যাণীয়া সিষ্টার তরু ঘোষ শিক্ষিতা নার্স ও অভিজ্ঞা ধাত্রীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ১।১।১ বি, কলেজ স্কোয়ার এবং ১৪২ এফ রসা রোড ভবানীপুরে নার্সেস ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সিষ্টার তরু ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মিণীগণের আত্মনিবেদিত সেবা-কার্য্য দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। য়ুরোপীয় নার্সগণের শিক্ষা ও সেবা-নিপুণতার তুলনায় ইহাদের অভিজ্ঞতা ও শুশ্রূষানৈপুণ্য কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে—অথচ ব্যয় য়ুরোপীয় নার্সের তুলনায় স্বল্প।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ধনী-সম্প্রদায় গৃহে রোগ-যন্ত্রণার সময়ে ইঁহাদের সেবা-নিপুণতায় উপকৃত হইতেছেন; এবং অভাবগ্রস্ত ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও এই ভাবে সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি কামনা করি। সিষ্টার তরু ঘোষের সাধনা সার্থক হউক!

টাকা অচল

গত ১৩ই আশ্বিন বুধবার ভারত সরকারের অর্থবিভাগ হইতে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১৭ই হইতে) সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এবং ষষ্ঠ জর্জ্জের নামে প্রচারিত টাকা ও আধুলি বাজারে চলিবে না। তবে ভারতীয় পোষ্টাফিস, ট্রেজারী ও রেল-ষ্টেশনে আগামী বৎসরের কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত) উহা চলিবে; তাহার পর ঐ সকল স্থানেও আর চলিবে না। তবে তাহার পরেও তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শাখায় গৃহীত হইবে। সরকার টাকায় অধিক রূপা রাখিতে ইচ্ছা করেন না; তাই অতঃপর যে টাকা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার আসল মূল্য অর্থাৎ ধাতব মূল্য অল্পই হইবে। তাহা স্থব-মরা বা ক্ষয় হইলে তাহার বিনিময়ে রৌপ্য পাইবার আর আশা থাকিবে না! ব্যবহারে উহার অক্ষর ঘসিয়া গেলে উহা অচল হইবে এবং সে জন্য সাধারণের ক্ষতিই হইবে। ইহা হইবে পূর্ণমাত্রায় ভাক্ত মুদ্রা (Token Coin)। ইহার ফলে কেবল আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের অর্থাৎ বাট্টার বাজার বিপর্য্যস্ত হইবে, তাহা নহে,—দেশের মধ্যেও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আসল মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রাও ভারতে আর চলিত থাকিল না, দেখিতেছি! ক্রমশঃ আমরা বিজ্ঞ হইতেছি।

আটলাণ্টিক ম্যাগাজিনের মত

'আটলাণ্টিক ম্যাগাজিন' মার্কিণের একখানি বিশিষ্ট সাময়িক পত্র। উহাতে সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার কথা আলোচিত হইতেছে। উক্ত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ যে, "ভারতীয় সমস্যার সমাধান-কল্পে সম্মিলিত জাতিগুলির সম্মিলিত ভাবেই আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।" উহাতে বলা হইয়াছে যে, "কংগ্রেসের সহিত পরামর্শ না করিয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভবে না। সত্য বটে, কংগ্রেসই ভারত নহে, ইহার সামাজিক কোন কার্য্যসূচি নাই এবং ইহার কোন গণতান্ত্রিক ভিত্তিও নাই। শ্রমশিল্পসেবী ব্যক্তিগণই আংশিক ভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষক। তাহা সত্ত্বেও ইহা ভারতের প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদিগেরই প্রতিনিধি-সভা। রয়টার সংবাদ দিয়াছেন, এই পত্রিকায় প্রকাশ—কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার এবং মার্কিণী সরকার চীনের সানিয়েৎসেনের বিরুদ্ধবাদী উন্নতি-বিরোধী সামরিকদিগেরই সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে তাঁহারাই আবার জাতীয়তাবাদীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া চুক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামরিক দলের সহিত চুক্তি করেন নাই।" "কংগ্রেসের নেতাদিগকে কারারুদ্ধ না করিয়া বরং মুস্লিম-লীগের নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করিলে অধিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত, চীনের ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।" চিরকালই সকল মানুষের চক্ষুতে ধূলি দিয়া চাতুরী বাহাল রাখা যাইবে—তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না! অন্য মত ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাই বিধাতার বিধান।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতা হালসী-বাগানে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার ইতিহাসে এরূপ অগ্নিকাণ্ডে আর কখনও এত লোক জীবন্ত দগ্ধ হন নাই। কলিকাতা হালসী-বাগান রোডে আনন্দ আশ্রমে কালীপূজার অনুষ্ঠান হয়। ২২শে কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ণে উক্ত পূজামণ্ডপে বিবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবার সময় সহসা আগুন লাগে। দেখিতে দেখিতে হোগলার বৃহৎ মণ্ডপে অগ্নিরাশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মণ্ডপের চারি দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। তাহার দুইটি দ্বারের মধ্যে একটি পুরুষের জন্য, আর একটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকদিগের দ্বারটি চাবি-বন্ধ ছিল এবং চাবি লইয়া কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না; কাজেই সেই দ্বার দিয়া কেহ বাহির হইতে পারেন নাই। অগ্নি যখন সমস্ত হোগলার মণ্ডপ দগ্ধ করিতে থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা বাহির হইতে পারে নাই। মণ্ডপের হোগলার আচ্ছাদন বাঁশ-দড়ি সহ জ্বলন্ত অবস্থায় সেই সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ জনতার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ তাহার মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হইতে থাকেন। প্রায় ১৪১ জন নারী ও বালিকা ঐ স্থানে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন আরও বহু লোক সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হন। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যাঁহাদিগকে হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহাদেরও অনেকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, দেড় শতের অধিক লোক এই দুর্ঘটনায় অপমৃত্যু বরণ করিয়াছেন। দগ্ধ লোকের সংখ্যাও শতাধিক ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল? অনুষ্ঠাতাদিগের বিষম অযোগ্যতায় এবং অপরিণামদর্শিতার ফলেই যে এই ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হোগলায় সহজে অগ্নি লাগিতে পারে। সেই হোগলার মণ্ডপের চারি দিক্ বন্ধ করিয়া সেখানে এরূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা কখনই সঙ্গত হয় নাই। অস্থায়ী বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ-দোষে এরূপ অগ্নিকাণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে। এই অগ্নিকাণ্ডে একটি স্ত্রীলোকের সাতটি সন্তান জীবন্ত পুড়িয়া মরিয়াছে। আর কত শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার সকল বিবরণ কি লোকে জানিতে পারিয়াছে?

২৫শে কার্ত্তিক কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাঁচ জন কাউন্সিলার ও তিন জন বিশিষ্ট নাগরিক লইয়া তদন্ত-কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবটি আলোচনা-সময়ে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা শোচনীয়। হোগলার মণ্ডপের বাঁশগুলি সন্নিকটবর্ত্তী বাড়ীর সহিত বাঁধা ছিল—অগ্নি-বিস্তারের আশঙ্কায় দড়িগুলি কাটিয়া দেওয়ায় সমগ্র জ্বলন্ত চালটি জনতার উপর অতি-শীঘ্র পতিত হইয়াছিল। দম-কল এবং এ, আর, পির উদ্ধারকারীদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। উৎসব-মণ্ডপে

এক জনও স্বেচ্ছাসেবক বা এক-বালতী জলেরও ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরিত এতগুলি অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির এক-সঙ্গে অনুরূপ পরিচর্য্যারও সুবিধা ঘটে নাই এবং তাহা সম্ভব ছিল না। তদন্তের পর যাহাদিগের দোষে এবং অবিমৃষ্যকারিতায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। অনিচ্ছাকৃত হইলেও যে ত্রুটির ফলে এইরূপ শোচনীয় জনক্ষয় হয়, তাহা কদাচ মার্জ্জনীয় নহে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ মূঢ়তা প্রকাশের অবকাশ না ঘটে, এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পয়সার অভাব

আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকের এই ঘোর অর্থাভাবের দিনে বাজার হইতে পয়সা যেন মন্ত্রবলে উড়িয়া গিয়াছে! অতি-দরিদ্র লোকেরই পয়সার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গরীব এক পয়সার শাক, লবণ প্রভৃতি কিনিয়া খায়; তাহা কিনিতে পারিতেছে না। অনেক ভদ্রঘরের বিধবা প্রভৃতির আয় মাসিক দশ-বারো টাকার অধিক নহে; তাঁহারা এই বিপদে নিরুপায়। যাহারা শাক, ডুমুর প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে এক বেলার উদরান্নের সংস্থান করিত, পয়সার অভাবে তাহাদের পণ্যগুলির বিক্রয় বন্ধ। ইহার জন্য কত লোকের যে ঘোর কষ্ট হইতেছে, তাহা সহরবাসীর অগোচর। তিন পয়সার বা পাঁচ পয়সার জিনিষ কিনিবার উপায় নাই। অনেকে পরদুঃখে কাতর হইয়া একটি পয়সা ভিক্ষা দিয়া থাকেন, পয়সার অভাবে তাঁহাদের দানের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতেছে। বাজার হইতে হঠাৎ পয়সার অদর্শন ঘটিল কেন, তাহা বুঝা যায় না। যুদ্ধের জন্য সরকারের যদি তামার পয়সার দরকার থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বাজারে অন্য ধাতুর পয়সা চালাইয়া তামার পয়সা প্রত্যাহার করিলেন না কেন? ট্রাম-কোম্পানী খুচরা চেঞ্জ দিবার জন্য এক পয়সা দুই পয়সার কুপন বাহির করিয়াছেন। তামার পয়সার অভাবে বাজারে এমনি কুপন চলিবে কি? এ বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বাঙ্গালায় বাত্যা ও বন্যা

গত দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন বাঙ্গালার উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে ঝড় নোয়াখালী ও বাকরগঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাতে যেমন ঝড় ব্যতীত জলোচ্ছ্বাসেও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল—এ বারও তেমনই ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণা জিলাদ্বয়ের কতকাংশে যে-ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কখন পূর্ণ করা সম্ভব হইবে কি না, বলা যায় না! ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে, সরকারী হিসাবে, প্রায় লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। এ বার ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

এ বার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুর্ঘটনার পরে প্রায় পক্ষকাল কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ ছিল। বাঙ্গালার সচিবদিগের মধ্যে ৩ জন—ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে সফর হইতে ফিরিয়া ২রা নভেম্বর (অর্থাৎ ঘটনার পক্ষ-কাল পরে) ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেন। তৎকালে তাঁহারা বলেন—সে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে বলা যায়, মেদিনীপুর জিলায় ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণা জিলায় ১ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে; প্রায় শতকরা ৭৫টি গৃহ-পালিত পশু নষ্ট হইয়াছে; মাটীর বাড়ী প্রায় সবই হয় নষ্ট, নহেত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সরকারের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে ঘটনার গুরুত্ব অনুমান করাও যায় না। তবে সরকারী হিসাবে—যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহার পরে জানা গিয়াছে, মৃতের সংখ্যা তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

তবে ঐ বিবৃতিতেই বলা হইয়াছিল, সরকার সাহায্য-দানের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিলেও কেবল সরকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধার-সাধন সম্ভব হইবে না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রাকৃতিক উপদ্রবের ফলে ঐ অঞ্চলে স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই—কৃষিকার্য্যের অসুবিধা হয় নাই। এ বার কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না।

যদি ধরা যায়, শতকরা ৭৫টি গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে, তবে প্রথম জিজ্ঞাস্য—কৃষিকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে?

মোট কত লক্ষ বা কোটি টাকা হইলে সাহায্যদান কার্য্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব, তাহার হিসাব এখনও বোধ হয়, হয় নাই।

তমলুক মহকুমার কোন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ

ঘটনার পরেও প্রায় পক্ষকাল বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট শৈলশিরে ছিলেন। তিনি ফিরিয়া ১১ই নভেম্বর এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—

"বাঙ্গালায় এ বার যেরূপ ক্ষতিকর ঝড় হইয়াছে, সেরূপ ক্ষতিকর ঝড় অধিক হয় নাই। সরকার যথাসাধ্য লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু দয়া-দত্ত দানে আরও অনেক কাজের অবকাশ রহিয়াছে।" আর—

"এই অবস্থায় আমি এই আশায় এই আবেদন প্রচার করিতেছি যে, ইহা বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের লোকের সাগ্রহ ও উদার সাহায্য-প্রাপ্তির কারণ হইবে। আমি জানি, আরও অনেকে ইতোমধ্যেই এই কার্য্যের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন—তাঁহাদিগের সাহায্য-দানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমি তাঁহাদিগকে আমার সহিত সহযোগ করিতে আহ্বান

করিতেছি যে, আমরা যেন এই দারুণ প্রাকৃতিক উপদ্রবে বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারি।

"এইরূপ অবস্থায় রাজনৈতিক বা অন্যবিধ বিচ্ছেদাত্মক ভাব বর্জ্জন করিয়া বিপন্নের সাহায্যের জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করাই প্রয়োজন।"

এই আবেদন-প্রচারে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহা হয়ত অনিবার্য্য। লর্ড কার্জ্জন এক বার, অন্য প্রসঙ্গে, বলিয়াছিলেন—সরকারের পক্ষে কোন কাজে অবহিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সরকার কোন কাজে অবহিত হইলে যে কর্ত্তব্য-পালনে তৎপরতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা আশা করি, যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সাহায্য-দান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেবল কাজের সুবিধা দেওয়াই হইবে না; পরন্তু তাঁহাদিগের সহিত সরকার আন্তরিকভাবে সহযোগ করিবেন। রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মহাসভা, মাড়বারী রিলিফ সোসাইটী প্রভৃতি যে সকল কেন্দ্রে কাজ করিতেছেন বা করিবেন, সে সকল কেন্দ্রে তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইবে।

গত ১২ই নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব-সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে যেমন ধ্বংসের পরিমাণ অনুমান করা যায়, তেমনই সরকারের সাহায্যদান-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মেদিনীপুরের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

মেদিনীপুরের উপকূলবর্ত্তী ৫টি থানাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রায় সমগ্র অঞ্চলেরই সকল ঘর ধ্বংস হইয়াছে এবং শতকরা ৭৫টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই ৩ লক্ষ ঘর ও ৬০ হাজার গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অবশিষ্ট ৭টি থানা এবং সদর ও ঘাটাল মহকুমার ১৩টি থানায় কম-পক্ষে ৪ লক্ষ ঘর পড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ১৫ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। এইরূপে প্রায় ৭ লক্ষ ঘর ধ্বংস হইয়াছে। ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। ৭৫ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসন প্রভৃতিরও ঐ অনুপাতে ক্ষতি হইয়াছে।

ইহার পর এই কল্পনাতীত ক্ষতিতে সরকার পানীয় জল সরবরাহের ও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত সাধারণ সাহায্যদানের এইরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে:—

খাদ্যের জন্য চাউল, ডাইল, লবণ, মণ্ট-দুগ্ধ প্রভৃতির প্রয়োজন। প্রতিদিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (১৪ বৎসরের অধিক) অর্দ্ধ সের এবং অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিকে এক পোয়া চাউল দেওয়া হইবে। ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্কগণকে আধ ছটাক ডাইল ও আধ ছটাক লবণ এবং ১৪ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বয়স্কগণকে উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। শিশুদিগকে বার্লি, সাগু, মিছরী ও মণ্ট-দুগ্ধ দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহের সাহায্য সেই সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট একটি তারিখে কেন্দ্র অনুসারে বিতরণ করা হইবে।

প্রত্যেক পরিবারকে খাদ্য লইবার জন্য একখানি কার্ড দেওয়া হইবে। খাদ্য দেওয়া হইলে কোন্ দিন খাদ্য দেওয়া হইল কার্ডে তাহা লিখা থাকিবে। কোন পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিদিগকে যখন কোন কার্য্য দেওয়া হইবে, তখন তাহাদিগের সাহায্য দান বন্ধ করা হইবে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ লোককেই এখন তাহাদিগের গৃহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই জন্য তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যাহারা অর্থোর্জ্জন করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে চারি সপ্তাহের অধিক বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান করা হইবে না।

এক স্থানে সমবেত অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন বিপন্ন নরনারী

গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে সরকার প্রত্যেক পরিবারকে গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন। একটি পরিবারকে বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণের জন্য ৩০ টাকার অধিক এবং রন্ধনগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২০ টাকার অধিক দেওয়া হইবে না। কোন পরিবার যতই বড় হউক না কেন, ৬০ টাকার অধিক কাহাকেও সাহায্য প্রদান করা হইবে না। যে সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই সকল ভগ্ন গৃহ হইতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাও গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। যে সকল পরিবারের বস্ত্র, বাসন এবং শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে এবং যাহাদিগের ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই,

তাহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য দেওয়া হইতে পারে অথবা অর্থ-সাহায্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং আট বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক-বালিকাগণের প্রত্যেককে একখানি করিয়া কাপড় দেওয়া হইবে। আট বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকা ও শিশুগণের প্রত্যেকের জন্য একটি শার্ট, পেনি অথবা একটি ফ্রক দেওয়া হইতে পারে। যে পরিবারে পাঁচ জন লোক আছে, সেই পরিবারের জন্য

তমলুক সহরের কয়েকটি বিধ্বস্ত গৃহ

অপর এক স্থানের ধ্বংসাবশেষ

একখানি করিয়া কম্বল দেওয়া হইবে, যে পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক, সেই পরিবারের জন্য দুইখানি করিয়া কম্বল দেওয়া হইবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের জন্য গরুর প্রয়োজন হইবে না। দুগ্ধবতী গাভীর আশু প্রয়োজন। যে সংখ্যক গবাদি পশু নিহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৪০ হাজারের কম নহে। যে সংখ্যক গবাদি পশু নিহত হইয়াছে, যদি তাহার শতকরা ২৫টি গবাদি পশুর ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলেও ১০ হাজার গবাদি পশুর প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য ইহা সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। দুগ্ধবতী গাভীর প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যথা সম্ভব শীঘ্র এই অভাব মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সাহায্যদান কার্য্য কিরূপ সহানুভূতি সহকারে সম্পন্ন হইবে, কার্য্যফল বহু পরিমাণে তাহার উপর নির্ভর করিবে। এ বার কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসের কর্ম্মীরা কারাগারে। এই সময়—বিহারের ভূমিকম্পের পর যেমন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল—তেমনই বাঙ্গালার কারারুদ্ধ কর্ম্মীদিগকে মুক্তি দিয়া লোকের সেবা-কার্য্যে সহযোগ করিতে বলার যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা তাহা পূর্ণ সমর্থন করি।

আমরা আরও প্রস্তাব করি—

(১) কোন প্রতিষ্ঠানকে যেন সাহায্যদান জন্য কোন অঞ্চলে যাইতে বাধা প্রদান করা না হয়।

(২) পাইকারী জরিমানা যেন আদায় বন্ধ করা হয়।

(৩) সংবাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে যেন কোন বাধা না থাকে।

(৪) বিধ্বস্ত অঞ্চলে যেন সহানুভূতিসম্পন্ন রাজ-কর্ম্মচারিগণকেই কার্য্যভার প্রদান করা হয়।

(৫) শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দিয়া এই কার্য্যে নেতৃত্ব করিতে আহ্বান করা হউক।

মেদিনীপুর, কাঁথি ও তমলুকের কল্পনাতীত দুর্দ্দশা

গত ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুর জিলায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমার উপর দিয়া যে প্রবল ঝড় ও সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষতির পরিমাণ কল্পনাতীত।

কাঁথি মহকুমার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—গাছ-গাছড়া বাড়ী-ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। রাজপথসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে—পুষ্করিণী বুঝিবার উপায় নাই। গাছগাছড়ায় এবং জঙ্গল ও আগাছায় সেগুলি পরিপূর্ণ—গো-মহিষাদির গলিত শবে জল পূতিগন্ধময় হইয়াছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরূপে কাঁথি মহকুমার কন্দর্পপুর গ্রামের কৃষক-যুবক রমণীমোহন মাঝীর প্রদত্ত বিবরণ এইরূপ :—

"১৬ই অক্টোবর মহা-সপ্তমীর দিন সকাল হইতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ঢাক-ঢোলের বাদ্যে গ্রাম-পথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামবাসী বালক-বালিকারা দলে দলে প্রতিমা দর্শন করিতে পূজা-বাড়ীতে যাইতেছিল। যাহারা কৃষক, তাহারা সেই দিনের মত কাজ বন্ধ করিয়াছে; বেলা পড়িয়া আসিলে স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া পূজা-বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইবে।

"সেই দিন সকাল হইতেই আকাশ সামান্য মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমরা গ্রামের অনেক লোক মিলিয়া বেলা অনুমান ৯টা কি ১০টার সময় বাঁধের নিকট মাছ ধরিতে যাই। পূর্ব্বে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বারিবর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়! এত প্রবল বারি-বর্ষণ এবং শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল যে, আমরা ভীতি-বিহ্বল হইয়া কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এমন সময় এক বিপুল সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ভিজাইয়া দিয়া গেল। পরবর্ত্তী তরঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া আমি গ্রামের দিকে দৌড়াইয়া যাইবার সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, আমার সঙ্গীরা ভাসিয়া চলিয়াছে! সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসের উচ্চতা প্রায় ২২।২৩ ফিট! প্রাণভয়ে এবং সকলকে সতর্ক করিবার জন্য দৌড়াইতে লাগিলাম। ঝড়ের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছিল। গাছ-গাছড়া ও কাঁচা বাড়ী একে একে পড়িয়া যাইতেছিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় গ্রামবাসীর ক্রন্দন-রোলে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত। তাহারা তখনও সমুদ্রতরঙ্গের কথা ভাবিতে পারে নাই।

"যাহা হউক, আমি গ্রামের বাড়ী বাড়ী দৌড়াইয়া যাহারা যাইতে পারে তাহাদিগকে সত্বর অন্যত্র যাইতে বলিলাম,—অবশিষ্টদিগকে চালা-ঘরের উপর উঠিতে বলিলাম—ইতোমধ্যে কিন্তু অনেক চালা ঘর পড়িয়া গিয়াছে—বহু নর-নারী চালা-ঘরের নিম্নে পড়িয়া কাতর ক্রন্দন করিতেছে।

"সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। যাহারা চালা ধরিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেহ বড় গাছে গিয়া আটকাইল, কেহ বা চালা ছাড়িয়া দিয়া তাহার অতি প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গাছের ডাল ধরিয়া রহিল। মাটী হইতে গাছের ডাল অনেক উচ্চে। আমি একটি তেঁতুল গাছে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিতে লাগিলাম, বহু নর-নারী, গাছ এবং গবাদি পশু চোখের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে।

"সারা দিন এই ভাবে কাটিল। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি একটু কমিল—ঝড় কমিল না—ধীরে ধীরে জল সরিতে লাগিল। তথাপি রাস্তায় এক-বুক জল। গাছ হইতে নামিলাম। গ্রামের কোন কোন বাড়ীতে গিয়া দেখি—কর্দ্দমাক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে শিশুর শব পড়িয়া আছে। মাতার কণ্ঠ নীরব। চালার নিম্ন হইতে মা মৃত শিশুর দিকে তাকাইয়া আছে! পরিধানে বস্ত্র নাই! আমার পরিধানের সিক্ত বসনের কতকটা ছিঁড়িয়া এক জনের নিকট ফেলিয়া দিলাম। কোন বাড়ীর উপর দিয়া যাইতেছি—শুনিতেছি, বাড়ীর চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্ষণে-ক্ষণে মনুষ্য-কণ্ঠের করুণ কাতর-ধ্বনি! গাছ পড়িয়া বা টিনের চালা পড়িয়া কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে—কাহারও হাত কাটিয়াছে—গাছের ডাল কাহারও বা চক্ষু ভেদ করিয়া গিয়াছে! দেখি, এক জন বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত, অবশিষ্ট সকলে অর্দ্ধমৃত। চাউল ডাইল সবই ভাসিয়া গিয়াছে। সকাল বেলা বাড়ীতে যে রন্ধন হইয়াছিল, কেহই তাহা খাইতে পায় নাই। জলে ছড়ান অন্ন কুড়াইয়া খাইলাম। তাহার পর কোন দিন খাইয়া কোন দিন না খাইয়া মৃত্যুবিভীষিকায় বিহ্বল হইয়া আছি!

"এক বাড়ীর এক জন লোক ছোট একটি সুটকেস হাতে করিয়া চালা-ঘরের উপর আশ্রয় লইয়াছিল। সেই চালা-ঘরটি ভাঙ্গে নাই—ঝড়ের প্রবল দাপট সহ্য করিয়া টিঁকিয়াছিল। ঝড় ও বৃষ্টি থামিলে সে নীচে নামিয়া আসিল। এই অঞ্চলের কোন কোন কৃষক দুর্দ্দিনের সঞ্চয় চাউল ও ধান আবশ্যকমত মাটীতে পুঁতিয়া রাখে। মাটী খুঁড়িয়া চাউল বাহির করিলাম। কিন্তু রাঁধি কেমন করিয়া? জ্বালানী কাঠ নাই—আগুন গ্রামের কোথাও নাই! ঐ লোকটির সুটকেসের মধ্যে একটি দিয়াশলাই ছিল—তাহারই সাহায্যে অতি কষ্টে জ্বালানী-কাঠ সংগ্রহ করিয়া চাউল সিদ্ধ করিতে লাগিলাম।

তমলুক সহরের তিন মাইল উত্তরে এক ধান্যক্ষেত্রে ১টি স্ত্রীলোক ও ৩টি পুরুষের মৃতদেহ

যেখানে চাউল সিদ্ধ করিতেছি, তাহারই পাশে মৃত গরু-বাছুর মরিয়া পড়িয়া আছে,—মনুষ্য-দেহও এখানে-ওখানে পড়িয়া আছে। কোন প্রকারে চাউল অর্দ্ধ-সিদ্ধ করিলাম, এবং ক্ষুধায় কাতর বিপন্ন নর-নারীকে তাহা হইতে কিছু-কিছু দিলাম।

"ক্রমে গ্রামবাসীর আত্মীয়-স্বজন—যাহারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—তাহারা দূর-দূরান্ত হইতে আসিয়া সেবাকার্য্য করিতে লাগিল। দুই একখানা চালা উঠিল। শব সৎকার হইল। আত্মীয়-স্বজনদিগের মধ্যে যাহারা একটু বিত্তশালী, তাহারা তাহাদিগকে গ্রামে লইয়া গেল। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা নগণ্য।

"গ্রামের শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শাসমল অবস্থাপন্ন এবং দয়ার্দ্র-চিত্ত। তাঁহার বহু ধান ও চাউল এবং অন্যান্য কৃষি-সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়াছে। ধানের জমিতে লোণা জল ঢুকিবার ফলে ভবিষ্যতে বহু দিন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পথ বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীর অধিকাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সমুদ্র-তরঙ্গে কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি তাঁহার সঞ্চিত চাউল সকল গ্রামের লোককে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে পুরাতন ও নূতন

কাপড় যাহা ছিল, তাহাও টুকরা-টুকরা করিয়া লজ্জা-নিবারণের জন্ম বিতরণ করিয়াছেন।"

এই ধ্বংসলীলার উল্লেখ করিয়া মেদিনীপুর-প্রবাসী তমলুকের এক জন অতি বৃদ্ধ লোক বলেন, সারা জীবন অতি-কষ্টে যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের প্রলয় ঝড়ে সবই বিনষ্ট হইয়াছে। রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র সকলের আজ এক অবস্থা। এখন আমরা সকলেই পথের ভিখারী।

তমলুক মহকুমার কোন গ্রামের এক-একটি তন্তবায় বংশ ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কংসবতী নদীর তীরে ঐ তাঁতীদিগের বাস। বহু কাল তাহারা ঐখানে কাটাইয়া দিয়াছে। নারী-শিশু মিলিয়া ১৪ জন তাঁতী এক-বাড়ীতে থাকিত। ঝড়ের দিনেও তাহারা অন্যান্য দিবসের ন্যায় যে যাহার গৃহকার্য্যে রত ছিল। শারদীয়া পূজার প্রথম দিবসে তাঁতের কাজ বন্ধ ছিল। প্রবল বারি-বর্ষণে নদীর জল ফুলিয়া আশ-পাশের সকল বাড়ী ভাসাইয়া দেয়। সমুদ্র-তরঙ্গে ঐ ১৪ জনই ভাসিয়া একটা মাঠের উপর পড়ে—বাড়ীতে একটিও ঘর ছিল না। কয়েক দিন পরে তাঁতীদিগের আত্মীয়-স্বজনগণ অতি-দূর হইতে আসিয়া মৃতদেহগুলি নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

অপর এক গ্রামে এক তাঁতী-পরিবারের বাস। তাহারা ঐ বাড়ীতে সবশুদ্ধ ৭ জন ছিল। ৭ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহাদিগের জন্য শোক করিবে, এমন কেহ নাই। যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে, উপযুক্ত সাহায্য ও আহারাদি না পাইলে তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

অপর এক গ্রামের ধ্বংস-দৃশ্য। একটি পশুর মৃতদেহ দেখা যাইতেছে

মেদিনীপুর এবং মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থা কাঁথি-তমলুকের তুলনায় এরূপ শোচনীয় না হইলেও জন-সাধারণের স্থাবর সম্পত্তির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কাঁচা ঘর নাই, পাকা ঘরও অনেক বিনষ্ট হইয়াছে। বড় বড় গাছ পড়িয়া কোনও পাকা বাড়ীর দেওয়াল ধ্বসিয়া গিয়াছে। কোন বাড়ীর চালা বা ছাদ উড়িয়া গিয়াছে! অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! রাস্তা-ঘাটে চলাচল প্রায় ৮।১০ দিন একরূপ অসম্ভব ছিল। রাস্তার উপর বড় বড় গাছ পড়িয়া থাকায় লোক এবং যান-চলাচলের বিঘ্নের সীমা ছিল না।

মেদিনীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে যকপুর ষ্টেশনের নিকট এক বাড়ীতে বহুকাল হইতে পূজা-পার্ব্বণ বিশেষ আড়ম্বরে হইয়া আসিতেছে। পূজার দিন মন্দিরে বসিয়া পুরোহিত চণ্ডী-পাঠ করিতে-ছিলেন এবং গৃহস্বামী ভক্তিভরে তাহা শুনিতেছিলেন। এমন সময় ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় দেবীমণ্ডপ ভূপাতিত হয়। দেবীর প্রতিমা চাপা পড়িয়া গৃহস্বামী এবং পুরোহিত মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা সরকার যে সাহায্য করিবেন— পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা যে যান্ত্রিক ভাব-বর্জ্জিত হইবে না—হইতে পারে না, তাহা আমরা অনায়াসে মনে করিতে পারি। কিন্তু আজ যখন বাঙ্গালার একাংশ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—যখন বিপন্নের আর্ত্তনাদ দিকে দিকে শ্রুত হইতেছে—পিতৃমাতৃ-হীন শিশুর ও বালকবালিকার—সন্তানহীনা জননীর—সর্ব্বস্বান্ত গৃহস্থের অশ্রু দেশ প্লাবিত করিতেছে—তখন সেই শ্মশানে আবার সংসার-গঠনের, আবার কোলাহল-মুখরিত কর্ম্মক্ষেত্র রচনার জন্ম যে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালীকে দিতে হইবে—সে জন্ম বাঙ্গালীকে সর্ব্ববিধ ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। কাজের গুরুত্ব যেন আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত করে। আমরা যেন স্মরণ করি— বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে আর কে রাখিবে? রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মহাসভা, বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র-সঙ্ঘ প্রমুখ সেবা-প্রতিষ্ঠানে যাহাতে অর্থের, বস্ত্রের, আহার্য্যের অভাবে সেবাকার্য্য কুণ্ঠিত না হয়, সে ভার বাঙ্গালীকে লইতে হইবে! বিপদে ধৈর্য্য না হারাইয়া—অভিভূত না হইয়া বীরের মত—ত্যাগীর মত কাজ করিতে হইবে।

সাক্ষাতে আপত্তি

হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা যখন বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান চেষ্টার জন্ম গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন যেমন বড়লাট তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, ১২ই নভেম্বর তেমনই তিনি শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়াকেও সেই অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বড়লাট বলিতেছেন, যখন কংগ্রেসের কারারুদ্ধ নেতারা দেশে কয় মাস যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, তখন মনে করা যায়—তাঁহাদিগের মতের পরিবর্তন হয় নাই এবং সেই জন্ম তিনি গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়াকেও সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন না। রাজাগোপাল বলিয়াছেন, গান্ধীজী ও কংগ্রেসী নেতারা বর্ত্তমান আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন নাই এবং জিজ্ঞাসিত না হইলে বন্দিশালার বাহিরে যাহা হইতেছে সে সম্বন্ধে যে গান্ধীজী কোন মত প্রকাশ করিবেন—এমন আশা করাও অসঙ্গত। গান্ধীজীর মত জানাই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বড়লাটের কার্য্যেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারিল না।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

বাঙ্গালা—পাইকারী জরিমানা—বর্দ্ধমান জিলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈষ্ণপুর, মীরহাট, চন্দ্রাবাদ ও আকালপৌষ মৌজার অধিবাসীদিগের উপর ১০ হাজার টাকা, মেমারী থানার মণ্ডলগ্রাম ও বামুনিয়া মৌজার অধিবাসীদিগের উপরেও ৫ হাজার টাকা, মণ্ডলেশ্বর থানার ৩ খানি গ্রামের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। দিনাজপুরে বালুরঘাট থানার অধীন দক্ষিণ চক ভবানী, খাদিম ও ডাকরা গ্রাম ও বালুরঘাটের অধিবাসীদিগের উপর ৭৫ হাজার টাকা ধার্য্য, ২০শে কার্ত্তিক মধ্যে ৩৩ হাজার টাকা আদায়। ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা সহরের এক অঞ্চলের উপর ১৫ হাজার টাকা ধার্য্য। ঢাকা জিলার সিরাজদীঘি থানার অধীন তালতলা বাজারের অধিবাসীদিগের উপর ৩ হাজার টাকা, অপর এক অঞ্চলের অধিবাসীদিগের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। বাখরগঞ্জ জিলার বাবুগঞ্জ থানার খাপুরা গ্রামের উপর ২ হাজার টাকা ধার্য্য। মালদহে ভালুকার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ২ হাজার টাকা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর পিপলার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ৩ হাজার টাকা আদায়।

কলিকাতা—১৫ই আশ্বিন শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের গৃহে তল্লাসী। ১৬ই আশ্বিন—৮ স্থানে তল্লাসী। ১৭ই আশ্বিন—গড়পাড়ের এক ডাকঘরে অগ্নিদান ও বোমা নিক্ষেপ—নগদ টাকা লুঠ, এক জন আহত। শ্যামবাজার ও আহিরীটোলা ডাকঘরের সম্মুখস্থ চিঠির বাক্সে অগ্নিদান। বাগবাজারের এক ডাকবাক্সে অগ্নিদান। ১৪ই কার্ত্তিক—উত্তর কলিকাতার ৫।৬টি চিঠির বাক্সে অগ্নিসংযোগ। গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক ৮ স্থানে ও কয়েকটি ছাপাখানায় তল্লাসী। এক জন যুবক কর্ত্তৃক বহুবাজারের এক মদের দোকান আক্রমণ। ১৫ই—আহিরীটোলার এক ডাকবাক্সে ও উল্টাডাঙ্গা পোষ্ট আফিসে অগ্নিদানের চেষ্টা। ১৬ই—দক্ষিণ কলিকাতার এক স্থানে তল্লাসী, ৪ জন গ্রেপ্তার। জোড়াসাঁকো অঞ্চলের চিঠির বাক্সে অগ্নিদানের চেষ্টা, তিন স্থানে ট্রামে রাসায়নিক দ্রব্য নিক্ষেপ, ৪ জন আহত। ২০শে ও ২১শে বহু স্থানে তল্লাসী, ১ জন গ্রেপ্তার। ১০ই কার্ত্তিক—ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে কামানের ভাঙ্গা শেল বিস্ফোরণ ৮ জন মুসলমান আহত। ২৭শে—দুই স্থানে তল্লাসী। শ্যামপুকুর অঞ্চলে কানাই লাল মিত্র ও অপর ৪ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—১৭ই আশ্বিন—গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে লুণ্ঠন ও অগ্নিদান সম্পর্কে মোট ২৫ জন গ্রেপ্তার। হাঙ্গামা সম্পর্কে আরও ৩ জন গ্রেপ্তার। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার শ্রীনগর থানার প্রায় ৫০ জন হিন্দুর বন্দুকাদি থানায় জমাদান। ২৪শে—মিঃ ওয়াহেদ আলি গ্রেপ্তার। ২রা কার্ত্তিক—সিরাজদীঘি থানার মধ্যপাড়া য়ুনিয়ন বোর্ডের আফিস পুড়াইবার ও লুঠ করিবার অভিযোগে বোর্ডের সভাপতি ও অপর ৬ জন গ্রেপ্তার। ঢাকা সহরের ফরিদাবাদে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজামণ্ডপে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য ৭ জন ধৃত। ৫ই কার্ত্তিক—কোতোয়ালী থানার নিকট দুই স্থানে বিস্ফোরণ। এ সম্পর্কে পর দিবস ২০ স্থানে তল্লাসী ও ১২ জন থানায় আহূত। ৭ই কার্ত্তিক ১০ই—লালবাগ থানায় বোমাবিস্ফোরণ। ১৪ই—বিশিষ্ট কর্ম্মী হীরালাল দত্তের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত। ১৬ই—সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার গৃহে পটকা নিক্ষেপের চেষ্টা। ১৮ই—পাতুরিয়া শক্তিমঠের প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার। ২৬শে—মাইসি গ্রামে (মাণিকগঞ্জ) যশোদা গোস্বামী গ্রেপ্তার। মাণিকগঞ্জে এক উকীলের বাড়ী তল্লাসী করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ও অপর ২ জন গ্রেপ্তার।

মেদিনীপুর—১২ই আশ্বিন তমলুকের খাসমহাল আফিস, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস, আবগারী দোকান ভস্মীভূত। ৫০০০ লোকের সুতাহাটা থান আক্রমণ ও অগ্নি দান। পুলিসের কোনমতে পলায়ন। খাসমহাল আফিসের ম্যানেজার হরণ, তাহার বন্দুক অপহরণ। মহিষাদল রাজকাছারী ভস্মীভূত, বিভিন্ন গ্রামের ধান্যগোলা লুঠ ও অগ্নিদান। নন্দীগ্রাম থানার সরকারী ভবনগুলির অগ্নিদানের ফলে ক্ষতি। ১৮ই আশ্বিন—মেদিনীপুর জিলার ২৪টি কংগ্রেস সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা। বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে কাঁথি, তমলুক ও সদর লোকাল বোর্ড নন্দীগ্রাম থানার নরঘাট য়ুনিয়ন বোর্ড, ময়না থানার—ময়না য়ুনিয়ন বোর্ড এবং পাঁশকুড়া থানার কোলা য়ুনিয়ন বোর্ডের কার্য্য ৬ মাসের জন্য স্থগিত।

ত্রিপুরা—২রা কার্ত্তিক—চিত্তরঞ্জন চন্দ গ্রেপ্তার। দুর্গাপুর য়ুনিয়ন বোর্ড (চাঁদপুর) ও ডাকঘর ভস্মীভূত। ৭জন যুবক গ্রেপ্তার ৫ই কার্ত্তিক—কুটি ডাকঘরে অগ্নিদানের চেষ্টা করিবার সময় একজন ধৃত। খেওড়া ডাকঘরের চিঠির বাক্স অপসারিত। ১৩ই কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রচারপত্র বিলি করিবার জন্য দুই জন মহিলা ধৃত।

নোয়াখালী—১৭ই আশ্বিন ফেণীর জনৈক ভূতপূর্ব্ব আটক বন্দী ও এক জন কংগ্রেসকর্ম্মীকে সিকিউরিটী বন্দিরূপে আটক। ৭ই কার্ত্তিক—ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ৭ জন কংগ্রেসকর্ম্মী আটক। ৮ই ফেণীতে জনৈক শিক্ষক গ্রেপ্তার। ৯ই—বারাইয়ায় (ফেণী) বোমা বিস্ফোরণে দুই জন নিহত ও ২ জন আহত। মুন্সুরী-গঞ্জে ৩ জন গ্রেপ্তার। বেগমগঞ্জ থানায় দুই গ্রামে স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত।

যশোহর—১৭ই আশ্বিন—বনগাঁ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি ও অপর চারি জন ধৃত। বনগাঁ কৃষক সমিতির আফিস তল্লাসী। ৩রা কার্ত্তিক—অমূল্যরতন ধর ও বিজয়চন্দ্র রায় গ্রেপ্তার।

ময়মনসিংহ—১লা কার্ত্তিক—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রেপ্তার নেত্রকোণায় কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী সিতাংশু দত্তের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। নেত্রকোণা মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ অমান্যে গ্রেপ্তার। এ স্থানে আরও ১ জনকে গ্রেপ্তার। ৪ঠা কার্ত্তিক—মুক্তাগাছার কংগ্রেসকর্ম্মী মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, ৭ই—শ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী ধৃত। ১১ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মুক্তাগাছায় ২১ জন গ্রেপ্তার। ১২ই—আপত্তিকর কাগজপত্র রাখিবার জন্য ময়মনসিংহে এক জন দণ্ডিত। নেত্রকোণায় এক জন এম-এ ও ল ক্লাশের ছাত্র গ্রেপ্তার।

বাঁকুড়া—১১ই কর্ত্তিক, জিলাবোর্ডের এক জন সদস্য এবং বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ গ্রেপ্তার।

বর্দ্ধমান—২৪শে আশ্বিন গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎকুমার চৌধুরী ও স্বামী নির্ম্মলানন্দ সরস্বতী ধৃত। ১১ই কার্ত্তিক মন্তেশ্বর থানার কুসুম গ্রামের ডাক-বাংলা ভস্মীভূত, ৬ জন গ্রেপ্তার।

চট্টগ্রাম—২৫শে আশ্বিন বাচ্চা মিঞা; ২৬শে আশ্বিন বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য; ২৯শে আশ্বিন—ফণী দাস, ৩০শে আসরফ মিঞা, আবদুল কাদের,—১লা কার্ত্তিক এইচ, গত হেভেনষ্টন, ৩রা কার্ত্তিক বরদাপ্রসাদ নন্দী গ্রেপ্তার। ৬ই কার্ত্তিক—শ্রীহট্টের বিদ্যাশ্রমের চট্টগ্রামস্থ কয়েকটি শাখাকেন্দ্র পুলিস কর্ত্তৃক অধিকার। ২রা কার্ত্তিক—যুধিষ্ঠির বড়ুয়া, বঙ্কিম বড়ুয়া, মফজ্জল আহমেদ, হবিবুল্লা, মজফ্ফর মিঞা, রমণীমোহন বড়ুয়া ও সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া গ্রেপ্তার। ২১শে কার্ত্তিক—চট্টগাম সদর খাসমহল আফিস ভস্মীভূত।

দিনাজপুর—২৫শে আশ্বিন যোগেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, ২৬শে আশ্বিন রজনীকান্ত সরকার ও অবিনাশচন্দ্র দত্ত এবং ৬ই কার্ত্তিক রামবল্লভ সমাজদার গ্রেপ্তার।

রঙ্গপুর—১৫ই আশ্বিন—কংগ্রেসকর্ম্মী জিতেন্দ্রনাথ সরকার সভা করিবার অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৩০শে আশ্বিন সরলকুমার গুহ গ্রেপ্তার। ৮ই কার্ত্তিক কালীনা রায়ণ সিংহ, অভিরঞ্জন সাহা ও যশোদানন্দন ভট্টাচার্য্য গেপ্তার।

পাবনা—২৯শে আশ্বিন কালাচাঁদ সাহা গ্রেপ্তার। ৮ই কার্ত্তিক—সিরাজগঞ্জের মাগুরা গ্রামে এক গৃহতল্লাসী। ১০ই কার্ত্তিক সিরাজগঞ্জ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও অপর একজন অভিযুক্ত; সুবোধ অধিকারী গ্রেপ্তার।

জলপাইগুড়ি—১৭ই আশ্বিন "বলশেভিক" পত্রিকা ও অপর কতকগুলি কাগজপত্র রাখিবার জন্য চারু মজুমদার ৪ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২৫শে আশ্বিন—রবীন্দ্রনাথ শিকদার গ্রেপ্তার।

আসাম—১৫ই আশ্বিন—হবিগঞ্জে স্বগৃহে আটকবন্দী রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য ও অপর ৩ জন শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হবিগঞ্জ মহকুমায় এ পর্য্যন্ত ৩৭ জন গ্রেপ্তার। এ স্থানের শ্রীযুত যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ ত্যাগ করায় ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে আটক। তেজপুর থানার ১৬ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করিবার আদেশ জারী। হবিগঞ্জ জেল হইতে যে ৬৬ জন কয়েদী পলায়ন করে, তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত ২৯ জন ধৃত। ধুবড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নি সংযোগ। ১৬ই—এ দিন পর্য্যন্ত আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে ৩৩ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ১৭ জন গ্রেপ্তার। ১৭ই—শ্রীহট্ট মহিলাসঙ্ঘের শ্রীমতী স্নেহপ্রভা দেব জজের চেয়ারে বসিবার জন্য ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা। অমরেশপুরে অননুমোদিত সভা (বিশ্বনাথ গ্রামে) করিবার জন্য কয়জন ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। বিশ্বনাথ গ্রামে আর দুই জন কংগ্রেস-কর্ম্মীর প্রত্যেকের ৯ মাস কারাদণ্ড। করিমগঞ্জেও ৮ জনের ৪—৯ মাস কারাদণ্ড। কর্ম্মী মণীন্দ্রমোহন রায় কাছাড় জিলা হইতে বহিষ্কৃত। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য হেমেন্দ্রমোহন দত্তের সদস্যপদ ত্যাগ। (মিউনিসিপ্যালিটীর মোট ২০ জন সদস্যের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৫ জন সদস্যের পদত্যাগ)। ৫ই কার্ত্তিক—কামরূপ জিলার সরুচায়া ও পার্ব্বতীয়া গ্রামের অধিবাসীদিগের সহিত পুলিসদলের সংঘর্ষ, ৫০ জন গ্রেপ্তার। জোরহাট মহকুমায় মোট ৮১ জন গ্রেপ্তার, ১৬ জন দণ্ডিত। ৬ই—আসামপরিষদের সদস্য শ্রীযুত শঙ্করচন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ নাথের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির। ৮ই মৌলভীবাজার মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষক গ্রেপ্তার। গৌহাটী ব্যাবহারাজীব সভার ২ জন ব্যারিষ্টার, ২ জন এডভোকেট ও ৭জন উকীল গ্রেপ্তার। লখিমপুরে কয়েকস্থানে ট্রেণ লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টা। লখিমপুরে বে-আইনী শোভাযাত্রার উপর লাঠী চার্জ্জ, কয় জন আহত, ৫ জন গ্রেপ্তার। ১০ই—বড়পেটা মহকুমার পাতাচর কুচি অঞ্চল হইতে ১৫ জন ধৃত। ১৩ই—ধুবড়ী কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা, শ্রীহট্টের বিদ্যাশ্রম অফিসগুলি পুলিস অধিকারে। রাজনগরে ৩জন যুবক গ্রেপ্তার। ১৫ই—উত্তর লখিমপুরে ৫৬০ মণ ধান্যপূর্ণ নৌকা নিমজ্জিত। শিবসাগরে লার্কিট হাউসে অগ্নিসংযোগ। উত্তর লখিমপুর সহরে রক্ষি-সৈন্যদিগের টহল। ২১শে পাইকারী জরিমানা আদায় করিতে গিয়া গোয়ালপাড়ার এক গ্রামে বন্দুকের গুলীতে একজন পুলিস ও অপর এক ব্যক্তি নিহত। বে-আইনী শোভাযাত্রা করিবার জন্য হবিগঞ্জের ৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক দণ্ডিত।

পাইকারী জরিমানা—কামরূপ জিলার যে সকল গ্রামবাসীর উপর পাইকারী জরিমানা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহারা জরিমানা না দেওয়ায় তাহাদিগের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক। ধুবড়ী সহরের হিন্দুদিগের উপর ১৫ হাজার টাকা ধার্য্য। গোয়ালপাড়া সহরে ৩ শত টাকা ধার্য্য।

বোম্বাই—১৬ই আশ্বিন মাঝগাঁও পুলিস আদালতে অগ্নিদান, দুই জন অগ্নিদগ্ধ, কেরাণীদিগের অফিস, রেকর্ড-রুম ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস ভস্মীভূত। বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি খেরের পুত্র মিঃ এস, বি, খের ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হাইকোর্টে পিকেটিং করিবার অভিযোগে উকীল শ্রীযুত হিম্মৎলাল যোগজীবন ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ১৭ই আশ্বিন, ওয়াদি বন্দরে বোমা বিস্ফোরণ। এক গৃহে ২১টি তাজা বোমা প্রাপ্তি। ১৭ই এক কাপড়ের কলে বোমা বিস্ফোরণ; এক জন আহত। ১৮ই গান্ধীজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শতাধিক মহিলার বারম্বার শোভাযাত্রা; মিঃ কে, এম, মুন্সীর দুই কন্যা ও অপর দুইজন মহিলা গ্রেপ্তার। জনতার উত্তেজনা, প্রস্তর ও সোডাওয়াটার বোতল নিক্ষেপ, ট্রাম থামাইবার চেষ্টা, ওলি জেলে রাজনীতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চার্জ্জ, কয়জন বন্দী আহত। ১০ই কার্ত্তিক বোম্বাই তুলার বাজারের নিকট ৩টি বোমা বিস্ফোরণ, ৩ জন পুলিস ও অপর একজন আহত; ৪০ জন গ্রেপ্তার। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় হাইকোর্টের এক কক্ষে ৩টি বোমা আবিষ্কার। সুরাটে এক মন্দিরে প্রবল বিস্ফোরণ। ১১ই বারদোলীর এক গৃহে বোমা বিস্ফোরণ। ১২ই বোম্বাইএ এক তুলা ব্যবসায়ীর গুদামে বোমা বিস্ফোরণ। টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রের কাগজের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি। ১৪ই এক পুলিস ঘাঁটাতে বোমা বিস্ফোরণ। চলন্ত মোটর গাড়ী হইতে ৫টি বোমা প্রাপ্তি, প্রত্যেকটি বোমার ওজন ৩০ পাউণ্ড, ড্রাইভারের পলায়ন। ২০শে বোম্বাইএ গোখলে রোডে ধাতু আধারে এক বোমা আবিষ্কৃত। ২১শে বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক নিঃ ভাঃ কং কমিটীর ১১ হাজার ৩১৫ টাকা ।৶০ আনা বাজেয়াপ্ত। ২৪শে নাসিক সিটি পুলিস অফিসে বোমা বিস্ফোরণ। ২৬শে উইলসন কলেজ ভবনে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড। শেয়ার বাজারে ৫ জন মহিলাকে গ্রেপ্তারের ফলে জনতার পুলিসের

উপর প্রস্তর ও ইলেক্‌ট্রিক বালব বর্ষণ। ধারওয়ারকর্ণাটক কলেজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বার্দ্দোলীতে বোমা বিস্ফোরণ। ২৭শে বিঠলসদন ও জিন্না হলের আসবাব, দলীল, ২ খানি মোটর গাড়ী ও টাকাকড়ি প্রভৃতি সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত। কংগ্রেসের বেতার বিস্তার যন্ত্র দখল। ২৮শে সুরাট জিলার বিদ্যালয়গুলি আরও ২ মাসের জন্য বন্ধ। রাজপুতানা শিক্ষা মণ্ডল ও নিখিল ভারত আগর ওয়াল জাতীয় কোরের কার্য্যালয় তল্লাসী।

আমেদাবাদ—১৬ই আশ্বিন বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ৬ জন ধৃত। এক কূপ ও পুষ্করিণী হইতে বোমা প্রাপ্তি। সহরে অস্ত্রসহ বাহির হইবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার মিয়াদ বৃদ্ধি, দুই স্থানে শোভাযাত্রা সম্পর্কে ৬জন গ্রেপ্তার। ১৮ই 'প্রভাত' পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ। বালক দল কর্ত্তৃক আদালত গৃহ আক্রান্ত। ৬ই কার্ত্তিক ভবনগরে ১০২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ১ মাস হইতে ২ বৎসর কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশের মিয়াদ বৃদ্ধি। ১৬ই ভিকটোরিয়া গার্ডেন্‌সে বোমা বিস্ফোরণ। ২০শে আমেদাবাদ সহরে পুলিস চৌকীর নিকটে, এলিস ব্রিজ থানার ওকটন একসৃচেঞ্জ ভবনে তাজা বোমা প্রাপ্তি। ২৬শে সান্ধ্য আদেশের মিয়াদ বৃদ্ধি, ২৭শে মসকাটি বাজারে জনতার উপর গুলীবর্ষণ, লাঠী চালন ও গ্রেপ্তার।

পুণা—সাতারার সরকারী বিদ্যালয়ে অগ্নিদান, মিঃ ডাবারের গৃহতল্লাসী ও তাঁহাকে গ্রেপ্তার, তামগাঁওএ ২৩ জন গ্রেপ্তার। ১৭ই আশ্বিন পুণার নিকটবর্ত্তী এক সেচ কার্য্যালয়ে অগ্নিদান, ওয়াদিয়া কলেজে এ, আর, পি গুদামে অগ্নিদান। ১০ই কার্ত্তিক বেলগাঁওএ ৩০।৪০ জন বন্দুকধারী ব্যক্তির ডাকগাড়ী লুণ্ঠন। হুবলী-পুণা মেলের এক কামরায় ও শিবাজী মারাঠা স্কুলের প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ। ১৬ই কার্ত্তিক হুবলী-পুণা শাখার ৩টি রেল ষ্টেশন আক্রমণ ও অগ্নিদান। শোলাপুরে ৩ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ। কয়েকজন ছাত্র আহত, ১৭ই, যারবেদা জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চালন, ৫।৬ জন রাজনৈতিক বন্দী ও জেলের ৪ জন পুলিস আহত, ৪ জন রাজনৈতিক বন্দীর পলায়ন। ২০শে নানাপেটে বহু পুরাতন মোটর টায়ার ভস্মীভূত। ২৬শে অস্ত্রাদিসহ পথ চলিবার নিষেধাজ্ঞার মিয়াদ বৃদ্ধি। শোলাপুর ষ্টেশনে অগ্নিসংযোগ।

সীমান্ত—৪ঠা কার্ত্তিক—ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী কাজী আতাউল্লা, ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খান আমির মহম্মদ খান, পরিষদ-সদস্য খান কামদার খান, খান জারিং খান এম-এল-এ, শ্রীযুত জয়া দাস এম-এল-এ, আবদুল আজিজ খান এম-এল-এ গ্রেপ্তার। ৮ই—৪১৬ জন লালকোর্ত্তা স্বেচ্ছাসেবককে মুক্তি দান। ১৩ই—খান খান আবদুল গফুর খান গ্রেপ্তার। এক জন স্বেচ্ছাসেবকের প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু।

সিন্ধু—১০ কার্ত্তিক—নূতন হিন্দু সচিব রায়-সাহেব গোকুল দাসের গৃহে, মিউনিসিপ্যাল উদ্যানে ও সচিব ডাঃ হেমনদাসের গৃহে বোমা বিস্ফোরণ। সচিবের গৃহের পাহারারত পুলিসের প্রতি বোমা নিক্ষেপ। হিন্দু সচিবদিগের গৃহে পিকেটিং করিবার জন্য ২২ জন মহিলা গ্রেপ্তার। পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে সিন্ধু এক্সপ্রেস ট্রেনের এক কক্ষে বোমা আবিষ্কার। ১২ই—সক্করে ১৫০ জন বালক-বালিকা গ্রেপ্তার। ২৮শে কার্ত্তিক—ডি-জে সিন্ধ কলেজে পুলিসদলের নিকট বোমা বিস্ফোরণ।

বিহার—১৫ই আশ্বিন—সারণ জিলার শিবওয়া গ্রামের এক গৃহে কতকগুলি টেলিগ্রাফের তার, রেলওয়ে সম্পত্তি, দুইখানি নূতন ছোরা, শত্রুদেশের কাহিনী সম্বলিত হিন্দী পুস্তিকা আবিষ্কার সম্পর্কে ৭ জন যুবক ধৃত। মানভূম জিলায় জনতা কর্ত্তৃক দুইটি থানা ভস্মীভূত। ১০ই কার্ত্তিক—সরাই থানার এক স্থানে দেশী পিস্তল, রিভলভার ও টোটা প্রাপ্তি। দেওঘরে আয়কর অফিস ভস্মীভূত। ১৮ই—মুঙ্গের সহরতলীর এক জঙ্গল হইতে ২ শত হাত বোমা আবিষ্কার। ২৫শে—হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ, যোগেন্দ্র শুকুল, রামনন্দন মিশ্র, সূরয নারায়ণ সিং, গুলাবীসোনার ও শালিগ্রাম সিংএর পলায়ন। তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ২১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ফতোয়া ষ্টেশনে আর-এ-এফ সামরিক কর্ম্মচারীকে হত্যার সংস্রবে ৫০ জন গ্রেপ্তার। পাটনায় কয়েকটি বেতার লাইসেন্স বাতিল। ২২শে—মজঃফরপুর জেলায় ৭ জনের নির্ব্বাসন ও কারাদণ্ড।

উড়িষ্যা—১৬ই আশ্বিন—গঞ্জাম জিলা কংগ্রেসের ঘনশ্যাম দাস পট্টনায়েক গ্রেপ্তার। ১০ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মোট ৭৭১ জন ধৃত। ধৃতদিগের মধ্যে ১৫ জন পরিষদ-সদস্য। ১৯শে—বালেশ্বর জিলায় হরামে গুলীবর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত।

যুক্তপ্রদেশ ১৪ই আশ্বিন বারাণসীতে মুখোস, ছোরা ইস্‌ক্রুড্রাইভার প্রভৃতিসহ ৪ জন গ্রেপ্তার। পিস্তল ও আপত্তিকর কাগজ পত্র রাখিবার জন্য এক জনের ৬ মাস কারাদণ্ড। ১৫ই আশ্বিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিন জন জজকে কয়েক জন তরুণীর আদালত বর্জ্জন করিতে অনুরোধ। কানপুরে ছাত্রছাত্রীদিগের এক জনতা ছত্রভঙ্গ। ৫৫ জন ছাত্রীর অর্থদণ্ড। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে এক জন ছাত্রী বলেন—আমি মহাত্মা গান্ধীর কন্যা। ১৮ই গোরক্ষপুর জিলার বাঁশগাঁও তহশীলের কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তারের ফলে হাঙ্গামা সম্পর্কে কয়েক জন দণ্ডিত। ৭ই কার্ত্তিক মীরাটের এক সিনেমা গৃহে বোমা বিস্ফোরণ। ১৫ই সশস্ত্র ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মরমূর্ত্তি বিকৃত করে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক গ্রেপ্তার।

মধ্যপ্রদেশ—২৪শে কার্ত্তিক নাগপুর সহরে বোমাসহ দুই জন সাইকেল-আরোহীর মধ্যে বিস্ফোরণ ফলে এক জন আহত। এক গৃহ হইতে ৭টি বোমা, রাসায়নিক পদার্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারাদি আবিষ্কার; ৬ জন গ্রেপ্তার।

সামন্তরাজ্য—৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্যে ৮১৪ জন গ্রেপ্তার। মহীশূরের ঈশ্বর গ্রামে আমিলদার ও দারোগা গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক নিহত ও কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী আহত। গুলী বর্ষণে দুইজন গ্রামবাসী আহত। গ্রামবাসীদিগের গ্রামত্যাগ। ৭ই কার্ত্তিক নয়াগড় রাজ্যে দুই সহস্র লোকের উপর গুলী চালন, ১ জন নিহত, কয়েক জন আহত। জনতা কর্ত্তৃক কতকগুলি সরকারী ভবন ভস্মীভূত। ১২ই বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেশনে বিস্ফোরণ। উড়িষ্যার ঢেনকানাল রাজ্যে আন্দোলন সম্পর্কে ৩ জনের প্রতি প্রাণদণ্ড ও এক জনের প্রতি ৬ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ।

"——অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি' ল'য়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।"

শিল্পী—[illegible]

২১শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ [২য় সংখ্যা

অদ্বৈতবাদীর সম্প্রদায়

ভারতীয় দার্শনিক মতবাদসমূহের আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সব মতবাদ প্রায়ই সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। গুরু শিষ্যকে যাহা শিক্ষা দেন, শিষ্য আবার তাহাই তাঁহার শিষ্যকে শিক্ষা দেন, তিনি আবার তাঁহার শিষ্যকে শিক্ষা দেন, এবং সম্ভব হইলে শিষ্য সেই গুরুমতের প্রচার ও পুষ্টিসাধন করেন। এই ভাবে ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলি প্রচারিত হইতে দেখা যায় বলিয়া ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলিকে সম্প্রদায়ক্রমে প্রচারিত বলা হয়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি বেদপ্রামাণ্যবাদী মতবাদগুলি; অথবা বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রভৃতি বেদের অপ্রামাণ্যবাদী মতবাদগুলি এই ভাবেই ভারতবর্ষে প্রচারলাভ করিয়াছে।

এই জন্যই বোধ হয় সম্প্রদায়ের উপযোগিতা বিষয়ক একটি পুরাণবচনও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই বচনটি এই—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

অর্থাৎ সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা বিফল হয়। এই স্থলে "মন্ত্র" শব্দের অর্থ—জপের মন্ত্র যেমন হয়, জাপকের অবলম্বনীয় মতবাদও তদ্রূপই হয়। কারণ, মতবাদ অনুসারে জপের মন্ত্রও পৃথক্ পৃথক্ হইতে দেখা যায়। যেমন অদ্বৈতবাদীর মন্ত্র ও দ্বৈতবাদীর মন্ত্রের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য দেখা যায়। এই জন্য বোধ হয় আমাদের ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলি সম্প্রদায়ক্রমে অর্থাৎ গুরু-শিষ্যক্রমে প্রচারলাভ করিয়া আসিতেছে। এ স্থলে পাশ্চাত্ত্য প্রভৃতি অন্য দেশেও এই নিয়ম কতকটা অনুসৃত হইয়া থাকে, ইহা বলিলে বোধ হয় বড় বেশী আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, তাহার প্রমাণ প্রচুরই পাওয়া যায়। যেমন সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো ইত্যাদি। তবে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ যতটা দেখা যায়, আমাদের মধ্যে ততটা নহে—এইমাত্র বিশেষ।

বস্তুতঃ, সম্প্রদায়ের জ্ঞান থাকিলে অনেক লাভ আছে। সাম্প্রদায়িকতা নিন্দনীয় হইলেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জ্ঞান নিন্দনীয় নহে। সম্প্রদায়ের জ্ঞানের সহিত দ্বেষভাব মিশ্রিত হইলেই সাম্প্রদায়িকতা নামে আখ্যাত হয়; এই সাম্প্রদায়িকতাই নিন্দনীয়—ইহাই দোষাবহ; নচেৎ সম্প্রদায়ের জ্ঞানমাত্রই নিন্দনীয় নহে। কারণ, ইহাতে নিজ গুরুপরম্পরার প্রাচীনত্বের জ্ঞান হয়; তাহার পর তাঁহাদের নাম, ধাম, চরিত্র ও সাধনসম্পত্তির পরিচয়লাভ হয়; আর তজ্জন্য নিজ নিজ মতে ও সাধনপথে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়; আর তাহার ফলে জ্ঞানেরই দৃঢ়তা হয়। কেবল তাহাই নহে, নিজ নিজ অবলম্বিত মতবাদের মূল এবং শিষ্যানুশিষ্যক্রমে তাহা পরিপুষ্ট হইয়া কিরূপ শাখা-প্রশাখা-সম্পন্ন একটি মহাপাদপে পরিণত হইয়াছে, তাহা জানা যায়। তাহাতে মতবাদের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যায়,

পক্ষান্তরে প্রকৃত লক্ষ্য বস্তুই স্পষ্টতর হইয়া উঠে। এই কারণে সম্প্রদায়ের জ্ঞান একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয়; আর তজ্জন্যই বোধ হয় ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলি সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

এইবার দেখা যাউক, অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় অন্য দার্শনিক মতবাদের কিরূপ সম্বন্ধ। দেখা যায়, ভারতীয় দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে বেদান্তসম্প্রদায়টি কিছু দিন হইতে অতি প্রবল। এই অদ্বৈত সম্প্রদায়ের নিকট আজ অপর সকল দার্শনিক মতবাদই নিষ্প্রভ। এই মতেই শাস্ত্রগ্রন্থ ও শাস্ত্রী পণ্ডিতের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই মতে যুক্তি তর্ক যত সূক্ষ্ম ও অকাট্য, অনুভব যত নির্ম্মল ও স্বাভাবিক, এবং শ্রুতির যত আনুগত্য, এরূপ আর অন্য কোন মতবাদেই নহে।

তাহার পর এই অদ্বৈত মতবাদটি ভারতের যতটা নিজস্ব সম্পত্তি, এত আর অন্য কোন মতবাদই নহে। কারণ, এই মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে বৈদিক মতবাদ। আর বেদকে ভারতে যেমন অভ্রান্ত অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়, এরূপ আর অন্য কোনও দেশেই দেখা হয় না। এজন্য এই মতবাদটি যতটা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি, এতটা অন্য কোনও মতবাদই নহে।

এই মতবাদের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ এই—বেদের কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডকে বেদান্ত বা উপনিষৎ বলা হয়। কারণ, ইহারা বেদের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট। সেই বেদান্তের মুখ্যসিদ্ধান্ত এই অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের মূলমন্ত্র—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জীব ব্রহ্মই, এবং জগৎ মিথ্যা। মিথ্যার অর্থ—যাহা দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ নাই, যেমন রজ্জুতে সর্প দেখা কালে রজ্জুতে সর্প বস্তুতঃ নাই, অথচ রজ্জুতে সর্প দেখা যায়। ইহার নাম অনির্ব্বচনীয়। ইহা পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অনিত্য। ইহার সত্তা অধিষ্ঠানসত্তার অধীন। জ্ঞানকালেই ইহার সত্তা স্বীকার করা হয়। অধিষ্ঠানের জ্ঞানে ইহার বিলয় হয়, আর ইহার পুনরুদ্ভব হয় না। ইহার বিলয় হইলে ইহা অধিষ্ঠানস্বরূপ হইয়া যায়। এই মিথ্যাই মায়া বা শক্তি। কার্য্য দ্বারা এই শক্তির অনুমান হয়। কার্য্য-নাশে ইহা ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ব্রহ্ম হইতে ইহার পৃথক্ সত্তা নাই, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-দর্শনকালে রজ্জু রজ্জুই থাকে বলিয়া ইহা ব্রহ্মস্বরূপিণী বলা হয়। ইহার কেন উদ্ভব হয়, তাহা বলা যায় না। তবে অধিষ্ঠান জ্ঞানে ইহার নাশ হয়। এইরূপ নানা কারণে ইহাকে নির্ণয় বা নির্ব্বচন করা যায় না। অজ্ঞানকালে ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বিচারকালে ইহা ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যাভেদযুক্ত ব্রহ্মভিন্ন বস্তু, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। আর জ্ঞানকালে ইহা নাই, সুতরাং ইহা ভিন্ন বা ভিন্নাভিন্ন কিছুই নহে, ইহার প্রতীতিও হয় না। এই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সৎ ও আনন্দ-স্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয়, স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রহিত এবং অনন্ত। যুক্তি-তর্ক ও অনুভবের দ্বারা এই অদ্বৈততত্ত্ব আবিষ্কৃত বা আবিষ্করণীয় নহে। এই মতবাদ আর কোনও দেশে নাই, এজন্য ইহা ভারতেরই সম্পত্তি।

ভারতের বেদপ্রামাণ্যবাদী অন্য দার্শনিক মতবাদগুলি যথা:—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি, মীমাংসা ও বেদান্তের ন্যায় বেদপ্রামাণ্যবাদী নহে। তত্তৎ মতে যুক্তি ও অনুভবকে অর্থাৎ অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বেদের সমকক্ষ প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বেদের সহিত তাহাদের আসন সমান উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বেদ দ্বারা যেমন ব্রহ্মকে জানা যায়, অনুভব ও অনুমান দ্বারাও তদ্রূপ ব্রহ্মকে জানা যায়। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত মতে বেদের প্রামাণ্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। তন্মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ বেদের নিকট হীনবল। অলৌকিক বিষয়ে ইহারা বেদের অনুকূল হইলেই গ্রাহ্য, নচেৎ অগ্রাহ্য। লৌকিক বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য ইহাদের নিকট দুর্ব্বল। কারণ, লৌকিক বিষয়ে বেদ "অনুবাদ" হয়, অনুবাদের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য অদ্বৈতবাদীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর হইয়া থাকে। বেদ হইতেই অদ্বৈত-বাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সন্ধান পাইয়া যুক্তিতর্ক বা অনুভবের দ্বারা ইহার পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে। এই কারণে অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে সাংখ্যাদি মতবাদগুলি সম্পূর্ণরূপে বৈদিক মত বলা হয় না। আর সম্পূর্ণরূপে ইহারা বৈদিক মত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে অবৈদিক মতবাদও বলা হয়। ইহার প্রমাণ ব্যাসদেবের বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ। অবশ্য তাই বলিয়া ইহা বৌদ্ধ জৈনাদির মত অবৈদিক মতবাদও বলা হয় না। কারণ, বৌদ্ধ জৈনাদি বেদের প্রামাণ্যই গ্রাহ্য করেন না। এই কারণে বৌদ্ধ জৈনাদির মতবাদকে কেবল অবৈদিক বলা হয় না, কিন্তু বেদবাহ্য বা বেদবিদ্বেষী অথবা বেদবিরোধী মতবাদ বলা হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও এই সব বেদবিরোধী বৌদ্ধ জৈনাদি মতবাদের মূল বেদমধ্যেই দেখা যায়। অধিক কি, এ পর্য্যন্ত জগতে যত দার্শনিক মতবাদ আবির্ভূত

হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মূল বেদমধ্যেই পাওয়া যায়। অন্য দেশীয় দার্শনিক মতবাদগুলিও এজন্য বেদমূলক মতবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা বেদে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বা দুষ্ট মতবাদরূপেই দৃষ্ট হয়। ৬ষ্ঠ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যের প্রথম দার্শনিক থেলিস্ জল হইতে জগতের উৎপত্তি বলেন, আমাদের বেদমধ্যে সে কথাও দৃষ্ট হইবে। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদগুলি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না বলিয়া তাহারাও বৌদ্ধ-জৈনাদির মতবাদের ন্যায় বেদবাহ্য মতবাদ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বিষয়টি একটু শ্রম স্বীকার করিলেই পাশ্চাত্ত্যের সকল দার্শনিক মতের বীজই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াই প্রদর্শন করা যাইতে পারে। উভয় মতের অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের উপর পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের অভিযানের বা নিন্দাবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আজ এরূপ উদ্যম হওয়া খুব স্বাভাবিক। এমন কি, হেগেল স্পেন্সর এবং খৃষ্টান পাদরীগণের গ্রন্থ এই নিন্দাবাদের প্রতি প্রমাণ। মনে হয়, অচিরে এই কার্য্যে কেহ না কেহ প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ, অনেকেই পাশ্চাত্ত্যের এই নিন্দাবাদের অভিসন্ধি এবং অযৌক্তিকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন দেখা যায়।

কিন্তু অদ্বৈতবাদই যে কেবল বেদান্তের মত, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, অদ্বৈতবাদের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈত মত, দ্বৈতাদ্বৈতমত, দ্বৈতমত, অচিন্ত্যভেদাভেদ মত প্রভৃতি বহু মতবাদই আজকাল বেদান্তমত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারাও নিজেকে বেদান্তী বলেন, এবং বেদান্ত-প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদিও করিয়াছেন। ইঁহারাও অদ্বৈতবেদান্তীর ন্যায় সাংখ্যাদি মতবাদগুলি খণ্ডন করিলেও অদ্বৈতমতবাদও খণ্ডন করেন, অধিক কি, পরস্পরের মধ্যেও একে অপরকে খণ্ডন করিয়াছেন—দেখা যায়। ইঁহারাও অদ্বৈতবেদান্তীর ন্যায় বেদেরই মুখ্য প্রামাণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ আছে। যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ কতকটা সাংখ্যমতের অনুসারী, দ্বৈতমতবাদটি ন্যায়মতের যেন অনুগামী বলিয়াই প্রতীত হইবে। বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বা দ্বৈতমতবাদী বেদকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও বেদবাক্যের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তির দুর্ব্বলতা মাত্র দূর করেন। যেহেতু, ব্রহ্ম তন্মতে যুক্তিগম্য। অদ্বৈতবাদীর যুক্তির দুর্ব্বলতা নাই। কারণ, তন্মতে ব্রহ্ম যুক্তিগম্য নহে। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ দৃষ্ট করা যাইতে পারে।

দ্বৈতাদিমতবাদী অন্য বেদান্তীর সহিত অদ্বৈতবেদান্তীর এই মতভেদের কারণ এই যে, অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মবস্তু সম্পূর্ণ অদ্বৈত অর্থাৎ অলৌকিক বস্তু ; কারণ, তাঁহাদের মতে তাহা সম্পূর্ণ নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। অন্য মতবাদীর মতে এই ব্রহ্মবস্তু সম্পূর্ণ অলৌকিক নহে। কারণ, ব্রহ্মে তাঁহারা গুণ ও বিশেষ স্বীকার করেন, কেহ বা স্বগতভেদ, কেহ বা স্বগত সজাতীয় উভয়বিধ ভেদ, আবার কেহ বা শক্তিমান্ ও শক্তিগত ভেদ স্বীকার করেন, ইহাই আবার তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ। কোনও ভেদ বা বিশেষ না থাকায় অদ্বৈতবাদীর শুদ্ধ ব্রহ্ম যুক্তি বা প্রমাণ-গম্য নহে ; কিন্তু ভেদ বা বিশেষ না থাকায় অন্যমতবাদীর ব্রহ্ম যুক্তিগম্য। তাঁহাদের এই যুক্তিতে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা শ্রুতির শরণ গ্রহণ করেন। এই জন্যই তাঁহাদের যুক্তিতে দোষ স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যেমন এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত অবিকারী ব্রহ্মের এক অংশ বিকারী "জীব ও জগৎ" বলায় যুক্তিদোষ হয়, অবিকারীর এক অংশ বিকারী বলায় বিরুদ্ধ কথাই হয়। অখণ্ড অনন্তের আবার অংশ কি ? কিন্তু অদ্বৈতবাদী সেরূপ কথা বলেন না ; আর তাঁহার ব্রহ্ম যুক্তিগম্য না হওয়ায় তাঁহাদের যে যুক্তি, তাহাতে দোষ থাকিতেই পারে না। শ্রুতি যে অদ্বৈত ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যে প্রত্যক্ষ বা অনু-মানের বিরোধ হয়, যুক্তি সেই বিরোধ বা অসম্ভাবনা মাত্র দূর করিয়া দেয়, অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদী সগুণ ব্রহ্ম সিদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের সম্ভাবনামাত্র প্রদর্শন করেন। কিন্তু অন্যমতবাদীর যুক্তি তাঁহাদের সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধিই করে, তাঁহাদের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই নাই ; এই জন্য অদ্বৈতবাদীর শুদ্ধ ব্রহ্মে যুক্তিদোষ নাই, কিন্তু অন্য বেদান্তীর ব্রহ্মে যুক্তিদোষ আছে। ইহাই হইল অন্য বেদান্তী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে ব্রহ্মের যুক্তিগম্যতা বিষয়ে প্রভেদ।

দৃষ্টান্তস্বরূপে আর একটি স্থলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন শ্রুত্যুক্ত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মে এক অলৌকিক বা অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার দ্বারা অদ্বৈতবাদী জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অন্য বেদান্ত-বাদী ঐরূপ শক্তি স্বীকার করিয়াও সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ বা বিশেষ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, সেই অচিন্ত্যশক্তি দ্বারাই ত সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মে সকল প্রকার অসম্ভবই সম্ভব হইতে পারে। আবার ব্রহ্মে ভেদ বা বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন কি ? শ্রুতির দ্বারা সেই ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ত্ব খণ্ডন করিতে যাইলে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, এই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিবাক্যেরই

বল অধিক। তাহার পর তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গ ছয়টিও ইহাতেই চরিতার্থ হয়। এই জন্য অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। সুতরাং শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিতে যাইলে অসঙ্গতই হইবে। এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা যখন একই ব্রহ্মে ভেদ-স্বীকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, তখন অচিন্ত্য-শক্তিও মানিব, আবার ব্রহ্মে ভেদও মানিব; ইহার প্রয়োজন কি? ইহা কি গৌরবদোষ নহে? অতএব এ স্থলে অদ্বৈতবাদীর কথাই শ্রুতি ও যুক্তি উভয়-সঙ্গতই হইতেছে!

কিন্তু ইহাতেও অন্য বেদান্তবাদী ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা উক্ত অচিন্ত্যশক্তির সত্তার দ্বারাই সেই ব্রহ্মে ভেদ বা বিশেষ স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করেন। কিন্তু এ স্থলেও যুক্তি ও শ্রুতি অদ্বৈতবাদীরই অনুকূলতা করে। কারণ, শক্তি কখন শক্তিমানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আর এই শক্তি, কার্য্য দেখিয়াই অনুমিত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ কখনই হয় না। যেমন কার্য্য না থাকিলে শক্তির অনুমান করাই যায় না, তদ্রূপ শক্তি থাকিলেই কার্য্য হইতে থাকে, শক্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। এ জন্য বলা হয়, "কারণের আত্মভূতা শক্তি আর শক্তির আত্মভূত কার্য্য" অর্থাৎ কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা অর্থাৎ প্রতীত হয়, কিন্তু নাই। কার্য্য কখনই নিত্য বস্তু নহে, ইহার উৎপত্তি-বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। আর শক্তি যদি নিত্যা হয়, তাহা হইলে তাহার অচিন্ত্যতাতেই ব্যাঘাত হয়। শক্তি নিত্যা হইলে নিত্যকার্য্যরূপে চিন্তনীয়াই হইল। তাহার অচিন্ত্যতা আর কোথায় থাকিল? আর শক্তি নিত্যা হইলে কার্য্যও নিত্য হইবার কথা। সুতরাং ইহাতেও ব্যাঘাতদোষ ঘটে। শ্রুতিও ব্রহ্মকে "অমায়" অর্থাৎ মায়াশূন্য এবং অশক্তি অর্থাৎ শক্তিশূন্য বলিয়াছেন। মায়াই ত এই শক্তি। অতএব শ্রুতি ও যুক্তি উভয়ই অদ্বৈতবাদেরই অনুকূল হইল। অন্যমতবাদী ইহা স্বীকার করিবেন না। কারণ, তন্মতে শক্তি নিত্যা, কার্য্য না থাকিলেও শক্তি থাকিতে বাধা নাই। কারণ, ইহারই নাম যোগ্যতা। কার্য্য না থাকিলে এই যোগ্যতা থাকিতে বাধা হয় না। অরণ্যস্থ দণ্ডে ঘটোৎপাদিনী যোগ্যতা থাকে, সকলেই স্বীকার করিবেন। এ কারণে শক্তির নিত্যতা। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলিবেন, এই যোগ্যতারূপা শক্তিকে কারণতা-বিশেষ বলা উচিত। শক্তি কারণতার অবচ্ছেদিকবিশেষ ধর্ম্ম। যেহেতু, যোগ্যতাসম্পন্নকে স্বরূপযোগ্য কারণ বলা হয় এবং অপরটিকে ফলোপধায়ক কারণ বলা হয়। যেমন অরণ্যস্থ দণ্ড স্বরূপযোগ্য কারণ, আর চক্রসংলগ্ন দণ্ড ফলোপধায়ক কারণ, এজন্য তাহারা অভিন্ন বস্তু নহে। এই জন্য তাঁহারা কারণের আত্মভূতা শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য বলেন। এজন্য "যুক্তেঃ শব্দান্তরস্বাচ্চ" ব্রহ্মসূত্রে ১।১৮ সূত্রে শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। তাঁহাদের মতে কারণ ও কার্য্য অভিন্ন। কার্য্যকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতিই ভ্রম। এ বিষয়ে বহু কথাই আছে, এ স্থলে কেবল ইঙ্গিতমাত্র করা গেল। এইরূপে দেখা যাইবে, অন্য বেদান্তমত, অদ্বৈত-বেদান্ত-মতের ন্যায় শ্রুতিকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। ইহাই হইল দুই এক কথায় অদ্বৈত-বেদান্তের সহিত অন্য বেদান্তমতবাদের সম্বন্ধ।

এইবার দেখা যাউক, এই অদ্বৈতবাদের সম্প্রদায়টি কিরূপ। ইঁহাদের সম্প্রদায়-কথা ইঁহাদের গুরুপ্রণাম-মন্ত্র মধ্যে প্রথমতঃ দেখা যায়, যথা—

"ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎ পুত্রপরাশরঞ্চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্॥
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিষ্যম্।
তং তোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি॥"

এই মন্ত্রটি খুব প্রাচীন গ্রন্থেও দেখা যায়। অষ্টোত্তরশত উপনিষদের শান্তিপাঠমধ্যেও ইহা দেখা যায়। অন্য একটি মন্ত্র শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরাতে পাওয়া যায়, যথা—

"আদৌ শিবস্ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা ততঃ পরম্।
বশিষ্ঠশ্চ ততঃ শক্তিঃস্তুতঃ ষষ্ঠঃ পরাশরঃ॥
ততো ব্যাসঃ শুকঃ পশ্চাদ্ গৌড়পাদাভিধস্ততঃ।
গোবিন্দার্য্যগুরুস্তস্মাৎ শঙ্করাচার্য্যসংজ্ঞকঃ॥
পদ্মপাদঃ সুরেশশ্চ হস্তামলকতোটকৌ।
বেদান্তশিক্ষাগুরব আচার্য্যাঃ পান্তু মাং সদা॥"

এই মন্ত্রদ্বয় হইতে জানা যায়, এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক নারায়ণ অথবা শিব। তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রহ্মা এই অদ্বৈতবিদ্যা লাভ করেন, ব্রহ্মা হইতে তৎপুত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ হইতে তৎপুত্র শক্তি, শক্তি হইতে তৎপুত্র পরাশর, পরাশর হইতে তৎপুত্র ব্যাস, ব্যাস হইতে তৎপুত্র শুক, শুক হইতে তৎপুত্র বা শিষ্য গৌড়পাদ, এই বিদ্যা লাভ করেন। এই গৌড়পাদ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পরম্পরাক্রমে তৎশিষ্য গোবিন্দপাদ এবং গোবিন্দপাদ ও গৌড়পাদ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য লাভ করেন। গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন শিষ্য পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান। ইহাও সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বিদ্যার্ণব তন্ত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সম্প্রতি কাশ্মীরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা শঙ্করা-চার্য্যের প্রশিষ্য কর্ত্তৃক রচিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও

গোবিন্দপাদ এবং শঙ্করাচার্য্য উভয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৌড়পাদের শিষ্য ছিলেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন সম্প্রদায়ও ইহাই বিশ্বাস করেন।

শঙ্করবিজয় গ্রন্থে দেখা যায়, গোবিন্দপাদ গৌড়পাদের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যকে সেই বিদ্যা দান করিবেন বলিয়া নর্ম্মদাতীরে ওঙ্কারনাথে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সমাধিতে দেহ রক্ষা করিতেছিলেন। গৌড়পাদও শুকের শিষ্য ও পুত্র। মাণ্ডুক্যকারিকার (৪।১) ভাষ্যটীকায় আনন্দগিরি বলেন, গৌড়পাদ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। শঙ্করবিজয় মতে তিনি ব্যাসাদির মত যোগসিদ্ধ পুরুষ সূক্ষ্মশরীরে অদ্যাবধিও বিদ্যমান। এই কারণে শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শঙ্করাচার্য্যও মাণ্ডুক্যকারিকাভাষ্যে গৌড়পাদকে "পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরু" অর্থাৎ গুরুগণের মধ্যে অত্যন্ত পূজনীয় বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু পরমগুরু বলায় অনেকে মনে করেন, শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ। কারণ, পরমগুরু পদের প্রচলিত অর্থ গুরুর গুরু। এই কথা হইতে অনেকে মনে করেন, গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের সময়ের কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার সময় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়। কারণ, শঙ্করাচার্য্য ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা গৌড়পাদকে শুকের শিষ্য বা পুত্র বলিয়া কলির প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত, ইহা আর বিশ্বাস করেন না। কিন্তু গৌড়পাদ যে শুকের শিষ্য তাহা (১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-ভাষ্যে (২) বালকৃষ্ণানন্দের শারীরকমীমাংসা ভাষ্যবার্ত্তিক-বিবরণ ৭ম শ্লোকে, এবং (৩) ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্যের প্রকটার্থ টীকায় অতি স্পষ্ট ভাষায় কথিত হইতে দেখা যায়। (মাদ্রাজ সংস্করণ ৩৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যকৃত ইহাই প্রসিদ্ধ, কিন্তু লিখনভঙ্গী দেখিয়া অনেকে ইহা শঙ্করাচার্য্য-কৃত নহে মনে করেন। কিন্তু এই যুক্তি কোন নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ মাত্রই জন্মে। প্রকটার্থকার ভামতীর অব্যবহিত পরে বা সমসাময়িক। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের সময় খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী। অতএব ১০ম শতাব্দীর গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়—গৌড়পাদ শুকের শিষ্য। পূর্ব্বোক্ত প্রথম গুরুপ্রণাম মন্ত্রে শুক, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও শঙ্করাচার্য্যের নাম থাকিলেও তাহা হইতেও পাওয়া যায়—গৌড়পাদ শুকের শিষ্য এবং পুত্র উভয়ই। কারণ, উহাতে পুত্র শব্দের পূর্ব্বে নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও শক্তি এই চারিটি নাম এবং পরে পরাশর, ব্যাস, শুক ও গৌড়পাদ এই চারিটি নাম দেখা যায়। পূর্ব্বের নাম চারিটির মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ সকলেই জানেন। আর সেইরূপ পরবর্ত্তী নাম চারিটির মধ্যেও সেই পিতাপুত্র সম্বন্ধ হওয়াই সঙ্গত। কারণ, এই চারিটি নামের মধ্যে পরাশর, ব্যাস, শুক এই তিনটি নামের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ বর্ত্তমান, ইহাও সকলেই জানেন। সুতরাং অবশিষ্ট গৌড়পাদ ও শুকের মধ্যেও পিতাপুত্র সম্বন্ধ বর্ত্তমান বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বের চারিটির মধ্যে যেমন পিতাপুত্র সম্বন্ধ, পরের চারিটির মধ্যেও তদ্রূপ সম্বন্ধ। এরূপ কল্পনার আর একটি কারণ, গৌড়পাদের পর যে গোবিন্দপাদের নামে প্রথম একটি 'শিষ্য' পদের যোগ দেখা যায় এবং তাঁহার পর যে শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্য যে পদ্মপাদ হস্তামলক প্রভৃতির নাম দেখা যায়, তাঁহাদের সঙ্গে অপর একটি 'শিষ্য' পদের সম্বন্ধ দেখা যায়। এই কারণে গৌড়পাদ পর্য্যন্ত শিষ্য ও পুত্রের ধারা এবং তাঁহাদের পর হইতে কেবল শিষ্যের ধারা ইহা বেশ বুঝা যায়। সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদও সেইরূপই শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত পিতা ব্যাসের অনুরোধে মহাপ্রস্থানোদ্যত শুকদেবের শরীরোৎপন্ন ছায়া-শুকের বিবাহের কথা বহু পুরাণেই আছে। সেই বিবাহের ফলে তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা হয়। সেই পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম "গৌর"। ইঁহাকেই এই সম্প্রদায় "গৌড়" বা গৌড়পাদ বলেন। অতএব গৌড়পাদকে শুকদেবের শিষ্য ও পুত্র উভয়ই বলিতে পারা যায়। আর তাহা হইলে গৌড়পাদকে কলির প্রারম্ভে প্রায় ৩০০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি বলিতে পারা যায়। যাঁহারা যোগসিদ্ধ সূক্ষ্মশরীরে বহু কাল অবস্থানের কথা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা হয়ত চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গের কথায় ইহা বিশ্বাস করিবেন। কারণ, তিনি বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে লোকে রসায়ন দ্বারা ১০০০ হাজার বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ বিদ্যা আছে।" আর যাঁহারা শঙ্করকৃত মাণ্ডুক্যকারিকাভাষ্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া গৌড়পাদকে শঙ্করের পরমগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা সেই "পরমগুরু" পদের বিশেষণ "পূজ্যাভিপূজ্য" পদের সার্থকতা চিন্তা করিতে পারেন। শঙ্করের সে স্থলে বাক্যটি এই—

"যত্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি

"পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরু" পদে ঠিক গুরুর গুরুকে বুঝাইতে পারে না। ইহার অর্থ অতি পূজনীয় মহামান্য গুরুগণের

গুরুমাত্র। আনন্দগিরিও টীকায় বলিয়াছেন—"পরমগুরুত্বং পূজ্যানাম্ অপি গুরূণাম্ অতিশয়েন পূজ্যত্বাৎ আচার্য্যস্য" ইত্যাদি। এজন্য পূজ্যাভিপূজ্য বিশেষণের ফলে পরমগুরু পদের প্রসিদ্ধ অর্থে গুরুর গুরুকেই পূজ্যাভিপূজ্য বলা হইতেছে না, কিন্তু পূজ্যাভিপূজ্য যেমন যৌগিক পদ, তদ্রূপ পরমগুরু পদটিও যৌগিক অর্থবোধক হইয়া পূজ্যাভিপূজ্য কোন মহামান্য গুরুকেই বুঝাইবে—ইহাই সঙ্গত। যৌগিক পূজ্যাভিপূজ্য পদের সান্নিধ্য বশতঃ পরমগুরু পদটি যৌগিক পদ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আর তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে—গুরুগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে পূজনীয় গুরু। আর তিনিই মাণ্ডুক্যকারিকার রচয়িতা বলিয়া মাণ্ডুক্যকারিকার রচয়িতার সময়ই এই পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরুর সময় হওয়াই উচিত। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৩০০০ বৎসর হওয়াই উচিত।

পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে গৌড়পাদকে সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্য (১।৪।১৪ সূত্রে এবং "বেদান্ত-সম্প্রদায়-বিৎ" আচার্য্য ২।১।৯ সূত্রে) বলিয়াছেন। সম্প্রদায়বিদ্ হইতে গেলে প্রাচীন হওয়াই আবশ্যক হয়। শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক ব্যক্তির পক্ষে সম্প্রদায়-জ্ঞানের সম্ভাবনা—শঙ্করাচার্য্যের মত হইবারই কথা, অথবা কিছু কমই হইবার কথা। এখন এই দুইটি বাক্য একত্র করিলে, 'পূজ্যাভিপূজ্য' পদের সার্থকতা ও 'সম্প্রদায়বিদ্' পদের প্রাচীনত্বদ্যোতকতা বিবেচনা করিলে গৌড়পাদের প্রাচীনত্বই সম্ভবপর হয়, সমসাময়িকত্ব সম্ভবপর হয় না। আরও একটি কারণ দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অথবা সমসাময়িক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্য বেদান্তের শাঙ্করব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে যাইয়া নিজমতকে সম্প্রদায়বিৎ উপবর্ষাচার্য্যের মত বলিতেছেন। (ভাস্করভাষ্য ১২৪ এবং ২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এই উপবর্ষ পাণিনির গুরু। পাণিনি অনেকেরই মতে বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ভাস্করাচার্য্য যাঁহাকে সম্প্রদায়-বিৎ বলিতেছেন, তিনি ভাস্করাচার্য্যের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। অতএব শঙ্করাচার্য্যের উক্ত সম্প্রদায়-বিৎ গৌড়পাদাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যের উপবর্ষের ন্যায় তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায়। সুতরাং উপরি উক্ত অন্য প্রমাণগুলির অনুরোধে গৌড়পাদকে শুক-সমকালীন অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে আবির্ভূত বলিতে বাধা হয় না। "পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরু" পদটি অথবা শঙ্কর-গৌড়পাদের "সাক্ষাৎকার" কথাটি উহার বাধক হইতে পারে না। কিংবা গুরুপ্রণাম মন্ত্রে গৌড়পাদের পর গোবিন্দপাদের নাম, তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের নামের উল্লেখও উহার বাধক হইতে পারে না। তাঁহার পর ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের গৌড়পাদ ও ৬৮৬ খৃষ্টাব্দের শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে এই সুদীর্ঘ ব্যবধান দেখিয়া যাঁহারা গৌড়পাদকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি বলিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার্ণব তন্ত্রের গুরুপরম্পরাটির উপর দৃষ্টি করিলে কতকটা সঙ্গতি পাইতে পারেন। সেই পরম্পরাটি এই—

কপিলশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সনকশ্চ সনন্দনঃ। ৫
ভৃগুঃ সনৎসুজাতশ্চ বামদেবশ্চ নারদঃ ॥ ৯
গৌতমঃ শৌনকঃ শক্তি র্মার্কণ্ডেয়শ্চ কৌশিকঃ। ১৪
পরাশরঃ শুকশ্চৈবাঙ্গিরাঃ কণ্বস্তথৈব চ ॥ ১৮
জাবালিশ্চ ভরদ্বাজো বেদব্যাসস্তথৈব চ। ২১
ঈশানো রমণশ্চৈব কপর্দ্দী ভূধরস্ততঃ ॥ ২৫
সুভটো জলজশ্চৈব ভূতেশঃ পরমস্ততঃ। ২৯
বিজয়ো ভরণশ্চৈব পদ্মেশঃ সুভগস্ততঃ ॥ ৩৩
বিশুদ্ধঃ সমরশ্চৈব কৈবল্যশ্চ গণেশ্বরঃ। ৩৭
সুপথো বিবুধো যোগী বিজ্ঞানো নগবিভ্রমৌ ॥ ৪৪
দামোদরশ্চিদাভাসশ্চিন্ময়শ্চ কলাধরঃ। ৪৭
বীরেশ্বরশ্চ মন্দারস্ত্রিদশঃ সাগরো মৃড়ঃ ॥ ৫২
হর্ষসিংহশ্চ গৌড়শ্চ বীরো ঘোরো ধ্রুবস্ততঃ। ৫৮
দিবাকরশ্চক্রধরঃ প্রমথেশশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬২
আনন্দভৈরবো ধীরো গৌড়পাবক এব চ। ৬৫
পারাশর্য্যঃ সত্যনিধী রামচন্দ্রস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৯
গোবিন্দঃ শঙ্করাচার্য্য একসপ্ততিসংখ্যকাঃ ॥ ৭১

ইহার মধ্যে প্রথম ২১ জন মুনি ঋষি। ২২শ হইতে ৭১ তম পর্য্যন্ত আচার্য্য পুরুষ। প্রথম ২১ জনের মধ্যে ক্রমের বিপর্য্যয় দেখা যায়। কারণ, পরাশরের পর শুক এবং শুকের পর বেদব্যাসের নাম রহিয়াছে। কিন্তু এই ত্রুটী অন্য উপায়ে অর্থাৎ পুরাণ-বচন দ্বারা সংশোধন করা যাইতে পারে। তদনুসারে ১৯শ পরাশর, ২০শ বেদব্যাস এবং ২১শ শুক বলিয়া গণ্য করা যায়। ২২শ ঈশান হইতে ৭১ তম শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ৫০ জন ব্যক্তির ক্রম মধ্যে কোন ত্রুটী আছে কি না বলা যায় না। ইহাতেও শুকের শিষ্য বা পুত্র গৌড়পাদের নাম দেখা যায় না। ৫৫ সংখ্যক গৌড় এবং ৬৫ সংখ্যক গৌড়পাবককে গৌড়পাদ বলা যায় না। কারণ, গৌড়পাদ শুকশিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এজন্য ২১ সংখ্যক শুক, এবং ২২ সংখ্যক গৌড়পাদ বলিয়া কল্পনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে ৭২ সংখ্যক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আর তাহা হইলে শুক হইতে শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ৫০ জন গুরুর নাম পাওয়া যায়। এই গুরুপরম্পরার দ্বারা

আমরা যদি মনে করি যে, গৌড়পাদ হইতে শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে বহু আচার্য্যই হইয়া গিয়াছেন ও কেবল গোবিন্দপাদ মাত্র ছিলেন না, তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইতে পারে না। সুতরাং গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধানের জন্য গৌড়পাদকে ৬ষ্ঠ-৭ম খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। বস্তুতঃ, বালকৃষ্ণানন্দের শারীরকভাষ্যবার্ত্তিক মধ্যে গৌড়পাদের দ্বাপর শেষে আবির্ভাবের কথাই আছে, যথা—

"গৌড়চরণাঃ কুরুক্ষেত্রদেশগত-হীরাবতীনদীতীরভব-গৌড়জাতিশ্রেষ্ঠাঃ দেশবিশেষভবজাতিনাম্নৈব প্রসিদ্ধাঃ দ্বাপরযুগম্ আরভ্য এব সমাধিনিষ্ঠত্বেন আধুনিকজনৈঃ অপরিজ্ঞাতবিশেষাভিধানাঃ সামান্যনাম্নৈব লোকবিখ্যাতাঃ। (শারীরকমীমাংসাভাষ্যবার্তিক-বিবরণ, ৭ম শ্লোক। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী এম-এ বেদান্ততীর্থ—বিশ্ববাণী পত্রিকা আষাঢ় ১৩৪৯ সাল দ্রষ্টব্য।)

এখন তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে, গুরুপ্রণাম মন্ত্রে এই সকল আচার্য্যকে প্রণাম করা হইল না কেন? কেবল বশিষ্ঠ, শক্তি পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ ও গোবিন্দ, শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যচতুষ্টয়কে প্রণাম করা হইল কেন? ইহার উত্তরে জানা যায়, এই কয়জন আচার্য্য এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান পথপ্রদর্শক আচার্য্য। অন্য সকল আচার্য্যকে গুরুপূজার দিন পূজা করা হয়, নিত্যপ্রণাম মধ্যে তাঁহাদিগকে, সংক্ষেপের অনুরোধে আর প্রণাম করা হয় না মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের পর যে সব আচার্য্যকে প্রণাম করা হয়, তাঁহারা সংখ্যায় বহু বলিয়া যিনি যে শাখার অন্তর্গত, তিনি গ্রন্থাদি রচনার কালে সেই শাখার প্রধান আচার্য্যগণকে প্রণাম মাত্র করেন—ইহাই দেখা যায়। এইরূপ গ্রন্থমধ্যে একখানি ভাষ্যবার্ত্তিকের নাম করা যাইতে পারে। ইহা আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে শঙ্করের পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, গুরুপ্রণাম মন্ত্রে যে কয় জন আচার্য্যের নাম দেখা যায়, তাঁহারা সম্প্রদায়মধ্যে অতিশয় পূজনীয়, এই জন্যই তাঁহাদের নাম উহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, ইহাই এস্থলে বক্তব্য।

এইরূপে দেখা যাইবে, এই অদ্বৈত সম্প্রদায়টি বেদ হইতে উদ্ভূত। ইহাতেই বেদের মুখ্যতাৎপর্য্য, ঋষিগণের মধ্যে যিনি ইহার প্রথম প্রচারক, তিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ; দেবতাগণের মধ্যে যাঁহারা ইহার প্রধান ব্যাখ্যাতা, তাঁহারা শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। আর বশিষ্ঠেরই পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ইহা পরবর্ত্তী কালে প্রচারিত। ইঁহাদেরও মধ্যে ব্যাস শুক ও গৌড়পাদই প্রধান। শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদেরই অবলম্বিত অদ্বৈতবাদেরই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের কথা কিছুই বলেন নাই। তিনি ইঁহাদেরই কথা শ্রুতি অবলম্বনে প্রচার করিয়াছেন মাত্র। এই বিশেষত্ব ব্যাস-মধ্যেও খুব প্রবল। তিনি ব্রহ্মসূত্র মধ্যে শ্রুতির দ্বারাই শ্রুতির মীমাংসা করিয়াছেন! যেখানে কোনরূপ ব্যক্তিগত মতের পূর্ব্ব হইতেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানে নিজ বাদরায়ণ নামের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমি, আত্রেয়, জৈমিনি প্রভৃতি অপর ঋষিনামেরও সূত্রমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন। নচেৎ শ্রুতির মীমাংসা পূর্ব্ব হইতে সম্প্রদায়ক্রমে যেরূপ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই তিনি সূত্রমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাংখ্যাদি মতবাদে অনুমান অনুভবের স্থান শ্রুতির সহিত যেরূপ সমান, এই মতে সেরূপ নহে বলিয়া ব্যাসদেব সূত্রমধ্যে স্থলবিশেষে নিজ নাম এবং উক্ত ঋষিগণের নাম করিয়াছেন। এ জন্য এই অদ্বৈতবাদটি কোন ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কৃত মতবাদ নহে, ইহা সম্পূর্ণ বৈদিকমতবাদ বলা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এ মতের এই যে, ইহা কোন মতবাদের সহিত বিরোধ করে না। ইঁহারা যখন অপর মতবাদ খণ্ডন করিতেছেন বলিয়া দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের আক্রমণের উত্তর মাত্র। ইহার উৎপত্তি বেদার্থনির্ণয় উপলক্ষে হইয়াছে। নিজ অনুভূত সত্যপ্রকাশের জন্য ইহার উৎপত্তি হয় নাই। ব্রহ্মে এক অনির্ব্বচনীয় মায়া শক্তির কার্য্য এই বিচিত্র জগৎ বলিয়া অন্য সকল মতবাদই এই মায়াশক্তির খেলা, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা অদ্বৈতবাদের কোন বাধাই হইতে পারে না, এই জন্য অন্য মতবাদ খণ্ডনে ইঁহাদের উৎসাহ নাই।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

[উপন্যাস]

২৮

বাবার কাছে আসিলে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রচূড়কে কেমন দেখলি করু ?

বাবা এ প্রশ্ন করিবেন, জানিতাম। চন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিবাহের সম্ভাবনা হইয়াছে বলিয়া আমার কুণ্ঠা হইল। অঙ্কুরে যাহার বিনাশ হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব জাগাইয়া রাখা মূঢ়তা! সহজ কণ্ঠেই আমি জবাব দিলাম, "ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌লো বাবা। কারো সঙ্গে ওঁর মিল নেই। উনি যেন সৃষ্টিছাড়া!"

"অনেকটা তাই! সত্যই আশ্চর্য্য ছেলে! মাস-দুই আগে আমি হরিপুরে গিয়েছিলাম। পাশাপাশি গাঁ-গুলো ঘুরে কি আনন্দ পেয়ে এসেছি, বলবার নয়। যাদের কথা কেউ ভাবে না, কেউ যাদের মুখ চায় না—সেই সব গরীব; চাষা-ভুষোদের নিয়েই চন্দরের কারবার। তাদের সঙ্গে মাঠে মাটী কুপিয়ে সার দেওয়া, রাত্রে গাছতলায় ছেলে-বুড়োর ক্লাশ করা, দশ জন লোকের খাটুনী মানুষ একা খাটতে পারে, ওকে না দেখলে ধারণা করা যায় না!"

বলিলাম, "চাষ-আবাদ শেখানো খুব ভালো মানি, তবে ওদের লেখাপড়া শেখানো কি ঠিক? লেখাপড়া শিখলে ওরা আর হাল-লাঙ্গল ধরতে পারবে না; ক্ষেতের কাজ করতে চাইবে না! হঠাৎ আলোয় এলে আলো-আঁধার—দু'কুলই হারাবে। শিক্ষার মোহে ওদের জাত-ব্যবসা আর ভালো লাগবে না, আশা বেড়ে যাবে! ওরা হতে চাইবে অফিসের বাবু, থানার কনেষ্টবল, যাত্রার দলের অভিনেতা। পাট না বুনে হতে চাইবে পাটের দালাল, ধানের ব্যাপারী।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাবা বলিলেন, "কুশিক্ষায় মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, জাত-ব্যবসা করতে তাদের লজ্জা হয়, এ-কথা তুমি মিছে বলোনি, মা! আজ-কালকার অর্থ-সমস্যার যুগে ঐটিই হচ্ছে প্রধান বিপদ, তবে চন্দ্রকে দেখে ওর ছেলে-বুড়ো ছাত্রের দল নিজেদের ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না। চন্দরের উদ্দেশ্য চাষ-আবাদের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া, নিরক্ষরকে অক্ষরের মধ্যে আনা। তুমি তো জানো না, ওর ত্যাগে-মহত্ত্বে সকলে ওকে দেবতার মত ভক্তি করে, প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। চন্দর ছোট-বড় সকলের দাদা-ঠাকুর, দেবতা! রূপে-গুণে চন্দ্রচূড় সত্যই চন্দ্রচূড়ের মত!"

বাবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অন্তরের সহিত আমি যোগ দিতে পারিলাম না। অতি সূক্ষ্ম এক বিদ্বেষের হুল আমার বুকে খচ্-খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। আমি যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি—ত্যাগে, মহত্ত্বে আর কেহ যদি তাঁহাকে ছাপাইয়া যায়, কেন তাহাতে আমার ঈর্ষা হইবে? আমার যিনি আরাধ্য, তিনি জগতের আরাধ্য না হইলে কিসের দুঃখ? আমার প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি, প্রেমের মালা তো অম্লান উজ্জ্বল রহিয়াছে – প্রাণের দেউলে সঙ্গোপনে দেবতার পূজা-আরতি চলিতেছে, তবু বাহিরের প্রলোভনে অন্যের গুণ-বাহুল্যে আমার ভয় হইবে কেন?

মুহূর্ত্তে মনের এ বিদ্বেষ-ভয় ঝাড়িয়া মুছিয়া বলিলাম,

চন্দ্র বাবুর আদর্শ খুব উঁচু বাবা! আমাদের দেশে অমন লোকের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই মঙ্গল।"

বাবা বলিলেন, "তা আর বলতে! মনের প্রেরণায় চন্দর সকলের সেবা-ব্রত নিয়েছে, মিথ্যা আড়ম্বর দেখাবার জন্য নয়। ওর তো অভাব নেই! স্বচ্ছল সংসারে আদরের ছেলে। চন্দরের মা আমার কাছে কত দুঃখ করলে, এই বয়সে ও মাছ-মাংস খায় না, ভোগের জিনিষ স্পর্শ করে না। আমি চন্দরকে ডেকে এ কথা বললাম। তাতে সে জবাব দিলে, 'মা'র কথা শুনবেন না মামা বাবু। আমার বিবাগী হবার সম্ভাবনা নেই! উদয়াস্ত কাজ নিয়ে থাকলে বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লাগতে পারে না। মাছ-মাংসর চেয়ে ভালো খাবার পেলে ও-সবে কার রুচি থাকে, বলুন? 'বিয়ে' কথাটা হয়েছে মা'র জপমালা, কিন্তু মা তলিয়ে দেখেন না—তাঁর অসভ্য গোঁয়ার, চাষা ছেলেকে কোন্ ভদ্রলোক মেয়ে দেবে? আমার কাজকে যিনি নিজের কাজ করে নিতে পারবেন, তেমন মেয়ে পেলে আমি বিয়ের কথা বিবেচনা করবো।' ছেলের কথা শুনে চন্দরের মা রেগে অস্থির! বললে, 'দয়া করে আমাকে জেল-খাটা, খদ্দর-পরা একটা মেয়ে এনে দিন তো দাদা! ঘরে বৌ এলে তার পর ছেলের বাহাদুরি আমি দেখে নেবো'।"

এ সম্বন্ধে কি উত্তর দিব, ভাবিতে লাগিলাম। বাবার আলোচনায় যোগ দিয়া চন্দ্র বাবুর ভাবী বধূ-নির্ব্বাচনের ভার আমি আনন্দে লইতে পারিতাম, কিন্তু পিসিমা সোজা-জিনিষটাকে একটু বাঁকাইয়া দিয়াছেন! যতই ইংরেজী বই পড়ি না কেন, স্বাধীন মনোবৃত্তির অনুশীলন করি না কেন, তবু আমি বাঙ্গালীর মেয়ে!

ক্ষণকাল পরে আমি বলিলাম, "আমাদের দেশে অনেক মেয়ে আছে বাবা, যারা যথার্থ দেশসেবিকা। তাদের ভিতর থেকে এক জনকে বেছে বার করতে পারলে চন্দ্র বাবুর অযোগ্য হবে না।"

আমার পিছন হইতে পিসিমা খর্-খর্ করিয়া উঠিলেন,—"যুগ্যি-অযুগ্যি কি বলছিস্ রে রুক্ন! চন্দরের মত বর পাওয়া তপিস্যের ফল। ছেলের গুণের সীমা নেই। দোষের মধ্যে ছোট-লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আর স্বদেশী করে! তা হলেও অমনটি আর পাওয়া যাবে না। তোরা বড় হয়েছিস্, দেখে-শুনে নিলি। এখন আর কোনো ওজর শুনবো না! দাদাকে তো ঠাকুরঝি কনে দেখার ভার দিয়ে রেখেছে। দাদা গিয়ে সব ঠিক করে এসো, সামনের অঘ্রাণে দু'হাত এক করে দিই।"

"কাদের দু'হাত এক করে দেবে মামিমা?" বলিতে বলিতে স্নানান্তে চন্দ্র বাবু ফিরিয়া আসিলেন।

লজ্জায় আমার চোখের পাতা বুজিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, ধরণি, দ্বিধা হইয়া আমাকে তুমি লুকাইয়া রাখো!—কলির মেয়ের কাতর মিনতিতে ধরণী বিচলিত হইলেন না!

পিসিমার মুখে খই ফুটিতে লাগিল? "কার আবার! তোদের কথা বলছিলাম। তোতে-রুকুতে দু'হাত 'এক হলে দিব্যি হয়। এমন গুণের মেয়ে তুই আর কোথাও পাবি নে চন্দর! এত যে লেখাপড়া করেছে, তবু কি ধীর, শান্ত! মাটি নড়ে তো মেয়ে নড়ে না! তুই রুকুকে নে বাবা, আমার পুরানো সম্পর্ক আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিই।"

সরমে আনত হইলেও আমি নারী, আমার নয়ন নারীর নয়ন! সে তাহার স্বভাবের বঙ্কিম ভঙ্গিমা ভুলিল না। নত চক্ষু ঈষৎ তুলিয়া আমি চন্দ্র বাবুর মুখের দিকে তাকাইলাম, সে রুক্ষ-কোমল মুখের অদৃশ্য লিপি পাঠ করিতে পারিলাম না। তাঁহার উজ্জ্বল ভাস্বর আঁখি-তারা আমারই মুখে নিবদ্ধ দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি চোখ নামাইয়া লইলাম।

স্নিগ্ধ-মধুর হাস্যে পিসিমার প্রস্তাব তিনি খণ্ডন করিলেন। বলিলেন,—"তুমি কি বলছো মামিমা! মামার মেয়ে—ও যে আমার বোন, তা তুমি ভুলে গেলে! তোমার কিসের লজ্জা রুকু, আমাদের ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে লজ্জার কিছু নেই!"

কি মিষ্ট সম্বোধন! আমার সমস্ত মন অমৃতে ভরিয়া গেল।

বাবা সস্নেহে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ চন্দর, রুকু বোনই তো! এ সম্বন্ধ ফেল্না নয়। তোমার যেমন বিয়েয় অনিচ্ছা, রুকুরো তাই। সে-দিক্ দিয়ে দুই ভাই-বোনের মিল দেখছি। কাল আমি ওকে অভয় দিয়েছি, যত দিন বিয়ে না করে থাকতে চায় থাকবে! ইচ্ছা না হলে বিয়েও করবে না।"

আহত ফণিনীর মত পিসিমা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি বলছো দাদা!. তোমাদের সব অনাসৃষ্টি! রুকুর মা থাকলে এ-কথা মুখে আনতে পারতে না! তোমার কি, লোকে কথা শোনাতে এসে আমাকেই শোনায়। কেনই বা শোনাবে না? এত বড় মেয়ে কার ঘরে আছে? আইবুড়ো মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে কে তার খেয়ালে তাল দিয়ে যাচ্ছে! ওর মাসীর যে অত খিষ্টানী মত, সে-ও মেয়ের

বিয়ে দিচ্ছে। যা খুশী করো গে। ভালো মনে করে চেষ্টা-চরিত্তির করতে গিয়েছিলাম, নাহলে আমার কিসের দায়।"

বাবা নিতান্ত নিরীহ। পিসিমার সে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির সম্মুখে ম্লান হইয়া গেলেন। সামান্য একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন চন্দ্রদা, বলিলেন, "মিছিমিছি রাগ করছ কেন মামিমা? তোমরা না এত মানো, বিশ্বাস করো! তবে ভুলে যাও কেন—হিন্দুর জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—ঈশ্বরের অভিপ্রেত! এ জোরের জিনিষ নয়। সময় হলে হয়ে যাবে, তার জন্য চিন্তা কেন? কৈ, তুমি না খেতে দেবে, তখন তাড়া দিচ্ছিলে! এখন হাত গুটিয়ে বসে রইলে।"

পিসিমা অপ্রতিভ হইয়া জল-খাবার আনিতে উঠিলেন।

২৯

সন্ধ্যার পরে বারান্দায় শুভ্র চন্দ্রালোকে আমাদের সভা বসিল। আমি অসঙ্কোচে চন্দ্রদার পাশে স্থান করিয়া লইলাম। অপরিচিত, অনাত্মীয় ভাবিয়া উঁহাকে আর পরিহার করিতে পারি না। আজ আমি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম, মানুষের প্রকৃতি সর্ব্ব দিক্ দিয়া সর্ব্বপ্রকার রস গ্রহণ করিতে উন্মুখ। আমার নিজের ভাই-বোন না থাকিলেও মিলির কাছে ভগিনীর প্রীতি লাভ করিয়াছি! ভানু আমাকে দিয়াছে ছোট ভাইয়ের বিশ্বাস, নির্ভরতা। জ্যেষ্ঠের স্নেহ-সৌহার্দ্দ্য আমি পাই নাই। পাইবার জন্য আমার চিত্ত কোন দিন লালায়িত হয় নাই। চন্দ্রদার স্নেহ-সম্ভাষণে আজ আমার সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত লাগিয়াছে। যেখানে সত্যের অভাব, সেখানে মিথ্যাকেই সত্য ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে সাধ হইতেছে।

জীবনে বেশী পাই নাই। পাইবার যোগ্যতা সকলের থাকে না। কিন্তু যিনি আজ অযাচিতরূপে দিতে চাহিতেছেন, তাঁহাকে ফিরাইব কেন?

কথায় কথায় আমি চন্দ্রদাকে বলিলাম, "আপনি কখনো কলকাতায় যান কি? এবারে গেলে আমাদের ওখানে যাবেন।"

চন্দ্রদা বলিলেন, "মাঝে মাঝে যেতে হয় বৈ কি। আমরা গেঁয়ো হলেও আমাদের এক প্রতিনিধি কলকাতাতেই থাকে। সে সনাতন দাদা। তার খাতিরে কাজ না থাকলেও যেতে হয়।"

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনাতন কে,—চিনলাম না।"

"চিনবেন কি করে মামা বাবু! ও তো দেশে থাকে না। অনেক দিন হলো কলকাতার বাড়ীতে দরোয়ান হয়ে আছে। দশ বছর বয়সে সনাতন-দা আমাদের কাজে বাহাল হয়। চল্লিশ বছর পার হতে গেল, কাজই করছে। এক ছেলে ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আমার সঙ্গে গিয়ে ছেলে বাপকে দেখে আসে। গঙ্গার তীর থেকে এক দিনের জন্য সনাতন দাদাকে আনা যায় না, এমনি তার গঙ্গা-ভক্তি!"

পিসিমা বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়েছ? সনাতন বুঝি ভাড়া আদায় করে?"

"নীচের তলাটা দোকানদারদের ভাড়া দেওয়া আছে, ওপরটা ভাড়া দেওয়া হয় না। কলকাতায় গেলে আমরা থাকি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ দিকে আপনাদের বাড়ী?"

"আশুতোষ কলেজের কাছে।"

বাবা বলিলেন, "ও! তা'হলে করুর মাসীর বাড়ীর কাছে।"

বলিলাম, "হ্যাঁ, আমাদের খুব কাছেই হবে। আপনি এবার কলকাতায় গিয়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

"যাবো বৈ কি, গেলেই যাবো। তুমি তো পরশু যাচ্ছো! পূজোর ছুটিতে আবার আসবে কি?"

"বোধ হয়, আসা হবে না। পরীক্ষার আগে মাসিমা আসতে দেবেন না।"

পিসিমা কহিলেন, "তুই কালকের দিনটা থাক্ না চন্দর, পরশু ওকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে তার পর যাস্। বাড়ীতে আমরা দু'টো বুড়ো মানুষ থাকি, ওর কথা বলবার একটা লোক অবধি নেই! এই দুঃখে করু এখানে আস্‌তেই চায় না।"

পিসিমার মিথ্যা ভাষণে চমকিত হইলাম। তাঁহার আশা-তরু ভূপতিত জানিয়াও তিনি তাহার মূলদেশে বারি-সিঞ্চন করিতেছেন! তাঁহার বিশ্বাস, স্রোতের গতি বিপরীত মুখে বহিলেও বহিতে পারে। সময় এবং সান্নিধ্যের সহযোগে অনেক সময় অসাধ্য-সাধন হয়।

চন্দ্রদা কহিলেন, "কালকে থাকতে পারলে তো ভালোই হতো মামিমা। কিন্তু তা হবার নয়। আমার আবার ক'টি রোগী আছে। আজকের ওষুধ দিয়ে এসেছি, কাল গিয়ে তাদের ব্যবস্থা ক'রবো। স্কুলের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু রোগী রেখে থাকা চলবে না।"

কহিলাম, "আপনি কি সব্যসাচী! চিকিৎসা-বিদ্যাও

জানেন্ ! কখনো লাঙ্গল ধরেন, তাঁত বোনেন, আবার মাষ্টার, ডাক্তার হতেও বাধে না। মানুষ তো আপনি একা, এত পারেন কি করে ?"

"ইচ্ছা থাক্‌লে সময়ের অকুলান হয় না। আসলে আমি চাষা। ডাক্তার বা তাঁতি নই। সংসারে থাকতে গেলে সব জিনিষ একটু-আধটু শিখে রাখতে হয়। বিনা-ওষুধে মরার চেয়ে আমার হোমিওপ্যাথি ছিটে-ফোঁটা মন্দর ভালো নয় কি ?"

বাবা মাথা নাড়িলেন। বলিলেন, "ভালো নয়, কে বলবে চন্দর ? তুমি মহৎ বলেই লোকের দুঃখ-কষ্টের দিকে চাইছো। কার জন্যে কে এত করে ? তোমার আদর্শ সকলের অনুকরণ করা উচিত।"

আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদা এ-প্রসঙ্গের ধারা পরিবর্ত্তনের জন্য পিসিমাকে কহিলেন, "কাল থাক্‌তে পারবো না,—শুনে তুমি রাগ করলে মামিমা ! এবারের মত আমাকে মাপ করো, আবার যে দিন হুকুম করবে, এসে হাজির হবো।"

পিসিমা ম্লান হাসি হাসিলেন। কহিলেন, "তোর ওপরে রাগ করে কে চন্দর ? রাগ করলেও তুমি রাগের কত ধার ধারছো ! মাকে তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক্ করে তুলেছো। ভদ্দর ঘরের ছেলে হয়ে চাষা বনেছো। কি যে তেমোর লেখাপড়া শেখা, কি যে তোমার বিলিতি বাঁদর হওয়া ! সমস্তই ভস্মে ঘী ঢালা হয়েছে।"

বাবা কহিলেন, "কি বলছিস্ বিন্দু ! ভস্মে ঘী ঢালা কি রে ! ভস্ম থেকে আগুন বেরিয়ে এসেছে। বাপ-মা'র সৌভাগ্য এমন ছেলে পাওয়া ! এরা দলে বেশী নয় বলে আমার দুঃখ হয়।"

চন্দ্রদা শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "আমার বাহনটির তোয়াজ করতে চল্লাম মামা বাবু। ওর আবার ডলাই-মলাইয়ের ব্যারাম আছে। সেটা ঠিক-মত না হলে বোঝা বইতে চায় না। এখন তোয়াজ করে না রাখলে শেষ-রাত্রে ওকে দাঁড় করানো যাবে না।"

বাবা বলিলেন, "তুমি বসো, নিতাইকে বলি, সে ও-সব বেশ জানে।"

"জানলে কি হবে মামা বাবু, অচেনা লোককে পবন গায়ে হাত দিতে দেবে না। ও যেমন আমাকে এক বেলার রাস্তা আধ বেলায় পৌঁছে দেয়, আমিও তেমনি ওর সেবা করি। পবনের কৃপায় আমি পাকা এক জন সহিস হয়েছি।"

চন্দ্রদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছু লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ঘোড়ার নাম বুঝি পবন ?"

"হ্যাঁ, আমি ওর নাম রেখেছি—পবন-নন্দন। হাস্‌ছো ! ঘোড়ায় চড়তে জান্‌লে পবনের পিঠে চেপে মুগ্ধ হয়ে যেতে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, পবন আমাকে খুব ভালোবাসে, বেশীক্ষণ না দেখলে খুঁজে বেড়ায় !"

"বিশ্বাস করবো না কেন ? আপনি ভালো বলে সবাই আপনাকে ভালোবাসে। পশুদের ভালোবাসার অনুভূতি মানুষের চেয়ে না কি বেশী শুনতে পাই। আমরা ওতে বঞ্চিত। ঘোড়ায় চড়তে জানি না।"

"না জান্‌লে শিখে নিতে দোষ নেই। জানি না, পারি না, ও কথা গৌরবের নয়। শিখবে ঘোড়ায় চড়া ? আমি এখনি তোমায় শিখিয়ে দেবো !"

"আপনি যেন শিখিয়ে দেবেন, কিন্তু সময়ে কুলোচ্ছে কৈ ? আপনি চলে যাচ্ছেন ভোরে। আমি যাচ্ছি পরশু,—কখন শেখাবেন ? আর শিখতে গেলে তো আপনার পবনের পিঠে চাপতে হবে। চাপা দূরের কথা, ওর কাছে যেতেই আমার ভয় করে।"

"ভয় করে ! পবনের মত শান্ত নিরীহ প্রাণীকে ভয় ! কোনো ভয় নেই ! এসো, আমি পবনের পিঠে তোমায় বসিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া চন্দ্রদা নিঃসঙ্কোচে আমার হাত ধরিলেন।

চকিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। সে মুখ স্নেহে-করুণায় প্রদীপ্ত, তাহাতে অন্য ভাবের লেশ নাই। তাঁহার ধরা হাতখানা তখনই টানিয়া লইতে পারিলাম না, কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ধরা-ছোঁয়া আমি ভালো বাসি না।

চন্দ্রদার পক্ষে কিছুই যেন অশোভন নয় ! তিনি সরল, নির্ম্মল, কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত হইলেও আমার মন বারি-ধৌত শুভ্র যুথিকা বলিতে পারি না ! এ ক্ষেত্রে লজ্জার ভাণ অচল। আমাকে ভয়ের ভাণ করিতে হইল।

তাঁহার মুঠার মধ্য হইতে হাত টানিয়া লইয়া ভীতি-ব্যাকুল স্বরে কহিলাম, "আমি পারবো না চন্দ্রদা, আমার কাজ নেই ঘোড়-সওয়ার হয়ে। মা গো, পবন যেন কেমন করে চাইছে !"

প্রসন্ন কোমল হাসিতে চন্দ্রদার মুখ ভরিয়া গেল। সস্নেহে, সকৌতুকে তিনি বলিলেন,—"কি ভীরু মেয়ে ! থাকো সহরে, লেখা-পড়া শিখেছো, তবু তোমার এত ভয় ! জানো না, আমাদের দেশের মেয়েদের সাহসে-বীরত্বে পুরাণ-ইতিহাস এখনো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। যারা সামান্য

ঘোড়ার ভয়ে অস্থির, তাদের দিয়ে দেশের কোন্ বড় কাজ হবে, করু ?"

চন্দ্রদার হাসির অন্তরালে যে-শ্লেষ, সেই শ্লেষের খোঁচা আমাকে বিঁধিল। অপ্রতিভ না হইয়া সগর্ব্বে আমি উত্তর দিলাম, "আমার ভয় দেখে মেয়ে-জাতকে ভীরু বলো না চন্দ্রদা। এক জনের ভীরু স্বভাবের অপবাদে আর সব মেয়ের সাহসের অভাব আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। পুরাণ-ইতিহাস উল্‌টোতে হবে কেন? আমার মাসতুতো বোন মিলির সাহস দেখলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। দশ জন পুরুষের যে সাহস নেই, মিলির তা আছে। সাঁতার, মোটর চালানো, ঘোড়ায় চাপা থেকে হেন কাজ নেই, যা সে জানে না। আবার এ-দিকে যেমন বুদ্ধি, তেমনি মেধা! সে এখানে থাকলে এক-মিনিটে আপনার পবনকে বশ করে নিতো।"

চন্দ্রদা সাগ্রহে বলিলেন, "চমৎকার মেয়ে তো! মামা বাবু তখন তাঁর কথাই বলছিলেন। আমি ভাবি, আমাদের দেশে অমন মেয়ের সংখ্যা কেন বাড়ে না? তুমি তাঁর বোন, তাঁর কাছে থাকো, অথচ দু'জনের স্বভাবে এত তফাৎ কেন?"

"আমার স্বভাবের আপনি কি জানেন চন্দ্রদা? ক' ঘণ্টা আমাদের জানা-শোনা, এর মধ্যে কারো স্বভাব জানা অসম্ভব।"

"খুব অসম্ভব নয়। আমি বেশ বুঝেছি, আমার করু বোনটি লক্ষ্মী হলেও খুঁত আছে। কি খুঁত, তা বলবো না। শুনলে তুমি রাগ করবে।"

চন্দ্রদা মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বলিলাম, "রাগ করবো কেন? খুঁতের কথা বলুন না!"

"বলি। তুমি ছল-ছুতোয় রাগ করতে ভালবাসো, ঠিক ছেলেমানুষের মত। তোমার রাগটুকু বড় মিষ্টি—ভারী ভালো লাগে। রাগে রাঙা হয়ে উঠলে যে! এখনি না বললে, রাগ করবে না!"

ভাগ্যে চন্দ্রদা আমাকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়াছিলেন, ভাগ্যে তাঁহার প্রকৃতি জানিতে আমার বাকী ছিল না, নহিলে এ মন্তব্যে আমি হয়তো পলকে প্রলয় করিয়া তুলিতাম! এমন সরল, আপন-ভোলা লোকটিকে কি উত্তর দিব ভাবিয়া না পাইয়া হাসিতে লাগিলাম।

আমার সে হাসিতে খুশী হইয়া চন্দ্রদা পবনের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

৩০

সে রাত্রে ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে চন্দ্রদা আমাদের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কালো ঘোড়ার সাদা সওয়ারটির আবির্ভাবে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলাম। সেই বিরক্তির অনুপাতে বিষাদের মেঘে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। এক এক জন মানুষের মধ্যে কি জানি কিসের যেন প্রভাব থাকে! তাহারা দূরে চলিয়া গেলেও অন্তরের অন্তস্তলে অনেক কিছু রাখিয়া যায়। ক্ষণেকের অতিথির সে ক্ষণেক আলাপ, ক্ষণেক হাসির স্মৃতি হৃদয়কে অকারণ ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে!

প্রতিদিনের মত প্রভাতের আলোয় ধরণী আলোকিত হইল। সে-আলোয় আমার মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কিন্তু আলোকিত হইল না।

যিনি ভাইয়ের স্নেহ লইয়া, বন্ধুর সহৃদয়তা লইয়া আমার এত কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনা আমাকে ম্রিয়মাণ করিল। কিন্তু কেন এমন হয়? সংসার-তরুর শাখায় কত পাখী আসে, চলিয়া যায়! এ আনা-গোনা জগতের বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে চিরকাল।

পিসিমার কাছে ঘেঁষিতে আজ আমার সাহস হইল না, আশাভঙ্গের আঘাতে তিনি অত্যধিক গম্ভীর।

বাবার ফুল-বাগিচার পরিচর্য্যায় যোগ না দিয়া আমি আমার নিভৃত কোটরে ঢুকিলাম। সময় আমার সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। আজিকার দিনটা মাত্র আমার আয়ত্তের মধ্যে। কাল সকালে আবার সেই গণ্ডীরেখার মধ্যে পা দিতে হইবে! মাঝখানে থাকিবে দিগন্ত-প্রসারিতা, সঙ্গীতমুখরা, নৃত্যশীলা পদ্মা। এ-পারে পড়িয়া থাকিবে বিশাল অরণ্য, নিবিড় বনানী, শান্তির নির্ঝর, স্নেহের অফুরন্ত উৎস! ও-পারে তৃণহীন, ছায়াহীন, বিশুষ্ক মরুভূমি, আর ভ্রান্তির মরীচিকা। তবু তাহারই পরি-বেষ্টনের মধ্যে আমার হৃদয় ধাবিত হইতে চায় কেন?

এ চাওয়ার মীমাংসা হইল না, পিসিমা গরম দুধের বাটি লইয়া উপস্থিত।

লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "আমাকে ডাকলে না কেন? তুমি আবার ব'য়ে নিয়ে এসেছ?"

"ডাকবো কি, তোমার তো গোছ-গাছ আছে। সারা বাড়ী জুড়ে সব ছড়িয়ে রেখেছো। আগে দেখে-শুনে না নিলে অর্দ্ধেক পড়ে থাকবে। এসে থাকা নেই, কেবলি যাওয়া-আসার ভোগান্তি!"

অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "সাধ করে তো

যাই না পিসিমা! তোমরাই লেখাপড়া শিখতে দিয়েছো! না গিয়ে কি করবো?”

“কেন, বিয়ে করে রাজার রাণী হবে, সোনার চাঁদ কোলে আস্‌বে। নাত্‌নী আমার কি করবেন, তা যেন জানেন না!”

কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম! ঠান্‌দির অতর্কিত আগমনে আমার মন যেন দমিয়া গেল। এত সকালে ঠান্‌দিকে আশা করি নাই!

পিসিমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ঠান্‌দিকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন, “এসো জ্যেঠাইমা, তোমার ফুল-দূর্ব্বো তোলা হলো? তোমরা পাঁচ জনে বিচার করো—একটা মেয়ে—সে-ও কাছে থাকে না। রাত ফরসা হলে রওনা দেবে। ভালো লাগে কখনো? যখনকার যা, তা না হলে কি সাজন্ত হয়? বলো।”

ঠান্‌দি ফুলের ডালা নামাইয়া দ্বার চাপিয়া বসিলেন। হাই তুলিয়া, তুড়ি দিতে দিতে পিসিমার সুরে সুর মিলাইলেন। বলিলেন, “যা বলেছিস্‌ বিন্দি, উচিত কথা! কালে কালে হলো কি! আইবড়ি ধিঙ্গি মেয়েগুলোর জালায় জাত-জন্ম রইলো না! কাল ছিল আমাদের! সাত চড়ে বৌ-ঝি রা-কাড়তো না, এক-হাত ঘোমটায় লজ্জা-সরম অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিল। এ ঘোর কলিতে সব ধিঙ্গি হয়েছে! কোথায় যাবে শ্বশুর-ঘর করতে, না, যাচ্ছেন কলেজে পড়তে!”

পিসিমার মেজাজ আজ ভালো ছিল না বলিয়াই তিনি খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নহিলে আমার শিক্ষার অনুকূলে বরাবর তিনি সায় দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সামান্য অসতর্কতার সুযোগে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণায় তিনি কেমন সচকিত হইলেন।

ত্রুটি-সংশোধনের আশায় পিসিমা বলিয়া উঠিলেন, “আমাদের যেমন পোড়া-কপাল জ্যেঠাইমা, এমন কারো নয়। লোকের ঘরে গণ্ডা-গণ্ডা ছেলে-মেয়ে, কেউ কাছে থাকে, কেউ দূরে যায়। দাদার এই সবে-ধন নীলমণি, তাকে নিয়ে পুতু-পুতু করছেন। ওকে পড়াচ্ছেন ছেলের আক্ষেপ মেয়ে দিয়ে মেটাবেন বলে!”

শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা পিসিমার ব্যর্থ হইল। ঠান্‌দি ঝঙ্কার দিলেন, “ও মা, কি সৃষ্টিছাড়া কথা বলিস্‌! ছেলেতে-মেয়েতে সমান হয় কখনো? মেয়েকে ছেলে বানালেই কাছে রাখা যায় না। কাছে রাখার সামগ্রী নয়! হ্যাঁ লা বিন্দি, কাল বুঝি তোর ভাগ্নে এসেছিল? নাত্‌নীর সঙ্গে ভালোবাসা করতে হবু-নাত-জামাইকে ডেকেছিলি না কি? তা ভাগ্নেটি তোর বড় সোন্দর, এমনটি আর নজরে পড়ে না। বেশী-দূর গড়াতে না দিয়ে তাড়া-হুড়ো করে সেরে দে, আমরা মিষ্টি-মুখ করি।”

সকৌতুকে ঠান্‌দির পানে চাহিলাম। ইহারা নিতান্ত অবলা অখলা, ভালো-মন্দের বিচার-বুদ্ধি কম, কিন্তু ইহাদের মন-মক্ষিকা মধু আহরণ করিতে জানে না! মনের দৃষ্টি ফোটা ফুলে উধাও না হইয়া আবর্জ্জনার স্তূপে আবদ্ধ থাকে! যাহা সহজ, সুন্দর, তাহাকে বিকৃত না করিয়া থাকিতে পারে না! স্ত্রী-পুরুষের মেলা-মেশার মধ্যে ইহারা এক-ভিন্ন দ্বিতীয় রূপ কল্পনা করিতে জানে না!

মনের উত্তাপ মনে চাপিয়া হাসিয়া আমি বলিলাম, “ভালোবাসা করতেই কি লোকের কাছে লোক আসে ঠান্‌দি! বিয়ে-ভালোবাসা ছাড়া কি কারোর সঙ্গে কারু কথা থাকতে পারে না? যাঁকে আমি প্রথম দেখলাম, ক'ঘণ্টার জন্য আলাপ হলো, তাঁর সঙ্গে বেশী দূর গড়ানো যে বললে, তার মানে কি?”

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, ঠোঁট উল্‌টাইয়া ঠান্‌দি খর্‌-খর্‌ করিয়া উঠিলেন, “মেয়ের কথা শুনে বাঁচি নে! মা গো, কোথায় যাবো? তুই বাছা থাকিস্‌ ভিজে-বেড়াল সেজে, তলে-তলে বাক্যি শিখেছিস্‌ তো বেশ! হলোই বা নতুন দেখা, কইলিই বা গুণে-গেঁথে কথা, মন থাকলে এর বেশী সময় লাগে না। এতেই এত মাখামাখি, হাত-ধরাধরি! সময় পেলে না জানি কি করতিস্‌!”

রাগে, ঘৃণায় মরিয়া হইয়া আমি বলিলাম, “কি আর করতাম? অমন গুণের দাদাকে কাছে পেলে অনেক বিদ্যা শিখে নিতাম। বড় হয়েছি বলে কি সম্পর্কে যিনি ভাই হন, তাঁর হাত-ধরা অন্যায় ঠান্‌দি? তোমরা কি তোমাদের দাদার সঙ্গে কথা বলোনি? হাত ধরোনি? দাদা কি জানতাম না, চন্দ্রদাকে পেয়ে আমার সে অভাব পূর্ণ হয়েছে।”

আমার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে পিসিমা বিবর্ণ হইলেন। তাঁহার আশার ক্ষীণ প্রদীপটি নিবিয়া গেল!

নীরস স্বরে ঠান্‌দি কহিলেন, “কি জানি বাছা, তোমাদের একেলে খিরিষ্টানি ঢংয়ের দাদা-দিদি আমরা বুঝি নে। যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই, সেখানে সম্পর্ক পাতাতে গেলে লোকের সন্দ হয়। আমরা সেকেলে মনিষ্যি, একালের ধরণ-ধারণ জানি না।”

মনে মনে উত্তর দিলাম, সম্পর্ক না পাতাইতে

জানিলে আমি নাত্‌নী হইলাম কোন সুবাদে ? আমাকে লইয়া এত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণেরই বা প্রয়োজন কিসের ?

মনে যাহাই হোক্, কথা আর বাড়াইতে সাহস হইল না। এমনি যেটুকু বলিয়াছিলাম, তাহা না বলিলেই বোধ হয় ভালো হইত !

নারী-প্রকৃতি আসলে এক ! শিক্ষায়, সংস্কারে উন্নত হইলেও হৃদয়ের প্রসার সঙ্কীর্ণ। তাহাতে অতুলনীয় মহত্ত্ব থাকিলেও উদারতার একান্ত অভাব। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে মেয়েরা সরল মীমাংসা করিতে জানে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও উদার মনে বিশেষ প্রভেদ নাই। শিক্ষাহীনা, নিরক্ষরা ঠান্‌দি স্থূল ভাষায় এই মুহূর্ত্তে যাহা প্রচার করিলেন, লেখাপড়া শিখিয়া আমরা সূক্ষ্ম, সুললিত বিশেষণে ইহারই যে অনুশীলন করি ! মিলির প্রতি কাজে প্রতি পদক্ষেপে আমার মনে সন্দেহ সজাগ হয় ! সে কিসের সন্দেহ ? মিলির স্বভাবের ? না, আমার অনুদার চিত্তের ?

এ পর্য্যন্ত একটি মেয়েকেই এ সন্দেহ, এ সংশয় হইতে মুক্ত দেখিয়াছি—সে মিলি। অন্যের বিষয় জানিবার কৌতূহল, অন্যের ছিদ্র অন্বেষণের স্পৃহা মিলির নাই ! তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশার মধ্যে দৃষ্টিকটু কোনো কিছু থাকিতে পারে, মিলি তাহা জানে না। তাহার তেজস্বী মনে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নাই, নিন্দা-কুৎসার আশঙ্কা নাই। কিন্তু মিলির মত আমার মন নির্বিকার, নিঃসংশয় নয় ! চন্দ্রদার সহিত মিশিবার সময় আমারই বিবেচনা করা উচিত ছিল। এখানকার পরিস্থিতি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, পারিপার্শ্বিক ভুলিয়া ছিলাম। মনে থাকিলে আপন-ভোলা চন্দ্রদার নির্ম্মল নামের সহিত আমার নাম যুক্ত করিবার সুযোগ দিতাম না।

৩১

নিঃশব্দে আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

আমার ঘরের পিছনে খানিকটা পড়ো জমিতে আগাছার ঝোপে-ঝাড়ে এক নিভৃত কুঞ্জ ছিল। আমি তাহারই মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিলাম। ঠান্‌দির কথার জ্বালায় রাগে ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া খাক্ হইতেছিল। লোকালয়ে থাকিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে বাবা আমার সন্ধানে আসিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাগানের কাজ হলো বাবা ?"

"হলো মা। গাছের সেবা তো আমার রোজ থাকবে, তুমি কিন্তু থাকবে না। গাছের গোড়া খোঁড়া-খুঁড়ি কম করে আজ তাই তোমার কাছে এলাম। বিন্দু বললে, জ্যেঠাইমার কথায় তুমি না কি খুব রাগ করেছ ! রাগ করেই কি জঙ্গলে এসে বসে আছো, রুরু ?"

"রাগ করে আসবো কেন বাবা ? ঠান্‌দির কথায় জবাব দিতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। সত্যি, এঁরা এমন কেন ? ভারী ময়লা মন, ডোবার পাঁকের মত।"

"ঠিক তা নয়, রুরু। মন ছাড়া সংস্কার বলে একটা জিনিষ আছে। সেইখানেই ওঁদের বাধে। সেকেলে মত অনুদার হলেও তাতে অশান্তি ছিল না। আধুনিক মতের দু'-চারটে যা নমুনা খবরের কাগজে বেরোয়, পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়।"

"যারা আসলে খারাপ, তাদের কথা ছেড়ে দাও। মন্দর দলে ভালোকে টান্‌লে আমার রাগ হয়। চন্দ্রদা'র মত ছেলে ক'জন আছে, বাবা ? তাঁর নাম নিয়ে সমালোচনা !"

সস্নেহে আমার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া সান্ত্বনার স্বরে বাবা বলিলেন, "বিন্দু আমায় সব বলেছে। জ্যেঠাইমা সমালোচনা করেননি, সম্ভাবনার প্রত্যাশায় বলেছেন। তাতে তোমার রাগ করে উঠে না এসে হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। নিজে ভালো হলে লোকের কথায় কিছু এসে-যায় না। লোকে ভুল করে, মিথ্যা বানিয়ে এক দিন বলে, দু' দিন বলে, তিন দিনের পরে আর সে বলতে পারে না। চন্দ্রকে এঁরা কতটুকু জানেন ? যে দিন ভালো করে জানবেন, সে দিন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। এতে কি মন-খারাপ করে ? তুমি যদি এখন 'মিশনে' যেতে চাও, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। আজ ছুটির দিন হয়ে ভালো হয়েছে মা, সারাটা দিন তোমার কাছে থাকবো। চলো, সিষ্টার ডরোথির সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি।"

আমি ঘাড় নাড়িলাম, "না বাবা, পাশ না করা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে আমি আর যাবো না। যদি পাশ করতে পারি, তখন গিয়ে দাঁড়াবো।"

"বেশ ভালো কথা মা, তাই যেয়ো। পাশ তুমি করবে, আর ভালো করেই করবে। চলো, বরং নদীর ধারটা ঘুরে আসি।"

বাবার সহিত অগ্রসর হইলাম।

বর্ষার প্রলয়-নর্ত্তনের পরে নটিনী তটিনী শ্রান্ত হইলেও এখনো সে নৃত্য-উচ্ছ্বাস থামাইতে পারে নাই। বায়ু-হিল্লোলে রহিয়া রহিয়া নৃত্যের মহলা দিতেছে।

নদীর তীর ঘেঁষিয়া আমরা পাদচারণা করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তে আমার উত্তপ্ত হৃদয়-মন জুড়াইয়া গেল।

ভাবিয়া দেখিলাম, কাহারও ইঙ্গিতে আমার রাগ অভিমান শোভা পায় না। কুমারীর অমলিন নির্ম্মলতার গৌরব আমি হারাইয়াছি। কেন হারাইলাম? অবাধ মেলা-মেশার ফলে? চন্দ্রচূড় না হোক, জ্যোতিভূষণ তো আমার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন! আমার নিষ্ঠা অবিচল থাকিলেও ইহা যে অন্যায়, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যাঁহার কথায় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, ছোট তিনি? না, আমি? পুরাকালের রক্ষণশীলতার বিচার করিলে ঠান্‌দিকে হীন ভাবিবার কারণ নাই। হীনতা এবং সাবধানতা এক নয়।

সহসা দূরে চোখ চাহিয়া দেখি, পথের বাঁকে কলসী কাঁখে ঠান্‌দি।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! একটু আগে যাঁহার উপর বিমুখ হইয়াছিলাম, তাঁহাকে পাইয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল। আগাইয়া গিয়া কহিলাম, "কি ঠান্‌দি, এত সকালে স্নান করতে চলেছো! এখন স্নান করে করবে কি?"

ঠান্‌দি হাসিলেন, বলিলেন, "শোনো মেয়ের কথা,—করবো কি? কাজের আবার আদি-অন্ত আছে? স্নান সেরে আগে পূজোর জোগাড়ে লাগতে হবে। সাজ আছে, নৈবিদ্যি আছে, শিব গড়া আছে। এদিক্ করে নিয়ে তার পর রান্নার পাট। রান্না-খাওয়া মেটাতে মেটাতে সেই যাকে বলে বেলা পড়ন্ত। বিন্দিকে বলে এসেছি, তুই দুপুরে আমার ওখানে খাবি নাত্‌নি। তখন তাই বলতেই তোর কাছে গিয়েছিলাম। ঠিক সময়ে যেতে ভুলে যাস্ নে দিদি!"

বাবা বলিলেন, "ভুলবে না, জ্যেঠাইমা। আজকের দিনটাই ও আছে, কাল এতক্ষণে বেরিয়ে যাবে। পূজোয় আসবে না, এবার আসবে সেই পরীক্ষার পরে।"

"ছাই পড়া! ছাই পরীক্ষে! মা-মরা একটা মেয়ে—তাকে সাধ করে এমন বনবাসে পাঠায়? বাছা আমার বাপের জন্য হেদিয়ে কাঁটা-সার হয়েছে। মা মঙ্গলচণ্ডী করুন, পাশ দিয়ে ঘরের বাছা ভালোয়-ভালোয় ঘরে আসুক!" বলিয়া ঠান্‌দি উদয়-সূর্য্যের পানে তাকাইয়া যুক্ত-করে প্রণাম করিলেন। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

মরমী

বিষয় বিভব যাক,—তা তুচ্ছ গণি—
ভাব-সম্পদে আমি যেন রই ধনী।
ভাব-দারিদ্র্য পরশে না যেন মোরে,
আর যা রত্ন লয় লয়ে যাক চোরে;
মোর যেন থাকে সেই সে পরশমণি।

শুকাক শরীর, মন যেন রহে তাজা,
নিতি নব নব ভাব-রাজ্যের রাজা।
আমি শ্রীবৎস, রাণী সে চিন্তা দেবী,
বনবাসে রই, সুরভি মাতাবে সেবি।
লক্ষ্মী অচলা—যত ক্লেশ দি'ক শনি।

ঘোর অনটন এনো মোর সংসারে।
পারণের লাগি দুর্ব্বাসা ডাকে দ্বারে।
সকাতরে ডাকি আমি সারা রাত ধরি'
কোথায় বিপদ-ভঞ্জন এসো হরি!
ওই শুনি বুঝি তাঁর নূপুরের ধ্বনি।

শুচিস্মিতা সে ভক্তি আমার ঘরে,
অসম্ভবকে নিতি সম্ভব করে।
মোর শাকান্ন তুচ্ছ নহে ত সে,
প্রসাদী হইয়া হয় অমৃত যে।
অনশনকে ত ব্রত-উপবাস গণি।

ভাবই আমার সন্তোষে ভরে বুক,
নিতি নিতি আনে দেবতার যৌতুক।
যতই থাকুক ঝঞ্ঝাট জঞ্জাল,
সঙ্গে আমার ঘুরিছে তাল-বেতাল।
অঙ্গনে মোর পদ্মরাগের খনি।

ভাবই বিভূতি তপস্যা যোগবল,
সেই সুধা, করে ধন্য সাগর-জল।
রাঙাতে বিশ্ব তারি শুধু আছে হাত,
ক্ষুদ্র তৃণেতে সে ফুটায় পারিজাত।
বাঁশ-বাঁশী করে তার মধু-গুঞ্জনই।

এক করে দেয় সে যে মেরে আঁখি-পাতে,
প্রতিমা পূজারী, জগৎ জগন্নাথে।
ডুবে যায় কোথা রবি-শশি গ্রহ-তারা,
তাহারি রূপেতে সব হয়ে যায় হারা,
প্রবাল যে পায় সাগর-আবেষ্টনী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন

প্রথম প্রস্তাব

নিরুদ্দেশ ও পুনরুদ্ধার-কাহিনী

শাসনখানি নবাবিষ্কৃতই বটে, তবে এই নবাবিষ্কারের পিছনে মস্ত একটা পুরাতন ইতিহাস আছে। উহা অনুধাবন করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই নবাবিষ্কার নব পুনরাবিষ্কার মাত্র।

সন্ন্যাসী কুমারের বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং দীর্ঘ-বিলম্বিত মোকদ্দমা ইত্যাদির জন্য ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণা এবং তাহার রাজ-পরিবার বাঙ্গালা দেশে অধুনা সুপরিচিত। ঢাকা জেলার উত্তরাংশ জুড়িয়া এই বিশাল পরগণা ময়মনসিংহ জেলার সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে এই পরগণা ভাবলীন নামে পরিচিত ছিল বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি তথাকথিত শিলালিপিতে (১) আছে :—

বংশবতী ব্রহ্মপুত প্রবিষ্টং।
দক্ষেণ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং॥

বংশবতী বা বংশাই নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রদেশের নাম ভাবলীন। কিন্তু এই সীমানার মধ্যে নদ-নদী মাত্র এই দুইটিই নহে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, এই টীলা ও কঙ্করময় রক্তমৃত্তিক ভাওয়াল প্রদেশ এবং ময়মনসিং জেলাস্থিত মধুপুরের জঙ্গল পলিমাটি-গঠিত বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনতম স্থল। এই সুপ্রাচীন ভূমি দ্বারা প্রতিহত হইয়াই লৌহিত্য নদের জলরাশি পর্য্যায়ক্রমে উহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। লৌহিত্যের পুনঃ পুনঃ গতি-পরিবর্ত্তনের পদাঙ্ক ভাওয়ালের বুকে, বিষ্ণুর বুকে ভৃগুপদ-চিহ্নের মত বিবিধ নদ-নদী-খাত-রূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান। উহাদের কোন কোনটা অদ্যাপি সচল, কোন কোনটা মজিয়া শুকাইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কালে বংশাই নদী হইতে দোলাই নদী বাহির হইয়া গিয়াছিল, উহাই বর্ত্তমানে বুড়ী গঙ্গা বলিয়া পরিচিত! কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উহার সহিত তুরাগ বা তুরগ নদী আসিয়া মিলিয়াছে। তুরাগ হইতে পাণ্ডব নদ বাহির হইয়া বর্ত্তমান ঢাকা সহরের উত্তরাংশ দিয়া বালু নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে। বালুর উর্দ্ধাংশ চিলাই নামে খ্যাত, ভাওয়ালের রাজধানী জয়দেবপুরের পার্শ্ববাহিনী। উহারই এক অংশ আবার বেলাই নামে বিখ্যাত। ভাওয়ালের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র হইতে শীতল লক্ষ্যা বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিছু পশ্চিমেই ত্রিমোহিনী নামক স্থানে উহার সহিত বানার বা বানহার নদ আসিয়া মিশিয়াছে। লক্ষ্যার নির্গমন-স্থানের কিছু পূর্ব্বে আড়ালিয়া নামক স্থান হইতে ভাওয়াল ভেদ করিয়া অতি প্রাচীন কালে ব্রহ্মপুত্র সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হইত এবং লাখপুর নামক স্থানে কন্যা লক্ষ্যার সহিত পুনরায় সঙ্গত হইয়া ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, সোনারগাঁ, বিক্রমপুর পরগণা ভেদ করিয়া প্রাচীন সোনারগাঁ সহরের বিপরীত দিকে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থ সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন বিক্রম-পুর সহরের নিকট ইচ্ছামতী-সঙ্গমে বারুণী ঘাট তীর্থের পথ দিয়া সোজা সাগরে চলিয়া যাইত। কোন্ অতীত কালে, জানিবার উপায় নাই, ব্রহ্মপুত্র আড়ালিয়া হইতে সোজা পূর্ব্ব দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং ভৈরব বাজারে যাইয়া মেঘনাদের সহিত সংযুক্ত হইল। ব্রহ্মপুত্র মেঘনাদের মিলিত প্রবাহ মেঘনা নাম ধারণ করিয়া সাগরে চলিয়া গেল, আড়ালিয়ার দক্ষিণস্থ ব্রহ্মপুত্রের বিশাল প্রবাহ ধীরে ধীরে মজিয়া আসিতে লাগিল। অথচ এই ঢাকা জেলাস্থিত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের দুই তীরে যে আর্য্য সভ্যতা, আর্য্য কর্ষণধারা জীবন্ত ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার নানা প্রমাণ অদ্যাপি বিদ্যমান। বংশবতী (বংশাই), তুরগ (তুরাগ), বানহার (বানার), দোলবতী (দোলাই), চেলবতী (চিলাই), বেলাবতী (বেলাই), শীতল লক্ষ্যা ইত্যাদি নাম যে কবি-হৃদয় বাগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ঋষিগণের প্রদত্ত, ইহা সম্ভবতঃ বিনা তর্কে কাহারও মানিয়া লইতে দ্বিধা হইবে না। অধুনা ঘন শালবন-পরিপূর্ণ এই দেশে এক সময় ঘন বসতি ছিল, প্রাক্-মুসলমান যুগের সেই প্রমাণেরও অভাব নাই।

এই ভাওয়ালের পূর্ব্ব প্রান্তে শীতল লক্ষ্যার পশ্চিম পারে কাপাসিয়া নামক একটি সুপরিচিত স্থান আছে।

---

(১) A note on the Math Inscription of Mahendra son of Harishchandra of Sabhar.—Dacca Review. Sept, Oct. 1920, pp, 111, ff by N. K. Bhattasali.

কাপাসিয়ার ৩ মাইল পশ্চিমে গড়খাই-ঘেরা একটি প্রাচীন রাজবাড়ীর চিহ্ন আছে। রাজবাড়ীর নাম হইতে গ্রামটিরও নাম রাজাবাড়ী। রাজাবাড়ী গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার অব্যবহিত দক্ষিণে মগ্‌গির দীঘি নামে পরিচিত একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। এই দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মগ্‌গির মঠ বলিয়া একটি মঠ। এই মঠ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দণ্ডায়মান ছিল। এই মঠের সংলগ্ন ভূমি চাষ করিতে এক জন কোঁচ রাইয়ত ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি আলোচ্য তাম্রশাসনখানি পায় এবং ভাওয়ালের তৎকালীন জমীদার রাজা লোক-নারায়ণ রায়ের হস্তে সমর্পণ করে। ঢাকার ম্যাজি-ষ্ট্রেট মিঃ ওয়ালটার্স ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লোকনারায়ণের পুত্র গোলোকনারায়ণের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন।

এই তীক্ষ্ণধী তীক্ষ্ণদৃষ্টি ম্যাজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঢাকার প্রান্তবর্ত্তী দোলাই খালের উপর ঝুলন্ত লোহার পুল নির্ম্মিত হয়। উহা ঢাকার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুলটি প্রায় এক শতাব্দ কাল ঢাকাবাসীর অসীম উপকার সাধন করিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল, উহার স্থানে লৌহস্তম্ভের উপরিস্থিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এ হেন উদ্যোগী ম্যাজিষ্ট্রেট তাম্রলেখাটির একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ছাড়িলেন না। সেই আমলে হিন্দু ও মুসলমান আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য এক এক জন কোর্ট-পণ্ডিত ও কোর্ট-মৌলবী থাকিত। ওয়ালটার্সের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন ভৈরব তর্কালঙ্কার। ওয়ালটার্স তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ধরিলেন। তর্কালঙ্কার মহাবিপদে পড়িলেন! প্রথম ছত্রের ওঁ নমো নারায়ণায় এবং গৌরীপ্রিয়া শব্দ দুইটি ছাড়া আর কিছুই তিনি পড়িতে পারিলেন না। কিন্তু ন্যায়পঠন-মার্জ্জিতবুদ্ধি—তর্কালঙ্কার হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তিনি যখন পড়িতে পারিতেছেন না, তখন অন্য কেহ পড়িতে পারিবে না, ওয়ালটার্সের তো কথাই নাই। তখন তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে অবিকৃত বদনে ভেজাল চালাইতে লাগিলেন! সাহেবকে তিনি বুঝাইলেন, ইহা জয়সেন (বিজয় সেনের নামের ঐটুকুই তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন) নামক রাজার দান-পত্র। তিনি কন্যা গৌরীপ্রিয়াকে এবং অন্যান্য অনেককে তাঁহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কাহার অংশে কত হাতী-ঘোড়া, জায়গা-জমি, মোহর ও টাকা পড়িল, তাহাও সূক্ষ্মরূপে পণ্ডিত মহাশয় নির্দ্দেশ করিতে ভুলিলেন না। সাহেব ভৈরব তর্কালঙ্কারের পাঠ ও ব্যাখ্যাসহ তাম্রলিপিখানি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী তখন বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর এইচ, এইচ, উইলসন। তিনি তর্কালঙ্কারের পাঠ ও ব্যাখ্যা পাইয়াই বুঝিলেন যে, উহা—"অত্যধিক এবং অনাবশ্যকরূপে বিকৃত" (Exceedingly and unnecessarily defective)। তিনি তিন জন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া নূতন পাঠ ও ব্যাখ্যা তৈয়ার করাইলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা এবং পাঠও তাঁহার প্রীতিপ্রদ ও মনঃপূত হইল না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ভবিষ্যতে শাসনখানি নিজে ভালরূপে পড়িতে চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক, উপস্থিত-মত তিনি তর্কালঙ্কারের পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সোসাইটীর পণ্ডিতগণের পাঠ যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া ৬ই মে, ১৮২৯, তারিখে সোসাইটীর এক মাসিক অধিবেশনে এই তাম্রলিপির এক বিবরণ পাঠ করেন। তাহাতে ভৈরব তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যা-সম্বলিত ওয়ালটার্স সাহেবের রিপোর্টও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ও সমা-লোচিত হইয়াছিল। এই সময় সোসাইটীর নিজের কোন্ মুখপত্র ছিল না। ফলে ডক্টর উইলসন-পঠিত বিবরণটি হস্ত-লিখিত অবস্থাতেই রহিয়া যায় এবং ক্রমে বিকৃত ও নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্নচর্চ্চার আদি যুগে জেনারেল কানিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ইত্যাদি অনেকেই সেন-রাজবংশের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের কেহই এই তাম্রশাসনখানির কথা অবগত ছিলেন না। পরবর্ত্তী লেখকদের তো কথাই নাই।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র ভদ্র নামক এক লেখক-প্রণীত ভাওয়ালের ইতিহাস নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমি দেখিতে পাই। উহা প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুঁথিখানিতে আমি প্রথম রাজাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির উল্লেখ দেখিতে পাই। উহা যে এসিয়াটিক সোসাইটীতে এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, এই পুস্তকে সেই কথারও উল্লেখ ছিল। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে এই শাসন-খানি বহু দিন পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, এবং কিরূপে উহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভদ্র মহাশয়ের পুস্তক পড়িবার পর হইতেই ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখানি কোথায় গেল, শাসনখানি কোন্ রাজার প্রদত্ত ছিল, তাহা জানিতে আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও কোন সন্ধান পাই নাই।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্নপ্রেমিক সদাশয় মিষ্টার রেঙ্কিন ঢাকা বিভাগের কমিশনার হইয়া আসেন। আমি ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলাম। কমিশনার সাহেব তখন ঢাকা মিউজিয়ম কমিটীর সভাপতি ছিলেন, তাই মিষ্টার রেঙ্কিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ঐতিহ্যে এমন আন্তরিক অনুরাগ আমি অল্পই দেখিয়াছি। এই মহাপ্রাণ ইংরেজের নিকট প্রত্নব্যাপারে যে সমাদর লাভ করিয়াছি, দেশী বিদেশী কাহারও নিকট আর তেমনটি পাই নাই—পাইলাম না। কুঠিতে যাইয়া দেখা করিয়া প্রত্ন-প্রসঙ্গ তুলিলে তিনি যেন মাতিয়া যাইতেন। দুই-তিন ঘণ্টা নানা আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক অবিশ্রাম চলিতে থাকিত। অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীরা দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেন। মিঃ রেঙ্কিনের লঞ্চে আমি সারা পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়াছি। সময় সময় মিঃ ষ্টেপল্‌টন্ আমাদের সঙ্গী হইতেন। রেঙ্কিনের এই প্রত্নপ্রেম ও প্রতিভার পরিচয় দুই-চারিটি প্রবন্ধে এবং তৎসম্পাদিত অমূল্য Dacca Diaries (J. A. S. B. 1920) নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঢাকাস্থ শাখার দৈনিক কার্য্য-বিবরণ-লিপিতে মাত্র বর্ত্তমানে প্রাপ্তব্য। তিনি বিস্তৃত ভাবে একখানি ঢাকার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমাংশ ছাপাখানায় পর্য্যন্ত গিয়াছিল, আমি একটি প্রুফও দেখিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে কয়েক দিন আলাপ-আলোচনার পরে পূর্ব্ব-লিখিত অংশ তিনি প্রকাশের অযোগ্য মনে করিলেন। ফলে ঢাকার ইতিহাস রচনা স্থগিত রহিল। অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে যাইয়া এই পুস্তক সম্পূর্ণ করিবেন, ইহা তাঁহার বাসনা ছিল। ভাওয়ালের মোকদ্দমায় হাইকোর্টে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া সন্ন্যাস রোগে এই মহাপ্রাণ জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী বিলাত হইতে তাঁহার সংগৃহীত অনেক মূল্যবান্ নক্সা, পুস্তক ও ছবি কোন চিঠিপত্র-বিনা আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন! আজ সাশ্রুনেত্রে এই মহানুভব ইংরেজের কথা স্মরণ করিয়া ভাবি, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে কত জিনিসই ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রীতিকামী দর্শনার্থিগণ তাঁহাকে প্রায়ই প্রাচীন মোহর নজর দিত। তিনি পাইবামাত্র তাহা ঢাকা মিউজিয়মে পাঠাইয়া দিতেন। এক মাড়োয়ারী এক দিন তাঁহাকে গৌরীনাথ সিংহের (আহোন) এক-খান মোহর নজর দেন। তিনি অমনি উহা ঢাকা মিউজিয়মে পাঠাইয়া দেন। আর এক বার কোটালিপাড়ে (ফরিদপুর) বেড়াইতে গিয়া তিনি কোটালিপাড়ে প্রাপ্ত চন্দ্রগুপ্তের (২য়) একখানি মোহর, গুপ্ত-পর-যুগের একখানি মোহর এবং কালো পাথরের একটি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি উপহার প্রাপ্ত হন। ঢাকায় ফিরিবামাত্র তিনি আমাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠান এবং মহা উল্লাসে ঐ সমস্ত আমার হস্তে সমর্পণ করেন! অকাল-পরলোকগত তীক্ষ্ণধী প্রত্নতাত্ত্বিক ৺গঙ্গামোহন লস্কর এই রেঙ্কিন সাহেবের নিকট অনেক সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিতেন। রেঙ্কিনেরই উৎসাহে তিনি ইদিলপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনখানি প্রাপকের বাড়ীতে যাইয়া পাঠ করিয়া আসিয়া রেঙ্কিন সাহেবকে উহার সংক্ষিপ্ত-সার প্রদান করিয়াছিলেন। লস্করের মৃত্যুর পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দের 'Dacca Review' পত্রিকায় রেঙ্কিন সাহেব সেই নোট প্রকাশিত করেন। রেঙ্কিনের প্রকাশিত এই নোটই অদ্যাপি বাঙ্গালার ঐতিহাসিকদিগের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।

ভাওয়ালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের কথা রেঙ্কিন সাহেবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এক দিন দেখা করিতে গেলে সাহেব বলিলেন, ভট্টশালী, আজ তোমাকে একটি নূতন জিনিষ দেখাইব। এই বলিয়া তিনি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত প্রাচীন এক খণ্ড পত্রিকা আমার হাতে দিলেন এবং পৃষ্ঠা নির্দ্দেশ করিলেন। পত্রিকাখানির নাম 'Asiatic Journal and Monthly Register Vol. XXVIII. July—December 1829.' ইহাতে "বিবিধ" (varieties) প্রসঙ্গে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮২৯এর ৬ই মের মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ উদ্ধৃত ছিল। এই অধিবেশনেই ডক্টর উইলসন কর্ত্তৃক ভাওয়ালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির বিবরণ পঠিত হয়। আমি এ রূপ অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে ভাওয়াল শাসনখানির সংবাদ পাইয়া আনন্দে অভিভূত হইলাম এবং রেঙ্কিন সাহেবকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে শাসনখানির মর্ম্ম উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল। ঐ বিবরণ এবং সেন-বংশের শাসনাবলীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে ভাওয়াল শাসনখানির স্বরূপ যেন বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়ার্টারলিতে "হারানো ভাওয়াল তাম্রশাসন" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলাম। উহাতে এই কয়টি তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম।

(১) শাসনখানি ছিল লক্ষ্মণসেন দেবের।

(২) ইহা তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে প্রদত্ত হয়

এবং ইহার মুসাবিদা লক্ষ্মণসেনের মাধাই নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অনুরূপ ছিল।

(৩) শাসনখানি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সপ্তবিংশ রাজ্য-সম্বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পরেও এই শাসনখানির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না। বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণ ইহার কোন তত্ত্বই লইলেন না। ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে বঙ্গের শাসনাবলী, তৃতীয় খণ্ড (Inscriptions of Bengal, Vol III) নাম দিয়া ইংরেজী ভাষায় সম্পাদন করিয়া চন্দ্র, বর্ম্ম ও সেনরাজগণের শাসনাবলী ও শিলালেখসমূহ প্রকাশিত করিলেন,—এই সুসম্পাদিত পুস্তকখানিতে ভাওয়াল শাসনের উল্লেখমাত্র নাই।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস-লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী ডক্টর রেওল্ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়ার্টারলিতে আবার ভাওয়াল-শাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, একটা কাঠের সিন্দুকে ২৪খানি তাম্রশাসন পড়িয়া আছে। উহাদের মধ্যে একখানি লক্ষ্মণসেনের সপ্তবিংশ রাজ্য-সম্বৎসরের। প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, ইহাই মৎবর্ণিত হারানো ভাওয়াল তাম্রশাসন। ডক্টর উইলসন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেন, তখন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিবামাত্র আমি কলিকাতায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলাম, শাসনখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পত্তি, বিলাতে পত্র লিখিয়া শাসনখানির প্রত্যর্পণ দাবী করা তাঁহাদের উচিত। দাবী করিবামাত্র এই দাবী স্বীকৃত হইল। কিন্তু তখন যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। শাসনখানি লণ্ডন হইতে কলিকাতায় আসে কি করিয়া? এই সঙ্কটে আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর সার হার্ব্বার্ট সঙ্কট-ত্রাণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে আসিবার সময় নিজের সঙ্গে শাসনখানি লইয়া আসিলেন। এইরূপে এই সুপ্রাচীন শাসনখানি পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়া প্রায় শতাব্দ-কালের নিরুদ্দেশের পরে আবার এসিয়াটিক সোসাইটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমান লেখককে তাঁহাদের পত্রিকার জন্য এই শাসনখানি সম্পাদিত করিতে আহ্বান করিয়া সম্মানিত করিলে চিত্রাদি-সমন্বিত এই বিষয়ক আমার বিস্তৃত প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় এই বৎসরের প্রথম প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক খোঁজ করিয়া পড়িতে পারেন। বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের জন্য ঐ প্রবন্ধের সার মর্ম্ম বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল।

শাসনখানির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বর্ণনা দ্বারা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি।

একখানি ১২″×১৩½″ তাম্রফলকের দুই পৃষ্ঠে শাসনখানি উৎকীর্ণ। ফলকের উপরিভাগে একটি মস্তকাকৃতি অংশ। তাহাতে সেনবংশের রাজকীয়-লাঞ্ছন দশভুজ সদাশিব-মূর্ত্তি বিরাজমান। মূর্ত্তিখানি লম্বায় ২½ ইঞ্চি মাত্র। সদাশিব মূর্ত্তিটি ক্ষয়িয়া গিয়াছে, কষ্টে হাতের অস্ত্রাদি চেনা যায়। লিপিটির দুই দিকেই অনেক স্থানে ক্ষয়িয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় পৃষ্ঠে। ঐ পৃষ্ঠে কোন কোন স্থান একেবারেই পড়া যায় না। প্রথম পৃষ্ঠে ত্রিশ ছত্র লেখা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৯ ছত্র লেখা আছে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ¼ ইঞ্চি মাত্র। স্পষ্ট থাকিলে লিপিটি পড়িতে কোনই কষ্ট হইত না। ইহার পদ্যাংশের ত্রয়োদশটি শ্লোকের পাঠ অবিকল লক্ষ্মণসেনের মাধাই নগরে (পাবনা জেলা) প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অনুরূপ। দুর্ভাগ্যক্রমে মাধাই নগর-শাসনও ক্ষয়িত ও অস্পষ্ট হইয়া পড়ায় অদ্যাবধি উহার পাঠ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই,—শেষ দিকের শ্লোকগুলির অনেকখানিই পড়া যায় নাই। ভাওয়াল-শাসন মিলাইয়া এখন সেই শ্লোকগুলির প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাও মাধাই নগর-শাসনের মতই ক্ষয়িত হওয়ায় প্রকৃত পাঠোদ্ধার বিষম আয়াস-সাধ্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাসনখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শাসনখানির আদিতেই স্বস্তিক চিহ্ন। দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালা ৭এর মত। উহা গণেশশুণ্ডের প্রতীক। প্রাচীন কালে উহাকে আঁজি বলিত। উহার অর্থ—সিদ্ধিরস্তু, সিদ্ধি হউক। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা Epigraphia Indiaতে প্রকাশিত (Vol xvii, p. 352 ff) আমার Some Image Inscriptions from East Bengal নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বস্তিক চিহ্নের পরে ওঁ নমো নারায়ণায় বলিয়া লিপি আরম্ভ।

১ম শ্লোকে পঞ্চানন দেবের মিলিত হরিহর ও উমা-লিঙ্গন মূর্ত্তি বর্ণিত।

দ্বিতীয় শ্লোকে সেনবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রদেব স্তুত।

তৃতীয় শ্লোকের বক্তব্য, চন্দ্রবংশে বহু বীর ও যাজ্ঞিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

চতুর্থ শ্লোকের বক্তব্য, এই বংশে পুরাণ-কীর্ত্তিত বীরসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়গণের শিরোভূষণস্বরূপ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুগণকে আজীবন সংহার করিয়া অবশেষে তিনি স্বর্গীয় নদীতে (গঙ্গাতে) নিজের তরবারি ধৌত করিয়াছিলেন।

পঞ্চম শ্লোকের বক্তব্য, সামন্তের পুত্র হেমন্ত।

ষষ্ঠ শ্লোকের বক্তব্য, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন। তিনি রাজ শব্দটি শুধু দ্বিজরাজ চন্দ্রমা হইতে চ্যুত করেন নাই, কারণ, তিনি বংশের আদিপুরুষ।

সপ্তম শ্লোকের বক্তব্য, বিজয়সেনের যশঃ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম শ্লোকের বক্তব্য, বিজয়ের পুত্র বল্লাল। তিনি শুধু রাজাধিরাজই ছিলেন না, পণ্ডিতগণেরও অগ্রগণ্য ছিলেন!

নবম শ্লোকের বক্তব্য, বল্লালসেন চালুক্য-রাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দশম শ্লোকের বক্তব্য, বাসুদেব ও দেবকী হইতে যেমন কৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন, বল্লালসেন ও রামদেবী হইতেও তেমনি নারায়ণস্বরূপ লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একাদশ শ্লোকের বক্তব্য, দৃপ্ত গৌড়েশ্বরের স্ত্রী হরণ করিয়া ইনি কৌমারকেলি করিয়াছিলেন; যৌবনে কলিঙ্গ-রাজ সর্ব্বদা সস্ত্রীক ইঁহার সন্তোষবিধান করিতেন। কাশীরাজকে ইনি সমরে জয় করিয়াছিলেন, ইঁহার অসি-ধারার ভয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্র আসিয়া ইঁহার শরণ লইয়াছিলেন।

দ্বাদশ শ্লোকের বক্তব্য, দিক্‌পতিগণ পর্য্যন্ত ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শ্লোকের বক্তব্য, আরামদ্রুমদলের শোভা দ্বারা যেখানে নদীগুলি অর্দ্ধ-গঙ্গায় পরিণত, যে ভূমিতে শস্ত-শিহরণে রাজার জয় বিঘোষিত, যথায় রাজাগণ প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেন না, সেখানে রাজা ঝটিতি বহু গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে শাসনস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

২৫-২৮ ছত্র। সেই রাজা লক্ষ্মণসেন বল্লালসেনের পাদানুধ্যান করিয়া ধার্য্য গ্রাম রাজধানী হইতে নিজ কর্ম্ম-চারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

[লক্ষ্মণসেনের প্রতি নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে :—

১। তিনি নিজ ভুজদ্বয়রূপ মন্দর দ্বারা দ্রুতবেগে বিষম সমর-সাগর সংমথিত করিয়া গৌড়লক্ষ্মীকে অর্জ্জন করিয়াছেন।

২। তিনি বীররূপ পদ্মসমূহের বিকাশের ভাস্কর সদৃশ ছিলেন।

৩। তিনি বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের উপাসক ছিলেন।]

২৮-৩০ ছত্র এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠের ১-৩ ছত্র। যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে সম্বোধন করা হইল, তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

৪-১৪ ছত্র। প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা। উহা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, বাগুন আবৃত্তি এবং বসুশ্রী চতুরকের অন্তর্গত, মাদিসাহংস এবং বসুমণ্ডন নামক গ্রামের অংশ এবং বানহার (বর্ত্তমান বানার) নদের দক্ষিণে স্থিত আরও চারিটি খণ্ডক্ষেত্র। ২২ হাত নলের মাপে সমস্ত জমি ৬ পাটক, এক দ্রোণ, ২৮ কাকিনী। বাৎসরিক ইহার আয় ছিল চারি শত কপর্দ্দক পুরাণ।

ছত্র ১৫-২০। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের নাম-পরিচয়। তাঁহার নাম পদ্মনাভ। পিতা মহাদেব। পিতামহ জয়দেব। প্রপিতামহ কৃষ্ণদেব। গোত্র মৌদ্গাল্য। পঞ্চপ্রবর, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবান্। সামবেদ। ব্যবসায়ে পাঠক।

নারায়ণ ভট্টারকের প্রীতি, এবং মহাদেবী শৃয়াদেবী ও কল্যাণদেবীর ভুতিপৌষ্টি কামনা করিয়া শাসনখানি প্রদত্ত।

২০-২৭ ছত্র। শাসনখানি নষ্ট না করিয়া রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্য রাজাগণের প্রতি অনুরোধ। নষ্ট করিলে যে দুর্গতি হইবে, তাহার বর্ণনা।

২৮ ছত্র। মহাসান্ধিবিগ্রহিক "মহীশতমুখ্য" শঙ্করধর এই শাসনের দূতক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৯ ছত্র। নিবন্ধন বা রেজিষ্ট্রেশনের সাঙ্কেতিক বাক্য সকল। তারিখ ২৭ রাজ্য-সম্বৎসর, ৬ই কার্ত্তিক।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এম-এ, পি-এইচ-ডি)।

ব্যাকরণমহাভাষ্য (পতঞ্জলি-বিরচিত)

(পস্পশাহ্নিক—ব্যাখ্যা ও অনুবাদ)

১০

মূল।—'সক্তুমিব'।

> সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
> যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
> অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে
> ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাঽধি বাচি ॥
>
> —ঋগ্বেদসংহিতা ৮।২।২৩।২

'সক্তুঃ' সচতের্দুর্ধাবো ভবতি, কসতের্বা বিপরীতাদ্বিকসিতো ভবতি। 'তিতউ' পরিপবনং ভবতি—ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা 'ধীরা' ধ্যানবন্তঃ। 'মনসা' প্রজ্ঞানেন। 'বাচমক্রত' বাচমকৃষত। 'অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে' অত্র সখায়ঃ সন্তঃ সখ্যানি জানতে। ক? য এষ দুর্গো মার্গ একগম্যো বাগ্বিষয়ঃ। কে পুনস্তে? বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ? 'ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাঽধি বাচি' এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি। লক্ষ্মীর্লক্ষণাদ্ ভাসনাৎ পরিবৃঢা ভবতি।—'সক্তুমিব'।

অনুবাদ।—'সক্তুমিব' (এই 'প্রতীকে'র দ্বারা সূচিত প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে ;—)

'সচ্' ধাতু হইতে (নিষ্পন্ন) 'সক্তু' (শব্দের অর্থ) দুর্ধাব (দুঃশোধ—যাহাকে পরিষ্কৃত করা অতি কষ্ট-সাধ্য) হয়। বিপরীত কস্ ধাতু হইতে (নিষ্পন্ন) (অর্থাৎ 'কস্'ধাতুর 'ক'কার ও 'স'কারের বৈপরীত্যে নিষ্পন্ন) (সক্তু শব্দের অর্থ) বিকসিত (যাহা ফুলিয়া উঠে) হয়। 'তিতউ' শব্দের অর্থ) পরিপবন হয়। (এই) তিতউ ততবৎ (বিস্তার-বিশিষ্ট) অথবা (এই তিতউ) তুন্নবৎ (বহুচ্ছিদ্র-বিশিষ্ট)। 'ধীরগণ'—ধ্যান-যুক্ত (ব্যক্তিগণ)। মনের দ্বারা (মনের কার্য্য) প্রজ্ঞার দ্বারা। 'বাক্‌কে করিয়া থাকেন'—অশুদ্ধ শব্দ হইতে (শুদ্ধ শব্দকে) পৃথক্ করিয়া থাকেন।' এখানে সখা হইয়া সখ্যকে প্রাপ্ত হয়—এখানে (অর্থাৎ এই শব্দে) সম-দৃষ্টি লাভ করিয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কোথায় (অর্থাৎ কাহার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়)? যে এই দুর্গম মার্গ (অর্থাৎ কঠিন উপায়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য) একের (অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানের) দ্বারা প্রাপ্তি-যোগ্য 'বাকে'র বিষয় (অর্থাৎ শ্রুতিরূপ 'বাকে'র বিষয়)। তাহারা কে (যাহারা এই একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহারা কে)? বৈয়াকরণগণ। কি কারণে ইহা (হয়,—বৈয়াকরণগণ কেন ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-লাভ করেন)? ভদ্রা ইঁহাদের লক্ষ্মী নিহিতা (আছে) অধিক (১) বাকে'—ইঁহাদের 'বাকে' ভদ্রা (কল্যাণময়ী) লক্ষ্মী নিহিতা আছে। লক্ষ্মী লক্ষণের দ্বারা (অর্থাৎ প্রকাশনের দ্বারা (অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিতে) সমর্থ হয়।

এই মন্ত্রের ভাবার্থ।—যেরূপ চালনীর দ্বারা তুষ হইতে পৃথক্ করিয়া সক্তুকে গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ শব্দশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপশব্দ (অশুদ্ধ অপভ্রংশ শব্দ) হইতে 'বাক্'কে পৃথগ ভাবে জানিতে পারেন। ব্যাকরণশাস্ত্রের দ্বারা 'বাক্তত্ত্বে'র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করায় তাঁহারা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি-যোগ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব,—যাহা 'বাক্যে'র যথার্থ স্বরূপ—তাঁহাকে অবগত হইয়া সকল বস্তুর স্বরূপকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র সম-দৃষ্টিলাভ করেন এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যেহেতু,

---

১। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত এই মন্ত্রে যে 'অধি' শব্দ আছে, নাগেশভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে তাহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'অধিক'; তদনুসারে এখানে 'অধি' শব্দের 'অধিক' এই অর্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করা হইল। মহাভাষ্যে এই মন্ত্রের অন্তিম পাদের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়,—মহাভাষ্যকার এই 'অধি' শব্দের এরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তিনি 'অধি' শব্দের 'অধিকরণ' রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অধি' শব্দের 'অধিক' এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু 'অধি' শব্দের 'অধিকরণ' এই অর্থও অপ্রসিদ্ধ নহে। 'অধিহরি' এই অব্যয়ীভাব-সমাসবদ্ধ পদে 'অধি' শব্দটি 'অধিকরণ' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর অব্যয়ীভাবসমাসপ্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে।—এই মন্ত্রের অন্তিম পাদে 'বাচি' এইটি সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত পদ; এস্থলে এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই 'অধিকরণ' রূপ অর্থ প্রকাশিত হইতেছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'অধিকরণ' অর্থ গ্রহণ করিলে এই 'অধি' শব্দটির কোন সার্থকতা থাকিতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সার্থকতা না থাকিলেও বেদে এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই; উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" (১।৩।২) এই সূত্রের মহাভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে একটি বৈদিক বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, অভ্র আঁ অটিতঃ"। এই স্থলে 'আঁ' শব্দটি 'আঙ্' এই অব্যয়ের একটি বৈদিক রূপ (দ্রষ্টব্য ৬।১।১২৬)। এখানে 'অভ্রে' এই সপ্তম্যন্ত পদের সহিত প্রযুক্ত হইয়াও 'আঙ্' সপ্তমী বিভক্তির অর্থ অধিকরণের দ্যোতনা করিতেছে, ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্বর-বৈদিকপ্রকরণের সুবোধিনী টীকাতে এবং পদমঞ্জরীতে (৬।১।১২৬ উল্লিখিত আছে। এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্যে (ঋগ্বেদসংহিতা ৮।২।২৩।২) এই 'অধি' শব্দ অধিকরণ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই মন্ত্রে 'বাচি' এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই অধিকরণ অর্থ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অধিকরণ অর্থের দ্যোতক 'অধি' শব্দের কোন আবশ্যকতা নাই, ইহা সূচিত করিবার উদ্দেশেই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় 'অধি' শব্দ কিংবা তাহার কোন প্রতিশব্দের উল্লেখ করা হয় নাই।

এই বৈয়াকরণগণের অনুশীলনের বিষয়ীভূত এই 'বাক্তত্ত্বে' সর্ব্ব-প্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ সংবিৎ সন্নিহিত আছে।

মন্তব্য।—এই মন্ত্রে 'অকৃত' ও 'অত্রা' এই দুইটি বৈদিক প্রয়োগ আছে। 'অকৃত' এই প্রয়োগটি কৃ-ধাতুর লুঙ্ লকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে (২); লৌকিক সংস্কৃতে এই স্থলে 'অকৃষত' এইরূপ প্রয়োগ হয়। 'অত্রা' এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে লৌকিক সংস্কৃতে 'অত্র' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে; 'অত্র' এই প্রয়োগ 'এতদ্' শব্দের উত্তর 'ত্রল্' প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; এই 'অত্র' শব্দের 'ত্র'র অকারের দীর্ঘ (৩) হইয়া 'অত্রা' এই বৈদিক প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে 'তিতউ' শব্দ 'অমরকোষে' পুংলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও ভাষ্যে নপুংসকলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এই শব্দ নপুংসকলিঙ্গও বটে।

ব্যাখ্যা।—এই মন্ত্রে যে 'সক্তু' শব্দ আছে, ভাষ্যকার তাহার দুইটি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমে 'সচ্' (ষচ্) ধাতু (৪) হইতে 'সক্তু' (৫) শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। সচ্ (ষচ) ধাতুর অর্থ সমবায়। এখানে সমবায় শব্দের অর্থ কোন বস্তুর সহিত মিলিত হওয়া; সক্তু তাহার তুষের সহিত মিলিত থাকে; এই তুষ হইতে সক্তুকে পৃথক্ করা প্রয়াসসাধ্য; তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, সচ্ ধাতু হইতে যে সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ—'দুর্ধাব' অর্থাৎ দুঃশোধ,—যাহাকে শুদ্ধ করিতে বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়, তাহাই সক্তু (ছাতু)। কস্ ধাতু হইতে সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন। এই কস্ ধাতুর গতি অর্থ—ইহা পাণিনীর ধাতুপাঠে আছে। ধাতুসমূহ অনেকার্থক (৬); এই জন্য এই কস্ ধাতুর 'বিকাস' (প্রস্ফুটিত হওয়া, এখানে ফুলিয়া উঠা) অর্থও অনুচিত নহে। বিকাস অর্থে বর্ত্তমান এই 'কস্' ধাতুর উত্তর "উণাদয়ো বহুলম্" (৩৩১) এই সূত্র অনুসারে 'তুন্' প্রত্যয় হইয়া ইহার অন্তর্গত ককার ও সকারের পরস্পর বৈপরীত্য ঘটিয়া (৭) 'সক্তু' পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে 'সক্তু' শব্দের অর্থ হয়—যাহা বিকসিত হয় ("বিকসিতো ভবতি")—যাহা ফুলিয়া উঠে। 'তিতউ' শব্দের অর্থ পরিপবন (চালনী); ভাষ্যকার এই শব্দটিকে 'তন্' ধাতু অথবা 'তুদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন (৮)। 'তন্' ধাতু হইতে 'তিতউ' শব্দ সিদ্ধ করিলে তাহার অর্থ হয়, বিস্তারযুক্ত ('ততবৎ'); 'তুদ্' ধাতু হইতে যদি 'তিতউ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থ হইবে ছিদ্রযুক্ত ('তুন্নবৎ'); 'চালনী' বিস্তারযুক্ত ও ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় এই দুইটি অর্থেই এখানে সঙ্গতি আছে। মহাভাষ্যকার 'ধীর' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ধ্যান-যুক্ত (ধ্যানবন্তঃ); ভাষ্যকার 'ধ্যৈ' (ধ্যৈ চিন্তায়াম) ধাতু হইতে 'ধীর' শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু উণাদিসূত্রে (২।২৪) 'ধা' ধাতু হইতে 'ধীর' শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। মনঃ শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞান' করা হইয়াছে, এখানে 'মনঃ' শব্দের মনোব্যাপারে লক্ষণা করা হইয়াছে। 'লক্ষ্মী' শব্দ 'লক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; যাহার লক্ষণ—ভাসন অর্থাৎ প্রকাশ আছে, তাহাই লক্ষ্মী; এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া, এখানে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকেই 'লক্ষ্মী' শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার সূচিত করিয়াছেন। কৈয়ট প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ মহাভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন।

এই মন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়,—যেরূপ চালনীর দ্বারা তুষের নিষ্কাসন করিয়া সক্তুর সারভাগের গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্যে অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) হইতে শুদ্ধ শব্দকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। এই বৈয়াকরণগণ শব্দের সূক্ষ্ম বিচার করিতে করিতে ইহার মূল তত্ত্ব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি প্রাপ্ত হ'ন, এবং অবশেষে ব্রহ্মে লীন হইয়া যান (৯)।

এই মন্ত্রটি নিরুক্তের চতুর্থ অধ্যায়ে দশম খণ্ডে 'তিতউ' শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শনের উদ্দেশে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই প্রসঙ্গে যাস্ক সংক্ষেপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন (১০)। সে স্থলে 'তিতউ'

২। 'মন্ত্রে ঘসহ্বরণশবৃদহাদ্বৃচ্কৃগমিজনিভ্যো লেঃ' (২।৪।৮০) এইটি এইখানে বিশেষ সূত্র। এই সূত্র অনুসারে লুঙ্লকারে বিহিত 'চ্লি' প্রত্যয়ের লুক্ হইয়া 'অকৃত' এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। লৌকিক সংস্কৃতে এখানে 'চ্লি' প্রত্যয়ের লুক্ হয় না; এই জন্য লৌকিক সংস্কৃতে 'অকৃত' এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে 'অকৃষত' এইরূপ প্রয়োগ হয়।

৩। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাম্ (৬।৩।১৩৩) এই বৈদিক সূত্র অনুসারে 'অত্র' এই পদের অন্তর্গত 'ত্র'র দীর্ঘ হইয়া 'অত্রা' এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। লৌকিক সংস্কৃতে দীর্ঘ-বিধায়ক এই সূত্রের প্রবৃত্তি হয় না; সুতরাং 'অত্র' এইরূপ প্রয়োগ হয়।

৪। 'সচ্' ধাতু ধাতুপাঠে 'ষচ্' এইরূপ মূর্দ্ধন্যষকারাদি পঠিত আছে। "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" (৬।১।৬৪) এই সূত্র অনুসারে 'ষ'র স্থানে 'স' হয়। 'ষচ সমবায়ে' এই উভয়পদী ধাতু বহুসম্মত হইলেও সর্ব্বসম্মত নহে (দ্রষ্টব্য,—মাধবীয়ধাতুবৃত্তি ভ্বাদি ১৭৭)। যাঁহাদের মতে এই উভয়পদী ধাতু নাই, তাঁহাদের মতে ষচ্ সেবনে' এই ধাতুই সমবায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক একটি ধাতু অনেকার্থ হওয়ায় এরূপ প্রয়োগ দোষাবহ নহে।

উজ্জ্বলদত্ত প্রণীত উণাদিবৃত্তিতে (১।৭০) সেচনার্থক ষচ (সচ্) ধাতু হইতেই 'সক্তু' এই শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে; "সচ্যতে স্নেহেন সিচ্যতে ইতি সক্তুর্যববিকারঃ।"

৫। ষচ্ (সচ্)+তুন্=সক্তু। সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ক্রুশিভ্যস্তুন্।—উণাদিসূত্র ১ম অধ্যায়। এখানে এই 'তুন্' প্রত্যয়ের 'ন্' ইৎসংজ্ঞক; সুতরাং ইহার লোপ হয়। প্রত্যয়ের নকারের ইৎসজ্ঞার ফলে এই নিৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আদি স্বর উদাত্ত হয় (ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্ ৬।১।১৯৭)। এখানে 'সক্তু' শব্দের আদি অকার উদাত্ত।

৬। দ্রষ্টব্য—মাধবীয়ধাতুবৃত্তি—ভূধাতু।

৭। পৃষোদরাদিত্বাদ্ বর্ণব্যত্যয়ঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

৮। উণাদিসূত্রে এই 'তিতউ' শব্দটিকে বিস্তারার্থক তন্ধাতু হইতেই সিদ্ধ করা হইয়াছে;—তনোতের্ডউঃ সন্বচ্চ (উণাদি ৫ অঃ, ৫৪০)।

৯। প্রথমে মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাকরণ-সিদ্ধান্তসুধানিধিতে এই প্রকার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০। সক্তুমিব পরিপবনেন পুনন্তঃ। সক্তুঃ সচতের্দুর্ধাবো ভবতি কসতের্বা স্যাদ্ বিপরীতস্য বিকসিতো ভবতি। যত্র ধীরা মনসা বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্। ধীরাঃ প্রজ্ঞানবন্তো ধ্যানবন্তঃ। তত্র

শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভাষ্যকার তাহার অনুসরণ করিলেও সর্ব্বাংশে অনুসরণ করেন নাই; যাস্ক লিখিয়াছেন, "তিতউ পরিপবনং ভবতি ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা তিলমাত্রতুন্নমিতি বা"। ইহার মধ্যে মহাভাষ্যকার "ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা" এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, শেষের অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৈয়ট 'ততবদ্' এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিস্তারযুক্তম্"—যাহার বিস্তার আছে। তন্ ধাতুর বিস্তার অর্থ হওয়ায় কৈয়টের এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত হয় নাই। নিরুক্তের টীকাকার 'তত' শব্দের চর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ততেন চর্ম্মণা নদ্ধম্"—'তত' অর্থাৎ চর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ (১১)। "তিলমাত্রতুন্নম্" এই অংশের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—যাহাতে তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে—"তিলমাত্রাণি তুন্নানি বা তস্মিন্নিতি তিতউ"। যাস্ক সক্তু শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মহাভাষ্যকার তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রটিকে বৈয়াকরণগণের প্রশংসা প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাস্কের ব্যাখ্যা (১২) এখানে একটু বিভিন্ন পথে গিয়াছে। দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে যাস্কের ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এইরূপ,—যেরূপ সক্তুকে চালনীর দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়, সেইরূপ যে যজ্ঞে বা সমাজে জ্ঞানী অর্থাৎ বিচারশীল মনীষিগণ মনের সাহায্যে 'বাক্'কে পরিষ্কৃত করিয়া প্রয়োগ করেন, সেই যজ্ঞে বা সমাজে একই শাস্ত্রে কৃতশ্রম এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরস্পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ জানিতে পারেন। তাহার কারণ, এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বাক্যে প্রশংসনীয় লক্ষ্মী (বিজ্ঞান) নিহিত আছে।

এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান উন্নত হওয়ায় সেই জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা অপরের জ্ঞানের উৎকর্ষ বুঝিতে পারেন, যাহাদের জ্ঞান উন্নত নহে, তাহারা পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না—ইহাই এখানে পর্য্যবসিত অভিপ্রায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটি বেদমন্ত্রের অনেকপ্রকার ব্যাখ্যা ভারতীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের অসম্মত নহে। বেদের 'সর্ব্বানুক্রমসূত্রে'র ভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলে, উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ অনুসারে অন্য প্রকার অর্থ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু পরম প্রামাণিক মহাভাষ্যকার যে অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অর্থে যে এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য্য নাই, ইহা অতি সাহসিক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না (১৩)।

মূল।—'সারস্বতীম্'

বার্ত্তিক: পঠন্তি—'আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদ্' ইতি। প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।' 'সারস্বতীম্'।

অনুবাদ।—'সারস্বতীম্' (এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের সূচনা করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে)।

যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, 'আহিতাগ্নি অপশব্দের প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তের অনুকূল 'সারস্বতী ইষ্টি'র অনুষ্ঠান করিবে।' আমরা প্রায়শ্চিত্তীয় (প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য) না হই, এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা।—যিনি শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্নির আধান করেন, তাঁহাকে 'আহিতাগ্নি' বলা হয়। এই 'আহিতাগ্নি' ব্যক্তি যদি অশুদ্ধ (অপভ্রংশ) শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তিনি পাপভাগী হ'ন। সেই পাপের নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তরূপে 'সারস্বতী' ইষ্টির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটি 'প্রায়' 'চিত্ত' এই দুইটি শব্দের সম্মেলনে সিদ্ধ হয় (১৪)। এই 'প্রায়' শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ প্রপূর্ব্বক 'ইণ' ধাতুর উত্তর 'ঘ' প্রত্যয় (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ ৩।৩।১১৮) অথবা 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ ৩।৩।১৯) 'প্রায়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়; চিতী সংজ্ঞানে' এই ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'চিত্তি' শব্দ এবং 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা 'চিত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (১৫)। এইরূপে নিষ্পন্ন এই 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের ব্যাখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে করা হইয়াছে। তপঃ শব্দের অর্থ কৃচ্ছ্র-সাধ্য ক্রিয়া, এই কৃচ্ছ্র-সাধ্য ক্রিয়ার নিশ্চয় (স্থির সঙ্কল্প) পূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত; এই ব্যাখ্যার অনুকূল একটি স্মৃতিবাক্য এই প্রসঙ্গে পদমঞ্জরীতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযোগাৎ প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥"

—'প্রায়' শব্দের অর্থ তপঃ; 'চিত্ত' শব্দের অর্থ নিশ্চয়; যে ব্যাপারে এই 'তপঃ' এর নিশ্চয়ের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ প্রথমে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠানের স্থির নিশ্চয় করিয়া যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা হয়।

ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁহার প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'প্রৌঢ়মনোরমা'

সখায়ঃ সখ্যানি সংজানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি ইতি।—নিরুক্ত ৪।১০

১১। ইহা হইতে বুঝা যায়, দুর্গাচার্য্যের সময়ে চালনীর বন্ধনগুলি চর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুর দ্বারা রচিত হইত।

১২। এখানে লক্ষ্য করিবার যোগ্য একটি বিষয় আছে। দুর্গাচার্য্য এই মন্ত্রের যাস্ক-কৃত ব্যাখ্যার যেরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যাস্কের ব্যাখ্যার প্রতি প্রণিধান করিলে, তাহার সেইরূপ অভিপ্রায় মনে হয় না। যাস্ক 'বাক্' শব্দের প্রতিশব্দ দিয়াছেন—প্রজ্ঞান (বাচমকুবত প্রজ্ঞানম্)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—যাস্ক 'বাক্' শব্দের বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ যে অর্থ শব্দ, সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

১৩। এতে চ মন্ত্রাঃ সর্ব্বানুক্রমভাষ্যেঽন্যত্র বিনিযুক্তা অপি ভাষ্যপ্রামাণ্যাদেতত্তাৎপর্য্যকা অপীতি বোধ্যম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

১৪। এই স্থলে অকারান্ত 'প্রায়' শব্দের পরে 'চিত্ত' শব্দ থাকায় 'প্রায়' শব্দের পরে 'সুটের' ('স্'র) আগম হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে 'সমাসাশ্রয়বিধি' নামক প্রকরণের শেষে একটি বচন পঠিত আছে, তাহাতে 'প্রায়' শব্দের পরে 'চিত্তি' এবং 'চিত্ত' শব্দ থাকিলে 'প্রায়' শব্দের পরে 'সুট্' আগম হয়, ইহা বলা হইয়াছে।—"প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ।" মহাভাষ্যে (৬।১।১৫৭) এইরূপ বাক্যের পরিবর্ত্তে অন্যরূপ বাক্য পঠিত আছে;—"প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ সুডস্কারো বা।" ইহার অর্থ এই, 'প্রায়' শব্দের পরে 'চিত্তি' অথবা 'চিত্ত' শব্দ থাকিলে 'প্রায়' শব্দের 'সুট্' আগম হয় অথবা 'প্রায়' শব্দের অন্ত্য অকারের স্থানে 'অস্' আদেশ হয় (দ্রষ্টব্য—মহাভাষ্যপ্রদীপ)।

১৫। চিতী সংজ্ঞানে ক্তিন নপুংসকে ভাবে ক্তঃ:—পদমঞ্জরী।

নামক স্বরচিত টীকাতে এই প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অন্যবিধ ব্যাখ্যার অনুকূল একটি স্মৃতিবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন ;—

"প্রায়: পাপং বিনির্দ্দিষ্টং চিত্তং তস্য বিশোধনম্ ।"

—'প্রায়' শব্দের অর্থ পাপ ; যে ক্রিয়ার দ্বারা পাপের ক্ষালন হয়, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত। উপরে উদ্ধৃত দুইটি বিভিন্ন স্মৃতিবাক্য হইতে 'প্রায়' শব্দের পরস্পর বিভিন্ন দুইটি অর্থ জানিতে পারা যাইতেছে—একটি অর্থ তপ: এবং অন্য অর্থ পাপ। উদ্ধৃত দুইটি বাক্যেরই প্রামাণ্য আছে, সুতরাং দুইটি অর্থই প্রামাণিক। (১৬)

প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যৌগিক অর্থ উপরে প্রদর্শিত হইল। প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি কেবল যৌগিক নহে— যোগরূঢ় ; এই জন্য প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারগণ এই শব্দের পর্য্যবসিত যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থই গ্রহণীয়,—কেবল মাত্র পাপক্ষয়ের উদ্দেশে শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত (১৭)। 'প্রায়শ্চিত্তি' শব্দটির অর্থও 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের অর্থের অনুরূপ।

উপরি উক্ত "আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ" এই বাক্যটি কোন 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের বাক্য। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি মহাভাষ্যকার অনেক স্থলে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের বাক্য উদ্ধৃত করিবার উপক্রমে "যাজ্ঞিকা: পঠন্তি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভাষ্যকারের এই রীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, এ স্থলে উদ্ধৃত এই বাক্যটিও একটি ব্রাহ্মণ বাক্য ; এই বাক্যটি যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই বাক্যে প্রথম প্রযুক্ত 'প্রায়শ্চিত্তীয়া' শব্দের অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের অর্থ পাপক্ষালন, ইহা কৈয়ট এবং নাগেশ ভট্টের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায় ; পাপক্ষালনের সাধন যে ইষ্টি, তাহাকেই এখানে প্রায়শ্চিত্তীয়া ইষ্টি (১৮) বলা হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী বাক্যে, ভাষ্যকার 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের অর্থ কর্ম্মবিশেষ, এইরূপ স্বীকার করিয়া 'প্রায়শ্চিত্তীয়' এই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন (১৯)।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে আহিতাগ্নি অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন—ইহা বলা হইয়াছে। পাপ জন্মিলে তাহার ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আহিতাগ্নির পক্ষে অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক ; কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে,—সকল অবস্থায় অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক নয় ; যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালেই অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ পাপজনক।

মহাভাষ্যকার পরে এই পাপশান্তিকেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা উপযুক্ত অবসরে এ বিষয় বিবৃত করিব।

যাহারা ব্যাকরণের অধ্যয়ন করে নাই, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ শব্দের পার্থক্য তাহাদের অবিদিত ; এই জন্য তাহাদের পক্ষে যে কোন অবস্থায় অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ অসম্ভাবিত নহে ; সুতরাং অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

মূল।—'দশম্যাং পুত্রস্য'

যাজ্ঞিকা: পঠন্তি 'দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্ত:স্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরিপ্রতিষ্ঠিতং তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমি'তি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। 'দশম্যাং পুত্রস্য'

অনুবাদ —'দশম্যাং পুত্রস্য' (এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত করা হইয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে)—

যাজ্ঞিকেরা পাঠ করেন — (পুত্র জন্মিবার) দশ দিন পরে (নব) জাত পুত্রের নাম করিবে (অর্থাৎ নাম রাখিবে) ; যে নামের আদিতে ঘোষবান (বর্ণ) হইবে, মধ্যে অন্তস্থা (২০) বর্ণ থাকিবে, (যে নাম) 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞক শব্দ হইবে না, (যিনি নামকরণ সংস্কারের অধিকারী পিতা, তাঁহার) তিন পুরুষের অভিধায়ক (শব্দের অনুরূপ) হইবে, অরি অর্থাৎ শত্রুতে যে নাম প্রতিষ্ঠিত নহে,—সেইরূপ নাম অতি প্রসিদ্ধ হয়, দুই অক্ষর অথবা চার অক্ষর কৃদন্ত নাম রাখিবে, তদ্ধিত (নাম) করিবে না।

ব্যাকরণ বিনা কৃৎ বা তদ্ধিত জানিতে পারা যায় না।

'দশম্যাং পুত্রস্য (এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইল)।

ব্যাখ্যা।—বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া আমাদের শাস্ত্রে 'সংস্কার' নামে প্রসিদ্ধ। এই সংস্কারসমূহের মধ্যে 'নামকরণ' সংস্কারও পরিগণিত আছে। এই 'নামকরণ' সংস্কারে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে নবজাত বালকের নাম রাখা হইয়া থাকে।

পুত্রজন্মের অশৌচের সমাপ্তি হইলে, একাদশ দিনে এই 'নামকরণ' সংস্কার হইয়া থাকে। 'নামকরণ' সংস্কারে পুত্রের যে নাম রাখা হয়, সেই নাম কিরূপ হইবে, তাহা উপরে উদ্ধৃত বাক্যে বলা হইয়াছে ; বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ এই সকল বর্ণ ঘোষবান্ ; এই বর্ণগুলির মধ্যে কোন বর্ণ নামের আদিতে থাকিবে ; নামের মধ্যবর্ত্তী বর্ণ অন্তস্থা বর্ণ হইবে। ব্যাকরণে আকার, ঐকার এবং ঔকারের 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা করা হইয়াছে (২১) ; যে শব্দের

১৬। প্রায়স্তেতি নির্দ্দেশাদকারান্তপুংলিঙ্গস্তপোবাচী প্রায়শব্দ:, "প্রায়ো নাম তপ: প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে" ইতি স্মৃতে: ; "প্রায়: পাপমি"তি স্মৃত্যন্তরাৎ পাপবাচ্যপি। লঘুশব্দেন্দুশেখর—সমাসাশ্রয়বিধি।

১৭। পাপক্ষয়মাত্রসাধনত্বেন বিধিবোধিতং কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তম্।—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যপ্রণীত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

১৮। প্রায়শ্চিত্তীয়ামি'ত ভবার্থে বৃদ্ধাচ্ছ:।—মহাভাষ্যপ্রদীপ। ভবার্থ ইতি। প্রায়শ্চিত্তসাধনত্বেন তত্ত্বত্বম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

১৯। প্রায়শ্চিত্তায় পাপশোধনায় শ্রুতিস্মৃতিবিহিতায় কর্ম্মণে হিতাস্তদ্বিমিত্তোৎপাদনা মা ভূমেত্যর্থ:।—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

২০। সাধারণভাবে য র ল ব কে 'অন্তস্থ' বর্ণ বলা হয় ; কিন্তু এই শব্দটি অকারান্ত নহে, এটি আকারান্ত শব্দ ;—"অন্তস্থাশব্দ আদন্ত:" —লঘুশব্দেন্দুশেখর—সংজ্ঞাপ্রকরণ।

ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণের নাম স্পর্শ বর্ণ ; শ ষ স হ এইগুলি উষ্ম বর্ণ ; বর্ণমালায় স্পর্শবর্ণ এবং উষ্ম বর্ণের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া য, র, ল ব-কে 'অন্তস্থা' বর্ণ বলা হয় ;—স্পর্শোষ্মণোর্মধ্যে তিষ্ঠন্তীতি তদর্থ:। —লঘুশব্দেন্দুশেখর—সংজ্ঞাপ্রকরণ।

২১। বৃদ্ধিরাদৈচ্ (১।১।১)।

আকার ঐকার ঔকারশ্চ আদেশানাদেশসাধারণ্যেন বৃদ্ধিসংজ্ঞ: স্যাৎ। —ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি।

আদিস্বর এই 'বৃদ্ধি'সংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ আকার, ঐকার অথবা ঔকার হয় তাহার নাম 'বৃদ্ধ' (২২); যেমন, 'রাম' শব্দটি 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞক। এইরূপ 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞক শব্দ নাম রাখিবে না। এখানে 'ত্রিপুরুষানূকম্' এই শব্দটির দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে,—যিনি 'নামকরণ' সংস্কারের কর্ত্তা (পিতা), তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষের যে নাম, সেই নামের অনুকৃতি অর্থাৎ সাদৃশ্য যে শব্দে আছে, সেইরূপ নাম রাখিবে। যদি পূর্ব্বপুরুষের নামের সহিত 'চন্দ্র' কি 'নাথ' শব্দ সংসৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে নবজাত কুমারের নামেও সেইরূপ শব্দ সংযোজিত করিতে হইবে; পূর্ব্বপুরুষের নাম অনুসারে কাহারও নাম 'হরচন্দ্র' হইবে, কাহারও নাম 'জীবনাথ' হইবে। 'অনরি প্রতিষ্ঠিতম্' এই অংশের দুইটি অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে,—(১) 'নৃ' শব্দের অর্থ নর—মনুষ্য; 'নৃ' শব্দের নঞ্-সমাসে 'অনৃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়; ইহার সপ্তমীর একবচনে 'অনরি' এইরূপ হয়; তাহা হইলে 'অনরি প্রতিষ্ঠিতম্' এই অংশের অর্থ মনুষ্যলোকে যাহা প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ দেবতার যে নাম, সেইরূপ নাম রাখিবে। (২) 'অরি' শব্দের অর্থ শত্রু। অরিতে যাহা প্রতিষ্ঠিত নয়—যে নাম শত্রুর নাম নয়—সেইরূপ নাম রাখিতে হইবে (২৩)।

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন, তাঁহার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার 'নাম-করণ' সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই 'নাম-করণ' সংস্কারে উপযুক্ত নাম নির্ব্বাচনে ব্যাকরণের অপেক্ষা আছে, তাহা উপরে প্রদর্শিত শাস্ত্রবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। অতএব গার্হস্থ্যব্যাপারের অন্তর্গত কর্ত্তব্যের যথাযথ সম্পাদনের অনুরোধেও ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত, ইহাই এখানে মহাভাষ্যকার এই শাস্ত্রবাক্যটি প্রদর্শনের দ্বারা সূচিত করিয়াছেন।

মূল।—'সুদেবোঽসি'

> সুদেবোঽসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
> অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব॥
> —ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৫।৭।২

'সুদেবোঽসি বরুণ সত্যদেবোঽসি। 'যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ।

'অনুক্ষরন্তি কাকুদম্' কাকুদং তালু। কাকুর্জিহ্বা সাঽস্মিন্নুদ্যত ইতি কাকুদম্।

'সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব' তদ্ যথা শোভনামূর্মিং সুষিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিশ্য দহত্যেবং তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়স্তাল্বনুক্ষরন্তি। তেনাঽসি সত্যদেবঃ। সত্যদেবাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

অনুবাদ।—'সুদেবোঽসি' এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের সূচনা করা হইয়াছে, তাহা বলা হইতেছে।

হে বরুণ, তুমি সুদেব হইয়াছ। যেহেতু সপ্ত সমুদ্র (তোমার) কাকুদকে (আশ্রয় করিয়া) প্রবাহিত হইতেছে। অগ্নি যেরূপ ছিদ্রবহুল শোভনা লৌহপ্রতিমাকে (মলহীন করে)।

'সুদেব হইয়াছ বরুণ'—সত্যদেব হইয়াছ। 'যেহেতু তোমার সপ্তসমুদ্র'—সপ্ত বিভক্তি। 'কাকুদকে (আশ্রয় করিয়া) প্রবাহিত হইতেছে'—কাকুদ তালু। কাকু—জিহ্বা, সেই (জিহ্বা) ইহাতে উৎক্ষিপ্ত হয়, এইজন্য (ইহা) কাকুদ। 'যেরূপ ছিদ্রবহুল শোভনা লৌহ প্রতিমাকে'—যেরূপ শোভনা সুষিরা (ছিদ্রবহুল) লৌহ প্রতিমাকে অগ্নি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে, এইরূপ তোমার সপ্ত সমুদ্র=সপ্ত বিভক্তি তালুকে (আশ্রয় করিয়া) প্রবাহিত হইতেছে। সেই জন্য তুমি সত্যদেব হইয়াছ।

আমরা সত্যদেব হইতে পারিব, এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

'সুদেবোঽসি' (এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের সূচনা করা হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইল)।

মন্তব্য।—'যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ'—এই স্থলে 'যস্য' এই ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চমীর স্থানে হইয়াছে। বেদে এইরূপ বিভক্তিব্যত্যয় আমরা ইহার পূর্ব্বেও একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি। এ বিষয়ে ব্যাকরণের প্রমাণও পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে,—যস্মাৎ এই অর্থে এখানে যস্য এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'সূর্ম্মীম্'—এইরূপ হইয়া থাকে; বৈদিক সংস্কৃতে 'সূর্ম্ম্যম্' এইরূপও হয় (২৪)। সূর্ম্মী শব্দের অর্থ লৌহপ্রতিমা, ইহা অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায় (২৫)। মহাভাষ্যকার এখানে 'সূর্ম্মী' শব্দের 'শোভনা ঊর্ম্মী' ('শোভনামূর্ম্মীম্') এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে 'সূর্ম্মী' শব্দের 'শোভনা অয়ঃ (লৌহ) প্রতিমা' (২৬) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়,—এখানে 'সু' শব্দের অর্থ শোভন এবং 'ঊর্ম্মী, শব্দের অর্থ লৌহপ্রতিমা—এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসারে 'ঊর্ম্মী' শব্দের অর্থ লৌহ-প্রতিমা—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 'সুষি' শব্দের অর্থ ছিদ্র। এই 'সুষি' শব্দের উত্তর ভূমা অর্থে (বাহুল্য অর্থে) মত্বর্থীয়-র প্রত্যয়ের (২৭) দ্বারা 'সুষির' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে এই 'সুষির' শব্দের অর্থ হইতেছে—বহুল ছিদ্রযুক্ত।

ব্যাখ্যা।—এই মন্ত্রটি বরুণের স্তুতি। বরুণের ব্যাকরণ-জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'সত্যদেব' বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। সাত বিভক্তির প্রত্যেক বিভক্তিতে অনন্ত শব্দরাশি সিদ্ধ হয়। এই জন্য এই মন্ত্রে সপ্ত বিভক্তিকে সপ্ত সমুদ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের

২২। বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্ বৃদ্ধম্ (১।১।৭৩)।

যৎসমুদায়ঘটকানামচাং মধ্যে পূর্ব্বোঽচ্, বৃদ্ধিসংজ্ঞঃ স বৃদ্ধসংজ্ঞঃ স্যাৎ।...বহুত্বমবিবক্ষিতম্।...ব্যপদেশিবদ্ভাবাদেকস্যাপি।

—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি।

২৩।—অমনুষ্যেঽরিভিন্নে ইতি বাঽর্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

২৪। সূর্ম্মীমিতি প্রাপ্তে 'অমি পূর্ব্বঃ' (৬।১।১০৭) ইত্যত্র 'বা ছন্দসি' (৬।১।১০৬) ইত্যনুবৃত্ত্যা যণাদেশঃ।—মহাভাষ্য—প্রদীপ। শব্দকৌস্তুভেও ইহার প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে।

২৫। সূর্ম্মী স্থূণাঽয়ঃপ্রতিমা।—অমরকোষ—শূদ্রবর্গ ৩৫

২৬। সূর্ম্মীং শোভনাময়ঃপ্রতিমাম্।—মহাভাষ্য প্রদীপোদ্দ্যোত।

২৭। উষ-সুষি-মুষ্ক-মধো রঃ (৫।২।১০৭)।

> ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
> সম্বন্ধেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥—মহাভাষ্য ৫।২।৯৪

শেবাংশের উপমায় (সূর্ম্ম্যং সুবিরামিব) দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে,—যেরূপ সচ্ছিদ্র লৌহপ্রতিমার অভ্যন্তরে অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিলে সেই প্রতিমা সকল প্রকার মল-কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ হয়, সেইরূপ যাঁহার শব্দ-জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার সকল প্রকার পাপ নষ্ট হইয়া যায়,—তিনি পবিত্র হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দ-জ্ঞানের একমাত্র উপায়; অতএব ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দ-জ্ঞান উৎপাদনের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তির সাধন—ইহা এই মন্ত্রে উপমার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফলের উদ্দেশে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য (২৮) ইহা প্রতিপাদনের উদ্দেশে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মূল। কিং পুনর্ব্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে, ন পুনরন্যদপি কিঞ্চিৎ? ওম্ ইত্যেবমুক্ত্বা বৃত্তান্তশঃ শমিত্যেবমাদীঞ্ শব্দান্ পঠন্তি।

অনুবাদ। কি কারণে ব্যাকরণেরই অধ্যয়নেচ্ছুগণকে (ব্যাকরণের) প্রয়োজন বলা হইতেছে; অন্য কিছুর (বেদের) অধ্যয়নেচ্ছুগণকে (প্রয়োজন বলা হয় না)। 'ওম্' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, প্রপাঠক-ক্রমে 'শম্' প্রভৃতি শব্দরাশি অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। অধিপূর্ব্বক অধ্যয়নার্থক 'ইঙ্' ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয়-যোগে, 'অধিজিগাংসমানেভ্যঃ' এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ইচ্ছা' অর্থে সাধারণতঃ 'সন্' প্রত্যয় হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হইয়াছে; যাহাদের ব্যাকরণের অধ্যয়নে ইচ্ছা আছে, তাহাদের সেই ইচ্ছা হইতেই ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি আসিবে; এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে প্রয়োজন বর্ণনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এই জন্য এখানে 'সন্' প্রত্যয়ের অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আশঙ্কা অর্থাৎ সম্ভাবনা অর্থেও 'সন্' প্রত্যয় হয় (২৯); এখানে সেই সম্ভাবনা অর্থে 'সন্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহা হইলে, 'ব্যাকরণমধিজিগাংসমানেভ্যঃ' ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হইবে,—যাহাদের ব্যাকরণের অধ্যয়নের সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ যাহারা ব্যাকরণের প্রয়োজন অবগত হইলে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহাদের উদ্দেশে প্রয়োজন বলা হইতেছে। বস্তুতঃ যাহাদের যোগ্যতা না থাকায় কোন কালে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের উদ্দেশে ব্যাকরণের প্রয়োজন প্রদর্শন করা অরণ্যে রোদনের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

সন্ প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য এখানে অনুবাদে 'সন্' প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থ প্রদর্শন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, এখানে যে সম্ভাবনা অর্থেই সন্ প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করা উচিত, তাহার যুক্তি উপরে প্রদর্শিত হইল।

তৈত্তিরীয়সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে 'প্রপাঠকে'র ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি অধ্যায়কে বিভিন্ন 'প্রপাঠকে' বিভক্ত করা হইয়াছে। এই 'প্রপাঠক'কেই এখানে পতঞ্জলি 'বৃত্তান্ত' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। এক একটি 'প্রপাঠকে' প্রায়শ এক একটি বিষয়ের আলোচনা আছে। তাহা হইলে, সাধারণভাবে দেখা যায়, এক একটি 'প্রপাঠক' এক একটি বিষয়ের প্রকরণ। ইহা লক্ষ্য করিয়া মহাভাষ্যকার 'প্রপাঠক' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বৃত্তান্ত' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 'বৃত্তান্ত' শব্দের 'প্রকরণ' অর্থে ব্যবহার যুক্তিহীন নহে।

যাহারা বেদের অধ্যয়ন করে, তাহাদের অধ্যয়নের পূর্ব্বে এবং পরে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিবার বিধান আছে;—

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি।—(মনু, ২য় অঃ)

—বেদের পাঠের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ করিবে। আরম্ভে প্রণব উচ্চারণ না করিতে বেদ ক্ষরিত হয় এবং সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ না করিলে বিশীর্ণ হইয়া যায়। ওঁকার স্বীকৃতি-সূচকও বটে; এই কারণে বেদের অধ্যয়নের পূর্ব্বে প্রণবের উচ্চারণের দ্বারা গুরুর প্রতি শিষ্যের আনুগত্যও সূচিত হয়। এই কারণে বেদের অধ্যয়নের পূর্ব্বে প্রণবের উচ্চারণের প্রথা আছে। সেই প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া এখানে পতঞ্জলি 'ওমিত্যুক্ত্বা' ইত্যাদি লিখিয়াছেন।

এই স্থলে ভাষ্যে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই;—যাহারা বেদের অধ্যয়ন করে, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বর্ণনা করিয়া তাহাদের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে হয় না; তাহারা কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশে বিস্তৃতভাবে প্রয়োজনের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ব্যাকরণের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষই দ্যোতিত হইতেছে।

মূল।—পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারকালোত্তরং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে। তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ, লোকাচ্চ লৌকিকা অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্‌ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে ইমানি প্রয়োজনানি অধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি।

অনুবাদ।—পূর্ব্বসময়ে এই (রীতি) ছিল, (উপনয়ন) সংস্কার-কালের পরে ব্রাহ্মণগণ ব্যাকরণের অধ্যয়ন করিতেন। সে সেই (উচ্চারণ-) স্থান, করণ (আভ্যন্তর প্রযত্ন) এবং অনুপ্রদানে (বাহ্য প্রযত্নে) অভিজ্ঞ সেই সকল (ব্যক্তি) কে বৈদিক-শব্দ সমূহের (বেদের) উপদেশ করা হইত। বর্ত্তমান সময়ে তাহা সেইরূপ নাই। বর্ত্তমান সময়ে (প্রথমে) বেদ অধ্যয়ন করিয়া (বিবাহাদি ব্যাপারে) ত্বরাযুক্ত (ব্যগ্র) হইয়া বক্তা হ'ন (বলিতে আরম্ভ করেন)—'বৈদিক শব্দ সকল বেদ হইতে আমাদের জ্ঞাত হইয়াছে; লৌকিক শব্দ সকল (লোক হইতে আমাদের জ্ঞাত হইয়াছে); (অতএব) ব্যাকরণ অনর্থক (নিষ্প্রয়োজন)।' এইরূপ বিরুদ্ধবুদ্ধি-সম্পন্ন সেই অধ্যেতৃবর্গকে আচার্য্য (অধ্যাপক) সুহৃদ্ হইয়া (বন্ধুভাবে) এই (প্রয়োজন-প্রতিপাদক) শাস্ত্রের অন্বাখ্যান করেন;—(ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের) এই সকল প্রয়োজন (আছে, অতএব) ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

২৮। অনেন স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলমিত্যুক্তম্।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

২৯। দ্রষ্টব্য—মহাভাষ্য ৩।১।৭

মন্তব্য।—'তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্ঞেভ্যঃ' অংশে তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণ-নাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যঃ' এইরূপ পাঠান্তর প্রচলিত পুস্তকে আছে। এই পাঠ শুদ্ধ নহে। 'অনুপ্রদান' শব্দের অর্থ বাহ্য 'প্রযত্ন'। 'নাদ' বাহ্য প্রযত্নের অন্তর্গত। নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে 'অনুপ্রদান' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অনুপ্রদানং নাদাদিবাহ্যপ্রযত্নঃ।" সুতরাং প্রচলিত পাঠে 'নাদ' শব্দটির আধিক্য সমর্থনযোগ্য নহে। ডাঃ কীলহর্ণের পুস্তকে 'নাদ' শব্দটি নাই। সেই পাঠ সুসঙ্গত বলিয়া এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে ভাষ্যে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনার বিরুদ্ধে যে আশঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই আশঙ্কার সমাধান করা হইতেছে। মুখের যে অংশে বায়ু-সংযোগ হইয়া যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাকে সেই বর্ণের স্থান বলে। বর্ণের উচ্চারণ করিতে হইলে ঐ সকল স্থানে বায়ুর সংযোগ সম্পাদন করিবার জন্য মুখের মধ্যে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা বায়ুতে ক্রিয়া উৎপাদন করিতে হয়। মুখের মধ্যে এই যে ব্যাপার হয়, এই সকল ব্যাপারের নাম 'করণ' বা আভ্যন্তর প্রযত্ন। এই আভ্যন্তর প্রযত্নের দ্বারা প্রথমে বর্ণ উচ্চারিত হইলেও, তাহাতে স্পষ্টতা আসে না; এই স্পষ্টতা-সম্পাদনের জন্য অন্য প্রকার ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে; এই ব্যাপারের নাম অনুপ্রদান বা বাহ্যপ্রযত্ন। এই বাহ্যপ্রযত্ন মুখের বাহিরে শরীরের অভ্যন্তরে নিষ্পাদিত হয়। মুখের বাহিরে এই প্রযত্ন হয় বলিয়াই ইহাকে বাহ্যপ্রযত্ন বলে। স্থান করণ এবং অনুপ্রদানের বিষয় সাক্ষাদ্ভাবে ব্যাকরণে আলোচিত না হইলেও, যাহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, তাহাদের এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কোনরূপেই চলিতে পারে না। এই সকল বিষয় "শিক্ষা"য় আলোচিত হইয়াছে। অতএব যাহারা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের শিক্ষাও অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্রথমেই যাহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত, তাহারা স্থান, করণ এবং অনুপ্রদানে অভিজ্ঞ হইয়া বেদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইত।

"তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্" (১।১।৯) এই সূত্রের মহাভাষ্যে স্থান, করণ এবং অনুপ্রদানের আলোচনা করা হইয়াছে; এই জন্য এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সেই সূত্রেই হওয়া বাঞ্ছনীয়; সুতরাং এ বিষয়ে এখানে কোন আলোচনা করা হইল না।

মূল।—উক্তঃ শব্দঃ। স্বরূপমপ্যুক্তম্। প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। শব্দানুশাসনমিদানীং কর্ত্তব্যম্।

অনুবাদ।—শব্দ বলা হইয়াছে। (শব্দের) স্বরূপও বলা হইয়াছে। (ব্যাকরণ অধ্যয়নের) প্রয়োজনও বলা হইয়াছে। এখন শব্দানুশাসন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—শব্দ, তাহার স্বরূপ এবং ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন বলা হইয়াছে, ইহা এ স্থলে মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী" ইত্যাদির দ্বারা শব্দ বলা হইয়াছে। "যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি"—ইহার দ্বারা শব্দের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহার পরে, "রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্" এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া, "সত্যদেবাঃ স্যাম ইত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এত দূর পর্য্যন্ত মহাভাষ্যকার যাহা কিছু বলিয়াছেন, 'উক্তঃ শব্দঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এখানে তাহার উপসংহার করিয়াছেন। প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় শব্দ এবং ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হইয়াছে, ইহা পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যেই এই উপসংহার করা হইয়াছে।

নাগেশ ভট্ট এস্থলে মহাভাষ্যের উক্তরূপ তাৎপর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। নাগেশ ভট্ট আরও বলিয়াছেন—বিষয় এবং প্রয়োজন নিরূপণ করাতেই সম্বন্ধ এবং অধিকারীও নিরূপিত হইয়াছে; এই জন্য মহাভাষ্যকার পৃথগ্ভাবে সম্বন্ধ এবং অধিকারী বলেন নাই (৩০)।

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য বিষয় আছে;—যে বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ইহার পরে যাহা বলা হইবে তাহার সূচনা করিবার উদ্দেশে, গ্রন্থের মধ্যে পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া পরবর্ত্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করিবার রীতি আছে (৩১)। ইহার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সন্দর্ভের সহিত পরবর্ত্তী সন্দর্ভের সঙ্গতি সূচিত হয় এবং শিষ্যের বুদ্ধি পরবর্ত্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি অবহিত হইয়া থাকে। এই স্থলে মহাভাষ্যকার উক্তঃ শব্দঃ...উক্তানি—এই অংশের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া, "শব্দানুশাসনমিদানীং কর্ত্তব্যম্" এই বাক্যের দ্বারা পরবর্ত্তী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সূচিত করিয়াছেন।

মূল।—তৎ কথং কর্ত্তব্যম্? কিং শব্দোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ, আহোস্বিদ্ অপশব্দোপদেশঃ, আহোস্বিদ্ উভয়োপদেশ ইতি।

অনুবাদ।—সেই (শব্দানুশাসন) কি প্রকারে করিতে হইবে? শব্দের উপদেশ করিতে হইবে? অথবা অপশব্দের উপদেশ (করিতে হইবে), অথবা উভয়ের উপদেশ (করিতে হইবে)?

ব্যাখ্যা।—এখানে মূলে 'কিম্' শব্দটি প্রশ্নের সূচক।

'অপশব্দ' এই শব্দটির অর্থ অসাধু অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ; এই 'অপশব্দে'র প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে এখানে 'শব্দ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে 'শব্দ' এই শব্দটির অর্থ শুদ্ধ শব্দ—সাধু শব্দ। যদি ব্যাকরণে কেবল শুদ্ধ শব্দের উপদেশ করা হয় অর্থাৎ সমস্ত শুদ্ধ শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া ব্যাকরণে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে, সেই সকল শুদ্ধ শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দগুলি যে অপশব্দ, তাহা বুঝিতে পারা

৩০। অয়মুপসংহারো গ্রন্থস্য, বিষয়প্রয়োজননিরূপণমেতাবতা কৃতমিতি বোধয়িতুম্। তেনৈব সম্বন্ধাধিকারিণাবুক্তাবিতি তৌ পৃথঙ্ নোক্তৌ। —মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

শাস্ত্রের সম্বন্ধ দুইটি;—(১) শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং (২) বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ; শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ; বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধের নাম প্রয়োজ্য-প্রয়োজকভাব সম্বন্ধ। যে প্রয়োজনের সিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র রচিত হয়, যিনি সেই প্রয়োজনের অর্থী, তিনিই শাস্ত্রের অধিকারী।

৩১। এই রীতি ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্কর ভাষ্য প্রভৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য—১।১।৫ সূত্রের ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভ;—ইত্যাদি—

যাইবে; এইরূপ, কেবল অপশব্দগুলি যদি ব্যাকরণে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে, সেই সকল অপশব্দ ব্যতীত যে সকল শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারাই যে শুদ্ধ শব্দ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যাকরণে শুদ্ধ শব্দ এবং অপশব্দ—এই উভয়বিধ শব্দের পৃথগ্ভাবে পাঠ করিলে, শুদ্ধ শব্দ এবং অশুদ্ধ শব্দ অনায়াসে স্পষ্টভাবেই জানিতে পারা যাইবে।

এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রশ্ন এইরূপ বিভিন্ন তিনটি অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া উত্থাপিত হইয়াছে।

মূল। অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ। তদ্যথা, ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্যপ্রতিষেধো গম্যতে। 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা' ইত্যুক্তে গম্যত এতদ্ অতোঽন্যে অভক্ষ্যা ইতি। অভক্ষ্যনিয়মেন বা ভক্ষ্যনিয়মঃ। তদ্যথা, 'অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ' 'অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ' ইত্যুক্তে গম্যত এতদ্ 'আরণ্যো ভক্ষ্য' ইতি। এবমিহাপি। যদি তাবচ্ছব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে, গৌরিত্যেতস্মিন্নুপদিষ্টে গম্যত এতদ্ 'গাব্যাদয়োঽপশব্দাঃ' ইতি। অথাপ্যপশব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে, গাব্যাদিষূপদিষ্টেষু গম্যত এতদ্ 'গৌরিত্যেষ শব্দঃ' ইতি।

অনুবাদ। (শব্দ এবং অপশব্দের মধ্যে) অন্যতরের উপদেশের দ্বারা (প্রয়োজন) নিষ্পন্ন হইবে। যেমন,—ভক্ষ্যের নিয়মের দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ প্রতীয়মান হয়;—'পাঁচটি পঞ্চনখ-যুক্ত (প্রাণী) ভক্ষ্য'—এইরূপ বলিলে এই বুঝিতে পারা যায় যে,—ইহারা ভিন্ন অন্য (পঞ্চনখ-বিশিষ্ট প্রাণী) অভক্ষ্য। অথবা,—অভক্ষ্যের নিয়মের দ্বারা ভক্ষ্যের নিয়ম (প্রতীত হয়)। যেমন,—'গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য' 'গ্রাম শূকর অভক্ষ্য' এইরূপ বলিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে,—আরণ্য (=বনে জাত) (কুক্কুট এবং শূকর) ভক্ষ্য। এখানেও এইরূপ। যদি শব্দের উপদেশ (পাঠ) করা হয়,—'গৌঃ' এই শব্দ উপদিষ্ট হইলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, 'গাবী' প্রভৃতি অপশব্দ। আর যদি অপশব্দের উপদেশ করা হয়—'গাবী' প্রভৃতি শব্দ উপদিষ্ট হইলে ইহা বুঝিতে হয় যে, 'গৌঃ' এইটি শব্দ।

ব্যাখ্যা। শব্দ এবং অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশ (পাঠ) করিলে যদিও স্পষ্টভাবে উভয়ের জ্ঞান হইতে পারে, তথাপি উভয়ের উপদেশ সমধিক-প্রয়াস-সাপেক্ষ বলিয়া গৌরব-গ্রস্ত। এই কারণে মহাভাষ্যকার বলিতেছেন,—উভয়ের উপদেশের প্রয়োজন নাই; শব্দ ও অপশব্দ,—এই উভয়ের মধ্যে একতরের উপদেশ করিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। মহাভাষ্যকার দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভক্ষ্যের নিয়ম করিলে, তাহার দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ প্রতীত হয়;—"পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ"—গণ্ডার, শ্বাবিধ (সজারু), গোধা, শশক এবং কূর্ম্ম—এই পাঁচটি পঞ্চনখ-যুক্ত প্রাণী ভক্ষ্য (৩২)'—ইহা বলিলে, এই পাঁচটি ব্যতীত ইহাদের সমানশ্রেণীর পঞ্চনখ-যুক্ত অপর প্রাণী—বানরাদি অভক্ষ্য, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ গৌঃ' প্রভৃতি সাধু শব্দের উপদেশ করিলে, ইহা ব্যতীত ইহার সমানার্থক 'গাবী' 'গোণী' 'গোতা' 'গোপোতলিকা' প্রভৃতি শব্দ যে অপশব্দ, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

অথবা অভক্ষ্যের নিষেধ করিলে তাহার দ্বারা ভক্ষ্যের নিয়ম প্রতীত হয়;—'গ্রাম্যকুক্কুট অভক্ষ্য' 'গ্রাম্যশূকর অভক্ষ্য'—এরূপ বলিলে, গ্রাম্যকুক্কুট এবং গ্রাম্যশূকরের অভক্ষ্যতা প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে আরণ্য অর্থাৎ বন্যকুক্কুট এবং বন্যশূকর যে ভক্ষ্য, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ, 'গাবী' প্রভৃতি অপশব্দের উপদেশ করিলে, 'গৌঃ' প্রভৃতি যে শুদ্ধ শব্দ, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্যাকরণে শুদ্ধ শব্দ এবং অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই; যদি ব্যাকরণে উপদেশই করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির উপদেশ করিলেই অনায়াসে অভীপ্সিত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

মহাভাষ্যকার "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই বাক্যকে নিয়ম বলিয়াছেন; পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা নিয়ম-বিধি নহে, ইহা পরিসংখ্যাবিধি।

মীমাংসকদের মতে বিধি তিন প্রকার (১) অপূর্ব্ববিধি, (২) নিয়মবিধি এবং (৩) পরিসংখ্যাবিধি;—

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে।

—(১) যাহা অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে বিষয় পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই, তাহার বিষয়ে বিধি হইয়া থাকে; ইহাকে 'অপূর্ব্ববিধি' বলা হয়। যেমন,—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি"। কুমারিল ভট্টের অনুবর্ত্তী মীমাংসকগণের মতে ইহার অর্থ—'অগ্নিহোত্র' নামক হোমের দ্বারা ইষ্ট (ইচ্ছার বিষয়ীভূত) বস্তু উৎপাদন করিবে (৩৩)। এই বাক্যের দ্বারা ইষ্ট (স্বর্গ) বস্তুর উৎপাদনের প্রতি 'অগ্নিহোত্র' নামক হোমের করণতা প্রতীত হইয়া থাকে। ইষ্ট বস্তুর প্রতি হোমের এই করণতা, এই বাক্যের অর্থবোধের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই। অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপক হওয়ায় 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যটি অপূর্ব্ববিধি। (২) যে স্থলে অন্য প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন দুইটি পক্ষ বৈকল্পিক ভাবে জ্ঞান-গোচর হইয়া আছে, সে স্থলে যদি বিধিবাক্যের দ্বারা, প্রমাণান্তরের দ্বারা পূর্ব্বে প্রাপ্ত দুইটি পক্ষের মধ্যে অন্যতরপক্ষে পর্য্যবসান ঘটে, তবে সে স্থলে নিয়মবিধি স্বীকৃত হইয়া থাকে। দর্শ এবং পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে পুরোডাশ দ্বারা হোম করা হয়; তণ্ডুল অথবা যবের চূর্ণের সহিত উষ্ণ জল (৩৪) মিশ্রিত করিয়া সেই চূর্ণের কূর্ম্মাকৃতি পিণ্ড করিতে হয়। 'গার্হপত্য' নামক অগ্নিতে মৃত্তিকানির্ম্মিত কপালে (৩৫) এই পিণ্ডকে ভর্জ্জন করিলে,

---

৩২। পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ।—বাল্মীকিরামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৭।৩৯

শল্যকঃ খড়্গী। শক্তিকাকারশল্যাবৃতসর্ব্বাঙ্গো জন্তুবিশেষ ইত্যন্যে।—রামাভিরামীয়টীকা।

৩৩। "অগ্নিহোত্রং জুহোতি"—এই বাক্যের উক্ত প্রকার অর্থ ভাট্টমীমাংসক সম্প্রদায়ের সম্মত। যেহেতু, তাঁহারা এই বাক্যের "অগ্নিহোত্রহোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ"—এইরূপ শাব্দবোধ স্বীকার করিয়াছেন।

৩৪। এই উষ্ণ জলকে 'মদন্তী' শব্দে অভিহিত করা হয়। এই জল যে পাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়, তাহার নামও "মদন্তী"। —শ্রৌতপদার্থনির্ব্বাচন, ইষ্টিপ্রকরণ।

৩৫। পুরোডাশের ভর্জ্জনে ব্যবহৃত দুই অঙ্গুলি উচ্চ অগ্নি-পক্ব মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রবিশেষের নাম কপাল।

সেই কূর্ম্মাকৃতি পিণ্ড 'পুরোডাশ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ পুরোডাশ নির্ম্মাণ করিতে যে চূর্ণের প্রয়োজন হয়, সেই চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে ধান্য কিংবা যবকে তুষ-রহিত করিয়া লইতে হয়। ধান্য বা যবের উপরিভাগ হইতে তুষের অপসারণ নখের দ্বারা করিতে পারা যায়; আঘাত করিলে অর্থাৎ কুটিলেও তুষের নিবৃত্তি হইতে পারে। যে স্থলে নখের দ্বারা চিরিয়া তুষের অপসারণ করা হয়, সে স্থলে আঘাতের প্রয়োজন থাকে না; আবার যে স্থলে আঘাতের দ্বারা তুষের নিবৃত্তি করা হয়, সে স্থলে নখ-বিদলনের অপেক্ষা থাকে না। অতএব, এরূপ স্থলে অবঘাতের পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে, নিয়ত প্রাপ্তি নাই। এইরূপ অবস্থায় "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই বিধির দ্বারা অবঘাতের নিয়ত প্রাপ্তি সম্পাদন করা হইয়াছে। পুরোডাশের জন্য যে তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে হইবে, সে তণ্ডুল কোন অবস্থাতেই নখ-বিদলনাদি অন্য প্রকারে নিষ্পাদন করা চলিবে না, সকল অবস্থাতেই সেই তণ্ডুল অবঘাতের দ্বারা সম্পাদন করিতে হইবে। এই নিয়মবিধির কোন দৃষ্টফল সম্ভাবিত নয়; আঘাত বিনাও অন্য প্রকারে তুষের নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। এই জন্য ইহার অদৃষ্টফল স্বীকার করা হয়। এই আঘাত হইতে একটি অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) উৎপন্ন হয়, সেই অপূর্ব্বটিও প্রধান যাগ (দর্শপূর্ণমাসাদি) হইতে যে অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) উৎপন্ন হয়—যে অপূর্ব্ব স্বর্গাদি ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া যাহাকে পরমাপূর্ব্ব বলা হয়—এই অবঘাতজনিত অপূর্ব্ব সেই পরমাপূর্ব্বের উৎপত্তিতে সহায়তা করে; এই অবঘাতজনিত অপূর্ব্ব না থাকিলে সেই পরমাপূর্ব্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। এ স্থলে এই অবঘাত-বিধির দ্বারা আঘাতের অভাবপক্ষে প্রাপ্ত নখ-বিদলনাদির নিবৃত্তি হয়। (৩) যে স্থলে একই বিষয়ে একাধিক বস্তুর অন্য কোন প্রকারে যুগপৎ প্রাপ্তি ঘটে, সেই স্থলে বিধিবাক্যের দ্বারা অন্যের নিবৃত্তি করিয়া কোন একটি পদার্থের নিশ্চিতরূপে প্রাপ্তির সম্পাদন করিলে, সেইরূপ স্থলে পরিসংখ্যাবিধি স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন,—পানভোজনাদি মানুষের স্বাভাবিক রাগের (কামনার) বস্তু; এই স্বাভাবিক রাগের বশে গণ্ডার, কূর্ম্ম, শশক, সজারু এবং গোধা—এই পাঁচটি পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণে যেরূপ মানুষের প্রবৃত্তি আসিতে পারে, সেইরূপ এই পাঁচটি ব্যতীত বানরাদি অন্য পঞ্চনখ-বিশিষ্ট প্রাণীর ভোজনেও মানুষের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে; এরূপ অবস্থায় সকল পঞ্চনখ-বিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণই মানুষের রাগ-প্রাপ্ত। এ স্থলে "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই প্রকার বিধি-বাক্যের দ্বারা উক্ত পাঁচটি পঞ্চনখ-বিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। এই বিধি উক্ত পাঁচটি প্রাণীর ভক্ষণের বিধান করিতেছে, এরূপ মনে করিলে এই বিধি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। কারণ, এই বিধি ব্যতিরেকেও স্বাভাবিক রাগের বশে বানরাদি অন্য পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ন্যায় উক্ত পাঁচটি প্রাণীর ভক্ষণও প্রাপ্ত আছে; যাহা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত আছে, তাহার জন্য বিধির কোন অপেক্ষা না থাকায় সেরূপ স্থলে বিধির ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন গতি নাই। এই জন্য এরূপ ক্ষেত্রে বিধির ব্যাপার প্রবৃত্তির দিকে স্বীকার না করিয়া নিবৃত্তির দিকেই স্বীকার করা হয়; উক্ত পাঁচটি পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী ব্যতীত পঞ্চনখ-বিশিষ্ট অন্য বানরাদি জীবকে ভক্ষণ করিবে না,—এই রূপ নিষেধের অনুকূলে "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই বিধির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে বিধির ব্যর্থতা নিবারিত হইয়া থাকে। যে স্থলে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়, সেস্থলে অন্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই নিবৃত্তি শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না; অন্য একটি বস্তুর (অবঘাতের) নিয়তভাবে শব্দের দ্বারা বিধান করিলে, অন্য বস্তুর (নখ-বিদলন প্রভৃতির) পক্ষান্তরে যে প্রাপ্তি আছে, সেই প্রাপ্তির আপনা হইতেই নিবৃত্তি ঘটে; এই নিবৃত্তিকে আর্থিক নিবৃত্তি বলে। পরিসংখ্যাবিধিস্থলে, সেই বিধির ব্যর্থতা নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অন্যের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। অতএব নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য এই যে, নিয়মবিধি স্থলে অন্যের নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ, সাক্ষাৎ শব্দ-প্রতিপাদ্য নহে; পরিসংখ্যাবিধি-স্থলে অন্যের নিবৃত্তি সাক্ষাৎ শব্দেরই প্রতিপাদ্য,—অর্থ-সিদ্ধ নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই বিধিবাক্যটি পূর্ব্বমীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিসংখ্যা-বিধি, নিয়মবিধি নহে (৩৬)। এখন এখানে এই প্রশ্ন উঠে যে—মহাভাষ্যকার "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এইরূপ বিধিবাক্যকে পরিসংখ্যা-বিধির অন্তর্গত না করিয়া "নিয়ম"রূপে উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এস্থলে তাঁহার অভিপ্রায় কি?

নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে ইহার উত্তর দিয়াছেন। 'পরিসংখ্যা' স্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্যের নিবৃত্তি আছে; 'নিয়ম'স্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্যের নিবৃত্তি না থাকিলেও, অন্যের নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'নিয়ম' এবং পরিসংখ্যা' এই দুই প্রকারের বিধিতেই কোন না কোন ভাবে অন্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই অন্য নিবৃত্তি অংশে 'নিয়ম' এবং 'পরিসংখ্যার যে সাম্য আছে, সেই সাম্যের অবলম্বনে, 'নিয়ম' এবং 'পরিসংখ্যার' অভেদ আশ্রয় করিয়া মহাভাষ্যকার এই স্থলে 'পরিসংখ্যা'-কেও 'নিয়ম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩৭)।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

৩৬। নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যাবিধির পার্থক্য কেবল যে নব্য মীমাংসকগণেরই সম্মত, তাহা নহে; ইহা পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনি ও ভাষ্যকার শবরস্বামী প্রভৃতিরও সম্মত। দ্রষ্টব্য—মীমাংসাদর্শন ১।২।৩২

৩৭। ননু পরিসংখ্যাত্বাৎ কথং নিয়মত্বেন ব্যবহারঃ? অস্তি চ নিয়মপরিসংখ্যয়োর্ভেদঃ। পাক্ষিকাপ্রাপ্তিকাপ্রাপ্তাংশপরিপূরণফলো নিয়মঃ, অন্যনিবৃত্তিফলা চ পরিসংখ্যা ইতি চেৎ, ন; নিয়মেঽপ্যপ্রাপ্তাংশপরিপূরণরূপফলবোধনদ্বারা আর্থান্যনিবৃত্তেঃ সত্ত্বেনাভেদমাশ্রিত্যোক্তেঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

সমস্যা-পূরণ

জাপানী বোমার ভয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে পল্লীগ্রামের পৈতৃক ভিটায় আশ্রয় লইতে হইল। সেখানে যাইতেই ননদিনী শশিকলা প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে সম্ভাষণ করিলেন, "কি বৌ, বাঁশ-বনে শেয়াল-রাজা হতে এলে না কি! কলকাতা সহরে থাকা আর পোষালো না? তা পাঁড়াগাঁয়ে মনে টেঁকবে তো?"

অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিলাম। আমি বেশী কথা বলিতে পারি না। এ-রকম টীকা-টিপ্পনী শুনিলে আমার ভীরু হৃদয় অস্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে। এক দিন স্বেচ্ছায় যাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম, অধিকারের দাবী লইয়া এখন তাহা দখল করিতে আসি নাই! আসিতে হইল নিতান্ত দায়ে পড়িয়া।

জানি, সংসারে শশিকলার জ্বালা আছে। কিন্তু সে জ্বালা বিধি-দত্ত। নিতান্ত কাঁচা বয়সে সে সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া হাতের লোহা ক্ষোয়াইয়া একমাত্র শিশুকন্যাকে লইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার সেই শিশু-কন্যা এখন দু'টি শিশুর জননী! শশী মেয়ে-জামাই লইয়া আমাদের পরিত্যক্ত সংসারে সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। আমার স্বামি-প্রদত্ত মাসহারাই ইহাদের সকলের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। শশিকলার ক্ষুর-ধার কথার ভয়ে এবং তার প্রখর স্বভাবের জন্যই আমি এখানে আসিতে চাহি না, তবু আসিতে হইল পিকুর আগ্রহে!

পিকু আমার কে? স্বামী লোহার ব্যবসায় করেন; পিকু তাঁহার সহকর্ম্মী, সহচর, নিতান্ত প্রিয়-জন। পিকুর সহিত আমার সম্পর্কও খুব মধুর। কঠিন লোহার ব্যবসা করিলেও ছেলেটি কোমল-প্রকৃতি, কৌতুকপ্রিয়।

কিন্তু পিকুর রূপ-গুণের বর্ণনা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া যে পরিবেশের মধ্যে উপনীত হইয়াছি, এখন তাহার কথা বলি।

শশিকলার এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম।

পিকু কাছে ছিল। মৃদু হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া সে বলিল, "এত কাল পরে নিজের বাড়ী-ঘরে এসে এমন চোরের মত রইলে কেন? পথের কষ্টে মুখ তোমার শুকিয়ে গেছে! আগে চান শেষ করে চা খেয়ে নাও।"

"আহা, তোয়াজ দেখে বাঁচিনে! মেয়ে-মানুষের আবার চা খাওয়া! এ যেন লাট-বেলাটের দরবার! ওরে ও আল্লাদি, কোথায় গেলি লা? চায়ের জোগাড় কর। বৌ-এর শুক্‌নো মুখ দেখে আমাদের নব-কার্ত্তিক আর সইতে পারছে না।"

"সইতে না পারি, তাতে কোনো দোষ আছে মেজদি! তা সে জন্য তোমার আল্লাদি-পেল্লাদিকে কষ্ট করতে হবে না। চায়ের সরঞ্জাম, মায় ষ্টোভ আমাদের সঙ্গে আছে। তৈরী করে দেবার লোকও নিয়ে এসেছি। এখন শুধু দেখিয়ে দাও, কোন্ ঘরটা এঁর জন্য খালি করে রেখেছো।"

শশিকলার মেয়ে আল্লাদি আমাদের সম্মুখে আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "মা গো, মামী এসেছে যেন নতুন বৌ! ওঁকে এখন ঘর দেখিয়ে দিতে হবে! চিরকাল যেখানে থেকেছেন, সে-জায়গা কেউ লুঠে নিয়েছে যেন!"

আমি আমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এ সেই নিভৃত কক্ষ—শৈশবের খেলা-ধুলা ছাড়িয়া আসিয়া নবীন জীবনের সূচনায় বধূজনসুলভ লজ্জায় যেখানে আত্মগোপন করিয়াছিলাম, ইটের পর ইটের সেই গাঁথুনি—এখনও ঠিক তেমনি আছে। এত কাল পরেও বাহিরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন চোখে পড়িল না। সেই পাখী-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা স্নিগ্ধ-শীতল সুমধুর পল্লী-ভবন! সেই ক্লান্তিহরা উদাস-করা মৃদু-মধুর সমীরণ-প্রবাহ! সবই ঠিক তেমনি আছে। নাই কেবল সে-কালের সেই স্নেহ-মধুর প্রাণস্পর্শী আহ্বান, প্রতীক্ষমান নয়নের মমতা-বিজড়িত ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি! যাহা যায়, তাহা আর ফেরে না। বুক হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

সর্ব্বাগ্রে বাক্স-পেট্‌রা খুলিয়া শশিকলার সন্তোষের উপকরণগুলি বাহির করিতে লাগিলাম। তাহার তসরের থান-ধুতি, রুদ্রাক্ষ-মালা, পাথরের বাসন। আহ্লাদির ঢাকাই-শাড়ী, আলতা, সিঁদুর। জামাইয়ের পার্কারের পেন। ছোট ছেলেমেয়ের খেলনা, পুতুল, রঙ্গীন জামা।

উপহার-লাভের পুলকে শশিকলা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইল, কহিল, "দাদা আমাদের মনে করে কত কি পাঠিয়েছে! আর তাও বলি, তোমাদের কিন্তু বলিহারি বৌ! দাদাকে দুম্‌-দাম্ এই বোমার ভেতর একা রেখে নিজেরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলে! বলে-ক'য়ে বুঝিয়ে তাকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল তো!"

"তিনি না এলে কি করবো ঠাকুরঝি! ও লোহা বাঁকানো কি আমার সাধ্যি? আর আমিও প্রাণের দায়ে আসিনি ভাই, মানের ভয়ে আমায় আস্‌তে হয়েছে।"

বিদ্রূপের অট্টহাস্যে দন্ত বিকাশ করিয়া ঠাকুরঝি কহিলেন, "হাঁ, তা মানের দায়ে একশো বার বৈ কি! যে রূপ-যৌবনের জোয়ার বইছে ও-দেহে, গোরা-পল্টনরা দেখ্‌লে ধরে নিয়ে যাবে, এ ভয় কি কম?"

"ধরে নিয়ে গেলে তুমি খুশী হতে মেজদি! যাকে দেখতে পারো না, সেই আপদের শাস্তি হতো!"

অকস্মাৎ বোমা ফাটিল—জাপানী বোমা নহে। নারী-কণ্ঠে ভীষণ গর্জ্জন, নারী-নয়নে অজস্র অশ্রু-বন্যা!

স্নানের ছলে সে সমর-ক্ষেত্র হইতে সভয়ে আমি সরিয়া পড়িলাম। কুয়া-তলা হইতে তপ্তশিখার মত আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল, "ওগো বাবা গো, মা গো, তোমরা কোথায় আছো গো? শুনে যাও, আমায় বলে কি! আমি না কি কাউকে দেখতে পারিনে! দেখতে পারার বিচার করতে এসেছেন আমার দরদী মাসী। এত দরদের জন্যই ত গাঁয়ের লোক ছি-ছি করে। এ-দিকে লোকের নিন্দে-অপবাদে যে কান পাততে পারিনে!"

দূর হইতেই শুনিলাম, পিকু হাসি-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের অপবাদ অখ্যাতি বলো না, অমৃতভাষিণী মেজদি! শুনে ধন্য হই! কর্ণকুহর শীতল করি!

"কি বলে, তা আবার বলে দিতে হবে? বলে, নাতির বিয়ে দিলে নাগালের বাইরে যাবে, সেই ভয়ে বিয়ে দিচ্ছে না! নইলে এত বড় যুগ্যি ছেলে, সে কেন বিয়ে করে না?"

"তুমি কেন তাদের সঙ্গে যোগ দাও মধুস্বরা? যোগ না দিয়েই বা কি করবে? জন্মে ঠাকুরমায়ের আদর-সোহাগ পাওনি তো! তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করবার আগেই যে তাঁর ডাক এসেছিল!"

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোনো মতে স্নান শেষ করিয়া ঘরে গিয়া পিকুকে ডাকিয়া কহিলাম, "ছি পিকু, ইতরের মত ঝগড়া করতে তোমার লজ্জা করছে না? আমরা এসেছি শুনে এখনি পাড়ার কত লোক আসবে দেখতে। এ সব কথা শুনলে তারা কি ভাববে? ঠাকুরঝির সঙ্গে তোমার খিটিমিটি লাগবার ভয়েই আমি এখানে আস্‌তে চাইনি!"

লজ্জিত হইয়া পিকু কহিল, "আমার দোষ কি? মেজদি ঝগড়া করতে এলে আমি বুঝি তোমার মত চুপ করে থাকবো? চুপ-চাপ করে থাকার বংশে আমার জন্ম হয়নি, তোমার ঠাকুরঝিও তার প্রমাণ।"

"ঠাকুরঝি অন্যায় কিছু বলেননি। পৃথিবী-শুদ্ধ রটে গেছে, আমিই না কি তোমাকে বিয়ে করতে দিচ্ছি না! শুনতে শুন্‌তে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে। আর আমি শুনবো না, এবার তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।"

"কেন, তোমাদের পাড়াকুঁদুলীদের অপবাদের ভয়ে! বিয়ে এখন আমি করবো না, কিছুতেই না। কারুকে আমার পছন্দ হবে না, তা বলে রাখছি।"—সে প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়িল।

"বিয়ে হলেই পছন্দ হবে। জাপানী বোমার ভয়ে আর যা হয়, হোক, বিয়ের যোগ লেগে গেছে। এ যোগে তোমার আইবুড়ো-নাম ঘুচিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।"

পিকু বিরক্তি-ভরে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দেখি, কয়েক জন প্রতিবেশিনী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আর আসিয়াছেন চৌধুরী-বাড়ীর কাকিমা। গ্রামের মধ্যে চৌধুরীদের ঐশ্বর্য্যের ও মান-সম্ভ্রমের খ্যাতি এবং খাতির সব চেয়ে বেশী। ইঁহারাও কলিকাতা-প্রবাসী। বোমার ভয়ে গ্রামে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাকিমার নাত্‌নি লহরীর সঙ্গে পিকুর বিবাহের কথা চলিতেছে। গ্রামের মেয়ে, আমাদের দেখা, চেনা-শুনা। বেশ মেয়ে, কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছে। গানে-বাজনায়—সকল আধুনিক শিক্ষায় অগ্রসর। কিন্তু বিপদ এই যে, পিকুর এখন বিবাহে রুচি নাই। লেখাপড়া শেষ করিয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। স্বভাব-চরিত্র নির্ম্মল, আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল।

কোন দিকে কোন বাধা নাই, বাধার মধ্যে পিকুর এই অহেতুক জেদ।

অন্য সকলের প্রণাম লইয়া কাকিমাকে প্রণাম করিলাম। কাকিমা আশীর্ব্বাদচ্ছলে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এসে ভালো কাজ করেছো মা! আমরা এখানে এসে নিত্যি নিত্যি তোমাদের খবর নিচ্ছিলাম। সে-দিন শশীর কাছে শুনে গেলাম, আজ তোমরা আসবে। এসেছো জেনেই ছুটে দেখতে এলাম। এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ এলো! তা বম্বের ও-দিকে গোলমাল কেমন? পিকুর বাবা-মা'রা আস্‌বে না?"

বলিলাম, "গোলমাল সবখানেই কাকিমা, কোথাও মানুষের শান্তি নেই। আমি ওদের চলে আস্‌তে লিখেছি। ছেলের আবার ডাক্তারী-ব্যবসা, সহজে সে ঠাঁই-নড়া হতে চায় না।"

"তা বল্‌লে কি চলে মা? প্রাণের চেয়ে টাকা বড় নয়। সকলে একত্র হলে আমাদেরো সুবিধা হতো। এখানেই বিয়ে-থা মিটিয়ে দিতে পারতাম। নাই বা থাক্‌লো কল্‌কাতার বাজনা-বাদ্যি, আলো, রোস্‌নাই। পাড়াগাঁয়ে কি লোকে বিয়ে দেয় না?"

শশিকলা বলিল, "আগেকার লোক বিদেশে থাক্‌লেও ক্রিয়া-কর্ম্ম এই গাঁয়ে এসেই করতো। এখন ফ্যাশন হয়েছে কলকাতা। আরে কলকাতায় কি আছে? সবই আগুন হয়ে গেছে। এখন কলকাতা যাওয়া শুধু আগুনে দগ্ধে মরবার জন্য।"

কাকিমা সায় দিলেন। বলিলেন, "যা বলেছিস মা, দিন-রাত মাথার ওপর ভোঁ-ভোঁ! এই বুঝি বোমা পড়ে! পোড়ার দশা কলকাতার! বৌমা এলেন, পিকুও এখানে —তুই উদ্যোগী হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা যাতে হয়, সেই চেষ্টা কর্।"

"আমার কথায় কি হবে কাকিমা? আমি এ-বাড়ীর দাসী-বাঁদী বই কিছু নই। যার ইচ্ছায় হবে, তাকে ধরো তোমরা!"

শশিকলার কথায় কাকিমা সত্যই আমার হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন, "শশী ঠিক কথা বলেছে। ও বেশী বলার মেয়ে নয়। তুমি যখন এসে পড়েছো মা, তখন আর দেরী করো না। ছেলে এখন বিয়ে করতে চায় না। বিয়ের আগে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা এমনি ধারাই করে। ধরে-বেঁধে দিলেই সব ঠাণ্ডা। নাতি তোমার বাধ্য অনুগত, ছেলেবেলা থেকে বাপ-মা ছেড়ে তোমার হাতেই মানুষ। তুমি ইচ্ছে করলে তাকে দিয়ে সমস্তই করাতে পারো, তা আমরা জানি!"

"আচ্ছা, আজ আবার তাকে আমি বলে দেখবো। তার বিয়ে—সে যে আমার সব চেয়ে আনন্দের জিনিষ।" বলিয়া কাকিমার মুঠার ভিতর হইতে আমি হাত টানিয়া লইলাম।

বিদায় লইবার সময় কাকিমা বলিলেন, "বিকেলে তুমি এক বার আমাদের বাড়ী যেয়ো মা, বৌমা বার বার বলে দিয়েছে। সে আমার সঙ্গে আস্‌তে চেয়েছিল। তার শরীরটা আজ ভালো নেই বলে আমিই মানা করলাম। তুইও বৌমার সঙ্গে যাস্ শশি! ক'দিন ও-মুখো হোস্‌নে। আমাদের লহর আবার তোর গল্প শুনতে বড্ড ভালোবাসে।"

প্রসন্ন হইয়া শশী জবাব দিল, "কি করবো কাকিমা, সময় পাই না। সংসারের ঘানি-গাছে কেবলি ঘুরে মরছি। যদি পারি, যাবো।"

বেলা হইয়া গিয়াছিল। কাকিমার সঙ্গে-সঙ্গে আর সকলেও চলিয়া গেল।

২

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে-ছিলাম। পিকু পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তখন চৌধুরী-বাড়ীর খুড়ি-বুড়ী তোমায় ধরে কি বলছিলেন?"

"বলছিলেন, লহরীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা। কোন দিকেই যেখানে বাধা-বিঘ্ন নেই, সেখানে অযথা দেরী করবার কোনো মানে হয় না। ওঁদের ইচ্ছে, শীগ্‌গির হয়। আমারও সেই ইচ্ছে। তোমার ওপর ওঁদের অনেক দিনের লক্ষ্য, আমরাও মেয়েটিকে পছন্দ করে রেখেছি! ঘটনাচক্রে সবাই এক-জায়গায় হয়েছি, এবার দিন ঠিক করো।"

"তোমাদের বণিক্-বৃত্তির বিয়েতে আবার দিন-ক্ষণ কিসের দিদিমণি? টাকার সঙ্গে টাকার বিয়ে—শুনতে আমার ঘেন্না হয়। তাই আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। যাতে সংসারের উপকার নেই, সমাজের উন্নতি নেই, কে তা চাইবে? চৌধুরীদের লক্ষ্য আমার ওপর, ওটা মিছে কথা! লক্ষ্য—বাবার পসার-প্রতিপত্তির ওপর। লক্ষ্য—দাদুর লোহা-লক্কড়ের ওপর। তোমাদেরও লক্ষ্য—চৌধুরী-বাড়ীর মেয়ে। এই লক্ষ লক্ষ্যের মধ্যে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। আমার পাপগ্রহ এ বনে-জঙ্গলেও ছুটে আসবে, টের পেলে কখনো এখানে আসতাম না। বারে-বারে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীন মত জাহির করতে লজ্জা করে, তাই

এখন নয়, তখন নয় বলে আপত্তি করছিলাম। তার ফলে ঘরে-বাইরে আমার চেয়ে তোমাকেই অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে বেশী। আমি আর একটিও কথা বলবো না, তোমাদের যা খুশী তাই করো।" বলিতে বলিতে পিকুর গলা ভারী হইয়া আসিল। চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল।

আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার একান্ত স্নেহের পাত্র পিকু—ম্লান মুখ কোলের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "তোর সুখের জন্যই বিয়ে পিকু, দুঃখের জন্য নয়। লহরীকে পছন্দ না হলে গরীব-ঘর থেকে আমি দেখে-শুনে ভালো মেয়ে আনবো। নেবো না কিছু, তা হলে তো হবে?"

পিকু সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না দিদিমণি, ওইটি করো না। তোমাদের এত কালের আশা আমি ভাঙতে পারবো না। তুমি নিজেই কত বার দাদুকে বলেছো, আমার বিয়ে দিয়ে তুমি ঘর-ভরা জিনিষ নেবে, হীরা-পান্নার গহনা নেবে। তোমার এ ইচ্ছা এক দিনের নয়। ইচ্ছা যখন হয়েছিল, তা অপূর্ণ রেখো না। তোমরা দিন ঠিক করো, আমি আর কথা কইবো না।"

পিকুর অনিচ্ছায় যে বিবাহ-অনুষ্ঠান এত দিন নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই, তাহার সম্মতিতে আজ কিন্তু আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না। ইহার নাম সম্মতি? স্বচ্ছ মুকুরের মত আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়াই পিকু মত পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পিকু আমাকে ভালোবাসে বলিয়া আঘাত দিতে চায় না। সত্যই সে আমার বাধ্য, অনুগত। আমার কোন সাধ তাহার নিকট অপূর্ণ থাকে না; ইহা আমার শুধু আনন্দের নয়, গৌরবের।

আমি গরীবের মেয়ে। দারিদ্র্যের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ঐশ্বর্য্যের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া জুড়াইয়াছিলাম। দারিদ্র্যের নামে আমার মনে উৎকট আতঙ্ক! মানুষের সহজাত বৃত্তি যে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া আসে, তাহার সংস্পর্শে পুনরায় যাইতে চায় না। জানি, ইহা হৃদয়ের নিদারুণ হীনতা! চরিত্রের কদর্য্য অভিব্যক্তি! নহিলে আমার স্বামি-পুত্রের অর্থলোলুপতা নাই। আমি বাড়ীর গৃহিণী। আমার ইচ্ছার উপর সমগ্র পরিবারের ইচ্ছা নির্ভর করে। বিশেষতঃ পিকু আমার অতি আদরের। তাহার ভালো-মন্দ লাভ-ক্ষতির প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ। স্বামী, পুত্র, বধূ—কোন বিষয়ে কখনো আমাকে বাঁধা দিতে আসে নাই। আমার ইচ্ছা, আমার আদেশ আমার ক্ষুদ্র সংসারে চূড়ান্ত বলিয়া, মাথা পাতিয়া লইয়াছে।

এইখানেই শশিকলার আঘাত গুরুতর। স্ত্রী জাতির এত স্বাধীনতা, এত কর্ত্তৃত্ব সে সহিতে পারে না। আমার নাম শুনিবামাত্র তাহার প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ-বহ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। ইহা ভিন্ন ভ্রমেও আমি শশীর অনিষ্ট করি নাই। উপকার ছাড়া অপকার করি নাই। শশীর বিদ্বেষ-বিরাগে আমার কিছুই যাইবে-আসিবে না,' পিকুর মাথা কোলে লইয়া আমি তাহার কথা ভাবিতে লাগিলাম। চৌধুরীদের ঐশ্বর্য্য, লহরীর সুন্দর সুগঠিত গর্ব্বিত মুখচ্ছবি, অঙ্গের হীরা-মুক্তার দ্যুতি আমার হৃদয়ের পট-ভূমিকায় ফুটিয়া উঠিল। পিকুর বেদনা তাহার বাক্যের রেশ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

৩

বৈকালে কাকিমা পুনরায় আমাকে লইতে আসিলেন। তাঁহাদের আগ্রহে প্রসন্ন চিত্তে আমি পথে বাহির হইলাম। জানিতাম, শশী আমার সঙ্গে কোথায়ও যাইতে ইচ্ছুক নয়। কাজেই কাজের অছিলায় সে ঘরে রহিল।

চৌধুরী-বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে অনেক দূরে—গ্রামের শেষ সীমায় নদীর ধারে। সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। দুই দিকে ঘাট-বাঁধা পুকুর। প্রাচীর-ঘেরা ফুল-ফলের বাগান পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। গ্রাম-সুবাদে কাকিমা, দিদি, দাদা ডাকে আমরা পরস্পরের পরিচিত।

আমাদের সাড়া পাইয়া লহরীর মা আসিয়া আদর আপ্যায়িত করিলেন।

অনেক দিন পরে লহরীকে দেখিলাম। রূপ ছাপাইয়া প্রসাধনের পারিপাট্যে প্রভাত-পদ্মের মত মেয়েটি যেন ঝলমল করিতেছে! কাছে বসাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ জায়গা তোমার কেমন লাগছে লহরি?"

কাণের হীরার কাণবালা দোলাইয়া মুখ বাঁকাইয়া লহরী উত্তর করিল, "বিচ্ছিরী! এ দেশে কি মানুষ থাকতে পারে? চার দিকে ডোবা-নালা, বন-জঙ্গল, গা আমার ঘিন্-ঘিন্ করে। কোথাও বেড়ানোর জায়গা নেই, দেখবার কিছু নেই। কেবল খাও আর শোও।"

"তোমাদের এমন সুন্দর নদী। নদীর ধার দিয়ে মাঠের দিকে সকালে-বিকেলে বেড়িয়ো, তাতে শরীর ভালো থাকবে, সময়ও কেটে যাবে।"

"মাটী-কাদায় পায়ে হেঁটে আমি বেড়াতে পারবো

না। বাবাকে লিখেছিলাম, গাড়ীগুলো গ্যারেজে "মা পচিয়ে সোফার-শুদ্ধু একখানা পাঠিয়ে দাও। বাবা লিখেছেন, গাঁয়ে মোটরের রাস্তা নেই, পাঠিয়ে কি হবে? আচ্ছা, আপনিই বলুন, রাস্তা না থাক্, বড় বড় মাঠ তো আছে। গাড়ী এলে হু'বেলা মাঠেই না হয় ঘুরপাক খাবো! বাবার কি, তিনি তো আর এমন অন্ধকূপে হত্যা হচ্ছেন না। আমিও রেগে লিখে দিয়েছি, রাস্তা থাক্ বা না থাক, গাড়ী পাঠাতেই হবে।"

লহরীর মা সহাস্যে কহিলেন, "গাড়ী এলে আবার মেয়ের চলবে না। ইলেক্‌ট্রিকও চাই। কেরোসিনের আলোয় সন্ধ্যার পর এক-পা চলতে পারে না! গ্যাসের আলো আনা হয়েছে।"

কাকিমা বলিলেন, "এখানকার অসুবিধার মধ্যে কখনো বাস করেনি তো, বাপের আদরের মেয়ে চিরকাল সুখে-ভোগে মানুষ হয়ে এখন এখানে থাকতে পারে না! তবু যতটুকু সুবিধা করা সম্ভব, তার চেষ্টা হচ্ছে। আমি এ সবের কিছু বলি না মা! সকলে যখন এক-জায়গায় হয়েছি, তখন এই যোগাযোগে শুভ-কাজটা হয়ে গেলেই বাঁচি।"

তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্‌টাইয়া লহরী বলিল, "তোমরা তো বাঁচবেই ঠাকুরমা! মরণ হবে যাদের বিয়ে।"

হাসিয়া আমি কহিলাম, "সহরের মত এখানে ধুমধাম হবে না, হতে পারে না ভেবে তোমার দুঃখ হচ্ছে লহরি? আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের এখানে বিয়ে হলে ধুমধামের খরচ আমার কাছে জমা থাকবে। কলকাতা শান্ত হলে তোমরা সেখানে গিয়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়ে উৎসব করো। পিকুকে বাগে এনেছি, তুমি আর এখন বাঁকা হয়ো না।"

আমার কথায় লহরীর মা, কাকিমা হাসিতে লাগিলেন। লহরী মুখ নত করিল। তাহার নত মুখে লজ্জার রক্তিম আভা না ফুটিয়া, ফুটিল গর্ব্ব-মিশ্রিত জয়ের দীপ্তি।

ইহার পর আরম্ভ হইল জলযোগের বিরাট্ সমারোহ, ভোজের রীতিমত আড়ম্বর।

কিছু গ্রহণ করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

আমাদের বাড়ীর পাশে মজুমদার-বাড়ী। হরিচরণ মজুমদারের মা'র সঙ্গে আমার নিবিড় হৃদ্যতা এক-কালে গল্প-কথায় দাঁড়াইয়াছিল। তিনি এখন পরলোকে। হরিচরণের প্রথমা পত্নী দু'টি পুত্র-কন্যা কালিচরণ ও টুনুকে রাখিয়া, শাশুড়ীর অনুসরণ করিয়াছে। পাঁচ বছর পূর্ব্বে আসিয়া হরিচরণের দ্বিতীয়া পত্নী এবং তাহার কোলে একটি শিশু-সন্তানকে দেখিয়া গিয়াছি।

তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। ভাবিলাম, এক বার খবর লইয়া যাই।

মাটীর ক'টি কুটীরে ঘেরা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে আসিলাম। চারটি উলঙ্গ শিশু ধূলা লইয়া খেলা করিতেছে। ঘরের চালের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া তাদের শরীর খুব শীর্ণ।

আমার পায়ের শব্দে চকিতা হইয়া এক মলিন-বসনা তরুণী রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া আসিল। পাঁচ বছর দেখা-সাক্ষাৎ না থাকিলেও চিনিতে বিলম্ব হইল না।

প্রশ্ন করিলাম, "তোরা কেমন আছিস্ টুনু?"

সস্মিত মুখে মেয়েটি আমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বারান্দায় চটের আসন পাতিয়া জবাব দিল, "ভালো আছি দিদিমণি, ভাই-বোনগুলো সমানে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। তুমি এসেছো খবর পেয়েও তোমাকে প্রণাম করতে যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম, রান্না-খাওয়া মিটিয়ে রাত্রে যাবো।"

"তোমার মা কোথায়? বাবা কি করছেন? কালীকে দেখ্‌ছি না যে?"

"বাবা হাঁসপুকুরের আড়তে মাসখানেক হলো কাজ পেয়েছেন, অত-দূর থেকে রোজ আস্‌তে পারেন না। দু'-তিন দিন পর-পর আসেন। মা ওই ঘরে। মার আবার মেয়ে হয়েছে, এখনো আঁতুড় যায়নি। দাদা গেছে যুদ্ধে। পয়সা খরচ করে বাবা তাকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। তাই কোথাও চাকরি হলো না। যুদ্ধে যেতে কত বারণ করলাম, দাদা শুনলে না! বললে, না খেয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধে-মরা ঢের ভালো।" বলিতে বলিতে টুনুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। চোখে জল আসিয়াছিল, তাহা গোপন করিতে আমার কাছ হইতে সে উঠিয়া গেল।

বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম—কালী যুদ্ধে গিয়াছে! দেশ কাহার? দেশ রক্ষা করিবার দায় কাহাদের? যুদ্ধে যোগ দেওয়া একটা উপলক্ষ মাত্র। মূল কারণ অনাহার, অভাব। পিকুর বয়সী—পিকুরই খেলার সাথী! অভাবের তাড়না সহিতে না পারিয়া মরণ-যজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে গিয়াছে!

"মা!"

সহসা আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। চোখ তুলিলাম। দেখি, অর্দ্ধছিন্ন বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কঙ্কাল-সার মূর্ত্তি আমার অদূরে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি? বৌমা? তোমার কি হয়েছে? এমন চেহারা?"

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর শুনিলাম, "অসুখ-বিসুখে! আর—বছরে এক বার করে আঁতুড়ে ঢুকে আমার এই হাল! দুপুরে শুনলাম, আপনারা এসেছেন। শুনে খুব আহ্লাদ হলো। কত কাল পরে দেশে এলেন! শরীর ভালো আছে? বাড়ীর আর সকলে?" বলিয়া টুনুর বিমাতা ক্লান্তিভরে নিশ্বাস ফেলিল।

বিহ্বল নেত্রে তাহার পানে চাহিলাম। মনে পড়িল, মাত্র পাঁচ বছর পূর্ব্বে স্বাস্থ্যসম্পন্না এক নবীনা জননীকে দেখিয়াছিলাম। পাঁচ বছরে পাঁচটি সন্তান প্রসব করিয়া তাহার আজ এই মূর্ত্তি! যে রোগশীর্ণ শিশু ক'টি অনাহারে অবহেলায় ধূলায় বসিয়া ধুঁকিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? পরিণত বয়সের পুত্র, বয়স্কা কন্যার সম্মুখে যে প্রৌঢ় পিতা অসংযত চরিত্রের পরিচয় দিতেছে, তাহার স্থান সমাজের কোন্ স্তরে? পিতার দায়িত্ব যে বহন করিতে পারে না, কোন্ সাহসে সে পিতৃত্বের অধিকার চায়?

করুণায় বুক ভরিয়া গেল! বলিলাম, "তোমাকে এমন দেখবো তা ভাবিনি বৌমা! মানুষ যে ক' বছরের ভেতর এমন হতে পারে, ধারণা করতেও পারিনি!"

"কেমন করে পারবেন মা! যে দেখে, সেই ঐ কথা বলে। আমার তো এত দিন মরে যাবার কথা, বাঁচিয়ে রেখেছে ঐ টুনু! সম্পর্কে ও আমার মেয়ে, কিন্তু আমি জানি, আর-জন্মে ও আমার মা ছিল। মায়ের সেবা-যত্ন দিয়ে ঐ আমাকে মরতে দিচ্ছে না।"

টুনুর কথা বলিতে বলিতে টুনু আসিল, তাহার এক হাতে পাণ, অপর হাতে পাথরের বাটিতে গরম চা।

আমার সামনে চায়ের বাটি ধরিয়া কুণ্ঠিত স্বরে টুনু কহিল, "চাটুকু খেয়ে নাও দিদিমণি। গুড় দিয়ে তৈরি! খেতে পারলে হয়! আমাদের চিনি আসে না!"

বিবিধ উপকরণ-সংযোগে ক্ষণকাল পূর্ব্বে ধনীর প্রাসাদে চা পান করিয়া আসিয়াছি, এই গরীব মেয়েটিকে সে-কথা বলিতে পারিলাম না। সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া চায়ের বাটি গ্রহণ করিতে হইল।

চা খাইয়া পাণ তুলিয়া লইয়া দেখি, পাণের পাশে ভাজা মশলা।

বলিলাম, "তোমরা বুঝি পাণের সঙ্গে এই মশলা খাও?"

বৌমা কহিল, "না মা, আমরা কেউ দোক্তা-মেশানো মশলা খেতে পারি না। আপনি এসেছেন শুনে দুপুর-বেলা টুনু করে রেখেছে। বললে, দিদিমণি এলে তাঁকে পাণ দেবো কি দিয়ে? মশলা ছাড়া তিনি পান খেতে পারেন না।"

আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। পাঁচ বছরের অদর্শনেও ইহারা ভুলিয়া যায় নাই সন্ধ্যায় আমার চা-পানের অভ্যাস, পাণের সহিত খাই ভাজা মশলা। ঠাকুর-মায়ের সখিত্বের সম্বন্ধ ধরিয়া আজও ইহারা হৃদয়ে দরদ এবং প্রীতি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে! আর প্রতিদানে আমি কি করিয়াছি? কি করিতে পারিয়াছি? মহা-নগরীর আরাম-বিরাম-বিলাসে দরিদ্রের দীন স্মৃতিটুকু মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি!

ভালো করিয়া কথা বলিতে পারিলাম না। বৌমার আলাপের ফাঁকে-ফাঁকে সংক্ষিপ্ত হাঁ-না উত্তর দিয়া ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

ধূলায় ধূসরিত শিশু ক'টিকে সস্নেহে সযত্নে ধোয়াইয়া মুছাইয়া টুনু খাওয়াইতে বসাইল। কেহ খাইল জল-সাবু, কেহ শুক্‌নো রুটী, কেহ ভাত।

ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া মিটাইয়া তাহাদিগকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া টুনু মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল, বলিল, "এখন তোমার খাবার দিই মা, তুমি খেয়ে নাও। রাত বেশী হলে আবার হজম হ'বে না।"

বধূ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "তুমি খেয়ে নাও বৌমা, সত্যি, রোগা শরীরে দেরী করো না। আমি বস্‌ছি।"

পাথরের থালায় টুনু মায়ের খাবার আনিয়া দিল। রুটী, এক-বাটি ডালের জল, বেগুন-পোড়া, একটুখানি গুড়। ইহাই এই দরিদ্র প্রসূতির পথ্য, রোগীর আহার!

বলিলাম, "তুমি এখন খাবে না টুনু?"

"না দিদিমণি, এত সকালে আমি খেতে পারিনে। আমার আর সনাতন দাদার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখেছি, আমরা পরে খাবো।"

"সনাতন বুড়ো এখনো বেঁচে আছে? তোমাদের কাজ ক'রছে?"

বধূ বলিল, "টুনু তাকে কাজ করতে দেয় না। বাড়ী-খানা আগলে আছে এই পর্য্যন্ত। এখনকার মত তোমার কাজ সারা হলো টুনু? চিরুণী নিয়ে মা'র কাছে বোসো। কত কাল চুলে চিরুণী পড়েনি! চুলগুলো যে গেল। ঘরকন্না নিয়ে, ছেলে-পিলের রোগ নিয়ে এক-মিনিট সময় পায় না, যদি বা কখনো একটু-আধটু

বস্‌বার সময় হয়, তা কাটে বই নিয়ে। সময় নেই, পড়ানোর লোক নেই, তবু আপন-মনে পড়ার বই পড়ে যায়। আমার পোড়া কপাল, তাই এমন মেয়ের জন্য কিছুই করতে পারি না।"

বধূর আক্ষেপের জবাব না দিয়া টুনুর চুলের গোছা লইয়া বসিলাম। চুলে তেল নাই, চিরুণী নাই, তবু বিধাতার কি অপূর্ব্ব দান! কাপড় বলিতে মিলের মোটা শাড়ী, তাও সেলাই-করা। ভূষণের মধ্যে নিটোল বাহুমূলে দু' গাছা কাচের চুড়ি। সাজাইবার সঙ্গতি নাই, সাজিবার উপাদান নাই! অমার্জ্জিত অভূষিত তনু, করুণা-কোমল শান্ত-স্নিগ্ধ মুখখানি!

৪

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শয়ন করিলাম। আহারের ইচ্ছা বা প্রয়োজন ছিল না। শরীর এবং মন ক্লান্ত লাগিতেছিল।

পিকু জিজ্ঞাসা করিল, "খেলে না কেন দিদিমণি? শরীর ভালো নেই?"

"ভালোই আছি। চৌধুরী-বাড়ী থেকে জল খেয়ে এসেছি। খিদে নেই। বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

ঘুম কিন্তু আসিল না। নিস্তব্ধ রজনীর গভীর নীরবতায় আমার বিনিদ্র চোখের সামনে দু'খানি ছবি ভাসিতে লাগিল। একখানি প্রাসাদে বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা স্বচ্ছলতার আনন্দে ও গৌরবে উদ্ভাসিত-মুখী ফুল্লকুসুম-স্বরূপা লহরী! আর-একটি দরিদ্রের পর্ণকুটীরবাসিনী মমতায় মণ্ডিতা, করুণায় বিগলিতা নির্লিপ্তা উদাসিনী!

পরদিন সকালে চৌধুরী-বাড়ীর কাকিমার সঙ্গে আবার দেখা হইল। কাকিমা বলিলেন, "আমি ভোর হতে না হতে ছুটে এলাম মা, তুমি চলে আসবার পরে রাত্রেই লহরের গয়নার ফর্দ্দ করা হলো কি না। দিন-ক্ষণ পরে ঠিক হলেও সময় না পেলে এত গয়না হয়ে উঠবে না। লহর মোট চার-সেট গয়না চেয়েছে—সোনা-মুক্তোহীরে আর এ-কালের ঐ প্ল্যাটিনাম। আজকের ডাকেই ফর্দ্দ পাঠানো হবে কি না, তাই তোমার কাছে শুনতে এলাম। তুমি যদি কোনটা বদ্‌লে দিতে বলো, দেওয়া যাবে।"

বলিলাম, "যে পরবে, তার পছন্দেই গয়না হোক কাকিমা। আমি কিছু বদ্‌লাতে বলতে পারি না। পিকু রাজী হয়েছে, এ খবরটা আমারও দু' জায়গায় দিতে হবে। আপনি ঠাকুরঝির কাছে বসুন, আমি চিঠি দু'খানা লিখে আস্‌ছি।"

"না মা, বস্‌বার সময় এখন নয়। দশটার মধ্যে ফর্দ্দ না পাঠালে আজকের ডাকে আবার যাবে না।" এই কথা বলিয়া কাকিমা প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় এবং বোম্বাইয়ে চিঠি লিখিতে বসিলাম। পিকু দু'-এক বার পাশে আসিয়া সরিয়া গেল। আমি তাহাকে কিছু বলিলাম না, সে-ও কোন কথা বলিল না। আগের দিন পিকুর স্বীকারোক্তির পর আমি তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতেছি। আমার ভয় ছিল—অভিমানের ঝোঁকে সে যাহা বলিয়াছে, আমার আদরে-সোহাগে প্রসন্ন চিত্তে তাহা ফিরাইয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবে না! এখন এক বার 'না' বলিলে 'হাঁ' বলাইতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। লহরী আসিলে সময়ের অভাব হইবে না। মাঝের ক'টা দিন এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া কাটিয়া যাইবে।

দ্বিপ্রহরের অবকাশ কাটাইবার উপলক্ষে টুনুদের কুটীরে গেলাম।

শিশুর দল দিবানিদ্রায় মগ্ন, তাহাদের শিয়রে বসিয়া টুনু খোলা বইয়ে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া সকলকে পাখার বাতাস করিতেছে। বধূ দ্বারপ্রান্তে বসিয়া ছেঁড়া ন্যাকড়া জোড়া দিয়া ছোট একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিল।

আমাকে দেখিবামাত্র তাহার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। কাঁথা রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আসুন মা, এই ভরা দুপুরের রোদে কষ্ট করে এসেছেন! গা ঘেমে গেছে! টুনু, মাকে বারান্দায় পাটীখানা পেতে দে, বালিস এনে দে। ওখানে বেশ ঠাণ্ডা আছে, হাওয়া দিচ্ছে।"

টুনু-প্রদত্ত শীতল-পাটীতে বালিসে হেলান দিয়া বসিতে হইল। টুনুর হাতের পাখার বাতাসে আপত্তি করিতে পারিলাম না। ইহাদের আন্তরিকতার তুলনায় সাধারণ শিষ্টাচার নিতান্ত তুচ্ছ! প্রাণের আগ্রহে যেটুকু দিতে চায়, তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না।

বেড়ার গায়ে নূতন একখানা লাল-পাড় শাড়ী শুকাইতেছিল, সেটাকেই আলাপের সূত্র করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাপড় এসেছে কার জন্য? হাট থেকে আনিয়েছো?"

দু'দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, মুখের চেয়ে টুনুর হাতই চলে বেশী। মেয়েটি অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী, বাক্যে এবং ব্যবহারে খুব সংযত।

বধূ বলিল, "কাল রাত্রে আপনি চলে গেলে উনি এসেছিলেন কি না। কাপড়খানা উনিই এনেছেন। টুনুকে পরতে বল্লাম, ও আমাকে নিতে বল্‌ছে। বলে, ষষ্ঠীপুজোয়

পরো। আর তিন দিন পরে আমার আঁতুড় যাবে, তা এবার আর ষষ্ঠীপুজো করবো না মা! আমার ঘেন্না ধরে গেছে।"

সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "রাত্রে এসে হরিচরণ আজই আবার চলে গেছে? আসবে জান্‌লে সকালে এসে দেখা করতাম। কত কাল দেখিনি, দেখতে ইচ্ছা করে। তার শরীর ভালো আছে?"

টুনু কহিল, "তেমন ভালো নয়। তুমি এসেছিলে শুনে বাবা নিজেই দেখা করতে যেতে চেয়েছিলেন। ভোর বেলা দুর্গাদহে গেলেন কি না, তাই আর যেতে পারলেন না। আজ যদি ফিরতে পারেন, কাল সকালে তোমার কাছে যাবেন।"

"কাল যে বললে, হরিচরণ হাঁসপুকুরে চাকরি করছে, তবে আবার দুর্গাদহে গেল কেন?"

উত্তর না দিয়া টুনু পাণ আনিবার ছুতায় উঠিয়া গেল। বধূ যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম,—দুর্গাদহের বিখ্যাত জোতদার মহেশ্বর রায় প্রথমা-স্ত্রী-বর্ত্তমানেই টুনুর নারী-জন্ম সার্থক করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমার অপরাধ—পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনি পঞ্চ কন্যার জননী। মেয়েগুলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা পুত্র-কন্যা লইয়া সংসার করিতেছে। জোতদারের প্রথমা পত্নীর পুত্র হইবার বয়সও উত্তীর্ণ হইয়াছে। অথচ বংশ-রক্ষার জন্য, জোত-জমি ভোগ করিবার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। স্বামীর বাহাত্তুরে-রোগের যাতনায় স্ত্রী মনের দুঃখে কাশীবাসিনী হইয়াছেন। স্বামী সেই সুযোগে সত্বর শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার আশায় হরিচরণকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

স্তম্ভিত বসিয়া রহিলাম। হিন্দু সমাজের এত বড় জটিল সমস্যার কথা কালও আমার মনে স্থান পায় নাই। অনেকক্ষণ পরে তিক্ত স্বরে কহিলাম, "বাপ হয়ে হরিচরণ এমন কাজ করতে পারবে? ছিঃ।"

লজ্জায় মুখ নত করিয়া বধূ চুপে-চুপে বলিল, "উনি তো তাকে জবাবই দিয়েছিলেন মা, কিন্তু টুনু তাঁর 'না'-কে 'হাঁ' করিয়ে তবে ছাড়লে! বললে, গরীবের মেয়ের কপালে এর চেয়ে ভালো জুটতে পারে না। লোকের নিন্দা-কুৎসা টিট্‌কিরীর চেয়ে সে ঢের ভালো হবে। আমি ভয় দেখিয়ে তাঁকে অনেক কথাই বল্লাম। বল্লাম—'রায়-গিন্নী এখন যেন রাগ করে চলে গেছে, দু'দিন পরে ফিরে এলে তোর সঙ্গে যখন চুলোচুলি করবে?' মেয়ে হেসে খুন! বলে, 'সম্পর্ক যাই হোক না কেন, তিনি আমার মায়ের বয়সী। আমি তাঁকে মা'র মত ভালোবাসবো, মান্য করবো! তাঁর ঝি-চাকরের কাজ করবো! তিনি আমাকে স্নেহ করবেন।' আমি বল্লাম, 'তোর মা থাকলে তুই এ কথা মুখে আনতে পারতিস্ নে টুনু, মা নেই বলেই ও রকম জিদ ধরেছিস্।' তাতেও দমলো না। বললে, 'আমার মা নেই, ও-কথা বলো না মা। সে-মা থাক্‌লে তোমার চেয়ে কি আমায় বেশী ভালোবাস্‌তো?' আমি আর কি করতে পারি, বলুন? কেউ যে নিতে চায় না। গরীবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে গরীবরাও ভয় পায়। উনি বলেন, 'ওখানে পড়লে তবু টুনু আমার পেট ভরে দু'মুঠো খেতে পাবে, পরনের কাপড় পাবে; আমি তাকে কিছুই তো দিতে পারিনে। কোন্ সুখে, কিসের আশায় ওকে ঘরে রাখতে চাইবো?' বলিতে বলিতে বধূর শুষ্ক কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিল।

এমন সময় টুনু পাণ আনিয়া আমাকে দিল। পাণের খিলি মুখে দিলাম। মশলা খাইলাম। কিন্তু কোন স্বাদ পাইলাম না।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, উঠিতে হইল। টুনু চা খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

৫

পরের দিন হরিচরণ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। হরিচরণ আমার ছেলের বয়সী। অনাহারে অত্যাচারে বার্দ্ধক্য তাহার জীর্ণ দেহে সুপ্রকাশিত।

নানা অবান্তর কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়ের বিয়ে ঠিক হলো?"

"হ্যাঁ মা, ঠিক হলো। রায়-মশায় তাড়াতাড়ি সারতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু দিন পাওয়া গেল না। পনেরো দিন পরে একটা দিন আছে, তেমন ভালো নয়, তবু ঐ দিনই ঠিক করলাম। শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে দিলেও বিয়ের যোগাড় আছে। তা সময় পাওয়া গেল, এরমধ্যে সব ঠিক করে নিতে পারবো।"

"বিয়ের খরচের জন্যে আড়ৎদারের কাছ থেকে কিছু টাকা নেবে না কি?"

"না মা, সে সুবিধা নেই। ক' মাস চাকরি না থাকায় বড্ডই কষ্টে পড়েছিলাম। চাকরিতে ঢুকে দু'মাসের মাহিনা আগাম নিতে হয়েছে। এখন আর এক-পয়সাও পাবো না।"

ভাবিলাম, বিবাহের খরচটা হরিচরণকে এখনই দিয়া দিই। আমি উহার মাতৃস্থানীয়া, উহাকে সাহায্যদানের

অধিকার আমার আছে। কিন্তু কি উপলক্ষে দিব ? এ কি বিবাহ ? না, বলিদান ?

কিছু দিবার সংকল্পে আমি মৌন হইয়া আছি, কল্পনা করিয়া আশ্বাসের স্বরে হরিচরণ কহিল, "ভগবান্ মিলিয়ে দেন মা ! তাঁর রাজ্যে কিছুই আট্‌কে থাকে না। ঘরের সোনা-রূপোর কুচিটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ হয়েছে—ঘরে আর কিছু নেই। টুনুর মায়ের এক জোড়া মাকড়ী কালীর বৌয়ের জন্য বৌ লুকিয়ে রেখেছিল। আজ বার করে দেছে। সোনার যা দাম—ওটা বেচলেই আমার ঐ এক রাত্রির হাঙ্গামা সামলাতে পারবো।"

অপরিসীম বিতৃষ্ণার মধ্যেও হরিচরণের উপর একটু শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। বুঝিলাম, হীন হইলেও লোকটা ইতর ভিক্ষুক নয়।

হরিচরণকে বিদায় দিয়া পিকুকে কহিলাম, "চলো পিকু, কাল আমরা কলকাতায় ফিরে যাই। এখানে আর আমার ভালো লাগছে না।"

সবিস্ময়ে পিকু প্রশ্ন করিল, "কেন দিদিমণি ? মেজ-দিদি কি তোমাকে কিছু বলেছেন ?"

"না, তাঁর সঙ্গে তো আমি বেশী কথা কইনে। এমনি থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না।"

"ইচ্ছা না হলেও আরো ক'টা দিন থাকো দিদিমণি ! দিন-আষ্টেক পরে যখন আমি ফিরে যাবো, তখন আমার সঙ্গে গিয়ে কালীর বাড়ীতেই থেকো না হয়। দাদুকে বিপদের মধ্যে রেখে এসে তোমার ভালো লাগছে না, না ?"

প্রতিবাদ না করিয়া কথাটা নিঃশব্দে স্বীকার করিয়া লইলাম। কেন থাকিতে পারিতেছি না, তাহা পিকুর কাছে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সাধে আমি দরিদ্রের সংস্পর্শে যাইতে চাই না ! আমার আদরের স্নেহের পিকুকে যাইতে দিতে পারি না। দারিদ্র্য সংক্রামক ব্যাধি ! তাহার সংস্পর্শে মনের প্রফুল্লতা, হৃদয়ের সরসতা সব নষ্ট হইয়া যায়। চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া বেড়ায় শুধু নিরুপায় নিরন্নের সকরুণ মূর্ত্তি !

স্থির করিলাম, আর অগ্রসর হইব না। পিছাইয়া ঘরের কাজে মনঃসংযোগ করিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। চৌধুরী-বাড়ীর কাকিমা নিত্য নূতন ফর্দ্দ লইয়া নিয়মিত আসা-যাওয়া আরম্ভ করিলেন। বাড়ীতে আসন্ন বিবাহোৎসবের সম্ভাবনায় শশিকলা আনন্দে উৎফুল্ল।

আনন্দের আতিশয্যে সে-দিন শশী বলিল, "দেখ বৌ, তুমি উঠে-পড়ে পিকুর বিয়েটা আগে দিয়ে দাও। গাঁয়ের লোক কারো ভালো দেখতে পারে না। মেয়েকে যারা বিশ হাজার টাকার গয়নাই দেবে—তাড়াতাড়ি তাদের গেঁথে ফেলতে হয়। কোন গতিকে অমন মেয়ে হাতছাড়া হলে ওর জুড়ি কিন্তু আর খুঁজে পাবে না, তা বলে দিচ্ছি।"

"সত্যি কথা ঠাকুরঝি ! কিন্তু কোন গতিকে পিকু ওদের হাতছাড়া হলে ওরাও পিকুর মত আর-একটি পাত্র খুঁজে পাবে না।"

"তা বটে ! পিকু আমাদের হীরের টুক্‌রো ছেলে ! তবে একটা খুঁত রয়েছে—ব্যবসাদার। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বললে বুকখানা যেমন ফুলে ওঠে, এতে তা হয় না। তুমি বাপু দাদাকে তাড়া দিয়ে আর একখানা চিঠি লেখো, শীগ্‌গির বিয়ের দিন ঠিক করতে।"

তাড়া দিয়া আমাকে আর চিঠি লিখিতে হইল না। দু' জায়গা হইতে পত্রে আমার উপরেই তাড়া আসিল। পিকুর বাবা-মা লিখিয়াছে—

"পিকু তোমারই ! তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের মতামত চাহিয়া লজ্জা দিও না। যেখানে ইচ্ছা, বিবাহ স্থির করিও। দিন ঠিক হইলে জানাইও। আমরা নিমন্ত্রণ খাইতে যাইব।"

স্বামী লিখিলেন "এ-যাবৎ তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি সন্দেহ করিবার সুযোগ পাই নাই। পিকুর জন্য যাহাকে তোমার মন চায়, তাহাকে আনিবে। শুধু আমার একটি কথা, শুভ-কার্য্য স্থির করিতে বিলম্ব করিও না। বিলম্বে পিকুর মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আমি শীঘ্রই যাইতেছি।"

চিঠি দু'খানি শরতের বায়ু-হিল্লোলের মত আমার হৃদয়ের সমস্ত মেঘের রেখা মুছিয়া দিল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

অনেক দিন পরে পিকুকে ডাকিয়া বলিলাম, "চল্ পিকু, আজ একটু বেড়িয়ে আসিগে। সন্ধ্যা হয়ে এলো, একলা যেতে ভয় করছে।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া পিকু বলিল, "ভয় ! না আনন্দ ! এক দিন দাদুর চিঠি না পেয়ে কি কাণ্ডটাই তুমি না করলে দিদিমণি ! না ছিল হাসি-খুশী, না ছিল কথাবার্ত্তা ! আজকের চিঠিতে দাদু তোমাকে কি অমৃত-বাণী পাঠিয়েছেন, আমাকে দেখাও না !"

"বুড়ো-বুড়ীর প্রেম-পত্র আইবুড়োকে দেখাতে নেই।

বিয়ে হলে দেখাবো। আয় পিকু, দেরী করিস্‌নে, মজুমদারবাড়ী থেকে এক বার ঘুরে আসি। অনেক দিন যাইনি, দিন-চারেক পরে টুনুর বিয়ে হবে। খোঁজ-খবর নিতে হয়।"

"প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিতে হয় বৈ কি! তুমি একাই যাও, কাকী ত এখানে নেই, আমি যাবো কার কাছে? এইটুকু রাস্তা যাবে, ভয় কিসের দিদিমণি?"

"আমার কি জুজুর ভয়ের বয়স চলে গেছে পিকু? আয় না সঙ্গে, ভেতরে যেতে না চাস্—বাইরেই না হয় দাঁড়িয়ে থাকবি! তোর ভয় নেই রে! সেখানে আমি দেরী করবো না।" বলিয়া আমি পিকুর হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া আগাইতে লাগিলাম।

হরিচরণ বাড়ীতে ছিল। পিকুকে আদর করিয়া বারান্দায় বসাইল। পিকু কালীচরণের বন্ধু, এ বাড়ীতে তাহার অবারিত-দ্বার।

পিকুর পদপ্রান্তে প্রণামের জন্য টুনু নত হইতেই আমি তাহাকে আমার কোলের কাছে টানিয়া লইলাম। আমার হাতের হীরার বালা খুলিয়া টুনুর হাতে পরাইতে পরাইতে ডাকিলাম, "হরিচরণ, কাগজের মোড়কে আমি ধানদূর্ব্বা এনেছি, তুমি পিকুকে আশীর্ব্বাদ করো। পিকুর সঙ্গেই টুনুর বিয়ে আমি ঠিক করে ফেল্লাম।"

হতবুদ্ধি হরিচরণ আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। টুনু আমার দেহের উপর দেহ-ভার রক্ষা করিয়া পতনবেগ সংবরণের চেষ্টা করিল।

আমার স্নেহের পিকু, আদরের পিকুর আনত আননে পরিতৃপ্তির হাসি দেখিয়া তখনি চকিতে আমার সব সমস্যার পূরণ হইয়া গেল।

শ্রীগিরিবালা দেবী

হতাশ পথিক

প্রেমের মালার ঝরা ফুল-দল পড়ে রয়,
চলে যাই চুপে চুপে।
পরিচয়-হীন ঘরে করে যাই পরিচয়.
নব নব নামরূপে।
ফিরে যাই কোথা! রহিতে পারি না চিরদিন,
রহিবার কত সাধ!
এই আলো-ছায়া নয়নের কোণে হয় লীন,
নাহি হেরি দিন-রাত।

যেতে হয় দূর মহা আহ্বান-গীতে কার
পরপারে একা নামি।
অনাদি অতীত কাল হ'তে আসি ধরণীতে
প্রবাসীর মত আমি।
যাওয়া-আসা মোর বারে বারে হোলো কত বার
হিসাবের নাহি ঠিক।
ভুলে যাই সব,—আমি যার কাছে যাই,—তার
নাহি দেশ, নাহি দিক্।

যত বেণু বীণা পৃথিবীর পথে রেখে যাই
খুঁজিয়া পাই না ফিরে।
নিখিল ভুবন মোর কাছে বুঝি প্রাণহীনা
প্রাণ দিয়ে নিয়তিরে!.
কত বার এসে বেঁধে গেছি ঘর বাসনায়,
ঘর ভেঙ্গে গেছে সব;
যে জন এসেছে, তারি দিবা-নিশি-যাপনায়
সঁপে গেছি বৈভব।

আজিকে আমার আশা-ভরসারে রাখি নাই,
দিব না মনেরে মান।
জীবনের কোনো স্বপনের ছবি আঁকি নাই
বহিতেছি ভাঙ্গা প্রাণ।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতের কৃষিপণ্য বিপর্য্যয়

ভারতবর্ষ স্বভাবত: কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ও প্রতিপত্তিও প্রচুর; যদিও তাহার অধিকাংশই কুটীর-শিল্পের আকারে পরিচালিত। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের যত বৈচিত্র্য, তাহার একত্র সমাবেশ এখানে প্রচুর। "India is an epitome of the World"—অর্থাৎ, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্রাকারে একটি পৃথিবী! ঋতু-পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রায় সর্ব্ববিধ শস্য উৎপন্ন হয়। বনজ ও খনিজ সম্পদেও ভারতবর্ষ অতুলনীয়। বোম্বাই সহর হইতে মধ্য-ভারতের দক্ষিণ দিক্ দিয়া বিহার প্রদেশের পাটনা সহর পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিয়া ভারতের ভূমিকে মোটামুটি ভাবে এমন দুই ভাগে ভাগ করা যায় যে, ইহার দুই দিকে দুই বিভিন্ন প্রকৃতির শস্য জন্মায়। উত্তর-পশ্চিম ভাগে গম, যব, তিসি; এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে ধান, পাট, তিল। এই উভয় খণ্ডের এখানে-সেখানে কতক পরিমাণে কার্পাস ও ইক্ষু জন্মায়। ভারতের প্রধান কৃষি-সম্পদ্—ধান, গম, যব, জোয়ার-বজরা-রাগী, ভুট্টা, ছোলা, মুগ, মসুর, মটর প্রভৃতি ডাল; সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি, কার্পাস-বীজ, চীনা-বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি তৈল-বীজ; আদা, হরিদ্রা, লঙ্কা, মৌরী, ধনে, এলাচ, লবঙ্গ, দারু চিনি, গোলমরিচ, তেজপাতা, জৈত্রী, জায়ফল প্রভৃতি মশলা; চা, কফি, তামাক, ইক্ষু, রবার, সিন্‌কোনা, আফিং, তুঁত, কার্পাস, পাট প্রভৃতি তন্তুবৃক্ষ; এবং আম, জাম, কদলী, আনারস প্রভৃতি বহুবিধ ফল।

সর্ব্বজনবিদিত উৎপাদনের কাল, উপায় ও পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া আমরা প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্যের আলোচনা করিব। যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতের কৃষি-শিল্পের ব্যবসা-বিপর্য্যয়ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যে সকল খাদ্য-শস্য ও বাণিজ্য-ফসল আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতির দৃঢ় অবলম্বন; যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু, বহির্বাণিজ্যের বিপর্য্যয়ে তাহা, গত বর্ষে দুইটি বিভিন্নমুখী প্রভাবের বশীভূত হইয়াছিল। দেশাভ্যন্তরে যুদ্ধানুষঙ্গিক ও তদনুগামী অন্যান্য শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি হেতু প্রাথমিক উৎপাদনের, অর্থাৎ কাঁচা মালের কাটতি বাড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বাণিজ্যের কণ্ঠরোধ হেতু উদ্বৃত্ত পণ্যের রপ্তানী বন্ধ হইয়া মজুত মাল স্তূপীকৃত হইতেছিল। সেই সমস্ত কাঁচা মালের সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত শিল্প-সম্প্রসারণের অভাবে তাহাদের কিঞ্চিদংশ-মাত্র নাম-মাত্র মূল্যে ব্যবহৃত হইতে পারিত। ফলে, যুদ্ধ-হেতু উচ্চলাভের দুরাশা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসের পরে আতঙ্কজনক মূল্য-হ্রাস হেতু দুঃস্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পাট, চীনা-বাদাম এবং ইক্ষু প্রভৃতি কয়েকটি কৃষিজপণ্যের অসম্ভব উদ্বৃত্ত ক্রমশঃ রাশীকৃত হইয়া একটি ভূমি-সম্পর্কীয় সঙ্কটের সূচনা করিয়াছিল।

ঘটনাক্রমে যখন কাঁচা মালের চাহিদা কমিয়া যাইতেছিল, রহস্য-ময়ী প্রকৃতি সেই সময় ভারতকে সুপ্রচুর ফসল প্রদান করিয়াছিলেন। য়ুরোপের বাজার রুদ্ধ হইবার ফলে রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রকৃষ্টাংশ ব্যাহত হইয়াছিল। পরন্তু, মাল চালানী জাহাজের অনটনে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যও প্রতিহত হইয়াছিল। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আস্থাহীন হইয়া লোকে ক্রমবর্দ্ধমান পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত কাঁচা মালের অচির-অনিষ্টাশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই চাঞ্চল্যকে আতঙ্কে পরিণত করিয়াছিল; কারণ, হ্রস্ব-আঁস তুলা প্রভৃতি কয়েকটি কাঁচা মালের কাটতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে এই অঞ্চলে। অধিকন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের বর্ত্ম প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি ব্যবসায়ী মাত্রকেই সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। প্রাথমিক উৎপাদনের পাইকারি মূল্যের মান (Index) ১২৪ হইতে ১১২ অঙ্কে নিম্নগতি লাভ করিয়াছিল।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাস হইতে এই পরিস্থিতির তীব্রতা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্রব্য মূল্যও ক্রমে উচ্চাভিমুখী হইয়াছিল; কিন্তু বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব স্তর লাভ করিতে পারে নাই। আতঙ্কের প্রারম্ভে যে তিনটি বিষয়ে জন-সাধারণ সচেতন ছিলেন না, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। প্রথম—আমদানী-বাণিজ্যের প্রতিরোধ এবং যুদ্ধ-প্রয়োজনের তাগিদে দেশাভ্যন্তরে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার-হেতু কাঁচা মালের কাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়—য়ুরোপের বাজার বন্ধ হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষতি সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহে চাহিদা-বৃদ্ধি দ্বারা কিয়দংশ পূরণ হইয়াছিল। ব্রিটিশ ভারত হইতে সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিজ পণ্যের রপ্তানী যুক্তরাজ্য ব্যতীত সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৪১.৫৯ কোটি টাকা হইতে গত ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ৫১.৬১ কোটি টাকায়, অর্থাৎ শতকরা ২৪ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জাহাজ চলাচলের ব্যাঘাত হেতু ভারত হইতে যুক্তরাজ্যের ক্রয় হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে যুক্তরাজ্যের প্রেরিত রপ্তানী-বাণিজ্যের মোট মূল্য ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৭২.৪৮ কোটির তুলনায় ৬৪.৯৭ কোটিতে অবনত হইয়াছিল। তথাপি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-পরিকল্পে যুক্তরাজ্যের ক্রয়ের প্রভাব কম ছিল না। তৃতীয়ত:—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রগুলির প্রাথমিক উৎপাদকগণকে এই সঙ্কটে সাহায্য করিবার সদিচ্ছা ব্যবসায়ীদিগকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করিয়াছিল।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি-সম্পর্কে একটি যুদ্ধ-সঙ্কট বীমার পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা অচিরে বিক্রেয় দ্রব্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে আতঙ্ক নিবারণ করিয়াছিল। এই সঙ্গে যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশ-সমূহে, তৈলবীজ

রপ্তানীর কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে অধিকতর আদান-প্রদানের সুযোগ-সম্ভাবনা আবিষ্কারের নিমিত্ত মীক্‌-গ্রেগরীর দৌত্য, বিভিন্ন মিত্র ও নিরপেক্ষ দেশে বাণিজ্য-আমীন নিয়োগের প্রসার এবং চীনা-বাদাম উৎপাদনে সাহায্যার্থ একটি ভাণ্ডার স্থাপনও উল্লেখযোগ্য। রপ্তানী-রুদ্ধ রাশীকৃত উদ্বৃত্ত কাঁচা মালের যথাসম্ভব যুক্তিসঙ্গত সদ্ব্যবহারের প্রতি সরকারের মনোযোগ ও লোকের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। পাটের দর দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা সরকারের অবলম্বিত বিধি-নিষেধের প্রত্যেকটি যদিও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই; তথাপি তাহাদের প্রবর্ত্তন পাটের ব্যবসাকে বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কৃষকেরা যাহাতে উপযুক্ত মূল্য পায়, তজ্জন্য বাঙ্গালা সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে পাটের চাষ সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে প্রাদেশিক সরকার চীনা বাদামের চাষ সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা-সঙ্ঘ তৈল-বীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈলের নূতনতর সদ্ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। যুদ্ধোপকরণ-সরবরাহ বিভাগ সরকারের প্রয়োজনে হ্রস্ব-আঁসযুক্ত কার্পাস তূলা দ্বারা বস্ত্রাদি বয়ন করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার য়ুরোপের রুদ্ধ-বাজার-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত কফির নিরঙ্কুশ বিলি-ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি কফি-শাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল বিধি-ব্যবস্থার, অর্থাৎ দেশাভ্যন্তরে কাঁচা মালের চাহিদা-বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহে রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের বিধি-বিধানের ফলে বাজার-দরের স্থিরতা সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং বৎসরের শেষভাগে এই দৃঢ়তা অটল ছিল।

আলোচ্য বর্ষে চাউল ও গম ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য অনুভবযোগ্য ভাবে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাটের দর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কমিয়াছিল। প্রথম শ্রেণী পাটের গাঁইট পূর্ব্ব-বৎসরের ৬৬ টাকা হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৩৭ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ শতকরা ৪৪ অংশ কমিয়াছিল। সমস্ত ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের গড় পূর্ব্ব-বৎসরের ৬২ টাকার তুলনায় ৪১ টাকায় নামিয়াছিল। এম, জি, এফ, জি, ব্রোচ কার্পাস তূলা প্রতি কান্দি (Candy) পূর্ব্ব-বৎসরের ২১২ টাকা হইতে গত বর্ষে ১৯৮ টাকায় অবনত হইয়াছিল। য়ুরোপের বাজার বন্ধ হইবার ফলে চীনা-বাদামের দাম পূর্ব্ব-বৎসরের কান্দি প্রতি ৩২ টাকা হইতে গত বর্ষে ২২ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ শতকরা ৩১ অংশ হ্রাস পাইয়াছিল। সমস্ত বৎসরের গড় পূর্ব্ব-বৎসরের ২৯ টাকার তুলনায় ২৪ টাকা ছিল। তিসির দর অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল,—গড়ে হন্দর প্রতি ৭।৶৹ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা মাত্র শতকরা ১৩ অংশ কম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাউল এবং গম এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১নং বালাম চাউলের মূল্য মণ-প্রতি ৪৸৹ হইতে ৫৶৹ এবং সাদা গম ২৸৶৹ হইতে ৩৶৹ অঙ্কে উন্নীত হইয়াছিল। মোটের উপর অধিকাংশ কৃষিজ পণ্যের পক্ষে গত সরকারী বৎসর আদৌ সন্তোষজনক ছিল না।

এখন আমরা বিশেষ ভাবে কয়েকটি কৃষিজ পণ্যের আলোচনা করিব। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কৃষিজ সম্পদ পাট। এই পাটের উন্নতি অবনতির উপর বাঙ্গালার আর্থিক স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা নির্ভর করে। কাঁচা পাট ব্যবসায়ের পক্ষে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ একটি কঠোর পরীক্ষার বৎসর ছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ তিন মাসে পাটের বাজারে যে তেজী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল; এবং যুদ্ধ-প্রয়োজনে যে পণ্য স্বর্ণ প্রসব করিবে আশা হইয়াছিল, তাহার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ফসলের আনুমানিক পরিমাণ ৯৭ লক্ষ গাঁইট ছিল; এবং চটের কলগুলি সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা চলিতেছিল। কাঁচা পাটের সমষ্টি-পরিস্থিতি তখন উৎপাদকের স্বার্থের অনুকূল ছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন বৃটিশ সরকার বালির থলের সরবরাহ ৩০শে এপ্রিল হইতে ৩১শে অগষ্ট পর্য্যন্ত বিলম্বিত করিয়া কলওয়ালাদের মনে প্রথম নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেন, কাঁচা পাটের মূল্য-মন্দা তখনও ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরের অগ্রগতির সহিত অধিকতর নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়; এবং পাটের ব্যবসা বিপন্ন হয়। অত্যধিক উৎপাদন, মালচালানী জাহাজের অভাবে রপ্তানী-বাণিজ্যের সঙ্কোচ এবং য়ুরোপে বিক্রয়-বন্ধ বিপদ সৃষ্টি করে। পাট-প্রস্তুত পণ্যোৎপাদনের উপর উপর্য্যুপরি বিধি-নিষেধের প্রকোপে আভ্যন্তরীণ চাহিদার ক্রমিক অবনতি ঘটে; এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে বিপর্য্যয়ের উদ্ভব হয়, তন্নিরাকরণার্থ বাঙ্গালা সরকারের আগ্রহশীল কিন্তু বিফল প্রচেষ্টা মুস্কিল আসান করিতে অপারগ হয়। পাটের রপ্তানী-বাণিজ্য কি পরিমাণে প্রতিহত হয়, তাহা রপ্তানী-অঙ্কের হ্রাস হইতে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্ব-বৎসরের ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টনের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টন পাট রপ্তানী হয়। রপ্তানী-বাণিজ্যের সঙ্কোচ এবং পাট প্রস্তুত পণ্যের মজুত উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি হেতু কলওয়ালারা কঠোরতার সহিত উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয়েন। ফলে, কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি হইলে যে সঙ্কট কাটিয়া যাইত, চাহিদা হ্রাসের সহিত তাহার তীব্রতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে পূর্ব্ব-বৎসরের ১৩ লক্ষ টনের পরিবর্ত্তে কলওয়ালারা ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মরশুমে মাত্র ১০ লক্ষ টন কাঁচা পাট ব্যবহার করেন। কাঁচা পাটের বাজারে এখনও জোর মন্দা চলিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের উৎপাদনও প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকার বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া, বর্ত্তমান সঙ্কট মোচনের নিমিত্ত ভারত-সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছেন; কিন্তু সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই।

কার্পাস তূলার সমষ্টি-পরিস্থিতি ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের মরশুমের অধিকাংশ কাল অনুকূল ছিল। মরশুমের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বৎসরের উদ্বৃত্ত কম ছিল; এবং ফসলও কম জন্মিয়াছিল। ঐ বৎসর ফসলের পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ গাঁইট, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মরশুমের গড়ের তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ কম। যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভে অতিরিক্ত লাভের লোভে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়িয়াছিল। য়ুরোপের বাজার বন্ধ হওয়ায় যে শতকরা ২৫ অংশ তাহারা লইত, তাহাও রুদ্ধ হইয়া গেল। ফলে, পূর্ব্ব-বৎসরের ৩৬ লক্ষ গাঁইটের পরিবর্ত্তে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ২৩ লক্ষ গাঁইট মাত্র রপ্তানী হইয়াছিল। শ্রমিক-ধর্ম্মঘটের ফলে কাপড়ের কলের চাহিদা

৩০ লক্ষ গাঁইটে অধোগতি লাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১'৩২ লক্ষ গাঁইট কম। ফসল কম না হইলে উদ্বৃত্ত মজুত জমা অত্যধিক হইত। বাস্তব পক্ষে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের শেষে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত আয়ত্ত-বহির্ভূত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের গড় ১৯'৭৫ লক্ষ গাঁইটের তুলনায় ১১'৭১ লক্ষ হইয়াছিল। এইরূপে বিঘ্ন-বিপদের মধ্য দিয়া কার্পাস তুলার ব্যবসায় যুদ্ধারম্ভের প্রথম বৎসর অল্প-বিস্তর সফলতার সহিত অতিক্রম করিয়াছিল।

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের পরিস্থিতি তদপেক্ষা কম সন্তোষজনক ছিল। তুলার ফসল ৫৮ লক্ষ গাঁইট, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৮ অংশ অধিক হইয়াছিল। য়ুরোপের বাজার বন্ধ এবং সুদূর প্রাচ্যের চাহিদার অনিশ্চয়তা হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যে মন্দা প্রবল ছিল, এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাত মাসে, পূর্ব্ব-বৎসরের ঐ সময়ের ২'৪৪ লক্ষ গাঁইটের তুলনায়, ২'১৩ লক্ষ হইয়াছিল। মাল-চালানী জাহাজের অভাবে যুক্তরাজ্যে রপ্তানীও কমিয়া গিয়াছিল; এবং সুদূর প্রাচ্যের আশা-ভরসাও তিরোহিত হইতেছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা চীনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বৃদ্ধি অন্যান্য বাজারের ক্ষতির তুলনায় সামান্যই ছিল। তথাপি ভারতীয় কাপড়ের কলে বয়ন-বৃদ্ধি-হেতু কার্পাসের কাটতি বাড়িয়াছিল। ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ— এই সাত মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলের কাটতি ২০'৪৪ লক্ষ গাঁইটে, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কাটতি বৃদ্ধিহেতু বৈদেশিক চাহিদার ঘাটতি কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতীয় কার্পাসের উদ্বৃত্ত-সমস্যা তাহাতে নিরাকৃত হয় নাই।

য়ুরোপের যুদ্ধ-বিস্তৃতির সহিত চীনা-বাদামের রপ্তানী কঠোর ভাবে প্রতিরুদ্ধ হয়। ভারতের রপ্তানীর তিন-চতুর্থাংশ যাইত য়ুরোপে, সুতরাং এই পণ্যের পরিস্থিতি সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর হইয়াছিল। ফলে, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের রপ্তানীর সমষ্টি হইয়াছিল মাত্র ৩'৩১ লক্ষ টন, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ৩৮ অংশ; এবং যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৎসরের (১৯৩৮-৩৯) তুলনায় শতকরা ৬০ অংশ কম হইয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে চীনা-বাদামের মূল্য ভারতে যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কম ছিল এবং এই পণ্যের ব্যবসায়ে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাজার-দরের খুঁট অঙ্ক ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের ১০০ হইতে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ সংখ্যায় নামিয়া আসে; এবং আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৪৩ সংখ্যায় অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালায় যেমন পাট, বোম্বাইয়ে যেমন কার্পাস তুলা প্রধান পণ্য, মাদ্রাজে তেমনি চীনা-বাদাম। সেই মাদ্রাজে, যন্ত্রের দ্বারা খোলা-ছাড়ান বাদামের মূল্য ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের কান্ডি (candy) প্রতি ৩২।০ হইতে ধীরে ধীরে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮৸/৪ পাইতে অধোগতি লাভ করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কখনও এরূপ মন্দা ঘটে নাই। ফলতঃ, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে চীনা-বাদামের ব্যবসায়ে চরম দুরবস্থা ঘটিয়াছিল।

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে দুইটি ফসলের মরশুমকে দখল করিয়াছিল— ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১। শেষোক্ত কালে চীনাবাদামের উদ্বৃত্ত মজুত মালের পরিস্থিতি হইয়াছিল অত্যন্ত জটিল। প্রথমোক্ত মরশুমে বাজার-দরের হ্রাস কাট্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের সমস্ত ফসল বিক্রীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গত কয়েক বৎসর যাবৎ চীনা-বাদামের আভ্যন্তরীণ কাটতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় চীনা-বাদামের উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন হইতে ৩২ লক্ষ টনে নিম্নগামী হইয়াছিল এবং ইহার অধিকাংশই দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৈলনিষ্কাষণ-শিল্পের প্রসারই ইহার প্রধান কারণ। প্রমাণ, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-ভারত ৮'৭ মিলিয়ন গ্যালন বাদামী তৈল রপ্তানী করিয়াছিল, এবং ইহা পূর্ব্ব-বৎসরের রপ্তানী-অঙ্কের দ্বিগুণেরও অধিক ছিল। বর্ম্মা এই তৈলের শ্রেষ্ঠ গ্রাহক ছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ২'৪ মিলিয়ন গ্যালনের তুলনায়, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মা লইয়াছিল ৬'৪ মিলিয়ন গ্যালন অর্থাৎ শতকরা ১৭০ গুণ অধিক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ কাট্তি এবং তৈল-রপ্তানীর প্রসার ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের ফসলের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয় নাই; কারণ, ঐ বৎসর ফসলের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ হইতে শতকরা ১০ অংশ অধিক, এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে যদিও কিছু বাদাম য়ুরোপের বাজারে বিক্রীত হইয়াছিল, গত বর্ষে আদৌ তাহা ঘটে নাই। ফলে, মজুত মাল বৃদ্ধির সহিত মূল্য নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল। যুক্তরাজ্যের চাহিদাই তখন একমাত্র অবলম্বন ছিল। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য দুই লক্ষ টন চীনা-বাদাম লইয়াছিল; এবং এই অঙ্ক পূর্ব্ব-বৎসরের অঙ্কের প্রায় দ্বিগুণ।

যুক্তরাজ্য একটি নির্দ্দিষ্ট হারে অধিকতর পরিমাণে চীনা-বাদাম লইতে স্বীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু মাল-চালানী জাহাজ চলাচলের অসুবিধায় ইচ্ছানুরূপ মাল লইতে পারে নাই। ফলে, নূতন ফসলের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই বাজার-দর যুক্তরাজ্যের খাদ্যযোগান-মন্ত্রির-নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা ন্যূন হইয়াছিল। উৎপাদকের সাহায্যার্থ ভারত সরকারের বিনীত অনুরোধে যুক্তরাজ্য নির্দ্ধারিত হারের হ্রাস করিতে বিরত হইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে উৎপাদকের পরিবর্ত্তে চালানদারেরাই অধিকতর লাভবান্ হইতে লাগিল। তখন চালানদারদিগের নিকট হইতে তাহাদের ক্রয়-মূল্য এবং যোগান-মন্ত্রির-প্রদত্ত বিক্রয়-মূল্যের প্রভেদ অঙ্ক আদায় করিয়া, উৎপাদকগণের উপকারার্থ একটি সংস্থান-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্থবণ্টন দ্বারা উৎপাদকের সাহায্য একটি কঠিন কার্য্য। এই নিমিত্ত, প্রাদেশিক প্রতিনিধি লইয়া ভারত সরকার একটি বৈঠক আহ্বান করেন এবং তাহাতে স্বীকৃত হয় যে, প্রচারকার্য্যের দ্বারা বপনক্ষেত্রের সঙ্কোচ, উৎপাদনের হ্রাস, এবং উৎপাদিত বাদাম হইতে তৈল এবং খইল প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থের নিজের, ক্ষেত্রের এবং গৃহ-পালিত পশুর প্রয়োজনে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুক্তরাজ্য ও ভারত সরকার অর্থসাহায্যে স্বীকৃত হইয়া একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণাসঙ্ঘ শিল্প-প্রয়োজনে অধিকতর উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দ্বারা উদ্বৃত্ত মজুত-জমা তৈল-বীজের সমস্যা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। কিছু সুফলও ফলিয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষের শেষ হইতে চীনা-বাদামের মূল্য উর্দ্ধগামী হইয়াছে।

প্রতীচ্যে পোত ও বিমান-নির্ম্মাণ-শিল্পের প্রসার এবং মাখন ও চর্ব্বির অপ্রতুলতা হেতু, যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভে তিসির কাটতি বাড়িবে, এই আশা জন্মিয়াছিল। এই পণ্যে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জ্জেণ্টাইনে উৎপাদন কয়েক বৎসর কম হইতেছিল। কিন্তু য়ুরোপের বাজার বন্ধ হইবার ফলে, যুক্তরাজ্যে অধিকতর কাট্তি সত্ত্বেও, তিসির বাজারে মন্দা ঘটিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে তিসির চাষ শতকরা ৪ অংশ কমাইলেও, পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৫ অংশ অধিক উৎপাদন হইয়াছিল, এবং ঐ বৎসরের উদ্বৃত্ত মাল, পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভে, পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; ঘটনাক্রমে ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে আর্জ্জেণ্টাইনের উৎপাদনও অধিক হইয়াছিল। আর্জ্জেণ্টাইনে উদ্বৃত্ত মালও তখন প্রচুর জমা ছিল। আর্জ্জেণ্টাইনে মূল্য-হ্রাসের প্রতিক্রিয়া ভারতের বাজারেও প্রতিপত্তিশীল হইয়াছিল। তথাপি বাণিজ্যক্ষেত্রে চীনা-বাদামের ন্যায় সকল অসুবিধা ভোগ করিলেও মন্দার তীব্রতা তত তীক্ষ্ণ হইতে দেয় নাই। সমষ্টি-সংখ্যাও অনুকূল ছিল। মাল-চালানী জাহাজের অভাব সত্ত্বেও পূর্ব্ব-বৎসরের ১৭২ লক্ষ টনের তুলনায়, গত বর্ষে ২ লক্ষ টন তিসি যুক্তরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। মোট রপ্তানীও পূর্ব্ব-বৎসরের ২.১১ লক্ষ টনের তুলনায় ২.৩৮ লক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩.১৮ লক্ষ হইতে অনেক কম ছিল। চীনাবাদামের ন্যায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি হেতু কিঞ্চিৎ সুবিধাও ঘটিয়াছিল। তিসি তৈলের চাহিদা কমে নাই; সুতরাং তৈল-নিষ্কাষণ-শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছিল। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮½ লক্ষ গ্যালন তৈল সিংহল, বর্ম্মা, প্রণালী-উপনিবেশ এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার অর্দ্ধেকেরও কম এবং ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র রপ্তানী হইয়াছিল। তিসি-ব্যবসায়ীরাও হ্রাস-মূল্যে বিক্রয় করিতে বিরত হইয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। ফলে, বর্ষশেষে বাজার-দর যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৩ অংশ অধিক দাঁড়াইয়াছিল।

গম ও চাউলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সর্ব্বদেশে গমের প্রাচুর্য্য এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্কোচ হেতু গমের বাজার মন্দার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তেজীর প্রভাবও প্রকট হইত এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের তুঙ্গী-মূল্যকেও অতিক্রম করিত। গমের রাণী অষ্ট্রেলিয়ায় উৎপাদন হ্রাস-হেতু, ভারতের গমের বাজার গরম ছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতের ফসল ১০.৮ মিলিয়ন টনে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এই সম্ভাবনায় একটু সন্দেহ জন্মে; কিন্তু, নূতন ফসল বাজারে আসিতে আরম্ভ করিলে সে সন্দেহ দূর হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ ও ভারত-সরকারের প্রচুর গমের চাহিদা, সমুদ্র-পথের সঙ্কট-হেতু, অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা ভারত হইতেই অধিকতর পরিমাণে সরবরাহ হইবে, এই প্রত্যাশা এবং পারস্য-উপসাগর ও সুয়েজ বন্দরে নূতন রপ্তানী-ক্ষেত্র লাভ, ভারতের গম-ব্যবসায়কে বিশেষ সুযোগ প্রদান করে। পূর্ব্ব-বৎসরের ১৫০০ টনের তুলনায়, গত বর্ষে, বৃটিশ-ভারত হইতে ২৪,২০০ টন গম পারস্য উপসাগরের বন্দরে প্রেরিত হয়। চাউলের অপ্রাচুর্য্যতা হেতু গমের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও ছিল প্রচুর। দীর্ঘকাল বৃষ্টির অভাবে নূতন চাষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। এই সকল কারণে গমের বাজারে তেজী অবস্থা প্রবল ছিল। ফলে, আন্তর্জ্জাতিক বাজারে যখন চরম মন্দা, ভারতের রপ্তানী তখন পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা সাড়ে পাঁচ গুণ অধিক হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৭,৮০০ টনের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-ভারত হইতে গমের রপ্তানী হইয়াছিল ৪৫,০০০ টন। কিন্তু এই অঙ্ক ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের রপ্তানীর তুলনায় এক-ষষ্ঠাংশেরও কম ছিল। যাহা হউক, উপযুক্ত কারণ এবং নূতন ফসলের হ্রাস হেতু বর্ষশেষে গমের বাজার তেজী ছিল। গমের উপর আমদানী-শুল্ককেও আর এক বৎসরের নিমিত্ত অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে চাউলের চাহিদা যে প্রাচ্য দেশসমূহে অধিকতর হইবে, তাহা সকলেই আশা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বে জাপানে ও বর্ম্মা-বাজারে ভারতের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত চাউলের দর দৃঢ় ছিল। নবেম্বর হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যুদ্ধপূর্ব্ব হার হইতে চাউলের দর শতকরা ৮ অংশ অধিক হয়। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের ফসলের আংশিক ক্ষতিই এই মূল্য-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পূর্ব্ব-বৎসরের ২.৫৮ কোটি টনের তুলনায় গত বর্ষের উৎপাদন হইয়াছিল ২.১৮ কোটি টন অর্থাৎ শতকরা ১৫ অংশ কম। বহু বর্ষ এরূপ কম উৎপাদন ঘটে নাই। ভারতের ঘাটতি বর্ম্মা হইতে পূরণ হয়; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে মাল-চালানী জাহাজের অভাবে পূর্ব্ব-বৎসরের ১৮.৮৭ লক্ষ টনের তুলনায় ১২.০৭ লক্ষ টন মাত্র বর্ম্মা হইতে আমদানী হইয়াছিল। আমাদের অভাবের তুলনায় ইহা অত্যন্ত কম ছিল। তাহার পর বর্ত্তমান সরকারী বর্ষে বর্ম্মা শত্রুকরতলগত হওয়াতে আমাদের প্রধান খাদ্য-শস্য চাউলের অভাব কিরূপ তীব্র এবং তাহার ফল কিরূপ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিহীন দেশে

কবিহীন এই দেশে
রবিহীন আকাশের তলে,
হবিহীন দীপগুলি
শুধু শুষ্ক সলিতায় জ্বলে।

শ্রীকালিদাস রায়

বিজয়া-দশমীতে দশভুজার বিসর্জ্জনের পর বিজয়ার প্রণামালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে আমাদের গোবিন্দপুরে যে আনন্দোৎসাহ লক্ষিত হয়, কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পর তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান থাকে না। শরৎকালের উৎসব এই ভাবে শেষ হইলেও হেমন্তের নব-নব উৎসব আরম্ভের আর অধিক বিলম্ব নাই। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার এক পক্ষ পরেই দীপান্বিতা কালীপূজা। কালীপূজার পূর্ব্বদিন ভূতচতুর্দ্দশী; সে দিন সায়ংকালে পল্লীবাসী হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেই চোদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়া আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে। এতদ্ভিন্ন, গৃহিণীগণকে সে দিন চোদ্দ শাক রাঁধিতে হয়। ইহা মেয়েলী-প্রথা হইলেও এই উভয় কার্য্যেই গ্রামস্থ বালকগণ অক্লান্ত উৎসাহ প্রদর্শন করে। তাহাদের পাঠশালা স্কুল পূজা উপলক্ষে বন্ধ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর খুলিবে; এ জন্য তাহাদের অখণ্ড অবসর।

চোদ্দ-রকম শাকের কোন্ কোন্ শাক কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে—ইহা স্থির করিবার জন্য গ্রামের ছেলেরা তাহাদের কোন খেলার আড্ডায় পরামর্শ আরম্ভ করিল; তাহার পর সেই প্রভাতেই দুই-তিন জন মিলিয়া এক এক দল শাকের সন্ধানে এক এক দিকে চলিল। এক দল গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীরে আসিয়া ভটলা আরম্ভ করিল। বর্ষার সেই দুকূল-প্লাবী খরস্রোতা প্রবাহিনী আর নাই; সঙ্কীর্ণকায়া নদীর অগভীর জল এখন কাচের মত স্বচ্ছ। নদীর ধারে নরম মাটাতে শুশুনীর শাক জন্মিয়া সবুজ মখমলের মত বহু দূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপিপিগুলি খাদ্যদ্রব্যের অন্বেষণে তাহার উপর পুচ্ছ নাচাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুই-একটা বক জলের ধারে শ্যামল শৈবাল-আসনে বসিয়া যেন ধ্যানমগ্ন! দুই-একটা মাছরাঙ্গা পাখী উড়িয়া-আসিয়া হঠাৎ নদীবক্ষে ছোঁ মারিতেছে, এবং অগভীর জলে সন্তরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য চঞ্চুপুটে সঞ্চয় করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে তীরের দিকে যাইতেছে। একটা চীল নদীতীরস্থ শিমুল গাছের শাখায় বসিয়া একঘেয়ে করুণ স্বরে চিৎকার করিতেছে। নদীর অপর তীরে ধোপারা কাপড় কাচিতেছে; তাহারা এক-হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া নত দেহে পাটের উপর কাপড় আছড়াইতে আছড়াইতে মুখে অস্ফুট শব্দ করিতেছে। কেহ কেহ কাপড় কাচিয়া তাহা শুকাইবার জন্য নদীতীরে ঘাসের উপর বিছাইয়া দিতেছে। গ্রাম্য জেলেরা নদীর এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া খ্যাপ্‌লা জাল ফেলিতেছে; এবং জাল তুলিয়া পাব্‌দা, ট্যাংরা, পুঁটি, বেলে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকলে মাছ সংগ্রহ করিতেছে। নদীতীরে দুই-একখানি জেলে-ডিঙ্গী বাঁধা আছে, প্রভাতের সমীরণ-হিল্লোলে তাহা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। অদূরে পার-ঘাট। পথিকগণ খেয়া নৌকায় নদীর এক পার হইতে অন্য পারে যাইতেছে। কাহারও সম্মুখে এক হাঁড়ি দুধ, কাহারও কাঁধে এক ধামা চাউল।

নদীতীরে বসিয়া শুশুনীর শাক তুলিয়া তদ্দারা কোঁচড় পূর্ণ করিয়া ছেলেরা হেলাঞ্চা ও কলমীর শাক সংগ্রহের জন্য মল্লিকদের আমবাগানের প্রান্তবর্ত্তী পরিত্যক্ত পচা-পুকুরে চলিল। উহা হেলাঞ্চা ও কলমীদামে আচ্ছন্ন। ছেলেরা পুকুরের এক-হাঁটু জলে নামিয়া হেলাঞ্চা ও কলমী শাক সংগ্রহ করিল। ঐ তিথিতে কলমী শাক ভক্ষণ শাস্ত্রসম্মত না হইলেও মেয়েলী-প্রথা সম্মত।

গ্রামপ্রান্তে মাঠ। মাঠে রবিশস্যের আবাদ হইয়াছে। কোথাও ছোলার ক্ষেত, কোন ক্ষেতে মটর, মশুর, খেঁসারীর শ্যামল শোভা। ছেলেরা এই সকল ক্ষেত হইতে ছোলা, মটর, মশুর ও খেঁসারীর শাক সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় বাজারে আসিয়া মূলো-বিক্রেতার নিকট হইতে মূলোর শাক কিনিয়া আনিল।

এই ভাবে আট রকম শাক সংগৃহীত হইলেও আরও ছয় রকম বাকি; কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিতে তাহাদিগকে দূরে যাইতে হইল না। গ্রামে অনেক গৃহস্থ-বাড়ীতে নটে, পালম, চুকো (টক পালম), লাল কন্‌কা শাক বপন করা হইয়াছে। এই চারি রকম শাক সহজেই সংগৃহীত হইল। আরও দুই রকমের অভাব। এ জন্য কেহ চালের উপর হইতে কচি কচি লাউ-ডগা সংগ্রহ করিল, কেহ বা শজিনা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া শজিনা-শাক তুলিয়া আনিল, এবং এই ভাবে চোদ্দ শাকের অভাব পূরণ করা হইল।

এই দিন সন্ধ্যার পর প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে চোদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়া দীপসজ্জা করিতে হয়। গ্রাম্য কুমোরেরা এই দিন বাজারে মাটীর হাঁড়ি, মালসা ও কলসীর সঙ্গে মাটীর 'ডেলকো' বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। তাহারা এক-কুড়ি ডেলকো তিন-চারি পয়সায় বিক্রয় করে। গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী সায়ংকালে চোদ্দটি দীপ জ্বালিবার নিয়ম থাকিলেও সকলেই সাধ্যানুসারে সমগ্র বাড়ীই আলোকমালায় ভূষিত করে। পোড়া-মাটীর এই সকল ডেল্‌কোর আকার এরূপ ক্ষুদ্র যে, প্রত্যেকটি এক পলা তেলে প্রায় এক ঘণ্টা জ্বলিয়া থাকে। পল্লীবাসী যে সকল গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা ভাল ও যাহাদের সখ আছে—তাহারা বাজার হইতে এদিন দুই-তিন কুড়ি ডেল্‌কো কিনিয়া লইয়া যায়। যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা পয়সা-জোড়া রঙ্গীণ চর্ব্বির বাতি সংগ্রহ করিয়া তাহাই আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহার করিতেন; কিন্তু পল্লীগ্রামে এরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, এবং ব্রহ্মদেশাগত ঐ সকল বাতি এখন দুষ্প্রাপ্য।

যাহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা

নদীতীর হইতে এঁটেল মাটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুই এক দিন পূর্ব্বেই অবসর কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপ নির্ম্মাণ করে। দুই এক দিনের রৌদ্রেই তাহা শুকাইয়া যায়। তাহাতে একটি সরু শল্‌তে ও একটু তেল দিয়া সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক ঘরের বারান্দায়, বাহিরের ঘরের দ্বারের পার্শ্বে ও বিভিন্ন প্রকাশ্য স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে জ্বালিয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রদীপে কেহ সর্ষপ, কেহ বা রেড়ীর তেল ব্যবহার করেন। পল্লীগ্রামের এই দীপোৎসবে কোন গৃহস্থই কেরোসিন তৈল ব্যবহার করে না।

এই দিন সায়ংকালে গ্রামস্থ বাজারের ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক দোকান শ্রেণীবদ্ধ দীপের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। দোকানদারগণের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, যৎসামান্য মূলধনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান পরিচালিত করে, তাহারা দোকানের বারান্দা ও সোপানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডেল্‌কো জ্বালিয়া আলোকিত করে বটে, কিন্তু অবস্থাপন্ন দোকানদারগণ এ দিন স্ব স্ব দোকান আলোকমালায় ভূষিত করিতে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করে না। অনেকে এ বিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিয়া থাকে। দোকানের সম্মুখে কদলীতরু প্রোথিত করিয়া বাঁশের বাখারী দিয়া গেট প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহার উপর লাল, নীল, হলদে, সবুজ ফানসে বাতি জ্বলে। অনেকে দোকানঘরের কার্ণিশ আলোকমালায় সজ্জিত করে; কেহ কেহ কেরোসিন বা আলকাতরা-সংরক্ষিত ক্যানেস্তারায় নানাপ্রকার সহজদাহ্য পদার্থ রাখিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া গ্রাম্য বাজারের বহু দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করে। এই দিন সায়ংকালে বিভিন্ন নগরের বাজারে যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ আলোকসজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র বাজারের এই আলোকসজ্জা নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও অদূরবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিস্তর লোক দল বাঁধিয়া ইহা দেখিতে আসে; এবং এরূপ কৌতূহলভরে তাহা নিরীক্ষণ করে—যেন জন্মান্ধ চতুর্দ্দিকের কৌতুকাবহ আলোকপ্রভা সন্দর্শনের জন্য অল্পকালের জন্য দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, কত অল্পে ইহারা সন্তুষ্ট!

পল্লীবাসিগণের এই আনন্দ ও উদ্দীপনা পরদিনও সমভাবেই প্রবল থাকে, কারণ, ইহার পর দিন কালীপূজা। গ্রামে যে সকল গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল, তাহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্বে কালীপূজা করিত, এখন পূজার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী কালীপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রত্যেক পাড়ার কোন তেমাথা রাস্তার সংযোগ-স্থলে খানিক জায়গা কানাতে ঘিরিয়া ও চ্যাটাই দিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া বারোয়ারী কালীপূজার আয়োজন হয়। কোন কোন পাড়ার সৌখীন অধিবাসীরা নৃত্যগীতেরও আয়োজন করেন। কোথাও দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া ঢপ বা কবির গান হয়; আবার কোন কোন পাড়ার জনসাধারণ, কৃষক বা শ্রমজীবীরা নৌকার পাল বা সতরঞ্চি বিছাইয়া সেখানে বেহুলার গান আরম্ভ করে। সাধারণ পল্লীবাসীরা চারি দিকে বসিয়া সেই নৃত্যগীত উপভোগ করে। চাষার ছেলেরা কেহ লখিন্দর সাজে, কেহ বা কৃষ্ণ পরচুল মাথায় দিয়া, নীলাম্বরী সাড়ী পরিয়া ও বিবর্ণ ঘুঙুর পায়ে আঁটিয়া বেহুলা সাজে। কিন্তু চাঁদ সদাগর যখন হতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্র লখিন্দরের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া অশ্বারোহণে বৈবাহিক সবাহন সদাগরের গৃহে উপস্থিত হয় এবং সবাহন নাচিতে নাচিতে আসরে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে বলে—

"বেয়াই এলো ঘরে রে প্রাণ, বসতে দাও পিঁড়ে,
জলপান করতে দাও শালিধানের চিঁড়ে।"

তখন বেয়াইয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও চাঁদ সদাগর অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়া অশ্বসহ নাচিতে থাকে। সেই দৃশ্য দেখিয়া পল্লীর চাবাভুষোর দল—বালক-বৃদ্ধ সকলেই বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে! চাঁদ সদাগর যে অশ্বারোহণে বৈবাহিক-গৃহে আসে—সেই অশ্ব হইতে তাহার নামিবার উপায় থাকে না; কারণ, এক জন লোক ঘোড়ার মুখোস পরিয়া কুঁজা হইয়া দাঁড়াইয়া নাচিতে থাকে, আর চাঁদ সদাগর তাহার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া নৃত্য করে। উভয়ের দেহ লোহিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকায় দর্শকগণের মনে হয়, সদাগর অশ্বারোহণেই নৃত্য করিতেছে।

আমাদের পল্লী অঞ্চলে মালীরাই কালী, কার্ত্তিক প্রভৃতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, এবং তাহারাই ডাকের সাজে প্রতিমা সজ্জিত করে। যে সকল গৃহস্থ কালীপূজা করিবে, তাহারা কালীপূজার দিন অপরাহ্ণে দুই একটি ঢোল ও কাঁসি বাজাইয়া সুসজ্জিত প্রতিমা মালী-বাড়ী হইতে কিনিয়া লইয়া যায়। গৃহস্থরা কালীপূজার রাত্রে আত্মীয়-বন্ধু ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লুচির ফলারে পরিতৃপ্ত করেন। যাঁহারা শাক্ত, কেবল তাঁহাদেরই বাড়ীতে দেবীর সম্মুখে পাঁঠা বলি হয়। গ্রামে অনেক বাড়ীতে কালীপূজা হইলেও মাত্র দুই পাঁচ জনের বাড়ী পাঁঠা বলি হইতে দেখা যায়। অনেক গৃহস্থ নিজের বাড়ীতে পূজার আয়োজন না করিয়া গ্রাম্য-দেবতা সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দিরে আসিয়া ঢাক, ঢোল বাজাইয়া, ও জোড়া-পাঁঠা বলি দিয়া দেবীর পূজা করিয়া যায়। কালীপূজার রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে পূজার ঘটা দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হয়। মানতের বলির পাঁঠার রক্ত রাজপথ পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিয়া ধূলারাশিকে রঞ্জিত করে। নিতাই দাস বাবাজী তাঁহার আখড়া হইতে সে সময় বাজারে আসিতে হইলে মুখ ঢাকিয়া ও কানে আঙুল দিয়া, বহু দূর ঘুরিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন।

কালীপূজার পর দিন কোন কোন গৃহস্থ বিনা-আড়ম্বরে কালী-প্রতিমার বিসর্জ্জনের জন্য নদীতে পাঠাইয়া থাকেন। কোন কোন প্রতিমার সঙ্গে একটি ঢোল ও একখানি কাঁসি থাকে; কিন্তু অধিকাংশ প্রতিমাই পূজার পর দিন অপরাহ্ণে ঢাক, ঢোল, কাঁসি ও সানাই সহ গ্রাম ঘুরাইয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে নীত হইয়া থাকে; সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরের আঙ্গিনায় তাহা নামাইয়া রাখা হয়। এই ভাবে গ্রামের সকল পাড়ার প্রতিমা বাদ্যভাণ্ড সহকারে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপিত হইলে সকলের শেষে ইংরেজ জমিদার-কোম্পানীর সদর নায়েব সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্যের সুবৃহৎ কালী-প্রতিমা ঢাক, ঢোল, চড়বড়ে, কাঁসি, খাস, নিশান, আশা-সোটা সহ গ্রাম ঘুরিয়া সিদ্ধেশ্বরী-তলায় আসিলে সকল প্রতিমা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নায়েব-বাড়ীর প্রতিমার অনুসরণ করে। তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে সকল প্রতিমাই নদীগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়; কিন্তু সৃষ্টিধর নায়েবের প্রতিমা যে পল্লীবাসী অন্যান্য গৃহস্থের প্রতিমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাহা নদীবক্ষে নৌকায় উত্তোলিত হয়, এবং বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া মহা-সমারোহে সেই নৌকারূঢ় প্রতিমার আরতি হয়। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী নায়েব সেই নৌকার এক প্রান্তে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন; পট্টবস্ত্রের

অন্তরালে তাঁহার ভক্তি-বিহ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র বলিয়াই অনেকের মনে হয়!

কালীপূজার উৎসব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব আরম্ভ হয়। সে দিন প্রত্যেক পরিবারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কি আনন্দ! ছোট ছোট ছেলেরা ফোঁটা লইবে বলিয়া সকালে অনাহারের কষ্ট সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত নহে। তাহারা ধোয়া ধুতি-চাদরে সজ্জিত হইয়া গম্ভীর ভাবে আসনে বসিয়া থাকে; তাহাদের দিদিরা প্রত্যেকের জন্ম এক এক ডিস সন্দেশ, দূর্ব্বা, ধান, চন্দন লইয়া তাহাদিগকে ফোঁটা দিতে বসেন। ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ময়রার দোকানে নূতন খেজুর গুড়ের সন্দেশ, ছাপার সন্দেশ, রথ, হাতী, পাখী, বিড়াল, মাছ প্রভৃতির ছাঁচ—এতদ্ভিন্ন, নূতন কাঁসি-খাজাও উঠিয়া থাকে। এই খাজা অত্যন্ত মুচমুচে, এবং ভাজা তিলে আবৃত। ইহার নাম 'কাঁসি খাজা' কেন হইল, তাহা জানিতে পারি নাই। ছোট ছোট ছেলেরা পরম গম্ভীর ভাবে তাহাদের দিদির নিকট ফোঁটা লইতেছে। যাহাদের বয়স কিছু বেশী, তাহাদের সন্দেশের রেকাবীতে পান ও পানের নানা রকম মশলা দেওয়া হইয়াছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে গিন্নীরা নানা প্রকার তরিতরকারী রাঁধিয়া থাকেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর কার্ত্তিকপূজা। পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থই কার্ত্তিকপূজা করেন; অনেক নিঃসন্তান নারী পুত্র-কামনায় কার্ত্তিকের মানস করেন, এবং তিন বৎসর বা চারি বৎসর কার্ত্তিক-পূজা করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই কয়েক বৎসর পূজা করেন। এই পূজা উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করা হয় না, যৎসামান্ত অর্থব্যয়ে পূজা শেষ করা হয়। নিষ্ঠাবতী বিধবারা সে দিন উপবাস করেন, এবং কার্ত্তিকের নিকট একটি নূতন হাঁড়ি ও চাল, ডাল, লবণ, তেল প্রভৃতি সিধা প্রদান করেন। এই হাঁড়িকে 'বরের হাঁড়ি' বলে। কার্ত্তিকপূজার পর দিন তাঁহারা সেই হাঁড়িতে ভাত রাঁধিয়া তদ্দ্বারা উপবাস-ভঙ্গ করেন। যাঁহাদের বাড়ীতে কার্ত্তিকপূজা হয় না, সেই বাড়ীর বিধবারা কোন প্রতিবেশীর বাড়ী 'বরের হাঁড়ি' কার্ত্তিকপূজার অন্যান্য উপকরণের নিকট রাখিয়া আসেন; কার্ত্তিক-পূজার পরদিন সেই হাঁড়ি ও সিধা বাড়ীতে আনিয়া আতপান্ন রাঁধিয়া নিয়ম পালন করেন।

গ্রামস্থ মালীদের প্রত্যেকেই বিক্রয়ের জন্য কুড়ি পঁচিশখানা কার্ত্তিক-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দোকানঘরে সাজাইয়া রাখে। যাঁহারা কার্ত্তিকপূজা করেন—তাঁহারা পূজার দিন অপরাহ্নে নগদ মূল্যে মালী-বাড়ী হইতে কার্ত্তিক কিনিয়া লইয়া যান, এবং তাহা নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় দ্বারা সজ্জিত করেন; কেবল জমিদার-কোম্পানীর নায়েব সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতেই রাজকার্ত্তিক নির্ম্মিত হয়। সৃষ্টিধরের পুত্রসন্তান নাই, একমাত্র কন্যা রাজলক্ষ্মী তাঁহার সংসারের অবলম্বন। সৃষ্টিধর পুত্রকামনায় প্রতি-বৎসর বৃহদাকার রাজকার্ত্তিক নির্ম্মাণ করাইয়া সমারোহে পূজা করেন। এই রাজকার্ত্তিকের দুই পার্শ্বে দুইটি সালঙ্কারা সখী, ও তাহার ঊর্দ্ধস্থ 'থাকে' দুইটি সশস্ত্র অশ্বারোহী প্রহরী দাঁড়াইয়া থাকে। রাজকার্ত্তিকের ময়ূরটির বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ-যোগ্য। তাহারও আকার বৃহৎ, তাহার পদতলে একটি উন্নতফণা সর্প কুণ্ডলী-পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। ময়ূরের দেহ, ময়ূরের পালকে আবৃত, এবং তাহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ ময়ূর-পুচ্ছ সুকৌশলে আঁটিয়া দেওয়া হয়, দেখিলেই মনে হয়—সেটি সজীব ময়ূর!

সংক্রান্তির পর দিন অপরাহ্নে গ্রামস্থ গৃহস্থগণের কার্ত্তিকের 'আড়ং' বাহির হয়; বাহকগণ কার্ত্তিকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহন করিতে থাকে। প্রত্যেক কার্ত্তিকের ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানাই প্রভৃতি তাহার আগে আগে চলিতে থাকে; কিন্তু নায়েবের রাজকার্ত্তিক অন্যান্য কার্ত্তিকের পুরোবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করেন। গ্রামের কোন অধিবাসীই নায়েবের রাজকার্ত্তিকের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করেন না! নায়েবের কার্ত্তিকের আগে আগে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, এবং খাস নিশান প্রভৃতি প্রতিমার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া নায়েবের ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর ও পদমর্য্যাদার পরিচয় প্রদান করে। যে আট জন বলবান্ বাগ্দী-বাহকের স্কন্ধে রাজকার্ত্তিকের সিংহাসন স্থাপন করা হয়, তাহাদের পশ্চাতে নায়েবের একটি ভৃত্য কার্ত্তিকের ময়ূরটির পুচ্ছ পরিচালিত করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে; ময়ূর-পুচ্ছের প্রান্তভাগ যে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাহা আকর্ষণ করিতেই পুচ্ছগুচ্ছ সঙ্কুচিত হইয়া একত্র গুটাইয়া আসে; আবার রজ্জুর আকর্ষণ শিথিল করা হইলে সমগ্র পুচ্ছ ময়ূরের পশ্চাদ্ভাগে কার্ত্তিকের চালির আকারে প্রসারিত হয়,—যেন ময়ূরটি পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ও ঢোলে নাচের বাজনা বাজিতে থাকে; রাজকার্ত্তিকের বাহকগণও নাচিতে নাচিতে গন্তব্যপথে অগ্রসর হয়। মনে হয়, কার্ত্তিক নাচিতে নাচিতে যুদ্ধে চলিয়াছেন! অন্যান্য কার্ত্তিকও তাহার পশ্চাতে সেই ভাবেই নাচিতে থাকে। পথের দুই ধারে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকারা দলবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে কার্ত্তিকগুলির শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করে। পল্লী অঞ্চলে কার্ত্তিকের এই 'আড়ং' বা শোভাযাত্রা 'কার্ত্তিকের লড়াই' নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কি অর্থে এত কাল ধরিয়া এই অভিযানকে 'কার্ত্তিকের লড়াই' বলা হইতেছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না; সম্ভবতঃ, কার্ত্তিকের যুদ্ধযাত্রার অনুরূপ বলিয়াই শোভাযাত্রা এই নামে পরিচিত।

গ্রামের সকল পথ ঘুরাইয়া শ্রেণীবদ্ধ কার্ত্তিকগুলি নদীতীরে আনীত হইলে প্রত্যেক কার্ত্তিকের দেহস্থিত বস্ত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি খুলিয়া লওয়া হয়। নায়েব-বাড়ীর রাজকার্ত্তিকের রাজবেশ, মাথার তাজ, হাতের তীরধনু, সখীদের মাথার ওড়না ও পরিচ্ছদ, ময়ূরের পালকগুলি ও সুদীর্ঘ পুচ্ছ সতর্ক ভাবে খুলিয়া লওয়া হইলে, সকলের শেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীজলে তাহার বিসর্জ্জন হয়। অতঃপর ঢাক-ঢোলগুলি বিসর্জ্জনের করুণ বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে; সানাই যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনানী-পরিবেষ্টিত সন্ধ্যাধূসর গ্রাম্যপথে দেবসেনাপতির অন্তর্দ্ধানবার্ত্তা বিঘোষিত করে।

কার্ত্তিকপূজার কয়েক দিন পরেই সমগ্র গ্রামখানি জগদ্ধাত্রী-পূজার উৎসবানন্দে পুনর্ব্বার উৎফুল্ল হইয়া উঠে; কিন্তু জগদ্ধাত্রী-পূজা অতি কঠিন পূজা—এই ধারণায় দুই চারি জন গৃহস্থ ভিন্ন অন্য কেহ জগদ্ধাত্রী-পূজার আয়োজন করিতে সাহস করেন না। গ্রামে প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-পূজার আয়োজন করিতে হয়, এজন্য কাহারও কাহারও পূজায় দৈবাৎ কোন না কোন ক্রটি থাকিয়া যায়; যাহাদের পূজায় ঐরূপ ক্রটি

ঘটে, দেবীর অভিসম্পাতে তাহাদিগকে নির্ব্বংশ হইতে হয়। জগদ্ধাত্রীপূজা করিয়া কেহ কেহ নির্ব্বংশ হইয়াছেন, গ্রামের মুরুব্বিরা তাহারও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন; তাহা এতই সুস্পষ্ট যে, কেহই তাহা অবিশ্বাস করিতে পারে না। গ্রামের কোন কোন ধনাঢ্য পরিবারের বিধবা 'মানসিক' করিয়া উপর্য্যুপরি তিন চারি বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজা করিয়া থাকেন; হঠাৎ কোন বৎসর পূজা 'পড়িয়া যাওয়া' অর্থাৎ কোন কারণে পূজা বন্ধ রাখা অত্যন্ত দোষের বলিয়া, যিনি উপর্য্যুপরি যে কয় বৎসর পূজা করিতে পারিবেন—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকেন, তিনি কেবল সেই কয় বৎসরের জন্যই এই ব্রত গ্রহণ করেন; কিন্তু সাধারণতঃ তাহা পাঁচ বৎসরের অধিক হয় না। যদি এই সময়ের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি লাভ করেন, অবশিষ্ট কয়েক বৎসরের পূজা তাঁহাকেই চালাইতে হয়। তিনি অসমর্থ হইলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সে-কালে গোবিন্দপুরে কোন কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া দুর্গোৎসব করিতেন; একালে ভিক্ষালব্ধ অর্থে উদরান্নেরই সংস্থান হয় না, পরের সাহায্যে কে দুর্গোৎসব করিবে? যাট্‌ পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার বাল্যকালে মধু নাপিত ঠাকুরদাদাকে কামাইতে বসিয়া ক্ষুরে তাঁহার গাল কাটিয়া দিলে ঠাকুরদাদা তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করেন; মধু ক্ষুর নামাইয়া রাখিয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, "আর কর্ত্তা! সাত সিকে থেকে ন'-সিকে চালের মণ হলো, কাচ্চা-বাচ্চাগুলো এবার না খেয়ে মরবে! এ কথা মনে হ'লে কি আর হাত ঠিক থাকে?"—আজ দশ টাকা চাউলের মণ! মধু আজ বাঁচিয়া থাকিলে ক্ষুরখানা ঠাকুরদাদার গাল হইতে সরাইয়া-লইয়া নিজের গলায় দিত!

গোবিন্দপুরে জগদ্ধাত্রী-পূজায় বিশেষ সমারোহ না হইলেও এই উৎসব গ্রামবাসিগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, আমাদের বাল্যকালে সিভিল সাহেবের নায়েব ধনঞ্জয় চৌধুরীর বাড়ী জগদ্ধাত্রী-পূজায় যে সমারোহ হইত, তাহার কাহিনী বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রামস্থ বৃদ্ধগণের সান্ধ্য-বৈঠকে সোৎসাহে আলোচিত হইত।

এই সিভিল সাহেবের অনেক গল্প আমরা বাল্যকালে শুনিতে পাইতাম। সে কালে দুই জন ইংরেজ গোবিন্দপুরের অধিবাসিবর্গের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছিলেন; এক জন আমাদের মহকুমার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জে, ডি এণ্ডারসন। তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসানকালে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনর হইয়াছিলেন, তিনি এ দেশের লোকের এতই প্রিয় ছিলেন যে, অনেকে তাঁহাকে এণ্ডারসন না বলিয়া 'ইন্দ্রসেন' নামে অভিহিত করিতেন। তিনি বঙ্গভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, সিভিল সার্ব্বিসের অবসানে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ফৌজদারী হাকিম গ্রামের শিক্ষিত অধিবাসিগণের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন, এবং তাঁহারই উৎসাহে কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি ফাল্গুন মাসে আমাদের গ্রামে মহাসমারোহে যে 'বসন্ত-মেলা' হইয়াছিল, সেই মেলায় এক বৎসর কলিকাতার 'বেঙ্গল থিয়েটার' দ্বারা বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনী তাহার অল্প দিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পল্লীর জনসাধারণ যাহাতে এই নব-প্রকাশিত উপন্যাসের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে জগৎসিংহ, ওসমান, কতলু খাঁ, এবং কোন কোন নায়িকার মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। মিঃ এণ্ডারসনের ন্যায় জনপ্রিয় ও বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এ কালে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে যে সিভিল সাহেবের কথা বলিয়াছি, তিনি নীলকর ছিলেন। তাঁহার নাম জন সিভিল কি জেম্‌স সিভিল ছিল—এত কাল পরে তাহা স্মরণ নাই। শুনিয়াছি, তিনি টুপি ও এক লাঠী সম্বল করিয়া ব্যবসায় করিবার জন্য বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের গ্রামের কয়েক মাইল দূরে এক নীলকুঠী স্থাপন করিয়া নিজের নামানুসারে গ্রামের নাম দিয়াছিলেন, 'সিভিল নগর।' স্থানীয় অধিবাসীরা 'সিভিলগঞ্জ'ও বলে। সিভিল সাহেব দীর্ঘকাল নীলের আবাদে নিযুক্ত থাকিলেও অন্যান্য নীলকরের ন্যায় নিষ্ঠুর ও প্রজাপীড়ক ছিলেন না; অথচ সুদীর্ঘ কাল নীলের আবাদ করিয়া, পরিণত বয়সে যখন তাঁহার জমিদারী ও কুঠী জিলার কোন বাঙ্গালী জমিদারের নিকট বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন আমরা নয় দশ বৎসরের বালক। সেই সময় শুনিয়াছিলাম—নয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া তিনি সোনার ভারত ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগকে স্নেহ করিতেন, এবং তাহাদের দুঃখ-বিপদে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন; তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। এই শ্রেণীর সহৃদয় ও মুক্তহস্ত ইংরেজ একালে এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাল্যকালে তাঁহার সহৃদয়তার অনেক গল্পই শুনিতে পাইতাম।

এক বার নায়েব ধনঞ্জয় চৌধুরী তাঁহার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী-পূজা দেখিতে যাইবার জন্য সিভিল সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন; অন্য কোন নীলকরকে নিমন্ত্রণ করিতে নায়েব ধনঞ্জয়ের সাহস হইত না; কিন্তু ধনঞ্জয় মনিবের সহৃদয়তার বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন, এই জন্যই সাহেবকে তিনি এই অনুরোধ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সিভিল সাহেব বলিলেন, "ওয়েল ডোনঞ্জয়, হামি টোমার বংগালী লোকের ফলার ভক্ষণ করা ডর্শন কোরিবে—ইহা হামার ডীরগ কালের খোস্। টুমি জয়গড় টার্টির পূজায় টোমার বরামহান লোকের ফলার ভক্ষণ আমার চক্ষুর সম্মুখে ষ্টাপন করো।—হামার কথা টুমি বুঝিতে পারিলো?"

নায়েব বলিলেন, "হাঁ হুজুর, আমার চণ্ডীমণ্ডপের সামনে সামিয়ানার নীচে ব্রাহ্মণভোজনের স্থান হবে; কিন্তু সেখানে ত আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো না, তবে আপনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারবেন।"

সিভিল সাহেব এই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়া পদ্মের পাতায় লুচির ফলার করিলেন। সাহেব তাঁহার ঘোড়া হইতে নামিয়া দেউড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণভোজন দেখিলেন; কিন্তু দেখিয়া খুসী হইতে পারিলেন না। তিনি নায়েবকে ডাকিয়া জানাইলেন, 'বংগালী লোক' ফলার করিবার সময় মুখ হইতে 'গপ্‌-গপ্‌' 'হাপুস্‌ হুপুস্‌' শব্দ উচ্চারণ করে—এ কথা শুনিয়াই তিনি ব্রাহ্মণভোজন দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না, ইহার কারণ কি?

ধনঞ্জয় নায়েব মাথা চুলকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ব্রাহ্মণরা লুচির ফলার করিলেন, উহাকে পাকা ফলার বলে;

পাকা ফলারে ঐরূপ শব্দ হয় না। যাহারা কাঁচা ফলার করে, অর্থাৎ দৈ দিয়া চিঁড়া-মুড়কি মাখিয়া আহার করে, তাহাদের মুখ হইতে আহার-কালে ঐরূপ শব্দ হয়। কিন্তু উহা সাধারণ লোকের ফলার; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে চিঁড়া-দৈ খাইতে দেওয়া যায় না। ভদ্রলোকরা 'কাঁচা ফলার' খাইতে আসেন না।

সাহেব চিঁড়া-দৈএর ফলার দেখিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পর দিনই ঐরূপ ফলারের আয়োজন করিতে বলিলেন। নায়েব জানাইলেন, এজন্ম পূর্ব্ব হইতে যোগাড় করিতে হয়, চিঁড়া কুটাইতে হয়, গয়লা-বাড়ী দধির বরাত দিতে হয়; কিন্তু প্রতিমার বিসর্জ্জনের পর পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। সাহেবের ধারণা হইল, পুনর্ব্বার অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় নায়েবের এইরূপ আপত্তি! এজন্ম তিনি নায়েবকে জানাইলেন, নায়েব গ্রামের জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে চিঁড়া-দৈএর ফলার দিবেন, সাহেব তাহা দেখিবেন, এবং সেজন্ম যে টাকা নায়েবকে ব্যয় করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং সেই ব্যয়-ভার বহন করিবেন।

নায়েব একটা উপায় স্থির করিলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহার মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ ছিল; সেই দিন তিনি গ্রামস্থ জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া চিঁড়া-মুড়কি, রাশি দৈ ও আকের গুড় দিয়া ফলার করাইলেন। সাহেব দেখিলেন, আহারের সময় তাঁহাদের মুখে 'হাপুস-হুপুস' শব্দ হইতেছে! দেখিয়া সাহেব খুসী হইয়া বলিলেন, "নায়েব, টোমার এই কাঁচা-ফলার আচ্ছা আছে, পাকা-ফলার কুছ্ কামকা নেহি।"

এই শ্রেণীর ইংরেজ একালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না; ঐ সকল ইংরেজের সদাশয়তার গল্পও একালে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন আমরা মূল প্রসঙ্গের অনুসরণ করি।

জগদ্ধাত্রীপূজার পর নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসে পল্লীগ্রামের সর্ব্ব-সাধারণের প্রীতিকর উৎসব। নবান্ন উপলক্ষে নূতন আমনের চাউলের আতপান্ন স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণকে নিবেদন করিয়া, সকলে পরমানন্দে ভোজন করে। গৃহস্থ পুরোহিতের সাহায্যে নূতন আতপান্ন দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া পাথরের খোরা-পূর্ণ দুগ্ধে তাহা মিশ্রিত করে। তাহাতে টাট্‌কা গুড় ও নানা প্রকার সাময়িক ফল, পাকা কলা, আকের টিক্‌লি, শশা, পাকা পেয়ারা, দাড়িম, পেস্তা, বাদাম, শাঁকালু, মূলা প্রভৃতি মিশাইয়া থাকে। গৃহিণীরা কলার পাতায় গরুবাছুরের জন্ম কিছু চাউল গোয়ালে রাখিয়া আসেন; কাক ও অন্যান্য পাখীদের জন্মও গাছের তলায়, এমন কি, ইঁদুরের জন্ম ইঁদুরের গর্ত্তের মুখেও কিছু কিছু চাউল রাখিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু একালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের অনেক শিক্ষিত পরিবারেই একালে নবান্নের প্রথা রহিত হইয়াছে; সুতরাং পুরোহিতের সাহায্যে আর উহা দেবগণের ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিবেদন করা হয় না। কিন্তু বাড়ীর গিন্নীরা দীর্ঘকালের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন না; এজন্ম তাঁহারা গ্রামস্থ জমিদারের গৃহদেবতা গোপালের ঘর হইতে নূতন চাউলের প্রসাদ আনাইয়া তাহাই মুখে দিয়া নিয়ম রক্ষা করেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রাম্যদেবতা গোপালের নবান্ন উপলক্ষে দুধ-গুড় মিশ্রিত নূতন আতপ চাউল বালতিপূর্ণ করিয়া রাখা হইত; গ্রামের যে সকল গৃহস্থ গোপালের প্রসাদ লইতে আসিত, তাহাদিগকে এক এক বাটি বা সরাপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হইত; কিন্তু একালে জমিদার-পরিবার অসংখ্য সরিকে বিভক্ত হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, গোপালের কোন উৎসবেরই আর তেমন সমারোহ নাই। নবান্ন উপলক্ষে প্রসাদ লইতে আসিয়া অনেককেই শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইতে হয়। আর কিছু দিন পরে পল্লীবাসীরাও নবান্নের কথা ভুলিয়া যাইবে।

নবান্নের সঙ্গেই পল্লীগ্রামে হেমন্তের উৎসব শেষ হইয়া যায় বটে, কিন্তু প্রভাতে মাঠে বাহির হইলে পল্লীপ্রকৃতির উৎসবের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়; দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া নানা প্রকার রবিশস্যের কচি কচি নধর চারাগুলি প্রাতঃসমীরণে হিল্লোলিত হইতেছে! ছোলা-মটরের শ্যামল চারাগুলি এখনও শাখাবাহু বিস্তার করে নাই; এজন্ম ক্ষেত্রস্বামীরা ছোলা-মটরের চারাগুলির মাথা ভাঙ্গিয়া-লইবার আদেশ করায় গ্রামস্থ বাগ্‌দিনীরা বড় বড় ঝুড়ি আনিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে ছোলা ও মটর-শাক সংগ্রহ করিতেছে। তাহারা এক বার মাত্র এই সকল চারার ডগা ভাঙ্গিতে পায়; কারণ, ঐরূপ করিলে ছোলামটরের গাছগুলি ঝাঁকড়া হয়, ও প্রত্যেক গাছে প্রচুর ফল ধরে। বাগ্‌দিনীরা এই সকল শাক লইয়া গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ীতে ফেরি করিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহারা ঝুড়ি হইতে যে দুই তিন মুঠা শাক ডালায় তুলিয়া প্রসারিত করিয়া রাখে—তাহার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করে না, দুই এক মুঠা চাউল পাইলেই তাহারা পরিতৃপ্ত। চাউল যে কিরূপ মহার্ঘ্য, তাহা ইহাদের অজ্ঞাত নহে; কিন্তু পল্লীর গৃহলক্ষ্মীরা চাউল অপেক্ষা পয়সাই অধিক মূল্যবান্ মনে করেন, কারণ, চাউল তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন; কিন্তু টাকা-পয়সার সহিত তাঁহাদের সংস্রব অল্প। বাড়ীর পুরুষরা চাউল না দিয়া দুই একটি পয়সা দিয়া শাক লইতে বলেন; কারণ, বাগ্‌দিনীরা আধ পয়সার শাক দিয়া আধ-বাটি চাউল লইয়া যায়।

মাঠের কোন অংশ এখন পতিত নাই, বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে অড়হরের দীর্ঘ চারাগুলি শাখাবাহু প্রসারিত করিয়াছে। মুগকলাই-এর ক্ষেতে মুগকলাই পাকিয়া উঠিতেছে। অগ্রহায়ণের শেষে নূতন মুগকলাই গ্রামের হাটে-বাজারে আমদানী হইতে থাকে। মুগের মধ্যে সোনামুগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু সোনামুগ ভিন্ন আরও যে কয় প্রকার মুগ আছে, অনেকেই তাহা জানে না। সোনা-মুগের নীচেই ঘীয়ে-মুগ; ইহার দানাগুলি সোনামুগের দানা অপেক্ষা মসৃণ। ইহা ভিন্ন হাড়িমুগ, ঘোড়ামুগ ও কাঠমুগের দানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; কিন্তু অন্য কোন মুগেই স্বাদ ও গন্ধ সোনামুগের অনুরূপ নহে। কড়াইও একাধিক প্রকার হইয়া থাকে; কিন্তু সহরের লোক তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারেন না।

এই সময় পল্লীগ্রামের গৃহিণীরা ঘরে ঘরে কলাই-ডালের বড়ি দিয়া থাকেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হয়। তাঁহারা বেতের ধামায় কাঁচা-কলাইএর ডাল ভিজাইয়া রাখেন; ডাল ভিজিলে অনেকে তাহা নদী হইতে ধুইয়া আনিয়া সন্ধ্যার পর ঢেঁকিতে কুটিয়া রাত্রির নীহারে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দেন; চাল-কুমড়োর শুষ্ক ঝুরিও গামছায় ভিজাইয়া রাখা হয়। গৃহিণীরা সকালে উঠিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া পাথরে সেই ডালের সহিত কুমড়োর ঝুরি মিশাইয়া দড়ির খাটিয়ায় 'কুমড়োবড়ি' দিতে আরম্ভ করেন।

এক একখান খাটিয়ায় তিন-চার সের ডালের বড়ির স্থান হইতে পারে। যাহাদের ইষ্টকালয় নাই, তাহারা প্রতিবেশীর ঘরের ছাতে বড়ি দিয়া আসে; প্রতিবেশিনীদের কেহ কেহ এই কার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। মনে হয়, তাঁহারা অভিন্ন পরিবারের লোক। কিন্তু আজ-কাল পল্লীগ্রামে এই দৃশ্য বিরল হইয়া আসিয়াছে; বাল্যকালে সর্ব্বদাই যাহা দেখিয়াছি, একালে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না! গ্রামস্থ প্রতিবেশিনীগণের পরস্পরের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি, পরস্পরের গার্হস্থ্য কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহ এখন বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে; তবে একালে বিশ্বজনীন উদারতা ও সম্প্রীতি সম্বন্ধে বড় বড় কথা নিত্য বক্তৃতায় শুনিতে পাইতেছি বটে! জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় ও দৈনন্দিন শত অভাবের নিষ্পেষণে আমাদের হৃদয়ের সরসতা শুকাইয়া যাইতেছে কি না, কে বলিবে?

যাহা হউক, হেমন্তের পল্লীর দিবাবসানের কথা শেষ করি। অপরাহ্ণে নাপতিনী ক্ষৌরকর্ম্মের উপকরণ—নরুণ, গৃহিণীদের পদতলের মরামাস ঘষিয়া তুলিবার ঝুঁত্তী, আলতার পাতা প্রভৃতি লইয়া গৃহস্থগৃহে উপস্থিত হয়। সে প্রৌঢ়া গৃহিণীগণের পদতলের শুষ্কচর্ম্ম অপসারণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নখের সংস্কার করে। বধূগণের, কুমারীগণের পায়ে আলতা পরায়। উহা কাচের শিশি-সঞ্চিত একালের সুবাসিত 'তরল আলতা' নহে। তরল আলতা নগরে প্রচলিত হইবার অনেক পরে তাহা পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিয়া নাপতিনীর অন্ন মারিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাগ্দীবৌ এক ঝুড়ি পদ্মের নাল (মৃণাল) লইয়া গৃহস্থের উঠানে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল, "খোকা, ও খুকী, নাল নিবা তো এসো!"

অগত্যা সুদীর্ঘ শুভ্র মৃণাল দুই একটি করিয়া ছেলে-মেয়েদের কিনিয়া দিতে হইল। মূল্য—বেতের পাখির আধ পাখি, অথবা তেলমাখা বাটির এক বাটি চাউল। ছেলেরা মৃণালগুলি মহা উৎসাহে চর্ব্বণ করিতে লাগিল; কেহ কেহ গলার মালা করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। অনেকে পদ্মের গোল গোল 'চাকি' কিনিয়া, খোসা ছাড়াইয়া পদ্মবীজগুলি খাইতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিয়া উঠিল। মাটীর প্রদীপ, কাঠের দীপগাছার মাথায় তাহা সংস্থাপিত। তখনও হরিকেন লণ্ঠন তাহাকে পল্লীভবন হইতে নির্ব্বাসিত করে নাই; বিদেশী কেরোসিন ক্ষেতের সর্ষপ ও রেড়ির তেলকে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে পারে নাই। এতদিন পরে প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হইয়াছে! কিন্তু অভ্যাস ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর; তাই পল্লীবাসী গৃহস্থ এখনও ছয় আনা হইতে বারো আনা মূল্যে এক বোতল কেরোসিন কিনিয়া অভ্যাস বজায় রাখিয়াছে!

বাজারের দোকানে দোকানেও দীপ জ্বলিল। দোকানদারেরা মাটীর ধুমুচীতে টিকে ও গুলের আগুন করিয়া ধুনা জ্বালিল। ধুনার সৌরভে বাজারের বায়ুস্তর সুরভিত হইল। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীর মন্দিরে কাঁসর, শঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ পুরোহিত পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ ও বাম হস্তে ঘণ্টা আন্দোলিত করিয়া দেবীর আরতি আরম্ভ করিলেন। আরতি শেষ হইলে দর্শকগণ 'জয় মা সিদ্ধেশ্বরি!' শব্দে মন্দির-দ্বারে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। বাজারের বিভিন্ন দোকান হইতে যুগপৎ হরিধ্বনি ও মা কালীর জয় রব উত্থিত হইল।

তাঁতিপাড়ার সঙ্কীর্ত্তনের দল তখন খোল-করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে,—"হরি নাম বিনে রে ভাই কি ধন আছে সংসারে,—বল মাধাই মধুর স্বরে!"

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইলে সমগ্র পল্লী ধীরে ধীরে সুপ্তিমগ্ন হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ওদের কাব্য সজীব রবে

আমরা কেবল দেখি ফুলের সুগন্ধ আর কোমলতা
রবির তাপেই শুকায় সে যে, ব'লবো এবার তারই কথা।

ফুলের 'পরে সইবে না কো অত্যাচার আর পায়ের আঘাত,
দখিণ হাওয়া—তার পরশও করবে যে তার শান্তি-ব্যাঘাত।
তাদের দেখে জাগবে মনে কেবল তন্দ্রা—কেবল নেশা,
স্পর্শে ধূলির মলিন হবে—যাবে না তার কাছে ঘেঁসা!

সকালে আর সন্ধ্যাবেলায় ওদের কেবল অশ্রু ঝরায়,
কোমলদেহ নারীর সঙ্গে ওরা কেবল উপমা পায়!
কিন্তু যারা সদাই অটল অত্যাচারে—অবিচারে,
যাদের উপর অনেক আঘাত পড়ছে এসে বারে বারে,

তবু যারা সকল স'য়ে দাঁড়িয়ে আছে লোহার মত,
অনাদরের মৃদু ছোঁয়ায় দুলছে না কো অবিরত,—
ফুলের চেয়ে তাদের নিয়েই কাব্যলেখা ভালো হবে,
ফুলের কাব্য শুকিয়ে গেলেও ওদের কাব্য সজীব রবে।

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রাজার জাতির প্রতি প্রজার মনোভাব

ভারতের তুর্কী-মোগল-শাসন যুগের (অর্থাৎ তুর্কীবিজয় হইতে মোগল শাসন পর্য্যন্ত) ইতিহাস প্রধানতঃ রাজার জাতির লেখকরাই লিখিয়া রাখিয়াছেন। প্রজারা রাজাকে কি দৃষ্টিতে দেখিত, তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া এই জন্যই দুঃসাধ্য। মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

কেবল সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালার ইতিহাসের এই দুরপনেয় ত্রুটির সংশোধনে সামান্য সাহায্য করিতে পারে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সে-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারগুলি এরূপ সতর্ক ভাবে বর্জ্জন করিয়া গিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে যে তথ্যটুকু সাহিত্য-ভাণ্ডারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু পরিমাণ সামান্য হইলেও, ইহার মর্য্যাদা সমধিক বলিয়া মনে করা উচিত। কারণ, ইহা ব্যতীত বিজিতগণের, (অর্থাৎ হিন্দু প্রজাগণের) শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি মনোভাব জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই।

এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের (চৈতন্যযুগ হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত) ইতস্ততঃ তুর্কী-মোগল শাসকদিগের এবং তাঁহাদিগের শাসন নীতির সম্বন্ধে যে সকল সামান্য তথ্য (উক্তি ও ঘটনার মধ্য দিয়া) পাওয়া যায়, তাহার সমাবেশ করিবার চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান-লভ্য সাহিত্য গ্রন্থগুলিই এ বিষয়ে লেখকের একমাত্র সম্বল। ভবিষ্যতে প্রাচীন সাহিত্যের লুপ্ত বা গুপ্ত অংশের পুনরুদ্ধার হইলে, আরও তথ্য প্রকাশ পাইবে—সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাউক।

১

কলিকালে "যবন" বা "ম্লেচ্ছ" রাজা, "যবনের সংসার" ইত্যাদি

প্রাচীন সাহিত্যে তুর্কী-মোগল রাজাদিগকে ও তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে "যবন" বা "ম্লেচ্ছ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; এবং তাঁহাদিগের অত্যাচার—আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের সহিত বহু স্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে একদা শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসের নিকট কলিকালে যবনের উৎপাত সম্বন্ধে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।
গোব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা দুরাচার।
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার।"

উত্তরে :—

"হরিদাস কহে—প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ।
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে।" ইত্যাদি।
(চৈঃ-চঃ অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ)

অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে "ম্লেচ্ছ"গণের অত্যাচারের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"একদিন হরিদাস কহে প্রভুস্থানে।
নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে।
দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ড ভণ্ড।
শ্রীমদ্‌ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে।
ব্রাহ্মণের শঙ্খ ঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক-মুদ্রা বলে চাটি খায়। *
শ্রীতুলসীবৃক্ষে মুতে কুকুরের সমে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে হৃষ্টমনে।
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়না করে বলিয়া পাগল।
হেনমতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
অবহেলে সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট করে।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় শাস্ত্রে আছে জানি।
যেই যেই কালে হয় সত্যধর্ম্মের গ্লানি।

---

* ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্যে অন্নদা বলিতেছেন :—
"যতেক বেদের মত, সকলি হইল হত,
নাহি মানে আগম পুরাণ।"
এবং—
"যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ,
নানা মতে করে অনাচার।
বামন পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়,
পৈতা ছেঁড়ে কোঁটা মোছে আর।"

যেই কালে হয় অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব।
সেই সেই কালে কৃষ্ণ হয় আবর্ভাব॥
এবে সেই কাল আসি হৈল উপস্থিত।
ইথে কাহে কৃষ্ণচন্দ্র না হৈলা উদিত॥
কি মতে হইবে প্রভু ধর্ম্মের রক্ষণ।
তাহা ভাবি সদা মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
প্রভু কহে এই কলিকাল ব্যবহার।
কৃষ্ণের প্রকট বিনু নাহি প্রতিকার॥"

চৈতন্যদেবের সংস্কৃত জীবনী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক কলিকালে অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে "ম্লেচ্ছ" রাজার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

একদা নারদ আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে "কোথায় বৈষ্ণব আছে দেখি; সেখানেই বাস করিব" মনে করিয়া পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

"দ্রক্ষ্যামি বৈষ্ণবঃ কুত্র তত্র বৎস্যামি সাম্প্রতম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দদর্শ পৃথিবীমিমাম্॥"

তাহার পর তিনি দেখিলেন—পৃথিবী পাপের বন্ধু কলির দ্বারা মলপঙ্কিল এবং প্রচণ্ড করভারে শোষিত হইতেছে; গোজাতি ম্লেচ্ছহস্তে পতিত, শূদ্র ও খল যবনরা এবং অপকর্ম্মপ্রবৃত্ত ও প্রজার সর্ব্বস্বহরণকারী ম্লেচ্ছগণ পৃথিবীর রাজা।

"কলিনা পাপমিত্রেণ প্রথিতমলপঙ্কিলাম্।
গামেব ম্লেচ্ছহস্তস্থাং প্রচণ্ডকরশোষিতাম্॥
... ...
রাজ্ঞশ্চ পাপনিপুণান্ শূদ্রান্ স যবনান্ খলান্।
ম্লেচ্ছান্ বিকর্ম্মনিরতান্ প্রজাসর্ব্বস্বহারকান্॥"
ইত্যাদি (২য় সর্গঃ)।

জয়ানন্দ-প্রণীত 'চৈতন্যমঙ্গলে' কলিযুগের "অনাচারের" মধ্যে "রাজা ম্লেচ্ছ জাতি" উল্লিখিত হইয়াছে :—

"এথা কলিযুগে বড় হৈল অনাচার।
পৃথিবী কান্দিঞা গেল ব্রহ্মার দুয়ার॥
প্রজাপতি চরণে করিল নিবেদন।
কলিযুগে হৈল জত জত অলক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ।
কলিযুগে ছাড়ে লোক নিজ নিজ ধর্ম্ম॥
বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস্য মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী॥
রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার।
দুই তিন চারি বর্ণে হৈল একাকার॥
দেবতা ব্রাহ্মণে হিংসা করে ম্লেচ্ছ জাতি।
ক্ষেত্রী যুদ্ধে শক্তিহীন নাহি বতি সতী॥"
ইত্যাদি।

মহাপ্রভু নিজেও কলির আচারের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে "রাজা ম্লেচ্ছজাতি" উল্লেখ আছে।

"ব্রাহ্মণ হরিবেক বেদ ইন্দ্র হরিবে জল।
নানা ছলে অর্থ রাজা হরিবে সকল॥
পৃথিবী হরিবে শস্য রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
কপিল হরিবেক ক্ষীর—স্বতন্ত্র যুবতী॥
... ...
গঙ্গা হরিবে জল ছাড়িবে তুলসী।
যবনে উৎসন্ন সে করিবে বারাণসী॥
... ...
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে॥
মনসবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকাচুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর॥
... ...
শূদ্র জগৎগুরু হবে ম্লেচ্ছ হবেক রাজা।
রাজা সর্ব্ব হরিবেক দুঃখিত হবে প্রজা॥"
(চৈতন্যমঙ্গল)

চৈতন্যযুগের পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব-সাহিত্যেও "যবন রাজার অধিকার" কলিকালের "দুরাচার" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রেমবিলাস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আছে :—

"কলিযুগের লোক সব বড় দুরাচার।
তাহার প্রধান কারণ যবন রাজার অধিকার॥"*
(প্রথম বিলাস)

অধিকতর আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থ 'বৃহৎ সারাবলিতে'ও "যবন" রাজত্বের এইরূপ উল্লেখ আছে :—

* * *

কলিকালে ক্ষিতিপতি হইবে যবন।
বাদসা বলিয়া নাম খ্যাত চরাচর।
সসাগরা হইবে তাহার অধিকার।
কলিকালে রাজত্বের না রবে বিচার।
ক্ষত্রী শূদ্র দ্বিজ বৈশ্য পাবে অধিকার।
যবনাদি নানা জাতি হইবে রাজন।
অল্প ক্ষিতি অল্প বিত্তি অত্যল্প জীবন।
এ সবা উপরে বাদসা হবে নরেশ্বর।
তার ছত্রতলে সবে যোগাইবে কর॥"

অন্যত্র :—

"কলির আচার মত বাদসার যাজন।"

এবং

"পৃথিবীর পতি বাদসা দুষ্ট দুরাচার।"

---

* দ্বিতীয় ছত্রের পাঠান্তর—"তাহার প্রধান কৈল রাজার অধিকার" এইরূপ থাকিলেও গ্রন্থমধ্যে 'যবন' সম্বন্ধে যে উক্তি ও বর্ণনা আছে, তাহাতে উদ্ধৃত পাঠেরই অধিক সঙ্গতি আছে, মনে হয়।

সত্যপীর-সাহিত্যেও ঐরূপ "যবনের" অত্যাচার বর্ণনার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য হয় :—

"কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী করিল নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।"
('সত্যপীরের কথা'—রামেশ্বর)

জবন পৃথিবীপতি একবৃত্তি ভবিষ্যতি
কলিযুগে কহেন পুরাণে।

(কবি গঙ্গারাম বিরচিত 'সত্যপীরের পুস্তক' বঙ্গাব্দ ১০৯৭—অপ্রকাশিত)

২

হিন্দুয়ানী-দমন-নীতি,—(সংকীর্ত্তনে বাধা, মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে মৃত্যুদণ্ড, বিগ্রহ-ভঙ্গ)

প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থলে এমন সব উক্তি ও ঘটনার উল্লেখ আছে যে, সে সকলে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু-ধর্ম্মানুষ্ঠান সরকারের নীতি অনুসারেই নিষিদ্ধ ছিল। সেকালের বিপুল হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান মুষ্টিমেয় ছিল। সুতরাং হিন্দু-দলন-নীতি সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা দুষ্কর হইত। ইহা ব্যতীত সকল শাসনকর্ত্তা একই রূপ উগ্র ও কর্ম্মতৎপর ছিলেন না। তথাপি, হিন্দু-দমন-নীতি যে প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, শাসক ও শাসিতের ধর্ম্ম বিষয়ে সমান অধিকার ছিল, সাহিত্যে এমন কোন ইঙ্গিত দেখা যায় না।

চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন নিষেধ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার উল্লেখ একাধিক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থে অন্যান্য বিবরণের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে শাসকগণের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য আছে, সেইগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অধিক।

'চৈতন্য চরিতামৃতে' (আদ্যলীলা) বর্ণিত আছে, মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় নবদ্বীপে নাম-সংকীর্ত্তনের প্রচলন হইলে শাসক সম্প্রদায়ের স্ব-ধর্ম্মাবলম্বীরা কাজীর কাছে নালিস করিয়াছিল। ইহার ফলে, কাজী যাহা বলিয়াছিলেন ও করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন শাসন-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' ভাষায়, সংকীর্ত্তন শুনিয়া মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।

"শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন।
কাজীপাশে আসি সব কৈল নিবেদন।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।

কাজীর উক্তি গুরুত্বপূর্ণ :—

"এত কাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি।
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে।
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।"

'চৈতন্যভাগবত' অনুসারে—

'একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়।
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া স্মঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র।
কাজী বোলে 'ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য্য'।
... ...
কাজী বোলে—'হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি'।
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লইয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজী কীর্ত্তন চাহিয়া।"

'চৈতন্যচরিতামৃতের' বিবরণ অনুসারে, কাজী কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন নিষিদ্ধ হইলে, হিন্দুরা চৈতন্যদেবের কাছে নিবেদন করিলে—

"প্রভু আজ্ঞা দিল যাই' করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন।
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কিন্তু—কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন।"

ইহার পর মহাপ্রভু বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তনের আদেশ দিলেন :—

"নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বালে ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।"

চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বিরাট্ নগর-কীর্ত্তন, সহস্র সহস্র হিন্দু কর্ত্তৃক কাজীর বাড়ীর উপর অভিযান, কাজীর সহিত তাঁহার ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি বিষয় এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই সব ব্যাপারের ফলে, কাজী কীর্ত্তন নিষেধ করা হইতে বিরত হইলে, মহাপ্রভু কাজীকে বলিয়াছিলেন :—

"তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী।
তবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি।"

শাসনকর্ত্তারা যে "হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী" অর্থাৎ তাঁহারা ঐরূপ মনে করিতেন, ইহা এই উক্তিতে প্রমাণ হইতেছে।

সে যাহাই হউক, ঐ প্রশ্নের উত্তরে কাজী যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে ('চৈতন্যচরিতামৃতের' মতে) এই :—

যে দিন কাজী কীর্ত্তন নিষেধ এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া হিন্দুদিগকে শাসন করিলেন, সেই রাত্রিতেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, "নরদেহ সিংহমুখ" মহাভয়ঙ্কর এক মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষে বসিয়া বলিল—কাজীর মৃদঙ্গ ভাঙ্গার শাস্তিস্বরূপ তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করা হইবে এবং "যবন" বিনাশ করা হইবে। ইহাতে ভীত হইয়া কাজী আর সংকীর্ত্তন নিষেধ করিলেন না। ফলে, নগরে অবাধে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু "রাজার জাতি" এক বার শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িল না।

"তবে ত নগরে হইবে স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর॥
… … …
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল॥"

কাজী অবশ্য ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তবে, এই অভিযোগের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিহিত আছে যে, সংকীর্ত্তন-নিষেধ কাজীর ব্যক্তিগত অভিরুচির ফল নহে; উহা পাতসাহেরই আদেশ অর্থাৎ তৎকালীন শাসন-নীতির অন্তর্গত।

'চৈতন্য-ভাগবত' অনুসারেও কাজীর সংকীর্ত্তন নিষেধ অমান্য করিয়া চৈতন্যদেব বিরাট কীর্ত্তন-দল বাহির করিলেন। গোলমাল শুনিয়া কাজী স্বীয় অনুচরবর্গকে বলিলেন :—

"কাজী বোলে, 'জান ভাই কি গীত বাজন।
কিবা কারো বিভা, কি বা ভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানী।
ঝাট জানি আয় তবে চলিব আপনি।"

কাজীর অনুচররা আসিয়া বলিল :—

"কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাঞি আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব স্থলে।
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানী বোলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলাঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥"

এবং আরও বলিল যে, যে সকল হিন্দুকে তাহারা প্রহার করিয়াছিল, তাহারা কাজীকে মারিতে আসিতেছে :—

"যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা।
আজি 'কাজী মার' বলি আইসে তাহারা॥"

ইহা শুনিয়া :—

"কাজী বোলে—'হেন বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত;
এবা নহে—মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানী করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে'।

এখানেও, "হিন্দুয়ানী" করা সম্বন্ধে সরকারী নিষেধ প্রকাশ পাইতেছে।

'চৈতন্য-ভাগবতে' সংকীর্ত্তন-দল কর্ত্তৃক কাজীর বাড়ী আক্রমণ, ঘর ভাঙ্গা, বাগান নষ্ট করা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সমগ্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কুত্রাপি, হিন্দুগণ কর্ত্তৃক এরূপ দলবদ্ধ ভাবে হিন্দুত্ব-দমনকারী কোন শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অভিযানের উল্লেখ দেখি নাই। এই বর্ণনারও কতটা বাস্তব, কতটা কাল্পনিক (অর্থাৎ জনশ্রুতি-ভিত্তি করিয়া লিখিত) বলা কঠিন।

উল্লিখিত বিখ্যাত কাজী কীর্ত্তন-ঘটিত ব্যাপার ব্যতীত, অনুরূপ অন্য ঘটনাও কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে। সেগুলির দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ভাবে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান (যথা কীর্ত্তন) সরকারী বিধানে নিষিদ্ধ ছিল।

'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও শ্রীবাস প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। ইহাতে নগরবাসীরা ভীত হইয়া বলাবলি করিত, "যবন নরপতি" সংবাদ পাইলে আর রক্ষা নাই।

"চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হইলে হরিনাম গায় উচ্চ স্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে—'হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥'
কেহ বোলে—'এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল'॥"

(আদিখণ্ড)।

ঐ গ্রন্থের অন্যত্রও অনুরূপ বর্ণনা আছে :—

"কেহ বোলে—'আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ॥

আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে হেথা॥
শুনিলে নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে-তে দিগে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত'॥
কেহ বোলে—'আমরা সভের কোন্ দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি চায়'॥
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজ-নৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥
... ...
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাহার॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।" ইত্যাদি।
(মধ্যখণ্ড)।

প্রকাশ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়া হিন্দুগণ কত ভীত ও আতঙ্কিত হইল, পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।*

কীর্ত্তনের প্রতি শাসনকর্ত্তাদিগের বিদ্বেষের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় :—

'চৈতন্য-ভাগবতের' অন্ত্যখণ্ডে ঠাকুর গদাধর দাসের গ্রামের এক কাজীর কথা আছে।

"সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার।"

গদাধর সেই কাজীকে দিয়া হরিনাম বলাইবার জন্য গমন করিলেন।

"পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥
যে কাজার ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে।"

কাজীর বাড়ীতে যাইয়া গদাধর বলিলেন :—শ্রীচৈতন্য জগতের মুখে হরিনাম বলাইলেন, কেবল তুমি বল না কেন ?

"পরমমঙ্গল হরিনাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি।"

শুনিয়া কাজীর চক্ষুস্থির :—

"যদ্যপিহ কাজী মহা হিংসক চরিত।
তথাপি না বোলে কিছু হইল স্তম্ভিত।"

'প্রেমবিলাস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে "রাজপ্রতিনিধি" সের খাঁ নামক পাঠানের ভীষণ কীর্ত্তনবিদ্বেষ বর্ণিত আছে। শ্যামানন্দ ঠাকুরের অলৌকিক কার্য্যাবলীর মধ্যে সের খাঁ-উদ্ধার অন্যতম। 'প্রেমবিলাসের' ঊনবিংশ বিলাসের বর্ণনা এইরূপ :—

"একদিন শ্যামানন্দ লৈয়া সংকীর্ত্তন।
নানা স্থানে ভ্রমে হৈয়া আনন্দিত মন॥
সেরখাঁ নামে পাঠান এক রাজপ্রতিনিধি।
সঙ্কীর্ত্তন শুনি ক্রোধে জ্বলে নিরবধি॥
সঙ্কীর্ত্তন করিতে সে করয়ে বারণ।
নাহি শুনে শ্যামানন্দ করে সঙ্কীর্ত্তন॥
ক্রোধে সে যবন দস্যু যবন লইয়া।
খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া।"

এখানে দুর্ব্বল হিন্দুর অলৌকিক উপায় ভিন্ন অন্য উপায়ে অত্যাচারের প্রতীকার করা সম্ভব হইল না। সেই অলৌকিক ঘটনা এই :—

"ক্রোধে শ্যামানন্দ করিলেন হুহুঙ্কার।
সব যবনের মনে হৈল ভয়ের সঞ্চার॥
যবনের দাড়ি গোঁফ সব পুড়ি গেল।
রক্ত বমি করে সবে অবসন্ন হৈল।"

পরদিন শ্যামানন্দ আবার সংকীর্ত্তন লইয়া বাহির হইলেন। তখন সের খাঁ আসিয়া তাঁহার শরণ লইলেন। সের খাঁ স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন :—

"পড়িলা দেখিনু এক রূপ ভয়ঙ্কর।
চড় মারি কহে ওরে যবন পামর॥
আমি তোর আল্লা হই আহ্লাদ স্বরূপ।
এত বলি দেখাইলা গৌরবর্ণ রূপ॥
মোর নাম শ্রীচৈতন্য সবার আশ্রয়।
শ্যামানন্দ হয় মোর ভক্ত অতিশয়॥
তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র কর রে গ্রহণ।
নহিলে নরকে তোর হইবে গমন।" ইত্যাদি।

অলৌকিক বিবরণটুকু বাদ দিলে, সংক্ষিপ্ত সত্য এইটুকু পাওয়া যায় যে, রাজার বিধানে সংকীর্ত্তন নিষিদ্ধ ছিল। এই পর্য্যন্ত বৈষ্ণবসাহিত্যের কথা। মুসলমান শাসক-দিগের হিন্দুত্ব-দলন-নীতির আরও পরিচয় আমরা মনসা-মঙ্গল সাহিত্যে পাই। বিজয়গুপ্তের গ্রন্থে হোসেনহাটি গ্রামের কাজীর বর্ণনায় কবি বলেন :—

"কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ানী রীত।"

রাখালেরা মনসাপূজা করিতেছে শুনিয়া কাজী বলিতেছেন :—

"হারামজাদ হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।"

* 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাসে'ও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসামঙ্গলেও' কাজীর দৌরাত্ম্যের বর্ণনা আছে :—

"ইহা দেখি ভক্তিভাবে যত গোপগণ।
দীপ ধূপে বলিদানে করয়ে পূজন॥
নানা মতে করে তথা বাদ্য নাটগীত।
হেনকালে এক কাজী আসি উপস্থিত॥
আপনিই কাজী সেই গোষ্ঠী তার জোলা।
কিতাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা॥
নগরে নগরে ফিরে হিন্দুর পূজা করি মানা।
ভূতপূজা বলি তারে করে বিড়ম্বনা॥
তার যত গোষ্ঠী জোলা কলিমা জানিয়া।
কাজীর ভাই কাজীর শালা সব হৈল মিঞা॥
... ...
ভিঠী হেন পাগ মাথে মুখে লম্বা দাঁড়ি।
সঙ্গে কম্মিন আরো খল হইছে পড়ি॥
হিন্দুয়ানী মানা করে গাঞে গাঞে যাইতে।
গোরক্ষকে পদ্মাপূজে দেখিল তা পথে॥"

ইত্যাদি।

'বাইশ কবি মনসা' নামক গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। মোল্লা যাইয়া কাজীর কাছে নালিস করিতেছে :—

"কাফের হিন্দুবা পূজে, যাই আমি গোঠমাঝে,
দেখি কবি হিন্দুপূজা মানা॥"

মোল্লার কথায় কাজী উত্তর করিলেন—"আমার দেশে হিন্দুয়ানী কেন?"

"শুনিয়া মল্লার বাত, কোপে জ্বলে সৈদনাথ,
মোর দেশে কেন হিন্দুয়ানা।"

'শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে' শ্রীকেশবভট্টের জীবনীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিবরণে 'অদ্বৈতপ্রকাশে' ও 'চৈতন্যমঙ্গলে' বর্ণিত শাসক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রজাগণের (অর্থাৎ হিন্দুগণের) প্রতি অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ভক্তমাল-গ্রন্থের' ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন :—

শ্রীকেশবভট্ট শান্ত শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত।
সিদ্ধ শকতিবান্ পরম বিরক্ত॥
মোছলমান সদা দ্বেষ্টা হিন্দুর ধরমে।
মথুরায় কৈল বাসা তীর্থ যে বিশ্রামে॥
যেই হিন্দু স্নানে যায় জোরাবরি করি।
মোছলমানগণ ভ্রষ্ট করে ধরি ধরি॥
শ্রীমান্ ভট্টজীউ দেখি বড়ই অনর্থ।
আপনি চলিয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ॥
ভট্টজীর উপরে যতেক মোছলমান।
উদ্যুক্ত হইল সবে করিতে আক্রমণ॥
সেইকালে ভট্টজীউ হুঙ্কার করিল।
যতেক যবনগণ পঙ্গুপ্রায় হইল॥" ইত্যাদি।

এইরূপে শ্রীকেশবভট্ট ঐ অত্যাচার দমন করিলেন। "রাজার জাতির" এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজার কাছে অভিযোগ করা তৎকালের হিন্দুদিগের চিন্তারও অতীত ছিল। কারণ, শাসকদিগের প্রকৃতি ও শাসননীতি সুবিদিত ছিল। সেকালে সকল হিন্দুই মনে করিতেন, স্বয়ং রাজাই হউন, অথবা তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীই হউক—"মোছলমান সদা দ্বেষ্টা হিন্দুর ধরমে" এ কথা সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের উক্তি ও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

চৈতন্য-ভাগবতে হরিদাস ঠাকুরের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, উহাতে শাসনকর্ত্তাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পক্ষপাতপূর্ণ নীতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, হরিদাস 'যবন' কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পর স্বেচ্ছায় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে থাকেন। শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত ও বৈষ্ণব সাধু বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এই কথা শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হইলে, স্বয়ং কাজী তাঁহার নামে অভিযোগ করেন—"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার"। যখন হরিদাস ঠাকুরকে হিন্দুধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করা সম্ভব হইল না, তখন তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল—কারণ, তৎকালীন রাজার আইনে মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে (এবং মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেও) মৃত্যুদণ্ডই সে কার্য্যের একমাত্র শাস্তি ছিল। অথচ, দেশের চারি দিকে তৎকালে হিন্দুর "জাতিমারা" অর্থাৎ জোর করিয়া মুসলমান করার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের বহু স্থানে * পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা আইনের চক্ষুতে কোন অপরাধ ছিল বলিয়া লেশমাত্র প্রমাণও পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে 'চৈতন্য-ভাগবত' হইতে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥
'যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার'॥

* মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করার দৃষ্টান্ত বিরল। যে পরিমাণে হিন্দুদিগকে মুসলমান করা হইত, তাহার তুলনায় উহা একান্ত মুষ্টিমেয়। শাসকসম্প্রদায়ের সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায়, এই বিরাট্ দেশের এখানে ওখানে দুই একটি শুদ্ধির সংবাদ তাঁহাদিগের কর্ণে সকল সময় পৌঁছাইত না।

পাপীর বচন শুনি সেহ পাপমতি।
ধরি আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়॥
... ...
... ...
আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।
'কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশ-জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার'॥"

হরিদাস উত্তরে, অন্যান্য কথার মধ্যে, বলিয়াছিলেন :—

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥"

এখানে দেখা যাইতেছে, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুকে কেহ বাধা বা শাস্তি দিত না।

সে যাহাই হউক, হরিদাসকে কোনরূপে বিচলিত করিতে না পারিয়া, কাজী প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন :—

"পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
'এমত মারিবি যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানী করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে'॥
পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥"

ইহার পরের ঘটনা অর্থাৎ "বাইশ বাজারে" লইয়া হরিদাসকে নির্ম্মম প্রহার, নদীতে নিক্ষেপ, অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার আত্মরক্ষা, অবশেষে কোনরূপে তাঁহাকে বধ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া—ইত্যাদির বর্ণনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। [ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

এ রাত্রি প্রথম নয়

প্রণয়-উন্মুখ রাত্রি মর্ম্মরিত পল্লবের ধ্বনি
শুনিছ কি গাহে কার বজ্রসম মহা-আগমনী?
স্বয়ম্ভূর কন্যা আসে, আজি তার আবাহন লাগি
মৃত্তিকার বক্ষ হতে ফুকারিয়া উঠিছে বৈরাগী!

নূপুর-নিক্বণ নয়, লজ্জাহীন প্রতি পদক্ষেপে
কত ক্লান্ত জনপদ বার বার উঠিতেছে কেঁপে।
কোমল কুসুম ছাড়ি ইস্পাতের সুতীক্ষ্ণ ফলকে
অনন্ত বাসর-শয্যা প্রয়োজন মৃত কল্পলোকে!

প্রতীক্ষা-কাতর আঁখি শত বর্ষ খুঁজিয়াছে যারে
বিরহী যক্ষের দল আজি তার নব-অভিসারে,
মিছে পরিচয় মাগে,—ধূর্জ্জটীর ত্রিনয়ন হ'তে
যে বহ্নি নিয়েছে দাঁড়াইয়া তাহার আলোতে!

এ রাত্রি প্রথম নয়—কত দীর্ঘ নিশা-অবসানে
বিপ্রলব্ধা এই নারী রেখে যায় ক্ষুধিত পাষাণে;
কবোষ্ণ শোণিত-মাখা যৌবনের সুতীব্র পিয়াস
অনন্ত মুক্তির মাঝে অর্দ্ধলুপ্ত প্রাক্-ইতিহাস!

প্রেমিকার বাহুলতা কাল প্রাতে মনে যদি পড়ে,
খুঁজিলে দেখিতে পাবে পৃথিবীর বুকের ভিতরে।
অজস্র কঙ্কালে আঁকা প্রাত্যহিক জীর্ণ পরিচয়
গাহে তার আগমন কোন দিন আকস্মিক নয়!

শ্রীঅমর ভট্ট।

ইতিহাসের অনুসরণ

চৌহান-সম্রাট্ বিশালদেব ও পৃথ্বীরাজ

ভারতের ইতিহাস তিমিরাচ্ছন্ন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কীর্ত্তিমালা বিস্মৃতির তিমিরময় গর্ভে আত্মগোপন করিয়াছে। অনেক বিজয়ী বীরের কাহিনী আজ তাঁহাদের বংশধরগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। নানা রাজনীতিক এবং আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে দেশকে কালসাগরে ভাসমান তরীর ন্যায় অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, সে-দেশের প্রকৃত মহাপ্রাণ এবং কীর্ত্তিমান্দিগের কথা যে লোক বিস্মৃত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বর্ত্তমান কালে অনুসন্ধানের ক্ষীণ বর্ত্তিকা-আলোক সেই তিমির গর্ভ বিস্মৃতির কন্দরে যেটুকু আলোক-সম্পাত করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহাতে দুই এক জন কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কাহিনী ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতেছে। চৌহান-রাজগণের মধ্যে সম্রাট্ বিশালদেবের কীর্ত্তি-কাহিনী—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যে রাজনীতিক কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিকৌমুদী ভারতের, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের গগন উদ্ভাসিত করিয়াছিল,—তাঁহার সেই কীর্ত্তি-মালা আজ রাহুগ্রস্ত হইলেও এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই বিশাল-কীর্ত্তি বিশালদেবের কাহিনী এখনও চৌহান-রাজমালার পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে দীপ্যমান রহিয়াছে। এই বিশালদেবের অপর নাম বিগ্রহরাজ। ইনি পঞ্চনদ-তীরে এবং ভারত সীমান্তে বহু বার মুসলমান-আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। সেই কাহিনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু কিছু প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছে; তবে এ কথা সত্য যে, দিবালোকে যাহা অতি স্পষ্ট দেখা যায়, অনুসন্ধানের ম্লান আলোকে তাহা তেমন সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্বের এবং মতভেদের অবকাশ থাকে।

রাজপুতদিগের ইতিহাসে চৌহানদিগের কীর্ত্তিমালা বিপুল বিস্ময়-জনক। এই চৌহান-রাজপুতগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে প্রায় ছয় শতাব্দী কাল তাঁহাদের বীরত্ব-প্রভায় চারি দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বংশধর বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ইঁহাদিগকে হূণ এবং গুজ্জর-দিগের বর্ণসঙ্কর বংশধর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয়-দিগের অনুমান, চাহমান বা চৌহানদিগের আদিপুরুষরা হূণদিগের বংশধর। কারণ, ইঁহাদিগের মধ্যে খিচি নামক এক সম্প্রদায় আছে, এবং চীনদেশেও খিচি নামক হূণজাতীয় লোক আছে। কেবলমাত্র শব্দের এই প্রকার আকস্মিক সামঞ্জস্য বা মিল দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কত দূর সঙ্গত, তাহা বিচার্য্য; বরং নৃতত্ত্বের অনুসরণে দৈহিক সামঞ্জস্য দেখিয়া যদি জ্ঞাতিত্ব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা স্বীকার্য্য। যাহা হউক, সেই প্রসঙ্গ এখানে আমাদের আলোচ্য নহে।—ইঁহাদের বংশের একটি শাখা প্রাচীন কালে রাজ-পুতানার অন্তর্গত সাম্ভরকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা কিছুকাল যাবৎ প্রতিহার রাজপুতগণের অধীন ছিলেন। প্রতিহারদিগের অবনতির সুযোগে চৌহানরাজ স্বাধীন হইয়াছিলেন। এই বংশের রাজা অজয়মের আজমীর নগরের প্রতিষ্ঠা, এবং মালবদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

এই অজয়দেবের পৌত্র বিশালদেব বা চতুর্থ বিগ্রহরাজ দিল্লী জয় করিয়া হিমাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। বিশালদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার প্রাণনাশ করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিশালদেবের পিতৃহন্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদেবকে (যুগদেব?) নির্ব্বাসিত করিয়া ১১৫২ খৃষ্টাব্দে আজমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জগদেব ও বিশালদেব উভয়েই মাড়ওয়ারের রাজনন্দিনী সুধবার গর্ভজাত। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের এক বিমাতা ছিলেন—তাঁহার নাম কাঞ্চন দেবী। কাঞ্চন দেবী ছিলেন গুজরাটরাজ জয়সিংহের দুহিতা। তাঁহার গর্ভে সোমেশ্বর নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই সোমেশ্বরই চৌহান-চূড়ামণি পৃথ্বীরাজ। থানেশ্বরের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইনি পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলে দিল্লী এবং আজমীর মহম্মদ ঘোরীর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই বিশাল-দেবের কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বিশালদেব বিশাল সামরিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সমকালে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানায় তাঁহার ন্যায় শৌর্য্য-শালী যোদ্ধা দ্বিতীয় কেহ ছিল না। বিশালদেবই চৌহান-রাজগণের মধ্যে প্রথম সম্রাট্ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ভারতের অনেক রাজাই তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তোমরদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, পৃথ্বীরাজই দিল্লীরাজ অনঙ্গপালের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই সূত্রে তিনি দিল্লীতে অধিকার লাভ করেন। পরে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে হয়, পৃথ্বীরাজের পিতৃব্য বিশালদেবই দিল্লী জয় করিয়াছিলেন; তবে অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া, এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া কোনক্রমে সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য হইতে পারে। বিশালদেব কেবলমাত্র দিল্লী জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আরও উত্তর এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মুসল-মানদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানে সম্পূর্ণ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসী ছিলেন; কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ভারতবর্ষ অনেক-গুলি ক্ষুদ্র এবং পরস্পর ঈর্ষ্যাসম্পন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহাদের পরস্পরের সহিত বিবাদে হিন্দুরাজগণের যথেষ্ট বলক্ষয় হইয়াছিল; সেই জন্যই মুসলমানগণ সহজে ভারত-বিজয়ে সমর্থ হইয়াছিল।

বিশালদেব কোন্ সময়ে দিল্লী জয় করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আজমীরের চিত্রশালায় একখানি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে, তাহাতে স্পষ্টই ক্ষোদিত আছে যে, বিশালদেব আজমীর হইতে দিল্লী, এবং আরও উত্তর দিকে অভিযান করিবার জন্য উদ্যোগ

করিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিশালদেব যে খৃষ্টীয় ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। ঐ তাম্রশাসনখানি ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। ইহাতে সহজেই মনে হয়, তিনি ঐ শিলালিপি প্রস্তুতের অল্প দিন পরেই দিল্লী আক্রমণ করিয়া জয় করিয়াছিলেন; কারণ, শত্রুপক্ষকে সুযোগ দানের জন্য কেহই পূর্ব্বে অভিযানের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন না। দিল্লী জয় করিতে তাঁহার দীর্ঘকাল সময় লাগে নাই; তাহার প্রধান কারণ, দিল্লীর শিবালিক স্তম্ভে তাঁহার যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, ১১৬৪ খৃষ্টাব্দের ১ই এপ্রিল তাহার তারিখ বলিয়া সুধীগণ নির্ণয় করিয়াছেন। উহাতে তারিখ দেওয়া আছে। ঐ উৎকীর্ণ-লিপি পাঠে জানা যায়, বিশালদেব ওরফে বিগ্রহরাজ ঐ সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ইহাতে অবশ্য মনে করা যাইতে পারে, ইহা অত্যুক্তি মাত্র। তিনি নিখিল ভারতের সার্ব্বভৌম নৃপতি হইতে পারেন নাই; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, দিল্লীবিজয়ের পর তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারত হইতে মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করিতে তাঁহার কত সময় লাগিয়াছিল, তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে এরূপ আভাস অল্প সূত্রে পাওয়া যায় যে, উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিতে তাঁহাকে প্রায় চারি বৎসর কাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত, এবং শতদ্রুর পরপার অবধি তাঁহার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বিশালদেব হিমাচলের পাদদেশস্থিত টোপরা বা টোপুর নামক স্থানে স্থাপিত শিবালিক স্তম্ভ-গাত্রে সে কথা খৃষ্টীয় ১১৬৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জরাজও হয় ত তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন; নতুবা তিনি ভারতসম্রাট্ বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিতেন না, এবং অশোকের শিবালিক স্তম্ভেও ঐরূপ প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিতেন না। উহাতে তারিখ দেওয়া আছে সংবৎ ১২২০ বৈশাখ সুদী ১৫ই; (অর্থাৎ ১১৬৪ খৃষ্টাব্দের ১ই এপ্রিল)। তিনি দিল্লী জয় করিয়া অন্যান্য স্থান জয় করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ১১৫৪ খৃষ্টাব্দেই বিশালদেব কর্ত্তৃক দিল্লী বিজিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ কথা সত্য যে হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর ৮০ বৎসরের মধ্যে মুসলমানদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদীর সন্নিহিত সৈকতভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পারস্য, সিরিয়া, মিশর, সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা; এমন কি, স্পেন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু সিন্ধুর অপর পারে মুসলমান-অধিকার স্থায়িভাবে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উদ্বেলিত বারিধি-তরঙ্গের ন্যায় ইহা কখনও অগ্রসর হইয়াছে, আবার কখনও বা পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়াছে। ইহার কারণ, ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের বাধা প্রদান। অন্য কোন কারণ দেখাও যায় না, অনুমান করাও যায় না। সত্য বটে, ৭১১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং মহম্মদ কাশিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু সে জয় স্থায়ী হয় নাই। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ সৌবিরী ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক ভারত হইতে থাইবারের পরপারে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তৎপরেও তাঁহারা যে ভারত-আক্রমণে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। পঞ্চনদ প্রদেশ বারংবার মুসলমান-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং আংশিক ভাবে অধিকৃত হইয়াছিল; ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণও বারংবার তাঁহাদিগকে ঐ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মামুদ যে কত বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। কেহ বলেন, অন্ততঃ ১২ বার, কেহ কেহ বলেন ১৯ বারের কম নহে। যে সকল যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ কেবলমাত্র সেই সকল অভিযানের কথাই বলিয়াছেন। হিন্দুদিগের লিখিত এই সময়ের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায় না; কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীদিগের সহিত ভারতীয় ক্ষত্রিয় বা রাজপুতদিগের যে সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাটিণ্ডায় গোগা নামক রাজপুত-সর্দ্দার শতদ্রুতীরে গজনীর মামুদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন—ইহা রাজপুতানার চারণদিগের গীতে সুস্পষ্টরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা বড় সমস্যা আছে। "পৃথ্বীরাজ-রাইসা" (রস?) নামক চাঁদ কবি-রচিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পৃথ্বীরাজ স্বকীয় পত্নীর অধিকার-সূত্রেই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তোমরবংশীয় অনঙ্গপালের কন্যা পৃথ্বীরাজের পত্নী ছিলেন—সেই সূত্রে পৃথ্বীরাজই দিল্লীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। "পৃথ্বীরাজ-রাইসা" পৃথ্বীরাজের সভাসদ্ রাজকবি "চাঁদ বরদাই" কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় লিখিত; সুতরাং উহার প্রামাণিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। এখন শিবালিক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত আছে, বিশালদেব ওরফে বিগ্রহরাজ দিল্লী জয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ তাঁহার পিতৃব্য হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে দিল্লী লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ বিশালদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিশালদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সোমেশ্বরের পুত্র, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন চাঁদ কবির কথা ঠিক, কি শিবালিক-স্তম্ভের কথা ঠিক? শিবালিক স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি পাথুরে প্রমাণ। ডক্টর কীলহর্ণ উহার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায়, বিশালদেবের আজ্ঞা অনুসারে শিবালিক-স্তম্ভগাত্রে বিশালদেবের জ্যোতিষী শ্রীতিলক রাজার সমক্ষে কায়স্থবংশাবতংস মাহবের পুত্র শ্রীপতি কর্ত্তৃক ১২২০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন উহা ক্ষোদিত হইল। রাজপুত সলক্ষণপাল বিশালদেবের প্রধান মন্ত্রী। এইরূপ স্পষ্ট উক্তি মিথ্যা হইতে পারে বলিয়া কখনই মনে হয় না। সেই জন্যই আমাদের অনুমান, রাণীর মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া রাজকবি অনঙ্গপালের পরাজয়-কথার উপর বিশেষ জোর দেন নাই। অথবা অনঙ্গপাল বিশালদেবের সামন্তরূপে কিছু দিন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিশালদেবের রাজধানী ছিল শাকম্ভরীতে অর্থাৎ বর্ত্তমান সাম্বরে। বিশালদেবের উৎকীর্ণ-লিপিতে তিনি শাকম্ভরীর রাজা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।

এইখানে শিবালিক-স্তম্ভের পরিচয় প্রদান বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোক দিল্লী হইতে ১০ ক্রোশ দূরস্থিত যমুনা নদীর তীরে সালোরা জিলায়—যেখানে যমুনা নদী পাহাড় অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে নামিয়াছে, সেইখানে ইহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪২ ফিট ৯ ইঞ্চি। অশোক ইহার গাত্রে নিজ অনুজ্ঞা (Ediot) উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। বিশালদেব বিগ্রহরাজ

ইহার উপরই তাঁহার প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন; ফিরোজশাহ তোগলক ইহা তথা হইতে দিল্লীতে আনয়ন করেন। বিশালদেব ভারত হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিবার পর এই শিবালিক-স্তম্ভে তাঁহার প্রশস্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন।

বিশালদেব অতীব সমরনিপুণ বীরপুরুষ ছিলেন। রণকৌশলে তাঁহার সমকক্ষ বীর সে সময় ভারতে আর কেহ ছিল না। তিনি কেবল মুসলমান-আক্রমণ প্রতিহত করিয়াই কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন নাই, অধিকন্তু, তিনি তোমর, রাঠোর প্রভৃতি বলদৃপ্ত রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের গর্ব্বও কতকটা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এই সকল রাজপুত একতাবদ্ধ না হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিবাদে রত হইয়া আপনাদের বলক্ষয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি একতাবদ্ধ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বিদেশী আক্রমণকারীরা কখনই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে পারিত না; কিন্তু তাঁহারা তাহা পারেন নাই। দেশাত্মবোধ অপেক্ষা তাঁহাদের গোষ্ঠীগত গর্ব্ব প্রবল ছিল। বিশালদেব অনেকটা দেশাত্মবোধ প্রকটিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশধরদিগকে বিদেশী আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ রাজপুতদিগের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বীর পুরুষ ছিলেন। পৃথ্বীরাজের কথা সংক্ষেপে পরে বলিতেছি।

কিন্তু বিগ্রহরাজ বিশালদেব কেবল যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন না; রাজপুতানার শুষ্ক মরু-কান্তার তাঁহার সরস হৃদয়কে ভাবহীন শুষ্ক শৌর্য্যে প্রদীপ্ত করে নাই তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত হরকেলী নাটক আজমীঢ়ের অধৈদিন ঝোঁপড়ার ভিতর কৃষ্ণ প্রস্তরে ক্ষোদিত ও প্রোথিত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য সুস্পষ্টই প্রকাশিত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, তিনি যে বিশেষ পাণ্ডিত ও রসজ্ঞ লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার এই হরকেলী নাটক পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

সম্রাট বিশালদেব প্রকৃত প্রজাহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রজার হিতজনক অনেক কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি এখনও বিরাজমান রহিয়াছে। সকলেই জানেন যে, আজমীঢ়ের মরুপ্রধান অঞ্চলে জলের বড় অভাব। নারীদিগকে অনেক সময় বহু দূর হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। এক দিন বিশালদেব মৃগয়া করিয়া ফিরিবার সময় এক স্থানে পাহাড়ের পার্শ্বে একটি নির্ঝর দেখিতে পান। তিনি আরও দেখিলেন যে, স্থানটি পরম রমণীয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সেই স্থানে একটি সরোবর খনন করিতে বলিলেন। সরোবরটি অতি সুন্দর; উহা সমচতুষ্কোণ দীর্ঘিকারূপ। উহার চারি দিকের দৃশ্যাবলি অতি মনোহর। এই সরোবর তাঁহার নামানুসারে "বিশাল-সর" বা বিশাল-সরোবর নামে অভিহিত। এখন স্থানীয় লোক উহাকে "বিশলিয়া" বলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উহা কৃত্রিম সরোবর, স্বাভাবিক নহে।

তাঁহার নামাঙ্কিত অধৈদীনকা ঝোঁপড়া তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার ও সুরুচির সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধৈদীন ঝোঁপড়া নামক যে হর্ম্ম্যটি এখন আজমীঢ় সহরের বক্ষে বিরাজ করিতেছে, তাহা রাজাধিরাজ বিশালদেব বিগ্রহরাজেরই কীর্ত্তি। উহা তিনি পণ্ডিতসমাজের একটি সম্মিলন এবং অবস্থান-স্থান হিসাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার এবং জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আর অধিক দিন উহা সারস্বত নিকেতন-স্বরূপ ছিল না। কুতুবুদ্দীন আইবেক এবং সামসুদ্দীন আলতামাস উহাকে জোর করিয়া একটি মসজেদে পরিণত করেন। তদবধি ইহা মসজেদরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে এই ঝোঁপড়ার ন্যায় সুরম্য নয়নাভিরাম হর্ম্ম্য অধিক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থাপত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহার বিশেষত্ব সহজেই ধরা যায়। প্রাচীন কালের এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভবন প্রায় দেখা যায় না। ভারতীয় পুরাবস্ত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার জেনারল কানিংহাম বলেন,—কি ইতিহাসের দিক্ দিয়া, কি পুরাবস্তুর দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহার তুল্য সুগঠিত হর্ম্ম্য ভারতে অধিক নাই। মিষ্টার ফার্গুসন বলেন, ইহার উপরিভাগের প্রসাধন-ব্যবস্থায় এই ঝোঁপড়া এবং দিল্লীস্থ আলতামাসের মসজেদের আর তুলনা নাই। সৌন্দর্য্যহীন রাজপুতানার মরুস্থলীতে যাঁহার বাস, এতাদৃশ সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা মসজেদে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় নাই,—বরং হানিই হইয়াছে। হিন্দুদিগের কত কীর্ত্তি যে এই ভাবে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

বিশালদেব ছিলেন শৈব। চৌহান প্রভৃতি রাজপুতগণের অধিকাংশই শৈব। শৈবধর্ম্ম জ্ঞান এবং শৌর্য্য সাধকদিগেরই ধর্ম্ম। ইহা অত্যন্ত কঠোর ধর্ম্ম। বিশালদেব ঐকান্তিকতার সহিত এই ধর্ম্ম পালন করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু ঐ সকল কিম্বদন্তী কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না।

বিশালদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার শাসন-কর্ত্তা গহড়বানরাজ বিজয়চন্দ্র বা জয়চন্দ্রকে স্ববশে আনিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি কান্যকুব্জ-পতিকে তাঁহার চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার রাজ্যের এত নিকট কান্যকুব্জ স্বাধীন থাকিতে তিনি কখনই আপনাকে ভারতেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে আমরা দেখিতে পাই যে, বিশালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র বা জয়পাল তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী ও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের প্রতাপে ঘোর রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ বিনসাম পরাজিত হইলে তিনি আর তখন ভারত আক্রমণ করিতে সাহস করিতেন না; কিন্তু একটা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে গোল বাধিয়া যায়। পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জয়চাঁদের ঈর্ষ্যানল প্রবল ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরাজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই। এই সময়ে উত্তর-ভারতে চাহমান বা চৌহান-রাজবংশ আজমীঢ়ে ও দিল্লীতে, গহড়বান রাজপুতগণ কান্যকুব্জে, এবং চন্দেল্ল রাজপুতগণ কালঞ্জরে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী ছিলেন। সম্ভবতঃ পৃথ্বীরাজ আপনাকে প্রবল পক্ষ মনে করিয়াই সেই রাজসূয় যজ্ঞে আইসেন নাই; জয়চন্দ্র এ জন্য বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। তাহার পর

প্রতিশোধ লইবার জন্ম জয়চন্দ্র তাঁহার কন্যার স্বয়ম্বর-সভায় পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; পরন্তু, দ্বারদেশে পৃথ্বীরাজের মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি দ্বারবানরূপে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের দুহিতা সংযুক্তা সেই স্বয়ম্বর-সভা ঘুরিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজের দ্বারবানরূপে সংস্থাপিত মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করেন। ইহাতে মহা কোলাহল হয়। পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে নিকটেই ছিলেন। তিনি সংযুক্তাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করেন। ইহাতে জয়চন্দ্র অধিকতর অপমান বোধ করেন। তিনি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে আপনাকে অক্ষম মনে করিয়াই ঘোররাজ্যের মহম্মদ বিলসামকে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তেরাইলের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত মহম্মদ ঘোরী সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার এই সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। তিনিও সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ পাইয়া তিনি অবিলম্বে পৃথ্বীরাজকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ম দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিলেন। আবার তেরাইলে দ্বিতীয় বার পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর প্রবল যুদ্ধ হইল। কান্তকুব্জের অধিপতি জয়চন্দ্র নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পৃথ্বীরাজের বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলে তেরাইলের (তিরোরী?) দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত এবং বন্দী হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। স্বজাতিদ্রোহী কাপুরুষ জয়চাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে যদি রাজপুতগণ সম্মিলিত হইয়া বিদেশীদিগের আক্রমণে বাধা দিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর ভাগ্যে পরবর্ত্তী কালে ঘোর দুর্গতি ঘটিত না; কিন্তু কেবল গহড়বানবংশীয় কান্তকুব্জপতি জয়চাঁদ ঠিক সেই সময়ে মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দেলারাজ কালঞ্জর-দুর্গে তখন নিশ্চিন্ত মনে পাশা খেলিতেছিলেন। ইঁহাদের মনে যদি দেশাত্মবোধ থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা এরূপ উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের রাজারা আপনাদের গৃহবিবাদ বিস্মৃত হইয়া মুসলমান-আক্রমণে বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। স্মিথের এ কথার কোন প্রমাণ নাই; কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখকও সে কথা বলেন নাই। সেই অধঃপতিত যুগে ভারতীয় হিন্দুদিগের মনে যদি দেশাত্মবোধ প্রবল থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা সম্মিলিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সে অনুভূতি ছিল না; তাঁহারা আভিজাত্যের অহঙ্কারেই মত্ত ছিলেন। কাজেই তাহার ফলে ভারতকে অশেষ দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। আমরা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কেবল জয়চন্দ্রেরই নিন্দা করিয়া থাকি,—কিন্তু দোষ সেই সময়ের সকলেরই। তখন এই রাজগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার মত শক্তিশালী জননায়কও ভারতে আবির্ভূত হন নাই। রাজপুতদিগের মধ্যে রাজসিংহের মত কোন রাজাও ছিলেন না। কাজেই তাঁহারা গোষ্ঠীগত গর্ব্বে এবং আভিজাত্যের অভিমানে ভবিষ্যৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন।

বিশালদেব কতকটা স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিলেন; কিন্তু তিনিও রাজপুতরাজগণের নিকট আবশ্যক সাহায্য পান নাই। মুসলমানদিগের সহিত সংগ্রামে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন সত্য,—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষতি অল্প হয় নাই। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁহার প্রণীত হরকেলী নাটক কতকটা ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় নাটকের আদর্শে লিখিত। ১১৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর তারিখে উহা লিখিত হইয়াছিল—উহাতে প্রদত্ত তারিখ হইতে পাশ্চাত্য বুধগণ ইহা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, বিশালদেব নানাবিধ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। মিঃ কীলহর্ণ লিখিয়াছেন, এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পুরাকালে ভারতীয় শক্তিশালী রাজ্যপালগণ কালিদাস এবং ভবভূতির ন্যায় কবিযশ প্রাপ্তির জন্যও আগ্রহান্বিত ছিলেন। ইনি যথেষ্ট বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজকবি সোমদেব ললিত বিগ্রহরাজ নাটক নামক পুস্তকে ইঁহার কথা লিখিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, খণ্ডিত ভাবে পাওয়া যায়। বিশাল-দেবের সমগ্র কীর্ত্তিকাহিনী এখনও জানা যায় নাই। ভবিষ্যতে হয় ত জানা যাইতে পারে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজ অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই; সুতরাং তাঁহার সকল কথাও জানিবার উপায় নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

দিনেকের দান

মিথ্যা এ রচনা জানি
জানি এর আয়ুটুকু কত,
নিশান্তে ঝরিয়া যাবে
নিতান্তই সেফালির মত।

মিথ্যা এর অভিলাষ
যদি ইহা বাঁচিবারে চায়,
মিথ্যা নয় এক দিনও
যে আনন্দ দিয়াছে আমায়।

শ্রীকালিদাস রায়।
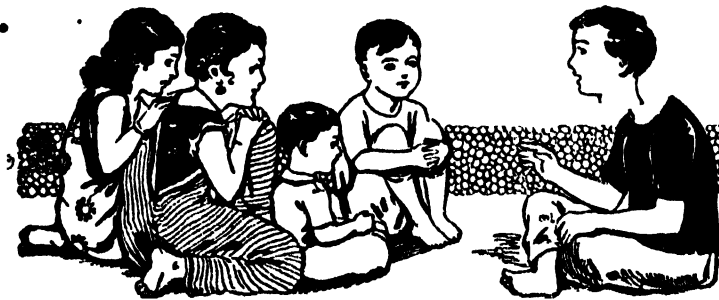
শিউলী

[রূপকথা]

এক দেশে এক বুড়ী থাকত। সে দেখতে ছিল যেমন কদাকার, তার মনটাও ছিল সেই রকম হিংসুটে। পাড়ার সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ানই ছিল তার স্বভাব। তার ছিল দু'টি মেয়ে। একটি নিজের, আর একটি স-তাত। এদের বাবা, প্রথম বৌ মারা-পড়বার পরই আবার বিয়ে করেন—তখন মেয়েটি খুবই ছোট। বাড়ীতে অন্য কেউ ছিল না, কে বা দেখে, কে বা মানুষ করে? কিন্তু নতুন বৌ এসে মেয়েটাকে দেখা তো দূরের কথা, উঠতে-বসতে খালি গালি-গালাজ করত। বাপ কিছু দিন পরেই মারা গেল। এই বুড়ীই এদের মানুষ করতে লাগল। নিজের মেয়ের নাম রাখলে লবঙ্গ-লতিকা, আর স-তাত মেয়ের নাম দিলে শিউলী।

সংসারের সমস্ত কাজই করতে হ'ত শিউলীকে। লবঙ্গলতিকা দিব্যি পায়ের উপর পা রেখে বসে বসে হুকুম চালাত। কাজের একটু এদিক্-ওদিক্ হলেই লবঙ্গ আর বুড়ী দু'জনেই তাকে গালাগালি দিত; মার ধর করত। সে বেচারী মুখ-বুজে সবই সহ্য করত। মনে যখন খুব কষ্ট হ'ত, তখন উঠোনের ধারে পাতকুয়ার পাড়ে বসে আপন-মনে কাঁদত। খুব লুকিয়ে চুপি-চুপি কাঁদতে হ'ত—পাছে সংমা কি লবঙ্গ টের পায়। তাহলে আবার মারের ওপর মার চল্‌বে!

পাড়ায় বুড়ীর খুবই বদনাম রটে গেল। সকলে বলাবলি করতে লাগল, বুড়ী ভয়ানক দজ্জাল, হিংসুটে! নিজের মেয়েকে কুটোখানা ভেঙ্গে দু'টো করতে দেয় না আর শিউলীকে শুধু শুধু কষ্ট দেয়। তার ওপর আবার শিউলী দেখতে সুশ্রী বিনয়ী, আর লবঙ্গ দেখতে যেমন বিশ্রী, তেমনি মুখরা আর ঝগড়াটে। সকলেই শিউলীর প্রশংসা আর লবঙ্গলতিকার নিন্দে করত। সেই জন্য বুড়ী শিউলীর ওপর আরও বেশী চটে গিছল। দিন-রাত তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার ছল খুঁজত।

এক দিন বুড়ী দুই মেয়েকেই চরকা কাটতে দিয়েছে। লবঙ্গকে দিয়েছে ভাল পেঁজা তুলো, আর শিউলীকে দিয়েছে বিচিশুদ্ধ খারাপ তুলো। সে বললে—"যদি কেউ সুতো ছেঁড় তো মজাটা টের পাবে। আমার কাছে হক্-বিচার।" শিউলী ভয়ে ভয়ে সুতো কাটছে, পাছে ছিঁড়ে যায়। আর লবঙ্গ তুলো নিয়ে চুপ করে বসে আছে। সে ভারী চালাক—জানে, সুতো না কাটলে তো আর ছিঁড়বার ভয় নেই। বুড়ী কিন্তু সে-দিকে নজর দিচ্ছে না। হঠাৎ শিউলীর সুতো গেল ছিঁড়ে। লবঙ্গ চেঁচিয়ে উঠল—"মা, শুলী সুতো ছিঁড়েছে।" বুড়ী 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এল। শিউলীর পিঠে গুম্ করে এক কীল মেরে বললে—"তবে লো চোখখাকী! সুতো ছিঁড়লি যে? আবার পাড়ার লোকের কাছে সোহাগ বাড়াতে যাওয়া হয়।" সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'-এক ঘা বসিয়ে দিলে। আচমকা মার খেয়ে শিউলী ডুকরে কেঁদে উঠল। বুড়ী অমনি খেঁকিয়ে উঠল—"কি! চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা হচ্ছে?" এই কথা ব'লে সে আর তার মেয়ে লবঙ্গ শিউলীকে টানতে টানতে প্যাতকুয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে তার মধ্যে ফেলে দিলে।

এখন সেই পাতকুয়ার মধ্যে থাকত দু'টি পরী। শিউলীদের বাড়ীর কথা সবই তারা জানত। আর তাকে তারা খুব ভালবাসত। সংমা বুড়ী শিউলীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে-দিতেই তারা তাকে কোলে করে এমন কৌশলে কুয়ার জলের ভেতর দিয়ে পাতালপুরীতে নিয়ে-গিয়ে হাজির করলে যে, তার শরীরে এক ফোঁটা জলও লাগল না। কিন্তু সেই পরীদের কথা শিউলী কিছুই জানত না। পাতালপুরীতে গিয়ে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল! চার দিকে কেমন সুন্দর গাছপালা, গাছে থরে থরে ফল, ফুল; চার ধারে কেমন আলো। অথচ আকাশ নেই, সূর্য্য নেই! অবাক্ হয়ে শিউলী এদিক্-ওদিক্ চাইছে, এমন সময় তার কানে গেল—কে যেন বলছে, "ও ভাই, শোন!" শব্দ শুনে কাছে গিয়ে দেখলে একটা প্রকাণ্ড কাছিম উল্টে পড়ে আছে। কাছিমকে সে কখনও কথা বলতে শোনে নি; তাই প্রথমটা শিউলীর বড্ড ভয় হল। খুব মিষ্টি-গলায় আদর করে কাছিমটা বললে—"আমাকে সোজা করে দাও না ভাই!" শিউলী তখনি তাকে সোজা করে দিলে। কাছিম খুশী হয়ে তাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করে বললে—"কখন যদি তোমার কোনও দরকার হয়, আমি তখনি হাজির হবো।"

শিউলী দু'ধারের শোভা দেখতে দেখতে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলে, কে যেন বলছে "ও ভাই, শোন।" শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখলে একটা জালে কতকগুলা পাখী আটক পড়েছে। তারা বললে "ভাই, আমাদের ছাড়িয়ে দাও না।" শিউলী তখুনি তাদের জাল থেকে মুক্ত করে দিলে; তারাও উড়ে যাবার সময় বলে গেল—"তোমার যখনই দরকার পড়বে আমরা আসবো।"

আরও একটু এগিয়ে যেতে তার মনে হল, কে যেন আবার ডাকছে—"ও ভাই, শোন!" কাছে গিয়ে দেখে, একটা মাছ ডাঙ্গায় পড়ে ধড়-ফড় করছে। শিউলীকে দেখে সে বললে—"আমাকে ভাই পুকুরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও না।" শিউলী তখনি তাকে দু'হাতে তুলে এনে সামনের পুকুরে ছেড়ে দিলে। মাছ খুব খুসী হয়ে বললে—"তুমি খুব ভাল মেয়ে। যদি কখনও কোন দরকার হয়, আমি তোমায় সাহায্য করব।"—এই বলে সে জলের মধ্যে চলে গেল।

চলতে চলতে শিউলী গিয়ে পৌঁছিল একটা বড় বাড়ীর সামনে। সে বাড়ীতে ঢুকতেই এক বুড়ী তার সামনে এসে তার আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখে জিজ্ঞেসা করলে—"তুমি কে গা?" শিউলী কাঁদ-কাঁদ

স্বরে জবাব দিলে—"আমার নাম শিউলী!" বুড়ী খেঁকিয়ে উঠে বলল—"তা এখানে কেন? তোমার কি চাই?" শিউলী ভয়ে কেঁদে ফেললে। বুড়ী তখন একটু নরম হয়ে বললে—"কেঁদ না বাছা! তুমি এখানে কেন এসেছ তাই বল।" শিউলী তখন একে একে তাদের বাড়ীর সব কথাই বললে। শুনে বুড়ী বললে—"আচ্ছা, তুমি আমার কাছে বছরখানেক কাজ কর। মাইনে কিছুই দেব না, শুধু খোরাক-পোষাক পাবে। এক বছর পরে তোমাকে একটা পুরস্কার দেব, এতে তুমি রাজী তো?" শিউলী সেখানে থাকবার আশ্রয় পেয়ে খুবই খুসী হ'ল। সেই দিন থেকেই সে বুড়ীর কাজে লেগে গেল।

সংসারের সব কাজ শিউলীকেই করতে হ'ত। বুড়ীর বাড়ীতে অন্য ঝি-চাকর ছিল না। গোয়ালে গিয়ে রোজ নিজ হাতে সব সাফ করে, গরুগুলার গা মুছিয়ে ভাল করে জাব মাখিয়ে খাওয়াত। তার পর দুধ দুইত। দু'বেলা বুড়ীর আর নিজের রান্না করত। বাড়ীতে একটা বেড়াল ছিল। তার সঙ্গে অবসর কালে খেলা করত। নিজের খাবার থেকে তাকে খেতে দিত। রোজ সন্ধ্যাবেলা বুড়ীর শণের মত পাকা চুল আঁচড়ে বেঁধে দিত। আর রাত্রে বুড়ীর পায়ে গরম সরষের তেল মাখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে নিজে ঘুমুতে যেত। বাড়ীতে কাজ করা তার অভ্যাস ছিল বলে সেখানে কোন কষ্ট হ'ত না।

এই রকম করে একটি বছর কেটে গেল; বুড়ী তার কাজ দেখে ভারী খুসী! তাকে ডেকে বললে—"আজ এক বছর শেষ হ'ল। এই বার তোমায় ছুটী। আমার কথার খেলাপ হয় না, তুমি পুরস্কার পাবে। কিন্তু তুমি আগে দু'টো কাজ কর। এই চালুনীটা ভর্ত্তি ক'রে পুকুর থেকে জল আন।" শিউলী তো ভেবেই সারা! ফুটো চালুনীতে জল আনবে কি করে? কিন্তু উপায় নেই! চালুনী নিয়ে সে পুকুর-ঘাটে গেল; কিন্তু যত বার জল ভরে, সঙ্গে সঙ্গে সব জল বেরিয়ে যায় বেচারী চালুনী নিয়ে পুকুর-ঘাটে বসে কাঁদতে লাগল। এমন সময় এক ঝাঁক পাখী এলো; এ সেই ঝাঁক—শিউলী ফাঁদ থেকে যাদের মুক্ত করেছিল। তারা বললে—"শিউলী, কেঁদ না। চালুনীতে ভাল করে ছাই মাখিয়ে নাও; তাহলে ফুটো দিয়ে জল পড়বে না।" তখন শিউলী চালুনীতে ছাই মাখিয়ে জল ভরলে। এবার আর জল পড়ল না। জল নিয়ে বুড়ীর সামনে যেতেই সে তো মহা খুসী! বললে—"তুমি খুব বুদ্ধিমতী। এইবার আর একটা কাজ করলেই ছুটী। এই আঙটাটা পুকুর থেকে খুব ভাল করে ধুয়ে আন ত'।" ঘাটে ব'সে শিউলী আঙটা ধুচ্ছে, এমন সময় আঙটাটা হাত থেকে হঠাৎ লাফিয়ে জলের মধ্যে চ'লে গেল! বেচারী ভয়ে কাঁদতে লাগল; বাড়ী গেলে বুড়ী নিশ্চয়ই খুব গাল দেবে। এমন সময় একটা মাছ এসে বললে—"ও শিউলী, কাঁদছ কেন?" শিউলী তাকে আঙটার কথা বলতেই সে ডুব দিয়ে আঙটাটা খুঁজে মুখে করে এনে শিউলীর হাতে দিলে। এ সেই মাছ—যাকে শিউলী ডাঙ্গা থেকে জলে ছেড়ে দিয়েছিল। আঙটা নিয়ে গিয়ে বুড়ীকে দিতেই সে খুব খুসী হল, শিউলীকে আদর করে বললে—"তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার ভাল হবে। এইবার ঐ ঘরে যাও; অনেকগুলি পেঁটরা দেখবে। তোমার যেটা ইচ্ছে বেছে নাও।" শিউলী সেই ঘরে গিয়ে ছোট বড় অনেক পেঁটরা থরে থরে সাজান দেখলে। কোন্‌টা নেবে ঠিক করতে না পেরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় বাড়ীর সেই বেড়ালটি—শিউলী যাকে নিজের খাবার থেকে ভাগ দিত—এসে বললে—"ঐ কোণের ছোট বাক্সটা নাও।" শিউলী সেইটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুড়ী তাই দেখে মুচ্‌কে হেসে বললে—"তা হলে এইবার তোমার ছুটী। বাড়ী যাও।" শিউলী বুড়ীকে প্রণাম করলে। বুড়ী তাকে—"রাজরাণী হও" বলে আশীর্ব্বাদ করলে। শিউলী যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে চললো। পাতকুয়ার তলায় এসে ওপরে ওঠবার কোন উপায় না দেখে সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় সেই কাছিমটা এসে তাকে দেখা দিল—যাকে শিউলী যাবার সময় সোজা করে বসিয়ে দিয়েছিল। সে বললে—"শিউলী, তুমি আমার পিঠে উঠে বস।" শিউলী তার পিঠের উপর উঠে বসতেই কাছিমটা তাকে নিয়ে ভুস করে জলের উপর ভেসে উঠল। সেখান থেকে পরীরা তাকে হাত ধরে পাতকুয়ার উপরে তুলে বাড়ী পৌঁছে দিলে।

শিউলীকে দেখে তার সৎমা আর লবঙ্গলতিকা যেমন অবাক্ হলো, তেমনি বিরক্তও হলো। শিউলী ফিরে এসেছে শুনে পাড়ার লোক ব্যস্ত হ'য়ে তাকে দেখতে এল। শিউলী তাদের পাতালপুরীর বুড়ীর গল্প বললে, আর সেই পেঁটরাটা দেখালে। সকলের অনুরোধে সে তখন পেঁটরাটা খুললে। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়লো হীরে-মুক্তোর একছড়া চমৎকার গলার হার! সেই হার গলায় দিতেই শিউলীর রূপ যেন দশগুণ বেড়ে উঠল। পাড়ার লোক শিউলীর খুব প্রশংসা করে বাড়ী ফিরে গেল। লবঙ্গ আর তার মা হিংসেয় জ্বলতে লাগল।

এক দিন বুড়ী লবঙ্গকে ডেকে বললে, "তুইও যা, শিউলীর মতন পাতালপুরী থেকে গহনার পেঁটরা নিয়ে আয়।" লবঙ্গ তাতে রাজী হলে বুড়ি তাকে ধাক্কা মেরে পাতকুয়ার মধ্যে ফেলে দিলে। পরীরা কিন্তু তাকে ধরলে না। জলের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে সে পাতালপুরীতে গিয়ে পৌঁছিল। জলে ভিজে শীতে হি-হি করে কাঁপছে, এমন সময় সেই কাছিম বলে উঠল,—"আমাকে সোজা করে দেবে?" নাক সিটকে লবঙ্গ বললে—"ছাই করে দেবে! আমার অত সময় নেই।" এ কথা বলেই সে হন-হন করে এগিয়ে চললো। একটু যেতেই পাখীরা বললে—"ভাই, জাল থেকে আমাদের ছাড়িয়ে দাও না।" লবঙ্গ মুখ ভেংচিয়ে বললে—"আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই কি না।" বলেই সে এগিয়ে চললো। বুড়ীর বাড়ীর কাছে যেতে মাছ বললে—"ভাই, আমায় জলে ছেড়ে দিয়ে এস না।" লবঙ্গ খেঁকিয়ে উঠল—"না, না, অত আবদারে আর কাজ নেই; আমি এখন গহনা আনতে যাচ্ছি।" বলেই সে সোজা বুড়ীর বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকল।

লবঙ্গকে দেখে বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল – "তুমি কে গা?" লবঙ্গ উত্তর দিলে—"আমার নাম লবঙ্গ। আমি শিউলীর বোন। তাকে যেমন গয়নার পেঁটরা দিয়েছ—আমাকেও তেমনি দাও।" লবঙ্গর আশ্চর্য আব্‌দারে বুড়ী মনে মনে ভারী চটে গেল; তবুও মুখে বললে—"সে এক বছর আমার কাছে কাজ করেছিল। তুমিও তাই কর, তাহ'লেই পাবে।" লবঙ্গ গহনার লোভে বুড়ীর কাজ করতে রাজী হ'ল।

সে গোয়াল-ঘরে গিয়ে দেখলে, গরুগুলার গায়ে ময়লা, আর ঘরখানা ভয়ানক অপরিষ্কার। সে কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করে না। গরুগুলাকে না দেয় জাব খোল, না দেয় কিছু খেতে। গরুও তেমনি, দুধ দুইতে

গেলেই লবঙ্গকে চাটু মারে। খাবার সময় বেড়ালটা এসে টিল মেরে তাড়িয়ে দেয়। বুড়ীর পায়ে তেল মাখাতে গিয়ে এমন টিপুনি দেয় যে, বুড়ী উহু করে চেঁচিয়ে ওঠে। আর চুল আঁচড়াতে গিয়ে পড় পড় ক'রে টেনে চুল ছিঁড়ে একাকার করে!

এই রকম করে এক বছর কাটল। তখন লবঙ্গ বললে—"দাও, এই বার গয়নার পেঁটরা, আমি বাড়ী নিয়ে যাই।" বুড়ী বললে "দিচ্ছি—আগে দু'টো কাজ কর। এই চালুনী ভরে পুকুর থেকে জল আন, আর এই আঙটিটা পুকুরের জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে এস।" কিন্তু পাখীর ঝাঁক এবং মাছ তাকে কোন সাহায্যই করলে না; তাই সে জলও আনতে পারলে না, আর আঙটিটাও পুকুরে হারিয়ে ফেললে। বুড়ী তখন রাগ করে বললে—"তুমি কোন কাজের মেয়ে নও। তোমার কোন দিন ভাল হবে না। তবুও আমি যখন কথা দিয়েছি—পেঁটরা দেব। ঐ ঘরে আছে। তোমার যেটা ইচ্ছে বেছে নাও।"—বেড়াল তাকে কিছুই বলে দিলে না। সে নিজের মনের মত একটা খুব বড় পেঁটরা নিয়ে হন-হন করে বাড়ীর দিকে চলল। পাতকুয়ার কাছে গিয়ে সে আর উঠতে পারে না। কাছিমটাও তাকে সাহায্য করতে এল না। সে পেঁটরাটা মাথায় বেঁধে দেয়াল বেয়ে অতি কষ্টে উপরে উঠতে লাগল। কত বার পড়ে গেল; হাত-পা ছড়ে গেল। সর্ব্বাঙ্গে কাদা দিয়ে পড়ল। শেষে কোন মতে উপরে উঠতে পারল।

লবঙ্গকে দেখেই তার মা পাড়ার লোকদের ডেকে আনলে। গহনার আশায় পেঁটরাটা সে সকলের সামনে খুলতেই তার ভেতর থেকে একটা প্রকাণ্ড কোলাব্যাঙ লবঙ্গর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। লবঙ্গ ভয়ে "মর মুখপোড়া!" বলে চেঁচিয়ে উঠল। ব্যাঙ তো অন্য দিকে পালিয়ে গেল; কিন্তু লবঙ্গর মুখ দিয়ে "মর মুখপোড়া" ছাড়া অন্য কোন কথা আর বার হয় না। পাড়ার লোক খুব খানিকটা হাসি-ঠাট্টা করে চলে গেল।

লবঙ্গ আর তার মা এই ব্যাপারের পর শিউলীর উপর আরও বেশী রকম চটে গেল।

পাণ থেকে চুণ খসলেই তারা শিউলীকে পিটিয়ে দিত, মুখ বুজে শিউলী সবই সহ্য করত। বাড়ীর সমস্ত কাজ, পুকুর থেকে বাসন মেজে আনা, রান্না করা, ঘর-দোর পরিষ্কার, কাঠ কাটা, সবই তাকে একলা করতে হ'ত। বুড়ী আর লবঙ্গ একটু নড়ে বসতো না।

এক দিন শিউলী জঙ্গলে গেছে কাঠ কাটতে। সেই দেশের রাজপুত্রও বনে এসেছিলেন মৃগয়া করতে। রাজপুত্র শিউলীকে দেখতে পেলেন; দেখেই তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। তিনি তাকে সঙ্গে করে রাজপুরীতে নিয়ে গেলেন। রাজা-রাণীরও শিউলীকে খুব ভাল লাগল। শিউলীর মুখে তার সব কাহিনী শুনে, পরদিনই তাঁরা রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। লবঙ্গ ও তার মাকে তাঁরা বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শিউলীর সুখ ও সৌভাগ্য দেখে তারা হিংসেয় যেন ফেটে পড়তে লাগল।

রাজা ও রাণী বুড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা রাজপুত্র অরুণকুমারকে রাজা আর শিউলীকে রাণী করে দিয়ে ভগবানের ধ্যান করতে বনে গেলেন। লবঙ্গ আর তার মা শিউলীর সব খবরই রাখত। এক দিন অরুণকুমার শিকার করতে গেছেন, ঠিক সেই সময় তারা রাজপুরীতে গিয়ে হাজির। বুড়ী শিউলীকে খুব আদর করলে, বললে—"চল মা, আমরা সবাই পুকুরে চান করে আসি।" লবঙ্গ, শিউলী আর তার সঙ্গে বুড়ী—তিন জনে স্নান করতে পুকুরে নেমেছে। কেউ কাছাকাছি নেই দেখে বুড়ী তাকে ধাক্কা দিয়ে গভীর জলে ফেলে দিলে। শিউলী বেচারী সাঁতার জানত না, দেখতে দেখতে ডুবে গেল। লবঙ্গ শিউলীর কাপড় জামা পরে রাণী সেজে রাজবাড়ীতে গেল। আর বুড়ী সেখান থেকেই নিজের বাড়ী ফিরে গেল।

অরুণকুমার সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এসে দেখেন, রাণী একগলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। রাজা যত কথাই বলেন, রাণী তার কোন জবাব দেয় না। তার শরীর খারাপ মনে করে তখনি রাজবৈদ্যকে ডাকা হ'ল। বৈদ্য অসুখের কথা জিজ্ঞেসা করতেই রাণী বলে উঠল, "মর মুখপোড়া।" সকলেই অবাক্ হয়ে গেল। রাণীর শরীর খারাপ, সেই জন্যই বোধ হয় মেজাজটা খিটখিটে হয়েছে—এই মনে করে রাজা তাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা না করে নিজের মহলে চলে গেলেন। রাত্রে কিন্তু তিনি ঘুমুতে পারলেন না। মনের মধ্যে কি রকম যেন একটা সন্দেহ হতে লাগল, কই, শিউলী তো কখনও এমন কথা আগে বলেনি। অতি শান্ত সে। আজ কি হ'ল। শিকার করতে যাবার সময়ও সে ভাল ছিল, এরি মধ্যে—এমন সময় খুব করুণ সুরের গানের একটা কলি তাঁর কানে ভেসে এল। জানলা খুলতেই দেখলেন, পুকুরের মধ্যে থেকে শিউলী ধীরে ধীরে গান গাইতে গাইতে উঠে আসছে। রাজা তখনই পুকুরধারে দৌড়িয়ে গেলেন—রাণীকে ধরতে। কিন্তু ধরবার আগেই শিউলী তাড়াতাড়ি আবার পুকুরের জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। জলপরীরা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

পরদিন রাত্রে অরুণকুমার পুকুরের ধারে একটা গাছের পাশে লুকিয়ে রইলেন। সে দিনও শিউলী গান গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে পুকুরের জল থেকে উঠে রাজবাড়ীর দিকে চলতে লাগল। রাজা পিছন থেকে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলেন। শিউলী পালাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু রাজা তার হাত ছাড়লেন না। হঠাৎ শিউলী মানুষ থেকে খরগোস, খরগোস থেকে হরিণ, হরিণ থেকে সাপ—এই ভাবে রূপ বদলাতে লাগল; তবু রাজা তাকে ছাড়লেন না। খাপ থেকে তিনি তলোয়ার বার করে সাপের মাথা কেটে ফেলতেই শিউলী মানবীরূপ ধারণ করলে। সব কথা অরুণকুমারকে খুলে বললে। রাজার তখনি ইচ্ছা হ'ল, লবঙ্গ ও তার মার গর্দ্দান নেবেন; কিন্তু শিউলী তাদের ক্ষমা করতে বললে। রাজা লবঙ্গ আর তার মাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসনের হুকুম দিলেন। তার পর অরুণকুমার শিউলীকে নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

"আমার কথাটি ফুরাল"—

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ অধ্যাপক)।

ভদ্রতা

লেখাপড়ায় পাশ করে দিগ্‌গজ হলেই মানুষ আচারে-ব্যবহারে ভদ্র হয়, তার কোনো মানে নেই! লেখাপড়া শিখলেও অনেককে দেখি, অপরের সঙ্গে মেলামেশায় ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র অভদ্রের মতো আচরণ করেন। এ অভদ্রতা প্রকাশ পায় হো-হো হাসিতে, বদ-রসিকতায়, অপরের মনে আঘাত দিয়ে জয়োল্লাস-উপভোগে এবং আরো নানা ভাবে! ট্রামে-বাসে সামনের আসনে বসে সিগারেট-বিড়ি ফুঁকে

ধোঁওয়া ছাড়া—পিছনের আসনে যাঁরা বসেন সে-ধোঁওয়ায় তাঁদের চোখে পীড়া হয় কতখানি, এ সব অসভ্য লোক তা বোঝে না। সামনের সীটে বসে হা-হা হাসির সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে পরচর্চ্চা বা নিজেকে জাহির করার গল্প-কাহিনী বলা—এগুলোতেও ভদ্রতা প্রকাশ পায় না! ভদ্রতার পরিচয় কিসে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু'-চারটে কথা বলি।

বাড়ীতে মা-বাপকে অগ্রাহ্য করা; তাঁদের মুখের উপর রূঢ় চোপা; নিজের স্বার্থে ভাই-বোনের স্বার্থে আঘাত; নোংরামি; জ্যাঠামি; ফাজলামি; স্কুলে নিরীহ টীচারের ক্লাশে উপদ্রবে তাঁকে বিব্রত এবং ক্লাশের শান্ত ভদ্র ছেলেদের পড়াশুনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা; খেলার আসরে বা মাঠে আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে অপরের খেলার আনন্দ নষ্ট করা—এগুলোতে ভদ্রতা দেশ-ছাড়া হয়। তর্কের আসরে অপরের বিরুদ্ধ মতবাদে অসহিষ্ণু হয়ে গালি-গালাজ করা বা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে কঠিন কথায় জর্জ্জরিত করা—এগুলোও ভীষণ অভদ্রতা। অপরের মত বা অপরকে যে সহ্য করতে পারে না, সে-অসহিষ্ণুতার ফলে ক্রমে তার পক্ষে আত্মীয়-বন্ধুর স্নেহ-প্রীতি পাওয়া অসম্ভব হয়। ট্রেণের কামরায় বা ট্রামে-বাসে আসন দখল করবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করায় অভদ্র মনের পরিচয় জাগে। ট্রামে চড়বার সময়—যাঁরা নামছেন, তাঁদের নামতে না দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে ট্রামে ওঠার প্রয়াস যাঁরা পান, তাঁরাও এক নম্বরের অসভ্য! সিনেমায় ছবি দেখানো হচ্ছে, হঠাৎ হয়তো প্রোজেক্টরের দোষে ধ্বনি কোনোখানে একটু ক্ষীণ বা অস্পষ্ট হলো কিম্বা ছবিতে আলোর মাত্রা কমে গেল, অমনি অনেককে দেখি, অপারেটরের উদ্দেশে ইতর গালি গালাজ বা রূঢ় ভর্ৎসনা বর্ষণ করে—এ কি ভদ্রতা? এ কি শিক্ষার সুফল? এ চীৎকারে অপরকে কতখানি জ্বালাতন করা হয়, যারা এমন অভদ্র চীৎকার তোলে, তারা কি তা বোঝে?

তোমরা মনে রেখো, আনন্দে বা শান্তিতে তোমার যেমন অধিকার, অপরেরও ঠিক তেমনি অধিকার! তোমার আনন্দের জন্য অপরের আনন্দ চূর্ণ করলে তারাও উল্টে তোমার আনন্দ চূর্ণ করবার জন্য যদি বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে তোমার আনন্দ কোথায় থাকবে? যে-পাড়ায় বাস করি, সে-পাড়ায় অপরের শান্তি আমি যদি ভঙ্গ করি, তাহলে তাঁরাও তো আমার শান্তি ভঙ্গ করতে পারেন! পরস্পরের সুখ-শান্তির জন্যই এক দিন রফা করে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থে অপরের সে সুখ-শান্তি ভাঙ্গতে গেলে আবার সেই বর্ব্বর-যুগের প্রবর্ত্তন হবে।

বহু গৃহে দেখেছি, দাসী-চাকরকে ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে। তাদের যেন মানুষ বলে মনে করে না! তারা অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘচোবার জন্য তোমাদের দোরে এসেছে—পরিচর্য্যায় তোমাদের অসুবিধা দূর করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে। বিনা পয়সায় তারা এ-সেবা করছে না, মানি। ভুল-চুকও তাদের হয়। কিন্তু ভুলচুক কার না হয়? সে ভুলচুকের জন্য বকাবকি-গালিগালাজ করলে তাদের বশ করতে পারবে না; দরদ দেখাতে হবে। স্নেহে-দরদে অবোলা পশু বশ হয়—আর মানুষ তাতে বশ হবে না? সেকালের মনিব দাসী-চাকরকে ছেলেমেয়ের মতো মমতা স্নেহ করতেন বলে দাসী-চাকরও প্রাণ দিয়ে মনিবের সেবা করতো। একালের দাসী-চাকর বেইমান হচ্ছে, ফাঁকিবাজ হচ্ছে—তার কারণ, মনিবের আজ সে দরদ নেই, তাই! তারা ফাঁকি দিতে তৎপর। তাদের স্নেহ-দরদ দাও, তারা সত্যি পশু নয়, চক্ষুলজ্জা এবং ঐ স্নেহ-দরদের খাতিরে বশ হবে, তাদের ফাঁকি-দেওয়া-রোগ সারবে।

পথে চলতে অন্য পথিকের নিরাপদ-স্বাচ্ছন্দ্য না নষ্ট করি, সে দিকে লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার লক্ষণ! বগলে ছাতি নিলুম—খোঁচার মতো সে ছাতা পিছনের পথিককে জখম করতে পারে, এই সহজ কথাটুকু যারা বোঝে না, তারা রীতিমত অভদ্র!

যে-লোককে নানা কারণে সহ্য করতে পারো না, তার সঙ্গে কোনো আসরে যদি দেখা হয়, এবং এমন ঘটে যে, তাকে পরিহার করা সঙ্গত নয়, তাহলে আভাসে-ইঙ্গিতে তাকে উপেক্ষা বা অপমান করা অভদ্রতা! এ অভদ্রতা কখনো করো না!

আর একটা জিনিষ,—নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে আর-সকলকে তুচ্ছ-জ্ঞান করার মতো মূঢ়তা আর নেই! সে-মূঢ়তায় মনে যত গর্ব্ব-সুখই উপভোগ করো না কেন, অপরের কাছে হাস্যাস্পদ হচ্ছো কতখানি, তা যদি বুঝতে পারো, তাহলে লজ্জা পাবে, নিশ্চয়!

আসলে ভদ্রতা শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো বই নেই, আইন-কানুনও নেই! সেই যে চলিত কথা আছে—অপরের কাছ থেকে যে-আচরণ প্রত্যাশা করো, অপরের প্রতি তোমার আচরণ যেন তেমনি হয়! এই কথা মেনে যদি চলতে পারো, তাহলে কোনো আচরণে অভদ্রতা প্রকাশ পাবে না—এ একেবারে ধ্রুব সত্য!

একে অনেক

মহম্মদ এবং জুলিয়াস সীজারের সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি, তাঁরা একসঙ্গে দু'টি কাজ করিতে পারিতেন—গল্প করিতে করিতে অনায়াসে চিঠি লিখিতেন। এখন হয়তো অনেকে এ দু'টি কাজ একসঙ্গে করিতে পারেন! কিন্তু একসঙ্গে ছ'রকমের কাজ—সে ছ'টির প্রত্যেকটি কাজে মনের গভীর অভিনিবেশ প্রয়োজন—এমন কাজ করিতে পারেন শুধু এক জন মার্কিন ভদ্রলোক। তাঁর নাম হ্যারি কন্! ভদ্রলোকের বয়স এখন প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর। কিন্তু একসঙ্গে ছ'রকমের কাজে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ২৫।২৬ বৎসর বয়সে!

তাঁর এই কল্পনাতীত কৃতিত্ব দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। যাঁরা মনস্তত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাঁরা তাঁর মনের এই অসাধারণ শক্তির কোনো হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আজ অবধি না!

বহু সভায় বহু জনের সামনে বহু বার তিনি তাঁর মনের এ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন! সভার মধ্যে প্রায় হাজার দু'হাজার নর-নারী জড়ো হইয়াছেন, তাঁদের উদ্দেশ করিয়া হ্যারি কন বলিলেন—আপনাদের মধ্যে কেউ একটা সংখ্যা আমাকে বলুন। কাহার কি বয়স, তাও বলুন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পানে চাহিয়া বলিলেন—আপনারা সকলে আপনাদের বান্ধবীদের বয়স আমাকে বলুন।

সকলে বয়সের পর বয়স বলিতে লাগিলেন, হ্যারি কিন্তু দাঁড়াইয়া রহিলেন না; কালো বোর্ডের সামনে দাঁড়াইয়া বোর্ডে মস্ত অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। মনে মনে অঙ্ক কষিয়া বোর্ডে তার ফল লিখিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে পর-পর যে-সব বয়স বলা হইয়াছিল, তেমনি পর-পর

অর্থাৎ আশ্চর্য্য ভাবে পর্য্যায়-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সেই সব শোনা-বয়ন মুখের কথায় বলিতে লাগিলেন।

কেন্ যখন প্রথম এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন, তখন তাঁর ঠাকুমা কাঁদিয়া সকলকে বলিয়াছিলেন—ও ছেলে পাগল হইবে! চিকিৎসকের দল বলিয়াছিলেন,—জিনিয়াস্! এমন জিনিয়াস্ জগতে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই!

কেন্‌কে অনেকে প্রশ্ন করিলেন, মনের এত শক্তি কোথায় পাইলে? কি করিয়া পাইলে? উত্তরে তিনি বলেন,—শুধু অভ্যাসের গুণে! মনের অনুশীলনে এ শক্তি লাভ করিয়াছি। একসঙ্গে ছু'-তিনটি ব্যাপারে গভীর অভিনিবেশ অর্পণ করিতে-করিতে মন এমন তৈয়ারী হইয়াছে। সার্কাশ-খেলোয়াড়ের দল যেমন অনুশীলনের ফলে তাঁদের পেশীগুলিকে যেমন-খুশী খেলাইতে পারেন, অনুশীলনের ফলে মনকে দিয়াও তেমনি একসঙ্গে অনেক কাজ করানো যায়।

Gaythorn Wins Third ... Race at Miami Prince In Wife Billing Scandal Face Disfigured Man Takes Poison Angry ... To Attack Waives Replies To Criticism ...
442473-5074617570-4156189116-5545790867-6567985861

১। খবরের কাগজ উলটো করে ধরে পড়া; ডান-দিক্‌কার কোণে যোগ-ফল; সব-নীচেকার লাইনে ভাজক-অঙ্ক

সকলে প্রশ্ন করেন,—মনকে এ ভাবে তৈয়ারী করিতে মস্তিষ্ককে অনেক বেশী খাটাইতে হয়?

তিনি জবাব দিলেন—নিশ্চয়। সার্কাশে যারা দৈহিক শক্তির নানা খেলা দেখায়, সে-শক্তি লাভ করিতে তাদের কষ্টের প্রথমে সীমা থাকে না! এ ব্যাপারেও ঠিক তেমনি।

২। যোগের অঙ্ক

প্রশ্ন হইল, মনকে এত খাটাইবার জন্য, মনের এ শক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষ কোনো রকম খাদ্য বা টনিকের প্রয়োজন আছে?

উত্তরে কেন্ বলিলেন,—না। তবে অতি-ভোজন করিলে চলিবে না। পেট-ভার থাকিলে মনকে কোনো বিষয়ে নিবিড় ভাবে নিবিষ্ট করা যাইবে না।

তিনি বলেন, যখন তাঁর বয়স তেরো-চোদ্দ বৎসর, স্কুলে পড়েন, তখন অঙ্ক ছাড়া আর সব 'সাবজেক্টে' তিনি ছিলেন কাঁচা। ক্লাশে সবার পিছনে পড়িয়া থাকিতেন। তাছাড়া অন্য 'সাবজেক্টে' তিনি মন দিতেন না। ক্লাশে টীচার এক দিন সে জন্য তাড়া দিলেন। সকলের সামনে সে-তাড়া তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধিল। তিনি তখন পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং লেখাপড়ায় পাশ করিতে তাঁকে বেগ পাইতে হয় নাই। তখন হইতেই একসঙ্গে ছু'-চারটি ব্যাপারে মনোনিবেশ করিবার শক্তি তিনি লাভ করেন। তার পর স্কুল ছাড়িয়া জুয়েলারির ব্যবসাতে নামিলেন। ব্যবসায় নামিলেও মনের সে অনুশীলন ত্যাগ করেন নাই। তার ফলে ক্রমে একসঙ্গে ছু'-রকমের বিচিত্র কাজে তাঁর সামর্থ্য হইয়াছে। কোন কাজে ভুল হয় না! মনের এ অনুশীলনে তাঁর স্মরণ-শক্তিও খুব প্রখর। অনুশীলনে মানুষের স্মরণ-শক্তি কত বাড়ে, তা অনুমান করা যায় না!

তিনি বলেন, দেখা বা শোনা বিষয়গুলির অর্দ্ধেকের উপর যে আমরা ভুলিয়া যাই, তার কারণ, সেগুলাতে তেমন মন দিই না! চোখ খুলিয়া মন দিয়া যাহা দেখিবে, কাণ খুলিয়া মন দিয়া যাহা শুনিবে, মানুষ তাহা সহজে ভোলে না। সে সব চট্ করিয়া ভুলিবার নয়। আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার পৃথিবীর মতো। সে ভাণ্ডারে অনেক কিছুর ঠাঁই হয়। ক্যামেরার দীর্ঘ ফিল্মে যদি ফোকাশ ঠিক থাকে, তাহা হইলে বহির্জগতের অনেকখানি যেমন সে-ফিল্মে আবদ্ধ ও মুদ্রিত হইয়া যায়, আমাদের চোগ-কাণ খুলিয়া মনের ফোকাশও যদি সেই সঙ্গে খুলিয়া রাখি, তাহা হইলে যা-কিছু দেখিব বা শুনিব, তার সব ঐ মনের পটে চিরদিনের মতো আবদ্ধ এবং মুদ্রিত থাকিবে: যাঁরা খুব মেধাবী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান, তাঁরা তাঁদের মনকে বিশিষ্ট কোনো বিষয়ে নিবদ্ধ রাখেন; অন্য সব বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের ঔদাসীন্য প্রচুর। এ জন্য তাঁদের স্মৃতির ভাণ্ডারে ঐ বিশেষ বস্তু ছাড়া আর-কিছু মজুত থাকে না—তাঁদের মধ্যে অনেকে হন উদাস ভুলো-মন (**absent-minded**)।

৩। ভাজ্য

একসঙ্গে কি রকমের ছুটি কাজ এমন নিখুঁত ভাবে করিতে পারেন, ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে।

কেন্ সাহেবের হাতে দেখিতেছ খবরের কাগজ! উল্টা ধরিয়া তিনিও খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতেছেন। (১ নং ছবি)

গড়-গড় করিয়া পড়িতেছেন। পড়া বাধিতেছে না। কাগজ-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে ছাপার খবর তিনি দাঁড়াইয়া উল্টা ভাবে লিখিতেছেন। এ লেখা শেষ করিয়া কাগজ পড়িতে-পড়িতেই তিনি ডান-দিক্‌কার কোণে যে মস্ত যোগের অঙ্ক দেখিতেছ, (২ নং ছবি) ঐ অঙ্কগুলি যোগ করিয়া তার যোগ-ফল লিখিয়াছেন। যোগফল লেখার সঙ্গে সঙ্গে সব-নীচে ঐ যে ৪১৪০০০১৮৫৭ অঙ্কটি (৩ নং ছবি) —ঐ অঙ্কটিকে লম্বা কালো বোর্ডে লেখা পাঁচটি অঙ্ক ৪৪২৪৭৩; ৫০১৪৬৮১৫৭০; ৬১৫৬১৮১৮৮৬; ৫৫৪৮৭১০৮৬৭; ৬৫৬৭১৮৫৮৬১ (১ নং ছবি)—এই ছ'টির প্রত্যেকটি অঙ্ক দিয়া সব-নীচেকার ঐ অঙ্কটিকে ভাগ করিয়া সেগুলির ভাগ-ফলও সঙ্গে সঙ্গে লিখিতেছেন। ভাবিয়া ছাখো, এ কি মানুষের কাজ! অথচ এ কাজে কেনের কোন দিন এতটুকু ভুল হয় নাই।

৪। ঝুলন্ত অবস্থায় লেখা

৫। ঝুলন্ত অবস্থায় ক্রশ্-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্

আর এক শক্তির পরিচয় ৪ নং ছবিতে। ত্ব'-পা বাঁধিয়া কেন্‌কে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝুলন্ত অবস্থায় মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বোর্ডে তিনি অনেকগুলি অক্ষর লিখিতেছেন। অক্ষরে যে দীর্ঘ ছত্র লিখিতেছেন, তার মাঝে-মাঝে অনেকগুলি অক্ষর উল্টা। ঐ ছত্রগুলির মধ্য হইতে মাত্রা-হিসাবে বাছিয়া অক্ষর তুলিয়া বিন্যস্ত করিলে তিনটি বিভিন্ন ইংরেজী কথা মিলিবে; "ইডিয়োসিনক্রেশিস্", "ইণ্ডিয়ানাপোলিশ" "কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল্।"

৫ নং ছবিতে ঝুলন্ত ভাবে 'ক্রশ-ওয়ার্ড' পাজ্‌লের সমাধান করিতেছেন!

৬ নং ছবি ছাখো। ত্ব' হাতে এবং ত্ব' পায়ে খড়ি ধরিয়া তিনি লিখিতেছেন। ডান হাতে উল্টা ধরণে, বাঁ হাতে সোজা এবং ত্ব' পায়ে সোজা লেখা লিখিতেছেন। তার উপর মুখেও খড়ি আছে। সে খড়ি দিয়াও লেখা চলিতেছে! একটি কথা নয়, পাঁচ খড়িতে পাঁচটি আলাদা লেখা লিখিতেছেন। এ লেখায় শুধু হাত-পায়ের কশরৎ নয়, মনের ক্রিয়াও কি ভাবে চলিয়াছে, ভাবো!

৬। হাত-পা এবং মুখে খড়ি ধরিয়া

আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু অসম্ভব নয়। কেন্ বলেন, বারো-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে গভীর অভিনিবেশে অভ্যাস করিলে তোমরাও এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে।

সংযোগ-রক্ষা

যুদ্ধে ফৌজের সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গও যেমন অজানা পথে অগ্রসর হইয়া চলে, পিছনকার আস্তানার সঙ্গে খবরাখবর রাখার ব্যবস্থাও অমনি ঐ সঙ্গে তারা করিতে ভোলে না! ফৌজের দলে
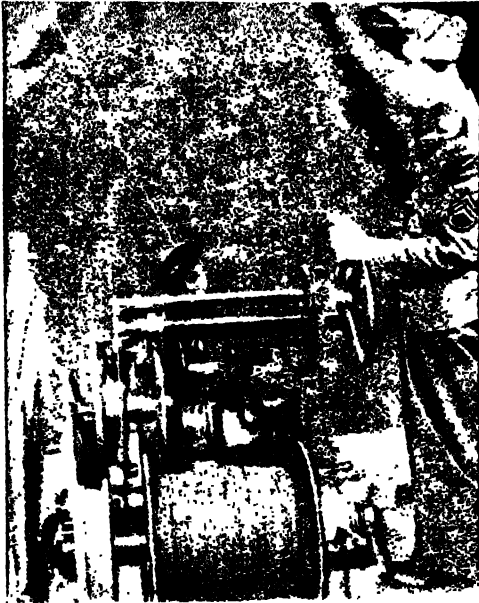
তারের পুলি খোলা

টেলিফোন ফিট্ করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তার পটুতা অসাধারণ। তিন জন মাত্র লোক দু' মিনিট সময়ের মধ্যে এক-মাইল-ব্যাপী পথে টেলিফোনের তার কায়েমি ভাবে খাটাইয়া ফেলে। এ জন্য বিশেষ যন্ত্রাদি আছে। সে-মেশিনের ওজন সাড়ে সাত মণ। ট্রাকের উপরে এই মেশিন যায় ফৌজের সঙ্গে; এবং এ গাড়ী চলিতে চলিতে পথের ধারে-ধারে ঘণ্টায় ৩০।৩৫ মাইল জুড়িয়া টেলিফোনের তার লাগাইয়া যায়। যন্ত্রকৌশলে ৪০ ফুট উর্দ্ধে এ তার নিক্ষিপ্ত হয়। মেশিনের পিছন-দিকে থাকে তার-জড়ানো রীল। প্রত্যেকটি রীলে এক-মাইল দীর্ঘ তার জড়ানো থাকে; এবং যন্ত্র-নিহিত গ্যাসোলিন-এঞ্জিন চালনার ফলে ঐ তার 'পুলির' রীল-মুক্ত হইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিতে এতটুকু আয়াস লাগে না। 'পুলি'-(চাকা)র সাহায্যে রীল হইতে তার খোলে। এক জন লোকের শুধু প্রয়োজন হয় ঐ রীলের চাকা ঘুরাইবার জন্য। প্রয়োজন ঘটিলে এ-ভাব 'আবার রীলে' গুডাইয়া তোলা যায়। একটির পর আর-একটি, তার পর আর-একটি—টেলিফোনের 'তার'-বাহী এমনি
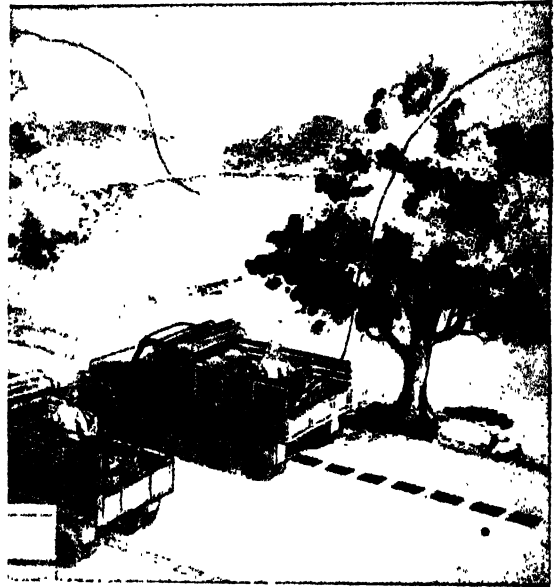
গাড়ী থেকে তার ফেলা

বহু ট্রাক ফৌজের সঙ্গে চলে। এ জন্য সংবাদ-আদান-প্রদানে কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

দোতলা ট্রেলার

বিপক্ষের বোমার আশঙ্কায় এক-জায়গা হইতে আর-এক জায়গায় আস্তানা তুলিবার প্রয়োজন বুঝিয়া আমেরিকার এক মোটর-কোম্পানি বিচিত্র-জাতের দোতলা-ট্রেলার তৈয়ারী করিয়াছে। এ ট্রেলার দো-তলা। পথে চলিবার সময় উপরের তলা নামাইয়া নীচের তলার সঙ্গে গায়ে-গায়ে খাপ খাওয়াইয়া লাগানো চলে; তার ফলে গাড়ী হয় নীচু এবং পথ চলিতে বাধা ঘটে না। তার পর যেখানে

পথে যেতে দু'-তলা গায়ে-গায়ে

আস্তানা পাতিবার প্রয়োজন, সেখানে আসিলে বোতাম টিপিয়া নীচের তলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপরে তোলা হয়। দুই তলা খোলা হইলে

ভাঁজ-খোলা দুই তলা

ট্রেলারের মধ্যে প্রচুর জায়গা মেলে—বাসের জন্য এতটুকু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

পথ-করা ট্রাক্টর

এ যুদ্ধে পূর্ত্ত-শিল্পীরা যে কর্ম্ম-তৎপরতা এবং বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দিতেছেন, তার আর তুলনা নাই। জলা-জঙ্গল বুজাইয়া প্রশস্ত পথ-নির্ম্মাণে তাঁদের পটুতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। বন-জঙ্গল কাটিয়া মাটী দলিয়া সমতল করিয়া সদ্য-সদ্য সে-সব জায়গায় পথ তৈয়ারী করিয়া সেই পথকে কঠিন মজবুত করিবার জন্য অসংখ্য অসাধ্য-সাধন ট্রাক নির্ম্মিত হইয়াছে। মার্কিণ কোম্পানি জ্যাক-র‍্যাবিট এ ট্রাক তৈয়ারী করিতেছে। গত পাঁচ মাসে জলা বুজাইয়া এক-একখানি ট্রাক্টরে মাটী সেঁচা হইয়াছে বারো লক্ষ গজ! এক-একখানি ট্রাক্টর লইয়া এক জন মাত্র লোক এ-কাজ করিয়াছেন। এ কাজের জন্য ট্রাক্টর তৈয়ারী হইয়াছে দু'-জাতের। এক-জাতের
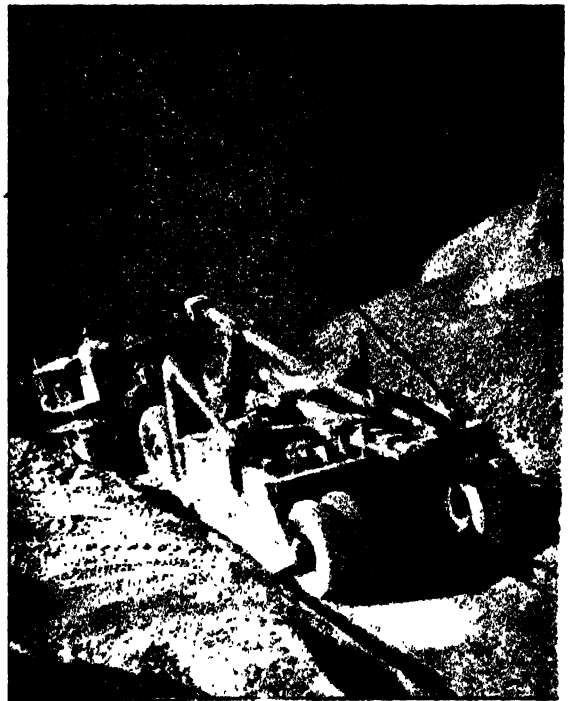
মাটী ভেঙ্গে পথ করা

ট্রাক্টর জলা বুজাইয়া মাটী কাটিয়া চাছিয়া জমিকে সমতল করে; আর এক-জাতের ট্রাক্টর সে-জমির বুকে টিলা মাটী ছড়াইয়া পথ পিষিয়া

পথ চৌরশ

দলিয়া সমতল, পরে নুড়ি-কাঁকর-খোয়া দিয়া সে পথকে কঠিন মজবুত করে।

পেঁয়াজী-গোলা

এখানি "কিং জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্‌" নামে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজের ছবি। এ জাহাজকে আদর করিয়া "পেঁয়াজী বারুদখানা" বলা হয়। এ জাহাজে অসংখ্য কামান আছে। সে সব কামান হইতে প্রতি-সেকণ্ডে অজস্র গোলা-বর্ষণ চলে। বিমান-বোমারু-প্রতিরোধে এ সব গোলার শক্তি অসাধারণ। বিমান-বোমারু মারা না পড়িলেও তার পক্ষে ধ্বংস-

যুদ্ধ-জাহাজে বোমারু-তাড়ানো কামান

কার্য্য-পরিচালনা—এ সব গোলাগুলি-বর্ষণে অসম্ভব হয়। এক-একটি গোলা বহু দূর পর্য্যন্ত পাড়ি দিতে পারে।

বেলুন-বারাজ

কলিকাতায় গঙ্গার ধারে, মিল-ডক প্রভৃতি অঞ্চলে এবং হাওড়ার পুলের উপরে শূন্য-পথে ঐ যে বিরাট্ শুয়কের মতো নোঙর-বাঁধা অতিকায় বেলুন দেখি, ওগুলির নাম বেলুন-বারাজ। এগুলি তৈয়ারী হইয়াছে—জাপানী বিমান-বোমারুর গতিরোধ এবং তাদের ধ্বংস-লীলার প্রতিবেধ-কল্পে। এগুলির সঙ্গে ইস্পাতের মোটা এবং মজবুত তার বাঁধা আছে। এ-সব তার খুব দীর্ঘ। বিমান-পোতের সাড়া পাইবামাত্র ঐ তার সুদীর্ঘ ভাবে ছাড়িয়া দিলে ঢাউশ বেলুনগুলি শূন্য-পথে বহু উর্দ্ধে উঠিবে। শূন্য-পথে এ-সব বেলুন বিক্ষিপ্ত থাকিলে বিমান-বোমারুর পক্ষে সুবিধামতো জায়গা সংগ্রহ করিয়া বোমা-নিক্ষেপে ধ্বংস-সাধনের কাজ দুঃসাধ্য হইবে।

বেলুন-বারাজ

আখ-মাড়া কল

আমেরিকায় লুইসিয়ানায় আখের ফসল ফলে প্রচুর। আখকে সেখানকার ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীর মতো মানে—এতটুকু আখ অপচয় করিতে জানে না। আখও সেখানে হয় সুদীর্ঘ—মাথায় বারো ফুট লম্বা। ক্ষেত হয় ঘন
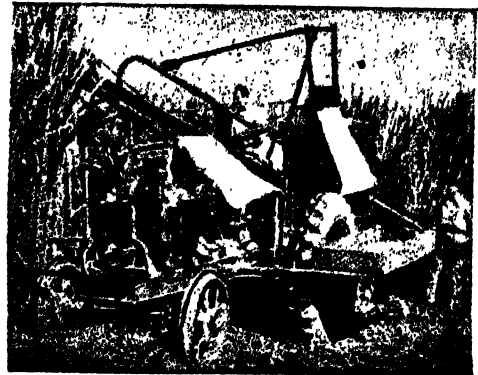
আখ কাটা

জঙ্গলের মতো! সে জঙ্গল ভেদ করিয়া আখ কাটিয়া লইবার জন্য মোটর-ট্রাকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসাইয়া সেই গাড়ী আখের ক্ষেতে চালাইয়া তার সাহায্যে আখ কাটিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহাতে একগাছি আখ নষ্ট হয় না এবং কাজও হয় খুব ক্ষিপ্র।

জলের আগুন

জলে আগুন লাগিলে কি করিয়া সে-আগুন নিবানো যায়? সমস্যার কথা! এবং এ সমস্যা চিরকাল আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত

জাহাজ থেকে উৎসারিত জলধারা

রাখিয়াছে। এ যুদ্ধে সাগরের বুকে বিপক্ষ-জাহাজে আগুন লাগানো নিত্যকার ব্যাপার। জলে-জলে যুদ্ধ-জাহাজের মারফৎ আগুন-লাগানোর বিপত্তি আছে, তার উপর এবার আবার শূন্যপথ হইতে বোমা ফেলিয়া সেই বোমার মারফৎ আগুন লাগানোর উৎপাত! এ জন্য যুদ্ধ-জাহাজকে অগ্নি-বাণ হইতে রক্ষা করিতে কাছাকাছি 'দম-কল'-জাহাজ থাকে। কোনো জাহাজে আগুন লাগিয়াছে দেখিবামাত্র এ-জাহাজ হইতে প্রচুর বারি-বর্ষণ সুরু হয়। এ-জাহাজ হইতে মিনিটে বিশ হাজার গ্যালন জল পাম্প এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ষণ চলে।

সিগারেটের কাগজ

কাগজের জোগানে যে-রকম কড়াকড় বাঁধন পড়িতেছে, লেখা-পড়ার বালাই আর থাকিবে না!! ধূম্রপায়ীদের মনেও আতঙ্ক দেখা দিয়াছে! কিন্তু তাঁদের ভয় নাই! আমেরিকায় শণ হইতে সিগারেটের কাগজ তৈয়ারী হইতেছে অজস্র-পরিমাণে। পূর্ব্বে সিগারেটের জন্য আমেরিকা পাৎলা কাগজ লইত ফ্রান্স এবং বেল-

এই শণ হইতে কাগজ
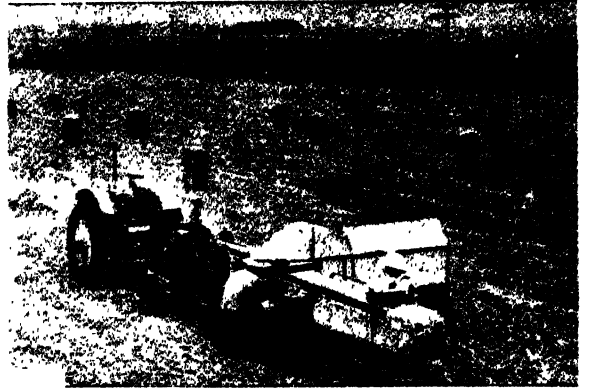
জিয়ামের বহু মিল হইতে। সম্প্রতি সে পথ বন্ধ। তাই মার্কিণ বৈজ্ঞানিকের দল ধোঁয়ার নেশা বজায় রাখিতে শণের চাষে প্রাণপাত করিতেছেন; এবং সেই শণ হইতে তাঁরা তৈয়ারী করিতেছেন সিগারেটের পাৎলা কাগজ। এ কাগজের লক্ষ লক্ষ গাঁট বস্তাবন্দী হইয়া দেশ-বিদেশে চালান যাইতেছে।

বিমান-বন্দর রক্ষা

এটিও আমেরিকার কীর্ত্তি! বিমান-বন্দরগুলির যেখানে বিমানপোত থাকে, বা শূন্য-পথ হইতে আসিয়া যেখানে অবতীর্ণ হয়, সেই মেঝে তৈয়ারী হয় তুলার 'ব্ল্যাঙ্কেট' পাতিয়া। কাজেই বোমা পড়িলে
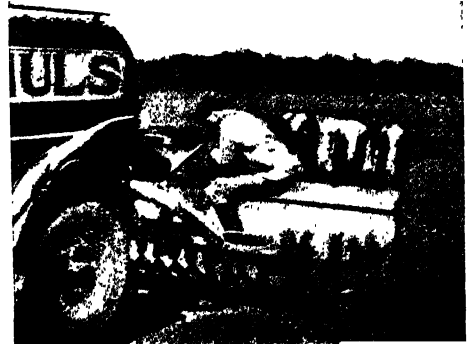
আশফাল্টের শীট্ পাতা

বিমান-বন্দর সে-আগুনে পুড়িয়া চকিতে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে। এ যুদ্ধে মার্কিণ-শিল্পীর বুদ্ধি-কৌশলে বিমান-বন্দরের মেঝেয় আগাগোড়া আলকাৎরার তৈরী এক-রকম মিক্সচার পিচকারী-ধারায় বর্ষণ করিয়া তার উপর আশফাল্টের প্রলেপ-লাগানো শীট্ আঁটা হইতেছে। এই প্রলেপ-শীটের গুণে আগুন লাগিলেও সে-আগুন বিমান-বন্দরের মেঝেকে কোনো মতে দগ্ধ করিবে না।

অস্ট্রেলেশিয়া

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগ হইতে সুরু করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি ছোট-বড় যে অসংখ্য দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপপুঞ্জ অস্ট্রেলেশিয়া বা ওশানিয়া নামে অভিহিত। অস্ট্রেলেশিয়ায় ছয়টি বিভিন্ন বিভাগ—(১) মলয়েশিয়া—

প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপপুঞ্জ

ইষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে নিউ গিনি পর্য্যন্ত; (২) মেলানেশিয়া—নিউ গিনি হইতে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত; (৩) অষ্ট্রেলিয়া ও টাশমানিয়া; (৪) নিউ জীলান্দ; (৫) পলিনেশিয়া (৬) মাইক্রোনেশিয়া—মেলানেশিয়ার উত্তরাবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ।

অষ্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথের কথা এ-বৎসর আষাঢ় মাসের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। নিউ গিনির পূর্ব্বার্দ্ধ—অষ্ট্রেলিয়ান কমনওয়েলথের এবং পশ্চিমার্দ্ধ ডাচদের অধীনে। নিউ জীলান্দ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্ব-শাসক রাষ্ট্র; ফিজি দ্বীপপুঞ্জও ব্রিটিশের অধিকার-ভুক্ত।

নিউ গিনি, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ কালেডোনিয়া দ্বীপগুলির উপর জাপানের তীব্র লক্ষ্য কেন, তাহা বুঝিতে হইলে এই সব দ্বীপ বা সমগ্র অস্ট্রেলেশিয়ার পরিচয় জানিতে হয়।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পীবডি মিউজিয়মের পক্ষ হইতে ডগলাশ অলিভার নামে একজন সদস্য বছর-খানেক পূর্ব্বে অস্ট্রেলেশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন; তিনি সেই ভ্রমণের বিশদ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিউ গিনির নাম শুনিয়া ক'বৎসর পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য জগৎ প্রশ্ন করিত,—সে আবার কোথায়? আর আজ? আজ জাপানী প্লেন আর বোমার শব্দে নিউ গিনি, নিউ ব্রিটেন, পাপুয়ার নাম ষ্টালিনগ্রাডের মত স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

জাপানের প্রধান লক্ষ্য এখন নিউ গিনি; নিউ কালেডোনিয়া এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জের উপর।

নিউ গিনির আয়তন ৩১৩০০০ বর্গ-মাইল; লোক-সংখ্যা ৬৭০০০০। নিউ কালেডোনিয়া—৮৫৪৮ বর্গ-মাইল, লোক-সংখ্যা ৫৪০০০; ফিজির আয়তন ৭০৮৩ বর্গ-মাইল, লোক-সংখ্যা ২১৫০০০।

এই দ্বীপগুলিতে আসিতে হইলে জাপানকে আসিতে

হইবে সলোমন দ্বীপ (প্রধান সহর তুলাগি ; জাপানী বোমায় তুলাগি ইতিমধ্যে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে) ; সাণ্টা ক্রুজ দ্বীপ ; নিউ হেব্রাইডিশ এবং নিউ কালেডোনিয়া পার হইয়া।

কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে,—নিউ কালেডোনিয়া অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ কোথায় এক কোণে পড়িয়া আছে,—তার উপর জাপানীর এত লোভ কেন ? লোভের কারণ, নিউ কালেডোনিয়া বিবিধ খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে ক্রোম এবং নিকেল মেলে প্রচুর এবং অজস্র পরিমাণে ; লোহা আছে দু' কোটি টন ওজনের। তার উপর এখানে কোবাল্ট ও সীসা ; ম্যাগনেসাইট ; জিঙ্ক ; এ্যাণ্টিমনি এবং মাঙ্গানীজ প্রচুর পরিমাণে আছে। জাপান আজ প্রচুর নিকেল চায়—সে-নিকেল সে পাইবে এই কালেডোনিয়া হইতে।

অধিকার-স্থাপনে প্রয়াস পায় নাই। শেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একখানি ফরাসী সার্ভে-জাহাজ এইখানে সাগর-কূলে ভাঙ্গিয়া গেলে মেলানেশিয়ানরা সে-জাহাজের যাত্রীদের খাইয়া সাফ করে। তখন ফরাসী-জাতি এ-দ্বীপটিকে শায়েস্তা করিতে উদ্যত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এ-দ্বীপটিকে ফরাসীরা করে দ্বীপান্তরী-আসামীদের আস্তানা। তবু মেলানেশিয়ানদের সঙ্গে বিরোধ-মীমাংসার অন্ত ছিল না। শেষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মেলানেশিয়ানদের শায়েস্তা করিয়া এখানে ফরাসী অধিকার কায়েমি হয়। অধিকার কায়েমি হইলেও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ জাতি ছিল মেলানেশিয়ানদের কাম্য ভোজ্য ! সেই বৎসরেই নোয়েল নামে এক জন দেশী সর্দ্দার এক শ্বেতাঙ্গ-পল্লী আক্রমণ করিয়া বহু শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করে ;

অষ্ট্রেলিয়া

নিউ কালেডোনিয়া ফরাসী-উপনিবেশ,—এখন ফরাসী ফ্রী কমিটির অধীন। পাইনস্ দ্বীপ, ওয়ালিশ দ্বীপপুঞ্জ, লয়ালটি, ফুতুনা, আলোফি, হুয়ন এবং নিউ কালেডোনিয়া —এইগুলিকে লইয়া নিউ কালেডোনিয়া উপনিবেশের সৃষ্টি। রাজধানী নুমিয়া নিউ কালেডোনিয়ার দক্ষিণ-সীমান্তে অবস্থিত।

ক্যাপ্টেন কুক এ-দ্বীপটিকে আবিষ্কার করেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। তার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এ দ্বীপ ছিল নাবিক এবং নিউ সাউথ-ওয়েলশের জেল-পলাতক আসামীদের আস্তানা ! কিন্তু এখানকার মেলানেশিয়ান-জাতের নিষ্ঠুর হিংসার ভয়ে ফ্রান্স এবং বৃটেন কেহই এখানে

এবং তাদের বলি দিয়া ভোজন-উৎসব সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার ফলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া মেলানেশিয়ানদের শ্বেতাঙ্গ-খাদ্যে আজ অরুচি এবং বিরাগ জন্মাইয়া দিয়াছে।

দ্বীপটিকে অধিকার করিয়া ফরাসী জাতি এখানকার খনিজ-সম্পদের সদ্ব্যবহারে এক দিনের জন্য আলস্য বা ঔদাস্য করে নাই। দেশীয় কুলি মিলে না বলিয়া ইন্দো-চীন এবং যবদ্বীপ হইতে হাজার-হাজার কুলি-শ্রমিক আনিয়া খনির কাজে লাগানো হয়। কানাডার পর এমন বিরাট্ নিকেল-খনি পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

তার পর জাপান যাহাতে সামরিক উপকরণ না পায়,

এ জন্ত নানা প্রদেশে আইন-কানুনের বিধি গঠিত হইলে জাপান চাহিল নিউ কালেডোনিয়ার দিকে। বহু জাপানী ধনী নিউ কালেডোনিয়ার খনির কাজে কোম্পানি খুলিয়া এখানে আসিয়া আস্তানা পাতিলেন। স্থানীয় আইন মানিয়া তাঁরা ফরাসী ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিলেন। এবং এমনি করিয়া বহু কল-কারখানা খুলিয়া নিউ কালেডোনিয়ার ভাগ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এখন এ যুদ্ধে জাপানের লক্ষ্য, ফরাসীর হাত হইতে —যেখানেই যান, ফিজি ভিন্ন যাইবার অন্ত পথ নাই। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজগুলির পক্ষে ফিজি একমাত্র সংযোগ-তীর্থ (জংশন)।

কৃষি-সম্পদে ফিজি সমৃদ্ধ। ফিজিয়ানরাই জমির মালিক। এখান হইতে নানা দেশে প্রচুর চিনি এবং নারিকেল চালান যায়। তার উপর এখানকার চন্দন-কাঠ বিশ্ব-বিখ্যাত।

আমেরিকা এক বার ফিজি-অধিকারে দাবী করিয়াছিল,

লে-গ্রামের বিমান-বন্দর—নিউ গিনি

নিউ কালেডোনিয়া ছিনাইয়া লইয়া তাকে স্বাধিকার-ভুক্ত করা।

নিউ কালেডোনিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ভিটি লেপু! ফিজি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ভিটি লেপু আয়তনে সব-চেয়ে বড়। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান খুব সঙ্গীন। প্রশান্ত-মহাসাগর-বাহী জাহাজগুলিকে ফিজি হইয়াই যাইতে হয়; এবং এই ফিজিতে একদা স্বর্ণ-খনির সন্ধান মিলিলে বহু ভাগ্যান্বেষী ফিজিতে আসিয়া প্রচণ্ড ভিড় জমাইয়াছিল।

বন্দর-হিসাবে এদিককার সাগর-পথে ফিজির তুলনা নাই। হাওয়াই, নিউ জীলাণ্ড, সামোয়া, নিউ কালেডোনিয়া কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফিজিতে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ বণিকের দল এখানে তুলার চাষ করিয়াছিল, কিন্তু আমেরিকান প্রতি-যোগিতায় তুলার সে চাষ বাড়িতে পায় নাই। তার পর হইতে ব্রিটিশ বণিকের দল চিনির কারবারে সমগ্র অধ্যবসায় নিয়োজিত করিয়াছে। এখানকার মাটী খুব উর্ব্বর। জল-বাতাসও উৎকৃষ্ট। কিন্তু মুস্কিল ঐ কুলি-মজুর লইয়া। কাজেই কাজের জন্ত টঙ্কিন এবং যবদ্বীপ হইতে লোক আনা ছাড়া উপায় ছিল না। তাহাতেও ব্যবসাতে সুবিধা ঘটে নাই। কারণ, তাদের সঙ্গে

কণ্ট্রাক্টে যে-সময়ের চুক্তি ছিল, সে সময় উত্তীর্ণ হইবা-মাত্র তারা দেশে চলিয়া যায়। তখন দারুণ সমস্যা ঘটিল। এবং সে সমস্যার সমাধান হইল ভারতবর্ষ হইতে কুলি-মজুর এবং শ্রমিক লইয়া গিয়া।

ভারতবাসীদের লইয়া এখন কিন্তু প্রমাদ ঘটিয়াছে। বৃটিশরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, ফিজিতে বাহিরের লোক যেন না আসে—বাহিরের কোনো প্রভাব যেন ফিজিয়ানদের উপরে না পড়ে! অথচ ফিজিয়ানরা জমির মালিক হইলেও মাঠে-বাটে নামিয়া কাজ করিবে না! এবং ও-সব জমিতে চাষবাসের জন্য লোক চাই,—সে-লোক ভারতবাসী। যে-সব ভারতীয়কে ফিজিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তারা সেখানে জমি-জমা লইয়া চিরদিনের জন্য ঘর বাঁধিতে চায়! তার উপর ভারতবাসীকে ওখানকার বৃটিশ বণিকের দল বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাদের মনে আশঙ্কা—রাজনীতির দিক দিয়া ফিজিয়ানদের যদি জাগাইয়া তোলে। অথচ এই ভারতীয়দের নহিলে চলে না! এখন সেখানকার চিনির কারবারে ভারতীয়েরাও বেশ আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সে জন্য চিনির শ্বেতাঙ্গ-কারবারীদের অস্বস্তির সীমা নাই।

ফিজি যদি আজ জাপানের অধিকার-ভুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমেরিকা এবং বৃটেনের বাণিজ্যের অবস্থা কি হইবে, ভাবিবার বিষয়! (with Fiji in Japanese hands, our (America) naval stronghold in Samoa would be menaced, perhaps cut off from supplies and reinforcements.

লেখক বলিতেছেন—বোটে চড়িয়া আমি পাপুয়া উপসাগর বহিয়া গিয়াছিলাম! উভয় তীরে দেখিবার মতো এমন কিছু নাই। বোটে কয়েক জন নারিকেল-ক্ষেতের প্ল্যান্টারের সঙ্গে দেখা হইল। তারা রাবৌলের গ্রীষ্ম-তাপের কথা বলিতেছিল। প্ল্যান্টাররা পোর্ট মোরেশবীতে নামিবে—সেখানে নামিয়া তারা যাইবে ওয়াউ সহরে। সেইখানেই তাদের অফিস।

এখানকার প্ল্যান্টারদের তেমন পরিশ্রম করিতে হয় না। ক্ষেত আছে—গাছে নারিকেল ফলে প্রচুর, কুলিরা

বর্ষার জলে পথ ডোবে—নিউ গিনি

জলেই ইহাদের বাস—পাপুয়ার ধীবর

দেখে। তার পাহারাদারীর ব্যবস্থা ঠিক থাকিলেই হইল! প্ল্যান্টাররা বোটে চড়িয়া ষ্টীমারে চড়িয়া পোর্ট মোরেশবীতে

যায়, সালামাউয়ে যায়; জলাজঙ্গল ঢুঁড়িয়া বেড়ায়; পাহাড়ে চড়িয়া পিকনিক করে। বেশ আমোদে তাদের দিনাতিপাত হয়।

পাপুয়ার প্রধান বন্দর এবং সহর—পোর্ট মোরেশবী। সহরটি ছোট পাহাড়ের উপরে। পাপুয়া এখন বেশ সমৃদ্ধ। অথচ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জলায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তখন ডাচ, জার্ম্মাণ এবং বৃটিশ—এই তিন জাতে নিউ গিনির

পাপুয়ার পাপুয়াত্বের পরিচয় পাওয়া যায় পোর্ট মোরেশবীর এক-মাইল উত্তরে হান্নুয়াবাদা গ্রামে। খুঁটীর উপরে শুধু চালা-ঘর। পথে ধূলায়-কাদায় ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে, বয়স্ক পুরুষের দল বসিয়া ধূমপান করিতেছে, নয় খুঁটাতে ঠেশ দিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই—আলস্য এবং কদর্য্যতার প্রতিচ্ছবি!

তাদের ছবি তুলিব বলিয়া ক্যামেরা বাহির করিতেই
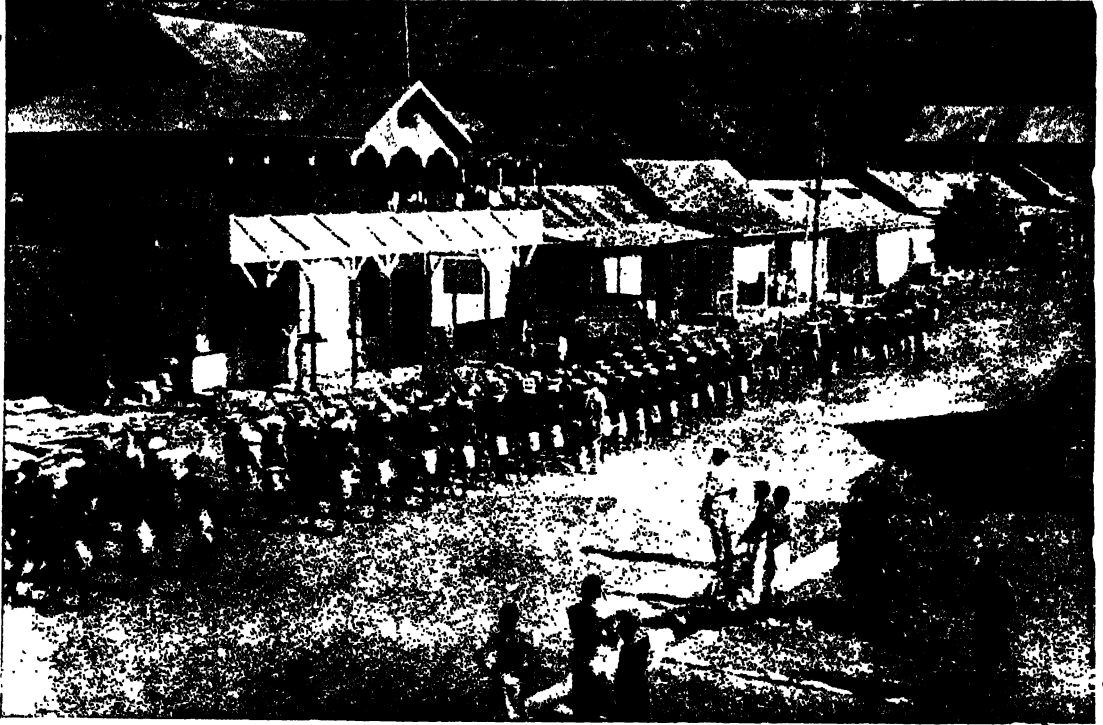
রাবৌলের দেশী ফৌজ—নিউ গিনি

অধিকার লইয়া বিপর্য্যয় রকমের দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলিয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভাগে প্রভুত্ব স্থাপন করে ডাচ্। পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর অষ্ট্রেলিয়ান কমনওয়েলথের হাতে অর্পিত হইয়াছে।*

নিউ গিনিতে বহু জাপানীর বাস। তারা এখানে নূতন জাতি, নূতন কালচারের সৃষ্টি করিতেছে।

পোর্ট মোরেশবীতে বড় বড় রাস্তার ধারে একখানিও কুটীর দেখি নাই। শুধু ইট-কাঠের তৈয়ারী ঘর-বাড়ী। অথচ বিশ বৎসর পূর্ব্বে এ সব ঘর-বাড়ীর চিহ্ন ছিল না!

* পাপুয়া সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এ বৎসরের শ্রাবণ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

দু'-এক জন ইংরেজী-জানা লোক আসিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভুল ইংরেজীতে বলিল—ছবি তৈরী করিবে? ছবি? বেশ, এই নাও, আমি এক-শিলিং দাম দিব, আমার ছবি নাও।

আমি বলিলাম—দাম চাহি না, বিনা-দামে ছবি লইব।

আশ্চর্য্য হইয়া তারা বলিল,—ও, তা বেশ, নাও।

ছবি তুলিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। সমুদ্র-কূলে শুধু পাহাড়ের শ্রেণী; তার পাশে এবং বুকে বাগান, ক্ষেত। নারিকেল-কুঞ্জেরই প্রাধান্য দেখিলাম। এ সব কুঞ্জে য়ুরোপীয়ান বণিকদের বাঙলো-বাড়ী। ইহারা নারিকেলের ব্যবসা করে।

পোর্ট মোরেশবী হইতে আমরা আসিলাম সামারাউয়ে।

নিউ গিনির মাঝি ও কুলি

সেপিক্-শিকারী—নিউ গিনি

সেপিক্ নদীর বুকে ডোঙ্গা—নিউ গিনি

ইম্‌বাস্তো জাতের বাঁশীওয়ালা—নিউ গিনি

পাপুয়া-বিলাসিনী—পোর্ট মোরেশবী
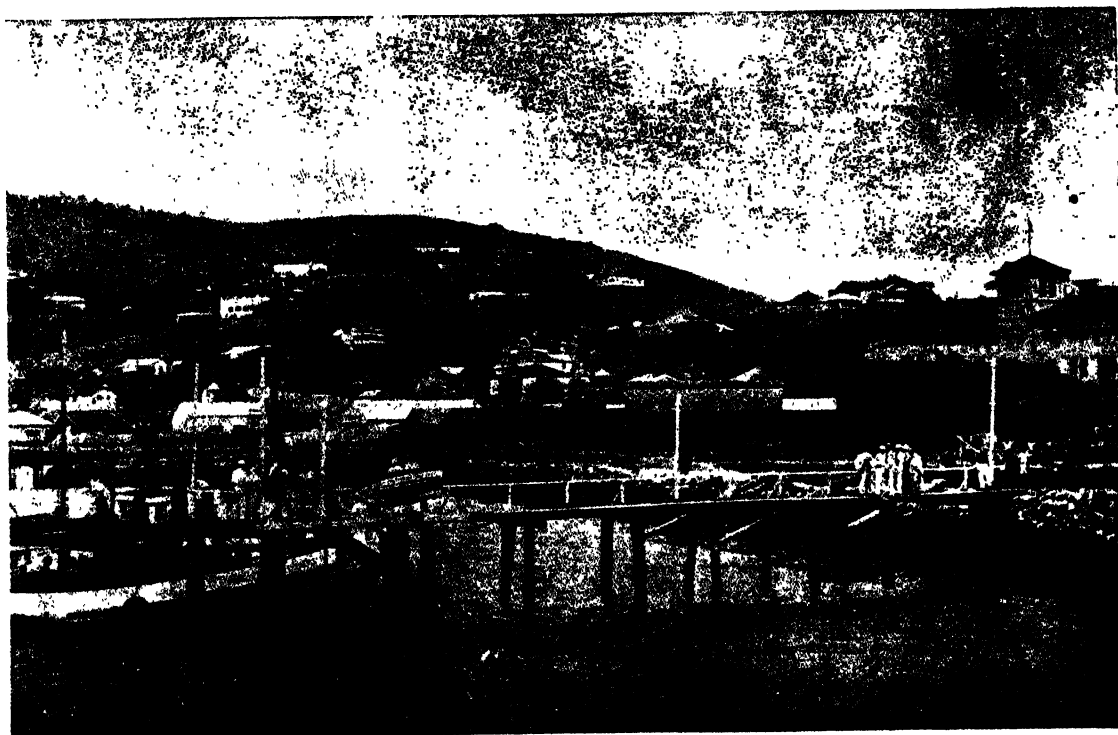
সামারাউ একটি অতি-ক্ষুদ্র দ্বীপ। সামারাউয়ে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের বাস।

সামারাউয়ের উত্তরে ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপ। তার পর ডোবু গ্রাম। এই ডোবু গ্রামে যত মেলানেশিয়ান যাদুকরের বাস। ইহারা ভেল্কি দেখাইয়া দিন গুজরান করে। সে ভেল্কিতে বেশ বৈচিত্র্য আছে।

পোকা পড়ে। এখানে দলাদলির খুব ঘটা। সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে প্ল্যাণ্টার, মিশনারী বা খনিওয়ালাদের মিল নাই মোটে। পরস্পরে দারুণ বিদ্বেষ! এক দলে দু'মিনিট গিয়া বসিলে শুনিব, সে-দল অন্য-দলের দোষ-গলদের ফিরিস্তি দিতেছে। সব দলেই এই এক বিধি। অবশ্য এখন জাপানী বোমার শব্দে এ দলাদলি

রামু নদীর তীরে শ্বেতাঙ্গ-জাতির ক্লাব

কেরিয়াকা-জাতের আইবুড়া যুবক—সলোমন দ্বীপ। তরুণ বয়সে মাথায় পাতার মুকুট আঁটিয়া মাথা ঢাকিয়া রাখিতে হয়—কোনো কুমারী যদি খালি-মাথা দেখে, তবে প্রাণদণ্ড!
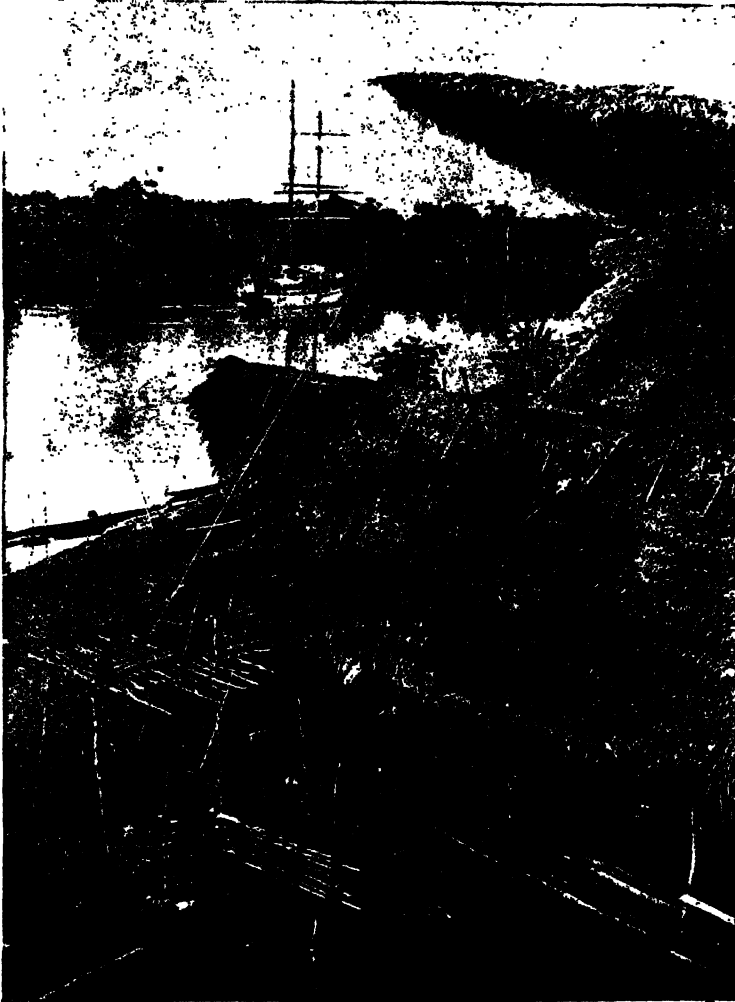
ডোবু ছাড়িয়া ক'দিন পরে আমরা আসিলাম নিউ ব্রিটেন দ্বীপে। ম্যালেরিয়ার আড়ং। এখানে চায়ের মতো দু'বেলা কুইনিন সেবন করিয়াছি। পোকা-মাকড়েরও কি দারুণ উৎপাত! জলের গ্লাশ, বীয়ারের গ্লাশ এক-সেকণ্ড আলগা রাখিবার জো নাই, ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়! নহিলে

ঘুচিয়া সকলে এক-জোট হইয়াছে—কি করিয়া জাপানীর দুর্দ্ধর্ষ গতি প্রতিহত হইবে, এই উদ্দেশ্যে।

১৯৪১ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত রাবৌল ছিল নিউ গিনির প্রধান সহর। নিউ বৃটেনের উত্তর-কোণে ব্লাঞ্চি উপসাগরের তীরে রাবৌল অবস্থিত। অবস্থানটুকুতে মাধুর্য্য আছে!
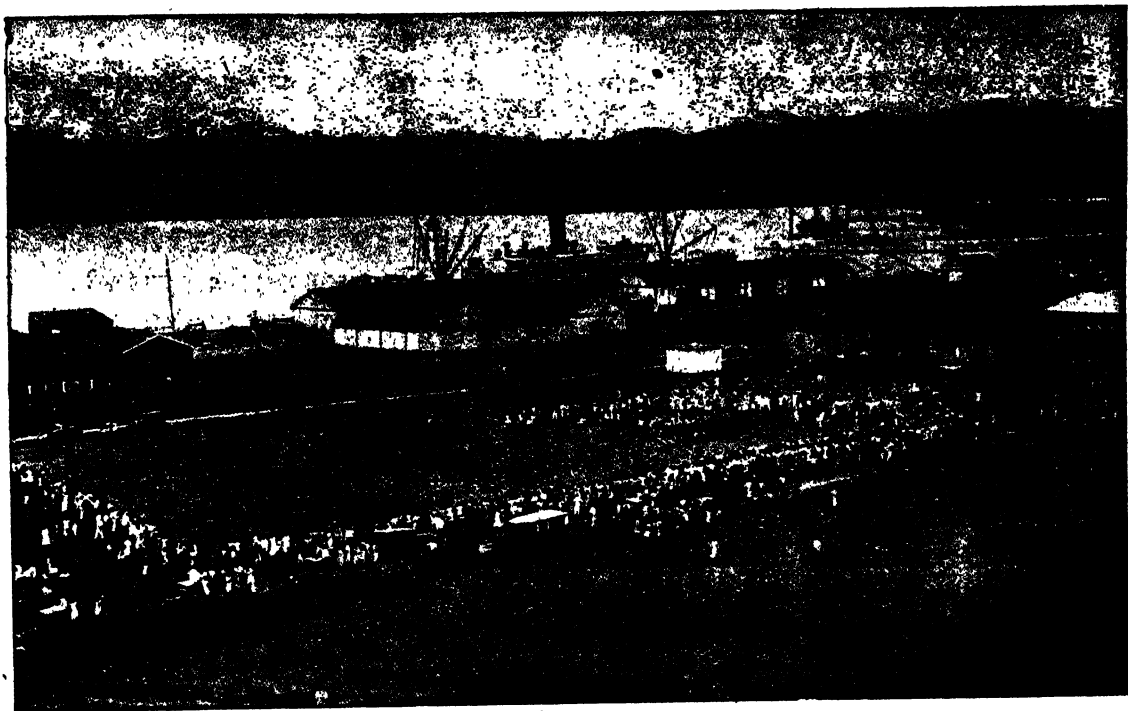
সুবা-ঘাট (ফিজি)—মার্কিন ও অষ্ট্রেলিয়ান জাহাজের ষ্টেশন

দেশী খৃষ্টান-পাড়া—বুগেনভিল্

এ জায়গা পূর্ব্বে ছিল জার্ম্মাণ সদাগরদের আস্তানা। তারাই এ-নগরের প্রতিষ্ঠা করে। তার পর আগ্নেয়গিরির দারুণ অগ্ন্যুৎপাতে সহরটি ভস্মতলে অদৃশ্য হয়। এখন ছাইয়ের চাপ সরাইয়া সহরের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে। তবে মাঝে মাঝে অগ্নি-গিরির বুক ভাঙ্গিয়া এখনো ধূম্র-বাষ্প সমুত্থিত হয়। হইলেও পূর্ব্বেকার মতো তেমন মারাত্মক অগ্নি-বর্ষণ আর হয় নাই।

রাবৌলে কয় সপ্তাহ কাটাইয়া সালামাউয়ে আসিলাম। এখানে সদ্য জাপানী বমারের সঙ্গে মিত্র-পক্ষীয় বমারের দারুণ সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে। এখানকার গল্‌ফ-খেলার মাঠে এখন সামরিক বিমান-পোতের ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে—সুবিস্তীর্ণ প্রসারে।

জাপান যখন নিউ বৃটেন আক্রমণ করে, তখন অষ্ট্রেলিয়ান্ বাহিনী এইখানেই জাপানী বাহিনীর সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিল। জাপানীরা রাবৌল অধিকার করিয়া নিউ বৃটেনের দিকে অগ্রসর হয় গাসমাটা অধিকারের উদ্দেশ্যে। তখন বিপুল অষ্ট্রেলিয়ান বিমান-বাহিনী জাপানের সে-গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল। এ বন্দরের চারি দিকে বহু স্বর্ণখনি আছে। সে সব খনির কাজ এখন এ রণমত্ততায় বন্ধ আছে।

রাবৌল ছাড়িয়া আমি আসিলাম উইওয়াকে।

উইওয়াকের পথে মাদাঙ। এখানে খুব বড় ডক আছে। কাজেই এখানে জাপানী-আক্রমণের আশঙ্কা সারাক্ষণ!

মাদাঙের পর রামু-সেপিকের সুবিস্তীর্ণ জলা। রামু এবং সেপিক নদীর মোহনা-সঙ্গমে এ জলার সৃষ্টি। রামু-সেপিকের একটু আগে ব্লাপ-ব্লাপ পাহাড় এবং সেই পাহাড়ের কোলে উইওয়াক। উইওয়াকেও সম্প্রতি সোনার বহু খনি মিলিয়াছে।

নুমিয়া-বন্দর—নিউ কালেডোনিয়া

উইওয়াকের পর তুঙ্গ পাহাড়ের বুকে মাই-মাই সহর। সহরটি যেন অতি-অকস্মাৎ প্রস্তর যুগের অন্ধকার কাটাইয়া আধুনিক যুগের আলোর স্নান করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! বাড়ী-ঘর, পুল, কেল্লা, দোকানপাট—সভ্য দেশের সর্ব্ব-উপকরণে সহর একেবারে সুসজ্জিত।

এ সব স্থানে আমি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলনের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম; আসিবার অন্তরালে কোনো

রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল না।

এ সব দ্বীপের আদিম অধিবাসীর পূর্ব্ব ইতিহাস সঠিক জানা যায় নাই। কত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়া প্রথম আস্তানা পাতে এবং কোথা হইতে আসে, তার সঠিক সন্ধান না বলিতে পারিলেও মনে হয়, ইহাদের আদি-পুরুষ ছিল নেগ্রিতো। চারি দিকে যে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ, সেই সব দ্বীপের অধিবাসীরা ক্রমে জঙ্গলময় অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপনা করে। এবং এমনি করিয়া এ-দ্বীপে ও-দ্বীপে—নানা দ্বীপের স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া বিচিত্র বহু জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। এ-সব জাতির ভাষা প্রশান্ত মহাসাগরের আশপাশের দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষার সঙ্গে মেলে না!
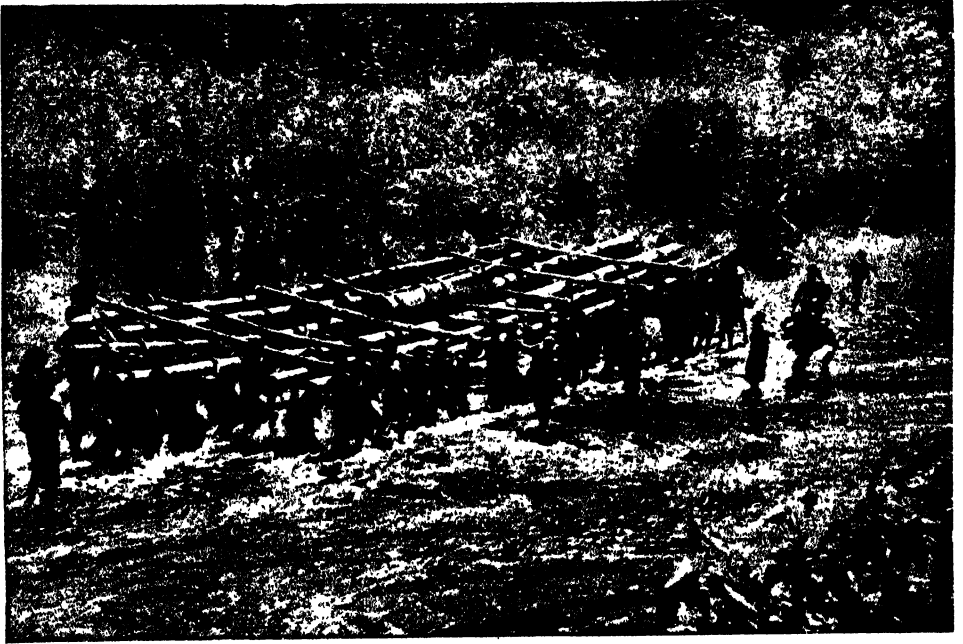
মাচায় করিয়া বড় ঢাক লইয়া চলিয়াছে উৎসবের জন্য—সলোমন দ্বীপ

যে-সব জায়গায় গিয়াছি, সর্ব্বত্র দেখিয়াছি জাপানী-পীড়নের আশঙ্কা। আলস্য ত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি লইয়া দিকে দিকে লক্ষ্মীর উপাসনা, নিবিড় শান্তি—বর্ব্বর জাপানী আজ সে সমৃদ্ধি, সে শান্তি দুর্ব্বার লোভে বিচূর্ণ করিয়া দিবে, এই ভয়ে কাহারো মুখে না দেখিয়াছি হাসি, না দেখিয়াছি কাহারো মনে সজীবতা!

দক্ষিণ বুগেনভিলের নিরক্ষর অধিবাসীরা পর্য্যন্ত এ আতঙ্কে নির্জ্জীব হইয়া আছে। তারা নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া গিয়াছে। ছ' মাস পূর্ব্বে আমি কিয়েটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি বেতারে সংবাদ পাইলাম, বুগেনভিলের প্রধান নগর কিয়েটা জাপানী বোমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে।

লেখক বলিতেছেন—নিউ কালেডোনিয়ায় এবং পাপুয়ায় অবস্থান-কালে সকলের যে কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া আসিয়াছি, আজ জাপানী নিগ্রহে সে-সবের অকাল বিলোপ সুনিশ্চিত। উয়োং ইউয়ের কত বড় কাঠের কারখানা দেখিয়াছি। উয়োং-ইউ সযত্নে নিজের হাতে কত ডিঙ্গি, কত নৌকা তৈয়ারী করে—মনে তার কত আশা! বোমার

এ-গাছ হইতে ময়দা মেলে—মেলানেশিয়া

কালান্তক আগুনের আঁচে তার ডিঙ্গি-নৌকা-গড়ার সে আশা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। চোখের সামনে আজো

দেখিতেছি, বার্ণস ফিলিপ কোম্পানির অতিকায় কর্ম্মশালা! তার আর চিহ্ন থাকিবে না! শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতার উপর মহাকালের এ কি অভিশাপ জাগিল! এত যত্নে গড়া এমন সব গ্রাম-নগর পথ-ঘাট বর্ব্বর লোভের আগুনে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে!

অস্ট্রেলেশিয়ার প্রত্যেকটি দৃশ্য, সেখানকার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ—দূর হইতে অনুভব করিয়া আমার মন হাহাকার করিতেছে—শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াও মানুষের এই হিংসার বিলোপ ঘটিবে না? মানুষ মানুষের প্রাণের দাম বুঝিবে না? মানুষের সাধনার ও সৃষ্টির মর্য্যাদা বুঝিবে না? এমনি করিয়া নেশার ঘোরে সে সব বিধ্বস্ত করিয়া দিবে?

কিয়েটার ধর্ম্মাচার্য্য বিশপ ওয়েড জাপানী আক্রমণের এই নৃশংসতার মুখেও কর্ত্তব্য ভুলিয়া কিয়েটা ত্যাগ করেন নাই। সে-দিন টেলিগ্রামে সংবাদ পড়িলাম, বিশপ ওয়েড কোনো মতেই কিয়েটা ত্যাগ করিবেন না! তিনি বলিয়াছেন—আমি আমার এই যাজকের বেশে জাপানী বাহিনীর সামনে গিয়া দাঁড়াইব! ধর্ম্মের নামে তাদের নিবৃত্ত করিব।

বিশপের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, জানি না। তবে যে-মন লইয়া বিশপ এ-কথা বলিয়াছেন, অস্ট্রেলেশিয়ার সর্ব্বত্র

বুনোই-জাতের নাচিয়ে—নিউ বৃটেন

আমি এমনি মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি। বর্ব্বর নিরক্ষর দ্বীপাধিবাসীও দেশের উপর জাপানের এ পীড়ন-অত্যাচার সহিবে না! প্রাণ দিবে, তবু জাপানীকে তারা সূচ্যগ্র ভূমি স্পর্শ করিতে দিবে না!

রূপাতীত

রূপের পূজারী আমি কবি, তব তনুর পিয়াসী নই!
অতনু-আবেশে মুগ্ধ-নয়নে মোহ অঞ্জন লই।
তব তনু যেন ক্ষীণ-বল্লরী নব-যৌবন-বনে
শ্যাম-সম্পদে মঞ্জু-শোভায় সেজেছে সঙ্গোপনে!

তব অধরের অনুরাগে সখি অধীর ভৃঙ্গ সম
গুঞ্জরি' ফেরে নিকুঞ্জে তব নিয়ত চিত্ত মম।
অঞ্চল-তলে পীন-পয়োধরে কি সুধা রেখেছ ঢাকি'
সে সুধা-সাগরে সিনান করিয়া অমর করিবে না কি?
প্রেয়সী তোমার কবিরে ক্ষমিয়ো, তব তনু দেহখানি
পিয়াসী বলিয়া চাহিনি কেবল ওগো মহীয়সী রাণি!
চকিত-ভঙ্গি, মৃদু-কটাক্ষ, চপল-হরিণী গতি,
কালো-বেণী যেন কাল-ভুজঙ্গ দংশিতে সদা মতি—
রতি-রভসের ইন্ধন এরা, তবু কহি রজকিনী,
চণ্ডীদাসেরে ভুলায়েছে সে কি কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?

তব যৌবন-ভ্রূ-লীলা-বিলাস মিথ্যা বলিনি কভু!
মন জানে আর তুমি জানো সখি, নহ রূপবতী, তবু
শ্যাম পল্লবে যে ললিত-রস-লাবণ্য রহে ফুটে,
সে যে রূপাতীত—ব্যথার আঘাতে সে মোহ কি সখি টুটে
তোমার ললিত-তনুতে রেখেছ সে পরম সম্পদ—
অরূপের মধু পান করিবারে মাগি রূপ-কোকনদ।
তোমার অধরে পেয়েছি সোহাগ, পেয়েছি পরম ধন,
ও দু'টি উচল বক্ষ নিঙাড়ি' পেয়েছি অজেয় মন।
রূপ হতে আমি কোথা ছুটে যাই? তনুরে হারাই বুঝি,
তাই ফিরে ফিরে প্রেয়সীর রূপে অরূপ-রতন খুঁজি!

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, বার-এট্-ল)

[উপন্যাস]

১২

জয়াদি এবং কামাখ্যা-সাহেব ভুলিয়াও কোনো দিন তত্ত্ব লইল না, সে জন্য মহেন্দ্রর সংসারে কোথাও এতটুকু বাধিল না। সুপ্রসন্নর সঙ্গে মহেন্দ্রর এক দিন আলাপ হইল! সুপ্রসন্ন নিজে আসিয়া দেখা করিল। বলিল,—দিদির কাছে আপনা-দের কথা শুনি। কাজের নেশায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছি যে, ভদ্রতা বা সামাজিকতা বুঝি এ-জীবনে আর রক্ষা করতে পারলুম না! এ নেশা ছাড়তে চাই···কিন্তু আমার অবস্থা যা হয়েছে···সেই গল্প আছে, আমি ছাড়ি তো কমলী ছাড়ে না, তেমনি!

মহেন্দ্র বলিল—আপনাকে না জানলেও দিদিকে জেনেছি। তা থেকে আপনার পরিচয় আমাদের অজানা নয়। আপনার ওখানে আমার যাওয়া উচিত ছিল। আমার সে-অপরাধ যে আপনি নেন্‌নি, আপনার আসায় তা বুঝে কতখানি আনন্দ হচ্ছে···

সুপ্রসন্ন বলিল—আমি এখানে বড় থাকি না। নানা কাজে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়।···এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকবো যে আপনি কাছে রইলেন···দেখতে-শুনতে পারবেন!

টুইশনি জুটিয়াছিল। সুভাষিণী সে-টুইশনি লইতে দিল না। বলিল,—ইস্কুলে তোমার খাটুনির অন্ত নেই! তার উপর তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি এসেছো শরীর সারাতে। একটু যদি বিশ্রাম না পাও, তাহলে···

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—শরীরে আমি বেশ জোর পেয়েছি সুভা। টুইশনি নেবো না! যে-আয় ছিল, এখানকার আয় তার চেয়ে কত কম!

সুভাষিণী বলিল—তার জন্য কষ্ট হচ্ছে না বা কোথাও বাধছে না তো!

—তোমাকে কতখানি পরিশ্রম করতে হচ্ছে···

সুভাষিণী বলিল—অসুখ-শরীরে তোমার পরিশ্রম কত ···তার তুলনায় আমার একে পরিশ্রম বলে না! তাছাড়া আমার যা কাজ, গেরস্তর ঘরে সবাই করছে! এটুকু না করলে কি নিয়ে দিন কাটাবো, বলো?

নিশ্বাস চাপিয়া মহেন্দ্র বলিল—আমার সংসারে দাসী-বৃত্তি করবে বলে' তোমাকে আনিনি সুভা! আমার সাধ হয় না, ভাবো, আর-পাঁচ জনের মতো তুমি দু'খানা ভালো শাড়ী পরবে, দু'খানা গহনা গায়ে দেবে?

বাধা দিয়া সুভাষিণী বলিল—তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, গহনা-কাপড়ের অভাব কোনো দিন আমার মনে জাগে না! তোমাদের জন্য আমার মনে কত গর্ব্ব! ভগবান্ আমাকে কি-সুখে না সুখী করেছেন! সংসারে আমার কত শান্তি! দেখেছি তো আরো পাঁচ জনের সংসার···দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে! মনে হয়, ভাগ্যে গহনা-কাপড়ে লোভ নেই! থাকলে তুমিও জ্বালাতন হতে, আমারো অশান্তির সীমা থাকতো না! ভগবানের কাছে আমার কোনো নালিশ নেই, শুধু একটি প্রার্থনা আছে, তিনি যেন আমাদের এ সুখটুকু না ভেঙ্গে দ্যান্!

মহেন্দ্র বলিল—স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টার বলছিলেন, আপনি এক বার বলুন না স্যার, হেড-মাষ্টারের একটা মর্য্যাদাও তো আছে···সে-মর্য্যাদার জন্য হেড-মাষ্টারের মাহিনা অন্ততঃ দু'শো টাকা হওয়া উচিত! আমি বলি, না শ্যামাচরণ বাবু, ও-সব টাকা-কড়ির ব্যাপারে কাঙালপনা করতে আমার লজ্জা করে!

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—তাই ভাবি, গুরু-জনের সমালোচনা করতে নেই, করা পাপ! মামাবাবু এত রাগ করলেন তোমার উপর যে সে-রাগ জীবনে গেল

না। মানুষ করেছিলেন তো! স্নেহ-মায়ার এক কণাও তাঁর মনে রইলো না, আশ্চর্য্য! কি তোমার অপরাধ?

মহেন্দ্র বলিল—তিনি মানুষ করে দিয়ে গেছেন···তাঁর এ স্নেহ, এ দয়ার কি তুলনা আছে! না হলে আজ কোথায় কি হয়ে থাকতুম!

সুভাষিণী বলিল,—ও-বাড়ীর গৌরী দিদি বলছিলেন ···তাঁকে সব কথা বলেছি তো! গৌরী দিদি বললেন, মামা অত বড়-মানুষ···নখের কোণে খুঁটেও তিনি কিছু দিয়ে গেলেন না ভাগনেকে! জিজ্ঞাসা করছিলেন, সব বুঝি ভাইঝীকে দিয়ে গেছেন?

মহেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল!

বলিল—জয়াদির সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলেছো না কি তুমি?

সুভাষিণী বলিল,—না।···গৌরীদি বললেন, বোনও কোনো খোঁজ-খপর নেন না? আমি বললুম—না। বিয়ে হয়ে আমি শুধু তাঁর নামই শুনেছি,—চোখে কখনো দেখিনি···ভাইয়েরও কোনো খপর নেয়নি! তাতে গৌরীদি বললেন, আশ্চর্য্য মানুষ তো! একসঙ্গে দু'জনে মানুষ হয়েছে,—এমন করে ভুলে গেল!

মহেন্দ্র শুনিল। বলিল—দেখো সুভা, ঘুণাক্ষরে যেন এ-সম্পর্ক কেউ না জানতে পারে! তাতে ওদের না হোক, আমার লজ্জা হবে! সকলে বলবে, এমন বোন!

সুভাষিণী বলিল—তুমি ক্ষেপেছো! তাছাড়া ওঁরা জানেন, তুমি এখানে এসেছো চাকরি করতে, অথচ কোনো দিন একটা উদ্দেশ নিলে না! তুমি ভাবো, বড়-মানুষ বলে সেধে আমি গিয়ে ওঁদের দোরে দাঁড়াবো! তাহলে তোমার মান থাকবে কোথায়?

মহেন্দ্র বলিল—জয়াদি কিন্তু এমন হবে, আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল, সুভা! আমি জানতুম, জয়াদি আমাকে তেমনি স্নেহ করে। জয়াদির এ নির্লিপ্ততা আমার বুকে বাজে···মস্ত আঘাতের মতো! সে-বারে সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে তোমার পরিচয় পেয়ে তোমাকে দেখেও চুপ করে রইলো···এ আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না! ···মানুষ পরকে আপন করে নেয়···আর এ আপন-জন! পুরুষ-মানুষ হলে তত দুঃখ হতো না···কিন্তু মেয়ে-মানুষ হয়ে এমন পাথরের মন জয়াদি কি করে পেলে?

সুভাষিণী বলিল—পরকে আপন করে নেওয়া সহজ, আমার মনে হয়। তার কারণ, পরের কাছ থেকে মানুষের যেমন প্রত্যাশা থাকে না, তেমনি পরের দাবীও কিছু নেই! আপনার লোককে মানুষ দূরে সরিয়ে পর করে দ্যায়—ভাবে, আত্মীয়তার দাবী তুলে যদি কোনো-কিছুর প্রত্যাশা জানায়।

নিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র বলিল—তাই হবে!

১০

এ দিকে বর্ষা কাটিলেও জানকী বাবুর বাতের ব্যথা কমিল না—বাড়িল। ডক্টর সামন্তর পরামর্শে তাঁকে তখন কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভালো-রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। সেখানে লইয়া গিয়া ক'জন বড় স্পেশালিষ্ট ডাকাইয়া এক বার হেস্তনেস্ত করা।

ভবানীপুরে বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল এবং পূজার পর জানকী বাবুকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে গেল সুরুচি, দাসী-চাকর, বামুন, দরোয়ান; এবং তাঁকে সব সময়ে দেখিবার জন্য ডক্টর সামন্তকেও যাইতে হইল। তিনি একা সেখানে কত দিন থাকিবেন? কাজেই তাঁর সঙ্গে চলিলেন মিসেস্ সামন্ত এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা। সামন্তর জন্য জানকী বাবুর বাড়ীর পাশে আর-একখানি ভালো বাড়ী লওয়া হইল। সোফা-কৌচ-টেবিল-চেয়ারে সাজানো বাড়ী। তিনি সাহেবী-মানুষ,—তাঁর কষ্টের সীমা থাকিবে না! ললি-মলি বোর্ডিং ছাড়িয়া মা-বাপের কাছে আসিল। বাড়ী হইতে গাড়ী করিয়া তারা স্কুলে যাতায়াত করে—ডে-স্কলার!

অগ্রহায়ণের শেষে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। মহেন্দ্রর খাটুনি আরো বাড়িল।

সে-দিন সকাল হইতে দারুণ দুর্য্যোগ। বৃষ্টিতে পৃথিবী যেন ভাসিয়া যাইবে! স্কুলে যাইতে হইল রিক্শয় চড়িয়া। তবু মহেন্দ্র রক্ষা পাইল না; জলে ভিজিল। এবং সেই ভিজা জামা-কাপড়ে এগজামিনের কাজ! দু'-চার জন টীচার বলিলেন—বাড়ী থেকে শুকনো কাপড় আনিয়ে নিন মহেন্দ্র বাবু!

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—কোনো প্রয়োজন নেই।

এ ঔদাসীন্যের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। বৈকালের দিকে মাথা ধরিয়া জ্বর আসিল।

জ্বর-গায়ে বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুভাষিণী রান্নাঘরে। ছেলেরা বসিয়া পরের দিনের এগজামিনের পড়া করিতেছে!

মহেন্দ্র আসিয়া ডাকিল—নারাণের মা···

ছোট খোকাকে লইয়া নারাণের মা সন্ধ্য বেড়াইয়া ফিরিয়াছে। ছোট খোকাকে গল্প বলিয়া দুধ

খাওয়াইতেছিল। মহেন্দ্রর আহ্বানে নারাণের মা বলিল,—যাই গো দাদাবাবু।

নারাণের মা আসিলে মহেন্দ্র বলিল—তোর বৌদিকে বলে আয়, রাত্রে আমি শুধু একটু গরম দুধ খাবো। শরীরটা তেমন ভালো নেই!

নারাণের মা রান্নাঘরে গিয়া সুভাষিণীকে এ-কথা বলিল।

শুনিয়া সুভাষিণী চমকিয়া উঠিল! মুখে যেন শপাৎ করিয়া চাবুক পড়িল! তার পর এক-মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া তখনি আসিল ঘরে মহেন্দ্রর কাছে।

মহেন্দ্র র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বিছানায় বসিয়া···সামনে একরাশ এগজামিনের খাতা। এগজামিনের পেপার দেখিতেছে।

সুভাষিণী আসিয়া বলিল—শরীর খারাপ, কিছু খাবে না, বলে পাঠালে! এদিকে আসতে না আসতে খাতা খুলে বসেছো!···কি হয়েছে বলো তো?

মহেন্দ্র হাসিল। মৃদু হাসি। হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—একটু মাথা ধরেছে···

—মাথা ধরেছে! সুভাষিণী আগাইয়া আসিয়া মহেন্দ্রর কপালে হাত রাখিল···গায়ে হাত দিল,—বলিল,—মাথা ধরা কি! বেশ জ্বর। গা যে পুড়ে যাচ্ছে!···খাতা রাখো···রেখে শুয়ে পড়ো।···বৃষ্টিতে ভিজেছিলে নিশ্চয়?

মহেন্দ্র বলিল—রিক্শর পর্দ্দা ফুঁড়ে জল আসছিল···সে-জল কি বন্ধ হয়!

সুভাষিণী বলিল—ভিজলে যদি, কাকেও বললে না কেন, বাড়ী থেকে শুকনো জামা-কাপড় নিয়ে যেতো!

মহেন্দ্র বলিল—সকলে বলেছিলেন। কিন্তু ঐ জলে যাকে পাঠাবো, সে-ই ভিজে একশা হবে। আমার যেন দু'-চার প্রস্থ জামা-কাপড় আছে, কিন্তু সে বেচারীর? তাই পাঠাইনি, সুভা!

সুভাষিণী যেন কাঠ! বুকের মধ্যে অসহায়তার আর্ত্ত ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া উঠিল! দু'চোখে দারুণ উদ্বেগ। সে-উদ্বেগের ঘন বাষ্পে আলো যেন মিলাইয়া গিয়াছে! সুভাষিণী বলিল,—সর্দ্দি হয়েছে, নিশ্চয়?

—না।

সুভাষিণী বলিল—খাতা দেখা হবে না। খাতা আমি রেখে দেবো।···মুড়ি দিয়ে তুমি শোও···আমি গরম চা করে নিয়ে আসি···রাত্রে আর কিছু নয়।

এই কথা বলিয়া এগজামিনের খাতাগুলি জড়ো করিয়া সে-খাতার বাণ্ডিল তুলিয়া রাখিয়া স্বামীকে সুভাষিণী শোয়াইয়া দিল। তার পর একখানা র‍্যাগ বাহির করিয়া মহেন্দ্রর শয্যালীন দেহের উপর সযত্নে সেখানা চাপা দিয়া সে ছুটিল রান্নাঘরে···চায়ের জল গরম করিতে।

রাত্রে জ্বর বাড়িল। পরের দিন সকালেও জ্বরের বিরাম নাই।

সুভাষিণীর চোখের সামনে অকূল সমুদ্র! ডাক্তার চাই! ডাক্তার!

ছেলেদের এগজামিন, কে ডাক্তার ডাকিতে যাইবে?

দিলু বলিল—আমি যাই মা, আশুবাবুকে ডেকে আনি।

আশুবাবু ছোট ডাক্তার। ডক্টর সামন্ত কলিকাতায় জানকীবাবুর কাছে···আশুবাবু এখন সামন্তর আসনে।

সুভাষিণী বলিল হ্যাঁ, না গেলে চলবে না, দিলু!

বই রাখিয়া দিলু বাহির হইবে, মা ডাকিলেন,—দিলু···

দিলু ফিরিল। বলিল—কি মা?

সুভাষিণী বলিল—উনি বারণ করছেন। বলছেন, না, ওকে বেরুতে বারণ করো।

দিলু আসিল বাপের কাছে; ডাকিল,—বাবা···

জ্বরের ঘোরে মহেন্দ্র চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল, দিলুর ডাকে চোখ মেলিয়া চাহিল।

দিলু দেখিল, মহেন্দ্রর দু'-চোখ জবাফুলের মতো রাঙা! বলিল—ডাকছো বাবা?

মহেন্দ্র বলিল—হাঁ···

—কেন? বলিয়া দিলু আসিল মহেন্দ্রর বিছানার কাছে।

মহেন্দ্র বলিল—বেশী কাছে এসো না দিলু। যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়···ইনফেক্‌শন্ লাগবে।

দিলু বলিল—কি বলছো?

মহেন্দ্র বলিল—ডাক্তারের কাছে এ-বেলা আর যেতে হবে না! ও-বেলায় দেখি, জ্বর ছাড়ে কি না!

দিলুর মনে দুশ্চিন্তার সীমা নাই। ডাগর ছেলে···জানে, অসুখের জন্য বাবাকে আনা হইয়াছে এই দূর-বিদেশে। পয়সার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই বলিয়া এই অসুখ-শরীরে বাবাকে চাকরি করিতে হইতেছে। ···পয়সা থাকিলে মানুষ হাওয়া খাইতে আসিয়া চাকরি করে না। এ জন্য তার মনে দুঃখের সীমা নাই! ভাবে, অসুখ যদি হইল তো আর দু' বছর পরে কেন বাবার এ অসুখ হইল না? তাহা হইলে কোনো রকমে দু' পয়সা আনিয়া বাবার এ-খাটুনি বন্ধ করিতে পারিত।

বাপের কথায় দিলু প্রবোধ মানিতে পারিল না। বলিল—না বাবা, আমি যাই। এ-বেলা ওষুধ পড়লে আপনি শীগ্‌গির সেরে উঠতে পারবেন—যাতনাও অনেকখানি কম্‌বে।

ছেলের এ কথা মহেন্দ্র মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিল! বলিল—না দিলু, তোমার এগজামিন চলেছে···টেষ্টে ভালো রেজাল্ট করা চাই। ডাক্তারকে যদি খপর দিতে হয় ···নারাণের মাকে বরং স্কুলে পাঠাও এক বার···স্কুলের দরোয়ানকে ডেকে আনবে। তার হাতে চিঠি লিখে দাও··· ডাক্তার বাবু আসবেন'খন। এ নিয়ে তুমি আর আজ ছুটোছুটি করো না!

—তাই হবে···বলিয়া দিলু পাঠাইল নারাণের মাকে স্কুলে···দরোয়ানকে ডাকিয়া আনিতে।

১৮

নানা বাঁকা পথ ধরিয়া ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া জ্বর ছাড়িল—কিন্তু যে-আঘাত দিয়া গেল, তার ফলে নিত্য একটা না-একটা উপসর্গ! সে-উপসর্গ ছাড়িতে চায় না!

ডাক্তার বলিলেন—বিশ্রাম দরকার। এত-বড় অসুখ গেল!

মুখে মলিন হাসি···মহেন্দ্র বলিল—এই বিশ্রাম নিতেই কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলুম।

ভয়ে ভাবনায় সুভাষিণী কাঁচুমাচু হইয়া আছে। বলে,—ছুটীর দরখাস্ত দেবে?

মহেন্দ্র বলিল—লজ্জা করে। এসে ছ'মাস গেল না, ছুটী! তাছাড়া স্কুলে নতুন সেশন আরম্ভ!···জানকী বাবু এখানে থাকলে না হয় চেষ্টা করা যেতো! তিনি এখানে নেই···

সুভাষিণী বলিল—ও বাড়ীর গৌরীদিদি বলছিলেন, জানকী বাবুর কাছে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে যদি ছুটী চাও?

মহেন্দ্র বলিল—না। তাঁর অসুখ কমেনি, সুভা! এ সময়ে তাঁকে বিব্রত করা উচিত হবে না।

সুভাষিণী বলিল—তাহলে?

মহেন্দ্র বলিল—তুমি ভেবো না। বেশী পরিশ্রম আমি করবো না। স্কুলের টীচাররা বলছেন, তাঁরা চালিয়ে নেবেন···আমার শুধু হাজির থাকা।

সুভাষিণী বলিল—তোমাকে তো জানি···তুমি তা পারবে না।

মহেন্দ্র বলিল—শীত পড়লো···এ সময়ে এখানকার হাওয়া ভালো।

সুভা আর কোনো কথা বলিল না···বলিবার মতো কথা নাই। কথার জায়গায় মনে যা আছে···

সুভাষিণীর সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল!

মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। স্কুলে এ-পূজায় বেশ সমারোহ হয়। প্রতিমা গড়িয়া পূজা, সেই পূজাকে উপলক্ষ করিয়া খাওয়া-দাওয়া, ছেলেদের গান, আবৃত্তি, অভিনয়···

এত ধকলে চাপা-জ্বর আবার ছাই-চাপা আগুনের মতো মাথা তুলিয়া দেখা দিল!···

মহেন্দ্র সে-কথা চাপিয়া রাখিল···কাহাকেও জানিতে দিল না।

কিন্তু এমন করিয়া জোড়া-তালি দিয়া কোনো-কিছুই চলিতে পারে না, বিশেষ মানুষের শরীর!

জ্বর আবার রুদ্র-রূপে দেখা দিল। মহেন্দ্রকে শয্যা লইতে হইল। তখন দায়ে পড়িয়া ছুটী!

কমিটির মিটিংয়ে জানকীবাবুর অনুপস্থিতিতে কামাখ্যা সাহেব এখন কর্ত্তা। কমিটির মেম্বাররা মহেন্দ্রকে জানেন। তাঁরা ছুটী মঞ্জুর করিলেন।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কিন্তু যার এ রকম রুগ্ন শরীর, তাকে দিয়ে কাজ চলবে কি করে?

মেম্বাররা বলিলেন—অসুখ-বিসুখের উপর তো মানুষের হাত নেই। এক বার একটু বেশী অসুখ হয়েছে বলে অসহ্য বোধ করলে কাজ চলে না। আমাদের অফিসের রেকর্ড খুললে এমন অসুখ, আর সে-অসুখের জন্য বহু ছুটীর পরিচয় মিলবে!

কামাখ্যা সাহেব চুপ করিয়া গেল।

ভাবিয়াছিল, এই ছলে যদি অন্য লোক মোতায়েন করা সম্ভব হইত!

মহেন্দ্রর উচ্ছেদ সে চায়, তা নয়! সে গুণী লোক··· এখানকার চাকরি গেলে মহেন্দ্র অন্য যে-কোনো জায়গায় হেড-মাষ্টারী চাকরি পাইবে, সে-সম্বন্ধে কামাখ্যা সাহেবের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই!

বাড়ীতে আসিয়া জয়াকে বলিল—তোমার ভাই বড্ড ভুগছে যে!

জয়া বলিল—তার মানে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বড়দিনের সময় অসুখের জন্য দিন পনেরো ছুটী নিয়েছিল, তার পর আবার এখন অসুখের জন্য এক-মাস ছুটীর দরখাস্ত করেছে।

—ছুটী পেয়েছে ?

—দিতে হলো। মেম্বাররা সব এক-মত। তাছাড়া মেডিকেল-লীভে দাবী আছে তো!

জয়ার মনের মধ্যে একটা তার যেন বিকল হইয়া গেল! সে কোনো জবাব দিল না।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোমার ভাইয়ের অহঙ্কার খুব···

চমকিয়া জয়া ফিরিয়া চাহিল।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এত দিন এখানে এসেছে, তা কোনো দিন আত্মীয় বলে' আমার বাড়ীতে আসতে পারলেন না! মানের হানি হতো ?

জয়া বলিল—তুমিও তো তাকে আত্মীয় বলে' তোমার বাড়ীতে ডাকোনি!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—ক্ষেপেছো! যে-লোক তাঁবে চাকরি করে, তাকে আত্মীয় বলে' প্রশ্রয় দিলে সে মাথায় চড়ে বসে। তাতে কখনো ডিসিপ্লিন থাকে ? দিস্ ইস্ আওয়ার ইংলিশ প্রিন্সিপল্! এ ইংরেজী প্রথা যারা অমান্য করেছে, তারাই পস্তেছে! সম্বন্ধী-ভগ্নীপতি-ভায়রাভাই কিম্বা ভাইপো-ভাগ্নেকে এনে অফিসের কাজে বসিয়ে আত্মীয়তার প্রশ্রয় দিয়ে বড় বড় বহু বাঙালী-ফার্ম্ম রসাতলে গেছে!

এ কথায় জয়ার মনে একটা কথা উদগ্র হইয়া উঠিল। সে-কথা জয়া মনের মধ্যে দাবিয়া চাপিয়া রাখিতে পারিল না! বলিল—কিন্তু মহীন্ তোমার স্কুলে তোমার তাঁবে চাকরি করতে আসেনি!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—না আসুক···অফিসিয়ালি আমি তার মনিব!

কামাখ্যা সাহেব সিগার ধরাইয়া মস্ত একটা টান দিয়া একখানা প্ল্যান মেলিয়া বসিল। জয়া গিয়া দাঁড়াইল খোলা খড়খড়ির ধারে।

বাহিরে তখন গোধূলির কুয়াশার উপর চাঁদের হিমেল আলো ঝরিয়া পড়িয়াছে।

ছেলে পিনাকী আসিয়া ডাকিল,—মা···

জয়া ফিরিল।

জয়ার কাছ ঘেঁষিয়া গিয়া মৃদু স্বরে পিনাকী বলিল—পাঁচটা টাকা চাই!

জয়া বলিল—কেন ? তোমার এ-মাসের হাত-খরচের টাকা ?

—সব খরচ হয়ে গেছে।

জয়া বলিল—ইংরেজী মাসের আজ বারো তারিখ। বারো দিনে পঞ্চাশ টাকার সব খরচ করেছো!

—বাঃ, গেল দু'মাস ধরে কত ধার শুধেছি, জানো ?

—ধার! এর মধ্যে ধার করতে শিখেছো!

পিনাকী বলিল—দু'টো গরম স্যুট্ করালুম···পূজোর সময় দার্জিলিং যাবার জন্য।

—স্যুটের টাকা তো আলাদা নিয়েছিলে!

—তাতে কুলোলো না। কলকাতা থেকে ভালো স্যুট্ করিয়ে আনালুম! এখানে তেমন ভালো কাপড় পেলুম কৈ ? তাছাড়া এখানকার দর্জীদের যা ষ্টাইল···হুঁঃ, সেই মান্ধাতার আমোলের! কাজেই···

জয়া বলিল—এ ভালো স্বভাব নয় পিনু। এই বয়স থেকে ধার করে সাজসজ্জা···

পিনাকী চটিল। কিন্তু সে রাগ আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করিল না। দায় তার। রাগ করিয়া মেজাজ দেখাইলে সে-দায় উদ্ধার হইবে না! দায় উদ্ধার করিতে হইলে কুসুমাদপি কোমল হইতে হয়, তৃণাদপি নীচু হইতে হয়—হাই-সোসাইটির ছেলের এ জ্ঞান হইতে সময় লাগে না। তাই সে বলিল—সখ হয়েছিল মা, তাছাড়া দার্জিলিংয়ে কত বনেদী লোকের ভিড়! তাই যা-তা ষ্টাইলের স্যুট পরে গেলে লজ্জা পেতুম। সেই জন্যই না···

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের পানে চাহিয়া একাগ্র মনে জয়া ছেলের কথা শুনিল। তার পর বলিল—পাঁচ টাকার কি দরকার, শুনি ?

—বায়োস্কোপে যাবো। ন'টার শো। খুব ভালো একখানা ছবি এসেছে।

—তার জন্য পাঁচ টাকা!

পিনাকী বলিল—একা যাবো না। মানে, দু'-এক জন বন্ধু···তাদের কথা দিয়েছি কি-না। সে-কথা না রাখলে তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না!

জয়া বলিল,—দিচ্ছি পাঁচ টাকা, এসো। কিন্তু আস্‌ছে-মাসের হাত-খরচের টাকা থেকে এ পাঁচ টাকা আমি কেটে নেবো।

—তা নিয়ো···

পিনাকীকে লইয়া জয়া চলিয়া গেল।

কামাখ্যা-সাহেব নিশ্চিন্ত মনে প্ল্যান দেখিয়া আলাদা কাগজে কি সব অঙ্ক বসাইতেছিল···জয়ার সঙ্গে পিনাকীর যে-কথা হইল, সে-কথা কাণে গেল না।

যায় না। ছেলেদের কোনো কথায় সে থাকে না। তাদের ভার জয়ার উপর। টাকা-পয়সা এবং মান-ইজ্জৎ ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো-কিছু লইয়া কামাখ্যা সাহেব মাথা ঘামায় না···মাথা ঘামাইতে চায় না!

বাসন্তীতে দু'টি ছবিঘর আছে। পার্ল এবং ব্লু-হাউস।

ব্লু-হাউসের কর্ত্তা এক জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

সেদিন এই ব্লু-হাউসে রাত্রি ন'টার শোতে বক্সে আসিয়া বসিল কামাখ্যা সাহেবের পুত্র পিনাকী এবং পিনাকীর সঙ্গে মাথায়-কাপড়-টানা জড়োসড়ো মূর্ত্তিতে প্রৌঢ়া এক জন বাঙালী মহিলা এবং একটি কিশোরী। কিশোরীর পরণে সিল্কের শাড়ী···এখনকার ষ্টাইলে পরা···কিশোরীর মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি!

বক্সের সামনের দিকে বসিল পিনাকী এবং সেই কিশোরী। পিছনের শীটে প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়া বলিল—আমাকে বুঝিয়ে দিয়ো বাবা, নাহলে কিছুই বুঝতে পারবো না!

কিশোরী বলিল,—ছবি দেখে বোঝবার চেষ্টা করো মা। না হলে উনি ছবি দেখবেন, না, বকবক করবেন তোমার সঙ্গে!

প্রৌঢ়া বলিল—ঐ জন্যেই বলেছিলুম, চলো, ওটায় যাই। সেখানে বাঙলা ছবি আছে 'সীতা-হরণ'—দেখে বুঝতে পারবো।

হাসিয়া কিশোরী বলিল—বাঙলা ছবিতে দেখবার কি আছে? হুঁঃ! বিলিতি ছবিতে কি গ্ল্যামর—কি ড্যাজ্‌ল্! নাচ-গান, পোষাক-আসাক, তাছাড়া মেলামেশায় কতখানি রোমান্স! দেশী ছবি আমার অসহ্য লাগে সত্যি! পিনুদা, আপনার ভালো লাগে বাঙলা ছবি?

পিনাকী বলিল,—না···

রূপার কেস্ খুলিয়া সিগারেট ধরাইয়া পিনাকী সিগারেট ধরাইল।

তার পর প্রৌঢ়ার পানে চাহিয়া পিনাকী বলিল—ছবি আরম্ভ হবার আগে গল্পটা আপনাকে খুব ছোট্ট করে বলে রাখি, মাসিমা। তাহলে কথাবার্ত্তা না বুঝলেও ওদের নড়ায়-চড়ায় হাবে-ভাবে মোদ্দা কথাটুকু বুঝতে পারবেন। বিলিতি ছবি দেখতে আপনাকে কেন আনলুম, জানেন? নিজেদের ঘরে ঐ কুটনো-বাটনা আর তরী-তরকারী শাক-পাতার চাপে মনটাকে পিষে চুরমার করছে! বিলিতি ছবির হাওয়ায় সে-দুঃখ খানিকটা ভুলতে পারবেন। বুঝবেন, মানুষ-হিসাবে আমরা ওদের কত পিছনে আছি। বাঁচা কাকে বলে, তার আইডিয়া পাবেন। দেখবেন, ও-দেশের মানুষ জড়-ভরত নয়, পঙ্গু নয়···ওদের কোনো দিকে কোনো বাঁধন নেই···অবাধ মুক্তি!

প্রৌঢ়া শুনিল। তার পর কিশোরীর পানে চাহিল, বলিল—তুই সব বুঝতে পারিস সরি? বিলিতি ছবির কথাবার্ত্তা?

সরি অর্থাৎ সরস্বতী রুক্ষ স্বরে জবাব দিল,—বুঝতে যদি না পারবো, তাহলে বিলিতি-ছবির নামে এমন যেতে উঠবো কেন?

ছবি-ঘরের আলো নিবিল। গ্রামোফোনের রেকর্ডে বাজনা সুরু।

সরি বলিল—চুপ করো মা···এখন আর কোনো কথা নয়।

অন্ধকার ঘর। ছবি সুরু হইল।

সরি এক মনে ছবি দেখিতেছে··তার চোখের সামনে যেন স্বর্গ। ও-স্বর্গে অভাব নাই, অভিযোগ নাই···শুধু রোমান্স! সরস্বতীর মন উধাও হইয়া চলিল ছবির ঐ আলো-ছায়ার সুরে-সুরে···পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ অজানা মায়া-লোকে!···

সরস্বতীর বাবা অন্নদাচরণ এখানকার এঞ্জিনীয়ারিং-ডিপার্টমেণ্টে ক্লার্ক। ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি করিলেও এক দিন সে 'হাই লাইফের' স্বপ্ন দেখিত। ভাগ্যদোষে সে-স্বপ্ন সফল হয় নাই! স্ত্রী মহামায়া ইংরেজী জানে না—তবু তার মনকে অনেকখানি প্রগতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। তার উপর অন্নদা এখানকার লাইব্রেরীর মেম্বার। হালের বইয়ের উপরই তার ঝোঁক খুব বেশী। হালের লেখা গল্প উপন্যাস পড়িয়া মুক্তির উপর তার ভক্তি অসাধারণ। মন সব জায়গায় সায় না দিলেও পাছে আর-কেহ ভাবে, অন্নদার মন পুরানো কুসংস্কারে ভরিয়া আছে, তাই সব-রকমের প্রগতি-প্রয়াসে সে মাথা তুলিয়া সাড়া দেয়। এবং সেই সাড়ার ঝোঁকে সরস্বতীকে সে পড়াইতেছে···তার সাজ-পোষাকের পিছনে অবস্থার অতিরিক্ত পয়সা খরচ করে। মেয়েকে নাচ-গান শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে···মেয়েকে সকলের সঙ্গে মিশিতে দেয়···

এবং অন্নদার এই মোহ-বিভ্রমের ফাঁকে হাই-সোসাইটির পিনাকী তার বাড়ীতে আসা-যাওয়ার সুযোগ করিয়া লইয়াছে।

মহামায়াকে পিনাকী বলে, 'মাসিমা',—সরস্বতী তাকে ডাকে 'পিনুদা'।

সরস্বতীকে পিনু বলে,··রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা জানো?···স্বপনে দোঁহে ছিনু। কি মোহে? সরস্বতী বলে, জানি! পিনু বলে,—গাও তো···ভারী চমৎকার! সরস্বতী গায়।

আজ সরস্বতীর জন্ম-দিন, তাই পিনু তাকে আনিয়াছে সিনেমা দেখাইতে। ডাগর মেয়ে—একা তাকে ছাড়িয়া দিতে পারে না, মা-মহামায়া তাই সঙ্গে আসিয়াছে তার চৌকিদারী করিতে।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
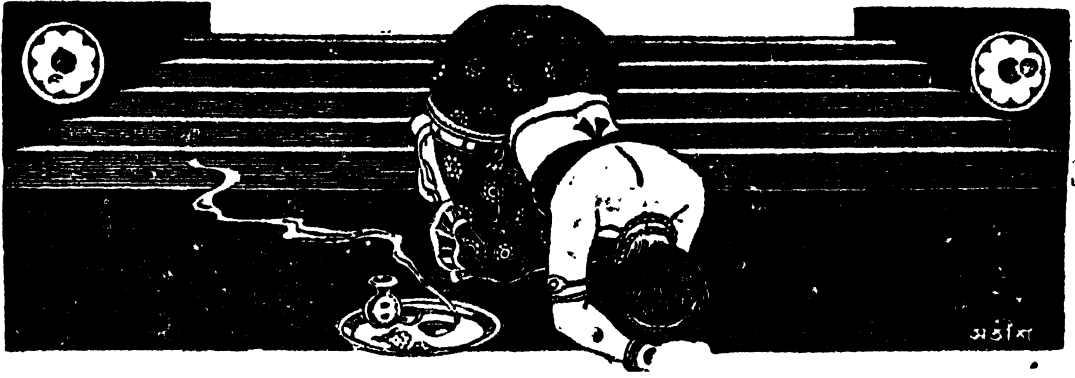
ঠেকিয়া শিখা

(গল্প)

১

আতিশয্যবহুলদেহ মোক্ষদাসুন্দরী যখন বলিলেন, "বৌমা, তবে এখন আমি আসি।" তখন ক'নে মীরার মা প্রমদা সসঙ্কোচে বলিলেন, "মুখে একটু কিছুই না দিয়ে যা'বেন, কাকীমা ?"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "কি যে তুমি বল, বৌমা ! সে-ই সকালে এসেছি, এখনও পূজাও হয় নাই ; তা'র পর তোমার খুড়-শ্বশুরের খাবার সময় হয়ে এল। আমাকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত কেন ? আমি কি মীরার কুটুম্ব ?"

বাড়ীর পুরাতন দাসী বামা বলিল, "কর্ত্তামা, বৌদিদিরা কি কর্ত্তাবাবুর খাবার এক দিন দিতে পারবেন না ?"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "তুই কি ক্ষেপা, বামী ? এত কাল এই বাড়ীতে কাটা'লি—জানিস না, ওঁর খাবারের গোছ আমি না করলে যেমন আমারও তৃপ্তি হয় না, তেমনই ওঁরও অসুবিধা হয় ?"

মোক্ষদাসুন্দরী উঠিলেন। বামা আবার বলিল, "কর্ত্তামা, গলার ও হার বুঝি নতুন ?"

সকলের দৃষ্টি তাঁহার হীরার হারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এক জন বলিলেন, "খুব ভাল হীরা।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "কেন বলিস, বামা ! জানিস ত কর্ত্তাবাবুকে বারণ করলেও শুনেন না—বলেন, গহনা সম্পত্তি, তা'র পর 'যা' দিবে অঙ্গে—তা'-ই যা'বে সঙ্গে' ; তা'ই গহনাও করাবেন—আর আমাকেও পরতে হ'বে। দাম অনেক, তবে আমার বড় মেয়ের শ্বশুর খুব ভাল হীরা চিনেন—তিনিই অনেক দর ক'রে হাজার টাকা দাম কমিয়েছিলেন—দু'খানা হীরায় একটু দোষ আছে, দেখিয়ে দিয়েছিলেন।"

প্রমদা বলিলেন, "কাকীমা, কাল সকাল সকাল আসবেন—নহিলে কোন ব্যবস্থাই হ'বে না।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "তা', আসব না !"—মীরার নন্দলালা আসবেন—আসব না ? সে আর আমাকে বলতে হ'বে না। তোমাদের আপদে বিপদে সম্পদে—ছোট কাকীমা এসে পড়ে নাই, এ দুর্নাম কখন কেহ দেয় নাই—যেন আর যে ক'টা দিন আছি, না দিতে পারে। আজও, দেখ, আমি ত এসেছি, তোমার শা'রা—কা কস্য পরিবেদনা। আমি আসব—ঠিক সময়েই আসব। তবে বলি বাছা—মেয়ে তোমার সুখী হ'ক, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থা'ক ; কিন্তু—কি বিয়েই হ'ল ! এ একেবারে সেই—ভারী ত বিয়ে, তা'র চার পায়ে আলতা !"

প্রমদা কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "কি করব, বলুন কাকীমা।"

"তা' ত বটেই। কথায় বলে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তাই ত আমি রসুনচৌকী পাঠিয়ে দিলাম ; তোমায় খুড়-শ্বশুরকে বললাম, শুভকর্ম্মে একটা বাজনা হ'বে না ! তা' ছাড়া মেয়েরও ভাগ্য চাই। আশীর্ব্বাদ করি—স্ত্রীভাগ্যে ধন ; তোমার জামাইয়ের তা'ই হ'ক। কিন্তু—ওর মা ছিল, আমার এক পিসীর কি রকম ননদ ; বাপের পয়সা ছিল—তবে ভারী কৃপণ—সকালে লোক নাম করত না ; ব্যবসাও ছিল—ব্যবসায় কি লোকসান দিয়েছে ?"

"তা' ত জানি না, কাকীমা।"

"এখন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব না হইলেই বাঁচি। যে দিন কাল ! সবারই যে ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য জুটবে, এমনও হয় না।"

গজেন্দ্রগমনেই বল আর মাল-বোঝাই বড় নৌকার গতিতেই বল—মোক্ষদাসুন্দরী যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন ; তাঁহার বধূদিগকে সত্বর পাঠাইয়া দিবার কথা বলিতেও প্রমদা ভুলিয়া যাইলেন।

বাহিরের রোয়াকে তখন শানাই প্রাণপণ চেষ্টায় বাড়ীতে শুভ কার্য্যের পরিচয় ঘোষণা করিতেছিল। মোক্ষদাসুন্দরী সকলকে জানাইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই শানাইওয়ালা পাঠাইয়াছেন।

মোক্ষদাসুন্দরীর অনেক গুণ ছিল—দোষও ছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজনের "করিতে" ত্রুটি করেন না—সে বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃহৎ সংসারের পরিচালিকার উপযুক্ত ; কিন্তু সময় সময় তিনি "শুনাইতেও" ত্রুটি করেন না— সেটা যে কখন অসময়ে হয় না, তাহাও নহে। তবে "যে গরু দুধ দেয়, তা'র চাটও সহ্য হয়" বলিয়া অনেকেই দোষ উপেক্ষা করেন। তাঁহার কথায় গর্ব্বের বিকাশ থাকে, তবে তাহার প্রকাশ একটু স্বতন্ত্ররূপ—যদি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের উপর খণ্ড মেঘ আসিয়া পড়ে, তবে যেমন সেই মেঘের পার্শ্ব হইতে রবিকর প্রকাশিত হয়, তেমনই তাহা কৃত্রিম বিনয়ের পার্শ্ব হইতে বাহির হয়।

প্রমদা একে তাঁহার বধূ তাহাতে আবার ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী নহেন—সেই জন্য এবং স্বভাবকোমলতাহেতু কখন মোক্ষদাসুন্দরীর কোন কথায় কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না—বিশেষ

খুড়-শ্বশুরের সুরম্য হর্ম্ম্যের কাছে তাঁহার স্বামীর ক্ষুদ্র জীর্ণ গৃহ যেমন—মোক্ষদাসুন্দরীর কাছে তিনি আপনাকে তেমনই কুণ্ঠিতা বোধ করিতেন।

কিন্তু খুড়-শ্বশুরের ঐশ্বর্য্যের পশ্চাতে যে রহস্য ছিল, তাহা যে তিনি জানিতেন না—তাহাও নহে। তাঁহার শ্বশুররা তিন ভ্রাতা—অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বড় ভাই দুইটি মাত্র কন্যা ও মধ্যম একমাত্র পুত্র—তাঁহার স্বামী—রাখিয়া অল্পবয়সে লোকান্তরিত হইলে সম্পত্তির ও সংসারের কর্তৃত্ব মোক্ষদাসুন্দরীর স্বামী গণপতির হস্তগত হয়। চতুর গণপতির কৌশলে তাঁহার অংশ যেমন বাড়িতে থাকে, ভ্রাতৃদ্বয়ের অংশ তেমনই হ্রাস পাইতে থাকে। সে—দীর্ঘ ইতিহাস। শেষে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তিনি ধনী আর ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাগ্যে একখানি জীর্ণ ছোট বাড়ী আর কয় হাজার টাকা মাত্র রহিয়া গিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্র সেই টাকা জমা দিয়া এক ব্যবসায়ীর আফিসে চাকরী করিতেছেন। গণপতির পাকা ব্যবস্থা আইনে কাঁচাইবার কোন উপায় তিনি রাখেন নাই। সেই জন্য মীরার পিতা সুশীল যেমন "সুশীল বালকের" মত যাহা অনিবার্য্য তাহাতে সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের দুই জামাতাও তেমনই আর কিছু করিতে পারেন নাই।

মোক্ষদাসুন্দরী যে মেয়ের ভাগ্যের ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও যে তাঁহার কন্যাদিগের বিবাহের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবার অভিপ্রায় ছিল না, এমন মনে করিবার কারণ নাই। ধনী হইয়া গণপতি তথা-কথিত অভিজাত দলের অন্তর্ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জামেয়ার কিনিতেন এবং ছেলেরা শীতকালে কোথাও নিমন্ত্রণে যাইবার সময় জামেয়ার না লইলে রাগ করিতেন। আর কন্যাদিগের বিবাহে—বড় বাড়ী ও ভাল গাড়ী না থাকিলে তিনি সে সম্বন্ধে কর্ণপাতই করেন নাই। তিনি বলিতেন, "আমি যখন খরচ করব তখন উপযুক্ত সম্বন্ধের অভাব হ'বে কেন? জান ত, গুড় দিলেই মিষ্ট হয়।" তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। তাহাতেও তিনি জামাতার যে আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। সে বিবাহে জাঁক-জমকের অভাব যে হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পিতামাতা কাকীমা'র গর্ব্ব করিবার অধিকার মানিয়া লইলেও এক জন তাহা কিছুতেই মানিয়া লইতে সম্মত হইত না—সে মীরা।

আজ যখন মোক্ষদাসুন্দরী শুনাইয়া যাইলেন—তিনিই তাহার বিবাহে—পাছে উৎসবের অঙ্গহানি হয়, সেই জন্য—রশুনচৌকী পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন হইতে মীরার মনে হইতে লাগিল—শানাই যেন তাহাদিগকে ও তাহাদিগের দারিদ্র্যকে উপহাস করিয়া সেই উপহাস ঘোষণা করিতেছে। সে বাজনা তাহার কর্ণে যেন জ্বালা বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু সে পিতামাতার মনে কষ্ট দিবে না বলিয়া কোন কথা বলিল না।

২

কখন কখন কেবল যে সামান্য কথায় বা কারণে মানুষের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, কেবল তাহাই নহে—অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভবও হয়। বিবাহের পূর্ব্বদিন মোক্ষদাসুন্দরী তাহার বিবাহ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, সে সব মীরার পক্ষে তেমনই হইল। মীরার বিবাহকালে তাহার বয়স প্রায় সপ্তদশ বর্ষ হইয়া গিয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে লিখাপড়া না শিখিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহা বিবাহে পাত্রীর গুণের অভাব বলিয়া বিবেচিত হয় বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাও দিয়াছিলেন—সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিও পাইয়াছিল এবং বিবাহের কথা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত কলেজে পড়িতেছিল। কাযেই তাহার বিচার-বুদ্ধি অনুশীলনের সুযোগ বয়সে ও শিক্ষায় হইয়াছিল। যে বিবাহ স্থির হইয়াছিল, তাহা যে তাহার বিচারে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা নহে। পাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার অসুস্থতাহেতু তাঁহার ব্যবসা পরিদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-চেষ্টা করে নাই। বিপত্নীক পিতার সংসারে কোন স্ত্রীলোকের অভাবহেতু তাহাকে সেই সময় বিবাহও করিতে হইয়াছিল এবং প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার প্রথমা পত্নী এক বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিতা হইয়াছিল। ইহাই যে সংসারের অবস্থা, মীরাকে কুঞ্জবিহারীর সেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইবে—বিবাহের পরেই সংসারের ও সপত্নীর সন্তানের সব ভার লইতে হইবে। এই অবস্থা যে তরুণীর পক্ষে আকর্ষণীয় হয় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা মীরাকেও আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। তাহার পর আবার মোক্ষদাসুন্দরীর কথায় সকলেরই মনে হইয়াছিল, কুঞ্জবিহারীর যেমন লোক-বলের তেমনই অর্থবলেরও অভাব ছিল।

পিতামাতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং বাঙ্গালী হিন্দু কন্যার স্বভাবজ লজ্জাবশে মীরা এই বিবাহে আপত্তি প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি কখন মনের অপ্রসন্ন ভাব দূর হয়? পিতা-মাতাও যে "মন্দের ভাল" হিসাবে এই সম্বন্ধই করিয়াছিলেন, তাহাও সে জানিত। কিন্তু মোক্ষদাসুন্দরী যখন তাহার অদৃষ্টের ও তাহার পিতামাতার আর্থিক অবস্থার নিন্দা সর্ব্বসমক্ষে করিলেন, তখন মীরার মনের ভাব-পরিবর্ত্তন হইল—সে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবে এবং সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবে। চিত্রাঙ্গদার কথা তাহার মনে পড়িল—যে বংশে দেবতার আশীর্ব্বাদ ছিল—কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিবে না, সেই বংশে সে কন্যারূপে জন্মিয়া দেববাক্য ব্যর্থ করিয়াছিল। সে-ও তেমনই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে—তাহার অদৃষ্ট ও তাহার পিতামাতার অর্থাভাব তাহাকে অসুখী করিতে পারিবে না—মোক্ষদাসুন্দরীর কন্যাদিগের তুলনায়ও সে সুখী হইবে।

কিরূপে সে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহা সে জানিত না—বুঝিতেও পারিল না। তাহা সম্ভব কি না—সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞতাহেতু—সে তাহা ভাবিয়াও দেখিল না। কেবল তাহার মনে সে সঙ্কল্প করিল, সে অসাধ্য হইলেও তাহা সাধন করিবে—প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া সুখী হইবে। তাহার মনে হইল—তাহাকে তাহা করিতেই হইবে; সে আশা পুষ্ট করিতে লাগিল—সে সুখী হইবে এবং তাহার সুখে স্বামীকে ও পিতামাতাকে সুখী করিবে। সে কোথায় পড়িয়াছিল, কাহারও আন্তরিক চেষ্টা কখন ব্যর্থ হয় না। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে কেন? দৈব ও পৌরুষ—এতদুভয়ের বল প্রভৃতি সে বুঝিত না। কিন্তু সে পৌরুষকেই দৈবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিল।

৩

আনন্দ বা নিরানন্দ বা আশঙ্কা লইয়া নববধূ মীরা স্বামীর গৃহে আসিল না,—মনে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আসিল—তাহাকে তিনটি কায করিতেই হইবে—প্রথম, স্বামিগৃহে গৃহিণীর কায করা; দ্বিতীয়, স্বামীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করা; তৃতীয়, স্বামীর মাতৃহীন পুত্রের মাতার স্থান গ্রহণ করা। প্রথম কায সে যে সুসম্পন্ন করিতে পারিবে, সে ভরসা তাহার ছিল; কেন না, সে প্রাচুর্য্যহীন সংসারে সুগৃহিণী মাতার শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কাযের সাফল্য যে প্রথম ও তৃতীয় কাযে সাফল্যের উপর নির্ভর করিবে, তাহা সে বুঝিয়াছিল। তৃতীয় কাযটি যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং হয়ত দুঃসাধ্য, তাহা মীরা বুঝিল এবং বুঝিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যে সাফল্য-লাভে আত্মনিয়োগ করিল।

সে দেখিয়া আনন্দিত হইল, তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। যে শিশু মাতা কি, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই মাতৃহীন হয়, বোধ হয়, স্বভাবজাত আগ্রহে সে-ও মাতার স্নেহের সন্ধান করে। নহিলে কুঞ্জবিহারীর পুত্র অতি অল্প আয়াসেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল কেন? যে দাসী প্রশান্ত নামক দুর্দান্ত শিশুকে পালন করিত, সে যে বলিয়াছিল, তাহার মা আসিতেছেন, শিশু তাহাই যেন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাসীর কথায় আরও বিশ্বাস করিয়াছিল, সে দুষ্টামী করিলে মা আবার চলিয়া যাইবেন। সেই জন্য—পাছে মা আবার চলিয়া যায়েন, এই ভয়ে সে অভ্যস্ত দুরন্তপনা করিয়া আপনিই যেন লজ্জিত হইত এবং মীরাকে বলিত, সে আর দুষ্ট হইবে না—মীরা যেন তাহার উপর রাগ করিয়া আবার চলিয়া না যায়। মা যদি আবার চলিয়া যায়েন, এই ভয়ে প্রশান্ত কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না—এমন কি, যখনই মীরা পিত্রালয়ে যাইত, তখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। দাস-দাসীরা তাহার আবদারে ও দুরন্তপনায় বিরক্ত হইয়া বলিত, সে দুষ্ট। কিন্তু সে যখন মীরাকে জিজ্ঞাসা করিত, "আমি কি দুষ্টু, মা?" তখন মীরা বলিত, "তা কি কখন হয়? তোমার নাম যে প্রশান্ত! তুমি শান্ত।" প্রশান্ত তাহাতে মা'র প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইত। এইরূপে বিবাহের পর তিন মাস যাইতে না যাইতে মীরা তাহার সঙ্কল্পিত তিনটি কাযের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য কাযটি ধৈর্য্যহেতু সহজে সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া প্রমদাও বিস্মিতা হইলেন। তিনি যখন বলিলেন, সে কথা শুনিয়া মোক্ষদাসুন্দরী এক দিন তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন—"এ যে একেবারে না বিয়িয়েই কানাইয়ের মা!'—তখন সে স্থির করিল, সে তাঁহার আহ্বানে যাইবে না—পাছে তাঁহার ঐরূপ কোন কথায় প্রশান্তের বিশ্বাসে সন্দেহের উদ্ভব হয়—সে তাহার মাতা নহে; তাহা হইলে মীরার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বাস্তবিক মোক্ষদাসুন্দরীর সামাজিক কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইত না। তিনি জানিতেন, সে জন্য সকলে তাহার প্রশংসা করে। তিনি এক দিন গাড়ী পাঠাইয়া প্রমদাকে লইয়া যাইয়া বলিলেন, "বৌমা, নানা ঝঞ্ঝাটে এত দিন পেরে উঠি নাই; তোমার মেয়ে-জামাইকে এক দিন আনা হয় নাই। কিন্তু আর দেরী করা ভাল দেখায় না। মেয়েটাই বা কি মনে করছে—জামাই-ই বা কি ভাবছে? তুমি বামাকে পাঠিয়ে জান, আসছে রবিবারে তা'রা আসতে পারবে কি? তা' হ'লে ছেলেরা কি নাতীরা কেহ গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে! আমার জামাইদেরও বলব—তোমার জামাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ক। কথায় বলে—

গরুর কুটুম চাটতে, চুটতে,
মানবের কুটুম আসতে যেতে।'

তবে কি জান, আমার জামাইদের অনেক কুটুম-স্বজন—একটু আগে খবর না দিলে আসতে পারে না।"

প্রমদা বলিলেন, "আমি জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠা'ব, কাকীমা। আসতেও বেশী পারে না—সংসারে ত আর মানুষ নাই; ছেলেও ছাড়ে না।"

"তা' ত বটেই। আমার সম্বন্ধটা ঐ জন্যই ভাল বোধ হয় নাই—সতীনকাঁটা রয়েছে। কিন্তু উপায় কি? বড় হয়ে উঠল—মেয়েও বাড়ন্ত; মেয়ে ত আর রাখবার জিনিষ নয়—তাই অবস্থা বুঝে বাবস্থা করতে হ'ল। আর তোমারও ত সর্ব্বদা আনার সুবিধা হয় না; গাড়ী নাই—আবার আনলেই খরচ।"

কথাগুলি সবই সত্য; সুতরাং প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতি-বাদ করিবার কিছু থাকিলেও প্রমদা কখন প্রতিবাদ করিতেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আপনাকে জানা'ব।"

প্রমদা গৃহে ফিরিয়া বামাকে সব কথা বলিয়া তাহাকে মীরার নিকট পাঠাইলেন। বামাও সব কথা মীরাকে বলিল; শুনিয়া মীরা বলিল, "বামা, তুই মা'কে বলিস্, আমার এখন যাওয়া হ'বে না।"

বামা বলিল, "কিন্তু কর্ত্তামা রাগ করবেন।"

"তা' করেন ত কি করব? মা'র মত আমি তাঁ'র সব কথায় 'হাঁ—হাঁ' বলতেও পারি না; ঝাঁক আমার অসহ্য হয়।"

"ঠিক বলেছ, দিদিমণি; মনের কথা টেনে বলেছ। বেঁচে থাক—জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে সুখী হও। কথা ত নহে—যেন মিছরীর ছুরী! তবু যদি আমি বামা—ভাইদের ফাঁকি দিবার কথা না জান্‌তাম। ও ত 'যা'র ধন তা'র ধন নয়—নেপোয় মারে দই!' আমি সব জানি।"

"তুই বলিস, আমার এখন অনেক কায—সংসার ত গুছিয়ে নিতে হ'বে।"

"নিশ্চয়" বলিয়া বামা চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার সহিত কুঞ্জবিহারীর সাক্ষাৎ হইলে কুঞ্জবিহারী শ্বশুরালয়ে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বামা কারণ ব্যক্ত করিয়া গেল।

কুঞ্জবিহারী মনে করিল, ছেলে ছাড়িতে চাহে না বলিয়াই, বোধ হয়, মীরার কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহার হৃদয় মীরার প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত হইয়া উঠিল। সে মীরাকে মোক্ষদাসুন্দরীর নিমন্ত্রণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "যেতে ত পাও না—আটকে পড়েছ। না হয় প্রশান্তকে এক দিন ভুলিয়ে ওর ঝির কাছে রাখবার ব্যবস্থা কর।"

মীরা দৃঢ় ভাবে বলিল, "না।"

তাহার পরেই কুঞ্জবিহারী পাছে তাহার কথা অভিমান-প্রসূত মনে করে—সেই জন্য বলিল, "ওখানে যেতে আমার ইচ্ছা করে না।"

কুঞ্জবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"সে পরে শুনবে।"

মীরা যে বামাকে সংসার গুছাইয়া লইবার কথা বলিয়াছিল, তাহাও সত্য। ছেলেকে আপনার করিবার কাযে সাফল্যলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে সংসার গুছাইয়া লইবার কাযে অবহিত হইয়াছিল। সে কাযে দাস-দাসীরাই সর্ব্বাধিক বাধা দিতেছিল—কারণ, তাহাদিগের স্বার্থে আঘাত লাগিতেছিল এবং সে স্বার্থ বহু দিন সম্ভোগ করায় তাহারা সে সকল অধিকার বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সে কাযে তাহার যেন অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল। আর সংসার গুছাইয়া লইবার কাযে তাহাকে প্রায়ই স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে হইত। তাহাতে স্বার্থের ঐক্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও বর্দ্ধিত হইতেছিল।

বিবাহের পর ছয় মাসের মধ্যে কুঞ্জবিহারী দেখিল, তাহার বিশৃঙ্খল সংসারে—যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে—শৃঙ্খলা ও শ্রী স্থাপিত হইয়াছে—সেই ঐন্দ্রজালিক দণ্ড যে মীরার গৃহিণীপনা, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

বৎসর ফিরিবার পূর্ব্বে মীরা বুঝিল, তাহার সঙ্কল্প সে সফল করিতে পারিয়াছে—সে স্বামীর সংসারে শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়াছে, সেই কাযে ও তাহার উপর তাঁহার পুত্রকে আপনার করিয়া সে স্বামীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছে, স্বামীর মাতৃহীন পুত্রকে সে আপনার করিতে পারিয়াছে।

সংসারে শৃঙ্খলা-স্থাপন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বামীর সকল কথা জানিবার সুযোগ পাইল এবং সেই জন্য জানিতে পারিল—মোক্ষদাসুন্দরী যে বলিয়াছিলেন, "ব্যবসায় কি লোকশান দিয়াছে ?"—সে সন্দেহের কোন কারণ নাই। মিতব্যয়ী পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত পুত্র কুঞ্জবিহারী কখন অমিতব্যয়ী হয় নাই—অর্থের গর্ব্ব করা ত পরের কথা। তবে তাহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সে পুত্রকে লইয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে ব্যবসায় অধিক মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই—সেই জন্য ব্যবসাও বাড়ে নাই। কুঞ্জবিহারীর অর্থের অভাব ছিল না। বিশেষ সে তাহার পিতার একটি অভ্যাস রক্ষা করিয়া গিয়াছে—স্বর্ণ ও হীরকাদি সুবিধা দর হইলেই কিনিয়াছে।

পুত্র যত মীরাকেই অবলম্বন করিতে লাগিল—কুঞ্জবিহারী ততই ব্যবসায় অধিক মনোযোগ প্রদানের সুবিধা পাইতে লাগিল।

আবার ব্যবসার সুযোগও উপস্থিত হইল—জার্ম্মাণ যুদ্ধের পরে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মালয় ও ব্রহ্ম আক্রমণ করিল এবং উভয় দেশই তাহার দ্বারা অধিকৃত হইল। অনেক পণ্যের মূল্য—অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল। ব্যবসাবুদ্ধি কুঞ্জবিহারী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল এবং পিতার শিক্ষায় তাহা অনুশীলনতীক্ষ্ণ করিতে পারিয়াছিল। সে যুদ্ধে ব্যবসার গতি লক্ষ্য করিয়া যাহা বুঝিয়াছিল, তাহাতে তাহার লোহের ও মসলার ভাণ্ডারই কেবল পুষ্ট করে নাই, পরন্তু, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের সওদা করিয়া বহু টাকার কাপড়ও বাঁধাই করিয়াছিল। এখন সে সকলের দর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর সম্পদ্ বল্মীকস্তূপের মত নিঃশব্দে বর্দ্ধিত হইতেছিল।

৪

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর এক দিন বামা আসিয়া সংবাদ দিল, গণপতির মধ্যম পুত্রের কন্যার বিবাহ—গণপতির পুত্রবধূরা কেহ মীরাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিবে কি কোন পৌত্রী আসিবে, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। পুত্রবধূরা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন সম্পর্কে বড়—বিশেষ মীরা কখন তাঁহাদিগের গৃহে যায় না, তখন তাঁহারা আসিবেন কেন ? মোক্ষদাসুন্দরী কিন্তু বলিয়াছেন, মীরা বাড়ীর বড় নাতিনী, তাহার সম্মান আছে—বধূরা যদি যাইতে না চাহে, তিনিই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবেন। বামা বলিল, "সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড, দিদিমণি। জানই ত, রাগলে কর্ত্তামা'র মুখের সামনে কেহ দাঁড়া'তে পারে না। হয়ত তিনিই আসবেন।"

মীরা বলিল, "তা' আসাই বা কেন ? আমি এক পাশে পড়ে আছি ; আমার জন্য স্নেহ উথলে উঠল কেন ?"

বামা যে দিন সংবাদ দিয়া গেল, তাহার তিন দিন পরে এক দিন অপরাহ্নে মোক্ষদাসুন্দরীর পুত্রবধূদিগের এক জনকে লইয়া এক পৌত্র কুঞ্জবিহারী ও মীরাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। পুত্রবধূর মুখে অপ্রসন্ন ভাব। তাঁহাকে শাশুড়ীর আদেশে মীরার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিতে হইয়াছে বলিয়াই যে তিনি অপ্রসন্ন তাহা নহে—তিনি মোক্ষদাসুন্দরীর ছোট মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে যাইয়া যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহা অভিপ্রেত নহে। সে যাহাই হউক, তিনি অব্যূঢ়ান্নের দিন ও বিবাহের দিন মীরাকে যাইতে বলিলেন ; তবে বলিয়া যাইলেন, যদিও সে ক'নের গাত্রে হরিদ্রা দিতে পারিবে না, তবুও সে যেন সকাল সকাল যায়। হরিদ্রা দিতে না পারার কারণ, সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আর তিনি বলিলেন, "ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাস। আহা—নিজের একটি এখনও হ'ল না ; এ যেন দুধের সাধ ঘোলে মিটান।"

সে কথা শুনিয়া মীরা বিরক্ত হইল।

কুঞ্জবিহারী ব্যবসাস্থান হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম করিবার পর মীরা তাহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়া বলিল, "বিপদ করলে দেখছি।"

কুঞ্জবিহারী পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিল, "বিপদ কেন ?"

"এই ত এক কাকীমা নিমন্ত্রণ করতে এসে বললেন, প্রশান্তকে ছেলে ক'রে আমার দুধের সাধ ঘোলে মিটান হচ্ছে। ছেলে যদি ও কথা শুনে, তবে কি মনে করবে ?"

"না গেলে ত ভাল দেখাবে না। বরং গায়-হলুদের দিন আমি প্রশান্তকে নিয়ে থাকব—দোকানে নিয়ে যা'ব—সেখান থেকে তোমায় আনবার জন্য গাড়ী পাঠাব। আমি পারলে বাড়ীতেই থাকতাম ; কিন্তু ও-দিন কতকগুলা কায আছে। বিয়ের দিন ও আমার কাছেই থাকবে—বাড়ীর ভিতরে যা'বে না।"

"আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।"

কুঞ্জবিহারী হাসিয়া বলিল, "কেন, বল ত ? কাকীমা'র কথা ত আজ তিনি বলেছেন ; কিন্তু এর আগেও ত তুমি তোমার ছোট ঠাকুরদার বাড়ীতে যেতে চাও নাই। তা'র কারণ কি ?"

তখন মীরা আর কোন কথা গোপন করিল না—তাহার বিবাহের পূর্ব্বদিন মোক্ষদাসুন্দরী যে সব কথা বলিয়াছিলেন—তাহার পিতামাতার আর্থিক অবস্থার প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—সে সব সে স্বামীকে বলিল। তাহার পরে বলিল, "আমার বিয়ের অন্ন দিন

আগেই ছোট ঠাকুরমা'র ছোট মেয়ের বিয়ে খুব জাঁকের সঙ্গে হয়েছিল; তাই ও কথা।"

কুঞ্জবিহারী বলিল, "সে বিয়ে কোথায় হয়েছে ?"

"শুনেছি, শ্যামবাজারে দত্তবাড়ী—কর্ত্তার নাম শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—কালীকুমার।"

"ছেলের নাম কৃষ্ণকুমার ?"

"হাঁ। ছোট ঠাকুমা'র এক খুড়-শ্বশুরের ঐ নাম ছিল, তাই তিনি বলেন—'বৃন্দাবনচন্দ্র'।"

"ভাল। তোমার ছোট ঠাকুরমা বুঝি 'শিশুশিক্ষা' পড়েন নাই—কাণাকে কাণা বলিতে নাই, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই—ইত্যাদি ?"

স্বামীর কথা শুনিয়া মীরা হাসিল।

কুঞ্জবিহারী বলিল, "তোমারই বা তা'তে রাগ কেন ? আমরা গরিব—সে কথা কেহ বললে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে ?"

"তা' পড়ে না বটে, কিন্তু আমিও বা শুনতে যাব কেন ? তোমারই কোন্ ভাল লাগে ?"

"আমি ও ভালমন্দ বুঝি না; আমার সঙ্গে বিয়ে যদি তোমার অসুখের কারণ হয়ে থাকে, তবে তা'তে আমি দুঃখিত হ'ব। কিন্তু উপায় কি ?"

"আমি কি কোন দিন তোমাকে তা বলেছি ?"

"বল নাই—কিন্তু মনে কর নাই ত ?"

"না কখন না।"

"তা'ই হ'লেই হ'ল। কে কি বলে, তা' নিয়ে ব্যস্ত হ'বার কোন প্রয়োজন নাই।"

তাহার পরেই "আমি এক বার টেলিফোন ক'রে আসি"—বলিয়া কুঞ্জবিহারী পার্শ্বের ঘরে গেল; মীরা তাহার শেষ কথা শুনিতে পাইল—"না, আর দেরী করবেন না—কালই নিলামের ব্যবস্থা করবেন।"

সে ফিরিয়া আসিলে মীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র কথা বলছিলে ?"

কুঞ্জবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে পরে শুনবে। এটর্ণীকে একটা নিলাম করতে ব'লে দিলাম।"

মীরা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কুঞ্জবিহারী বলিল, "যে দিন নিমন্ত্রণে যা'বে, সে দিন কি গহনা প'রে যা'বে, তা' আমি ঠিক ক'রে দিব।"

মীরা বলিল, "কেন ? আমি এই গায় যে গহনা আছে, তা'র বেশী আর কিছুই পরব না।"

কুঞ্জবিহারী হাসিয়া বলিল, "কেন—দ্বিতীয় পক্ষ ব'লে ?"

"তুমি যখন-তখন ও কথা ব'ল না। কোন্ দিন প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করবে—"মা, ওর মানে কি ?"—তখন ?"

"যেখানে গহনারই আদর, সেখানে গহনা পরেই যেতে হয়—কথায় বলে, 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'—আর জান ত—'আপ রুচি খানা—পর রুচি পরনা'।"

"সে কিছুতেই হ'বে না।"

"ভাল, পরের কথা পরেই হ'বে।"

কুঞ্জবিহারী জানিত, সে যাহা বলিবে, মীরা কখনই তাহার ব্যতিক্রম করিবে না। এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যই সে, সে দিন সে বিষয়ে আর কিছু বলিল না।

সে দিন কুঞ্জবিহারীর মনে হইল, সে মীরাকে বিস্মিত করিবে এবং সে বিস্ময় যেমন অতর্কিত তেমনই আনন্দদায়ক হইবে।

পরদিন হইতে সে পুত্রকে বুঝাইতে লাগিল, সে এক দিন তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে—তাহাকে সে কি কি জিনিষ কিনিয়া দিবে, তাহার তালিকার আলোচনাও হইল। সেই জন্য উদ্রিক্ত-কৌতূহল বালক মীরা যে দিন গাত্রহরিদ্রার নিমন্ত্রণে যাইবে, সে দিন আর তাহার সহিত যাইবার জন্য জিদ করিল না।

অলঙ্কার সম্বন্ধে অবশ্য কুঞ্জবিহারী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল—মীরা প্রথমে আপত্তি করিলেও স্বামীর নির্দ্দেশেই অলঙ্কার ব্যবহারে সম্মত হইল। কুঞ্জবিহারী সে বিষয় পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল—তবে দুই এক বার স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া লইল। সে বলিল, "তোমার ছোট ঠাকুরমা যেমন বিনয়ের ছদ্মবেশে গর্ব্ব প্রকাশ করেন, বল—তেমনই হ'বে—অল্প ক'খানা গহনা পর—কিন্তু সে ক'খানা লোককে আকৃষ্ট করবে।" কুঞ্জবিহারী অল্প দিন পূর্ব্বে ক্রীত হীরার হার, হীরা ও পান্নার চুড়ী আর কাণে হীরার দুল বাহির করিয়া দিয়া বলিল,—"এক'খানা ছাড়া তোমার আর যা' ইচ্ছা পর।"

মীরা বলিল, "আবার কেন ?"

কিন্তু কুঞ্জবিহারী তাহাকে "উপর হাতের" একখানি গহনা ও একটি হীরার আঙ্গটী না পরাইয়া ছাড়িল না।

৫

বিবাহ-বাড়ীতে আসিয়া মীরা যেমন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইল, আর সকলে তেমনই তাহাকে না হইলেও তাহার গহনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মীরা একটু বিলম্ব করিয়াই আসিয়াছিল; কারণ, সংসারের—স্বামীর ও পুত্রের আহারাদির সব ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে আসিতে হইয়াছিল। সে যখন আসিয়া মোক্ষদাসুন্দরীকে, তাহার মাতাকে ও কাকীমাদিগকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার দেহের আন্দোলনে আন্দোলিত কর্ণের দুলের হীরক হইতে বহু আলোকের সূচী যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল—সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সকলে তাহার দিকে চাহিতেই তাহার হীরক হার তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

বামা বলিয়া উঠিল, "ঠিক কর্ত্তামা'র হারের মত !"

বধূরা এক জন বলিলেন, "তা'ই বটে। নূতন হয়েছে বুঝি, মীরা ?"

মীরা বলিল, "হাঁ, কাকীমা।"

কেহই লক্ষ্য করিল না, মোক্ষদাসুন্দরী এবং তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ফুল্লরা এক বার তাহার গলার হারের দিকে, আর এক বার তাহার প্রকোষ্ঠের চুড়ীর দিকে চাহিয়া কেমন যেন অন্যমনা হইয়া পড়িলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক—বেশ হয়েছে।"

মীরা বলিল, "ছোট ঠাকুরমা, আমি ও সব প'রে আসতে চাই নাই; তোমার নাত-জামাই জিদ করলেন—বড়-মানুষের বাড়ী, নহিলে লোক নিন্দা করবে।"

"বাপের বাড়ী কি আবার বড়মানুষের কি গরিবের বাড়ী হয় ? কি যে তোদের বুঝ ! পরবি না-ই বা কেন ? বলে, 'যা' দিবে অঙ্গে, তা'ই যা'বে সঙ্গে'। প'রে আসতে চাস নাই কেন ?"

"আমি ব'ললাম, আমার লজ্জা করে—তুমি সত্যই বলেছিলে, 'ভারী ত' বিয়ে, তা'র চার পায়ে আলতা' !"

"তুই কি নাতজামাইকে সেই কথা বলেছিস ? কি লজ্জা ! আমি কেমন ক'রে তা'র কাছে মুখ দেখাব ? আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম—তুই নাতিনী তাই। তুই সেই কথা বললি ?"

"তুমি ত ঠাট্টা ক'রে বলনি, ছোট ঠাকুরমা—সত্য কথাই বলেছিলে।"

"শুনে নাতজামাই কি বললে ?"

"হেসে বল্লেন, তুমি বুঝি 'শিশুশিক্ষা' পড় নাই—'কাণাকে কাণা বলিতে নাই, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই' গরিবকে গরিব বললে কি রাগ করতে আছে ?"

"না, মীরা—তুই বড় লজ্জা দিলি।"

মীরা বলিল, "চল না, ছোট ঠাকুরমা, ছোট দাদাকে প্রণাম ক'রে আসি।"

মোক্ষদাসুন্দরী দাসীকে বলিলেন, "দেখে আয় ত, বাবু কি করছেন।"

বহ্নি যে ভাবে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে, মীরার হার যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, তাহা সেই ভাবে ফুল্লরাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "দেখি হারছড়া, মীরা।"

মীরা হার খুলিয়া দিল। সকলেই দেখিল, ধুকধুকীর পশ্চাদ্দিকে একখানি কাগজ আঁটা।

বহ্নি যে ভাবে পতঙ্গকে দগ্ধ করে, হার যেন সেই ভাবে ফুল্লরাকে দগ্ধ করিল। সে হার আর দেখিতে পারিল না—মীরাকে ফিরাইয়া দিল। হার দিবার সময় তাহার হাত যেন একটু কম্পিত হইল। তাহার পর সে উৎসব-কোলাহলের মধ্য হইতে উঠিয়া মোক্ষদাসুন্দরীর ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। দাসী তাহাকে যাইতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফুল্লরা বলিল, "এখন কাউকে কিছু বলিস না—আমার শরীরটা ভাল নাই।"

মোক্ষদাসুন্দরীর মুখও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বহু কষ্টে ভাব গোপন করিলেন এবং তাহার পর মীরাকে স্বামীর কাছে লইয়া যাইলেন।

গণপতিকে দেখিয়া মীরার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। সে ফুল্লরাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছিল, যে আনন্দের প্রতিমা ছিল, সে বিষাদ-মলিনা ! তাহার দেহে লাবণ্য ও মুখে হাসি নাই। সে মোক্ষদা-সুন্দরীকে দেখিয়াও বিস্মিতা হইয়াছিল—এক বৎসরে—যে জরা এত দিন যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই তাঁহাকে অধিকারগত করিয়াছে, চুল অনেকগুলি পাকিয়াছে—যেন বহু দিন রোগভোগে তাঁহার দেহ শিথিল হইয়াছে। কিন্তু গণপতিকে দেখিয়া সে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিতা ও ব্যথিতা হইল। তিনি বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া সব কাযের ব্যবস্থা করিতেছিলেন—তাঁহাকে বালিসে ঠেস দিয়া বসিতে হইয়াছিল—তিনি যেন রোগে জীর্ণ !

মীরা প্রণাম করিয়া বলিল, "এ কি ছোট দাদা ! কি হয়েছে ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া গণপতি বলিলেন, "খোঁজ ত আর নিবি না—বুড়া দাদা থাকল কি গেল ? এখন গৃহিণী হয়েছিস—কর্ত্তা বুঝি ছেড়ে দেন না ?"

"সত্য, ছোট দাদা, কি অসুখ ?"

"শেষ অসুখ, দিদি—শেষ অসুখ। আর কত দিন থাকব ? দাদারা যে বয়সে গেছেন, আমি ত অনেক দিন সে বয়স পার হয়েছি। যা'ব না বললেই কি থাকা যায় ?"

"কি অসুখ, ছোট দাদা ?"

"ডাক্তাররা একটা মস্ত নাম বলে; ব্যাপারটা এই যে, রক্ত বুকে যেতে যেতে থমকে যায়; যে দিন থমকানিটা বেশীক্ষণ থাকবে, সেই দিনই শেষ—সে যখন তখন হ'তে পারে।"

"কষ্ট হয় ?"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া গণপতি বলিলেন, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস না; বেঁচে থাকতেই মৃত্যু-যন্ত্রণা কি, তা' বুঝছি।"

শুনিয়া মীরার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "চল, মীরা।"

মীরা ভাবিতে লাগিল—এক বৎসরে এ কি পরিবর্ত্তন ! মোক্ষদা-সুন্দরীকে ও ফুল্লরাকে দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল—সুখের সংসারে দুঃখের ছায়াপাত হইয়াছে, গণপতিকে দেখিয়া সে বুঝিল—গৃহে মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছে। তাহার মনে হইল, গণপতির জন্যই মোক্ষদাসুন্দরীর ভাবান্তর। কিন্তু ফুল্লরার ভাবান্তরের কারণ সে বুঝিতে পারিল না। সে কারণ কত বেদনাদায়ক, তাহা সে অনুমান করিতেও পারিল না—সেই কারণই যে মোক্ষদাসুন্দরীর ভাবান্তরের ও গণপতির ব্যাধির কারণ, তাহা সে কিরূপে বুঝিবে ?

যে স্থানে সকলে বসিয়া ছিলেন, মীরাকে লইয়া মোক্ষদাসুন্দরী তথায় আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেকে আনলি না কেন ?"

মীরা উত্তর দিল, "আমি বড় ভয় পাই, ছোট ঠাকুরমা ! মেজ-কাকীমা সে দিন নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে বললেন, নিজের ত নয়—ও দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান। শুনে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগল—পাছে ছেলে শুনতে পায়। কত কষ্টে যে ওকে আপনার করতে হয়েছে তা' আমিই জানি।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "তুই অসাধ্যসাধনই করেছিস্, বৌমা'রা বুঝেন না—হাতের তীর আর মুখের কথা এক বার বেরিয়ে গেলে আর ফিরান যায় না। সেই জন্যই সাবধান হয়ে কথা বলতে হয়।"

মীরার মেজ কাকীমা শাশুড়ীর কথায় যেমন লজ্জানুভব করিলেন, মীরা যে এ কথা বলিয়াছিল তাহাতে তেমনই অসন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইল।

সকলে আহারে বসিলেন এবং গল্পে ও কথায় আহার শেষ হইতে বেলা প্রায় দুইটা বাজিল।

তাহার অল্পক্ষণ পরেই এক জন ভৃত্য আসিয়া মীরাকে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "গাড়ী এসেছে।"

মীরা পত্রখানি খুলিয়া দেখিল, কুঞ্জবিহারী লিখিয়াছে :—

মীরা,

গাড়ী পাঠাইলাম। আমি যে সব আফিসের সঙ্গে কারবার করি, সেই সকলের একটির 'বড় সাহেব' একখানি গাড়ী আনাইয়াছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধের একটা কাযে সিমলায় যাইতে

হইতেছে। তিনি আমাকে গাড়ীখানি লইতে বলিলেন—লোকসান করিয়াই দিলেন। তাঁহার নিকট অনেক কায পাইয়াছি; সেই জন্ত গাড়ীখানি লইতেই হইল।

আমি এখনও গাড়ীখানিতে চড়ি নাই। আগে তোমার জন্ত পাঠাইয়া দিলাম।

আমি পুরাতন গাড়ীতে প্রশান্তকে লইয়া বাজার ঘুরিয়া ফিরিব।

তোমার

কুঞ্জবিহারী

উপস্থিত মহিলাদিগের মধ্যে এক জন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তলব বুঝি ?"

মীরা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গণপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময়। তিনি মীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঞ্জ কি ঐ গাড়ী কিন্‌ছে ?

মীরা বলিল, "পত্রে ত তাই আছে।"

"কি রে ?"

মোক্ষদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

পুত্র বলিলেন, "ও গাড়ী কলিকাতায় পাঁচ সাতখানার বেশী নাই। ও হায়দ্রাবাদের নিজামের বা বরদার গায়কবাড়ের সাজে। ব্যাপার কি ?"

মীরা মোক্ষদাসুন্দরীকে বলিল, "ছোট ঠাকুরমা, আমি তবে আজ যাই।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "এস, দিদি। এ ক'দিন এক এক বার এস; বিয়ের রাত্রিতে থাকতে হ'বে। তুমি বড় ভালী।"

মীরা চলিয়া গেল।

কন্তার কথার আলোচনায় প্রমদা যেমন আনন্দলাভ করিলেন, তাঁহার মনে তেমনই সকলের বিস্ময়ে ও কথায় ঈর্ষ্যার ভাবে আশঙ্কা অনুভূত হইতে লাগিল।

৩

উৎসবানন্দসমুজ্জ্বল গৃহে বেদনার যে মেঘ সমস্ত দিনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা উৎসব-কলরবের অবসানে স্তব্ধ গৃহে রাত্রিকালে যখন শ্রান্ত দেহে, অবসন্ন মনে মোক্ষদাসুন্দরী আসিয়া তাঁহার শয্যায় আশ্রয় লইলেন, তখন বর্ষণে পরিণতি লাভ করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোক্ষদাসুন্দরী দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া "মা দুর্গা—দুর্গতিনাশিনী এ দুর্গতি দূর কর" বলিয়া শয্যায় আসিলেন। কন্তা ফুল্লরা সেই শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল। সে ডাকিল, "মা!" সে যে কাঁদিতেছিল, তাহা মোক্ষদাসুন্দরী তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত দিন—দীর্ঘ দিন মনোভাব গোপন করিয়া ছিলেন। তাহা তাঁহাকেই পীড়িত করিতেছিল। তিনি বহু চেষ্টায় যে অশ্রু বর্ষিত হইতে দেন নাই, এখন তাহাই ঝরিতে লাগিল।

উভয়েরই এই বেদনা আজ নূতন নহে—গত ছয় মাস তাহা কুসুমে কীটের মত তাঁহাদিগের হৃদয়ে থাকিয়া দংশন করিয়াছে এবং গণপতির দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে।

হার যে মোক্ষদাসুন্দরীর ছিল, তাহাতে মাতা ও পুত্রী উভয়েই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ হার ক্রয় করিয়া গণপতি পত্নীর ইচ্ছানুসারে ধুকধুকীর পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার ইষ্টদেবী ষোড়শীর চিত্র মিনা করাইতে জয়পুরে পাঠাইয়াছিলেন। কোন ভুলে মিনাকার শিল্পী ষোড়শীর স্থলে কমলাচিত্র মিনা করিয়া পাঠাইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, কমলার মুখে এমন উগ্র ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, বিরক্ত হইয়া মোক্ষদাসুন্দরী তাহার উপর একখানি কাগজ আঁটিয়া তাহা আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং মীরা যে হার পরিয়া আসিয়াছিল, তাহা যে সেই হার, সে সম্বন্ধে তাঁহার ও ফুল্লরার সন্দেহের অবসর ছিল না। যখন ও সেই হার, তখন চুড়ীও যে বিবাহে ফুল্লরাকে পিতার উপহার, তাহা অনুমান করা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল।

ফুল্লরার বিবাহের পর ছয় মাসের মধ্যেই তাহার শ্বশুরালয়ের ব্যবহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। নানা ছলে প্রায়ই কখন ফুল্লরাকে দিয়া, কখন বা জামাতা স্বয়ং টাকার বা নূতন গহনার দাবী জানাইতে থাকে। সে দাবী পূর্ণ না করিলে ফুল্লরার প্রতি রূঢ় ব্যবহার হইতে থাকে। সে অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল—মোক্ষদাসুন্দরী যত দিন পারিয়াছিলেন, সকলের অজ্ঞাতে কন্তার শ্বশুরালয়ের দাবী যথাসম্ভব পূর্ণ করিতেন। কিন্তু দাবী ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং ঘন ঘন হইতে থাকে, তখন তাহা তাঁহার সাধ্যসীমা অতিক্রম করায় তাঁহাকে সে কথা গণপতির গোচর করিতে হয়। কন্তার দুর্দ্দশার বিষয় তিনি পূর্ব্বে কাহাকেও জানিতে দেন নাই—পাছে পুত্ররা জানিলে পুত্রবধূরাও জানে এবং তাহাতে ফুল্লরাকে অনাদর সহ্য করিতে হয়। তখনই তাঁহার মূল্যবান্ হীরার হার ফুল্লরাকে দিতে হইয়াছিল। ফুল্লরার অধিকাংশ অলঙ্কারও যে তাহার পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন। মোক্ষদাসুন্দরী যখনই তাঁহার পুত্রকন্তা সকলের মধ্যে তিনি যাহাকে সর্ব্বাধিক স্নেহ দিয়াছিলেন সেই সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্তার মলিন মুখ দেখিতেন—সে যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল তাহা লক্ষ্য করিতেন—তখনই তিনি বিচার-বিবেচনা না করিয়া তাহার দুঃখ-বিমোচনের চেষ্টা করিতেন।—সে চেষ্টা যে সফল হইতে পারে না, তাহা তিনি জানিতেন না—কারণ, নদীর এক এক স্থানে যে গভীর "দহ" সৃষ্ট হয়, তাহা কেহ পূর্ণ করিতে পারে না।

বাধ্য হইয়া মোক্ষদাসুন্দরী স্বামীকে অবস্থা জানাইলে গণপতি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা দেখেন, তাহাতে তিনি শিরে করাঘাত করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকেন—এই অনুসন্ধান তিনি কন্তার বিবাহের পূর্ব্বে করেন নাই কেন? বাড়ী, গাড়ী—সবই মায়া! পুত্রের বিবাহে তাঁহার বৈবাহিক যে ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাজারে—বিশেষ বৈবাহিকের নিকট—"দর বাড়াইবার" অভিপ্রায়ে; সে সময় যে ব্যয় তিনি করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব বৈবাহিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থেই নিকাশ হইয়াছিল। কয় বৎসর পূর্ব্বে পুত্রকে তিনি কোন বড় ব্যাঙ্কে মুৎসুদ্দী করিয়া দিয়াছিলেন—কুসঙ্গে পড়িয়া পুত্র এত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল যে, জামিনের জন্ত আমানত টাকায় তহবিল পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই এবং তখনই ঋণ করিতে হয়। ব্যাপারটি মিটাইয়া ফেলিয়া পিতা প্রকাশ করেন, তাহার পুত্রকে তিনি চাকরী করিতে না দিয়া কোন ব্যবসা করিতে দিবেন—তাঁহার পরিবারে চাকরী নিন্দার কথা। পুত্র কিছু দিন শেয়ার বাজারে "বাহির হয়"। যে মাতৃস্তনে শিশু অমৃত পায়—জলৌকা যেমন তাহাতে রক্তলাভ করে, তেমনই যে শেয়ার বাজারে লোক লক্ষ লক্ষ টাকা এক দিনে লাভ করে, তাহাতেই কেহ কেহ

আবার সর্ব্বস্বান্ত হয়। সেই বাজারের বিষয় অবগত হইয়া পিতা ও পুত্র ফাটকায় আকৃষ্ট হন।

গল্প আছে, পিতা মদ্যপ পুত্রকে মদ্য ত্যাগ করিতে বলিলে পুত্র পিতাকে বলিয়াছিল, তিনি মাত্র সাত দিন মদ্য পান করুন, তাহার পর উভয়ে একসঙ্গে মদ্য ত্যাগ করিবে—সপ্তম দিবসে পিতা পুত্রকে বলিয়াছিলেন, মদ্য ত্যাগ করিতে হয় সে করুক—তিনি ত্যাগ করিবেন না। এ ক্ষেত্রে তেমনই লোকসানের পরিমাণে পুত্র ভীত হইলেও পিতা ভীত হয়েন নাই। ফলে ক্রমে বাড়ী, গাড়ী, ঠাট—সবই বহিরাবরণে পরিণত হইয়াছিল—ভিতরে ঋণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

অনুসন্ধানে গণপতি যাহা দেখিলেন, তাহা যে কেবল কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই তাহার চিন্তার—দুশ্চিন্তার কারণ হইল, তাহাও নহে। তিনি সমস্ত জীবন অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞানে তাহার সাধনা করিয়াছিলেন—অর্থের জন্য আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও প্রাপ্যে বঞ্চিত করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। তিনি মনে করিতেন—তিনি অত্যন্ত চতুর। এখন তিনি বুঝিলেন, তিনি নির্ব্বোধের মতই কায করিয়াছেন এবং কন্যাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় তাঁহার যে অনেক অর্থ ব্যয়িত হইল—সে অর্থ সবই যে সদুপায়ে অর্জ্জিত, তাহা নহে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল :—

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
* * * *
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?"

অনুসন্ধানে তিনি কনিষ্ঠ জামাতার আর্থিক অবস্থা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন—রোগ শিবের অসাধ্য হইয়াছে—কন্যা-জামাতার নিঃস্ব অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়ান অবশ্যম্ভাবী। তিনি যত চেষ্টাই কেন করুন না, অগ্নি যেমন অঞ্চলে আবৃত করা যায় না, তেমনই তাহাদিগের দুর্দশা গোপন করা যাইবে না। তিনি নিজেও তাহাদিগের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং সে ব্যয় নিরর্থকই হইয়াছে। তিনি সমস্ত জীবন অর্থের সাধনা করিয়া এখন সে সাধনা ব্যর্থ হইল মনে করিয়া কেবলই ভাবিতেছিলেন—মান-সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখিয়া তিনি বিদায় লইতে পারিবেন ত?

গণপতির দেহের দৌর্ব্বল্য তাঁহার মনেও প্রতিফলিত হইতেছিল এবং তিনি আপনার যে অতীতকে সবলে দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি যখন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া যে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব করিতেছিল, তাহা তাঁহাকে অনুতাপপ্রবণ করিয়া তুলিতেছিল।

কন্যার অবস্থাই মোক্ষদাসুন্দরীকে বিষণ্ণ ও কাতর করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাহার উপর স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ তাঁহার আরও দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। আর স্বামীর মত তাঁহারও কেবলই মনে হইতেছিল, যে অহঙ্কার তাঁহার কথায় ও কাযে সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই চূর্ণ হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। লোক এখন কি বলিবে?

ফুল্লরার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাহার কেবল দুশ্চিন্তাই ছিল না—শ্বশুরালয়ের তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার অত্যাচারেরই নামান্তর হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন রাত্রিতে মাতার ও পুত্রীর মূল্যবান্ অলঙ্কার বিক্রীত হইয়া যাহাকে তাহারা কখন আপনাদিগের সমান মনে করিতে পারেন নাই, সেই মীরার হস্তগত হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদিগের বেদনার ক্ষতে যেন ক্ষারক্ষেপ হইয়াছিল। কথায় বলে, "যা'র যেখানে ব্যথা তা'র সেখানে হাত।" তাঁহাদিগেরও তাহাই হইয়াছিল—মীরা নিশ্চয়ই সব জানিতে পারিয়াছে এবং সেই জন্যই ঐ সব গহনা পরিয়া আসিয়াছিল।

ফুল্লরা মাতাকে বলিল, "মা, এত লোকের মৃত্যু হয়—আমারই হয় না!"

মোক্ষদাসুন্দরী কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

কন্যা আবার বলিল, "আমি মরলে কেবল আমারই হাড় জুড়ায় না—বাবাও হয় ত রক্ষা পান; তোমরা মনে করতে পার—একটা মেয়ে ছিল, মরেছে। মনকে প্রবোধ দিতে পার—মৃত্যুর উপর কা'রও হাত নাই। এ যে দগ্ধে মরা, মা!"

কন্যার কথায় মাতার হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি আপনার দুঃখ গোপন করিয়া কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। মানুষ যখন সান্ত্বনার অন্য উপায় পায় না, তখন দেবতার কথা মনে করে। তিনি বলিলেন, "ভগবান্‌কে ডাক—তিনি কখনই অবিচার করবেন না। তুই ত কা'রও অনিষ্ট চা'স নাই।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "মীরা খুব চালাক বটে—কিন্তু তবুও মনে হ'ল না, সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।"

ফুল্লরা বলিল, "ওর স্বামী কি খোঁজ না নিয়েই অত দামী গহনা কিনেছে?"

মোক্ষদাসুন্দরী সে কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

৭

যে দিন, এক বৎসর পরে, মীরা গণপতির গৃহে গমন করিয়াছিল, সে দিনের ঘটনা প্রমদার নিকট রহস্যাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। তিনি গৃহে ফিরিয়া সকল কথা স্বামীকে বলিয়া সে রহস্য ভেদ করিবার কার্য্যে সাহায্য সন্ধান করিলেন। কিন্তু সরলবুদ্ধি সুশীল সে বিষয়ে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিল না। সে কন্যার আর্থিক সৌভাগ্যদ্যোতক অলঙ্কার ও মোটর-যানের কথায় কিন্তু একটু চিন্তিত হইল; বলিল, "গহনার কথা বুঝতে পারি। কারণ, মীরা এক বার বলেছিল, এ সব সংগ্রহ করা কুঞ্জবিহারীর পিতার যেমন বাতিক ছিল—কুঞ্জবিহারীরও তেমনই আছে; ও সব সে সম্পত্তি ব'লে সংগ্রহ করে। কিন্তু তুমি যে গাড়ীর কথা বললে, তা' ত কিছু বুঝতে পারছি না; কুঞ্জ ত কখন বে-হিসাবী ব্যয় করে না।"

তবে সকলের চাপা আলোচনার কারণ সম্বন্ধে সুশীল বলিল, তাহা গণপতির গৃহের বৈশিষ্ট্য—অপরের আর্থিক অবস্থার আলোচনা তাঁহারা, অকারণে হইলেও, করিতেই অভ্যস্ত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, কুঞ্জবিহারীর আর্থিক অবস্থা "চলনসহি" মাত্র; সেই জন্য অলঙ্কারে ও যানে তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। আর কাহারও যে আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না—বিশ্বাস করিতে বেদনানুভব করেন।

প্রমদা বলিলেন, "সেই জন্যই ত মীরা বিরক্ত; এই এক বছর ও বাড়ীর চৌকাঠ পার হয় নাই। ওর গায়-হলুদের দিন যে কাকীমা

বলেছিলেন, ভারী ত বিয়ে, তা'র চা'র পায় আলতা—সে কথা ও কখন ভুলে নাই, আজও তাঁ'কে সে কথা শুনিয়ে দিয়েছে।"

সুশীল "সে কি?" জিজ্ঞাসা করিলে প্রমদা সে বিষয়ও বিবৃত করিলেন।"

প্রমদা কিন্তু স্বামীর কথায় সন্দেহমুক্ত হইতে পারিলেন না। পরদিনও তাঁহার গণপতির গৃহে যাইবার কথা। তথায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি কন্যার গৃহে গমন করিলেন এবং কন্যাকে বলিলেন, "কি হ'ল বল ত? কাকীমা'র মুখ আজকাল অন্ধকারই থাকে; বোধ হয়, কাকাবাবুর অসুখে সদাই চিন্তা; কিন্তু মুখ যেন একেবারে কাল-বৈশাখীর মত হ'ল. ফুল্লরা উঠে গিয়ে শয্যা নিল; দেখলি ত, কি মড়ার আকার হয়েছে? আর তা'র পর কেবল গুজগুজ ফুস-ফুস! গাড়ী নিয়েও আলোচনা!"

মীরা বলিল, "ও তোমার খুড়-শ্বশুরের বাড়ীর স্বাভাবিক ব্যাপার—ওরা মনে করে, দুনিয়ায় ওরাই বড়মানুষ—আর সবাই গরিব। কেবল তা'ই নহে—গরিব হওয়া অপরাধ—পাপ! যে বড়মানুষ তা'র পাড়ার এক সাধারণ গৃহস্থের ছেলে মুন্সেফ হয়েছে শুনে বলেছিল, 'মুন্সেফ হ'লেও মাহনা পা'বে না'—ওরা সেই দলের। ওতে তুমি বিস্মিত হও কেন?"

"না বাছা—আমার ভয় হয়; লোকের আলোচনাও 'চোখ দেওয়া'। আর গাড়ী নিয়েই বা কত আলোচনা!"

"ও গাড়ী এক রকম বাধ্য হয়েই কিনতে হয়েছে। এই দেখ"—বলিয়া মীরা পূর্ব্বদিন তাহাকে লিখিত স্বামীর পত্র মাতাকে দিল।

প্রমদা যখন তাহা পড়িতেছিলেন, সেই সময় দিদিমা'র আগমন-সংবাদ পাইয়া প্রশান্ত তাহার শিক্ষকের নিকট হইতে চলিয়া আসিল এবং প্রমদার কোল অধিকার করিয়া মীরার নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিল, "মা কাল তোমাদের বাড়ী গিয়েছিল—আমায় নিয়ে যায় নাই, দিদিমা।"

প্রমদা তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, "আমাদের বাড়ী নহে, দাদাভাই—আর এক বাড়ী। আমাদের বাড়ী যা'বার সময় যদি তোমাকে না নিয়ে যায়, তবে আমি মা'কে মারব।"

"না, দিদিমা, মারবে না; মা কখন আমায় মারে না—বকেও না।"

মাতাপুত্রীতে যে আলোচনা হইতেছিল, তাহা আর অগ্রসর হইতে পারিল না!

প্রমদা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ত আজ আর যাবি না?"

কন্যা বলিল, "না। ভাবছি, বিয়ের দিনও যা'ব না। তোমার জামাই ত যা'বেন—তা' হ'লেই হ'বে। আমি আর প্রশান্ত বাড়ীতে থাকব।"

"সে কি ভাল দেখা'বে?"

"তোমার জামাইও ত ঐ কথা বলছেন।"

প্রশান্ত বলিল, "মা, বাবা বলেছেন, সে দিন তিনি আমাকে নিয়ে যা'বেন; তবে আমাকে তাঁ'র কাছে থাকতে হ'বে।"

"ঠিক বলেছেন, দাদাভাই। তা'ই হ'বে। কি বল?"

"যাই। আবার ও-বাড়ীতে যেতে হ'বে"—বলিয়া প্রমদা বিদায় লইতে চাহিলেন।

মীরা বলিল, "একটু বিলম্ব কর, মা—তোমার জামাইকে আনতে গাড়ী যা'বে; তোমাকে বাড়ীতে দিয়ে যা'বে।

মীরা ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ী বাহির করিতে আদেশ করিল।

সে দিন কুঞ্জবিহারীকে মীরা যখন প্রমদার নিকট যাহা শুনিয়াছিল তাহা বলিল, তখন কুঞ্জবিহারী কেবল হাসিল। মীরার মনে হইল, সে হাসির মধ্যে একটু দুষ্টামীর বিকাশ ছিল।

কুঞ্জবিহারী বলিল, "এখন হ'তে ভাব—বিয়ের রাত্রিতে কি গহনা—কি কাপড় প'রে যা'বে।"

মীরা বলিল, "আমি কোন গহনা পরব না।"

"সে কি কখন হয়? বড়মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ—ধার ক'রেও গহনা প'রে যেতে হয়।"

৮

এক বৎসর পরে গণপতির গৃহে যাইয়া মীরা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল তাহাতে, সে যত বিরক্তই কেন থাকিয়া থাকুক না, দুঃখিত হইয়াছিল। তদবধি সে মধ্যে মধ্যে গণপতির, মোক্ষদাসুন্দরীর ও ফুল্লরার সংবাদ লইতে লোক পাঠাইত—যখনই তাহার লোক যাইত, তখনই মোক্ষদাসুন্দরী বলিয়া দিতেন—"এক বার আসতে বলবে। আমরা আর ক' দিন আছি? কর্ত্তা বলেন, ও বাড়ীর বড় না'তনী—ওর সম্ভ্রম আলাদা।" বামা যখনই আসিত, সংবাদ দিত—"কর্ত্তাবাবুর শরীর দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে—কর্ত্তামা ভেবে ভেবেই আধখানা হয়ে গেলেন; দেখে কষ্ট হয়, দিদিমণি।"

এক দিন মীরা বামাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফুল্লরা পিসীমা'কেও ত দেখলাম বড় কাহিল।"

বামা বলিল, "তা' বুঝি তুমি জান না? তা' জানবেই বা কেমন ক'রে—তুমি ত মা'রই মত পরের কথায় থাকতে ভালবাস না। শ্বশুরবাড়ীর ব্যবহারে মেয়েটা জ্বালাতন হয়েছে।"

"কে তো'কে বললে?"

"তোমরা জানবার আগে ঝি-চাকর আমরা সব জানতে পারি। শ্বশুরবাড়ীর লোক টাকা টাকা ক'রে যে অত্যাচার করে, তাতেই মেয়ের কথা ভেবে ভেবে কর্ত্তাবাবুর অসুখ হয়েছে। তা'রা মোটেই ভাল লোক নহে—কুটুম্বের পয়সায় লোভ কেন, বাপু?"

"আমি বলে দিচ্ছি, বামা, তুই ও সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করিস্ না।"

"না, দিদিমণি—গরিবের সবই দোষ হয়, তা কি আমি জানি না? তবে কি জান, দিদিমণি, ছেলেরাও বিরক্ত—তাই বৌরাও জানে—জামাই জুয়া খেলে। কি জানি, বাপু।"

"যে যা' খেলে খেলুক—আমাদের ও কথায় কায নাই।"

"তাই হ'বে, দিদিমণি।"

যে দিন বামার সহিত মীরার এই সব কথা হইল, সেই দিনই মীরা তাহার ভ্রাতার নিকটে শুনিল, বিবাহের পর হইতে গণপতির অসুখটা ঘন ঘন হইতেছে। সে বলিল, সে এক দিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবে।

কয় দিন পরে সে এক দিন পিত্রালয়ে যাইয়া—তথায় প্রশান্তকে রাখিয়া এক বার গণপতিকে দেখিতে গেল। তখন সে গণপতির ব্যাধির স্বরূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যেন কিছুক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে না!

সে দিন সে শুনিতে পাইল, ডাক্তার গণপতির মধ্যম পুত্রের জিজ্ঞাসায় বলিলেন, "বলবার আর কিছুই নাই; আজ কি কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ?"

গণপতির মধ্যম পুত্র বলিল, "হাঁ। আমার ছোট ভগিনীপতি এসেছিলেন, তাঁকে বকেছিলেন—তা'র পরেই। সে এক আপদ হয়েছে।"

"আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার জানবার কোন দরকার আমার নাই। কিন্তু এইটি স্থির জানবেন, যদি উত্তেজনার কারণ থেকে ওঁকে দূরে রাখতে না পারেন, তবে যে কোন সময়ে—যে কোন মুহূর্ত্তে জীবন যেতে পারে। আমাদের উপদেশ—যে কোন লোক উত্তেজিত ক'রে এ রকম রোগীকে মেরে ফেলতে পারে—সাবধান।"

"কিন্তু সেই ত হয়েছে বিপদ।

"তা' হ'লে প্রস্তুত থাকবেন, যখন তখন প্রাণ যেতে পারে।"

"কি যে করি!"—বলিতে বলিতে গণপতির মধ্যম পুত্র ডাক্তারকে বিদায় দিয়া চিন্তিত ভাবে পিতার কক্ষে গমন করিল। তখন কেবল পিতার দেহে জীবনের আবির্ভাব—নদীতে জোয়ারের জলের প্রবেশের মত অনুভূত হইতেছে। তাঁহার রক্তশূন্য মুখে তখনও রক্ত দেখা যায় নাই।

৯

গণপতির পৌত্রীর বিবাহের চারি মাস পরে এক দিন প্রাতে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ও তাহার পিতা গণপতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জামাতা যখনই আসিত, তখনই টাকা দিবার কথা বলিত এবং তাহাতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য তিনি পুত্রদিগকেও জানিতে না দিলেও, পুত্রগণ দেখিত, তিনি বিচলিত হইয়াছেন। সেই জন্য কিছু দিন হইতে তাহারা, নানা ছলে, তাহাকে গণপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিত না। কিন্তু তাহার পিতাকে ত নিবারণ করা যায় না। অগত্যা—অনিচ্ছায় তাহারা যাইয়া পিতাকে তাঁহার আগমন-সংবাদ দিল। গণপতি তাঁহাদিগকে আনিতে বলিলেন। তিনি বুঝিলেন, একটা দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে।

বৈবাহিক ও জামাতা তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলে গণপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহাই মহাশয়ের কি কোন কথা আছে ?"

বৈবাহিক বলিলেন, "বড় প্রয়োজনীয় কথা—সেই জন্যই, বাধ্য হয়ে বিরক্ত করতে হ'ল।"

গণপতি পুত্রদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

বৈবাহিক তাঁহাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। কুঞ্জবিহারীর নিকটে তাঁহার সর্ব্বস্ব বন্ধক ছিল; সে নালিশ করিয়াছিল, প্রাপ্য আদায় করিতেছে। সে যদি সময় না দেয়, তবে এক দিন পরেই তাঁহাকে নিঃসম্বল অবস্থায় গৃহের বাহির হইতে হইবে—তিনি পথের ভিখারী হইবেন।

গণপতি বলিলেন, "অত টাকা দিবার সাধ্য আমার নাই। এ পর্য্যন্ত অনেকই দিয়াছি—আর পারি না।"

বৈবাহিক বলিলেন, "আমি টাকা চাহি না—সময় চাহি।"

"পাওনাদারকে বলুন।"

"সে শুনছে না।"

"তবে আমি কি করব ?"

"আপনার নাতজামাই—আপনি বলুন।"

"অসম্ভব।"

"কেন ?"

"তা'র সঙ্গে—তা'দের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা আমাদের নাই।"

"আপনার ভাইপোকে বলুন।"

"সে আমার কথা শুনবে কেন ? আর আমিই বা তাঁকে কোন্ মুখে বলব ?"

"কুটুম্ব-স্বজনই বিপদে ক'রে। আপনি না করেন—ভাল। কাল রবিবার মাঝখানে আছে—আমি যে দিকে দু' চক্ষু যায় চলে যা'ব। তা'র পর যা'র অদৃষ্টে যা' থাকে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার মেয়ে আর জামাই-ই পথের ভিখারী হ'বে।"

যেন অন্যমনস্ক ভাবে গণপতি বলিলেন—"অদৃষ্ট।"

বৈবাহিক বলিলেন, "কিন্তু আপনি ত কোন চেষ্টাই করলেন না।"

"অসম্ভব, বেহাই মহাশয়, অসম্ভব।"

"তবে আমরা যাই"—বলিয়া বৈবাহিক উঠিলেন।—তাঁহার পুত্রও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল।

পুত্রগণ আসিয়া দেখিল, গণপতি নিস্তব্ধ হইয়া আছেন; তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি হাত নাড়িয়া সকলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি একাকী ভাবিবার অবসরই চাহিতেছিলেন।

পুত্ররা যাইয়া মোক্ষদাসুন্দরীকে সংবাদ দিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া আসিলেন—ফুল্লরাও সঙ্গে আসিল।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর গণপতি, বৈবাহিক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী শুনিয়া ফুল্লরার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে পাষাণ-প্রতিমার মত রহিয়াছে। তিনি কন্যাকে লইয়া আপনার ঘরে আসিলেন—যদি সে মূর্চ্ছা যায়, তবে গণপতি চঞ্চল হইয়া উঠিবেন এবং তাহাতে কি বিপদই না ঘটিতে পারে ?

তিনি কন্যাকে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না বটে, কিন্তু কন্যা যখন বলিল, "মা, আমি আত্মহত্যা করব"—তখন মা'র মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং প্রবল বাত্যায় সমুদ্র যখন বিক্ষুব্ধ হয়, তখন যেমন অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্রব্য ভাসিয়া উঠে, তেমনই তাঁহার মনে যে সঙ্কল্প তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই, তাহাই দেখা দিল। মানুষ যখন অকূলে পতিত হয়, তখন সে তৃণখণ্ড ধরিয়াও বাঁচিবার চেষ্টা করে। গণপতি যাহা অসম্ভব বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা সম্ভব হয় কি না দেখিবেন।

মোক্ষদাসুন্দরী ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ী বাহির করিতে বলিলেন এবং ভৃত্য যখন আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহার পুত্রদিগের এক জন তখনই কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—গাড়ী দ্বারেই আছে, তখন তিনি ফুল্লরাকে "আমার সঙ্গে আয়" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া—আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী সুশীলের গৃহে যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন।

ফুল্লরা কিছু বুঝিতে পারিল না; বোধ হয়, বুঝিবার চেষ্টা করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না।

সুশীলের গৃহে উপনীত হইয়া মোক্ষদাসুন্দরী যাইয়া প্রমদাকে বলিলেন, "বৌমা, আমার সঙ্গে যেতে হ'বে—এস।"

প্রমদা রন্ধনশালায় ছিলেন; বাহির হইয়া হাত ধুইয়া কাকীমা'র

অনুসরণ করিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় তিনি মোক্ষদাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যা'বেন, কাকীমা ?"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "মীরার বাড়ী।"

প্রমদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে? তাঁহার মন আশঙ্কায় ব্যাকুল হইল। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন, ফুল্লরা গাড়ীতে বসিয়া আছে—সে কান্দিতেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন রহস্যাচ্ছন্ন,—আতঙ্কজনক।

মোক্ষদাসুন্দরী বামাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাহার নির্দ্দেশে গাড়ী মীরার গৃহে যাইয়া উপনীত হইল।

১০

সর্ব্বাগ্রে গাড়ী হইতে নামিয়া বামা ঊর্দ্ধশ্বাসে মীরাকে সংবাদ দিতে গেল—কর্ত্তামা আসিতেছেন।

মীরা তখন স্বামীর বসিবার ঘরে বসিয়া তাহার সহিত কি আলোচনা করিতেছিল। বামাকে দেখিয়া অঞ্চলখানি মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, বামা? হাঁফাচ্ছিস যে?"

বামা তখন হাঁফাইতে হাঁফাইতেই বলিল, "কর্ত্তামা এসেছেন?"

বিস্মিত ভাবে মীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা' জানি না। মা'কে নিয়ে এসেছেন।"

"হঠাৎ? কি হয়েছে?"

কুঞ্জবিহারী বলিল, "সে তাঁ'দের কাছেই শুনবে। তাঁ'দের নিয়ে এস।"

মীরা দুইটি ঘর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই মোক্ষদাসুন্দরী, প্রমদা ও ফুল্লরা—তিন জনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

মীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ, ছোট ঠাকুরমা?"

মোক্ষদাসুন্দরী উচ্ছ্বসিত রোদন সংযত করিয়া বলিলেন, "তোর কাছে ফুল্লরার জন্য ভিক্ষা চাহিতে এসেছি, দিদি!"

"কি বলছ, ছোট ঠাকুরমা?"

"আমরা ভিখারী—তা'রও অধম। তোকে রক্ষা করতেই হ'বে।"

মীরা তাঁহাদিগকে আনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে বসাইল। সে বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ওদের সময় দিতেই হ'বে।"

"কিসের জন্য সময়?"

"তুই কি জানিস না, তোদের কাছে ওদের সর্ব্বস্ব বন্ধক ছিল—সময় না দিলে কাল ওদের বাড়ী ছেড়ে যেতে হ'বে। ফুল্লরা বলছে, ও আত্মঘাতী হ'বে। আমি মা; আমি ছুটে এসেছি—মীরা কখন আমার কথা ঠেলবে না। তোর ঠাকুর-দাদাকে বাঁচা।"

মীরা বলিল, "আমি এর কিছু জানি না। তুমি তোমার নাত-জামাইকে বল।"

সে বামাকে বলিল, "বামা, কাউকে বল, ওঁকে ডেকে আনুক।"

পশ্চাৎ হইতে কুঞ্জবিহারী বলিল, "এই যে আমি।"

সে অগ্রসর হইয়া মোক্ষদাসুন্দরীকে ও প্রমদাকে প্রণাম করিল এবং বয়ঃকনিষ্ঠা ফুল্লরাকে প্রণাম করিবে কি না ভাবিয়া—একটু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রণাম করিল।

মোক্ষদাসুন্দরী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বেঁচে থাক, সুখে থাক।"

মীরা কাপড় মাথার উপর আরও টানিয়া দিয়া উঠিয়া যাইয়া পার্শ্বের ঘরে দ্বারের পার্শ্বেই দাঁড়াইল।

মোক্ষদাসুন্দরী প্রথমে তাহার উদ্দেশে বলিলেন, "যাস না, দিদি।" কিন্তু মীরা তখন ঘর অতিক্রম করিয়াছে।

তাহার পর মোক্ষদাসুন্দরী কুঞ্জবিহারীকে বলিলেন, "আমি আজ তোমার কাছে—তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে এসেছি। তুমি না বাঁচালে তোমার দাদা বাঁচবেন না; আর ফুল্লরাও বাঁচবে না।"

কুঞ্জবিহারী বলিল, "ও কি কথা বলছেন, ঠাকুরমা? ওতে যে আপনার নাতিনীর অকল্যাণ হ'বে।"

"বালাই—ষাট। তোমাদের কল্যাণই হ'ক। কিন্তু তোমাকে এটি করতেই হ'বে।"

"কি, আজ্ঞা করুন।"

"তোমার কাছে ফুল্লরাদের যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক ছিল?"

"হাঁ। কিন্তু সেটা আপনার নাতিনী এ বাড়ীর লক্ষ্মী হয়ে আসবার পূর্ব্বে।"

কুঞ্জবিহারী দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, মীরা রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেছে।—সে রোষ যে কৃত্রিম, তাহা কুঞ্জবিহারী বুঝিতে পারিল।

কুঞ্জবিহারী বলিল, "উনি আসবার পরে আমি—সম্পর্ক জানতে পেরে টাকাটা আদায় ক'রে—ভবিষ্যতে কোনরূপ মনান্তরের কারণ যা'তে না হয়, তা'র চেষ্টা করেছি। কারণ, আপনি সত্যই বলে-ছিলেন, 'ভারী ত বিয়ে, তা'র চার পায়ে আলতা।'—আমি—"

বাধা দিয়া মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "আর লজ্জা দিও না। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার সে দিন আর নাই, দাদা—সে কথা বলবার মুখও নাই। আজ আমি—ভিক্ষা চাহিতে এসেছি।"

কুঞ্জবিহারী বলিল, "যদিও আপনার নাতিনী রাগ করছেন; তবুও আমি বলছি, উনি যে ভাবে সকলেরই ভাল চা'ন, তা'তে ওঁর অনেক ভাল হাতে পড়াই উচিত ছিল।"

"খুব ভালই পড়েছে। আমরা হয় ত প্রথমে বুঝতে পারি নাই—ভগবান্ ওর ভাগ্যে ভালই করেছেন।"

"আপনারা সেই আশীর্ব্বাদই করুন। আমাকে কি করতে হ'বে?"

"ওদের ক'টা মাস সময় দিতে হ'বে।"

"আপনি বললে আমি অবশ্যই দিব। যদি কোন মনান্তর ঘটে, সেই জন্যই আমার সব কথা—ব্যবসা, টাকা, সব বিষয়ের কথা আমি আপনার নাতিনীকে বললেও ঐ কথাটি বলি নাই। কিন্তু সময় দিলে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুঞ্জবিহারী বলিল, "আমি আসছি।" বলিয়া সে পার্শ্বের ঘরে গেল।

কথায় বলে, ঘর-পোড়া গরু সিঁদূরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়। মোক্ষদাসুন্দরীর ভয় হইল, হয়ত মীরার সহিত পরামর্শের ফলে কুঞ্জবিহারী আর তাঁহার কথা রক্ষা করিবে না। তিনি উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত ভাবে কুঞ্জবিহারীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; প্রমদাকে ব'ললেন, "বৌমা, তুমি এক বার মেয়েকে বল।"

কুঞ্জবিহারী মীরার সহিত পরামর্শ করিতেই গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, "ঠাকুরমা, আপনি সময় দিতে বলছেন, আমি নিশ্চয়ই দিব। কিন্তু সময় দিলে কিছুই হ'বে না—ও প্রায় ভরাডুবী হয়ে এসেছে।"

শিরে করাঘাত করিয়া মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "তবে কি হ'বে ?" সুন্দরী যেন জ্ঞান হারাইল।

কুঞ্জবিহারী তখন বলিল, "আপনি আরও যা' বলেছিলেন, তা' ফলেছে। স্ত্রী ভাগ্যে ধন—আপনার নাতিনীর ভাগ্যে আমি এই যুদ্ধের বাজারে যে টাকা পেয়েছি, তা' আমার কল্পনাতীত। বাবা যা' রেখে গিয়াছিলেন, তা' আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি যা' তা'র পরে পেয়েছি, তা' আশাতীত। আপনার নাতিনীর জন্যই এই হয়েছে। ওঁর ইচ্ছা, আমি সব টাকা ছেড়ে দিয়ে মুক্তি দিই ও মুক্ত হই।"

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, "রাজরাজেশ্বর হও, দাদা। এমন মানুষ যে একালে হয়, সে ধারণা আমার ছিল না।" তিনি যাইয়া মীরাকে জড়াইয়া ধরিলেন; কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "তোর জন্য তোর পিতৃকুল ধন্য হ'ল, মীরা।"

সেই সময় কুঞ্জবিহারী বলিল, "কিন্তু একটা কথা আছে। ঠাকুরমা, যে সম্পত্তি ডুবছিল—তা' যে তুললে আবার ডুববে না, তা' কে বলতে পারে ?"

মোক্ষদাসুন্দরীর মনে হইল, তিনি দেবলোক হইতে ভূতলে পতিত হইতেছেন। কুঞ্জবিহারী কি বলিবে ? তিনি বলিলেন, "তা' হ'লে কি হ'বে ?

কুঞ্জবিহারী বলিল, "জুয়াখেলার নেশা বড় ভয়ের কথা, ঠাকুরমা। যা'তে দায়মুক্ত সম্পত্তি আবার দায়যুক্ত না হ'তে পারে—আপনার মেয়ের ছেলেরা তা'দের পৈতৃক সম্পত্তি পায়, তাই আমাদের ইচ্ছা।"

মোক্ষদাসুন্দরী যেন স্বস্তি লাভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "সে ত খুবই ভাল। তা'র কি ব্যবস্থা হ'বে ?"

কুঞ্জবিহারী বলিল, "সে বিষয় আমি ছোট-ঠাকুরদা মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করতে চাহি। তিনি উকীলের পরামর্শ মত লিখাপড়ার ব্যবস্থা করবেন।"

"তাই হ'বে, দাদা! তুমি চল"—বলিয়া তিনি মীরাকে বলিলেন, "তুইও চল।"

মোক্ষদাসুন্দরীর জিদে কুঞ্জবিহারীকে ও মীরাকে গণপতির কাছে যাইতে হইল। স্থির হইল, কুঞ্জবিহারী, তাঁহার এটর্ণী, গণপতি, তাঁহার এটর্ণী ও জামাতার পক্ষের এটর্ণী এক সঙ্গে লিখাপড়া শেষ করিবেন।

কুঞ্জবিহারী ও মীরা বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত হইতেছিল—প্রশান্তের আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল—কুঞ্জবিহারীকেও কার্য্যস্থানে যাইতে হইবে।

তাহারা বিদায় লইবার সময় গণপতি কুঞ্জবিহারীকে বলিলেন, "তোমার ব্যবহারে মানুষের সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিবর্ত্তন করতে হ'ল। তোমাকে আমার নিজের একটা কাযে দরকার আছে—কাল এক বার আসতে হ'বে।"

গৃহে ফিরিবার পথে পরম আনন্দিতা প্রমদাকে তাঁহার গৃহে নামাইয়া দিয়া মীরা স্বামীকে বলিল, "তুমি লোকের কাছে আমাকে অত বাড়াও কেন ? ছিঃ!"

কুঞ্জবিহারী বলিল, "তুমিও জান—আমিও জানি—আমি মিথ্যা কথা বলি না।"

"লোক কি মনে করে ?"

"যা'র যা' ইচ্ছা মনে করুক—তা'তে সত্য কখন মিথ্যা হ'বে না।"

* * * *

পরদিন গণপতির নিকটে যাইয়া কুঞ্জবিহারী দেখিল, তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহাকে একখানি কাগজ দিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। তাহা তাঁহার উইল। তখন তাঁহার উকীল ও এক বন্ধু তাহাতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "তুমি পড়িয়া সহি কর। কিন্তু উইলের বিষয় তোমার শ্বশুর ছাড়া আর কাহাকেও ব'ল না—আমার ছেলেরা, বোধ হয়, অসন্তুষ্ট হ'বে। কিন্তু আমি এ উইল না ক'রে পারলাম না; তোমার কাযে আমার মনের অর্দ্ধেক ভার গিয়াছে—এই উইল ক'রে আমি ভারমুক্ত হ'লাম। এখন মত-পরিবর্ত্তন ক'রে শান্তিতে মরতে পারব।"

উইলে গণপতি লিখিয়াছিলেন—আমার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি সমান তিন ভাগ হইবে—এক অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজের দুই কন্যা সমভাবে পাইবে; এক অংশ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীলের; অবশিষ্ট অংশ তাঁহার তিন পুত্র ও স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী চারি জনের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

যান্ত্রিক উন্নতি

অসমান অর্থের বণ্টন এই দুনিয়ার
অগণন অশান্তি-কারণ, প্রাণপাত করি
যত মুটে শ্রমিক মজুর খাটে দিন-রাত
নাহি জুটে পরনে বসন পেট-ভরা ভাত;
রক্তচক্ষু ধনিক মালিক হাতে ঘড়ি ধরি
যন্ত্র-সম খাটাইয়া লয় ভারি হুঁসিয়ার।

ছুটি নাই, হাঁফ ছাড়িবার নাহি যে সময়;
মুখ বুজে কাজ করে যাও, রক্ত, মাংস দাও,
পিষে ফেল. আপনারে যদি জাঁতার চাকায়
স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তবু কেহ কি তাকায় ?
সভ্যতার যান্ত্রিক উন্নতি, মেসিন চালাও,
মূল-ধনে মূলে হাবাৎ মানব-হৃদয়।

অপারগ, ব্যাধি যদি হয়, পেয়ে গেলে ছুটি,
রোজ-গণ্ডা কাটা গেল সব, মারা গেল রুটি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী।

সপ্তত্রিংশৎ তরঙ্গ

অপরিচিত ব্যক্তির অপমৃত্যু

স্মিথের কথা শুনিয়া রোপার ওয়াইল্ড উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, "শোন স্মিথ, তোমার আবদার পূর্ণ করিতে আমার অনিচ্ছা নাই; কারণ, আমি জানি—তোমার ধারণা-শক্তি অল্প, এবং—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমারও ধারণা-শক্তি ঐরূপ অল্প। বিশেষতঃ, আমি তোমার সংস্রবে না থাকায় সকল কথা জানিতেও পারি নাই; সেই জন্যই প্রকৃত ঘটনার সকল বিবরণ শুনিতে আমারও অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।"

ওয়াইল্ডের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইত—সে মিঃ ব্লেকের নিমন্ত্রিত অতিথি; তাহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ছিল না। সে ব্লেককে ভয় করিলেও—সে যে অপরাধী, তাহার কথা শুনিয়া তাহাও বুঝিবার উপায় ছিল না।

ওয়াইল্ডের ইঙ্গিতে স্মিথ হুইস্কির বোতল ও সোডা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। ওয়াইল্ড কিঞ্চিৎ পান করিলেও ব্লেক তাহা স্পর্শ করিলেন না।

ওয়াইল্ড অতঃপর কথা আরম্ভ করিয়া বলিল, "আমি প্রথমেই আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি—আমি যাহা বলিব, তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি; তাহা শুনিবার পর আপনি কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।"

ব্লেক বলিলেন, "কি বলিবে বল, আমরা তাহা শুনিবার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছি।"

ওয়াইল্ড বলিল, "গত রাত্রিতে আমি উইম্বলডনের মাঠে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু উহা দৈবাৎ ঘটিয়াছিল, হঠাৎ আমি মনের খেয়ালেই ঐ কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনি হয় ত জানেন, আমি এখন কস্‌মস্ হোটেলে বাস করিতেছি; তবে আমি সেখানে কর্ণেল হ্যাম্পসন এই সম্মানজনক ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, উক্ত হত্যাকাণ্ডের পর আর আমি সেখানে প্রত্যাগমন করি নাই; কারণ, সকলেই শুনিবে আমার মৃত্যু হইয়াছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির ধারণা হয়—আমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই।

"এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই কার্ণের উপর আমার লক্ষ্য আছে; সার রডনে ড্রুমণ্ড তাহার যে তিন জন মহাশত্রুর বিষ দাঁত ভাঙ্গিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কার্ণ সেই তিন জনের অন্যতম। তিন জনের মধ্যে এখন এই নরপিশাচই জীবিত আছে। এক সপ্তাহেরও অধিক কাল আমি তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমার ধারণা, এখন সে আমার ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছে! তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য আমি যে মুষ্টিযোগ প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছি—তাহা আমারই আবিষ্কৃত—আমার নিজস্ব।—যদি এই প্রসঙ্গে আমি কোন অবান্তর বাক্যের অবতারণা করি—তাহা হইলে আপনি আমাকে সতর্ক করিবেন।"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ এখনই তোমাকে সতর্ক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে; কারণ, গত রাত্রে কি ঘটিয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে চাই, কিন্তু তুমি সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক্, কেবল বাজে কথায় আমাদের সময় নষ্ট করিতেছ!"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, সেই কথাই এখন বলিব। আমি আপনাকে প্রথমেই বলিয়াছি আমি গত রাত্রে উইম্বলডনের মাঠে গমন করিয়াছিলাম; কার্ণের বাড়ীর উপর নজর রাখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি কোন কৌশলে তাহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার গোপনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে পারিব।"

"আমার উদ্দেশ্য ছিল—আমি তাহার অনুষ্ঠিত কোন না কোন প্রবঞ্চনা আবিষ্কার করিতে পারিব। তাহার ফলে তাহাকে ফৌজদারী-সোপরদ্দ করিয়া দীর্ঘকাল তাহার সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিব। যাহা হউক, আমি যে সময় সেই মাঠে পদার্পণ করিলাম—সেই সময় প্রবল মেঘগর্জ্জন আমার কর্ণগোচর হইল। আমি ভাবিলাম, সেই দুর্য্যোগের অবসান হইলে আমি আমার সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিব।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঐরূপ ভাবিবার কারণ কি?"

ওয়াইল্ড বলিল, "কারণ—রাত্রিকালে সহসা প্রচণ্ডবেগে পুনঃ পুনঃ মেঘ-গর্জ্জন হইলে লোকের নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। আমি যে সময় আরব্ধ কার্য্যে রত থাকিব, সেই সময় কার্ণ জাগিয়া-উঠিয়া আমার কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমার লক্ষ্য ছিল। আমার ধারণা হইয়াছিল অল্পকালের মধ্যেই সেই দুর্য্যোগের অবসান হইবে। সেই আশায় আমি মাঠের ভিতর একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া রহিলাম; কিন্তু সেই দুর্য্যোগের অবসান না হইয়া শীঘ্রই তাহা ভীষণ ঝঞ্ঝায় পরিণত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘে এরূপ বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল যে, আমি বিহ্বল ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।"

স্মিথ বলিল, "সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তুমি মাঠেই বসিয়া রহিলে?"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমাকে কি তুমি সেই রকম আহাম্মুক মনে

কর? বৃষ্টি আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মাঠেই ছিলাম বটে, কিন্তু যখন ভাঁটার মত মোটা মোটা বৃষ্টি-ধারার বর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন আমাকে উঠিয়া-গিয়া একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইতে হইল।"

স্মিথ বলিল, "ওটা কিন্তু তোমার আহাম্মুকিই হইয়াছিল!"

ওয়াইল্ড বলিল, "তা বটে; মেঘগর্জ্জনের সময় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া যে অবিবেচনার কাজ—ইহা কি করিয়া অস্বীকার করি? কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় আমি ব্যাকুল নহি, বিশেষতঃ, আমি অদৃষ্টবাদী (fatalist)। আমার বিশ্বাস, ভাগ্যে যাহা আছে—তাহা ঘটিবেই। অদৃষ্টবাদী বলিয়াই জীবনের যুদ্ধে কোন দিন আমি পশ্চাৎপদ হই না। যদি আমার ভাগ্যে লেখা থাকে—বজ্রাঘাতেই আমার মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে নিভৃত গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও আমি ঐরূপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব না। যাহা হউক, বৃষ্টিতে ভিজিবার আশঙ্কায় বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু বৃষ্টির বিরাম হইল না। প্রবল বর্ষণের সহিত মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, আর কি ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন! যেন প্রলয়কাল সমাগত! মিঃ ব্লেক, সেই সময় নৈশ প্রকৃতির যে প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইতে পারে, কিন্তু এই লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ, তাহার বর্ণনার উপযুক্ত ভাষায় আমি বঞ্চিত। প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির সেই বিরাট্ রুদ্র সৌন্দর্য্য ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। নৈশ-প্রকৃতির সেই বিশ্ববিধ্বংসী প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সেই স্থানে সেই অপরিচিত হতভাগ্য আগন্তুকের সমাগম হইল!"

স্মিথ বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে? কাহার কথা বলিতেছ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "মৃত্যুকবলিত অপরিচিত হতভাগ্য বলিয়াই আজি তাহার পরিচয় দিব; কারণ, তাহার পরিচয় আমার অজ্ঞাত। বৃষ্টিধারা যে সময় প্রবলবেগে বর্ষিত হইতেছিল—সেই সময় আমি তাহাকে সেই মাঠের ভিতর আসিতে দেখিলাম। আমার মনে হইতেছিল, বৃষ্টির প্রবল বর্ষণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হওয়ায় সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল—যেন তাহার আত্মসংবরণের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল! সে সেই মাঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ তাহার অদূরে বজ্রাঘাত হইয়াছিল, এবং তাহার ঝাঁঝে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, সেই বৃষ্টি ও বিদ্যুদ্বিকাশের মধ্যেই সে বন-জঙ্গল ও ঝোপের ভিতর দিয়া কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছিল, তাহাও তাহার বুঝিবার যেন শক্তি ছিল না!

"আমার নিকট আসিয়া সেই গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য তাহাকে আহ্বান করিতে আমার প্রবল আগ্রহ হইল; কিন্তু আমার মুখে কথা সরিবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তমধ্যেই হঠাৎ কি কাণ্ড ঘটিল, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না! আমার চক্ষু ধাঁধিয়া, আমার কর্ণ বধির করিয়া বজ্রনির্ঘোষ হইল। বজ্রাঘাত সম্বন্ধে আমার চাক্ষুষ-অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু কড়-কড় শব্দে যে অশনি-সম্পাত হইল, তাহার প্রভাবে আমার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইল! অনুমান হইল, সেই বিদ্যুৎপ্রবাহে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সিয়া গেল! বিজলি-প্রবাহ মুহূর্ত্তমধ্যে যেন আমার চতুষ্পার্শ্বে তরঙ্গায়িত হইয়া নৈশ অন্ধকারে বিলীন হইল।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি যে অপরিচিত আগন্তুকের কথা বলিলে, সেই ব্যক্তিই কি ঐ ভাবে নিহত হইল?"

ওয়াইল্ড বলিল, "সে কথা পরে বলিতেছি। সেই বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষমূলে আমার দীর্ঘ-দেহ প্রসারিত হইল। যেন কোন বিশালকায় দৈত্যের অঙ্গুলি-সন্তাড়নে আমাকে মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইতে হইল! প্রায় দশ মিনিট পর্য্যন্ত আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হওয়ায় আমি নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিলাম!

"জ্ঞানসঞ্চার হইলে আমার মনে হইল, আমার সব শেষ হইয়া গিয়াছে; যদি মরিয়া না থাকি—তাহা হইলেও আমি অকর্ম্মণ্য হইয়াছি। আমি হাত-পা নাড়িবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেই মনে হইল, আমার দেহ হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল! প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আমি অতিকষ্টে উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলাম! বুঝিতে পারিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আমি জীবিত আছি। আমি উঠিয়া বসিবার পর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন আমার মনে হইল, আমার আরব্ধ-কার্য্য পরিহার করিয়া কসমস্ হোটেলে প্রত্যাগমন করাই কর্ত্তব্য।

"সেই সময় আমার স্মরণ হইল, আমি যেন কাহারও কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম! কিন্তু সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে আর দেখিতে পাইলাম না। যে স্থানে বজ্রাঘাত হইয়াছিল, সেই স্থানে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম। লোকটিকে আমি সেই স্থানেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তখন বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল; ঝটিকাও থামিয়া গিয়াছিল। আমি উঠিয়া গিয়া সেই বজ্রাহত লোকটিকে দেখিলাম। আপনারা তাহাকে যে অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থাতেই তাহাকে সেই স্থানে নিপতিত দেখিলাম।"

ওয়াইল্ড সহসা নীরব হইল, এবং গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আমি কি দেখিলাম—তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, আপনারাও তাহা দেখিয়াছেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছিল। বজ্রাঘাতে তাহাকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। আমি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে একটি ফন্দি আমার মস্তকে আসিয়া জুটিল। ভাবিলাম, এই হতভাগ্যের মৃত্যু কি আমি নিজের কোন কাজে লাগাইতে পারি না? নিহত ব্যক্তির দেহ আমার দেহের ন্যায় দীর্ঘ, এবং আমাদের উভয়ের আকৃতিরও কতকটা সামঞ্জস্য ছিল।"

ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া স্মিথ ব্যগ্র ভাবে বলিল, "এবার আমি তোমার মতলব কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি; হাঁ, অন্ধকারের মধ্যে আমি আলোক দেখিতে পাইতেছি!"

ওয়াইল্ড স্মিথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু যখন আমার মনে হইল—ঐ লোকটির গৃহে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা থাকিতে পারে, তখন ভাবিলাম, আমার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না করাই সঙ্গত হইবে; বিশেষতঃ, কাজটি তেমন প্রীতিকরও নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি নিহত ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহের আশায় তাহার পকেট হাতড়াইতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু তাহার পকেটে নামের কার্ড বা চিঠিপত্র কিছুই পাইলাম না, কেবল কয়েকটি শিলিংমাত্র দেখিতে পাইলাম। তাহার পরিচয়-সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া আমি আমার সঙ্কল্পের অনুসরণ করিলাম।

"কাজটা আমার পক্ষে আদৌ কঠিন হইল না। আমার নিজের

পকেটে যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহা তাহার পকেটে রাখিয়া দিলাম। আমিই যে সেই নিহত ব্যক্তি—ইহা প্রতিপন্ন করা সহজ হইবে বলিয়াই আমার ধারণা হইল। বস্তুতঃ, আমিই যে ঐ ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছি—কে ইহা অবিশ্বাস করিবে ?"

ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু লোকদের এই ভাবে প্রতারিত করিবার জন্য তোমার আগ্রহের কারণ কি ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "ইহা আমার কল্পনা-শক্তির প্রাখর্য্যেরই পরিচায়ক। আমি কেন যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা আপনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। আমার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, কার্ণ আমাকে হত্যা করিয়াছে—এই ধারণাই যেন লোকের মনে বদ্ধমূল হয়।"

স্মিথ বলিল, "লোকের ধারণা হইত, বজ্রাঘাতেই তোমার মৃত্যু হইয়াছে; এ অবস্থায় কার্ণ তোমাকে হত্যা করিয়াছে, ইহা কে বিশ্বাস করিত ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "তোমার এ কথা সত্য; কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক অনুসন্ধানের ফলে কার্ণকেই আমার হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবেন। আর মিঃ ব্লেক যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেও পুলিশ কার্ণকে সন্দেহ করিবেই। আর প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়াছেও তাহাই। তোমার কি মনে হয় না—কার্ণ এই ব্যাপারের পর বিচারালয়ে নীত হইয়া—যে হত্যাকাণ্ডের জন্য সে দায়ী নহে—সেই অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে ? অভিযোগ মিথ্যা হইলেও তাহার পক্ষে এই চরম দণ্ড অপরিহার্য্য।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু সে যে অপরাধ করে নাই, সে জন্য তাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু কার্ণ মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছে; সুতরাং আমার এই কৌশলে সে দণ্ডিত হইলে সুবিচারই হইবে (would only have served the ends of justice)।"

ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপারটা তুমি এক দিক্ হইতে দেখিতেছ, কিন্তু কার্ণ যে সত্যই মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছে ইহা আমাদের অজ্ঞাত।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু তাহার মত দুর্জ্জন গ্রেপ্তার হওয়ায় আপনি কি সন্তুষ্ট হন নাই ?"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তোমার আমার সন্তোষ এক কথা, আর সুবিচার-ফলে আইনের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অন্য কথা ওয়াইল্ড! আইনের ভার তুমি স্বহস্তে লইতে প্রস্তুত থাকিলেও আমি সে জন্য প্রস্তুত নহি। যাহা হউক, তোমার গল্পটা এখন শেষ কর।"

ওয়াইল্ড বলিল, "অতঃপর আমি কার্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত প্রসারিত একটা চিহ্ন রাখিলাম। তাহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করাও আমার পক্ষে কঠিন হয় নাই, এবং প্রমাণ গড়িয়া তুলিতেও অধিক বিলম্ব হয় নাই। মিঃ ব্লেক, আপনি নিহিত ব্যক্তির দেহে একটা টাইপিন্ দেখিতে পাইয়াছিলেন কি ?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহা পাইয়াছিলাম।"

"আপনি কি উহা চিনিতে পারিয়াছিলেন ?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ চিনিয়াছিলাম, উহা কার্ণের জিনিস।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমিই মতলব করিয়া উহা সেখানে রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, উহা আপনার নজরে পড়িবে, এবং উহা কাহার জিনিস, তাহাও আপনি বুঝিতে পারিবেন। উহা আমি কার্ণের ডেস্কের উপর পাইয়াছিলাম। আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, উহার প্রান্তস্থিত সূতাটি জীর্ণ হইয়াছিল। উহা ডেস্কের উপর পাওয়ায় আমার কাজের সুবিধাই হইয়াছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু রক্তের দাগগুলি ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "সে রক্ত আমারই দেহের।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আর সেই রক্তাক্ত দাণ্ডাটা ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "উহাও আমার দেহের রক্ত।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি আহত হইলে না, অথচ তোমার দেহ হইতে রক্তপাত হইল ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "উহা অত্যন্ত সহজ। আমি নাকে খোঁচা দিয়া রক্ত বাহির করিয়াছিলাম। ঐ লোকটা বজ্রাঘাতে এক খণ্ড পাথরের উপর পড়িয়া যাওয়ায় উহার মস্তকে ক্ষত হইয়াছিল। আমি সেই পাথরখানা মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখায় আপনি তাহা দেখিতে পান নাই। আমি সকল ব্যবস্থাই শেষ করিয়া রাখিয়া কার্ণের গৃহ ত্যাগ করি। আমি জানিতাম—মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হইবে, কার্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং কার্ণকে এই ব্যাপারে জড়াইবার সুবিধা হইবে। তাহাকে হত্যাভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইল—ইহা মনশ্চক্ষে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, এবং পরবর্ত্তী ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইহাও আমার প্রীতিকর হইয়াছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর কি হইল ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "অতঃপর আমি নগরে প্রত্যাগমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। যে সকল অসুবিধা ঘটিতে পারে—সেই সকল বিষয় সম্বন্ধেও মনে মনে আলোচনা করিলাম। আমার মনে হইল, এক দল সাধারণ লোক হয় ত মৃতদেহটি দেখিতে পাইবে, তাহার পর সেখানে ভীড় জমিয়া যাইবে; আমি সতর্কতা সহকারে যে চিহ্ন রাখিয়াছিলাম, তাহারা হয় ত দাপাদাপি করিয়া সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। তাহার পর আমি কার্ণের লাইব্রেরী যে অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছিলাম, কার্ণ তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি তাহা গুছাইয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। ঐরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যাপার পুলিশের গোচর না হয়—এইরূপই আমার ইচ্ছা ছিল।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে মিঃ ব্লেকের কথাই তখন তোমার মনে হইয়াছিল ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ স্মিথ! আমি সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার পর মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছিলাম।"

ব্লেক গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে স্ত্রীলোকটি টেলিফোনে আমাকে ঐ সংবাদ জানাইয়াছিল—তাহা হইলে তুমিই সেই স্ত্রীলোক ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "ঐ প্রকার চাতুরীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত; কিন্তু আমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, আশা করি, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে আমার ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। উহা কি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই ?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে—তুমি কার্ণের গৃহরক্ষিতাকে (hose-keeper) কথা বলিতে শুনিয়াছিলে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি ঐরূপই অনুমান করিবেন। সকাই আমি মিসেস্ ফিঞ্চের সহিত দুই বার আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। গত সপ্তাহে আমি ইন্সিওরেন্সের এজেন্টের ছদ্মবেশে দুই বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি যখন টেলিফোনে আপনাকে সংবাদ প্রদান করি, তখন মিসেস্ ফিঞ্চের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হয় নাই। অন্যের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে আমার কিঞ্চিৎ দক্ষতা আছে—ইহা বোধ হয় আপনি অস্বীকার করিবেন না।

"আসল কথা এই যে, আপনাকে এই ব্যাপারে টানিয়া আনিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল; কারণ, আমি জানিতাম, প্রয়োজন বুঝিলে আপনি দংশনে বিরত হইবেন না। আপনি সকল বিষয় এক বার পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না—এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। আমি এ কথাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, দায়িত্বভার নিজের স্কন্ধে না রাখিয়া আপনি এই ভার পুলিশের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। আমার এই অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা বোধ হয় আপনি অস্বীকার করিবেন না। কি বলেন আপনি ?"

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওয়াইল্ড, তুমি আমাকে বোকা বনাইয়াছিলে—এ কথা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ; তাহা এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই!"

ওয়াইল্ড বলিল, "উহার একটিমাত্র কারণ ছিল, সেই কারণটি এই যে, আপনার মনের ভার লাঘব করিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমি জানিতাম, আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া আপনি কতকটা বিচলিত হইয়া উঠিবেন; এই জন্যই আপনার ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত আমার আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল। বিশেষতঃ, যখন ঠিক জানিতে পারিলাম, কার্ণ পলায়ন করিয়াছে—তখন আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। মিঃ ব্লেক, আপনাকে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আপনি যাহাতে সেই বদমায়েসটাকে ধরিতে পারেন—সে বিষয়ে আপনার সহযোগিতা না করিয়া নিরস্ত থাকা আমার অসাধ্য। আমার এত সতর্কতা সত্ত্বেও যে সে পলায়নে সমর্থ হইল—ইহা বড়ই লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিলাম।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ওয়াইল্ড, একটা বিষয় তুমি ভুল বুঝিয়াছিলে। কার্ণের সম্বন্ধে আমার মনে আদৌ কোন প্রকার কৌতূহলের সঞ্চার হয় নাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "ও বাজে কথা! মেটল্যাণ্ডের হত্যাপরাধ উহার ঘাড়ে চাপাইবার জন্য আপনার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। যিনি সুবিচারের প্রার্থী—এ বিষয়ে তিনি আদৌ উদাসীন থাকিতে পারেন না। না, আপনার অন্য কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। আমি ত আপনাকে বলিয়াছি—আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিব।"

ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটি বিষয় আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।—আমার মনে হয়, তুমি কার্ণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তাহার বাড়ীতে ঐ সকল কাজ করিয়াছিলে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য।"

ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে যখন আমরা কার্ণের বাড়ীতে যাই, সে সময় কার্ণ শয্যাত্যাগ করে নাই। তাহার পরিচারিকা তাহাকে কথা বলিতে উদ্যত হইলে সে তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহার লাইব্রেরীর সকল জিনিস ওলট-পালট করা হইয়াছিল, ইহা তখন পর্য্যন্ত সে জানিতে পারে নাই; তাহা হইলে হঠাৎ তাহার পলায়নের কি প্রয়োজন ছিল ?

স্মিথ বলিল, "এই ভাবে তাহার পলায়ন করিবার কারণ—আমার ইহাই মনে হইয়াছিল যে, সে ভাবিয়াছিল, হত্যাকাণ্ডের জন্য পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে; কিন্তু ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, তাহার ঐ ধারণা সত্য নহে; এ অবস্থায় কার্ণ কি কারণে চম্পট দান করিল ?"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কার্ণ নানা কারণে এতই বিচলিত হইয়াছিল যে, ধরা পড়িবার ভয়ে যে-কোন মুহূর্ত্তে সে পলায়নের জন্য প্রস্তুত ছিল। আমার মনে হয়, এখন ঘটনা-স্রোতের অনুসরণ করাই আমাদের উচিত।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহা অসম্ভব।"

ওয়াইল্ড বলিল, "অসম্ভব কেন ? আমি জীবিত আছি—এ কথা আপনারা কেনই বা এখন প্রকাশ করিবেন ? আমার ইচ্ছা, এই প্রতারণার সংবাদ গোপনেই রাখা হউক। আমার হত্যার অভিযোগে কার্ণকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। আপনি ঘটনার এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করুন মিঃ ব্লেক! ইহা কি আপনার মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করে নাই ?"

ব্লেক বলিলেন, "না, এক বিন্দুও নয়। বিশেষতঃ, সেই অপরিচিত পথিকের কথা ভাবিয়া দেখ। যদি পুলিশের সত্যই বিশ্বাস হয় যে, তুমিই সেই মৃতব্যক্তি; তাহা হইলে লোকটার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য কোন চেষ্টাই হইবে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার আত্মীয়-স্বজন উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার সন্ধান করিবে, এবং প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার প্রত্যাগমনেরই প্রতীক্ষা করিবে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি স্বীকার করি, ইহা চিন্তার বিষয় বটে! কিন্তু অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের কথা চিন্তা করিলে আমি—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "এই ভুল আমি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া দিব। সত্য ঘটনা পুলিশের গোচর করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু আমি আপনাকে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত গোপনীয়।"

ব্লেক বিরক্তিভরে বলিলেন, "বোকার মত কথা! তোমার ঐ সব ফন্দি-ফিকির আমি চাপিয়া রাখিব—এরূপ অঙ্গীকার করি নাই ওয়াইল্ড! সুতরাং সুযোগ পাইলেই আমি সত্য কথা প্রকাশ করিয়া ন্যায়ের সমর্থন করিব। যত শীঘ্র সম্ভব, এ কাজ আমাকে করিতেই হইবে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু সেরূপ-কিছু করিবার পূর্ব্বে আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে—"

ব্লেক বলিলেন, "যাহা সঙ্গত, তাহা করিতে আমার বিবেচনার অভাব হইবে না। কার্ণের বিরুদ্ধে পুলিশের প্রকৃতই কোন অভিযোগ নাই; এ অবস্থায় কার্ণকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার অনুকূলে কোন যুক্তি নাই। ঐরূপ করা অত্যন্ত অন্যায় হইবে। আমি একটি কথা প্রকাশ করিলেই সকল মিথ্যা অভিযোগ উড়িয়া যাইবে, এবং সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব হইবে। বিশেষতঃ, আরও কথা এই যে—"

ওয়াইল্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চুলোয় যাক্ অন্য কথা! সাইমন কার্ণের রক্ষা-সমিতির উদ্দেশ্যটা কি? ডার্টমুরের কারাগারে এখনও এরূপ অনেক আসামী আটক আছে—যাহাদের জুতালেহন করাও এই বদমায়েসটার পক্ষে গৌরবজনক। এ সকল কথা আপনি আমার মতই সুস্পষ্টরূপে জানেন। এ অবস্থায় কার্ণকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া আপনি কি কারণে ব্যাকুল হইতেছেন?"

ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "কারণ, আমি সর্ব্বদাই ন্যায়ের সমর্থন করি! সৌভাগ্যক্রমে আমার বিবেক তোমার বিবেকের ন্যায় কলুষিত হয় নাই। যদি কার্ণের বিরুদ্ধে সত্যই কোন অভিযোগ থাকিত, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে তাহার দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতাম; সে জন্য আমার চেষ্টা-যত্নের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য হইত না। কিন্তু তাহার যখন প্রকৃতই কোন অপরাধ নাই, তখন সত্য কথা পুলিশের গোচর করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য।"

ব্লেকের কথা শুনিয়া রোপার ওয়াইল্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার পর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনার প্রধান দোষ এই যে, আপনি ভয়ঙ্কর একরোখা, যাহা ধরেন, তাহা ছাড়িতে চাহেন না! আমি ক্রমশঃ সৎপথ অবলম্বন করিতেছি, তাহা আপনাকেও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু কোন বিষয় লইয়া তাহার শেষ পর্য্যন্ত মাতামাতি করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমাদের উভয়েরই প্রতীতি হইয়াছে যে, কার্ণই মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছে; এ বিষয়ে যখন কোন সন্দেহ নাই, তখন অন্য এক জনের হত্যাপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইলে দোষ কি? উভয়ই অপরাধ, তাহাদের পার্থক্য কি?"

ব্লেক বলিলেন, "উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান! যদি কার্ণ অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহা অন্য একটি মামলার বিষয়; কিন্তু যে ব্যক্তি মাঠের ভিতর বজ্রাঘাতে নিহত হইয়াছে—তাহার মৃত্যু সম্পূর্ণ আকস্মিক, ইহা দৈব-দুর্ঘটনা। তাহার মৃত্যুর জন্য আমরা কাহাকেও দায়ী করিয়া ফাঁসে ঝুলাইতে পারি না।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা ঠিক কথাই বলিয়াছেন ওয়াইল্ড! এ কথা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহা তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য।"

ওয়াইল্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ উড়াইবার বিষয় নহে; তবে আমি এ সম্বন্ধে আর তর্ক-বিতর্ক করিতে অনিচ্ছুক। যদি মেটল্যাণ্ডের হত্যাকাণ্ডে আমরা কার্ণের অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনি কি তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন?"

ব্লেক বলিলেন, "তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে তাহার প্রতিকূলে সাহায্য করিব; কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ—আমি কোন প্রকার চাতুরীর সমর্থন করিব না। আর—"

ওয়াইল্ড বাধা দিয়া বলিল, "সে জন্য আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই; আমি এত নির্ব্বোধ নহি যে, আপনাকে চাতুরীতে ভুলাইবার চেষ্টা করিব। আমি সার রডনে ড্রমণ্ডের সহিত কি চুক্তি করিয়াছিলাম—তাহা আপনার সুবিদিত। তাঁহার যে তিন শত্রুকে চূর্ণ করিয়া আমি প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইতাম—তাঁহার সেই তিন জন শত্রুর মধ্যে দুই জন পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে; মেটল্যাণ্ড ও রোর্কি উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়াছে, এইরূপই প্রকাশ; কিন্তু আমরা জানি, কার্ণ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। রোর্কি প্রাণভয়ে মারা গিয়াছে। এখন যদি আমরা কার্ণকে মেটল্যাণ্ডের হত্যাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য শেষ হইবে। এই জন্যই আমি কার্ণের বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে চাহি।"

স্মিথ বলিল, "সে যাহাই হউক, কার্ণ তোমার চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথাই জানিত না; তবে সে আজ সকালে হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল কেন, তাহা তুমি আমাদের নিকট প্রকাশ কর নাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "সে কথা তোমাকে বলিতেছি। গত কল্য আমি কার্ণকে টেলিফোনে জানাইয়াছিলাম, সার রডনে ড্রমণ্ড তাঁহার আরণ্য-ভবন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পরিচারকের সহিত কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।"

ব্লেক বলিলেন, "এ কথা তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে?"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম। তাহাকে আরও জানাইয়াছিলাম—সার রডনে তাহার মুঠার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিয়াছিলাম—আমি সার রডনের এজেণ্ট, এ জন্য আমি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি, এবং আমার এই চেষ্টা যে শীঘ্রই সফল হইবে, এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। বিশেষতঃ, আর এক মাসের মধ্যেই আমি তাহাকে কারাগারে পুরিতে পারিব—এ কথাও প্রসঙ্গক্রমে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছি।"

ব্লেক বলিলেন, "এ সকল কথা তুমি কেন বলিলে?"

ওয়াইল্ড বলিল, "একটু মজা করিবার জন্য। আমি নিজের ফন্দী অনুসারেই কাজ করিয়া থাকি। কার্ণকে ঐ সকল কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ও-সকল কথা শুনিয়া সে ভয়ে কাঁপিয়া মরিবে—আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবে ভাবিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, ভয়ে সে সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার পর প্রভাত হইবামাত্র বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় ডুব মারিয়াছে!"

ব্লেক বলিলেন, "পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে ভাবিয়াই সে পলায়ন করিয়াছে; কারণ, গত রাত্রে কোন কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার সন্ধান করিয়াছিল, ইহা সে জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সার রডনে যে দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন—এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে?"

"সার রডনে নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন।"

"কখন?"

ওয়াইল্ড বলিল, "যে দিন তিনি দেশত্যাগ করেন, তাহার পূর্ব্বদিন। আমি সে-দিন স্বয়ং ষ্টোক পডনিতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—বিদেশে যাইবার পরামর্শ আপনিই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। পরামর্শটি সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া আমারও মনে হইয়াছিল; কারণ, এই অবস্থায় আমি অসঙ্কোচে কাজ করিতে পারিব। আমি কার্ণের পতনের জন্য আমার সকল সময় ব্যয় করিতে পারিব। সার রডনের নিকট আমি চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাই বা না পাই—আমি আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবই।"

ব্লেক ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "সার রডনের আরণ্য-ভবন খালি পড়িয়া আছে—এ কথা কি তুমি কার্ণকে জানাইয়াছ?"

"হাঁ, জানাইয়াছি।"

ব্লেক বলিলেন, "এই সংবাদ সে কালই শুনিয়াছে?"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, আপনার কথা সত্য। আপনার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি মিঃ ব্লেক! কথাটা আমিও ভাবিয়াছিলাম।"

ব্লেক বলিলেন, "পুলিশ কার্ণের অনুসরণ করিয়াছে, এই ভয়ে সে আজ সকালে ফেরার হইয়াছে। পলায়ন করিয়া কি কৌশলে ধরা পড়িতে না হয়, কার্ণের তাহা সুবিদিত। সে ইংলণ্ডের বাহিরে পলায়ন করিবার চেষ্টাও করিতে পারে; কিন্তু সে হয় ত এখনও সেরূপ চেষ্টা করে নাই। সে জানে, পুলিশ তাহার সন্ধানে প্রত্যেক বন্দরে দৃষ্টি রাখিবে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমার অনুমান, সে কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহাই সম্ভব বটে; কিন্তু আমার সন্দেহ, সে সার রডনের আরণ্য-ভবনে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে তোমার নিকট জানিতে পারিয়াছে সেই স্থান এখন খালি পড়িয়া আছে; সুতরাং সেই স্থানে গমন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। আমার বিশ্বাস, আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে। বিশেষতঃ, সেই আরণ্য-ভবন তাহার সুপরিচিত, এবং তাহা কিরূপ দুর্গম, তাহাও তাহার অজ্ঞাত নহে। সে জানে, সেই নির্জ্জন স্থানে লুকাইলে কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না, এমন কি, ঐরূপ সন্দেহও কাহারও মনে স্থান পাইবে না।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার এই সন্দেহের কথা আমারও মনে হইয়াছে। এরূপ নিরাপদ আশ্রয় সে সত্যই আর কোথাও পাইত না। বিশেষতঃ, সে যে সেই স্থানে লুকাইতে পারে—এ সম্ভাবনা কখনই পুলিশের মনে স্থান পাইবে না। সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কার্ণের অপরাধ কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলে সে যেখানেই লুকাইয়া থাকুক, তাহাতে তাহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই! আমরা তাহাকে ধরিয়া বিচারালয়ে হাজির করিবার পূর্ব্বে তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাই।"

ওয়াইল্ড বুক ঠুকিয়া বলিল, "আমার মাথায় একটা ফন্দী আসিয়াছে।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মস্তিষ্কটি ত ফন্দীতেই পরিপূর্ণ! যাহা হউক, তোমার এই নূতন ফন্দীটি কি, তাহা আমাদের শুনাইয়া দাও। আশা করি, কোন রকম চাতুর্য্যের সহিত তোমার এই ফন্দীর কোন সংস্রব নাই, কি বল?"

ওয়াইল্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মিঃ ব্লেক, আমার এই ফন্দী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; কিন্তু ইহাতে চমৎকার কাজ হইতে পারে। যদি আমি একাকী এই ফন্দী কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার গুলী খাইবার আশঙ্কা আছে—এই জন্যই আমাদের দুই জনকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমি যখন যে কাজ করিয়াছি, একাকীই তাহা সম্পাদন করিয়াছি; কোন কার্য্যে আমি অন্য ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করি নাই। বস্তুতঃ, ইহাই আমার কার্য্যের ধারা। এ জন্য আপনাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমি অন্য কোন তস্করকে আমার সহযোগিতায় আহ্বান করিব না; ঐরূপ লোকের নিকট আমার গুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেও আমি সম্মত নহি। কিন্তু মিঃ ব্লেক, এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা লাভ করা আমি সম্মানের নিদর্শন বলিয়াই মনে করি। আশা করি, আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

ওয়াইল্ড তাহার নূতন ফন্দী সম্বন্ধে ব্লেকের সহিত আলোচনা করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাহার বক্তব্য বিষয় বলিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া ব্লেকের মুখেও আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হইল; কিন্তু তিনি তাঁহার মনোভাব গোপনের চেষ্টা করিলেন না।

কথা শেষ করিয়া ওয়াইল্ড মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মনে করেন, আমার এই ফন্দী সফল হইবে?"

স্মিথ উৎসাহভরে বলিল, "ইহাতে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা হইতেও পারে; কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে আমি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইব—এরূপ অভ্যাস আমার নাই। তবে এই কার্য্যে তোমাকে সাহায্য করিতে আমি আপত্তির কোন কারণ দেখি না, ওয়াইল্ড! হাঁ, আমি তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প।"

ওয়াইল্ড সোৎসাহে বলিল, "আপনি খুব ভাল কথা বলিলেন; আপনার কথা শুনিয়া আমি কার্য্যোদ্ধারের আশা করিতেছি।"

ব্লেক ওয়াইল্ডের করমর্দ্দন করিলেন দেখিয়া স্মিথ কৌতূহলভরে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করিল; কারণ, ব্লেক ওয়াইল্ডের ন্যায় দস্যুর সহিত এরূপ আচরণ করিবেন, ইহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ, ব্লেক ওয়াইল্ডকে শত্রু মনে করিয়া তাহার সংস্রব এড়াইবারই চেষ্টা করিতেন।

অবশেষে ব্লেক ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "কিন্তু এক সর্ত্তে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হইব, ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকেও আমি সহযোগিরূপে গ্রহণ করিতে চাই।"

ওয়াইল্ড মাথা চুলকাইয়া বলিল, "এই আবার একটা নূতন ফ্যাসাদে ফেলিলেন! কেন, আমরা কি তাঁহাকে বাদ দিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না?"

ব্লেক বলিলেন, "তাহা পারি বটে, কিন্তু এই ব্যাপারের সাক্ষী করিবার জন্য আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইতে চাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "তবে তাহাই হউক; আশা করি, আমাদের বন্ধু চীফ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সহিত একযোগে কাজ করিয়া আনন্দলাভ করিব। তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের দলে যোগদানের সময় আমার পূর্ব্ব-অপরাধের জন্য তিনি আমার বিরুদ্ধে দুই-তিনখানা গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা পকেটে করিয়া লইয়া আসিবেন না। পুলিশ কি না, ও-জাতিকে বিশ্বাস করা কঠিন, মিঃ ব্লেক!"

ব্লেক বলিলেন, "আমি তাঁহাকে এখন ধরিতে পারিলে তোমার ভয় দূর করিবার ব্যবস্থা করিব।"

ব্লেক উঠিয়া টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, চীফ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড তখনও তাঁহার আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন।

ব্লেক লেনার্ডকে টেলিফোনে আহ্বান করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রস

১০

চতুর্ব্বিংশতি প্রকার রসাশ্রয়-বিভূতির 'প্রকীর্ণ'-পরিচ্ছেদের পর 'প্রেম'-পরিচ্ছেদ। ভোজদেব প্রেমের দ্বাদশটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১) নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী—যাহা নায়ক-নায়িকার অন্তরের বিপ্রিয়-প্রদর্শনেও বিনষ্ট হয় না।

(২) নৈমিত্তিক—তপশ্চরণাদি-জনিত। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে ইহার অপরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

"ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিবাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ"।
(৫।২)

[দেবী পার্ব্বতী তপোবলম্বনে সমাধি আশ্রয়-পূর্ব্বক নিজ সৌন্দর্য্য সফল করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাদৃশ আদর্শ প্রেম ও মৃত্যুঞ্জয়-স্বরূপ অনন্যসুলভ পতি কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে?]

(৩) সামান্য—অর্থাৎ যাহার কোন বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হয় নাই।

(৪) বিশেষ—যাহার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(৫) প্রচ্ছন্ন—ইঙ্গিতাদি-দ্বারাও যাহা বুঝা যায় না।

(৬) প্রকাশ—কোন উপায়ে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে।

(৭) কৃত্রিম—যাহার কারণ আছে, অর্থাৎ যাহা কোন কারণবশে উৎপন্ন।

(৮) অকৃত্রিম—স্বাভাবিক, অহেতুক, কারণ-নিরপেক্ষ।

(৯) সহজ—জন্ম হইতে সহজাত—জন্মান্তরের সংস্কার হইতে জনিত। যথা, মহাদেবের প্রতি পার্ব্বতীর প্রেম। সতীদেহ-ত্যাগের পর পার্ব্বতী-রূপে জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাদেবের প্রতি সহজ-প্রেমযুক্তা হইয়াছিলেন।

(১০) আহার্য্য—আহরণীয়। নানাবিধ অনুকূল উপচার-প্রয়োগে যাহা উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

(১১) যৌবনজ—যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে যে প্রেম উৎপন্ন হয়।

(১২) বিস্রম্ভজ—উপচারের অপেক্ষা না রাখিয়াই যে প্রেম উৎপন্ন হয়। 'বিস্রম্ভ' শব্দের অর্থ বিশ্বাস। নায়ক-নায়িকার একের বা উভয়ের পরস্পর বিশ্বাস হইতে ইহা জন্মিয়া থাকে।

ইহার পর 'প্রেম-পুষ্ট'। প্রেম-পুষ্টির দ্বাদশটি অবস্থা-ভেদ—(১) চক্ষুঃপ্রীতি বা চোখে ভাল লাগা, (২) মনঃসঙ্গ বা মনের আসক্তি, (৩) সঙ্কল্পোৎপত্তি—অনুরাগের প্রথম ইচ্ছার অভিব্যক্তি, (৪) প্রলাপ, (৫) জাগর, (৬) কার্শ্য—প্রেমবশে শরীরের কৃশতা, (৭) অন্য বিষয়ে অরতি, (৮) লজ্জা-বিসর্জ্জন, (৯) ব্যাধি, (১০) উন্মাদ—কামোন্মাদ, (১১) মূর্চ্ছা, ও (১২) মরণ। এই দ্বাদশবিধ প্রেমপুষ্টি বিপ্রলম্ভ-জনিত হইলেও সম্ভোগাবসরেও যথাযোগ্য ভাবে প্রযুক্ত হইলে প্রেমের প্রকর্ষ জন্মাইয়া থাকে।

ইহার পর নায়ক-নায়িকাদির স্বরূপ ও গুণের পরিচয়।

নায়ক-গোষ্ঠীর চারিটি ভেদ—(১) নায়ক—যাহার চরিত্র সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, অতি মহান্ ও সমগ্র কথাব্যাপী, যথা—শ্রীরামচন্দ্র; (২) প্রতিনায়ক—নায়ক-বিরোধী অন্যায়কারী উদ্ধতচরিত্র—নায়কের দ্বারা উন্মূলনযোগ্য, যথা—রাবণ; (৩) উপনায়ক—কিয়দংশে নায়ক-সদৃশ গুণবিশিষ্ট—নায়কের মিত্র—কিন্তু নায়ক-তুল্য সুমহান্ চরিত্র নহে। নায়কের কোন কোন গুণ ইহাতে নাই অথবা ইহার আখ্যান সমগ্র কথাব্যাপী ও নহে—তথাপি পূজ্যচরিত্র, যথা—সুগ্রীব; (৪) অনুনায়ক—নায়কের অনুকূল উন্নত চরিত্র—উপনায়কের সমান অথবা তদপেক্ষা অল্প গুণবান্, যথা—হনুমান্।

ঠিক ঐরূপ নায়িকা-গোষ্ঠীরও চারিটি ভেদ—(১) নায়িকা—সর্ব্বগুণ-যুক্তা—কথাব্যাপিনী; (২) প্রতিনায়িকা—যিনি নায়িকার প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণা নায়িকার সপত্নী; (৩) উপনায়িকা—নায়িকা হইতে কোন কোন গুণে হীনা অথচ পূজ্য-চরিত্রা; (৪) অনুনায়িকা—উপনায়িকার সমগুণবতী অথবা তাঁহা হইতেও অল্পগুণযুক্তা—কনীয়সী।

এতদ্ব্যতীত আভাসের চারিটি ভেদ-(১) নায়কাভাস—যথার্থ নায়ক না হইলেও নায়ক-স্থানীয় বলিয়া কোন বস্তুকে বর্ণনা করিলে উহাকে নায়কাভাস বলা চলে; যথা, নায়ক-প্রতিকৃতি প্রভৃতি।

এইরূপ—(২) নায়িকাভাস—যথার্থ নায়িকা না হইলেও নায়িকা-রূপে বর্ণিত; যথা—

"কৃতসীতাপরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্।
বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্"।

[সীতা পরিত্যাগের পর নরপতি শ্রীরামচন্দ্র কেবল রত্নাকর-মেখলা পৃথিবীকেই ভোগ করিয়াছিলেন। এস্থলে পৃথিবী যথার্থ নায়িকা না হইলেও নায়িকা-রূপে কবি-কর্ত্তৃক বর্ণিতা বলিয়াই নায়িকাভাস]

ঐরূপ—(৩) উভয়াভাস ও (৪) তির্য্যগাভাস।

নায়কের গুণ-বশতঃ তিন প্রকার ভেদ—(১) উত্তম—সকল প্রকার গুণ-সম্পত্তি-যোগে এই উত্তমত্ব; (২) মধ্যম—কিঞ্চিন্ন্যূন গুণ-সম্পত্তিযোগ বশতঃ (ভোজমতে এক-চতুর্থাংশ হীন হইলেও মধ্যম) ও (৩) অর্দ্ধ-গুণ-সম্পত্তি-যোগে অধম বা কনিষ্ঠ নায়ক।

প্রকৃতি অনুসারেও নায়কের ত্রিধা ভেদ—(১) সাত্ত্বিক—সত্ত্বপ্রাধান্য-বশতঃ (সত্ত্ব বলিতে বুঝায় চিত্তের নিশ্চলতা); রাজস—রজোগুণপ্রধান (রজঃ—ক্রিয়াশক্তি-প্রবৃত্তি, ইত্যাদি); (৩) তামস—তমঃ-প্রধান (তমঃ—আলস্য, জড়তা, অজ্ঞান)।

বিবাহাদি-দ্বারা স্ত্রী-পরিগ্রহ অনুসারে নায়কের দ্বিধা ভেদ—(১) সাধারণ—অনেক জায়ার পতি—বহু নায়িকার বল্লভ। যথা—

স্নাতা তিষ্ঠতি কুন্তলেশ্বরসুতা বারোঽঙ্গরাজস্বসু-
র্দ্যূতে রাত্রিরিয়ং জিতা কমলয়া দেবীং প্রসাদ্যাদ্য চ।

ইত্যন্তঃপুরসুন্দরীঃ প্রতি ময়া বিজ্ঞায় বিজ্ঞাপিতে
দেবেনাপ্রতিপত্তিমূঢ়মনসা দ্বিত্রাঃ স্থিতং নাড়িকাঃ ।

[কোন এক বহুবল্লভ নৃপতির সম্বন্ধে এই উক্তি করা হইয়াছে—'কুন্তলেশ্বর-সুতা (রাজার এক পত্নী) আজ স্নান করিয়াছেন। অঙ্গরাজ-ভগিনীর (রাজার অপরা পত্নীর) আজ পালা। দেবীকে (প্রধানা মহিষীকে) প্রসন্ন করিয়া কমলা (রাজার আর এক পত্নী) 'দ্যূতের পণ-রূপে আজিকার এই রাত্রিটি জয় করিয়া লইয়াছেন' ।—অন্তঃপুর-সুন্দরীগণের পক্ষ হইতে রাজা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে পর তিনি কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া দুই তিন দণ্ড কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় চিত্তে অবস্থান করিয়াছিলেন।]

(২) অসাধারণ—একমাত্র পত্নী যিনি পরিগ্রহ করিয়াছেন—দ্বিতীয়া নায়িকা যাঁহার কদাপি নাই। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র।

"আ বিবাহসময়াদ্ গৃহে বনে শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাসিতোঽন্যয়া রামবাহুরুপধানমেষ তে" ।

(উত্তররামচরিত ১।৩৭)

[শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'বিবাহ-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া—কি গৃহে, কি বনবাসে—কি শিশুকালে, কি যৌবনে—অন্য নারীর দ্বারা অনুপভুক্ত আমার এই বাহু তোমার নিদ্রা-বিধায়ক উপাধানের কার্য্য করুক'।]

নায়কের চিত্তগত ধৈর্য্যের নানারূপ বৃত্তিভেদে চতুর্দ্ধা বিভেদ—(১) ধীরোদ্ধত—অহঙ্কার-প্রধান, যথা—অশ্বত্থামা ; (২) ধীর-ললিত—রত্যুপচার-প্রধান, যথা—উদয়ন ; (৩) ধীরপ্রশান্ত, যথা—যুধিষ্ঠির ; (৪) ধীরোদাত্ত—নিজ পত্নীর প্রতি যিনি বিস্রব্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা—শ্রীরামচন্দ্র।

প্রবৃত্তি অনুসারে নায়কের পুনরায় চারি ভেদ—(১) শঠ—ছলনা-প্রধান,

যথা—"দৃষ্ট্বৈকাসনসঙ্গতে প্রিয়তমে পশ্চাদুপেত্যাদরা-
দেকস্যা নয়নে নিমীল্য বিহিতক্রীড়ানুবন্ধচ্ছলঃ।
ঈষদ্বক্রিতকন্ধরঃ সপুলকঃ প্রেমোল্লসন্মানসা-
মন্তর্হাসলসৎকপোলফলকাং ধূর্ত্তোঽপরাং চুম্বতি" ।

[নায়িকা ও তাহার এক সখী একাসনে উপবিষ্টা। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে ধূর্ত্ত নায়ক আসিয়া আদর করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে নায়িকার নয়নদ্বয় চাপিয়া ধরিল। পরে গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া রোমাঞ্চিত-দেহে প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে অপরা সখীকে চুম্বন করিল। ধূর্ত্তের শঠতা-দর্শনে সখীর অন্তরে হাস্যোদ্রেক হওয়ায় তাহার কপোল-দেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।]

(২) ধৃষ্ট—অপরাধ করা সত্ত্বেও যাহার লজ্জা নাই।

(৩) অনুকূল—নায়িকার প্রতি যাহার অনুরাগ হৃদ্গত থাকে—বহিঃ প্রকাশিত হয় না।

(৪) দক্ষিণ—যে নায়কের নায়িকার প্রতি অনুরাগ অনুনয়াদি ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া থাকে (১)।

গুণাদি-বশতঃ নায়িকার ত্রিবিধ ভেদ—(১) উত্তমা—সর্ব্বগুণ-সম্পত্তি-শালিনী, (২) মধ্যমা—পূর্ণ গুণ-সম্পৎ না থাকিলেও অন্ততঃ ত্রি-চতুর্থাংশ (¾—বারো আনা) গুণাবলী যাহার বিদ্যমান ; (৩) অধমা—অর্দ্ধগুণ-সম্পত্তি-যুক্তা।

বয়স্ ও কলা-নিপুণতার তারতম্যানুসারে ত্রিধা ভেদ—(১) মুগ্ধা—এক দিকে অপ্রাপ্তবয়স্কা ও অন্য দিকে কৌশলে অসম্পূর্ণা বা অনভিজ্ঞা ; (২) মধ্যমা—প্রাপ্তবয়স্কা, অথচ কৌশলে অনভিজ্ঞা ; প্রগল্‌ভা—পূর্ণবয়স্কা ও নিপুণা—বয়স্ ও কৌশল উভয়তঃ পরিপূর্ণা।

ধৈর্য্যানুসারে নায়িকার দ্বিধা ভেদ—(১) ধীরা—নায়ক পলায়ন করিলে (অর্থাৎ অবিশ্বাসী হইলে) যাঁহার মানহানি হয়, অন্যথা হয় না। (২) অধীরা—নায়ক পলায়ন না করিলেও (অর্থাৎ—নায়ক অবিশ্বাসী না হইলেও) অতি অল্প কারণেই যে নায়িকার অপমান বোধ হয় (২)।

পরিগ্রহের দৃষ্টিতে নায়িকার দ্বিধা ভেদ—(১) স্বা বা স্বীয়া—আত্মীয়া নিজ-পরিগৃহীতা ; (২) অন্যদীয়া বা অন্যা—পরকীয়া—পর-পরিগৃহীতা।

বিবাহের দৃষ্টিতে আবার দ্বিধা বিভাগ—(১) ঊঢ়া—যাহার পাণি-গ্রহণ-ক্রিয়া (অর্থাৎ—বিবাহ) সুসম্পন্ন হইয়াছে ; (২) অনূঢ়া—যাহার বিবাহ হয় নাই—কুমারী।

বিবাহের ক্রমানুসারে পুনরায় দ্বিবিধ ভেদ—(১) জ্যেষ্ঠা—প্রথমে যে নায়িকার সহিত বিবাহ হইয়াছে ; (২) কনীয়সী—পশ্চাৎ যাহার সহিত উদ্বাহ হইয়াছে।

মানের তারতম্যানুসারে নায়িকার চারিটি বিভাগ—(১) উদ্ধতা—অহঙ্কারযুক্তা—যাহার অহঙ্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে ; (২) উদাত্তা—যাহার মান বা অহঙ্কার অন্তর্গূঢ় ; (৩) শান্তা—যাহার মান নির্ব্বেদ (অর্থাৎ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে) (৪) ললিতা—শ্লাঘনীয়মানা (অর্থাৎ-যাহার পক্ষে মান করা শোভা পায়)।

নিজ বৃত্তি অনুসারে নায়িকার ত্রিধা ভেদ—(১) সামান্যা—যে নায়িকা অনিয়ত ভাবে অনেকের উপভোগ-যোগ্যা ; (২) পুনর্ভূ—পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর-গ্রাহিণী ; (৩) স্বৈরিণী—স্বাভিপ্রায়ানু-সারে বিচরণকারিণী (আত্মচ্ছন্দা)।

জীবিকা (আজীব) উপার্জ্জনের উপায়ের ভেদ অনুসারে পুনশ্চ ত্রিবিধ বিভাগ—(১) গণিকা—চতুঃষষ্টি-ললিত-কলাভিজ্ঞা ; (২) রূপাজীবা—রূপই যাহার আজীব অর্থাৎ জীবিকা—রূপ-যৌবন-মাত্রোপ-জীবিনী ; (৩) বিলাসিনী—কুট্টমিত প্রভৃতি নানাপ্রকার আন্তর ভাব (ভাও) প্রদর্শনে অভিজ্ঞা।

আবার অবস্থাভেদে নায়িকার অষ্টবিধ প্রসিদ্ধ বিভাগ—

(১) খণ্ডিতা—যে নায়িকার কান্ত নায়ক প্রভাতে অজ্ঞাত কোন স্থান হইতে সদ্যোনিদ্রাভঙ্গ-জনিত তাম্রারুণ-লোচন ও নারী-নখাঙ্কিত দেহ হইয়া আগমন করেন, তিনিই খণ্ডিতা।

(২) কলহান্তরিতা—প্রাণনাথ চাটুবাক্য বলিলেও যে নায়িকা কোপভরে প্রথমে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া পশ্চাত্তাপ ভোগ করেন, তাঁহার নাম কলহান্তরিতা।

(৩) বিপ্রলব্ধা—দিনের পর দিন দূতী-সম্প্রেরণ করায় কোন স্থানে

(১) "হৃদয়ঙ্গমপ্রবৃত্তিরনুকূলঃ···উপরোধিকপ্রবৃত্তির্দক্ষিণঃ"।
—সঃ কঃ (৫)।

(২) "পলায়নেঽপমানা ধীরা···অপলায়নেঽপমানা অধীরা"।
—সঃ কঃ (৫)।

মিলনের সঙ্কেত করিয়াও যাঁহার কান্ত আসিয়া উপস্থিত হন না, তাঁহার নাম বিপ্রলব্ধা।

(৪) বাসকসজ্জা—নিজ বাসগৃহ সজ্জিত করিয়া পর্য্যঙ্কে শয্যা পাতিয়া ও স্বয়ং নানা ভূষণে ভূষিতা হইয়া যে নায়িকা নায়কের প্রতীক্ষা করেন, তিনি বাসকসজ্জা।

(৫) স্বাধীনপতিকা—বিচিত্র সুখাস্বাদন-লোলুপ নায়ক যে নায়িকার পার্শ্ব মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই স্বাধীনপতিকা [স্বাধীন (নিজাধীন) পতি যাঁহার—তিনিই স্বাধীন-পতিকা।]

(৬) অভিসারিকা—কামবাণ-প্রপীড়িতা হইয়া যিনি কান্ত-সমীপে গমন করেন, সেই নায়িকার নাম অভিসারিকা।

(৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা—যাঁহার প্রিয় দেশান্তর-গত, সেই নায়িকার নাম প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।

(৮) বিরহোৎকণ্ঠিতা—প্রবাস হইতে ফিরিবার দিন উপস্থিত হইলেও যাঁহার বল্লভ ফিরিয়া আসে না, সেই নায়িকার নাম বিরহোৎকণ্ঠিতা।

এইরূপে ভোজদেব নায়িকার বত্রিশ প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

নায়ক-নায়িকা ব্যতীত হীন পাত্রগণের মধ্যে ভোজদেব শকার, ললক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন।

শকার—নৃপতি-কর্ত্তৃক অনূঢ়ার ভ্রাতা—সাধারণতঃ অতিশয় উদ্ধত, দুশ্চরিত্র। নগরের শাসন-কর্ত্তৃত্ব ইঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। মৃচ্ছকটিকের শকার, শাকুন্তলের নগরপাল প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ-চরিত্র।

ললকের কোনরূপ পরিচয় ভোজদেব দেন নাই।

পীঠমর্দ্দ—অমাত্য প্রভৃতি; অথবা আসনদানে পূজার যোগ্য পাত্রাদি।

বিদূষক—রাজার নর্ম্মসচিব। হাস্যজনক, নৃপতির ক্রীড়নক-স্থানীয়, অথচ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

বিট—যিনি নিজের বিভব নিঃশেষে ভোগ করিয়াছেন (অর্থাৎ স্বসম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছেন); যাঁহার কলত্রাদি বর্ত্তমান, অথচ যিনি গুণবান্ ও শৃঙ্গার-সহায়, তিনিই বিট।

চেট—দাস, ধাত্রীপুত্র প্রভৃতি।

পতাকা—স্বাত্মোপযোগী—প্রাসঙ্গিক চরিত্র—নায়কের অনুকূল, যথা—হনূমান্।

আপতাকা—নায়ক-ব্যতিরিক্ত অন্যের উপযোগী প্রাসঙ্গিক চরিত্র, যথা—মারীচ।

প্রকরী—নায়কের অনুপযোগী চরিত্র, যথা—জটায়ুঃ।

নায়িকার সখীর ভেদ ত্রিবিধ—(১) সহজা, (২) পূর্ব্বজা, (৩) আগন্তু। বাল্যাবধি সখী সহজা—সমবয়স্কা। মাতা পিতা প্রভৃতির সহিত বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ-বশতঃ জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যাহার সহিত সখী-সম্বন্ধ; অথবা যে সখী বয়সে অনেক বড়, তিনিই পূর্ব্বজা। আর যাহার সহিত সখীত্ব সহসা সঞ্জাত, তিনি আগন্তু সখী; যথা—সীতার সহিত ত্রিজটার সখীত্ব।

নায়িকার অনুরাগ-লাভের যোগ্য হইতে হইলে নায়ককে দ্বাদশটি গুণবিশিষ্ট হইতে হইবে। সে দ্বাদশটি গুণ—(১) মহাকুলীনতা—উচ্চকুলে জন্মের সৌভাগ্য, (২) ঔদার্য্য, (৩) মহাভাগ্য, (৪) কৃতজ্ঞতা, (৫) রূপ-সম্পদ্, (৬) যৌবন-সম্পদ্, (৭) বৈদগ্ধ্য-সম্পদ্, (৮) শীল-সম্পদ্, (৯) সৌভাগ্য-সম্পদ্, (১০) মানিতা, (১১) উদারভাবিত্ব ও (১২) স্থিরানুরাগিত্ব।

আবার নায়কের যোগ্যা হইতে হইলে নায়িকারও এই দ্বাদশ গুণ প্রয়োজন।

নায়ক-নায়িকার প্রকার-ভেদ ও তাঁহাদিগের গুণ-পরিচয় এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর 'প্রেম-ভক্তি' পরিচ্ছেদ। প্রেম-ভক্তি চতুর্ব্বিধ—(১) পাক-ভক্তি, (২) রাগ-ভক্তি, (৩) ব্যাজ-ভক্তি ও (৪) প্রেমসম্পর্ক-ভক্তি। 'ভক্তি' অর্থে 'বিভাগ'।

পাক ত্রিবিধ—(১) মৃদ্বীকা-পাক—আদিতে অস্বাদু, অন্তে স্বাদু। 'মৃদ্বীকা'—শব্দের অর্থ দ্রাক্ষা (আঙ্গুর)। মৃদ্বীকা যেমন অপক্কাবস্থায় অত্যন্ত অম্লরস-যুক্ত থাকে, কিন্তু পক্ব হইলে অত্যন্ত মধুরস্বাদ হয়, সেইরূপ যে প্রেম প্রথমে অস্বাদু ও পরিণামে স্বাদু হয়, তাহাকে মৃদ্বীকা-পাক-যুক্ত প্রেম বলা চলে। (২) নারিকেলী-পাক—ইহা আদি ও অন্তে সমান স্বাদু। (৩) আম্রপাক—ইহা আদিতে স্বাদু, মধ্যে স্বাদুতর ও অন্তে স্বাদুতম।

রাগ ত্রিবিধ—(১) নীলীরাগ—যাহা কদাচ অপগত হয় না, অথচ বাহিরে অতিশয় শোভাও পায় না, যথা—রাম ও সীতার পরস্পরানুরাগ। (২) কুসুম্ভরাগ—যাহা সহজেই অপগত হয়, আবার বহির্দৃষ্টিতে শোভাও পাইয়া থাকে। (৩) মঞ্জিষ্ঠারাগ—যাহা কদাচ অপগত হয় না, আবার বাহিরে খুব শোভাও পাইয়া থাকে।

'ব্যাজ'-শব্দের অর্থ—ছল, কপটতা প্রভৃতি। ব্যাজ ত্রিবিধ—(১) অন্তর্ব্ব্যাজ—গূঢ়-ব্যলীক। 'ব্যলীক'-শব্দের অর্থ দোষ, অপরাধ, ছলনা, প্রতারণা প্রভৃতি। যে প্রেমে প্রতারণা, ছলনা প্রভৃতি অপরাধ অন্তর্গূঢ়, তাহাই গূঢ়ব্যলীক অন্তর্ব্ব্যাজ। (২) বহির্ব্ব্যাজ—অগূঢ়-ব্যলীক—যাহাতে এই ছল গোপন করা হয় না—বাহিরেই প্রকাশ পায়। (৩) নির্ব্ব্যাজ—অব্যলীক—যাহাতে ছদ্ম নাই।

প্রেম-সম্পর্ক ত্রিবিধ—(১) ধর্ম্মোদর্ক, (২) অর্থোদর্ক ও (৩) কামোদর্ক।

(১) ধর্ম্মোদর্ক—'উদর্ক'-শব্দের অর্থ উত্তর-কাল বা ভবিষ্যৎ। যে প্রেমের পরিণাম ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই ধর্ম্মোদর্ক প্রেম-সম্পর্ক; যথা—

"অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে
নৃপতিককুদং দত্ত্বা যূনে সিতাতপবারণম্।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে
গলিতবয়সামিক্ষ্বাকূণামিদং হি কুলব্রতম্॥" (রঘুবংশ ৩।৭০)

[ইহার সারার্থ এই যে—দিলীপ বিষয়ভোগেচ্ছা ত্যাগপূর্ব্বক যথা-বিধি নিজ পুত্র রঘুকে রাজচিহ্ন শ্বেতাতপত্র প্রদান করিয়া দেবী সুদক্ষিণার সহিত তপোবনের তরুচ্ছায়া আশ্রয় করিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতিদিগের বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনই কুলব্রত। এ ক্ষেত্রে দিলীপ ও সুদক্ষিণার প্রেম বানপ্রস্থাবলম্বনে ধর্ম্মোদর্ক হইয়াছে।]

(২) অর্থোদর্ক - যে প্রেমের পরিণাম অর্থভোগে পর্য্যবসিত; যথা—

"ভূত্বা চিরায় সদিগন্তমহীসপত্নী দৌষ্মন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং প্রসূয়।
তৎসন্নিবেশিতভরেণ সহৈব ভর্ত্রা শান্তে করিষ্যসি পদং
পুনরাশ্রমেঽস্মিন্"। (শাকু ৪)

[সারার্থ—মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বলিতেছেন—'সমগ্র পৃথিবীর সপত্নীরূপে দীর্ঘকাল দুষ্মন্তের মহিষীরূপে থাকিয়া ও পরে অপ্রতিরথ তনয় প্রসব-পূর্ব্বক তাহার করে রাজ্যভার প্রদানান্তে পতিসহ পুনরায় এই শান্ত আশ্রমে আসিয়া বাস করিবে'। এ স্থলে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে অর্থোদর্ক প্রেমসম্পর্ক বিবৃত হইয়াছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম দিগন্তব্যাপী সমগ্র পৃথিবীরাজ্যভোগে ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুত্রপ্রজননে পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া কণ্ব আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্দ্ধ অবশ্য ধর্ম্মোদর্ক - যেহেতু, উহার চরম পরিণাম বানপ্রস্থ অবলম্বন।]

(৩) কামোদর্ক—যাহার পরিণাম প্রেমের উপভোগেই পর্য্যবসিত। এস্থলে কাম বলিতে রতিভাবকেই বুঝাইতেছে ; দৃষ্টান্ত—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি যৎ প্রার্থ্যতে"। (৩)
(উত্তরচরিত ১)

[শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—যাহা সুখে দুঃখে একরূপ, সকল অবস্থায় অনুকূল, যাহাতে হৃদয় শান্তিলাভ করে—জরা যাহার আনন্দ অপহরণ করিতে পারে না—কালবশে লজ্জা-ভয়াদি আবরণের অপগমে যাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া স্নেহসারে পরিণত হয় (যাহাকে বলে—'দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হয়'), সজ্জনের সেই কল্যাণকর অদ্বিতীয় প্রেম অতি দুর্লভ। এস্থলে 'স্নেহসারে স্থিতং'—এই বাক্যাংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রেমের পরিণামও প্রেম-ঘন অবস্থা। তাই এরূপ প্রেম কামোদর্ক।]

এইরূপে রসাশ্রয় বিভূতির প্রায় সকল প্রকার ভেদই উক্ত হইল। অবশিষ্ট আছে কেবল—"নানালঙ্কারসংসৃষ্টেঃ প্রকারাশ্চ রসোক্তয়ঃ"। এস্থলে ভোজদেব বলিয়াছেন যে, নানা অলঙ্কার বলিতে কেবল বিবিধ শব্দার্থালঙ্কার বুঝায় না—অধিকন্তু গুণ ও রসসমূহেরও সংগ্রহ কর্ত্তব্য। কারণ, দণ্ডী বলিয়া গিয়াছেন যে, কাব্য-শোভাকর ধর্ম্মই অলঙ্কার (৪)। গুণ রস প্রভৃতিও কাব্য-শোভাকর। অতএব, দণ্ডী, ভোজ প্রভৃতির মতে সেগুলিও অলঙ্কার-মধ্যে গণ্য। বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির (বা মার্গের) পরস্পর ভেদ দেখাইবার জন্য দণ্ডী যে দশটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলিকেও তিনি 'অলঙ্কার' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫)। ভোজদেবও এ বিষয়ে দণ্ডীর অনুবর্ত্তী। এই দশটি গুণের নাম—১ শ্লেষ, ২ প্রসাদ, ৩ সমতা, ৪ মাধুর্য্য, ৫ সুকুমারতা, ৬ অর্থব্যক্তি, ৭ উদারত্ব, ৮ ওজঃ, ৯ কান্তি ও ১০ সমাধি। এই দশটি গুণ বৈদর্ভ-মার্গের প্রাণস্বরূপ। গৌড়মার্গে প্রায় ইহাদের বিপর্য্যয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে (৬)।

গুণ-রস-অলঙ্কার এ সকলই কাব্য-শোভাকর বলিয়া সাধারণতঃ অলঙ্কার নামে পরিগণিত হইতে পারে। অতএব, ইহাদিগের সাঙ্কর্য্য (৭) ছয় প্রকারে সম্ভব—(১) গুণ-সঙ্কর, (২) অলঙ্কার-সঙ্কর, (৩) গুণালঙ্কার-সঙ্কর, (৪) রস-সঙ্কর, (৫) রসগুণ-সঙ্কর ও (৬) রসালঙ্কার-সঙ্কর।

গুণ তিন প্রকার—(১) শব্দ-গুণ, (২) অর্থগুণ ও (৩) দোষ-গুণ। ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বিবিধ—(১) সোল্লেখ ও (২) নিরুল্লেখ। শব্দগুণের মধ্যে—মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সোল্লেখ; শ্লেষ-প্রসাদ-সুকুমারতা প্রভৃতি নিরুল্লেখ। অর্থগুণের মধ্যে—প্রসাদ-কান্তি প্রভৃতি সোল্লেখ; অর্থব্যক্তি-সৌখ্য প্রভৃতি নিরুল্লেখ। দোষগুণের মধ্যে—গ্রাম্য-পুনরুক্ত-অপার্থ প্রভৃতি সোল্লেখ; শব্দহীন-অপক্রম-বিসন্ধি প্রভৃতি নিরুল্লেখ। সজাতীয় গুণসমূহের মধ্যে—(অর্থাৎ কেবল শব্দগুণ বা কেবল অর্থগুণ বা কেবল দোষগুণের মধ্যে) কেবল সোল্লেখ বা কেবল নিরুল্লেখ গুণগুলির পরস্পর সাঙ্কর্য্য সম্ভব। আবার পরস্পর বিজাতীয় গুণগুলিরও (যথা—শব্দগুণের সহিত অর্থগুণের, ইত্যাদি) সঙ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। ভোজদেব এ সকলের বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

অলঙ্কার-সঙ্কর ছয় প্রকার—(১) শব্দালঙ্কার-সঙ্কর, (২) অর্থালঙ্কার-সঙ্কর, (৩) উভয়ালঙ্কার-সঙ্কর, (৪) শব্দার্থালঙ্কার-সঙ্কর, (৫) শব্দোভয়ালঙ্কার-সঙ্কর ও (৬) অর্থোভয়ালঙ্কার-সঙ্কর।

গুণালঙ্কার-সঙ্করে কখনও গুণের প্রাধান্য, কখনও অলঙ্কারের। উহা ছয় প্রকার (১) শব্দগুণ-প্রধান, (২) অর্থগুণ-প্রধান, (৩) দোষগুণ-প্রধান, (৪) শব্দালঙ্কার-প্রধান, (৫) অর্থালঙ্কার-প্রধান, (৬) উভয়ালঙ্কার-প্রধান।

---

(৩) প্রচলিত পাঠ—ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে"।

(৪) "কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মানলঙ্কারান্"—(কাব্যাদর্শ ১)।

(৫) "কাশ্চিন্মার্গবিভাগার্থমুক্তাঃ প্রাগপ্যলঙ্ক্রিয়াঃ"—(কাব্যাদর্শ ১)।

(৬) এই গুণগুলির লক্ষণ ও উদাহরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলে বিবৃত হইল না।

(৭) মূলে আছে—"অলঙ্কারসংসৃষ্টেঃ প্রকারাঃ"। 'সংসৃষ্টি' বলিতে বুঝায় মিলন। সাঙ্কর্য্য ও সংসৃষ্টি—এই উভয়বিধ মিলনের ভেদ নব্যমতে দেখান হইয়াছে—পরস্পর অনপেক্ষ-ভাবে (একটি আর একটির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত না হইয়া) অবস্থিতির নাম সংসৃষ্টি; আর পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাবে—একাশ্রয়ত্বে অথবা সন্দেহে সাঙ্কর্য্য। "মিথোঽনপেক্ষয়ৈতেষাং স্থিতিঃ সংসৃষ্টিরুচ্যতে। অঙ্গাঙ্গিত্বেঽলঙ্কৃতীনাং তদ্বদেকাশ্রয়স্থিতৌ। সন্দিগ্ধত্বে চ ভবতি সঙ্করস্ত্রিবিধঃ পুনঃ" —, সাঃ দঃ ১০ম পরিঃ) নব্যমতে সংক্ষেপে ভেদ দেখান হয়—তিল-তণ্ডুলবৎ মিশ্রণে সংসৃষ্টি, নীর-ক্ষীরবৎ মিশ্রণে সঙ্কর। দণ্ডীর অনুবর্ত্তী হইয়া ভোজ বলিয়াছেন, সংসৃষ্টি ও সঙ্কর একই। তবে মোটামুটি উহার দ্বিধা ভেদ—(১) পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান ও (২) সকলগুলির সমকক্ষভাবে স্থিতি। "অঙ্গাঙ্গিভাবাবস্থানং সর্ব্বেষাং সমকক্ষতা। ইত্যলঙ্কারসংসৃষ্টের্লক্ষণীয়া দ্বয়ী গতিঃ"। (কাব্যাদর্শ, সঃ কঃ উদ্ধৃত)। ভোজ আবার সাঙ্কর্য্যের ছয় প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন—(১) তিল-তণ্ডুল-প্রকার, (২) ক্ষীর-নীর-প্রকার, (৩) ছায়াদর্শ-প্রকার, (৪) নরসিংহ-প্রকার, (৫) পাংশূদক-প্রকার ও (৬) চিত্রবর্ণ-প্রকার।

রস-সঙ্কর সহজেই বুঝা যায়। রসসঙ্করের ন্যায় ভাব-সঙ্কর, রসাভাস-সঙ্কর, রস প্রশম-সঙ্কর, ভাবাভাস-সঙ্কর, ভাব-প্রশম-সঙ্করও সম্ভব। ভোজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

অতঃপর রসগুণ-সঙ্কর। কোন কাব্যে রস যদি গুণের আরম্ভক বা জনক হয়, অথবা যদি গুণ রসের আরম্ভক হয়, তাহা হইলে তাহাকে রস ও গুণের সাঙ্কর্য্য বলা চলে না। তবে যে সকল ক্ষেত্রে পৃথক্ প্রযত্ন-দ্বারা বিভিন্ন বাক্যে (তিল তণ্ডুল-বৎ, ক্ষীর-নীর-বৎ বা ছায়াদর্শ-বৎ) সমকক্ষ-রূপে গুণ ও রসের পৃথক্ সন্নিবেশ করা হয়, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই গুণ ও রসের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে। রস-গুণ-সঙ্কর ছয় প্রকার—(১) গুণ-প্রধান, (২) রস-প্রধান, (৩) উভয়-প্রধান, (৪) উভয়াপ্রধান, (৫) গুণাধিক ও (৬) রসাধিক।

এইবার রসালঙ্কার-সঙ্কর। ইহাও দ্বিবিধ—(১) রস-প্রধান ও (২) অলঙ্কার-প্রধান। ভোজ বিবিধ অলঙ্কারের সহিত ভাব ও রস-সমূহের সাঙ্কর্য্যের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখের পর অলঙ্কারের সহিত রসাভাস, ভাবাভাস, রসপ্রশম প্রভৃতির সাঙ্কর্য্যের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন যে—অলঙ্কারের সহিত রস-সাঙ্কর্য্যের মধ্য দিয়া রসের সহিত রসাভাসেরও কখন কখন সাঙ্কর্য্য ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক—

"রামমন্মথশরেণ তাড়িতা দুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী।
গন্ধবদ্রুধিরচন্দনোক্ষিতা জীবিতেশবসতিং জগাম সা"।

[তাড়কা রাক্ষসী রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইবার পর কবি বর্ণনা করিতেছেন—তাড়কার স্বামী বহু পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করায় তাড়কা তাহার বিরহে ব্যাকুলা ছিল। এক্ষণে রাম-রূপ মন্মথের দুঃসহ শরে হৃদয়ে তাড়িতা হওয়ায় গন্ধময় রক্ত-রূপ চন্দনে অনুলিপ্তা হইয়া যেন তাহার প্রাণনাথের ভবনে (অর্থাৎ—মৃত-পতি-সকাশে—অথবা প্রাণাধিপতি যমরাজের ভবনে—পরলোকে) প্রস্থান করিল। এস্থলে বর্ণনীয় রস হইতেছে বীভৎস। কিন্তু শ্লেষ-রূপকাদি অলঙ্কারের সহিত সাঙ্কর্য্যবশতঃ মনে হইতেছে যেন শৃঙ্গার-রসের সহিত বীভৎস-রসের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে। অথচ বস্তুতঃ শৃঙ্গার-রস এ স্থলে নাই—রাম-রূপ মন্মথের শরে বিদ্ধা রাক্ষসী রক্তরূপ-চন্দনে লিপ্তা হইয়া প্রাণনাথ-ভবনে গমন করিল—ইহাতে শৃঙ্গার-রসের শ্রুতি মাত্র আছে। অর্থাৎ—শব্দগুলি মাত্র শৃঙ্গার-রস-ব্যঞ্জক ; কিন্তু অর্থে শৃঙ্গাররসের প্রতীতি হয় না। এ কারণে ইহা শৃঙ্গারাভাস মাত্র। আর দুর্গন্ধ-রক্তাপ্লুত দেহে রাক্ষসী প্রাণত্যাগ করিল—ইহাতে বীভৎস-রসের প্রতীতি। শ্লেষ-রূপকাদি অলঙ্কার-সামর্থ্যে বীভৎস রসের সহিত শৃঙ্গারাভাসের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে।]

এইরূপে নানারূপ রস-গুণ-অলঙ্কার প্রভৃতির পরস্পর সাঙ্কর্য্য বা সংসৃষ্টি কাব্যে রস-সৃষ্টি ও রস-পুষ্টি করিয়া থাকে ; ইহা ভোজদেব বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা সবিস্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সরস কাব্য রচনা করিতে হইলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—তাহাও ভোজদেব এই প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন। তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর হইলেও প্রকরণের উপসংহারার্থ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

ভারতী, কৈশিকী, সাত্ত্বতী ও আরভটী—এই চারিটি বৃত্তি (৮) কি দৃশ্য কি শ্রব্য কাব্যের মাতৃকা-স্বরূপ। যথাস্থানে যথাযথ ভাবে ইহাদিগের সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। ভারতীর চারিটি অঙ্গ—(১) প্ররোচনা—বক্তব্যার্থের প্রশংসা, (২) প্রস্তাবনা—প্রকৃত-বস্তু-সূচনা, (৩) বীথী—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত—এই পঞ্চরূপ (৯), (৪) প্রহসন—স্বধর্ম্মচ্যুত ভণ্ডতাপসাদির উপহাসকর বাক্য। আরভটীর চারিটি অঙ্গ—(১) সংক্ষিপ্তিকা, (২) অবপাত, (৩) বস্তুত্থাপন ও (৪) সম্ফেট—শৃঙ্গার-প্রকরণে এগুলি অপ্রাসঙ্গিক। কৈশিকীর চারিটি অঙ্গ—(১) নর্ম্ম—সশৃঙ্গার ও সপরিহাস বাক্য ও চেষ্টা, (২) নর্ম্মস্ফিঞ্জ—প্রথম সম্ভোগের অনুকূল নব শৃঙ্গারাশ্রয় বাক্য-ক্রিয়া প্রভৃতি, (৩) নর্ম্মস্ফোট—অভিলাষ জন্মিবার পর অকালে সম্ভোগ-বাধা, (৪) নর্ম্মগর্ভ—স্বকার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে নিজ যথার্থ স্বরূপ-জ্ঞান প্রভৃতির প্রচ্ছাদন। সাত্ত্বতীরও চারিটি অঙ্গ—(১) উত্থাপক, (২) পরিবর্ত্তক (৩) সংলাপক ও (৪) সঙ্ঘাত্যক। বর্ত্তমান শৃঙ্গার-প্রকরণে ইহারাও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক (১০)।

প্রবন্ধের নায়ক হইবেন চতুর অথচ উদাত্ত (অর্থাৎ ধীরোদাত্ত)। ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ কাব্যের ফল। এ হিসাবে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি আর্ষ-মহাকাব্যই যথার্থ আদর্শ কাব্য-পদ-বাচ্য। অতএব, প্রকৃষ্ট কাব্য রামায়ণ-মহাভারত-মূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের (শ্রব্যকাব্য বা দৃশ্যকাব্যের) সাধারণতঃ পঞ্চ-সন্ধি (বা গ্রন্থি)—(১) মুখ, (২) প্রতিমুখ, (৩) গর্ভ, (৪) অবমর্শ (বা বিমর্শ) ও (৫) নির্বহণ (বা উপসংহার) (১১)। প্রবন্ধটি নাতিবিস্তৃত নাতিসংক্ষিপ্ত, সুন্দর, শ্রুতিসুখকর, ছন্দোবদ্ধ, সুসংশ্লিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শ্রব্যকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে—প্রতি সর্গ যে ছন্দে লিখিত হইবে, তাহার অন্তস্থিত এক বা একাধিক শ্লোক অন্য ছন্দে রচিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ কাব্য লোকের প্রশংসা লাভ করিতে পারে।

নানাবিধ নগরী, উপবন, রাষ্ট্র, সমুদ্র, আশ্রম প্রভৃতির বর্ণনা ও দেশের সমৃদ্ধির বিবরণে রসের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। বিবিধ ঋতু, রাত্রি,

---

(৮) এ সম্বন্ধে মদীয় 'নাট্যমাতৃকা' প্রবন্ধ (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৪ দ্রষ্টব্য।) তাহাতে বৃত্তিচতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভারতী সর্ব্বরসে ব্যবহার্য্য, বাক্প্রধান, পুরুষাশ্রিত, সংস্কৃত-বহুল। কৈশিকী প্রধানতঃ নারীপ্রযোজ্য, শৃঙ্গাররস-প্রধান, বেশাদির বৈচিত্র্যযুক্ত, নৃত্য-গীতাদি-বহুল। সাত্ত্বতী বীররস-প্রধান, সত্ত্ব-শৌর্য্য-ত্যাগ-দয়া-ঋজুতা-হর্ষ-প্রকাশক, শৃঙ্গার-বর্জ্জিত। আরভটী রৌদ্র-বীভৎস-রস-প্রধান, মায়া-ইন্দ্রজাল-ক্রোধ-উদ্ভ্রান্তচেষ্টা প্রভৃতির প্রকাশক।

(৯) এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। উদ্ঘাত্যকাদি পঞ্চ ভেদ প্রস্তাবনার—ইহা সাহিত্যদর্পণাদিতে (ষষ্ঠ পরিঃ) দ্রষ্টব্য। পক্ষান্তরে বীথীর ত্রয়োদশ অঙ্গ কথিত আছে। এ সকলই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়।

(১০) বৃত্তিচতুষ্টয়ের অঙ্গগুলির নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভেদ সাহিত্যদর্পণাদিতে দ্রষ্টব্য। ইহাদিগের লক্ষণ নাট্য-শাস্ত্র, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে।

(১১) ইহাদিগের লক্ষণাদি নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণাদি গ্রন্থে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থলে এগুলি অপ্রাসঙ্গিক।

দিবস, সূর্য্য-চন্দ্রাদির উদয়াস্ত প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনায় রস পুষ্টিলাভ করে। রাজকন্যা, রাজকুমার, স্ত্রীলোক, সৈন্য, সৈন্যগণের অভিযান প্রভৃতির বর্ণনায় কাব্যে রস-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। উদ্যান-গমন, জলক্রীড়া, মধুপান, রত্নোৎসব, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে রসাবহ। মন্ত্রণা, দূত-প্রেরণ, যুদ্ধ, নায়কের অভ্যুদয় প্রভৃতি পুরুষকারের পুষ্টিজনক বর্ণনা কাব্যে রস-বর্ষণ করে। অবশ্য একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সকল বিষয়ের বর্ণনাই যে সকল কাব্যে অবশ্য করিতে হইবে—এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। যদি ধরুন, পর্ব্বত-ঋতু প্রভৃতির বর্ণনা-দ্বারাই রস-পুষ্টি সম্ভব হয়, তাহা হইলে নগরী প্রভৃতির বর্ণনা না করিলেও কোন দোষ হয় না।

প্রথমে নায়কের উচ্চ বংশ ও গুণাবলী বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা তাঁহার শত্রুর ধ্বংসসাধনের বিবরণ প্রদান করা কবির কর্ত্তব্য। ইহাই কাব্য-রচনার স্বভাবসুন্দর রীতি। ইহা দণ্ডীরও অভিমত। রিপু অর্থাৎ প্রতিনায়কেরও বংশ-বীর্য্য-আচরণ-পাণ্ডিত্য প্রভৃতির উপন্যাস করিয়া দেখান উচিত যে, প্রতিনায়কও অসাধারণ পুরুষ। এরূপ অসাধারণ প্রতিনায়ককে জয় করিতে পারিলেই তবে নায়কের যথার্থ গৌরব। রামায়ণে প্রতিনায়ক রাবণ অতি বিরাট্ পুরুষ। তাই রামায়ণ-কথা-নায়ক রাবণ-বিজয়ী রামের এত সমাদর।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণের শৃঙ্গার-প্রকরণ তথা রস-প্রকরণ এখানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

ভানুদত্ত-কৃত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভাগ-বিশ্লেষণ যেরূপ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে, রসবিভাগ সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রয়াস দৃষ্ট হয় না। ভানুদত্ত কেবল বলিয়াছেন—রতি-স্থায়িভাব-মূলক শৃঙ্গার। শৃঙ্গারের দ্বিধা ভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভের দশটি অবস্থা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও নিধন। এইগুলির লক্ষণ ও উদাহরণ তিনি দিয়াছেন। উহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না। কেবল নিধন অমঙ্গলকর বলিয়া উহার দৃষ্টান্ত দেন নাই। এই সকল অবস্থার মূল দর্শন। দর্শন ত্রিবিধ (১) স্বপ্ন-দর্শন, (২) চিত্র-দর্শন ও (৩) সাক্ষাৎ দর্শন।

ভানুদত্তের শৃঙ্গার-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। ধ্বন্যা-লোকলোচনাদি প্রাচীন গ্রন্থে ও রসগঙ্গাধরাদি নবীন গ্রন্থসমূহে রস-বিচারই মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। রসের বিভাগ, লক্ষণ, উদাহরণাদি লইয়া সবিস্তর বর্ণনা এ সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে নাই। কেবল জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে শৃঙ্গারের দুইটি ভেদ—(১) সংযোগ (সম্ভোগ নহে) ও (২) বিপ্রলম্ভ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নায়ক-নায়িকার সামানা-ধিকরণ্যই (অর্থাৎ একত্র অবস্থানই) সংযোগ নহে; কারণ, এক শয্যায় শয়নকালেও মানবশতঃ দম্পতির মধ্যে সংযোগের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভ ঘটিতেও দেখা যায়। আমাদের শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ আপাততঃ এই স্থলেই সমাপিত করা হইল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

মৃত্যু-ধূসর

উষর মরুর অসীমায় ঢাকা মৃত্যু-ধূসর পথে
মোহাচ্ছন্ন চলেছে যাত্রীদল,
দিগন্ত-বুক হয়তো রঙীন অস্তরাগের স্রোতে,
হয়তো গোধূলি-মদির ধরণীতল।
আমি একা বসি' দীনা পৃথ্বীর বৈতরণীর কূলে
গভীর ব্যথায় কাঁদি ভীরু কবি—হেরি যবে আঁখি তুলে—
সহস্র তারা ঝরে' ঝরে' পড়ে একটি রাতের ভুলে,
ধরার নয়নে নামে অশ্রুর ঢল।

উষর বাতাসে নিশ্বাস জাগে মরুভূ'র অন্তরে,
হিম-ঝটিকায় কেঁপে ওঠে সারা নভ!
উত্তাল ঢেউ দলি' ওরা চলে প্রমত্ত মোহ-ভরে
তুহিনের স্তূপে কাঁদে কি নিখিল ভব!
অসীমের বুকে ছায়াপথ জাগে নির্ম্মম পরিহাসে
মিথ্যা আশার উন্মাদনায় যাত্রীরা ফিরে আসে,
গুমরি গুমরি স্থবির ত্রিকাল বেদনার নিশ্বাসে
সাজায় ডালিতে ব্যর্থতা নব নব।

মৃত্যু-সায়রে জীবনতরীর অভিযান? সব মিছে!
ভাগ্যের সাথে সংগ্রাম?—সব ভুল!
রাতের আঁধারে দিনের আলো—সে কখন্ ঝরেছে পিছে,
গোধূলির মায়া কখন্ হারালো কূল!
মত্ত নিয়তি—যূপ-মূলে হত মানুষরা দলে-দলে,
শাণিত খড়্গ রক্তলেখায় জ্বলে ওঠে পলে-পলে
মৃত্যু-ধূসর-পাংশু ধরণী কঠিন অশ্রু-জলে,
রক্তলোলুপ শ্মশান-শিবের শূল।

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ করায় যে উৎসাহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এখন হ্রাস পাইতেছে। যুদ্ধের অবস্থায় এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের কাল এখন অতীত: উদ্ভূত অবস্থার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের দিকেই এখন সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু এই অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশ উৎসাহজনক নহে। ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষের কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু সামরিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবামাত্রই তাঁহারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। শুনা গিয়াছিল —রোমেলের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে—চূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এখন সেই বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণিত সেনাদলের কঙ্কাল এল্-আঘেলিয়াতে জেনারল মণ্টগোমারীকে প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণের জন্য দণ্ডায়মান হইতেছে। একমাত্র পূর্ব্ব-য়ুরোপে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্যজনক শীতকালীন প্রতি-আক্রমণই উৎসাহজনক। নতুবা প্রাচ্য অঞ্চলে ও নিউগিনি-সলোমনসে সম্মিলিত পক্ষ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা—

সমগ্র ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই বিশাল অঞ্চলে প্রভুত্ব-বিস্তার-প্রয়াসে যে সামান্য সামরিক সজ্ঘর্ষ স্বাভাবিক ছিল, তাহাও হয় নাই; এডমিরাল দার্লাঁ ও জেনারল্ জিরো সম্মিলিত পক্ষে যোগ দেওয়ায় দুই একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ব্যতীত ভিসি ফ্রান্সের সমগ্র সেনাবাহিনী তন্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। এড্‌মিরাল দার্লাঁ মার্শাল পেতাঁর নামে সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বয়ম্ভু অধিপ সাজিয়াছেন; সম্মিলিত পক্ষও তাঁহাকে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগাইতেছেন। চরম দুর্দ্দিনে যে জেনারল দ গলে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদী এড্‌মিরাল দার্লাঁর সহিত সম্মিলিত পক্ষের এই 'দহরম মহরমে' চতুর্দ্দিকে প্রবল প্রতিবাদের রোল উঠিয়াছে। মনে হয়, সম্মিলিত পক্ষ বুঝিয়াছেন—এডমিরাল্ দার্লাঁকে দিয়া তাঁহারা সত্বর পশ্চিম-আফ্রিকাকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিবেন, এবং ইহাতে তাঁহাদিগের সমর-প্রচেষ্টায় সহায়তা হইবে। এই জন্যই নিছক্ স্বার্থের খাতিরে তাঁহারা সাময়িক ভাবে দার্লাঁকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেও এই স্বার্থ সিদ্ধি হইবামাত্র দার্লাঁ দূরে নিক্ষিপ্ত হইবেন।

ফরাসী নৌবহরের আত্ম-নিমজ্জন—

ফরাসী সাম্রাজ্য এই ভাবে ভিসি-ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী নৌবহরও এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে বৃটিশ ও মার্কিনী সৈন্য উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণের পর ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভিসি-ফ্রান্সের পক্ষে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না; অবিলম্বে সমগ্র ফরাসী-ভূমি নাৎসী-বুটের নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত হইবে। কাজেই, তখন ফ্রান্সের নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হয়। মিত্রশক্তি আশা করিয়াছিলেন—আড়াই বৎসরে ভিসি-ফ্রান্স যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে ফরাসী নৌবিভাগের কর্ম্মচারীরা সম্মিলিত পক্ষে যোগদানের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন। পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণীও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছিল; সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকায় পৌঁছিবার পরই সমগ্র ফ্রান্স নাৎসী-মথিত হয়; কিন্তু ফ্রান্সের বিশাল পোতাশ্রয় তুলোঁ তখনও অনধিকৃত থাকে। তুলোঁকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া জার্ম্মাণী আকাশপথে ও জলপথে তুলোঁয় অবস্থিত নৌবাহিনীতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ঐ সময় তুলোঁয় ফ্রান্সের ৩ খানি ব্যাট্‌লসিপ, ও ৪ খানি গুরুভার ক্রুজার, ৪ খানি সাধারণ ক্রুজার, ২৫ খানি ডেষ্ট্রয়ার, ২৬ খানি সাবমেরিণ, এবং ১ খানি বিমানবাহী জাহাজ ছিল। তাহার পর,

২৬শে নভেম্বর গভীর রাত্রিতে নাৎসী-বাহিনী বিসর্পিত গতিতে তুলোঁর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। ফরাসী নৌকর্ম্মচারীরা জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন; তাঁহারা ফ্রান্সের গৌরব এই নৌবহর বিজয়ীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দেওয়া অপেক্ষা উহার ধ্বংসসাধনই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তুলোঁর উপকূলবর্ত্তী কামানশ্রেণী গোলাবর্ষণ করিয়া নাৎসী-বাহিনীর অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটায়; ইত্যবসরে ফরাসী নৌবাহিনী আত্মনিমজ্জন করে। ২৭শে নভেম্বর বেলা ১০টার মধ্যে তুলোঁর বিশাল পোতাশ্রয় পোতবিহীন আশ্রয়মাত্রে পরিণত হয়। ঐ সময় তুলোঁ ব্যতীত মার্সাই এবং ডাকারে ফ্রান্সের কয়েকখানি রণপোত ছিল; উহার মধ্যে ডাকারের একখানি ব্যাট্‌লসিপ এবং কয়েকখানি ক্ষুদ্র পোত সম্মিলিত পক্ষের হস্তগত হইয়াছে। মার্সাইএর পোতগুলি জার্ম্মাণী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে—এইরূপই মনে হয়।

গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাহার নৌবাহিনীতে বিভিন্ন শ্রেণীর নিম্নলিখিত রণপোতগুলি ছিল—৭খানি

ব্যাট্‌ল্‌সিপ ১ খানি বিমানবাহী জাহাজ, ১৯খানি ক্রুজার, ৫০খানি ডেষ্ট্রয়ার, ১২খানি টরপেডো বোট, ৭৭খানি সাবমেরিণ। আট মাস-ব্যাপী যুদ্ধে ৮খানি সাবমেরিণ এবং ৬খানি ডেষ্ট্রয়ার ব্যতীত ইহার অন্ত কিছু বিধ্বস্ত হয় নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তখন বৃটিশের পক্ষ হইতে রেণো-মন্ত্রিসভাকে এই অনুরোধ করা হয়, তাঁহারা যেন ফ্রান্সের রণ-পোতগুলি বৃটিশ পোতাশ্রয়ে প্রেরণ করেন। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—তৎকালীন ফরাসী নৌসচিব এডমিরাল দার্লাঁ ব্যক্তিগত ভাবে ফরাসী নৌবহর প্রেরণের জন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশ কমন্স সভায় বলেন—

"এডামর্যাল দার্লাঁ কর্তৃক ব্যক্তিগত ভাবে বৃটিশ নৌসচিবকে সকল প্রকার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ এক যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, যাহার ফলে সমগ্র ফরাসী নৌবহর জার্ম্মাণী ও তাহার ইটালীয় মিত্রের হস্তে পতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।"

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি হয়, তাহাতে ফরাসী নৌবহর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি স্থান পাইয়াছিল—

"সমগ্র ফরাসী নৌবহর ফ্রান্সের এলাকাভুক্ত সমুদ্রাংশে আনয়ন করিতে হইবে, তথায় তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইবে, এবং জার্ম্মাণী ও ইটালীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহাদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন পোতাশ্রয়ে আটক থাকিবে। জার্ম্মাণী ও ইটালীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঐ নৌবাহিনীর কতকাংশ ফরাসী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারিবে।"

যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর কতকগুলি ফরাসী রণতরী গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে অসমর্থ হওয়ায় বৃটিশ পোতাশ্রয় পোর্টস্‌মাউথ্ এবং প্লীমাউথে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। ঐ সময়ে ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ পোতাশ্রয় আলেকজান্দ্রিয়ায় ফ্রান্সের একখানি ব্যাট্‌ল্‌সিপ, ৪খানি ক্রুজার এবং কয়েকখানি ক্ষুদ্র পোত ছিল। ঐ পোতগুলি বৃটিশ নৌ-বিভাগ আটক রাখেন। ইহার পর, বৃটিশ সরকার সংবাদ পান—ওরাণে ফ্রান্সের দুইখানি প্রথম শ্রেণীর ব্যাট্‌ল্‌সিপ এবং কয়েকখানি ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিণ আছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই বৃটিশ নৌবাহিনী ওরাণ আক্রমণ করে; এই আক্রমণে একখানি ফরাসী রণপোত নিমজ্জিত এবং কয়েকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার দুই দিন পরে বৃটিশ নৌবাহিনী ডাকারে আক্রমণ চালাইয়াছিল; ফলে, তারও একখানি ফরাসী ব্যাট্‌ল্‌সিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিশ্চিহ্ন ফ্রান্স—

সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াও আড়াই বৎসর ফ্রান্স কোন প্রকারে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; কারণ, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ নৌবহর ও উপনিবেশের প্রতি যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। ফরাসী-ভূমিকে সঙ্কুচিত করিলেও জার্ম্মাণী ফ্রান্সকে নিশ্চিহ্ন করিতে সাহসী হয় নাই; কারণ, তাহাতে ফরাসী নৌবহর ও ফরাসী সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। মিত্রশক্তিও জার্ম্মাণীকে এই সম্পদে বঞ্চিত রাখিবার জন্ত এবং সম্ভব হইলে উহা স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন। এই সম্পদের জন্তই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এত দিন পরাভূত ফ্রান্সের মর্য্যাদা ছিল। জার্ম্মাণী আশা করিয়াছিল—অতি ধীরে এবং কৌশলে অগ্রসর হইলে এই সম্পদ্ এক দিন তাহার হস্তগত হইবেই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে নাই; কেবল ভিসি-ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, এবং কৌশলে ও সংযত ভাবে দাবীর মাত্রা বাড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে, ভিসি-ফ্রান্সের সহিত মিত্র-শক্তিও যত দূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসির সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করে নাই, ফরাসী উপনিবেশে সে খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছে। এমন কি, মঃ লাভাল্ যখন আমেরিকার সহিত যুদ্ধরত জার্ম্মাণীর বিজয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখনও মার্কিনী রাজনীতিকগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশের ভাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য, ফ্রান্সের পতনের সময় তাহার যে স্বর্ণভাণ্ডার মার্টিনিকে প্রেরিত হইয়াছিল, উহা যাহাতে পুনরায় ফ্রান্সে যাইতে না পারে, মার্কিনী সরকার তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে ভুলেন নাই।

আড়াই বৎসর পর গত ২৬শে নভেম্বর ফ্রান্সের সম্পদ্—তাহার নৌবহর ও উপনিবেশ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির অলিখিত বিধান অনুসারে ফ্রান্সের আর রাষ্ট্র হিসাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে। কাজেই, নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই ফ্রান্সের স্বাতন্ত্র্য আজ বিলুপ্ত; জার্ম্মাণী ইহার জন্ত উপলক্ষ মাত্র।

আফ্রিকার যুদ্ধ—

সম্মিলিত পক্ষের পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি রোধের জন্য এবং দক্ষিণ-ইটালীতে তাঁহাদিগের আক্রমণ নিবারণের উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী টিউনি-সিয়ার স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রে সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছে। সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য রাজধানী টিউনিস ও বিজার্টার সংযোগ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল; সম্প্রতি তাহারা টেবুর্‌বা এবং বুজেদিদা নামক দুইটি স্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। এই বিফলতার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—এখনও সম্মিলিত পক্ষ পশ্চিম-আফ্রিকায় যথেষ্ট বিমানঘাঁটী স্থাপন করিতে পারেন নাই; এই জন্য অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, এত আয়োজন ও ঢক্কানিনাদের পর জার্ম্মাণ-বাহিনীর সম্মুখীন হইবামাত্র এই পরাজয় সম্মিলিত পক্ষের গ্লানিকর।
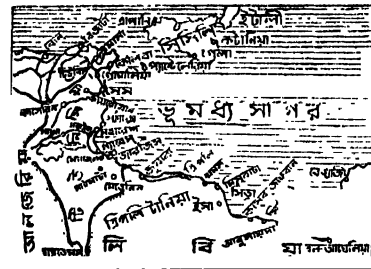
টিউনিসিয়ার সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জিব্রল্টর ও সুয়েজের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে টিউনিসিয়া অবস্থিত, সিসিলি উহার অদূরবর্ত্তী। সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যে ক্ষুদ্র প্যান্টেলেরিয়া দ্বীপটিও ইটালীর। কাজেই ফ্যাসিষ্ট শক্তি যদি টিউনিসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে,

তাহা হইলে সেখান হইতে তাহাদিগের পক্ষে ভূমধ্য সাগরের মধ্যস্থলে সুদৃঢ় "প্রাচীর" নির্ম্মাণ সম্ভব হইবে; পশ্চিম ও পূর্ব্ব অঞ্চলে অবস্থিত নৌবহরের পক্ষে এই প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য হওয়াও সম্ভব। পক্ষান্তরে, সম্মিলিত পক্ষ যদি জার্ম্মাণীকে টিউনিসিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমে দক্ষিণ-ইটালীতে তাহাদিগের আক্রমণ প্রসারিত করা সম্ভব হইবে। বস্তুতঃ, টিউনিসিয়ার এই যুদ্ধে প্রতীচ্য অঞ্চলের সমগ্র সমর-প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ গতি নির্ভর করিতেছে; ইহাতেই য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টির সম্ভাবনা তথা রুশ-যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

জেনারল রোমেলের সেনাবাহিনী এখন বেঙ্গাজীর পশ্চিমে এল-আঘেলিয়াতে ব্যূহ রচনা করিয়া সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জেনারল মণ্টগোমারীও পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত। এই আসন্ন সংগ্রামের ভবিষ্যৎ টিউনিসিয়ার যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে। টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণ-সেনা যদি পরাভূত হয়, তাহা হইলে রোমেল প্রয়োজনীয় সাহায্যে বঞ্চিত হইবেন এবং তাহার ফলে মণ্টগোমারীর আক্রমণ অধিক কাল প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে, টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণী যদি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে রোমেলের প্রতিরোধ অলঙ্ঘ্য হইতে পারে। লিবিয়ার মরুভূমিতে যুদ্ধরত পক্ষদ্বয় ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার ছুটাছুটি করিয়াছে; উহার গুরুত্ব অধিক নহে। বেঙ্গাজীর পশ্চিম পর্য্যন্ত ফ্যাসিস্ত-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই যুদ্ধের শেষ মীমাংসা আজ জেনারল এসেন্‌হাওয়ারের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে।

সেনাপতি রোমেল

সোভিয়েট বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ—

ইতোমধ্যে রুশিয়ার সকল রণক্ষেত্রেই সোভিয়েট বাহিনীর শীত-কালীন প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসর জার্ম্মাণী যে উদ্দেশ্য লইয়া দক্ষিণ রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। অন্যান্য অঞ্চলে রুশ-সেনার প্রবল প্রতিরোধের পর ষ্ট্যালিনগ্রাডে নাৎসী-বাহিনী সুদীর্ঘ তিন মাস আটক থাকায় তাহার সমগ্র সমর-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে।

এই বৎসর জার্ম্মাণ সমরনায়কগণ সোভিয়েট সমরযন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিকল করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বিধ্বস্ত করিবার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া দক্ষিণ-রুশিয়ায় আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। গত বৎসর দুই হাজার মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে অত্যধিক সৈন্য ও সমরোপকরণ হানির ফলে এ বৎসর নাৎসী সমরনায়কগণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সমর-পরিকল্পনা রচনা করেন। এই বৎসর কেবল ৫ শত মাইল রণাঙ্গনে বিশাল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম রুশিয়ার গমের ক্ষেত্র এবং তৈলকেন্দ্র হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন। মস্কৌকে পার্শ্বে রাখিয়া দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড আক্রমণে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়াও নাৎসী-বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে ভল্গার তীরবর্ত্তী ও উরলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের সংযোগ মস্কৌ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত।
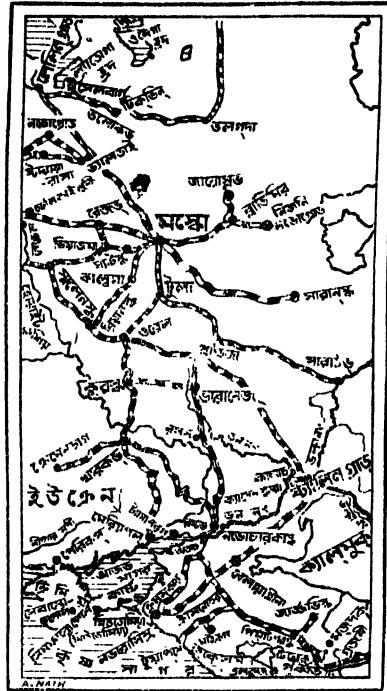
দক্ষিণ রুশিয়ার প্রয়োজনে মস্কৌ অঞ্চল হইতে সোভিয়েট সেনা অপসারণেরও প্রয়োজন হইত। তাহার পর, নাৎসী-বাহিনী বিচ্ছিন্ন-সংযোগ ও দুর্ব্বল-শক্তি মস্কৌকে স্বল্পায়াসে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী হইত। জার্ম্মাণী এবার কেবল ককেসাসের তৈল, কুবানের গম, এবং ভল্গার তীরবর্ত্তী যন্ত্রশিল্প অধিকার করিতে চাহিয়াছিল বলিলে তাহার আক্রমণ-পরিকল্পনার সকল কথা বলা হয় না। জার্ম্মাণী ষ্ট্যালিনগ্রাডে চরম শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, ইহার অর্থ ভল্গা অতিক্রম করিয়া সারাটভ ও কুইবিশেভ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য, ভল্গা অতিক্রমণের ফলে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ ককেসাস্ অঞ্চলের তৈলকেন্দ্র অনায়াসে আয়ত্তে আনিবার স্বপ্নও জার্ম্মাণ সমরনায়কগণ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু মার্শাল্ টিমোশেঙ্কো জার্ম্মাণীর সযত্নরচিত পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়াছেন।

গত গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর সেবাস্তোপোল অধিকারে অত্যধিক বিলম্ব ঘটে। তাহার পর, মার্শাল টিমোশেঙ্কো খারকভে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়া জার্ম্মাণ-বাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। ভারোনেজে নাৎসী-বাহিনীর অগ্রগতি কেবল রুদ্ধই হয় নাই—তাহারা ডনের পশ্চিম তীরে অপসরণ করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর, ষ্ট্যালিনগ্রাডে সোভিয়েট-বাহিনীর অসাধারণ বীরত্ব ও দৃঢ়তা! সোভিয়েট-বাহিনীর এই প্রবল প্রতিরোধের ফলেই সম্মিলিত পক্ষ শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছেন; এই প্রতিরোধের জন্যই মিশর রক্ষা পাইয়াছে; উত্তর-আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক তৎপরতাও সম্ভব হইয়াছে। এই প্রতিরোধের জন্যই জাপানও পশ্চাদ্দিক হইতে রুশিয়াকে ছুরিকাঘাত করিতে সাহসী হয় নাই।

নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে সোভিয়েট-বাহিনীর শীতকালীন প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে জার্ম্মাণী মধ্য-ককেসাসে পরাভূত হয়। তাহার পর, ষ্ট্যালিনগ্রাড অঞ্চলে প্রায় ৩ লক্ষ জার্ম্মাণ-সেনা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। মধ্য-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর সুদৃঢ়

যাঁটা রেজভেও সোভিয়েট বাহিনী কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়াছে; ভেলিকাই-লুকিতেও তাহারা প্রবল আঘাত করিতেছে। সম্প্রতি ভরোনেজে সোভিয়েট সেনা প্রতি-আক্রমণ করিয়াছে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কো

সোভিয়েট সেনা গত বৎসর শীতকালে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়া কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সাফল্যের গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নাই। ষ্টালিনগ্রাড অঞ্চলের ন্যায় ষ্টারায়া-রাসাতেও গত বৎসর বিশাল জার্ম্মাণ-বাহিনী অবরুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু পরে, তাহারা অবরোধমুক্ত হইতে সমর্থ হয়।

প্রতি-আক্রমণ ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন—

গত বৎসর সোভিয়েট-বাহিনীর শীতকালীন সাফল্যের গতি অব্যাহত না থাকিবার সর্ব্বপ্রধান—হয়ত একমাত্র কারণ, য়ুরোপের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা। সমগ্র য়ুরোপখণ্ডের সম্পদে সমৃদ্ধ সমরাস্ত্র লইয়া জার্ম্মাণী ও তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় পূর্ব্ব-য়ুরোপে অবস্থান করিতে পারিয়াছে। এই বিশাল সমর-যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েট-বাহিনী যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। জগতের অন্য কোন শক্তির পক্ষে এইরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ আদৌ সম্ভব ছিল না। কিন্তু একাকী সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে এই দুর্দ্ধর্ষ ফ্যাসিস্ত সমরাস্ত্র চূর্ণ করা সম্ভব নহে। এই জন্যই জার্ম্মাণীকে অন্যত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য গত দেড় বৎসর প্রবল আন্দোলন হইয়াছে; কিন্তু সামরিক অসুবিধার অজুহাতে এত দিন এই প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ চাপা দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি, এই প্রসঙ্গের আলোচনার জন্য বিজ্ঞতাভিমানী রাজনীতিকগণ বিরক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন।

এত কাল পরে, এখন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন-সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইতোমধ্যে প্রচার-দুন্দুভিতেও প্রবল আঘাত পড়িয়াছে, এবং ইহাকে—উত্তর-আফ্রিকার তৎপরতাকেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইতেছে। মঃ ষ্টালিন তাঁহার "নভেম্বর দিবসের" বক্তৃতায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় বলেন—বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী ও তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ১৮০ ডিভিসন সৈন্য পূর্ব্ব-রুশিয়ায় যুদ্ধরত রহিয়াছে; অন্যত্র জার্ম্মাণীকে এইরূপ ভাবে আঘাত করিতে হইবে, যাহার ফলে জার্ম্মাণীর ৫০ ডিভিসন এবং তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ২০ ডিভিসন সৈন্য সেই দিকে মনঃসংযোগে বাধ্য হয়। লিবিয়ায় মাত্র ১৫ ডিভিসন ফ্যাসিস্ত সৈন্য বিব্রত; উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতার ফলে টিউনিসিয়ায় আরও পাঁচ সাত ডিভিসন ফ্যাসিস্ত-সৈন্য নিযুক্ত হইতে পারে। কাজেই, রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর চাপ কমাইবার পক্ষে আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ-আশঙ্কায় এত দিন উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে জার্ম্মাণী ৬০ ডিভিসন সৈন্য মজুত রাখিয়াছিল। এই অঞ্চল হইতে সে এখন কিছু সৈন্য অপসারণ করিতে পারিবে। একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা সে করিবে না।

আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রাথমিক প্রয়াস হইলেও পূর্ব্ব-য়ুরোপের যুদ্ধসম্পর্কে ইহার গুরুত্ব অধিক নহে; ইহার ফলে সোভিয়েট-বাহিনীর শীতকালীন সাফল্যও পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত পক্ষ যদি টিউনিস্ ও বিজার্টায় জার্ম্মাণীর প্রতিরোধব্যূহ অবিলম্বে চূর্ণ করিতে পারেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি প্যান্টেলেরিয়া ও সিসিলির পথে ইটালীতে তাহাদিগের আক্রমণ প্রসারিত হয়, তাহা হইলে তখন—একমাত্র তখনই প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইবে, এবং তাহার ফলে রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর 'চাপ' কমিবে। পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর শক্তি হ্রাস পাইলে নাৎসী-বাহিনী যে অত্যন্ত বিব্রত, এমন কি বিধ্বস্ত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সুদূর প্রাচী—

হল্যাণ্ডের রাজ্যহারা রাণী উইলহেলমিনা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"স্রোত ফিরিতেছে···জাপানের শক্তিতে ভাটা পড়িয়াছে; অতি সত্বর তাহার পরাভব নিশ্চিত।" রাজ্য হারাইয়াও রাণী উইলহেলমিনা ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। সেই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিশালী বিশাল অংশ জাপান ছিনাইয়া লইয়াছে। কাজেই, জাপানের শক্তির লঘুত্ব অথবা তাহার আশু পতন-সম্ভাবনা সম্বন্ধে জাপানের সামরিক তৎপরতার ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত রাণী উইলহেলমিনার উক্তি গুরুত্বহীন মনে করা হয়ত অসঙ্গত নহে।

ঠিক এই সময়ে জাপানের শক্তির সহিত একরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফ্রেজার সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি করিয়াছেন। মিঃ ফ্রেজার বলেন—"অনেক বিষয়ে জার্ম্মাণদিগের অপেক্ষা জাপানীরা অধিকতর বিপজ্জনক। আমাদিগকে যে জাপানের সহিত অত্যন্ত কঠোর ও তিক্ত সঙ্ঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইবে—এই কথাটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে আমরা যেরূপ সুস্পষ্ট বুঝি, উত্তর-আফ্রিকায় এবং য়ুরোপে তাহা সেরূপ স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধ হয় না বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়।"

বস্তুতঃ, জাপানের শক্তিতে লঘুত্ব আরোপের কোনই কারণ নাই;

গত এক বৎসরেই জাপান সুদূর প্রাচীতে যে সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল অধিকার করিয়াছে, তাহার রসে জাপানের দানবীয় শক্তি আরও পুষ্ট হইয়াছে। সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা হয়—জাপান তাহার পরিপাক-শক্তির অতিরিক্ত খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথা কাহারও অজ্ঞাত নাই যে, জাপানের কুক্ষিগত অঞ্চল আদৌ দুষ্পাচ্য নহে,—সেখানে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব বা ধ্বংসাত্মক কার্য্যের কোনই সম্ভাবনা নাই। মিত্রশক্তিও জাপানের নবাধিকৃত সাম্রাজ্যের রস শোষণে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান কয়েকটি নৌ-যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; ইহার ফলে সে এখনই চরম পরাজয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে মনে করা বাতুলতা। নিউ গিনি ও সলোমনসে জাপান কতক অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হইলেও এখনও নিউ গিনি হইতে জাপানী সৈন্য বিতাড়িত হয় নাই, সলোমনসেও তাহারা প্রতিষ্ঠিত আছে। বস্তুতঃ, নিউ গিনির গোনা বুনা অঞ্চলে অবরুদ্ধ জাপানীরা যে প্রবল প্রতিরোধ-শক্তির পরিচয় দিতেছে, তাহাতেই জাপানী সৈন্যের দৃঢ়তা সুপ্রকাশ।

জাপানের সাম্প্রতিক নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সে এশিয়া-খণ্ডে ব্যাপক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতিরোধ-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্রই জাপান এখন নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয়তাকে তাহার শক্তিহীনতা মনে করিয়া সাময়িক সন্তোষ লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা সত্য যে, ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব না হওয়াই সম্ভব।

এশিয়াখণ্ডে জাপানের লক্ষ্য দুইটি—চীন এবং ভারতবর্ষ। জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মিত্রশক্তির এই ঘাঁটিটি সত্বর শক্তিহীন করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে পরে ধীরে ধীরে চীনের সমস্যার সমাধানে তাহার বিলম্ব হইবে না। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে সংগ্রামরত চীনা-বাহিনীকে রাখিয়া তাহার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্ভব কি না, তাহাও বিবেচ্য। বিশেষতঃ, পশ্চিম দিক্ হইতে জার্ম্মাণীর পরোক্ষ সহযোগ লাভের আশা আপাততঃ জাপানের নাই। পক্ষান্তরে, জাপান যদি চীন আক্রমণ করিয়া পুরাতন চীনা সমস্যার দ্রুত মীমাংসার জন্য প্রবল প্রয়াস করে, তাহা হইলে ভারতীয় ঘাঁটী হইতে তাহার পশ্চাদ্ভাগে সজোর আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ অবস্থায় জাপানের সমর-নায়কগণ তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচনে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছেন।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপানী সৈন্যের পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে; পর্য্যবেক্ষক বাহিনীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যের মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘর্ষও হইতেছে। কখনও কখনও জাপানী বিমান পূর্ব্ব-ভারতে বোমাবর্ষণও করিতেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে দুই বার (৫ই ও ১০ই ডিসেম্বর) বোমা বর্ষিত হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষক বাহিনীর এই তৎপরতা এবং এই বিমান-আক্রমণকে জাপানের প্রত্যক্ষ আক্রমণের পূর্ব্বাভাস মনে হইতে পারে; কারণ, স্থলপথে অভিযানের পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষক বাহিনীর সাহায্যে প্রতিপক্ষের শক্তি পরীক্ষা এবং তাহার বিমানঘাঁটী বিধ্বস্ত করাই সমর-নীতি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল তৎপরতাকে জাপানের ভারত আক্রমণের নিশ্চিত পূর্ব্বাভাস মনে করা যায় না—প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনেও এই প্রকার তৎপরতা স্বাভাবিক। তবে, জাপানের ভবিষ্যৎ সমর-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়—ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মদেশ তথা চীন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতেই জাপানী সমর-নায়কগণ অধিকতর আগ্রহান্বিত হইবেন; কারণ, এই বৎসর শীতকালে যদি পূর্ব্বাভিমুখী অভিযান স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে পরে এই প্রয়াস অসাধ্য হইতে পারে।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ, ইন্দো-চীন ও শ্যামে জাপানের সৈন্য-সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। চীনা সমরনায়কদিগের অনুমান—চীনের উদ্দেশে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করিবার জন্যই জাপানের এই আয়োজন। ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া চীনের প্রতি জাপানের অবহিত হইবার সম্ভাবনা যে একেবারে নাই, তাহা নহে। জাপানের সমর প্রচেষ্টার জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ হয়—তাহার নিজ গৃহের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে। এই সকল সমরোপকরণ চীনের উপকূলপথে পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরিত হয়। সম্প্রতি জেনারল শ্রীণওয়েলের বিমানবাহিনী এই সমুদ্রপথ বিপ্লাস্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে; পূর্ব্বচীনের চেকিয়াং ও ফুকিয়েন্ প্রদেশ হইতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের শ্রমশিল্প-কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জন্য জাপানের পক্ষে বর্ত্তমানে ব্যাপক পূর্ব্বাভিমুখী অভিযানে দ্বিধানুভব অসম্ভব নহে। ব্রহ্মদেশে ব্যাপক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা রাখিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ হইতে চুংকিংএর উদ্দেশেও জাপানের আক্রমণ চালিত হইতে পারে। এই ভাবে চুংকিংকে আঘাত করিয়া জাপান নান্কিং সরকারের সহযোগে চীনে গৃহ-যুদ্ধ সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হইতে পারে।

সংক্ষেপে, জাপান যদি বুঝে—দুই দিক্ হইতে চুংকিংকে প্রবল ভাবে আঘাত করিয়া এবং নান্কিংএর সহযোগে চীনে গৃহ-যুদ্ধ বাধাইয়া দ্রুত চীনা-সমস্যার সমাধান সম্ভব, তাহা হইলে সে আপাততঃ ব্রহ্মদেশে দৃঢ় রক্ষাব্যবস্থা রাখিয়া চীন আক্রমণে প্রয়াসী হইতে পারে। তবে, ইহা সত্য—চীনেই হউক, আর ভারতবর্ষেই হউক, অতি সত্বর জাপানের প্রবল আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ হইবে; তাহার বর্ত্তমান নিষ্ক্রিয়তা যে শক্তিসঞ্চয়ে ও সুনির্দ্দিষ্ট আক্রমণ-পরিকল্পনা-রচনায় ব্যয়িত হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

৮।১২।৪২

শ্রীঅতুল দত্ত

কাগজের অভাব

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের কাগজের কলে যত কাগজ উৎপন্ন হইবে, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ তাঁহারাই (ভারত সরকার) গ্রহণ করিবেন; কারণ, যুদ্ধের কার্য্যে ঐ পরিমাণ কাগজ তাঁহাদের প্রয়োজন হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এত কাগজের প্রয়োজন হয়, ইহা আমরা কস্মিন্ কালেও শুনি নাই! বিদেশ হইতে এখন আর এদেশে কাগজ আসিতেছে না। তাহার উপর ৪০ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিশাল ভারতের অধিবাসিবর্গের কাগজের প্রয়োজন অল্প নহে। ১৯৩৮—৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত ৩১ টন কাগজ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারতীয় কাগজের কলে কেবলমাত্র ৫৯ হাজার ১ শত ১৮ টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ভারতের ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন কাগজের প্রয়োজন। সুতরাং ভারতে যে আরও কাগজের কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল এবং আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতে যে কয়টি কাগজের কল আছে, তাহাই সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া এখন আনুমানিক ১ লক্ষ টন কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। তন্মধ্যে এ দেশের লোক এখন কেবল ১০ হাজার টন কাগজ পাইবে; কিন্তু উহা প্রস্তুত করিবার উপাদান চাই। যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে কাগজের মণ্ড (pulp) ও রাসায়নিক দ্রব্য আসিতেছে না। সাবুই ঘাস ও বাঁশ যথেষ্ট মিলিতেছে না। উহা আনিবার খরচা বাড়িয়াছে,—গাড়ীও পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই, ভারতে লব্ধ স্বল্প উপাদানে যে পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই প্রস্তুত হইতেছে। এই জন্যই প্রয়োজনানুরূপ কাগজ প্রস্তুতে বিশেষ বাধা ঘটিতেছিল। এই অবস্থায় সরকার একমাত্র কাগজ-শিল্পের উপর উচ্চহারে রক্ষা-শুল্ক ধার্য্য করিয়া বিদেশাগত কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ব্যতীত এদেশের কাগজ-শিল্পের উৎসাহদান-কল্পে তাঁহাদের হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত উত্তোলন করেন নাই! কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেও এদেশের কাগজের কলগুলি সুলভ মূল্যে কাগজ বেচিতে পারিত না। ১২টি কলের মধ্যে ১টি কার্য্য করিতেছিল, অন্যগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিলে বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী ও কাগজ প্রস্তুত করিবার মণ্ড ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কলগুলি কাগজের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়া লাভবান হইতেছিল। সরকার তখনও বিশেষ কিছুই করেন নাই। বিদেশী কাগজ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়া এখন কাগজ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; এই সময় সরকার কলমের এক-আঁচড়ে ভারতীয় মিলে প্রস্তুত সমস্ত কাগজের ৯০ অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া হঠাৎ কৃতসঙ্কল্প হইলেন কেন? আচম্বিতে যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের এত কাগজের দরকার হইল কেন? সরকারের এখন কতকগুলি অনাবশ্যক রিপোর্ট প্রভৃতির প্রচার বন্ধ করাই কর্ত্তব্য। এ দিকে কতকগুলি কাগজের কলওয়ালা তাঁহাদের ক্রেতাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শতকরা যে ১০ ভাগ কাগজ তাঁহাদের হস্তে অবশিষ্ট থাকিবে; যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগের প্রয়োজন মিটাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইবে—সুতরাং প্রকাশক প্রভৃতিকে অত্যাবশ্যক কাগজ দিতে পারিবেন না। অতএব, জনসাধারণের পক্ষে কাগজ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প। জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের পথ রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই প্রবল। ইহাতে পুস্তক, সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে। সরকারের অদূরদর্শিতার ফলেই আজ এই সঙ্কট উপস্থিত হইল। তাঁহারা যদি প্রথম হইতে এ দেশে কাগজশিল্প প্রসারণের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আজ এ দশা হইত না। সোভিয়েট-শাসিত রুশিয়া জ্ঞানবিস্তারের জন্য কাগজ উৎপাদনের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহা সরকার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পান নাই! ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-সরকার তথায় ৪৯টি নূতন কাগজের কল বসাইবার সঙ্কল্প করেন। এখন তথায় প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে; আর ভারতে সরকার নিরবচ্ছিন্ন স্বৈরিতা সহকারে প্রায় সমস্ত কাগজ স্বয়ং গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন! এই সঙ্কল্প সরকারের ত্যাগ করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য।

আমাদের মনে হয়, সরকারী বিভাগের কাগজের খরচ আরও সঙ্কোচ করাই সঙ্গত। সরকারের প্রয়োজন যতই হউক, দেশে শিক্ষাবিস্তার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ও ব্যবসায়-পরিচালন জন্য দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় কাগজে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে। কাগজের অভাবে বহু ছাপাখানা বন্ধ হইয়া এই দুর্দ্দিনে বেকার-সমস্যা আরও প্রবল হইবে। সরকার দেশের বেকার-সমস্যা বাড়াইয়া আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবেন না।

গান্ধীজী সম্বন্ধে সেনাপতি স্মাট্‌স্‌

দুঃখের বিষয়, সাম্রাজ্যবাদীরা হীন স্বার্থ সাধন করিবার জন্য অসত্যের আশ্রয় লইতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন না। সম্প্রতি বিলাতের এক দল সাম্রাজ্যবাদী বলিতেছেন যে, গান্ধী পঞ্চমবাহিনীর লোক।—তিনি এখন জেলে। তাঁহার এখন আত্মপক্ষ সমর্থন সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ একতরফা কুৎসা প্রচার করা কতখানি নীতিবিরুদ্ধ, বিলাতের ধর্ম্মযাজক মহাশয়রা তাহা বলিয়া দিবেন কি? কিন্তু সম্প্রতি বুয়র সেনাপতি স্মাট্‌স্‌ গান্ধী সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"গান্ধীজীকে পঞ্চমবাহিনীভুক্ত বলা ঘোর অসঙ্গত। তিনি মহামানব। তিনি পৃথিবীর মহামানবের মধ্যে অন্যতম; তাঁহাকে পঞ্চমবাহিনীর লোক বলা যায় না। তাঁহার আদর্শ আধ্যাত্মিক। এই পৃথিবীতে সেই আদর্শের অনুসরণ করা যায় কি-না, সে বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে; কিন্তু গান্ধীজী যে দেশানুরাগী মহামানব, এবং আধ্যাত্মিক নেতা, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতেই পারেন না।"—গান্ধীজীর সহিত সেনাপতি স্মাট্‌সের পরিচয় বহু দিন পূর্ব্বের। কোন ইংরেজের তাঁহার সহিত এত দিনের পরিচয় নাই। তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করা মূঢ়তা। হায় সাম্রাজ্যবাদ!

আম্বেদকরের নেতৃত্ব

সাম্রাজ্যবাদীরা ডাক্তার আম্বেদকরকে হরিজনদিগের মুখপাত্র খাড়া করিয়াছেন; কিন্তু এই ব্যক্তিকে কোন বিশিষ্ট হরিজনই তাঁহাদের

মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। অশিক্ষিত হরিজনরাও তাঁহাকে চিনেন বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি এই ডাক্তার আম্বেদকর মিঃ জিন্নার ন্যায় হরিজনের জন্য ভারতে একটা স্বতন্ত্র অংশ নির্দ্দেশ করিবার আব্দার ধরিয়াছেন। এই আব্দার তিনি কাহাদের প্রেরণায় ধরিয়াছেন, তাহা লোকের বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। কিন্তু যাঁহারা হরিজনের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহারা ইহাতে ভীত হইয়া তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় হরিজন-সম্মিলনের সভাপতি মিঃ এম এল যাত্রী, উহার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত ভাগত আমিনচাদ, যুক্তপ্রদেশের হরিজন-সম্মিলনের প্রেসিডেন্ট চৌধুরী গিরিধারীলাল, পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত যুগলকিশোর, যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য চন্দ্রভীম সেন, পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মূলা সিং, এবং মধ্যপ্রদেশের হরিজনদিগের সদস্য মিষ্টার খণ্ডকার মিলিত হইয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ডাক্তার আম্বেদকর এই বিষয়ে হরিজনদিগের মত প্রতিফলিত করেন না। তিনি অখণ্ড হিন্দুস্থানকে যে বিখণ্ডিত করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা মুস্লিমলীগের পাকিস্থানের দাবীর নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য আত্মসমর্পণ মাত্র। হরিজনদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থানের দাবী করিলে তাহাতে হরিজন-সম্প্রদায়ের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করা হইবে—ইত্যাদি। কতকগুলি লোক মনে করে যে, দল ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকিলে তাহারা আপনাদের হীন স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইবে। তাহার উপর যদি অন্য দিক্ হইতে প্ররোচনা পায়, তাহা হইলে তাহারা সবই করিতে পারে। হরিজনদিগের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া ভালই করিয়াছেন।

বিদ্যুতের ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকার বিদ্যুতের ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি সরবরাহ ও সংযোগের উপকরণের অভাব, এবং বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনোপযোগী তৈল দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা যুদ্ধ এবং রাজ্যরক্ষা কার্য্যে সম্পর্কিত, তাঁহারা বৈদ্যুতিক সংযোগ পাইবেন। কিন্তু জনসাধারণ নূতন বৈদ্যুতিক সংযোগ পাইবেন না। কেরোসিন তেলের যেরূপ অভাব, তাহাতে এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের ও ছোট ছোট কারখানার বিশেষ অসুবিধাই হইবে। আশা করি, বঙ্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি-নিয়ন্ত্রক সমিতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থাই করিবেন।

ঋণ দান

পাটের দর কিছু দিন পূর্ব্বে অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় এবার পাটচাষীদিগের দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই। তাহারা যাহাতে এই অসুবিধা হইতে উদ্ধার-লাভ করিতে পারে, সে জন্য কেন্দ্রী সরকার তাহাদিগকে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সরকারকে ২ কোটি টাকা ঋণ দানে সম্মত হইয়াছেন। ঐ টাকা হইতে বঙ্গীয় সরকার পাট-উৎপাদক কৃষকদিগকে অবিলম্বে ১ কোটি টাকা ঋণ দিতে চাহিয়াছেন। পাটচাষের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে। জাপানে পাটের অনুরূপ উদ্ভিদের আঁশে পাটের অভাব পূরণ করা হইতেছে। ডি ১৫৪ (D 154) পাটের সহিত উহার বিশেষ পার্থক্য নাই। যুদ্ধাবসানে জাপানী পাট ভারতীয় পাটের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জ্জেন্টাইন এবং উরুগুয়ায় পাটের চাহিদা আছে। মিশরেও পাটচাষের পরীক্ষা এবং পাট-কল খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মার্কিন তুলার সূতায় বস্তা প্রস্তুত করিয়া পাটের বস্তার কাজ সারিবার চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকার পানামা এবং কোষ্টারিকা অঞ্চলে জঙ্গল উজাড় করিয়া ম্যানিলা শণের চাষ করা হইতেছে। এ দিকে কলিকাতায় পাটের দর সম্প্রতি কিছু অধিক হইলেও মফঃস্বলে পাটের দর অধিক নহে। যানাভাবে মফঃস্বলের পাট কলিকাতায় আনা সম্ভব হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় সরকারের ঋণ ও সাহায্য দান সমীচীন।

চার্চ্চিলের উক্তি

ম্যান্সন হাউসে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে, বিলাতের লোক এবং বিলাতী উপনিবেশের লোকরাই কেবল মিশরের যুদ্ধ জয় করিয়াছে। বটে! তবে তথায় ভারতীয় সৈন্য, স্বাধীন-ফরাসী সৈন্য, গ্রীক সৈন্য, চেকোশ্লোভাক সৈন্যরা বসিয়া বসিয়া কি স্বপ্ন দেখিতেছিল? সকল দিক্ বজায় রাখিয়া কথা বলাই সঙ্গত। তবে চার্চ্চিল-আমেরীর ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীরা যাহা খুশী বলিতে পারেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ

বঙ্গীয় সরকারের রাজস্ব-সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৪ঠা অগ্রহায়ণ পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের পরেই তিনি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—"কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া আমি এই কথা বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নামে যে শাসন-পদ্ধতি চলিতেছে, তাহা একটা বিরাট্ পরিহাস মাত্র! এগারো মাস প্রাদেশিক মন্ত্রিরূপে কাজ করিয়া আমি সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি যে, মন্ত্রীদিগের কার্য্যের জন্য তাঁহারা দেশের লোকের এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট বিশেষ দায়িত্ব রাখেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের দেশের লোকের অধিকার এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ক্ষমতাই নাই।" অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্ত-শাসন যে নিতান্তই একটা দর্শনধারী ব্যাপার, উহার ভিতরে যে কিছুই নাই,—তাহা এ দেশের বহু লোক পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, মন্ত্রীদিগের কোন ক্ষমতাই নাই,—তাঁহারা গবর্ণরকে তাঁহাদের বক্তব্য মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ গবর্ণরই সিভিলিয়ানদিগের দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গবর্ণর এক জন স্থায়ী রাজ-পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া মন্ত্রীদিগের মতের বিপরীত কাজ করিয়াছেন; এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 'ক্রনিকল' বলিয়াছেন,—"গবর্ণর পশ্চাৎ হইতে সূত্রাকর্ষণ করিলে সেই মত কাজ হইয়া থাকে, কিন্তু যখন কাজের ফলে লোক অসন্তুষ্ট হয়, তখন তিনি সচিবদিগকে

দেখাইয়া দেন।" ইহা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিলেও শ্যামাপ্রসাদ বাবু পদত্যাগ করেন নাই কেন, তাহার কারণ তিনি বলিয়াছেন, তিনি ঐ পদে থাকিয়া যদি দেশের লোকের কিছু উপকার করিতে পারেন, এই আশায়। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকগ্রস্ত মেদিনীপুর অঞ্চলে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্যে, এবং পাইকারী জরিমানা আদায়ে গবর্ণরের সহিত মতভেদের জন্ত তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় ব্যাপারেই মন্ত্রিগণের পরামর্শের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করা গবর্ণরের উচিত ছিল; নতুবা মন্ত্রিমণ্ডলী-গঠনের কোন সার্থকতা থাকে না। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী একযোগে কার্য্য করিতেছিলেন, ইহা স্বার্থবান্ ব্যক্তিদিগের চক্ষুশূল। তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া উন্নতির পরিপন্থী লোকদিগের সাহায্যে এই অবস্থা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। তার পর গত তিন মাস পূর্ব্বে কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিবার পর হইতে

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গবর্ণর যে সিবিলিয়ানদিগের সাহায্যে দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাহা অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিয়াছেন। মেদিনীপুরের কয়েক জন রাজপুরুষের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগ উপস্থিত হইলেও কেহ তাহার জবাব দেন নাই; সে বিষয়ে অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। ইহা দেখিয়াই লোকের মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক। তাহার পর যে ভাবে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইতেছে, তাহাতে লোকের মনে সরকারী নীতি সম্বন্ধে একটা প্রতিকূল ধারণার উদ্ভব হইতেই পারে।

'বম্বে ক্রনিকল' বলিয়াছেন, "ডক্টর মুখোপাধ্যায় যে কেন এত দিন পদত্যাগ করেন নাই, তাহাই আমরা বিস্ময়ের বিষয় মনে করিতেছি।" তিনি ৭ই অগ্রহায়ণ তাঁহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বিশেষ অবস্থার জন্ত তিনি তিন মাস পূর্ব্বে পদত্যাগ করেন নাই। নিখিল ভারতের এইরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রিপদে থাকিয়া হয়ত লোকের কিছু উপকার করিতে পারেন, এই আশাতেই তিনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান-সচিব ও ভারত-সচিব এই বলিয়া জাঁক করেন যে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বর্ত্তমান শাসন-পরিষদের মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে ভাগ্য ন্যস্ত করিয়া সুখী আছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনি তাঁহাদের উক্তির জবাবে বলিতেছেন যে, "আমি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়াও বলিতে পারি—বঙ্গে যে শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী নহে, উহা একটা বিরাট্ প্রহসন মাত্র।" তিনি ১১ মাসের অভিজ্ঞতার ফলে এই কথা বলিয়াছেন। "গত এক বৎসর কাল ধরিয়া বাঙ্গালায় এই দ্বৈত-শাসন চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার গভর্ণর অনেক অনেক অত্যাবশ্যক ব্যাপারে মন্ত্রীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে যদি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত-সচিবের অনুসন্ধান করিবার সাহস থাকে, তাহা হইলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন এদেশে কত দূর শূন্যগর্ভ, তাহা প্রকাশ পাইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "গভর্ণরের এই ভাবভঙ্গীতে তাঁহার মনে সাধারণ ভাবে অসন্তোষ উপস্থিত হইলেও দুইটি বিশেষ বিষয়ের প্রতিকার করিতে না পারায় তাঁহার মন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে। একটি,—পাইকারী জরিমানা আদায়; আর একটি,—মেদিনীপুরের অবস্থা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। অর্ডিন্যান্স অগ্রাহ্য করিয়াই পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে। দোষী-নির্দ্দোষ-নির্ব্বিচারে কেবল হিন্দুদিগের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। আমরা বারংবার প্রার্থনা করিলেও গভর্ণর এই বিষয়টির পুনর্ব্বিচার করিতে চাহেন নাই। আমি এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে রাজনীতিক আন্দোলন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল অবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছিল। লোকের জীবন, ধন-সম্পত্তি এবং নর-নারীর ব্যক্তিগত সম্মান সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তাহার পর মেদিনীপুরে এই দুর্বিপাক ঘটিয়াছে। এই উপলক্ষে কতকগুলি রাজপুরুষের এবং গভর্ণরের অবিলম্বে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্য করিতে গভীর শৈথিল্য লক্ষিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ অর্থহীন হইবে।"—আমরা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। যে ক্ষেত্রে ঐরূপ স্বৈরতার সহিত কার্য্য হয়, সে ক্ষেত্রে মন্তব্যপ্রকাশ নিষ্ফল। শ্যামাপ্রসাদ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, "তিনি জেলের ভিতরের এবং বাহিরের লোকদিগের সহিত আলোচনা করিয়া যত দূর বুঝিয়াছেন, তাহাতে যদি বিচক্ষণতার, সহানুভূতির, এবং অনুকম্পার সহিত কার্য্য করা হইত, তাহা হইলে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এক-প্রাণে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিত।"

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বিবৃতি পাঠে বেশ বুঝা যায়—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য—উহা যে কেবল লোককে ধাপ্পা দিবার জন্তই পরিকল্পিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল শ্যামাপ্রসাদ বাবুই এই অভিযোগ করেন নাই; সিন্ধুর পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সও বলিয়াছেন যে, এই নামে-মাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন

কেবল একটা প্রহসন এবং প্রবঞ্চনা (Farce and fraud) মাত্র। শ্যামাপ্রসাদ বাবুও উহাকে একটা বিরাট্ পরিহাস (a colossal mockery) বলিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী মিষ্টার চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি এবং বাঙ্গালার স্বাধীনচেতা ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ও এইরূপ অসার ব্যবস্থায় ব্যথিত হইয়া মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে মন্ত্রীদিগের হাতে যদি সম্যক্ ক্ষমতা না থাকে,—মতভেদ ঘটিলে যদি স্থায়ী রাজপুরুষদিগের জিদই পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা হয়,—জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের যুক্তিযুক্ত কথা যদি ভাসিয়া যায়—তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে কোনমতেই প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন বলা যাইতে পারে না।

মেদিনীপুরের ভীষণ ঝঞ্ঝা

গত ২১শে আশ্বিন মহাসপ্তমী ও তাহার পর দিন বাঙ্গালার মেদিনীপুর জিলায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমায়, এবং ২৪ পরগণা—ডায়মণ্ড-হার্ব্বারের সন্নিহিত স্থানগুলির যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনাও কল্পনার অতীত! প্রথমে ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ পায়, মেদিনীপুর জিলায় ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পরে অনুমিত হয় যে, মেদিনীপুর জিলাতে প্রায় ৪০ হইতে ৫০ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত, এবং ২০ লক্ষ লোক গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। দুই সপ্তাহ দার্জ্জিলিঙে অতিবাহিত করিবার পর বাঙ্গালার গভর্ণর বিমানযোগে মেদিনীপুর পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, "বিমান হইতে আমি দেখিলাম যে, গ্রামগুলিতে সজীব প্রাণী নাই। উহা জলপ্লাবনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু বর্গ-মাইল স্থানে গৃহপালিত পশুর ও শস্যের অস্তিত্বও নাই। শুষ্ক ভূমিতে প্রায় সকল বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। কুটীরগুলি বাসের অযোগ্য হইয়াছে; পাকা বাড়ীর ছাদ ও প্রাচীর উড়িয়া গিয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে ঝড়ে বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, সে-ঝড়ের পরেই বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল মিষ্টার বিভার্লিকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন—"এই ব্যাপারে কত লোক মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় নাই—হইবেও না। ইহা অনেকটা অনুমান করা যায় মাত্র। অনুমান কখন ঠিক হয় না।" এবারও সেই কথা বলা যাইতে পারে। যেখানে প্রবল ঝড়ে বড় বড় মহীরুহ ভূপতিত হইয়াছে, বারিধির জলোচ্ছ্বাসে গ্রাম-জনপদ ভাসিয়া গিয়াছে, যেখানে অন্ততঃ বিশ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে, সেখানে যে ৪০-৫০ হাজার লোক মরিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? চাষের জমিতে সাগরের লোণা জল প্রবেশ করিয়া জমির উর্ব্বরতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এই বিপত্তির কোনো সীমা পরিসীমা নাই; অথচ এই দৈব-দুর্ব্বিপাকের সংবাদ ১৭ই কার্ত্তিকের পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়া ছিল! আমাদের প্রশ্ন—২রা কার্ত্তিক বিজয়া দশমীর পূর্ব্বে এই প্রকারের একটা বায়ু-বিলোড়ন ব্যাপার যে ঘটিবে, সরকারের নভোবিজ্ঞান বিভাগের কর্ম্মচারীরা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে কি তাহার পূর্ব্বাভাস দেন নাই? যদি তাঁহারা তাহা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে শাসন-বিভাগের রাজপুরুষরা সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? কলিকাতা হইতে বিমানযোগে কাঁথি বা তমলুকে যাইতে ৪৫ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। মেদিনীপুরের শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এই দারুণ দুর্ব্বিপাকের অব্যবহিত পরে কি করিয়াছিলেন? লোকজনের উদ্ধার, সান্ধ্য আইন রহিত করিয়া দিয়া নৌকায় করিয়া লোকদিগকে সাহায্য করা হইয়াছিল কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর মিলিবে কি? ১১ দিন পরে ১০ই কার্ত্তিক রাজস্ব-বিভাগের মিষ্টার বি আর সেন—ও তাহার দুই দিন পরে তিন জন মন্ত্রী ধ্বংসক্ষেত্রে অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছিলেন। এত বিলম্ব কেন? ইহার উত্তরে রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন, সরকারের স্থায়ী আদেশ অনুসারেই উহা ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার বিবৃতি এবং সাধারণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে অর্থাৎ এই ধ্বংসলীলার ১ মাস ২ দিন পরে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ বিলম্ব আর কস্মিন্ কালে কোন দেশে ঘটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। যে স্থানে বিশ লক্ষ লোকের জীবন ঘোর বিপন্ন, সেখানে সাহায্য-দানের জন্য এত বিলম্ব কি শাসকদিগের সুবন্দোবস্তের এবং কর্ম্মতৎপরতার পরিচায়ক?

এক জন মার্কিণী মহিলা মেদিনীপুরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া-আসিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। ইনি ইংরেজ-বন্ধু। ইঁহার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, (১) দুর্গতিগ্রস্ত অঞ্চলের লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং আরও শোচনীয় হইবে। লোকের খাইবার কিছুই নাই, গৃহপালিত পশু নাই,—মাথা রাখিবার আশ্রয় নাই, আশ্রয় নির্ম্মাণের উপকরণও নাই। (২) সরকারী সাহায্য দান করা হইতেছে সত্য, কিন্তু উহা অত্যন্ত মন্থর ভাবে এবং বিলম্বে। এরূপ বিলম্বে সাহায্য দান করা সাহায্য না-করার মতই নিষ্ফল। (৩) কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকেরা প্রায় উলঙ্গ বলিয়া সাহায্য লইতে আসিতে পারিতেছে না। (৪) দুইখানি গ্রামের লোক ৫ দিন ধরিয়া চাউল পায় নাই। (৫) লোককে অবিলম্বে বিনা-মূল্যে সাহায্য দিতে হইবে। অথচ কর্ত্তৃপক্ষের প্রয়োজনানুরূপ ক্ষিপ্রতার অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল অঞ্চলে পানীয় জলের একান্ত অভাব। উন্মুক্ত প্রান্তরে অনাবৃত দেহে শীতের প্রকোপে লোকে কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে।—একে তো সরকারী সাহায্যের গতি মন্থর, তাহার উপর বে-সরকারী সাহায্য সরকারী বিধি-নিষেধের কঠোর নিগড়ে কুণ্ঠিত। যাহারা এইরূপ দুরবস্থায় পতিত, তাহাদের অনেকেই রাজনীতিক আন্দোলনের ধার ধারে না; তাহারা কোনরূপে অতি কষ্টে দিন কাটায়। ভগবানের প্রকোপে পতিত দুঃস্থদের প্রতি রাজনীতিক বিক্ষোভের জন্য দানের হস্ত কোনমতে সঙ্কুচিত করা বিধেয় নয়। মনে পড়ে, এক দিন লর্ড নর্থব্রুক অনুরূপ বিপদে পতিত জনগণের দুঃখ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, অনাহারে যেন এক জন লোকও মারা না যায়। আর আজ এত বড় ধ্বংসলীলার পর দুই মাস অতীত হইল, এখনও অনেক স্থানে সাহায্য পৌছিতেছে না, শুনা যাইতেছে! সামরিক প্রহরীরা যে ক্ষেত্রে রাজস্ব-সচিব এবং সিভিলিয়ান মিষ্টার বি আর সেনকেও ম্যাজিষ্ট্রেটের ছাড়পত্র না দেখাইলে খেয়া পার হইতে দেয় নাই, সে ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থায় সাধারণ কর্ম্মীদিগের পক্ষে কাজ করা কত কঠিন, অনায়াসেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। বাঙ্গালার

গবর্ণর প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, দেশবাসী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহায্য-ভাণ্ডারে, কিম্বা যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কার্য্যতঃ সাহায্যদান-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রদান করিতে পারেন। এখন শুনা যাইতেছে, সকল প্রতিষ্ঠানের টাকাই যাহাতে গবর্ণরের সাহায্যভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়, সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাই চাহেন। এইরূপ বিস্ময়কর আব্দার করিবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে বেসরকারী সাহায্য-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এমন কথাও শুনা যাইতেছে, যে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ সরকারের ভাণ্ডারে জমা দিবেন না, তাঁহাদের সে টাকা ফুরাইলে তাঁহাদিগকে সাহায্যদান-কার্য্য গুটাইতে হইবে। নিতান্ত বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য-দান-কার্য্যে এত বিধি-নিষেধ কি সঙ্গত? বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহ-বর্দ্ধনকল্পে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। আশা করি, বাঙ্গালার লাট স্যর জন হার্ব্বার্ট এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সরকারী বিবৃতি

মেদিনীপুরের দুর্ব্বিপাক সম্বন্ধে সরকারের ২০শে অগ্রহায়ণের বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলের লোক আইন ও শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করিয়া অনেক অনাচার করিয়াছে। সরকার বলিতেছেন যে, কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় শৃঙ্খলাসম্পন্ন সরকারকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং হইতেছে,—এখন পর্য্যন্ত তথায় সরকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। "মেদিনীপুরে যখন এই ঝটিকা এবং জলোচ্ছ্বাস ঘটে, তাহার পূর্ব্বেই আইন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীরা রাজপথ এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, থানা, ডাকঘর, অন্যান্য সরকারী গৃহ, খেয়া এবং নৌকা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার অথবা বিতাড়িত হইয়াছিল; স্থানে স্থানে উহারা প্রহৃতও হইয়াছিল।" শ্যামাপ্রসাদ বাবুও তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, "মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে রাজনীতিক আন্দোলন অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা আনিয়াছিল (took a serious turn)।" যাহারা ঐ অবস্থা করিয়াছিল, তাহারা যে কংগ্রেসপন্থী নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, অহিংসাই কংগ্রেসের মূলমন্ত্র। হিংসা এবং প্রতিহিংসার দ্বারা এ দেশে কোন পক্ষই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে না। এ দেশের মহামানব বলিয়াছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটা আসুর দোষ,—এই তিনটাই সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ক্রোধই হিংসা এবং প্রতিহিংসার জনক। গান্ধীজীও হিংসা এবং প্রতিহিংসা উভয়েরই তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানিতে চাহি যে, মেদিনীপুরে সরকারের যে সৈনিক ও পুলিস ছিল, তাহারা কি সে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা দমন করিতে পারে নাই? তাহারা কি উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগকে বাধা দেয় নাই? সরকার পুলিসের ব্যয়ই বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু সে অর্থ কি দরিয়ায় ডালি দেওয়া হইতেছে,—কাজে কিছুই হইতেছে না? আমরা হিংসা এবং প্রতিহিংসাকারী উভয় দলেরই তুল্যভাবে নিন্দা করি। মেদিনীপুরে যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাহায্যদান কার্য্যে বাধা ঘটিতে পারে,—কিন্তু অপর পক্ষের প্রতিহিংসা-পরায়ণতাই যদি সে বাধার কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও কি নিন্দনীয় নহে? গান্ধীজী হিংসা এবং প্রতিহিংসা উভয়েরই তুল্য ভাবে নিন্দা করিয়াছেন; শ্যামাপ্রসাদ বাবুও হিন্দুভাবে প্রভাবিত; তিনিও বলিয়াছেন, মেদিনীপুরে যাহারা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। দৈব-বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়া যাহারা দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় পতিত, তাহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিহিংসা-শূন্য হইয়া কাজ করাই বলবান পক্ষের ও বীর-পুরুষের কর্ত্তব্য। ইহা হিন্দুর চিরকালের মত। মেদিনীপুরে একাধিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হইয়াছেন, এবং অনেক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইহা সত্য। কেহই উহার প্রশংসা করে নাই। সকলেই ঐ কার্য্যের নিন্দাই করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিপন্ন লোকদিগকে দৈবনিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার সময় সেই ক্রোধ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য নহে। প্রতিহিংসার দ্বারা হিংসা প্রতিরুদ্ধ হয় না,—প্রেমের দ্বারাই হিংসাকে জয় করা সম্ভব। মেদিনীপুর হইতে অনেক কথাই শুনা যাইতেছে। সে সকল কথার অপ্রিয় আলোচনার প্রয়োজন নাই। যাহারা এক সঙ্গে বিপন্ন হইয়াছে, তাহারা যে সকলেই হিংসাপন্থী হইয়া কাজ করিয়াছে,—ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। যাঁহারা হিংসাপন্থী নহেন, এবং কাহারা হিংসাপন্থী, তাহাও জানেন না, তাঁহাদিগকে সাহায্যদানে শৈথিল্য করা কি সঙ্গত?

সরকারই স্বীকার করিয়াছেন,—ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুর জিলায় দুর্ভাগ্য অধিবাসীরা যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব কত অধিক, তাহা সংবাদপত্রে পরে প্রকাশিত হইলেও, তাহাতে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মনে সমবেদনা জাগিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যথাসময়ে সে সংবাদ প্রকাশ করা হয় নাই কেন? সে জন্য কি কেহ দায়ী নহে?

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, সরকার নিরপেক্ষ সমিতির দ্বারা ঝটিকার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সময়ে মেদিনীপুরের রাজপুরুষ এবং দেশের লোকের ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন। তাহা হইলে সব কথাই প্রকাশ পাইবে। সরকার কি বলেন?

কুইনাইনের অভাব

ম্যালেরিয়া ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ব্যাপক—প্রবল ব্যাধি। বৃটিশ-ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ১৫ লক্ষ লোক এই রোগে মরে এবং প্রায় দুই কোটি লোক জীবন্মৃত হয়। কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার অমোঘ ঔষধ। বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার বিষাণ বাজিতেছে, কিন্তু এবার বাজারে কুইনাইন দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। অল্প মাত্রায় কুইনাইনে কোন কাজ হয় না। জ্বরের উপশান্তি হইলেও কুইনাইন অন্ততঃ এক সপ্তাহ খাইয়া যাইতে হয়। এবার কুইনাইনের পাউণ্ড আঠারো টাকা হইতে সাড়ে তিন শ' টাকায় উঠিয়াছে। এক গ্রেণ কুইনাইনের দর মফঃস্বলে দু' আনা। কাজেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে নিস্তারের উপায় নাই। প্রকাশ, সরকার অনেক কুইনাইন দেশবাসীর জন্য ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু তাহার লক্ষণ ত দেখা যাইতেছে না। কুইনাইনের দাম ত কমিতেছে না। ব্যাপার কি?

ভারত সম্বন্ধে মার্কিণীদিগের সিদ্ধান্ত

মার্কিণের কতকগুলি সাংবাদিক এবং রাজনীতিক লেখক স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিতেছেন,—তাহা পাঠ করিয়া

বিলাতের কাঠপরাণে (diehard's) সাম্রাজ্যবাদীরা একেবারে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বিখ্যাত লেখক মিষ্টার লুই ফিশার মার্কিণের 'নিউ ইয়র্ক নেশনে' কি জন্য ক্রীপ্‌সের মিশন ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিলাত এবং ভারতের 'কাঠপরাণে'দিগের কার্য্যফলে উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। মিষ্টার উইণ্ডেল উইলকি মধ্য-এসিয়া, রুশিয়া এবং চীন-মুলুক ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে, সকলেরই মুখে একই প্রশ্ন—ভারতের কি হইল? কায়রো হইতে সর্ব্বত্র সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভারতের কি ব্যবস্থা হইল? চীনের অনেক বিশিষ্ট অধিবাসী তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর আশা এবং আকাঙ্ক্ষা যদি কিছু দিনের জন্য চাপিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সে জন্য বৃটেনের নিন্দা হইবে না, নিন্দা হইবে মার্কিণের। মিষ্টার এডগার স্নো মার্কিণের এক জন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক লেখক। তিনি সম্প্রতি ভারতে আসিয়া ভারত সম্বন্ধে মার্কিণী কাগজে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "কংগ্রেস বৃটেনের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, কার্য্যতঃ ভারতের সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির তাহাই মত, সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকে এই মত পোষণ করেন।" ইনি বলিয়াছেন যে, "ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক।" মিষ্টার স্নো বলেন যে, "মানুষের শক্তিতে যতখানি সম্ভব সেই ভাবে ভারতকে রক্ষা করিতে হইবে।" মার্কিণ সাংবাদিকের পত্নী শ্রীমতী জন গাম্থার 'নিউ রিপাবলিক' পত্রে ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক দল—স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছেন। ইংলণ্ড ইহার প্রতিকূলে বলেন,—ভারতে অধিকাংশ লোকের মতানুসারে শাসননীতি চলিবে না—বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ভারতে গণতন্ত্র চলিতে পারে না। যে মুসলমানসমস্যা, জাতিসমস্যা, এবং রাজন্যসমস্যা বিকৃত ভাবে খাড়া করা হইয়াছে, তাহা আত্মপ্রতারণাপূর্ণ ভ্রান্তিজাল-জনক মিথ্যাবাদ। এ সকল কথা বিপজ্জনক, এই সকল উক্তি পড়িয়া কাঠপরাণে সাম্রাজ্যবাদীর দল স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত মিথ্যার প্রচার করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আত্মস্বার্থ মানুষকে এতই অবনত করে!

সর্ব্বদল-সম্মেলনে সার তেজবাহাদুর

সার তেজবাহাদুর সপ্রু ধীরপন্থী। তিনি ভারতীয় সমস্যার সমাধানে সর্ব্বদলের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে আহ্বান করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার প্রস্তাব ছিল। বড়লাট বাহাদুরকে ঐ সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে। তিনি যদি উহা আহ্বান করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে সার তেজবাহাদুর নিজে উহা আহ্বান করিতে সম্মত ছিলেন। গান্ধীজী ঐ সম্মেলনে কোন ফল হইবে না মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি সম্মেলনে যোগদান করিবেন, বলেন। সার তেজবাহাদুর বলিয়াছেন যে, ঐ সম্মেলন আহূত হইলে ফল ভাল হইত। আসল কথা, সাম্রাজ্যবাদীরা বর্ত্তমান অচল অবস্থার সমাধান করিতে সম্মত নহেন। জন কয়েক মুসলমানের নেতা এবং স্বয়ং-হরিজননেতা আম্বেদকর প্রভৃতি ভিন্ন আর সকল ভারতবাসী এই অচল অবস্থার সমাধান করিতে চাহেন। আমাদেরও ধারণা এই যে, এই সর্ব্বদল-সম্মেলনে কোন ফল হইবে না; কারণ, বৃটিশ জাতি তাঁহাদের ক্ষমতা ত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। সার তেজবাহাদুর আরও বলিয়াছেন যে, উপস্থিত কিছু কালের জন্য জাতীয় সরকার সংগঠন ব্যাপারে তিনি ভারতীয়দিগকে শাসনযন্ত্র পরিচালনে নিযুক্ত করিলে সন্তুষ্ট হইবেন না। শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারত-সচিব, ইণ্ডিয়া আফিস অথবা বড়লাটের হাতে থাকিলে চলিবে না। উহা ব্যবস্থাপক সভার হস্তে অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে; নতুবা কেবল ধলার স্থানে কালা-বুরোক্রেসী বসাইলে কিছুই হইবে না।

বঙ্গীয় সরকার ও বাজার-দর

বঙ্গীয় সরকারের বাজার-দর সম্পর্কিত বিভাগের কাণ্ড দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছি। এই বিভাগ হইতে বাজার-দর সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, সে দরে কুত্রাপি জিনিষ পাওয়া যায় না। বাঁকতুলসী চাউলের মূল্য লিখিত হইয়াছে ১০ টাকা হইতে ১১ টাকা মণ, পাটনাই ৭ টাকা চার আনা আর মোটা চাউল ৬৸০। এই দরে কোথায় চাউল পাওয়া যায়? মফস্বলে চাউল দশ টাকা ও কলিকাতায় পনেরো টাকা মণ বিকাইতেছে। আটা ২২শে অগ্রহায়ণ না কি পৌণে ৯ টাকা মণ বিকাইয়াছিল; কিন্তু কুড়ি টাকার কম কোথাও মেলে নাই। তাহা হইলে এই দর প্রকাশ করিয়া লাভ কি? মফস্বলে চাউলের ও আটার বড়ই অভাব। সবটাই কি "আঁধার বাজারের" দোষ? সরকারী ব্যবস্থায় চিনি ছয় আনা সের, কিন্তু বাজারে ২৫ টাকা মণ। সর্ষপ তৈল ৩০ টাকা ৩২ টাকা মণের কম মিলিতেছে না। বাঙ্গালায় বহু লোক খাইতে পাইতেছে না,—অথচ ইরাক, ইরাণ, সিংহলে এ দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইতেছে। যে দরে জিনিষ মিলিতেছে না,—সরকারী ইস্তাহারে জিনিসের সেই দর লিখিলে কি লোকের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে? 'ক্যাপিটালে' প্রকাশ, এবার ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ১০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ অল্প হইয়াছে। সুতরাং ধানের ফসল ১ কোটি মণ কম হইবে। তাহার উপর ঝড়ে জলে অনেক ধান নষ্ট হইয়াছে। এখন সরকার যদি আবার ভারত হইতে চাউল চালান দেন, তাহা হইলে অর্দ্ধাহারে বাঁচিয়া অনশনে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত পরলোকে

প্রতিভাবান্ প্রবীণ ঔপন্যাসিক—একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক—বন্ধুবর কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে, ২৭শে কার্ত্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। যশোহর জিলায় তাঁহার জন্ম। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শিক্ষাব্রত ও সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদের দেশব্যাপী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্ম্মিরূপে তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের শিক্ষাদান ও উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাহা যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হইলে আজীবন তাহার কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। 'মালঞ্চ' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রথম বিকাশ।

বহু উপন্যাস—গল্প প্রণয়নে—বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রবন্ধ—'রাজপুত-কাহিনী' প্রভৃতি প্রকাশে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সার্থক হইয়াছিল। 'মাসিক বসুমতী' তাঁহার বহু গল্পে, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাস গল্পের ভিতর শিক্ষার—আদর্শের অন্তঃসলিলা প্রবাহ লীলায়িত হইয়া সাহিত্যকে স্নিগ্ধ—সরস করিয়াছে। 'দৈনিক বসুমতী'তে কংগ্রেস ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জাতীয় জীবন সংগঠনের পর্য্যাপ্ত উপাদান সুসজ্জিত হইয়াছিল। তিনি "হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান" গ্রন্থে হিন্দু সমাজতন্ত্রের সহিত রুশিয়ার সাম্যবাদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চিন্তাশীলতার শ্রেষ্ঠতম দান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র-পরিজনগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

'একে একে নিবিছে দেউটি'—মাতৃভূমির অলঙ্কার—বঙ্গ-বরেণ্য মনীষী সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ২০শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায়, ৬৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর মন্মথ বাবুর জন্ম। তাঁহার পিতা অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ই, বি, রেলের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ও রিপণ কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৮ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা—শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া, তিনি ১৯২৪ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারকের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৪—৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দে তিন বার তিনি প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক বলিয়া তিনি খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন—বিচারকের মহান্ আদর্শ হইতে কোন দিন বিচ্যুত হন নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি ভারত সরকারের আইন-সদস্যরূপে কার্য্য করিবার পর চার বৎসর পাটনা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর হিন্দুর অতি দুঃসময়ে হিন্দুদিগের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের সংরক্ষণ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর জন্য অধিকার প্রার্থনা করিলেও তিনি ন্যায় ভিন্ন কোন অসঙ্গত বা অতিরিক্ত অধিকার চাহেন নাই; ইহা তাঁহার নিঃস্বার্থপরতা, স্বাধীন মনোবৃত্তি এবং মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। মালদহের কানসাটে ও দিনাজপুরে প্রতিমা-বিসর্জ্জন উপলক্ষে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি হিন্দুর জন্য কোন অতিরিক্ত অধিকার প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের পক্ষপাতদুষ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা-বিস্তারের কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতিকূলে যে যুক্তিযুক্ত নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তেজস্বিতা ও মনোবলেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সার মন্মথনাথ দেশহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন; কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবাসী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েসন, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, মেডিকেল স্কুল, প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার সুপরামর্শ লাভ করিয়া যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। আইনে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহার প্রণীত আইন-গ্রন্থরাজি বিচারকার্য্যের সহায়ক হইয়াছে।

আজ বঙ্গভূমি সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষে জর্জ্জরিত—প্রাকৃতিক উপপ্লবে বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চল বিপন্ন—মৃত্যুর সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত, পরাভূত, বিধ্বস্ত দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারাকক্ষে আবদ্ধ, এ সময় বাঙ্গালী তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী দৃঢ়চিত্ত নেতার সহযোগিতা ও সুপরামর্শে বঞ্চিত হইল, ইহা বাঙ্গালীর অল্প দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। তাঁহার ন্যায় আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুবিচারক—নিষ্ঠাবান্ স্বদেশ-সেবকের অভাবে এই সঙ্কট সময়ে যে ক্ষতি হইল, অদূর ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরলোকে মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—পরিচালক মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে কাশীলাভ করিয়াছেন। ইহা হিন্দুর বাঞ্ছিত মৃত্যু। মথুর বাবু বি-এ পাশ করিয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্যের পর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন এবং ক্রমে ভারতের প্রায় প্রত্যেক সহরে বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া সুলভ মূল্যে কবিরাজী ঔষধের বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-সাধনা সার্থক হইয়াছে।

—

রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসু

মেদিনীপুরের খ্যাতনামা উকিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায়-বাহাদুর মন্মথনাথ ব ৴ ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুরে ওকালতি আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল মেদিনীপুর জিলা-বোর্ডের সদস্য ও মিউনিসিপালিটির সভাপতিরূপে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সমবায় আন্দোলনের পরিচালকরূপে সমবায় বিভাগের 'সিলভার জুবিলি' পদক লাভ করিয়াছিলেন।

—

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

বাঙ্গালা—২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ ফজলুল হক প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালার কয়েক জন প্রতিপত্তিশালী জমিদার পাইকারী জরিমানা আদায় সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী নোটিশের ভাষায় হিন্দুদিগের অভিযোগের সঙ্গত কারণ আছে। বাঙ্গালায় অর্ডিন্যান্সের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া দোষী ও নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে প্রধানতঃ হিন্দুদিগের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হয় এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও গভর্ণর এই অবস্থার প্রতীকার করিতে সম্মত হন নাই, এই হেতু প্রদর্শন করিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সচিব-পদ ত্যাগ করেন।

কলিকাতা—২রা অগ্রহায়ণ গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের ডাঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত উৎফুল্ল রায়, শ্রীযুত রণজিৎ মজুমদার এবং অনিলচন্দ্র শ্রীবাস্তব, সত্য চৌধুরী, সুরথ বংশ সিং, দেবেন্দ্রবিজয় দত্ত ও ননীগোপাল মজুমদার গ্রেপ্তার। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার ১৩ স্থানে তল্লাসী, ৬ জন গ্রেপ্তার। প্রমাণাভাবে রণজিৎকুমার মিত্র ও বিভূতিভূষণ বসুকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবামাত্র তাঁহারা ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার। ৩রা—রিভলভার ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র প্রাপ্তির অভিযোগে ২ জন গ্রেপ্তার। ৫ই—স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (শরৎকুমার ঘোষ) গ্রেপ্তার। ৬ই—শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ১৭ই অগ্রহায়ণ বিনা সর্ত্তে মুক্তিদান। ১১ই হইতে প্রায় প্রত্যহ কলিকাতার বহু স্থানে তল্লাসী। ১৭ই—শ্যামপুকুর ও শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে দমকল-বাক্স ভাঙ্গিবার অভিযোগে এক জন গ্রেপ্তার। গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক ৪ স্থানে তল্লাসী, ডাঃ আবদুল রসিদ চৌধুরী ও মিঃ আহম্মদ উল্লা কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত। ১৮ই—উত্তর ও দক্ষিণ—কলিকাতার ৪ স্থানে তল্লাসী। ১৯শে—৩ স্থানে তল্লাসী। দক্ষিণ সহরতলীর এক রেল-ষ্টেশন আক্রমণ। আক্রমণকারীদের দ্বারা বোমা নিক্ষেপ, ষ্টেশনের টাকা লুণ্ঠন। ২০শে—স্থানে স্থানে ডাক-বাক্সে অগ্নিসংযোগ ও ট্রামগাড়ী আক্রান্ত। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট ট্রাম লক্ষ্য করিয়া পটকা নিক্ষেপ। ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে প্রবল বিস্ফোরণ; বালীগঞ্জেও ট্রামের তার কর্ত্তন, ৩ জন গ্রেপ্তার। রাসবিহারী এভিনিউ-এ ট্রামে-রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ বোতল নিক্ষেপের ফলে ট্রামে অগ্নিকাণ্ড। কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে জনতার ট্রাম আক্রমণ। ৩ জন গ্রেপ্তার, ট্রাম চলাচল সাময়িক ভাবে স্থগিত, বিক্ষোভকারীদের চেষ্টায় ট্রামে ট্রামে সংঘর্ষ। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের গৃহে তল্লাসী। সহরের কোন কোন অঞ্চলে হরতাল। বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার। ২১শে—দুই স্থানে তল্লাসী। ২২শে—নিমতলার ট্রাম-ডিপোর সম্মুখে ৩খানি ট্রামে দাহ্য পদার্থপূর্ণ কতকগুলি বোতল ভয়ঙ্কর শব্দে ফাটিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নিকাণ্ড। এক ট্রামচালক আহত। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আর একখানি ট্রামে পটকা নিক্ষেপের ফলে গাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড। হাটখোলা ও বড়বাজার ডাকঘরে অগ্নিদান, দুই স্থানে তল্লাসী। ২৪শে—সেণ্টজেভিয়ার্স ও রিপণ কলেজে ছাত্রধর্ম্মঘট। ছাএশোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ, জি-পি-ও ও হ্যারিসন রোডের ডাক-বাক্সে অগ্নিদান। ২৫শে—৬ স্থানে তল্লাসী। পূর্ব্বদিন রিপণ কলেজ হইতে হ্যারিসন রোড দিয়া যে শোভাযাত্রা চলে, তাহা ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় শ্রীযুত, মহীতোষ রায়চৌধুরীর পুত্র সুশীল রায়চৌধুরী ও অজিতকুমার ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে ৩ জন তরুণী ও তিন জন যুবক গ্রেপ্তার। ২৬শে—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে বোমা বিস্ফোরণ, ২ জন আহত।

ঢাকা ১লা অগ্রহায়ণ সূত্রাপুরের এক গন্ধকবিক্রেতা বিস্ফোরণ দ্রব্য আইন অনুসারে ও ভাঃ রঃ বিধির ৩০৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, হাবিলদার ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্যের গৃহে সে বোমা নিক্ষেপ করে। ২রা—কয়েক দল যুবক কর্ত্তৃক জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বিভিন্ন বিভাগ আক্রমণ ও অগ্নিদান ও আফিস হইতে ৮ শত টাকা লুণ্ঠন। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী দলের কিশোরীলাল জুবিলি হাইস্কুলের আফিস আক্রমণ, ১৫১ টাকা লুণ্ঠন। যুবকদলের কলেজিয়েট স্কুল ও গ্রাজুয়েট হাইস্কুল আক্রমণ। ১৩ই—পিয়ারীলাল রোডস্থিত জিলা কংগ্রেস সমিতির কার্য্যালয় পুলিসের দখল। ২৪শে—রাজনগর বাজারে সভা অনুষ্ঠানের অভিযোগে মথুরামোহন কুণ্ডু, সুধীর কুণ্ডু ও অগ্নিকুমার সরকারের প্রত্যেকে নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২৫শে—অনিষ্টকর রিপোর্ট রাখার অভিযোগে জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত বীরেন্দ্রমোহন পোদ্দার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২৬শে—মাণিকগঞ্জে তল্লাসী, দুই জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, স্বর্ণগ্রামে (মুন্সীগঞ্জ) এক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষার খাতা অপসারণ, ৮ জন ছাত্র গ্রেপ্তার।

বর্দ্ধমান - মুচলেখা বা জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় ভারত গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩ মাস কারাদণ্ড। মেমারি থানার বামুনিয়া গ্রামের দণ্ডবিধির ১৪৭।৪৫৪ ধারা এবং ভারতরক্ষা বিধির ৩৫ (ক) ধারা অনুসারে ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন। ২৩শে কাটোয়া মহকুমার কাইচর গ্রামে য়ুনিয়ন বোর্ড, ঋণসালিশী বোর্ডের আফিস, পচাই মদের

দোকান ও হাইস্কুল ভস্মীভূত। ১১শে—বর্দ্ধমান রাজ-কলেজের "কমলা লজ" নামক বোর্ডিংএ ও বীরহাটা মহল্লায় এক স্থানে তল্লাসী, ২ জন ছাত্র গ্রেপ্তার।

বাঁকুড়া—১৬ই বাঁকুড়া জিলাবোর্ডের সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ ও শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসুর পুনরায় গ্রেপ্তার ও বাঙ্গালা সরকারের আদেশে মুক্তিলাভ। পূর্ব্বে এক মাস আটক থাকিবার পর তাঁহারা ৯ই অগ্রহায়ণ মুক্তি পান। ২৩শে—চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে অসম্মত হওয়ায় বৃন্দাবনপুরে এক ব্যবসায়ীর দোকান লুঠ, কয় জন গ্রেপ্তার।

ত্রিপুরা—১২ই—ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের সম্পাদক শ্রীহরিগঙ্গা বসাক ঢাকায় ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। ১৬ই—ডাকঘরে অগ্নিদানের চেষ্টার অভিযোগে নবীনগর থানার বীরেন্দ্র বসুর ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

নোয়াখালী—৭ই—রেলওয়ে লাইন পাহারা দিবার জন্য পরশুরাম থানার এলাকার বহু ব্যক্তি স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত। ২৪শে ৫ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার।

বগুড়া—২রা বড় ডাকঘরের চিঠির বাক্সে অগ্নিদান। অপর এক স্থানের চিঠির বাক্স অপসারিত। ১৪ই—জিলা কংগ্রেসের সভাপতি মৌঃ মহম্মদ আজিজুল বারী গ্রেপ্তার।

মুর্শিদাবাদ—৩রা—পাটিকাবাড়ী ডাকঘর পুড়াইবার জন্য দুই জন গ্রেপ্তার। ১১শে—খাগড়া বড় ডাকঘরের চিঠির বাক্সে অগ্নিদান।

রাজসাহী—৩রা অগ্রহায়ণ জোয়ারির জমিদার শ্রীযুত নলিনীনাথ বিশি পাবনা কলেজ-প্রাঙ্গণে বক্তৃতাদানের জন্য দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

মালদহ—৩রা—হবিবপুর থানায় সভা করিবার জন্য ২ জন সাঁওতাল ও ১ জন পোলিয়ার কারাদণ্ড। ১৭ই—অবৈধ প্রচারপত্র রাখিবার জন্য মালদহ মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও জিলা কংগ্রেসের সদস্য উকীল শ্রীযুত রামহরি রায় ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

দিনাজপুর—২৩শে ভারতরক্ষা বিধির ৩৬ ও ৩৮ ধারা অনুসারে সমরেন্দ্র রায়, বিশ্বনাথ প্রসাদ, অরুণ রায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নিত্য ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকের ৬ মাস কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড।

ফরিদপুর—৩রা—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতরক্ষা বিধির ২৬(৬), ৫৬(৪) ও ৩৮(৫) ধারা অনুসারে ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। গোঁসাইহাট থানা দখলের চেষ্টার অভিযোগে ৯ জন প্রত্যেকের ১৮ মাস কারাদণ্ড।

মেদিনীপুর—বাত্যা ও প্লাবনে রামনগর থানার ১০নং য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্টের পরিবারের ২১ জনের মৃত্যু হয়, ৮ই অগ্রহায়ণ প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার।

নদীয়া—৩রা—শ্যামনগর ও রাণীনগর ডাকঘর, জমীদারের কাছারী পোড়ান সম্পর্কে দুই জন গ্রেপ্তার, ২ জনের নামে হুলিয়া বাহির। বহু স্থানে তল্লাসী। ২০শে—নদীয়া কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার, কুষ্টিয়ার ডাঃ সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরীর কারাদণ্ড।

বাখরগঞ্জ—২১শে—বাখরগঞ্জ কংগ্রেস-অফিস পুলিশ-দখল হইতে মুক্ত। বানরিপাড়ায় বক্তৃতাদান ও পিকেটিং করিবার জন্য শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা ও শ্রীযুক্তা যোগমায়া দত্তের (৬৫) কারাদণ্ড।

আসাম—ভারতীয় চা-বাগান মালিক সমিতির ৫৩তম বার্ষিক সভায় সভাপতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভাল রেলপথ ও রাস্তা থাকিলেও ১১ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে চিঠি প্রেরণ করিতে আসাম ডাক-বিভাগের ৫ দিন লাগে। কলিকাতা ও আসামের মধ্যে ডাক-আদান-প্রদানের অত্যন্ত বিলম্ব হয়। অনেক ক্ষেত্রে জরুরী তার বিলির পূর্ব্বে পত্র বিলি হয়। ১লা অগ্রহায়ণ—শ্রীহট্ট জিলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক গ্রেপ্তার। ৩রা—শ্রীহট্ট জিলার কুলাউড়া জয়চণ্ডী, ছাপাকান গ্রামের বহু স্থানে তল্লাসী, করিমগঞ্জ মহকুমায় পাথরকান্দি গ্রামে সাম্যবাদীদলের এক জন গ্রেপ্তার। ৪ঠা মৌলভী বাজারের আলায়া মাদ্রাসার প্রধান মৌলভী মৌলানা আবদুল বারী ও মৌঃ আজিজ আবদুল খাকে সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আন্তর্জাতীয় ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে দণ্ডিত হইয়া আপীলে মুক্তিলাভ করিলেও এক ব্যক্তির বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল। হবিগঞ্জে পুলিস কর্ত্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত কয়েক জনের বন্দুক গ্রহণ। ৮ই—আসামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলুই বর্ত্তমানে কোথায়, ব্যবস্থা পরিষদে এ সংবাদ প্রদানে সরকারের অস্বীকার। ১১ই—গৌহাটী লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ ডেকা গ্রেপ্তার। কামরূপ জিলার সার্কেল সাবডেপুটী কালেক্টারের অফিস ভস্মীভূত। ১৪ই টেলিগ্রাফ তারের ক্ষতি করিবার জন্য বিয়ানিবাজারে (শ্রীহট্ট) ৫ জন ছাত্র ও ১ জন শিক্ষক গ্রেপ্তার। ১৫ই—জগদীশপুর (শ্রীহট্ট) কংগ্রেস সমিতির সভাপতি শ্রীবিধুভূষণ দাস ও সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় প্রত্যেকের ৬ মাস কারাদণ্ড। বড়পেটা জিলা কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত। নিষিদ্ধ শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য সাম্যবাদী কর্ম্মী চুণী নাগের ৩ মাস কারাদণ্ড। ১৬ই—মৌলভী বাজারে দুই জনের কারাদণ্ড। ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও ৫ মাস বর্দ্ধিত। ১৭ই—বিনা লাইসেন্সে জল বা স্থলপথে লুসাই পাহাড় হইতে ধান্য ও চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ। ধুবড়ীর তিন স্থানে তল্লাসী। ১৮ই—হবিগঞ্জে শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়ের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। তিন স্থানে তল্লাসী। বিদ্যাশ্রমের সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র আচার্য্য ও অপর ৪ জন কর্ম্মী চট্টগ্রাম জিলার জোড়াগঞ্জ কেন্দ্রে ধৃত। বিদ্যাশ্রমের আরও ৩ জন কর্ম্মী বিয়ানিবাজার কেন্দ্রে গ্রেপ্তার। "স্বরাজ-সঙ্গীত" নামক পুস্তক বাজেয়াপ্ত। শ্রীহট্টে কংগ্রেসকর্ম্মী অবলাকান্ত গুপ্ত ও মনোমোহন ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার। ডিব্রুগড় ও লখিমপুরে সভা ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ। ২০শে—গৌহাটী জিলা কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ ভুবনেশ্বর বড়ুয়া ও লোক্যাল বোর্ডের সদস্য শ্রীযুত নরনারায়ণ গোস্বামীর কারাদণ্ড। লখিমপুর জিলায় সভাসমিতি ও জনসমাগম সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ৬ মাস বর্দ্ধিত। ২১শে—করিমগঞ্জে জমিউৎ-উল-উলেমার হাজী মৌলভী আবদুল হামাউ চৌধুরী ও ৩৭ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার। শ্রীহট্টে দশ জনের অধিক যুবক গ্রেপ্তার। শিবসাগরে বিদ্যালয়ের দুই জন পণ্ডিত ও অপর ৩ জন গ্রেপ্তার। ২৩শে—বড়পেটা কলেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ড। বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের তিনটি শ্রমিক বস্তীতে অগ্নিদানের অভিযোগে ৭ জন গ্রেপ্তার। ২৪শে—মজলিশ মৌলভী কোয়ারী আব্দার রহিম ও খিলসাদ—শ্রীযুত অমর [illegible] গ্রেপ্তার। ভটবঙ্গি মাদ্রাসার প্রধান মৌলভী জহরুল হকের [illegible]

তল্লাসী। বিলাতে কমন্স সভায় ভারত-সচিবের বিবৃতিতে প্রকাশ যে, আসামে ট্রেণ লাইনচ্যুত করায় অনেকের প্রাণহানি।

মাদ্রাজ—২রা অগ্রহায়ণ—হাইকোর্টে আপত্তিকর প্রচারপত্র বিতরণ করিবার জন্ত শ্রীযুত পেরুমল ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী আম্মাল গ্রেপ্তার। তেলিচেরীর সাব-রেজিষ্ট্রারের আফিস আক্রমণ করিয়া জনতার কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন। পুলিসের লাঠী চালন, ২ জন গ্রেপ্তার। ১১ই—ক্যানানোরের ২ গ্রামে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে নানা স্থানে তল্লাসী। ২১শে—সশস্ত্র ৩ শত ব্যক্তির বাসে অগ্নিদান ও বাস হইতে নগদ টাকাপূর্ণ সিন্দুক লুণ্ঠনের অভিযোগে মাদুরায় ১০ জন দণ্ডিত। দক্ষিণ গোপরাম মীনাক্ষী মন্দিরের নিকট পুলিস-ইনস্পেক্টর ও অপর দুই জনের উপর এসিড নিক্ষেপের অভিযোগে ১৬ জনের বিচার। এ মামলায় ১৩ জন নিরুদ্দেশ। ২৩শে—মালাবার জেলার সর্ব্বত্র জনসমাবেশ, লাঠি, ছড়ি বা অন্যান্য অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ। ২৫, ২৬শে হাইকোর্টের বিচার-কক্ষে সন্দেহজনক ধূমনির্গমন। এজলাস তল্লাসী।

বোম্বাই—১লা—ধারোয়ারের অন্তর্গত হোলিয়াপুর রেলওয়ে ষ্টেশন জনতা কর্ত্তৃক ভস্মীভূত। ২রা অগ্রহায়ণ বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ গিল্ডার, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের পুত্র শ্রীযুত দয়াবল্লভ পেটেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত সূর্য্যবল্লভ দাস, নিখিল ভারত গ্রাম-শিল্প সমিতির মিঃ জে, সি, কুমারাপ্পা, মিঃ বাটাসি ভানসি এবং শ্রীযুত কিকাভাই ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। পুণায় নানা স্থানে তল্লাসী, বোমা প্রস্তুতকারী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট এই অভিযোগে ১২ জন ছাত্র গ্রেপ্তার। তল্লাসীর ফলে আংশিক ভাবে প্রস্তুত বোমা, বারুদ, বিস্ফোরক রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা প্রস্তুতের মালমসলা আবিষ্কার। সুরাটের এক প্রস্রাবাগারে বোমা-বিস্ফোরণ। বেলগাঁওএ খাদি-বাজারে থানার নিকট বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্তি। হুবলীর জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুত শ্রীপদরাও সেবাদে গ্রেপ্তার। ডাঃ বি কে মনোহর ও ডাঃ বি কে বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাইএ গ্রেপ্তার। উত্তর কানাড়া জিলার সিদ্দপুর তালুকে সাঁকো অপসারিত করিবার অভিযোগে ১৭ জন গ্রেপ্তার। ৩রা—বেলগাঁওএর এক পথে ১৫ খানি গরুর গাড়ী বোঝাই শস্যাদি লুণ্ঠন। হুকেরীতে এক রাত্রিতে ৪ গৃহে ডাকাতি। বেলগাঁও জিলাবোর্ডের সভাপতি ও ৫ জন সদস্যকে আটক করায় সহ-সভাপতি ও ২২ জন সদস্যের পদত্যাগের ফলে অচল অবস্থা। আমেদাবাদ বেলগাঁওএর নানা স্থানে মেল-ব্যাগ লুণ্ঠন। ৪ঠা—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ত্রিকমদাস গ্রেপ্তার, সেপ্টেম্বর হইতে তাহার সন্ধান মিলে নাই। পুলিশ কর্ত্তৃক বার্দ্দোলি আশ্রম দখল, আশ্রম ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় কুমারী অনুসূয়া বেন ও দুই জন আশ্রমবাসী গ্রেপ্তার। ৪ঠা সুরাটে বিস্ফোরণকালে বালক আহত। ৬ই বেলগাঁও-হুবলী রেলপথের এক ষ্টেশন ভস্মীভূত। আমেদাবাদে রাত্রিকালে ১৬টি বোমা বিস্ফোরণের ফলে এক ইলেক্‌ট্রিক সাব-ষ্টেশনের বাড়ীর প্রাচীর নষ্ট। ২টি বোমা ফাটে নাই। ৭ই. বোম্বাই সহরের বাণিজ্য-কেন্দ্র সুওরচাওলে বোমাবিস্ফোরণে ১৪ জন আহত। সহরে তল্লাসী করিয়া বিস্ফোরক রাসায়নিক দ্রব্যপূর্ণ ১০.১২টি নল ও একটি ডুপ্লিকেটর যন্ত্র প্রাপ্তি। বিজাপুরের রেলওয়ে ষ্টেশন এবং হুবলীর নিকটবর্ত্তী গুর রেলওয়ে ষ্টেশন জনতা কর্ত্তৃক ভস্মীভূত। ৮ই আমেদাবাদে পুলিশ-চৌকীর নিকট বোমা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড। পুণার বিভিন্ন স্থানে ডাকহরকরা আক্রান্ত। বোম্বাই এক্সচেঞ্জ ভবনের সম্মুখে বসিয়া থাকিবার জন্ত বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার। মধ্যরাত্রিতে ৩০ জন সশস্ত্র মুখোসধারী লোক কর্ত্তৃক হোলেআলুর রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ, রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও প্রহরিগণ পরাভূত, প্রহরিগণের পলায়ন, কেরোসিন ও পেট্রোল দ্বারা অগ্নিদান, সমগ্র ষ্টেশন তৈজস ও খাতাপত্রাদি সহ ১৫ মিনিটে ভস্মীভূত। ঐ লাইনের জুমনল ষ্টেশনেও অগ্নিকাণ্ড। ১১ই, টুমিনকাটি থানা, রতিহালীর পূর্ত্তবিভাগের বাংলো এবং বড়-কুদামপুর হাটিকারী ফরেষ্ট ডিপো ভস্মীভূত। দাদারের এক বিদ্যালয়ে বোমা-বিস্ফোরণ। নানা স্থানে বিদ্যালয়-গৃহে অগ্নিসংযোগ। ১২ই—আমেদাবাদে পুলিশের উপর প্রস্তর ও এসিড বর্ষণ। দুই জন পুলিশ আহত। চিকোদি রোড ষ্টেশনের অদূরে ডাকগাড়ীর সশস্ত্র আরোহিগণ কর্ত্তৃক পিস্তল দেখাইয়া মেল লুণ্ঠন। বর্দ্দোলী তালুকের বিভিন্ন স্থানে বহু যুবক ও মহিলা গ্রেপ্তার। ১৩ই সাংলির নিকট সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক মেলবাস আক্রমণ, মেলব্যাগ লুণ্ঠন, আক্রমণকারীদের গুলীতে কয় জন আহত। ১৫ই—বেলগাঁও হইতে সাওন্তাবাদের দিকে অগ্রসর এক ডাকবাহী বাস লুণ্ঠন। ১৭ই—সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে বাধা দিবার অভিযোগে খারাটকোপ (বেলগাঁও) গ্রামের ৫০ জন, চিকোদি তালুক হইতে ১২ জন, গোলক তালুক হইতে ৩ জন গ্রেপ্তার। বেলগাঁও ও খাসপুর তালুকের ১২খানি গ্রামে অগ্নিসংযোগ। নানা স্থানে বাংলো ও পান্থনিবাসে অগ্নিদান। বোম্বাইএ পুলিশের চৌকীতে অগ্নিদান। ১৮ই—আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ আই, আর, ভাগারের গৃহের পার্শ্বে বোমা বিস্ফোরণ। পটমা ষ্ট্রীটে এক গৃহে তাজা বোমা ও বোমার মাল-মসলা আবিষ্কার, ৩ জন গ্রেপ্তার। গোকক (বেলগাঁও) মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সম্মুখে ও আসানি মিউনিসিপ্যাল আফিসের নিকটে বিস্ফোরণ। ভাদাগাও-শাহপুর রোডে এক তাড়িখানায় অগ্নিদান। ধারোয়ার (হুবলী) কর্ণাটক কলেজে বিস্ফোরণের ফলে দুই জন আহত। কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক মিঃ আর, এস, হুকেরিকার আত্মসমর্পণ না করায় পুলিশ কর্ত্তৃক তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক। আমেদাবাদ মেডিক্যাল হোষ্টেলে বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতি। ভবনগর কলেজের আই, এ ক্লাসে অধ্যয়নের সময় বিস্ফোরণ। সুরাটে বহু বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ১৮ জন গ্রেপ্তার, ২৪ স্থানে তল্লাসী। মোভরা গ্রামে ডাক লুঠ; কিম্‌-ভাদর পথে গরুর গাড়ী হইতে মাল লুঠ। বেখোদ মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুত ভাইজিভাই প্রাণজীবন দাস গ্রেপ্তার। ধুমকা গ্রামে ডাক লুঠ। ২১শে, ধুলিচার গরুড় লাইব্রেরীর সম্মুখে বিস্ফোরণ। ধারোয়ারের ২টি স্কুলগৃহে অগ্নিকাণ্ড। রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে ১০ জন ৬ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ছয় মাসের জন্ত বোম্বাই সহরতলী লোকাল বোর্ডের কার্য্য বাতিল। আমেদাবাদে পুলিসের উপর এসিড ও প্রস্তর-বর্ষণ। হুবলীতে শ্রীমতী বরদা ভাট, শ্রীমতী শারদাভাই লালভাগ ও অপর ১১ জন ২ হইতে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আকোলায় ৩ জন গ্রেপ্তার। ২২শে—পুণার নিকট শোনান ষ্টেশন ভস্মীভূত, কারাদ তালুকের এক গ্রামে সশস্ত্র এক দল লোক কর্ত্তৃক মেলব্যাগ লুণ্ঠন। ২৩শে—

আমেদাবাদে পুলিশের গুলীবর্ষণ, ৪ জন নিহত, ১ জন আহত। ভবনগরে একটি উকীল-গৃহে বোমাবিস্ফোরণ, ২ জন ছাত্র আহত। নাদিয়াদে সরকারী হাইস্কুলে বোমাবিস্ফোরণ, ছাদ নষ্ট। আনন্দে শার্ব্বা হাইস্কুলে ২বার বোমাবিস্ফোরণ। বোমা তৈয়ারীর অভিযোগে শাহাপুরে (বেলগাঁও) ১০ জন গ্রেপ্তার। বেলগাঁও-কাকতীপথে খাদ্যশস্যপূর্ণ গোশকট লুণ্ঠন, সামরিক লরী হইতে লুণ্ঠনকারীদের উপর গুলীবর্ষণ। বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের আর একটি ছাপাখানা আবিষ্কার, ছাপাখানা পুলিশ-অধিকারে, কয় জন গ্রেপ্তার। ২৪শে—আমেদাবাদে ১৫ স্থানে পুলিশের উপর ইষ্টকবর্ষণ ৪ স্থানে পুলিসের গুলীচালন, ১ জন নিহত ও ৩ জন আহত, ৬ জন গ্রেপ্তার। পুলিসের উপর পটকা ও এসিড নিক্ষেপ। ক্যালিকো মিলের ম্যানেজার মিঃ এস, এ, খের গ্রেপ্তার। নাদিয়াদ ও শাকদা হাইস্কুলে বোমাবিস্ফোরণ, তিন দিনে ১ শত ব্যক্তি গ্রেপ্তার। পুণায় ব্যাপক তল্লাসী, রিভলভার কার্ত্তুজ ও বহুপরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য আবিষ্কার। সহরের বিভিন্ন স্থানে পথের মোড়ে সভা ও পতাকা-অভিবাদন অনুষ্ঠান, আমেদাবাদে এক রেলওয়ে সেতুর নিকট বোমা বিস্ফোরণ, সেতুর সামান্য ক্ষতি। ২৫শে—বেলগাঁওএ থালাক বস্তির এক চায়ের দোকানের সম্মুখে বিস্ফোরণ। বোম্বাইএ নাগদেবী ষ্ট্রীটে এক গুপ্ত ছাপাখানা আবিষ্কার, এ স্থানে অননুমোদিত "অবাধ বন্দে মাতরম" পত্র ছাপা হইত। এ সম্বন্ধে তল্লাসী, ৪ জন গ্রেপ্তার, ছাপাখানা পুলিসের অধিকার। ২৬শে, আমেদাবাদে ১০।১২ জন বালকের রাজস্বের টাকা লুণ্ঠন ও ৬ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ। ২৭শে—বোম্বাইএ পুলিশ দলের উপর বোমা নিক্ষেপ—পুলিসের ১ জন নিহত ১০ জন আহত। ৫০ জন গ্রেপ্তার।

যুক্তপ্রদেশ—২রা—আপত্তিকর পুস্তক রাখিবার জন্য ৮ জন দণ্ডিত। ১৬ই—লক্ষ্ণৌএ চিঠির বাক্স পুড়াইবার চেষ্টা। এলাহাবাদ পুলিশ কর্ত্তৃক এক গ্রামে ভূনিম্ন হইতে রাসায়নিক পদার্থ-পূর্ণ কয়েকটি বোতল এবং এক সাঁকোর নিকট ৬টি বোমাপূর্ণ বাক্স আবিষ্কার। ১৭ই—এলাহাবাদে জনৈক এডভোকেটের গৃহে তল্লাসী। ১৮ই—লক্ষ্ণৌএর এক গৃহ হইতে গুলী, বারুদ, টোটাভরা দুইটি রিভলভার ও বোমা তৈয়ারীর মাল-মশলা আবিষ্কার। বাড়ীর ৪ জন গ্রেপ্তার। ২০শে, মজঃফরপুর জেল হইতে ৩ জন রাজনীতিক বন্দীর পলায়ন। ২১শে, হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলাতক যোগেন্দ্র শুকুল মজঃফরপুরে গ্রেপ্তার। ২৩শে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভ—বিভিন্ন কার্য্যালয় ও ভবনের ক্ষতি। বারাণসীতে পিস্তল প্রস্তুতরত এক জন কর্ম্মকার গ্রেপ্তার। এ সম্পর্কে দুই জন যুবক গ্রেপ্তার। গোরক্ষপুরে আসুরণকা পেরিখার নিকট ৩৫ স্থানে ৮টি তাজা বোমা, কিছু বারুদ ও বোমা প্রস্তুতের উপাদান উদ্ধার।

মধ্যপ্রদেশ—১লা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক বোমা প্রস্তুতকারী দলের লোক সন্দেহে ১৪ জন গ্রেপ্তার। ধৃত এক জনের গৃহে বোম্বাইএ প্রস্তুত ৭টি বোমা প্রাপ্তি। ১২ই—নাগপুর জিলার থাপা ও সাওনে মিউনিসিপ্যালিটী ৬ মাসের জন্য সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে। ১৬ই—হিন্দুমহাসভার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এবং নাগপুরের 'আদেশ' পত্রের সম্পাদক মিঃ ডি, জি, দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার। ২৮শে—গণ্ড জাতির বহু লোক কর্ত্তৃক রেলওয়ে, থানা, বনবিভাগের ডিপো আক্রমণ করিবার জন্য ১ জন প্রাণদণ্ডে, ৪ জন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড, ১ জন গণ্ড-স্ত্রীলোক ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আষ্টি (ওয়ার্দ্ধা) পুলিস হত্যার মামলায় ১০ জনের প্রাণদণ্ড, ৫৫ জন নির্ব্বাসন-দণ্ড ও ৯ জন ২ হইতে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। রায়পুর জিলা জেলের ৩ স্থানে বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংস করিবার চেষ্টা। ২৬শে "সাবধান" পত্র সতর্কীকৃত।

বিহার—২রা অগ্রহায়ণ—ভাগলপুর জিলার রঙ্গগ্রামে এক জনতা কর্ত্তৃক আবগারী ইন্সপেক্টার ও দুই জন কনষ্টেবলকে আক্রমণ করিয়া বন্দুক সংগ্রহ। গ্রামে তৎক্ষণাৎ সৈন্যপ্রেরণ। ৩রা—জাহানাবাদে (গয়া) কার্ত্তুজ ও রিভলভার সহ এক জন গ্রেপ্তার। সাঁওতাল পরগণায় তীর ধনুক ও মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত জনতার দুই স্থানে মদের দোকান, এক সেতু ও বস্তি গ্রামের ডাকবাংলা আক্রমণ। জনতার সহিত সংঘর্ষ। পলাতক শ্রীযুত প্রফুল্ল পট্টনায়েক ও শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ গ্রেপ্তার। দুই জন নিহত। ১৭ই—ধানবাদ বাজারে ডাকঘর লুঠ সম্পর্কে ধৃত ৮ জনের মধ্যে ৫ জনকে মুক্তি দিয়া পুনরায় ভারতরক্ষা বিধি বলে গ্রেপ্তার। ঝরিয়া ষ্টেশনের গুদাম লুঠ সম্পর্কে ৪ জন অভিযুক্ত। ১৮ই—মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী শ্রীমতী খুরশেদ বেন ধানবাদে গ্রেপ্তার। ২২শে—পাটনার 'বিহার হেরাল্ড' পত্রে বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ-পত্রের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় পুলিসের তল্লাসী এবং ঐ সংখ্যার সকল পত্র অধিকার। ২৪শে—গত আগষ্ট বৃটিশ বিমান বাহিনীর দুই জন কানাডীয় কর্ম্মচারীকে হত্যা সম্পর্কিত মামলার বিচারকগণকে দেখাইবার জন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেণের যে বগি-খানি পাটনায় লইয়া যাওয়া হয় তাহাতে অগ্নিসংযোগ।

সামন্তরাজ্য—মহীশূরের 'বিশ্বকর্ণাটক' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণশর্ম্মা ভারতরক্ষা বিধির ৩৮, ৩৯ ও ৪০ বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। ঈশ্বর গ্রামে এক হাঙ্গামাকালে এক জন দারোগা ও ১ জন আমীনদারকে হত্যা করিবার অভিযোগে ১১ জন প্রাণদণ্ডে ও ১৩ জন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত। সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক কোলাপুরে মেলবাস লুণ্ঠিত, ১৬ই—রাজকোটে ধর্ম্মেন্দ্র সিংহী কলেজের এক আফিসে ও চৌধুরী হাইস্কুলে অগ্নিসংযোগ, ২৩শে বাঙ্গালোর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিস্ফোরণ। ২৪শে, মহীশূর রাজ্যে গুলীবর্ষণের ফলে ২৫ জন আহত ৩৬ নিহত এবং বেত ও লাঠী চার্জ্জের ফলে ৭৩ জন আহত, এ পর্য্যন্ত ২০৩৬ জন আটক, ইহাদের মধ্যে ৬২৫ জন ছাত্র। ৪১১ জন ছাত্র দণ্ডিত।

সীমান্ত প্রদেশ—১লা—ডাঃ খান সাহেব, মিঃ আবদুল কায়ুম, মৌঃ জাফর শাহ, শেঃ আরবাব আবদুর রহমান খানের উৎমনজাইএর নিকট বক্তৃতাদান। ২রা অগ্রহায়ণ—হাজারা জিলার হাফ ফায় জনতা কর্ত্তৃক জরিপের কার্য্যে বাধাদান, খান ফকিরা খান ও অপর দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার। লাল কোর্ত্তা দলের পেশাওয়ার আদালতের দিকে অভিযান। ২৬শে, ডক্টর খানসাহেবের পুত্র ওবেদুল্ল খান গ্রেপ্তার।

পঞ্জাব—২রা অগ্রহায়ণ—নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির এক সাম্যবাদী সদস্য ও আম্বালার কংগ্রেস নেতা ভগতরাম শুক্ল গ্রেপ্তার।

সিন্ধু—২রা অগ্রহায়ণ সিন্ধু ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটী স্পীকার কুমারী জেঠী সিপাহী মালানী গ্রেপ্তার। ৪ঠা রাত্রিতে তল্লাসী করিয়া বিস্ফোরক দ্রব্য ও কার্ত্তুজ আবিষ্কার, দুই জন গ্রেপ্তার। ১৮ই—এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষের পশ্চাতে বোমাবিস্ফোরণ

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

SATISH SINHA

২১শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৯ [৩য় সংখ্যা

সংস্কৃতকাব্যে চিত্র-চর্চা

দণ্ডী সত্যই বলিয়াছেন,—

> সারা ত্রিভুবন অন্ধসমান রহিত আঁধারে ভরা।
> যদি না উদিত শব্দজ্যোতিঃ সংসার-আলো-করা ॥ (১)

সৌর কিরণ যেমন নৈশ তিমির বিদূরিত করিয়া বহির্জ্জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তেমনই শব্দময় জ্যোতিঃ মূকতারূপ তমোনাশ করিয়া অন্তরজগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। শব্দসম্পদ হইতেই ভাবরাজ্যের পরিচয়; পরকীয় চিত্তবৃত্তির গূঢ় স্পন্দন শব্দই আমাদের নিকট বহন করিয়া আনে। এই শব্দসমষ্টিই ভাষার রূপকে ফুটাইয়া তুলে।

সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভার এমনই রমণীয় এবং নমনীয় যে, তাহাকে যে কোন ছন্দে-বন্ধে-ভঙ্গিতে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিলেও তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের হানি হয় না। যদি কোথায়ও মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়, তথাপি ভাষাগত কোন অক্ষমতা দেখা যায় না। শব্দসম্পদের এইরূপ বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই সংস্কৃত কাব্যে চিত্র-চর্চ্চার অবকাশ ঘটিয়াছে।

শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, কাব্যে সুপ্রযুক্ত হইলে শব্দের ঝঙ্কার কর্ণগোচর হইবার পর চিত্তে রসবিশেষ জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু চিত্রবন্ধে—শব্দরাশি লিপিবিশেষে সজ্জিত হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। কাব্যে সন্নিবিষ্ট এই চিত্র শ্রবণ ও নয়ন উভয়কেই আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া ইহার বৈচিত্র্য কবিগণ সাদরে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। সযত্নে অঙ্কিত চিত্রকরের চিত্র সুদৃশ্য হইলেও তাহা শব্দময়ী ভাষা প্রকাশে অক্ষম হইয়া থাকে, আবার সযত্নে রচিত কাব্য মনস্তৃপ্তিদায়ক হইলেও নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে না, এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য একটা সমাধানের চেষ্টা 'চিত্রবন্ধে' উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই সমাধান—সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে নাই। কাব্য ও চিত্রের মিলন করিতে যাইয়া অনেক সময়ে দুরূহ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে, অনেক কবি ও আলঙ্কারিক এইরূপ চিত্রচর্চ্চাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশে মম্মট ভট্ট মন্তব্য করিয়াছেন যে,—"এতে হি শক্তিমাত্রপ্রকাশকা ন তু কাব্যরূপতাং দধতীতি ন প্রদর্শ্যন্তে"—এই চিত্রবন্ধগুলি কবির শক্তি বা কৌশল মাত্র প্রকাশ করে, কিন্তু কাব্যের স্বরূপতা লাভ করিতে পারে না," এই জন্য এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। সাহিত্যদর্পণেও বিশ্বনাথ আরও একটু তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন (২)। তথাপি সংস্কৃত সাহিত্যে এই চিত্রকাব্যের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। যদিও আদি-কবি বাল্মীকি বা মহাকবি কালিদাস 'চিত্র' অলঙ্কার সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে স্বাভাবিক কবিত্বগতির মধ্যেও অনুপ্রাসের অভাব নাই (৩) এবং কালিদাসের রঘুবংশে

(১) ইদমন্ধন্তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে ;
কাব্যাদর্শ।

(২) কাব্যান্তর্গড়ুভূততয়া তু নেহ প্রপঞ্চ্যতে। ১০ম পরিচ্ছেদ

(৩) চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিত-তারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্ ॥
রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড।

যমবতামবতাঞ্চ ধুরি স্থিতঃ ইত্যাদি। রঘু, ৯ম সর্গ

অক্লেশরচিত যমকাবলীর বিকাশ দেখা যায়। অনুপ্রাস ও যমকের অনুশীলন হইতেই যে পরবর্ত্তিকালে চিত্রবন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। বাস্তবিক সংস্কৃত কাব্যে অনুপ্রাস ও যমকের অনুশীলন যে কত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল—তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং এইরূপ অনুশীলন করিতে করিতে একটা অভিনব শব্দসজ্জার আকাঙ্ক্ষা উদিত হওয়ার ফলেই প্রথমে রেখা-চিত্রের সহিত বর্ণের মিলন করিবার প্রয়াস ঘটে।

বাঙ্গালা ভাষায় যমকের একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বাল্যকালে বড়ই কৌতুক উদ্রেক করিত—

"বকী বলে বকা বোকা. বকা বলে বকী
এইরূপে বকাবকী করে বকাবকি।"

এই কষ্টকল্পিত যমক যে কাব্যরসের পরিপন্থী, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু যমকের প্রয়োগ থাকিলেও তেমন প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই (৪) কিন্তু মহারাষ্ট্র ভাষায় মোরপন্থকৃত মহাভারতে কি অপূর্ব্ব যমকের বিকাশ, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—বাঙ্গালা ভাষার সহিত যমক ও অনুপ্রাসের আধিক্য সৌন্দর্য্য-স্মষ্টির বাধক, কিন্তু মহারাষ্ট্র ভাষায় সাধক হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার সহিত মহারাষ্ট্র ভাষার সম্বন্ধ একাংশে নিকটতর বলিয়া অনেক শ্লোক উভয় ভাষায় একরূপে সমান ছন্দে গ্রথিত হইতে পারে (৫), কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ শ্লোক রচনা কষ্টকর। মদীয় 'সারস্বত-শতকম্' নামক কাব্য হইতে এইরূপ একটি শ্লোক উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

শুভ্রোজ্জ্বলে শতদলে তব পাদপদ্ম
শোভাধরে মধুরিমা ভুবনপ্রকাশে।
দীব্যা যথা কিশলয়ে, তব দেবি! সন্ধ্যো
ভাসে চ'খে শশিকলা বিকলা সকাশে॥

ইহাতে কোনরূপ অনুস্বার বিসর্গ যোগাযোগ না করিলেও এই পদ্যটি হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণসহ বসন্ততিলক ছন্দে পাঠ করিলেই সংস্কৃতভাষায় একটি অর্থবোধ করাইবে, অথচ বাঙ্গলা চতুর্দ্দশপদী ছন্দেও ইহা রচিত! কেবলমাত্র 'চ' 'খে' এইরূপ পৃথক্ পদ হইবে।

যাহা হউক,—খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে যমকের নানাবিধ ভঙ্গী মহাকাব্য কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে বিকশিত হইতে দেখা যায় এবং ইঁহাদেরই প্রদর্শিত সর্ব্বতোভদ্র, অর্দ্ধভ্রমক ও গোমূত্রিকাবন্ধ সংস্কৃত কাব্যে প্রথমে লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,—এই তিনটি চিত্রই সরলরেখার অঙ্কন দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। সর্ব্বতোভদ্র সম্বন্ধে কাব্যাদর্শে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—'তদিদং সর্ব্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্ব্বতঃ'। বুঝিবার সুবিধার জন্য 'সারস্বতশতকম্' হইতে সর্ব্বেতোভদ্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

মায়াসারবরসায়ামা যা জপাক্ষক্ষপাজয়া।
সা পাশদে দেশপাসা রক্ষ দেবি বিদে ক্ষর।

(অনুবাদ)

মায়া আর শ্রেষ্ঠরসে ব্যাপ্ত যিনি সদা,
অজ্ঞানরজনি জিনি' অজপা বিশদা।
সেই তুমি অধিষ্ঠানে দেশরক্ষা কর,
এস (ভব) পাশচ্ছেদিনি মা, জ্ঞানসুধা ক্ষর॥

মা	য়া	সা	র	র	সা	য়া	মা
যা	জ	পা	ক্ষ	ক্ষ	পা	জ	য়া
সা	পা	শ	দে	দে	শ	পা	সা
র	ক্ষ	দে	বি	বি	দে	ক্ষ	র
র	ক্ষ	দে	বি	বি	দে	ক্ষ	র
সা	পা	শ	দে	দে	শ	পা	সা
যা	জ	পা	ক্ষ	ক্ষ	পা	জ	য়া
মা	য়া	সা	র	র	সা	য়া	মা

এই শ্লোকটির বিশেষত্ব এই যে,—শ্লোকের প্রথম চরণটি এই অঙ্কিত (আটঘরা) চিহ্নের ঊর্দ্ধ, অধঃ, বাম বা দক্ষিণ যে কোন দিক্ হইতে পাঠ করিলে একরূপেই পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় চরণটি সর্ব্বদিকেই দ্বিতীয় স্থানে, এইরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণটি—সর্ব্বদিক্ হইতে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে একরূপেই দেখা যাইবে।

এইরূপ ছন্দের সহিত বিচিত্র বর্ণবিন্যাস আর কোন ভাষায় সম্ভবপর কি না, জানি না, তবে, সর্ব্বতোভদ্রজাতীয় বর্ণবিন্যাস করিবার একটা প্রবৃত্তি দেশান্তরেও দৃষ্ট হয়।*

সর্ব্বতোভদ্রের পরই অর্দ্ধভ্রমকের স্থান। অর্দ্ধভ্রমক এই নামেই

(৪) এ বিষয়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালী কাব্যে বহুল প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

(৫) মহদে সুরসংধম্মে তমবসমাসঙ্গমাগমাহরণে।
হরবহু সরণং তং চিত্তমোহমবসর উমে সহসা॥
দেবীশতকম্ ৭৬ শ্লোক, সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত।

*REMARKABLE INSCRIPTION.

The following singular inscription is to be seen carved on a tomb situated at the entrance of the Church of San Salvador. in the city of Oviedo. The explanation is that the tomb was erected by a King named Silo, and the inscription is so written that it can be read 170 ways by beginning with the large S in the centre. The words are Latin 'Silo princepsfecit.' (The world of wonders—Page 100).

T I C E F S P E C N C E P S F E C I T
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I
C E F S P E C N I R I N C E P S F E C
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P
E C N I R P O L I S I L O P R I N C E
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E
C E F S P E C N I R I N C E P S F E
I C E F S P E C N I N C E P S F E C
T I C E F S P E C N C E P S F E C I T

তাহার স্বরূপের পরিচয়। বর্ণগুলি এমন ভাবে সজ্জিত হয় যে, দুই দিক্ দিয়া ঘুরিয়া আসে না, একদিক্ মাত্র ভ্রমণ ক'রে। শ্লোকটি এই—

মাতা ন মায়য়া বাধ্যা তারবাদনকারবা।
ন বা সুধামাত্রকায়া মাদধারাস্তমানয়॥

(অনুবাদ)

মাতা তুমি বাধ্য নহ মায়ার বন্ধনে,
প্রণবঝঙ্কার তোল' বীণার স্পন্দনে।
চির নবীনতা তব, সুধামাত্র কায়া,
আন' গো আনন্দধারা হইয়া সদয়া;

শ্লোকটির অঙ্কন এইরূপ,—

মা	তা	ন	মা	য়	য়া	বা	ধ্যা
তা	র	বা	দ	ন	কা	র	বা
ন	বা	সু	ধা	মা	ত্র	কা	য়া
মা	দ	ধা	রা	স্ত	মা	ন	য়
য়	ন	মা	স্ত	রা	ধা	দ	মা
য়া	কা	ত্র	মা	ধা	সু	বা	ন
বা	র	কা	ন	দ	বা	র	তা
ধ্যা	বা	য়া	য়	মা	ন	তা	মা

এই চিত্রে সর্ব্বতোভদ্রের মত সকল দিক হইতে সমানরূপে বর্ণগতি সম্ভবপর হয় না, কেবলমাত্র এক একদিকে অক্ষর ধরিয়া যাইলে—একটি চরণ পাওয়া যাইবে। সর্ব্বতোভদ্রে দুই দিক্ হইতে আট বার ঘুরিবে এবং প্রত্যেক চরণের আট বার আবৃত্তি হইবে। অর্দ্ধ ভ্রমণে এক দিক্ হইতে চার বার মাত্র আবৃত্তি, এ জন্য অর্দ্ধভ্রমক নামটি সার্থক হইয়াছে।

'গোমূত্রিকাবন্ধ'—তির্য্যগগতি সরল রেখার উপর প্রতিষ্ঠিত। গোমূত্র যেমন zigzag গতিতে পতিত হয়, এই বন্ধেও সেইরূপ তির্য্যক্ রেখার অঙ্কন হইবে। সেরূপ অঙ্কন করিতে গেলে সম অক্ষর (even number) বা বিষম অক্ষর (odd number) দুই চরণের পক্ষে সাধারণ (common factor) হওয়া চাই; যেমন,—

হি
ম স্তো তা
ম স তুঃ
মা সো দা
ম কো ঢ়
ম লা কি
পা প লা
তা প চা
হা লা

গোমূত্রিকাবন্ধ

হিমস্তোমসমা সোম-কোমলা পাপতাপহা।
হিতা স্তোতুঃ সদা সোঢ়কোকিলালাপচাপলা।

(অনুবাদ)

হিমরাশিমত শুভ্রবরণা কোমলা চন্দ্রসমা
পাপতাপহরা, স্তবকারি-জনে মঙ্গল কর মা!
মধুঋতু যবে নামিছে ধরায়—তখনই তোমার আসা,
সহিছ পিকের চপল আলাপ এত জীবে ভালবাসা।

প্রথম অক্ষরকে লইয়া আরম্ভ হইলে বিষমাক্ষর গোমূত্রিকা বন্ধ এবং দ্বিতীয় অক্ষর হইতে হইলে সমাক্ষর গোমূত্রিকা বন্ধ হইবে। উপরিস্থ চিত্রে বিষমাক্ষর গোমূত্রিকা বন্ধ।
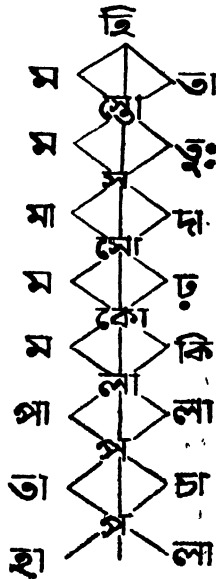
এই তিনটি বন্ধের প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তৎপরে মুরজ-বন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব বিকাশলাভ করে। মুরজ শব্দে মৃদঙ্গ, মৃদঙ্গের অঙ্গে বেত্রগুলি যেমন সাজান থাকে, তদনুকরণে মুরজবন্ধের কল্পনা হইয়াছিল—ইহাও সরল রেখার অঙ্কন। যেমন,—

হে ভারতি! সমেহি ত্বং স্মাভারপ্রশমে হিতা।
ত্বদ্‌ভা রবৌ হিমে হি স্যা শুভা রতিসমেহহিঙ্গিং॥

(অনুবাদ)

ত্বরায় ভারতি! এস হে ধরায়,
ভূভার-হরণ তোমা হ'তে হয়।
তব ভাতি ফুটে হিমে রবি-গায়
রতিসম শুভে! তম' কর জয়॥

বন্ধ চিত্রটির বিশেষত্ব এই যে,—প্রথম ও অন্তিম চরণ দুই রূপে দেখা যাইবে। সাধারণ ভাবে শ্লোক যেমন থাকে, তাহা ব্যতীত প্রথম চরণের প্রথম অক্ষর হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে নীচের দিকে নামিয়া পুনরায় উর্দ্ধে উঠিবে এবং অন্তিম চরণের প্রথম অক্ষর হইতে তির্য্যগ-গতিতে উপরে উঠিয়া আবার নামিবে ও উভয় স্থলেই শেষ অক্ষরে পুনঃ মিলিত হইবে।
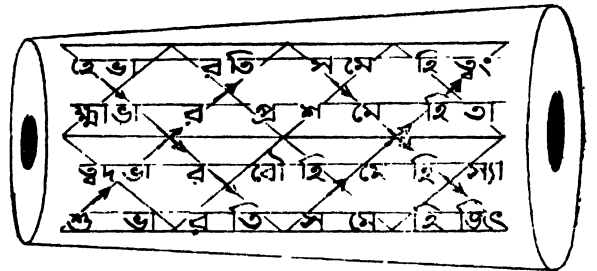
মুরজবন্ধ

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য (যিনি ধ্বন্যালোক প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা) তাঁহার প্রণীত 'দেবীশতকম্' নামক একখানি ভক্তিরসাত্মক খণ্ডকাব্যে মুরজবন্ধের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে বহু কাব্যে মুরজবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি 'দেবীশতকে' বহু প্রকারের যমক, অনুপ্রাস, অনুলোমপ্রতিলোমযমক, সর্ব্বতোভদ্র, অর্দ্ধভ্রমক, মুরজবন্ধ এবং গোমূত্রিকাবন্ধের প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং গোমূত্রিকাবন্ধ হইতে দুইটি অবান্তর বন্ধ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ গোমূত্রিকাবন্ধ দুইটি পাশাপাশি সংলগ্ন করিয়া রাখিলে জালবন্ধের স্বরূপ হইবে এবং গোমূত্রিকার প্রথম ও শেষ বর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া অনুষ্টুপ্ ছন্দের মধ্যবর্ত্তী ছয়টি বর্ণ সমানভাবে সাজাইলে তূণবন্ধ হইবে।* দেবীশতকের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে অসাধারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় নবমশতকেও কাব্যের

তূণবন্ধের স্বরূপ এই—

* ত্বন্দেবি সারদা ভক্তানন্দে বিশারদা ভব।
নমু জ্ঞেযু দয়া শক্ত্যা তমু জ্ঞেযু দয়া শয়ম্।
সারস্বতশতকম্।

চিত্রচর্চ্চা সরলরেখার উপরেই প্রধানভাবে চলিয়াছে। ইহাতে একটি মাত্র অষ্টদল পদ্মের উদাহরণ পাওয়া যায়।

অতঃপর ভোজরাজের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থে—বহুবিধ চিত্রের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে অনুপ্রাস যমক প্রভৃতির গৌরব উচ্চাশিখরে আরোহণ করে। তাই ভোজরাজ বলিয়াছেন,—

উপমাদিবিযুক্তাপি রাজতে কাব্যপদ্ধতিঃ।
যদ্যনুপ্রাসলেশোঽপি হস্ত তত্র নিবেশ্যতে ॥
কুণ্ডলাদিবিযুক্তাপি কান্তা কিমপি শোভতে।
কুঙ্কুমেনাঙ্গরাগশ্চেৎ সর্ব্বাঙ্গীণঃ প্রযুজ্যতে ॥

(অনুবাদ)

উপমাদিহীনা হ'লেও ত' দীনা
নহে সে অমর-বাণী।
যদি অনুপ্রাস মধুর বিন্যাস
লেশতঃ করিতে জানি ।
কুণ্ডলাদি নানা আভরণ বিনা
হয় না কি বধূ শোভা ?
কুঙ্কুমরাগে যদি তার জাগে
সকল অঙ্গে আভা ?

ভোজরাজ চিত্র-অলঙ্কারকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া (১) বর্ণচিত্র, (২) (উচ্চারণ) স্থান-চিত্র, (৩) স্বরচিত্র, (৪) আকার-চিত্র, (৫) গতি-চিত্র ও (৬) বন্ধ-চিত্ররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) বর্ণচিত্রের বর্ণশব্দের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না পৃথগ্‌ভাবে স্বরচিত্রের কথা আছে। এই ব্যঞ্জনবর্ণ চিত্র—একটি, দুইটি, তিনটি বা চারিটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহারে শ্লোক রচনা সম্ভবপর হইলে তাহা বর্ণ-চিত্র। (২) ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান অনেক ; কিন্তু তন্মধ্যে তালব্য, মূর্দ্ধন্য বা ওষ্ঠ্যবর্ণ একেবারে বর্জ্জন করিয়া কবিতা রচনার নাম স্থানচিত্র। (৩) একপ্রকার, দ্বিপ্রকার বা তিন প্রকার স্বরমাত্র ব্যবহারে অথবা সর্ব্বপ্রকার স্বরবর্ণের প্রয়োগ দেখাইয়া কবিত্বপ্রকাশের নাম স্বর-চিত্র। আধুনিক দৃষ্টিতে এই সকল চিত্রের চিত্তাকর্ষকতা স্বীকৃত হয় না। (৪) আকার-চিত্রমধ্যে পদ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। 'পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে'—এই যে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণের লক্ষণ,—ইহাতে ভোজরাজের আকার-চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। পদ্মচিত্রের উদাহরণটি দেবীশতক হইতেই সংগৃহীত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেবীশতকের টীকাকার 'কয়্যট' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু পদ্মচিত্রের সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই কয়্যট ৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ভীমগুপ্ত নৃপতির সমসাময়িক বলিয়া টীকাশেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। দশমশতকেও যে পদ্মচিত্রের তেমন প্রচলন হয় নাই, ইহা অনুমান করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে সরস্বতীকণ্ঠাভরণে শুধু একটি অষ্টদল পদ্ম নহে, ষোড়শদল, চতুর্দ্দল ও চার প্রকার অষ্টদল পদ্মচিত্র উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মৎপ্রণীত 'সারস্বত-শতকম্' হইতে অষ্টদল পদ্মের একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি,—

সারদা সারসাধ্যাসা সাধ্যা সাচ্যুতবেধসা।
সাধবে দত্তসাতাস্তু স্তুতা সাস্তু সদারসা ॥

(অনুবাদ)

সারদা আসীনা সরোজ-উপরে।
(যাঁরে) অচ্যুত বিধি সাধেন সাদরে।
সজ্জনে আজি হউন সুখদা।
তিনি স্তুতিগুণে রসময়ী সদা ॥
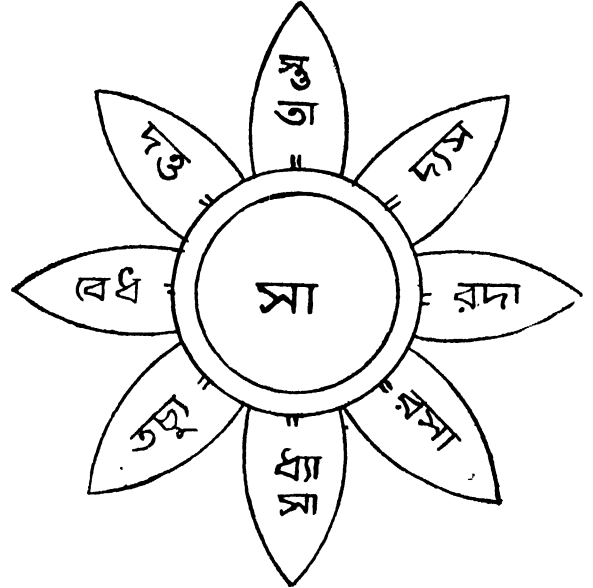
পদ্মবন্ধ

এই বন্ধের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে পদ্মমধ্যের "সা" হইতে পূর্ব্বদিকের দল ধরিয়া পাঠ করিতে হইবে, তৎপরে দিগ্‌দলগুলিতে যে অক্ষর বসান আছে—তাহা দুই বার বিপরীত ভাবে পড়িতে হইবে, কোণের পদ্মদলের অক্ষর এক বার মাত্র পাঠ করিয়া ঘুরিয়া আবার পদ্মমধ্যে মিলিতে হইবে। সরস্বতীকণ্ঠাভরণের কিছু পূর্ব্ব হইতেই যে চিত্রবন্ধের বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। পদ্ম-চিত্রের দলগুলিতেও মধ্যভাগে অক্ষরসজ্জা তখনও এমন কৌশলে করা হইত যে, কবির নামাক্ষর পর্য্যন্ত তাহাতে স্থান পাইতে বাধা হয় নাই।

(৫) গতি-চিত্রে—অনুলোম গতিতে শ্লোকের এক চরণ কি দুই চরণ রচিত হইয়া পুনরায় সেই বর্ণগুলিই প্রতিলোমগতিতে শ্লোকাংশ পূর্ণ করিবে। যেমন,—

রাধানুরাগিন্নুপসংসরাশু তামাহিতামস্তরভূমকায়া।

ইহাকেই বিপরীতভাবে পাঠ করিলে শ্লোকটি পূর্ণ হইবে,—

যা কামভূরন্তমতা হি মাতা সুরাসসম্পন্নু গিরা নু ধারা ॥

(অনুবাদ)

ওহে আরাধনা অনুরাগী জন,
সন্নিধানে তাঁর কর প্রসরণ।
সমাগতা সেই অন্তরের ধন
ভূমা তনু যাঁর—কামপ্রস্রবণ।
পরমা জননী তিনি সুধাকারা
না জানি, বাঙ্‌ময়ী কিংবা রসধারা।

গতপ্রত্যাগত চিত্র বা অনুলোম বিলোম কাব্য বহু ভাগে দেখা

যায়। রামকৃষ্ণবিলোম কাব্য ইহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অক্ষরগুলি পড়িয়া গেলে রামচরিত এবং দক্ষিণ হইতে বামে পাঠ করিলে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর বন্ধচিত্রের মধ্যে চক্রবন্ধ, শরবন্ধ, ব্যোমবন্ধ, মুরজবন্ধ, গোমূত্রিকাবন্ধ এবং গোমূত্রিকাধেনুবন্ধ প্রভৃতি বহু বন্ধের পরিচয় সরস্বতীকণ্ঠাভরণ হইতে পাওয়া যায়।

এই চিত্রবন্ধের ক্রমবিকাশ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে—যদিও ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধন যমকাদি নিবন্ধের তেমন প্রশংসাপরায়ণ ছিলেন না, * তথাপি তিনি নিজেই 'দেবীশতকম্' নামক কাব্য রচনা করিয়া যমক ও চিত্রবন্ধের বহুবিধ সমাবেশ করিলেন কেন? এই প্রশ্ন সকলেরই চিত্তে উদিত হইতে পারে। এই প্রশ্নের সবল উত্তর এই যে,—প্রকৃত রসবিষয়ক রচনায় যমক বা চিত্রবন্ধাদির ব্যবহার না করাই বহু আলঙ্কারিকের অভিপ্রেত এবং রস বলিতে প্রধানভাবে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই আটটি রসকেই বুঝাইয়া থাকে। শান্তরস বা বাৎসল্যরস সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। এই শান্তরসের সহিত ভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ জন্য ভক্তিরসাত্মক স্তোত্রকাব্য-রচনায় যদি যমক বা চিত্রবন্ধাদির প্রয়োগ করা যায়, তাহা দোষাবহ হইবে না। বিশেষতঃ, অধিকাংশ-স্থলে দেবতার পূজোপচার—অঙ্গভূষণ বা অঙ্গে ধারণীয় অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে যে সকল বস্তু পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই প্রায় বন্ধচিত্র রচিত হইয়া থাকে. সুতরাং এই সকল চিত্র দেবতাপ্রকরণ সম্বন্ধীয় বলিয়া ভক্তি প্রকাশের সহায়ক হইতে পারে, এবং তাহার ফলে শান্ত নামক নবমরসের উদ্দীপক হিসাবে চিত্রগুলি রসসম্বন্ধহীন বলিয়া উপেক্ষণীয় হয় নাই।

দেবপূজার অঙ্গরূপে শঙ্খ, ঘণ্টা, মুরজাদি বাদ্য আজিও ব্যবহৃত হয়। সারস্বতশতকে ঘণ্টা ও শঙ্খবন্ধ এইভাবেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—

ঘণ্টাবন্ধের শ্লোকটি এই,—

সুহৃৎসদানন্দন-তারদানা-
দ্বিধের্জ্জগৎসৃষ্টিবিধৌ হি দেবি!
বিদে ত্বমেহি স্ফুরদাত্মবীণা-
নাদাবদা নন্দনদাসহৃৎসু।

(অনুবাদ)

সুহৃৎ সদাই তুমি বিধাতার
সৃষ্টির কাজে বিতর ওঙ্কার।
ঝঙ্কারিয়া বীণা দেবি! জ্ঞান দিতে
এস মা কিঙ্কর তনয়ের চিতে।

এই বন্ধে প্রথম চরণের ঠিক প্রতিলোম বর্ণ সাজাইয়া চতুর্থ চরণটি পাওয়া যাইবে। ঘণ্টার ধরিবার দণ্ড (handle) মধ্যে উপর হইতে শ্লোক আরম্ভ হইয়া বাদ্যভাণ্ডটুকু বেষ্টন করিয়া পুনরায় ঐ দণ্ড ধরিয়া আবদ্ধ স্থানেই শ্লোক সমাপ্ত হইয়াছে।

তৎপর শঙ্খবন্ধটির স্বরূপ নিম্নে দেওয়া হইল—

ভাতু কাপি ললিতাকৃতিঃ সিতা
তাপহা প্রশমদায়িকা তু ভা।

* যমকাদিনিবন্ধেষু পৃথগ্‌যত্নোঽস্য জায়তে।
শক্তস্যাপি রসাঙ্গত্বং তস্মাদেষাং ন বিদ্যতে।
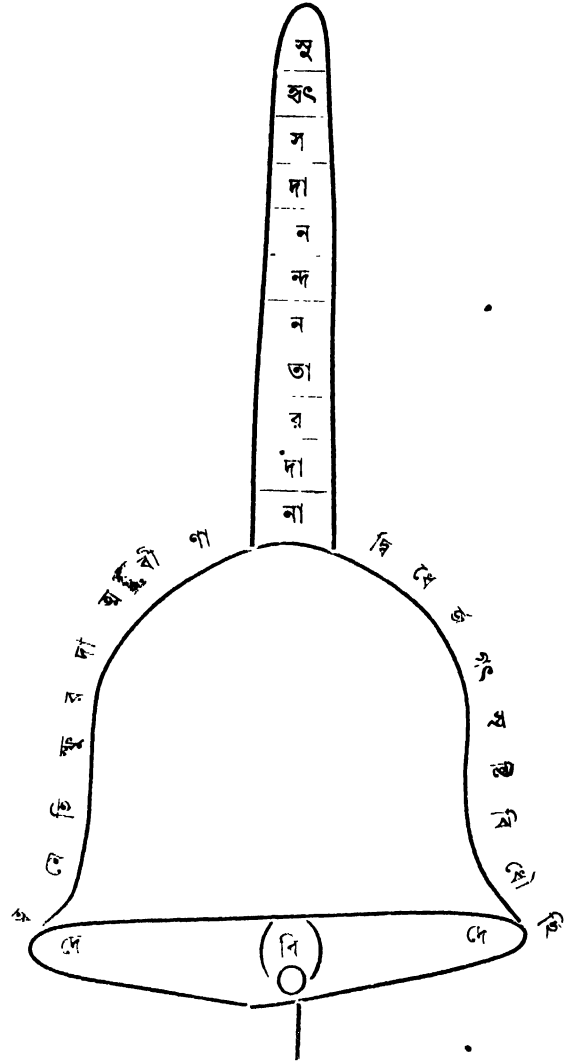
ঘণ্টাবন্ধঃ

দীর্ঘদর্শিনয়নৈকতারকা
তারকান্ত-কলয়া লয়াদৃতা।

(অনুবাদ)

ভাত গৌর দ্যুতি এক ললিত সুঠাম
শুভ্রা তাপনিবারণী পরশে আরাম।
দীর্ঘদর্শি-নয়নের ধ্রুব তারা মত
শোভে যে রজতকান্তি প্রলয়ে আদৃত।

শঙ্খবন্ধের বা ঘণ্টাবন্ধের কোন প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাই নাই। কাজেই এইরূপ চিত্রে নবকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। শঙ্খবন্ধের প্রাথমিক চারটি বর্ণ দ্বিতীয় চরণের অন্তিম চারটি বর্ণ প্রতিলোম গতিতে সমান হইয়াছে এবং 'তারকা' ও 'লয়' এই বর্ণগুলি দ্বারা দুইটি যমক সৃষ্টি হওয়ায় নিম্নস্থ দুইটি সারির মিলিত বর্ণসংখ্যা মধ্য-সারির সংখ্যার সহিত সমান করা হইয়াছে।

শঙ্খ বন্ধ
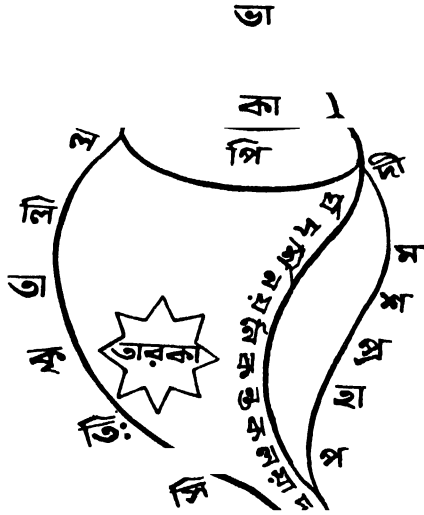
ঘটবন্ধ, পূজাপ্রকরণে ঘটস্থাপনার প্রয়োজন আছে; ঘটে থাকে সিন্দূরের স্বস্তিক চিহ্ন, এই ঘটবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, অনুপ্রাস ও যমকের সন্নিবেশেই ইহার রচনা। শ্লোকটি এই,—

স্তন্যস্তন্যরসাসার-রমণী-রমণীয়তা।
তায়তাং জগতো মাত্রা মাত্রাতো যা মিতায়তা।

(অনুবাদ)

স্তন্যরসধারা দানে তনয়ের কল্যাণ সাধন
রমণীর রমণীয় ভাব এই জানে সর্ব্বজন।
জগতের জননি গো! সেই ভাব বিস্তর সংসারে
এই স্নেহমাত্রা হায়! মবতের কে বুঝিতে পারে?
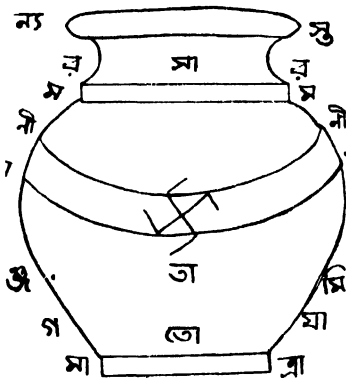
ঘটবন্ধ

এই বন্ধের এবং উপরিস্থ শঙ্খবন্ধের শ্লোক দুইটিতে যেমন সরস্বতীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি শঙ্খ ও ঘটের স্বরূপটিও সঙ্কেতে বলা হইয়াছে। শঙ্খ শুভ্র শীতল, আলয়ে আলয়ে আদরের সামগ্রী ও গৃহিণীদের সর্ব্বদা লক্ষ্যের বস্তু এবং ঘট যে জলের আধার রমণীর কক্ষশোভা, এইরূপ ব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে। ধনুর্ব্বাণবন্ধে এই ব্যঞ্জনাকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ধনুর্ব্বাণবন্ধের শ্লোকটি এই,—

বাণী নমৎ-কোটি গুণানুবন্ধ-
স্কন্তে রুচিং স্বাং কমলে চ বাণী।
কুশেশয়াস্তঃ ক্ষয়সন্ধতাঞ্চ
প্রবীণতাং পাণিগতাঙ্গগম্যাম্।

(অনুবাদ)

ধনুষ্কোটি নত হ'লে গুণের যোজন
করে সেই বাণধারী বাণী (বাণ+ইন্) যেই জন।
(আর) নম্রজনে কোটিগুণযোগ দেন বাণী
(এমন করুণাময়ী তাঁরে মোরা জানি।)
কমল—হরিণে বাণ বিঁধিবারে রুচি,
(আর) বাণীর প্রভায় হয় অরবিন্দ শুচি।
বাণের সন্ধান হয় সারস নিধনে
বাণীর নিয়ত বাস কমল-কাননে।
বাণ ধরি' প্রবীণতা আসে অঙ্গুলিতে,
বাণী মঞ্জুবীণা করে, গন্ধর্ব্বের হিতে।
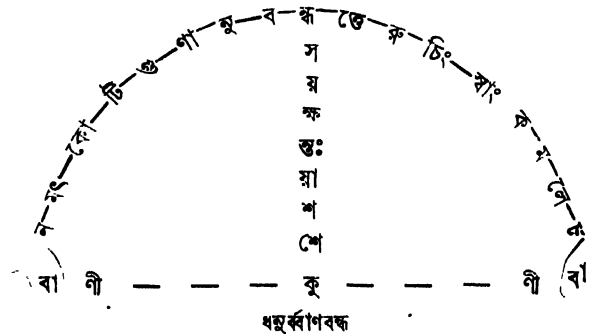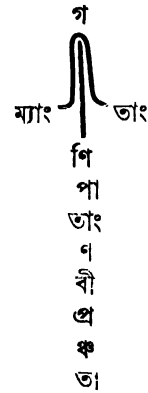
ধনুর্ব্বাণবন্ধ

বাণী (বাণধারী বীরপুরুষ) ও বাণী (সরস্বতী) ধনুর্ব্বাণবন্ধের সহিত সরস্বতীর এই শব্দগত সাদৃশ্যকে আপাততঃ গ্রহণ করিয়া সরস্বতীর মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ বৈচিত্র্য এই যে, সরস্বতীর সহিত ধনুর্ব্বাণের সম্বন্ধ উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম—লক্ষ্য, জীবাত্মা হইল বাণ, ও প্রণব ধনুঃ এই রূপকের আভাস উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।"

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ)।

সুরের আগুন

(গল্প)

ইন্‌স্‌পেক্‌শন সারিয়া মীরপুরে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল! জমিদার-বাবুরা বলিলেন—আমাদের এখানে রাত্রিটা আজ···

নিশীথ রায় বলিলেন—না। আমি ডাক-বাংলাতেই থাকবো। তার পর কাল ঢাকায় ফিরবো।

ডাক-বাংলায় ফিরিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর একখানা চিঠি। ভাবিলেন, নিশ্চয় পার্টির ব্যবস্থা! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে-মনে বলিলেন, ক্লান্তির ছলে একটু বিনয়-সহকারে ক্ষমা চাহিব। সারা দিন যে-ধকল গিয়াছে—এখন বিশ্রাম!

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি খুলিয়া যা দেখিলেন···চমকিয়া উঠিলেন! মেয়েহাতের লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে:

কি বলে সম্বোধন করবো বুঝতে পারছি না! মহামান্য জজ-সাহেব বাহাদুর? না···

ক্যাম্পবেলের পাশ সামান্য ডাক্তারের স্ত্রী আমি। আর তুমি এ জেলার জজ-সাহেব! যাকে বিশ বছর চোখে ছাখোনি—যার কথা কাণে শোনোনি···

কার চিঠি? কে লিখিয়াছে?

তলায় নাম—জয়ন্তী। মনে পড়িল!

কিন্তু বিশ বছর পরে···হঠাৎ? জয়ন্তী এখানে কোথা হইতে আসিল?

নিশীথ বাবু চিঠি পড়িতে লাগিলেন। চিঠিতে লেখা আছে:

ঢাকা থেকে জজ-সাহেব আসছেন এ-গ্রামে ইন্‌স্‌পেক্‌শনে! জজ-সাহেবের নাম নিশীথ রায় আই-সি-এস্। মনে পড়বে না হয়তো! বিশ বছর পরে হঠাৎ আমার বাড়ীর এত-কাছে এসেছো, আমার মন কেমন আকুল হলো! আসবে, কি আসবে না—এ চিন্তা না করেই চিঠি লেখবার দুঃসাহস করছি! উপায় থাকলে নিজে গিয়ে সেলাম দিয়ে আসতুম হয়তো! কিন্তু আমি গ্রামের কুলবধূ—আমার পক্ষে যাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন আশা করতে পারি, কাজের পর আমার এখানে তুমি আসবে? আমি থাকি সাভারে। মীরপুর থেকে সাভার আট মাইল। ইচ্ছা হলে জজ-সাহেবের পক্ষে বজরা জোগাড় করা মোটেই শক্ত হবে না।

নদীর উপরে আমার বাড়ী-বাগান। বাগানটি মনের মতো তৈরী করেছি। খারাপ লাগবে না। এলে তোমার সঙ্গে বেচারী-সুলতার কথা একটু···

অতীতের সব কথা নিশীথের মনে পড়িল। সে-কথায় অনেকখানি ব্যথার স্মৃতি বিজড়িত! সে কথার কি প্রয়োজন আজ!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশীথ আসিয়া বসিলেন ডাক-বাংলার বারান্দায়। আদালী আসিয়া টেবিলের উপর চায়ের ট্রে ধরিয়া দিল।

নিশীথের সেদিকে লক্ষ্য নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া নিশীথ ভাবিলেন, যে-অতীত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আজ বিশ বছর পরে, সে ছাইয়ের স্তূপ ঘাঁটিয়া লাভ? যে ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি, নূতন করিয়া সে-ব্যথা জাগাইয়া তোলা মূঢ়তা!

জয়ন্তী!···এখন প্রৌঢ় বয়স। ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তার তার স্বামী···নামটা? ব্রজেশ্বর! তাই বটে! মনে পড়িল, সুলতা আর সে···জয়ন্তীকে দু'জনে কত মানা করিয়াছিল, ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তারকে বিবাহ করিয়ো না! সে-মানা জয়ন্তী শোনে নাই! এক দিন কি নির্ব্বোধই সব ছিল!···সেই সুলতা···সে আজ ইহলোকে নাই!

কিন্তু জয়ন্তী··ভালোই করিয়াছে। বিবাহ করিয়াছে! উচিত কাজ! এখন দেখিতে কেমন আছে? সব দিকে তার সেই তেমনি লক্ষ্য···তেমনি তার ধীর শান্ত প্রকৃতি···তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনা?

তার সঙ্গে শেষ দেখা···জয়ন্তীর বয়স তখন কত? বাইশ? চব্বিশ?···চব্বিশ বছরই! গানে তার কি মধুর কণ্ঠ! জয়ন্তী বলিত, বিবাহ করিয়া ঘর-সংসারে তার রুচি নাই···গানে সে বাংলা দেশে কীর্ত্তি রচনা করিবে! তার পর যেদিন বলিল, না, মেয়ে-জন্ম লইয়া তা করিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিবে না···সে বিবাহ করিতেছে ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তার ব্রজেশ্বরকে, সেদিন সুলতার কি নিষেধ! কত তিরস্কার! কি মিনতি! দিদির এ-কামনায় সুলতার দু'চোখে যেন বন্যা নামিয়াছিল! বলিয়াছিল, তোর অমন গলা দিদি···বিধাতার দান···এ-দান তুই মিথ্যা করবি? জয়ন্তী সে-কথা মানে নাই!

মনে পড়িল, কলেজে পড়িবার সময় সে থাকিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মামার বাড়ীতে। মামার বাড়ীর সামনে ছিল জয়ন্তীদের বাড়ী। জয়ন্তীর বাপ ক্ষিতীশ বাবু ছিলেন গান-পাগলা ভদ্রলোক। তাঁর বাড়ী ছিল গানের আখড়া! কত ওস্তাদ, কত কালোয়াৎ আসিত। দেশের কত যন্ত্রী! নিশীথ গিয়া জুটিত! নিশীথের বয়সী আরো কত লোক! ক্ষিতীশ বাবুর স্ত্রী ছিলেন না। শুধু দুই মেয়ে···জয়ন্তী আর সুলতা। দেখিতে যেমন সুশ্রী, কণ্ঠও তাদের তেমনি! বিশেষ সুলতার কণ্ঠ! সুলতাকে নিশীথ কি ভালোই বাসিত! সে ভালোবাসা···সে-ভালোবাসার কথা জানিত শুধু জয়ন্তী!

সে-ভালোবাসা যেন সেই···তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি যুগে-যুগে অনিবার!

তার পর নিশীথ বিলাত গেল···বিলাত হইতে ফিরিল··· ফিরিয়া বিবাহ করিল। স্ত্রী কুরঙ্গিণী··মস্ত ব্যারিষ্টারের মেয়ে! নিশীথের জীবনে সে আনন্দ···শান্তি···কল্যাণ! কি নয়? দুই ছেলে···ছেলেরা ডাগর হইয়াছে···পড়াশুনা করিতেছে।

সুলতার কথা মনে জাগে! নিশীথ মনে-মনে হাসে! এক দিন ভাবিত, মানুষ এক বারের বেশী দু'বার ভালোবাসিতে পারে না! এখন জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে, ও-কথা ঠিক নয়!

কিন্তু জয়ন্তী?

বিশ বছর পরে জয়ন্তী ডাকিয়াছে! এমন করিয়া নিশীথকে মনে রাখিয়াছে যে একবেলার জন্য নিশীথ এখানে আসিয়াছে, সে খবরটুকুও তার শুধু অজানা নয়! জানিয়া এমন করিয়া ডাকা···

বেয়ারা আসিয়া বলিল—আপনার রাত্রে খানা···

নিশীথ বলিল—না। নেমন্তন্ন আছে। সাভার যাবো। চাপরাশিকে বল, বজরা রেডি করবে। এখনি যাবো।

বেয়ারা বলিল—আমরাও যাবো?

নিশীথ বলিল—না। আমি একা।

বজরায় নিশীথ। মনের পটে অতীতের দিনগুলা যেন ছবির পর ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে!

জয়ন্তী আর সুলতা···দু' বোনের স্বভাবে কত তফাৎ! জয়ন্তী বড়। সুলতাকে যেন ডানা দিয়া ঢাকিয়া রাখিত। সুলতার নিত্য নূতন বায়না! ঘরে পয়সার টানাটানি, সুলতার চাই ভালো শাড়ী, ভালো ব্লাউশ, নাচ-গান, পার্টি, হল্লার উল্লাস! ক্ষিতীশ বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ভিড় আরো জমিয়া উঠিল! আজ চ্যারিটি-শো···কাল জলশা···পরশু পিকনিক-পার্টি। সুলতাকে গান গাহিতে হয়! অমনি নয়! টাকা! পিকনিকে তার গানের দাম আসিতে লাগিল!

জয়ন্তী বলিল—টাকা নিবি?

সুলতা বলিল—বা রে, আমি গাইবো, আমার গলার দাম দেবে না?

দামে ক্রমে সুলতার নেশা লাগিল আরো বেশী! টাকার তার অন্ত নাই! যে-রেটে টাকা আসে, তার চেয়ে জোর-রেটে সুলতা টাকা খরচ করে···বেশে-ভূষায় সখে-খেয়ালে! জয়ন্তী ডানা মেলিয়া সুলতার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাকে আগলায়। তার নিজের কোনো অস্তিত্ব রহিল না!

জয়ন্তীকে নিশীথ বলিত,—তোমার মতো এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কোনো বোনের দেখিনি!

জয়ন্তী জবাব দিল—সুলতার কথা বলছো?

—হ্যাঁ।

জয়ন্তী বলিত,—মা ওকে এতটুকুন্ রেখে মারা গেছে। আমিই মানুষ করেছি। আমি ছাড়া কে আর ওর আছে? তুমিও তো ওকে ভালোবাসো নিশীথ···ওর যেন নেশা লেগেছে···ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

নিশীথ বলিল—কিন্তু আমার এ ভালোবাসা! জানো তো জয়ন্তী, ···এর মানে···

হাসিয়া জয়ন্তী বলিল—জানি, you are not lovers!

নিশীথ বলিল—ওর এ-নেশা ছাড়াতে হবে! না হলে···

না হলে কি, সে-চিন্তায় দু'জনেই শিহরিয়া উঠিত!···নিশীথের কাছে সুলতা ছিল···যেন ফুল! সে ফুল দেখিয়া সুখ! হাতে লইতে ভয় হয়···হাতের মলিন স্পর্শে পাপড়ি যদি ঝরিয়া যায়! যদি ও-ফুল মলিন হয়!

কি ভালোবাসা···এ-বয়সে আজ তা বুঝাইতে পারিবে না। তবে সে ভালোবাসার স্মৃতিতে মনের খানিকটা আজো যেন রাঙা হইয়া আছে। সে-দিকটা···সে যেন সেকালের সেই ঠাকুর-ঘর···বাহিরের কোন-কিছু সেদিকটাকে পাছে স্পর্শ করে, মন তার এখনো সজাগ সতর্ক আছে!

তার পর নিশীথের এগজামিন! ওদিকে সুলতাকে নহিলে সভা-সমিতি জমে না! সুলতার গান!···চ্যারিটি-শো হয়, সুলতার গানের নামে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তার পর জয়ন্তীর বিবাহ···নিশীথের বিলাত-যাত্রা···ষ্টেশনে তাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল জয়ন্তী আর সুলতা।

বিলাত হইতে নিশীথ ফিরিয়া আসিল। মান-মর্য্যাদা, স্ত্রী, ঘর-সংসার···কোথায় গেল জয়ন্তী কোথায় বা সুলতা···এক কোণে রহিল শুধু তাদের স্মৃতির ক্ষীণ রেখা!

সাভার। ব্রজেশ্বর ডাক্তারের বাড়ী। নিরালা নির্জ্জন গৃহ। আকাশে একরাশ জ্যোৎস্না।

দ্বারে জয়ন্তী। প্রৌঢ় স্থূল দেহ। সমাদরে নিশীথকে আনিয়া সে ঘরে বসাইল।

নিশীথ চমকিয়া উঠিল! সেই জয়ন্তী এমন! চেনা যায় না!

জয়ন্তী বলিল,—এসেছো তাহলে! সত্যি খুব খুশী হয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস।

জ্যোৎস্নার আলোয় নিশীথ দেখিল, আগেকার সে জয়ন্তীর থাকিবার মধ্যে আছে শুধু দু'টি চোখ···সেই ডাগর চোখ!

নিশীথ বলিল—খবর ভালো?

জয়ন্তী বলিল,—এমনি চলে যাচ্ছে!

—উনি বেরিয়েছেন। ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। ফেরেন রাত আটটা নটায়!···তোমার খপর ভালো?

নিশীথের মুখে কথা নাই!

জয়ন্তী বলিল—যখন শুনলুম জজ-সাহেব আসছেন মীরপুরে··· জানি, তুমি ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছো।···তুমি খপর রাখো না, আমি রাখি। ভালো কথা, এখন তাহলে কি বলে ডাকবো, জজ-সাহেব? না, নিশীথ?

নিশীথ বলিল—যদি আগেকার সম্পর্ক ভুলতে পারো, তাহলে জজ-সাহেব বলো। আমাকেও তাহলে আপনি-মশাই বলতে হবে!

জয়ন্তী বলিল—মনে না থাকলে চিঠি লেখবার দুঃসাহস হবে কেন?···বিয়ে করেছো?

নিশীথ বলিল—করেছি বৈ কি! দু'টি ছেলে। তারাও ডাগর হয়ে উঠলো।···তোমার?

একটা নিশ্বাস! জয়ন্তী বলিল,—ছেলেপিলে হয়নি।···সংসারে তুমি সুখেই আছো, নিশ্চয়···মানুষ যেমন থাকে?

নিশীথ বলিল—আমার স্ত্রী···মানে, যাকে আমাদের দেশে বলে, লক্ষ্মী! এমন স্ত্রী·· তার স্বামীর কোনো দুঃখ-দুর্ভাগ্য থাকতে পারে না, জয়ন্তী!

—বুঝেছি, বৌ খুব ভালো।···বিয়ে হয়েছে, তা···প্রায় উনিশ বছর হলো না? হ্যাঁ, উনিশ বছরই। আমার বিয়ে হয়েছে পঁচিশ বছর। বলিয়া সে হাসিল। ম্লান হাসি।

নিশীথ বলিল—সুলতাকে ভালোবাসি···তখন আমার বয়স একুশ বছর। সে ভালোবাসার ঘোর সারা জীবন থাকবে, এ তুমি নিশ্চয় ভাবোনি জয়ন্তী!

জয়ন্তী বলিল—না। অথচ তোমাকে তখন এ-কথা বললে তুমি কি-রকম রাগ করতে! মনে আছে, তুমি বলতে, আমার এ ভালোবাসাকে তুমি জলের লিখন বলতে চাও?

নিশীথ হাসিল। বলিল—সে-বয়সে জীবনের কি বা জানতুম! যখনি আমরা ভালোবাসি, তখনি মনে হয়, সেইটেই পরম সত্য! এ-ভালোবাসা জীবনে মিলিয়ে যাবে না!

একটা নিশ্বাস চাপিয়া জয়ন্তী বলিল—অত ভালোবাসা, পরে তার কিছু মনে থাকে না, এর চেয়ে দুঃখ আর কি থাকতে পারে!

নিশীথ বলিল—তা ঠিক নয়, জয়ন্তী! সুলতাকে ভালোবাসা··· আমার জীবনে সে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি···unique! এ ভালোবাসার স্মৃতি ভোলবার নয়···আমি ভুলিনি। তাকে

ভালোবাসার সঙ্গে যত নৈরাশ্য, যত ব্যথা পেয়েছি—সে নৈরাশ্য, সে ব্যথা শুধু মিলিয়ে গেছে···ভালোবাসায় যে-সুখ, যে-আনন্দ ছিল, তা আমার মনে জেগে আছে চিরদিন!

তার পর দু'জনেই নীরব···দু'জনেই ভাবিতেছিল সুলতার কথা!

ভগবান্ সুলতাকে যে-কণ্ঠ দিয়াছিলেন, সে-কণ্ঠ লইয়া কি ভাবেই না নিজেকে সে নষ্ট করিয়া গিয়াছে! মানুষের মন পৃথিবীর মতো চলিয়াছে···শুধু চলিয়াছে! তার এ-চলার বিরাম নাই! নিমেষের জন্য না!···এক দিন যে-সুলতার গান শুনিবার জন্য মানুষ আকুল উন্মত্ত হইত, আজ সে-সুলতার নামও তারা করে না! সে সুলতার অভাবে তাদের গানের আসর-জমায় কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

গানের আসর ছাড়িয়া সুলতা গিয়া নামিল শেষে ফিল্মের পর্দায়। ছবির যা-কিছু জোর, তা সুলতার গানে! গ্রামোফোনের রেকর্ডে সুলতার গান! ঘরে ঘরে সুলতার গানের রেকর্ড! ঘরে ঘরে ফিল্ম-ষ্টার সুলতার ছবি! সুলতা,—সুলতা,—সুলতা! সুলতা ছাড়া বাঙলা দেশে আর কেহ নাই—কিছু নাই! মা-লক্ষ্মী কোথা হইতে আসিয়া সুলতার মাথায় দু'হাতে টাকা বর্ষণ করিতেছেন—সুলতাও তেমনি সে টাকা খরচ করে! টাকার উপর তার মায়া ছিল না, মমতা ছিল না! দামী শাড়ী-ব্লাউশ···আসবাব মোটর-গাড়ী! ফুলে মধু থাকিলে যেমন মধুকরের ভিড় লাগে, সুলতাকে ঘিরিয়া তেমনি মানুষের ভিড়···কত রকমের মানুষ!

শেষে জয়চাঁদ মাড়োয়ারি···

তার দৌলতে কি না মিলিল! বাড়ী···বাগান! জুয়েলারি। ঐশ্বর্য্য যত বাড়ে, বেপরোয়া সুলতা তত যেন উন্মত্ত হয়।

শেষে হাউইয়ের আগুন যেমন নিবিয়া ঊর্দ্ধ-আকাশ হইতে মাটীতে পড়ে ছাইয়ের রাশি হইয়া···তেমনি এক দিন সুলতারো এ দীপ্তির অবসান হইল পঙ্ক-কর্দ্দমের স্তূপে! নিজের বাগান-বাড়ীর পুকুরে এক দিন সকালে পাওয়া গেল সুলতার মৃতদেহ···সিল্কের ব্লাউশ ফুঁড়িয়া পিঠে রক্তের জমাট চাপ···ব্লাউশ লালে লাল!

খবরের কাগজে হৈ-হৈ রব উঠিল। তার ছবি ছাপিয়া পিতৃ-পরিচয়ের সঙ্গে গানে তার প্রতিভার বিকাশ কি করিয়া ঘটিল,—তাহা হইতে সুরু করিয়া জয়চাঁদ মাড়োয়ারি, সমর গুপ্ত, অমর ঘোষ, এ ল্যাহারি···এমনি সত্তেরো নামের মালায় তার স্মৃতির কি লাঞ্ছনাই না জাহির করিয়াছিল! সুলতার জীবন ঘিরিয়া হায়-হায় বেদনার সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উৎস!

জয়ন্তী বলিল—বিলেত থেকে ফিরে তার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়নি?

—না। বিলেত থেকে প্রথম প্রথম প্রায় তাকে চিঠি লিখতুম। দু'মাস দু'মাস অন্তর দু'-চারখানার জবাব দিত। লিখতো, ভারী ব্যস্ত! চিঠির সঙ্গে খপরের কাগজের কাটিং পাঠাতো···কোন্ কাগজ বলেছে নাইটিংগেল্···কোন কাগজ লিখেছে সুরের পরী! বছরখানেক এমনি চিঠি লিখেছিল। তার পর তিন-চারখানা চিঠির জবাব দেয়নি। আমিও লেখা ছেড়ে দিয়েছিলুম···তোমার সঙ্গে দেখাশুনা···?

জয়ন্তী বলিল—না। ইদানীং খবর দিত না। খবর রাখতো না আর! কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে বোম্বাই গিয়েছিল। খপরের কাগজ পড়ে যখন জানলুম কলকাতায় ফিরেছে, তখন চিঠি লিখেছিলুম, আমা কাছে একবার আসবার জন্য। তার জবাবও দ্যায়নি! আসেওনি!

নিশীথ বলিল—আমার স্ত্রী ওর গানের সুখ্যাতি করতেন। সুলতার গানের সব রেকর্ড কিনেছেন।

জয়ন্তী বলিল—জানে তোমার সঙ্গে ভাব-সাবের কথা?

নিশীথ বলিল—না। যে সময় এ-সব রেকর্ড কেনা হয়, সুলতা তখন ফিল্মে জয়েন করেছে। পাছে আমার স্ত্রী তার নামের অমর্য্যাদা করেন, তাই বলিনি।

জয়ন্তী বলিল—তার যখন খুব নাম, তুমি তো তখন বিলেত থেকে ফিরেছো, তার গান শুনতে যাবার ইচ্ছা হয়নি? কি কৌতূহল?

—না। তখন ঘর-সংসার পেতে বসেছি।···যা গেছে, তাকে ফের জাগিয়ে তুলে লাভ! তবে আমার কাণে সব খপর পৌঁছুতো। পাঁচ জনে আলোচনা করতো, জয়চাঁদ মাড়োয়ারি তাকে কিনে রেখেছে···তার দৌলতে সুলতার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই! শুনে আমার মনে কষ্ট হতো!···নিঃশব্দে তা সয়েছি!

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

জয়ন্তী বলিল,—আমার সম্বন্ধেও কখনো কৌতূহল জাগেনি? হঠাৎ আমি গান ছেড়ে ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তারকে বিয়ে করলুম···তার পর কি করছি? কেমন আছি?···এ কৌতূহল? আমার এই গানের গলা নিয়ে আমিও কেন দিগ্বিজয়ে গেলুম না···মনে হতো না?

নিশীথ চাহিল জয়ন্তীর পানে, তার দু'চোখে অনেকখানি কৌতূহল!

জয়ন্তী বলিল—এ খাতির লোভ আমারো ছিল। আমার গান শুনে চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠবে, মনে হতো! কিন্তু সুলতাকে দেখে ভয় হলো! সমস্ত পৃথিবীকে যেন সুলতা ত্যাগ করেছে···এমন মত্ততা যে গানের জন্য যেখানে তাকে ডাকে, সুলতা দ্বিধা না করে চলে যায়! সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলো না! সে বলতো career সেই career-এর নেশা! আমি দিদি···সে-নেশায় আমাকে ভুলে গেল···আমার পানে চাইলো না!

জয়ন্তী চুপ করিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিল। আবার বলিল,—লতির চেয়ে আমার মনের জোর অনেক-বেশী···প্রথম প্রথম পাঁচ জনে এসে যখন তার নামে পাঁচ কথা বলতো, আমি অগ্রাহ্য করতুম। ভাবতুম, হিংসায় ওরা ও-সব অপবাদ রটাচ্ছে। লতিকে একবার সে-কথা বলি। তাতে হেসে সে জবাব দেয়, এতে রাগ করো কেন? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এরা যা বলে, তা সত্যি? লতি তাতে জবাব দিয়েছিল, যে যা বলে বলুক গে দিদি, জীবনকে তা বলে উপভোগ করবো না? লোকের কথায় ভয়ে জুজু-বুড়ী হয়ে থাকবো? ···এ কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম। আমার ভয় হলো! ভাবলুম, ভগবান্ মেয়েমানুষকে সত্যিকারের প্রতিভা দিলে কি হবে, সে-প্রতিভার চারি দিকে এত শত্রু এত রকমের ফন্দী আর প্রলোভন নিয়ে ঘুরছে! মেয়েমানুষ এমন অসহায়! মেয়েমানুষের সরল বিশ্বাস ···তার প্রতিভার সম্মান করা দূরের কথা··· পুরুষমানুষ সে-প্রতিভাকে হাতের অস্ত্র করে তোলে মেয়েমানুষের সর্ব্বনাশের জন্য!

কথার শেষের দিকে বাষ্পভারে জয়ন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নিশীথ নির্ব্বাক্! চাহিয়া রহিল পাশের ঐ মালতী-ঝাড়ের দিকে ···হঠাৎ ব্রজেশ্বরের কণ্ঠ—বাইরে বসে আছো! এমন চুপচাপ!

নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশীথের পানে চাহিয়া বলিল—উনি এসেছেন।

নিশীথ ফিরিয়া দেখিল, খাটো-গড়নের মানুষ···গায়ে গলাবন্ধ কোট, হাতে মোটা লাঠি, মুখে একরাশ দাড়ি···ব্রজেশ্বর ডাক্তার।

নিশীথ বলিল—নমস্কার! আসুন।

ব্রজেশ্বর বলিল—ওঁর মুখে আপনার কত কথাই শুনি! চোখে কখনো দেখিনি! দেখবার দুরাশা কোনো দিন মনে জাগেনি। আমরা হলুম চুনোপুঁটি মানুষ, বুঝলেন কি না···আর আপনি হলেন···

বাধা দিয়া জয়ন্তী বলিল—ওকে জজ-সাহেব বলে খাতির করতে হবে না! মিষ্টার টিষ্টার বলবার দরকার নেই··ও হলো নিশীথ ···তোমার সম্বন্ধী।

স্মিত-মুখে ব্রজেশ্বর চাহিল নিশীথের পানে। বলিল—জয়ন্তী বলছে তাই···আমি আপনার আত্মীয়···a very near and dear relation.

ব্রজেশ্বর হাসিল। প্রাণ খুলিয়া খানিকটা উচ্চ হাসি! তার পর বলিল—ভাইকে শুধু বসিয়ে গল্প শোনাচ্ছো! খাবার-দাবার ব্যবস্থা কৈ? আমার কতখানি সৌভাগ্য, আমার কুঁড়েয় উনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন!

জয়ন্তী বলিল—তুমি বলবে, তবে সে-ব্যবস্থা করবো?

—না, না, তাই বলছি কি না!

জয়ন্তী বলিল—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও। তার পর দু'জনে খেতে বসবে।

নিশীথ বলিল—তুমি?

জয়ন্তী বলিল—তোমাদের হয়ে গেলে তার পর···

নিশীথ বলিল—না, তা হবে না। একসঙ্গে তিন জনে বসে খাবো। এমন সুযোগ জীবনে এই প্রথম!···এবং হয়তো এই শেষ!

—বেশ, তাই হবে!

তার পর আহার চুকিল।

ব্রজেশ্বর বলিল—আমাকে একটু মাপ করতে হবে: বীরেন সাহার বাপ জনাৰ্দ্দন সাহার খুব অসুখ। বুড়ো মানুষ—এ যাত্রা টিঁকবে না! আমাকে তাই যেতে হবে···রাত্রে ওয়াচ্ করবার জন্য··· ঢাকা থেকে সিভিল-সার্জ্জন সাহেব এসেছিলেন বিকেলে···

তার পর নিশীথের পানে চাহিয়া বলিল—বলতে সাহস হয় না, ···দয়া করে যদি পায়ের ধুলো দেছেন, আজ রাত্রে আর নাই বা ফিরলেন!

নিশীথ বলিল—কিন্তু···

ব্রজেশ্বর বাধা দিল, বলিল—কিন্তু কেন! ওঁর গান শুনবেন। সত্যি, এখনো চমৎকার গাইতে পারেন।

দু' চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া নিষেধের স্বরে জয়ন্তী বলিল—আঃ!

নিশীথ হাসিল। হাসিয়া বলিল,—গান তাহলে ছেড়ে দেননি!

ব্রজেশ্বর বলিল—ছাড়বার জো কি! একলাটি থাকতে হয়··· আমার হাসপাতাল আছে···পেসেণ্ট আছে···আমার বাইরে-বাইরে দিন কাটে! ভাগ্যে ওঁর ঐ গান ছিল! ভগবান্ অমন গলা দিয়েছেন···গান গেয়ে কোনো মতে এ নিঃসঙ্গতা সয়ে বাস করছেন! তাছাড়া সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন না। ওঁর মনের সঙ্গে পাল্লা দেবে, এমন-মনের মেয়েছেলেও তো আশে-পাশে আর নেই।··· আরো জানেন নিশীথ বাবু, এখন চ্যারিটি শো হলেই ওঁর ডাক পড়ে, গাইতে হবে। মুক্তি নেই! সে বারে অত-বড় বন্যা হয়ে গেল ···গ্রামের পর গ্রাম ভেসে মানুষ সর্ব্বস্বান্ত···এখানে চ্যারিটি শো হলো, তার aid-এ উনি গেয়েছিলেন সে-আসরে পাঁচখানি গান। ওঁর গানের জোরে উঠেছিল···তা দু' হাজার টাকা। ঢাকা থেকে বড় বড় লোক এসেছিলেন ওঁর গান শুনতে।

জয়ন্তী মুখ নত করিল।

নিশীথ বলিল—আমি জানি, চমৎকার গান গাইতে পারেন। তবে ভেবেছিলুম, আপনার সংসারের চাপে সে সব ঝরে গেছে!

ব্রজেশ্বর বলিল—তা কখনো যায় মশায়! গুণীর গুণ কিছুতেই ঝরতে পারে না! ও হলো ভগবানের দান! হা-হা-হা···

ব্রজেশ্বর রোগী ওয়াচ্ করিতে গেল।

জয়ন্তীকে গাহিতে হইল। সেই পুরানো দিনের গান। নিশীথ ছাড়িল না।

তার পর হঠাৎ জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—চলো, আমার বাগান দেখবে! জ্যোৎস্না-রাত···তোমার ভালো লাগবে।

বাগানখানি সত্যই চমৎকার। ফুলে ফুলে আলো হইয়া আছে··· তার উপর আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না!

জয়ন্তী বলিল,—জানো, মারা যাবার দু'দিন আগে লতি আমায় চিঠি লিখেছিল! সে চিঠি পাবার আগেই খবরের কাগজে আমি শেষ-খপর পেয়েছিলুম···তার চিঠি যখন হাতে এলো, কি যে হলো আমার! একখানি চিঠির জন্য কি-মিনতি না জানিয়েছি, তার লেখবার খেয়াল হয়নি!

নিশীথ বলিল—তোমার ঠিকানা সে জানতো তাহলে?

—না। সে-চিঠি অনেক ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁচেছিল!

—চিঠিতে কি লিখেছিল?

—চিঠিতে শুধু লেখা ছিল—অনেক উঁচুতে উঠেছি! যদি পড়ি, খুব উঁচু থেকেই পড়বো দিদি—মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না!··· শুধু এইটুকু!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশীথ চুপ করিয়া রহিল।

জয়ন্তী বলিল—খ্যাতি যা পেয়েছিল, খুব! রাখতে পারলো না! ···কিন্তু হঠাৎ এত কালের পর আমাকে ও-কথা লেখবার কি দরকার ছিল? এ চিঠি আমি পেলুম সে চলে যাবার পর। চিঠি পেয়ে আমার মনে হলো, সে যেন ও-পার থেকে আমাকে ডেকে এ-কথা বলছে! সে-কথা এখনো যেন কাণে বাজছে!

নিশীথ বলিল—আশ্চর্য্য!

জয়ন্তী বলিল—আমার শুধু এই শান্তি, শেষ-দিন পর্য্যন্ত আমাকে মনে রেখেছিল! ভোলেনি!

নিশীথ কোনো জবাব দিল না।

জয়ন্তী বলিল—হয়তো জেনেছিল, সব তার শেষ হয়ে এসেছে। নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখেছিল, হয়তো যত খ্যাতি হয়েছে, যত নাম···যে-জিত, যে-আনন্দ পেয়েছে···আমি ও-পথে যাইনি··· ও-পথে যেতে তাকে মানা করেছিলুম···তাই আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, না, তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই···সে তৃপ্তি

পেয়েছে! ভগবানের অমূল্য দান···তা নিয়ে যা-খুশী তাই করে গেছে! সে-দানকে পায়ে ঠেলে আর কোনো-কিছুর প্রত্যাশা বা লোভ সে করেনি!···আমি যেমন সে-দানকে হেলায় হারিয়েছি···

নিশীথ বলিল—কিন্তু তা নয় জয়ন্তী!···তুমিও তোমার ও-দানে অনেককে তৃপ্তি দেছ। এই তো শুনলুম ব্রজেশ্বর বাবুর কাছে, বন্যা-রিলিফে তোমার গানে তুমি দু'হাজার টাকা দান করেছো।

নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তী বলিল—সে কি গান! বিধাতার দান নিয়ে ছেলাখেলা করেছি··সে দানের মর্য্যাদা রেখেছি কৈ!··· বিশ বছর আগে আমার গলা কি রকম ছিল···আমার গান তো শুনেছিলে···

নিশীথ বলিল—কিন্তু তোমার তো কোনো দুঃখ নেই সে জন্য। তোমার স্বামী···সংসার···

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তী বলিল—দুঃখ আমার নেই··· আমাকে উনি তুচ্ছ করেন না···আমার উপরই সব ভার। আমি যা করি···যা খরচ করি, কখনো তার কৈফিয়ৎ চাননি··কিন্তু আমি কি পেলুম? স্বামী তাঁর পেসেণ্ট নিয়ে মেতে আছেন চব্বিশ-ঘণ্টা··· তাদের রোগ আর ওষুধ এই নিয়েই···আমার পানে ফিরে তাকাবার সময় নেই! কি নিয়ে···কি করে আমার দিন-রাত কেটে চলেছে··· ভাবেন না! আমি যেন মেশিন! আমার সুখ নেই, দুঃখ নেই, আমার আরাম নেই, কিছু নেই। একে বাঁচা বলে না, নিশীথ! মেয়েদের এ দুঃখ তোমরা কখনো দেখলে না। বুঝলে না! জীবনে আমি কি পেয়েছি, বলতে পারো? ভগবান্ আমাকে যে-কণ্ঠ দিয়েছিলেন, স্বামী তার পানে কখনো চেয়ে দেখেছেন? কখনো তার দাম বুঝেছেন?···আমার কি মনে হয়, জানো নিশীথ? ভগবান্ আমায় অনেক-কিছু দিয়েছিলেন কিন্তু আমার অযত্নে সে-সব মিথ্যা হয়ে গেল!···কি আমার দাম? স্বামীর বাসনা-কামনার তৃপ্তি জোগাবার জন্যই কি মেয়ে-মানুষের জীবন? তাছাড়া তার আর অস্তিত্ব নেই?

নিশীথ বলিল—এ সব কথা মনে আনতে নেই জয়ন্তী! এই যে সংসার তুমি গড়ে তুলেছো, তাকে লালন করছো···

—আমি তাতে কি পেয়েছি!···তাছাড়া কার সংসার? এ সংসারে আমার স্থান কোথায়? কি দাম?

জয়ন্তীর দু'চোখে অশ্রুর উচ্ছ্বাস···

নিশীথ শুনিল। কি জবাব দিবে? সান্ত্বনা দিবে যে, তুমি তোমার জীবনের পঁচিশটা বৎসর পরের জন্য নিজেকে যে এই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছ, এই ত্যাগেই তো নারী-জন্মের সার্থকতা?

এ কথা কতখানি স্বার্থপরের···

জয়ন্তী বলিল—অনেক রাত হয়ে গেল···ডাক-বাংলায় ফিরবে? না, বজরায় থাকবে?

নিশীথ যেন চমকিয়া উঠিল! বলিল—না, ডাক-বাংলাতেই ফিরবো।

জয়ন্তী বলিল,—তাহলে আর দেরী নয়···চলো, তোমাকে বজরায় তুলে দিয়ে আসি।

জয়ন্তীর স্বর বাষ্পার্দ্র। নিশীথ বুঝিল। কোনো কথা বলিল না। জয়ন্তীর মনে যে-বেদনা, মুখের সান্ত্বনা-বাক্যে সে-বেদনা ঘুচিবে না, ঘুচিতে পারে না···তা সে বোঝে।

বজরা চলিয়া গেল।

বজরায় বসিয়া জয়ন্তীর কথা ভাবিতেছিল। জয়ন্তীর ভুল? জীবনে নিশীথের অভিজ্ঞতা প্রচুর···পৃথিবীকে স ভালো করিয়াই জানিয়াছে!···নিজের কথা মনে পড়িল। চাকরি করিয়া টাকা রোজগার করিতেছে···পঞ্চাশ দিকে পঞ্চাশ রকমে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয়। সকলকে লইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে হয়! নিজের চাওয়া-পাওয়াকেই বড় করিয়া তুলিলে দুঃখ পাইতে হয়! পৃথিবীতে শুধু দেওয়া-নেওয়ার কারবার! এ বয়সে জয়ন্তী মনের মধ্যে এ কি অতৃপ্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে! সংসার স্বামী···ইহাই চলিয়া আসিতেছে চিরকাল। জলসার খ্যাতি! ফিল্মের খ্যাতি···এই খ্যাতিই কি জীবনে সব?···আবার মনে হইল, বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন, আমার পুঁথিপত্র গুছাইয়া শৈবলিনীর কি সুখ?···তাই? তাঁর জজীয়তীর গৌরবে তিনিও তো···স্ত্রী কুরঙ্গিণীও সে-গৌরবে এমনি বিভোর? তার নিজের কামনা কিছু নাই? ছিল না?···হয়তো জয়ন্তী যা বলিল···ব্রজেশ্বর তো রোগী দেখিতে চলিয়া গেল। যখন বাহিরে কাজ থাকিবে না, তখন আসিবে ঘরে স্ত্রীর কাছে! স্ত্রী শুধু স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্য আরামের কথাই ভাবিবে? স্ত্রীর কথা স্বামী ভাবিবে না?···নাঃ, জটিল সমস্যা! ভাবিতে গেলে কূলকিনারা মেলে না···

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আল্‌গা ও নিবিড়

আলগা-চুমা ছোঁয়াও খোকার গালে
যেমন ফুলে রবির পরশ জাগে!
অপরাজিতায়, হাস্নুহানার ডালে
পরজাপতির চরণ-ছোঁয়া লাগে।

নিবিড়-চুমা ছোঁয়াও বধূর মুখে
অধীর যেমন ভৃঙ্গ ফাগুন-সাঁঝে,
আলিঙ্গনে জাগুক্ সোহাগ বুকে-
রক্তজবা মুখখানি হোক্ লাজে।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, বার-এ্যাট-ল)।

শৃঙ্গারের পর হাস্য। মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—হাস্য-রস হাস-স্থায়ি-ভাবাত্মক। ইহা অপরের বিকৃত বেশ, বিকৃত অলঙ্কার, ধৃষ্টতা, লৌল্য কুহক, অসৎপ্রলাপ, অঙ্গহানি প্রভৃতি দর্শন ও দোষকথনাদি বিভাব-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ১। ওষ্ঠ-নাসা-কপোল প্রভৃতির স্পন্দন, চক্ষুর ব্যাকোশন ও আকুঞ্চন, স্বেদোদ্গম, মুখরাগ, পার্শ্বগ্রহণ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা হাস্য-রসের অভিনয় কর্ত্তব্য ২। অবহিত্থ, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, প্রবোধ, অসূয়া প্রভৃতি হাস্য-রসের ব্যভিচারী ভাব ৩।

হাস্য-রস দ্বিবিধ—(১) আত্মস্থিত ও (২) পরস্থিত। কোন ব্যক্তি যখন স্বয়ং হাস্য করেন, তখন হাস্য-রস তাঁহার 'আত্মস্থ' বা আত্মগত। আর যখন তিনি অপর কোন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তিকে হাস্য করাইয়া থাকেন, তখন হাস্য-রস 'পরস্থ' বা পরগত।

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত একটি অতি সুন্দর বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মহর্ষি-কর্ত্তৃক কথিত আত্মস্থ-পরস্থ-বিভাগ-দর্শনে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে—বিদূষক বিকৃত-বেশাদি আত্মগত বিভাব-হেতু স্বয়ং যখন হাস্য করেন, তখন ঐ হাস্য-রস তাঁহার 'আত্মস্থ'; আবার যখন প্রধানা রাজমহিষীর হাস্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, তখন উহা রাজমহিষীর নিকট 'পরস্থ' (বিদূষক-গত)। কিন্তু ইহা ঠিক নহে; কারণ, এ ক্ষেত্রে কেবল বেশ প্রভৃতি বিভাব বিদূষকে বিদ্যমান—স্থায়ী ভাব (হাস) নহে। এরূপ স্থলে বরং বিভাবের আত্মস্থ-পরস্থ বিভাগ করা চলে। পক্ষান্তরে, কোন স্থলে প্রভু শোকার্ত্ত হইলে তাঁহার অনুজীবিগণও প্রভুর প্রতি সহানুভূতি-বশে শোক করিয়া থাকেন—ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। অতএব, উক্ত ন্যায় অনুসারে সর্ব্বরসেই আত্মস্থ পরস্থ-বিভাগ সম্ভব; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে। এই কারণে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—মহর্ষি-কৃত আত্মস্থ-পরস্থ-বিভাগের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। লৌকিক ব্যবহারে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে—কোন লোক হাস্যকর বিভাবাদি স্বয়ং দর্শন করিয়া হাসিতেছেন। অন্য এক জন লোক স্বয়ং ঐ হাস্য-জনক বিভাবাদি দেখিতে না পাইলেও কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে হাসিতে দেখিয়াই হাসিতে আরম্ভ করিলেন। আবার কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা যায় যে—কোন ব্যক্তি স্বয়ং হাস্যকর বিভাবাদি দর্শন করিয়াও গাম্ভীর্য্যবশে হাস্য চাপিয়া রাখিলেন—কিন্তু অপরকে হাসিতে দেখিয়া আর হাসি চাপিতে পারিলেন না—হাসিয়া ফেলিলেন। হাস্য স্বভাবতঃ সংক্রামক। অম্লরসের সহিত ইহার অনেকটা তুলনা হইতে পারে। ধরুন, কোন ব্যক্তি অম্ল-আচার প্রভৃতি খাইতেছেন, অপর এক ব্যক্তি উহা খাইতেছেন না—কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অম্ল-ভক্ষণ দেখিতেছেন। তথাপি এরূপ স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির জিহ্বাতে স্বভাবতঃ জল-সঞ্চার হইতে দেখা যায়। যে স্থলে স্বয়ং বিভাব-দর্শনে হাস্যোদ্রেক হয়, তথায় হাস্যরস স্বগত; আর যথায় বিভাবাদির অদর্শন সত্ত্বেও অপরের হাস মাত্র দর্শনে হাস্য জন্মে, তথায় উহা পরগত ৪।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি সাম্প্রদায়িক আর্য্যা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(এ রসে) বিপরীত (অর্থাৎ অস্বাভাবিক) অলঙ্কার, বিকৃত আচার-উক্তি-বেশ ও বিকৃত অঙ্গ-বিকারাদি দর্শনে কোন ব্যক্তি স্বয়ং হাস্য করেন বলিয়াই এ রস 'হাস্য'-রস নামে চিরদিন অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

আবার, (এ রসে) বিকৃত আচার-বাক্য-অঙ্গ-বিকার ও বিকৃত বেশ দ্বারা কেহ অপর ব্যক্তিকে হাসাইয়া থাকেন বলিয়াও ইহার নাম 'হাস্য'।

স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতিক পাত্রে এই হাস্য-রস প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ছয় প্রকার ভেদ :—

---

(১) বেশ—কেশরচনা প্রভৃতিও বেশের অন্তর্গত। অলঙ্কার—কটক-কেয়ূর-অঙ্গদ প্রভৃতি। বিকৃত বলিতে বুঝায়—দেশ-কাল প্রকৃতি-(স্বভাব)-বয়স্-অবস্থার বিপরীত। দৃষ্টান্ত, যথা—বালকের বেশ বা অলঙ্কার বৃদ্ধ ধারণ করিলে উহা হাস্যোদ্রেক করে। বেশ-অলঙ্কার ব্যতীত গদ্‌গদ (আধ-আধ কণ্ঠস্বর) প্রভৃতিও হাস্যকর। ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা—নির্লজ্জতা। লৌল্য—বিষয়ে অনিয়ত ভাব—চাপল্য। কুহক—কক্ষ-গ্রীবা প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া হাস্য উৎপাদন—এইরূপে সাধারণতঃ বালকগণের হাস্যোৎপাদন করা হইয়া থাকে—ইহার চলিত নাম 'কাতু-কুতু' (বা 'কুতু-কুতু') দেওয়া - ইহা অভিনবগুপ্তের মত। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন—roguery বা দুষ্টামি। অসৎপ্রলাপ—অসৎ-প্রসঙ্গ—হাস্যজনক উক্তি, অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ—যাহার কোন অর্থ হয় না, এরূপ কথাবার্ত্তা বলা। ডক্টর মুখোপাধ্যায় ইংরেজী করিয়াছেন—senseless drivels, অর্থাৎ বালকের মত বা বাতুলের মত যা-তা আবোল-তাবোল বলা। ব্যঙ্গ—অঙ্গবিগম—অঙ্গহানি। অভিনবগুপ্ত অর্থ দিয়াছেন—'বিথুনাদি'; ইহা অতি অস্পষ্ট। বোধ হয় ইহার অর্থ এইরূপ—অঙ্গহানি-জনিত বিকৃত অঙ্গচেষ্টা। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী—ridiculing. দোষকথন; 'দোষ' বলিতে বুঝায়—যাহার যাহা স্বভাব নহে, তাহার উপর সেই সেই অস্বাভাবিক ভাবের আরোপ; যথা—বীরের সম্বন্ধে ভয় পাওয়ার উল্লেখ (ভয় পাওয়া বীরের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক), অথবা ধার্ম্মিকের সম্বন্ধে অকার্য্য-করণাদির উল্লেখ। আবার পূর্ব্বোক্ত বিকৃত-বেশাদিকেও দোষ বলিয়া অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। দোষকথনাদি—আদি-পদটির দ্বারা সঙ্কল্প-স্মৃতি প্রভৃতি বুঝায়।

(২) ব্যাকোশ বা ব্যাকোশন—বিকাস বা উন্মীলন ও নিমীলন—চোখ খোলা ও পলক ফেলা। আকুঞ্চন—ঈষৎ বিকাস ও ঈষৎ নিমীলন, চক্ষু কুঁচ্‌কান। মুখরাগ—মূলে আছে 'আস্যরাগ'। পার্শ্বগ্রহণ—পার্শ্বদেশ-দ্বয়ের পীড়ন।

(৩) অবহিত্থ—বাহ্য আকারের প্রচ্ছাদন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়—dissembling. তন্দ্রা—মোহ (অভিনবগুপ্ত)। প্রবোধ—জাগরণ।

(৪) অভিনবভারতী, ষষ্ঠ অধ্যায়, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৩১৪—৩১৬

(১) স্মিত, (২) হসিত, (৩) বিহসিত, (৪) উপহসিত (৫) অপহসিত ও (৬) অতিহসিত।

ইহাদিগের দুইটি দুইটি করিয়া ভেদ যথাক্রমে উত্তম-মধ্যম-অধম প্রকৃতির পাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ—জ্যেষ্ঠ বা উত্তম-প্রকৃতির পাত্রগণ-কর্তৃক স্মিত ও হসিত প্রযুক্ত হয়, মধ্যম-প্রকৃতি-দ্বারা বিহসিত ও উপহসিত, আর অধম-প্রকৃতি-দ্বারা অপহসিত ও অতিহসিতের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদি গণ্ডদেশ ঈষৎ বিকসিত (অর্থাৎ উৎফুল্ল) হয়, কটাক্ষ বেশ সৌষ্ঠবযুক্ত (অর্থাৎ—অনুগ্র) ভাবে প্রযুক্ত হয়, আর দন্ত লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয়, উত্তম-প্রকৃতির পাত্র-কর্তৃক প্রযোজ্য ধীর (অর্থাৎ—মন্থর) 'স্মিত'।

যে হাস্যে মুখ ও নয়ন উৎফুল্ল ভাব ধারণ করে, গণ্ডদেশ বিকসিত হয়, আর দন্তপঙ্ক্তি ঈষৎ লক্ষিত হয় তাহার নাম 'হসিত'। ইহার প্রয়োগও উত্তম-প্রকৃতির পাত্র কর্তৃক হইয়া থাকে।

যে হাস্যে অক্ষি ও গণ্ডদেশ আকুঞ্চিত (অর্থাৎ ঈষৎ সঙ্কুচিত) হয়, যাহা মধুর স্বন-যুক্ত ও যাহা স্মিত-হসিতের অনন্তর যথাকালে সমাগত (অর্থাৎ—অভিব্যক্ত) ও যাহাতে মুখরাগ উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ—মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া থাকে), তাহার নাম 'বিহসিত' ৫।

যে হাস্যে নাসিকা উৎফুল্ল (অর্থাৎ—নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত) হয়, জিহ্মা দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা হয়, স্কন্ধদেশ ও মস্তক নিকুঞ্চিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ—ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়), তাহার নাম 'উপহসিত'। বিহসিত ও উপহসিত মধ্যম পাত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ৬।

যে হাস্য অস্থানে (অর্থাৎ—অকালে) প্রযুক্ত হয় যাহাতে নেত্রে অশ্রু উদ্গত হইয়া থাকে, আর যাহাতে স্কন্ধদেশ ও মস্তক উৎকম্পিত হইতে থাকে, তাহার নাম 'অপহসিত' ৭।

যে হাস্যে নেত্র উত্তেজিত ও অশ্রুযুক্ত হয়, স্বর বিকৃষ্ট ও উদ্ধত ভাব ধারণ করে, আর পার্শ্বদেশ হস্ত-দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়, তাহার নাম 'অতিহসিত'৮। অপহসিত ও অতিহসিত অধম পাত্রের যোগ্য।

বিভিন্ন শ্রেণীর দৃশ্য-কাব্যে নানা কার্য্যবশে উৎপন্ন যে যে হাস্য-স্থান দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থলে উত্তম-মধ্যম-অধম পাত্র অনুসারে এই ছয় প্রকার হাস্যের যথাযথ ভাবে প্রয়োগ কর্ত্তব্য ৯।

মহর্ষি ভরত এই স্থলে স্ব-সমুত্থিত ও পর-সমুত্থ ভেদে দ্বিবিধ, উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে তিন প্রকার প্রকৃতির অনুযায়ী অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট ষড়্‌বিধ হাস্য-রসের বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে হাস্য-রসের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রের এই বিবৃতির অনুসারী। হাস্য-রসের স্থায়ি-ভাব হাস—উহা বিকৃত আকার-বাক্য-বেশ-চেষ্টা প্রভৃতি হইতে ও কুহক (কাতু-কুতু) হইতে উৎপন্ন—উহার বর্ণ শ্বেত ও দেবতা প্রমথ ১০। যাহার বিকৃত আকার-বাগ্-বেশ-চেষ্টা দেখিয়া লোকে হাস্য করে, সেই হাস্য-রসের আলম্বন-বিভাব। তাহার শারীর-চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব। তাহার নেত্র-সঙ্কোচন, বদনের স্মেরভাব প্রভৃতি অনুভাব। আর নিদ্রা-আলস্য-অবহিত্থ প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব।

হাস্য ষড়্‌বিধ—জ্যেষ্ঠপাত্রের স্মিত ও হসিত, মধ্যম পাত্রের বিহসিত ও অবহসিত, আর অধম পাত্রের অপহসিত ও অতিহসিত ১১।

স্মিত—নয়ন ঈষৎ বিকসিত ও অধর ঈষৎ স্পন্দিত। হসিত—স্মিত-স্থলে দন্তপঙ্ক্তি কিঞ্চিৎ লক্ষিত। বিহসিত—মধুর স্বর-যুক্ত হাস্য। অবহসিত—শিরঃকম্পন-সহিত হাস্য। অপহসিত—চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম হয়—এরূপ জোর হাসি। অতিহসিত—অঙ্গ-বিক্ষেপ সহ বিকট অট্টহাস্য।

বিশ্বনাথ স্বরচিত একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"গুরোর্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটমিশ্রপাদাঃ"।

[কোন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতকে কুক্কুটমিশ্র নামে উপহাস করিয়া বলা হইতেছে—গুরুর বাক্য (অর্থাৎ প্রভাকরের মীমাংসা-মত) দিন পাঁচেক পড়িবার পর, বেদান্ত (অর্থাৎ উপনিষদ্-গীতা-ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যাদি) তিন দিন পড়িয়া, আর তর্ক-শাস্ত্রের বাদ (অর্থাৎ—তত্ত্ব-নির্ণায়ক বিচার-পদ্ধতি) কেবল আঘ্রাণ মাত্র করিয়াই পরম-পূজনীয় কুক্কুটমিশ্র পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

সাহিত্যদর্পণের হাস্যরস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর হাস্য-রস-সম্বন্ধে শারদাতনয়-রচিত ভাবপ্রকাশনের সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

---

(৫) কুঞ্চিত অক্ষি—contracted eyes; নাট্যশাস্ত্র-মতে—রস-দৃষ্টি অষ্টবিধ, স্থায়িভাব-দৃষ্টি অষ্টবিধ ও সঞ্চারি-ভাবজ-দৃষ্টি বিংশতি প্রকার। কুঞ্চিতা দৃষ্টি তাহার একটি ভেদ। যে দৃষ্টিতে অক্ষি-পক্ষ্মের অগ্রদেশ ঈষৎ নিকুঞ্চিত, অক্ষিপুট (eye-socket) ঈষৎ কুঞ্চিত ও অক্ষিতারকা সম্যগ্‌রূপে নিকুঞ্চিত, তাহার নাম 'কুঞ্চিত'-দৃষ্টি (নাঃ শাঃ ৮।৭০—কাশী সং; ৮।৭১ বরোদা সং)।

মূলে আছে 'কালাগতং'—অভিনবগুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—"স্মিতানন্তরং সঙ্গমনকাল ইত্যর্থঃ" (অভিঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১৬)। অভিনব আরও বলিয়াছেন—"স্মিতমেব সঙ্ক্রান্তং সদেবংরূপতামেতীত্যর্থঃ" অর্থাৎ—স্মিত অন্য ব্যক্তিতে সঙ্ক্রান্ত হইলে বিহসিত হইয়া থাকে।

(৬) জিহ্মদৃষ্টি—যে দৃষ্টিতে অক্ষিপুট লম্বিত ও আকুঞ্চিত (অথবা—যে দৃষ্টি লম্বিতভাবাপন্না ও যাহাতে অক্ষিপুট কুঞ্চিত), যাহাতে নিরীক্ষণ ধীরে ধীরে তির্য্যগ্‌ভাবে (টেরচাভাবে) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, যাহাতে দৃষ্টি নিগূঢ় ও অক্ষিতারকাও গূঢ় (গুপ্ত), তাহার নাম 'জিহ্মা' দৃষ্টি (নাঃ শাঃ, বরোদা সং ৮।৭৩)।

(৭) অস্থানে—অকালে, যথা—শোকাদির ক্ষেত্রে যথায় হাস্য-রসের অবসর নাই।

(৮) বিকৃষ্ট—শ্রবণকটু। উদ্ধত—অত্যুগ্র ও অত্যুচ্চ।

(৯) হাস্যস্থান—occasion for laughter.

(১০) 'কুহক'-শব্দের অর্থ শ্রীরাম তর্কবাগীশ করিয়াছেন—'নর্ত্তকাৎ'। তাঁহার মতে ইহার মর্ম্মার্থ—বিকৃত আকার-বাক্য-বেশ-চেষ্টা প্রভৃতি বিশিষ্ট নর্ত্তক বা নট হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। তিনি আরও বলিয়াছেন—কেবল এইরূপ নর্ত্তক কেন, বিকৃত আকার প্রভৃতির বর্ণনা-যুক্ত শ্রব্যকাব্য হইতেও হাস্য-রসের উৎপত্তি সম্ভব—"এতদুপলক্ষণং বিকৃতাকারাদিবিষয়কশ্রব্যকাব্যাদপি"। তিনি আর একটি পাঠান্তর ধরিয়াছেন—"কুতকাৎ" ও উহার অর্থ করিয়াছেন—"কৌতুকাৎ"—"বিকৃতাকারাদিজন্যাৎ কৌতুকাৎ"। কিন্তু অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্র-ব্যাখ্যায় 'কুহক'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—কাতু-কুতু দেওয়া।

(১১) নাট্যশাস্ত্রের 'উপহসিত' সাহিত্যদর্পণে 'অবহসিত' সংজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

রসের উপাদান-হেতু স্থায়ি-ভাব। হাস স্থায়ি-ভাব—হাস্যরসের উপাদান-হেতু। যে প্রীতিবিশেষে চিত্তের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'হাস'। হাস্য রস-রূপে পরিণত হইলে উহার ছয় প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

শৃঙ্গারে বিভাব-সমূহ ললিতভাবাপন্ন। হাস্য-রসের বিভাব ললিত নহে—ললিতাভাস। এই ললিতাভাস হাস্য-বিভাবগুলি যখন স্বীয় উৎকর্ষ-হেতুক যথাযোগ্য অনুভাব-সঞ্চারি-ভাব-সাত্ত্বিক-ভাব ও অনুকূল অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা হাস-স্থায়ি-ভাবকে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত করায়, তখন প্রেক্ষকগণের চৈতন্যাশ্রিত অন্তঃকরণ ঈষৎ রজোগুণ-সংস্পৃষ্ট ও তমোগুণ-যুক্ত হইয়া যে বিকার (অর্থাৎ পরিণাম) প্রাপ্ত হয়, তাহাই হাস্য-রস নামে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহাই শারদাতনয়ের সিদ্ধান্ত।

বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। প্রত্যেক মনুষ্যের যথার্থ স্বরূপ তাঁহার আত্মা। উহা চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ—স্বপ্রকাশ। উহার সংস্পর্শে যাহা আসে তাহাই প্রকাশিত হয়। এই আত্মার সহিত প্রথম সংস্পর্শে আইসে মানুষের মন বা অন্তঃকরণ। অর্থাৎ—জীবের সর্ব্বান্তর-ভূত তত্ত্ব হইতেছে তাঁহারই অন্তরতম অন্তর্য্যামী আত্মা। উহারই উপর জীবের অন্তঃকরণ (মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার), বহিঃকরণ (বহিরিন্দ্রিয়) দেহ প্রভৃতি আশ্রিত আছে ১২। আত্মা সর্ব্বান্তর—তাহার প্রথম আবরক বুদ্ধি। বুদ্ধি অত্যন্ত স্বচ্ছ—এ-কারণে উহা আত্মচৈতন্যের জ্যোতিতে অবভাসিত হইয়া উজ্জ্বলভাব ধারণ করে ও অপরাপর জড়-পদার্থ-সমূহের প্রকাশে সমর্থ হয়। এইরূপে চৈতন্যাশ্রিত উজ্জ্বল বুদ্ধি প্রকাশ করে মনকে। বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া মন প্রকাশ করে ইন্দ্রিয়-সমূহকে। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশ করে স্থূল দেহ ও বাহ্য বিষয়-সমূহকে, বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ বলিয়া আত্মচৈতন্য-জ্যোতির সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রতিফলনে সমর্থ। কিন্তু দেহ ও বাহ্য বিষয়-সমূহ অত্যন্ত স্থূল ও অস্বচ্ছ বলিয়া আর অন্য বিষয় প্রকাশে সমর্থ হয় না। অন্তঃকরণ জড় বস্তু বলিয়া জড়রূপা প্রকৃতির তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সমবায়ে গঠিত। সত্ত্ব—প্রকাশ-ধর্ম্মক উজ্জ্বল বৃত্তি—জ্ঞান-বৃত্তি। রজঃ—ক্রিয়া-ধর্ম্মক, অনুরঞ্জক-বৃত্তি—কর্ম্ম-বৃত্তি। তমঃ—মোহ-ব্যঞ্জক আবরক-বৃত্তি—অজ্ঞান-বৃত্তি। মন বা অন্তঃকরণ চৈতন্যে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত। যখন অভিনয়-দর্শন-কালে দর্শকের মন (অর্থাৎ অন্তঃকরণ) ঈষৎ রজোগুণস্পৃষ্ট ও তমোগুণান্বিত হইয়া বিশিষ্ট পরিণাম-ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আলঙ্কারিক পরিভাষায় সেই বিশিষ্ট মনঃপরিণাম বা মনোবৃত্তির নাম হয় হাস্য-রস। এক কথায়—হাস্য-রসে মনের রজোগুণ ঈষৎ অভিব্যক্ত (অর্থাৎ—রজোগুণ মনকে স্পর্শ মাত্র করিয়া বর্ত্তমান), আর তমোগুণ মনের অন্তস্তলে সূক্ষ্মরূপে অন্বিত ১৩।

শারদাতনয় আবার অন্যত্র বাসুকি ও নারদ-কথিত হাস্য-রসোৎপত্তি-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। এ মতে—অহঙ্কারযুক্ত মন যখন রজোগুণ-হীন ও সত্ত্বগুণ-যুক্ত তখনই হাস্য-রসের উদ্ভব ১৪।

হাস্য-শব্দের নির্ব্বচন করিতে গিয়া শারদাতনয় বলিয়াছেন—হস্-ধাতুর উত্তর অপ্-প্রত্যয় করিলে 'হস'-শব্দ উৎপন্ন হয়। আর হস্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে 'হাস'-শব্দ সিদ্ধ হয়। "স্বনহসোর্বা" এই সূত্র অনুসারে হস্-ধাতুর উত্তর বিকল্পে অপ্' বা 'ঘঞ্' প্রত্যয় বিহিত আছে। যেহেতু ইহা-দ্বারা লোকের হাস্য উৎপন্ন হয়, অতএব ইহার নাম 'হাস্য' ১৫।

রসোৎপত্তি-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—কোন এক সময়ে সকল লোক দগ্ধ করিবার পর দেবদেব মহেশ্বর নিজ মহিমায় অবস্থান করিতেছিলেন। কিছু কাল পরে আনন্দ-মন্থর নৃত্য করিতে করিতে তিনি নিজ মন হইতেই বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। তখন বিভুর বামভাগে মায়াময়ী বৈষ্ণবী শক্তি অম্বিকারূপে অবস্থান করিতে-ছিলেন। দেবাধিদেবের নিয়োগবশতঃ ব্রহ্মা লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন—'ঈশ্বরের দিব্য চরিত্র আমি কিরূপে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিব'? ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে থাকিলে ভগবান নন্দিকেশ্বর তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে প্রয়োগ বিজ্ঞান সহ নাট্যবেদের অধ্যাপনা করিলেন ও আদেশ দিলেন—'পিতামহ! এই নাট্যবেদোক্ত লক্ষণ অনুসারে এক একখানি রূপক (অর্থাৎ—দৃশ্যকাব্য) রচনা করিয়া আপনি নটগণকে উহাদিগের প্রয়োগ-শিক্ষা দিন। ঐ সকল রূপকের অভিনয় দেখিতে দেখিতে প্রাক্তন কল্পসমূহ আপনার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে'। এই বলিয়া নন্দী অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মাও 'ত্রিপুরদাহ'-নামক একখানি রূপক রচনা করিয়া নটগণকে উহার প্রয়োগ-শিক্ষা দিলেন। পরে উহার অভিনয় দেখিতে দেখিতে তাঁহার চারিটি মুখ হইতে চারিটি বৃত্তি ও তৎসহ চারিটি মুখ্য রসের অভিব্যক্তি হইল। দেবদেব ও দেবীর মিলনাভিনয় দর্শনে ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে

---

(১২) অন্তঃকরণ—চলিত ভাষায় ইহাকেই 'মন' বলা হয়। বস্তুতঃ, মন অন্তঃকরণের একটি বিশিষ্ট রূপ মাত্র। মন – অন্তঃকরণ যখন দোনা-মনা করে—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা—ব্যবসায়াত্মিকা; ব্যবসায়—স্থির নিশ্চয়। চিত্ত—স্মরণাত্মক। অহঙ্কার—গর্ব্বাত্মক। করণ—ইন্দ্রিয়। সাধারণতঃ করণ দ্বিবিধ—(১) অন্তঃকরণ (বর্ত্তমান-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 'মন' নামেই ইহার উল্লেখ করা হইবে) ও (২) বহিঃকরণ। বহিঃকরণ দ্বিবিধ—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়—৫টি—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ও (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়—৫টি—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়-গোচর নহে—অতীন্দ্রিয়। অক্ষিগোলক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহে—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্থান দেহাবয়ব মাত্র। আত্মচৈতন্যই সকলের আধার—দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সবই আত্মাতে আশ্রিত। আবার বাহ্য-বিষয়ও ব্রহ্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ও আত্মা একই—ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

(১৩) ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৪।

(১৪) "তস্মাদেব রজোহীনাৎ সসত্ত্বাদ্ধাস্যসম্ভবঃ",—ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৪৭।

(১৫) "অপ্‌প্রত্যয়ান্তঃ শব্দোহয়ং হস ইত্যভিধীয়তে।
ঘঞন্তো হাসশব্দস্তু দ্বয়োঃ প্রত্যয়য়োরপি॥
অত্র স্বনহসোর্বেতি বিকল্পেন বিধানতঃ।
হাস্যতেহসাবিতি যতস্তস্মাদ্ধাস্যস্য নির্ব্বহঃ॥
বিকৃতাঙ্গবয়োদ্রব্যভাষালঙ্কারকর্ম্মভিঃ।
জনান্ হাসয়তীত্যেব তস্মাদ্ধাস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"।—
ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৮।

কৈশিকী-বৃত্তি ও তৎসম্ভূত শৃঙ্গার-রসের আবির্ভাব ঘটিল। দেবদেব-কর্তৃক ত্রিপুর-মর্দ্দনের অভিনয়-দর্শনে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্বতী-বৃত্তি ও তদ্ভব বীর-রস জন্মিল। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের অভিনয়-দর্শনে তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে আর পাঁচটি বৃত্তি ও তজ্জনিত রৌদ্র-রসের উৎপত্তি ঘটিল। প্রভুর প্রলয়-কালীন সংহার-কর্ম্ম দর্শনে পিতামহের উত্তর মুখ হইতে ভারতী-বৃত্তি-সম্ভূত বীভৎস-রসের উদ্রেক হইল। শৃঙ্গার হইতে জন্মিল হাস্য, বীর হইতে অদ্ভুত, রৌদ্র হইতে করুণ ও বীভৎস হইতে ভয়ানক উৎপন্ন হইল ১৬।

যখন জটাজাল-শোভিত-শীর্ষ, অজিন-ধারী, সর্প-ভূষিত অগ্নিময়-নেত্র-বিশিষ্ট, ভস্মাঙ্গরাগ-বিভূষিত-দেহ দেবদেব দেবী পার্ব্বতীর রতি কামনা করিয়াছিলেন, তখন দেবীর ও দেবীর সখীবর্গের প্রচুর হাস্য জন্মিয়াছিল। এই কারণেই বলা হয়, শৃঙ্গার হইতে হাস্যের উদ্ভব ১৭।

হাস্যের বিভাবাদি বর্ণনা করিতে যাইয়া শারদাতনয় বলিয়াছেন —বিকটাকার বেশ, বিকৃত আচরণ ও ক্রিয়া, বিকৃত বাক্য, ধৃষ্টতা, লোভ ও চাপল্য, বিকৃত অভিনয় ও বিকৃত অঙ্গাবলোকন, কুহক, অসৎ-প্রলাপ, দোষ-কথন প্রভৃতি হইতে হাস্য উৎপন্ন হয়—ইহা স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতিতে বহুল ভাবে দৃষ্ট হয়। আশ্রয়ভেদে ইহা দ্বিবিধ—স্বাশ্রয় ও পরাশ্রয়। আবার প্রকৃতি-ভেদে ইহা ষড়্‌বিধ—(ক) বরিষ্ঠ-গণের—(১) স্মিত ও (২) হসিত ; (খ) মধ্যমগণের—(১) বিহসিত ও (২) উপহসিত ; (গ) নীচগণের—(১) অপহসিত ও (২) অতি-হসিত। স্মিতে—ঈষৎ বিকসিত গণ্ডদেশ, সকটাক্ষ নিরীক্ষণ, দন্তজ্যোৎস্না অলক্ষিত। হসিতে—সমগ্র গণ্ডমণ্ডল বিকসিত, আনন উৎফুল্ল ও দন্ত লক্ষ্যমাণ। বিহসিতে—অক্ষি ও গণ্ডদেশ আকুঞ্চিত, মুখরাগ, মধুর ধ্বনিযুক্ত। উপহসিতে—জিহ্মাবলোকনা দৃষ্টি, উৎফুল্ল-নাসিকাযুক্ত মুখ, শিরোদেশ নিকুঞ্চিত ১৮। অপহসিত—অস্থানে উচ্চ হাস্য (অট্টহাস), নয়নে উদ্গতাশ্রু, অঙ্গ-শিরোদেশ গাত্র কম্পমান। অতিহসিত—বিক্রুষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনিযুক্ত, উদ্ধত, নয়নে অশ্রুর উদ্গম, পার্শ্বদেশ কর দ্বারা নিপীড়িত (অত্যধিক হাস্যের বেগে পার্শ্বদেশে বেদনা জন্মে যেন পার্শ্বদেশ ফাটিয়া যাইতেছে, তখন উহা চাপিয়া ধরিতে হয়)। হাস্যে এক প্রলয় (মূর্চ্ছা) ব্যতীত অপর সকল সাত্ত্বিকভাবই প্রযোজ্য। হাস্যের ব্যভিচারি-ভাব—শঙ্কা, ত্রপা (লজ্জা), চপলতা, শ্রম, গ্লানি, অপত্রপা (নির্লজ্জতা), হর্ষ, প্রবোধ, অবহিত্থ, (স্বেদ, অশ্রু, পুলক) প্রভৃতি ১৯।

বাগ্‌-অঙ্গ-নেপথ্য (বেশ) ভেদে হাস্য আবার ত্রিবিধ ২০। প্রহসন (অর্থাৎ—হাস্যের উৎপাদক) বাক্যকে 'বাচিক হাস্য' বলা হয়। মাল্য-আভরণ-বস্ত্রাদির বিপর্য্যয়ে নিক্ষেপ—'নৈপথ্যজ হাস্য'। স্বভাববশতঃই হউক, আর কপটতা-পূর্ব্বকই হউক—অঙ্গসমূহের যে বিকট ভাবে অভিনয় (অর্থাৎ—বিকট অঙ্গবিক্ষেপ), উহাই 'আঙ্গিক হাস্য'।

হাসের দেবতা প্রমথবৃন্দ। কারণ, হাস্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতেছে বিকট অভিনয়। প্রমথগণের মধ্যে উহা অতি স্বাভাবিক। হাস্যের বর্ণ শ্বেত। কারণ, হাস্যকালে শ্বেতবর্ণ দন্তরুচি-কৌমুদীর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

শারদাতনয়ের বিবৃত হাস্য-রস প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে হাস্যরসের স্থায়িভাব হাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন ; যথা—

"আকুঞ্চ্য পাণিমশুচিং মম মূর্দ্ধ্নি বেশ্যা
মন্ত্রাম্ভসাং প্রতিপদং পৃষতৈঃ পবিত্রে।
তারস্বরং (স্বনঃ) প্রথিতথূৎকমদাৎ প্রহারং
হা হা হতোঽহমিতি রোদিতি বিষ্ণুশর্ম্মা"।

[অর্থাৎ—'বৈদিক মন্ত্রের প্রত্যেক পদ উচ্চারণে মন্ত্রপূত জল-দ্বারা আমার যে মস্তক পবিত্র হইয়াছে, সেই মস্তকে উচ্ছিষ্টাদি-লিপ্ত অশুচি হস্ত সঙ্কোচ-পূর্ব্বক বেশ্যা প্রহার করিয়াছে ও উচ্চৈঃস্বরে উহাতে থূৎকার প্রদান করিয়াছে—হায়! হায়! আমি মারা গেলাম'!—এই বলিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা রোদন করিতেছেন। টীকাকারগণের মতে—এস্থলে বিষ্ণুশর্ম্মা হাস্যের আলম্বন-বিভাব ; তাঁহার রোদন উদ্দীপন-বিভাব ; রসের আশ্রয়ভূত পুরুষের এই বাক্যটি অনুভাব। চাপল্যাদি ব্যভিচারি-ভাব। এই প্রসঙ্গে একটি বিচারও উঠিয়াছে। এই কাব্যে রতি-ভাবের আশ্রয়ভূত নায়ক-নায়িকার ন্যায় হাসের আশ্রয়ভূত পুরুষের সাক্ষাৎ কোন বর্ণনা নাই—তথাপি এই হাস্য-জনক দৃশ্যের দ্রষ্টা কোন পুরুষ যে বর্ত্তমান থাকিয়া এই বর্ণনা করিতেছেন, তাহা বিভাবাদি হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। সাহিত্যদর্পণ-কারও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—যাঁহার হাস (অর্থাৎ যিনি হাসিতেছেন—হাস-স্থায়ি-ভাবের আশ্রয়ভূত হাস্যকর দৃশ্যের দ্রষ্টা পুরুষ), তিনি যদি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে কাব্যে উপনিবদ্ধ নাও হন,

---

(১৬) ভাবপ্রকাশন, তৃতীয়াধিকার, পৃঃ ৫৫-৫৮। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) "জটাজিনধরো ভোগিভূষণঃ সাগ্নিলোচনঃ।
ভস্মাঙ্গরাগশ্চ যদা দেব্যা কাময়তে রতিম্।
তদা সখীনাং দেব্যাশ্চ হাসঃ সমুদভূন্মহান্।
তস্মাদ্ধাস্যসমুৎপত্তিঃ শৃঙ্গারাদিতি কথ্যতে"।
—ভাব-প্রঃ, পৃঃ ৫৭।

(১৮) শিরঃকর্ম্ম ত্রয়োদশ প্রকার বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—(১) আকম্পিত (বা অকম্পিত), (২) কম্পিত, (৩) ধুত (বা ধূত), (৪) বিধুত, (৫) পরিবাহিত, (৬) আধুত (বা উদ্বাহিত), (৭) অবধুত, (৮) অঞ্চিত, (৯) নিকুঞ্চিত, (১০) পরাবৃত্ত, (১১) উৎক্ষিপ্ত, (১২) অধোগত ও (১৩) লোলিত (নাঃ শাঃ, কাশী সং ৮।১৭—৩৬, বরোদা সং ৮।১৭—৩৯)। ইহার মধ্যে 'নিকুঞ্চিতং শিরঃ' বলিয়া কোন শিরঃকর্ম্মের উল্লেখ নাই।

(১৯) এই পর্য্যন্ত অংশ নাট্যশাস্ত্রেরই অনুবাদ মাত্র। কেবল স্বেদ—অশ্রু—পুলক—এই তিনটিকে ব্যভিচারী না বলিয়া সাত্ত্বিক বলাই সঙ্গত।

(২০) অভিনয় চতুর্ব্বিধ—(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক, (৩) আহার্য্য (বা নৈপথ্য) ও (৪) সাত্ত্বিক। আহার্য্য—বেশ-ভূষা প্রভৃতির দ্বারা যে অভিনয় হয়, (make-up, costume)। 'নেপথ্যে' বলিতেও বুঝায় বেশ-ভূষা। সাত্ত্বিক—সত্ত্বসম্ভূত বিকার-দ্বারা অভিনয় ; সাত্ত্বিক-ভাব-দ্বারাও অভিনয় প্রদর্শনীয়। সাত্ত্বিক—শারীরিক। সত্ত্ব—শরীর।

ক্ষতি নাই; বিভাবাদির সামর্থ্যবশে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে ২১।]

যদিও কাব্যপ্রকাশ-কার এই শ্লোকটিকে হাস্য-রসের উদাহরণ বলিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের মনে হয়, ইহাকে হাস্য-রসের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত না বলিয়া অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ বলাই অধিকতর সঙ্গত। এমন কি, ইহাকে ব্রীড়া বা জুগুপ্সার ব্যঞ্জক অশ্লীলতা-দোষের উদাহরণ বলিলেও বলা চলে।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্পণে দৃষ্ট হয়—হাস্য-রস বিকৃত আচার-জল্প-অঙ্গ-আকল্প-বিস্মাপন প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত; নাসাস্পন্দ, অশ্রুপাত, জঠরগ্রহণাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ২২।

হাস্যের ষড়্‌ভেদ—(ক) জ্যেষ্ঠ-প্রকৃতির (১) স্মিত ও (২) হস (বা হসিত)। (খ) মধ্যপ্রকৃতির (১) বিহাস (বিহসিত) ও (২) উপহাস (উপহসিত)। (গ) নীচ (অধম) প্রকৃতির (১) অপহাস (অপহসিত) ও (২) অতিহাস (অতিহসিত)। স্মিত—অলক্ষিত-দন্ত হাস্য। হসিত—দন্ত কিঞ্চিৎ লক্ষিত। বিহসিত—মধুরস্বর-যুক্ত আস্যরাগ-বিশিষ্ট ও সময়প্রাপ্ত (যথাকালোপযোগী—অবসর-প্রাপ্ত—যথাস্থানে প্রযুক্ত)। উপহসিত—স্কন্ধ ও শিরোদেশ যে হাস্যে কম্পমান। অপহসিত—অনবসর-প্রাপ্ত (অর্থাৎ হাস্যের অবসর না থাকিলেও যে হাস্য উদ্গত হয়—অস্থানে হাস্যের উদ্গম), অশ্রুপূর্ণ নেত্র, উৎকম্পিত স্কন্ধ ও শিরোদেশ। অতিহসিত—উভয় পার্শ্ব হস্ত-দ্বারা নিপীড়িত, উদ্ধত, বিক্রুষ্ট-স্বর-বিশিষ্ট ২৩।

এই হাস্য-রস প্রায় পামর-প্রকৃতিক ও অধম-প্রকৃতিক পাত্রেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অধম-প্রকৃতি বলিতে নাট্যদর্পণকার-দ্বয় স্ত্রী প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে স্ত্রীগণ পুরুষাপেক্ষা অধম-প্রকৃতিক ২৪।

নাট্যদর্পণের হাস্য-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২১) "যস্য হাসঃ স চেৎ ক্বাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে। তথাপ্যেষ বিভাবাদিসামর্থ্যাদবসীয়তে (উপলভ্যতে)॥ অভেদেন বিভাবাদিসাধারণ্যাৎ প্রতীয়তে। সামাজিকৈস্ততো হাস্যরসোঽয়মনুভূয়তে"॥—"এবমন্যেষ্বপি রসেষু বোদ্ধব্যম্"—(সাঃ দঃ. ৩য় পরিঃ)

(২২) বিকৃত—প্রকৃতি-(স্বভাব)-দেশ-কাল-বয়স্‌-অবস্থা প্রভৃতির বিপরীত। জল্প—বাক্য, কথোপকথন। বিকৃতাঙ্গ—যথা খঞ্জ প্রভৃতি। আকল্প—বেশ-ভূষাদি। এই প্রসঙ্গে—ধৃষ্টতা চাপল্য প্রভৃতিরও সংগ্রহ কর্ত্তব্য। বিস্মাপন—কক্ষ-নাসা-বাদন, ভ্রূ-কর্ণ-চূড়া-গ্রীবা-নর্ত্তন, পরভাষার অনুকরণ প্রভৃতি বিটের কার্য্য; বিট—যাঁহার সকল সম্পত্তি নিঃশেষে নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার কলত্রাদি বর্ত্তমান, সেই গুণবান শৃঙ্গার সহায়। হাস্য-রস নাট্যদর্পণ মতেও স্ব-পর-স্থায়ী—দ্বিবিধ। নাসা-স্পন্দন—গণ্ড-স্পন্দন, ওষ্ঠ-স্পন্দন প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে সংগ্রাহ্য। অশ্রুপাত—চক্ষুর আকুঞ্চন-প্রসারণ প্রভৃতি নেত্রবিকারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। জঠরগ্রহ—পার্শ্বগ্রহণ-করতাড়ন-মুখরাগ প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে গ্রহণীয়।

(২৩) এ-অংশে নাট্যশাস্ত্রের সহিত নাট্যদর্পণের বিশেষ পার্থক্য নাই।

(২৪) "অয়ং চ হাস্যো রসঃ···বাহুল্যেনাধমপ্রকৃতৌ পামরপ্রায়ে ভবতি। স্ববর্গাপেক্ষয়া চ স্ত্রিয়াঃ প্রাধান্যেঽপি পুরুষাপেক্ষয়াধমত্বৈবেতি তত্রাপি"—নাট্যদর্পণ, বরোদা সং, পৃঃ ১৬৭।

সত্য ও জীবন

সত্যের তরে প্রাণ দিলে তাহা
হয় না ক' নিষ্ফল,
সত্য ইহা কি? হয়ত বা ইহা
কবির বচন-ছল!
ওগো দেশগুরু, এই দ্বিধা শুধু
ক'রে দাও নিরসন,
প্রাণের মমতা রাখিব না আর
করিব মৃত্যুপণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

আমি সেই কবি

যুগে যুগে রচি আমি যৌবনের প্রেমের প্রলাপ
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরি নিয়া সঙ্গীতের তাপ
আকুল বেদনা-ভরে। মুক্ত-পক্ষ পাখী উদাসীন
তুলিয়া মর্ম্মরধ্বনি দিগন্তের সীমান্তে বিলীন
লীলাছন্দে। চোখের আকাশে মোর বিস্মৃত স্বপন
তন্দ্রাচ্ছন্ন দিনান্তের সন্ধ্যাগামী বকের মতন
চেয়ে আছে লায়লীর নিষ্পলক কালো আঁখিতারা,
দুনিয়ার বালুচরে চলি আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বহারা।

শেলী দত্ত।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৫

এক মাসে মহেন্দ্রের অসুখ সারিল না ; আরো ক'টা উপসর্গ লইয়া এমন বাঁকা পথ ধরিল যে, ভয়ে-ভাবনায় সুভাষিণীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল !

এবং বাড়ীতে এই বিপর্যয়ের মধ্যে দিলুর এগজামিন শেষ হইল।

বাড়ী আসিয়া সে ডাকিল—মা···

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুভাষিণী বসিয়া বেদানার রস ছাঁকিতেছিল। দিলুর এই আহ্বানের অর্থ সুভাষিণী যা' বুঝিল, তার বুকখানা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল ! সে চাহিল দিলুর পানে।

দিলু বলিল—বাবার অসুখ তো কিছুতে সারছে না ! এখানে এসে উপকার হলো কৈ ?

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী কহিল—কি যে করি ! আমার মাথায় কিছু আসছে না দিলু !

দিলু বলিল—আর কোথাও হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করলে হয় না ?

সুভাষিণী বলিল—বলেছিলুম, উনি বলেন, তাতে খরচ কত ! তাছাড়া উনি ভারী আকুল হয়ে পড়েছেন। বলেন, এবারে ছুটি নিলে হয়তো অর্দ্ধেক মাইনে দেবে !

চোখের সামনে অকূল সমুদ্র···দিলুর আকুলতা বাড়িল অনেকখানি।

সুভাষিণী বলিল—ও-বাড়ীর দিদি বলছিলেন, সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ী আছে পুরীতে···বলছিলেন, তোমার এগজামিন চুকলে পুরীতে যাবার কথা ! বাড়ী-ভাড়া লাগবে না।

দিলু বলিল—তাহলে দেরী করো না মা ! আমি বলি, পুরীতেই চলো। সেখানকার হাওয়ায় ওজোন আছে। বাবা নিশ্চয় সে-হাওয়ায় সেরে উঠবেন।

সুভাষিণী বলিল—ওঁকে বলি। আজো বিকেলে দিদি এসে বার-বার বললেন, দিলুর এগজামিন শেষ হয়েছে—দেরী করো না বৌ, পুরীতে নিয়ে যাও !

দিলু বলিল—সুপ্রসন্ন বাবু এখানে আছেন ?

সুভাষিণী বলিল—না।

—তবে ?

সুভাষিণী বলিল,—দিদি বললেন, তার জন্য ভাবনা নেই। দিদি যা ঠিক করে দেবেন, সুপ্রসন্ন বাবু তাতে অমত করবেন না··· করবার লোক তিনি নন্।

দিলু বলিল—তাহলে আজই বাবাকে বলে রাজী করাও মা··· কিন্তু টাকার জোগাড় ?

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নগদ তেমন নেই। গায়ে গহনা আছে তো আমার !

দিলু কোনো জবাব দিল না···নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বেদানার রসটুকু মহেন্দ্রকে খাওয়াইয়া সুভাষিণী কথা তুলিল। বলিল—তোমার ছেলে ভারী অস্থির হয়েছে গো···বলছে, পুরীতে যখন বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে, দেরী না করে তোমাকে ও সেইখানে নিয়ে যেতে চায় !

মহেন্দ্র বলিল—পাগল হয়েছো ! সে কি সস্তা টাকার খেলা, সুভা ! তোমাদের শেষে ধনে-প্রাণে মেরে রেখে যাবো, বলতে চাও ?

সুভাষিণীর বুকে যে-জায়গায় সব চেয়ে বেশী বেদনা, এ-কথা সে বেদনার উপর বড় জোরে আঘাত করিল। সুভাষিণী বলিল—কি যে বলো ! এ কথা বলে বুঝি খুব আনন্দ পাও ?

মহেন্দ্র বলিল—আনন্দ কতখানি, তুমি বুঝবে না সুভা ! আমার জন্য তোমরা যে-উদ্বেগ ভোগ করছো, তোমাদের সে-উদ্বেগের চেয়ে আমার উদ্বেগ কত বেশী···

আবেগে মহেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুভাষিণীর মুখে কথা নাই। মলিন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে সে চাহিয়া রহিল···নিঃশব্দে।

মহেন্দ্র বলিল—দেহের কোথায় কল এমন বিগড়ে গেল যে, কিছুতে আর সারতে চায় না ! শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছি, কতখানি আশা নিয়ে দেশ ছেড়ে এখানে এলুম—সব মিথ্যা হয়ে যাবে ?

মহেন্দ্রর স্বর গাঢ়। সুভাষিণী শিহরিয়া উঠিল ! বলিল—না, না, কেন মিথ্যা হবে ! ভোগ বলে একটা কথা আছে—গ্রহ খারাপ হলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। ও-বাড়ীর দিদি আজ বলছিলেন, তোমার কোষ্ঠী থাকে যদি, ওঁকে দিতে ! ওঁর জানা লোক আছেন, ভালো জ্যোতিষী···সেই জ্যোতিষীকে উনি এক বার দেখাতে চান্ ! কোনো গ্রহ যদি বিরূপ থাকে, তাহলে সে বিরূপতা কাটাবার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করবেন উনি।

মহেন্দ্র হাসিল—মলিন হাসি ! বলিল—দিয়ো কোষ্ঠী·· ডাক্তারের চিকিৎসায় কিছু হচ্ছে না যখন, দ্যাখো, তোমার শান্তি-স্বস্ত্যয়নে যদি আমাকে সারাতে পারো !

পরের দিন গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন···বেলা তখন পাঁচটা। বলিলেন,—কাল দোল। ছেলেরা দু'বেলা আমার ওখানে খাবে—তোমার খাবার পাঠিয়ে দেবো। বাড়ীতে রান্নাবান্না করো না। সন্ধ্যার পর তুমি এক বার গিয়ে ঠাকুর দেখে এসো···

তার পর তিনি মহেন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন—অমত করো না ভাই ···পুরীতে যাবার ব্যবস্থা করো। আমি বুঝি, কোথায় বাধছে। কিন্তু সে-বাধা মানলে তো চলবে না ! এগুলির মুখ চেয়ে সেরে উঠতে হবে···কাজ-কর্ম্ম করে পয়সাও রোজগার করতে হবে। আমার কথা শোনো, এ ঘুসঘুসে জ্বর সমুদ্রের বাতাস গায়ে একবার লাগলেই সেরে যাবে !

মহেন্দ্র বলিল,—ভাবি, কুলি-মজুরের মতো যে-মানুষ দিন আনে দিন খায়, এ-রোগ ভগবান্ তাকে কেন দিলেন !

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কেন দিলেন, তা যদি আমরা বুঝবো, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল ?···পরীক্ষা ! সংসারে থাকতে হলে মানুষকে কত রকমের পরীক্ষা দিতে হয় ! কিন্তু ও-সব কথা নয়।

আমি বলি, দিলুর এগজামিন হয়ে গেল, ভালো দিন দেখে চটপট্ বেরিয়ে পড়ো। পুরীর বাড়ীতে আছে সুবল। বাড়ী-ঘর দেখে। খুব ভালো লোক সে। দেখাশুনা করবে, তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না! সাত দিনেই উপকার বোধ করবে! সুপ্রসন্নর একবার হয়েছিল এমনি জ্বর—কিছুতে ছাড়ে না! ডাক্তার-বদ্যি এলে দিয়েছিল! অস্থিসার দেহ! শেষে পুরীতে নিয়ে গেলুম। এক-মাসে অসুখ সেরে গেল,—আর চেহারা যা হলো! আমার ও দেখা, বুঝলে ভাই, আমার কথায় 'না' বলো না।

মহেন্দ্র বলিল—অসম্ভব দিদি! আপনি তো বোঝেন, আবার ছুটী নিলে চাকরি না গেলেও মাইনে কমে যাবে! তাতে…

বাধা দিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—শরীর যদি না থাকে, চাকরি কে করবে, শুনি? টাকার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার কাছ থেকে ধার নিয়ো। তার পর সেরে চাকরি করে আস্তে-আস্তে শুধে দিয়ো।

মহেন্দ্র এ-কথার জবাব দিল না; চুপ করিয়া রহিল। মন বলিতেছিল, স্ত্রী-পুত্র…তাদের ভবিষ্যৎ…

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমি কোনো আপত্তি শুনবো না। আমায় যদি সত্যি দিদি বলে ভাবো, তাহলে আপত্তি করবে না তুমি! এ শরীরে চাকরি করতে পারবে না,—ছুটী তোমাকে নিতেই হবে। এখানে পড়ে থাকলেও মাইনে কমবে!… শুয়ে শুয়ে ভুগে এদের সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থাও করতে পারবে না যখন, তখন এ ছাড়া অন্য উপায় কি আছে বলো ভাই!

মহেন্দ্র বলিল—আচ্ছা, আপনার কথাই শুনবো। দেখি, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এই তো লক্ষ্মী ভাইয়ের মতো কথা! কালই আমি ভালো দিন দেখিয়ে রাখবো…আর সুবলকে চিঠি লিখে দেবো, পুরীর বাড়ী সাফ্-সুতরো করে রাখবার জন্য।

গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন সুভাষিণীর কাছে! দু'চোখে অধীর প্রশ্ন…সুভাষিণী চাহিল গৌরী ঠাকুরাণীর পানে।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—বলে এলুম পুরী যাবার কথা! রাজী হয়েছেন। ভালো দিন দেখিয়ে আমিই পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। টাকার জন্য ভেবো না। আমি দেবো টাকা।

সুভাষিণীর চোখের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, না, কি…সুভাষিণীর মুখে কথা ফুটিল না!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—টাকা যদি মানুষের কাজে না লাগলো, তাহলে সে টাকার কি দাম? কাজে লাগবে না, শুধু জমানো থাকবে, এই যদি—তাহলে টাকার বদলে নুড়ি-পাথর জমালেও চলে। দু'য়েরই তুল্য-মূল্য! তাছাড়া নিতে বলছি না তে! তোমার দরকার, ধার নাও। তার পর দিন পেলে শুধে দিয়ো।…ভাবছো কি আমার পানে চেয়ে?

সুভাষিণী বলিল—ভাবছি, আর-জন্মে আপনি সত্যি আমার দিদি ছিলেন!

হাসিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ও, এ-জন্মে দিদি নই? বটে!

১৬

পুরী যাওয়ায় বাধা পড়িল। দোলের পর মহেন্দ্রর জ্বর বাড়িল। ডাক্তার বলিলেন—এত-জ্বরে ট্রেণে যাওয়া উচিত হবে না!

মহেন্দ্র বলিল—সত্যি কথা বলবেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বলিলেন,—বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন?

মহেন্দ্র বলিল—যে ভয় করছি, তাই?

—তার মানে?

—সেই পী-এচ-টি-এচ-আই-এস-আই-এস?

নিশ্বাস চাপিয়া ডাক্তার বলিলেন—লাংসে তেমন লক্ষণ তো পাচ্ছি না!

মহেন্দ্র বলিল,—যখন পাবেন, তখন আমার কিছুই আর থাকবে না, বোধ হয়!

ডাক্তার বলিলেন—না, না, সে ভয় করবেন না!

মহেন্দ্র বলিল,—ভরসাও যে এতটুকু পাচ্ছি না। এ ভয় রোগকে নয়, মৃত্যুকে নয়, ডাক্তার বাবু! এ ভয় আমার…আমি চলে গেলে যারা থাকবে, তাদের জন্য। ছেলেদের মানুষ করতে পারলুম না! সংস্থান বলতে কিছুই নেই। এই বিদেশ…

ডাক্তার বলিলেন—শরীরে একটু বল পেলে পুরী পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। সেরে উঠবেন নিশ্চয়। এর চেয়েও কত শক্ত কেস্ সারছে…

মহেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—তাই থেকেই বুঝুন আমার দুর্ভাগ্য কত বেশী! মাইনে ওদিকে কমলো! নাম কেটে দ্যায়নি…সইটুকু ছাড়া আর কোনো দিকেই সুরাহা দেখছি না!

এ কথার উত্তর ডাক্তার কি দিবেন? ডাক্তার উত্তর দিলেন না; যথারীতি ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সুভাষিণীর সহিত মহেন্দ্রর কথা হইতেছিল। মহেন্দ্র বলিল—ডাক্তারের কথা মানো সুভা, পুরীতেই নিয়ে চলো। এখানে পড়ে শুধু ভুগছি! এ রোগভোগে আমার মন কি আতঙ্কে ভরে আছে!

সুভাষিণী বলিল—এখানে তবু দু'-এক জন আত্মীয়-বন্ধু আছেন! পুরীতে গিয়ে যদি বাড়ে? তাই ভাবছি…

মহেন্দ্র বলিল—কিন্তু তুমি কি করে এ পরিচর্য্যা চালাবে, ভেবে আমি দিশা পাচ্ছি না! ওঁরা যে-সব ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করছেন, সে ব্যবস্থা চলে বড় লোকের ঘরে…যার অজস্র টাকা! আমার মতো অবস্থার মানুষ…

সুভাষিণী বলিল—চলছে তো যাহোক করে! তাছাড়া ও সব কথা তুমি কেন ভাবো? মানুষের যা করা কর্ত্তব্য, করতে হবে তো!

মহেন্দ্র বলিল—রোগের জন্য আমার ভাবনা নয়! ভাবনা, আমার এ রোগে তোমার সেবা-পরিচর্য্যার এই বাহুল্য…কি দিয়ে এ-ব্যবস্থা তুমি করছো? তোমাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভয় করে কতখানি!

সুভাষিণী এ কথার জবাব দিল না। এ কথার জবাব নাই! মহেন্দ্র আবার কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না, দিলু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

মায়ের কাছে আসিয়া মায়ের হাতে পনেরোটি টাকা দিয়া দিলু বলিল—আমার মাইনে।

কথাটা মহেন্দ্র শুনিল, বলিল—মাইনে!

সুভাষিণী বলিল—এক-মাস ও ছেলে পড়াচ্ছে। পনেরো টাকা করে তারা দেবে, বলেছে।

মহেন্দ্রর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! মহেন্দ্র বলিল—ভগবান্ কোনো দিকে আর কিছু বাকি রাখলেন না! ছেলের রোজগারও দেখিয়ে দিলেন যাবার আগে!

সুভাষিণী কহিল—এ আবার কি কথা! ছেলে খুশী-মনে রোজগারের টাকা এনে দাঁড়ালো···এ-কথা ওর বুকে পাথরের মতো বাজবে না?

মহেন্দ্র বলিল—আমার বুক এতে পাথর হয়ে গেল যে!

সুভাষিণী বলিল—কি দুঃখে পাথর হবে? সংসারে টাকার দরকার। ছেলের এগজামিন শেষ হয়েছে···এখন পড়াশুনা নেই! তাস-পাশা না খেলে, হুটোপাটি না করে ও যদি দু'টি ছেলে পড়িয়ে টাকা আনে? সংসারের সাশ্রয় করে? তাতে তোমার বুক পাথর হবে কি দুঃখে! না, মন-খারাপ করো না। তোমার মাইনে কমেছে··· ভগবান্ এক দিক্ থেকে যদি খানিকটা সুরাহা করেন, তাঁর সে অনুগ্রহ মাথায় তুলে নাও।

মহেন্দ্র বলিল—তাই নিলুম! তাঁর অনুগ্রহ-নিগ্রহ সবই মাথায় নিয়েছি সুভা···শুধু আজ নয়, চিরদিন!

সুভাষিণী এ-কথার জবাব দিল না, দিলুর পানে চাহিল, বলিল—কাল সকালে ওঁর মিকশ্চারটা আনতে হবে দিলু। এক দাগ বাকী আছে। আজ রাত্রে খাবেন। তার পর কাল সকালে···

দিলু বলিল—কাল সকালে শিশি দিয়ো···ওষুধ নিয়ে আসবো।

সুভাষিণী বলিল—এখন তুমি যাও দিলু, নীলুর কি পড়া বলে দিতে হবে না কি!

—যাই···বলিয়া দিলু চলিয়া গেল।

রাত্রি আটটা। পথ্যের প্লেটে মোজাম্বিক্ দেখিয়া মহেন্দ্র বলিল—ছেলের রোজগারের টাকা ভেঙ্গে আমীরি পথ্য খাওয়াচ্ছ আমাকে···ওদের পেটে কিছু পড়লো না নিশ্চয়!

সুভাষিণী বলিল—তার মানে?

মহেন্দ্র বলিল—মানে, ওর টাকায় আমার জন্য এলো মোজাম্বিক! এদেশে এর দাম কি সামান্য পয়সা! আমাদের মতো গরীব-গৃহস্থের ঘরে ঘোড়া-রোগ এনে দিয়ে ভগবান্ কি তামাসাই না দেখছেন!

সুভাষিণী কহিল—ভয় নেই, এ ফল কেনা হয়নি! যে-বাড়ীতে পড়ায়, তারা দিলুকে খুব ভালোবাসে, যত্ন করে···রোজ ওকে জলখাবার দেয়! কলকাতা থেকে ওঁদের কে কুটুম এসেছেন। তিনি মোজাম্বিক, আপেল, নাশপাতি নিয়ে এসেছেন। দিলুকে তাই খেতে দিয়েছিলেন। ও খায়নি। জোর করে ওর হাতে তাঁরা গুঁজে দিয়েছেন একটি আপেল, দু'টি মোজাম্বিক, চারটে ন্যাশপাতি, কিছু খেজুর আর মেওয়া! দিলু বললে, মোজাম্বিক তোমার পক্ষে খুব উপকারী হবে, তাই···

মহেন্দ্র বলিল—ওদের দেছ?

—দিয়েছি গো!···আধখানা কেটে ওদের তিন ভাইকে দিয়েছি··· আর এই আধখানা এনেছি তোমার জন্য!

মহেন্দ্রের বুক ঠেলিয়া সঞ্চিত এক-রাশ অশ্রু আসিয়া চোখের পিছনে দাঁড়াইল। রোগশুষ্ক কণ্ঠ সে অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হইয়া উঠিল। বাষ্পার্দ্র স্বরে মহেন্দ্র কহিল,—ছেলেকে এমন মানুষ করে তুলেছো সুভা! এর চেয়ে বড় সম্পদ্ আর কি আছে! ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করবেন!

সুভাষিণীর বুক দুলিয়া উঠিল! গ্লানির ভারে মহেন্দ্র এখন যে-সব কথা বলে, সে-কথায় এত ধার যে, বুকখানা তাহাতে ছিঁড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হয়! কোনো মতে আত্মসংবরণ করিয়া সুভাষিণী বলিল,—শুয়ে শুয়ে মন্দটাই যদি তুমি এমন করে ভাবো, তাহলে আমরা দাঁড়াবো কিসের জোরে, বলতে পারো? দিলু···বেচারী! শুক্‌নো মুখ করে আমায় বললে,—উনি যদি এমন হতাশ হয়ে পড়েন···

কথা শেষ হইল না! পাহাড়ের মতো যে বিরাট্ ভয়-ভাবনা বুকের উপরে খাড়া আছে, সে ভয়-ভাবনা তাকে যেন চাপিয়া ধরিল! সে-চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

রাত্রি দশটা। সুভাষিণীকে তাড়া দিয়া মহেন্দ্র খাইতে পাঠাইয়াছে, দিলু আসিয়া বসিল মহেন্দ্রর বিছানায়। সে বাপের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

মহেন্দ্র ডাকিল—দিলু···

দিলু বলিল—বাবা···

মহেন্দ্র বলিল—নীলু শুয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তুমি?

দিলু বলিল—আপনি ঘুমোলে আমি শুতে যাবো।

—রাত হয়েছে। শোওগে দিলু।

—মা আসুন। আমার ঘুম পায়নি। এগারোটা পর্য্যন্ত আমি পড়ি, তার পর শুতে যাই।

—আজ পড়বে না?

—পড়বো'খন!

মহেন্দ্র আর কোনো কথা বলিল না। দিলু বাপের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···পনেরো মিনিট কাটিল।

দিলু বলিল - ঘুম পাচ্ছে না?

—না।

দিলু বলিল—নিশ্চয় অনেক কথা ভাবছেন!

মহেন্দ্র বলিল—অনেক কথা নয় দিলু, শুধু একটা কথা ভাবছি! সে কথা তোমাকে বলা দরকার মনে হচ্ছে। তুমি দুঃখ করো না! বয়সে ছেলে-মানুষ হলেও তোমার মন, তোমার বুদ্ধি সাধারণ ছেলেদের মতো ছোট নয়। তাই তোমাকে সে-কথা বলা উচিত মনে করছি!

দিলু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বুঝিল, মহেন্দ্র এমন কথা বলিবে, যে-কথা কাঁটার মতো দিলুর বুকে বাজিবে!

মহেন্দ্র বলিল—তুমি যে এই টুইশনি-চাকরি করছো···আমার এতে খুবই বেজেছে! এ-বয়সে সংসার নিয়ে দুঃখ-দুর্ভাবনা করবার কথা তোমার নয়, দিলু! না, দুঃখ করো না, তোমার বয়সে যে-ছেলেকে সংসারে সাশ্রয় হবে বলে চাকরি করতে বেরুতে হয়, সে ছেলের যে-বাপ, তার দুর্ভাগ্য কতখানি, তা আমি বুঝি, দিলু!···তবু এতে সান্ত্বনাও পাচ্ছি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র চুপ করিল। দিলুর মাথার মধ্যে এক-রাশ সরীসৃপ যেন কিলবিল করিতে লাগিল! বাহিরে জমাট স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতা চিরিয়া থাকিয়া-থাকিয়া দূরে একটা কুকুর ডাকিতেছে!

মহেন্দ্র আবার বলিল—সব-সময়ে সৎপথে থেকো। যা সত্য আর ন্যায় বলে বুঝবে, তার পক্ষ কখনো ত্যাগ করবে না। ন্যায় আর সত্য রক্ষা করতে যদি গুরুজন বা প্রিয়জনের মনে ব্যথা লাগে, তাতেও কখনো কাতর হয়ো না। পরের অনুগ্রহের উপর কখনো নির্ভর রেখো না। কারো কৃপাপ্রার্থী হয়ো না জীবনে। নিজের শক্তির উপর নির্ভর করবে চিরকাল। ভিক্ষায় বা পরের কৃপায় যে রাজ্য-সম্পদ্ ভোগ করে, তার চেয়ে যে কুলি নিজের সামর্থ্যে মোট বয়ে দিনাতিপাত করে মানুষ-হিসাবে সে অনেক বড়!

এ কথায় কিসের আভাস, দিলু বুঝিল। ব্যথার নিশ্বাসে দিলুর বুক যেন ফাটিয়া যাইবে! সে বলিল,—এ সব কথা আমাকে বলতে হবে না বাবা। আপনাকে দেখে আমি জেনেছি, মানুষ কাকে বলে…মানুষ হতে হলে…

মহেন্দ্র বলিল—তবু বলে রাখি দিলু। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার হিসাবই আমরা বুঝে নিতে শিখেছি। কিন্তু পাশ করলেই কেউ মানুষ হয় না! কি করলে মানুষ হয়, ছেলেমেয়েদের তা কখনো আমরা বলে দিই না। তাই…

আঁচলে ভিজা হাত মুছিতে মুছিতে সুভাষিণী আসিল ঘরে। দিলু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সুভাষিণী কহিল—কিসের গল্প হচ্ছে তোমাদের?

মহেন্দ্র বলিল—দিলুকে বলছি, কি ভাবে চলবে! মা-বাপ কারো চিরদিন বাঁচেন না তো!

সুভাষিণী রাগ করিল, বলিল—ও সব তত্ত্ব-উপদেশ শোনবার বয়স তোমার ছেলের এখনো হয়নি!…তুই যা দিলু, শুগে যা!

মায়ের কথায় দিলু উঠিয়া গেল। গেল টলিতে টলিতে…কেমন আচ্ছন্নের মতো।

১৭

আরো এক মাস পরের কথা…

মহেন্দ্রর শরীর আরো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সারা বাড়ী ঘিরিয়া দারুণ অশান্তি-দুশ্চিন্তার ছায়া!

গৌরী ঠাকুরাণী ক'দিন এইখানেই বাস করিতেছেন। সকালে উঠিয়া বাড়ী যান্। ছেলেরা তাঁর ওখানে খাওয়া-দাওয়া করিতেছে। সুভাষিণীর জন্য নিজের হাতে তিনি ভাত বাড়িয়া আনেন। তাঁর মনেও আশার শেষ রশ্মিটুকু নিব-নিব হইতেছে!

সে দিন তিনি আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—মানুষ, না, পিশাচ! দেখা হয়েছিল তোমাদের ঐ কামিখ্যে-সাহেবের সঙ্গে। বললুম, তোমার না আপন-জন? তার এই অসুখ! বলে, যমে-মানুষে টানাটানি, আর তুমি সাহেবিয়ানা করছো! বললুম, তুমি না যাও, তোমার স্ত্রী…তার তো ভাই হয়! দু'জনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে! তিনি এক বার খোঁজ নিতে পারেন না?

রাগের ঝোঁকে তিনি অনেক কথা বলিলেন। তার পর সে ঝোঁক কমিলে তিনি বসিলেন। বসিয়া বলিলেন—ডাক্তারকেও আজ ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম। পয়সার চাকর বৈ তো নয়! সুপ্রসন্নর পয়সা আছে…তার দিদি আমি…ডাকতেই এসেছিল। বললুম, আমরা ডাক্তার নই, আমরা বুঝছি রোগ শক্ত—আর তুমি ডাক্তারী-পাশ করে মাইনে নিয়ে চাকরি করছো—শিসি-শিসি ওষুধই খাওয়াচ্ছো, অসুখ কমছে না, রোগীর দেহ পাত হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ব্যবস্থা নেই? কেউ ওদের দেখবার নেই…কেউ কিছু বলে না, তাই, বটে? তাতে আমতা-আমতা করে বললে, কলকাতার মতো এখানে ব্যবস্থা তো নেই, কাজেই!…আমি ছাড়িনি তবু। বললুম, এখানকার বড় বড় চাকুরে যারা, যাদের হাতে চাকরির কল-কাঠি, তাদের জীবনেরই দাম আছে, ভাবো? আর এ-সব লোকের জীবনের কোনো দাম নেই যে, শুধু ওষুধ দিয়ে দায়ে খালাশ হচ্ছো!

গৌরী ঠাকুরাণী আবার চুপ করিলেন। তার পর দম লইয়া আবার বলিলেন—সুপ্রসন্নকে আমি চিঠি লিখেছি। এক বার আসতে বলেছি! তাকে এখানকার কথা লিখেছি। লিখেছি, আমরা মেয়েমানুষ… কিছু বুঝতে পারছি না। একবার সে যদি আসে, ভালো রকম বিধি-ব্যবস্থা করি!…এ ডাক্তারের উপর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। এমন করে রোগীকে ওর হাতে আর ফেলে রাখা চলে না! বড়-চাকুরেদের বাড়ীতে অসুখ হলে পৃথিবী মাথায় করে নাচতে থাকে… দেখেছি তো! আর এখানে শুধু ঠেকো দিচ্ছেন! মাইনের চাকর এ-সব হতভাগা…মানুষের চামড়াখানাই শুধু যে গায়ে আছে!

ভয়ে-ভাবনায় সুভাষিণীর মন যেন পাথর হইয়া আছে! গৌরী ঠাকুরাণীর এ-কথায় সে-পাথর ফুঁড়িয়া অশ্রু একেবারে উতল হইয়া উঠিল!

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—কি করে আমার দিন কাটছে দিদি, ভগবান্ জানেন! এত দিন তাঁকে যখনি ডেকেছি, তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন। এবারে কি এমন অপরাধ করেছি যে, তাঁর দয়া হচ্ছে না!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি মন খারাপ করো না বৌ! তোমার মনের জোরের উপরই রোগীর জীবন!…সাবিত্রীর কথা শুনে-ছিলুম…এখানে এক জন কথক এসেছিলেন…তিনি বলেছিলেন, সাবিত্রীর মনের জোরেই সত্যবান্ বেঁচেছিলেন। যমের কাছ থেকে বর পাওয়া…ও সব বানানো গল্প! সত্যবানকে ফিরে পাওয়ার আসল মানে তিনি বেশ মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, সাবিত্রী মনের জোরে সেবা করেছিলেন…মনকে তিনি শক্ত করে বুঝিয়েছিলেন যে, না, সত্যবানের মৃত্যু হতে পারে না! তাঁর সেই মনের জোর আর সেবার জোর…তাতেই সত্যবান্ বেঁচে উঠেছিলেন!

একাগ্র মনে সুভাষিণী এ কথা শুনিল। ভাবিল, তার নিষ্ঠা কি সাবিত্রীর নিষ্ঠার চেয়ে কম? তার ভালোবাসাও সাবিত্রীর ভালোবাসার চেয়ে এক-তিল কম নয়! তবু সুভাষিণী মনে জোর পায় না কেন? মহেন্দ্রর জন্য সুভাষিণী কি না করিতে পারে? সাবিত্রী ছুটিয়াছিলেন যমকে ভয় না করিয়া যমের পিছনে বৈতরণীর পারে…সুভাষিণী সে-পার ছাড়িয়া দূরে…আরো…আরো…আরো দূরে ছুটিতে পারে, মহেন্দ্র যদি তাহাতে বাঁচিয়া ওঠে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আমাদের শিবনাথকে বলেছি, কাল সে পার্ব্বতীপুর গিয়ে সেখান থেকে সিভিল-সার্জ্জনকে একবার নিয়ে আসবে। তুমি ভেবো না বৌ…এক বার দেখি, আমরা যা পারি!

তার পর সুপ্রসন্ন আসুক! বিনা-চিকিৎসায় এভাবে একটা প্রাণ··· যেতে পারে না···যাবে না!

নিশ্বাসের বাষ্পে কথা শেষ হইল না।

তার পর কিছু বাকী রহিল না। পার্ব্বতীপুর হইতে সিভিল-সার্জ্জন আসিলেন। রোগী দেখিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া তিনি যে-কথা বলিলেন, শুনিয়া গৌরী ঠাকুরাণীর হাত-পা অবশ হইয়া গেল! তাই? তাহা হইলে উপায়? সুভাষিণী? ছেলেরা?

রোগী ক ক্রমে বিছানা হইতে নাড়া অসম্ভব হইল।

পার্ব্বতীপুরের সিভিল-সার্জ্জন ইন্‌জেকশন দিলেন, কত-কি করিলেন। তাঁর হাতে এক দিন একটু ভালো যায়, পরের দিন মন্দ, তার পরের দিন আবার একটু ভালো···

এবং এমনি আশা-নিরাশার তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে এক দিন শেষ রাত্রে সংসারটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রকে বিদেশে অসহায় রাখিয়া মহেন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া গেল!

কান্না নাই···চীৎকার নাই! বাড়ী যেন নিমেষে পাথরের পুরীতে রূপান্তরিত হইল! কি দারুণ নিস্তব্ধতা! দুঃখ-বেদনা-শোকের আঘাতে বাড়ীর লোক-জন যেন সে-পাথর-পুরীর সঙ্গে মিশিয়া পাথর হইয়া গেছে!　　ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

সিনেমার রোমাঞ্চ

আমেরিকান্ ছবির কথা বলিতেছি। ছবির পর্দ্দায় যে দ্যাখো, মহা-সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া জাহাজ চলিয়াছে—হঠাৎ এক অতিকায় তুষার-গিরি ঐ ভাসিয়া আসে—এবার জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবে! ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়! তার পর সে তুষার-গিরিতে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়!
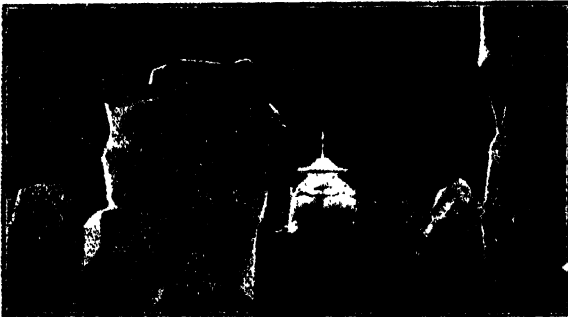
নকল সাগরে নকল তুষার-গিরি

ছবি দেখিবার সময় তন্ময়তার জন্য এ ভীষণ দৃশ্যে শিহরিয়া উঠি! কি করিয়া এমন ভাবে মৃত্যুর মুখে মানুষ অগ্রসর হয়, সে চিন্তা তখন মনে জাগে না! তার পর ভাবিয়া আকুল হই, কি করিয়া এমন রোমাঞ্চকর দৃশ্য তোলা হইল!

রহস্য খুব জটিল নয়। এ দৃশ্যের জন্য ছোট-খাট মডেলে তৈরী করা হয় জাহাজ এবং তুষার-গিরি। নকল সাগর তৈরারী হয় চৌবাচ্ছায় বা ট্যাঙ্কে। তার পর চৌবাচ্ছার জলে ঐ নকল জাহাজ এবং তুষার-গিরি ছাড়িয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রযোগে সাগর-জলে স্রোত সঞ্চালিত এবং নকল সাগরের মাথার উপর যে-আকাশ, সে-আকাশে নকল কুয়াশা সৃষ্টি করা হয়। জল-মধ্যে খাটানো তার টানিয়া তুষার-গিরির সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লাগানো হয়! বাহিরে ক্যামেরা রাখিয়া এ দৃশ্যের ছবি যেমন তোলা হয়, তেমনি অন্য দিকে জাহাজের আরোহীদের ভীত আর্ত্ত চীৎকারও শব্দযন্ত্রে তোলা হয়; তার পর ছবির দৃশ্যের সঙ্গে এই শব্দ জুড়িতে বেগ পাইতে হয় না!

নকল এঞ্জিন

ছবিতে বড় বড় যুদ্ধের যে সব অগ্নিময় মারাত্মক দৃশ্য দেখানো হয়, সেগুলিও নকল মডেলের সাহায্যে তোলা।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শিকাগো সহরে দারুণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। সে অগ্ন্যুৎপাতের ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা লইয়া সেখানে কেহ হাজির ছিলেন না! অথচ সিনেমার ছবিতে সে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য তোলা হয় কি করিয়া, বলি। সত্যকার অগ্নিদাহে চার বর্গ-মাইল-পরিমিত জমিতে যত বাড়ী-ঘর দোকানপাট ছিল, সমস্তই ভস্মসাৎ

হইয়া যায়। সিনেমায় এ দৃশ্য তুলিবার জন্য চার বিঘা-পরিমিত জমির উপর পাৎলা কাঠ ও ক্যাম্বিশ দিয়া বহু বাড়ী-ঘরের কাঠামো প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়; সেই সঙ্গে নদী তৈয়ারী হয় দীর্ঘ নালা খুঁড়িয়া। পরে পাইপ-সংযোগে ঐ নদীতে পেট্রোল ঢালিয়া তাহাতে লাগানো হয় আগুন! একেবারে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলে! এই আগুনের ছবি তোলা হয়। এবং অগ্নিকাণ্ডের এ ছবি পর্দ্দায় প্রতিফলিত হইলে তার ভীষণ বাস্তবতায় দর্শকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠেন।

তোমাদের মধ্যে অনেকে "কিঙ্কঙ্" ছবি দেখিয়াছ নিশ্চয়! সে ছবিতে অতিকায় দৈত্য কিঙকঙ শেষের দৃশ্যে সহরের আকাশস্পর্শী উচ্চশিখর গৃহের আশ্রয় লইয়াছিল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নকল। কার্ডবোর্ড ও পাৎলা কাঠের বাড়ী-ঘরে সহরের যে আভাস তৈয়ারী হয়, ক্যামেরার সাহায্যে তাহাই বাস্তব-রূপে আমাদের নয়নে-মনে এতখানি বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে। আসল বাড়ী-ঘরের আকারের ১।৪৮তম ছোট-আকারে এই সব নকল ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল।

গৃহচূড়ে কিঙ্কঙ্

নকল বনের নকল গাছ

নকল সমুদ্রে বা নদ-নদীতে জলের গভীরতার আভাস জাগাইতে জলের ট্যাঙ্কে গ্লিসারিণ ঢালা হয়। গ্লিসারিণ গাঢ় বলিয়া ক্যামেরায়-তোলা ছবিতে সে গ্লিসারিণকে দেখায় যেন অথৈ গভীর জলরাশি।

নকল বন-জঙ্গলের বা বাগিচার গাছ-পালা তৈরী করা হয় 'চীজ্-ক্লথ' নামে এক-জাতের কাপড় পাওয়া যায়, সেই কাপড় কিম্বা স্পঞ্জের সাহায্যে।

ট্রেণ-কোলিশন প্রভৃতির যে ছবি আমরা দেখি, সত্যকার ট্রেণে-ট্রেণে কোলিশন ঘটাইয়া তাহা তোলা হয় না। এ ব্যাপারের জন্য ছোট ছোট এঞ্জিন ও ট্রেণের কামরা তৈয়ারী করা হয়। নকল রেল-পথে নকল ট্রেণ চালাইয়া কোলিশন্ লাগাইয়া তার ছবি তোলা হয়। এবং সত্যকার চলন্ত ট্রেণের ছবির সঙ্গে নকল-ট্রেণের কোলিশন্-ছবি জুড়িলেই তাহা আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রমে একাকার হইয়া বাস্তবের ভয়ঙ্কর বেশে প্রতিফলিত হয়।

এই সব নকল দৃশ্য তৈয়ারী করিতে যে কল্পনা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাতে অশিক্ষিত-পটুত্বের ছায়া নাই; তাহাতে অনেকখানি মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন। এবং মনের এ উৎকর্ষ-লাভ সম্ভব হয় শুধু বিজ্ঞান-শিক্ষায়, বিজ্ঞানের অনুশীলনে; এবং কল্পনার জোরে!

আশা ও শক্তি

মার্কাস অরেলিয়াসের লেখা পড়ছিলুম। তিনি ছিলেন প্রাচীন রোমের এক জন বিখ্যাত জ্ঞানী; এবং তিনি যে সব মহাবাণী লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন, সে বাণীর মর্ম্ম বুঝে যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে জীবনে কোনো দিন দুঃখ-অশান্তি পাবো না!

তাঁর একটি মহাবাণীর কথা আজ বিশেষ ভাবে বলতে চাই। নানা ব্যাপারে আজ আমাদের জীবন এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে যে, আতঙ্কে-দুর্ভাবনায় আমরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি! এ মহাবাণীর মর্ম্ম যদি গ্রহণ করতে পারো, তাহলে দুঃখ-দুর্ভাবনা অনেকখানি কমবে।

সে মহাবাণীটি হচ্ছে,—বিধাতা আমাদের এমন ভাবে তৈরী করেছেন যে, পৃথিবীতে সব-কিছুই আমরা সহ্য করতে পারি—যদি অবশ্য সচেতন হয়ে সে-চেষ্টা করি!

আমাদের মহাকবিও বলে গেছেন,—

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে যেন করিতে পারি জয়!

এ কথা মেনে যদি চলতে পারি, তাহলে বিপদকে ভয় করবার কারণ থাকতে পারে না! এখন মার্কাস অরেলিয়াসের মহাবাণীর আলোচনা করা যাক!

দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘটলে যদি চোখ মেলে বাহিরের পানে তাকাও, দেখবে, তোমাদের চেয়ে আরো কত বেশী দুঃখ-দুর্দ্দশা আরো যত লোক সহ্য করছে! আমরা যাদের বলি "দুর্ভাগা" "ভাগ্য-হত", তাদের সংখ্যা সামান্য নয়! এদের এতখানি দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ, এরা নিশ্চেষ্ট ভাবে সে দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করে—বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান মনে করে! পরাজয়, নৈরাশ্য—এ-সবে যদি মন ভেঙ্গে চুপ করে পড়ে থাকো, তাহলে জয়ের আশা কি করে থাকবে? স্কুলের পরীক্ষার কথা ভাবো! ভালো পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব নয়—ফেল হওয়া অনিবার্য্য! ফেল হয়ে যদি ভাগ্যকে দোষী সাব্যস্ত করে চুপচাপ পড়ে থাকো, তাহলে কি করে পাশ করবে, বলো? ফেল হয়েছো, বেশ, এবার ভালো করে পড়াশুনা করো, ফাঁকি নয়! মনে শক্তি পাবে। সে শক্তির ফলে পড়াশুনায় মন বসবে এবং ভালো করে পড়াশুনা করলে দেখবে, পাশ হবেই! জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রেও এই একই বিধি! আমাদের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মশায় বলে গেছেন—

যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে'—
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে!
তুফানে পড়েছো যদি, ছাড়িয়ো না হাল;
আজিকে না হলো যদি, হতে পারে কাল।

আমি ও-কাজ পারবো না—আমার সাহস নেই—এমন চিন্তা কদাপি মনে এনো না! যে-কাজ আর পাঁচ জনে করেছে, সে-কাজ মানুষ মাত্রেই করতে পারে। তবে তার জন্য চাই মনের জোর, একাগ্রতা আর অধ্যবসায়।

মনের পানে একবার ভালো করে তাকাও দিকিন্। সকলেরি মনে আছে সাহস, শক্তি, দরদ, স্নেহ, মায়া, মমতা! রূঢ়তা, স্বার্থ-পরতা, হিংসা—এগুলিও মনের মধ্যে আবর্জ্জনার মতো সঞ্চিত হয়। ঘর-দ্বার ব্যবহার করলে যেমন সে ঘর-দ্বারে আবর্জ্জনা জমে, এবং নিত্য দু'বেলা ঝাঁট দিয়ে সে আবর্জ্জনা সাফ করতে হয়, জগতে নানা রকমের লোক-জনের সঙ্গে বাস করতে কাজে-কর্ম্মে আচারে-ব্যবহারে মনের মধ্যেও তেমনি আবর্জ্জনা জমে। এ আবর্জ্জনাও নিত্য দু'বেলা ঝেড়ে বার করে মনকে সাফ করতে হবে। তা না করলে ঘরে আবর্জ্জনা জমলে ঘর যেমন আঁস্তাকুড় হয়ে ওঠে, মনের আবর্জ্জনা সাফ না করে মনের মধ্যে সেগুলিকে জড়ো করে রাখলে মনও তেমনি নরক হয়ে উঠবে! নরকের সে কলুষিত গন্ধে-বাষ্পে মনের অপমৃত্যু ঘটবে—মানুষ দানব হয়ে উঠবে!

অমুক লোক তোমার উপর অন্যায় করেছে, অবিচার করেছে, অমুক তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করেছে, মিথ্যাচরণ করেছে, বেইমানী করেছে? করুক! তুমি সে ব্যথা মনে রেখো না, মনের মধ্যে তার গ্লানি জড়ো করো না। সত্য এবং ন্যায়কে মেনে তুমি চলো তোমার লক্ষ্য ধরে! দেখবে, কারো দেওয়া দুঃখ তোমার মনে বাজবে না—এতটুকু অশান্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে না। মাইকেলের কথা —"ভুল দোষ, গুণ ধরো" মেনে চলবার চেষ্টা করো, দেখবে, জীবন হবে স্বচ্ছন্দ, সুখময়—এবং সিদ্ধির বিজয়-মাল্যে তোমার কণ্ঠ বিভূষিত হবেই!

চাঁদের দেশের মেয়ে

(রূপকথা)

সেকালে এক বুড়ো কাঠুরের সংসারে ছিল সে আর তার বৌ। ছেলে-মেয়ে হয়নি, তাই তাদের বড়ই দুঃখ। একটি ছেলের জন্যে তারা কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। কিছু দিন পরে এক দিন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখলে, গভীর বনের ভেতর থেকে চাঁদের কিরণের মতন কোমল আলো বেরোচ্ছে। কাঠুরে তার কাছে গিয়ে দেখে, ছোট্ট একটি মেয়ে একা শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। ফুলের মতন সুন্দর তার মুখ, আর তার গা দিয়ে চাঁদের আলোর মত আলো ফুটে বেরোচ্ছে! মেয়েটি দেখে সে ভারী খুশী হয়ে তাকে কোলে নিয়ে নিজের কুটীরে ফিরে গেল, বউকে ডেকে বললে, "গিন্নি, দেখ, কেমন সুন্দর একটি মেয়ে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেলাম'।" মেয়ে দেখে তার বৌয়ের কি আহ্লাদ! মেয়েটিকে কোলে নিয়ে সে কত আদর করলে, কত চুমু খেলে। দু'জনে ভাবলে, ভগবান্ এবার আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। তিনি দয়াময়।

মেয়ের গা বেয়ে চাঁদের আলো ঝরতে দেখে—তারা মেয়েটির নাম রাখলে জ্যোছনা। কাঠুরে খুব গরীব ছিল, সব দিন তাদের খাবার জুটতো না; কিন্তু জ্যোছনাকে ঘরে আনবার পর থেকে সংসারে তার আর কোন অভাব রইল না। তারা মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল, এই ভাবে দিন কাটতে লাগল, জ্যোছনা বেশ বড়-সড় হয়ে উঠলো, তার রূপ আর গুণের খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশ-বিদেশের রাজা-রাজড়ারা তাকে বিয়ে করবার জন্যে কাঠুরের কুটীরে লোক পাঠাতে লাগলেন। জ্যোছনা সে কথা শুনে তাঁদের কাউকেই বিয়ে করতে রাজী হলো না। কাঠুরে আর তার বউ তাকে অনেক রকম বুঝিয়ে বলায় সে বললে, যারা তাকে বিয়ে করতে আসবে, তাদের সে পরীক্ষা করবে। সে পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হবে, তাকেই সে বিয়ে করবে। তার প্রতিজ্ঞা শুনে রূপনগরের কুমার রূপচাঁদ এলেন, অবন্তী রাজ্যের রাজপুত্র শান্তিকুমার এলেন, সোনাগড়ের সুবর্ণদেব, কাঞ্চীর চঞ্চলকুমার, মায়াপুরের অমিয়কুমার প্রভৃতি আরও কত রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র সেখানে এসে জুটলেন। ক'নের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে শুনে প্রথম পাঁচ জন ছাড়া আর সকলেই সরে পড়লেন। জ্যোছনা রূপচাঁদকে বললে,—"যে পাত্র থেকে সর্ব্বক্ষণ সোনালি আলো ঝরে, আমাকে সেই পাত্র এনে দিন।" শান্তি-কুমারকে বললে—"সোনার গাছে রূপোর শিকড়, তার পান্নার পাতা আর তাতে হীরের ফুল ফোটে। আমাকে সেই গাছ, না হয় তার একটা ডাল এনে দিন।" সুবর্ণদেবকে বললে—"আমাকে এমন একটা ঘেরাটোপ এনে দিন—যা জলে ভেজে না, আগুনে পোড়ে না।" চঞ্চলকুমারকে বললে—"বিশাল একটা অজগরের মাথায় সাত-রঙা মাণিক আছে, সেইটে আমায় এনে দিতে হবে।" আর অমিয়কুমারকে বললে—"সাত সমুদ্রের পারে যে টিয়াপাখী আছে, তার গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, সে গান শুনলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আমাকে সেই পাখীটা এনে দিন। যিনি প্রথমে তাঁর কাজ শেষ করে ফিরে এসে আমাকে খুশী করতে পারবেন, আমি তাঁর গলায় মালা দেব।"

রূপচাঁদ কোথায় সেই অদ্ভুত পাত্র পাওয়া যায়, তা জানিতেন না। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রটিয়ে দিলেন, তিনি সেই পাত্রের সন্ধানে যাচ্ছেন. এবং তাঁর যাত্রার খবরটা তাঁর চেষ্টায় জ্যোছনাও জানতে পারল। তার পর তিনি গোপনে এক যাদুকরের সঙ্গে দেখা করলেন। যাদুকর তাঁর কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করে একটি সুদৃশ্য পাত্রে এমন জিনিষের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে যে, সেই পাত্রের গা থেকে ক্রমাগত সোনালি আলো ঝরতে লাগল। রাজপুত্র খুব খুশী হয়ে সেই পাত্রটি এক জন দূতের মারফৎ জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা সেই পাত্রটি হাতে নিয়ে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতেই প্রলেপ উঠে গেল, তখন আর তা থেকে আলো বেরুল না। জ্যোছনা দূতকে বললে, "তোমাদের রাজপুত্র আমার সঙ্গে চালাকী করেছেন! সে ধাপ্পাবাজকে আমি বিয়ে করব না।"

অবন্তীর রাজপুত্র শান্তিকুমারও রূপচাঁদের মত সোনার গাছ খুঁজতে যাচ্ছেন, এই সংবাদ প্রচার করে কয়েক জন ওস্তাদ কারিগর দিয়ে খুব গোপনে সোনার একটি বৃক্ষশাখা, পল্লব, পাতা আর তার হীরের ফুল প্রস্তুত করালেন। সেই সব মিস্ত্রীর হাতের কাজ এমন নিখুঁত হ'ল যে, তা দেখে শাখাটি আসল কি নকল, তা কেউ ঠিক করতে পারল না। শান্তিকুমার এক জন দূত মারফৎ সেই অদ্ভুত শাখাটি জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা সেই দূতের সামনেই শাখাটি মাটীতে রোপণ করল, কিন্তু শাখাটা বড় গাছে পরিণত হলো না! তা দেখে সে দূতকে বললে—"তুমি তোমার মনিবকে জানাবে, তিনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। আমি ডাল আনতে বলেছি। এটা সে আসল ডাল নয়। অতএব তিনি আমাকে বিবাহের আশা ত্যাগ করুন। কোন প্রতারক আমার স্বামী হবার যোগ্য নয়।"

এ কথা শুনে দূত মাথা হেঁট করে চলে গেল।

সোনাগড়ের সুবর্ণদেবও অন্য দুই রাজপুত্রের মত তাঁর বরাতি আলখাল্লা খুঁজতে যাবার মিথ্যে সংবাদ রটিয়ে গোপনে এক দর্জ্জিকে দিয়ে খুব মোটা কাপড়ের এক ঘেরাটোপ তৈয়েরী করালেন। তার ভেতরে দিলেন ভিজে তুলোর অস্তর। তার পর দূতকে দিয়ে সেই ঘেরাটোপ জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দূতের সামনেই জ্যোছনা সেই ঘেরাটোপ জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিতেই আগুনের তাপে ভিজে তুলো শুকিয়ে যেতেই ঘেরাটোপটা 'দাউ-দাউ' করে জ্বলে উঠল! তা দেখে দূতকে লজ্জায় মাথা হেঁট করে চলে যেতে হলো।

ওদিকে কাঞ্চীর চঞ্চলকুমার ভেবে দেখলেন, আসল অজগরের মাথা থেকে মণি সংগ্রহ করে আনা শুধু যে ভীষণ বিপজ্জনক কাজ তা নয়, সে-মণি দুষ্প্রাপ্য। এই জন্যই তিনি মণি খুঁজতে যাচ্ছেন এই মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে, নিজের ধনরত্নের সিন্দুক থেকে গোপনে একটি খুব প্রকাণ্ড হীরা বার করে, এক জন সুদক্ষ মণিকারকে ডাকালেন, এবং তাকে দিয়ে হীরাতে অতি নিপুণ ভাবে সাত রকম রং করিয়ে নিলেন; তার পর দূতকে দিয়ে সেই হীরা জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা দেখলে, সেই হীরা থেকে সাত রকম রঙের আভা বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু আসল মণি থেকে সাত বার সাত রকম রং বেরুবার কথা। তাই সে দূতকে বললে—"এটা সাপের মাথার মণি নয়। এ প্রতারণা। যে প্রতারক, তাকে আমি বিয়ে করতে পারিনে।" দূত ম্লানমুখে নত-মস্তকে প্রস্থান করল।

মায়াপুরের অমিয়কুমার ঐ রকম আজগুবি একটা পাখী আনা পণ্ডশ্রম মনে করলেন; কিন্তু রাজ্যে রটিয়ে দিলেন যে, তিনি পাখীর সন্ধানে যাচ্ছেন। তার পর এক পাখীর ওস্তাদের কাছ থেকে গোপনে খুব ভাল একটা শীষ দেওয়া টিয়া পাখী কিনে এনে দূতের হাতে সেই টিয়া পাখী জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা দেখলে, পাখী গানও গায় না, আর তার শীষের ঘুম পাড়াবার শক্তিও নেই। তাই সে দূতকে বললে—"এ পাখীর কথা ত আমি বলিনি, তোমাদের রাজকুমারকে বলো, তিনি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছেন, অতএব তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।" দূত মুখ চূণ করে ফিরে গেল।

পাঁচ জনেই যখন এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন, তখন তাঁরা সকলে পরামর্শ করলেন যে, জ্যোছনাকে তার গর্ব্বের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দল বেঁধে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁরা কাঠুরের কুটীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

ওদিকে জ্যোছনা—চাঁদের দেশের রাজকন্যা, কোনও একটা ভুলের জন্য তাকে মানবী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছিল। সেই সময় বনে পেয়ে কাঠুরে তাকে কুড়িয়ে আনে। অভিশাপ ছিল, তাকে ষোল বছর পৃথিবীতে বাস করতে হবে। যে দিন রাজপুত্রেরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাঠুরের কুটীরের দিকে অগ্রসর হলো. সেই দিনই অভিশাপের ষোল বছর পূর্ণ হবে। চন্দ্রপুরী থেকে তাকে নেবার জন্য রথ এসেছে। চন্দ্রপুরীর মন্ত্রী জ্যোছনাকে ডেকে বললেন, "চল মা, এইবার তোমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে।" মন্ত্রীর কথা শুনে জ্যোছনার যেন চমক ভাঙ্গল। পূর্ব্বস্মৃতি একটু একটু ফিরে আসতে লাগল। সেই সময় মন্ত্রী সুধাভাণ্ড নিয়ে জ্যোছনাকে সুধা পান করতে দিলেন। অমনি সে তার পূর্ব্ব-রূপ ফিরে পেল।

এদিকে পাঁচ রাজপুত্র এসে কুটীর ঘিরে ফেলেছেন। তাই দেখে কাঠুরে আর কাঠুরে-বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই দেখে, বিরাট্ সৈন্যসমুদ্র আর অপূর্ব্ব রথের উপর বসে পরমাসুন্দরী এক কন্যা! কাঠুরে আর তার বউকে দেখেই চন্দ্রপুরীর রাজকন্যা বললে, "তোমরা আমাকে এত দিন যে স্নেহে মানুষ করেছ, তা আম ভুলতে পারব না। মা-বাপের ঋণ কেউ শোধ দিতে পারে না। আমি বলছি, জীবনে তোমরা কখনও দুঃখ পাবে না।" এই বলে সে তাদের মাথায় সুধাবর্ষণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে রথ আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে।. তাই দেখে পাঁচ রাজপুত্রই সৈন্যদের রথ লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে বললে। তারা যেমন ধনুকে বাণ যোজনা করেছে, অমনি চন্দ্রপুরীর মন্ত্রী তাদের উপর হিমবর্ষণ করতে লাগলেন। সৈন্যসামন্ত সবাই হিমে জমে এক বিরাট্ বরফের পাহাড়ে পরিণত হলো। রথ দেখতে দেখতে শূন্যে অদৃশ্য হ'লো।

আজও সেই রজত-গিরি দেখা যায়! জোরে বাতাস বইলে সেখানে করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যায়, রাজপুত্রদের আর সৈন্যদের মরণ-ক্রন্দন!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা না করিলেই দোষ হয়। এই আত্মরক্ষার অঙ্গ-স্বরূপে কখন কখন অন্যকে আক্রমণ করাও আবশ্যক হয়। কারণ, কেবল আত্মরক্ষাতে পরকর্ত্তৃক আক্রমণের স্থায়িভাবে নিবৃত্তি হয় না, বা পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা দূর হয় না। বহির্জ্জগতে ইহা যেমন নিয়ম, চিন্তারাজ্যেও ইহা তদ্রূপ একটি নিয়ম। এ জন্য দার্শনিক তত্ত্ববিচারে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন, অন্য কথায় খণ্ডন ও মণ্ডনের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। এইরূপ আত্মরক্ষার ফলে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দার্শনিকগণের অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং সত্যনির্ণয়ের পথও পরিষ্কৃত হয়।

অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানেও আমাদের বৈদিক ধর্ম্ম, সমাজ ও দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতির উপর নানা দিক্ হইতে নানারূপ আক্রমণ চলিতেছে। আর সেই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশে বৈদিক সমাজও যথা-সম্ভব তাহার প্রতিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কিছু দিন হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় দর্শনের উপর, বিশেষতঃ বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদ এবং সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন তাহার প্রধান প্রচারক শঙ্করাচার্য্যের উপর এই আক্রমণ কোন কোন দিক্ হইতে যেন আবার একটু নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতনত্ব এক্ষণে এক কথায় পাশ্চাত্ত্য মতবাদের প্রভাবের ফল বলিতে পারা যায়। এখন পণ্ডিতসমাজে কেবল মতবাদ খণ্ডন হইতেছে না, কিন্তু মতবাদীর নাম করিয়া তীব্র ভাষায় তাঁহার নিন্দা পর্য্যন্তও আরম্ভ করা হইয়াছে। আবার কোন কোন দিক্ হইতে বৈদিক সমাজের যেন কল্যাণার্থ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অতি যত্নসহকারে প্রকাশিত করিয়া, ভূমিকা, উপসংহার, মন্তব্য বা ব্যাখ্যামধ্যে এমন সব নিরপেক্ষ ও সত্যানুসন্ধিৎসুর কথা বলা হইতেছে যে, সাধারণ পাঠক তাঁহাদের অন্তরের ভাব সম্বন্ধে কোনও-রূপ সন্দেহ করিতে পারেন না। আর ইঁহাদের এই অন্তরের ভাবমধ্যে অনেকরূপ অভিসন্ধিই দৃষ্ট হয়। কোথাও বা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা-অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের জাতির ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্যে আকৃষ্ট করা হয়, কোথাও বা বৈদিক ধর্ম্মের এই ছদ্মবেশী কল্যাণকামিগণের নিজ নিজ ধর্ম্মমতে বৈদিকগণকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মমতের পুষ্টিসাধন করা হয়, কোথাও বা কৌশলে তাঁহা-দিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রয়াস হয়। এই ছদ্মবেশধারী হিতকারিগণের কার্য্যে বৈদিকগণের, বিশেষতঃ তাঁহাদের সন্তানগণের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ঘটিতেছে। এখন প্রায়ই বেদ আর অভ্রান্ত, অনাদি, অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করা হয় না, গুরুভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, দেবতা ও ধর্ম্মে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে, শাস্ত্র ও ঋষিবাক্যে সন্দেহের সঞ্চার হইতেছে, ধর্ম্ম-জীবনের মূল যে শ্রদ্ধা, তাহাই আজ বিলুপ্তপ্রায়। এতদপেক্ষা বিপদ আর কি হইতে পারে? তাহার উপর আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতিতে ধর্ম্ম-শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই; প্রত্যুত, তদ্বিপরীত শিক্ষার সহায়তা করা হইতেছে। বিদ্যার্থিগণকে ভাষাবিদ্ বুদ্ধিমান্ ও জড়বিজ্ঞানবিদ্ এবং ইতিহাসজ্ঞ করিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করা হয় মাত্র। আর তাহার ফলে তাহারা ইহলোকভোগসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছে, ধর্ম্ম এবং নীতি উভয় বিবর্জ্জিত হইতেছে। যে সব তরুণগণ স্বভাববশে স্বধর্ম্মাচরণে অভিলাষী হয়, তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। ইহাই আজ আমাদের ভারতীয় দর্শনের উপর নূতন ধরণের আক্রমণ। এই জাতীয় কৌশল-পূর্ণ আক্রমণ পূর্ব্বকালে প্রায় ঘটিত না।

অবশ্য ইহাতে যদিও ভারতীয় দর্শনের কোন বিশেষ স্থায়ী ক্ষতি হইতে পারে না,—কারণ, ভারতীয় দর্শন সত্যে প্রতিষ্ঠিত; সদাচার, সংযম, স্বধর্ম্মনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত; তথাপি প্রতিবাদের অভাবে যাঁহারা মনে করিতে পারেন,—তবে বুঝি উঁহাদের বলিবার কিছুই নাই, তবে বুঝি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত দোষগুলি ইঁহাদেরও স্বীকার্য্য, তবে বুঝি ইঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য, তাঁহাদেরই জন্য কিছু বলা আবশ্যক। তাহাদের জন্য প্রতিবাদ আবশ্যক। ইহা না করিলে অন্যায় মানিয়া লইতে হয়। আর আত্মরক্ষা করাও হয় না। এই আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ভবিষ্যদ্ বংশধরদিগের কল্যাণসাধনের প্রবৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক। এ জন্য আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও আমাদের স্বাভাবিক, সুতরাং কর্ত্তব্যই। সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। এ জন্য আমাদের ভারতীয় ভাবের উপর যেখানে আক্রমণ হয়, যেখানে নিন্দা প্রচার হয়, সেখানে আমাদের সকলেরই তাহার প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটীই হইবে—আমাদের জাতীয় ধ্বংসে সহায়তা করা হইবে।

১৩৪১ কার্ত্তিক সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীণ আচার্য্য মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় "আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত" এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় আজীবন যেরূপ দার্শনিক চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার এই প্রবন্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন। ইহাতে এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের মনে শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈত-বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও হইতে পারে। অদ্বৈত সম্প্রদায়ানুমোদিত পথে যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহাদেরও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার হানি হইবার সম্ভাবনা। বেদ ও ঋষিবাক্যে বিশ্বাসী সাধারণ বৈদিকধর্ম্মসেবীরও. বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা। এই সকল কারণে তাঁহার এই প্রবন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বাল্যকালে সিটি স্কুলে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট আমরা ইংরেজী শিক্ষা করিতাম, এজন্য তাঁহার উপর অধ্যাপকোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম—এই প্রবন্ধটিতে শঙ্করের দার্শনিক মতের অর্থাৎ অদ্বৈত-বাদের খণ্ডনপ্রয়াসে ভারতীয় দার্শনিকতার নিন্দা এবং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকতার প্রশংসা করা হইয়াছে। এজন্য এই প্রবন্ধে শঙ্করাচার্য্যের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে মাত্র। আর তজ্জন্য এই প্রবন্ধের নাম "অদ্বৈতমতের খণ্ডন ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎকর্ষ" দিলেই হইত। তাহা হইলে প্রবন্ধের নাম হইতেই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করা হইত। ইহাকে অদ্বৈতমতখণ্ডন-প্রচারের কৌশলবিশেষ বলা যায় না কি?

ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের জীবনকথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা-মুখে এক স্থলে বলা হইয়াছে—"শঙ্কর * * * প্রবল স্মৃতি-শক্তিশালী ছিলেন। * * * জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিকটে ও ইংরেজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির সুপ্রমাণিত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে, শঙ্করের জীবনের ঐ সকল দৃষ্টান্ত বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হয় না" (১০৩ পৃঃ)। "জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিকটে বার বৎসর বয়সে তাঁর গ্রামের গির্জ্জায় প্রসিদ্ধ আচার্য্যের উপদেশ, জার্ম্মাণীর তখনকার শিক্ষা-পরিদর্শকের নিকট কিছু পরে এক সময় আচার্য্যের অঙ্গভঙ্গি উচ্চারণক্রম প্রভৃতির সহিত অবিকল পুনরুক্তি করেন। "Pleasures of Hope"এর প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক সদ্যোলিখিত একটি দীর্ঘ কবিতা স্যার ওয়ালটার স্কটকে শুনাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এ সকল স্পষ্ট প্রামাণিক আধুনিক দৃষ্টান্তে শঙ্করের সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বিবরণ প্রমাণিত হচ্চে।" (১০৮ পৃঃ)'।

ইহা হইতে মনে হয়, আমাদের দেশীয় প্রাচীন দৃষ্টান্তের প্রামাণিকতার বুঝি অভাব ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক কথারই প্রামাণ্য আমাদের নিকট অধিক হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধেই দেখা যায়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় স্বাধীন চিন্তারই পক্ষপাতী। ইহাকে কি তাঁহার স্বাধীন চিন্তাশীলতার নিদর্শন বলা যায়? এখনও শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু জীবিত। তিনি তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও মানস-অঙ্ক কষিবার শক্তির দ্বারা পাশ্চাত্ত্য মনীষিবর্গকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য নহে? কিছু কাল পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে পণ্ডিতপ্রবর ৺জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্নানকালে তীরোপরি দুই জন গোরার কলহ, ইংরেজী না জানিয়াও প্রায় অবিকল আবৃত্তি করিয়া রাজদ্বারে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন—ইহা কি বিশ্বাস করা যায় না? এক বার শুনিয়া আবৃত্তি করার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এ সব কি সুপ্রমাণিত দৃষ্টান্তের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না? এইরূপ বহু ভারতীয় দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্যের কথা বিশ্বাস করিলে আমাদের যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাদৃশ মনোবৃত্তিসপন্ন ব্যক্তির ভারতীয় দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার মূল্য কতটুকু? ভারতীয় স্মৃতিশক্তির কথা হুয়েনসাঙ্গ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাও বিস্ময়কর! শতাবধানীর বাহুল্য মাদ্রাজে এখনও দেখা যায়। এতাদৃশ পাশ্চাত্ত্যপক্ষপাতিত্ব কি সত্যানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক হয় না?

দ্বিতীয়—শঙ্কর-রচিত গ্রন্থনির্ণয়ের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"তাঁর নামে চলিত গ্রন্থ অনেক, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-গবেষণাকারীদের মতে বৈদান্তিক প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য ছাড়া তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ লেখেননি।" (১০৪ পৃঃ)

ইহাতেও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কথায় প্রামাণ্যবোধের আতিশয্য প্রমাণিত হইতেছে। ভারতীয় মনীষিবর্গের গবেষণার কথা উল্লেখ করিয়া, অথবা নিজ অনুসন্ধানের ফল বলিয়া কোনরূপ মত প্রকাশিত করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা সাদরে গ্রহণ করিতাম। আজকাল পাশ্চাত্ত্যের মোহ অনেকেরই অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এখন এ জাতীয় কথা আর রুচিকর হয় কি? আমরা যথেষ্ট প্রমাণসাহায্যে নিশ্চয় করিয়াছি, পাশ্চাত্ত্যগণের ঐ কথা নিতান্তই ভ্রম। ইহা প্রমাণিত করিবার স্থল ইহা নহে, ইহা প্রসঙ্গান্তর।

তৃতীয়—বলা হইয়াছে—"মূল এবং প্রকৃত বেদান্ত হচ্চে আটখানা উপনিষদ্, যেগুলি বেদের অন্তর্গত—বেদের অন্তভাগ বা বেদের সিদ্ধান্ত। এই আটখানার মধ্যে পাঁচখানা ক্ষুদ্র (minor) উপনিষদ্, যা'তে বেদান্তমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র, ব্যাখ্যাত হয়নি। এই পাঁচখানা হচ্চে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়। অবশিষ্ট তিনখানা কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক হচ্চে (major) বৃহৎ উপনিষদ্, এগুলিতে বেদান্ত-মতের অল্পাধিক দীর্ঘ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর এই চারখানা minor upanishads বেদে পাওয়া যায় না। যদিও এগুলিকে অথর্ব্ব বেদের উপনিষদ্ বলে ধরা হয়। এগুলিতে এক দিকে বৈদিক ব্রহ্মবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে বেদবিরুদ্ধ মূর্ত্তিপূজা শিক্ষা দেওয়া হয়নি, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বেদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এগুলিকে আর্ষ অর্থাৎ ঋষি-প্রণীত মনে করে উক্ত আটখানার সঙ্গে প্রকৃত উপনিষদ্ বলে ধরা হয়। এই বারোখানা উপনিষদই আমি প্রকাশ করেছি।" (১০৪।৫ পৃঃ)

মূল এবং প্রকৃত বেদান্ত আটখানা উপনিষদ, এ কথা আমাদের শাস্ত্রে কোথায়? বেদ অতি প্রাচীন, তাহার কথা বলিতে গেলে প্রাচীনের কথা দ্বারাই বলিতে হইবে। কিন্তু বিনা বিচারে যাহা নিজের বোধ হয়, তাহাই বলিলে কি মান্য হইবে? এই আটখানা বেদের অন্তর্গত এ কথাও সেই কারণে তদ্রূপ অপ্রামাণিক। এই আটখানার পাঁচখানা minor বলায় সেই অন্ধভাবে আবার সেই পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণই করা হইল। বেদমত সংক্ষেপে উক্ত হইলে, ব্যাখ্যাত না হইলে কি minor বলা সঙ্গত? অনেকেই জানেন যে, উপনিষদ্ বেদের মন্ত্র বা সংহিতাভাগের শেষে থাকে, অথবা সেই মন্ত্র বা সংহিতাভাগের প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা যাহাতে থাকে, সেই ব্রাহ্মণভাগের শেষে থাকে। ঈশ, শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার ৪০তম অধ্যায়, ইহার ব্যাখ্যা বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, তন্মধ্যে এই উপনিষদ্‌খানি আবার উদ্ধৃত দেখা যায়। সংহিতা বা মন্ত্র স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রকায় হয়। সুতরাং তাহাতে ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তাহাকে minor উপনিষদ বলা অমূলক কল্পনামাত্র। "কেন" ব্রাহ্মণোপনিষৎ, "কঠ" সংহিতোপনিষৎ, "তৈত্তিরীয়" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণমিশ্রিত উপনিষৎ। "ঐতরেয়" ব্রাহ্মণোপনিষৎ। এই সব কথায় মনোনিবেশ না করিয়া উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হাস্যাস্পদ উক্তি মাত্র। কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক major উপনিষদ্, কারণ, তাহাতে ব্যাখ্যা আছে ও আকারে বৃহৎ, এ কথাগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ হাস্যাস্পদ কথা। এ সমস্ত ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়াই বৃহদাকার। বলা হইয়াছে—"প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর, এই চারখানি minor upanishad বেদে পাওয়া যায় না।" কিন্তু কেহ কি সমগ্র বেদ দেখিয়াছেন, সংগ্রহ করা ত দূরের কথা! যাঁহারা এই সব উপনিষদের প্রাচীন ব্যাখ্যাতা, তাঁহাদের কথা দ্বারা প্রমাণ দিয়া বলিলে কি ভাল হইত না? বর্ত্তমানে লভ্য প্রাচীনতম শাঙ্করভাষ্যে ত এ সব সন্ধান অনেক প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর যে বারখানা উপনিষদ্ শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় বাহির করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতেই আছে যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদীয়, তাহাকে অথর্ব্ববেদীয় বলা যায় কিরূপে? যিনি বেদেও ভ্রম-প্রমাদ স্ববিরুদ্ধ কথা এবং মতভেদ দেখেন, ঋষিদের বাক্যে প্রমাণাভাস ভ্রম ও মতভেদ দেখেন, বেদের সন্ধান সম্যক্‌রূপে

রাখেন না, যিনি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎকে অথর্ব্ববেদীয় বলেন, আর প্রথম হইতেই যিনি "যা খোঁজেন তাহা হেগেলের দর্শনে পান, আমাদের দর্শনে পান না" আর এই কথা যিনি বহু বার বলিয়াছেন, তাঁহার বেদ লইয়া এত মাথাব্যথার কি প্রয়োজন, তাহা ত বুঝা যায় না। পরের কথা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন?

বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই—এ কথাই বা তিনি বলিলেন কেন? তিনি ত বেদকে প্রমাণ বলেন না, অতএব এখানেই বা বেদের দোহাই কেন? খৃষ্টান পাদরীদের কথা আমাদিগকে এখনও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে—দেখিতেছি। যাঁহারা বেদসেবী ছিলেন, তাঁহারাই ত মূর্ত্তি-পূজক হইয়াছিলেন। বেদে না থাকিলে তাঁহারা তাহা করিলেন কেন? এবং বেদে বিহিত বলিয়াই বা গ্রহণ করিলেন কেন? যাহা হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহা তাহাতে থাকে, এই যুক্তিতেও মূর্ত্তিপূজা বৈদিক বলিতে হয়। যে বেদের আজ সহস্র ভাগের এক ভাগ পাওয়া যায়, তাহাতে না পাইয়া "বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই" বলা কি শোভন ও সঙ্গত? পুরাণ ও মহাভারত বেদেরই বিস্তার। বেদে বীজাকারে না থাকিলে তাহা পুরাণাদিতে থাকিতে পারে না। এই জন্য পুরাণাদি দেখিয়া এবং শিষ্টাচার দেখিয়া বেদ অনুমান করিয়া লইবার রীতি বৈদিক সমাজে প্রচলিত। তাহার পর "প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌গুলি 'ঋষিপ্রণীত' মনে করে উক্ত আটখানির সঙ্গে প্রকৃত উপনিষদ্ বলে ধরা হয়"—ইহা কোন সমাজের কথা? এ ত বৈদিক সমাজের কথা নহে। তবে কেন এ কথা এরূপ সাধারণ ভাবে বলা হইল? এরূপ কথায় মনে হয়—এ কথা যেন বৈদিক সমাজও মান্য করে! কিন্তু তাহা ত নহে, এরূপ কথা আমরা এক জন প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না।

চতুর্থ—বলা হইয়াছে "যা হো'ক, শঙ্কর উক্ত ১২খানা উপনিষদের মধ্যে দশখানার ভাষ্য করেছেন—কৌষীতকি ও শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য করেননি। তাঁর অনুশিষ্য শঙ্করানন্দ স্বামী এই দুইখানার ভাষ্য করেছেন।"

শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য শঙ্করানন্দকৃত—এ কথা কি কোথাও প্রাচীন কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়? আমরা জানি, এ পর্য্যন্ত এরূপ প্রাচীন কোনও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব এটা একটা সন্দিগ্ধ কল্পনামাত্র। সেই কল্পনার হেতুই পরে বলা হইতেছে—"নামের সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হয়ে অনেকে এই ভাষ্যদ্বয়কে আচার্য্য শঙ্করের লেখা বলে মনে করেন, যদিও এগুলির ভাষা শঙ্করের ভাষা থেকে খুব ভিন্ন। এইরূপ অন্যান্য অনেক গ্রন্থকেই শঙ্করের বলে ভ্রম করা হয়। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অধ্যক্ষেরা সকলেই 'শঙ্করাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদের লিখিত উপনিষদ্‌ভাষ্য বা অন্য কোনও বৈদান্তিক গ্রন্থ আদিম শঙ্করাচার্য্য দ্বারা লিখিত বলে ভ্রম হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।" এতদুত্তরে আমরা বলি, ইহাতে কি শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য শঙ্করানন্দলিখিত—এরূপ বলা যায়? যদি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে উক্ত ভাষ্য কাহার রচিত—এরূপ কথা না থাকিত, অথবা অপর কাহারও রচিত বলিয়া উক্ত হইত, তাহা হইলে এইরূপ "সম্ভব" আর প্রয়োগ করিতে পারা যাইত। যাবতীয় প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে উহা শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য বলিয়া উক্ত, এস্থলে যদি কোনও একটি পুঁথিতে শঙ্করানন্দ-রচিত বলিয়া উক্ত হইত, তাহা হইলে যে সন্দেহ জন্মিত, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ওরূপ যুক্তি কার্য্যকরী হইত। কিন্তু ইহা ত সেরূপ স্থল নহে। অতএব এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত।

তাহার পর শঙ্করের প্রধান মঠ শৃঙ্গেরীতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় শিষ্যগণ বর্ত্তমান, তাঁহারা তাহা হইলে কি তাহার প্রতিবাদ করিতেন না? শ্রীরঙ্গমে প্রকাশিত শাঙ্করগ্রন্থাবলী শৃঙ্গেরীমঠের পুঁথি দেখিয়া যে মুদ্রিত করা হইয়াছে, ইহা অনেকেই জানেন। তাহাতেও ত এ কথা নাই। অতএব এরূপ যুক্তিহীন কথা শোভন হয় নাই।

তাহার পর গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া গ্রন্থকার নির্ণয় করিলে তাহা অভ্রান্ত হয় না। এক ব্যক্তি পাঁচ রকম ভাষা লিখিতে পারেন—দেখা যায়। ভাষা দেখিয়া শাঙ্করগ্রন্থের নির্ণয় করিলে সন্দিগ্ধ বিষয়ের দ্বারা অসন্দিগ্ধ বিষয়ের অন্যথা-সাধন করা হয়। এ স্থলে অসন্দিগ্ধ বিষয় প্রাচীন পুঁথিতে রচয়িতার উল্লেখ। এ জন্য সন্দিগ্ধ বিষয়রূপ ভাষা দেখিয়া এই অসন্দিগ্ধ বিষয়ের অন্যথা জ্ঞান করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না।

যদি বলা হয়, গ্রন্থান্তর্গত বিষয়, অন্য নিঃসন্দিগ্ধ গ্রন্থের বিষয়ের সহিত বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে শঙ্করের নয় বলিব? সে স্থলেও চিন্তা করিবার অনেক বিষয়ই আছে। কারণ, সে স্থলে যথার্থ বিরোধ আছে কি আমাদের বুঝিবার দোষ হইতেছে, তাহাও বিবেচ্য। যেমন নির্গুণ ব্রহ্মবাদী শঙ্করের কোনও গ্রন্থে সগুণ ব্রহ্মবাদের কথা থাকিলে তাহাকে শঙ্করের নয় বলা সঙ্গত নয়। কারণ, এস্থলে বিরোধ নাই। ইহার কারণ, শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান অসম্ভব—ইহাও শঙ্করের মত। প্রমাণদোষ, প্রমাতৃদোষ ও প্রমেয়দোষ পরিহার করিয়া নির্ণয় করিলে তবে অভ্রান্ত নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকে। এ সম্বন্ধে বহু কথা আছে, তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির"-প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, এ বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আদরণীয় নহে।

তাহার পর ভাষ্য ও টীকার মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা হইল না কেন? শঙ্করানন্দ ১০৮ উপনিষদের উপর দীপিকানাম্নী টীকাই লিখিয়াছেন, তিনি কোনও উপনিষদের ভাষ্য লেখেন নাই। অতএব শঙ্করানন্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, এ কথা ভ্রম। এরূপ অসাবধানতাপূর্ণ কথা আমরা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট আশা করি না।

পঞ্চম—তাহার পর বলা হইয়াছে—"শঙ্করের ভাষ্যগুলিতে ব্রহ্মোপাসনাই প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কোনও দেবতার পূজা শিক্ষা দেওয়া হয়নি। এই জন্যই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। * * * * সুতরাং শঙ্করের নামাঙ্কিত কোনও গ্রন্থে যদি কোন সসীম দেবতা বা গঙ্গাযমুনাদি নদীর স্তব থাকে, তবে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, সে গ্রন্থ শঙ্করের লেখা নয়।" (১০৫ পৃঃ)।

এতদুত্তরে বলিব—ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনা শঙ্করের ভাষ্যগুলিতে নাই। যাহা শঙ্করের গ্রন্থে আছে, তাহা বৈদিক মতেরই অথবা শঙ্করমতেরই ব্রহ্মোপাসনা। শঙ্করের ভাষ্যে "কোমল হস্ত রাতুল চরণবিশিষ্ট অসীম ব্রহ্মের" উপাসনা নাই। আর, "কোন

ভাষ্যে দেবতা-পূজার শিক্ষা দেওয়া হয়নি," ইহাও অসঙ্গত কথা। কারণ, ভাষ্যমধ্যে আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনার (ব্রঃ সূঃ ১।১।২০) কথা কি নাই? এরূপ স্থল আরও আছে। তিনি কি দেবতা নহেন?

তাহার পর ভাষ্য সর্ব্বদাই মূল গ্রন্থের প্রসঙ্গ অনুসারে হইবার কথা। ভাষ্যকার ত নিজের কথা ভাষ্যে বলিতে পারেন না। অতএব ইহাতে দেবতার উপাসনার কথা নাই বলিয়া "শঙ্কর দেবতা-উপাসনা বলেন নাই"—ইহা কি করিয়া বলা যায়? তাঁহার অন্য গ্রন্থে তাহা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা তাঁহারই উপদেশ বলিব। যদি বলা যায়, শঙ্করের নামে প্রচলিত কোনও গ্রন্থে দেবতা-উপাসনা থাকিলে সেই গ্রন্থই শঙ্করের নহে,—যেমন গঙ্গা-যমুনাদির স্তব শঙ্করের নহে বলা হইতেছে—তাহা হইলে বলিব, ভাষ্যগুলি যে শঙ্কররচিত, তাহা কে বলিল? আমি তাহাতেই সন্দেহ করিব! আর যদি ভাষ্যগুলি তাঁহার নামে প্রচলিত বলিয়া তাহা শঙ্করের হয়, তবে অন্য গ্রন্থও তাহাই হইবে না কেন? নচেৎ নিজের মত যেখানে মিলিবে, সেখানে তাহা শঙ্করের বলিব, অন্যথা বলিব না—ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত পথ হয় না। যাহার উপর নির্ভর করিয়া একটা কিছু স্থির করা হয়, তদন্তর্গত কোন কথার দ্বারা সেই মূল যুক্তির অন্যথা করা অসঙ্গত। প্রমাণকুশল ব্যক্তির কথা ইহা হইতে পারে না। ইহা, যে শাখায় বসা যায়, সেই শাখা ছেদনের অনুরূপ কার্য্যই হয়। এরূপ যুক্তি আমরা কাহারও নিকট হইতে আশা করিতে পারি না।

তাহার পর "শঙ্করভাষ্যে কোনও দেবতা-পূজা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই বলিয়া শঙ্কর রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন"—এই কথাটিও নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক কথা। কারণ, রাজা রামমোহন রায় তন্ত্রমতে শক্তিসাহায্যে কারণ পান করিয়া উপাসনা করিতেন, ইহার নিদর্শন পূর্ব্ববঙ্গে এখনও একটি স্মৃতিস্তম্ভ বলা যায়। বস্তুতঃ, শাঙ্করভাষ্যে দেবতা-পূজা নাই বলিয়া শঙ্কর রাজা রামমোহন রায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—এ কথা আগ্রহাতিশয্যের অসত্য কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করের মহত্ত্বেই তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করের কতিপয় মাত্র ভাষ্য দেখিয়া শঙ্কর দেবতার উপাসনার কথা বলেন নাই, এই কথা বলা মহা ভ্রম নহে কি? ভাষ্যে দেবতাধিকরণে দেবতার বিগ্রহ এবং শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুবুদ্ধির কথা প্রভৃতি কি দৃষ্টিগোচর হইল না? এজন্য ব্রহ্মসূত্র (১।৩।২৬) (৩।৩।১) দ্রষ্টব্য। *

[ক্রমশঃ।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী।

* "এতেন প্রতিমাব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণ্বাদিদেবপিত্রাদিবুদ্ধীনাং চ সত্য-বস্তুবিষয়ত্বসিদ্ধেঃ" বৃহদারণ্যকভাষ্য ও ১।৩।১ দ্রষ্টব্য।

কালের রীতি

অমানিশা পরে আসে পূর্ণিমা, দুঃখের শেষে সুখ,
অস্তাচলের চিত্রফলকে শুভ্র তারকা দোলে;
রাত্রি-শেষের ধূসর পথেই শোভে প্রভাতের মুখ,
নব-বসন্তে শীতের বীথিকা অবগুণ্ঠন খোলে।
শীর্ণা তটিনী ফিরে পায় তার দুকূল-ভাসানো গান,
স্বপন-সায়রে স্মৃতির কমল কহে অতীতের কথা;
মরুর জীবন সিন্ধুরে লভি জুড়ায় দগ্ধ প্রাণ,
বেঁচে ওঠে পুনঃ ঝটিকা-ক্ষুব্ধ মৃত্যু-আহত লতা।
বিশ্ব-ভুবনে নিঃস্ব যাহারা হেরিছে অন্ধকার,
একদা আলোকে লভিবে ভাগ্য-দেবীর প্রসাদী ফুল।
ভাগ্য যাদের করেছে বরণ পরায়ে রত্ন-হার;
তাদের ভাঙ্গিবে সাধের প্রাসাদ চিত্ত-নদীর কূল।
সমভাবে কভু যায় না সময়,—জগতের এই রীতি,
সীতার জীবনে হেরিনু কেবল ধরার উল্টা নীতি।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

আশার বাণী

দূর করি দাও মিথ্যা বাঁধন, দূর করি দাও ভয়
অন্ধকারের বুক ভেদি আসে আলোক জ্যোতির্ম্ময়।
উদয়াচলের দেশে হের ঐ নবীন জ্ঞানের ভাতি।
ওরে ঘর-ছাড়া, ওরে পথ-হারা, কাটিল আঁধার রাতি।
পশ্চিমে হের অস্ত-লালিমা, সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে,
পূর্ব্বে তরুণ অরুণ উদয়, নবীন প্রভাত হাসে।
সাম-গীতি-ভরা মঞ্জু-বনানী আবার উঠিবে জাগি।
কুটীরে কুটীরে বাজিবে আরতি সায়ংসন্ধ্যা লাগি।
নীবার ধান্য মিটাইবে ক্ষুধা বল্কল দেবে বাস।
মায়ের মতন উদার করুণা বর্ষিবে নীলাকাশ।
সত্য ও ত্যাগে, ক্ষমা-সংযমে উন্মুখ হবে হিয়া।
প্রেমের যমুনা উতলা-আকুল, প্রিয় লাগি কাঁদে প্রিয়া।
পশ্চিমে আজি শশাঙ্ক-লেখা-বিহীনা আসিছে রাতি।
পূর্ব্বে উদিবে গৌরব-রবি দিগন্তে জাগে ভাতি।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ তরঙ্গ

ফাঁদ-পাতা

ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে মিঃ ব্লেক টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেনার্ড, তুমিই কি সাড়া দিলে ? বেশ !—কার্ণের কোন সন্ধান পাইলে কি ?"

লেনার্ড বলিলেন, "না, তাহার সন্ধান পাই নাই ; কিন্তু আমি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছি, সেই ফাঁদে তাহাকে ধরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিতে পারিবে ? তুমি অবিলম্বে বেকার ষ্ট্রীটে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে ?"

লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি যে ! এখন আমার অবসর নাই মিঃ ব্লেক !"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনেই আমি তোমাকে এখানে আসিতে বলিতেছি। আর ওয়াইল্ডও এখানেই আছে।"

লেনার্ড বলিলেন, "কি বলিলেন ? আপনার শেষ কথাটা ঠিক শুনিতে পাই নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "ওয়াইল্ড আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ; সে এখানেই আছে।"

লেনার্ড বলিলেন, "ওয়াইল্ড আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ? কোথা হইতে ? কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন ! আপনি পরিহাস করিতেছেন না ত ?"

ব্লেক বলিলেন, "পরিহাস ? এ কি পরিহাসের বিষয় ? ওয়াইল্ড এখনও আমার ঘরে বসিয়া আছে। সে তোমাকে এ কথা বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছে। সে বাঁচিয়া আছে লেনার্ড ! সত্যই তাহার মৃত্যু হয় নাই।"

লেনার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি বলিলেন ? সে জীবিত আছে ?"

ব্লেক বলিলেন, "সত্যই তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে সেই মৃত-দেহটা দেখাইয়া আমাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

লেনার্ড বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত কথা ! এদিকে কার্ণকে নরহন্তা মনে করিয়া তাহার গ্রেপ্তারের জন্য আমরা পরোয়ানা বাহির করিয়াছি! এ যে দারুণ গোলমেলে ব্যাপার হইয়া পড়িল ব্লেক !"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি শীঘ্র এখানে এস, তাহা হইলে সকল কথাই তুমি শুনিতে পাইবে।"

লেনার্ড বলিলেন, "আমি আর দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি।"

* * * *

চীফ্-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড যথাসময় মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলে ওয়াইল্ড তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া উৎসাহভরে বলিল, "নমস্কার ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ! আপনাকে বন্ধুভাবে পাওয়া সত্যই আনন্দের বিষয়। না, আপনার শত্রুতা আমার প্রার্থনীয় নহে।"

লেনার্ড ওয়াইল্ডের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার বন্ধু ব্যক্তি, এ কথা তোমাকে কে বলিল ? আমি তোমার ঘাড়টি মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিতে পারিলেই খুসী হইতাম। তুমি কি মতলবে এই ভাবে আমাদিগকে কষ্ট দিলে, তাহা বলিবে কি ? তুমি মরিয়াছ শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু মরিলে ত আবার বাঁচিয়া উঠিলে কেন ?"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি ত মরিয়াই ছিলাম ; কিন্তু মিঃ ব্লেক যে আমার মৃত্যু মঞ্জুর করিলেন না ! উইম্বলডনের প্রান্তরে আজ আমি মৃত্যুর অভিনয় করিয়াছিলাম—কার্ণকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্য। কিন্তু সে ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে ; আপনি শীঘ্রই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন—এই আশায় আপনাকে সাহায্য করিতে উৎসুক হইয়াছি

আরও আধ-ঘণ্টা ধরিয়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা চলিল। আলোচনা শেষ হইলে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বলিলেন, "কার্ণ সম্বন্ধে আপনারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ! আমার ধারণা, মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়াছে ; কিন্তু তাহা সত্য কি না, নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।"

ব্লেক বলিলেন, "যদি সুযোগ পাই, তাহা হইলে আজ রাত্রেই আমি কার্ণকে একরার করাইতে বাধ্য করিব ; ওয়াইল্ড আমাকে এই পরামর্শ দিয়াছে। আশা করি, ইহাতে সুফল পাওয়া যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি চেষ্টা করিলেই ঐরূপ ঘৃণিত পেশা ত্যাগ করিয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে পার ; তবে তুমি তাহা করিতে চাহ না কেন ? দেখ ওয়াইল্ড, চুরি-ডাকাতি করিয়া কোন লাভ নাই, এরূপ কার্য্যে কেহই সুখী হইতে পারে না ; অথচ এ সকল লোককে সকলেই ঘৃণা ও অবিশ্বাস করে। আর তুমিও ত তাহা জান—তবে জানিয়া শুনিয়া তুমি—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনার কথা সত্য বলিয়াই এক এক সময় আমার মনে হয় ; কিন্তু আপনার উপদেশ পালন করা যে কত কঠিন, তাহা আপনি ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি জীবনে আমার মত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে—সে চেষ্টা করিয়াও তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমার মত দস্যু-তস্কর যদি বহু দিনের কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সৎপথে চলিতে আরম্ভ করে—তাহা হইলে পুলিশের লোক—আপনারা তাহা বিশ্বাস করেন না, আপনাদের পূর্ব্ব-ধারণার কোন পরিবর্ত্তন হয় না ; ইহার ফলে—'জাত যায়, কিন্তু পেট ভরে না'—এই প্রবাদটিই খাটিয়া থাকে !"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড কিঞ্চিৎ বিব্রত ভাবে বলিলেন, "তোমার ও কথা সত্য নহে। যখন কোন অসৎ ব্যক্তি সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎপথে চলিতে আরম্ভ করে—তখন আমরা তাহার কার্য্যে বাধা দান করি না ; কিন্তু আমরা এরূপ শত শত ব্যক্তিকে জানি—যাহারা সৎপথে চলিবার ভাণ করিয়া তাহাদের মন্দ অভ্যাসেরই অনুসরণ করে ; প্রকাশ্যে সাধু সাজিয়া গোপনে চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত থাকে। আমরা কিরূপে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারি ? তাহাদের

গতি-বিধি লক্ষ্য না করিলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, তোমার সহিত এখন এ সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। হাঁসের পিঠে জল ঢালিলে যেমন সেই জল তাহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে না, আমার কোন উপদেশ সেইরূপ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না—ইহা আমার অজ্ঞাত নহে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার এ কথা কত দূর সত্য, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, ইন্‌স্পেক্টর!

উনচত্বারিংশ তরঙ্গ

সাইমন কার্ণের অনুসন্ধান

সাইমন কার্ণ সহসা সচকিত ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; তাহার দৃষ্টিতে আতঙ্ক পরিস্ফুট!

কার্ণ অস্ফুট স্বরে বলিল, "ওটা কি? ইঁদুর ছুটপাট্‌ করিয়া বেড়াইতেছে না কি? কি নোংরা যায়গা! এখানে আসিয়া আমি বড়ই বোকামি করিয়াছি! শেষে কি আমি ক্ষেপিয়া যাইব? আমার মনে হইতেছে, কেহ এখানে দীর্ঘকাল থাকিলে ক্ষেপিয়া যায়!"

কার্ণ তখন সার রডনে ডুমুণ্ডের আরণ্য-ভবনের অন্তর্ব্বর্ত্তী লাইব্রেরীতে বসিয়া ছিল। সে সেই অট্টালিকার সকল অংশই অধিকার করিয়াছিল। তখন রাত্রিকাল। বাহিরে নৈশ সমীরণ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

কার্ণের দেহটি প্রকাণ্ড; মুখখানা হাঁড়ির মত গোল, এবং চক্ষু-তারকা নীলাভ। তাহার চক্ষুতে ধূর্ত্ততা ও কপটতা সুপরিস্ফুট।

কার্ণ সার রডনের ব্যবহৃত চেয়ারে বসিয়া ছিল। সেই কক্ষের ডেস্কের উপর একটি তেলের আলো জ্বলিতেছিল, উহা ব্যতীত সেই কক্ষে অন্য কোন আলো ছিল না। গৃহের প্রত্যেক কোণে অন্ধকার পুঞ্জীভূত! সমগ্র স্থানটি বিভীষিকাপূর্ণ, যেন তাহা আতঙ্ক ও নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের লীলাস্থল! দিবাভাগে সেই স্থানে বাস করা কষ্টকর না হইলেও রাত্রিকালে কার্ণের ন্যায় সন্দিগ্ধচেতা, অসংযত-চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে সেই স্থান বাসের আদৌ উপযোগী নহে।

রবার্ট ব্লেক পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, কার্ণ অন্য কোন স্থানে পলায়ন না করিয়া সার রডনে কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তাঁহার আরণ্য নিবাসেই আশ্রয় লইয়াছে। তাঁহার এই অনুমান সত্য। কার্ণ পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিরাপদ হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, কার্ণকে কেহই সেই আরণ্য ভবনে আসিতে দেখে নাই, এবং সে সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ সন্দেহ অন্য কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কার্ণ সার রডনের ভাণ্ডার-ঘর পরীক্ষা করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল; কারণ, সেই কক্ষে যে সকল খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত ছিল, তাহা আহার করিয়া এক মাসেরও অধিক কাল চালাইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই আরণ্য-ভবন যে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কেহ তাহার সন্ধানে আসিবে, এরূপ আশঙ্কাও তাহার মনে স্থান পায় নাই।

কিন্তু এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণের পর তাহার পূর্ব্ব-ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—সে স্বেচ্ছায় নির্জ্জন কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইলেও কার্ণ শয়ন করিতে যায় নাই। সে সেই চেয়ারে বসিয়াই কিছু কাল ঘুমাইয়া লইয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরাতন হলঘরের ভিতর দিয়া দোতলায় উঠিতে তাহার সাহস হয় নাই। বাহিরে নৈশ সমীরণের শব্দ ভূতের আলাপ বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল! যেন তাহারা দ্বিতলের বারান্দায় অন্ধকারে দাপাদাপি করিতেছিল। সেই নিবিড় অরণ্যে জনমানবের সাড়া-শব্দ ছিল না। বস্তুতঃ, কার্ণ বলবান্ ব্যক্তি, এবং তাহার সাহসের অভাব না থাকিলেও এই স্থানে আসিয়া তাহাকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল। স্থান-কালের প্রভাব সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সহস্র প্রকার আতঙ্কে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল; অথচ তাহার আতঙ্কের প্রকৃতই কোন কারণ ছিল না! উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। একটা সামান্য কোন শব্দ হইলেই তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কার্ণের ইচ্ছা হইল, সেই কক্ষ আরও কয়েকটি দীপের আলোকে উদ্ভাসিত করে; কিন্তু অন্য আলোক জ্বালিবার উপায় ছিল না। এই স্থানে আসিয়া সে অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছে ভাবিয়া অনুতপ্ত হইল; কিন্তু স্থানটি তাহার পক্ষে অত্যন্ত নিরাপদ, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অগত্যা আত্মসংযম করিতে হইল। সে আপনাকে জগতের আয়ত্তাতীত প্রাচীন দুর্গের অধিকারী মনে করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

কিন্তু কার্ণ যে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিল, ইহা সে তখনও বুঝিতে পারিল না। উইম্বলডনের প্রান্তরে যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল, এই সংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল। তাহার লাইব্রেরীর জিনিস-পত্র যে বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও সে জানিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন, হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হইয়াছিল, ইহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

সেই দিন প্রভাতে তাহার গৃহে অপরিচিত লোক-জনের সমাগমের কথা জানিতে পারায়, এবং তাহার গৃহরক্ষিকার ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় তাহার মন আকস্মিক আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল, আর এই জন্যই সে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। তাহার অপরাধী বিবেক তাহাকে নিঃশঙ্ক থাকিতে দেয় নাই; বিশেষতঃ, ওয়াইল্ড তাহাকে টেলিফোনে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহাও তাহার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল।

অল্প দিন পূর্ব্বে সে পেট্রলের ব্যবসায়ের কতকগুলি 'সেয়ার' সম্বন্ধে প্রতারণা করিয়া কিছু অর্থলাভ করিয়াছিল; এই জন্য তাহার ধারণা হইয়াছিল, পুলিশ তাহার সেই প্রতারণা সম্বন্ধে অভিযোগ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভয় তেমন প্রবল বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। সে জানিত, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শত্রুতাই বিশেষ বিপজ্জনক; কিন্তু তৈলের ব্যবসায়ে সে যে প্রতারণা করিয়াছিল, তাহা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তদন্তের বিষয় নহে, এ বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না।

কার্ণ যদি জানিতে পারিত—কিরূপ অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহার মন অধিকতর আতঙ্কে পূর্ণ হইত; তাহার দুশ্চিন্তারও সীমা থাকিত না। বস্তুতঃ, লঘু অপরাধে দণ্ডের ভয়ে সে কাতর না হইলেও তাহার

স্নায়বিক অবসাদই তাহার আতঙ্কের প্রধান কারণ। কার্ণ মন স্থির করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রোর্কি ও মেটল্যাণ্ডের কথাই সে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিল। তাহাদের অপমৃত্যুর জন্তই তাহার মন দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষে, কার্ণের হস্তেই মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল। হুবার্ট রোর্কির এরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না, যাঁহা দ্বারা সে কার্ণকে সাহায্য করিতে পারিত; আতঙ্কেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, সুতরাং ত৲ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্ফল।

কার্ণ তদন্তের রিপোর্ট পাঠ করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। পর পর যে সকল অনর্থপাত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়; পরে তাহার কণ্ঠরোধের জন্ত সে কার্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। তাহার পর রোর্কিও পরলোকে তাহার অনুসরণ করে। কার্ণ ভাবিল, এবার কি তাহার পালা?

টেলিফোনে কার্ণকে যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল। সেই ব্যক্তি সার রডনে ড্রমণ্ডের এজেণ্ট, এবং সে কার্ণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে ভাবে সে কার্ণের সহযোগিদ্বয়কে চূর্ণ করিয়াছিল, সেই ভাবে সে কার্ণকেও চূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প। কার্ণ বুঝিতে পারিল, তাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই; তথাপি মেটল্যাণ্ডের চিন্তাতেই তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল।

সে একটা স্থূল মাংসস্তূপের মত চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সে তাহার অতীত অপরাধের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অসুকার মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিবার পর জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছিল। কার্ণের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহার এই সহযোগীকে রাজার সাক্ষিরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে। এইরূপ অনুমান করিয়াই মেটল্যাণ্ডের মুখ হইতে সত্য কথা প্রকাশের ভয়ে কার্ণ বিষ-প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত কথা কার্ণের অজ্ঞাত ছিল না।

এখন সে সেই পুরাতন নিভৃত আরণ্য-ভবনের একটি কক্ষে বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল, এবং তাহার সকল চিন্তাই মেটল্যাণ্ডের উপর পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। সেই সময় যদি সে কোন হোটেলে থাকিত, কিম্বা লণ্ডনের কোন নির্জ্জন বাড়ীতে বাস করিত, তাহা হইলে তাহার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইত; কিন্তু এই পরিত্যক্ত ভবনে একাকী বাস করায় নানা দুশ্চিন্তায় সে প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল, তাহার মস্তকের উপর মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু কি ভাবে তাহার জীবনের অবসান হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিবার উপায় ছিল না। এই ভাবে লুকাইয়া থাকিয়া কোন লাভ আছে কি না, ইহাও সে বুঝিতে পারিল না। পুলিশ সত্যই তাহার অনুসন্ধান করিতেছিল কি না, তাহাও সে ঠিক জানিতে পারে নাই। তাহার মনে হইল, তাহার এই আশঙ্কা হয় ত অমূলক। আতঙ্কে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অবশেষে কার্ণ মনে মনে বলিল, "এই অভিশপ্ত স্থান হইতে কালই আমি সরিয়া পড়িব। হাঁ, রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি এই নির্জ্জন আরণ্য-ভবন ত্যাগ করিব। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিবে কি না, তাহা আমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হয়, কারাকক্ষে বাস করা এই দুর্ভোগ সহ্য করা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর নহে,—কিন্তু ও কি! কিসের শব্দ?"

কার্ণ চেয়ার হইতে লাফাইয়া-উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, কোন স্থান হইতে শীতল নৈশ বায়ুর একটা প্রবাহ আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিল। তেলের যে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহা হঠাৎ এ ভাবে কাঁপিয়া উঠিল যে, তাহার আশঙ্কা হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে।

কার্ণ সেখানে দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল; আতঙ্কে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। যে আরণ্য-ভবনকে সে নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়াছিল, এখন সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত তাহার ব্যাকুলতার সীমা রহিল না; কিন্তু সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে তাহার সাহস হইল না। রাত্রিকালে সমুচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত অরণ্য অতিক্রম করিতে হইবে ভাবিয়া ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল; এই জন্ত অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সেই স্থানে অতিবাহিত করাই সে সঙ্গত মনে করিল। ইহা ভিন্ন সে অন্ত কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না।

সে আবার সেই চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া মন স্থির করিবার জন্ত একটা চুরুট ধরাইয়া-লইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে সে বিরক্তিভরে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না, ধূমপানে আমার স্পৃহা নাই। এখন কি করি? এখন কিছুকাল ঘুমাইতে না পারিলে আমি ক্ষেপিয়া যাইব!"

তাহার সহযোগিদ্বয়ের ন্যায় তাহাকেও নিহত হইতে হইবে, এই ভয়ে তাহার মন পুনর্ব্বার চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও তাহারা কত সুখী ছিল, তাহাদের দিনগুলি শান্তিতে ও আনন্দে কাটিতেছিল; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার বন্ধুদ্বয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দেহ সমাধি-ক্ষেত্রে চির-বিরাম লাভ করিতেছে। তাহারা যেন তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্ত তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে!

তাহার এই দুরবস্থার জন্ত সে সার রডনে ড্রমণ্ডকেই দায়ী করিল, এবং শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সঙ্কল্প করিল। তাহার মনে হইল, সে কি বিষপ্রয়োগে তাঁহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না?

বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিবার কথা মনে হইতেই তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে জানিত, এই ভাবে যে নরহত্যা করে, হত্যাকারিগণের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা হীন-প্রকৃতির নরহন্তা; কিন্তু বিষপ্রয়োগে বিশ্বস্ত সহযোগীকে হত্যা করিয়াও তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হয় নাই। যে উপায়েই হউক, আত্মরক্ষা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল; কিন্তু আত্মরক্ষা করাও কি অতঃপর তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে?

কার্ণের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে স্থিরদৃষ্টিতে দীপের দিকে চাহিয়া রহিল। দীপালোক সহসা কম্পিত হইল; উহা কি বাতাসে নিবিয়া যাইবে?—এই কথা চিন্তা করিতেই তাহার মনে হইল, কেহ যেন তাহাকে গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "কার্ণ!"

এই আহ্বান-ধ্বনিতে বিচলিত হইয়া কার্ণ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, কিন্তু চারি দিকে চাহিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, বাহিরের নিবিড় অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া এ ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে! সে বিহ্বল দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল—সে ভিন্ন সেই স্থানে অন্য কোন লোক ছিল না; এমন কি, সেই অরণ্যের বাহিরেও কয়েক মাইলের মধ্যে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

পুনর্ব্বার কে যেন মৃদু স্বরে তাহাকে ডাকিল, "সাইমন কার্ণ!"

এবার কার্ণ ভয়-বিজড়িত স্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "কে আমাকে ডাকিলে? কে কোথায় আছ? কাহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম? কে তুমি?"

অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন হইল, "তুমি কি আমার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলে না? এত অল্প দিনেই তুমি অসৃকার মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর ভুলিয়া গিয়াছ? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

এ কথা শুনিয়া কার্ণের কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত ধ্বনি নিঃসারিত হইল; সে মাতালের মত টলিতে টলিতে একখানা চেয়ারে ঢলিয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে গৃহ-কোণের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু সে আর কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না, চতুর্দ্দিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; বাহিরের উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ এক এক বার তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিতেছিল।

কার্ণ সেই নিবিড় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল, "আমি কি নির্ব্বোধ! আমি কি পাগল হইলাম? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এখানে জন-প্রাণীরও অস্তিত্ব নাই; আমার কল্পনাই আমাকে প্রতারিত করিয়াছে! আমার এরূপ বিহ্বল হইলে চলিবে না, মন সংযত করিতে হইবে। মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার কণ্ঠস্বর এখানে শুনিতে পাওয়া কি সম্ভব? হাঁ, আমার সৌভাগ্য-ক্রমেই সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যু হইয়াছে—এ জন্য আমি আনন্দিত। তাহাকে আমি সর্ব্বদাই ভয় করিতাম; আমার জীবনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। যে আমার সকল কষ্ট, সকল বিপদের মূল ছিল,—সে মরিয়াছে; আমি তাহাকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছি।.

কার্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছিল—সেই সময় সহসা অন্ধকারের ভিতর হইতে সে শুনিতে পাইল, "ওরে নরহন্তা! তোর মনে কি অনুতাপ হয় নাই? তুই যাহাকে হত্যা করিয়াছিস্—তাহার জন্য তোর মনে কি বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হয় নাই? তুই কি মনে করিয়াছিস্—আমার প্রেতাত্মাও বিনষ্ট হইয়াছে? না সাইমন কার্ণ, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। হাঁ, আমি তোকে প্রতিফল দিতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুই কি আমার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিস্ নাই?"

এই সকল কথা শুনিয়া কার্ণ বিহ্বল ভাবে পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের ভাব অতি ভীষণ হইল। তাহার ধারণা হইল—উহা মেটল্যাণ্ডেরই কণ্ঠস্বর বটে! অস্ফুট নহে, ইহা তাহার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। নৈশ বায়ুপ্রবাহে সেই স্বর ভাসিয়া আসিয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর তাহার সুপরিচিত, এ বিষয়ে তাহার ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল না। কার্ণ চেয়ারে বসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ চা-খড়ির মত শাদা হইয়া গেল। তাহার কম্পিত হস্ত স্থির হইল না।

এবার সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না না, এ সবই মিথ্যা, আমার কল্পনার বিকার! ইহা মায়ার ছলনা মাত্র! দুশ্চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়াছি, ইহা তাহারই প্রমাণ। এখন আমার সুনিদ্রার প্রয়োজন; আলোক, উত্তাপ ও সঙ্গী পাইলেই আমার সকল আতঙ্ক—সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে। এই স্থানে আসিয়া আমার সকল সাহস, মনের বল অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি হীন কাপুরুষে পরিণত হইয়াছি! আমি ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না; আমি এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না।"

সহসা কার্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইল। তাহার ধারণা হইল—কল্পনাই তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, এ সকল কথা সত্য নহে। ইহা তাহার উন্মত্ত মস্তিষ্কের ছলনা মাত্র।

কার্ণ ভাবিল, তাহার চক্ষুও কি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে? তাহার মনে হইল, সেই কক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে কি নড়িয়া বেড়াইতেছে! ইহা সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রতীতি হইল!

সেই দিকে যে বাতায়ন ছিল, তাহা পরীক্ষা করিতে কার্ণের সাহস হইল না; যেন তাহা রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন! সেখানে যে কাবোর্ড ছিল, কার্ণ তাহার নিকটেও যাইতে পারিল না; অথচ সেই স্থানেই কাহারও মূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল!

কিন্তু তাহার আকার কিরূপ, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না; এবং তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ছিল বলিয়াও তাহার মনে হইল না। কার্ণ যেন ভূতের মত কাহারও ছায়াময় দেহ দেখিতে পাইল! কিন্তু অবশেষে ক্রমশঃ তাহা আকারবিশিষ্ট স্থূল দেহ ধারণ করিল,—তাহা মনুষ্যদেহ!

কার্ণ সেই দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার দেহের একটি শিরাও স্পন্দিত হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড়! তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসেরও শক্তি রহিল না। সে জীবনে কখন ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নাই, এবং প্রেততত্ত্বকে (Spiritualism) সে অমূলক ও প্রতারণাময় বলিয়াই মনে করিত। ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের কথা চিরদিনই সে অবিশ্বাসভরে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে!

কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে সে যে-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—সেই দিকে চাহিয়া সে ভূতের ভয়ে আতঙ্কাভিভূতা বালিকার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সাহস সঞ্চার হইল না। উহা যে ভৌতিক ব্যাপার নহে—এ ধারণাও আর তাহার মনে স্থান পাইল না।

অবশেষে সেই মূর্ত্তি কথা কহিল; কণ্ঠস্বর মৃদু হইলেও সুস্পষ্ট এবং সুতীক্ষ্ণ। কার্ণ শুনিতে পাইল, "সাইমন কার্ণ! আমি এখানে আসিয়াছি। তুমিই আমাকে হত্যা করিয়াছিলে, এ জন্য আমি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে চাহি। তুমি যে-সকল ঘৃণিত অপরাধ করিয়াছ, ইহলোকে তোমার সেই সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত

নাই; কিন্তু তুমি বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিবে, এরূপ আশা করিও না।"

কার্ণ বুঝিতে পারিল—উহা সেই মূর্ত্তিরই কণ্ঠস্বর! কার্ণ এবার আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সম্মুখে যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—তাহা অসুকার মেটল্যাণ্ডেরই সজীব মূর্ত্তি! কিন্তু তখনও তাহা অস্ফুট ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; তথাপি সেই মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর যে মেটল্যাণ্ডের, এ বিষয়ে কার্ণের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে হইল, তবে কি অসুকার মেটল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করিয়া তাহার অপরাধের প্রতিফল দিতে আসিয়াছে?

কার্ণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সেই আর্ত্তনাদে যে ভীষণ আতঙ্ক পরিস্ফুট, তাহা যেন অপরাধী আত্মার মর্ম্মভেদী বেদনার অভিব্যক্তি! কিন্তু কার্ণ এবার কথা বলিবার শক্তি লাভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে কম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইতেই সেই মূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বলিবার আছে কার্ণ! তুমি আমার পান-পাত্রে বিষ প্রদান করিয়াছিলে—এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর? হাঁ, তুমি হৃদয়হীন ইতর নরহন্তা; তুমি কি তোমার অনুষ্ঠিত অপরাধ অস্বীকার করিতে এখনও সাহস করিতেছ?"

কার্ণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিকৃত স্বরে বলিল, "হাঁ, ইহা মিথ্যা কথা; আমি তোমাকে হত্যা করি নাই। রোর্কিই তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। রোর্কিই তোমার পানপাত্রে বিষ দিয়াছিল।"

মূর্ত্তি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী! তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ।"

কার্ণ পুনর্ব্বার বিচলিত স্বরে বলিল, "না, আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। রোর্কিই তোমার গ্লাসে বিষ দিয়াছিল। আমি তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। তুমি কেন আমার সম্মুখে আসিয়াছ? তুমি শীঘ্র এই স্থান হইতে চলিয়া যাও; আমার কাছে আসিও না। আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; রোর্কিই তোমাকে বিষ পান করাইয়াছিল।"

এবার কার্ণ কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া সেই মূর্ত্তি দৃঢ়পদে ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল—যেন কার্ণকে প্রতিফল দানের জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কার্ণ ভয় পাইয়া মূর্চ্ছিত হইবে—সেরূপ ভীরুপ্রকৃতির লোক ছিল না। সে নরপশু, তাহার দেহের পেশীসমূহ সুদৃঢ় ছিল, এবং তাহার প্রকৃতিও অত্যন্ত কঠোর ছিল। সে ভয় পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় নাই।

কার্ণ পুনর্ব্বার কম্পিত স্বরে বলিল, "হাঁ, রোর্কিই তোমার পান-পাত্রে বিষ দিয়াছিল; তুমি ভুল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ! তুমি ফিরিয়া যাও মেটল্যাণ্ড! তুমি তোমার সমাধিগহ্বরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া বিশ্রাম কর।"

মূর্ত্তি বলিল, "আমরা শীঘ্রই ইহার মীমাংসা করিব। তুমি বলিতেছ, রোর্কিই বিষ দিয়া আমাকে হত্যা করিয়াছিল। তুমি তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিতেছ—তাহা সত্য কি না. ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি তাহাকে এখানে আহ্বান করিতেছি।— হুবার্ট-রোর্কি! তুমি আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও।"

কার্ণের এবার মনে হইল, সে সত্যই ক্ষেপিয়া যাইবে! কারণ, মুহূর্ত্ত পরেই সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে আর একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল—যেন রোর্কির প্রেতাত্মা আত্মসমর্থনের জন্য দেহ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল!

সেই মূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিল, "মেটল্যাণ্ড, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?"

সাইমন্ কার্ণ হতাশ ভাবে বলিল, "রোর্কি, রোর্কি! তুমিও এখানে আসিয়াছ?"

কার্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। ফাঁদে আবদ্ধ নিরুপায় বন্য-জন্তুর ন্যায় তাহার অবস্থা! সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, তাহার দুষ্কর্ম্মের সহযোগী হুবার্ট-রোর্কি মনুষ্যদেহে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিদ্যাসুন্দর

সৌরভে যেমন পুষ্পের পরিচয়, গ্রন্থে তেমনি গ্রন্থকারের পরিচয়। যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, মল্লিকা প্রত্যেকেরই সুগন্ধ আছে, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকেরই গন্ধের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, যুঁইএর গন্ধ চামেলীর গন্ধের মত নয়; আবার রজনীগন্ধার গন্ধও মল্লিকার গন্ধের অনুরূপ নহে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ-সমূহেরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্য আছে। সেক্সপীয়র, মিল্টন, সেলী বায়রণ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতি কবিগণেরও প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে; সেইরূপ বঙ্গ-সাহিত্যেও চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায়—খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক এই উভয়েরই নাম অভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি বলা যায়—'বাল্মীকিতে মহাভারতের উপাখ্যান-ভাগ বিবৃত না থাকিলেও ব্যাসে রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে বর্ণিত আছে', সেই স্থানে 'বাল্মীকি' এবং 'ব্যাস' কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার যখন বলা যায়—'কালিদাসে যক্ষের বিরহ-বর্ণনা অতীব করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী', তখন 'কালিদাসে' অর্থাৎ কালিদাসের 'মেঘদূতে'—ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বৈষ্ণবেরা বলেন—নামী হ'তে নাম বড়। এখানেও দেখা যায়—নামের দ্বারাই নামীর পরিচয়। মেঘদূতের কবি বলিলেই কালিদাসকে বুঝায়; হ্যামলেটএর কবি বলিলেই সেক্সপীয়রকে বুঝায়; কিন্তু তখনই বিভ্রাটের সম্ভাবনা ঘটে,—যখন একাধিক কবি একই বিষয় অবলম্বনে কোন গ্রন্থ রচনা করেন। ইহারও দৃষ্টান্ত কিন্তু সাহিত্যিক জগতে বিরল নয়। একই রামচরিত অবলম্বনে বাল্মীকি, কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বহু কবি অনবদ্য কাব্য রচনা

করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষাতেও দেখিতে পাই—বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনায় অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি মধুর ছন্দের ঝঙ্কার ও অপূর্ব্ব বর্ণনাবৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তথাপি কৃত্তিবাসের রামায়ণই এ দেশে সমধিক আদৃত। আবার দেখিতে পাই—বিদ্যাসুন্দরের সরস উপাখ্যান বর্ণনা করিতে অনেক বাঙ্গালী-কবিই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দরের কবি' বলিলে আমরা সাধারণতঃ রায় গুণাকরকেই বুঝি। বলা বাহুল্য, এখানেও সেই নামের দ্বারা নামীরই ইঙ্গিত করা হইতেছে। এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল নিবন্ধ রচনা সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। অনেকের মত এই যে—বিদ্যাসুন্দর কোন বঙ্গীয় কবির কল্পনা-প্রসূত কাব্য নহে; কবি বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর-কাব্য হইতে মূল উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া বহু কবি তাহা বহু প্রকারে পল্লবিত করিয়া অসামান্য কবি-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম কবি বররুচি কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বররুচি-প্রণীত সংস্কৃত প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে; কিন্তু তৎপ্রণীত কোন কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-লাইব্রেরিতেও বররুচি প্রণীত কোন কাব্য বা কবিতার সন্ধান মিলে নাই।

বাঙ্গালায় রচিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্যমধ্যে চোরপঞ্চাশৎ নামে যে পঞ্চাশটি শ্লোক সন্নিবেশিত দেখা যায়, অনেকের মতে সেগুলি কাশ্মীরী পণ্ডিত কবি বিল্হন-বিরচিত *। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। তবে, সকল বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরে চোরপঞ্চাশতের সকল শ্লোক বা তাহার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহারও মতে, এই মূল সংস্কৃত খণ্ডকাব্যই কল্পনা-কুশলী নিপুণ কবিগণের দ্বারা বিস্তারিত হইয়া ক্রমে সুন্দর, সুবিপুল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই চোরপঞ্চাশতের মধ্যে সুড়ঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। সুপণ্ডিত রাম তর্কবাগীশ মহাশয় এই চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলির কালিকাপক্ষে অতি সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এইবার আমরা সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির আলোচনা করিব। বঙ্গভাষায় কোন্ কবি প্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে বঙ্গভাষায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম রচিত হয় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার দুই-চারি বৎসর পূর্ব্বে। এই কাব্যের কবি শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গৌড়ের সুলতান নসিরুদ্দিন নসরৎ সাহর পুত্র যুবরাজ আলাউদ্দিন ফিরোজসাহ। পরে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে বা পরবর্ত্তী শতকের প্রথম পাদে ভাগীরথীতীরস্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসিগণের কৃপায় নাগরিক সভ্যতা ও বিলাসিতা দেশময় পরিব্যাপ্ত হইলে, ঐ নিবন্ধ ধর্ম্মের নির্ম্মোকে সংবৃত করা হয়।

(১) রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন—ময়মনসিংহনিবাসী কবি কঙ্ক। কিন্তু কঙ্ক-প্রণীত বিদ্যাসুন্দর অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

(২) কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কালিকামঙ্গলে ভণিতামুখে পূর্ব্ববর্ত্তী রচয়িতৃগণের নামের যে তালিকা দিয়াছেন * তদ্‌দৃষ্টে মনে হয়, গৌড়ীয় ভাষায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রণয়ন করেন শ্রীকাববল্লভ। কিন্তু এই বল্লভেরও সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

(৩) বঙ্গভাষায় রচিত যে সমুদয় বিদ্যাসুন্দর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বোধ হয় কবি কৃষ্ণরাম দাস-রচিত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। প্রাচীন মঙ্গল-কাব্য-রচয়িতৃগণের মধ্যে কবি কৃষ্ণরামের নাম সুপরিচিত। তাঁহার জন্মমৃত্যুর সন-তারিখ অদ্যাবধি নির্ণীত না হইলেও, কবির কাব্যগুলির মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত স্বপরিচয়-জ্ঞাপক ভণিতাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—

সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উৎপত্তি।
তাঁহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি।
শুন সবে এক চিত যেমতে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে সপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী।—রায়মঙ্গল।

অন্যত্র— কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসুশূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর।—রায়মঙ্গল।

আরও—নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উৎপত্তি।
হইয়ে একচিত রচিলা রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি।—রায়মঙ্গল।

কবির কালিকামঙ্গলের শেষ ভাগে আছে—

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর অপরূপ নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান।

এই সকল বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়—কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবি কৃষ্ণরাম দাসের পিতার নাম ভগবতী দাস। তাঁহাদের বসতি ছিল

---

* "Of purely erotic type is the 'Chaurapanchasika,' which is almost certainly by Bilhana author of the 'Vikramadeva-charitam'. There is, of course no truth in the picturesque tradition which alleges that the poet contracted a secret union with a king's daughter, was captured and condemned to die, but won the heart of the sovereign by the touching verses uttered as he was led to execution in which he recalls the joys of the love that had been. It is highly probable that there is no personal experience at all in the lines whose warmth of feeling undoubtedly degenerates into license."—Classical Sanskrit Literature by A. Berriedale Keith D. C. L., D. Lit, 2nd Edn. p 120.

* ঐ ভণিতা পরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নিমিতা গ্রামে। প্রথম বয়সে কবি যখন রায়-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। রায়মঙ্গলের রচনা-কাল ১৬০৮ শক—১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ। কবি নিজে কালিকামঙ্গল রচনার সময়-নির্দ্দেশ না করিলেও, ধরা যাইতে পারে যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এই কাব্য রচিত হওয়াই সম্ভব। ইঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দরে বর্দ্ধমানের নামোল্লেখ নাই।

(৪) বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল; ইহাতে কবির স্বপরিচয়-জ্ঞাপক ভণিতায় দেখিতে পাই—

পিতামহ শ্রীচৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পূজিল যার আশ॥

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবির বংশলতিকা এইরূপ ছিল—

চৈতন্য চক্রবর্ত্তী
|
দেবীদাস চক্রবর্ত্তী—কাঞ্চনী দেবী
|
বলরাম চক্রবর্ত্তী

কবিশেখরোপাধিক বলরাম চক্রবর্ত্তীর বিদ্যাসুন্দর বেশ প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূর্ণ, ভারতচন্দ্রের মত আদিরসবহুল নয়।

(৫) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনার কাল অদ্যাবধি নিঃসন্দেহে নির্ণীত না হইলেও, খুব সম্ভব, ভারতচন্দ্রের রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নানাবিধ ছন্দের ঝঙ্কার ও মাঝে মাঝে সুমধুর কবিত্ব থাকিলেও তাঁহার ভক্তি-রসাত্মক গানগুলি সমধিক পরিচিত, ও বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত।

(৬) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল কাব্য। সকলেই জানেন—ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবনী বা রচনাবলী সংক্রান্ত অধিক উপাদান অদ্যাবধি সংগৃহীত হয় নাই। খ্যাতনামা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথমে বহু চেষ্টায় ভারতচন্দ্রের জীবনী সঙ্কলন করেন। গুপ্ত কবির মতে অনুমান ১১১৯ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭১২ খৃষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র যে সত্যপীরের কথা রচনা করেন, তাহাতে কবির স্বপরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—

দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা।

অন্যত্র—

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতী-যুত
ফুলের মুখটী খ্যাত দ্বিজ-পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর হরি হোন বরদায়
ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা॥

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ সমূহ হইতে জানা যায়, কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন রায় উপাধিধারী রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ভুরসুট পরগণার অধীন আমতার সন্নিহিত পেঁড়ো-বসন্তপুরে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়; পরে ভাগ্যবিড়ম্বনায় সেই স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া কবি সপ্তগ্রামের অদূরবর্ত্তী দেবানন্দপুরের অধিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর হীরারাম রায়ের বাসনানুসারে তিনি সত্যপীরের কথা রচনা করেন—"সনে রুদ্র চৌগুণা," অর্থাৎ ১১৩৪ বঙ্গাব্দে—১৭২৭ খৃষ্টাব্দে। কবির বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র।

ভারতের বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্নদামঙ্গলের রচনা-কাল কবি স্বয়ং এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

অর্থাৎ ইহার রচনা-কাল ১৬৭৪ শক—১৭৫২ খৃষ্টাব্দ। অতএব দেখা যায় যে, বাঙ্গালার ইতিহাসের যুগান্তকারী যে মহাসমর পলাশী-প্রান্তরে সংঘটিত হয়, এবং যাহার ফলে বাঙ্গালার রাজমুকুট হতভাগ্য সিরাজের মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া বণিক্ ইংরেজের মস্তক সমলঙ্কৃত করে, তাহার ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের রসময় কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের রচনার অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম কালিকা-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন—কলিকাতার অন্তঃপাতী চড়কডাঙ্গার পশ্চিম হইতে ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে আত্মারাম ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল নকল করেন। তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র তাঁহার সুললিত ছন্দোঝঙ্কারপূর্ণ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার পূর্ব্বে কৃষ্ণরামের কাব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র যেমন মোহিনী তুলিকা-সম্পাতে বর্দ্ধমান নগরকে বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারভূমিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন; কৃষ্ণরাম তাহা করেন নাই। কেহ কেহ বলেন—সুদূর দক্ষিণাপথে বিদ্যাসুন্দরের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে বর্দ্ধমানকে বিদ্যাসুন্দরের মিলনস্থলরূপে নির্দ্দেশ—ভারতচন্দ্রের স্বকীয় কল্পনা-প্রসূত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে ভারতচন্দ্রের শৈশবাবস্থায় ভাগ্যবিড়ম্বনায় জন্মস্থান হইতে বিতাড়িত, অর্থাৎ বর্দ্ধমানের মহারাণীর কোপে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও গৃহ-বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল! এ লাঞ্ছনা কবি জীবনের পরবর্ত্তী কালে কোন দিনও ভুলিতে পারেন নাই; এই জন্যই মনে হয়, সম্ভবতঃ আক্রোশ বশতঃ তিনি তাঁহার অমর লেখনীর সাহায্যে সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান রাজপরিবারের ললাটে এই দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। কবির কাব্যমধ্যেই দেখিতে পাই—

সভাসদ্ তাঁহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভুরসুটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥

কিন্তু ভারতচন্দ্র যে লিখিয়াছেন—

রাণী আইল ক্রোধ-মনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়।

অথবা—

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়
কাটিতে বাসনা হয় ঠেকেছি মায়ায়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভারত তদানীন্তন বর্দ্ধমানরাজের নাম বীরসিংহ রায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু বর্দ্ধমানের কোন রাজার নাম বীরসিংহ ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। এই স্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্নদামঙ্গলে "রাধানাথ" নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;

রাধানাথের দুঃখ-ভরা, নাশ গো সত্বরা।
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥
* * *
তুমি গো তারিণী-তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তব ঋণী চক্রে প্রাণ তব গো॥

কিন্তু এই রাধানাথ লোকটি কে ছিলেন?

(৭) এইবার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষ রচয়িতার কথা বলিব; ইঁহার নাম প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী। প্রাণারাম তাঁহার কালিকামঙ্গলে লিখিয়াছেন—

বসুদ্বয় বাণচন্দ্র শক নিরূপণ। (১৫৮৮)
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন॥
শ্রীকবিবল্লভ দ্বিজ রচিত আছিল।
এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ করিল॥
আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর।
শোধন পূর্ব্বক পুনঃ হইল উদ্ধার॥
বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যাহার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে॥

উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতীতি হয় যে, কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর আশানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই,—যদিও তাঁহার রচিত গানসমূহ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

এ কথাও অনেক সময়ে মনে হইয়াছে—যে-নিবন্ধ অবলম্বনে এতগুলি খ্যাতনামা লেখক তাঁহাদের সমগ্র কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, সাড়ম্বরে ও সালঙ্কারে প্রত্যেকেই এক একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের তৃপ্তিবিধানের জন্য নিছক দৈহিক ভোগের কাহিনী হইতেই পারে না। শুধু দৈহিক ভোগের বর্ণনাপূর্ণ কাব্য রচনা দ্বারা বঙ্গবাসীর নিকট হইতে যে স্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করিতে * পারা যায় না—ইহা তাঁহারা সকলেই জানিতেন। বাঙ্গালী ভোগবিলাসী জাতি নয়; একমাত্র ত্যাগের মহিমাই বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ করিতে পারে, তাহাই বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর যাঁহাদের আদর্শ দেবতা, সংসার-বিরাগী বুদ্ধ, চৈতন্য যাঁহাদের নিকট ভগবানের অবতার, রামায়ণ যাঁহাদের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ,—কলুষ-ময় কামায়ন, যত সুন্দর ভাবেই রচিত বা বর্ণিত হউক না কেন, তাহা যে কোন কালেও সেই বাঙ্গালী জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন স্থাপন করিতে পারিবে না, তাহা তাঁহারা প্রত্যেকেই উত্তমরূপে জানিতেন। ভাগবত যদি নিছক ভোগের কাব্য হইত, রাধাকৃষ্ণের বিহার যদি প্রকৃতপক্ষে শুধু দৈহিক ভোগেরই বর্ণনা হইত, তাহা হইলে তাহা কখনও বাঙ্গালীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিত না। এই জন্যই মনে হয়—এই অনবদ্য কালজয়ী বিদ্যাসুন্দর কাব্যমধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচ্ছন্ন আছে; তাহা কেবল গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। নীলাচলে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-গাত্রে যে সমুদয় চিত্র অঙ্কিত আছে, তৎসমুদয়ের যদি অন্তর্নিগূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে সেগুলি লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থাপিত করা নিশ্চিতই অতীব দূষ্য ও গর্হিত। সুতরাং মনে হয়, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্তর্নিগূঢ় উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা যে—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান (পরা বিদ্যা, যদ্দ্বারা 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে') ও আদর্শ সুন্দর (সত্যং শিবং সুন্দরম্)—ইহা প্রকৃত মিলনের পরিপন্থী অনেক; সুড়ঙ্গদ্বার দিয়া (ইড়া পিঙ্গলা প্রভৃতি দ্বার দিয়াই) ঐ মহামিলন সংঘটিত হইতে পারে। 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই ইহা পাঠ করা সার্থক, নতুবা বিদ্যাসুন্দর-পাঠ ব্যর্থ, এবং এই প্রবন্ধ-রচনাও নিষ্ফল।

শ্রীজহরলাল বসু।

---

* যদিও এখনকার দিনে তদ্দ্বারা প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে বটে। পণ্ডিতেরা বলেন—'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর-ক্ষতয়ে।'—লেখক

অপেক্ষা

রাইচরণ লেখে—কবিতা, গান, নাটক সবই। মরবার সময় তার বাপ একখান বাড়ী আর কিছু নগদ টাকা রেখে যায়; সুতরাং বাপের এক ছেলে সে, চাকরী-বাকরী না করে মা বীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করলে। অন্দরে স্ত্রীর মুখে স্বামীর রচনার প্রশংসা ধরে না! বাইরে রাইচরণের বৈঠকখানায় বসে বন্ধু-বান্ধবেরা চা আর লুচি-মিষ্টান্নাদি খায় আর তার লেখার বাহবা দেয়। অতএব রাইচরণ নিঃসন্দেহেই কবি এবং লেখক।

রাইচরণ শুধু লেখে, আর কিছু করে না। কাজেই যে পয়সা খরচ হয়, তার পূরণ হয় না। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে যায়। রাইচরণের অবস্থাও ক্রমে পড়তে লাগল। বন্ধুরা পরামর্শ দিলে, "কলকাতা যাও। সেখানে তোমার লেখা কাগজে বার করলে কিছু পাবে। তা ছাড়া যদি ষ্টেজে কিম্বা ফিল্মে তোমার বই চলে, তাহলে লাল হয়ে যাবে।"

ক্রমাগত রক্তপাত হওয়ায় রাইচরণের চেহারা একটু ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল; সুতরাং লাল হবার আশায় পৈত্রিক ভিটাটুকু বিক্রী করে সস্ত্রীক সে কলকাতায় গিয়ে হাজির হল।

ছোটখাটো একখানি বাড়ী চল্লিশ টাকায় ভাড়া করে রাইচরণ সস্ত্রীক কলকাতায় আস্তানা পাতলে। এক জন দিন-রাত্তের চাকর রইল, আর একটি ঠিকা ঝি। প্রথম ক'দিন সব দেখা-শুনা করাতেই কেটে গেল। তার পর রচনার বাণ্ডিল বগলে নিয়ে লাল হবার চেষ্টায় রাইচরণ ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাইচরণ ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে। কোথাও ঠিক স্থিতি করে উঠতে পারছে না। প্রকাশকরা কেউ বলেন, পরে এক সময় আসবেন। কেউ তাও বলেন না। দেখব বলে কেউ বা রচনা রেখে দেন; তার পর পুনঃ পুনঃ তাগাদায় বিরক্ত হ'য়ে অপঠিত অবস্থায় তা ফেরৎ দেন। কেউ বা হারিয়ে গেছে বলে ফেরতও দেন না। সম্পাদকরা তো লেখা প্রথমতঃ নিতেই চান না; নিলেও পড়তে চান না। কোনো মতে পড়াতে পারলেও ছাপতে চান না; এবং ক্রমাগত আনাগোনা ধরাধরি করার পর চক্ষুলজ্জার খাতিরে যদিও বা ছাপেন তো দক্ষিণা দিতে চান না। ষ্টেজ আর ফিল্মের কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখাই ঘটে না। কোনো মতে যদি বা একে-ওকে ধরে তাঁদের দরবারে গিয়ে হাজির হয় তো ক্রমাগত তাঁদের পূজায় পান-সিগারেট ও চা জোগাতেই গাঁটের কড়ি বেরিয়ে যায়! তার পর হয়তো দয়া করে তাঁরা বলেন—"আচ্ছা, রেখে যান, পড়ে দেখব।"

রোজই যায় আসে, পান-সিগারেট দেয়, চা খাওয়ায়, পরে বাড়ী ফিরে আসে; উত্তর আর পায় না। মিনতি জানালে তাঁরা বলেন—"বড্ড ব্যস্ত আছি মশায়—পড়বার সময় করে উঠতে পারছিনে কি না।"

এমনি ভাবে আরও কিছু দিন কাটে। গাঁট থেকে আরও কিছু খসে। শেষে ক্রমাগত খোসামোদ করা এবং যাওয়া-আসার ফলে হয়তো খুশী হয়ে তাঁরা বলেন—"বেশ হয়েছে। কিন্তু এখন তো আমাদের হাতে ক'খানা বই রয়েছে। আপনি এখন নিয়ে যান। দরকার হলেই আপনাকে খবর দেব। ফার্ষ্ট চয়েস্। মধ্যে মধ্যে আসবেন কিন্তু।"—মানে, পান-সিগারেট এবং চা মধ্যে মধ্যে বেখরচায় আসে তো মন্দ কি?

পাঁচ বছর কেটে গেছে। রাইচরণকে দেখলে আর এখন চেনা যায় না; অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এখন সাত টাকা ভাড়ায় খোলার ঘরে বাস। ঝি নেই, চাকর নেই। স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়। বেশী দিন বাঁচবে—সে আশা নেই। ভাল ওষুধ পথ্য দেবে, সে অর্থও তার নেই। স্ত্রী কোন দিন কোন অভিযোগ জানায়নি; বরং নিরাশায় রাইচরণ যখন ভেঙ্গে পড়েছে, তখন স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—"নিশ্চয়ই ওরা তোমার লেখা নেবে। আমি জানি, এক দিন না এক দিন তোমার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।"

আজ-কাল রোজই সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে বিফল-মনোরথ হয়ে রাইচরণ ঘরে ফেরে। স্ত্রী প্রশ্ন করে—"হ্যাঁ গা, বই ওরা কেউ নিলে?"

রাইচরণ উত্তর দেয়—"হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়ে গেছে। রিহার্সল আরম্ভ হ'ল বলে।"—নির্ভেজা মিথ্যা কথা এই বলতে রাইচরণের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তবু সে বলে। আনন্দে স্ত্রীর চোখ-দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ হাত দু'খানি দিয়ে স্বামীর হাত ধরে উৎফুল্ল ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে—"আমি আগেই তো বলেছিলুম।"

দিন যায়। স্ত্রী প্রশ্ন করে—"হ্যাঁ গা, আর কত দিন দেরী? আমি বেঁচে থাকতে কি শুনে যেতে পারব না—তোমার বই হচ্ছে?"

ধরা-গলায় রাইচরণ বলে—"কি যে বলো! তুমি সেরে উঠবে এবং দেখতে যাবে, প্ল্যাকার্ড বেরিয়ে গেছে। আর-শনিবারে উদ্বোধন-রজনী।"

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে স্ত্রী উত্তর দেয়—"ভগবান্ এবার বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। আমি আগেই ঠিক বলেছিলুম।"

শনিবার এল। উত্তেজনায় স্ত্রী ছট্‌ফট্ করছে। শরীর তার ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। জীবন-দীপ নিবে আসছে। রাইচরণ দুপুরবেলা বেরিয়েছে। আজ তার বইএর প্লে, কত কাজ! রাইচরণ বুঝতে পেরেছে, আজকের দিনটা বোধ হয় কাটবে না। প্রমীলার তখন যায় যায় অবস্থা! মরবার আগে তার এই একমাত্র সাধ যদি কোনো মতে পূর্ণ করা যায়, এই আশায় প্রত্যেক ম্যানেজারের দোরে দোরে সে ঘুরছে। শেষে সন্ধ্যা-নাগাদ সে যেন ভেঙ্গে পড়ল। কলকাতায় একটা নতুন থিয়েটার খুলেছে। ছোকরা ম্যানেজার, বাপের সম্পত্তি পেয়েছে; রাইচরণ তাকেই নিজের সমস্ত কাহিনী অকপটে খুলে বললে; শেষে বললে, "দেখুন, সত্যি করে নয়, যদি মিথ্যা, শুধু আপনি এইটুকু মাত্র বলেন যে, আপনারা আমার বই অভিনয় করবেন, আমি গিয়ে সেই সুখবরটুকু আমার স্ত্রীকে দিতে পারব। মৃত্যুর আগে একটা সত্য কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলেও আমি অনেকখানি তৃপ্তি পাব, সেও সুখী হবে।"

ম্যানেজার নিজের গাড়ীতেই রাইচরণের বাড়ী গেলেন। তার একখানি বই নিয়ে, তাকে পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিয়ে, 'কাল কথাবার্ত্তা হবে' বলে চলে এলেন। রাইচরণ কিছুই বুঝতে পারলে না। স্ত্রীকে জানাতে সে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলে; কিন্তু সেই আনন্দের আতিশয্যে সেই রাত্রেই প্রমীলা মারা গেল। মরবার আগে তার মুখের শেষ কথা—"আমি জানতুম, তোমার বই নেবেই।"

রাইচরণের জীবনের কামনা পূর্ণ হয়েছে! নাট্যকার হিসেবে তার খ্যাতি আজ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ সুখের যাকে ভাগ দেবে, সে আজ আর পৃথিবীতে নেই!

শ্রীযামিনীমোহন কর।

ম্যালেরিয়ায় পথ্য-সমস্যা

আজ কাল কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কোন ডাক্তারকে না ডাকিলে যেমন রোগী বা তাঁহার আত্মীয়েরা চিকিৎসায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, সেইরূপ রোগীর জন্য কৌটা-ভরা বিদেশী বার্লি, হর্লিক্‌স ফুড, গ্লুকোজ, পার্ল-সাগু, বা ঐ শ্রেণীর বিদেশজাত এবং সুদৃশ্য আধারে সংরক্ষিত মূল্যবান লঘুপাক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ না করিলে রোগীর জন্য যথাযোগ্য পথ্যের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে এ দেশে রোগের ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে এই প্রকার পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের উপর এরূপ উৎকট প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে যে, পথ্যের মূলতত্ত্ব পরিহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য ব্যবস্থার অনুসরণই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

বাস্তবিক পথ্য বলিলে আমাদের শরীরের অন্তর্নিহিত স্রোতঃ-পথের পক্ষে যাহা কল্যাণপ্রদ, তাহাই বুঝা উচিত। জ্বর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লপিত্ত, ক্ষয়, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, শূল, গ্রহণী, আমাশয় প্রভৃতি এরূপ বহু রোগ আছে—সে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় পথ্যের প্রয়োজন। কোন একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন না করিয়া বিভিন্ন চিকিৎসক গতানুগতিক প্রথায় ইচ্ছানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করেন। এই প্রকার বিনা-বিচারে পথ্য-নির্ব্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বিপন্ন হইতে হয়। হয় একটা বড় বিলাতি পেটেণ্ট ঔষধের ফিরিস্তি অথবা আফগানিস্থানের 'কাবুলি মেওয়া', না হয় এমন-একটা অদ্ভুত-কিছুর ব্যবস্থা করা হয়—মোটের উপর যাহা কখন পুষ্টি-কর, কখন লঘুপাক, কখন বা কোন দিক্‌ দিয়া অসাধারণ হইয়া থাকে; কারণ, রোগীর আত্মতৃপ্তির অনুরূপ ব্যবস্থা না হইলে চিকিৎসার মর্য্যাদাহানিরও সম্ভাবনা ঘটে। বস্তুতঃ, পথ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট ধারা আছে; চিকিৎসকগণ বিবেচনার সহিত তাহা অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগকে আর আশ্বস্তচিত্তে প্রতীচীর দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না, কিম্বা পথ্যাদি নির্ব্বাচনের চিন্তায় গলদ্‌ঘর্ম্মও হইতে হয় না।

সকল রোগে ধান্যজাতীয়, দুগ্ধজাতীয়, মূলজাতীয়, ফলজাতীয়, মৎস্য, মাংস এবং তরকারীজাতীয় এক বা একাধিক পথ্যের প্রয়োগ করিতেই হয়। বিশেষতঃ, সকল রোগেই অল্পাধিক পরিমাণে মন্দাগ্নিত্ব থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে মাত্রার অল্পতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। মাত্রা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অগ্নিবলানুসারী হইবে। আবার আয়ুর্ব্বেদ মতে ম্যালেরিয়া এক প্রকার বিষম জ্বর—যাহা পরোক্ষ ভাবে মশক-দংশনজনিত বিষ, প্রত্যক্ষ ভাবে জলগত বিষক্রিয়ার ফলে কোষ্ঠাগ্নিকে বিকৃত করে; আর এই কোষ্ঠাগ্নিবিকার বলিতে—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতুর এক বা একাধিক যে কোনটি বুঝায়। এই কোষ্ঠাগ্নি স্বস্থানে, স্বভাবে ও স্বমানে থাকিয়া কার্য্য করিতে বিরত হইলে অন্নরস যথাবিধি রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ক্রমপরিণতিতে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে না, ফলে ক্ষেত্রবিশেষে রক্তাল্পতা বা যকৃৎ-প্লীহার বৃদ্ধি, আবার কোন ক্ষেত্রে শারীরিক অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, বা কোষ্ঠবদ্ধতার উৎপত্তি হয়; এবং এই সমস্ত ব্যাপার রোগীর অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হওয়ায় রোগী স্বয়ং আদৌ তাহা বুঝিতে পারে না। ফলতঃ, বিকৃত অন্নরসের অনুলোমগতি বা প্রতিলোমগতি হয়। অনুলোমগতির ক্ষেত্রে বিকৃত রস যকৃৎ বা প্লীহাগত হইয়া প্লীহা যকৃৎ বৰ্দ্ধিত করে, ফলে রক্তের মাংস ইত্যাদি ক্রমপরিণতি সম্ভব হয় না। আবার যে ক্ষেত্রে প্রতিলোমগতি হয়, সে ক্ষেত্রে শরীরের অবসাদ, সাধারণ অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মোটের উপর সকল ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা থাকিবেই। আর এ রোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিকৃত রস আমাশয় বা পাকস্থলীগত থাকে না বলিয়া রোগী এক প্রকার কৃত্রিম ক্ষুধা অনুভব করে, এবং রোগীর অগ্নি বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাহার উপলব্ধি হয় না। সুতরাং জ্বরবিরামের পরেই যে কৃত্রিম ক্ষুধা অনুভূতি হয়, সেই কৃত্রিম ক্ষুধাই যত অনর্থের মূল। এ জন্য রোগটিকে এক প্রকার মৃদু বিষক্রিয়া বলিয়াই অভিহিত করা যায়। আর এই মৃদু বিষক্রিয়া শোণিত-শোষক বাদুড়ের মত মানুষের তথা জাতির রক্ত তিলে তিলে শোষণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করে। অন্য রোগে দেহ পথ্য গ্রহণ করিতেই চায় না, কিন্তু এ রোগে দেহ পথ্য গ্রহণ করিয়া রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

সুতরাং জ্বর থাকিলে দুগ্ধ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তরল অন্নমণ্ড, খইএর মণ্ড, যবের মণ্ড, বা চিঁড়াভাজার মণ্ডের যে কোন একটি দুই তোলা মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ঐ জলীয়াংশ দিনে চারি বার পান করাইলে অগ্নিবল বিকৃত হয় না, অথচ ক্ষুধা বা পিপাসা-বোধ থাকে না। জ্বরবিরামে দুগ্ধসহ এই পথ্য দানে দেহের পোষণ ও বিষক্রিয়ার নাশ হয় এবং অপেক্ষাকৃত গুরু দ্রব্যই প্রদান করা হয়। আবার জ্বরবিরামের তিন দিন পর হইতে এই তরল অন্নমণ্ড কিছু ঘন করিয়া দুগ্ধ বা মাছের ঝোল, বা তরিতরকারীর ঝোলসহ দিলে অন্নগত বিকৃত রস তাহার অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে না; অথচ দিনে তিন-চারি বার সেবনে ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। এই জ্বরের সুপ্তিকাল জ্বর-বিরামের পরে এক মাস বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে; যদি সেই সময়-মধ্যে জ্বরের পুনরাক্রমণও হয়, তাহা হইলেও এক মাস কাল এই নিয়মানুসারে চলিলে অনেক ক্ষেত্রে বিনা-ঔষধে অগ্নি স্বস্থান বা স্বভাবগত হইবার সুযোগ পায়, এবং রোগীও ক্রমসুস্থতা অনুভব করে। ফলের রস যাহা সুমিষ্ট অথচ পেটের ভিতর গিয়া অম্ল-বিপাক হয় না, মধুর-বিপাক হয়, সেগুলি রোগীর পক্ষে হিতকর। এ জন্য ডালিম, বেদানা, আঙুর, আমলকী, কচি ডাবের জল প্রভৃতি প্রদানে আপত্তির কারণ নাই। মুখের স্বাদ পরিবর্ত্তন, এবং দেহের পুষ্টি, এ উভয়ই ইহার দ্বারা সাধিত হয়। জ্বরবিরামের পরে তৃতীয় সপ্তাহ হইতে কিছু কিছু স্থূল অথচ সুন্দররূপে সিদ্ধ অন্ন বা তরি-তরকারী পূর্ণমাত্রার অর্দ্ধাংশ, চতুর্থ সপ্তাহে তিন-চতুর্থাংশ, এবং পঞ্চম সপ্তাহে শরীরের স্বাভাবিকত্ব বোধে স্বাভাবিক অন্নে অভ্যস্ততা পথ্য সম্বন্ধে সাধারণ বিধি। ক্ষুদ্র অতৈলাক্ত মাছ বা মাংসের ঝোল তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ব্যবহারে ক্ষতি নাই; কিন্তু জ্বর হইলেই সাগু, বার্লি, এরারুট, হর্লিক বা গ্লুকোজ প্রভৃতি বিদেশজাত পথ্যাদির প্রয়োজন—এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বেদান্তশাস্ত্রী কবিরাজ)।

অগ্নিশিখা ও পতঙ্গ

করোনার রায় দিলেন—আত্মহত্যা, উপলক্ষ প্রণয়ের ব্যর্থতা ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বের কিছু ইতিহাস আছে, আমরা এখানে সেই পূর্ব্বকথার আলোচনা করিতেছি।

সে দিন কি একটা ছুটীর বার। 'মনোমোহিনী-মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র হেড-মিস্‌ট্রেস নীলিমা ব্যানার্জ্জী ঘরে বসিয়া সে দিনের দৈনিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিল। পিয়ন দুইখানি পত্র লইয়া আসিল। একখানি পিয়নের হাতে ফিরাইয়া দিয়া নীলিমা বলিল, "মাকে দাও।" মনে মনে বলিল, "দাদার চিঠি।"

পিয়ন চলিয়া গেলে দ্বিতীয় পত্রখানা নীলিমা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল ; মুদ্রিত নেত্রে ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে তাহা বুকে চাপিয়া রাখিবার পর সে খামখানার উপর—যেখানে শিরোনামা লেখা ছিল, চুম্বন করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল ; কিন্তু তাহার ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া সে অবাক্‌ হইয়া গেল! খামের ভিতর তাহারই লিখিত পত্র ফেরত আসিয়াছে কেন ? ক্ষিপ্রহস্তে ভাঁজ খুলিতেই ভিতর হইতে অন্য যে পত্রখানা বাহির হইল, তাহাই ভূপতির লিখিত। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অসীম বিস্ময়ের সহিত নীলিমা ভূপতির পত্রখানা পড়িতে লাগিল। সে লিখিয়াছে,—"কল্যাণীয়া নীলিমা, তোমার পত্রখানি এই সঙ্গে ফেরত পাঠাইলাম—দেখিয়া নিশ্চিতই বিস্মিত হইবে। কেন ফেরত পাঠাইতেছি, তাহা পরিষ্কার করিয়াই লিখিতেছি। আমি তোমার কাছে ঋণী ;—অসময়ে তুমি আমায় যে কত সাহায্য করিয়াছ—আমি তাহা কোন দিনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু তোমার এ ধরণের চিঠি, অর্থাৎ প্রেমপত্র আমার কাছে আর রাখা উচিত নয় বলিয়া এখানি ফেরত পাঠাই ; অবশিষ্টগুলিও একত্র বাণ্ডিল বাঁধিয়া শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

"তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, আমি বিশ্বস্ত স্বামী হইতে চাই।…কিন্তু এ কথা তোমাকে পূর্ব্বে জানাইবার সুযোগ হয় নাই। সময় অত্যন্ত অল্প ; আগামী রবিবার আমার বিবাহ। যাঁহার ডিস্‌পেন্সারীতে গত মাস হইতে বসিতেছি, তাঁহারই একটি পিতৃহীনা পৌত্রী আছে, তাহারই সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পাত্রী তোমার অপরিচিতা নয়। রেণু বলিয়াছে, বিদ্যাসাগর কলেজে সে তোমার সহিত আই-এ পড়িত। রেণু রায়—সম্ভবতঃ তাহাকে চিনিতে পারিবে।

"রেণুকে ভালবাসিয়া বুঝিয়াছি, তোমার সহিত আমার প্রেমের অভিনয়ে যে ছেলেখেলা হইয়াছিল, তাহা একেবারেই ছেলে-মানুষী! আশা করি, তুমিও তাহা ঐ রকম হাল্কা ভাবেই গ্রহণ করিবে ; কারণ, উহাতে সারবত্তা কিছু ছিল না—ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না।

"তুমি টাকা দিয়া অনেক সময় সাহায্য করিয়াছ ; আমি উহার হিসাব রাখি নাই। তোমার নিকট যদি তাহা থাকে, অথবা একটা আনুমানিক হিসাব দিতে পার, তবে শীঘ্র তাহা পাঠাইও। আমি পত্র পাঠমাত্র সে টাকা তোমায় পাঠাইয়া দিব। ইতি ভূপতি।"

মন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া নীলিমা পত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, এবং বিবর্ণ পাংশুমুখে খোলা-জানালার বাহিরে গাঢ় ধূসরবর্ণ বর্ষণরত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সমস্ত অন্তর বিরাট্‌ শূন্যতায় হা হা করিতে লাগিল ; তথাপি তাহার মনে হইল—ভূপতি কি তামাসা করিয়াছে?…না, পত্রের প্রত্যেক অক্ষর নির্ম্মম সত্য ; তামাসা বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, এরূপ তরল উক্তি উহার ভিতর একটিও নাই।…ছেলেখেলা! আজ ভূপতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমকে ছেলেখেলা বলিয়া অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিতে চায়! দীর্ঘ সাত-আট বৎসরের অনাবিল প্রেম ও নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ভিতর সারবস্তু কিছুই ছিল না? নীলিমা ইহাকে 'হাল্কা ভাবে' গ্রহণ করিবে?…ভূপতি এ কথা—এই নির্ম্মম উক্তি অতি সহজে, অবলীলাক্রমে লিখিতে পারিল! সে ত উত্তমরূপেই জানে, সে নীলিমার হৃদয়ের ধ্রুবতারা। আর সে-ও যে ভূপতির…না, না, আজ আর ভূপতি তাহার নয় ; রেণুকে ভালবাসিয়া সে নীলিমার প্রণয়ের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছে!…বিদ্যাসাগর কলেজের সেই রেণু! সুন্দরী রেণু!…নীলিমাকে কালো বলিয়া সে কি অবজ্ঞাই না করিত! লেখাপড়ায় নীলিমার পাদপীঠে বসিবারও যোগ্যতা তাহার ছিল না ; সে জন্য সে নীলিমাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও হিংসাও করিত।

সেই রেণু—যে সারস্বত-কুঞ্জে কোন দিন নীলিমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই—আজ জীবনের যুদ্ধে সহজেই সে জয়ী হইয়াছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-টীকা আজ নীলিমার কোন কাজেই আসিল না! ভূপতি ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছে! হাঁ, ঋণ-পরিশোধ সে এখন অনায়াসেই করিতে পারে। রেণু ধনীর দুলালী, বিবাহে ভূপতি প্রচুর টাকা পাইতেছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু অর্থের ঋণ পরিশোধ করিলেও নীলিমার গভীর প্রেমের ঋণ সে কি দিয়া পরিশোধ করিবে? আজ চারি বৎসর নীলিমা চাকুরী করিতেছে, প্রতি মাসেই সে ভূপতিকে টাকা পাঠাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, ছিল শুধু অন্তরের আকর্ষণ। কোন দিনও সে একখানি মূল্যবান সাড়ী পরে নাই ; নিজের বিলাসিতায় কখন কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় করে নাই। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে শুধু ভূপতির উন্নতির পথটি নিষ্কণ্টক —মসৃণ রাখিতে চাহিয়াছে! এ জন্য কতই কঠোর বিদ্রূপ, টিট্‌কারী তাহাকে শুনিতে হইয়াছে, তাহা সে গ্রাহ্য করে নাই। ভূপতি আজ সেই অকিঞ্চিৎকর আর্থিক ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যস্ত,—কিন্তু প্রতি-দিনের প্রত্যেক কামনা বাসনা সম্বরণের ঋণ সে কি দিয়া পরিশোধ করিবে?—নীলিমার নাসিকা কম্পিত করিয়া একটা জলন্ত নিশ্বাস নিঃসারিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইল। হায়! ভারবাহী গর্দ্দভের মত শুধু বোঝা বহিয়াই তাহাকে এত কাল কাটাইতে হইল ; ভোগ করিতে পারিল না সে এতটুকু!

ভূপতি! ভূপতি! এই ত তিন মাস পূর্ব্বেও সে নীলিমার সহিত দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে! তখনও সে নীলিমার প্রেমে পরিতৃপ্ত ছিল ; বরং নীলিমা নিজে যদি বলিয়াছে, 'আমার রংটা যদি একটু ফরসা হত ; তোমার পাশে আমায় কি বিশ্রীই যে দেখায়!'…তখন ভূপতি আদর করিয়া বলিত, 'তুমি যে আমার ছায়া! ছায়া অন্ধকারই হয়, দেখনি?' অথচ আজ সে রেণুর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া ঠিক বুঝিয়াছে, তাহার প্রণয়

ছেলেখেলা ছিল, সারবস্তু উহাতে কিছুই ছিল না! ভূপতি কি অর্থের কামনাতেই তাহাকে ঐরূপ চাটুবাক্যে ভুলাইত?

ইহাই ভূপতি ও নীলিমার সব কথা নয়, ইহারও কিছু কিছু পূর্ব্ব-কথা আছে। নীলিমা চাকুরী করিয়া তাহার নিজের ও মাতারই নহে, সমগ্র পরিবারেরই সে অন্নসংস্থান করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু অত্যধিক বিলাস ও স্বচ্ছলতায় তাহার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছিল।

নীলিমার দাদা তাহার অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বড়। তিনি জ্যেষ্ঠ, নীলিমা কনিষ্ঠা; মধ্যে আর যে সাত-আটটি ভাই-বোন জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই গতায়ু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবিনয় ব্যবসায়ী। নীলিমা শৈশবে পিতৃহীনা হইলেও এই পিতৃতুল্য স্নেহময় ও ধনী সহোদরের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ায় বিপুল প্রাচুর্য্য উপভোগ করিয়াছিল। দাদা সর্ব্বদা তাহার আব্দার রক্ষা করিয়া চলিতেন।

আজ আর সে দিন নাই।

তাহার মসীলিপ্ত মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ সেই রঙিন্ দিনগুলির সুখস্মৃতি ভাসিয়া উঠিল; কিন্তু আজ তাহার চিন্তাধারা অনন্যমুখী থাকায় ভূপতিই সেখানে আসিয়া জুড়িয়া বসিল।

নীলিমা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, তখন ভূপতি তাহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়। ভূপতি তখন সবে আই এ পড়িতেছিল; তাহার বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি, আর রূপ যেন কন্দর্প তুল্য। নীলিমা কালো হইলেও কৈশোরের লালিত্য তাহার দেহে লাবণ্য বিকাশ করিয়াছিল। কিছু দিন মধ্যে দু'জনেই পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হইল। ইহার পর এক দিন মামাত বোনের দ্বারা সে মাকে জানাইল, ভূপতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। মা নিজেও ব্যাপারটা অনুমান করিয়াছিলেন; এবার কথাটা পুত্রের গোচর করিয়া বলিলেন, "বিনু, নীলাটা নমিকে দিয়ে আমায় কি বলিয়েছে জানিস্? সে বলে, তার মাষ্টার ভিন্ন আর কাউকে সে বিয়ে করবে না।"

সুবিনয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হুঁ, মাকাল ফল দেখেই ভুলে গেছে! ছেলেমানুষ বৈ ত নয়! মা—অন্নদা এমন মন্তব্য শুনিবেন, এরূপ মনে করেন নাই; কারণ, কন্যার নির্ব্বাচন তাঁহার নিজেরও মনোমত হইয়াছিল। রূপের মোহিনী শক্তি আছে,—এই নিরুপম সুন্দর সুকুমার ছেলেটি যখন মা বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহার এই সম্বোধনটাকে স্থায়িত্ব দানের জন্য তাঁহার নিজেরও বাসনা প্রবল হইয়া উঠিত।

সুবিনয় মায়ের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনের গতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলো মা?—মা তখন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "তাতে দোষ কি বাবা! ছেলেটি ভালো, আর করণীয় ঘরও বটে।"

সুবিনয় হাসিয়া বলিলেলন, "এ রাঙ্গা মূলো দেখে তুমিও ভুললে? কিন্তু ওকে কি দেখে দেব? কি আছে ওর? মোটে ত আই-এ পড়ছে। ওর ভবিষ্যৎ কি, তা ভেবে দেখেছ?"

অন্নদা প্রদীপ্ত মুখে বলিলেন, "ওর কিছু নেই, কিন্তু আমার তুমি আছ! তুমি থাকতে আমি কারুর জন্যে ভাবিনে বাবা!"

সুবিনয় মায়ের মুখপানে চাহিয়া আবার হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি না হয় ভাব না, কিন্তু আমি থেকে ওর কি করব? বলছ, নীলু আমার কাছেই থাকবে; তার মানে ভূপতিকে তুমি কি ঘরজামাই ক'রে রাখতে চাইছ?"

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিলেন, "দুর্গা, দুর্গা! পরের ছেলে এনে ঘরজামাই করে পোষা সাত-জন্মের পাপ! তা বলবো কেন? তোমার কারবারে কত লোক প্রতিপালন হচ্ছে; তুমি তোমার ভগিনীপতির জন্যে আর কোন-একটা ব্যবস্থা করতে পারবে না? তোমার ত বলে —হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত!"

সুবিনয় বলিলেন, "মা, সে কি ভালো? কুটুম্ব কুটুম্বই, সে কর্ম্মচারী হলে কি ভাল দেখায়? আমার ভগিনীপতি আমায় মনিব মনে করে আমার কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকবে? ছি ছি!"

অন্নদা তথাপি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "ছেলেটি ভালো, আর—"

সুবিনয় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিছুই ভালো নয় মা। তবে ওর চেহারাখানা ভালো বটে! তা ছাড়া, ওর কি আছে? বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, বংশমর্য্যাদা কিছুই ওর লোভনীয় নয়। শুধু রূপ দেখে ভুলে গেলে নীলার ভবিষ্যৎ জীবন শান্তিতে কাটবে না।"—অবশেষে তিনি মাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু ভেব না মা, এমন জামাই তোমায় এনে দেব যে, দেখে সকলেরই মুখে তার প্রশংসা শুনতে পাবে। তখন দেখো মা—নীলু তার নিজের মস্ত গাড়ী নিয়ে রোজ তোমার দোরে এসে দাঁড়াবে, রোজ চার বার করে তোমায় ফোন করবে। ভগিনীপতি আমার বাড়ী ঢুকবে মাথা উঁচু করে। বিদ্যা-বুদ্ধির দিক্ দিয়ে আমার চেয়ে সে বড় হবে।...সেই ভালো হবে? না, এই চাল-চুলোহীন রূপসর্ব্বস্ব জামাইকে ভালো বলবে?"

ইহার পর অন্নদার আর কিছুই বলিবার রহিল না, বাধ্য হইয়াই তিনি চুপ করিলেন; পুত্রের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিলেও ভূপতির জন্য তাঁহার মনটা কেমন লোভাতুর হইয়া রহিল।

ইহার পর মাস শেষ হইলে সুবিনয় মাকে বলিলেন, "ভূপতিকে জবাব দিলুম মা! ওকে মাষ্টার রাখাই ভুল হয়েছিল আমার। দেখ্ছি, নীলুর লেখাপড়ায় উন্নতি না হোক, ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী!"

সুবিনয় ভূপতিকে নীলিমার সম্মুখ হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিলেও তাহারা পরস্পরকে ছাড়িল না। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নীলিমা বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হইল। এই সময়েই সুবিনয়ের ব্যবসায়ে অকস্মাৎ ভাঙ্গন ধরিল। ঘরের গাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল, নীলিমা কলেজের বাসে যাতায়াত করিতে লাগিল; উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের কিছু কিছু সুবিধা হইল। ইহার পর সুবিনয়ের বৈষয়িক অবস্থা দিন দিন ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল; তখন অগত্যা নীলিমার বিবাহের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নীলিমা নিশ্চিন্ত মনে পড়িতে ও ভূপতির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। দাদার তখন আর্থিক ও মানসিক উভয় অবস্থাই শোচনীয়; কাজেই নীলিমা তাঁহাকে আর তেমন আমলে আনিল না।

ভূপতি তখন মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়াছে। দেশে তাহার যাহা কিছু সম্বল ছিল, মাতৃবিয়োগের পর সমস্ত বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া সে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার পর কয়েক বৎসর নীলিমার যে কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা শুধু ভগবানই জানেন!—দিবানিশি অভাবের কষ্ট সহ্য করিয়া কোন মতে সে বি-এ পাশ করিল। সৌভাগ্যক্রমে পাশ করিবার পরই দেড় শত টাকা বেতনের এই চাকুরিটা জুটিয়া গেল। তদ্ভিন্ন, সে

বাসের জন্য বাড়ীও পাইল, এবং কোন জমীদারের কন্যা ও পুত্রবধূকে পড়াইবার কাজ পাওয়ায় তাহাতে তাহার আরও ৩০ টাকা আয় হইল। ভূপতিকে ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া নীলিমার এই কাজ লইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ভূপতি নিজের অর্থাভাব জানাইলে নীলিমা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া এই চাকুরী গ্রহণ করিল। তদবধি মা ও সুবিনয়ের বড় ও মেজ মেয়েকে লইয়া সে এখানেই আছে। দাদাকে প্রতি মাসে ৫০৲ টাকা এবং ভূপতিকেও প্রতি মাসে ৩০।৪০ টাকা পাঠায়। প্রয়োজন জানাইলে কোন কোন মাসে তাহাকে ৫০৲ টাকাও পাঠায়। এ জন্য তাহাকে কিছু ঋণগ্রস্তও হইতে হইয়াছিল; কিন্তু অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহা সে পরিশোধ করিয়াছে। এই সকল অসুবিধার জন্য কোন দিন সে ক্ষুব্ধ হয় নাই।

ইহার পর মাঝে মাঝে দুই-এক বেলার জন্য ভূপতির সহিত নীলিমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। পরীক্ষার পাশ করিয়া গ্রীষ্মের ছুটীর সময় ভূপতি তাহাকে লিখিয়াছিল, "তোমার ত এখন ছুটী; আমার ইচ্ছা দু'জনে দার্জ্জিলিংএ বেড়িয়ে আসি। আজ চার বছর তুমি প্রবাসে কাটালে, দুই-এক ঘণ্টার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাতে তৃপ্তি পাইনি।"

নীলিমা উত্তরে লিখিল, "আমি প্রস্তুত, তুমি কবে আসছো লিখবে।"

তাহার পর আট দিন দার্জ্জিলিংএ থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নীলিমা তাহার ছয় গাছি চুড়ীর চারি গাছি বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

অন্নদা মেয়ের হাতে চুড়ী চারি গাছি দেখিতে না পাওয়ায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নীলিমা বলিল, "বিক্রী করে ফেলেছি, বেড়াতে যাবো কি না।"

মা এই সংবাদে রাগ করিয়া বলিলেন, "কি ডোকলা মেয়ে রে তুই! গায়ের গয়না বিক্রী করে বেড়াতে যাবার সখ? ভূপতিও যাবে বুঝি?"

নীলিমাও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "মানুষের সখ—সাধ থাকে না? তোমার ছেলের সংসার আমায় যদি না পুষতে হত, তাহলে কি আমায় গায়ের গয়না বেচতে হয়? যত দিন থেকে চাকরী করছি, কেবল তো ভার বয়েই মরছি।"

এ গঞ্জনা মায়ের পক্ষে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক; তিনি আর কথা বলিলেন না।

তাহার পর এক দিন সে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিল। শিলিগুড়িতে ভূপতির সহিত দেখা হইলে ভূপতি প্রথমেই যাহা বলিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত জ্বালার সহিত তাহার মনে পড়িল। ভূপতি বলিয়াছিল, "এঃ, নীলা, তুমি যে ভয়ানক মোটা হয়ে পড়েছ। 'এক্সারসাইজ' করো, 'এক্সারসাইজ' করো!"—নীলিমা সেই হইতে প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করিতেছে; কিন্তু ভূপতি তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই আজ কৃশাঙ্গী সুন্দরী রেণুর প্রণয় ও রূপে মুগ্ধ!

৩

মায়ের আহ্বানে নীলিমা পিছনে ফিরিল। অন্নদার হাতে একখানি পত্র। দু'জনের কাহারও মানসিক অবস্থা সহজ না থাকায় কেহই অপরের বেদনা-পাণ্ডুর মুখভাব লক্ষ্য করিল না। অন্নদা ভারী-গলায় বলিলেন, "বিনুর চিঠি এসেছে রে!"

নীলিমা নির্ব্বিকার ভাবে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল; সহসা দাদার পত্র আসিয়াছে—এ সংবাদে সে সময় তাহার মন বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না।

অন্নদা নিজেই বলিলেন, "বৌমার এই ন'মাস পড়ল, এ মাসে কিছু বেশি দিতে পারবি? আঁতুড়-খরচ কিছু তো লাগবে।"

নীলিমা অকস্মাৎ বারুদের স্তূপে অগ্নিস্পর্শের মত জ্বলিয়া উঠিল; কঠোর স্বরে বলিল, "পারব না, আমি কিছুতেই পারব না বলছি, আর একটা কানা-কড়িও আমি দিতে পারব না। বারো মাসই তোমার ছেলে-বৌয়ের রাজ্যের খরচ আমায় যোগাতে হবে, এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?"

অন্নদা সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলেন; মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "অভাব বলেই তো তোকে তা জানিয়েছে—"

নীলিমা বাধা দিয়া উগ্র কণ্ঠে বলিল, "অভাব হয় কেন শুনি? পুরুষমানুষ, হাত পা আছে, সুস্থ শরীর, খেটে রোজগার করে নিজের সংসার প্রতিপালন করতে পারে না? অমন পুরুষের পোড়া কপাল! আমি কিছুই দিতে পারব না। আমায় কি টাকার গাছ পেয়েছো যে, নাড়া দিলেই টাকা ঝ'রে পড়বে?"

অন্নদা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রধূমিত ক্রোধ যেন জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "নিজের ভাইএর জন্য টাকা বেরোবে কেন? ভূপতিকে ঘুস যোগাবার সময় খুব বেবোয় তো? মনে করিস্ আমি কিছুই টের পাইনে, নয়? মরছিস্ তার পেছনে সর্ব্বস্ব খুইয়ে। মনে করেছিস্, একটু পসার জমাতে পারলে তোকেই পাটরাণী করবে! তার ব'য়ে গেছে! সে ঝানু ছেলে, তোর ঘাড় ভেঙ্গে কাজ বাগিয়ে নিয়েছে, এইবার তোকে কলা দেখাবে। তার দায় পড়েছে তোকে বিয়ে করতে। কোন দিন কি আর্সীতে নিজের মুখখানাও দেখিস্‌নি? ভূপতি আসবে তোর মত মাংসপিণ্ডিকে বিয়ে করতে? হায় রে কপাল!...এই আমি বলে গেলুম দেখিস্—তোর মুখে লাথি মারবে, মেরে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে তোর চোখের ওপর সংসার পেতে বসবে। সেই হবে তোর মত নির্ব্বোধের উপযুক্ত শাস্তি! নিমক-হারাম, বেইমান! যে ভাই তোকে বুকে করে মানুষ করলে, তাকে মাসে পঞ্চাশটে টাকা দিস্, তারই জন্যে এতো মুখনাড়া দিচ্ছিস্? তোর তিনটে মাষ্টারের পেছনেই যে সে মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা খরচ করেছে। যা যখন আব্দার ধরেছিস্, দ্বিতীয় বার চাইতে হয়নি। আর আজ সেই ভাইয়ের অসময়ে সাহায্য করছিস্ ব'লে তুই যা মুখে আসচে তাই বলছিস্!...বেশ, আমি বিনুকে লিখছি, যদি সে কলকাতার রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় সে-ও ভাল, তবু তোর অশ্রদ্ধার অন্ন যেন মুখে না তোলে—তাকে তার মরা-বাপের দিব্যি দিয়ে লিখছি!" কথাগুলা বলিয়া অন্নদা হন্-হন্ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

সমুদ্রের উপর দিয়া যেন প্রচণ্ড বেগে তুফান বহিয়া গেল! বিক্ষুব্ধ উত্তাল-তরঙ্গমালার আলোড়ন স্থির হইতেও সময় লাগিল। নীলিমা যখন সমস্ত ঘটনা পুনরায় স্মরণ করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল, তখন তাহার দুই চক্ষু যন্ত্রচালিতের মত ড্রেসিং-টেবিলের দিকে ঘুরিয়া গেল। আয়না দেখিয়া বুঝিল, সে মাংসপিণ্ডই বটে! সে কালো, তাহার উপর শরীর স্থুল হওয়ায় তাহার যৌবনের লাবণ্যটুকুও চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ

বৎসর, কিন্তু মেদবৃদ্ধি বশতঃ তাহাকে স্থূলাঙ্গী গৃহিণীর মত দেখায়। নবোঢ়া বধূ সাজিবার চেহারা সে অনেক দিন পূর্ব্বেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভূপতির মুখও এই সময় তাহার মনশ্চক্ষে জাগিল। কান্ত মধুর রূপ, সহসা সে রূপের তুলনা মিলে না। আর নীলিমার সর্ব্বাবয়বের কোথাও এমন এক তিলও সৌন্দর্য্য নাই—যাহা ভূপতির বিন্দুমাত্র প্রীতিকর হইতে পারে!

মা জানেন না, কি কঠোর সত্য তিনি দৈববাণীবৎ নিজের অজ্ঞাত-সারেই আজ বলিয়া ফেলিলেন। নীলিমার জীবনে তাহাই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূপতি আজ অবলীলাক্রমে তাহাকে লিখিতে পারিয়াছে, তাহার সহিত নীলিমার ছেলেখেলা প্রণয় মাত্র। নীলিমা তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ভূপতির সাফল্য-অর্জ্জনের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আপনাকে প্রতিদিন—প্রতিক্ষণে বঞ্চিত রাখিয়া পতিব্রতা রমণী যেমন একান্ত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর জন্য সমস্তই উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার কল্যাণ-কামনাকেই একমাত্র কাম্য মনে করিয়া থাকে, তেমনই নীলিমাও সমস্ত বিলাস-বাসনা বর্জ্জন করিয়া ভূপতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতিকেই একমাত্র কাম্য মনে করিয়াছে; অথচ সে-সকলের মূল্য ভূপতির কাছে যেন কিছুই নয়! নিয়মিত ভাবে অর্থসাহায্যের জন্য অত্যন্ত সাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। কৃতজ্ঞ! আজ সে শুধু কৃতজ্ঞ! এ কথা মনে করিতে গিয়া সহসা তাহার স্মরণ হইল, ঠিক এই ভাবেই সে নিজেও তো স্নেহের ঋণ অস্বীকার করিয়াছে! দাদা তাহার পিছনে জলের মত অর্থব্যয় করিয়াছেন; স্নেহের তাঁর সীমা-পরিসীমা ছিল না। কোন দিন নিজের ছেলে-মেয়েদেরও তেমন আদর করেন নাই। এই ভূপতিকে শুধু দাদাই রূপ-সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে তাহাকে অপসারিত করিয়াছিলেন। নীলিমার তাহা মনঃপূত হয় নাই, তাই দাদার সতর্কতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিশাহারা হইয়া সে অন্ধ-আবেগে যে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছিল, আজ তাহাকে তাহা পঙ্কিল জলাভূমিতে আনিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিল! আজ জীবনের সমাপ্তি! নীলিমা চমকিয়া উঠিল, জীবনের সমাপ্তি! কি শ্রুতিমধুর শব্দ! যেন প্রণয়ীর মৃদু-গুঞ্জন! জীবনের সমাপ্তি! এ অভিশপ্ত ব্যর্থ জীবনের পরিসমাপ্তি! ইহাই কি এখন কাম্য?

এতক্ষণ পরে নীলিমার মন কতকটা স্থির হইল। তাহার দিশাহারা জীবনের ভুল-পথ ছাড়িয়া এই বার সে সত্য পথের সন্ধান পাইয়াছে। আর ভুল নয়, ইতস্ততঃ নয়; সে দৃঢ় অটল পদে অগ্রসর হইবে। দাদার মুখ মনে পড়িল। স্নেহময় পিতৃতুল্য হিতাকাঙ্ক্ষী সহোদর, কতই না সাধ তাঁর ছিল নীলিমাকে লইয়া! ধনী, চরিত্রবান্, বিদ্বান্ পাত্রে তাহার বিবাহ দিবেন,—ঘরে মোটর থাকিবে, ফোন থাকিবে; আভিজাত্যের আধুনিক সকল উপকরণের সে অধিকারিণী হইবে। দাদা বলিতেন, "আমার বোন কালো, আমি সোনা দিয়ে তাকে মুড়িয়ে দেব।"

৪

অনেক দিন হইতে দাদাকে সাহায্য করিতে হয় বলিয়া নীলিমা ভিতরে ভিতরে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার কথা মনে হইলে তাহার মন অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিত। আজ সহসা অতীতের কথা স্মরণ করিয়া, মাঝের কয়টা অপ্রিয় বৎসরের স্মৃতি মুছিয়া-ফেলিয়া দাদার প্রতি সহানুভূতি ও মমতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। আপনাকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া সে তখনই কুণ্ঠা ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল! তাহার মনে হইল, দাদাকে যতটা সাহায্য করা তাহার উচিত ছিল, তাহা না করিয়া সে অন্যায় করিয়াছে। যতটা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল, ততটাও করে নাই! দাদাকে সাহায্য না করিয়া সেই টাকাগুলি ভূপতিকেই দিয়াছে, অথচ তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত হইয়াছে। ভূপতি নৌকায় নদী পার হইয়াই পদাঘাতে তাহা উল্টাইয়া-ফেলিয়া তীরে উঠিয়াছে। পুরাতন জীর্ণ কদাকার তরণী আজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন!···যদিও দাদাকে সে যাহা দিত, তাহাতে তাহার অন্তরের তেমন কোন প্রেরণা ছিল না; বরং প্রতি মাসেই দুইখানা মণি-অর্ডার লিখিবার সময় তাহার মনে হইত, দাদার ভার বহিতে না হইলে সে ভূপতিকে আর একটু স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিতে পারিত। দাদার নিকট হইতে প্রাপ্তি-স্বীকারের যে পত্র পায়—তাহা আন্তরিক আশীর্ব্বাদ; কত লজ্জা, কত ক্ষোভে পরিপূর্ণ; কিন্তু নীলিমা সে লজ্জা ও ক্ষোভপূর্ণ পত্র পড়িয়া কোন দিন ব্যথিত হয় নাই; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খাম খুলিয়াছে, এবং কুঞ্চিত ভ্রূ লইয়াই তাহা নিতান্ত উপেক্ষা-ভরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আজ সহসা সেই সকল বিগত দিনের স্মৃতি মনে করিতেই তাহার মর্ম্মস্থল ক্ষোভ, বেদনা ও আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। আজ ভূপতির ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়াছে; কিন্তু নিজে সে তাহার অপেক্ষা শতগুণ গর্হিত কাজ করিয়া আসিতেছে। সে ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার মনোভাব লইয়া দাদাকে সাহায্য করিয়াছে,—যে দাদা তাহাকে ভালবাসিতেন বক্ষ-শোণিতের তুল্য! এইমাত্র দাদাকে উপলক্ষ করিয়া মা'কে সে যাহা বলিয়াছে, এবং মা-ও যে উত্তর দিয়াছেন, উভয়ই যুগপৎ তাহার মনে পড়িল। নীলিমা ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর কিছু পরে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে সে সোজা হইয়া বসিয়া প্যাডখানা টানিয়া-লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। লিখিল—"ভূপতি বাবু!" আজ আর অন্য দিনের মত তাহার লেখনীমুখে 'আমার চির-সুন্দর' সম্বোধন বাহির হইল না;—লিখিল, "ভূপতি বাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি আপনাকে কত টাকা দিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই। আনুমানিক হিসাব এই চারি বৎসরে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া ধরিতেছি; তাহাতে প্রায় ১৪৫০৲ টাকা হইতে পারে। আপনি ঐ টাকা দাদাকে তাঁহার নেবুবাগানের বাসায় দিয়া আসিলে উপকৃত হইব। ইতি—

নীলিমা ব্যানার্জ্জী।"

পত্রখানা সে শত বার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া পড়িল। কে বলিবে, ইহা ভূপতিকে লিখিত নীলিমার পত্র? ইহা যেন পাকা মহাজনের তাগিদ! ইহাতে কুণ্ঠার কোন কারণ ছিল না; ভূপতি তো ইহা ব্যতীত নীলিমার সহিত অন্য সম্পর্ক স্বীকার করে নাই!

কতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া-থাকিয়া সে আর একখানি পত্র লিখিল,—"দাদা, কয়েক দিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভূপতি বাবুকে আমি প্রায় দেড় হাজার টাকা ঋণ দিয়াছিলাম; অবশ্য, কোন লেখা-পড়া নাই। সেই টাকা

তিনি এখন ফিরাইয়া দিতে চান। আমি আজ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম, আপনার বাড়ী গিয়া টাকাগুলি তিনি যেন আপনাকে দিয়া আসেন। আপনি ব্যবসায়ে সুদক্ষ,—আশা করি, ঐ কয়টা টাকা লইয়াই আবার বৈষয়িক কাজে নামিয়া পড়িবেন। ভগবান্ এবার আপনার শ্রম সফল করুন। আর এক কথা, ভূপতি বাবুর হাত হইতে টাকা পাইবার পূর্ব্বে কোন পারিবারিক কথার উল্লেখ করিবেন না—তাহা যতই গুরুতর হউক।

স্নেহের নীলিমা।"

পত্রখানা দুই-তিন বার পড়িবার পর সে, সেখানা লইয়া মায়ের কক্ষাভিমুখে চলিল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, তাহার মাথাটা অত্যন্ত হাল্কা ও দেহটা অতিশয় গুরুভার হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে ধরিত্রী যেন টলমল করিয়া উঠিতেছে।

টলিতে টলিতে সে মায়ের কক্ষদ্বারে গিয়া পৌঁছিল, দেখিল, মা পত্র লিখিতেছেন; তাঁহার গালের উপর দু'টি স্থূল অশ্রুধারা। সুবিনয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা পিতামহীর দুই পাশে বসিয়া পত্রখানি পড়িতেছে; তাহাদেরও চক্ষুদু'টি জলপূর্ণ।

নীলিমা গাঢ় স্বরে ডাকিল, "মা!"

তড়িদ্বেগে অন্নদা মুখ তুলিলেন, মেয়ে দু'টিও চাহিয়া দেখিল। নীলিমা দুয়ারের উপর বসিয়া-পড়িয়া কপাটে মাথা রাখিয়া বলিল, "দাদাকে চিঠি লিখছ মা?"

মা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কথায় তোর দরকার কি?"

নীলিমা মিনিটখানেক মৌন থাকিবার পর বলিল, "ও চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেল। আমি খুব অন্যায় করেছি, কিন্তু তুমি মা হয়ে তা ক্ষমা করবে না?"

অন্নদা রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "না; কারণ, ক্ষমার একটা সীমা আছে।" বলিয়া তিনি পুনরায় কলম তুলিলেন।

নীলিমা ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, "মা, আজ আমায় জীবনের মত ক্ষমা করো মা! আর কখন এমন অন্যায় কথা আমার মুখ থেকে বেরোবে না। আমি কতখানি অন্যায় করেছি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।" ভাইঝি দু'টির দিকে চাহিয়া সমবেদনায় তাহার বুকের যেখানটা একেবারে খাঁ-খাঁ করিতেছিল, সেখানটা অকস্মাৎ ভারী হইয়া উঠিল। মনে হইল, ইহারা কোন দিন তাহাকে পিসিমা ভাবিয়া একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই; স্কুলেও যেমন এখানেও তেমনি প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর মর্য্যাদাই দিয়াছে। সেও কোন দিন তাহাদের ডাকিয়া আদর করিয়া কথা বলে নাই; তাহার কারণ, তাহার মন দিক্-দর্শন যন্ত্রের মত সর্ব্বদাই একমুখী থাকিত; তাই একটি পাই-পয়সাও ব্যয় করিতে তাহা তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিত। মনে হইত, সমস্তই তাহার অপব্যয় হইতেছে। মা ব্যতীত তাই প্রত্যেকেরই ভার সে অত্যন্ত বিরক্তি ও অনিচ্ছায় বহন করিয়াছে। ইহারা স্নেহ পাইবে কোথা হইতে?

নীলিমা তাহাদের পানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল, "তোরা কাঁদছিস কেন, মণি, রেবা? আয়, আমার কাছে উঠে আয়, লক্ষ্মী মা আমার!"

পিসিমার মুখ হইতে এই স্নেহমাখা কথা শুনিয়াও মেয়ে দু'টি উঠিয়া-আসা দূরের কথা, দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল। নীলিমা হাত বাড়াইয়া মায়ের পায়ে রাখিয়া বলিল, "মা, তোমার পায়ে ধরছি, ও-চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেল। দাদাকে এ সব কথা কিছু লিখ না; আর এই চিঠিখানাও তোমার চিঠির সঙ্গে দাদাকে পাঠিয়ে দিও।"—বলিয়া হস্তস্থিত পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে রাখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

সমস্ত পৃথিবী তখন তাহার চোখে ঘন কালিমায় সমাচ্ছন্ন।

* * * *

খানিকটা পরে মা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া নীলিমার পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানা ছোট বটে, কিন্তু পড়িয়া তাঁহার মনে কেমন-একটা ধাঁধা লাগিল। ভূপতি ঋণ লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিতেছে কেন? নীলিমার টাকা তো তাহার ঋণ নয়! আর শেষের দিকে একি কথা? কি এমন পারিবারিক গুরুতর কথা হইবে? এ যেন তাঁহার কেমন দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইল।

এতক্ষণের পর অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, নীলিমার মুখখানি কেমন যেন বিবর্ণ, প্রাণহীন দেখিয়াছিলেন। এ আবার কি হইল? কি এমন ঘটিল? একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলেই তো নয়! বুকের ভিতরটা তাঁহার ছাঁৎ করিয়া উঠিল; এইমাত্র তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া আসিয়াছেন যে!...কিন্তু তিনি তখনই ভগবান্‌কে মনে মনে অসংখ্য প্রণতি জানাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাগের ঝোঁকে বলেছি বলে সত্যই তা চাইনি, তুমি তো মায়ের মন বোঝ। ভূপতি যেন ওকে সোনার চোখে দেখে। ও যে পেট ভরে খায়নি, প্রাণ ধরে একখানা ভাল কাপড় পরেনি, শুধু তার উন্নতিই খুঁজেছে।..."

তিনি পত্রখানা সেখানেই রাখিয়া-দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রেবা বলিল, "কি হ'ল ঠাকুরমা?"

অন্নদার গলার শব্দ অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "কিছু বুঝতে পাচ্ছি না রে! নীলুর কাছে যাচ্ছি। হাঁ রে, ওর মুখ বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছিল না? মণি, দেখেছিলি?"

মণি বলিল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে ঠাকুরমা! একটা কিছু হয়েছে বোধ হয়—"

চিঠি দুইখানা চাপা দিয়া তিন জনেই উঠিয়া নীলিমার কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

নীলিমার কক্ষদ্বার রুদ্ধ। অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সশব্দে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন, "নীলি, নীলু—ও নীলু!" ভিতর হইতে যন্ত্রণা-মথিত শব্দ আসিল, "আমায় ক্ষমা ক'রো মা।" এবং পরক্ষণেই একটা চেয়ার-পড়ার জোর শব্দ হইল। অন্নদা সভয়ে দুয়ারে করাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ও নীলু! নীলু রে!"

মণি ও রেবা দৌড়াইয়া জানালার কাছে গেল; খড়খড়ি টানাটানি করিয়া তুলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ঠাকুরমা গো! পিসিমা পাখায় কাপড় খাটিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে!—মা গো!"

শ্রীমায়াদেবী বসু।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রজার মনোভাব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"রাজার জাতি" কর্তৃক হিন্দুর দেববিগ্রহ ভঙ্গ একটি সাধারণ ঘটনা ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রজার প্রতি এই অত্যাচার যে আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, প্রাচীন সাহিত্যে এমন কোন প্রমাণ পাই নাই। হিন্দুরা এ বিষয়ে রাজার কাছে কখন অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার কল্পনাও করিত না; সকলেই সাধ্যানুসারে স্ব স্ব বিগ্রহরক্ষার চেষ্টা করিত। স্বয়ং রাজারাই যে কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন,* সেই কার্য্য রাজার জাতির দ্বারা সম্পন্ন হইলেও তাহাদের অপরাধ হইত না।

"ম্লেচ্ছভয়ে" দেব-বিগ্রহের কি অবস্থা হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত "অদ্বৈতপ্রকাশে" দেখা যায়। অদ্বৈত ঠাকুর নানা তীর্থ ভ্রমণের পর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নাদেশ অনুসারে যমুনাতীরস্থ কোন স্থান হইতে মৃত্তিকাপ্রোথিত মদনমোহন বিগ্রহ উদ্ধার করেন; এবং একটি মন্দিরে বিগ্রহ-স্থাপন করিয়া জনৈক "সদাচারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ"কে সেবায় নিযুক্ত করিয়া পরিক্রমায় বাহির হন। এদিকে :—

"দুষ্ট যবনেরা পাঞা ঠাকুরের তত্ত্ব।
ভাবে ঠাকুর ভাঙ্গি হিন্দুর নাশিমু মহত্ত্ব।
যুক্তি করি ম্লেচ্ছগণ হইয়া একত্র।
অদ্বৈত বটেতে আইলা লঞা অস্ত্র শস্ত্র।
মদনমোহন দুষ্ট ম্লেচ্ছ ভয় পাঞা।
পুষ্পতলে লুকাইলা গোপাল হইয়া।
ম্লেচ্ছগণ প্রবেশিয়া শ্রীমন্দির দ্বারে।
ঠাকুর না দেখি গেল দুঃখিত অন্তরে।"

সন্ধ্যাকালে অদ্বৈত ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর নাই; তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে মদনমোহন স্বপ্নে বলিলেন :—

"উঠহ অদ্বৈত মুঞি ম্লেচ্ছগণ ডরে।
গোপাল হইয়া লুকাইল পুষ্পান্তরে।"

তখন ঠাকুরকে তুলিয়া-আনিয়া মন্দিরে স্থাপন করা হইল; কিন্তু দেবতা নিজেই "ম্লেচ্ছভয়ে" উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বলবান্ রক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে অদ্বৈতকে স্বপ্নাদেশ দেওয়া হইল :—

"অহে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুন এক কথা।
মথুরার চৌবে এক আসিবেক হেথা।
ইঁহা দুষ্ট ম্লেচ্ছগণের অত্যাচার হয়।
চৌবে মোরে সমর্পিয়া হও নিঃসংশয়।"

অতএব, চৌবের হস্তে ঠাকুরকে সমর্পণ করা হইল।

"চৈতন্যচরিতামৃতে"ও (মধ্যলীলা) দেবতার ও দেবতার সেবকগণের "ম্লেচ্ছভয়ে" পলায়নের বর্ণনা আছে :—

"অন্নকূট নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামে বসতি।
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুরুকধারী সাজিল।
আজি রাত্রে পলাহ, না রহিহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ, আসিবে কালি যবন।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠোলি গ্রামে থুইল।
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হইল, পলাইল সর্ব্বজন।
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে।
*   *   *   *
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর-ঘরে।"

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থেও 'অদ্বৈতপ্রকাশের' ঘটনার বর্ণনা আছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যতীত, মনসা-সাহিত্যেও হিন্দুর দেবপূজা ও দেবস্থানের প্রতি আক্রমণের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঐরূপ অত্যাচার হিন্দু জনসাধারণের নিকট বিস্ময়কর বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মপুরাণ' অনুসারে মনসাপূজার স্থানে কাজী "সসৈন্য" উপস্থিত হইলেন।

"কটক সনে হোসেন, করিয়াছেন গমন
লড়ে আসি মিলিলা সত্বরে।
আগে পাইল ব্রাহ্মণ, ধরিয়া ছিঁড়িল নয়ন,
মাথায় মারিল যে পাথরে।
যত পাইল আশপাশ, ধরি কৈল জাতিনাশ,
মারিয়া কাটিল নাক কাণ।
খাইয়া আসার বাড়ি, ব্রাহ্মণে পাড়ে লড়ালড়ি,
হস্তেতে লইয়া পুঁথি খান।
*   *   *   *
আসার বাড়ি মারি ঘট কৈল খান খান।
যার লাগ পায় তার কাটে নাক কাণ।"

এই ঘটনার পূর্ব্বেই হাসান-হোসেনের "দূত" মনসার পূজার ঘট দেখিবামাত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

"বিবিধ প্রকারে গোপ পদ্মারে পূজিল।
হেনকালে হাসান-হোসেনের দূত আইল।
আছাড় মারিয়া ঘট ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
পূজার যতেক দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া।"

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে'ও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তকাই মোল্লা রাখালদিগের মনসার ঘট ভাঙ্গিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়া কাজীকে জানাইল। কাজী সদলে রাখালদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন :—

"সাজ সাজ বলিয়া কটকে পড়ে সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আসিল হোসেন-পাড়া।

---

* হোসেন শাহ উড়িষ্যা-অভিযানে যাইবার সময় সনাতনকে সঙ্গে লইতে চাহিলে সনাতন বলিয়াছিলেন, "যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে" ইত্যাদি (চৈঃ-চরিতামৃত, মধ্যলীলা)।

যতেক যবন আছে হোসেনের পাড়া।
নগর হইতে আসিল পুরুষ মাথামুড়া।"

ইহারা পূজার ঘর, মনসার ঘট ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল:—

"কাজির আজ্ঞায় সৈয়দগণ চলে।
ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে সমুদ্রের জলে।
কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটি।
কোদালে কাটিয়া ফেলে ঘরভিটার মাটি।
* * * *
মাটির গঠন ঘট কনকের চূড়া।
দারুণ যবনে ঘট করিলেক গুঁড়া।"

মনসা-সাহিত্যের অন্যত্রও এরূপ বর্ণনা আছে।

দেবস্থান ও দেবপ্রতিমার প্রতি অত্যাচারের যে বর্ণনাগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইল, তৎকালীন শাসকবর্গের ও তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষের উহাই চূড়ান্ত প্রমাণ। তুর্কী-মোগলশাসনযুগের সমসাময়িক বলিয়া—ঐ গ্রন্থগুলির বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য নহে। এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তৎকালীন সাহিত্যকারগণ রাজনৈতিক (অর্থাৎ রাজাদিগের ও তাঁহাদের স্বধর্ম্মীদের সম্পর্কিত) ব্যাপার-সমূহ সাহিত্যে সাবধানে যথাশক্তি এড়াইয়া চলিতেন; নতুবা, আমরা সে কালের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সাহিত্য হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিতাম।

৩

"ম্লেচ্ছ"-স্পর্শে ঘৃণা, বেনাপোলের রামচন্দ্র খানের উপর "ম্লেচ্ছ" রাজার দৌরাত্ম্য, "যবনের ভয়," "কাল যবন রাজা"।

প্রাচীন সাহিত্যে "ম্লেচ্ছ"-স্পর্শে হিন্দুর কলুষিত হওয়ার কথা, (বিশেষতঃ, "ম্লেচ্ছের" অন্নজল-গ্রহণে "জাতি-যাওয়ার" কথা) এত অধিক সংখ্যক স্থলে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই তাহা সুবিদিত। এ স্থলে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

'পদ্মপুরাণে' বর্ণিত কাজি-বনাম-রাখাল-সংক্রান্ত ঘটনায় কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এড়ারুটি খাওয়াইয়া রাখালদিগের জাতি মারিবেন।"* চৈতন্যসাহিত্যে সুবুদ্ধিরায়ের বৃত্তান্ত সুপরিচিত। হোসেন শাহ "কারোয়ার পানি" (বদ্‌নার জল) খাওয়াইয়া সুবুদ্ধির "জাতি" মারিয়াছিলেন। জাতিনাশে, সুবুদ্ধি হিন্দুর দৃষ্টিতে এত কলুষিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বারাণসীতে যাইয়া পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্ত-বিধান চাহিলে, তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, উত্তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগ করাই উক্ত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্যে, ভবানন্দকে বন্দী করিবার পর রোহিলা প্রভৃতি রক্ষীরা "জাতি মারিবার" ভয় দেখাইয়াছিল—("জাতি লৈতে কেহ চায়")।

রূপ-সনাতন হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্য্যের জন্য সুলতানের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন। সুলতান ও তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে থাকিলেও তাহাদিগের প্রতি রূপ-সনাতনের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল না, বরং তাঁহাদের উপর তীব্র বিরক্তি ও ঘৃণাই ছিল। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলায় বর্ণিত আছে, চৈতন্য রামকেলী গ্রামে যাইলে রূপ-সনাতন গোপনে, ছদ্মবেশে দেখা করিতে আসিয়া এই ভাবে তাঁহার নিকট দীনতা প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ:
অধম পতিত পাপী আছি দুই জন।
ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।"

'ভক্তিরত্নাকরে' রূপ-সনাতনের মনের অনুশোচনা এই ভাবে বর্ণিত আছে:—

"পিতাপিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার।
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়।
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান।
* * *
যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে।
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি হয়।
বিপ্ররাজ হৈয়া মহা খেদযুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।"—(১ম তরঙ্গ)

রূপ-সনাতনের পিতা শ্রীকুমার সম্বন্ধে "ভক্তিরত্নাকর" বলেন:—

"যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ।"—(১ম তরঙ্গ)

"অদ্বৈতপ্রকাশে"র মতে চৈতন্যদেব বারাণসীতে যাইলে মণিকর্ণিকার ঘাটে এক সন্ন্যাসী চৈতন্য সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন:—

"বেদের বিরুদ্ধে কার্য্য করে সর্ব্বক্ষণ।
যবন সংসর্গে নাহি মানয়ে দূষণ।
ছলেতেও ম্লেচ্ছ যদি করে হরিনাম।
তারে আলিঙ্গিতে নাহি মানে ধর্ম্মজ্ঞান।"—(১৭ অধ্যায়)

"নরোত্তমবিলাসে"র নিম্নলিখিত উক্তিও অর্থপূর্ণ:—

"প্রভুর অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন্ জন।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন।"—(১ম বিলাস)

অন্যত্র:—

"অতিনীচ যবন বর্ব্বর দুরাচার।
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ বিহার।"

"চৈতন্যভাগবতে" (৫ম অধ্যায়), সপ্তগ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের বর্ণনায়:—

"অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার।"

* ব্রাহ্মণের কাণে কলমা উচ্চারণ,—বলপূর্ব্বক সুন্নত, এবং স্ত্রী লোকের সতীত্বনাশও—"জাতিনাশের" অন্তর্গত।—মনসা-সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

"ম্লেচ্ছ" ও "যবনের" প্রতি এই যে দারুণ ঘৃণা, ইহার যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শৌচাশৌচ * ইত্যাদি আচারঘটিত ঘোর পার্থক্য ব্যতীতও, তৎকালে রাজায় প্রজায় বিশেষ ভেদভাবের আর এক কারণ—প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার। প্রজারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কী-মোগল-শাসন-কর্ত্তাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীগণ রাজগণের কৃত অত্যাচার-কার্য্যে, সকল সময়ে না হইলেও—অন্ততঃ অনেক সময়ে যোগ দেওয়ায়, সমগ্র "রাজার জাতি"র প্রতিই হিন্দুদিগের আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ও ধনী হিন্দুগণের দ্বারা মুসলমান আদব কায়দা ইত্যাদির অনুকরণ ও ফার্সী ভাষা ব্যবহার, † "রাজার জাতি"র সহিত প্রজাদিগের মনোমালিন্যের অভাব প্রতিপন্ন করে না; বর্ত্তমান ভারতের অসংখ্য শিক্ষিত ভারতবাসী কর্ত্তৃক ইংরেজি ভাষার ব্যবহার, এবং ইংরেজি আচরণ ও ভাবের অনুকরণ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হইলেও ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, বর্ত্তমানে রাজার জাতির সহিত শিক্ষিত ভারতীয়গণের মনোমালিন্য নাই।

পুনঃ পুনঃ অত্যাচারের ফলে, হিন্দুদিগের মধ্যে "যবনের ভয়" অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার আতঙ্ক স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "প্রেমবিলাসে" সাধুচরিত্র দরিদ্র চৈতন্যদাসের স্ত্রী স্বপ্নে দেখিলেন—কোন মহাপুরুষ তাঁহার গর্ভে আসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদিগের দারিদ্র্য ও গ্রামের সকল উপদ্রব—তথা "যবনের ভয়" বিলুপ্ত হইল :—

"লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে বড় পাইলাম ধন।
ঘুচিল দারিদ্র্য তোমার সফল জীবন॥
রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপজাতি।
তাহা শান্তি হৈল রাজা করিল পীরিতি॥
গ্রাম ছাড়ি জমিদার ছিল অন্য গ্রামে।
সেই উপজাতি গেল আসিব নিজস্থানে॥
প্রবেশ করিতে গ্রামে আনন্দ হৃদয়।
অনায়াসে গেল সব যবনের ভয়॥"—(প্রথম বিলাস)

রূপ, সনাতন ও শ্রীবল্লভ, এই তিন ভ্রাতার পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিবরণ প্রসঙ্গে দেখা যায়—

"মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার।
গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে ছিল বাসঘর॥
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটি ছাড়িল।
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈল॥"—(২৩ বিলাস)

নবদ্বীপে শ্রীবাস স্বগৃহেও সংকীর্ত্তন করিতে যাইয়া উহা "যবনের রাজ্য" মনে করিয়া ভীত হইতেন।

"ম্লেচ্ছদেশ" ও "ম্লেচ্ছরাজ্য" সম্বন্ধে, প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে আতঙ্কজনক বর্ণনা আছে। চৈতন্যদেব উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উড়িষ্যা রাজ্যের মেদিনীপুর-সীমা পর্য্যন্ত আসিলে উড়িষ্যা-রাজের কর্ম্মচারী সম্মুখের দিক দেখাইয়া বলিতেছেন :—

"মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥"
'চৈতন্যচরিতামৃত' (মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ)

অন্যত্র—চৈতন্যদেব যখন প্রয়াগের দিকে যাইতে উদ্যত, তখন সাগৌড়িয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন :—

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব?॥
ম্লেচ্ছ দেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।" ইত্যাদি
(মধ্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ)

'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র (মধ্যলীলা) আরও একটি বিবরণে "ম্লেচ্ছরাজ্য" বিপদের স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। মাধবেন্দ্রপুরী গোবর্দ্ধনে (বৃন্দাবনে) শ্রীগোপাল-বিগ্রহের সেবায় রত ছিলেন। গোপাল স্বপ্ন দিলেন—"উড়িষ্যার নীলাচল হইতে চন্দন আনিয়া আমার গাত্রে লেপন কর।" মাধবেন্দ্র উড়িষ্যায় যাইয়া "মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর" সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রেমুনা গ্রামে আসিলে গোপাল আবার স্বপ্ন দিলেন—"এই গ্রামস্থ গোপীনাথ দেববিগ্রহের গাত্রে চন্দন-লেপনেই আমার দেহ শীতল হইবে।" গোপালের স্বপ্নাদেশ প্রদানের কারণ এই যে, চন্দন লইয়া ফিরিতে হইলে "ম্লেচ্ছদেশের" ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু উহা বিপজ্জনক স্থান। ম্লেচ্ছ রাজার প্রহরীরা জাগিয়া পাহারা দেয় ও পথিকের মূল্যবান্ দ্রব্য লুণ্ঠন করে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থ 'বৃহৎ সারাবলী'তেও আছে যে, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সীমায় উপস্থিত হইলে "উড়্দেশ অধিকারী" আসিয়া চৈতন্যকে বলিলেন, সম্মুখে "যবনাধিকার"।

"তবে চলিবারে ইচ্ছা কৈল গৌরহরি।
নরপতি নিবেদয় যোড়হাত করি॥
আগেতে সে গ্রাম হয় যবনাধিকার।
বড়ই নির্দ্দয় রাজা অতি দুরাচার॥
বাটে যেতে নারে কেহ তাহার শাসনে।
দ্বিজ মুনি বৈষ্ণব কাহারে নাহি মানে॥
পিচ্ছল জলা পর্য্যন্ত তাহার অধিকার।
তার ভয়ে কেহ নারে হ'তে নদী পার॥"

"যবনাধিকার" সম্বন্ধে হিন্দুর মনে ভীতি সঞ্চারের কারণ যে যথেষ্টই ছিল, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সময় সময় কিরূপ লোমহর্ষণ ভয়াবহ ঘটনা ঘটিত, বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্রের ঘটনা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। বেনাপোলের (যশোহর জিলার অন্তর্গত) রাজা রামচন্দ্র প্রজার নিকট স্বয়ং কর আদায় করিয়া নবাবকে দিতেন না। শাস্তিস্বরূপ, রামচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রাদিসহ জাতিনাশ ও গ্রাম উজাড় করিয়া দেওয়া হইল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত হইয়াছে—

---

* ভারতচন্দ্রকৃত "মানসিংহ" কাব্যে ভবানন্দ-জাহাঙ্গীর সংবাদে ভবানন্দ বলিয়াছিলেন—

"শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥"

"বৃহৎ সারাবলী"তে অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলিতেছেন, তোমার আমার ঈশ্বর এক, কিন্তু গোবধাদিজন্যই পার্থক্য।

† ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণনা এবং "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে বর্দ্ধমান রাজসভার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

"দস্যুবৃত্তি করে * রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিল॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥"

নীলকণ্ঠের 'ঘটককারিকা'র বর্ণিত 'পীরালী ব্রাহ্মণে'র উৎপত্তিও প্রায় অনুরূপ ঘটনা।

প্রাচীন লেখকরা কখন কখন "যবন" শাসনকর্ত্তাদিগের মুখ দিয়াই উহাদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করাইতেন। যথা, "চৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ) উড়িষ্যার সীমাপ্রান্তস্থ বঙ্গদেশের অন্তর্গত "ম্লেচ্ছরাজ্যে"র শাসনকর্ত্তা চৈতন্যের নিকটে আসিয়া দীনতা ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিল;—দণ্ডবৎ হইয়া সে বলিতেছে:—

"অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥
* * * *
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা কর্যাছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥"

'বৃহৎ সারাবলীতে'ও অনুরূপ বর্ণনা আছে।

"যবন রাজা" যে কিরূপ বিভীষিকার কারণ ছিলেন, জয়ানন্দকৃত 'চৈতন্যমঙ্গলে'র একটি বর্ণনায় তাহা বিশদরূপে বুঝা যায়। উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের ইচ্ছা হইল, গৌড়দেশ আক্রমণ করিবেন। এই জন্য প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের উপদেশ চাহিলেন। চৈতন্য বলিলেন—"সাবধান, অমন কাজ করিও না। তুমি গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ বাধাইলে, ওড়দেশ উৎসাদিত হইবে, জগন্নাথ পলায়ন করিবেন, দেশে প্রলয় ঘটিবে। তদপেক্ষা বরং তুমি কাঞ্চীরাজ্য আক্রমণ কর।" কাঞ্চী অবশ্য তখন হিন্দুরাজ্য ছিল। 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র বিবরণ;—

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা আনিল।
প্রভু বলেন, প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দূল দেখ কতেক অন্তর॥
ওড়্রদেশ উৎসন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এত দিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয়* হইব উৎকলে॥"

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রাচীন কবিদিগের যে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমাদিগের ন্যায় সাধারণ পাঠকের অলভ্য নহে, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া সেকালের তুর্কী-মোগল জাতীয় রাজগণের সম্বন্ধে প্রজারা (ইঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন) কি মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। অপ্রকাশিত পুঁথিরও কিছু কিছু সন্ধান করিয়াছি; কিন্তু এ বিষয়ে নূতন তথ্য বিশেষ কিছুই পাই নাই। ভবিষ্যতে যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, যাহাতে এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত খণ্ডন হইতে পারে, তবে তাহাই তখন সমাদৃত হইবে; কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন আমাদের অনুসৃত মতে এই সিদ্ধান্তই স্থির থাকিবে যে, তুর্কী-মোগল শাসনের প্রতি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা (হিন্দুরা) সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং শাসনকর্ত্তাদিগকে ও তাঁহাদিগের অত্যাচারের সাহায্যকারী স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস করিতেন না।† বর্ত্তমান যুগে আমরা যদি কাব্য, নাটক, উপন্যাস অথবা "ঐতিহাসিক চিত্র" রচনা করিয়া সে যুগের হিন্দুদিগের মুখ হইতে তুর্কী-মোগল রাজগণের প্রতি অতুলনীয় ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বহাই, তাহা হইলে তদ্দারা প্রাচীন ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত মতই প্রচার করা হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের, অর্থাৎ তুর্কী-মোগল যুগের সমসাময়িক সাহিত্যের দ্বারা এই মতই সমর্থিত হইবে।‡

রাজা প্রজার এই অসদ্ভাবের বহুবিধ কারণ ছিল। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত বহু উক্তি ও ঘটনায় সেই কারণগুলি সুপ্রকাশিত। ধর্ম্মস্থানের পবিত্রতা নাশ, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে আরও একটি কারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। উহা গোহত্যা। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসক ও শাসিতদিগের মধ্যে পার্থক্য ও অসন্তোষের

* "দস্যুবৃত্তি" সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, ইহা সত্য অভিযোগ, না শাক্ত-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-প্রসূত কটূক্তি? রামচন্দ্র খান গোঁড়া শাক্ত ছিলেন এবং হরিদাস ঠাকুর তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

* বঙ্গদেশে এক অনুরূপ "প্রলয়" বা "প্রমাদে"র কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। কৃত্তিবাসের আত্মচরিতে:—

"বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥"

† অপর পক্ষে, "রাজার জাতি" প্রজাদিগকে (অর্থাৎ হিন্দুদিগকে) কি চক্ষুতে দেখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "রাজার জাতির" লিখিত ইতিহাস। আবুল ফজল ব্যতীত, বোধ হয় প্রত্যেক ইতিহাস-লেখকই "কাফের"দিগকে মহা উৎসাহে ও গর্ব্বভরে বহু প্রকার অপমানসূচক আখ্যা ও বর্ণনা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

‡ বাঙ্গালার তুর্কী-মোগল রাজগণের মধ্যে একমাত্র হোসেন শাহই ৩।৪ জন হিন্দু কবির স্তুতির পাত্র হইয়াছিলেন।

ইহা একটি প্রধান কারণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' কাজীর সহিত ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :—

"প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা।
পিতামাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম॥
* * * *
তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গো-বধে রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর।"

প্রধানতঃ এই গো-বধের জন্যই রাজায় প্রজায় মিলনে বাধা পড়িয়াছিল, ইহার প্রমাণ অন্যত্রও আছে। 'বৃহৎ সারাবলীতে' অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলিতেছেন :—

"তোমার কোরাণে যারে বলে পরমেশ্বর।
আমার পুরাণে তারে লিখয়ে ঈশ্বর।
আমার পুরাণ আর তোমার কোরাণ।
এক ব্রহ্ম দুই নহে সেই ভগবান।
রাম রহিম দোঁহে এক নাম জান।
আমাদের রাম তোমাদের রহিমান।"

কিন্তু, তথাপি উভয় সম্প্রদায়ে মিলন হয় না কেন ?

অভিরাম বলিতেছেন :—

"গরু বধি তোমরা যে নার বাঁচাইতে।
আর তার মাংস রাঁধি ভক্ষ উদরেতে।
এই সব অনাচার তোমার যাজন।
তে কারণে জাতিভেদ হইল যবন।
হিন্দুয়ানী নষ্ট কৈল যবন দুরন্ত।
তে কারণে ভগবান হইলা রূপান্ত।
রাম রহিম হৈলা এই ত কারণে।
নীচ জাতি অনাচারী করিলা যবনে।
হিন্দু মুসলমান এই বিভেদ হইল।
এক মূলে যেন দুই বৃক্ষ উপজিল।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভবানীদাস "রামরত্নগীতা" নামক গ্রন্থেও উক্ত ভাবের মহিমা প্রচার করিয়াছেন ;—

"রহিমান নাম বোলাইলা তার তরে।
কোরাণ স্বদিষ্টে তারা গোহত্যাদি করে।
কৃষ্ণ বলে ধনঞ্জয় শুনহ কারণ।
গোহত্যা পাতকী জীব হয় ত যবন।
পুনঃ পুনঃ নানা যোনি মধ্যে জন্ম লয়।
কুকর্ম্মাদি পাপকর্ম্ম সতত আচরয়।" *

গোহত্যা যে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুদিগের বিরাগ ও অবজ্ঞার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এই -সকল কারণেই ধর্ম্মসমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা হিন্দুরাই আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমতঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সত্যপীর সাহিত্যের সর্ব্বত্রই দেখি, ফকির পীরের পূজার প্রস্তাব করিলে হিন্দুরা প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল। রামেশ্বরের পুস্তকে আছে—

"দ্বিজ বলে কহিলেন দেওয়ান মহাশয়।
যবনের কার্য্য সে ত ব্রাহ্মণের নয়।
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন অন্য।
ডুবাইব পরকাল ইহকাল জন্য।"

কবি বল্লভের "সত্যনারায়ণের পুঁথিতে" ফকির বণিক্-রমণীকে পীরের সিন্নি দিতে বলিলে, হিন্দুরমণীদ্বয় ঘৃণাভরে "রাম রাম" বলিয়া উঠিয়াছিল।

"রাম রাম করি দুহে কর্ণে দিল হাত।
তিনবার স্মঙরে ঠাকুর জগন্নাথ।
কোথাকার ফকির দেখ ছেণ্ডা কাঁথা গায়।
পীরের সিরিণি দিয়া জাতি নিতে চায়।
কালাম কিতাব কোন কালে নাহি শুনি।
গন্ধবণিক্ হয়্যা হব মুসলমানী।"

"কঙ্ক ও লীলা" আখ্যায়িকায় (মৈমনসিংহগীতিকা) দেখিতে পাই, কঙ্ক গোপনে পীরের কাছে দীক্ষা লইয়া সত্যপীরের পাঁচালি প্রচলন করিল। ইহাতে তাহার অপযশ ঘটিল :—

"জাতি ধর্ম্ম নাশ হৈল রটিল বদনাম।
পীরেব নিকটে কঙ্ক শিখিয়ে কালাম।
এবং—"হিন্দু যত সবে কঙ্কে মোসলমান বলি।
কেহ ছিঁড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী।
জাতি গেল মোসলমানের পুঁথি নিয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে।"

এই প্রকারের ভেদ-ভাব সত্ত্বেও ইহা বলা সঙ্গত হইবে না যে, হিন্দুরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানুষের মহত্ত্ব মানিতেন না। 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র এই শ্লোকটি স্মরণীয় :—

"কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি।"

সর্ব্বশেষে, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ইংরেজের অধিকারের ফলে, সে কালের শাসকরাও এখন প্রজার স্তরে উপনীত হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানে শাসক-শাসিত সম্পর্ক দূর হইয়া মিলনের অন্যতম গুরু বাধা অপনীত হইয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব প্রায় সর্ব্বসাধারণেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা অতি উত্তম কথা, এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্টই আশার কথা। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেক ভারতবাসীরই সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনের জন্য সঙ্গত ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু এ জন্য ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত অথবা গোপন করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। অতীতের ইতিহাস হইতে বর্ত্তমানের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রোগের কারণ গোপন করিলে সুচিকিৎসায় বাধা পড়ে। যে একতা বা প্রীতির বন্ধন কোন প্রকার যুক্তিপূর্ণ, সত্য, কিন্তু অপ্রিয় সমালোচনায় নিমেষে ছিন্ন হয়, তাহার মূল্য অধিক নহে।

সর্ব্বোপরি নিবেদন এই যে, সেকালের তুর্কী-মোগল জাতীয় শাসকবর্গের এই সমালোচনা আপনাদিগের গাত্রে মাখিয়া লইবার মত অনাবশ্যক হঠকারিতা প্রদর্শনের জন্য কাহারও যেন আগ্রহ না হয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

* ডঃ সুকুমাররঞ্জন সেন-প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

করবী-মল্লিকা

(উপন্যাস)

৩২

মুক্ত অবাধ নীল আকাশের নীচে সবুজ বন-বনান্তরকে দূরে রাখিয়া বন-বিহগী আসিয়া আবার নগরের কোটরে প্রবেশ করিল।

বাবার স্নেহ-সজল মুখ, পিসিমার বিরাম-বিহীন অশ্রু স্মৃতির কোঠায় ভরিয়া আমি ফিরিলাম মাসিমার গৃহে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মিলিরা কেহ বিছানা ছাড়িয়া ওঠে না। আসিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া এখানে কাহাকেও আমি তাহা জানাই নাই, কাজেই কেহ আমার প্রতীক্ষায় ছিল না।

চাকরদের পাশ কাটাইয়া দ্বিতলে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে আমি স্নান করিলাম।

স্নানান্তে চায়ের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছি, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মিলি আসিল বারান্দায়।

মিলি আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করে, ক'দিনের অদর্শনের পর আমাকে দেখিয়া তাহার স্নেহের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। ব্যগ্র বাহু দিয়া আমার কটি ঘিরিয়া উল্লাসে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রুরু! কখন এলি? আজ আসবি, তা এক ছত্র লিখেও জানাস্‌নি তো! এসেও একটা ডাক দিসনি! এর মানে? মেসোমশায় কেমন আছেন? ত্যাখ্, ভারী মজা হয়েছে, এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোকেই আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। আমার ভোরের স্বপ্ন সত্য হলো, সুপ্রভাত বলতে হবে!"

বলিলাম, "সকালে আমার মুখ দেখে উঠ্‌লে কারো সুপ্রভাত হয় না মিলি। 'কুপ্রভাত' বল। ক'দিনের জন্যই বা যাওয়া-আসা, তার আবার লিখবো কি? ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করে সকলের ঘুম ভাঙ্গানোর দরকার ছিল না বলেই আমি এসে স্নান করে নিয়েছি। বাবা ভালো আছেন। তোরা কেমন ছিলি?"

"এ দিকে মন্দ নয়। শুধু তোর বিরহে যা জর-জর, মর-মর। এতক্ষণে দেহে আমার প্রাণ এলো!"

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "এত-ও জানিস্ মিলি! আমার বিরহে কারো এমন শোচনীয় দশা হতে পারে, এ আমার গৌরবের কথা। যাঁর বিরহে হবার সম্ভাবনা, তিনি তো কাছেই ছিলেন। খুব আমোদেই বোধ হয় তোদের এ ক'টা দিন কেটে গেছে? ওঁদের খবর কি? দিদিরা কেমন আছেন?"

"ভালো আছেন। খুব বেশী আনন্দে দিন কাটেনি রে! বাধ্য হয়ে আমাকে এক অপ্রিয় কাজ করতে হয়েছে। যাকে ভালোবাসি, তার ভালোর জন্য মানুষকে কত কি করতে হয়।"

আমার মনে কাল-বৈশাখীর উদয় হইল। আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে না জানি কি আঘাত করিয়াছে! তিনি আমার নন্, মিলির! তবু তাঁর বেদনা যেন আমারই বেদনা!

নিরুত্তরে মিলির মুখের দিকে চাহিলাম।

মিলি বলিল, "অমন করে চাইছিস্ কেন রে? তোর ভয় নেই, জ্যোতি বাবুকে কিছু বলিনি। তুই যাবার পরে একদিন মাত্র মিনিট-পাঁচেকের জন্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বল্‌চি কমলের কথা। বেচারা ছেলেমানুষ, কাণ্ডজ্ঞান নেই। জানার মধ্যে জান্‌তো শুধু বই। আমার মরণ! সেই দুগ্ধপোষ্য বালক শেষে কি না আমার প্রেমে পড়লো!"

"প্রেমে পড়ার অপরাধ কি বল্? তোর পাল্লায় পড়লে পাথরে ঘাস গজায়, মরা নদীতে বান ডাকে। কমলের দোষ কি? অমন করে লেগে থাক্‌লে কার না মতি-ভ্রম হয়?"

মিলি সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, "তোর যুক্তিতে গা জ্বালা করে রুরু, ভালোবেসে কারো গায়ে হাত দেওয়া, কাউকে আদর করা দোষের? পৃথিবীতে এক ছাড়া আর অন্য কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না? ছেলেয়-ছেলেয় গলা জড়িয়ে এক-বিছানায় শুতে পারে, মেয়েয় মেয়েয় ভালোবেসে একসঙ্গে থাকতে পারে, তাতে দোষ হয় না! যত দোষ, ছেলেতে আর মেয়েতে মুখোমুখী হলে! ভালোবাসার ভিন্ন রূপ যারা জানে না, তাদের উচিত নয়—মেলা-মেশা করা। কমলকে আমি বলে দিয়েছি, একসঙ্গে পড়া সুবিধে হচ্ছে না। তোমার মতন তুমি পড়ো, আমার মত আমি।"

চন্দ্রদাকে আমার মনে পড়িল। এ ভালোবাসার আস্বাদ আমিও সদ্য পাইয়া আসিয়াছি।

মাসিমার সাড়া পাইয়া তখনকার মত চন্দ্রদার অবতারণা করিতে পারিলাম না।

মাসিমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। কলেজ কামাই করিয়া আমার বাড়ী যাওয়ার ক্ষোভ এখনো তিনি ভুলিতে পারেন নাই। ছাত্রীর একাগ্রতার বিষয়ে কতকগুলি হিতোপদেশ দিয়া মাসিমা আমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। মৃদু কণ্ঠে মিলি বলিল, "এখন মুখ বুজে থাক্ রুরু, কলেজ কামাই হয়েছে বলে মা তোর উপর ভীষণ চটে আছেন। আমাদের দুই মুখের কথা শুনলে আরো চটে যাবেন। দুপুরবেলা আমরা গল্প করবো।"

দ্বিপ্রহরে মিলির সহিত গল্প করিবার আগ্রহ থাকিলেও তাহা কাজে পরিণত হইল না। আহারান্তে বিছানায় যাইতে না যাইতে গত-রজনীর নিদ্রাহারা নয়ন ঘুমে জড়াইয়া আসিল।

মিলির আহ্বানে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন বেশী ছিল না।

মিলি বলিল, "আর ঘুমোয় না। খুব হয়েছে! এখন উঠে তৈরি হয়ে নে। চল্, দিদির ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি। মা'র হুকুম, কাল থেকে খোপে বন্ধ হয়ে বই মুখস্থ কর্‌তে হবে, বেড়ানো চলবে না। এত দিনের ফাঁকির শোধ মা এবার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবেন।"

"বেশ তো, আমার ভালোর জন্যই মাসিমা কড়াকড়ি করছেন। পড়া আমার একেবারেই হয়নি, তা তাঁর জানা আছে। আরো ভালো করে জানা আছে, আমার নিরেট মাথার দৌড়! সকলের স্মরণশক্তি মল্লিকা দেবীর মত নয়। এক বার চোখ বুলোলে মনের মধ্যে অক্ষরগুলো দাগ কেটে বসে না। মল্লিকা কাটেন ধারে, আমরা কাটি ভারে! ভারের ভার নিতে আজ থেকেই আমি প্রস্তুত মিলি। চাই নে কোথাও যেতে। যাবার দরকার কি?"

"দরকার আছে। তোর যাবার দিনে দিদি নিজে এসে কি যত্নে মেসোমশায়ের জন্য কত জিনিষ সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁর

ভাই গাড়ীতে তুলে দিলেন। ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করা খুব অভদ্রতা হবে। চট্ করে ঘুরে আসবো।"

আমার বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে মহা-পারাবারের উদ্দেশে আমার হৃদয়-নদী অবিরাম ধাবিত হইতে চায়, আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তাহার দিকে ছুটিতে পারি না। কি জানি, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে কি করিতে কি করিয়া বসিব! কি বলিতে কি বলিব!

বাহ্যিক দর্শন-স্পর্শনের প্রয়াসী আমি আর নই। বাহিরের যোগসূত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াই না তাঁহাকে আমার অন্তরের অন্তরতম করিতে চাহিতেছি! ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য জানি না,—জানি, তিনি মিলির। তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকা আমার বিধি-লিপি। প্রলোভনের মরীচিকায় দিশাহারা হইলে আমার চলিবে না। দিদির স্নেহাঞ্চল যে তাঁহারও আনন্দ-নীড়, একের সন্নিধানে দুইয়ের সংঘাত। দিদির অমূল্য স্নেহ অন্তরে অন্তরে আমি উপভোগ করিব, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। বিশাল জলধির উপকূলে তৃষিতা চাতকী যেমন ঘুরিয়া মরে, আমিও তাহারই মত। চাতকীর আশা—আকাশের নব-নীল মেঘ-সম্ভার, মেঘের স্নিগ্ধ বারি-ধারা। আমার আশা—মরণের শান্ত-কোমল আশ্রয়!

আমি বলিলাম, "আজ আমি কোথাও যেতে পারবো না মিলি, বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। এর পর একদিন গিয়ে দেখা করে আসবো।"

মিলি রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। দূর হইতে তাহার গানের সুর ভাসিয়া আসিল—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর,
তোমার মাঝে আমার বিকাশ, তাই এত মধুর।'

৩৩

আলোর সামনে বইয়ের পাতা সবেমাত্র খুলিয়াছি, দিদি আসিয়া ডাকিলেন, "বনফুল! এসেই তোমার শরীর খারাপ হয়েছে না কি? তবে পড়তে বসেছো কেন?"

আমি চমকিত হইলাম। শুধু দিদিই আসেন নাই, তাঁহার পিছনে জ্যোতি বাবু আর মিলি। হৃদয়কে শান্ত করিয়া দিদিকে প্রণাম করিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "মিলি ফোন্ করেছিলেন, আপনার অসুখ করেছে, বেরুতে পারবেন না। শুনে এখানে আস্‌বার জন্য দিদি একেবারে অস্থির! কারো অসুখ শুনলে দিদির আর জ্ঞান থাকে না! কি হয়েছে আপনার? গাঁয়ের ম্যালেরিয়াকে সঙ্গী করে নিয়ে এলেন না কি? আপনার বাবা কেমন আছেন?"

মিলির দুষ্টবুদ্ধিতে আমার রাগ হইতেছিল। মিলির পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আমি জবাব দিলাম, "বাবা ভালো আছেন। আমার ম্যালেরিয়া নয়, রাত্রে ঘুমুতে পারিনি, তাই বেলা-ভোর শুয়ে ছিলাম। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে বসবেন।"

"মাসিমা বাড়ী নেই, তোমার ঘরেই আমাদের কুলিয়ে যাবে বনফুল,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখন তো তোমার মাথা-ধরা নেই? একটু ভালো বোধ করছ তো?" বলিয়া দিদি আমার বিছানায় বসিলেন।

চেয়ারখানা জ্যোতি বাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া আমি দিদির পাশে বসিলাম।

আমার অসুস্থতার সংবাদ দিয়া মিলি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে,—কাজেই আমার শরীর হইয়া তাহাকেই জবাবদিহি করিতে হইল। মিলি বলিল, "এখন ওর মাথাধরা নেই দিদি,—সারা দুপুর খুব কষ্ট পেয়েছে। যেমন মাথার যন্ত্রণা, আপনাদের দেখবার জন্য তেম্‌নি ছট্‌ফটানি।"

মিলির কথা আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, এ মিথ্যাজাল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি কহিলাম, "আপনারা বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।"

জ্যোতি বাবু বাধা দিলেন, "চা আমরা খেয়েই আস্‌ছি, আর চাই না। দিদিকে গণ্ডাদশেক পাণ এনে দিন্—পাণের জাবর না কাটলে দিদি নিস্তেজ হয়ে পড়েন।"

দিদির চোখে কলহের বাষ্প ঘনাইয়া আসিল। দিদি বলিলেন, —"হ্যাঁ, সব-তাতেই দিদির দোষ! পাণ জুগিয়ে খোঁটা দিলে তবু না হয় মেনে নিতাম, আমি পাণের জাবর কাটি। সিগারেটের জাবর কাটে কে রে? যেমন সিগারেট, তেমনি চা। দুই নেশায় যিনি মশ্‌গুল, তিনি এসেছেন আমার সমালোচনা করতে! দিন-রাত অগ্নিমুখো হয়ে কথা বলতে তোর লজ্জা করে না জ্যোতি?"

"লজ্জা কিসের দিদি? এটা পুরুষের গর্ব্ব, মুখে আগুন ভিতরে উত্তাপ না থাকলে এ-জাত এত দিনে নিবে যেতো, তোমাদের কোন কাজে লাগতো না। পাওয়ার চেয়ে আরো আদায়ের আশাতেই না এমন জায়গায় পাঠিয়েছিলে, যেখানে চা-সিগারেটের চেয়েও তেজস্কর জিনিসের আমদানী। ভাগ্যে তার ভক্ত হয়ে ফিরিনি! নিজের ওপর নিজের যে কি অখণ্ড শ্রদ্ধা হয় দিদি, বলবার নয়! রাত্রে শুয়ে কপালে পায়ের ধূলো ছুঁইয়ে নিজেই নিজের স্তব করি। বলি জ্যোতিভূষণ, তুমি অপরূপ, তুমি অসীম, অনেক লোভ জয় করেছো। গেলাসে-গেলাসে অমৃত উপেক্ষা করেছো! তোমার মনের বল অসাধারণ, তোমাকে প্রণাম করি।"

জ্যোতি বাবুর বলিবার ধরণে দিদি হাসিতে লাগিলেন। আমি কোনো মতে হাসি চাপিলাম।

আমাদের হাসিতে যোগ না দিয়া মিলি তীক্ষ্ণ কটাক্ষে জ্যোতি বাবুকে বিদ্ধ করিয়া কহিল, "আপনার মত এত অহঙ্কার এত গর্ব্ব আমি কোথাও দেখিনি। নিজের ওপর এতখানি বিশ্বাস না রেখে চার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন। যারা বিদেশে যায়, তাদের সবাই কিছু চরিত্র হারিয়ে মাতাল হয়ে ফিরে আসে না!"

"আসে না আবার! তুমি কিছু জানো না মিলি! পরিচিতের এক জন বিলাত-ফেরতের নাম করো,—যার মাতাল নাম রটেনি, চরিত্রহীন নাম রটেনি। ভালো থাকলেও স্থান-মাহাত্ম্যে কেউ তাকে ভালো বলে স্বীকার করে না। যাদের সাথের সাথী নিন্দা-কুৎসা, নিজেদের জয়-ঢাক তাদের আপনাকে বাজাতে হয়। সাধে আমি আমার ভেতরকার জ্যোতিভূষণকে নমস্কার করি!"

জ্যোতি বাবু হা-হা শব্দে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির বাতাসে মিলির মনের মেঘ কাটিয়া গেল।

দিদি কহিলেন, "আহা, বেচারা জ্যোতিভূষণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! দিন-রাত কি কষ্টই না সইচে! মিথ্যা অপবাদ, অখ্যাতির বিষ

গিলে নীলকণ্ঠ হয়েছে! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কত নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ হয়ে ফিরেছে, এ পোড়া দেশের পোড়া লোকগুলো তা বুঝতে পারে না! এদের নামে শুধু শুধু কলঙ্ক দেয়? যা রটে, তা ঠিক না ঘটলেও তিল থাকে! তিল থেকে তাল হয়, আম-কাঁটাল ফলে না জ্যোতি।"

মিলি সায় দিল, সত্যি কথা বলেছেন দিদি, সামান্য কিছু না থাকলে লোকে এমন বলে না। এই তো আমরা দু'টি বোন এক-বাড়ীতে রয়েছি, সামনে না বলুক, আড়ালেও আমার নামে নানা জনে নানা কথা বলে। আমি খুব ভালো নই বলেই বলতে পারে। করুকে তো বলতে পারে না! পারবে কি করে? ও যে সত্যি ভালো।"

আমি মিলিকে থামাইয়া দিলাম, "বাজে বকিস্ নে মিলি, ভালো লোক হলেই প্রশংসা পায় না। অনেকে নিন্দার কাজ ক'রে প্রশংসা পায়, আবার প্রশংসার কাজেও মানুষের নিন্দা হয়। নিন্দা-প্রশংসা আসলে প্রবাদের মত! এবার পিসিমার এক ভাগ্নের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমাদের বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন। আশ্চর্য্য মানুষ, তিনি! বহু কাল আমেরিকায় থেকেও তিনি সিগারেট দূরের কথা, চা-পর্য্যন্ত অভ্যাস করেননি। তাঁর জীবন-যাত্রার প্রণালী আর্য্য-ঋষিদের মত, তাঁকে দেবতা বললেও বেশী বলা হয় না। তাঁকেও লোকে সন্দেহ করে!"

মিলির চোখে-মুখে বিদ্রূপের হাসি উথলিয়া উঠিল। বাঁকা ঠোঁট আরো একটু বাঁকাইয়া মিলি কহিল, "দেবতা বললেও যাঁকে বেশি বলা হয় না, কৈ, সারাদিনেও তাঁর কথা তো আমায় বলিসনি করু! কোথায় তিনি থাকেন? কি কাজে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, শুনি? কি তাঁর নাম?"

মিলির প্রশ্নে আমার রাগ হইল। তিক্ত স্বরে আমি জবাব দিলাম, "সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালাম, বলবো কখন? আর তাঁর কথা তোমাদের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বড়মানুষদের শোনবার যোগ্য নয় মিলি! তাঁর কাজ দীন দুঃখীদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনাটন নিয়ে,—কি হবে তা শুনে? তোমরা বুঝবে না! তাই তার কথা বলে তোমাদের কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ করতে চাই না।"

মিলি হাসিল, "এরি মধ্যে এমন দরদ! এত টান! অভয় দিচ্ছি, করু, তোর আদর্শ মহাপুরুষকে আমাদের তিন জনের বিরাট্ সভায় হাস্যাস্পদ করবো না। তুই নির্ভয়ে তাঁর নাম বল্, তাঁর কার্য্য-তালিকা দাখিল কর্।"

দিদি সকৌতুকে বলিলেন, "বনফুল আমাদের পাগলি! যিনি বড়, তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাসা চলে না বোন। তুমি যাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো, আমরা কি তাঁকে অসম্মান করতে পারি? কখনো না।"

জ্যোতি বাবু কহিলেন,—"নিশ্চয়। যিনি আপনার প্রীতিভাজন হয়েছেন, আমাদেরো তিনি ভাই। আপনি তাঁর নাম বলুন, আমিও পাড়াগেঁয়ে লোক—হয়তো চিনতে পারবো।"

অলক্ষ্যে আশ-পাশের তিনখানা মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। কৌতুকে কৌতূহলে তিন-জোড়া চোখে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি! আমারই ভুল,—চন্দ্রদার সম্বন্ধে এখনি এতখানি পক্ষপাতিতা-প্রকাশ আমার অন্যায় হইয়াছে। সকলের মনে আশু-সম্ভাবনার আভাস আমিই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি।

লজ্জিত হইয়া আমি বলিলাম, "তাঁর নাম চন্দ্রচূড় রায় চৌধুরী। তিনি আমার দাদা হন।"

জ্যোতি বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রচূড়! চন্দ্র যে আমার বাল্যবন্ধু। গায়ে-গায়ে লাগানো দু'খানা গাঁ হলেও আমরা এক-স্কুলে পড়েছি। একসঙ্গে এক-কলেজে ঢুকেছি, তার পরে হয়েছে আমাদের ছাড়া-ছাড়ি। সে আমার বন্ধু, এ গৌরব আমার সব চেয়ে বড়। আমি হতভাগা, তাই তার পথ ধরতে পারিনি। তার ত্যাগ—তার আদর্শকে মনে-মনে পূজো করেই আসছি শুধু। আপনি তাকে কোথায় দেখলেন? সে কেমন আছে? কত কাল তাকে দেখিনি!"

"চন্দরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনফুল? আমি ভাবছিলাম, না জানি কার নাম করবে! তোমাদের মত আমিও চন্দরের দিদি। তাকে আমি কত ভালোবাসি বলবার নয়। ছেলে, না, হীরার টুকরো! অমন ছেলে আর-একটি আমার চোখে পড়েনি। তুমি আমাদের কথা তাকে বলেছিলে কিছু? বলবেই বা কি করে? তাকে যে জানি আমরা, তা তো কখনো তোমায় বলিনি। চন্দ্র তোমাদের বাড়ীতে কেন এসেছিল?"

দিদি চুপ করিলেন। স্নেহে করুণায় তাঁহার চক্ষু ছলছল্ করিতে লাগিল।

বলিলাম, "তিনি আমার পিসিমার ভাগ্নে। পিসিমা ডেকেছিলেন, তাই দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তো জানি না, তাঁর সঙ্গে আপনাদের জানা-শোনা আছে! তাঁকে আমি এই প্রথম দেখলাম। তিনি ভালোই আছেন।"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "আপনি তাকে প্রথম দেখলেন করবী দেবি! দেখাবার মত অমন যে রূপ, তা আপনার পিসিমা এত দিন না দেখিয়ে এবার আপনি বাড়ী যাবা মাত্র চন্দ্রকে ডেকে দেখালেন কেন? আপনার পিসিমা সেকেলে মানুষ, পাকা বুদ্ধি, নিশ্চয় তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে।"

জ্যোতি বাবুর পরিহাসে দিদি খুশী হইলেন, বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্ জ্যোতি, আমি যেন কি! এত দিন আর একটা ভাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, চন্দরের কথা আমার মনে এসেও আসেনি। আসেনি বলে মনকে দোষ দেওয়া যায় না,—সাধারণ ভাবে কেউ তাকে চাইতেই পারে না। পুণ্য না থাকলে ওকে পাওয়া যায় না। বনফুল যেমন লক্ষ্মী মেয়ে, চন্দরও তেমনি সাক্ষাৎ চন্দ্রচূড়! দু'টি এক হলে মণিকাঞ্চন যোগ হবে।"

মৌন-মুখে মিলি আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনিতেছিল, বলিল, "দিদির অন্য ভাইটি যে 'সন্তান', অনুমানে তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বিদ্বান্ আর 'সন্তানের' মণিকাঞ্চন সংযোগ, জানতাম না।"

দিদির হইয়া জ্যোতি বাবু জবাব দিলেন, "চন্দ্র যথার্থ সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই। তার মত প্রকৃত সন্তান হাজারে একটা মেলে না। জীবানন্দের শান্তি ছিল, চন্দ্রচূড়েরও শান্তির প্রয়োজন আছে। কাল্কের ডাকে চন্দ্রকে আমি চিঠি লিখবো। পিসিমার ডাকে তাকে সাড়া দিতে হয়েছে, আমাদের ডাকে তাকে ধরা দিতে হবে। কি বলো দিদি, পারবে না তুমি তাকে বাঁধন পরাতে?"

"পারবো না আবার? আমিও কাল চিঠি লিখবো। বনফুলের মত মেয়ে কটা আছে?"

মিলি বলিল, "বেশি নেই দিদি, কিন্তু আপনার বনফুলের বিয়ের

ঘটকালি সহজ নয়। ও পাহাড়ী নদী, ওর গতি আঁকা-বাঁকা। তবু আপনাদের আদর্শকে এক বার দেখান্, আমরাও চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।"

মিলি এ বলে কি! বাক্যে ব্যবহারে আমার মনের ভাব কখনো আমি কাহাকেও জানিতে দিই নাই। ফল্গুর ক্ষীণ ধারা জাগিয়া আমার মনের মধ্যে লুকাইয়া আছে! তাহার কলধ্বনি মিলির জানিবার কথা নয়! আমার পাপের মন,—সামান্য উপহাসকে তাই সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। কি জানি, কি কথায় মুখরা মিলি কি বলিয়া বসিবে! অথচ দিদির প্রস্তাবকেই বা মাথা পাতিয়া লই কি বলিয়া?

মরিয়া হইয়া আমি কহিলাম, "মিলির কথা শুনো না দিদি, গতি আমার ঠিকই আছে। তবে চন্দ্রদাকে আমি 'দাদা' বলে ডাকি, নিজের দাদার মতই মনে করি। তিনিও আমাকে তাঁর ছোট বোনের মত স্নেহ করেন। পিসিমার নিজের ভাগ্নে,—আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমার অনুরোধ, তাঁর নামের সঙ্গে তোমরা আমার নাম জড়িয়ো না।"

দিদি ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "তাই তো, আমার ঘটকালি যে হলো না! মুল্লুকে এত মানুষ থাকতে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গেই বা তোমার ভাই-বোন সম্বন্ধ বেরুলো কেন? এখন আবার কোথায় খুঁজে বেড়াই! খুঁজলে আর যা মিলুক, চন্দ্রচূড় মিলবে না তো!"

"কেন মিলবে না দিদি? আগে হুজুরে হাজির করিয়ে দিন, তার পরে পিসিমার ভাগ্নে, মাসিমার দেওর—আমরা দেখে নেবো। বিয়ের কনেদের দস্তুর ওজর-আপত্তি করা, তাতে কাণ দিলে কর্ম্ম-কর্ত্তাদের চলে না!" বলিয়া মিলি আমার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিল।

দুই ভাই-বোন প্রসন্ন হইলেন।

আমার মনের মেঘ সরিয়া গেল! আমার অন্তরতম কথা তাহা হইলে এখনো মিলির অগোচর আছে!

৩৪

সেদিন শীতের স্বল্পায়ু অপরাহ্নে সবে চুল-বাঁধা শেষ করিয়াছি, এমন সময় মিলি আমাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল।

আজকাল মিলির অকারণ গল্প, ভানুর আব্দার, মাসিমার ফরমাস প্রায় বন্ধ হইয়াছে। মাসিমার কড়া শাসনে বাড়ীতে হাসি-কলরব থামিয়া গিয়াছে। আমাদের তিন ভাই-বোনের আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় তিনি অস্থির। গৃহে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া আগন্তুক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার তিনি নিজে লইয়াছেন।

মাসিমা আজ বাড়ী নাই। কি কাজে কোন্ বন্ধুর গৃহে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। এমন সুযোগে মিলি হয়তো আড্ডা জমাইতে আমাকে ডাকিতেছে জানিয়া আমি হলে প্রবেশ করিলাম।

দেখি, পাশাপাশি দু'খানা সোফায় বসিয়া চন্দ্রদা এবং মিলি।

সবিস্ময়ে আমি বলিলাম, "চন্দ্রদা! আপনি এখানে?"

হাসিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, "হাঁ, আমি এখানে,—অবাক হচ্ছ করু! ক'মাস আগে তুমিই না আমাকে এখানে আসবার নেমন্তন্ন করে এসেছিলে! তাই এসেছি। আসবার পথে মামা বাবুকে দেখে এসেছি। তিনি ভালো আছেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে আপনি এসেছেন? মিলির সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কেমন করে?"

"কাল এসেছি। জ্যোতির ওখানে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি নিজে এসে তোমাকে চমকে দেবো বলে কাল আমার আসার খবর দিতে ওঁকে বারণ করেছিলাম। ক'মাস হলো যেমন জ্যোতির 'এসো-এসো' ডাকাডাকি, দিদিরও তেমনি তাড়া। অবশেষে কাজকর্ম্ম ফেলে আমাকে আসতে হলো। তোমার পরীক্ষাও তো এসে পড়লো, কেমন তৈরি হলো?"

"ভালো না চন্দ্রদা, গোড়ায় না পড়ে শেষকালে আরম্ভ করলে যা হয়! কিছু মনে থাকছে না। ভালোও লাগে না। কত দিন আপনি এখানে থাক্‌বেন?"

"কত দিন আর! এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছি। তার অর্দ্ধেক কেটে গেল। আছি আর দিন তিন্-চার।"

মিলি কহিল, "আপনার আবার ছুটি কিসের? আপনি তো কারো গোলামী করেন না!"

"আমি কাজের গোলাম মল্লিকা দেবি,—কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে হয়।"

ফুলদানি হইতে একটা পাতা লইয়া মিলি নীরবে ছিঁড়িতে লাগিল।

এতক্ষণ মিলিকে আমি তেমন লক্ষ্য করি নাই। তরুণ বয়স্ক পুরুষের সামনে মিলি চিরকাল রহস্যময়ী, কৌতুকময়ী। তার বাক্-চাতুরী, হাব-ভাব, লীলা-মাধুরী উৎকর্ষ লাভ করে। সর্ব্বোপরি মিলির প্রসাধন—দেখিবার বস্তু। তাহা যেমন রুচিসঙ্গত, তেমনি মোহময়।

সাধারণতঃ মিলি রং ভালোবাসে। রঙ্গীণ বসন-ভূষণে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি সাজিয়া সে সকলের চোখ ঝল্‌সাইয়া দিতে ভালোবাসে। আজ মিলি শুভ্রবেশে দেহশ্রী বিকশিত করিয়াছে। জরি-পাড়ের সাদা শাড়ী, হীরার বালা, কুচা হীরার কণ্ঠী, খোঁপায় জড়ানো কুন্দকলির মালা। জ্ঞানে গর্ব্বে সমুজ্জ্বল আয়ত চোখ, প্রীতিপ্রসন্ন-মুখ। কিন্তু এ প্রয়াস কাহার জন্য? নামের মত যিনি নির্লিপ্ত, উদাস, নারীর রূপে—নারীর প্রসাধনে তাঁহাকে কেহ বিচলিত—বিমোহিত করিতে পারে কি?

আমি বলিলাম, "চন্দ্রদা আপনার কর্ম্মক্ষেত্র আর ছুটি—ও-সব জানি না, আমার পরীক্ষার আগে আপনি যেমন এসে পড়েছেন, আপনাকে ক'দিন না খাটিয়ে ছাড়ছি না! সাহায্য করতে হবে। ভাই হওয়া মুখের কথা নয়। বোনের দাবী মেটাতে হয়।"

মিলি প্রশ্ন করিল, "আপনার কি ফিলজফি ছিল?"

চন্দ্রদা বলিলেন, "অতীতে ছিল, সবাই জানে! কিন্তু বর্ত্তমানে আমি সে সব ভুলে গেছি। এখন আমাকে দার্শনিক বললে ভালো লাগে না। চাষা বললে খুশী হই। আমার কাছে পড়া তোমার নিরাপদ নয় করু, ফিলজফির বদলে আমি হয়তো তোমাকে কৃষিতত্ত্ব পড়িয়ে তোমার পড়া মাটী করে দেবো। নাহলে বোনের দাবী মেটানো ভাইয়ের কর্ত্তব্য, নিশ্চয়। সত্যি যদি তোমার উপকার হয়, তা হলে বই নিয়ে এসো, উল্টে-পাল্টে দেখি, কিছু মনে আছে কি না?"

"আপনার আবার মনে নেই! খুব আছে। এখনি আমি বই

আনছি। আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন চন্দ্রদা! বলুন, কি খাবেন? নিয়ে আসি।"

মিলির পানে চাহিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, "এখন আমার পক্ষে খাওয়া কত দূর অসম্ভব, তার সাক্ষী আছেন এই ইনি। এঁর সাম্‌নে দিদির আদেশ পালন করে আস্‌ছি। আজ আর পারবো না করু,—আছি তো ক'দিন, খেলেই হবে। মল্লিকা দেবি, আপনি আমাকে আনতে গিয়ে স্বচক্ষে চাষা-ভূষোর খাওয়ার বহর তো দেখে এলেন!"

মিলি কহিল, "যত বলছেন, তেমন কিছু খাননি! আজ না খেলেন, কাল কিন্তু আমাদের এখানে আপনাকে খেতে হবে। চা খান না, চায়ের নেমন্তন্ন চলবে না। দুপুরবেলা ভাতের নেমন্তন্ন রইলো। মা বাড়ী নেই, মার প্রতিনিধিদের অনুরোধ রাখতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না?"

"কি যে বলেন মল্লিকা দেবি! আপত্তি আবার কিসের? আপনি বললেন, এই যথেষ্ট। ভাত-তরকারী বেশি করে রাঁধবেন। বাঙ্গালের খাওয়া, শেষকালে আপনাদের ফাঁকিতে না পড়তে হয়!"

"আমরা ফাঁকিতে পড়ি না, আপনারা যে আমাদের নাম দিয়েছেন অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার!"

মিলির কথার উত্তর-স্বরূপ চন্দ্রদা একটু হাসিলেন। হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি এখানেই পড়বে? না, তোমার পড়ার ঘরে যাবে? শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না।"

মিলি সবিনয়ে বলিল, "সবে তো সন্ধ্যে, এ সময় করু কোন দিন পড়ে না। আজ না হয় পড়ানো থাক্‌. আপনি তৈরী হয়ে আসেননি!"

"সামান্ত বিষয়ে প্রস্তুত-অপ্রস্তুতের কিছু নেই। দেখুন, আমার একটা বদ অভ্যাস আছে, কোন কাজের কথা উঠলে তা না করা পর্য্যন্ত কেমন সুস্থির হতে পারি না। যা করবো মনে করি, তখনি সেটা করা চাই।" বলিতে বলিতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে চন্দ্রদা আসন পরিত্যাগ করিলেন।

মিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে যেন প্রদীপ জ্বলিতেছে!

মিলির চোখের এ আলো অভিনব! এ বিমুগ্ধ, বিহ্বল ভাব নূতন। মিলি পুরুষ-বিদ্বেষী, পুরুষের কাজে তাহার চোখে বিদ্রূপের জ্বালাই বিকীর্ণ করে চিরদিন, তাহাতে প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধার জ্যোতি কখনো দেখি নাই।

সেই মিলির সলজ্জ, শঙ্কিত, আবেশ-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে খুশী হইলাম। হাঁ, বিধাতার রূপ-সৃষ্টি মিথ্যা হয় নাই! যে প্রদীপ এত দিন পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদ করিয়া আসিতেছে, এত দিনে ঘন আবরণের অন্তরালে কি তাহার আত্মগোপনের সময় উপস্থিত হইল? চন্দ্রচূড়ের চন্দ্রকান্ত মূর্ত্তি প্রথম-দর্শনেই আমার মনে মিলির কথা জাগিয়াছিল। ভগবানের পরিকল্পনার নিদর্শন এত শীঘ্র মিলিকে দেখাইতে পারিব, ভাবি নাই! কায়মনোবাক্যে আমার কামনা, মিলি জ্যোতি বাবুর হৃদয়কে সরস সজীব করিয়া তাঁহার গৃহ আলো করিয়া রাখুক নিজের দর্পতেজ বিসর্জ্জন দিয়া। নারীর এত গর্ব্ব-অহঙ্কার সাজে না! আশ্চর্য্য হইলাম, আমার অগোচরে এত তাড়াতাড়ি মিলি চন্দ্রদার সঙ্গে শুধু আলাপ করে নাই, শ্রদ্ধাও করিয়াছে।

তাহার পর আমরা তিনটি প্রাণী আমার পড়ার ক্ষুদ্র টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। চন্দ্রদা পাঠক, আমরা দুই বোন শ্রোতা। সুরু হইল নীরস দর্শন-শাস্ত্রের সুচারু ব্যাখ্যা, গভীর গবেষণা।

চন্দ্রদা বলিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন। ভোলা যদি ইহার নাম, তবে স্মরণ রাখা কাহাকে বলে? মন দিয়া আমি তাঁহার পঠিত বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মিলি অনিমেষ নয়নে তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত, উগ্র সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মিলি ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগিণী, দর্শনে তাহার আগ্রহ নাই। কিন্তু বক্তার প্রকাশ-ভঙ্গিমায় আজ সে যেন তন্ময়!

অনেক রাত্রে চন্দ্রদার বিদায়-কালে মিলি বলিল, "এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে আবার আমি ফিলজফি নিয়ে এম-এ পড়বো। তখন কিন্তু দয়া করে আমায় সাহায্য করতে হবে।"

হাসিয়া চন্দ্রদা কহিলেন, "বেশ তো, যখন আমাকে দরকার হবে, ডাকবেন।" [ক্রমশঃ।

শ্রীগিরিবালা দেবী

পৌষের পল্লী

বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন—পল্লীগ্রামের গৃহস্থমাত্রেই পৌষ মাসকে 'লক্ষ্মী মাস' বলেন। পল্লীগ্রামের জনসাধারণের নিকট ধান্তই লক্ষ্মী। এই জন্ত পল্লীগ্রামের সর্ব্ব-শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে 'কোজাগর পূর্ণিমায়' যে লক্ষ্মীপূজা হয়, সেই পূজা উপলক্ষে নিষ্কলঙ্ক 'নূতন ধান্তে পূর্ণ লক্ষ্মীর আড়ি' বা বেত্র-নির্ম্মিত 'কাঠা' অনুচ্চ কাষ্ঠাসনে রাখিয়া মালী-বাড়ী হইতে সংগৃহীত সোলা-নির্ম্মিত লক্ষ্মীর মুখ (মুখোস) সেই ধান্তস্তূপের উপর বসাইবার পর লক্ষ্মীরূপে 'লক্ষ্মীর আড়ির' পূজা করা হয়।

বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের অনেক পল্লীর 'বিলেন' জমিতে বা নদীতীরে 'আশুধান্ত' অর্থাৎ আউশ ধান উৎপন্ন হয়। এই ধান তিন মাসেই পাকিয়া যায় বলিয়া ইহা আশু বা 'আউশ' নামে পরিচিত; কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই অল্প যে, তাহাতে দুই-তিন মাস মাত্র পল্লীবাসী গৃহস্থের সাংসারিক অভাব পূরণ হইয়া থাকে। তাহা নিঃশেষিত হইলে শরতের শেষে আমন ধান পাকিয়া উঠে, এবং তাহাতেই গৃহস্থের সম্বৎসরের চাউলের খরচ চলে। পল্লীবাসী গৃহস্থেরা পৌষ মাসেই নূতন আমনের চাউল সংগ্রহ করে; তখন তাহারা আর অভাবের কষ্ট বুঝিতে পারে না। মাঠে মাঠে আমন ধানের কাটাই-মাড়াই চলে, স্বর্ণাভ ধান ঝাড়িয়া বিচালীর যে স্তূপ পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহস্থের পালিত গো মহিষাদির ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইয়া দুগ্ধবতী গাভী অধিক দুগ্ধ প্রদান করে। এদিকে অগ্রহায়ণের শেষেই মুগ, কলাই, মসুর প্রভৃতি ডালের খন্দ উঠিয়াছে; সুতরাং পৌষ মাসে পল্লীবাসীর সাধারণ আহার্য্য ডাল ভাতের অভাব দূর হয়। পল্লীবাসীর পক্ষে এরূপ সুখের মাস আর নাই; এই জন্তই তাহারা পৌষ মাসকে 'লক্ষ্মী মাস' নামে অভিহিত করে।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্বে আমাদের পাঠ্য-জীবনে পল্লী-অঞ্চলে পৌষ মাস কি ভাবে অতিবাহিত হইত, আজও তাহা মনে পড়িতেছে।

সেই সুদীর্ঘ ষাট্ বৎসর পরে—একালে সেই দৃশ্যের প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পল্লীর সেই সকল বৈশিষ্ট্য অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন গর্ভে চির বিলীন হইয়াছে।

সে কালে এই সময় গ্রামের হাটে বা বাজারে 'রাঢ়' (মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম) অঞ্চল হইতে গাড়ী গাড়ী নূতন চাউল ও মুগ কলাই আমদানী হইত। গ্রামপ্রান্তবাহিনী নদীতে প্রতিদিন নৌকাবোঝাই ধানেরও আমদানী হইত,—সরু, মোটা নানা প্রকার ধান। নানা প্রকার তাহাদের নাম। উহা ক্রয়ের জন্য গ্রামস্থ জনসাধারণের কি আগ্রহ ও উৎসাহ! চেলুকীরা তাহা কিনিয়া চাল প্রস্তুত করিত। গ্রামের নিকট রেলষ্টেশন না থাকিলেও গ্রামবাসীরা এই সকল পণ্যের অভাব অনুভব করিত না। অগ্রহায়ণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বিভিন্ন ধান্যক্ষেত্রে কৃষকদের যেন আনন্দোৎসব চলিত! দীর্ঘকাল রৌদ্রে পুড়িয়া ও সারাদিন বর্ষার জলে ভিজিয়া কঠোর পরিশ্রমে তাহারা যে ধান্য উৎপাদন করিয়াছে, এত দিন পরে মাঠের শোভা ও তাহাদের সম্বৎসরের সম্বল সেই সোনার ফসল পাকিয়াছে; তাহা তাহারা কাটিয়া এক এক স্থানে স্তূপাকারে পালা দিয়া রাখিয়াছিল। এখন ক্ষেতের মধ্যে অনেকখানি স্থান কোদালীর সাহায্যে চাঁচিয়া পরিষ্কৃত করিয়া যে 'খোলা' প্রস্তুত করিয়াছে, সেই স্থানে আট দশটি বলদের সাহায্যে পালার ধান মাড়াইয়া বিচালী হইতে ঝরাইয়া লওয়া হইতেছে। কৃষক বলদগুলিকে পাশাপাশি রজ্জুবদ্ধ এবং তাহাদের প্রত্যেকের মুখে দড়ির জাল আঁটিয়া দিয়া, তাহাদিগকে প্রসারিত ধান্যরাশির উপর পুনঃ পুনঃ ঘুরাইতেছে। অন্য এক জন কৃষক তাহার পশ্চাতে ঘুরিয়া, 'কাঁদাল' দিয়া সেই সকল বিচালী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া চারি দিকে সরাইয়া দিতেছে। চার পাঁচ হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডের মাথায় লোহার হুক আঁটিয়া এই 'কাঁদাল' নির্ম্মিত হইয়াছে। বিচালী হইতে ধানগুলি নিঃশেষে ঝরিয়া খোলায় পড়িবে—এই উদ্দেশ্যেই কাঁদালের ব্যবহার।

কোন কোন ক্ষেতে ধান-মাড়াই শেষ হইয়াছে। বলদগুলিকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদের মুখের জাল খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহারা এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া নতমুখে বিচালী চর্ব্বণ করিতেছে। দুই-তিন জন কৃষক বিচালীর গাদা এক এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া ধানগুলি স্তূপাকারে জড়ো করিতেছে, এবং কেহ কেহ কুলার সাহায্যে সেই ধান ঝাড়িয়া তদ্দ্বারা বস্তাগুলি পূর্ণ করিতেছে। গরুর গাড়ী খোলার মধ্যেই আনিয়া রাখা হইয়াছে।—ধান্যপূর্ণ বস্তাগুলি গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইলে, কৃষক যখন ছয়-সাত বস্তা (বার চৌদ্দ মণ) ধানসহ গাড়ী বলদ-জোড়ার সাহায্যে বাড়ী লইয়া যাইতেছে,—তখন দিবা অবসানপ্রায়, সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। ধূলিধূসরিত নগ্নকায় কৃষক, মাথায় মলিন গামছা জড়াইয়া গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া মহানন্দে গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। আজ তাহার সকল কষ্ট ও পরিশ্রম সফল!

গ্রামের উত্তরে ও পূর্ব্বে মেঠোপথ প্রসারিত; তাহার দুই পাশে স্থানীয় সমৃদ্ধ গৃহস্থদের আম-কাঁটালের বাগান; তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা সেকালে এই সকল বাগান প্রস্তুত করিয়া সযত্নে ইহাদের পরিচর্য্যা করিয়া আসিলেও এখন বাগানগুলি অরক্ষিত ও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত; নাটা, শিয়াকুল, ময়না, বৈঁচি প্রভৃতি কণ্টকপূর্ণ লতা-গুল্মে ঐ সকল স্থান দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে; স্থানে স্থানে জঙ্গল এরূপ নিবিড় যে, বাঘ লুকাইয়া থাকে শুনিয়া দিবাভাগেও কেহ সেই সকল জঙ্গলের দিকে যাইতে সাহস করে না। গ্রীষ্মকালে আম-কাঁটাল সংগ্রহ করিবার জন্য নিকিরীরা এই সকল বাগান যকর জমা লইয়া ফল পাহারা দেওয়ার জন্য সেখানে 'টোং' পাতে। এই 'টোং'গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর; তাহাদের খড়ের চাল, এবং চ্যাটাই-নির্ম্মিত আবরণ। প্রত্যেক টোং তিন-চারি হাত উঁচ বংশদণ্ডের উপর স্থাপিত; বাঁশের মৈ (সিঁড়ি) দিয়া টোংএ উঠিতে হয়। এই জন্যই রাত্রিকালে বাগানের প্রহরীকে কোন বন্য জন্তু আক্রমণ করিতে পারে না। বাগানের প্রহরীরা রাত্রিকালে এই সকল টোংএ শয়ন করিয়া টোংএর অদূরে উপবিষ্ট ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পায়। তাহাকে দূরে তাড়াইবার জন্য অনেক প্রহরী টোংএর চারি দিকে শুকনো কাঠ, বাঁশ প্রভৃতির সাহায্যে আগুন জ্বালিয়া রাখে। আগুন দেখিলে বাঘ তাহার নিকটে আসে না।

এই সকল পুরাতন বাগানের অদূরে গ্রামের কোন কোন সমৃদ্ধ অধিবাসী আম, লিচু নারিকেলাকুল, কামরাঙ্গা, জাম, জামরুল প্রভৃতি ফলের নূতন বাগান করিয়াছেন; সেগুলি সযত্নে রক্ষিত। বাগানের পর সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। পৌষ মাসে অরহর-ক্ষেত্রে অরহর গাছগুলি পাঁচ-ছয় হাত দীর্ঘ হইয়াছে; তাহাদের শাখাগুলি পরিপুষ্ট ফলভারে অবনত। অদূরে ছোলার ক্ষেতে ছোলা পুষ্ট হওয়ায় অপরাহ্নে গ্রামের ছেলেরা শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া মাঠে বেড়াইতে আসিয়া ছোলার ঝাড় তুলিয়া অঞ্চলে সঞ্চয় করিতেছে; কোন কোন দল মাঠের ভিতর আগুন জ্বালিয়া তাহাতে সেই সকল ছোলার গাছ দগ্ধ করিতেছে; আগুনে গাছের ছোলাগুলি আধ-পোড়া হইলে তাহারা খোসা ছাড়াইয়া সেগুলি মহানন্দে চর্ব্বণ করিতেছে। এই অর্দ্ধদগ্ধ ছোলাকে 'ছোলার হোরা' বলে; পল্লীগ্রামের বালক-বালিকাগণের ইহা অত্যন্ত মুখরোচক খাদ্য।

গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে, পথের ধারে, বাগানের ভিতরে অসংখ্য খর্জ্জুরবৃক্ষ। গ্রামস্থ হাড়ী, বাগ্দী, বাইতি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক খেজুরে-গুড় প্রস্তুতের জন্য এই সকল খেজুর-গাছের 'মাথীর' নিম্নভাগ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে চাঁচিয়া, শীতের কয়েক মাস সেখানে মাটীর ঠিলি বাঁধিয়া রস সংগ্রহ করে। ইহাদিগকে কোথাও 'শিউলি', কোথাও বা 'গাছী' নামে অভিহিত করা হয়। অপরাহ্নে গাছীরা মাটীর ঠিলি পশ্চাতে ঝুলাইয়া, আবদ্ধ আঁটায় স্থূল রজ্জুর সাহায্যে খেজুর গাছে উঠিতেছে, এবং একটি অনতিদীর্ঘ বংশদণ্ড রজ্জু দ্বারা গাছের সঙ্গে আড়ভাবে বাঁধিয়া, তাহার উভয় প্রান্তে দুই পা রাখিয়া কটিদেশে আবদ্ধ চর্ম্মাবরণের ভিতর হইতে বক্রমুখ তীক্ষ্ণাস্ত্র হেঁসো বা কাটারী বাহির করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা গাছের গলা পুনর্ব্বার চাঁচিয়া রস বাহির হইলে বহিত স্থানের নীচে চেরা-কঞ্চির পাঁচ-ছয় আঙ্গুল দীর্ঘ 'নলি' বসাইয়া দিতেছে; তাহার পর সেই নলির অগ্রভাগ ঠিলির মুখে প্রবেশ করাইয়া, ঠিলিটা নলির মুখ হইতে কোন কারণে সরিয়া যাইতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে খেজুর-গাছের দুইটি ডেগড়ো দুই দিক্ হইতে টানিয়া-আনিয়া তদ্দ্বারা রজ্জুবদ্ধ ঠিলির গলা আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সারা রাত্রি ধরিয়া সেই ঠিলিতে খর্জ্জুর-রস সঞ্চিত হইতে থাকে। গ্রামের অনেক দুষ্ট লোক রাত্রিকালে গাছে উঠিয়া ঠিলি হইতে সঞ্চিত রস চুরি করিয়া লইয়া যায়—এই জন্য গাছী মানকচু চাকা-চাকা করিয়া কাটিয়া ঠিলির ভিতর ফেলিয়া রাখে। মানকচুর রস খেজুর-রসের

সহিত মিশিলে সেই রস পানের অযোগ্য হয়; যদি কেহ না জানিয়া সেই রস পান করে, তাহা হইলে মুখে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, এমন কি, মুখ ফুলিয়া উঠে! কোন কোন গাছী ঠিলির ভিতর মানকচুর চাকতি এত অধিক পরিমাণে ফেলিয়া রাখে যে, সেই রস হইতে যে গুড় হয়, সেই গুড় খাইলেও গলা কুট-কুট করে! কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

গাছীরা যাহাদের খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে প্রত্যেক গাছের জন্য দুই সের গুড় খাজনা দিয়া থাকে; কিন্তু রস হইতে অধিক গুড় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই খাজনা প্রদান করে না। যাহাদের জমিতে ৫০।৬০টি খেজুর গাছ আছে, তাহারা অভিজ্ঞ শ্রমজীবীর সাহায্যে গাছ 'কাটাইয়া', নিজেরাই বাইন নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে গুড় প্রস্তুত করাইয়া লয়। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক সতেজ খেজুর গাছ হইতে কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত কয়েক মাসে আড়াই মণেরও অধিক গুড় পাওয়া যায়।

নবীন সর্দ্দার বহু কাল আমাদের গ্রাম্য ডাকঘরে 'ডাক-রনারের' কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আমাদের গ্রাম হইতে বেঙ্গল আসাম (B. A. Ry.) রেলের ষ্টেশনের দূরত্ব আঠার মাইল। এই দীর্ঘ পথে গাড়ীতে ডাক-বহনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে নবীন সর্দ্দার সন্ধ্যার সময় বল্লমের অনতিদীর্ঘ দণ্ডবিশিষ্ট গলার ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে তাহাতে আবদ্ধ ডাকের প্রকাণ্ড ব্যাগ পিঠে লইয়া দৌড়াইত। সে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী আড্ডায় পৌঁছিয়া দ্বিতীয় রনারকে ডাকের ব্যাগ দিয়া সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিত; আবার প্রত্যূষে সেই আড্ডায় গমন করিয়া রেলষ্টেশন হইতে আনীত ডাক বহন করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে পৌঁছাইয়া দিলেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার ছুটী।

খেজুরে-গুড় প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভ হয় বলিয়া নবীন সর্দ্দার শীতকালের কয়েক মাস ডাক-বহনের কার্য্যে অন্য লোককে 'একটিনী' দিয়া ডাক বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট ছুটী লইত, কারণ, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে যখন তাহাকে ডাক বহন করিতে হইত, সেই সময়েই খেজুরের রস সংগ্রহ করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার নিয়ম। নবীন প্রত্যহ বৈকালে তিন-চারিটার সময় হইতে গাছে গাছে উঠিয়া রসের জন্য ঠিলি বাঁধিত, এবং সন্ধ্যার পর কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিত। যে সকল গাছে উপর্য্যুপরি তিন দিন রস সংগ্রহ করা হইত, সেই সকল গাছকে কয়েক দিন বিশ্রাম দিয়া পুনর্ব্বার তাহার শুষ্ক অংশ চাঁচিয়া তাহাতে ঠিলি বাঁধা হইত; এই ভাবে সংগৃহীত প্রথম দিনের রসকে 'জিরেন-কাটের' রস বলা হয়। এই রসের পরিমাণ অধিক, এবং স্বাদও উৎকৃষ্ট হয়; গাছীরা খেজুর-রস বিক্রয় না করিলেও তাহাদের নিকট কেহ রস খাইতে চাহিলে তাহাদের অনেকেই তাহা দানে কার্পণ্য প্রকাশ করে না।

নবীন প্রত্যহ প্রভাতে উষালোক পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই রসপূর্ণ ঠিলি খুলিতে যাইত, এবং বাঁশের বাঁকের দুই দিকে সেই সকল রসপূর্ণ ঠিলি একাধিক বারে ঝুলাইয়া-লইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিত।

নবীন তাহার বাড়ীতে মৃৎকুটীরের এক প্রান্তে খানিক যায়গা পরিষ্কার করিয়া সেখানে রস জ্বাল দিবার 'বাইন' করিত। এই বাইনে সে বৃহৎ ও গভীর উনান কাটিত; তাহার পাশে রসপূর্ণ ঠিলিগুলি সারিবন্দী করিয়া বসাইয়া রাখিত। তাহার পর শুকনো গুল্মরাশির সাহায্যে সেই উনানে আগুন জ্বালিত। নবীন বা অন্য কোন গাছীকে রস জ্বাল দেওয়ার 'খড়ি' কিনিতে হইত না; তাহারা বিভিন্ন পাড়ার বাগানে বাগানে ঘুরিয়া আস্তাওড়া, ভাঁট, কাল্‌কাসিন্দা, ও বাকস প্রভৃতি গুল্ম কাস্তে দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া-রাখিয়া আসিত; কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি শুকাইলে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িত, তখন তাহারা তাহা আঁটি বাঁধিয়া বাড়ীতে আনিয়া বাইনে সঞ্চয় করিত, এবং তদ্দ্বারা উনানে খোলাপূর্ণ রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিত।

নবীন গুড় প্রস্তুত করিয়া তাহার ঠিলিগুলির অধিকাংশ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া তাহার উপর এক এক হাতা গুড় ঢালিয়া দিত; সেই গুড় ঠাণ্ডা হইয়া পাটালীর আকার ধারণ করিলে সে সেগুলি কুলা বা ডালায় সাজাইয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত।

এই সময় পাড়ার ছেলেরা কেহ কচুর পাতা, কেহ কলাপাতা হাতে লইয়া নবীনের 'বাইনে'র কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। নবীন তাহার খোলা হইতে সকলকেই এক একটু গুড় খাইতে দিত। সে সরাগুড়গুলি বিক্রয় করিয়া দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। বাজারে যাইবার পূর্ব্বে সে রস-সংগ্রহের ঠিলিগুলি বাইনের উনানের চারি দিকে কাত করিয়া সাজাইয়া রাখিত। তাহার প্রস্তুত সরাগুড়গুলি এমন সুগন্ধ ও ফরসা হইত যে, বাজারে যাইবার পথেই সেগুলি বিক্রয় হইয়া যাইত।

নবীন সর্দ্দার ও গ্রামস্থ অন্যান্য গাছী প্রত্যূষে খেজুর গাছের গলা হইতে রসপূর্ণ ঠিলি খুলিয়া লইয়া যাইবার পর নলির মুখ দিয়া প্রায় সমস্ত দিন টপ্‌-টপ্‌ করিয়া রস ঝরিত; গ্রামের সাধারণ লোকের ছেলেরা প্রশস্ত ফুটা-বিশিষ্ট প্রায় এক হাত দীর্ঘ বাঁশের চোঙার ডগায় ছিদ্র করিয়া দড়ি বাঁধিত, এবং সেই চোঙায় তাহারা সারাদিন ধরিয়া রস সঞ্চয় করিত। এই রসকে তাহারা 'ওলা' বা 'গাঁজলা' রস বলিত। বেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা সেই রস খোলায় ঢালিয়া উনানে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিত। এই গুড়ের রং কালো, এবং তাহার স্বাদও ভাল হইত না; একালে গ্রামস্থ বালকরা সময় নষ্ট করিয়া আর এভাবে রস সংগ্রহ করে না।

সেকালে দেখিতাম—পৌষ মাসে দলে দলে পেশোয়ারী শাল, র‍্যাপার, আলোয়ান, জামিয়ার প্রভৃতি শীতবস্ত্রের বড় বড় বাণ্ডিল পিঠে লইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী তেঁতুলতলায়, বা কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনাস্থিত বড় বড় আম, কাঁটাল গাছের ছায়ায় আড্ডা লইত। অনেকে সেখানে বসিয়াই গ্রামবাসীদের নিকট শীতবস্ত্রাদি বিক্রয় করিত। সমগ্র পৌষ মাস এবং মাঘ মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ব্যবসায় চলিত। রাত্রিকালে তাহারা মুক্ত প্রাঙ্গণে অগ্নিকুণ্ডে কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়া তাহার চারি দিকে বসিয়া বসিয়া আরব্যোপন্যাসের গল্পের অনুরূপ অনেক গল্প করিত; গৃহস্থরাও তাহাদের পাশে বসিয়া সেই সকল সরস উপকথার মাধুর্য্য উপভোগ করিত।

কিন্তু একালে আর পল্লীগ্রামে এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও গ্রামে প্রতি-বৎসর শীতকালে পেশোয়ারীদের সমাগম হয় বটে, কিন্তু তাহাদের পিঠে শীতবস্ত্রের গাঁটরীর পরিবর্ত্তে এখন তাহাদের হাতে খেরো-বাঁধা খাতা ও কাঁধে পাঁচ হাত লম্বা গাঁটবিশিষ্ট পাকা বাঁশের লাঠী সমুদ্যত! তাহারা এখন শীতবস্ত্রের ব্যবসায় ত্যাগ

করিয়া অত্যন্ত অধিক সুদে পল্লীগ্রামের দুঃস্থ গৃহস্থগণকে টাকা ধার দিয়া মহাজনী ব্যবসায় চালাইতেছে।

পৌষ মাসের শেষেই গ্রামস্থ দেশী কুলগাছগুলিতে কুল পাকিয়া উঠে। কোন্ পাড়ায় কাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় সুমিষ্ট দেশী কুলের গাছ আছে, গ্রামস্থ বালকগণের তাহা সুবিদিত। পাঠশালার ছুটী হইলে এবং ইংরেজী স্কুলের টিফিনের অবকাশে ছেলেরা দলে দলে সেই সকল কুলগাছের তলায় সমবেত হইয়া এড়ো মারিয়া কুল পাড়ে, এবং পরস্পর হুড়ামুড়ি করিয়া পাকা কুলগুলি কুড়াইয়া-লইয়া কেহ তিন চারিটা এক সঙ্গে মুখে পোরে, কেহ কেহ পরে সদ্ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে তদ্দ্বারা পকেট পূর্ণ করে।

পল্লীগ্রামে পৌষ মাসেও গৃহিণীরা ফুলকপি সংগ্রহ করিতে পারেন না ; কারণ, পল্লীগ্রামের ক্ষেতের কপিতে তখনও ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না। সহর হইতে যাহা আমদানী হয়, তাহা এরূপ দুর্ম্মূল্য যে, অধিকাংশ গৃহস্থেরই তাহা কিনিবার সামর্থ্য নাই ; কিন্তু এই সময় পল্লীগ্রামের অনেক কাঁটাল গাছে যে ইঁচড় পাওয়া যায়, তাহা কপির অভাব পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ; এ জন্য তাঁহারা উহাকে 'গাছকপি' নামে অভিহিত করেন। এতদ্ভিন্ন, এই সময় পল্লীগ্রামে প্রচুর মূলো, বেগুন, সুমিষ্ট আলতাপাতি শিম, মেটে আলু, ও কড়াইসুঁটি পাওয়া যায় ; তদ্দ্বারা যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, পল্লীবাসীদের নিকট তাহা ফুলকপির ডালনার মতই মুখরোচক ও আদরণীয়।—এত রকম তরিতরকারী বৎসরের অন্য সময় পাওয়া যায় না ; এ জন্যও পৌষ মাস পল্লীবাসীর নিকট সমাদৃত।

পৌষ মাসের আরও গৌরব পোষলার জন্য। পোষলা পল্লীবাসীর আনন্দপ্রদ উৎসব। সাধারণ গ্রামবাসীরা পৌষ মাসের কোন দিন, কখন কখন একাধিক দিন, গ্রামের মাঠে বা গ্রামান্তরে দল বাঁধিয়া গমন করে, এবং সেখানে ভাত বা খিঁচুড়ি ও নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, এমন কি, মাছ, মাংস রাঁধিয়াও মহানন্দে বনভোজন করে। পল্লী-সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও পৌষ মাসে পোষলার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। পৌষ মাসে আমরা স্কুলের ছাত্ররা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পোষলা করিতে যাইতাম। মনে পড়িতেছে, এক বার আমরা আমাদের গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীর অপর পারে অবস্থিত যাদবপুরের মাঠে পোষলা করিতে গিয়াছিলাম। গ্রামের বয়স্ক অধিবাসীরা বা আদালতের আমলা প্রভৃতি পোষলার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া থাকেন। যাঁহারা নানাপ্রকার উপচার সংগ্রহ করিয়া মহা সমারোহে পোষলা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের চাঁদার পরিমাণ দুই-তিন টাকাও হইয়া থাকে। সেই টাকায় তাঁহারা চাল, ডাল, মুগ, তেল হইতে হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান ; কিন্তু আমাদের পোষলার ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। একালে সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; কারণ, একালের সভ্য ছেলেরা সেইরূপ 'গেঁয়ো' ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহে। আমরা যে কয় জন পোষলা করিতে যাইব, তাহা স্থির হইলে আমাদের দলপতি প্রত্যেককে চাল, ডাল ও তরিতরকারী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিত ; তদনুসারে আমরা থলির অভাবে এক একটা বালিসের ওয়াড় লইয়া তাহার ভিতর বিভিন্ন পুঁটুলীতে চাল, ডাল, আলু, বেগুন, মূলো এবং ঝাল-মসলা, লবণ প্রভৃতি রন্ধনের বিভিন্ন উপকরণ সঞ্চয় করিতাম। সকলের সংগৃহীত সিধা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু সে সকল দ্রব্য বাড়ী হইতে পোষলার স্থানে লইয়া যাইবার অসুবিধা ছিল, অর্থাৎ জ্বালানী কাঠ, হাঁড়ি, তেল, ঘি, মাছ, দধি, পায়েসের দুগ্ধ, ও সন্দেশ প্রভৃতি নগদ মূল্যে ক্রয় করা হইত। তাহাতে যে অর্থব্যয় হইত, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে ছয় আনা বা আট আনা অতিরিক্ত চাঁদা দিতে হইত।

আমরা সকালে বেলা নয়টার সময় আমাদের সিধার ঝুলি বহন করিয়া সদলে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, এবং নদী পার হইয়া যাদব-পুরের প্রান্তবর্ত্তী একটি বাগানের ভিতর সুবৃহৎ আমগাছের ছায়ায় আমাদের সংগৃহীত উপকরণগুলি নামাইয়া রাখিলাম। সেই স্থানে পাশাপাশি দুইটি তেউড়ি খুঁড়িয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। আমাদের দলের দুই তিন জন বলিষ্ঠ বালকের রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল ; তাহারাই রাঁধিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরেই বাজার হইতে মাছ, কপি, চিনি, সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। মহা আড়ম্বরে রন্ধন আরম্ভ হইলে এক দল ছেলে অদূরবর্ত্তী মাঠে ডাণ্ডাগুলি খেলিতে লাগিল ; কয়েক জন তাস লইয়া বসিয়া গেল।

রন্ধন শেষ হইতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। আমাদের পোষলার সংবাদ পাইয়া এক দল ভিক্ষুক-বালক আহারের লোভে অদূরবর্ত্তী গাছতলায় কলাপাতা বিছাইয়া, কখন রান্না শেষ হয়, সাগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের সঙ্গে যে মুড়ি ছিল, বহু পূর্ব্বেই তাহা কাঁকাইয়া শেষ করা হইয়াছিল ; সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিতেছিল। সেই সময় দশ-বারটি ভিক্ষুককে আহারের লোভে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া প্রায় সকলেই রাগিয়া উঠিল। চাল, ডাল, মাছ, তরকারী সকলই পরিমিত ; এতগুলি ক্ষুধার্ত্ত আগন্তুককে অন্ন-ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করা আমাদের অসাধ্য ! কেহ বলিল, "দাও বেটাদের গলায় ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে।" কেহ বলিল, "আরে, তার দরকার কি ? পাত পেতে যেমন বসে আছে থাক্, আমরা পোষলা শেষ করে চলে যাই। আমরা তো আর সদাব্রত করতে এই যাদবপুরের মাঠে আসিনি।"

যাহা হউক, অবশেষে সুবুদ্ধিরই জয় হইল ; স্থির হইল, আমরা কিছু কম খাইয়াও উহাদিগকে দুই-এক মুঠা খাইতে দিব।—এই ভাবেই পোষলা শেষ হইল। আমরা কলার পাতায় আহার করিয়াছিলাম ; আহার শেষে উঠিতে না উঠিতে ক্ষুধিত ভিক্ষুকরা কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া দিয়া যে ভাবে আমাদের উচ্ছিষ্ট পাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল—এই সকল হতভাগ্য ভিক্ষুক কত দিন হয় ত অনাহারে আছে ! একটি দুর্ব্বল বালক একখানা পাতা হইতে একটা রসগোল্লা তুলিয়া-লইয়া মুখে পূরিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একটা ভিক্ষুক দুই হাতে তাহার গাল টিপিয়া রসগোল্লাটি বাহির করিয়া লইয়া গ্রাস করিল ! মুখের গ্রাসে বঞ্চিত সেই অসহায় বালকের যে হতাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া-ছিলাম—এত কাল পরে আজ এই জীবন-সায়াহ্নেও তাহা ভুলিতে পারি নাই ! তথাপি সেই সময় চাউলের মণ আড়াই টাকা, কোন খাদ্যদ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য ছিল না ; দশ টাকা আয়েই লোক নিরুদ্বেগে সংসার চালাইত। আর আজ ? সেই সস্তার দিনেও অস্থিচর্ম্মসার, কোটরগত-চক্ষু ভিক্ষুকগণ অনাহারে শীর্ণ হইত, আর শিকারপুর পাটকেবাড়ী কুঠীর নীলকর সাহেবদের ওয়েলার ঘোড়াগুলা পল্লীবাসী

দরিদ্র কৃষকের ক্ষেত্রোৎপন্ন দানায় পুষ্ট হইত। নীলকরেরা আমাদের সোনার বাঙ্গালায় আসিয়া দেশের লোকের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ করিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিত।—এ দেশ আমাদের!

পোবলা শেষ করিয়া আমরা খেয়া নৌকায় যখন নদী পার হইলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। খোলা মাঠে পৌষের কন্‌কনে শীতে আমাদের বুক তুরু-তুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। আমরা শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নদীর এপারে গোপালগঞ্জের ঘাটে নামিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পৌষ মাস একালেও নিয়মিত ভাবে আসিয়া থাকে; কিন্তু একালে আর তাহা পল্লীবাসিগণকে সেকালের মত আনন্দ ও তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বোধ হয়, আমাদের রসাস্বাদনের শক্তি হ্রাস হইতেছে, এবং সেকালে পল্লীজীবনের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ ছিল, তাহাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্তু তথাপি পল্লীরমণীগণ একালেও পৌষ মাসের মায়া কাটাইতে না পারিয়া পৌষ-সংক্রান্তির রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগ করিয়া মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা করেন,—

"পৌষ মাস লক্ষ্মী-মাস—যেও না,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ—যেও না,
লেপ-কাঁথায় থাক পৌষ—যেও না,
পোয়াল-গাদায় থাক পৌষ—যেও না;
পৌষ মাস লক্ষ্মী-মাস—যেও না।"

তাহার পর সমগ্র গ্রাম সুপ্তিঘোরে মগ্ন হয়, এবং পৌষের দীর্ঘরাত্রি সকলের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে উষার হিরণ্ময় অঞ্চলে বিলীন হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গুজরাতের ভক্ত-কবি নরসিং মেহতা

(১৫০০—১৫৮০)

নরসিং মেহতা গুজরাতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'মীরাবাঈ'র সমসাময়িক। তাঁহার সময়ে গুজরাত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবর তখন ভারত-সম্রাট্। কথিত আছে, সম্রাট্ আকবর তানসেনকে লইয়া মীরাবাঈকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মোগল-রাজত্বে গুজরাতের সমৃদ্ধির খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল। গুজরাতের অন্তর্গত কাম্বে ও সুরাট তখন প্রসিদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক বন্দর। য়ুরোপীয় পর্য্যটক বার্থেম (১৫০৩—১৫০৮) এবং ওভিংটন (১৬৯০) তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে গুজরাতের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। কাফি খাঁর মতে গুর্জ্জর তখন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। গুজরাতের রাজধানী আমেদাবাদের তিন শত আশীটি (৩৮০) উপকণ্ঠ বা সহরতলী ছিল; এই সকল উপকণ্ঠের প্রত্যেকটিতে রাস্তা, ঘাট, বাজার ও অট্টালিকা এত অধিক ছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র নগর বলিলে অত্যুক্তি হইত না।

গুজরাতী কবি ভেঙ্কটাধ্বরিন্ (১৬৪০) তাঁহার "বিশ্বগুণাদর্শ" নামক কাব্যে গুর্জ্জরদেশের সম্পদের প্রাচুর্য্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

সকর্পূর-স্বাদু-ক্রমুকনবনীটীরসলস-
মুখাঃ সর্বশ্লাঘাপদবিবিধদিব্যাম্বরধরাঃ।
কনদ্রত্নাকল্পাধৃমধুমিতদেহাশ্চন্দনহৃদৈ-
র্যুবানো মোদন্তে যুবতিভিরমী তুল্যরতিভিঃ॥১

অনুবাদ:—সর্ব্বসম্পদের আলয় অমর ভূমি এই গুর্জ্জরদেশের যুবকগণের মুখে কর্পূর ও মিষ্ট সুপারি দ্বারা স্বাদু টাট্‌কা পান; তাহাদের গাত্র বিচিত্র শ্লাঘ্য দিব্যবস্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারে শোভিত; সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তাহাদের দেহ অনুলিপ্ত, এবং তাহারা রতিতুল্য যুবতীগণের সহিত আহারবিহার করে।

তপ্তস্বর্ণসবর্ণমঙ্গকমিদং তাভ্যো মৃদুশ্চাধরঃ
পাণী প্রাপ্তনবপ্রবালসরণী বাণী সুধাধোরণী।
বক্ত্রং বারিজমিত্রমুৎপলদলশ্রীস্যচনে লোচনে
কে বা গুর্জ্জরসুন্দরীবামবয়বা ন্যনাং ন মোহাবহাঃ॥২

অনুবাদ:— গুর্জ্জরদেশের তরুণীগণের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। তপ্তস্বর্ণবৎ তাহাদের কান্তি; অধর কোমল ও রক্তবর্ণ; তাহাদের হস্ত নবমৃণালসদৃশ সূক্ষ্ম; মুখের বাক্য সুধাতুল্য; মুখ পদ্মবৎ; নীল পদ্মের আভা তাহাদের চক্ষুতে (প্রতিফলিত); গুর্জ্জরের এই সুন্দর রামাগণ কাহার মন না মুগ্ধ করে?

দেশে দেশে কিমপি কুতুকাদদ্ভুতং লোকমানাঃ
সম্পাদ্যৈব দ্রবিণমমিতং সদ্য ভূয়োঽপ্যবাপ্য।
সংযুজ্যন্তে সুচিরবিরহোৎকণ্ঠিতাভিঃ সতীভিঃ
সৌখ্যং ধন্যাঃ কিমপি দধতে সর্ব্বসংপৎসমৃদ্ধাঃ॥৩

অনুবাদ:—গুর্জ্জরবাসিগণ দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া নব নব আচার-ব্যবহার শিক্ষা করে ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। তাহারা ভ্রমণ ও বাণিজ্য সমাপনান্তে স্বদেশস্থিত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দীর্ঘবিরহোৎকণ্ঠিতা সতী পত্নীবর্গের সহিত সম্মিলিত হয়। এইরূপে সর্ব্বসম্পদশালী গুজরাতীগণ পরমসুখে কালযাপন করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কবি নরসিং গুজরাতে ভক্তি-ভাবের অভিনব স্রোত প্রবাহিত করেন। শ্রীকানাইয়ালাল এম, মুন্সী তাঁহার গ্রন্থে (১) বলেন, "মীরার লালিত্য, সুরদাসের ব্যাকুলতা, এবং তুলসীদাসের গুরুগাম্ভীর্য্য নরসিংহের (রচনায়) না থাকিলেও তাঁহার কবিতায় ও গানে ভাবসম্পদের অভাব নাই। গুজরাতী কবিতার নির্জীব গতানুগতিকতা ভগ্ন করিয়া তিনি ইহাকে প্রাণ ও

১। Guzrat and its Literature K. M. Munshi

প্রেমে পূর্ণ করেন। কবি, ভক্ত, আর্য্য-সংস্কৃতির প্রতিমূর্ত্তি নরসিং অদ্যাপিও গুজরাত ও কাথিয়াবাড়ের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সঙ্গীত। গুজরাতী সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। গুজরাতের অমর কবি নরসিংএর নিম্নলিখিত ভজনটি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনসঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সবরমতী আশ্রমে এই ভজনটি প্রাতঃকালে গীত হইত।

"বৈষ্ণবজনো তো তেনে কহিয়ে, জে পীড় পরাই জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তে, মন অভিমান ন জানে রে।
সকল লোকমাঁ সহুনেবন্দে, নিন্দা তে ন করে কেনী রে।
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাত রে॥
মোহমায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামশুঁ তালী রে লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে॥
বনলোভী নে কপটরহিত ছে, কামক্রোধ নে নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়ো তেনুঁ দরশন করতাঁ, কুল ইকোত্তের তার্যা রে॥

অনুবাদ :—তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা ভক্ত, যিনি অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, যিনি দুর্গতদের সেবা করেন, যাঁহার মনে অভিমান নাই, যিনি সকলকে মান দেন, এবং কাহারও নিন্দা করেন না, ও কায়মনোবাক্যে নিশ্চল। তাঁরই জননী ধন্য। প্রকৃত ভক্ত সমদৃষ্টি ও তৃষ্ণাত্যাগী, তিনি পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করেন, তিনি পরধন স্পর্শ করেন না, তাঁহার জিহ্বা কখনও অসত্য উচ্চারণ করে না, তিনি মায়া মোহে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার মনে তীব্র অনাসক্তি, রামনামে (ঈশ্বর নামে) তিনি অশ্রুপাত করেন। তাঁহার শরীরে সর্ব্বতীর্থের সমাগম হয়। তিনি লোভমুক্ত, অকপট, ও কামক্রোধরহিত। নরসিংহ বলে যে, "সেরূপ ভক্তের দর্শনে একাত্তর কুল উদ্ধার হয়।"

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভক্ত-কবি নরসিংএর যশোভাতি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সময়ে সময়ে যে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বহু প্রদেশে লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছিল। গুজরাতী কবি বিশ্বনাথ জানী (১৬৫২)এই সকল ঘটনা অবলম্বনে মনোরম আখ্যায়িকা রচনা করেন।

কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় সহরের নিকটবর্ত্তী তলাজা-গ্রামে নরসিং মেহতা কোন দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণদাস নাগরব্রাহ্মণ ছিলেন। নাগরগণই গুর্জ্জরে কুলীন ব্রাহ্মণ, এবং সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে সমাসীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁহারাই এই প্রদেশে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের সংরক্ষক ছিলেন। অল্প বয়সেই নরসিংএর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে অগত্যা অগ্রজের গলগ্রহ হইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি পরিব্রাজক সাধুদের সংস্পর্শে আসেন, এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের নিকট ব্রজভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা'তে লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জুনাগড়ের রণছোড়জীর মন্দিরে শুভাগমন করেন। নরসিং চৈতন্যদেব এবং মীরাবাঈ'র ন্যায় গোপীভাবের সাধক ছিলেন। গোপীভাবের আবেশে উন্মাদের মত তিনি নৃত্য করিতেন, গান গাহিতেন, এবং 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আবেগভরে আহ্বান করিতেন। তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত আচরণে আত্মীয়-স্বজনগণকে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক বার তাঁহারা নরসিংএর বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে মাণেক-বাঈ নাম্নী ভক্তিমতী মহিলার সহিত নরসিংএর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে কিন্নরবাঈ নাম্নী কন্যা ও শ্যামল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কপর্দ্দকশূন্য হইলেও নরসিং ও মাণেকবাঈ সময়মত কোন রকমে সেই পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রজ-পত্নীর কর্কশ বাক্যে ও দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া নরসিংকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি জুনাগড়ের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কোন মন্দিরে গোপনাথ মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাত দিন ও সাত রাত্রি ক্রমাগত অনাহারে ও অনিদ্রায় দেবারাধনার ফলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। এই দেবতাই নরসিংকে দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন। নরসিং প্রেম-চক্ষুতে এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সন্দর্শন করেন। এই দর্শনের পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তিনি দিবারাত্রি ভাব-বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ-পত্নীকে কটুবাক্য প্রয়োগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; কারণ, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—কটুবাক্য শুনিয়া মনঃকষ্টে গৃহত্যাগ না করিলে তাঁহার হয়ত এই অমূল্য ভাব-নিধি লাভ হইত না। কিন্তু নরসিং তাঁহার ভ্রাতার গৃহে পুনঃপ্রবেশ না করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক জন কৃষ্ণভক্ত নরনারীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। এই সময় হইতে নরসিং রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ভজন ও পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। করতাল সহযোগে স্বরচিত ভজনাদি গানেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। জনসাধারণেও তাঁহার পদাবলীগুলি ক্রমশঃ গায়িতে লাগিল। এইরূপেই নরসিংএর ভজনাবলী গুজরাত ও কাথিয়াবাড়ের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

ভক্ত নরসিং সর্ব্বক্ষণ ভাবনিমগ্ন থাকায় নিজের ও পরিবার-বর্গের অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা আদৌ চিন্তা করিতেন না। শিশু যেমন জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তিনিও সেইরূপ ভগবানের উপর সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। নগরের ধর্ম্মনিষ্ঠ নরনারীগণই তাঁহার সংসার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশপূজ্য নাগর-ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার বংশ-গৌরব বা জাতি-গৌরবের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি আপামর সাধারণের সঙ্গে মিলিতেন, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভক্তি-রসাস্বাদন করাইতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে ভেদাভেদের ভাব, সেখানে পরমেশ্বর নাই। সমদৃষ্টিতে সকলেই সমান। এক বার মেথরাদি অস্পৃশ্য জাতির নিমন্ত্রণে তিনি তাহাদের গৃহে গমন করিয়া নাম-কীর্ত্তনাদিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রভাতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে 'পাষণ্ড' 'ভণ্ড' ও 'জাতিভ্রষ্ট' বলিয়া তিরস্কার করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা সত্যই বলিয়াছ : আমি ভণ্ডই। তোমরা যাহা ইচ্ছা আমাকে বলিতে পার, কিন্তু আমার প্রীতি গভীর। আমি জাতিবিচার করি না, হরিভক্ত-গণই আমার একমাত্র আত্মীয়। যে নিজেকে হরিভক্ত অপেক্ষা

উচ্চজ্ঞান করে, সে পতিত।"—জ্ঞাতিগণ নরসিংকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিল।

নরসিং-এর ৭৪০টি পদাবলী সংগৃহীত হইয়া "শৃঙ্গারমালা" নামক গুজরাতী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কবি যেমন চণ্ডীদাস, সেইরূপ গুর্জ্জরের কবি নরসিং মেহতা। দ্বারকার মন্দিরে তাঁহার যে প্রেমানুভূতি হয়, তাহা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করেন—"গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার পরিণয় হয়েছে। আমি আর কিছুই চাই না। আমার পুরুষদেহ নারীদেহে পরিণত হয়েছে। আমি এক জন গোপী। প্রধানা গোপিকা বিরহিণী রাধিকাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা-দানের সময় দেখিলাম, রাসরাজ কৃষ্ণ আমার হৃদয়বেদীতে সমাসীন।" বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় গুজরাতী বৈষ্ণব-সাহিত্যেও বিরহ-ভাবই প্রবল। নরসিংএর অধিকাংশ ভজন ও পদাবলী কৃষ্ণ-বিরহ-ভাবে পরিপূর্ণ। নরসিং গাহিতেছেন, "প্রিয়তমের বংশী-ধ্বনি শুনিতেছি। গৃহে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আমি ব্যাকুল—অস্থির। প্রিয়তমের দর্শনলাভের উপায় কি?" "প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অধরামৃতরস পান করিলাম।" "যমুনায় কি করিয়া জল আনিতে যাই? প্রিয়তমের বাঁশরী আমায় পাগল করিয়াছে।" "তাঁর চক্ষু কি সুন্দর! তিনি আমাকে কামবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন—তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন। বিরহের উত্তাপে আমার জ্বরবোধ হইয়াছে। তাঁহার বিরহে আমি মৃতপ্রায়। প্রভু, আমায় দর্শন-স্পর্শন দাও।"—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত বিহার করিতেছেন, তদ্দর্শনে ভক্ত নরসিং চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, —"চাঁদ, বাতির মত তুমি চঞ্চল হইও না। তোমার জ্যোতি যেন নিষ্প্রভ না হয়। মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হও, আমি আমার প্রিয়তমের মুখপদ্ম সন্দর্শন করি। আজ বড় শুভ রজনী। আমার প্রভু—আমার প্রাণের প্রাণকে আজ আমি লাভ করিয়াছি।"

নরসিং-রচিত "রাসসহস্রপদী" নামক আর একখানি পদাবলী-গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমানে ১২৩টি মাত্র পদ আছে। মূল গ্রন্থখানি বোধ হয় ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায়ের ভাবাবলম্বনে লিখিত। ইহাতে ভাগবতের বর্ণনা ও ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রত্যেক গোপীর নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিলেন—তাঁহার বংশীর সপ্ত সুরে কিরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন উল্লসিত হইল—এই সকল বিষয় নরসিং মধুর ভাবের উচ্ছাসে ও সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। গুজরাতী সাহিত্যে ব্রজ-প্রেমের প্রথম ও প্রধান উৎসই নরসিংএর পদাবলী। "বসন্তনাপদো" গ্রন্থে ফাগোৎসব এবং "হিন্দোলানাপদো" গ্রন্থে দোল-উৎসবের বর্ণনায় নরসিংএর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব সুপ্রকাশিত। ভাগবতের ১০ স্কন্ধ অবলম্বনে নরসিং 'কৃষ্ণ-জন্ম', 'বাললীলা, 'নাগ-দমন', 'দানলীলা', 'মানলীলা', 'সুদাম-চরিত্র' ও 'গোবিন্দগমন' নামক সাতটি দীর্ঘ পদাবলী বিভিন্ন বয়সে গুজরাতী ভাষায় রচনা করেন। গ্রন্থগুলি মূলের অনুবাদ নহে। গ্রন্থকার মূলের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন। মূল সূত্রকে ভিত্তি করিয়া মৌলিক কল্পনার সাহায্যে তিনি এইগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। যাঁহারা মূল ভাগবত পাঠ করেন নাই, এইগুলি কবির মৌলিক রচনা বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইবে। নরসিংএর রচিত "সুরতসংগ্রাম" নামক আর একটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া এই আখ্যায়িকা অপূর্ব্ব। ইহাতে শ্রীরাধিকাপ্রমুখ দশ জন গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া গোপীনাথের হস্তে বন্দী হন। আখ্যানটি সম্ভবতঃ নরসিংএর কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির উজ্জ্বল চিত্র; কারণ, নরসিং সংগ্রামস্থলে 'গীতগোবিন্দ'-প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, এ কথার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্তি ও জ্ঞানের তত্ত্ব বর্ণনাতেই নরসিংএর ভাব ও ভাষার চরম পরিণতি। উক্ত কবির চরিত্রের বিভিন্ন দিকের চিত্র ইহাতে পরিস্ফুট। কবি শুধু ভক্ত ছিলেন না—তিনি পরমজ্ঞানী বা বৈদান্তিকও ছিলেন। জ্ঞান-ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তিনি গাহিয়াছেন:— "স্নান, সেবা, পূজায় কি লাভ? গৃহে বসিয়া দানাদিরই বা সার্থকতা কি? ষড়্‌দর্শন পাঠেরই বা কি ফল—যদি জাতিভেদ না যায়। এইগুলি ত জীবিকা-অর্জ্জনের কৌশলমাত্র।" নরসিং বলেন— "তত্ত্বদর্শন ব্যতীত রত্নচিন্তামণিতুল্য অমূল্য জীবন বৃথা হইল।" তাঁহার বেদান্ত প্রয়োগমূলক। তাঁহার মতে "জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম—এই ভেদজ্ঞান দ্বারা সত্যবস্তু লাভ হয় না। 'আমি' 'তুমি' ভেদ ত্যাগ না করিলে গুরুকৃপা হয় না।"—নরসিং তাঁহার পদাবলীতে আর্যনীতির নির্য্যাস সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন—স্ব-প্রচারিত আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। কর্ম্মজীবনে যাহা তিনি পালন করিয়াছিলেন—তাহাই তিনি ভজনে ও পদাবলীতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণা আজও গুজরাতের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে—তাঁহার বাণী আজও গুজরাতবাসীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ভাবের সরসতায় এবং ভাষার সৌন্দর্য্যে গুজরাতী ভাষায় এখনও কোন কবি নরসিংকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বোপরি ছিলেন—পরম কৃষ্ণ ভক্ত। তাঁহার প্রাণ কৃষ্ণময় ছিল। জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নে তাঁহার মন কৃষ্ণচিন্তা করিত। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ শুধু আকার ও সগুণ মাত্র নহেন, তিনি আবার নির্গুণ ও নিরাকার। সেই কৃষ্ণ সকল নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। নরসিং পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা নিম্নলিখিত স্ব-রচিত ভজনে সুপরিস্ফুট:—

"গগনে নিরীক্ষণ কর; দেখ, কে ইহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া 'আমি সেই', 'আমি সেই' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী শ্যামের চরণে আমি মরিতে চাই; কারণ, ইহলোকে বা পরলোকে কৃষ্ণের তুলনা নাই। অসীম শ্যাম-শোভায় আমি আত্মহারা, অনন্ত উৎসবানন্দে আমার মন চির-নিমগ্ন। জড় ও চৈতন্য এক প্রেমময়েরই প্রকাশ। প্রেমে অনন্ত জীবনকে আশ্রয় কর। শূন্যে দেখ, যেখানে কোটি উদিত রবির জ্বলন্ত জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্ণালোকে ঊর্দ্ধে সপ্তভুবন উজ্জ্বল, সেখানে স্বর্ণময় দোলায় বিরাজিত হইয়া সচ্চিদানন্দ আনন্দ-ক্রীড়া করিতেছেন। তথায় বাতি, তৈল ও সূত্রবিনা চির-প্রদীপ অচল ঝলকে জ্বলিতেছে। এসো, এই নিরাকার পুরুষকে দর্শন করি, কিন্তু এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা নহে। এসো, এই পরমপুরুষের প্রেম-রস পান করি, কিন্তু এই স্থূল জিহ্বায় নহে। এই অজর অবিনাশী পুরুষ অধঃ ও ঊর্দ্ধে ব্যাপ্ত ও বাক্য-মনের অতীত। নরসিংএর প্রভু সর্ব্বব্যাপী। ভক্তগণ প্রেমচক্ষে তাঁহার দর্শন পান—অপরে নহে।"

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

পাটের দুর্দ্দশা

বিগত মহাযুদ্ধের সুযোগে পাটের কারবারে অনেক পেটো মহাজন বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল। অনেকেরই আশা ছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধেও ঐরূপ অর্থাগম হইবে; কিন্তু সে-আশা সফল হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় বর্ত্তমান যুদ্ধের রীতি-নীতি ও গতি-প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন, কালের ব্যবধানে ও কলা-কৌশলের ব্যতিক্রমে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যুদ্ধ-শিল্প ও যুদ্ধকালীন ব্যবসায়-বাণিজ্যের রীতি-নীতি ও গতি-প্রকৃতিও তেমনি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে পাটের দুর্দ্দশার কারণ-পরম্পরা ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বাঙ্গালার কৃষি-সম্পদগুলির মধ্যে ঐশ্বর্য্যে পাটই প্রধান। পাট সদ্য অর্থ-প্রাপ্তির ফসল; এই নিমিত্তই বাঙ্গালার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর পাটের প্রভূত প্রভাব লক্ষিত হয়। পাটের উন্নতিতে বাঙ্গালার যেমন উন্নতি, পাটের অবনতিতে বাঙ্গালার সেইরূপই অবনতি। বঙ্গদেশের প্রধান কৃষিজাত ফসল ধান ও পাট। ধান গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে; পাট বিলাস-ব্যসনের অর্থ প্রদান করে। পাট বঙ্গদেশের প্রায়-একচেটিয়া উৎপন্ন-দ্রব্য। ইহার সামান্য কিছু বিহার ও আসামে উৎপন্ন হয়। পাটচাষের জন্য প্রচুর বারি ও উত্তাপের প্রয়োজন। মাটির সার ভাগ পাট গাছের পুষ্টির জন্য শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়। এই হেতু নদীতীরে—যেখানে প্রতি-বৎসরই নূতন পলিমাটি সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই ইহার চাষ ভাল হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীর-ভূমিতেই ইহার আবাদ ভাল হইয়া থাকে। পাটই বাঙ্গালার প্রধান বণিজ পণ্য। বঙ্গদেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ কলিকাতা-বন্দর দিয়া পরিচালিত হয়। এই কলিকাতা-বন্দর হইতে সমগ্র রপ্তানীর খুঁট-অঙ্ক যদি ১০০ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার ৪৬ অংশ কাঁচা পাট রপ্তানীর এবং ১৪ অংশ পাটজাত দ্রব্যাদির। বাঙ্গালা প্রদেশে অন্যূন ৮৪টি পাটের কল আছে। এই পাটের উৎপত্তি কিংবা মূল্য হ্রাস পাইলে বাঙ্গালার কৃষককুলের দুরবস্থা ঘটে। কৃষককুলই বাঙ্গালার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, এবং তাহাদের উন্নতির উপর বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উন্নতি নির্ভর করে।

গত তিন বৎসর কাল পাটের বিষম দুরবস্থা চলিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্বে, বিশেষতঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ-পাদে পাটের দর ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এই উন্নতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যুদ্ধ-ব্যপদেশে যে পণ্য স্বর্ণ প্রসব করিবে বলিয়াই আশা হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে তাহার দুরবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ আর্থিক বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ফসলের পরিমাণ ৯'৭ মিলিয়ন গাঁইট অনুমিত হইয়াছিল, এবং পাটের কলগুলি সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কার্য্য করিতেছিল; সুতরাং কাঁচা পাটের অঙ্কপরিস্থিতি অনুকূল ছিল। এমন কি, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন সরকার বালির থলির সরবরাহ-কাল ৩০শে এপ্রিল হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখনও কাঁচা পাটের দরের মন্দা স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, বৎসরের অগ্রগতির সহিত বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইতে লাগিল এবং পাটের ব্যবসায় সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপত্তি, মালচালানী জাহাজের অপ্রতুলতা হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যের খর্ব্বতা, য়ুরোপের বিপণি রুদ্ধ, এবং দেশাভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্যাদির ক্রমান্বয়ে উৎপাদন-প্রতিরোধহেতু কাঁচা পাটের চাহিদার স্বল্পতা, পাটের ব্যবসায়কে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। পাট-ব্যবসায় ও পাট-শিল্পের গুরুত্ব এবং উভয়ের অবনতি হেতু সমগ্র প্রদেশের আর্থিক বিশৃঙ্খলার পরিণাম উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালা সরকার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ একটি জরুরি আইন (Jute Regulation Ordinance) জারী করেন, যাহাতে পাট-উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিমাণ ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মরশুমে তৎপূর্ব্ব বৎসরের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক না হয়।

ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে কাঁচা পাটের ব্যবসায়ে আশু উন্নতির সম্ভাবনা অনুমিত হয়। ক্রেতৃবর্গের সঞ্চিত মজুত মাল ঐ সময়ে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, এবং লোকের মনে এইরূপ আশার সঞ্চারও হইয়াছিল যে, কাঁচা পাটের পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদন ও সঙ্গত মূল্যে তাহা বিক্রীত হইবে। জনমতের প্রাবল্যে বাঙ্গালা সরকার বাধ্যতামূলক বিধান পরিহার করিয়া, পাট-উৎপাদন-ক্ষেত্রের স্বেচ্ছামূলক সঙ্কোচেরই ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা ফলে ঐ বৎসরের ফসলের পরিমাণ হয় সর্ব্বোচ্চ—১৩'২ মিলিয়ন গাঁইট! ইতিমধ্যে পরিস্থিতির প্রতিকূল পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং যখন নূতন ফসল বাজারে আমদানী করা হইল, তখন কাঁচা পাটের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় অর্দ্ধেকে নামিয়া আসিয়াছিল! যে মহাদেশিক য়ুরোপ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রপ্তানী পাটের শতকরা ৫৬ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তখন নাৎসী-করতলগত! ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মালচালানী জাহাজের দারুণ অভাবহেতু তখনও উন্মুক্ত বিদেশী-বাজারে মাল পাঠাইবার উপায় ছিল না। রপ্তানী-বাণিজ্যের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, অঙ্কের সাহায্যে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬,৯০,০০০ টনের এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৫,৭০,০০০ টনের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ২,৪৩,০০০ টন! দেশাভ্যন্তরেও চাহিদা কমিয়া যাইতেছিল, কারণ, বৈদেশিক বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের কাট্‌তি-হ্রাস এবং মজুত মালের পরিমাণ-বৃদ্ধি হেতু পাটের কলগুলি কাজ কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বৎসরের মরশুমের ১২,৮৮,০০০ টনের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মরশুমে কলগুলি লইয়াছিল মাত্র ৯,৮৯,০০০ টন!

কাঁচা পাটের মূল্য দ্রুতগতিতে নিম্নাভিমুখী হইয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এরূপ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বাঙ্গালা সরকার পাট-ব্যবসায় ও শিল্প-সংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন একটি জরুরি আইন দ্বারা ফাট্‌কা বাজারে পাটের মূল্য ৬০৲ হইতে ৯০৲, এবং চটের মূল্য ১৩৲ হইতে ২১৲ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; কিন্তু বাজারে পাট ও চট নিম্নতম দর অপেক্ষাও অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ফলে, ফাট্‌কা বাজারের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল। সরকার তখন নিজেই পাট কিনিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা পুরাতন পাট, এবং বহু পূর্ব্বেই তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছিল। সুতরাং কৃষকদের ইহাতে বিন্দুমাত্র সুবিধা হইল না। নূতন পাট

কিনিলে কৃষকদের সুবিধা হইত; কিন্তু নূতন পাটের এক-চতুর্থাংশ মাত্র কিনিতেই বাঙ্গালার এক বৎসরের সমগ্র রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক অর্থের প্রয়োজন হইত। পক্ষান্তরে, মজুত মালের সমষ্টিবৃদ্ধিহেতু চটের বাজারেও ঐ সময়ে মন্দার প্রকোপ তীব্র হইল। পরিশেষে সরকার কলওয়ালাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পাটের ও চটের দর দৃঢ় রাখিবেন; এবং সরকারও ঐ সময়ের মধ্যে কোন আইন জারী করিবেন না। এই বন্দোবস্তের ফলে সঙ্কটের সন্ধিক্ষণ কাটিল বটে, কিন্তু জের মিটিল না।

বিক্রয়ের অভাবে উৎপন্ন মালের মজুত জমা-বৃদ্ধি হেতু কলওয়ালাদের কাঁচা পাটের চাহিদা স্বতঃই হ্রাস পাইল; এবং বৎসরের শেষপাদে কল-পরিচালনা প্রতি মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নূতন পাটের পরিমাণই যে অপরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এরূপই নহে, ইহার অধিকাংশই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর। রপ্তানী ও কলের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট পাটের পরিমাণ হইয়াছিল অত্যন্ত অল্প। কলওয়ালারা নিকৃষ্ট পাটের নিমিত্ত নূতন চিহ্ন (New Mark) এবং অল্প মূল্যের আবদার জানাইলে সরকার তাহাতে অসম্মত হইলেন। এই বিপত্তিকালে ভারত সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। নয়া-দিল্লীতে ভারত সরকারের, পাট-উৎপাদক তিনটি প্রদেশের, এবং পাট-কল সমিতির প্রতিনিধিবর্গের একটি বৈঠকে আলোচনার ফলে নূতন চিহ্নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়; এবং কলওয়ালারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত মূল্যে সাড়ে ৩ লক্ষ গাঁইট ব্যবহারযোগ্য পাট কিনিতে স্বীকৃত হন। এই ব্যবস্থায় কিছু সুফল ফলিল বটে, কিন্তু আধিক অসুবিধার নিমিত্ত কলওয়ালারা নির্দ্ধারিত সমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন না। এই দুই তৃতীয়াংশ অবশ্য তাঁহাদের তদানীন্তন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়াছিল। কলওয়ালাদের এই অসামর্থ্যের ফলে পাটের বাজারে আবার মন্দা দেখা দিল; কিন্তু অন্য দুই একটি কারণে হতাশা ঘটে নাই। প্রধান কারণ এই—বাঙ্গালা সরকারের বাধ্যতামূলক ভাবে পাটক্ষেত্রের আয়তন কমাইবার ঘোষণা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আয়তনের দুই তৃতীয়াংশ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থায় আংশিক ভাবে উদ্বৃত্ত মজুত মালের কিয়দংশ বিক্রীত হইবে আশা হইয়াছিল। পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ইতিমধ্যেই বর্দ্ধিত হওয়ায় কাঁচা পাটের দর অত্যধিক কমিতে পারে নাই; কিন্তু এই আশা-মরীচিকা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, কলওয়ালাদের চুক্তি অসম্পূর্ণ থাকিবার ফলে, উদ্বৃত্ত মজুত মালের সম্পূর্ণ কাটতি ঘটিল না; এবং কাঁচা পাটের দর পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদের শেষ ভাগে রীতিমত আতঙ্কেরই সৃষ্টি করিল!

সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে পাট-শিল্প বালির থলির সরকারী ক্রয়-চুক্তি লাভ করে। কলওয়ালারা কলের কার্য্যকাল পুনরায় বর্দ্ধিত করেন; তাঁহাদের কাঁচা পাটের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের নয়া-দিল্লী বৈঠকের বন্দোবস্ত, চটের মূল্য বৃদ্ধি, এবং বাধ্যতামূলক ভাবে পাটের চাষ-সঙ্কোচনের ফলে পাটের বাজারে আবার উন্নতি লক্ষিত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের উৎপাদনও যথাসম্ভব অল্প হয়; কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মরশুমে ভারত সরকারের প্ররোচনায় বাঙ্গালা সরকারকে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পাটের চাহিদা আশা করিয়া বাঙ্গালা সরকারকে আশ্বাস দেন যে, যদি পাট-চাষ বৃদ্ধির ফলে কাঁচা পাটের মূল্য একটি নির্দ্দিষ্ট হারের নিম্নে পতিত হয়, তাহা হইলে ভারত সরকার সাধ্যানুসারে চাষীকে সাহায্য করিবেন। এই আশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, জাপানের যুদ্ধে যোগদান সত্ত্বেও, বাঙ্গালা সরকার ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এক-তৃতীয়াংশ স্থলে দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে চাষ-বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেন। ফলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সরকারী বিবরণী হইতে বিগত, গতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান বর্ষের উৎপাদন-অঙ্ক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১৯৪০—৪১	১৯৪১—৪২	১৯৪২—৪৩
১৩১.৪৬ লক্ষ গাঁইট	৫৪.৭৪ লক্ষ গাঁইট	৯০.১৪ লক্ষ গাঁইট

বে-সরকারী অনুসন্ধানের ফল বিভিন্ন। পাটব্যবসায়ী-মহলের অনুমান, বর্ত্তমান বর্ষের ফসল ১০০ লক্ষ গাঁইটেরও অধিক হইবে। ইহার সহিত গত বৎসরের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ৩৯ লক্ষ গাঁইট যোগ করিলে পাটের মোট জমা হয় ১৩৯ লক্ষ গাঁইট। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান বর্ষের চাহিদার সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে, সম্ভাব্য প্রয়োজনের পরিমাণ ৮৫ লক্ষ গাঁইটের অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে আনুমানিক অঙ্ক দেওয়া গেল।

রপ্তানী	১৫	লক্ষ গাঁইট
চটকলের প্রয়োজন	৬৫	" "
পল্লীগ্রামের ব্যবহার	৫	" "
মোট	৮৫	" "

যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা এবং তথায় মাল-প্রেরণের নিমিত্ত জাহাজের গতাগতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই বিশ্বাসের উপর উক্ত অনুমান নির্ভর করিতেছে। আমরা আরও আশা করিতেছি যে, চটকলগুলি বর্ত্তমানের ন্যায় এক-দশমাংশ তাঁত বন্ধ রাখিয়া ৫৪ ঘণ্টা কার্য্য করিবে। যদি এইরূপ ঘটে, তাহা হইলে বর্ত্তমান বর্ষের উদ্বৃত্তের অঙ্ক ৫৫ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে; এবং তন্মধ্যে ৩৫ লক্ষ গাঁইট হইবে চটকলগুলির নিয়মানুযায়িক মজুত মাল। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষের শেষভাগে পাটের বাজারে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকিবে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ গাঁইট। এই পাটকে বাজার হইতে দূরে নিশ্চল করিয়া রাখিতে না পারিলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া মূল্যের দৃঢ়তা সংরক্ষণ অসম্ভব।

বিগত এবং গতপূর্ব্ব বৎসর সরকার চটের ক্রয়-চুক্তি করিয়াছিলেন—মরশুমের শেষভাগে যখন সমস্ত পাট কৃষকদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ফলে ঐ সকল ক্রয়-চুক্তি হইতে কৃষকেরা কোন উপকারই পায় নাই। যদি বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের মারফতে মিত্রশক্তি-সমবায়ের প্রয়োজনের পরিমাণানুযায়ী ক্রয়-চুক্তির আদেশ অবিলম্বে সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে চাহিদার দৃঢ়তার সহিত মূল্যের স্থৈর্য্য সম্পাদন সম্ভব হয়। বিদেশে রপ্তানী করিবার নিমিত্ত মালচালানী জাহাজে পাটের জন্য যদি আনুপাতিক অংশ (Quota) অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক স্থান লাভ করা যায়, তাহা হইলেও অধিকতর

রপ্তানীর দ্বারা চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা সম্ভব হয়। এই সমতার উপরেই মূল্যের দৃঢ়তা নির্ভর করে।

সম্প্রতি আরও একটি অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে, সাধারণ ভাবে মূল্য-হ্রাস ব্যতীত কলিকাতা ও মফস্বলের বাজার-দরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। মফস্বল হইতে কলিকাতায় মাল চলাচলের অসুবিধা হেতু কলিকাতায় সরবরাহ কম, এবং মফস্বলে প্রচুর। ফলে, কলিকাতার দর অপেক্ষা মফস্বলে পাটের দর অনেক কম। কলিকাতায় ৬৷৴৬৷৹ টাকা হারে মণের তুলনায় মফস্বলের দর মণ-প্রতি ২।৹ হইতে ৩।৹ টাকা। তিনটি উপায়ে পাট মফস্বল হইতে কলিকাতায় পৌঁছে। প্রথম রেল, দ্বিতীয় ষ্টীমার, এবং তৃতীয় দেশী নৌকা। সাধারণতঃ এই ত্রিবিধ উপায়ে নিম্নোদ্ধৃত পরিমাণ পাট কলিকাতায় ও চটকল-কেন্দ্রে আনীত হয়,—

	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
রেলপথে	৩৮'৬৮ লক্ষ গাঁইট	২৬'৩১ লক্ষ গাঁইট
ষ্টীমারে	৫০'২৭ " "	২৮'৭২ " "
নৌকায়	২'৪০ " "	'৭৯ " "
মোট	৯১'৩৫ " "	৫৫'৮২ " "

সাধারণতঃ রেল এবং ষ্টীমারই অধিকাংশ কাঁচা পাট, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে বহন করে; কিন্তু যুদ্ধ-পরিস্থিতির অভিঘাতে রেল ও ষ্টীমার পূর্ব্বের ন্যায় কাঁচা পাট বহন করিয়া আনিতে পারিতেছে না। সুতরাং নৌকাযোগে অধিকতর পাটব্যবসায় ও শিল্পকেন্দ্রে আনিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেশী নৌকাগুলি যে যথেষ্ট অধিক পরিমাণে পাট বহন করে না, সে দোষ তাহাদের নহে। চটকল ও গাঁইট-বাঁধা কলগুলি নৌকাকে অনুকূল চক্ষুতে দেখে না। পক্ষান্তরে, ষ্টীমার প্রবল প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে কক্ষচ্যুত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-পরিস্থিতিহেতু নৌকাগুলির গতিবিধি কঠোররূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পরন্তু, নৌকাগুলি অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে পাথর প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য-বহনে নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি রেলে অধিকতর পরিমাণ পাট আসিতেছে বটে, এবং ষ্টীমারেও অধিকতর আমদানী সম্ভবপর হইতে পারে, তথাপি নৌকাযোগে পাট আমদানী করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা ব্যতীত, মফস্বল হইতে বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে পাট আমদানী সম্ভব নহে। বাঙ্গালার জাতীয় বণিক্-সমিতি (Bengal National Chamber of Commerce) এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সমীচীন প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছেন। (১) নৌকাগুলির নদীপথে নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা, (২) "অস্বীকার নীতি" (Denial policy) ও শত্রুর অত্যাচার হেতু ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা, (৩) মাঝি-মাল্লাদের নিরাপত্তা এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় আপদ-বিপদের দায়িত্বমূলক সাহায্য (War risks injuries benefits) ব্যবস্থা, (৪) সরকারের তত্ত্বাবধানে অধিকতর পরিমাণে মাল বহন করিবার নিমিত্ত, সরকারের সুপারিশে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক বীমা-হারের লাঘব ব্যবস্থা, এবং (৫) কলিকাতার খাল ও ভাগীরথীর মধ্য দিয়া নৌকা-চলাচলের প্রশস্ততর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

মাল-চলাচলের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার সহিত আর্থিক সুবিধার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেহেতু, জাহাজে মাল-প্রেরকেরা (shippers) বোঝাই মালের হিসাব-পত্রের (Bills of Lading) উপর অগ্রিম টাকা পায়। এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, যদি সরকার কোন বিশ্বস্ত দেশাভ্যন্তরচারী ষ্টীমার-পরিচালক (Recognised in land-steamer service) কিংবা অন্য যান-বাহনপরিচালক সংগঠন (other transport organisation) প্রতিষ্ঠানকে নৌকাযোগে পাট-চলাচল ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-ভার লইতে সম্মত করিতে পারেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্-সমিতি সন্ধান লইয়াছেন যে, আড়াই হইতে তিন শত গাঁইট বহন করিতে পারে—এমন নৌকা বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সহজলভ্য, এবং যদি এইরূপ সহস্র নৌকা পাট বহনের কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মরশুমে ১০ হইতে ১৫ লক্ষ গাঁইট পাট স্থানান্তরিত হইতে পারে; এবং এই কার্য্য যদি রেল ও জলপথের সংযোগস্থলে, রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সাহচর্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা। খুলনা এবং গোয়ালন্দ এই ব্যবস্থার উপযোগী।

মাল-চলাচলের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা সাময়িক সুবিধা প্রদান করিবে মাত্র। পাট ব্যবসায়ের স্থায়ী উন্নতিকল্পে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মালের সদ্ব্যবহার-ব্যবস্থাই অত্যাবশ্যক। শুধু বর্ত্তমান নহে, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মজুত কাঁচা পাটের নিঃশেষে ব্যবহারের ব্যবস্থা সম্পাদন হেতু, আগামী বর্ষে যাহাতে মাত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপাদিত না হয়, তৎপ্রতি কঠোর অনুশাসনের প্রয়োজন। বর্ত্তমান বর্ষে পাটের চাষ অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়াও অবশ্য-প্রয়োজন; এবং পাট-মুক্ত জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রধান কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে কাঁচা পাটের একটি নিম্নতম মূল্যের হার নির্দ্ধারণ অত্যাবশ্যক। কৃষকদের নিকট হইতে পাট ক্রয়ের একটি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা ব্যতীত মূল্যের নিম্নতম হার দৃঢ় রাখিয়া হতভাগ্য কৃষককুলের দুর্দ্দশা দূর করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত লোকেরা দীনহীন বুভুক্ষু কৃষকদের দাদন দিয়া অথবা অন্য প্রকারে অতি অল্পমূল্যে কাঁচা পাট ক্রয় করিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় দ্বারা লাভবান্ হয়। চির-দরিদ্র কৃষকের দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রথার মূলে সবলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন। কাঁচা পাট কৃষকের নিকট হইতেই কিনিতে হইবে; কিন্তু কিনিবে কে? সরকারের সরাসরি এই কার্য্যে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে; কারণ, তাহাতেও অনাচারের সুযোগ ঘটিতে পারে। ক্রয়ের সহিত বাছাই, শ্রেণীবিভাগ, এবং গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার নিকট-সম্বন্ধ। বে-সরকারী ধনী পাটব্যবসায়ীরা ক্ষতির আশঙ্কায় কাঁচা পাট মজুত জমা রাখিতে বিশেষ অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত-বহির্ভূত কারণে ক্ষতি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে, মনে হয়, সরকার যদি পাট ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে, আবশ্যকমত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা দ্বারা, তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন শ্রেণীর পাট ক্রয় ও গুদামজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নিরন্ন কৃষক-প্রজার অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্-সমিতি একটি সমীচীন প্রস্তাব করিয়াছেন। সরকার প্রতিনিধি দ্বারা মফস্বল হইতে পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেই যে মধ্যবিত্ত লোকেরা অপসৃত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই নিমিত্ত সরকার যদি যথার্থ কৃষক-উৎপাদকদিগের মধ্যে প্রথমে পাট-বিক্রয়-অধিকার-পত্র (Jute sale

permits) বিতরণ করেন এবং পরে প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের নিকট হইতেই পাট ক্রয় করে, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত লোকেরা দরিদ্র কৃষকের দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া অতি অল্প মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে পাট কিনিয়া, নিজেরা লাভবান্ হইতে পারিবেন না। এই বিক্রয়-অধিকার-পত্র, নিয়ন্ত্রণ, অথবা মণ্ডল, কর্ম্মচারী (Jute Regulation or Circle Officers) সাহায্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং যাহারা এই বিক্রয়-অধিকার পাইবে, তাহারাই সরকারের প্রতিনিধিগণের নিকট পাট বিক্রয় করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সরকার বা তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গকে মফস্বলের উপযুক্ত সংখ্যক ক্রয়কেন্দ্রে গোমস্তা নিযুক্ত করিতে হইবে; যাহাতে সমস্ত পাট-উৎপাদক মোকামে পাটের দর অযথা হ্রাস না পায়।

এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই যে, সর্ব্বপ্রকার অবিচার হইতে কৃষকসমূহ অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই নিমিত্ত এই পাট-বিক্রয়-পরিকল্পনার নিরঙ্কুশ প্রবর্ত্তন ও পরিচালন হেতু বাঙ্গালা সরকার, ভারত সরকার, পাট-কারবারে সংশ্লিষ্ট-সঙ্ঘ-সমূহ, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কেন্দ্রীয় পাট-সমিতির (Indian Central Jute Committee) প্রতিনিধি লইয়া, একটি উপদেশক-মণ্ডলী (Advisory Body) অথবা ক্রয়সঙ্ঘ (Purchasing Commission) সংগঠন করিতে হইবে। এইরূপ একটি সঙ্ঘ, অথবা মণ্ডলী মফস্বলে কাঁচা পাট ক্রয়ের তত্ত্বাবধান, এবং সুচারুরূপে ক্রয়-পরিচালন হেতু সদুপদেশ দান ও কর্ম্মপন্থার যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশও প্রদান করিতে পারিবেন।

এ সকল ভবিষ্যতের ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে পাট কারবারের আশু দুঃখমোচনকল্পে উৎপাদন-উদ্বৃত্তের যাহাতে বাজারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অধিকতর মূল্য-হ্রাসের কারণ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। চটকলওয়ালাদের গুদামে মজুত মালের অবশিষ্ট ব্যতীত, ১৫ হইতে ২০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট আগামী মরশুমের প্রারম্ভে একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবে;—যদি ইতিমধ্যে এই উদ্বৃত্তকে স্বতন্ত্র ও নিশ্চল করিয়া রাখা না যায়। মণ-প্রতি নিম্নতম মূল্য ৬৲ টাকা ধরিলেও কুড়ি লক্ষ গাঁইট উদ্বৃত্ত পাটকে অন্তরিত ও বহির্ভূত করিয়া রাখিতে, বাঙ্গালা সরকারের প্রায় ছয় কোটি টাকার প্রয়োজন। বাঙ্গালা সরকার, ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুসারে গত মরশুমে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাট-চাষের অনুমতি দিয়াছিলেন। উহার ফলেই এ বৎসর অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপাদিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পাট ব্যবসায়ের কল্যাণার্থ উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে নিশ্চল রাখিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য প্রদান করাই ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। এ টাকা অপব্যয় হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ, আগামী বর্ষে উৎপাদন কম করিতে পারিলে উদ্বৃত্ত মজুত পাটের চাহিদা হইবে, এবং তাহা বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় অপেক্ষা অল্প হইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় পাটের অপ্রাচুর্য্যহেতু মূল্যাধিক্য, এবং মফস্বলে তাহার প্রাচুর্য্যহেতু মূল্যহ্রাসজনিত সমস্যার একমাত্র সমাধান মাল-বহনের সুবন্দোবস্ত। এই উদ্দেশ্যে গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভারতের বাণিজ্য-সচিব তাঁহাদিগকে মাল-চলাচলের যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দিয়াছেন, এবং কৃষক-প্রজাদিগের অবিক্রীত পাটের উপর যত দিন না বিক্রয় হয়, তত দিনের জন্য ঋণ প্রদানের নিমিত্ত দুই কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারও এই উদ্দেশ্যে আরও অর্দ্ধ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন; কিন্তু এই ঋণে কৃষকগণের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ পাট যদি তাহারা পেটের দায়ে বিক্রয় না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঋণ এবং সঞ্চিত পাটবিক্রয়-লব্ধ অর্থ এই উভয়ই তাহারা খরচ করিয়া ফেলিবে। তাহাতে তাহাদের ঋণের এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার ভার লঘু না হইয়া অধিকতর দুর্ব্বহই হইবে। কৃষক-প্রজাদের যথার্থ কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে সরকারকে মফস্বলে গুদাম ভাড়া করিয়া, তাহাতে পাট বন্ধক রাখিয়া ঋণ দান করিতে হইবে। বর্ত্তমান মূল্যের সমানুপাতে এই ঋণ দিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাহাদের লভ্যাংশ তাহাদিগকে প্রদান করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক পাট কিনিবার প্রস্তাব ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল রায়

ভারতীয় যে সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইতেছিল, বুন্দেলার বা বুন্দেলখণ্ডের মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল রায় তাঁহাদের অন্যতম। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিষ্টার কে, পি, যশোয়াল তাঁহার কাহিনী জনসমাজের গোচর করিয়াছেন। যে সময়ে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ধর্ম্মান্ধ বাদশাহ ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার অল্প দিন পরেই বুন্দেলা-রাজপুতকুলে এই মহাবীর হিন্দু ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংরক্ষণের জন্য সুশাণিত কৃপাণ হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যজীবনের বিবরণ সাধারণের অজ্ঞাত; কেবল জনশ্রুতিতে প্রকাশ, তাঁহার শৈশবকালে কোন জ্যোতিষী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এই বালক ভবিষ্যতে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্ভর করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখেন—ছত্রশাল। ছত্রশালের অর্থ ছত্রপতি বা সার্ব্বভৌম সম্রাট্। তাঁহার সমসাময়িক হিন্দী-কবিগণের অনেকে তাঁহার প্রসঙ্গে অনেক কথার উল্লেখ করিলেও কেহই তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম হিন্দী কবিভূষণ তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তাঁহার সৈন্য এবং সেনা বিভাগ রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে, এরূপ বীরপুরুষ সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে কেহই ছিল না। তিনি যুদ্ধে মোগল-বাহিনীকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন।" তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদল অতীব পরাক্রান্ত ছিল। কিন্তু শিবাজীকে প্রেরণা দানের জন্য রামদাস যেমন তাঁহার গুরু ছিলেন, —মহারাজ ছত্রশালকে প্রেরণা দানের জন্য তাঁহার সেরূপ কোন গুরু ছিলেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে তিনি যে স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ছত্রশাল রায় বুন্দেলার যে রাজপুত-বংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ অর্চ্ছা নামে অভিহিত হইত। তাঁহার পিতার নাম চম্পৎ রায়। চম্পৎ রায়ের পূর্ব্বপুরুষ মহেবা নামক একটি ক্ষুদ্র জায়গীর লাভ করিয়া তাহারই উপস্বত্বে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কারণ, জায়গীরের যে অংশটুকু তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক আয় ছিল—সাড়ে তিন শত টাকা মাত্র। ডামোয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর হীরালাল, তাঁহার ডামোয়া-দীপিকায় লিখিয়াছেন, চম্পৎ রায়ের দৈনিক আয় ছিল—পনর আনা মাত্র। এইরূপ দরিদ্র চম্পৎ রায় মহা পরাক্রান্ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষায় পশ্চাৎপদ হন নাই। ইনি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। তখন মহারাজ ছত্রশাল রায়ের বয়স অত্যন্ত অল্প। চম্পৎ রায় প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইলেও তাঁহার অর্থবল ছিল না। এ জন্য তিনি সৈন্যরক্ষণে অসমর্থ ছিলেন। তবে বুন্দেলার রাজপুতগণ ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে অতিশয় উত্ত্যক্ত হওয়ায় তাঁহাকেই নেতৃপদে বরণ করিয়া সদলে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল-পরাক্রান্ত মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধে চম্পৎ রায় যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও বুন্দেলার রাজপুতগণকে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্জ্জীব হইয়া পড়েন নাই। রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধে মোগল-সৈন্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

চম্পৎ রায়ের পুত্র ছত্রশাল রায় শৈশবে পিতৃহীন হইয়া বিধবা জননী কর্ত্তৃক অতি কষ্টে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। নিঃস্ব জায়গীর-দারের পুত্রের জীবনকাহিনী কেহ লিপিবদ্ধ না করিলেও ডামোয়া অঞ্চলে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ছত্রশাল ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন জ্যোতিষী তাঁহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

ছত্রশাল অল্পবয়সে পিতৃহীন হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী তাঁহাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দানের ত্রুটি করেন নাই। পারিবারিক গুরুর নিকট ছত্রশাল সাহিত্য ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং জননীর উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এক বার এক ব্যক্তি একটি ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তুমি ছত্রশাল (চক্রবর্ত্তী মহারাজ) কেবল তোমার মুখের জোরে, কারণ, এক অঙ্গুলি পরিমাণ জমিও তোমার নাই।" সেই কবিতার উত্তরে ছত্রশাল হিন্দী ভাষায় একটি সুললিত কবিতা লিখিয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এই—

"হাঁ মহাশয়, জ্ঞানের শিক্ষক আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অহঙ্কার ঠিক পথ নহে। কিন্তু যে দেবতার বাহন গরুড়, তাঁহার সেবাই ঠিক পথ। তিনিই কেবল নাম প্রদান করেন, এবং তাঁহার ভক্তকে রূপান্তরিত করেন। তিনিই অতি দীন সুদামকে রাজ্যেশ্বর করিয়াছিলেন, বিদুরকে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন, এবং কুব্জাকে সৌন্দর্য্যদান করিয়াছিলেন। আমি বলি, তিনিই কি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন নাই? না, পাষণ্ড হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ভক্তের প্রতি তাঁহার অঙ্গীকার পালন করেন নাই?" তাঁহার স্বরচিত এই কবিতা যেমন তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক, উহা তেমনই তাঁহার সুদৃঢ় বিষ্ণুভক্তিরও পরিচয় প্রদান করে। তিনি অল্প বয়সেই এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুর প্রতি গভীর ভক্তি—বিষ্ণুই তাঁহার ভক্তদিগকে সর্ব্ব প্রকার আপদ-বিপদে রক্ষা করেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপা লাভ করিলে তিনি বুন্দেলখণ্ডের সুদাম হইতে পারেন,—এই অবিচলিত বিশ্বাসই তাঁহার উন্নতির মূল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি কোথায় কিরূপে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তিনি একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ, রাজনীতিক ও অতিশয় বিষ্ণুভক্ত হইলেও অরিন্দম পুরুষসিংহ ছিলেন, প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের সহিত সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী একাধিক বার তাঁহার কণ্ঠ জয়মাল্যে সুশোভিত করিয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীও এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। শিবাজীকেও কিছু দিন মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য-ভারতের দুর্গম মরু-কান্তারের এই পুরুষসিংহকে কোন দিনও মোগল বাদশাহের বা অন্য কোন বিধর্ম্মী শাসন-কর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় নাই। ঔরঙ্গজেব যখন স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অতিরিক্ত গোঁড়ামীর জন্য অমুসলমান ব্যক্তিদিগকে বল-পূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বুন্দেলার এই পিতৃহীন সহায়-সম্পদ্-বর্জ্জিত রাজপুত বালক স্বদেশের মুষ্টিমেয় দরিদ্র রাজপুতগণকে লইয়া প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহকে বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল—তিনি বিষ্ণুবিদ্বেষী বাদশাহের এই ঘৃণ্য কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্যই ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজা ছত্রশাল সে কার্য্যে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা য়ুরোপীয় বুধগণও স্বীকার করেন, সেই জন্য Encyclopoedia Britannicaতেও লিখিত হইয়াছে।

Under Champat and his son Chitrashal the Bandalas offered a successful ressitance to the proselytising efforts of Aurangzeb অর্থাৎ বুন্দেলার রাজপুতগণ চম্পৎ রায় এবং তাঁহার পুত্র ছত্রশালের নেতৃত্বে ঔরঙ্গজেবের ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টায় বাধা দিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই স্বয়ংসিদ্ধ রাজপুত বীর কি প্রকার সমরকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাত বলিয়াই এই মহাবীরকে লোকে অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু ক্রমওয়েল নামে অভিহিত করে। ইনি ষোল বৎসর বয়স হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বহু যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

ইনি কোন্ সময়ে রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৈতৃক জায়গীরের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন্ সময় 'রাজা' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও অজ্ঞাত। তবে ডামো জিলার সংগ্রামপুরে একটি সোপানযুক্ত ইঁদারা-গাত্রে এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ আছে যে, রাজা ছত্রশালের শাসনকালে উহা প্রতিষ্ঠিত। উহার তারিখ ১৭৩৫ সম্বৎ,—অর্থাৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয়, ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার সময়েই জায়গীরদার ছত্রশাল রায় রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ডামো জিলার কুণ্ডলপুর গ্রামস্থ কোন জৈন-মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—১৭৫৭ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা

ছত্রশাল—'মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলেই ঐ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধর্ম্মান্ধ মোগল-বাদশাহ ঔরঙ্গজেব অমুসলমান ভারতবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার কত বার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। তবে ঐ অঞ্চলে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ছয়-সাত বার অপেক্ষা অল্প বার যুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল যুদ্ধে কোনটিতেই মোগল-বাহিনী জয়লাভ করিতে পারে নাই। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। তিনি আপনাকে বিষ্ণুর দাস মনে করিতেন বলিয়াই কোথাও জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন নাই। বুন্দেলার রাজপুতগণ বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন না। জাতীয় কীর্ত্তিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন না। যাহা হউক, ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে জৈইৎপুর নামক স্থানে মহারাজ ছত্রশালের সহিত দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে মহম্মদ শাহ ৮০ লক্ষ অশ্বারোহী এবং বহু লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ গিরধর বাহাদুর ও দয়া বাহাদুর নগর নামক দুই জন হিন্দু সেনাপতিকে ছত্রশালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিপুল মোগল অনীকিনী বীরদর্পে ক্ষুদ্র বুন্দেলা অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র বুন্দেলখণ্ড এবং মালোয়ার আর রক্ষা নাই! কিন্তু বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছত্রশালকে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে দেখা যায় নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাদশাহী সৈন্যচমূকে বাধা দানের জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হিন্দী কবিতায় লিখিত একখানি পত্রে মহারাষ্ট্র-নায়ক বাজীরাও পেশোয়াকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ছত্রশাল ইতোমধ্যে মুসলমান সৈন্যদিগকে বাধাদানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অতঃপর পেশোয়া বাজীরাওয়ের সৈন্যমণ্ডলী সহসা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে জৈইৎপুরের যুদ্ধে তিনি মোগলবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মোগলসৈন্যগণ সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহাই মোগলসৈন্যের সহিত ছত্রশাল রায়ের শেষ যুদ্ধ। প্রকাশ, এই জৈইৎপুরের যুদ্ধে মোগলসৈন্যদিগকে ৮০ টাকা সের মূল্যে আটা কিনিতে হইয়াছিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের মৃত্যু হয়। ইনি ন্যূনকল্পে ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া বুন্দেলখণ্ডের কীর্ত্তি ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের কতগুলি কীর্ত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের এবং স্থাপত্য-রুচির পরিচয় বিঘোষিত করিতেছে। রাণী কমলাবতীর স্মৃতি-মন্দির তাহাদের অন্যতম। ইহা অনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এরূপ সুদৃশ্য ও সুনির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির সমগ্র ভারতে তাজমহল ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। ইহার পার্শ্বেই রাজা ছত্রশালের স্মৃতি-মন্দির। ইহা তিনি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পুত্র ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

ছত্রশালের মহিষী কমলাবতীর মৃত্যুকাহিনী অতিশয় সকরুণ ও বেদনাপূর্ণ। রাজ্ঞী কমলাবতীর পতিপ্রেম অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। এখনও যুক্তপ্রদেশ হইতে বিহার পর্য্যন্ত—গোয়ালিয়র হইতে মালোয়া পর্য্যন্ত হিন্দুনারীরা রাণী কমলাপত্তের (কমলাবতীর অপভ্রংশ) গৌরব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। সেই কবিতার মর্ম্ম এই যে—"রাণী বলিতে রাণীর শ্রেষ্ঠ কমলাপৎ। অবশিষ্ট সকলে কেবল সম্মানের ভারবাহিকা মাত্র। রাজা বলিতে রাজা ছত্রশাল, অন্য সকলে ক্ষুদ্র নরপতি। হ্রদের মধ্যে ভূপালের হ্রদই প্রকৃত হ্রদ, অবশিষ্ট হ্রদ-সমূহ পুষ্করিণী মাত্র।"

বলিয়াছি, রাণী কমলাবতীর মৃত্যু-কাহিনী অতীব সকরুণ। রাজা ছত্রশালের বুদ্ধির দোষেই এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ছত্রশাল একদা শিকারে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শোণিতসিক্ত পরিচ্ছদ রাণী কমলাবতীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, রাজা ছত্রশাল শিকারে গমন করিয়া সিংহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছেন। সেই রক্তাক্ত বস্ত্র রাজপ্রাসাদে পৌঁছিলে রাণী তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি অনুমৃতা হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ চিতা-শয্যার আদেশ করিলেন। কাহারও বাধা মানিলেন না। সংবাদটি সত্য কি না, তাহার অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিলেন না! অবিলম্বেই চিতা সজ্জিত হইল। রাণী চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সেই অনুপম বরবপু ভস্মে পরিণত করিল। রাজ্ঞীর কোন হস্ত, এমন কি, একটি অঙ্গুলিও কম্পিত হইল না। চিতা যখন নির্ব্বাণপ্রায়, রাজা ছত্রশাল ঠিক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ললাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি সেই চিতাগ্নিতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। রাজ্ঞী কমলাবতীর পুণ্য-স্মৃতির সংরক্ষণ-কল্পে তিনি তাঁহার শিকারস্থলের সান্নিধ্যে একটি হ্রদ এবং সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং সেই হ্রদে কমল রোপণ করিয়াছিলেন। স্থানটি অতি সুন্দর এবং সেই দৃশ্য অতীব প্রীতিকর।

রাজা ছত্রশাল অতীব ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিরতিশয় ভক্ত ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। হিন্দী কবি বলভদ্র স্বকীয় চেষ্টায় সাফল্যলাভে সমর্থ ব্যক্তির কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রকাশের পর উপসংহারে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, "পাঠক, তুমি ছত্রশালের সারা জীবনের ক্রিয়াকলাপ স্বকীয় মানস-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখ। পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, কার্য্যারম্ভ করিবার যোগ্য সম্বলে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত, সৈন্যহীন, সজ্জাশূন্য, রাজনীতিক্ষেত্রে সহায়হীন হইয়াও কেবলমাত্র সাহসে নির্ভর করিয়া ছত্রশাল তাঁহার রাজ্য এবং গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।" তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাঁহাকে 'মধ্য-ভারতের শিবাজী' নামে অভিহিত করিতেন। শিবাজী অপেক্ষা তাঁহার বয়স প্রায় ২১ বৎসর কম ছিল।

মহারাজ ছত্রশাল অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। পেশোয়া বাজীরাওকে তিনি 'ধর্ম্মপুত্র' বলিতেন। বাজীরাও তাঁহাকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন। মৃত্যুকালে মহারাজ ছত্রশাল তাঁহার রাজ্যের একাংশ জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাগ হিসাবে পেশোয়াকে দান করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দুই অংশ তাঁহার ঔরসজাত দুই পুত্র পাইয়াছিলেন। বরং বাজীরাও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হিসাবে কিছু অধিক সম্পত্তিই পাইয়াছিলেন।

রাজা প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণের জন্যই প্রাচীন পন্নার নিকট একটি হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা বিষ্ণুর দান বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একাধারে পরমভক্ত এবং শূর সর্ব্বত্রই অতি দুর্লভ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি

ছেলেবেলায় আমরা যে-সব ভূগোল পড়িয়াছি; এবং সে-ভূগোলের বিদ্যাকে সুস্পষ্ট ও ভারী করিয়া তুলিতে দেশী-বিলাতী যে-সব ম্যাপ আমাদের সামনে ধরা হইত, আজ এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় বুঝিতেছি,

প্রশান্ত মহাসাগর—পূর্ব্বাংশ

সে ভূগোল এবং সে ম্যাপ কতখানি ফক্কিকারী আর ধাপ্পা চালাইয়াছে! সে-ভূগোল পড়িয়া এবং সে-ম্যাপ দেখিয়া জানিতাম, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আছে শুধু জাপান; অষ্ট্রেলিয়া; এবং নিউ-জীলাণ্ড; সুমাত্রা, যব, বোর্ণিয়ো, সেলিবিশ এবং ফিলিপাইনস্; আর আছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অথই অসীম জল আর জল! তাই পার্ল-হার্বারে যুদ্ধ; আর নিউ-গিনি, পাপুয়া, ফিলিপাইনস্ এবং অষ্ট্রেলিয়ার উপর জাপানের এতখানি লক্ষ্য দেখিয়া আমরা যেমন দিশাহারা, তেমনি আশ্চর্য্য হইয়াছি! তার পর এখনকার যুদ্ধ-সংস্থান বুঝিতে নূতন ম্যাপে দেখিতেছি, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঐ ক'টি দ্বীপই শুধু আছে, তা নয়! ও-বুকে ছোটয়-বড়য় মিশিয়া দ্বীপ আছে প্রায় দু' হাজার! বিভিন্ন দ্বীপ বিভিন্ন জাতির অধিকারে। এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে আছে ব্রিটিশ; মার্কিন; ফরাসী; ডাচ; এবং জাপানী।

জাপানীদের অধিকৃত দ্বীপের সংখ্যা ১৪৮৩টি। তার মধ্যে বড় এবং মাঝারি দ্বীপের সংখ্যা ৬২৩; এই ছোটখাট দ্বীপ ৮৬০!

যে দ্বীপগুলি জাপান অধিকার করিয়া আছে, সেগুলির অবস্থান এমন কায়েমি যে, প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি-কাঠি জাপানের হাতে, এ-কথা বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না!

জাপান তার অধিকার-ভুক্ত দ্বীপগুলি হইতেই হাওয়াই, ফিলি-পাইনস্, ডাচ-ইণ্ডীজ এবং অষ্ট্রেলিয়া-অধিকৃত দ্বীপগুলিতে হানা দিবার সুযোগ পাইয়াছে চমৎকার! এই সব দ্বীপের দৌলতে জাপান প্রকৃতপক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আজ দুর্দ্ধর্ষ। কি করিয়া এ সব দ্বীপে জাপান স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল, সে-কাহিনী রোমান্সের মতো বিচিত্র।

তিনিয়ান, পোনাপি, কুশাই এবং মাইক্রোনেশিয়ার বাহিরে ঈষ্টার এবং অন্যান্য বহু ছোট দ্বীপে আজো যে-সব প্রাচীন তৈজস ও আসবাব-পত্র গিরি-শিলা-লিপি এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সবের ভাস্কর্য্য ও কারু-কৃতিত্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান আছে। এ সব কীর্ত্তি কোন্ প্রাচীন জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিয়া আজো বহু সহস্র যুগ ধরিয়া বিদ্যমান আছে, ঐতিহাসিক অনুশীলনে তার কোনো সন্ধান মিলে নাই।

সে জাতির পর এ-সব দ্বীপে পলিনেশিয়ান জাতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এখনকার পলিনেশিয়ানরা আদি-পূর্ব্বপুরুষের কোনো সংবাদ জানে না।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতিগুলি বহু সন্ধানের পর বলিতেছেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে মলয়-দ্বীপপুঞ্জ হইতে পলিনেশিয়ান জাতির বহু স্ত্রী-পুরুষ এই সব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করিতে আসিয়াছিল। এসিয়া হইতে নানা জাতি মলয়-দ্বীপে আসিয়া ভিড় জমায়। তাদের তাড়ায় ইহারা মলয় ত্যাগ করিয়া এই-সব দ্বীপে আসিয়া নিরাপদ আস্তানা পাতিয়াছিল।
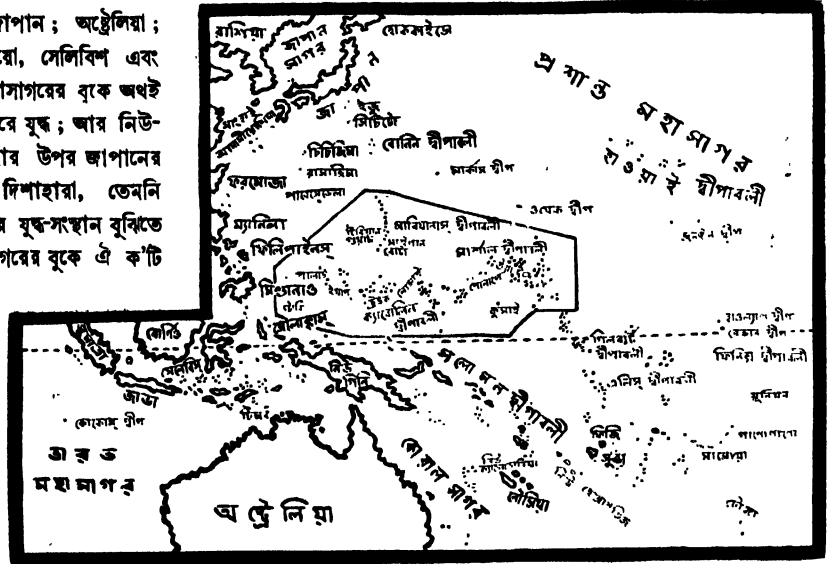
প্রশান্ত মহাসাগর—পশ্চিমাংশ

বাহু-বলের সঙ্গে অস্ত্র-বল মিলিয়া মলয়ের আদিম অধিবাসীদের মলয়-ছাড়া করিয়াছিল। মলয়বাসীদের অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল পাথরের তৈয়ারী —এসিয়াবাসী ঔপনিবেশকের দল মলয়ে আনিল নানা ধাতুর অস্ত্রশস্ত্রে

সজ্জিত হইয়া। ধাতুর কাছে পাথরের অস্ত্র পরাভব স্বীকার করিল। এবং মলয়বাসীরা বড় বড় নৌকায় চড়িয়া সাগরের বুক বহিয়া দিক্‌দিগন্তে সরিয়া পড়িল। এমনি করিয়া এ-সব দ্বীপে পলিনেশিয়ান জাতির আবির্ভাব।

তার পর বহু বৎসর ধরিয়া কয়েকটি দ্বীপে পলিনেশিয়ানরা আচারে-ব্যবহারে খাঁটা মলয়ের মতো ছিল; অন্ত জাতির সহিত বিবাহ-সূত্রে

গ্রাম্য ক্লাবগৃহ—ইয়াপ্‌

নিজেদের আবদ্ধ করে নাই। মাইক্রোনেশিয়ায় কিন্তু এ নিষ্ঠা রক্ষা পায় নাই। তার কারণ, তার অবস্থান। মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে জাপান; পশ্চিমে চীন এবং ফিলিপাইন্‌স্‌; দক্ষিণ-পশ্চিমে বোর্নিয়ো, সেলিবিশ ও নিউ-গিনির মতো সমৃদ্ধ তিনটি দ্বীপ; সর্ব্ব-দক্ষিণে গোলোকধাঁধার মতো মেলানেশিয়া দ্বীপ; এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে পলিনেশিয়া। এ সব দ্বীপের সঙ্গে মাইক্রোনেশিয়া নিজেকে সম্পর্ক-চ্যুত রাখিতে পারিল না। প্রথমে ব্যবসায়-সূত্র ধরিয়া মেলামেশা; তার পর সেই সূত্র বিবাহ-নিগড়ে মিলিয়া মাইক্রোনেশিয়ানদিগকে সংযোগ-সম্পর্কে নানা রূপে গড়িয়া তোলে। তার ফলে মাইক্রোনেশিয়ায় কোনো জাতি গড়িয়া উঠিল পীতাভ মোঙ্গোলোয়ড ছাঁচে; কোনো জাতি মেলানেশিয়ানের মিষ কালো রঙে হইল কৃষ্ণবর্ণ; কোনো জাতির গঠন হইল চীনা-প্যাটার্ণের; কোনো জাতি হইল জাপানী। সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতেও বিপ্লব ঘটিয়া গেল। চীনা, জাপানী-ফিলিপো, মেলিনেশিয়ান, মলয়, এমন কি ভারতের হিন্দুস্থানী ভাষাও এখানে সমান তেজে চলিয়াছে। এই সব ভাষা ধরিয়া মাইক্রোনেশিয়ানদের বংশ-পরিচয় আজ সহজ-লভ্য হইয়াছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য-জগৎ হইতে মাগেলান আসেন এ-পথে। তিনি আসিয়া মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। এত কাল এ সব দ্বীপের অস্তিত্ব পাশ্চাত্য জাতির অজ্ঞাত ছিল। মাগেলান আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ দ্বীপের নাম দেন লাটান সেইলাশ দ্বীপপুঞ্জ। এখানে গুয়ামা দ্বীপের অধিবাসীরা লুঠপাট করিয়া তাঁর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। মাগেলান্‌ কোনো মতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান; এবং রাগে তিনি তখন লাটান সেইলাশ নাম বদলাইয়া এ-দ্বীপের নাম দেন লাড্রোন্‌স্‌ (চোরের আড্ডা)।

এ ঘটনার প্রায় এক শত বৎসর পরে স্পেন হইতে এক দল পাদরী আসিয়া এখানে আস্তানা পাতেন। স্পেন-রাজের বিধবা পত্নী মারিয়ানার নামে তাঁরা এ দ্বীপের নাম-করণ করেন।

জেশুইট্‌ পাদরীদের আগমনের পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দুঃসাহসী বেপরোয়া স্পানিশ-পর্য্যটকদের যাতায়াতের মাত্রা বাড়িল। এবং এ সব দ্বীপ হইতে তারা যাহা পাইত, লইয়া গিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের পথ-প্রসারণে উদ্যোগী হইল।

তার পর সার জর্জ্জ গ্রে নামে এক জন ইংরেজ রাজনীতিক সঙ্কল্প করেন, এই সব অরাজক বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিকে কোনো মতে বৃটিশ পতাকা-তলে আনিতে পারিলে প্রচুর সমৃদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু তাঁর এ সঙ্কল্প মনে উদয় এবং মনে বিলীন হইল। ইতিমধ্যে জাপানে ঘটিল অভ্যুদয়! জাপান এই সব দ্বীপে অধিকার-স্থাপনে উদ্যোগী হইল।

ইংরেজ এবং মার্কিন জাতি ভাবিল, আলস্য বা অবহেলার সময় আর নাই। এ দুই জাতিও তখন কোমর বাঁধিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঐ যে সব বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ—ওগুলিকে লইতে হইবে।

স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ চার্লসটন গুয়ামের বন্দরে আসিয়া সেখানকার স্পানিশ-দুর্গের সামনে কামানে

ঘাসের ঘাগ্‌রা—ইয়াপ্‌

তোপ দাগিল। দুর্গটি ছিল প্রাচীন এবং নামেই শুধু দুর্গ। মার্কিনের তোপের উত্তরে স্পানিশ দুর্গ হইতে কামানের সাড়া জাগিল না;

তার পরিবর্তে বড় একখানি নৌকায় চড়িয়া দুর্গ হইতে কয়েক জন স্পানিশ-কর্মচারী আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিল, দুর্গে একটিও বন্দুক বা কামান নাই। তারা বলিল, তারা জানে না যে, স্পেনের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিয়াছে। সুতরাং চক্ষের পলকে গুয়াম আসিল আমেরিকার হাতে।

যুদ্ধ-শেষে আমেরিকা কিন্তু সমগ্র স্পানিশ-মাইক্রোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন্‌স্ লইয়া দুশ্চিন্তায় পড়িল! এ সব দ্বীপ লইয়া বড় বড় মার্কিনী রাজনীতিকের দল রায় দিলেন, যে-দ্বীপ রক্ষা করিতে যুদ্ধ-জাহাজে অসম্ভব ব্যয়, তাহার উপর মমতা উচিত হইবে না! অথচ পাকা ফলের মতো অনায়াসে এত-বড় দ্বীপ হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও মূঢ়তা! তখন রফা হইল—ফিলিপাইন্‌স্ এবং গুয়াম রাখিল আমেরিকা; এবং মাইক্রোনেশিয়ার অবশিষ্ট অংশ স্পেনকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর সঙ্গে গোপনে স্পেনের ব্যবস্থা পাকা—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জার্ম্মাণী খানিকটা স্থান চাহিতেছিল; সেখান হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি গড়িয়া তুলিবে, সেই জন্ত। কাজেই আমেরিকার কাছ হইতে মাইক্রোনেশিয়ার অবশিষ্ট-অংশ ফিরিয়া পাইবামাত্র স্পেন এ-সব দ্বীপ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডলার দামে জার্ম্মাণীকে বেচিয়া দিল।

জার্ম্মাণী তখন চকিতে কেরোলাইন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে কেব্‌ল্-ষ্টেশন গড়িয়া তুলিল—কুশাই দ্বীপের দিকে মার্কিনের গতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু জার্ম্মাণী টিঁকিল না। জাপান জার্ম্মাণীকে বিতাড়িত করিল। গত বারের মহাযুদ্ধে মিত্র-শক্তির নামে জাপান জার্ম্মাণ-মাইক্রোনেশিয়া আক্রমণ করিল।

সে যুদ্ধের অবসানে যে সন্ধি হইল, সেই সন্ধির সর্ত্তে লীগ-অফ-নেশন্‌স্ জাপানের হাতে মাইক্রোনেশিয়ান্ দ্বীপগুলিকে তুলিয়া দেয়। এমনি করিয়া মার্কিনের মাঝখানে জাপান নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল।

মাইক্রোনেশিয়ার অবস্থান যেন কুঠারের মতো! এ কুঠারের ধারালো একটি প্রান্ত আছে হাওয়াইয়ের সামনে, আর এক-প্রান্ত ফিলিপাইন্‌স্, ডাচ-ইণ্ডীজ এবং অষ্ট্রেলেশিয়ার সামনে। এ কুঠারের বাঁট ধরিয়া আছে জাপান!

গত বৎসর ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হাওয়াই দ্বীপের গায়ে জাপান এ-কুঠারের আঘাত হানিল। পূর্ব্বদিককার ধারালো প্রান্ত মার্কিন নৌ-শক্তিকে অনেকখানি জখম করিয়াছে। তার পর ও-প্রান্তে আঘাত হানিয়াছে ফিলিপাইন্‌স্ এবং ডাচ্-ইণ্ডীজের গায়ে।

জাপান যে এখন আমেরিকার গায়ে কুঠার হানিতে চায়, তার আভাস পাওয়া যাইতেছে। জাপান চায় হাওয়াই ফুঁড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এবং পানামা-খালে কুঠার চালাইতে।

কি করিয়া আভাস মিলে, তাহা বুঝিতে হইলে এ-কুঠারটিকে অনুশীলন করিতে হয়। জাপানের এ-কুঠার বা শক্তির সীমানা দৈর্ঘ্যে ১৮০০ মাইল। এই আঠারো শত মাইলের মধ্যে আছে মারিয়ানা; এবং এ কুঠার সরাসরি উত্তরে একেবারে সেই জাপান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ-লাইনে আছে বোনিন এবং ইজু দ্বীপ।
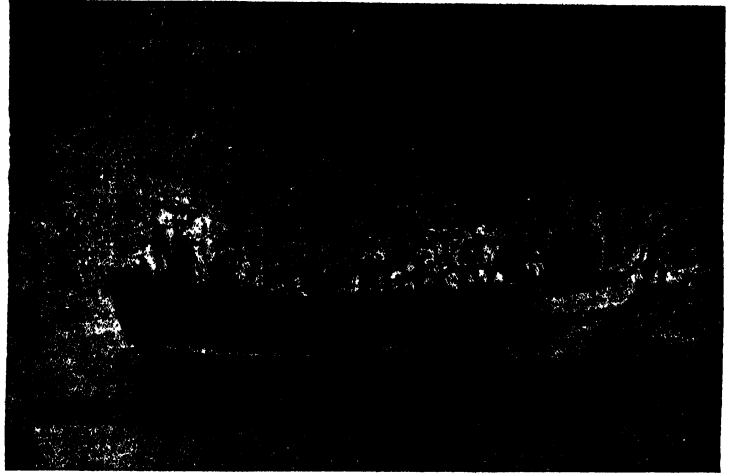
বোনিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আছে। এ দ্বীপ এক দিন ইংরেজের অধিকারে ছিল; তার পর আমেরিকার হাতে যায়।

শাইপানে জাপানী যাত্রী

জাপান হইতে কাঠ চলিয়াছে শাইপানে

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ক্যাপটেন ফ্রেডরিক উইলিয়াম বীচ্ এ-দ্বীপটিকে ব্রিটিশ-রাজ তৃতীয় জর্জের নামে অধিকার করিয়া ছিলেন। তবু বহু বৎসর যাবৎ আমেরিকাই ছিল এ-দ্বীপের দণ্ডমুণ্ডধর। এ দ্বীপের কর্তৃত্ব ছিল এক জন মার্কিনের হাতে। তাঁর নাম ছিল নাথানিয়েল মার্কিন কুমোডোর পেরি তখন বোনিনে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। এ দ্বীপে কয়লার আড্ডা খুলিলে প্রশান্ত মহাসাগর-বাহী জাহাজ-ষ্টীমারের যাতায়াতের পক্ষে বহু সুবিধা হইবে।

কিন্তু কি করিয়া তা হয়? দ্বীপের মালিক ইংরেজ? না, মার্কিন? পেরির মনে সমস্যা জাগিল। মার্কিন সাভোরি তখন সে দ্বীপে রাজ্য করিতেছেন। দ্বীপের বুকে মার্কিন পতাকা—আইন-কানুনও মার্কিনী। তিনি ওয়াশিংটনে চিঠি লিখিলেন। লিখিলেন, লুচু দ্বীপে মার্কিন শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হোক। বোনিনকে করা হোক কোলিং-ষ্টেশন। চিঠিপত্র চলিতেছে, এমন সময় জাপান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লুচু এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফরমোশা অধিকার করিয়া বসিল। অধিকার করিয়া তারা লুচুর নাম দিল রাইয়ুকিউ; ফরমোশার নাম দিল তাইওয়ান্।

বন্দর-রচনা—গুয়াম্

তার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বৃটেন এবং আমেরিকাকে জাপান দিল নোটিশ—"বোনিন আমাদের। বোনিন প্রথম আবিষ্কার করে এক জন জাপানী—১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে। তার নাম ছিল ওগাশাওয়ারা সাদাইরোরি। কাজেই বোনিনের উপর জাপানের দাবী তোমাদের চেয়ে বেশী। ওগাশাওয়ারার পূর্ব্বে বৃটেন বা আমেরিকা বোনিনের নামও শোনে নাই!" এ নোটিশের পর আমেরিকা এবং বৃটেন বোনিন ছাড়িয়া দিল।

ইজু দ্বীপটিও ঐ কুঠারের গায়ে; মারিয়ানাও তাই। বিনা-অনুমতিতে মারিয়ানায় অপর জাতির প্রবেশ নিষেধ।

মাইক্রোনেশিয়ায় বিদেশীদের সকলে সন্দেহের চোখে দেখে। প্রশান্ত মহা-সাগরের এদিকে বিদেশী জাহাজের যাতায়াত বন্ধ। যদি কোনো বিদেশী যাত্রী জাপানী জাহাজে মাইক্রোনেশিয়ার টিকিট কিনিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্ব-সময়ে এক উত্তর মিলিবে—জাহাজে জায়গা নাই!

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাইক্রোনেশিয়া জাপানের হাতে গিয়াছে, তখন হইতে এ যাবৎ দু'তিন জন মার্কিনী সাংবাদিক ভিন্ন এ-পথে অপর কোনো বিদেশী প্রবেশাধিকার পান নাই। যাঁরা গিয়াছিলেন, ক'-সপ্তাহ মাত্র তাঁদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল।

শিলা-কারু—মারিয়ানা

সাভোরি। হাওয়াই হইতে তিনি এখানে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিল এক জন ইংরেজ, এক জন দিনেমার, এক জন জেনোয়ীজ্ এবং পঁচিশ জন হাওয়াইয়ান। সাভোরি এ দ্বীপে রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এক জন জাপানী আসিয়া এ দ্বীপে নামিল।

এ পথে জাহাজের পাড়ি খুব নিরাপদ নয়। জলের বুকে পাহাড়-পর্ব্বত আছে—ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ ভাঙ্গিবে! তার উপর এখানে প্রায় ঝড় ওঠে। সে ঝড়ে জাহাজকে রক্ষা করা কঠিন।

গুয়ামের পূর্ব্বোত্তরে শাইপান। এখানে আখের অনেক ক্ষেত। চিনির বড় বড় কারখানা আছে। দ্বীপটি চিনির মিষ্ট গন্ধে

ভরিয়া আছে সর্ব্বক্ষণ। সমুদ্রের কূলে নারিকেল গাছের সুদীর্ঘ কেয়ারি। তাছাড়া এখানে আছে কলা, ব্রেড-ফ্রুট, ও লেমু গাছের ঘন বন। এখানে নানা জাতের কার্প প্রচুর জন্মায়। শাইপানে পথ-ঘাট ভালো, ঘর-বাড়ী দোকান-পাট অসংখ্য। পথে মোটরের যেমন

গবর্ণমেণ্ট হাউস—পোনাপে

ভিড়, তেমনি ভিড় সাবেকী গরুর গাড়ীর। সভ্যতার সর্ব্ব-সরঞ্জাম-সম্পদে শাইপান সমৃদ্ধ।

শাইপানে স্পানিশ আমোলের শামোরোশ জাতির বাস। এ জাতির উদ্ভব হইয়াছে মাইক্রোনেশিয়ানের সহিত স্পানিশ-জাতির সহযোগ-সম্পর্কে। ইহাদের গায়ের বর্ণ হাল্‌কা পীতাভ,—ভাষায়

জেলেদের মাছ ধরা—কুশাই দ্বীপ

স্পানিশের আমেজ মিশানো। মেয়েরা স্কার্ট পরে, পুরুষরা সকলেই প্রায় গীটার বাজাইতে ওস্তাদ। নাচ-গান এ জাতির জীবন।

সামরিক-ঘাঁটী হিসাবে শাইপান দুরধিগম্য। মাইক্রোনেশিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ আগাগোড়া বহু কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গে সংরক্ষিত।

শাইপানের পশ্চিমে তিনিয়ান দ্বীপ। এখানেও আখের অজস্র ক্ষেত। এখানে বহু প্রাচীন মন্দিরের যে ভগ্ন-স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহা প্রাগৈতিহাসিক জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচায়ক। বহু জাপানী এখানে এখন বাড়ী-ঘর করিয়াছে। দোকান-সিনেমা-প্রসাধন-বিপণী অসংখ্য—শিন্তো-মন্দিরের অভাব নাই।

গুয়ামের পূর্ব্বদিকে গুয়াম হইতে চব্বিশ মাইল দূরে রোটা। রোটার কাছে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন বহু ছোট দ্বীপ আছে। সব দ্বীপই উর্ব্বরতা-গুণে সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি দ্বীপ বিচিত্র ফলে-ফুলে ভরা—যেন মায়া-কানন। স্বাস্থ্য এবং আবহাওয়া চমৎকার। এ-সব
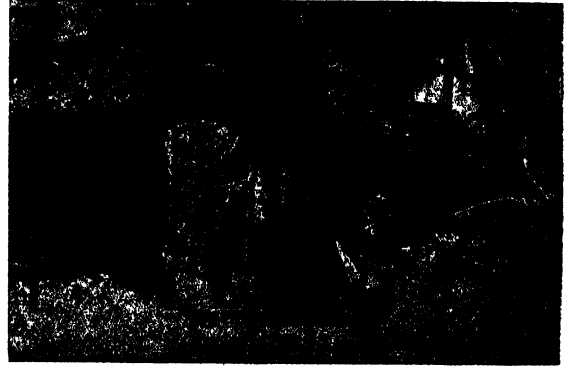
স্পানিশ আমলের গৃহ—পোনাপে

দ্বীপে তাল-নারিকেল হইতে সুরু করিয়া প্রাচ্য জগতের কোনো ফলের অভাব নাই! কলা ও পেঁপের প্রাচুর্য্য, আম ও কমলা লেবুর বর্ণোচ্ছ্বাসে দ্বীপগুলিকে মনে হয় প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জ! ফুলও তেমনি—বেল জুঁই চাঁপার গন্ধে দিক্ ভরিয়া আছে! ম্যাপের বিষুব-রেখার গা ঘেঁষিয়া দ্বীপগুলির অবস্থান, তবু গ্রীষ্মের

কাণ-ফোঁড়ায় অঙ্গ সজ্জা

খর তাপ কোথাও নাই। সারা বছর টেম্পারেচার সমান। ৮০ ডিগ্রীর উপরে যেমন ওঠে না, তেমনি তার নীচেও নামিতে জানে না। সমুদ্রের বাতাসে স্নিগ্ধতা এখানে বারো মাস।

ঋতুর হিসাব এখানে নাই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্তের বৈচিত্র্য নাই। বারো মাস এখানে বসন্তের রাজ্য। ক্ষেতে বছরের সব সময়ে শস্যের ফলন,—সমুদ্রে মাছের অভাব ঘটে না কোনো কালে। কাজেই অন্নের জন্ত কাহাকেও ভাবনা-চিন্তা করিতে হয় না।

ঋতুভেদ না থাকিলেও বাতাসের গতিতে বৈচিত্র্য আছে! ছ' মাস এখানে বায়ু বহে পূরবৈয়া—বাকী ছ' মাস পশ্চিমী-বাতাস বহে।

বাতাসের 'গতি ধরিয়া সময় নির্দ্দেশ হয়—'পূব্-বাতাসের বছর'—'পশ্চিমী-বাতাসের বছর'—East-wind year এবং West-wind year.

স্পানিশদের আমোলে বোষ্টন হইতে যে-সব মার্কিনী পাদরী আসিয়া এখানে আস্তানা পাতেন, এখানকার মেয়েদের তাঁরা গাউন পরানো শেখান্। তার ফলে এখানকার মেয়েরা গাউন পরে। এখন বিদেশী পাদরীর নামগন্ধ নাই। বৌদ্ধ, শিন্তো এবং খৃষ্টধর্ম্মী

মজুর—ইয়াপ্। মাথায় চিরুণী আঁটা—স্বাধীন জাতির নিদর্শন
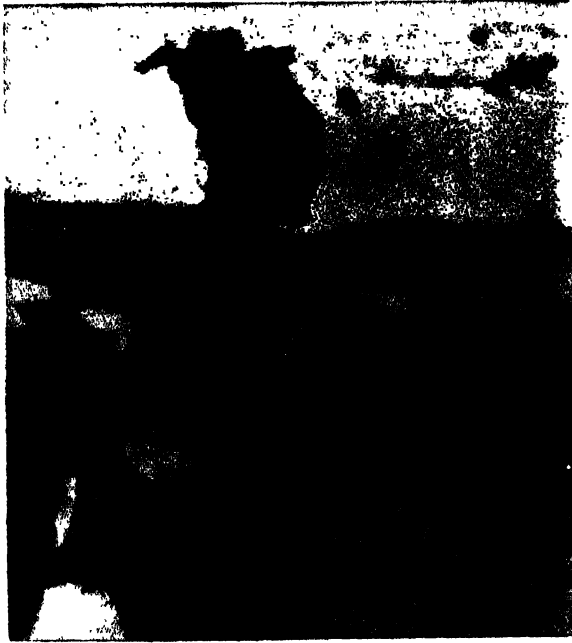
জাপানী-পাদরীর দল আসিয়া বিদেশী পাদরীর আসন অধিকার করিয়াছে।

জাপানী-অধিকারে আসিলেও দ্বীপগুলিতে বিচরণ করিবার সময় লোকজনের আচার-রীতিতে স্পানিশ ও জার্ম্মান্ ছাপ্ লক্ষ্য হয়। বুড়ার দল অভিবাদন জানায় স্পানিশ ভাষায়, "Buenos dias" বলিয়া; মধ্যবয়স্কেরা বলে, "guten morgen"; এবং তরুণরা বলে "ohayo"।

প্রাচীন যুগের বহু আচার-সংস্কার এখনো লোপ পায় নাই। দ্বীপগুলির অভ্যন্তর-প্রদেশে এখনো রণ-নৃত্যের রেওয়াজ আছে। জাপানী আদর্শে বাক্সের প্যাটার্ণে বাঁধা ঘরের পরিবর্ত্তে অনেকে এখনো পুরাকালের খড়ে-ছাওয়া ঘরের পক্ষপাতী। কাণ বিঁধিয়া ভারী মোটা কর্ণভূষণ পরা—বিশেষ কাণের ডগা ও ধার কাটিয়া পকেটের মতো ঝুলাইয়া দেওয়া এবং সে-স্থল অলঙ্কারের ছাঁদে কাণ ঘিরিয়া জড়াইয়া তোলা—এ বিচিত্র সজ্জা-রীতি এখনো আছে।

মাইক্রোনেশিয়ার বিচিত্র দ্বীপগুলির চারি দিকে অসংখ্য প্রবাল-গিরি আছে। এ সব গিরি আছে সমুদ্র-গর্ভে ২০০ ফুট জলের নীচে।

কেরোলাইন-দ্বীপালীর মধ্যে ত্রুক্ দ্বীপপুঞ্জের বৈচিত্র্য অতুলনীয় এবং এটি প্রবাল-দ্বীপ। চারশ' মাইল চওড়া এক হ্রদকে ঘিরিয়া এ দ্বীপের অবস্থান। হ্রদটির বুকে আছে ২০৫টি ছোট দ্বীপ। হ্রদটি (lagoon) অতলস্পর্শী গভীর। হ্রদের জল খুব স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ জল-তলে দেখিবেন নানা বর্ণের প্রবাল-পুঞ্জ। যে সব মার্কিনী পর্য্যটক ত্রুক্ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁরা বলেন,

কাঠের বালিশে মাথা

ত্রুক্কে দেখিয়া স্বর্গের কল্পনা মনে জাগে! ভগবান্ যদি বলেন, স্বর্গে থাকিতে চাও? না, ত্রুকে থাকিতে চাও? আমি জবাব দিব, ত্রুকে (If allowed to choose between Heaven and

সদর-রাস্তা—আধুনিক পালাউ

Truk in what to spend eternity, he should say Truk)।

ত্রুকের পশ্চিমে পোনাপে দ্বীপ। আকারে এটি বড়—১৩০ বর্গ-মাইল। দ্বীপটি সমুদ্র-গর্ভ হইতে এত ঊর্দ্ধে রহিয়াছে যে, সাগর যদি কোন দিন ধ্বংস-লীলায় ক্ষেপিয়া ওঠে তো পোনাপেকে সে গ্রাস করিতে পারিবে না! এ দ্বীপটির চারিদিকে বিশাল লেগুন-হ্রদ

—তার বুকে আছে পঞ্চাশটি ছোট দ্বীপ! পোনাপেতে ছয়টি উৎকৃষ্ট বন্দর আছে; এবং সমগ্র দ্বীপটিকে রক্ষীর মতো ঘিরিয়া আছে ৮৭৬ ফুট উঁচু জোকাজ দ্বীপ!

মাইক্রোনেশিয়ার ঠিক মাঝখানে পোনাপে। পোনাপে ছিল এ-দিকে স্পানিশদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া পাপুয়া, জাপান—যেখানেই যান, পোনাপে ঘেঁষিয়া যাইতেই হইবে। এ দ্বীপ হইতে আর সব দ্বীপের নাগাল মেলে সহজে।

পোনাপের বাসিন্দারা খুব জোয়ান। তারা ভয়-ডর জানে না। ছোট ছোট ডিঙি লইয়া সাগরের বুকে অনায়াসে পাড়ি দেয়। তারা এখনো প্রয়োজন ঘটিলে শড়কী হাতে পোনাপেয়ানরা পোনাপেকে কাঁপাইয়া তুলিতে ছাড়ে না! এক গ্রামের এক জন লোক যদি জাপানী-মনিবের উপর রাগে ক্ষেপে তো তার সে রাগের কথা সে শিঙ্গা বাজাইয়া পাড়ায় পাড়ায় রটনা করে। পাড়ার সে-রটনা গিয়া পৌঁছায় গ্রামে-গ্রামে এবং সব গ্রামের লোক শড়কী-হাতে রণমূর্ত্তি ধরিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে ছুটিয়া আসে!

ইহাদের খেলা রণোন্মাদ-নৃত্য। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া এ-খেলায় এমন মাতিয়া ওঠে যে, খেলা অনেক-সময় প্রাণঘাতী হয়। আপাদ-মস্তক তেলে জব্‌জবে করিয়া রণনৃত্যে নামে; নহিলে খেলার লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হইবার আশঙ্কা প্রচুর।

চিনির কারখানা—তিনিয়ান্

পোনাপেয়ান্ রূপসীর হাতে বোনিতো মাছ

ভালো কথার বশ। তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করুন, আয় গোলাম বনিবে; কিন্তু রুক্ষ মেজাজ যদি দেখান কিম্বা রূঢ় হন, তারা হিংস্র মূর্ত্তি ধারণ করিবে! জোয়ান পোনাপেয়ান-সমাজে এক আশ্চর্য্য রীতি আছে—হাতে আগুনের ছাঁকা দিয়া নক্সা আঁকে এবং বুকে অস্ত্র বিঁধিয়া গহ্বর-রচনা করে। এ দু'টি ব্যাপারে জানাইতে চায়, তাদের ভয়-ডর নাই! এখনো তারা সাবেকী ধনুঃশর ছাড়িয়া দেয় নাই। এ ধনুঃশরে তারা বনের পশু-পক্ষী শীকার করিতে যেমন পটু, তেমনি পটু সমুদ্রের মাছ ও হাঙ্গর শীকারে। শড়কী অস্ত্রও আছে। জাপান-রাজ তাদের হাতে বন্দুক-পিস্তল দেয় নাই। কারণ, এ-জাত এখনো এমন দুরন্ত যে, পাণ হইতে চূণ খসিলে কি না করিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই!

শুঁড় মাছ মুখে পুরিয়া ইহারা ঠিক গরুর জাবর-কাটার ভঙ্গীতে জাবর কাটিয়া খায়। খেলায়-ধূলায় কাজে-অবসরে মেয়েদের মুখে শুঁড় মাছ আছে সর্ব্বক্ষণ। আমাদের দেশের তাম্বুল-বিলাসীদের মতো ঐ মাছ তারা চিবাইতেছে তো চিবাইতেছেই।

পোনাপেয়ানরা শয়ন করে কাঠের মেঝের কাঠের বালিশে মাথা দিয়া। বালিশ মানে, গাছ হইতে কাটিয়া-আনা কাঠের কুঁদা। জাপানীরাও কাঠের বালিশ মাথায় দেয়। সে বালিশে খানিকটা কারিগরি আছে। পোনাপেয়ানরা সে-বালিশ চায় না।

কাজ-কর্ম্ম করে মেয়েরা—পুরুষরা বসিয়া গল্প-গুজব করে, নয় খেলা-ধূলা করিয়া দিন কাটায়।

মন্দ যা-কিছু ঘটে, পোনাপেয়ানরা বলে, মেয়েদের দোষে! মিথ্যা

কথাকে ইহারা বলে, মেয়েলি-স্বভাব! উঁকি-ঝুঁকি মারাকে বলে, মেয়েলি কৌতূহল; চক্রান্তকে বলে, মেয়েলি চুকলি; পক্ষপাতিত্বকে বলে, মেয়েলি সোহাগ; রাগকে বলে, মেয়েলি কণ্ঠ! অথচ যে মেয়ে-জাতকে এত হেনস্থা, সেই মেয়ে-জাত নহিলে কাজ চলে না! বিবাহ হয় বাল্যে এবং তার প্রথা খুব অদ্ভুত। মেয়ে পছন্দ হইলে মেয়ের বাড়ীতে বরের মা আসিয়া মেয়ের পিঠে জ্যাব্‌জেবে করিয়া তেল মাখায়; ইহার নাম 'কন্যা-পছন্দ'। তার পর বরের মা আর এক দিন আসিয়া কন্যার মাথায় মস্ত ফুলের মালা চাপাইয়া দেয়—ব্যস্, অমনি বিবাহ-পর্ব্ব চুকিয়া গেল।

এ বিবাহে বরের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। বিবাহ যেন বরের মায়ের সঙ্গে! বরের ঘরে আসিয়া বধূ হয় আসলে শাশুড়ীর দাসী। শাশুড়ীর যে-সব প্রবালগিরি, সেই গিরির গোপন-গুহার মধ্যে। সেখানে লতায়-পাতায় ফলে-ফুলে অপূর্ব্ব জৌলুশ আর সেখানকার বাতাস ভরিয়া আছে নানা জাতের মাছের তেলের গন্ধে। নরকও এমনি এক প্রবাল-গিরির গুহার মধ্যে। নরকে শুধু কাদা আর পাঁক,—সে কাদায়-পাঁকে হাড়-কনকনানি শীতের চরম! নরকের দ্বারে আছে দু'জন প্রহরিণী। তাদের এক হাতে জ্বলন্ত মশাল, আর এক হাতে ধারালো খাঁড়া!

চাষ-বাসে ইহাদের অনুরাগ কম। তবু চাষ-বাস করে দায়ে পড়িয়া। সমুদ্রে নামিয়া মাছ-ধরায় আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশী। মাছ-ধরায় ইহাদের উৎসাহ তাই সীমাহীন।

মাইক্রোনেশিয়ার সাগরে বেনিতো নামে এক জাতের মাছ
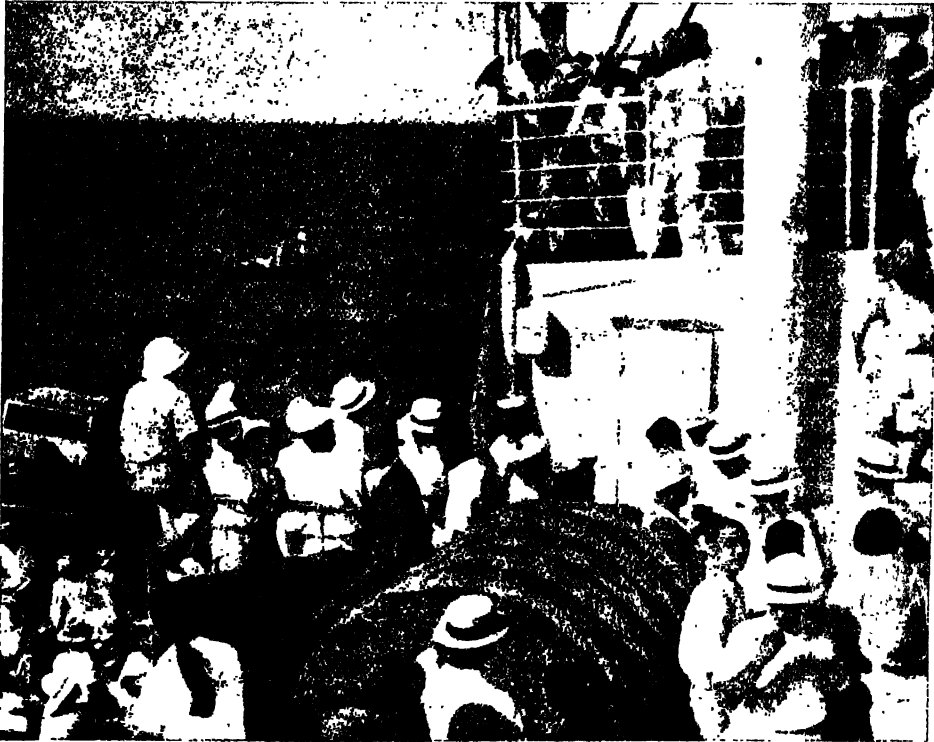
মারিয়ানা-যাত্রী নিপ্পনীজের দল

সঙ্গে বধূর বনিবনা না হইলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়; বধূ ফিরিয়া যায় তার বাপের বাড়ী! কিম্বা অন্য কোনো ঘরে যদি তার ডাক পড়ে তো সেই ঘরে।

জাপানীদের মতো পোনাপেয়ান-সমাজে পূর্ব্বপুরুষের পূজা প্রচলিত। তাছাড়া ভূত, প্রেত আর দানবের ভয়ে এ জাতি সর্ব্বদা সশঙ্কিত! তাই দেবতা বলিয়া মানে ভূতপ্রেত-পিশাচকে, পাহাড়-বন-জলা-নদী-সাগরকে। মনে সর্ব্বদা ভয়, অপরাধ হইলে ঘরের দেওয়াল বা ছাদ ফুঁড়িয়া কখন্ কোন্ ভূতপ্রেত-দৈত্য আসিয়া কঠিন সাজা দিবে! স্বর্গ সম্বন্ধেও অদ্ভুত ধারণা। এ স্বর্গ আছে বড় হ্রদের নীচে মেলে। সে মাছের ব্যবসায় জাপানীরা বহু অর্থ উপার্জ্জন করে। এ মাছ ইহারা রাঁধিয়া খায়; তাছাড়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া টিনে ভরিয়া রাখে। সে-চূর্ণ স্যুপে মিশাইলে স্যুপের স্বাদ হয় না কি অমৃতের মতো! এই বোনিতোর শুষ্ক-চূর্ণ দেশ-বিদেশে চালান দিয়া জাপানীরা ব্যবসাটিকে বেশ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

সাগরে হাঙ্গর-অক্টোপাশের উৎপাত খুব বেশী। কিন্তু এ সব দ্বীপের লোক হাঙ্গর-অক্টোপাশকে ভয় করে না। হাঙ্গর-অক্টোপাশ ধরে ছিপে টোপ গাঁথিয়া—ছিপ-হাতে মৎস্য-বিলাসীদের মতো অনায়াস ভঙ্গীতে!

লেগুন-হ্রদের বুকে—ক্রক্

পোনাপের উত্তরে মার্শাল দ্বীপ। এ-সব দ্বীপ প্রবাল-বৈচিত্র্যে যেমন সুন্দর, তেমনি সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এখানে ছিল আগ্নেয়-গিরির সুদীর্ঘ শ্রেণী। সে-সব গিরির অগ্নিস্রাব চিরদিনের জন্ম নিবিয়াছে এবং তাহারি গায়ে প্রবাল-পুঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে; লেগুনও জন্মিয়াছে অজস্র। এই সব লেগুন আজিকার এ অভিযানে জাপানীদের প্রধান ও প্রবল সহায় হইয়াছে। এই মার্শাল দ্বীপ হইতেই জাপানীরা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল-হার্বার বিচূর্ণ করিয়াছে; এবং এ-বৎসর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমান-পোত আসিয়া কাজলিন, উয়োৎজে, মালোই, লাপ এবং জালুইয়তে হানা দিয়া সফলকাম হইয়াছিল। এখান হইতে এক দিকে পানামা-খাল, আর এক দিকে হাওয়াই দ্বীপ নাগালের মধ্যে; তাই এ জায়গাটি হইল জাপান ও মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের পক্ষে সঙ্কট-সন্ধিক্ষেত্র।

জাপানী কুঠারের আর-এক দিক গিয়া ঠেকিয়াছে ২৫০০ মাইল দূরে পালাউ দ্বীপে। পালাউ হইতে ফিলিপাইনস্, ডাচ-ইণ্ডীজ এবং অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ জাপানীদের পক্ষে সহজ। জাপানীরা ইতিমধ্যে মালুশ্ দ্বীপের লোরেঙ্গো অধিকার করিয়াছে।

পালাউ জাপানীদের কাছে সিঙ্গাপুরের মতো! পালাউকে অভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে এক শত দ্বীপ—কঠিন দুর্গ-প্রাচীরের মতো ঘিরিয়া। পালাউয়ে জাপানীদের বিরাট্ কর্ম্মশালা। সামরিক ও বে-সামরিক অফিসারদিগের ভিড়ে এবং সর্ব্বপ্রকার সামরিক সজ্জা-সরঞ্জামের মধ্যে যেন মক্ষিকা-প্রবেশের ফাঁক নাই! অসংখ্য অফিস, অসংখ্য কল-কারখানা পালাউকে জমজমাট রাখিয়াছে সর্ব্বক্ষণ! এখানকার বিমান-বন্দর, বাণিজ্য-বন্দর এবং যুদ্ধ-জাহাজের বন্দর যেমন বিরাট্ বিশাল, তেমনি সমৃদ্ধ। পালাউয়ের পূর্ব্বোত্তর কোণে ইয়াপ। ইয়াপের কাছাকাছি অতিক্ষুদ্র ক'টি দ্বীপ আছে—সেগুলি যেন ইন্দ্র-নীল মণির কুচি!

ইয়াপে অদ্ভুত রকমের দাসত্বপ্রথা আছে। দাসেরা নিজ নিজ গ্রামে বাস করে। তাদের লইয়া কেনাবেচার কারবার চলে না; এবং ইহারা কোন বিশেষ-ব্যক্তির দাসত্ব করে না। ইহারা সম্মিলিত সমাজের দাস। রাজার আদেশ ভিন্ন আর-কোন মনিবের আদেশ মানিতে বাধ্য নয়।

ইয়াপ দ্বীপটিতে বারো জন রাজা আছে। রাজারা আদি-বংশীয়। জাপান এ-দ্বীপগুলিতে জাপানী শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করে নাই; এই রাজার মারফৎ রাজ্য-শাসন চলে। রাজাদের আসন এবং দাবী বংশগত।

ইয়াপ কথার অর্থ, এখানকার লোক-জন বলে, পৃথিবীর ঠিক মাঝখান! এখানে যে কেব্‌ল্-ষ্টেশন, সেটি জাপানের বার্ত্তাবাহী কাজে সর্ব্বাগ্রণী। তার উপর ইয়াপের "নেভাল" বন্দর সবল ও সমৃদ্ধ।

এ দ্বীপগুলি এমন যে, মনে হয়, ভগবান্ যেন জাপানের জন্যই এগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন। এ দ্বীপগুলি যদি জাপানের হাতে থাকে, তবেই প্রশান্ত মহাসাগর শান্ত থাকিবে, উৎপাতে সে-সাগর অশান্ত হইবে না!

আমেরিকাও এ কথা স্বীকার করিতেছে। বলিতেছে, মাইক্রোনেশিয়ার উপর প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তি নির্ভর করিতেছে। এ শান্তির চাবি-কাঠি এই মাইক্রোনেশিয়া! এবং সে-চাবি আজ জাপানীর হাতে আছে, সত্য!

বিজ্ঞান-জগৎ

গাছ বাঁচানো

ফুল-ফলের এমন অনেক গাছ আছে—চারা-অবস্থায় শীতের হিমে কিম্বা গ্রীষ্মের রৌদ্রে তাদের বাঁচানো কঠিন। এক মার্কিণ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ এই সব চারা-গাছের রক্ষা-কবচ বাহির করিয়াছেন। কবচ মানে, এ সব চারা-গাছের গা ঘিরিয়া ঐ চারা জড়াইয়া ঘন করিয়া খড় বাঁধিয়া দিন। গ্রীষ্মকালে সকালে জলধারা-বর্ষণ করিবেন; শীতের দিনে

চারা-গাছে খড়

জল দিবেন না। কদাচ বেশী করিয়া জল দিবেন না; দিলে সে-খড় পচিয়া যাইতে পারে, তাহাতে গাছের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। খড় যদি রৌদ্রে শুকাইয়া জীর্ণ হয়, তাহা হইলে তার গায়ে আবার নূতন খড়ের আঁটি বাঁধিয়া দিবেন। এ প্রক্রিয়ায় চারা বাঁচিবে এবং তার বাড়ের অসুবিধা ঘটিবে না।

কামানের শক্তি

যে-জাতির কামান-বারুদ যত বেশী এবং জোরালো, সেই জাতির পক্ষেই শুধু যুদ্ধ-জয়ের সম্ভাবনা। এই কামান-বারুদ এবং অমোঘ অস্ত্রশস্ত্রাদি যত শীঘ্র এবং যত অনায়াসে বিপক্ষ-দলনে পাঠানো যাইবে, জয়ের আশা ততই অধিক হইবে। এ যুগের এ যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রাদির ক্ষিপ্র জোগানের উপর যুদ্ধ-রত জাতির আত্মরক্ষা এবং বিজয় নির্ভর করিতেছে। প্রচুর রশদ এবং তার দ্রুত জোগান—এ বিষয়ে মার্কিন জাতি আজ অসাধ্য-সাধন করিতেছে। মার্কিনের অতিকায় কামান আজ এমন শক্তিমান্ যে, তার মুখে রাজ্যপাট নিমেষে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়! এ কামান যে-গাড়ীতে করিয়া বহা হয়, সে-গাড়ীতে টায়ার আছে দশখানি করিয়া। বেশ ভারী মোটা মজবুত টায়ার। এ-গাড়ী চলে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে। কামানের সাহায্য ভিন্ন পদাতিক সেনার পক্ষে যুদ্ধে নামা বাতুলতা! প্রত্যেক মার্কিন পদাতিক-দলে থাকে ৩১০খানি করিয়া ট্যাঙ্ক; তার সঙ্গে অতিকায় কামান ৮০; তাছাড়া অসংখ্য কামান-

অতিকায় গাড়ী
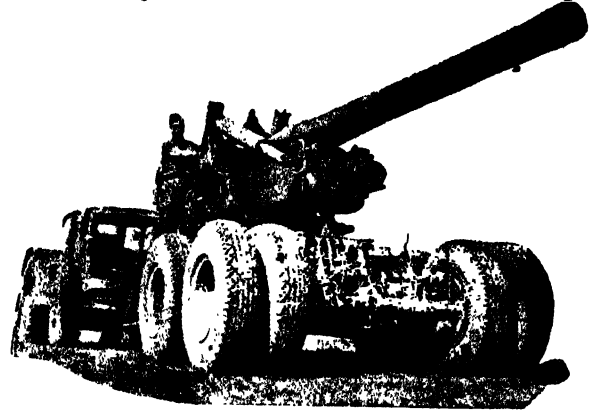
বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র যাহা থাকে, তাহা অমোঘ! ইহার উপর বিমান-পোত এবং বিপক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার জন্য ডেষ্ট্রয়ারও থাকে অসংখ্য! এমন বিরাট্ বাহিনীর কল্পনা মানুষ কখনো করে নাই! এ শক্তির সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে কি?

জলমগ্ন শী-প্লেন

যুদ্ধে বহু শী-প্লেন জলমগ্ন হইতেছে। সে জল-সমাধি হইতে সেগুলির উদ্ধার-সাধন ঘটিতেছে এক অভিনব কৌশলে। মজবুত লৌহ দিয়া দীর্ঘ আংটা তৈয়ারী হইয়াছে। সেই আংটা জলগর্ভে ফেলিয়া

আংটা দিয়া তোলা

তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে জলমগ্ন শী-প্লেনকে টানিয়া উপরে তোলা যায়। এ আংটার কব্জা এমন কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে, যে-কোনো দিকে এবং যে-কোনো ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করা চলে।

ডাল-ছাঁটা রণপা

গাছপালার স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মার্কিন উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞেরা গাছ-পালার অতি-বাড় ছাঁটিয়া, গাছের শুষ্ক বা অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কাটিয়া বাদ দিবার পরামর্শ দিতেছেন। যে সব গাছ-পালা খুব দীর্ঘ, সে সব গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা

উঁচু ডাল ছাঁটা

কাটিবার জন্য সহজ উপায়ও বাহির হইয়াছে। এলুমিনিয়ামের সুদীর্ঘ রণপা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে দাঁড়াইয়া অনায়াসে উঁচু ডালপালা কাটা যায়। যিনি কাটিবেন, এ রণপায় তিনি নিরাপদে দাঁড়াইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। রণপায়ে এমন ভাবে থাক্ সংলগ্ন আছে যে, প্রয়োজন বুঝিয়া যে-কোনো ভাবে রণপাকে দীর্ঘ বা খাটো করা চলে। থাকের সঙ্গে যে পা-দানি বা ফুটপ্লেট আছে, জুতা-পায়ে সে পাদানিতে দাঁড়ানো চলে স্বচ্ছন্দ নিরাপদ ভাবে। বড় সাইজের রণপাগুলির ওজন সাড়ে চার সের পাঁচ সের মাত্র।

পঙ্ক-কর্দ্দম-দলনী

আমেরিকার রণ-বিভাগ এক অপূর্ব্ব মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে। যে সুগভীর পঙ্ক-কর্দ্দমে হাঁস এবং ব্যাঙ্ মাত্র বিচরণ করিতে পারে, এমন

পঙ্ক-পথের গাড়ী

গভীর পঙ্ক-কর্দ্দম কাটিয়া এ গাড়ী অনায়াসে তার পথ-যাত্রা-সম্পাদনে সমর্থ। এ গাড়ীতে চার হইতে দশখানি মোটা টায়ার সংলগ্ন আছে। টায়ারগুলির আয়তন ৩২" ২৪"। অতলস্পর্শী পঙ্ক-কর্দ্দম কাটিয়া পাড়ি-সম্পাদনে এ গাড়ীর এতটুকু বাধে না। এ গাড়ীর গীয়ার এবং এ্যাক্সলও বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বলিয়া ফৌজ এবং তাদের কামান-বন্দুক ও রসদ বহিয়া পঙ্ক-কর্দ্দমে এ গাড়ী অনায়াসে চলিতে পারে!

শক্তিমান্ বমার

এ যুদ্ধে বড় ভারী বমারের চেয়ে ছোট হাল্কা বমারের কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। ছোট বমার যেমন দ্রুত-আক্রমণে সমর্থ, তেমনি তাড়া খাইলে চকিতে পলায়ন করিতে পারে। মার্কিন রণবিভাগ এই ছোট হাল্কা বমার তৈয়ারী করিতেছে অজস্র সংখ্যায়। এ-সব বমার বিপক্ষ-গণ্ডীর মধ্যে চকিতে আসিয়া হানা দেয়। এক-একখানি বমারের ওজন সাড়ে ন'টন—দু'টি করিয়া এঞ্জিন সংযুক্ত থাকে। বোমা

প্যারাশুট্ বোমা

ফেলিতে এ বমারের যেমন তৎপরতা, তেমনি শক্তি যুদ্ধ করিতে। এ বমার চলে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে। অনেকগুলি করিয়া বমার অভিযানে বাহির হয় এবং প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে থাকে রক্ষি-বিমানপোত। এ বমারের গতি এত ক্ষিপ্র যে, বহু প্রয়াসেও তার ফটো তোলা যায় না। মেশিন-গানের সাধ্য নাই, এ বমারকে আঘাত করিবে! অতি নিঃশব্দে এ বমার আসিয়া হানা দেয়। এক শত গজের মধ্যে আসিবার পূর্ব্বে বিপক্ষ তার সন্ধান পায় না। সন্ধান পাইয়া তার দিকে মেসিন-গান তাগ্ করিতে না করিতে এ সব বমার বোমা ফেলিয়া চলিয়া যায়। এক হাজার গজ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া প্রতি দশ গজ অন্তর একটি করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়া যায়। তাড়া করিলে প্যারাশুট-বোমা ফেলে। প্যারাশুটের এ সব বোমা একটু বিলম্বে ফাটে। প্যারাশুট ফেলিয়া বমারগুলির অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, কখনো চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফাটে।

জলের বুকে ফাঁদ

শত্রুর আক্রমণ হইতে বন্দরাদি-রক্ষার জন্য মার্কিন রণতরী-বিভাগ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বারোখানি বোট বন্দরের মুখে রাখা হয়। সেই সব বোট হইতে শক্ত ইস্পাতের তারের তৈয়ারী

ফাঁদ-পাতা বোট

মজবুত জাল বন্দরের মুখ হইতে জলের বুকে বহু দূর পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়। এ জাল ফুঁড়িয়া কাটিয়া অতি-বড় দুর্দ্ধর্ষ জাহাজের পক্ষেও বন্দরে প্রবেশ-লাভ প্রায় অসম্ভব। স্বপক্ষের জাহাজকে বন্দরে আনিবার সময় বোট হইতে পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যে ফাঁদ গুটাইয়া লওয়া যায়। বিস্তীর্ণ প্রসারে ফাঁদ ফেলিতেও পনেরো মিনিটের বেশী সময় লাগে না। এ ফাঁদ যেমন জটিল, তেমনি মজবুত ; কাজেই এ ফাঁদ লঙ্ঘন করা বেশ কঠিন। এ ফাঁদে পড়িলে সশস্ত্র রণতরী এমন ভাবে বন্দী হয় যে, তার মুক্তির উপায় থাকে না।

এক্স্-রে ছবির যন্ত্র

মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বহু গবেষণায় যে এক্স-রে-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে এক সেকণ্ডের শততম সময়ে মানুষের বক্ষ-কন্দরের এক্স-রে ফটো তোলা সম্ভব হইয়াছে। যাঁহার বক্ষ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাঁহাকে একটি ফ্রেমে দাঁড় করাইয়া যন্ত্রের বোতাম টিপিয়া দিলেই এক্স-রে টিউব-সংযোগে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হয় ; সে প্রবাহে যে তাপের সঞ্চার ঘটে, তাহারি ফলে বক্ষের যত-কিছু স্পন্দনের রেখা ক্যামেরার প্লেটে সুস্পষ্ট মুদ্রিত হয়। এই সব রেখা দেখিয়া বক্ষের অতি-সূক্ষ্ম খুঁতটুকুও বিশেষজ্ঞেরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া বুঝিতে পাবেন।
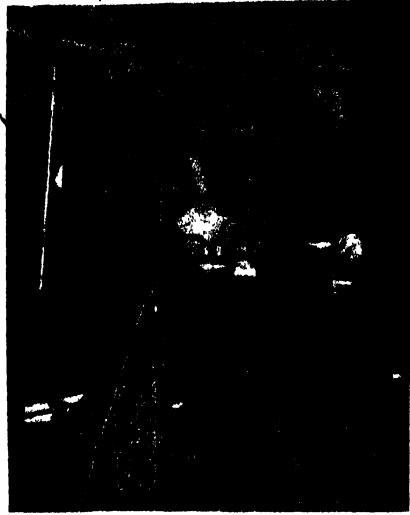
বৈদ্যুতিক টিউবে বুকের ছবি

ফৌজের মুখোশ

মার্কিন নৌ-বিভাগের সৈনিককে বিষাক্ত বাষ্পে মরিতে বা অস্বাস্থ্য ভোগ করিতে না হয়, সে জন্য পশমী ফেল্টের তৈয়ারী

নিরাপদ মুখোশ

মুখোশের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ মুখোশে মুখে বা গলায় কিম্বা নাকে এতটুকু চাপ পড়ে না। গ্রীষ্মের তাপ, বৃষ্টি, ঝড়—এ সবের দরুণ এতটুকু অস্বাস্থ্য বা কষ্ট সহিতে হয় না। মুখ-বিবরের কাছে স্বতন্ত্র আবরণ আছে—সে আবরণ খুলিয়া সহজে পান-ভোজন এবং ধূম্রসেবন করা চলে।

হারা ধন

যাহা মোর ছিল না'ক পাই যবে তাই,
আনন্দের তুলি কলরব।
হারাইয়া যাওয়া ধন যবে ফিরে পাই,
করি তবে মহা মহোৎসব।

শ্রীকালিদাস রায়।

অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-সমস্যা ও বণ্টন-বিভ্রাট

ভারতে খাদ্যসমস্যা সঙ্কট-অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য কিছু দিন হইতে সরকার এ দেশে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য একটি বিভাগ খুলিয়াছেন। ঐ বিভাগের নাম হইয়াছে উৎপাদন বিভাগ।

(১) ভবিষ্যতে কি পরিমাণে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে, তাহার অনুসন্ধান এবং অনুমান। (২) তদনুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া, উহা সঙ্গতরূপে বণ্টন করিবার পরিকল্পনাও এই বিভাগ করিয়া দিবেন।

এই উভয় উদ্দেশ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, একাধারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং বণ্টন এই দুইটি কার্য্যই এই বিভাগ দ্বারা সাধিত হইবে। গত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগ হইতেই এই বিভাগ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ একটি বিভাগের যে একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিভাগ যদি সুচারুরূপে কার্য্য-পরিচালনা করেন, তাহা হইলে এই সঙ্কট-সময়ে এ দেশের লোকের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, কিছু দিন হইতে খাদ্যশস্যের মূল্য যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে! শীঘ্রই ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা এবং বড় বড় পল্লীগ্রাম ভিন্ন অন্যত্র খাদ্যশস্য অগ্নিমূল্যেও পাওয়া যাইতেছে না। বিভাগটি আজ প্রায় এক-মাস-কাল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু পণ্যের মূল্যে ইহার কার্য্য-নৈপুণ্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতেছে না। ছোট ছোট পল্লীগ্রাম-গুলিতে চাউল, আটা, ময়দা, চিনি প্রভৃতির মূল্যই সমধিক দেখা যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এক দিকে যেমন খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে,—অন্য দিকে তেমনই ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি পল্লীগ্রামে এবং অধিকাংশ ছোট গ্রামে ঐ সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিকাইতেছে,—কারণ, তথায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কেহই নাই। ফলে তথায় অতিলোভী ব্যবসায়ীমাত্রই নিরঙ্কুশ। সংবাদপত্রে হাটলুঠ—দোকানলুঠের যে সকল সংবাদ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে এই খাদ্য-সঙ্কটের ফল, এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই করা যায়।

এ দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। কাজেই বিলাতের ন্যায় যে সকল দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির বাস, সেখানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল কার্য্যপদ্ধতি সফল হইয়াছে,—এ দেশে সেই সকল পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা যে সাফল্য লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। এ-কথা সত্য যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন (production) এবং বণ্টন (consumption) উভয় কার্য্যই বিশেষ বিচার-বুদ্ধি সহকারে নিয়ন্ত্রিত করিলে (rationalize) তদ্দ্বারা বিশেষ সুফল লাভ করা যাইবে। কিন্তু ঐ পদ্ধতি সর্ব্বত্র একই ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। দেশ, কাল, এবং পাত্রভেদে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। দেশের লোকের চিরাচরিত অভ্যাস, তাহাদের মনোবৃত্তি ও জ্ঞান, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির উপরই উহার সাফল্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। বিলাতে খাদ্য-দ্রব্যের বণ্টন-নিয়ন্ত্রণের জন্য তথাকার সরকার কুপন বা ছাড় বাহির করিয়াছেন, সে জন্য সাধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক খাদ্য প্রাপ্তির সুবিধা হইয়াছে,—কিন্তু আমাদের দেশে উহা প্রবর্ত্তিত করিলে সকল স্থানে সুবিধা না হইতেও পারে। এ দেশের বিভিন্ন সহরে ও পল্লীগ্রামে যদি বহু সরকারী দোকান খোলা হয়, এবং সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের মারফতে খাদ্যদ্রব্য (চাউল, আটা, ময়দা, সর্ষপ তৈল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি) বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে।

বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি কলিকাতায় ২১টি বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল প্রভৃতি বিক্রয়ের দোকান খুলিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা বাহির করিয়াছেন; তৎপূর্ব্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩ পয়সা সের-দরে দুই সের পর্য্যন্ত মোটা চাউল ও ।৵০ সের দরে আধ সের করিয়া চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইতে বেলা ১১টা এবং বেলা ৩টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দারুণ ভীড়ের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াও সপ্তাহে দুই দিনের বেশী চাউল বা চিনি সংগ্রহ করা কোন ভাগ্যবানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এরূপ বিড়ম্বনা ভোগের পর রিক্তহস্তে ফিরিয়া তাঁহাদের অর্দ্ধাশনের পর অনশনের অভ্যাস করিতে হইয়াছে; নচেৎ 'আঁধার-বাজারের' সহায়তায় ১৪৷১৫৲ মণ দরে মোটা চাউল বা ১৬৲ হইতে ১৮৲ মণ দরে মাঝারি বা আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহা কি বাঙ্গালায় আকাল—দুর্ভিক্ষ—মন্বন্তর যে কোন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে? কলিকাতা করপোরেশনের ধাঙ্গড় ও শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া সম্প্রতি একযোগে যুদ্ধপূর্ব্ব-মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দাবী জানাইয়াছে; কিন্তু ভদ্র গৃহস্থগণের নিশ্চয়ই সেরূপ দাবী করিবার সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে না।

সিঙ্গাপুর-প্রত্যাগত কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নিকট সম্প্রতি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জাপানী আক্রমণ সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারিগণ সিঙ্গাপুরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এরূপ কঠোর ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, সেখানে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ বা কোন খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় নাই।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে এ দেশের লোকের ঘোর কষ্ট হইতেছে। কারণ, চাউলই বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য। এক এক স্থানের ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হইয়া চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন। দেশের লোকের ধারণা, দেশে চাউলের অভাব হইয়াছে। কিন্তু সরকার-পক্ষ এবং য়ুরোপীয় সওদাগরদিগের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' বলিতেছেন, দেশে চাউলের অভাব হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ শত্রুকবলে পতিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণে চাউল বাঙ্গালায় আমদানী হইত। ঐ চাউল ত এ দেশেই খরচ হইত। এখন সে চাউল আসিতেছে না। সুতরাং সে চাউলের অভাব অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় বাজারে বা দেশে যথেষ্ট চাউল আছে, এ কথা বলিলে লোক শুনিবে কেন? তবে কোন কোন মহকুমার সদর সহরে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরা চাউলের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। 'ক্যাপিটাল' লিখিয়াছেন যে, চাউলের মূল্য মণ-করা ৪ টাকা ৬ আনা সাড়ে চারি পাই হইতে ১০ টাকা পৌণে ৮ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে ঐ মূল্যে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। কলিকাতায় চাউলের পাইকারী দর শতকরা ১৩৮ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে হইতে পারে, কিন্তু মফস্বলে

ঐ দরে পাওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি কলিকাতায় চাউলের মূল্য কিছু কমিলেও মোটা, মাঝারি ও আতপ এবং ভাল চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিকাইতেছে।

বাঙ্গালায় প্রতি বৎসরে সমান ধান জন্মে না। প্রতি বৎসর সমপরিমাণ ক্ষেত্রেও ধান উৎপাদন করা হয় না। তবে মোটের উপর যে বার প্রচুর ধান হয়, সে বার বাঙ্গালায় ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মণ ধান জন্মে। ইহার এক শত ভাগের অন্ততঃ ১ ভাগ চেলো পোকায় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কীটে নষ্ট করে। ইন্দুরের দৌরাত্ম্যও বড় কম নহে। তাহার পর আর্দ্রতায় বা স্যাঁতায় অনেক চাউল খারাপ হইয়া যায়। এই সকল বাদ দিলে বাঙ্গালায় ২০ কোটি মণের অধিক চাউল মানুষের ভোগে আসে না। কিন্তু বৃটিশ-শাসিত বাঙ্গালায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ লোকের বাস। উহারা গড়ে বৎসরে প্রতি জন ৬ মণ করিয়া চাউল খায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার প্রয়োজন ৩৬ কোটি মণ চাউলের। বাঙ্গালার চাউলে এই জন্য বাঙ্গালীর অভাব পূর্ণ হইত না বলিয়াই বাঙ্গালীকে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে হইত; তথাপি অনেক লোক অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইত। যদি গড়ে প্রত্যেক মানুষের জন্য বার্ষিক ৫ মণ চাউল প্রয়োজন, ইহা ধরা যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালায় বার্ষিক ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ মণ চাউলের একান্তই প্রয়োজন। এ বার শুনিতেছি, ভারতে ১০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ অল্প হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালায় ধানের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জমিতেই হইয়াছে। তাহার উপর ঝড়ে, জলোচ্ছ্বাসে অনেক চাউল ও শস্যক্ষেত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালায় আগামী বার চাউল অল্প জন্মিবে না, এরূপ আশা সরকার কি করিয়া করিতে পারেন? নূতন আউস চাউলের মূল্যই যখন কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে ১১ টাকা, ১২ টাকা মণের কম পাওয়া যাইতেছে না, পুরাতন চাউল ১৪ টাকা হইতে ১৬ টাকা, এমন কি ১৭ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিকাইতেছে, তখন চাউলের অভাব নাই কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আটা, ময়দা, সুজি, যবের ছাতু প্রভৃতির খুচরা দর কম হইলেও লোক অনশন—অর্দ্ধাশন হইতে রক্ষা পাইতে পারিত।

তাহার পর চিনি। চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৩ টাকা হইতে ১৪ টাকা মণ। কিন্তু ঐ দরে কুত্রাপি চিনি পাওয়া যায় না। সরকার কলিকাতায় কয়েকটি দোকানে ।৶০ সের দরে আধ সের করিয়া চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভীড়ে দাঁড়াইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসা সম্ভবপর নহে। কাজেই 'আঁধার বাজারের' সাহায্যে অধিক দরে চিনি কিনিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। গুড়ের দরই মফঃস্বলে মণ-করা ১৫ টাকার অধিক। এরূপ অবস্থায় সরকারের চিনির নির্দ্দিষ্ট মূল্য নিতান্তই হাস্যজনক। ব্যাপার দেখিয়া বঙ্গীয় চিনির কল-সম্মেলন কলিকাতায় সভা করিয়া ইহার প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কল বন্ধ রাখিবেন স্থির করিয়াছেন। সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে গুড়ের মূল্য ১০ টাকা মণের অধিক হওয়া কোন মতেই সঙ্গত হয় না। বিহার প্রদেশে বহু চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখান হইতে বাঙ্গালায় যথেষ্ট চিনি আসিবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু মালগাড়ীর অভাবে এখন তাহা সম্ভব হইতেছে না।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, Bengal Industrial Servey Committee এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা এক প্রাদেশিক শর্করা-সমিতি গঠন করিতে বলিয়াছেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, ডিরেকটোরেট অফ সিভিল সাপ্লাইস কলিকাতা ও বাঙ্গালার জিলায় জিলায় চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। চিনি সস্তা হইলেই গুড় সস্তা হইবে। আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান সময়ে গুড়ের দর অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। গুড়-বিক্রেতারা এই অসময়ে ফাট্‌কাবাজী আরম্ভ করিয়াছে। এখন সরকারের এই ব্যবস্থা কতটা সুফল প্রদান করিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। এ পর্য্যন্ত সরকার মূল্যনিয়ন্ত্রণের যত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার একটিও সুফল প্রদান করে নাই; বরং বিপরীত ফলই হইয়াছে। এদিকে দেশের লোকের প্রাণান্ত হইতে বসিয়াছে। পণ্যমূল্যের একটা স্থিরতা নাই। সুবিধা পাইলেই যে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, সে তাহার পণ্যের সেই মূল্য হাঁকিতেছে।

এই নিদারুণ দুর্গতির দিনে মফঃস্বলবাসীদিগের যে কত দূর কষ্ট হইয়াছে, তাহা সহরের লোকের ধারণার অতীত। ইতিপূর্ব্বে পণ্যের মূল্য কখনই এত বৃদ্ধি পায় নাই। মফঃস্বলেই দরিদ্র লোকের বাস, ইহা সরকার পক্ষের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কয়লার অভাবে লোকের কষ্টের এক-শেষ হইয়াছে। গাড়ীর অভাবে কয়লা আসিতেছে না। মফঃস্বলে সরিষার তৈল পাঁচ সিকা দেড় টাকা সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অথচ কলিকাতায় দেখা যাইতেছে, সরিষার তৈলের পাইকারী দর ৩০৲—৩৫৲ টাকা মণ। ময়দা ২৫৲ মণ ৸০ আনা সের, আটা ২২৲ মণ ।৵০ সের, কেরসিন ।৶০—।০ বোতল, রেড়ীর তেল ১।০—১॥০ সের, ছাতু ॥৶০ সের, মুড়ি ৸০ সের, একটি দেশলাই ছয় পয়সা! মফঃস্বলে বিক্রেতারা এই হুজুগে দলবদ্ধ হইয়া দর যত ইচ্ছা তত বাড়াইতেছে। ইহার প্রতিকার করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য। নতুবা শেষে অবস্থা বড়ই সঙ্কটপূর্ণ হইবে।

আমাদের মনে হয়, সরকার যদি প্রত্যেক থানায়, ফাঁড়িতে, বাজারে ও দোকানে নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্য-তালিকা মোটা-মোটা অক্ষরে ছাপাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অথচ সেই দর ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই। গুড়ের দর যখন ১৫—১৬ টাকা, তখন চিনির দর ১৩ টাকা লিখিয়া হাস্যাভাজন হইলে চলিবে না। যাহারা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, তাহারা অধিক দর লইবার লোভে বলে, "আমরা আর চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করি না,"—কিন্তু অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইলে তখন চাউল দিয়া থাকে। ইহারা খরিদ্দারদিগের নিকট হইতে দাম লইয়া রসিদ দেয় না। খরিদ্দারও দোকানদারকে অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। জিনিষের স্বচ্ছলতা থাকিলে লোকের এত কষ্ট হইত না।

খাদ্যশস্য ভিন্ন অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যও নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্নের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন অসাধারণ। ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিবই বলিয়াছেন যে, কয়েক মাসের মধ্যে বস্ত্রোৎপাদনের মূল্য বা খরচা দ্বিগুণ হইয়াছে। Textile Advisory Panel ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনার সমর্থন করিয়াছিলেন। যান-বাহনের খরচা-নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা একই দরে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিলেন। তবে

তিন মাস অন্তর ইহার মূল্য পুনরায় ধার্য্য করা হইবে। তিন প্রকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করা হইবে। প্রথম জামার কাপড়, দ্বিতীয় ধুতি এবং তৃতীয় শাড়ী। গরীবদিগের ব্যবহারের জন্যই এই কাপড় প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার মূল্য সাধারণ বস্ত্র প্রস্তুতের খরচা অপেক্ষা শতকরা ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা হারে কম হইবে। এই সব সিদ্ধান্ত হইয়া—এজেণ্টগণের নাম শীঘ্রই বিঘোষিত হইবে—পূজার পূর্ব্বেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে আসিবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু বহু-প্রত্যাশিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দেখা মিলে নাই। এদিকে অর্থাভাবে এবং বস্ত্রাভাবে দেশের গরীব এবং অল্পবিত্ত ভদ্রশ্রেণী প্রায় দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পক্ষান্তরে, মিলগুলি সমস্তই সরকারের সামরিক বিভাগের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সামরিক কার্য্যের জন্য মাল সরবরাহ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু দেশের লোক ত আর দিগম্বর হইয়া থাকিতে পারে না! শুনিতে পাইতেছি যে, কেবল মাত্র বিদেশস্থ ভারতীয় সৈন্যদিগের জন্য ভারতীয় কলগুলিতে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে না; প্রতি মাসে প্রায় ২০ কোটি টাকার কাপড়ের বায়না দেওয়া হইতেছে। প্রকাশ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত সরকার ভারতীয় কলগুলি হইতে ১২০ কোটি টাকার কাপড় লইয়াছেন এবং আগামী বর্ষে ৭০ কোটি টাকার বস্ত্র লইবেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সৈনিক বিভাগের জন্য ১ কোটি পোষাক প্রস্তুত হইতেছে এবং ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য নানা স্থানে প্রায় এক লক্ষ দর্জ্জী কাজ করিতেছে। ভারতীয় কলগুলিতে এত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই কলওয়ালাদিগকে দিন-রাত কল চালাইয়া এই বস্ত্র প্রস্তুত এবং তিন প্রস্থ শ্রমিক লইয়া কাজ করিতে হইতেছে। অতিরিক্ত অধিক সময় কল চলিতেছে বলিয়া কলের কোন কোন অংশ অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ জন্য ক্ষয় পাইতেছে। কিন্তু উহার কতকগুলি অংশ এ দেশে প্রস্তুত হয় না, বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। ইহা এখন আনা যায় না, পথ বিঘ্নসঙ্কুল। এক্ষণে যাহা আছে, তাহা অগ্নিমূল্যে বিকাইতেছে। তাহার উপর মজুরীর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী কর, অতিরিক্ত লাভ-কর প্রভৃতি দিয়া কলওয়ালারা অধিক লাভ পাইতেছেন না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করিতে এখন সম্মত হইয়াছেন! দেখা যাউক, কি রকম কাপড় হয়—সস্তার দুরবস্থা না হয়!

তাহার পর ঔষধের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইন দুর্মূল্য, অথচ এ বার ম্যালেরিয়া অধিক। টিংচার আয়ডিন, বাই-কার্ব্বনেট অফ সোডা প্রভৃতির দাম অসম্ভব বাড়িয়াছে। অনেকে ঔষধ পাইতেছেন না। অনেক ঔষধ-ব্যবসায়ী অবস্থা বুঝিয়া যদৃচ্ছা ঔষধের দাম চড়াইতেছেন।

বিশ্বপ্রলয়ে কাগজ কেবল অসম্ভব দুর্মূল্য হয় নাই, দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ সরকারের প্রয়োজনে গৃহীত হইতেছে। কাগজের অভাবের কথা আমরা বহু বার সাময়িক-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ইদানীং কাগজের অভাব এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সংবাদপত্রের এবং সাময়িক পত্রগুলির সরকারী নিয়ন্ত্রণে মূল্যবৃদ্ধি ও আকার হ্রাস করিয়াও প্রকাশ করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। লিখিবার কাগজের মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের ঘোর অসুবিধা ঘটিতেছে। ভারতের সাধারণ নাগরিকদিগের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন কাগজের প্রয়োজন। এখন ভারতীয় কলগুলিতে বৎসরে ১ লক্ষ টন করিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে ভারত সরকার ৯০ হাজার টন কাগজ লইবেন বলাতে দেশে আশঙ্কার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। বার্ষিক ১০ হাজার টন কাগজে দেশের লোকের কোন প্রয়োজনই মিটিতে পারে না। কাজেই পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র প্রভৃতির প্রচার ক্রমে বন্ধ হইবে। হাজার হাজার কম্পোজিটার, লেখক, প্রেসম্যান, দপ্তরী প্রভৃতির কার্য্য বন্ধ হইবার আশঙ্কা জন্মিতেছে। ইতোমধ্যে এই সকল কার্য্য সঙ্কুচিত হওয়াতে বহু সহস্র লোক বৃত্তিহীন হইয়াছে ও হইতেছে। এই উৎকট দুর্ম্মূল্যতার সময় এত অধিক লোক বেকার হইয়া পড়াতে সমাজের আর্থিক অবস্থার যে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে, তাহার প্রতিকারে সরকার মনোযোগী হন নাই। এক জনের অন্ন মারা গেলে তাহার পরিবারস্থ অন্ততঃ ৫-৬ জন যে না খাইয়া মরিবে, ইহা কি সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন? অতএব সরকারের এই সঙ্কল্প অবিলম্বে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহার উপর কাগজের অভাবে শিক্ষার আলোক স্তিমিত হইবে। চীন এত দিন ধরিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতেছে,—কিন্তু তাহার লোক-শিক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত হইতে দেয় নাই। কোন দেশই তাহা দেয় না। এই কার্য্যে ভারত সরকারের নিতান্ত স্বৈরিতার এবং দেশবাসীর কল্যাণসাধনে অনবধানতাই সূচিত হইতেছে। আশা করি, গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিণ হইতে কাগজ আনাইবার যথাসম্ভব সত্বর সুব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার সমাধান করিবেন।

শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারে সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য। কেবল কাগজ নহে, নিব পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য। এক পয়সার নিব ছয় পয়সায় বিক্রয় হইতেছে। নিবও কি যুদ্ধে যাইতেছে? টিনের অভাবে ভারতে প্রস্তুত নিবও দুর্মূল্য। ইহাতে দরিদ্র লোক কি করিয়া সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখায়? সরকার তাহা বলিয়া দিবেন কি? লোকশিক্ষা যে সরকারের একটা প্রধান কর্ত্তব্য, এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। লোক শিক্ষিত না হইলে নানাবিধ কুকর্ম্মে রত হইয়া থাকে। শাসকদিগের পক্ষে তাহা কলঙ্কের কথা! এ সকল বিষয়েও সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করা উচিত।

সর্ব্বোপরি তামার পয়সার অন্তর্ধানে—রেজকীর স্বল্পতার জন্য বাজারে টাকার বিনিময়ে সামান্য মূল্যের জিনিস কিনিবার উপায় নাই। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীর অনুকরণে পয়সার পরিবর্ত্তে কুপন দিয়া কি বেসাতি চলিবে? অথচ সরকার বলিতেছেন, তাঁহারা মাসে ৭ কোটি টাকার খুচরা বাজারে ছাড়িতেছেন। সবই কোথায় উড়িয়া যাইতেছে—তাজ্জব প্রহেলিকা বটে! ফলে এই যুদ্ধে আমরা দেখিতেছি যে, এবারকার এই সার্ব্বত্রিক যুদ্ধে ভারতবাসীর পক্ষে অন্নাভাবে জীবন রক্ষা করা, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা করা, ঔষধাভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং কাগজ কলম বই প্রভৃতির অভাবে শিক্ষালাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আবার কি কঞ্চির কলম, খাঁকের কলম, পেন কলম প্রভৃতির যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে? অনেকেই আমাদের স্বাধীনতা প্রদানের লুব্ধ-আশ্বাস দিতেছেন; আমেরিকা—বৃটেন স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন—কিন্তু সেই আনন্দসমুজ্জল অনাগত ভবিষ্যতের পূর্ব্বেই কি আমাদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনাই প্রবল নহে?

নারী-মন্দির

কাঠে ও কাচে ছবি তোলা

কাঠের গায়ে ; কিম্বা কাচ, পাথর অথবা কাঁশা-পিতলের তৈজসের গায়ে বালি ছিটিয়ে নানা রকমের ছবি তোলা খুব সহজ। এ রীতিতে 'সিলুয়েটের' ধরণে রকমারি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিলিপি খড়খড়ি-জানলার গায়ে, ট্রে বা সার্শির গায়ে অনায়াসে তুলতে পারবেন। এ কাজে বড় রকমের শিল্প-শক্তির বা অসাধারণ ধৈর্য্যের দরকার নেই। যে-কোনো ছাপা বা আঁকা ছবি বা নক্সা থেকে সাদা কাগজে তার প্রতিলিপি তুলে সেই ছবি বা নক্সা আপনারা কাঠ, কাচ, কাঁশা-পিতলের গায়ে অনায়াসে ছকে নিতে পারেন।

আঁকা বা ছাপা ছবির প্রতিলিপি তুলতে দরকার শুধু পরিষ্কার এক-শীট-কার্বন কাগজ। যে-পেন্সিলের শীস নরম অর্থাৎ যাকে আমরা soft পেন্সিল বলি, সেই পেন্সিল দিয়ে কার্বন-কাগজের সাহায্যে ছবির প্রতিলিপি তুললে সে-প্রতিলিপি বেশ স্পষ্ট হবে। 'হার্ড' বা 'মিডলিং' পেন্সিলে কার্বনের সাহায্যে প্রতিলিপি তেমন স্পষ্ট হবে না।

১নং ছবিখানি দেখুন—কাঠের গায়ে বালি ছিটিয়ে জাহাজের ছবি আঁকা হয়েছে। এ কাজের জন্য যে-কোনো জাতের নরম
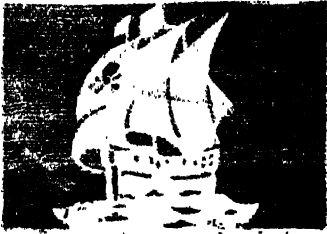
১। জাহাজ

কাঠ নিলে চলবে। প্যাকিং-বাক্সের কাঠ কিম্বা এমনি নরম কাঠ নেবেন। কারণ, নরম কাঠে ছুরি বা নরুণ দিয়ে সহজেই কাটকুট করতে পারবেন।

২নং ছবিখানি দেখুন—এখানি হচ্ছে সাদা কাগজে জাহাজের ছবি। কাগজে ঘর কাটা হয়েছে, তার কারণ, এমনি করে সাদা কাগজে ঘর কেটে ছোট ছবিকে এনলার্জ বা বড় করা চলে। যে-কাঠের গায়ে ছবি তুলতে চান, সে-কাঠের গায়ে শিরীষ কাগজ ঘষে প্রথমে সে-কাঠকে বেশ প্লেন করে নিতে হবে। শিরীষ কাগজ মানে মিহি-জাতের শিরীষ কাগজ ঘষবেন। শিরীষ কাগজ ঘষে তার পর কাঠের গায়ে এক-কোট গলা-মোমের (liquid wax) প্রলেপ মাখাবেন।

মাখাবার পর বিশেষ মিক্সচার ঢেলে কাঠের গায়ে জমি তৈরী করা চাই। এ মিক্সচার তৈরী করতে লাগবে খানিকটা শিরীষের টুকরো (Glue)। যে-শিরীষে আঠা তৈরী হয়, সেই শিরীষ। এই শিরীষের টুকরোর সঙ্গে—যতখানি শিরীষের টুকরো দেবেন, তার চার-ভাগের এক ভাগ ওজনের জল মেশাবেন। মিশিয়ে ছোট কেরোসিন-ষ্টোভের উপর বসিয়ে কিম্বা নরম আঁচে সেটা চড়িয়ে দেবেন। আগুনের আঁচে যতক্ষণ চড়ানো থাকবে, ততক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে সেটা নাড়বেন। তাহলে সমস্ত টুকরোটুকু শীঘ্র গলে যাবে। আঁচে ফুটে এটি যখন ক্ষীরের মত ঘন হবে, তখন একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন। তার পর জুড়িয়ে গেলে এতে এক-চামচ (বড় চামচ) গ্লিশিরিণ (অভাবে মিছরীর রস) মিশিয়ে নেবেন। মিশিয়ে তার পর সেটা বেশ মিশ খেলে তাতে দেবেন চায়ের-চামচের এক-চামচ-পরিমাণ জিঙ্ক অক্সাইড। জিঙ্ক-অক্সাইড মেশালে এই মিক্সচারের রং সাদা হবে। এখন মিক্সচার তৈরী হলো।

আচ্ছা, এবার পেষ্টবোর্ড থেকে চারটি টুকরো কেটে নিন ; এগুলি চওড়ায় হবে আধ ইঞ্চি করে। কাঠের যে-জায়গায় নক্সা বা ছবি

২। কাগজে আঁকা জাহাজ

তুলবেন, সেই নক্সা-গণ্ডির বাইরে এই চার পীশ পেষ্টবোর্ডের টুকরো ধারির মত এঁটে নিন। তার পর ঐ যে মিক্সচার তৈরী হয়েছে, সেই মিক্সচার সাবধানে কাঠের গায়ে ঢালুন। ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে তালপাতার চিপ্ দিয়ে সরু-চাকলি তৈরী করবার সময় চাটুতে গোলা ঢেলে যেমন করে খাড়াখাড়ি ভাবে তালপাতা টেনে-টেনে সেই গোলাকে চারিয়ে নেওয়া হয়,—তেমনি ভাবে ঐ মিক্সচার-গোলাটুকুকে চারিয়ে নিতে হবে। তার পর দু'দিন বা আড়াই দিন ওকে রেখে দিন শুকোবার জন্য।

শুকোলে কার্বন-সাহায্যে কাগজের ওপর যে প্রতিলিপি করা আছে, সেটি ঐ জমির ওপরে রেখে ছবির রেখা ধরে ধারালো ছুরির ডগা বুলিয়ে কুঁদে যান। কাঠের গায়ে ছুরির রেখা যেন বেশ সুস্পষ্ট

হয়। ৩নং ছবি দেখলে ছবি টেনে রেখা তোলার কায়দা বুঝতে পারবেন। তার পর কাঠের গায়ে যে-সব জায়গা খালি অর্থাৎ যেখানে ছবি বা রেখা নেই, সেই সব জায়গায় যদি ঢেউ-খেলানো রেখা টানতে পারেন, তাহলে আকাশ বা জলের এ দিয়া বেরুবে।

৩। ছুরির রেখা

এইবার বালি ছিটুনোর পালা। বালি বেশ-জোরে ছিটুতে হবে। ছবি আঁকা হয়ে গেলে হাতে বালি নিয়ে ব্লো-পাইপে জোর-ফুঁ দিয়ে বালি ছিটুবেন—অবশ্য ছবি তাগ্ করে। বালি ছিটুবার সময় চোখ বুজে বালি ছিটুবেন কিম্বা চোখে নীল চশমা আঁটবেন। না হলে চোখে বালি লাগবে।

এবারে আর-একটু কাজ বাকি। বালি ছিটুনো হয়ে গেলে গরম জলে খানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে—সেই ভিজে ন্যাকড়ায় ছবির ঐ কাঠখানিকে চাপা দিয়ে রাখবেন—ন্যাকড়া যেন বেশ ভিজে থাকে। এবং পুরো একটা রাত্রি এমনি চাপা দিয়ে রাখা চাই। পরের দিন সকালে ভোঁতা ছুরি ঘষলে মোম আর মিকশ্চারের প্রলেপটুকু সহজেই চেছে ফেলতে পারবেন। প্রলেপ মুছে গেলে কাঠের এই ফাঁকা জায়গায় ছবির রেখা বাঁচিয়ে শিরীষ কাগজ সাবধানে ঘষে নিলে কাঠখানি বেশ প্লেন ও ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠবে। এই রীতিতে ৪নং, ৫নং বা যে-কোনো ছবি তুলতে পারবেন।

সার্শির কাচে অবশ্য কোঁদার বালাই নেই। কাচের এক পিঠে এই একই রীতিতে প্রলেপ লাগাবেন, তার পর এমনি ভাবে ছবি আঁকা। শুধু কাচের উল্টো-পিঠে কালো রঙের কাগজ এঁটে নিতে
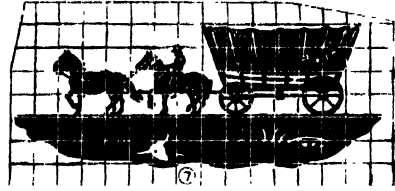
৪। গাড়ীর ছবি

হবে, তাহলেই কালো ব্যাক-গ্রাউণ্ডের জন্ম কাচের গায়ে ছবির বাহার খুলবে।
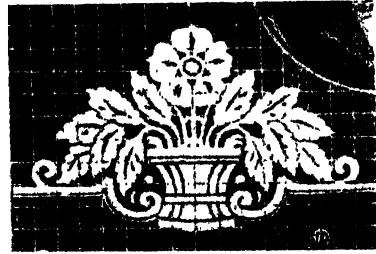
৫। ফুলের তোড়া

কাঁশা-পিতলের পাত্রের গায়ে যদি ছবি আঁকতে চান তো তার রীতিও এই একই রকম!

বালু-চর

স্বপ্নের মায়া নিয়ে চলে যায় মেঘের কুহেলী-রাশি,
রূপালী চাঁদের কল-হাসি জোছনায়,
শরতের বাণী বয়ে নিয়ে ছোটে নীল-সায়রের মাঝে
ভেসে আসে আর ভেসে ভেসে চলে যায়।

সসীম পৃথিবী অসীমের মাঝে একমনে চেয়ে থাকে
ঝরে পড়ে শুধু চন্দ্রের নির্ঝর,
ওই দূরে হাসে শাদা কাশবন মধুর স্বপন-রাতে
চক্ চক্ চক্ জাগিয়াছে বালু-চর।

চক্রবাকের উচ্ছাসভরা অস্ফুট ধ্বনি মাঝে
সাড়া দিয়ে যায় না-বলা প্রাণের কথা—
চাঁদের মায়ায় বালুকার চরে মেদুর প্রেমিক-রাতি
বয়ে আনে মনে শাশ্বত আকুলতা।

মহা-বালুচরও হাসে এক দিন কুহক-চাঁদিমা সাথে
চিরন্তনীর বাঁধে শুধু খেলাঘর,
তবু শেষ হয় উৎসব-রাতি চন্দ্রমা ডুবে যায়,
ভেঙে ভেঙে যায় প্রেমের বালুকা-চর।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এবার বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের সম্মুখীন; রণাগ্নির লেলিহান শিখা সত্যই বাঙ্গালীর গৃহ স্পর্শ করিয়াছে। যে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞে সমগ্র জগৎ বিপর্য্যস্ত হইতেছে, এক দিন বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসেও যে সেই যজ্ঞের বিষাক্ত ধূম বিচ্ছুরিত হইবে, তাহা বহু পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এত দিনে সকল আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার অবসান হইল; বাঙ্গালা আজ সত্যই আক্রান্ত! তবে, এখনও সে আক্রমণ আকাশপথে। এই আক্রমণ ক্রমে স্থলভাগেও প্রসারিত হইবে কি না, তাহা লইয়া আজ আবার নূতন উৎকণ্ঠা।

বাঙ্গালায় জাপানের বিমান আক্রমণের প্রসার—

ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার পূর্ব্বতম প্রান্তে জাপানী বিমান-বাহিনী আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের এই আক্রমণ প্রসার লাভ করিয়াছে; পূর্ব্ববঙ্গে কেবল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতেই নহে—বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায়ও জাপান এবার নিয়মিত ভাবে আঘাত হানিয়াছে। ইহা জাপানের নিছক শত্রুতা-সাধনের গুরুত্বহীন প্রয়াস নহে—সুনির্দ্দিষ্ট সমর-পরিকল্পনা অনুযায়ীই জাপানের এই আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। নিছক শত্রুতা-সাধনের জন্য আক্রমণ—অর্থাৎ সম্মিলিত পক্ষ যাহার নাম দিয়াছেন Nuisance Raid—তাহার জন্য জাপানের এত দিন প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। গত বর্ষাকালে সম্মিলিত পক্ষ যখন ব্রহ্মদেশে পুনঃ পুনঃ বিমান আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন জাপানের পক্ষে বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে কয়েকখানি বিমান প্রেরণ নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত ছিল না।

অন্তরীক্ষে জাপানের এই তৎপরতা হয় তাহার স্থলপথে ভারত অভিযানের পূর্ব্বাভাস; অথবা সে সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের আয়োজন বিনষ্ট করিতে চাহে। এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পের ধ্বংস-সাধন, সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করা এবং বেসামরিক জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তাহার একান্ত প্রয়োজন। সামরিক প্রয়োজনীয়তার দিক্ হইতে জাপানের বিমান আক্রমণ এখন এই প্রথম স্তরে রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন—জাপান যেমন অরক্ষিত অবস্থায় পাঁচ-ছয়খানি বোমাবর্ষী বিমান প্রেরণ করিয়া একরূপ লক্ষ্যহীন ভাবেই বোমা ফেলিতেছে, তাহাতে তাহার এই সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—কলিকাতা ও তাহার সহরতলীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাপান পাঁচ-ছয়খানি অরক্ষিত বিমান পাঠাইয়া চরম ফললাভের আশা সত্যই করে না; প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাহার বোমাবর্ষী বিমান স্থানে স্থানে আঘাত করিয়াছে। গত এক বৎসরে ভারতের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা জাপানের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। কয়েকখানি বিমান নিষ্ক্রিয়ভাবে আকাশে ঘুরিয়া এই সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কোথায় কি পরিমাণ বিমান-বিধ্বংসী কামান স্থাপিত হইয়াছে, জঙ্গী বিমানগুলির অবস্থান-ক্ষেত্র কোন্ দিকে, সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্থানে স্থানে আঘাত করা প্রয়োজন। এই সকল অত্যাবশ্যক সংবাদ সংগৃহীত হইবার পর জাপানী বিমানবহর শ্রমশিল্প ও সংযোগ-সূত্র বিনাশ-সাধনের এবং বেসামরিক জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবে। তখন বোমাবর্ষী বিমানগুলি প্রচুর জঙ্গী বিমানের রক্ষণাধীনে প্রেরিত হইবে। কত দিনে জাপানের সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ হইবে এবং তাহার প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইবে—তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ইহা সত্য, জাপানের প্রাথমিক বিমান আক্রমণের অল্পতা ও বিফলতা লক্ষ্য করিয়া অত্যধিক আশান্বিত হওয়া উচিত নহে; বস্তুতঃ, ইহা তাহার পর্য্যবেক্ষণ মাত্র—প্রকৃত আক্রমণ নহে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—জাপান কেবল সামরিক লক্ষ্য-বস্তুতে আঘাত করিতে চাহে না—বেসামরিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিও তাহার উদ্দেশ্য, ইহা তাহার সামরিক প্রয়োজনেরই অঙ্গ। ইতঃপূর্ব্বে নান্‌কিংএ, ক্যান্টনে, রেঙ্গুনে, মান্দালয়ে এবং সিঙ্গাপুরে আমরা
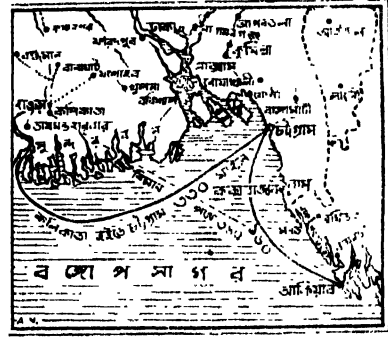
কলিকাতায় বিমান-আক্রমণের সম্ভাবিত ঘাঁটী আকিয়াব

জাপানের এইরূপ প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছি; প্রত্যেকটি স্থানে সে প্রথমে একরূপ লক্ষ্যহীন ভাবে আক্রমণ চালাইয়া বেসামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহার পর, প্রত্যক্ষ সামরিক লক্ষ্য-বস্তুগুলির প্রতি অবহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, বেসামরিক ব্যবস্থার সহিত সমরায়োজনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; বেসামরিক ব্যবস্থায় যদি বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কেবল সামরিক লক্ষ্য-বস্তুতে আঘাত করিয়া আক্রমণকারীর অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য, জাপান ভারতের জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চাহে। বিশেষতঃ, আমাদের শাসকশক্তির নির্ব্বদ্ধিতায় জাপান এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিতও হইয়াছে; সে জানে—ভারতবর্ষের জাপান-বিরোধী সমর-প্রচেষ্টা সমগ্র ভারতের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নহে। কাজেই, বিমান-আক্রমণকালে যথাশক্তি বেসামরিক অধিবাসীকে এড়াইয়া চলা জাপানের রাজনীতিক স্বার্থ; ইহাতে সে এ শ্রেণীর সহানুভূতি পাইবে মনে করিতে পারে। কিন্তু এই রাজনীতিক স্বার্থের জন্য সে আশু সামরিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, সামরিক সাফল্যের উপরই তাহার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কাজেই, বেসামরিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সামরিক

প্রয়োজনে যদি কিছু বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়, কিছু বেসামরিক সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে জাপান নিরুপায়।

জাপান কি ভারত আক্রমণ করিবে ?

এখন প্রশ্ন—জাপান কি সত্বর ভারতবর্ষের উদ্দেশে প্রত্যক্ষ অভিযান আরম্ভ করিবে? সম্মিলিত পক্ষের সমর-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন—না, জাপানের সেরূপ শক্তি নাই। তাহার পর, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে এবং আরাকান প্রদেশে সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া নিয়মিত ভাবে যে প্রচারকার্য্য চলিতেছে, তাহাতে অনেকের মনেই এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, জাপানের পক্ষে এখন ভারত আক্রমণ সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয়—জাপানের শক্তি ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষই যে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন এবং জাপান সেখানে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত, ইহা সত্য। কিন্তু সেখানে জাপানের প্রতিরোধের প্রাবল্যে লঘুত্ব আরোপ করা যায় না। এক নিউ গিনির প্যাপুয়াতেই জাপান ৬ মাস প্রতিরোধে প্রবৃত্ত আছে; বুনা অঞ্চলেই প্রায় দুই মাস যুদ্ধ চলিতেছে। এখনও নিউ গিনির লে ও স্যালামুয়া জাপানের অধিকার-ভুক্ত। তাহার পর, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী রবাউল অবশিষ্ট আছে; সমগ্র নিউ বৃটেন্ ও নিউ আয়র্লণ্ড হইতেও জাপানী সৈন্য বিতাড়িত হওয়া প্রয়োজন। সলোমন্সেও সম্মিলিত পক্ষের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা আপাততঃ শ্রুত হয় নাই। অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিক নৌ-যুদ্ধে জাপান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু এই ক্ষতিতে জাপানের নৌবহর পঙ্গু হইয়াছে, মনে করা যায় না। তাহার পর, আরাকানে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রগতিতেও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলে না; বুথিডং ও মংডয় জাপানীরা প্রতিরোধ করে নাই—সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য নির্ব্বিরোধে ঐ দুইটি স্থানে পৌঁছিয়াছে। ইহার পর আকিয়াবই জাপানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী; এই আকিয়াব অধিকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য উল্লেখযোগ্য নহে—তৎপূর্ব্বে জাপানের প্রকৃত মনোভাবও সুস্পষ্ট হইবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গত মে মাসের পর হইতে জাপান একরূপ নিষ্ক্রিয়। এই বিষয়ে ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, ফ্যাসিষ্ট শক্তির চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থায় যুদ্ধ চালাইয়া পরে অধিকৃত অঞ্চলের রস আহরণে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে জাপান প্রয়াসী হইয়াছে। এই নিষ্ক্রিয়তা তাহার শক্তিহীনতার নিশ্চিত দ্যোতক না হওয়াই সম্ভব।

এখন প্রাকৃতিক অবস্থা পুনরায় যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী। জাপানের প্রধান মন্ত্রী সে দিন প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করিয়াছেন—এই বার "প্রকৃত সংগ্রাম" আরম্ভ হইবে। তাঁহার এই উক্তি নিছক্ "ফাঁকা আওয়াজ" নহে বলিয়াই মার্কিণী বিশেষজ্ঞদিগের ধারণা। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে জাপানের সমরায়োজন বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই আয়োজন চীনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। এই সকল বিষয় উত্তমরূপে চিন্তা করিলে জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা উপেক্ষা করা চলে না। প্রথমতঃ, জাপানের আক্রমণ-শক্তি এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সে এত অধিক বিব্রত নহে যে, অন্যত্র আক্রমণ-পরিচালন তাহার সাধ্যাতীত; তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে জাপানের সমরায়োজন বিশেষ ভাবেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং চতুর্থতঃ, জেনারল তোজোর উক্তি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ।

তবে, এই বিষয়ে একটি সন্দেহের কারণ আছে; সেই কারণে জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনায় যেমন সন্দেহের অবকাশ ঘটে, তেমনই মিত্রশক্তির ব্রহ্মদেশ আক্রমণের এবং য়ুরোপে তাঁহাদের "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টির সম্ভাবনায়ও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। রুশিয়ার যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে—যেখানে প্রতিপক্ষের দ্রুত ও নিশ্চিত পরাভবের সম্ভাবনা নাই, সেখানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত
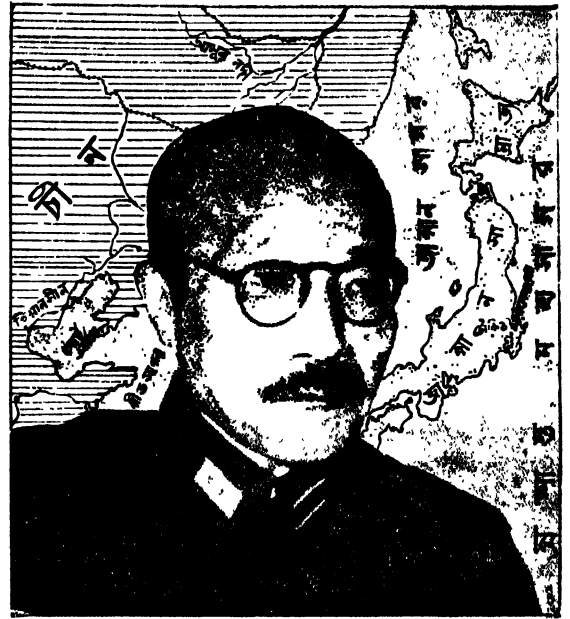
জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো

হইলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরযন্ত্রও বিকল হইয়া পড়িতে পারে; বিশেষতঃ, প্রতিপক্ষের যদি দীর্ঘকাল গতিশীল যুদ্ধ পরিচালনের উপযোগী বিশাল দেশ থাকে, প্রয়োজন হইলে সে যদি প্রতিরোধকারী সৈন্যদিগকে অপসরণ করিয়া নূতন নূতন ব্যূহে সমাবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিরোধ অভেদ্য হইয়া উঠাও সম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারী শক্তি কিছু অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীই ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইতে থাকে। ভারতবর্ষে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন সম্প্রতি বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; বিভিন্ন প্রতিরোধ-ব্যূহে অপসরণ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী দেশও এই ভারতবর্ষ। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মনে হইবে—ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ না করিয়া জাপান একাকী স্থলপথে ভারত আক্রমণে ইতস্ততঃ করিতে পারে। বিশেষতঃ, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতিরোধ

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ পরিবেষ্টনের প্রয়াস হয়ত জাপানের পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু অন্য দিক্ হইতে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা জাপানের অনুকূল হইবারও সম্ভাবনা আছে। এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে যে, হিট্লার অদূর ভবিষ্যতে তুরস্ক আক্রমণ করিয়া পশ্চিম-এশিয়ায় সম্মিলিত পক্ষকে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন। এই ভাবে জার্ম্মাণীর আক্রমণে ভারতের পশ্চিম দিকে সম্মিলিত পক্ষ যখন বিব্রত থাকিবেন, সেই সময় জাপান পূর্ব্ব দিকে ভারতবর্ষকে আঘাতের অনুকূল সময় মনে করিতে পারে। হয়ত অক্ষ-শক্তির এইরূপ সমর-পরিকল্পনাই যবনিকার অন্তরালে রচিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অক্ষশক্তির পক্ষে সুষ্ঠু সমর-পরিচালনার জন্য তাহাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমর-যন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগ প্রয়োজন। এই দিক্ হইতে মিত্রশক্তির সমর-পরিচালন-পদ্ধতি অধিকতর উন্নত; বৃটেন্ ও আমেরিকার সামরিক সহযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, রুশিয়ার সহিতও সমরোপকরণের আদান-প্রদান চলিতেছে। কিন্তু অক্ষশক্তির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিত্র পরস্পরের সহিত সর্ব্ববিষয়ে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ। কাজেই, কেবল জাপানের প্রয়োজনে—অর্থাৎ ব্রহ্মদেশরক্ষার্থ তথা চীনের সমস্যার সমাধানের জন্যই যে ভারতবর্ষের প্রতি অক্ষশক্তির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাই নহে—অক্ষশক্তির সুষ্ঠু সমর-পরিচালনের জন্যও দক্ষিণ এশিয়ায় তাহাদের অধিকার-বিস্তৃতির প্রয়োজন সৃষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় আশান্বিত হইয়া জাপান ভারত আক্রমণে উৎসাহিত হইতে পারে। ভারতে প্রকৃত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমর-প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির সহযোগ গ্রহণের সুবুদ্ধি আমাদের শাসক-শক্তির হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ধৃত হইবার পর ভারতে যে গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নির্ম্মম দমননীতির ফলে তাহা শান্ত হইয়াছে বলিয়া শাসক-শক্তি এখন হয়ত আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মম দমননীতির ফলে জনসাধারণ এখন অধিকতর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে; তাহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দিক্ হইতে গত আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন উহা অধিকতর অবনত। এখন ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট জনসাধারণের পক্ষে আক্রমণকারী শক্তির প্রতি আত্মঘাতী সহানুভূতি প্রদর্শনের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। জাপান ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং গণ-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। কংগ্রেসের জাপ-বিরোধী মনোভাব এবং চীনের প্রতি তাহার সহানুভূতি জাপানের অজ্ঞাত নাই; কংগ্রেসের সর্ব্বশেষ প্রস্তাবে বৃটিশের ভারত-ত্যাগ দাবী করা হইলেও ভারতে বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যের অবস্থিতিতে আপত্তি করা হয় নাই। সেই কংগ্রেসের নামে যে গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লন—ইহা জাপানের আকাঙ্ক্ষিত নহে; বৃটিশের দমন-নীতিতে ভারতের জনসাধারণ আরও অধিক বৃটিশ-বিরোধী হইয়া উঠুক, ইহাই তাহার কাম্য। সে জানে—এই বিদ্বেষ চরমে উঠিলে ভারতীয় জনসাধারণ দিশাহারা হইবে এবং তখনই তাহাদিগকে স্বাধীনতার আশা দিয়া "হাত" করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে। এখন জাপান মনে করিতে পারে—সেই উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তাহার পর, জাপান দেখিয়াছে—চীনে ও রুশিয়ায় কেবল রাজ্যগত বিশালতাই অক্ষশক্তির বিজয়ের পথে অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই; ঐ সকল দেশের বেসামরিক জনসাধারণের সহিংস অসহযোগ সশস্ত্র প্রতিরোধ অপেক্ষাও ভয়াবহ। ভারতীয় জনসাধারণকে এই সহিংস অসহযোগে উদ্বুদ্ধ করিতে বৃটিশ সরকারের সামর্থ্যে জাপানের সন্দেহ সঙ্গত।

উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র ও জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি—

লিবিয়ায় জেনারল রোমেলের সেনাবাহিনী আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। তবে, টিউনিসিয়া ও লিবিয়ার সীমান্তের দিকে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

ফ্যাসিষ্ট স্পেনের ফ্যাসিষ্ট নেতা জেনারল ফ্রাঙ্কো

জেনারল রোমেল এ ল্-আঘেলিয়ায় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন না ই—তিনি ক্রমেই পশ্চিমাভিমুখে অপসরণ করিতেছেন। আমরা বহু পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে, রোমেল লিবিয়ায় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত না হইয়া টিউনিসিয়ায় সহযোদ্ধ্-গণের সহিত মিলিত হইবেন। আমাদের সেই অনুমান এখন যেন সত্যে পরিণত হইতেছে; লিবিয়ায় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রোমেলের আর নাই বলিয়াই মনে হয়। জেনারল নেহরিংএর সহিত মিলিত হইয়া তিনি যেন উত্তর আফ্রিকায় শেষ প্রতিরোধের আয়োজন করিবেন।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়—হিটলার হয়ত টিউনিসিয়ার স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে অসাধ্য-সাধনের দুরাশা পোষণ করেন না; তিনি কেবল টিউনিসিয়ায় একটি সুদৃঢ় "কীলক" প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিতেছেন। টিউনিসিয়ার এবং তাহার উত্তরে সমুদ্রাংশের ও দ্বীপগুলির সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। জেনারল এসেনহাওয়ারের পক্ষে এই স্থানে জার্ম্মাণীর সুদৃঢ় "কীলক" অপসারণ করা সহজসাধ্য হইবে না।

সে যাহা হউক, হিটলার এই "কীলকের" দ্বারাই সমগ্র উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে পরিবর্ত্তন-সাধনের পরিকল্পনা করেন নাই বলিয়া মনে হয়; অতি সত্বর দুই পার্শ্ব হইতে সম্মিলিত পক্ষকে আঘাত করিয়া তিনি উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে আমূল পরিবর্ত্তন-সাধনে প্রয়াসী হইতে পাবেন। এক দিকে তুরস্ক এবং অন্ত দিকে স্পেনে তাঁহার আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনা। স্পেন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র; জার্ম্মাণীর স্বগোত্র। কাজেই, সে যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধেই জার্ম্মাণীর দাবী মানিয়া লইবে, ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত। স্পেনের মনোভাব সম্বন্ধে সময় সময় স্বকপোলকল্পিত কাহিনী প্রচারিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি জেনারল ফ্রাঙ্কো উদারনীতিকতার বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা করিয়া এবং হিট্‌লার ও মুসোলিনির জয়-গান গাহিয়া তাঁহার তথা ফ্যাসিষ্ট-স্পেনের প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্পেন এত দিন জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে নিরপেক্ষ আছে মনে করাই সঙ্গত। জার্ম্মাণী যে দিন তাহাকে নিরপেক্ষ রাখা অপেক্ষা যুদ্ধে লিপ্ত করান অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিবে, সেই দিনই স্পেন তাহার নিরপেক্ষতা-মুখোস ত্যাগ করিবে। অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী স্পেন অধিকার করিয়া উত্তর আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করিতে পারে; মিত্রশক্তির অজ্ঞাতসারে দ্রুত স্পেনের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি হস্তগত করিবার জন্যই জার্ম্মাণী হয়ত এখন ওঁৎ পাতিয়া আছে।

তবে, তুরস্কে জার্ম্মাণী প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে। কিন্তু স্পেনে কোনরূপ প্রতিরোধের সম্ভাবনা না থাকায় এবং টিউনিসিয়ায় ব্যাপক রণক্ষেত্র সৃষ্ট না হওয়ায় জার্ম্মাণী তুরস্কের প্রতি প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতেও পারিবে। হয়ত পশ্চিম-এশিয়ায় এই আসন্ন অভিযানের প্রয়োজনেই জার্ম্মাণী উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র ইচ্ছা করিয়া সঙ্কীর্ণ করিতেছে। তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীর এই সম্ভাবিত অভিযান যদি সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ রুশিয়ায় উহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পতিত হইবে, ভারতবর্ষ ইহাতে বিপন্ন হইবে, সুয়েজের পক্ষে নূতন বিপদের সৃষ্টি হইবে। কাজেই, এই নূতন অভিযানের জন্ত জার্ম্মাণীর ব্যাপক আয়োজন স্বাভাবিক এবং সে জন্য অন্যান্য রণক্ষেত্রে তাহার তৎপরতা সাময়িক মন্দীভূত হওয়াও সম্ভব।

এডমিরাল্ দারলাঁ নিহত—

গত ডিসেম্বর মাসে এডমিরাল দারলাঁ গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয় নাই। ফ্যাসিষ্ট-অনুরক্তি, না দারলাঁর ন্যায় সুবিধাবাদীর প্রভাব হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করা এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য, তাহা এখনও সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নাই। যে কারণেই এডমিরাল্ দারলাঁকে হত্যা করা হউক না কেন, তাঁহার মৃত্যুতে এক অপ্রীতিকর বিতর্কের অবসান হইয়াছে।

দারলাঁর জীবনে কোন সুস্পষ্ট রাজনীতিক আদর্শ ছিল না; তাই, সুবিধাবাদীর স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি একাধিক বার রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন; ফ্রান্সের নৌ-সচিবরূপে তিনি বৃটিশ নৌ-সচিবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ফরাসী নৌবহর বৃটিশ নৌ-ঘাঁটীতে প্রেরিত হইবে। কিন্তু পরে তিনি ফ্রান্সের সকল সম্পদ জার্ম্মাণীর পদে অর্পণ করিয়া তাহার কৃপাপ্রার্থী হন। তাহার পর, ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সহযোগিতার কালে তিনি জার্ম্মাণীর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। আবার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের অভিযান আরম্ভ হইবামাত্র এডমিরাল্ দারলাঁ ফ্রান্সকে জার্ম্মাণীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান!

জেনারল দ্য গলে সম্মিলিত পক্ষের চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থাতেও জার্ম্মাণীর বিরোধিতায় বিরত হন নাই। সেই দ্য গলেকে উপেক্ষা করিয়া বহুরূপী দারলাঁর সহিত "দহরম মহরম" করায় সম্মিলিত পক্ষ তীব্র প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অবশ্য দারলাঁর সহিত মিত্রতার সামরিক কারণ ছিল। তাঁহার সহযোগিতায় উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষ অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন; মার্কিণী সমর-সচিব মিঃ ষ্টিম্‌সনের ভাষায় তাঁহাদের ২ মাস সময় বাঁচিয়া গিয়াছে এবং ১৬ হাজার সৈন্যের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। এই সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজনীতিক কারণেও তাঁহারা দারলাঁকে "হাতে রাখিতেছিলেন" বলিয়া মনে হয়।

সম্মিলিত পক্ষ এখন য়ুরোপে প্রত্যক্ষ অভিযান-পরিচালনের কথা চিন্তা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এক দুরূহ রাজনীতিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীন য়ুরোপে যাহারা এখন চরম নির্য্যাতন সহিয়া বিজয়ী শক্তির প্রতিরোধে প্রবৃত্ত আছে, তাহারা উগ্র বিপ্লববাদী। সম্মিলিত পক্ষ কখনও য়ুরোপে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা চাহিতে পারেন না। হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, য়ুগোশ্লোভিয়া, গ্রীস্ প্রভৃতি রাজ্যগুলির তথাকথিত সরকার লণ্ডনের "পিঁজরাপোলে" সংরক্ষিত আছে। সম্মিলিত পক্ষ আশা করেন— য়ুরোপের যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় তাঁহারা প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের এই সকল কঙ্কালকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ফ্রান্সের কি হইবে? ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের কঙ্কাল ত কোন পুরাতত্ত্বশালায় রক্ষিত নাই! এই জন্য যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় ফ্রান্সে সকল শ্রেণীর ফরাসীদিগের সহযোগিতায় এক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়ত সম্মিলিত পক্ষের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়ত তাঁহারা এডমিরাল দারলাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে এবং ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সহযোগিতার কালে এডমিরাল দারলাঁ ফ্রান্সে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন।

সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্য—

রুশ-সৈন্য সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। মধ্য-রণাঙ্গনে ভেলিকাই-লুকি অধিকার করিয়া তাহারা জার্ম্মাণীর একটি প্রধান সরবরাহ-সূত্র বিপন্ন করিয়াছে; ইহার পর নভো-সকোল্‌নিকি যদি তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলের সহিত জার্ম্মাণীর মধ্য-রণাঙ্গনের সংযোগ ছিন্ন হইবে। ভেলিকাই-লুকির পূর্ব্বদিকে রেজভেও জার্ম্মাণ-বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ স্থানটির পতন হইলে ভিয়াস্‌মা পর্য্যন্ত রেলপথ মুক্ত হইবে এবং স্মলেনস্কের পতনও আসন্ন হইয়া উঠিবে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে কোটেল্‌নিকভো পুনরধিকার সোভিয়েট বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তাহাদিগের পরবর্ত্তী

দক্ষিণ রুশিয়ার রণক্ষেত্র

লক্ষ্য স্যালস্ক; এই স্যালস্ক হইতেই রষ্টভ যাইবার ব্র্যাঞ্চ লাইন। রষ্টভ দক্ষিণ রুশিয়ায় জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সরবরাহ-ঘাঁটী। মধ্য-ককেসাসে মজদক, নাল্‌চিক ও প্রখ্‌লাদনায়া পুনরধিকার করিয়া সোভিয়েট-বাহিনী গ্রজনী তৈলকূপকে সম্পূর্ণরূপে বিপ্নমুক্ত করিয়াছে। বস্তুতঃ, সমগ্র পূর্ব্ব-য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থা এখন সোভিয়েট রুশিয়ার অত্যন্ত অনুকূল। আশা করা যায়, আগামী বসন্তকালের পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের অবস্থা আরও উন্নত হইবে; ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে যাহা লাভ করিয়াছে, এই বৎসর শীতকালে সে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

রুশ-বাহিনীর এই শীতকালীন প্রতি-আক্রমণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে মন্তব্য করিয়াছি, এখনও তাহারই পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সম্মিলিত পক্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিতে না পারেন, তাহা হইলে সোভিয়েট-বাহিনীর এই শীতকালীন সাফল্যের গতি আগামী বসন্তকালে অব্যাহত থাকিবে না। যত দিন জার্ম্মাণী নিশ্চিন্তে সমগ্র য়ুরোপখণ্ডের রস শোষণ করিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারিবে, তত দিন তাহার পক্ষে শীতকালীন প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া বসন্তকালে পুনরায় নূতন বিক্রমে আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব হইবে।

৮।১।৪৩　　　শ্রীঅতুল দত্ত।

কণ্ঠ ও চিবুক

পনেরো-ষোল বৎসর বয়সেই মেয়েদের মধ্যে অনেকের চিবুকের নীচের দিকটা দু'-ভাঁজ হইয়া পড়ে, তার ফলে কণ্ঠের শ্রী ও শোভা নষ্ট হয়। চিবুক এমনি দু'-ভাঁজ হওয়ার ইংরেজী-নাম—ডবল্-চিন্ (double chin)। দু'-ভাঁজ চিবুকে মুখের কমনীয়তা থাকে না।

চিবুক এমন দু'-ভাঁজ হয় শয়নের দোষে, চলা-ফেরা করার দোষে। এদিকে যদি গোড়ায় মনোযোগী হন, তাহা হইলে অভ্যাসে শুইতে বসিতে চলিতে ফিরিতে স্বাচ্ছন্দ্য যেমন নষ্ট হইবে না, চিবুকের এবং কণ্ঠের গড়নেও তেমনি এতটুকু বৈকল্য ঘটিবে না।

কি করিয়া চলিবেন, কি করিয়া বসিবেন, দাঁড়াইবেন, জানেন? বুক সিধা রাখিয়া চিতাইয়া—যেন বুক দিয়া ঢেউ ঠেলিয়া চলিতেছেন! বসা, দাঁড়ানো কিম্বা চলা-ফেরা—সব সময়ে মাথা রাখিবেন সিধা! মাথা যদি একান্ত হেলে তো পিছন-দিকে। সামনের দিকে মাথা কখনো যেন না ঝোঁকে—এতটুকু না! এবং চিবুকও যেন কখনো সামনের দিকে হেলিয়া না থাকে! শুইবার সময়েও সতর্ক থাকিতে হইবে। উঁচু বা শক্ত বালিশ মাথায় দিয়া শুইলে পিঠের মেরুদণ্ডের সঙ্গে মাথা সমান-রেখায় রাখা যায় না—ঘাড় একটু বাঁকিয়া থাকে; তার ফলে মুখে নানা দাগ (wrinkles) এবং চিবুকে ভাঁজ পড়ে। চিবুক হয়—যাকে বলে, ডবল্ চিন!

১নং ছবিতে দেখুন উঁচু বালিশে মাথা দিয়া শুইবার ফলে ঘাড় বাঁকিয়া আছে; চিবুকের প্রান্ত ঝুঁকিয়া আছে! ইহাতে মুখের শ্রী ও গড়ন বিকৃত হয়। অতএব বালিশ মাথায় দিতে হইলে নরম

১। শক্ত উঁচু বালিশে মাথা

এবং নীচু বা পাতলা বালিশ মাথায় দিবেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, মাথায় যদি বালিশ আদৌ না দেন, তাহা হইলে ঘাড় গলা বা চিবুকের গড়ন কোনো কালে বিকৃত হইবে না এবং মুখে একটিও রেখা বা দাগ পড়িবে না।

২। মাথা ঝুলাইয়া

যাঁদের চিবুক দো-ভাঁজ এবং গলা বিশ্রী—যেন গন্ড-গণ্ডে আক্রান্ত,—ব্যায়ামে তাঁরা সে বিকৃতি মোচন করিতে পারেন। সে জন্য ব্যায়ামের বিধি—

১। কৌচে বা খাটে শুইয়া মাথা রাখুন ২নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড়ের কাছ হইতে ঝুলাইয়া। তার পর ধীরে ধীরে মাথাসমেত ঘাড় সামনে-পিছনে তোলা-নামা করুন—যতখানি সম্ভব অর্থাৎ পারেন। এমন ভাবে সামনের দিকে মাথা তুলিবেন, চিবুকের প্রান্তভাগ যেন কণ্ঠ-বিবর স্পর্শ করে! তার পর আবার পিছন-দিকে মাথা নামান্। দু'চোখ খুলিয়া রাখিবেন (২নং ছবি দেখুন)। তোলা-নামা করিবেন খুব মৃদু ভাবে—তবে এমন ভাবে যে ঘাড়ে ও গলায় যেন চাড় পড়ে! পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ ব্যায়াম করিবেন।

তার পর সিধা খাড়া হইয়া বসুন। এমন ভাবে বসিবেন, তল-পেটের পেশীগুলিতে যেন টান পড়ে এবং চেয়ারের পিঠে যেন মেরুদণ্ডের ভর থাকে। দুই হাত রাখুন কোলে। এবার মাথা দিন পিছন দিকে হেলাইয়া ৩নং ছবির মতো—যতখানি হেলাইতে পারেন। মুখ খুলিয়া রাখুন। তার পর সামনের দিকে বেশ জোর দিয়া মাথা হেলান—সঙ্গে সঙ্গে মুখ বুজিবেন। তখনি আবার পিছন দিকে মাথা হেলান—পিছন দিকে মাথা হেলাইবার সময় মুখ খুলিবেন। তার পর সামনের

দিকে মাথা হেলানো এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বোজা। ইহাতে গলায় ও গালের পেশীতে চাড় পড়িবে। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

পিছনে মাথা হেলাইয়া

৪। ঘাড় ফিরান্

এবার ৩ নম্বরের ব্যায়াম। উঠিয়া দাঁড়ান—পায়ে-পায়ে ঠেকিয়া থাকিবে না—দু' পা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবেন—দু' হাত রাখুন কোমরের উপর। ঘাড় সিধা রাখিবেন। এবার ডান দিকে যত-খানি পারেন, ঘাড় ফিরান—চিবুক যেন ঠিক ডান-কাঁধের উপর পর্য্যন্ত আসে। তার পর বাঁ দিকে ঘাড় ফিরান—এবার চিবুক আসিবে বাঁ কাঁধের উপর পর্য্যন্ত (৪ নং ছবি দেখুন)। এমনি ভাবে এক বার ডান দিকে, পরক্ষণে বাঁ দিকে ঘাড় ফিরাইবেন—খুব জোরে নয় এবং খুব আস্তেও নয়। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট।

যাঁদের চিবুক দো-ভাঁজ এবং কণ্ঠ হইয়াছে গণ্ডমালা-ব্যাধিগ্রস্তার মতো, এ ব্যায়ামে তাঁদের চিবুকের ও গলার ভাঁজ সারিবে, গলা হইবে সুন্দর সুশ্রী। এবং যাঁদের এ বিকৃতি ঘটে নাই, এ বিকৃতির আশঙ্কাও তাঁদের থাকিবে না।

শাশুড়ী-বৌ

রসরাজ অমৃতলাল তাঁর "গ্রাম্য-বিভ্রাটে" এক-দল শাশুড়ীর অবতারণা করে তাদের মুখ দিয়ে "বৌ এসে ছেলে পর করে দেওয়া"র একমাত্র কৌতুক-দিকটাই দেখিয়েছিলেন। শাশুড়ী যেখানে বৌয়ের উপর পীড়ন করে, সেখানে হাসি-তামাসা মিললেও বহু সংসারে এমন ঘটে, যেখানে প্রাণের অজস্র স্নেহ-মমতা দিয়েও শাশুড়ী বৌমার মন পান্ না! মন পাওয়া দূরের কথা, শাশুড়ীকে বৌমা দেখেন বিষ-নয়নে। বিদুষী বৌমার দলকেও যখন দেখি এ-অভিযোগ থেকে মুক্ত নন্, তখন শিক্ষার উপর ঘৃণা জন্মায়! তবু জিজ্ঞাসা করি, যাঁরা এ অভিযোগ তোলেন, বৌমা পরের ঘরের মেয়ে বলে তাঁরা শুধু তাঁর দোষ দেন কেন? পেটের ছেলে যদি ঠিক থাকে, তাহলে পরের মেয়ে বৌমার সাধ্য কি, শাশুড়ীকে অমান্য বা তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে!

ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলের মা যদি ভাবেন, তাঁর ছেলেটি এখনো বাছা-গোপালের মতো তাঁর আঁচল ধরে নেচে বেড়াবে—এবং তাই ভেবে তিনি যদি ছেলে-বৌয়ের মধ্যে এসে দাঁড়ান, তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা খুব অন্যায় হবে। ছেলের বিয়ের পরেও যে-মা ছেলেকে এমনি পুতু-পুতু করেন, বৌকে যেমন তিনি কখনো আপনার করে নিতে পারেন না, তেমনি পেটের ছেলেকেও হারিয়ে বসেন। এই সব শাশুড়ীকে বলি—ছেলে-বৌয়ের বয়সের কথা ভাবুন! নূতন দাম্পত্য-জীবনে তাদের মনে কত সাধ, কত কল্পনা, কত আকাঙ্ক্ষা—দিন্ তাদের সে সাধ-আশা সফল করতে! তাদের নিজস্ব আনন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাবেন না! তাদের ছেড়ে দিন—তারা আমোদ-আহ্লাদ করুক!

আর এমন দুঃখিনী শাশুড়ীর ছেলেকে বলি—তুমি কেমন ছেলে বাপু? তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালোবাসবেন, আর তোমার মাকে তিনি ভালোবাসবেন না? বৌ চায়, তুমি বৌমার মাকে মাথায় করে রাখবে, তাঁকে মান্য করবে, শ্রদ্ধা করবে—আর তোমার মার বেলায় তিনি সে-মান্য দিতে পারবেন না! এ কেমন কথা! ইংরেজীতে একটা কথা আছে—love me, love my dog—আমায় যদি ভালোবাসো, আমার কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে! আর বৌয়ের বেলায়—তিনি স্বামীকে ভালোবাসবেন! আর স্বামীর যিনি মা—কুকুর-বেড়াল নন—তিনি মা! সেই মাকে বৌ ভালোবাসবে না!

বৌয়ের কথায় যে-ছেলে মাকে তুচ্ছ করতে পারে, সে-ছেলেকে তার বৌও দু'দিন পরে তুচ্ছ করবে—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, স্ত্রী-জাতি শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে এমন পুরুষকে—যে-পুরুষের মন সবল, সুদৃঢ়! আজ যৌবনের মোহে স্বামীর উপর স্ত্রীর এত প্রগাঢ় ভালোবাসা—এ প্রথম-মোহ কাটলে স্বামীকে সে জানবে দুর্ব্বল-মন অপদার্থ!

শাশুড়ী-বৌয়ে মনের অমিল ঘটছে দেখবামাত্র যে-পুরুষ সচেতন মনে এ মেঘ-মোচনে চেষ্টা করে, তার সংসারে অশান্তি ঘটবে না! উচিত—দু'দিক্ বিচার করে যে-পক্ষের ভুল বা দোষ, সে-পক্ষকে শান্ত ভাবে সুযুক্তি দিয়ে—কোনো দিকে পক্ষপাতিত্ব না করে বোঝানো! তা করতে পারলেই মঙ্গল এবং তাই করা উচিত। কারণ, স্ত্রীকে যেমন ফেলতে পারা যাবে না, মাও তেমনি পরিত্যাজ্যা নন্!

মাকে যে-লোক সহ্য করতে পারে না,—দুনিয়ায় তার মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই!　　শ্রীইন্দিরা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লর্ড লিন্‌লিথগোর বক্তৃতা

১লা পৌষ লর্ড লিন্‌লিথগো রয়েল এক্সচেঞ্জ ভবনে য়ুরোপীয় বণিক্‌-সভায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। এই বক্তৃতায় বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ। ইহাকে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করা সঙ্গত হইবে না। তাঁহার কথা ইহার একতা সম্পাদন করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত। ইহার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ভারত সরকারের উদ্দেশ্য নহে। এ কথা বৃটিশ রাজনীতিকগণ বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাঁহাদেরই নীতি এবং কার্য্যফলেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে ভেদ বুদ্ধি গজাইয়া উঠিয়াছে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে এবং সাইমন কমিশন রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে তীব্র ভেদবুদ্ধি গজাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহাতে লোকে কি মনে করিতে পারে? এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই ভিন্নমত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা অন্যের প্ররোচনায় ভিন্নমত অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং বিভাগের সমর্থক, তাঁহারা বোধ হয় বুঝেন যে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তীব্র হইলে দেশের আর্থিক, সামাজিক, শৈল্পিক, শুল্কনীতি এবং দেশরক্ষা সম্বন্ধে ভিন্নমত আত্মপ্রকাশ করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেশের মঙ্গল বিনষ্ট হইবেই হইবে। সেই জন্য তিনি কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিয়া একতা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যবস্থার ফলে এই ভেদবুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা তিরোহিত না করিলে কিছুতেই ইহা প্রশমিত হইবে না। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে জাতি বিভক্ত, সে জাতি তাহার আবশ্যক কাজ করিতে পারে না। তিনি মুখে একতা প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার পথ সুপ্রশস্ত করা হইতেছে কি? তাহা করিতে হইলে জাতিধর্ম্ম এবং বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতারই সমাদর করিতে হয়। বড়লাট তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

লর্ড লিন্‌লিথগো বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার যে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথা সত্য নহে। ক্ষমতা ত্যাগ করিবার মত অবস্থার সৃষ্টি হইলে তাঁহারা ক্ষমতা ত্যাগ করিতে এখনই প্রস্তুত আছেন। সকল সম্প্রদায়ের ঐকমত্যই সেই অবস্থা। এ ক্ষেত্রে বড়লাট কূট সাম্রাজ্যবাদীদিগের কথারই উদ্গার করিয়াছেন। যেখানে ভিতর হইতে উৎসাহ দিবার জন্য স্বার্থপর ব্যক্তিরা আছেন, সেখানে কল্পান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আশা থাকে না। অগ্রে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে পরে একতা প্রতিষ্ঠা সম্ভবে। কানাডার ফরাসী এবং ইংরেজ-বংশধর ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে বিশেষ বিবাদ ছিল। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। মিশর যত দিন বৃটিশ প্রোটেক্টোরেট ছিল, তত দিন কেবল তথাকার ফেলাহীন এবং এফেন্দীর বিবাদ প্রবল হইয়াছিল। তাহা কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই। শেষে যখন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল এবং জগলুল পাশা জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখনই উহা প্রশমিত হইয়াছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর সিদ্দিকী পাশার সময় আবার উহা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। এই উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র ও ইংরেজদিগের পরস্পর মনোভাব পরিবর্ত্তনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পণ্যমূল্য যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায়, এরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার কোন কথাই বড়লাট বলেন নাই। যুদ্ধের সময় অনেক শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং তাহাতে দেশের লোকের ধনাগম হইতেছে; সুতরাং তাহাদের অধিক মূল্য দিয়া জিনিষ কিনিবার শক্তিও জন্মিতেছে, এই কথা বলিয়াই তিনি বিষয়টির আলোচনা শেষ করিয়াছেন। সাময়িক পণ্য উৎপাদনের ফলে কতকগুলি কলওয়ালা এবং কয়েক লক্ষ শ্রমিকের হাতে অধিক অর্থ আসিতেছে সত্য, এবং শ্রমশিল্পপ্রধান স্থানে কিছু অধিক অর্থ অল্প জন কয়েক মাত্র পাইতেছে, কিন্তু এই দুর্দ্দিনে যাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছে, কাগজের অভাবে যে সকল লোকের কর্ম্ম গিয়াছে, যাহাদের আয় অতি অল্প, যাঁহারা পেন্সনভোগী, এরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে কি? বরং পণ্যমূল্যের স্ফীতিসাধন (Inflation) ফলে ইহাদের প্রকৃত আয় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি যে অধিক হইয়াছে, এ কথা অনেক বিশেষজ্ঞই স্বীকার করিতেছেন। এই দারুণ অন্নকষ্টের দিনে ভারতের বড়লাটের মুখে দরিদ্র লোকরা একটিও আশার বাণী শুনিতে পায় নাই। তিনি পল্লবগ্রাহীর মত কেবল ভাসা-ভাসা কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। ঝড়ে, জলোচ্ছ্বাসে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জন্য তাঁহার মুখ হইতে একটিও সমবেদনার বাণী বাহির হয় নাই। দেশের লোকের উপর সাম্রাজ্যবাদীদিগের সহানুভূতির ইহাই নমুনা!

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলিয়া বড়লাট বলিয়াছেন যে, ইহার জন্য দায়িত্ব দেশের লোকেরও যেমন অধিক, সরকারেরও তেমনই অধিক। দেশের জন কয়েক অদূরদর্শী এবং অশিক্ষিত লোক যাহা করে, তজ্জন্য সমস্ত দেশের লোককে দায়ী করা অসঙ্গত। সত্য বটে, কতকগুলি সঙ্কীর্ণচিত্ত, স্বার্থপর লোক গোপনে অতিরিক্ত পণ্য সঞ্চয় করিতেছে, ফাটকাবাজীর দ্বারা অধিক লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে, মাল বাঁধি করিতেছে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের রৌপ্যমুদ্রা গোপন করিয়াছে,—তাম্রমুদ্রার অদর্শন ঘটাইয়াছে, কিন্তু সাধারণের সেই অসুবিধা ঘটানর জন্য ইহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এরূপ সামাজিক অপরাধের শাস্তি সকল দেশেরই সরকার দিয়া থাকেন। বড়লাটের বক্তৃতায় কোন সমস্যারই সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয় নাই। উহা নৈরাশ্য ও অসন্তোষজনক।

—

চীন রাষ্ট্রনায়কের দান

চীনদেশের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইসেক এবং তাঁহার পত্নী উভয়ে বাঙ্গালার ঝটিকা-বিধ্বস্ত এবং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের বিপন্ন লোকদিগের সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালার শাসনকর্তার সাহায্য-ভাণ্ডারে ৫০ হাজার টাকা পাঠাইয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। চীনের সহিত বাঙ্গালার সংযোগ নূতন নহে। ইহা বহু কালের। কিন্তু মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পাইয়াছিল। আজ চীন দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সময়ে সপত্নীক চিয়াং কাইসেকের ঐ দান এ দেশের লোককে নিশ্চয়ই চীনের সহিত নিবিড় প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের শাসকদিগের মধ্যে অনেকে কাজে কিছু করা দূরে থাকুক, মুখে সহানুভূতির একটি বাণীও উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। বরং বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবস্থিত য়ুরোপীয় সৈনিকরা সেই দুরবস্থায় পতিত লোকদিগকে সময়োচিত সাহায্য করিয়াছিল, সে জন্য তাহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

—

'ডেলী হেরাল্ডে'র মিথ্যাপ্রচার

বিলাতের 'ডেলী হেরাল্ড' সম্প্রতি অতি-ভীষণ মিথ্যার প্রচার করিয়াছেন। ঐ পত্রখানিতে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপান যদি জয়ী হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে তাহারা ভারত সরকার করিবে অর্থাৎ কংগ্রেসকেই তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবে। কোন ইংরেজ সম্পাদক যে এত বড় মিথ্যার প্রচার করিতে পারেন, এ ধারণা এ দেশের লোকের কস্মিন্‌কালেও ছিল না! সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে কতকগুলি বৃটেনবাসী কিরূপ অসত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কংগ্রেসের নেতারা স্বৈর-শাসনের আদৌ সমর্থন করেন না। তাঁহারা কোন বিদেশীর অধীন থাকিতেও ইচ্ছা করেন না। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কথা, এক জাতির অন্য জাতিকে শাসন করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম্মগত অধিকার নাই। সেই জন্য ভারতবাসীরা চীনাদিগের অনুরাগী —জাপানের নহে।

—

পাইকারী জরিমানায় অবিচার

বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ডাক্তার মুকুন্দরাম রাও জয়াকর ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইনি গোল-টেবিল বৈঠকের, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর সদস্য এবং ফেডারেল কোর্টের এক জন বিচারপতি হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর পাইকারী জরিমানা আদায় করা আইনসঙ্গত নহে। ইউনাইটেড প্রেস শুনিয়াছেন যে, ঐ ব্যবস্থা আইনসঙ্গত কি না, এলাহাবাদের হাইকোর্টে তাহা পরীক্ষা করিবার আয়োজন হইতেছে। শুনা যাইতেছে, ভারতরক্ষা আইনের নিয়মানুসারে ঐ কার্য্য সমর্থন করা যায় না। বিষয়টা ব্যবহারশাস্ত্র-সম্পর্কিত; সুতরাং ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ব্যক্তিরাই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। আমাদের ধারণা, ইহা দল বা সম্প্রদায়বিশেষকে নির্য্যাতন করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। রাজনীতির আলোচনা হিন্দুদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহা করিয়া থাকেন। পাইকারী জরিমানা দোষী-নির্দ্দোষী-নির্ব্বিচারে সকলের উপর ধার্য্য হইয়া থাকে। সে হিসাবে উহা ধর্ম্মনীতির বিরোধী। কোন অপরাধের অনুষ্ঠানই সম্প্রদায়বিশেষের এক-চেটিয়া নহে। জন মর্লি যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, কঠোর শাস্তি শান্তি-স্থাপনের পথ নহে,—উহা বোমার পথ। সাম্রাজ্যবাদীরা এই ভ্রান্ত পথ ধরিয়া ভারতে তীব্র অশান্তির পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

—

দল-নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের বিবৃতি

ভারতের দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিক আছেন। যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইঁহারা তাহাই বলিয়া থাকেন। বৃটিশ জাতির সহিত সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ইঁহাদের প্রধান কাম্য। গত ২৬শে হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ এলাহাবাদে ইঁহাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া ভারতের এই অচল অবস্থার সমাধান করিবার কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন, কেবলমাত্র স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদিগণ ব্যতীত পৃথিবীর আর সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই তাহার সারবত্তা স্বীকার করিবেন। সত্য বটে, ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নয়নে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রদেশের তথাকথিত মন্ত্রিসভায় অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন,—কিন্তু তাহাতে অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি ঘটে নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা শাসন-ব্যবস্থায় ঘোর অবনতিই ঘটিয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সরকারেরই মনোনীত। সরকারই তাঁহাদিগকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অধিক বেতন দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সরকারের মনের মত কথা বলিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? উর্দ্দী পরিয়া সভাশোভন হইয়া বসা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন কাজ আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। হয়ত কিছু আছে। কিন্তু আসল কাজ এবং শাসন-নীতির পরিচালন যে সিভিলিয়ানরাই করিতেছেন, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক পরিষদের কার্য্যকরী সমিতিও বলিয়াছেন যে, "এই যুদ্ধের সময় আইনের শাসনের পরিবর্ত্তে খোসখেয়ালী হুকুম-নামার (ordinance) রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" উক্ত সমিতি আরও বলিয়াছেন যে, "প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বৃটিশ-সম্রাজ্ঞী ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তখনকার তুলনায় এখনকার অবস্থা বরং কোন কোন বিষয়ে অধিকতর মন্দ হইয়াছে।" "ভারতরক্ষা আইন ভারতরক্ষা ব্যাপারের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইতেছে। সাধারণ মামলার বিচারও সাধারণ আদালতের বহির্ভূত করা হইতেছে। অর্ডিনান্সগুলি ব্যবস্থা পরিষদের অনুমোদিত ত নহেই, অধিকন্তু, সেগুলি শাসন-পরিষদের অনুমোদনেরও অপেক্ষা করে না।" ফলে দল-নিরপেক্ষ পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার দোষের কথা স্পষ্ট ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। লর্ড লিন্‌লিথগো এই দলের কোন ব্যক্তিকে বন্দী কংগ্রেস-নেতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেন নাই,—বা কোন বন্দী কংগ্রেস-নেতাকে এই সমিতিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন নাই।

ইহাতে স্বতঃই মনে হয়।—এই অচল অবস্থার সমাধান করা যেন সরকারের অভিপ্রেত নহে। জিন্না আমন্ত্রিত হইয়াও আসেন নাই। সকলে ত সরকারের ক্রোধ বা অসন্তোষ উপেক্ষা করিয়া কাজ করা সঙ্গত মনে করেন না। হিন্দুসভার এক জন বিশিষ্ট সদস্য এই সমিতির প্রথম দিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন,—কিন্তু পরে যোগ দেন নাই। ভারতের তথাকথিত ছয়টি স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশের গবর্ণরই সিভিলিয়ানদিগের সাহায্যে স্বৈর-শাসন চালাইতেছেন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাহার উত্তরে বলেন যে, ঐ অঞ্চলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই ত? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীন ভাবে সাধারণের হিতসাধন-কল্লেই দেশের এবং দশের কাজ করিবার জন্য ত ব্যবস্থা-পরিষদে যাওয়া? না, কেবল 'যে-আজ্ঞার' ঝুড়ি লইয়া স্তাবনসীন হওয়া সঙ্গত? বৃটিশ সরকার প্রথম হইতেই এক বুলি ধরিয়াছেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মতের একতা হইলেই তাঁহারা ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে পারেন; অন্যথা নহে। কংগ্রেস বলিতেছেন যে, বৃটিশ সরকার ক্ষমতা ছাড়িয়া না দিলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদন সম্ভব হইবে না। কংগ্রেসের এই কথাই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার সে কথা মোটেই শুনিতেছেন না। সেই জন্য ভারতের দল-নিরপেক্ষ ধীরপন্থী রাজনীতিকরা একবাক্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে মীমাংসা করিবার সুবিধা ঘটে, সরকার সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা এখনও স্পষ্ট ভাষায় এমন কথা বলিতেছেন না যে, যদি মীমাংসা হয়, তাহা হইলে ক্ষমতা ত্যাগ করিবেন এবং ভারতবাসীকে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিবেন। কংগ্রেসের মতই যে অভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসে ডাকাতি

গত ২৮শে অগ্রহায়ণ সোমবার বেলা আড়াইটার সময় বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১২ জন যুবক পোষ্টাফিস-গৃহের ভিতর আচম্বিতে যাইয়া বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। পাঁচটি বোমা ফাটিয়া পোষ্টাফিসের ছয় জন কর্ম্মচারীকে অল্পাধিক আহত করে। পোষ্টাফিসের কাঠের রেলিংএ আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু উহা শীঘ্রই নিবাইয়া ফেলা হয়। চারিটি বোমা ফাটে নাই। সহরের কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যস্থলে দিবালোকে এরূপ দুঃসাহসিক দস্যুতা আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। দস্যুরা প্রায় দেড় হাজার টাকার খুচরা নোট লইয়া চম্পট দিয়াছে। ইহারা দুই-তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। কাহারা এই দস্যুতা করিল, তাহা কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। ইহাদের এই কার্য্যের কারণ রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, তাহাও বুঝা যাইতেছে না।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ কি জন্য?

সরকার কি দেশের লোকের জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন? যদি তাঁহারা তাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ২১শে অগ্রহায়ণ দিল্লীতে ভারত সরকারের এড্‌ভাইসরী পেনেল অব একাউণ্টসের অধিবেশনে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমি রেইস্‌ম্যান্‌ বলিয়াছেন—"ভারত সরকার প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের লোকের জন্য উহা করা গৌণ উদ্দেশ্য হইতে পারে।" * * "হংকং, মালয় এবং প্রাচ্যখণ্ডের দেশগুলি হস্তচ্যুত হইবার পর হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, ভারতকে সম্মিলিত শক্তিবর্গের অস্ত্র-নির্ম্মাণের স্থান এবং অস্ত্রাগার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা নির্ম্মাণের স্থানে পরিণত করিতে হইবে। ফলে দিন দিন ঐ নানাবিধ জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে, যোগান অপেক্ষা টান ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে! আরও একটি কঠিন সমস্যা কম জটিল নহে। সামরিক ঠিকা লাভ করিয়া ঠিকাদারেরা যাহাতে অধিক লাভ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা-সম্পাদন। এই ক্ষেত্রে যাহাতে আমরা ন্যায্য এবং সঙ্গত মূল্যে জিনিষ পাইতে পারি, তাহার একটা উপায় বাহির করিয়াছি, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও কতকটা অগ্রসর হইয়াছি। এই সম্বন্ধে পণ্যের যে মূল্য ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ঠিক হইল কি না, ঠিকাদারদিগের হিসাব দেখিয়া এবং কারবারে যে অর্থ নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার উপর সঙ্গত লাভের কথাও বিবেচিত হইতেছে। এই সম্পর্কে শেষ উপায় হইতেছে যে, সরকার আইন অনুসারে যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তদ্দারা তাঁহারা সরকারের ধার্য্য মূল্যে পণ্য প্রস্তুত করিতে কারবারীদিগকে বাধ্য করিতে পারেন, তবে যে ক্ষেত্রে তাহারা নিতান্তই ঐ মূল্যে পণ্য যোগাইতে নারাজ হইবে, সেই ক্ষেত্রেই সরকার ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ করিবেন।" এ কথাগুলি ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিবের উক্তি। সুতরাং নিশ্চয়ই সত্য। কতকগুলি পণ্যের মূল্য কেন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, রাজস্ব-সচিবের কথায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সমরক্ষেত্রে প্রায় সকল রকম জিনিষের প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বজোড়া সংগ্রামের বিশাল ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্য যথাসম্ভব প্রেরিত হইতেছে। কাজেই ভারতীয় নাগরিকদিগের জন্য পণ্যের অভাব লক্ষিত হইতেছে। সরকার সকল শ্রমশিল্পজ পণ্যই নিজ হাতে রাখিতেছেন, অথচ রাজপুরুষগণ hoarding hoarding বলিয়া চীৎকার করিতেছেন,—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! ইহাতে একটা কথা বেশ বুঝা গেল। সরকার তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই কন্‌ট্রাক্টরদিগের নিকট হইতে পণ্য লইবেন; সাধারণে সে মূল্যে পণ্য পাইবেন কি না, তাহার দায়িত্ব সরকারের নহে!

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের চেষ্টার আর অন্ত নাই। কিন্তু জাপানীরা যে উহা সহজে ছাড়িবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অচির ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশ লইয়া তুমুল যুদ্ধ হইবে এবং ইহার জন্য ব্যয়-বাহুল্যের সীমা থাকিবে না! এ ব্যয়ভার বহন করিবে কে? 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় বোম্বাইস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ যখন ভারতের সীমান্ত, তখন

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের ব্যয় ভারত সরকারের তহবিল হইতে দিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় বাবদ কত অংশ বৃটিশ সরকার দিবেন আর কত অংশ ভারত সরকারকে দিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের কথা হইতেছে শুনিয়াছি; এই জন্যই না কি ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমি রেইসম্যানকে বিলাত ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এখন শুনা যাইতেছে, ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের সমস্ত ব্যয়ভার আর্থিক মেরুদণ্ডহীন ভারতকেই বহিতে হইবে। এই সংবাদে বোম্বাই প্রদেশে লোকের মনে চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য না হইতেও পারে,—তবে ব্যয়ের একটা মোটা অংশ ভারতকে দিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মকে যখন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছিল, তখন উহা পুনরধিকারের ব্যয় ভারতকে দিতে হইবে কেন, এই যুক্তিমূলক প্রতিবাদ কেহ শুনিবে না। সংবাদ কত দূর সত্য, তাহা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেটের সময়েই পাকাপাকি ভাবে জানা যাইবে।

—

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন

১৭ই হইতে ১৯শে পৌষ বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩০তম অধিবেশন কলিকাতা সায়েন্স কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অধিবেশনের প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং পরে অধ্যাপক ওয়াদিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এক জন যুবক প্রথমে মঞ্চোপরি উঠিয়া পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালজীর অভিভাষণ পাঠের দাবী জানাইলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় বলেন, পণ্ডিতজীর অভিভাষণ তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। উহা পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করা হইয়াছিল কি না, প্রশ্ন করিলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা বলেন যে, এই সভায় বোধ হয় আমা অপেক্ষা পণ্ডিতজীকে কেহ ভাল জানেন না। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র তখন সেই যুবককে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। যুবক সেই প্রস্তাবে অসম্মত হন। কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর যুবক বলেন যে, যদি সরকার পণ্ডিতজীর অভিভাষণ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরকারের নীতির নিন্দা করিয়া এই কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করুন। ডাক্তার রায় বলেন, এই কথা বলিবার কোন কারণ নাই। যুবকটি অতঃপর বলেন যে, সেখানে এইরূপ অবস্থা, সেখানে পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি পুষ্পশোভিত করিয়া রাখা সঙ্গত নহে। উহা তাঁহার প্রতি অসম্মানজনক; এই বলিয়া তিনি নেহরুর প্রতিকৃতিটি লইয়া ঐ স্থান হইতে চলিয়া যান। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু যুবক ঐ সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ পণ্ডিত নেহরুর অভিভাষণ পাইবার চেষ্টা করিয়াও তাহা পান নাই। পণ্ডিতজীকে সরকার রাজনীতিক অপরাধী বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার রাজনীতিক কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে আটক রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বাধা দিবার সঙ্গত কারণ নাই। রাজনীতিক কারণ বিজ্ঞান-আলোচনায় বাধা হওয়া সঙ্গত নহে। অধিবেশন সমাপ্তির সময় নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ আগামী বর্ষেও পণ্ডিতজীকে ঐ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। আশা করি, সরকার আগামী বার পণ্ডিতজীকে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিতে দিবেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ কমিটী জানাইয়াছেন যে, সরকারের মনোভাব বুঝিবার জন্য তাঁহারা আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আশা করি, তৎপূর্ব্বে সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হইবে।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে মিষ্টার ওয়াদিয়া পৃথিবীর খনিজ-সম্পদের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ভারতে খনিজ-সম্পদের অভাব নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসনশীল নহে বলিয়া তাহার খনিজ-সম্পদের যেরূপ সদ্ব্যবহার হওয়া সঙ্গত, সেরূপ হইতেছে না। ফলে, ভবিষ্যতে ভারতে তাহার প্রয়োজনীয় খনিজ-সম্পদেরও অভাব হইতে পারে। আজ আমরা যে পয়সার অভাব অনুভব করিতেছি, তাহাতেই বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে খনিজ-সম্পদের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। এক জন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারফলে বিহারে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে। এই বিষয়ে বিহারের বিশেষ সুবিধাও আছে। কারণ, বিহারে লৌহ ও কয়লা উভয়ই সহজপ্রাপ্য। টাটার বিরাট্ কারখানার জন্য যে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে, তাহার তুল্য লৌহ যে ভারতের অন্য স্থানেও নাই, এমন বলা যায় না।

খনিজ-সম্পদ্ উত্তোলিত করিবার অধিকার বিদেশীরা পাইয়াছে। যেমন ব্রহ্মে পেট্রল কোম্পানী, ইরাণে অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী। বিদেশী কোম্পানী ঐ কাজে কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। এই সকল বিদেশী প্রতিষ্ঠান যে টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, সে টাকা যদি দেশে থাকিত, তবে তাহাতে কৃষিপ্রধান দেশ শিল্পপ্রধান হইতে পারিত। আমরা যে ব্রহ্মের কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, যে সময় ঐ বিদেশী প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মে পেট্রল উত্তোলনের অধিকার লাভ করেন, তখন ব্রহ্ম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দেশে কয়লার খনির অনেকগুলি বিদেশীদিগের অধিকৃত।

পৃথিবীতে ধাতুর ব্যবহার কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা মিষ্টার ওয়াদিয়া দেখাইয়াছেন—দুইটি জার্ম্মাণ-যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে মানুষ যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ ব্যবহার করিয়াছে, আর কখনও সে পরিমাণ ব্যবহার করে নাই। আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই অধিক অবহিত। এ দেশের খনিজ সম্পদ বিদেশের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া আমরা নিঃস্ব না হই, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। পশুবধ ও কৃষিকার্য্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে মানুষ যে বর্ত্তমান যুগের মানবে পরিণত হইতে পারিয়াছে—ধাতু ও অন্যান্য খনিজ-দ্রব্য লাভই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু এই উন্নতির জন্য পৃথিবীর খনিজ-সম্পদ্ ভাণ্ডার ব্যবহার করিবার চেষ্টায় মানুষ সেই ভাণ্ডারের সঞ্চয় বহু পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে।

ভারতবর্ষে যে লৌহ পরিষ্কৃত করিবার শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানও প্রয়োজন; এবং সেই অনুসন্ধান-কার্য্য সফল হইলে পৃথিবীর উপকার হইতে পারে। দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহ-স্তম্ভের লৌহ যাহারা পরিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু। তাহার পর যে তরবারি—ডামাস্কসের বলিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা যে ভারতে প্রস্তুত হইত, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই বিশাল দেশের খনিজসম্পদ

সম্পর্কে এখনও আবশ্যক অনুসন্ধান হয় নাই। আসামে যে পেট্রল পাওয়া যায়, তাহা জানা গিয়াছে। এখন সে বিষয়ে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিবার কোন উপায় হইতে পারে না কি?

মিষ্টার ওয়াদিয়া তাঁহার অভিভাষণে আটলাণ্টিক চার্টারের একটি দফা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—উহাতে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর সকল দেশের উপকরণে সকল রাষ্ট্রের তুল্যাধিকার থাকিবে। কিন্তু সে কল্পনা যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে শান্তির ও সম্প্রীতির সময়ের, তাহা বলা বাহুল্য। যে দেশের কোন খনিজ-সম্পদ অধিক, সেইরূপ অবস্থা ব্যতীত কখনও সে অন্য রাষ্ট্র হইতে অন্য খনিজ-সম্পদ আনিয়া—বিনিময়ে আপনার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। ভারতে টিন, টাংশষ্টেন, গ্রাফাইট, দস্তা প্রভৃতির যেমন অভাব, তেমনই লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতির প্রাচুর্য্য আছে। সুতরাং সুব্যবস্থার বিনিময়ে ভারতবর্ষ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ব-শিক্ষার অভাব থাকিলেও এ দেশে নানারূপ সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়—আবশ্যক ব্যবস্থা হইলে এ দেশ নানা বিষয়ে অনায়াসে—স্বল্পায়াসে স্বাবলম্বী হইতে পারে।

কিন্তু সে ব্যবস্থা কে করিবে?

দেখা গিয়াছে, ভারতের বিদেশী সরকার সে ব্যবস্থা করেন নাই।

অশোভন ঘটনা

১১শে পৌষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে ষ্ট্যাটিসটিক্যাল কনফারেন্স আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বিধান বাবু গাড়ী হইতে নামিলে জন কয়েক যুবক একটা পটকা নিক্ষেপ করে ও তাঁহাকে আক্রমণ করে। বিধান বাবুর মোটর-চালক বাধা দিতে যাইয়া আহত হয়। তাহারা নলিনী বাবুর গাড়ীতেও উঠে, কিন্তু কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। বিধান বাবু পরে বলিয়াছেন, ঐরূপ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে ঘটিয়াছে ইহা পরিতাপের বিষয়। আমি আশা করি, আক্রমণকারীরা কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত লোক নহেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই লজ্জাজনক। হয়ত ইহা বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ব্যাপারের উপসংহার।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"রাজনীতিক স্বাধীনতার অভাবে এ পর্য্যন্ত আমাদিগের জাতিগঠনমূলক কার্য্যাবলী ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু আমি আমাদিগের রাজনীতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। এই উন্নত অবস্থায় আমরা স্বাধীন ভাবে যুদ্ধের পর আমাদিগের অর্থনীতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব। উন্নতির চেষ্টায় আমাদিগের সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা দরকার। এ জন্য সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনের বহু বিষয়ের সংখ্যাতত্ত্ব একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যাতত্ত্ব পরিকল্পনার ভিত্তি-স্বরূপ।"

ভারতীয় অচল অবস্থা সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের মত

লণ্ডনস্থ খৃষ্টান বান্ধব-সমিতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদনের উপায় না করিয়া কেবল তাহাদের মধ্যে মতের একতা স্থাপন করিতে বলা বাজে কথা মাত্র। এই প্রকারে মিটমাটের উপায় বন্ধ করিয়া দেওয়াতে খৃষ্টান মিশন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সেই জন্য আমরা আটক নেতাদিগের সহিত তৃতীয় দলের কথাবার্ত্তা কহিবার পথে বাধা অপসারিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। মিটমাট করিবার পথ এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ করা যে খৃষ্টানদিগের জনমতের প্রতিকূল, সে কথা সরকারকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমরা আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতাদিগের সহযোগিতা লাভ একান্ত প্রার্থনা করি।" কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লর্ড লিন্‌লিথগোই রাজাগোপাল আচারিয়া ও সার তেজবাহাদুরের সহিত গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া মীমাংসার অন্তরায় হইয়াছেন। জাতীয় শান্তি সমিতির কর্ম্মচারীরাও ঐরূপ অনুরোধ করিয়া বড়লাটকে তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন অনুরোধে কোন ফল হয় নাই—হইবেও না।

লোকের কলিকাতা-ত্যাগ কি সত্য?

বড়লাটের শাসন-পরিষদের বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের সদস্য স্যার জে, পি, শ্রীবাস্তব দিল্লী হইতে ঘোষণা করেন, "কলিকাতা ছাড়িয়া লোক যে রেলপথে এবং পদব্রজে চলিয়া যাইতেছে, ইহা জনরবমাত্র, সত্য নহে—একেবারেই মিথ্যা।" বড়লাটের শাসন-পরিষদের অপর সদস্য শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি এনি ১৮ই পৌষ মাদ্রাজে পৌঁছিয়াই কিন্তু বলেন, "লোকজন যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না এ কথা ঠিক নহে। কতক লোক চলিয়া যাইতেছে, তবে মোটের উপর কলিকাতার নাগরিকগণ যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়াছেন।" কলিকাতায় জাপ-আক্রমণের সময় উড়িষ্যার প্রধান-সচিব এবং তাঁহার দুই জন সহ-সচিব কলিকাতায় ছিলেন। প্রধান-সচিব পারলাকিমেদির মহারাজা ২০শে পৌষ কটকে ফিরিয়া এক বক্তৃতায় কলিকাতাবাসীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, গোটা-দুই বোমা পড়িতেই দলে দলে লোক কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন! তিনি সিদ্ধান্ত করেন, "নগর হইতে এই প্রকার পলায়ন যে পঞ্চমবাহিনীর কারসাজি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চমবাহিনীই লোকের উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।" ইহার যোগ্য উত্তরে 'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন, "পর্য্যাপ্ত অন্ন এবং সুখ-সুবিধার পর্য্যাপ্ত সুব্যবস্থার উপর জনসাধারণের উৎসাহ নির্ভর করে। যে দেশের জনসাধারণ যুদ্ধের হেতু এবং শান্তির উদ্দেশ্যের কথা বেশী জানে, তাহাদের পক্ষেও এ কথা সত্য। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে যে দেশবাসীর নির্দ্দিষ্ট কোন সুদৃঢ় সঙ্কল্প নাই, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় অনভিজ্ঞ সে দেশবাসীকে মাতৃভূমি প্রভৃতির দোহাই দিয়া কষ্ট এবং বিপদ বরণ করিতে যেখানে বলা হয়, সেখানে এ কথা আরও সত্য।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ

এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় মুসলমান ছাত্রগণের ব্যবহারে ছাত্রসমাজ লজ্জিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সার ইস্মাইল মির্জ্জাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই সমাবর্ত্তন-সভায় উপদেশ

দানের জন্ম আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। সে হিসাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গবাসীর অতিথি। মুসলমানগণ অতিথির সহিত কখনই অসদ্ব্যবহার করেন না।

কিন্তু ঢাকার মুসলমান ছাত্রগণ তাঁহাদের সেই সর্ব্বজন-প্রশংসিত কৃষ্টি বর্জ্জন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। ইহার পূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় বক্তৃতায় সার ইস্মাইল মির্জ্জা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী সকলেই এক জাতি। মিষ্টার জিন্না এবং তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা যে হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে দুইটি বিভিন্ন জাতি মনে করেন,—ইহা তাঁহাদের ভুল। সে ভুল লজ্জাজনক। ঢাকাতে সার মির্জ্জা সেই কথা বলিবেন বুঝিয়া, মিষ্টার জিন্নার মতাবলম্বী কতিপয় মুসলমান ছাত্র তাঁহার বক্তৃতাস্থল কার্জ্জন হলে কোন মুসলমানকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কয়েক জন মাত্র অতি কষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। ঢাকা অঞ্চলের এই সকল মুসলমান ছাত্র কি স্বাধীনতা চাহেন না? তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কাহাকেও ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রদানেও নারাজ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর এম, হাসান এবং রেজিষ্ট্রার খাঁ বাহাদুর নসিরুদ্দীন আমেদ অতিকষ্টে কোনরূপে ঐ সমাবর্ত্তন-সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান ছাত্রগণের এই আচরণে ব্যথিত হইয়া সার আবদুল হালিম গজনভী এবং খাঁ বাহাদুর এস, এম, জান বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সার মির্জ্জা ঢাকা সমাবর্ত্তন-সভায় বলিয়াছেন, একতার উপরই ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারতের শিক্ষা ব্যাহত করা সঙ্গত নহে। তাঁহার কথাগুলি সারগর্ভ এবং প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু ইহা মিষ্টার জিন্নার অসহ্য!

বাঙ্গালায় জাপানের বিমান আক্রমণ

অনেক দিন হইতে লোক যাহার আশঙ্কা করিতেছিল, তাহা সহসা সত্যে পরিণত হইয়াছে। ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই পৌষ জোৎস্না-রাত্রিতে জাপানীরা বিমানপথে কলিকাতা অঞ্চল আক্রমণ করে। ৬ই পৌষ ভারতের যৌথ সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, কোন আক্রমণই প্রবল হয় নাই। হতাহতের সংখ্যা অল্প। আক্রমণের সময় কলিকাতায় সতর্ক হইবার জন্ম সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছিল এবং জঙ্গী বিমানগুলি উপরে উঠিয়াছিল। ৮ই পৌষ মধ্যরাত্রিতে জাপানী বিমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া আবার কলিকাতা অঞ্চলে কতকগুলি বোমা ফেলিয়াছিল। সামান্য কয়েক জন হতাহত হইয়াছিল। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি হইতে শত্রু-বিমানের উপর গুলী বর্ষিত হয়। বৃটিশ পক্ষের লড়াইয়ে বিমান শত্রু-বিমানগুলিকে বাধা দিবার জন্ম আকাশে উঠিয়াছিল। একখানি জাপানী বিমান জ্বলন্ত অবস্থায় ভূপতিত হয় এবং কয়েকখানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ রাত্রিতে কলিকাতা সহরে শত্রুবিমান চতুর্থ বার বোমাবর্ষণ করে এবং আক্রমণ-সঙ্কেত দীর্ঘ সময়ব্যাপী হইয়াছিল। উহারা অত্যন্ত উর্দ্ধ আকাশপথে আসিয়াছিল। একটি গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে একটা বোমা পড়িয়াছিল। কোন বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ঐ দিনের আক্রমণে এন্টি-পার্শন্যাল বোমা বর্ষিত হয়। এই বোমা কেবলমাত্র খোলা জায়গায় অবস্থিত লোকদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।

ইহাতে বুঝা যায়, লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করাই শত্রুপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য। ১১ই পৌষ জাপানীরা পুনরায় কলিকাতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করে। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা অঞ্চলে ৫ বার জাপানী বিমান আক্রমণ হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে সরকারী সংবাদ প্রচারে অসঙ্গত বিলম্ব ঘটিয়াছে। ইহাতে ইংরেজ-সম্পাদিত 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পর্য্যন্ত অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সরকারী ইস্তাহারের সঠিকত্বের (precision) অভাব দেখিয়া সরকারের ঐ নীতির নিন্দা করিয়াছেন। ২৭শে ডিসেম্বর আবার উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, বড়দিনের পূর্ব্বরাত্রিতে কলিকাতাতে যে বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, তাহার সরকারী ইস্তাহার ১২ ঘণ্টা পরেও কোন সংবাদপত্র-আফিসে পৌঁছে নাই। তাহার পর যাহা পৌঁছিয়াছিল, তাহা অতি সামান্য—কেবলমাত্র চল্লিশটি শব্দে সমাপ্ত। ইহাতে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত কথা দায়িত্বহীন লোকের মুখে প্রচারিত হয় এবং সকলে তাহা বিশ্বাস করে। কলিকাতায় দ্বিতীয় বিমানাক্রমণের পর-দিবস, ৭ই পৌষ, পূর্ব্ববঙ্গেও দুই স্থানে আক্রমণ হয়। ঐ দিন অপরাহ্নে ফেণী অঞ্চল এবং রাত্রিতে চট্টগ্রাম অঞ্চল আক্রান্ত হয়। ফেণী অঞ্চলের উপর বৃটিশ বিমান-বাহিনীর সহিত জাপ বিমানের লড়াই হয়। প্রকাশ, অন্ততঃ পক্ষে একখানি জাপ বিমান ধ্বংস এবং কয়েকখানি জাপ বিমানের ক্ষতি হইয়াছে। চট্টগ্রামে হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয় নাই বলিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।

ভারতে মার্কিণী রাষ্ট্রদূত

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার রুজভেল্ট ভারতের প্রকৃত আর্থিক এবং রাজনীতিক অবস্থা জানিবার জন্ম বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি বার বার নূতন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠাইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মিষ্টার জনসন এবং মিষ্টার ফিসারকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। এবার আবার তিনি মিষ্টার উইলিয়ম ফিলিপসকে ভারতের বার্ত্তা লইবার জন্ম এ দেশে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, তিনি যেন ঠিক অবস্থা জানিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার সংশয় হইয়াছে। মিষ্টার ফিলিপস দিল্লীতে ভারতীয় সাংবাদিকদিগের সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতের কথা জানিতে আসিয়াছেন। বড়লাট, পঞ্জাব, বোম্বায়ের লাট প্রভৃতির সহিত তিনি আলাপ করিয়াছেন। দিল্লীতে থাকিয়া আমলাতান্ত্রিক ভারতের আমলাদিগের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা অনেক করিয়াছেন। উহা অবশ্য এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষের কথা যাঁহারা বলিতে পারেন, সরকার তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত মিষ্টার ফিলিপস কারাগারে দেখা করিবেন কি না, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ভারত সরকার তাঁহাকে সে সুযোগ দিবেন কি না, বলা কঠিন। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভার্সাইয়ের সন্ধির সময় মার্কিণের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উইলসনের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, এবার এই সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের পর সন্ধির সময় হয়ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অবস্থা সেরূপ না হইতে পারে,—কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদের মদিরায় মত্ত হইবেন কি না, কে বলিতে পারে?

ভারত সরকারের অসাফল্য

ভারত সরকার এই যুদ্ধের সময় পণ্য-মূল্য—বিশেষতঃ সাধারণের অবশ্য-ব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতে যাইয়া যেরূপ অসাধারণ অক্ষমতা প্রকটিত করিয়া বসিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটা বিস্তীর্ণ দেশের সরকার যে এই কার্য্য করিতে অক্ষম হইবেন,—ইহা কখনই পূর্ব্বে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া,—ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ফসল উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের এবং তাহাদের দেশের লোকের জন্য পর্য্যাপ্ত ফসল না রাখিয়া বৃটিশ জাতির খাস উপনিবেশ সিংহলে চাউল চালান দেওয়া যে কোন্ নীতির অনুমোদিত হইল, তাহা বুঝা যায় না। তাহার পর নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমী রেইস্‌ম্যান্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত রণক্ষেত্রের জন্য রসদ সরবরাহ করিতে হইতেছে বলিয়া সরকারকে নিজ প্রয়োজনে ভারতে যন্ত্রশিল্পজ পণ্য অধিক পরিমাণে রাখিতে হইতেছে। সে জন্য সাধারণ নাগরিকদিগের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারত হইতে কেবল যন্ত্রশিল্পজ পণ্যই রণক্ষেত্রে যাইতেছে না; খাদ্যদ্রব্যও অনেক চালান যাইতেছে। সে জন্যও খাদ্যশস্যের অনাটন ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া সিংহলে বা অন্য কোন দেশে অসামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য চালান দেওয়া কি উচিত? চীন দেশেও আজ পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চলিতেছে। সে দেশেও সরকার অতিরিক্ত নোট প্রচলিত করিয়াছেন। সে দেশের লোকেরা খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। সে দেশেও খাদ্যশস্যের অভাব লক্ষিত হইয়াছে! কিন্তু তাহা হইলেও তথাকার সরকার কেমন সুন্দর ভাবে পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহা অবশ্যই সরকার জানেন। চীন সরকার যেরূপ বিবেচনার সহিত এই কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন,—ভারত সরকারের তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। চীন সরকার ৪৫ কোটি চীনা-ডলার মূলধন করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর এখানে ভারত সরকারের এ বিষয়ে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনাই নাই। উভয় দেশের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হয় কেন?

ভারত সরকারের উপেক্ষা

ভারত সরকার এই যুদ্ধের সময় লোকমত কিরূপ উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! আজ প্রায় ছয় মাস কাল ভারতের বাজারে তামার পয়সার দেখা নাই, সে জন্য সাধারণের যে ঘোর কষ্ট হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। উহার প্রতিকার করিবার জন্য সরকারকে বার বার অনুরোধ করা হইলেও সরকার তাহার প্রতিকার করেন নাই। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, আধ-আনি, আনি, দু-আনি, সিকি, আধুলিও অন্তর্হিত হইয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব করিয়াছে। সরকার বলিতেছেন, তাঁহারা প্রতিমাসে ৭ কোটি টাকার খুচরা বাজারে ছাড়িতেছেন, লোকে উহা সঞ্চয় করিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত সরকার ভারতীয় টাকশালে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তামার পয়সা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্-সভা সরকারের ঐ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। সরকারের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের এই আচরণে আমরা স্তম্ভিত! যদি তাঁহাদের কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহা কখনই সুফল প্রদান করিবে না।

সিকান্দার হাইয়াৎ খাঁ পরলোকে

পঞ্চনদ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার সিকান্দার হাইয়াৎ খাঁ ৫১ বৎসর বয়সে ১১ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার জন্ম। নবাব সার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি প্রথমে আলিগড়ের কলেজ, পরে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্জাবের ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সিকান্দার হাইয়াৎ খাঁ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চনদ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব সরকারের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর কার্য্য প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য নিখিল ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণরও হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের প্রধান-মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। সামরিক ব্যাপারেও তাঁহার অনেকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। মন্ত্রিত্ব করিবার সময় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল-কর্ত্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত সামাজিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছিলেন—রেলওয়ে বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ যদি তাঁহাদের

নিজ নিজ বিভাগে সাম্প্রদায়িক ভাব-পরিবর্জন করিয়া সার্ব্বজনীন মঙ্গলের এবং সমদর্শিতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে।

—

বিজয়চন্দ্র মজুমদার পরলোকে

সুচিন্তাশীল সাহিত্যিক—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি—শিক্ষাব্রতে আত্মনিবেদিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে ১৫ই পৌষ সুদীর্ঘ কালের সাহিত্য-সাধনা সমাপন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। যৌবনে তিনি কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি উকিল ও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পরামর্শদাতা ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে এবং অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্র-সম্পাদনে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষে ২৫ বৎসর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইলেও তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার রচিত 'যজ্ঞভস্ম' শ্রীজয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দ ও বৌদ্ধগাথার সুমধুর পদ্যানুবাদ তাঁহার কবিকীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'প্রাচীন সভ্যতা' গ্রন্থে তিনি ভারত—মিশর—আরব—চীন প্রভৃতি সুপ্রাচীন দেশের গৌরব-সমুজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করিয়া—প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ যে আর্য্য-জাতির সন্তান, তাহা সুপ্রমাণিত করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু আইন সম্বন্ধে এবং ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ তাঁহার কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থও বিশেষ সমাদৃত। তিনি কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের সুহৃদ্ ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিকপত্র হইতে সঙ্কলিত—প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।

— —

হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

১৩ই হইতে ১৫ই পৌষ কাণপুরে হিন্দু মহাসভার ২৪তম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিভাষণ-সূচনায় বীর সাভারকর মস্লেম লীগের পাকিস্থানের দাবীর বিরোধিতা করিতে হিন্দু মহাসভার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়া বলেন, "হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। বৃটিশ শাসনের মত পাকিস্থানও যদি আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিকারে বঞ্চিত হইব না। মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা এই পরিকল্পনার সামরিক তাৎপর্য্য যেন উপলব্ধি করেন, ইহা আত্মঘাতী নীতি মাত্র। পাকিস্থানের পর পাঠানিস্থানের দাবীও সম্ভব হইতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ধারণা যে, সম্মিলিত দাবী হস্তগত হইবামাত্র ইংলণ্ড ভারত ত্যাগ করিবে। কংগ্রেস, মস্লেম লীগ, হিন্দু মহাসভা সকলের সম্মিলিত দাবী যে বৃটেন পূর্ণ করিবে, এমন আশা নাই। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া জাতি;—মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মাত্র। মুসলমানরা পাকিস্থানের জিদ ধরিয়া বিরোধিতা করিলে তাঁহাদের সহযোগিতার প্রত্যাশা না করিয়া হিন্দুরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। আমারা সকল জাতির সমান অধিকারের স্বরাজ চাই।"

এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য (১) সমর-বিভাগে হিন্দু সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। (২) বড়লাটের শাসন-পরিষদ, আইনসভা, দেশরক্ষা সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও প্রজাধিকার কেন্দ্রগুলি অধিকার করিতে হইবে। (৩) হিন্দুর প্রজাধিকার-পরিপন্থী সকল চেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। (৪) মহাসভার সদস্য-সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৫) ৫ বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত লক্ষীপৎ সিংহানিয়া তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন,—মুসলমানদিগকে সর্ব্বদা সুবিধা দিয়া আপোষের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া কংগ্রেসকে দোষী করা ঠিক হইবে না। সর্ব্ব প্রকার অজুহাত ও অতীতের ভুল-ভ্রান্তির কথা বিবেচনা করিয়া অধিকতর উদারনীতি অবলম্বন করাই হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য।

১৫ই পৌষ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা রক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য বৃটিশ সরকারই দায়ী। তাঁহারা নানা ওজর-আপত্তি করিয়া ভারতের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। যখন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন ভারতের অমতে ভারতের স্কন্ধে চাপান হইয়াছিল, তখন ঐ সকল অজুহাতের কথা উঠে নাই। ভারতবাসীরা কোন বৈদেশিক শাসনেরই পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা ভারতবাসী কর্তৃকই ভারত-শাসন চাহেন। বৃটিশ সরকার ভারত-বাসীর হস্তে ক্ষমতা দিতে সম্মত, এ কথা মিথ্যা। যে ব্যবস্থায় ভারতের অখণ্ডতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, হিন্দু মহাসভা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। পাকিস্থানের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে।" কথা সত্য। হিন্দুসভা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া সর্ব্ববিধ যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত—এ জন্য তাঁহারা একটি কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। মহাসভা কোন সম্প্রদায়েরই কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত অধিকারই ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। পাকিস্থান প্রস্তাব পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদিগের উদ্ভাবিত। তাঁহাদেরই স্বার্থ-সাধনের একটা হেয় কল্পনা! উহা ভারতবর্ষকে চিরদাসত্বে বন্ধন করিবার কূট কৌশল। স্থুলবুদ্ধি সাধারণ লোকও তাহা বুঝে। তবে পাকিস্থানপন্থী জন কয়েক মুসলমান যে কেন তাহা বুঝেন না, তাহা বলা কঠিন। বৃটিশ সরকার যে পাকিস্থান প্রস্তাবের সহায়তা করিতেছেন, তাহা ক্রীপস্ প্রস্তাবেই সুপ্রকাশ। হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য হিন্দু মহাসভা এক সক্রিয় আন্দোলন উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই আন্দোলন-সম্পর্কে মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক প্রদেশে ১ লক্ষ "রামসেনা" গঠন করিতে হইবে। সৈন্যবিভাগে যোগদান ও শিল্পের প্রসার সম্পর্কে মহাসভার নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।" তাঁহারা কেবলমাত্র হিন্দুদিগের উপরই পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকারের নিন্দা করিয়াছেন। আগামী বারে পঞ্চনদ প্রদেশের অমৃতসর সহরে হিন্দুসভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

সংবাদপত্র—২৮শে—বিহারের 'সার্চ লাইট' পত্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বিহার সাংবাদিক-সঙ্ঘের দাবী। হবিগঞ্জে (আসাম) 'পল্লীবাসী' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত সুবোধকুমার রায়ের ৩ মাস কারাদণ্ড। ২৯শে—ঝাঁসীর 'হিন্দুকেশরী' পত্রের সম্পাদক মিঃ মহম্মদ শের খাঁ গ্রেপ্তার। তেজপুরে 'আসামসেবক' পত্র আফিস তল্লাস। ৩০শে—পুণার দৈনিক সংবাদপত্র 'লোক-শক্তির' জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রেস ক্রোক। ১লা পৌষ—লাহোরের 'প্রতাপ' পত্রের মালিক ও তাঁহার পুত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ২রা পৌষ—বোম্বাইএর ২৪খানি, সুরাটের ৩খানি এবং আমেদাবাদের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ। ১৬ই, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্‌সের' সম্পাদক শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী এবং 'হিন্দুস্থান' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত মুক্তিবিহারী বর্ম্মের প্রতি নির্দ্দেশ যে, জনবিক্ষোভ সংক্রান্ত সকল সংবাদ সহকারী প্রেস-এডভাইসারের মঞ্জুরী লইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। দিল্লীর উর্দ্দু দৈনিক পত্র 'ডেলি তেজের' যুগ্ম সম্পাদক-মুদ্রাকর ও প্রকাশক গ্রেপ্তার। ২১শে, নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মিলনের নির্দ্দেশে এবং সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদস্বরূপ 'ষ্টেটসম্যান' ও 'নবযুগ' ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের এক দিনের জন্য হরতাল। ২৩শে, বোম্বাইএর মারাঠী দৈনিক সংবাদপত্র 'নবকালের' সম্পাদক মিঃ জি, ডি, মহাশব্দে গ্রেপ্তার। বোম্বাইএর 'জন্মভূমি' প্রেসের জামানতের কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত। ২৪শে, আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে মিঃ এম, জে, রামলিঙ্গম্ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

লুণ্ঠনাদি—২১শে অগ্রহায়ণ—বোম্বাইএ জনতা কর্ত্তৃক এক খাদ্যশস্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন, ৮০ জন গ্রেপ্তার। ৩০শে—মধ্য-প্রদেশের রামটেক ট্রেজারি তহশীল আফিস লুণ্ঠনাদির অভিযোগে ৮৮ জন অভিযুক্ত। কাটোয়ায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গুদাম ও কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়ায় ৪৫ শত লোক কর্ত্তৃক এক আড়তের প্রায় ৪০০ বস্তা ধান্য ও চাউল লুণ্ঠন। ১লা পৌষ—বোম্বাই প্রদেশের নাগেশ-কুলকরণী গ্রামের প্রায় ২০ একর জমির ফসল লুণ্ঠন। বেলগাঁওএ এক স্থানে মেল-ব্যাগ লুণ্ঠন। চিখালীর (সুরাট) জীবনজী লালভাইএর গৃহে ১ শত জনের হানা, ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন। ৩রা—ঢাকায় এক মদ ও মনোহারী ব্যবসায়ীর দোকানে লুণ্ঠনের চেষ্টা। ৫ই—জনতা কর্ত্তৃক সিরাজগঞ্জের তালগাছী হাট লুঠ, প্রায় ২৫ হাজার টাকার ক্ষতি। ৫ই, সরিষাবাড়ীর (ময়মনসিংহ) নিকটবর্ত্তী রামনগর হাটে কাপড়ের দোকান লুঠ। খুলনা জিলার বরাতিয়া গ্রামাঞ্চলের বহু জমি হইতে পাকা ধান চুরি। ৬ই—পাবনার বাজারে দোকান লুঠের চেষ্টা। ১১ই—থানা জিলার (বোম্বাই) বেত্তিবাদী গ্রামের বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত, ৩৭ জন গ্রেপ্তার। ১৪ই, আমেদাবাদের গোধরা তালুকে সরকারী পণ্য-ভাণ্ডার ভস্মীভূত। রাজস্ব-আদায়কারীকে প্রহার করিয়া অর্থাদি লুণ্ঠিত। পাতদী রাজ্যের এক ব্যবসায়ীর মজুত ছোলা ও বিবিধ শস্য ভস্মীভূত। ১৩ই, হুগলী জিলার চাঁপাডাঙ্গায় এক হাট লুঠ, পুলিসের গুলীবর্ষণ, ১ জন নিহত, ১০।১২ জন আহত। ১৫ই, ভূধরগড় তালুকের ট্রেজারী লুঠের চেষ্টার অভিযোগে ৪০ জন গ্রেপ্তার। নওগাঁ সহরে (রাজসাহী) জনৈক ব্যবসায়ীর নৌকা হইতে ধান লুঠ, ইহার পক্ষকাল পূর্ব্বে আসানগঞ্জ হাট লুঠের চেষ্টা নিষ্ফল। ১৬ই, দিনাজপুর জিলার কাহারোল হাটে যাইবার পথে সশস্ত্র এক দল লোক কর্ত্তৃক বস্ত্রাদিপূর্ণ ৭খানি গরুর গাড়ী লুণ্ঠিত।

বাঙ্গালা—কলিকাতা—২৮শে অগ্রহায়ণ বিডন ষ্ট্রীট ডাকঘর হইতে ১ হাজার টাকা লুণ্ঠিত, ৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী আহত। ৩০শে—৩ স্থানে তল্লাসী। ১লা পৌষ—১২ স্থানে তল্লাসী। আপত্তি-কর পত্রাদি রাখিবার জন্য ৪ জন দণ্ডিত। ২রা—১০।১২ স্থানে তল্লাসী। ৩রা—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ের নিকট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ৪ঠা—ল্যান্সডাউন রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে ট্রামগাড়ী আক্রান্ত, ড্রাইভার আহত। কোন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ধৃত, জনৈক উকীল ও ছাত্রের গৃহে তল্লাসী। ৬ই—ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট লায়ন্সরেঞ্জে দুইটি বোমা বিস্ফোরণ। টালীগঞ্জে প্রতাপাদিত্য রোড ও রসারোডের মোড় এবং বালীগঞ্জের ট্রাম-ডিপোয় ট্রাম আক্রান্ত, রাসবিহারী এভিনিউর এক বিলাতী মদের দোকানে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ। ৭ই—কলিকাতা ও সহর-তলীতে প্রকাশ্যে তরবারি, ছোরা, বর্শা, লাঠী, বন্দুক বা কোন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ। ৮ই—লোয়ার সার্কুলার রোডে এক সামরিক কর্ম্মচারীর গৃহ হইতে ৪টি রিভলভার ও ১৪৬২৲ টাকা অপহৃত। ১৭ই,—মধ্য-কলিকাতার ৩ স্থানে তল্লাসী, ৫ জন গ্রেপ্তার। ১৯শে—দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসের প্রবেশ পথে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রতি পটকা নিক্ষেপ, যুবক দল কর্ত্তৃক ডাঃ রায় আক্রান্ত, নলিনী বাবুকে আক্রমণের চেষ্টা। ২২শে, ৫।৬ স্থানে তল্লাসী। ২৪শে, নানা স্থানে তল্লাসী, ৯ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—২৮শে অগ্রহায়ণ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার, ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্ শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঢাকা সহরে আটক। ৭ই পৌষ, নরিন্দা থানায় বোমা নিক্ষেপ। কোপুনগর যুনিয়নের চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়া সরকারী কর্ম্মচারী প্রহৃত, কয় জন গ্রামবাসী অভিযুক্ত। ৯ই, ঢাকা সহরের জনসন রোডে এক রেস্তোরায় দুইটি বোমা নিক্ষেপ। ১৩ই—ঢাকা সহরের নবাবপুর রোডে এক দল যুবক কর্ত্তৃক আবগারী দোকান আক্রমণ, ৩ জন গ্রেপ্তার। ব্রাহ্মণকিতা গ্রামে শ্রীমনো-রঞ্জন রায় ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। ২২শে—এক সিনেমা-গৃহের সম্মুখে বিস্ফোরণ, ৫ জন আহত।

ময়মনসিংহ—২রা পৌষ—হিজলী বন্দিনিবাস হইতে পলাতক কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী গৌরীপুরে গ্রেপ্তার। ১৩ই—মুক্তাগাছার এক হাঙ্গামা সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র উপেন্দ্রমোহন সাহা ও চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকে দেড় বৎসর এবং ননীগোপাল সান্ন্যাল ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৬ই—টাঙ্গাইলে এক বৎসর সভা ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ।

দার্জ্জিলিং—শিলিগুড়ির কংগ্রেসকর্ম্মী প্রতুলকুমার মৈত্রেয়, ডাঃ বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং অপর এক জন কর্ম্মীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

মুর্শিদাবাদ—৩০শে অগ্রহায়ণ, কমরেড গৌর বাগচী গ্রেপ্তার। কমরেড নির্ম্মলেন্দু বাগচী ও ছাত্রকর্ম্মী শৈলেন বিশ্বাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ।

নোয়াখালি—১লা পৌষ ট্রেণে পুলিশের হেপাজত হইতে বিচারাধীন বন্দী ননীগোপাল ভৌমিকের পলায়ন। ৫ই, সেনবাগ থানায় দুইটি লাইসেন্সবিহীন দেশী বন্দুক প্রাপ্তি, এক জন গ্রেপ্তার। ২৩শে—বিমানঘাঁটার কার্য্যে বাধাদানের জন্য পূর্ত্তবিভাগের কুলীদিগকে আক্রমণ, মোটর গাড়ীগুলির ক্ষতি এবং ৫০ জন কুলীকে আহত করিবার অভিযোগে তিন জন মুসলমান দণ্ডিত।

খুলনা—৫ই পৌষ, খুলনা কালেক্টরীর ইংলিস অফিসের রেকর্ডে অগ্নিসংযোগ।

নদীয়া—৩রা পৌষ, মেহেরপুরের ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক রমেশ গোস্বামীর গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ৮ই, মুড়াগাছার রেলওয়ে সম্পত্তি নষ্ট করিবার অভিযোগে গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অপর কয় জন গ্রেপ্তার, নবদ্বীপের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার।

যশোহর—২৭শে অগ্রহায়ণ—বিশিষ্টা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীমতী মনোরমা বসু ৬ মাসের জন্য যশোহর সহরে আটক। ৫ই পৌষ—ট্রেণে অগ্নিদানের সম্পর্কে এক জন গ্রেপ্তার। ৮ই, ঝিনাইদহ থানার নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

ফরিদপুর—২৭শে অগ্রহায়ণ—জিলা কংগ্রেস কমিটার সম্পাদক এবং অপর ৪ জন আটক। গোয়ালন্দ মহকুমা কংগ্রেসের কর্ম্মী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রেপ্তার। মাদারীপুরের খালিয়া য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট দ্বিবিকানাথ বড়োরী গ্রেপ্তার। ১লা পৌষ—ভাঙ্গা থানা এলাকার ৮ জন হিন্দু ভদ্রলোকের বন্দুকের লাইসেন্স নাকচ।

পাইকারী জরিমানা—ফরিদপুর জিলার গোঁসাইঘাট থানার অধীন কয়েক স্থানের অধিবাসীদিগের উপর এক হাজার টাকা, দার্জ্জিলিং ও ময়মনসিংহ জিলার আংশিক শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের উপরেও পাইকারী জরিমানা, অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ, ঢাকার ৮টি মৌজায় ২০ হাজার টাকা ধার্য্য। পুনরায় বেলডাঙ্গার অধিবাসীদিগের উপর ২ হাজার টাকা পাইকারী ট্যাক্স ধার্য্য, ইহার মধ্যে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের প্রতি ১ হাজার টাকা দিবার আদেশ। ঢাকা জিলার তালতলা বাজারের অধিবাসীদিগের উপর ধার্য্য ৩০০০৲ টাকার মধ্যে ২১৮২৷০ আদায়।

বোম্বাই—২৮শে অগ্রহায়ণ—কাফি ক্লাবে বোমা বিস্ফোরণ, কয় জন সৈনিক আহত, অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা। এক দল পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ, ৩ জন গ্রেপ্তার। ২৯শে—গিরগাঁওএর এক ডাকঘরের নিকট বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার। ঐ স্থানে একটি তাজা বোমা প্রাপ্তি। বোম্বাই সহরের উত্তরাংশের এক কারখানায় বোমা বিস্ফোরণ, বোমা প্রস্তুতের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার, এক লৌহ কারখানার মালিক ও অপর ৩ জন গ্রেপ্তার। সিরওয়ারে রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ, জনতা কর্ত্তৃক প্রহরীদিগের নিকট হইতে বন্দুকাদি সংগ্রহ। ষ্টেশনে অগ্নিদান। ৩০শে—পাঁচ স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত, ১২ জন গ্রেপ্তার। স্বাস্থ্য বিভাগের এসিষ্টান্ট ডিরেক্টারের আফিসের দ্রব্যাদি ও কাপড়ের বাজারে কাপড়ের গাঁইটে অগ্নিসংযোগ। বেলগাঁওএ ১৮খানি গ্রামের দপ্তর ভস্মীভূত। ১লা পৌষ—আমেদাবাদে ৫ স্থানে বিস্ফোরণ। এক স্থানে দুইটি বালিকা আহত। দুইটি চৌরা ভস্মীভূত। কয়রা জিলার চারিখানি গ্রামের কয়েক জন লাইসেন্সধারীর বন্দুকগুলি অপহৃত। ধুলিয়া সহরের তিন স্থানে বিস্ফোরণ, কয় জন গ্রেপ্তার। ৩রা—প্রায় ১ শত লোক কর্ত্তৃক সার্কন থানা আক্রান্ত। গুলীর আঘাতে এক কনষ্টেবল ও দুই জন আহত। বারদোলীতে শ্রীযুত নগিনভাই দেশাইএর গৃহ হইতে বন্দুক চুরি। ৪ঠা—আমেদাবাদে জনতার উপর পুলিশের ৫ বার গুলীবর্ষণ, ২ জন কনষ্টেবল আহত, ১ জন গ্রেপ্তার, মিউনিসিপ্যাল কনজারভেন্সী আফিসের আসবাবপত্র ও রেকর্ড ভস্মীভূত। বোম্বাইএ এক মিল-এলাকায় অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। ৫ই—সুরাটে ১২টি বোমা আবিষ্কার, ৫ জন গ্রেপ্তার। ৭ই—আমেদাবাদে তিন স্থানে গুলীবর্ষণ, ৪ জন কনষ্টেবল ও এক জন দারোগা আহত, ৩ জন গ্রেপ্তার। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট বোমা বিস্ফোরণ। বার্দ্দোলীতে এক বিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ। ৮ই—ওয়ার্লী পুলিশ চৌকীর নিকট অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। ১০ই, আমেদাবাদে বালক-দলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত। বোম্বাইএ ফিরোজশা মেটা রোডের নিকট এক রেস্তোরায় বোমা নিক্ষেপ। এক মোটর গাড়ী হইতে দশ হাজার কংগ্রেস ইস্তাহার প্রাপ্তি। ১১ই, আমেদাবাদে পুলিশের গুলীচালন, এক সিনেমাগৃহে বোমা বিস্ফোরণ, পাটন হাইস্কুল ভস্মীভূত। কয়রা জেলার এক গ্রামে পুলিশ চৌকীর নিকট বিস্ফোরণ, ১ জন পুলিশ আহত, ৮ জন গ্রেপ্তার। পুনা সহরের দুই স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, ২ জন আহত। বোম্বাইএর ফোর্ট এলাকায় একটি বোমা আবিষ্কার। ১২ই, ধারওয়ার মিশন স্কুলে টাইম-বোমা নিক্ষেপ। ১৩ই আমেদনগরে এক সিনেমাগৃহে বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, কয় জন আহত। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে বোমা বিস্ফোরণ। ওরলী বন্দিশালায় ১ শত রাজনীতিক বন্দীর উপর লাঠি চালন। ১৪ই, পাঁচমহল জিলার হালোল নামক স্থানে, আমেদাবাদের ওল্ড কমার্শিয়াল মিল ও মহেশ্বরী মিলে বোমা বিস্ফোরণ। আমেদাবাদের পাতসা ষ্ট্রীট ও লুনসাওয়াদায় পুলিসের গুলী চালন। সুরাট জিলায় জালালপুর ও চিকলি তালুকের কয়েক স্থানে অগ্নিদান। আমেদাবাদের পাতাসা ষ্ট্রীটে পুলিসের দ্বিতীয় বার গুলীবর্ষণ। পুনা সার্ভে অফিসের নথিপত্র আংশিক ভস্মীভূত। ১৫ই—বোম্বাই হর্ণবী রোডের এম্পায়ার রেস্তোরায় বোমা বিস্ফোরণ। কলবাদেবী অঞ্চলে এক বদ্ধ ঘর হইতে প্রায় ১ শত বোমা ও বোমা তৈয়ারীর উপকরণ আবিষ্কার, ৮ জন গ্রেপ্তার। মধ্য-রাত্রিতে আদালত অঞ্চলে টর্চ্চ লাইট সহ মিছিলের উপর পুলিসের গুলী বর্ষণ, ১ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার। আমেদাবাদে আসারুয়া মিলে বোমা বিস্ফোরণ। ১৬ই—নদিয়াদে মুখোসধারী ৪৫ জন যুবক কর্ত্তৃক আয়কর অফিস আক্রমণ ও অগ্নিদান। আমেদাবাদে সরিষাপুর অঞ্চলে বিস্ফোরণ, সান্ধ্য আদেশের মেয়াদ ১ সপ্তাহ বৃদ্ধি। থানার কারজাত অঞ্চলে এক খাড়া পাহাড়ের চূড়া হইতে সশস্ত্র পুলিস-দলের উপর গুলী বর্ষণ। উভয় পক্ষে বন্দুক-যুদ্ধ। ১ জন নিহত, ২ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার; বহু বোমা, রাইফেল, বিস্ফোরক পদার্থ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি উদ্ধার। ১৭ই—বোম্বাই সহরের বড়ীবন্দর এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ, ৭ জন আহত। লেডী জামসেদজী রোডে ডাকঘর আক্রমণ, ২০ জন গ্রেপ্তার। কয়রা জিলার লিম্বাসী ডাকঘরে অগ্নিসংযোগ, বাগাদ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট বোমা

বিস্ফোরণ। ১৮ই—হালালে (সুরাট) মামলতদারের আদালতে এক বোমা বিস্ফোরণ। কয়রা জিলায় দুই জনের ব্যাটারী রেডিও হস্তগত। ১৯শে—বোম্বাই আদালত অঞ্চলে পুলিশ-অফিসের সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণ। আমেদাবাদে মনোগ্রাম মিলের নিকট তাজা বোমা। খাদিয়া পুলিশের চৌকীতে বোমা নিক্ষেপ। ২২শে, এক গৃহে সুটকেশে ৩টি বোমা প্রাপ্তি, ২ জন গ্রেপ্তার। ২৩শে—আমেদাবাদ জি, আই, পি, আর অফিসে তিনটি তাজা বোমা প্রাপ্তি, একটি বোমা বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড। সুরাটের এক গ্রামে পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষ। শ্রমিকনেতা মিঃ গেগলেকার ও ডাক্তার শিরোদশর গ্রেপ্তার। ২৪শে আমেদাবাদে ১২ বার পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত, ১ জন গ্রেপ্তার। সুরাট "বরো" মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্টের গৃহের বারান্দায় বোমা বিস্ফোরণ। ২৫শে, আমেদাবাদের বেদিয়াচর রাস্তায় পুলিশের গুলীবর্ষণ, এক জন নিহত। শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিকাণ্ড।

সিন্ধু—১৫ই পৌষ সিন্ধু প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি মিঃ এ, টি, গিদওয়ানী গ্রেপ্তার।

মধ্যপ্রদেশ—১৫ই পৌষ—মধ্যপ্রাদেশিক পরিষদের সদস্য শ্রীযুত কুশলচাঁদ খাজাঞ্চীর রেডিও যন্ত্র পুলিসের হস্তগত। শেঠ যমুনালাল বাজাজের পুত্রবধূ শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বাজাজের রেডিও লাইসেন্স বাতিল। ২৭শে—অধ্যাপক ভানশালীর প্রায় ৫০ দিন পর অনশন ভঙ্গ। মধ্যপ্রাদেশিক সরকার ও অধ্যাপকের মধ্যে মীমাংসা। অধ্যাপক ভানশালী সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া ভারতরক্ষা বিধির আদেশ প্রত্যাহার। মীমাংসার সর্ত্ত অপ্রকাশ।

আসাম—১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত আসামে মোট ৬০০ জন দণ্ডিত। ২৬শে অগ্রহায়ণ—নলবাড়ী ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ। ২৭শে—মৌলভী বাজারের অবসরপ্রাপ্ত সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ সরোজকুমার ঘোষ ও অপর ৮ জন স্পেশাল কনষ্টেবল নিযুক্ত। ৩০শে—কম্যুনিষ্ট দলের আসাম শাখার সম্পাদক জগৎ ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার। গৌহাটীর রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ৩০শে—নওগাঁওএর কংগ্রেসকর্ম্মী মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা ও লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা। তেজপুরের রেভিনিউ সার্কেল অফিস, বিলুগুড়ি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ভবন ও তিনটি সেনানিবাস এবং হাজোর ফরেষ্ট বিট হাউস ভস্মীভূত। ১লা পৌষ—বড়পেটার এক ডাকঘর, থানা ও স্কুল অগ্নিদানে ধ্বংস ও লুণ্ঠনের অভিযোগে ৭ জন অভিযুক্ত। শ্রীহট্ট জিলা-জজের আদালতে "ভারত হইতে দূর হও" ধ্বনি করায় আসাম প্রাদেশিক জমিয়ৎ উল উলেমার নেতা মৌলানা জামালউদ্দীন আহম্মদ ও অপর ৪ জন মুসলমান কর্ম্মীর কারাদণ্ড। ২রা—ফেরার আটকবন্দী শ্রীযুত কিরীটী-ভূষণ চৌধুরী শ্রীহট্ট উপকণ্ঠে গ্রেপ্তার। ৫ই—কয়েকটি ইনস্পেকসন বাংলা, হাইস্কুল, কমলাবাড়ী ডাকঘর ভস্মীভূত। ১৮ই, নওগাঁ জিলার কয়েকটি বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ। ১০ই, নওগাঁ জিলার ভেরভেরী এলাকা হইতে ১৮ জন গ্রেপ্তার, এক বাড়ী হইতে ৩টি তাজা কার্ত্তুজ প্রাপ্তি। ১৩ই—নওগাঁ জিলার লাহোরিঘাট থানার এলাকা হইতে ৫টি বন্দুক অপহৃত। বহু গৃহে তল্লাসী। তিন জন যুবক গ্রেপ্তার।

পাইকারী জরিমানা—১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার এগার টাকা জরিমানা ধার্য্য। তেজপুর থানায় এলাকাধীন মাজগাঁও গ্রামের অধিবাসীদিগের উপর ৮০০৲ টাকা ধার্য্য। শিবসাগর জিলায় মোট ৩৬ হাজার টাকা ধার্য্য।

বিহার—২৮শে মিনাপুর থানার দারোগাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে ১ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড। ৫ই পৌষ—পাটনায় কানাডীয় বৈমানিক হত্যা-মামলার পলাতক আসামী চন্দ্রদীপ শর্ম্মা গ্রেপ্তার।

পাইকারী জরিমানা—ভাগলপুর জিলার মোকাশিল থানার ১৯খানি গ্রামের উপর ২০ হাজার টাকা ধার্য্য।

সীমান্তপ্রদেশ—১লা পৌষ—পেশাওয়ার দায়রা জজের এজলাসে হানা দিবার জন্য এক দল লালকোর্ত্তা গ্রেপ্তার।

যুক্তপ্রদেশ—২রা পৌষ, শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী এবং তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী হাতিসিং এবং তাঁহাদিগের গৃহের জনৈক ভৃত্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৭ই, এলাহাবাদে বহু স্থানে তল্লাসী, দুইটি রিভলভার ও একটি পিস্তল আবিষ্কার। ঝাঁসিতে এক কর্ম্মকারের গৃহ হইতে কতিপয় শূন্য বোমার খোল ও বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার, ৩ জন গ্রেপ্তার। মজঃফরপুরে এক জনের নিকট ১৪৬২৷৷০ আনার পয়সা ও খুচরা ভাঙ্গানী আবিষ্কার, লোকটি গ্রেপ্তার। ২৫শে, মোরাদাবাদে ৮টি বেতার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত। বেরিলীতে দুইটি বন্দুক ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত।

মাদ্রাজ—মুকুন্দাপুরমের এক গৃহে দুইটি বোমা ও কার্ত্তুজ আবিষ্কার। ১১ই পৌষ—রামনাদ জিলার এক থানা ও সাব-ট্রেজারী লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী এক জনের নিকট পুলিসের গুলীতে নিহত। ২৪শে পৌষ, কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য অধ্যাপক রঙ্গ ও তাঁহার ভ্রাতা অন্ধ্র কিষাণ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ জি, এল, নারায়ণের ধান্য ক্রোক।

সামন্তরাজ্য—৩রা পৌষ বরোদার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে একটি এবং মেসানা নামক স্থানে ২টি বোমা বিস্ফোরণ। ৭ই, রাজকোটে ভাবমন্দ্রসিংজি কলেজে ও উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৩টি বোমা বিস্ফোরণ। ১০ই, বরোদা কলাভবন কারখানায় বিস্ফোরণ, এক গ্রামের পুলিশ-চৌকীতে বোমা বিস্ফোরণ। ১৪ই, কোলাপুরের পুরাতন কারাগৃহে অগ্নিদান। শিবাজীপেট চৌকীতে অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। প্রজা-পরিষদের কয়েক জন সদস্য গ্রেপ্তার। ১৬ই; কোলাপুরে ট্রেজারী-প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ সম্পর্কে বহু লোক গ্রেপ্তার। বরোদা রাজ্যের এক হাইস্কুল হইতে এক অবিস্ফোরিত বোমা অপসারণ। ১৮ই বরোজার বরুণতীর্থ মিউজিয়ামে, জেল-প্রাঙ্গণে ও একটি ব্যাঙ্কের নিকট বোমা বিস্ফোরণ। ২২শে, বরোদার কলেজের গুদামঘরে বোমা নিক্ষেপ। ভবনগরের এক মেল ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বোমা বিস্ফোরণ। ২৪শে, বরোদা রাজ্যের মেহসেনার বাজারে বিস্ফোরণ, ২ জন গ্রেপ্তার।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
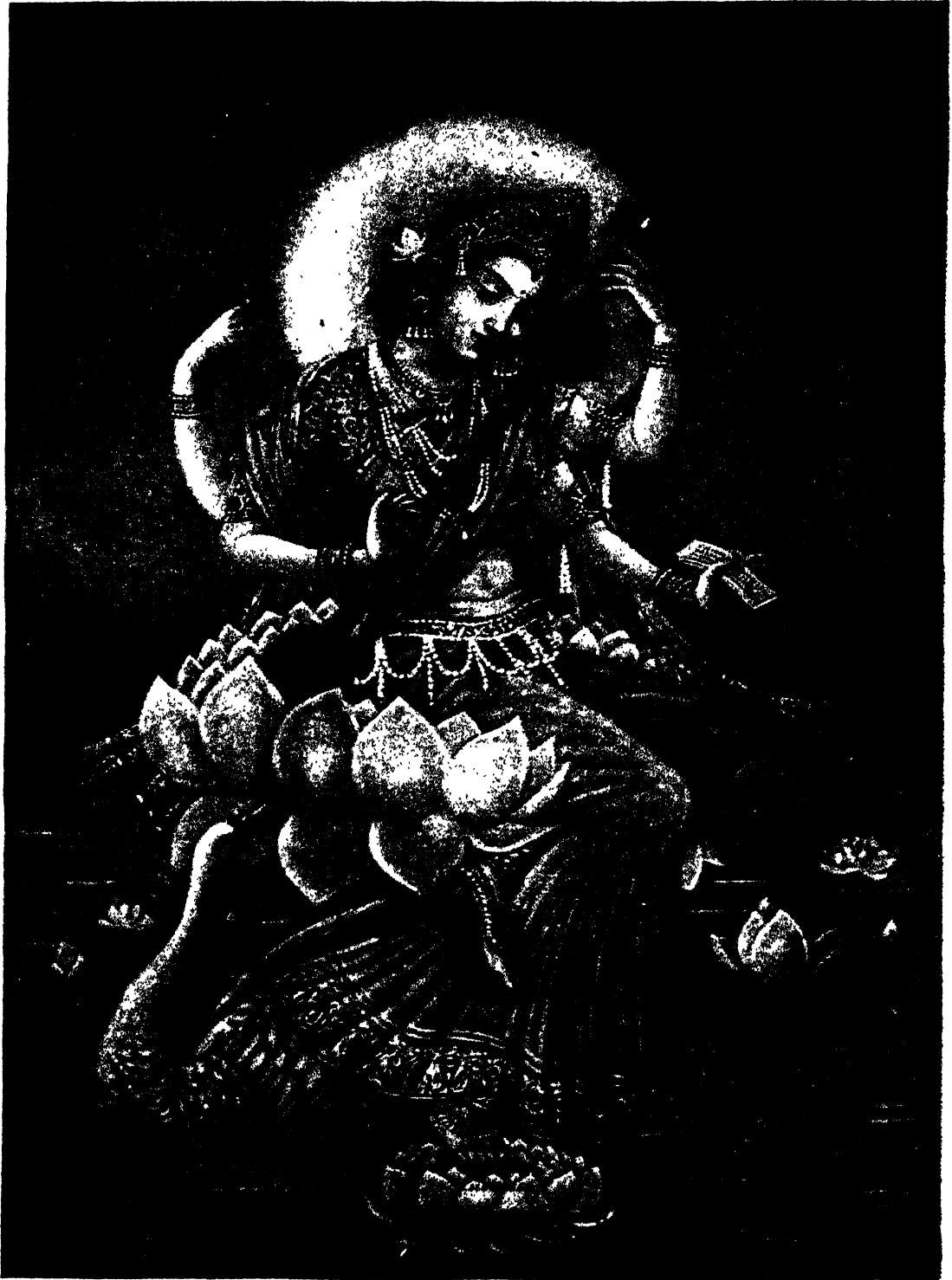
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২১শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৯ [৪র্থ সংখ্যা

সরস্বতী-স্তুতি

১

জননি বাণি ! করবাণি নমস্তে
ত্বং গতিরেকা জগতি সমস্তে ।
অতিমধুরোজ্জ্বলকোমলকান্তি-
স্ত্বমসি বিশ্বজন-মানসশান্তিঃ ॥

২

মধুরবিপঞ্চীধ্বনিহৃতজাড্যে
জয়তি কুন্দকুসুমাভরণাঢ্যে ।
সিতচরণচ্ছবি-জিতরবিচন্দ্রা
জগদুদ্ভাসয়সি চ নিস্তন্দ্রা ॥

৩

মুগ্ধদুগ্ধময়সিন্ধুতরঙ্গে
শুভ্রকমলদলপরিলসদঙ্গে !
রুচিরশুচিস্মিতরচিতসিতাশে !
কুরু করুণাময়ি ময়ি ! চিরদাসে ॥

৪

কুন্দরদোজ্জ্বলসুন্দরবদনে !
নন্দ দেবি ! মম মানস-সদনে ।
বিবুধবৃন্দচিরবন্দিতচরণে
দেহি দয়ালবমাপত্তরণে ॥

১

হে জননি বাণি ! লহ প্রণতি
জগতে তুমিই এক পরমা গতি !
কোমল-মধুর তব উজ্জ্বল কান্তি
জগজন-চিত্তে সুবিমল শান্তি ।

২

বীণা-নিক্কণে হর জড়তা-জাড্য,
কুন্দকুসুমে তব আভরণ আঢ্য ।
রবি-শশী জিনি পদ-দ্যুতি-উদ্ভাসে
বিশ্বে বিকশি তোল অতন্দ্র-হাসে ॥

৩

উচ্ছলিত দুগ্ধ-সিন্ধু-তরঙ্গে
শুভ্র কমলদল রাজিত অঙ্গে ।
দশ দিশি উজলিত তব স্মিত হাসে
কৃপা করো কৃপাময়ি ! তব চির-দাসে

৪

কুন্দ-দশন-শোভা সুন্দর আননে,
নন্দিত করো দেবি মানস-কাননে ।
বন্দি ও বুধগণ সেবিত চরণে,
জননি শকতি দাও বিপদ-তরণে ॥

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সংস্কৃত কাব্যে চিত্রচর্চা

৩

বীণা—বাগ্‌দেবীর করকমললীনা—বীণা মধুর প্রণবঝঙ্কারে বিশ্বচৈতন্য-দায়িনী, বাণী শব্দ মাধুরীর অপূর্ব্ব প্রতিমা। এক হস্তে পুস্তক-লেখনী, অপর হস্তে বীণা—শাস্ত্রবিদ্যা ও গীতবিদ্যা উভয়ই তাঁহার নিজ সম্পৎ। এজন্য বীণা ও পুস্তক-বন্ধ—সারস্বতশতকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বন্ধচিত্রের বিকাশ-ইতিহাসে—পুস্তকবন্ধ সরলরেখার অঙ্কন হইতে উদ্ভূত হইলেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সে কালের পুঁথীর মধ্যে একটি ছিদ্র থাকে, অঙ্কিত পুঁথীতে—সেই ছিদ্রমধ্যে যে 'রা' বর্ণটিকে রাখা হইয়াছে, তাহার সহিত প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় চরণে দুই বার করিয়া চারি বার সম্বন্ধ হইতেছে,—
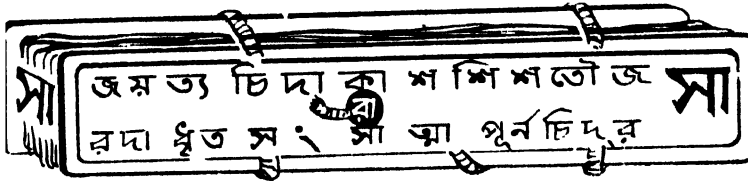
পুস্তকবন্ধ

পুস্তকবন্ধের শ্লোকটি এই,—

সা জয়ত্যচিদাকারা রাকাশশিশতৌজসা।
সারদা ধৃতসংসারা রাসাত্মা পূর্ণচিদ্রসা॥

(অনুবাদ)

জয় মা সারদা—স্ফুরিছে তোমার মূরতি-মাঝে
শত পূর্ণচাঁদ অচিদ বিলাস রূপেতে রাজে।
ধরিছ সংসার বাঁধনে মায়ার—আবার হেরি,—
(শব্দ) ব্রহ্মরূপিণী চিন্ময়রসে রহিছ ভরি।

বীণাবন্ধের অঙ্কনে সরলরেখার সহিত বক্ররেখা ও অলাবু-আকারের মিলন ঘটিয়াছে। তিনটি তন্ত্রী ও বীণার অঙ্গ সরলরেখায় ও অলাবুটি

বীণাবন্ধ

তদাকারে অঙ্কিত। ইহাতে তিনটি স্বরারোহণী (শোয়ারী) 'র'কার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্লোকটি এই,—

যা দেবশক্তিরপি সেবকভক্তিযোনির,
নির্ব্বেদহেতুরপি বেদবচোঽবধেয়া।
যাযাবরস্য বরদাপি জড়ার্ত্তিহানির,
নির্ম্মাণকৃদ্ বিততবিশ্বভুবোঽপ্যকামা।

(অনুবাদ)

সুরশক্তি তবু তুমি সেবকের ভক্তিতে উদিতা
নির্বেদ জাগাও তুমি কিন্তু বেদবচনে নির্ণীতা।
বর দাও যাযাবরে, জড়েরো ত' জড়ত্ব ঘুচাও
রচিলে প্রপঞ্চ, কিন্তু আপ্তকামা কিছু নাহি চাও।

এই দুইটি বন্ধই—স্বকপোলকল্পিত, প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাই নাই। তবে, আমার বক্তব্য এই যে, বন্ধচিত্রে কেবলমাত্র গতানুগতিকতা প্রাচীনকালেও অবলম্বিত হয় নাই। পূর্ব্ব প্রবন্ধে নব আবিষ্কারের ও ক্রমবিকাশের আলোচনা করিয়াছি এবং আরও দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশীয় 'অবতার' নামক এক বিশিষ্ট কবি—'ঈশ্বরশতকম্' প্রণয়ন করেন। ইহাতে মহাদেবের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে নানা বন্ধকাব্যের অবতারণা করিয়াছেন। এই 'ঈশ্বরশতকম্' আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীত-'দেবীশতকম্' এর অনুকরণে রচিত হইলেও বন্ধ-বৈচিত্র্যে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। তবে, ভাষার সরলতা ও মধুরতা ইহাতে হ্রাস পাইয়াছে। শুধু পূর্ব্বানুসৃত পন্থা অবলম্বনে তিনি রচনা সমাপ্ত করেন নাই, পরন্তু, বহুবিধ নূতন আকার-চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এমন কি, পদ্ম-বন্ধের পরই এক অভিনব 'মহাদেব-বন্ধ' রচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-শব্দের অর্থ মহাদেব বলিয়াই 'মহাদেব-বন্ধ' রচনার প্রয়োজন কবি-হৃদয়ে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে—ইহা ঈশ্বরশতক ভিন্ন অন্য কাব্যে দেখা যায় নাই বা সম্ভাবনা করাও যায় না। কোন আলঙ্কারিক গ্রন্থেও দেবতানাম লইয়া বন্ধের বিবরণ দেখা যায় না। এবং দুঃখের বিষয় এই যে, এই 'মহাদেব-বন্ধের' অঙ্কন যে কিরূপ হইবে, তাহার কোন সঙ্কেত প্রদত্ত হয় নাই, এক্ষণে উক্ত চিত্রটি শ্লোক হইতে বাহির করিতে বিশেষ চিন্তা ও শ্রমের প্রয়োজন।

এই গ্রন্থে—প্রচলিত যমক ও অনুপ্রাসের যথেষ্ট সম্পদ বিকাশলাভ করিয়াছে—ইহার সহিত সর্ব্বতোভদ্র, গোমূত্রিকা, মুরজ, পদ্মবন্ধ ব্যতীত বজ্র—ত্রিশূল—পরশু—গদা—ক্ষুরিকা—তূণ—চক্র—খড়্গ—মুষল—ধনুঃশর—ডমরু—হল—নন্দিকাবর্ত্ত—কুসুমোচ্চয়—

অশ্বপদ—গজপদ—কাঞ্চী ও ছত্রবন্ধ কোথায়ও একরূপে, কোথাও বা একাধিক প্রকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাদেবের অঙ্গভূষণ বা ধারণীয় অস্ত্রগুলি উক্ত বন্ধচিত্রে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু এই বন্ধগুলি কি নিয়মে রচিত, তাহার কোন উল্লেখই নাই। মূলগ্রন্থের সহিত স্বরচিত টীকা যোজিত হইলেও কবি বন্ধচিত্রের নিয়ম বিষয়ে কোনরূপ বিচার প্রকট করেন নাই। পরবর্ত্তিকালে সর্পবন্ধ প্রচলিত হইলেও ঈশ্বরশতকে তাহার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় নাই, অথচ মহাদেবের সহিত সর্পের সম্বন্ধ অপরিহার্য্যরূপেই চিন্তনীয়। মনে হয়, সর্পবন্ধের জটিল অঙ্কন তৎকালেও আবিষ্কৃত হয় নাই। আবার চিত্রের যত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা যাইবে, অঙ্কনের জটিলতা ততই অনুভূত হইবে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, কবিচিত্তে অঙ্কনবিদ্যার প্রভাব ও শক্তি অনুসারে বন্ধচিত্রের বিকাশ-বৈচিত্র্য সম্ভবপর হইয়া থাকে।

জটিল বন্ধ-চিত্রের নিদর্শন প্রসঙ্গে হংস ও ময়ূরবন্ধের উল্লেখ করিতে পারি।

সরস্বতী হংসবাহনা কি ময়ূরবাহনা, এ বিষয়ে দেশভেদে ভিন্নমত আছে। এ জন্য হংসবন্ধ ও ময়ূরবন্ধ উভয়ই গ্রহণ করিয়া সারস্বতশতকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দুইটি বন্ধেও একটু অভিনবত্ব আছে। পবরক্ষরূপিণী সরস্বতীর মহিমা বর্ণনার সহিত চিত্র দুইটির ব্যঞ্জনাও জড়িত আছে। হংসবন্ধের শ্লোকটি এই—

হংসো মানসসঙ্গী জীবনরঙ্গী ন চোম্মিরুগ্‌ভাগী।
গীর্বাহনতনুযোগী যো গীতঃ স্বমহিমা সোঽহং।

(অনুবাদ)

হংস বিরাজে মানস সঙ্গে, জীবন ল'য়ে খেলিছে রঙ্গে।
বেদনা বাধা লাগে না অঙ্গে ভাসিয়া কি বা চলে তরঙ্গে ॥[১]
সে তনুর যোগে নূতন ধন্য, বাগ্‌দেবী যার বশতাপন্ন।
হংসঃ সোঽহং নহে বিভিন্ন, এই ত মহিমা জগবরেণ্য ॥
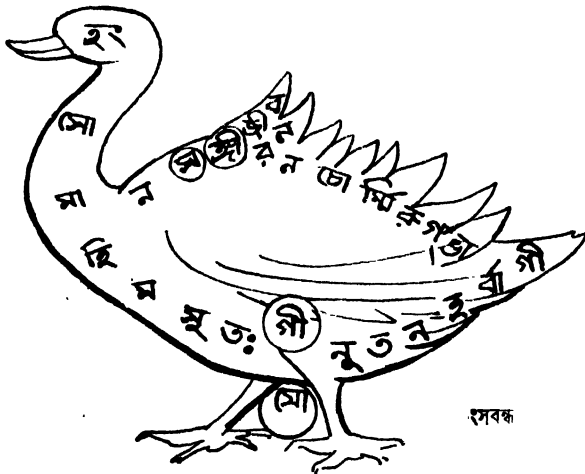
হংসবন্ধ

হংসবন্ধের শ্লোকটি ঐ চিত্রের মুখভাগ হইতে আরব্ধ হইয়া হংসচিত্রে পক্ষের উপর দিক্ দিয়া যাইয়া পুচ্ছে মিলিত হইলে শ্লোকের একচরণ সমাপ্ত হইল; তৎপরে পুচ্ছস্থ 'গী' বর্ণ হইতে নিম্নভাগে নামিয়া পদদ্বয় ঘুরিয়া পুনরায় মুখে মিলিত হইবে। 'হংসো মা' এই তিনটি বর্ণ বিপরীতভাবে 'মা সোহং' হওয়াতে গলদেশের সঙ্কীর্ণ স্থানে দুইরূপে এক হইয়া থাকিতে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। পুচ্ছের অন্তভাগে 'গী'—দুই বার, চরণের মধ্যবর্ত্তী 'যোগী' শব্দটি দুই বার একরূপেই মিলিত হইয়া আছে। 'মানসসঙ্গী' এখানে দুইটি 'স' একত্র মিলিত এবং 'ঙ্গী' 'রঙ্গী'র 'ঙ্গী' সহ মিশিয়া আছে।

ময়ূরবন্ধের রচনা-প্রণালী হংসবন্ধেরই অনুরূপ। ময়ূরের আরও সঙ্কীর্ণ অথচ দীর্ঘ গলদেশ, এজন্য পাঁচটিবর্ণ 'কাকেশরত' অনুলোম-বিলোম রীতিতে মিলিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহারও আরম্ভ মুখভাগ হইতে—সমাপ্তিও সেইখানে,—কেবলমাত্র সমস্ত শরীরটা ঘুরিয়া আসিতে হইবে নিম্নভাগ হইতে উপরভাগে পদের উপরে ও নীচে যে দুইটি বর্ণ আছে—'ভা' ও 'ন'—তাহার দুই বার আবৃত্তি হইবে। পুচ্ছের অন্তিমে 'ভা' বর্ণও দুই বার পঠিত হইবে। শ্লোকটি এই—

কা কেশরতনুশোভাননভাকৃতসন্ততাহিসংক্ষোভা
ভাস্বরচন্দ্রকলাস্যা যদ্ বাণাক্বণিতরশকেকা ॥

(অনুবাদ)

কেশরের তনু শোভে কার লাগি'
(কার) মুখভাতি করে তপন মলিন।
শশিকলা কার মুখে রহে জাগি'
বীণারবে হয় কেকাস্বর লীন ॥
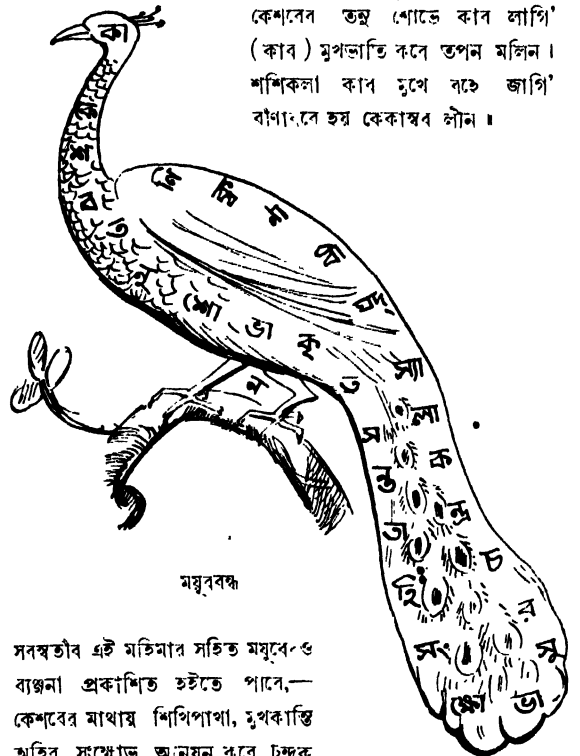
ময়ূরবন্ধ

সরস্বতীর এই মহিমার সহিত ময়ূরেরও ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হইতে পারে,—কেশরের মাথায় শিখিপাখা, মুখকান্তি অহির সংক্ষোভ আনয়ন করে, চন্দ্রক (পুচ্ছের চাঁদগুলি) লাস্য, নৃত্য ও কেকা সমস্তই ময়ূরের অসাধারণ লক্ষণ এই শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

অনুসন্ধান-ফলে জানা গিয়াছে যে,—আর্য্যাবর্ত্তের মত দাক্ষিণাত্যেও এই বন্ধচিত্রের রচনা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তবে, দাক্ষিণাত্য কবিদিগের তেমন প্রাচীন রচনার পরিচয় পাই নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েক জন বিশিষ্ট কবি অভ্যুদিত হইয়া

(১) হংস—জীবাত্মা ও পক্ষিবিশেষ। মানস—মনঃ ও মানস-সরোবর। জীবন—আয়ুষ্কাল ও জল। তরঙ্গ—দুঃখমোহাদি ষড়্‌বিধ ও ঢেউ।

বন্ধচিত্রের নবীন পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক জনের নাম কৃষ্ণমূর্ত্তি—ইনি কঙ্কণবন্ধ রামায়ণ রচনা করেন। এই বন্ধের বিশেষত্ব এই যে, একটি শ্লোকে সমস্ত রামায়ণখানির আখ্যানভাগ বিবৃত করা হইয়াছে।

কঙ্কণ—নারীদিগের হস্তের অলঙ্কার—বলয় নামে প্রসিদ্ধ। এই গোলাকৃতি অলঙ্কারচিত্রে বত্রিশটি অক্ষরের একটি শ্লোক এমন ভাবে সাজান হয় যে, যে কোন একটি স্থান হইতে পাঠ করিয়া এক বার সেই বৃত্তটি ঘুরিয়া আসিলেই একটি শ্লোক হইবে। দক্ষিণাবর্ত্তে বা—বামাবর্ত্তে প্রথম—অথবা দ্বিতীয়াদি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর অক্ষর পাঠ করিয়া যাইলেই এক একটি বিভিন্ন অর্থের শ্লোক হইবে। এই কঙ্কণবন্ধ রামায়ণ অবশ্য দুর্বোধ, সন্দেহ নাই—টীকার সহায়তা গ্রহণ না করিলে চলিবে না, কিন্তু বৈচিত্র্য এই যে, বত্রিশ অক্ষর হইতে চৌষট্টিটি শ্লোক রচিত হইবে এবং তাহার দ্বারা বক্তব্য প্রকাশ করা যাইবে। এই কঙ্কণবন্ধ রামায়ণ এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল যে, উক্ত কবি কৃষ্ণমূর্ত্তির পদাঙ্কানুসরণে আরও কয়েক জন কবি উক্ত বন্ধচিত্রের অনুশীলন করিয়াছেন।

বেঙ্কটেশ-রচিত রামচন্দ্রোদয় কাব্যের ২৬ সর্গেও এই একটি কঙ্কণবন্ধ দ্বারা সমস্ত সর্গের আখ্যানবস্তু প্রকাশিত করা হইয়াছে। 'সারস্বতশতকম্' হইতে কঙ্কণবন্ধের একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন দেখাইতেছি। সারস্বতশতক ক্ষুদ্র কাব্য বলিয়া মাত্র ষোড়শ অক্ষরের ছন্দে এই কঙ্কণবন্ধ রচিত হইয়াছে। শ্লোকটি এই,—

(১)

মায়াসারা জ্ঞানালোকা।
সামারাকা ভায়াদেকা ॥১॥
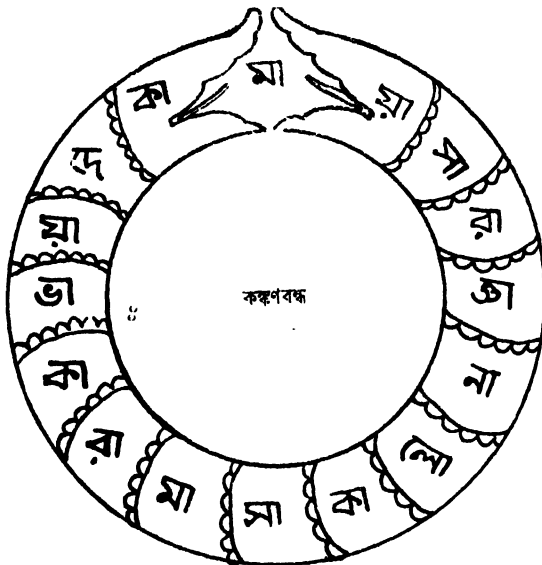
উক্ত চিত্রস্থ বলয়মুখে 'মা' হইতে বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া উপরি লিখিত একটি শ্লোক হইবে, আবার দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিলে 'কা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মা' পর্য্যন্ত আর একটি শ্লোক হইবে। প্রথম অক্ষরটি ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় অক্ষরক্রমে বৃত্তটি ঘুরিয়া আসিলে আবার তৃতীয় অক্ষরক্রমে বা চতুর্থ পঞ্চমাদি অক্ষরক্রমে পাঠ করিলে অন্ততঃ ১৬টি শ্লোক হইতে পারে। এইরূপ বিপরীতক্রমে ধরিলে আরও ১৬টি মোট—৩২টি শ্লোক হইতে পারে। পূর্ব্বলিখিত শ্লোকটির অনুবাদ এই,—

(১)

মিলিত মায়ার ছায়া জ্ঞানালোক স্বরূপে যাঁহার,
আবির্ভূতা হ'ন তিনি অমারাতি রাকা একাকার ॥

ঐ শ্লোকটি বিপরীত ভাবে পাঠ করিলে—হইবে,—

(২)

কা দেয়া ভা কা রামা সা।
কালোনাজ্ঞা রাসায়ামা ॥২

(অনুবাদ)

(২)

পরমদানের বস্তু কি বা ? দীপ্তি কি বা ?
নিত্যা চিদানন্দময়ী সুন্দর সে বিভা ॥

(১ নং) মূল শ্লোকের প্রথমবর্ণ ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে শ্লোকের রূপ হইবে,—

(৩)

যা সারাজ্ঞানালোকা সা।
মা রাকাভা যাদেকামা ॥৩

(অনুবাদ)

(৩)

শ্রেষ্ঠা যিনি, যাঁরে নাহি হেরে মূর্খগুলা।
লক্ষ্মী পূর্ণচন্দ্ররূপা—অচলা অতুলা ॥

বিপরীত ক্রমে প্রথমবর্ণ ত্যাগ করিলে, আর একটি শ্লোক হইবে,—

---

(১) মায়া অসারঃ অপ্রধানাংশো যস্যাং সা মায়াসারা, জ্ঞানম্ আলোকঃ দ্যোতঃ যস্যাং সা। আলোকপার্শ্বস্থা ছায়েব জ্ঞানং মায়া চ যস্যাঃ স্বরূপম্। অতএব সামা অমাবস্যয়া সহিতা রাকা পূর্ণেন্দুতিথিঃ ইবেতি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা, নিত্যসম্মিলিতচিদচিদ্রূপা এবা অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপিণী ভায়াৎ প্রকাশিতা ভবতু॥ ইদং শাক্তসিদ্ধান্তমতে॥ দেবীসূক্তে বাগ্‌দেবতায়া ব্রহ্মস্বরূপতাকীর্ত্তনাৎ।

(২) কা অদেয়া—নাস্তি দেয়া যতঃ দেয়বস্তুষু সর্ব্বোত্তমা, বিদ্যাদানস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কা ভা ? দীপ্তিঃ ? জগতি গ্রহনক্ষত্রাদীনাং দীপ্তির্বহিঃপ্রকাশিকা বিদ্যা ত্বন্তঃপ্রকাশিকেতি তত্তৎকর্ষঃ। সা রামা মনোজ্ঞা কালোনা কালেন মৃত্যুনা উনা হীনা নিত্যেত্যর্থঃ। জ্ঞা জ্ঞানং তদ্রূপা রাসঃ রসসম্বন্ধী আয়ামঃ বিস্তারো যস্যাঃ 'রসো বৈ সঃ' অতএব চিদানন্দময়ীত্যর্থঃ।

(৩) যা সারা শ্রেষ্ঠা, অজ্ঞানালোকা অজ্ঞৈঃ মূর্খৈঃ অনালোকা, তেষামপ্রত্যক্ষা, সা মা লক্ষ্মীরূপাপি, তথা রাকাভা রাকাবৎ পূর্ণিমাবৎ আভাতীতি রাকাভা, অযাদেকামা অযাৎসু অচলৎসু বস্তুষু একা মুখ্যা, অমা অতুলা। লক্ষ্মীস্তু চলা, সরস্বতী লক্ষ্মীরূপাপি অচলেতি অতুলত্বকীর্ত্তনম্। লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টিরিত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ সরস্বত্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ।

(৪)

দেয়াজ্ঞা কারামা সাকা

লোনাজ্ঞারা সায়ামা কা ॥৪

(অনুবাদ)

(৪)

বিশ্বে দেওয়া আভা কার ? অতনু হ'য়েও যাঁর

জলে পদ্ম-উপবনে বিছান আসন।

ইন্দ্র হ'তে নানা বস্ত- দেবগণে করি নত

নাশি' মোহ,—মহিমায় ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।

আবার যদি মূল শ্লোকের প্রথম দুইটি বর্ণ ত্যাগ করিয়া তৃতীয় বর্ণ হইতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে শ্লোকের রূপ হইবে—

(৫)

সারাজ্ঞানালোকা সামা।

রাকাভায়া দেকা মায়া ॥৫

(অনুবাদ)

(৫)

ব্রহ্মে অজ্ঞানীজনে রূপ যাঁর দেখিতে না পায়,

চন্দ্রের ষোড়শ-কলা-অমা যাঁর ললাট-শোভায়।

কামাগ্নিজনিত দুঃখ কভু যাঁর নিকটে না পশে

উদিতা হউন সেই দেবী এক—নাহি মায়া বশে॥

বিপরীত দিক্ হইতে দ্বিতীয় বর্ণ ত্যাগ করিয়া তৃতীয় বর্ণ হইতে শ্লোকের আরম্ভ ধরিলে তাহার স্বরূপ হইবে—

(৬)

না ভাকারামাসা কালো।

না জ্ঞা রাসা যামাকাদে ॥৬

(অনুবাদ)

(৬)

গ্রহগণসম উজ্জ্বল আকার

নাহি কালিমার লেশ।

ব্যাধিহরা তুমি—কভু বা পুরুষ

কভু জ্ঞানময় বেশ।

করুণায় তব শবদ নিচয়

বিকাশ অর্থ তার।

(ত্যজিয়া মোদের) যেও নাক' চলি'

(এই নিবেদন আর) ॥

এইরূপে প্রত্যেক বর্ণ ধরিয়া পৃথক্ ভাবে বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী বর্ণগুলিকে সাজাইলে বহু শ্লোক হইতে পারে. আমি তন্মধ্যে ১৬টি শ্লোক সারস্বতশতকে ব্যাখ্যার সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছি। সংস্কৃতজ্ঞদিগের বুঝিবার জন্য শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা পাদটীকায় লোখিত হইল। উপরে মাত্র ছয়টি শ্লোকের স্বরূপ ও অনুবাদ দেখাইলাম. 'মাসিক বসুমতী'র অঙ্গে অধিক বিস্তার পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইতে পারে। কঙ্কণ-বন্ধের বৈচিত্র্য এই যে, সকল বর্ণগুলিই গুরুস্বরযুক্ত, এ জন্য ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা নাই। বিদ্যুন্মালা ছন্দের এক এক চরণে আটটি অক্ষর থাকে এবং সকলগুলিই গুরুস্বরযুক্ত। বিদ্যুন্মালার অর্দ্ধ হইল 'কন্যা' ছন্দঃ। এই ছন্দঃ সারস্বতশতকে গ্রহণ করিয়া কঙ্কণবন্ধের একটি ক্ষুদ্র রূপ দেখাইয়াছি। ইহাতে এক একটি চরণ চারটি গুরুস্বরযুক্ত অক্ষরে নিবদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যদেশের আর একটি বিশিষ্ট বন্ধচিত্র—'পদ্মমালাবন্ধ'।

এই বন্ধে রচিত স্তোত্রগ্রন্থের নাম 'পদ্মমালিকাস্তোত্র'। লক্ষ্মীদেবীর স্তুতি রচনাই এই গ্রন্থের বিষয়। পদ্মালয়ার সন্তোষবিধানের জন্য—প্রত্যেক শ্লোকটিকে এক একটি পদ্মমালারূপে উপহার প্রদানে চিত্তে যে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই স্তোত্রের রচয়িতা—কবি বেঙ্কটাচার্য্য। এই পদ্মমালা বন্ধ—পচিশটি পদ্মপুষ্পে রচিত একটি মাল্যের চিত্র।

পদ্মমালাবন্ধের শ্লোক যে ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকে, তাহা অতীব কষ্টকর। বন্ধ-কাব্যের ক্রম-বিকাশে—ইহার চিত্রাঙ্কনে যেরূপ বৈচিত্র্যের বিকাশ হইয়াছে—কাব্যাংশে তদনুপাতে অধিকতর দুর্ব্বোধতার জন্য তাহা কয় জন সহৃদয়ের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে ? তথাপি বন্ধকাব্যে ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে সারস্বতশতক হইতে পদ্মমালা-বন্ধের শ্লোক দেখাইতেছি :—

সারাধনায় তত সাতগশাঃ পিপাসা-

সা পাপিহৃদবররসা ররমূলবাসা।

---

(৪) দেয়া আভা যস্যাঃ সা, অন্যথা বিশ্বপ্রকাশো ন সম্ভবতি, বাগ্দেব্যাঃ আভানাদের চন্দ্রসূর্য্যাদীনামপি জ্যোতিঃ প্রকাশতে, 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্' ইতি শ্রুতেঃ। কারামাসাকা—কারামাসা অকা ইতি পদচ্ছেদঃ। কং জলম্ আরামঃ উপবনং তচ্চ কমলোপবনং তত্র আসঃ অধিষ্ঠানং যস্যাঃ সা। অকা অশরীরা। লোনাজ্ঞারা লাং ইন্দ্রাৎ উনাঃ বরুণহুতাশনাদয়ো দেবাঃ, তেষাম্ অজ্ঞা অজ্ঞানং রাতি গৃহ্ণাতীতি সা। উমারূপেণ আবির্ভূয় ইন্দ্রাবরান্ দেবান্ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান্ স্বয়ং চকারেতি কেনোপনিষদ্বার্ত্তা। সায়ামা সর্ব্বব্যাপিকেত্যর্থঃ। কা ইতি প্রশ্নে।

(৫)। সারাজ্ঞানালোকা সামা, সা অমা তন্নাম্নী মহাকলা—আধারশক্তিরূপা, সারে ব্রহ্মণি অজ্ঞানং যেষাং তে সারাজ্ঞানাঃ তৈঃ অলোকা অদর্শনীয়া। রাকাভায়াদেকামায়া—রাকাভা আয়াৎ একা অমায়া ইতি পদচ্ছেদঃ। রঃ কামবহ্নিঃ তৎ সম্বন্ধি যৎ অকং দুঃখং কামাগ্নিজনিতং দুঃখং তত্র ন নাস্তি ভা প্রকাশো যস্যাঃ সা, কামজনিতদুঃখেন সহ যস্যাঃ সম্বন্ধলেশোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ সা রাকাভা, একা অদ্বিতীয়া অমায়া মায়ানধীনেত্যর্থঃ, আয়াৎ আগচ্ছতু।

(৬)। যাভাকারামাসাকালো—যা ভাকারা আমাসা অকালো, ভানি গ্রহাঃ তদ্বৎ আকারঃ যস্যাঃ সা, যা, জ্যোতির্ম্ময়ীত্যর্থঃ, আমঃ রোগঃ তম্ অস্যতি ক্ষিপতি দূরীকরোতীত্যর্থঃ সূর্য্যাদিগ্রহাণাং রোগহরত্বং যথা তথৈব সরস্বত্যাঃ, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাপি তদধীনেতি ভাবঃ। নাস্তি কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ যত্র সা অকালা নিরঞ্জনেত্যর্থঃ। উ ইতি অব্যয়মাত্রং সম্বোধনে, জ্ঞারাসায়ামাকাদে না—জ্ঞায়াসায়া মা অক আদে! ইতি চ্ছেদঃ। হে আদে! আদিভূতে! ত্বং পুরুষোঽপি। 'পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্'ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞা অর্থজ্ঞানং রাসঃ শব্দঃ (ইতি মেদিনী) তয়োঃ আয়ঃ উদয়ঃ আবির্ভাবঃ যতঃ সা, জ্ঞারাসায়া শব্দার্থজ্ঞাননিদানমিতি যাবৎ ॥ সা ত্বং মা অক গচ্ছ। ইহৈব তিষ্ঠেত্যর্থঃ।

সা বাল্যভাবহৃৎসান্তরচিদ-বিলাসা
সালা বিভাতু মম সা-মেতুলা-ধরাসা
(অনুবাদ)
আরাধনাপরায়ণে সুখ-যশ দানি,
পিপাসা নিবার দেবি ! ; পাপহীন চিতে,
পরম আনন্দ আন—(সকলি ত জানি,)
শব্দমূলে—নলাগারে বসতি নিভৃতে।
স্মিতকান্তি রূপে তব কেশদামে শোভা
যজ্ঞীয় অনলে হয় তব জ্ঞান ভাত,
জীবের জীবন-শালা তুমি মনোলোভা,
শান্তি তার তুল্য-দাক, এস এস মাতঃ।

পদ্মমালাবন্ধ

মধ্যবর্ত্তী পদ্মকোণে—যে 'সা' আছে, ঐ স্থান হইতে শ্লোকের প্রত্যেক চরণ আরম্ভ হইবে এবং ঘুরিয়া আসিয়া ঐখানেই পুনরায় মিলিত হইবে। প্রথম আরম্ভ হইবে পূর্ব্বদিক্ হইতে। কিন্তু পদ্মের দুইটি শ্রেণি, একটিতে ষোলটি, আর একটিতে আটটি পদ্ম আছে। দ্বিতীয় পদ্মশ্রেণির সহিত প্রথম সারির যে আটটি পদ্ম গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, সে গুলির মধ্যবর্তী অক্ষর যাতায়াতে দুই বার করিয়া পঠিত হইবে, প্রথম সারির বাকী আটটি পদ্মের মধ্যবর্ত্তী অক্ষর একবার মাত্র পাঠ্য। সর্ব্বমধ্য অক্ষর 'সা'টির দ্বাদশ বার আবৃত্তি হইবে। 'ত', 'র', 'ত', 'ম', এই চারিটি বর্ণের তিন বার করিয়া পাঠ হইবে। মোটের উপর ২৫টি অক্ষরে ৫৬টি অক্ষর রচিত একটি শ্লোক হইতেছে।

আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ যান—বিমান। এইরূপ বিমান পূর্ব্বকবিদিগের অজ্ঞাত ছিল। সরস্বতী দেবভাষা—দেবভাষার মর্ত্তধামে সমাগম বিমানযোগেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। অথচ বিমান শব্দের আর একটি অর্থ আকাশ—আকাশই শব্দের আশ্রয়—এ জন্য শব্দময়ী দেবীর বিমান সম্বন্ধ অস্বাভাবিক নহে। আকাশ নীরূপ, কিন্তু বিমানের রূপ—বর্ত্তমান সময়ে প্রায়ই প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে, ইহা এক্ষণে অনেকের লক্ষ্য, ভয়ে বা ভক্তিতে ধ্যানের বস্তু। এই বিমানরূপের চিত্র সহ সরস্বতীর মহিমা কিরূপে বর্ণিত হইতে পারে, তাহা 'সারস্বত-শতকম্'এ 'বিমানবন্ধ' দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে—

বিমানবন্ধের শ্লোকটি এই,—

বিদ্যা বিভা বিশ্ববিভূতিভূমা
মাতা প্রসন্নাননশীতধামা।
মা ত্রীয়তাং নো বিবিধার্থদা মা
মায়াতটজ্ঞাননদীনরূপা॥

বিমানবন্ধ

(অনুবাদ)

বিদ্যা বিভাময়ী ভূমা, বিশ্বের বিভূতি,
তুমি মাতা, সুপ্রসন্ন চন্দ্রাননদ্যুতি।
তুমিই বিবিধ অর্থ দাও তাই রমা,
(মোদের) ছেড়ো না মা মায়াতটে জ্ঞানসিন্ধুসমা॥

এই বন্ধের মধ্যে 'বিমান' শব্দটি উপর নীচে ও দুই পার্শ্বের পক্ষে বৃত্তমধ্যস্থ বর্ণ দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বিমানের ঊর্দ্ধ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া শ্লোকটি পক্ষদ্বয় ঘুরিয়া নিম্নভাগে সমাপ্ত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, ইহা অভিনব কল্পনা।

আরও কতকগুলি নূতন ও গতানুগতিক বন্ধ আছে—মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

এই পবিত্র মাঘমাসে দেবী সরস্বতী বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আরাধিতা হইতেছেন। তাঁহার মহিমা বর্ণনায় এই চিত্র-চর্চ্চা কৃতার্থ হউক।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ, অধ্যাপক)

এ যুদ্ধে মিশর

কথায় বলে, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খড়ের প্রাণ যায়! মিশরের সম্বন্ধে এ কথা খুব খাটে! মিশরে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া আছে চিরদিন, সেই ঐতিহাসিক যুগের গোড়া হইতে! কিন্তু এবারকারের এ যুদ্ধ মিশরে নয়! মিশরের সঙ্গে কাহারো বিরোধ নাই! অথচ এ যুদ্ধের বেগ মিশরকেও ভোগ করিতে হইতেছে অনেকখানি!

মিশরে নীল নদের তীরে চাষ-বাসের কাজে বিরাম নাই, তুলা-চিনির ফশল ফলিতেছে আগেকার মত! শুধু ক্ষেতের উপর দিয়া মুহুর্মুহু চলিয়াছে ঐ বমার-প্লেন! মিশরের আকাশে-বাতাসে অস্ত্রের ঝন্-ঝনা-রব মিশিয়া আছে মজ্জায়-মজ্জায়।

তার কারণ, আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েক মাইল মাত্র দূরে বড় বড় ব্রিটিশ রণতরী ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে,—এ পথে ইতালীয়ান-শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া দেখা দিলে তখনি তার উচ্ছেদ করিতে হইবে! এবং ঐ ব্রিটিশ রণতরীর আশপাশ দিয়া মিশরী-মাঝি নিত্য-দিনের মত নৌকায় পশরা বহিয়া নীল-নদের বুকে যাতায়াত করিতেছে—

মিশর

ভূমধ্য-সাগরের তীরে

তার সে জল-যাত্রায় বাধা নাই, বন্ধ নাই!

মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন-পালনের কাজে এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নাই! দিনের কাজ-কর্ম্মে গোলযোগ নাই,—মিশরী ফৌজ নিবিরোধীর মত চুপচাপ আছে! নূতন ডিউটির মধ্যে কায়রোর চারি দিক্ ঘিরিয়া এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় ও সুয়েজ-কেনালে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা সর্ব্বক্ষণ হুঁসিয়ার! ইহা ছাড়া এ যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত নির্বিকার।

গত বৎসর জুন মাসে আলেকজান্দ্রিয়ার বুকে হঠাৎ বোমা পড়ার জন্য এক রাত্রে চারি শত লোকের মৃত্যু হয়; তাই বোমার ভয়ে সহরের কতক লোক আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজ-কেনাল-সন্নিহিত

অঞ্চল ছাড়িয়া দূরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কায়রোয় আজ ব্ল্যাক-আউটেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কাছা-কাছি বিপক্ষের দু'-চারিটি বোমা পড়িলেও সহরের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। পৃথিবীতে আজ যে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, এ যুদ্ধের বিষ-বাষ্প বহু প্রদেশকে পীড়িত করিলেও কায়রোর গায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিতে পারে নাই! অথচ এই কায়রো চতুর্মুখী তোরণ! পূর্ব্ব-আফ্রিকা, গ্রীশ, সিরিয়া এবং পশ্চিম-মরুভূমিতে যাইতে কায়রোর মত নিরাপদ পথ আর নাই!

মিশর এ যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিলেও কত দিন এ নির্লিপ্ততা টিঁকিবে, বলা দুষ্কর। মিশরের পশ্চিমে বিশাল মরুভূমির বুকে আজ এ মহাযুদ্ধের একাঙ্ক লীলা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে, কে জানে, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই বুঝি-বা এ যুদ্ধের অবসান! এবং এই মিশরের কূলেই হয়তো বহু জাতির ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিবে!

পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই শক্তিমান্, সকলেই পাকা আয়োজনে যুদ্ধে নামিয়াছে। রশদাদির জোগান্ সম্বন্ধে যে জাতির তৎপরতা অধিক, সেই জাতির বিজয় সুনিশ্চিত; এবং সে দিক্ দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়-লাভের আশা সবচেয়ে বেশী বলিয়া মনে হয়।

এ যুদ্ধে আমেরিকা একেবারে শত-বাহু দিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে। ব্রিটেনকে আমেরিকা দিতেছে ফৌজ, ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড-কার, ট্রাক, এরোপ্লেন এবং খাদ্য। লিবিয়ায় জার্ম্মানি যে নৌ-শক্তি গড়িয়া তুলিতেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে মার্কিনকে তার নৌশক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে বিপুলতর করিয়া এবং সেই সঙ্গে রশদের জোগানে চাই ক্ষিপ্রতা ও প্রাচুর্য্য! তাহা করিতে এই মিশরই আমেরিকার মস্ত সহায়। রয়েল এয়ার-ফোর্শ এবং রয়েল নেভি এখন ভূমধ্য-সাগরকে জার্ম্মানি এবং ইতালীর পক্ষে দুরভিগম্য করিয়া তুলিয়াছে। যুদ্ধের উপকরণাদি উত্তমাশা অন্তরীপ এবং রেড্‌শীর বুক বাহিয়া মিশরে আনা হইতেছে। আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে মিশর হইতেই সে-সব উপকরণের

কায়রোর মিউজিয়ম (অস্ত্রবিভাগ)

এই প্লেনে মরুর বুকে ডাক আসে

ভারতীয় সেনার দল

মরুপথের বাহন

যথারীতি তার পরিবেশন চলিতেছে। তাছাড়া এরোপ্লেনের জন্য আমেরিকা বিমান-পথ পাইয়াছে এইখানে। বিমান-পথের পক্ষে মিশর নিরাপদ ষ্টেশন। মিশর আজ যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট সর্ব্বজনের পেট্রল-ষ্টেশন। এ-সব সেনা এখানে নিঃসঙ্গতা বোধ করেন না। দেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়া জীবনকে বেশ স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিয়াছেন।

এবারকারের এ যুদ্ধে রসদ-জোগানের সার্থকতার উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। তবু যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা নামিয়াছেন, তাঁরা যন্ত্র নন, মানুষ। তাঁদের সুখ-দুঃখ আরাম-বিরামের কথা ভুলিলে চলিবে না। মিশরে নীল-নদের তীরে তালীকুঞ্জে, কায়রোর পথে-ঘাটে এবং সীমান্ত-শিবিরে আরাম-বিরামের আয়োজন মিলিয়াছে অসামান্য রকম। অষ্ট্রেলিয়ান সেনাদল মনের কোমল বৃত্তির ধার ধারে না—তারাও মিশরে আসিয়া আরাম-বিরামের স্নিগ্ধ আশ্রয় পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে।

আজ তিন বৎসর ধরিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং সুয়েজ-কেনালে ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড, গ্রীনলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলাণ্ড, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে সেনা-বাহিনীর স্রোত আসিয়া জমিতেছে। এ সেনাদলে মাওরি, কাফ্রী, সোয়াঙ্কি, জুলু ও জোশা জাতির অভাব নাই। ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছে শিখ, গুর্খা, পাঞ্জাবী, রাজপুত, গাড়ওয়ালি সেনার দল; তার উপর আছে সুদানের ফৌজ। কায়রোয় যে-সব জার্ম্মান ও ইতালীয় বাস করিত, তারা বন্দী হইলেও মিশরের পথে জার্ম্মান ও ইতালীয়ান রমণীর দেখা মেলে। তার উপর পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীশ এবং ফ্রান্স হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ কায়রোয় গিয়া সঙ্কট-কালে আশ্রয় লইয়াছেন। এত জাতির সমন্বয়ে মিশরে যেন আজ সর্ব্বজাতির মহাচ্ছত্র গড়িয়া উঠিয়াছে!

খেলা-ধূলায় এবং আমোদ-প্রমোদেও নানা জাতির বৈচিত্র্য মিশরে আজ লক্ষ্য করিবার মত! ইংরেজ সেনারা ক্রিকেট খেলায় মত্ত, গ্রীকেরা নীল নদের বুকে

নৌকা চালাইয়া বাচ খেলিতেছে, ভারতীয় সেনাদের পূজা-উপাসনায় বিরাম নাই। নানা জাতির বিভিন্ন আচার-রীতি, বেশ-ভূষা মিশরে এক অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

মিশরের বাহিরে বিশাল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু নানা জাতির সেনা মরুভূমিকে হাস্যে-ভাষ্যে মোহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মরু-প্রান্তরে রাত্রে বিশ্রাম-ছাউনি ফেলা হয় চক্রাকারে। ছাউনির বাহিরে কামান সাজানো থাকে। বাহিরের দিকে থাকে কামানের মুখ—জার্ম্মান বা ইতালীয়ানরা সহসা যদি আক্রমণ করিতে আসে, কামানের গোলায় তাদের সাধ্য থাকিবে না, মিলিত শক্তির রন্ধ্র ভেদ করিবে!

মিশরীর কাছে পাঠান সেনার সৃফিন্‌ক্সের গল্প শোনা

মিশরী নক্সাওয়ালার দোকানে

এবং পাইপ বসাইয়া বহু দূর জনপদ পর্য্যন্ত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করিয়া সে সব ঘর-বাড়ী আসবাব-পত্রে, রেডিও-পানাগারে এবং সর্ব্ব-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ করিতে কার্পণ্য করে নাই। নিরাপদ বাসের জন্য পাথরের দীর্ঘ প্রাচীর-নির্ম্মাণেও ঔদাস্য রাখে নাই। এখন সে সব ঘর-বাড়ী পথ-ঘাট আসবাব-পত্র মিত্রপক্ষীয় সেনা-বাহিনীকে আরাম দান করিতেছে।

মিশরের জল-বাতাস বৃটিশ সেনার স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন অনুকূল না হইলেও মরু-বাসের কষ্ট সহিতে শিখিবার ফলে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ

নীল নদের বাহিরে মিশর দশ-বারো মাইল মাত্র চওড়া। কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ের শিখর হইতে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—সেই পিরামিড্ এবং পশ্চিম-সীমার মরুভূমি পর্য্যন্ত। তাই এই পাহাড়ের মাথায় বৃটিশ সেনা ছাউনি ফেলিয়াছে। সে ছাউনি হইতে পাহারাদারীর কাজ চলে। মরুর বুকে কুচ-কাওয়াজের বিরাম নাই। তাছাড়া মরু-প্রান্তরে বাস করিয়া সেনারা কষ্ট-সহিষ্ণুতায় যে-শিক্ষা পাইতেছে, তার মূল্য এ যুদ্ধে তুচ্ছ করিবার নয়।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইতালীয়ানরা যখন সিদি বারানি অধিকার করিয়াছিল, তখন সেখানে তারা বড় বড় পাকা পথ তৈয়ারী

মরু-পথে

মিশরে মার্কিন ট্যাঙ্ক

হয় নাই। এখানে আমাশয় রোগের প্রাদুর্ভাব খুব ; টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়ার অত্যাচারও অপরিসীম। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের ফলে এ তিনটি রোগের আক্রমণ অনেকখানি ব্যর্থ হইয়াছে। মশা-মাছি এবং রোগবাহী সর্ব্বপ্রকার কীট-পতঙ্গ মারা চাই—এ সম্বন্ধে প্রত্যেককে হুঁশিয়ার করা হইয়াছে। মিত্র-বাহিনীর প্রত্যেকে জার্ম্মান ও ইতালীয়ান শত্রুর মতই এই সব মশা-মাছি কীট-পতঙ্গের উচ্ছেদ-সাধনে তিলমাত্র ঔদাস্য করে না।

বিদেশী সেনাদলকে আতিথ্যে পরিতৃপ্ত করিতে মিশরীরা সর্ব্বদা উন্মুখ। কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার নৃত্যশালা, নৈশ ক্লাব—এগুলি সেনাদের উল্লাস-কলরবে পরিপূর্ণ। সকলে মিশরকে আনন্দে গ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতিই পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেছে—সাদা-কালোর পার্থক্য কাহারো মনে নাই। জাতি-বিজাতীয়ে যে সৌহৃদ্য এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

দিনের বেলায় কুচকাওয়াজে সকলে মাতিয়া থাকে, তার পর দিনের শেষে বিশ্রাম। তখন ছাউনিতে-ছাউনিতে নাচের আসর বসে। মেয়েদের নাচ নয়,—নাচে তরুণ নিউবিয়ানের দল। নাচের সঙ্গে বাজনা চলে। গীটার বাজে, বাঁশের বাঁশী বাজে, ঢোল বাজে। কেরোসিনের অস্পষ্ট আলোয় সে বাজনায় তন্দ্রালুতা জাগে। সাধারণ নৃত্যশালায় হয় নিউবিয়ান নর্ত্তকীদের নাচ—নাচের সঙ্গে গান হয়। বিদেশী সেনারা সে-গানের মানে বোঝে না,—নানা ছাঁদের নাচের ভঙ্গীতে অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দর্শক সেনারা ইচ্ছা করিলে নর্ত্তকীদের সঙ্গে

নাচের আসরে প্রজাপতি !

সে-নাচে যোগ দিতে পারে। নৃত্যাগারে সুরাপানের ব্যবস্থা আছে। সুরা বিক্রয় করে তরুণী নর্ত্তকীরা।

নৈশ ক্লাবে ইংরেজী-জানা নর্ত্তকীর অভাব নাই—সেখানেও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। এখানকার নর্ত্তকীরা জাতে লেভান্‌টাইন্‌।

মিশরের নারী-সমাজ এত দিন অবরোধের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল—আজ আর সে নিগড় নাই। হারেমের চিহ্ন আজ মিশরে নাই। পুরুষের বহু-বিবাহ প্রথা লোপ পাইয়াছে। মিশরে নারীরা ভোটের অধিকার আজো পায় নাই—না পাইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ পদের অধিকারে তাঁরা বঞ্চিত নন্। তবে বিবাহই মিশরী নারীর জীবনের লক্ষ্য।

মিশরী-কুমারীরা অজানা পুরুষের সঙ্গে এখনো মেলামেশা করেন না। সে বিধি এখানে অজ্ঞাত। তবে বিবাহ হইলে বাহিরের পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় বা বন্ধুত্বে বাধা নাই। কায়রোর যে সব ইংরেজের

ইংরেজ ফৌজের ক্রিকেট খেলা

বাস, সে-সব ইংরেজের ঘরের মেয়েরা আচারে-ব্যবহারে মিশরী নারীর মত—বাহিরের অজানা পুরুষের সঙ্গে তাঁরাও মেলামেশা করেন না।

মিশরের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা আজ য়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে। তার ফলে মডার্ণ গার্ল নাই, এমন নয়! তারা আজ বিদেশী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিতেছে। সে মেলামেশা দেখিয়া মিশরের সিরিয়ান্ মেয়েরা বলেন—যারা ছিল বনের ফুল, বিজনে ফুটিত,—তারা আজ সকলের বুকে উঠিতেছে! ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে মেয়েরা প্রজাপতি বনিয়া নানা ফুলের পাপড়িতে আশ্রয় লইতেছে।

মিশরের ওয়াই, এম, সি, এ বিদেশী সেনাদের নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য মিশরী কিশোরীদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ করিয়া দিতেছে। ওয়াই, এম, সি, এ বলে,—আত্মীয়-বন্ধু ছাড়িয়া উহারা আসিয়াছে সুদূর মরুর দেশে—মেয়েদের সঙ্গ-সাহচর্য্য না পাইলে তারা কি করিয়া বাঁচিবে! তাই সেনাদের নারী-সাহচর্য্য-সুখের ব্যবস্থা-কল্পে গ্রেশহাম্ কোর্টের চা-বাগানে ওয়াই, এম, সি, এ সপ্তাহে দু' দিন করিয়া নাচের আসরের ব্যবস্থা করিয়াছে। সে আসরে সেনারা মেয়েদের সঙ্গে অবাধে নাচিতে পায়, আলাপ করিতে পায়। এ সব মেয়েদের আনা হয় ভদ্র ও পদস্থ গৃহ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া। বহু প্রৌঢ়াও এ আসরে আসেন। তাঁরা আসেন কনিষ্ঠা ভগ্নী বা কন্যাদের পাহারাদারী করিতে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেনাদের আলাপ জমে এই প্রৌঢ়াদের সঙ্গে। বহু প্রৌঢ়া এই সব সেনাকে স্বগৃহে চায়ের ও লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেন।

উটের পিঠে নার্শ—গী

বালির বুকে প্লেনের বন্ধু

শুধু নাচের আসরে সেনাদের আসরের ব্যবস্থা করিয়াই ওয়াই, এম, সি, এ কর্ত্তব্য শেষ করে নাই। সেনাদের লইয়া সদস্যেরা ঐতিহাসিক কীর্ত্তি প্রভৃতি দেখাইতে যান। শত্রুর বোমার ভয়ে মিশরের মিউজিয়ামের সব-কিছু দর্শনীয় সামগ্রী মাটীর নীচে সতর্ক ভাবে সংরক্ষিত আছে—তাহা দেখিবার উপায় নাই। সেগুলি ছাড়া কায়রোয় বা আলেকজান্দ্রিয়ার বা কাছাকাছি যাহা-কিছু দ্রষ্টব্য আছে, সেনাদলকে সে সব দেখাইতে ওয়াই, এম, সি, এর আগ্রহ অপরিসীম। গীর্জার পিরামিড, সাক্কারার পিরামিড, ঐবং স্তূপ; কায়রোর প্রসিদ্ধ মসজেদ; পিশিড়ল এল আহমদের মুশলিম বিশ্ববিদ্যালয়—এ-সব দেখিতে সেনাদের আগ্রহও সীমাহীন।
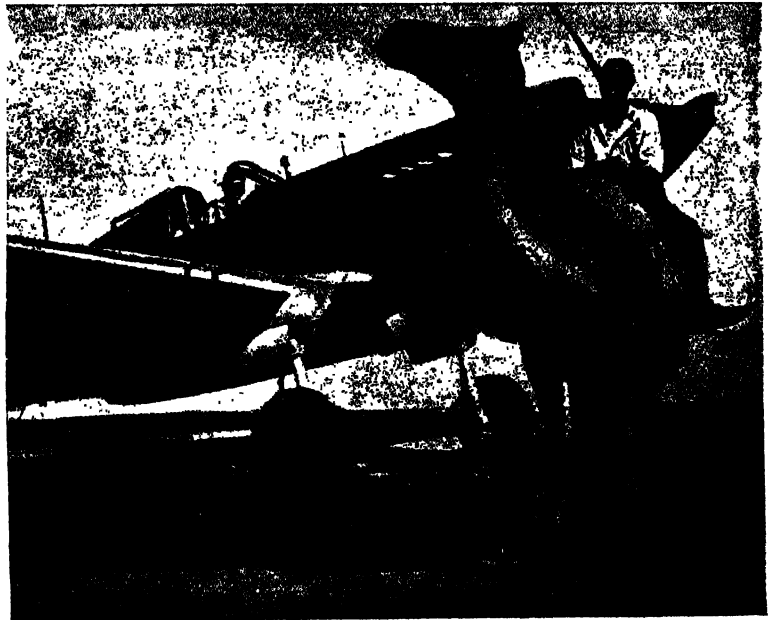
মিশরের এই সব ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কাহিনী পৃথিবীর বুকে অমর হইয়া আছে।

নৈশ ক্লাবের নৃত্য-রঙ্গিণী

ইংরেজ সেনার সঙ্গিনী—লেভান্টাইন-কিশোরী

মরু-পথে ট্রাক্ চলে

ছাউনিতে অন্ন তৈরী

মশা-মাছি বধ-পর্ব্ব

পাহাড়ের উপর বিরাট্ তুলুন মসজেদ—বিদেশী সেনাদের কাছে তীর্থের মত সমাদর লাভ করিয়াছে। অবসর পাইলেই বহু সেনা গিয়া পাহাড়ে চড়ে। মসজেদটি দুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। মহম্মদ আলি এটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অসংখ্য চূড়ার সমাবেশে মসজেদটির শোভা পরম রমণীয়। সেনাদের সঙ্গে নানা দেশ হইতে নানা জাতের মেয়ে আসিয়াছেন সেবা-ব্রত লইয়া।

আমেরিকান বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিমান-বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব নেতা জেনারেল জর্জ ব্রেট। মার্কিন রণতরী-বিভাগ হইতে আসিয়াছেন ক্যাপটেন জেমস্ রুজভেল্ট এখানকার নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া।

মিশরীরা সাধারণতঃ গৃহকোটর ছাড়িয়া বাহির হইতে চায় না। বিদেশ ও বিদেশীদের সঙ্গে মিশরীরা বড় একটা সম্পর্কও রাখে না। কিন্তু আজ বহু বিদেশী মিশরে আসিয়াছে; এবং মিশরীরা এ-সব 'পরকে' বেশ সহজে 'আপন' করিয়া লইয়াছে।

বিদেশীর বিপুল ভিড়ে মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে। মিশরী তুলার বাজার আজ একেবারে আগুন! মিত্র-শক্তির ফৌজের জন্যই সব তুলা বিক্রয় হইতেছে। মিশরী দর্জীর দল অহোরাত্র উর্দ্দী-পোষাক তৈয়ারী করিতেছে; তাদের ব্যবসাও বেশ সম্পন্ন হইয়াছে। মিশরে অপর ব্যবসা-বাণিজ্য চলে ফিরিওয়ালাদের মারফৎ। সে ব্যবসায়ের প্রসারও আজ অপরিসীম।

সামরিক অফিসারদের মধ্যে অনেকে মিশরী ও আরবী ভাষা শিখিতেছেন। অনেকে অবসর যাপন করিতেছেন মিশরের লাইব্রেরীতে এবং বইয়ের দোকানে।

গোল বাধিয়াছে শুধু খাদ্য লইয়া। যে-খাদ্য মিশরে জন্মায়, মিশরীদের তাহাতে কোনো মতে দিন চলিত। এখন এই বিপুল লোক-সমাগমের জন্য খাদ্যে টান পড়িয়াছে। সে জন্য অনেকে তুলার চাষ ছাড়িয়া গম ও ধানের চাষে মন দিয়াছে! সকল খাদ্য-

চিত্র-করা প্লেনের মুখ

সামগ্রীতেই টান পড়িয়াছে। খাদ্যের মূল্য বাড়িয়াছে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় এখনো মেলে নাই। মিশরে বহু যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সব যুদ্ধের স্মৃতি মিশরের মাটীর বুক হইতে আজো মিলায় নাই। আজ মিশর যুদ্ধ করে নাই। যুদ্ধ সে চায় নাই! আজিকার এ মহাযুদ্ধের গর্জ্জন-হুঙ্কারে মিশরের আকাশ প্রকম্পিত!
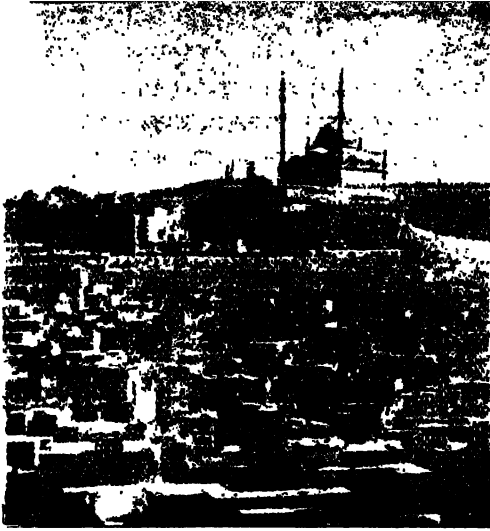
তুলুন মসজেদ—কায়রো

ফৌজের ট্রাক্

চায়ের পার্টিতে সকল জাতির মেলা

মিশরে এই যে আজ বহু জাতি আসিয়া সমবেত হইয়াছে হিটলারকে দমিত করিবার জন্য, সে আশা সার্থক করিতে না পারিলে য়ুরোপ-আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া মহা বিপন্ন হইবে! বৃটেনের কাছে আজিকার এ বিপদ ডোভারে যেমন দারুণ বিভীষিকাময়, মিশরের মরু-প্রান্তরেও ঠিক তেমনি। কাজেই শান্ত অতীত-স্মৃতিস্বপ্নে বিভোর মিশরকে আজ রণোন্মাদনায় জাগ্রত হইতে হইয়াছে।

নেলশন এক দিন এই নীল নদের বুকেই নেপোলিয়নের দুর্দ্ধর্ষ নৌ-শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বৃটেনকে এই মিশরের বিজয়ী করিয়াছিলেন, তেমনি হিট্লার এবং মুশোলিনিকে পরাভূত করিয়া আজো এই মিশরেই বিজয়-গৌরব লাভ হইবে, এ আশা বৃটেনের মনে অনুক্ষণ জাগিয়া আছে!

সুখী কে?

হৃদয়েতে যার শান্তি বিরাজে
সেই ত প্রকৃত সুখী,
পরহিংসায় মন জ্বলে যার—
তার সম নাহি দুখী।

সংসারে থেকে সংসার ছেড়ে
দূরে থাকে যার মন,
নাহি বন্ধন, সকলি আপন
লভে সে পরম-ধন।

শ্রীযামিনীমোহন কর।

মুদ্রা-বিভ্রাট ও বাঙ্গালার মূল্য-সঙ্কট

অর্থই অনর্থের মূল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ গত তিন বৎসর কৃষিজ, বনজ, খনিজ এবং শিল্পজ বহুবিধ উপাদান উপকরণ সরবরাহ করিয়া প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে। এই অর্থই অধুনা ভারতবাসীর অনর্থের নিমিত্ত হইয়াছে; এবং সুদূর ভবিষ্যতে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধেও ভারতবর্ষ প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে অর্জ্জিত অর্থসমষ্টি তদপেক্ষা বহু গুণে অধিক। তথাপি, এই অর্থের অত্যধিক প্রাচুর্য্যে হতভাগ্য ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা কিছুমাত্র প্রশমিত হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহার অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষা-সমস্যাকে অধিকতর প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে।

অর্থের প্রবল প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও তাম্র হইতে রৌপ্য পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ধাতব মুদ্রার যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানের সহিত, নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে, এবং দেশে খাদ্য ও ইন্ধন দ্রব্যাদির, এখনও অনটন না ঘটিলেও, উভয়ের মূল্য অপরিসীম বৃদ্ধি পাইয়া পরিমিত আয়বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের অশন-বসনের রূঢ় অভাব নিদারুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। অন্ন-বস্ত্রের মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বাজারে চল্‌তি চাকতির অর্থাৎ প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের সর্ব্ববিধ ধাতব সংস্করণের প্রবল দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে।

কেন এমন ঘটিল, তাহারই নিদান ও কারণ অনুসন্ধান-অনুশীলন পূর্ব্বক প্রতিকারের পন্থা-নির্দ্দেশ উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিপদের ন্যায় বিপ্লবও একাকী আসে না। একত্রে অথবা উপর্য্যুপরি বহু ভাবে উপস্থিত হয়। যুদ্ধে রাষ্ট্রভঙ্গ। রাষ্ট্রভঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব। রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে। আমরা এই প্রবন্ধে শুধু অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের আলোচনা করিতেছি। অধুনা দেশব্যাপী যে মুদ্রাবিভ্রাট ও খাদ্যসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এই অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের ফল।

যুদ্ধ-পরিচালনা প্রচুর ধনবল ও জনবলের উপর নির্ভর করে। ধনবলই মুখ্য। ধনবল ব্যতীত সৈন্য-সামন্ত, রসদ, পোষাক, সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, কামান-বিমান, পোত-ট্যাঙ্ক, যান-বাহন প্রভৃতির যথার্থরূপ সরবরাহ সম্ভব নহে। শান্তিকালে যে স্থায়ী সৈন্য-বাহিনী, নৌ-বহর ও বিমান-বহর পর্য্যাপ্ত, যুদ্ধকালে যুদ্ধের প্রবর্দ্ধমান ব্যাপ্তি ও তীব্রতার সহিত তাহাকে বহুল পরিমাণে প্রবৃদ্ধ করিতে হয়। শান্তিকালে এই অতিরিক্ত ফৌজ কৃষি-শিল্প ও নানাবিধ বৃত্তি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে এবং তাহারা নিজেদের ভরণ-পোষণ নিজেরাই করে। সরকারী ফৌজে ভর্ত্তি হইলে তাহাদের অশন-বসনের ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হয়। স্বাধীন ভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের সময় তাহাদের যেরূপ আহার ও পরিচ্ছদে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেই যথেষ্ট হয় না,—উন্নতিবিধান করিতে হয়; সুতরাং তদপেক্ষা পুষ্টিকর আহার্য্য ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের প্রয়োজন। সে ব্যয় শান্তিকালের তুলনায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সামরিক কার্য্যে সমর্থ যুবকগণকে নিযুক্ত করা হয়। তজ্জন্য গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী রসদের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, উৎকৃষ্ট কর্ম্মীদিগকে কৃষি-শিল্প ও বৃত্তি-ব্যবসায় হইতে অপসৃত করিবার ফলে ঐ সকল ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে, উন্নতি ব্যাহত হয়।

আধুনিক যুদ্ধ,—যন্ত্রের লড়াই। বিজ্ঞান-বুদ্ধির সহিত বিজ্ঞান-বুদ্ধির সংঘর্ষ। কল-কৌশল ও উপায়-উপকরণের সহিত কল-কৌশল ও উপায়-উপকরণের প্রবল প্রতিযোগিতা। আধুনিক যুদ্ধে সীমান্তে রণাঙ্গণে যেমন সৈন্য-সামন্তের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রয়োজন, দেশাভ্যন্তরে কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-প্রাঙ্গণে, বিজ্ঞানাগারে এবং সর্ব্বপ্রকার কল-কারখানায় তদ্রূপ উদ্ভাবন ও উৎপাদন-শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে, অপরিত্যাজ্য ব্যতীত, অধিকাংশ শক্ত-সমর্থ ব্যক্তির সামরিক কার্য্যে নিয়োগের ফলে, তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, শিক্ষিত ও পটুর পরিবর্ত্তে অধিকতর অশিক্ষিত ও অপটু লোককে নিযুক্ত করিতে হয়! শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধের প্রয়োজনে কৃষি-শিল্পে, বিজ্ঞানাগারে ও কল-কারখানায় অধিকতর দ্রব্য-সামগ্রীর ত্বরিত উৎপাদনার্থ, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বিপুল বিস্তৃতির সহিত বহুল পরিমাণে অধিকতর কৃষক, শিল্পী, কারিগর, শ্রমিক, সরবরাহকারী, বাহক ও বাহন নিযুক্ত করিতে হয়। আধুনিক যুদ্ধে গুরু ও বৃহৎ হইতে, লঘু ও ক্ষুদ্রতম চল্লিশ হাজার প্রকার দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োজন হয়। এই সকল সামগ্রীর ত্বরিত উৎপাদন ও যথাসময়ে যথানিয়মে যোগান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অন্যূন চল্লিশ লক্ষ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রয়োজন। প্রত্যক্ষে হউক, অথবা পরোক্ষে হউক, এই সমস্ত লোকের সর্ব্ব-প্রকার পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক এবং এই সমুদায় কর্ম্মক্ষেত্রের উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের চলাচল-ব্যয় সরকারকে বহন করিতে হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ ঘটনাচক্রে অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিনষ্ট হয়। সুতরাং উৎপাদন, প্রয়োজন অপেক্ষাও অতিরিক্ত মাত্রায় করিতে হয়। যুদ্ধের স্থায়িত্ব কালের দৈর্ঘ্য; এবং দ্রুত, অথবা বিলম্বিত, বিস্তৃতির সহিত সরকারের ব্যয় বিপুল হইতে বিপুলতর হয়। এই নিমিত্ত যুদ্ধে লিপ্ত জাতিমাত্রেরই যুদ্ধব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধোপকরণ ব্যতীত, যোদ্ধৃবর্গের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ হেতু বহু সুযোগ্য চিকিৎসকের ও ঔষধের প্রয়োজন। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিবর্গের সুচিকিৎসার নিমিত্ত উপযুক্ত চিকিৎসালয়, ঔষধাদি এবং সেবক ও শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন হয়। হত ব্যক্তিবর্গের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। সুতরাং যুদ্ধার্থে যে কিরূপ বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত, সামরিক উপকরণ, রসদ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির নিয়মিত উৎপাদন, যোগান ও হিসাব-নিকাশ হেতু, বহু অ-সামরিক কেরাণী ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। যুদ্ধ শেষ হইলেও এই সকল দপ্তরের লোককে বহু দিন পোষণ করিতে হয়। সুতরাং যুদ্ধের নিমিত্ত প্রত্যেক যুদ্ধমান্ জাতিকে জলস্রোতের ন্যায় রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

যুদ্ধে লিপ্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা

এখনও প্রতিকূল নহে। সম্প্রতি ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে শত্রু হানা দিয়াছে এবং পূর্ব্ব-উপকূল ভাগে বিমান-আক্রমণ চালাইতেছে। ফলে, ভারতের সামরিক ব্যয় প্রতিদিন ক্রোর টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। উপাদান উপকরণ সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত অর্থ-সামর্থ্যে দীন দরিদ্র। ভারতের ব্যয় গত তিন বৎসরে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ভারত সরকারের আয়-ব্যয় হিসাবের আলোচনা করিলে প্রকট হইবে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সূচনা ১৯৩৯-৪০ আর্থিক বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে। যুদ্ধ বাধিবে না এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ বৎসরের আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল। যুদ্ধের নিমিত্ত, সংরক্ষণ বিভাগে ত্রিবিধ বাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং পোত-বিমান প্রভৃতির সংস্কার ও নববিস্তার আরব্ধ হয় নাই। সুতরাং ঐ বৎসরের বাজেট্ যুদ্ধব্যয়-বিমুক্ত ছিল। তথাপি, ৮২'১৫ কোটী টাকা আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আনুমানিক অঙ্ক ছিল ৮২'৬৫ কোটী; অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি। এই ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত দরিদ্র ভারতবাসীর করভার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত তিন বৎসরের অনুপাতে কর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ভারতের প্রথম যুদ্ধ-বাজেট্ ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এই বৎসর ভারতের সংরক্ষণ-ব্যয় ছিল ৭৩'৩১ কোটী টাকা। তন্মধ্যে ৩৬'৭৭ কোটী টাকা ছিল স্বাভাবিক বাৎসরিক ব্যয়, এবং বক্রী টাকা অতিরিক্ত ব্যয়। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে সংরক্ষণ-ব্যয় প্রথমে নির্দ্ধারিত হয় ৮৪'১৩ কোটী। এই অঙ্কে অতিরিক্ত যুদ্ধ-ব্যয় ছিল ৩৫'৬০ কোটী। বর্ষশেষে যথার্থ ব্যয় হইয়াছিল আরও অধিক—৫৩'০৩ কোটী। স্বাভাবিক বাৎসরিক ও অতিরিক্ত, উভয়বিধ ব্যয়ের পরিমাণ ঐ বৎসরের শেষে দাঁড়াইয়াছিল ১০২'৪৫ কোটী টাকা। এতদ্ব্যতীত, ব্রিটিশ সরকারের দেয় অংশ ছিল, ২০০ ক্রোটী টাকা। সুতরাং ভারতের হিসাবে মোট যুদ্ধ-ব্যয়ের মাত্রা ছিল প্রায় ৩০০ কোটী টাকা। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ-বাজেটের মোট অঙ্ক ৫৩৩ কোটী টাকা। তন্মধ্যে ভারতের অংশ ১৩৩ কোটী এবং বৃটিশ সরকারের দেয় অংশ ৪০০ কোটী। এই স্থানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের সংরক্ষণ হিসাবে যে সামরিক ব্যয়, তাহার অধিকাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার নিমিত্ত, সুতরাং বৃটিশ সরকার তাহার প্রকৃষ্ট অংশ বহন করেন। এইরূপে বৃটিশ সরকার গত তিন বৎসরে, ভারতের সংরক্ষণ হিসাবে ৬৬০ কোটী টাকার দায় গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, যুদ্ধ-পূর্ব্ব সামরিক বাজেটের তুলনায় ভারতের নিজস্ব সংরক্ষণ ব্যয় ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪২-৪৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ১৫০ কোটী টাকা। নিত্য নূতন কর ধার্য্য করিয়া এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইতেছে। অবশ্য নূতন নূতন আয়ের পন্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোটের উপর গত তিন বৎসরে ঘাটতির অঙ্ক অনুমিত হইয়াছিল, ৪১'৮৭ কোটী। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট্-অধিবেশনে গত কয়েক বৎসরের যুদ্ধের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব পাওয়া যাইবে।

বাজেটে ঘাটতি এবং প্রতি বৎসর যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধি। অথচ আমরা বলিয়াছি, ভারতের প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যথার্থ তাহা নহে। যুদ্ধের ব্যয় সরকারের, অর্থাৎ সরকারী তহবিল হইতে নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু যুদ্ধ-নিমিত্ত আয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। যুদ্ধের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশের কিয়দংশ লোকের বহু অর্থ প্রাপ্তি ঘটে। এই নিমিত্ত যুদ্ধের ক্রম-বর্দ্ধমান ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সরকার শ্রেণীবিশেষের অথবা দেশবাসীর উপর নূতন অথবা অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেন, এবং প্রয়োজন মত ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু, কেবল কর বৃদ্ধি ও ঋণ বৃদ্ধি করিলেই যুদ্ধ-পরিচালনা সম্ভব হয় না। যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধির সহিত অর্থ বৃদ্ধি করিতে হয়। অর্থাৎ, নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিতে হয়।

শান্তিকালে যে পরিমিত অর্থে সর্ব্বলোকের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধিত হয়, যুদ্ধকালে যুদ্ধ-প্রয়োজনে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সকলেই জানেন, যেখানে বহু অর্থের আদান-প্রদান করিতে হয়, সেখানে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার সহ-ও সুবিধাজনক হয় না। এই নিমিত্তই কাগজের ভাক্ত মুদ্রা অর্থাৎ নোটের বহুল প্রচার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাগজের নোটের কোন বাস্তব মূল্য নাই। এই হেতু ইহার পশ্চাতে রাখিতে হয়, ইহার মূল্য পরিমাণের উপযুক্ত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং প্রয়োজন-সঙ্গত স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা। স্বর্ণ-রৌপ্য মূল্য, ধাতবমান দৃঢ়তা হেতু, সর্ব্বদেশের মুদ্রাপ্রকরণের যোগ-সূত্র। স্বর্ণ-মান ও স্বর্ণ-বিনিময়-মান হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদের রৌপ্যমুদ্রা এখন যুক্তরাজ্যের ষ্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত। এই নিমিত্ত, আমাদের কাগজের নোটের পৃষ্ঠ-শক্তি ষ্টার্লিং এবং রৌপ্য মুদ্রা। বলা বাহুল্য, ষ্টার্লিং এখন মার্কিণ ডলারের সহিত দৃঢ় সংযুক্ত।

যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের কারেন্সি নোটের সমষ্টি ছিল ১৮২ কোটী টাকা। তদবধি এই নোটের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। নিম্নের তালিকা হইতে এই সমষ্টির দ্রুত স্ফীতি বোধগম্য হইবে।

১৯৩৯ (সেপ্টেম্বর)	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩ (জানুয়ারী)
	(ক্রোর টাকা)		
১৮২	২১৬	৪১১	৫৯০

বর্ত্তমান সমষ্টির বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গত ১৫ই জানুয়ারীর অঙ্ক এইরূপ,—

ঋণরাশি (ক্রোর টাকা)		ধনরাশি (ক্রোর টাকা)	
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১২'২১	স্বর্ণমুদ্রা ও বাট	৪৪'৪১
বাজারে চলতি	৫৮৯'৪৪	ষ্টার্লিং সংস্থিতি	৩৫০'৮৩
	৬০১'৬৫	মোট	৩৯৫'২৪
		রৌপ্যমুদ্রা (টাকা)	১২'০৫
		টাকার খত	১৯৪'৩৫
		মোট	২০৬'৪০
		পূর্ণ সমষ্টি	৬০১'৬৪

মোট ধনরাশির সহিত ঋণরাশির অনুপাত ৬৫'৬৯৩%

এখন এইখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। কাগজের টাকা যেরূপ বৃদ্ধি করা যায়, ধাতব মুদ্রা সেরূপ সহজে বৃদ্ধি করা যায় না।

যুদ্ধ এবং অন্যান্যরূপ ব্যাবহারিক প্রয়োজনে কয়েকটি অত্যাবশ্যক ধাতুর নিত্য প্রয়োজন। এই সকল ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার যথেচ্ছ বৃদ্ধি সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত সরকার যুদ্ধ-হেতু প্রয়োজনীয় নহে, এমন ধাতুর দ্বারা ছোট ছোট মুদ্রা অর্থাৎ রেজকী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। টাকশালের টাকা এবং রেজকী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার একটি সীমা আছে। গত তিন বৎসরে কারেন্সি নোটের যেরূপ স্ফীতি ঘটিয়াছে, তাহার সমনুপাতে ধাতু-মুদ্রা তৈয়ারী করা সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে, ইতিমধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ম্মা-প্রত্যাগত লোক এবং শ্বেত, পীত সৈনিক ও বন্দী প্রভৃতির অস্বাভাবিক স্ফীতি সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমানে বহু কোটী জনসংখ্যার নিমিত্ত বহু গুণে স্ফীত কাগজের টাকা পর্য্যাপ্ত; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা-সমষ্টি পর্য্যাপ্ত নহে। কাগজের মুদ্রার তুলনায় রৌপ্য মুদ্রার এবং রৌপ্য টাকার তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত আছে। মোট সমষ্টি ১০ কোটী টাকা মাত্র।

যুদ্ধ-পূর্ব্বে ১৯৩৮-৩৯ আর্থিক বৎসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল ১৮ লক্ষ টাকার। পরবর্ত্তী বৎসরে (১৯৩৯-৪০) ঐরূপ নূতন মুদ্রার পরিমাণ হইয়াছিল ২'১৯ কোটী টাকা। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে এই অঙ্ক উন্নীত হইয়াছিল ৪'২৬ কোটী টাকাতে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আধুলি ব্যতীত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার বৃদ্ধি হইয়াছিল প্রায় ৮ কোটী টাকা। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার বৃদ্ধির পরিমাণ ৩ কোটী। এইরূপ বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেজকীর অভাব ঘটিয়াছে নিদারুণ। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অত্যন্ত কম।

বিগত মহাযুদ্ধের পাঁচ বৎসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার প্রচলন ছিল মাত্র ৫ কোটী টাকা। তখন কিন্তু রেজকী ও পয়সার এরূপ অভাব অনুভূত হয় নাই। আর বর্ত্তমান যুদ্ধকালে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার পরিমাণ ১০ কোটী টাকার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি অভাবের অন্ত নাই। ইহার কারণ কি? বিগত মহাযুদ্ধের সময় বহু সাবধানী লোক স্বর্ণ, রৌপ্য এবং রূপার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রেজকী-পয়সার কোন গুপ্ত সঞ্চয় ঘটে নাই। সে বারে ভারতে এরূপ লোকবৃদ্ধি ও যুদ্ধ-শিল্পের প্রসার ঘটে নাই। সে বারে যুদ্ধ-প্রয়োজনে বিভিন্ন ধাতুরও এরূপ তীব্র ও তীক্ষ্ণ অভাব ঘটে নাই। প্রকাশ যে, এ বারে একমাত্র তামার পয়সাই উধাও হইয়াছে অনূন ১৩ লক্ষ টাকার। এতদ্ব্যতীত, নিকেলের একানি-দুয়ানিও আত্মগোপন করিয়াছে বহুল পরিমাণে।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আধুলি ছিল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুদ্রা-পর্য্যায়ের বহির্ভূত। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুদ্রার সাম্প্রতিক অঙ্ক হইতে আমরা যদি আধুলির সংখ্যা বাদ দিই, তাহা হইলে ১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের ২'১ ও ৪'২ কোটী হইতে প্রচলিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়ায় ১'৬ ও ২'৭ কোটীতে। বিগত মহাযুদ্ধের বাৎসরিক প্রচলন ১ কোটী এবং ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দের ২'১ কোটীর তুলনায় ইহার পার্থক্য অতি সামান্যই বলিতে হইবে। অথচ জনসংখ্যার হিসাবে প্রয়োজনের মাত্রা বাড়িয়াছে প্রভূত পরিমাণে।

সম্প্রতি কারেন্সি নোটের দ্রুত স্ফীতির সমানুপাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে নাই। সামরিক এবং সাধারণ প্রয়োজনে, কৃষি, শিল্প, বৃত্তি, ব্যবসায় প্রভৃতিতে, বহু গুণে বর্দ্ধিত শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে, প্রভূতরূপে প্রবৃদ্ধ আদান-প্রদান হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার প্রয়োজন হইয়াছে অতিরিক্ত পরিমাণে অধিক। হয় তো বহু অর্থগৃধ্নু লোক অদূর ভবিষ্যতে অতিরিক্ত বাটা লইয়া টাকার ভাঙ্গানী দিবার নিমিত্ত এবং পয়সা গলাইয়া তামা করিয়া, অত্যধিক মূল্যে চোরা বাজারে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত, বহু পরিমাণে পয়সা ও রেজকী গুপ্ত ভাবে সঞ্চিত রাখিয়াছে। অনেক গুপ্ত সঞ্চয় ইতিমধ্যে ধরা পড়িয়াছে; এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া কোন কোন সঞ্চয়কারী শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সরকার সম্প্রতি কম-ওজনের দু-আনি, আনি, আধ-আনি এবং সিকি-আনি, অর্থাৎ পয়সা তৈয়ারী করিতেছেন এবং ইস্তাহার জারি করিয়া কূটচক্রীদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না।

সমস্ত ধাতব মুদ্রার আইনানুমোদিত লৌকিক, অর্থাৎ বাজার-মূল্য অপেক্ষা তাহার বাস্তব ধাতু-মূল্য অনেক কম। টাকশালের মুদ্রা-প্রকরণ-প্রস্তুত শক্তিকেও প্রবৃদ্ধ করিয়া অধিকতর সামর্থ্যশীল করা হইতেছে। ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারবারী বিভাগের জানুয়ারী মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের এবং পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ প্রথম সপ্তাহের মজুত নোট, টাকা ও রেজকীর অঙ্কসমষ্টি হইতে উহাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতির মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে।

	সপ্তাহ ১৫-১-৪৩	সপ্তাহ ৮-১-৪৩	সপ্তাহ ১৬-১-৪২
নোট	১২'২১ ক্রোর টাকা	১২'২১ ক্রোর টাকা	১১'৭৬ ক্রোর টাকা
রূপার টাকা	১১'১৮ লক্ষ "	১১'৪০ লক্ষ "	১০'৯২ লক্ষ "
রেজকী	১'৪৯ " "	১'৮৪ " "	৪'৪৭ " "

দ্রুতবেগে অধিকতর উৎপাদন ব্যতীত রেজকী-পয়সা সমস্যার সমাধান হইবে না।

এইবার আমরা অতিরিক্ত অর্থ-প্রচলনপ্রসূত খাদ্য-সমস্যার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যুদ্ধ প্রয়োজনে বাহিনী বৃদ্ধির সহিত সৈনিক বিভাগের জন্য রসদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে ভারতে অতিরিক্ত জন-সংখ্যার অনুপাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। বর্ম্মা হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে ২৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী হইত, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। অধিকন্তু, বর্ত্তমান বর্ষে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে আমাদের বহুবিধ ফসলের প্রভূত ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং সামরিক প্রয়োজন বৃদ্ধির সহিত সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনোপযোগী খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা ঘটিয়াছে। যেমন খাদ্যবিষয়ে, তেমনি অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতেও স্বল্পতা ঘটিতেছে। কারণ, যুদ্ধোপকরণ-উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সর্ব্বসাধারণ-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। এ দেশে জনসাধারণের অর্থ-বৃদ্ধির সহিত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে; ফলে ক্ষয়িষ্ণু অল্পপরিমিত দ্রব্য-সম্ভারের নিমিত্ত, বহু পরিমিত বর্দ্ধিষ্ণু অর্থ উপস্থিত হওয়াতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। মুদ্রা বৃদ্ধি হইলেই মূল্য বৃদ্ধি পায়। তাহার কারণ, মুদ্রা সুলভ হইলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়। আবার মুদ্রা দুর্লভ হইলে মুদ্রার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজন, অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক সামঞ্জস্য

ও বিপর্য্যয়হেতু সমস্ত বস্তুরই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অধুনা, ক্ষয়িষ্ণু ও স্বল্প-পরিমিত দ্রব্যের নিমিত্ত বহু-পরিমিত বর্দ্ধিষ্ণু অর্থের আতিশয্য হেতু দ্রব্যমূল্য যথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, বিত্তশালী ব্যক্তি অল্পমাত্র দ্রব্যাদি অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছেন, এবং স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্রের অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। উপযুক্ত অর্থের অনটনে এবং খাদ্যাভাবে ও বস্ত্রাভাবে স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের দুঃখ-ক্লেশ চরমে পৌঁছিয়াছে

ইহার একমাত্র প্রতিকার,—মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও প্রাপ্তব্য ও প্রাপনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও বিচারসঙ্গত বণ্টন। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক অবস্থা ও ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশে দ্রব্যমূল্যনিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যাদির ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, অতিশয় আয়াসসাধ্য সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক বিধিব্যবস্থা কোন পক্ষেই অনুকূল হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসন ও অনুশাসন ব্যতীত এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। বিধিবদ্ধ বণ্টন ব্যতীত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। ন্যায্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তব্য ও প্রাপনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণ অবধারণ প্রথম প্রয়োজন।

কোন কোন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সর্ব্বাগ্রে মজুত মালের হিসাব না লইয়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিয়া, অধিকতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন। রাতারাতি মজুত মাল, বিভিন্ন দোকান ও আড়ৎ হইতে অপসৃত হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। জনসাধারণের অত্যধিক ক্লেশের ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন এবং সরকারও এ কথার অনুমোদন করিতেছেন যে, এখনও দ্রব্যাদির যথার্থ অভাব অনটন ঘটে নাই। ইহা সত্য কি না, সে বিচারের স্থান এ প্রবন্ধে নাই। যাহা হউক, ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের বিধিসঙ্গত ব্যবস্থার অভাবে, কোথাও প্রাচুর্য্য কোথাও বা নিদারুণ অভাব ঘটিয়াছে। মাল-চলাচলের সুগমতার অভাবেও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ও অসমীচীন অবস্থা ঘটিয়াছে। সাময়িক প্রয়োজনে নানা স্থানে মাল-চলাচলের সুগমতা ব্যাহত হইয়াছে। সরকার জনসাধারণের খাদ্য ও বস্ত্রাভাব বিদূরিত করিবার নিমিত্ত নানা পরিকল্পনা প্রচার করিতেছেন। যুদ্ধশিল্পে শিল্পী ও শ্রমিক কর্ত্তৃক অর্জ্জিত অতিরিক্ত অর্থকে সংরক্ষণ-ঋণে গচ্ছিত ও সঞ্চিত রাখিয়া, তাহার ক্রয়-শক্তিকে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, নিষ্ক্রিয় রাখিবার প্রচেষ্টাও চলিতেছে।

অর্থের আতিশয্যে যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আলোচনা শেষ করিয়া, এইবার আমরা ইহার একটি প্রকৃষ্ট সুফলের প্রতি মনোযোগ দিব। যুদ্ধোপকরণ যোগা দিয়া, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের মারফতে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতেছে। এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টার্লিং সংস্থিতিতে সঞ্চিত হইতেছে। যুদ্ধারম্ভে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর এই সংস্থিতির পরিমাণ ছিল ১০৩'৯২ কোটী টাকা। তিন বৎসর পরে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথমে এই অঙ্ক ৩১১'৭১ কোটীতে উন্নীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে (১৯৪৩) বর্ষের ১৫ই জানুয়ারী এই সমষ্টি দাঁড়াইয়াছিল ৩৫০'৮৩ কোটীতে; প্রবন্ধ লিখিবার সময় ইহা বর্দ্ধিত হইয়াছে ৩৫৬ কোটীতে। ইতিমধ্যে এই সংস্থিতি হইতে ভারতবর্ষের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধিত হইতেছিল। এই ষ্টার্লিং ঋণের জন্য ভারতবর্ষকে সুদ দিতে হইতে প্রচুর। সুতরাং এই ঋণ হইতে মুক্তি, দরিদ্র ভারতের পক্ষে লাভকর সন্দেহ নাই। ষ্টার্লিং ঋণের পরিবর্ত্তে সরকার এখন ভারতে ঋণ লইতেছেন। যুদ্ধ-পূর্ব্বে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০৯'১০ কোটী টাকা। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিয়াছে এবং রেলওয়ে এন্যুইটি ও রেলওয়ে ডিবেঞ্চারও শোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে ভারতবর্ষ ৩৭০ কোটী টাকার ঋণ হইতে মুক্ত। বর্ত্তমান ষ্টার্লিং সংস্থিতি ৩৫০ কোটীর সহিত উপর্য্যুক্ত ৩৭০ কোটী যোগ দিলে ভারতের ষ্টার্লিং সংস্থিতির পরিমাণ যুদ্ধের ব্যাপক বৎসরে হয় ৭২০ কোটী। ভারতবর্ষ এই ষ্টার্লিং সংস্থিতির অধিকারী হইয়াছিল।

যুদ্ধ যত দিন চলিবে, তত দিন এই ষ্টার্লিং সংস্থিতি বৃদ্ধি পাইবে। ভবিষ্যতে এই সংস্থিতির উদ্বৃত্তের গতি কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া এখন হইতেই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ এইরূপ সংস্থিতি হইতে দেড় কোটী টাকা ব্রিটিশ সরকারকে দান করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে ক্যানাডাও এইরূপ বদান্যতা দেখাইয়াছে। কিন্তু ক্যানাডার সহিত ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার তুলনা হইতে পারে না। আমরা এই সংস্থিতি হইতে রেলওয়ের ন্যায় বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত অন্যান্য সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে উৎসুক। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। এই ষ্টার্লিং সংস্থিতির উদ্বৃত্তির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই এ প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় অর্থই অনর্থের মূল বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতে অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছি।

মোটের উপর গত তিন বৎসরে যুদ্ধব্যয় বৃদ্ধি এবং ভারত সরকারের বাজেটের ঘাটতি সত্ত্বেও ভারতের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য যুদ্ধমান্ দেশ অপেক্ষা অনুকূল। এই নিমিত্তই কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির মূল্য দৃঢ় আছে। অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষা-সমস্যাই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। অধমর্ণ ভারতবর্ষ আজ উত্তমর্ণ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাহার অর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কতটুকু!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রস

১২

সাগরনন্দী 'নাটকলক্ষণ-রত্নকোষে' মূলতঃ ভরত-নাট্যশাস্ত্রেরই অনুসরণে হাস্যরসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অবহিত্থ (১), বিকৃত বেশাদি, বিকৃত অঙ্গ, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, কুহক প্রভৃতি দ্বারা হাস উৎপন্ন হয়। এই হাসই হাস্য-রসের স্থায়ী ভাব। স্বপ্ন-আলস্য-অবহিত্থ-তন্দ্রা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। হাস্য-রসের ছয়টি ভেদ ও ইহাদিগের লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিবরণের অনেকটা অনুরূপ (২)। এমন কি, অনেক স্থলে তিনি নাট্যশাস্ত্রের ভাষা পর্য্যন্ত যথাযথভাবে সমুদ্ধৃত করিয়াছেন।

শিঙ্গভূপাল 'রসার্ণব-সুধাকরে' বলিয়াছেন—স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-দ্বারা সহৃদয় দর্শক-সমাজের আস্বাদনীয় হইলে হাস-স্থায়িভাব হাস্যরসে পরিণত হয়। আলস্য-গ্লানি-নিদ্রা-প্রবোধ হাস্য-রসের উচিত ব্যভিচারী। আত্মস্থিতি ও পরস্থিতি ভেদে হাস্য-রসের দ্বিধা বিভাগ। যখন আত্মগত নানাবিধ বিকার-দর্শনে কোন ব্যক্তি স্বয়ং হাস্য করেন, অর্থাৎ—নিজেকে নিজে উপহাস করেন, তখন হাস্য-রস 'আত্মস্থ'। পরগত বিকার-দর্শনে যখন অপরে হাস্য করে, (অর্থাৎ যখন পরের বিকার দেখিয়া পরকে উপহাস করা হয়।) তখন হাস্য-রস 'পরস্থ' (৩)। শিঙ্গভূপাল হাস্য-রসের যে ছয় প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে একটি ভেদ নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'উপহসিতে'র পরিবর্ত্তে 'অবহসিত' নামে অভিহিত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণেও 'উপহসিত' স্থলে 'অবহসিত' সংজ্ঞা দৃষ্ট হইয়া থাকে—পূর্ব্বসংখ্যায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। রসার্ণব-সুধাকরে হাস্য-রস বর্ণনায় আর কোন বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না।

হাস্য-রসের পরই করুণ-রস। হাস্য-রসের পরই করুণের উল্লেখ কেন, সে প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত একটু বিচারের উত্থাপন করিয়াছেন। কোন এক টীকাকারের (৪) মত উল্লেখ করিয়া অভিনব বলিতেছেন—শৃঙ্গারের দুইটি ভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। তন্মধ্যে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের সহিত হাস্য-রস আর বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সহিত করুণ-রস নিকট সম্বন্ধযুক্ত। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে, সম্ভোগের অঙ্গভূত হাস্য-রস; আর বিপ্রলম্ভ ও করুণের ব্যভিচারিভাব একই বলিয়া বিপ্রলম্ভের অঙ্গস্থানীয় করুণ ইহা বলা চলে (৫)। অভিনবগুপ্ত স্বয়ং অবশ্য ক্রমের এরূপ কারণ স্বীকার করেন নাই। তিনি রস-প্রকরণের প্রথমেই বলিয়াছেন—কাম সকল-জাতি-সুলভ, সকলের অত্যন্ত-পরিচিত ও সকলের নিকট হৃদ্য। এ কারণে শৃঙ্গার-রসই আদিরস। হাস্য তাহার অনুগামী। তাহার পর করুণ; যেহেতু, উহা নিরপেক্ষস্বভাব ও হাস্যের বিপরীত (৬)। অতএব, হাস্যের পরই করুণের স্থান।

ইহার 'করুণ' নামকরণ কেন হইল—তৎসম্বন্ধে শ্রীশঙ্কুকের মত অভিনব উদ্ধৃত করিয়াছেন। হৃদয়গত দয়া করুণা নামে লোকে প্রসিদ্ধ। এই করুণার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আলোচ্য রসটির নাম হইয়াছে 'করুণ'। অভিনেতা যখন কোন চরিত্রের অনুকরণকালে শোক-ভাবের অভিনয় করেন, তখন নানারূপ লিঙ্গ (চিহ্ন) দর্শনে দর্শকগণের অন্তঃকরণে নটে শোকভাবের অস্তিত্ব প্রতীত হইতে থাকে। এইরূপে দর্শকচিত্তে করুণার উদ্রেক হয় বলিয়াই উক্ত রস করুণ নাম ধারণ করিয়াছে। অভিনব শ্রীশঙ্কুকের এই মত খণ্ডন করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীশঙ্কুক পূর্ব্বাপর-ক্রম বিস্মৃত হইয়াছেন; কারণ, যাহা হইতে শোকের উদ্ভব, তাহার প্রতিকারই করুণা, অর্থাৎ—দয়া বা করুণা দুঃখ পরিত্রাণের ইচ্ছা। উহা কখনও শোকের অনুকরণাত্মক হইতে পারে না (৭)।

মহর্ষি বলিয়াছেন—শোক-স্থায়িভাব হইতে করুণ-রসের উৎপত্তি। উহা শাপ-ক্লেশ-গ্রস্ত প্রিয়জনের বিয়োগ-বিভবনাশ-বধ-বন্ধন-বিদ্রব-উপঘাত-ব্যসনসংযোগ প্রভৃতি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয় (৮)।

---

(১) অবহিত্থ—লজ্জা-ভয়াদি হেতু আত্মগোপন।

(২) অনেকটা অনুরূপ হইলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে:—(১) স্মিত—ঈষৎ বিকসিত গণ্ডদেশ; সৌষ্ঠবযুক্ত কটাক্ষ, অলক্ষিত দন্ত, ধীর স্মিত; (২) হসিত—কিঞ্চিৎ লক্ষিত দন্তাগ্র; (৩) বিহসিত—কপোল ও অক্ষি আকুঞ্চিত, কখন স্বনযুক্ত কখন নিঃস্বন, হাস্যকর প্রস্তাব হইতে উৎপন্ন, অনুরাগযুক্ত; (৪) উপহসিত—নাসিকা উৎফুল্ল, দৃষ্টি জিহ্ম, অঙ্গ ও শিখর (মস্তক) নিকুঞ্চিত; (৫) অতিহসিত—অস্থানে (অকারণে—যাহা হাস্যের ক্ষেত্র নহে এরূপ স্থলে) হাস্য, হাসিতে হাসিতে নেত্রে অশ্রুর উদ্গম, হাস্যের বেগে স্কন্ধ ও শিরোদেশ উৎকম্পিত (ইহা নাট্যশাস্ত্রে অপহসিত-লক্ষণের অনুরূপ); (৬) অপহসিত—নেত্র উত্তেজিত ও অশ্রুযুক্ত, স্বর বিক্রুষ্ট (ক্রোধপূর্ণ অথবা কর্কশ) ও উদ্ধত, আর হাস্যবেগ সংবরণ করিতে পার্শ্বদেশ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়।

(৩) অভিনবগুপ্ত যে আত্মস্থ ও পরস্থ বিভাগের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বসংখ্যায় দেখান হইয়াছে।

(৪) ঐ টীকাকারের নাম তিনি দেন নাই।

(৫) "সম্ভোগেন হাস্যোঽঙ্গত্বেনাপেক্ষিতো বিপ্রলম্ভেন চ সমানব্যভিচারিকত্বাৎ করুণ ইতি টীকাকারাঃ";—অভিনবভারতী, নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৩১৮।

(৬) "তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্ব্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্ব্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ। নিরপেক্ষস্বভাবত্বাত্তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬৯।

(৭) "যা দয়া হৃদয়গতা ইতি করুণা লোকে প্রসিদ্ধা সা চ লিঙ্গৈরনুকর্ত্তরি শোকং প্রতিযতাং সামাজিকানামি(মে)তি করুণব্যপদেশ ইতি (ব্যপদেশমিতি) শ্রীশঙ্কুকঃ। এতচ্চ পূর্ব্বাপরবিস্মরণবিজৃম্ভিতমস্য, যতঃ শোকং প্রতিকৃতিস্তস্য করুণা দয়া চ নাম পরিত্রাণেচ্ছা সা কথং শোকানুকরণং, কিং প্রতি চ তেষাং দয়েতি ন বিদ্মঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১৮।

(৮) শাপ—যে সকল হেতুর কোন প্রতিকার সম্ভব হয় না, সেইগুলি বুঝাইতে শাপ দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে (—"অশক্যপ্রতীকারহেতূপলক্ষণং শাপগ্রহণম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১৯); **malediction—Dr. Mukherjee.** মূলে আছে—"শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিপ্রয়োগবিভবনাশবধবন্ধ..." অভিনবের মতে এস্থলে নিম্নরূপ অন্বয় হইবে—শাপ ও ক্লেশে পতিত যে ইষ্টজন তাহার যে বিপ্রয়োগ, বিভবনাশ ইত্যাদি (—"শাপক্লেশে পতিতস্যেষ্টজনস্য যে

অশ্রুপাত - পরিদেবন - মুখশোষণ-বৈবর্ণ্য-স্রস্তগাত্রতা-নিশ্বাস-স্মৃতিলোপ প্রভৃতি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (৯)। ইহার ব্যভিচারিভাব—নির্ব্বেদ, গ্লানি, চিন্তা, ঔৎসুক্য, আবেগ, ভ্রম, মোহ, শ্রম, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ব্যাধি, জড়তা, উন্মাদ, অপস্মার, ত্রাস, আলস্য, মরণ, স্তম্ভ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ (স্বরভঙ্গ) প্রভৃতি (১০)। এই প্রসঙ্গে দুইটি আর্য্যা-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

প্রিয়জনের বধ দর্শনে অথবা প্রিয়জনের বধবার্ত্তা প্রভৃতি অপ্রিয় বচন শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত ভাব-বিশেষ-সমূহ-দ্বারা করুণরস উৎপন্ন হইয়া থাকে (১১)।

সস্বন রোদন, মোহাগম, পরিদেবন, বিলাপ, দেহের আয়াসন ও অভিঘাত দ্বারা করুণ-রস অভিনেয় (১২)।

নাট্যশাস্ত্রের করুণ-রস-প্রকরণ এই স্থলেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে যে—ইষ্টনাশ (১৩) ও অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে করুণ-নামক রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুধীগণ বলেন—ইহার বর্ণ কপোতের ন্যায় ও ইহার অধিপতি দেবতা যম। শোক ইহার স্থায়িভাব। যাহার জন্য শোক করা যায়, সেই শোচ্য ব্যক্তিই ইহার আলম্বন-বিভাব। শোচ্য ব্যক্তির দাহ প্রভৃতি অবস্থা করুণ-রসের উদ্দীপন-বিভাব। ইহার অনুভাব—দৈবনিন্দা, ভূমিতলে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, স্তম্ভ, প্রলাপ প্রভৃতি। আর ব্যভিচারি-ভাব—নির্ব্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি (১৪)।

করুণ বিপ্রলম্ভ হইতে করুণ-রসের ভেদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবেই করা হইয়াছে। দর্পণকার বলিতেছেন—যেহেতু করুণ-রসে শোক স্থায়িভাব, অতএব উহা বিপ্রলম্ভ হইতে পৃথক্;

বিপ্রযোগাদয়ঃ"—অঃ ভাঃ, ৩১১); কিন্তু ডাক্তার সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্যরূপ অন্বয় করিয়াছেন, যথা—শাপ, ক্লেশ, ইষ্টজনের বিনিপাত ইত্যাদি—"malediction, weariness, the downfall of beloved ones, bereavement, loss of wealth" (Dr. Mukherjee). মনে হয়, অভিনবগুপ্তের অন্বয় অধিকতর সঙ্গত। বিদ্রব—দেশাদি হইতে উচ্চাটন; panic—Dr. Mukherjee. উপঘাত—অগ্নি প্রভৃতি হইতে মৃত্যু। অভিনব বলিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা 'বিদ্রব' উপস্থিত হয় ও চৌর প্রভৃতি হইতে আসে 'উপঘাত'; কিন্তু ইহা ঠিক নহে—কারণ, চৌর প্রভৃতি হইতে আগত অনর্থ 'বিভবনাশের'ই অন্তর্ভুক্ত (—"অগ্ন্যাদিকৃতো বিদ্রবঃ, চোরাদিকৃত উপঘাত ইতি ত্বসৎ, বিভবনাশেন গতার্থত্বাৎ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১); injury (Dr Mukherjee). ব্যসন—মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি অনর্থকর ব্যাপার; misfortune (Dr. Mukherjee). ব্যসন—দ্বিবিধ—কামজ ও ক্রোধজ [মনু ৭।৪৭-৪৮; মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ (পরোক্ষে পরের দোষ কথন), স্ত্রীসংসর্গ, মদ, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ—এই দশটি কামজ ব্যসন। পৈশুন্য (অজ্ঞাত দোষাবিষ্কার), সাহস (সাধুগণের নিগ্রহ) দ্রোহ, (ছদ্মভাবে বা কোন ছলে বধ), ঈর্ষা (অন্যের গুণে অসহিষ্ণুতা, পরস্ত্রীকাতরতা) অসূয়া (পরের গুণে দোষাবিষ্করণ), অর্থদূষণ (অর্থ অপহরণ, দেয় অর্থ না দেওয়া), বাক্‌পারুষ্য (তর্জ্জন-গর্জ্জন), দণ্ডপারুষ্য (তাড়ন)—এই আটটি ক্রোধজ ব্যসন।]

এই বিভব নাশ প্রভৃতি উত্তম প্রকৃতির শোক উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কিন্তু মধ্যম ও অধম প্রকৃতির শোক জন্মাইয়া থাকে।

(৯) পরিদেবন—নিজের, দৈবের অথবা অন্যের প্রতি তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ। দৈবনিন্দা বলিয়া যে অনুভাব সাহিত্যদর্পণ-কার পৃথক্ ধরিয়াছেন, অভিনবগুপ্তের মতে তাহা নাট্যশাস্ত্রোক্ত পরিদেবনেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্বাস (নিঃশ্বাস, নিশ্‌শ্বাস)—দীর্ঘনিশ্বাস—যে শ্বাসটি নাসাদ্বার হইতে নির্গত হয় তাহাই নিশ্বাস। 'নিশ্বাস' বলিতে এস্থলে নিশ্বাসের অনন্তর-ভাবী উর্দ্ধশ্বাস বা উচ্ছ্বাসও বুঝিতে হইবে। এই উচ্ছ্বাসই টানিয়া লওয়া হয়। স্মৃতিলোপ—এতৎপ্রসঙ্গে স্তম্ভ ও প্রলয়—এই দুইটি সাত্ত্বিকভাবও গ্রহণীয়—ইহা অভিনবের মত। কিন্তু মূলে স্তম্ভ ব্যভিচারি-ভাবমধ্যে উক্ত হইয়াছে।

(১০) ব্যভিচারি-ভাবগুলির লক্ষণাদি যথাস্থানে সবিস্তরে বর্ণিত হইবে বলিয়া এ প্রসঙ্গে আর পৃথগ্ভাবে কিছু বলা হইল না। স্তম্ভ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ—এগুলিও সাত্ত্বিক-ভাবের অন্তর্গত। স্তম্ভকে অভিনব স্মৃতিলোপের সহিত জুড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। বেপথু সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও স্বরভেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এগুলি বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এগুলি অবশ্য ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি-ভাবের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। বৈবর্ণ্য—ইহা করুণের অনুভাবগুলির মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। আসলে ইহা সাত্ত্বিকভাব মাত্র। মহর্ষি সাত্ত্বিকভাবগুলির পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া কোন কোনটিকে অনুভাব-মধ্যে আর কোন কোনটিকে ব্যভিচারি-ভাব-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। অভিনবের মতে—বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ প্রভৃতিকে ব্যভিচারি-রূপেই গণ্য করিয়া অভিনয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে। অতএব, উহাদিগের পুনরুক্তি দোষের হয় নাই (—"এতে হ্যশ্রুপ্রভৃতয়ো ব্যভিচারিত্বাভিনেয়ত্বোপজীবনায়ৈব মধ্যে নির্দ্দিষ্টা ইত্যবোচাম বক্ষ্যামশ্চ। তেন ন পৌনরুক্ত্যম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১)। ব্যাধি হইতে উন্মাদ ও অপস্মারের ভেদ আছে। ব্যাধি—রোগের সাধারণ নাম। উন্মাদ—পাগলামি। অপস্মার—ভূতগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি। ইহাদিগের পরস্পর ভেদ যথাসময়ে সবিস্তরে কথিত হইবে।

(১১) প্রিয়জনের বধ—এস্থলে বন্ধনাদিরও গ্রহণ করিতে হইবে। 'বিপ্রিয়বচন' (মূলের পাঠ)—ইষ্টজনের বধ-বন্ধনাদি যে বাক্যের দ্বারা উক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত ভাব-বিশেষ-সমূহ-দ্বারা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারবিভাব-সমূহ-দ্বারা। 'ভাব'বলিতে এস্থলে 'বিভাব' বুঝাইতেছে—("ভাবশব্দোঽত্রার্য্যায়াং বিভাববাচী"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১১)।

(১২) দ্বিতীয় আর্য্যাটিতে অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব-সমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। মোহাগম—জড়তা-প্রাপ্তি; ইহা দ্বারাই অন্য ব্যভিচারিভাবগুলি উপলক্ষিত হইতেছে। আয়াসন—পাতন, বেষ্টন প্রভৃতি। অভিঘাত—বক্ষোদেশের তাড়নাদি। এক মোহাগম ছাড়া অন্যগুলি সবই অনুভাব।

(১৩) ইষ্টনাশ—'ইষ্ট' অর্থে অভীষ্ট; যথা—প্রিয় পুত্রাদি; 'নাশ' অর্থে বিচ্ছেদ বা মরণ। আবার 'ইষ্ট' অর্থে অভিপ্রেত বস্তু; তাহার বিনাশ।

(১৪) দৈবনিন্দা—রামের বনবাস-জনিত শোকে আর্ত্ত দশরথ বিধির নিন্দা করিয়াছিলেন—ইহার একটি দৃষ্টান্ত দর্পণকার দিয়াছেন। করুণ-রসের পরিপোষ মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

করুণ-বিপ্রলম্ভে রতি স্থায়িভাব—এ কারণে উহা পুনরায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের হেতু বলিয়া গণ্য হয়।

সাহিত্যদর্পণের করুণ-রসপ্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর এ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশন-কার শারদাতনয়ের সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে।

শোক-স্থায়িভাব করুণ-রসের উপাদানহেতু। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের যে পরিক্লেশ, তাহারই নাম 'শোক'। সত্ত্বাদি ভেদে উহার তিন প্রকার ভেদ।

আবেগ, জড়তা, উন্মাদ, বিতর্ক, মোহ, আলস্য, অপস্মার, ব্যাধি, কৃশতা, শ্বাস প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব ও স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিকভাব প্রায়ই করুণ-রসের স্থায়িভাব শোকের সহিত সংযুক্ত দৃষ্ট হয়।

করুণে বিভাব-সমূহ রূক্ষভাবাপন্ন। যখন এই রূক্ষ বিভাবগুলি স্বেতর অথচ অনুগামী যথাযোগ্য ভাবান্তর-সমূহের সহিত নাট্যাভিনয়ে সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (শোকে) অবস্থান করে, তখন মনকে তমোরূঢ়, জড়াত্মক ও চিন্তাবস্থাযুক্ত হইতে দেখা যায় (১৫)। ঐরূপ দশাপন্ন মনের যে বিকার (পরিণাম) উপস্থিত হয়, তাহাই করুণ-রসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সরল ভাষায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, রূক্ষভাবাপন্ন বিভাব ও যথোচিত ব্যভিচারি-ভাব-সমূহের সহিত মিলিত শোক-স্থায়িভাব অভিনয়-দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে চিত্ত তমোগ্রস্ত, জড়ভাবাপন্ন, চিন্তাকুল অথচ ঈষৎ সত্ত্বান্বিত অবস্থায় উপনীত হয়। মনের ঐরূপ বিকারই করুণ-রসে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ —করুণরসে তমোগুণ অন্তঃকরণকে আবৃত করিয়া রাখে বটে, কিন্তু সত্ত্বগুণ অন্তরের অন্তস্থলে সূক্ষ্মরূপে অন্বিত থাকে।

রসোৎপত্তির প্রকার-নিরূপণ-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, ভরত-নাট্যশাস্ত্রের রসোৎপত্তি-প্রক্রিয়া আর বাসুকি-প্রোক্ত রসোৎপত্তি-প্রকার একই রূপ। অনন্তর নারদ-মতে রসোৎপত্তির প্রকারান্তর তিনি স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এ মতে—বাহ্যবিষয়াশ্রিত মন কেবল তমোগুণ-যুক্ত রজোগুণ-হীন ও অহঙ্কার-বর্জ্জিত হইয়া যে বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম করুণ-রস (১৬)।

করুণ-শব্দের নির্ব্বচন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—'ঘৃণি' ধাতুর অর্থ—দয়া, দান ও গ্রহণ। এই দয়া-দান-গ্রহণ-ক্রিয়ার কর্ত্তৃস্থানীয়া যে ধী (বুদ্ধি), তাহারই অপর নাম 'ঘৃণা'। 'করুণা' ইহারই পর্য্যায়। ইহার অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তিও আছে। 'করু' শব্দের অর্থ 'ক্লেশ'। যে বুদ্ধি করু (ক্লেশ) সহ্য করে না, সেই বুদ্ধির নাম 'করুণা'। পরগত ক্লেশের অসহিষ্ণুতার ভাব মনে প্রকাশ পাইলে উক্ত ভাবকে 'করুণ' বলা চলে (১৭)।

রসোৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—নটগণ-কর্ত্তৃক 'ত্রিপুরদাহ' রূপকের অভিনয় দর্শন-কালে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের অভিনয় দেখিতে দেখিতে পিতামহ ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে আরভটী বৃত্তি ও তজ্জনিত রৌদ্ররসের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই রৌদ্ররস হইতে করুণের জন্ম (১৮)।

যখন রুদ্রস্বভাব বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, তখন তিনি নানা প্রহরণ-দ্বারা দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ প্রহারপূর্ব্বক দণ্ডদান করিয়াছিলেন। সেই সকল ছিন্ন-কর্ণ-নাসিকা-বিশিষ্ট দীন-ভাবাপন্ন দেবগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দেবী সতী ও তাঁহার সখীগণের অন্তরে অত্যন্ত কারুণ্যের উদ্রেক হইয়াছিল। এই কারণে বলা হয় যে, রৌদ্র হইতে করুণরসের উৎপত্তি (১৯)।

করুণের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—করুণ শোকাত্মক। ইহা সাধারণতঃ যোষিৎ ও নীচাদি প্রকৃতিগত হইয়া থাকে। অভীষ্ট (জন বা বস্তুর) বিরহবশে, শাপহেতু, ক্লেশ-বিনিপাতাদি কারণবশতঃ, ইষ্টবধহেতু, পুত্রাদির নিধনবশে, অর্থহানি, রাজ্য-দেশ-ভ্রংশ, অন্যান্য নানাবিধ ব্যসনাগম-দৈবোপঘাত-দারিদ্র্য-ব্যাধি প্রভৃতি কারণবশে করুণরসের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। এই সকল হেতুর শ্রবণ-দর্শন বা অনুভব দ্বারা মানবের কারুণ্যোদ্রেক হয়। অশ্রুপাত, মুখশোষ, স্বরভেদ, বিবর্ণতা, (দীর্ঘ) নিঃশ্বাস, স্মৃতিলোপ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা, মোহাগম, অভিঘাত, ভূতলে পতন, পরিদেবন, মহীপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠন (বিচেষ্টন), ভুজদ্বয়ের বিবর্ত্তন (হাত-খেঁচা), শ্বাস, উচ্ছ্বাস, দেহে আঘাত ও দেহ পাতন, বক্ষস্তাড়ন—এইগুলি করুণরসের অনুভাব। মোহ, বিষাদ, নির্ব্বেদ, চিন্তা, ঔৎসুক্য, দীনতা, জড়তা ব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, আলস্য, মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব। স্তম্ভ,

---

(১৫) এ বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ, পৌষের বসুমতীতে (রস-১১) প্রদত্ত হইয়াছে। মূলে আছে—"তদা মনস্তমোরূঢ়ং চিন্তাবস্থং জড়াত্মকম্। সদন্বয়ী চ তত্রস্থো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। প্রাপ্নোতি সোঽপি করুণরসতাং বস্তুতে চ তৈঃ।"—ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, পৃঃ ৪৫। 'সদন্বয়ি' পাঠ হইলে ভাল হয় (অবশ্য 'সমন্বয়ি' বা সমান্বয়ি' পাঠান্তর আছে)। 'সদন্বয়ি' হইলে উহা 'মনঃ'পদের বিশেষণ হয়। অর্থ দাঁড়ায়—মনে তমোগুণ প্রবল, আর সত্ত্বগুণ অন্বিত মাত্র।

(১৬) "রজস্তমোঽহঙ্কৃতিভির্যুতাদ্বাহ্যার্থসংশ্রয়াৎ। মনসো যো বিকারস্ত স রৌদ্র ইতি কথ্যতে। করুণস্তত এব স্যাদ্রজোঽহঙ্কার-বর্জ্জিতাৎ"। ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭।

বাহ্যার্থসংশ্রিত মন যখন রজঃ তমঃ ও অহঙ্কারযুক্ত, তখন সেই মনোবিকারই রৌদ্র। আর উহা হইতে রজঃ ও অহঙ্কার বর্জ্জন করা হইলে (অর্থাৎ কেবল তমোযুক্ত মনের বিকারই) করুণ।

(১৭) "ঘৃণিধাতুর্দয়াদানগ্রহণেষু চ বর্ত্ততে।…ঘৃণেঃ করুণশব্দস্ত বিহিতঃ শব্দবাদিভিঃ॥ অতো নৈঘণ্টুকৈরুক্তা ঘৃণেতি করুণেতি চ। করুঃ ক্লেশ ইতি খ্যাতঃ ক্লেশং ন সহতে যতঃ॥ যস্যা ধীঃ করুণা সা স্যাৎ প্রত্যয়ে করুণো ভবেৎ। পরাশ্রিতানাং ক্লেশানামসহিষ্ণুতয়োচ্যতে॥ মনসো যাদৃশো ভাবো স বৈ করুণ উচ্যতে॥"—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৯।

(১৮) ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৌষের বসুমতীতে দ্রষ্টব্য (রস-১১)। আরভটী উদ্ধতা বৃত্তি। মদীয় 'নাট্যমাতৃকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (মাসিক বসুমতী)

(১৯) "রুদ্রেণ বীরভদ্রেণ দক্ষস্য ধ্বংসিতে মখে। দণ্ডিতেষু চ দেবেষু নানাপ্রহরণৈঃ পৃথক্॥ বিলোক্য তান্ প্রলপতশ্ছিন্নকর্ণা-ক্ষিনাসিকান্। দীনান্ দেব্যাঃ সখীনাঞ্চ করুণো বদভূন্মহান্॥ তস্মাৎ প্রবৃত্তঃ করুণো রৌদ্রাদিতি বিভাব্যতে"। ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৫৮।

কম্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি আটটি সাত্ত্বিকভাবই করুণে প্রযোজ্য। আর করুণের উদ্দীপক-মাত্রই উদ্দীপন-বিভাব।

স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতিতে করুণের স্থায়িভাব শোক মরণের অধ্যবসায় (দৃঢ়সঙ্কল্প) আনয়ন করে। শোকে মধ্যম-প্রকৃতির মুমূর্ষা (মরণেচ্ছা) অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। আর উত্তম প্রকৃতির শোক অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও বিবেক-দ্বারাই শান্ত হইয়া থাকে। উত্তম প্রকৃতির শোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরাশ্রিত শোক দর্শনেও তাঁহার নিজেরই ব্যসন উৎপন্ন হইয়া থাকে (অর্থাৎ—পরকীয় শোকদর্শনেই উত্তম প্রকৃতির আত্মগত শোক উৎপন্ন হয়)।

মনো-বাগ্-অঙ্গের ক্রিয়াভেদে করুণ রস ত্রিধা বিভক্ত (২০)। বাক্যার্থের অননুসন্ধান (অর্থাৎ—উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারা), নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসের দীর্ঘতা, কেশ-বাস অঙ্গসংস্কারাদি কার্য্যে উপেক্ষা, দীনভাব, অনুভূত বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব, চিত্তের একাগ্রতার অভাব (অনবস্থিতচিত্ততা), সর্ব্ববিষয়ে বিরক্তি, যাহারা স্নেহশীল তাহাদিগেরও সঙ্গবর্জ্জন, আকাশ-বীক্ষণ—'মানস করুণে'র লক্ষণ। হা-হা-কার, রোদন, আক্রোশন, প্রলাপ, দীর্ঘভাষণ, দূর হইতে আহ্বান, আক্রন্দন প্রভৃতি—'বাচিক করুণে'র নিদর্শন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শারদাতনয় 'আঙ্গিক করুণে'র লক্ষণ প্রদর্শন করেন নাই। আমাদিগের মনে হয়, গ্রন্থ এই স্থলে ত্রুটিত হইয়াছে।

করুণের দেবতা যম। কারণ, যম মৃত্যুদাতা। মৃত্যু শোকের কারণ। আর শোক করুণের হেতু। শারদাতনয় ইহার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে করুণের আশ্রয় (অধিষ্ঠান) করুণা বা দয়া। এই দয়া অবলম্বনে যম পাপকে সংযত করেন। তাই সেই পাপ-সংযমন-কর্ত্তার নাম 'যম'। করুণা অবলম্বন-পূর্ব্বক পাপ সংযম করেন বলিয়াই যম করুণের অধিদেবতা।

করুণের বর্ণ কপোতের ন্যায়। 'কপোত' বলিতে বুঝায় গৃহ-পালিত কপোত (অর্থাৎ পারাবত) অথবা বন্য কপোত (অর্থাৎ ঘুঘু)। করুণ-রসের বর্ণ কপোতের ন্যায় হইল কেন, ইহার কারণ কেহ উল্লেখ না করিলেও এ বিষয়ে দ্বিবিধ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ, কপোতের ধূসর বর্ণ উজ্জ্বলতার অভাববশতঃ শোকেরই সূচনা করে। শোকাকুল ম্লান মুখ ধূসরবর্ণই দেখায়। এ কারণে করুণরসকে ধূসরবর্ণ বা কপোতবর্ণ বলা হইয়াছে। অথবা ইহাও বলা চলে যে, কপোতের ডাক বড়ই করুণ। এ হেতু করুণ-রসের সহিত কপোতের একটা পারম্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে করুণ-রসকে কপোত-বর্ণ বলা হইয়াছে। উক্ত দুই প্রকার অনুমান কত দূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

'কাব্যপ্রকাশ'-কার মম্মটভট্ট শোক-স্থায়িভাব (২১) হইতে করুণের কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহাই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত।

রামচন্দ্র গুণচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণে' পাওয়া যায়—মৃত্যু-বন্ধন-ধনভ্রংশ শাপ-ব্যসন-সম্ভূত করুণ বাষ্প-বৈবর্ণ্য-নিন্দন দ্বারা অভিনেয় (২২)।

সাগরনন্দী 'নাটকলক্ষণরত্নকোষে' নাট্যশাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন—ইষ্টনাশ-ধনব্যয়-বধ-ব্যসন-তাড়ন-শাস-ক্লেশ-উপঘাত প্রভৃতি বিভাব-জনিত করুণ-রস। অশ্রু-নিশ্বাস-বৈবর্ণ্য-স্রস্তাঙ্গতা-স্মৃতিক্ষয়-পরিদেবন-মুখশোষাদি অনুভাব-দ্বারা উহা অভিনেয়। স্বরভেদ-অশ্রু-বৈবর্ণ্য-নির্ব্বেদ-বিষাদ-আবেগ-মৃত্যু-মোহ-অপস্মার-জড়তা-চিন্তা-ঔৎসুক্য-বেপথু-দৈন্য-আলস্য-ব্যাধি-গ্লানি-শ্রম-স্তম্ভ প্রভৃতি ইহার চর (ব্যভিচারী) ভাব। শোক স্থায়ী।

শিঙ্গভূপাল 'রসার্ণব-সুধাকরে' নূতন কিছুই বলেন নাই। যথোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাবাদি সংযোগে শোক-স্থায়িভাব সহৃদয় দর্শক-সম্প্রদায়ের আস্বাদনযোগ্য হইলেই করুণ-রসে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। আটটি সাত্ত্বিক ভাবই ইহাতে প্রযোজ্য। জাড্য-নির্ব্বেদ-গ্লানি-দীনতা-আলস্য-অপস্মার-ব্যাধি-মোহাদি-ব্যভিচারী ভাব। তাঁহার দৃষ্টান্তটিতে পাওয়া যায়—যদুপতি কৃষ্ণ নায়ক। নায়কের বন্ধুর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার চিত্তে শোকোচ্ছ্বাস হইয়াছে। শোক স্থায়িভাব। কৃষ্ণ শোকের আলম্বন-বিভাব। বন্ধুর গুণাবলীর স্মরণ-দ্বারা ঐ শোক উদ্দীপিত। দৈন্য-মোহ-গ্লানি প্রভৃতি সঞ্চারিভাব-দ্বারা উহা প্রপঞ্চিত। মুহুর্মুহুঃ বাষ্পত্যাগ, দীর্ঘশ্বাস, মলিন মুখরাগ প্রভৃতি অনুভাব দ্বারা উহা অভিব্যক্ত। এইরূপে বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগে শোক-স্থায়ী হইতে করুণ-রসের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

করুণ-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

করুণের পর রৌদ্র-রস। করুণের নিমিত্ত রৌদ্র, যেহেতু, রৌদ্রের অভিব্যক্তি দর্শনে করুণের উদ্রেক হয়। এই কারণেই করুণের পর রৌদ্রের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে (২৩)।

মহর্ষি বলিয়াছেন—রৌদ্র-রস ক্রোধ-স্থায়িভাবাত্মক। অভিনব বলেন—রৌদ্র-রসের চর্ব্বণা (আস্বাদন) ও ক্রোধাময়ী; এ কারণে রৌদ্রকে ক্রোধাত্মক বলা হইয়াছে। এই রৌদ্র-রস রক্ষো-দানব-

---

(২০) এস্থলে 'ক্রিয়া' অর্থে অভিনয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অভিনয় চতুর্ব্বিধ—আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক। 'মানস' বলিতে 'সাত্ত্বিক' অভিনয় বুঝিতে হইবে। সাত্ত্বিক—সত্ত্বসম্ভূত বিকার-দ্বারা কৃত অভিনয়। রজস্তমোগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট মনই 'সত্ত্ব'—ইহা সাহিত্যদর্পণের মত। অতএব 'মানস করুণ' অর্থে করুণরসের সাত্ত্বিক অভিনয়ের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি।

(২১) কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ-কার গোবিন্দ ঠক্কুর শোকের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—'ইষ্টনাশাদি দ্বারা চিত্তের বৈক্লব্যই শোক-শব্দের অর্থ'—"ইষ্টনাশাদিভিশ্চেতোবৈক্লব্যং শোকশব্দভাক্"।

(২২) শাপ—দিব্য প্রভাবশালী ব্যক্তির আক্রোশ—প্রিয়জনের বিয়োগহেতু। ব্যসন—অনর্থ। জৈন গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেশোচ্চাটন প্রভৃতি কারণোৎপন্ন বিপ্লবাদি এ ক্ষেত্রে সংগ্রহ করিতে হইবে। মৃত্যু-বন্ধন প্রভৃতি বিভাব। বাষ্প-বৈবর্ণ্য—এগুলি অনুভাব; ইহাদিগের সহিত নিঃশ্বাস, মুখশোষ, স্মৃতিলোপ স্রস্তগাত্রতা প্রভৃতির গ্রহণ কর্ত্তব্য। নিন্দন—আপনার অথবা দৈবের নিন্দা; ইহা দ্বারা রোদন-প্রলাপ-বক্ষস্তাড়ন প্রভৃতিরও সংগ্রহ কর্ত্তব্য। ব্যভিচারি-ভাব—নির্ব্বেদ-গ্লানি-চিন্তা প্রভৃতি। সাত্ত্বিক—স্তম্ভ-বেপথু-বৈবর্ণ্য-অশ্রু-স্বরভেদ প্রভৃতি। বর্ণনা পূর্ব্ববৎ। কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

(২৩) "করুণো রৌদ্রাদিত্যুক্তম্। স কীদৃগ্রৌদ্র ইতি ক্রমং কেচিদাহুঃ"।—অ: ভা:, পৃ: ৩২০। নিরপেক্ষ-স্বভাবত্বাত্তদ্বিপরীতত্বতঃ করুণঃ। তত্তন্নিমিত্ত রৌদ্রঃ, স-চার্থ-প্রধানঃ।—অ: ভা:, পৃ: ২৬৯।

উদ্ধত-মনুষ্য-প্রকৃতিক ও সংগ্রামহেতুক (২৪)। ইহা ক্রোধ-আধর্ষণ-অধিক্ষেপ-অবমান-অনৃতবচন-উপঘাত--বাক্পারুষ্য--অভিদ্রোহ--মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে (২৫)। তাড়ন-পাটন-পীড়ন-ছেদন-ভেদন-প্রহরণের আহরণ-শস্ত্রসম্পাত-সম্প্রহার-রুধিরাকর্ষণ প্রভৃতি ইহার কর্ম্ম (২৬)। রক্তনয়ন-স্বেদ-ভ্রূকুটিকরণ-দন্তোষ্ঠপীড়ন-গণ্ডস্ফুরণ-হস্তাগ্রনিষ্পেষণ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য(২৭)। অসম্মোহ-উৎসাহ-আবেগ-অমর্ষ-চপলতা-উগ্রতা-গর্ব্ব (বিকৃত নয়ন) -স্বেদ-বেপথু-রোমাঞ্চ-গদ্গদাদি (ব্যভিচারী) ভাব (২৮)।

এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার পরবর্ত্তী সংখ্যায় করা যাইবে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

---

(২৪) "উদ্রিক্তং হন্তুং যেষাং তে উদ্ধতাঃ, তদ্বেষধারিণো যে নটাঃ (নরাঃ?) তে প্রকৃতিঃ চর্ব্বণোদয়হেতুরস্য"। যাহাদিগের চিত্তে হননেচ্ছার উদ্রেক হইয়াছে তাহারা 'উদ্ধত'। উদ্ধত ব্যক্তিগণ যে রসের আস্বাদনের হেতুভূত, সেই রৌদ্র-রস 'উদ্ধত-প্রকৃতিক'। এই স্থলে অভিনবগুপ্ত একটি বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছেন। এই রক্তপান-কার্য্যে তাঁহার উদ্ধত-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ ঔদ্ধত্য যুদ্ধহেতুক—স্বাভাবিক নহে। পক্ষান্তরে, স্বভাবরৌদ্র রাক্ষস-দানবাদির ঔদ্ধত্য স্বাভাবিক। এরূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের যুক্তি অভ্রান্ত নহে। কারণ, ভীমের রুধির-পান যুদ্ধহেতুক নহে; বরং ঠিক ইহার উল্টা—রুধির-পানের উদ্দেশ্যেই তাঁহার যুদ্ধ-করণ। উদ্ধত-স্বভাব-বশতঃই তিনি ক্রোধ-পরবশ হইয়া এই অনুচিত কার্য্য (রক্তপান) করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এ কারণে বেণীসংহারে কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ভীমের উপর রাক্ষস ভর করিয়াছিল। অতএব, রাক্ষস-দানবাদির মত স্বভাবতঃ উদ্ধত-প্রকৃতি মনুষ্যই রৌদ্ররসের আলম্বন বুঝিতে হইবে।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২০-২১। সংগ্রামহেতুক—উদ্ধত-প্রকৃতির স্বভাবই সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। এ সংগ্রাম ধর্ম্মযুদ্ধ বা ন্যায়যুদ্ধ নহে, কিন্তু এ সংগ্রামের হেতু কুৎসিত। এই কুৎসিত হেতু দ্বারা সংগ্রামের ঔচিত্য তিরোহিত হওয়ায় এবংবিধ সংগ্রাম রৌদ্ররসের হেতুরূপে গণ্য হয়। অন্যথা ন্যায্যহেতুক সংগ্রাম বীর-রসেরই কারণ হইয়া থাকে ("তথা চ প্রাধান্যেন যুদ্ধেন বীর এব ব্যপদিশ্যতে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২১)

(২৫) রৌদ্র-রসের আলম্বন-বিভাব স্বভাবক্রোধন হইলেও উদ্দীপন-বিভাবের যে প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝাইতে মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত বিভাব-(উদ্দীপন-বিভাব)-গুলির উল্লেখ করিয়াছেন। আধর্ষণ—দারাদি-খলীকরণ; attack (Dr. Mukherjee). অধিক্ষেপ—দেশ-জাতি-অভিজন (কৌলীন্য)-বিদ্যা-কর্ম্ম প্রভৃতির নিন্দা। উপঘাত—গ্রহভৃত্যাদির উপমর্দ্দন; injury (Dr. Mukherjee). বাক্পারুষ্য—'মারিব' প্রভৃতি বলিয়া তর্জ্জন। অভিদ্রোহ—জিঘাংসা; malicious hatred (Dr. Mukherjee). মাৎসর্য্য—গুণে অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা; self-sufficiency (Dr. Mukherjee). 'আদি' পদের দ্বারা রাজ্যগ্রহণাদি বুঝিতে হইবে।

(২৬) তাড়নাদি—কর্ম্ম। রক্তনয়নাদি—অনুভাব। তাড়নাদি কর্ম্মও ত অনুভাব-মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তথাপি উহাদিগের পৃথগ্ নির্দ্দেশ কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন—যদিও কর্ম্মগুলি ও অনুভাবগুলি সবই অনুভাব মধ্যে গণ্য, তথাপি উভয় শ্রেণীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য কোথায়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন—কর্ম্মগুলির কেবল কথায় বর্ণনা করিতে হইবে; কারণ, তাড়নাদি কর্ম্ম রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শনের অযোগ্য। পক্ষান্তরে, রক্তনয়নাদি অনুভাবগুলি প্রত্যক্ষতঃ রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করিবার যোগ্য। অভিনব বলেন—কর্ম্ম ও অনুভাব—এই দুইটি শ্রেণীর পৃথগ্ উক্তির ইহাই মাত্র পর্য্যাপ্ত কারণ নহে। তাঁহার মতে—রাক্ষস-দানব-উদ্ধতপ্রকৃতিক মনুষ্য প্রভৃতি কোনরূপ উদ্দীপন-হেতু ব্যতীতও স্বভাবতঃ যে সব কর্ম্ম করে (যথা—বন্ধু সহ নর্ম্মগোষ্ঠী প্রভৃতি), সে সকল স্থলেও তাড়নাদি ক্রিয়া প্রধানভাবে অভিব্যক্ত। অর্থাৎ—উদ্ধতপ্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ চেষ্টা বা কর্ম্ম—তাড়ন প্রভৃতি; যখন সে ক্রুদ্ধ হয় নাই এমন সময়েও (এমন কি কেবল আদর প্রকাশ করিবার কালেও) সে মার-ধর করে—ইহাই তাহার স্বভাব। অতএব উদ্দীপন বিনা কৃত এই কর্ম্মগুলি তাহার 'স্বাভাবিক কার্য্য'। আর উদ্দীপনহেতু দ্বারা যে সকল কার্য্য প্রকাশ পায় (যেমন—রক্তনয়নাদি), সেগুলিই 'অনুভাব' (অং ভাঃ, পৃঃ ৩২১)। তাড়ন—করতলাদি দ্বারা আঘাত। পাটন—দ্বিধাকরণ। পীড়ন—মর্দ্দন। ছেদন—কাটা। ভেদন—ফুঁড়ে ফেলা। প্রহরণাহরণ একটি পদ; প্রহরণগুলি আহরণ (বলপূর্ব্বক অপহরণ)। শস্ত্রসম্পাত—দেহ বিদ্ধ না হইলে; দেহ বিদ্ধ হইলে সম্প্রহার। অভিনব বলিয়াছেন—রাক্ষসাদি আদর করিয়াও মার-ধর করে, তবে উহার ফল রক্ত বাহির হওয়া মাত্র; তাহার অধিক মারাত্মক কিছু হয় না (—"রক্ষঃপ্রভৃতয়ো হি নর্ম্মণাপি প্রহরন্তি, কিন্তু রুধিরাগমন-মাত্রফলং, ন ত্বধিকম্" অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২২)।

(২৭) ভ্রূকুটী—ভ্রূযুগলের মূলদেশের উৎক্ষেপ। দন্তোষ্ঠপীড়ন—দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়ান। হস্তাগ্রনিষ্পেষণ—দুইটি হাত পরস্পর কচ্লান।

(২৮) অসম্মোহ—এই নামের কোন ব্যভিচারী ভাব নাই বটে, কিন্তু ইহা মোহের বিপরীত ভাব—সম্যগ্‌বোধ—বিবোধ-স্থানীয়। উৎসাহ—বীর-রসের স্থায়ি-ভাব—এ স্থলে ব্যভিচারী। এক রসের স্থায়ী অন্য রসের ব্যভিচারী হইতে পারে। স্বেদ-বেপথু প্রভৃতি—এগুলি বাহ্য। আভ্যন্তর হইলেই এগুলি সাত্ত্বিক-ভাব-রূপে গণ্য হয়। আর বিষাদি বাহ্য কারণে উৎপন্ন হইলে ব্যভিচারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।—ইহা অভিনব-সিদ্ধান্ত (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২২)।

জাপানী বোমা।

[গল্প]

ডক্টর প্রদোষ পালিত, এম, এ, পি, এইচ, ডি, কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। পৈত্রিক ভিটা ইনপ্রুভমেন্টের রাস্তার সীমায় পড়ায় তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকাগুলি পাইয়াছিলেন, তাহা দিয়া বালিগঞ্জে তিনি হাল ফ্যাসানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মোটর গাড়ী, টেলিফোন, রেডিও-সেট, পিয়ানো প্রভৃতি আধুনিক প্রথায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সকল সরঞ্জামই তাঁহার দৈনন্দিন অভাব দূর করিতেছে। শ্রীলেখা পালিত তাঁহার পত্নী—সুশিক্ষিতা গ্র্যাজুয়েট মহিলা। জ্যেষ্ঠা কন্যা পৃথা, 'অনার্স' লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে। মিঃ পালিত তাহার এম-এ পড়িবার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেও মিসেস্ পালিতের তাহাতে আপত্তি। তিনি বলেন যে, মেয়েদের পক্ষে বি-এ পাশ করাই যথেষ্ট! এইবার বিবাহ! কনিষ্ঠা স্বাহা, আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া বি-এ পড়িতেছে। একমাত্র পুত্র প্রবীর গ্লাসগো হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছে, এবং বিলাতী ডিক্রির খাতিরে ভাল চাকরীও পাইয়াছে। তাহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর; সুপুরুষ, এখনও সে অবিবাহিত।

এক কথায় মিঃ পালিতের গৃহ তাঁহার ও পরিজনবর্গের শান্তির নীড়। তাঁহার মান-সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও উচ্চ ডিক্রিধারী অবিবাহিত পুত্র যে দিন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সম্মানপূর্ণ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার পরদিন হইতেই এমন সব গণ্যমান্য খেতাবধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মিঃ পালিতের আত্মীয়তা বন্ধুত্ব হইয়াছে, যাঁহাদের নাম, সম্ভ্রম ও সামাজিক সম্মান এই অধ্যাপকের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহারা এখন মিঃ পালিতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উৎসুক। মিসেস্ পালিতের এ বিষয়ে চেষ্টা ও উৎসাহের অভাব ছিল না। দৃষ্টি তাঁহার সর্ব্বত্রগামী, এবং বুদ্ধিও অতি তীক্ষ্ণ। মিঃ পালিতের বিশ্বাস, মিসেস্ পালিত ইচ্ছা করিয়াই এত দিন পুত্রের বিবাহের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, এখন তিনি অন্তরে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা লইয়াই পুত্রের জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, যে পাত্রীর দুইটি শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম অবিবাহিত ভ্রাতা বর্ত্তমান, সেই পাত্রীই তাঁহার পুত্রবধূর স্থান গ্রহণ করিবে। বস্তুতঃ, শ্যামবাজারের বাস্তভিটার বিনিময়ে তাঁহার যেমন লাভ হইয়াছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়াও তিনি সেইরূপ দাঁও মারিবেন, দুস্তর কন্যাদায় হইতে বে-খরচায় উদ্ধার লাভ করিবেন।

মিঃ পালিত এ সকল বিষয়ে কোন দিন কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই, এবং প্রবীরও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। মিসেস্ পালিতের ধারণা, বৈষয়িক বুদ্ধিতে তাঁহার দার্শনিক স্বামী ও ইঞ্জিনিয়ার পুত্র বাস্তুজ্ঞানহীন বালক অপেক্ষাও অনভিজ্ঞ; কাজেই তাঁহাদের মতের কোন মূল্য আছে—মিসেস্ পালিত ইহা স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ, অশেষ প্রভাবশালিনী মিসেস্ পালিতই ছিলেন তাঁহার সংসারের একমাত্র পরিচালিকা; তাঁহার ইচ্ছার উপর কাহারও কোন কথা চলিত না।

কিন্তু যে তরীখানি আনন্দ-প্রবাহের ভিতর দিয়া অনুকূল বায়ু-হিল্লোলে তর তর বহিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ যেন তাহার গতিরোধ করিয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ঈশান কোণের বৈশাখী মেঘের এক টুক্‌রা দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রের প্রলয়-বিষাণ ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল।

জাপানী বোমার ভয়ে দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত, আতঙ্কাভিভূত। জননায়কগণ নানা ভাবে সহর-ত্যাগের নির্দ্দেশ দান করিতেছেন। এই সময় মিঃ পালিতের সংসারে সহসা একটা তুফান উঠিল।

লীলা বিশ্বাস,—মেয়েটি শ্যামবর্ণ, গড়ন ছিপ্‌ছিপে। মস্তকের কেশের স্বল্পতা হেতু তাহার ললাট কিরূপ উচ্চ, তাহা সুবিন্যস্ত অলকদামের ভিতর হইতেও বুঝিতে পারা যায়। তথাপি মিসেস্ পালিতের দৃষ্টি তাহারই দিকে—সে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। ইহার কারণ, মিস্ বিশ্বাস উচ্চতম আদালতের বিচারপতি সার বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাসের আদরিণী দুহিতা, এবং তাহার অবিবাহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের একটি আই-এম,-এস, অন্যটি ইঞ্জিনীয়ার। তাহারা উভয়েই সুপুরুষ।

মিসেস্ পালিত বলিতেন,—লীলার চেহারায় একটা আলাদা চটক আছে! কমনীয়তা তাহার দেহে জড়াইয়া আছে! আর পিতার আকৃতিবিশিষ্ট মেয়েরাই সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে। লীলা বিশ্বাসের আকৃতি তাহার পিতার আকৃতির অনুরূপ।

মিসেস্ পালিতের এই পক্ষপাতপূর্ণ মন্তব্যের শেষ অংশটা সম্বন্ধে কেহ কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও প্রথম অংশটার সমালোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। পৃথাও বলে, "মা, লীলা বিশ্বাস কি যাদু জানে যে, তোমাকেও মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে? তার সবই ভাল। কে তোমার কথার প্রতিবাদ করবে?"

পৃথা গৌরাঙ্গী, চোখ-মুখও ভাল। তবে দেহ ক্রমশঃ স্থূল হইতেছে। প্রকৃতির খেয়াল!

স্বাহার রংটি 'লালচে হইলেও গঠন-সৌষ্ঠব ছিল, কোমল দেহে লাবণ্যেরও অভাব ছিল না।

মা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন,—"বাঙালী-ঘরে তেমন সুন্দর বেশী আছে কি? সেকালে কিন্তু সুন্দরীর অভাব ছিল না। দত্তবাড়ী, মিত্তির-বাড়ীর ঝি-বৌদের দেখেছি তো! বুড়ো বয়সেও রং ছিল যেন বেদানার দানা! কিন্তু একালে ক্রিম, পাউডার, স্নো, আরও কত ছাই-ভস্ম-মাখা, এনামেল-করা মুখের সে জৌলুস কোথায়?"—এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি উঠিয়া যান। এবং এইরূপে তর্ক থামিয়া যায়। কিন্তু মিসেস্ পালিত কোন কারণেই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। তিনি সুচতুর গৃহিণী, এবং কর্ত্রীত্ব করিবার শক্তিও তাঁহার অসাধারণ।

মিসেস্ পালিত এক দিন কথায় কথায় প্রচার করিলেন,—প্রবীরের

জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি একটা আনন্দ-ভোজের আয়োজন করিতেছেন।

এ সংবাদ তিনি যখন স্বামীর গোচর করিলেন, অধ্যাপক তখন কলেজে বাহির হইতেছেন। কথাটা শুনিয়া তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, "সাইরেন—"

"তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না গো!"

ভাবিবার অবকাশও ছিল না, মিঃ পালিত অন্যমনস্ক ভাবে মোটরে উঠিলেন। সকল অধ্যাপকের উহা রাখিবার শক্তি না থাকিলেও স্ত্রীর জন্যই তাঁহাকে এই হাতী পুষিতে হইয়াছিল!

চায়ের মজলিস ইদানীং ঘন ঘন বসিতেছিল,—অবশ্য সপুত্র-কন্যা লেডি বিশ্বাসই প্রধান অতিথি হইতেন। তবে কখন কখন অন্য অতিথিও থাকিতেন, কিন্তু এই দিনের ভোজন-ব্যাপারে অনেক বাছিয়া অল্পসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের নিমন্ত্রণ হইল। তাঁহাদের মধ্যে লেডি বিশ্বাসের প্রিয়জনবাই প্রধান।

সার বি. আর, বিশ্বাস বলিলেন,—"আমার গাউটটা বড় বেড়েছে—"

লেডি বিশ্বাস বলিলেন,—"তা তুমি যেতে না পারলেও অন্য সকলেই যাবে।"

মিসেস্ পালিতের উৎসাহের সীমা ছিল না। লেডি বিশ্বাসদের পরিজনবর্গকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য কন্যাদের সহিত কয় দিন তিনি বিস্তর আন্দোলন-আলোচনা করিতেছিলেন। এ বিষয়ে মেয়েদের উৎসাহ মায়ের অপেক্ষা অল্প ছিল না। পিতা-পুত্র এই ব্যাপারে নির্ব্বাক্ ছিলেন।

মিসেস্ পালিত নিমন্ত্রণ পাকা করিয়া অধ্যাপক স্বামীকে ধরিয়া বলিলেন,—"দেখ, কেবল বই মুখে করে ঘরের কোণে বসে থেক না। বিশেষ লক্ষ্য রেখো—আদর-যত্ন ও শিষ্টাচারের যেন ত্রুটি না হয়।"

"খাসা উপদেশ! তা বেশ, তোয়ালে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব—শিষ্টাচারের চূড়ান্ত হবে না?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে হাসিটা চাপা দিয়া ক্রোধের ভাণে মিসেস্ পালিত কহিলেন,—"উলটো বুঝলে না কি! অন্য পাঁচ জনের জন্যে আমার ভাবনা নেই, কেবল লেডি বিশ্বাসের জন্যই ভয়। বড্ড না কি খুঁতখুঁতে শুনতে পাই।"

মিঃ পালিত হাসিয়া কহিলেন,—"তোমারই দিদি তো তিনি?"

—"হ্যাঁ, দিদিই তো! এই দিদি ডাক শুনে তিনি কত খুসী! আর আমাকে কত ভালবাসেন! আর দেখ, কার্য্যোদ্ধারের জন্য ও-সব চাই; তা তুমি কোন কিছু বোঝ না, বোঝ কেবল কেতাব!"

অতঃপর মিসেস্ পালিত পুত্রকে কহিলেন,—"দেখ প্রবীর, আজ তোমারই উৎসব উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ—এটা তোমার জন্মতিথি কি না! আমার ইচ্ছে, তোমার ব্যবহারে সকলেই যেন আনন্দ পায়।"

মাতার নিগূঢ় ইঙ্গিতটা বুঝিয়া পুত্রের মুখে কেবল একবিন্দু হাসি ফুটিল।

পালিত-গৃহিণী এইবার মেয়ের দিকে মন দিলেন। কেমন রঙে, কোন্ বস্ত্রালঙ্কারে কন্যাদ্বয়ের রূপ ফুটিয়া উঠিবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। কন্যারাও এ বিষয়ে মাকে সাহায্য করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিল না। মায়ের সহিত এইখানে তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা।

* * * * *

নির্দ্দিষ্ট দিন অপরাহ্ণে লেডি বিশ্বাস পরিজনবর্গসহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। আরও যে দুই-দশ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হইল, পদমর্য্যাদায় তাঁহাদের কেহই উপেক্ষাযোগ্য নহেন, কারণ, ঐ দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মিসেস্ পালিতের সাদর সম্ভাষণে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইলেন। প্রবীরের আদর-আপ্যায়নও তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

গান-বাজনা, হাস্য-কৌতুকের প্রবাহ বহিতে লাগিল।

লীলা একটু সুযোগ পাইয়া কহিল,—"আমরা তো সকলে এতক্ষণ গান-বাজনা করলুম, কিন্তু শ্রোতা হিসাবেও আপনি সব সময় এখানে থাকতে পারেন নি মিঃ পালিত! সেই ত্রুটি-সংশোধনের জন্যও আপনাকে অন্ততঃ একটা কিছু গাইতেই হবে।"

"উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া প্রবীর উঠিয়া রেডিওর সুইচটা টিপিয়া দিল,—রেডিওতে তখন ভাটিয়ালী গান চলিতেছিল,—

"ঘাটে ডিঙ্গা লাগায়ে বঁধু পান খায়ে যাও।"

অমিত কহিল,—"ও কি!"

প্রবীর কহিল,—"হাতুড়ি-পেটা বিদ্যে; এইটেই ভাল বুঝি কি না।"

লীলা ফোঁস করিয়া উঠিল,—কিন্তু ওটা কি আপনার গান হল?

ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রবীর কহিল,—"বাঃ! সকল কাজই যখন প্রতিনিধি দ্বারা চলতে পারে, তখন এ কাজটাই বা তা হবে না কেন? ঐ গায়কই আমার প্রতিনিধি"—উত্তর শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

আহার প্রস্তুত। ভোজনের সকল উপকরণ ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বদেশী। বিলাতী খানা সতর্কতার সহিত বর্জ্জিত হইয়াছিল। প্রবীর বিলাতী ডিগ্রিধারী হইলেও ভোজ্য-নির্ব্বাচনে স্বদেশীর পক্ষপাতী। আমাদের দেশী খাবার ও বিলাতী খানা প্রস্তুতের খরচে আকাশ-পাতাল তফাৎ! কাজেই হিসাব করিয়া মিসেস্ পালিতকে অগত্যা পুত্রেরই মতাবলম্বী হইতে হইল। সস্তায় সাহেবীয়ানা বিড়ম্বনা, এ জ্ঞান তাঁহার ছিল।

পূর্ণ উৎসাহে ভোজন আরম্ভ হইল। কিন্তু পোলাওয়ের একটি গ্রাস চর্ব্বণ করিতে করিতে মিঃ পালিত পত্নীর সতর্কতাপূর্ণ সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া মুখ হইতে এমন একটা কথা বাহির করিলেন যে, সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিল।

মিঃ পালিত কহিলেন,—"সবাই তো এখানে আমোদ-আহ্লাদ করছ, কিন্তু হঠাৎ পালাবার দরকারটা কি ভুলে গেলে?—তার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? শুনি!"

সচকিত ভাবে লেডি বিশ্বাস বলিলেন,—"আপনি ও-কি বলচেন?"

এমন অতর্কিত ও অশোভন প্রশ্নের পর মিঃ পালিতকে সামলাইবার কোন উপায় রহিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন—"আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি, ক্যালক্যাটা ইন সিরীয়স্ ডেঞ্জার! আর সত্যই কোন টাউন আউট অফ ডেঞ্জার নয়! বেষ্ট ভিলেজ—"

লেডি বিশ্বাস কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"আমিও ত তাই বলি; কিন্তু ইনি ও-কথা কাণেই তোলেন না, অর্থাৎ যাকে বলে—'বকো আর ঝকো কানে গুঁজেছি তুলো'!"

অমিত, সুহৃদ্ একসঙ্গে কহিল,—"কোথাও পালাবার পক্ষপাতী আমরাও নই কিন্তু।"

মিঃ পালিত ঈষৎ বিরক্তি বোধ করিলেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত অতিথির খাতিরে ধৈর্য্য ধারণ করাই আবশ্যক—কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি নীরস স্বরে কহিলেন,—"বিপদকে অস্বীকার করলেই তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

লেডি বিশ্বাস কহিলেন—"এটা খাঁটী কথা। আচ্ছা, অনেকেই তো দিল্লী, এলাহাবাদ, বেনারস—কিম্বা কোন হিল-ষ্টেশনের নাম করে—"

মিঃ পালিত ব্যগ্র স্বরে কহিলেন,—"সাবধান, দেখুন ঐ রকম ভুল যেন কদাচ না হয়। জানেন, সেকেণ্ড ডিফেন্স লাইন—এখানে পালান একবারেই উচিত হবে না।"

সুহৃদ কহিল,—"পালাতেই বা হবে কেন?"

মিঃ পালিত উষ্ণ স্বরে কহিলেন, "বর্ম্মার দিকে চাইলেই তার কারণ বুঝতে বিলম্ব হবে কি?"

মিসেস্ পালিত স্বামীর ধাত জানিতেন। জাপানী বোমার নাম শুনিলেই তিনি কিরূপ বিচলিত হইয়া স্থান-কাল-পাত্র সকলই ভুলিয়া যান, তাহাও তাঁহার সুবিদিত। কি সে বলিবেন আর কি যে করিবেন, তার কোন হিসাব থাকে না। এই জন্যই ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার মতলবে তিনি কহিলেন—"পালানোর পথেই যখন বিপদ, তখন ঘরে বসে বিপদের প্রতীক্ষা করাই ভাল।"

মিঃ পালিত ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন,—"এ সব শিয়ালের যুক্তি! যাবার জায়গা নেই কে বললে? ভিলেজ সম্পূর্ণ নিরাপদ—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

লেডি বিশ্বাস আশ্বস্ত চিত্তে কহিলেন,—"আমিও তাই বলি! এ দুর্যোগে পল্লীগ্রামে বাসই নিরাপদ!"

মিঃ পালিত খুসী হইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ! আপনার কথা শুনলে আনন্দ হয়! আপনার বোনটিকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লে—"

লেডি বিশ্বাস মিসেস্ পালিতের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"কেন, শ্রীলেখা, মিঃ পালিত তো খুব ভাল কথা বলেছেন! ওঁর এ সকল বিষয়ে ওঁর অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট।"

মিঃ পালিত এই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ। সেখানেই প্রতিপালিত! আজই যেন সহুরে হয়েছি, আমরা পল্লীজননীর ক্রোড়ে ফিরে সেখানে বাস করতে পারব না? এ কি একটা কথা?"

লেডি বিশ্বাস তাঁহার মন্তব্যের সমর্থনে কহিলেন,—"হাঁ, ঠিক পারবেন! হয় তো দু'দিন একটু কষ্ট হবে, ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাবে। আর আমিও এখানে টিকতে পাচ্ছি না; একদণ্ড স্বস্তি নেই! ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী—এদের বাঁচাই কি করে! আমার কথা কানেই তুলতে চান না! কিন্তু মিঃ পালিত, তা ব'লে আমি ছাড়চি নে! কালই বড় মেয়েকে টেলিগ্রাম করচি, সে থাকে কটকে,—জামাইকে ওখান-কারই ম্যাজিষ্ট্রেট ক'রে পাঠিয়েছে।"

লেডি বিশ্বাসের কথায় প্রতিবাদ করিবার সাহস না হওয়ায় মিসেস্ পালিত নীরব রহিলেন! কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামী জাপানী বোমার আতঙ্কেই তাঁহার অনেক পরিকল্পনা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই জন্য ক্রোধে তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন।

* * * * * *

মিঃ পালিত 'যঃ পলায়তে স জীবতি' নীতির অনুসরণে প্রাণ-রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প।

কন্যাদের পোষকতা লাভ করিয়া মিসেস্ পালিত স্বামি-পুত্রের সহিত কিছু দিন লড়ালড়ি করিয়া অবশেষে হার মানিলেন। তাহার প্রধান কারণ, বালিগঞ্জের সেই অংশটা ক্রমশঃ জনহীন হওয়ায় ফাঁকা হইয়া পড়িল। অধিকাংশ অধিবাসীরই 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত!' তাঁহারা পল্লী-অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন।

সুতরাং অবশেষে এক দিন মিসেস্ পালিতও বিছানাপত্র বাঁধিয়া সুটকেশ-তোরঙ্গ প্রভৃতিতে পর্ব্বতপ্রমাণ লগেজ সহ একান্ত অনিচ্ছার সহিত স্বামি-পুত্রের অনুসরণ করিলেন। বালিগঞ্জের নবনির্ম্মিত সুসজ্জিত অট্টালিকার দ্বারে চাবি পড়িল, তাহা দারোয়ানের জিম্মায় রহিল। মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি, নগদ টাকা প্রভৃতি মিঃ পালিত কিছু দিন পূর্ব্বেই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

ঘটনাটি এইরূপ,—মিঃ পালিতের কোন বন্ধু ব্রহ্মদেশ হইতে দেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া মিঃ পালিত বন্ধুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবেই গৃহে ফিরিলেন! তিনি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে ডাকিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—"হেম একটা ছোট এ্যাটাচি-কেশ মাত্র নিয়ে বিস্তর টাকা খরচ করে সস্ত্রীক প্লেনে পালিয়ে এসেছে। সে আমায় বল্‌লে—আমার স্ত্রীও ঠিক ঐ রকম আপত্তি করতো বলেই তো আর কিছু আনতে পারিনি। মা-বাপের আশীর্ব্বাদে শুধু পৈত্রিক প্রাণ নিয়েই পালিয়ে এসেছি। সে আমায় আরও বল্‌লে—'প্রদোষ, এখনও তুমি এখানে আছো দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি—বাঁচতে চাও তো শীগ্‌গীর পালাও।"

মিসেস্ পালিত কহিলেন,—"কিন্তু সেটা যে বর্ম্মা মুল্লুক—আর এ হচ্ছে—"

মিঃ পালিত বাধা দিয়া বলিলেন,—"হ্যা গো! ওদের কাছে সব মুল্লুকই সমান! বোমা মাথায় না পড়লে কি জ্ঞান হবে না? উঃ! সে কি ভীষণ শব্দ! সেই শব্দ শুনলেই তো কালা হতে হবে। না প্রবীর, এক দিনও আর দেরী করা হবে না। তুমি সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও।"

প্রবীর কহিল,—"অনেক আগেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা ঘটেনি, এখন আর ইতস্ততঃ করবার সময় নেই।"

—"বাঃ, আমি তো গোড়া হতেই সে কথা বলেছি,—কেবল তোমার মার আপত্তিতে—কিন্তু আর নয়, চলে যেতেই হবে, এ জন্য আমি গাড়ী পর্য্যন্ত রিজার্ভ করেছি। কালই 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়তে হবে।" ইতিপূর্ব্বে কেহ কোন দিন মিঃ পালিতের মুখে দেব-দেবীর নাম শুনিতে পায় নাই।

প্রবীর কহিল,—"ওরা যেতে রাজি হলেই আমি যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারি।"

মিঃ পালিত এ কথায় যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন,—"আমার কথা যেন কথা নয়! এতগুলো লোক চোখের উপর মারা পড়বে?"

মিসেস্ পালিত বুঝিলেন, অতঃপর তাঁহার জিদ নিষ্ফল, সুতরাং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন।

পৃথা কহিল,—"যাবে ত বলছো,—কিন্তু যাওয়া হবে কোথায় ? কোন্ চুলোয় ?"

মিঃ পালিত কহিলেন,—"কেন, আমার কি দেশ নেই ?"

স্বাহা অবনত মুখে মৃদু স্বরে কহিল,—"হ্যাঁ, পঁচিশ বছর আগে ছিল বটে শুনেছিলাম।"

মিঃ পালিত কথাটা বোধ হয় কাণে তুলিলেন না। দেশের প্রতি মিঃ পালিতের অনুরাগ সহসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এত কাল পরে তাঁহার মুখে দেশের সুখ্যাতি ধরিতেছিল না !

* * * *

এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে অতি ক্ষুদ্র একটি রেল-ষ্টেশনে নামিয়া মিঃ পালিত পুত্রকে লইয়া গো-শকটের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিস্তর দর-কষাকষির পর খান-তিনেক গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সহ তাহাতে আরোহণ করিলেন। জিনিষপত্রও তাহাতে বাঁধিয়া লওয়া হইল। অসমতল সঙ্কীর্ণ পথে বিচিত্র ঝাঁকানি সহ্য করিয়া এবং গাড়োয়ানের অদ্ভুত বাক্যবিন্যাসে পরিতৃপ্ত হইয়া মাইল পাঁচেক পথ কোনক্রমে পাড়ি দিয়া বাল্য-কৈশোরের লীলা-ক্ষেত্র স্ব-গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ সমাগত, সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশ তখনও লোহিত বর্ণে সুরঞ্জিত।

মিসেস্ পালিত যখন নববধূ, সেই সময় এক বার তিনি স্বামীর আগ্রহে ও অনুরোধে শ্বশুরের বাস্তভিটায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র তিন দিনের জন্য। তার পর কাঁদিয়া-কাটিয়া এই বনবাস হইতে তিনি সেই যে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার পর গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা কেহই এই পল্লীভবনে আসেন নাই। আজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া সেই দুর্গম পথের কষ্ট সহ্য করিতে হওয়ায় ক্রোধে দুঃখে তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া স্বাহা ও পৃথা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গরুর গাড়ীর চাকার একঘেয়ে ক্যাঁ কোঁ শব্দ, বলদগুলিকে লক্ষ্য করিয়া গাড়োয়ানের অদ্ভুত বুলি, পল্লীগ্রামের যদৃচ্ছা-বর্দ্ধিত লতাগুল্মের জঙ্গলে শীতের শুষ্ক ঝরাপাতার স্তূপ একত্র মিলিয়া মনটাকে উত্ত্যক্ত করিলেও শীতের মধ্যাহ্নের মধুর সূর্য্যকিরণ আম-কাঁটাল গাছের ঊর্দ্ধে নীল গগনে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমদলের কূজন মাঝে মাঝে যে নূতন স্বাদ দান করিতেছিল, কলিকাতায় তাহা দুর্ল্লভ। তাই চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া স্বাহা কহিল,—"আঃ, বাঁচলুম !"

এ কথা শুনিয়া পৃথা হাসিল। মিসেস্ পালিত মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাঁচার এখনও ঢের বাকী ! দুর্গতির এই তো সবে সুরু !"

অন্য যে গো-শকট হইতে স্বামি-পুত্র অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া মিসেস্ পালিত কহিলেন,—"কি গো, বাড়ী চিনতে পারবে তো ?"

মিঃ পালিত কহিলেন,—"কি রকম ? আমার বাড়ী, আমি চিনতে পারবো না ? এই তো মিত্তিরদের শিবমন্দির, ওই তো মল্লিকদের ঠাকুরবাড়ী।"—তিনি একটি ভগ্ন অট্টালিকার কপাটহীন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"এস।"

গরুর গাড়ী ও অপরিচিত আরোহীদের দেখিয়া বালক-বালিকার দল সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহাদের পিছনে যুবক ও প্রৌঢ়ের দল। সেই দলের এক জন প্রৌঢ় আগন্তুকগণের নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"কেও ? প্রদোষ নয় ?"

মিঃ পালিত ফিরিয়া চাহিলেন, এবং প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হরিহর ! ভাল আছ তোমরা সকলে ?"

—"আর ভাই, কোন রকমে বেঁচে আছি। আমার অত বড় ছেলেটা—" কথা শেষ না করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

স্বাহা ও পৃথা গভীর বিস্ময়ে হরিহরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ পালিত অতঃপর কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেন কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

হরিহর নিজেই সান্ত্বনা লাভ করিয়া কহিলেন,—"তাই মলিনাকে বল্লুম,—বাড়ী তো খালি পড়ে রয়েছে, থাক্ তোরা শাশুড়ী-বৌ এখানে, প্রদোষ এ জন্য রাগ করবে না।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মিঃ পালিত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে হরিহরের মুখের দিকে চাহিলেন। গো-যানে উঠিয়া অবধি তিনি ভাবিয়াছেন, পিতৃপুরুষদের চিরদিনের অবলম্বন প্রাচীন বাসভবনখানি পারিবারিক গৌরবের আধার—নগণ্য পল্লীর ক্রোড়স্থিত সেই পুরাতন অট্টালিকা কালস্রোতে বিলীন হইয়াছে না এখনও তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। জঙ্গল সমাকীর্ণ সেই পৈত্রিক অট্টালিকার অবস্থা এখন কিরূপ, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। তথাপি মিঃ পালিতের মনে হইতেছিল—সেই উপেক্ষিত গৃহ, অনাদৃত বাসভবনখানি যেন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার, এবং সুদৃঢ় দুর্গের মতই নিরাপদ ! তাই তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ও অনুরাগের অন্ত ছিল না। এখন সেই স্থানে এক জন বাল্যবন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। কিন্তু সেই বন্ধুর মুখে তাঁহার বাসগৃহ সম্বন্ধে একটা গোলমেলে কথা শুনিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৃহ কি অন্য কেহ অধিকার করিয়াছে ? সুতরাং তাঁহার যে কণ্ঠ মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে স্নিগ্ধ ছিল,—তাহা কঠোর করিয়া তিনি উগ্র স্বরে কহিলেন,—"কি রকম ? আমার বাড়ী কি তা হলে—"

কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে চতুর হরিহর বাতাসের গতি বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—"সে কি ? বাড়ী তো তোমারই ;—মলিনা তো সেই জন্যই সর্ব্বদা বলে,—'দাদা, প্রদোষ-দা কই এলেন না ?' তা সে বলতে পারে। জ্যাঠাইমা বেঁচে থাকলে মলিনাই তোমার গলায় মালা দিত হে !"

মিঃ পালিত নীরস স্বরে কহিলেন,—"কিন্তু আমাকে তো আমার বাড়ীতে বাস করতে হবে।"

—"বিলক্ষণ ! থাকবে না তো যাবে কোথা ? হ্যাঁ হে প্রদোষ, তোমায় আমি চিঠি দিয়েছিলুম, মলিনা তোমার বাড়ীতে থাকবে—মনে হচ্ছে, তুমি তাতে মত দিয়েছিলে।"

মিঃ পালিত কহিলেন,—"যাক্ সে কথা,—ও-সব আলোচনার এখন প্রয়োজন নেই। চল,—বাড়ীর অবস্থাটা দেখা যাক।"

—"চল" বলিয়া হরিহর প্রদোষকে লইয়া অগ্রসর হইলেন,—পশ্চাতে তাঁহার স্ত্রী-কন্যা। প্রবীর ভৃত্য ও গাড়োয়ানের সাহায্যে জিনিষপত্র নামাইতেছিল,—লণ্ঠনের আলোগুলা সে জ্বালিতে বলিল।

শীতের সন্ধ্যা দেখিতে দেখিতে গাঢ় হইয়া আসিল। মিঃ

পালিতের ভগ্ন গৃহেও সন্ধ্যার শঙ্খ ধ্বনিত হইল। তিনি সচকিত ভাবে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, সন্ধ্যার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে একটি বিধবা তুলসীতলায় সন্ধ্যা-দীপ দিয়া প্রণাম করিতেছে !

মিঃ পালিত থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এই দৃশ্য তাঁহার বড় মধুর বলিয়া মনে হইল। তাঁহার পরিত্যক্ত গৃহে কল্যাণজনক আচরণ এখনও চলিতেছে বুঝিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল।

হরিহর ডাকিলেন,—"মলিনা, প্রদোষ এলো রে ! সবাইকেই নিয়ে এসেছে।"

মলিনা তুলসী-মূলে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়াছিল। চকিতে সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেওয়ালের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল। মিঃ পালিত সেই রমণীকে দেখিয়া বুঝিলেন, এই নারী তাঁহার বহু দিনের বিস্মৃতা, বাল্য-সহচরী মলিনা।

* * * *

জিনিষপত্রগুলা গাড়ী হইতে নামাইয়া লওয়া হইলে হরিহর সেগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিলেন, এবং মিঃ পালিত নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে একটি কিশোরী গৃহদ্বারে আসিয়াই যেন হতভম্ব হইয়া গেল !

হরিহর তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন,—"ভদ্রা, তোর ঠাকুমাকে সবাইকার রান্না চড়াতে বল গে,—আর আমার বাড়ীতেই তোরা আজ সবাই শুবি—বুঝলি ?"

মিঃ পালিত জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিতেই কহিলেন,—"ও ! ভদ্রা—মলিনার নাতনী।" সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রাকে কহিলেন,—"নমস্কার কর এঁদের ভদ্রা ! আমি যেমন তোর দাদামশায়—উনিও তেমনি রে !"

'দাদা মহাশয়' কর্ত্তৃক আদিষ্ট হওয়ায় ভদ্রা কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ পালিতকে প্রণাম করিয়া প্রবীরের পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল। একটা ভারী স্যুটকেশ দুই হাতে টানাটানি করিয়া প্রবীর তখন গলদ্‌ঘর্ম্ম ! অনভ্যস্ত অন্ধকারে সে একাই সেটা নামাইতেছিল; পায়ের কাছে কেহ যে প্রণামের জন্য মাথা নোয়াইয়াছে, সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তোরঙ্গের উপর সেটাকে সমান ভাবে বসাইতে গিয়া ভদ্রার দেহের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিল। প্রবীর চমকাইয়া উঠিয়া "ইস্‌ লাগল !" বলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে ভদ্রার মুখের দিকে চাহিল।

হরিহর বিরক্তিভরে বকিয়া উঠিলেন,—"বোকা মেয়েটার কোন কাজের যদি ছিরি থাকে !"

ভদ্রা মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার কপালে স্যুটকেশের একটা কোণের গুঁতা লাগিয়াছিল। প্রদোষ কহিল,—"আহা ! ওর দোষ কি ?—তুমি নমস্কার করতে বললে, প্রবীর এমন অন্যমনস্ক যে, বেচারার কপালটি—"

প্রবীর সঙ্কোচ ভাবে কহিল—"আমি ত দেখিনি !—আহা, বড়ই লেগেছে, জলের ঝাপটা দিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু প্রবীরের এই সেবা গ্রহণ করিতে ভদ্রা সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না,—প্রণাম অসমাপ্ত রাখিয়াই সে সরিয়া পড়িল।

হরিহর পরিচয় দিলেন,—"রাজার ঐশ্বর্য্য পড়ে আছে, আমার কাছে দুঃখিনীর মত, কি করব ? কপাল ! অতটুকু বয়সে বাপ মারা গেল, মা পাগল হলো !

—"মলিনার ছেলে মারা গেছে ?" প্রদোষ মলিনার নাম এই প্রথম বার উচ্চারণ করিলেন।

—"না, সে কপাল কি তার, তা না হলে তার অভাব কি ? পড়েছিল তো রাজার ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই, কিন্তু কপাল যে ঘুঁটে-কুড়নীর !"

* * * *

বাহিরে যখন এই সকল আলোচনা চলিতেছিল, অন্দরে তখন রান্নাঘরে দুইটি উনান জ্বালিয়া মলিনা রন্ধন আরম্ভ করিয়াছিল।

মাতা ও কন্যাদ্বয় তিন জনে অদূরে তখন একখানা মাদুরে উপবেশন করিয়াছিল। চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গেই আসিয়াছিল, মলিনা চা প্রস্তুত করিয়া তিনটি বাটিতে তিন জনকে দিয়া ভদ্রাকে কহিল, "এ দু'টো বাটি তুই দিয়ে আয় ভদ্রা !"

ভদ্রা অসন্তুষ্ট স্বরে মাথা নাড়িয়া কহিল,—"আমি পারবো না—তুমিই নিয়ে যাও।"

মলিনা বকিয়া উঠিল,—"অত-বড় মেয়ের আক্কেল হ'ল না ! আমি যাব কেন ? তুমি দিয়ে আস্‌তে পারচ না ?"

মিসেস্‌ পালিত কহিলেন,—"না, থাক। আমার চাকর অধর আছে, তাকেই ডাকচি।"

—"না বৌদি, গেরস্থ ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম্ম শিখুক। মানুষ বাড়ীতে এলে আদর-যত্ন করতে হবে না ? পর তো নয় ! প্রদোষ-দার এই আশ্রয়টুকু না হলে মাথা গুঁজতুম কোথায় ?"

চায়ের বাটি হাতে লইয়া ভদ্রা প্রস্থান করিল। মিসেস্‌ পালিত কহিলেন,—"ছেলের না মেয়ের ?"

"ছেলের !" বলিয়া মলিনা হাসিল; কহিল,—"শাশুড়ী-বৌ আমরা এক-বয়সী।"

স্বাতী, পৃথা অবাক হইয়া কহিল,—"সে কি ?" কিন্তু তাহাদের মা কথার গূঢ় ইঙ্গিত বুঝিয়া কহিলেন,—"আগে বৌ এলো, না, আগে শাশুড়ী হ'ল ?"

"না, বৌ আসবার তিন মাস আগেই অবিশ্যি শাশুড়ী গেছেন। কিন্তু সে এক মজার কাণ্ড ! ছেলে গেছল বিয়ে-বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে—ফিরে এল বৌ নিয়ে ! বাপ রেগে ক্ষেপে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধালে ! ভয়ে আমি তো কাঠ ! শেষে থাকতে না পেরে আমিই বৌবরণ করলুম—ড'গর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল কি না।"

কৌতূহলভরে মিসেস্‌ পালিত কহিলেন,—"শ্বশুরঠাকুর এত ক্ষেপলেন কেন ?"

—"সে এক মস্ত ইতিহাস ! ডালটা সাঁতলে নিয়ে গল্পটা বলি। এই যে, ভদ্রা-মা ফিরেছে।"

মুখখানা ভার করিয়া ভদ্রা কহিল,—"হ্যাঁ, ফিরবে বলেই তো এত দেরী, নতুন বৌ তো এখন আসেনি,—এলে দেখে আসবে, খালি জিজ্ঞেস কচ্ছে—'বর পালায় নি ?' না ঠাকুরমাকে নিয়ে আমি আর কোথাও যাব না,—কেবল পাগলামী !"

মিসেস্‌ পালিত চকিত কণ্ঠে কহিলেন,—"পাগল না কি ?"

মলিনা তরকারীর ঝুড়িটা টানিয়া-লইয়া বঁটি পাতিয়া কুটিতে কুটিতে কহিল,—"না, ঠিক পাগল নয়। তবে বাতিকের একটু ছিট আছে।"

সভয়ে মিসেস্‌ পালিত কহিলেন,—"কি রকম করে ?"—স্বর তাঁহার সন্দিগ্ধ।

মলিনা কহিল,—"ভয় নাই বৌদি—তেমন নয় ! টাইফয়েড হওয়ার পর থেকে মাথা একটু গোলমাল হয়েছে। এই এক্ষুণি আসবে।"

মিসেস্ পালিতের গা ছম-ছম করিয়া উঠিল। কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে পাগলের মাথায় কি খেয়াল চাপিবে! এতগুলা অচেনা লোকের ভীড়; তাই বুঝি হরিহর নিজের বাড়ী হইতে ভগিনীকে অন্দের পড়ো-বাড়ীতে সরাইয়া দিয়াছেন!

স্বাহা কহিল—"পিসীমা, গল্পটা বলুন"—এই অল্পকালের পরিচয়ের মধ্যে মলিনা স্বাহা ও পৃথাকে 'পিসীমা' বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে! বিশেষতঃ, তাহার মিষ্ট ব্যবহারটুকু তরুণীদ্বয়ের এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, পিসীমা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে তাহাদের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় নাই।

মলিনা, মিসেস্ পালিতের পানে চাহিয়া কহিল,—"হ্যাঁ বৌদি, তোমায় আমি এই প্রথম দেখলুম, কিন্তু খুব সকাল সকাল, না? জাপানী বোমাকে ধন্যবাদ! ছোটবেলায় মার মুখে একটা ছড়া শুনতুম,—

'চকা বলে চকী রে ভাই এ বড় কৌতুক,
বিধি চেয়ে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ!'

কেমন বৌদি!"—বলিয়া মলিনা হাসিল; কিন্তু মিসেস্ পালিত সে হাসিতে যোগ দিতে পারিলেন না! সহসা তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ লইয়াই দিনটা যেন আসিয়াছিল! বিরসতায় ভরা! মলিনার হাস্য-পরিহাসে ও আদর-যত্নের অবকাশে মেঘখানা ক্ষণেকের জন্য অদৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু সেই হাস্য-পরিহাসের পর সেই অপ্রসন্নতার মেঘ আবার যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

মলিনা কিন্তু অত বুঝিল না। নিজের কথার স্রোতেই সে ভাসিয়া চলিল; বলিতে লাগিল—"তুমি যখন বিয়ের পর এলে, আমি তখন শ্বশুরবাড়ী। ফিরে এসে দাদার মুখে শুনে আপশোষে মরি। সেই খেদ আমার এত দিনে মিটল।"—বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

কিন্তু মিসেস্ পালিতের সন্দিগ্ধতা আরও ঘনীভূত হইল। কাহার আগমনে খেদ মিটিল, মলিনা কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া 'বিধির চেয়ে ব্যাধ ভাল' বলিল? এই প্রশ্ন কাঁটার মত তাঁহার মনের ভিতর খচ্‌খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

পৃথা কহিল,—"পিসীমা, তোমার গল্পটা?"

মলিনা চকিত হইয়া বলিল,—"গল্প? হ্যাঁ, গল্পই বটে! তবে শোন মা! পাড়াগাঁ, বিয়ে-বাড়ী; কনে আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে বসেছে, ওমা! বরযাত্রী আর কনেযাত্রীর মধ্যে কি কথা নিয়ে ঝগড়া বেধে উঠলো। কোন্ পক্ষের মান-মর্য্যাদা কি হানি হল, তা ভগবান্ জানেন, বরের খুড়ো এসে বরের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে তুলে বললে,—'ছোট লোকের সঙ্গে কাজ করব না!' মেয়ের বাপ ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরল! কিন্তু কে তার কথা শোনে? হৈ-হৈ কাণ্ড! সে হাঙ্গামা কেউ সামলাতে পারল না। আমার ছেলেও বিয়েতে গিছল,—সে বরের বন্ধু কি না, ব্যাপারটা কোথায় গড়ায় তা দেখবার জন্য সে সেখানে বসেছিল; কিন্তু দায় চাপল তারই ঘাড়ে! কেলেঙ্কারী থামাতে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ঝক্কি পড়ল তারই মাথায়; মেয়ের বাপ তার হাত দু'খানা ধরে বললে, 'বাবা তুমি দেখছ, দয়া করে তুমিই নাও আমার মেয়েকে।' অন্দরে তখন কান্না-কাটি পড়ে গেছে, ছেলে অগত্যা রাজি হয়ে বরের পরিত্যক্ত আসনে বসলে। কনের খুড়ো, জ্যাঠা ছুটে এল আমার স্বামীর কাছে, হাত জোড় করে সব কথা নিবেদন করলে। বললে, —'আপনি দেবতা, আজ আমাদের—' কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনে তাদের নির্ব্বাক্ হতে হল। স্বামী আমার বললে,—'ছোট লোক—ফন্দীবাজি আমার কাছে—আমার সরকার যে ঘরে কাজ করে না, আমার ছেলে হবে তাদের জামাই?'

'কনের খুড়ো ছিল কড়া মেজাজের লোক! উত্তর দিলে,—'মশাই, তিন মাস আগে কি কোন রাজার মেয়েকে আপনি ঘরে এনেছেন যে, এত—'

এ কথা শুনে স্বামী আরো ক্ষেপে উঠলেন। বললেন,—'এঁ্যা, আমার বিয়ে? পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করেছি না পিত্তি রক্ষে করেছি! বিয়ে আমার হয়েছিল বটে মূলোজোড়ে বোসেদের বাড়ীতে, চার ঘোড়ার গাড়ীতে যাবা আনাগোনা করত।'

'হ্যাঁ, ওই ঘোড়ার পেছনেই সর্ব্বস্ব গেছে।' এমনি কত কথা, থাক্ সে সব কথা! যা হোক, পরের দিন বৌ বাড়ীতে এল! কিন্তু কে তাকে বরণ করে? আমিই এগিয়ে গিয়ে শাঁখ বাজালুম! গরীবের মেয়ে, গরীবের মেয়ের দুঃখ আমি জানি তো! তা বরণ-ডালা তখন কোথায় পাব? ঠাকুরঘরের নির্ম্মাল্য এনে বরণ করলুম! জলের ধারা দিয়ে বউ ঘরে তুললুম। কিন্তু আমায় ঘরে এনেছিল বলে ছেলে আমার মুখ দেখত না; লোকের কাছে আমার পরিচয় দিত—'বাবার পরিবার!' এবার আমায় ডাকলে 'মা' বলে! বললে,—'মা, তোমার দাসী এনে দিলুম।' বললুম, —'না, দাসী কেন, লক্ষ্মী! আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।'

স্বামী কিন্তু ছেলের বৌকে গ্রহণ করলেন না! কে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল,—এটা কারসাজি। এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে তিনি পাকা কথাই দিয়েছিলেন। সেই কথা খেলাপের অপমানে তিনি এতই ক্রুদ্ধ হলেন যে, তেজ্যপুত্র করে তবে ক্ষান্ত হলেন। ছেলেকে বললেন,—'ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখলে আমার ভিটেতে স্থান হবে না! ভদ্রলোকের জাত রক্ষে করেছ—বেশ করেছ, এখন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। পঞ্চাশ টাকা করে মাসহারা পাবে।' ছেলে কিন্তু তাতে রাজি হল না, বললে,—'অগ্নি সাক্ষী করে যাকে গ্রহণ করেছি, তাকে ত্যাগ করা যায় না।' তার পর বাপের ভিটে ছেড়ে কলকাতায় চলে গেল।"

পৃথা কহিল,—"হ্যাঁ পিসীমা, তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন তো?"

—"হ্যাঁ মা, এম-এ পাশ করেছিল। একটা ইস্কুলে মাষ্টারী চাকরী আরম্ভ করলে। পাঁচ বছর কেটে গেল। স্বামী বিছানা নিলেন! তবু ছেলের নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না; 'লোকেন' নাম আর কোন দিন উচ্চারণ করেন নি! কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরের শূন্যতা বুঝতে পারতুম। ছেলেকে বাপের অসুখের সংবাদ দিয়ে আসতে লিখলুম, কোন উত্তর নেই! এক এক করে কতখানা পত্র লিখলুম, ছত্রে ছত্রে কত অনুরোধ অনুনয়! সব বৃথা হল! ভাগ্নেকে তিনি আসতে লিখেছিলেন। আমায় বললেন,—'ছোট বৌ,—অনেক চেষ্টা করলে—আনতে পারলে কি! ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি।' আইন অনুসারে ছেলেকে তেজ্যপুত্র করে সম্পত্তি দিলেন ভাগ্নেকে! আমায় পর্য্যন্ত কিছু দিলেন না, পুত্রের মোহে পাছে আমি সেই অকৃতজ্ঞকে

কিছু দিই। বললেন,—'এক কাণা-কড়িও সেই জন্যে তোমায় দেব না! অপুকে খালি তোমার কথা বলে গেলুম।'

উইল করবার তিন দিন পরেই তাঁকে তাঁর কর্ম্মের জবাবদিহি করতে যেতে হল। বাপ নেই, এই সংবাদ শুনে লোকেন ছুটে এল—আছড়ে পড়ে মেয়েমানুষের মত কি তার কান্না! আমায় বল্লে,—'বাবার অসুখ আমি বিশ্বাস করি নি ছোটমা! ভাবতুম, ও তোমারই একটা ফন্দী আমাকে ফেরাবার জন্যে! অপু-দা বলত, মামা বাবু ভালই আছেন।'

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকল। উইলের কথা জানতে পেরে ছেলে হতভম্ব হয়ে গেল! কিছুকাল কোন কথাই বলতে পারলে না, শেষে বললে,—'বাবা আমায় কিছু দেয় নি! না, এ মিথ্যে, এ হ'তে পারে না,—আমি মকদ্দমা করব।' কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টারের কতই টাকা! তাই নিজের আংটি, ঘড়ি-চেন যা ছিল দিলে, আমিও আমার গয়নাগাঁটি তার হাতে দিলুম, যদি বাপের সম্পত্তি হাতে পায়!

কিন্তু সে উইল অসিদ্ধ হ'ল না। শুধু শুনলুম, অল্প পুঁজি, আমরা নিঃস্ব। রায় বার হবার দু'বছর পরেই কলেরাতে ছেলে মারা গেল। অপু বললে,—'মামিমা, মায়ের আদর-যত্নে তোমায় রাখতে পারতুম,—কিন্তু সাপকে ঘরে ঠাঁই দিতে নেই। আর লোকেনের বিধবা বা ওর মেয়ে এ ভিটেয় স্থান পাবে না।'

বললুম,—'বেশ তাই হোক! ভদ্রা তখন এক বছরের মেয়ে, ওকে নিয়ে দাদার এখানে উঠলুম! ছিলুম, শাশুড়ী-বৌ দু'জন, তা ও-বছর টাইফয়েড হ'ল,—বাঁচবার আশা ছিল না; যম কিন্তু নিলে না, সেরে উঠল,—কেবল ওই এক কথা,—'দেখ, বিয়ে করতে এসে বর যেন না পালায়!'

ডাক্তার ফাঁকা বাড়ীতে রাখতে বলেছিলেন। দাদা বললেন,—'এই বাড়ীই তো খালি পড়ে আছে। প্রদোষ-দাকে চিঠিও না কি লিখেছিলেন; বৌমাকে নিয়ে আজ এক বছর এখানে আছি। প্রথম যখন আসি এখানে, তখন কি ভয়ানক জঙ্গল'!"

স্বাহা কহিল,—"আপনার তো ভারী কষ্ট হবে?"

মলিনা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কষ্ট আর কি? নিজের রাজ-প্রাসাদ যে হারিয়েছে— খোলটা হয়ে গেছে—দেখ ভাই বৌদি, আজ তোমাদের নিরামিষ খেতে হবে।" মলিনা তরকারী চড়াইবে বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

* * * *

মিঃ পালিত পার্শ্বশায়িতা পত্নীকে কহিলেন,—"আজ যে কষ্টটুকু পেলে, কাল আর অতটা হবে না। ঠিক বন্দোবস্ত করে দিতে পারবো।"

মিসেস্ পালিত নির্ব্বাক্ ভাবে পড়িয়া রহিলেন।

মিঃ পালিত আবার কহিলেন,—"কি বল? প্রবীরকে বলেছি, বাড়ীখানা ভাল করে মেরামত করে দিতে।"

মিসেস্ পালিত অবশেষে কহিলেন,—"কিন্তু শুনেছ,—এখানে এক পাগল আছে?"

—"পাগল!" প্রদোষ চমকিয়া উঠিলেন। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—"পাগল!—আমার বাড়ীতে পাগলের আমদানী হ'ল কোথা থেকে?"

—"কোথা থেকে এসেছে, তা কি করে জানব? তুমিই তো এ সব রেখেছ!"—মিসেস্ পালিতের স্বর অভিমান-বিজড়িত!

"আমি পাগল রেখেছি!" বিচলিত স্বরে পালিত কহিলেন,—"ঠাট্টা না কি? আমি কখন কাউকে রাখিনি—পাগল তো দূরের কথা!"

মিসেস্ পালিত এবার জেরা করিলেন,—"তবে ওরা এল কোথা থেকে?"

—"ওরা! মলিনা তো? সে যে হরিহরের বোন, সেই এনে রেখেছে।"

—"তুমি কি বলতে চাও, তোমার সম্মতি না নিয়েই—"

মিঃ পালিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই। তা ওরা এখানে থাকায় কিছুই ক্ষতি হয়নি, ঘর-দোর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে—সে-ও তো অল্প সুবিধার কথা নয়!"

—"মলিনা যে বললে,—দাদা চিঠি লিখেছিল?"

"হরিহর বোধ হয় তাই তাকে বলেছে, আমি জানি, মলিনার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান খুব প্রবল। কিন্তু সে যাই হোক, পাগলটা কে, তা বুঝতে পেরেছ?"

মিসেস্ পালিত রুক্ষ স্বরে কহিলেন,—"তার বৌ, আর কে হবে?"

"বটে! কালই তা হ'লে পাগলটাকে বিদেয় ক'রে দিতে হবে—পাগলের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করা! অসম্ভব।"

—"মলিনার সঙ্গে এ বাড়ীতে থাকতে?"

মিঃ পালিত এই প্রশ্নের গূঢ় ইঙ্গিত লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, মলিনার কি কোন ছেলে-পুলে আছে?"

—"সতীন-পো-বৌ! শাশুড়ী-বৌর একই বয়স বোধ হয়!"

—"মলিনার বুঝি একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?"

—"হ্যাঁ গো! এখন আর সে খেদ করলে কি হবে? এত বকতে পারিনে তোমার সঙ্গে"—বলিয়া মিসেস্ পালিত পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

—"আহা, বড্ড ক্লান্ত হয়েছ, ঘুমোও! আমারও ঘুম পাচ্ছে।" বলিয়া মিঃ পালিত চক্ষু মুদিলেন। কিন্তু চক্ষুতে তাঁহার নিদ্রা আসিল না। নিমীলিত নেত্রের সম্মুখে ছায়ার মত ভাসিতে লাগিল কত পুরাতন দিনের বিস্মৃতপ্রায় ছবি!

* * * *

পৃথা, স্বাহা কয় দিনেই ভদ্রার সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছিল। নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার অভিমান বা ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার এই অশিক্ষিতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী তরুণীর সহিত তাহাদের আত্মীয়তায় বাধা দান করে নাই। প্রবল উৎসাহে, তাহারা দুই ভগিনী ভদ্রাকে সুশিক্ষিতা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রুটীন বাঁধিয়া তাহাকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। ভদ্রার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নম্র আচরণ এবং সলজ্জ মধুর ভাবটুকু তাহাদের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল।

* * * *

ছয় মাসের মধ্যে মিঃ পালিতের পূর্ব্ব-পুরুষদের বাস্তুভিটা যেন নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! কে বলিবে, উহা সেই অতি প্রাচীন জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ পৈত্রিক ভিটা! যেন প্রাচীন মুমূর্ষু ব্যক্তি মৃতসঞ্জীবনী সুধার প্রভাবে নব-যৌবন লাভ করিয়াছে।

পৃথা, স্বাহার কাহারও আর এ গৃহে বাস করিতে আপত্তি নাই। অসন্তুষ্ট কেবল মিসেস্ পালিত, তথাপি বালিগঞ্জের বাড়ী হইতে কিছু কিছু আসবাবপত্র এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অর্গানটাও আনা হইয়াছে। স্বাহা, পৃথা, ভদ্রাকে নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা দেয়। মিসেস্ পালিত তাহার গান শুনিয়া বলিলেন,—"ভদ্রার ভারী মিষ্টি নরম গলা।"

পৃথা হারমোনিয়ম বাজাইয়া ভদ্রাকে কহিল,—"নে, ধর।"

ভদ্রা বলিল,—"কোন্‌টা গাইব পৃথাদি'?"

—"তোর যেটা ইচ্ছে?"

ভদ্রা গান ধরিল,—

"কাজল-বিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিও—"

স্বাহা হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—"দাদা ওই গানখানা গাচ্ছিল,—তুই ঐটাই গাইলি!"

পৃথা বিস্ময়ভরে কহিল,—"দাদা গান গাচ্ছিল! বলিস্ কি?"

—"হ্যাঁ গো! আরসীর সামনে দাড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আজ-কাল তার গলায় গানের ফোয়ারা ছোটে।"

ভদ্রা সলজ্জ ভাবে কহিল,—"তা তোমরা আমায় বল, কি গাইব; যা জানি, তা গাইতে আমার আপত্তি কি?"

পৃথা, স্বাহা সেই ব্রীড়াসঙ্কুচিতা তরুণীর লজ্জারক্তিম মুখের পানে চাহিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

কক্ষমধ্যে যখন এইরূপ হাস্য-পরিহাসের স্রোত চলিতেছিল, পালিত-দম্পতি তখন বেতের চেয়ারে বসিয়া বারান্দায় তখন শীতের মধুর রৌদ্র উপভোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন।

হঠাৎ মিঃ পালিত কহিলেন,—"তোমায় কে বোধ হয় খুঁজছে? আমি আছি বলে এখানে আসতে পারছে না?"—তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন।

মিসেস্ পালিত দেখিলেন,—একটি স্ত্রীলোক সিঁড়ির কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি সিঁড়ির নিকটে আসিয়া সমাদরভরে সম্ভাষণ করিলেন,—"ওমা! তুমি—মলিনা-দি! তা দাঁড়িয়ে কেন? ভাইকে দেখে লজ্জায় একগলা ঘোমটা! এস, এস।"

মিঃ পালিত পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সলজ্জ হাস্যে মলিনা কহিল,—"তোমাদের বিরক্ত করলুম,—দু'জনে গল্প করছিলে।"

—"তা হোক; কিন্তু তোমার যে আর পায়ের ধূলো পড়ে না! —আমি ভাবি, রাগ হ'য়েছে না কি?"

মলিনা বিস্ময়ভরে কহিল,—রাগ! বল কি? রাগ হবে কেন ভাই? আসতে পাই নে! সময় কোথায়? আর ভদ্রার মুখেই সব খবর পাই কি না।—বৌমাও মাঝে মাঝে আসে—বাড়ীখানা দিব্যি হয়েছে; যেন রাজ-অট্টালিকা!"

মিসেস্ পালিত ঈষৎ হাস্যে কহিলেন,—"তার পর হঠাৎ যে আগমন—"

মলিনা যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—"না বৌদি, রাগ করো না, ভাই, আগমন হঠাৎ নয়—দরকার অনেকখানি; ভদ্রার কাল আশীর্ব্বাদ কি না—তোমরা যেয়ো ভাই! দাঁড়িয়ে থেকে সব করিয়ে দিও। দাদাকেও আমার হয়ে বলো। আমার দাদাও বলতে আসবে। পৃথা, স্বাহা ওরাও যেন যায়—ভদ্রাকে সাজিয়ে দেবে। তুমিও যেও বৌদি, লক্ষ্মীটি! আর প্রদোষ দা'কে আমার নাম করে বলো—"

মিসেস্ পালিত বাধা দিয়া কহিলেন,—"বেশ তো, ঘরেই রয়েছে, নিজেই বলে যাও না।"

মলিনা সচকিত ভাবে কহিল,—"না, না,—এমন দশায় তাঁর সামনে বার হতে লজ্জা করে। তুমি বলো ভাই! আজ আর দাঁড়াবার বসবার সময় নেই।"—মলিনা চেয়ার ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল, এবং ব্যস্ত ভাবেই সেই স্থান ত্যাগ করিল।

স্বাহা, পৃথা, ভদ্রার বিবাহের সংবাদ পাইয়া বড়ই খুসী হইল। উৎসাহভরে কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল, যা হোক একটা কিছু করা যাবে!"—তাহারা ভদ্রাকে হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর আনিয়া কহিল,—"দেখি ভদ্রা, তোর মুখখানা।"

পৃথা মাথা নাড়িয়া কহিল,—"হুঁ, লাল হয়েছে!"

ভগিনীদের হাস্যকলরোল শুনিয়া প্রবীর সেখানে আসিয়া কহিল,—"ব্যাপার কি? এত হৈ-চৈ কেন রে?"

তাহারা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"কারণ, ভদ্রার বিয়ে হচ্ছে!"

ভদ্রার সলজ্জ মুখের দিকে চাহিয়া প্রবীর একটু হাসিল। তাহার পর কহিল,—"সুসংবাদ বটে! তা হালের ফ্যাসান অনুসারে ওর বিয়েতে একটা পদ্য লেখা যাবে। তার একটু নমুনা দিই,—

'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে দোয়েল ধরেছে তান,
এমন সময় কাণে এল ভদ্রার বিয়ের গান।'

কেমন, এ রকম কবিতা মঞ্জুর হবে তো?"

স্বাহা কহিল, "সত্যি দাদা! বিয়ের ওই মামুলি পদ্যগুলো শুনলে গা জ্বলে যায়।"

পৃথা কহিল,—"তা হোক, আনন্দ প্রকাশ করা নিয়েই কথা।"

স্বাহা কহিল,—তোমার বিয়েতে ভদ্রাও অমনি আনন্দ প্রকাশ করবে, কি বলিস্ ভদ্রা?"

প্রবীর কহিল,—"ভদ্রা না করলেও আমি করতে শিখিয়ে দেব।"

পৃথা কহিল,—"ভদ্রাকে তখন পাবে কোথায়? তখন একটা কাঁদুনে ছেলে কোলে নিয়েই ও ব্যস্ত থাকবে।"

প্রবীর ভদ্রার পানে চাহিয়া কহিল,—"হ্যাঁ ভদ্রা, ওর কথাটা—"

—"যাও আমি জানি না।" বলিয়া ভদ্রা পলাইবার চেষ্টা করিতেই পৃথা ও স্বাহা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "পালাচ্ছিস্ যে বড়? গুরুদক্ষিণা দিবি নে?"

নিরুপায় হইয়া ভদ্রা পুতুলের মত নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ব্রীড়াবনত দৃষ্টি ভূমিতে সন্নিবিষ্ট।

প্রবীর তাহার লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তুমিও বল না ভদ্রা, আশীর্ব্বাদের বহর দেখে প্রণামীর ব্যবস্থা হবে।"

পৃথা কহিল,—"আশীর্ব্বাদের বহর দেখতে পাবি ভদ্রা। তা কাল কি কাপড় পরবি তুই?"

—"সে আমি কি জানি—"

—"তবে কে জানবে?" স্বাহা, পৃথা উভয়েই অভিযোগের সুরে কথাটা বলিল।

থতমত খাইয়া ভদ্রা কহিল,—"কেন, তোমরা?"

স্বাহা ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল,—"আমরা! কে কে—?"

—"কেন,'তুমি, পৃথা-দি', প্রবীর-দা'।"

স্বাহা হাসিয়া বলিল,—"ওঃ বুঝেছি,—দাদার পছন্দটাই ওর দরকার! কিন্তু তা তোর যতই দরকার হোক ভদ্রা, জজের মেয়ে

দাদার জন্যে তপস্যা করচে ; আর মা ভারী কড়া রাশভারী মানুষ, তা জানিস্ তো ?"

প্রবীর তাড়া দিয়া বলিল,—"কি সব বাজে বকিস্ ?"

পৃথা কহিল,—ঠিক কথাই বলছি। মনের যে বাসনা, তার চেয়ে আর বেশী কি বলা হয়েছে ?"

"আঃ ! পৃথা-দি' !" বলিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া ভদ্রা এবার সত্যই পলায়ন করিল।

প্রবীর কহিল,—"এ তোমাদের ভারী অন্যায় !"

স্বাহা কহিল,—"আমরা ওতে আমোদ পাই কি না !"

পৃথা কহিল,—"তোমার কথা হলেই ভদ্রার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ! তাই তো ও-কথা বললুম ! ও যেন আর কোন আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন না দেখে—"

—"মানুষ কি ভেবে-চিন্তে স্বপ্ন দেখে ? না, যা ইচ্ছা তাই দেখা যায় ?" বলিয়া প্রবীর সেই স্থান ত্যাগ করিল।

উভয় ভগিনী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

*　*　*　*

আজ ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ভদ্রার বিবাহের দিন। গায়-হলুদ, বিবাহ এক দিনেই হইবে। স্বাহা, পৃথা ইহাতে আপত্তি করিলেও ব্যয়-বাহুল্যভয়ে তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই।

মিসেস্ পালিত সকালেই সপরিবারে এ বাড়ী আসিলেন। সন্ধ্যায় বর আসিবার পূর্ব্বে মিঃ পালিত সেখানে উপস্থিত থাকিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রবীর বরের আসর সাজাইবার এবং পৃথা ও স্বাহা কনে সাজাইবার ভার লইয়াছে। মিসেস্ পালিত বাকী সব কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মলিনা পুনঃ পুনঃ মিসেস্ পালিতের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে এবং স্বাহা, পৃথা ও প্রবীরকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। কিন্তু চক্রীর চক্র কখন কোন্ দিকে ঘুরে, তাহা কেবল সেই চক্রীই জানেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা-সমাগম হইল, তথাপি বরের বাড়ী হইতে তৈল-হরিদ্রাটুকু পর্য্যন্ত কেহই লইয়া আসিল না, তত্ত্ব তো দূরের কথা ! দেখিয়া শুনিয়া হরিহরের হর্ষ-সমুজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি দুই বার বরের বাড়ী লোক পাঠাইলেন—কিন্তু কোন সমাচার লইয়া কেহই ফিরিয়া আসিল না।

স্বাহা ও পৃথা বলিল—"বোমা সেইখানেই পড়ছে না কি ? তাই কি কেউ আসচে না ?"

মিসেস্ পালিতের মুখকান্তি জলদজাল-সমাচ্ছন্ন আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ভদ্রার মাতা আসিয়া কহিলেন—"তা হোক ! তত্ত্ব নাই বা এলো, সকলে এখনই খেয়ে নাও—বিয়ের সময় তাড়াতাড়িতে খাওয়া হবে না।"

মিসেস্ পালিত কহিলেন—না না, তা কি হয় ? বিয়ের কোন খোঁজ নেই; আগেই খাওয়া !"

ভদ্রার মা ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন;—"কেন হবে না ? এত সব রান্না-বান্না; খাবে না তো কি করবে ?"—তিনি নিজেই এক গোছা কলাপাতা আনিয়া পাত সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। পাগল মানুষ বলিয়া তাঁহার কার্য্যের কেহ প্রতিবাদ করিল না।

মলিনা আসিয়া বিমর্ষ মুখে কহিল—"বোমা, পাত কচ্ছ—ভালই ; সকলে এখনই খেতে বসুক। কি বল বৌদি ?"

মিসেস্ পালিত অপ্রসন্ন স্বরে কহিলেন;—"তোমরা যা ভাল বোঝ কর ! সকলেরই ক্ষুধা পাইয়াছিল ; সুতরাং বিশেষ প্রতিবাদ না করিয়া সকলেই আহারে বসিল। উৎসাহহীন ভোজন শেষ হইলে সকলেই অস্বচ্ছন্দ চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভদ্রার মা কহিলেন,—"হ্যাঁ গা, ওই যে ছেলেটি আসর সাজাচ্ছে—ওর সঙ্গেই ভদ্রার বিয়ে দাও না।"

পৃথা, স্বাহা কথাটা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। পৃথা বলিল,—"আমার দাদার কথা বলছো।"

মিসেস্ পালিত বিরক্তিভরে উঠিয়া মলিনার নিকট আসিয়া তাহাকে কহিলেন,—"আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

—হ্যাঁ বৌদি, বড় খাটুনি হল—তা এসো, আর দাদাকে সব বলো।"

মিসেস্ পালিত প্রস্থান করিলেন।

ভদ্রার মা তখন স্বাহা ও পৃথাকে গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেই মলিনা সেখানে আসিয়া ধমক দিয়া কহিল,—"বৌমা, তোমায় না ঠাকুরঘরে যেতে বললুম ? যাও, এখনই উঠে যাও—শুনলে ?"

—"যাই মা ! আমি বলছিলুম কি জান ? এদের দাদাকে দেখেছ,—তাকেই জামাই করলে হয় না ?"

মলিনা বকিয়া উঠিলে তিনি উঠিয়া চলিতে চলিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"বেশ ! মানুষকে ও-কথা বলব না ; মনের কথা ঠাকুরকে জানাই গিয়ে। তিনি অন্তর্য্যামী, সকলেরই মনের কথা জানতে পারেন।"

উহা শুনিলে কে বলিত—পাগলের অর্থহীন প্রলাপ ?

*　*　*　*

হরিহর নিঃশব্দে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে মলিনা। উড়ানীখানা আলনায় রাখিয়া হরিহর কহিলেন,—"যা বলেছিলুম, তাই ! ভাংচি ! গেছলুম নিজে—দেখলুম, ভারী ঘোঁট চলছে। বরের বাপ বলে—'না মশায়, পাগলের মেয়ে কেউ জেনে, শুনে ঘরে আনে ?' আমি বললুম,—'রোগে মাথা একটু খারাপ হয়েছে ; আসলে পাগল নয় !'—এ কথা শুনে ছেলের জ্যেঠা বললে,—'তা হোক, পাগলের মেয়ে বৌ করতে নেই।' এত বললুম, কিন্তু কোন কথাই কাণে তুললে না !"

ক্ষীণ কণ্ঠে মলিনা কহিল,—"যেমন অদৃষ্ট ! আচ্ছা, দত্তদের সেই—"

হরিহর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ !—তার স্বভাব বড়ই খারাপ ! পাকা মাতাল ! তাই তো তার বিয়ে হচ্ছে না। আচ্ছা দেখি, বাড়ীখানা তো তবু আছে !"

*　*　*　*

হরিহরের ঘরে যখন এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছিল,—পালিত-বাড়ীতে তখন অধ্যয়নরত অধ্যাপক ঘড়ীর বাজনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; তাঁহার স্মরণ হইল,—বিবাহ-বাড়ীতে যাইবার সময় উত্তীর্ণ-প্রায় ! তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র ভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সেই সময়ে মিসেস্ পালিত দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া বিমর্ষ মুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া অধ্যাপক নিমিষে বুঝিয়া লইলেন,—বিবাহ-বাড়ীতে তাঁহার গমনে বিলম্ব দেখিয়া গৃহিণী তাগিদ দিতে

আসিয়াছেন। আত্মসমর্থনের জন্য তিনি ব্যগ্র স্বরে কহিলেন,—"কখন্ থেকে পাঞ্জাবীটা খুঁজছি—তা কি পাবার জো আছে? কোথা গেল সেটা?"

অন্য সময় হইলে মিসেস্ পালিত স্বামীর এই জবাবদিহি শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতেন। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া নীরস স্বরে কহিলেন,—"ওই তো রয়েছে! তা এখন আর কি করতে যাবে ওখানে?"

বিস্মিত কণ্ঠে মিঃ পালিত কহিলেন,—"কি করতে যাব? বিলক্ষণ! হরিহর কত করে বল্লে—"

—"বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, বর আসেনি!"

মিঃ পালিত হতভম্বের মত পত্নীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ পালিত কহিলেন,—"দত্তদের কে না কি এক ন্যাড়া আছে, হাভাতে! তারই বাপের পায়ে ধরতে গেছে হরিহর বাবু।"

বিমূঢ় কণ্ঠে মিঃ পালিত কহিলেন,—"সেই পাত্র?"

—"তারা বলেছে—পাগল। আমরা বড্ড বিশ্রী পাগল—চলে এলুম। প্রবীর, পৃথা, স্বাহাকে ডাকলুম, কেউ এল না। ভদ্রা কাঁদছে বসে বসে।"

মিঃ পালিত মুহূর্ত্ত কাল কি চিন্তা করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন।

মিসেস্ পালিত কহিলেন,—"যাচ্ছ?"

—"হ্যাঁ?"

—"প্রবীরকে পাঠিয়ে দিও।"

মিঃ পালিত তখন বারান্দা হইতে নামিয়া পড়িয়া কি উত্তর দিলেন,—বোঝা গেল না।

* * * *

বালিগঞ্জে পালিত-ভবনে আনন্দভোজের ব্যবস্থা হইতেছিল! মিঃ প্রদোষ পালিতের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রবীর পালিতের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ,—বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে পুত্রের বিবাহের সংবাদ জানাইয়া দেওয়া। তাই আষাঢ়ের আকাশের প্রভাহীন রৌদ্রের মত মিসেস্ পালিতের মুখ বিরস।

কিন্তু পৃথা ও স্বাহা আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, প্রকাণ্ড সোরগোল তুলিয়া নিমন্ত্রিতদের নামের ফর্দ্দখানা দীর্ঘ করিতে ব্যস্ত। অবশেষে মিসেস্ পালিত বিরক্তিভরে মন্তব্য করিলেন, ঘরে দু'-দুটো ধাড়ী আইবুড়ো মেয়ে রেখে ছেলের বিয়েতে এত ঘটা না করলেই নয়?"—মিসেস্ পালিত রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

মায়ের কথায় মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিরুৎসাহ-চিত্তে তিনি ইজিচেয়ারখানাতে শুইতে যাইতেছেন, এমন সময় ভৃত্য ডাকের চিঠি লইয়া আসিল। চিঠিখানা হাতে লইয়াই মিসেস্ পালিত দেখিলেন—লেডি বিশ্বাসের পত্র! ব্যস্ত হইয়া তিনি পত্রখানা পাঠ করিলেন, লেডি বিশ্বাস লিখিয়াছেন—

"কল্যাণীয়াসু,

শ্রীলেখা, কলিকাতায় তিন দিন হ'ল ফিরেছি; বোমার ভয়ে স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করে পরিবারবর্গকে বাঁচাবার আশায় দেশ ছেড়ে গিয়েছিলুম,—তা বাঁচালুম ভাল! আমার বড় মেয়ের দু'টি ছেলে—একটিকে হারালুম—পুকুরের জলে, অন্যটিকে হারালুম টাইফয়েডে! নিজেও ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি! আশা করি, তোমরা ভাল আছ! এইবার কাজের কথা বলি,—আমি তোমার কন্যা দু'টিকে বধূরূপে লইতে ইচ্ছা করি, এবং আমার লীলার সহিত প্রবীরের বিবাহ দিতে চাই! যদি তুমি এতে সম্মত হও তো আগামী মাঘ মাসেই শুভ কাজ সুসম্পন্ন করবার আয়োজন করি। ইনি বলেন,—লীলার বিবাহই আগে হোক,—কারণ, তোমার পৃথা, স্বাহার চাইতে লীলা এক বছরের বড়, এ বিষয়ে তোমার মতামত একটু সত্বর জানাবে; কারণ, চারি দিক্ হতেই ছেলেদের বিয়ের তাগিদ আসচে! আমায় ভাবী ব্যস্ত করে তুলেছে! তবে যদি লীলাকে তুমিই নাও, তা হলে আর কারুর উপরোধ অনুরোধ গ্রাহ্য করবার দরকার হবে না' ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

দিদি।"

মিসেস্ পালিত পত্রখানা একটা গভীর নিশ্বাসের সহিত শেষ করিলেন। খোলা জানালাটার দিকে চাহিয়া অস্তোন্মুখ তপনের রাঙা আলোক-তরঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন।

ঠিক সেই সময়ে প্রসাধনরতা ভদ্রাকে সিনেমায় যাইবার জন্য প্রবীর ভয়ানক তাড়া দিতেছিল। স্বামীর তাগিদের উত্তরে ভদ্রা কহিল,—"আমি ইংরিজি নাটক বুঝতে পারি নে।"

হাসিয়া প্রবীর কহিল,—"আমি পাশে থাকতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আর নিয়ে যাচ্ছি—এতে পড়াশোনার দিকে তোমার একটু বেশী ঝোঁক হবে।"

ভদ্রা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে।"

—"কি?"

—"আমায় বিয়ে করে ভারী মুস্কিলে পড়েছ! অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে, না? মা ভাবছেন কি পরিচয় দেবেন?"

—"কেন তাঁর পুত্রবধূ বলে! এর চেয়ে অন্য পরিচয়ের মর্য্যাদা বেশী না কি?"

—"বাবা যদি অতখানি দয়া না দেখাতেন, কি হতো তবে?"

"—বেশ হত, সেই ন্যাড়া বাঁদরের গলায় মুক্তার হার তুলতো।"—বলিয়া প্রবীর হাসিতে লাগিল। শেষে কহিল,—"কেউ তোমায় পেত না গো—আমিই নিতুম। আমিই তোমার বিয়েতে ভাংচি দিয়েছি—পাঁচটি টাকা খরচ করে লোক পাঠিয়েছিলুম।"

হতভম্বের মত মুহূর্ত্ত কাল স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া থাকিয়া বিমূঢ় কণ্ঠে ভদ্রা কহিল,—তুমি ভাংচি দিয়েছিলে?"

বুকে করাঘাত করিয়া প্রবীর সগর্ব্বে কহিল,—"হাঁ, আমিই। কি করব? এমন চাঁদমুখখানা যে অন্যে কেড়ে নেবে, তা সইতে পাল্লুম না।"—বলিয়া প্রবীর পত্নীকে সাদরে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল,—"কি করি? মা তো জজসাহেবের অনার্স পাশ কালো মেয়েটাই গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন; কিন্তু সেই উঁচু-হিল জুতো আর বিলিতি মেজাজ আমার ধাতে সইত না! তাই বোমার ভয় এসেই তো বাঁচিয়ে দিলে! বাবাকে রোজই ভয় দেখাতুম,—তাঁকে পালাবার পরামর্শ দিতুম, যাতে ফাঁড়াটা পেছিয়ে যায়।"

"মা গো, এতও জান।"—বলিয়া স্বামীর সোহাগে গলিয়া ভদ্রা প্রবীরের স্কন্ধে মুখ লুকাইল।

মিসেস্ পালিত সক্রোধ পদবিক্ষেপে স্বামীর পাঠকক্ষে প্রবেশ করিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"বোমা পড়েছে !"

হাতের বইখানা খসিয়া টেব্‌লের উপর পড়িয়া গেল। মিঃ পালিত সভয়ে কহিলেন,—এ্যাঁ, সাইরেন—"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভার্য্যা কহিলেন, "সাইরেন বাজবে কেন ? বোমা যে আমার মাথায় পড়েছে ! এই দুই হাতী হাতী আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে বসে থাক। দিচ্ছিলুম তো অমন ঘরে বিয়ে। বেশ হয়েছে,—যাও, পাড়াগাঁয়ে দু'টো পাত্তর খুঁজে আন এইবার। মনে রেখ, বি-এ অনার্স, আই-এ স্কলারশিপ—এ সব বিয়ের বাজারে কাজে আসে না ; সেখানে চাই টাকা।"—বলিয়া তিনি লেডি বিশ্বাসের পত্রখানা স্বামীর টেব্‌লে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সক্রোধে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ষষ্ঠ—এইবার দেখা যাইবে, ম্যাক্সমূলরের নাম করিয়া ভারতীয় দর্শনকে দর্শন বলিতেও অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তি হইয়াছে। বলা হইতেছে—"ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে দর্শন বললে যা বুঝায়, ভারতের দর্শন তা নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে "দর্শন" বললে বুঝায়—জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা। কিন্তু ভারতীয় দর্শন, শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে একটা স্বাধীন প্রমাণ বলে মানে। কোনও মত বা বিশ্বাসকে শ্রুতি-সম্মত বলে দেখাতে পারলে এই দর্শনানুসারে সেই মত বা বিশ্বাস প্রমাণিত হয়ে গেল। * * যা হো'ক, বেদমূলক ভারতীয় দর্শনে এই শাস্ত্রাধীনতা থাকাতে পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেকে একে দর্শনই বলতে চান না।" (১০৫ পৃঃ)

এতদুত্তরে আমরা বলি, আচ্ছা, পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিতে না হয় আমাদের দর্শন দর্শনই নহে, আমাদের দৃষ্টিতে তাহা দর্শনই। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য আমাদিগকে যাহাই কেন বলুক না, আমাদের তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমরাও বলিব, পাশ্চাত্ত্য দর্শনও দর্শনই নহে ; কারণ, তাহারা অলৌকিক বিষয়ে যুক্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্ত্য দর্শন ভারতীয় দর্শনের ছায়া বা বিকৃতিবিশেষ। বহু প্রমাণই আছে যে, পাশ্চাত্ত্যগণ ভারতীয় বিদ্যা লাভ করিতেছেন। দেখা যায়, ক্যাণ্টের জীবদ্দশাতেই উপনিষদের আরবি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে এবং ক্যাণ্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহা লাটিন ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। যে গ্রন্থ যখন অনূদিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে তাহার প্রচার হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ক্যাণ্ট উপনিষদের কথা জানিয়াছিলেন কল্পনা করা যায়। সক্রেটিসের সহিত এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার-কথাও ম্যাক্সমূলর স্বীকার করেন। পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের জন্মদাতা আরিষ্টটল আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহিত মিলনেরও প্রবাদ আছে। তাহার পদার্থ-বিভাগ বৈশেষিক দর্শনের অনুরূপ। রোমের সভায় বৌদ্ধ-সমাগমের কথাও শুনা যায়। (এ জন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের অদ্বৈতবাদ ২১৪-২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এইরূপ নানা কারণে আমরা মনে করি, ভারতীয় দর্শনের ছায়াই পাশ্চাত্ত্য দর্শন ; অথবা তাহারই বিকৃত রূপ-বিশেষ।

তাহার পর পণ্ডিত মাক্সমূলরের দোহাই দিয়া নিজ মত প্রকাশিত করিলে স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন প্রকট হয় কি ? এই ম্যাক্সমূলর সাহেব তাঁহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তিনি যে বেদাদি গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খৃষ্টান পাদরিগণের সুবিধার জন্য। (Chips from a German workshop গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) অতএব তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়াই তাঁহার কথা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন "পাশ্চাত্ত্য দেশে দর্শন বললে যা বুঝায়, ভারতের দর্শন তা' নয়। "পাশ্চাত্ত্য দেশে দর্শন বললে বুঝায় জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে সেই স্বাধীন চিন্তা নাই। ভারতীয়েরা শ্রুতিপ্রমাণেই সন্তুষ্ট।" এতদুত্তরে জিজ্ঞাসা করি—বৌদ্ধ জৈন কি ভারতীয় দর্শন নহে ? তাঁহারাও ত বেদ মানেন না ; অতএব ম্যাক্সমূলরের এই কথা সঙ্গত হয় কি করিয়া ? সাংখ্য ও যোগদর্শন, ইঁহারা অনুমান ও অনুভব দ্বারা ঈশ্বর বা পুরুষ বা প্রকৃতি প্রভৃতি প্রমাণ করিয়া পোষক প্রমাণরূপে বেদ-প্রমাণ প্রদর্শন করুন। ইহাতে কি তাঁহারা শ্রুতি দেখাইয়া নিজ মত প্রমাণিত করিলেন—বলা যায় ? পোষক প্রমাণ ও সাংখ্য প্রমাণ কি অভিন্ন ? যদি বলেন, বেদান্তে সেই ভাবই আছে, তাঁহারা শ্রুতি দেখাইয়া সন্তুষ্ট ? কিন্তু তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু হইলেও সিদ্ধ বস্তু বলিয়া তাহার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শ্রুত্যনুকূল অনুমানাদি প্রমাণগম্যও বটে। কেবল অনুমান বা কেবল অনুভবের দ্বারা সন্দেহের অবকাশ থাকে বলিয়া শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা তাহার নিবারণ করা হয় মাত্র। এ জন্য বেদান্তদর্শন ২য় সূত্র শাঙ্করভাষ্য এবং মাণ্ডুক্যকারিকা ভাষ্য ৩।১ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।* অতএব বেদান্তও শ্রুতির দোহাই দিয়া সন্তুষ্ট নহে। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ কি শ্রুতি দেখাইয়া সন্তুষ্ট ? তাহার পর শ্রবণের পর যে মননের বিধান, তাহার উদ্দেশ্য

* কিন্তু শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবম্ ইহ প্রমাণম্ অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।১।২ সূত্র)। অদ্বৈত···শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্ (মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।১) ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কি—ভাবিলে ত ওরূপ কথা বলাই যায় না। মনন অর্থই এ স্থলে অনুমানাদি সহকারে যুক্তি বিচার করা। অতএব বেদান্তই বা কি করিয়া 'শ্রুতি-প্রমাণ দেখাইয়া সন্তুষ্ট' বলা যাইতে পারে? গৌড়পাদীয় আগমের দ্বিতীয় প্রকরণের ভাষ্যেও যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণের কথা বলা হইয়াছে। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখী অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে কি যুক্তিপ্রদর্শন নাই? বৌদ্ধ, জৈন এবং নৈয়ায়িকগণ কি শ্রুতি দেখাইয়াই সন্তুষ্ট? অতএব এতাদৃশ আক্ষেপ স্বমতানুরাগাধিক্য বশতঃ অন্ধতাবিশেষ বলিলে চলে না কি?

তাহার পর বেদকে বেদান্তে ব্রহ্ম বিষয়ে মুখ্য প্রমাণ ও অনুমানাদিকে গৌণ ও লৌকিক প্রমাণ বলা হয় কেন, তাহাই একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। দেখা যায়, জগতের যে মূল কারণ, তাহা বেদান্তমতে অলৌকিক বস্তু বলা হয়। কারণ, যাহা জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা যদি নিজ পূর্ব্বরূপে তখনও বর্ত্তমান থাকে, তবে সেই পরিণাম আর সত্য পরিণাম-পদবাচ্য হয় না। তাহাকে তখন মিথ্যা অর্থাৎ প্রাতীতিক বলিতে হইবে, অর্থাৎ তাহা নাই অথচ প্রতীতি হয়, এইরূপ একটি বস্তু বলিতে হইবে। আর যদি জগতের মূলবস্তু জগদ্রূপে পরিণত হইবার পর বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে সেই মূল বস্তু আর নাই, জগৎই সেই মূলবস্তু হইয়া যায়। আর যদি সেই মূল বস্তু সত্য সত্য জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও পূর্ব্বরূপে বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা আর লৌকিক বস্তুই হইতে পারে না। তাহাকে অলৌকিক বস্তুই বলিতে হইবে। এ জন্য জগতের সত্যতাবাদীরও নিকট জগৎ-কারণ বস্তুটি অলৌকিক বস্তুই হয়, এবং জগতের মিথ্যাত্ববাদীর নিকটও জগৎকারণটি অলৌকিক বস্তুই হয়। আর জগৎকেই জগতের মূল বলিলে জগতের মূলান্বেষণই ব্যর্থ হইয়া যায়। এ জন্য জগৎকারণ লৌকিক বস্তু হয় না। এই অলৌকিক বস্তু বিষয়ে সত্য নির্ণয়ে অল্পজ্ঞ আমরা অভ্রান্তরূপে করিতে পারিব, ইহা আশা করাই যায় না। সর্ব্বজ্ঞ যদি কেহ থাকেন, তবে তিনিই তাহা করিতে পারিবেন, ইহাই সঙ্গত। এই যুক্তিও ঈশ্বরাস্তিত্বে একটি প্রমাণ, এই সর্ব্বজ্ঞের উক্তিই বেদ, ইহাই আমাদের অনাদি কালের প্রবাদ। এই বেদ না মানিলে কোনও যুক্তি—কোনও প্রমাণ জগতের মূল তত্ত্বের কথা অবিসম্বাদিত ভাবে বলিতে পারে না। যে যাহাই নির্ণয় করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া তাহার অন্যথা প্রমাণিত করিতে পারা যাইবে। ফলতঃ, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইরূপ নানা কারণে এই অলৌকিক বিষয়ে বেদান্তিগণ বেদকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলেন। অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত কথা বেদ উপদেশ করিলে বেদ অনুবাদক হয়, বেদের আর প্রামাণ্য থাকে না। যাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না, তাহার কথা বেদ বলে বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য; নচেৎ নহে। এই অনাদি সর্ব্বজ্ঞের উক্তি যে বেদ, তাহা না মানিয়া বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাকগণ তর্ক দ্বারা কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাহার ফলে কেহ শূন্যবাদী হইয়াছেন, কেহ বিজ্ঞানবাদী হইয়াছেন, কেহ বা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী হইয়াছেন, কেহ বা সপ্তভঙ্গীন্যায়বাদী হইয়াছেন, কেহ বা দেহাত্মবাদী হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আবার পরস্পরে পরস্পরের খণ্ডন করিতেছেন। বেদান্তী এই জন্য এই অলৌকিক বিষয়ে বেদকে মানিয়া এক অবিকারী অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়াছেন। জীবকে সেই বস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। যাঁহারা এই বেদার্থ লইয়া বিবাদ করেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা মীমাংসকগণ "লোকবেদসাধারণ" নিয়ম নির্ণয় করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বেদ দ্বারা জগৎকারণের সর্ব্ববাদিসম্মত একটা নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে; কিন্তু যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহাদের সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহতই থাকিয়া যায়; তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সন্দেহ কিছুতেই দূর হইতে পারে না, এই জন্য বেদান্তিগণ অলৌকিক বিষয়ে বেদকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলেন, আর এই বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক বেদের অনুকূল হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। অপৌরুষেয় বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকর্ত্তৃক রচিত বলিলে বেদের কোনও প্রামাণ্য থাকে না। তখন সেই পুরুষের অনুভব বা প্রত্যক্ষই প্রমাণপদবাচ্য হয়। আর সেই অনুভব বা প্রত্যক্ষ বিভিন্ন মহাত্মগণের বিভিন্নই দেখা যাইতেছে। এ জন্য অলৌকিক বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞের উক্তি বেদ ভিন্ন আর গতি নাই। আর বেদ—কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের উক্ত হইলে যদিও বেদের প্রামাণ্য হয়, তখনও সেই বেদ অনাদিই হয়। কারণ, সর্ব্বজ্ঞের নিকট নূতন কিছুই থাকে না বলিয়া তাহা রচিত বলা যায় না। রচনাকর্ত্তা রচনার পূর্ব্বে জানিলে আর রচনা হয় না, তখন তাহা আবৃত্তি-বিশেষ হইয়া যায়। আর জীব কখনও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, কারণ, সর্ব্বজ্ঞ হইতে গেলে সর্ব্বস্বরূপ হওয়া আবশ্যক হয়। জীব সর্ব্বস্বরূপ হইলে জীবত্বই থাকে না। আর দুই জন সর্ব্বজ্ঞ স্বীকার করিলেও তাঁহারা কখনও বিভিন্ন কথা বলিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতভেদও হয় না। এ জন্য বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় স্বতঃপ্রমাণ শব্দরাশি বলা আবশ্যক হয় এবং সত্যদর্শী ঋষিদিগের মতভেদও নাই বলিতে হয়। এই বেদে বা ঋষিবাক্যে মতভেদ বা মতবিরোধ আছে বলিলে বেদের ও ঋষিবাক্যের অপ্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়। এ জন্য বেদের বা ঋষির মধ্যে মতভেদ বৈদিক হিন্দুর কথাই নয়। আর যদি অলৌকিক বিষয়ে স্বতঃপ্রমাণ কোনও কিছু স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কোন কথাতেই প্রামাণ্যবোধ জন্মিতে পারে না। এই বেদাধীনতার জন্য যাঁহারা ভারতীয় দর্শনকে দর্শন বলেন না, তাঁহারাই ভ্রান্ত, তাঁহারা মরুমরীচিকার জলে তৃষ্ণানিবারণের প্রয়াসী হয়েন। পাশ্চাত্য দেশে দর্শন বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা যেমন জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা—আমাদের দর্শনেও সেইরূপ জগৎ, জীব ও পরমাত্মার চিন্তাই আছে, তবে তাহা সর্ব্বজ্ঞের উক্তি বেদাধীন চিন্তা, কারণ, জগৎকারণ অলৌকিক বস্তু, এই বেদ সর্ব্বজ্ঞের উক্তি বলিয়া তাহা অনাদিও বটে। কারণ, ঈশ্বর যাহা করেন বা করিবেন, সবই তিনি জানেন। এই অলৌকিক বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা কত দূর সম্ভব, তাহা কি "তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) সূত্র হইতেও জানা যায় না? বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য দর্শন জগৎকারণকে লৌকিক বলায় তাহাই দর্শনপদবাচ্য হয় না।

সপ্তম—তাহার পর বলা হইয়াছে—"এই (ভারতীয়) দর্শনে যেটুকু স্বাধীন চিন্তা আছে, তাও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী (method) অবলম্বন করে নি" (১০৬ পৃঃ)।

কথাটা খুব স্পর্দ্ধার কথা বটে। অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্রগ্রন্থ না পড়িলে এই প্রণালী প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহাদের মনোবিজ্ঞানের কথা পড়িতে গেলে অতি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও কুণ্ঠিত হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"প্রণালীহীন মতবাদী"। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে। এতদপেক্ষা ভারতীয় ভাবের নিন্দা আর কি হইতে পারে? এতদপেক্ষা স্বজাতিধ্বংসের প্রশস্ত পথ

আর কোথায়? যখন যে জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সে জাতি নিজের যাহা কিছু সবই মন্দ দেখে, পরেরই ভাল দেখে। এই প্রসঙ্গেই আবার বলা হইয়াছে—"বিশেষতঃ ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি যে সকল বৈদান্তিক গ্রন্থ পড়েছি, যেমন শঙ্করের ভাষ্যত্রয়, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী, শঙ্করের নামে চলিত বিবেকচূড়ামণি, সদানন্দ-রচিত বেদান্তসার, গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা ইত্যাদি, সেই সব গ্রন্থের একটিতেও সেই ভিত্তি পাই নি।" এতদুত্তরে আমরা বলি—এই সব গ্রন্থ তিনি যথাবিধি উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট সম্ভবতঃ অধ্যয়ন করেন নাই। উহার মধ্যেই আমাদের প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। অধ্যাস ভাষ্যের প্রথম বাক্যেই আমাদের দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহা তিনি দেখিতে পাইলেন না কেন? ইহাতেই আছে—(১) যাহা—যাহা, তাহা কখনও অন্য হয় না, (২) ধর্ম্ম কখনও ধর্ম্মী ত্যাগ করে না, (৩) একের ধর্ম্ম অন্যে যায় না, (৪) কিন্তু তাহা হইলেও অনাদি কালের ইহা ব্যবহার, (৫) ব্যবহার ন্যায়সিদ্ধ। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মূলসূত্র হইবার যোগ্য। ইহাতে যে সব আপত্তি হইতে পারে, তাহার জন্য প্রকরণগ্রন্থ আছে। এ স্থলে যে সব গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, উহারা প্রমেয়বহুল গ্রন্থ, উহাতে প্রমাণের কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। প্রকরণগ্রন্থ পড়িতে গেলে আমাদের ন্যায় ও মীমাংসার জ্ঞান আবশ্যক, বৌদ্ধাদি অন্য দর্শনেও জ্ঞান আবশ্যক হয়। অধ্যাপকের নিকট পড়িলে সে সব কথা মুখে মুখে শিক্ষা হয়। বস্তুতঃ, এই প্রমাণতত্ত্ব বিশেষ ভাবে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। উহা না পড়িয়া বেদান্ত পড়িলে কতকটা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় হয়। এই ভাষ্যত্রয় পড়িতে অনেক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরও বহু বৎসর অতীত হয়। আমাদের মনে হয়, এই ভাষ্যত্রয় বুঝিতে গিয়া ইহার উপর যে সব গ্রন্থাদি জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের নাম পর্য্যন্তও অনেকেই জানেন কি না সন্দেহ। এখনও পর্য্যন্ত কত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং কত আবিষ্কৃত গ্রন্থ এখনও পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। অধ্যাস ভাষ্যের খ্যাতিবাদটি বুঝিলে কোনও দর্শন আর অজ্ঞাত থাকে না। আর এ স্থলে বলা হইল—"আমাদের দর্শনে প্রণালী নাই, method নাই।" ধন্য সাহসিকতা। পঞ্চদশীতেও প্রসঙ্গক্রমে এই প্রণালী বর্ত্তমান। বেদান্তসার গ্রন্থখানি সিদ্ধান্তের সূত্র মাত্র। তাহার টীকাতে তাহা কিছু আছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট নহে, মাণ্ডুক্যকারিকা অদ্বৈতবেদান্তের মূল গ্রন্থ, ইহাতে অনেক কথাই আছে। কিন্তু নিজে নিজে পড়িয়া তাহার জ্ঞান আহরণ সম্ভবপর নহে।

অবশ্য অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তাপ্রণালী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত না হইবার অন্য যে একটি মুখ্য কারণ, তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটি সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের দর্শনের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই অবস্থা। রঙ্গিণ উপনেত্র ধারণ করিয়া যাহাই দেখা যাইবে, তাহাই সেই রঙ্গে রঞ্জিত দেখায়। তিনি বলিতেছেন—"অনেক বার বলেছি যে, দেশীয় দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়েই আমি পাশ্চাত্ত্য দর্শনাধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হলাম, এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের পর তাই পেলাম, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।" কোন্ বয়সে কি কি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি দেশীয় দর্শন পড়ে অসন্তুষ্ট হলেন, সেটা কি ভাবা উচিত নহে? আর এই কথাটা তিনি "অনেক বার" বলেন কেন—ইহাও কি ভাবিবার বিষয় নহে? নিরপেক্ষ পাঠক এই কথা হইতেই সংস্কারাধীনতার পরিচয় পাইবেন।

ইহা হইতেই সিদ্ধ হয়, তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহার সামান্য জ্ঞান তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। সেই সামান্য জ্ঞানটা না থাকিলে তিনি তাহা খুঁজেন কি করিয়া? যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা সেই সামান্য ভাবে জ্ঞাত বস্তুর বিশেষ জ্ঞান মাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য—তাঁহার এই সামান্য জ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে? তাহা কি তাঁহার সহজাত বা অর্জ্জিত? সহজাত হইলে তাঁহার বুদ্ধির প্রবল সংস্কারাধীনতার পরিচয় বিশেষ ভাবেই পাওয়া যায়। প্রবল সংস্কারাধীন হইয়া সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার ভাগ্যে নিরপেক্ষ সত্য-লাভের সম্ভাবনা বড়ই অল্প। যিনি যথার্থ সত্যান্বেষী হইবেন, তাঁহার সর্ব্বদা নিজ সংস্কারের উপরও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাঁহার সর্ব্বদা প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতৃগত দোষের জন্য সাবধানতা আবশ্যক! কিন্তু তাহা ত দেখা যাইতেছে না। আর সেই সামান্য জ্ঞানটি যদি অর্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ন্যায়পূর্ব্বক অর্জ্জিত হওয়াই আবশ্যক। তাহা না হইলে পদে পদে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা। কিন্তু সে চিন্তা সে অনুশীলন কি তিনি করিয়াছিলেন? তাঁহার কথা হইতে ত তাহা বুঝা যায় না। তিনি যখন এরূপ কথা লিখিতে পারেন, যে, "শঙ্কর এই উপনিষদের (কৌষীতকি) ভাষ্য করেন নি, সুতরাং এ পড়েছিলেন কি না তাই সন্দেহ" (১০৬ পৃঃ), তখন তিনি কত দূর ন্যায়সঙ্গত কথা বলিতে অভ্যস্ত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু পড়িলেই কি ভাষ্য করিতে হয়? আর শঙ্করই কি যাহা পড়িয়াছেন, সেই সকলেরই কি ভাষ্য করিয়াছেন—বলা যায়? তিনি বহু গ্রন্থের বিচার করিয়াছেন, তাহাদের ত তিনি ভাষ্য করেন নাই বা করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। অতএব এই জাতীয় উক্তি যিনি করিতে পারেন, তিনি কত দূর ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহার পর তাঁহার অনুসন্ধেয় বিষয় প্রথমে কতকটা ক্যাণ্টে এবং পরে হেগেলের Dialectic methodএ অর্থাৎ ভেদের মধ্যে অভেদদর্শনরূপ ভেদাভেদবাদে পাওয়া যাওয়ায় তাঁহার সংস্কারটি পূর্ব্ব হইতেই ভেদাভেদবাদের যুক্তি-সমূহে অভিভূত ছিল বলা যায় না কি? যিনি পূর্ব্ব হইতেই অন্তরে অন্তরে ভেদাভেদবাদী, তিনি অদ্বৈতবাদীর গ্রন্থে method দেখিবেন কোথা হইতে? তিনি দেশীয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইবেন কি করিয়া? ইহা এ স্থলে প্রমাতৃগত দোষের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। অতএব শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান পাইবেন কিরূপে আর দিবেনই বা কিরূপে? এই "ভেদের মধ্যে অভেদ দর্শন" অর্থাৎ ভেদাভেদবাদটি যে একটি অসঙ্গত মতবাদ, তাহা আমরা এখনই দেখাইতেছি, উপস্থিত তদুক্ত পরবর্ত্তী কয়েকটি কথা আলোচনা করা যাউক।

অষ্টম—"তাই পেলাম যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম" (১০৬ পৃঃ), এই কথার পরই তিনি বলিতেছেন—"ক্যাণ্টের পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্যে দর্শনেও নির্দ্দিষ্ট যুক্তিপ্রণালীর যথেষ্ট অভাব ছিল। মোটের উপর বলতে গেলে তখনকার প্রণালী ছিল (১) Dogmatism, অর্থাৎ চলিত মত বিনা বিচারে নেওয়া, (২) Scepticism লৌকিক মত অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ করে ত্যাগ করা।" ইত্যাদি।

ইহাতে বলা হইল, আমাদের দর্শনেও নির্দ্দিষ্ট যুক্তি-প্রণালীর

অভাব ছিল। এ কথার উত্তর কিছু উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা ছিল তাহা চলিত মত বিনা-বিচারে লওয়া এবং লৌকিক মত অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ করে ত্যাগ করা। আচ্ছা, চলিত মত বিনা-বিচারে লওয়া মাত্রই কি দোষাবহ হয়? তাহা হইলে লোকে কি জ্যামিতি শিক্ষা করিতে পারিত? স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলি না মানিয়া, স্বীকার্য্যগুলি না মানিয়া কি কেহ জ্যামিতি শিক্ষা করিতে পারে? আপ্ত পুরুষের বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কি ব্যবহার চলে? "ইনি পিতা, ইনি মাতা"—ইহা কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিলে কি বলিতে পারা যায়? অথবা সব কথাই কি পরীক্ষা করিয়া লইতে পারা যায়? কখনই নহে। অতএব Dogmatism নামেই দোষাবহ হয় না। পূর্ব্বে Dogmatism ছিল, পরীক্ষা করিবার রীতি ছিল না—এ কথা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় কি করিয়া বলিলেন, বুঝা যায় না। পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা মানুষের স্বভাব। ইহা পূর্ব্বে ছিল না, ইহা কি বলা যায়। অবশ্য সাধারণ লোকের মধ্যে সম্যক্‌রূপ ছিল না—এইমাত্র বলা যায়। আর তাহা আজ কি নাই? এরূপ উক্তির সার্থকতা কি? তাহার পর Scepticism অর্থ বলিলেন—"লৌকিক মত অবিশ্বাস্য বলে প্রমাণ করে ত্যাগ করা।" কি চমৎকার কথা! অগ্রে অবিশ্বাস্য বলিয়া বুঝা, পরে প্রমাণ করিয়া ত্যাগ করা। ইহা কি মনুষ্যের স্বভাব? লোকে প্রথমেই বিশ্বাস করে, পরে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ বা গ্রহণ করে। কিন্তু যদি লৌকিক মত বলিয়াই অবিশ্বাস্য বলিতে হয়, তবে ত তাহা প্রমাণ করিয়াই বলিতে হয়, নচেৎ মনুষ্য-স্বভাবের বিপরীত কার্য্যই করা হয়। লৌকিক মত হলেই যে অবিশ্বাস্য হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তাহাতে সংশয় করিয়া পরীক্ষা করিয়া, ত্যাজ্য হইলে ত্যাগ করা, অন্যথা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব ক্যাণ্টের পূর্ব্বে এইরূপ মতবাদ ছিল না, আর প্রাচীন মাত্রকেই ভ্রান্ত বলা এক কথাই হয়। এ স্থলেও মনে হয়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় ভারতীয় দর্শনের উপর অবিচার করিয়াছেন।

নবম—অতঃপর বলা হইতেছে—"ক্যাণ্ট দেখালেন যে, প্রকৃত জ্ঞানপ্রণালী হচ্ছে Criticism of Experience, অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞান ভাব ইচ্ছা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার সূক্ষ্ম পরীক্ষা।"

এ বিষয়ে আমরা বলি—ক্যাণ্ট ইহা দেখাইবার বহু পূর্ব্বে আমাদের দর্শনে ইহা পুরাতন কথা হইয়া গিয়াছে। ন্যায়ের অনুমান-খণ্ডের উপযোগিতাধিক্য বিচারে এ কথা অতি উত্তমরূপেই আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রের রচনাই "উদ্দেশ লক্ষণ ও কীর্ত্তন" এই ক্রমে করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে "বিষয়ের নাম কীর্ত্তন" বিভাগাদি নির্দ্দেশ, তৎপরে লক্ষণ কীর্ত্তন, অর্থাৎ ইতরভেদানুমাপক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ, তৎপরে তাহার পরীক্ষা করিয়া তদবিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। এই সব করা ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠ্যগ্রন্থেই কথিত হইয়াছে। অতএব ক্যাণ্ট ইহা দেখাইলেন—এ কথাটি এ দেশে বলা হাস্যাস্পদ হওয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাহার পর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকলের বলাবল নির্ণয় প্রসঙ্গে পরীক্ষিত্বই বলাধিক্যের নির্ণায়ক—ইহা সূত্রভাষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যায়ামৃত অদ্বৈতসিদ্ধি পর্য্যন্ত গ্রন্থে যেরূপ বিশদ আলোচনা দেখা যায়, তাহাতে ক্যাণ্টের নামে ইহার আবিষ্কার-কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা করা, এ বিষয়ে, অনভিজ্ঞতার নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অদ্বৈতসিদ্ধি ক্যাণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর সন্তান যে পাশ্চাত্য দর্শনে মুগ্ধ হন, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। তাহার পর জ্ঞানকে যে মানসিক ক্রিয়া বলা, ইহাতেও নূতনত্ব নাই। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে "ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া" এই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষই দেখা যায়। সুতরাং এ কথা আরও বহু পূর্ব্বের। এ সকল সত্ত্বেও বলা হইয়াছে, ক্যাণ্টের পূর্ব্বে জ্ঞানের পরীক্ষা-পদ্ধতি ছিল না—কি ভীষণ বিড়ম্বনা!

ক্রমশঃ।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"

গৃহসংসার ছাড়ি যেই পাগলিনী নারী
বেণুতানে ছুটে যায় ভুলি গৃহকর্ম্ম।
কুলশীল লাজভয় সকলি করিয়া জয়
নিছনি দিল যে পায় নিজ নারী-ধর্ম্ম।

মানিল না বন্ধন মানিল না গুরুজন
মানিল না সমাজের পরিবাদ-দণ্ড,
ভূধর-শিখর হ'তে প্রপাত ধারার স্রোতে
ছুটিল যে, প্রেম যার এমনি প্রচণ্ড,

কণ্টকরাজি গাড়ি অঙ্গনে যেই নারী,
ঘটজলে পিচ্ছিল করে তায় শিক্ষা,
আপনার আঙিনাতে কেমনে শ্রাবণ-রাতে
বনপথে অভিসার—পরম তিতিক্ষা,

মানিল না আঁধিয়ার বরষার বারিধার
বজ্রের হুঙ্কার করিল না গণ্য,
ফণীরে দলিল পায়, পৌষের শীত-বায়
কাঁপিল না ছুটে গেল দয়িতের জন্য।

তারে ভুলি শ্যামরায় রাজা হয়ে মথুরায়
বীর-গৌরবে রবে ভোগসুখে মত্ত,
ভুলিবে না এতে ভবী, মানিবে না ইহা কবি
পুরাণ বলুক যাহা ইহা নয় সত্য।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিমান-বোটে বোম্বেটে

চত্বারিংশ তরঙ্গ

ওয়াইল্ডের সঙ্কল্পসিদ্ধি

কয়েক মিনিট কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

আগন্তুকদ্বয়ের উভয়ের মূর্ত্তিই যেন অপরিস্ফুট, ছায়াময়, অপ্রাকৃত! যদি কার্ণের নিকট তাহাদের পরিচয় দেওয়া না হইত, তাহা হইলে কার্ণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিত না। কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক সে সময় বিকৃত ছিল না; আগন্তুকদ্বয়ের কণ্ঠস্বর তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত—ইহা তাহার অবিশ্বাস করিবার উপায় ছিল না। কণ্ঠস্বর যখন মিলিয়া গেল, তখন মানুষও সে সত্য, ইহা স্বীকার না করিবার কোন হেতু ছিল না। কেহ মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতে পারে—এরূপ অসম্ভব কথা কার্ণের মনে স্থান পায় নাই। কার্ণ দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

রোর্কি সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কাপুরুষ, ইতর, মিথ্যাবাদী! তুমি আমার ঘাড়ে এই হত্যার অভিযোগ চাপাইতে সাহস করিতেছ? সাইমন কার্ণ, আমরা উভয়েই উত্তমরূপে জানি যে, আমিই এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। হাঁ, আমিই তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর তুমিই যে সে বাধা না মানিয়া মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছ—এ কথা স্বীকার করিতে এখন তোমার সাহস হইতেছে না, মিথ্যাবাদী নরহন্তা!"

কার্ণ কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও মেটল্যাণ্ড! তুমি এখন আর মনুষ্যদেহে বাঁচিয়া নাই, এখন তোমার প্রেতাত্মা আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, তাহা আমি জানি, তবে আর কেন আমাকে জ্বালাতন করিতেছ। সত্য কথা না শুনিলে যাইবে না? বেশ, আমি সত্য কথাই বলিতেছি—আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছিলাম মেটল্যাণ্ড! তোমার অস্তিত্ব এখন আমার কল্পনায় বিরাজ করিতেছে।"

মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমাদের দুই জনের কাহাকেও আমি এখন গ্রাহ্য করি না। হাঁ, তোমার মত বিশ্বাসঘাতককে আমি হত্যা করিয়াছিলাম; আমি যে রোর্কিকে হত্যা করিতে পারি নাই, এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। মেটল্যাণ্ড, তোমার মত ইতর দুর্জ্জনকে হত্যা করিয়া সত্যই আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সত্য কথা শুনিলে ত? তবে এখন এই স্থান ত্যাগ কর—আমাকে শান্তিতে থাকিতে দাও। তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমি নিরাপদ হইয়াছি। তোমার প্রেতাত্মাকে আমার ভয় নাই। আমি এখন—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কার্ণ হঠাৎ নীরব হইল; সে স্তিমিত নেত্রে সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সেই মুহূর্ত্তেই সেই স্থানে উজ্জ্বল আলোকপ্রভা বিকীর্ণ হইল। একটি দীর্ঘদেহ বলবান্ পুরুষ লাইব্রেরী অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে কার্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে সাইমন কার্ণের হাত ধরিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "সাইমন কার্ণ, তুমি অসকার মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছ, এই অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। আমি তোমাকে এই উপদেশ দান করিতেছি যে, যদি তোমার কোন মন্তব্য বা বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তুমি তোমার কাউন্সিলের সহিত পরামর্শের পর তাহা বলিতে পার। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি।"

কার্ণ বক্তার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "আপনি—তুমি কে?" তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল।

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি আমার পরিচয় জানিতে চাও?—আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড। কার্ণ, আমাদের চালাকীতে তুমি স্বেচ্ছায় ফাঁদে পড়িয়াছ, তুমি মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছ—ইহা স্বয়ং একরার করিয়াছ। চারি জন সাক্ষী তোমার এই স্বীকারোক্তি শুনিয়াছে; সুতরাং এবার তোমার নিস্তার নাই।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি কার্ণের উভয় হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; হাতকড়ি তাঁহার পকেটেই ছিল।

কার্ণ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে তখন যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়াছিল। তখন চারি দিকেই আলোকরাশি প্রজ্বালিত হইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড চারি জন সাক্ষীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মুখোস খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল, তাঁহাদের এক জন রবার্ট ব্লেক, দ্বিতীয় ব্যক্তি রোপার ওয়াইল্ড!

ওয়াইল্ড খুসী হইয়া বলিল, "আমার ফন্দীটা ঠিক কাজে লাগিয়াছে মিঃ ব্লেক! আমি জানিতাম, কার্ণ এই ফাঁদে পড়িবেই।"

চীফ ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, এ অতি চমৎকার ফন্দী! এই নরপিশাচকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমরা বহু দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু উহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে, এরূপ কোন অপরাধে উহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব—এ আশা কোন দিন আমাদের মনে স্থান পায় নাই। এই ভাবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমি প্রশংসা লাভ করিব।"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ওয়াইল্ডই এ জন্য ধন্যবাদের পাত্র। ওয়াইল্ড চমৎকার ফন্দী খাটাইয়াছিল।"

চীফ ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ ওয়াইল্ড, তুমি সত্যই আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র, এ গৌরব তোমারই, আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার প্রশংসা করিতেছি। তোমার বিরুদ্ধে আর আমার কোন অভিযোগ নাই। দুঃখের বিষয়, তুমি এইরূপ প্রশংসাজনক কার্য্যে পূর্ব্বে আত্মনিয়োগ কর নাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "যে সকল কার্য্যে আমি আনন্দ ও তৃপ্তি পাইয়াছি—তাহাই আমার প্রীতিকর ছিল, তাহা সম্পাদনের জন্য আমি কোন বিপদই গ্রাহ্য করি নাই।"

ওয়াইল্ডই স্বয়ং অসকার মেটল্যাণ্ডের প্রেতাত্মার অভিনয় করিয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বরের সহিত তাহার পরিচয় থাকায় সে নিখুঁত ভাবে তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।

ব্লেক রোর্কির কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। কার্ণ তাঁহাদের চাতুরী বুঝিতে পারে নাই। সে উত্তেজিত কল্পনা দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিল।

কার্ণ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ সকলই তোমাদের নষ্টামী, ইহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি।"

লেনার্ড বলিলেন, "সে জন্য তোমার আক্ষেপ করিয়া আর কোন ফল নাই, তুমি যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।"

কার্ণ গর্জ্জন করিয়া বলিল; "আমার হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লও, তুমি আমাকে এ ভাবে প্রতারিত করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে তোমার চাকরী হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিব।"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু তুমি অপরাধ স্বীকার করিয়াছ—এ কথা বিস্মৃত হইও না।"

কার্ণ বলিল, "পাগলের মত কথা বলিতেছ। আমি যে কথা বলিয়াছি, সে জন্য আমি দায়ী নহি। তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়াছ, সেই জন্যই আমি ভাবিয়াছিলাম—"

ওয়াইল্ড বলিল, "তুমি কি ভাবিয়াছিলে, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। তোমার এই প্রলাপ বন্ধ কর। আমি সার রডনে ড্রমণ্ডের এজেণ্ট, আমি তোমাকে চূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এবং অবশেষে তোমাকে আমার মুঠায় পুরিয়াছি, আমার কবল হইতে আর তোমার পরিত্রাণ নাই, এ জন্য তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।"

কার্ণ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া বলিল, "আমার হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইবে? তোমরা আমাকে আটক করিতে পারিবে না, আমি তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল করিব।

কার্ণ সক্রোধে তাহার উভয় হস্ত সবলে আকর্ষণ করিতেই হাতকড়ি দ্বিখণ্ডিত হইল। লেনার্ড তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতবেগে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

লেনার্ড চিৎকার করিয়া বলিলেন, আসামী পলায়, সকলে উহাকে ধরুন।"

ওয়াইল্ড বলিল, "কাহারও ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আমিই উহার ভার লইতেছি।"

ওয়াইল্ড এক লম্ফে কার্ণের অনুসরণ করিয়া চক্ষুর নিমেষে তাহাকে সুদৃঢ় বাহুপাশে বন্দী করিল। কার্ণ মুহূর্ত্তমধ্যে বুকের পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া সরোষে বলিল, "প্রাণের মায়া থাকিলে সরিয়া দাঁড়াও।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আর একটা খুন করিবার জন্য তোমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু তোমার সেই চেষ্টা সফল হইবে না, শীঘ্র তোমার হাতের পিস্তল ফেলিয়া দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিস্তল 'দুড়ুম' শব্দে গর্জ্জন করিল। পিস্তলের গুলী রোপার ওয়াইল্ডের বাহুমূলে বিদ্ধ হইল। কিন্তু ওয়াইল্ড সে দিকে দৃক্‌পাতও করিল না, তাহার পর কার্ণ পুনর্ব্বার গুলীবর্ষণে উদ্যত হইতেই ওয়াইল্ড তাহাকে দুই হাতে জাপ্টাইয়া ধরিয়া মাথার উপর তুলিল এবং সবেগে পুরাতন সোফার উপর নিক্ষেপ করিল। ওয়াইল্ড সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিল। কার্ণ যথেষ্ট বলবান্ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণে তাহার আর নড়িবারও শক্তি রহিল না।

ওয়াইল্ড ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে বলিল, "আপনি উহা অপেক্ষাও শক্ত হাতকড়ি আনুন, যেন তাহা ঐ ভাবে ছিঁড়িতে না পারে।"

কার্ণ সরোষে বলিল, "ওরে শয়তান, আমি এখনও শক্তিহীন হই নাই। আমি মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিয়াছি, তোদেরও সকলকে হত্যা করিয়া আমি মুক্তিলাভ করিব।"

লেনার্ড বলিলেন, "কৌশল করিয়া আমরা তোমাকে অপরাধ স্বীকার করাই নাই, তুমি স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়াছ, এ কথা কি মিথ্যা? ওয়াইল্ড, তুমি সত্যই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, কারণ, তুমি এখানে উপস্থিত না থাকিলে এই নরপশু আমাদের খুন করিয়া পলায়ন করিত। স্মিথ! তুমি আমার অনুচরদের ডাক, তাহারা আসিয়া উহাকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করুক।"

স্মিথ সানন্দে বলিল, "হাঁ, তাহাই এখন কর্ত্তব্য বটে।"

* * * *

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাইমন কার্ণ সম্পূর্ণ অসহায় হইল। তাহার মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। তাহার উভয় হস্ত সুদৃঢ় হাতকড়ির দ্বারা আবদ্ধ হইল, তাহার উপর তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করা হইল। তিন জন বলবান্ পুলিশ-প্রহরীর হস্তে তাহার রক্ষার ভার অর্পিত হইল। পথে যে মোটর-কার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কার্ণকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "একটা হাঙ্গামা চুকিল বটে; এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে—আমি পূর্ব্বে এরূপ আশা করিতে পারি নাই। কিন্তু এই নরপশু তোমাকে গুলী মারিয়া বোধ হয় বিলক্ষণ জখম করিয়াছে, ওয়াইল্ড!"

ওয়াইল্ড তাহার আহত হস্তের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ও কিছুই নয়; মনে হইল, পিপড়ায় কামড়াইয়াছে?"

রবার্ট ব্লেক ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া তাহার আহত হাতখানি ধরিয়া তাহার জ্যাকেটের আস্তিন উর্দ্ধে সরাইয়া দিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। ক্ষতমুখ হইতে তখনও দর দর করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। কার্ণ-নিক্ষিপ্ত গুলী তাহার মণিবন্ধের অস্থি স্পর্শ না করিলেও মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

লেনার্ড সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি যন্ত্রণা বোধ করিতেছ না?"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "হাঁ, বলিয়াছি ত, পিপড়ায় কামড়াইলে যে রকম যন্ত্রণা হয়, সেই রকম যন্ত্রণা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক। ঐরূপ আঘাতে আমার যন্ত্রণা হয় না, ইহা আমার দেহেরই বৈশিষ্ট্য; এই জন্য এই ভাবে আহত হইলে আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করি না।"

অতঃপর ওয়াইল্ড ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "তাঁহাদেরও আসিবার সময় হইল।"

ব্লেক বলিলেন, "কি বলিতেছ ওয়াইল্ড! কাহাদের আসিবার সময় হইল?"

ওয়াইল্ড বলিল, "সার রডনে ও তাঁহার অনুচরের।"

স্মিথ বলিল, "তাঁহারা ত সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়াছেন, তবে তাঁহারা এখনি এখানে কিরূপে আসিবেন?"

ওয়াইল্ড বলিল, "সার রডনে যদি আমার তার পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেখানে যান নাই বলিয়াই মনে হয়। মিঃ ব্লেক, আপনাকে কি আমি এ কথা পূর্ব্বে বলি নাই?"

ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমাকে? কখন তুমি আমাকে ও কথা বলিলে?"

ওয়াইল্ড ন্যাকা সাজিয়া বলিল, আপনাকে সে কথা বলি নাই? বোধ হয়, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এ জন্য আমি দুঃখিত। আমি তাহাকে তার করিয়া জানাইয়াছিলাম,—তিনি যেন উড়ো জাহাজে আজ সন্ধ্যার মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবার চেষ্টা করেন। আশা

করি, তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কথা এই যে, তাঁহার প্রতিশ্রুত পুরস্কারে কথাটা ঠিক সময়েই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "পুরস্কারটা হাতে পাইবার জন্য তুমি কিরূপ ব্যাকুল, তাহা আমার জানা আছে। সার রডনের প্রতিশ্রুতিতে তুমি নির্ভর করিতে পার—ইহা জানিয়াও তুমি তাহার জন্য তাগিদ দিবে বলিয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি এখানে আসিতে তার করিয়াছ—এ একটা কথাই নয়!"

ওয়াইল্ড বলিল, "এ সময় তিনি এখানে আসিয়া পড়িলে তাহা যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে, ইহাও ত অস্বীকার করা যায় না। আমরা তাঁহাকে জানাইতে চাই যে, তাঁহার বিপদের সকল কারণ দূর হইয়াছে, তিনি এখন সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক—স্বাধীন। কারণ, তাঁহার তিন শত্রুই চূর্ণ হইয়াছে। হাঁ, ঐ তিনি আসিতেছেন, আশা করি, আমার এই ধারণা নির্ভুল।"

ওয়াইল্ডের কথা শুনিয়া সকলেই উৎকর্ণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্মিথ বলিল, "কই, আমি ত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, কিন্তু এই বদমায়েসটার কথা স্বতন্ত্র, উহার কান টেলিফোনের রিসিভারের মতই প্রখর!"

অল্পক্ষণ পরেই সার রডনে ড্রমণ্ড তাঁহার পরিচারক জার্ভিসকে সঙ্গে লইয়া ব্যগ্র ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সার রডনে ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমি আসিবার সময় পুলিশের মোটর-গাড়ীতে কার্ণকে প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহাকে নিশ্চিতই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমার তিন শত্রুর মধ্যে সেই শেষ শত্রু। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।"

ব্লেক বলিলেন, "আপনার ধন্যবাদের পাত্র আমি নহি, সার রডনে। ওয়াইল্ডকেই আপনি এই কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, সে দক্ষতার সহিত আপনার আদেশ পালন করিয়াছে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, এই কার্য্য সাধন করিয়া আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি, সার রডনে! আমার এ আনন্দের তুলনা নাই।"

সার রডনে ওয়াইল্ডের করমর্দ্দন করিয়া লেনার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর আপনার এখানে কি কাজ ছিল, ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিনিধি-রূপে এখানে উপস্থিত আছি।"

সার রডনে হাসিয়া বলিলেন, "এই ত্র্যহস্পর্শ আশার অতীত—তিন জনের এক জন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিখ্যাত ইন্‌স্পেক্টর, দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ডিটেক্‌টিভ এবং তৃতীয় ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কি বলি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তস্কর!"

ওয়াইল্ড বলিল, "কিন্তু স্মিথের কথাও আপনার ভুলিলে চলিবে না। স্মিথ অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য-সাধন করে।"

সার রডনে বলিলেন, "হাঁ, আমি জানি, স্মিথের সাহায্য অপরিহার্য্য। কিন্তু আমি ওয়াইল্ডকে তস্কর বলিয়া তাহার প্রতি বোধ হয় অবিচার করিলাম। ওয়াইল্ড সত্যই খাঁটি লোক। তাহার বিরুদ্ধে আমি কোন অভিযোগ শুনিতে চাহি না। দেখুন ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড, আপনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিনিধি কি না, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই; কিন্তু আমি ওয়াইল্ডকে আমার বন্ধু মনে করি, এবং তাহার বন্ধুত্ব আমার গৌরবের বিষয়। মিঃ ব্লেক, এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"

ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, "ওয়াইল্ড ন্যায়বিচারের অনুকূলে যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা যে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গৌরবজনক। আমি আশা করি, ওয়াইল্ড এখন হইতে এই পথেরই অনুসরণ করিবে।"

সার রডনে উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন, "আমিও সেইরূপ আশা করি; কিন্তু ওয়াইল্ড, আমি এক-কথার মানুষ, আমার অঙ্গীকারের কখন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে যে পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, কালই তুমি তাহা পাইবে। তোমার চেষ্টায় আমার সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, আমি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, আমি এখন নিরাপদ, ইহার তুলনায় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় আমি নিতান্ত—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আপনার নিকট এই পুরস্কার লাভ করিয়া আমি সুখী হইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আমি আপনার জন্য যাহা করিয়াছি—এই পুরস্কারের তুলনায় তাহা নিতান্ত তুচ্ছ। যদি আপনি উহার পঞ্চমাংশ আমাকে দান করেন—"

সার রডনে বলিলেন, "বোকার মত কথা বলিও না, ওয়াইল্ড! আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তোমাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতেই আমার আনন্দ। তোমার কার্য্যের তুলনায় এই পুরস্কার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।"

রবার্ট ব্লেক বলিলেন, "প্রতিশ্রুত পুরস্কার তুমি গ্রহণ কর ওয়াইল্ড, ইহাতেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখে কাটিবে, আর তোমাকে চুরি-ডাকাতি করিতে হইবে না। সাধু ভাবে জীবন যাপনে কিরূপ শান্তি পাওয়া যায়—তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষ হইতে তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি—তোমার বিরুদ্ধে দুই-একটি পুরাতন চার্জ্জ আছে বটে, কিন্তু যদি তুমি ভবিষ্যতে সাধু ভাবে জীবন যাপন কর, তাহা হইলে তোমার অতীত অপরাধের জন্য তোমাকে টানাটানি করা হইবে না, তুমি মুক্ত। আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি। ভবিষ্যতে কোন দিন তোমাকে আমাদের অনুকূলে পাইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না।"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "আপনার কথাগুলি আমি ভাবিয়া দেখিব ইন্‌স্পেক্টর! আপনি হয় ত কোন দিন আমাকে মিঃ ব্লেকের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিটেকটিভরূপে দেখিতে পাইবেন। ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চাভিলাষই আমার নাই।"

সার রডনে সোৎসাহে বলিলেন, "চমৎকার! তোমার কথা সত্য হইলে আমরা ব্লেকের এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইব।"

ওয়াইল্ড উঠিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমার কার্য্য আপাততঃ শেষ হইয়াছে, এ জন্য আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। মিঃ ব্লেক, আপনাকেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন। আশা করি, আমাদের ভবিষ্যৎ সাক্ষাৎ এইরূপ আনন্দপ্রদ হইবে।"

ওয়াইল্ড নৈশ অন্ধকারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল।

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বিচারের পর সাইমন কার্ণের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। সার রডনের শত্রুত্রয়ের কেহই জীবিত রহিল না।

সমাপ্ত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চণ্ডীদাসের রামী কি মানবী ?

চণ্ডীদাসের পদাবলীর বহু আলোচনা হইয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া এই সকল পদাবলীর আলোচনা হইলেও সাধনার দিক্ দিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তেমন আলোচনা হয় নাই, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কবি চণ্ডীদাসকে চিনিলেও তাঁহার সাধন-জীবন বাঙ্গালীর কাছে এখনও রহস্যময় রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের সাধন-পদাবলী (যাহা সাধারণতঃ রাগাত্মিক পদাবলী নামে অভিহিত) সাধারণের নিকট পরম রহস্যময় বস্তু। কারণ, উক্ত পদসমূহে তাঁহার সাধনার ধারা অতি সাবধানে, এমন সুকৌশলে বর্ণিত রহিয়াছে যে, সাধারণ মানুষের নিকট তাহা হেঁয়ালীর মত মনে হইবে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা সাধন-পথের পথিক, তাঁহাদের নিকট উক্ত রহস্যময় পদসমূহ প্রাঞ্জল সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। উক্ত পদসমূহে শুধু অনুভূতিরই কথা আছে, সুতরাং অনুভবী অর্থাৎ অনুভূতিসম্পন্ন সাধক ব্যতীত কে সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবে ?

শাস্ত্রীয় কোন্ প্রণালীতে চণ্ডীদাস সাধন ভজন করিতেন, তাহা জানাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার পদাবলী বৈষ্ণবের নিকট অতিশয় পবিত্র। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ গাহিতে গাহিতে বিভোর হইয়া পড়িতেন। অন্য পক্ষে, তান্ত্রিক শাক্তগণ তাঁহাকে ষট্‌চক্রসাধনসম্পন্ন যোগী বলিয়া অভিহিত করেন। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে তাঁহাদের মতাবলম্বী মনে করেন। এ অবস্থায় কোন সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা নিরাপদ হইবে না। চণ্ডীদাসের উক্ত সাধন-পদাবলী (রাগাত্মিক পদসমূহ) হইতেই তাঁহার সাধনার ধারা আবিষ্কার করিতে পারিলে সে সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট হইবে না।

প্রথমতঃ, এ কথা সত্য যে, তিনি রাধাকৃষ্ণের ভক্ত সাধক ছিলেন। এ বিষয়ে প্রতিবাদ বা ভিন্ন মতের অবতারণা করা বাতুলতা। কারণ, দেখা যাইতেছে, তিনি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কিঞ্চিন্ন্যূন সহস্র সুললিত, প্রাণস্পর্শী পদাবলী (আজ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে) রচনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রত্যেকটি পদ তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-মন্দাকিনীর এক একটি ধারার মত। তথাপি প্রশ্ন উঠে তাঁহার সাধন-প্রণালীর বৈচিত্র্য লইয়া। কারণ, তাঁহার রাগাত্মিক পদসমূহে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রসাধন-প্রণালীর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং এই তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত 'রাগ-সাধনা' প্রণালীর সুন্দর সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়াছে।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাসের পদাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ;—"চণ্ডীদাসের সাধনা-প্রণালী যে কি ছিল, তাহা বলিবার সাধ্য আমার নাই। সে সাধন-প্রণালী গুরুর উপদেশ ভিন্ন বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে চণ্ডীদাস যে তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে রাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতেন, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। তাঁর রাগাত্মিক পদগুলিতে এই সাধন-প্রণালী অতি সাবধানে বর্ণিত হইয়াছে।"

এক্ষণে দেখা যাউক, নীলরতন বাবু কি কারণে চণ্ডীদাসের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

> "সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
> চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥"

"পঞ্চভূত ক্ষেত্র ক্ষিতি তেজ মরুৎ ব্যোম অপ্।" প্রভৃতি 'চব্বিশ তত্ত্বে' এই দেহের গঠন হইয়াছে। তৎপরে এই দেহমধ্যে—

> "কিবা কারিকরের আজা কারিকুরি।
> তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পূরি ॥"

এই ছয় পদ্ম বা ষট্‌চক্রের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন ;—

> "সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
> তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ॥
> নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি।
> কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শদল পদ্ম দিল রাখি ॥
> হৃৎপদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
> কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে ॥
> নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
> অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥
> তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
> স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥
> লিঙ্গমূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।
> গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ॥
> এই অষ্টপদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
> মতান্তরে হৃৎপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥
> সহস্রদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
> এই দুই পদ্ম নিত্যবস্তুর আধার হয় ॥"

তৎপরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অবস্থান সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিতেছেন ; –

> "ষট্‌চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
> শিবসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড ॥
> দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
> মধ্যে স্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে ॥
> মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার।
> অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার ॥"

পুনরায় চণ্ডীদাস বলিতেছেন ;—

> "রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে।
> সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে ॥"

চণ্ডীদাসের এই সব পদ হইতে বুঝিতে পারি যে, তিনি ষট্‌চক্র-সাধনসম্পন্ন সমাধিবান্ যোগী ছিলেন। এবং ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনি নাভির নিম্নভাগে "প্রেম-সরোবরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং উক্ত প্রেম-সরোবরের মধ্যে অষ্টদল পদ্মের অবস্থিতি ও সেই অষ্টদল পদ্মে 'লীলার সঞ্চার' হয়, বলিতেছেন। আবার ইহাও বলিতেছেন যে, 'রতি' প্রেম-সরোবর অষ্টদলে স্থির হয় এবং ইহাই সাধনের মূল কথা।

তবে চণ্ডীদাসের 'প্রেম' ও 'রতি-সাধন' কি তাঁহার স্বীয় দেহ-মধ্যকার ব্যাপার? ষট্‌চক্রসাধন প্রণালীর সহিত এই প্রেম-সাধনার কি কোন সম্বন্ধ আছে? চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে;—

"প্রেমের যাজন শুন সর্ব্ব জন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন করিবা তখন
এড়ায় (ঈড়ায়) টানিবা শ্বাস॥
তাহা হইলে মন-বায়ু সে
আপনি হইবে বশ।"

চণ্ডীদাসের 'প্রেমের যাজন'এর সহিত তন্ত্রোক্ত ঈড়ায় শ্বাস টানার এবং মন-বায়ুকে বশ করার একটা নিয়ম আছে এবং চণ্ডীদাস এই 'নিগূঢ় রস' সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন;—

"বেদ-বিধি পার এমন আচার
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্যধন পায় সেই জন
তাহার উপর কে॥"

এইরূপ 'আচার' যিনি 'যাজন' করেন, তিনিই চণ্ডীদাসের মতে ব্রজের নিত্যধন (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হন।

চণ্ডীদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন;—

"ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয়॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই জন লোকধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ॥
কায়মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত কারণে উপজয়ে প্রেমধন॥"

এখানে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মের সহিত চণ্ডীদাসের 'গুরুর সাধন' ও 'প্রেমধনে'র যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া চণ্ডীদাসের সাধন-পদের মধ্যে তন্ত্রোক্ত 'হ্রীং' বীজেরও উল্লেখ দেখা যায়;—

"হ্রীং সে অক্ষর তাহার উপর
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর॥"

তার পর চণ্ডীদাসের পদাবলীমধ্যে সুমেরু, সুমেরু-শিখর প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা;—

১। "সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
ভ্রমর ধরি ফুল।
তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
হারায়েছে জাতিকুল॥"

২। "সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
এ কথা বুঝিবে কে।
চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
বুঝিতে পারিবে সে॥"

৩। যে জন চতুর সুমেরু-শিখর
সুতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গে বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥"

৪। "শুন লো সুন্দরী প্রেমে বল হরি
বিচার করিয়া লবে।
ধনের উদ্দেশে যাবে নানা দেশে
সুমেরু-শিখরে পাবে॥"

তন্ত্রে সুষুম্নাকে সুমেরু এবং সহস্রারকে সুমেরু-শিখর বলা হইয়াছে, কারণ, সহস্রার সুষুম্নার ঠিক উপরে অবস্থিত। বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও সুষুম্নাকে সুমেরু বলা হইয়াছে। 'ভজন-সংহিতা' নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে;—

"দক্ষিণে পিঙ্গলা বামে ইঙ্গলা বসয়ে।
মধ্যেতে সুমেরু তথা সুষুম্না কহয়ে॥"

এই সমস্ত দেখিয়া চণ্ডীদাসকে নীলরতন বাবুর মত তান্ত্রিক মনে করা স্বাভাবিক; শুধু বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সাধনমার্গে বেদান্তোক্ত জীবাত্মা-পরমাত্মা, সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি বা তন্ত্রোক্ত শিবশক্তির পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত রাধাকৃষ্ণের ভাবনা করিয়াছেন। এবং তাঁহার সাধনলব্ধ বিভিন্ন অবস্থাসমূহ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত রাগ, অনুরাগ, রস, রতি, সহজ পীরিতি, প্রেম, লীলা, শৃঙ্গার প্রভৃতি সংজ্ঞায় তাঁহার সাধন পদাবলীতে অতি সাবধানে বর্ণিত রহিয়াছে। আমাদের অনেকের সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে যে, তান্ত্রিক সাধনার সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর 'আশমান-জমিন্ ফারাক্'; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার অন্যরূপ। সহজিয়া বৈষ্ণবগণের সাধন-পদাবলীর সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই যাহা সত্য, তাহা সঠিক প্রতিভাত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীদাসকে সহজিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের মতাবলম্বী মনে করেন, আর তাঁহার পদাবলীতেও 'সহজ' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, সহজিয়াগণের এই 'সহজ' কি, ইহার সাধন-প্রণালীই বা কিরূপ এবং চণ্ডীদাসের পূর্ব্বদৃষ্ট তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর সহিতই বা ইহার কি সম্বন্ধ আছে? বৈষ্ণবকবি মুকুন্দরাম দাসের নিম্নোদ্ধৃত পদটি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলেই 'সহজ' বস্তুটি যে কি, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে এবং আরও বুঝা যাইবে যে, তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রসাধন-প্রণালীর সহিত এই সহজ-সাধনার কত নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে। পদটি এই;—

১। মস্তক উপরে আছে অক্ষয় সরোবর।
সহস্রদল পদ্ম হয় তাহার উপর॥
তার পর কৃপাদৃষ্টি গুরু মহাশয়।
সহস্রদল পদ্ম জানি তাহার নির্ণয়॥
শুক্লবর্ণ ধরে শুদ্ধ প্রেমের গঠন।
আপনে রাখিবে কথা অতি সংগোপন॥

২। পদ্ম……আছে রস-সরোবর।
সপ্তদল পদ্ম আছে তাহার উপর॥
পীতবর্ণ ধরে পূর্ব্বরাগের গঠন।
রুক্মী সত্যভামা লৈয়া করেন বিহরণ॥

৩। বক্ষঃস্থল মধ্যে আছে সিদ্ধি-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম আছে তাহার উপর॥

রক্তবর্ণ ধরে অনুরাগের গঠন।
অষ্ট যূথেশ্বরী তাহে নিত্য বিহরণ॥
অষ্টদলে অষ্ট সখি সদা করে স্থিতি।
অষ্টদলে দেখি নিত্যে দোঁহার পীরিতি॥
৪। নাভিদেশ মধ্যে আছে মান-সরোবর।
শতদল পদ্ম আছে তাহার উপর॥
নীলবর্ণ ধরে সদা রসের গঠন।
ষড়্‌দলে অষ্টমঞ্জরী করে বিহরণ॥
৫। চক্রপরি বৈসে দুই কিশোরা-কিশোরী।
মঞ্জরীগণ রহে দোঁহে মুখ হেরি॥
নাভিতলে আছে পৃথিবী-সরোবর।
তিন পদ্ম আছে তার জলের ভিতর॥
ভাব প্রেম রস এই তিন পদ্ম হয়।
তিন পদ্ম তিন রূপ অতি ঘোরালয়॥
দুই পদ্ম বিকশিত এক পদ্ম কোড়া।
অধোমুখ উৰ্দ্ধমুখ দুই মুখে জোড়া॥
কোড়া পদ্মে বিরাজয়ে কিশোবা-কিশোবী।
কেবল জানয়ে ইহা শ্রীরূপমঞ্জরী॥
এক পদ্মে বলরাম আর পদ্মে যোগমায়া।
দোঁহে আরাধন করে নিত্য করে ছায়া॥
প্রেম-সবোবরে নিত্য মাধুর্য্য বিশেষ।
কোটি মধ্যে হয় এক জনার প্রবেশ॥
কোড়া পদ্ম হয় প্রেম নিত্যবৃন্দাবন।
ইহার অধিক নাহি কহিল কারণ॥
এক সরোবরে শুক্ল তিন পদ্ম হয়।
তিন পদ্ম তিন বর্ণ কহিল নির্ণয়॥
শুক্ল রক্ত নীল এই তিন স্থিতি।
কহয়ে মুকুন্দদাস সহজ পীরিতি॥'

(ইতি—পদ্মকড়চা)

উল্লিখিত এই পদ্মতত্ত্ব বাহিরের বা সাধারণ কল্পনার ব্যাপাব নহে, উহা সাধকের দেহে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। যথা;—

"তার পর পদ্মতত্ত্ব দেহেতে প্রকাশ।
অমৃতরত্নাবলী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥"

আমরা দেখিলাম, মুকুন্দরাম দাস এই পদ্মতত্ত্বকেই সহজ পীরিতি-সাধন বলিয়াছেন। মস্তক উপরে শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্মে শুদ্ধ প্রেম, তন্নিম্নে পীতবর্ণ সপ্তদল পদ্মে পূর্ব্বরাগ, বক্ষঃস্থলে রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্মে অনুরাগ এবং অষ্টদলে অষ্ট সখি, নাভিদেশে নীলবর্ণ শতদল পদ্মে রস এবং ষড়্‌দলে অষ্টমঞ্জরী, নাভিতলে পৃথিবী-সরোবরে আর তিন পদ্ম (ভাব, প্রেম ও রসের প্রতীক) প্রভৃতির নির্দেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। উক্ত তিন পদ্মমধ্যে দুইটি বিকশিত এবং একটি কোড়া বা কুঁড়ি; এই কুঁড়ি পদ্মে কিশোরা-কিশোরী বিরাজ করেন এবং এই পদ্মেই প্রেম নিত্যবৃন্দাবনের অবস্থিতি। তিন পদ্ম যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও নীলবর্ণের এবং মুকুন্দরাম দাস এই পদ্ম-সাধনতত্ত্বকেই সহজ পীরিতি বলিতেছেন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ধরণের অনেক পদ পাওয়া যায়। সাধারণে ইহাকে হেঁয়ালী মনে করিয়া ইহার আলোচনায় বিরত থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অতি গুহ্য সাধনতত্ত্ব, সাধকজীবনের অনুভূতির বর্ণনার প্রয়াসমাত্র। এই সমস্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রসাধন এবং এই সহজ পীরিতি-সাধন মূলতঃ অভিন্ন। একই বস্তুকে লইয়া তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-সাধক নিজ নিজ ভাবে সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন। সেই বস্তুটি কি? ইহা প্রকৃতিরূপা জীবশক্তি, ইঁহার আশ্রয়েই সাধক ক্রমশঃ সাধনার পথে অগ্রসর হন এবং অন্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার কৃপা না হইলে সাধন-পথের পথিক হওয়া যায় না। শাস্ত্রাদিতে এই শক্তিকে পরমপুরুষের বনিতা কল্পনা করিয়া অসংখ্য শ্লোক ও পদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই শক্তি পরমপুরুষ হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহেন। সাধনার চরম অবস্থায় এই দুইয়ের একত্ব অনুভূত এবং ভাগ্যবান্ সাধকের সমগ্র কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া পরমপদ লাভ হয়। তন্ত্রে এই প্রকৃতিস্বরূপা জীবশক্তিকে কুলকুণ্ডলিনী বলা হইয়াছে। প্রত্যেক জীবেরই কুলে অর্থাৎ মূলাধারে বলয়ের মত কুণ্ডলী অবস্থায় তিনি নিদ্রিতা রহিয়াছেন। তাঁহাকে সাধনার দ্বারা জাগরিতা করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণই সাধকের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই শক্তিকে প্রধানতঃ রাধাশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'আধারবাসিনীত্বাৎ রাধা', আধারে অর্থাৎ মূলাধারে বাস করেন বলিয়া রাধা বলা হইয়াছে। রাধা শব্দের অন্য অর্থও দেখা যায়; যথা—রা (নির্ব্বাণমুক্তি)র, ধা (ধারণ-কর্ত্রী)। তাঁরই আশ্রয়ে নির্ব্বাণমুক্তি বা পরমপদ লাভ হয়। তন্ত্রে সহস্রার পদ্মকে পরমশিবের স্থল বলা হইয়াছে; কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই সহস্রার পদ্মে পরমশিবের সহিত মিলিতা হন। ইহা দেহতত্ত্বের ব্যাপার। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই সহস্রার পদ্মকে সুমেরু-শিখর, নিত্য-বৃন্দাবন, অক্ষয়-সরোবর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রস-স্বরূপা রাধাশক্তি মূলাধার বা রস-সরোবর হইতে উত্থিতা হইয়া এই নিত্যবৃন্দাবনরূপী সহস্রার পদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-পরমপদে মিলিতা হন এবং সাধকের এই ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন। তন্ত্রে কুলকুণ্ডলিনীর অসংখ্য নাম রহিয়াছে—এবং কোন নামই নিরর্থক নহে। সাধনমার্গে পাঠক প্রকৃতিস্বরূপিণী এই শক্তিকে যখন যে অবস্থায় দেখিয়াছেন, সেই অবস্থারই একটি সংজ্ঞা বা নাম দিয়াছেন বৈষ্ণবশাস্ত্রেও রসময়ী রাধাশক্তির অসংখ্য নাম রহিয়াছে। শ্রীরাধিকার শতনাম-স্তোত্রে তাঁহার অনেকগুলি নামের মধ্যে 'রামিণী' নামও পাওয়া যায়। যথা;—

"রমণী রামিণী গোপী বৃন্দাবনবিলাসিনী।
নানা রঙ্গ বিচিত্রাঙ্গী নানা সুখময়ী সদা॥"

এ ছাড়া তন্ত্রেও কুলকুণ্ডলিনীর 'রামিণী' নামের উল্লেখ আছে। কুলকুণ্ডলিনী-স্তোত্রে কুলকুণ্ডলিনীকে 'রজকী' বলা হইয়াছে। যথা;—

"সূক্ষ্মা সূক্ষ্মতরা পাতু সূক্ষ্মস্থাননিবাসিনী।
লাকিনী লোকজননী পাতু কূটাক্ষরান্বিতা॥
তেজসাং পাতু নিয়তা রজকী রাজপূজিতা॥"

(রুদ্রযামল, উত্তর খণ্ড, কুণ্ডলিনীকবচ)

কুলকুণ্ডলিনীর 'রজকী' অর্থাৎ ধোপানী নামের সার্থকতা এই যে, তিনি সাধকের জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররূপ মলরাশি ধৌত করিয়া দিয়া সাধককে মুক্তির পথে লইয়া যান। শাস্ত্রে এই সমস্ত দেখিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, চণ্ডীদাসের রামিণী বা রামী কি কোন মানবী, না, তাঁহার দেহমধ্যস্থ সাধনার ধন রসস্বরূপিণী রামিণী শক্তি, যাহাকে

আশ্রয় করিয়া চণ্ডীদাস সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন ? সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, যখন আমরা দেখি, চণ্ডীদাস নিজেই বলিতেছেন ;—

"বিশুদ্ধ রতিতে কারণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি ॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর ॥
বীজে মিশাইয়া রামিণী যজ।
রসিকমণ্ডলে সতত ভজ ॥"

উল্লিখিত পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা সাধনতন্ত্রের কথা। চণ্ডীদাস 'বীজে' মিশাইয়া 'রামিণী' যজন করিতে বলিতেছেন। আমরা জানি যে, হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি বীজ সাধকেরা সাধনমার্গে ব্যবহার করেন। এই বীজে মানবী 'রামিণী'কে মিশাইবে কিরূপে ? এবং মিশাইয়া যজনই বা কিরূপে করিবে ? অন্য আর একটি রাগাত্মিক পদে চণ্ডীদাস রামিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

"তুমি সে তন্ত্র　　তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস।"

এখানে চণ্ডীদাস রামিণীকে 'উপাসনা রস' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রামিণী বা রাধাশক্তিকে রসস্বরূপা বলা হইয়াছে। যথা ;—

"রাধা রসময়ী রম্যা রসজ্ঞা রসমঞ্জরী।
রাসেশ্বরী রসবতী রসপূর্ণা রসপ্রদা ॥"

ইহা ছাড়া রামিণীকে চণ্ডীদাস 'হরের ঘরণী', 'বেদমাতা গায়ত্রী', বাগ্‌বাদিনী (ধ্বনিবিগ্রহবতী) প্রভৃতি নামেও অভিহিতা করিয়াছেন। যথা ;—

"ত্রিসন্ধ্যা যাজন　　তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী　　হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত　　পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়ানের তারা ॥"

উল্লিখিত পদে চণ্ডীদাস 'ত্রিসন্ধ্যা যাজন', 'ভজন' প্রভৃতি শব্দ রামিণীর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সব দেখিয়া কি মনে হয় ? রামিণী কি মানবী—কোন রাজকন্যা, না, চণ্ডীদাসের দেহতত্ত্ব-সাধনার সাধন-সহচরী মূলাধারনিবাসিনী রামিণী বা রাধাশক্তি ?

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, চণ্ডীদাসের সাধনপ্রণালীর সহিত তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণ মিল আছে এবং তন্ত্রোক্ত সাধন ও সহজসাধন মূলতঃ এক জিনিষ। সহজসাধন, শৃঙ্গারসাধন বা পরকীয়া-সাধন প্রকৃত পক্ষে বাহিরের কোন মেয়েমানুষকে আশ্রয় করিয়া নহে ; উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের ব্যাপার। তবে বৈষ্ণব-সাধকগণ তাঁহাদের পদাবলী এরূপ লৌকিক তথা বহির্জ্জগতের দিক্ দিয়া রচনা করিয়াছেন কেন ? মধ্যযুগীয় সাধকগণের প্রায় প্রত্যেকেরই এই একটি ধারা দেখা যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের সাধনপ্রণালী অত্যন্ত গুহ্য ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কাহারও কাহারও পদাবলী এরূপ ভাবে রচিত যে, আধ্যাত্মিক ও লৌকিক দুই দিকেই অর্থ করা যায়। এরূপ করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, অনধিকারীর হাতে পড়িয়া সাধনতত্ত্বের মহত্ত্ব নষ্ট না হয়। সাধনতত্ত্ব গুরুমুখী বিদ্যা,—গুরুর আশ্রয় ব্যতীত এ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অনধিকারীর সাধনতত্ত্বে অধিকার নাই। কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী, তাহা গুরুর বিচার-সাপেক্ষ। সদ্‌গুরু নিষ্ঠাবান্, সাত্ত্বিকভাবসম্পন্ন শিষ্যকেই এই বিদ্যা প্রদান করেন, অনধিকারীকে নহে। সেই জন্যই বোধ হয়, সাধনতত্ত্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণের এরূপ গুহ্য ভাবে রাখিবার প্রয়াস। তান্ত্রিক গুরুগণও ঠিক এইরূপ গুহ্য ভাবেই তাঁহাদের সাধনপ্রণালীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে আছে ;—"যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।" অর্থাৎ শাম্ভবী বিদ্যা (যোগবিদ্যা) কুলবধূর তুল্য সদাই অপ্রকাশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক অর্থে পঞ্চমকার সম্পূর্ণ যোগসাধনা। চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলী হইতেও এই বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তবে বাসনা রহিল, ভবিষ্যতে চণ্ডীদাসের ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসম্বলিত সাধন-পদাবলী সাধারণের গোচর করিব। বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারসাধন ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের 'মৈথুন' মূলতঃ এক বস্তু। পঞ্চমকারের 'মৈথুন' রমণী-সেবা নহে, ব্যভিচার নহে ; উহা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে শিবরূপী পরমব্রহ্মের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির মিলন। বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারসাধনও ঠিক এই জিনিষ। কুল অর্থাৎ মূলাধারবাসিনী রসময়ী* রাধাশক্তি কুল ত্যাগ করিয়া অকুলে অর্থাৎ সহস্রারে শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমব্রহ্মের সহিত মিলিতা হন। এই জন্য রাধার এক নাম কুলকলঙ্কিনী ও অন্য নাম কুলটা। রাধার প্রেমকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে কুটিলা বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকে ইহার লৌকিক অর্থ করে এই যে, রাধা-প্রেম মান, অভিমান প্রভৃতি দ্বারা কুটিলভাবসম্পন্ন।* কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কুল অর্থাৎ মূলাধার ত্যাগ করিয়া রাধাশক্তির যখন অকুল বা সহস্রার অভিমুখে গতি হয়, তখন ইনি কুটিলগামিনী হয়েন, অর্থাৎ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলেন। রাধার সহস্রনামস্তোত্রে রাধাকে রতিরূপা, প্রেমরূপা প্রভৃতি বলা হইয়াছে। স্বরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে প্রেমস্বরূপিণী রাধাশক্তির গতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত হইয়াছে,—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।" অর্থাৎ প্রেমার গতি অহিবৎ অর্থাৎ সর্পবৎ কুটিলস্বভাবসম্পন্ন। এই গতি সম্বন্ধে মুকুন্দরাম দাস লিখিয়াছেন,—"বামা বক্রগতি রাধাপ্রেমের স্বভাব।" এবং মাধবদাস লিখিয়াছেন,—"সর্পচক্রগমন ন্যায় গতি সে প্রেমার।" রাধার সহস্রনামের মধ্যেও রাধাশক্তিকে সর্পিণী, কৌলিনী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা ;—"সর্পিণী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী চ জগন্ময়ী।" সর্পিল (সর্পীর মত) গতির জন্য সর্পিণী এবং কুলে অর্থাৎ মূলাধারে অবস্থানহেতু কৌলিনী বলা হইয়াছে, চণ্ডীদাসও এই গতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"আনন্দের আনন্দ　　সচ্চিদের বিন্দু
প্রেম উপজিল তায়।
অধঃপদ্ম হ'তে　　কামের সহিতে
বাঁকা গতি চলি যা।"

এই সমস্ত দেখিয়া মহাসাধক চণ্ডীদাসের রামিণী বা রামীকে কি মনে হয়? সুধী পাঠক-পাঠিকা, ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। পরবর্ত্তী কালে রামী ধোপানীকে লইয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লৌকিক দিক্ দিয়া বহু উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। ইহাতে অভিনবত্ব নাই—প্রত্যেক সাধকের জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক অলীক উপাখ্যান লোকমুখে প্রচারিত হয়। শুনিয়াছি, বীরভূম জেলায় নান্নুরে রামীর ভিটাও না কি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখানো হয়। বর্ত্তমানে এই দিক্ দিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। কারণ, যে চণ্ডীদাস নিজে বলিয়াছেন, "স্বপনে কামিনী সনে না হয় দরশন।" সেই নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র মহাসাধকের অকলঙ্ক চরিত্রকে সাধারণের সমক্ষে সত্যরূপে ফুটাইয়া তোলা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

বৈরাগ্যের পথে

[গল্প]

ভৈরব ঘোষালের এক মাসের ছুটি বড় সাহেব মঞ্জুর করিলেন।

ছোট সাহেব বলিলেন—"ছুটি অবশ্য এক মাসেরই থাকলো; কিন্তু দরকার না হোলে শুধু শুধু এক মাস বাড়ীতে বসে থেকো না যেন; পার ত তার আগেই আফিসে 'জয়েন' কোরো।"

'অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট' নীরদ বাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিলে, নীরদ বাবু তাঁহার চিন্তা ও বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বলিলেন—"নারায়ণকে ডাকুন, কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, বিপদ কেটে যাবে।"

বিপদ তাঁহার গুরুতর। তাঁহার একমাত্র পুত্র—'খোকা'র কঠিন অসুখ। প্রথম উপলক্ষ—বুকের পাঁজরে সামান্য একটা ব্রণ। সেই ব্রণ অসাবধানে সে এক দিন চুলকাইয়া ফেলে। ফলে দু'-চার দিনের মধ্যে তাহা বিষাক্ত হইয়া সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে। প্রথমটা চাঁদসীতে দেখান হয় এবং দিন চার-পাঁচ ধরিয়া সেই চিকিৎসাই চলে; কিন্তু পাশের বাড়ীর হৃদয় বাবু পরামর্শ দেন—"চাঁদসী অবশ্য এ সব ব্যাপারে ভাল বটে; তবে হোমিওপ্যাথ বনমালী বাবুকে দিয়ে একবার দেখালে হয়; বিচক্ষণ চিকিৎসক; ওঁর এক কোঁটা ওষুধেই আমার মনে হয়···। আমার কল্যাণীর অত বড় অসুখটা তিন দিনে···।"—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভৈরব অস্থির চিত্তে বনমালী ডাক্তারকেই 'কল' দিলেন। তাঁর ঔষধ তিন দিন খাইবার পর হঠাৎ 'খোকার' রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিল। শরীরের সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর। ভৈরবের মাথা ঘুরিয়া গেল। একমাত্র সন্তানের এই সঙ্কট অবস্থায় স্বামি-স্ত্রীর আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল।

কয়েক দিন হইতেই তাঁহার আফিস কামাই হইতেছিল। আজ এক মাসের ছুটি পাইয়া, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ভৈরব তাঁহার অঘোর অচৈতন্য পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

ভৈরবের টাকার অভাব ছিল না। সারা জীবনে, নানা উপায়ে তাঁহার বহু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। ভৈরব দুই জন নাম-করা এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার আনিলেন। তাঁরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"নিউমোনিয়া! বোথ লাঙস্!" পাগলের মত হইয়া ভৈরব আরও এক জন বড় ডাক্তার আনিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছট দিনে নয় বার আসিবার পর, ডাক্তাররা মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব হন্ত-দন্ত হইয়া ছুটিলেন—নেবুতলায়, তাঁহার গুরুদেবের কাছে।

গুরুদেব বলিলেন,—"ভয় নেই! স্বস্ত্যয়নের জন্য একশোটা টাকা রেখে যা। যে দিকে খোকার শিয়র আছে, তার বিপরীত দিকে শিওর ঘুরিয়ে দিগে যা। আর···ঐ উঠোন থেকে চারটি ধূলো নিয়ে আয় দিকি!" ধূলা আনা হইলে, ডান পায়ের বড়ো আঙুলটা তাহাতে ঠেকাইয়া বলিলেন—"এইটে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিবি: যা, চলে যা। কালই আদ্ধেক রোগ সেরে যাবে।"

হইলও তাই। পরদিন—অর্দ্ধেক নয়—একেবারে সমস্ত রোগের হাত হইতে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত চিকিৎসার হাত হইতে খোকা নিষ্কৃতি লাভ করিল। ভৈরব-গৃহিণী ডাক ছাড়িয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, ভৈরব ক্ষিপ্তের মত মাথার চুল ছিঁড়িতে ও বুক চাপড়াইতে লাগিলেন।

পাড়ার অনেকেই ছুটিয়া আসিল। মেয়েরা ভৈরব-গৃহিণীকে এবং পুরুষেরা ভৈরবকে নানারূপ স্তোক বাক্যে সান্ত্বনাদানের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাশের বাড়ীর হৃদয় বাবু কহিলেন—"জগতের এই-ই নিয়ম, ভৈরব বাবু! যার সময় হয়, সে চলে যাবেই; তাকে আটকে রাখে কার সাধ্যি!" ভৈরব কাটা ছাগলের মত ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখে জল নাই, মুখে কথা নাই; বুকের ভাঙ্গা পাঁজর দুই হাতে চাপিয়া মেঝের উপর তিনি গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন।

তিন দিন ভৈরব ঘরের বাহির হ'ন নাই। খাবার সময় কেহ তাঁহাকে দুইটি খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কি না, কিম্বা তিনি খাইয়াছেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান নাই। এই ভাবে তিন দিন কাটিবার পর, তিনি নেবুতলায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। গুরুদেব দূর হইতে তাঁহার আলুথালু বেশ ও রুক্ষ কেশ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন—সংবাদ শুভ নহে। ভৈরব কাছে আসিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"রোগ সেরেছে ত?"

কাঁদ-কাঁদ মুখে ভৈরব কহিলেন—"না প্রভু, খোকা আমার ফাঁকি দিয়ে······"

তাঁহাকে বাধা দিয়া গুরুদেব বলিলেন—"আমার কথা মিথ্যে

হয় না। রোগ সারতেই হবে। রোগ থোকার নয়, বেটা, রোগ তোর ;—বন্ধন-রোগ, মায়া-রোগ! বুঝতে পারছিস্ না! কি বন্ধনে পড়েছিলি? মহামায়ার দয়াতে তোর মায়া কেটে গেল—তুই মুক্তি পেলি! এত দিনে তোর রোগ সারলো। আয়; বোস্।"

অভিভূতের মত থপ্ করিয়া ভৈরব গুরুদেবের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন। গুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নানা তত্ত্বকথা ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করতঃ ভৈরব সন্ধ্যাবেলায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বৈঠকখানার ফরাসের উপর নিৰ্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন।

ভৈরবের এই বাড়ীটি দুইটি অংশে বিভক্ত। একাংশে নিজে থাকেন, অপর অংশ মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকায় ভাড়া দেওয়া। ভাড়াটিয়া কুঞ্জ বাবুর কাছে দুই মাসের ভাড়া পড়িয়াছিল। তিনি দুই মাসের ভাড়া নব্বইটি টাকা লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন। এই দুঃসময়ে ভাড়াটা ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না। নোট ও টাকাগুলি ভৈরবের সামনে ফরাসের উপর রাখিয়া দিয়া কুঞ্জ বাবু কহিলেন—"ভবিতব্যতার হাত কারো এড়াবার উপায় নেই; কি আর করবেন বলুন!"

প্রশান্ত স্থির কণ্ঠে ভৈরব কহিলেন—"একটা জিনিষ শুধু করবার আছে কুঞ্জ বাবু, সেইটাই করব। এ কি, আপনার ভাড়ার টাকা?"

"আজ্ঞে হাঁ। দু'মাসের,—নব্বই।"

একটা ঝাড়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভৈরব কহিলেন—"আর আমার টাকা-কড়ির কি দরকার! মহাবন্ধন যখন ঘুচে গেল, তখন টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি—এ সবে আমার কোনই দরকার নেই।"

টাকাগুলি সেইখানেই পড়িয়া রহিল। ভৈরব তার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন না। বহুক্ষণ ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর কহিলেন,—"কুঞ্জ বাবু, সংসার আমার সইলো না। সংসার থেকে ভগবান্ আমায় ধাক্কা দিয়ে বার কোরে দিলেন। কিসের জন্য, কার মুখ চেয়ে আর এখানে পড়ে থাকা? টাকা-পয়সা বাড়ী-ঘর কিছুই আমার দরকার নাই।"

সান্ত্বনা দিবার ছলে কুঞ্জ বাবু কহিলেন—"বেঁচে থাকতে হোলে সবই দরকার ঘোষাল মশাই! এ হোল কর্ম্মভূমি! খা-ও পেতে হবে, কাজ-ও করতে হবে।"

"সংসারে আর থাকচি না কুঞ্জ বাবু! সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। সব ঠিকঠাক কোরে ফেলেছি। কার জন্যে সংসারে থাকবো! উঃ! ভগবান!"—ভেউ ভেউ করিয়া ভৈরব বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

কুঞ্জ বাবুর অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

* * * *

কাশীর 'রাণামহলে'র দেউড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বরাবর গঙ্গার দিকে আসিতে গেলে বাঁ-দিকে যে একটি প্রকাণ্ড বাঁধানো নিমগাছ দেখা যায়, এক দিন অপরাহ্নে তাহারই তলায় দুই জন সন্ন্যাসী মুখোমুখী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দুই জনেরই পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় গেরুয়ায় ছোপানো ও দুই জনই বাঙ্গালী। দুই জনেরই বয়স চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।

এক জন অপর জনকে কহিলেন—"প্রথম স্ত্রী মারা যেতে ব্যথা পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু এই স্ত্রী একেবারে পাঁজর ধ্বসিয়ে দিয়ে গেছে! সংসার একেবারে বিষ বলে মনে হল, তাই সন্ন্যাসী হোয়ে বেরিয়ে পড়লুম! কার জন্যে আর সংসার, ভৈরব বাবু!"

"কার জন্যে সংসার! সত্য! আমার 'খোকা' চলে যাবার পর তাই বুঝেই ত বেরিয়ে পড়লুম!"

আজ তিন দিন, ভৈরব কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কাশী আসিয়াছেন। অবশ্য সস্ত্রীকই আসিয়াছেন। এই 'রাণামহলে'ই একখানা বাড়ীর দ্বিতলের একখানা ঘর ভাড়া লইয়া আছেন। সন্ন্যাসী চন্দ্রকান্ত বাবুর সহিত গতকল্য এই নিমতলাতে তাঁহার সাক্ষাৎ এবং আলাপ। চন্দ্রকান্ত বাবু পাশের 'হাতিফটকা'র গলিতে বাসা লইয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—"প্রথম স্ত্রীকে ভগবান্ টেনে নিয়ে বেশ হালকা কোরেই দিয়েছিলেন। কেন যে আবার বিয়ে করতে গেলুম, ভৈরব বাবু! বিয়ে যদি আর না করতুম, তাহলে এই শেল আজ বুকে নিয়ে ছন্নছাড়ার মত এমন কোরে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না। উঃ! আমার সমস্ত বুকখানা জুড়ে ছিল, ভৈরব বাবু! বুক একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে!—এখন বাকী জীবনটা এই রকম সন্ন্যাসী হোয়ে থাকাই দরকার,—কি বলেন?"

"নিশ্চয়। আর কার জন্যে সংসার? আমার 'খোকা' যে দিন ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, সে দিন আমি ভাবলুম, আর কার জন্যে সংসার, কার জন্যে টাকা-কড়ি, কার জন্যে আফিস, আর কার জন্যেই বা···"

"আফিসে আপনার মাইনে ছিল কত, ভৈরব বাবু?"

"আরে, মাইনে ছিল সামান্য, গোটা আশী টাকা; কিন্তু তার ওপর একশো আশী টাকা যে ফী মাসে পকেটে আসতো—উপরি পাওনা!—উপরি মানে চুরি নয়। পাটের আফিস কি না; দালালরা কিছু কিছু বক্‌শিস দিত।"

"তা, সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলেন ত?"

"ঐ যে বললুম, কার জন্যে আর চাকরী করবো! আসবার আগে বড় সাহেবের বাড়ী গিয়ে দেখা করলুম; তিনি অবশ্য বললেন,—'দু'মাস ঘুরে এসো—গোষাল, মনটা একটু সুস্থ হলে আবার কাজে জয়েন কোরো।' আমি মনে মনে বললুম, 'হ্যাঃ—ফিরেও আর এসেচি, চাকরীও আর করেচি! ভগবান যখন সব কাটান্-ছাড়ান্ কোরে দিলেন, তখন বাজে কাজে কেন আর জড়িয়ে থাকি'!"

"যা বোলেচেন! আমিও ওই কথা ভাবি, ভৈরব বাবু! ভগবান্ যখন তাকেই সংসার থেকে টেনে নিলেন, তখন সে সংসারে আমি আর পড়ে থাকি কেন!"—চন্দ্রকান্ত বাবুর হৃদয় মথিত করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল।

এই দুই দাগাপ্রাপ্ত গৃহত্যাগী প্রত্যহ অপরাহ্নে এই ভাবে এই বাঁধানো নিমতলাতে বসিয়া আপন আপন দুঃখের কথা এবং তাহার সহিত নানাবিধ তত্ত্ব এবং পরমার্থ-কথার আলোচনা করেন। ধর্ম্মপিপাসু দুই-চারি জন কাশীবাসীও এখানে আসিয়া বসেন এবং নানাপ্রকার ধর্ম্মকথার অবতারণা করিয়া অপরাহ্ণ সময়টা সাধুসঙ্গে কাটাইয়া যান।

মাস-খানেকের মধ্যেই নিমতলাতে লোক-সমাগম বেশ বাড়িয়া উঠিল। অনেক স্ত্রীলোকও ঘাটে যাইবার পথে এখানে আসিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা পুণ্যসঞ্চয়ার্থ একটি আনি, দুয়ানি বা সিকি দিয়া সন্ন্যাসিদ্বয়ের

চরণ-বন্দনা করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিষয়-সম্পত্তি-সংসারের মায়া কাটাইয়া যাঁহারা সংসারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, টাকা-পয়সায় তাঁহাদের আর কি দরকার! সুতরাং সেগুলা তাঁহারা গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিতে লাগিলেন।

ইঁহাদের চরণে প্রণামীর সংখ্যাটা দিন দিন যখন বেশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন ভৈরব এক দিন চন্দ্রকান্তকে বলিলেন—"দেখুন, রোজই প্রায় একটা কোরে টাকা প্রণামী পড়চে; এগুলো ঠিক এ ভাবে গরীব-দুঃখীদের দান না করে যদি জমিয়ে রাখা যায়, তাহলে এর দ্বারা বড় রকমের কোনো সংকাজ করা যেতে পারে। ক্রমেই ত লোক বেশী হচ্ছে, প্রণামীও বাড়চে। ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।"

চন্দ্রকান্ত বাবু এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন; কহিলেন—"তাহলে আপনিই ওগুলো জমা কোরে রাখুন দাদা!"

"তাই হবে।"

ভৈরবের কাছেই সাধু-প্রণামীর টাকা-পয়সা সেই দিন হইতে জমা হইতে লাগিল।

নানা প্রকারের ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক দিন এক পশ্চিমা ব্যবসাদার তাহার বছর-আষ্টেকের একটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া সাধুদের প্রণাম করিল ও দুইটি টাকা প্রণামী দিল। ব্যবসায় শিখাইবার উদ্দেশ্যে যেখানেই সে যায়, ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া ফেরে। ছেলের মাথায় সাধুদের পদধূলি বুলাইয়া হিন্দি ও বাংলা মিশাইয়া সে কহিল—"মেরা সবসে ছোটা লেড়কা, মহারাজ!"

ভৈরব আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"জীতা রহ বেটা—জীতা রহ। বহুৎ ভালা লেড়কা হায় আপকো।"

"আট বরিষ উমের, লেকেন জ্ঞেয়ান-বুদ্ধি খুব আচ্ছি হায়। ও-রোজ হাম পুছা থা, ইসবগুলকা ভূসিকা সাথ কোন ভেজাল ঠিক-সে-ঠিক মিল খায়েগা? হামরা তিন বড়া লেড়কা বোল্‌নে নেহি সেকা, লেকেন ইয়ে লেড়কা ঝটসে বোল্ দিয়া।"

"কেয়া বোলা?"

"একদম ঠিক-সে-ঠিক বোলা। সফেদওয়ালা যো পেকিং লড়কি হায়, উসকো করাতেসে কাটনেসে যো মিহিন গুঁড়া নিক্‌লাতা ওহি গুঁড়া ইসবগুলকা ভূসিকা সাথ বেমালুম মিল খা জাগা। দেখিয়ে তো, আট বরিষকা বাচ্ছাকা ক্যায়সী জ্ঞেয়ান-বুদ্ধি হায়।" বলিয়া, প্রশংসার দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া তাহার গায়ে-মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল।

একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ হইতে ছোট একটি রুগ্ন ছেলেকে কোলে করিয়া এক ধারে দাঁড়াইয়াছিল। মাড়োয়ারী উঠিয়া গেলে স্ত্রীলোকটি সরিয়া আসিয়া কহিল—"বাবা, দয়া কোরে একটু ওষুধ দিতে হবে; এই নাতিটি আমার অনেক দিন ধরে ভুগছে।"

চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—"বাছা, আমরা ত সে রকম সন্ন্যাসী নই। আমরা ধরতে গেলে গৃহী। তবে···"

ভৈরবও কিছু একটা বলিতে যাইতেছিলেন, তৎপূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটি কহিল,—"বাবা, ভস্ম মেখে জটা রাখলেই কি আর সন্ন্যাসী হয়! একটু পায়ের ধূলো, বাবা, মাখিয়ে দিন; তাইতেই ও সেরে যাবে।"

অগত্যা উভয়েই খোকার মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পায়ের ধূলা মাখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

* * * *

ভক্তের ভীড় যেমন জমিতে লাগিল, ওদিকে তেমনি প্রায় তিনটি মাস অতিবাহিত হইল।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ এ-যাবৎ এঁরা বাজার-হাট করিয়া নিজেরাই ঘরে রান্না করিয়া খাইতেন, বিপত্নীক চন্দ্রকান্তের স্বপাক এবং সপত্নীক ভৈরবের গৃহিণীপাক। কিন্তু কিছু দিন হইতে ভৈরবের পরামর্শে উভয়েই 'পাকাপাকি'র ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া 'ছত্রে'র শরণ লইয়াছেন। উদ্দেশ্য—এক বেলার ব্যয় এবং পরিশ্রম বাঁচানো এবং রন্ধনাদির ব্যবস্থায় যে সময়টা নষ্ট হয়, সে সময়টা ভগবানের শরণে ও ধ্যানে কাটানো। বাধাও কিছু নাই, যেহেতু, উভয়েই ব্রাহ্মণ এবং 'রাঙ্গামাটী'র ছত্রে সধবাদেরও আহারের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আজ কিছু দিন হইতে ইঁহারা মধ্যাহ্নের আহারটা 'রাঙ্গামাটী'-ছত্র হইতেই সারিয়া আসেন। রাত্রির আহার ঘরে তোলা-উনুনে সারিয়া লওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অর্থও বাঁচিতেছে, হাঙ্গামাও কমিয়াছে।

সে দিন বৈকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিমতলাতে আসিয়া বসিলেন। খালি গায়ে একখানি আড়-ময়লা চাদর কাঁধে ফেলা; হাতে একগাছা বংশযষ্টি; চোখে ভাঙ্গা ফ্রেমওয়ালা চশমা। ব্রাহ্মণের মাথার ও দাড়ির চুলগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

ভৈরব তাঁহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন—"অনেক দিন পরে আপনি এলেন। শরীর বোধ হয় ভাল ছিল না?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আপনাদের আশীর্ব্বাদে শরীর ভালই ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক মহা কাজের ভার এই দুর্ব্বল মাথার ওপর এসে পড়েছে। তাই সকাল-বিকেল একটু ঘোরা-ঘুরি করতে হয়, এখানে আসতে সময় করতে পারি না"—এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার মহা কাজের যে বৃত্তান্ত দিলেন, তাহার মর্ম্ম:—হুগলীতে দেশ। বড় ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়া তাঁরা স্বামি-স্ত্রী আজ আঠারো বৎসর কাশীবাস করিতেছেন। বড় ছেলের বড় মেয়ে শান্তি বিবাহের বয়স ছাড়াইয়া ঘোরতর অশান্তির কারণ ঘটাইতেছে। তাঁদের 'পণ্ডিতরত্নী' মেল; ছেলে পাওয়া দুষ্কর। তাই শান্তিকে তাহারা তাদের ঠাকুরদাদার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে—পাত্রস্থ করিবার জন্য; যেহেতু, কাশীতে নানা শ্রেণীর পাত্রের অসদ্ভাব নাই। এবং এই কারণেই 'পণ্ডিতরত্নী' মেলের একটি পাত্রের সন্ধানে তাঁকে সকালে-বিকালে নানা স্থানে ঘুরিতে হয়।

ভৈরব মধ্যে মধ্যে "হুঁ হুঁ" দিয়া গেলেও তাঁহার মন কিন্তু বৃদ্ধের কথার দিকে ছিল না বলিয়া মনে হয়। অদূরে উপবিষ্টা নবাগতা এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি পড়িতেছিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটি বুঝি একটু বড় হোয়ে উঠেচে?"

"একে কাশী স্থান, তার ওপর আপনাদের পুণ্যপীঠে বসে ত আর মিথ্যা বলতে পারি না। মেয়েটা আঠারো ছাড়িয়ে উনিশে পড়েচে; তার ওপর বাড়ন্ত গড়ন। আর 'পণ্ডিতরত্নী' ঘরের পাত্র মেলা ত সোজা······"

"আপনার বাসাটা এখানে কোথায়? 'সোনারপুরা'র দিকে না?"

"না। ঐ 'পাড়ে-হাব্‌লী', ১৮।২৩ নং। বড় বাদাম গাছটার সামনেই। আচ্ছা, আজ উঠলুম; এক বার দুর্গাবাড়ীর ঐ দিকে

যেতে হবে।"—বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং সাধুদ্বয়ের উদ্দেশে নিম-বেদীমূলে প্রণাম দিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন সেই প্রৌঢ়ার দিকে ফিরিয়া ভৈরব কহিলেন—"বুকভরা ভক্তি নিয়ে খালি তাঁর পিছনে ছুটছিস বেটী ; তোর ত একেবারে জিত-কাট্, 'বুড়ি' ছুয়ে বসেছিস !"

স্ত্রীলোকটি একটু আগাইয়া আসিয়া বসিল। আঁচল হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ভৈরবের পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল—"মহাপাপী বাবা ! কি করে যে উদ্ধার হ'ব জানি না। একটু পায়ের ধূলো দিন দেবতারা, তারি জোরে যদি······"

"তুই ত এগিয়ে চলেছিস বেটী ! রাত কেটে গিয়ে দিন আসচে। বুকের সিংহাসনে হর-পার্ব্বতীকে বসিয়েছিস ; কাজ ত গুছিয়ে নিয়েছিস !—বামুনের মেয়ে ?"

"না, বাবা। কায়স্থ। জীবনটা বৃথা গেল বাবা, কিছুই করতে পারলুম না ; হট্টগোলে আর বাজে কাজেই······"

হঠাৎ চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক পা—এক পা করিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ভৈরবের বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা হইল। গলি হইতে 'বাণামহলে'র ফটকে ঢুকিয়া, ডান দিকে একখানা বাড়ীর পরের যে বাড়ীখানায় তিনি থাকেন, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটিও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া গৃহে ফিরিবার উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কহিলেন—"তুই কিছু চিন্তা করিস না, মা। তোকে যখন মা বোলেচি, সব ভার রইল আমার। সন্ধ্যা হোয়ে আসচে ; যা, এখন ঘরে যা। কাল সকালে আসিস আমার বাসায়। ঠিক আসবি।"

পায়ের ধূলা লইয়া পূর্ণশশী নামে সেই স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল।

পরের দিন, তার পরের দিন, এবং তার পরের দিন স্ত্রীলোকটি ভৈরবের বাসায় আসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কি সব কথাবার্ত্তা ও আলাপ-আলোচনা করিয়া গেল।

এ কয় দিনই ভৈরবের মন খুব প্রফুল্ল, অথচ চিন্তা, সন্দেহ ও ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ। এ কয় দিনই তাঁরা 'ছত্রে' খাইতে যান নাই। নিমতলাতেও বসেন নাই। শুধু এক বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছেন মাত্র এবং দেখিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্রকান্তও আসেন নাই। এ কয় দিন চন্দ্রকান্তও ছত্রে খাইতে যান নাই। চতুর্থ দিনে ভৈরব চন্দ্রকান্তের সংবাদ লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাসায় গিয়া দেখিলেন—তিনি শয্যায় শুইয়া আছেন এবং ভয়ানক অসুস্থ।

ভৈরব জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্বর হয় কি ?"

"বাইরে হয় না, ভেতর—ভেতর।"

"গা-জ্বালা ?"

"ভয়ানক !"

"ঘুম ?"

"খালি স্বপ্ন। আর অনবরত আপনার গিয়ে···ইয়ে হয়।"

"কি হয় ?"

"এই বুকটা ধড়ফড় করে।"

"দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। এক কাজ করতে পারবেন ? ঐ 'ছোট ডিম' একটা কোরে, তার সঙ্গে আধ আউন্সটাক···ঐ গিয়ে···বুঝতে পেরেচেন বোধ হয় ? আমার কাছে আছে খানিকটা ; একটু না হয় দিয়ে যাব এখন"—বলিয়া ভৈরব উঠিলেন।

ভৈরব চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রকান্তও শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ঘরে তালা লাগাইয়া বাহিরের পথে আসিয়া দ্রুতপদে হন্-হন্ করিয়া চলিলেন।

* * * *

ভৈরবের শরীরও কয় দিন হইতে ভয়ানক অসুস্থ। আহারে রুচি নাই, চোখে ঘুম নাই, গাত্রদাহ, অস্থিরতা, পেট ভুটভাট, খিটখিটে স্বভাব, মস্তিষ্ক সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান—ইত্যাদি। গৃহিণী হেমলতা কহিল—"এক জন ডাক্তার ডেকে ওষুধ-টোষুধ খাও একটু। চব্বিশ ঘণ্টা এই রকম শুয়ে ছটফট করবে—এ ত ভাল নয়।"

বিরক্তির সহিত ভৈরব কহিলেন,—"ডাক্তার ! ওষুধ ! 'খোকার বেলা ডাক্তার আর ওষুধের হাট বসিয়ে দিয়েছিলুম—বাড়ীতে। কর-করে হাজার টাকা আমার তাতে বেরিয়ে গেছে ! একটি হাজার টাকা ! বাপ্ ! গেলুম !—সতা, একটু চা কোরে দাও, বুক শুকিয়ে উঠলো বড্ড !"

চা খাইয়া, কাঁধে চাদর ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমলতা কহিল—"আবার কোথায় বেরুচ্চ ?"

"দেখি, আর এক বার পূর্ণশশীর খোঁজ নিয়ে আসি। উঃ ! কি শনিতেই ধরেছে রে বাবা। এক কাঁড়ি টাকা গেল, চাকরীটারও আশা নেই, ওদিকে ভাড়াটে ব্যাটা দিব্বি মজা পেয়ে এই তিন-চার মাস ভাড়া পাঠাবার আর নামটি নেই। গুয়োটা ভেবেচে—সন্ন্যাসী হোয়ে বেরিয়ে গেল, ভাড়া-টাড়া আর দিতে হবে না। হয় ত বা ভেবেচে, বাড়ীখানাই তার হোয়ে গেল।"

"তা তার কি অপরাধ ? গেরুয়া পরে একেবারে বিবাগী হয়েই ও বেরিয়ে এলে।"

"ভুল, ভুল ! মস্ত ভুল কোরে ফেলেচি। উঃ ! কি ক্ষতিটাই কোরেচি। ভাবলুম, পূর্ণশশীর তিন হাজার টাকা হস্তগত করতে পারলে সমস্ত ক্ষতিটার পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এ-ও বুঝি ফস্কায় ! এখানেও ভুল করে ফেললুম !"

"তার সঙ্গে তুমি নিজে কোলকাতায় গেলেই ত পারতে।"

"তবে আর বলচি কি ? এখানেও ভুল কোরে বসলুম ! এ-ও বোধ হয় ফস্কায় ! কম নয় তিন—তিন হাজার টাকা ! উঃ ! কি করি রে বাবা !

পূর্ণশশীর উদ্দেশ্যে ভৈরব ক্ষিপ্তের মত 'পুষ্পদন্তেশ্বরে'র দিকে চলিয়া গেল ! এবং অনেক বেলায় বিষণ্ণ বদনে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন হেমলতা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল—"এসেছে ?"

"না !"—নির্জ্জীবের মত ভৈরব গিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল।

পূর্ণশশীর ব্যাপারটা এই :—

সে বালবিধবা। ধর্ম্মপরায়ণা। হাতে যৎসামান্য টাকা আছে। সেই টাকা দিয়া কাশীতে সে ছোট একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। কিন্তু যাহার কাছে এ প্রস্তাব করে, সে-ই বলে, তিন হাজার টাকায় শিবমন্দির হয় না ; অন্ততঃ দশ হাজার চাই। ভৈরবই শুধু বলিয়াছে, ঐ টাকাতেই হইবে এবং তার সকল ভারও ভৈরব গ্রহণ করিবে। ভৈরবকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া পূর্ণশশীরও তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি হইয়াছে। টাকাটা

কলিকাতায় ব্যাঙ্কে আছে। সেই টাকা আনিতে পূর্ণশশী কলিকাতায় গিয়াছে। সঙ্গে গিয়াছে তার বাড়ীর বাড়ীওলা—নবীন সিমলাই। ফিরিবার কথা গিয়াছে—তরস্থ, অর্থাৎ পরশুর আগের দিন, কিন্তু আজও ফিরে নাই। তাই ভৈরবের গাত্রদাহ, জ্বরভাব, অনিদ্রা, অরুচি, পেট ভুটভাট এবং দিনের মধ্যে বিশ বার করিয়া 'পুষ্পদন্তেশ্বরে' পূর্ণশশীর বাসায় ছুটাছুটি!

শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতে করিতে ভৈরব কহিলেন—"আমি এবার মরবো।"

মুখভার করিয়া হেমলতা কহিল—"কি যে অলুক্ষণে কথা বল, তার ঠিক নেই! বলি, তোমার ত আর টাকার কিছু কমতি নেই। পরের টাকার ওপর……"

"আরে, টাকা আমার আর থাকলো কই? চোদ্দ হাজার পূরো —নেট্—ছিল; তার থেকে এক ভুতুড়ে ধাক্কায় বেরিয়ে গেল প্রায় দু'টি হাজার; তার সঙ্গে যায় চাকরীটাও! পূর্ণশশীর এই তিনটে হাজার নির্ঘাৎ আসবার কথা; কিন্তু……উঃ!

—'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিঠুর শিশির ঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া'!"

চমকিয়া উঠিয়া হেমলতা বলিল—"ও আবার কি?"

"বোধ হয় পাগল হোয়ে যাব, লতা!"

হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল—"দাদা, কেমন আছেন? দাদা!"

হেমলতা দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়া বসিল।

চন্দ্রকান্ত বাবু ঘরে ঢুকিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এ কি! অসুখ না কি?"

"ভয়ানক!—আপনার ত আর দেখাই পাওয়া যায় না। যখনি যাই, গিয়ে দেখি—ঘরে তালা বন্ধ। কোথায় যান বলুন ত?"

আমতা-আমতা করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"ঐ আপনার… ওর নাম কি…সারা দিন একলা ঘরে থাকতে পারি না, তাই ঐ… ওর নাম কি…ইয়ে……" বলিয়াই চন্দ্রকান্ত নীরব হইলেন।

বাড়ীওলার মেয়ে উপরে আসিয়া ভৈরবের হাতে একখানা ডাকের চিঠি দিয়া গেল। ভৈরব বসিয়াছিলেন; চিঠিখানা পড়িয়া, ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং মুখখানা বিকৃত করিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন।

চিঠিখানা পূর্ণশশী লিখিয়াছে কলিকাতা হইতে। তাহাতে লেখা—'বাবা, ক্ষমা করিবেন। সব মতলব ওলট-পালট হইয়া গেল। যাহা ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না। আমার প্রণাম লইবেন। ইতি—'

* * * *

কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কের একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পূর্ণশশীর বাড়ীওলা—কাশীর নবীন সিমলাই ও তস্য সম্বন্ধী সীতানাথের নিভৃত আলাপ চলিতেছিল। সৌখীন সীতানাথের সাধারণ বেশভূষা বর্ত্তমানে কথঞ্চিৎ অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার পরণে গেরুয়ার থান, তদুপরি গেরুয়ার আলখাল্লা, বুকে-পিঠে গেরুয়ার উত্তরীয়। মাথায় ফেরতা দিয়া একখণ্ড লাল চেলী বাঁধা; তাহার দুই প্রান্তভাগ দক্ষিণ কর্ণকে ঢাকিয়া ঝুলিতেছে। পদদ্বয় নগ্ন।

সীতানাথ কহিল—"দাদা, তিন হাজারের আর্দ্ধেকটা, অর্থাৎ দেড় হাজার আমায় দিন। বড়ই টানাটানি যাচ্ছে। চাল কুড়ি টাকা, কয়লা তিন টাকা, বস্ত্রাভাবে বোধ হয় শীগ্‌গিরই দিগম্বর…"

বাধা দিয়া নবীন কহিল—"দেখ সীতানাথ, এতে আর বেশী লোভ কোরো না। ঐ পাঁচশ' বলেচি, না হয় আরো শ'দুই নিও, এর ওপর আর কথা কোয়ো না। অন্য লোক সাজিয়েও আমি আনতে পারতুম, তাকে শ'দুত্তিন দিলেই চলতো!" তার পর হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—"তবে তুমি হলে বৌয়ের ভ্রাতা, তাই ভাবলুম—তোমার মাথাতেই ধরি ছাতা…হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

"যাক দাদা, একটু ভাল কোরেই তা হোলে ছাতাটা ধরুন, যাতে একটু ছায়া পাই! অন্ততঃ হাজারখানেক যেন…"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখন চল, কাজটা আগে আজ শেষ কর, টাকা 'রেডি'। আমি আগে যাব। তার পর মিনিট পনের-কুড়ি পরে তুমি…বুঝলে? আমি চল্লুম তা' হোলে। বিকালে আবার তোমার ওখানে যাব—টাকাটা আনতে।" সিমলাই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পার্ক হইতে বাহির হইয়া বরাবর খালধারের পথ ধরিয়া বল্লভ লেনের এক ক্ষুদ্র বাটীতে প্রবেশ করিল। নীচের তলার একটি ঘরে পূর্ণশশী জানালার ধারে একা বসিয়া নশ্বর জগৎ, জীবন, পাপ-পুণ্য, শিবমন্দির, কাশী, মেদিনীপুরের বন্যা ও সেখানকার দুর্গতদের দুর্দ্দশা প্রভৃতির কথা চিন্তা করিতেছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিমলাই কহিল—"একলাটি চুপ করে বসে বসে কি ভাবচেন?"

"মেদনীপুরের কথা ভাবছি বাবা। উঃ কী ভীষণ! এগার হাজার লোক…!"

"তাদের জন্যে ত আর কোন ভাবনাই নেই। এখন ভাবনা—যারা অন্ন-বস্ত্রের অভাবে আধমরা হোয়ে পড়ে র'য়েছে তাদের জন্য—এদের বাঁচানো, এ যে কত বড় পুণ্য, কত বড় মহৎ কাজ, তা আর বলা যায় না। লক্ষ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাও এর কাছে…শাস্ত্রে আছে:—'নলিনীদলগতজলমতিতরলম্, তদ্বদ্ জীবনমতিশয়চপলং'—অর্থাৎ এই বিশাল জগৎ-জলতরঙ্গে মানব ভাসছে, প্রত্যেকের বুকের মধ্যে আছেন নারায়ণ।—'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা'—যিনি নিজের সঙ্গতি দিয়ে এই সব বিপন্ন মানবদের এই দুঃখ-ভবার্ণব থেকে উদ্ধার করবেন তিনিই সজ্জন, তিনি নারায়ণকে উদ্ধার করবেন; কেন না, প্রত্যেক নারী ও নরের মধ্যে রয়েছেন—স্বয়ং নারায়ণ। সুতরাং…এই যে, উনি এসেছেন। আসুন বাবা, প্রণাম।" সীতানাথের পদপ্রান্তে সিমলাই প্রণাম করিল। পূর্ণশশীও করিল। এবং সীতানাথের বসিবার জন্য একখানি কুশাসন পাতিয়া দিল।

আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিয়া সীতানাথ কহিল—"বড্ড কাজের ভীড় পড়েছে মা, বেশীক্ষণ বসতে পারবো না। কাল পাঁচ হাজার মণ চাল কেনা হোয়েছে, আজই সব পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। চান্দী নগরের রাজা কোলকাতায় এসেছেন, তিনি একষট্টি হাজার টাকা দেবেন, সেখানেও একবার যেতে হবে। টাকাটা যদি তৈরী থাকে, তাহোলে…"

পূর্ণশশী ব্যস্ততার সহিত কহিল—"না বাবা, আপনাকে দেরী করাবো না, আমি সব ঠিক করে রেখেছি"—বলিয়া ট্রাঙ্কের মধ্য হইতে

কাপড়ে বাঁধা নোটের পুঁটুলি সীতানাথের পদপ্রান্তে রাখিয়া আর এক বার ভক্তিভরে প্রণাম করিল। এই সময়ে সিমলাইয়ের অন্তরের যে অন্তর—সেখানটা একটু ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! সে ভাবিল—'দেশের এত বড় একটা শোচনীয় দুর্ঘটনাকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে এ কাজ না কোরলেই ভাল হোতো! বোধ হয়, এ ব্যাপারে আমার জোড়া আর কেউ নেই যে, এই উপলক্ষে টাকা ফাঁকি দিয়ে নিতে পারে!' বুকটা এক বার কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মনে কতকটা বল আনিল। ভাবিল—"এ ছাড়া আর কি উপায়েই বা নিতে পারতুম! কিন্তু নেওয়াটা!······তা, এক জোচ্চোরের হাত থেকে আমি ছিনিয়ে নিয়েছি মাত্র। সেই ত প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল! তবু—তবু···"

তিন হাজার টাকার পুঁটুলী লইয়া, পূর্ণশশীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সীতানাথ চলিয়া গেল। সিমলাই কহিল—"সহস্র শিবমন্দির করার চেয়েও আপনার এ কাজ অনেক বড় হলো!"

পূর্ণশশী কহিল—"তা' হোলে বাবা, কাজ ত হোয়ে গেল, এখানে থেকে আর ফল কি! কালই চলুন, ফেরা যাক।"

"তাই হবে।"

বিকালের দিকে সিমলাই সীতানাথের নিকট হইতে টাকা আনিতে গিয়া তাহাকে পাইল না; কাহারও নিকট তাহার সন্ধানও মিলিল না। কাঠের পুতুলের মত বহুক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহাভিমুখে ফিরিল।

বাসায় ফিরিয়া সিমলাইও অসুস্থ হইয়া পড়িল। অর্থাৎ এই ব্যাপার লইয়া অসুস্থ হইল—তিন জন। সীতানাথের স্বাস্থ্যের সংবাদ অজ্ঞাত রহিয়া গেল; কারণ, তাহার খোঁজ মিলিল না। অসুস্থতার জন্য সিমলাই সাত দিন কলিকাতায় ছিল বটে, কিন্তু এক দণ্ড বাসায় না থাকিয়া সীতানাথের সন্ধানে সারা কলিকাতা তোলপাড় করিয়াছিল, তত্রাচ তাহার কোন সন্ধান মিলাইতে পারে নাই। অবশেষে হতাশ অন্তরে অসুস্থ শরীর লইয়াই তাহাকে কাশী ফিরিতে হইল।

* * * *

এক মাস ভৈরব কলিকাতায় আসিয়াছেন। গেরুয়া ত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্বেকার মত গৃহী হইয়াছেন এবং অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বড় সাহেবের কৃপায় তাঁহার সে চাকুরীটি আবার পাইয়াছেন। খোকার জন্য তাঁহার যে টাকা সর্ব্ব রকমে ব্যয় হইয়াছে, সেই ক্ষতিটা পূরণের জন্য তিনি এক মাড়োয়ারীর গদীতে বাড়তি একটা কাজ লইয়াছেন। বেতন চল্লিশ টাকা! এখানে তাঁহাকে সকাল সাতটায় হাজিরা দিতে হয়। সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত 'ডিউটী'। এখান হইতেই সরাসর অফিসে যাইতে হয়। সুতরাং সকালে তাঁহার ভাত খাওয়া আর হয় না। ভোর পাঁচটায় উঠিয়া তিনি স্নান সারিয়া লন; তার পর 'ফারপো'র রুটী এবং আলু-চচ্চড়ি ও কিছু মিষ্টি রুমালে বাঁধিয়া মাড়োয়ারীর গদীতে গিয়া হাজির হন। সেখানে কাজ-শেষে বেলা দশটার সময় উহা খাইয়া আপিসে হাজিরা দেন। সন্ধ্যার পর একেবারে বাজার করিয়া বাড়ী ফেরেন। বাত রোগের জন্য কোন দিনই রাত্রে তাঁহার ভাত সহ্য হয় না; কয়েকখানি চাপাটি খাইয়া শুইয়া পড়েন। সুতরাং রবিবার ভিন্ন তাঁহার পেটে কোন দিনই আর ভাত পড়ে না।

এক দিন বাড়ী ফিরিতে ভৈরবের রাত নয়টা বাজিয়া গেল! হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল—"আজ এত রাত হোল যে?"

"বৌবাজারে বারো টাকায় একটা ছেলে-পড়ানো চাকরি নিয়েছি। দু'ঘণ্টা করে রোজ পড়াতে হবে। ভাবলুম, বহু টাকা বেরিয়ে গেছে, একটু খেটে-খুটে যতটা পারি উসুল করি। উঃ! মোহাচ্ছন্ন হোয়ে কি ভুলই করে ফেলেছি!"

"কিন্তু দিনরাত এ রকম খাটলে শরীর থাকবে কেন! এত কষ্ট করে টাকা রোজগারের কি দরকার?"

"বোঝ না, লতা। টাকা আমি ছাড়তে পারি না। প্রথম দিন-দু'চ্চার একটু কষ্ট হবে, তার পর স'য়ে যাবে। দাও, আজ বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও শীগ্‌গির।"

হেমলতা খাবার ঠিক করিতে গেল।

ইহারই দিনকতক পরে, ছেলে পড়াইয়া বৌবাজারে এক অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া ভৈরব ফিরিতেছিলেন,—একে 'ব্ল্যাক আউটে'র রাত্রি, তাহাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গ্যাস্‌পোষ্টগুলি আছে কি নাই জানা যায় না। এই ঘট্‌ঘটে অন্ধকারের মধ্যেও কিন্তু লোক-চলাচলের বিরাম নাই।

হঠাৎ ঘোর রবে চিত্তবিভ্রমকারী 'সাইরেণ' বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে পিছন হইতে এক সাইকেলের ধাক্কা খাইয়া ভৈরব পড়িলেন গিয়া—একটা সাদা ষাঁড়ের উপর। পরক্ষণেই জানিতে পারা গেল—ষাঁড় নয়, একটি মোটা-সোটা ভদ্রলোক! ভদ্রলোকটি ভৈরবের উদ্দেশে বাংলা ও ইংরেজীতে মিশাইয়া গালাগালি দিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে দিকে ভৈরবের ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় ছিল না। ছুটিয়া ভৈরব সামনেকার বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকটির ছিল—এক হাতে রাবড়ীর ভাঁড়, আর এক হাতে—কাপড়ের একটা বাণ্ডিল। রাবড়ী রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঘুসি পাকাইয়া তিনিও বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া, কহিলেন,—"আরে! ভৈরব বাবু!"

ভৈরবও তদ্রূপ বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—"চন্দ্রকান্ত বাবু! আরে, খবর ভাল ত? এ সব শাড়ী-ব্লাউজ কার জন্যে?"

"আর দাদা, বোলবেন না। শূন্যঘর পূর্ণ না কোরে আর থাকতে পারা গেল না!"

"কোথায় হলো?"

"ঐ কাশীতেই।"

"তা' হলে কি, 'পাঁড়ে-হাব্‌লী'র সেই বুড়ো ব্রাহ্মণ—সেই পণ্ডিতরত্নী' মেল্‌···?"

"হ্যাঁ দাদা; সেই। চলুন, এই কাছেই আমার বাসা; এক বার পায়ের ধুলো দিতেই হবে।"

সে দিন বৈরাগ্যের পুণ্যোজ্জ্বল পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। আজ 'ব্ল্যাক-আউটে'র অন্ধকার রাতে পুনর্মিলন! ভৈরবের হাত ধরিয়া চন্দ্রকান্ত টান দিয়া আবার কহিলেন—"চলুন, দাদা; এক বার যেতেই হবে; কিছুতেই ছাড়ছি না।"

ভৈরব কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে শুধু চন্দ্রকান্তের আনন্দোদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

করবী-মল্লিকা

[উপন্যাস]

৩৫

রান্না-বান্নার হাঙ্গামা মিলি ভালোবাসিত না! দুইএকটা নূতন তরকারী রাঁধিবার উৎসাহে ক্বচিৎ কখনো সে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছে। ভোর হইতে না হইতে সেই মিলি আজ কোমরে কাপড় জড়াইয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে!

গৃহকর্ম্মে বিমুখ, সৌখীন-প্রকৃতির মেয়েটির এ আচরণে মাসিমা অনুযোগ করিতে লাগিলেন, "আজ তোমার হলো কি, মিলি! সকালে উঠেই কালি-ঝুলি, হাতা-বেড়ি নিয়ে রইলে যে। ঠাকুরকে বলে-কয়ে তুমি পড়তে যাও। পড়া কামাই করে হাঁড়িঠেলা—ও আমি ভালোবাসি না!"

মিলি ঝঙ্কার দিল, "দিন-রাত বই মুখস্থ আমার ভালো লাগে না। বিদ্যার মধ্যে তো ঐ নিয়েই শুধু আছি। মেয়ে-জন্ম নিয়ে রান্না জানি না, লজ্জার কথা! আজ থেকে আমি রান্না শিখবো! এক জন ভদ্রলোককে খেতে বলেছি—তিনি আবার মাছ-মাংস খান না, এ দিক্‌টা তো দেখতে হয় মা! রান্না আর খাওয়ানো-দাওয়ানোর পাট করু নেয় বলেই না নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়! এখন্ করুর সময় আমি নষ্ট হতে দিতে পারবো না।"

মেয়ের কর্ত্তব্যবোধে মা বিরক্ত হইলেন। আমিও আশ্চর্য্য হইলাম। অতিথি-অভ্যাগতদের চিত্তবিভ্রমের জন্য মিলি এতকাল সাজ-সজ্জাই করিয়া আসিয়াছে! রাঙা ঠোঁট আরো রাঙাইয়া হাসির তীর নিক্ষেপ করিয়াছে! বাছা বাছা সরস বাক্য কণ্ঠে জমকাইয়া রসনায় শাণ দিয়াছে! ভূষণের ঝিকি-মিকি, বসনের ঝল-মল, নয়নের কটাক্ষ ছাড়া মিলির যে কাহারো জন্য করিবার কিছু আছে, তাহা জানিতাম না! এখন আর বেশী জানিবার অবকাশ ছিল না। চন্দ্রদা কতকগুলি লিখিতে দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বসিলাম। কোথা দিয়া যে শীতের স্বল্পায়ু বেলা মধ্যাহ্নের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জানিতে পারিলাম না।

অকস্মাৎ চন্দ্রদার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আমার ধ্যান ভাঙ্গিল। খাবার-ঘরে ঢুকিয়া দেখি, চন্দ্রদা আর ভানু পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে! মাসিমা বেতের মোড়ায় সমাসীন। প্রীতি-প্রফুল্ল হাস্যে মিলি পরিবেশন করিতেছে!

ভাত মাখিতে মাখিতে চন্দ্রদা বলিলেন, "বেলা ঢের হয়েছে, আপনারা সকলে খেতে বসুন, আর দেরী করবেন না।"

মিলির দিকে তাকাইয়া মাসিমা হুকুম দিলেন, "করুকে নিয়ে তুমি বসে যাও মিলি। ঠাকুর দেওয়া-থোওয়া করুক। আমার আজ ভাত খাওয়া নেই, একাদশী। তোমাদের হয়ে গেলে জল খাবো।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মিলি বলিল, "না, তা হয় না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, চন্দ্র বাবু! ছুটির দিনে আমরা বেলাতেই খাই। বেলাও বেশী হয়নি। আপনাদের আগে হোক।"

"আমাদের হবে কেন? একসঙ্গে বসতে আপনাদের আপত্তি আছে না কি? আপনারা কারো সামনে খেতে ভালোবাসেন না বুঝি?"

"তা নয়, তবে একসঙ্গে বস্‌লে খাওয়ানোর আনন্দ পাওয়া যায় না। খায় তো মানুষ নিত্যই—তাতে রস নেই! কিন্তু খাওয়ানো দৈবাৎ,—কাজেই তাতে আনন্দ প্রচুর!" বলিয়া মিলি মোচার গরম 'চপ' আনিতে গেল।

মাসিমা বিদেশের গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। একাধিক লোকের কাছে একাধিক বার বিদেশের বার্ত্তা বলিয়া মাসিমা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইয়া পুনরায় তিনি পুরাতন কথা বলিতে সুরু করিলেন।

নানা দেশের নানা আলোচনার মধ্য দিয়া আমাদের দ্বিপ্রহরের ভোজন-পর্ব্ব মিটিল।

আহারান্তে যাইবার সময় চন্দ্রদা বলিলেন—"সন্ধ্যার সময় আবার আসবো করু। যে দু'টো দিন আছি আবোল-তাবোল বকা যাবে, তাতে তোমার উপকার হোক্, আর নাই হোক্! কাছাকাছি থাক্‌লে তোমার পড়ার সঙ্গী হতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়।"

মিলি বলিল, "হবার নয় কেন? ইচ্ছা করলেই আপনি করুকে সাহায্য করতে পারেন।"

"কেমন করে পারি মল্লিকা দেবি? আমি যে রাজ্যের কাজ নিয়ে পড়েছি। ইচ্ছা থাক্‌লেও বেশী দিন কোথাও আমার থাক্‌বার উপায় নেই। থাক্‌তে পারলে বোনের সঙ্গে আবার ভুলে-যাওয়া বিদ্যার অনুশীলন করতাম।"

কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার উপকার লইতে মাসিমার বাধে—সে কাজ তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। সহানুভূতি বা দয়া-দাক্ষিণ্যে তাঁহার গর্ব্বকে আহত করে। মাসিমা মহা রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "যাঁর এখানে থাক্‌বার উপায় নেই, কেন তাঁকে বিরক্ত করছো মিলি? আমি তো আগেই টিউটরের কথা বলেছিলাম, করু বারণ করলে বলেই শুধু ঠিক করি নি। প্রোফেসরের কাছে পড়ার দরকার বোধ করলে সে ব্যবস্থা আমি করবো,—লোকের অভাব কি!"

"অভাবের কথা হচ্ছে না মা! তুমি তো জানো, করু কক্‌খনো তোমার পয়সা খরচ করতে চায় না। 'প্রোফেসর' রাখবার মত অবস্থা ওদের নয়। আপনার লোকের কাছ থেকে ও যদি একটু সুবিধা পায়, কেন তা নেবে না? তোমার-আমার জন্য বলছি নে চন্দ্র বাবুকে, বলছি ওঁর বোনের জন্য। শুনি, সকলের উপকার করে বেড়ানোই ওঁর কাজ। এত যিনি করেন, তাঁর কি উচিত নয় বোনের উপকার করা?"

"আপনি ঠিক বলেছেন মল্লিকা দেবি! ভাই হয়ে বোনের কোন কাজে না লাগলে চলবে কেন? কাল গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে আবার আমি ফিরে আসবো। ওর পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত দুই-এক বার আসা-যাওয়া করলে আমার সব দিক্ বজায় থাকবে।"

মিলির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

কুণ্ঠার সহিত আমি কহিলাম, "আপনার কত কাজ চন্দ্রদা, কাজের ক্ষতি করে কেন কষ্ট সইবেন আপনি? আমি নিজে-নিজেই পড়ে নেবো। ফল যা হবার, হবে!"

"আমি পড়ালেই যে ফল ভালো হবে, সে আশা আমি করি না

করি না করু, তবু চেষ্টা করবো। দাদা বলে স্বীকার করেছো—দাদার একটা কর্ত্তব্য আছে—সে কথা ভুলো না বোন।"

চন্দ্রদা সস্নেহে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মাসিমা সরিয়া গেলে মিলির উপর আমি খুব একচোট ঝাল ঝাড়িলাম। বলিলাম, "তোর এমন করে বলা অন্যায় মিলি। মাসিমার টাকা নেবো না, এমন কথা আমি কখনো বলিনি! শুধু শুধু অপব্যয় হবে, এই মনে করেই বারণ করেছিলাম। মাসিমা রাগ করলেন। তাঁর টাকা বাঁচিয়ে পাঁচ কাছ থেকে অনুগ্রহ নেবার ব্যবস্থা হলো, তিনি আমার মাসিমার চেয়ে বেশী আপন-জন নন, নিশ্চয়! ছি ছি, আমার লজ্জা করছে। কি দরকার ছিল তোর এত কাণ্ড করবার?"

কিছু না বলিয়া আমার খোলা চুলে একটা টান দিয়া মিলি মনের খেয়ালে কীর্ত্তন ধরিল—

"সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম!
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

৩৬

পরের দিন চন্দ্রদা চলিয়া গেলেন। আবার আসিয়া আবার গেলেন। তাঁহার এই আনা-গোনার মধ্যে আমার পরীক্ষার দিন আসন্ন হইল। বাহিরের সহিত আমার যোগাযোগ ক্রমে বিলীন হইয়া আসিল! চন্দ্রদা পড়ান, আমি শুনিয়া বুঝিয়া লই। মিলি আমার পাশে নিঃশব্দে ছায়ার মত বসিয়া থাকে। চন্দ্রদার আসিতে দেরী হইলে সে গিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনে! তাহাকে সন্দেহ করিবার সময় আমার হয় না। তেমন লক্ষ্যও করিতে পারি না। তবু মনে হয়, মিলির মধ্যে কি যেন একটা ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপার চলিতেছে! বিদ্যুৎ ও ঝটিকার রঙ্গভূমিতে স্নিগ্ধ-শীতল বারিবিন্দুর আভাস ক্ষণে সূচিত হইয়া ক্ষণে মিলাইয়া যায়!

চন্দ্রদার সঙ্গে মিলি অবাধে মেশে, সাগ্রহে বাক্যালাপ করে, কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লেশও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চন্দ্রদার আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যুত্তরে মিলির কণ্ঠে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিশ্বাসের সুর ধ্বনিয়া ওঠে।

এক দিন নিভৃতে মিলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চন্দ্রদাকে তোর কেমন লাগছে মিলি,—কৈ, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলছিস্ না কেন? চিরকাল তুই পুরুষের নিন্দায় পঞ্চমুখ, এবার নিয়ম-ভঙ্গ হলো কিসে?"

আমার প্রশ্ন এড়াইয়া মিলি আবৃত্তি করিতে লাগিল:—

"চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি,—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।"

রাগিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু রাগই করি, আর বিরক্তই হই, মিলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। চন্দ্রদাকে সত্যই আমার প্রয়োজন ছিল। মিলি এমন সংযোগ না করিয়া দিলে আমি চন্দ্রদার নাগাল পাইতাম না। দিতে পারি কি না জানি না, লইবার ক্ষমতা আমার নাই!

দিন যায়,—অবশেষে আমার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিলাম।

সে-দিন পরীক্ষার গুরু-ভার নামাইয়া হাল্কা মনে বাড়ী ফিরিয়া দেখি, বহু দিনের পর আবার আমাদের পুরাতন সভা বসিয়াছে। দিদি আসিয়াছেন, জ্যোতি বাবু আসিয়াছেন,—সে সভায় চন্দ্রদাও উপস্থিত।

কথা ছিল, আজ রাত্রের গাড়ীতে চন্দ্রদা দেশে যাইবেন। দিদির ব্যবস্থায় আগামী কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে! কাল সন্ধ্যায় দিদি আমাদের সকলকে খাইতে বলিয়াছেন। বাবা আমাকে অনতিবিলম্বে রওনা হইতে লিখিয়াছেন। প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, এখন ঝড়ের পাখীর নীড়ে ফিরিবার পালা।

দিদির প্রস্তাবে মাসিমা বলিলেন, "বেশ তো, ওরা যাবে। তবে ভানুর না যাওয়াই উচিত। ভারী অমনোযোগী ছেলে—একটা কিছু ছুতো পেলে বই আর ছুঁতে চায় না!"

দিদি কহিলেন, "ছেলে-মানুষদের স্বভাবই অমনি! তা হোক্—তবু ভানু যাবে। আপনি সকলকে নিয়ে যাবেন। খাওয়া নামের, আসল হচ্ছে, সকলে একত্র হয়ে একটু আমোদ করা। চন্দ্রচূড় ভাইটিও এক বার পালালে ওকে আবার ধরা মুস্কিল। করুও থাকবে না,—আবার কত কালে ওদের পাবো, কে জানে?"

মাসিমা বলিলেন, "তা ঠিক। এখন মিলিরও তৈরী হবার সময় হয়ে এলো। 'জুলাই'-য়ে ওর পরীক্ষা। মাঝখানে শুধু দু'টো মাস—মিলি এবার কিচ্ছু পড়ছে না!"

"না পড়ুক মাসিমা, না পড়েই ও যা ফল করবে, অন্যে হাজার পড়েও ওর সমান হতে পারবে না। শ্রাবণের প্রথমে পরীক্ষা,—মা'র ইচ্ছা—শেষের দিকে যেন দিন হয়! শ্রাবণে না হলে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক—ক' মাস আর বিয়ে হবে না। অগ্রহায়ণে আবার জ্যোতির জন্ম-মাস,—ও-মাসে মা বিয়ে দেবেন না। তার পর সেই মাঘ-ফাল্গুন—সে অনেক দিনের ধাক্কা। মার শরীরও ইদানীং ভালো যাচ্ছে না বলে আমাদের ইচ্ছা, শ্রাবণেই দিন হোক্,—এতে আপনার বোধ হয় অমত হবে না!"

"না, আমার অমত কিসের? বিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়তে চাই। কাল তোমার মার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হবে।"

আমি জ্যোতি বাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি অনিমেষ নয়নে মিলিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, মিলির মুখ কিন্তু আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন!

চন্দ্রদা সোৎসাহে কহিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং! শ্রাবণেই আইবুড়ো-নাম ঘুচিয়ে ইতর জনদের মিষ্টান্ন বিতরণ করো জ্যোতি! জ্যাঠাইমার শরীর ভালো নয়, দেরী করা উচিত নয়।"

চন্দ্রদার কথা শেষ হইতে না হইতে মিলি দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া চন্দ্রদাকে আক্রমণ করিল। বলিল, "উচিত-অনুচিত নিয়ে আপনার এত মাথা-ব্যথা কেন বলুন তো? এতই যদি সখ, তবে আগে নিজের আইবুড়ো-নাম ঘোচান তো দেখি! নিজের বেলায় দিব্যি আঁটিসুটি থেকে অন্যের পায়ে শেকল পরানোর জন্য এত উৎসাহ কেন?"

এ আক্রোশের মর্ম্ম বেচারা চন্দ্রদা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

দিদির হাসি-মুখ পলকে শ্রীহীন, পাণ্ডুর হইয়া গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মিলির এ উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার লাগিবার কথা, তিনি লেশমাত্র বিচলিত হইলেন না।

আদুরে মেয়ের অর্থহীন আব্দারের মত মিলির ঝাঁজ হাসির বাতাসে উড়াইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, "কারো অনিচ্ছায় কেউ কাকেও শেকল পরাতে পারে না, মিস গুপ্ত! চন্দরের উৎসাহ বেশি, ওর পালাটাই আগে শেষ করা যাক, কি বলো দিদি! তুমি উঠে-পড়ে লেগে যাও ভোজের জোগাড়ে। করবী দেবীর উপর ভার দেওয়া হোক, কনে-নির্ব্বাচনের। আমি কাজের লোক না হলেও একেবারে অকেজো নই, আমি খাট্‌বো তোমাদের ফাই-ফরমাশ!"

জ্যোতি বাবুর হাল্কা পরিহাসে দিদি আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, "এর বাড়া আনন্দের আর কি আছে জ্যোতি! চন্দরকে ধরে-বেঁধে সংসারে না ঢোকালে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। তোরা ছেলেবেলাকার খেলার সাথী, সব কাজে সাথী হয়ে চলবি,—দেখে আমাদেরো চোখ জুড়োবে। এখনো সময় আছে, এর মধ্যে আমি ভালো মেয়ে খুঁজে বের করতে পারবো! তার পর শ্রাবণের শেষের দিকে দু'টি শুভ কাজ শেষ করা যাবে।"

চন্দ্রদা অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া ঘাড় নাড়িলেন। "দোহাই তোমাদের দিদি, আমাকে রেহাই দাও। আমি এখন বিয়ে করতে পারবো না, তার সময়ও নেই। ভেবে-চিন্তে পরে তোমাদের জানাবো।"

জ্যোতি বাবু কহিলেন, এতে "ভাববাব কিছু নেই চন্দর! বিয়ের ব্যাপারে বেশি ভাবতে গেলে অনেক সমস্যা এসে দেখা দেয়। না ভেবে চটপট ও-কাজ সেরে ফেলাই সঙ্গত। তোমার কাজে এক জন সহকর্ম্মীও তো চাই। একের বদলে দোসর পেলে সব কাজের সুবিধা হয়। আর তোমাদের মত এমন সব ছেলেরা যদি সন্তান-ব্রত নিয়ে থাকতে চাও, তা হলে সমাজ চলে না, সংসারও চলে না। তুমি বাপ-মা'র প্রথম সন্তান—তোমার ওপর তাঁদের কতখানি আশা-ভরসা! শ্রাবণেই তোমার বিয়ে ঠিক থাক্‌লো। মিথ্যা ওজর দেখিয়ো না ভাই।"

হাত-জোড় করিয়া চন্দ্রদা নীরবে মাথা নাড়িলেন।

স্পষ্ট স্বরে মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, "এ যে তোমাদের জুলুম জ্যোতি, এক্‌ জনের মতের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মত চালাবার এ চেষ্টা অন্যায়! সবাইকেই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোনো মানে নেই!"

"অন্যের তাতে মানে নেই! আর যত মানে আমার বেলায়? আমার মাথার উপর পরীক্ষা, এ সময় বিয়ে, বিয়ের দিন বল্‌তে তোমাদের বাধে না? সকলেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, আমার নিজের বুঝি তা থাকতে নেই? বিয়ে আমি করবো না,—করতে পারবো না। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও।"—বলিতে বলিতে চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া মিলি উঠিয়া গেল।

মিলির ভাবান্তর যেমন আকস্মিক, তেমনি অভাবনীয়! কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সকলে সচমকে মিলির পথের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মিলির এই অহেতুক অশ্রু-বর্ষণ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। তাহার অশ্রু-সূচনায় মাসিমা বিমনা হইলেন। মিলির চক্ষে চিরদিন আমরা বিদ্যুৎই দেখিয়াছি! এ বর্ষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। মেয়ের স্বভাবের সহিত মাসিমার পরিচয় বাকী ছিল না। ছাত্রী-মহলে মাসিমার তেজস্বিতার খ্যাতি থাকিলেও মিলির কাছে তাহা মূল্যহীন। মেয়ের সংকল্প প্রতি পদে মা'র সংকল্পকে পরাভূত করিয়া রাখে।

সম্মুখে ভাবী জামাতা, ভাবী কুটুম্বিনী,—নিজেকে সামলাইয়া লইতে মাসিমার বিলম্ব হইল না। একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো হলে কি হবে, বড্ড ছেলেমানুষ, পড়ার চাপে ওর মেজাজ ভালো নেই! তা আমি বলি কি, এখন দিনের কথা তুলে কাজ নেই। ভালোয়-ভালোয় পরীক্ষা হয়ে যাক্‌, তার পর যা হয় করা যাবে। ওর পরীক্ষার দিক্‌টাও তো আমাদের দেখতে হবে।"

"তা দেখতে হবে বৈ কি, মাসিমা। কিন্তু এর জন্য কান্নাকাটি, বিয়ে করবো না,—এ সব আমার ভালো লাগে না। মিলি যত ভালো হোক, আমার ভাইও ফেলনা নয়, তারো মান-সম্ভ্রম আছে। মার কাণে এ সব কথা গেলে তিনি কি ভাববেন, বলুন তো?"

"এ সব তুচ্ছ কথা তাঁর কাণে যাবেই বা কেন? তাছাড়া ছেলেমানুষের ছেলেমী কেন তোমরা ধরছো? আগে ওর পরীক্ষা হোক্‌, তার পরে দেখে নিয়ো, সব ঠিক হয়ে যাবে। জ্যোতি ফেলনা হবে কেন,—ভালো বলেই দশ জনের মধ্য থেকে না আমি ওকে বেছে রেখেছি!"

মাসিমার আশ্বাসেও দিদির প্রশান্ত আননের বিষণ্ণতা আজ তিরোহিত হইল না।

জ্যোতি বাবুর অধরে কিন্তু চাপা হাসি খেলিতে লাগিল।

৩৭

আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিয়াছিল, মিলির প্রস্থানের পর তেমনি তাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

মিলিকে ডাকিতে গিয়া রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখ হইতে আমি ফিরিয়া আসিলাম। মিলি সাড়া দিল না, দরজা খুলিল না।

নারী-চরিত্রে অনভিজ্ঞ চন্দ্রদা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ওঁর হলো কি? অমন করে চলে গেলেন কেন? শ্রাবণ মাসে বিয়ে যদি না করতে চান, বেশ তো, দিন পিছিয়ে দিলেই হবে।"

মাসিমা বলিলেন, "আমিও তাই বল্‌ছি।"

দিদি কোন কথা কহিলেন না। চন্দ্রদা চিন্তান্বিত ভাবে চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন।

সহসা চন্দ্রদার পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া জ্যোতি বাবু ডাকিলেন, "জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছো না কি চন্দর? চলো, 'লেক' ঘুরে বাড়ী ফেরা যাক্‌। দিদি, তুমি বসবে? না, বেড়াতে যাবে?"

"রাত হয়ে গেছে, আর বসবো না, বাড়ী যাবো। আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোরা বেড়াতে যা।"

দিদি উঠিয়া মাসিমার নিকটে নিমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রান্ত দেহে আমি বিছানায় লুটাইয়া পড়িলাম। অবসাদে আমার চোখ বুজিয়া আসিল। জলযোগের সময় মিলি আমাকে রাত্রের মত খাইতে দিয়াছিল, কাজেই আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

* * * *

"করু, ও করু,—মা গো, এ যে কুম্ভকর্ণের ঘুম! এক-রাতে কি হবে? দিনে-রাতে পুষিয়ে নিতে হবে। উঠে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে। খেয়ে-দেয়ে আবার না হয় ঘুমোস্!"

মিলির আহ্বানে আমার সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি, বেলা হইয়াছে, রবিকরোজ্জ্বল ধরণীর চতুর্দ্দিকে কাজের সাড়া পড়িয়াছে। আমার বিছানার অনেকটায় প্রভাতের রৌদ্র ঝক্‌মক্ করিতেছে! সত্যই আমি কুম্ভকর্ণ হইয়াছি! এমন গভীর ঘুম আর কখনো ঘুমাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না!

লজ্জিত হইয়া কহিলাম, "আমি যেন মরে ছিলাম, মিলি! তুই আমায় আগে ডাকিস্‌নি কেন? ছি, ছি, মাসিমা কি ভাবছেন! তাঁর চা খাওয়া হয়ে গেছে? আজ চাটুকু তৈরি করে দিতে পারলুম না?"

"এক দিন পারিস্‌নি, তাতে কি হয়েছে? মাসীর বাড়ীতে এমন দাসত্ব করা আমি জন্মে দেখিনি করু! মা আবার ভাববেন কি? পরিশ্রমের পরে ক্লান্তি আসে, এ তাঁর জানা আছে। নে, চট্ করে মুখ ধুয়ে আয়, আমি তোর চা করে দিই।"

"তুই কেন করবি, বেয়ারাকে বলে দে।"

"আমাদের চা তো কোন দিন বেয়ারাকে করতে দিস্‌না। নিজের হাতে চা তৈরী করে দিয়ে আস্‌ছিস। এত সেবা-যত্ন আর কে করবে? আমরা কেবল তোর কাছ থেকে আদায়ই করছি। এবার নেয়া-দেয়া ফুরিয়ে এলো, করু! যে দু'টো দিন আছিস্, আমার কাছ থেকে কিছু নে।"

আমি চমকিত হইলাম! মিলির কণ্ঠে এমন করুণ স্বর এত দিন কোথায় ছিল? এ উচ্ছ্বাস তাহার ধাতের বাহিরে। মিলি কাহাকেও নরম করিয়া কিছু বলিতে পারে না, হৃদয়ের কোমল ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহে না! তাহার মনের গহনে পাপিয়া, পিক, চন্দনার মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হয় কি না, জানি না! সাধারণতঃ সে কল-ভাষিণী, মুখরা সারিকা! সেই সারিকা আজ শ্যামার কূজন কোথায় শিখিল? যেখানেই শিখুক, আমার হৃদয় বিগলিত হইল। মনে পড়িল, এখানে আমার কাজ ফুরাইয়াছে। শান্ত সুন্দর সংযত পাঠ্য-জীবনের সমাপ্তি হইয়াছে। মিলির সহিত আমার অবিচ্ছিন্ন মিলনে বিচ্ছেদ আসিয়াছে!

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিলির একখানি হাত আমি চাপিয়া ধরিলাম।

আমার বালিসে হেলান দিয়া মিলি বলিল, "কি দুষ্টু মেয়ে! নিজেও উঠবি না, আমাকেও উঠতে দিবি না! একা পড়ে থেকে তৃপ্তি হচ্ছে না, দোসর চাই? না বাপু, আমি এখন তোমার কাছে শুতে পারবো না, এই দণ্ডে স্নান করে এসেছি। ভিজে চুল শপ্-শপ্ করছে। ছোট বোনকে শয্যাসঙ্গী না করে শীগ্‌গির বিয়ে করে ফেল্ করু, বি-এ হলে বিয়ে করতে হয়।"

"নিশ্চয়! আর তার ব্যতিক্রমে মর্ম্মাহত হয়েছি। বছর দুই আগে তোর যা করণীয় ছিল, তার স্বপ্ন অন্যকে দেখাচ্ছিস্ কেন?"

"আগে নিজের পালা সাঙ্গ কর্, তার পর পরের বিধান করিস্?"

"করতে চেয়েছিলাম, তুই হতে দিস্‌নি। বড়র না হলে ছোটর বিয়ে শাস্ত্রে বাধে। এবার তুই তাড়াতাড়ি সেরে নে, আমি বরণ-ডালা সাজাই!"

"বরণডালা যত সহজ, বর তত সহজ নয় মিলি! আমাদের মতন ধেড়ে মেয়ের বর জোটানো আকাশ-কুসুম। আকাশ-কুসুমের দুরাশায় আমি বরং কয়েক দিন জিরিয়ে নিই। তোর যখন বসন্ত 'জাগ্রত দ্বারে', তুই তাকে বারেবারে ফিরিয়ে দিস্‌নে। বড় অনুমতি দিলে আটকায় না রে, আমি তোকে অনুমতি দিলুম। আমরা দিন-ক্ষণ স্থির করতে বস্‌লে তুই কিন্তু 'গোসা-ঘরে' বসে খিল দিতে পারবি নে!"

"সাধে খিল দিই? বড়র অব্যবস্থায় মনের দুঃখে দোরে খিল দিতে হয়। জ্যেষ্ঠার অনুমতি তো সব নয়, কনিষ্ঠারো কর্ত্তব্য আছে। হাতের কাছে যখন একটি মিলেছে, তখন সেটি বড়র প্রাপ্য হোক্। ছোটর ভাগ্যে নিতান্ত না মিললে দিদির প্রসাদ-স্বরূপ—"

আমি মিলির মুখ চাপিয়া ধরিলাম। হোক উপহাস, তবু মিলি এ বলে কি? বাধা না পাইলে মুখরার মুখের আগল খুলিয়া যাইবে! যাহা আমার ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, তাহার এতটুকু আভাসও আমি সহিতে পারিব না! ইহা আমার—কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"লুকানো বিষাদ আঁধার অমায় মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে ঢালে সুমধুর বেদনা কত।"

মিলিকে আর একটি কথা বলিবার অবসর না দিয়া প্রায় ছুটিয়া আমি স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। কলের জলের ঝর-ঝর শব্দের সহিত মিশিয়া মিলির দূরাগত মধুর স্বর আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

মিলির গান শুনিতে শুনিতে আমি মনে মনে বলিলাম, 'ওগো গরবিনী সুন্দরী, তুমি বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে পারো, কিন্তু তোমার কণ্ঠের ভাষণ প্রাণের নয়। হৃদয়ের তারের সঙ্গে তোমার স্বরের মিল নাই! থাকিলে ও-গান গাহিতে গাহিতে তুমি কাঁদিতে! হাসিতে পারিতে না! হাসিয়া লও সুহাসিনী, তোমার জীবন হাসির জীবন! কাঁদিবার জীবন পৃথক, তুমি তাহা জানো না। জগতের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা লুণ্ঠন করিয়া তোমার ভাণ্ডার তুমি পূর্ণ করিয়া রাখো, অক্ষয় করিয়া রাখো! তোমার ও কৃপণ হস্ত হইতে করুণার এক কণাও তুমি বিতরণ করিয়ো না!'

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিবালা দেবী।

ছোটদের আসর

বিবাহ-বিভ্রাট

(রূপকথা)

অনেক দিনের কথা। কাঞ্চনপুরের বাইরে শ্মশানের কাছে এক সন্ন্যাসী বাস করতেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিলেন ক'জন শিষ্য। এক জন শিষ্যের নাম রামদাস। রামদাস চমৎকার গান গাইতো। ক'জন শিষ্যকে নিয়ে এক দিন গুরু কোথায় গেছেন, রাত অনেক হয়েছে—বাকী শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়েছে—রামদাস নিজের মনে বসে বসে গান গাইছে। গাইতে গাইতে হঠাৎ শুনলো, কে যেন বলছে,—"রামদাস, বলি ও রামদাস, শুনছো?" নাম শুনে কুটীরের বাইরে এসে রামদাস দেখে, এক বৃদ্ধ। রামদাস জিগ্যেস করলে—"আমায় আপনি ডাকছিলেন?" বৃদ্ধ উত্তর দিলে—"হাঁ। আমার প্রভু কাঞ্চনপুরের রাজা। পারিষদদের নিয়ে এই কাছেই তিনি অবস্থান করছেন। আপনার গানের সুখ্যাতি শুনে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমায় তিনি আদেশ করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে যদি আসেন তো বড় ভালো হয়।" রামদাস বললে—"বেশ।"

তখনি সে নিজের একতারাটি নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। অন্য শিষ্যেরা ঘুমুচ্ছে দেখে তাদের সে কিছু বলে গেল না।

খানিক দূর গেলে বৃদ্ধ বললে—"দেখুন, যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে একটা কথা বলি।"

রামদাস হেসে বললে—"মনে করবো কেন? বলুন, কি বলবেন!"

বৃদ্ধ বললে—"মহারাজের কাছে আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যাবো।"

চোখ বাঁধার কথা শুনে রামদাস একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। দেখে বৃদ্ধ বললে—"আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার বুঝছেন তো, কোন বাইরের লোককে তাঁর কাছে গুপ্তপথে নিয়ে যেতে হলে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়াই বিধি। এতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, আপনি ফিরে যেতে পারেন।" রামদাস দেখলে, কথাটা বৃদ্ধ নেহাৎ অন্যায় বলেনি। তাই সে বললে, বেশ,—"তাই হোক্"।

বৃদ্ধ তখন রুমাল দিয়ে রামদাসের চোখ বেঁধে দিলে, রামদাস চমকে উঠলো, কি হিমশীতল স্পর্শ! তার সমস্ত শরীর যেন কন্‌কনিয়ে গেল! মনে একটু ভয়ও হলো; কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

কিছুক্ষণ চলবার পর তার কাণে এলো, কে যেন বলছে—"রামদাস এসেছে?" সঙ্গী বললে, "হ্যাঁ, এইবার তবে চোখ খুলে দি।" সে-লোকটি বললে—"একেবারে মহারাজের সামনে নিয়ে গিয়ে চোখ খুলো।" একটু পরেই লোক-জনের পায়ের আওয়াজ, কাপড়-জামার খস-খস শব্দে রামদাস বুঝলে যে, সে রাজসভায় পৌঁচেছে!

বৃদ্ধ তার চোখ খুলে দিলে। রামদাস অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল! প্রকাণ্ড ঘর—আলোয় আলো! সুবেশা নর্ত্তকীরা বসে আছে। অপর প্রান্তে রাজসিংহাসনে মহারাজ। তাঁর পাশে ছোট একটি সিংহাসনে পরমাসুন্দরী এক কন্যা। চারি দিকে সভাসদেরা বসে। রামদাস মহারাজকে প্রণাম করলে। তিনি বললেন—"রামদাস, আমরা তোমার গান শোনবার জন্য উৎসুক। তুমি গান আরম্ভ করো।"

ঘরের মধ্যে খুব দামী গালচে পাতা ছিল। রামদাস সেই গালচেয় বসে প্রাণ খুলে গান গাইতে লাগলো। অপূর্ব্ব সঙ্গীত! সভাব সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো। গান শেষ হলে মহারাজ বললেন, "রামদাস, তোমার গান শুনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আমার একমাত্র কন্যা পুষ্পমঞ্জরীর বিশেষ ইচ্ছা, তুমি রোজ এসে তাকে গান শোনাও।" রামদাস অভিবাদন করে বললে—"মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

তার পর বৃদ্ধ আবার তার চোখ বেঁধে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো তবে কুটীরের সামনে। চোখ খুলে দিয়ে বললে, "আমি কাল আবার আসবো তোমাকে নিয়ে যেতে। এ সব কথা কিন্তু কাউকে বলো না, তা হলে ক্ষতি হতে পারে!" রামদাস বললে, "না, না, কাউকে বলবো না।"

বৃদ্ধ চলে গেল। রামদাস কুটীরে ঢুকে দেখলে, এখনও সকলে ঘুমুচ্ছে। কাউকে না জাগিয়ে সে-ও ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। রাজকন্যা পুষ্পমঞ্জরীব কথা মনে পড়তে লাগল।

পরদিন রাত্রে আবার সেই বুড়ো এলো। রামদাস তার জন্য তৈরী হয়ে বাহিরে অপেক্ষা করছিল। রামদাসের চোখ বেঁধে বুড়ো তাকে রাজসভায় নিয়ে গেল। রামদাসের গান হলো। গান শেষ হলে রাজকন্যা নিজের মাথার ফুল রামদাসকে উপহার দিলেন। রামদাস যেন হাতে স্বর্গ পেলো!

পরের দিন আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে সে নিজের কুটীরে ফিরে গেল। "কাল আবার আসবো—তৈরী হয়ে থকেবেন" বলে বৃদ্ধ কুটীরের সামনে থেকে বিদায় নিলে।

রামদাস কুটীরে ঢুকতেই তার এক বন্ধু জিগ্যেস করলে—"কি রামদাস, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" রামদাস ভাবেনি, কেউ জেগে থাকবে! হকচকিয়ে গিয়ে সে বললে,—"কোথাও নয়! এই ঘুম আসছিল না—তাই বাইরে একটু বেড়াচ্ছিলুম।" এই কথা বলে তাড়াতাড়ি সে শুয়ে পড়লো।

বন্ধু কিন্তু রামদাসের কথা বিশ্বাস করলে না। সে মনে মনে ঠিক করলে, রামদাস কোথায় যায়—কেন যায়, দেখতে হবে। রাত্রে সে ঘুমোবার ভাণ করে শুয়ে পড়ে রইলো। তার পর রামদাস যখন বৃদ্ধের সঙ্গে বেরুলো, সে-ও একটু দূরে থেকে ওদের পিছু-পিছু চলল। খানিক দূর যাবার পর বৃদ্ধ আর রামদাস কোথায় যেন মিলিয়ে গেল! সে আর কিছু দেখতে পেলে না!

ওদিকে রাজ-সভায় রামদাসের গান হলো। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। গান শেষ হলে মহারাজ বললেন, "রামদাস, আমরা তোমার গান শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তুমি কি চাও, বলো?" রামদাস রাজকন্যার মুখের দিকে চাইলে এবং তাঁকে মৃদু হাসতে দেখে সাহস করে বললে, "যদি আপনি সত্যই আমার গান শুনে খুশী হয়ে থাকেন এবং আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, তবে অভয় দিলে আমি আমার ইচ্ছা জানাতে পারি।"

মহারাজ তার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বললেন—"তুমি নির্ভয়ে তোমার মনের কথা বলতে পারো।" রামদাস তখন বিনীত ভাবে বললে—"আমি রাজকন্যা পুষ্পমঞ্জরীকে বিয়ে করতে চাই।"

মহারাজ বললেন,—"আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম।"

তখনি পুরোহিত ডেকে রাজকন্যা পুষ্পমঞ্জরীর সঙ্গে রামদাসের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হলো। মহারাজ রামদাসকে একখানি মোহর দিয়ে বললেন, "এই টাকা নিয়ে সহরে একটা ভালো বাড়ী ভাড়া করে তুমি থাকো গে। রাজার জামাইয়ের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে তো! আর একটা কথা তোমায় সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে—রাত্রির অন্ধকার ছাড়া দিনের আলোয় কখনও আমাদের কারো দেখা তুমি পাবে না।"

তার পর বৃদ্ধের সঙ্গে রামদাস আবার গুরুর কুটীরে ফিরে এলো।

সে রাত্রে রামদাসের বন্ধু হরিদাস জেগে বসেছিল। রামদাস ফিরতেই সে প্রশ্ন করলে,—"কি রামদাস, কোথায় গিয়েছিলে?" রামদাস জবাব দিলে—"কোথাও না।" হরিদাস বললে, "কোথাও না, মানে? আমি দেখলুম, তুমি এক জন বুড়োর সঙ্গে যাচ্ছ, আমি তোমাদের পিছু-পিছু গেলুম, কিন্তু তোমরা যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলে, আর দেখতে পেলুম না! ও কি, তোমার হাতে ও-পুঁটলি কিসের?"

ধরা পড়ে গেছে দেখে রামদাস বললে, "বাইরে চলো, বলছি।"

কুটীরের বাইরে এসে রামদাস বললে—"কাউকে বলো না যেন! এ পুঁটলিতে মোহর আছে।"

হরিদাস প্রশ্ন করলে, "মোহর কোথা পেলে?" রামদাস বললে, "না ভাই, সে কথা আমায় জিগ্যেস কোরো না। সে আমি বলতে পারবো না।"

উদ্বিগ্ন হয়ে হরিদাস প্রশ্ন করলে, চোর-ডাকাতের দলে মেশোনি তো? "রামদাস হেসে উত্তর দিলে, না, না।"

হরিদাসের মনের সন্দেহ কিন্তু সে-কথায় গেল না।

দিন-দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রামদাস যখন বাড়ী-ভাড়া আর প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্তর কিনতে বেরুলো, হরিদাস আলাদা তার পিছু নিলে। সব গোছগাছ করে বাড়ীতে চাবি দিয়ে রামদাস যেই বেরিয়েছে, অমনি দেখে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হরিদাস। হরিদাস বললে—"সব দেখেছি ভায়া! এত টাকা কোথায় পেলে মোদ্দা বলো? না বললে এখনি আমি সহর-কোতোয়ালকে জানিয়ে দেবো, তুমি চোর!"

ভয়ে রামদাস বললে, "তুমি এই টাকার ভাগ নাও, কিন্তু কোথা থেকে পেয়েছি, তা জিজ্ঞেস করো না। আর এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলো না।"

হরিদাস ইতস্ততঃ করে বললে—"না ভাই, চোরাই-মালের ভাগ আমি নেবো না! শেষে ধরা পড়লে আমিও কারাগারে যাই আর কি!"

কাতর স্বরে রামদাস বললে—"সত্যি বলছি, এ চোরাই-মাল নয়। আমাকে এক জন দিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এর বেশী আমি আর কিছু বলতে পারবো না।"

হরিদাস বললে—"না ভাই, আমি ভাগ চাই না। আর কোনো প্রশ্নও করবো না—যদি আমাকে তোমার বাড়ী থাকতে দাও আর খেতে-পরতে দাও! টাকা-কড়িতে আমার দরকার কি!"

রামদাস তখনি সানন্দে রাজী হলো। সে ভেবে দেখলে, বাড়ী-ঘর-দোর দেখবার জন্য এক জন লোকের দরকার তো! বিনা-পয়সায় জানাশুনা লোক পাওয়া গেল, মন্দ কি। ও-দিকে হরিদাস ভাবলে, বাড়ীতে সব সময় থাকলে রামদাসের গোপন কথা সব জানতে পারা যাবে; তার পরে মোচড় দিয়ে অনেক বেশী টাকা আদায় হবে!

সেই দিন রাত্রে গান-বাজনার আওয়াজে হরিদাসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চুপি-চুপি ওপরে গিয়ে সে দেখে, রামদাসের ঘরের দরজা বন্ধ এবং সেই ঘর থেকে হাসি, ঠাট্টা, গান-বাজনার আওয়াজ আসছে। হরিদাস দেখবার চেষ্টা করলে,—কিন্তু দরজা-জানলা সব বন্ধ—কাজেই কিছু দেখতে পেলে না। সে তখন নীচে সদরের কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো।

ভোর হয়ে গেল, তবুও কেউ বাড়ীর বার হলো না,—হরিদাস তখন ভিতর থেকে দরজায় তালা বন্ধ করে সমস্ত বাড়ীটা খুব ভালো করে খুঁজলে,—জনপ্রাণীর দেখা পেলো না। রামদাসের ঘরের সামনে গিয়ে তাকে ডাকতে রামদাস ঘরের দরজা খুলে দিলে। হরিদাস তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখে, সেখানে অন্য-কোনও প্রাণী নেই। এ-কথা সে-কথার পর হরিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না।

পরের দিন রাত্রে সে ঘুমালো না—জেগে বসে রইলো, কিন্তু দরজা দিয়ে কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে না। হঠাৎ কিন্তু কাণে সেই আগের রাত্রির মত গান-বাজনার আওয়াজ ভেসে এলো। অমনই সে তাড়াতাড়ি উঠে উপরে গেল। দরজায় আস্তে ধাক্কা দিলে—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তখন সে বাহির থেকে শিকল টেনে দিয়ে ঘরের সামনে চুপ করে বসে রইলো। ভিতর থেকে নাচ-গান হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ আসছে! কিছুক্ষণ জেগে থাকবার পর ঘুমে হরিদাসের চোখ ভারী হয়ে এলো।

হরিদাস ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখে দরজা তেমনি বন্ধ আছে। ভিতরে গান-বাজনাও বন্ধ। শিকল খুলে সে রামদাসকে ডাকলে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে রামদাস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে,—"কি হরিদাস, ব্যাপার কি?" হরিদাস বললে—"সকাল হয়ে গেছে, তাই ডাকতে এলুম। এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছো!" রামদাস বললে—"হুঁ,—তাই তো, এত বেলা হয়ে গেছে!" কৃত্রিম উদ্বেগে হরিদাস বললে—"তোমার শরীর ভাল তো? রাত্রে ঘুম হয়েছিল?" রামদাস উত্তর দিলে—"হ্যাঁ।" হরিদাস আর কোনো প্রশ্ন করলে না।

দিনের বেলা রামদাস বাইরে গেলে হরিদাস রামদাসের ঘরের দরজায় একটা ফুটো করে রাখলো। সে রাত্রে গান-বাজনার শব্দ পেতেই ওপরে গিয়ে রামদাসের দরজার সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে কি হচ্ছে, দেখবার চেষ্টা করলে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল। আলো খুব কম। সবই যেন ঝাপসা। সেই ঝাপসা আলোয় সে দেখলে, রামদাস গান গাইছে আর একটি মেয়ে বসে একাগ্র চিত্তে তার গান শুনছে। গান শেষ হলে এক-দল নর্ত্তকী নাচতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যেন হাজার বাতি জ্বলে উঠলো। সে কি চমৎকার নাচ! হরিদাস মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো। আশ্চর্য্য! সে কিন্তু কারো মুখ দেখতে পেলে না। সকলের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। হঠাৎ

কোথা থেকে যেন ঘরে একটা দমকা হাওয়া এলো। সে হাওয়ায় রামদাসের পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, তার মুখের ঘোমটা গেল সরে। যা দেখলে, তাতে হরিদাস বিমুগ্ধ হলো! তার চোখের আর পলক পড়ে না। এমন সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আছে? এমন রূপ? চাঁদের জ্যোৎস্না যেন ও-রূপের কাছে মলিন হয়ে গেল!

তার পর নাচ শেষ হলো। নাচ শেষ হতে নর্ত্তকীরা ঘোমটা খুলে রামদাস আর সেই মেয়েটিকে অভিবাদন করলে। তারাও তেমনি রূপসী! ও-মেয়েটি যদি হয় চাঁদ, এরা চাঁদের পাশে যেন নক্ষত্র! হরিদাস স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে রইলো—রাত্রি ও-দিকে গড়িয়ে চলেছে প্রহরের পর প্রহর বয়ে—হরিদাসের সে-দিকে চেতনা নেই।

তার পর সকাল হলো! দরজা খুলে রামদাস এলো বাইরে। হরিদাসকে দেখে রামদাস বললে, "ব্যাপার কি হরিদাস? এখানে এমন পাথরের মত বসে আছো যে!" হরিদাসের মুখে কথা নেই!

রামদাস বললে, "আমাকে ডাকতে এসেছো বুঝি? ভাবছো, আজো বেলা হবে আমার ঘুম ভাঙ্গতে!"

হরিদাস কোনো মতে জবাব দিলে, "তাই!"

এ কথা বলে সে উঠে তখনি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গেল একেবারে নিজেদের সেই পুরানো আড্ডায়!

আড্ডায় গিয়ে বন্ধু প্রাণকেষ্টকে সে রাত্রির কথা খুলে বললে। প্রাণকেষ্ট বললে, "দরজা বন্ধ অথচ তারা চলে গেল?" হরিদাস বললে, "তা বৈ কি!"

প্রাণকেষ্ট বললে—"বুঝেছি। তারা নিশ্চয় পরী। এ ভালো কথা নয়, হরিদাস! রামদাসকে পরীতে পেয়েছে। ওঝা ডাকা দরকার।"

এ কথা বলে হরিদাসকে নিয়ে প্রাণকেষ্ট চললো—এক ওঝার কাছে।

কথা শুনে ওঝা বললে—"মন্ত্র পড়ে ও-পরী তাড়াতে হবে। আসলে ওরা পরী নয়।"

হরিদাস বললে,—"ওরা তবে কি?"

ওঝা বললে—মন্ত্র পড়ি আগে, তার পর দেখো, ওরা কি! আজ রাত্রেই তা হলে ব্যবস্থা করো। আমি যাবো সে-বাড়ীতে।

তাই হলো। রাত্রে ওঝাকে নিয়ে হরিদাস আর প্রাণকেষ্ট এলো রামদাসের বাড়ী। উপরের ঘরে নাচ-গান, হাসি-হল্লা চলেছে। হরিদাস বললে, "ঐ—শুনতে পাচ্ছ।"

ওঝা বললে, "চুপ! গোল কোর না। চুপি-চুপি চলো দোতলায়—সেই ঘরের সামনে।"

তিন জনে এলো দোতলায়। দরজার ফুটোর কাছে গিয়ে ঘরের ভিতরে চেয়ে ওঝা বললে, "ছাখো, এবারে মন্ত্র পড়ি।"

ওঝা মন্ত্র পড়তে লাগলো—খুব মৃদু কণ্ঠে। তার পর বললে—"ওদের আমি তাড়াবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তোমার বন্ধু প্রাণে বাঁচবে কি না সন্দেহ! তোমরা যা বলবে, আমি তাই করবো। ব্যাপার খুব সুবিধার নয়—তা আগে থেকেই বলে রাখছি। ওদের মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে সুন্দরী, ওকে তোমাদের রামদাস বিয়ে করেছে। ওরা প্রেতিনী।"

হরিদাস বললে—"প্রেতিনী!"

ওঝা বললে—"মন্ত্র পড়া হয়েছে। এবার দরজার ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখ দিকিনি!"

হরিদাস দেখলে। দেখে আঁৎকে উঠলো!

যাদের দেখেছিল পরমা সুন্দরী পরী, এখন মন্ত্রের গুণে দেখে, তারা পরী নয়! কঙ্কাল!

প্রাণকেষ্ট বললে,—"ওদের তাড়াবার বন্দোবস্ত করো।"

ওঝা তখন ঘর-বেঁধে বেঁচিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো। একটু পরেই ভিতর থেকে নাকি-সুরে আওয়াজ এলো—"চুঁপ কঁর, থাঁমো, আঁমি চঁলে যাঁচ্ছি!"

ওঝা প্রশ্ন করলে—"তুই কে?" উত্তর এল—"আঁমি কাঁঞ্চনপুঁরের রাঁজকন্যা পুঁষ্পমঞ্জরী। আঁর এঁরা সঁব আঁমার সঁখি।" ওঝা জিজ্ঞেস করলে,—"তোমরা এখানে কেন?" উত্তর এলো—"এঁটা আঁমার শ্বঁশুর-বাঁড়ী।" ওঝা প্রশ্ন করলে—"রামদাস তোমার কে?" প্রেতিনী উত্তর দিলে—"আঁমার বঁর।" ওঝা আবার জিজ্ঞেস করলে—"তোমরা এ দশা প্রাপ্ত হলে কেন?" সে উত্তর দিলে—"ভূঁমিকম্পে রাঁজ-প্রাঁসাদ পঁড়ে গিঁছলো। প্রাঁসাদের সঁকলেই আঁমবা অঁপমৃত্যুর জঁন্য প্রেঁত হঁয়েছি।" ওঝা তখন আদেশের সুরে বললে—"বেশ, তোমরা যাও।" প্রেতিনী উত্তর দিলে—"আঁমরা এঁখুনি চঁলে যাঁচ্ছি, কিঁন্তু ওঁকে নিঁয়ে যাঁবো। উঁনি আঁমাকে বিঁয়ে কঁরেছেন!"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা গেল খুলে।

হিমের মত ঠাণ্ডা এক ঝলক দমকা হাওয়া ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। সকলে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে রামদাসের নিশ্চল দেহ বিছানায় পড়ে আছে! গলায় পাঁচ আঙ্গুলের দাগ। বোধ হয়, যাবার সময় পুষ্পমঞ্জরী গলা টিপে অপঘাতে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকেও নিজের সঙ্গে প্রেতপুরীতে নিয়ে গেছে!

কাঞ্চনপুরে এখনও সে বাড়ী আছে। যদিও সময়ের গতির সঙ্গে তা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে! সেখানকার লোকেরা বলেন, এখনও প্রতি রাত্রে নাচ-গান, হাসি-হল্লা সেই বাড়ী থেকে ভেসে আসে! ভয়ে কেউ রাত্রে ও-দিক্ মাড়াতে চায় না!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

আবিষ্কারের কথা

কল্পনা এবং মাথা খাটাইয়া মানুষ এই যে নানা যন্ত্র-তন্ত্র তৈয়ারী করিতেছেন, আইন-মতে এগুলির পেটেণ্ট-রেজিষ্ট্রী করা প্রয়োজন। নহিলে তুমি করিলে নূতন রকমের কোনো যন্ত্র আবিষ্কার, সে-যন্ত্র বাজারে বেচিয়া অর্থ উপার্জ্জন হইবে,—আমি সে-যন্ত্র তৈয়ার করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিলাম আমার তৈয়ারী বলিয়া—তোমার লোকসানের সীমা রহিল না! একের ধন অপরে না লইতে পারে; তাহারি জন্য আইন-মোতাবেক এই সব আবিষ্কার-রচনাদি রেজিষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা আছে—সকল দেশে।

স্বাধীন দেশে মানুষের কল্পনা যেমন দিগ্-দিগন্তে প্রসারিত হয়, আবিষ্কারের সুযোগও তেমনি সে সব দেশে অনেক বেশী। তাই ওদিকে আমেরিকায় ও য়ুরোপে এবং এদিকে জাপানে নব-নব আবিষ্কারের এমন সমারোহ দেখি। আমাদের দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তির

অভাব নাই,—কল্পনা এবং চিন্তা করিয়া যন্ত্র ও আসবাব-পত্রের আবিষ্কারে আমাদের দেশের লোকের শক্তি নাই, এমন কথা বলা চলে না! তবে সুবিধা ও সুযোগের অভাবে সে শক্তির বিকাশ ঘটে না।

তোমরা যদি ভাবিয়া থাকো, আবিষ্কারে মাথা খাটাইতে হইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তো সে ধারণা ঠিক
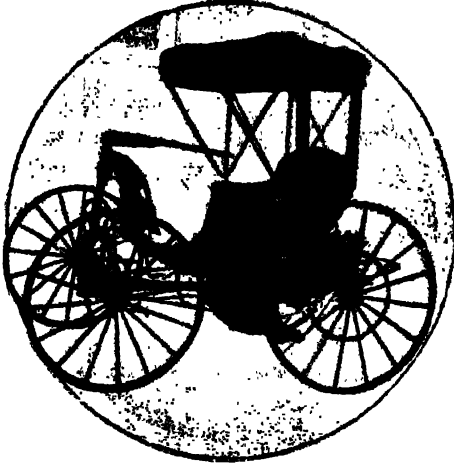
প্রথম মোটর-গাড়ী (১৮৯৩)

নয়, জানিয়ো। কারণ, আমেরিকার যে সব মনীষী নানা যন্ত্র-তন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁরা প্রাইমারী বিজ্ঞান-পাঠের একটি পাতাও খুলিয়া দেখেন নাই! ল্যাবরেটরি সম্বন্ধেও তাঁদের এক তিল অভিজ্ঞতা ছিল না।

আবিষ্কার সম্বন্ধে মার্কিন মহামতি লিন্‌কন বড় একটি সত্য কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—মানুষ সর্ব্ব-প্রথমে কি

মোটর-গাড়ীর ক্রমোন্নতি (১৯০৬)

আবিষ্কার করিয়াছিল? মানুষ প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিল নিজের অবস্থার নগ্নতা—এবং সে তখন ভাবিয়া স্থির করিল, গাছের লতা-পাতা-বল্কল দিয়া নগ্নতার আবরণ রচনা করিতে। গাছের পাতা আর বল্কল হইতেই পৃথিবীতে আজ ধুতি-শাড়ী-লুঙ্গি, উড়নি কোট-পেণ্টলেন, সার্ট-পাঞ্জাবী-টুপির আবিষ্কার ঘটিয়াছে। কেহ বলেন, বর্ণমালা মানুষের প্রথম আবিষ্কার। কেহ বলেন, লাঠি এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রথম আবিষ্কার; হিংস্র পশু এবং শত্রু বধ করিয়া নিরাপদে বাসের ব্যবস্থা করিতে মানুষ আবিষ্কার করিয়াছিল লাঠি এবং অস্ত্র-শস্ত্র। আবার কেহ বলেন, আগুন জ্বালিবার উপায় মানুষের প্রথম আবিষ্কার। গৃহ-নির্ম্মাণকেও অনেকে আবার মানুষের প্রথম আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করেন।

এ সবের আলোচনা করিয়া লিন্‌কন বলিয়াছেন, খাদ্য-সংগ্রহ বা গৃহ-নির্ম্মাণ পশু-পক্ষীতেও করে। তবে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে ভাবে তারা খাদ্য সংগ্রহ বা গৃহ নির্ম্মাণ করিত, আজ পাঁচ হাজার বৎসর পরেও তাদের সে খাদ্য-সংগ্রহ বা গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালীতে কোনো পার্থক্য নাই! মানুষের সঙ্গে তাদের প্রভেদ শুধু ঐটুকু!

আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত সন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কাজে দীন-দরিদ্রেরাই সব চেয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। অভাবে মানুষের
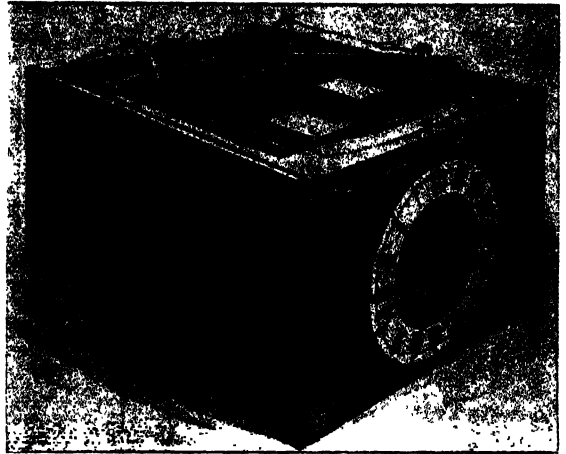
প্রথম টাইপ-রাইটার (উইলিয়াম বার্টের আবিষ্কার)

চিন্তাশক্তি খুব বেশী জাগ্রত হয় এবং সে চিন্তার প্রভাবে অভাব-মোচনের উদ্দেশ্যেই আবিষ্কারের পত্তন। তাই ইংরেজীতে চলিত কথা দেখি,—**Necessity is the mother of inventions.** সিন্দুকের বা আলমারির চাবি খুলিতে না পারিয়া মাথা খাটাইয়া চাবি খুলিবার যে উপায় চোর-ডাকাতে বাহির করে, তাহাকেও আবিষ্কারের কোঠায় ফেলা চলে!

দূর-পথের পাড়িকে সহজ ও ক্ষিপ্র করিবার জন্য মানুষ প্রথমে বলদের পিঠে চাপিত,—তার পর ঘোড়াকে করিল বাহন,—ঘোড়ার ক্ষিপ্রগতির জন্য। ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ পথ চলা সহজ নয়; তাই গাড়ীর সৃষ্টি হইল। এবং এ গাড়ীকে যতখানি স্বচ্ছন্দ ও সহজ করা যায়, সে সম্বন্ধে মানুষের কল্পনা ও চিন্তার বিরাম ছিল না বলিয়াই আজ স্থলপথে আমরা পাইয়াছি মোটর-গাড়ী। জলপথের পাড়িকে স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্র করিতে দাঁড়-টানা নৌকার পরে মানুষ বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিয়াছে পালতোলা জাহাজ, ষ্টীমার এবং মোটর-বোট। তবু মানুষের চিন্তা গেল না! শূন্যপথে কি করিয়া পাড়ি দেওয়া চলে? মানুষের এ চিন্তা এবং কল্পনা হইতে প্রথমে নির্ম্মিত হইল বেলুন।

বেলুনকে নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হইল—তার পর হইল এরোপ্লেনের সৃষ্টি। এই এরোপ্লেনকে সহায় করিয়া কি ভাবে শত্রু ও শত্রুর দেশকে ধ্বংস করা যায়, বুদ্ধির বলে তাই আজ যে সব বিধ্বংসী প্লেনের সৃষ্টি হইয়াছে, তার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সে পরিচয়ে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃত মন লজ্জায়-ঘৃণায় আতঙ্কে-ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে!

ধ্বংসের কথা ছাড়িয়া দিই। মানব-জীবনকে স্বচ্ছন্দ করিতে জীবলোকের স্থিতি ও পালনের জন্য এই যে সব নানা যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে—কলের তাঁত, কলের লাঙ্গল, বৈদ্যুতিক আলো-পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফটোগ্রাফি, রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন, সিনেমা প্রভৃতি—এ সবে জীবলোকের কতখানি কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে, তার আর সীমা নাই।

বৈদ্যুতিক প্রবাহের কথা ধরা যাক্! বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কবে ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া ঘুড়ির সুতায় বিদ্যুতের প্রবাহ ধরিয়া ছিলেন! সে-প্রবাহ লইয়া ছেলেখেলায় না মাতিয়া তিনি গভীর চিন্তা-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁর সে ধ্যান-তপস্যার ফলে মর্ত্ত্যলোক আজ
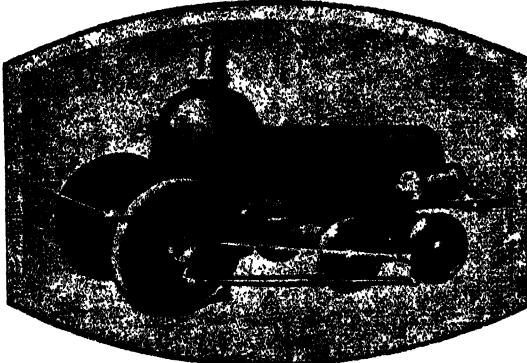
রেল-এঞ্জিনের মডেল (১৮৪০)

বিদ্যুৎকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে পাইয়া জীবনকে কত দিক্ দিয়া কতখানি সুবহ-স্বচ্ছন্দ করিয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়ে আকুল হই! ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী মনে পড়ে! ভগীরথ যে গঙ্গাকে ভারতে আনিয়াছিলেন, সে গঙ্গা আজ আমাদের কতখানি কল্যাণ-সাধন করিতেছেন! ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ-আনয়নেও সারা পৃথিবী তেমনি কল্যাণ-সম্পদে সমৃদ্ধ!

বাড়ীতে আজ তেলের প্রদীপের জায়গায় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া কত সহজে আমরা কতখানি আলো পাইতেছি, তৈল-সলিতার হাঙ্গামা নাই—শুধু একটি সুইচ টেপা! এ বৈদ্যুতিক আলোর সৃষ্টি করিয়াছেন এডিশন। এ আলো-পাখা দরিদ্র-ধনী-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে সহজলভ্য করিতে তাঁর সাধনার অন্ত ছিল না—তাঁহারি সাধনার ফলে আমরা আজ এতখানি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছি।

বিদ্যুতের ঐ প্রবাহ-ধারা—তার শক্তি কতখানি, সে পরিচয় এডিশন প্রভৃতি আবিষ্কারকের কল্যাণে আজ আমাদের কাঁহারো আর অজ্ঞাত নাই।

শুধু যন্ত্র কেন, মূক-বধিরের শিক্ষা-বিধি আবিষ্কারের কথা ভাবো! আলেকজান্দার গ্রেহাম বেল্ স্বপ্ন দেখিতেন, কল্পনা করিতেন, চিন্তা করিতেন,—ঐ যে অগণিত মূক-বধির বেচারা মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া পাথর হইয়া রহিল—তাদের এ প্রস্তরত্ব ঘুচানো যায় না? শব্দ-বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া শব্দ-তরঙ্গের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া তিনি শব্দ-স্পন্দনের সাহায্যে মূক-বধিরকে আজ সচেতন করিয়াছেন, তাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়াছেন।

ছুঁচ, সুতা, আলপিন, জামার বোতাম, হুক, পেরেক, স্ক্রু,—এ-সবের সৃষ্টি হইল কিরূপে, ভাবিয়া দেখিয়াছ? বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আবিষ্কারের রাজ্য সীমাহীন। এখনো কল্পনা এবং চিন্তা করিয়া আবিষ্কারের রাজ্যে অনেক-কিছু করিবার আছে। তোমরা-আমরা—সকলেই যদি চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক চালনা করি, জীবনকে আরো স্বচ্ছন্দ করিবার উপযোগী বহু সামগ্রী হয়তো তৈয়ারী করিতে পারিব।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইরিচ্ হার্জ বলিয়া গিয়াছেন—ভগবান্ মানুষকে যে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়াছেন, তাহার জোরে মানুষ অসংখ্য পৃথিবী সৃষ্টি করিতে পারে—সে জন্য মানুষকে আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে! এ-কথায় বিশ্বামিত্রের নূতন পৃথিবী-সৃষ্টির কথা মিথ্যা কল্পনা বলিয়া মনে হয় না।

তোমরাও আলস্য ত্যাগ করো—শিক্ষা করো—মস্তিষ্ক চালনা করো—আবিষ্কারে মর্ত্ত্য-বাসকে আরো স্বচ্ছন্দ করিয়া জীব-জগতের কল্যাণ সাধন করিবে! ধরণীর ইতিহাসে অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নাম ক্ষোদিত রাখিতে পারিবে!

পর চর্চ্চা

সে-দিন ট্রামে চড়ে চলেছি, সামনের শীটে দু'জন ভদ্রলোক বসে অনর্গল কথা কইছিলেন। তাঁদের কথা স্পষ্ট শুনছিলুম। ট্রাম চলেছিল লালদীঘির দিক থেকে ভবানীপুর। ভদ্রলোক দু'টি যে-কথা বলছিলেন, তাকে কথা বললে কথার অপমান হয়—তাঁরা করছিলেন পর-চর্চ্চা! এবং যাঁদের সম্বন্ধে চর্চ্চা, তাঁরা অবশ্য ছিলেন বহু দূরে, নেপথ্যে, তাঁদের সে চর্চ্চার নাগালের বাইরে!

তাঁদের কথার মর্ম্ম—অফিসের বড় বাবু থেকে অন্য সহকর্ম্মীরা সবাই মন্দ—নিন্দার যোগ্য!

তাঁদের সে আলাপ-আলোচনা শুনে মনে হচ্ছিল, দুনিয়ায় যত মন্দ যত বদ লোক, সবাই যেন পরামর্শ করে একত্র মিশেছেন ওঁদের দু'জনের অফিসে!

ট্রাম থেকে নেমে সে-দিন ওঁদের কথাই মনে হচ্ছিল। ভাবছিলুম, মানুষ সত্যই এত মন্দ হতে পারে? শুধু স্বার্থপর? কৃপণ? অবিবেচক? পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে দিনাতিপাত করেন? ভালোর তিলাংশ এঁদের মাধ্য নেই?

বাড়ীর একটি চাকরের কথা মনে পড়লো। তার কাজ ছিল নিখুঁৎ—মন দিয়ে কাজ করতো। দোষের মধ্যে চুরিতে তার হাত ছিল ভয়ানক। এক বার চুরি ধরা পড়তে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই চাকরের কথা মনে জাগলো। ভাবলুম, সে চোর ছিল বটে, কিন্তু তার গুণও ছিল অনেক!

মনে হচ্ছে, অপরের সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে তার দোষের দিকটাই আমরা বড় করে তুলি, গুণের কথার উল্লেখ করি

না—এ কি ভালো? এতে নিজেদের মন অনেকখানি ছোট হয়ে যায়!

বাড়ীতে ছেলেরা ক্লাশের পড়া মুখস্থ করছিল। ইংরেজী কবিতা পড়ছিল—

There is so much good in the most of us
And so much bad in the best of us,
That it ill behoves any of us
To find fault with the rest of us.

সংস্কৃতেও একটা কথা আছে, 'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি'! এ দু'টি কথা খব সত্য। মানুষের আড়ালে তার নিন্দা করার মতো হীনতা আর নেই!

অপরের দোষ-ত্রুটির আলোচনা করবার আগে আমাদের উচিত, নিজেদের দোষ-ত্রুটির সন্ধান নেওয়া। পৃথিবীতে সবাই চায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে। অপরের নিন্দা করে বেড়িয়ে কি লাভ? যে সময় পরচর্চা করবো, সে সময় যদি ভালো বই পড়ি, ভালো চিন্তা করি, হাসি-গল্প করি, তাহলে মন তাতে কতখানি তৃপ্তি পাবে! কতখানি শান্তি পাবো মনে! এ কথা যদি চিন্তা করে দেখি, তাহলে পরচর্চায় মতি হবে না, নিশ্চয়।

যে-লোক অপরের নিন্দা করে রসনার তীব্রতায় গর্ব্ব বা আনন্দ বোধ করে, তেমন লোককে কেউ সুনজরে দেখে না। সকলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, ভয়ের চোখে দেখে। ভাবে, আমাদের অসাক্ষাতে তো এ লোক অন্য জায়গায় বসে রসনায় এমনি বিষোদ্গারণ করবে! কাজেই তার পক্ষে সত্যকার বন্ধু, সত্যকার স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া কঠিন। পরের যা ভালো অর্থাৎ গুণ, তাই নিয়ে আলোচনা করা উচিত। পরের গুণাবলীর আলোচনা করো। গুণের অনুশীলন-বিশ্লেষণে নিজের দোষ বিদূরিত হবে।

এ-কথা মনে করে পরনিন্দা তোমরা সর্ব্বদা পরিহার করে চলবে। শুধু তাই নয়, যে লোক পরচর্চা করে, তার সঙ্গ-সাহচর্য্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবে! মন্দ কথা আলোচনায় মানুষের স্বভাব মন্দ হয়ে যায়, মানুষ মন্দ হয়—এ-কথা মনে রেখো।

অঘোরপন্থী

অর্দ্ধদগ্ধ গলিত কন্থাভার,
সদ্য-চিতার অস্থি ও অঙ্গার,
করাল করোটি, চুম্বা ঝুলিছে গলে,
আসব-আবেশে চলে যায় কুতূহলে।
কর্ণে তাহার কুবৃহৎ কুণ্ডল,
উদ্ধত জটা—যেন ভুজঙ্গ-দল;
ললাট জুড়িয়া প্রকাণ্ড ললাটিকা,
অঙ্গে অঙ্গে পড়িতেছে বিভীষিকা!
মূর্ত্তি তাহার রহস্যময় কি যে!
অঘোরপন্থী তুমুক্ষু বলে সে নিজে।

শুক্লা রজনী, শুভ্র দিনের আলো
চক্ষে তাহার লাগে না মোটেই ভালো।
সে সূচিভেদ্য গহন আঁধার যাচে,
মেঘ ও বজ্র বিদ্যুতে বুক নাচে:
চুম্বক সম তাহার আকর্ষণ
টানে ধরণীর গ্লানি ও আবর্জ্জন।
সে থাকিতে চায় শুধু তাহাদিগে নিয়া
রুদ্রদেবের ক্ষুদ্র সে সাপুড়িয়া।
গরল তাহার চন্দ্রচূড়ের দান
চায় না প্রকাশ, চায় সে যে নির্ব্বাণ।

অটল গভীর তুমুক্ষুর বিশ্বাস—
কুৎসিত-মাঝে সুন্দর করে বাস।
হীরক যেমন অঙ্গার হতে জাগে—
শিব হতে হলে শব হতে হবে আগে!
মুক্তি পাইতে, ঠিক মুক্তার মত
সহিতে হইবে সাগরের দেওয়া ক্ষত।

বিরাট্ বেদনা মর্ম্মর শিলাভার,
বহাবে মর্ম্মে রেবার স্বচ্ছ ধার।
কূট হলাহল সুধা হবে নিবেদনে,
দৃপ্ত নেত্র তৃপ্ত প্রেমাঞ্জনে।

প্রভু যে তাহার অঘোরেশ্বর শিব,
সেই জীবন্ত—আর সব নির্জ্জীব।
তাঁর নামে যাহা গ্রহণ করে তা শুচি,
তিনি যাহা দেন তাহাতেই অভিরুচি।
রূপের মাসিক আনন্দ সং চিং!
তাঁর কাছে নাই কুৎসিত অকুৎসিত।
দ্রব্যের গুণ কি বোঝে অজ্ঞ জন?
বদল করিতে তাঁহার কতক্ষণ!
সব রসই মিঠা—বিচার বিফল গণি,
সব রুদ্রের সুরে বংশীধ্বনি।

মলিনত্বের গৌরব অবজ্ঞাতে,
ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিও সেই পাতে।
ঘৃণা-আবরণ সব আভরণ সেরা
সেই ত মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া।
সবার আড়ালে—সেথা সহস্রদলে,
অচিন্তনীয় আদান-প্রদান চলে।
সে আঁধারে পাই যে আলোর পরসাদ,
মিটে নয়নের শত জন্মের সাধ।
কারে পাওয়া যায়, সে পাওয়ায় কি যে সুখ?
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ,—রসনা মূক!

তুমুক্ষু বলে, যা করিতেছি ব্যবহার,
এ নব-কপাল নহে ত অবজ্ঞার।
কত ভাব কত চিন্তার এ যে রাজা!
শিরায় শিরায় রঙিন গোলাপ তাজা!
কত অনুভূতি—কতই নিবিড় স্নেহ,
হেথায় বসতি করেছে,
ভাবে না কেহ!
উহাতে-আমাতে প্রভেদ ক'দিন লাগি,
তাই ভালোবাসি! এত এর অনুরাগী!
উলটি পালটি দেখি, উৎসুক ভারী—
বিধির লিপিটা যদিই পড়িতে পারি!

শিব আমাদিগে শ্মশানেতে আনে টানি
ও যে সৃষ্টির সূতিকাগার, তা জানি।
হেথা সাধনায় ধরি সারা বিভাবরী
জ্যোতির্বর্ম্মেরই মোরা ধ্যান করি।
আমাদের দেওয়া অমেধ্য উপচার
হোক নিন্দিত, তবু পূজা করি তাঁর।
নীতি না মানুক—আমাদের কারু-কলা
হর-গৌরীর সজ্জায় ছালনা-তলা।
পঙ্কশয্যা যত পারো ঘৃণা করো
ফোটায় কমল—তোলাই শক্ত বড়।

• • •

ব্যাস-কাশী হতে কাশী কতটুকু দূর
তুমুক্ষু কি হবে জানেন চন্দ্রচূড়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পরিপূর্ণ দেহ

উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন, "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি"! আবার বলিয়াছেন, "যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা!"

ফুলের মতো অঙ্গের যে এই পূর্ণ বিকাশ, ইহার অর্থ, হাত-পা, মুখ, বুক, কোমর—প্রত্যেকটি অঙ্গের পরিপূর্ণতা! প্রতি অঙ্গের গঠন পরিপূর্ণ না হইলে মানুষকে সুন্দর বলা চলে না। আবার দেহের গঠন যদি পরিপূর্ণ না হয়, কোনো অঙ্গের গঠন খর্ব্ব বা দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে দেহের সে-অসৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানুষের মনও নিখুঁত স্বাস্থ্যে ভরিয়া ওঠে না।
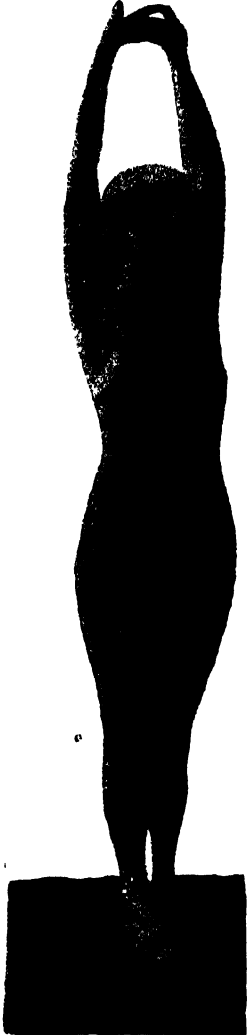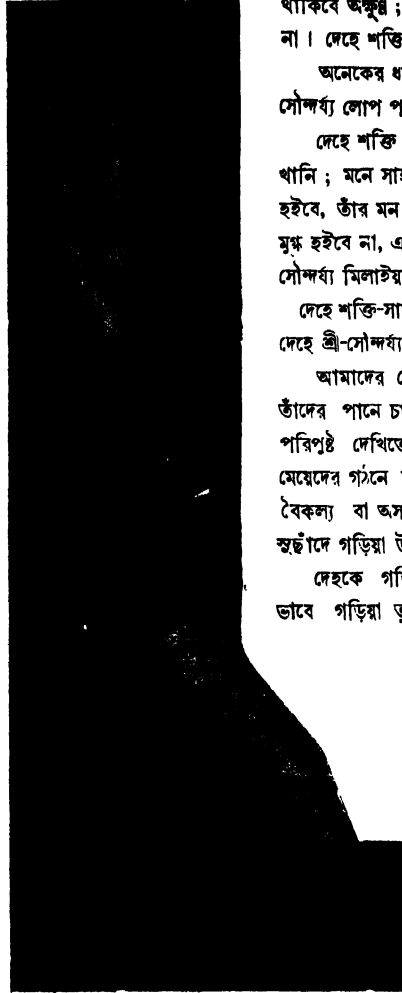
১। সিধা খাড়া দাঁড়ান

২। দেওয়ালে হাত চাপিয়া হেলিয়া পড়া

আজ যদি আমরা সভ্যতা বা ফ্যাশনের দাস না করিয়া স্বাভাবিক ভাবে বাস করিতাম, তাহা হইলে আমাদের দেহের গঠনে আপনা হইতে সৌকুমার্য্য রক্ষা পাইত। আজো আমাদের দেশের অসভ্য সাঁওতাল বা কোল-ভীলদের দেহ যৌবনে যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, দেখিলে নয়ন-মন জুড়াইয়া যায়। রঙ কালো হইলে কি হইবে, তাদের দেখিয়া সৌন্দর্য্য-পূজারী কবিরা বলেন, যেন কালো পাথর কাটিয়া নিপুণ শিল্পী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন!

যৌবনের এই পরিপূর্ণ ছাঁদে দেহকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে স্বাস্থ্য থাকিবে অক্ষুণ্ণ; সেই সঙ্গে যৌবনশ্রীকে কোনো দিন হারাইতে হইবে না। দেহে শক্তি-সামর্থ্য থাকিলে মানুষকে সুন্দর দেখাইবেই।

অনেকের ধারণা, দেহ শক্ত-সমর্থ হইলে নারীর শ্রী ঝরিয়া যায়, সৌন্দর্য্য লোপ পায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

দেহে শক্তি থাকিলে নিজের উপর পুরুষের বিশ্বাস থাকে অনেকখানি; মনে সাহস থাকে, শান্তি থাকে। নারীর দেহও যত শক্ত-সমর্থ হইবে, তাঁর মন ততই প্রফুল্ল থাকিবে; এবং সে নারীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে না, এখন মানুষ পৃথিবীতে মিলিবে না! এই শক্তির সহিত সৌন্দর্য্য মিলাইয়াই ভারতের কবি মোহিনী-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন!

দেহে শক্তি-সামর্থ্য থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকিবে এবং মনের প্রফুল্লতায় দেহে শ্রী-সৌন্দর্য্য বিকাশ লাভ করে,-শ্রী-সৌন্দর্য্য অটুট অক্ষয় থাকে।

আমাদের দেশের মেয়েরা আজ পথে-ঘাটে বাহির হইতেছেন, তাঁদের পানে চাহিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! ক'জনের দেহ পূর্ণ পরিপুষ্ট দেখিতে পাই? আকারে কেহ খর্ব্ব, কাহারো দেহ দীর্ঘ। মেয়েদের গঠনে কি বৈসাদৃশ্যই না লক্ষ্য করি! দেহের গঠনে এ বৈকল্য বা অসামঞ্জস্য ঘটিবার কারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে সুছাঁদে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

দেহকে গড়িতে হইবে। আলস্যে-ঔদাস্যে দেহকে ঢিলা-ঢালা ভাবে গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। সে ঔদাস্যের ফলে গলায় ঝিঁক উঠিবে, বুক হইবে পাংলা পাতের মতো, জঘন-দেশ হইবে কদর্য্য, পা হইবে খাটো, হাত সুদীর্ঘ। বেছাঁদ দেহে নানা ব্যাধি-উপসর্গ আসিয়া বাসা বাঁধিবে!

দেহকে সুছাঁদে এবং পরিপূর্ণ সৌকুমার্য্যে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিশেষ কয়েকটি ব্যায়াম-বিধি পালন করা কর্ত্তব্য।

প্রথম বিধি,—জোড়া পায়ে সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়া থাকিবে—১নং ছবির মতো। তার পর সিধা ভাবে দুই হাত তুলুন ঊর্দ্ধে মাথা ছাড়াইয়া। তুলিয়া দুই করতল আবদ্ধ করুন। মাথা খাড়া রাখুন—মাথা কোনো দিকে হেলিবে না, ঝুঁকিবে না।

এমনি ভাবে এক মিনিট স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকুন। তার পর দুই হাত অঞ্জলি-বদ্ধ ভাবে রাখিয়া সামনে-পিছনে সবেগে দুলান দশ-বারো বার। পিঠ যেন এ সময়ে না ঝোঁকে; মাথা না হেলে!

দ্বিতীয় বিধি,—দেওয়ালের কাছ হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ান—জোড়-পায়ে দাঁড়াইবেন।' তার পর পায়ের আঙুলগুলির

উপর মাত্র দেহের ভর রাখিয়া গোড়ালি তুলিয়া (২নং ছবির মতো) দেওয়ালে দুই হাত চাপিয়া হেলিয়া পড়ুন তার পর বেশ জোর দিয়া সিধা হইয়া দাঁড়ান। সিধা দাঁড়াইবার পর আবার এমনি দেওয়ালে হাত রাখিয়া দেহ হেলানো ; তার পর আবার সিধা খাড়া হওয়া। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ-পক্ষে দশ বার।

তৃতীয় বিধি,—সিধা দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া দুই হাত পিছনে রাখিয়া দুই হাতে একটি দড়ির দুই প্রান্ত ধরুন। দড়ি ধরিয়া এমনি পিছন দিকে সে দড়ি ধরিয়া দু'হাতে টানাটানি করুন (৩ নং ছবি দেখুন) প্রায় পাঁচ মিনিট। এ ব্যাপারে কাঁধের ও ঘাড়ের গড়ন নিখুঁৎ পরিপুষ্ট হইবে।

চতুর্থ বিধি। ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে অবস্থান করিয়া ডন্ ফেলিতে হইবে। নীচু হইবার সময় বুক ও মুখ যেন ভূমি স্পর্শ না করে— হাত এবং পা টাইট সিধা রাখিতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পাঁচ মিনিট।

৩। দড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া

৪। ডন্ ফেলা

এ চারটি বিধি-পালনে দেহের গঠন হইবে নিটোল টাইট এবং প্রতি অঙ্গ ভরাট পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে।

ছেলে কেন কাঁদে ?

কচি ছেলের কান্নার কথা বলছি। মায়ের পেট থেকে পড়েই কচি ছেলে জীবনের সাড়া তোলে কেঁদে। কান্নাকে সাথী করেই মানুষের জন্ম ! যে কচি ছেলে দিনে অন্ততঃ পনেরো মিনিট থেকে আধ-ঘণ্টাটাক সময় কাঁদে, তার ফুশ-ফুশ যন্ত্রটি প্রসারিত এবং সুস্থ ভাবে গড়ে উঠছে, জানবেন। যে কাঁদে না, তাকে ডাক্তার-দেখানো দরকার।

মা হয়তো কাজে ব্যস্ত, ওদিককার ঘরে ছেলে উঠলো কেঁদে। একটানা কান্না ! এ-কান্নার বিরাম নাই, ছেদ নেই। মা ছুটে এলেন। এসে দেখেন, ছেলে কাঁদছে মুখের মধ্যে দু'টি আঙুল পুরে। এতে বুঝবেন, ছেলের খিদে পেয়েছে ; তাকে এখন খাওয়াতে হবে। ছেলেকে মা খাওয়াবেন। খাওয়াবার পর তবু যদি ছেলে খুঁৎ-খুঁৎ করে কাঁদে, তাহলে বুঝতে হবে, অনুরূপ খাবার সে পাচ্ছে না, যে-খাবারে তার দেহের পুষ্টি হয়। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই।

মায়েদের উচিত, ছেলের ছ' মাস বয়স অবধি প্রত্যহ যেন ছেলের ওজন নেওয়া হয় ; তার পর মাসে একবার করে ছেলের ওজন নেবেন। ছেলের ওজন বাড়া চাই। যদি দেখেন ওজন বাড়ছে না, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে ছেলের লালন-সম্বন্ধে অনুরূপ বিধি-ব্যবস্থা করবেন।

খাবার সময় নয়, অথচ ছেলে যদি কাঁদে, তেমনি বিরামহীন একটানা কান্না—তাহলে বুঝবেন, তার তেষ্টা পেয়েছে। ছেলেকে জল খাওয়াবেন। আঘাত লাগলেও ছেলেরা একটানা-কান্না কাঁদে। সে জন্য কাঁদলে দেখবেন, কোথাও তার লেগেছে কি না। কাঁদতে কাঁদতে ছেলে যদি হাঁটু নাড়ে, হাতের দু'টি বুড়ো আঙুল হাতের মধ্যে গুটিয়ে হাত-মুঠি করে, তাহলে বুঝবেন, কলিকের বেদনায় কাঁদছে। দাঁত ওঠার সময়ে ব্যথা-ভরে ছেলে কাঁদে। এ কান্নার সঙ্গে সে নাকে হাত ঘষে, কাণ ধরে টানে। এ লক্ষণ দেখলে বুঝবেন, দাঁতের ব্যথায় ছেলে কাঁদছে।

ভয় পেয়েও ছেলেরা কাঁদে। সে কান্নায় কাণে যেন ছুঁচ বেঁধে। ছেলেদের ভয় দেখানো মহা পাপ। ভয় পেলে ছেলের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, তার মনের গড়নে বাধা ঘটে ; মন বিকৃত বিকল হয়ে গড়ে ওঠে—এ কথা বেশ করে মনে রাখবেন।

শোয়াবার দোষে শরীর বেজুৎ হলে ছেলে কাঁদে। খাওয়াবার পর ছেলেকে ডান-কাতে শোয়াবেন, না হলে হজমে গোলমাল ঘটবে। ঘণ্টাখানেক ডান-কাতে শোয়াবার পর বাঁ-কাৎ করে দেবেন। চিৎ করিয়ে বেশীক্ষণ শুইয়ে রাখবেন না।

মেজাজ খারাপ হলেও ছেলে কাঁদে। এ-কান্নার সময় সে হাত-পা নাড়ে ভীষণ ভাবে ঝাঁকানি দিয়ে। এ রকম কান্নায় আদর করে দোলা দিয়ে ছড়া শুনিয়ে ছেলের মেজাজকে শান্ত করবেন। তাহলে ছেলের কান্না থামবে।

ছেলেকে চটকানো বা দিন-রাত তাকে বুকে-কোলে রাখা কিম্বা ঝুমঝুমি-খেলনার সমারোহে বিব্রত করা—দোষের। তাতে তার মন-মেজাজ খারাপ হয়, মনের ও দেহের গড়নে বিকৃতি ঘটে। অতএব এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

ছেলের কান্না না থামিয়ে ছেলেকে কখনো ঘুম পাড়াবেন না।

জন্মাবার পর এক মাস দেড় মাস যে-ছেলে কাঁদে, তার সে কান্না ভালো ; তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। সে কান্নায় তার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে ! তার পর নিজের হাত-পা সম্বন্ধে চেতনা জাগলে সুস্থ অবস্থায় ছেলে কাঁদে না। তখন যদি কাঁদে, তাহলে সে কান্নার লক্ষণ দেখে কারণ বুঝে যথারীতি বিধি-ব্যবস্থা করবেন।

বিজ্ঞান-জগৎ

ঐ আসে বমার !

আমাদের মধ্যে যাঁরা কলিকাতায় আছেন, গত বড়দিনের সময় হইতে তাঁরা 'সাইরেন' শুনিয়া সতর্ক হইতেছেন ! জাপানী-বমার আসিতেছে —ও 'সাইরেন' তাহারই সতর্ক-সঙ্কেত ! তার পর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া নিরাপদ নীড়ে থাকিয়া প্রাণ ও হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ষার ব্যবস্থা। মনে আমাদের স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, রাত্রির অবছা-

বমারের আগমন বুঝিবার যন্ত্র
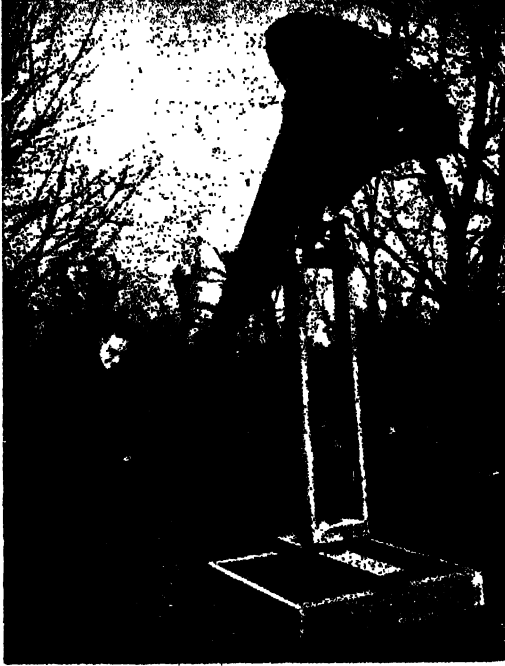
আলো-আঁধারে গা ঢাকিয়া মেঘনাদী বমার আসিতেছে, তাদের সে-আসা কি করিয়া জানা যায়? সে-আবির্ভাব জানিবার জন্য প্লেন-ডিটেক্টর-যন্ত্র আছে। ... ভূমির উপরে এই যন্ত্র রাখা হয় এবং সেখানে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী আছেন খবরদারী করিতে। বায়ু-তরঙ্গে প্লেনের শব্দ ভাসিয়া এ যন্ত্রে আসিয়া স্পন্দন তোলে। যন্ত্রে এ্যামপ্লিফায়ার সংযুক্ত আছে; সে এ্যামপ্লিফায়ার-সংযোগে ও-স্পন্দন সশব্দে প্রকাশ পায়; সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের আলো জ্বলে। হরিদ্রা বর্ণের আলো জ্বলিলে বুঝিতে হইবে, বমার-প্লেন আসিতেছে, তবে সে দূরে আছে ! আর লাল আলো জ্বলিলে বুঝিবেন, প্লেন খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ স্পন্দন-শব্দ এবং আলোর বিকাশ দেখিয়া বেতার-মারফৎ বমারের আবির্ভাব-সংবাদ নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে জানানো হয়—অমনি বিকট শব্দে সে-সব ষ্টেশন হইতে 'সাইরেন' বাজাইয়া দিকে দিকে সঙ্কেত জারি হয়।

মশারি-মোজা

যুদ্ধের সময় কোন্ জলা-জঙ্গলে ছাউনি ফেলিয়া লক্ষ লক্ষ ফৌজকে থাকিতে হয়—সেখানে মশা-মাছির বিষম উৎপাত। মশা-মাছির কামড়ে শুধু যে নিদ্রার বা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত, তা নয়। তাদের কামড়ে দারুণ ব্যাধির আশঙ্কা খুব বেশী। ফৌজদের সুস্থ রাখিতে

মশারি-মোজা

না পারিলে যুদ্ধে জয়লাভের আশা থাকে না। বিছানায় মশারি খাটাইয়া মশা-মাছির পীড়ন হইতে নিরাপদে থাকা চলে, কিন্তু দিনের বেলা কাজ-কর্ম্মের সময় তারা ছাড়িয়া দিবে না ! তাই মশারির থান কাটিয়া সেই থানে পায়ের আচ্ছাদন তৈয়ারী হইয়াছে। এ আচ্ছাদনে পা ঢাকিয়া ফৌজ এবং নার্শের দল ব্যাধি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের দায় এড়াইয়া সুস্থ দেহ-মনে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ফৌজের স্নান

যুদ্ধ করিতে এই যে বিরাট্ বাহিনীকে দিক্-বিদিকে পাঠানো হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য চলিয়াছে অস্ত্র-শস্ত্র, ঔষধ-পথ্য এবং খাদ্যাদির

নির্ঝর-ধারায় স্নান

বাষ্পরোধী পারাম্বুলেটর

বিপুল সরঞ্জাম, তাহাতেই তো তাদের পরিচর্য্যার শেষ হয় না! এতগুলি লোকের স্নান-পানের জন্য জল চাই! স্নানের জন্য মার্কিন পূর্ত্ত-শিল্পীর দল জল পাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার চমৎকারিত্বের তুলনা নাই! যথাসময়ে বনে-প্রান্তরে যন্ত্রযোগে নলকূপ খনন করা হয়; তার পর কাঠের ফ্রেমের উপর বড় পাইপ খাটাইয়া সেই নল-কূপ হইতে জল লইয়া নির্ঝর-ধারায় তাহা উৎসারিত করা হয়। সে স্নিগ্ধ শীতল জল-ধারায় স্নান করিয়া সেনা-বাহিনী দেহ-মনের শ্রান্তি ঘচায়, গায়ের ধূলা-কাদা মুছিয়া আরাম পায়।

বিষ-বাষ্প-প্রতিষেধ

জার্ম্মানরা বোমায় বিষ-বাষ্প ভরিয়া সেই বোমা-বর্ষণে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণ-সংহারে একেবারে পৈশাচিক রকমে অকুণ্ঠ। সে বিষ-বাষ্প হইতে শিশুদের রক্ষা-কল্পে এক জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বিষ-বাষ্প-প্রতিষেধী পারাম্বুলেটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। এ গাড়ীর উপর দিক্ বায়ু-বন্ধী কাচের আচ্ছাদনে ঢাকা। গাড়ীর মধ্যে শিশুকে শোওয়াইয়া পাম্প-যোগে অক্সিজেন পরিচালনা করা হয়। সে অক্সিজেনের কল্যাণে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে এতটুকু বাধা ঘটে না। গাড়ীর মধ্যে শিশু সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

বমার-ম'র

সেদিন যে তিনখানা জাপানী-বমার কলিকাতা অঞ্চলে হানা দিতে আসিয়া ফ্লাইট-সার্জ্জেন্ট প্রিংয়ের হাতে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে— যে প্লেন-বমার লইয়া প্রিং বিজয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সে প্লেন-বমার

বমারের যম (ওয়াগনারের সৃষ্টি)

মার্কিন শিল্পীর তৈয়ারী অপূর্ব প্লান! এ প্লেনের সৃষ্টি হইয়াছে বিমান-শিল্পী জনি ওয়াগনারের বুদ্ধি-কৌশলে। রাত্রে শূন্য-পথে বহু উর্দ্ধে আসীন শত্রু-বমারকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং সে বমারকে তাড়া করিয়া হাতের নাগালে পাইতে এ প্লেনের শক্তি অসাধারণ। এ প্লেন আকাশে ১৫০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিতে পারে; এবং ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় চারি শত মাইল। মিনিটে চার হাজার ফুট উপরে ওঠে। তার উপর যে-কোনো অবস্থায় (পোজিশনে) নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিপক্ষ-বমারকে আক্রমণ করিতে এ প্লেনের আদৌ বাধে না!
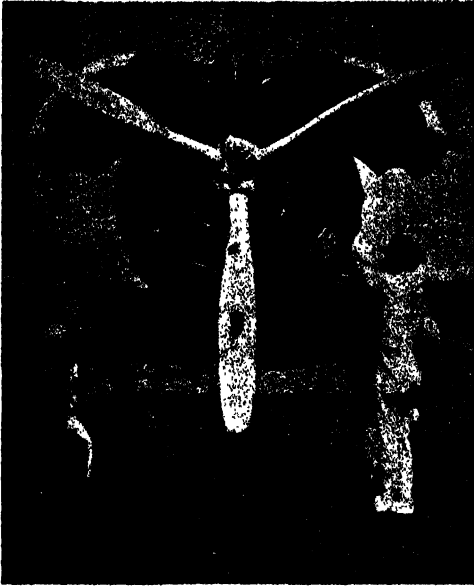
রকেট মনোপ্লেন

আমেরিকার আর দু'জন বিমান-শিল্পী কাশ এবং লুইস এ যুদ্ধে বমার-নিধন-কল্পে আর-এক জাতের মনোপ্লেন তৈয়ারী করিয়াছেন—বমারের আক্রমণ-প্রতিরোধে তার শক্তিও অসাধারণ। এ প্লেন শূন্যে ওঠে রকেট-বাজির মতো সিধা সোজা। ঘণ্টায় তিনশো মাইল ইহার গতিবেগ। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এ প্লেন একদমে সিধা একেবারে ৩৭০০০ ফুট উর্দ্ধে ওঠে। এ-বমার জার্মান-বমারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছে।

আটাশে ছেলে

উচিত-সময়ের পূর্ব্বে যে সব শিশু জন্ম লাভ করে, তাদের বাঁচাইয়া তোলা কঠিন ব্যাপার। লালনে এমন শিশুদের বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা যন্ত্র-মাতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এ 'যন্ত্র-মাতা' বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে অকালোদ্ভূত শিশুদের চমৎকার ভাবে লালন-পরিচর্য্যা করিতে পারে। ও-পাশের ছবিতে এ যন্ত্র-মাতার পরিচয় মিলিবে। জন্মিবামাত্র শিশুকে এই লৌহ-যন্ত্র-মধ্যস্থ বাক্সে শোয়াইয়া যন্ত্রটির আচ্ছাদন ঢাকিয়া দেওয়া হয়। যন্ত্রমধ্যে আছে জলের ট্যাঙ্ক, বাতাসের পাম্পার, তাপ-সঞ্চারী বাতি, এবং আরো কয়টি উপাদান। এ-সবের সাহায্যে শিশুর আশ্রয়াগারটুকুর টেম্পারেচার-নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুর বাড় ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ব্যবস্থা চলে। আশ্রয়াগারের
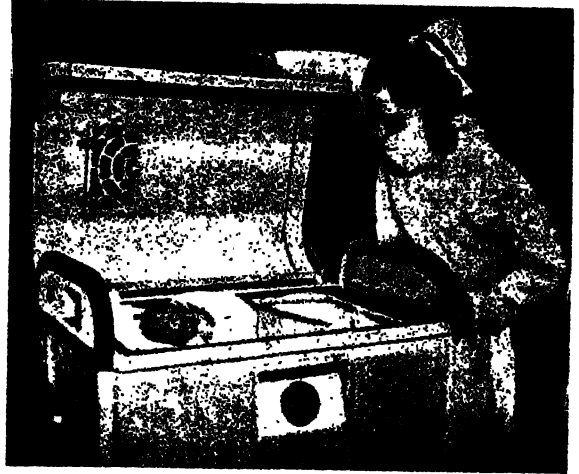
শিশুর রক্ষা-নীড়

আচ্ছাদন না খুলিয়া "লেভার" পরিচালনার দ্বারা চিকিৎসক ও ধাত্রীর দল আশ্রয়-আগারের আবহাওয়াকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

আসবাব-খট্টাঙ্গ

একটি আলমারি—আসবাব-হিসাবে ঘরের সজ্জা বর্দ্ধন করে। সে আলমারির মধ্যে এক জনের ব্যবহার্য্য কাপড়-চোপড় রাখা চলে। আলমারিটি দোতলা। উপর-তলায় থাকে কাপড়-চোপড়; সেই সঙ্গে ছোট একখানি লেপ-তোষক ও একটি বালিশ; নীচের তলায়
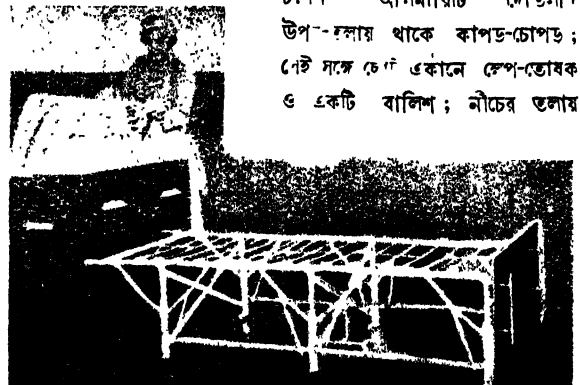
আলমারির মধ্যে খাট-বিছানা

থাকে গুটানো-অবস্থায় স্প্রিংয়ের একখানি একানে খাট। রাত্রে নীচের তলার ডালা খুলিয়া স্প্রিংয়ের খাট বাহির করিয়া বিছানা পাতিয়া সুখ-শয়ন। এ আলমারি সৃষ্টি করিয়াছেন এক জন মার্কিন শিল্পী। চমৎকার ব্যবস্থা, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার মৃৎশিল্প

বাঙ্গালার মৃত্তিকা ও বাঙ্গালার জল—এই সহজলভ্য উপকরণ সম্বল করিয়া বাঙ্গালার মৃৎশিল্পী যে সকল দ্রব্য রচনা করে, সে সকলের শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়—অনেক স্থানে বিস্ময়কর। তাহার উপকরণ যেমন অল্প ও সহজলভ্য, তাহার যন্ত্রও তেমনি জটিলতাশূন্য।

বাঙ্গালার মৃৎশিল্পকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) কুম্ভাদি পাত্র

(২) বিচিত্র ইষ্টক

(৩) পুতুল

কুম্ভ হইতেই মৃৎশিল্পীর নাম কুম্ভকার হইয়াছে এবং পুতুল—অনুশীলন ফলে—ধ্যানের ধারণানুযায়ী প্রতিমায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত পাত্র নানা প্রকার। রন্ধনের জন্য যেমন হাণ্ডিকা বা হাঁড়ী প্রয়োজন, তেমনই তরল পদার্থ রক্ষার্থ কুম্ভ প্রয়োজন। আর হাণ্ডিকার মুখাবরণ ও দ্রব্যাদি রক্ষার্থ সরা যেমন প্রয়োজন, তেমনই শস্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য হাণ্ডা বা জালা ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালার কুম্ভকার অতি সাধারণ চক্র ঘুরাইয়া হস্তের সাহায্যে কুম্ভাদি প্রস্তুত করে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, সে সকল কেবল কার্য্যোপযোগীই নহে; পরন্তু সে সকলে শিল্পীর রুচিপরিতৃপ্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। কোন কোন দেশে যে কোন কোন সময়ের নিত্যব্যবহার্য্য সাধারণ দ্রব্যেও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ, সে সকল দেশে সেই সকল সময়ে ক্রমাভিব্যক্তি ও অনুশীলনের ফলে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যেরও আকার ও প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল দ্রব্যের আকার ও প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মনে সে সকলে সজ্জা বা অলঙ্কার-যোগের বাসনা দেখা দেয়। আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে আবৃত পম্পিয়াই নগরের খননে গার্হস্থ্য ব্যবহারের যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, সে সকলেও ইহা লক্ষ্য করা যায়। * এ দেশে গৃহকার্য্যে নিত্যব্যবহার্য্য দা, কলসী প্রভৃতিতে শিল্পী রেখা বা পরিচিত পুষ্পপত্রাদির চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রয়োজনের সহিত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ করিয়া থাকে। এ দেশে যুক্তপ্রদেশাদি স্থানের মৃৎপাত্রের সহিত বাঙ্গালার মৃৎপাত্রের তুলনা করিলে বাঙ্গালার মৃৎশিল্পীর নৈপুণ্যের ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ হয়। হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতির "কানার" গঠন, তাহাতে চিত্রিত পত্র বা পুষ্পের প্রতিকৃতি এ সকল বাঙ্গালায় অতি সাধারণ। শিল্পী যে তাহার চারিপার্শ্বস্থ পত্র ও পুষ্পাদির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে, তাহা স্বাভাবিক। শিল্প যখন অনুকরণে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহা আর সজীব নহে। মৌলিকতাই শিল্পে সজীবতার পরিচায়ক। এ দেশের বয়ন-শিল্পী বস্ত্রে ও স্বর্ণকার অলঙ্কারে পত্রপুষ্প প্রভৃতির আদর্শই সজ্জার জন্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালার শিল্পী পুরুষানুক্রমে একরূপ পদ্ধতিতে কায করিয়া যে নৈপুণ্য লাভ করে, তাহাও তাহার সহজাত সংস্কারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য সে যে শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত করে, তাহাতেই বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতে পারে।

বিজ্ঞ শিল্প-সমালোচক স্যর জর্জ বার্ডউড মত প্রকাশ করিয়াছেন—মনুসংহিতার সময় হইতে ভারতের সমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে প্রত্যেক মানব জন্মগ্রহণ করিলেই সমাজে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অধিকার জন্মে। তাহাতে সে যে শান্ত পরিবেষ্টনী লাভ করে, তাহার প্রভাব তাহার কার্য্যে পরিলক্ষিত হয়। *

পুরুষানুক্রমে একই প্রথায় কায করিলে যে অশিক্ষিতপটুত্ব জন্মে, তাহার পরিচয় কটকের স্বর্ণকারদিগের তারের কাযে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। মধুসূদন দাস মহাশয় বলিয়াছেন, কটকের ঐ শিল্পের পরিচালকগণ তার জিহ্বায় রাখিয়া তাহার স্থূলত্বের যে নির্দ্দেশ দিতে পারেন, যাঁহারা সে শিল্পে অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা নিক্তিতে ওজন না করিয়া সে নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। পুরুষানুক্রমে কায করায় এই ক্ষমতা উদ্ভূত হয়।

সামাজিক প্রয়োজনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎপাত্রের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সরার স্থানে যে রেকাবের প্রচলন হইয়াছে, তাহাতেও বাঙ্গালার মৃৎশিল্পীর এই নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রেকাব প্রভৃতিও শিল্পচাতুর্য্যশূন্য হয় না। যে সকল দ্রব্য এক বার মাত্র ব্যবহৃত হইবে, সে সকলেও যে শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়, তাহা শিল্পীর সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের আগ্রহই প্রকট করে।

অনুশীলনের ফলে বাঙ্গালার মৃৎপাত্রগুলি বিস্ময়কর বৃহদাকারেরও হয়। বার্ডউড বলিয়াছেন, এ দেশের কুম্ভকারগণ চাকে যে সব বৃহৎ পাত্র গঠিত করিয়া অগ্নিদগ্ধ করিতে পারে, সে সকল বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। আমেদাবাদে ও বরোদায় এবং গুজরাটের শস্যপ্রসূ উর্ব্বর সকল অংশে যে সকল মৃৎপাত্রে শস্য রক্ষিত হয়, সেই সকল দগ্ধ মৃত্তিকার পাত্র ৫ ফিট উচ্চও হয়; আর বাঙ্গালায় ঢাকায় ঢোল সমুদ্রের কূলে প্রায় ৩৮ মণ ওজনের শস্যরক্ষার উপযোগী জালাও প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, সাধারণ চক্রেই কুম্ভকারগণ এই সকল গঠিত করে এবং সাধারণ "পোয়ানে" বা উনানেই সে সকল দগ্ধ করে। কূপের জন্য যে গোলাকার "পাট" প্রস্তুত করিয়া দগ্ধ করা হয়—সে সকলও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একটি "পাটের" সহিত আর একটির যোগ যে ভাবে হয়, তাহাতে শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। মৃত্তিকা দগ্ধ হইলে কতটুকু সঙ্কুচিত হয়, তাহাও শিল্পীরা বুঝিয়া থাকে। পুতুলে ও মূর্ত্তিতে আমরা ইহার পরিচয় বিশেষভাবে পাইয়া থাকি।

মৃৎপাত্রের পর আমরা বিচিত্র ইষ্টকের কথা বলিতে পারি। বাঙ্গালায় পাথরের অভাব শিল্পীরা এই ইষ্টকের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিল। যে সকল স্থানে প্রস্তর সুলভ, সে সকল স্থানে শিল্পীরা যেমন যন্ত্রের সাহায্যে পাথরে নানা চিত্রাদি অঙ্কিত করে—বাঙ্গালার শিল্পীরা তেমনই এই সব ছাঁচে-ঢালা ইষ্টকে নানা চিত্র ও নানা দৃশ্য দেখাইয়াছে।

* Conway—'Domain of Art.'

* Birdwood—'Industrial Arts of India.'

১৮১১ খৃষ্টাব্দে শিল্পী হ্যাভেল কলিকাতায় ইংরেজ সরকারের দপ্তর-খানায় যে সকল বিদেশী মৃন্মূর্ত্তি আছে, সে সকলের উল্লেখ করিয়া

শান্তিপুরের রুদ্রকান্তের মন্দির

বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় গৃহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড হইতে এক লক্ষ টাকার এই সকল মূর্ত্তি আনা হইয়াছিল*। এগুলি অতি সাধারণ মূর্ত্তি—এগুলি দেখিয়া বাঙ্গালী শিল্পীর শিক্ষালাভের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পাবে না। অথচ বাঙ্গালায় ইষ্টক প্রস্তুত হয় এবং এককালে ছাঁচে প্রস্তুত সুন্দর ইষ্টক প্রস্তুত করিবার যে শিল্প বাঙ্গালায় ছিল, তাহার নিদর্শন বাঙ্গালার নানা স্থানে গৃহে এখনও লক্ষিত হয়। যদি সেই অনাদৃত শিল্পের উন্নতির জন্য লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত, তবে যেমন কলিকাতায় সরকারের গৃহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইত, তেমনই সেই পুরাতন শিল্প পুনর্জ্জীবিত করা যাইত।

এই শিল্পে ইষ্টকে কেবল যে নানারূপ পত্র, লতা, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প, রেখা, মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখা যায় তাহাই নহে—পরন্তু ইষ্টকের পর ইষ্টক যে ভাবে গৃহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কোন কোন পৌরাণিক ঘটনা—রামায়ণের বা অন্য কোন পুরাণের এক একটি সুপরিচিত ঘটনা—চলচ্চিত্রের চিত্রের মত দেখা যায়। ইহাতে যে ইষ্টক-নির্ম্মাতার মত গৃহনির্ম্মাণ-কারীরও নৈপুণ্য প্রকট হয়, তাহা বলা বাহুল্য। প্রধানতঃ মন্দিরেই এই সকল ইষ্টক ব্যবহৃত হইত। যাঁহারা এইরূপ ইষ্টকে নির্ম্মিত মন্দির লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, সে সকল মন্দিরের সৌন্দর্য্য উড়িষ্যার বা যুক্তপ্রদেশের শিল্পের নিদর্শন ও প্রস্তর-মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রসম্ভূত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলা যায় না।

আমরা এই প্রসঙ্গে এখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত বহু মন্দিরের মাত্র দুইটির উল্লেখ এই স্থানে করিতেছি। দুইটি মন্দিরই কলিকাতা হইতে অদূরে অবস্থিত এবং অনায়াসেই লক্ষিত হইতে পারে:—

(১) শান্তিপুরের রুদ্রকান্তের মন্দির
(২) গুপ্তিপাড়ার রাম-সীতার মন্দির।

এই মন্দিরদ্বয় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের এবং সুরক্ষিত। প্রথমটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বৃদ্ধ-পিতামহ রামকৃষ্ণের মাতা (রুদ্রকান্তের পত্নী) শান্তিপুর বেজপল্লীতে যে শিব স্থাপনা করেন, তাহাই "রাণীর শিব" ও "রুদ্রকান্ত" নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মন্দিরটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরেও এইরূপ ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়—তবে সমগ্র মন্দিরে নহে। মন্দিরের কতকাংশে—বিশেষ দ্বারের পার্শ্বে ও উপরে এইরূপ ইষ্টকের ব্যবহার অনেক স্থানেই লক্ষিত হইবে। তাহাতে বাঙ্গালায় এইরূপ ইষ্টকের প্রচলন প্রতিপন্ন হয়।
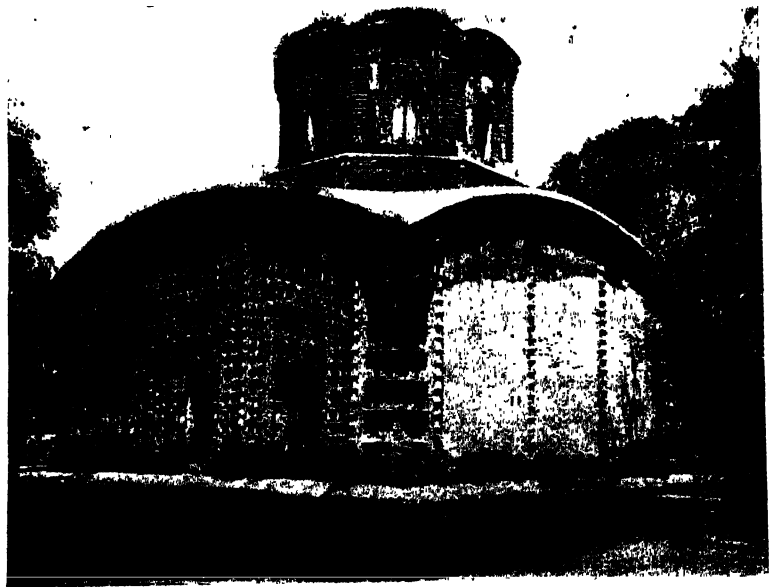
গুপ্তিপাড়ার রাম-সীতার মন্দির

এই ইষ্টকের ব্যবহারে মন্দির কিরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইতে পারে, দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দির তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিলে হয় না। এই মন্দির-নির্ম্মাণ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ ও ১৭২২ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। সমগ্র মন্দিরগাত্রে এই বিচিত্র-চিত্র-চিত্রিত

* Havell—'Art Education in India.'

ইষ্টক—অধিকাংশ ইষ্টকে যে সকল মূর্ত্তি আছে, সে সকলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, বেশ প্রভৃতির যে পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তাহা সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। সে বিষয়ে এই মন্দির কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' কাব্যের সহিত তুলিত হইতে পারে। বিশেষজ্ঞ ফার্গুশন * বলিয়াছেন, ক্ষোদিত কার্য্যে ইহা উড়িষ্যার ও মহীশূরের পুরাতন প্রস্তর-মন্দিরের অনুরূপ কার্য্যের তুল্য না হইলেও সাধারণ ভাবে দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্য সে সকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।
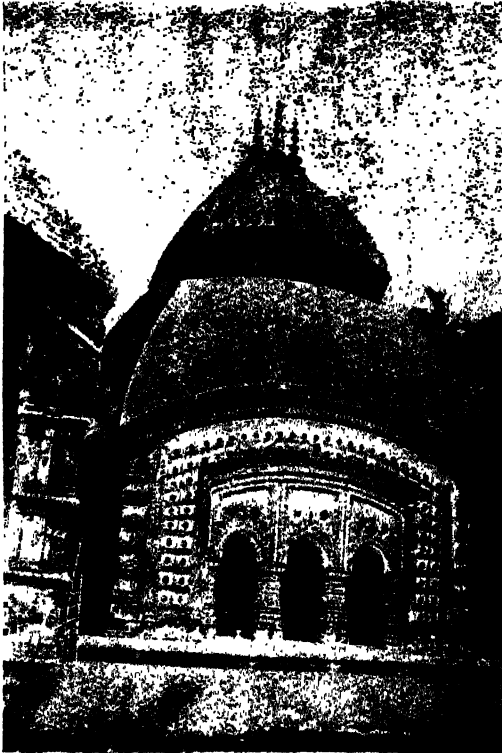
গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির

এইরূপ ক্ষোদিত ইষ্টকে প্রস্তুত নহে—কিন্তু নানারূপ স্থূলতার ইষ্টকের ব্যবহারে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন মন্দিরেরও অভাব বাঙ্গালায় নাই। কলিকাতায়ও সেরূপ মন্দির আছে।

প্রস্তরে যেকোনরূপ চিত্র ক্ষোদিত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কিন্তু মৃত্তিকার ছাঁচে ঢালাই করা ইষ্টকের প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া ও দগ্ধ করিয়া সে সকলের সন্নিবেশে দৃশ্য বা চিত্র সম্পূর্ণ করা যে অধিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রচলিত মত এই যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চেঙ্গিজ খাঁ চীন আক্রমণ ও জয় করার পর এশিয়ার অন্যান্য দেশে ও য়ুরোপে মীনাকরা মৃৎপাত্রাদির পরিচয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তৎপূর্ব্বেও নানা স্থানে ঐরূপ টালীর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় গৌড়ে ঐরূপ যে সকল টালী পাওয়া গিয়াছে, সে সকল যে আকবর বর্ত্তৃক গৌড়জয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, সে সকলের সহিত মোগলদিগের প্রাধান্যকালের ঐরূপ টালীর বর্ণের ও নক্সার প্রভেদ সুস্পষ্ট। তাহা বিবেচনা করিয়া বার্ডউড বলিয়াছেন, বাঙ্গালার মত মৃত্তিকায় প্রস্তুত ইষ্টকের ব্যবহারকারী প্রদেশে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু অধিবাসীরা যদি মীনা-করা ইষ্টকের ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সেন ও পাল রাজাদিগের
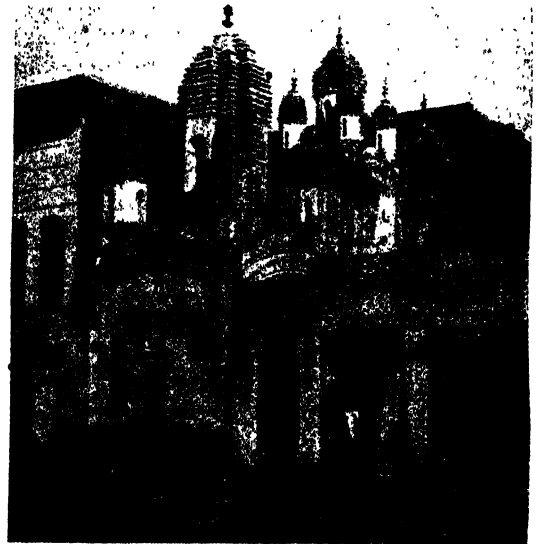
কলিকাতার একটি পুরাতন মন্দির

রাজধানীর স্থানসমূহে অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের শেষ দশায়ও এই ইষ্টক-শিল্প অনুন্নত ছিল না। তাহার পর যে রাষ্ট্রবিপ্লব দেশের উপর দিয়া প্রবল জলোচ্ছাসের মত প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহাতে অনেক শিল্প বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। সে বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য—তাহা জাতিকে কেবল রাজনীতিক পরবশ্যতাপীড়িতই করে নাই; পরন্তু, তাহাকে অর্থনীতিক পরবশ্যতা স্বীকার করাইয়াও ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে ভাবের দাসত্বেও উপনীত করাইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষাও ভয়াবহ। কারণ, শেষোক্ত জাতির জীবনী-শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহাকে যে অবস্থায় উপনীত করে, তাহাতে তাহার পক্ষে রাজনীতিক পরবশ্যতা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাও কষ্টসাধ্য করে। আর ভাবের দাসত্ব তাহার জাতীয় শিল্প, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় গর্ব্ব সবই নষ্ট করে। সেই জন্যই শতাব্দী কালের পরবশ্যতার ফল লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—"হে

* Fergusson—'History of Indian and Eastern Architecture.'

এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?" ভাবদাসত্বে আমরা যাহা হারাইয়াছি, তাহাই তিনি ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন—"ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।"*

ইংরেজ এ দেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিয়াছিল। কাযেই তাহারা এ দেশে যে সকল গৃহ—তাহাদিগের প্রয়োজনে—নির্ম্মিত করিয়াছিল, সে সকলে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় বা অবসর তাহাদিগের ছিল না। সে সে সকলে তাহার স্বদেশের উচ্চ শিল্পাদর্শও প্রকট-প্রচেষ্টা করে নাই, এ দেশের বহু চেষ্টায় অভিব্যক্ত শিল্প-সৌন্দর্য্য-রমণীয় আদর্শও গ্রহণ করে নাই। তাহার সেই সকল গৃহ—সৈনিকদিগের বাসের বা গুদামের প্রয়োজনে নির্ম্মিত; সে সকলে সৌন্দর্য্যের অভাবের দিকে সে দৃষ্টিপাত করে নাই—কার্য্যোপযোগিতাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। ভাবদাসত্বহেতু এ দেশের লোকও শাসকদিগের গৃহের সেই আদর্শ অনুকরণযোগ্য মনে করিতে আরম্ভ করায় বাঙ্গালার স্থাপত্যে আর প্রদেশজ বৈশিষ্ট্য থাকে নাই। তাহাই বিচিত্র-চিত্রিত ইষ্টকের ব্যবহার-বিরতির প্রধান কারণ। গ্রাউজ লিখিয়াছেন—সরকারী নথীপত্র রক্ষার ও বিস্তৃত রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসের গৃহ হিসাবে সরকারী গৃহগুলি সমালোচনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু দেশের লোক যখন মনে করে, সর্ব্বশক্তিমান্ সরকার যখন প্রাসাদ বর্জ্জন করিয়া ব্যয় করিয়া নির্ম্মিত এই সকল গুদামের মত ঘরে কর্ম্মচারীদিগের বাসের ব্যবস্থা করেন, তখন এইরূপ গৃহই আদরনীয়, তখন তাহারা উহার অনুকরণ করায় শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়।†

ইষ্টকের পরে আমরা পুত্তলের উল্লেখ করিব। সকল দেশের মত বাঙ্গালায় বালকবালিকাদিগের খেলার জন্য মৃত্তিকার পুত্তল ব্যবহৃত হইত—এখনও হয়। এই সকল পুত্তল যথাসম্ভব প্রকৃত আদর্শের মত করিবার চেষ্টা বাঙ্গালায় কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদিগের পুত্তল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কান্তনগরের মন্দির

বার্ডউড তাঁহার প্রামাণ্য পুস্তকে কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকার মূর্ত্তি প্রভৃতির উল্লেখ সর্ব্বাগ্রে করিয়াছেন।* তাহার সঙ্গে তিনি লক্ষ্ণৌ ও পুনা—উভয় স্থানের পুত্তলেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের পুত্তলে যে কমনীয়তা লক্ষিত হয়, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। শতবর্ষ পূর্ব্বেও কৃষ্ণনগরের এই সকল পুত্তল বিক্রীত হইত। কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে ঘূর্ণীতেই কুম্ভকারপল্লী। তথায় মৃত্তিকার কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না, তাহার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, বোধ হয়, হয় নাই। কিন্তু কুম্ভকারয়া সেই স্থানের মৃত্তিকার ব্যবহারে অভ্যস্ত বলিয়া পুতুল বা

* স্বামী বিবেকানন্দ—'বর্ত্তমান ভারত'

† Growse—'The Calcutta Review', 1884.

* Birdwood—'Industrial Arts of India.'

মূর্ত্তি অগ্নিদগ্ধ করিলে কতটুকু সঙ্কুচিত হইবে, তাহা জানে এবং তাহা জানিয়া সেই ভাবে পুতুল বা মূর্ত্তি গঠিত করে। খৃষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এই শিল্পীরা লোককে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহাদিগের যে মূর্ত্তি মৃত্তিকায় গঠিত করিত, তাহা অগ্নিদগ্ধ হইবার পরেও আদর্শের অনুযায়ী থাকিত। আমরা নিম্নে এইরূপ একটি মূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রদান করিলাম।

কৃষ্ণনগরে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত মৃৎ-মূর্ত্তি

সেই সকল শিল্পীর বংশধরগণ যদি সিমেণ্টে ঐরূপ মূর্ত্তি গঠিত করে, তবে তাহাতে যেমন বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না, তেমনই বংশধরদিগের মর্ম্মর মূর্ত্তি রচনা-নৈপুণ্যও পুরুষানুক্রমে কৃত কার্য্যে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফল বলা যায়।

পশু, পক্ষী, ফল প্রভৃতি গঠিত করার পর সে সকল স্বাভাবিক বর্ণে রঞ্জিত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, যখন প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে এই প্রথার অনুশীলন হইত, তখন বিদেশ হইতে কয়লাজাত রং আবিষ্কৃতই হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক ডাক্তার বেয়ার প্রথম উদ্ভিজ্জ নীলের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম নীল আবিষ্কার করেন। তাঁহার আবিষ্কারের কয় বৎসর পূর্ব্বেও জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার নীল আমদানী করিত। * বলা বাহুল্য, ঐ নীল প্রধানতঃ বাঙ্গালা হইতে রপ্তানী হইত। তখনও বিহার বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালার নীল, বাঙ্গালার লাক্ষারক্ত, হীরাকস প্রভৃতির সাহায্যে এই শিল্পীরা আপনাদিগের কার্য্যের জন্য বর্ণ প্রস্তুত করিত। সে সকল বর্ণের স্থায়িত্বহেতু সেই সকলে চিত্রিত পুতুলাদি কখন মলিন হইয়া যাইত না।

* Charles Tower—'Germany of To-day.'

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"ইদানী এ দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত নানারূপ মৃৎপুতুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সে সকল বড় ও ছোট করা হয়। এই প্রকার ৩টি আদর্শ আমষ্টারডাম প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তথায় বিশেষ মনোযোগ লাভ করিয়াছিল। পূর্ণাবয়বের আদর্শ ৩৫ টাকায় ও ক্ষুদ্র আদর্শ ৪ টাকায় বিক্রীত হয়। যে সকল আদর্শ আমষ্টারডামে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সকলের নির্ম্মাতা যদুনাথ পালকে কলিকাতা প্রদর্শনীতে প্রদর্শন জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতীয় মানুষের মূর্ত্তি গঠনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে।" *

মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কলিকাতা প্রদর্শনীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী। জুলেস জুবার্ট নামক এক ব্যক্তির চেষ্টায় এই প্রদর্শনীর কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়। হেমচন্দ্রের একটি কবিতায় † তাহার স্মৃতি রক্ষিত আছে:—

"হায় কি হলো—আধখানা মাঠ ‡ জুবার্ট নেছে ঘেরে!
বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে!
আন্ধেক বাড়ী সহর মাঝে হচ্চে ম্যারামৎ;—
শুনতে ভাল 'একজিবিসন'—এক জনার বিসমৎ!
দেশের শিল্পী কারিগরি শিখবে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দু দিন বাদে মরবে এ দেশীরা!
হাসবো কত—'একজিবিসন' দেশের ভালো করে;
খেতে অন্ন নাইকো যা'দের—এ কি তা'দের তরে?"

ঐই প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদিগের শিল্প-নিদর্শন বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রদর্শনীতে শ্মশানঘাট, কালীপূজা, বিবাহবাড়ী প্রভৃতির যে সকল আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সে সকল এমন স্বভাবানুগ যে, বিদেশী ধনীরা সে সকল—বাঙ্গালার সমাজ-চিত্র জানিয়া—বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ঐ আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর পর বিদেশের নানা স্থান হইতে—সেই সকল দেশের প্রদর্শনী ও "যাদুঘরের" জন্য বাঙ্গালার ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতির মৃন্মূর্ত্তি গঠনের কার্য্য কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ করিয়াছেন।

তাহার পর হইতে এক দিকে যেমন বিদেশ হইতে "চীনা মাটীর" পুতুল ও কাষ্ঠের পুতুল এ দেশে আমদানী হইতে থাকে, অপর দিকে তেমনই এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে অবস্থা ঘটে তাহার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন—তাঁহাদিগের নিকট "বিলাতী সবই ভাল"—তাঁহারা "ইস্তক বিলাতী পাণ্ডিত, নাগায়েৎ বিলাতী কুকুর সকলেরই সেবা করেন।" § ইঁহাদিগের বিকৃত রুচি এ দেশের শিল্পের যত অনিষ্ট করিয়াছে, তত আর কিছুই করিতে পারে নাই। কোন কোন

* T. N. Mukhurji—'Hand-book of Indian Products' (1883)

† "হায় কি হলো।"

‡ কলিকাতার গড়ের মাঠ

§ 'কৃষ্ণচরিত্র'

ইংরেজও তাহা বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সার জর্জ্জ বার্ডউড, মিষ্টার হ্যাভেল, লর্ড কার্জ্জন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, লর্ড কার্জ্জনের পরিকল্পনায়, দিল্লীতে যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহার বিবরণেও আমরা কৃষ্ণনগরের পুতুলের উল্লেখ দেখিতে পাই। * উহাতে লিখিত আছে :—

"মৃত্তিকায় মূর্ত্তি রচনা করিয়া তাহা রঞ্জিত ও বেশসজ্জিত করা প্রধানতঃ দেবমূর্ত্তি গঠন হইতে উদ্ভূত। সেই জন্য মূলতঃ এই শিল্প হিন্দুর। পুণা, লক্ষ্ণৌ ও কৃষ্ণনগর ইহার প্রধান কেন্দ্র হইলেও সকল পল্লীগ্রামেই দেবমূর্ত্তি ও খেলানা নির্ম্মিত হয়।

"কিছু দিন হইতে পুণায় এই শিল্পের অনুশীলন আর হয় না বলিলেই চলে। আর কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ—যথাযথ বেশে সজ্জিত পুত্তলগুলি রচনা হইতে আর অধিক অগ্রসর হইতে না পারিলেও সেগুলির মূল্য ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে মৃত্তিকার পুত্তল-শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।"

দিল্লীর প্রদর্শনীতে লক্ষ্ণৌ সহর হইতে প্রেরিত পুত্তলগুলিই অধিক প্রশংসিত হইয়াছিল।

সার জর্জ্জ ওয়াট যে এই শিল্প হিন্দুর বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। মুসলমানদিগের অনেকের মতে জীবের প্রতিকৃতি গঠন নিষিদ্ধ। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি সেই জন্য নানা শিল্পের বিরোধী ছিলেন। সাহিত্যিক রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর শিল্পী পিতা লকউড কিপলিং লিখিয়াছেন, রাজপুতানার প্রাসাদে এখনও দেখা যায়, প্রস্তরে ক্ষোদিত শিল্প-নিদর্শন বালুকার আস্তরণে আবৃত করা হইয়াছিল—শুনা যায়, মূর্ত্তিদ্বেষী সম্রাটের রোষের আভাস পাইয়াই তাহা করিতে হইয়াছিল। †

দিল্লীতে কৃষ্ণনগরের যে সকল পুত্তল প্রেরিত হইয়াছিল, সে সকল কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিচারকরা যে লক্ষ্ণৌ সহরের পুত্তলকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, কৃষ্ণনগরের শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন গৃহীত হয় নাই। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণনগরের শিল্প—নানা কারণে —অবনত হইলেও তাহা লক্ষ্ণৌ সহরের শিল্পের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে পারে। কৃষ্ণনগরের পুত্তলে যে স্বাভাবিক ও জীবন্ত ভাব আছে, তাহা অন্য কোন স্থানের এইরূপ পুত্তলে দুর্ল্লভ। সার জর্জ্জ ওয়াটের পুস্তকে দিল্লীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত লক্ষ্ণৌ সহরের শিল্পীর যে সকল পুত্তলের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি যে কৃষ্ণনগরের পুত্তলের সহিত তুলিত হইতে পারে না, তাহা যে কেহ দুই স্থানের পুত্তল এক স্থানে রক্ষা করিয়া দেখিলেই স্বীকার করিবেন।

গৃহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য গৃহসজ্জারূপে এই সকল পুত্তলের উপযোগিতা যে অসাধারণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। উপযুক্ত আদর পাইলে যে এই শিল্প আরও উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং তাহাতে বাঙ্গালার শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য সার্থক হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। কোন শিল্পী কখন তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের সৌন্দর্য্যেই আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে, মনে করিতে পারেন না—সে জন্য অন্যের প্রশংসা—অন্যের সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের পরিচয় প্রয়োজন হয়।

যে শিল্প-নৈপুণ্য এই সকল পুত্তলাদিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই প্রতিমা রচনায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বার্ডউড বাঙ্গালায় কার্ত্তিকপূজার জন্য নির্ম্মিত কার্ত্তিকের মূর্ত্তির বিরাটত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেইরূপ কোন কোন মূর্ত্তি ২৭ ফিট উচ্চ। সেইরূপ উচ্চ অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও দেখা যায়।

কিন্তু বিরাটত্বই বাঙ্গালার দেবদেবী মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য নহে। মূর্ত্তিতে ভাবের অভিব্যক্তি—ধ্যানের মূর্ত্ত বিকাশই সে সকলের বৈশিষ্ট্য।

বাঙ্গালার প্রস্তর-শিল্পে বিষ্ণুমূর্ত্তি (লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

কবিতায় যেমন শব্দের টঙ্কার, ছন্দের ঝঙ্কার, উপমার অলঙ্কার, দেবদেবীর মূর্ত্তিতে তেমনই ভাবের বিকাশ, কালের আভাস, পাত্রের প্রকাশ। সেই সকলই বাঙ্গালার শিল্পীর রচিত দেবদেবী মূর্ত্তিতে লক্ষিত হয়।

বাঙ্গালায় যে প্রস্তরশিল্প ছিল না, তাহা নহে; তবে ভাস্করের কার্য্যের নিদর্শন অল্প। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত বাঙ্গালায় প্রস্তরে ক্ষোদিত দেবদেবী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় দেবদেবী মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিবার জন্য সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরই ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালার শিল্পীর রচিত এই সকল প্রস্তর-মূর্ত্তিতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহাই তাহাকে উড়িষ্যার প্রস্তর-মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন প্রতিপন্ন করিত। উপরে একটি প্রস্তরে ক্ষোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। মূর্ত্তিটি যে প্রস্তরখণ্ড হইতে ক্ষোদিত, তাহা ৬২ ইঞ্চ দীর্ঘ—মূর্ত্তিটি ৪১ ইঞ্চ। বিষ্ণু বিকশিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান—তাঁহার দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। বিশেষজ্ঞগণ স্থির

* George Watt—'Indian Art at Delhi.'

† Lockwood Kipling—'Beast and Man in India.'

করিয়াছেন, মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের অর্থাৎ প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের পরবর্ত্তী এবং তৎকালীন বাঙ্গালার শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূর্ত্তিটির অঙ্গে নানা অলঙ্কার শোভা পাইতেছে।

বাঙ্গালার দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রধানতঃ মৃত্তিকায় গঠিত হয়। সে সকলের সৌন্দর্য্য দর্শকমাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। দেবদেবীর ধ্যানানুসারে মূর্ত্তি গঠিত হয় এবং বাঙ্গালার দুর্গা প্রতিমার মত মূর্ত্তিবহুল—বিভিন্ন-ভাবব্যঞ্জক-মূর্ত্তিসমন্বিত দেবী-প্রতিমা সচরাচর লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার এই মাতৃমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন —"দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" সে মূর্ত্তি দেখিলে ডাকিতে ইচ্ছা হয়—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই সকল দেবীর ও কার্ত্তিকেয়, গণপতি প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি এত ধ্যান'মুগ যে, সে সকলে কোনরূপ ত্রুটি থাকে না। জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা অপেক্ষাকৃত অল্প কালের। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধ্যানানুযায়ী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি গঠন করাইয়া জগদ্ধাত্রী প্রতিমার পূজা প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তি গঠন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বা মধ্যভাগে আরম্ভ হইয়াছিল, বলা যায়। যে কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালার মৃৎশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তথায়—শিল্পের পৃষ্ঠপোষক মহারাজের আগ্রহে ও উৎসাহে এই মূর্ত্তি প্রথম রচিত হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, এই মূর্ত্তি কৃষ্ণনগরে যত সুন্দর হয়, সেরূপ অন্যত্র বিরল।

বাঙ্গালার কুম্ভকার প্রতিমায় যে "দেবী মুখ" রচনা করিয়াছে, তাহাতে দিব্য সৌন্দর্য্য যেন প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রশংসা শিল্পীর নৈপুণ্য-প্রদর্শন-বাসনা প্রণোদিত করে। সেই জন্য প্রতিযোগিতায় শিল্প স্ফূর্ত্ত হয়। বাঙ্গালায় মৃৎশিল্পের উন্নতি-সাধনে প্রতিযোগিতার প্রভাব অল্প নহে। তবে সেই প্রতিযোগিতা কখন শত্রুতার স্রষ্টা হয় নাই। তাহার সর্ব্ব-প্রধান কারণ, এক এক স্থানের মৃৎশিল্পীরা পরস্পরের সহিত নানা সম্বন্ধে সম্বন্ধ—আত্মীয় বা কুটুম্ব। পরস্পরের কার্য্য পরস্পর লক্ষ্য করে—আলোচনা করে। বিশেষ প্রতিমাসমূহ যখন শোভাযাত্রা-সহকারে বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখন রাজপথে আলোকে শিল্পীরা পরস্পরের রচিত প্রতিমার আলোচনা ও সমালোচনা করিবার এবং লোকের মত শুনিবার সুযোগ পাইয়া উপকৃত হয়। এই উপকার সামান্য নহে।

বিজ্ঞ বার্ডউড প্রভৃতি এ দেশের শিল্পের উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দুসংহিতায় সমাজের যে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে সে সমাজে যে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করে। তাহাতে যে সন্তোষের পরিবেষ্টনে সে জাত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা শিল্প-সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। আবার যাহারা পুরুষানুক্রমে একই উপায়ে একই প্রকার কায করে, তাহারা সেই কাযে একরূপ "অশিক্ষিত-পটুত্ব" লাভ করে—সে শিল্প-নৈপুণ্য যেন তাহাদিগের পক্ষে সহজাত সংস্কারে পরিণত হয়। এ দেশের সামাজিক প্রথায় এই সকল শিল্পী অভাবের তীব্র তাড়না হইতেও অব্যাহতি লাভ করে; কারণ, সে সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যই উৎপন্ন করে—সে সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন—এ দেশের শিল্প উটজ। প্রতীচীতে শিল্প কলকারখানায় হয়—কাযেই নগর শিল্পের কেন্দ্র হইয়া উঠে। তাহাতে গ্রাম্য জীবনের ও গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষতি অনিবার্য্য হয়। উটজ শিল্পে শিল্পী তাহার গৃহের পূত পরিবেষ্টনে—গ্রামের গৃহে কায করিতে পারে। তাহার গৃহপ্রাঙ্গণ তাহার কারখানা এবং তাহার পরিবারস্থ সকলে তাহার সহকর্ম্মী। ফলে তাহার পণ্যোৎপাদনের ব্যয় যথাসম্ভব অল্প হয় এবং তাহার সন্তানাদি বাল্যকাল হইতেই কৌলিক কার্য্যে শিক্ষালাভ করে—শিক্ষানবিশী করিতে তাহাদিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। এইরূপে শিল্পের নৈপুণ্য পুরুষানুক্রমে প্রসারিত হয়। বাঙ্গালার এই শিল্পের সহিত বাঙ্গালীর সমাজের ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং ইহার স্থিতি ও উন্নতির প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই শিল্প যে এখনও মৌলিকতা হারায় নাই—জীবনীশক্তিভ্রষ্ট হইয়া অনুকরণমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা দেবীপ্রতিমার, পুতুলের এমন কি গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিরও নূতন নূতন রচনায় দেখিতে পাই।

বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সাহায্য পাইলে এই উন্নতি আরও উল্লেখযোগ্য ও দ্রুত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃত্যু-বাসর

মৃত্যু তোমার এনে দিল সে সুযোগ।
আঁটো সাঁটো মনে নিষ্ঠা ভরিয়া বুকে—
তুমি যা ছিলে না, প্রমাণ করিব সুখে
তুমি তাহা ছিলে, তাই ত এ উদ্যোগ।

জীবন ভরিয়া ফাঁকি দিছি আপনারে :
তোমারেও দিছি, যেহেতু বন্ধুজন।
তোমা প্রতি আজ করি কাজ সমাপন,
চরম ফাঁকিটি আনিয়াছি উপহারে।

মোর পথে আর দাঁড়াবে না প্রতিবাদী
নির্ভয়ে তাই হয়েছি কত উদার ;
তাই নির্ঝর খুলেছি প্রশংসার—
ছিলে জ্ঞানী, গুণী, মহীয়ান্ ইত্যাদি।

কপটাচারের শুভ্র কুসুম-রাজি
মৃত্যু-বাসরে অর্ঘ্য এনেছি আজি।

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী।

ইতিহাসের অনুসরণ

বৈশালী

বৈশালীর প্রথম পরিচয় আমরা পাই রামায়ণ গ্রন্থে। কথিত আছে, রামচন্দ্র মিথিলা গমনের পথে বৈশালীরাজ সুমতির গৃহে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। রামায়ণের মতে ইক্ষ্বাকু-তনয় "বিশাল" বৈশালী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ঐতিহাসিক-যুগের "বৈশালী" লিচ্ছবিদের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং বিশাল জনপদ ছিল বলিয়া ইহার নাম "বৈশালী"। লিচ্ছবিদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মিথিলার বৈশালীও একটি রাজতন্ত্র রাজ্য ছিল। খৃঃ-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভৃজ্যগণ মিথিলা এবং বৈশালী রাজবংশদ্বয়ের উচ্ছেদ সাধন এবং সমগ্র "তিরহুতে" আধিপত্য স্থাপন করেন। ভৃজ্যগণ অষ্ট সম্প্রদায়ে সম্মিলিত ছিলেন এবং ইঁহাদিগের মধ্যে লিচ্ছবিগণই কালে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। বৈশালী ছিল ইঁহাদিগের রাজধানী এবং ইঁহারাই ঐ স্থানে গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ "নৃপতি বিম্বিসারে"র পূর্ব্বে মগধরাজ্য লিচ্ছবিদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, এবং বিম্বিসারই মগধ হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করেন। একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ("Sutta Nipata") বৈশালী "মগধপুর" নামে অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং বৈশালী যে এক সময়ে মগধের অধীশ্বরী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ

মগধেশ্বর বিম্বিসার লিচ্ছবিদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিবার জন্য লিচ্ছবি-রাজকুমারী "চেহলানা"র পাণিগ্রহণ করেন। বিম্বিসার কোশল-নরপতি প্রসেনজিতের ভগিনীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মগধের দুই প্রবল শত্রুর (কোশল এবং বৈশালী) সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্যই বিম্বিসার এই দুই রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সপ্তম হেনরী, প্রথম জেম্স (Henry VII, James I) প্রভৃতি ইংলণ্ডের নৃপতিরা শক্তিবৃদ্ধির অথবা আত্মরক্ষার জন্য এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। চেহলানা-পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য-বিস্তারকল্পে বৈশালী আক্রমণ পূর্ব্বক লিচ্ছবিদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করেন। এই পরাজয়ের পর লিচ্ছবি-জাতি অজাতশত্রুর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু অজাতশত্রু তাঁহাদিগের শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বকালে লিচ্ছবিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিলেন, এবং তিনি নাম-মাত্র তাঁহাদিগের প্রভু ছিলেন। লিচ্ছবিগণ একতা এবং সঙ্ঘ-শাসনপ্রণালীর জন্য অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হওয়ায় কৌটিল্য তাঁহার প্রভুকে লিচ্ছবিদিগের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিয়া সৌহার্দ্য বন্ধনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। অশোকের সময় লিচ্ছবিরা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ সুঙ্গ রাজগণের (The Sunga Dynasty) সময়েও লিচ্ছবিরা বৈশালী নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কুশান-নরপতিদের রাজত্বকালে লিচ্ছবিরা আবার ক্ষমতালাভ করেন এবং মগধকে শাসনাধীনে রাখেন। ৩০৮ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ক্ষুদ্র নরপতি লিচ্ছবি-রাজকুমারী কুমার দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং লিচ্ছবিদের সাহায্যে একটি বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদিগের ইতিহাস হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বৈশালীর লিচ্ছবির বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন, এবং বিম্বিসার কর্ত্তৃক মগধ হইতে বহিষ্কৃত হইলেও আবার মগধ অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কলুহাগ্রামে অশোক-স্তম্ভ

মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধ-তীর্থাদি দর্শনকালে নেপাল গমনের পথে বৈশালীতে উপস্থিত হন এবং ঐ স্থানে একটি "স্তূপ" (Stupa) এবং সিংহমূর্ত্তি-বিশিষ্ট স্তম্ভ (Lion Pillar at Kaluha) স্থাপন করেন। অনুমান, ১২০ খৃষ্টাব্দে কুশান-সম্রাট্ কনিষ্ক বৈশালী আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং গান্ধারে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র লইয়া যান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক "ফা হিয়েন"

বৈশালী দর্শন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক "উয়ান চোয়াং" (Yuan Chwang) বৈশালী দর্শন করেন, এবং তাঁহার বিবরণ হইতে বৈশালী সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। তাঁহার বিবরণ অনুসারে বৈশালী রাজ্যের সীমা সে সময় এক সহস্র মাইল বিস্তারিত ছিল। জমির উর্ব্বরতা, এবং বিবিধ ফলপুষ্পের জন্য বৈশালীর খ্যাতি ছিল। অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, বিদ্বান্ এবং মহানুভব ছিলেন। তাঁহার সময় সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিস্তেজ, এবং কতিপয় বৌদ্ধমঠ ভিন্ন অপর মঠগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজধানী বৈশালী নগরীর প্রাসাদ, দুর্গ এবং অন্যান্য সৌধরাজি হতশ্রী ছিল। "উয়ান চোয়াং"য়ের বৈশালী দর্শনকালে সমগ্র তিরহুত, অর্থাৎ বৈশালী, মিথিলা প্রভৃতি ছিল সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত। তাঁহার মৃত্যুর পর বৈশালী কিংবা মিথিলার বিশেষ কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না, এবং সমগ্র তিরহুত ক্রমে বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী অর্জ্জুন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। চীন-সম্রাট্ প্রেরিত রাজদূতদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য তিব্বতের রাজা গ্যাম্পো তাঁহার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক নেপাল এবং তিরহুত অধিকার করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তিরহুত ছিল তিব্বতের অধীনে।

ইহার পর পাল-নৃপতিরা বিশেষতঃ রামপাল তিরহুতের অধীশ্বর হন। একাদশ শতাব্দীতে মিথিলা অর্থাৎ তিরহুত মধ্য-ভারতের চেদি-নরপতিদের করতলগত হয়। পাল-নৃপতিদিগের পতনের পর সেন-নৃপতিরা মিথিলা অধিকার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

রাজা বিশালের গড

বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দীন ইওয়াস সর্ব্বপ্রথম তিরহুত আক্রমণ এবং ১৩২৩ খৃঃ অব্দে তুগলক শা তিরহুত জয় করেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর বিহার প্রদেশ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। এখন তিরহুত বিহার প্রদেশের একটি শাসন-বিভাগ এক জন কমিশনারের দ্বারা ইহার কার্য্যাদি পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান বসার গ্রামে লিচ্ছবিদিগের রাজধানী বৈশালী অবস্থিত ছিল।

কলুহা গ্রামে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি

এই স্থানে রাজা বিশালের গড়,—যাহা আজকাল বৃহৎ একটি মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত, কতিপয় মন্দির, একটি বৃহৎ সরোবর এবং বসার হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে কলুহা গ্রামে সিংহমূর্ত্তি-বিশিষ্ট অশোকস্তম্ভ, একটি স্তূপ, এবং একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি দর্শনীয়।

লিচ্ছবিদের আদি বাসভূমি—

লিচ্ছবিগণের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে লিচ্ছবিরা পারস্য বন্দর নিসিবিস্ (Nisibis) হইতে তিরহুতে আসিয়াছিলেন; সেই জন্যই ইঁহাদিগের নাম "নিচ্ছবি" (মনুসংহিতায় এই নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়) অর্থাৎ "লিচ্ছবি" হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, নিসিবিস বন্দর খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল, লিচ্ছবিরা ঐ সময় বৈশালী রাজ্যে অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। পারসিকগণ এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিরহুতে আপন ক্ষমতা এবং সভ্যতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও খুব বিচারাধীন।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে লিচ্ছবিরা তিব্বত হইতে তিরহুতে আসিয়াছিলেন। কারণ, তিব্বতে লিচ্ছবিদিগের বহু রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতও অভ্রান্ত মনে হয় না। কারণ, তিরহুতের বহু বৌদ্ধ লিচ্ছবি সন্ন্যাসী অশোকের রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতেই তিব্বতের অধিবাসারাও লিচ্ছবি রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে লিচ্ছবিরা Yuechi জাতির এক সম্প্রদায় অর্থাৎ লিচ্ছবিরা চীন হইতে তিরহুতে আসিয়াছিলেন। এ ধারণাও সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, Yuechi জাতির ভারত আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই লিচ্ছবিরা বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন। শ্রীযুত বিমলাচরণ লাহা তাঁহার "Kshatriya Clans in Buddhist India" নামক পুস্তকে লিচ্ছবিদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ভারতীয় আর্য্যের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে বিশেষতঃ মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্রান্ত, জাতক, Professor Oldenbergএর "On the History of the Indian Caste System" নামক পুস্তক, কল্পসূত্র, Le Mahavastu edited by Steuart এবং Indian Antiquary Vol. XXXVII প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে লিচ্ছবিদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারা বশিষ্ঠ-গোত্রীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বশিষ্ঠ-সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই সমস্ত কারণে শ্রীযুত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের মতই সমর্থনযোগ্য মনে হয়। ভারতবর্ষে আর্য্যগণের আগমনের পর তাঁহারা নানা স্থানে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং কালক্রমে বর্ত্তমান তিরহুত প্রদেশও তাঁহাদিগের করতলগত হয়। লিচ্ছবিরা ইঁহাদিগেরই সন্তান—তাঁহারা চীন, তিব্বত, কিংবা পারস্য হইতে আসেন নাই।

বৈশালী এক সময়ে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। জৈন ধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান মহাবীর বৈশালী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধ বৈশালী নগরী তিন বার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিদের আহ্বানে মহামারী দূর করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথম বৈশালীতে আসেন। দ্বিতীয় বার বৈশালী অবস্থানকালে তিনি তাঁহার মাতার (বিমাতা) অনুরোধে ধর্ম্মসঙ্ঘে স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। এবং এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মে ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় বার তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে কুসীনারা গমনের পথে তিনি বৈশালীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর লিচ্ছবিরা তাঁহার দেহের অংশবিশেষের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই সমস্ত কারণে প্রমাণিত হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম বৈশালী নগরীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

শাসন প্রণালী—

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, ভারতবাসী স্বায়ত্ত শাসনে অসমর্থ। কারণ, তাঁহাদিগের মতে প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রজাতন্ত্র শাসন বর্ত্তমান ছিল, তবে এ কথা সত্য যে, বহু কাল ঐ প্রকার শাসন-প্রণালীর অভাবে ভারতবাসিগণ ইহা বিস্মৃত হইয়াছেন। যখন গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মৌর্য্যগণ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, গঙ্গার উত্তর দিকে তখনও প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে যত দিন পর্য্যন্ত বৈশালীর অস্তিত্ব ছিল, তত দিন ঐ রাজ্যে গণতন্ত্র, অর্থাৎ একপ্রকার প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। Mr. Jayaswalএর মতে বৈশালীর শাসনকার্য্য চারি জন প্রধান কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। রাজা (President), উপরাজা (Vice-President), সেনাপতি (Generalissimo), এবং ভাণ্ডাগারিক (Chancellor of the Exchequer)নামে তাঁহারা অভিহিত হইতেন। লিচ্ছবিদের মহাসভা অর্থাৎ Parliament, এবং শাসন-পরিচালক সভা (Cabinet) বৈশালী নগরীতে অবস্থিত ছিল। যে সকল লিচ্ছবি বৈশালী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণের হস্তেই রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল, এবং তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই প্রধান কর্ম্মচারী-চতুষ্টয়, অর্থাৎ রাজা, উপরাজা, সেনাপতি এবং ভাণ্ডাগারিক নির্ব্বাচিত হইতেন। বৈশালীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ আটষট্টি হাজার। প্রত্যেকেই নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিতেন, এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে কিংবা নির্ধন ধনীকে সমীহ করিতেন না; প্রত্যেকেই রাজা উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৈশালী রাজ্যে কাহারও বিশেষ কোনও অধিকার বা সুবিধা ছিল না। রাজনৈতিক অধিকার সকলেরই সমান ছিল, অর্থাৎ কোন "Privileged class" ছিল না। এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর উপাধি রাজা ছিল বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, বৈশালীতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আথেন্সের এক জন প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর উপাধি ছিল "King" অথবা "Archon", সেই জন্য আথেন্সে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এমন ধারণা করিলে ভুল হইবে। আমার মনে হয়, গ্রীকদিগের ন্যায় লিচ্ছবিরাও অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন, এবং সেই জন্যই নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা 'রাজা' (অর্থাৎ কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন) উপাধি ধারণ করিতেন। প্রোফেসর ভাণ্ডারকার বলেন, প্রত্যেক লিচ্ছবির স্বতন্ত্র ভূ-সম্পত্তি ছিল, এবং সেই সম্পত্তি তিনি নিজে (রাজা স্বরূপ) এবং তাঁহার অধীনস্থ তিন জন কর্ম্মচারী (উপরাজা, সেনাপতি এবং ভাণ্ডাগারিক) দেখিতেন। সেই জন্যই বৈশালী নগরীতে বহু সংখ্যক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। প্রোফেসর ভাণ্ডারকারের মত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা তাঁহার "Kshatriya Clans in Buddhist India" পুস্তকে লিখিয়াছেন—বৈশালীর সমস্ত ভূমি লিচ্ছবিদিগের সাধারণ সম্পত্তি ছিল, ইহার কোন অংশে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার ছিল না। গ্রীসে "Heroic Age"তে এমনই প্রথা বিদ্যমান ছিল। তিব্বতের বিবরণ অনুসারে লিচ্ছবিদের প্রধান কর্ম্মচারী "নায়ক" নামে অভিহিত হইতেন, সমস্ত নাগরিকের দ্বারা তিনি নির্ব্বাচিত হইতেন। লিচ্ছবি মহাসভার আদেশ-অনুসারে "নায়ককে" শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতে হইত।

মহাসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট—

বৈশালীতে লিচ্ছবিদের মহাসভার অধিবেশন হইত। এই সভার সদস্যেরাই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। ইঁহাদিগের অভিমতানুসারে পূর্ব্ববর্ণিত রাজকর্ম্মচারীদিগকে (রাজা, উপরাজা ইত্যাদি)

কার্য্য করিতে হইত। কাহারও কাহারও মতে বৈশালীর সমস্ত অধিবাসীই এ সভার সদস্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল লিচ্ছবি বৈশালী স্থাপন করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের বংশধরগণই এই সভায় যোগদান করিতে পারিতেন। এ মহাসভায় সর্ব্ব বিষয় আলোচিত হইত, অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তই সকলকে গ্রহণ করিতে হইত। এই সভাগৃহ 'সান্তাগার' নামে বর্ণিত হইয়াছে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে "Asana Pannapaka" (অর্থাৎ "Regulator of seats") নামে একজন কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইত। এই কর্ম্মচারী বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে সভ্যদিগকে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করাইতেন (Vinay Texts S. B. E. Vol XX, page 403) এখনকার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যগণ যে ভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, লিচ্ছবিদের মহাসভার সদস্যেরাও সেই ভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন। প্রস্তাব-কর্ত্তা সদস্যগণকে প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম বিশদরূপে বিবৃত করিতেন, তাহার পর সদস্যেরা তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। এই প্রশ্ন এক বার কিংবা তিন বার করা হইত। তর্ক-বিতর্কঘটিত কোনো প্রস্তাব উপলক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে সদস্যেরা গুপ্তমত প্রদান-পদ্ধতি (অর্থাৎ Voting by ballot) অবলম্বন করিতেন, এবং অধিক সংখ্যক সভ্যগণের মত (ভোট) অনুসারে সেই প্রস্তাবের মীমাংসা হইত। সদস্যগণকে ভোট লিখিবার উপকরণ (Tickets or Salakas) প্রদান করা হইত এবং তাঁহাদিগের মধ্য হইতে এক জন ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে এই ভোটগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য নির্ব্বাচন করা হইত। যে সকল সদস্য কোনও কারণে অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহাদিগের ভোট লইবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। এখন কোন দেশে এ প্রথা পরিলক্ষিত হয় না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, লিচ্ছবিরা রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অধিকারের মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেন এবং তাহার হ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন যেমন ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির অধিবেশনে quorumএর (ন্যূন সংখ্যা) আবশ্যক হয়, তেমনি লিচ্ছবিদের মহাসভার অধিবেশনেও quorum, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতির আবশ্যকতা ছিল। মহাসভার কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্যও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত।

লিচ্ছবিরা কখনও কখনও নিকটবর্ত্তী জাতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। পরস্পরের সাহায্য বা স্বার্থ-সংরক্ষণাদির জন্যই ইঁহারা অন্য জাতির সহিত মিলিত হইতেন। এই উদ্দেশ্যে লিচ্ছবিরা এক সময়ে নিকটবর্ত্তী মল্ল জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মিলিত জাতিদ্বয়ের এক মন্ত্রণা সভা (Federal Council) ছিল। এ সভায় নয় জন লিচ্ছবি এবং নয় জন মল্ল সভ্য ছিলেন। উভয় জাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই এ মন্ত্রণা-সভায় আলোচিত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায়, মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের মন্ত্রণা-সভায় তুল্য সমতা ছিল—যদিও মল্লগণ লিচ্ছবিদের অপেক্ষা শৌর্য্যে এবং বৈভবে অনেকখানি হীন ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে লিচ্ছবিরা অন্যান্য সভ্য জাতির তুলনায় অধিকতর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। গ্রীক ইতিহাস হইতে আমরা অবগত হই, আথেন্স এবং স্পার্টা দুর্ব্বল গ্রীক রাজ্যগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাদিগের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পরহস্ত হইতে তাহাদিগের উদ্ধার সাধনের পর বহু কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অধীনে রাখিয়াছিল। গ্রীকগণ অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল, কিন্তু স্পার্টা, আথেন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ কালক্রমে স্বার্থান্ধ হইয়া দুর্ব্বল গ্রীক্ রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই। এ সম্বন্ধে গ্রীক্ ইতিহাসের Confederacy of Delos বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফৌজদারী বিচার-পদ্ধতি—

লিচ্ছবিদের বিচার-পদ্ধতি বিশেষতঃ ফৌজদারী বিচার-প্রণালী ছিল অতিশয় চমৎকার। এখন কোনও সভ্য জাতির মধ্যে সুবিচারের তেমন বন্দোবস্ত দেখা যায় না। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে প্রথমে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তাহাকে বিনিশ্চয় মহামাত্রদিগের (Viniscaya Mahamatras) নিকট প্রেরণ করা হইত। এই কর্ম্মচারীরা আসামীকে প্রশ্ন করিতেন ও অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেন এবং তাহার অপরাধের কোন প্রমাণ না পাইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইত। দোষী বিবেচনা করিলে শাস্তি প্রদান না করিয়া তাহাকে ব্যবহারিকদিগের (Vyavaharikas) হস্তে সমর্পণ করিতেন।

আসামীর অপরাধ প্রমাণিত না হইলে তাঁহারা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতেন; কিন্তু অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে তাঁহারা তাহাকে দণ্ডিত না করিয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চ-শ্রেণীর বিচারক অর্থাৎ সূত্রধরদিগের (Suttadharas) নিকট প্রেরণ করিতেন। সূত্রধরগণ আসামীকে দোষী মনে করিলে তাহাকে "অষ্টকুলক"দিগের (Auttha-kulaka) নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিতেন। "অষ্টকুলক" লিচ্ছবি-দিগের প্রধান বিচারালয়, এখানে বিচারপতি ছিলেন আট জন। "অষ্টকুলক" আসামীকে দোষী স্থির করিলে আসামী সেনাপতির নিকট প্রেরিত হইত, এবং তিনি তাহাকে উপরাজের নিকট প্রেরণ করিতেন। উপরাজের নিকট দোষ প্রমাণিত হইলে রাজা আসামীর বিচার করিতেন। রাজা দোষী মনে করিলে আইন অনুসারে তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৈশালীর কোন অধিবাসীকে কেহ সহজে শাস্তি প্রদান করিতে পারিত না। বিনিশ্চয় মহামাত্র হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই যখন কাহাকেও অপরাধী মনে করিতেন, তখনই সে দণ্ড পাইত। এই বিচার-প্রণালীতে সময় অনেক নষ্ট হইত সত্য, কিন্তু আসামীর বিচারে ত্রুটি থাকিত না।

দেওয়ানী বিচার-প্রণালী—

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার সর্ব্ব-প্রথমে "বিনিশ্চয় মহামাত্র"দিগের বিচারালয়ে হইত। তাহার পর "ব্যবহারিক"গণ উহার বিচার করিতেন। ব্যবহারিকদিগের নিকট হইতে মোকদ্দমা "সূত্রধর"দিগের বিচারালয়ে যাইত, এবং সর্ব্বশেষে 'পরাজিত' ব্যক্তি "অষ্টকুলকের" বিচার প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইত। "বিনিশ্চয় মহামাত্রে"র বিচারালয়কে "মুন্সেফ কোর্ট" এবং দ্বিতীয় বিচারালয়কে "জজ কোর্ট" বলা যাইতে পারে। "সূত্রধর"দিগের বিচারালয় "হাইকোর্ট" এবং "অষ্টকুলক" Judicial Committee of the Privy Council, অথবা ফরাসী দেশের "Court of Cassation"এর স্থানীয় ছিল; সুতরাং লিচ্ছবিদিগের মধ্যে সুবিচারের বন্দোবস্ত ছিল চূড়ান্ত রকমের।

লিচ্ছবিগণের সামাজিক রীতিনীতি—

লিচ্ছবিরা অতিশয় কর্ম্মপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু, সমরপটু, এবং পুরুষোচিত ক্রীড়া-কৌতুকের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চৌর্য্য অপরাধ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহারা শুধু রণকুশলই ছিলেন না, শিল্পকলারও পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার্থে লিচ্ছবিরা দূরদেশে গমন করিতেন। মাহালী (Mahali) নামক এক জন লিচ্ছবি যুবক তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহুসংখ্যক লিচ্ছবি যুবককেও শিল্প-বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। বৈশালী নগরীতে বহুসংখ্যক দরজী, স্বর্ণকার এবং জহুরীর বাসস্থান ছিল, কারণ লিচ্ছবিরা অতিশয় বিলাসী ছিলেন। ভাস্কর্য্য এবং সৌধশিল্পেও লিচ্ছবিদের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। কারণ, বৈশালী মনোহর সৌধমালায়, সুন্দর মন্দিরসমূহে এবং বিরাট্ বৌদ্ধস্তূপ-রাজিতে পরিপূর্ণ ছিল।

লিচ্ছবিদের বিবাহের নিয়ম ছিল অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। বৈশালী-কুমারীদিগকে বৈশালীতেই বিবাহ করিতে হইত, অন্য স্থানে তাহাদিগের বিবাহ হইতে পারিত না। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার দিকে লিচ্ছবিদিগের লক্ষ্য ছিল সুদৃঢ়। স্ত্রীলোকের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারে অপরাধীর কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে নারী-হরণ প্রভৃতি অপরাধ বৈশালীতে বিরল ছিল। কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইলে কিংবা বিবাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে স্বামী তাহাকে হত্যা করিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ স্ত্রী যদি কোন প্রকারে ভিক্ষুণী (Nun) হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে কোন শাস্তি প্রদান করা যাইত না। লিচ্ছবিরা কখনও মৃতদেহের সংকার করিতেন, কখনও বা মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত করিতেন, এবং কখনও বা জন্তুর ভক্ষণার্থে বনে-প্রান্তরে পরিত্যাগ করিতেন। লিচ্ছবিদের মধ্যে নানাপ্রকার উৎসব,—যেমন গ্রীক্ ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, প্রচলিত ছিল। এই সব উৎসবে লিচ্ছবিরা নৃত্য, গীত, বাদন এবং কবিতা আবৃত্তি দ্বারা উল্লসিত হইতেন।

বণিকসমিতি—

প্রাচীন বৈশালী এবং আধুনিক বসার গ্রাম একই স্থান বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ বসারের এক অংশ খনন করাইয়াছিলেন; ফলে বহুসংখ্যক মোহর (Seals) মৃত্তিকানিম্ন হইতে বহির্গত হয়। সেই সব মোহরের মধ্যে কতকগুলি ছিল সরকারী মোহর, অবশিষ্ট বণিকদিগের মোহর। ইহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র হইতে মোহরযুক্ত সরকারী পত্রাদি বৈশালীস্থিত মগধের রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রেরিত হইত, এবং বৈশালীর বণিকদিগের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বণিকদিগের ঘনিষ্ঠতা ছিল; স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তখন বৈশালী অথবা পাটলিপুত্রে এক বণিক সমিতি অর্থাৎ "Chamber of Commerce", সংস্থাপিত ছিল।

বৈশালীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই বৈশালী এক সময়ে বৈভবে, শৌর্য্যে, এবং সভ্যতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল—কালের আবর্ত্তনে বৈশালী আসিরিয়া, বেবিলোনীয়া, লিডিয়া, মিডিয়া, মিশর, কার্থেজ এবং রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছে, এখন তাহার সে গৌরবের কণামাত্রও বিদ্যমান নাই। পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে,—তাই অতি দুঃখে অমর কবি ওমর খৈয়ম গাহিয়াছেন:—

"জীর্ণ-ভাঙ্গা সরাইখানার রাত্রি-দিবা দুইটি দ্বার।
তারির ভিতর আনাগোনা—দুনিয়াদারি চমৎকার।
রাস্তার পরে আস্ছে রাজা, সজ্জা কতই বাদ্য ধূম—
তুচ্ছ সে সব—ক'দিনই-বা—তার পর তো সব নিঝুম!" *

শ্রীঅতুলানন্দ সেন (এম-এ)।

বাঙ্গালায় ইংরেজ

ইংরেজ বণিক্রা কোন্ সময়ে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলা একটু কঠিন। ইংরেজ বণিক্দল মাদ্রাজের কৃষ্ণানদীর তীরে মসলিপত্তন বন্দরে কুঠি স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালার দিকে লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বাঙ্গালার ফসল এবং ধেনো মদ বিশেষ ভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। যাহা হউক, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা ৩ হাজার টাকা লইয়া ইংরেজ বণিক্দিগকে বাঙ্গালায় অবাধে বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করেন। তৎপূর্ব্বে সার টমাস রোর পরামর্শ অনুসারে হুগলীতে ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত করিয়াছিলেন। পাটনা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজারে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদিগের বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। ১৬৬০ এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকাই মসলিন গ্রেট বৃটেনে নীত হইয়াছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার সহিত ইংরেজ বণিকদিগের প্রায় ১ কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংরেজ বণিকগণ ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন কিনিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময় মুসলমান রাজপুরুষদিগের ঘোর অবনতি ঘটে। তাঁহারা বিলাসী, ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং অর্থলোলুপ হইয়া উঠেন। এ দেশের সাধারণ লোক অত্যন্ত নিরীহ, ইহা বুঝিতে পারিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকরা শিল্পী ও বণিকদিগকে নিপীড়িত করিতে কুণ্ঠা রাখিলেন না। দেশের লোক সেই জন্য অনন্যোপায় হইয়া মুসলমান রাজপুরুষদিগের নিকট ইংরেজ

---

* নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অবলম্বনে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে:—

(১) Mr. Jayaswal's Hindu Polity.
(২) Muzaffarpur District Gazetteer.
(৩) Mr. Vincent Smith's History of India.
(৪) Mr. Rapson's History of India.
(৫) Mr. B. C. Law's Kshatiriya Clans in Buddist India.
(৬) The Jatakas.
(৭) Mr. S. N. Singh's History of Trihut.
(৮) Aiyangar's History of India.
(৯) Rhys Devid's Buddhist India.
(১০) Mr. N. C. Banerji's Economic Life in Ancient India.
(১১) Fahian's Travels.
(১২) Hiouen Thsang's Travels.

কুঠিয়াল এবং তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন। সেই জন্য বাঙ্গালার সুবেদার সায়েস্তা খাঁর সহিত ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের বিবাদ বাধে। সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের সোরা এবং অন্যান্য পণ্য-বোঝাই নৌকা আটক করেন। সেই বিবাদের ফলে ইংরেজ কুঠিয়ালরা হুগলী প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বাঙ্গালা ত্যাগ করেন। কিন্তু বাঙ্গালা ত্যাগ করিলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা বিশেষ তদ্বির করিয়া ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁয়ের উপর তাঁহাদিগকে অবাধে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দানের জন্য একখানি পরোয়ানা বাহির করেন। এই সময় জব চার্ণক নামক জনৈক সুচতুর কর্ম্মদক্ষ ইংরেজ প্রথমে উলুবেড়িয়ায় ডক বা জাহাজ নিম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু পরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি সুতানুটীতে আসিয়া কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ঔরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না। কিন্তু ইংরেজরা চলিয়া গেলে তাঁহার রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইতে দেখিয়া তিনি ইংরেজদিগকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে অবিশ্রাম ব্যস্ত থাকায় ঔরঙ্গজেবের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি ইংরেজদিগকে বাণিজ্য করিতে দিতে স্বীকৃত হন। চার্ণক সুতানুটীতে আসিয়া সেখানে তাঁহাদের যে ঘর-বাড়ী ছিল, তাহা পান নাই। সে সমস্তই লোক ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ বণিকদের সুতানুটীতে আসিবার পূর্ব্বে আর্ম্মানী বণিকরা সুতানুটী নামক স্থানে সুতার এবং নটীর ব্যবসায় করিত। সেই জন্য ঐ স্থানের নাম হইয়াছিল সুতানুটীর হাট। সে সময়ে লোকের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা প্রকাশ্যে আর্ম্মেনীয়ান এবং অন্যান্য জাতীয় নারী খরিদ করিত। শুনা যায়, সুতানুটীর হাটে সুতা ত বিক্রয় হইতই, অধিকন্তু, নটীও বিক্রয় হইত। তখনকার লোকের অন্নচিন্তা বড় একটা ছিল না, সে জন্য যাহাদের অবস্থা একটু সম্পন্ন ছিল, তাহারা নটী-বিলাস করিত। জব চার্ণক বার্ষিক ১২ শত টাকা খাজনা দিয়া সুতানুটী, কালীকুঠি এবং গোবিন্দপুর পত্তনী লইয়াছিলেন। সুতানুটীর হাট বর্ত্তমান ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কিছু উত্তর হইতে হাটখোলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শোভাবাজার সুতানুটীরও অন্তর্গত ছিল। গোবিন্দপুর ছিল বর্ত্তমান খিদিরপুর এবং ভবানীপুর পর্য্যন্ত। এই তিনখানি গ্রাম পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল না। স্থানে স্থানে গভীর বন এবং হোগলার জঙ্গল ছিল। ইহার মধ্যে সুতানুটীর হাটই বিস্তৃত ছিল। কালীকুঠি বা কলিকাতা ছিল বর্ত্তমান টাকশাল হইতে কাষ্টম্-হাউস পর্য্যন্ত।

বাঙ্গালায় এই কলিকাতা ইজারা লইবার পর হইতেই ইংরেজ বণিকদিগের সৌভাগ্যের উদয় হয়। তাঁহারা সুতানুটীর পরিবর্ত্তে কলিকাতা নাম গ্রহণ করেন, তাহার কারণ কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা কলকাতা হইতে চালানী মাল কালিকট হইতে চালানী মাল বলিয়া য়ুরোপে পরিচয় দিতে পারিবেন বলিয়া ঐ নামই পছন্দ করিয়াছিলেন। তখন কালিকটই ইংরেজদিগের অধিক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান ছিল। যাহা হউক, ভাগ্যফলে কলিকাতা পত্তনের পর হইতেই ইংরেজদিগের ভারতীয় বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে এক সন্ধি-সর্ত্ত স্থির হয় যে, ইংরেজ ও ফরাসীরা যে যাহা জয় করিয়াছিল, তাহা তাহারা পরস্পরকে ফিরাইয়া দিবে। অবশ্য তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিয়াছিল। ফরাসীরা যে সুবিধা হারাইয়াছিল, তাহা আর তাহারা ফিরাইয়া পায় নাই। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে সুবিধা পাইয়াছিল, ফরাসীদিগের সে সুবিধা লাভ ঘটে নাই।

বঙ্গদেশে এই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এরূপ ভাবে চালিত হইয়াছিল যে, তাহার ফলে মানুষের অজ্ঞাতে ইংরেজদিগের অনুকূল এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল—যে জন্য ইংরেজই ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই উহা বুঝা যাইবে। মীরজুমলা যখন বাঙ্গালার সুবেদার, তখন আরাকান বাঙ্গালা দেশের অশান্তির একটা ঝটিকা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে আরাকানে দুষ্ট পর্ত্তুগীজ এবং পর্ত্তুগীজ-বর্ণসঙ্করদিগের একটা আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল। উহারা বাঙ্গালায় বিষম উৎপাত করিত। মীরজুমলার পর সায়েস্তা খাঁ যখন বাঙ্গালা দেশের সুবেদার হইয়া আসেন, সেই সময় তিনি আরাকানের এই দুর্দ্দান্ত জলদস্যুদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরাকানের রাজাকেও শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সঙ্কল্প সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সায়েস্তা খাঁর নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কার্য্যসাধনে ওলন্দাজগণ সায়েস্তা খাঁর সহায়তা করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ অধিকাংশ পর্ত্তুগীজকে ঢাকার কয়েক মাইল দক্ষিণস্থিত ফিরিঙ্গীবাজারে বাস করাইয়া তথায় তাহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ঐ স্থান এখনও ফিরিঙ্গীবাজার নামে পরিচিত। এখন তথায় ঐ সকল পর্ত্তুগীজের বংশধর বিদ্যমান রহিয়াছে। সায়েস্তা খাঁ আরাকান রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং চট্টগ্রাম নাম ঘুচাইয়া ইহার রাজধানীর নাম ইস্‌লামাবাদ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই জলদস্যু-দমনকার্য্য যে ভালই হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার ফলে বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্য-জাহাজের গতাগতি বিঘ্নশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সুদৃঢ় ফল হইয়াছিল—বাঙ্গালায় ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্ট্যানলী লেনপুল লিখিয়াছেন,—"সায়েস্তা খাঁ বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি বঙ্গোপসাগরের জলদস্যুদিগকে দমন করিয়া কার্য্যতঃ ভবিষ্যতে বঙ্গদেশে এক শাসক জাতির আবির্ভাবের প্রকৃত সুবিধা করিয়া দিতেছেন; ঐ জাতি যখন ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করিয়াছিল, তখন তাহারা যে এইরূপ সমৃদ্ধিশালী হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে নাই। পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিবার কুড়ি বৎসর পরে জব চার্ণক, স্থানীয় ফৌজদারের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে সুতানুটীতে কিছু জমি লইয়া উহা হইতে জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া সেখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (১)। ইহাই হয় কলিকাতার পত্তন। এই কলিকাতার পত্তন হইতেই ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য লাভের সূচনা হইয়াছিল। আর এ কথাও সত্য যে, মোগল সাম্রাজ্যের পতন ফলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা হইতেই

(১) Aurengzib, p 117—118.

বুঝা যায় যে, কোন অদৃষ্ট শক্তির অপ্রতর্কিত প্রভাবেই বাঙ্গালায়, তথা ভারতে বৃটিশ-শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কতকগুলি ঘটনা এমন ভাবে ঘটিয়াছিল যে, তাহার ফলে ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক বঙ্গোপসাগরের জলদস্যু-দমন অন্যতম।

বাঙ্গালায়, তথা ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা আর দুইটি কারণে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরের প্রতিষ্ঠা হইবার পরই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে। ইহা ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার একটি অনুকূল ঘটনা। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঔরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে সুনজরে দেখিতেন না। তিনি জীবিত থাকিতে ইংরেজরা বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌গণ নামে-মাত্র সম্রাট্ হইয়া পড়েন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম শা আলম বরং কিছু ভাল ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী জাহাঙ্গর শাহ হইতেই সকল বাদশাহ কেবল ভোগাসক্ত, ভীরু, উৎসাহহীন এবং অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়া পড়েন। ফলে ভারতের সর্ব্বত্রই মুসলমান-শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বহু স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁয়ের কর্ম্মচারী আলিবর্দ্দী খাঁ নবাবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া ঘোর অরাজকতার এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। বেরারের মহারাষ্ট্রীয় নায়ক রঘুজী ভোঁসলা বার বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া বাঙ্গালা দেশকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচার ফলে আলিবর্দ্দী খাঁ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়া আলিবর্দ্দী রঘুজী ভোঁসলার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ঐ সন্ধিতে স্থির হইয়াছিল যে, আলিবর্দ্দী রঘুজীকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিবেন। এই টাকার জন্য আলিবর্দ্দী খাঁকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল। কারণ, বাঙ্গালায় তখন আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিল না। নানারূপ ষড়যন্ত্র এবং অসাধু রাজপুরুষদিগের অত্যাচারে আলিবর্দ্দীকে এবং বাঙ্গালার লোককে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। বর্গীদিগের অত্যাচারে এবং লুণ্ঠনে বাঙ্গালার রাজনীতিক এবং আর্থিক উভয় দিকেই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালায় কোন কোন জমিদার যে য়ুরোপীয় কুঠিয়ালদিগের উপর পরোক্ষে অত্যাচার না করিতেন, তাহা নহে। তৃতীয়তঃ, নবাবের আফগান সেনাপতিরাও বিদ্রোহী হওয়াতেও বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। কিন্তু ইংরেজ-বণিকদিগের বাণিজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল—নবাব কর্ত্তৃক তাহাদের নিকট হইতে বার বার অধিক অর্থগ্রহণ।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা বকীর আলির বিরুদ্ধে উড়িষ্যা যাত্রা করেন। সেই সময়ে তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে জাহাজ দিয়া বালেশ্বরের দিকে পাহারাদারী করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যদি শত্রু পলায়ন করে, তাহা হইলে তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন। ঐ বৎসরই কাশিমবাজারের কুঠিয়ালগণ নবাবকে ১৭ হাজার ৫১ টাকা নজরআনা দিতে বাধ্য হয়। কেবল তাহাই নহে, নবাবের কর্ম্মচারীদিগকেও উঁহাদের ১১ হাজর ৬ শত টাকা দিতে হইয়াছিল। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা গোপনে বর্গীদিগের সহায়তা করিতেছেন; সে জন্য তিনি কাশিমবাজারের কুঠিয়ালদিগের নিকট ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবী করিয়াছিলেন। তদনুসারে কাশিমবাজারের কুঠিয়ালগণ তাঁহাদের মুরুব্বি ফতেচাঁদের নিকট এই বিষয়টি রফা করিবার জন্য তাঁহাদের উকীল পাঠাইয়াছিলেন। ফতেচাঁদ তাঁহাদিগকে নবাবের সহিত বিবাদ করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ কুঠিয়ালগণ ৮০ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত নবাবকে দিয়া তুষ্ট করিবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নবাবের নিকট ৫০ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেই পারিলেন না। ফতেচাঁদ বলিলেন, যদি কোম্পানী ৫ লক্ষ টাকাও দিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে তিনি নবাবকে উহা গ্রহণ করিয়া রফা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে সাহস করিতেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, সুজা দৌলতের (সুজা আদ্দেন খাঁর) সময়ে ফরাসী এবং ওলন্দাজরা অনেক অধিক টাকা দিয়া নবাবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বিবাদের ফলে পাটনায় এবং ঢাকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে কুঠি ছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এদিকে নবাব গুড়ে আড়ং আক্রমণ করিবার জন্য অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য পাঠাইলেন। তিনি একে একে কোম্পানী পক্ষের ব্যবসায়ীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ভয় দেখাইলেন। পিরীচ কোটমা নামক কোম্পানীর গোমস্তাকে ধরিয়া নবাবের লোক তাহাকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শেষে সে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিল। তখন তাহাকে আর এক দল নির্য্যাতনকারীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। সেই নির্য্যাতনের ফলে সে আরও তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিল। নরসিং দাস নামক কোম্পানীর দাদন-দারের জনৈক গোমস্তাকে ধরিয়াও তাহার উপর ঐরূপ অত্যাচার করা হইয়াছিল। বালী কোটমা নামক কোম্পানীর এক জন গোমস্তা পলাইয়া কাশিমবাজারের কুঠিতে আশ্রয় লইয়াছিল এবং কেবলরাম নামক কাশিমবাজারের জনৈক ব্যবসায়ীকে নবাবের লোক গ্রেপ্তার করে। তখন কোম্পানীর কলিকাতাস্থ মন্ত্রণা-সভায় সদস্যবর্গ এক লক্ষ টাকা দিয়া নবাবকে তুষ্ট করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবের দরবারে তদনুসারে কোম্পানীর উকিল প্রেরিত হইয়াছিল। নবাব উকিলের কথা শুনিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত দেশের বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছে, অথচ তাহারা নবাব-সরকারে আমদানী-রপ্তানী-শুল্ক বাবদ এক পয়সাও দেয় না এবং নবাবের অনেক প্রজাকে আটক করিয়া রাখে। নবাব আরও বলিয়াছিলেন যে, বালী কোটমাকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে তিনি কোম্পানীর কুঠি অবরুদ্ধ করিবেন। তাহাতেও যদি তাঁহারা উহাকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে নবাবের সৈন্যগণ কোম্পানীর আড়ঙ্গের (কুঠির) সমস্ত মাল এবং টাকাকড়ি লুণ্ঠন করিয়া লইবেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল দেখিয়া কুঠির কর্ত্তারা ফতেচাঁদ এবং চাঁদ রায়ের নিকট এই ব্যাপার

জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, দুই-এক লক্ষ টাকা দিয়া নবাবকে শান্ত করা সম্ভব হইবে না। কারণ, তাঁহার টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। অগত্যা কোম্পানীর কুঠিয়াল নবাব আলিবর্দ্দীর আত্মীয় ও হুগলীর ফৌজদার সৈয়দ আমেদ খাঁকে অনেক টাকা দিয়া নবাবের সহিত ঐ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিবার ভার দিয়াছিলেন। টাকা খাইয়া সৈয়দ আমেদ কুঠিয়ালদিগকে ভরসা দিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। শেষে কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট কাশিমবাজারের কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী মিষ্টার ফরষ্টারকে লিখিলেন, যে প্রকারে হউক, নবাবের সহিত এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইতেই হইবে। শেষে কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ নবাবকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফতেচাঁদ কোম্পানীকে হুগলী, পাটনা, ঢাকা এবং অন্যান্য আড়ঙ্গে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা এবং নবাব কর্ত্তৃক ধৃত কোম্পানীর গোমস্তা প্রভৃতিকে লইয়া আসিয়াছিলেন। কোম্পানীকে নানা বাবদ নবাবের লোকদিগকে এবং উমিচাঁদকে বহু সহস্র টাকা দিতে হয়। ইহার ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তাঁহারা মাল কিনিয়া রপ্তানী করিতেও পারিতেন না। আমদানী মালও বিক্রয় করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন কাশিমবাজারের কুঠিয়ালদিগকে নবাবের কর্ম্মচারী-দিগকে সাড়ে ৩০ হাজার টাকা দিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু, বিভিন্ন স্থানের কুঠি হইতে নবাবের লোকদিগকে বহু সহস্র টাকা দিতে হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এত করিয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবাব আলিবর্দ্দীর স্থায়ী প্রীতি সম্পাদিত হয় নাই। ইংরেজ বণিকরা সুবিধা পাইলেই অন্য জাতীয় বণিকদিগের পণ্য প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইতেন। বোধ হয়, বাঙ্গালায় ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহাদের একচেটিয়া করিবার জন্য তাঁহারা ঐরূপ করিতেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা কতকগুলি আর্ম্মেনিয়ান এবং মোগল ব্যবসায়ীর বাণিজ্য-জাহাজ আটক এবং লুণ্ঠন করেন বলিয়া তাঁহারা নবাবের নিকট নালিশ করেন। সেই অভিযোগ প্রাপ্তিমাত্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ইংরেজদিগের গভর্ণর বারওয়েলের উপর নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পরোয়ানা জারি করেন:— 'হুগলিস্থিত সৈয়দ, মোগল এবং আর্ম্মানী ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করিতেছে যে, তোমরা তাহাদের প্রভূত মাল এবং ধনরত্নপূর্ণ নৌকা আটক করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছ এবং বিদেশী অঞ্চল হইতেও আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমরা ফরাসীদিগের বলিয়া ভাণ করিয়া অন্যান্য মহাজনের হুগলী-গামী জাহাজ আটক করিতেছ। উহার মধ্যে মোচেল হইতে প্রভূত মালপূর্ণ এণ্টনীর জাহাজে তথাকার সেরিফ আমাকে যে সকল অসামান্য কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা ছিল; তাহাও তোমরা ধরিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছ। ঐ সকল বণিকরা রাজ্যের হিতকর, তাহাদের কর্ত্তৃক আমদানী এবং রপ্তানী পণ্য সকলের পক্ষেই হিতকর এবং আবশ্যক। উহাদের অভিযোগ এতই গুরু যে, আমি আর তাহা না শুনিয়া পারিতেছি না। তোমাদিগকে বোম্বেটেগিরি করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। অতএব আমি লিখিতেছি যে, এই পরোয়ানা প্রাপ্তিমাত্র তোমরা ঐ সকল বণিকের মাল উহাদিগকে এবং আমার মাল আমাকে প্রদান করিবে, অন্যথা তোমাদিগকে এরূপ কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে যে, তাহা তোমরা আশা কর নাই।' (১) এই পরোয়ানা পাইবামাত্র কোম্পানীর কলিকাতাস্থিত গভর্ণর উত্তর দিয়াছিলেন যে, ঐ সকল জাহাজ এবং মালপত্র রাজার জাহাজ কর্ত্তৃক আটক করা হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহাদের কোন হাত নাই। ফরাসীদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারাই শত্রুপক্ষের মাল বলিয়া আর্ম্মানীদিগের মাল আটক করিয়াছে।

নবাব কিন্তু এই সব ওজর-আপত্তিতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নানা স্থানের ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের উপর কঠোর ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের বাণিজ্য-জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের পরামর্শ-পরিষদের সভাপতি ওয়ালধাম ব্রক ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বোর্ডের সভাপতিকে লিখিয়া পাঠান যে, লুণ্ঠিত জিনিষগুলি ফিরাইয়া না দিলে নবাব কিছুতেই শান্ত হইবেন না। তাহার মধ্যে নবাবের নিজ জিনিষও আছে। ফলে এই ব্যাপারে ইংরেজ কুঠিয়ালরা যত অল্পে মীমাংসা হইতে পারে, তাহার জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা এবং অর্থব্যয় করেন। সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। ফলে শেষটা আলিবর্দ্দীকে তুষ্ট করিবার অন্য উপায় হইল না দেখিয়া ইংরেজ কুঠিয়ালগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নবাবের বাধাদানে তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকিল। এ দিকে আর্ম্মেনীয় বণিকদিগকে তুষ্ট না করিলে নবাব কোন সর্ত্তেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহারা অতি কষ্টে আর্ম্মেনীয় বণিকদিগকে তুষ্ট করিলে এবং নবাবকে অর্থ দিলে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, নবাবী আমলে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ইংরেজ কুঠিয়ালদিগের নিকট হইতে নবাবরা আবশ্যক মত টাকা আদায় করিতেন। অবশ্য বৃটিশ বণিকরা সহজে টাকা দিতে চাহিতেন না। তাঁহারা দেশের শিল্পী প্রভৃতির উপর এবং তাহাদের কর্ম্মচারীদিগের উপর জুলুম করিয়া সস্তায় মাল লইতেন। সেই জন্য তাঁহারা অনেক লাভ করিতেন। সেই জন্য তাঁহারা নবাবদিগের দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত হইতেন। নবাবরা ঐরূপ টাকা পাইতেন বলিয়া বিভিন্ন য়ুরোপীয় কুঠিয়ালগণ যে প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করিত, তাহা আর দেখিয়াও দেখিতেন না বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে, ইংরেজ বণিকরা জোর করিয়া এ দেশের বণিকদিগের বাণিজ্যে বাধা দিতেন। আর্ম্মেনীয়ান এবং মোগল বণিকদিগের বাণিজ্য-জাহাজ আটক করা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে, নবাবকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়াও তাঁহারা যে এ দেশে বাণিজ্য করিতেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহারা অযথা ভাবে অতিরিক্ত লাভ করিতেন। নতুবা তাঁহারা কখনই নবাবদিগকে অত টাকা দিয়া এ দেশে বাণিজ্য করিতে সম্মত হইতেন না।

মারহাট্টাগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা আক্রমণে বাঙ্গালার ইংরেজ কুঠিয়াল-দিগের কিছু অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। মারহাট্টারা সাধারণতঃ

(১) Consultation Tannary 11,—1749

ইংরেজদিগের কুঠি আক্রমণ করিত না। সেই জন্য আলিবর্দ্দী বলিতেন যে, ইংরেজরা মারহাট্টাদিগকে ভিতরে ভিতরে সহায়তা করিতেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্ম লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টারা কেবল একবার মাত্র বাঙ্গালায় বৃটিশ বাণিজ্যের ক্ষতি করিয়াছিল। (১) সেই সময়ে তাহারা কাশিমবাজার হইতে কলিকাতাগামী কোম্পানীর নৌকা ধরিয়া ৩০০ গাঁইট রেশম লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল। তবে বর্গীর হাঙ্গামায় কোম্পানীর বাণিজ্যের পরোক্ষ ভাবে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় দেশীয় শিল্পীরা নানা দিকে পলায়ন করিত। কাজেই কোম্পানীর উহাতে কয়েক বার ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন স্থানীয় জমিদাররাও সময় সময় কোম্পানীর নিকট হইতে কিছু কিছু টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কণিকার রাজা কুঠিয়ালদিগের নিকট হইতে নগদ ২ হাজার টাকা, একখানি রক্তবর্ণের বস্ত্র এবং একটি ঘড়ি লইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজাও কোম্পানীর নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতেন। পক্ষান্তরে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা অন্যায়রূপে দস্তক করিয়া দেশীয়দিগের উপর অত্যাচার করিতেন এবং কোম্পানীর যে সর্ত্তে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ছিল, তাহা তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা আপনাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য প্রয়োগ করিতেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর সে সকল কথা বিস্তৃত ভাবে বলিব না। ফলে, ইংরেজ কুঠিয়ালরা এ দেশের শাসনের উপর ভাল ধারণা করিতে পারেন নাই।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় দারুণ ঝড় হয়। সেই ঝড়ের সহিত ভূমিকম্প এবং সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া সাগরতীর হইতে যাট মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দেশের লোকের বিশেষ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। উহার জন্য পর-বৎসর বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজরা এই সময় বাঙ্গালীদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া এ দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ফলে, ব্যক্তিগত গুণে এবং ব্যবহারে ইংরেজরা সেই সময়কার মুসলমান রাজপুরুষগণ অপেক্ষা অনেক ভাল ছিলেন। সেই জন্য এ দেশের লোক ইংরেজদিগের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। ইংরেজরা যে অত্যাচার করিতেন, তাহা তাঁহাদের গোমস্তাদিগের মারফতে; কাজেই লোক সে দোষ গোমস্তাদিগের উপরই চাপাইত।

ব্যবহারের ফলে এ দেশ-প্রবাসী ইংরেজ কুঠিয়ালরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এ দেশের লোক অত্যন্ত নিরীহ,—তাহারা সামান্য অসুবিধায় এবং অত্যাচারে বিলাতের বা য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের ন্যায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে না। দ্বিতীয়তঃ, তখন নানা কারণে এ দেশের সমাজের সংহতি-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 'ইহা আমার দেশ এবং ইহারা আমার দেশের লোক', এরূপ একটা প্রাণের টান তখন বাঙ্গালীর মধ্যে লোপ পাইয়াছিল; ইংরেজ বণিকরা অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়া দেশের জমি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। সেই জন্য ইংরেজের পক্ষে বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালা জয় করা সহজ হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী এবং সিরাজের পর ক্লাইভের গর্দ্দভ মীরজাফরের আমলেই ইংরেজ কার্য্যতঃ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মীরকাশিম বাঙ্গালাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াও তাহা করিতে পারেন নাই। সে সব কথা আর এবার বলা হইল না। ফলে, বাঙ্গালী জাতি নিজ দোষেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে ভগবানের ইচ্ছায় ইংরেজ বাঙ্গালার রাজা হইয়াছেন। অস্ত্রবলে ইংরেজ এ রাজ্য অধিকার করেন নাই—ভাগ্যবলেই যে তাঁহারা ইহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন

(১) Orme, vol. II, p. 46.

সংসার-অঙ্গন

সংসার-অঙ্গনে মোরা সকল মানব,
নিত্য করি দ্বন্দ্ব-কলরব।
উত্তপ্ত তনুর তলে লুকাইয়া রাখি মত্ত ঝঙ্কার পিপাসা,
হিংসা-দ্বেষ বক্ষ-মাঝে বাঁধে তপ্ত বাসা।

দলনে পীড়নে নিত্য নিঠুর সংগ্রাম,
দিবানিশি চলে অবিরাম;
বক্ষ ছিঁড়ে রক্ত করি পান,
মর্ম্মভেদী অত্যাচারে প্রতি প্রাণ হয় ম্রিয়মাণ।

লুণ্ঠনে পীড়নে ধ্বংসে আনিয়া প্রলয়,
মানুষে মানুষে আজ দেয় পরিচয়।
হায়! ওরে মরে-গেছে ধরা হতে মানুষের প্রাণ,
শুধু রক্ত-মাংস নিয়ে জাগিতেছে জগৎ-শ্মশান।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)

ছায়া

জীবনের পথে নেমে আসে আজ অতীতের ঘনছায়া,
বেদনা-মুখর কত হাসি-গান বিস্মৃতি-ছোঁওয়া স্মৃতি;
ছেঁড়া খাতা তবু পাতায় পাতায় ভরে আছে কত মায়া,
বিগত দিনের হাসি ও অশ্রু জীবনের পরিচিতি।

সীমাহীন এই জীবনের পথে অসীমের হাতছানি,
ভেসে চলে প্রাণ অশ্রু-হাসির মিলনের মোহানায়;
ফেলে-আসা পথে ধীরে ধীরে নামে গোধূলির ছায়াখানি,
সে ছায়া-আলোকে চলে পরিচয় কত চেনা-অচেনায়।

সৃষ্টির সেই সুরু হ'তে চলে জীবনের অভিযান,
শাশ্বত এই কালের বুকেতে অবিরাম যাওয়া-আসা;
অতীতের ছায়া পিছনে তাহার কভু নহে অবসান,
সেই স্মৃতি ল'য়ে আমাদের শুধু কাঁদা, হাসা, ভালোবাসা।

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়, (এম-এ)

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

দুই

১

দু'বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

বাসন্তীর গৃহস্থ-পল্লী। অনেকগুলি এক-তলা বাড়ী···পাশাপাশি। বাসন্তীর ফ্যাক্টরিতে এবং অফিসে যারা চাকরি করে, এ সব বাড়ীতে তারাই থাকে সপরিবারে।

দুপুরবেলা। পুরুষেরা কাজ-কর্ম্মে বাহির হইয়াছে।

অন্নদাচরণের বাড়ীতে আরো পাঁচ-সাত বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া জড়ো হইয়াছে। জড়ো হইবার কারণ, এক ভাটিয়া শাড়ীওয়ালা আসিয়াছে, সঙ্গে আনিয়াছে রাশীকৃত সিল্কের শাড়ী।

অন্নদার স্ত্রী মহামায়া আর মেয়ে সরস্বতী দু'খানা শাড়ী পছন্দ করিয়াছে···একখানি মায়ের, অপরখানি মেয়ের জন্য।

পাশে গঙ্গাপদর স্ত্রী যামিনী···আকুল নয়নে বসিয়া আছে।

মহামায়া বলিল—আমি বলছি, শাড়ী পছন্দ হয়েছে, নে; পারবে না। এই যে আমি নি। ওর ব্যবস্থা ভালো! এক-সঙ্গে টাকা দিতে হবে না! মাসে-মাসে দু'-চার টাকা করে নিয়ে যায় এসে।

নিশ্বাস ফেলিয়া যামিনী বলিল—ওঁকে না বলে নেবো?

মহামায়া বলিল—বলতে গেলে আর কেনা হবে না। জানিস তো পুরুষ-মানুষের স্বভাব! নিজেদের সিগারেট-বিড়িতে কত খরচ করে, তাতে গায় লাগে না! আর আমরা কিছু চাইলেই অমনি হাঁ-হাঁ করে ওঠে। বলে, পয়সা কোথায়?

সরস্বতী বলিল,—তুমি নাও মাসিমা, ভারী তো দাম! মাত্র আঠারো টাকা। মাসে তিন টাকা করে দিতে পারবে না?

মেয়ের কথার খেই ধরিয়া মা মহামায়া বলিল—প্রথমে আমারো ভয় হয়েছিল ভাই! তার পর সরো বললে, সামান্য একখানা শাড়ী···সে-সখও মেটাতে পারবো না? পোলাও-কালিয়া খাচ্ছিনে, নতুন গহনা চাইছিনে···মাসে-মাসে দু'-চারটে টাকা···তা জুটবে না? আমি তখন রুদ্র-মূর্ত্তি ধরলুম। সত্যিই তো, মেয়ে-জন্ম নিয়ে কোন্ সাধটা মিটেছে? নিলুম শাড়ী। সে শাড়ীর দাম ছিল বারো টাকা। মাসে মাসে তিনটে করে টাকা দিতুম! সংসারে কত দিকে কত পয়সা বাজে খরচ হচ্ছে! তা যদি সয়, এই বা সইবে না কেন?··· একখানা ভালো শাড়ী···পাঁচ জনের সামনে বেরুতে হয়···যে-কালের যা দস্তুর! না হলে মান থাকবে কেন?···আমি বলছি, তুই নে! গঙ্গাপদ বাবুকে না হয় বলিসনি। সংসার-খরচের টাকা থেকে দিবি। ও-শাড়ীর দাম বললে কত?

নিশ্বাস ফেলিয়া যামিনী বলিলেন,—আঠারো টাকা!

মহামায়া বলিল—মাসে তিন টাকা করে দিবি। আমি বলে দিচ্ছি! তার পর সহসা কণ্ঠ মৃদু করিয়া দু' চোখে গর্ব্বের বাতি জ্বালিয়া মহামায়া বলিল,—জানিস, এমনি করে একখানা নয়, তিন-তিনখানা শাড়ী আমি কিনেছি! উনি টের পাননি!··· পরে' যখন বেরিয়েছি, দেখে বলেছেন, খাশা শাড়ী···বাঃ! তুই নে। বলে, যা দেবে অঙ্গে, তা যাবে সঙ্গে!

কণ্ঠে দ্বিধা···যামিনী বলিল—নেবো?

সবল কণ্ঠে সরস্বতী বলিল,—নিশ্চয়!

যামিনী বলিল,—ভয় করে, মা। ওঁকে না জানিয়ে এত কাল কিচ্ছু করিনি।

মহামায়া বলিল—তাই ভালো শাড়ীও এত কালে অঙ্গে ওঠেনি। আমার পিসিমা বলতো, সংসারের গিন্নি হয়েও যদি সব বিষয়ে ওদের তাঁবেদারি করবি, তা হলে না পাবি কোনো কালে দু'খানা শাড়ী-গহনা পরতে, না পাবি ভালো কিছু খেতে!

যামিনী তখনো যেন অন্ধকারে দিশাহারা!

সে অন্ধকারে আলো জ্বালিল সরস্বতী! শাড়ীওয়ালাকে সে বলিল,—ওখানা উনি নেবেন। ঐ আঠারো টাকার খানা···নতুন খদ্দের হলেন।···মাসে তিন টাকা করে দেবেন কিন্তু।

শাড়ীওয়ালা দ্বিরুক্তি করিল না; সবিনয়ে কহিল,—তাতে কি আছে, মা-জী! দাম কি হামি আভি মাঙ্গছে! লেকেন, এ-সব শাড়ী লিয়ে আসৃছি সুরাটসে···কলকাত্তায় ভি এ শাড়ী এখনো পৌঁছায়নি।

শাড়ীওয়ালা শাড়ী বাহির করিয়া সরস্বতীর হাতে দিল। যামিনীর হাতে শাড়ী দিয়া সরস্বতী বলিল—এই রাখো শাড়ী···এ শাড়ী তোমায় চমৎকার মানাবে মাসিমা। এমন সুন্দর তোমার রঙ!

মহামায়া বলিল—যা, তিনটে টাকা নিয়ে এসে ওকে দে··· মাসে-মাসে তিনটে করে টাকা ফেলে দিবি, গায়ে লাগবে না। ভাববি, বাড়ীতে কুটুম এসেছিল, তাদের পরিচর্য্যায় খরচ হয়েছে! মাঝে থেকে একখানা ভালো শাড়ী হবে লাভ···যাকে বলে, মেয়ে-মানুষের সম্পত্তি!

নিশ্বাস তবু বুকের কোটর ছাড়িতে চায় না! কেমন যন্ত্রচালিতের মতো যামিনী উঠিল, বলিল,—শাড়ী এখুন এখানে তোমার কাছে রাখো দিদি···আমি টাকা নিয়ে আসি। মুদির টাকাটা হাতে রয়েছে···এখনো নিয়ে যায়নি।

মহামায়া বলিল,—তাকে না হয় এ মাসে তিন টাকা কম দিস্।

যামিনী বাড়ী গেল টাকা আনিতে।

বিজয়িনীর ভঙ্গীতে মহামায়া তখন চাহিল গোলাপীর দিকে। গোলাপী সতু বাবুর স্ত্রী! সতু বাবু এখানকার স্কুল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বয়স হইয়াছে। এক-বাড়ী ছেলে-মেয়ে। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। ছ'মাস মুখ কালো করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া পড়িয়া ছিলেন; কোনো মতে শুধু চাকরিটুকু রক্ষা করিতেন—লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়িয়া দিয়া। তার পর গরমের ছুটীতে স্কুল বন্ধ হইলে নিঃশব্দে এক দিন কলিকাতায় যান্ এবং পনেরো দিন পরে ফিরিয়া আসেন একেবারে রূপসী দ্বিতীয়-পক্ষ এই গোলাপীকে সঙ্গে লইয়া।

গোলাপী লেখাপড়া জানে। রুচি সৌখীন। বলিতে গেলে এ শাড়ীওয়ালার সন্ধান পাইয়া সে-ই তাকে এ পাড়ায় প্রচারিত

করিয়াছে। শাড়ীওয়ালার কাছ হইতে এ-যাবৎ কম্‌সেকম সে প্রায় দশখানা শাড়ী লইয়াছে, এমনি সস্তা কিস্তির বন্দোবস্তে।

একখানা শাড়ী আজ তার খুব পছন্দ হইয়াছে—ধানী রঙের একখানা জর্জ্জেট। দাম বলিয়াছে, পঁচিশ টাকা। ওদিককার বাকী দেনা এখনো সাঁইত্রিশ টাকা জমিয়া আছে। তিনখানা শাড়ীর দাম-বাবদ; মাসিক কিস্তির অঙ্ক এখন বারো টাকা দাঁড়াইয়াছে।

শাড়ীওয়ালা এবার চাহিল গোলাপীর পানে, বলিল—এ শাড়ীঠো লিয়ে লিন। আপনার জন্ত আনছিলুম। দো ঠো লেয়াই ছিনু··· একঠো পার্ব্বতীপুরের এস-ডি-ও সাব আছেন, ওঁর মেম-সাবের জন্ত। ওঁর ইঠো আপনকার জন্ত। এ শাড়ীর উপর দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-সাবের লেড়কীর বহুৎ টাঁক্···ক্যাশ্-রুপেয়া দেনে মাঙ্গাথা! তবভি হামি দিইনি মা-জী!···এ একদম নয়া ফ্যাশন্!

গোলাপী নিঃশব্দে বসিয়া যামিনীকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল। পঁচিশ টাকার এ-শাড়ীখানার জন্ত তার মনে যা হইতেছিল···এখন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—নিতে ইচ্ছা তো খুব! কিন্তু এখনো সাঁইত্রিশ টাকা বাকী রয়েছে।

শাড়ীওয়ালা বলিল,—তাতে কি! রুপেয়া হামি কভি মাঙ্গিয়েছে? সাঁইত্রিশ, ওঁর এ পঁচিশ—হোবে বাষট্ রুপেয়া। আপনি পন্‌রো রুপেয়া করে দিবেন। ব্যস্!

হাসিয়া গোলাপী বলিল—হ্যাঁ, তুমি যা চালাক! বাষট্টি টাকার পনেরো টাকা এখন দেবো, বাকী থাকবে সাতচল্লিশ! তখন তুমি এসে আবার একখানা বত্রিশ টাকার শাড়ী দেখাবে, লোভে পড়ে সেখানাও নেবো, কিস্তি গিয়ে মাসে দাঁড়াবে কুড়িতে! তার পর উনি দিন্ ঘাড় ধরে' বাড়ীর বার করে!

ও-বাড়ীর নয়নতারা সদ্য বিধবা। এ-সব শাড়ীর উপর লোভ হইলেও দেশের পোড়া আইনে এ শাড়ী পরিবার উপায় নাই! বসিয়া বসিয়া সে আক্রোশে জ্বলিতেছিল। যত দিন এ-সব শাড়ী পরিবার উপায় ছিল, তত দিন কোথায় ছিল লক্ষ্মীছাড়া এই শাড়ীওয়ালা! মনের ক্ষোভ এ-জন্মের মতো মনে রহিয়া গেল!

গোলাপীর কথায় তার মনের আক্রোশ একেবারে সাপের মতো ফণা তুলিয়া উঠিল। ছোবল দিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। নয়নতারা বলিল—নাও ছোট-বৌ, নাও! তুমি কি যে-সে মানুষ গো, তুমি হলে দ্বিতীয়-পক্ষ! নামে গোলাপ, রঙে গোলাপ! সতুদা আমাদের বুড়ো শিব—তুমি সেই বুড়ো শিবের শিব-রাত্রির সল্‌তে! এ শাড়ী পরে সতুদার সামনে দাঁড়ালে সতুদার পরমায়ু বেড়ে' যাবে দশ বচ্ছর! নাও, নাও, ওতে দো-মন করো না!

২

পূরবেলায় এ-বাড়ীতে শাড়ীওয়ালা যখন আসর জমাইয়াছে, তখন পাশের বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় সেলাইয়ের কল চালাইয়া সুভাষিণী একরাশ পেনি-ফ্রক সেলাই করিতেছিল।

এ সংসারের উপর দু'বৎসর পূর্ব্বে যে-ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তার চিহ্ন আজো মিলায় নাই!

মহেন্দ্রর মৃত্যুর পর এইখানেই সকলে রহিয়া গিয়াছে। বাসন্তী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার মতো জায়গাও নাই!

যে-বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ীতে থাকা গেল না। ভাড়ার টাকা কোথায় মিলিবে?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, সুপ্রসন্নর এত বড় বাড়ী—সুভাষিণীকে তিনি দেখেন নিজের বোনের মতো···

সুভাষিণী সে স্নেহ বোঝে। কিন্তু অপরের আশ্রয়···

সজল চোখে সুভাষিণী কোনো মতে বলিয়াছিল, সব জানি দিদি! তোমার কত স্নেহ! কিন্তু তুমি আমায় মাপ করো। এ ভাগ্য নিয়ে কাকেও আশ্রয় করতে আমার ভয় করে!···তবে এইখানেই আমাকে থাকতে হবে! ছেলেদের পড়াশুনা···কোথায় যাবো? এখানে তুমি আছো···তাছাড়া এখানকার বাতাসে তাঁর শেষ নিশ্বাস···

বলিতে বলিতে সুভাষিণীর কণ্ঠ বিজড়িত হইয়াছিল।

ভরসার মধ্যে চায়না কোম্পানিতে মহেন্দ্রর যে লাইফ-ইনশিওর ছিল, সেই টাকা! সুপ্রসন্নর যত্নে সে-টাকা পাইতে বিলম্ব হয় নাই; এবং সুপ্রসন্ন সে-টাকা তাঁহারি জানা এক কোম্পানিতে সুদে খাটাইবার জন্ত জমা দিয়া দিয়াছেন; সে টাকার সুদ মাসে-মাসে পাওয়া যায়। তার উপর দিলু ছেলে পড়ায়—সে-টাকা!

দিলু পাশ করিয়া স্কলারশিপ পাইল।

কিন্তু কলেজের পড়া চালাইতে গেলে বাহিরে যাইতে হয়, এখানে কে দেখে! বুদ্ধিমান্ ছেলে! দুঃখে-কষ্টে আগাগোড়া মানুষ না হইলেও এ ক'মাসের দুর্বিপাকে তার বুদ্ধি বাড়িয়াছে! সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যৎ দেখিবার মতো তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে!

ভাবিয়া চিন্তিয়া সুভাষিণীকে সে বলিল—লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে অনেক সময় লাগবে, মা! তার উপর ও-পথে নানা বাধা ঘটতে পারে। পথও অনিশ্চিত! তার চেয়ে আমি ঠিক করেছি, এখানকার ফ্যাক্টরিতে ঢুকে যদি কোনো কাজ শিখি···আজ-কাল এদিকেও উন্নতির সম্ভাবনা বেশ?

সুভাষিণী বুঝিল। এই বয়সে ছেলে বুঝিয়াছে, সংসারের বোঝা বহিবার দায়িত্ব চাপিয়াছে তার ঘাড়ে! নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—কিন্তু দিলু, ভালো পাশ করলি, স্কলারশিপ পেলি··· লেখাপড়া ছেড়ে দিবি?

দিলু বলিল—ছেড়ে ঠিক দেবো না, মা। লেখাপড়া চলবে, তবে কলেজে গিয়ে রুটিন মেনে চলা সম্ভব হবে না।···বাঁচতে হবে সকলকে। তাই আমি ঠিক করেছি, ফ্যাক্টরিতে ঢুকে কাজ শিখবো। তাতে শীগ্‌গির মানুষ হবো। টাকাও রোজগার হবে কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে। নীলুর রেজাণ্ট অনেক ভালো হবে মা। তুমি দেখে নিয়ো, সুযোগ-সুবিধা পেলে ও এক জন মানুষের মতো মানুষ হবে। সে সুযোগ ওকে দেওয়া চাই। আর সে সুযোগ দিতে হলে এইটিই চমৎকার এবং একমাত্র উপায়!

এ-পল্লীতে ছোট একতলা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেই বাড়ীতে ক'টি প্রাণী আশ্রয় লইয়াছে। দু'খানি ঘর। ছোট একটি উঠান। উঠানের এক কোণে পাতার ছাউনি-করা রান্নার জায়গা। রান্নাঘরের চালে লাউ-কুমড়ার গাছ, তাহাতে লাউ-কুমড়া ফলে। উঠানে বেগুন এবং পাঁচ-রকম শাক-পাতার গাছ। টিউব-ওয়েল আছে; আর আছে দু'খানি ঘরের সামনে খানিকটা ঢাকা বারান্দা।

কারখানায় ঢুকিতে দিলুকে বেগ পাইতে হয় নাই। সুপ্রসন্নর সুপারিশে সেখানে ঢুকিয়াছে মেকানিকাল ডিপার্টমেণ্টে।

ইলেক্‌ট্রিকের কাজও শিখিতেছে। প্রথম তিন মাস মাহিনা পায় নাই, তার পর মাহিনা হইয়াছে মাসে পঁচিশ টাকা। সন্ধ্যায় ছ'টি ছেলে পড়ায়; সেখানে পায় পনেরো। চল্লিশ টাকায় সংসার এক-রকমে চলিয়া যায়। না গেলেই বা উপায় কি!

পাঁচ-টাকার মাসিক কিস্তীতে আজ ছ'মাস একটা সেলাইয়ের কল কেনা হইয়াছে। সুভাষিণী বলিল,—চুপ করে বসে থাকি কেন দিলু? সেলাই করলে তা থেকে যদি ছ'পয়সা আসে!

মনে কতখানি দুঃখ চাপিয়া দিলু মায়ের কথায় সায় দিয়াছে, তা জানেন তার অন্তর্যামী!

কারখানায় দিলুর আদরের সীমা নাই। কাজে তার যেমন পটুতা, আচারে-ব্যবহারেও তেমনি সে বিনয়-নম্র।

গৌরী ঠাকুরাণীর সংসারে খানিকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কৌমুদী গিয়াছে কলিকাতায়। মামার বাড়ীতে থাকে। সেখানকার কলেজে পড়িতেছে। এবারে আই-এ দিবে।

জানকী বাবু দেশে ফিরিয়াছেন। বাতের ব্যথা এ জীবনে সারিবার নয়; তবে অনেকটা কমিয়াছে। সুরুচি এইখানে আছে।

সেদিন কারখানা হইতে জানকী বাবুর গৃহে ডাক পড়িল, এক জন ভালো ইলেকট্রিক-মিস্ত্রী চাই। জানকী বাবু ফ্রিজিডেয়ার-যন্ত্র আনাইয়াছেন···সেটা ভালো চলিতেছে না; ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

দিলুকে পাঠানো হইল। বেলা তখন সাড়ে ন'টা।

কম্পাউণ্ডওয়ালা মস্ত বাড়ী। সামনে মার্বেল-পাথরের বড় দালান। দালানে চেয়ারে বসিয়া মণিময়···সামনে বই-খাতা।

দিলু আসিয়া বলিল, সে আসিয়াছে কারখানা হইতে··· মেকানিক···কি না কি কাজ আছে।

মণিময় ডাকিল—জোগু···

জোগু আসিল। মণিময় বলিল—বাবুকে খপর দে। মেকানিক এসেছে বরফের আলমারির জন্ম।

জোগু চলিয়া গেল; এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু স্নান করিতেছেন; স্নান সারা হইলেই তিনি আসিবেন।

দিলু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ। মণিময়ের সামনে বই-খাতা দেখিয়া মনে কৌতূহল হইল অনেকখানি।···ঘোড়া দেখিলে সওয়ারের মনে যেমন আগ্রহ-কৌতূহল জাগে, তেমনি! তার উপর মণিময় বই খুলিয়া খাতার পানে এক-মনে চাহিয়া আছে! ভাবিয়া যেন কিসের কূল-কিনারা পাইতেছে না!

কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না···ধীর-পায়ে দিলু আগাইয়া আসিল এবং দূর হইতে দেখিয়া বুঝিল, অঙ্ক!

চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—অঙ্ক কষছেন! ইন্‌টারেষ্ট! কোন্‌টা?

মণিময়ের বিস্ময়ের সীমা নাই! কারখানার তেল-কালিমাখা মিস্ত্রী···এরিথমেটিকের পানে চাহিয়া সে বলে, অঙ্কর নাম ইন্‌টারেষ্ট! চকিতে সে দিলুকে নিরীক্ষণ করিয়া লইল। মিস্ত্রী হইলেও চেহারা ভদ্রঘরের মতো! বলিল,—হ্যাঁ। এই অঙ্কটা···**In how many years will a sum of money treble itself at 3⅛ per cent?** তুমি অঙ্ক জানো, বুঝি?

মৃদু হাস্যে দিলু বলিল,—জানি। ওর খুব সহজ ফর্মুলা আছে। সে ফর্মুলা জানা থাকলে ইন্‌টারেষ্টের কোনো অঙ্ক কোনো দিন বাধবে না, খুব সহজে কষতে পারবেন!

মণিময় বলিল—আমায় বলে দেবে সে-ফর্মুলা?

খুশী হইয়া দিলু বলিল—বেশ।···এখানে আপনাকে সময় **calculate** করে বার করতে হবে তো?

মণিময় বলিল—হ্যাঁ।

দিলু বলিল—এর ফর্মুলা হচ্ছে

$$\text{Time} = \frac{\text{Interest} \times 100}{\text{Principal} \times \text{rate of interest.}}$$

অর্থাৎ যেটা সুদ,—তার মানে, এখানে প্রিন্সিপাল ধরুন এক টাকা; সেটা সুদ-সুদ্ধ তিনগুণ হয়ে হলো তিন টাকা! তাহলে সুদ হলো তিন মাইনাস্ এক···দু' টাকা। এবারে ফর্মুলা ধরে কষুন—সুদ ২ টাকা ইন্‌টু ১০০ ইকোয়াল-টু ২০০। এটাকে ভাগ দিতে হবে প্রিন্সিপাল ১ টাকা ইন্‌টু রেট্‌ অফ্‌ ইন্‌টারেষ্ট ৩⅛ অর্থাৎ ২৫-এর ৮ দিয়ে! তাহলে হবে···

বলিয়া মণিময়ের খাতা টানিয়া দিলু কষিয়া দিল, ৬৪ বছর।

আন্‌সার মিলাইয়া মণিময় বলিল—বাঃ! আমাকে শিখিয়ে দিন তো এ ফর্মুলাগুলো!

দিলু ফর্মুলা লিখিয়া অঙ্ক বুঝাইতেছিল, জানকী বাবু আসিলেন। দিলুর পরণে তেল-কালিমাখা শর্ট আর সার্ট দেখিয়া চিনিলেন, মিস্ত্রী!

বলিলেন—কি হচ্ছে মণি?

মণিময় বলিল—আমাকে ইনি অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বাবা। সত্যি, চমৎকার!

জানকী বাবু বলিলেন—বটে! আচ্ছা, আগে অঙ্ক শেখো, তার পর আমাদের কাজ।

তাহাই হইল। জানকী বাবু বলিলেন—কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ··· পারবে?

দিলু বলিল—আজ্ঞে, না দেখলে বলতে পারবো না।

মেশিন দেখানো হইল,—এবং নূতন হইলেও কল-কব্জার ব্যাপার, দিলু বুঝিল, কি ঘটিয়াছে।···মেশিন ঠিক করিয়া দিল।

জানকী বাবু খুশী হইলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিলু পরিচয় দিল।

শুনিয়া জানকী বাবু বলিলেন,—তুমি মহেন্দ্র বাবুর ছেলে···বটে! হুঁ! কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলে···স্কলারশিপ পেয়েছিলে!

দিলু বলিল,—উপায় ছিল না।

জানকী বাবু বলিলেন,—যদি উপায় কেউ করে দেয় [illegible], তোমার বড় হবার চান্স আছে!

নম্র কণ্ঠে দিলু বলিল,—ফ্যাক্টরিতে কাজ করে বড় হওয়া যাবে না?

জানকী বাবু জবাব দিলেন না···স্থির চক্ষে দু মিনিট দিলুর পানে চাহিয়া থাকিয়া তার পর বলিলেন,—বেশ, যে-কাজ শিখছো, শেখো। তার পর সময় পাবে কি? সময় পেলে তোমাকে আর একটি কাজের ভার দিতুম।

সবিনয়ে দিলু বলিল,—কারখানার কাজের পর সে কাজ করা চলবে?

জানকী বাবু বলিলেন,—কেন চলবে না? তবে তোমার বিশ্রাম চাই তো!

কুণ্ঠিত স্বরে দিলু বলিল—বিশ্রামের জন্য···মানে,···

জানকী বাবু বলিলেন—সময় থাকলে তোমাকে বলতুম, মণিকে পড়াবার কথা। অবশ্য মাইনে আমি ভালোই দেবো। ছাখো, পারো যদি···আমি পঞ্চাশ টাকা করে দেবো। দেড় ঘণ্টা কি ছ' ঘণ্টা করে তোমার অবসর-মতো···

আশার রঙীন-আলোয় দিলুর মন ভরিয়া উঠিল! দিলু বলিল—আমি পারবো।

—বেশ। তা হলে কাল থেকে···

মাথা নাড়িয়া দিলু সম্মতি জানাইল!

বাড়ী ফিরিয়া মার কাছে বলিতেছিল সকালের কথা—জানকী বাবুর ছেলেকে অঙ্ক বলিয়া দিতেছিল, হঠাৎ জানকী বাবু আসিয়া তাহা দেখিয়া যেন তার সামনে রাজ-সিংহাসন পাতিয়া দিলেন।

সুভাষিণীর দু' চোখ সজল হইল। সুভাষিণী বলিল—তাঁর দয়া! যাদের কেউ নেই, তাদের তিনি আছেন, দিলু!···এ কত বড় সত্য, তা আমি আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছি।

ওদিকে জানকী বাবু বলিতেছিলেন সুরুচিকে—সেই যে মহেন্দ্র বাবু ছিলেন হেড-মাষ্টার···তাঁর ছেলে। লেখাপড়ায় ভালো। নিরুপায়ে কারখানায় কাজ শিখতে ঢুকেছে! পড়া ছাড়েনি। মনে হলো, সাহায্য করি···কিন্তু দু'-একটা কথায় বুঝলুম, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! বললে, কারখানায় কাজ শিখেও বড় হওয়া যায়!···এমন মন যদি থাকে, আশ্চর্য্য নয় মা! এ লাইনেও মানুষ বড় হতে পারে। তবে তেমন মন চাই!

৩

দশ দিন পরে বাসন্তীর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কসের বার্ষিক উৎসব। সারা গ্রামে সমারোহের আভাস জাগিয়াছে। কিশোরের দল এ্যামেচার থিয়েটার করিবে। তার জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে স্কুলে রিহার্শাল চলিতেছে। ছেলেদের দেখাদেখি মেয়েরা ক্ষেপিয়াছে, তারাও অভিনয় করিবে। তারা করিবে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচি লইয়াছে মেয়েদের এ অভিনয়ের ভার। তাঁর বাড়ীতে মেয়েরা আসিয়া রিহার্শাল দেয়। শান্তি-নিকেতন হইতে জানকী বাবু এক জন শিল্পীকে আনাইয়াছেন; তাঁহারি অধ্যক্ষতায় 'বাল্মীকি-প্রতিভার' অভিনয় হইবে।

ফাল্গুন মাস। বসন্তের শ্যামলশ্রী দিকে দিকে উদ্ভাসিত।

সেদিন দ্বাদশী।

রাত্রি ন'টা বাজে। আকাশে বেশ খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। সে জ্যোৎস্নায় গাছের-ছায়ায়-ঢাকা বাসন্তীর পথে যে-আলো, সে-আলোয় কেমন স্বপ্নময়তা!

এ-পথ ধরিয়া ক'জন মেয়ে বাড়ী ফিরিতেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল সরস্বতী। সরস্বতী অভিনয়ে নামিবে না, সে গিয়াছিল রিহার্শাল দেখিতে।

খানিকটা আসিবার পর তে-মাথা। এই তে-মাথায় দল ছাড়িয়া সরস্বতী বাঁকিল তাদের বাড়ীর পথে।

একা। কিছু দূর আসিয়াছে, পাশে পুকুর-ঘাট। দেখে, ঘাটের কাছে নিস্পন্দের মতো দাঁড়াইয়া দিগঙ্গনা। দিগঙ্গনার সজ্জিত বেশ। এ-বেশে দিগঙ্গনাকে এখানে একা দেখিয়া সরস্বতী বলিল—এত রাত্রে এখানে দাঁড়িয়ে!

দিগঙ্গনা বলিল—বেড়াতে এসেছিলুম।

—একা?

—হ্যাঁ।

—রিহার্শালে যাওনি?

দিগঙ্গনা মনে-মনে চটিল, বলিল—না। কিন্তু তার জন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন, বুঝি না!

স্বরে সে ঝাঁজ সরস্বতী লক্ষ্য করিল, কিছু বলিল না। বলিবার মুখ নাই। দিগঙ্গনার বাবা বড় চাকরি করে, আর সরস্বতীর বাপ অন্নদা সামান্য কেরাণী! এ পার্থক্য মানিয়া চলিবার মতো বুদ্ধি সরস্বতীর আছে!

সরস্বতী বলিল,—তা নয়, তবে আমি রিহার্শালে গিয়েছিলুম কি না···তোমার জন্য সকলে অনেকক্ষণ বসেছিল। সুরুচিদি বললে, দিগঙ্গনা এলো না? সে সাজবে লক্ষ্মী!

দিগঙ্গনা এ কথার জবাব দিল না। এ কথা যেন তার কাণে গেল না, এমনি ভঙ্গীতে মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে সরিয়া গেল। সরস্বতী এ উপেক্ষা লক্ষ্য করিল। কিন্তু গায়ে না মাখিয়া ধীর-পায়ে সে-ও বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

মনে কেমন সংশয়! এখানে নিরালা ঘাটের কাছে মানুষ এ-সময়ে একা বেড়াইতে আসে না! নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে!

কি সে উদ্দেশ্য?

আরো দু'-চার মিনিট পরে সে-উদ্দেশ্যের যেন একটু আভাস···

শীষ দিতে দিতে ওদিক হইতে সামনে আসিয়া উদয় হইল পিনাকী।

চার চোখে দৃষ্টি-বিনিময়। পিনাকী ডাকিল—সরো!

সরস্বতী বলিল—হ্যাঁ! তুমি ভেবেছিলে; ভূত!

পিনাকী বলিল,—না। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?

সরস্বতী বলিল—রিহার্শাল দেখতে।

—তুমিও নামছো না কি বাল্মীকি-প্রতিভায়?

—না। কিন্তু তুমি এ পথে? এমন সময়?

সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া পিনাকী বলিল—একটা এনগেজমেণ্ট আছে। মানে···আচ্ছা, আসি। লেট্ হয়ে যাবে না হলে!

কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পিনাকী চলিল তার গন্তব্য পথে।

সরস্বতী নড়িল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন একেবারে সেই ফোয়ারার মতো শত-ধারায় যেন উৎসারিত হইল! সে ধারায় তার গতি অবরুদ্ধপ্রায়!

সে ফিরিয়া চাহিল পিনাকীর পানে।

ঐ চলিয়াছে পিনাকী···

দিগঙ্গনার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট নয় তো? মনের উপর যেন কাঁটার চাবুক পড়িল! সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা!

সরস্বতী ফিরিল, এবং পিনাকীকে লক্ষ্য করিয়া তার পিছনে চলিল

দিগঙ্গনার সঙ্গে পিনাকীর কথা হইতেছিল। দিগঙ্গনা বলিল—তুমি এমন! কতক্ষণ একা এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলো তো! ভয়ে যেন কাঁটা! এখন বাবুর আসা হলো!

পিনাকী বলিল,—খেয়ে-দেয়ে আসতে হলো কি না! তা ছাড়া সিনেমা আরম্ভ ন'টায়!

দিগঙ্গনা বলিল,—আমাকে বলেছিলে কেন, আটটার ঠিক পরে এখানে এসে দাঁড়াতে?

পিনাকী বলিল,—ভেবেছিলুম, বাইরে খাবার ব্যবস্থা করবো। ব্লু হাউসের সঙ্গে ভালো রেস্তরা আছে, সেইখানে। কিন্তু বাধা পড়লো। বাবা বললে, সকলে একসঙ্গে খেতে বসবো। স্রেফ্ এ্যাক্সিডেন্ট!···তুমি খেয়ে আসোনি?

ঝঙ্কার তুলিয়া দিগঙ্গনা বলিল,—তুমি নেমন্তন্ন করলে, আমি খেয়ে আসবো কি রকম?

পিনাকী বলিল,—অল্ রাইট্। পার্ল রেস্তরাতেই খাবে। চলো।

দু'জনে চলিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতী এতক্ষণে অলক্ষ্যে দু'জনের পিছনে আসিয়াছে···সতর্ক ভাবে। এখন তাদের অলক্ষ্যে সে-ও পিছনে চলিল। মনের মধ্যে যেন সেই জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞের ছবির মতো রাশি-রাশি সাপ আসিয়া জমিতেছে···নিষ্ফল আক্রোশে ফণার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া!

পিনাকী বলিল,—বাড়ীতে কি বলে এলে?

দিগঙ্গনা বলিল,—কম ফন্দী করতে হয়েছে!···বাড়ীতে বলেছি, আজ একটু রাত্রে রিহার্শাল। পোষাক তৈরী হয়ে এসেছে···সেই পোষাক পরে আলো-টালো জ্বেলে···উইথ অল পম্প! বলেছি, আজ সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া।

হাসিয়া পিনাকী বলিল,—বাহাদুর!

দিগঙ্গনা বলিল,—মার সঙ্গে শুধু বাংলা ছবি দেখা···সে আমার ভালো লাগে না! মাকে যদি কখনো বিলিতি ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে পারি! তাই তোমার খোশামোদ!

পিনাকী বলিল,—এ খুব ভালো ছবি···সেভ্‌নথ্ হেভ্‌ন্···আজ লাষ্ট শো। এতে প্লে যা করেছে তোমার জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট আর সাইমোন সাইমন—ফার্ষ্ট ক্লাশ্! তাই তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলুম! তুমি এমন ছবি ভালোবাসো···

দু'জনে চলিল।

দিগঙ্গনা বলিল,—ভয় করছে!

—ভয়!

দিগঙ্গনা বলিল,—করবে না? বাড়ীতে মিথ্যা কথা বলে রাত্রে বেরিয়েছি···চোরের মতো!···যদি জানতে পারে?···তুমি বাড়ীতে কি বলে বেরিয়েছো, শুনি?

—আমি! পিনাকী হাসিল, বলিল,—আমি এখনো নাবালক আছি না কি? তাছাড়া পুরুষ-মানুষ! আমাদের···হুঃ! তবে বাবা ভারী কড়া···কিন্তু জানো তো, বজ্জর-আঁটুনি ফস্কা গেরো!···সকলে জানে আমি শুতে গেছি!

দিগঙ্গনা বলিল,—তোমাদের দেখে হিংসা হয়, সত্যি! ভাবি, যদি পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মাতুম!

পিনাকী বলিল,—ভাগ্যে তা হওনি!

দিগঙ্গনা বলিল—তার মানে?

পিনাকী বলিল—তাহলে তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার লোভ হতো কি?

সরস্বতী আর পারে না!···এমন···বটে!

সরস্বতী ডাকিল,—পিনু-দা···

পিনাকী আর দিগঙ্গনা চমকিয়া উঠিল। দু'জনেই ফিরিয়া চাহিল!

পিনাকী ডাকিল,—সরো!

সরস্বতী কহিল—হ্যাঁ···

পিনাকী কহিল—ধাওয়া করেছো! Spying!

সরস্বতী বলিল,—বটে! তাই দিগঙ্গনা সেজেগুজে বন-পথে দাঁড়িয়েছিল! একেবারে সেই ব্রজধামের কদম্ব-কানন!

দিগঙ্গনা গর্জ্জিয়া উঠিল—What you mean?

সরস্বতী বলিল—যা mean করছি, তা তুমি বোঝো না, না?

তার পর সে চাহিল পিনাকীর পানে, বলিল—কাল তুমি আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার করে নিয়ে এলে, বললে, আজ সকালে গিয়ে দিয়ে আসবে। খুব গেলে তো!

পিনাকী বলিল—তাই বুঝি কাবলীওলার মতো তাগাদা করতে এসেছো এইখানে?

—কাবলীওলা নয়। তোমায় বলেছিলুম, ও-টাকা বাবার লাইফ-ইনসিওরের টাকা থেকে দিচ্ছি। কাল সকালে বাবা প্রিমিয়াম দেবার জন্য যখন চাইবে···তখন? কি করবো, বলতে পারো? তোমার মতো বড়মানুষ নই আমরা! লেডি-ফ্রেণ্ড নিয়ে সিনেমায় যেতে পারো, তাকে পার্ল রেস্তরায় খাওয়াতে পারো, আর আমাদের মতো গরীব-মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে তা শুধে দেবার কথা মনে থাকে না!

দিগঙ্গনার সামনে এত-বড় কথা! এমন লাঞ্ছনা!

পিনাকী বলিল—কাল সকালেই টাকা পাবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। না পাও, উকিলের চিঠি দিতে পারো! কোর্টে নালিশ করতে পারো!···এসো অঙ্গনা···বলিয়া দিগঙ্গনার হাত ধরিয়া তাকে সে আকর্ষণ করিল।

সরস্বতী বলিল—উকিল-আদালতের কথা হচ্ছে···[illegible] আমাদের বাড়ীতে আসতে হবে না আর, ভাবো? জানো, তোমার···

বেদনা, অভিমান একসঙ্গে আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কথা আর বাহির হইল না! চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল···

শুনিল দিগঙ্গনার কথা। দিগঙ্গনা বলিল—How mean!

পিনাকী বলিল—শুধু mean নয়···she is jealous!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ-প্রস্তাব

ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার উমেদার হইলে অনেকেই ভোট প্রাপ্তির আশায় অনেক প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না, সে সময়ে সকলে তাহা ভাবিয়া দেখেন না। মৌলবী ফজলুল হক এইরূপ কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়া কৃষক-প্রজাদলের ভোটলাভে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি প্রজাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে—জমিদারকে দেয় খাজানা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদানের জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। প্রজার সুবিধার জন্য তিনি এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহার একটিও সুফল প্রসব করে নাই। তাঁহার প্রণীত মহাজনী আইনে প্রজার অল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই হয় নাই,—বরং আপদকালে ঋণ পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার কোনরূপ অগ্রগতি না হইলেও নির্ম্মম ভাবে প্রজার নিকট হইতে তাহার জন্য কর আদায় হইতেছে। সুতরাং এই দুই বিষয়েই তাঁহার বিপুল নিষ্ফলতাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ দিকে অনেকেই আশা করিতেছেন যে, আর এক বৎসর কাল মধ্যেই বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটিবে। তাহার পর আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। কাজেই এই সময় হইতে প্রজাকে জমিদারের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য কিছু করা উচিত। নতুবা ভোটদাতাদিগের নিকট মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। সেই জন্য এই ঘোর অসময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ কামনায়, না ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উদ্ভট প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটি সংক্ষেপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রস্তাবটির যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তিনি নিজেও এইরূপ প্রস্তাবের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন নাই। সুচিন্তিত ভাবে তিনি একটি প্রস্তাব করেন নাই—করিয়াছেন দুইটি বৈকল্পিক প্রস্তাব; অর্থাৎ এটা না হয় তো ওটা—এমনই দুইটা প্রস্তাব। দুইটাই প্রায় একরূপ। ইহাতে তাঁহার মনে তাঁহার প্রস্তাবের উপর নিশ্চয়ই দৃঢ়তা নাই বলিয়াই মনে হয়।

মিষ্টার হক বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তাবটি তাঁহার ব্যক্তিগত; সরকারের বা অন্য কাহারও মত নহে। কিন্তু প্রধান-সচিবের মত—সুতরাং সরকারের কার্য্য-পরিচালনায় নিয়ামকপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার এ ভাবে মত প্রকাশ অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। তিনি এখন সরকারী কাজের পরিচালক। তাঁহার পদের দায়িত্ব অসামান্য। শাসকদিগের মনোভাব না জানিয়া কি তিনি ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই সাধারণের মনে উঠিতে পারে। তাঁহার কথায় তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন যে, প্রস্তাবটি সরকারের সমর্থন পাইতে পারে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সেই জন্য ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। আমরা সে আপত্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত মনে করি।

মিষ্টার হকের এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য কি? দরিদ্র কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশমত ব্যবস্থা করিলে সে উদ্দেশ্য কিছুতেই সাধিত হইবে না। তিনি বিশেষ না জানিয়া অথবা না বুঝিয়া রুশিয়ার কমিউনিষ্টদিগের ব্যবস্থা দেখিয়া ভারতীয় ভূসম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রুশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা আর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সমান নহে, ইহা তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল। রুশিয়ার কমিউনিষ্টরা ভূসম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা কৃষিপ্রধান রুশিয়াকে অতি দ্রুত শিল্পপ্রধান করিবার জরুরী ব্যবস্থাও করিয়াছে। মিষ্টার হক তাহা পারিবেন কি? রুশিয়ায় সর্ব্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মিষ্টার হকের জানা উচিত ছিল যে, বর্ত্তমান রুশিয়ার প্রথম ব্যবস্থাপক লেনিন বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি পৃথুল শিল্প (heavy industry) প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা হইলে সমাজতান্ত্রিকতার কথা ছাড়িয়া দাও, সভ্য জাতি হিসাবে আমরা বিনষ্ট হইব।" সেই জন্য সমস্ত জমি সরকারের করিবার পূর্ব্বেই লেনিন দেশে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রুশিয়ার সমস্ত ভূসম্পত্তি এখনও রাষ্ট্রীয় নহে।

হক সাহেবের প্রস্তাব দ্বারা প্রজার উপকার হইবে না। তিনি কৃষকদিগকে তাহাদের সমস্ত উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসাবে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জমিদারকে প্রজা প্রতি-বিঘায় গড়ে দেড় টাকা খাজনা দেয়। অবশ্য সর্ব্বত্র খাজনার হার সমান নয়। বিঘা-প্রতি আট আনা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা আছে। এরূপ অবস্থায় যে কৃষকের জোতে ১০ বিঘা জমি আছে, জমিদারকে ২০ টাকার অধিক খাজনা তাহার দিতে হয় না। কিন্তু তাহার জমিতে যদি ৬০ মণ ধান আর ৪০ মণ বিচালী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সরকারকে ১০ মণ ধান এবং প্রায় ৭ মণ বিচালী দিতে হইবে। ধানের দর এখন গড়ে মণ-করা ৪ টাকা। সুতরাং কৃষককে খাজনা বাবদ ৪০ টাকার ধান এবং বিচালী বাবদ ২০ টাকা দিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে ২০ টাকার স্থানে ৬০ টাকা দিতে হইবে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য—ধান চাষে প্রজার বিশেষ লাভ হয় না। তাহার নিজের মজুরী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ খরচা ধরিলে বরং ক্ষতিই হয়। লাভের মধ্যে সে আপনার গতর খাটাইয়া অতিকষ্টে বৎসরের ভাত-কাপড়ের সংস্থান করে। তাহাকে আর পরের দ্বারে অনিশ্চিত দিন-মজুরী করিতে যাইতে হয় না। সরকার অবশ্য ফসলে খাজনা লইবেন না। খাজনা লইবেন টাকায়। কিন্তু এই উৎপন্ন ফসলের মূল্য-নিরূপণ করিবে কে? কিরূপেই বা উহা আদায় হইবে? প্রধান-সচিব এ বিষয়ে নীরব। আর ঐ টাকা আদায় করিতে সরকারকে অনেক কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে—তাহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইবে। সে টাকা দিবে কে? প্রতি বৎসর ফসলের মূল্য সর্ব্বত্র সমান হয় না। গত বৎসর মুগের দর সাড়ে ৫ টাকা, ৬ টাকা হইয়াছিল, এ বার ১১ টাকা—১২ টাকা হইয়াছে। সুতরাং প্রতি বৎসরই ফসলের মূল্য ধার্য্য করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইবে।

রুশিয়ায় কতকটা ঐরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সেখানের অবস্থা অন্যরূপ। সেখানে যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই জমির মালিক, সে ক্ষেত্রে প্রজারা সবাই মজুর মাত্র। রাষ্ট্রই প্রজাদিগকে খাদ্য বণ্টন করেন। এখানে তাহা হওয়া সম্ভবে না। মৌলভী হক সাহেব যদিও রাষ্ট্রকে নামে-মাত্র ভূস্বামী বলিয়াছেন, কিন্তু প্রজাকে ষষ্ঠাংশ খাজনা দিতে বলিয়া সরকারের সেই ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চাহিয়াছেন। রুশিয়ায় সমস্ত ফসলই রাষ্ট্রের,—প্রজা কেবল নিজ জীবনরক্ষার জন্য আবশ্যক দ্রব্য পায়। রুশিয়ায়,—যেখানে ভূমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেখানে দুই প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রথম, রাষ্ট্রের খাসগামার (Sookhoz); দ্বিতীয়, প্রজার সমষ্টিগত বা 'একজাই' সম্পত্তি (Kolkhoz)। শেষোক্ত সম্পত্তি বা একজাই খামার কম। শেষোক্ত সম্পত্তি অল্প এবং উহার আয় চাষীরাই ভাগ করিয়া লয়। রাষ্ট্র তাহার ভাগ লইয়া যায়। কিন্তু জমি রাষ্ট্রীয় করিবার পূর্ব্বে রুশিয়ার সর্ব্বস্বত্ববাদীরা দেশটাকে অতি দ্রুত শিল্পপ্রধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। (১) মৌলভী ফজলুল হক দেশকে শিল্পপ্রধান করিবার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল কৃষি-প্রধান রাখিয়াই ভূমি-সম্পর্কিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়াসে নিজের অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। নূতন ব্যবস্থায় রুশিয়া শ্রমশিল্পের যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, শ্রমশিল্পে অগ্রসর কোন দেশ এক-পুরুষে বা দুই-পুরুষে তাহা পারে নাই। (২) মৌলভী সাহেব সে দিকে তাকাইলেন না,—জমিকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেক কৃষকের জোতে বড় জোর ৫০ বিঘা করিয়া জমি দিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজ অজ্ঞতা বিকট ভাবে প্রকট করিয়াছেন। কোন কৃষকই ৫০ বিঘা জমির অধিক পাইবে না, এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি বর্ত্তমান কৃষি-ব্যবস্থায় যে সমস্ত অসুবিধা আছে, তাহাই বজায় রাখিতে চাহেন। তিনি এক জন কৃষকের সর্ব্বনিম্ন কত বিঘা জমি থাকিবে, তাহা বলেন নাই। কিন্তু বঙ্গীয় কৃষকদিগের জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়াই উহা কৃষির উন্নতির পথে অতি প্রবল বিঘ্নরূপে বিদ্যমান, তাহা কি তিনি বুঝেন না? না, কেবল দলের মুখ চাহিয়া তিনি সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই? তাঁহার অনধিক পঞ্চাশ বিঘার প্রস্তাব বৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থায় দারুণ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। 'অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের' প্রবল পরিপন্থী হইবে। সমস্ত দেশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল একটা দলের বা সম্প্রদায়ের তুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইলে এইরূপই হাস্য-ভাজন হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি-পদ্ধতি চালাইতে পারিলেই কেবল ফসলের ফলন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভবে। তাহা হইলেই কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচিবে। অন্যথা কিছুতেই তাহা ঘুচিবে না। অন্ততঃ, এক বন্দে এক জন কৃষকের তিন শত বিঘা জমি না থাকিলে বাষ্পচালিত লাঙ্গল চালান যায় না, ঐ ধরণের ছোট কলের লাঙ্গল চালাইতে হইলেও অন্ততঃ ২ শত বিঘা জমি এক বন্দে থাকা আবশ্যক। মৌলভী হকের জানা উচিত, দেশ আগে, দল আগে নহে।

মিষ্টার হক যে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের জন্য এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা আমরা কোন মতেই মনে করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে তিনি কোন মতেই এ সময়ে এইরূপ ঘোর বিপজ্জনক প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন না! যে ভূমির রাজস্ব-প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা এই ভাবে সবলে উৎপাটিত করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত। ব্যক্তি-বিশেষের অবিবেচনাপূর্ণ দলগত স্বার্থসাধনকল্পে কিছু করা উচিত নহে। কিন্তু যে সময় শত্রু দেশের সিংহদ্বারে আসিয়া সিংহনাদ করিতেছে,—দেশশুদ্ধ লোক দুর্ম্মূল্যতায়—অভাবে প্রপীড়িত হইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে, যে সময়ে লোক রোগ হইলে ঔষধ পাইতেছে না, পথ্য মিলিতেছে না,—যে সময়ে দেশে ঘোর অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে,—ঠিক সেই সময়ে তাঁহার এইরূপ ঘোর সামাজিক এবং আর্থিক উপপ্লবজনক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? সত্য বটে, ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট আজ তিন বৎসর কাল সরকারের দপ্তরখানায় পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সরকার ঐ রাজস্ব-কমিশনের রিপোর্টখানি প্রকাশ করিয়াছেন,—তদবধি যুদ্ধ আমাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কাণ্ড আর কখনও হয় নাই। এরূপ স্থলে লোকের পক্ষে এই বিষয়টি প্রশান্তচিত্তে এবং একাগ্রমনে চিন্তা করা কঠিন। মৌলভী সাহেব প্রধান-সচিবের গদিনসীন হইয়া মোটা-বেতন পাইতেছেন। তাঁহার পক্ষে এখন সেই গদি কায়েম করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের লোকের ভাবনার অন্ত নাই। পক্ষান্তরে, বিষয়টি কত গুরু, তাহা কমিশনের রিপোর্টেই সুপ্রকাশ। কমিশনের এগার জন সদস্যের মধ্যে ছয় জন সদস্য সম্মিলিত এবং স্বতন্ত্র ভাবে মূল রিপোর্ট হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মতামতের মধ্যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতও প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল বিশেষজ্ঞ এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের উক্তিতে এতই পরস্পরবিরোধী কথা ছিল যে, সরকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই বিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মিষ্টার গার্ণার (C. W. Gurner) এ বিষয়ে বহুশত পৃষ্ঠাব্যাপী অভিজ্ঞতাপূর্ণ একখানি রিপোর্ট দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বর্ত্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থার বিশেষ নিন্দা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থায় কতকগুলি দোষ আছে সত্য, কিন্তু আজ দুই শত বৎসর ধরিয়া উহার কায যেরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে উহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, দেশের সমস্ত জমি যদি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে রাজস্ব-সম্পর্কিত ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাহার পর বঙ্গীয় সরকার ফাঁপরে পড়িয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ঐ বিষয়টির আলোচনা করিতে দিয়াছিলেন। গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উহার যে আলো-

(১) The Communist leaders in 1928 had not only to plan the output of industry, but actually to create the industrial structure by means of which planned output was to be achieved. They set out not merely to use and develop gradually the existing industrial machine but to turn their country into an advanced industrial State,—Cole, Practical Economics.

(২) See The Post-war world by J. Hampden Jackson, Page 179.

হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই। এখন সরকার এই ব্যাপারটা শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছেন।

সচিব, বিশেষতঃ যিনি প্রধান-সচিব-পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহার কর্ত্তব্য —সকলের স্বার্থ সমান ভাবে দেখা। সম্প্রদায়-বিশেষের বা দল-বিশেষের স্বার্থ রাখিবার জন্য জিদ একান্ত অনুচিত। বিলাতে **Party Government** আছে সত্য, কিন্তু সেখানে কোন দলের সচিবসঙ্ঘই অপর দলের স্বার্থ এমন নির্ম্মম ভাবে ক্ষতি করিতে চাহেন না। কিন্তু, বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মৌলভী ফজলুল হক জমিদারদিগের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতেছেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসই জমিদারদিগের জমি খাজনার দায়ে বেচিয়া লইতেন। কিন্তু যাঁহারা টাকা দিয়া তাহা কিনিয়াছেন,—তাঁহাদিগকে ন্যায্য মূল্য না দিলে চলিবে কেন? জমিদাররা জমি কিনিয়াছেন এই সর্ত্তে যে, জমিদারী ব্যবস্থা চিরকালের জন্য কায়েম থাকিবে, এখন তাঁহাদের জমির ন্যায্য মূল্যও দেওয়া হইবে না, কি জন্য? একমাত্র রুশিয়া ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন দেশেই এরূপ জুলুম-বাজীর ব্যবস্থা নাই। ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুশিয়ার কৃষকদিগের উপর যেরূপ ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মিষ্টার কোল বলিয়াছেন, তাহাতে রুশিয়া যে একটি বর্ব্বরের দেশ, ইহা অস্বীকার করা যায় না। (৩) রেলওয়ে, কলকারখানা, খনি প্রভৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইলে যেরূপ ন্যায্য মূল্যে রাষ্ট্র উহা খরিদ করিয়া লইয়া থাকেন, ভূমি-সম্পত্তিকে সেইরূপ ন্যায্য মূল্যে খরিদ করা না হইবে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

মিষ্টার হক বর্গা চাষ উঠাইয়া দিতে চাহেন। তাহাতে কৃষী-বলের কোন দেশেই উপকার হয় নাই। মতের হিসাবে যাহা লাভ-জনক বলিয়া মনে হয়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। তাহার কারণ অনেক। য়ুরোপেও বর্গা চাষের ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিষ্টার ডবলিউ ই বেয়ার (**W. E. Bear**) য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বর্গাচাষীর অবস্থা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্গাচাষী-দিগের অবস্থা ভূস্বামী কৃষকদিগের অবস্থা হইতে ভাল এবং কৃষি-মজুরদিগের অবস্থা হইতে অনেক ভাল। (৪) সুতরাং নিতান্ত হঠকারিতার সহিত একটা পুরাতন প্রথাকে উচ্ছিন্ন করা কর্ত্তব্য নহে।

বর্ত্তমান সময়ে কৃষকদিগের ভূমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেই জন্য কৃষকরা অতি দরিদ্র। প্রধান-সচিব তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। জোতে অল্প জমি থাকিলেই ভূস্বামী কৃষকরা সুদখোর মহাজনদিগের কবলে পতিত হয়। আয়র্লণ্ডে এবং ফ্রান্সে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জমিতে যদি কৃষকের নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকে,—তাহা হইলে কৃষক সহজে ঋণ পায়, সেই জন্য তাহারা সুদখোর মহাজনদিগের নিকট ঋণে বদ্ধ হয়। য়ুরোপীয় মহাদেশে কৃষিঋণ দান ব্যাঙ্ক গঠিত করিয়া উহার কতকটা প্রতিকার করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিঋণ দান ব্যাঙ্ক সফল হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা সচিবপ্রবর ভাবিয়া দেখিবেন কি?

কৃষকের জোতের জমি যাহাতে অধিক হয় এবং থাকে,—মিষ্টার হক তাহার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থার দ্বারা কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। চাষের জমির স্বল্পতাই কৃষকের দারিদ্র্যে অতি প্রবল কারণ। কিন্তু তিনি সেই জোতের জমি বৃদ্ধি করিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। তিনি কোন কৃষককে ৫০ বিঘা জমির অধিক দিতে সম্মত নহেন। সেই কৃষক মরিলে তাহার যদি তিন কন্যা ও তিন পুত্র থাকে, তাহা হইলে মুসলমান দায়ভাগ অনুসারে প্রত্যেক পুত্র এবং কন্যা কতটুকু করিয়া জমি পাইবে? হক সাহেব তাহা জানেন। হিন্দুর দায়ভাগ অনুসারে তাহার প্রত্যেক পুত্র ১৭ বিঘা করিয়া জমি পাইবে। তাহার পৌত্রেরা একেবারে অতি দরিদ্র কৃষকে পরিণত হইবে। অথচ জমি অধিক না হইলে তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে না। ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, আয়র্লণ্ডে এবং য়ুরোপ মহাদেশের আরও কোন অংশে জমির স্বল্পতাই যে কৃষকের দুর্দ্দশার কারণ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গ্রেট বৃটেন ধনীর দেশ। সেখানে জমি সরকারের সম্পত্তি নহে। উহা করিবার জন্য কেহ চেষ্টা করে না। তথায় অধিকাংশ জমিই প্রজা-বিলি; এবং সেখানে প্রজার জোতের জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত নহে। গ্রেট বৃটেনে কৃষকের অবস্থা ফ্রান্স বা রুশিয়ার কৃষকের ন্যায় নহে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল কি মন্দ, তাহা এ প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিব না। হক সাহেবের প্রস্তাবে কতকগুলি দোষ কত স্পষ্ট, এ প্রবন্ধে সেই কথাই বলিলাম। জমিদারী ব্যবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বহু দোষ-ত্রুটির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব নহে। কারণ, কৃষিই দেশের একমাত্র ধনোৎপাদক বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, লোক-সংখ্যা যত বাড়িতেছে, জমির উপর লোকের চাপ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ হইতেছে বলিয়া কৃষীবলের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার-সাধন ইহার একমাত্র প্রতিকারের উপায়। রুশিয়ার ব্যবস্থা অনুশীলন করিলে হক সাহেব তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

---

(৩) Nothing save a recognition that Russia is still a barbarous country can extenuate the inhuman severity of this drive against the kulaks.—Practical Economics, P. 52

(৪) So far as available information is to be trusted the position of metyars appears to be superior to that of the peasant proprietors with whom they may be compared and very greatly superior to the labourers in their own countries.—Essay on the land and the cultivation.

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

অক্ষশক্তিগুলির মধ্যে জাপান আমাদের প্রতিবেশী; তাহার মনোভাবের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ। অবশ্য মধ্য-প্রাচীর ও পূর্ব্ব-য়ুরোপের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘটনাবলী এবং ক্যাসাব্লাঙ্কা ও বার্লিনের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের মূল্য অসাধারণ; সমগ্র সমর-প্রচেষ্টায় ইহার সুদূরপ্রসারী প্রভাবও পতিত হইবে। কিন্তু আমাদের আশু হিতাহিত আমাদের প্রতিবেশীর মনোভাবের সহিতই সংশ্লিষ্ট; কাজেই অন্যান্য অঞ্চলের সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই প্রতিবেশীর নীতিতে ও কার্য্যে কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে, তাহাই আমাদের পক্ষে আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করা স্বাভাবিক।

জাপানের রহস্যাবৃত মনোভাব—

গত ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালায় জাপানের বিমান-তৎপরতা অকস্মাৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু জানুয়ারী মাসে উহা অত্যন্ত হ্রাস পায়। গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মাত্র দুই বার এবং পূর্ব্ববঙ্গে তিন-চারি বার গুরুত্বহীন বিমান আক্রমণ হইয়াছে। সম্প্রতি কক্সবাজারে জাপ-বিমান দুই বার হানা দিয়াছিল। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি যে, অত্যন্ত অপটু বৈমানিকদিগের দ্বারা এই সকল আক্রমণ চালিত হইয়াছিল; আক্রমণগুলিও যেন আন্তরিকতাবিহীন। এই প্রকার আক্রমণে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে না। কলিকাতা অঞ্চলে পরিচালিত ৭টি আক্রমণের মধ্যে এক বারও কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তু স্পর্শ করা সম্ভব হয় নাই; জনপদের বিশালতা বিবেচনা করিলে বিমান আক্রমণে বেসামরিক অধিবাসীর জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিও উপেক্ষণীয় মনে হইবে! এই প্রকার ক্ষতিতে বেসামরিক অধিবাসীর চিত্তে ত্রাস সঞ্চার করিয়া সমর-প্রচেষ্টায় স্থায়ী বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।

কাজেই, জাপানের এই আকস্মিক বিমান-তৎপরতা স্বভাবতঃ অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হয়। তবে ইহা সত্য যে, এই গুরুত্বহীন ও ব্যর্থ আক্রমণ জাপানের দৌর্ব্বল্যের নিশ্চিত দ্যোতক নহে। আট মাস পূর্ব্বে এই জাপান যখন প্রাচীর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তড়িৎগতিতে জয়লাভ করিতেছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার অস্ত্রের ও সৈন্য-সংখ্যার আধিক্যের কথাই শ্রুত হইয়াছিল। গত আট মাস জাপান একরূপ নিষ্ক্রিয়। কাজেই, এই সময়ে তাহার শক্তি হ্রাস পাইবার কোন কারণ নাই, বরং নবাধিকৃত অঞ্চলের রস আহরণে তাহার শক্তি বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তাহার পর, যে সকল অঞ্চলে জাপান প্রতিরোধে প্রবৃত্ত, সেখানে তাহার শক্তির পরিচয় আমরা পাইতেছি।

প্রথমতঃ আরাকান; গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রকাশ করা হয় যে, সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী আকিয়াব হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী মংড-বুথিডং অঞ্চল অধিকার করিয়াছে; জাপানীরা এই অঞ্চলে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত না হইয়া পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। তদবধি আজ দেড় মাস আরাকানের যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবাদে আমরা পুনঃ পুনঃ রথেডংএর নামই শ্রবণ করিতেছি। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে এই রথেডংএর সম্মুখবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ টেম্পল হিল অধিকৃত হইয়াছে; কিন্তু এখনও রথেডংএ জাপ-ব্যূহ সম্পূর্ণ অটল। এখানে জাপানের যে সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নহে।

নিউ গিনির অন্তর্গত প্যাপুয়া হইতে জাপানীরা বিতাড়িত হওয়ায় আমরা নানারূপ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিতেছি। এই সম্পর্কে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিলে সমগ্র অবস্থাটি সুস্পষ্ট হইবে। নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটাতে রয়টারের যে বিশেষ প্রতিনিধি আছেন, গত ৩রা জানুয়ারী তিনি লিখেন—"প্যাপুয়া হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিতে যদি ৬ মাস অতিবাহিত হয়, একমাত্র বুনা অধিকারেই যদি ৬ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে লে ও সালামুয়াতে জাপানী ঘাঁটা অধিকারে কত সময় লাগিবে? গুরুত্বপূর্ণ বিশাল ঘাঁটা রবাউলের কথা না হয় নাই বলিলাম। ইহাও উপলব্ধ হইতেছে যে, নিউ গিনি, নিউ বৃটেন ও নিউ আয়র্লণ্ড অধিকৃত হইলেও জাপানের নিজ ভূমি স্পৃষ্ট হইবে না।" অতঃপর এই সংবাদদাতা বলেন যে, অবশিষ্ট কার্য্যের তুলনায় প্যাপুয়ায় জয়লাভ নগণ্য হইলেও এই জয়ের নিজস্ব গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—এই সময়েও প্যাপুয়া সম্পূর্ণ অধিকৃত হয় নাই; প্যাপুয়ার শেষ জাপানী ঘাঁটা সানোন্দা হইতে শত্রুসৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিতে আরও ৩ সপ্তাহ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

রয়টারের এই সংবাদদাতার পরবর্ত্তী উক্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ; ইহাতে নিউ গিনির যুদ্ধের অবস্থা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। ৮ই জানুয়ারী ইনি লিখেন—"নিউ গিনির উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে নূতন অঞ্চল অধিকার করিয়া জাপান প্যাপুয়া হস্তচ্যুতির উত্তর প্রদান করিয়াছে। সে বুনা হারাইয়াছে বটে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে নিউ গিনির ৫ শত মাইল উপকূলের ৬টি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুযোগ পাইলে সে ঐ সকল স্থানে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিবে। এখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগেই জাপান প্যাপুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিল; ঐ সময় বুনা ও গোনা গ্রাম অধিকৃত হওয়ায় বিচ্ছিন্ন-সংযোগ জাপানী সৈন্যের শক্তি বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয়। কাজেই তখন বুনা অঞ্চলের সৈন্যদিগকে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া কালহরণের ব্যবস্থা হয়; ইতোমধ্যে জাপান তাহার নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করে। বুনা অঞ্চলে হুয়ান্ উপদ্বীপের চতুষ্পার্শ্ব হইতে ওলন্দাজ নিউ গিনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপকূলে জাপান কতকগুলি স্থান অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছিল।" এই উক্তিতে প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট; এই সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সলোমন্সে গুয়াদালক্যানার দ্বীপ হইতে জাপ-সৈন্য ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে অপসরণ করিয়াছে। গত জুন মাসে জাপান এই দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; অর্থাৎ সাত মাস পরে সে উহা ত্যাগ করিল। আর জাপ-সৈন্যের অপসরণ যেরূপ আকস্মিক, তাহাতে মনে হয়, জাপান অন্য কোন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছে। আর জাপ-সৈন্য যদি অবিমিশ্র সামরিক কারণে বাধ্য হইয়া গুয়াদালক্যানার ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও সাত মাস পরে সম্মিলিত পক্ষের এই সাফল্য আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইবার নহে।

আরাকানে, নিউ গিনিতে ও সলোমন্সে জাপানের তৎপরতা করিলে ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে, জাপান শক্তিহীন

বাঙ্গালায় বিমান আক্রমণে তাহার ব্যর্থতা অথবা ব্রহ্মদেশে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যজনক বিমান আক্রমণ জাপানের দৌর্ব্বল্যের পরিচয় নহে। বস্তুতঃ, জাপান তাহার অভিসন্ধি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া চলিতেই প্রয়াসী ; বর্ত্তমানে সে প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া কাল-হরণ করিতে চাহিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাচিত মুহূর্ত্তে আক্রমণ-পরিচালনের জন্ম গোপনে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। এই আক্রমণ কোন্ দিকে চালিত হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর। তবে ইহা সত্য, রুসিয়ার দিকে জাপান হস্ত প্রসারিত করিবে না। আর চীন সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নান্‌কিং সরকারের দ্বারা জাপান চীনে পুনরায় অন্তর্ব্বিপ্লব সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইবে। আমাদের এই অনুমান যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে, তাহার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাইতেছে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে নান্‌কিং সরকারের যুদ্ধ-ঘোষণাকে গুরুত্বহীন ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, নান্‌কিং সরকার কর্ত্তৃক যুদ্ধ-ঘোষণার পর ১০ লক্ষ চীনাসৈন্য জাপানী অধিকৃত চীনা অঞ্চলে সমবেত হইয়াছে। ইহাতেই হয় ত চীনের ব্যাপারে জাপানের প্রকৃত অভিসন্ধির সন্ধান পাওয়া যাইবে। অদূর ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ—এই দুইটির যে কোন একটির উদ্দেশ্যে জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হওয়া সম্ভব ; জাপানের অধিকৃত অঞ্চলকে নিরাপদ করিবার জন্য এই দুইটি অঞ্চলের প্রতি তাহার মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, জাপানের নিজ প্রয়োজন ব্যতীত অক্ষশক্তির সমর-প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় তাহাদের অধিকার বিস্তৃতি একান্ত প্রয়োজন। এত দিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অক্ষশক্তি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমগ্র ভাবে যুদ্ধের গতি অক্ষশক্তির প্রতিকূল হইয়া উঠিতেছে। কাজেই এখন তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন—তাহাদের সমগ্র শক্তি সুসম্বদ্ধ ভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য অক্ষশক্তির এই প্রয়োজনে দক্ষিণ এশিয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদের আক্রমণও একযোগে চালিত হওয়া সম্ভব ; অর্থাৎ একই সময় প্রতীচ্য অক্ষশক্তি পশ্চিম এশিয়ায় এবং জাপান পূর্ব্ব ভারতে আঘাত করিতে পারে। শীতকালই প্রাচ্য অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ; এই সময়ে জাপানের মনোভাব রহস্যাবৃত থাকায় এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতেছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অক্ষশক্তির মধ্যে সামরিক সহযোগ সৃষ্টির কোন গোপন পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। শীত উত্তীর্ণ না হইলে প্রতীচ্য অক্ষ-শক্তির পক্ষে পশ্চিম-এশিয়ায় আঘাতের সময় আসিবে না ; কাজেই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যদি শত্রুপক্ষের সম্মিলিত সমর-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উহা প্রকাশ পাইতে আরও অন্ততঃ দুই মাস সময় অতিবাহিত হইবে। অবশ্য, সম্মিলিত পক্ষ যদি ইতোমধ্যে প্রতীচ্য অঞ্চলে শত্রুকে প্রবল ভাবে আঘাত করিতে পারেন, তাহা হইলে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব।

উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ—

লিবিয়ায় যুদ্ধের অবসান হইয়াছে ; মার্শাল রোমেলের সেনা-বাহিনী টিউনিসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে বিখ্যাত "ম্যারেথ লাইনের" অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। জার্ম্মাণী যেমন টিউনিসিয়ায় "কীলক" প্রবিষ্ট করাইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের শত্রুসৈন্যের পারস্পরিক মিলনে বাধা সৃষ্টি করিতে চাহে, তেমনি মিত্রশক্তিও জেনারল রোমেলের ও ফন আর্নিমের সেনাবাহিনীকে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। রোমেলের সেনা-বাহিনী ইতোমধ্যে ফন্ আর্নিমের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ট্যাঙ্ক ও কামানে শক্তিশালী হইয়া ফৈদ গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়াছে। টিউনিসিয়ায় প্রকৃত যুদ্ধ এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই যুদ্ধে "ম্যারেথ লাইনের" নাম আমরা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিব। এই ব্যূহশ্রেণীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ম্যারেথ লাইন বস্তুতঃ তিনটি ব্যূহশ্রেণী ; ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে ৩০ মাইল দূরে দেড় হাজার ফুট উচ্চ মাটমাটাস্ পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত উহা প্রসারিত। এই ব্যূহশ্রেণীর মধ্যস্থলে একটি গ্রামের নাম ম্যারেথ্। ম্যারেথ লাইনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অবস্থিত সৈন্যকে পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করা সম্ভব নহে, ইহার বাম দিকে সমুদ্র এত অগভীর যে, সেখানে সৈন্য অবতরণ করা অসম্ভব ; গ্যাবেস্ নামক ক্ষুদ্র বন্দরটি অক্ষশক্তির দ্বারা সুরক্ষিত। দক্ষিণ দিকে মাটমাটাস্ পর্ব্বতশ্রেণী পথশূন্য ও জলশূন্য ; উহার পার্শ্বে একটি সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত হ্রদ অবস্থিত, উত্তর-আফ্রিকায় ইহা উৎকৃষ্টতম প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনি যখন টিউনিসিয়ার উদ্দেশে হুমকী দিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় ম্যারেথ্ লাইন নির্ম্মিত হয় ; লিবিয়ার সীমান্ত হইতে ৭০ মাইল দূরে উহা অবস্থিত। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ম্যাজিনো লাইনের অনুকরণে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে তিনটি স্বতন্ত্র ব্যূহশ্রেণী ম্যারেথ লাইনের অন্তর্ভুক্ত, তাহার প্রত্যেকটি দুর্গ মরু অঞ্চলের পাহাড় কাটিয়া রী-ইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রীট দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল দুর্গে সজ্জিত কামানগুলি প্রয়োজন হইলে নীচে নামাইয়া অদৃশ্য অবস্থায় রাখা যায়। ম্যাজিনো লাইনের ন্যায় এই দুর্গের অভ্যন্তরেও শয়নকক্ষ, টেলিফোন প্রভৃতি ত আছেই ; ইহা ব্যতীত মরু অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় জল-সরবরাহের ব্যবস্থা এখানে অতি উত্তম। ম্যারেথ লাইনের সম্মুখে দশ মাইলব্যাপী অঞ্চলে কাঁটা তারের বেষ্টনী, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী গহ্বর এবং ট্যাঙ্ক-গান ও মেসিনগানের আক্রমণ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের পতন হইলে ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ ম্যারেথ লাইন ধ্বংস করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্য আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে জার্ম্মাণী উহাকে সংস্কার করিয়া সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী করিয়াছে। ম্যারেথ লাইনকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য ৪০ হাজার সৈন্য প্রয়োজন। রোমেল প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণ লইয়াই আসিয়াছেন।

টিউনিসিয়ায় যে যুদ্ধ আসন্ন, ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এত কাল পরে এখন সম্মিলিত পক্ষ য়ুরোপে জার্ম্মাণকে আঘাতের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহার প্রথম পর্ব্বের শেষ সিদ্ধান্ত এই টিউনিসিয়ায় হইবে। এই অঞ্চলের যুদ্ধে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির সরবরাহ-সূত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ

এবং সহজগম্য। পক্ষান্তরে, উভয় দিকেই সম্মিলিত পক্ষের সরবরাহ-সূত্র অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বিস্তারিত। লিবিয়া অধিকারে পূর্ব্ব দিকে সম্মিলিত পক্ষের সরবরাহ-সমস্যা আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছে; ক্রীটে যত দিন জার্ম্মাণ বিমান ও সাবমেরিণ ওৎ পাতিয়া থাকিবে, তত দিন পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর-পথ নির্ব্বিঘ্ন হইবে না, উত্তর-আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী পথও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে না। তাহার পর, পশ্চিম দিকে বৃটেন ও আমেরিকা হইতে সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলিকে সাবমেরিণ-কণ্টকিত আটলাণ্টিক অতিক্রম করিতে হইবে; উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল হইতেও টিউনিসিয়ায় সাহায্য প্রেরণ সহজসাধ্য নহে। উভয় পক্ষ এই সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া টিউনিসিয়ায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে—টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির অবস্থা যদি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্পেন হইতে সম্মিলিত পক্ষের পার্শ্বদেশে আঘাত পতিত হইবার আশঙ্কাও আছে।

ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মিলনঃ—

গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ফরাসী মরক্কোর অন্তর্গত ক্যাসাব্লাঙ্কায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; দশ দিনব্যাপী এই আলোচনায় না কি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই আলোচনার এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্য বিবরণ জানা সম্ভব নহে; তবে অনুমান করা হইতেছে যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির এবং রুশিয়াকে আরও অধিক পরিমাণ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, ফরাসী সেনাপতি জেনারল দ্য গলে ও জেনারল জিরোর মধ্যে আপোসের প্রচেষ্টাও এই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই গৌণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়কদ্বয় সম্পূর্ণ সফলকাম হন নাই। জেনারল দ্য গলে ও জেনারল জিরোর মধ্যে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই; তবে, আপাততঃ তাঁহারা উভয়ে অক্ষশক্তির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত থাকিবেন।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির কথা শুনিতেই আমাদিগের গত বৎসরের করুণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হয়। গত বৎসর ২৬শে মে ইঙ্গ-সোভিয়েট রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ কমন্স সভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—**Full understanding was reached between the two parties with regard to the urgent tasks of creating a second front in Europe in 1942.** ইহার পর, ওয়াশিংটনে মঃ মলোটভের সহিত মার্কিণী রাষ্ট্রনায়কদিগের আলোচনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতেও এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় রুশিয়া কত দূর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রথমে মিঃ উইলকীর এবং পরে মঃ ষ্ট্যালিনের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। মিঃ চার্চিল কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—তাঁহারা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। পুনরায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে।

উত্তর-আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক তৎপরতাকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রাথমিক আয়োজন বলিয়া প্রচার করা হয়। বস্তুতঃ, অক্ষশক্তি যদি আফ্রিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয় এবং স্পেন ও তুরস্কের মধ্য দিয়া আক্রমণ প্রসারিত করিয়া আফ্রিকার যুদ্ধের গতির পরিবর্ত্তন-সাধন যদি তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সত্যই য়ুরোপ আক্রমণের একটি পাদভূমি লাভ হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিবেচ্য। বৃটেন হইতে ফ্রান্স আক্রমণ যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে সরবরাহ সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষ যে সুবিধা লাভ করিতেন, উত্তর-আফ্রিকায় তাঁহারা সে সুবিধা পাইবেন না। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে সরবরাহ-সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা; এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবার পূর্ব্বে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া চলে না। জার্ম্মাণী সম্মিলিত পক্ষের এই অসুবিধার কথা জানিয়াই সম্প্রতি সাবমেরিণ আক্রমণের প্রাবল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি করিতেছে। সমুদ্রবক্ষের এই উপদ্রব দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে সম্মিলিত পক্ষের য়ুরোপ আক্রমণ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

তাহার পর, রুশিয়াকে সাহায্য প্রদানের কথা। অক্ষশক্তি যদি টিউনিসিয়া হইতে বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে উত্তর-আফ্রিকার উপকূল-পথে রুশিয়ায় সাহায্য প্রেরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। সম্মিলিত পক্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিতে সমর্থ না-ও হন, তাহা হইলেও সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে অক্ষশক্তিকে সন্ত্রস্ত রাখিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতেও বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে, ইহা সত্য যে, জার্ম্মাণীকে অন্যত্র ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান এক কথা, তাহাকে প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা অটুট রাখিতে বাধ্য করান অন্য কথা। ইহা ব্যতীত, রাজনৈতিক কারণেও সম্মিলিত পক্ষ অক্ষশক্তিকে পরাভূত করিবার সম্পূর্ণ ভার রুশিয়াকে দিতে পারেন না। কারণ, বিজয়ী সোভিয়েট বাহিনী যদি পশ্চিম-য়ুরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহাদের সাম্যবাদী আদর্শে সমগ্র য়ুরোপ প্রভাবিত হইবেই।

ক্যাসাব্লাঙ্কা বৈঠকের পর মিঃ চার্চিল তুরস্কে গিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তুরস্কের মধ্য দিয়া পশ্চিম-এশিয়ার মধ্যে জার্ম্মাণীর আক্রমণ প্রসারিত হওয়া সম্ভব। এই কারণেই মিঃ চার্চিল তুরস্কের প্রকৃত মনোভাব ও সামরিক শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রেসিডেণ্ট ইনেউনুর সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যতীত, যুদ্ধের অবস্থা এখন সম্মিলিত পক্ষের অনুকূল হওয়ায় তুরস্ককে নিরপেক্ষতা ত্যাগের জন্যও হয় ত প্ররোচিত করা হইতেছে। তুরস্ক স্বদলভুক্ত হইলে সম্মিলিত পক্ষ বলকান্ আক্রমণের একটি উত্তম ঘাঁটী লাভ করিতে পারেন। এই দিক্ হইতে জার্ম্মাণীকে forestall করা সম্ভব হইতে পারে।

বার্লিনে রাজনীতিক অনুষ্ঠান—

গত ৩০শে জানুয়ারী বার্লিনে হিটলারের ক্ষমতালাভের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। হিটলার স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন নাই; ইহা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কি না, তাহা বলা যায় না। এই অনুষ্ঠানে মার্শাল গোয়েরিং প্রধান বক্তা ছিলেন; এই উপলক্ষে তাঁহার উক্তি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। তাঁহার বক্তৃতার যে সার মর্ম্ম রয়টার পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে কোথাও বৃটেন্ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি কটূক্তি নাই; মাত্র এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—বলশেভিক্ প্রতিরোধ চূর্ণ হইবার পর তিনি জার্ম্মাণীতে বিমান-আক্রমণের প্রতিশোধ লইবেন। এই ক্ষুদ্র মন্তব্য

ব্যতীত গোয়েরিংএর সমগ্র বক্তৃতা "বলশেভিক্ বর্ব্বরতার" বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তিতে পূর্ণ; বলশেভিকরা জয়ী হইলে য়ুরোপের কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মার্শাল গোয়েরিংএর বক্তৃতা পাঠ করিয়া মনে হয়—হেসের দৌত্য ব্যর্থ হইবার পর জার্ম্মাণী এখনও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কদিগকে বলশেভিক রুশিয়ার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছে। জার্ম্মাণী যেন এখনও বৃটিশ ও মার্কিণ ধনিকদিগের উদ্দেশে বলিতে চাহে—"আমি ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী হইলেও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে তোমাদের সগোত্র; আমার নিকট হইতে তোমাদের ভয় করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমরা যে বলশেভিককে শক্তিশালী করিতেছ, সে তোমাদের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করিবে।" গোয়েরিংএর বক্তৃতায় আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—তিনি হিট্‌লারকে প্রশংসা করিবার অছিলায় পরোক্ষে রুশ-যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়াছেন। ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে রুশিয়া কিরূপে তাহার শক্তির প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে রুশিয়ার সামরিক শক্তি কিরূপ প্রবল, তাহা গোয়েরিং স্পষ্ট বলিয়াছেন। সর্ব্বশেষে যে সকল জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ রুশিয়ার সমরায়োজন দেখিয়া জার্ম্মাণীকে রুশিয়া আক্রমণে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাদের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া রুশিয়া আক্রমণের দায়িত্ব তিনি হিট্‌লারের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। ইহা যেন জার্ম্মাণ জনসাধারণের নিকট গোয়েরিংএর "ভাল মানুষ" সাজিবার সুচতুর প্রয়াস! কোন কোন বৈদেশিক সাংবাদিক গোয়েরিংকে অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—হিট্‌লারের প্রতি গোয়েরিংএর প্রবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকিলেও দুঃসাহসিক কার্য্যগুলি সম্পাদনের জন্য তিনি হিট্‌লারকে আগাইয়া দেন। উদ্দেশ্য—ঐ কার্য্যে বিফলতার ফলে যদি বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গোয়েরিং তখন হিটলারকে অপসারণ করিয়া নিজে ক্ষমতাশালী হইবার সুযোগ পাইবেন। জানুয়ারী মাসে গোয়েরিংএর এই বক্তৃতায় যেন সাংবাদিকদিগের এই উক্তির যাথার্থ্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

হিটলারের যে ঘোষণা-বাণী এই অনুষ্ঠানে পঠিত হয়, তাহাতে অধিক আত্মশ্লাঘা নাই—সত্য ভাষণ আছে; তিনি জার্ম্মাণ জাতিকে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে আর সামরিক জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নাই, ইহা এখন প্রকৃত জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম! শীত উত্তীর্ণ হইবার পর রুশিয়াকে "দেখিয়া লইবার" হুমকীও তিনি দিয়াছেন; তবু এই হুমকী গত বৎসরের বাহ্বাস্ফোটের তুলনায় অত্যন্ত মৃদু। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী এই অনুষ্ঠানেই হিট্‌লার বলিয়াছিলেন—"সোভিয়েট সেনার কৃতিত্বের জন্য নহে—ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী হিমের জন্যই জার্ম্মাণ সেনা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া স্থিতিশীল যুদ্ধে রত হইতে বাধ্য হইয়াছে।" এই বক্তৃতার পর মার্চ্চ মাসের এক বক্তৃতায় হিটলার বলেন—"এক শীতে বলশেভিকরা জার্ম্মাণ সেনা ও তাহার মিত্রদিগকে পরাভূত করিতে পারে নাই; আগামী গ্রীষ্মকালে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন হইবে।" সেই গ্রীষ্মকাল আসিয়াছিল, চলিয়াও গিয়াছে। সেই গ্রীষ্মকালের এবং তাহার পরবর্ত্তী শীতকালের অবস্থা আজ সুস্পষ্ট। কাজেই, হিট্‌লারের আত্মশ্লাঘার আর কি থাকিতে পারে?

রুশ-রণাঙ্গন—

রুশিয়া তাহার শীতকালীন প্রতি-আক্রমণে আরও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাডে জার্ম্মাণ প্রতিরোধের সম্পূর্ণ অবসান হইয়াছে। এই অঞ্চলে পরিবেষ্টিত জার্ম্মাণ বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে ফিল্ড মার্শাল পলাস্ ও জেনারল ফন্ ষ্ট্রাইসার সহ প্রায় ১ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য সোভিয়েট বাহিনীর নিকট বন্দী হইয়াছে; অবশিষ্ট দুই লক্ষাধিক জার্ম্মাণ সৈন্য ধরাশায়ী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, ককেসাস্ অঞ্চলের সমগ্র জার্ম্মাণ সেনা এখন আজভের উপকূল পর্য্যন্ত বিতাড়িত; ককেসাস্ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান সরবরাহ-কেন্দ্র রষ্ঠভ এখন অত্যন্ত বিপন্ন, কুপাইনস্ক ও বিয়েলগোরোড্ অধিকৃত হওয়ায় খারকভের বিপদ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ভরোনেজ হইতে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে পরিচালিত আক্রমণের ফলে ওরেল আর নিরাপদ নহে; সোভিয়েট বাহিনী কুরস্ক অধিকার করিয়াছে। মধ্য-রণক্ষেত্রে ভেলিকাই-লুকি সোভিয়েট বাহিনীর অধিকারভুক্ত হইবার পর ঐ অঞ্চলে পুনরায় প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ইতোমধ্যে ১৬ মাস পর লেনিনগ্রাড্ অবরোধমুক্ত হইয়াছে; সোভিয়েট বাহিনী শ্লুসেলবুর্গ দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

এই বৎসর সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন প্রতি-আক্রমণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা এবার প্রত্যেক স্থানে শত্রুসৈন্যকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ষ্ট্যালিনগ্রাড্ অঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনী পরিবেষ্টিত হইবার সংবাদে উল্লসিত হই নাই; কারণ, গত বৎসর ষ্টারায়া-রাসায় পরিবেষ্টিত জার্ম্মাণ বাহিনী নিশ্চিহ্ন না হইবার কথা আমাদের স্মরণ ছিল। কিন্তু এখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, সোভিয়েট বাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাডে অত্যন্ত গৌরবময় বিজয়লাভ করিয়াছে। ককেসাস্ হইতে বিতাড়িত বাহিনীকেও সোভিয়েট সেনা এখন পরিবেষ্টিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে প্রয়াসী। দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যান্য রণাঙ্গনেও এই উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা সুকৌশলে আক্রমণ চালাইতেছে। মধ্য-রণাঙ্গনে ভেলিকাই-লুকি অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া রেজভের জার্ম্মাণ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ ও পরিবেষ্টিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই বৎসর সোভিয়েট বাহিনীর এই নূতন কৌশলের কথা স্মরণ রাখিলে গত বৎসর শীতকালে তাহার অভিযান অপেক্ষা এই বৎসরের শীতকালীন অভিযানের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা উপলব্ধ হইবে; ষ্ট্যালিনগ্রাডের ন্যায় অন্যান্য স্থানেও যদি তাহাদের কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে এই বৎসর শীতকালে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্যের মূল্য গত বৎসরের সাফল্যের মূল্য অপেক্ষা বহু গুণ অধিক হইবে।

লেনিনগ্রাড অবরোধমুক্ত হওয়ায় ফিন্‌ল্যাণ্ডের অসুবিধা স্পষ্ট হইয়াছে; এখন স্থলপথে জার্ম্মাণীর সহিত ফিন্‌ল্যাণ্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্যের গতি যদি আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পতিত হইতে পারে; ইতোমধ্যেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপনের জনরব শ্রুত হইতেছে।

১০।২।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ

তুর্কী সাংবাদিকগণের ভারত-ভ্রমণ

ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে তুরস্ক হইতে একদল সাংবাদিক ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা ৭ই মাঘ দিল্লী, ৯ই পেশোয়ার, ১৩ই রাওয়ালপিণ্ডী হইয়া ১৫ই মাঘ লাহোরে গমন করেন। ঐ তারিখে লাহোরে মুসলমান-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের পক্ষ হইতে তুর্কী সাংবাদিকদিগকে অভ্যর্থনা করা হয়। লাহোরের সাংবাদিকদিগের প্রশ্নের উত্তরে তুর্কী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এম, আতাই বলেন,—"আমরা প্রথমে আমাদিগকে তুর্কী এবং তাহার পরে মুসলমান বলিয়া ভাবি। সমস্ত মুসলমান রাজ্যকে সম্মিলিত করিবার কথা আমাদের মনের কোণেও আমরা ঠাই দিই না।" ইহাই হইল মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী দেশের মধ্যে যে-দেশ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং শক্তিশালী, সেই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অভিমত। এ বিষয়ে তিনি যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন, "তুরস্ক দেশে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, দেশের রাজনীতিক ব্যাপারের অথবা শাসন-ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।" কথা সত্য। আমরাও এ কথা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার; দেশ, রাজনীতি এবং শাসন-ব্যবস্থা পার্থিব ব্যাপার; উভয়কে মিশাইতে গেলে প্রমাদ ঘটিবে। মুসলীম লীগের কতকগুলি লোক ভ্রান্তবুদ্ধির বশে সমস্ত মুসলমানপ্রধান দেশগুলিকে সম্মিলিত করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, অথবা উহার প্রলোভনে সাধারণ লোকদিগকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কতখানি অসম্ভব, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। সম্ভবতঃ তাঁহাদের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। তাই এম, আতাই বলিয়াছেন—"অটোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত উন্নতির দিনেও ঐরূপ চেষ্টা সফল হয় নাই। অটোমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে আমরা আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান দেশের সহিত কত বার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। সমস্ত মুসলমান রাজ্যকে একত্র করিবার চেষ্টা বৃথা বলিয়া তুরস্ক সে চেষ্টা পরিহার করিয়াছে।" কোন মুসলমান রাজশক্তি সমস্ত মুসলমান-অধ্যুষিত দেশকে একই শাসনের পতাকা-তলে সম্মিলিত করিবার পরিকল্পনা বা চেষ্টা কোন কালে করিয়াছেন, ইতিহাসে এমন প্রমাণ মেলে না। পাঠান এবং মোগল শাসকগণের মধ্যে কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। বরং মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত স্বার্থের বিরোধ বাধিলে তাঁহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধই করিয়াছেন। প্যান ইস্‌লাম মতবাদ কখনই কার্য্যসাধক হইতে পারে নাই। কিন্তু নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য যাঁহারা কোন মতবাদের সমর্থন করেন, তাঁহারা কি কোনো কালে ন্যায় এবং যুক্তির সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন? স্বার্থপরতা মানুষকে নিজ চরম কল্যাণ সম্বন্ধে যেমন অন্ধ এবং বুদ্ধিকে জড়ীভূত করে, এমন আর কিছুতেই করে না। তাই কোন কোন পাকিস্থান-ওয়ালা এখন বলিতেছেন যে, তুর্কীরা বিদেশী, তাঁহারা ভারতীয় পাকিস্থানের কথা কি করিয়া বুঝিবেন? এ-প্রশ্ন শুধু হাস্যকর নয়, লজ্জাকরও বটে!

১৭।১৮ই বারাণসী দেখিয়া তুর্কী সাংবাদিকগণ ১১শে মাঘ কলিকাতায় আসেন এবং ঐ দিনে কলিকাতার আশুতোষ কলেজে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের অধিনায়কতায় এক বিরাট অধিবেশনে তুর্কী সাংবাদিকগণকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। এখানকার সাংবাদিকগণের অভিনন্দনের উত্তরে এম, আতাই বলেন,—তাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানিতে। বিদ্যামন্দিরে অভিনন্দিত করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা খুব আনন্দিত; যেহেতু তুরস্ক বিজ্ঞানের সাধনা করে। এই বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সাধনাই নব্য তুরস্কের উন্নতির অন্যতম নিদর্শন। তুরস্কের কামাল পাশা এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; এবং তুরস্ক তাঁহার নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে।

সাংবাদিকগণ ২৪শে মাঘ মাদ্রাজে পৌছিলে নিখিল ভারত সম্পাদক-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীনিবাসম্ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন। তাহার উত্তরে এম, আতাই বলেন,—ভারতে লোকমত ব্যক্ত করার সুবিধা চমৎকার; এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাপক! তাঁহার এ কথায় মনে হয়, ভারতে সম্বাদপত্র কিরূপ সুকঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ বুঝিবার সুযোগ তুর্কী সাংবাদিকগণ নিশ্চয় পান্ নাই!

মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর হইয়া তাঁহারা ৮ই ফাল্গুন বোম্বাই পৌছিবেন—তার পর দিল্লী যাত্রা করিবেন।

যুদ্ধ কবে শেষ হইবে?

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষ কবে হইবে, তাহা লইয়া অনেকেই অনেকরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। সার আর্থার মূর বলিতেছেন, এই বৎসরেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তিনি অবশ্য এ উক্তির যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু যে যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বিধাতার ইচ্ছা মানুষ সব সময় বুঝিতে পারে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিতেছেন, অক্ষশক্তি সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত শক্তির হস্তে আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধের সমাপ্তি হইবে না। হিটলার বলিতেছেন, তাহা তাঁহারা কিছুতেই করিবেন না। এরূপ অবস্থায় সন্ধি যে সন্নিহিত, এমন মনে হইতেছে না। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। যুযুধানগণ পরস্পর মুখে যাহা বলিতেছেন, মনে তাহা বুঝিতেছেন কি না, বলা কঠিন। এখন যুদ্ধ চলিতেছে জিদের উপর। শীতান্তে রুশিয়ায় আবার কি ঘটে বলা যায় না। য়ুরোপীয় মহাদেশে যাঁহারা অক্ষশক্তির বিরোধী,—তাঁহারা সম্মিলিত দলের বন্ধু হইবেন কত দূর, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। কাজেই কোন কথা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। সবই অনুমান মাত্র।

ওয়াডিয়ার বিশেষ কথা

এবার কলিকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধ্যাপক ডি, এন, ওয়াডিয়া তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "যুদ্ধে খনিজ সম্পদের অংশ।" পৌষ সংখ্যায় তাহার আলোচনা ও প্রশংসা করিয়াছি। অভিভাষণের মুখ্য বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন,

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য প্রস্তুত করিবার আগ্রহ এবং প্রাচীন জগতের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সরল জীবন-যাপন—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সাধনের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন এবং তাহার মঙ্গল বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই উভয় দিকের সাম্য-সাধন ভারতবাসীর কৌলিক বৈশিষ্ট্য।" ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় মঙ্গল সাধন কল্পে অধ্যাপক ওয়াডিয়া এই কথা কয়টি বলিয়াছেন। আমরা এ কথা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য খরস্রোতা শৈল্পিকতায় এবং ভোগস্পৃহায় গা ভাসাইয়া চলিলে মঙ্গল হইবে না। আধ্যাত্মিক শান্তিকে পরিহার করিলেও চলিবে না। পক্ষান্তরে শিল্পের উন্নতি না করিলে বর্ত্তমান জগতে আমাদের স্বকীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইবে। কাজেই উভয়ের সাম্য সাধন দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন সংগঠন কর্ত্তব্য। উভয় দিকে আমাদের তুল্য ভাবে মনোযোগ দিতে হইবে। তবে পার্থিব মঙ্গলের জন্য শৈল্পিকতাকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিতেই হইবে। আমাদের শিল্পসেবা বহু স্বদেশী এবং বিদেশীর চক্ষুশূল। দেশের লোক শিল্পাভাবে যত দরিদ্র, ততই পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্'। সেই জন্য দুঃখের দাবানলে আমাদের শান্তি ভস্মীভূত হইতেছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের লুব্ধ আশ্বাস

কাপড়ের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বস্ত্র-শিল্পের আদি স্থান ভারতবর্ষ শেষে দিগম্বরের দেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে সৈনিকদিগের পরিচ্ছদের জন্য সরকার যত দূর সম্ভব ভারতীয় কলগুলি হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া লইতেছেন, কাজেই তাহারা আর দেশের লোকের জন্য পর্য্যাপ্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। দেশের লোক বর্ত্তমান বাজারে অত মূল্য দিয়া কাপড় কিনিতে পারিতেছে না; সেলাই করিয়া, তালি দিয়া কোনরূপে নগ্নতা-নিবারণের প্রয়াস পাইতেছে। ব্যাপার এইরূপ হইবে, তাহা সরকার প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলেন। তাই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহারা এই দেশের সরল-বিশ্বাসী জনগণকে আশা দিয়া আসিতেছেন,—"শীঘ্রই আমরা সস্তায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বাহির করিতেছি, লজ্জা-নিবারণের ভাবনা নাই!" সেই হইতেই কত কথা, কত আশ্বাস, কত আশা এই নিরন্ন, লজ্জাকাতর দেশবাসীকে দেওয়া হইল, কিন্তু সরকারের কল্পিত সে আশা আশা-লোকেই রহিয়া গেল, বস্ত্ররূপে আর দেখা দিল না! রাজপুরুষ-মহলে কত লম্ফ-ঝম্ফ, কত বাহ্বাস্ফোটই দেখা গেল। কিন্তু বস্ত্রের পরিবর্তে লোকে পাইল কেবল কুহকিনী আশা! আশায় লজ্জা নিবারণ হয় না। কুহকেও লজ্জা ঢাকে না। সরকার জানেন **The miserable have no other medicine but hope.** দীন-দুঃখীর আশা ভিন্ন আর কোন উপায়ই নাই, অতএব বস্ত্র না দিয়া আশা দিয়াই তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিব। সে আশা-দানের আর অন্ত নাই। গত গ্রীষ্মকালে নয়া-দিল্লীতে আবার আর এক দফা আশা বিতরণ হইল। শুনা গেল, পূজার সময় সরকারী সস্তা কাপড় লোকে পাইবে। কিন্তু হয়-হয় করিয়াও কিছু হইল না। পূজা গেল, দেওয়ালী কাটিল,—লোকে পাইল কেবল আর এক ডোজ আশা! শেষটা শুনা গেল, ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারের পরিকল্পিত কাপড় কল্পলোক ছাড়িয়া ভারতের বাজারে অবতীর্ণ হইবে! কিন্তু মানুষ আর কত সহিবে? তালি দিয়া লজ্জা আর ঢাকা যায় না। আবার কি সেই আদমের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে? এখন সেই ফেব্রুয়ারী আবার আসিল, কিন্তু সরকারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আসিল না। এখন শুনিতেছি, ১লা এপ্রিল না কি কাপড় পাওয়া যাইবে!

"১লা এপ্রিল" তারিখ শুনিয়া ভয় হয়, অল্-ফুল্‌স্-ডেতে সরকার স্পষ্টভাষায় দেশের লোককে বাকল পরিবার নির্দ্দেশ না দিয়া বসেন!

কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা

আমাদের এই দেশ কি ভাবে শাসিত হইতেছে, ইহার ভিতরে কতখানি গলদ, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইতেছে। ইহার আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Organisation) এবং সাজ-সজ্জা সমস্তই যে ত্রুটিবহুল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সরকারের ব্যবস্থাপনা-দোষে যে সকল ত্রুটি জাজ্বল্যমান ভাবে দেখা দিতেছে, তাহা ঢাকিবার জন্য কেবল চোরা বাজারের দোষ দিলেই চলিবে না! দেশে কয়লার অভাব অত্যন্ত লজ্জাজনক হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই দেখিতেছেন, দেশের সর্ব্বত্র কয়লার বিষম অভাব। ভারতের জনবহুল প্রধান সহর কলিকাতাতেই অনেকে এই দুর্মূল্যতার দিনে অতিকষ্টে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও ইন্ধনের অভাবে বাঁধিতে পারিতেছেন না। কেন এমন হইতেছে? অদূরেই কয়লার পর্য্যাপ্ত খনি আছে, খনিতে কয়লাও আছে প্রচুর, নাই কেবল একটা বস্তু। সে বস্তু—সে কয়লা আনিবার সুব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত সুশীলকুমার ঘোষ সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলেন, কয়লা আনিবার জন্য সরকার উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ী দিতেছেন না; সাধারণের ব্যবহারের জন্য কয়লা আনিবার গাড়ী অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে মেলে নাই, এবং পরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা পাইবার পূর্ব্বেই সরবরাহ বন্ধ করা হইয়াছিল। তাই সহর ও মফস্বলের লোক এই দুর্দ্দিনে অকারণে ঘোর কষ্ট পাইতেছে। যুদ্ধের জন্য দুর্মূল্যতার কারণে দশ আনা মণ কয়লা পাঁচ সিকা মণে বিকাইতে পারে, তাই বলিয়া অযথা পাঁচ টাকা মণে কিছুতেই বিকাইতে পারে না! সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারী বিবৃতিতেই শুধু দেখিতেছি, কলিকাতায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জ্বালানী কয়লা পাওয়া যায়! কিন্তু কয়লা কোথায়? বেশীর ভাগ দোকানই দেখি খালি,—সেখানে আছে শুধু জ্বালানী-কাঠ! যে সব দোকানে কয়লা আছে, সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে, এমন মনে হয় না! এ-সব দোকানে যেমন খুশী দাম এবং অসম্ভব গাড়ী-মুটে-ভাড়া। ইস্তাহার ছাপাইলেই সরকারের কর্ত্তব্য কি শেষ হইবে? সরকারের উচিত, সর্ব্বাগ্রে কয়লার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর কয়লা আনানো। তাহা না হইলে —অভাব না ঘুচিলে—দর বাঁধিয়া কড়াকড় করিলেও অভাগাদের দুঃখ ঘুচিবে না! কয়লার অভাবে বহু গৃহস্থ উনান জ্বালিতে পারিতেছেন না, অনেকে একবেলা খাইতেছেন, সরকার কি সে সংবাদ রাখেন?

হা পয়সা !

বাজারে আজ কয় মাস ধরিয়া তামার পয়সা এবং রেজকির অভাব ঘটায় জনসাধারণের—বিশেষ মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। সকল সংবাদপত্রই এই অসুবিধার দিকে সরকারের দৃষ্টি বার-বার আকর্ষণ করিতেছেন। আধ-আনি বাহির হইলেও তাহা অধিক সংখ্যায় মিলিতেছে না। শুনিতেছি, আঁধার বাজারের চোরা বালিতে তাহা অদৃশ্য হইতেছে! দুই একটা লোকও পয়সা গোপন করিয়াছিল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে ও শাস্তি পাইয়াছে। এত দিনে সরকারের টনক নড়িয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় রাজার মূর্ত্তিবিহীন—শুধু মুকুটাঙ্কিত নূতন সচ্ছিদ্র পয়সা দেখা দিয়াছে—কিন্তু মফস্বলে এখনও তাহার প্রচলন হয় নাই। কবে হইবে? এই নূতন সচ্ছিদ্র পয়সা ওয়াশারের অনুরূপ। কিন্তু বাজারে এখন ইস্ক্রুপের দারুণ অভাব! তাই আশা আছে, ইস্ক্রুপের অভাবে এ-পয়সা ওয়াশারের কাজের জন্য উবিয়া যাইবে না!

জিন্নার মুখে নূতন কথা

১৮ই মাঘ মিষ্টার জিন্না বোম্বাইয়ের ইস্মাইলী কলেজের ছাত্র-সভায় এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "দেশের হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় দলই যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সরকার তাঁহাদের সে দাবী মানিয়া লইবেন। এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার অচল অবস্থা স্থায়ী এবং পাকা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, দুই সম্প্রদায়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহারা ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন। তাঁহাদের সে কথা আন্তরিক কি না, তাহা বিচার্য্য। ভারতবাসীরা বৃটিশ সরকারকে বলুন যে, আমরা সকলে এক-মত হইয়াছি, অতএব আমাদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তাহার পর এই একই কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্মিলিত হইয়া দেশের লোকের সংগ্রাম করিবার সময় আসিবে। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করুন না কেন?" হিন্দুরা কোন সম্প্রদায়ের উপর কখনই অযথা অধিকার স্থাপনার চেষ্টা করে নাই। তাই পার্শী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ও বিশেষ অধিকার চাহেন না। মুসলমানরাও পূর্ব্বে চাহিতেন না, মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভ হইতে এবং লর্ড মিণ্টোর নিকট আগা খাঁ প্রভৃতি মুসলমান প্রতিনিধি পাঠানোর পর হইতেই মুসলমানগণ সেই আব্দার ধরিয়াছেন। কোকনদে কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আলি বলিয়াছিলেন, লর্ড মিণ্টোর নিকট আগা খাঁ-প্রমুখ ডেলিগেটের উপস্থিতি একটা Command performance বা ফরমাইসী ব্যাপার মাত্র। সেটা কাহার ফরমাইস? কে সে ফরমাইস করিয়াছিল? মুস্লিম লীগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভিতর হইতে কাহার প্রেরণা ছিল? সে সকল কথা ভাবিয়া মিষ্টার জিন্না বলুন দেখি, মিলনের অন্তরায় কাহারা? তিনি পাকিস্থান কায়েম করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বরং তাঁহার পাকিস্থানে হিন্দুদিগের উপর ধমক দিবার উৎকৃষ্ট মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, বলিবার ভঙ্গী বদলাইয়াছে। দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তুর্কী সাংবাদিকদিগের উক্তিই কি ইহার কারণ?

কাগজের দুর্ম্মূল্যতা

সর্ব্ব দেশে এবং সকল কালেই স্বৈর-শাসকগণ প্রজাদিগের স্বাধীন ভাবে মত-প্রকাশে, সংবাদপত্রাদির প্রচারে—প্রকাশে, এবং শিক্ষাবিস্তারে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে যখন ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের আমদানী হয়, তখন এ দেশের ইংরেজরা যে ভাবে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

লর্ড মেটকাফ এ দেশের সংবাদপত্রকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়া ডিরেক্টরদিগের এত দূর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, সে জন্য তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া ভারত হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তদবধি এক শ্রেণীর সঙ্কীর্ণচিত্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের সংবাদপত্রের এবং শিক্ষার বিস্তার-সাধনকে অত্যন্ত বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন। এবার এ যুদ্ধে সরকার ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে সংবাদপত্রের পক্ষে স্বাধীন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ যেরূপ দুঃসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, কাগজ নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রচার এবং প্রসার-সাধনও তেমনি অসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই দরিদ্র দেশে সংবাদপত্র এবং পুস্তক লোকে অধিক মূল্য দিয়া কিনিতে পারে না। যুদ্ধের অজুহাতে সরকারের পণ্য-নিয়ন্ত্রণ এবং অত্যধিক নোট-প্রচলনের ফলে পণ্য-মূল্য যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে লোকের পক্ষে অধিক মূল্য দিয়া সংবাদপত্র এবং পুস্তক কিনিবার সাধ্য নাই। কাজেই সংবাদপত্র সঙ্কুচিত এবং পুস্তক-প্রকাশ বিরল হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রেরা পুস্তক কিনিয়া পড়িতে পারিতেছে না, কাগজের অভাবে লিখিতে পারিতেছে না। কাজেই সরকারের এই ভারতীয় কলের কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ গ্রহণের ফলে সাম্রাজ্যবাদীদিগের উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হইতেছে। ২৮শে মাঘ দিল্লীর কেন্দ্রী পরিষদেও এ জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বাবু বৈজনাথ বাজোরিয়ার নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দেশের লোকের কোন আপত্তিতেই সরকার বিচলিত হইতেছেন না। মার্কিণ হইতে কাগজ আমদানী কি অসম্ভব? জ্ঞানের আলোক এই ভাবে নিবাইলে সরকারেরই আশঙ্কার কারণ আছে! অন্ধকারেই কি বিপদ-ঘটনের সম্ভাবনা সমধিক নহে?

সন্ধির প্রস্তাব

কতকগুলি সাংবাদিক গুজব রটাইতেছেন যে, অক্ষশক্তিবর্গ শীঘ্র সন্ধির প্রস্তাব করিবে; জাপান তাহার বিজয়লব্ধ সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া চীনের সহিত সন্ধি করিবে। এইরূপ অসঙ্গত উক্তি কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, ওয়াশিংটনের কোরিয়ানরা ঐ সংবাদ দিয়াছে এবং তাহারা বলিতেছে যে, জাপানের প্রধান মন্ত্রী টোজো আগামী সেপ্টেম্বর মাসে চীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইবেন। আট-নয় মাস পরে টোজো কি করিবেন, তাহা কি তিনি মার্কিণ-প্রবাসী কোরিয়ানদিগের গলা ধরিয়া বলিতে গিয়াছেন? এখনও আট মাস যুদ্ধ চালাইয়া গেলে তবে সেপ্টেম্বর মাস আসিবে। এই আট মাসে কি হয়, তাহা টোজোও বলিতে পারেন না। যুদ্ধে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে, অনেক মিথ্যা কথা রটে। বর্ত্তমান যুদ্ধে আমরা হাতে হাতে

তাহার প্রমাণ পাইতেছি। চীনে কি হইতেছে, তাহার প্রকৃত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। পাঁচ বৎসর যুদ্ধ করিবার পর জাপান যে চীনকে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিবে, জাপানীরা তেমন পাত্র নহে। এ দিকে ফিলাডেলফিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, চীনের বৃটেনস্থ দূতের পত্নী ম্যাডাম উইলিংটন কু বলিতেছেন যে, আর্থিক দিক্ দিয়া চীনের ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মার্কিন আর চীনা সৈন্যদিগকে সাহায্য করিতে বিলম্ব করিলে চলিবে না। এরূপ অবস্থায় জাপান যে আট-নয় মাস পরে চীনের সহিত সন্ধির কথা কহিবে, তাহা বিশ্বাস করা চলে না।

তার পর রুশিয়ার কথা। এবার শীতকালে সত্য সত্যই রুশিয়ায় লাল ফৌজ জয়যুক্ত হইতেছে। ষ্টেলিনগ্রাড, লেনিনগ্রাড প্রভৃতি স্থান হইতে জার্ম্মাণ-সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব কত দিন হইবে, তাহা এই শীত না গেলে বুঝা যাইবে না। ষ্টেলিনগ্রাডের দিকে পরাজয় জার্ম্মাণীর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধে রুশিয়াকে কতখানি ধন-জন ক্ষয় স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহা বুঝা কঠিন। বার-বার লাল ফৌজ জার্ম্মাণীর ব্যূহ ভেদ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে রুশিয়াকে মনে মনে "পাইর‍্যাসের" ন্যায় আক্ষেপ করিতে হইতেছে কি না, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। এ যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ক্ষতির কথা প্রকাশ করা হইতেছে, কিন্তু রুশিয়ার কোন ক্ষতির কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি না। প্রকাশ, একমাত্র রুশিয়ার রণক্ষেত্রেই জার্ম্মাণীর ৮০ লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ সেখানে ২ কোটি জার্ম্মাণ সৈন্য বিশেষরূপে জখম এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, জার্ম্মাণীর বুঝি আর সৈন্য নাই! তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সহস্র মাইল বিস্তৃত ব্যূহ কি করিয়া রক্ষা করিতেছে? কি করিয়াই বা তাহারা তাহাদের নির্জ্জিত দেশগুলিকে আয়ত্তে রাখিয়াছে? তবে এ কথা সত্য যে, রুশিয়া এই শীতকালে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সর্ব্বস্ব পণের ফলে রুশিয়া যদি জার্ম্মাণীকে চূর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলেই মঙ্গল। নতুবা কি হইবে, কে বলিতে পারে! সম্মিলিত শক্তি আপাততঃ পারস্যের ভিতর দিয়া রুশিয়াকে সাহায্য-দানের চেষ্টা করিতেছে।

জাপান কি করিতেছে, তাহা বলা যাইতেছে না। সলোমনের দিকে জাপান পরাজয় স্বীকার করে নাই। পাপুয়ার দিকে জাপান পরাজিত হইলেও একেবারে হাল ছাড়ে নাই। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সেনাপতি ম্যাক আর্থারের সাফল্য আশাজনক সত্য, কিন্তু তাহাতে জাপান নিরাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না! এই সকল বিবেচনা করিয়া মনে হয়, যুদ্ধে এখনও সন্ধির কথা পাড়িবার সময় আসে নাই। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সন্ধির সম্ভাবনা অল্প।

মহাত্মাজীর অনশন

মহাত্মা গান্ধী, ২৭শে মাঘ মধ্যাহ্ন হইতে তিন সপ্তাহ অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। অনশন-সঙ্কল্প-সূচনায় মহাত্মাজীর সহিত ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী সার রিচার্ড টটেনহামের যে সকল পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, সেগুলি সমালোচনা ও বিতর্কপূর্ণ—সকল সংবাদপত্রেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব। এই সকল পত্রে বড়লাট দেখাইতে চাহিয়াছেন—গত অগষ্ট মাসে বোম্বায়ে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্তের ফলেই দেশব্যাপী চাঞ্চল্য—বিভিন্ন প্রদেশে হাঙ্গামা, উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে। তিনি এই হাঙ্গামাকে কংগ্রেসী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন। পত্রের উত্তরে মহাত্মাজী এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন—অহিংসাই তাঁহার মূলমন্ত্র—জীবন-ব্রত বলিয়াছেন। হিংসামূলক এই আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের বা তাঁহার নেতৃত্বের যে কোন সম্পর্ক আছে, ইহা মহাত্মাজী অস্বীকার করিয়া সরকারী দমন-নীতির উপর দোষারোপ করিয়াছেন। যদি কংগ্রেসের অগষ্ট মাসের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয় বা গান্ধীজী এখন অস্বীকার করেন, তবে বিষয়টি পুনরায় বিচার করা হইবে বলিয়াও বড়লাট পত্রে আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাহাতে সম্মত হন নাই। মহাত্মাজীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে বড়লাট লিখিয়াছেন—"আপনার স্বাস্থ্য ও বয়স বিবেচনা করিয়া আপনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি দুঃখিত।...আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রায়োপবেশনকে আমি হিংসা বলিয়া মনে করি। এই কার্য্যের কোন নৈতিক যুক্তি নাই।" উত্তরে মহাত্মাজী ৭ই ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছেন—"সত্যাগ্রহীর দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে আপনার পত্র প্রায়োপবেশনের আমন্ত্রণ-লিপি বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ও ইহার ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমারই। আপনি এরূপ কথা লিখিয়াছেন, যাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আপনার পত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে আপনি এই সিদ্ধান্তকে সহজে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বন্ধুরূপে আপনি যে আমার উপর এরূপ হীন ও কাপুরুষোচিত অভিসন্ধি আরোপ করিতে পারেন, ইহা আমার ধারণার অতীত। ইহাকে আপনি রাজনৈতিক হিংসা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আপনি আমার পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধ আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন... আমার পরিকল্পিত ব্যবস্থা ও আমার প্রবন্ধের মধ্যে অসামঞ্জস্যের কিছুই নাই।"

৭ই ফেব্রুয়ারী স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মহাত্মাজীকে লিখিয়াছেন—"আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে মুক্তিদান করা হইবে। আপনি যে কয় দিন অনশনে থাকিবেন, তাহার মধ্যে আপনি যে স্থানেই গমন করুন তাহাতে কোন আপত্তি করা হইবে না। আগা খাঁনের প্রাসাদ হইতে দূরে আপনার বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।" উত্তরে ৮ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী লিখিয়াছেন—"আমি আটক বন্দী অবস্থায় প্রায়োপবেশন করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইব। যদি সরকারের সুবিধার জন্য আমাকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে—যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। বন্দী হিসাবে প্রায়োপবেশন ব্যতীত আমি এমন কিছুই করিব না যাহাতে সরকার বিব্রত বোধ করিতে পারেন।...মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া

মুক্তিলাভের কোনরূপ অভিপ্রায় আমার নাই।...আমি সত্য ও অহিংসার নীতি ত্যাগ করিতে পারি না।"

ভারতের দুর্ভাগ্য, বড়লাট ও মহাত্মাজীর বিপরীত মতের সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন ও দমন-নীতি প্রশমিত—শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইল না। সঙ্কল্পে অবিচলিত হইয়া মহাত্মাজী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন—তবে এবার তাঁহার মৃত্যুপণে অনশন নহে—কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে তিন সপ্তাহ মধ্যেও তিনি নিবৃত্ত হইতে পারেন। তাঁহার অহিংস-ব্রত—জীবন-সাধনা। স্বাস্থ্য ও বয়সের কথা স্মরণ করিয়া দেশবাসীর উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। দিল্লীতে জনরব, মহাত্মাজীকে সত্বর মুক্তি দেওয়া হইবে।

মহাত্মাজীর অনশনের সংবাদ পাইয়া অধ্যাপক ভানসালি ২৮শে মাঘ হইতে উপবাস করিতেছেন। ৬৩ দিন পরে উপবাস ভঙ্গ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

যুব-সম্মেলন

১৬ই মাঘ লাহোরে শিখ যুব-সম্মেলনের অধিবেশনে বক্তারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, স্বদেশপ্রীতিই সকলের উপর অবস্থিত। সর্দার উজ্জ্বল সিং এই সভায় বলিয়াছিলেন—"আমরা আমাদের দেশকে সকল ব্যাপারের ঊর্দ্ধে মনে করি। দেশের কাজই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেশকে যে ভালবাসে, সে কখনই দেশকে খণ্ডিত করার সমর্থন করিবে না। যাহার মনোবৃত্তি দাস-সুলভ এবং যাহার মনে দেশপ্রেমের অভাব, তাহারই মনে এমন কল্পনা স্থান পায়।"

ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান-পরিষদ

গত ১৭ই পৌষ আগ্রা সহরে নিখিল ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান-পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক বৈঠক বসিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু তাঁহার যে প্রারম্ভিক স্বস্তি-বাচনিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সর্ব্ব দিক্ দিয়াই তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং তাহার গুরুত্বও অনেক অধিক। দুর্ভাগ্যক্রমে একই সময়ে এত অধিক সভা-সমিতির অধিবেশন হয় যে, সম্যক্‌মত সকলগুলির আলোচনা করিবার স্থান থাকে না। অক্ষশক্তির পরাজয়ে যে ভারতের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা, এ কথা পণ্ডিত হৃদয়নাথ বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার সংবাদপত্র প্রভৃতির উপর অহেতুক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন—কঠোর আদেশ জারী করিয়া ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, "সরকার সংবাদপত্রের উপর যে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তত নহে,—ইহা স্বাধীন সংবাদপত্রের উপর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সরকারের বিরাগেরই ফল।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "অর্ডিনান্স জারী করিয়া সরকার ব্যবস্থা পরিষদকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়াছেন, তবে আর্থিক ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভাগুলির কিছু হাত আছে, তাই রক্ষা। নতুবা উহাকে উপেক্ষা করিয়া ভারতে শাসকদিগের প্রভুত্বই পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইত।" আমাদের কিন্তু মনে হয়, কার্য্যতঃ আর্থিক ব্যাপারেও ব্যবস্থাপক সভাগুলির বিশেষ কোন ক্ষমতাই নাই। সবই কেবল দর্শনধারি ব্যাপার! সরকারের নিজ বৃহত্তর স্বার্থ-সাধনের জন্যও এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলিয়াছেন, "যে সকল প্রদেশ এখন সচিবদিগের দ্বারা শাসিত হইতেছে, যুদ্ধ-জনিত অবস্থার ফলে কার্য্যতঃ তাহার সমস্ত ক্ষমতাই স্থায়ী রাজ-পুরুষদিগের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। সচিবরা এখন কেবল ঢাকের বাঁয়া মাত্র! আর যে সকল প্রদেশের শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তথায় সমস্ত শাসনভারই এক জনের হাতে গিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ বিধি-বিগর্হিত।" ঐ সকল প্রদেশে গবর্ণরই স্বৈর শাসক-পদে অবস্থিত এবং স্থায়ী রাজপুরুষরাই হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আসল কথা, কেন্দ্রী সরকারে স্বৈর-ক্ষমতা থাকিলে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বপূর্ণ শাসন থাকিতেই পারে না।

তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সদস্য নির্ব্বাচন (Functional representation) এবং অনপসরণীয় শাসনকর্ত্তা নিয়োগেরও দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলিতে শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবসান হইলে উহাদের সহিত বৃটেনের সম্বন্ধ-ঘটিত ব্যবস্থায় আরও পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা নিশ্চয়। তাহারা বৃটেনের সহিত সম্মিলিত স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতবাসীরাও আর পরাধীন থাকিতে চাহিবেন না। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে বৃটিশ জাতির সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে চাহিবেন। পণ্ডিতজী অনেক যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তাঁহার সকল কথার আলোচনা বা উল্লেখ এখানে সম্ভব নহে!

মার্কিণ প্রতিনিধির আলোচনা

পঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য লালা দুনীচাঁদ ভারতরক্ষা আইনে আম্বালায় আটক আছেন। কংগ্রেসের কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা না করিলে ভারতের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপস্‌কে পত্র লিখিয়াছিলেন। পঞ্জাব সরকারের অনুমতিক্রমে লালা দুনীচাঁদ লাহোরে গিয়া মিঃ ফিলিপসের সহিত চল্লিশ মিনিট ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট, রুজভেল্টকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানাইতে হইলে মিষ্টার ফিলিপসের কারাগারের ভিতরে বা বাহিরে যে সকল নেতা আছেন, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া স্বাধীন ভাবে মতামত স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন—তাহা আমরা পৌষ সংখ্যায় লিখিয়াছি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা হইলে মিষ্টার ফিলিপস্ জাতীয়তাবাদীদিগের মনোভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, শরৎ বাবু ব্যক্তিগত মত ক্ষুন্ন করিয়াও দেশের প্রয়োজনে মিষ্টার ফিলিপসের সহিত আলোচনার প্রস্তাব করিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আগামী বৎসরের বাজেট পেশ করিয়াছেন। আনুমানিক আয়—২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; ব্যয়—২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। অতএব ঘাটতি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। এই ঘাটতি-পূরণের জন্য সহরে আনীত গৃহস্থালীর প্রয়োজন ব্যতীত কয়লা—পাট—চা—মদ—স্পিরিট—চুরুট—সিগারেট—পেট্রোল—আমোদ-প্রমোদের উপর বোম্বায়ে প্রবর্ত্তিত নাগরিক শুল্কের অনুরূপ কর-ধার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে। এমন কি, তিনি শিক্ষার উপরেও করধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। সামরিক যান-বাহন-চলাচলে রাস্তার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার জন্য সরকারের নিকট অর্থ প্রার্থনা—ইম্প্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্টের নিকট অধিক অর্থ দাবী করা হইয়াছে। বিমান-আক্রমণে রক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে কলিকাতা কর্পোরেশনকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে—সহরের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য অনেক টাকা ট্যাক্স অনাদায় রহিয়াছে সত্য; কিন্তু অত্যধিক বেতনের কর্ম্মচারিগণের আরও বেতন ও ভাতা-বৃদ্ধি—প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু কর্ম্মচারী-নিয়োগ প্রভৃতিতেও কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যয়ের অন্ত নাই। অপচয়, অপব্যয় এবং অপকর্ম্ম অবাধে সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিস্তারিত হইতেছে, তাহাতে কুবেরের ধন-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়, এ তো কর্পোরেশনের তহবিল! যুদ্ধের জন্য নূতন গৃহাদি-নির্ম্মাণ বা রাস্তা-মেরামত সম্ভব হইতেছে না, অথচ এ সব বিভাগের কোথাও ব্যয়-সঙ্কোচের কোনো ব্যবস্থা ইঙ্গিতেও দেখা যায় না! সুতরাং কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক দুর্গতির কথা—প্রতি বৎসরে সঞ্চিত তহবিল কি ভাবে নিঃশেষিত হইতেছে, তাহার জন্য বিলাপ করিয়া লাভ নাই! কলিকাতা কর্পোরেশনে পুঞ্জীভূত অনাচার যে ভাবে স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহার সংস্কার-সাধন সম্ভব বলিয়াও মনে হয় না!

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের সন্ন্যাস-গ্রহণ

কলিকাতা বৈঠকখানা রোডের স্বনামধন্য সুচিকিৎসক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরির আশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম ও সচ্চিদানন্দ গিরি নাম গ্রহণ করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারী পাশ করিয়া কিছু কাল সরকারী কার্য্যে আত্মনিয়োগের পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কশৌলী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করিয়াছিলেন। মতদ্বৈধতা হেতু সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভবানীপুর অঞ্চলে থাকিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে যশ ও অর্থার্জ্জন করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষরূপে যোগদান করিয়া তাহার উন্নতি-বিধানে তিনি আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান ৬০টি শয্যাযুক্ত বৃহৎ হাসপাতালে পরিণত হয়। বেলেঘাটার শুঁড়ায় সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় গড়িয়া উঠে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে দরিদ্র রোগিগণের সেবা ও চিকিৎসা করিতেছেন। দেবেন্দ্র বাবুর মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ত্যাগী কর্ম্মবীরের পরিণত বয়সে কর্ম্ম-জীবনে সাফল্য-লাভের পর এরূপ সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ সার্থক। ইহা হিন্দুর আদর্শ—অনুকরণযোগ্য।

আবার অবাধ বাণিজ্যনীতি

যুদ্ধের পর সকল জাতির আর্থিক উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা এবং সকল জাতি যাহাতে সমভাবে পণ্যের উপাদান এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হইতে সিনেটর গিনেটী পর্য্যন্ত সকলেই একমত। প্রস্তাবটি স্থূল-দৃষ্টিতে কতকটা নিরীহ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শিল্প-কার্য্যে যে সকল জাতি পশ্চাৎপদ, তাহাদের পক্ষে ইহাতে শঙ্কার কথা আছে। কারণ, অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কৃষিপ্রধান জাতির শিল্প-সেবার প্রবৃত্তিকে পঙ্গু করা সম্ভবে। ভারতবর্ষকেও এই অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্পহীন করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান জাতির আর্থিক দুর্দ্দশা কখনও ঘুচে না। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক জাতি শিল্পসাধন-বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এবার এই যুদ্ধের পর তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া শঙ্কা হয়। ইহার ফলে পরিণামে কোন পক্ষের হিত সাধন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে ভবিষ্যৎ বিবাদের বীজ উপ্ত হইবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিবে। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিয়া নিজ-নিজ শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা তাহাদিগকে করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু উন্নত জাতিরা তাহা করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালায় এসিয়াটিক সোসাইটী

এবার ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি এবং ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগ উহার জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ইঁহাদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এসিয়াখণ্ডে এসিয়াটিক সোসাইটী একটি প্রাচীন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—সার উইলিয়ম জোন্স ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সার উইলিয়ম জোন্স বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রাচীন; ইহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেই বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান অত্যন্ত আবশ্যক। সেই জন্যই তিনি এ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ইহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা এখন গবেষণামূলক সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। সুযোগ্য হস্তে ইহার পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ-ভার অর্পিত থাকিলেই মঙ্গল।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, যুদ্ধের সময় যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, যুদ্ধান্তে সে কথা

আর কাহারও মনে থাকে না। তখন জয়ী-পক্ষ যত দূর সাধ্য আপনার কোলেই ঝোল টানিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন! বিগত মহাযুদ্ধেও মিত্র-শক্তিবর্গ "ডেমক্রেসির জন্য" অথবা 'সভ্যতা-রক্ষার জন্য' যুদ্ধ করিতেছেন, এ-কথা তার-স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে কি হইয়াছিল? মিষ্টার হেষ্টিংস জ্যাকসন তাঁহার প্রণীত "যুদ্ধের পরবর্ত্তী ভূমণ্ডল" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"মিত্রশক্তি-বর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জাতিই লুণ্ঠনের লোভে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।" কেবল মার্কিণের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উইলশন্ তাহা হন নাই। এবার মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আটলাণ্টিক চার্টারের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই যুদ্ধের পর সকল অধীন জাতিই স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পাইবেন—আশা হয়। কিন্তু সে আশা কত দূর সফল হইবে, বুঝা কঠিন। ব্রিটিশের প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিলাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। কাজেই রুজভেল্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাজ কতটা হইবে, বুঝা কঠিন। সেই জন্যই মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সিনেটর গিনেটী তথাকার সিনেটে এই মর্ম্মে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে বলা হউক, তিনি যেন সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া আটলাণ্টিক চার্টারের নীতি-অনুযায়ী চুক্তি করেন। সেই চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা যেন (১) রাজ্য এবং অন্য কোন অধিকার লাভের চেষ্টা না করেন। (২) প্রত্যেক জাতির সুবিধা-অনুসারে তাহাদের ইচ্ছামত সরকারের অধীনে বাসের অধিকার আছে—ইহা স্বীকার করেন। এবং (৩) যে সকল জাতি সেই অধিকারে বঞ্চিত আছে, তাহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিবেন। তাঁহারা যে ন্যায়সঙ্গত শান্তি স্থাপন করিবেন, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথা সত্য। কিন্তু সিনেটর গিনেটীর মতাবলম্বী কত লোক মার্কিণে আছেন এবং দেশের লোকের উপর তাঁহাদের প্রভাবই বা কতখানি, তাহা না জানিলে কিছুই বলা যাইতেছে না। বিলাতেও পার্লামেণ্টের কতকগুলি সদস্য এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ধনতান্ত্রিক গ্রেট বৃটেনে তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই—হইবেও না, ইহা চার্চ্চিল-আমেরীর উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে। কাজেই এই বিষয়ে ভারতবাসীর আশা বড় কিছু নাই। মনোভাব বা আসক্তির দ্বারাই মানুষ প্রায়ই চালিত হয়, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা হয় না। কাজেই লাভের লোভে মানুষ বেশী আকৃষ্ট হয়। ত্যাগের দিকে,—বিশেষ বিচার-বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া ভবিষ্যৎ এবং শাশ্বত মঙ্গলের দিকে তত আকৃষ্ট হয় না; সেই জন্যই পৃথিবীতে এত অশান্তি।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

'স্বাধীনতা' দিবস উপলক্ষে বিক্ষোভ—ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে বৃটিশ দূতাবাসের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে ১৫ জন তরুণ ও ৮ জন তরুণী গ্রেপ্তার। ১২ই মাঘ আমেদাবাদে হরতাল, বোম্বাইএ শোভাযাত্রা, ১৭ জন গ্রেপ্তার। কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কাপড়ের কল বন্ধ। এলাহাবাদে এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ৭৮ জন গ্রেপ্তার। অননুমোদিত ইস্তাহার সহ বহু বেলুন আকাশে উড়ান। স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চালন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালন! কালনা মুন্সেফী আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য ২ জন কংগ্রেস ও জমিয়াৎউল-উলেমার কর্ম্মী গ্রেপ্তার, গোপালগঞ্জে (শ্রীহট্ট) ৪ জন ছাত্র ফেডারেশনের ৪ জন সদস্য গ্রেপ্তার। শ্রীরামপুরে ১৪ জন, চুঁচুড়ায়, মেমারীতে ও চাঁদপুরে বহু যুবক গ্রেপ্তার, ঢাকায় ৭ জন ছাত্র গ্রেপ্তার!

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব স্পীকার শ্রীযুত বুলুসু শাম্বমূর্ত্তি, এবং ব্যবস্থাপক সভার আরও কয় জন সদস্যের প্রতি স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান হইতে বিরত থাকিবার জন্য ১৪৪ ধারার আদেশ জারী!

আগ্নেয়াস্ত্র লুণ্ঠন ও বাজেয়াপ্ত—আসাম নওগাঁর ডেপুটী কমিশনার বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ৭০০ বন্দুকের নূতন করিয়া লাইসেন্স দেন নাই। মফঃস্বল এলাকার অধিকাংশ বন্দুকই পুলিশ সংগ্রহ করিয়াছে। ২৫শে পৌষ—বেরিলীর এক গৃহ হইতে পুলিস ১টি পিস্তল ও নূতন ধরণের দুইটি বন্দুক হস্তগত করিয়াছে। ২৮শে পৌষ—রাজকোটে এক স্থান হইতে বহু পরিমাণ পেট্রোল ও এসিড আবিষ্কার, ১২ জন ছাত্র গ্রেপ্তার, ২রা মাঘ—বোম্বাইএ মালাবার হিলে এক স্থানে এক গুপ্ত অস্ত্রাগার হইতে সালফিউরিক এসিড, প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য, কতকগুলি হাই-এক্সপ্লোসিভ বোমা ও অগ্নিদানকারী বোমা আবিষ্কার, ১২।১৪ জন গ্রেপ্তার, ৮ই মাঘ—বিহারে রাঁচির পিসরোডে এক বাড়ী হইতে দেশী রিভলভার ও কতকগুলি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার। বাড়ীর মালিক ও অপর এক জন গ্রেপ্তার। এক বস্তি হইতে ৩টি অবিস্ফোরিত বোমা, কতকগুলি হাতবোমা ও কিছু রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার। ১০ই—করাচীতে বোমা-কারখানা আবিষ্কার। এ স্থান হইতে ১টি পিস্তল, ৩টি রাইফল ও বোমা প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কার।—নওগাঁ (আসাম) জিলার বহু বন্দুক চুরি, ৯ই মাঘ পুলিস কর্ত্তৃক ৫টি বন্দুক উদ্ধার, ১১ই মাঘ কামরূপের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লাইসেন্স সহ সকল আগ্নেয়াস্ত্র ২৭শে মাঘের মধ্যে জমা দিবার আদেশ জারী। ১২ই—বেলগাঁওএর ইয়ামিনকাটি গ্রাম হইতে ৪টি, তিনডোলী গ্রাম হইতে ২টি এবং বাসার ফোড হইতে ১টি রাইফল অপহৃত। ১৫ই—ঢাকার পারুলিয়া গ্রামে অস্ত্র ও গোলাবারুদের কারখানা আবিষ্কার। বহু বারুদ, দেশী কার্ত্তুজ, সীসা ও গুলী-বারুদ প্রস্তুতের মশলা প্রাপ্তি। কয় জন যুবক গ্রেপ্তার। ১৬ই—আসামে নওগাঁ থানার জামজুড়ী গ্রামে এক গৃহ হইতে কিছু তাজা টোটা আবিষ্কার। ১১শে—মীরাজের (বোম্বাই) ৪খানি গ্রামের পুলিস প্যাটেলদিগের বন্দুক চুরি। কিলিচাবাদী হইতে দারোগার পোষাক ও রিভলবার অপহৃত।

বেতারযন্ত্র বাজেয়াপ্ত—২৫শে পৌষ পর্য্যন্ত মোরাদাবাদে ৮টি বেতার সেট বাজেয়াপ্ত। ১০ই মাঘ—ঢাকায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ডাঃ যোগেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুত নলিনীকান্ত দত্ত, ডাঃ গোবিন্দ পাল এবং শ্রীযুত রঘুনাথ রায়ের বেতারযন্ত্র বাজেয়াপ্ত।

প্রেস ও সংবাদপত্র—বোম্বাইএর 'ইত্তেহাদ' পত্রের কার্য্যালয়ে তল্লাসী, সম্পাদিকা কুমারী আনতুস্ সালাম গ্রেপ্তার। ২১শে পৌষ—গৌহাটীর অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'অসমীয়ার' সম্পাদক

শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া, এক প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত রবীন নবীশ, কনট্রাক্টর শ্রীযুত দেবপাল দাশ ও আর এক জন ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। ৬ই মাঘ—সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লা বক্সের পরিচালিত দৈনিক 'আজাদের' সম্পাদক মৌলানা আবদুল করিম চিস্তিগি গ্রেপ্তার। ৯ই—আসামে উলাবারির কামরূপ প্রেস ও গৌহাটীর হিন্দুস্থান প্রেসে তল্লাসী। কুষ্টিয়ায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাজেয়াপ্ত পুস্তক "এ ফেজ অব দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগলে"র প্রকাশক শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভৌমিকের বাড়ীতে তল্লাসী। লাহোরের দৈনিক "প্রতাপের" স্বত্বাধিকারী ও তাঁহার পুত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। তেজপুরে 'আসাম-সেবক' পত্রের কার্য্যালয় ও ছাপাখানায় তল্লাসী।

লুণ্ঠন—২৫শে পৌষ—বোম্বাইএ ধুলিয়া সহরের কয়েকটি শস্যের দোকান লুঠ। চিকোদি তালুকের আকোল গ্রামের হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কয়েক জন ব্যবসায়ীর কয়েক গাঁইট বস্ত্র লুণ্ঠন। ২৯শে—করাচীর দুই দোকান হইতে ১১ হাজার টাকা মূল্যের কাপড়ের গাঁইট অপসারিত। ২রা মাঘ—নাসিকে জনতা কর্ত্তৃক কয়েকটি খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের দোকান লুণ্ঠন, কয়েক জন পুলিশ আহত। পুলিশ ও সৈন্যদলের সতর্ক না করিয়াই গুলী চালনের আদেশ দান। সান্ধ্য আদেশ জারি, ৫০ জন গ্রেপ্তার, কয়েক জন স্ত্রীলোকও গ্রেপ্তার। আমেদাবাদে প্রকাশ্য রাজপথ হইতে কয়লাগাড়ী লুঠ। ৪ঠা—বগুড়ার বাজারে লুণ্ঠনের আশঙ্কা, জনৈক ফেরীওয়ালার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ। মোরারের (ধারওয়ার) কুলবারনীর ক্ষেত্র হইতে শস্য লুণ্ঠন। ৬ই—পচাপুরে (বেলগাঁও) একটি দেশী মদের দোকান লুণ্ঠিত। ৭ই—চিরহাটাতে (বোম্বাই) এক জনতা মামলতদারের নিকট জোয়ার দাবী করিলে পুলিশের গুলী বর্ষণ। ৮ই—ঝালোদে (সুরাট) এক গাড়ী ও কাথিয়ারোডে ২১ গাড়ী শস্য লুণ্ঠিত। ৯ই—মেদিনীপুরে ব্যবত্তারহাটে (তমলুক) এক দোকান এবং সরিষা বোঝাই কয়েকখানি গরুর গাড়ী লুঠ। বেলগাঁও (বোম্বাই) জিলার ডোলগী চাবাদী হইতে সংগৃহীত রাজস্বের ৩ সহস্র টাকা সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক পুলিশের নিকট হইতে লুণ্ঠন, ঐ সময় তথায় বোমা বিস্ফোরণ। সুতিয়ায় (তেজপুর) এক দারোগার ২টি ধান্যগোলায় অগ্নিদানের ফলে ৫ হাজার টাকার ধান নষ্ট। জনতা কর্ত্তৃক আজিয়ান (আরা) ডাকঘর লুণ্ঠন। ২২শে—কাদেরপুর (ঢাকা) হাট লুঠ।

সমাজতন্ত্রীদলের বিক্ষোভ—২২শে পৌষ—কুমিল্লায় ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদলের সদস্য শ্রীযুত সুকুমার ভট্টাচার্য্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ২৭শে—উৎকল সমাজতন্ত্রীদলের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, উড়িষ্যা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত লোকনাথ মিশ্র ও অপর ১৪ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। ১৩ই মাঘ—সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ বি, পি, সিং ও বিহারের সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা যশোয়ান সিং দিল্লীতে গ্রেপ্তার, তাঁহাদের নিকট নগদ ২ হাজার টাকা প্রাপ্তি।

বাঙ্গালা—২৮শে পৌষ—ভারত-রক্ষা বিধি অনুসারে ত্রিপুরা ও চাঁদপুর কংগ্রেস সমিতি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, শিবদাসপুর, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন, ঢাকার বাঙ্গালা বাজার, রায়পুরা ও সামসাবাদে নিখিল ভারত কাটুনে সঙ্ঘের শাখা সমূহ, ঢাকা জিলার বাঁথারী ও মালিকান্দার অভয় আশ্রম, কুমিল্লার খাদি ভাণ্ডার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চরকা বিদ্যালয়, করিমগঞ্জের (ত্রিপুরা) চাঁজমা মায়া কেন্দ্র—বেআইনী ঘোষিত।

কলিকাতা—২৬শে পৌষ—গার্ডেনরীচ রোডে হিন্দী ইস্তাহা'র বিলি করার অভিযোগে শ্রীরাজকিশোরী সিংএর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ২৮শে—ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ১২নং বাড়ীর নিকট বোমা বিস্ফোরণ। জনৈক টেলিফোন-মিস্ত্রী গুরুতর আহত। অবসর প্রাপ্ত দায়রা জজ রায় বাহাদুর অনন্তনাথ মিত্রের পুত্র করুণা মিত্র বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেও পুলিস কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার। ২৯শে—তিন স্থানে তল্লাসী। ১লা মাঘ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের গৃহে ও অপর তিন স্থানে তল্লাসী। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পুত্র শুভায় দাশগুপ্ত, বিজয় নন্দী, অমিতাভ গুহ, মণীন্দ্র সান্যাল ও শান্তিভূষণ সরকার আপত্তিকর কাগজপত্র রাখার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেও পুলিস কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা বিধিবলে গ্রেপ্তার। ২রা—ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর গৃহে ৩ ঘণ্টা তল্লাসী। ৫ই, ৬ই, ৮ই, ৯ই, ১১ই, কয়েক স্থানে তল্লাসী, ১ জন আটক। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে ৭ই মাঘ মুক্তি দিয়া ৮ই মাঘ পুনরায় ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার। ১১ই—কলেজ রো'এ এক হোটেলে বিস্ফোরণ, ১২ই—হ্যারিসন রোডস্থ এক সিনেমা-গৃহে বিস্ফোরণ। ২৮শে—বেলিয়াঘাটায় এক কর্পোরেশন প্রাইমারী স্কুলে সশস্ত্র ১২ জন যুবক কর্ত্তৃক শিক্ষকগণ আক্রান্ত। যুবকদিগের একটি বাঁশের নল ও পটকা রাখিয়া স্থান ত্যাগ। বিস্ফোরণের ফলে জনৈক অঙ্গুলী-রেখা-বিশেষজ্ঞ আহত।

ঢাকা—২৫শে পৌষ রাত্রিতে পুলিশ কর্ত্তৃক নশঙ্কর, নয়না, বাউৎভোগ, ধীর প্রভৃতি গ্রামের বহু গৃহ ঘেরাও ও প্রাতে তল্লাসী। মালধা হইতে বিরাট শোভাযাত্রার বহু গ্রাম প্রদক্ষিণ। ২৬শে—লালবাগ থানার কয়েকটি গৃহে তল্লাসী। ২৭শে—ঢাকা জিলায় নশঙ্কর সত্যাশ্রম পুলিস দখলে। ২রা মাঘ—কয়েক জন বালক কর্ত্তৃক ২ জন সার্জ্জেণ্ট প্রহৃত। ৩রা—এক সিনেমা-হলের নিকট বিস্ফোরণ। ১২ই—গোয়েন্দা বিভাগের এক জন কনষ্টেবল ছুরিকাহত, ১ জন গ্রেপ্তার। টিকাটুলীর নারীশিক্ষা মন্দিরের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী হেলেনা দত্তের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ১৪ই—ভিক্টোরিয়া পার্কে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

বাঁকুড়া—২৬শে—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশিবরতন রাঠী গ্রেপ্তার।

যশোহর—২৬শে বগচর গ্রামের শ্রীতারাপদ চন্দ ও শ্রীভুবনেশ্বর দাঁ এবং যশোহর সহরের শ্রীনলিনীকান্ত দে স্বগৃহে আটক।

ফরিদপুর—২৮শে পৌষ—মাদারীপুরে এক মুনসেফকে সাহেবী পোষাক ত্যাগ করিয়া আদালতে যাইতে বলায় এবং দারোগার টুপী পুড়াইবার জন্য প্রাণতোষ চৌধুরী ৯ মাস ও আশারঞ্জন গাঙ্গুলীর ১ বৎসর কারাদণ্ড। ২রা মাঘ—রাইপুর গ্রামের ৪ গৃহে এবং ইলিশকোল গ্রামের এক গৃহে তল্লাসী। ১২ই—রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্তা চারুপ্রভা সেনগুপ্তার গৃহ তল্লাসী, তাঁহার দুই কন্যা কুমারী

কমলা, কুমারী অরুণা ও পুত্র শ্রীপরিমলবন্ধু এবং রায়পুর গ্রামের সুরেশচন্দ্র রায় নামে এক বালক গ্রেপ্তার।

নদীয়া—শ্যামনগর ডাকঘর পুড়াইবার অভিযোগে শ্রীসিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস ও অপর ৪১৫ জন ফেরার ছিল। সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

নোয়াখালি—২২শে পৌষ—পরশুরাম থানার অধীন যশোদাপুর গ্রামের দুই জন ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ধৃত। ২১শে, গ্রামে গ্রামে ইস্তাহার বিলির অভিযোগে শ্রীবিধুভূষণ রায়ের ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। যুদ্ধবিরোধী প্রচার কার্য্য করিবার অভিযোগে পরশুরামের মিঃ নুরুল ইসলাম ও ফেণীর আশুতোষ বিশ্বাস গ্রেপ্তার।

ত্রিপুরা—২৫শে পৌষ কুমিল্লার মিঃ মোহন মিঞা চৌধুরী এবং আখাউড়ার যোগেন্দ্র দাস ভারতরক্ষা বিধিবলে গ্রেপ্তার। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস বর্ম্মন, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীসুকুমার দাশ-গুপ্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ত্রিপুরা জিলা ত্যাগ করিবার আদেশ। ২৮শে—কুমিল্লার ইনকাম ট্যাক্স আফিসের সম্মুখে হাঙ্গামার সংস্রবে মৌলভী হবিবর রহমান চৌধুরীর পুত্র মুস্তাফিজর রহমন চৌধুরী, নির্ম্মল দত্ত, পাণ্ডব দাস, সুভাষ গুপ্ত, হরিগোপাল কর্ম্মকার, নরেশ চক্রবর্ত্তী, রমণী পাল ও কানাই চক্রবর্ত্তী দণ্ডিত। ৬ই মাঘ—কুমিল্লার কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী দেবেন সেন, এম সিদ্দিক, রহমৎ আলি, ডাঃ দুর্গেশ রায়, ডাঃ রাধারমণ দেব, নৃপেন্দ্র ভৌমিক এবং আর ৬ জন গ্রেপ্তার। মেহারকালী বাড়ীর সুধীর ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার।

দিনাজপুর—১১ই মাঘ ৫ সহস্রাধিক লোক কর্ত্তৃক বালুরঘাট দেওয়ানী আদালত, সাবট্রেজারী, সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক, য়ুনিয়ন বোর্ড অফিস ও অন্যান্য সরকারী অফিসে হানা দিবার অভিযোগে ৫৭ জন যুবকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া দাঙ্গা, গৃহদাহ, অনধিকার প্রবেশ, বলপূর্ব্বক অর্থলুণ্ঠন, ধ্বংসমূলক কার্য্য প্রভৃতির অভিযোগে মামলা আরম্ভ।

বোম্বাই—২৩শে পৌষ—সুরাট জিলার করাদী সাতওয়াদে পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষের ফলে কয়েক জন হতাহত। ২৪শে পৌষ আমেদাবাদে পুলিসের গুলী চালনে ১ জন নিহত। বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রি-মণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্রের এক গৃহে বোমা বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড। লুসানাবাদ পুলিশ ফাঁড়ীর নিকট বোমাবিস্ফোরণ। গোয়া হইতে আসিবার কালে বন্দুক ও কার্ত্তুজাদিসহ দুই জন গ্রেপ্তার। ২৬শে নদিয়াদের এক হাই স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ। এ সম্পর্কে ১১ জন গ্রেপ্তার। ২৭শে আমেদাবাদে ওয়ার্দ্ধান কাম্পের এক জেলখানার সম্মুখে বোমা-বিস্ফোরণ। আমেদনগরে বালাপুর ডাকঘরে বোমা বিস্ফোরণ। ২৮শে—আমেদাবাদে লালদীঘির নিকট ও অপর ২ স্থানে বিস্ফোরণ। ২ জন আহত। ২৮শে—বোম্বাইএর সহরতলীতে কংগ্রেসের কার্য্য সম্পর্কে ১২।১৪ জন গ্রেপ্তার। ২৯শে আমেদনগরে এক চাবাদী ভস্মীভূত। আমেদাবাদে চলন্ত ট্রেণ হইতে দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত। সুরাটে এক ব্যবসায়ীর গৃহের ছাদে বোমা বিস্ফোরণ। ২রা মাঘ কলবাদেবী ডাকঘরে বোমা বিস্ফোরণ ৫ জন সামান্য দগ্ধ। আমেদাবাদের ধানসুভার ষ্ট্রীটে এক পুলিস-বাহিনীর নিকট বোমা বিস্ফোরণ। সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক সাতারার সেচবিভাগের সোনেরালী বাংলা আক্রান্ত। প্রহরীদিগকে পরাজিত করিয়া জনতার অগ্নিদান। ৩রা—আমেদনগরের টেলিফোন আফিস, স্কুল ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিস্ফোরণ, ২ জন আহত। বেলগাঁও জিলার ১৫টি গ্রাম্যদপ্তর ভস্মীভূত, ধর্ম্মশালা ও হাইস্কুলে বিস্ফোরণ, মেলব্যাগ লুণ্ঠন। সাপুর (হুবলী) সরস্বতী গার্লস হাইস্কুলে বিস্ফোরণ। ডাকহরকরাগণ আক্রান্ত হওয়ায় সাতারার ৮টি ডাকঘর বন্ধ। করাদ তালুকে ব্যাপক তল্লাসী। কারাগার হইতে মুক্তিদানের পর কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্দ্ধনের ভ্রাতা রাওসাহেব পটবর্দ্ধন পুনরায় আটক। পূর্ব্ব-খান্দেশ জিলার যাবল মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল। সুরাট জিলার সর্ব্বপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদ আমদানী নিষিদ্ধ। যুক্ত প্রদেশের শীতলপুর জিলার হিন্দুস্থান সুগার মিলস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট বোম্বাইএর বাছরাজ কোম্পানীতে জমা ৭২ হাজার টাকা নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির টাকা অনুমান করিয়া বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ। বেলগাঁও সহরের এক দোকানের সম্মুখে জলগাঁওএর নন্দুরগড়ে ও সুরাট সহরে এক গৃহের ছাদে বোমাবিস্ফোরণ। ৬ই—আমেদাবাদ সহরে সান্ধ্য আদেশ জারী। বোরসাদে মামলতদারের রেকর্ড-ঘরে বিস্ফোরণ। আনন্দ ষ্টেশনে ট্রেণের কামরায় বোমা। ৭ই বেলগাঁওএ মার্কেট পুলিশ চৌকীর নিকট বিস্ফোরণ। আঁকলি পুলিশ ফাঁড়ি, শোলাপুর বিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে অগ্নিকাণ্ড। ৮ই—আমেদাবাদে জনতার উপর লাঠিচালন, এক স্থানে জনতার এসিড নিক্ষেপ। ৯ই—আমেদাবাদে সেচ বিভাগের এক বাংলোয় অগ্নিদান, প্রহরিগণ প্রহৃত, এক হাইস্কুলে অগ্নিদান। ১০ই—পুণা ক্যান্টনমেন্টে এক রঙ্গালয়ে বিস্ফোরণ, ৮৭ জন আহত, ২ জনের মৃত্যু। ১১ই—আমেদাবাদে কয়েক স্থানে এসিড নিক্ষেপ। ১২ই আমেদাবাদে এক জনতার উপর গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত, এক পুলিশ চৌকীতে বোমা নিক্ষেপ। ১৩ই—আমেদাবাদ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডের আফিসের প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ, নাসিকের সাতাল গ্রামে বহু অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। নাদিয়াদে চৌককোর্টের নিকট, বাদ্দোলীর এক গ্রামের বিবাহবাসরে, বেলগাঁওএর খাদেবাজার সরকারী কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সে ও সাহাপুর সরস্বতী বিদ্যালয় গৃহের সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণ। ১৪ই—আমেদাবাদের জাভেরীবাদে পুলিসের উপর বোমা নিক্ষেপ, ১ জন পুলিশ আহত। ১৫ই—বেলগাঁও জিলায় মেলব্যাগ লুণ্ঠিত হইতে থাকায় ৫টি ডাকঘর বন্ধ। ১৭ই গিরগাঁও রোডের এক মোড়ে প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ, ২ জন কনষ্টেবল আহত, ১৭ জন গ্রেপ্তার। সুরাটে নাসিকের জেনারল পোষ্টআফিসে বোমা বিস্ফোরণ। ১৯শে—পুণায় যোগেশ্বরী মন্দিরের পূজারীর নিকট হইতে ৬টি বোমা ও কতকগুলি বোমার পলিতা প্রাপ্তি। শ্রীযুত বি, পি কার্ণিকের গৃহ হইতে বহু রাসায়নিক দ্রব্য প্রাপ্তি। পুণায় শ্রীযুত কার্ণিকের বিষ খাইয়া আত্মহত্যা।

সিন্ধু—৭ই মাঘ রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করিবার অভিযোগে সক্করের ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র হেমু কালানীর ফাঁসী। করাচীর স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের বিক্ষোভ প্রদর্শন। ৮ই লারকানার দেওয়ানী আদালতের রেকর্ড ঘরে অগ্নিকাণ্ড। ১০ই করাচীতে

বন্দর রোডে এক বিস্ফোরণের ফলে ১ জন আহত, এ-সম্পর্কে তদন্ত কালে বিপ্লবী দলের এক প্রধান আড্ডা ও গুপ্ত মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার। এ সম্পর্কে এক জন ওয়ার্ডেনকে আহত অবস্থায় এক ধর্ম্মশালায় গ্রেপ্তার।

দিল্লী—২৪শে পৌষ কংগ্রেস-পতাকা সহ শোভাযাত্রা বাহির করিবার কালে ৪ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার। যুক্ত প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক পলাতক বলিয়া ঘোষিত যুক্ত প্রদেশের ৪ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার। ৪ঠা মাঘ পুলিশ কর্ত্তৃক এক তালাবদ্ধ গৃহে সাড়ে ১৭ হাজার কংগ্রেস বুলেটিন ও এক হাজার ২৫ কপি 'আমাদের আজিকার সংগ্রাম' পুস্তক হস্তগত। ১২ই পুরাতন দিল্লীর এক নাট্যশালায় বিস্ফোরণ।

মধ্যপ্রদেশ—সেগাঁও আশ্রমের অধ্যাপক ভাঁসালী মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত চিমুর ও অস্থির ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের দাবী করিয়া ১০ই নভেম্বর হইতে ৬৩ দিন মৃত্যুপণ অনশন করেন। সরকার এ সম্পর্কে সকল সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। সরকার আপোষে সম্মত হওয়ায় ২৭শে পৌষ তাহার অনশন ভঙ্গ এবং ২৮শে মাঘ পুনরায় অনশন আরম্ভ। ২১শে পৌষ নাগপুর সিটি পোষ্ট আফিসে অগ্নিদান ও লুণ্ঠনের অভিযোগে ১৩ জনের কারাদণ্ড। ৪ঠা মাঘ—নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় মগনবাড়ীতে (ওয়ার্দ্ধা) পুলিশের তল্লাসী। ৫ই—নিমার জিলার বুরহানপুর মিউনিসিপ্যালিটী বাতিল। ১৮ই—জনতা কর্ত্তৃক অস্থি ষ্টেশন আক্রমণ, ১ জন দারোগা, ২ জন কনষ্টেবল হত্যা সম্পর্কে নাগপুর হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড ও অপর ৪৮ জনের পূর্ব্ব দণ্ড বহাল।

বিহার—১২ই মাঘ—ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে কংগ্রেসী বিচারাধীন বন্দী ও অপর বন্দীদিগের বিদ্রোহের ফলে ২ জন জেল কর্ম্মচারী ও ১ জন শাস্ত্রীকে হত্যা ও গুদামে অগ্নিদানের ফলে ২ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি করিবার অভিযোগে ৩ জন মৃত্যুদণ্ড, ৪ জন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড ও ২৪ জন ৩ হইতে ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। এই বিদ্রোহে গুলীচালনের ফলে ২৮ জন বন্দী নিহত ও ৮৬ জন আহত।

আসাম—২৭শে পৌষ পর্য্যন্ত জোড়হাট মহকুমায় ২১১ জন গ্রেপ্তার, ৬৬ জন দণ্ডিত, ১৫০ জন বিচারাধীন। ধৃতদিগের মধ্যে ৭৩ জন ছাত্র। নওগাঁর বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বড়-কাকতি ও শ্রীযুত নীলকান্ত মহান্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত। রাজনগরের (শ্রীহট্ট) শ্রীঅরুণ হালদারের ১ মাস কারাদণ্ড। মিছিল ও আদালতে পিকেটিং করিবার জন্য শ্রীঅমর চৌধুরীর ১ বৎসর কারাদণ্ড। সম্প্রতি কারামুক্ত তেজপুরের শ্রীঅজয় চালিহা ভারত-রক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। নওগাঁ সহরের উপকণ্ঠে বেঙ্গালআটি গ্রামে তল্লাসী করিয়া পুলিস কর্ত্তৃক ৫ জন গ্রেপ্তার, আমবাগান গ্রামে শ্রীঅমূল্যকুমার লাহিড়ী গ্রেপ্তার। গৌহাটীর উকিল শ্রীযুত দেহীরাম বর্ম্মণ এবং টিহুরের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীঅরুণচন্দ্র গোস্বামী গ্রেপ্তার। নওগাঁয় সাহিত্যিক শ্রীঅমলেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উকীল শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ হাজারিকা ও কবিরাজ শ্রীযুত পরমানন্দ ওঝা ধৃত। জোড়হাটের মেলেং হাটখোলার এক বাংলো ও মদের দোকান ভস্মীভূত। গ্রামের মণ্ডল সহ আট জন গ্রেপ্তার। ২৮শে—তেজপুর সার্কেল আফিস ভস্মীভূত। ৩রা মাঘ—শ্রীহট্টে ৬ মাসের জন্য সভা ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ। ৬ই—গৌহাটীর ডাঃ এইচ, কে, দাসের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দাস, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অমলপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভা দাস আটক। ৭ই—আসাম প্রাদেশিক জমিয়ৎ-উল-উলেমার বিশিষ্ট সদস্য মৌলভী খলিলুর রহমান গ্রেপ্তার। ৯ই—ছয় দিনে নওগাঁ জিলার ৫৭ জন গ্রেপ্তার। তিহুরের ডাঃ দীননাথ দাস ও তাঁহার পুত্র শ্রীনীল দাস গ্রেপ্তার। ১৩ই পাঠশালা রেলওয়ে ষ্টেশনে বিস্ফোরণ।

উড়িষ্যা—৭ই মাঘ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার জনবিক্ষোভ সম্পর্কে ভারতরক্ষা বিধির ২৩ ধারা অনুসারে মোট ২১৮ জন গ্রেপ্তার ও আটক।

মান্দ্রাজ—২০শে মাঘ—স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মান্দ্রাজের নেতা শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তিকে মুক্তিদান।

সামন্ত রাজ্য—২৫শে পৌষ কোলাপুর প্রেসিডেন্টের কার্য্যালয়ে 'মর্চ্চা' লইয়া যাইবার জন্য ৪ জন মহিলা গ্রেপ্তার। কোলাপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি মিঃ এম, ডি, শ্রেষ্ঠী এবং ১২ জন প্রজাপরিষদের কর্ম্মী ধৃত। ২৭শে রাজকোটে এক সিনেমা-গৃহে ও শস্যবাজারে বোমা বিস্ফোরণ। ২৯শে—বাঙ্গালোর সেনট্রাল জেল হইতে শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে মুক্তি দিয়া মহীশূর হইতে নির্ব্বাসন করা হইলে বৃটিশ পুলিশ কর্ত্তৃক তিনি ধৃত ও ভেলোরে প্রেরিত। ১লা মাঘ কোলাপুরের এক স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট এক স্থানে অগ্নিকাণ্ড। শোলাপুরের একগ্রাম হইতে ২খানি তরবারি ও বন্দুক আবিষ্কার। ১৩ই, কোলাপুর রাজ্যের শিরোলপেঠাতে ১৪৫ জন সশস্ত্র লোক কর্ত্তৃক চাবাদী আক্রমণ।

সীমান্ত-প্রদেশ—১১শে দায়রা জজের আদালতে প্রবেশ করিবার চেষ্টায় ৫ জন লাল কোর্ত্তা গ্রেপ্তার।

যুক্তপ্রদেশ—২৭শে মাঘ রাত্রিতে কানপুর সেনট্রাল ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ, ৩ জন নিহত, কয়েক জন আহত, বিস্ফোরণের ফলে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরার ক্ষতি ও ষ্টেশনের এক ছাদ ও সিঁড়ির ক্ষতি। ২৮শে—কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য অধ্যাপক চন্দ্রভাই জহুরীর বিনাসর্ত্তে মুক্তির পর মৃত্যু।

২৯শে মাঘ—ভারত-সচিব কমন্স সভায় জানাইয়াছেন, ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গণবিক্ষোভ সম্পর্কে ৬০ হাজার ২২৯ জন গ্রেপ্তার, ৩১ হাজার ৪১৮ জন আটক, ৪৭০ ক্ষেত্রে পুলিশ কর্ত্তৃক ও ৬৮ ক্ষেত্রে সৈন্যদল কর্ত্তৃক গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে। এই দিন কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সদস্য জানান, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ৬০ হাজার ২২৯ জন গ্রেপ্তার, ২৬ হাজার জন দণ্ডিত, ১৮ হাজার লোক ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে আটক, পুলিশ ও সৈন্যের ৫৩৮ বার গুলীবর্ষণে ৯৪০ জন নিহত; ১ হাজার ৬৩০ জন আহত। কত জনের প্রাণদণ্ড হইয়াছে জানান হয় নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফুলধনুর জয়যাত্রা

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত
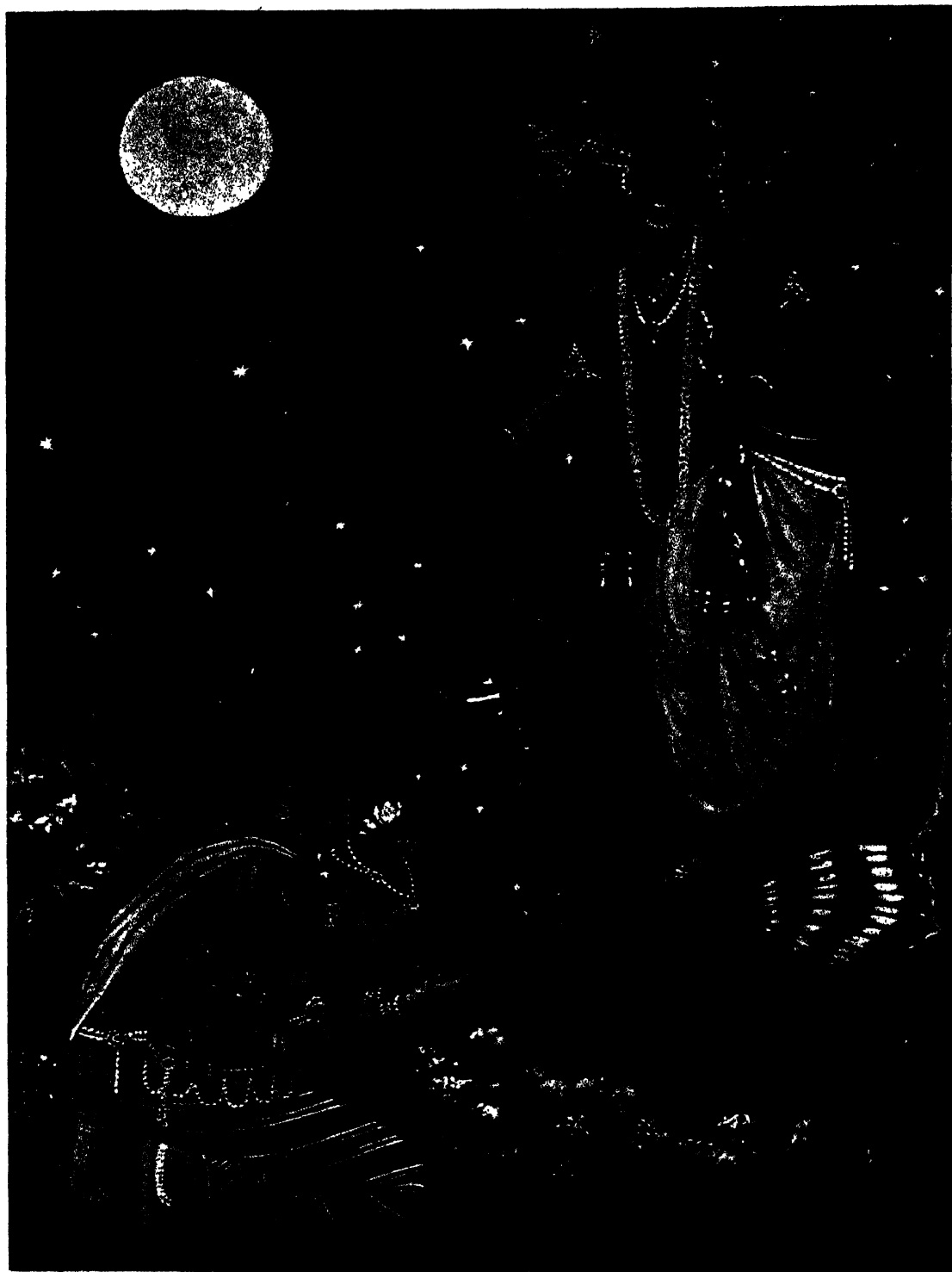
২১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৯ [৫ম সংখ্যা

রস

১৩

মহর্ষি রৌদ্র-রস সম্বন্ধে একটি বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—রাক্ষস-দানব প্রভৃতির রৌদ্র-রস—এ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। রৌদ্র-রস কি কেবল ইহাদেরই একচেটিয়া, অন্যের পক্ষে রৌদ্র-রস থাকা কি সম্ভবই নহে? ইহার উত্তরে মহর্ষি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অন্যেরও রৌদ্র-রস সম্ভব; তবে রাক্ষস-দানবাদির রৌদ্র-রস থাকিবেই থাকিবে—ইহাই মাত্র বিশেষ। রাক্ষসাদিতেই রৌদ্র-রসের যথার্থ অধিকার; কারণ, তাহারা স্বভাবতঃই রৌদ্র-প্রকৃতিক (১)। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—রাক্ষসাদিও ত নিজ পরিজনবর্গের প্রতি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধভাব প্রদর্শন করে না, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে স্বভাবতঃ রৌদ্র-প্রকৃতিক বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—ইহারা বহু-বাহুবিশিষ্ট, বহু-মুখ, উন্নত-বিকীর্ণ-পিঙ্গল-কেশধারী, বৃত্তাকারে ঘূর্ণ্যমান রক্তনেত্র-যুক্ত, ভীমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; অর্থাৎ—সাধারণ জনগণের আকৃতির বিপরীত আকৃতি তাহাদিগের। তাহার উপর পর-বিনাশের অভিসন্ধি-জনিত উগ্র তপশ্চর্য্যা অথবা অন্য নানারূপ দুষ্ট কর্ম্মেও তাহাদিগকে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ঐ সকল উগ্র ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, তখনও কিন্তু কেবলই অনুমান-বশতঃ মনে হইতে থাকে যে, ইহাদিগের অন্তরে ঐ সকল উগ্র ক্রোধাত্মক অভিসন্ধি রহিয়াছে। তবে তখন উহার অভিব্যক্তি দৃষ্ট না হওয়ায় সামাজিকগণের রৌদ্র-রসাস্বাদ হয় না। অতএব ক্রোধকালে ইহাদিগের যে রৌদ্র-ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ইহাদিগের মধ্যে সতত বিদ্যমান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইহাদিগের যেন ক্রোধের প্রতিই অনুরাগ—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। কেবল কি আকৃতিই ইহাদিগের এইরূপ রৌদ্রস্বভাবের অনুকূল? ইহাদিগের বাগঙ্গ-চেষ্টাও যাহা যাহা দেখা যায়—সে সকলই রৌদ্র-রসের আস্বাদজনক। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বাচিক বা কায়িক ব্যাপার ইহারা আরম্ভ করে—সে সকলই রৌদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমন কি দেখা যায়—যখন তাহাদিগের অন্তরে রৌদ্র-ভাব জন্মে নাই, তখনও তাহারা যে সকল বাচিক বা কায়িক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে, সেগুলির মধ্যেও তাড়নাদি ক্রিয়ার প্রাধান্য রহিয়াছে। কাব্যে তাহার বর্ণনা অথবা নাট্যে সেই ব্যাপারগুলির প্রয়োগ রৌদ্র-রস আস্বাদনের হেতু হইয়া উঠে (২)।

---

(১) স্বভাবতঃই রৌদ্র-প্রকৃতিক, 'স্বভাবতঃ রৌদ্র' প্রভৃতি বাক্যাংশ হইতে বুঝিতে হইবে যে—রাক্ষসাদিকে দেখিলে স্বতঃই তাহাদিগের রৌদ্র-ভাবের কথা মনে উঠিয়া থাকে। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, এই কারণেই মহর্ষি তাহাদিগের অঙ্গাদিতেও (আকৃতিতেও) রৌদ্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন। অন্যথা তাহাদিগের রৌদ্র স্বভাবটি কেবল রক্তনয়নাদির বর্ণনা-দ্বারাই পরিস্ফুট হইতে পারিত—সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিহেতু বহু বাহু-মুখ প্রভৃতি বিকট আকৃতির বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। এই বিকট আকারের বর্ণনা মহর্ষি দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় যে, যখন তাহাদিগের অন্তরে রৌদ্রভাবের প্রকাশ থাকে না, তখনও তাহাদিগের আকৃতি হইতে তাহাদিগকে রৌদ্র বলিয়াই মনে হয়।

(২) এ স্থলে অভিনব গুপ্ত কেবল বাচিক ও কায়িক ব্যাপারেরই উল্লেখ করিয়াছেন—মানস চেষ্টার কোন উল্লেখই করেন নাই। তাহার কারণ—মানস চেষ্টা অপ্রত্যক্ষ। উহা যখন দর্শনগোচর হইতে পারে না, তখন উহা রৌদ্র-ভাবাপন্ন কি না, বুঝিবার উপায় নাই। কেবল

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন—এই সকল রাক্ষসাদি প্রায়ই বলপূর্ব্বক অতি ক্রূরভাবে শৃঙ্গার-সেবা করিয়া থাকে। অভিনব বলিয়াছেন—'শৃঙ্গার' বলিতে এ ক্ষেত্রে 'শৃঙ্গারের বিভাব' বুঝাইতেছে। শৃঙ্গার-রসের ত আর ক্রূরভাবে আস্বাদন সম্ভব হয় না। অতএব, শৃঙ্গারের আলম্বন প্রমদা বা উদ্দীপন উদ্যানাদি তাহারা বলপূর্ব্বক উপভোগ করে—ইহাই অভিনবের উক্তির তাৎপর্য্য। তবে ইহা প্রায়িক। এ কারণে ক্বচিৎ কদাচিৎ তাহাদিগের অনুনয়পূর্ব্বক শৃঙ্গারাস্বাদও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; অর্থাৎ—কখনও কখনও তাহারা বলপূর্ব্বক উপভোগের পরিবর্ত্তে প্রার্থিরূপেও উপভোগ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, যাহারা রাক্ষসাদির অনুগামী বা অনুকারী, তাহাদিগের ক্ষেত্রে সংগ্রাম-সম্প্রহারাদি-জনিত রৌদ্র-রস বর্ত্তমান—ইহা অনুমান-দ্বারা বুঝিতে হইবে। যাহারা উদ্ধত-প্রকৃতির মনুষ্য—তাহাদিগের ক্ষেত্রে রৌদ্র-রস কিরূপে সম্ভব? কারণ, তাহারা ত আর রাক্ষসাদির ন্যায় বহু বাহু প্রভৃতি বিকট অঙ্গবিশিষ্ট নহে। ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—এই প্রকৃতির মনুষ্যগণ রাক্ষসাদির অনুকারী। তাহারা তামস-প্রকৃতিক, অতএব রাক্ষসাদির সদৃশ—অনুগামী—ইহা বুঝিতে হইবে। যদিও তাহাদিগের ঊর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত পিঙ্গল কেশরাজি, বহু বাহু প্রভৃতি নাই, তথাপি তাহারা সংগ্রাম-সম্প্রহার-তাড়ন-পাটনাদি যে সকল কার্য্যে অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে, সেই সকল ক্রোধোচিত বাচিক ও আঙ্গিক চেষ্টা দর্শনে তাহাদিগকে রৌদ্র-প্রকৃতিক বলিয়া বুঝা যায়। পক্ষান্তরে, যাঁহারা বীর-রস-প্রধান (যথা, অশ্বত্থামা, পরশুরাম প্রভৃতি), তাঁহাদিগেরও ক্রোধ কারণের গুরুত্ব বশতঃ রৌদ্ররস-রূপে আস্বাদনযোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ—এই সকল বীর-প্রধান ব্যক্তির আকৃতি বা প্রকৃতিতে রৌদ্র-ভাব স্বভাবতঃ বর্ত্তমান না থাকিলেও গুরুতর কারণে ইহারা কখনও কখনও এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন যে, সেই ক্রোধ স্থায়িভাব রৌদ্র-রসে পর্য্যবসিত হয়। ইঁহারা স্বভাবতঃ বীর-প্রকৃতিক—কিন্তু বিশেষ কারণে রৌদ্র-রসের আলম্বন হইয়া উঠেন—ইহাই তাৎপর্য্য। আবার দেখা যায় যে, যথাযোগ্য কারণ-বশে রাক্ষসাদিরও হাস-শোকাদি স্থায়িভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে ও তাহার ফলে তাহাদিগের চিত্তগত স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ-ভাব এই সকল হাস-শোকাদি ভাব-দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়; অর্থাৎ—স্বভাবতঃ রৌদ্র-প্রকৃতিক রাক্ষসাদিকেও বিশেষ বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে হাস্য-করুণাদি রসের আলম্বন হইতে দেখা যায়। অতএব, রাক্ষসাদির যে কেবল রৌদ্ররসই—অন্য রস সম্ভব নহে—ইহা মহর্ষির অভিমত নহে।

এখন আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। রাক্ষসাদি বা উদ্ধত-প্রকৃতিক মনুষ্যাদির না হয় রৌদ্ররস সম্ভব হইল, কিন্তু সামাজিক-গণের কিরূপে রৌদ্র-রসাস্বাদ হওয়া সম্ভব? রৌদ্র-রসের আস্বাদন ক্রোধাত্মক। রাক্ষসাদি স্বভাব-রৌদ্র। তাহাদিগের পক্ষে ক্রোধাত্মক আস্বাদ স্বাভাবিক। কিন্তু রাক্ষসাদিগত ক্রোধের অভিব্যক্তি দর্শনে সহৃদয় দর্শক-সামাজিকগণের অন্তরেও যে ক্রোধাত্মক আস্বাদ জন্মিবে, তাহার নিশ্চিত হেতু কি? সাধারণতঃ সামাজিকগণ ত আর রৌদ্র-প্রকৃতিক হইতে পারেন না। অতএব, অপরের ক্রোধদর্শনে তাঁহাদিগের চিত্তে ক্রোধের উদয় হইবে কেন? ইহার উত্তরে অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—'আস্বাদ' বলিতে বুঝায় হৃদয়ের একতানতা বা হৃদয়-সংবাদ। দর্শক সাধারণতঃ নানা প্রকৃতির হইয়া থাকেন। কেহ উত্তম সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক, কেহ মধ্যম রাজস-প্রকৃতিক, আর কেহ বা অধম তামস-প্রকৃতিক। যাঁহারা সম-প্রকৃতিক, তাঁহাদিগের পরস্পর হৃদ্‌গত ভাবের ঐক্য বা হৃদয়-সংবাদ দেখা যায়। ক্রোধে এই প্রকার হৃদয়-সংবাদ কেবল তামস-প্রকৃতিক সামাজিকগণের সহিত রাক্ষসাদির (বা তদনুকরণশীল নটাদির) হইয়া থাকে। কারণ, তামস-প্রকৃতিক দর্শকগণ দানবাদি-সদৃশ। এই হেতু তাঁহারা রাক্ষসাদির ক্রোধাভিব্যক্তি দেখিতে দেখিতে হৃদয়-সংবাদ-বশতঃ তন্ময় হইয়া ঐ সকল অন্যায়কারী রৌদ্র-প্রকৃতিক রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ক্রোধ-ভাব আস্বাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে রৌদ্র-রস-নিষ্পত্তি ঘটে (৩)।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রৌদ্র-রসের স্বরূপটি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন—

যুদ্ধ, প্রহার, ঘাতন, বিকৃত-চ্ছেদন, বিদারণ, সংগ্রাম-নিমিত্ত সম্ভ্রম প্রভৃতি হইতে রৌদ্ররস সঞ্জাত হইয়া থাকে (৪); অর্থাৎ—এইগুলি রৌদ্র-রসের উদ্দীপন-বিভাব (৫)।

নানা-প্রহরণ-নিক্ষেপ, শিরোদশ-কবন্ধ-ভুজ-কর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার-বিশেষ-দ্বারা এই রৌদ্র-রসের অভিনয় কর্ত্তব্য; অর্থাৎ—এইগুলি রৌদ্র-রসের অনুভাব (৬)।

বাচিক ও কায়িক চেষ্টাতেই রৌদ্রের আভাস পাওয়া যায়—"চিত্ত-স্তাবিকারেঽপি যচ্চেষ্টিতং বাচিকং কায়িকং বা তদেবাং তাড়নাদি-প্রধানমিতি দৃশ্যমানং কাব্যে প্রয়োগে চ রৌদ্রাস্বাদহেতু···মানসস্তু চেষ্টিতপ্রত্যক্ষমারোক্তম্"—অভিনবভারতী, বরোদা সংস্করণ নাট্য-শাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩।

(৩) "ননু সামাজিকানাং তথাভূতরাক্ষসাদিদর্শনে কথং ক্রোধাত্মক আস্বাদঃ? উচ্যতে—হৃদয়সংবাদ আস্বাদঃ। ক্রোধে চ হৃদয়সংবাদস্তামসপ্রকৃতীনামেব সামাজিকানামিতি দানবাদিসদৃশাস্তন্ময়ী-ভূতা এবান্যায়কারিবিষয়ং ক্রোধমাস্বাদয়ন্তীতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্"—অভিনবভারতী, পৃঃ ৩২৪।

(৪) প্রহার—আঘাত করা, মারা; "fighting"—Dr. Mukherjee. ঘাতন—মারিয়া ফেলা; "beating"—Dr. Mukherjee. বিকৃতচ্ছেদন—যে ভাবে কাটিলে অঙ্গ-বিকৃতি হইয়া থাকে; "deforming cuts"—Dr. Mukherjee. "বিকৃতং যচ্ছেদনং ব্যঙ্গাদিকরণং"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪। মূলে আছে—"সংগ্রামসম্ভ্রমাদ্যৈঃ"। অভিনব গুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—"সংগ্রামায় সম্ভ্রমঃ শস্ত্রাহরণে ত্বরা"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪; অর্থাৎ—সংগ্রামের নিমিত্ত যে সম্ভ্রম—অস্ত্র-শস্ত্রাদি আনয়নে যে ত্বরা। Dr. Mukherjee অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—'সংগ্রাম, সম্ভ্রম প্রভৃতি হইতে'—"from wars, from confusions, etc."

(৫) অভিনব বলিয়াছেন—এই সকল যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অনুমিত পর-চিত্ত-গত যে ক্রোধ, তাহাই এস্থলে বিভাব—অর্থাৎ উদ্দীপন বিভাব—"যুদ্ধাভ্যনুমিতস্য পরক্রোধাদের্বিভাবত্বমুক্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪।

(৬) কবন্ধ—মুণ্ডহীন দেহ; "trunk"—Dr. Mukherjee. এই সকল কার্য্যে মারণের প্রাধান্য আছে বলিয়াই ক্রোধের আতিশয্য
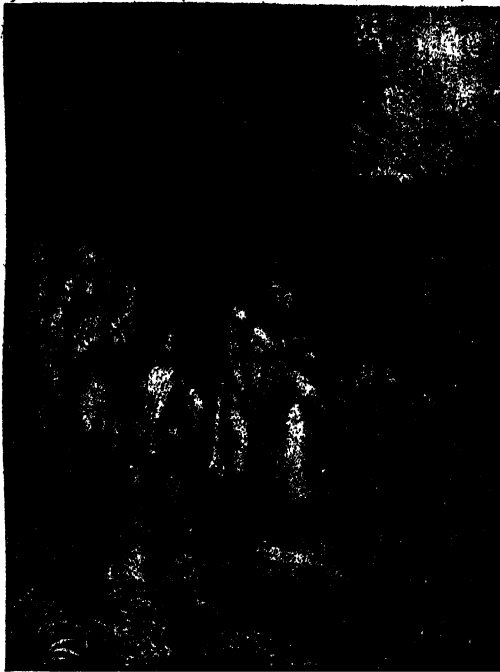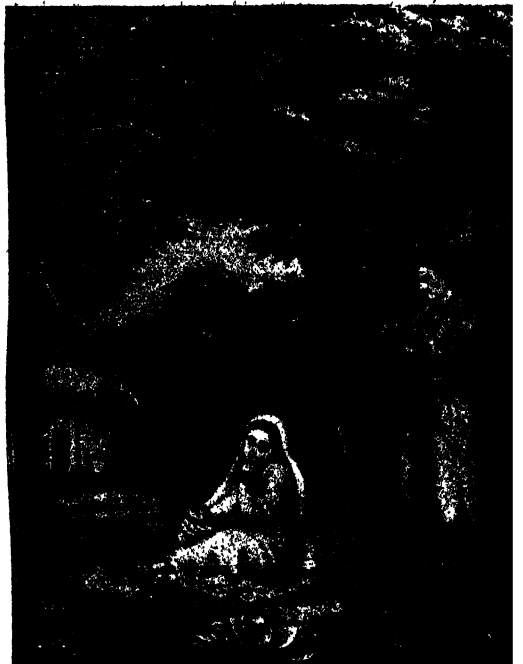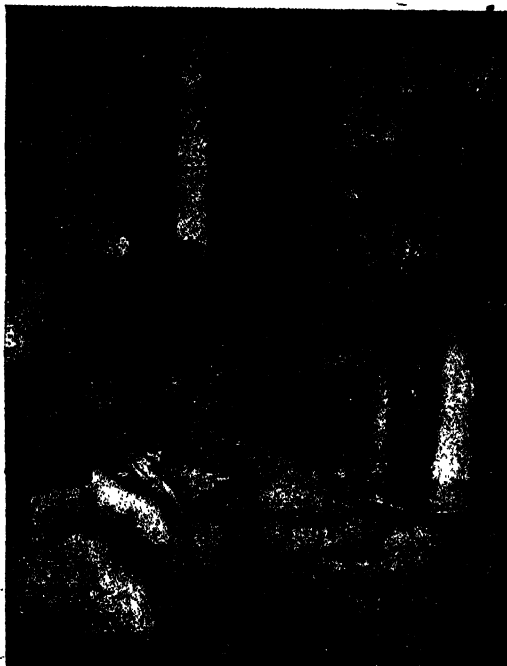
আদি-রস

করুণ-রস

হাস্য-রস

রৌদ্র-রস

রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বহুব্যয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিচ্ছবি

ইহার পর স্বরচিত একটি শ্লোক-দ্বারা ভরতমুনি রৌদ্র-রস-প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন—(৭)

দেখা যায়—রৌদ্র-রস রৌদ্র-ভাবাপন্ন বাগঙ্গ-চেষ্টা-সংযুক্ত, শস্ত্র-প্রহার-ভূয়িষ্ঠ ও উগ্রকর্ম-ক্রিয়াত্মক (৮)।

নাট্যশাস্ত্রের রৌদ্র-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণ-কার বলিয়াছেন—রৌদ্র-রসের স্থায়িভাব ক্রোধ, বর্ণ রক্ত, দেবতা রুদ্র, আলম্বন অরি, তাহার চেষ্টা উদ্দীপন। এই চেষ্টা কিরূপ, তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—মুষ্টি-প্রহার, পতন, বিরুদ্ধাচরণ (বিকৃত), (খড়্গাদি দ্বারা) ছেদন, (শূলাদি দ্বারা) অবদারণ (বিদারণ), সংগ্রাম-সম্ভ্রম প্রভৃতি দ্বারা রৌদ্র-রসের পূর্ণ দীপ্তি হইয়া থাকে। ভ্রূ-বিভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দ্দংশ, বাহুস্ফোটন, তর্জ্জন, আত্মাবদান-কথন, আয়ুধোৎক্ষেপণ, উগ্রতা, আবেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মদ, আক্ষেপ, ক্রূরসন্দর্শনাদি ইহার অনুভাব (৯)। আর মোহ, অমর্ষ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

শ্রীভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার' নাটকের অশ্বত্থামার উক্তি একটি শ্লোক রৌদ্র-রসের উদাহরণরূপে দর্পণ-কার উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে অর্জ্জুনাদি শত্রুপক্ষগণ অশ্বত্থামার ক্রোধের আলম্বন-বিভাব, অর্জ্জুনাদি-কৃত দ্রোণ-বধ-রূপ অকার্য্য উদ্দীপন-বিভাব, অশ্বত্থামার গর্জ্জনাদি অনুভাব ও গর্জ্জন হইতে অভিব্যক্ত গর্ব্ব ও অমর্ষ (ক্রোধ—অসহনশীলতা) ব্যভিচারী। এইরূপে অশ্বত্থামার ক্রোধ সামাজিকগণ-কর্ত্তৃক আস্বাদ্যমান হইয়া রৌদ্ররসের জনক হইতেছে (১০)।

দর্পণ-কার যুদ্ধবীর হইতে রৌদ্র-রসের ভেদ দেখাইয়াছেন—রৌদ্র-রসে মুখ ও নেত্রের রক্তবর্ণতা যুদ্ধবীর হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া থাকে। রৌদ্র-রসে যেরূপ, যুদ্ধ-বীরেও সেইরূপ—রিপুই আলম্বনবিভাব। অতএব, এরূপ আশঙ্কা ত হইতে পারে যে, রৌদ্র-রসে ও যুদ্ধ-বীরে বিশেষ কোন ভেদ নাই। দর্পণ-কার বলিয়াছেন—রৌদ্র-রসে মুখ-নেত্রাদি রক্তবর্ণ ধারণ করে, যুদ্ধ-বীরে তাহা করে না—ইহাই উভয়ের পার্থক্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—রক্তবর্ণ মুখ-নেত্রাদি হইতে অভিব্যক্ত ক্রোধই উভয়ের পার্থক্য সূচনা করে; অর্থাৎ—রৌদ্র-রস ও যুদ্ধ-বীর উভয় স্থলেই যদিও রিপুই আলম্বন-বিভাব, তথাপি যে ক্ষেত্রে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তথায় রৌদ্র-রস ও যথায় উৎসাহের আবির্ভাব, তথায় যুদ্ধ-বীর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (১১)।

সাহিত্য-দর্পণের রৌদ্ররস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর এ সম্বন্ধে শারদাতনয়-কথিত ভাবপ্রকাশনের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

রৌদ্রের বিভাব 'খর'। রৌদ্রের আলম্বন—বহু-বাহু, বহু-মুখ, ভীমদংষ্ট্র, সিতাঙ্গ—ক্রূর, উদ্বৃত্ত, শঠ প্রভৃতি (১২)।

ক্রোধ-স্থায়িভাব রৌদ্র-রসের উপাদান-হেতু। ক্রোধ তেজের জনক। ইহার ত্রিবিধ ভেদ—(১) ক্রোধ, (২) কোপ ও (৩) রোষ।

হর্ষ-আবেগ-উগ্রতা-উন্মাদ-মদ-গর্ব্ব-চাপল-ঈর্ষ্যা-অসূয়া-শ্রম-অমর্ষ-অবহিত্থ-অপত্রপা-নিশ্বাস-স্তম্ভ-রোমাঞ্চ-স্বেদ—এই ভাবগুলি রৌদ্র-রসের অনুকূল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রৌদ্র-রসের বিভাবসমূহ খর-ভাবাপন্ন। যখন এই খর বিভাবগুলি স্বানুকূল অন্য যথাযোগ্য ভাবান্তর-সমূহের সহিত নাট্যাভিনয়-দশায় সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবের (ক্রোধের) অনুগামী হয়, তখন প্রেক্ষকগণের মন অহঙ্কারযুক্ত ও রজস্তমোন্বিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দশাপন্ন মনের যে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম রৌদ্র-রস (১৩)।

বাসুকি-মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রসোৎপত্তি বর্ণনার পর শারদাতনয় নারদ-মতেও রসোৎপত্তি-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। এ মতে—বাহ্য-বিষয়াশ্রিত রজ-স্তমোহঙ্কার-যুক্ত মনের যে বিকার, তাহাই সূচিত হইতেছে। অন্য প্রকার বীর-রসের কথা দূরে থাকুক, যুদ্ধ-বীরেও এইরূপ মারণ-প্রাধান্য বা ক্রোধাতিশয্য থাকে না। এইখানেই বীর হইতে রৌদ্রের ভেদ—"মারণপ্রাধান্যং নানাপ্রহরণেন দর্শয়তি...ক্রোধাতিশয়ং সূচয়ন্ বীরাদ্ভেদমাহ। যুদ্ধবীরেঽপি হি তন্নাস্তি"—অ: ভা: পৃ: ৩২৪—২৫।

---

(৭) "ভরতমুনিশ্চৈকেন শ্লোকেনোপসংহরতি"—অ: ভা: পৃ: ৩২৫।

(৮) উগ্রকর্ম্মক্রিয়াত্মক—উগ্র অর্থাৎ উগ্র-ভাব-প্রধান যে সকল কর্ম্ম—শিরশ্ছেদ প্রভৃতি, তাহাদিগের যে ক্রিয়া অর্থাৎ অভিনয়, তাহাই যাহার আত্মা অর্থাৎ তাহাই যাহাতে প্রধান—এইরূপ অর্থ অভিনব করিয়াছেন।

(৯) ওষ্ঠনির্দ্দংশ—নির্দ্দয়ভাবে ওষ্ঠদংশন; ৺চণ্ডীতে মহাসুরগণের বর্ণনায় আছে—"সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ"; এই সকল অসুরই রৌদ্র-রসের প্রতীক। বাহুস্ফোটন বাহ্বাস্ফোট। আত্মাবদান-কথন—'অবদান' অর্থে কর্ম্ম; ইহার তাৎপর্য্য আত্মশ্লাঘা-করণ। উগ্রতা-আবেগ-মদ—ব্যভিচারীর মধ্যে গণিত হইলেও এস্থলে অনুভাবরূপে কথিত হইয়াছে, রোমাঞ্চ-স্বেদ-বেপথু—সাত্ত্বিক-মধ্যে গণ্য হইলেও এ ক্ষেত্রে অনুভাব-তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) "অত্রাশ্বত্থাম্নঃ ক্রোধস্তার্জ্জুনাদিরালম্বনং তদকার্য্যমুদ্দীপনং তাদৃশগর্জ্জনমনুভাবঃ গর্জ্জনব্যঙ্গ্যো গর্ব্বোঽমর্ষশ্চ ব্যভিচারী ক্রোধস্তু সামাজিকরসোৎপত্তেঃ"—রামতর্কবাগীশ-কৃত-দর্পণ-টীকা।

(১১) "রক্তাস্যনেত্রতা চাত্র ভেদিনী যুদ্ধবীরতঃ"—সা: দ: ৩য় পরিচ্ছেদ। "ননু রৌদ্রযুদ্ধবীরয়োঃ রিপুরালম্বনবিভাব ইত্যনয়োরভেদ এবাপতিত ইত্যনয়োর্ভেদং দর্শয়িতুমাহ...রক্তাস্যনেত্রতাব্যঙ্গ্যঃ ক্রোধ এব ভেদঃ। তথা চোভয়ত্র রিপোরালম্বনত্বেঽপি ক্রোধাবির্ভাবে রৌদ্রঃ, উৎসাহাবির্ভাবে বীর ইত্যনয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(১২) যে সকল ভাব গ্রহণমাত্রেই মনের কাতরতা উৎপাদনে সমর্থ, সেইগুলি 'খর' ভাব; উহারা রৌদ্রের পরিপোষক—"গৃহীতমাত্রা মনসঃ কাতরোৎপাদনক্ষমাঃ। যে ভাবাস্তে খরাঃ খ্যাতা রৌদ্রোৎকর্ষবিবর্দ্ধনাঃ"।—ভাবপ্রকাশন, প্রথমাধিকার, পৃ: ৫। "বহুবাহা বহুমুখা ভীমদংষ্ট্রাঃ সিতাঙ্গকাঃ। রৌদ্রস্যালম্বনা ভাবাঃ ক্রূরোদ্বৃত্তশঠাদয়ঃ"—ভাব-প্রঃ, পৃ: ৬। সিতাঙ্গ—শ্বেতাঙ্গ। উদ্বৃত্ত—দুর্ব্বৃত্ত।

(১৩) এ বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ পৌষের মাসিক বসুমতীতে (রস-১১) দ্রষ্টব্য। মূলে আছে—"খরা বিভাবাস্তু যদা স্বানুকূলৈঃ সহেতরৈঃ। স্থায়িনি স্বে প্রবর্ত্তন্তে স্বীয়াভিনয়সংশ্রয়াঃ॥ তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং রজসা তমসান্বিতম্। সাহঙ্কারঞ্চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স রৌদ্ররসনামা স্যাৎ জায়তে চ স তৈরপি"।—ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, পৃ: ৪৪।

রৌদ্র বলিয়া কথিত হয় (১৪)। অতএব, রৌদ্র-রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদ-মত ও বাসুকি-মত অভিন্ন।

রৌদ্র-শব্দের নির্ব্বচন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—রুদ্র হাত দিয়া থাকেন বলিয়া রৌদ্র-শব্দের নিরুক্তি; অর্থাৎ রুদ্র যে কাজে হাত দেন, তাহাই রৌদ্র-কর্ম্ম। সেই রৌদ্র-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বের হেতু যাহা, তাহাই রৌদ্র। অথবা যে কর্ম্ম অপরকে রোদন করায়, তাহাই রৌদ্র (১৫)।

রৌদ্র-রসোৎপত্তির ইতিহাস-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সভায় ভাবাভিনয়-কোবিদ দিব্য-নটগণ-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত 'ত্রিপুর-দাহ' নামক রূপকের অভিনয় দর্শন-কালে পিতামহ ব্রহ্মার চারিটি মুখ হইতে চারিটি বৃত্তির সহিত চারিটি মুখ্য রসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঐ রূপকান্তর্গত দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের দৃশ্য যখন অভিনীত হইতেছিল, তখন তদ্দর্শনে ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে আরভটী বৃত্তি জন্মে। আরভটী হইতেই রৌদ্র-রসের উদ্ভব (১৬)।

যখন রুদ্র-স্বভাব বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন, তখন তিনি দেবগণকে নানা প্রহরণের আঘাতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে দণ্ডদান করিয়াছিলেন। সেই সকল ছিন্ন-কর্ণ, ছিন্ন-নাসিক, স্ফুটিত-নয়ন দীন-ভাবাপন্ন দেবগণের এই বিলাপ-মুখর অবস্থা দর্শনে বীরভদ্রের রৌদ্ররস অনুমিত হইয়া থাকে (১৭)।

রৌদ্রের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ইহা রাক্ষস-উদ্ধত-দৈত্য-ক্রূরাদি-প্রকৃতি-গত হইয়া থাকে। অনৃত বাক্য, অবজ্ঞাসূচক বা পরুষ উক্তি, অপরকে বধের ও অন্যের স্ত্রী-হরণের প্রতিজ্ঞা, রাষ্ট্রভেদ, গৃহ-ক্ষেত্র-দার প্রভৃতির বলপূর্ব্বক গ্রহণ, মাৎসর্য্য, দেশ-জাতি-কুল-আচার-বিদ্যা-শৌর্য্য প্রভৃতির নিন্দা, আক্রোশ-কলহ-আক্ষেপবাক্য-আজ্ঞাভঙ্গ (ভর্ৎসনা) প্রভৃতি ইহার (উদ্দীপন) বিভাব। ভ্রূকুটি, মুহুর্মুহুঃ গণ্ডদেশের স্ফুরণ, দন্তৌষ্ঠ-পীড়ন, হস্ত-নিষ্পেষণ, রক্তনেত্রতা, শস্ত্রাস্ত্র-গ্রহণ, ছেদন, করতল-দ্বারা তাড়ন, মোটন, রুধিরাদি-পান, অস্ত্রাদি-দ্বারা অলঙ্করণ, অবিচারে যুদ্ধে পাত, পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন, ভর্ৎসন ও রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি—ইহার অনুভাব। উগ্রতা, মদ, অমর্ষ, মূর্চ্ছা, অসূয়া, অবহিত্থ, স্মৃতি, চাপল্য, বোধ, ধৈর্য্য, উৎসাহ প্রভৃতি ব্যভিচারী (১৮)।

অঙ্গ-নেপথ্য-বাগ্-ভেদে রৌদ্র ত্রিবিধ। বহু স্থূল শিরঃ, ঊর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত পিঙ্গল কেশরাজি, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব বহু-শস্ত্রাস্ত্রধারী বাহুসমূহ, উদ্‌বৃত্ত (ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ) রক্ত নেত্র, বিরাট্ দেহ ও কৃষ্ণ বর্ণ—এগুলি আঙ্গিক রৌদ্রের পরিপোষক। কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বসন, কৃষ্ণ-রক্ত গন্ধানুলেপন, কৃষ্ণ-রক্ত মাল্য, কৃষ্ণ-রক্ত ভূষণ—নৈপথ্যজ রৌদ্র। 'ছেদন কর, ভেদ কর, বন্ধন কর, খাও, মার, তাড়ন কর, আজ তোমার রক্তপান করিব, পেষণ কর', ইত্যাদি—বাচিক রৌদ্রের দৃষ্টান্ত (১৯)।

রৌদ্রের অধিদেবতা রুদ্র। কারণ, রৌদ্র-রসের যাহা কর্ম্ম—রোগাদি, রুদ্র তাহা দিয়া থাকেন। এ হেতু রুদ্রই রৌদ্রের অধিপতি দেবতা।

রৌদ্রের বর্ণ রক্ত। কারণ, অন্তরে ক্রোধ-স্থায়িভাবের প্রকাশ হইলে মুখ-নেত্রাদি আরক্ত ভাব ধারণ করে—ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা।

শারদাতনয়ের রৌদ্র-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে মম্মটভট্ট ক্রোধ-স্থায়িভাব হইতে কিরূপে রৌদ্র-রসের উৎপত্তি হয়, তাহা একটি শ্লোক উদ্ধার-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। বেণীসংহারের এই শ্লোকটিই রৌদ্র-রসের দৃষ্টান্তরূপে সাহিত্যদর্পণেও উদ্‌ধৃত হইয়াছে। প্রদীপ-কার গোবিন্দ ঠক্কুর ক্রোধের লক্ষণ করিয়াছেন—প্রতিকূল ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষ্ণভাবের উদ্বোধন 'ক্রোধ'। রৌদ্র তৎপ্রকৃতিক (২০)। বেণীসংহারের এই শ্লোকটিতে রৌদ্র-রসের অভিব্যক্তি হইলেও রৌদ্র-রস-ব্যঞ্জন-ক্ষমা আরভটী বৃত্তি নাই। ইহা কবির অশক্তির পরিচায়ক—ইহা নাগোজী ভট্ট উদ্দ্যোতে স্পষ্ট বলিয়াছেন (২১)। এ ক্ষেত্রে অপকারী অর্জ্জুনাদি আলম্বন, পিতৃহন্তৃত্ব, অস্ত্রাদির উদ্যমন প্রভৃতি উদ্দীপন। অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা অনুভাব। অশ্বত্থামা যে বলিয়াছেন—একাই তিনি সকলকে ধ্বংস করিবেন—এই উক্তি-গম্য গর্ব্বই সঞ্চারী ভাব (২২)।

---

(১৪) "রজস্তমোঽহঙ্কৃতিভির্যুতাদ্বাহ্যার্থসংশ্রয়াৎ। মনসো যো বিকারস্ত স রৌদ্র ইতি কথ্যতে"।—ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, পৃঃ ৪৭।

(১৫) "রুদ্রো হস্তং দদাতীতি রৌদ্রশব্দো নিরুচ্যতে। তৎ-কর্ম্মকর্ত্তৃতাহেতুর্যঃ স রৌদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যৎ কর্ম্ম রোদয়ত্যন্যান্ স রৌদ্র ইতি বা ভবেৎ"।—ভাব-প্রঃ দ্বিতীয় অধিঃ, পৃঃ ৪৯।

(১৬) "তস্মিংস্ত্রিপুরদাহাখ্যে কদাচিদ্‌ব্রহ্মসংসদি। প্রযুজ্যমানে ভরতৈর্ভাবাভিনয়কোবিদৈঃ। তদেতৎ প্রেক্ষমাণস্য মুখেভ্যো ব্রহ্মণঃ ক্রমাৎ। বৃত্তিভিঃ সহ চত্বারঃ শৃঙ্গারাদ্যা বিনিঃসৃতাঃ"। "যদা দক্ষাধ্বর-ধ্বংসোঽভিনীতো ভরতৈর্দৃঢ়ম্। অভূদারভটীবৃত্তে রৌদ্রঃ পশ্চিম-বক্ত্রতঃ"।—ভাব-প্রঃ, তৃতীয় অধিকার, পৃঃ ৫৬—৫৭।

(১৭) "রুদ্রেণ বীরভদ্রেণ দক্ষস্য ধ্বংসিতে মখে। দণ্ডিতেষু চ দেবেষু নানাপ্রহরণৈঃ পৃথক্। বিলোক্য তান্ প্রলপতশ্ছিন্ন-কর্ণাক্ষিনাসিকান্। দীনান্"—ভাব-প্রঃ ৩য় অধিঃ, পৃ ৫৮।

(১৮) মোটন—নিষ্পেষণ, পেষণপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলা। রুধির পান ও অস্ত্রাদি-দ্বারা শরীরের অলঙ্করণ এই দুইটিকে রৌদ্র-রসের অনুভাব না বলিয়া বীভৎস-রসের অনুভাব বলিলেই ভাল হইত। রোমাঞ্চ-স্বেদ-কম্প—এগুলি বস্তুতঃ সাত্ত্বিক ভাব হইলেও অনুভাব-মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

(১৯) পূর্ব্বে বহু বার বলা হইয়াছে—অভিনয় চতুর্ব্বিধ—আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক। আঙ্গিক—যেরূপ অঙ্গ বা অঙ্গ-বিকার-দ্বারা অভিনয়ে রৌদ্র-রসের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই আঙ্গিক রৌদ্র। নৈপথ্যজ—'নেপথ্য' অর্থে বেশভূষা, সাজ-পোষাক-অঙ্গরাগ প্রভৃতি। নৈপথ্যজ রৌদ্র বলিতে বুঝাইতেছে, যেরূপ আহার্য্য অভিনয়-দ্বারা রৌদ্রের অভিনয় হইতে পারে। আহার্য্যাভিনয়—নেপথ্যাভিনয়।

(২০) "প্রতিকূলেষু তৈক্ষ্ণ্যস্য প্রবোধঃ ক্রোধ উচ্যতে। তৎপ্রকৃতিকো রৌদ্রঃ"—প্রদীপ।

(২১) "অত্র পদ্যে (কৃতমনুমতমিত্যত্র) রৌদ্ররসব্যঞ্জনক্ষমা বৃত্তির্নাস্তীতি কবেরশক্তির্বোধ্যা"—উদ্দ্যোত।

(২২) "অত্রাপকারিণোঽর্জ্জুনাদয় আলম্বনম্। পিতৃহন্তৃত্বমস্ত্রা-দ্যুদ্যমনমুদ্দীপনম্। প্রতিজ্ঞানুভাবঃ। অন্যৈরপেক্ষ্যগম্যগর্ব্বঃ সঞ্চারী"—উদ্দ্যোত।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্পণে বলা হইয়াছে—প্রহার-অসত্য-মাৎসর্য্য-দ্রোহ-আধর্ষ-অপনীতি প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন রৌদ্র-রস। ঘাত-দন্তৌষ্ঠপীড়নাদি দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য (২৩)।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপ আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। শস্ত্রাঘাত ও উদ্ধত বাগঙ্গ-চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা উগ্রকর্ম্মের অভিনয়াত্মক, সমুদ্ধত-নর-প্রকৃতিক, সংগ্রাম-হেতুক রৌদ্র-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকলের অধিক্ষেপ (অবমাননা), মাৎসর্য্য, ধর্ষণ, উপঘাত, অনৃতালাপ, বাক্-পারুষ্য প্রভৃতি ইহার বিভাব। দন্তৌষ্ঠসন্দংশন, ভুজাস্ফোটন, পাটন (দ্বিধাকরণ), শস্ত্রঘাত, শিরো-বাহু-কবন্ধ-স্কন্ধ-তাড়ন (কর্ত্তন), পীড়ন, ছেদন, ভেদন, শোণিতাকর্ষণ, ভ্রুকুটী, হস্ত-নিস্পেষণ প্রভৃতি দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ —এইগুলি ইহার অনুভাব। উগ্রতা, অমর্ষ, রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বেদ, চাপল, মোহ, বেগ (আবেগ) ইহাতে ব্যভিচারী।

শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকরে রৌদ্র-রসের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবাদি দ্বারা ক্রোধ-স্থায়ী দর্শক-(সদস্য)গণের রস্য (অর্থাৎ আস্বাদন-যোগ্য) হইলেই রৌদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আবেগ-গর্ব্ব-ঔগ্র্য-অমর্ষ-মোহাদি ইহার ব্যভিচারী। প্রস্বেদ, ভ্রুকুটী, নেত্রের রক্তিমা প্রভৃতি ইহার বিকার অর্থাৎ অনুভাব।

রৌদ্র-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

রৌদ্রের পর বীর-রস। কেন রৌদ্রের পর বীর-রসের উপাদান, আচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। বীরের অন্যতম ভেদ যুদ্ধ-বীরে সংগ্রাম-সম্প্রহার প্রভৃতির যোগ দৃষ্ট হয়। রৌদ্রেও উহা বর্ত্তমান। রৌদ্রের যে জিঘাংসা-ভাব, তাহা বীরেও বর্ত্তমান—এই কারণে রৌদ্রের পর বীরের স্থান (২৪)। আবার দেখা যায় যে, শৃঙ্গার কাম-প্রধান। কাম সকলের নিকট সুলভ—সকলের অত্যন্ত পরিচিত, সকলের নিকট অতিশয় হৃদ্য। তাই সর্ব্বাগ্রে কামের ও তদভিব্যঞ্জক শৃঙ্গারের স্থান। তাহার পর শৃঙ্গারানুগামী হাস্য। নিরপেক্ষ-স্বভাব ও হাস্য-বিপরীত বলিয়া হাস্যের পর করুণ। তাহার পর করুণের নিমিত্ত রৌদ্র ; উহা অর্থ-প্রধান। কাম ও অর্থ ধর্ম্মমূলক বলিয়া তদনন্তর ধর্ম্ম-প্রধান বীর-রস (২৫)।

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় করা যাইবে।

[ক্রমশঃ

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

---

(২৩) প্রহার—পরকে যাহা বিদীর্ণ করে অথবা না করিতেও পারে, এরূপভাবে শস্ত্রব্যাপারের নাম 'প্রহার' ; গৃহাদি ভঙ্গ করা, ভৃত্যাদির উপমর্দ্দন প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। অসত্য—বধ-বন্ধন প্রভৃতির বাচক বাক্-পারুষ্যও ইহার অন্তর্গম্য। মাৎসর্য্য—গুণে অসূয়া। দ্রোহ—জিঘাংসা। আধর্ষ—পত্নীধর্ষণ, বিদ্যা-কর্ম্ম-দেশ-জাতি প্রভৃতির নিন্দা, রাজ্য-সর্ব্বস্ব-গ্রহণ ইত্যাদি। অপনীতি—অন্যায়। ইহা হইতে ঔদ্ধত্যও সূচিত হইতেছে।—এইগুলি উদ্দীপন বিভাব। ঘাত—ইহা হইতে ছেদন-ভেদন-রুধিরাকর্ষণ প্রভৃতি অনুভাবও সংগ্রহ করিতে হইবে। দন্তৌষ্ঠপীড়ন—ইহা দ্বারা গণ্ডৌষ্ঠস্ফুরণ-হস্তাগ্র-নিস্পেষণাদি অনুভাব-সমূহেরও সংগ্রহ কর্ত্তব্য। ইহার ব্যভিচারী—মোহ-উৎসাহ-আবেগ-অমর্ষ-চাপল্য-উগ্রতা-স্বেদ-বেপথু-রোমাঞ্চ প্রভৃতি। উৎসাহ প্রভৃতি যদিও স্থায়িভাবমধ্যে গণ্য (বীর-রসের স্থায়ী উৎসাহ), তথাপি এক রসের স্থায়ী অন্য রসে ব্যভিচারী হইতে পারে)। স্তম্ভ-স্বেদ প্রভৃতি রসের কার্য্য নহে—স্থায়িভাবের কার্য্য—ব্যভিচারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

(২৪) "যুদ্ধবীরে হি সংগ্রামসম্প্রহারযোগো রৌদ্রেঽপীতি বীরে জিঘাংসেত্যানন্তর্য্যমথশব্দেনাহ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫।

(২৫) "তত্র কামস্য সকল জাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্ব্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্ব্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ। নিরপেক্ষস্বভাবত্বাৎ তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ, স চার্থপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্ম্মমূলত্বাদ্বীরঃ, স হি ধর্ম্মপ্রধানঃ" —অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬৯।

কৃষ্ণ-ভ্রমর

ভ্রমর কহিল, "রক্ত-কমল খোলো খোলো তব দল,
আমি যে ভক্ত ভৃঙ্গ তোমার যাচি মৃদু পরিমল।

আলোর্তে এ কালো পক্ষ মেলিয়া ভাসিয়া সমীর-ভরে,
দূর হতে এসে দেখিব কি দ্বার রুদ্ধ কঠিন-করে ?
কণ্টকে-ঘেরা পত্র-আড়ালে গভীর পঙ্ক-নীরে
ভুবনমোহন মূর্ত্তি ধরিয়া খোলো দল ধীরে ধীরে।
কনককিরণে নাচিছে সলিল, বহিছে গন্ধবহ—
মিনতি আমার রাখো পঙ্কজ অঙ্গে বরিয়া লহ।
চপল-ভ্রমর দুয়ারে তোমার কমল-নয়ন তোলো,
পীন-উন্নত বিকচোন্মুখ বক্ষ-আগল খোলো।"
গুঞ্জরি' ফেরে রক্তকমল-দুয়ারে কৃষ্ণ-অলি
মধুলোভে তার রসনা লোলুপ কত কথা যায় বলি'!

প্রথম-প্রণয়মুগ্ধা তরুণী লজ্জায় নত আঁখি,
গোপন তাহার মনের কামনা—কিছু না রহিল বাকি।
চপল ভ্রমর কেমনে জানিল গূঢ় সে মনের কথা,
লঘু-ডানা দু'টি আলোতে মেলিয়া প্রচারিল যথা-তথা।

পদ্মপাতায় ঝলকে শিশির ক্ষেতে-ক্ষেতে লাগে দোল,—
হাসিয়া তপন জাগিল গগনে দিকে-দিকে কলরোল।
রক্তকমলে কৃষ্ণ-ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া বসে,
দলে-দলে তার নগ্ন-বক্ষ খুলিল রভস-রসে।
যুগে-যুগে হায়, এমনি লীলায় মাতিছে চিত্তরাধা,
শ্যামের মোহন বেণুটি ভুবনে আজো রাধা-নামে সাধা!

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, বার-এট-ল)

ভূমধ্য-সাগর

ভূমধ্য-সাগর যেন পশ্চিমে আজ রণ-কপালিনীর লীলা-শ্মশান! এই ভূমধ্য-সাগরে কত জাতি, কত রাজ্যের ধ্বংস সাধিত ঘটিয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! এবং এই ভূমধ্য-সাগর-তীরবর্ত্তী উনিশটি রাজ্য আজিকার এ-মহাযুদ্ধে প্রাণাহুতি দিতে দাঁড়াইয়াছে!

জার্ম্মান-বাহিনী এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়া গিয়া আথেন্স, হায়ফা, আলেকজান্দ্রিয়া এবং মাল্টা আক্রমণ করিয়াছে! এবং এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়াই বৃটিশ-জাতি মার্কিনকে সহায় করিয়া মার্কিন ফৌজ, মার্কিন শিল্পী, মার্কিনী প্লেন, ট্যাঙ্ক ও কামানের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া মিশরে গিয়া জার্ম্মান-শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

যে-লিবিয়ার আকাশ-বাতাস এক দিন গ্রীস ও রোমের যুদ্ধরথ-চক্রের নির্ঘোষে পরিপূর্ণ থাকিত, আজ সে-লিবিয়ার আকাশ-বাতাস তেমনি মিত্র-পক্ষের ও এক্সিসের ট্রাক্, প্লেন এবং ট্যাঙ্কের বজ্র-হুঙ্কারে সমাচ্ছন্ন! ক্রীটে এক দিন রণতরী বহিয়া শত্রু আসিয়া হানা দিত! এবারেও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (২১ ও ২২ তারিখে) প্লেনে চড়িয়া জার্ম্মান-বাহিনী আসিয়া ক্রীটে আস্তানা পাতিয়া বসে এবং সেখান হইতে মাল্টা এবং আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে। জার্ম্মানির পাশবিকতার এখানে সীমা ছিল না! প্যারাশুট-যোগে অসংখ্য বাহিনী ক্রীটে নামিয়া বোমার আগুনে গ্রাম-নগর জ্বালাইয়া দেয়; টর্পেডো দিয়া বড় বড় অসংখ্য জাহাজ ধ্বংস করে। সে-কালে বর্ব্বর বোম্বেটের দল যেমন নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস সাধন করিত, এ কালের সভ্য জাতিও তেমনি ভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ধ্বংসে এতটুকু লজ্জা বোধ করে নাই!

পূর্ব্ব ভূমধ্য-সাগর

পশ্চিম ভূমধ্য-সাগর

মিশরের সভ্যতা এক দিন এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়া পালেস্তাইনে গিয়া সে-প্রদেশকে সুসংস্কৃত করে। এই ভূমধ্য-সাগর পার হইয়াই ব্যাবিলনীয়

সভ্যতা-সংস্কৃতি এক দিন গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় গিয়া আসন পাতে।

ভূমধ্য-সাগরের বুকে ছোট-বড় দ্বীপ আছে প্রায় লক্ষাধিক—তাছাড়া উপসাগর-অন্তরীপাদিরও সংখ্যা নাই! ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণ-সাগর প্রভৃতির মারফৎ ভূমধ্য-সাগর এশিয়ার সহিত য়ুরোপের যে যোগ-সূত্র রচনা করিয়াছে, তাহার প্রভাব সামান্য নয়।

আকার-আয়তনের দিক্ দিয়া যেমন ইতিহাসের দিক্ দিয়াও তেমনি ভূমধ্য-সাগরের সহিত অপর কোনো সাগরের তুলনা হয় না!

কৃষ্ণ-সাগরকে ভূমধ্য-সাগরের অংশ বলিয়া যদি ধরা হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-উপসাগরের পশ্চিম-প্রান্তবর্তী বাটুম্ হইতে মরক্কোর উত্তরে ট্যাঞ্জিয়ার্স পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের দৈর্ঘ্য হয় ২৮০০ মাইল।

পশ্চিম দিক্ দিয়া ভূমধ্য-সাগরে প্রবেশ করিতে হইলে জিব্রাল্টারের সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া আর অন্য পথ নাই। জিব্রাল্টারে ব্রিটিশের সুরক্ষিত দুর্গ আছে। ভূমধ্য সাগর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচ্যে ভারত-মহাসাগরে যাইতে হইলে পূর্ব্ব-সীমান্তে আছে সুয়েজ খাল। এই সুয়েজ খাল পার হইয়া লোহিত-সাগর দিয়া ভারত-মহাসাগরে আসিতে হয়। জিব্রাল্টার হইতে সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত ভূমধ্য-সাগরের টানা দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইলেরও বেশী।

জিব্রাল্টার হইতে পূর্ব্ব-সীমানায় যাইতে ভূমধ্য-সাগরের উভয় তীরে আছে স্পেন, ফ্রান্স, মোনাকো, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া, গ্রীস এবং তুরস্ক; তার পর পূর্ব্বে দার্দানালেশ, মর্ম্মরা ও বশফরাস ভেদ করিয়া যে-পথ, সে-পথে যাওয়া যায় বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, বেশারেবিয়া, রুশ-উক্রেন, ক্রিমিয়া, জর্জ্জিয়া এবং উত্তর-তুরস্কে। দক্ষিণ-তুরস্কের দিকে ভূমধ্য-সাগরের তীরে আছে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশর। আবার পশ্চিমে আটলান্টিকের দিকে আসিতে লিবিয়া (সাইরেনায়কা এবং ত্রিপোলিতানিয়া); তুনিশিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো।

লিবিয়ায় মার্কিন প্লেন ও ট্যাঙ্ক

সুতরাং ভূমধ্য-সাগরের দুই তীরে কত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি বিরাজ করিতেছে, ভাবিলে চমক লাগে! তার উপর এই সব বিভিন্ন জাতির প্রধান তীর্থগুলিতে যাইতে হইলেও ভূমধ্য-সাগরই একমাত্র পথ। এই ভূমধ্য-সাগরের বুকে কত যুগের কত রাজা-বাদশা, কত সম্রাট্-সুলতান, কত ডিউক-ডিক্টেটর শক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন! রোমের ও তুরস্কের বিজয়-অভ্যুত্থান এবং গৌরব-নাশ—তাহাও ঘটিয়াছে এই ভূমধ্য-সাগরের বুকে এবং নানা জাতির অভ্যুদয় ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী সমস্ত রাজ্য-জনপদের ভাগ্যে কত ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে, তাহারো সীমা নাই!

আজ এ-যুগের তিনটি প্রধানতম জাতির বিরাট্ স্বার্থও এই সাগরের সঙ্গে বিজড়িত।

রোমের সে বিরাট্ রাজ্য-সম্পদের প্রসার আজ নাই! ক্ষুদ্র ইতালীটুকু লইয়াই আজ রোমের যা-কিছু গর্ব্ব-গৌরব! কত ক্ষুদ্র ইতালীতে সমস্ত ইতালীয়ান জাতের স্থান সঙ্কুলান হয় না। তাই বহু ইতালীয়ান প্রবাসে গিয়া আস্তানা পাতিয়াছেন। কতক গিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাজ্যে; কতক আমেরিকায়; কতক ফ্রান্সে; এবং কতক আফ্রিকায়। নিরুপায়ে তাঁদের যাইতে হইয়াছে। শুধু স্থানাভাবই কারণ নয়; ইতালীতে খাদ্য এমন প্রচুর নয় যে, সকলের তাহাতে ভরণ-পোষণ হইতে পারে!

যুদ্ধে নামিবার ন'মাস পূর্ব্ব হইতে ইতালীকে দায়ে পড়িয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রণের বিধি এখন আরো কঠিন। বস্ত্রাদি এবং কয়লার অভাব ইতালীতে নিদারুণ। জার্ম্মানির

আকাশে বৃটিশ প্লেন—যুদ্ধ-জাহাজের শত্রু। জলের বুকে বৃটিশ নৌ-শক্তি।

বৃটিশ সেনার স্নান। এ ট্যাঙ্কের জলে রোগের ভয় নাই!

সঙ্গে ইতালীর যে কন্‌ট্রাক্ট, তার সর্ত্ত-মতো ইতালীকে জার্ম্মানির জোগাইতে হয় মাসে দশ লক্ষ টন কয়লা! এ কয়লার জোগান পূর্ব্বে হইত ট্রেণে। ৬০ গাড়ী করিয়া কয়লা প্রত্যহ ইতালীতে পাঠানো হইত। পরে ফৌজ-যাতায়াত বাড়িবার দরুণ কয়লার গাড়ী নিয়মিত আসে না; এবং গাড়ীর সংখ্যাও কমিয়াছে। তাছাড়া ইতালীতে কাঁচা মাল তেমন বেশী জন্মায় না, কাজেই ইতালীতে যে-মাল মিলিতেছে, তার দাম খুব চড়া। এ জন্য অভাব বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর ঋণ-ভার বাড়িয়া পাহাড়ের মতো বিপুল হইতেছে।

আমদানি দ্রব্যাদির শতকরা ১৪ ভাগ বৃটেন পায় সুয়েজ-খালের মারফৎ। এ জন্য ভূমধ্য-সাগর ও সুয়েজ—বৃটেনের 'জীবন-রেখা' নামে খ্যাত! আজ সব দিকে বিপর্য্যয় ঘটিলেও উত্তমাশা অন্তরীপের পথ বৃটেনের পক্ষে মুক্ত আছে। সে জন্য তার মাল-আমদানি মাত্রায় কিছু কমিলেও সেখানে তেমন অভাব-অনাটন ঘটিতেছে না। ভূমধ্য-সাগরের উপর আজ বৃটেনের সতর্ক পাহারাদারী চলিয়াছে। বিপক্ষ-দল যদি একবার এ পথে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে নানা বিপর্য্যয় ঘটাইবে।

এ যুদ্ধে মিশরের সঙ্গে কাহারো বিরোধ নাই! তবু মিশর নির্লিপ্ত থাকিতে পারিল না! জার্ম্মানির এবং ইতালীর সর্ব্বগ্রাসী বাসনাকে চূর্ণ করিবার জন্য মিশরকে রক্ষা করিতে বৃটেন আজ কোমর বাঁধিয়াছে। এক্সিস-শক্তি যেন আস্তানা পাতিবার জন্য মিশরে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি না পায়!

আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বৃটিশ-অধিকৃত প্রদেশগুলিতে যাইতে হইলে মিশর দিয়া যাইতে হয়। সে পথ রুদ্ধ রাখা চাই! তাই সে-পথে প্রহরীর মতো বৃটেন আজ অষ্টবজ্র সম্মিলন ঘটাইয়াছে!* মিশরে যদি এক্সিস-শক্তি আস্তানা পাতিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে বৃটিশ-অধিকৃত কেনিয়া, ফরাসী-অধিকৃত আফ্রিকার সকল অংশ, বেলজিয়ান্‌-অধিকৃত কঙ্গো এবং প্রাচ্য ভূখণ্ড সমধিক বিপন্ন হইবে। অথচ এখানে ইংরেজ আস্তানা পাতিলে সুয়েজ-খালে বৃটেন একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে—সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, ত্রিপোলি এবং সেই সঙ্গে কায়রো পর্য্যন্ত ইরাক-তৈল রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে। তার উপর ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত—শূন্য এবং জলপথ বৃটেনের পক্ষে নিরাপদ এবং অবারিত থাকিবে। সুয়েজের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত এরিত্রিয়ায় সামরিক ঘাঁটা স্থাপনা করিয়া তুর্কির পথে অথবা কৃষ্ণ উপসাগরের দিকে এক্সিস-শক্তিকে মিত্র-শক্তি দাবে রাখিতে পারিবে।

স্পেনের দিক দিয়া এক্সিস-শক্তি যদি আক্রমণের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে ভূমধ্য-সাগরের জন্যই তার সে উদ্যোগ ব্যর্থ হইবার আশা অনেক বেশী।

ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিম প্রান্তে জিব্রাল্‌টার এবং পূর্ব্ব প্রান্তে সুয়েজ। এ দু'টি ঘাঁটা সুরক্ষিত থাকিলে এ যুদ্ধে বৃটেন এবং আমেরিকার পক্ষে জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র এবং রশদের জোগানে কোনো দিন অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

* মিশর সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণ মাঘ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।
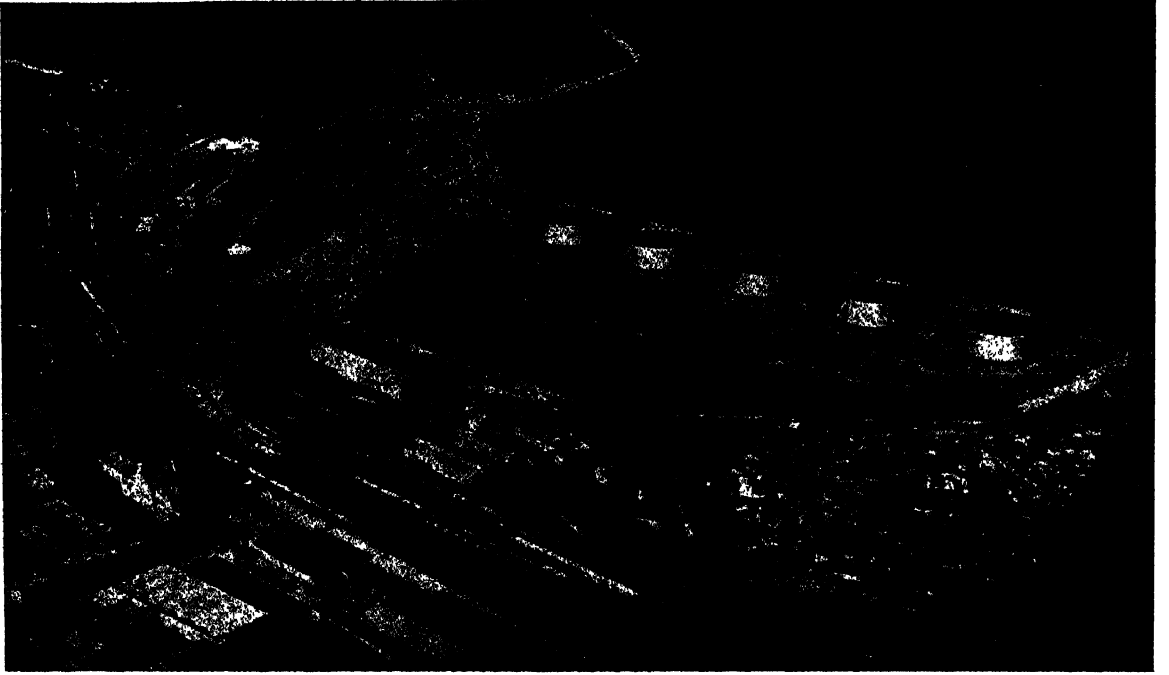
হায়ফা—এ যুগের সমৃদ্ধতম বন্দর
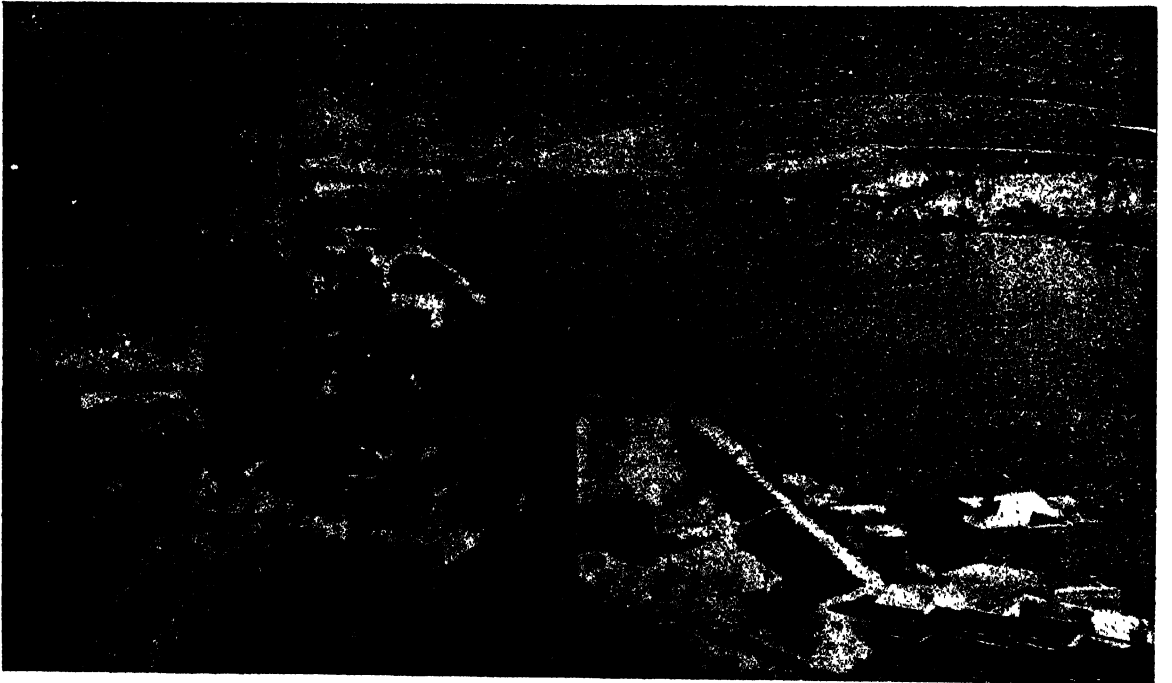
বস্‌ফরাশ—এই নদী পার হইয়া য়ুরোপ ও এশিয়া পরস্পরে এক দিন শত-শত যুদ্ধ করিয়াছিল।

আলজিয়ার্স—আলজিরিয়ার প্রধান সহর। পুরাকালে বোম্বেটের আস্তানা ছিল
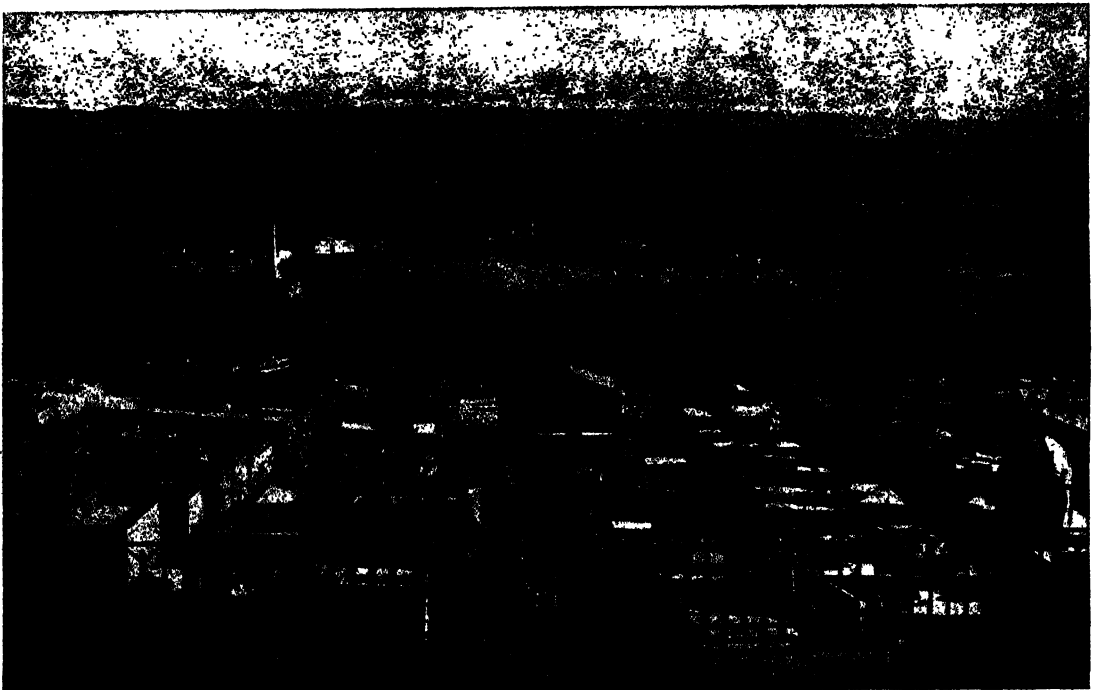
মেশিনো বন্দর—ও-পারে ইতালী

মার্শেল্ (ফ্রান্স) : মধ্যে শাঁতে জীন্ দুর্গ"; এ-পারে রাণী ইউজিনির প্রাসাদ—এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান-মন্দির
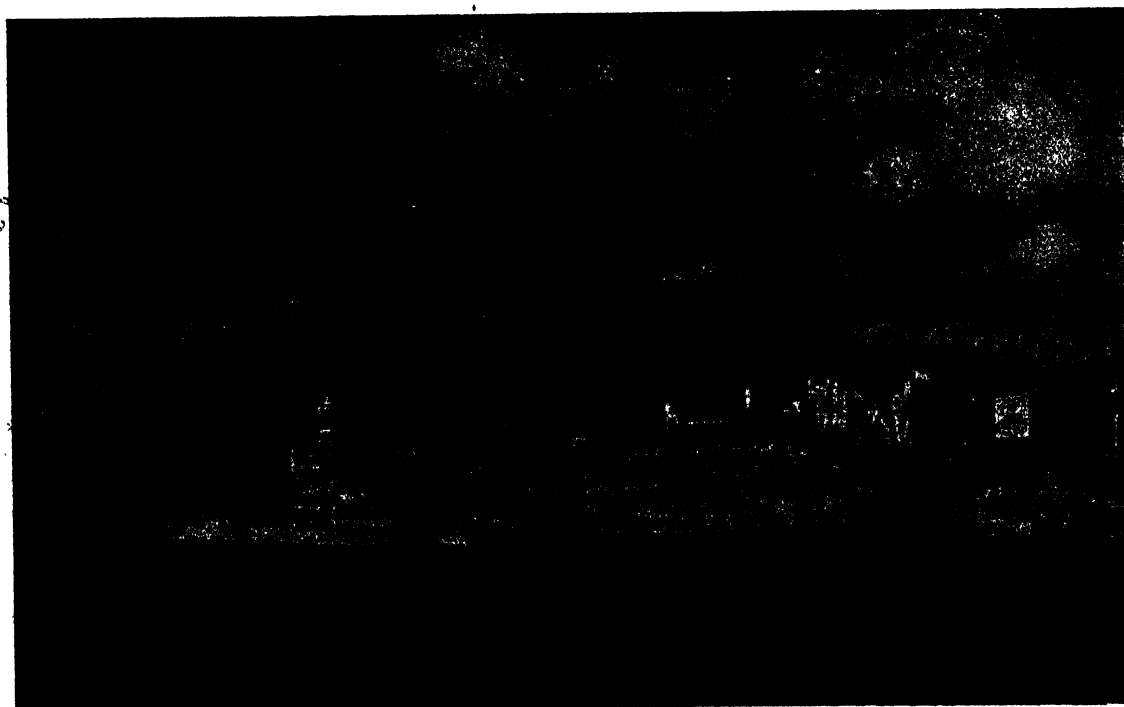
মাল্টার পাহারাদার বৃটিশ রণ-তরী "কুইন এলিজাবেথ"
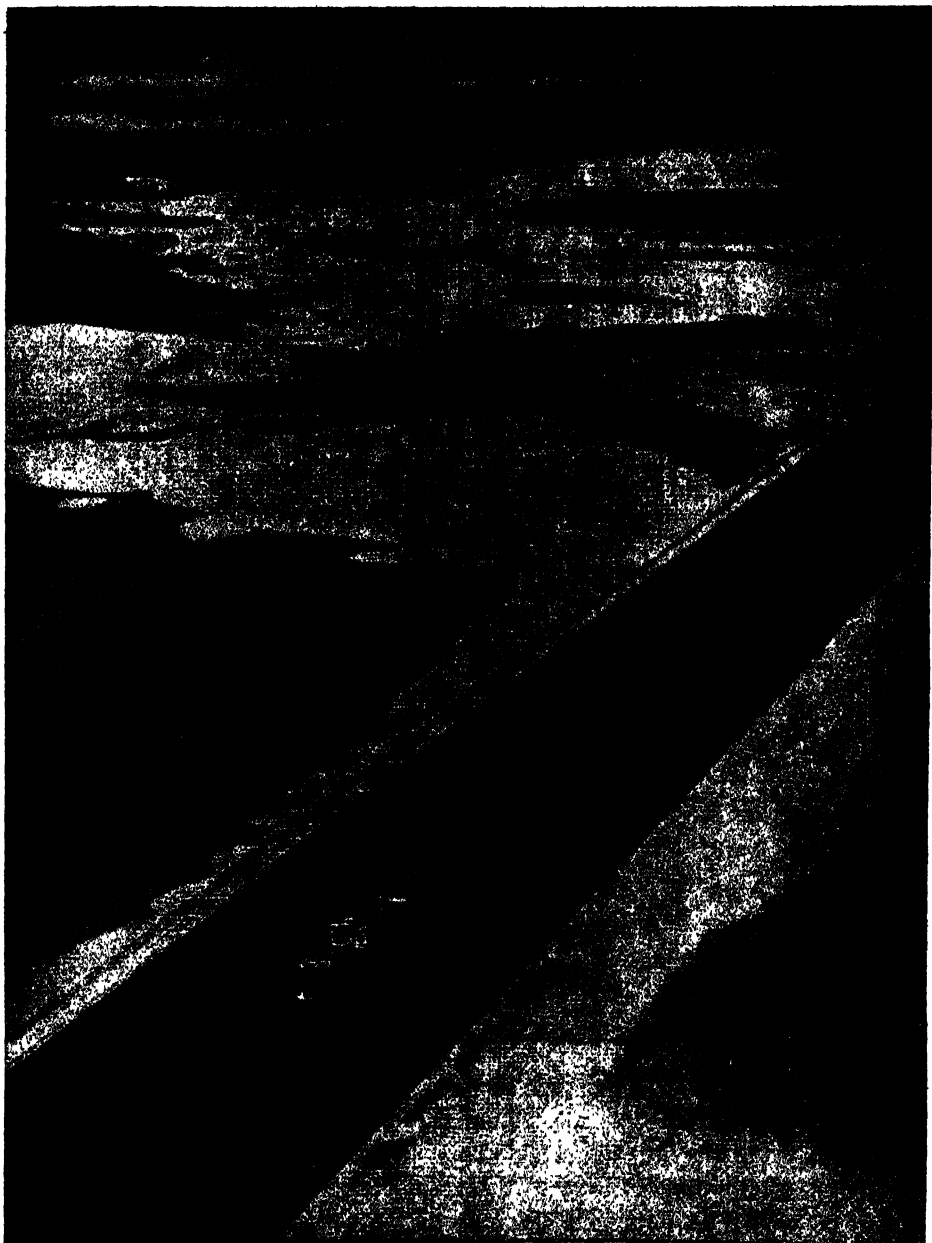
ধূ-ধূ মরুভূমির বুকে সুয়েজের শীর্ণ জলরেখা—সুয়েজের বুকে জাহাজ চলিয়াছে

জিব্রাল্টারে ভূমধ্য-সাগর চওড়া মোটে সাত মাইল। এ সাত মাইলের পাড়িতে য়ুরোপ হইতে আফ্রিকা পৌঁছতে সময় লাগে খুব অল্প। হানিবল এই পথে আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরে মুর-জাতিও এই পথে সাগর পার হইয়া আফ্রিকায় আসিয়াছিল।

মরক্কোর কিউটা সহর স্পানিশের অধিকার-ভুক্ত। তারি নিকটে টাঞ্জিয়ার—খুব সমৃদ্ধ বন্দর। টাঞ্জিয়ারে ৬০ হাজার লোকের বাস। ঘর-বাড়ী, সিনেমা, নৃত্যশালা, হোটেল, অয়েল-ট্যাঙ্ক, মোটর-গাড়ীর কারখানা ও এজেন্সির প্রাচুর্য্যে টাঞ্জিয়ারের গৌরব-মহিমা আজ সমুজ্জ্বল।

টাঞ্জিয়ারের অপর তীরে জিব্রাল্টার। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনের করচ্যুত হইয়া জিব্রাল্টার গিয়াছে বৃটেনের হাতে। জিব্রাল্টারে গত বৎসর জার্ম্মানি প্রচুর বোমা বর্ষণ করিয়াছিল—কিন্তু জিব্রাল্টারের দুর্ভেদ্যতা-নাশে জার্ম্মানি সমর্থ হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া জিব্রাল্টারের কোনো মূল্য নাই। এখানে এমন

কোনো দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, যাহা বিদেশে চালান দিয়া অর্থ আসিবে। বাহির হইতে মাল আমদানি করিয়া জিব্রাল্টারের দিনাতিপাত হয়। জিব্রাল্টারের বুকে শুধু উষর পাহাড়। আকাশে-বাতাসে অতীতের-শত কাহিনী ভাসিয়া বেড়াইতেছে! ফল-ফুলের প্রাচুর্য্য এখানে খুব বেশী। পূর্ব্বে এডেন, মাঝখানে মাল্টা এবং পশ্চিমে জিব্রাল্টার; ভূমধ্য-সাগরের বুকে এই তিন জায়গায় তিনটি দুর্ভেদ্য দুর্গ—ভূমধ্য-সাগর সুয়েজ এবং লোহিত-সাগর মারফৎ বৃটেনের বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পথকে নিরাপদ রাখিয়াছে চিরদিন।

অতীত যুগে যখন বিমানপোতের কথা স্বপ্নের অগোচর ছিল, জাহাজ ও রেলপথ ছিল সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তখন আরব এবং ভারতবর্ষ হইতে রেশম, হস্তিদন্ত, আতর, মরীচ এবং মণি-প্রস্তরাদি লইয়া ব্যবসায়ীর দল উটের পিঠে চড়িয়া ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী জনপদে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সেই ব্যবসায়ের প্রসার-কল্পে সুয়েজ খাল খোঁড়ার প্রেরণা জাগে। ফলে এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যের সম্পর্ক সহজ ও সুদৃঢ় হয়।

খৃষ্ট-জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলের বাণিজ্য-সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিক এজকিল যে প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, পালেস্তাইনের উত্তরে টায়ার সহরের বাজারে ভারতবর্ষ আর মিশর হইতে বহু পণ্য আমদানি হইত। ফিনিশিয়ানরা এ বাজারে প্রচুর টিন আনাইত; সেই টিন হইতে তারা তৈয়ারী করিত ব্রোঞ্জ-ধাতু। এখনো নানা পণ্য লইয়া টায়ারে বাজার বসে, তবে টায়ারের চেহারা সব দিক দিয়া বদলাইয়া গিয়াছে। এখন টায়ারের হাটে নূতন যে-সব দ্রব্যের আমদানি হইতেছে, তার মধ্যে আছে সেলাইয়ের কল, রেডিয়ো-সেট, ক্যামেরা প্রভৃতি। সুয়েজ-খাল সে-কালেও ছিল; এবং সে খাল প্রথম তৈয়ারী হইয়াছিল খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে।

খৃষ্ট-জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচখানি জাহাজ ভরিয়া চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, সোনা, দারুচিনি, মৃগনাভি, সুর্ম্মা এবং বহু বান্দা-বাঁদী লইয়া মিশরের রাণী হাতশেপসুৎ এই লোহিত সাগরের বুকের উপর দিয়া আরবে আসিয়াছিলেন বাণিজ্য করিতে, ইতিহাসে এ কথাও লিখিত আছে; এবং সুয়েজ খালে বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করিত খৃষ্ট-জন্মের ১৯০০ হইতে ৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।
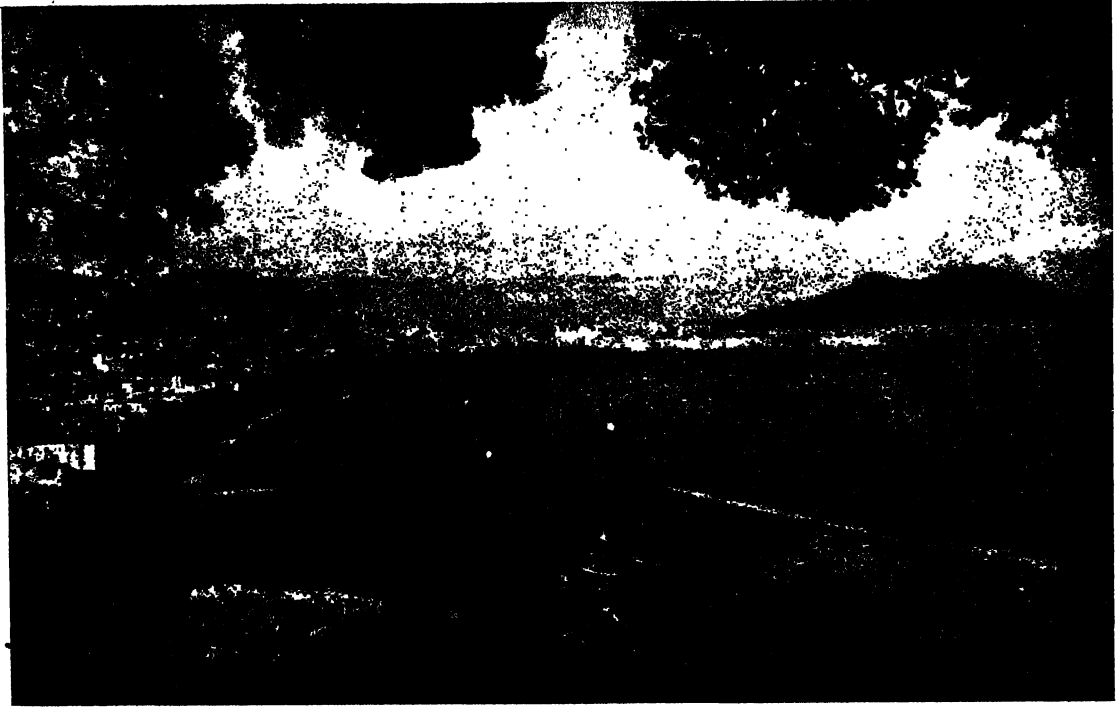
নেপল্‌স্ বন্দরে সূর্য্যোদয়। ডাহিনে বিসুবিয়াস; গায়ে-গায়ে সান্ জিয়োভানি, রেজিনা গ্রাম; পম্পিয়াই এবং হার্কিউলেনিয়ামের স্মৃতিস্তূপ!

এই ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে জানিতে পারি, সুয়েজ খাল এ যুগের সৃষ্টি নয়! ভাস্কো ডি গামা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন আফ্রিকার সর্ব্বদক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া—সে শুধু সুয়েজের পথ তিনি ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া। ভারতবর্ষে আসিবার জন্য সুয়েজ খালকেই তিনি পথ-স্বরূপ অবলম্বন করিবেন, স্থির ছিল। কিন্তু সে পথ ভুল করিয়া তিনি গিয়া পড়িয়াছিলেন উত্তমাশা অন্তরীপে।

এখন যুদ্ধের এই বিপর্য্যয় দুর্য্যোগে জাহাজের জন্য ভূমধ্য-সাগর মুক্ত বা অবারিত নাই, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। তবে ভূমধ্য-সাগরের পথ রুদ্ধ হইলেও সুয়েজের পথ রুদ্ধ হয় নাই। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া বহু বৃটিশ ও মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজ সুয়েজের মধ্য দিয়া সৈয়দ বন্দরে ও আলেকজান্দ্রিয়ায়

এল্ জেম্ গ্রাম (তিউনিশিয়া)—প্রাচীন থিশড্রাস্ ; পিছনে রোমান্ এ্যাম্ফি-থিয়েটার

উপর দিয়া জার্ম্মান প্লেন আফ্রিকায় যাতায়াত করিতেছে ! বৃটিশ প্লেন চলিয়াছে ফৌজ এবং অস্ত্র-শস্ত্র বহিয়া !

মিশরের সঙ্গে আমেরিকার আজ যে যোগাযোগ, তাহা আছে শুধু ঐ আকাশ-পথ দিয়া। ব্রেজিল হইতে বিমান-পোত আজ আফ্রিকায় আসিতেছে কায়রো পর্য্যন্ত। সেখানে বৃটিশ বিমান-বন্দর আছে।

ভূমধ্য-সাগরে একাধিপত্য লাভের জন্য ফ্রান্সের প্রথম চেষ্টা জাগে নেপোলিয়নের সময়। ভূমধ্য-সাগর বহিয়া নেপোলিয়ন গিয়া মিশর আক্রমণ করেন ; এবং তাঁর সে আক্রমণ সার্থক হয়। কিন্তু এ সৌভাগ্য সহিল না! অচির-কালের মধ্যে নীল-নদের যুদ্ধে

এমন কি জায়ফা-হায়ফাতেও আসিতেছে। তবে বেশীর ভাগ মাল-পত্র সুয়েজে নামানো হইতেছে।

যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, তখন বছরে ৬০০০ জাহাজ সুয়েজ খাল মারফৎ এশিয়া-য়ুরোপে যাতায়াত করিত। এ সব জাহাজের মধ্যে শতকরা ৬০খানি ছিল বৃটিশ।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃটেন হলাণ্ড জার্ম্মাণ ফ্রান্স স্কানডিনেভিয়া—সকলের বাণিজ্য-জাহাজ চলিত এই সুয়েজ খাল দিয়া ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসাদারী করিতে। এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়াই আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইজার্লাণ্ড, বেলজিয়াম প্রাচ্য ভূখণ্ডের সহিত ব্যবসায়-সম্পর্ক নিবিড় ও অব্যাহত রাখিয়াছিল। তার উপর ভূমধ্য-সাগরে দরিদ্র মৎস্য-জীবীদের জেলে-নৌকা চলিত অসংখ্য। আজ যুদ্ধের দারুণ বিভীষিকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্যবসায়ীরা মাছ ধরিতে ভূমধ্য-সাগরে বোট লইয়া বাহির হয়। তবে বাণিজ্যের দিক দিয়া ভূমধ্য-সাগর আজ ডেড-শীতে পরিণত হইয়াছে ! তার ধূ-ধূ বিরাট্ বক্ষে বাণিজ্য-জাহাজের চিহ্ন দেখা যায় না ! আকাশ-পথে দেখা যায় শুধু ভূমধ্য-সাগরের

নেপোলিয়নের ভীষণ পরাজয় হয়, তখন তিনি সিরিয়ায় গিয়া বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সে যুদ্ধেও তাঁর জয় হয় নাই, পতনের সূচনা ঘটে।

তার পর ইতালী এবং ইংলণ্ডের সহিত একযোগে এই ভূমধ্য-সাগর পার হইয়া আফ্রিকায় আসিয়া ফ্রান্স এখানে বহু প্রদেশ লাভ করে। ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া এবং মরক্কো আজ ফ্রান্সের অধিকারে। বহু ফরাসী নর-নারী আসিয়া এ-সব জায়গায় বসবাস করিতেছেন। এক আলজিরিয়াতেই ফরাসী অধিবাসীর সংখ্যা সাত-আট লক্ষ। মরক্কো আলজিরিয়া প্রভৃতির অধিবাসীদের লইয়া এখানকার ফরাসী সৈন্য সংগঠিত হইয়াছিল। তাদের মাথায় ফেজ, পরণে জমকালো লুঙ্গী এবং গায়ের উজ্জ্বল কালো বর্ণ য়ুরোপে এক-দিন প্রচুর বিস্ময় চমক জাগাইয়াছিল !

ভূমধ্য-সাগরে যে-সব দ্বীপ আছে, সে সব দ্বীপে ছয়টি বিভিন্ন জাতি ভাগ-দখল করিয়া লইয়াছে।* মালটা এবং সাইপ্রাস—বৃটিশ

* 'মালটার' সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

জাতির, ফরাসীর কর্সিকা; স্পেনের বালিয়ারিক্‌স্—বিমান এবং নৌবন্দর; ইতালীর সার্দিনিয়া, রোড্‌স্, ইজিয়ান * দ্বীপপুঞ্জ, পান্তেলেরিয়া এবং সিসিলি। এ-সব দ্বীপ পূর্ব্বে জার্ম্মানির ছিল; এখন ইতালী ভোগ করিতেছে। গ্রীসের ছিল ক্রীট এবং কয়রা। এ হু'টি দ্বীপ এখন এক্সি স-শক্তির অধিকারে। তুর্কির আছে দার্দ্দানেলেশের মুখে ইমব্রশ এবং টেনিডশ।

এক্সিস-শক্তির ঘাঁটী সিসিলি হইতে দক্ষিণে ৬০ মাইল দূরে মাল্টা। হু'টি দ্বীপে নিয়ম করিয়া বোমায় আলাপ চলে! মাল্টার একদিকে সিসিলি, আর এক দিকে আফ্রিকা। কাজেই কুকুরের মুখে মাংসর টুকরার মতো এ দ্বীপটিকে লইবার জন্য বহু জাতির মধ্যে "খেয়োখেয়ি" চলিয়াছে বহু বার। মাল্টা প্রথমে ছিল ফিনিশিয়ানদের হাতে; তার পর কার্থেজিয়ান, রোমান এবং গ্রীকদের হাত হইতে নর্মান এবং আরাগনীজের হাত ঘুরিয়া ইংরেজের হাতে আসিয়াছে।

সাইপ্রাস—লাইরেলিয়া বন্দর

ভূমধ্য-সাগবের বুকে বৃটেনের দ্বিতীয় দ্বীপ সাইপ্রাস। এটিও দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারাদিতে সুগঠিত। পালেস্তাইনের হায়ফা হইতে উত্তরে ১৭০ মাইল দূরে সাইপ্রাস অবস্থিত। সাইপ্রাস প্রায় তিনশো বৎসর যাবৎ তুর্কির অধীনে ছিল। গত মহাযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস আসিয়াছে বৃটেনের হাতে। এ দ্বীপের উপর জার্ম্মানি এবং ইতালীর আক্রমণের আজ বিরাম নাই!

তার পর দার্দ্দানেলেশ, মর্মরা এবং বসফরাশ—ভূমধ্য-সাগর হইতে কৃষ্ণ-সাগরে যাইতে নাতিপ্রসার তিনটি জল-প্রণালী। ভূমধ্য-সাগর হইতে কৃষ্ণ-সাগরের তীরে রাশিয়ার হু'টি বন্দর ওডেশা এবং বাটুম। এ হু'টি বন্দরে যাইতে এই দার্দ্দানেলেশই একমাত্র পথ। রাজনীতিকগণের কাছে দার্দ্দানেলেশের মূল্য জিব্রাল্টার এবং সুয়েজের অনুরূপ। সে জন্য দার্দ্দানেলেশ লইয়া বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। এটি যদি রাশিয়ার করচ্যুত হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার নৌ-শক্তি একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে।

খৃষ্ট-জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্রিমীয়ার গম, ককেশাসের কাঠ এবং চামড়া চালান দিবার জন্য এই দার্দ্দানেলেশই ছিল রাশিয়ার একমাত্র গতি। এ যুগেও নানা খনিজ সামগ্রী এবং বাটুম্ ও বাকু হইতে পাইপযোগে রাশিয়া যে-পেট্রোল আনিতেছে, তাহাও এই দার্দ্দানেলেশের কল্যাণে।

এশিয়া-তুর্কির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপের মিলন সংঘটিত হইয়াছে দার্দ্দানেলেশের ক্ষীণ জলরেখা-সংযোগে। য়ুরোপের বহু প্রদেশের মধ্য দিয়া প্যারিস হইতে যে সুদীর্ঘ রেল-পথ, সে পথ আসিয়াছে দার্দ্দা-নেলেশের উত্তর গা ঘেঁষিয়া একেবারে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত। শান্তির দিনে নির্ব্বিবাদে এ পথে ট্রেণ যাতায়াত করিত। এখন অবশ্য ট্রেণ-চলাচল বন্ধ আছে। ট্রেণ হইতে এখানে নামিয়া যাত্রীরা বসফরাশ পার হইয়া আবার বাগদাদী-রেলে চড়িতেন। এ ট্রেণে চড়িয়া আঙ্কারা, এলেপো, মশুল, বাসরা পৌঁছানো যায়। পারস্য-উপসাগরের তীরে এই বাসরাতেই ইরাকী পেট্রোলের বিরাট্ বিপুল খনি-সম্পদ অবস্থিত।

প্রাচীন গ্রীকরা দার্দ্দানেলেশকে হেলেনোপন্ত নামে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন যুগে লিয়াণ্ডার এবং এ যুগে লর্ড বায়রন সাঁতার দিয়া দার্দ্দানেলেশ পার হইয়াছিলেন। এখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাঁতার কাটিয়া দার্দ্দানেলেশ পার—নিত্য-খেলার ব্যাপারে দাড়াইয়াছে।

দার্দ্দানেলেশ পার হইয়া কিম্বা কৃষ্ণ-উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জার্ম্মানি চায় প্রাচ্য ভূখণ্ড আক্রমণ করিতে। সেই জন্যই রাশিয়ার সঙ্গে তার জীবন-পণ যুদ্ধ চলিয়াছে।

---

* ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

দার্দ্দানেলেশের ...ীর তুর্কির অধীনে। ...। দুই তীর তুর্কি দুর্গ-প্রাকারে সুরক্ষিত ...রিয়াছে। দার্দ্দানেলেশে ...হু জাতির স্বার্থ আছে। ...র্দ্দানেলেশে যদি এক্সিস-...ক্তি প্রবেশাধিকার ...ায়, তাহা হইলে এদিক-...ার পথে তার আক্রমণ ...র্দ্দ্বর্ষ হইবে!

দার্দ্দানেলেশের ...ল্যাণে আজ আমেরিকা ...াইতেছে তামাক। এই তামাকের দৌলতে তারা ধূমপানের আরাম উপভোগ করিতেছে। দার্দ্দানেলেশের দৌলতে দেশ-বিদেশে ভারে ভারে চলিয়াছে অলিভ তৈল, ফিগ্‌, পেস্তা, বাদাম, খেজুর, চীজ, মিশরী তুলা, রকমারি সুরা।

ক্রীট্—প্যারাশুটে এখানে নামিয়া জার্ম্মানরা এ-দ্বীপকে করিয়াছিল আক্রমণের ঘাঁটী (মে ১৯৪১)

আজ মহাযুদ্ধের এই পৈশাচিক লীলার ভারে ভূমধ্য-সাগর স্থির নিষ্কম্প পড়িয়া আছে! তার বুকে বাণিজ্য-সম্ভারবাহী জাহাজের চিহ্ন নাই! যাত্রীদের সে কল-হাস্য নাই! চালানীর কাজ একেবারে বন্ধ। তার ফলে সাগরের উভয়-তীরবর্ত্তী জনপদে খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব! কোথাও আনন্দ নাই! জীবনের স্পন্দন ক্ষীণ! এই ভূমধ্য-সাগর এক দিন গ্রীস হইতে ভারতবর্ষ হইতে মিশর হইতে জ্ঞান-সম্ভার বহন করিয়া সারা পৃথিবীতে তাহা বিতরণ করিয়াছে! এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়া বিজ্ঞান-দর্শন ললিত কলা-শিল্প ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি সভ্যতা সংস্কৃতি পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে! বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মিলন সংঘটিত হইয়াছিল এই ভূমধ্য-সাগরকে অবলম্বন করিয়া! সেই ভূমধ্য-সাগরের আজিকার এ মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যে-মানুষকে জ্ঞান-বিভূষণে সে সভ্য ভব্য দরদী করিয়াছে, সেই মানুষ এমন পশুর মত হিংস্র হইয়া বিরাট্ ধ্বংসে উদ্যত—তাহা দেখিয়াই সে যেন আজ শিহরিয়া এমন নিস্পন্দ নিথর রহিয়াছে!

বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাঙ্গালায় এবং বর্দ্ধমান বিহারের কোন কোন অংশে লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। অনেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রথম আপত্তি, ইহা ভূস্বামী বা জমিদারদিগকে বিনা পরিশ্রমে বহু টাকার অধিকার দেয়। তাঁহারা সেই টাকায় বিলাসে গা ভাসাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। দ্বিতীয় আপত্তি, যে টাকাটা জমিদারদিগের আয় হয়, সেই টাকাটা সরকারের আয় হইলে তাহাতে সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারিত। উভয় আপত্তিই আপাতদৃষ্টিতে ভাল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার একটিও বিচারসহ নহে। প্রথমতঃ, অর্থ নিয়োগ করিলেই লোক শ্রম না করিয়াই অর্থের বা আয়ের অধিকারী হইয়া থাকে। ঋণ দান করিলে যে সুদ পাওয়া যায়, তাহা বিনা শ্রমে আয়েরই সৃষ্টি করে। ডিবেঞ্চার, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশ প্রভৃতি খরিদ করিতে পারিলেই উহা লোককে অনর্জ্জিত আয়ের (unearned income) অধিকারী করে। কিন্তু ঐরূপ আয়ের বিরুদ্ধে ত' কেহ কোন কথা বলেন না। কারণ, উহা বন্ধ করিলে সর্ব্ববিধ আয়ের উপায় বন্ধ হইয়া যায়। তবে রাশি রাশি অর্থ দিয়া যাঁহারা ভূসম্পত্তি খরিদ করেন, তাঁহারা সে আয়ের অধিকারী না হইবেন কেন? ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর ইঁহারা দিতে পারেন না। সুতরাং এ আপত্তি বিচারসহ নহে। দ্বিতীয় আপত্তি, যে টাকাটা জমিদারদিগের আয় হয়, সে টাকাটা যদি সরকারের আয় হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু সকল সময় বা সকল অবস্থায় তাহা হয় না। সরকার যদি স্বদেশী—স্বদেশপ্রাণ হয় এবং যদি সেই সরকারের কার্য্য স্বদেশ-হিতৈষণার দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে পারে। কিন্তু

তাহা প্রায় হয় না। বিশেষতঃ, পরাধীন রাজ্যে তাহা হইতেই পারে না। কারণ, বিদেশী রাজার বা সরকারের পক্ষে প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া থাকে। উহাতে অনেক টাকা খরচা পড়িয়া যায়। বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর বেতন বাবদ ব্যয় অত্যন্ত অধিক। সাধারণের মধ্যে তাঁহাদের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার ব্যয় বেশী পড়ে। সুতরাং কার্য্যতঃ ঐ টাকা দেশের হিতার্থে ব্যয় হয় না,—হয় বিদেশী ব্যুরোক্রেসী-পোষণে। এরূপ অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে উভয় আপত্তির মধ্যে কোন আপত্তিই সমর্থিত হইতে পারে না।

এ দেশে ভূসম্পত্তি চিরকালই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহা এ দেশের চিরাচরিত প্রথা। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ব্যক্তিবিশেষকে ভূমিদান করিতেন। সেই দত্ত ভূসম্পত্তিতে সেই দানগ্রহীতারই নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। রাজা দত্তাপহারী হইতেন না। এ দেশের ইতিহাসের উষাকালেই, দেখা যায় যে, বামন বলি রাজার নিকট ত্রিপদ ভূমি মাত্র ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে ভূমিদানের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু সমাজে ভূমি চিরকালই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, এ দেশের জমিদাররা কেবলমাত্র খাজনা-আদায়কারী ছিলেন না, তাঁহারা প্রকৃতই দেশের শাসক ছিলেন। লর্ড কার্জ্জন, রমেশ বাবুর এই উক্তিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি এই কথার খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াও খণ্ডন করিতে পারেন নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট বঙ্গীয় সরকার যে রিপোর্ট ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, কতক জমিদার মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় হইতেই হইত, আর কতক জমিদার পুরুষানুক্রমে জমিদার ছিলেন। ইহাতে রমেশ বাবুর উক্তি খণ্ডিত হয় নাই। অভাবগ্রস্ত জমিদার অভাবে পড়িয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেই উহা অন্য লোকের হাতে যাইয়া পড়ে এবং ক্রেতা পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বেরই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কতক ভূ-সম্পত্তি যে অন্য ধনী লোকের হাতে পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? উহাতে বরং জমিতে প্রাচীন ভূ-স্বামীর নির্ব্যূঢ় অধিকার সূচিত হয়। তবে মুসলমান নবাবগণ খাজনার দায়ে জমিদারের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন না বা ন্যায়তঃ পারিতেন না। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। নলডাঙ্গার রাজাদের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নলডাঙ্গার জমিদার রাজা রামদেব দেবরায় কয়েক বৎসর নবাব-সরকারে তাঁহার দেয় রাজস্ব দিতে পারেন নাই। সে সময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত জমিদারদিগের নিকট হইতে সরকারী রাজস্ব আদায় করিতেন। যে জমিদার রাজস্ব কয়েক বৎসর দিতে পারিতেন না,—তাঁহাকে তিনি কোমরে দড়া বাঁধিয়া পুরীষপূর্ণ এক হ্রদে ফেলিয়া যন্ত্রণা দিতেন। রাজা রামদেব সরকারী রাজস্ব দিতে পারেন নাই বলিয়া নবাব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। শেষে তিনি স্বয়ং নবাবের নিকট হাজির হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে এবং বহাল তবিয়তে জমিদারী ইস্তফা করিতে সম্মত আছেন। নবাব তাহাতে রাজী হইলেন। রামদেব জমিদারী ইস্তফা করিয়া এক দলিল লিখিয়া নবাবকে দিলেন। রামদেব "বৈকুণ্ঠের" যাতনা হইতে রেহাই পাইলেন। কিন্তু নবাব-সরকারে রামদেবের এক জন আম-মোক্তার ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস। তিনি সেই কথা পরদিন শুনিয়া নবাবের নিকট হইতে ইস্তফা-পত্রখানি দেখিবার জন্য চাহিয়া লয়েন এবং পরে উহা গালে পূরিয়া গিলিয়া ফেলেন। এই ব্যাপারে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দাসকে বেদম প্রহার করাইয়া তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার আদেশ দেন। ভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য, জমিদার যদি কেবলমাত্র নবাব-সরকারের আদায়কারী কর্ম্মচারী হইতেন, তাহা হইলে নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাঁহাকে জমিদারী স্বেচ্ছায় ইস্তফা করিতে হইবে কেন? নবাব ত' ইচ্ছা করিলেই তাহা কাড়িয়া লইতে পারিতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য বৈকুণ্ঠ নামক নরকের সৃষ্টি করিতে হইত না! আর ইস্তফা-পত্রখানি নষ্ট হইল বলিয়া রাজা রামদেবের জমিদারী রক্ষা পাইল, ইহাই বা কেন হয়? পরে রাজা রামদেব কয়েক কিস্তীতে নবাব-সরকারের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। সুতরাং জমিদার কেবল আদায়কারী কর্ম্মচারী ছিলেন না। আবার নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব দেবরায় নবাবের আদেশ অমান্য করায় সুজাউদ্দীন রঘুদেবের জমিদারী নাটোরের রাজাকে পাওনা আদায়ের জন্য দিয়াছিলেন। তিন বৎসরে প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া নবাব সুজাউদ্দীন রাজা রঘুদেবকে তাঁহার জমিদারী ফিরাইয়া দেন। জমিদারী জমিদারদিগের সম্পত্তি, এরূপ মনে না করিলে ন্যায়নিষ্ঠ সুজাউদ্দীন কখনই উহা রাজা রঘুদেবকে তিন বৎসর পরে ফিরাইয়া দিতেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সুতরাং বঙ্গীয় সরকার যে লর্ড কার্জ্জনের আমলে তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন,—জমিদারীতে সকল জমিদারেরই মালেকান স্বত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহারা পান নাই—সে কথা সত্য নহে। মালেকান স্বত্ব না থাকিলে জমিদাররা জমিদারী করিতেন কোন্ অধিকারে? তবে অনেক জমিদার ঋণের দায়ে তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জমিদারী কিনিতেন,—সে জন্য উহা অন্য সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়িত। জমিদাররা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। জমিতে যদি জমিদারের মালেকান স্বত্ব না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই চিরদিনের জন্য কাহাকেও জমি দান করিতে পারিতেন না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, স্বর্গীয় রমেশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য। জমিদাররাই জমির মালেক ছিলেন।

যাঁহারা পুরুষানুক্রমে জমির মালেক বলিয়া উহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন,—এবং যাঁহারা জমিদারী স্বত্ব টাকা দিয়া কিনিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সম্পত্তি ন্যায্য মূল্য দিয়াই খরিদ করা উচিত। অন্যথা তাহা নিতান্তই জুলুম বা লুণ্ঠনের কার্য্য হয়। এরূপ প্রস্তাব কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারেরই কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর কোন দেশেই তাহা করা হয় না। ফ্রান্সে কৃষক-ভূস্বামী সৃষ্টি করিবার সময় কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিয়াই জমি লইতে হইয়াছিল,—তথাকার সরকার সে বিষয়ে কৃষকদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জমির মালিকদিগের জমির মূল্য কম দেন নাই। য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে, যেখানে কৃষক-ভূস্বামী সৃষ্টি করিবার হুজুক উঠিয়াছিল, সেইখানেই কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইয়াছে। ষ্টেট বা সরকার কৃষকদিগকে সেই মূল্য প্রদানের সহায়তা করিয়াছেন,—রামের ধন শ্যামকে দিয়া বাহাদুরী করেন নাই।

কোন্ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহার ফল দেশের লোকের পক্ষে মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, নিরপেক্ষ ভাবে তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের রাজা হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ খাজনা দিতে অক্ষম জমিদারদিগের অনেক জমিদারী সুদখোর মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করেন। তাহার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা বিদিত ভুবনে।

সেই জন্ম লর্ড কর্ণওয়ালিস এ দেশীয় প্রথা অনুসারে জমি যাহাতে প্রাচীন জমিদারদিগের হস্তে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার্থ দশ বৎসরের জন্ম ভূমির নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উহার ফল এতই ভাল হইয়াছিল যে, দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছিলেন। সার ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং সার জন শোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) উভয়েই ভূমির রাজস্ব স্থায়িভাবে নির্দ্দিষ্ট করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাঙ্গালার অভিজাতবর্গ প্রাধান্ম লাভ এবং বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে যে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা প্রথমেই শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার জমিদাররা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁহাদের এলাকামধ্যে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এক বা ততোধিক উচ্চ এবং মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই জন্ম বাঙ্গালায় প্রথমে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

অনেকে মনে করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজার কোন উপকার হয় নাই। ঘটনা-পরম্পরা হইতে তাহা কোন ক্রমেই মনে করিতে পারা যায় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, বাঙ্গালায় প্রজাদিগের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের প্রজা-সাধারণের তুলনায় বিশেষ মন্দ নহে। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ১৩ বৎসর পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর বাঙ্গালা দেশে আর কখনই তেমন প্রবল দুর্ভিক্ষ হয় নাই। তখন একটু সম্পন্ন বা সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদিগের ঘরে কিছু না কিছু খাদ্যশস্য সঞ্চিত থাকিতই। এই তথ্য হইতেই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার কৃষীবল অন্যান্য প্রদেশের কৃষীবল অপেক্ষা দরিদ্র ছিল না। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা অনাহারে মরিয়া উজাড় হইয়া যাইত না,—এখনও যায় না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে যে ব্যাপক ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই সকল দুর্ভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি—ইহাই সরকারী রিপোর্ট। কিন্তু স্বয়ং ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিহারে এই দুর্ভিক্ষের বহর দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—"আমার ইহা শঙ্কা করিবার কারণ আছে যে, এই দুর্ভিক্ষের কারণ যদি কলুষিত এবং অত্যাচারপূর্ণ শাসন না-ও হয়, তাহা হইলেও উহা শাসন-ব্যবস্থার দোষে ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" স্বয়ং ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন উহা কলুষিত এবং অত্যাচারপূর্ণ শাসনের ফল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তখন অন্যে কি বলিবে? কিন্তু বাঙ্গালায় ঐ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, পণ্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল,—কিন্তু এ অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া অনাহারে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় নাই।

যাঁহারা বলেন যে, জমিদারগণ নানা বাবদ প্রজাদিগের অর্থ শোষণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়ে,—তাঁহারা তাহার প্রমাণ কিছুই দিতে পারেন না। বাঙ্গালার প্রজাগণ যদি অত্যন্ত রিক্ত অবস্থায় পতিত হইত, তাহা হইলে এ দেশে অনাবৃষ্টি এবং অজন্মার ফলে অন্যান্য প্রদেশের প্রজার ন্যায় দলে দলে অসহায় ভাবে অনাহারে মরিত। কিন্তু তাহা মরে নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষে ১২ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের বিস্তার অধিক ছিল না। কেবল শ্রমিক বা শিল্পী ইহাতে মরে নাই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কৃষীবলও মরিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের আমলে ভারতে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহাতে গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষীবল অনেক মরিয়াছিল, মরুতুল্য বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র মানুষ এবং গরুর কঙ্কালে বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ হয় নাই। বাঙ্গালায় অজন্মা হইয়াছিল,—কিন্তু মানুষ বা কৃষির পশু অধিক মরে নাই। ইহাতে বাঙ্গালী কৃষকদিগের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল,—তাহারা অজন্মার তাড়না অনেকটা সহ্য করিতে পারে এবং পূর্ব্বে আরও পারিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাতে জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা-শোষণের বৈপরীত্যই প্রকাশ পায়। ইহা সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বাঙ্গালার কৃষীবলের অবস্থা কখনই ভাল বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহার কারণ জমিদারী প্রথা বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নহে, তাহার কারণ—কৃষকের জোতের জমির অল্পতা এবং অত্যন্ত অধিক লোকের মধ্যে বিভাগ। বাঙ্গালার শ্রমশিল্পের তিরোধানে লোক জীবনরক্ষার জন্য কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া উদরান্নের সম্পূর্ণ সঙ্কুলান না হইলেও জমিতে কিছু স্বত্ব রাখিতেছে। কাজেই কৃষকের জোতের জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া 'চটকস্য মাংসে' পরিণত হইতেছে। জমিদারকে খাজানা দিয়া যে জমিতে কিছু লাভ থাকে, সে জমি পত্তনী, দরপত্তনী, ছে-পত্তনী, হাওলা, নিমহাওলা প্রভৃতি স্বত্বের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু সে দোষ ত' জমিদারী ব্যবস্থার বা জমিদারের নহে। সে দোষ ত' সম্পূর্ণ প্রজার। প্রজারা গরজে পড়িয়া অনেক মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালায় শতকরা যত লোক কৃষিসেবী, ভারতের অন্য প্রদেশে এত লোক কৃষিসেবী নহে। সেই জন্য হলকর্ষী চাষীদের বিশেষ কিছু লাভ থাকে না। কৃষকরা সেই জন্য কৃষির দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না। ইহার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দোষ দেওয়া সঙ্গত নহে। দেশের সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক যদি কৃষির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহাদের দারিদ্র্য কখনই ঘুচিবে না। যেখানে কৃষক-প্রজার জমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে, সেখানেও এই দোষ দেখা যায়। ফ্রান্সে অনেক প্রজার কৃষিক্ষেত্রে স্বামিত্ব আছে। কিন্তু সেখানেও কৃষির জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। অষ্ট্রীয়ায় এবং হাঙ্গেরীতে এই দোষ পরিস্ফুট। তথাপি ঐ সকল দেশের কৃষকদিগের জোতের জমি এ দেশের কৃষীবলের জোতের জমির তুলনায় অনেক অধিক। এই দেশের প্রতি-কৃষকের জমি গড়ে ৬—৭ বিঘার অধিক হইবে না। কিন্তু ফ্রান্সে কৃষকদিগের জোতে ৩৭ বিঘার কম জমি অতি অল্পই আছে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে অন্ততঃ ২৫ একর বা ৭৫ বিঘা জমি আছে। অষ্ট্রীয়ায় এবং হাঙ্গেরীতে ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে ৭ একর বা ২১ বিঘার কম জমি প্রায় নাই। অধিকাংশ কৃষকের জোতে ৭৫ বিঘা জমি আছে। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষী প্রজার জোতে ৫ বিঘা জমিরও কম আছে। এরূপ অবস্থায় এ দেশের কৃষক যদি অতি দরিদ্র হয়, সে জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করা যাইতে পারে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে দুইটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃষীবল প্রজাকে তাহার জমিতে মালেকান স্বত্ব প্রদান; দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করা। কিন্তু ইহার কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশের উপযোগী হইবে না। এ দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ একেবারে অশিক্ষিত। তাহারা অনেক সময় স্বীয় অবস্থা বুঝিয়া চলিতে অসমর্থ। মতের হিসাবে, কাগজে-কলমে এ ব্যবস্থা ভাল বলিয়া মনে হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফল কোন দেশেই ভাল হয় নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনিকের দেশে—যেখানে প্রত্যেক

কৃষকের জোতের জমি শত বিঘারও অধিক, সেখানেও উহা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাকার কৃষীবল শিক্ষিত হইলেও তথায় যদি উহা নিষ্ফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশে কি হইবে। বেয়ার বলিয়াছেন যে, কৃষকের ভূস্বামিত্ব ইংলণ্ডেও সুফলপ্রদ হয় নাই। কেবল মতের হিসাব করিলে চলিবে না, যাহারা কর্ম্মী, তাহাদের প্রকৃতি ও বিচার-বুদ্ধির উপর সকল ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। ফ্রান্সে, অষ্ট্রীয়ায়, হাঙ্গেরীতে, এমন কি, মার্কিণেও ইহা বিশেষ হিতকর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় জমিদারী বন্দোবস্ত উচ্ছিন্ন করিয়া কৃষকদিগকে ভূস্বামী করিলে এই অজ্ঞতা-প্লাবিত দেশে তাহার ফল কখনই ভাল হইবে না। উহাতে কৃষক-দিগেরই সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ আপাত-দৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হইলেই এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে সরকারের বা রাষ্ট্রের নির্ব্যূঢ় অধিকার স্থাপন। এ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত অন্য কোন দেশে হয় নাই। এখন রুশিয়ায় ইহা হইতেছে। প্রাচীন কালে ভারতে কতকটা এই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন রুশিয়ায় উহা যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে ভাবে প্রাচীন কালে ভারতে উহা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সকল দেশেই ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রুশিয়াতে সে অধিকার এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। লেনিন প্রথমে রুশ-কৃষীবলকে ভূমির স্বত্বাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন,—কিন্তু পরে নানা দিক্ দিয়া উহার অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত নির্ম্মম এবং কঠোর হস্তে উহা দমন করেন। অনেক ডিগবাজী খাইয়া লেনিন, ট্রোটস্কি এবং ষ্ট্যালিন কার্ল মার্ক্স-অনুমোদিত রুশিয়ায় প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তিতে রাষ্ট্রের অধিকার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এখনও উহা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হয় নাই। কতক জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। উহার প্রজারা সকলেই মজুর মাত্র। উহারা সরকারের নিকট হইতে মাপা সমস্ত আবশ্যক পণ্য পায়। আর সমস্ত ফসলাদি সরকার লইয়া থাকেন। আর কতকটা জমি আছে, উহা অত্যন্ত দরিদ্র চাষী প্রজাদিগকে সম্মিলিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। উহাতে যে ফসল জন্মে, তাহা হইতে সরকার তাঁহাদের নিজ ভাগ লইয়া যান। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা সকলে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া লইয়া থাকেন। এখন রুশিয়ায় যত কৃষক বিদ্যমান,—তাহার শতকরা ৬০ ভাগ সরকারী খামারে মজুরী করে অথবা সম্মিলিত খামারে (collective farms) কাজ করে। আর অবশিষ্ট যে ৪০ ভাগ কৃষক নিজ খামারে কাজ করে, তাহারা দূর মফস্বলে বাস করে। তাহাদের জোতেও অধিক জমি আছে বলিয়া মনে হয় না।

তাহা হইলেও রুশিয়ার জনসাধারণ এখন জার-শাসিত রুশিয়া অপেক্ষা অনেকটা সমৃদ্ধ হইয়াছে। কারণ, রুশিয়া এখন কৃষিমাত্র সম্বল নহে। লেনিন এবং ষ্ট্যালিন ঐ দেশকে শ্রমশিল্পে অগ্রসর করিবার জন্য নানা মতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম তথায় শ্রমশিল্প পণ্য ভাল প্রস্তুত হইত না। এখন হইতেছে। শ্রমশিল্পের কার্য্যে অধিক লোক আকৃষ্ট হওয়াতে জমির উপর লোকের চাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কাজেই রুশিয়ার লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

রুশিয়ায় ভূমি-সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তথায় বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই প্রথমে সরকারী সম্পত্তি করা হইয়াছিল। এখন কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় কর্ম্মীরা মজুর এবং সরকার মনিব।

আমি এ স্থলে রুশিয়ার কথা অতি সংক্ষেপে বলিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য, যাঁহারা বাঙ্গালার ভূসম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সম্পত্তি করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা কি বাঙ্গালাকে ঐরূপ শ্রমশিল্পের প্রগতির পথে প্রধাবিত করিতে সম্মত আছেন? না, তাঁহারা উহা করিতে পারিবেন? যাঁহারা সরকারকে সমস্ত উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ খাজনা দিয়া পাকা বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেছেন, সরকারই তাহাতে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিবেন, এরূপ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি উচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সবই উচ্ছিন্ন হইতে পারে; দেশে এখনও যেমন অবুঝ লোকের অভাব নাই,—পরেও সেরূপ থাকিবে না। গরজে পড়িলে সকল শক্তিশালী সরকার সবই করিতে পারেন। স্বাধীন দেশেও তাহা হইয়া থাকে। উৎকট সাম্যবাদী রুশিয়াতেও প্রজাকে জমিতে মালেকান স্বত্ব দিয়া তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

গ্রেট বৃটেন ধনিকের দেশ। উহা শিল্পপ্রধান। ঐ দেশে জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত। তথাকার ভূস্বামীরাই জমির মালেক, তাঁহারাই জমিতে প্রজাবিলি করিয়া থাকেন। প্রজা খাজনা দিয়া অথবা মজুরী করিয়া মনিবের খামারে শস্য উৎপাদন করে। তথায় ভাগ-চাষের ব্যবস্থা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। তবে এ কথা সত্য যে, বিলাতী কৃষীবলের অবস্থা অন্য দেশের কৃষক ভূস্বামীদিগের অবস্থা হইতে অনেক উন্নত। ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের নানা কারণে তুলনা হইতে পারে না। ইংরেজ জাতি স্বদেশের কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করে না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য—অনেক বিশিষ্ট ইংরেজই জমিদারী প্রথার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশপ হেয়ার, সার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, মার্কুইস অব ওয়েলেসলি, লর্ড মিণ্টো, মার্কুইস অব হেষ্টিংস, লর্ড ক্যানিং, সার চার্লস উড (ভারত-সচিব), সার জন লরেন্স (লর্ড লরেন্স), সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট (ভারত-সচিব) প্রভৃতি যে প্রথাকে মোটের উপর ভাল বলিয়াছেন, সে দিনও মিষ্টার সি ডবলিউ গার্ণার যে ব্যবস্থাকে মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়াছেন, তাহাকে কি অকস্মাৎ হঠকারিতার সহিত অনিষ্টকর বলা অসঙ্গত নহে? পৃথিবীতে কোন ভূমি-সম্পর্কিত ব্যবস্থাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, জমিদারী প্রথাও নহে। তাই বলিয়া উহার বিলোপসাধনে যে দেশ সমৃদ্ধ হইবে, এমন মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

ভারতীয় বাজেটের সমস্যা সঙ্কট

১৫ই ফাল্গুনে প্রকাশিত, ভারতের চতুর্থ যুদ্ধ-বাজেট অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের চতুর্থ বৎসরের অগ্রিম আয়-ব্যয় হিসাব-বিবরণী আতঙ্কের যৎকিঞ্চিৎ প্রশমন করিয়াছে বটে; কিন্তু আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে পারে নাই। প্রতি বৎসর বাজেট প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক আপেক্ষিক গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব এবং তদনুযায়ী কর-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আর্থিক ও বণিক্-ব্যবসায়ী জগতে, বিশেষতঃ শিল্পী ও সাধারণ প্রজাসম্প্রদায়ে সুগভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এ বৎসরের প্রধান আতঙ্ক ছিল, বৃটিশ সরকারের সহিত ভারত সরকারের যুদ্ধজনিত ব্যয়ের বাটোয়ারা বন্দোবস্তের অহেতুক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। দ্বিতীয় আতঙ্ক ছিল, আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধনানন্তর অবশিষ্ট উদ্‌বৃত্তের ভবিষ্যৎ নিয়োগ সম্বন্ধে। তৃতীয় আতঙ্ক ছিল, মুদ্রা-বৃদ্ধি ও মূল্য-স্ফীতি হেতু অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অভাব-অনাটনজনিত যে সুকঠোর পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহার আশু এবং অনতিদূরবর্ত্তী জটিল ও কুটিল পরিণাম সম্পর্কে। চতুর্থ আতঙ্ক ছিল, ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধব্যয়ের সরবরাহ নিমিত্ত অতিরিক্ত করবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুর্ব্বহ কর ও ঋণ-ভারের দুর্ব্বিসহ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে।

যুদ্ধ ঘোর বিপ্লব। যুদ্ধের ব্যয় ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং তাহার অকুণ্ঠিত সরবরাহ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সাধারণ ও স্বাভাবিক আয়-ব্যয়ের আয়ত্তের বাহিরে। করবৃদ্ধি এবং ঋণ ব্যতীত তাহার নিয়মিত যোগান সম্ভবপর নহে। ঋণ উত্তমর্ণের প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্‌বৃত্ত অঙ্ক হইতে সংগৃহীত হয়; কিন্তু করবৃদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃস্ব ও দরিদ্র প্রজাসাধারণের ক্লেশকর হয়। অপরিহার্য্য অধিকতর কৃচ্ছ্র-সাধন দ্বারা চিরন্তন অভাবের মাত্রা বাড়ানো ছাড়া তাহার দ্বিতীয় উপায় থাকে না। এই নিমিত্ত যুদ্ধ-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যুদ্ধ-প্রয়োজন-জনিত আয়ের প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে, উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয় হইতে লব্ধ ঋণ এবং সমর্থ স্বচ্ছল ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতামূলক দান ও সাহায্য ব্যতীত অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়।

যুদ্ধের পশ্চাদাগত সুফল অথবা কুফল সর্ব্বজনভোগ্য; সুতরাং যুদ্ধের দায়ও সর্ব্বসাধারণের। এই নিমিত্ত ন্যায় ও নীতির নিয়মানুযায়ী প্রজাসাধারণেরও যথাশক্তি অর্থ ও সামর্থ্য প্রদান করিতে হয়। কিন্তু দরিদ্রের অর্থই বা কোথায়, এবং তাহার সামর্থ্যই বা কতটুকু! বিশেষতঃ, ভারতের সাধারণ প্রজাবৃন্দ চির-দরিদ্র। দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার তাহাদের কদাচিৎ জোটে। প্রচুর মুদ্রা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও তাহাদের অর্থের একান্ত অভাব। যুদ্ধকালে স্বভাবতঃই অপ্রচুর খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা হেতু তাহাদের ভাগ্যে অর্দ্ধাশন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনশনই ব্যবস্থা। অর্থশাস্ত্রের মৌলিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু বিপ্লবের সময়, নিদারুণ যুদ্ধের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ম ও নীতির মর্য্যাদা সংরক্ষণ অসম্ভব। যুদ্ধ ভারতের নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু আমাদের দ্বারে হানা দিয়াছে। সুতরাং ভারতের সংরক্ষণ-ব্যয় যে বর্ত্তমান বর্ষে তুঙ্গশীর্ষ অধিকার করিবে, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বাজেটের অব্যবহিত পূর্ব্বে শেয়ার-বাজার প্রভৃতিতে বিভ্রমের পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব সাম্যাবস্থা প্রবল ছিল। অর্থনীতিবিদ্ মহলেও বাজেটের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতের ন্যায় প্রত্যাশিত করভারও সর্ব্বত্র—সর্ব্বক্ষেত্রে—বিশেষতঃ, চির-দরিদ্রের প্রতি ক্লেশদায়ক। সেই ক্লেশের মূল যুদ্ধের ত্বরিত শান্তির নিমিত্ত সকলেই সমুৎসুক; শান্তির আকাঙ্ক্ষায় রাজা-প্রজা সকলেই অশেষ ক্লেশস্বীকারও সহ্য করিতেছে। কোথাও ক্লেশের তীব্রতা অধিক, কোথাও অপেক্ষাকৃত কম, এইমাত্র প্রভেদ। দরিদ্রের ক্লেশ সমধিক।

বাজেটের আর্থিক হিসাব-নিকাশের অঙ্ক দৈনিক সংবাদপত্রাদিতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত পাঠকের সুবিধার্থ তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তৎসংশ্লিষ্ট অর্থনীতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে আমরা মনোনিবেশ করিব। প্রতি বৎসর অতীত বৎসরের শেষ-সঙ্কলিত হিসাবনিকাশ, গমনোন্মুখ বর্ত্তমানের সংশোধিত আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং প্রবর্ত্তনোন্মুখ আগামী সরকারী বৎসরের আয়-ব্যয়ের অগ্রিম বিবরণী বাজেটের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়; সুতরাং ১৯৪০-৪১ পূর্ব্বাব্দে ভারতের প্রথম যুদ্ধ বাজেট সঙ্কলিত হয়। ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪২-৪৩ পর্য্যন্ত যুদ্ধপূর্ব্ব সামরিক বাজেটের তুলনায় ভারতের নিজস্ব সংরক্ষণ-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৫০ কোটি টাকা এবং মোটের উপর গত তিন বৎসরে রাজস্বের ঘাটতির অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বাজেটে প্রকাশ, গত অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের উন্নতি হেতু ঘাটতির পরিমাণ ১৭.২৭ কোটি হইতে ১২.৬৯ কোটিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ঘাটতির পরিমাণ ৩৫.৭৩ কোটি হইতে ৯৪.৬৬ কোটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই অঙ্কের চরম পরিণতি আগামী বর্ষের বাজেটে প্রকটিত হইবে। ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংরক্ষণ-ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধি নিম্নলিখিত অঙ্ক-তালিকায় প্রকটিত—

	স্বাভাবিক (ক্রোর টাকা)	অতিরিক্ত (ক্রোর টাকা)	মোট (ক্রোর টাকা)
১৯৪০-৪১	৩৬.৭৭	৩৬.৫৪	৭৩.৩১
১৯৪১-৪২	"	৬৫.৬৮	১০২.৪৫
১৯৪২-৪৩	"	২০২.১২	২৩৮.৮৯
১৯৪৩-৪৪	"	১৬২.৮৯	১৯৯.৬৬

বর্ত্তমান ও আগামী বর্ষের সংরক্ষণ-ব্যয়কে নূতন প্রণালীতে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে—রাজস্ব-মূলক ও মূলধন-মূলক অংশে; যথা,—

	রাজস্ব-মূলক (ক্রোর টাকা)	মূলধন-মূলক (ক্রোর টাকা)	মোট (ক্রোর টাকা)
১৯৪২-৪৩	১৮৯.৭৫	৪৯.১৪	২৩৮.৮৯
১৯৪৩-৪৪	১৮২.৪১	১৬.৮৫	১৯৯.২৬

এই দ্বিধা-বিভাগের অন্তরালে যে বিভ্রম প্রচ্ছন্ন, তাহা শুধু অর্থ-নীতিকের বোধগম্য। পৃথিবীর পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা এবং দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি ও আক্রমণের ফলে বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে আমাদের যোদ্ধৃ-সংখ্যা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সর্ব্বপ্রকারে সংরক্ষিত করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। আগামী বর্ষে আমাদের সর্ব্বপ্রকার

সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সর্ব্ববিধ বিপদের উপযোগী ও উপযুক্ত হইবে, অর্থ-সচিব এই আশা দিয়াছেন।

ভারতে বিপুল ব্যয়ে যে সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহা কেবল ভারতের আত্মরক্ষার জন্ম নহে; ইহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই ভারতের হিসাবের সংরক্ষণ-ব্যয়ের একটি প্রকৃষ্ট অংশ বৃটিশ সরকার বহন করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থ-সচিব এই অংশবণ্টনের ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার নিমিত্ত বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বিধি-ব্যবস্থার সংশোধন হেতু কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসৃত হয়, তখন জল, স্থল ও বিমান শক্তির [illegible] গুরু প্রসারণ ঘটে নাই। যখন যুদ্ধের কুটিল পরিস্থিতি হেতু ত্রিবিধ বাহিনীর প্রসার ঘটিল, তখন স্থলবাহিনীর দায়িত্ব সাম্রাজ্যের সহিত যৌথ-ভাবে দৃঢ়বদ্ধ। সুতরাং স্থির হয় যে, (১) ভারতের অর্থ ও শক্তি-সম্পদ হইতে গঠিত শিক্ষিত এবং সজ্জিত সমস্ত স্থলবাহিনীর ভারতে অবস্থিতি কালীন সমগ্র ব্যয়ভার ভারত বহন করিবে। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সমুদ্রপারে প্রেরিত হইলে তাহাদের ব্যয়ভার বৃটিশ সরকারের এবং (২) ভারতে গঠিত শিক্ষিত এবং সজ্জিত স্থলবাহিনীর প্রসার হেতু ভারতের বহির্ভাগ হইতে যে সকল সাজ-সরঞ্জাম এবং উপকরণসম্ভার আনীত হইবে, তাহার মাত্র কয়েকটি ব্যতীত সমগ্র ব্যয়ভার বৃটিশ সরকার বহন করিবেন। রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রসারকল্পে কোন জটিলতার সৃষ্টি ঘটে নাই। স্থলবাহিনীর ন্যায় বিমান-বাহিনীর গুরু প্রসারণব্যয়ও সম্মিলিত দায়িত্বে নির্দ্ধারিত হয়, সংরক্ষণ-ব্যয়ের অন্তিম আপাত (Incidence) সংঘাত, যোগান বিভাগের কর্ম্মবিস্তার এবং ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যের নিমিত্ত আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঋণ সাহায্য—এই তিনটি বিষয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। প্রথমোক্তটির সম্পর্কে মৌলিক (Capital) ব্যয় বৃটিশ সরকার বহন করিতেছেন। কিন্তু যোগান বিভাগের ক্রমবর্দ্ধমান কর্ম্মতৎপরতার ফলে ভারতে বহু শিল্পে স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতেছে, এই অজুহাতে বৃটিশ সরকার উভয় পক্ষের অন্যোন্যসাপেক্ষ (Mutual) স্বার্থের অনুকূলে কিঞ্চিৎ মৌলিক ব্যয় ভারতের অংশে বণ্টন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব ভারতের ওয়াকিবহাল মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। কাগজে-কলমে ব্যয়-বণ্টন ব্যবস্থা যেরূপ সমঞ্জস ও সমীচীন অনুভূত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবল ও দুর্ব্বল স্বার্থের সংঘর্ষে তাহার প্রচুর ব্যতিক্রম ঘটে। সেই ব্যতিক্রম স্বেচ্ছাকৃত কিংবা ঘটনামূলক, সে আলোচনা নিষ্ফল। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে বৃটিশ সরকার বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-প্রচেষ্টা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

বিমান-বাহিনীর সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, ভারতের স্থায়ী স্বার্থের অনুকূলে ভারতের অভ্যন্তরে বিমান-ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ হেতু মৌলিক, এবং ভারতে অবস্থানকালীন বিমান-চমূগুলির পৌনঃপুনিক ব্যয় ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে। সরবরাহ-প্রচেষ্টার নিমিত্ত মৌলিক ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ ভারত বহন করিবে এবং ভারতে সৃষ্ট সম্পদ্-সম্পত্তির অধিকারী হইবে। ইজারা-ঋণ সম্পর্কে মার্কিণের সহিত ভারতের সরাসরি অন্যোন্যসাপেক্ষ একটি বন্দোবস্তের আলোচনা চলিতেছে। ইতিমধ্যে আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঋণ সম্পর্কিত ব্যয় ভারতের সংরক্ষণ-হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে যেখানে জনসাধারণের কিংবা প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র, রেলপথ এবং কারবার-হিসাবে-পরিচালিত সরকারী বিভাগের নিমিত্ত ইজারা-ঋণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে উপযুক্ত মূল্য সরকারী তহবিলের আমলে লওয়া হইয়াছে। মার্কিণের সহিত আদান-প্রদানমূলক ব্যয়ের তালিকা-নির্দ্ধারণ দুরূহ; তথাপি ১৯৪২-৪৩ অর্থাৎ বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে ইহার পরিমাণ ১৬.৭০ কোটি এবং আগামী বৎসরে ৮.০৪ কোটি টাকা হইবে।

যুদ্ধ-বাজেটে যুদ্ধ-সম্পর্কিত ব্যয়ের বিস্তৃত আলোচনা এবং তদানুষঙ্গিক সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ অপরিহার্য্য। তথাপি আগামী বৎসরের মোট আয়-ব্যয়ের অতি সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দিয়া আমরা নব-নির্দ্ধারিত কর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যুদ্ধ-সম্পর্কিত ব্যয়-বৃদ্ধির প্রচণ্ডতা হেতু বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ ঘটিয়াছে ৯৪.৬৬ কোটি টাকা, এবং আগামী বৎসরের ঘাটতির অঙ্ক ৬০.২৮ কোটি। এই অঙ্ক অবশ্য বর্ত্তমানে প্রচলিত কর সমূহের অক্ষুণ্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আগামী সরকারী বৎসরের আয়-ব্যয়ের জায় এইরূপ:—

	ক্রোর টাকা
বে-সামরিক ব্যয়	৭৬.৭৮
সংরক্ষণ	১৮২.৮১
মোট	২৫৯.৫৯
বর্ত্তমান নিরিখ অনুযায়ী—	
মোট রাজস্ব	১৯৯.৩০
মোট ঘাটতি	৬০.২৯

এই ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ নূতন কর এবং দুই-তৃতীয়াংশ ঋণ গ্রহণ দ্বারা পূরণ করা হইবে।

শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা হেতু সংরক্ষণ-ব্যয় অপরিহার্য্য। এই ব্যয় সাধারণ ও স্বাভাবিক মাত্রাতিরিক্ত এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল। নূতন কর এবং ঋণ ব্যতীত এই ব্যয়-সঙ্কুলান সম্ভবপর নহে। নূতন কর যে আকার-প্রকারেই আসুক না কেন, তাহার প্রকোপ ক্রমনিম্নগামী হইয়া সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রতি-প্রসারিত হয়। ভারতের সর্ব্বজনীন দারিদ্র্যের সমানুপাতে, অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের তুলনায়, প্রচলিত করভার জনসাধারণের স্বল্প অর্থ, বিত্ত ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত। অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত করের প্রভাব নিঃস্ব ও দরিদ্রকেও নিষ্কৃতি দেয় না। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে, —**necessary evil,** অর্থাৎ অপরিহার্য্য বৈগুণ্য। সংরক্ষণ-ব্যয় সঙ্কুলানার্থ নূতন কর অনিবার্য্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই; তবে সঙ্কট এই যে, এই করনির্দ্ধারণে সাধারণ প্রজাবৃন্দের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিগণ যেরূপ বিচক্ষণতার ও সহৃদয়তার সহিত প্রতি নূতন করের অন্তিম-দায়ীর দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন, আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। শাসক ও শাসিতের স্বার্থও স্বতন্ত্র; এবং যেখানে শাসক বিদেশী, সেখানে অনাচার অথবা অবিচারের আশঙ্কা অমূলক নহে। আমলাতন্ত্রকে সর্ব্বদা সমুদ্রপারে কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত-অনুমতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট অসম্ভব নহে। অত্যাচার না হউক, অনাচার ঘটিতে পারে।

কিন্তু ঋণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা ভিন্ন। ঋণ উদ্বৃত্ত অর্থের অধিকারীই দিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ভারতের ভাগ্যে বিভ্রাট কম ছিল না। বহু দিন স্বদেশী হইতে বৈদেশিক ঋণভারই ভারতের পক্ষে প্রবল ছিল। কালক্রমে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ত্তমানে এই পরিস্থিতির প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দরিদ্রের দেশ হইলেও কৃষিজ, বনজ, খনিজ এবং শিল্পজ সম্পদে ভারত চিরদিন সমৃদ্ধ। বিগত এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রয়োজনসাধনার্থ বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং রসদ উপকরণ সরবরাহ করিয়া ভারতবাসী যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র-গৃহীত দ্রব্যাদির মূল্য ভারত সরকারকে টাকায় পরিশোধ করিতে হয়। বৃটিশ সরকার তদ্বিনিময়ে ষ্টার্লিং জমা দেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে। এই ষ্টার্লিং এবং নানা কারণে যুদ্ধ পরিস্থিতিহেতু ভারতের আমদানী-হ্রাস এবং রপ্তানী-বৃদ্ধির ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-জমা-খরচে উদ্বৃত্ত জমার অন্তর্ভুক্ত ষ্টার্লিং একত্রিত হইয়া, যুদ্ধারম্ভ কাল হইতে আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি ৬৫ কোটি হইতে ৮৪৪ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। এই সংস্থান হইতে আমরা ৪০০ কোটি টাকা ষ্টার্লিং, অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে এই সংস্থিতির পরিমাণ ছিল ৪৪৪ কোটি টাকা। প্রতি মাসে এই সংস্থিতি ২০ কোটি টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। যত দিন যুদ্ধ স্থায়ী হইবে, তত দিন এই সংস্থিতি বৃদ্ধি পাইবে। এই সংস্থিতিই আন্তর্জাতিক আর্থিক জগতে ভারতকে অধমর্ণের পর্য্যায় হইতে উত্তমর্ণের পদবীতে আরূঢ় করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন, কিরূপে এই সংস্থিতির ন্যায় ও নীতি-সঙ্গত সদ্ব্যবহার হইবে। অর্থ-সচিব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই সংস্থিতি হইতে ষ্টার্লিং অর্থাৎ বৈদেশিক অবসর বৃত্তি, পারিবারিক-বৃত্তি এবং সংস্থান-ভাণ্ডার-সংশ্লিষ্ট দায় হেতু বৃটিশ সরকারকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া বক্রী অর্থে যুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর-সংগঠন এবং বিবিধ শিল্পের পুষ্টি ও প্রসার হেতু একটি পুনর্গঠন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং সেই ভাণ্ডারের অর্থে বিলাত হইতে কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং এ দেশে দুষ্প্রাপ্য উপায়-উপকরণ ক্রীত হইবে। কিন্তু এই পুনর্গঠনের ব্যয় সাধারণ সরকারী তহবিল হইতে নির্ব্বাহ হওয়া সমীচীন। এই বিশেষ ও বিরল সংস্থিতি দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক মূলধনের মূল উচ্ছেদ করিয়া আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী। যুদ্ধান্তে বৈদেশিক পণ্যও আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বিপণিতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কোন দেশবিশেষ হইতে উচ্চমূল্যে দ্রব্যাদি আহরণ করিলে তাহা অর্থ-শাস্ত্রের নীতি উল্লঙ্ঘন করিবে। বৃটিশ মূলধনে পরিচালিত সর্ব্ব-প্রকার প্রতিষ্ঠান আয়ত্ত করিয়া, সামান্য কিছু ষ্টার্লিং-সংস্থান ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিমিত্ত রাখিয়া, একটি ডলার-সংস্থিতি সংগঠন উপযোগী হইবে। কারণ, আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঋণ কারবারের নিমিত্ত শীঘ্রই আমাদের মার্কিণের সহিত একটি বিশিষ্ট চুক্তি বিধিবদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য, এই সংস্থিতির সহিত ভারতের সংরক্ষণ-ব্যয়ের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া ভারত সরকার ভারতে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার কল্যাণপ্রদ ফল এই যে, আমরা বৈদেশিক ঋণের সুদস্বরূপ যে মোটা টাকা বিদেশে পাঠাইতাম, তাহা স্বদেশেই থাকিবে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মূলধনকেও যদি আমরা স্বদেশী মূলধনে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে এখন যে প্রচুর লভ্যাংশ বিদেশে যায়, তাহাও আমরা স্বদেশে স্বদেশবাসীর কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারিব। ষ্টার্লিং-এর যুদ্ধোত্তর দৃঢ়তা সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তার প্রচুর আশঙ্কা আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আগামী সরকারী বৎসরের ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হইতে পূরণ হইবে এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ঋণ দ্বারা সরবরাহ করা হইবে। যুদ্ধপূর্ব্বে ভারতের বৈদেশিক এবং ভারতীয় ঋণের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

	ভারতীয় (ক্রোর টাকা)	বৈদেশিক (ক্রোর টাকা)	মোট (ক্রোর টাকা)
মার্চ্চ, ৩১, ১৯৩৯	৭০৯.৯৬	৪৬৯.১০	১১৭৯.০৬
" " ১৯৪২	৯৪২.২৯	১৮০.০০	১১২২.২৯

যুদ্ধপূর্ব্বে সুদের দায়ে ভারত সরকারের ঋণসমষ্টি ছিল ১১৮৫ কোটি টাকা। পুরাতন মেয়াদী ঋণ পরিশোধ এবং নূতন ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া সাধনানন্তর, বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের শেষে ঋণ-সমষ্টি দাঁড়াইবে ১২৭৩ কোটিতে এবং আগামী বৎসরের শেষে ১৩৩১ কোটিতে। ইহার প্রায় সমগ্র অংশই ভারতীয় ঋণ। রাজস্বের ঘাটতি এবং সংরক্ষণ হেতু মৌলিক ব্যয়ই এই বৃদ্ধির হেতু। রেল, ডাক ও তার বিভাগের মূলধন, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কিছু ঋণ ও দাদন, কিছু প্রযুক্ত অর্থ (Investments) এবং নগদ তহবিল বাদ দিলে, ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষে সরকারের দুর্ব্বহ ঋণভার দাঁড়াইবে ৩১৭ কোটি। অবশ্য সরকারের কিছু সম্পত্তি এবং অর্থকরী সম্পদ্ আছে এবং এই ঋণের সুদনির্ব্বাহার্থ কয়েকটি নূতন রাজস্বের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের দুঃস্থ জনপ্রতি এই ঋণের পরিমাণ ও প্রকোপ কিরূপ প্রবল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সাম্রাজ্য-সংরক্ষণার্থ যুদ্ধোপকরণ এবং ভারতের সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে উপায়, উপাদান এবং উপকরণ প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভারতে চলতি মুদ্রার প্রভূত প্রসার সাধন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্বে কারেন্সি নোটের প্রচলন ছিল ১৭২ কোটি টাকা। ধীরে ধীরে সেই অঙ্ক আজ ৬২৬ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু অর্থবৃদ্ধির সমানুপাতে প্রজাসাধারণের আহার্য্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই;—যুদ্ধ-প্রয়োজনে পাওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্বল্প-পরিমিত আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের নিমিত্ত অত্যধিক পরিমিত অর্থ প্রাপণীয় হওয়াতে দ্রব্যমূল্য অযথা অসীম পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কর্ম্মজীবীর পারিশ্রমিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে, জীবন-যাত্রার ধারা নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। এই নিমিত্ত চিন্তাশীল অর্থ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা-পরিচালন-যন্ত্র সাহায্যে বৃটিশ সরকার ও মিত্র রাষ্ট্রগুলির তরফে টাকা খরচকে (**Rupee disbursements**) দায়ী করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়ার ফলেই যে অর্থ-স্ফীতি (**Inflation of Currency**) এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে মূল্য-স্ফীতি (**Inflation of Prices**) ঘটিয়াছে, ভারতের অর্থ-সচিব তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত যে যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় সরকারী আমলার পক্ষে সমঞ্জস্ হইলেও বিশেষজ্ঞের পক্ষে সমীচীন নহে। ভারতের অর্থ-সচিব মনে করেন,

কার্য্য-কারণ এবং পরিণাম-পরিণতি (Cause and effect) বিষয়ে মতিভ্রমই এই প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গীর হেতু। ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এখনও ভারতের জন-শক্তি ও সম্পদ্-সামর্থ্যের বৃহত্তম অংশ আয়ত্ত করে নাই; সরবরাহ, সংগ্রহ এবং সংগঠন-কার্য্য এখনও প্রবল; সর্ব্বসাধারণ-যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় (Common war effect) দ্রব্যসামগ্রী এবং চাকুরি-নকুরি দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক ঋণ-সমস্যার মীমাংসা হেতু প্রচলিত স্বাভাবিক উপায় ও বিধান প্রাপণীয় নহে এবং আমদানী বৃদ্ধি দ্বারা, কিংবা বিনিময়-হারের উর্দ্ধগতি দ্বারা, বাণিজ্য-জমা-খরচের সামঞ্জস্য সংসাধন দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সম্পর্কের সঙ্গতি-সাধন সম্ভবপর নহে; এবং যেহেতু ভারতীয় প্রচলিত মুদ্রা সাহায্যেই ব্যয় [illegible], করিতে হইবে, সেই হেতু কিরূপে যুদ্ধ-ব্যয়ের বিলি-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার সহিত অর্থ-স্ফীতি প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক; যদিও চরম নিষ্পত্তির পক্ষে ইহার গুরুত্ব প্রচুর। সুতরাং কর-নির্দ্ধারণ এবং ঋণ-গ্রহণ সাধ্য হইলে, ভারতের অনুকূলে ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরীণ সমস্যার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। ভারতের অর্থ-সচিবের বিশ্বাস, যুদ্ধে জয়লাভের সহিত যুক্তরাজ্য এবং ভারত সরকার উৎকৃষ্ট আর্থিক নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক বিগত মহা-যুদ্ধের অবসানে কোন কোন বিজিত দেশে অনুভূত অর্থাতিশয্যের কুফল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। ক্রমবর্দ্ধমান ষ্টার্লিং-সংস্থিতি এবং অত্যধিক অর্থ-স্ফীতি, এই যমজ সমস্যার (Twin problem) গুরুত্বের অপলাপ না করিয়া, অর্থ-সচিবের বিশ্বাস যে, প্রকৃত বাজার-সম্ভ্রম বৃদ্ধি (Pure credit inflation) এবং স্থিতিশীল কিংবা ক্ষয়িষ্ণু ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু ক্রয়শক্তির সংঘাত, এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যের ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রতিপক্ষের আশঙ্কার উৎপত্তি।

ভারতের অর্থ-সচিব "বিশুদ্ধ বিবেকের" সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন সময়েই ভারত সরকার বাজার-সম্ভ্রম-স্ফীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বাজেটে রাজস্বের ঘাটতি-পূরণের কিংবা ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকারী তহবিল-বৃদ্ধির নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা লয়েন নাই। উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য ট্রেজারি বিল (Ad hoc Treasury Bills) দ্বারা ষ্টার্লিং-ঋণের আংশিক পরিশোধ বাজার-সম্ভ্রম-স্ফীতি পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। এই ঋণ-পরিশোধ প্রকল্পে কোন অবস্থাতেই "এড হক্ ট্রেজারি বিলের" বিরুদ্ধে "কারেন্সির" বিস্তার সাধন করা হয় নাই। "ট্রেজারি বিল"গুলি মাত্র সেই ষ্টার্লিংএর স্থান গ্রহণ করে—যাহার বিরুদ্ধে অগ্রেই কারেন্সির বিস্তার সাধিত হইয়াছে—নিয়মানুগ ভাবে, বৈধ দাবীর রোক-শোধ (cash payment) হেতু এবং এই পরিবর্ত্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগের (Issue department) সম্পদের (assets) সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মাত্র। ইহা জাতির ব্যবহারের নিমিত্ত অর্জ্জিত নিবন্ধ অর্থসমষ্টি (Block of investment) মাত্র। অর্থ-সচিবের আরও একটি যুক্তি এই যে, সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিস্তৃতি ও দৃঢ়তার সহিত শ্রম, কাঁচা মাল এবং বিবিধ কর্ম্মের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান পাওনাদারগণকে নগদ মূল্য দিতে হয়। যুদ্ধ-পরিস্থিতিপ্রসূত আশঙ্কা নিবারণ হেতু যে সকল ক্ষেত্রে শান্তিকালে চেক্ চলে, সে সকল স্থলেও নগদ-বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং বিশাল এবং বিস্তারশীল জনসংখ্যার নিমিত্ত প্রভূত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। অধিকন্তু, সরকারের সর্ব্ববিধ যুদ্ধ-ব্যয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহায়ক নহে, যদিও সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টা হেতু অসামরিক দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন এবং আমদানী কিয়দংশে ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে দ্রব্যমূল্য উচ্চস্তরে নহে—নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল, এবং তাহাদিগকে উর্দ্ধাভিমুখী করিবার প্রয়োজনও ছিল।

যুক্তি বটে! কিন্তু এই যুক্তিজালের অযৌক্তিকতা দুরবগাহ নহে। যে ৪০০ কোটি টাকা ঋণ-পরিশোধার্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৬০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদান করিয়াছে। কিন্তু গত দুই বৎসরের রাজস্ব-ঘাটতির গুরু অঙ্ক ১০৮ কোটি টাকা যে এই টাকার অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের যেরূপ নিকট এবং নিগূঢ় সম্পর্ক, তাহাতে ভারত সরকারের ক্রমাগত ঋণগ্রহণ-প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজের নোট ছাপিয়া সরকারের বাজার-সম্ভ্রম বৃদ্ধি করেন নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়! অর্থ লইয়াই যাহাদের কারবার, অর্থাৎ শিল্পী, বণিক্ ও বৃত্তি-ব্যবসায়ী প্রভৃতির বৈধ-প্রয়োজনে প্রচলিত মুদ্রাবৃদ্ধি মুদ্রা-স্ফীতি (Inflation) নহে, এবং তাহার বৈধ মুক্তি-পন্থা কারবারী হুণ্ডি (Trade bills)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "বিল" তহবিলের নিরন্তর হ্রাস-লাঘবতার সহিত কারেন্সি নোটের সংখ্যা-বৃদ্ধি অসমঞ্জস্ পরিস্থিতির নির্দ্দেশ দেয়। দ্বিতীয় কথা, সামরিক উপাদান-উপকরণের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অসামরিক আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। তখন যুদ্ধ-প্রয়োজনে ক্রমাগত অর্থবৃদ্ধি হইলে স্বল্প-পরিমিত ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ক্রম-বিস্তৃত অর্থবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল,—দ্রব্যমূল্যের অযথা অপরিসীম বৃদ্ধি। এ দায়িত্ব কাহার?

খাদ্য-দ্রব্যের স্বল্পতা, মূল্য-শাসনের ব্যর্থতা, মাল-চলাচলের দুর্গমতা, গরিষ্ঠ শিল্পের অপ্রতিষ্ঠা, যথা-সময়ে উপযুক্ত ও উপযোগী প্রতিবার-ব্যবস্থার অভাব,—এ সকলের জন্য দায়ী কে? আমদানী-প্রতিরোধই কি খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতার একমাত্র কারণ? খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাহার রপ্তানি কি অর্থশাস্ত্রের অনুমোদিত? সামরিক প্রয়োজনে সরকারের ক্রয়-নীতির সহিত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধির কি কোন সম্পর্ক নাই? বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই যদি এ দেশে এঞ্জিন ও মাল-গাড়ী প্রস্তুতকার্য্য আরব্ধ হইত, তাহা হইলে এখন মাল-চলাচলের এই বিষম ব্যাঘাত ঘটিত না। পক্ষান্তরে, ভারতের বাহিরেও রেলগাড়ী পাঠাইতে হইয়াছে! এ ত্রুটি কাহার?

তৃতীয় কথা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দ্বারা নিরন্ন কৃষককুলের ঋণভার লাঘব হইয়াছে কি? তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব প্রশমিত হইয়াছে কি? চোরা বাজারের সৃষ্টি ও অত্যাচারের মূল উৎস কোথায়? যুদ্ধ-প্রয়োজনে করবৃদ্ধি অপরিহার্য্য। কিন্তু যে প্রকারেই করবৃদ্ধি হউক না কেন, তাহার ক্রম-অধঃ-প্রসারিত অন্তিম অভিঘাত কি দরিদ্রের উপর আপতিত হয় না? তামাক ও বনস্পতি ঘৃতের উপর কর নিতান্তই দরিদ্রের প্রতি প্রযুক্ত নহে কি? কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত বাড়্তি কর, এবং ডাক ও আইনগঠিত সমিতি (Corporation) কর কি শিল্প, বাণিজ্য ও বৃত্তি-ব্যবসায়কে খর্ব্ব করিবে না? এবং জরুরী (emergency) কর কি অবশেষে স্থায়ী করে পর্য্যবসিত হয় না?

যুদ্ধে ব্যয়-বণ্টন-ব্যবস্থা, ষ্টার্লিং-সংস্থিতির উদ্বৃত্তের শেষ পরিণাম, মুদ্রা-বিভ্রাট ও দুর্ম্মূল্য অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা আমাদের আতঙ্ক প্রবর্দ্ধিত না করিলেও আশঙ্কা নিবৃত্তি করে নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল—ঘনঘটা না হউক, গাঢ় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। কর ও ঋণ,—ঋণ ও কর, উভয়ই দরিদ্রের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নিদারুণ অভিসম্পাত, কিন্তু রাষ্ট্র ও পৌর বাজেটের তাহা প্রধান উপজীব্য।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

করবী-মল্লিকা

(উপন্যাস)

৩৮

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, বিছানায় শুইয়া মাসিক-পত্রের ছবি দেখিতেছি, মিলি আসিয়া আপন-মনে আরম্ভ করিল,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান,
এক-সুরে বাঁধা এক-মন্ত্রে সাধা বাজিয়া উঠেছে যুগল প্রাণ।
হৃদয়ের ভাষা হিয়ার পিয়াসা, শুনিতে বুঝিতে পারে কি পরে!
কি জানি কি কয় নীরবে মলয় যূথিকা-কলিকে হরষ-ভরে!
সে অফুট কথা, নীরব ব্যথা জানে শুধু ওই কুহকী বাঁশী—
বাঁশীর সুস্বরে ভাসি ওঠে ধীরে, কত আঁখি-ধারা হাসির রাশি!"

ছবি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও আবার কি মিলি? সারা দুপুর ওই কাজ হয়েছে না কি? আমার হাতে কাগজখানা দে তো, পড়ে দেখি।"

উত্তর না দিয়া মিলি তেমনি নত-নেত্রে পড়িতে লাগিল,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান,
ও অধীর ধ্বনি শুধু প্রতিধ্বনি, তরুণ প্রাণের করুণ গান।
ডাকিছে বাঁশরী, আয় কুলনারী, উছলে দু'হৃদি উথলে কূল,
আয় রে যতনে দু'কূল বাঁধনে বেঁধে দিতে দু'টি প্রাণের মূল।
থেকো নিরমল দুইটি কমল, পবিত্র প্রেমের হারেতে বাঁধা,
বাঁশীর নিক্কণে দুইটি পরাণে উঠুক সুচির প্রণয়-গাথা।"

বিছানা ছাড়িয়া মিলির হাত হইতে খাতার পাতাখানা কাড়িয়া লইলাম।

হাতের লেখা মিলির নয়। বলিলাম, "এ তো তোর লেখা নয়! কার লেখা? কোথা থেকে আন্‌লি?"

মিলি কহিল, "আমার মাষ্টার-মশায় ললিত বাবু এসেছিলেন; তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম। উনি স্বভাব-কবি, ভেবে-চিন্তে উনি লেখেন না। কলম নিয়ে বসলেই হলো! বললাম, করুর বিয়েতে জরির সুতো দিয়ে মখমলের ওপর আমি একটা স্মরণ-চিহ্ন সেলাই করে দিতে চাই। বলবা মাত্র কল্পতরু মাষ্টার-মশায়ের কলমের ডগা থেকে খস্‌-খস্‌ করে এটা বেরিয়ে এলো। হাতে সময় রেখে সেলাই করতে হয়। চার-দিকে লতার বর্ডার দিয়ে মাঝখানে এতগুলি অক্ষর লিখতে সময় বড় কম লাগবে না! এটিতে সুর দিয়ে গাইবো, ইচ্ছা আছে। ভাবছি, তুই কীর্ত্তন ভালোবাসিস্‌, কীর্ত্তনের সুরই দেবো! ভালোবাসিস্‌ বলেই না আজ-কাল তোকে আমি কীর্ত্তন শোনাই। এর কথাগুলিতে বেশ কীর্ত্তনের টান রয়েছে,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি, কোমলে মিলায় মধুর তান।"

মিলির পাগ্‌লামিতে রাগ করিব, কি হাসিব, ভাবিয়া পাইলাম না। সময়-সময় ও যেন সত্যই প্রহেলিকা হইয়া ওঠে! মিলিকে জানিবার শক্তি আমি হারাইয়া ফেলি! আজ যেন মিলি আমাকে জ্বালাতন করিবার সংকল্প লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রভাতে যাহার সূচনা হইয়াছিল, অপরাহ্নেও তাহার নিবৃত্তির আশা নাই বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া আমি কহিলাম, "মাপ কর্‌ মিলি, আর আমায় ত্যক্ত করিস্‌ নে। মন দিয়ে শুনে রাখ্‌, বিয়ে আমি কখ্‌খনো করবো না। আমার মিলন-বাসরে কাকেও মিলন-গীত গাইতে হবে না! যদি মরণ বাসরে কিছু দেবার থাকে, তাহলে বরং দিস্‌। এ জন্মের মত আমার মিলন শেষ। এক আশা, তোদের মিলনে গান গাইবো, তোরা সুখী হলেই আমি সুখী হবো। এ ছাড়া আমার অন্য কামনা নেই।"

"তোর কামনা নেই, আর আমারি আছে করু? তোর ছল-ছল চোখের আমি ধার ধারিনে আর। এত দিন চুপ করেই ছিলাম, আজ আমার বলবার দিন এসেছে। তুই কি জানিস্‌ না, বর্ণচোরা আমের উপরে রং না ধরলেও ভিতরের রংএ খবর কারো অজানা থাকে না। তোকে যে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে, তার সঙ্গেও ছলনা! ছি করু, ভুলেও তুই আমাকে আপনার ভাবতে পারলি নে!"

মুহূর্ত্তে আমি বিচলিত হইলাম। এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী তরুণীর কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে আমি বিহ্বল হইলাম। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে আমার খানিকটা সময় লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিলাম, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মিলি? কি তোকে গোপন করলাম? কিসেরই বা ছলনা? তুই যা-তা বলিস, আমি বারণ করি বলেই না এত কথার সৃষ্টি! আর বারণ করবো না, তোর যা খুশী তুই বল— হলো তো? এদিকে বাজে বকছিস্‌, ওদিকে বেলা যে গেল, সে-জ্ঞান আছে?" নেমন্তন্ন যেতে হবে না? মাসিমা এখনি তাড়া দেবেন, তোর আবার তৈরি হতে দেরী হয়।"

"দেরীর ভয় নেই! তুই যা চাপা দিতে চাইছিস্‌, আমি তা চেপে গেলাম। শোন্‌ করু, আজ আমার একটা কথা তোকে রাখতে হবে। চিরকাল তোর পছন্দ-মত তুই সাজ করিস্‌, আজ কিন্তু আমি তোকে সাজিয়ে দেবো। নিজের রুচিতে খাওয়া, পরের রুচিতে পরা—এক দিনের জন্য শুধু এ নীতি মেনে নে!"

নিষ্কৃতির সহজ উপায় বুঝিয়া আমার বুকের পাথর যেন নামিয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, "এ নীতি মেনে নিলাম মিলি, তবে আমার মিনতি, বাড়াবাড়ি করিস্‌ নে। বেশী সেজে বেরুতে আমার লজ্জা করে। আমার সাজের আছেই বা কি? আমার মতে পরের হাতে মানুষের সাজের দিন জীবনে দু'টো,—এক বিয়েয়, আর শেষের দিন।"

"বেশ, আমি কথা দিলাম, তোর বিয়ের দিনে আমি সাজিয়ে দেবো আর তুই আমাকে সাজিয়ে দিবি মরণের পর শ্মশান-যাত্রার সাজে।"

ব্যথিত হইয়া আমি ডাকিলাম,—"মিলি!"

মিলি হাসিল, "এতে চোখ-রাঙ্গানোর কিছু নেই করু। জন্ম যখন নিয়েছি, তখন এক দিন না এক দিন সে-দিন আসবে। চল্‌, কাপড় ছাড়বার ঘরে যাই। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, মা রাগ করবেন।"

নির্ব্বিবাদে মিলির হাতে নিজেকে আমি সমর্পণ করিলাম।

নানা উপকরণে মিলি আমার অঙ্গ সুশোভিত করিতে লাগিল। তাহার হীরা-মুক্তার বাছা কয়েকটি গহনায় ত'হারই গৈরিক রঙের 'বিষ্ণুপুরী' শাড়ীতে আমার দেহশ্রী বিলুপ্ত হইল কি বর্দ্ধিত হইল, তাহা সে বলিতে পারে! তাহার একাগ্রতায় নিপুণতায় আমার খোঁপায় মালা পর্য্যন্ত বাদ রহিল না।

এমন করিয়া কেহ কখনো আমাকে সাজায় নাই, আমিও সাজি নাই। অনভ্যস্ত বেশভূষায় আমার লজ্জার সীমা রহিল না। প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। এত দিন মিলিকে শুধু ভালোই বাসিতাম, সে ভালোবাসায় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। মিলি আমাকে যেন জানে,—আমার যাহা গোপনীয়, ও যেন তাহার সন্ধান পাইয়াছে! মিলি আজ আমার বিচারকের আসনে বসিতে পারে! লুকানো বস্তু প্রকাশ্য দিবালোকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে! মিলিকে জানিবার অহঙ্কার আমার চূর্ণ হইয়াছে। তাহাকে কেহ জানিতে পারে না, দূর হইতে সে দূরতম, সীমার উর্দ্ধে সে! আমাদের ক্ষুদ্র মাপ-কাঠিতে তাহাকে মাপা যায় না, আমাদের মনের সূক্ষ্ম সূতায় সে বাঁধা পড়ে না।

আমার সজ্জা-পর্ব্ব সম্পূর্ণ হইল। প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া মালাকর যেমন নির্নিমেষে সে প্রতিমার পানে তাকাইয়া থাকে, মিলিও তেমনি মুগ্ধনেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আমার প্রতি অঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া মিলি কহিল, "সত্যি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! একটু এমন-তেমন করলে তোকে এত ভালো দেখায়, তা জানতাম না! কে বলে, তুই দেখতে ভালো নোস্? অনেকের চেয়ে, আমার চেয়ে ঢের ভালো। সবাই যে আমাকে সুন্দর বলে, তা শুধু তোর চেয়ে ফর্সা রংএর জন্য নয়, রাত-দিন আমি সেজে থাকি, তাই। তোর মুখের কাছে আমার মুখ? আয়নায় ছাখ, কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে!"

আমার হাত ধরিয়া মিলি আমাকে বড় আয়নার সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

চোখ তুলিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। মিলি এ কি করিয়াছে? আমি যাহা নই, তাহাই যে প্রতিপন্ন হইতেছে! নয়নের কাজল-রেখায়, অধরের রক্তিম আভায়, চিবুকের কৃষ্ণ তিলের তলে আমি যেন হারাইয়া গিয়াছি! কিন্তু এমন বেশে কেমন করিয়া আমি তাঁহার কাছে যাইব? তিনি কি ভাবিবেন? লজ্জায়, কুণ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার নব সজ্জা আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিল, ভয় কি, ভীরু! তোর ভয় নেই, মিলির দীপ্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে তোর এ সজ্জার আড়ালে তুই অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিবি! কে তোকে লক্ষ্য করিবে? তোকে কার বা প্রয়োজন? এ জীবনের মত তোর বিবাহের বেশ তোলা রহিল, এক দিনের এ প্রসাধন অপরাধের নয়!

সরিয়া আসিয়া মিলিকে কহিলাম, "এখন তুই তৈরি হয়ে নে, তোর দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোর মত আমি অত-শত জানি না, তবু আয়, চুলটা বেঁধে দি, জামা-কাপড় বের করে দি!"

"আমার জামা-কাপড়ের আজ দরকার নেই রুরু, আমি নেমন্তন্ন যাবো না।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! "যাবি না? তাঁরা অত করে বলে গলেন! তুই না গেলে দিদি দুঃখিত হবেন, জ্যোতি বাবু আঘাত পাবেন। তোর না যাবার কারণ কি, শুনি? তুই না গেলে আমিও যাবো না,—যেতে আমি পারবো না।"

"আমি না যেতে পারলে তোর যাবার মানা কিসের? ভানু যাবে, মা যাবেন, তাতে হবে না? আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, তাই যাবো না। এ কথা তাঁদের লিখে জানিয়েছি, তাঁরা দুঃখিত হবেন না, আঘাতও পাবেন না। তুই চলে যাবি, আমি তো এইখানেই থাকবো, আমার আর-একদিন গেলেই হবে!"

"তা হয় না মিলি। তুই না গেলে আমি কখখনো যাবো না। বেশ তো, ভানুকে নিয়ে মাসিমা নেমন্তন্ন রক্ষা করে আসুন, তোতে-আমাতে বাড়ীতে থাকি। কিন্তু না, তোর শরীর আবার খারাপ কোথায়? মিছে ছুতো করছিস তুই!"

"ছুতো নয় রুরু, সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে না। তুই থাকবি না বলেই ওঁরা খেতে বলেছেন, তোর জন্যই আজকের খাওয়া-দাওয়া, আমার জন্য নয়। আমি না যেতে পারলে বিশেষ দোষ হবে না। কত জায়গায় তো আমি গিয়েছি, তুই যাসনি, তুই গেছিস, আমি যাইনি! তাতে কি হয়েছে! আজ তোকে কিন্তু যেতেই হবে, রুরু।"

"যেতে হবে তা যেন মেনে নিলাম, কিন্তু আমরা সকলে একত্র হবো, তাই আবো ওঁরা বলেছেন। আমি চলে গেলেও আবার আসতে পারি! চন্দ্রদাকে আবার কত দিনে পাওয়া যাবে! তুই না গেলে তিনিই বা ভাববেন কি?"

"তাঁর বাড়ী নয়, তাঁর নেমন্তন্ন নয়, তিনি আবার কি ভাববেন?"

৩৯

অনেক দিনের পর আবার সেই বাড়ী, সেই পুষ্পোদ্যান। আমরা গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র মা আমাকে সাদরে আহ্বান করিলেন, "এসো মা-লক্ষ্মি, ঘরে এসো!"

দিদি বলিলেন, "মাসিমাকে নিয়ে বসাওগে মা, আমি এদের বাগানে নিয়ে যাচ্ছি।"

ভানুকে প্রবীরের দলে ভিড়াইয়া দিদি আমাকে বাগানে লইয়া চলিলেন।

বাগানে বেতের চেয়ারে বসিয়া চন্দ্রদা ও জ্যোতি বাবু গল্প করিতেছিলেন। জ্যোতি বাবুর পাশের শূন্য আসনে আমাকে বসাইয়া দিদি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বসন্তের রূপে, রসে, গন্ধে ধরণী রোমাঞ্চিত, বায়ু সুরভিময়। লেকে পর-পারের ঘনসন্নিবেশিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া কোকিল ডাকিতেছিল।

চন্দ্রদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলাম, মল্লিকা দেবীর অসুখ করেছে! কি অসুখ রুরু?"

উত্তর দিলাম, "তেমন কিছু নয়, শরীরটা ভালো বোধ করছে না, তাই এলো না।"

"তাঁর যদি এখানে আসতে ভালো না লাগে, তাতে দুঃখের কি আছে চন্দ্র? আমি জানি, অসুখ তাঁর দেহের নয় মনের। তোমার না ডাক্তারী-বিদ্যায় এত খ্যাতি, দাও না মল্লিকা দেবীর মনের অসুখ সারিয়ে! এত কাল কেবল শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাই করেছো, এবার মানসিক রোগের চিকিৎসা ধরো।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চন্দ্রদা কহিলেন, "মানসিক রোগের ওষুধ আমি তো জানি না জ্যোতি,—ডাক্তারী বইয়ে লেখা থাকলে খুঁজে বের করবো।"

"খুঁজতে হবে না,—ভাবলেই পাবে, ভাই। এত দেশ-বিদেশ ঘুরে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে তবু এমন নিরেট হয়ে রইলে! অন্য বিষয় না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা সকলেরই থাকে! তোমার—"

কথাটা জ্যোতি বাবু শেষ করিতে পারিলেন না। ব্যস্তসমস্ত ভাবে দিদি আসিয়া কোন কাজের জন্য যেন চন্দ্রদাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

সেই নির্জ্জন লতা-বিতানে, সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে জ্যোতি বাবুর পাশে আমি! কেহ কোথাও নাই! মাথার উপর অবারিত অনন্ত আকাশ, চারি দিকে ফুলের সমারোহ। এ মায়া-বিভ্রমের মধ্যে কেহ কাহাকেও ভালোবাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না! আমিও পারিলাম না,—অস্থির চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সবিস্ময়ে জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এ কি, আপনিও চললেন যে! ভিতরে যাবার আগে আমার ঘরে আপনাকে এক-বার যেতে হবে। মিলি আজ আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে—সেটা আপনার দেখা দরকার। এখানে আলো নেই, আলোয় যেতে হবে।"

মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, "চলুন।"

আবার সেই গৃহ—যেখানে এক দিন অভিসারে আসিয়া আমার আকুল চুম্বন রাখিয়া গিয়াছি! যেখানে যে-জিনিষ সে-দিন দেখিয়াছিলাম, আজও সে-সব তেমনি আছে! সেই নিভৃত নিলয়, সেই ঘন-নীল রঙের যবনিকা। সাদা পাথরের 'টিপয়ের' উপর তেমনি পুষ্পগুচ্ছ। আজ রজনীগন্ধা নয়, কুন্দ এবং শ্বেত করবীর তোড়া।

আমার দিকে চেয়ার সরাইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু আমার সামনে বিছানায় বসিলেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দুরু-দুরু কম্পিত বুকে তাঁহার হাত হইতে আমি চিঠি লইলাম,—কিন্তু কোন শব্দের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অক্ষরের পর অক্ষরের মালার পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এ কি, আপনার হাত এত কাঁপছে কেন? ভয় কি! মিলি ভয়ের কোন কথা লেখেনি। শান্ত হয়ে পড়ুন। জল খাবেন? বলুন? জল দেবো? না, দিদিকে ডাকবো?"

কি লজ্জা, কি ঘৃণা! এই কি আমার সংযম-শিক্ষা! নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া জবাব দিলাম, "না, জল চাই নে, দিদিকেও ডাকতে হবে না।"

এবার মিলির লেখা আর ঝাপসা অস্পষ্ট রহিল না। মিলি লিখিয়াছে,—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে পারবো না বলেই এ চিঠির অবতারণা। সাম্‌না-সাম্‌নি বলতে গেলে যে কথা বাধে, লেখায় তার বালাই থাকে না।

আমি যা বলতে চাই, তা জেনে অপরে আশ্চর্য্য হলেও আপনি হবেন না, এ আমি জানি! তবু আপনার আর আমার মধ্যে সব পরিষ্কার হওয়া উচিত।

এক দিন দ্বিধা-সংশয়ের মাঝে যে-সম্মতি দিয়েছিলাম, এত কাল মনে-মনে তার আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, সে সম্মতির কোনো দাম নেই!

সময় চেয়েছিলাম শুধু নিজেকে জানবার জন্য। পরীক্ষা একটা ছুতো মাত্র।

আশা ছিল, আমার মন ক্রমে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে, জগতে সব চেয়ে প্রিয়-জ্ঞানে আপনাকে আমার বলে মনে করবো! প্রেমশূন্য বিয়ে যে বিয়ে নয়, এটা আর-সকলের মত আমিও জানি। কিন্তু পারলাম না,—আপনি আমাকে মাপ করবেন।

আমি ভালো না হতে পারি, কিন্তু ছলনার ছদ্মবেশে আপনাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাই না। বিয়ে আমার মত মেয়ের জন্য নয়!

প্রথমে আপনি হয়তো অনেক আশা করে আমার সামনে আপনার মনের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, আমি সেখানে প্রবেশ করতে পারিনি। এগিয়ে যাবার প্রেরণা না পেলে জোর করে কিছু করা যায় না। আমি আপনার অন্তরে না গেলেও আর এক জনের যে সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল, তা আপনার অগোচর নেই। গোঁজামিল দিয়ে আপনি তার নাম দিয়েছিলেন, 'শ্রদ্ধা'! আন্তরিক শ্রদ্ধাই যে প্রেমের গতি-পথ, তা কি আপনি জানেন না?

শ্রদ্ধা আপনি আমাকে কখনো দেননি—ধারণা করেছিলেন, ভালোবেসেছেন! আমি জানি, সে ভালোবাসা নয়, মোহ! কালে আপনার মোহ কি পরিণতি লাভ করতো, তা উপভোগ করবার অবকাশ আমার হলো না। কারণ, আমি চাই না আপনার মোহ-বিজড়িত দুর্ব্বল ভালোবাসা। আপনাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

যার ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা অতুলনীয়, সে আজ আপনার কাছে যাচ্ছে। তাকে পাওয়া আপনার কেন, অনেকের পক্ষেই সৌভাগ্য। আপনার মা এবং দিদি তাকেই একান্তে চেয়েছেন। আপনার সুপ্ত বাসনাও তাঁদের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে!

ভ্রমেও আপনি ভাববেন না, করু আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে জেনে আমি তার পথ থেকে স'রে যাচ্ছি! করুকে যতই ভালোবাসি, তবু এত উদার আমি নই।

আপনার আর আমার মধ্যে করুর পক্ষে আপত্তিকর কিছুই ঘটেনি। আত্মীয়-স্বজন যে-মিথ্যাকে গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন, তা ভাঙ্গতে পেরে আমি আনন্দ বোধ করছি।

আপনার আংটিটা এই লোকের হাতে ফেরত দিলাম। যে এর প্রকৃত অধিকারিণী, এটি তাকে দেবেন।

বিনীতা
শ্রীমল্লিকা দেবী।

৪০

হৃদয় যতই কঠিন, সংযত করিয়া মিলির চিঠি পড়ি না কেন, চিঠির শেষ অংশ আমাকে বিচলিত করিল। অবশেষে মিলি আমাকে ধরিয়া ফেলিল? শুধু ধরা নয়, ধরাইয়া দিল! এ লজ্জা কোথায় রাখিব? আমার কাম্য যে কিছুই ছিল না! দানের সংকল্প লইয়া আমি বাঁচিয়াছিলাম। আমার গোপন দুর্গ ভাঙ্গিয়া গেল! নগ্ন পৃথিবীর বুকে শত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বিচরণ করিবার শক্তি আমার কোথায়? ভীরু মন কাঁপিয়া মরে,—সঙ্কোচে চোখের পাতা বুজিয়া আসে!

দেহ ঝিম্-ঝিম করিতে লাগিল,—চেয়ারের হাতলে আমি মাথা রাখিলাম।

ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া জ্যোতি বাবু প্রশ্ন করিলেন, "অসুখ বোধ হচ্ছে? বিছানায় শোবেন কি?"

কথার উত্তর না দিয়া আমি ঘাড় নাড়িলাম।

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিল। সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জ্যোতি বাবু বলিতে লাগিলেন, "যা আমার আনন্দের, সুখের, তা জেনেছি বলে তোমার লজ্জা কিসের, করু? তুমি তো লজ্জার কিছু করোনি! আমি অন্ধ ছিলাম—ভুল আমারি। দিদিকে মিলির চিঠি দেখাতে তিনি আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন!"

সর্ব্বনাশ! আমার কথা দিদিও তাহা হইলে জানিয়াছেন! মা জানিয়াছেন! এতক্ষণ মাসিমারও জানিতে বাকী নাই। তাই মা আমাকে ডাকিয়াছিলেন, "এসো মা, ঘরে এসো।" তাই আমাদিগকে সুযোগ দিতে ভানু ও চন্দ্রদাকে দিদি সরাইয়া লইয়াছিলেন? মিলি, তুই এ কি করিলি? আমি কোথায় যাইব? কোথায় আমার স্থান?

লুকাইবার অবলম্বন না পাইয়া দুই হাতে আমি মুখ ঢাকিলাম।

তিনি বলিলেন, "মুখ ঢাকলে কেন, করবী? শোনো, আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। আমার যা বলার, মিলির চিঠিতে তা সহজ হয়েছে। মিলি লিখেছে, মোহ! আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু মোহ হলেও মিলিকে এক দিন আমি ভালোবেসেছিলাম।"

হাত নামাইয়া কাঁপা গলায় কোনরূপে বলিলাম, "তাতে কি হয়েছে? মিলিকে সবাই ভালোবাসে, আমিও বাসি। দেখুন, আমার মনে হয়, মিলি আমার জন্যেই এ-সব লিখেছে। দূরে না ঠেলে, আপনার ভালোবাসার জোরে তাকে কাছে নিয়ে আসুন।"

আমাকেই তিনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আমার কথায় তাঁহার মুখ লাল হইল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে এতখানি কাপুরুষ ভাববার তোমার কোন কারণ হয়নি, করু! যে আমাকে চায় না, অপরকে ভালোবাসে, জোর করে তার প্রাণহীন দেহ দখল করবার কল্পনা—আমার পৌরুষে বাধে। ভালোবাসাই ভালোবাসাকে টেনে আনে! অপর-পক্ষ যোগ না দিলে আদান প্রদান চলে না, আপনা-আপনি তার গতিবেগ থেমে যায়। আমার মনের ঘোর কেটে গেছে। তুমি মনেও ভেবো না, মিলি তোমার জন্য এই সব করেছে! সে কাকে চায়, তা আমার জানা হয়ে গেছে।"

"কাকে সে চায়?"

"জানো না? নিজে গোপনে ভালোবাসতে শিখেছো, আর-এক জনের লুকানো কথা টের পাও না? তোমার মল্লিকা পাখী চন্দ্রচূড়ের শরজালে ধরা পড়েছেন।"

আমি চমকিত হইলাম! সামনের কালো পর্দ্দা সরিয়া গেল। প্রতি দিনের প্রতি ঘটনা যেন আমি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

মিলির জন্য আমার হৃদয় বেদনায় বিগলিত হইল। চন্দ্রদা যে বিবাহ-বিমুখ! তিনি বিবাহ না করিলে, মিলির প্রেমের প্রতিদান না দিলে মিলি কি করিবে? কি করিয়া হৃদয়-ভার বহন করিবে? এ মর্ম্মান্তিক জ্বালার পরিচয় যে আমি জানি!

বলিলাম, "কিন্তু চন্দ্রদা বিয়ে করতে চান না যে! মিলির কি হবে?"

"শুনেছি, তুমিও বিয়ে করতে চাওনি! তোমার চন্দ্রদাও চায় না। তার চাওয়া-না-চাওয়ার ভার আমি নিলাম। ভয় নেই করু, তোমার ভগিনী-প্রেমের, সখী-প্রীতির অনেক পরিচয় পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, মল্লিকা দেবীর জীবন মিথ্যা হবে না, যে যুগ মানুষকে বাইরে থেকে বিচার করে, চন্দ্র সে যুগের নয়। চন্দ্র মিলিকে ঠিক চিনতে পারবে। মিলির মত সহজ সাবলীল মন মেয়েদের মধ্যে কেন, ছেলেদের মধ্যেও দুর্লভ! মিলিকে তুমি সাধে ভালোবাসো? এক কালে আমিও বেসেছিলাম,—কিন্তু তাতে ভয় পেয়ো না। আমিই তার যোগ্য নয়। অমন বেগবতী নদীকে ধারণ করবার ক্ষমতা আমার নাই। ও নদীকে বাঁধতে পারে শুধু ঐ চন্দ্রচূড়।"

মিলির মৃগয়ার শর এত দিনে লক্ষ্য পাইল? শিকারী আজ নিজেই আহত, তাহার লক্ষ্য কিন্তু ব্যর্থ নয়। সারা জীবন প্রেমের ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া, এত দিনে মিলি প্রেমের দেখা পাইয়াছে। তাহাকে তরল-চিত্ত ভাবিয়া তাহার উপর করুণাও করিয়াছি, তাহাকে চিনিতে পারি নাই। তাহাকে চিনিয়াছিল পুরুষ,—যে-পুরুষ চিরকাল এই ছলনাময়ী, শক্তিময়ী নারীর কাছে আত্মদান করিয়াছে। মিলির কৃত্রিম বেশভূষা, নির্লজ্জ প্রেমলীলা—সমস্তই তাহার অশান্ত চিত্তকে ভুলাইবার জন্য! বেশ-ভূষার হৃদয়হীন উপহাসের অন্তরালে এত কাল সে আপনার নীড় খুঁজিয়া ফিরিয়াছে!

"এত ভাবনা কিসের, করু? আমি তোমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেছি। মিলিকে রেখে তুমি এগিয়ে যেতে চাও না! সে ব্যবস্থা পঞ্জিকার পাতায় আছে। এক দিনে দু'টো লগ্ন,—কেমন? মুখ অত নামিয়ো না, চোখ তোলো। আমার ভারী মুস্কিল হয়েছে, একটা বোঝা সারা দিন বয়ে বেড়াচ্ছি—তাকে রাখবার জায়গা পাচ্ছি না।"

বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু পাঞ্জাবীর বুক-পকেট হইতে মিলির প্রত্যাখাত হীরক-অঙ্গুরী বাহির করিলেন। বিজলী-আলোর প্রভায় হীরক হাসিতে লাগিল!

সেই হীরকের মত উজ্জ্বল হাসি-মুখে আমার আরো কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "মিলি লিখেছে, 'যে প্রকৃত অধিকারিণী, তাকে দেবেন'। অধিকারিণীকে আমি পেয়েছি, কিন্তু তিনি অধিকার নেবেন কি না, তা এখনো জানা হয়নি!"

নীরবে আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। মিলির কর-ভ্রষ্ট হীরা আমার বাম-অনামিকায় জ্বলিতে লাগিল! ভ্রষ্ট-তারা এত দিনে যেন তার স্থান খুঁজিয়া পাইল!

শ্রীগিরিবালা দেবী।

শেষ

বিবাহের পরে

(গল্প)

অধ্যাপক বিনয় সেন শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণী রায়কেই বিয়ে করলে না। বিনয় বাবুকে আপনারা নিশ্চয় চেনেন। আমাদের কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। ইন্দ্রাণী আমাদের সঙ্গে পড়তো। ইংরেজীতে অনার্স। মেয়েটি সুন্দরী এবং বড়লোকের মেয়ে। ঘরের মোটারে করে কলেজে আসতো যেতো। পরীক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশী নম্বর পেতো। অতি চালিয়াত—গায়ে-পড়ে আমরা আলাপ করতে গেলুম, সে আমাদের সঙ্গে কথাই কইলো না। তাই আমরা যখন জানতে পারলুম, বিনয় বাবু তাকে বাড়ীতে পড়ান, তখন তা নিয়ে আমরা খুব খানিকটা কাণাঘুষো হৈ-চৈ আরম্ভ করলুম! দেখতে দেখতে কলেজে এবং বাহিরে একটা কথা ছড়িয়ে পড়লো যে, অধ্যাপক বিনয় সেন তাঁর ছাত্রী ইন্দ্রাণী রায়ের প্রেমে পড়েছেন। ডালপালা নিয়ে সে কথা শেষে এমন রূপ ধারণ করলে যে, কলেজের অধ্যক্ষ এক দিন বিনয় বাবুকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনে কি কথা হয়েছিল জানি না, তবে ক'দিন পরেই মহা সমারোহে অধ্যাপক বিনয় সেনের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ হয়ে গেল। আমরা তাদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেরাই বোকা ব'নে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে লাগলুম। অবশ্য অনার্স-ক্লাসের ছেলেদের তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং যে মহিলাটিকে নিয়ে আমরা রঙ্গ করতুম, গুরু-পত্নী বলে পায়ে হাত দিয়ে তাঁকেই প্রণাম করতেও হয়েছিল! তবে ভোজটা হয়েছিল খুব জবর রকমের—এই যা সান্ত্বনা।

গরমের ছুটীতে অধ্যাপক আর মিসেস্ সেন কালিংপঙ্ বেড়াতে গেলেন। দার্জ্জিলিং না গিয়ে কালিংপঙ্ যাওয়ার কারণ—সেখানে ভিড় কম।

বিনয় বাবুর বয়স বত্রিশের কাছাকাছি, ইন্দ্রাণীর বাইশ-তেইশ।

ইন্দ্রাণী পথে অধ্যাপককে বললেন,—"ছাখো, নতুন বিয়ে হয়েছে শুনলে লোকে বড় ঠাট্টা করে। কেউ জিগ্‌গ্যেস করলে আমরা বলব, সাত-আট বছর বিয়ে হয়েছে। তুমি কিন্তু সেখানে অধ্যাপক বলে পরিচয় দিয়ো না।"

বিনয় বাবু কবি লোক। স্ত্রীর আইডিয়ার নূতনত্বে তিনি খুব খুশী হলেন। বললেন,—"মজা মন্দ হবে না। সব সময় যদি লোক জন এসে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাই করে, তাহলে কলকাতা ছেড়ে তোমাকে নিয়ে কালিংপঙ্ যাচ্ছি কি করতে।"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্টু"—বলে হেসে ইন্দ্রাণী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাহিরের শোভা দেখতে লাগলেন।

ট্রেণ থেকে নামবার সময় ইন্দ্রাণী বললেন, "যা বলেছি মনে আছে?"

বিনয় বাবু বললেন, "খুব। তবে চেনা-শুনা কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলেই মুস্কিল!"

ইন্দ্রাণী বললেন, "সে তখন দেখা যাবে। আমার ভয় তোমাকে নিয়ে। যা তোমার ভুলো মন, কোন্ দিন ফস্ করে কি বলে সব ফাঁস করে দেবে!"

বিনয় বাবু হেসে বল্লেন, "বটে, আমি না তোমার অধ্যাপক। গুরুনিন্দা করতে নেই।"

কৃত্রিম কোপে ইন্দ্রাণী বললেন, "আবার!"

অধ্যাপক এবং মিসেস সেন এভারেষ্ট হোটেলে রুম নাম্বার টেন অধিকার করলেন। হোটেলের কোন অধিবাসীই তাঁদের পরিচিত নয় দেখে দু'জনে আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বিনয় সেন কবি, ইন্দ্রাণী সুন্দরী এবং সুগায়িকা, কাজেই দু'-চার দিনের মধ্যে হোটেলের সকলের সঙ্গেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ঘটলো! দুপুরে ব্রীজ এবং সন্ধ্যায় গান-বাজনায় হোটেলে যেন আনন্দের স্রোত বইতে লাগলো।

ক'দিন পরের ঘটনা। এক নম্বর রুমের বিন্দুবাসিনী রাত্রে তার স্বামী জলধর বাবুকে বললেন, "ইন্দ্রাণী মেয়েটি বেশ!"

জলধর বাবু তখন সিগার-মুখে একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলেন! মুখ না তুলেই তিনি বললেন, "হুঁ", বিনয় বাবুও লোকটি খুব ভালো।"

"আচ্ছা ইন্দ্রাণী বলছিল, ওদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে—এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?"

বই থেকে মুখ তুলে জলধর বাবু বললেন,—"না, না, তুমি ভুল করেছ, সাত নয়—আট বছর।"

বিন্দুবাসিনী বললেন—"আমাকে ইন্দ্রাণী নিজে বলেছে সাত বছর।"

জলধর বাবু উত্তর দিলেন,—"তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছো! মিষ্টার সেন নিজে আমাকে বলেছেন আট বছর।"

কুপিত স্বরে বিন্দুবাসিনী বললেন,—"না, আমি ভুল শুনিনি, তুমি ভুল শুনেছ। সব-তাতেই আমার কথার উপর কথা কওয়া তোমার কেমন অভ্যেস। তাছাড়া পুরুষমানুষের কথার দামই বা কি! তারা বিয়ের তারিখ পর্য্যন্ত ভুলে যায়, তা বছর! পুরুষ-জাতটাই এমনি।"

অগত্যা জলধর বাবুকে চুপ করতে হলো।

দু'নম্বর রুমের প্রীতিলতা তাঁর স্বামী নবীনচন্দ্রকে বললেন,— "হ্যাঁ গা, ইন্দ্রাণী যে বলে, সাত বছর ওর বিয়ে হয়েছে, তোমার বিশ্বাস হয়?"

নবীনচন্দ্র তখন একমনে বসে পেসেন্স খেলছিলেন। মুখ না তুলেই তিনি বললেন—"এতে অবিশ্বাসের কি আছে, এই তো আমাদের চোদ্দ বছরের উপর বিয়ে হয়েছে।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে প্রীতিলতা বললেন,—"চোখের মাথা খেয়েছ!"

অপ্রস্তুত হয়ে নবীনচন্দ্র বললেন,—"তাই তো, পঞ্জাটা যে ছক্কার তলায় বসবে, তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।"

রেগে তাসগুলোকে ঘরময় ছত্রাকারে ছড়িয়ে প্রীতিহীন স্বরে প্রীতিলতা বললেন,—"চব্বিশ ঘণ্টা তাস আর তাস। আমি হয়েছি তোমার চক্ষুশূল।"

ভীত ভাবে নবীনচন্দ্র বললেন,—"কেন, কি আবার হলো?"

"হবে আবার কি! আমার কথার জবাব দাও!"

"তোমার কোন্ কথা?"

"এতক্ষণ আমার একটা কথাও কাণে যায়নি বুঝি, এত তাচ্ছিল্য! আমি জিগ্‌গ্যেস করলুম, ওদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে, তুমি তা বিশ্বাস করো?"

"করি, তবে তুমি যদি আপত্তি করো, তাহলে বেশ, অবিশ্বাস করবো।"

"তোমার কথা শুনলে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। চোদ্দ বছরে যখন এতখানি তাচ্ছিল্য, তখন সাত বছরে কিছু তো হবে। অথচ ওদের মধ্যে যে-রকম ভাব দেখি, আমার বিশ্বাস হয় না।"

একটু হেসে নবীনচন্দ্র বললেন,—"তোমার সঙ্গে কিছু দিন মিশলেই তোমার ভাব পাবেন'খন।

বারুদে যেন অগ্নিসংযোগ হলো। তীব্র স্বরে প্রীতিলতা বললেন, "আমার তো সবই খারাপ, বেশ তো। পছন্দ না হয়, আর-একটা দেখে-শুনে ঘরে আনো না—কে বারণ করছে।"

"আহা হা, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারলে না গো! আমি বলছিলুম—"

"থাক্, কিছু বলে দরকার নেই! ঢের হয়েছে!"—বলে প্রীতিলতা পান সাজায় মনোনিবেশ করলেন; কিন্তু মহিলাদের স্বভাবই এমন যে, নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ না বলতে পারলে পেট ফোলে! অম্ল, অজীর্ণ, পেট-ফাঁপা, বুক-ধড়ফড়, এমন কি, হিষ্টিরিয়া পর্য্যন্ত হ'তে পারে। তাই তিনি কিমামযোগে পান মুখে পূরে আবার আরম্ভ করলেন—"তুমি লক্ষ্য করেছে, বেড়াতে বেড়িয়ে বিনয় বাবু তাঁর স্ত্রীর ওভার-কোট বয়ে নিয়ে যান!"

রসিকতা করে স্বামী বললেন—"ইংরেজীতে একটা কথা আছে, বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ নারীর পিছনে-পিছনে চলে। বিবাহের পর কয় মাস চলে পাশে পাশে। তার পর স্বামী এগিয়ে চলেন আর স্ত্রী ছোটেন তাঁর পিছনে-পিছনে।"

স্ত্রী বললেন—"সেই কথাই আমি বলছিলুম। স্ত্রীর উপর যখন ওঁর এত টান, তখন আমার মনে হয়, সাত বছর নয় আরো কম। সে দিন তাখোনি, এক সঙ্গে আমরা বেড়াতে গেছলুম—ইন্দ্রাণীর হাত থেকে রুমাল পড়ে যেতে বিনয় বাবু তখনি সে রুমাল কুড়িয়ে ঝেড়ে তুলে দিলেন। তুমি কখনো দিয়েছ? বিয়ের বেশী দিন পরে কোন্ স্বামী তা দেয়?"

নবীনচন্দ্র চুপ করে রইলেন। এর পর কি-বা বলবেন!

তিননম্বর ঘরের শান্তিসুধা তাঁর স্বামী বিজয় বাবুকে বলছিলেন—"হ্যাগা, ইন্দ্রাণী বললে, তাদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে। এক ছেলে, এক মেয়ে। আর বাপের বাড়ীতে তাদের রেখে এসেছে। তোমার বিশ্বাস হয় এ কথা?"

বিজয় বাবুর বদ অভ্যাস, আহারের পরেই ঘুম পায়। তন্দ্রাজড়িত স্বরে লেপের মধ্য থেকে তিনি বললেন—"কেন, এতে অবিশ্বাসের কি আছে? সকলেরই তো আর আমাদের মত ভাগ্য নয় যে, দশ বছরের উপর বিয়ে হলো, এখনও একটি সন্তানের মুখ দেখলুম না!"

অভিমান-হত স্বরে স্ত্রী বললেন—"এটা নিয়ে খোঁটা দেবার কি আছে! আমার বরাত! তোমার ইচ্ছা হলে আবার বিয়ে করতে পার। আমি তাতে আপত্তি করছি না তো"—বলতে বলতে ঝর-ঝর ধারে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিজয় বাবুর তন্দ্রা তখনই গেল ছুটে। লজ্জিত ভাবে উঠে বসে ব্যথিত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আমায় ক্ষমা করো শান্তি, তোমাকে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হলে পর শান্তিসুধা আবার কথার ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে বললেন,—"তোমার বিশ্বাস হয়, ওদের এক ছেলে, আর এক মেয়ে?"

বিজয় বাবু বললেন,—"এক ছেলে, আর দুই মেয়ে। তোমার শুনতে ভুল হয়েছে বোধ হয়!"

দৃঢ় স্বরে শান্তিসুধা বললেন—"ভুল হবে কেন? ইন্দ্রাণী নিজে আমাকে বলেছে, এক ছেলে, আর এক মেয়ে। ছেলের নাম সুনীল, মেয়ের নাম অলকা।"

বিজয় বাবু উত্তর দিলেন,—"উঁহু, তোমার ভুল হচ্ছে! বিনয় বাবু নিজে আমাকে বলেছেন, ওদের একটি ছেলে, আর দু'টি মেয়ে। ছেলের নাম হিরণ, মেয়েদের নাম অণিমা, আর নীলিমা। তারা মামার বাড়ীতে নয়, ঠাকুরমার কাছে আছে।"

শান্তিসুধা তীব্র ভাবে বললেন—"আমার সব কথাতেই তুমি তর্ক করো। লোকে কথায় বলে, যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। হয় তোমার শুনতে ভুল, নয় সব গুলিয়ে ফেলেছো। মা'র কখন ভুল হতে পারে না!"

"বাপেরই বা ভুল হবে কেন?"

"খুব ভুল হতে পারে। পুরুষদের পক্ষে সব সম্ভব!"

অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজয়কুমার আবার লেপের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আর এক দিনের ঘটনা। বন্ধুদের সঙ্গে বিনয় সেন বেড়াতে বেরিয়েছেন। হঠাৎ টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখার কথা উঠলো। সকলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। বিনয় বাবু বললেন—"আমি লাষ্ট ইয়ারে সূর্য্যোদয় দেখতে গেছলুম। ডিভাইন! সাব্লাইম! সে দৃশ্য ভোলবার নয়! এখনও যেন চোখে লেগে রয়েছে! মাত্র একবার দেখে আশ মেটে না!"

দিলীপ বাবু প্রশ্ন করলেন,—একা গেছলেন? না, সস্ত্রীক?"

বিনয় সেন ঠিক জানতেন না, ইন্দ্রাণী টাইগার-হিলে কখনও গেছেন কি না? শেষে বেকুব না বনতে হয়! তাই তিনি বললেন—"আমি একাই গিছলুম। উনি তখন বাপের বাড়ীতে ছিলেন। সেই বছরই আমাদের ছোট মেয়ে—"

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নরহরি বাবু বললেন—"তাই তো! এমন একটা দৃশ্য মিসেস্ সেন দেখতে পেলেন না! উনিও দেখেননি। চলুন না, এক দিন সকলে দল বেঁধে যাই। কি বলেন?"

সকলে সানন্দে এ প্রস্তাবের সমর্থন করলেন!

হোটেল-সংলগ্ন উদ্যানে চা-পর্ব্ব শেষ করে মহিলারা গল্প করছেন। কথায় কথায় সুপ্রভা বললেন—"পাহাড়ে ভোর আর সন্ধ্যাই সব চেয়ে দেখতে ভালো।"

জয়ন্তী বললেন,—"সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত?"

ইলা বললেন—"সূর্য্যোদয় দেখতে হলে টাইগার-হিল। হ্যাঁ ভাই ইন্দ্রাণী, তুমি টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখেছ কখনো?"

ইন্দ্রাণী হেসে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, বছর-দুই আগে দার্জ্জিলিং গছলুম—সে বার দেখেছি।"

অর্থপূর্ণ হাস্যসহ সুপ্রভা প্রশ্ন করলেন—"একা, না জোড়ে?"

ইন্দ্রাণী কি উত্তর দেবেন, ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলেন। জয়ন্তী হেসে বললেন—"চুপ করে থাকার মানেই জোড়ে। কি বলো?"

ইন্দ্রাণী শুধু নতমুখে ফিক ফিক করে একটু হাসলেন।

সেই দিনই রাত্রের কথা। চার নম্বর ঘরের সুপ্রভা তাঁর স্বামী দিলীপ বাবুকে বললেন—"ছাখো, সকলে টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখেছে, কিন্তু আমি দেখিনি—এতে আমার ভারী লজ্জা করে। দেখিনি, এ কথা স্বীকারও করতে পারি না, দেখেছি, তাও বলতে পারি না। আমাকে এক দিন সূর্য্যোদয় দেখাতে নিয়ে চলো।"

দিলীপ বাবু বললেন—"বেশ। এক দিন যাওয়া যাবে। আজ সকালেই আমাদের টাইগার-হিল যাবার পরামর্শ হচ্ছিল। বিনয় বাবুর ইচ্ছা, শীঘ্র এক দিন যেতে হবে। ওঁর স্ত্রী আর-বছর বাপের বাড়ীতে ছিলেন। সে সময় উনি গিয়েছিলেন। এবার সস্ত্রীক যাবার ইচ্ছা আছে। উনি বলছিলেন, ওঁর স্ত্রী কখনও টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখেননি।"

বাধা দিয়ে সুপ্রভা বললেন—"তুমি নিশ্চয় ভুল শুনেছ। আজ সকালেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমাদের কথা হচ্ছিল। সে নিজে বলেছে, বছর-দুই আগে ওরা জোড়ে টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখতে গিছল। আর তুমি বলছো, ইন্দ্রাণী দেখেনি!"

দিলীপ বাবু উত্তর দিলেন,—"কিন্তু আজ সকালেই যে বিনয় বাবু নিজে বললেন—"

উত্তপ্ত কণ্ঠে সুপ্রভা বললেন,—"আজ সকালে ইন্দ্রাণী নিজে আমাদের বলেছে। তুমি নিশ্চয় শুনতে ভুল করেছ! কিম্বা কে ও-কথা বলেছে, তা তোমার মনে নেই।"

দিলীপ বাবু বললেন—"আশ্চর্য্য! আমার বেশ মনে আছে—"

তীব্র কণ্ঠে সুপ্রভা উত্তর দিলেন,—"ঐ তোমার কেমন স্বভাব! আমি যা বলবো, তা নিয়ে তর্ক করা চাই-ই! আমি হয়েছি তোমার চোখের বালি!" সঙ্গে সঙ্গে চোখে তিনি আঁচল চাপা দিলেন।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে দিলীপ বাবু বললেন—"ঠিকই তো। আমারই ভুল হয়েছে। বয়স হয়েছে, সব কথা কেমন মনে রাখতে পারি না! হ্যাগা, রাগ করলে?"

মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে সুপ্রভা মধুর স্বরে উত্তর দিলেন,—"পাগল! রাগ করবো কেন?"

তার পর, যাক সে কথা।

কিছু দিন থেকে সকলের মনে কেমন একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। ইন্দ্রাণী আর বিনয় বাবুর কথায় মিল নেই। ছেলেমেয়ের নাম এবং নম্বর পর্য্যন্ত ভুল! আর দু'জনের মধ্যে যে রকম ভাব, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে তা দেখা যায় না। বিশেষ করে সাত-আট বছর এক সঙ্গে থাকবার পর! কত দিন বিবাহ হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু'জনের দু'রকম কথা—সন্দেহের অপরাধ কি!

হোটেলের মেয়ে-পুরুষ, স্বামি-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখে এই এক কথা! এরা কি তবে সত্যই স্বামি-স্ত্রী নয়! অথচ মেয়েটার মাথায় সিঁদুর!

হোটেলের ম্যানেজার প্রাণকেষ্ট বাবুর স্ত্রী নবতারা তাঁর স্বামীকে বললেন—"ছাখো, মেয়েরা ভারী গোল করছিলেন, ঐ বিনয় বাবু আর ইন্দ্রাণীকে নিয়ে—"

প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন—"পুরুষরাও আমাকে বলেছেন। এমন কি, ওদের না তাড়ালে এঁরা চলে যাবেন, এমন কথাও বলেছেন। তাই ভাবছি—"

ঝঙ্কার দিয়ে ম্যানেজার-পত্নী বললেন—"এতে ভাববার কি আছে? এক জনদের জন্য এতগুলো লোক চলে যাবে? কালই ওদের তুমি দূর করে দাও।"

চিন্তিত ভাবে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন—"দূর করে দাও বললেই কি দেওয়া যায়! ওঁরা এক মাসের ভাড়া আগাম দেছেন। হঠাৎ কি করে চলে যেতে বলি! একটা কারণ দেখাতে হবে তো!"

উত্তপ্ত কণ্ঠে নবতারা বললেন,—"কারণ? এর চেয়ে বেশী কারণ আর কি থাকতে পারে! তুমি পরিষ্কার বলে দেবে—ও-রকম লোকদের জন্য এ হোটেলে জায়গা হবে না। এখানে ভদ্রলোকরা থাকেন!"

মাথা চুলকে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন—"কিন্তু ভালো রকম সন্ধান না নিয়ে এত বড় কথাটা বলা উচিত হবে? তাছাড়া ওঁর স্ত্রীর সীঁথিতে সিঁদূর রয়েছে। বিয়ে না হলে কি সীঁথিতে সিঁদূর পরতে পারতেন!"

চোখ ঘুরিয়ে মুখের সামনে হাত নেড়ে নবতারা বললেন—"যার বুদ্ধি নেই, তার আবার সব কথায় তর্ক করা কেন? ও তো অন্য লোকের স্ত্রীও হতে পারে। তোমাদের বিনয় বাবু হয়তো নিয়ে এসেছে!" আজ-কাল কি না হচ্ছে, সিঁদূর থাকলেই যে স্বামি-স্ত্রী হতে হবে, তার কি মানে আছে?"

আম্‌তা আম্‌তা করে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন,—"তা বটে, তা বটে!"

পরের দিন সকালে চা-পান শেষ হবার পর সকলে হোটেল-সংলগ্ন বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় প্রাণকেষ্ট বাবু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নিম্ন স্বরে ক'জনের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করলেন। একটু পরে বিনয় বাবু এসে সে-দলে যোগ দিলেন। এ কথা সে-কথার পর ম্যানেজার বাবু বললেন,—"আচ্ছা বিনয় বাবু, আপনি কি কাজকর্ম্ম করেন?"

আশ্চর্য্য হয়ে বিনয় বাবু বললেন,—"কেন, বলুন তো? হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন?"

দু'বার ঢোক গিলে প্রাণকেষ্ট বললেন,—"না, এমনি জিগ্‌গেস করছিলুম। আপনি বলেছিলেন কবিতা লেখেন! কিন্তু কবিতা লিখে বাঙ্গালা দেশে কি কিছু হয়, মশাই?"

হেসে বিনয় বাবু উত্তর দিলেন,—"না, তা হয় না। তবে আমার পৈত্রিক কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, আর নিজেও একটা চাকরি করি। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারলুম না! আপনার প্রাপ্য কিছু বাকী আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!"

অপ্রতিভ ভাবে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন,—"না, মানে সে কথা নয়। আচ্ছা বিনয় বাবু, আপনার বিবাহ হয়েছে কত দিন?"

অবিরাম প্রশ্নের চোটে বিনয় বাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠেছিল। শ্লেষ-সহ তিনি বললেন,—"হোটেলে থাকতে হলে বিবাহের তারিখ বলবার দরকার হয়, তা জানতুম না।"

এ কথার প্রাণকেষ্ট বাবু কি উত্তর দেবেন, ভেবে না পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠলেন! বললেন—"আপনার আর আপনার স্ত্রীর কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত অসামঞ্জস্য রয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো—যে মহিলাটিকে আপনি স্ত্রী বলে চালাচ্ছেন, তিনি সত্যই আপনার স্ত্রী?"

বিনয় বাবু অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিও পেলো। তাঁর আর ইন্দ্রাণীর কথায় অমিল থাকা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কারণ, দু'জনেই মিথ্যা কথা বলছিলেন,—এবং পরামর্শ করে নয়, স্বতন্ত্র ভাবে। তাই জিনিষটাকে তামাসার হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্য দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললেন,—"আপনি জানতে চাইছেন, আমার স্ত্রী আমার সত্যকারের স্ত্রী কি না? তার উত্তরে আপনাকে জানাচ্ছি, আমার স্ত্রী, আমারই স্ত্রী।"

ম্যানেজার বলে উঠলেন,—"প্রমাণ?"

উদ্যত ক্রোধ দমন করে বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বিনয় বাবু বললেন,—"ওঃ! আচ্ছা, আপনার স্ত্রী যে আপনার স্ত্রী, তার প্রমাণ? কোনো ভদ্রলোকই বোধ হয় এমন প্রশ্নের উত্তরে বিবাহের প্রমাণ দিতে পারেন না? সে যাই হোক, আমার বিল দিয়ে দেনা-পাওনা চুকিয়ে নিন। এমন অভদ্র অপমানের পর এখানে থাকা আমাদের পোষাবে না!"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন্-হন্ করে বিনয় বাবু সেখান থেকে প্রস্থান করলেন! সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

ওদিকে মেয়ে-মহলে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তীব্র আলোচনা চলছে। সকলেই একমত, ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই বিনয় বাবুর স্ত্রী নয়, সুতরাং এই মুহূর্ত্তে তাকে হোটেল থেকে বার করে দেওয়া উচিত।

বিন্দুবাসিনী বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, সুযোগ পেলেই তাই তিনি লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের বিদ্রূপ করতেন। তিনি বললেন,—"লেখা-পড়া শিখলেই মেয়েরা ধিঙ্গী হয়ে ওঠে। লজ্জা-সরমের মাথা খায়। এই জন্যই দেশটা উৎসন্ন যেতে বসেছে!"

শান্তিসুধা কলেজে-পড়া মেয়ে। তখনই প্রতিবাদ করলেন,—"ঐ আপনার অন্যায় কথা! লেখা-পড়ার সঙ্গে এ সব ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। যারা উৎসন্ন যায়, তারা লেখা-পড়া না শিখলেও যায়। বরং মুখ্যুরাই বেশী—"

কথা শেষ হ'ল না। যাকে নিয়ে এ বাক্-বিতণ্ডা, সেই ইন্দ্রাণী ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন।

হেসে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলেন—"এত তর্ক কিসের?"

সুপ্রভা বললেন—"আমাদের তর্ক হচ্ছে—মেয়েদের লেখা-পড়া শেখা উচিত কি না, এই নিয়ে!"

সবল কণ্ঠে ইন্দ্রাণী উত্তর দিলেন—"খুব উচিত, একশো বার উচিত। এতে কোন ভুল আছে না কি?"

সুপ্রভা বললেন—"কিন্তু ইনি বলছিলেন, লেখা-পড়া শিখলে মেয়েরা অধঃপাতে যায়।"—এই কথা বলে তিনি বিন্দুবাসিনীকে দেখিয়ে দিলেন।

বক্তব্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বিন্দুবাসিনী বললেন—"নিশ্চয়। আচ্ছা ইন্দ্রাণী দেবি, একটা কথার উত্তর দেবেন?"

"কি কথা, বলুন?" ইন্দ্রাণী জিগ্‌গেস করলেন।

বিন্দুবাসিনী বললেন,—"বিনয় বাবু আপনার স্বামী?"

এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ইন্দ্রাণী যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো। কঠোর স্বরে তিনি বললেন—"আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমার ঘৃণা হয়।"—এ কথা বলে তিনি দ্রুতপদে তখনি সে স্থান ত্যাগ করলেন। পিছন থেকে চাপা হাসির একটা আওয়াজ তাঁর কাণে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে মিষ্টার বিনয় সেন এবং ইন্দ্রাণী হোটেল-প্রাঙ্গণে এসে অপেক্ষা করছেন, কুলীরা মোট-ঘাট এনে জড়ো করছে, এমন সময় হোটেলে এক নতুন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। যে কলেজে বিনয় বাবু অধ্যাপনা করেন, ইনি সেই কলেজের অধ্যক্ষ। প্রায় প্রতি বছর ইনি ক্যালিংপঙে আসেন এবং এসে এই হোটেলে থাকেন। বিনয় বাবুকে দেখে তিনি বললেন—"কি বিনয় বাবু, চলে যাচ্ছেন! আর কিছু দিন থাকুন, এই তো সীজন আরম্ভ হলো! তার পর ইন্দ্রাণী, ভালো আছো মা?"

ইন্দ্রাণী ঐ কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন। দু'জনেই অধ্যক্ষ রবি বাবুকে প্রণাম করলেন।

ইতিমধ্যে হোটেলের ম্যানেজার প্রাণকেষ্ট বাবু এসে হাজির। রবি বাবুকে নমস্কার করে কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি জিগ্‌গেস করলেন—"বিনয় বাবুকে আপনি চেনেন বুঝি?"

হো হো করে হেসে রবি বাবু বললেন,—"চিনবো না! আজ সাত বছরের ওপর উনি আমাদের কলেজে প্রোফেসরি করছেন! আর ওঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী—উনি আমাদেরই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ওঁদের দু'জনকেই আমি খুব ভালো রকম চিনি। এই ক'মাস হলো, ওঁদের বিবাহ হয়েছে। দু'বাড়ীতেই যে-খাওয়া খেয়েছি, এখনো তা ভুলতে পারিনি।"

প্রাণকেষ্ট বাবু এবং হোটেলের অন্যান্য যে সব ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই অপ্রতিভ হয়ে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

তার পর রবি বাবুর মধ্যস্থতায় সকল পক্ষের মনের কালি দূর হয়ে গেল।

সকলেই সেন-দম্পতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সাত বছর বিবাহ হয়েছে বলে কি বিপদের সৃষ্টি হ'লো, এ নিয়ে সকল পক্ষেই হাসাহাসির বিরাট স্রোত ব'য়ে গেলো।

পরের দিন প্রাণকেষ্ট বাবু সেন-দম্পতীর সম্বর্দ্ধনার জন্য এক বিরাট ভোজ দিলেন। বিন্দুবাসিনী বাজার থেকে অনেক ফুল আনিয়ে নতুন করে তাঁদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করলেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

তন্ত্রে ভাবত্রয়

ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা আজ আর কুসংস্কারমূলক বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইংরেজী সভ্যতার প্রবর্ত্তনের পর ভারতীয় চিত্তে যে হীন দাস-মনোভাবের বীজ উপ্ত হয়—যাহার ফলে আর্য্যকৃষ্টির (Culture) প্রতি সকলে বীতরাগ ও সন্দিহান হইয়া পড়েন; সুখের বিষয়, সেই দাস-মনোভাবের ক্রমিক উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আর্য্যচিত্তে সেই সনাতন আর্য্যকৃষ্টির প্রতি আবার শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছে—বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে; আর সেই সঙ্গে জাগিয়াছে সম্ভ্রমবোধ। ইহা জাতীয়তার নিদর্শন, সন্দেহ নাই। ইহার ফলে রসিক বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্ণবের রস-সাধনায় আকৃষ্ট হইয়াছে। এত দিন ইংরেজী শিক্ষায় যে উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্ণবসাধনাকে ভোগমূলক ও অশ্লীল বলিয়া ভাবিয়াছিল, আজ তাহাই এই জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার দিনে এক নবীন অধ্যাত্ম-প্রেরণার বলে বৈষ্ণবের অতীন্দ্রিয় রস-সাধনার বাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। বাস্তবিক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত যে বৈষ্ণবধর্ম্ম—যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, তাহার একটা World message আছে,—বিশিষ্ট মৌলিক রূপ আছে। বাঙ্গালী সহজিয়া-সাধক কিশোরী লইয়া যে রস-সাধন করিয়াছিল, তাহাও তাহার মৌলিক সাধনা। বড়ই সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্ণব-সাধনায় সমাকৃষ্ট। কিন্তু বাঙ্গালী-প্রতিভার অপর একটি দিক্ আছে। সেটি হইতেছে তন্ত্র। প্রবাদ-বাক্য এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরই জয়গান গাহে। যথা—"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা। ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥" তন্ত্র বাঙ্গালী-প্রতিভার সম্যক্ দান না হইতে পারে, সমগ্র ভারতেই ইহার প্রতিষ্ঠা আছে, তবু তন্ত্র-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যে সাধনা, যে দান, তাহা আপন বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত ও মৌলিক।

বাঙ্গালী কোমল ধাতের মানুষ। কেবল পদাবলী-সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর প্রাণের খবর লইতে গেলে তাহার প্রকৃত সন্ধান মিলিবে না। বাঙ্গালীর চিত্ত শুধু মধুর রস-ঘন-পদাবলী-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-রসাস্বাদেই সমর্থ, এ কথা ভাবিলে ভুল হইবে। বাঙ্গালী যেমন আদি-রস-যাজনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছিল, তেমনি সে আবার ভয়ানক-রসের সাধনাতেও সমাহিত হইয়াছিল। ভগবান্ রসস্বরূপ। রস বলিতে তো তিনি মধুর-রসের বিগ্রহস্বরূপ, ইহাই বুঝায় না। তিনি মধুর; তিনি ভয়ানক। বাঙ্গালী শুধু Worship of the Beautiful—সুন্দরের পূজায় পৌরোহিত্য করে নাই। ভারতের এক গৌরবময় দিবসে সে Worship of the Terrible—রুদ্রের পূজায়, ভীষণতার সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই তাহার তন্ত্র-সাধনা। তন্ত্রের প্রতি তরুণ বাঙ্গালী তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। ইহা লজ্জার কথা। আজিকার জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার দিনে তন্ত্রা-লোচনায় যথেষ্ট লাভ আছে। তরুণ বাঙ্গালী জানুন যে, সর্ব্বপ্রকার ভীতিবিমুক্ত এক অখণ্ড অমোঘ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা তন্ত্রের সাধনায় সম্ভব। সে কথা আজ লিখিব না। তন্ত্রে যে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব,—এই ভাবত্রয়ের কথা আছে, তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-এক কথা বলিব।

তন্ত্রের প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইহার কারণ, তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার-সাধনা অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহা লইয়া পঞ্চ-মকার-সাধন। এই সাধন-সামগ্রীগুলিই শ্রদ্ধাহীনতার কারণ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধনের পশ্চাতে একটা তত্ত্ব বা Philosophy আছে—তাহা জানিলে শ্রদ্ধাহীনতার কারণ থাকিবে না। জগতে কোন বস্তুই হেয় নহে, ব্যবহার করিতে পারিলে বাস্তবতঃ হেয় বস্তুও শ্রদ্ধেয় বস্তুতে পরিণত হয়। কার্লাইলের Sartor Resartus বাহ্যতঃ একটা Philosophy of cloth কিন্তু ইহা কি তাহাই? আর যদি বলি, তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকারসাধনা Philosophy of wine, Philosophy of meat ভিন্ন আর কিছু নয়, তাহা হইলে শিক্ষিত যুবকগণ বোধ করি, এই বিচিত্র রহস্য-নিবিড় তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে মনে আর ঘৃণার ভাব পোষণ করিবেন না।

যাক্, এক্ষণে ভাবত্রয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই পশুভাব। তাহার পর একটা transitionএর কাল—সেটি বীরভাবে উন্নতি—তাহার পর আবার transition বা দিব্যভাবে উন্নতি। এই ভাবত্রয়ের কথা বলিতে গেলে তন্ত্রোক্ত সপ্তাচারের উল্লেখ করিতে হয়। এই সপ্তাচার লইয়াই উক্ত ত্রিবিধ সাধনা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কৌলাচার। প্রথমে বেদাচার ও সর্ব্বশেষে কৌলাচার। প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি, পরে তৃতীয়টি এবং শেষে কৌলাচার। সাধকের চরম আদর্শ এই কৌলাচার। সাধনার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে এই সপ্তাচারের বিন্যাস। প্রথমাচারে অর্থাৎ বেদাচারে সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি-পুরাণাদি-সম্মত আচার অবলম্বন করিয়া সকাম ভাবে উপাস্য দেবতার উপাসনা করেন। মাংসাদি ভক্ষণ করেন না। বেদ ও স্মৃতির বিধানগুলি যথাভাবে পালন করেন। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবাচার—এই আচারে সাধক বেদাচারোক্ত নিয়মগুলি পালন করেন, তদুপরি এই আচারে তাঁহাকে আরও কিছু অগ্রসর হইতে হয়, যথা—তাঁহাকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিতে হয়। বেদাচারে বৈধ মৈথুন নিষিদ্ধ ছিল না এবং সাধক সকাম ছিলেন। বৈষ্ণবাচারে তিনি নিষ্কাম হইবেন এবং সর্ব্ব প্রকারে হিংসা বর্জ্জন করিবেন। তৃতীয়—শৈবাচারে তিনি আরও অগ্রসর হইবেন। এবার তিনি বৈধ হিংসা করিতে পারিবেন অর্থাৎ সাধনার্থ পশুবধ করিতে পারিবেন এবং অষ্টাঙ্গ যোগাশ্রয় করিয়া আরাধনা করিবেন। চতুর্থ, দক্ষিণাচার—এ আচারেও বেদাচার গ্রহণীয়। এ আচারেও স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া "দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ।" পঞ্চম, বামাচার—সাধককে এই আচারে দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাত্রিতে পঞ্চ-মকারের দ্বারা দেবীপূজা করিতে হয়। এই আচারে বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়—এই আচারই আপাততঃ বিদ্রোহমূলক—এই আচারে সাধকের অভিনব জীবন আরম্ভ হয়। ষষ্ঠ, সিদ্ধান্তাচার—এই আচারে সাধক বামাচারোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন। তবে ইহাতে অন্তর্যাগের মাত্রা বাড়াইতে হয়—তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সর্ব্বশেষে কৌলাচার।

কুল শব্দ ব্রহ্মবাচক—"কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।" এই শৈবাচারে সাধক ব্রহ্মসদৃশ হয়েন। ভাবচূড়ামণি তন্ত্র বলিয়াছেন—এই অবস্থায় সাধক—"কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নঃ পুত্রে শত্রৌ তথাপ্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি! তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।" এই আচারে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—সোঽহং-তত্ত্বের বা অদ্বৈত-তত্ত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। আচার প্রকৃত পক্ষে দ্বিবিধ, যথা—দক্ষিণাচার ও বামাচার। দক্ষিণাচারের অন্তর্গত বেদাচার, শৈবাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচার; এবং বামাচারের অন্তর্গত বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং। সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং যৎ কৌলমুচ্যতে॥" ভাবত্রয়ের মধ্যে বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত; সিদ্ধান্ত ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত।

বীরভাব প্রসঙ্গে অগ্রে পশুভাবের আলোচনা আবশ্যক। এই পশুভাব হইতেছে বিধিমার্গ এবং বীরভাব বিধিপরিত্যাগের মার্গ। বৈষ্ণব যাহাকে রাগমার্গ বলিয়াছেন, ইহা কতকটা সেইরূপ। বিধি-মার্গের যাজন না করিলে রাগমার্গের অবসর নাই। বিধিমার্গের যাজনে চিত্তশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বভাবপুষ্টির যোগ্যতা আইসে। তখন বিধিমার্গ পরিত্যাগের অবসর আইসে। মহাপ্রভু যখন রসিক-শিরোমণি রায় রামানন্দকে সাধ্য-সাধন জিজ্ঞাসা করেন, তখন রায় মহাশয় স্বধর্ম্মপালনই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত করেন। মহাপ্রভু ইহা বাহ্য বলিয়া গূঢ়তম ধর্ম্মরহস্য জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রায় মহাশয় স্বধর্ম্মপালন কিরূপে রাগমার্গের প্রবর্ত্তক হয়, তাহার ক্রমাভি-ব্যক্তি প্রণালী বর্ণনা করেন। পশুভাব বলিতে এই 'স্বধর্ম্মপালন' বুঝাইয়া থাকে। আর শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত কর্ত্তব্যসম্পাদনই স্বধর্ম্মপালন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের যথারীতি সম্পাদনে সকাম ও নিষ্কাম ভাবের সাধনায়, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়। এইরূপে বিশুদ্ধচিত্তের উদ্ভব হইলে বীরভাবের অনুশীলন করিতে হয় এবং পশুভাব ত্যাগ করিতে হয়। তাই রুদ্রযামল তন্ত্র বলিয়াছেন—"আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদবশ্যকম্। বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং। তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্।"

বাস্তবিক ভারতীয় সাধনার বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় সাধক এই বিষয়-জগতের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়া ইহাকে সে দূরে পরিত্যাগ করিতে চাহে। সংযম-মূলক ভোগাবসানে ইন্দ্রিয়জগৎ ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় সত্তার সমাধিতে নিমগ্ন হইতে চাহে। এই অতীন্দ্রিয় সত্তার সমাধি অর্থে পরিপূর্ণ অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। সে অবস্থায় ঈশ্বর জীবে, ধ্যাতা ও ধ্যেয় বস্তুতে আর সীমারেখা থাকে না—সব এক হইয়া যায়। বিধি-নিষেধাত্মক বিষয়-জগৎই এই পশুভাবের ক্ষেত্র। এই বিধি-নিষেধাত্মক পশুভাব বর্জ্জন করিয়া অগ্রসরকামী যোগ্য সাধককে অতীন্দ্রিয় সাধনার ক্ষেত্রে সমাসীন হইতে হয়। বীরভাবেই এই অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত-জ্ঞানের আরম্ভ বা 'প্রবর্ত্তদশা'। পরিপক্ব সাধন-দশাতেই অতি সুন্দর মহাফল দিব্যভাব বা কৌলাচার।

এইবার বীরভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্। অবশ্য এই বীরভাবে একটা বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে—যাহা বাহ্য-দৃষ্টিতে সমাজবুদ্ধির প্রতিকূল ও পরিপন্থী বলিয়া মনে হইবে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহা লইয়াই বীরাচারীর সাধন। ভীষণ কথা! কিন্তু স্থিরবুদ্ধি হইয়া এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহা শরীরপালন বিদ্যা (Hygiene) এবং পরমার্থ-তত্ত্ববিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র বলিয়াছেন—ইহা অতি কঠিন দুশ্চর ব্রত। পরমানন্দতন্ত্র বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমঃ কৌলমার্গঃ সম্যঙ্ মহেশ্বরি। অসিধারাব্রতসমো মনোনিগ্রহহেতুকঃ॥" ইত্যাদি। এই দুশ্চর ব্রতের অধিকারী কে? ত্রিপুরার্ণবতন্ত্র বলিয়াছেন—"অয়ং সর্ব্বোত্তমো ধর্ম্মঃ শিবোক্তঃ সুখসিদ্ধিদঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য সুলভো নান্যস্যানন্তজন্মভিঃ॥" জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই মার্গের অধিকারী। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিয়া এই মার্গে প্রবেশ করিতে হয়।

বীরভাব সাধনায় মদ্য-সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে 'বীর' কে, তাহা জানা প্রয়োজন। তন্ত্র বলিয়াছেন, "অগ্নি প্রলয়ং কুর্ব্বন্ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ। স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মানন্দ-নিমগ্নধীঃ॥" যিনি প্রতিযোগী, ইদংপদার্থকে অর্থাৎ বিষয়-জগৎকে অহংপদার্থে লীন করিতে পারেন, তিনিই বীর। সমগ্র বিষয়-জগৎ অহংপদার্থে লীন হইলে দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল অহং জাগিয়া থাকে, আর এই অহংই ব্রহ্ম; শাস্ত্রের ভাষায় "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" ইহাই অদ্বৈতজ্ঞান। যাঁহার এই অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিয়াছে, অথচ এ জ্ঞান সুদৃঢ় হয় নাই, এমন ব্যক্তিকেই বীর বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিয়াছেন—"বীরস্তু তত্ত্বজ্ঞানী স ন বাহ্যান্তরক্রিয়াবান্ ঊর্দ্ধমানসত্বাৎ সর্ব্বং গ্রাহ্যং।" বীরাচারীর জন্য শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাব একটা higher mental status—ইহাই তন্ত্রোক্ত 'ঊর্দ্ধমানসত্ব'। এই 'ঊর্দ্ধমানসত্বে'র সাহায্যে বীরাচারী প্রকৃত বীরের ন্যায় অসম্ভব সম্ভব করেন, মদ্যাদি-সাধনারূপ অসিধারা-ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উন্নত মন লইয়া এই সাধনায় রত হইতে হয়। আগে এই উন্নত মনের 'ঊর্দ্ধমানসত্বের' আবাদ করিতে হয়। এই ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মদ্যসাধন নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার নয়। আর বাস্তবিক তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া বস্তু হিসাবে দেখিলেও মদ্য খারাপ বস্তু নহে। আয়ুর্ব্বেদ পুনঃ পুনঃ ইহার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন; যথা—"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ। প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥" এত বড় পুষ্টিবিধায়ক খাদ্যকে আমরা অযথা ব্যবহার করিয়া দুঃখভোগ করি। প্রকৃত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা দ্বারা শারীরিক পুষ্টিবিধানই হইয়া থাকে—আমাদের physiological gain হয়। আমাদের দেশে এবং সর্ব্ব দেশে সুরা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বীরাচারী তান্ত্রিক সুরার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত ছিলেন। মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-রহস্য তান্ত্রিক বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রবৃত্তির পথ ধরিয়া এক অভিনব কলা-কৌশল আশ্রয় করিয়া মানবকে নিবৃত্তির পথে দাঁড় করাইবার বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য ধর্ম্ম-বিধান মানুষকে শিক্ষা দেয়—জোর করিয়া প্রথম হইতেই তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিতে। ইহা প্রকৃত মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নহে। মনোবিজ্ঞান-দক্ষ তন্ত্রের ব্যবস্থা তাই অন্যরূপ। বীরাচারীর ব্যবস্থায় কি অপরূপ কৌশলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পরিণত হয়। ভোগ যোগে রূপান্তরিত হয়। তাই সুরা লইয়া আরম্ভ। এ সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম

আছে। অতি সামান্য মাত্রায় ইহা গ্রহণ করিতে হয়। আবার কোন কোন তন্ত্র বলিয়াছেন, মন যাবৎ অস্থির না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত। এইরূপ পরিমিত পানে "মনো নিশ্চলতাং যাতি চিত্তঞ্চাপি প্রসন্নতাম্।" তাহার পর "ততো ধ্যায়েৎ পরং জ্যোতিরাত্ম-জ্যোতিঃ সনাতনম্।" ধ্যানের জন্য, বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির করিবার জন্যই সাধক সমাধির অনুকূল এই বাহ্য দ্রব্যের সাহায্য সাধনের "প্রবর্ত্তদশায়" লইয়া থাকেন। পরে দিব্যভাবে আর কোনরূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য লইতে হয় না। বীরাচারীর অদ্বৈতজ্ঞান সুস্থির থাকে না। যে অবস্থায় অদ্বৈতজ্ঞান কিছু ভাসা-ভাসা ভাবে থাকে, সেরূপ মানসিক অবস্থার নামই বীরভাব। এই ভাসা-ভাসা ভাব দূর করিবার জন্যই দ্বৈতবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞান সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বীরাচারী সাধক বাহ্যবস্তুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তন্ত্র বলিয়াছেন—"মন্ত্রজ্ঞানস্ফুরণায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং, লোলুপো নরকং ব্রজেৎ।" কারণ, বীরাচার হইতেছে অদ্বৈতজ্ঞান-সাধনের প্রবর্ত্তদশা মাত্র। দিব্যভাবে "সিদ্ধদশায়" ইহার পূর্ণ পরিণতি, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। তন্ত্র মদ্যকে সংস্কৃত বা শোধিত করিতে বলিয়াছেন। তাহার অনেক নিয়মানুষ্ঠান আছে। সে সব আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে মোটের উপর আমাদিগকে জানিতে হইবে, সুরাসংস্কার অর্থে ইহাই বুঝায় যে, একটা 'ঊর্দ্ধমানসত্ব' লইয়া, সত্ত্বভাব-পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া সুরাপান করিতে হয়। আমাদিগকে শ্রুতিবচন স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ-ব্রহ্মকে realise করাই কৌল-সাধনা। এই আনন্দ-ব্রহ্ম একটা abstract idea —চিন্ময় তত্ত্ববস্তু। এরূপ abstract বস্তুকে concretise করিতে না পারিলে উপাসনা অসম্ভব হইয়া উঠে, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ঐন্দ্রিয়িক বস্তুর সংযোগাশ্রয় ব্যতিরেকে realise করা দুষ্কর হয়। তাই হিন্দুর সাধনা একটা জড়বস্তুর আশ্রয়ে করিতে হয়। ইহারই নাম প্রতীক-উপাসনা। জড়বস্তুর সাহায্যে একটা তত্ত্ববস্তুকে বুঝিতে যাওয়ার নামই প্রতীক-উপাসনা। হিন্দুর সর্ববিধ সাধনার মূলে এই তত্ত্ব নিহিত আছে। মদ্যাদি সেই আনন্দ-ব্রহ্মেরই যেন স্বরূপ, অভিব্যঞ্জনা মাত্র। সাধক মদ্যপানের মধ্য দিয়া পানকালে সেই অখণ্ডানন্দের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন। কারণ, তন্ত্রও বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং। তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ।" ইত্যাদি। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পানকালে এই ভাব স্মরণ করিতে হয়, যথা "আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা"—আমি জ্যোতিঃস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ। এই ভাবে পান করিলে তন্ত্রোক্ত 'ঊর্দ্ধমানসত্বে'র জন্ম হয়, এই ভাবে 'ঊর্দ্ধমানসত্ব' লইয়া পান করিলে তাহা প্রকৃত পান—হোমবুদ্ধিতে পান। অন্য ভাবে পানের নাম পশুপান। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই সব ক্রিয়া অনেকটা অনুভবসিদ্ধ, তর্কসিদ্ধ নহে।

মাংস-সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে মদ্যপান সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কুৎসিত ধারণা সাধারণের মধ্যে আছে—তাহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সেটি হইতেছে সপ্তবিধ উল্লাসের কথা। আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত, উন্মন ও অনবস্থ—এই সপ্তবিধ উল্লাস। সাধারণের ধারণা—অত্যধিক মদ্যপানে এই সপ্তবিধ বিকৃত অবস্থা ঘটে। অত্যধিক মদ্যপানে ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়ার নামই বুঝি অনবস্থ উল্লাস। ইহা অতি ভ্রমাত্মক ধারণা। ইহা সাত প্রকার মানসিক অবস্থা—সমাধির পূর্ব্বে সাত প্রকার স্তরভেদ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই অবস্থাসমূহকে সপ্তজ্ঞানভূমিকা বলা হইয়াছে। যথা—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুর্য্যগা। এক এক অবস্থায় এক এক রূপ পাত্র। মন্ত্র-সিদ্ধি হইলে অধিক পানও সম্ভব।

সাধক যে অবস্থায় পানে সবেমাত্র দীক্ষিত হয়, তাহারই নাম আরম্ভোল্লাস। ঈষৎ জ্ঞানের উদয় হইলে তরুণোল্লাস। যে অবস্থায় ব্রহ্মে লীন মনকে যত্ন করিয়া সঞ্চালিত করিতে হয়, তাহার নাম উন্মনোল্লাস। আর যে অবস্থায় মনকে কোনরূপে চালিত করা যায় না, তাহারই নাম অনবস্থোল্লাস। ইহাই সমাধি।

এইবার আমরা দ্বিতীয় মকার মাংস ও তৃতীয় মকার মৎস্য-সাধন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাংস ও মৎস্য উত্তম খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। তন্ত্রও এই মৎস্য ও মাংস পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। তবে তন্ত্র এই সুন্দর পুষ্টিবিধায়ক বস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। প্রকারান্তরে, এই দুই সাধনে সাধকের শারীরিক-শক্তি বিকশিত হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে সাধনার দিক্ হইতেই ইহা গ্রহণ করিতে হয়। যে ভাব ও যে মনোবৃত্তি লইয়া মদ্যপান করিতে হয়, ইহাও সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যহেতু সাধন করিতে হয়। কারণ, পঞ্চ-মকার সাধনের উদ্দেশ্য একই সেই "ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ—" ইত্যাদি। মৎস্য সম্বন্ধে তন্ত্র বহুপ্রকার মৎস্যের আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি, রন্ধনের প্রণালী সম্বন্ধেও উপদেশ করিয়াছেন। সে সব আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নহে। তন্ত্রে পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন। চতুর্থ মকার মুদ্রাও বলকারক খাদ্য-বিশেষ। সাধারণ ভাষায় যাহাকে "চাট" বলে, তাহারই নাম মুদ্রা। পরিমিত মদ্যের সাহায্যে পরিমিত পরিমাণ মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা গ্রহণ করিলে অন্নময়-দেহের পরিপুষ্টি হয় এবং তত্ত্বের দিক্ হইতে গ্রহণ করিলে পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয়। ইহা আমরা মদ্যসাধনের কালে বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা করিতে যাওয়া পুনরুল্লেখ মাত্র। মদ্য ও মৈথুন সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ করিবার কারণ থাকায় এই দুইটি আলোচনার যোগ্য। তবে মাংস ও মৎস্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে আপত্তি হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া আমরা মৈথুন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা—মাংস-সাধনের ব্যবস্থায় তন্ত্র হিংসাবৃত্তি জাগরণের প্রশ্রয় দেন। ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা। সাধনার ক্ষেত্র ব্যতীত পশুবধ নিষেধ। তন্ত্র অন্যত্র পশুবধের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ পশুবধ-ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তন্ত্র বলিতেছেন,—যিনি পূর্ব্বে অহিংসার যাজন করিয়াছেন, তিনিই পশুহননে অধিকারী। পশুভাবে যিনি বৈষ্ণবাচার যাজনপূর্ব্বক কায়, মন ও বাক্যে অহিংসা সাধন করিয়াছেন, তিনিই বীরাচারে কেবল সাধনার ক্ষেত্রে পশুবধের অধিকারী। তিনি শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-কথিত এক 'ঊর্দ্ধমানসত্বে'র মধ্য দিয়া, এক অপূর্ব্ব প্রেম-পরিমার্জ্জিত মন-বুদ্ধি লইয়া, সত্ত্বময় নিষ্কাম ভাব লইয়া বাহ্যতঃ

বধের অভিনয় করেন মাত্র, ছল করেন মাত্র, বস্তুতঃ, ইহা বধ নহে— একটা মস্ত বড় তত্ত্বের সাধন মাত্র। ইহাতে তাঁহার চিত্তের অশুদ্ধি জন্মে না, পারমার্থিক কল্যাণই হইয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর "দেবীচৌধুরাণী"র শিক্ষাপ্রণালী স্মরণ করিলে আমাদের বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন। এই তত্ত্ব-বস্তু বাদ দিয়া বহির্ম্মুখী হইয়া উদরতৃপ্তির জন্য পশুবধ করিলে তাহাই বধ বা হিংসার অনুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে। তত্ত্বতঃ এই জগতে কে কাহাকে বধ করে, কে কাহাকে হনন করে। তত্ত্বতঃ এই বধ বা হনন সম্পূর্ণ মিথ্যা। সবই তো আত্মার বিকাশ। অতএব চাই একটা দিব্য-দৃষ্টি একটা **view point** অদ্বৈতজ্ঞান-ভূমি হইতে দেখিলে বধ প্রকৃত বধ নহে—বাহ্য বধ বা বধের অভিনয় মাত্র। এমন কি, বৈষ্ণব-পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবত পর্য্যন্ত এইরূপ বধ, বধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, যথা—

"যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীধরস্বামী স্বীকার করিয়াছেন—"যদ্ যস্মাৎ সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ অবঘ্রাণং স এব বিহিতো, ন পানম্। তথা পশোরপি আলভনমেব বিহিতং ন তু হিংসা" ইত্যাদি।

এইবার আমরা পঞ্চম তত্ত্ব বা মৈথুন সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিব। যৎসামান্য কেন না, ইহা অতি গূঢ় ব্যাপার, গোপন বস্তু। তন্ত্র ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই তত্ত্বের সাধনেই দেশে ব্যভিচার ঘটে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের কিশোরীভজনও এইরূপ ভয়াবহ সাধন। রমণী লইয়া তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবের ভজনের উদ্দেশ্য এক না হইলেও সাধনপ্রণালী অনেকটা একরূপ বলিয়া বোধ হয়। কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, মাকড়সার জালে যিনি হাতী বাঁধিতে পারেন, সাপের মুখে যিনি ভেক নাচাইতে জানেন, তিনিই কিশোরী-ভজনের অধিকারী। তান্ত্রিকের পক্ষেও একই কথা। মৈথুন তিন প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম দূতীযাগ। ইহা পরকীয়া রমণী লইয়া সাধিতে হয়। ইহার অধিকারী-বিচারে পরমানন্দতন্ত্র বলিয়াছেন—"অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো যো যোঽসৌ সংসারপারগঃ। স এব যজনে দূত্যা অধিকারী তু নাপরঃ।" কলিকালে পরকীয়া রমণী লইয়া এই দূতীযাগ সাধন তন্ত্রে নিষিদ্ধই হইয়াছে। স্বকীয়া লইয়াই এ কালে পঞ্চমতত্ত্বের সাধন করিতে হয়। যিনি অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান সুস্থির করিবার জন্য এই মৈথুন-সাধন করিয়া থাকেন।

কিরূপে ইহা সম্ভব? অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। এই ভাবের যাজন করিতে হইলে হৃদয়ে সর্ব্বদাই মাতৃভাবের স্ফুরণ করিতে হয়। এই মাতৃভাবের বিকাশে কামের প্রভাব নষ্ট হয়। সকল তরুণী রমণীকে জগদম্বার অংশ বলিয়া ভাবনা করিতে হয়। তাহা হইলে রমণীর রমণীভাব নষ্ট হয়, রমণী জননীতে পরিণত হয়। পরে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিতে হয়। মাতৃভাবে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হৃদয়-মন লইয়া অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মচারী সাধক মৈথুনতত্ত্বের যাজন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব হইতে **well equipped** না হইয়া এ ক্ষেত্রে নামিলে সাধন ব্যর্থ হয়।

এই যে মৈথুনতত্ত্ব—ইহাও একটা মস্ত প্রতীক উপাসনার রূপ। সাধক যে রমণীকে লইয়া সাধন আরম্ভ করিতে চান, সেই রমণী গৌরী বা শক্তির স্বরূপ বা প্রতীক এবং সাধক শিবের প্রতীক বা শক্তিমান্। এই শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ বস্তু, যথা—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" অগ্নি যেমন দাহিকা শক্তি হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানেও ভেদ নাই। এই শক্তি ও শক্তিমানে অভেদজ্ঞান জন্মিলে সোঽহং তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়—জীব ও শিব এক হইয়া যায়, সাধক মুক্ত হইয়া তাঁহার **original** ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হয়েন। পুংদেহ হয় শক্তিমানের স্বরূপ এবং স্ত্রীদেহ শক্তির স্বরূপ; সুতরাং এই উভয়ের মিলনে এই অদ্বয়ভাব—এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাধির অনুকূল ভাব সৃষ্ট হয়—যাহা পূর্ব্বে একটা **abstract** ভাবমাত্র ছিল, তাহাই নর-নারীর মিলনের মধ্য দিয়া দৃঢ়ীভূত হয়, **impressive** হইয়া চিত্রপটে অঙ্কিত (**stamped**) হইয়া যায়। নরনারীর মৈথুনকালে উভয়েরই বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত হয়—চিত্তের অপরাপর বৃত্তির যেন কতকটা নিরোধ হইয়া যায় এবং একমুখী হয়। সেই সৃষ্টির পরমক্ষণে চিত্তের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা যেন উহাতে লাগিয়া যায়; সুতরাং অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান অনেকটা স্থির হইয়া যায়। ইহাই মৈথুনতত্ত্বের পরম পারমার্থিক লাভ। অপর লাভও আছে। এই সাধনের জন্য অনেক প্রকার প্রক্রিয়া আছে। এইগুলির উদ্দেশ্য এক ভাগবত-দেহের সৃষ্টি। সাধক ও সাধিকার জড়দেহকে জড়ভাব হইতে মুক্ত করিয়া উহাতে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তবেই তাহা সাধনদেহ বা ভাগবত-দেহ হয়। অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিতেছি। সকল পূজার ন্যায় অঙ্গন্যাসাদি করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্না সাত্ত্বিকী ভক্তিসংযুক্তা নারীর কুলাঙ্গে মাতৃকান্যাসাদি সম্পাদন করতঃ শ্রেষ্ঠ অঙ্গে পরমেশ্বরীর পূজা করিতে হয়। শক্তির সমগ্র অঙ্গে অপরাপর দেবতার পূজা করিতে হয়। এই ভাবে সমগ্র দেহকে ভাগবতদেহে পরিণত করিতে হয়। সাধকের দেহকেও শিবরূপে পূজা করিতে হয়। উভয় দেহে এই ভাবে চিন্ময়ভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে মৈথুনারম্ভ। মৈথুনকালেও বহু জপ করিতে হয়—"প্রজপেৎ ক্ষোভরহিত-শ্চাষ্টোত্তরসহস্রকম্" এই ভাবে অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে মনের ঊর্দ্ধগতি জন্মে—ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নষ্ট হইয়া যায়। মন ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন হইলে এক উন্নত **status**এ পৌঁছিলে, আমরা যাহাকে মৈথুন বলি, সে মৈথুন আর থাকে না, ইহার রূপ বদলাইয়া যায়,—স্বভাব বদলাইয়া যায়। সুতরাং ইহা মৈথুনের অভিনয় হয় মাত্র। তন্ত্র বলিয়াছেন, সঙ্গমান্তে আমিই ব্রহ্ম বা শিবস্বরূপ, এইরূপ ভাবিতে হয়—'সঙ্গমান্তে শিবোঽহং ইতি ভাবয়ন্ উভয়োঃ সঙ্গমং কৃত্বা পূর্ব্ব-বজ্জপাদিকং কুর্য্যাৎ'—ইহাই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এই বাহ্য মৈথুনের মধ্য দিয়া এক বিরাট্ তত্ত্বের সাধনা—কাম এই ভাবে অকাম অবস্থায় পৌঁছিয়া যায়। কিশোরী-ভজন বুঝাইবার কালে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "কামের অকাম নিত্যস্বরূপ আশ্রয়। তবে সেই নিত্যবস্তু কামেতে উদয়॥" কামেরও একটা অকাম নিত্যস্বরূপ আছে। সাধনা দ্বারা কাম এই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তবে তজ্জন্য সাধকগণ অন্যান্য যৌগিক উপায়ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে সামান্য

একটু আভাস দিই। আমাদের জানা উচিত যে, পুরুষের শুক্রসমূহ ইড়া নাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাত্মক স্নায়ুসমূহ কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। পিঙ্গলা নাড়ীর অন্তর্গত কর্ম্মাত্মক স্নায়ুসকল মস্তিষ্ক-সঞ্চিত শুক্রকণাকে অধোগামী করিয়া সুষুম্না-মুখে সঞ্চিত করে। পরে তত্রত্য কামবায়ুর প্রতিকূলতায় উহা মূত্রনালীপথে বহির্গত হইয়া যায়। ইড়া নাড়ীতে শ্বাসবহমানকালে প্রাণায়ামাদি যৌগিক-প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা সাধক সুষুম্নামুখ-সঞ্চিত শুক্ররাশিকে উর্দ্ধগ করিয়া মস্তিষ্কে নীত করিতে পারেন। সেখানে উহা 'অটল' এবং সাধন-পক্ক হয়। পরে সাধক সেই অটল শুক্ররাশিকে অধোগামী করিতে পারেন। শুক্রোপরি সাধকের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়—সাধক কামজয় করিতে পারেন। সাধনার এই অবস্থাগুলিকে কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত-স্নান বলে। এই সকল অতি গূঢ় বিষয়—তন্ত্রে এ-সব প্রকাশে নিষেধ আছে।

মোট কথা, এই সব প্রক্রিয়ায় মৈথুনতত্ত্ব সাধিত হইলে নরনারী রিপুর উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। তন্ত্রসাধনে এই সকল কল্যাণের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, ইহা কত বড় বৈজ্ঞানিক-সাধন এবং তন্ত্রশাস্ত্র কিরূপ বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত। তন্ত্র ইহাই ঘোষণা করেন যে, সংসারে কাম-রিপুর আকর্ষণ ভীষণ,—রমণীর নিকট হইতে ভীরুর মত দূরে পলাইয়াও ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না; বরং রমণী-দেহকে স্বীকার করিয়াই ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রমণী ও পুরুষের মধ্যে যে বিভিন্নধর্ম্মী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত থাকে—যৎকর্ত্তৃক যৌন-চৈতন্য অতিমাত্রায় সজাগ হতে,—তাহা পরস্পরের সান্নিধ্য দ্বারা অনেকখানি ব্যর্থ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

তন্ত্র জানেন, মানুষ স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন জীব। ত্যাগের দ্বারা এই প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সুকঠিন। তন্ত্রে তাই প্রবৃত্তি লইয়াই আরম্ভ। প্রক্রিয়া-বলে প্রবৃত্তিকে ভোগের মধ্য দিয়া নিবৃত্তি অবস্থায় আনা যায়—তমকে শুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত করা যায়। বীরাচারীর ইহাই পরম সাধনা ও চরম বিজয়। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন, এই সাধনায় "ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে। মোক্ষায়তে তথা হিংসা কুলধর্ম্মে মহেশ্বরি।"

বাস্তবিক বীরভাব হইতেছে দিব্যভাবের অনেকটা যেন experimental অবস্থা। আমরা দেখাইলাম, বাহ্যবস্তুর সহায়তায় এই ভাবকে realise করিতে হয়। চিত্তে অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান অনেকটা স্থির হইলে মদ্যাদি বাহ্যবস্তুর আর আবশ্যক হয় না। তখন চিত্তে আপনা হইতেই ভাবস্ফূর্ত্তি ঘটে। মনের এই অবস্থার নাম দিব্যভাব। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিয়াছেন—"দিব্যস্তু তত্ত্বজ্ঞানী সম্মানসক্রিয়াবান্" ইত্যাদি। দিব্যভাবে সাধক কেবল মানসক্রিয়াবান্। এক্ষণে তিনি মনে মনে ভাবযাজন করেন। বাহ্যদ্রব্যের সহায়তা লয়েন না। ক্রমে তিনি সমাধিযোগ অবলম্বন করেন। সহস্রারপদ্মে চন্দ্রমণ্ডলক্ষরিত সুধাই তাঁহার মদ্য; যথা—"সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।" এক্ষণে সাধক রসনার দ্বারা উচ্চারিত বাক্যকে ভক্ষণ করিতে অর্থাৎ বাক্‌সংযম করত মাংসসাধক হয়েন, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মন নিশ্চল করত মৎস্য-সাধক এবং সহস্রদল কমলকর্ণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া মুদ্রা-সাধক হইয়া থাকেন। সর্ব্বশেষে সাধক জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া মৈথুন-সাধক হয়েন। ইহা পূর্ণ যোগের অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বভূতে সমদর্শন হন, শত্রু ও মিত্রে, বিষ্ঠা ও চন্দনে সমদৃষ্টি হন। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম জীবন্মুক্তি। এইরূপ সমাধিযুক্ত সাধক পরমহংস নামে খ্যাত হইয়া থাকেন।

অতি সংক্ষেপে আমরা তন্ত্রোক্ত ভাবত্রয়ের আলোচনা করিলাম। তন্ত্র আর্য্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। তন্ত্র-জগৎ বিশাল—ইহা আমাদিগকে স্মৃতি, বিধি-ব্যবস্থা, আইন, চিকিৎসাপ্রণালী, ঐহিক ও পারমার্থিক বহুবিধ কল্যাণের উপায় নির্দেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণবের বাঁশী তরুণ বাঙ্গালীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়াছে। উহা তাহার নবীন যাত্রাপথের মঙ্গলগীতি হউক, কম্মক্লান্ত তরুণ বাঙ্গালীর শ্রবণ-পথে বাঙ্গালী-কবির প্রেমের গান মধু-ধারা বর্ষণ করুক! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী আজ যে রুদ্রের সাধনায় সমাহিত, যে পিনাকপাণির প্রলয় গর্জ্জনে সে মাতিয়া উঠিতে চায়, তন্ত্র-সাধনায় তাহার পাওনা হইবে এক দিকে ত্যাগ, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ভাগবতশক্তি, অপর দিকে শ্রী, অমোঘ বীর্য্য এবং অমোঘ ভীতিশূন্যতা!

একটি মাত্র ধ্যানের কথা বলি—সেটি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ছিন্নমস্তা দেবীর ধ্যান। কি উৎকট সংহার-উন্মাদনার প্রেরণায় দেবী আপনার শির আপনি ছেদন করিয়া স্বীয় রক্ত-পানানন্দে বিভোর! নিজের মস্তক কাটিয়া গিয়াছে, আবার সেই নিম্মস্তক বিগ্রহের রক্তপান! কি বিপরীত ভাবের পরিকল্পনা! কোমল-চিত্ত বাঙ্গালী সাধক এই মূর্ত্তির ধ্যান করুন।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য।

বাউল

নীল আকাশের স্বপন-বুকে পাখীর পাখায় পাল তুলে
একতারাটি বাজাও বাউল কোন্ কূলে?

ভোরের আলোর ঝরণা-ধারা, আন্‌লো বয়ে কোন্ বাণী?
নাম-হারা সেই সব-হারানো অবুঝ তোমার গানখানি।
ডুবিয়ে দিল আলোর বানে—ডুবিয়ে দিল কূল-হারা—
এই ধরণীর শ্যামল বুকে সুর-ধারা।
বনের ছায়ে ফাগুন-বায়ে গানখানি তার যায় লুটে;
অশোক-শাখায় রক্ত কলি রয় ফুটে।

হাওয়ার বুকে ঘুমিয়ে থাকা আন্‌মনা গো সেই সুরে
নদীর বাঁকে, বালুর চরে কাশের বনে, কোন্ দূরে
বাজাও বাউল পাগল তোমার একতারা!
ও পারের ঐ সুরের নেশায় এ-পারেতে রয় যারা
তোমার গানে তারাও যে হায় রয় ভুলে;
সব হারায়ে আঁধার মায়ার কোন কূলে?

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল্)।

জীবন রঙ্গ

[গল্প]

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে কমলা মুখ-হাত ধুইয়া ঢাকা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া স্বামী নীতীন দাড়ি কামাইতেছে।

বেশ একটু কঠিন স্বরেই কমলা বলিল—তোমার ঘুম ভাঙ্গলো, আমাকে যে বড় ডেকে দাওনি!

মুখ না ফিরাইয়াই নীতীন বলিল—তোমার নাক ডাকছিল··· ঝুমঝুম, আরামে ঘুমোচ্ছ!···তাই মায়া হলো!

ভ্রূকুটি করিয়া কমলা বলিল—সকালেই এমন মিথ্যা কথাটা না-ই বলতে!

—মিথ্যা কথা! কোন্‌টা মিথ্যা হলো? তোমার ঘুম?

কমলা বলিল—ঘুম নয়। নাক-ডাকা। তোমার মতো আমার বাঁশী-নাক নয় তো যে ডাকবে!

নীতীন বলিল—আমার নাক ডাকে, এ অপবাদ শুনি শুধু তোমার মুখে!···আমি নিজে তার বিন্দুবিসর্গ টের পেলুম না কখনো! আমার নাকে বেদনা হলে আমি জানতে পারি, আর সে-নাক ডাকলে আমি টের পাবো না, ভাবো?

কমলা বলিল—নাক যার ডাকে, সে টের পায় না!

হাসিয়া নীতীন বলিল—তাহলে স্বীকার করছো তোমার নাক যদি ডেকে থাকে, তাহলে তোমার তা টের পাবার কথা নয়!

অন্য সময় হইলে কমলা হয়তো খানিকটা তর্ক করিত, কিন্তু এখন তর্ক বা কথা-কাটাকাটি করিবার মতো মেজাজ তার নয়। সে বলিল,—আজ তাহলে তুমি বাড়ী যাবেই?

বাড়ী মানে, হালিসহরে নীতীনের পল্লী-গৃহ। দাড়ি কামানো শেষ হইয়াছিল, ব্লেড রাখিয়া নীতীন বলিল—দু'হপ্তা যাইনি! মা সেখানে একলাটি···

কমলা বলিল—এই তো পরশু তাঁর চিঠি পেয়েছো! লিখেছেন, ভালো আছেন!

নীতীন বলিল—তা আছেন। তবু মায়ের মন! তুমিও তো বোঝো তোমার নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে! তাছাড়া আমি ছেলে··· আমার কর্তব্য!

কমলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল—এখানকার এ-কাজও তোমার কর্তব্য ছিল। সংসারে বাস করতে হলে আত্মীয়-বন্ধুদের ছেঁটে ফেলা··· কর্তব্য নয়।···আমার বোন্‌পোর ভাত···আমার দিদির নেমন্তন্ন।··· তবে আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী···আমাকেই মানো না··· তা আমার দিদি!

কথাটা বলিয়া কমলা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

চোখে খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অস্বস্তি···নীতীন শুধু চাহিয়া দেখিল···মুখে কোনো কথা বলিল না।

স্নান করিয়া ঘরে আসিল। টেবিলের উপর টোস্ট-রুটি, মাখন, ওমলেট্। পেয়ালায় চা কমলা ঢালিয়া দিল।

নীতীন বলিল—টুনু-বুলু ওঠেনি?

টুনু মেয়ে—বয়স দশ বছর; বুলু ছেলে—সাত বছরের।

কমলা বলিল—এত সকালে আর কবে ওরা ওঠে!

কমলার মুখ গম্ভীর।

নীতীন দেখিল, দুর্জ্জয় অভিমান! ছেলেমেয়ের দিক দিয়াও এ অভিমান টলিবার নয়! সে বলিল—তোমার চা?

কমলা বলিল—আমি এখন খাবো না।

নীতীন কথা বাড়াইল না···চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল।

কমলা বলিল—যাক্, আমার বোনের নেমন্তন্ন রক্ষা না করো, ক্ষতি নেই, তাতে তারা বুক ফেটে মরে যাবে না! কিন্তু আমায় যেতে হবে তো! তোমার বাঁদীগিরি করছি বলে নিজের বোন-বোনপোকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আর যেতে যখন হবে, তখন দিদি আর রায়-মশাই যে-কথা বলেছিলেন, তার একটা জবাব তাঁরা নিশ্চয় চাইবেন। তা কি বলবো তাঁদের?

রুটিতে মাখন মাখাইতে মাখাইতে নীতীন বলিল—কিসের কি বলবে?

কমলা বলিল—কিসের! তার মানে? বিস্ময়ে তার দুই চোখ একেবারে জ্বল-জ্বল করিয়া উঠিল!

নীতীন বলিল—মনে নেই, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মুখে নিরুপায় হতাশার ভাব···কমলা বলিল—ওঁদের বাড়ীর কাছে ভালো বাড়ী আছে, তুমিই দেখতে বলেছিলে! বলেছিলে, এ বাড়ীতে অসুবিধা হচ্ছে, বড় বাড়ীতে গেলে ভালো হয়! তাছাড়া আপনা-আপনি কাছাকাছি থাকা!···ভাড়া এখানে যা দিচ্ছ, তার চেয়ে ওখানে শুধু পনেরোটা টাকা বেশী!

নীতীন বলিল—মাসে পনেরো টাকা করে বাড়লে বছরে হবে বারো ইন্‌টু পনেরো—যার নাম একশো আশী টাকা! প্রায় দু'শো টাকাই ধরো! না কমল, খরচ এমনিতেই চার দিকে বেড়ে চলেছে। কাজেই বাড়ী-ভাড়া-বাবদ আর এক পয়সা আমি বাড়াতে চাই না! বিশেষ এ বাজারে!

কমলার মন একেই অস্বস্তিতে ভরিয়া আছে! সে অস্বস্তির উপর আবার এই জবাব! যেন বারুদে আগুন পড়িল! কমলা বলিল,—এ বাড়ীতে অসুবিধার সীমা নেই, তাই আমার বলা! তোমার কি! বাড়ীতে কতক্ষণ থাকো! তোমার শোয়া-বসার তো অসুবিধা হয় না···ভাবো, এরাও এমনি দিব্যি আরামে আছে!···একটা লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী! আশেপাশে মানুষের মতো এমন মানুষ নেই যে, দু'দণ্ড কথা কয়ে হাঁফ ফেলতে পারি!

নীতীন বলিল—কিছু মনে করো না কমল, তোমার হাঁফ ফেলবার সুবিধার জন্য অত টাকা দামের রেডিও-শেট কিনে দিলুম সে-দিন···কাজকর্ম্ম চুকলে চুপচাপ বসে রেডিও শুনবে!

কমলা বলিল—রেডিও-শেট আমার সখে কেনোনি! যখন কোনো কথা বলবে, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো! তুমিই বলেছিলে, সব-বাড়ীতে রেডিও আছে···এ-কালে ও-একটা ফ্যাশন···রেডিও না থাকলে পাঁচ জনে হাসবে! এই কথা বলে তুমিই ছুটেছিলে রেডিও কিনতে! আমার কথায় নয়!

নীতীন এ-কথার জবাব দিল না···নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

কমলা বলিল—বেশ, আমার দিদির বাড়ীর কাছে ও-বাড়ী নাই নিলে! বালিগঞ্জের দিকে নতুন বাড়ী ঢের পাওয়া যায়···ভালো ভালো বাড়ী···সেইখানেই না হয় চলো।

নীতীন বলিল—বাড়ীর জন্য যে-ভাড়া দিচ্ছি, তার উপর ভাড়া আমি আর এক পয়সা বাড়াতে পারবো না!···আচ্ছা, এ-কথা কেন বোঝো না কমল···খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই? ছেলে-মেয়েকে মানুষ করা আছে! তার উপর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে আর চার-পাঁচ বছর পরে! সে খরচ কি সহজ, ভাবো! বাজে-খরচ করতে তোমার বুক কাঁপে না?

কমলা কোনো জবাব দিল না। দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

নীতীনের খাওয়া শেষ হইল। ডাকিল—শম্ভু···

শম্ভু ভৃত্য। বাবুর ডাকে শম্ভু আসিয়া দেখা দিল।

নীতীন বলিল—ড্রাইভার গাড়ী বার করেছে?

শম্ভু বলিল—কৈ, না!

—বল, বল, তাড়া দে। সাড়ে সাতটায় আমার ট্রেণ। ওদিকে সাতটা বাজে।

শম্ভু গেল ড্রাইভারকে তাড়া দিতে; নীতীন ঢুকিল ঘরে সাজ-সজ্জা করিতে।

ছেলে-মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিল। মেয়ে টুনু আসিয়া বলিল—হালিসহরে যাচ্ছো বাবা?

নীতীন বলিল—হ্যাঁ।

বুলু বলিল—বা রে, আমাদের নিয়ে যাবে না? বলেছিলে, এবার যখন ঠাকুমার কাছে যাবে, আমাদের নিয়ে যাবে!

নীতীন বলিল—আজ যে মাসিমার বাড়ী তোমাদের নেমন্তন্ন··· ছোট খোকার ভাত।

বুলু বলিল—না, আমি মাসিমার বাড়ী যাবো না। আমি ঠাকুমার কাছে যাবো।

ঝাঁঝিয়া কমলা ধমক দিল, বলিল—তাই যা! মাসিমা 'বুলু' বলতে অজ্ঞান, মাসিমার কাছে যাবি কেন?···সে একের জন্ম ···আমার মা-বোনকে মানলে মহাপাতক হবে!

নীতীন ফিরিয়া তাকাইল কমলার পানে···বলিল—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি হচ্ছে ও!

মার ধমকে বুলু চুপ করিয়া গেল···কিন্তু মুখ হইল হাঁড়ির মতো!

টুনু বলিল,—আমার বেহালা কবে কিনে দেবে বাবা? আমি বুঝি বেহালা শিখবো না? মিত্তির বাবু সে-দিনও এসে বলে গিয়েছেন, এখনও বেহালা কেনোনি!

নীতীন বলিল—দেবো রে, এইবার কিনে দেবো। বড্ড খরচপত্র চলেছে···একটু সামলে উঠি···সামলে উঠলেই তোর বেহালা কিনে দেবো।

শম্ভু আসিয়া খবর দিল, ড্রাইভার গাড়ী বাহির করিয়াছে।

নীতীন গমনোদ্যত হইল···টুলু-বুলুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, —ঠাকুমাকে তোদের কিছু বলবার আছে?

টুনু বলিল—ঠাকুমাকে বলো আমায় চিঠি দিতে।

বুলু বলিল—ঠাকুমার কাছ থেকে আমার জন্য সেই সোনালী রঙের পুরু আমসত্ত চেয়ে এনো বাবা! বলো, বুলু চেয়েছে।

টুনু বলিল—আর আমার চাই সেই বড়ির গহনা···বেশ মুচ্‌মুচে খেতে!

নীতীন বলিল—বলবো।

নীতীন আসিল বারান্দায়। কমলা বলিল—একটা কথা ছিল। ভয় নেই, পেছু ডাকিনি।

—বলো···

কমলা বলিল—বোনপোর ভাত···শুধু হাতে তো যেতে পারি না। কিছু দিতে হয়···তোমার মান রাখতে। তাই মানে···দু'টো জিনিষ রাত্রে তোমায় দেখিয়েছিলুম। একটা ঐ মিনের কাজ-করা ঝুমঝুমি, আর একজোড়া সেই সোনার বালা। তার কোন্‌টা দেবো?

নীতীন বলিল—এর মানে? যা তুমি ভালো বুঝবে, দেবে··· ও-সম্বন্ধে মতামত দিয়ে কখনো আমি অনধিকার-চর্চ্চা করেছি যে, আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছো!

কমলা বলিল,—না···মানে, বাজে খরচ নিয়ে অত কথা বললে কি না। সোনার বালাজোড়ার দাম পড়বে প্রায় বাহাত্তর টাকা··· আর ঝুমঝুমির দর বলেছে, কুড়ি টাকা।

নীতীন বলিল—পঞ্চাশ টাকার তফাৎ বলে' দুশ্চিন্তা হয়েছে···না?

নীতীনের চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুকের হাসি। তার পর বলিল—বালাজোড়াই দিয়ো!

কমলা তাহাতে ভুলিল না। বলিল—বালার কথা মনেও আনতুম না···অত দাম! তবে এ-সব কাজে তোমার হাত দরাজ হয় দেখছি কি না। তবু অসৈরণ সইতে পারি না, তাই না বলেও থাকতে পারি না···এই যে একটু স্বচ্ছন্দ ভাবে বাস করবার মতো বাড়ী···সে-বাড়ীর ভাড়ার জন্য বছরে একশো-আশী টাকা দিতে তোমার গায়ে লাগে, অথচ সে-দিন তোমার মা ব্রত করলেন, তার জন্য দু-তিন শো টাকা খরচ করতে তো তোমার বাধেনি! বেশ হাসি-মুখে খুশী-মনে সে-টাকা খরচ করতে পেরেছিলে!

এ কথার পিছনে কী···বুঝিয়া নীতীনের মন কালো হইয়া উঠিল! সে ডাকিল—কমলা···

তখনি নিজেকে সংযত করিল। করিয়া চলিয়া যাইতেছিল··· যাওয়া হইল না কমলার কথায়!

কমলা বলিল—এর মধ্যে আবার কমলা কি! আমি বললেই তুমি খরচের খোঁটা দাও কি না, তাই। কি বাজে খরচটা আমি করছি, জানতে চাই। এখন বেরুচ্ছো, এখন থাক্! ফিরে এসে আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ো, আমি তোমার পায়ের জুতো মাথায় বইবো!···তুমি বলবে, দাসী রেখেছো, চাকর রেখেছো, বামুন রেখেছো! সে আমার জন্য রাখোনি! রেখেছো তোমার ইজ্জতের জন্য! নাহলে যে-দিন তোমাদের বাড়ী বৌ হয়ে এসেছি তার দু'দিন পর থেকেই হেঁসেলে ঢুকেছি! বামুন-চাকর রাখার জন্য যদি মনে করে থাকো বাজে খরচ হচ্ছে, দাও তাদের ছাড়িয়ে··· হেঁসেলে ঢুকে হাতা-বেড়ী ধরতে আমি ভয় পাই না, ঘর ঝাঁট দেবার জন্য ঝাঁটা ধরতেও কোনো দিন মূর্চ্ছা যাবো না!

নীতীন ফিরিল। বলিল—আমার দুঃখ হয় এই জন্য যে, তুমি আমি আলাদা নই, পর নই···আমার আয়-ব্যয়ের দিকে আমার যেমন লক্ষ্য থাকা উচিত, তোমার কেন হবে না! খরচপত্র করবার সময়

তোমাকে আমি ছেঁটে চলি না।···আচ্ছা, বেশ, বলো, কি করতে হবে? ন্যায্য কথা আমি চিরদিন শিরোধার্য্য করে চলি!

কমলা বলিয়া উঠিল—আমার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি দেবো তোমায় উপদেশ! সে-উপদেশ মানলে বুঝতুম, আমাকে মানুষ বলে' মানো! খরচ বেশী হচ্ছে বলে এই যে মেজাজ খারাপ করো··· আচ্ছা, বলতে পারো···কেন, দেশে আর একটা সংসার রাখবার কি দরকার? মা বিধবা মানুষ···এখানে এসে একসঙ্গে থাকতে পারেন অনায়াসে! ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী···তা নয়···

নীতীন দাঁড়াইল না! এ কথা সে শুনিয়াছে অনেক বার···ভালো লাগে না! মা···তার মা···যে-মা এক দিন কি দুঃখ-কষ্ট সহিয়াই না তাকে মানুষ করিয়াছেন!

মা বলিলেন—বড্ড রোগা দেখছি কেন রে এবার! মুখখানা শুকনো···চোখের কোণে কালি! অসুখ-বিসুখ করেছিল?

নীতীন বলিল—না!

—খুব খাটুনি চলেছে বুঝি?

নিশ্বাস ফেলিয়া নীতীন বলিল—ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে, মা। মাথার উপর ঝক্কি। সে জন্য সর্ব্বক্ষণ দুশ্চিন্তা।

মা বলিলেন—বড্ড খরচ করিস্ যে তোরা। এত আমি বলি, এখনো দু'-দু'টো চাকর, তার সঙ্গে একটা ঝী,···কেন? কি দরকার? ভগবানের আশীর্ব্বাদে ছেলেমেয়ে ডাগর হয়েছে···তাদের যে চাকর, সেটাকে না হয় ছাড়িয়ে দে। তার মাইনে, খাওয়া-পরার খরচ··· তাতে কম পয়সা বাঁচবে না তো!

নীতীনের মনেও এ চিন্তা হয়। ভাবে, লক্ষ্মণকে অনায়াসে ছাড়াইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু···

মনে পড়িল, ছাড়াইবার কথা তুলিয়াছিল, কমলা তাহাতে জবাব দিয়াছিল, শম্ভু তোমার কাজ করে! যতক্ষণ তুমি বাড়ীতে থাকো, তোমার মুখে-মুখে থাকে! তার পর সে বিছানা করে, ঘর-দোর সাফ রাখে,···কাপড় কাচা, কাপড় কুঁচানো, ছোটখাট ফাই-ফরমাস খাটা, স্কুলে ছেলেমেয়েদের জল-খাবার লইয়া যায়! খানসামা চাকর··· পাঁচ জন ভদ্রলোক আসেন, তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কওয়া···তাঁদের আদর-আপ্যায়ন···পুরানো লোক!···লক্ষ্মণ বাসন-কোসন মাজে, বাজার করে। তাকে দিয়া শম্ভুর কাজ চলে না, চলিতে পারে না!

নীতীন বলিল—না মা, কাজ ঢের বেড়ে গেছে। দু'জন চাকর না হলে চলে না।

—ঝী কি করে তবে?

—ঝী আছে···মানে, ওদের কাপড় কাচে। ওদের তেল-মাখানো, গা-হাত টেপা···তাছাড়া ঝী! এটা-সেটা করে···রান্নাঘরের কাজ··· ভাঁড়ার···

মা বলিলেন—বাড়ীর ভাড়া তো এখনো দিচ্ছিস্ সেই একশো টাকা করে?

—তা দিচ্ছি বৈ কি।

—ওর চেয়ে কম-ভাড়ার বাড়ী মেলে না? এই তো শুনতে পাই, কলকাতায় অনেক ফ্ল্যাট-বাড়ী হয়েছে, তার ভাড়া না কি অনেক কম!

নীতীন বলিল—ফ্ল্যাট-বাড়ীতে থাকা চলে না, মা। বাজারে মান-ইজ্জৎ আছে। তা ছাড়া ফ্ল্যাট-বাড়ী নিলে গেরাজের জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হবে।

মা বলিলেন—কিন্তু বাবা, দিন-কাল ক্রমেই তো খারাপ হচ্ছে, দেখছি। আগে যে-মানুষ মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতো, সে-ও দেখেছি দোল-দুর্গোৎসব করে' মেয়ের বিয়ে দিয়ে দশ-বারো হাজার টাকা রেখে যেতো। আর তুই এত টাকা রোজগার করিস, কি বাঁচে তোর, শুনি? সত্যি, কিছু জমালি?

নীতীন বলিল—কৈ আর জমে! সম্বলের মধ্যে দু'টো লাইফ-ইনসিওর করিয়েছি···একটা পাঁচ হাজার টাকার, আর-একটা দশ হাজার!

মা'র ললাটে চিন্তার রেখা। মা বলিলেন—তবে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে···ছেলেকে মানুষ করতে হবে!

নীতীনের বুকের উপর যেন পাহাড় জমিয়া উঠিল! এ কথা যখনি মনে উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর পাহাড় জমিয়া ওঠে। সে-পাহাড়কে ঠেলিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না! সে জন্য এ কথা সে মনে আনে না! এখন মা'র কথায় আবার সেই পাহাড়ের ভার! না, এ ভার জমিতে দেওয়া ঠিক নয়।

হাসিয়া নীতীন বলিল—আমাকে তুমি মানুষ করেছো···বিধবা মেয়ে-মানুষ! আর আমি পুরুষ-মানুষ হয়ে ছেলেকে মানুষ করতে পারবো না? তুমি আশীর্ব্বাদ করো, মা!

—সে-আশীর্ব্বাদ সব সময়ে করছি, বাবা! দিনরাত্রি আমার শুধু ঐ এক চিন্তা! দূরে থাকি···কিন্তু আমার মন বাস করছে তোমাদের সঙ্গে সেই সহর-কলকাতায়!

নীতীন খাইতে বসিয়াছে। মা সামনে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। নিজের হাতে পাঁচ ব্যঞ্জন তৈয়ারী করিয়াছেন। শুক্তো, সোনা-মুগের ডাল, বড়ি ভাজা, আলু-বেগুন ভাজা, মোচার ঘণ্ট, বড় বড় মৌরলা মাছের ঝাল। ছেলে চিরদিন মৌরলা মাছের ভক্ত। ঘোষালদের পুকুরের পোনা মাছ···সেই পোনা মাছের ঝোল, করমচার অম্বল! ছেলে এক দিন এই করমচার নামে গলিয়া পড়িত!

খাইতে বসিয়া নীতীনের মনে অতীতের ছবি জাগিতেছিল। মনে হইতেছিল, মা···আমার মা! এই মায়ের স্নেহ যার আছে, তার কিসের দুশ্চিন্তা! মা বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার ছেলে, কি দুঃখ-কষ্ট সহিয়াছি এই ছেলের মুখ চাহিয়া! ছেলে আজ মায়ের মুখ রক্ষা করিয়াছে! সে আজ পাঁচ জনের এক জন! সহরে তার কত মান, কতখানি ইজ্জৎ!

আহারাদির পর মা বলিলেন—আজ থাকবি না কি রে নীতু?

—না মা। বিকেলের ট্রেণেই যেতে হবে। সন্ধ্যায় কাজ আছে। রবিবার ছাড়া আর কোনো দিন তো অন্য দিকে চাইবার ফুরসৎ থাকে না।

মা বলিলেন—ওদের কথা বল্ রে, শুনি। বৌমার বুদ্ধিশুদ্ধি হলো একটু? না, এখনো তেমনি খেয়ালী-বুদ্ধি আছে? একটু মোটা-সোটা হয়েছে? হ্যাঁ, তোকে যে বলেছিলুম, সেকেলে সেই রতনচূর আছে আমার দরুণ, সেটা ভেঙ্গে বৌমার জন্য একেলে কিছু গড়িয়ে দিতে···দিয়েছিস্ গড়িয়ে? তার পর বৌমার সে-অসুখে

সে-বারে মানত করেছিলুম, মা-কালীর ওখানে পূজো দেবো! সে পূজো দিয়েছিস তো? দেখিস বাবা, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত··· ফেলে রাখিসনে! বুলু কোন্ ক্লাশে পড়ছে? টুনুর কাশী হয়েছিল, সে বারে বলে গেছলি, সেরেছে বেশ? না সেরে থাকে, আমি বাখশের ছাল আর পাতা দেবো, অল্প-জলে সিদ্ধ করে সন্ধ্যার পর খাইয়ে দিস দিকিন্···তু'দিনে সেরে যাবে।···ব্রাহ্মী-শাকও তু'টি দেবো'খন। আগুনে সেঁকে তার সত্ত বার করে খাইয়ে দিস্! ব্রাহ্মী-শাক্ একেবারে ধন্বন্তরি!

নীতীন বলিল—হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার নাতি-নাতনির ফরমাশ আছে, মা। বলে দেছে। টুনুর চাই সেই বড়ির গহনা আর বুলু চেয়েছে তোমার কাছে সোনালী রঙের পুরু আমসত্ত!

হাসিয়া মা বলিলেন—নিয়ে যাস্। বড়ি করে রেখেছি···আমসত্তও রেখেছি। আর বৌমা আচার-কাসুন্দি ভালোবাসে, আচার-কাসুন্দিও করে রেখেছি।

বাহির হইতে কে ডাকিল—মা···

মা বলিলেন—কে? বিমলা?

—হাঁ।

—কেন রে?

বিমলা বলিল—সদাকে বলে এসেছি, সে এক-বাজরা তরী-তরকারী নিয়ে এখনি আসবে। কচি শসা, বেগুন, পটল, আর ঢেঁড়ো-ডাঁটা।

নীতীন বলিল—তরী-তরকারী কি হবে মা?

—তোর সঙ্গে দেবো।

নীতীন বলিল—পাগল হয়েছো তুমি! অত মোট নিয়ে আমি যাবো কি?

মা বলিলেন—বাগানের জিনিষ···টাটকা সব্জী···নিয়ে যাবিনে?

—না, মা। তারা সহুরে লোক···তারা শুকনো বীট-কপি খায়। সে-ই তাদের ভালো। এখান থেকে ও-সব নিয়ে গেলে বলবে, জঙ্গল নিয়ে গেছি।

হাসিয়া মা বলিলেন—না, না, নিয়ে যাবি বৈ কি। নিজেদের জমির ফশল। তোর ভাবনা নেই রে! সদা ইষ্টিশানে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে ঠিক তুলে দেবে'খন। সেখানে একটা কুলি ডেকে নামিয়ে নেওয়া শুধু।

কথায়-কথায় নীতীন বলিল—একটা কথা বলবো মা?

—বল্!

—আমি বলি, তুমি এখানে একলাটি থাকো···ম্যালেরিয়ার আড্ড···সে জন্য সব সময়ে আমরা কি-দুর্ভাবনায় কাঁটা হয়ে যে বাস করি! চলো না মা, আমাদের ওখানে···বেশ একসঙ্গে সব থাকবো। তোমার নাতি-নাতনিরা তোমাকে পেয়ে বর্ত্তে যাবে, আমরাও নিশ্চিন্ত থাকবো।

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—মন আমার সেইখানেই···তবু সেখানে আমার যাওয়া হয় না, বাবা। এখানে সাত-পুরুষের ভিটে···সাঁঝে পিদীম জ্বলবে না, তা কি হয়!

নীতীন বলিল—আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে, সে ইচ্ছা করে না, মা?

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—করে কি না, অন্তর্যামী জানেন, বাবা!

তার পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিলেন—তুমি মানুষ হয়েছো···আমার ইহকালের কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, বাবা!

নীতীন বলিল—আমারো কর্ত্তব্য আছে তো···তোমায় দেখবো, তোমার সেবা করবো।

মা বলিলেন—সে কর্ত্তব্য তুমি তো করছো বাবা। কর্ত্তব্যে তোমার ত্রুটি নেই! আমার ব্রত করার সাধ ছিল, করালে। সে-বারে বড্ড মন হয়েছিল, অর্দ্ধোদয়ে পৈরাগে যাবো, বুকে করে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি চান্ করিয়ে আন্লে। সে জন্য আমার বুক ভোরে' আছে, বাবা! এমন সুছেলে আমার!

নীতীন বলিল—আমার মন কিন্তু সর্ব্বদা হা-হা করে মা তোমার জন্য। কি তোমার আপত্তি এখান ছেড়ে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে থাকতে?

মা বলিল—এ বাড়ী ছেড়ে আমায় যেতে বলিসনে বাবা। এ বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। এ বাড়ীতে তিনি দেহ রেখে গেছেন! এ বাড়ীতে আমি যেন দেহ রেখে যেতে পারি, তোমায় মানুষ করার পর এই একটি মাত্র প্রার্থনা শুধু জানাই আমি আমার ইষ্টদেবতাকে!···এ বাড়ী থেকে আমায় টেনে নিয়ে যাসনে

নীতীন চুপ করিয়া এ কথা শুনিল। শুনিয়া গুম্ হইয়া রহিল। তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না মা, আর আমি কখনো তোমায় এ বাড়ী ছেড়ে আমাদের কাছে যাবার কথা বলবো না।

বিদায়-বেলা। মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া নীতীন বলিল—আসি মা। আবার আসছে রবিবারের পরের রবিবার···

ছেলের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া মা বলিলেন—খরচ-পত্র একটু বুঝে করিস নীতু। টাকা-কড়ির জন্য সব সময়ে কেন এত দুশ্চিন্তা করিস যে! শরীর ওতে থাকবে কেন? শরীর থাকলে তবেই পয়সা। বৌমা ছেলেমানুষ···এ বয়সে পাঁচটা সখ হয়, আবদার করে, বুঝি! কিন্তু তুমি তো জানো বাবা, টাকার অভাবে কি দুঃখ পেতে হয় মানুষকে! যখন ছোট ছিলে, আমার মনে কত সাধ হতো, ছেলেকে এটা খাওয়াবো, ওটা পরাবো! উপায় ছিল না বলে মনটার মধ্যে যা করতো···

মায়ের কণ্ঠ গাঢ় হইল, কথা শেষ হইল না।

নীতীন বলিল—না মা, বাজে খরচের সম্বন্ধে আমি খুব হুঁশিয়ার হবো।

মা বলিলেন—বাড়ী করতে চাস কলকাতায়, কারণ···একটা আশ্রয়। ছেলেমেয়েরা কি আর এ পাড়াগাঁয়ে থাকবে? থাকতে পারবে না। না হলে বলতুম, যে-পয়সা অপব্যয়ে যায়, অপব্যয় বাঁচিয়ে সে-পয়সা দিয়ে এ-বাড়ীকে সারিয়ে মজবুত করতে। কিন্তু তা আর হয় না বাবা! যা যায়, তা আর ফেরে না। তাছাড়া দিন-কাল যা হচ্ছে···

নীতীন বলিল—তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো মা। একটু অসুখ বোধ করলেই যেমন করে পারো, তখনি আমাদের কাছে খপর পাঠাবে।

ছেলের এ উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া মায়ের মন খুশী হইল। হাসিয়া মা বলিলেন—পাঠাবো খপর। আমার জন্য কিছু ভাবিসনে নীতু। এত দিন যখন রয়ে গেছি, দেখিস, টুলুর-বুলুর বিয়ে না দেখে তোর মা মরবে না।

শেয়ালদা ষ্টেশন। বাড়ীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুলির মাথায় তরী-তরকারীর বাজরা···তার সঙ্গে মায়ের দেওয়া ব্রাহ্মী শাক, বাখশের পাতা আর ছাল, টুলুর জন্য বড়ি, বুলুর জন্য আমসত্ত, বৌমার জন্য আচার-কাসুন্দির হাঁড়ি···

নীতীন বলিল—মা-জী কোথায় ?

ড্রাইভার বলিল—মাসিমার কোঠি···বাগবাজার।

নীতীন বলিল—মালপত্র নিয়ে বাড়ী যাও। মালপত্র নামিয়ে বাগবাজার যাবে। আমি যাবো ট্যাক্সি করে অন্য জায়গায়। কাজ আছে।

নীতীনের ট্যাক্সি আসিয়া থামিল ভবানীপুরে একটা গলির মুখে। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া নীতীন গলিতে ঢুকিল।

চার-পাঁচখানা বাড়ীর পর দোতলা বাড়ী। নীতীন আসিয়া সেই বাড়ীর দোতলার ঘরে ঢুকিল।

সোফা-কৌচ-আয়নায় সজ্জিত ঘর। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া এক তরুণী···মাথায় পিন আঁটিতেছে···কণ্ঠে গানের কলি,

ও কেন গেল চলে
কথাটি নাহি বলে
মলিনমুখী আঁখি ভরিয়া নীরে!

নীতীন বলিল—গুড্ ইভনিং পুষ্প!

তরুণী ফিরিল। মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ···বলিল—এ কি বেশ!

নীতীন বলিল—বহু দূরে গিয়েছিলুম। ষ্টেশন থেকে আর বাড়ী ফিরিনি···একেবারে এখানে আসছি।

বলিয়া গায়ের চাদরখানা শোফায় ফেলিল।

তরুণী বলিল—সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু তোমার দেখা নেই! আমি ভাবছিলুম, বুঝি, কাজের ঝঞ্ঝাটে আসতে ভুলে গেলে!

নীতীন বলিল—ভুলবো? কি যে তুমি বলো, পুষ্প!···তা আজ ষ্টুডিয়োয় যাওনি?

পুষ্প বলিল—না। ছুটী নিয়েছি। বলেছি, কাজ আছে, শুটিংয়ে আসতে পারবো না।

—বার্থডের কথা বলেছো?

—না। তাহলে তাদের ক'জনকে নেমন্তন্ন করতে হতো না মশাই? আজকের উৎসবে শুধু তুমি আমার গেষ্ট! তবে পরে ওদের বলতে হবে এক দিন, প্রেজেন্টগুলো ফাঁক যাবে কেন!

নীতীন বলিল—আমার প্রেজেন্ট পছন্দ হয়েছে?

পুষ্পর গলায় ছিল জুয়েলড় নেকলেশ। নেকলেশ দেখাইয়া পুষ্প বলিল—হুঁ!

—মার্কেট থেকে ফুল পাঠিয়েছে? আমি অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলুম।

—ফুল পেয়েছি। মাই বেষ্ট থ্যাঙ্কস, ডার্লিং।

আবেশের বিহ্বলতায় পুষ্প দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল।

নীতীন বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে আসি। ধুলো আর কয়লা যা মেখেছি, ওঃ!

স্নান সারিয়া ধোপদোস্ত কাপড় পরিয়া নীতীন আসিয়া সোফায় বসিল।

পুষ্প বলিল—খাবার দিতে বলি?

নীতীন বলিল—শুধু এক পেয়ালা চা।

পুষ্প কহিল—দু'খানা স্যাণ্ডুইচ আর ফল দিক।

—বেশ, দাও।

চা খাইতে খাইতে নীতীন বলিল—তোমার এ ছবি শেষ হবে কদ্দিনে?

—বড় জোর আর এক মাস! আচ্ছা, তার পর ভাবছি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চোখে কটাক্ষ ভরিয়া কণ্ঠে আব্দারের সুর তুলিয়া পুষ্প বলিল,—আমার একটা কথা রাখবে? গুড-ফ্রাইডের সময় নিজেকে ফ্রী রেখো···পাঁচ-সাত দিন। একটু ঘুরে আসবো, ভাবছি···দু'জনে···সুন্দরবন সার্ভিশে!

নীতীন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, বলিল—কিন্তু এ-বছর ব্যবসা ভারী ডাল্ যাচ্ছে, পুষ্প···মানে, একটু টানাটানি!

পুষ্পর মুখে মেঘের মলিন ছায়া! মুখ ভার করিয়া পুষ্প বলিল—সব সময়ে তোমার টাকার কাঁদুনি! দু'বছর কোথাও বেরুইনি··· কলকাতার এই বদ্ধ বাতাসে পড়ে আছি। চারখানা ছবিতে কাজ করেছি। ষ্টুডিয়োর ঐ গরম বাতাসে কি কষ্ট, তুমি তার কি বুঝবে!

পুষ্প উঠিয়া খোলা খড়খড়ির ধারে গেল। গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীতীন চাহিয়া রহিল পুষ্পর পানে···

মনে চিন্তার প্রবাহ।

বেচারী! সিনেমা-আর্টিষ্ট বেলা, চামেলী, প্রতিভা, চম্পকলতা ···যেন বাজ-পাখী! শিকার ছাড়া কিছু জানে না। আর পুষ্প?··· নীতীনের বয়স পঁয়তাল্লিশ। পুষ্পর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ! চব্বিশ বছর বয়সে পুষ্পর মনে কত সাধ, কত আশা···পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে নীতীন তার সে সাধ-বাসনার কোন্‌টা পূরণ করিয়াছে? অথচ পুষ্প কথায়-গানে, হাস্যে-লাস্যে নীতীনের ক্লান্তি হরণ করে। কি শান্তিই তাকে দেয়! নহিলে ঘরে কমলার ঐ মেজাজ···

নীতীন ডাকিল—শোনো পুষ্প···

পুষ্প সাড়া দিল না, ফিরিয়া চাহিল না।

নীতীন গিয়া তার হাত ধরিল, বলিল—শোনো, এপ্রিল-মাসে মস্ত একটা 'ডিউ' মীট্ করতে হবে···তার পর মানে, যা ভাবছি, তা যদি হয়, তাহলে নেক্সট্ পূজার সময়···পাঁচ-সাত দিন কেন, পনেরো দিনের জন্য···তুমি যেখানে যেতে বলবে, যাবো!

পুষ্প নিশ্বাস ফেলিল। বড় নিশ্বাস। বলিল—তখন কে যাবে! নতুন ছবি সুরু হবে! তাছাড়া এখন আমার সখ হয়েছিল! গুড্-ফ্রাইডেতে অম্বালিকা যাচ্ছে বোম্বাই···অতসী দার্জ্জিলিং··· লালিমা কাশ্মীর···আমি তা যেতে চাইনি···সাত দিনের জন্য শুধু এই কাছে···সুন্দরবন-ট্রিপ!

নীতীন বলিল—কিন্তু আমি ছলনা করছি না পুষ্প, মিথ্যা কথাও বলিনি!

পুষ্প বলিল—তোমার যা ভালোবাসা…থাক্!

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস…মলিন মুখ আনত করিয়া পুষ্প বসিয়া রহিল।

নীতীনের মনে সারা দিনের ঘটনাগুলা যেন গোবার মত প্যারেড করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৃথিবীতে নিজের দিক্‌টাই সকলে বড় করিয়া দেখে! স্ত্রী কমলা…সে চায় নিজের স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম সবার আগে! বড় বাড়ী…যে-বাড়ীতে গেলে নিজের মর্য্যাদা আরো বাড়াইয়া তুলিতে পারিবে! মা এখানে আসিতে চাহিলেন না…দেশের বাড়ী ছাড়িয়া! তাঁর সেন্‌টিমেণ্ট! ছেলের উপর স্নেহ…সে-স্নেহের চেয়েও দেশের বাড়ীর উপর মায়ের স্নেহ-মায়া অনেক বেশী! কোথাকার কে এই পুষ্প…মোহের আবেশে নিজের তৃপ্তির জন্ম তাকে আশ্রয় করিয়াছে নীতীন! সে চায় ট্রিপ! নীতীনের টাকায় টান পড়িয়াছে…পুষ্প মুখ ভার করিল!

সত্যই তো, যে-টাকা সে রোজগার করিতেছে, সে-টাকা দিয়া নীতীন কি পায়? সে-টাকার উপর চারি দিক্‌কার কত দাবী…সে-দাবী না মিটাইলে সকলের মুখ-ভার! তার মুখের পানে কে চায়?

অথচ এই টাকা যখন ছিল না, অভাবের চাপে দেহ-মন যখন টনটন্ করিত, যখন টাকার সে স্বপ্ন দেখিত, তখন নিজের অভাব-অভিযোগ স্মরণ করিয়া কত বার ভাবিয়াছে, টাকা যদি কখনো পায়, …অনেক…অনেক টাকা…সে টাকায় ছোট ছোট অভাবের জ্বালায় যারা মাথা তুলিতে পারে না, তাদের পানে এক বার ভালো করিয়া চাহিবে!

মন কেমন রী-রী করিয়া উঠিল! বয়স হইয়াছে! এ বয়সে এই পুষ্পর বয়সী একটা মেয়ের কাছে এমন ভিখারীর মতো…

নীতীন উঠিল। বলিল—তোমার মেজাজ ভালো নয়, দেখছি। আমিও ক্লান্ত বোধ করছি। ভেবো না। দেখবো, গুড্-ফ্রাইডের সময় তোমার ট্রিপের ব্যবস্থা যেমন করে পারি, করবো! তবে আমি যেতে পারবো কি না…

পুষ্প এ কথার জবাব দিল না। নীতীন ডাকিল,—পুষ্প…

পুষ্প সাড়া দিল না।

এখনো অভিমান!

নীতীন উঠিল…নীচে নামিয়া আসিল…একেবারে বাহিরে পথে।

পথে গাড়ী নাই। পাশে কোন্ বাড়ীতে গ্রামোফোনে অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছিল।

শুনিতে শুনিতে নীতীন গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিল।

একখানা চলন্ত ট্রাম। ট্রামে উঠিয়া বসিল। লাষ্ট ট্রাম। এস্‌প্লানেড চলিয়াছে। নীতীনের বাসা পদ্ম-পুকুরে।

বাড়ী আসিয়া দেখে, বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছে সত্যসিন্ধু অফিসের কেরাণী।

ছেলেটি ভালো। কাজে ফাঁকি দেয় না। নীতীনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো।

নীতীন বলিল—খপর কি, সত্য?

সত্যসিন্ধু বলিল—বড্ড বিপদে পড়েছি স্যর।

—বিপদ! এত রাত্রে! কি হয়েছে?

সত্যসিন্ধু বলিল—বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে…বাবার দেনা ছিল…সে দেনার দায়ে ভিটে ক্রোক্…সাত দিন পরে নিলামে উঠবে। ভিটে গেলে মা, বুড়ো বাপ, ছোট ভাইবোন…কারো আর মাথা গোঁজবার আশ্রয় থাকবে না স্যর।

কথার শেষে সত্যসিন্ধুর দু' চোখে জল!

নীতীনের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! পুষ্পলতার জন্মদিনে দেড়শো টাকা দামের নেকলেশ দিয়াছে নীতীন…বাগবাজারে…

নীতীন বলিল,—কত টাকার দরকার?

—আজ্ঞে, দেড়শো।

—দেড়শো টাকা দিলে বাকী থাকবে কত?

সত্যসিন্ধু বলিল—দেড়শো দিলেই দেনা চোকে। মানে, তিনশো পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়েছে, স্যর, বাড়ীর সোনা-রূপো সব বেচে। এখন আর এমন কিছু নেই, যা থেকে আর একটি পয়সার জোগাড় হতে পারে!

সত্যসিন্ধু কাঁদিতে লাগিল।…নীতীন নির্ব্বাক্।

সত্যসিন্ধু বলিল—মাইনে-বাবদ আমাকে এ্যাডভান্স দিয়েছিলেন, তার এখনো বাইশ টাকা বাকী। আপনাকে বলবার মুখ নেই, স্যর, কিন্তু আপনি ছাড়া এ বিপদে কার পানে চাইবো, এমন আমাদের কেউ নেই!

নীতীন বলিল—কেঁদো না, এসো!

সত্যসিন্ধুকে সঙ্গে করিয়া নীতীন আসিল বসিবার ঘরে। টেব্‌লের ড্রয়ার খুলিয়া চেকের বই লইয়া চেক লিখিয়া দিল সত্যসিন্ধুর নামে দেড়শো টাকার চেক।

সে চেক সত্যসিন্ধুর হাতে দিয়া নীতীন বলিল—এই নাও। মাসে মাসে তোমার মাহিনা থেকে যেমন ভাবে পারো, শোধ দিয়ো। তোমায় আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, সে বিশ্বাস তুমি নষ্ট করবে না।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া সত্যসিন্ধু একেবারে নীতীনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

পা সরাইয়া লইয়া নীতীন বলিল—পা ছাড়ো। কৃতজ্ঞতা যদি বোধ করো, আচরণে জানিয়ো। কথায় নয়। কথায় যে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তার কোনো দাম নেই, সত্য। এখন যাও। কাল চেক্ ক্যাশ্ করে নগদ টাকা নিয়ে তোমার বাবার হাতে দাও গে। তার পর ফিরে এসে আমায় জানিয়ো, সম্পত্তি রক্ষা হলো কি না!

সত্যসিন্ধু চলিয়া গেল। নীতীনের মনের ভার যেন কিছু হালকা হইল। সকাল হইতে যা-যা ঘটিয়াছে…শেষে ঐ পুষ্পর নেকলেশ! এ বয়সে এমন তার নির্লজ্জতা! পয়সা দিয়া তরুণীর সোহাগ কিনিতে যাওয়া…ছি!

সত্যসিন্ধুকে চেক দিবার পর নেকলেশের সে-গ্লানি যেন মন হইতে মুছিয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের অনুসরণ

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রথম প্রস্তাবেই দেখাইয়াছি, তাম্রশাসনখানিতে প্রদত্ত ভূমির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা দুইটি গ্রামাংশ এবং পৃথক্ পৃথক্ চারি খণ্ড ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত প্রত্যেক ভূমিরই চৌহদ্দির উল্লেখ আছে। সৌভাগ্যক্রমে এক ভূমির উত্তর সীমানায় বানহার নদের উল্লেখ আছে। এই নামটি পাঠ করিয়াই চিনিতে পারা গেল, ইহা তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে, কাপাসিয়া নামক সুপরিচিত গ্রামের প্রান্তবাহী বানার নদ। বুঝা গেল, তাম্রশাসন প্রাপ্তি-স্থানের অদূরে বানার নদের পারেই উৎসৃষ্ট ভূমি অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমানে সমগ্র ভাওয়াল অঞ্চল গজারি বা শালবনে সমাচ্ছন্ন। গজারি গড়ের আয়ই ভাওয়াল জমীদারীর প্রধান আয়। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেলরাস্তার জয়দেবপুর হইতে ফাওরাইদ পর্য্যন্ত অংশ এই গজারি গড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। রেলযাত্রিগণ গাড়ীতে বসিয়াই ছোট ছোট টিলার উপরে অবস্থিত বহুবিস্তৃত এই গজারি গড়ের শোভা দেখিতে পান। এই যে ভূমি, কবি গোবিন্দ দাসের জন্মভূমি,—যথায়, তাঁহারই ভাষায়,—

"টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।"

যথায় :— চিলাইর নীল চেলি তরঙ্গে তরঙ্গে ঠেলি
ছুটিয়া যাইতে লয় লুটিয়া পবন।

তাহা আজ শালবনাচ্ছন্ন হইলেও, ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে উহা পলি-মাটি গঠিত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রাচীনতম ভূমি এবং নিম্নবঙ্গে আর্য্য উপনিবেশের প্রাচীনতম স্থল। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক যুগের বহুবিধ চিহ্ন ও স্মৃতি এই পুণ্যভূমির বুকে ছড়াইয়া আছে। ভূতাত্ত্বিকগণ এই ভূমির উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি এই দিকে উপযুক্তরূপে আকৃষ্ট হয় নাই।

ভূতাত্ত্বিকগণ এই সমগ্র রক্তমৃত্তিক টিলা-ভূমিকেই 'মধুপুর জঙ্গল' এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত মধুপুর জঙ্গল ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। বিশালকায় ব্রহ্মপুত্রের বন্যা বা বানের অতিরিক্ত জল পূরণ করিয়া নাতিক্ষীণকায় যে নদটি মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষিয়া প্রবাহিত, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সুদূর অতীতে তাহারই সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন বানহার বা বানার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ময়মনসিংহ জেলার সরকারী গেজেটিয়ারে এই সুপ্রাচীন নদটির উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সার্ভে বিভাগের প্রচারিত ১″=১ মাইল মানচিত্রে দেখা যায়, মুক্তাগাছা থানার মধ্য দিয়া অনুসরণ করিয়া জামালপুর থানার ডেঙ্গারগড় গ্রাম পর্য্যন্ত, (ব্রহ্মপুত্র নদের ১ মাইল দক্ষিণস্থ) নদটিকে মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। ডেঙ্গারগড়ের অব্যবহিত উত্তরেই এই নদটি ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে। এই স্থানটি জামালপুরের ৫ মাইল নীচে অর্থাৎ অনুলোমে। এই স্থান হইতে আরব্ধ হইয়া সোজা দক্ষিণে চলিয়া নদটি মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষিয়া বহিয়া ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে সোজা পূর্ব্বদিকে চলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহা ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলার সীমানারূপে পরিণত হইয়াছে। ঢাকা ময়মনসিংহ রেললাইনটি ফাওরাইদ ষ্টেশনের পরেই নাতিবৃহৎ সেতুর দ্বারা এই নদটি পার হইয়াছে। ফাওরাইদের প্রায় চারি মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে ত্রিমোহিনী নামক স্থানে ইহা লক্ষ্যা নদীতে মিশিয়াছে। লক্ষ্যা নদীও ইহার অল্প পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে, এবং লাখপুর নামক স্থানে পুনরায় ব্রহ্মপুত্র-সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের এই কন্যাসঙ্গম অপবাদে উহা অপবিত্র বলিয়া গণ্য, ইহা হিন্দুশাস্ত্রে সুবিদিত! বৎসরে শুধু এক দিন, অর্থাৎ অশোকাষ্টমীর দিন উহাতে সমস্ত তীর্থ সমবেত হয়। তখন লাঙ্গলবন্ধ তীর্থে ব্রহ্মপুত্র তীরে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত লক্ষ্যার প্রবাহ নিজ নাম হারাইয়া বর্ত্তমানে বানার নামেই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিচিত্র ভুলের ফল সার্ভে বিভাগের পক্ষে বড় মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরানা ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ আড়ালিয়া নামক স্থান হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাখপুরে কন্যাসঙ্গত হইয়া, পুনরায় উহাকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতে দিয়া, ব্রহ্মপুত্র নিজে মহেশ্বরদি ও সুবর্ণগ্রাম পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম নগরের বিপরীত দিকে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থের জন্মদান করিয়া বিক্রমপুরে ইছামতীর সহিত সঙ্গত হইয়া সেই সঙ্গমস্থলে যোগিনীঘাট তীর্থ সৃষ্টি করিয়া এবং সঙ্গমস্থানের অদূরে শ্রীবিক্রমপুর নগরের জন্মদান করিয়া, বিক্রমপুরের দক্ষিণে উহা মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত লক্ষ্যার প্রবাহ বানারের অভ্যাগমে নিজের নাম হারাইয়া বানার নামে পরিচিত হওয়ায় সার্ভে বিভাগের কর্ত্তাগণ লাখপুর হইতে আড়ালিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের অংশকে সরকারী মানচিত্রে লক্ষ্যার প্রাচীন খাত বলিয়া অভিহিত করিয়া বসিলেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মেইন্ সার্কিট্ ম্যাপগুলিতেও এই ভুল দেখা যায়। কাজেই এই ভুলের জন্ম ইহার পূর্ব্বে হইয়াছিল। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সরকারী ম্যাপে এই ভুল চলিয়া আসিতেছে। বহু লেখক বার বার এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ সাকৃটির সম্পাদনে সরকার কর্ত্তৃকই প্রকাশিত ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার ৭ পৃষ্ঠায় এই ভুল দেখান আছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এস্কলিকে আমি বিশেষ ভাবে এই ভুল দেখাইয়া দিই। কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ভুল সরকারী মানচিত্রগুলিকে বিকৃত করিতেছে।

পূর্ব্বের বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে যে, রক্তমৃত্তিক কঙ্কর-পরিপূর্ণ মধুপুর—ভাওয়ালের সমস্তটাই ভূতাত্ত্বিকগণের নিকট শুধু মধুপুর জঙ্গল বলিয়া পরিচিত হইলেও, স্থানীয় জনসমূহের নিকট উহার মধুপুর ও ভাওয়াল অংশ পৃথক্‌রূপে সুপরিচিত। এই উভয় স্থানের মধ্যে প্রশস্ত বালুকাময় নিম্নভূমির ব্যবধান আছে এবং তাহারই উপর দিয়া বানার নদ বহিয়া ঢাকা-ময়মনসিংহের সীমানা সৃষ্টি করিয়াছে। অধুনা বানার নামেই পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যা নদীর ত্রিমোহিনী লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশ ভাওয়ালের টিলাময় উচ্চ ভূখণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত। এই উভয় বিভাগই প্রচুর বনসমাকীর্ণ এবং ছোট-বড় বহু টিলার সমবায়ে

গঠিত। কোন কোন টিলা বেশ উঁচু এবং এই ভাওয়াল অঞ্চলে কয়েকটি স্থানে বল্মীক-স্তূপের আকৃতি লৌহনল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া নিম্নে লৌহখনির অস্তিত্বও সপ্রমাণ করিতেছে। এই অংশের বানার বা লক্ষ্যার উপর অনেক স্থানেই টিলাসমূহ আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নদ বা নদীটি স্থানে স্থানে বেশ গভীর এবং জলপৃষ্ঠ হইতে তীরস্থ টিলার মাথা কোন কোন স্থানে ৭০ ফিট উঁচু। নদীর গভীরতাও এক এক স্থানে ৪০ ফিটের কম নহে।

এই বানার-লক্ষ্যা দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত ভাওয়ালের দুই ভাগেই বহু নদ-নদীর খাত বিদ্যমান। পূর্ব্ববিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খাত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের খাত ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ আড়ালিয়া হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অদ্যাপি অশোকাষ্টমীর দিনে এই শুষ্ক খাতেই স্বল্পাবশিষ্ট জলে তীর্থযাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন। বহু দূর হইতে আনিয়া মৃতদেহসমূহ এই খাতের তীরেই পোড়ান হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্র সুপ্রাচীন কালে এই খাত পরিত্যাগ করিয়া আড়ালিয়া হইতে পূর্ব্বদিকে বহিয়া ভৈরববাজারে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু আড়ালিয়া-ভৈরববাজার অংশ অদ্যাপি স্থানীয় লোকগণের নিকট আড়িয়ল খাঁ বলিয়া পরিচিত এবং এই অংশকে আদৌ পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। অশোকাষ্টমীতে এই অংশের জলে স্নান হয় না,—হয় আড়ালিয়া-লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শুষ্ক খাতে। ব্রহ্মপুত্রের নব্যতম প্রবাহ যমুনা বা যমুনা,—যাহা বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার সীমানারূপে প্রবাহিত, তাহাকেও পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয় না।

এই পূর্ব্বাংশের আরও দুইটি নদ-নদীর উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের আড়ালিয়া-লাখপুর খাতের পূর্ব্বে এই পাহাড় অঞ্চল ভেদ করিয়া একটি জলধারা প্রবাহিত। স্থানীয় লোক ইহাকে পাহাড়িয়া নদী বলে। তাহারও পূর্ব্বে টেঙ্গর অঞ্চলের পূর্ব্বসীমান্তে আর একটি নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণে বহিয়া মেঘনায় যাইয়া মিশিয়াছে। ইহার নাম আড়িয়ল খাঁ নদী।

লক্ষ্যানদীর ত্রিমোহিনী-লাখপুর অংশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বানার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কারণ, বর্ত্তমান তাম্রশাসনখানি দ্বারা এই প্রবাহের তীরেই জমী দেওয়া হইয়াছে এবং এই তাম্রশাসনেও নদের এই অংশ বানহার বা বানার নামেই উল্লিখিত। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বানারের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে বিস্তৃত ভাওয়াল অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকগণের মতে নিম্নবঙ্গের প্রাচীনতম স্থল। এই ভূমি বর্ত্তমানে জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং বিরলবসতি বটে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে ইহা যে বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ স্থান ছিল, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান।

প্রথম প্রমাণ—নদ-নদী ও গ্রামের নামসমূহে। শ্রী-অন্ত গ্রামের নাম এই অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। বর্ত্তমান তাম্রশাসনে বসুশ্রী গ্রামের নাম আছে। ত্রিমোহিনীর সংলগ্ন পূর্ব্বে সিংহশ্রী গ্রাম। এই স্থানে এক বটবৃক্ষ-মূলে এক মুসলমান কৃষক সুলতানী আমলের বহু রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল। উহাদের মধ্যে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের (অর্থাৎ রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র যদুর) অন্ততঃ ১৫টি টাকা পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুলপরিদর্শক মিষ্টার ষ্টেপলটনের হস্তগত হয়। তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৪০৭ পৃষ্ঠায় এই সিংহশ্রীতে প্রাপ্ত মুদ্রা-সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পত্রিকার ৫ পৃষ্ঠায় সিংহশ্রীতে প্রাপ্ত দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাগুলির সচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন। নদের নাম বানহার এবং নদীর নাম শীতললক্ষ্যা। সুপণ্ডিত হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ সুপ্রাচীন কালে এই নামকরণ করিয়াছিলেন। বানহার নামটি লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেই (১২০৪ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া যাইতেছে। ঐতিহাসিক যুগের আদিকালে যখন সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন সুসভ্য আর্য্যগণ এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয়, নামে এইরূপ কাব্যগন্ধ।

দ্বিতীয় প্রমাণ, এই অঞ্চল হইতে সুপ্রাচীন গুপ্তধন ও তাম্রশাসনাদি আবিষ্কার। সিংহশ্রীতে আবিষ্কৃত সুলতানী আমলের মুদ্রা পাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আড়িয়ল খাঁ নদীর পারে মরজাল নামক গ্রামে বহু রৌপ্যময় প্রাচীন কার্ষাপণ মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্গণ এই মুদ্রাগুলিকে পাঞ্চ্‌মার্ক্‌ অর্থাৎ বিবিধ ছাপ-সম্বলিত মুদ্রা বলিয়া থাকেন। নারায়ণগঞ্জের সেই সময়ের সাবডেপুটী খাঁ সাহেব সৈয়দ এ-এস্-এম্ তৈফুর সাহায্যে আমি ঐ মুদ্রার প্রায় ৯০টি টাকা মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্গণের মতানুসারে এই মুদ্রাগুলি মৌর্য্য ও প্রাগ্‌মৌর্য্য আমলের। আড়িয়ল খাঁ নদীর তীরবর্ত্তী মরজাল গ্রাম হইতে মৌর্য্য ও প্রাগ্‌মৌর্য্য যুগের এই মুদ্রার আবিষ্কার হইতে এই অঞ্চলে লোক-বসতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যে আশরফপুর গ্রামে মহারাজ দেবখড়্গের দুইখানি তাম্রশাসন এবং কয়েকটি ধাতুময় বৌদ্ধ-চৈত্য পাওয়া যায়, তাহাও প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও পাহাড়িয়া নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং লাখপুর হইতে ৬ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী। লাখপুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে বেলাব গ্রামে ভোজবর্ম্মের তাম্রশাসন পাওয়া যায়। আর লাখপুরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে বানারের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূভাগে লক্ষ্মণসেনের আলোচ্য শাসনখানি পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রমাণস্বরূপ এই অঞ্চলবর্ত্তী বানার নদের দুই পারের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলির উল্লেখ করিতে চাহি।

প্রথম প্রস্তাবেই উল্লেখ করিয়াছি, আলোচ্য তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তি-স্থানের মাইলখানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজাবাড়ী নামক গ্রামে একটি প্রাচীন রাজবাড়ীর অবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাড়ীটি গড়খাই ঘেরা। গড়খাইর আয়তন ৭০৪ × ৪৪০ গজ। এই গড়খাইর মধ্যে চারিটি বড় বড় দীঘি আছে; গড়খাইর বাহিরে উত্তর-পশ্চিম কোণে আরও একটি বড় দীঘি আছে। কিন্তু এই স্থানের মাইলখানেক উত্তর-পূর্ব্বে যে মগ্‌গির দীঘির পাড়ে আলোচ্য তাম্রশাসনখানি পাওয়া যায়, এই অঞ্চলের দীঘিগুলির মধ্যে আয়তনে উহাই সকলের অপেক্ষা বড়। মগ্‌গির দীঘির আয়তন ৩৪০ × ১০০ গজ।

ভাওয়াল অঞ্চলে রাজবাড়ীটি "চাঁড়াল রাজার গড়" বলিয়া বিখ্যাত। চণ্ডালজাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক দুই ভাই না কি এই অঞ্চলে যুক্তভাবে রাজত্ব করিতেন এবং এই রাজবাড়ী না কি তাঁহাদেরই রাজবাড়ী ছিল। প্রতাপ ও প্রসন্নের ভগিনীর নাম ছিল মগ্‌গি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ রেঙ্কিন আমাকে লইয়া মগ্‌গির দীঘি ও মঠ পরিদর্শন করিতে যান। মগ্‌গির মঠ

তখনও দণ্ডায়মান ছিল—এখন না কি উহার উপরে জাত বট-অশ্বত্থ গাছের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মঠ দেখিয়া উহা বেশী দিনের পুরাতন বলিয়া আমার ধারণা জন্মে নাই। মোগল ও প্রাগ্‌মোগল যুগের যে সমস্ত ঘরান বার্ণিশযুক্ত এক-কক্ষ মন্দির বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান, মঠটি সেই ধরণের ছিল। মঠটি দেখিয়া মনে হইল, প্রতাপ প্রসন্ন এবং মগ্‌গি যদি সত্যই কোন কালে বর্ত্তমান থাকিয়া থাকেন, তবে সেই কাল মোগল-যুগের বড় বেশী আগে হইবে না। ভাওয়ালে প্রাগ্‌মোগল যুগে গাজীবংশীয় জমীদারগণের উত্থানের ফলে প্রতাপ ও প্রসন্ন রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন। অদ্যাপি ভাওয়াল অঞ্চলে প্রবাদ আছে, "চাঁড়ালের রাজত্ব আড়াই দিন।"

কিন্তু মগ্‌গির মঠের নিকটস্থ স্থান হইতে আলোচ্য তাম্রশাসনখানির আবিষ্কারে ব্যাপারটা একটু সন্দেহ-সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাজাবাড়ীর রাজবাড়ী প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক অতি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কৃত কি না, সেই বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা বানার নদের তীরে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, বর্ত্তমানে এই অঞ্চল যে প্রকার বিরল-বসতি ও জঙ্গলময়, সেন-আমলে সেই রকম ছিল না। আলোচ্য তাম্রশাসনের ত্রয়োদশ শ্লোকে দেখা যায়, রাজা ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর নিকটেই যেন এই রকম বহু গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাম্রশাসন-প্রাপ্তি স্থানের অদূরে স্থিত রাজবাড়ীটি লক্ষ্মণসেনের ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর রাজবাড়ী হওয়া অসম্ভব নহে। সেন-বংশের পতনের পর বিক্রমপুরস্থ রাজধানী ও রাজবাড়ী যে প্রকার পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই ধার্য্যগ্রাম রাজধানার রাজবাড়ীও হয় ত সেই অবস্থায়ই ছিল। প্রতাপ ও প্রসন্ন অভ্যুদিত হইয়া ঐ পরিত্যক্ত রাজবাড়ীই আত্মসাৎ করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাম্রশাসনগুলি বিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রচারিত হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি, আনুলিয়া, বকুলতলা, গোবিন্দপুর এবং শক্তিপুর শাসন এইরূপে বিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রচারিত। কিন্তু রাজত্বের শেষ ভাগে পঞ্চবিংশ সম্বৎসরে মাধাইনগর এবং সপ্তবিংশ সম্বৎসরে বর্ত্তমান শাসনখানি যখন প্রচারিত হয়, তখন আর বিক্রমপুর রাজধানীর নাম পাই না,—পাই নূতন এক রাজধানী ধার্য্যগ্রামের নাম। ১২০২ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিনের আক্রমণে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ মুসলমানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্মণসেন যখন পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন, তখন হয় ত প্রাচীন রাজধানী আর নিরাপদ বিবেচিত হইতে পারে নাই। বানার-তীরে বনময় প্রদেশে, প্রয়োজন হইলেই তৎকাল পর্য্যন্ত মুসলমান-অনধিকৃত কামরূপ প্রদেশে সরিয়া যাইবার প্রশস্ত জলপথের উপরে এই রাজাবাড়ী নামে পরিচিত স্থানটিতে রাজধানী ধার্য্য হইয়া ধার্য্যগ্রাম নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাওয়ালের রাজাবাড়ীই রাজধানী ধার্য্যগ্রাম কি না, সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে না। এই ধার্য্যগ্রামে সেন-রাজধানী বেশী দিন ছিল না। কারণ, লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের শাসন দুইখানি ফল্গু-গ্রাম নামক নূতন রাজধানী হইতে প্রদত্ত। বিক্রমপুরের অন্যতম প্রধান জলপ্রণালী তালতলার খালের পাড়ে, পরস্পরের অদূরে অবস্থিত ধাইরপাড়া এবং ফেগুনাসার নামে দুইটি গ্রাম আছে। উহাই ধার্য্যগ্রাম এবং ফল্গুগ্রাম কি না, তাহাও বিবেচ্য।

যাহা হউক, রাজাবাড়ী ধার্য্যগ্রাম হউক আর না হউক, বানারের দুই তীর যে প্রাগ্‌মুসলমান যুগে এবং সুলতানী আমলে রাজধানী সুবর্ণগ্রামের যুগে বহুল জনবসতিপূর্ণ এবং মন্দির-দুর্গাদিপূর্ণ ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই শীতললক্ষ্যা বানারের জলপথ, সেই আমলে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসাম অঞ্চলে যাইবার প্রধান ও প্রশস্ত জলপথ ছিল। কাজেই আসামের দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য এই পথটি দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিতে হইয়াছিল। কাপাসিয়ার ৬ মাইল উত্তরে বানারের পূর্ব্বতীরে রাণীর ফোর্ট বা শাহবিদ্যার ফোর্ট বা দুরদুরিয়ার ফোর্ট নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়। মিঃ রেঙ্কিনের সাহচর্য্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন এই স্থান পরিদর্শন করি, তখন এক জন মুসলমান কৃষক বলিল, কয়েক বছর আগে মাটি খুঁড়িতে একখানি অক্ষর-খোদিত তামার পাত এই দুর্গাভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারকারী ভয় পাইয়া এই যাদুমন্ত্র-সম্বলিত তামার পাতখানি বানার নদে ফেলিয়া দেয়। এই তাম্রশাসনের আবিষ্কার হইতে বুঝা যায়, দুর্গটি প্রাগ্‌মুসলমান যুগের। দুর্গেরও শুধু চিহ্নটিই আছে, আর কিছুই নাই। মোগল আমলের কয়েকটি দুর্গ এই অঞ্চলে অদ্যাপি দেয়াল ইত্যাদি সহ প্রায় অভগ্ন দণ্ডায়মান। উহাদের অপেক্ষা এই চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট দুর্গটি যে কয়েক শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। দুর্গের বিপরীত পারের গ্রামটির নাম গোশিঙ্গা। এই স্থানে বানার গোশৃঙ্গের আকৃতিতে এমন চমৎকার ঢাকিয়া গিয়াছে যে, গ্রামটির এই নাম যিনি রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। ডক্টর টেইলার-প্রণীত Topography of Dacca নামক বিখ্যাত পুস্তকের ১১২—১১৩ পৃষ্ঠায় রাণীর ফোর্টের বর্ণনা আছে। "গোশিঙ্গায় প্রাচীন কালে যে একটি সহর বর্ত্তমান ছিল, তাহার নানা চিহ্ন বিদ্যমান। গোশিঙ্গার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দুইটি বিশাল দীঘি বর্ত্তমান, বৃহত্তরটির আয়তন $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$ মাইল। ডক্টর টেইলার লিখিয়াছেন :—(১১৪ পৃঃ) "গোশিঙ্গা হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে দুইটি চমৎকার বিশালায়তন দীঘি বিদ্যমান। লোকে বলে, উহা ভূঞা রাজাদের খনিত। দুটি দীঘিই বেশ গভীর এবং সম্ভবতঃ ভূগর্ভস্থ নির্ঝরের সহিত যুক্ত।"

এই অঞ্চলের আর দুইটি প্রাচীন কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। শীতললক্ষ্যা যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার সংলগ্ন গ্রাম টোকনগর সুপরিচিত স্থান। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র ভাওয়ালের দৃঢ়মৃত্তিক টিলাময় প্রদেশে প্রতিহত হইয়া হঠাৎ প্রায় সমকোণে দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে টোকের বিপরীত পারে এগার-সিন্ধু (কেহ কেহ বার-সিন্ধুও বলে) নামক স্থানে একটি বেশ বড় আয়তনের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। স্থানীয় প্রবাদ, দুর্গটি ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলির প্রতিষ্ঠিত। আকবরের রাজত্বকালে ইনি ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা জেলার বিস্তৃত প্রকাণ্ড রাজ্যখণ্ড স্বাধীন ভূপতির মত শাসন করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমি স্বয়ং এগার-সিন্ধুর দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

দেখিয়াছি। রাণীর কোটের মত ইহারও চিহ্নমাত্রই অবশিষ্ট আছে, যদিও পূর্ব্বে ইহা বেশ বড় দুর্গ ছিল। রাণীর কোর্টের মত এই দুর্গটিও হিন্দু আমলের বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঈশা খাঁ শেষ ইহার সংস্কার ও ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ইহার সহিত ঈশা খাঁর নাম যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গের বয়স যাহাই হউক, এগার-সিন্ধু নামটি যে অতি প্রাচীন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এগারটি নদী এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে এগার-সিন্ধু। সিন্ধু শব্দটির নদী অর্থে ব্যবহার সুপ্রাচীন কালের, সন্দেহ নাই। এগার-সিন্ধুর বিশ মাইল দক্ষিণে আড়িয়ল খাঁ নদীতীরে জনসমূহ যে আমলে পুরাণ বা কার্ষাপণ ব্যবহার করিত, সেই মৌর্য্য বা প্রাগমৌর্য্য আমলেই এই স্থানটি এগার-সিন্ধু নাম পাইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি; টোকের প্রায় চারি মাইল দক্ষিণস্থ কপাল সহর বা কপালেশ্বর নামক স্থানের মন্দিরাবলির ধ্বংসাবশেষ। রাজসাহীর ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থ বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যেমন অধুনা পঞ্চম সহর নামে পরিচিত, কপাল সহরও তেমনি কপালেশ্বর নামেরই বিকৃতি বলিয়া বোধ হয়। আমি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করি। ইহার বর্ণনা 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকার সপ্তম খণ্ডে ১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে ১২ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে মদীয়—Notes on Antiqarian Remains on the Lakshya and the Brahmaputra নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ হইতে কপালেশ্বরের বর্ণনা অনূদিত করিয়া নিম্নে দিলাম।

"কপালেশ্বরের ধ্বংসাবশেষ টোকের পশ্চিমস্থ উলুসরা নামক গ্রামের ঠিক ৪ মাইল দক্ষিণে। নামটি শুনিয়াই বুঝা যায়, উহা একটি শিবের মন্দির ছিল এবং উহা প্রাক্-মুসলমান যুগের। চারিটি বেশ বড় বড় পুষ্করিণী এক লাইনে খুঁড়িয়া উহাদের তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুইটি দীঘিতে এখনও গভীর জল থাকে। সকলের উত্তরের দীঘিটিই সর্বিশেষ পর্য্যবেক্ষণযোগ্য। দুর্গের প্রাকারের মত উহার পাড়গুলি উচ্চ। দীঘিটির পশ্চিম তীরে একটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরের দেয়ালগুলি ভাঙ্গা-চূরা ইটের বেশ মোটা রকমের সারি দ্বারা অদ্যাপি চেনা যায়। নানা স্থানে বেশ বড় বড় পাথরের খণ্ডসমূহ পড়িয়া আছে। স্থানীয় লোকে বলিল, তাহারা ছেলেবেলায় আরও অনেক পাথর দেখিয়াছে, সেগুলি মাটিতে ঢাকিয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জেলায় দেবকোট বা বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডের এত ছড়াছড়ি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এই জনবিরল স্থানে পুরুষানুক্রমে অধিবাসী বড় নাই, —যে কয় ঘর আছে, সকলেই আগন্তুক। এক জন বুড়া বলিল, সে ছেলেবেলায় মুরব্বীদের মুখে শুনিয়াছে, এই সমস্ত মন্দির বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

লক্ষ্মণসেনের রাজাবাড়ী শাসনের প্রদত্ত ভূমির সংস্থান এবং এই কপালেশ্বরের ধ্বংসাবশেষের সহিত বল্লালসেনের নাম বিজড়িত থাকা দেখিয়া মনে হয়, সেন-আমলে এই অঞ্চল এমন বিরলবসতি ছিল না এবং রাজাবাড়ী গ্রামের রাজবাড়ীটি লক্ষ্মণসেনের ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর রাজবাড়ী হওয়া অসম্ভব নহে।

তাম্রশাসন দ্বারা দান করা গ্রামগুলির বর্ত্তমান অবস্থান-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। বল্লালসেনের কাটোয়া-শাসন দ্বারা প্রদত্ত গ্রামটি এবং চৌহদ্দিতে উল্লিখিত গ্রামগুলি অদ্যাপি অবিকৃত নামসহ বিদ্যমান। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসনে যে বেতড় গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, অদ্যাপি তাহা হাওড়া-শিবপুরের মধ্যবর্ত্তী সুপরিচিত স্থান। কিন্তু অধিকাংশ তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামই খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হয়, তাহাদের কোন উদ্দেশই মিলে না। আলোচ্য শাসনখানিতে তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থানের অদূরে প্রদত্ত ভূমির সীমায় উল্লিখিত বানার নদের অস্তিত্ব অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকায় প্রদত্ত ভূমির সংস্থান-নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। বানার নদটি প্রদত্ত ভূমির এক খণ্ডের উত্তর সীমা ছিল। বানার নদ কিন্তু এই স্থানে উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত। কাজেই কোন ভূমির উত্তর সীমানারূপে উহাকে পাওয়া কঠিন,—যখন উহা বাঁকিয়া সোজা পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তখনই উহাকে উত্তর সীমানারূপে পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী গ্রামের তিন মাইল পূর্ব্বস্থ কাপাসিয়া গ্রামের নিকট ঠিক তাহাই হইয়াছে, পূর্ব্বাভিমুখী এক প্রকাণ্ড বাঁকে নদটি বাঁকিয়া গিয়াছে। এই বাঁকের অভ্যন্তরস্থ গ্রামের নাম মানচিত্রে দেখা যায় সাফাইশ্রী। প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি, বাগুন, আবৃত্তি এবং বসুশ্রী নামক চতুষ্কের অন্তর্গত মাদিসাহংস এবং বসুমণ্ডল নামক গ্রাম এবং বানারের দক্ষিণস্থ আরও চারিটি খণ্ডক্ষেত্র আলোচ্য শাসনখানি দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বাগুন অধুনা বাড়ুন নামে পরিচিত, সাফাইশ্রী গ্রামের ঠিক তিন মাইল দক্ষিণস্থ। সাফাইশ্রী প্রাচীন বসুশ্রী নামের পরিবর্ত্তিত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বসুমণ্ডলই সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে মান্দা নামে পরিচিত! মান্দা অথবা রায়মান্দা সাফাইশ্রী ও বাড়ুনের মধ্যবর্ত্তী।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এম-এ, পি এইচ-ডি)।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মণরাজগণ

পূর্ব্ববঙ্গে যে বর্ম্মণবংশীয় রাজগণ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা ঘটনা-পরম্পরায় নানা ঝটিকাবর্ত্তে লোকের স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। সাধারণে তাঁহাদের কথা মনে রাখে নাই, বিশেষজ্ঞেরাও তাঁহাদের কথা বিশেষ জানিতেন না। যে সকল জনশ্রুতি বিশেষজ্ঞেরা অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেন তাহা যে অলীক নহে, বেলাবে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন তাহা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। এই বর্ম্মণবংশীয় রাজগণ কি প্রকারে পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ বঙ্গদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানিতে পারা যায় নাই। ইঁহারা যাদব-বংশীয়, সুতরাং ক্ষত্রিয়। ইঁহাদের আদি স্থান বা রাজধানী ছিল সিংহপুর। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানটি ছিল আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থ-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সিংহপুরে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই যদু বা যাদববংশ বলিয়া অনুমিত হয়। হিমালয় পর্ব্বতের অন্তঃপাতী লাক্ষামণ্ডল নামক স্থানে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, বর্ম্মণবংশের বার জন রাজা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ

পর্য্যন্ত সিংহপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদুবংশ বা যাদব ক্ষত্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একদল যাদব হয়ত পঞ্চনদের সিংহপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সুদৃঢ় কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঘটনাচক্রে কোন দিক্ দিয়া কে কোথায় পড়িয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। এই বর্ম্মণ-রাজগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পঞ্চনদের প্রান্ত হইতে একেবারে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, না, অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদববংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত বজ্রবর্ম্মার প্রপৌত্র ভোজবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদবসেনার সমর-বিজয়-যাত্রাকালে বজ্রবর্ম্মা মঙ্গলস্বরূপ গণ্য হইতেন। রাখাল বাবুর এই সিদ্ধান্ত অনেকটা অনুমানমূলক। সিংহপুর কোথায়, সে সম্বন্ধে রাখাল বাবু দুইটি অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হয় উহা হুয়েন্থ-সাং বর্ণিত সিংহপুরো অথবা উহা মালব রাজ্যের অন্তঃপাতী সীহোর। আবার রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, উহা লালবক্ত অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে অবস্থিত মহাবংশে উল্লিখিত যে সিংহপুর আছে, ইহা সেই সিংহপুর। আবার জনৈক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, কলিঙ্গ দেশে সিংহপুর নামক একটি স্থান আছে। সিংহলের রাজা সাহসমল্ল (১২০০ খৃষ্টাব্দে) এই সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক হুলচ (Hultzsch) বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে চিকাকোল এবং নবসন্নচিয়ার মাঝখানে যে সিংহপুরম্ আছে,—উহা সেই সিংহপুরম্। উহা বহু কলিঙ্গ-রাজগণের রাজধানী ছিল। এই সকল রাজার নামের শেষে পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণ-রাজাদিগের নামের সহিত "বর্ম্মণ" এই শব্দ দেখা যায়। যথা—

(১) চণ্ডবর্ম্মণ
(২) বিজয়ানন্দী বর্ম্মণ
(৩) নন্দপ্রভঞ্জন বর্ম্মণ
(৪) উমাবর্ম্মণ

বংশধারা ক্রমে এই বর্ম্মণ-রাজগণ কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে চণ্ডবর্ম্মণ এবং উমাবর্ম্মণের অনুশাসন (inscription) পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের প্রদত্ত অনুশাসন বা প্রশস্তিতে কোন প্রাচীন বংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথার উল্লেখ নাই। ইহাতে কোন সময়ের নির্দ্দেশ নাই। অর্থাৎ কোন্ সময় ঐ সকল শিলালিপি এবং তাম্রানুশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। তাহা হইলেও প্রত্নলিপির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ঐ অনুশাসনগুলি লিখিত। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই কলিঙ্গ দেশে এই বর্ম্মণ বা বর্ম্মা উপাধিযুক্ত রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যাইতেছে। কলিঙ্গ দেশ হইতে বর্ম্মণ-রাজগণের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আসা অসম্ভব ছিল না। সেন-রাজগণের আদিপুরুষ যখন কর্ণাট দেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন বর্ম্মণ-রাজগণের পক্ষে কলিঙ্গ দেশ হইতে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ জয় করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। বেলাবে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সিংহপুর নগরে এক গৌরবযুক্ত রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল,—ইঁহারা বর্ম্মণ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই রাজবংশেই বজ্রবর্ম্মণ জন্মিয়াছিলেন, মহারাজ চণ্ডবর্ম্মণ এবং তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বর্ম্মণ এই অভিখ্যা ধারণ করিতেন। সে জন্য অনুমান হয়, "বর্ম্মণ" ইঁহাদের বংশগত উপাধি ছিল। বজ্রবর্ম্মা সেই রাজকুলেই জন্মিয়াছিলেন। এই বজ্রবর্ম্মা যে এক জন বিখ্যাত বীর ছিলেন, তাহা ভোজবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়; যথা—

অভবদথ কদাচিদ্ যাদবানাং চমনাং
সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
শমন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং
কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাম্॥

অর্থাৎ যাদবসেনার সমরবিজয়যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ বজ্রবর্ম্মা জন্মিয়াছিলেন। ইনি শত্রুদিগের কাছে ছিলেন শমনের ন্যায় এবং বান্ধবদিগের নিকট সোম বা চন্দ্রের ন্যায়; কবিগণের মধ্যে বড় কবি এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যে বড় পণ্ডিত। ইনি কোন্ সূত্রে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বহু ঐতিহাসিকই মনে করেন, ইনি রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গেই তাঁহার সেনাপতিরূপে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। রাখাল বাবু বলিয়াছেন যে, "বজ্রবর্ম্মা বোধ হয় কেবল হরিকেল বা চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে জাতবর্ম্মা সঙ্গে যাদব-প্রতিভার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।" এখন প্রশ্ন এই—হরিকেল কোথায়? রাখাল বাবু বলিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপ। এই হরিকেল যে ঠিক কোথায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হরিকেলে অনেক হিন্দু এবং বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ছিল। চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিম দিকে হরিকেল নামক একটি স্থান ছিল, সেই জন্য সম্ভবতঃ সমস্ত চন্দ্রদ্বীপই হরিকেল নামে অভিহিত হইত। ইৎসিং বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমায় হরিকেল নামে একটি বদ্বীপ ছিল। ইৎসিং হয়ত ঐ বদ্বীপকেই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমা মনে করিয়া থাকিবেন। সেই সময় ঐ বদ্বীপের বা চন্দ্রদ্বীপের সহিত বঙ্গদেশ সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। ইৎসিং বলিয়াছেন যে, ঐ স্থানে বহু বৌদ্ধ-কীর্ত্তি দেখা যাইত। শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, "যশোরই প্রাচীন হরিকেল।" তাঁহার ঐরূপ অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন, "এখানকার মৃত্তিকা খনন করিলে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া যায়।" এ অনুমান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। হরিকেল ঠিক কোথায় ছিল, তাহা এখন বুঝা না; গেলেও উহা যে মোটামুটি চন্দ্রদ্বীপ, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না বলা যাইতে পারে।

বজ্রবর্ম্মা কোন্ সূত্রে বা কি উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বেলাবের তাম্রশাসন পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেন সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। সামরিক শক্তিতে তিনি এ কার্য্য সাধন

করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনুমান, বজ্রবর্ম্মা রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে এক জন বিশিষ্ট সেনাপতিরূপে আসিয়াছিলেন। এই অনুমান একেবারে অস্বীকার করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না।

বজ্রবর্ম্মার পুত্র জাতবর্ম্মাও বিশেষ শৌর্য্যসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। পিতার বিজিত রাজ্যকে তিনি সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই যদুবংশ যে একটি প্রসিদ্ধ বংশ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ বা যাদববংশ-জাত, কোন তাম্রশাসনে এমন কথার উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ যদুবংশের প্রসিদ্ধি এত অধিক যে, তাহা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইঁহারা উচ্চবংশোদ্ভব না হইলে কলচুরি বা চেদিবংশীয় আভিজাত্য-গৌরবগর্ব্বিত কর্ণদেব জাতবর্ম্মাকে কখনও কন্যাদান করিতেন না। কর্ণদেব তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বীরশ্রীকে জাতবর্ম্মার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত। সুতরাং জাতবর্ম্মার সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, বজ্রবর্ম্মা যখন পূর্ব্ববঙ্গ জয় করেন, রাজা মহীপাল (১ম) তখন গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মহীপাল খৃষ্টীয় ৯৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র নয়পাল খৃষ্টীয় ১০২৬ অব্দ হইতে ১০৪২ অব্দ পর্য্যন্ত এবং তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল ১০৪২ হইতে ১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বিগ্রহ পাল এবং জাতবর্ম্মা সমসাময়িক ছিলেন। ত্রিপুরীর কলচুরি-বংশীয় কর্ণদেবও ১০৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দিব্য এবং গোবর্দ্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশে অধিকার-বিস্তার এবং কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইনি গৌড়দেশ জয় করিয়া পরে হয়ত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা দিব্বোককেও পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশ বিজয় করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু অনুমান করিয়াছেন, কর্ণদেব কিম্বা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের যে সময় যুদ্ধ হইয়াছিল, সে সময় বঙ্গেশ্বর গৌড়পতির পক্ষ অবলম্বন করেন। কৌশম্বীর অধিপতি গোপবর্দ্ধনকে জাতবর্ম্মা পরাজিত করিয়াছিলেন (রামচরিতে তাহা লিখিত আছে)। কামরূপের যে রাজাকে জাতবর্ম্মা সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

জাতবর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গদেশের সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। শ্যামলবর্ম্মা জগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কোন স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হইলে তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ থাকিত। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা সিংহাসন লাভের পাঁচ বৎসর পরে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশম্বী এবং উপ্যালিকা গ্রাম রামদেব শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। কৌশম্বীর নাম এখন কুশম্বা—ইহা রাজসাহী জিলায় অবস্থিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বদেশের বর্ম্মবংশীয় এক জন রাজা আত্মরক্ষার জন্য আপনার হস্তী, অশ্ব এবং রথ রামপালকে দিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি কারণে তিনি রামপাল দেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, সেই সময়ে বর্ম্মবংশীয় রাজা রামপালের শরণ লইয়াছিলেন।

ভোজবর্ম্ম দেবের বেলাব তাম্রশাসনে দেখা যায়, হরিবর্ম্ম নামধেয় যাদব বর্ম্মবংশে এক জন রাজা আবির্ভূত হন। কোন্ সময়ে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। "একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রশাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম্মা দেবের অস্তিত্ব-কথা জানা যায়।" এই শিলালিপিখানি উড়িষ্যার পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা এখন অনন্ত বাসুদেব প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন আছে। হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব ভট্ট। ইনি হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রেরও পরামর্শদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করিয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে নারায়ণ অনন্ত এবং নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির অক্ষর সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর ফ্লিট হর্ণের মতে এই শিলালিপি অক্ষরের আকার দেখিয়া উহা খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দের অক্ষর বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ডক্টর ফ্লিট হর্ণের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিপিবিদ্যা-বিশারদদিগের মধ্যে এ বিষয়ে গভীর মতভেদ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে লিপিবিদ্যাবিশারদ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—"বিগত চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর পূর্ব্বার্দ্ধে বহু নূতন ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু রাজবংশের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইতিহাসের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের অক্ষরতত্ত্বের আলোচনা কালে এখন আর বুলার বা ফ্লিট হর্ণের নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অতি-প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করা চলিবে না। শিলালিপির সহিত শিলালিপির এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় এবং দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন।"—(বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৩০৩—৩০৪ পৃষ্ঠা)।

এই হরিবর্ম্ম দেব কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষে রাখাল বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্ম দেব শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসুর মতে তিনি বজ্রবর্ম্মারও পূর্ব্ববর্ত্তী"—এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। সে-জন্য আমি ইহার কাল-নির্ণয় বিষয়ে বিশেষ কোন মত প্রকাশ করিলাম না।

বর্ম্মণ উপাধি যে কেবল পূর্ব্ববঙ্গের এই যাদববংশেরই রাজগণের ছিল, তাহা নহে। নিধানপুরে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে কামরূপের ভগদত্তবংশীয় রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মৌখরী রাজবংশের অনেকগুলি রাজার বর্ম্মা উপাধি ছিল। যথা হরিবর্ম্মা, আদিত্যবর্ম্মা, যজ্ঞবর্ম্মা, শার্দ্দূলবর্ম্মা ইত্যাদি। কামরূপের ভাস্কর বর্ম্মার বংশ যাদববংশ নহে,—কারণ, ভগদত্ত যাদববংশীয় ছিলেন না। বর্ম্মা উপাধি ক্ষত্রিয়মাত্রেই গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন "শর্ম্মা" উপাধি ব্রাহ্মণমাত্রেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। হরিবর্ম্মার বংশধরগণই যে কেবল বর্ম্মা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা করা ভুল। ইঁহারা কলিঙ্গদেশের সিংহপুর হইতে রাজা রাজেন্দ্র চোলের আমলে বঙ্গদেশ বা পূর্ব্ববঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন;—ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনুমান।

ইহা অনেকটা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই রাজবংশের অনেক কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে যদি তাহার পুনরুদ্ধার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা যাইবে। কলিঙ্গদেশের সিংহপুরের যাদববংশীয় রাজারা বর্ম্মণ উপাধিতে আত্মপরিচয় দিতেন,—এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মবংশীয় রাজগণ যাদববংশীয় এবং বর্ম্মণবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ইহা হইতেই অনুমিত হইতেছে যে, ইঁহারা কলিঙ্গদেশের রাজগণেরই শাখা। ইঁহাদের আমলে পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের কীর্ত্তিও খুব অধিক নাই। ইঁহাদের আদিস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু অনেকের মতে ইঁহারা কলিঙ্গ হইতে আগত। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা পঞ্জাব অথবা মালবের সিংহপুর হইতে আগত,—কিন্তু সে কথা বিচারসহ নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

নদী এলো বান

[চীনা গল্প]

[এ গল্পটি লিখিয়াছেন চীনের মহিলা লেখিকা কিঙ-লিঙ্। কিঙ্-লিঙের লেখার আদর চীনে যেমন, বিদেশেও তেমনি। হুনানের চাংতে গ্রামে দরিদ্র-পরিবারে তাঁর জন্ম। বহু-কষ্টে তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় চীনের বিদ্রোহ-আন্দোলনে তিনি যোগ দেন; এবং বিদ্রোহ-সম্পর্কে বহু গল্প লেখেন। বিদ্রোহী দলের অন্যতম অধিনায়ক হু-ইয়ে-জিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর এবং স্বামীর সহযোগী শোঙ্-শুঙ-ওয়েনের সঙ্গে দীর্ঘ কাল তিনি সাংহাইয়ে ছিলেন। তাঁদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চীনের নব-জাগরণের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কম্যুনিষ্ট-নিগ্রহের সময় হু-ইয়ে-জিন নিহত হন; এবং কিঙ্-লিঙ্ বন্দী হন। এখনো তিনি নান্‌কিঙে বন্দিনী।

কিঙ্-লিঙ্ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তার মধ্যে ওয়েই হু; আত্মঘাতীর ডায়েরি; পুরুষের জন্ম-তিথি; এবং শা-ফেইয়ের দিন-নামচা—এ বই ক'খানি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

এ গল্পটি চীনার ইংরেজী-অনুবাদ হইতে সঙ্কলিত]

আশ-পাশের গাঁ থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল সবাই এসেছে। ঘরে বসে সকলে কথা হচ্ছিল।

অন্ধকার ঘর। খড়ে-ছাওয়া। খোলা দ্বার দিয়ে মলিন চাঁদের ফিকা-নীল জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে।

লাঙ্-ইয়াঙয়ের বয়স পাঁচ বছর। মাথাটি সদ্য কামানো। মা'র কোলে মাথা রেখে চুপ করে সে শুয়ে আছে—দু' কাণ খাড়া—কি কথা হচ্ছে, তার সব সে শুনতে চায়, এমনি তার ভাব! সব কথা সে বোঝে না, এ-সব কথা শোনবার দরকারও তার নেই, তবু শুনছে!

দূরে একটা কুকুর থেকে-থেকে ডেকে উঠছে—যেন ভয়ের আর্ত্ত রব! হঠাৎ জাগলো জলো বাতাসে দম্‌কা বেগ! সে বেগে যেন আক্রোশের রেশ!

—শুনছিস সকলে? ঐ···কান্নার শব্দ, দূরে কে কাঁদছে!

—কৈ, না!

—চুপ কর্ দিকিনি, এখনি শুনতে পাবি!

পাঁচ জনে কথা হচ্ছিল। তাদের কাছাকাছি বসে আছে গাঁয়ের দিদু। এ সব কথা দিদুর কাণে যাচ্ছে না···আপন-মনে দিদু বলছে,—কি যে তোমার মনে আছে, কি যে করবে ঠাকুর! গণকে বলেছে, এ-বছরটা আমার খুব খারাপ! ও-পাশের গাঁ বানে ডুবেছে···শুনে আমি শিউরে উঠেছি। ও বান আমাদের গাঁয়ে আসবে না কি? এত সব বিপদ-আপদ···আমার এটা-ওটা সব নিয়ে যাচ্ছে···আমায় ছুঁতে জানে না! আবো কত কাল বাঁচবো? মরণকে আমি ভয় করি না! এত ঝড়-জল সয়েও বেঁচে আছি, আশ্চয্যি! আবার কোন্‌টা কোন্ দিক্ থেকে সরে যাবে, এই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

পাড়ার ফুঙ্-গিন্নী বললে—ছেলে বলো, নাতি-নাতবৌ বলো, অদেষ্ট বাছ-বিচার করে না, পিসি! যাকে খুশী, আর যখন খুশী, টেনে নিয়ে যায়!

দিদু বলে উঠলো—চুপ, চুপ! ওরে, এরা ছেলেপুলে নিয়ে বাস করে। এদের ভয় হবে তোর কথা শুনে!

একটি মেয়ে বললে—রাত হয়েছে। দিদুকে শুইয়ে দে, হাই।

হাই বললে—চলো দিদু, শোবে। অনেক রাত হয়েছে।

দিদু বললে—না, আমি শোবো না। ওরা এখনো ঘরে ফিরলো না! ওরা আসুক। কতক্ষণে যে ফিরবে, কে জানে! কোথায় সব আছে, তাও কেউ জানে না! কারো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি কি যে জানতে পারবো?

—তোমার কি মনে হয় দিদু, আজ রাত্রে আমাদের গাঁয়ে বান আসতে পারে?

—কি করে বলবো, বল্? বুদ্ধ-ঠাকুর কি তা বলে দেবেন? এত তাঁকে ডাকছি!

এক জন কিশোরী চড়া-গলায় বলে উঠলো—রাখো দিদু তোমার বুদ্ধ-ঠাকুর! আমাদের ডাক তোমার ঠাকুর কবে শুনেছে, বলতে পারো? বান এসে নিত্যি সকলের ক্ষেত-খামার ঘর-বাড়ী ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এত তাকে ডাকছি, শুনেছে কখনো? বছর-বছর বাঁধ বাঁধতে সকলের জান বেরিয়ে যাচ্ছে···বুদ্ধ-ঠাকুর চুপ করে আছে! কোনো বছর এ বান রদ করলো না তোমার ঠাকুর! আমি বলি, দাও তোমার ও মরা-ঠাকুরকে জলে ভাসিয়ে।

জিভ কেটে দিদু বললে—ও-সব কথা বলতে নেই রে তা-ফু! যে ঠাকুর চোখে দেখতে পায় না, আমাদের হাতে পড়ে আছে, তাকে জলে দেবার কথা বলতে নেই!

তা-ফু বললে—আমি বলছি দেখে নিয়ো দিদু, এত তো তোমার ঠাকুরকে তুমি ডাকছো, এবারও তোমার ঠাকুর ঠেলবে না, বান এসে সব ধুয়ে মুছে দেবে!

দিদু জবাব দিলে না! ঘরে কারো মুখে আর কথা নেই। সকলে চুপ করে আছে। কে যেন আসছে তার সর্ব্বগ্রাসী হাত তুলে··· সে যেন কাকেও ছাড়বে না! সেই ভয়ে সকলে একেবারে বেঁচো!

নিশ্বাস ফেলে দিদু বলতে লাগলো,—সে কত বছর আগে মনে পড়ে না—আমি তখন কত বড়? ঐ লুঙ-এর···ওর বয়সী। জানিস, এমন দিন এলো যে, সকলে মাটী আর গাছের ছাল খেয়ে দিন কাটিয়েছে···মুখে দিতে আর-কিছু জোটেনি! আমাদের অত বড় সংসার···দেখতে-দেখতে সব যেন ছায়ায় মিলিয়ে গেল! আমি একা বইনু! কি করে যে সব গেল!···মড়কে পট-পট করে সব মরতে লাগলো···যেন ঝড়ের ঝাপ্‌টায় গাছ থেকে ফুল-পাতা ঝরে পড়ছে! ···কে কাকে বার করে নিয়ে যায়, লোক মেলে না! আমার মাসী আর খুড়ো শিয়েন···তারাও রইলো না, চলে গেল! আমার বয়স তখন সাত বছর! সেই সাত বছর বয়স থেকে আজ আমার বয়স হলো সাতষট্টি! এ যাট্ বছর কি করে যে কেটেছে! লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করেছি, বুঝলি, সেই একটুখানি বয়স থেকে! একটু এদিক্-ওদিক্ হয়েছে, ধরে কি মারটাই না মেরেছে! তার পর···

দিদুর কণ্ঠ মৃদু হয়ে এলো এবং সে মৃদু কণ্ঠ বয়ে দীর্ঘ ষাট বৎসরের যত ব্যথা, যত বেদনা, যত আশা, যত নৈরাশ্য ভেসে চললো!

তার পর কণ্ঠ আবার যেন সতেজ! দিদু বলতে লাগলো,— বিয়ে হলো! স্বামী ভালোই ছিল! কথার মানুষ! ছেলেও ছিল তার বাপের মতো তেমনি। তারাও চলে গেল এই চোখের উপর দিয়ে! দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম···বুঝলি ইউয়েন···আমার জন্য নয়— এ কথা বলছি তোরা বুঝবি,···তোদের মনে আজ কত সাধ, কত আশা! ও-বয়সে আমার মনেও কম সাধ, কম আশা ছিল?··· রোজ রাত্রে শুতে যাবার সময় ভেবেছি, কাল উঠে দেখবো পৃথিবীর রঙ বদলেছে···এমনি একটানা দুঃখ মানুষ পায় কখনো?··· আশা নয়, সে স্বপ্ন! স্বপ্ন যেমন মিলিয়ে যায়, আমার নিত্য-রাতের আশা পরের দিন মিলিয়ে যেতো! আবার আশা করতুম···সে আশাও মিলতো! বুঝলি মিঙ্, পৃথিবীতে ভালোর মানে বোকা! এর পর আমি চলে যাবো···তবু যেমন পৃথিবী, ঠিক তেমনি থাকবে··· এমনি দুঃখ, দুর্দ্দশা! এ-সব আর কোনো দিন ঘুচবে না!

জোর-গলায় মিঙ্ বলে উঠলো—এমনি থাকবে কি, দিদু···পৃথিবী এর চেয়েও বিশ্রী হবে, নোংরা হবে। হচ্ছেও তাই! ভালো কোন্‌খান্‌টা?

বাইরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো···দিদু বললে —কে এলো রে?

কথার সঙ্গে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো জোয়ান এক জন পুরুষ। পুরুষ বললে—কি হচ্ছে সব বসে?

এ কথার জবাব কেউ দিলে না। দিদু বললে,—শান-ইয়ে এলি! কি খপর তোদের? বাঁধ সব ঠিক আছে তো? নদীর জল?

শান্-ইয়ে বললে—অন্ধকারে সব ঘরে বসে আছো···ভূতের মতো! পিদীম নেই? অন্ধকার ঘর! সব ভেবেছো কি যে, মেঘলা আকাশ-খানা মাথায় ভেঙ্গে পড়বে?

দিদু বললে—ঘরে তেল বাড়ন্ত রে! দু'টো বাতি আছে ঘরে··· ঠাকুর-ঘরে আলো দিতে হবে তো···ঠাকুরের পূজো আছে!

মিঙ্ বললে—কারো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না মোটে! জলের খপর কি?

শান্-ইয়ে বললে—পাশেই তাঙ্-গাঁ···সে গাঁ ভেসেছে! গাঁয়ের বাঁধ ছিল পল্‌কা···সময় থাকতে কেউ নজর ছায়নি···দেখতে-দেখতে গাঁ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! যে-তোড়ে জল ঢুকছে···সাবাড় হয়ে গেল বলে!

হুই বললে—এখানকার খপর কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনি! আমার শুয়োরগুলো না তুলে চলে এসেছি।

শান্-ইয়ে বললে—বলা শক্ত। তাঙ্ গাঁ ভাসিয়ে জল যদি ওর উপর দিয়ে পূব-দিকে চলে যায়, তাহলে আমাদের ভয় নেই। কিন্তু জলের বেগ···বলা যায় না তো!···ওরে তা-চু,—ও এর-ফু··· তোরা এখানে! আয়, আয়, তোদের চার-চারটে হাত···তাতে ঢের কাজ পাবো! আরো লোক চাই। আয়, আয়···বাঁধে যদি একটু ফাট ধরে, তা হলে আর কোনো আশা থাকবে না, সব যাবে!

শান-ইয়ে চললো। তা-ফু, এর-ফু তারাও ঘর থেকে বেরুলো।

মেয়েদের কণ্ঠে আর্ত্ত নিবেদনের একটা মিশ্র ঝঙ্কার···

সে ঝঙ্কার শুনে শান-ইয়ে বললে—এখন থেকে কান্নাকাটি শুরু করো কেন? ঐ তো মেয়েদের দোষ!···তা-ফাঙ্, তুমিও এসো। আর এর-শান্, তুমিও! ছোট হলেও ওদের চোখে-কাণে তেজ আছে···তোমরা যেমন দেখবে-শুনবে, আমরা কি তেমন পারবো! লাও-ইয়াঙ্···না, তুই থাক···তোর অসুখ শরীর। তোর আর গিয়ে কাজ নেই। তুই ঘরে থাক্!

চকিতে ক' জনে চলে গেল। ঘরে জমাট-স্তব্ধতা।

শান্ ইয়ের বৌ তা-ফু! সে বলে উঠলো,—আমিও যাবো··· শান-মু, তুই থাক···ফু-ফু নেহাৎ কচি! ওকে তুই দেখবি···লুঙ-এর ···তুইও থাক্ মা···

বাইরে জলো বাতাস···সে বাতাসে দুরন্ত বেগ। ঘরের মধ্যে সকলে নিস্পন্দ নিথর!

দিদু বললে—আমি জানি, এই বিপদে আমরাই মরবো। যাদের টাকা আছে, তাদের আবার বিপদ কিসের? চিরদিনই দেখছি, যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারা এ বানকে ভয় করে না। বানের জলে আমাদের সব যায়, আর তারা দেখে তামাসা! এক বার বুঝলি, সে অনেক দিনের কথা···খুব বান এলো···আমি তখন পণ্ডদের বাড়ী কাজ করি। ওঃ, সব খুইয়ে কাতারে-কাতারে লোক এসে দাঁড়ালো পণ্ডদের দোরে···ভাত চাই, কাপড় চাই! আহা, বেচারা সব ভিখিরীর মতো! পণ্ডের ছেলেমেয়েরা বাগান-বাড়ীতে গেল···সে বাড়ীর ছাদ থেকে বানের জল দেখতে। যত ফশল পণ্ড সাহেব নিজের খামারে টেনে টেনে জড়ো করলে। তার পর সেই ফশল পাঁচ-গুণ সাত-গুণ বেশী দামে বেচে লাখো টাকা ঘরে তুললে। যার অনেক আছে, ঠাকুর তাকেই আরো বেশী-বেশী ঢেলে দেন! তেলা মাথায় তেল দেওয়া ঠাকুর-দেবতাদেরও স্বভাব! আমরা দুঃখী-কাঙাল গরীব···কিছু নেই, তবু আমাদের নিয়ে তাঁর টানাটানি চলেছে পৃথিবীর সেই গোড়ার দিন থেকে!···এত বয়স হলো, বরাবর দেখছি, যারা ধনী, তাদের ধন বেড়েই চলেছে! আর যাদের নেই, তাদের অভাব আর কোনো দিন ঘুচলো না!

হঠাৎ বাইরে অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার,—জল—জল!···সামাল, সামাল ভাই সব!···

বাতাসের বেগ বাড়লো···

ঘরের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য!

সকলে চীৎকার করে উঠলো,—ওরা যদি যায়, আমরা কার মুখ চেয়ে বসে থাকবো? আমরাও যাবো···যতক্ষণ তবু পারি···

বাহিরে ঝড়ের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সকলে ছুটলো, ঝড়ের মতো অস্থির উদ্দাম গতি!

পথের কোথায় ক'টা কুকুর ছিল, কি তাদের হলো, আর্ত্ত-রবে দিগন্ত মুখরিত করে তুললো! তাদের সে আর্ত্ত-রবে ভয় পেয়ে ছেলে-মেয়েরা উঠলো কেঁদে! মেয়ের দল জলস্রোতের মতো পথ বয়ে চলেছে···ওদিকে পুরুষদের কণ্ঠে যেন বজ্রনাদ উঠেছে!

—বাঁধ···বাঁধ···মাটী···মাটী নিয়ে এসো!

—শীগগির···শীগগির!

—ঐ খসেছে ওদিক···পশ্চিম···পশ্চিম দিক!

—আলো···আলো···আলো! মশাল জ্বালো···মশাল!

পিঁপড়ের মতো মানুষের সার! জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখাচ্ছে যেন ওখানে কি মরণ-যজ্ঞ চলেছে! ঝড়ের বেগ আরো···আরো তীব্র! গাছপালা ভেঙ্গে পড়ছে মাটীর বুকে! আর দিগন্তব্যাপী কালোর পাথারের বুকে ঢেউয়ের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসির সাদা ফেনা! ভীম ভয়ঙ্কর-নাদে প্রলয়-হুঙ্কার তুলে ছুটেছে জল···তার গতি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল!

যেন মরণের দামামা বাজছে! লোকজনের মুখে চীৎকার—গেল···গেল···গেল···গেল···

—জল···জল···জল···

—পালা···পালা···শেঙ্-ফু···লু-ফু···

জলের সে বেগ রুখে দাঁড়ানো যায় না! বাঁধের মাটী খুলে-ঝরে ধুয়ে-মুছে কোথায় সরে চলেছে···জল-তরঙ্গ সে-মাটীকে নিমেষে চূর্ণ করে গিলে গ্রাস করছে যেন!

মাথার উপর আকাশের বুকে মেঘের ছুটোছুটি! তারা যেন নীচে এই মরণ-নৃত্য দেখে নিজেদের আর ধরে রাখতে পারছে না!

তারাও সুরু করেছে আকাশের বুকে এমনি উদ্দাম নৃত্য! ভয়ে চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে···নক্ষত্রগুলো জ্বলতে-জ্বলতে প্রদীপের শিখার মতো দপ্ করে ঐ নিবে গেল!

আকাশ আর পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার···মিষ-কালো জমাট অন্ধকার! সে অন্ধকারের বুকে জল-তরঙ্গ···অট্টহাসির বিপর্য্যয় সাদা রেখা···প্রলয়-ছন্দে পৃথিবী দুলছে!

পরের দিন সকাল বেলা!

ঝড় থেমে গেছে। বানের জল গেছে নেমে। আকাশে চিরদিনের সেই সূর্য্য! নীচে পৃথিবীর বুকে শুধু ধূ-ধূ কাদা-মাটী···সে মাটীর বুকে গাছ নেই, পাতা নেই, ক্ষেত নেই, খামার নেই, কিছু নেই! দূরে উঁচু পাড়ের উপর একখানি পাতার কুঁড়ে···যেন কোন্ অতীত যুগের পৃথিবীর শেষ-স্মৃতির চিহ্ন! সে কুঁড়ের নিরালা ঘরে বসে বুড়ী দিদু···একা···বিড়-বিড় করে বকছে,—এ প্রাণ কে চেয়েছিল, ঠাকুর! বারে-বারে এসে সকলকে নিয়ে যাচ্ছো, আমায় শুধু ফেলে রাখছো···কেন? কেন? কেন?

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

কিন্তু

সব আয়োজন হয়েছে পূর্ণ, সামান্য কিছু বাকি।
সুরে-বাঁধা বীণা কোথায় যেন সে একটু বেসুরো বাজে,
রজনীগন্ধা ফুটেও ফোটে না তিমির-কোমল সাঁঝে;
'কিন্তু' কথারে সৃজিল কোনও দীর্ঘসূত্রী না কি!

আবেগ-উৎস রুধিল কত যে কিন্তু-পাষাণ-ভার।
দার্শনিকের চিন্তার পথে গড়েছে পুরু দেয়াল,
পূর্ণচন্দ্র ঢেকেছে হঠাৎ রাহুর ছায়া করাল;
করমের মাঝে চমকি' সাধক গুটায়েছে হাত তার।

ছিন্নতন্ত্রী সঙ্গীত কত হয়েছে কুক্ষিগত।
প্রীতির প্রেরণা, নব প্রেমধারা শুকায় তীব্র তাপে,
ফুল্লজীবনে ঝরিয়াছে ফুল আচম্বিত অভিশাপে;
মদির আবেশ-পূরিত বক্ষ সহসা মরণাহত।

ঘেরি' চারি পাশ প্রতি পলে পলে নাগপাশে বেড়ী দিয়া
জীবনবৃত্ত ক্ষুদ্র চিত্ত আনিছে সঙ্কুচিয়া।

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

স্বপ্ন-দর্শন

ডক্টর ফ্রয়েড বলেন, আমাদের সব স্বপ্নই বাসনা-মূলক (Every dream is the fulfilment of a desire)। আজ তাঁহার সেই কথাটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মানুষের বাসনার সীমা নাই। এই সকল বাসনাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) জ্ঞাত বাসনা ; (২) অজ্ঞাত বাসনা। ইংরেজীতে যাহাকে Unconscious desire বলে, আমরা তাহাকে অজ্ঞাত বাসনা বলিতেছি। আমার অর্থ-লাভ হোক, আমি পরীক্ষায় পাশ করি—এগুলি আমার জ্ঞাত বাসনা। যে-বাসনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন—তাহাকে বলিব জ্ঞাত বাসনা। একটি ছেলে অসুস্থ। তার আম খাইবার ইচ্ছা হইল। অসুখ বাড়িবে ভাবিয়া মা তাহাকে আম খাইতে দিলেন না। রাত্রে ছেলে স্বপ্ন দেখিল, আম-বাগানে গিয়া পেট ভরিয়া সে আম খাইতেছে। এ স্বপ্নে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ছেলেটি নিজেও বিস্মিত হইবে না। দিনের বেলায় যে-জিনিষ পাইবার জন্য সে বাসনা করিয়াছিল, রাত্রে তাহারই স্বপ্ন দেখিল।

কিন্তু এমন অনেক স্বপ্ন আমরা দেখি, যে-স্বপ্নে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

ধরুন, এক জন লোক স্বপ্ন দেখিল, বন্ধু-পত্নীর সহিত সে নিবিড় আলাপে মগ্ন। হঠাৎ জাগিয়া সে বিচার করিতে বসিল, এ কি? বন্ধুপত্নীর সম্বন্ধে এমন চিন্তা আমি কখনও মনে আনি নাই, তবে এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম?

আমাদেরও প্রশ্ন, কেন এমন হইল? আমাদের প্রত্যেকটি স্বপ্ন যদি কোন-না-কোন বাসনার প্রতিবিম্ব বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে স্বপ্নে এমন ব্যাপার আমরা কেন দেখি—জাগ্রত অবস্থায় যাহার সম্বন্ধে চিন্তাও করি নাই? এ-লোকটিও জাগ্রত অবস্থায় বন্ধু-পত্নীর সম্বন্ধে কোন কামনাই মনে স্থান দেয় নাই, তবু সে এমন স্বপ্ন কেন দেখিল?

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর—অজ্ঞাত বাসনা। এই অজ্ঞাত বাসনার অর্থ,—এমন অনেক বাসনা আমাদের মনে উদয় হয়—এত গোপনে, এমন ভীত-কুণ্ঠিত ভাবে যে সে-বাসনার কথা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও প্রকাশ করিয়া বলিতে আমাদের লজ্জা হয়! এমন কি, নিজের কাছেও এই সব বাসনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত! আমাদের জন্মগত শিক্ষা, চরিত্র ও জীবনের আদর্শ হইতে এ-সব বাসনা এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ যে, এমন কোন বাসনা ঘুণাক্ষরে মনে জাগিলে সাধারণতঃ আমরা সে-দিকে লক্ষ্য দিই না ; বরং যত শীঘ্র পারি এমন বাসনাকে সমূলে চাপিয়া চিন্তাস্রোত ভিন্ন দিকে ফিরাই। এই সব বাসনার চিন্তায় আমরা বিরত হই! কাজেই এ-সব বাসনা আমাদের মনে বেশীক্ষণ থিতাইতে পারে না। তাই ইহাদের অস্তিত্বও আমরা অতি শীঘ্র ভুলিয়া যাই। এ-সব বাসনাকে আমরা অজ্ঞাত বাসনা বলিব। ইহাদের অস্তিত্ব আমরা মনের কোণেও রাখি না। এমন বাসনা কখনো করিয়াছি কিম্বা এমন বাসনা কখনো মনে উদিত হইয়াছিল কি না, তাহাও আমাদের স্মরণে থাকে না। ইহাদের পূর্ব্ব-অস্তিত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই। সে-জন্ম স্বপ্নাবস্থায় এরূপ কোনো বাসনার উদয় হইলে আমরা আশ্চর্য্য হই। মনে করি, ডক্টর ফ্রয়েড যা বলেন, প্রত্যেক স্বপ্নই বাসনার প্রতিবিম্বমাত্র—তা তবে ভুল!

পূর্ব্বোক্ত লোকটি ডাক্তার ফ্রয়েডের কাছে গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। ডাক্তার ফ্রয়েড তখন সে স্বপ্ন-সম্বন্ধে তাহাকে বহু প্রশ্ন করেন ; লোকটিও সে-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়। প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে, এই লোকটি এক দিন তাহার বন্ধুর গৃহে গিয়াছিল ; সেখানে বন্ধু-পত্নীকে দেখিয়া তাহার মনে এমনি চিন্তা বিদ্যুতের শিখার ন্যায় ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গিয়াছিল, পর-মুহূর্ত্তেই মন হইতে এ চিন্তা নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। এবং ইহার সম্বন্ধে সে আর কখনো কোনো চিন্তা করে নাই। বিজলী-চমকের ন্যায় ঐ ক্ষণস্থায়ী চিন্তার অস্তিত্বও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে ভুলিলেও সে-বাসনা বা চিন্তা তাহাকে ভোলে নাই! একবার যে-বাসনা আমাদের মনে উদিত হয়, তাহা আমাদিগকে একেবারে পাইয়া বসে—ছাড়ে না! অজ্ঞাত বাসনার নিয়মই তাই। আমরা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও বাসনা আমাদের ছাড়ে না। দিনে নানা কাজে, জাগ্রত-চেতনায় নানা বিষয়ে যখন ব্যস্ত থাকি, তখন সে-বাসনা এতটুকু সুবিধা করিয়া মাথা তুলিতে পারে না! কিন্তু রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মনে উদিত হইয়া নৃত্য সুরু করিয়া দেয়! তখন আমরা আশ্চর্য্য হই ; কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই! কারণ, আমরা আমাদের সে ক্ষণিক বাসনাকে ভুলিয়া গেলেও সে-বাসনা আমাদের ভোলে না!

এই যে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বাসনা—এই দুই প্রকার বাসনাই আমাদের স্বপ্নে উদিত হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের স্বপ্নে জ্ঞাত বাসনা এবং বয়স্কদের স্বপ্নে অজ্ঞাত বাসনাই বহুল পরিমাণে দেখা দেয়। ইহার কারণ, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মানসিক জীবন খুব সরল। তাহাদের জীবনে অজ্ঞাত বাসনা নাই বলিলেও চলে। তাহারা যে-কামনা করে, তাহার সম্বন্ধে তাহারা খুবই সচেতন—অপরেও তাহা জানিতে না পারে, এমন নয়! তাহাদের কথায় এবং কাজেও তাহা বেশ প্রকাশ পায়। একটি ছোট ছেলে এক দিন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া দেখে যে, একটি ছোট মেয়ে তাহার ভাইকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। ফুলের পাপড়ির মতন নরম তুলতুলে খোকাকে কোলে লইবার জন্য ছেলেটির প্রবল ইচ্ছা হইল। খোকাকে তাহার কোলে দিতে বলিল। মেয়েটি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না, তুই নিজেই ছোট! তুই কি কোলে নিতে জানিস্! তোর কোল থেকে খোকা পড়ে যাবে।" এ-অপমান ছেলেটির বুকে কাঁটার মত বিঁধিল! সে বলিয়া উঠিল, "তুই খুব বড়? আর আমি ছোট? তুই কোলে নিতে জানিস, আর আমি জানি না? দিচ্ছি তোকে ঠিক করে।" বলা বাহুল্য, দিনের বেলায় সে তাহাকে "ঠিক" করিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু স্বপ্নে এই মেয়েটির হাত সে এত জোরে কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, মেয়েটিকে কাঁদিতে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেও সে দ্বিধা করে নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, স্বপ্ন ও কামনার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই। স্বপ্নের মধ্যে কামনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সুন্দর ভাবে প্রকটিত আছে।

বয়স্কদের স্বপ্নে বাসনার অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়। কারণ, সাধারণতঃ তাহাদের স্বপ্ন জ্ঞাত বাসনামূলক নয়; অর্থাৎ জ্ঞাত বাসনার প্রতিচ্ছবি নয়। তাহাদের স্বপ্নে অনেক অজ্ঞাত বাসনা লুকাইয়া আছে। ইহার কারণ, বয়স্কদিগের মানসিক জীবন ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মানসিক জীবনের ন্যায় সরল নয়; জটিল। তাহাদের নানা রকমের সাধ আছে, ইচ্ছা আছে, আশা আছে। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে তাহারা জগৎ-সংসারকে দেখিতেছে। নানা প্রকারের অসংখ্য ধারণা তাহাদের মনে নিত্য-নিয়ত আসা-যাওয়া করিতেছে! কিন্তু সব ধারণাকেই সমাদরে গ্রহণ করা চলে না, সব ধারণাকেই আমরা আমাদের মনের কুটীরেও প্রকাশ্য ভাবে স্থান দিতে পারি না! সমাজের শাসন, নীতির শাসন, ধর্ম্মের শাসন, রাজার শাসন প্রভৃতি বহু শাসন মানিয়া আমাদের চলিতে হয়। সেই জন্য যে সব ধারণা আমাদের ধর্ম্ম, নীতি বা জন্মগত শিক্ষা এবং সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যায়, জোর করিয়া সেই সকল ধারণাকে আমরা চাপিয়া রাখি। মৃত্যু-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ পীড়িত পিতার সেবা করা প্রত্যেক পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি এই উপদেশই দেয় এবং আমরাও সাধারণতঃ এই উপদেশ অনুসারে কাজ করি। কিন্তু পৃথিবীর সব লোক সমান নয়। বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে করিতে কোন পুত্রের মনে হয়তো হঠাৎ এমন ভাব জাগিল, যত শীঘ্র পিতার মৃত্যু হয়, ততই ভালো! তিনিও রক্ষা পান, আমিও শান্তি পাই! এমন ভাব মনে জাগা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জন্মগত শিক্ষা ও সংস্কার কিছুতেই এমন ভাবের অনুমোদন করিবে না। তার উপর সামাজিক নিন্দা এবং নিজেদের বিবেকের তাড়নাও আছে। তাই আমরা এরূপ চিন্তা-প্রবাহকে এতটুকু উৎসাহ বা প্রশ্রয় না দিয়া যত শীঘ্র পারি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিই! এই প্রকারে ইহাকে দাবিয়া রাখিতে পারি বটে এবং পরেও হয়তো ইহার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে পারি—কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে যেমন Conservation of Energy (শক্তি-সংরক্ষণ) বলিয়া বিধি আছে, মানসিক জগতেও তেমনি Conservation of Ideas (ধারণা-সংরক্ষণ) বলিয়া কঠোর বিধি বিদ্যমান আছে। কামনার নাশ নাই! আজ মাটি দিয়া ঢাকিয়া তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিলাম সত্য, কিন্তু কাল মাটি ভেদ করিয়া আবার সে মাথা তুলিয়া বাহির হইবে! দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় অনেক বাসনাকেই আমরা জোর করিয়া দাবিয়া ঢাকিয়া তাহা ভুলিতে পারি, কিন্তু রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তাহারা অনায়াসে আমাদের স্বপ্নে সমুদিত হইতে পারে।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমাদের স্বপ্নের অধিকাংশ অজ্ঞাত বাসনাই কাম-মূলক (Sexual)। সাধারণতঃ প্রত্যেক নর-নারীর জীবনে কাম-প্রবৃত্তি প্রবল। আমাদের জীবনে, বিশেষতঃ যৌবনে অসংখ্য যৌন বাসনা আমাদের মনে উদিত হয়; শুধু শিক্ষার গুণে এবং সমাজের শাসনে মুখে আমরা তাহা বলিতে বা প্রকাশ করিতে পারি না। রাজনৈতিক বাসনার উপর কেবল রাজার শাসন বর্ত্তমান,—অধম-বাসনার উপর ধর্ম্মের শাসন। কিন্তু আমাদের যৌন বাসনার উপর ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা, রাজা ও সমাজ—সকলের শাসনই বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল শাসনই আমাদের যৌন বাসনাসমূহকে সবলে দাবিয়া রাখিবার জন্য সতর্ক। উগ্র ব্যাধিতে উগ্র ঔষধ। পাশবিক শক্তিতে যৌন বাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্,—তাই তাহার উপর শাসনও সবচেয়ে কঠোর। তাহা না হইলে এ সব বাসনা মানব-জীবনে হয়তো ভীষণ প্রলয়ের সৃষ্টি করিত! এই সব কঠোর শাসনের ভয়ে আমরা আমাদের যৌন বাসনাসমূহ দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। তাহার ফলে এই সব যৌন বাসনা মনের নিম্ন-স্তরে পড়িয়া থাকে। ইহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করি; এবং শিক্ষার প্রভাবে সত্যই তাহা ভুলিয়া যাই। এই সব "চাপিয়া-রাখা" "ভুলিয়া-যাওয়া" বাসনাই অজ্ঞাত বাসনারূপে পরিণত হয়। আমরা তাহাদের ভুলিয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই! মনের নিম্নস্তরে নিতান্ত নির্জীবের মত তাহারা পড়িয়া আছে বটে, তাই বলিয়া তাহারা একেবারে শুকিয়া মরিয়া যায় নাই! একটু সুবিধা পাইলেই মনের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে ভাসিয়া ওঠে! তখন অজ্ঞাত সীমা পরিত্যাগ করিয়া আবার জ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করে। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় সকল শাসন যখন সজাগ, তখন এই সব বাসনাও নির্জীবের মত নিম্নে পড়িয়া থাকে; কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় এ সব শাসন শিথিল; কাজেই সেই সুযোগে এ সব বাসনা উপরে উঠিয়া নৃত্য সুরু করে। তখন আমরা স্বপ্ন দেখি।

২

বয়স্কলোকের অধিকাংশ স্বপ্নই অজ্ঞাত বাসনামূলক; আর তাহাদের অধিকাংশ অজ্ঞাত বাসনাই যৌন বাসনা-মূলক। বাসনা স্ব-রূপে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়। বাসনা ও স্বপ্নের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব থাকে না, ইহা আমরা বুঝিয়াছি। অজ্ঞাত বাসনা-মূলক স্বপ্নে বাসনাকে খুঁজিয়া বাহির করা তত সহজ নয়। কারণ, প্রথমতঃ, বাসনা ঠিক কি, সহজে তাহা ধরা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই অজ্ঞাত বাসনা স্বপ্নে কি রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। মোট কথা, এই প্রকার স্বপ্নে অজ্ঞাত বাসনা তাহার নিজের স্ব-রূপ গোপন করিয়া অন্য রূপে দেখা দেয়। স্বপ্নে যে অজ্ঞাত বাসনা বিদ্যমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বাসনা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আছে; তাহাকে অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

উদাহরণ দিয়া এই কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করি। এক বয়স্কা কুমারী স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার ভগিনীর ছোট ছেলেটি মারা গিয়াছে; ছেলেটির মৃতদেহ ছোট "কফিনে" রাখা হইয়াছে; কফিন লইয়া সকলে গোরস্থানে আসিয়াছে; পাদরী-সাহেব প্রার্থনা করিতেছেন; শিশুর মাতা এবং কুমারী নিজে মলিন মুখে বিষণ্ণ চোখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবও সহানুভূতি জানাইবার জন্য সেখানে আসিয়াছে!

এ স্বপ্ন দেখিয়া কুমারী অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিল। ভগিনীর ছেলেটিকে সত্যই সে খুব স্নেহ করিত; ছেলেটিরও কোন রোগ ছিল না। সুস্থ সুন্দর ছেলে! অথচ কিশোরী স্বপ্ন দেখিল, এই ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে। কুমারীর অত্যন্ত দুঃখ হইল। কেন এমন দুঃস্বপ্ন দেখিল! ডক্টর ফ্রয়েডের নিকটে গিয়া কিশোরী এ স্বপ্নের বিবরণ দিয়া বলিল,—"ডাক্তার, আপনি বলেন স্বপ্নমাত্রই বাসনার প্রতিচ্ছবি, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন,- আমি সত্য বলিতেছি,

আমার মনে কখনও এমন নিষ্ঠুর বাসনা জাগে নাই। ছেলেটিকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। তাহার মৃত্যু দূরের কথা, তাহার সামান্য একটু পীড়া হইলেই আমি অস্থির হইয়া উঠি। অথচ কেমন করিয়া আমি এমন নিষ্ঠুর স্বপ্ন দেখিলাম?" ডাক্তার বলিলেন, "ছেলেটির মৃত্যু হয়—মনে এমন ইচ্ছার স্থান হয়তো তুমি কখনো দাও নাই! কিন্তু তোমার এই স্বপ্ন যে মৃত্যু-কামনার প্রতিচ্ছবি, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। ইহার মধ্যে হয়তো অন্য-কোন গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। হয়তো অন্য কোন অজ্ঞাত বাসনা এইরূপ ছদ্ম-বেশ ধরিয়া সমুদিত হইয়াছে।" ডাক্তার তখন কুমারীকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিত ব্যাপার জানা গেল।

এক যুবকের সঙ্গে কুমারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরস্পরকে তাহারা খুবই ভালোবাসিত এবং একপ্রকার স্থির ছিল, শীঘ্রই তাহাদের বিবাহ হইবে! কিন্তু কতকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক কারণে বিবাহ হইল না। বিবাহের সম্ভাবনাও রহিল না। দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া আসিল। দু'জনেই ভিয়েনা সহরে থাকিত, কিন্তু মিলনের কোন উপায় ছিল না। কুমারী কিন্তু সে-যুবককে ভুলিতে পারে নাই—তাহার চিন্তায় অনেক সময় সে বিহ্বল থাকিত! এই-রূপে প্রায় এক বৎসর কাটিল। তখনও কুমারী পূর্ব্বের মত যুবককে ভালোবাসে; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক সময় কুমারীর ইচ্ছা হইত প্রবল; কিন্তু দেখা করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইত না। এক দিন এক ব্যাপার ঘটিল। কুমারীর ভগিনীর বড় ছেলেটির মৃত্যু হইল; ছোট একটি কফিনে তাহার মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল; সেই কফিন লইয়া সকলে গোরস্থানে গিয়াছিল; বন্ধু-বান্ধব সকলেই সেখানে আসিয়াছিল; এমন ব্যাপারে অনুপস্থিত থাকা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, তাই কুমারীর সেই যুবক বন্ধুও সে-দিন সেখানে আসিয়াছিল; এবং সেখানে যুবকের সহিত কুমারীর সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল।

এ ব্যাপার জানিতে পারিলেই কুমারীর স্বপ্নের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিব। কুমারীর মনে গূঢ় বাসনা নিহিত ছিল—কি করিয়া যুবকটির সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইতে পারে! এই অজ্ঞাত বাসনাই তাহার স্বপ্নে প্রকটিত হইয়াছে! এ স্বপ্নে মৃত্যু-বাসনার নির্দ্দেশ নাই—মিলন-বাসনাই এ স্বপ্নের মূল কারণ। কিন্তু এই মিলন-বাসনা স্পষ্টরূপে বাহিরে আসিতে সাহস করিতেছে না! পূর্ব্ব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত জানাইতেছে যে, সে-দিন যেমন ঘটনাচক্রে দেখা হইয়াছিল, আবার যদি তেমন ঘটনা ঘটে!

এ দৃষ্টান্তে বাসনার ছদ্মবেশ-গ্রহণের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারি। বাসনা যেমন, স্বপ্ন যে তাহারি অনুরূপ হইবে—তাহা বলা যায় না। সাধারণতঃ স্বপ্নে বাসনা বরং ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়। আমাদের বাসনাটি ঠিক কি—স্বপ্ন স্পষ্ট তাহা না বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইবার চেষ্টা করে। স্বপ্ন—বাসনার অবিকল প্রতিবিম্ব নয়, ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিতের যথার্থ অর্থ যে বুঝিতে পারে, এ বাসনার স্বরূপও সে জানিতে পারিবে। এই ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বপ্নের মধ্যে বাসনার অনুধাবন করিতে হয়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Psycho-analysis (বা মানস পৃথক-করণ)। স্বপ্নের মধ্যে যে গূঢ় বাসনা আছে, তাহা নিশ্চিত; কিন্তু সেই বাসনাকে অনুসন্ধানে বাহির করা সহজ নয়, স্বপ্ন-রূপ ইঙ্গিতের নির্দ্দেশ-প্রমাণে চলিয়া তবে ইহাকে বাহির করিতে হয়। ডক্টর ফ্রয়েড তাই তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন "Interpretation of Dreams"। তিনি বলিতে চান, স্বপ্নই স্বপ্নের লক্ষ্য নয়; স্বপ্ন একটি ইঙ্গিত মাত্র; ইঙ্গিতে কোন এক গুপ্ত বাসনার সে নির্দ্দেশ করে। স্বপ্নের যথার্থ অর্থ (Interpretation) বুঝিলে এই গুপ্ত বাসনাও ধরা পড়িবে।

উদাহরণে এ কথাটি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। বিপ্লবীরা অনেক সময় এক প্রকার সঙ্কেত-ভাষা (Code language) ব্যবহার করে। এক দিন হয়তো তাহাদের একটা টেলিগ্রাম আসিল, "Marriage Settled. Send money." পোষ্ট-মাষ্টার তারের সরল সহজ (superficial) অর্থই বুঝিলেন, তাই তিনি ইহাতে কোন দোষ দেখিলেন না। কিন্তু তিনি যদি ইহার সঙ্কেত-অর্থ বুঝিতেন, তবে টেলিগ্রামটি সটান্ তিনি পুলিশের নিকট পাঠাইতেন। সঙ্কেত-অর্থ হয়তো এইরূপ যে, "ষড়যন্ত্রের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক। এখন মাল-মশলা পাঠাও।" আমাদের স্বপ্নও এমনি Code language. স্বপ্নে যাহা যে-রূপে দেখা দেয়, তাহা যে সত্যই তার রূপ—তা নয়। "Marriage Settled. Send money." পোষ্ট-মাষ্টার এই তারের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ অর্থ নয় এই তারের যেমন এক নিগূঢ় অর্থ ছিল, আমাদের স্বপ্নেরও সেইরূপ নিগূঢ় অর্থ আছে এবং এই নিগূঢ় অর্থই তাহার যথার্থ অর্থ।

আর একটি উদাহরণ দিই—এক দিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, সেতার বাজাইতেছি। কিন্তু কি জানি কেন, আমার আঙুল চলিতেছে না। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি বাজাইতে পারিতেছিলাম না। হয়, আঙুল চলে না, না হয় সব তারগুলিতে আঙুল লাগিয়া সেতার ঝনঝন করিয়া ওঠে! কিছুক্ষণ পরে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি! আমার আঙুলের তো কিছু হয় নাই! তবে কি সত্যই বাজাইতে ভুলিয়া গেলাম? শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া সেতার লইয়া বাজাইতে বসিলাম। কোন কষ্ট হইল না! বেশ বাজাইলাম, আঙুলও ঠিক চলিতেছে! তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়া বিছানায় শুইলাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার এ স্বপ্নের অর্থ কি?

ভাসা-ভাসা ভাবে দেখিলে মনে হয়, স্বপ্নটি নিতান্ত নির্দ্দোষ! কিন্তু "appearances are deceptive" এইরূপ বিচার করিতে করিতে আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। এবার যে-স্বপ্ন দেখিলাম, তাহার সাহায্যে আমার পূর্ব্ব-স্বপ্নের অর্থ বাহির করা সহজ হইল। এবার স্বপ্ন দেখিলাম, সেতার বাজাইতেছি, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, সেতারটি ধীরে ধীরে তাহার কাষ্ঠ-মূর্ত্তি ত্যাগ করিল। দেখি, কাষ্ঠ-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সেতার এক সুন্দরী তরুণীতে পরিণত হইয়াছে! তরুণীর দিকে ভালো করিয়া তাকাইতেই আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! এ দু'টি স্বপ্নে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম, প্রথম স্বপ্নটি যেমন নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেটি প্রকৃত-পক্ষে তা নয়। এক অজ্ঞাত বাসনা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং সে অজ্ঞাত বাসনা যে কাম-মূলক, তাহাও সুনিশ্চিত। ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, দিনের বেলায় হ্যাভলক এলিশ প্রণীত Studies in the Psychology

of Sex পড়িতেছিলাম। তাহাতে এক জায়গায় ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzac-এর একটি কথা উদ্ধৃত আছে। সে-কথা আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। Balzac বলেন, "বেহালা বাজাইতে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, স্ত্রীলোকের সহিত আচার-ব্যবহার করিতে জানাও তেমনি শিক্ষা-সাপেক্ষ। বেহালার সহিত মহিলার তুলনা করা যাইতে পারে। বেহালার ন্যায় মহিলাও delicate যন্ত্র-বিশেষ। যাহার শিক্ষা আছে, তাহার স্পর্শে দু'টিই মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া ওঠে। কিন্তু অসভ্য ওরাং-উটাঙের হাতে বেহালা যেমন বাজে না, অশিক্ষিত পুরুষের হাতেও মহিলা-বীণা তেমনি মধুর ঝঙ্কার তোলে না!" Balzac-এর এ উপমাটি সুন্দর! এবং এই সুন্দর উপমাটি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার স্বপ্নে প্রকট হইয়াছিল। স্বপ্নে আমি ওরাং-উটাঙের স্থান অধিকার করিয়া বেহালার বদলে সেতার বাজাইবার বৃথা প্রযত্ন করিতেছিলাম!

এখন দেখিলাম, বাসনাকে মনের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠাইয়া আনাই স্বপ্নের প্রধান কাজ। মনের কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকার কুটারে যে সব বাসনা গুমরিয়া মরিতেছে, তাহাদিগকে স্বপ্নাকারে প্রকাশ করার নাম স্বপ্ন-ক্রিয়া (Dream-work)। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে বাসনা তাহার স্বকীয় যথার্থ-রূপে প্রকাশ পায় না! স্বপ্নে সে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অন্য-রূপে আবির্ভূত হয়। বাসনাকে এইরূপে ছদ্মবেশে সাজাইয়া দেওয়া স্বপ্নের দ্বিতীয় কাজ। সংক্ষেপে স্বপ্ন (১) বাসনাকে উপরে লইয়া আসিতেছে; (২) আনিয়া ছদ্মবেশে তাহাকে প্রকাশ করিতেছে!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বপ্ন-ক্রিয়া বাসনাকে ছদ্মবেশে সাজাইতেছে কেন? বাসনা যেরূপ, স্বপ্নও তদ্রূপ হয় না কেন? বাসনা গুপ্ত বা ছদ্মবেশ ধারণ করে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের অনেক বাসনা অন্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অবিবাহিত বহু স্ত্রী-পুরুষ কুকুর-বিড়াল পালন করে; অনেকে আবার গান-বাজনায় মগ্ন থাকে; সেতার-দিলরুবা তাহাদের প্রাণ-স্বরূপ হয়। এ ক্ষেত্রে অনায়াসে বুঝা যায় যে, কুকুর-বিড়াল ও সেতার-এস্রাজের উপর তাহাদের যে অনুরাগ, তাহা শুধু কাম-বাসনার রূপান্তর মাত্র! বয়স্থা কুমারী ও বিধবাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনেক সময়ে তাঁহাদের কাম-বাসনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। জেলের নির্জ্জন কুটারে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মপ্রাণ বাঙালী বিপ্লবীদের সকল বাসনা যখন অতৃপ্ত থাকিত, তখন তাঁহারা যেমন ঈশ্বরচিন্তায় কিঞ্চিৎ তৃপ্তি পাইতেন, তেমনি বয়স্থা কুমারী এবং বিধবারাও ঘরের কোণে বদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদের বহু অতৃপ্ত বাসনাকে ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। বাসনার রূপান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—স্ত্রীর হঠাৎ পিতৃগৃহে যাইবার বাসনা যে অভিমানের রূপান্তর মাত্র, অনেকেই তাহা জানেন।

সমাজের শাসনের ভয়ে এবং শিক্ষার ও সভ্যতার খাতিরে আমরা অনেক সময়ে কিছু-কিছু ভণ্ডামি করিয়া থাকি। মনে রাগ, তবু মুখে হাসি ফুটাইয়া কথা বলিতে হয়। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য হয়তো খুব ইচ্ছা; কিন্তু সমাজের খাতিরে মুখে উদাসীন ভাব দেখাই—যেন মনে কোন বাসনাই নাই!

কেবল স্বপ্নাবস্থায় নয়, জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা আমাদের বাসনা স্বপ্ন-রূপে প্রকাশ না করিয়া গুপ্ত-ভাবে বা ছদ্মরূপে প্রকাশ করি—ইহার কারণ কি? উপমার ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়, আমাদের মনের মধ্যে সর্ব্বদাই এক জন শাসক (censor) বিরাজমান আছে। বাসনাগুলিকে শাসন করাই তাহার কাজ। চিঠি গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে আগে censor-এর কাছে আসে। আমাদের বাসনাও তেমনি প্রকাশের অনুমতির জন্য প্রথমে এই মানসিক শাসকের নিকটে যায়। তিনি যাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহার উপর কোন প্রকার অস্ত্রোপচার না করিয়া তাহাকে তাহার স্বকীয় মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিতে অনুমতি দেন। তখন আমরা যে-স্বপ্ন দেখি, তাহা বাসনার অবিকল প্রতিচ্ছবি—যেমন ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন! কিন্তু যে-বাসনায় কোন গলদ থাকে, শাসক তাহাকে তাহার স্ব-মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিতে দেয় না! তাহাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া, তাহার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া, তাহার নানা স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া একেবারে নির্দোষ গোবেচারা বানাইয়া তবে তাহাকে উপরে আসিতে দেয়। তখন আমরা যে-স্বপ্ন দেখি, তাহা বাসনার নিছক প্রতিচ্ছবি নয়। এ স্থলে বাসনা এমন নিরীহ ও বেচারার রূপ ধরিয়া উদিত হয় যে, তাহার আসল রূপ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে—যেমন বয়স্কদিগের স্বপ্নে ঘটিয়া থাকে।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার

বসন্ত

শীতের হিমের বাঁধন কাটিয়া ধরণীতে এলো বসন্ত।
অন্ধ মদন ফুলধনু হাতে খেলিছে খেলা দুরন্ত।
কানন ভরেছে আজি রূপ-রস-গন্ধে,
জগৎ জেগেছে নব মধু-সুর-ছন্দে,
প্রকৃতি সেজেছে নূতন ভূষণে উজলিয়া দিক্-দিগন্ত।
দখিণ হাওয়ায় মন-পরাণ মাতায়,
রঙের নাচন আজি পাতায় পাতায়,
যৌবন-উচ্ছল বনানীর দেহে, উৎসবে মাতে অনন্ত॥

শ্রীযামিনীমোহন কর।

পরিচয়

বিরহ আর মিলন নিয়ে
এই জীবনের কান্না-হাসির মেলা!
কেউ প্রিয়ারে বক্ষে বাঁধে
সঙ্গিবিহীন কেউ বা কাটায় বেলা!
হিংসাতে কেউ জ্বলেই মরে
কেউ বা প্রেমে আপন-ভোলা হয়!
অশ্রু-হাসির আলিঙ্গনে
এই জীবনের সত্য পরিচয়।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর) *

দশম—ইহার পর বলা হইয়াছে—"এই পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতার ভিতরে যে পাঁচ প্রকার উপাদান আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র নয়, পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য। এই উপাদানগুলি হ'চ্চে (১) আত্মজ্ঞান (২) ইন্দ্রিয়বোধ, (৩) ইন্দ্রিয়বোধের আকার দেশ ও কাল (৪) ইন্দ্রিয়বোধের গুণ, পরিমাণ ও সম্বন্ধ বিষয়ে আত্মার বিবিধ ধারণা (conception of categories) (৫) জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই তিনটি মূল বস্তুর ধারণা (Three ideas of reason) ইত্যাদি।"

এ কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা ন্যায়ের আদ্য গ্রন্থ তর্কসংগ্রহ পড়িয়াছেন, বেদান্তের পরিভাষা গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই জাতীয় কথা অতি পুরাতন কথা। যাঁহারা মীমাংসা ও ন্যায়ের পদার্থতত্ত্ব বুঝেন, কেন পদার্থ সাতটি, আটটি হইল না কেন ?—ইত্যাদি বুঝেন, যাঁহারা ন্যায়ের বা বেদান্তের বা অন্য দর্শনের জ্ঞানোৎপত্তি-প্রক্রিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহার কোনই নূতনত্ব নাই। দেশ ও কালের সিদ্ধি ও তাহাদের খণ্ডনে যে সব কথা আছে, তাহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই আছে। 'জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং সম্বন্ধ' বিচারপ্রসঙ্গে যে সব কথা আছে, ইহাদিগকে সিদ্ধ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে, কোন একটা মতবাদ-বিশেষেই প্রবিষ্ট হইতে হয়, নূতন কিছু করা একটা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভারতীয় দর্শন যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট ক্যাণ্টের এই সব আবিষ্কারের কথা বলা বৃথা শ্রম মাত্র। সংস্কৃতশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের ইংরেজী না জানাতেই পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন মহাত্মগণের এই জাতীয় মন্তব্য বহু স্থলেই দেখা যায়। ইহাই আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস।

একাদশ—অতঃপর বলা হইতেছে—"ক্যাণ্টীয় দর্শন আয়ত্ত করলে দেখা যায়, লৌকিক ও চলিত নৈয়ায়িক চিন্তা যে প্রত্যক্ষ (perception) ও অনুমান (inference)কে দুই স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে মনে করে, এতেই মস্ত ভুল রহিয়াছে, ফলতঃ, প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নেই, পরোক্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ নেই। জ্ঞান হ'চ্চে বহু উপাদানযুক্ত একটি অখণ্ড ক্রিয়া, এবং এই অখণ্ড ক্রিয়ার বিষয় হ'চ্চে জগৎ ও জীববিশিষ্ট এক অখণ্ড পরমাত্মা।"

এই কথাটিতেও বহু অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথম, প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিলে ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। কেহই প্রত্যক্ষকে অনুমান বলে না, এবং অনুমানকেও প্রত্যক্ষ বলে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ না বলিয়া প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বলিলে জ্ঞানত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে তাহারা অভিন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই অনুমিতিরূপ জ্ঞান হয় না। তাহার পর প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নাই, আর পরোক্ষ ছাড়া প্রত্যক্ষ নাই বলিয়া ইহাদিগকে স্বতন্ত্র নহে অর্থাৎ অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। যাহারা ছাড়াছাড়ি থাকে না, তাহারা কি অভিন্ন হয় ? অংশ অংশীকে ছাড়া থাকে না, গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকে না, তাহারা কি অভিন্ন নহে বলিব ? অনুমান করিতে গেলে প্রত্যক্ষ আবশ্যক হয়, প্রত্যক্ষ করিতে গেলে কি অনুমানের আবশ্যকতা আছে ? আত্মা-মন-ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হইলেই প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে অনুমান কোথায় ?

যদি বলা যায়, ঘটজ্ঞান কালে ঘটের একদেশই আমাদের চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, ঘটের সর্ব্বদেশে চক্ষুঃসংযোগ হয় না। যে দেশে চক্ষুঃসংযোগ হয়, সেই দেশেরই প্রত্যক্ষ হয়; যে দেশে চক্ষু সংযুক্ত হয় না, সে দেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই অনুমানগম্য। অতএব ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই থাকিল ! অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান পৃথক্ জ্ঞান নহে ?

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ঘটজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয় থাকিলেও ঘটপ্রত্যক্ষকেও ঘটের অনুমান বলা হইল না। ঘটজ্ঞান ও ঘটপ্রত্যক্ষজ্ঞান তু অভিন্নপদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের একটা প্রকার মাত্র। জ্ঞান একটি সামান্য নাম। প্রত্যক্ষ তাহার বিশেষ নাম—এইমাত্র প্রভেদ।

যদি বলা হয়, ঘট-প্রত্যক্ষমধ্যেও ঘটানুমান থাকায় উহারা অভিন্ন বলিব ? যেহেতু, ইন্দ্রিয়সহ একদেশসন্নিকৃষ্ট ঘট হইলেও সমগ্র ঘটের প্রত্যক্ষ হইল, এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহাও অসঙ্গত। কারণ, এস্থলে অনুমানের সামগ্রী "ব্যাপ্তিজ্ঞান" অনুভূত হয় না। আর সকল দ্রব্যপ্রত্যক্ষই এইরূপ হয় বলিয়া এবং গুণাদি প্রত্যক্ষে এই দেশভেদ থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষমধ্যে অনুমানের স্থান নাই।

যদি বলা যায়, ঘটকে ঘট বলিতে গেলে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটাকার বলিয়া "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞান হয়, আর তজ্জন্য উহার মধ্যেও অনুমান থাকিয়া যায় ? কিন্তু ঘটের সামান্যজ্ঞানে অনুমান কোথায় ? তাহাতে ঘটকে "ইহা" বলিয়া একটা জ্ঞানই হয়। ঘটের বিশেষজ্ঞানও ন্যায়মতে ঘটত্ব জাতির দ্বারা সিদ্ধ হয়, বেদান্তমতে একটি ঘটপ্রত্যক্ষে যাবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ কালে তাহাতে অনুমান থাকে বলা হয় বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও এত কথা আছে যে, ক্যাণ্টের এই কথা তাহার তুলনায় বিশেষ কিছুই নহে বলিতে পারা যায়। আর যদিও তিনি অন্যত্র অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ভারতীয় দার্শনিকগণের নিকট তাঁহাকে ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা বলা বৃথা।

তাহার পর "জ্ঞান হ'চ্চে বহু উপাদানযুক্ত একটি অখণ্ড ক্রিয়া" এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, জ্ঞান বহু উপাদান বা সামগ্রী হইতে জন্মে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানে কি সেই উপাদানগুলি থাকে যে, তাহাকে "উপাদানযুক্ত" বলা যায়। জ্ঞানসামগ্রীগুলি জ্ঞানের নিমিত্তকারণ, তাহা কার্য্যের সহিত একত্র থাকে না। উহার উপাদান-কারণ অর্থাৎ সমবায়ী কারণ আত্মা, তাহা বহু নহে। বেদান্তমতে এই জ্ঞান নিত্য, উহাই আত্মার স্বরূপ। অন্তঃকরণবৃত্তি সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়াবগাহী

---

* ১৩৪১ কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত" প্রবন্ধের প্রতিবাদের অনুবৃত্তি।

হইয়া বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। এইরূপ বহু মতই আমাদের দর্শনে আছে। সকল মতই অতি গম্ভীর।

তাহার পর জ্ঞানকে ক্রিয়া বলাও ভ্রম। ন্যায়মতে তাহা গুণ, বেদান্তমতে তাহা গুণাশ্রয় দ্রব্যবিশেষ। ক্রিয়া দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সংযোগ-বিভাগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চমক্ষণ পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। গুণের ন্যায় ইহাও দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধেও ভারতীয় দর্শনে বহু মতভেদ আছে। সে সব শুনিয়া ক্যান্টের কথায় নূতনত্ব অনুভূত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

তাহার পর এই জ্ঞান নামক ক্রিয়ার আবার অখণ্ডত্ব কি? ক্রিয়ার উৎপত্তি-নাশ আছে, অখণ্ডেরও কি তাহাই আছে? আর যদি অখণ্ডঅর্থ একটামাত্র হয়, তবে বহু উপাদানযুক্ত বস্তু আবার অখণ্ড হয় কিরূপে? বহু উপাদানজাত বস্তু একটি বস্তুবিশেষ হইলে তাহাকে অখণ্ড যদি বলা যায়, তাহাও যথার্থ অখণ্ড নহে। কারণ অখণ্ড বস্তুর ভিতর-বাহির থাকে না। থাকিলে আর তাহা অখণ্ড ঠিক ঠিক হয় না। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই সব কথা সঙ্গত বলিয়া বুঝা যায় না।

তাহার পর বলা হইয়াছে—অখণ্ড ক্রিয়ারূপ জ্ঞানের বিষয় জগৎ-জীববিশিষ্ট এক অখণ্ড পরমাত্মা। এ কথার সার্থকতা কি? যাহাই জানা যায়, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হয়। সবিষয় জ্ঞানকেই বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়, বৃত্তিশূন্য জ্ঞান নির্বিষয় হয়। উহাই আত্মা বা ব্রহ্মবস্তু বলা হয়। এই বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়কে জীব-জগৎ ও অখণ্ড পরমাত্মা বলিবার উদ্দেশ্য কি? যদি ইহার উদ্দেশ্য হয়—বিষয়কে জড় ও চেতনে বিভক্ত করা, তাহা হইলে জড় ব্যতীত জীব কে কোথায় দেখিয়াছে? আর জীব ব্যতীতই বা জড় কোথায় কে দেখিয়াছে? চেতন ব্যতীত জড় কোথায়? জীবমধ্যে জড় ও চেতন উভয়ই দৃষ্ট হয়। আর জীবও কি জগতের মধ্যে নয়? অতএব এই বিভাগ যথার্থ বিভাগ-পদবাচ্য নহে। ব্যবহার সম্পাদনার্থ এই বিভাগ। ব্যবহার ভ্রমজ্ঞান দ্বারাও হয়, প্রমাজ্ঞান দ্বারাও হয়।

তাহার পর অখণ্ড পরমাত্মাই বা জ্ঞানের বিষয় হয় কি করিয়া? জ্ঞান ও তাহার বিষয় পরমাত্মা স্বীকার করায় জ্ঞানসত্তা দ্বারা পরমাত্মা আর অখণ্ড হইতে পারে না। দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য বস্তুই অখণ্ড হয়। অখণ্ড বস্তুর সঙ্গে বা তাহার মধ্যে অন্য বস্তু স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব অখণ্ড পরমাত্মাকে জ্ঞানের বিষয় বলা ভ্রম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সাধারণতঃ আমাদের অদ্বৈত দর্শনে যে এই বিভাগ দেখা যায়, তাহা অজ্ঞের স্বীকৃত বিষয়ের দ্বারা উপদেশ করিবার জন্য।

তাহার পর বিষয়ের সত্তা জ্ঞানের সত্তার অধীন, জ্ঞান না থাকিলে বিষয় থাকে কি করিয়া? যাহা আছে, অথচ জানি না বলা হয়, তাহার সত্তাও জ্ঞানাধীন সত্তা। সেখানে অজ্ঞানকে দ্বারস্বরূপ করিয়া তাহার সত্তা সিদ্ধ হয়। যাহাই কোন না কোনওরূপে বিষয় হয়, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, তাহারই সত্তা জ্ঞানাধীন। যাবদ্ বস্তুই জ্ঞানের আকার, এজন্য বিষয় মাত্রই জ্ঞানাধীন-সত্তাক। জ্ঞান হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা স্বীকার ব্যবহারসম্পাদনার্থ মাত্র। জ্ঞানাকার বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না, এজন্য জ্ঞানের এই আকারকে অনির্ব্বচনীয় বলা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কয়েক পংক্তি পরেই বলা হইয়াছে "অনাত্মা জড় বলে কোনও বস্তু নাই।" অথচ অনাত্মা না থাকিলে জ্ঞানের আকার আসে কোথা হইতে? আকার ও জ্ঞান ত অভিন্ন বস্তু নহে। অতএব জ্ঞানের বিষয় জীব, জগৎ ও পরমাত্মা বলাই ভ্রম! জ্ঞান ও তাহার আকার অভিন্ন বলাও ভ্রম, ভিন্ন বলাও ভ্রম, আর ভিন্নাভিন্ন বলাও ভ্রম। অভিন্ন হইলে জ্ঞানের আকার—এরূপ বলা হইত না, ভিন্ন বলিলে জ্ঞান ভিন্ন অন্যত্রও আকার থাকিত। ভিন্নাভিন্ন বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। এ জন্য এই আকারের স্বরূপ নির্ণয় হয় না।

যদি বলা হয়, ঘটের আকার যেমন মৃত্তিকাতে থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানেও থাকে; ঘটের আকার সুবর্ণ-ঘটে ও মৃন্ময়-ঘটে—উভয় স্থলেই থাকে? অতএব আকার অন্যত্র থাকিল, বলিব না কেন? ইহাও অসঙ্গত? কারণ, জ্ঞানের আকার জ্ঞান ভিন্ন কোথায় থাকে, মৃত্তিকার আকার মৃত্তিকা ভিন্ন কোথায় থাকে? সুবর্ণঘটের আকার ও মৃন্ময়ঘটের আকার ঘটেই থাকে, সুবর্ণ বা মৃত্তিকাতে থাকে না। আকার যদি আকারী ভিন্ন কোথাও থাকিত, তাহা হইলে আকারের পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ হইত, আর তখন তাহার নির্ব্বচনও সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া আকারকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। আর অনির্ব্বচন হইলে আমরা নির্ব্বচন করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমাদের বুদ্ধির দুর্ব্বলতাই বুঝাইল, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নির্ব্বচন না হইলেও তাহা থাকে, এ কথা বলা যায় কি করিয়া? যাহা থাকে তাহারই নির্ব্বচন হয়, যাহা থাকে না অথচ প্রতীত হয়, তাহারই কেবল নির্ব্বচন হয় না। "আকার" ঠিক এইরূপ বস্তু, এজন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই জন্যই দৃশ্য বা জ্ঞেয়মাত্রেরই আকার থাকে। আর তাদৃশ সাকার দৃশ্যমাত্রই অনির্ব্বচনীয় বলা হয়।

যদি বলা হয়, এই আকার বাদ দিলে কিছুই থাকে না—বলিব? তাহা বলা যায় না। কারণ, সাকার সকল বস্তুরই আকার পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। আর এই আকার একেবারে বাদ দিলে নিরাকার নির্গুণ এক অদ্বৈত সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ একটি বস্তু থাকিয়া যায়। তাহা আছে, কিন্তু কিরূপ, কি প্রকার, কিমাকার কিছু বলা যায় না। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সত্তাসামান্য বা জ্ঞানসামান্য ব্রহ্ম বা আত্মা। আকার বাদ দিলে ইহাই থাকে। এইরূপ একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত বিরোধের নিয়ম স্বীকার করিয়াই লভ্য হয়, বিরোধের নিয়ম অমান্য করিয়া ভেদাভেদবাদ দ্বারা কোনও সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ইহা আমরা এখনই দেখাইতেছি। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় অখণ্ড পরমাত্মা হয় না, ইহাই এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শিত হইল।

দ্বাদশ—এইবার ক্যান্টেরও ভ্রম দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিতেছেন—"যা হোক ক্যান্ট জ্ঞানের এই অখণ্ডত্ব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তাহা দৃঢ়রূপে ধরতে পারেননি। জ্ঞানের বাহিরে একটি স্বাধীন বস্তু (thing in itself) আছে, যা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ আসছে। এই ধারণা তাঁহার সমস্ত দর্শনের বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেননি। * * * সর্ব্বাধার ব্রহ্মের ধারণাটাকে তিনি একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান যে আমাদের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এক, সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক, তা বুঝতে পারেননি।"

এতৎপ্রসঙ্গে বলিতে হয়—ক্যাণ্ট জ্ঞানের অখণ্ডত্ব দেখাইয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি ক্যাণ্টের আগে কেহ ইহা দেখান নাই? লেখার সুর হইতে ত তাহাই বুঝায়। এজন্য বলিব—যিনি পঞ্চদশী গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তিনি প্রথমেই ইহা দেখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় পঞ্চদশী গ্রন্থ পড়িয়াও কেন ওরূপ কথা বলিলেন, বুঝা গেল না। তাহার পর এই কথাটা "ক্যাণ্ট দৃঢ়রূপে ধরতে পারেননি" ইহার কারণ কি এই যে, ক্যাণ্ট, "জ্ঞানের বাহিরে একটা স্বাধীন বস্তু (thing in itself) আছে, যা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ আসছে"—এই কথা বলিয়াছেন? কিন্তু ক্যাণ্টের এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলিয়া বুঝিলে ত তাঁহার (ক্যাণ্টের) কথার কোনও অসঙ্গতি দেখা যায় না। বৃত্তিজ্ঞানের বাহিরে জ্ঞানের আকার সমর্পকরূপে বিষয় থাকে, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই, ইহা খুবই সঙ্গত কথা। "এই ধারণা তাঁহার সমস্ত দর্শনের বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেননি"—এইরূপ মন্তব্য ক্যাণ্ট সম্বন্ধে প্রকাশ করা যেন একটু ব্যগ্রতার পরিচয় নহে কি? ক্যাণ্টের মত ব্যক্তি সহজে স্ববিরুদ্ধ কথা বলিবেন, সংস্কারের বশীভূত হইয়া একটা কথা বলিবেন—ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। আমাদের মনে হয়, আমরাই তাঁহার কথা বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্ত্য দেশেই ক্যাণ্টের মত বুঝা সম্বন্ধে অনেক বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে শুনা যায়। তাহার পর "সর্ব্বাধার ব্রহ্মের ধারণাকে ক্যাণ্ট একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন" এ কথাতেও অসঙ্গতি কোথায়? কারণ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান ত আমরা অভিন্ন বলিয়া বুঝি। ধারণা ত জ্ঞানই। অতএব ইহাতেও ত ক্যাণ্টের দোষ দেখা যায় না। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান যে অভিন্ন, তাহা যুক্তি ও শ্রুতিসিদ্ধ। এস্থলে সে কথা প্রমাণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ক্যাণ্টের এ কথায় শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে দোষ দেখিলেন, তাহার কারণ তিনি বলিতেছেন, "ব্রহ্মজ্ঞান যে আমাদের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এক, সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক, তা (ক্যাণ্ট) বুঝতে পারেননি।" কিন্তু এই কথায় যে কত দোষ হইল, তাহা একবার দেখা যাউক—

আচ্ছা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম, তাহা আত্মজ্ঞানের বিষয় যে আত্মা তাহা অভিন্নই হয়। অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান দুইটি এক হওয়ায় তাহাদের বিষয় ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্নই হয়। কিন্তু তাহা হইলে "সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক" এ কথা সঙ্গত হয় কি করিয়া? মূলে এক বলায় সকল অবস্থায় এক নহে, ইহা কি বলা হইল না? মূল শব্দের প্রয়োগ যখন করা হইয়াছে, তখন সসীম জীবের সহিত অসীম পরমাত্মার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বলাই হইতেছে, কারণ, মূল শব্দের অর্থই কারণ। এখন তাহা হইলে সসীম জীবটি কার্য্য এবং অসীম পরমাত্মাটি কারণপদবাচ্য হইল। জীব পরমাত্মার কার্য্য হওয়ায় সমগ্র পরমাত্মারই বিকার হয়, ইহা স্বীকার্য্য হইল। আর যদি পরমাত্মার একদেশ বিকৃত হইয়া জীব-কার্য্যের উৎপত্তি হয়—বলা হয়, কিন্তু ইহা বলিলেও পরমাত্মারই বিকার স্বীকার্য্য হইল। কারণ, অংশকে অংশীর নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, উপাদান দৃষ্টিতে অংশ ও অংশী এক বলা হয়। যেমন ঘট ও শরাব মৃত্তিকা-দৃষ্টিতে এক বলা হয়। আর অংশকে অংশীর নামে অভিহিত করা ভ্রম বলিলে অংশ ও অংশী দুইটি ভিন্ন বস্তু কেন বলা হইবে না! এতদ্ব্যতীত পরমাত্মার অংশ স্বীকার করায় পরমাত্মা আর অখণ্ড হইলেন না। যাহার খণ্ড আছে তাহা সাবয়ব। যাহা সাবয়ব তাহা বিনাশী, অতএব পরমাত্মা অনিত্য বস্তু হইলেন। আর সমগ্র পরমাত্মার বিকার হইলে পরমাত্মা আর নাই; এবং তাঁহার এই কার্য্যাবস্থা ইহাও আর বলা যায় না। সমগ্র দুগ্ধ দধি হইলে যেরূপ দুগ্ধ আর থাকে না, তদ্রূপ পরমাত্মা আর নাই।

যদি বলা যায়, পরমাত্মার শক্তির বিকার হইয়াছে, পরমাত্মার বিকার হয় নাই, তাহাও বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, শক্তি কখনও শক্তিমান্ ছাড়িয়া থাকে না। সুতরাং শক্তির বিকার হইলে শক্তিমানের বিকারই হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপে জীব-ব্রহ্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

যদি বলা হয়, জীব ও পরমাত্মার সহিত অংশাংশিসম্বন্ধ, অর্থাৎ পরমাত্মার এক অংশ জীব, সুতরাং পরমাত্মার এক অংশের বিকার হইল, অন্য অংশের বিকার হইল না। এজন্য উভয়-অংশ-সাধারণ যে পরমাত্মবস্তু, তাহা বিকারীও বটে, অবিকারীও বটে। অতএব "সসীম জীব মূলে অসীমের সঙ্গে এক" এ কথার অসঙ্গতি থাকিল না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, পরমাত্মার জীবরূপ বিকারী অংশ এবং পরমাত্মার জীবভিন্নরূপ অবিকারী অংশের সাধারণ নাম পরমাত্মা বলিলে ভ্রমই হইবে। কারণ, পরমাত্মার যে অংশ বিকারী, সেই অংশ আর অবিকারী পরমাত্মা হইল না। বিকারী অবিকারী এই অংশদ্বয়-সাধারণ পরমাত্মা বলাই ভ্রম। কারণ, পরস্পর বিরুদ্ধের মধ্যে সাধারণ অংশই থাকে না। থাকিলে আর তাহারা বিরুদ্ধই হয় না।

আর যদি বলা হয়, পরস্পর-বিরুদ্ধ অংশ-দ্বয়কেই পরমাত্মা বলি, তাহা হইলে উক্ত পরমাত্মা উক্ত অংশদ্বয় হইতে অভিন্ন বস্তুই হইল। আর তাহা হইলে পরমাত্মা আর উভয় হইতে transcend করিলেন না। ধর্ম্ম, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদ-পুরস্কারে বিরুদ্ধদ্বয়ের মধ্যে এই যে সাধারণ অংশ, ইহা তখন মিথ্যা বা কল্পিত সাধারণ অংশ হইল। বিরুদ্ধ অংশদ্বয়ের যদি সাধারণ অংশ থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই পরস্পর-বিরুদ্ধ অংশদ্বয়ের সহিত কোনই সম্বন্ধ থাকিল না। বিকারী ও অবিকারীর সাধারণ অংশ কতকটা বিকারী ভিন্ন এবং কতকটা অবিকারী ভিন্নই হইবে, সুতরাং অবিকারী পরমাত্মাংশ নিজে নিজ হইতে ভিন্ন হইল। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত কথা। আর বিকারী পরমাত্মাংশ কতকটা অবিকারী হইলে, সেই বিকারী অংশকেই পরমাত্মার অংশ বলা যায় না। অতএব জীবের সহিত অংশী পরমাত্মার ভিন্নাভিন্ন-সম্বন্ধ সম্ভবপর হইল না। সুতরাং মূলে এক বলায় পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব ইহাও বলা যায় না। অথবা পরমাত্মার অংশ জীব বলিয়া পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব, এরূপ কথা বলা যায় না। আর যদি "পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব" ইহার অর্থ বিবর্ত্তবাদ অনুসারে করা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইল। সুতরাং "সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক"—এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ক্যাণ্ট ইহা না বুঝিতে পারিয়া আমাদের মনে হয় ভালই করিয়াছেন। অসীম বস্তু কি কাহারও মূল হয়। অসীম হইলেই অখণ্ড অদ্বৈত ও নিষ্ক্রিয় বস্তুই হয়।

ত্রয়োদশ—তাহার পর বলা হইতেছে—"আমাদের ধারণাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি (ক্যাণ্ট) বুঝেছেন যে, প্রত্যেক ধারণারই বিপরীত ধারণা আছে বটে, কিন্তু এই দুই ধারণার ভেদের ভিতরে অভেদও আছে। এই যে প্রত্যেক বস্তুতে ভেদাভেদদর্শন, একেই বলে Dialectic method। ক্যাণ্টের অব্যবহিত পরবর্ত্তী জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টে শেলিং হেগেল, বিশেষরূপে হেগেল, ক্যাণ্টের ভুল দেখাতে গিয়ে এই Dialectic methodএ ভেদাভেদ-ন্যায়ে উপনীত হলেন। হেগেল ও তাঁর ইংরেজ অনুবর্ত্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই তাঁদের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ দর্শন স্থাপন করেছেন। আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত উপনিষদ-ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন।"

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "প্রত্যেক ধারণারই বিপরীত ধারণা আছে"—ইহার অর্থ—সকল ধারণার অর্থাৎ সকল জ্ঞানের একটা বিপরীত ধারণা আছে অর্থাৎ একটা বিপরীত জ্ঞান আছে, ধারণা অর্থ—জ্ঞান। যেহেতু, ঘট এই জ্ঞানে ঘট-জ্ঞান যেমন আছে, তদ্রূপ ঘটাভাব এই জ্ঞানও আছে। ইহা না থাকিলে ঘটজ্ঞানটি পূর্ণ নয়। আর তজ্জন্য ঘটজ্ঞানের বিষয় যেমন ঘট আছে, তদ্রূপ ঘটাভাব-জ্ঞানের বিষয় ঘটাভাবও আছে। এই ঘটাভাব থাকে ঘটভিন্ন পটাদিতে। তদ্রূপ পটাভাব থাকে পটভিন্ন ঘটাদিতে। ঘটধারণার বিপরীত ধারণা পটধারণা বলিলে ঠিক বিপরীত ধারণা বুঝায় না। উহা ঘটধারণার বিপরীত পটমঠাদি অসংখ্য ধারণার মধ্যে একটি ধারণাই হয়। এজন্য ঘটধারণার বিপরীত ধারণা ঘটাভাবের ধারণা। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতে ক্যাণ্ট ইহা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটধারণা ও ঘটাভাবধারণার মধ্যে যে অভেদ আছে,—তাহা তিনি বুঝেন নাই! আমাদের মনে হয়, ক্যাণ্ট ইহাতে ভালই করিয়াছেন।

কারণ, ঘটজ্ঞান ও ঘটাভাবের জ্ঞানের মধ্যে অভেদ কোথায়? ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘটকে বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে এবং ঘটাভাবের জ্ঞানের বিষয় ঘটাভাবকে বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে, তাহারা অভিন্ন হয় বটে, অর্থাৎ সেই জ্ঞানদ্বয়ে অভেদ থাকে বটে, কিন্তু বিষয় দুইটি বাদ না দিলে কি বিশিষ্ট জ্ঞানদ্বয়ে অভেদ থাকে বলা যায়? কখনই নহে। বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। কারণ, বিষয়শূন্য জ্ঞান ত স্বীকার্য্য নহে। আর ঘট-শরাবমধ্যে মৃত্তিকা অংশে অভেদ আছে বটে, ধনুকের বা একটি বক্ররেখার ন্যুব্জ কুব্জ ধর্ম্ম মধ্যে ধনুক অংশে বা রেখা অংশে অভেদ আছে বটে, ঘটজ্ঞান ও ঘটাভাবজ্ঞানে বিরোধিতা অংশে অভেদ আছে বটে, কিন্তু যে অংশে ভেদ, সেই অংশে কি অভেদ থাকে? ঘট-শরাবে ঘটত্ব ও শরাবত্ব অংশে ভেদই থাকে, অভেদ ত থাকে না। মৃত্তিকা অংশেই অভেদ থাকে। এইরূপ অন্য দুইটি স্থলেও ধর্ম্মভেদে অভেদ থাকে বুঝিতে হইবে। অতএব এমন কোনও দৃষ্টান্ত নাই, যেখানে যে ধর্ম্মে ভেদ, সেই ধর্ম্মে অভেদও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। ইহা বিরুদ্ধ কথা। ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। আর যদি দুইটি বিষয়ের একটি ধর্ম্মে ভেদ, এবং অন্য ধর্ম্মে অভেদ হয়, তাহা হইলে সেই দুই বিষয়ে ভেদই থাকিল, ভেদাভেদ আর থাকিল না। একই ধর্ম্মে ভেদ এবং সেই একই ধর্ম্মে অভেদ থাকিলে ভেদাভেদ বলার সার্থকতা হয়, নচেৎ ভেদাভেদ বলা ব্যর্থ। কারণ, সব "ভিন্ন" পদার্থেই এইরূপ ভেদাভেদ দেখাইতে পারা যায়। এইরূপ "সম্বন্ধ" ও "অবচ্ছেদ" লইয়াও ভেদাভেদের বিচার আছে। যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট, যে ভূতলে, যে কালে থাকে, সেই ভূতলে সেই কালে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাভাব আর থাকে না, এবং বৃক্ষের যে অবচ্ছেদে অর্থাৎ যে অংশে পক্ষী যে কালে বসে, বৃক্ষের সেই অবচ্ছেদে অর্থাৎ সেই অংশে পক্ষী সেই কালে থাকে না—ইহা বলা যায় না। এই কারণে, ধর্ম্ম, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদ এই তিনটি লইয়াই বিরোধের পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন যে বস্তু, যে ধর্ম্মে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যেখানে থাকে, সেই ধর্ম্মে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সে বস্তু সেখানে নাই—ইহা বলা যায় না। বলিলে বিরুদ্ধ কথা হয়। ভেদ ভিন্ন অভেদ হওয়ায় অর্থাৎ ভেদ ও অভেদের মধ্যে এইরূপ বিরোধ থাকায় ইহারা একত্র থাকিতেই পারে না। আর যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধ অবচ্ছেদের একটি অবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর ভেদের মধ্যে অভেদ থাকিল না। তাহাদের মধ্যে তখন ভেদই থাকিল। এই ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর। কারণ, ভেদবাদীরা এই কথাই বলেন।

যদি বলা হয়, যখনই যাহার জ্ঞান হয়, তখনই তদ্‌ভিন্নেরও জ্ঞান হয়, তদ্‌ভিন্নের জ্ঞান ব্যতীত তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয় না, অতএব সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক। এজন্য ভেদের মধ্যে অভেদ থাকিবে না কেন? কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, যখনই যাহার জ্ঞান হয়, তখনই তদ্‌ভিন্ন সমুদায়েরই জ্ঞান হয় না। যেমন পুস্তকের জ্ঞান কালে পুস্তকভিন্ন পুস্তকাধার লেখনী প্রভৃতি কতিপয় বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক হইলেও তদ্‌ভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান ত হয় না। অতএব তদ্‌ভিন্নের পূর্ণ জ্ঞানই হয় না। এজন্য তদ্‌বস্তুর জ্ঞানের জন্য তদ্‌ভিন্নের জ্ঞান আবশ্যক হয় না বলা যায়।

যদি বলা যায়, তদ্‌বস্তুজ্ঞানের জন্য তদ্‌ভিন্নসমুদায়ের জ্ঞান আবশ্যক না হইলেও জ্ঞাত তদ্‌ভিন্ন সমুদায়ের জ্ঞান আবশ্যক হয়, অজ্ঞাত তদ্‌ভিন্ন সমুদায়ের জ্ঞান অনাবশ্যক হয় হউক, তদ্‌ভিন্ন কতকগুলি বস্তুর ত জ্ঞান আবশ্যকই হয়। পুস্তকজ্ঞানে গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান অনাবশ্যক হইলেও পুস্তকাধার প্রভৃতি তদ্‌ভিন্নের জ্ঞান ত আবশ্যকই হইবে। নচেৎ ব্যবহার অচল হইবে? তাহা হইলে বলিব, সে স্থলেও যাবদ্ জ্ঞাত বস্তুরও জ্ঞান অনাবশ্যক, কতকগুলি জ্ঞাততদ্ভিন্নেরই জ্ঞান আবশ্যক হয়। এজন্য তদ্‌ভিন্নজ্ঞানের আবশ্যকতা বলা অযুক্ত। এরূপ বলিলে অংশীর কার্য্য অংশের দ্বারা সিদ্ধ করা হয়। ইহাও অযুক্ত। ব্যবহারেও ইহা বাধিত হয়। এজন্য নৈয়ায়িক প্রভৃতি অনেক ভারতীয় দার্শনিক, তদ্‌বস্তুর জাতি বা অনুগত ধর্ম্ম দ্বারা তদ্‌বস্তুর জ্ঞানের পূর্ণতা হয়, স্বীকার করেন। বস্তুতঃ দেখাই যায়—এক-রূপ কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে বাছিয়া লওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কি ভেদ, তাহা নির্ব্বাচন-কর্ত্তা বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। সেখানে সেই বস্তুর জাতি বা আকার-বিশেষই সেই নির্ব্বাচনের হেতু হয়। অতএব তদ্‌বস্তুর জ্ঞানের জন্য তদ্‌ভিন্নবস্তুর জ্ঞান আবশ্যক, ইহা অসঙ্গত কথা। জাতি বা অনুগত ধর্ম্ম দ্বারা তদ্‌বস্তুর জ্ঞানেরও পূর্ণতা এবং ব্যবহারও সম্পাদিত হয়। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, গুড় ও ইক্ষুর মিষ্টতা শব্দ দ্বারা সরস্বতীও বুঝাইতে পারেন না।

যদি বলা যায়, জাতিও তদ্‌জাতিমদ্‌ভিন্নের ধর্ম্মের অভাবস্বরূপই বস্তু। অতএব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান পূর্ণ হয়, ইহা না বলিয়া তদ্‌জাতিমদ্‌ভিন্নের ধর্ম্মের অভাব দ্বারাই যে কোন বস্তুর জ্ঞানের পূর্ণতা হয় ইহা বলাই সঙ্গত। অতএব কোন বস্তুর জ্ঞানকালে তদ্‌ভিন্নবস্তুর

জ্ঞান অনাবশ্যক, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক বলা অসঙ্গত কেন হইবে? কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, জাতির জ্ঞানে ভাব পদার্থেরই জ্ঞান ভাসমান হয়, জাতিকে অভাবরূপে আমরা বুঝি না। ঘটে ঘটত্বই জাতি, কম্বুগ্রীবাদিমত্বই অনুগত ধর্ম্ম, তাহারই ভান ঘটজ্ঞানে হয়, তাহা পটমঠাদিভিন্ন এ ভাবে ঘটের জ্ঞান হয় না। ব্যবহারকালে তাহার আবশ্যকতা হইলেও জ্ঞানকালে তাহার আবশ্যকতা নাই।

যদি বলা যায়, যে বস্তুরই জ্ঞান হয়, তাহাতে সেই বস্তুকে "সেই বস্তু" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা নিজে নিজের ভেদের অভাবের জ্ঞান অর্থাৎ অভেদের জ্ঞান, এবং তদ্‌ভিন্নের ভেদের যে জ্ঞান হয়, তাহা ভেদের জ্ঞান—এইরূপে সকল বস্তুর জ্ঞানে ভেদ ও অভেদের জ্ঞান হয়। ইহা না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক? কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ, সেই বস্তুতে যে সেই বস্তুর জ্ঞান, তাহা প্রকারান্তরে নিজে নিজের অভাবরূপের জ্ঞান হইলেও তাহা সেই বস্তুর ভাবরূপের জ্ঞান বলিয়া প্রতিভাত হয়, অভাবরূপে প্রতিভাত হয় না। তাহা একটা কিছুর জ্ঞান বলিয়া তাহা ভাবরূপেরই জ্ঞান। অতএব সেই বস্তুতে সেই বস্তুর জ্ঞান, প্রকারান্তরে অভেদের অর্থাৎ ভেদের অভাবের জ্ঞান হইলেও তাহা একটা ভাবরূপেরই জ্ঞান হয়। তাহাতে অভাবের জ্ঞান অগ্রে হয় না, অগ্রে ভাবেরই জ্ঞান হয়, পরে কল্পনার সাহায্যে তাহাকে অভাবের অভাব বলা হয়। আবার সেই বস্তুতে তদ্‌ভিন্নের যে ভেদ-জ্ঞান হয়, তাহা ভেদের জ্ঞান নয়, কিন্তু ভেদ-বিশিষ্টের অর্থাৎ ভিন্নের জ্ঞান হয়। যেহেতু, ঘটভিন্ন যে পটাদি, সেই পটাদিভিন্নই ঘট হয়। পটাদির ভেদ ঘটাদি নহে। ঘটাদিতে সেই ভেদ থাকে, সেই ভেদ ঘটাদি হয় না। আধার কখনও আধেয় হয় না। আধার আধেয় ভিন্নই হয়। অতএব সকল জ্ঞানই ভেদা-ভেদাত্মকের জ্ঞান—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। ভেদবিশিষ্টের অর্থাৎ ভিন্নের জ্ঞানে ভেদ হয় বিশেষণ, এবং যাহাতে সেই ভেদ থাকে, তাহা হয় বিশেষ্য। বিশেষণ অপেক্ষা বিশেষ্যেরই প্রাধান্যই হয়।

যদি বলা হয়, সকল বস্তুতে তাহার ভাবরূপের জ্ঞান হইলেও তাহা যে ভাবাভাবাত্মক হয়, অর্থাৎ ভেদাভেদাত্মক হয়, তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞান হয় না বলিয়া জ্ঞেয় বস্তুর ত অন্যথা হয় না। অতএব সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক বলিতে পারা যায়। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। যাহা কল্পিত হয়, তাহার সত্তাও সিদ্ধ হয় না। নিজে নিজের ভেদের অভাবের জ্ঞান, ইহা কল্পনা করিয়া বুঝিতে হয়, এজন্য এই অভেদ কল্পিত পদার্থ। আর জাতির দ্বারা যখন তদ্‌ভিন্নের ভেদজ্ঞানের কার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন তাহার স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। অতএব কল্পিতের সত্তার দ্বারা অকল্পিতের স্বরূপ সিদ্ধ করা ব্যর্থ হয়! এ কারণ, বেদান্তিগণ ব্যবহারক্ষেত্রে ভেদাভেদ স্বীকার করিলেও ভেদ মিথ্যা এবং অভেদ সত্য, এই ভাবে ভেদাভেদ স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই ভেদাভেদবাদী, তবে তন্মতে উভয়ই সত্য বলা হয়। ইহা ক্যাণ্ট হেগেলের বহু বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব হেগেল ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা ইহা বলা সঙ্গত হয় না। আর এইরূপ নানা কারণে উক্ত **Dialectic method** একটি শব্দাড়ম্বর মাত্র। ইহা ব্রহ্মবিচারের পথই নহে। যে পথে বিরোধ অমান্য করা হয়, সেই পথ পথই নহে। বিরোধ অমান্য করিলে বক্তাকে লোকে বাতুলই বলে।

তাহার পর "ভেদের মধ্যে অভেদ দর্শন" এই কথাটির অর্থও বুঝিতে হইবে। এই নামকরণেও বাহাদুরী আছে! ভেদের মধ্যে অভেদ দেখাকে যদি ভেদ নামক অভাব বস্তুকে অভেদ অর্থাৎ ভেদা-ভাবরূপ একটি ভাববস্তু বলিয়া দেখা—ইহা বলা যায়, তবে অভাবকে ভাব বলিয়া দেখায় তাহা অপ্রমা অর্থাৎ ভ্রমপদবাচ্য হইল। যদি ভেদে অভেদ অর্থাৎ ভেদাভাবরূপ অভাব দেখা হয়, তাহা হইলেও ভ্রম হয়।

যদি বলা যায়, ভেদে অভেদ দর্শন—ইহার অর্থ; ভেদবিশিষ্ট যে ভিন্ন নামধেয় বস্তু, সেই ভিন্নে অভেদ, অর্থাৎ ভেদাভাব দর্শন, তাহা হইলে তাহাও ভ্রম হয়, কারণ, যাহা ভিন্নপদবাচ্য হয়, তাহা ভাব-বস্তুও হয়, অভাব বস্তুও হয়। অতএব ভিন্ন নামক ভাববস্তুতে অভাব দর্শন হইলে তাহা ভ্রমই হয়। এখানে অভাবে অভাবদর্শন সম্ভবপর নহে, কারণ, এখানে ভাববস্তুরই কথা হইতেছে। অতএব "ভিন্নে অভাবদর্শন" ভ্রমই হয়। আর তজ্জন্য "ভেদের মধ্যে অভেদদর্শন" বাক্যের অর্থ এরূপও হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, ভেদের মধ্যে অভেদদর্শন—ইহার অর্থ—ভিন্নে অভিন্নদর্শন বলিব, তাহা হইলেও বিরোধ হয়, আর তজ্জন্য তাহাও ভ্রমপদবাচ্য হয়। অতএব ইহার অর্থ, এক ধর্ম্মে ভিন্নদর্শন এবং অন্য ধর্ম্মে অভিন্নদর্শন—এইরূপ করিলে "ভিন্নে অভিন্নদর্শন" কথাটা সঙ্গত হয়। আর তাহা হইলে ভেদের মধ্যে অভেদদর্শনের অর্থ ধর্ম্মভেদে ভিন্নে অভিন্নের দর্শন করিলে কতকটা সঙ্গত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন, ঘট ও শরাবে ঘট ও শরাব দর্শন—"ভিন্নে ভিন্নদর্শন" হয়, এবং ঘট ও শরাবে মৃত্তিকাদর্শন ভিন্নে অভিন্নের দর্শন হয়। অর্থাৎ ভাব ও অভাবের মধ্যে ধর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অবচ্ছেদের মধ্যে কোন একটির অন্যথা করিয়া যে দর্শন, তাহাতে বিরোধ থাকে না বলিয়া তাহাই ভেদের মধ্যে অভেদদর্শন পদবাচ্য হয়। ইহা কিন্তু ভেদাভেদ-দর্শন হয় না, ইহা বস্তুতঃ ভেদদর্শনই হয়। এজন্য ইহাকে ভেদাভেদ-বাদ বলাও সঙ্গত হয় না। ভেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ যে অভেদ, তাহাদের যদি একত্র অবস্থান হয়, তাহা হইলেই ভেদাভেদ বলার সার্থকতা হয়। নচেৎ তাহা ভেদবাদেরই নামান্তর হয়। এজন্য এতাদৃশ ভেদাভেদ-বাদ শব্দাড়ম্বর মাত্র বলা হয়।

যদি বলা হয়, অবয়ব সকল হইতে অবয়বী, যেমন অবয়ব সকলে থাকিয়াও একটা অতিরিক্ত বস্তু হয় অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু হয়, সমষ্টি যেমন ব্যষ্টিতে থাকিয়াও ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ পৃথক্ হয়, তদ্রূপ ভাব (thesis) এবং অভাব (antithesis) এই উভয়ের মধ্যে থাকিয়াও একটা যে অতিরিক্ত বস্তু (synthesis) স্বীকার করা হয়, তাহাই জগৎকারণ মূল বস্তু, তাহাই ব্রহ্মবস্তু। এই অতিরিক্ত বস্তুটি, ভাব ও অভাবে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত বা অনুপ্রবিষ্ট থাকে, অথচ তদতিরিক্ত বস্তুও হয়। অর্থাৎ, ইহা ভাববস্তুও হয়, এবং ভাবভিন্ন বস্তুও হয় এবং অভাববস্তুও হয় এবং অভাবভিন্ন বস্তুও হয়, ইহাই ভেদাভেদবাদ। বাম হস্ত ও দক্ষিণ হস্তের সহিত দেহের যেরূপ সম্বন্ধ, এই ভাব ও অভাবের সহিত সেই অতিরিক্ত বস্তুরও সেইরূপ সম্বন্ধ। বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হস্তের ভেদ আছে, কিন্তু দেহের সহিত তাহাদের ভেদ নাই। দেহরূপে বাম ও দক্ষিণ হস্ত অভিন্ন, কিন্তু হস্তরূপে তাহারা ভিন্ন। ইহাকে অদ্বৈত বস্তুর স্বগতভেদ বলা যায়, অংশাংশী সম্বন্ধও বলা যায়।

হস্তদ্বয়ই দেহ হইতে অতিরিক্ত নহে, কিন্তু দেহ হস্তদ্বয় হইতে অতিরিক্ত। তদ্রূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্ম মধ্যে আছে, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ অনতিরিক্ত, ব্রহ্ম কিন্তু জীব-জগৎ হইতে অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভিন্নও বটে। এজন্য জীব ও জগৎ এবং তাহাদের যে অভাব—এই ভাব ও অভাব উভয়ের স্বরূপ ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম তদতিরিক্তও বটে। সমষ্টি-ব্যষ্টির সম্বন্ধ, অবয়ব-অবয়বীর সম্বন্ধ, অংশ ও অংশীর সম্বন্ধ, আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটি বেশ বুঝা যায়। সকল জ্ঞানে এই ভেদাভেদ ভাব বর্ত্তমান, সকল বিষয়েও এই ভেদাভেদ বর্ত্তমান। ইহাই ভেদাভেদবাদ। এই ভেদাভেদবাদ দ্বারা শ্রুতির সকল বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা হয়, এজন্য ইহাই শ্রুতিরও তাৎপর্য্য, ইত্যাদি।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে বিরোধের অমান্য করা হয়। যেহেতু, যাহা যদতিরিক্ত হয়, তাহা তদ্‌ভিন্ন হয়। যাহা যদ্‌ভিন্ন, তাহা তাহা হইতে পারে না। হইতে পারে বলিলে বিরোধ হয়। এ স্থলে ভাব ও অভাব হইতে অতিরিক্ত বস্তুটি অতিরিক্ত বলিয়া একবার ভাব হইতেও ভিন্ন হয় এবং অভাব হইতেও ভিন্ন হয়, অন্যবার তাহা ভাবস্বরূপ হয়, এবং অভাবস্বরূপও হয়। নচেৎ অতিরিক্ত বলাই বৃথা হয়। ইহাই ত বিরুদ্ধ কথা। ভাবকে ভাবভিন্ন বলা ভ্রম, তদ্রূপ অভাবকে অভাবভিন্ন বলাও ভ্রম। যেহেতু, ভাবভিন্নই অভাব, এবং অভাবভিন্নই ভাব। যে অতিরিক্ত বস্তু একই দেশকালে একবার ভাব এবং অন্যবার অভাব হয়, তাহাই ত অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহাকে আছে বলা যায় না, নাই বলাও যায় না, এবং আছে-নাই উভয়ও বলা যায় না। এজন্য তাহাকে সদসদ্‌ভিন্ন বলা যায়। ইহাকেই অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হয়। ইহাকে ব্রহ্মবাদ বলা অসঙ্গত। ইহাকে প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদ বলা যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মবস্তুটি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ একটি অখণ্ড নির্ব্বিশেষ বস্তু। তাহা ভেদাভেদাত্মক নহে। আর প্রদর্শিত ভেদাভেদবাদ অবয়বি-অবয়বের ন্যায় নহে, অথবা সমষ্টিব্যষ্টির ন্যায়ও নহে। কারণ, ইহারা সকলেই ভাববস্তু। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাব ও অভাব বস্তুকে লইয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং অবয়ব-অবয়বি মধ্যে বা সমষ্টিব্যষ্টি মধ্যে যেমন অভেদ থাকিতে পারে, এই ভাব অভাবের মধ্যে সেরূপ অভেদ থাকিতে পারে না। অবয়ব-অবয়বি মধ্যে বিরোধ নাই, সমষ্টিব্যষ্টিতে বিরোধ নাই, কিন্তু ভেদ ও অভেদে বিরোধ বিদ্যমান। এই জন্য এই মতবাদটি শব্দাড়ম্বর মাত্র।

বিরোধ না মানিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা ভ্রম হয়, আর যাহা করা যায়, তাহা অন্যায় হয়। বিরোধ-অমান্যকারীর অসাধ্য কিছুই নাই। এমতে উন্নতি, প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য্য। এই মতেই পাপ পুণ্য যে যাহাই করুক না কেন, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই মতেই অনন্ত উন্নতিবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই মতে ভোগত্যাগ সন্ন্যাস প্রভৃতি অনাবশ্যক, এই মতেই সাধনার জন্য শক্তিদেবী আবশ্যক, এই মতে সংযমও সুতরাং নিষ্প্রয়োজন, এই মতেই বলা হয়, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, এই মতেই বলা হয়, অনন্ত বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ। এই মতের ফলে আজ পাশ্চাত্ত্যের মহাসমর চলিয়াছে। এই মতে বলা হয়, জীবন অনন্ত হয়, এই মতেই ভাগবতী নিত্যতনু লাভ হয় বলা হয়। এই মতেই কেহ জন্মান্তর স্বীকার করিয়া অনন্ত উন্নতি বলেন, আবার কেহ বা এই জীবনেই, এই দেহেই অনন্ত উন্নতি বলেন। এই দেহই ক্রমে দিব্য দেহে পরিণত হইবে, এই মতেই বলা হয়, একই কালে একই ব্যক্তিতে ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য হয়। এই মতবাদের বীজ পাশ্চাত্ত্য হইতে আসিয়া ভারতভূমিতে রোপিত এক অতি অদ্ভুত পাপ-পাদপে পরিণত হইয়াছে। এ দেশের ভেদাভেদবাদে ভগবানে ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও উপাসনার স্থান ছিল, পাশ্চাত্ত্য ভেদাভেদবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাতে আর সে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি শ্রদ্ধা ও উপাসনার স্থান নাই, তৎপরিবর্ত্তে যে কোন উপায়ে ভোগনিষ্পত্তির প্রবৃত্তির একাধিপত্য হইয়াছে। আর তাহার ফলে কপটতা কুটিলতা প্রভৃতি বিবিধ পাপের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

যদি বলা যায়, এরূপ জ্ঞান ভ্রম হইলেও এই জ্ঞানের বিষয়বস্তু ভেদাভেদাত্মক হইতে বাধা কি? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা কোনও কালে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তাহার সত্তা স্বীকার করা যায় না, উহা কল্পিত পদার্থ হয়। এই ভেদাভেদে বিরোধ স্বীকার করা হয় না বলিয়া ইহা উপেক্ষার যোগ্য।

তাহার পর সকল ধারণারই যদি বিপরীত ধারণা থাকে, তবে সেই অতিরিক্ত বস্তুরই বিপরীত কিছু থাকিবে না কেন? এবং তদুভয়েরও আবার অতিরিক্ত বস্তু থাকিবে, আবার তাহারও বিপরীত কিছু থাকিবে। এইরূপে কোনও অতিরিক্ত বস্তুতে বিশ্রান্তি ঘটিতে পারিবে না। এজন্য সকল ধারণার বিপরীত ধারণা থাকে, এই কথাই সঙ্গত নহে। আর বিপরীত ধারণা না থাকায় সেই ধারণার বিষয়ও বিপরীতভাবাপন্ন অর্থাৎ ভেদাভেদাত্মক হয় না।

তাহার পর ভাবাভাবাবগাহী যে অতিরিক্ত বস্তুটি হয়, তাহার জ্ঞানকালে তাহার অঙ্গীভূত ভাব ও অভাবের জ্ঞান হয় না, সেই অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞানটি, একটি বস্তুরই জ্ঞান হয়। যেমন ঘটরূপ অবয়বীর জ্ঞানে ঘটাবয়ব কপালের জ্ঞান হয় না, অথবা বৃক্ষের সমষ্টি বনের জ্ঞানকালে ব্যষ্টি বৃক্ষ সকলের জ্ঞান হয় না, কিন্তু ঘট-জ্ঞান-কালে একটি ঘটবস্তুরই জ্ঞান হয়, এবং বনজ্ঞান কালে একটি বনবস্তুরই জ্ঞান হয়। ঘটমধ্যে ঘটাবয়ব থাকিলেও সেই অবয়বের জ্ঞান হয় না, বনমধ্যে বৃক্ষ থাকিলেও বৃক্ষের জ্ঞান হয় না। অতএব ভাব ও অভাবের অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞানকালে সেই পরস্পর বিপরীত ভাব ও অভাবের ভান হয় না। তদ্রূপ জগৎকারণ ব্রহ্মের জ্ঞান-কালে ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়, জগৎ এবং তাহার অভাবের জ্ঞান হয় না। এই কারণে জ্ঞানও ভেদাভেদাত্মক নহে, জ্ঞানের বিষয়ও ভেদাভেদাত্মক হয় না; সুতরাং ব্রহ্মও ভেদাভেদাত্মক নহে।

এই ভেদাভেদবাদের রহস্য এই যে, এই ভেদাভেদবাদের ভেদ ও অভেদ উভয়ই যদি সমান সত্য হয়, যদি একই দৃষ্টিতে ভেদ এবং অভেদ হয়, অর্থাৎ যদি একই ধর্ম্ম, সম্বন্ধ, অবচ্ছেদে যদি ভেদ ও অভেদ হয়, তাহা হইলে এই ভেদাভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, এবং তখন ইহা অনির্ব্বচনীয় বস্তু হইয়া যায়। তখন ইহা বেদান্তের সম্মতও হয়; কারণ, বেদান্তমতে ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অনির্ব্বচনীয় বলা হয় এবং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অখণ্ড অদ্বয় বস্তু। আর যদি এক দৃষ্টিতে ভেদ এবং অন্য দৃষ্টিতে অভেদ হয়, এবং ইহারা সমান সত্য বলা হয়, তখন ইহাকে ভেদবাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ তখন ইহাকে ভেদবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতবাদমধ্যে গণ্য করা

হয়। এই মত দ্বারা ব্যবহার সুসম্পন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ সহায়তা হয়, জাগতিক উন্নতির বিশেষ অনুকূলতা হয়; যেহেতু, ঘটশরাবাদির মধ্যে মৃত্তিকা দর্শনের ন্যায়, যাবদ দৃশ্য পদার্থের মধ্যে একটি সাধারণ বস্তুর অন্বেষণে সুবিধা হয়। ফলে জড়ের উপর আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। ইহার শেষ প্রকৃতি পর্য্যন্ত। এই মতে উপাসকের গতি জগৎকারণ প্রকৃতিতে লয় পর্য্যন্ত। আর প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া এই গতিতে জন্ম-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। জন্ম-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে অপরির্ত্তনীয় বস্তু হইতে হইবে। আর যদি ভেদ মিথ্যা এবং অভেদ সত্য—ইহাই ভেদাভেদবাদ হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রথম কল্পের ন্যায় বেদান্ত সিদ্ধান্তই হয়, কারণ, ব্রহ্ম এক অভিন্ন বস্তু, ইহাই সত্য এবং ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু বিভিন্নস্বভাব বস্তু, উহা মিথ্যা অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ দেখা যায় কিন্তু নাই। ইহাতে মুক্তির সাধন বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে।

এখন "হেগেল ও তাঁহার ইংরেজ অনুবর্ত্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই তাঁহাদের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ-দর্শন স্থাপন করেছেন"—এই কথায় মনে হয়, বেদান্তের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ দর্শনটি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের স্কন্ধে চাপান হইতেছে মাত্র। পাশ্চাত্ত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ চারি দিকে পাশ্চাত্ত্য হেগেলীয় দর্শন দেখা হইতেছে মাত্র। "আত্মবাদ ব্রহ্মবাদ" শব্দ বৈদিক শব্দ, ইহা বৈদিক সম্প্রদায়ের কথা। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই শব্দ নিজ নিজ দর্শনে প্রয়োগ করেন নাই। সিদ্ধান্তের কথঞ্চিৎ সাম্য দেখিয়া এক্ষণে তাঁহাদের দর্শনের এইরূপ নামকরণ করা হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মবাদের বা আত্মবাদের ব্রহ্ম বা আত্মা যে লক্ষণাক্রান্ত, তাহা স্বাধীন যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা জানিতে পারা যায় না। বেদ হইতে তাহার সন্ধান পাইয়া যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা তাহার সম্ভাবনা সিদ্ধ করা হয় মাত্র, তাহার বিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন করা হয় মাত্র। বৈদিক ব্রহ্মবাদের নাম পাশ্চাত্ত্য জগৎকারণবাদে প্রয়োগ করিয়া বৈদিক ব্রহ্মবাদীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করা হইল মাত্র। যেহেতু, একটু পরেই বলা হইয়াছে—"আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত উপনিষদ ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন।" অগত্যা ভারতীয় দর্শনের স্কন্ধে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত চাপান দেওয়া হইল বলিতে পারা যায়। যিনি ভারতীয় দর্শনে স্বসম্মত ব্রহ্ম না পাইয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়িলেন এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়িয়া বুঝিলেন ভারতীয় দর্শনেও এই ব্রহ্মবাদ রহিয়াছে, তাঁহার কি ভারতীয় দর্শন পড়িবার অগ্রেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মে নাই। তাহা না হইলে কি করিয়া বলা যায় "দেশীয় দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়েই আমি পাশ্চাত্ত্য দর্শনাধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হলাম এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের পর তাহাই পেলাম, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।" ইত্যাদি। কিন্তু ইহাই কি সত্যানুসন্ধানের রীতি? ইহাতে কি ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ যথাবিধি যোগ্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া বেদান্তের কয়েকখানি পুস্তক নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া স্থির করা হইল না যে, ইহাতে সত্য নাই! ইহাতে কি এইরূপ কথাই বলা হইল না?

তাহার পর আবার যখন বলা হইল, "ভারতীয় দর্শনাধ্যয়নে ফিরে গিয়ে উপনিষদ্ ও তন্মূলক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়লাম। পড়ে দেখলাম যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদৃশ বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গভীর **dialectic method**, পরন্তু ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়,—যদ্দারা কখনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না।" (১০৬ পৃঃ) ইত্যাদি।

এই কথায় মনে হইতেছে, প্রথমে প্রাচ্য দর্শন পড়িয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়িবার ফলে উভয় দর্শনকে "অভিন্ন" বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তৎপরে পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়িয়া দ্বিতীয় বার প্রাচ্য দর্শন পড়িবার ফলে বোধ হইল "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদৃশ"। অর্থাৎ শেষকালে "উভয় দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত" আর অভিন্ন বোধ হইল না। সাদৃশ্য ও অভেদ এক বস্তু নহে। আচ্ছা, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উভয় দর্শন পড়িলে কি আর সাদৃশ্যও থাকিবে না—ইহা আশা করা ভ্রম হইবে? নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের এই দশাই উপস্থিত হয়—বলা যায় না কি?

অতঃপর বলা হইল—"প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গম্ভীর **Dialectic method**, পরন্তু ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়,—যদ্দারা কখনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না।" ইহা কি সঙ্গত কথা? কারণকূট পৃথক্ হইলে কি কার্য্যও বিভিন্ন হয় না? পাশ্চাত্ত্য ব্রহ্মবাদের কারণ উক্ত **Dialectic method**, আর প্রাচ্য ব্রহ্মবাদের কারণ শ্রুতির দোহাই। এইরূপ বিভিন্ন কারণ হইতে কি করিয়া একই ব্রহ্মবাদ লব্ধ হয়? ইহা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা নহে কি?

যদি বলা যায়, প্রথমে "অভিন্ন" বলা হইয়াছিল, পরে কিন্তু "সদৃশ" বলা হইয়াছে, অতএব বিরুদ্ধ কথা হয় নাই? কিন্তু তাহা হইলেও সদৃশ বলার সার্থকতা কি? সদৃশ বলায় ত ভেদ কিঞ্চিৎ স্বীকার করা হইল। কিন্তু সদৃশের মধ্যে অভেদের ভাগই অধিক থাকে—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদগতভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব"কে সাদৃশ্য বলা হয়। সুতরাং **Dialectic method**-এর দ্বারা যাহা লভ্য, তাহার সদৃশ বস্তুও শ্রুতির দোহাই বা লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের দ্বারা লভ্যই নহে। অভিন্ন বলায় যে দোষ হইতেছিল, তাহার মাত্রা কিছু কমিল বটে, কিন্তু নির্দোষ হইল না।

তাহার পর যে লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের দ্বারা যাহা প্রাপ্যই নহে, তাহার দ্বারা সেই ব্রহ্মবাদ লব্ধ হইল কিরূপে? এটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত কথাই হইয়া পড়িল। আর লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায় বলায় যে অলৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের সত্তা স্বীকার করা হইল, তাহার দ্বারা লোকে সেই ব্রহ্মবাদ কি করিয়া বুঝিবে? লোকে যাহা বুঝে, তাহাই ত লৌকিক, আর যাহা লোকে বুঝে না, তাহাই ত অলৌকিক। ইহাকেই কি **transcendal logic** বলা হইয়া থাকে? এখন যদি অলৌকিক ন্যায় দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা হইল, তবে পিতৃপিতামহগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত অলৌকিক শ্রুতিবাক্য মানিতে কি দোষ হইল? অলৌকিক ন্যায় অপেক্ষা অলৌকিক শ্রুতিরই প্রাবল্য অধিক হওয়া উচিত। কারণ, শ্রুতির পশ্চাতে একটা ঈশ্বর কর্ত্তৃক দানের প্রবাদ আছে, অলৌকিক যুক্তিতে সেরূপ কিছু নাই। শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্য প্রমাণগম্য হইলে শ্রুতি অনুবাদ হয়। অনুবাদের প্রামাণ্য নাই, কারণ, যাহার অনুবাদ তাহারই প্রামাণ্য

হয়। যে বস্তু চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তাহার জন্য শুনা কথাকে কে শুনিতে চায়? প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় প্রত্যক্ষ না করিয়া কে শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়। এই কারণে অনুবাদের প্রামাণ্য নাই বলা হয়। অতএব অলৌকিক ন্যায় কথাগুলি নিতান্ত অসঙ্গত কথা। এজন্য Dialectic method দ্বারা প্রাপ্য ব্রহ্মবাদ শ্রৌত ব্রহ্মবাদই নহে বা শ্রৌত ব্রহ্মবাদের সদৃশও নহে। শ্রৌত ব্রহ্মবাদ অসঙ্গ অবিকারী ব্রহ্মবাদ। অলৌকিক ন্যায়লভ্য ব্রহ্মবাদ অথবা পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদ বিকারী সাপেক্ষ ব্রহ্মবাদ। উহা স্বগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্মবাদ, আর স্বগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্ম স্বীকারে তাহা বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট হয়। বৃক্ষের সহিত শাখাপল্লবের স্বগতভেদ থাকায় বিজাতীয় আকাশের সত্তা স্বীকার্য্য হয়, তজ্জন্য বিজাতীয় ভেদও স্বগতভেদে স্বীকার্য্য হয়। আর বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট বস্তু সাবয়ব হয়, আর সাবয়ব হওয়ায় তাহা বিনশ্বর হয়, নিত্যবস্তু হয় না। পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদের সহিত শ্রৌত ব্রহ্মবাদের একবার সাদৃশ্য দেখিয়া অন্যবার মূলতঃ অভিন্ন দেখাই ভ্রম, অথবা স্বমতানুরাগাধিক্যবশতঃ দুরাগ্রহ অথবা উহা বিশ্বপ্রেমের নামান্তর, নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহা অপরকে দিবার প্রবৃত্তিবিশেষ। আর লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের অপ্রাপ্য বলায় অলৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের প্রাপ্য বলা হইল না কি? আর তাহাতে যে নিজ বাক্যেই ভেদাভেদবাদকে ভেদবাদ বলিয়া স্বীকার বলা হইল। সত্য এই ভাবেই প্রকাশ পায়। এই জন্যই আমরা ভেদাত্মক-বাদকে ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

এস্থলে পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদের একটু আলোচনা করিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়। বলা হইতেছে—"ব্রহ্মবাদের ভিত্তি হচ্ছে আত্ম-বাদ, সবই আত্মিক, অনাত্ম জড় বলে কোনও বস্তু নেই, এই মত।" (১০৬ পৃঃ)

"আচ্ছা সবই আত্মিক হইলে অনাত্মা জড় বলিয়া কিছু থাকে না" কি করিয়া? আত্মিক শব্দের অর্থ আত্মসম্বন্ধীয় অর্থাৎ আত্ম-ভিন্ন সবই আত্মার বিকার বিবর্ত্ত বা বিলাস অথবা কোনওরূপ রূপান্তর। অগত্যা আত্মভিন্ন কিছু না থাকিলে আত্মসম্বন্ধীয়তা সিদ্ধ হয় কি করিয়া? আত্মা ও আত্মিকের কিছু ভেদ না থাকিলে আত্মিক বলার সার্থকতা কোথায়? এখন যাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, তাহা আত্মভিন্ন না হইলে সম্বন্ধ হয় কি করিয়া? সম্বন্ধ মাত্রই দ্বিনিষ্ঠ হয়, নচেৎ সম্বন্ধই হয় না। এখন আত্মভিন্নেরই ত নাম অনাত্মা, আত্মা চেতন বস্তু বলিয়া এই অনাত্ম জড়ই হয়। অতএব "সবই আত্মিক, অনাত্মা জড় বলে কোনও বস্তু নেই" এই কথাটি শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কি করিয়া সঙ্গত হয়? অবশ্য বিরোধ অমান্যকারী অলৌকিক ন্যায়ে ইহার সঙ্গতি করিতে পারা যায়। এজন্য মনে হয়, উপনিষদাদি বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় ব্যাখ্যা প্রভৃতির রচনা, অপরকে হেগেলিয়ান মতে লইয়া যাইবার চেষ্টা, এবং তাহা শ্রৌতগণের অবলম্বিত প্রমাণাদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার প্রয়াস মাত্র বলা যাইতে পারে না কি? দেখা যায়, স্বর্গীয় বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের দ্বারা নিজ লেখা সংশোধন করাইয়া লইয়া যে কয়েকখানি উপনিষদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ-সমন্বিত শঙ্করকৃপা নাম্নী টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে কৌশলক্রমে পাশ্চাত্য ভেদাভেদবাদ প্রবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং ভূমিকা ও মন্তব্য লিখিয়া শঙ্করব্যাখ্যার উপর অশ্রদ্ধা আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। যাঁহারা উপনিষদ প্রথম পড়িতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই কৌশল আবিষ্কার করা অসম্ভব, এজন্য বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এই সব গ্রন্থ মহা অনিষ্ট সাধন করিবে সন্দেহ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এস্থলে মন্দ হয় না। ঈশোপনিষদের ১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে "অমৃতম্" "অশ্নুতে" পদের অর্থ করা হইল—'আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন' শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন "দেবতাত্মভাব" অর্থাৎ দেবতাস্বরূপতা লাভ করেন। মহাভারতে অমৃত শব্দের অর্থ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থিতি, যথা "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" কিন্তু "শঙ্করকৃপা" নাম্নী টীকা, যাহা ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে অমৃত শব্দের অর্থ "অধ্যাত্ম জীবন" বলিলেন না। অতএব বুঝা যায়, অমৃত শব্দের অর্থ "আধ্যাত্মিক জীবন" ৺সামশ্রমী মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে। পুস্তকের মুখপত্রেই আছে "শ্রীমদ্বেদাচার্য্যেণ স্বর্গগতেন সত্যব্রতসামশ্রমিণা সংশোধিতা"। এই আধ্যাত্মিক জীবনটা আজকালকার অনন্ত জীবনবাদীর বা ভাগবত জীবনবাদীর কথা। এই মতে অনন্ত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মানব পাপ-পুণ্য যাহাই করুক না কেন, উন্নতি অনিবার্য্য। এই মতে কেহ কেহ বলেন, এই দেহেই অক্ষয় জীবন লাভ হইবার সম্ভাবনাও আছে, ইত্যাদি। ইহা বস্তুতঃ বেদ-বিরুদ্ধ কথা। তত্ত্বভূষণ মহাশয়-কৃত ঈশ উপনিষদের বঙ্গানুবাদে "অমৃত" পদের অর্থ "আধ্যাত্মিক জীবন" করায় উক্ত স্বাভিমত মতবাদটি কৌশলে পাঠককে শিক্ষা দেওয়া হইল না কি? ইহাকে স্বমতান্ধতা বলিব বা আর কিছু বলিব?

[ক্রমশঃ।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী।

শেষ বাসনা

মৃত্যু দাঁড়াইয়া দ্বারে
বলিল সে "হতভাগ্য নর
যাহা বলিবার আছে
লও তাহা বলিয়া সত্বর।"
কত কথা বলিবার
কি বলিবে, বলিবে না আর,
স্থির না করিতে পারি
দিশেহারা অন্তর তাহার।
কণ্ঠ রুদ্ধ বাষ্পভারে,
এক কথা আসে রসনায়
"যারা মোরে ভালবাসো
তারা যেন ভুলো না আমায়।"

শ্রীকালিদাস রায়।

বিজ্ঞান-জগৎ

দৃষ্টিলাভ

চোখের বৈকল্য-হেতু যাঁদের দৃষ্টি-বিভ্রম বা দৃষ্টি-বিকার ঘটিয়াছে, সরাসরি চশমা না লইয়া তাঁরা যদি চোখের পেশীগুলির ব্যায়াম-কল্পে বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নষ্ট বা ক্ষুন্ন দৃষ্টিকে আবার নিখুঁৎ করিয়া লইতে পারিবেন।

১। ঘোরা চাকতির গায়ে কালির ফোঁটা

এ জন্য এক জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ দু' রকম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রথম যন্ত্রটি ১নং ছবির মত (horizontal) সমতল একটি রড,—এ রডের প্রান্তে রেকাবির ছাঁদে গড়া একখানি চাকতি সংলগ্ন আছে! চাকতির ফ্রেমের উপর এক-জায়গায় আছে কালির একটি ফোঁটা। চাকতিখানি ঘুরানো যায়। ১নং ছবির মত চাকতি ঘুরাইতে হইবে, চাকতি ঘুরিবে; এবং চোখের পেশীর যিনি ব্যায়াম-সাধন করিতে চান, তিনি ঐ ঘোরা-চাকতির ফ্রেমের গায়ে দু'চোখের দৃষ্টি সুদৃঢ় ভাবে
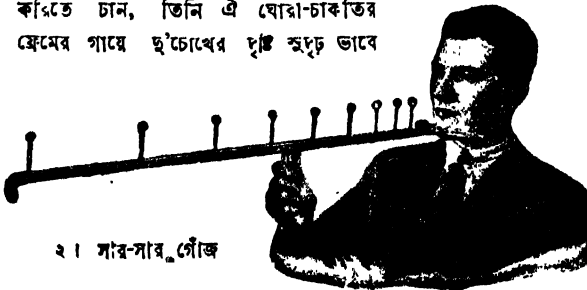
২। সার-সার গোঁজ

নিবদ্ধ রাখিবেন—চোখ চাহিয়া তিনি শুধু দেখিবেন চাকতির গায়ে ঐ কালির ফোঁটা! আর একটি যন্ত্র—২নং ছবিতে সে-যন্ত্রের পরিচয় পাইবেন। একটি দীর্ঘ রডের মাথার উপর নয়টি কাঠি বা গোঁজ্—গোঁজগুলির মাথা গোল, (knob) "নবে"র মত। রডের এক প্রান্তে যে আংটা, ঐ আংটা গলায় লাগাইয়া রডটি সরল রেখায় সিধা করিয়া ধরিতে হইবে। ধরিয়া একটির পর আর-একটি গোলকের উপর দিয়া বার-বার দৃষ্টি বুলানো চাই। এক বার ওদিক হইতে এদিক পর্য্যন্ত, তার পর এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত। দশ-বারো বার করিয়া এ ব্যায়ামটুকু করা চাই। রডটি যেন এতটুকু না নড়ে! এ দুইটি যন্ত্র-সাহায্যে চোখের পেশীসমূহের যে ব্যায়াম হইবে, তাহার ফলে ট্যারা চোখের দৃষ্টি সরল হইবে এবং সেই সঙ্গে চোখের বৈকল্য সারিবে।

মরণ-পিচকারী

ফাল্গুনে হোলি-উৎসব! পিচকারীতে আবীর-বর্ষণ! কবি গাহিয়া গিয়াছেন—"এমন দিনে আপন-জনে ফাগ মাখাতে হয়!" আর যারা

গোলার পিচকারী

আপন-জন নয়, দুষমণ? তাদের সঙ্গে ফাল্গুনে হোলি-খেলা খেলিতে ব্রিটিশ রণ-তরী-বিভাগ পিচকারী-মেশিন-গানের সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধ-জাহাজগুলিতে সার সার কামান সাজানো হইয়াছে,—এক-একটি কামানের সঙ্গে চার-চারটি করিয়া মেশিন-গান সংলগ্ন আছে; প্রত্যেকটি মেশিন-গান হইতে মিনিটে-মিনিটে অজস্র গোলা-বর্ষণ হয়। শত্রুর বিমান-পোতকে ধ্বংস করিবার জন্যই এ পিচকারী-মেশিন-গানের সৃষ্টি। প্রত্যেকটি কামানের সঙ্গে লক্ষ্য-সন্ধানী যন্ত্র আছে—সে-যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর বিমানপোত লক্ষ্য করিয়া এক জন মাত্র গোলন্দাজ এ মেশিন-গানে ঝকে-ঝকে ঊর্দ্ধ আকাশ-পথে অজস্র গোলা-বর্ষণ করিতে পারেন।

গ্লাসের শুচিতা

অফিসে ও স্কুল-কলেজে জল-পানের জন্য কাচের গ্লাসের ব্যবস্থা আজ সুপ্রচলিত। কুঁজোর মুখে, মেঝেয়, ধুলায় অথবা ঘরের কোণে কোনো টেবিলের উপরে গ্লাস রাখা হয়; জল-পানের সময় গ্লাসে একটু জল ঢালিয়া গ্লাস ধুইয়া তাহাতে জল ভরিয়া আমরা জল পান করি! ইহাতে বহু রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ধুলা-ময়লায় লক্ষ লক্ষ রোগ-বীজাণুর বাস। ও-রকম ধোয়ায় গ্লাসও সাফ হয় না। এ জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, পাৎলা কাগজে আপাদ-মস্তক জড়াইয়া ঢাকিয়া গ্লাস রাখিবেন, পানের সময় গ্লাসে পরিপূর্ণ ভাবে জল ভরিয়া গ্লাস ধুইয়া তবে তাহা হইতে

জল পান করিবেন। চাকর-বাকরে হাতে করিয়া গ্লাস আনিয়া দেয়, তাদের হাতের ছোঁয়ায় রোগ-বীজাণুর ভয় আছে। তাছাড়া কুঁজোর মুখে, মেঝেয় বা টেবিলে না ঢাকা দিয়া গ্লাস রাখা নিরাপদ

কাগজে মুড়িয়া গ্লাস রাখুন

নয়। জল-পান করিতে চাহিলে জল-ভরা গ্লাসের মাথা ধরিয়া গ্লাস আনিয়া দেওয়া কদভ্যাস—সে কদভ্যাস বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

অক্সিজেন-দান

রোগীকে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ করিতে অনেক সময় যন্ত্রযোগে তাঁকে অক্সিজেন-বাষ্প দিতে হয়। এ অক্সিজেন-বাষ্প দিতে যে সিলিণ্ডারের ব্যবহার

অক্সিজেন দেওয়া

প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক অসুবিধা। এ অক্সিজেন যিনি দেন, তাঁকেও অস্বাচ্ছন্দ্য সহিতে হয়, তাছাড়া অক্সিজেনের অপব্যয় হয় অনেকখানি। অক্সিজেন-বাষ্প দিবার জন্য এক জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ বিশেষ রকমের একটি সিলিণ্ডার তৈয়ারী করিয়াছেন। শয্যা-শায়িত রোগীর নাকের উপরে ঘ্রাণ লইবার উপযোগী স্বচ্ছ সেলুলোজের তৈয়ারী হালকা মুখোস লাগাইয়া নল দিয়া অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক হইতে অক্সিজেন বাষ্প প্রয়োগ করা হয়। রোগীর যেমন তাহাতে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না, তেমনি এ-বাষ্প যিনি দেন, তাঁর পরিশ্রমও অনেকখানি কমে—সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের ব্যয় হয় খুব অল্প। তার উপর এক জন ব্যক্তি এই যন্ত্র-সাহায্যে দু'জন রোগীকে একসঙ্গে অক্সিজেন দিতে পারেন।

হাত ধুইবার জল

স্কুল-কলেজে জল ছোঁয়াছুঁয়ির জন্য অনেক সময় সংক্রামক বহু রোগের প্রসার বাড়ে। ছবির অনুরূপ হাত ধুইবার "ওয়াশ-বেশিনে"

পা দিয়া তলা চাপিলে জল মেলে

ছোঁয়াচের ভয় নাই। জলের ট্যাপে হাত দিতে হয় না; পা দিয়া তলার 'পেডাল' চাপিলেই জল মিলিবে।

স্বর-পরীক্ষা

সিনেমা দেখিতে গিয়া অনেক সময় শুনি, নট-নটীর কণ্ঠস্বর তেমন স্পষ্ট নয়, সে-স্বর কর্কশ! অথচ সাধারণ ভাবে কথা কহিলে তাঁদের স্বরে কোনরূপ বৈকল্য হয়তো উপলব্ধি হইবে না! শব্দ-যন্ত্রে কণ্ঠস্বরের যে ছাপ ওঠে, যন্ত্রের সূক্ষ্মতায় স্বরের অতি-ক্ষুদ্র খুঁৎটুকুও সে ছাপে বড় করিয়া মুদ্রিত হয়। তার ফলে যাঁদের স্বর ভালো, মাইকের মারফৎ শুনি গানে তাঁর গলা ফাটা! এ জন্য সিনেমার অভিনয়ে নামাইবার পূর্ব্বে নট-নটীদের স্বর-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্বর-যন্ত্রের সাহায্যে স্বরের পরীক্ষা চলে। এ যন্ত্রের সঙ্গে যে-চোঙ লাগানো থাকে, সেই চোঙের সামনে মুখ আনিয়া কথা কহিতে বা গান গাহিতে হয়; যন্ত্রের রেকর্ডিং-অংশে স্বরের ছাপ পড়ে।

সেই রেকর্ড-করা কণ্ঠস্বর হইতে বুঝা যায়, স্বর স্পষ্ট, না, জড়ানো! কাটা, না, নিখুঁৎ! অর্থাৎ কণ্ঠের অতি-ছোট খুঁৎটুকুও ধরা

কণ্ঠ কেমন

পড়ে। যাঁদের স্বর নিখুঁৎ হয়, মার্কিন সিনেমায় অভিনয়ের জন্ম তাঁহাদিগকেই বাছিয়া লওয়া হয়।

শিল্পীর দস্তানা

মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, যাঁরা পিয়ানো বাজান, শুধু-হাতে না বাজাইয়া পশমের দস্তানা হাতে আঁটিয়া যদি বাজান, তাহা

দস্তানা-হাতে পিয়ানো

হইলে পিয়ানো বাজিবে ভালো। এ দস্তানা হাতে আঁটিয়া ভালো পিয়ানিষ্টরা ছ'-সেকণ্ডে পিয়ানোয় ২৬৮টি নোট বাজাইতে সমর্থ হইতেছেন। তার উপর বিশেষজ্ঞেরা বলেন, শুধু-হাতে পিয়ানোয় যে সুর-ঝঙ্কার পাওয়া যায়, পশমী হাতের আঘাতে ঝঙ্কার হইবে তার চেয়ে আরো দশ গুণ মিষ্ট-মধুর। টাইপ-রাইটার লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া যাঁদের টাইপের কাজ করিতে হয়, এ দস্তানায় তাঁদের কাজ হইবে অনেক বেশী ক্ষিপ্র; এবং আঙুল কোনো কালে দুর্ব্বল হইয়া অস্বাচ্ছন্দ্য বা ক্লান্তির সৃষ্টি করিবে না।

খবরাখবর

কামান-বন্দুক লইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফৌজ চলিল্ যুদ্ধ করিতে—হেড-কোয়াটার্স বা প্রধান আস্তানার সঙ্গে খবরাখবর চলিবে কি করিয়া? খবরের আদান-প্রদান সহজ ও সুনিশ্চিত করিতে টেলিগ্রাফের তার খাটানোর এক অভিনব উপায় বাহির করিয়াছে ব্রিটিশ সমর-বিভাগের সাঙ্কেতিক দল। কামানে গোলার মত সুদীর্ঘ তার ভরিয়া তাহা ঠিক ঐ কামান-ছোড়ার রীতিতে ছোড়া

তার খাটানো

হয়। সে-ছোড়ায় জলা-জঙ্গল নদী-নালা পাহাড়-পর্ব্বত পার হইয়া টেলিগ্রাফের তার বহু দূরে গিয়া পড়ে—এদিককার প্রান্ত অবশ্য গোলন্দাজের হাতে থাকে। তার পর সেই তার লক্ষ্য করিয়া সাঙ্কেতিক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা অগ্রসর হইয়া যান। এমনি ভাবে বহু দূর ব্যাপিয়া টেলিগ্রাফের তার খাটানো হয়। তার পর সেই তার-মারফৎ সুদূরবর্ত্তী আস্তানার সঙ্গে খবরের আদান-প্রদানে কোনো অসুবিধা থাকে না!

কেশ-পরিচর্য্যা

সুকেশিনী না হইলে তাহাকেও সুন্দরী বলা চলে না। কেশেই নারীর সুষমা-সৌন্দর্য্য। মাথায় যাঁর রেশমের মতো কোমল মসৃণ প্রচুর কেশ, তাঁর মুখের মাধুরীর তুলনা মেলে না!

এ কেশ উঠিয়া যায়, অকালে পাকিয়া সাদা হয়। তখন বিজ্ঞাপন দেখিয়া কত রকমের তৈল আনিয়া মাথায় মাখেন! তবু যে-কেশ গিয়াছে, সে-কেশকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না! এমন দুর্ভাগ্য যাঁর ঘটিয়াছে, তিনি যেন মরমে মরিয়া আছেন!

কেশের এ দুর্দ্দশা হয়, শুধু সময় থাকিতে কেশের আমরা যত্ন লই না—কেশের পরিচর্য্যা করি না, বলিয়া।

এক দিন আমাদের দেশে দিদি-মায়ার মত কেশ-পরিচর্য্যার বিধি মেয়েরা পালন করিতেন। স্নানের সময় মাথায় ঘষিয়া ঘষিয়া তেল মাখা—স্নানের পর গামছা দিয়া ঝাড়িয়া-ঝাড়িয়া কত কৌশলে মাথার জল মোছা—সর্ব্ব-কাজের মধ্যে সময় করিয়া মাথার ভিজা চুল শুকানো; তার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে রীতিমত আয়না পাড়িয়া, ফিতা-চিরুণী লইয়া চুল বাঁধা! নিয়মিত এ-পরিচর্য্যায় মাজিয়া-ঘষিয়া নিজেকে শুধু পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া তোলা হইত, তা নয়—ইহাতে কেশের স্বাস্থ্য ভালো থাকিত। একালে লেখাপড়ার চাপ আছে, নাচ-গান-বাজনা-শেখার ধুম আছে,—এ-সবের মাঝে কেশ-পরিচর্য্যার অবসর কোথায়? তার উপর মাথায় ঘষিয়া ঘষিয়া সে তেল-মাখা নাই! মেম সাহেবদের নকলে এই গরম-দেশে অনেকে আবার মাথায় তেল মাখার পাট ছাড়িয়া দিয়াছেন! স্নানের পর তেমন করিয়া ঘষিয়া মাথার জল মোছার কোনো নিয়ম নাই,—মাথা শুকাইবার বা বাঁধিবারও সময় মেলে না! ফ্যাশনের খাতিরে ফিরিঙ্গি-প্যাটার্ণে মাথার চুলে একটা 'নট্', তার সঙ্গে দু'-চারিটা ক্লিপ গোঁজা,—ব্যস্! ফল যা চোখে দেখিতেছি, বলিবার নয়!

কিন্তু না, এ ঔদাস্য চলিবে না! স্নো-রুজ-পাউডার ঘষিবার জন্য যদি সময় পান, তবে কেশ-পরিচর্য্যার জন্যই বা সময় পাওয়া যাইবে না কেন? বাঙলার ঘরের মেয়েদের তাই বলি, কেশের সম্বন্ধে বৈরাগ্য, ঔদাস্য ছাড়িয়া সযত্নে কেশ-পরিচর্য্যা করুন। কেশের সাজে দেহের শ্রী, মুখের মাধুরী বাড়িবে কতখানি,—সে-ফল হাতে হাতে পাইবেন!

এ সম্বন্ধে এক জন মার্কিন মহিলা বহু অনুশীলন করিয়া উপদেশ-ছলে বলিয়াছেন—**You can't neglect your hair and get away with it—it won't be cheated without paying you back and in a very thorough fashion.**

কথাটা খুব সত্য। নাক যদি কাহারো খাঁদা হয় বা কাহারো যদি খড়্গ নাক থাকে তো বিধাতার দেওয়া সে বিকৃতি সহিয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই! কারণ, খোদার উপর খোদ্‌কারি চলে না! কিন্তু কেশের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। মাথায় যাঁর কেশ অল্প কিম্বা কেশে বহু খুঁৎ, পরিচর্য্যার গুণে তাঁরো কেশ দীর্ঘ হইবে, কোমল মসৃণ সুন্দর হইবে, তাহাতে এতটুকু সংশয় নাই। মাথায় যে মরা-মাস হয়, কিম্বা ঐ যে চুল উঠিয়া যায় বা চুলে পাক ধরে—**ইহার কারণ বুঝিবেন, কেশ বিদ্রোহী হইয়াছে!**

কেশের 'শাম্পু' প্রয়োজন—সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন করিয়া। শাম্পুর জন্য অন্য কোনো উপকরণ না পান, ব্যাশম্ আছে,—মাথায় বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ব্যাশম মাখুন। চুলে ব্যাশম মাখাইয়া চুল ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলুন। এক বার দু'বার তিন বার করিয়া ব্যাশম মাখিয়া শাম্পু করুন। মাথা ধোওয়ার পর মাথায় বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তেল মাখিবেন। এ-ঘষায় মাথার ব্যায়াম হইবে, রক্ত-চলাচল স্বচ্ছন্দ হইবে। তার ফলে কেশের মূল হইবে শক্ত মজবুত। চুল উঠিয়া যাইবে না বা চুলে পাক ধরিবে না।

আমাদের মাথার কেশ আর গাছ-পালা,—দুইই এক নীতি মানিয়া চলে। অর্থাৎ গাছপালা যেমন মূলের সাহায্যে মাটী হইতে

১। দু'হাতের আঙুল দিয়া চক্র-রচনা

রস টানিয়া বাড়ে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া থাকে, কেশও তেমনি মূল-দেশ দিয়া মাথার খুলি (scalp) হইতে প্রাণ-রস লইয়া সুস্থ স্বচ্ছন্দ ভাবে বাড়ে। এ জন্য মাথা ঘষিয়া নিত্য তেল-মাখায় কেশ পায় শক্তির জোগান—তার গোড়ায় থাকে জোর, তেজ। তাই চুল পাকিতে পারে না বা উঠিয়া যায় না।

সেই সঙ্গে চাই কেশের ব্যায়াম-সাধনা।

প্রথমে ব্রাশ লইয়া মাথা আঁচড়ান,—সীঁথি ধরিয়া চিরুণীর সাহায্যে কেশ চিরিয়া দু'ভাগ করুন; করিয়া ব্রাশে আঁচড়ান। তার পর

১। উঁচু টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখুন—কনুই হইতে আঙুল পর্য্যন্ত সামনের হাত উঁচু করিয়া তুলুন। এবার দুই কাণের পিছন হইতে সুরু করিয়া দু' হাতের মধ্যমাঙুলি

দিয়' মাথার পরিচর্য্যা। সারা মাথায় চালিয়া-চালিয়া চক্রাকারে দু' আঙুল ঘষুন। ১নং ছবির মতো এমনি করিয়া সমস্ত মাথায় দুটি আঙুল চাপিয়া চক্রাকারে ঘষুন।

২। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে পিঠের দিকে মাথা হেলাইয়া ডাহিনে-বাঁয়ে দু'দিকে মাথা নাড়ুন প্রায় পাঁচ মিনিট।

২। মাথা হেলাইয়া নাড়া

৩। তার পর টেবিলের উপর দুই বন্নুইয়ের ভর রাখিয়া দু' হাতের আঙুল দিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মাথা ঘষুন। মাথার

৩। মাথা ঘষুন

সমস্তটুকু এমনি ভাবে পর-পর ঘষিবেন—দু' হাতের আঙুলে এক ইঞ্চিটাক যেন ফাঁক থাকে।

৪। এবার ৪নং ছবির মত ডান হাতের আঙুল দিয়া চুলের একটি করিয়া গুছি ধরিয়া জোরে জোরে টানুন। হ্যাঁচকা-টানে

৪। গুছি ধরিয়া হ্যাঁচকা টান

টানিতে হইবে। মাথার সব চুল এমনি গুছি করিয়া পর্য্যায়ক্রমে টানা চাই।

৫। তার পর ৫নং ছবির ভঙ্গীতে এক-গুছি করিয়া চুল বাঁ হাতে টানিয়া দীর্ঘ ভাবে ধরুন—ধরিয়া ডান হাতে সে-গুছির

৫। একটি একটি গুছি ধরিয়া ব্রাশ করা

উপর মাথার দিক হইতে উর্দ্ধ দিকে জোরে-জোরে আট-দশ বার করিয়া কড়া ব্রাশ চালান। সব চুলগুলির উপর এমনি ভাবে ব্রাশ চালানো চাই।

এ কয়টি বিধি যদি নিয়ম করিয়া নিত্য-দিন সযত্নে পালন করেন, তাহা হইলে কেশের বাড় হইবে এবং কেশ হইবে কোমল, মসৃণ, বরণীয়। কোনো দিন কেশের দুর্দ্দশা ঘটিবে না।

মা-বাপের কথা

ছেলেমেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব মা-বাপের বড় সামান্য নয়। তাদের ভালো খাওয়া ভালো পরার ব্যবস্থা করে দিলেই মা-বাপের দায়িত্ব চোকে না। ছেলেমেয়ে বদ হলে অবাধ্য হলে বাপের দল বলেন—কি করবো! ওঁর দোষেই ছেলেমেয়ে এমন হচ্ছে!

যে-সব মা ছেলেমেয়েকে খুব হুঁশিয়ার ভাবে লালন করেন, তাঁদেরো এমন অনুযোগ-অভিযোগ শুনতে হয়।

সাধারণতঃ বাপেদের বিশ্বাস, তাঁদের সামনে ছেলেরা যত শান্ত শিষ্ট বিনয়ী মূর্ত্তিতে উদয় হোক, তাদের শয়তানী আছে বিলক্ষণ এবং সে-শয়তানীর প্রশ্রয় তারা পায় মায়েদের কাছে! প্রশ্রয় না পেলেও ছেলেমেয়েদের শয়তানী কতখানি, মায়েরা তা জানেন, এবং জেনে তাঁদের কাছ থেকে সে-শয়তানীর বৃত্তান্ত গোপন রাখেন! বাপেরা বলেন,—মায়েরা ভাবেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে খুব ভালো, যাকে বলে perfect! ছেলেমেয়ে যে-আব্দার করে, সেই আব্দারই মায়েরা রক্ষা করেন; তাদের প্রশ্রয় দেন; আলস্য এবং অপব্যয়কে স্নেহের চোখে দেখেন; ছেলেমেয়ে দোষ করলে বাপ যখন তাড়া দেন, মা তখন তাদের পক্ষ সমর্থন করেই প্রাণপণে লড়েন।

এ অপবাদ যাঁরা দেন তাঁদের জানা উচিত, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে মায়ের এবং বাপের কর্ত্তব্য এক নয়। ছেলেরাও তা জানে। মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা আজে-বাজে আব্দার তোলে না। সখের আব্দার নিয়ে ছেলেমেয়েরা ভুলেও কখনো বাপের কাছে যায় না। "মা সার্কাশ দেখতে যাবো—মা সিনেমায় যাবো—মা ভালো বুট চাই—সিল্কের গেঞ্জি চাই—" এ সব আব্দার ছেলেরা তোলে মায়ের কাছে, বাপের কাছে নয়!

অনেক বাপের কাছে ছেলেমেয়েদের আসল পরিচয় অপরিজ্ঞাত থাকে। তার খাবার রুচি, পরবার রুচি বাপ জানেন না; কিন্তু মা জানেন। ছেলেমেয়ের সখের আর্জী মায়েরা যখন কর্ত্তার কাছে পেশ করেন, তখন অনেক ক্ষেত্রে বাপ তা নামঞ্জুর করতে উদ্যত হন। যদি তা পূরণ করেন তো মায়ের চেষ্টায়, মায়ের ওকালতিতে তা ঘটে।

নিজের ছেলেবেলাকার কথা বাপ ভুলে যান, মা ভোলেন না।

জন্ম থেকে মা ছেলেমেয়েকে দেখে আসছেন প্রতিদিন, প্রতি দণ্ড, প্রতি পল। মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের বড় হওয়ার প্রত্যেকটি ক্ষণ যেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, তেমনি তার পর্য্যায়ের এতটুকুও মায়ের মন থেকে মুছে যায় না বা সে-পর্য্যায় এতটুকু অস্পষ্ট হয় না।

আদর করে' ছেলেমেয়ে মার হাতে এনে দিলে একটি শুকনো ফুল, একটি মার্বেল, একটি ভাঙ্গা পুতুল! আনন্দে মায়ের প্রাণ তাতে ভরে ওঠে। তুচ্ছ খেলায়-ধূলায় ছেলেমেয়ে মাকে পায়! ছেলেমেয়ের ডাকে সে-খেলায় মাকে যোগ দিতে হয়। মা কখনো "য্যাঃ" বলে সরিয়ে দেন না। বাপের কাছে ছেলেমেয়ের খেলা তুচ্ছ—নগণ্য! কোনো কাজে যদি ছেলেমেয়ের পারদর্শিতা হলো, চারি দিকে তাদের নামে জয়ধ্বনি জাগলো তো বাপ তখন এসে ছেলেমেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সে-গৌরবে গর্ব্ব বোধ করেন। ছেলে যদি পরীক্ষায় ফেল হয়, বাপের পিতৃগৌরব ক্ষুণ্ণ হলো বলে' বাপ ওঠেন চটে! ছেলেকে তিনি বকেন! তার এ অকৃতকার্য্যতায় বাপের দিক্ থেকে মায়া-মমতা-দরদ জাগে না! তাঁর মাথা হেঁট হলো--এইতেই তাঁর বিরক্তি! কিন্তু মা? গৌরবে-লজ্জায়, সম্পদে-বিপদে ছেলেমেয়ের সঙ্গে মায়ের যেন নাড়ীর সংযোগ! মায়ের স্নেহের কোনো সীমা নেই! সে-স্নেহে স্বার্থের লেশ নেই। বাপের স্নেহে তাঁর স্বার্থ বিজড়িত থাকে! তুমি যদি বাবা বলে' মানো, তবেই আমি তোমাকে মানবো ছেলে বলে'! মা কিন্তু এমন কথা মনে আনেন না। এ চিন্তা মায়ের কল্পনাতীত। ছেলেকে 'ত্যজ্যপুত্র' করেন বাপেরা। কোনো মা ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন, এমন কথা বাঙলা দেশে শোনা যায়নি! বৌমার কথায় যে-ছেলে ওঠ্-বোস্ করে, তেমন ছেলের পীড়ন-দুর্ব্যবহার সয়েও মা বলেন, "পোড়ার জন্য! লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে কি না!" বৌয়ের তিনি দোষ দেখেন,—ছেলেকে কখনো দোষী করেন না। অসুখ-বিসুখে মায়ের বিরামহীন সেবা—ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখে বাপ তার কিছুই পারেন না! মায়ের এই তুলনাহীন স্নেহের জন্যই বুঝি আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা বাপের সম্বন্ধে বলেছেন, "পিতা স্বর্গ"! কিন্তু মাকে বলে গেছেন সে-স্বর্গের চেয়েও বড়—স্বর্গাদপি গরীয়সী! আমরাও যত দূর দেখছি, শাস্ত্রকারদের এ-কথাকে অত্যুক্তি বলে মনে হয় না!

বন্দী

বন্দী যে আসি বর্ত্তমানের ভঙ্গুর কারাগারে—
বন্দী আমার অভিযাত্রিক প্রাণ!

লক্ষ আশার বক্ষ কাঁড়িয়া নিরুদ্ধ হাহাকারে
জাগিছে আঁধারে মৃত্যুর কল-তান!
কাব্যে ও গানে আমাদের প্রাণে নিখিলের পরিচয়,
স্পন্দন আনে—দেখিয়াছি তবু বিপন্ন বিস্ময়
কত অসীমের ছায়া-পথ ঘুরি তাহারে আনিছে ডাকি
জাগর-জীবনে চিতার ভস্মে যাহারে এসেছি রাখি!

বন্দীর চির-ভীরুতা লইয়া প্রশ্ন করেছি আমি,—
অবিনশ্বর হে মহা প্রহরী ভবিষ্যতের স্বামি,
যুগ-যুগান্তে জানিতে চেয়েছি বলে যাও আজ মোরে
দু'জনে আমরা পথ চলেছিনু দু'জনের হাত ধরে,—
আমারে বন্ধু বন্দী করিয়া নিজে হলে তার দ্বারী;
আবার দু'জনে কারাগার ছাড়ি কবে হবো পথচারী?
উত্তর মোর আজিও মেলেনি। প্রহরী নিরুত্তর!
শৃঙ্খল শুধু জানায়ে দিয়াছে আমি হেথা নশ্বর!

আমারি মতন অতীতের কত বন্দীর আঁখিজল
বর্ত্তমানের ব্যথার পঙ্কে হয়ে আছে শতদল!
আগামী কালের তরুণ উষায় চিনিবে না কেহ তারে,
বন্ধন-হীন বিগত পথিক শুধু জানি বারে-বারে
পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়ে যাবে ভুলের পদ্ম লাগি—
কালের প্রহরী তাহাদের তরে প্রতিদিন আছে জাগি!

শ্রীঅমর ভট্ট।

ছোটদের আসর

মানুষের বন্ধু কুকুর

মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া পোষ মানিয়া কুকুর শুধু খাওয়া-দাওয়া-আরাম লইয়া নিশ্চিন্ত বিলাস-সুখ উপভোগ করে না! যে মানুষের খায়, তার হিত-সাধনে কুকুরের যত্নের সীমা দেখি না! সাধারণ-কুকুর পুষিয়াও তাদের যে-পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে

তুষারের বুকে আশ্রম

প্রভু-ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার দিক দিয়া কুকুরকে বহু কাপুরুষের উপরে আসন দিলে অন্যায় হইবে না!

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, এক জন ভিখারী আমাদের পাড়ায় ভিক্ষা করিত। তার সঙ্গে আসিত একটা কুকুর। খুব সাধারণ কুকুর। পথে-ঘাটে যে-সব কুকুর দেখা যায়, তাদেরি শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ যে কুকুরকে আমরা বলি, "নেড়ি-কুত্তা!" এক দিন পাড়ায় একটা বিবাহ-উৎসবে ভিখারী দান পাইয়াছিল একখানা নূতন কাপড়। দান লইয়া খুশী-মনে সে গৃহে চলিয়াছে, এক জন জুয়ান বদমায়েস তার কাছ হইতে সে কাপড় কাড়িয়া লয়। ভিখারী ছাড়িবে কেন? বদমায়েসটাকে ধরিয়া কাপড় উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে সে টানাটানি জুড়িয়া দিল। বদমায়েসটা শেষে ভিখারীকে প্রহার করিয়া ফেলিয়া দিয়া কাপড় লইয়া পলায়নোদ্যত! ভিখারীর কুকুর লাফ দিয়া তার ঘাড়ে কামড় দিয়া ঝুলিতে থাকে,—কিছুতে তাকে ছাড়িবে না! কামড়ের জ্বালায় বদমায়েসটা কাপড় ফেলিয়া দিল, কুকুরও তাকে দিল মুক্তি!

নানা ব্যাপারে কুকুরের প্রভু-ভক্তির যেমন পরিচয় পাই, তেমনি বুঝিতে পারি, ইতর-জীব হইলেও তার বোধ-শক্তি সামান্য নয়। যাদের বাড়ীতে পোষা কুকুর আছে, সে সব কুকুরের বুদ্ধির বহু পরিচয় তারা পাইয়াছে নিশ্চয়।

সে কুকুর নয়! আজ তোমাদের কাছে বরফ-দেশের সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুরের কথা বলি।

সুইজারল্যাণ্ডের শিয়রে সমুদ্র হইতে আট হাজার ফুট উর্দ্ধে আল্‌স পর্ব্বত। হিমের আবাস-ভূমি! বছরে ন'-দশ মাস এ পাহাড় বরফে ঢাকিয়া থাকে। এই বরফের গায়ে আছে দোতলা বাড়ী। সেখানে থাকেন ব্রতচারী সাধু-সন্ন্যাসীর দল। হিমের দৌরাত্ম্যে তাঁরা বিচলিত হন না! তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মত বাস করে সেণ্ট-বার্ণার্ড জাতের কুকুর। বরফে ঢাকা থাকিলেও এ-পাহাড়ে চড়িয়া পাহাড় দেখিবার উদ্দেশ্যে নানা দেশ হইতে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। সে-সব যাত্রীর মধ্যে কত জন যে হিমের কবর হইতে রক্ষা পাইয়াছেন শুধু এই সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুরের দয়ায়, তার সংখ্যা নাই!

পাহাড়ের নীচে একটি ষ্টেশন আছে। যে-সব যাত্রী পাহাড়ে চড়েন, এখানে তাঁদের নাম-ধাম লিখিয়া রাখা হয়। যদি কেহ নিরুদ্দেশ হন, তাঁর সন্ধান চলে। পাহাড়ের মাথায় সাধু-সন্ন্যাসীদের যে আশ্রম, সেই আশ্রমের সঙ্গে নীচেকার ষ্টেশনের যোগ আছে টেলিফোন-সূত্রে। কোনো যাত্রীর সম্বন্ধে সংশয় জাগিলে টেলিফোন-যোগে আশ্রমে খবর দেওয়া হয়, অমুক যাত্রীর সন্ধান নাই! তখন আশ্রমের সাধুরা এই সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুরদের লইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রীদের সন্ধানে বাহির হন।

ক' বছর পূর্ব্বে এক দুর্য্যোগের রাত্রে আশ্রমে খবর আসিল,—এক দল ইতালীয়ান যাত্রী,—সঙ্গে একটি মহিলা—পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন। মহিলাটি বরফের খদে পড়িয়া গিয়াছেন—তাঁর সন্ধান মিলিতেছে না!

সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুর

সাধুরা বলিলেন—কুকুর লইয়া এখনি আমরা সন্ধানে বাহির হইতেছি।

এক দল কুকুর লইয়া তাঁরা বাহির হইলেন। অন্ধকারে দিক্ আচ্ছন্ন। ঝড়ো বাতাসে বরফের কুচি আসিয়া গায়ে লাগে। সাধুদের হাতে লণ্ঠন—স্কী-যোগে তাঁরা চলিয়াছেন! কুকুরগুলি দিকে-দিকে ছুটিয়া গেল। সাধুর দল লণ্ঠন হাতে ইতস্ততঃ সন্ধানে রত, হঠাৎ একটি কুকুর ছুটিয়া আসিয়া সাধুর পরিচ্ছদ ধরিয়া টানে। এ-সঙ্কেত সাধু বুঝিলেন। কুকুরের সঙ্গে তিনি চলিলেন। এক জায়গায় আসিয়া দেখেন, আরো পাঁচটি কুকুর তুষারের আবরণ সরাইয়া মহিলাকে বাহির করিয়াছে। মহিলাকে তাঁরা আশ্রমে আনিলেন এবং পরিচর্য্যার গুণে মহিলা সুস্থ হইলেন।

এ আশ্রমটি বহু শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। গিরি-যাত্রীদের উদ্ধার ও রক্ষা-কল্পেই এ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। জার্ম্মানি

স্কী-যোগে সাধু—সঙ্গে কুকুর

হইতে রোম যাতায়াত করিতে সেকালে অনেকে এই পাহাড়-পথ অবলম্বন করিতেন। আশ্রমে তাঁরা আশ্রয় লইতেন। আজো যাত্রীর দল এ আশ্রমে আশ্রয় পান। বাসের ও খাদ্যের জন্য কাহাকেও মূল্য দিতে হয় না।

আশ্রমটি বেশ বড়। এখানে এক শত শয্যা এবং তিন শত যাত্রীর বাসের উপযোগী ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে বহু সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুর প্রতিপালিত হয়। তারা শুধু পথহারাদের পথ নির্দ্দেশ করে না, বিপদে উদ্ধার-সাধন এবং গাইডের কাজেও এ-সব কুকুরের তৎপরতার সীমা নাই। এ-সব কুকুরের বংশ-মর্য্যাদা আছে—পাঁচশো বৎসর ধরিয়া এই তুষার-পাহাড়েই এ-কুকুরের বাস।

ঝড় বা দুর্য্যোগের লক্ষণ বুঝিবামাত্র সাধুরা এ-সব কুকুরকে ছাড়িয়া দেন। তারা দল বাঁধিয়া নানা দিকে ঘোরে। যদি আর্ত্ত বিপন্ন যাত্রীর সন্ধান পায়, উদ্ধার-সাধন করে। এ-কাজে কখনও তাদের অসাফল্য ঘটিয়াছে, এমন কথা জানা যায় নাই!

এ কুকুর আকারে হয় ৩০ ইঞ্চি উঁচু। দেহের ওজন এক মণ পনেরো সের। জোয়ান মোটা একটি মানুষকে এ-কুকুর অনায়াসে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। আশ্রমের কুকুরকে যখন নিরুদ্দিষ্ট যাত্রীর সন্ধানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন তাদের গলার কলারে ব্র্যাণ্ডির বোতল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তার পর তাদের যা শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষার গুণে এক জন তরুণ স্কাউটের কাজ ইহারা অনায়াসে সাধন করিতে পারে। পথে বিপন্ন যাত্রী পাইলে চীৎকারে কুকুর সঙ্কেত জানায়—আশ্রমে আসিয়া সাধুদের সে সঙ্কেতে সচকিত করে। তখন বিপন্ন যাত্রীর উদ্ধার-সাধনে আশ্রম হইতে সর্ব্ব-সহায়তা-দানে এতটুকু বিলম্ব বা ত্রুটি ঘটে না।

ব্যারি নামে একটি কুকুর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। এক বার এক জন তরুণ সেনা বরফে চাপা পড়ে। দু'দিন তার কোনো সন্ধান মেলে নাই। তৃতীয় দিনে ব্যারি তাকে খুঁজিয়া বাহির করে। সৈনিক মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়া ছিল। জিভ্ দিয়া চাটিয়া ব্যারি সৈনিকের চেতনা সঞ্চারিত করে। চেতনা-লাভে ব্যারিকে নেকড়ে-বাঘ ভাবিয়া সৈনিক ব্যারির অঙ্গে বেয়নেট্ বিঁধিয়া দেয়। সে আঘাতে বেচারা ব্যারির মৃত্যু ঘটে।

ব্যারির কবরের উপর তার কীর্ত্তি খুদিয়া স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। পিতৃ-গৌরবের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে ব্যারির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বদল করিয়া সাধুরা তার নাম দিয়াছেন, ব্যারি!

চিন্তা-শক্তি

চিন্তা করার একটা প্রণালী আছে। সকলে চিন্তা করতে পারে না। চর্চ্চায় চিন্তা-শক্তি বাড়ে।

ছেলেমেয়েদের আমরা "চলি-চলি-পা-পা" করে হাঁটতে শেখাই,—তাদের বর্ণমালা শেখাই,—গান বাজনা শেখাই। কিন্তু কি করে চিন্তা করতে হয়, চিন্তা-শক্তি কিসে বাড়ে, সে সম্বন্ধে কাকেও মাথা ঘামাতে দেখি না!

চিন্তা করবার শক্তি যাদের আছে, তারাই শুধু বিপদ-আপদে আকু-পাকু করে মরে না—বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় বার করে' নিস্তার পায়।

চোখের দেখায় বাহিরের কত বস্তুর সঙ্গে নিত্য আমাদের পরিচয় হচ্ছে,—কাণে শুনে আমরা কত কি শিখছি। তার পর ঘ্রাণ, স্পর্শ, স্বাদ—এ-সবের জোরেও আমাদের অভিজ্ঞতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ—এ-সবের গণ্ডী ছোট। এ-সবের সাহায্যে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি অর্থাৎ যা শিখি, তার সীমা সঙ্কীর্ণ। তবে দৃষ্টি, শ্রুতি প্রভৃতির সাহায্যে যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞানের সঙ্গে যদি আমরা আমাদের চিন্তাকে মিলিয়ে নিতে পারি, তাহলে জ্ঞানের প্রসার অনেকখানি বেড়ে ওঠে!

ছোট একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক জন বন্ধুর বাড়ী গেলুম,—সন্ধ্যার আগে। সদরে ঢুকে বাড়ীর ডান দিকে বসবার ঘর। দেখলুম, ঘরের একটি জানলা দিয়ে অস্ত-সূর্য্যের কিরণ এসে অপর দিকের দেওয়ালে পড়েছে। এখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ দিকে,—অর্থাৎ পূব, পশ্চিম, না, উত্তর, দক্ষিণ দিকে মুখ করে এ বাড়ীতে ঢুকেছি তো কি জবাব দেবো?

অভিজ্ঞতার জোরে আমরা জানি, সূর্য্য অস্ত যায় পশ্চিম দিকে—সুতরাং ঘরের দেওয়ালে যে রৌদ্র এসে পড়েছে, ও রৌদ্র অস্ত-সূর্য্যের, পশ্চিম দিক্ থেকে এসেছে! এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সঙ্গে চিন্তা করে সহজেই আমরা বলতে পারবো বাড়ীর সদর কোন্-মুখী!

স্কুলে এসেছি। স্কুলে আসবার সময় বাড়ী থেকে মা বলে দেছেন—ওরে, ছুটীর পর তোর বোনের জন্য একখানা ফার্ষ্ট বুক কিনে আনবি; তবে গিয়ে তোর মেসোমশায়ের অসুখ, তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবি,—বাড়ীতে কাল সত্য-নারায়ণের পূজা হবে ঠিক করেছি, ভট্টচায্যি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে অমনি বলে আসবি, তিনি যেন কাল সন্ধ্যার সময় আসেন—তার উপর আছে খোকার ফরমাশ, তার চাই লজেঞ্জস! বন্ধু নন্দ পয়সা দিয়ে বলে দেছে, তার চাই একটা লাটাই—তাও কিনে নিয়ে যেতে হবে!

এই যে এত কাজের ভার রয়েছে—আগে থেকে যদি চিন্তা করে নি,—স্কুল থেকে বেরিয়ে কার বাড়ী, কোন্ দোকান আগে পড়ে,—তাহলে আগে-পরে ঠিক করে' নিয়ে সব কাজগুলি পর-পর এবং শীঘ্র সারতে পারবো এবং কোনোটা বাদ থাকবে না!

এখানে চিন্তা না করতে পারলে এটা করতে ওটা যাবো ভুলে! না হয় স্কুলের কাছের দোকান থেকে বই না কিনে হয়তো বহু দূরে চলে গেলুম মেসোমহাশয়ের বাড়ী! তার পর মনে পড়লো ফার্ষ্ট বুকের কথা! আবার এলুম স্কুলের কাছে বই কিনতে; তার পর বাজারে গেলুম উল্টো পথে নন্দর জন্য লাটাই কিনতে—তার পর আবার ঘুরে এলুম লজেঞ্জস কিনতে! ঘোরাঘুরি কষ্টের আর অন্ত থাকবে না! এ জন্য চাই, ছোট বয়স থেকেই ভাবতে শেখা; ভেবে ছোট-খাট সমস্যার সমাধান করা চাই। ভাবতে ভাবতে আমাদের বুদ্ধিতে 'শাণ' পড়ে—বুদ্ধিতে মরচে ধরে না, বুদ্ধি হয় ধারালো; এবং বুদ্ধি ধারালো হলে লেখাপড়া বলো, লেখাপড়া সাঙ্গ হবার পর সংসার-ক্ষেত্রে বলো—কোথাও কোনো ব্যাপারে দিশাহারা হতে হবে না। জীবনে যত বড় কঠিন বিপদ বা সমস্যা আসুক, চিন্তার শক্তিতে সে-বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার, সে সমস্যা সমাধানের উপায় সহজেই মিলবে!

আমাদের মনের শক্তি চিন্তার ধারায় বাড়ে। চিন্তা-শক্তিকে বাড়িয়ে তোলবার পক্ষে—ক্রশ-ওয়ার্ড-পাজ্‌লের সমাধান, ধাঁধা-হেঁয়ালির জবাব বার করা, অঙ্ক কষা, প্রবন্ধ লেখা—এগুলিতে খুব সাহায্য হয়।

চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত করে, শাণিয়ে ধারালো করে মানুষ জগতে কি অসাধ্য না সাধন করেছেন! সিনেমা, রেডিও, এরোপ্লেন, যন্ত্র-পাতির আবিষ্কার এবং নির্ম্মাণ—গল্প মহাকাব্য নাটক উপন্যাস সৃষ্টি—যে-মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, সে-মানুষ ছাড়া এ-সব রচনা করবার ক্ষমতা অপরের থাকতে পারে না। তাই তোমাদের উচিত, ভাবতে শেখা। "ওরে বাবা, ভাববো কি"—বলে' চিন্তার পাশ কাটিয়ে 'নন্দ-দুলাল' হয়ে থাকলে কোনো দিন মানুষ হতে পারবে না!

"স্যর এতগুলি অঙ্ক দেছেন, কষে নিয়ে যেতে হবে, দু' পেজ ট্রানস্লেশন করে নিয়ে যেতে হবে, তার উপর কাল আছে আবার হিষ্ট্রীর এগজামিনেশন!" এ কথা মনে করে যে চুপচাপ বসে থাকে, ভাবনা-চিন্তা করে কাজে লেগে যায় না, তাকে চিরজন্ম দুঃখ পেতেই হবে। "আয়েসী" মানুষ জীবনে কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না—তার কারণ, সে ভাবতে চায় না! 'আয়েসী' হয়ো না, ভাবতে শেখো। তাহলে জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হবে না, পরাজিত হবে না—সিদ্ধিলাভ করবে, সুনিশ্চিত!

বিদেশী চোর

[রূপকথা]

বহু দিন আগেকার কথা। চন্দনপুরে নৃপেনাদিত্য নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি দয়ালু। তাঁর রাজ্যে প্রজারা পরম সুখে বাস করত। চুরি ডাকাতি এ-সব তাঁর রাজত্বে কখনও হ'ত না। প্রতিদিন সকালে রাজ্যের গরীব-দুঃখীদের রাজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাবার-দাবার কাপড়-জামা, যার যা দরকার দান করতেন। লোকে কথায় বলত—"আমরা রাম-রাজত্বে বাস করছি।" বলতে গেলে কোন অভাব-অভিযোগ তাঁর রাজ্যে ছিল না।

এক দিন রাজা নৃপেনাদিত্যের কাণে এল, কে এক জন বিদেশী চোর তাঁর রাজ্যে এসে বাস করছে এবং তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তখনি ডাক পড়ল মন্ত্রীর। বৃদ্ধ মন্ত্রী বিমলদেব এসে হাজির হলেন। মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"মন্ত্রিবর, শুনেছেন কি, আমার রাজত্বে এক বিদেশী চোর এসে উপদ্রব করছে!" মন্ত্রী মহাশয় বলির পাঁটার মত কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"হাঁ মহারাজ, আজ সকালে এই দুঃসংবাদ আমার কাণে এসেছে! আমি কোটাল চন্দ্রপীড়কে চোর ধরবার আদেশ দিয়েছি।" মহারাজ নৃপেনাদিত্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"উত্তম। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে সেই চোরকে জীবিত অথবা মৃত আমার সম্মুখে উপস্থিত করা চাই। আপনি আর চন্দ্রপীড় থাকতে এ-রকম অভিযোগ আমার কাণে আসে, এ ভয়ানক দুঃখের কথা!"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলে মন্ত্রী মহাশয় মহারাজকে অভিবাদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

গুপ্তচর-মুখে চন্দ্রপীড় সংবাদ পেলেন, কাছেই এক গ্রামে চুরি হয়েছে। অদ্ভুত চুরি! দিনের আলোয় চোর বাড়ীর মধ্যে জামাইয়ের ছদ্মবেশে ঢুকে বাড়ীর মেয়ের গহনার বাক্স নিয়ে চলে গেছে। চন্দ্রপীড় দলবল নিয়ে তখনই সেই গ্রামে যাঁর গৃহে চুরি হয়েছে, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গৃহস্বামী তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। চন্দ্রপীড় আশ্বাস দিয়ে বললেন—"কোন চিন্তা করবেন না। শীঘ্রই আমি চোর এবং চোরাই মাল খুঁজে বার করে দেব!" সে-দিনের মত চন্দ্রপীড় দল-বল সমেত তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় চন্দ্রপীড় এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য এক জন চাকর কিছু মিষ্টান্ন ও সরবৎ নিয়ে এল। তাঁরা বেশ পরিতৃপ্তি-ভরে খাওয়া-দাওয়া করলেন; তার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে নিদ্রিত হলেন।

ঘণ্টা-দুই পরে গৃহস্বামী তাঁদের খাবার জন্য ডাকতে এসে দেখেন, সকলে ঘুমুচ্ছেন। ভাবলেন—'আহা, এরা পথশ্রমে ক্লান্ত। যাক, ঘুমুচ্ছেন ঘুমুন, একটু পরে এসে আবার ডাকব।' ঘণ্টা-খানেক পরে আবার এসে দেখল, সকলে তখনো সেই রকম গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি তাঁদের ডাকলেন, কিন্তু কারো ঘুম ভাঙ্গলো না। তখন তিনি চন্দ্রপীড়কে নাড়া দিতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি নাড়ানাড়ির পর চন্দ্রপীড়ের ঘুম ভাঙ্গল। লজ্জিত হয়ে বললেন—"তাই তো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" গৃহস্বামী বললেন—"তাতে কি হয়েছে, পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন—" কথা কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। চমকিত ভাবে চন্দ্রপীড় বলে উঠলেন—"অ্যাঁ, এ কি?"

"কেন কি হ'ল?"

"আমার গলার হার, আঙ্গুলের আংটি—কিছুই দেখছি না।"

"বলেন কি?"

চন্দ্রপীড় চিন্তিত ভাবে বললেন—"কিছু তো বুঝতে পারছি না।"

তার পর অঙ্গরাখার জেবে হাত দিয়ে বললেন—"এটা কি?"

সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি বার করলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

"কোটাল চন্দ্রপীড় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আমায় ধরা আপনার কর্ম্ম নয়। মহারাজকে বলবেন, আরও যোগ্যতর লোক পাঠাতে। গৃহস্বামী নির্দ্দোষ। তাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না যেন। কন্যার গহনার শোকে তিনি পীড়িত। আমি চাকর সেজে গাঁঠের পয়সা খরচ করে যখন মিষ্টান্ন আর সরবৎ দিয়ে আপনাদের সম্বর্দ্ধনা করেছিলুম, অতিথি-সৎকারের জন্য তখন তিনি জেলে দিয়ে পুকুরে মাছ ধরাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, মিষ্টান্নে আর সরবতে ঘুমোবার ওষুধ মেশানো ছিল। আপনার স্নেহের দানের কথা চিরকাল মনে থাকবে। আপনার হার আমার গলায় এবং আপনার আংটি আমার আঙ্গুলে শোভাবর্দ্ধন করছে। নমস্কার।

বিনীত

বিদেশী চোর।"

লজ্জিত ভাবে রাজধানীতে ফিরে মহারাজকে চন্দ্রপীড় সকল কথা নিবেদন করলেন। মন্ত্রী আর মহারাজ দু'জনেই চিন্তিত হলেন। চন্দ্রপীড়কে বিশেষ দোষ দিতে পারলেন না। এমন ক্ষেত্রে সন্দেহই বা হয় কি করে! তিন জনে গভীর ভাবে পরামর্শ করতে লাগলেন, কি করা যায়, কাকে এ কাজের ভার দেওয়া যায়!

শেষে মন্ত্রী বিমলদেব বললেন, "মহারাজ, যদি অনুমতি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।" মহারাজ বললেন, "বেশ, আপনিও একবার দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন।"

পরদিন গুপ্তচরেরা সংবাদ দিলে, রাজধানীর কাছে স্বর্ণধারা নদীর তীরে সদর নায়েব মলয়ানিলের বাড়ীতে গতরাত্রে চুরি হয়েছে। চুরিটা বিস্ময়কর! সদর নায়েব মহালের আদায়পত্র হিসেব করছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে তীব্র আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে তিনি ভিতরে গেলেন। ভিতরে গিয়ে শুনলেন, সকলের মুখে এক কথা—"কে চীৎকার করলে?" চারি ধারে খুঁজে তার কোনও সন্ধান না পেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের ঘরে এসে দেখেন, বাক্স ভাঙ্গা, টাকাকড়ি সমস্ত চুরি গেছে, একটি পয়সাও নেই!

মন্ত্রী মহাশয় দু'জন অনুচর নিয়ে অনতিবিলম্বে মলয়ানিলের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে শুনে মন্ত্রী বললেন,—"এ নিশ্চয় সেই বিদেশী চোরের কাজ! আপনি ভাববেন না—আমি শীঘ্রই এর ব্যবস্থা করব।"

মন্ত্রী বৃদ্ধ, এবং ঠাকুরদেবতার উপর খুব ভক্তি। পরদিন সকালে স্নান সেরে স্বর্ণধারা নদীর তীরে রাধাকৃষ্ণজীউর মন্দিরে গেলেন। সঙ্গে দু'জন অনুচর। মন্দিরে পূজাদি শেষ হবার পর সেখানকার পুরোহিত তাঁকে চরণামৃত খেতে দিলেন। হঠাৎ মন্ত্রী মশাইয়ের শরীর অত্যন্ত আনচান্ করতে লাগল। মন্দির-সংলগ্ন একটি ঘরে তাঁকে শুইয়ে পুরোহিত অনুচর দু'জনকে বাড়ীতে খবর দিতে আর কবিরাজ ডাকতে পরামর্শ দিলেন। তারা তখনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

কবিরাজ আর নায়েব মশায়কে নিয়ে অনুচররা যখন মন্দিরে ফিরল, তখন সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এসে তাঁরা শুনলেন, সত্যকারের পুরোহিতকে মন্দিরের পিছনে মুখ আর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিতরে গিয়ে তাঁরা দেখেন, মন্ত্রী মহাশয় তখনো অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করবার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। প্রশ্ন করতে তিনি বললেন—"জানি না, হঠাৎ শরীরটা কেন যে অমন করে উঠল! অ্যাঁ, এ কি!"

"কেন? কি হয়েছে?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মন্ত্রী বলে উঠলেন—"আমার গলার হার, আঙ্গুলের আংটী?"

অনুচরেরা তখনি চারি ধারে খুঁজতে আরম্ভ করল। হার-আংটী পাওয়া গেল না, মিলল একটি চিঠি। মন্ত্রী মহাশয় দেখলেন, তাতে লেখা আছে—

"মন্ত্রী বিমলদেব সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বৃদ্ধ লোক। অনর্থক আমাকে ধরবার জন্য কেন কষ্ট করছেন! ধর্ম্মে আপনার মতি আছে। আমি জানতুম, আপনি এতখানি পথ যখন এসেছেন, তখন নিশ্চয় রাধাকৃষ্ণজীউর মন্দির দর্শন করবেন। তাই আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। চরণামৃতে ঘুমোবার ওষুধ ছিল। আপনার হার এবং আংটী আমিই ধারণ করেছি। নমস্কার।

বিনীত

বিদেশী চোর।"

* * * *

ক্ষুণ্ণ মনে রাজধানীতে ফিরে মহারাজাকে মন্ত্রী সব কথা নিবেদন করলেন। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর ঠিক হলো, মহারাজ ঘোষণা প্রচার করবেন, চোর যদি স্বয়ং মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের চুরির কেরামতি দেখিয়ে তাঁকে খুশী করতে পারে, তাহলে মহারাজ তার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন! নগরে নগরে ঢ্যাঁটরা দিয়ে ঘোষণা প্রচার করবার দু'-এক দিন পরেই এক যুবক রাজ-দরবারে এসে উপস্থিত হলো। উজ্জ্বলকান্তি, সৌম্যদর্শন, বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। সভার সকলে তার দিকে প্রশংসা-বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। যুবক মহারাজকে অভিবাদন করে বললে—"আমি ঘোষণা-অনুযায়ী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

মহারাজ আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—"যুবক, তুমি কে?" যুবক মৃদু হাস্যে উত্তর দিলে—"আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আপনার কোটাল আর মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। আমি সেই বিদেশী চোর।" সভায় সেই মুহূর্ত্তে বজ্রপাত হলেও লোকে এত চমকিত হতো না। মহারাজ বললেন—

"তোমার আগমনে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, কিন্তু আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে তোমার কঠোর সাজা হবে।" অভিবাদন করে বক উত্তর দিলে—"তা জেনেই আমি এসেছি মহারাজ!"

সে-দিনকার মত সভা ভঙ্গ হলো।

পরদিন মহারাজ চোরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দূরে এক কৃষক গরু দিয়ে লাঙ্গল চালাচ্ছিল। মহারাজ বললেন—"শুনছো, "ঐ যে কৃষক লাঙ্গল চালাচ্ছে, ওর গরু আর লাঙ্গল চুরি করতে হবে, কিন্তু ও তা বুঝতে পারবে না। কেমন পারবে?" চোর বললে—"আপনার আশীর্ব্বাদে পারব বৈ কি। আপনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করুন।"—এই কথা বলে চোর সেইখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এক জন লোক একটি পুঁটলি কাঁধে কি যেন খেতে খেতে কৃষকের কাছে গিয়ে হাজির হলো। কৃষক তাকে প্রশ্ন করলে, "কি খাচ্ছ?"

সে উত্তর দিলে, "কাছে ঐ বনের মধ্যে খুব মিষ্টি কুলের গাছ আছে, সেখান থেকে কুল এনে খাচ্ছি।" কৃষকের কুল খাওয়ার লোভ হলো। লোকটিকে সে বললে, "তুমি যদি ভাই আমার গরু দু'টোকে একটু দেখ, আমি তাহলে গোটাকতক কুল নিয়ে আসি।" আগন্তুক বললে—"বেশ তো, স্বচ্ছন্দে যেতে পার।" লোকটির জিম্মায় গরু রেখে কৃষক চলে গেল। তখন লোকটি ঝুলির মধ্য থেকে গরুর ল্যাজের ডগা আর শিঙ্ বার করে মাটাতে পুঁতে দিলে, তার পর লাঙ্গলশুদ্ধ গরুকে নিয়ে রাজার কাছে ফিরে হাজির হয়ে সেখানে রেখে আবার পূর্ব্ব-স্থানে ফিরে এসে হেট-হেট করতে লাগল! ততক্ষণে কৃষক এসে পড়ল। লোকটি মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে—"ভাই, মাটাটা বড় নরম ছিল। গরু-লাঙ্গল সব-শুদ্ধ মাটার ভেতর ঢুকে গ্যাছে।" মহারাজ ততক্ষণে সেখানে এসে পড়েছেন। হেসে তিনি বাঁচেন না! বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তিই সেই বিদেশী চোর! অবশ্য কৃষককে তখুনি সে গরু আর লাঙ্গল ফেরৎ দেওয়া হলো। প্রথম পরীক্ষায় বিদেশী চোর উত্তীর্ণ হলো।

পরের দিন চোরকে মহারাজ বললেন—"আমার ঘোড়া অশ্বরক্ষকের সামনে থেকে চুরি করতে হবে, অথচ সে সন্দেহ করবে না। পারবে?" হেসে মহারাজের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যুবক বললে—"আপনার আশীর্ব্বাদে পারব বৈ কি।" মহারাজ বললেন—"বেশ, কিন্তু অশ্বরক্ষকের যেন সন্দেহ না হয় তুমি চুরি করছ! সাবধান!" কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এক জন বৃদ্ধ অশ্বশালে উপস্থিত হয়েছেন। অশ্ব-রক্ষককে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমাকে মহারাজ পাঠিয়েছেন ঘোড়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে।" বছরে দু'-চার বার এ রকম স্বাস্থ্য-পরীক্ষক পাঠানো হয়। তখনি চিকিৎসককে সঙ্গে করে অশ্বরক্ষক তাঁকে অশ্বশালে নিয়ে গেল। তিনি ঘোড়াদের দাঁত, পা, ঘাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করতে লাগলেন। রাজার খাস-ঘোড়া কোন্‌টা, জিজ্ঞেস করতে অশ্বরক্ষক দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এই কুড়িটা ঘোড়া তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্ম। তার মধ্যে এটি তাঁর সব চেয়ে আদরের।" বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়াটিকে পরীক্ষা করলেন, করে বললেন—"ঘোড়াটির আর সবই ভালো, তবে পায়ে যেন একটা বাতের মত মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একে একটু ছুটিয়ে দেখি।" অশ্বরক্ষক বললে—"বেশ।" তখনি বৃদ্ধ রাজার প্রিয় অশ্বের পিঠে চড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে মহারাজের কাছে উপস্থিত হলো, এবং মহারাজকে সব কথা খুলে বলল। এই বৃদ্ধ চিকিৎসকই সেই বিদেশী চোর।

দু'-চার দিন পরে মহারাজ চোরকে বললেন—"আজকে সন্ধ্যের পর মহারাণীর গলার হার চুরি করতে হবে। ঘরে ঢোকবার পথ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরা পড়ে গেলে কিন্তু প্রাণদণ্ড হবে।"—এই বলে মহারাণীর মহলে ঢোকবার পথ চোরকে দেখিয়ে দিলেন! সন্ধ্যার পর রাণীর মহলে প্রবেশের পথে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং মহারাণীর ঘরে পাহারা দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার কিছু পরে এক মনুষ্যমূর্ত্তি মহারাণীর মহলের প্রবেশ-পথে দেখা দিল, অমনি আড়াল থেকে প্রহরী সে মূর্ত্তিকে বর্শা-বিদ্ধ করলে। নীচে প্রাঙ্গণে ধপ করে মনুষ্যদেহ-পতনের শব্দ হলো! মহারাজ রাণীকে পূর্ব্বেই এই চোরের কথা সব বলেছিলেন। পতনের শব্দ শুনে বললেন,—"এবার লোকটার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। একে বর্শার আঘাত—তার পর এত উঁচু থেকে পতন! নিশ্চয় সে বেঁচে নেই। যাই, দেখে আসি।"—এই কথা বলে তিনি মহল ত্যাগ করে, নীচে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এক জন প্রহরী মহারাণীর কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললে,—"মহারাণি! বিদেশী চোরের অন্তিমকাল উপস্থিত। শেষ প্রার্থনা-হিসেবে সে, যে-জিনিষের জন্ম প্রাণ হারাতে বসেছে, সেই হারটি একবার দেখতে চায়। মহারাজ তাই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" মহারাণী তখনি প্রহরীর হাতে নিজের গলার হার খুলে দিলেন।

নীচে মৃতদেহ ঘিরে মহারাজ আর প্রহরীরা দাঁড়িয়ে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল,—"মহারাজ, এই নিন রাণীমার গলার হার।" রাজা বিস্মিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, বক্তা সেই বিদেশী চোর! প্রহরীদের বিদায় দিয়ে মহারাজ চোরকে জিগ্‌গেস করলেন—"কি করে কি হলো, সব খুলে বল তো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" চোর বললে—"আপনার কথায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, আমাকে ধরবার জন্ম কোনও ফাঁদ পেতেছেন, তাই আগে আমি একটি মৃতদেহ জোগাড় করে তাকে দ্বারপথে এগিয়ে দিয়েছিলুম। প্রহরীদের আঘাতে সেই মৃতদেহই নীচে পড়ে গিছল। আমি এক-ধারে লুকিয়ে ছিলুম, আপনারা নীচে নেমে যেতেই আমি মহারাণীর মহলে প্রবেশ করলুম।" তার পর কি করে মহারাণীর কাছ থেকে হার নিয়ে এল, সে কথাও বললে।

পরদিন মহারাজ মন্ত্রী ও কোটালকে সব কথা খুলে বললেন। মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন—"এ চোরকে শাস্তি না দিয়ে রাজকার্য্যে ব্যবহার করলে প্রভূত উপকার হতে পারে। চোরের বুদ্ধি যে তীক্ষ্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" কোটাল প্রশ্ন করলে,—"কিন্তু কি ভাবে তা করা সম্ভব?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন,—"যদি রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহলে সে আর রাজ্যের কোনও ক্ষতি তো করবেই না, বরং তার বুদ্ধির বলে রাজ্যের অনেক উন্নতি হবে।" রাজা বললেন—"কথাটা মন্দ বলোনি, তবে রাজকন্যার মতামত জানা প্রয়োজন।" মন্ত্রী বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো বটেই।"

সে-দিনকার মত সভা ভঙ্গ হলো।

সুদর্শন যুবকটিকে দেখে আর তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রাজার মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই মন্ত্রীর পরামর্শ তাঁর খুব ভালই

লাগল। তিনি তখনই অন্তঃপুরে গিয়ে রাণী ও রাজকন্যাকে সব কথা খুলে বললেন। রাণী আপত্তি করলেন—"কিন্তু এক চোরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে!" রাজা হেসে বললেন—"শোনাচ্ছে খুব খারাপ, কিন্তু ওর বুদ্ধি বিপথে চলেছে। ও-বুদ্ধি যদি ঠিক পথে আসে, তাহলে সে আর চোর থাকবে না। দস্যু রত্নাকরও পরে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি হয়েছিলেন। ওর বুদ্ধির প্রাচুর্য্য অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং আমার বিশ্বাস, তাকে সুপথে চালিত করা যাবে।"

রাজকন্যা বললেন—"কিন্তু আমি তার বুদ্ধির কোন পরিচয় পাইনি। যদি সে আমার কাছে বসে এমন কোন সত্য গল্প শোনাতে পারে যা সত্যই বিস্ময়কর, তবেই আমি তাকে বিবাহ করব, এই কথা তুমি তাকে বলে দাও। যখন সে গল্প বলবে, সেই সময় আমি তাকে ধরে ফেলব। যদি সে আমার হাত থেকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে, তবেই বুঝব সে প্রকৃত বুদ্ধিমান্। আর যদি সে অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাকে সাধারণ চোরের মত শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য এ কথা আর কাউকে বোলো না।"

মহারাজ কন্যার বুদ্ধির প্রশংসা করে বললেন—"মন্দ যুক্তি নয়।"

সে দিন সন্ধ্যার সময় চোর রাজকন্যার সামনে বসে তাঁকে গল্প শোনাচ্ছে—"এক রাজা। তিনি তার পাশের রাজার রাজত্ব আক্রমণ করেন এমন সময়, সে দেশের রাজা যখন পীড়িত এবং তাঁর একমাত্র সন্তান নাবালক। রাজা হেরে গেলেন এবং নাবালক পুত্রকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তার পর রাজা মারা গেলেন,—আর তাঁর পুত্র বড় হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার না ছিল সৈন্য, না ছিল অর্থ! তাই সে একাই রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে লাগল। রাজা বিপদে পড়লেন—" গল্প জমে এসেছে, এমন সময় রাজকন্যা চোরের হাত দু'হাতে চেপে ধরে "চোর ধরেছি" বলে চীৎকার করলেন। চোর অমনি ঘরের জ্বলন্ত প্রদীপটি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। আলো নিয়ে লোক-জন এবং রাজা ঘরে ঢুকলেন—তখনও রাজকন্যা চোরের হাত ধরে আছে—কিন্তু চোর কই? যে হাত রাজকন্যা ধরে আছেন, সে হাত মোমের তৈরী এবং তার আঙ্গুলের ফাঁকে একটা চিরকুট আটকানো! লোকজনকে বিদায় দিয়ে রাজকন্যা পড়ে দেখেন, চিরকুটে লেখা আছে—"আমিই সেই হতভাগ্য বিতাড়িত রাজার পুত্র, আর আপনার পিতাই আমাদের রাজ্য-সম্পদ্ কেড়ে নিয়েছিলেন।" রাজকন্যা পিতাকে প্রশ্ন করতে তিনি সবই স্বীকার করলেন। রাজকন্যাও চোরের বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না।

তার পর? তার পর রাজকন্যার সঙ্গে চোর-রাজপুত্রের খুব ধুমধাম করে বিয়ে হলো এবং কালে এই রাজপুত্রই রাজা হলেন। তাঁর রাজ্যে কখন কোন উপদ্রব বা চুরি-ডাকাতি হবার উপায় ছিল না। কারণ, তিনি নিজেই ছিলেন চোরের রাজা! তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মস্থান ও পিতৃপরিচয়

প্রাচীন সপ্তগ্রাম সহর হুগলী নগরের বায়ু-কোণে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ইহার অনতিদূরেই মুক্ত ত্রিবেণী। পুরাণে এই সপ্তগ্রাম একটি সুপবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইত। এই সুপবিত্র নগর পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী ও উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত হওয়ায় ইহা একটি সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রিয়ব্রত-পুত্র সাত জন তপস্বীর তপস্যার স্থান বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ থাকিলেও প্রাচীন সপ্তগ্রাম খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও একটি সুবৃহৎ সহর ছিল। বর্ত্তমান কলিকাতার আদিম অধিবাসিরূপে যে সকল শেঠ, বসাক ও সুবর্ণ-বণিক্গণকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের অনেকেরই পূর্ব্বনিবাস সপ্তগ্রাম। পাঠান-শাসন কালে সপ্তগ্রাম দক্ষিণ-বঙ্গের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ইবন্ বতুতা' নামক মিশরদেশীয় পর্য্যটক সপ্তগ্রামে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামকে "সোদকাওয়ান" বা "সাদগাঁওন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুবিখ্যাত পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ডি ব্যারোজও (De Barros) তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক নামক এক জন ইংরেজ পর্য্যটক বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন। তখন পর্য্যন্তও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সরস্বতীর মূল স্রোত তখন ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত হওয়ায় সুবৃহৎ অর্ণবপোতগুলি সপ্তগ্রামে না আসিয়া "বাওর" নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিত, ইহা ফ্রেডারিকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। পাঠান-শাসন কালে সপ্তগ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উহা লক্ষ্য করিয়াই কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিত হইয়াছে—

"সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসি সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।"

পাঠান-শাসন কালে অধিকাংশ শাসনকর্ত্তারই সপ্তগ্রামে টাকশাল ছিল। বোধ হয়, দক্ষিণ-বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া এই স্থানে মুদ্রার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইত।*

* "সাজাহাননামা" হইতে জানা যায় যে, পরবর্তী কালে পর্ত্তুগীজগণ হুগলীতে বাস করিয়া ঐ স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করায় এবং কারখানা

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম একটি "মুলুক" ছিল। অনেকগুলি পরগণা লইয়া একটি মুলুক গঠিত হইত। স্বাধীন পাঠান বাদশাহ্‌দিগের আমলে সপ্তগ্রামের রাজনৈতিক অবস্থাও বিশেষ উন্নত ছিল। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ এক-শাসনাধীনে আসিয়াছিল, তখনও গৌড়ে মূল রাজধানী থাকিলেও সপ্তগ্রাম দ্বিতীয় রাজধানীরূপে পরিগণিত হইত। এখানেও বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণ সময়ে সময়ে অবস্থান করিতেন। ফলতঃ, এই মুলুকের শাসনকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়ায় এখানেও এক জন ফৌজদার ও কাজি থাকিতেন এবং এখানেও অপরাধীদিগকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল।

এই মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার যাঁহারা লইতেন, তাঁহাদিগকে মুলুকের অধিকারী বা মজুমদার বলা হইত। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বার্ষিক রাজস্ব আদায় করিয়া দিবার সর্ত্তে মুলুক ইজারা লইতেন। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারে জমা দিয়া ইহার অধিক যে পরিমাণ রাজস্ব তাঁহারা আদায় করিতে পারিতেন বা অন্য কোনও প্রকারে প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ অধিকারী আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা সরঞ্জামি ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ নিজেরা লইতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিরণ্য দাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাস সপ্তগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদার নামে অভিহিত হইতেন। গৌড় তখন স্বাধীন পাঠান রাজগণের রাজধানী। মুলুকপতি মজুমদারগণকে তখন গৌড়ের সরকারে এক জন উকীল বা আরিন্দা রাখিতে হইত। ইঁহাদের মারফতে রাজস্ব সরবরাহ করা হইত এবং ইঁহারাই মজুমদারের মধ্যে ও রাজ-সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষ হইতে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক জন ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজ-সরকারের "আরিন্দা" ছিলেন। ইনি মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের অঙ্গীকৃত রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসরে গৌড়ের রাজ-সরকারে জমা দিতেন। মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের শুদ্ধ রাজস্বের খাতে ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আদায় হইত, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, ঐ জন্য তাঁহারা বার্ষিক ৪।৫ লক্ষ টাকা শুল্ক হিসাবেও আদায় করিতেন। এইরূপে রাজস্ব হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা রাজ-সরকারে দিয়াও ইঁহাদের প্রায় ১২।১৩ লক্ষ টাকা থাকিত।

সপ্তগ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর নামে একটি পল্লীতে মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজপ্রাসাদতুল্য আবাস-গৃহ ছিল। এই স্থানটি সরস্বতী নদীর তীরে, এখনও এই স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্নেই সরস্বতীর খাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই স্থানে এই সুবিশাল প্রাসাদের কোনও চিহ্ন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন এই স্থান আর লোকের সুপরিচিত নহে; জঙ্গলের মধ্যে ঢুলেপাড়ার সন্নিকটে জনবিরল স্থানে "রঘুনাথ দাসের পাটবাড়ী"রূপে এই স্থানটির এখনও সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে একটি আধুনিক ইষ্টকনির্ম্মিত সামান্য গৃহে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ জনৈক ভেকধারী বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে সরস্বতীর খাদে নামিবার জন্য ইষ্টকনির্ম্মিত সোপান আছে।

এই কৃষ্ণপুর গ্রাম যখন সপ্তগ্রামের সহরতলীরূপে সপ্তগ্রামের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক উক্ত দুই জন কায়স্থ ভ্রাতা এই স্থানে বাস করিতেন। কায়স্থ-সমাজে ইঁহারা যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইঁহাদিগকে "সংকুলীন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * শ্রীল সনাতন গোস্বামীও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে "কায়স্থকুল-ভাস্কর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। † সম্ভবতঃ, ইঁহারা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন; কারণ, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে "দাস" উপাধিধারী কেহ কোনও দিন কুলীন বলিয়া গৃহীত হন নাই। নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই এই দাস-ভ্রাতৃদ্বয়ের দানগ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশের শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ও শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ইঁহার দান গ্রহণ করিতেন, এ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই জানা যায়। সুতরাং এই মজুমদার-বংশ যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত এই ভ্রাতৃদ্বয় সদাচারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। এই জন্য ইঁহারা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন।

কিন্তু এই বিশাল সমৃদ্ধির মধ্যেও ইঁহাদের অন্তরে সুখ ছিল না। ইঁহাদের পুত্র-সন্তান ছিল না। হিরণ্য দাসের কোনই সন্তান হয় নাই; দীর্ঘকাল পরে বোধ হয়, প্রৌঢ় বয়সে গোবর্দ্ধনের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইনিই রঘুনাথ দাস। সম্ভবতঃ ১৪১৬ শকে বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপুরে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস ইঁহারাই উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও জন্মসময়, জন্মতিথি নির্দ্দিষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। যে বিনয়ে আদর্শ-চরিত্র ভক্ত "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া যান, ইঁহারা সেই বিনয়ের মূর্ত্তিমান্ অবতার। ইঁহাদের নিজ নিজ জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনের এই ছয় গোস্বামীর মধ্যে পাঁচ জনই ব্রাহ্মণ, মাত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কায়স্থ। হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস রাম-লক্ষ্মণের মত অভিন্নহৃদয় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পুত্ররূপে রঘুনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মে মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের

স্থাপন করায় সপ্তগ্রামের বাণিজ্যসমৃদ্ধি হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলীর সম্মুখের খাল সংস্কৃত করিয়া দেওয়ায় নদীর মূল স্রোত তাহাতে প্রবাহিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের সম্মুখস্থ নদীস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়।

* মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সংকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য।
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

† শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীল হরিভক্তিবিলাসে স্বকৃত টীকা দিগ্‌দর্শনীর প্রারম্ভেই শ্রীল রঘুনাথ দাসের পরিচয় দিতে যাইয়া তাঁহাকে "কায়স্থকুল-ভাস্কর" বলিয়াছেন। সনাতন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

হৃদয় যে আনন্দের প্রবাহে পরিষিক্ত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। রঘুনাথের জন্মে উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগকে "পুত্রবান্" বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রঘুনাথের যেমন রূপ, তেমনই গুণ। উভয় ভ্রাতাই তাঁহাকে প্রাণের সমান ভালবাসিতেন।

শিক্ষা ও সাধুসঙ্গ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য। পুত্রের শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই তাঁহারা তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শান্ত সৌম্যদর্শন রঘুনাথের বাল্যকাল হইতেই বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। ধার্ম্মিক দাস-ভ্রাতৃদ্বয়—সে কালের প্রচলিত রীতি অনুসারে রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত মনে করিলেন। গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষাতেই স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয় এবং সদাচার অভ্যস্ত হয়। কৃষ্ণপুরের অনতিদূরে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্য নামক এক জন সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহাকেই দাস-ভ্রাতৃগণ পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাকে সর্ব্বাংশে অনিন্দনীয় ও আদর্শ-চরিত্র জানিয়া রঘুনাথের পিতৃব্য ও পিতা তাঁহাকে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের বাটীতে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। শুভক্ষণে রঘুনাথ আচার্য্যগৃহে প্রেরিত হইলেন।

জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবশেই শৈশব হইতেই তাঁহার মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সুকৃতী রঘুনাথ "বাল্যকাল হইতেই বিষয়ে উদাসীন"। বলরাম আচার্য্য একে সুপণ্ডিত, তাহাতে ভগবদ্ভক্ত। রঘুনাথ তাঁহার গৃহে আসিয়া অতীব ঔৎসুক্য সহকারে বিদ্যাশিক্ষায় নিরত হইলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র-গুণে তিনি অচিরেই বলরাম আচার্য্যের স্নেহলাভ করিলেন। রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন—বলরাম আচার্য্যের সুনিপুণ অধ্যাপনায় রঘুনাথও সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারে কি প্রকার সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহার দানকেলি-চিন্তামণি, মুক্তা-চরিত ইত্যাদি গ্রন্থে এবং সুমধুর কবিত্বপূর্ণ পুস্তকাবলীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে আবার বলরাম হরিভক্তের শিরো-মণি, বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। তিনি ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের জাতিকুল বিচার করিতেন না! শ্রীচৈতন্যদেব যে সর্ব্ব-লোকসুলভ সাধনপদ্ধতি জগৎকে দান করিয়াছেন—শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। যাঁহারা ঐকান্তিক অনুরাগে এই নামসঙ্কীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়াছিলেন. হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেন। ইনি যবন হইলেও হরিনামে ইঁহার নিষ্ঠার ফলে ইনি "হরিদাস ঠাকুর" নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইঁহার আদর্শ চরিত্র এবং হরিনামে ইঁহার নিষ্ঠা ও অনুরাগের জন্য ইনি উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে সকলেরই পরম শ্রদ্ধাপাত্র হইয়াছিলেন। বেণাপোলে একটি নির্জ্জন স্থানে ইনি অবস্থান করিয়া প্রতিদিন তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেন। হরিনামে ইঁহার এই অনুরাগের কথা শুনিয়া ঐ স্থানের জমিদার রামচন্দ্র খাঁন অসূয়াবশে ইঁহার নিকট একটি সুন্দরী বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়া ইঁহার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই বেশ্যা হরিদাস ঠাকুরের প্রভাবে—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্তি॥"

হরিদাস ঠাকুর বেণাপোলে তাঁহার সাধন-কুটীর এই বেশ্যাকে দিয়া বেণাপোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। বৈষ্ণবে অসামান্য প্রীতিশীল বলরাম আচার্য্য তাঁহাকে চাঁদপুরে নিজ গৃহে রাখিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে নামকীর্ত্তনের জন্য একখানি ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি সেখানে থাকিয়া নাম জপ করিতেন এবং বলরাম আচার্য্যের গৃহে "ভিক্ষা" গ্রহণ করিতেন। এই সৌম্যমূর্ত্তি নাম-সংকীর্ত্তনপর সাধুকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই দশ বৎসর বয়স্ক বালক এই সাধুর প্রতি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিলেন। হরিদাস ঠাকুর শিশুগণকে পবিত্র দেব-পূজার ফুলের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ইনি শিশুদিগকে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের মুখে হরিনাম শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। কথিত আছে, বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে যে "হরির লুট" দেখা যায়, ইনিই এইরূপে তাহার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রতি রঘুনাথের শ্রদ্ধা দেখিয়া তিনিও এই শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুশীল বালককে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহাকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন। বালক রঘুনাথও এই অবধি নিষ্ঠাসহকারে তাঁহার জন্মান্তরীণ সাধনের সহায়ক হরিনাম, যত অল্প সময়ের জন্যই হউক, নিয়ম পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

দৈববশে এই সময়ে একটি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বেতন ভোগ করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে গৌড় সরকারে রাজস্ব জমা দিতেন এবং রাজ-সরকারের সহিত মজুমদার-ভ্রাতৃগণের যোগ রক্ষা করিতেন অর্থাৎ মজুমদারের পক্ষ হইতে যাবতীয় ব্যাপার রাজ-সরকারে জানাইতেন এবং রাজ-সরকারের যাবতীয় ব্যাপার মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের গোচরে আনয়ন করিতেন। এইরূপ কর্ম্মচারীকে আরিন্দা নামে অভিহিত করা হইত। এই গোপাল চক্রবর্ত্তীর আকৃতি পরম সুন্দর ছিল। এক দিন মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহে বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহাদের সভায় লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া দুই ভাই পরম সমাদরে প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সভায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই হরিদাস ঠাকুর যে তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করেন, তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ সকলেই নামের মহিমা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন—নাম হইতে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। অন্য কেহ বলিতে লাগিলেন—নামের ফলে জীবের মোক্ষলাভ হয়। হরিদাস ঠাকুর এই সকল আলোচনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হরি-নামের এই ফল পর্য্যাপ্ত নহে, হরিনামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উৎপন্ন হয়। সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, পরে সূর্য্য উদিত হইলেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও মঙ্গলের প্রকাশ হয়; সেইরূপ নামরূপ সূর্য্য উদিত হইলে কৃষ্ণপদে ভক্তিরূপ মুখ্য ফল জন্মে এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে মুক্তি ও পাপ নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং নামাভাস হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।"

এই কথা গোপাল চক্রবর্ত্তীর সহ্য হইল না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ!
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়।"
হরিদাস কহে—"কেনে করহ সংশয়?
শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়।
ভক্তিসুখ—আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়।"

উদ্ধত যুবক গোপাল চক্রবর্ত্তী বলিয়া বসিল—"যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে তোমার নাসিকা ছেদন করিব।" হরিদাস ঠাকুর তাহাই স্বীকার করিলেন। সভাস্থ সকল লোক হরিদাস ঠাকুরের এই অপমানে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। হিরণ্য মজুমদার গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ত্যাগ করিলেন। মহাত্মের অপমানের যে সর্ব্বনাশ ফল, অবশেষে তাহাই ফলিল।

"তিন দিন ভিতরে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পককলিকা সম হাত পায়ের অঙ্গুলী।
কোঁকর হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; অন্ত্য; ৩য় পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পরে হরিদাস ঠাকুর চাঁন্দপুর ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন—শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পরম সমাদরে তথায় রাখিলেন।

এই ঘটনার ফলে সপ্তগ্রামে নাম-মহিমার প্রতি লোকের অতিশয় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল এবং বালক রঘুনাথের ও হরিদাস ঠাকুরের নাম-মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হইল। রঘুনাথ দাসের সৌভাগ্যোদয়ের ইহাই প্রথম সোপান। হরিদাসের এই কৃপা হইতেই তাঁহার হরিনামে নিষ্ঠা হইল এবং কিছু দিন পরেই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া তাঁহার পাদপদ্মলাভকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া স্থির করিলেন। সামান্যমাত্র সাধুসঙ্গেরও ফল কিরূপ সর্ব্বার্থসাধক, রঘুনাথের উত্তর-জীবনে তাহা প্রমাণিত হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

সুধা-হরণ

[নক্সা]

মুর্শিদাবাদ জেলার মধুনগর গ্রামের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী রমা বসু উচ্চশিক্ষিত ও প্রতাপান্বিত। গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধুনগরের নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন প্রায় এক মাইল দূরে। গ্রাম হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে।

জমিদার-বাটীর সদরের বৈঠকখানায় জমিদারণী রমা বসু একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতে করিতে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থূলদেহ এবং গম্ভীর মুখ দেখিলে দর্শকের মনে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। যৌবনে তিনি যে অসামান্যা রূপবতী ছিলেন, তাহার লক্ষণ এখনও তাঁহার শরীরে বিদ্যমান। এখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, চল্লিশ পার হয় নাই। দুই রগের পাশে কিছু শুক্লকেশ থাকিলেও দূর হইতে তাহা লক্ষ্য হয় না। যৌবনে তিনি যেমন রূপবতী ছিলেন, সেইরূপ বলবতীও ছিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া যখন কলেজে পড়িতেন, তখন **Long jump high jump**, প্রভৃতিতে অনেক বার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হইলেও তাঁহাদের প্রবীণা ম্যানেজার মৃণালিনী মজুমদারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শরীরচর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চায় কোন ত্রুটি হয় নাই, ম্যানেজারের নিকট তিনি জমিদারীর কাজ কর্ম্মও রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে বান্ধবীদের সংসর্গে পড়িয়া না কি তাঁহার চরিত্রস্খলনের উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা মৃণালিনী দেবীর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি যুবতী মনিবকে দেশে আনাইয়া তাঁহার মতি-গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মধুনগরের সন্নিহিত আনন্দপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্র হিমাংশুকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ম্যানেজার দেবীকে তিনি "মাসীমা" বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তিও করিতেন, মাসীমার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে তাঁহার সাহস ছিল না। ম্যানেজার দেবী বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রমা বলিয়াছিলেন—"আমার ইচ্ছা, এম-এটা আর একবার চেষ্টা করে দেখি, এম-এ পাশ করে তার পর বিবাহ করলে হয় না?"

এ কথায় ম্যানেজার দেবী বলিয়াছিলেন, নাই বা পাশ করলে মা, তোমাকে ত চাকরি করতে হবে না যে, পাশ করলে চাকরির সুবিধা হবে! তোমার বার্ষিক আয় বিশ হাজার টাকার উপর; কাজেই সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না। তোমার লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য জ্ঞান-লাভ, বাড়ী বসেই তা হতে পারে। আমার ইচ্ছা, তুমি বাড়ীতে বসে বিষয়-কর্ম্ম দেখ আর পড়াশুনা কর। আমি আর কত দিন?"

মাসীমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। রমার বিবাহ হইল। বিবাহের সময় রমার বয়স চব্বিশ বৎসর, হিমাংশুর বয়স উনিশ। বাড়ীতে বসিয়া রমার বিষয়-চর্চ্চা ও বিদ্যা-চর্চ্চা চলিতে লাগিল

কিন্তু বলচর্চ্চা বন্ধ হইল। ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মেদবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি রীতিমত স্থুলাঙ্গী হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে সহপাঠিনীদের সঙ্গে তিনি কুস্তি লড়িতেন, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দৌড়-ঝাঁপ করিতেন, কিন্তু দেশে আসিয়া সে চর্চ্চা বন্ধ করিতে হইল; কারণ, তিনি জমিদারণী। জমিদারণী হইয়া প্রজাদের সম্মুখে দৌড়া-দৌড়ি করিলে মান থাকিবে না! প্রজার কাছে তিনি যে রাণী-মা।

জমিদারণী যখন সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স্ক এক ভৃত্য, বৈঠকখানার অন্তঃপুরের দিকের দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া একবার উঁকি মারিয়াই অদৃশ্য হইল এবং পর-মুহূর্তে সেই দ্বার দিয়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক সুশ্রী, সুবেশ পুরুষ অতি সন্তর্পণে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ত্রীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা সহসা টানিয়া লইলেন। রমা দেবী একটু চমকিত হইয়া আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "হিমা, অসময়ে এখানে কি মনে করে?"

পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া হিমাংশুকুমার বলিলেন, "সময়ে ত তোমার দেখা পাবার উপায় নাই, তাই অসময়ে আসতে হয়। বেলা বারোটার সময় কাছারীতে গিয়ে প্রজাদের আবেদন-নিবেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকো সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আর সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে দাবা, তাস, পাশা, তার পর ভিতরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুতে রাত একটা-দেড়টা বেজে যায়, পরের দিন বেলা দশটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না! ঘুম ভাঙ্গলে স্নানাহার করতেই আবার বারোটা বাজে। এই ত তোমার ডেলি রুটিন্, কাজেই তোমার সঙ্গে কথা কইতে হলে অসময়ে আসতে হয় বৈ কি!"

কর্ত্রী বলিলেন, "কি করি বলো? কাছারীতে বসে জমিদারীর কাজ না দেখলে চলে না, আর সন্ধ্যায় পাড়ার পাঁচ জন ভদ্রমহিলা এসে বসেন, তাঁদের ত তাড়িয়ে দিতে পারি না, কাজেই খেতে-শুতে একটু রাত হয়ে যায়।"

হিমাংশু বলিলেন, "আমি ত ভদ্রমহিলাদের তাড়াতে বলছি না, জমিদারীর কাজ দেখতেও বারণ করছি না! এ দু'টো ছাড়া তোমার দেখবার কি আর কোন কাজ নেই? সুধা যে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাইশ উৎরে যেটের তেইশে পা দিয়েছে, সে খবর রাখো? তার বিয়ে দিতে হবে না? আমার উনিশ বছরে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছরে সেই মেয়েটা হয়ে আঁতুড়ে নষ্ট হলো, তার পর তেইশ বছর বয়সে সুধাকে কোলে পেলেম। তেইশ বছর বয়সে আমি দু' সন্তানের বাপ, আর তেইশ বছরে সুধা এখনও আইবুড়া, কি বলবো বলো?"

"সুধার বিয়ের কথা বলবার জন্যে বুঝি অন্দর ছেড়ে সদরে এসে আমাকে পাকড়াও করেছ? তা আমি ত নবাবপুরের জমিদারণী চন্দ্রমুখী মিত্তিরের ছেলেকে কথা দিয়েছি যে, তাঁর সঙ্গেই সুধার বিবাহ হবে, পাত্রী ঠিক করাই আছে, আমি যদি কাল বলি ত কালই বিয়ে হয়—"

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, "পোড়া কপাল অমন পাত্রীর! তার গুণের কথা আমি ঢের শুনেছি, যেমন বওয়াটে, তেমনি নেশাখোর, মদে দিন-রাত মত্ত হয়ে আছে! তার জ্বালায় নবাবপুরের সোমত্ত ছেলেদের গাঁয়ে বাস করা দায় হয়েছে, তার হাতে দেওয়ার চেয়ে ছেলেকে বিষ খাইয়ে মারা ভালো!"

রমা দেবী বলিলেন, "জমিদারের ঘরে ও-রকম একটু-আধটু দোষ কোথায় নেই? ছেলে মানুষ, বয়স হলে কি আর ও-সব দোষ থাকবে?—"

ছেলে মানুষ কাকে বলো? ত্রিশ বছরের ধুমশো মাগী ছেলে মানুষ! না, কচি খুকী! তুমি যাই বলো না কেন, সে বওয়াটে হতভাগীর সঙ্গে কিছুতেই আমি সুধার বিয়ে দেবো না।"

কর্ত্রী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তবে কোথায় দেবে, শুনি? নবাব-পুরের মিত্তিররা বনেদি ঘর। চন্দ্রমুখী দেবীর বছরে প্রায় আঠারো হাজার টাকা আয়,—ঐ একটি মাত্র মেয়ে"—

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, "ছেলের ভালো-মন্দ, সুখ-শান্তি দেখবে না? খালি টাকা আর জমিদারী দেখবে? আমার মায়েরও ত পনেরো হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে, সে এর পর সুধাই পাবে, আমার ত আর বোন নেই যে জমিদারী ভাগাভাগি হবে? নবাবপুরের সেই বাঁদরীর গলায় আমি কিছুতেই এই মুক্তোর মালা দিতে দেবো না; তা' বলে রাখছি—"

এমন সময় রমা দেবীর খানসামা গোলাপী আসিয়া বলিল, "বহরমপুরের উকীল সরোজিনী দেবী এসেছেন।"

রমা দেবী বলিলেন, "তাঁকে উপরের বৈঠকখানাতে বসিয়ে তামাক দিগে যা, আমি এখনি যাচ্ছি।" এই কথা বলিয়া তিনি পতিকে বলিলেন, "আমি এখন উপরে চললুম, তুমি ভিতরে গিয়ে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখগে। একমাত্র ছেলে, তাকে হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার হাতে দিতে পারি না—চারি দিক্ দেখে শুনে তবে"—

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, "চারি দিক্ দেখেছি, শুনেছি, জেনেছি বলেই আমি নবাবপুরের সঙ্গে কিছুতেই কুটুম্বিতা করব না, তা বলে রাখছি।"

২

রমা দেবীর স্বামী হিমাংশু বাবু পত্নীকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিলেও নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে অন্ধ পত্নী-ভক্তিতে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই, যাহা ভালো ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনিও অশিক্ষিত নন, বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তাহার উপর তিনি দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্র নন, তাঁহার মাতাও এক জন সম্ভ্রান্তা ভূম্যধিকারিণী ছিলেন। সেই জন্য স্বামীকে রমা দেবী একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পুত্র সুধাংশু বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রমা দেবী পুত্রকে কলিকাতার কোন কলেজে পড়াইবার প্রস্তাব করাতে হিমাংশু বাবু আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "বাড়ীর কাছে বহরমপুরে এমন ভালো কলেজ থাকতে ছেলে কলকাতায় পাঠাবার কি দরকার? আমি শুনেছি, মফস্বলের অনেক ছেলে-মেয়ে কলকাতায় পড়তে গিয়ে কুসংসর্গে মিশে নিজেদের নষ্ট করেছে। সুধাংশুর কলকাতায় পড়তে যাওয়া হবে না, ও বহরমপুরেই পড়ুক।"

রমা দেবী ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। সুধাংশু বহরমপুর কলেজেই প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু বেশী দিন তাহাকে কলেজে পড়িতে হইল না, আই-এ পাশ করিবার পর চোখের অসুখের জন্য তাহাকে চশমা লইতে এবং অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে লেখা-পড়া বন্ধ করিতে হইল।

সুধাংশু যখন কলেজিয়েট স্কুলে পড়িত, তখন কলেজে এক জন ছাত্রী ছিল—সুলোচনা সরকার। সুলোচনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। মফস্বলের কোন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইয়া বহরমপুর কলেজে সে পড়িতে আসে। অসামান্য রূপবতী না হইলেও দেখিতে সে মন্দ ছিল না। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী, কলেজের কোন ছাত্র-ছাত্রীই শরীর-চর্চায় তাহার সমকক্ষ ছিল না। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক সকল প্রকার ক্রীড়ায় সে ছিল অদ্বিতীয়। স্কুল বিভাগের ছেলে-মেয়েরা সুলোচনা দিদিকে সকল বিষয়েই আদর্শ মনে করিত। সুলোচনা যদি কোন বালকের সহিত হাসিয়া কথা কহিত, তাহা হইলে সেই বালক আপনাকে ধন্য মনে করিত।

সুধাংশু যে বৎসর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিল, সুলোচনা সেই বৎসর আই-এস-সি পাশ করিয়া বি-এস সি থার্ড ইয়ার ক্লাসে গেল। সুধাংশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার জননীকে এক দিন বলিল, "মা, আগামী বৎসর আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা, এ দু'টো বৎসর বাড়ীতে এক জন মাষ্টার রাখলে ভালো হয়।"

রমা দেবী বলিলেন, "আমিও সে কথা ভেবেছি। তোমাদের স্কুলের হেড-মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার প্রাইভেট টিউটারের ব্যবস্থা করা যাবে।"

স্কুলের হেড-মাষ্টার অর্থাৎ হেড-মিষ্ট্রেস্ কলেজ-বোর্ডিংএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, সেই জন্য বোর্ডিংএ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ছিল, তাহাদের সকলকেই জানিতেন। তাঁহার পরামর্শে রমা দেবী সুলোচনাকে সুধাংশুর প্রাইভেট টিউটর মনোনীত করিলেন। বহরমপুরে রমা দেবীর একটা বাড়ী ছিল, মামলা মোকদ্দমার জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে সহরে যাইতে এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে বাস করিতে হইত বলিয়া সেখানে বারো মাসই এক জন পাচিকা, ভৃত্য ও দাসী থাকিত। সুধাংশু বহরমপুরের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত, প্রতি শনিবারে সে মধুনগরে যাইত এবং সোমবারে আবার বহরমপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। যে সুলোচনাকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ বলিয়া মনে করিত, সেই সুলোচনা যখন সুধাংশুর প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল, তখন সুধাংশু অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সুধাংশুর বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর, সুলোচনার বয়স আঠারো।

দু'বৎসর পরে সুধাংশু প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, সুলোচনাও বি-এস-সি পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল এবং এম-এস-সি পড়িতে কলিকাতায় গেল। বলা বাহুল্য, দু'বৎসরের ঘনিষ্ঠতায় ছাত্র ও শিক্ষয়িত্রী উভয়ের মনেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। বহরমপুর ত্যাগের পূর্ব্বদিন সুলোচনা বিরলে সুধাংশুকে বলিল :—"সুধা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। আমি চোখের আড়াল হলে বোধ হয় আমাকে ভুলে যাবে? জান ত, out of sight, out of mind."

সুধাংশু বলিল, "সে আপনাদের মেয়েমানুষের পক্ষে, আমরা ব্যাটা ছেলে—ও-কথা আমাদের সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাকে ভোলবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

"তোমার মা যদি জোর করে তোমার বিবাহ দেন?"

"বিয়ে দিলেই আমি বিয়ে করছি আর কি!"

"তোমার মা বনিয়াদি জমিদার ছাড়া কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না। তিনি কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন যে, সমান অবস্থার লোক না হলে কুটুম্বিতা করে সুখ হয় না। তোমার অবস্থা আর আমার অবস্থা—দু'য়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তবে এ কথা আমি তোমাকে বলতে পারি যে, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না। তোমাকে না পাই, চিরকাল আইবুড়ো থাকব।"

সুধাংশু বলিল, "আমারও সেই কথা। আপনি কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি দেবেন ত?"

"দেব, কিন্তু তোমার মা আপত্তি করবেন না?"

"মা জানতে পারলে ত? আমার চিঠি আপনি আমার বন্ধু অমিয়র নামে পাঠাবেন। খামের উপর এক কোণে "S" লিখে অমিয়র নাম-ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।"

"অমিয়র মা কি বাবা যদি জানতে পারেন?"

"অমিয়র বাবা ইংরেজী জানেন না, মা কলকাতায় চাকরি করেন, মাসে একবার করে বাড়ীতে আসেন। তিনি কি করে জানতে পারবেন?"

পত্র-ব্যবহার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়া সুলোচনা চোখের জল মুছিয়া সুধাংশুকে চোখের জলে ভাসাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

৩

সুলোচনা কলিকাতায় গেলে সুধাংশুর মন অত্যন্ত খারাপ হইল। গ্রীষ্মের ছুটার পর কলেজ খুলিলে সে কলেজে ভর্ত্তি হইল বটে—কিন্তু প্রথম দু'তিন মাস পড়াশুনায় আদৌ মন বসিল না, মন রহিল সুলোচনার কাছে।

পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত মত সুলোচনা কলিকাতা হইতে প্রতি সপ্তাহেই অমিয়র নামে সুধাংশুকে পত্র দিতে লাগিল এবং সুধাংশুও নিয়মিতরূপে সে সব পত্রের উত্তর দিত। নূতন বিরহের তীব্রতা কালে কিছু হ্রাস পাইলে সুধাংশু আবার পড়াশুনায় মন দিল এবং যথাসময়ে দ্বিতীয় বিভাগে আই-এ পাশ করিল। ওদিকে সুলোচনাও যথাসময়ে এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিল।

এম-এস-সি পাশ হইবার কয়েক মাস পরে সুলোচনা সুধাংশুকে জানাইল যে, সে কোন বান্ধবীর সাহায্যে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সুলোচনার বান্ধবী তাহাকে এই সর্ত্তে টাকা দিবে যে, সুলোচনা যদি বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উচ্চতর পরীক্ষায় পাশ হয়, তাহা হইলে উপার্জ্জনশীল হইয়া দু'টি শিক্ষার্থীকে সে শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, তাহার জন্য যত টাকা ব্যয় হইবে, সে টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে হইবে। সুলোচনা এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া সর্ত্তনামায় স্বাক্ষর করিয়াছে, আর কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই তাহাকে ইউরোপে যাত্রা করিতে হইবে।

এ পত্র পাইয়া সুধাংশু অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। ইউরোপে কত দিন থাকিতে হইবে, কত দিন পরে আবার দেখা হইবে, ইউরোপে অবস্থান কালে হয় ত কোন শ্বেতকায় যুবকের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবে, এমনি কত দুশ্চিন্তাই না তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল! ফলে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। স্কুলে পড়িবার সময় তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে চিকিৎসক

তাহাকে চশমা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে সুধাংশু চশমা ব্যবহার করিত। এখন মানসিক দুশ্চিন্তায় তাহার শিরঃপীড়ার সূত্রপাত হওয়াতে চিকিৎসকের পরামর্শে তাহাকে লেখাপড়া বন্ধ করিতে হইল। শিরঃপীড়ার চিকিৎসার জন্য সুধাংশু জননীর সঙ্গে কলিকাতায় গেল, সেখানে তিন-চার জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলিলেন, লেখাপড়া বন্ধ করিতেই হইবে,—অন্ততঃ চার-পাঁচ বৎসর কলেজে পড়া স্থগিত রাখিতে হইবে। সুতরাং সুধাংশুর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া আর হইল না, উনিশ বৎসর বয়সে তাহাকে সরস্বতীর মন্দির হইতে বিদায় লইতে হইল।

সুধাংশুর কলেজ ছাড়িবার পর আরও চার বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চার বৎসরে সুলোচনার নিকট প্রতি মেলেই সে পত্র পাইয়াছে। সুলোচনা কলিকাতায় অবস্থান-কালে যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চতর বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য ফরাসী পড়িতে আরম্ভ করে। দু'বৎসরের চেষ্টায় সে মোটামুটি ফরাসী বলিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছিল। ইউরোপে গিয়া সুলোচনা ফ্রান্সে মোটর গাড়ীর ও বিমানপোতের এঞ্জিন নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য একটা মোটরের কারখানায় শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করে। এক বৎসরে মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ-কৌশল শিখিয়া সে প্রায় ছয় মাস জার্ম্মানি, রুশিয়া, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া এরোপ্লেন-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিবার জন্য আমেরিকায় যায়।

দু'বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া সুলোচনা বিমান-নির্ম্মাণে অনেক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিল এবং বিমান সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পাশ্চাত্য দেশে তাহার খ্যাতি রটিল। আমেরিকায় তৃতীয় বৎসরের শেষে সুধাংশুকে সে পত্রে লিখিয়া জানাইল যে, সে এক প্রকার এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে এরোপ্লেন খুব ছোট ও হাল্কা। তার বিশেষত্ব এই যে, ঠিক সোজা ভাবে উপরে উঠিতে ও নীচে নামিতে পারে। সে প্লেন যেমন আকাশপথে ছুটিতে পারে, তেমনি আবার মাটিতেও মোটর গাড়ীর মত ছুটিতে পারে এবং মাটিতে ছুটিবার সময় যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে আকাশে চালনা করা যায়। আমেরিকার খুব বড় এক মোটর কোম্পানি ঐ বিমানের একমাত্র নির্ম্মাতা হইবার জন্য সুলোচনাকে এক লক্ষ ডলার বা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু সুলোচনা এখনও তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই।

এ সংবাদে সুধাংশুর যেমন আনন্দ হইল, তেমনি ভাবনাও হইল। আনন্দের কারণ, তাহার সুলোচনাদি'র বিদেশে এই অসামান্য সাফল্য ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত! আর ভাবনার কারণ, প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে তাহাকে কাঁদাইয়া ইউরোপে গিয়াছে, সে কি করিয়া আসিয়া সুধাংশুকে অর্দ্ধাঙ্গরূপে গ্রহণ করিবে? প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে সুধাংশুকে সে যে-দৃষ্টিতে দেখিত, এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া কি আর ঠিক সেই দৃষ্টিতে দেখিবে? সে যে দেশে ফিরিবে, তাহারই বা ঠিক কি?

যে পত্রে সুধাংশুকে সুলোচনা নূতন প্রকার বিমানের সংবাদ দিয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তী পত্রে সুধাংশুর দুশ্চিন্তার কতকটা নিরসন করিল। শেষ পত্রে সুলোচনা লিখিল, দু'তিন মাসের মধ্যেই সে দেশে ফিরিবে, কারণ, সে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিমান-নির্ম্মাণ বিভাগে বেশ উচ্চ বেতনে চাকরি পাইয়াছে। যে মার্কিন কোম্পানি তাহাকে এক লক্ষ ডলার দিয়া তাহার নবোদ্ভাবিত বিমানের একমাত্র নির্ম্মাতা হইতে চাহিয়াছিল, সেই কোম্পানি অবশেষে নগদ দেড় লক্ষ ডলার এবং প্রত্যেক বিমানের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কমিশন দিতে সম্মত হইয়াছে। এই ব্যাপারের শেষ নিষ্পত্তি হইলেই সুলোচনা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নূতন কার্য্যে যোগদান করিবে।

ইহার দু'মাস পরে সুধাংশু দিল্লী হইতে সুলোচনার এক পত্র পাইল। সুলোচনা লিখিয়াছে—"* * * আমি দিল্লীতে আসিয়া নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। দিল্লীতেই আমাকে বছরে সাত-আট মাস থাকিতে হইবে। এখানে বেশ সুন্দর কোয়ার্টার্স পাইয়াছি। * * * তোমার পত্রে জানিলাম যে, তোমার মা নবাবপুরের চন্দ্রমুখী মিত্রের মেয়ে অপর্ণার সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। অপর্ণাকে আমি জানি, তাহার অনেক গুণের কথা আমি শুনিয়াছি। তোমার বাবার এ বিবাহে মত নাই, লিখিয়াছ। তাঁহার মত না থাকিবারই কথা; তুমি এক কাজ করিতে পারিবে? তোমার মাকে কোনরূপে জানাইয়া দিও যে, অপর্ণাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি নাই। তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে এ কার্য্য করিতে বলিতেছি। তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। অপর্ণার সঙ্গে বিবাহের কথা হইলে কোন্ তারিখে এবং কোন্ লগ্নে বিবাহ হইবে, তাহা আমাকে জানাইতে অন্যথা করিও না। কেন এ অনুরোধ করিতেছি, পরে জানিতে পারিবে। জননীর অবাধ্য হইয়া এ বিবাহে আপত্তি করিও না। ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।"

এ পত্র পড়িয়া সুধাংশু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সুলোচনাদি'র এ কি অদ্ভুত অনুরোধ! সে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বন্ধু অমিয়ের শরণাপন্ন হইল। অমিয়ও সুলোচনার পত্রের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। যা হোক, তিনি যখন তাঁর উপর নির্ভর করে তোমাকে নিশ্চিন্ত হতে বলেছেন, তখন তুমি তাই করো। আমার মনে হয়, যেমন করেই হোক, তিনি শেষ রক্ষা করবেন।"

অগত্যা সুধাংশু সুলোচনার অনুরোধ পালন করিবার সঙ্কল্প করিল।

৪

নবাবপুরের জমিদারণী চন্দ্রমুখী মিত্রের একমাত্র কন্যা অপর্ণার গুণের পরিচয় হিমাংশু বাবুর মুখে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃত গুণের শত ভাগের এক ভাগও নয়। চন্দ্রমুখী কন্যাকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অপর্ণার লেখাপড়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত, দু'বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। জননী অনেক ভর্ৎসনা করিয়াও কন্যাকে স্কুলে পাঠাইতে পারিলেন না। তখন তিনি হতাশ হইয়া অপর্ণাকে জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল। মাতার আদেশে অপর্ণা

দু'-চার দিন কাছারীতে গিয়া বসিল, কিন্তু কাজ-কর্ম্মে তাহার মনোযোগ ছিল না—তাহার আকর্ষণ ছিল অন্য দিকে। প্রজাদের মধ্যে কাহার সুশ্রী যুবা পুত্র আছে, গোমস্তাদের দ্বারা সে সন্ধান লইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার বয়স কুড়ি-একুশ বৎসর। স্বভাব-চরিত্র মন্দ হইতে দেখিয়া মা তাহার হাত-খরচ বন্ধ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অপর্ণাও হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিতে আরম্ভ করিল।

অপর্ণার বয়স যখন ছাব্বিশ বৎসর, তখন চন্দ্রমুখী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইলেন। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, কিন্তু চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না, প্রায় এক বৎসর শয্যাগত থাকিয়া তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বান্ধবীরা বলেন, কন্যার দুর্ব্বব্যবহার-জনিত মনঃপীড়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

জননীর মৃত্যুতে অপর্ণা স্বাধীন হইল। অন্তঃপুরে অপর্ণার পিতা ছিলেন, কিন্তু অপর্ণা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিত না। চন্দ্রমুখীর আত্মীয়-স্বজন বলাবলি করিতেন, পিতার অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয়ই অপর্ণার অধঃপাতের কারণ।

মাতার মৃত্যুতে অপর্ণা জমিদারীর কর্ত্রী হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল। পিতা মধ্যে মধ্যে সদুপদেশ দিতেন বলিয়া অপর্ণার যত আক্রোশ গিয়া পড়িল পিতার উপর। বিনা কারণে বা অতি সামান্য কারণে পিতাকে যৎপরোনাস্তি অপমান লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। অবশেষে কন্যার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পত্নীবিয়োগ-বিধুর মিত্রকর্ত্তা কাশীবাসী হইলেন, অপর্ণাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

জননীর মৃত্যুর পর, এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই অপর্ণার জমিদারীর একটার পর একটা মহল বাঁধা পড়িতে লাগিল। এ সময় বান্ধবীরা তাহাকে পরামর্শ দিল, "যদি মধুনগরের রমা বসুর ছেলেকে বিবাহ করতে পারো, তাহলে সোনায় সোহাগা হয়। রমা বসুর ঐ একমাত্র ছেলে, তাঁর প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী, তার উপর সে ছেলের পৈতৃক জমিদারীর আয়ও পনেরো হাজার টাকার উপর। যদি রমা বসুর ছেলেকে বিয়ে করতে পারো, তাহলে আর তোমাকে পায় কে? আর সে ছেলে রূপে একেবারে কার্ত্তিক!"

বান্ধবীদের কথায় অপর্ণারও ঝোঁক হইল—রমা বসুর ছেলেকে বিবাহ করিতেই হইবে। পরদিনই মধুনগরে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া এক জন লোক গেল। দু'দিন পরে সে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, অপর্ণার হাতে পুত্র সম্প্রদান করিতে রমা বসুর আপত্তি নাই, তবে তাঁহার পুত্রের শরীর এখন ভালো নয়, পুত্রের শরীর একটু সারিলে এ বিষয়ে তিনি বিবেচনা করিবেন।

ইহার পর সুধাংশুর স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য অপর্ণা আরও দু'-তিন বার লোক পাঠাইয়াছিল। অপর্ণার এই আগ্রহ দেখিয়াই রমা বসু হিমাংশু বাবুকে বলিয়াছিলেন, "পাত্রী ঠিক করাই আছে, আমি যদি কাল বলি ত কালই সুধার বিয়ে হয়।"

অপর্ণার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে হিমাংশু বাবুর ঘোর আপত্তি থাকিলেও তাঁহার পত্নী অপর্ণাকেই পুত্রবধূ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বলা বাহুল্য, এ বিবাহে সুধাংশুর আদৌ মত ছিল না। বন্ধু অমিয়র দ্বারা সে তাহার অভিমত পিতাকে জানাইয়াছিল। উত্তরে হিমাংশু বাবু বলিলেন, "আমারও ত মত নাই, কিন্তু উনি যে যুক্তি-তর্ক কিছুই শুনবেন না। তাঁর এক কথা—'যখন কথা দিয়েছি, তখন কিছুতেই তার অন্যথা হবে না'।"

ইহার পর সুলোচনার পত্র পাইয়া সুধাংশুর মতের পরিবর্ত্তন হইল, সে সুলোচনার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া অপর্ণার সহিত বিবাহে আর আপত্তি করিল না। অমিয় হিমাংশু বাবুকে বলিল, "কাকাবাবু, আপনি অপর্ণার সঙ্গে সুধার বিবাহে আর আপত্তি করবেন না। সুধার ইচ্ছা নয় যে, তার বিবাহের কথা নিয়ে কাকীমার সঙ্গে আপনার কলহ-বিবাদ হয়। আপনি কাকীমাকে বলুন, অপর্ণা দেবীর সঙ্গে বিবাহে সুধার কোন আপত্তি নেই।"

অমিয়র কথা শুনিয়া হিমাংশু বাবু যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, পুত্রের সহসা এ মত-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? তিনি পত্নীকে এই সংবাদ প্রদান করিলে কর্ত্রী বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং পুরোহিত ঠাকুরাণীকে ডাকাইয়া বিবাহের জন্য দিন স্থির করিতে বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুরাণী পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন, "আগামী ১৯শে ফাল্গুন রবিবার বেশ ভালো দিন আছে, রাত্রি ১১টা ২৩ মিনিটের পর ১টা ৩২ মিনিটের মধ্যে। আর একটা লগ্ন আছে, রাত্রি ৩টা ৪০ মিনিট হইতে ৫টা ১৭ মিনিটের মধ্যে।"

রমা দেবী বলিলেন, "ঐ ১৯শেই হবে। এখন থেকে আয়োজন করা যাক্।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, সুলোচনাকে বিবাহের তারিখ ও সময় অবিলম্বে জানানো হইল।

৫

আজ ১৯শে ফাল্গুন, রবিবার সুধাংশুর বিবাহ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, মধুনগরের জমিদার-বাড়ী লোকে লোকারণ্য। বরাসনে অপর্ণা মিত্র বারাণসী শাড়ী পরিয়া বান্ধবী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে। তাহার সহিত প্রায় দেড় শত কন্যাযাত্রিনী আসিয়াছে। কন্যাযাত্রিনীদিগের মধ্যে অধিকাংশই যুবতী—প্রবীণা মহিলা নাই বলিলেই হয়! অপর্ণার যে সব বান্ধবী আসিয়াছে, তাহাদের অনেকের মুখেই তীব্র সুরার গন্ধ!

রাত্রি ১১টার পর বিবাহের লগ্ন, তাহার পূর্ব্বেই সমস্ত মহিলা ও পুরুষদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার হইবে। বহির্ব্বাটীতে মহিলাদের ও অন্তঃপুরে পুরুষদের খাওয়ানো হইতেছে। সকলেই মহাব্যস্ত, সকলেই ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করিতেছে।

রাত্রি ১১টার মধ্যে নিমন্ত্রিতা ও নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশেরই খাওয়া শেষ হইয়াছে, এখনও ভিতরে বাহিরে প্রায় তিন শত লোক ভোজন করিতেছে। সেই সময় একটি হৃষ্ট-পুষ্ট যুবতী একখানা লাল শাল গায়ে দিয়া অন্তঃপুরের প্রবেশ-পথে দু'-চার পা অগ্রসর হইয়া এক জন ভৃত্যকে বলিল, "তুমি অমিয় বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারো? তাঁর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।"

ভৃত্য বলিল, কোন্ অমিয় বাবু? অমিয় দত্ত, না অমিয় ঘোষাল?

"অমিয় ঘোষাল।"

"আচ্ছা, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি ডেকে দিচ্ছি?" এই বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, গেঞ্জি-গায়ে, কোমরে গামছা-বাঁধা অমিয় বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরিচিত যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে ডাকছিলেন?"

"আপনি সুধাংশু বাবুর বন্ধু অমিয় বাবু ?"

"হাঁ, আপনার নাম ?"

যুবতী বলিল, "আমার নাম সুলোচনা সরকার। আমি এখনই একবার সুধাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, আর আধ ঘণ্টা পরেই বিবাহের লগ্ন।"

সুলোচনার নাম শুনিবামাত্র অমিয় সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই সুলোচনা দেবী ? আজ আমার সুপ্রভাত ! আমি এখনই সুধাকে নিয়ে আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া অমিয় বাটীর ভিতর চলিয়া গেল এবং দু'-তিন মিনিটের মধ্যে সুধাংশুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুধাংশু সুলোচনাকে দেখিবামাত্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং "দিদি, আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনা বলিল, "তোমাকে রক্ষা করবো বলেই এসেছি। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে মধুনগর ছেড়ে যেতে পারবে ?"

"ও কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন ? চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

সুলোচনা বলিল, "চলো, তোমার কনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি।"

বলিয়া সুধাংশুর হাত ধরিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে বরাসনের নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুলোচনা বলিল, "অপর্ণা দেবি, আমি আপনার বর সুধাংশু বাবুকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাচ্ছি ?"—বলিতে বলিতে সে সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

সুলোচনার কথা শুনিয়া অপর্ণা ও তাহার বান্ধবীরা বিস্ময়ে দু'-তিন মিনিট কাল নির্ব্বাক্, হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহার পর "ধরো—ধরো" "পাকড়ো—পাকড়ো" বলিতে বলিতে পথের দিকে ধাবমান হইল। রমা দেবী গোলমাল শুনিয়া দ্রুতপদে সেইখানে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?"

অপর্ণা বলিল, "কে একটা মাগী এসে বরকে ধরে নিয়ে গেল।"

"সুধাকে ধরে নিয়ে গেল ? কে ?"

অপর্ণা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই বহরমপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভা মুখার্জ্জি দৃঢ়মুষ্টিতে অপর্ণার হাত ধরিয়া বলিলেন, "অপর্ণা মিত্র, কলকাতা থেকে আপনার নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট এসেছে। সেই ওয়ারেণ্টের বলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

প্রভা মুখার্জ্জির কথা শুনিয়া রমা দেবী বিস্ময়-বিভ্রান্ত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "গ্রেপ্তার ? অপর্ণাকে ? অপর্ণার অপরাধ ?"

"অপর্ণা দেবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—জাল চেকে ব্যাঙ্ককে ঠকিয়ে তেইশ হাজার টাকা আত্মসাৎ !"

যে সকল স্ত্রীলোক সুলোচনাকে ধরিবার জন্য "ধরো—ধরো" বলিতে বলিতে পথে দৌড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি যুবতী এই সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া রমা দেবীকে বলিল, "কাকীমা, সেই মেয়েছেলেটা সুধা দাদাকে নিয়ে পথে একখানা মোটর গাড়ীতে চড়ে পালাচ্ছিল, আমরাও আপনার মোটর নিয়ে তাকে ধ'রতে যাচ্ছিলাম। খানিক দূর গিয়ে তাদের মোটর হঠাৎ পাখীর ডানার মত দু'খানা ডানা ছড়িয়ে আকাশে উঠে গেল। দেখে আমরা অবাক্ ! যেন ভৌতিক কাণ্ড !"

প্রভা মুখার্জ্জি এক জন কনষ্টেবলকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রেমকুমারী, আসামীকো হাতকড়া লাগায়কে গাড়ি পর উঠাও। রমা দেবি, যে গুণবতীর হাতে আপনার পুত্রকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছিলেন, তার চেয়ে একটা প্রেত্তিনীর হাতে পড়াও ঢের ভালো। আমি এখন চল্লেম। গুড নাইট্।"—এই কথা বলিয়া তিনি রমা দেবীর করমর্দ্দন পূর্ব্বক অপর্ণাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

* * * *

২২শে ফাল্গুন বুধবার, রমা দেবী মেদিনীপুর হইতে একখানা পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল :—

"মা, আমি আপনার অপরিচিতা নই, সুধা যখন বহরমপুরে পড়িত, তখন দু'বৎসর আমি তাহার প্রাইভেট টিউটার ছিলাম। সে সময়ে আমাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার হয়। তাহার পর সুধার সহিত আমার নিয়মিত পত্র-ব্যবহার হইত। আমি সুধার পত্রে জানিতে পারি যে, আপনি জমিদারণী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সুধার বিবাহ দিবেন না।

কলিকাতা হইতে এম-এস্-সি পাশ করিয়া আমি প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরিয়া আমেরিকাতে বিমান-নির্ম্মাণ শিখিতে যাই। সেখানে আমি এক নূতন ধরণের বিমান-নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করি। সেখানকার এক মার্কিন কোম্পানি আমাকে নগদ দেড় লক্ষ ডলার দিয়া আমার বিমান-নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের এজেণ্ট হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতেও আমি বাৎসরিক সত্তর-আশী হাজার ডলার কমিশন পাই।

জমিদার ব্যতীত আপনি অন্য কাহাকেও পুত্রবধূ করিবেন না জানিয়া আমি কলিকাতায় আমার বান্ধবী হেমাঙ্গিনী রায় এটর্ণীকে আমার জন্য একটা জমিদারী কিনিতে অনুরোধ করি। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি আমার জন্য নবাবপুরের চন্দ্রমুখী মিত্রের কন্যা অপর্ণার জমিদারী এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকায় কিনিয়াছেন, সুতরাং আমিই এখন নবাবপুরের জমিদারণী।

সুধাকে লইয়া আমি আমার বিমানযোগে রাত্রি ১২টার সময় মেদিনীপুরে আমার এক আত্মীয়ার বাটীতে আসি এবং সেই লগ্নেই সুধাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করি। আমার আত্মীয় আমার কথামত বিবাহের আয়োজন করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

আপনি অপর্ণা মিত্রের সহিত সুধার বিবাহ স্থির করিতেছিলেন, সুধার পত্রে এই সংবাদ পাইয়া আমি অপর্ণার স্বভাব-চরিত্রের সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করি ; ফলে জানিতে পারি যে, প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের এক ভদ্রলোকের কুড়ি বৎসর বয়স্ক একটি নাবালক ছেলেকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, পরে ধরা পড়িয়া ছ'মাস জেল খাটে ; আজ খবরের কাগজে দেখিলাম, একটা চেক জাল করিবার অভিযোগে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মা, আপনাকে সব কথা জানাইলাম। আশা করি, এখন আমাকে পুত্রবধূর প্রাপ্য স্নেহদানে কুণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন, নিবেদন ইতি।

কৃপা-প্রার্থিণী—সুলোচনা সরকার।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

৪

ইস্কুলে সেদিন হেডপণ্ডিত মশায় আসেন নাই। সেকণ্ড আওয়ারে পণ্ডিত মশায়ের ফার্ষ্ট ক্লাশ লইবার কথা। ছেলেরা জানে, পণ্ডিত মশায় আসেন নাই! একদল ছেলে ছিল ক্লাশে—বাপের বড় চাকরি এবং পয়সার জোরে বেপরোয়া···কাহাকেও তারা গ্রাহ্য করে না। সে দলের চার-পাঁচ জন ছেলে তুমুল কলরব তুলিয়া বায়না ধরিল—মাছ ধরতে যাই, চলো। স্কুলের কাছে যদু দাসের পুকুরে অনেক মাছ···

এ ক্লাশে নীলু পড়ে। ক্লাশের সে ফার্ষ্ট বয়। তাকেও তারা ছাড়িল না। নীলু বলিল—না, আমি যাবো না।

তার উপর টিটকারী চলিতেছে, এমন সময় সেকণ্ড পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে ঢুকিলেন।

কামাখ্যার মেজো ছেলে দেবকী এ ক্লাশের চাঁই। বাপ কামাখ্যা চাটুয্যে এ তল্লাটে সর্ব্বময় কর্ত্তা, কাজেই দেবকীর দাপট খুব বেশী। শুধু যে সৌখীন, তা নয়! নানা উপঢৌকন দিয়া, বাপের গাড়ীতে চড়াইয়া বেচারী-ছেলেদের সে তার বশীভূত করিয়াছে।

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়কে দেখিয়া দেবকী কোঁশ করিয়া উঠিল। পণ্ডিত মশায়ের মুখের উপরে বলিয়া বসিল—আমরা ঠিক করেছি, এ আওয়ারে মাছ ধরতে যাবো···আর আপনি এসে ক্লাশে ঢুকলেন শনি-ঠাকুরের মতো!···

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় দেবকীকে ভালো করিয়াই জানেন? নীচে-কার ক্লাশে একবার তাকে শাসন করিবার ফলে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পিছন হইতে মাথার উপর গোময়-বৃষ্টি হইয়াছিল। স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন তখন সাত্যকি ত্রিবেদী। ত্রিবেদীর কাছে গিয়া নালিশ করিলে তিনি পণ্ডিত মশায়কে চুপি চুপি উপদেশ দিয়াছিলেন, ওটি হলো কামাখ্যা বাবুর ছেলে। ও ছেলের সঙ্গে লড়াই করিতে গেলে, এ স্কুলে চাকরি রাখা কঠিন হইবে! সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় এ কথায় চমকিয়া সে-অপমান নিঃশব্দে সহিয়াছিলেন। চাকরিও বুঝি তাই আজো বজায় রহিয়াছে!

সেই দেবকী! ক'বছরে তার মুখ-চোখ আরো খুলিয়াছে!

সে বলিল—এ আওয়ারে ক্লাশ বসবে না পণ্ডিত মশায়, আপনি ···

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় বলিলেন—কিন্তু হেড-মাষ্টার মশায় আমাকে পাঠিয়েছেন এ ক্লাশ নিতে। বেশ, পড়াবো না। আমি essay লিখতে দেবো'খন। যা পারো, লিখো!

—না, না, না···দেবকী একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এবং একদল ছেলেকে হিঁচড়াইয়া ক্লাশ হইতে টানিয়া সে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ হট্টগোল···অপর ক্লাশে টীচার এবং ছাত্রের দল স্তম্ভিত!···স্কুলে ডাকাত পড়িল, না, কি?

ফার্ষ্ট ক্লাশে রহিল শুধু নীলু।

হেড-মাষ্টার আসিলেন। বলিলেন—ব্যাপার কি?

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের দু'চোখ ভয়ে বাষ্পাকুল···কোনো মতে তিনি ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন।

হেড-মাষ্টার গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—এ ভালো কথা নয়! Such lack of discipline···তার পর সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের পানে চাহিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন,—আপনি ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারেন না···এ ব্যাপার কমিটি শুনলে আপনি কি-জবাব দেবেন?

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় বলিলেন—আমি শিকল বেঁধে ওদের আটকে রাখবো, এমন সাধ্য আমার···

—হুঁ! বলিয়া হেড-মাষ্টার বলিলেন—এ ব্যাপার রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। যে সব ছেলে ক্লাশ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের জরিমানা করা দরকার। না হলে এ ব্যাপার যদি সেনেটে রিপোর্ট হয়, ভাবনার বিষয়!

গম্ভীর মূর্ত্তিতে হেড-মাষ্টার চলিয়া গেলেন···সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের মুখ বিবর্ণ!

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। অন্য-সব ক্লাশে আবার পড়ার মিশ্র গুঞ্জন-রব উঠিল। সে-রবে সারা স্কুল গম্-গম্ করিতেছে।

পণ্ডিত মশায় ডাকিলেন—নীলাম্বু···

নীলুর ভালো নাম নীলাম্বু।

পণ্ডিত মশায়ের আহ্বানে নীলু চাহিল পণ্ডিত মশায়ের পানে। পণ্ডিত মশায় বলিলেন—তুমি তো দেখলে বাবা, ছেলেদের কাণ্ড··· বিশেষ ঐ দেবকীকুমার।

নীলু কোনো কথা কহিল না।

পণ্ডিত মশায় বলিলেন—আমি কি করে ম্যানেজ করবো, বলো? হুদ্দাড়িয়ে বেরিয়ে গেল! হেড-মাষ্টার মশায় যদি রিপোর্ট করেন? জানো তো বাবা, স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদু বাবু ঐ দেবকীর বাবার পিছনে ঘোরেন ছায়ার মতো! হয়তো আমার চাকরি নিয়ে টান পড়বে! এ বয়সে চাকরি গেলে···

পণ্ডিত মশায়ের চোখের সামনে জাগিল সংসারের ছবি! দু'টি বিধবা বোন···তাদের চারটি ছেলেমেয়ে···নিজের চারটি! তাঁর দুই চোখ বাষ্পভারে আচ্ছন্ন হইল···সে বাষ্পভার কণ্ঠে জমিয়া তাঁর কণ্ঠরোধ করিয়া দিল···পণ্ডিত মশায়ের কথা শেষ হইল না।

নীলুর মন দুলিল। গরীব···তাই গরীবের দুঃখু সে বুঝিতে পারে।

পণ্ডিত মশায়ের দুঃখ সে বুঝিল। বলিল—এত অবিচার তা বলে হতে পারে না, পণ্ডিত মশায়। হেড-মাষ্টার মশায় যদি রিপোর্ট করেন, আপনি সব কথা খুলে বলবেন। তাছাড়া হেড-মাষ্টার মশায় পণ্ডিত লোক···উনি এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেবেন কেন? স্কুলের ডিসিপ্লিন্ উনি দেখবেন না?

নিশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত মশায় বলিলেন—প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করতে এলে বিদ্যা-বুদ্ধি সব শিকেয় তুলে রাখতে হয়, বাবা! এ কি তোমার বাবা হেড-মাষ্টার! আজ তিনি বেঁচে থাকলে এতটুকু অবিচারের ভয় করতুম না আমি!

স্বর্গীয় পিতার উপর এতখানি বিশ্বাস শ্রদ্ধা···নীলুর চোখে জল আসিল। সে বলিল—ভয় করবেন না, পণ্ডিত মশায়··· আমার বাবা বলতেন, সত্য আর ন্যায়কে অবলম্বন করলে কোনো দিন দুঃখ পেতে হয় না!

পণ্ডিত মশায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন···

নীলু লক্ষ্য করিল, আতঙ্কে পণ্ডিত মশায়ের মন একেবারে ভরিয়া রহিয়াছে। তাঁর মনকে কতকটা হাল্কা করিয়া দিতে পারে যদি, ভাবিয়া নীলু বলিল—আমার এই সংস্কৃত-ট্রান্‌স্লেসনগুলো যদি দেখে দেন পণ্ডিত মশায়, ঠিক হয়েছে কি-না! হেড-পণ্ডিত মশায় আজকের জন্য টাস্ক দিয়েছিলেন!

বলিয়া জোর করিয়া সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের মনে নীলু হোম্‌-টাস্কের খাতাখানা গুঁজিয়া দিল!

ওদিকে কারখানায় টিফিনের ছুটী হইয়াছে। কারখানা ছাড়িয়া কেহ গিয়াছে খাইতে, কেহ বা গাছতলার সভায় জুটিয়া জটলা করিতেছে। এ দুই দলের কোনো দলের সঙ্গে দিলুর সংযোগ নাই! এ সময়টায় বই লইয়া সে একান্তে গিয়া বসে। ইণ্টার-মিডিয়েটের বই। মনে বাসনা আছে, কাজ করিতে করিতে যদি পারে নন-কলেজিয়েট হইয়া কোনো মতে ইউনিভার্সিটির এগজামিন দিয়া পাশ করিতে···

একান্তে বসিয়া সে পড়িতেছিল মিল্‌টনের প্যারাডাইস লষ্ট। হঠাৎ শুনিল জানকী বাবুর কণ্ঠস্বর—মুরারি···মুরারি···

মুরারি অফিসে জানকী বাবুর খাশ-খানসামা। বই হইতে মুখ তুলিয়া দিলু উৎকর্ণ হইয়া রহিল! মুরারির সাড়া না পাইয়া জানকী বাবু এবারে ডাকিলেন—সুরেশ···সুরেশ···

সুরেশ তাঁর অফিসের তরুণ কেরাণী।

দিলু উঠিল···উঠিয়া জানকী বাবুর সামনে গিয়া দাঁড়াইল! বলিল,—মুরারিকে ডেকে দেবো?

জানকী বাবু বলিলেন—হাঁ···ছাখো তো···মুরারি, না হয় সুরেশ···দু'জনের এক জনকে আমার চাই। খুব দরকার।

দিলু ছুটিল মুরারি আর সুরেশের সন্ধানে। প্রায় পনেরো মিনিট কারখানা আর অফিসের সর্ব্বত্র সন্ধান করিল—কোথাও তাদের দেখা পাইল না!

ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দেখা পাইল না।

জানকী বাবুর ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন—টিফিনের ছুটী···ভাবলে, এ সময়ে পাছে কিছু করতে হয়, তাই এমন ছুট দেছে যে কেউ না নাগাল পায়!

অপ্রসন্নতার কালো ছায়া জানকী বাবুর মুখে···

দিলু সে ছায়া লক্ষ্য করিল। বলিল—আমাকে দিয়ে সে কাজ হবে···যে জন্য ওদের খুঁজছিলেন?

জানকী বাবু বলিলেন—একখানা চিঠি ছিল। জরুরি। এখানা এখনি পোষ্ট-অফিসে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে···পোষ্ট-অফিসের লেটার-বক্সে। না হলে···

দিলু বলিল—আমি দিয়ে আসবো?

জানকী বাবু বলিলেন—যাবে?···তোমার আবার কারখানার হাজ্‌রে কটায়?

দিলু বলিল—দু'টোয়।

—দু'টো! এখন একটা-পঁয়ত্রিশ···বেশ, তা হলে যাও।

জানকী বাবু চিঠি দিলেন দিলুর হাতে। চিঠি লইয়া দিলু ছুটিল পোষ্ট-অফিসের দিকে।

পোষ্ট-অফিসের পথ স্কুলের সামনে দিয়া। স্কুলের কাছাকাছি আসিয়াছে, দেখে, একটি ছেলের ঘাড়ে পড়িয়াছে চার-পাঁচ জন ছেলে···পড়িয়া তার উপর পীড়ন করিতেছে!

দিলু আসিল তাদের মাঝখানে। আসিয়া সে দেখে, যার উপর পীড়ন চলিয়াছে, সে নীলু! এবং পীড়ন করিতেছে দেবকী এবং দেবকীর অনুচরবৃন্দ।

দিলু বলিল—তোমাদের লজ্জা করে না···ক'জনে মিলে এক জনকে মারছো!

দেবকী বলিল—ও! দাদাগিরি ফলাতে এসেছেন! ওরে, নীলু হচ্ছে এই মিস্ত্রীর ভাই!

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল,—মিস্ত্রীর ভাই মিস্ত্রীর ভাইয়ের মতো থাকে না কেন? সাধু সেজে পণ্ডিতের 'সো' হবার সখ! করবি তো শেষে মিস্ত্রীগিরি!

দিলু বলিল—মিস্ত্রীগিরি করলেও তোমাদের মতো বাঁদরামি করবে না কখনো!

—কি! এত বড় কথা! আমাদের বাঁদর বলা! একটা মিস্ত্রী! এখনি জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেবো, জানিস্‌!

বলিয়া দেবকী একেবারে মার-মূর্ত্তি ধরিয়া আস্তিন গুটাইয়া দিলুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিলু বলিল—পা থেকে জুতো খুলে একবার ছাখো···মুখ ছেঁড়া কতখানি সহজ!··ছোটলোকের মতো গালাগাল দিতেই পারো! মারতে হলে কোমরে জোর চাই! সে জোর বাবুয়ানা করে মেলে না, দেবকীকুমার!···এসো, ক'জনে মিলে আমার সঙ্গে লেগে ছাখো··· এক জোড়া কেন, চার জনের চার জোড়া জুতো নিয়ে চেষ্টা করো, আমার মুখ কতখানি ছিঁড়তে পারো!

এ কথায় দেবকী ভড়কাইয়া গেল! হাজার হোক, দিলু আজ মিস্ত্রীগিরি করিলেও ক্লাশে সে ছিল সবার সেরা ছেলে! পাশ করিয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে! সাধারণ মিস্ত্রী সে নয়···কাজেই মুখ-সাপাটি করিয়া বলিল—চলে আয় রে···রাম নয়···সুগ্রীব দোশর এসেছে! তা ছাড়া মিস্ত্রী-মজুরের সঙ্গে হাতাহাতি করলে ইজ্জৎ থাকবে না।

এ কথা বলিয়া দ্রুত-চম্পট-দানে সকলে ইজ্জৎ রক্ষা করিল।

নীলুর পায়ে বেশ চোট্‌···উঠিতে পারে না। পথের প্রান্তে বসিয়া-ছিল দু'হাঁটু এক করিয়া···দিলু আসিয়া বলিল—উঠতে পারবি নে?

—খোয়া লেগে দু'টো হাঁটু খুব কেটে গেছে।

—ইস্‌, তাই তো! এ যে রক্ত-গঙ্গা! আয়, দেখি!

বলিয়া নীলুর হাত ধরিয়া দিলু কোনো মতে তাকে লইয়া অদূরে একটা ডিস্‌পেনসারিতে আসিল এবং সেখান হইতে জল চাহিয়া লইয়া সেই জলে কাটা ঘা ধোয়াইয়া দিল। কমপাউণ্ডার আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া দিল। কাটা ঘায়ে তুলা চাপা দিয়া দিলু বলিল—আমার কাঁধে ভর দিয়ে চ···তোকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

চলিতে চলিতে দিলু বলিল—হঠাৎ তোর উপরে পড়লো?

নীলু বলিল সেকণ্ড আওয়ারের বিবরণ···তার পর বলিল—

আজ হাফ-হলিডে হলো। আসছি, হঠাৎ ওরা এসে টিট্‌কিরি সুরু করলে! বললে, আমাদের সঙ্গে আসা হলো না! ট্রেটর··· কাওয়ার্ড···ডেজার্টার···এমনি সব গালাগাল! আমি শুধু বলেছিলুম—Mind your own machine. অমনি ক'জনে মিলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মারতে লাগলো···

নীলুকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া দিলুর মনে পড়িল জানকী বাবুর চিঠির কথা। এতক্ষণ এ গোলমালে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে পড়িবামাত্র সে এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না···পোষ্ট-অফিসের দিকে ছুটিল।

লেটার-বক্সে চিঠি দিয়া পোষ্ট-অফিসে একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—ডাক কখন যাবে?

বাবু বলিলেন—পনেরো মিনিট আগে রাণার ডাক নিয়ে চলে গেছে। আজ আর যাবে না। এ চিঠি যাবে কাল বেলা দু'টোয়।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দিলু দেখে, দু'টো বাজিয়া আঠারো মিনিট। সে ছুটিল কারখানায়।

কাজে সুখ নাই। মনের মধ্যে কে যেন অজস্র ছুঁচ ফুটাইতেছে! জানকী বাবুর চিঠি ডাকে দিবার ভার লইয়াছিল···জানকী বাবু বলিয়াছেন, জরুরি চিঠি! সে-চিঠি যথাসময়ে সে ডাক-বাক্সে দিতে পারিল না!···ইহার কি কৈফিয়ৎ দিবে?

জানকী বাবুকে যদি না বলে? তিনি জানিবেন, চিঠি যথাসময়ে ডাক-বাক্সে গিয়াছে···তার পর···

চিঠির ডেলিভারিতে দেরী তো অমন হয়···

কিন্তু না, না! বিশ্বাস করিয়া তিনি কাজের ভার দিয়াছেন···তাঁর সে বিশ্বাস···

বুকের মধ্যে ছুঁচ-ফোঁটার যাতনা অসহ্য হইল!

ছুটী হইলে অপরাধীর মতো দিলু গিয়া দাঁড়াইল জানকী বাবুর অফিস-ঘরের সামনে।

জানকী বাবু বাহির হইলেই আর্ত্ত করুণ কণ্ঠে বলিল—স্যর···

জানকী বাবু বলিলেন—ও তুমি! চিঠি ডাকে দেছ?

কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—কিন্তু আমার দেরী হয়েছিল বলে আজকের ডাকে চিঠি যাবে না।

জানকী বাবু বলিলেন—সে কি! প্রচুর সময় ছিল···আজকের ডাকে যাবার জন্য! সেই জন্যই পোষ্ট-অফিসের লেটার-বক্স···

কুণ্ঠিত স্বরে দিলু সব কথা খুলিয়া বলিল। জানকী বাবু একাগ্র মনে শুনিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন,—একটু অসুবিধে হবে এক দিনের দেরীর জন্য! যাক্‌, তুমি যে এ-কথা গোপন না রেখে আমার কাছে এসে অপরাধ স্বীকার করে বলেছো, এতে আমি খুশী হয়েছি!···এ স্বভাব চিরদিন যেন থাকে! তবে ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ো, যে-কাজের ভার নেবে, সে-কাজ যথাসময়ে করা চাই। অন্য কোনো দিকে মন দিলে যদি সে-কাজ যথাসময়ে করতে না পারো, তাহলে জীবনে কোনো কাজ ঠিক সময়ে করতে পারবে না। অভ্যাস আর স্বভাব দুই খারাপ হয়ে যাবে।

মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দিলু বলিল,—এ কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, স্যর।

৫

রাত্রি প্রায় আটটা। কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী সাহেবের গৃহ। কামাখ্যা বসিয়া অফিস-ঘরে একটা এষ্টিমেটের খশড়া দেখিতেছে, কম্পিত পায়ে অন্নদাচরণ আসিয়া তটস্থ হইয়া এক-পাশে দাঁড়াইল।

তাকে দেখিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল—অন্নদা! কি চাই?

বিনয়ে একেবারে আভূমি আনত হইয়া অন্নদাচরণ বলিল—আজ্ঞে, পিনাকী বাবুর কাছে এসেছিলুম।

—পিনাকী!···পিনাকীর সঙ্গে তোমার কিসের দরকার?···কোনো রেকমেণ্ডেশন্ না কি?···পিনাকী এমন মুরুব্বি হয়ে উঠেছে? হুঁ!

কথাটা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া কামাখ্যা সাহেব আবার হিসাবের কাগজে মনোনিবেশ করিল।

অন্নদা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে আর পাঁচ জনের কাছে এ বাড়ীর দর্পে গলা খুব জাহির করিলেও আসল গৃহস্বামীর কাছে সে কেঁচো! কামাখ্যা সাহেবের কথার উত্তরে একটি কথাও বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কামাখ্যা সাহেব দেখিল, অন্নদা নড়িবার নাম করে না! বলিল—তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো তোমার পিনাকী বাবুর দেখা পাবে না। তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে খপর নাও···তিনি মস্ত লায়েক হয়েছেন···তাঁর আলাদা বসবার ঘর আছে···হাওয়া খেতে বেরোন্!

এ কথার পর অন্নদাচরণ এ ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস পাইল না···চোরের মতো নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

গিয়া সে দাদাবাবুর খাশ ভৃত্য বনোয়ারীর শরণ লইল। বনোয়ারীকে বলিল—তোমার বড় দাদাবাবু কোথায় বনোয়ারী?

বনোয়ারী মাদুর পাতিয়া সে-মাদুরে বসিয়া কাপড় কোঁচাইতেছিল। বলিল—বড় দাদাবাবু কি এখন বাড়ীতে থাকেন?

—কখন আসবেন?

বনোয়ারী বলিল—তা তো আমাকে বলে যান্ নি।

অন্নদাচরণ বিরক্ত হইল। চাকরের মুখে কথা কি···যেন গায়ে জল-বিছুটীর আছড়া মারিতেছে!

অন্নদাচরণ বলিল,—আমাকে আসতে বলেছিলেন কি না···তাই। মানে···

বনোয়ারী বলিল—তাহলে ও-ঘরে গিয়ে বসো। এলে দেখা হবে।

ওদিকে কর্ত্তার কাছে তাড়া, এদিকে খানশামা বনোয়ারীর এই ভঙ্গী···অন্নদাচরণের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল! মনে হইল, যে জন্য আসিয়াছে, সে কাজ হইলে হয়···

অথচ মাথার উপর পাহাড়ের ভার! এ ভার নামাইতে না পারিলে এই পাহাড়ের তলায় প্রাণটা বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইবে!

ভগবান্ তার ব্যথা বুঝিলেন, অচিরে বড় দাদাবাবুর আবির্ভাব ঘটিল।

অন্নদাচরণ বলিল—এই যে পিনাকী···একটু দায়ে পড়ে তোমাকে এ সময়ে জ্বালাতন করতে এলুম, বাবা!

কি দায়, অন্নদাচরণকে দেখিয়াই পিনাকীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না! দায়ের কথা বনোয়ারীর সামনে পাছে প্রকাশ করিয়া ফেলে, এ জন্য পিনাকী বলিল—আমার ঘরে আসুন। শুনি, আপনার কি দায়!

এই কথা বলিয়া অন্নদাচরণকে লইয়া পিনাকী আসিল তার বসিবার ঘরে। সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। তার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া সোফায় বসিয়া সামনের চেয়ারে দু'পা তুলিয়া

সিগারেটে দু'টা টান দিয়া বলিল—বুঝেছি···সেই টাকা···? পাঁচটা তো টাকা! তার জন্ম ঘুম হচ্ছে না!

কাঁচুমাচু মুখে অন্নদাচরণ বলিল—জানো তো বাবা, সামান্ত মাইনে···ওই থেকে প্রিমিয়াম দিতে হয় মাসে বারোটা টাকা।

পিনাকী বলিল—আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন, ত্রিশ টাকা থেকে প্রিমিয়াম বারো টাকা দিয়ে বাকী আঠারো টাকার উপর নির্ভর করে' আপনার সংসার চলে? বিশেষ আপনার অমন সৌখীন সংসার! সরোর সেন্ট-পাউডারেই তো মাসে আপনার কম্-সে-কম্ তিন-চার টাকা খরচ, তার উপর আছে ভালো শাড়ী, ভালো ব্লাউশ···

কথাগুলা জুতার মতো অন্নদাচরণের মাথায় পড়িল! অন্নদাচরণ বলিল—আজ প্রিমিয়াম দেবার লাষ্ট দিন ছিল। এখানকার ঐ লোকাল অফিসে কাল ফার্ষ্ট আওয়ারে অফিস-খোলার সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা না দিলে নয়! সত্যি, সাতটি টাকা ছাড়া আমার আর এমন কিছু সম্বল নেই, যা থেকে প্রিমিয়াম দেবো। তাই, মানে, সামান্ত পাঁচটি টাকা নির্লজ্জের মতো চাইতে এসেছি!···তোমার অভাব নেই, বাবা···

পিনাকী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল—আমার বড্ড টানাটানি পড়েছিল বলেই সামান্ত ক'টা টাকা সরোর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলুম। মাসের আর চারটে দিন গেলেই মাস-কাবার। পয়লা তারিখে বাবার কাছ থেকে হাত-খরচের টাকা পাবো, পেলেই আপনার টাকা ক'টা ফেলে দেবো'খন। যান, পাঁচ টাকার জন্ম সুদ দেবো না হয় পাঁচ আনা!

অন্নদাচরণ হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া এ-কথা শুনিল। পিনাকী বলিল—আজ বাড়ী যান্···পয়লা তারিখে সন্ধ্যার সময় আসবেন, এসে পাঁচ টাকা পাঁচ আনা নিয়ে যাবেন।

বলিয়া পিনাকী উঠিতেছিল, অন্নদাচরণ বলিল—কিন্তু তুমি, রাগ করছো বাবা···নেহাৎ দায়ে পড়েই শুধু···

পিনাকী চটিল। রূঢ়-স্বরে বলিল—ত্রিশ টাকা মাইনের উপর নির্ভর করে অমন ষ্টাইলে বাস করা যায় না অন্নদা বাবু, এ জ্ঞান আমার আছে। কেন মিছে বকছেন! যে-ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, ও-ডিপার্টমেণ্টে পয়সা একেবারে ছড়ানো আছে! দায় হয়ে থাকে, কারো কাছ থেকে দু'-চার দিনের জন্ম পাঁচটা টাকা ধার নিয়ে কাজ সারুন। তার পর বলেছি তো, পয়লা তারিখে সন্ধ্যার সময়···

অন্নদাচরণ কিছু বলিল না···পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিতেছে···চোখের সামনে অন্ধকার!

পিনাকী বলিল—জানেন, সেদিন সরোর জন্মদিনে তাকে যে টয়লেট-শেটটা প্রেজেণ্ট দিয়েছি, তার দাম কত? পনেরো টাকা। তার পরে সিনেমার-খরচ! আমি কচি ছেলে নই অন্নদা বাবু, কেন আপনার এত দায় হলো, আমি বুঝি! দিগঙ্গনাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলুম, সরোকে নিয়ে যাই নি, সেই হিংসেয় সরো ক্ষেপে উঠেছে, আর তাই আপনি এসেছেন সামান্ত পাঁচটা টাকার তাগাদা করতে!

এ কথার ভিতরে কতখানি শ্লেষ, কি নিদারুণ অপমান, অন্নদাচরণ মর্ম্মে-মর্ম্মে তাহা বুঝিল! কিন্তু সে সরোর বাপ···তাই কেঁচো খুঁড়িতে তার আর ভরসা হইল না! কম্পিত পায়ে নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে।

সকলে আহার করিতে বসিয়াছে।

কামাখ্যা সাহেব ডাকিল—দেবকী···

দেবকী বলিল,—বাবা···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যদু দাসের বাগানে ঢুকে তার কলমের আম-গাছ উপড়ে দেছ···তার একটা গরুকে মেরে জখম করে এসেছো···কেন?

অবিচল কণ্ঠে দেবকী বলিল—না বাবা, মিথ্যা কথা!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—অফিস থেকে বাড়ী ঢুকছি, দেখি, সদরে যদু দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে কেঁদে আমার কাছে নালিশ জানিয়েছে···ওপ্ড়ানো গাছ এনে দেখিয়েছে। মিথ্যা তার এ নালিশ করবার মানে?

দেবকী বলিল—তার গরু ঐ শিবুদের বাগানে ঢুকে ভালো ভালো ফুলের চারা মুড়িয়ে খাচ্ছিল, তাই আমরা সে গরুকে নিয়ে থানায় দিতে যাচ্ছিলুম···যদু এসে গরু কেড়ে নিয়ে যায়। শিবু বলেছিল, থানায় গিয়ে সে নালিশ লেখাবে···এই তো জানি, ব্যাপার।

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—হুঁ! বেশ, যদুকে আমি কাল সকালে ডাকিয়ে পাঠাবো। তার সামনে তোমার এ-কথা বলো···আমি বিচার করবো।

দেবকী কথা কহিল না।

কামাখ্যা সাহেব চাহিল জয়ার পানে। বলিল—ছেলেগুলিকে যা তৈরী করছো···এর পরে আমি মরে গেলে ওদের দশা কি হবে, তা কখনো ভেবেছো?

জয়া বলিল—আমার তো দেখবার কথা নয়! তুমি দেখে বুঝে যা উচিত বোধ করবে, করো।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—আমি ঠিক করেছি, সামনের মাস থেকে ওদের মাসকাবারী হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেবো।

জয়া বলিল,—তাই যদি উচিত মনে করো, করো···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—তুমি নাই দিয়েই ওদের সর্ব্বনাশ করলে!

তার পর নিস্তব্ধতা। সকলে বুঝিল, কামাখ্যা সাহেব রাগ করিয়াছে। রাগের সময় কোন কথা বলিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে পারে! এ সময়টায় চুপচাপ থাকিলে ও-রাগ পড়িয়া জল হইতে দ্বর সহে না। এত দিনকার অভিজ্ঞতায় এ কথা সকলে ভালো করিয়াই জানে।

অন্নদা গিয়া বাড়ীতে মার-মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিল, স্ত্রীকে ডাকিল,—শুনে যাও···

মহামায়া আসিল। কহিল,—কি বলছো?

অন্নদাচরণ বলিল—তোমার মেয়েকে বলো যেখান থেকে পারে, পাঁচটা টাকা এনে দিতে। ঐ উড়নচণ্ডীকে টাকা ধার দেওয়া···হুঁঃ!

মহামায়া বলিল—যে করে আমার কাছে মিনতি জানিয়ে চাইলে, বললে, একটা দিনের জন্ম মাসিমা! কাল আমি টাকা দিয়ে যাবো!

অন্নদাচরণ বলিল—অত বড় লোকের ছেলে—সে পাঁচ টাকা ধার চাইছে! এ থেকে বুঝতে পারো না, ওর খরচের কি অন্ত আছে!

মহামায়া বলিল—পাঁচটা মাত্র টাকা! এটা-ওটা···কি না এনে দিচ্ছে, বলো তো! সিনেমা দেখানো···

অন্নদাচরণ খিঁচাইয়া উঠিল। বলিল—এ দানের মানে বোঝো ?··· ঐ তোমার সরো, ও যদি পুচ্‌কে বাচ্ছা মেয়ে হতো···কিম্বা মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তাহলে 'মাসিমা' বলে পিনাকী তোমার পায়ে অমন লুটিয়ে পড়তো, ভাবো ?

মহামায়া এ কথার অর্থ বুঝিল। মায়ের প্রাণ! সহ্য করিতে পারিল না। বলিল,—চুপ করো, সরো তোমার মেয়ে! মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে লজ্জা হলো না তোমার ?

অন্নদাচরণ বলিল,—সত্য কথা বলবো, তাতে লজ্জা কিসের !··· ও ছেলে ছুঁচ হয়ে ঘরে ঢুকেছে···ফাল হয়ে বেরুবে শেষে···সাবধান থেকো !

—আচ্ছা, আচ্ছা···এখন কি হলো, তাই বলো ?···টাকা দিলে না ?

অন্নদাচরণ বলিল—ক্ষেপেছো ! কোথা থেকে দেবে ? তুমি যেমন মাসিমা, এমন অনেক মাসিমা ওর আছে অনেক বাড়ীতে ! মুখের উপর সে যে কথা বলেছে আজ···কি বলবো, নেহাৎ তোমাদের মুখ চেয়ে চাকরির মায়া ! না হলে···

মহামায়া বুঝিল, এ-পথে গেলে রাগ বাড়িবে, তাই কথার মোড় ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—তুমি যে বলেছিলে, ২০ তারিখে ষাট টাকা পাবার কথা। হানিফ মিস্ত্রীর সাড়ে তিন শো টাকার বিল কাট্‌কুট্ না করে পাশ করে দিয়েছো ··সে বলেছিল, ষাট টাকা তোমাকে দেবে !

জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘী পড়িল !

রূঢ়-স্বরে অন্নদাচরণ বলিল—হ্যাঁ ! দেছে কি না ! ব্যাটা ভয়ঙ্কর শয়তান ! শুধু বিল পাশ করা ! বিল পাশ করে রামহরি বাবুকে ধরে টাকাগুলো সদ্য সদ্য পাইয়ে দিলুম···ইশারা করে আপিসে বলে গেল, সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এসে টাকা ক'টা দিয়ে যাবে ! আজ মাসের সাতাশ তারিখ···ব্যাটা এ পথ মাড়ালো না একবার !

—বোধ হয়, অসুখ-বিসুখ করেছে।···না হলে তোমার সঙ্গে বেইমানী করতে পারে ? এ এষ্টেটে কাজ করে খেতে হবে তো তাকে···বিলও পাশ করাতে হবে !

অন্নদাচরণ কোন জবাব দিল না···নিরুপায় আক্রোশে সাপের মতো গজ্জাইতে লাগিল।

এমন সময় সরস্বতীর প্রবেশ। সে গিয়াছিল সদু বাবুর বাড়ী··· সদু বাবুর নবোঢ়া দ্বিতীয়-পক্ষ তার গান শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই !

সরস্বতী বলিল,—টাকা পেলে বাবা ?

—হ্যাঁ···টাকার ছালা বয়ে নিয়ে আসছে তার পাইক।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সরস্বতী বলিল—ও মা··· দিলে না ? কি মিথ্যুক গো !

অন্নদাচরণ বলিল—শোনো সরো, ওটার সঙ্গে আর কখনো মিশবে না। ডাগর হয়েছো···ও হলো একের নম্বরের ছুঁচো !··· না হলে ইজ্জৎ থাকবে না ! তার পর মহামায়ার পানে চাহিয়া বলিল,—মাসিমা বলে ফের যদি এ বাড়ীতে ঢোকে, খবদ্দার, আর প্রশ্রয় দিয়ো না ওকে···বুঝলে !

এ কথায় কতখানি গ্লানি, সকলে বুঝিল। কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অন্নদা আবার বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সকালে কামাখ্যা সাহেব বনোয়ারীকে দিয়া যদুকে ডাকাইয়া আনিল। যদু আসিলে কামাখ্যা সাহেব ডাকিল দেবকীকে।

বনোয়ারী আসিয়া খবর দিল, দেবকী বাড়ী নাই।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোমার কত লোকসান হয়েছে যদু ?

যদু বলিল,—প্রায় সাত-আট টাকা।

যদুর হাতে আটটা টাকা দিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল— এই নাও আট টাকা···খুশী হয়েছো ?

কামাখ্যা সাহেবকে সেলাম করিয়া যদু বলিল,—আপনি বলছেন, বাবু ! কিন্তু একটু বলে দেবেন, আমার পিছনে না লাগে ! ছাপোষা গরীব মানুষ···পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, ফল-মূল···ঐ বেচে আমার দিন চলে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—বলে দেবো যদু···তোমার দিক মাড়াবে না আর ! যদি কিছু করে, এসে আমাকে জানিয়ো।

যদু চলিয়া গেল।

খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া কামাখ্যা সাহেব বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। মনে হইতেছিল, আমি তো এক রকম করিয়া দিন কাটাইয়া চলিলাম ! কিন্তু ছেলে-মেয়েরা ?

জানকী বাবু কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, বড় ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলুন কামাখ্যা বাবু ! এক দিন এ এষ্টেটের ভার হয়তো তার হাতেই পড়িবে !

এ কথার অর্থ কামাখ্যা সাহেবই নয়—আরো পাঁচ জনে যা বুঝিয়াছিল···তার চেয়ে বড় কামনা কামাখ্যা সাহেবের আর নাই ! জানকী বাবুর ছেলে মণিময়···তার রুগ্ন শরীর···তার উপর জানকী বাবু আশা-ভরসা রাখেন না। তাঁর আশা-ভরসা ঐ মেয়ে সুরুচির উপর ! হয়তো তাঁর ইচ্ছা আছে, পিনাকীর সঙ্গে সুরুচির বিবাহ···

কিন্তু ছেলে তার কি যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে ? কামাখ্যা সাহেবই বা ছেলেদের সম্বন্ধে কি করিয়াছে ? নিজের অর্থ আর স্বার্থ লইয়াই···

এ চিন্তার মাঝখানে বনোয়ারী আসিয়া দেখা দিল। তার হাতে একখানা কার্ড। কার্ড লইয়া কামাখ্যা সাহেব নাম পড়িল, ইংরেজী হরফে ছাপা—

ভিখামল রণছোড়দাশ
সিল্ক এণ্ড ক্লথ মার্চেন্টস্
রিপ্রেজেণ্টেড্ বাই···বিক্রমদাস

কে ?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—পাঠিয়ে দে···

বনোয়ারী চলিয়া গেল এবং পরক্ষণে ঘরে ঢুকিল ঢিলা পায়জামা পরা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর জওহরলাল-ভেষ্ট, মাথায় গান্ধী টুপি···এক ভদ্রলোক।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—ইয়েস···

বিক্রমদাস একখানা চেক বাহির করিয়া কাম্যাখ্যা সাহেবের হাতে দিল।

চেক দেখিয়া কামাখ্যা সাহেব স্তম্ভিত ! চেক কাটিয়াছে পিনাকীলাল চ্যাটার্জী···এবং কাটিয়াছে প্রায় দেড় মাস আগে !

বিক্রমদাস বলিল, ছোট সাহেব একখানা গুজরাটী শাড়ী লইয়া তারি দাম দিয়াছিলেন পঁচিশ টাকার এই চেকে ! তিন বার এ চেক ব্যাঙ্কে পাঠানো হইয়াছিল, তিন বারই ফেরত আসিয়াছে। ছোট সাহেবকে রেজিষ্ট্রী-চিঠি দেওয়া হইয়াছে, উকিলের চিঠি দেওয়া

হইয়াছে। ছোট সাহেব সে-চিঠির উত্তর দিয়াছেন সময় চাহিয়া··· এই সে চিঠি।

কামাখ্যা সাহেব চিঠি দেখিল। তার পর ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া ডাকিল—বনোয়ারী···

বনোয়ারী আসিল। কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোর বড় দাদাবাবু···

ডাকিবার জন্ম দূরে যাইতে হইল না, পিনাকী আসিতেছিল বাপের কাছে। ভিখামল উকিলের চিঠি দিয়াছে নালিশের ভয় দেখাইয়া···ফৌজদারী মকদ্দমার ভয়; তাই কোনো ছুতায় টাকার ব্যবস্থা করিতে বাপের কাছে আসিতেছিল। মায়ের হাতে টাকা নাই। মা সাফ নোটিশ দিয়াছে,—তোদের জন্ম আমার কাছ থেকে টাকা-কড়ি সব কেড়ে নিয়ে উনি ব্যাঙ্কে জমা দেছেন!

সামনে বিক্রমদাসকে দেখিয়া পিনাকীর চক্ষু-স্থির!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কার জন্ম এ শাড়ীর প্রয়োজন হলো পিনাকী বাবু?

পিনাকীর বুদ্ধি···যাকে 'বলে, রীতিমত শাণ দেওয়া! কাল অন্নদাচরণ আসিয়াছিল! ধাঁ করিয়া সে বলিল—তোমার অফিসের ঐ অন্নদা বাবু আমাকে ধরেছিল গোটা পঁচিশেক টাকার জন্য···কি না কি শাড়ী কিনেছে···তার দাম। বলেছিল, এ মাসে মাইনে পেলে টাকা দিয়ে দেবে। তাই আমি চেক দিয়েছিলুম। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবার কথা মনে ছিল না।

কামাখ্যা সাহেব একাগ্র মনোযোগে কথাগুলা শুনিল। শুনিয়া বলিল—তোমার বন্ধু হয়েছেন অন্নদা বাবু? হুঁ! কাল সন্ধ্যার পর তোমার কাছে এসেছিলেন!···তা, অন্নদা বাবু মাইনে পান কত জানো?

—শুনেছি, ত্রিশ টাকা।

—ত্রিশ টাকা যে মাইনে পায়, সে কিনেছে পঁচিশ টাকার শাড়ী ···তাও তোমার কাছ থেকে চেক নিয়ে! এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

পিনাকী বলিল—ত্রিশ টাকা মাইনে পেলেও উপরি-রোজগার আছে তো!

—ও! উপরি···তাও জানো!

এইটুকু বলিয়া কামাখ্যা সাহেব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ছেলের পানে চাহিয়া রহিল···ক্ষণ-কাল···তার পর বুকের মধ্যে কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! একখানা পঁচিশ টাকার চেক লিখিয়া বিক্রমদাসের হাতে দিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ বাবুকে আর কখনো শাড়ী দেবে না···দিলে তার দাম আমার কাছ থেকে পাবে না।

চেক লইয়া বিক্রমদাস চলিয়া গেল। পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, কামাখ্যা সাহেব বলিল—দাঁড়াও পিনাকী···

পিনাকী দাঁড়াইল। কামাখ্যা সাহেব বলিল—সামনের মাসে তোমার হাত-খরচার পঞ্চাশ টাকা থেকে এ পঁচিশ টাকা আমি কেটে নেবো। পঁচিশ টাকার বেশী তুমি পাবে না।

পিনাকী গোঁ ভরে যাইতে উদ্যত হইল···কামাখ্যা সাহেব বলিল—বুকের পাটা বড্ড বাড়ছে পিনাকী বাবু···হুঁশিয়ার! না হলে বুক ফেটে এক দিন হাহাকার সার হবে, মনে রেখো! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এত দিন জাপানের প্রকৃত মনোভাব যে রহস্যের যবনিকায় আবৃত ছিল, তাহা এখন ক্রমে উত্তোলিত হইতেছে। গত বৎসর মে মাসে ব্রহ্ম-অভিযান শেষ হইবার পর এত দিন কোথাও জাপানের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই; অথচ প্রত্যেকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাহার আয়োজনের কথা শ্রুত হইতেছে। মাঞ্চুকো-সীমান্তে জাপানের ব্যাপক সমরায়োজন দেখিয়া চীনের পক্ষ হইতে একাধিক বার প্রচারিত হইয়াছে—রুশ-জাপান সজ্ঘর্ষ আসন্ন। ব্রহ্মদেশেও জাপানের সমরায়োজন কম হয় নাই; এখানে জাপানের আড়াই লক্ষ সৈন্য এবং প্রয়োজনানুরূপ সমরোপকরণ সন্নিবেশের কথা শ্রুত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্য সম্পর্কে প্রচারের আতিশয্য যতই প্রবল হউক, তাহাতে ঐ অঞ্চলে জাপানের সমরায়োজনের কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই। বস্তুতঃ, এত দিন বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানের নীরব সমরায়োজন, রণক্ষেত্রে তাহার একরূপ নিষ্ক্রিয়তা অথবা সামান্য প্রতিরোধাত্মক তৎপরতা এবং সর্ব্বোপরি স্থানে স্থানে বিফলতা তাহার প্রকৃত মনোভাব অত্যন্ত রহস্যাবৃত করিয়াছিল। এই সময়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারকার্য্যের দ্বারা এইরূপ ধারণা সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে যে, জাপান অত্যন্ত শক্তিহীন; সে যে বিশাল অঞ্চল গলাধঃকরণ করিয়াছে, তাহা পরিপাক করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্যত্র আক্রমণাত্মক প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইবার কথা সে এখন ভাবিতেই পাবে না। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারকার্য্য বাস্তবতার সহিত কিরূপ সঙ্গতিহীন, গত মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল।

জাপানের আক্রমণাত্মক আয়োজন—

গত ১লা মার্চ্চ অকস্মাৎ সম্মিলিত পক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত প্রধান কেন্দ্র হইতে ঘোষিত হয়,—"জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে সৈন্য-সমাবেশ করিতেছে। গত কয়েক সপ্তাহের বিমান পর্য্যবেক্ষণে জানা গিয়াছে—যে দ্বীপমালার দ্বারা উত্তর-অষ্ট্রেলিয়া পরিবেষ্টিত, তাহাতে জাপানের সমর-শক্তির প্রত্যেকটি অংশ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে।" এই সরকারী বিজ্ঞপ্তির সমালোচনা কালে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা অতীতের সকল প্রচারকার্য্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এত দিন আমরা শুনিতেছিলাম—জাপানের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। তাহার জাহাজ নাই; সুতরাং সে তাহার বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার বিমান নাই; কাজেই আধুনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এখন অষ্ট্রেলিয়া আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনা যাইতেছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা

জানাইয়াছেন—"জাহাজ-সন্নিবেশের প্রধান পোতাশ্রয়গুলিতে অসংখ্য বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও জাপানের এখনও প্রচুর জাহাজ আছে। কোরাল্ সাগরে জাপানের যত জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক জাহাজ সে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিবে। ইহাও কাহারও অবিদিত নাই যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের দুর্জ্জয় বিমান-শক্তি আছে। সম্মিলিত পক্ষের বিমান-সংখ্যা অপেক্ষা জাপানের বিমান-সংখ্যা বহু পরিমাণে অধিক।"

এই সংবাদ ও সমালোচনা পরিবেশিত হইবার অব্যবহিত পরেই বিস্মার্ক সাগরে জাপান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সাগরপথে জাপানের কতকগুলি সৈন্যবাহী জাহাজ নিউ গিনির উত্তর উপকূলে যাইতেছিল। সম্মিলিত পক্ষের প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণে এই সকল জাহাজের ২২খানি নিমজ্জিত হইয়াছে, ১৫ হাজার জাপানী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, সৈন্যবাহী জাহাজ-দলের রক্ষায় নিযুক্ত ৫৯খানি বিমানও ধ্বংস হইয়াছে। বিস্মার্ক সাগরের যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত আশা ও উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল। বিলাতের সাংবাদিকগণ অত্যন্ত ফলাও করিয়া" এই সংবাদের শিরোনামা দিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ এরূপ উক্তিও করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ এখন দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রবর্ত্তী ঘাটী হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা পুনরায় নৈরাশ্যজনক উক্তি করিয়াছেন। ইংরেজিতে যাহাকে "শীতল জল প্রক্ষেপ" বলে, এই সংবাদদাতা সেন বিলাতের উৎসাহী সাংবাদিকদিগের উদ্দেশে তাহাই করিলেন। তিনি বলেন—"বিস্মার্ক সাগরের যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ দূরীভূত হয় নাই। এই সাফল্যের দ্বারা নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষ কোন অঞ্চল অধিকারে সমর্থ হন নাই; ঐ অঞ্চলে জাপানের বহু সৈন্য মজুত আছে। রবাউলে তাহার বহুসংখ্যক জাহাজ সন্নিবিষ্ট। বিস্মার্ক সাগরের যুদ্ধে জাপানের বিমান-শক্তির এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। সম্মিলিত পক্ষ অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন—ইহা মনে করা অন্যায়। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, শত্রু পুনরায় অধিকতর বিমান-শক্তি লইয়া অগ্রসর হইতে পারে।" এই উক্তির পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—আপাততঃ রুশিয়ার দিকে জাপান হস্ত প্রসারিত করিবে না; সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ চীনের সম্বন্ধেও সে অধিক উৎকণ্ঠিত নহে। অদূর ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ—এই দুইটির যে কোন একটির উদ্দেশে জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হওয়া সম্ভব। ইহার কারণ—জাপানের অধিকৃত অঞ্চলকে নিরাপদ করিবার জন্য এই দুইটি অঞ্চলের প্রতি তাহার মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের এই কথাই মনে হইয়াছে যে, রুশ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর জাপানের পক্ষে একাকী এইরূপ বিশাল দেশ আক্রমণে উদ্যত হওয়া স্বাভাবিক নহে; পশ্চিম দিক্ হইতে তাহার ফ্যাসিষ্ট মিত্রের পরোক্ষ সহযোগে সে ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ফ্যাসিষ্ট শক্তির মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় অক্ষশক্তির প্রভুত্ববিস্তৃতির প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু য়ুরোপে ফ্যাসিষ্ট শক্তি এখন যে ভাবে বিব্রত, তাহাতে জাপানের পক্ষে এই মিত্রের সহযোগিতা লাভের আশা আপাততঃ নাই; গত শীতকালে রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বিপর্য্যয় তাহার নিজের পক্ষে যেমন, তাহার মিত্রদিগের পক্ষেও তেমনই কল্পনাতীত ছিল। যদি প্রতীচ্য-মিত্রের সহযোগে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা জাপানের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর অপ্রত্যাশিত পরাজয় তাহাকে নিরাশ করিয়াছে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে রুশ-সেনার বিক্রমেই ভারতবর্ষ আপাততঃ পরিত্রাণ পাইল বলা যাইতে পারে।

সামরিক দিক্ হইতে জাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ একান্ত প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী অবশিষ্ট দ্বীপগুলি যদি সম্মিলিত পক্ষের হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে তাঁহাদের আর কোন নৌঘাটী থাকিবে না অথচ, রুশিয়ার ও চীনের পূর্ব্বাঞ্চলের কথা বাদ দিলে জাপানকে আঘাত করিবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রাধান্য একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত নৌঘাটী ব্যতীত এই প্রাধান্য লাভ সম্ভব নহে; রণপোতগুলি নিরবলম্ব অবস্থায় সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধের পর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বীপ-সমষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাপান ঐ অঞ্চলের জলরাশির প্রকৃত "চাবিকাঠি" হস্তগত করিয়াছিল। এই দ্বীপসমষ্টি হইতেই গত বৎসর সে অতি সহজে পশ্চিম দিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং পূর্ব্ব দিকে হাওয়াইতে আঘাত করিতে পারিয়াছিল। তাহার পর, গত বৎসর সিঙ্গাপুর এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঘাটীগুলি অধিকার করিয়া জাপান পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অত্যন্ত শক্তি-শালী হইয়াছে। এখনও অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী যে অঞ্চল সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত আছে, তিন দিক্ হইতে জাপানী-দানবের সুতীক্ষ্ণ নখর তাহার প্রতি উদ্যত। এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ অত্যন্ত অধিক; এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিন্ মধ্যে মধ্যে এইরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, জাপান যদি এখন সত্যই অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলে সকল মনোযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের ঘোর বিপদ উপস্থিত!

তাহার পর, জাপান এখন নিরুৎকণ্ঠায় অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে; ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে তাহার অধিক দুশ্চিন্তার কারণ নাই। সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের "শুভ বাসনা" বহু বার শ্রুত হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ আজ প্রায় তিন মাস রথেড়ংএর বৈচিত্র্যহীন প্রহসনই চলিতেছে। প্রাচ্য অঞ্চলে সামরিক তৎপরতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় শীত এখন অতিবাহিত, বর্ষা আসিতে আর বিলম্ব নাই; বর্ষাকালে ব্রহ্মদেশে অভিযান চলে না। কাজেই জাপান সঙ্গত ভাবেই মনে করিতে পারে—সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের বাসনা আপাততঃ বাসনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। পূর্ব্বের চমক-প্রদ সাফল্যে গর্ব্বস্ফীত জাপান আশা করিতে পারে যে, ব্রহ্ম-অভি-যানের উপযোগী পরবর্ত্তী ঋতু আসিবার পূর্ব্বেই সে অষ্ট্রেলিয়ার সমর-শক্তি চূর্ণ করিয়া ব্রহ্মদেশে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারে। ইতোমধ্যে ব্রহ্মদেশে জাপান প্রয়োজনানুরূপ প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, জাপান জানে,—ব্রহ্মদেশে সম্মিলিত পক্ষের অভিযান পরিচালিত হইবার উপযোগী রাজনীতিক অবস্থা

এখনও সৃষ্ট হয় নাই ; ব্রহ্মবাসীর হৃদয় জয় করিবার মত কোন রাজনীতিক প্রতিশ্রুতি বৃটেন এখনও দেয় নাই। ভারতভূমি হইতে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভারতের যে রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান হওয়া উচিত ছিল, বৃটিশ রাজনীতিকদিগের অদূরদর্শিতার ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। জাপান হয় ত আশা করে—চীনে গণ-শক্তির সহিংস প্রতিকূলতার জন্য সে যেরূপ বিব্রত হইয়াছে, সম্মিলিত পক্ষও ব্রহ্মদেশে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলে বর্ম্মী জনসাধারণের প্রবল প্রতিকূলতায় সেইরূপ বিব্রত হইবেন। ভারতবর্ষের শোচনীয় রাজনীতিক অবস্থার জন্যও তাঁহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিবেন।

এডমিরাল্স্ নিমিৎসের আশ্বাস—

ঠিক এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত মার্কিণী নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল নিমিৎস্ বলিয়াছেন—"প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিণী নৌশক্তি এইরূপ কতকগুলি স্থান অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যেথান হইতে জাপানের শ্রম-শিল্পকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ ভাবে ধ্বংসমূলক আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে আমরা এখন সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছি।"

এডমিরাল্ নিমিৎসের শেষের উক্তিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই ; প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ এখন সত্যই সন্ধিক্ষণে উপনীত। কিন্তু সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক আয়োজনের আভাস পাইবার পূর্ব্বে এডমিরাল্ নিমিৎসের উক্তিতে অধিক উৎসাহিত হওয়া যায় না। তিনি জাপানী দ্বীপপুঞ্জে বিমান-আক্রমণ বা জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণের কথা বলেন নাই—জাপানের শ্রমশিল্পকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ আঘাতের উপযোগী স্থান অধিকারের আশ্বাস শুনাইয়াছেন।

রুশিয়ার পূর্ব্বতম অঞ্চলের কথা বাদ দিলে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যক্ষ আঘাতের একমাত্র উপযুক্ত ঘাঁটা চীনের পূর্ব্বাঞ্চল। রুশিয়ার কোন স্থান আপাততঃ জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই, জাপানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্রহ্ম-চীন পথ যদি উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে চীনের শক্তি কখনই আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তাই, জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের পরিকল্পনার সহিত সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অথচ, সামরিক অথবা রাজনীতিক—যে কারণেই হউক, সম্মিলিত পক্ষের দ্বিধা ও সঙ্কোচে ব্রহ্ম-অভিযানের উপযুক্ত সময় আজ অতিবাহিত।

আরাকানের উপকূলে গত কয়েক মাস যে গুরুত্বহীন সামরিক তৎপরতা চলিতেছে, সময় সময় উহাকে ব্রহ্ম-অভিযান বলিয়া চিত্রিত করিবার প্রয়াস হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন ব্রহ্মদেশের যে অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত, উহা "বে-ওয়ারিশ" অঞ্চল মাত্র। পূর্ব্ব দিকে ভারতের রাজনীতিক সীমান্ত যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার কিয়দ্দূরে চিন্দুইন্ নদী ও আরাকান্ য়োমা পর্ব্বতশ্রেণীকে জাপান ব্রহ্মদেশের স্বাভাবিক পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া মনে করে। এই সীমান্তরেখার পূর্ব্ব দিকেই জাপানের প্রকৃত সমরায়োজন। এই আয়োজন যে অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ—গত আট মাস ব্রহ্মদেশে সম্মিলিত পক্ষের উচ্চ-বিঘোষিত বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও জাপান আজ নিশ্চিন্ত মনে অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে, জাপানের বিশ্বাস,—সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের সম্ভাবনা যেমন আপাততঃ নাই, তেমনই তাঁহাদিগের বিমান আক্রমণেও জাপানের সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে না। সে যাহা হউক, চিন্দুইন্ নদী ও আরাকান্ য়োমা পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্ব দিকে জাপানের সমরায়োজনে আঘাত করিবার পূর্ব্বে প্রকৃত ব্রহ্ম-অভিযান আরম্ভ হইয়াছে বলা হাস্যোদ্দীপক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী "বে-ওয়ারিশ" অঞ্চলে জাপান না কি তাহার একটিও নিজের সৈন্য নিয়োগ করে নাই ; মালয়ে ও সিঙ্গাপুরে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীই এই অঞ্চলে নিয়োজিত। আর সম্মিলিত পক্ষেও না কি সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিরা এই অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছে।

রুশ-রণাঙ্গন—

ষ্ট্যালিনগ্রাডে জার্ম্মাণীর পরাজয় সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ বলিয়াছেন—Hitler has been out-generalled, out-manœuvred and out-fought. বস্তুতঃ, ষ্ট্যালিনগ্রাডে জার্ম্মাণ বাহিনীর পরাজয় বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে অতুলনীয়। একটি রণক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হইবার কাহিনী ইতঃপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নাই। আর এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষরূপে হিটলারই ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। ষ্ট্যালিনগ্রাডের সাফল্যই সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন বিজয়ের মূল উৎস। এই উৎস হইতে তাহারা যে সামরিক সুবিধা ও নৈতিক বল লাভ করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে শত্রু তিষ্ঠিতে পারে নাই।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সোভিয়েট বাহিনী দক্ষিণ-রুশিয়ায় বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করে। ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রুশ-সেনা কর্ত্তৃক রেলওয়ে এঞ্জিন নির্ম্মাণের প্রধানকেন্দ্র ভরোশিলভগ্রাড, গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন বীয়েলগোরড্ ও লজোভায়া, ডনের রাজধানী রষ্টভ, কুবানের রাজধানী ক্রাস্নোডর এবং সর্ব্বোপরি ইউক্রেণের পুরাতন রাজধানী ও হিটলারের সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী খারকভ পুনরধিকার নাৎসী বাহিনীর তিন বৎসরের ব্লিৎস্ক্রিগকেও ম্লান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর, দক্ষিণ অঞ্চলে অসময়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হওয়ায় এবং জার্ম্মাণ-সেনার প্রতিরোধ প্রাবল্য লাভ করায় সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে। ইহার পর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে রুশ সেনা কিছু অগ্রসর হইলেও খারকভের উত্তরে সুমী এবং কুরস্কের পশ্চিমে লগভ্ রেলষ্টেশন পুনরধিকারই তাহাদিগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ইতোমধ্যে মধ্য-রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী তৎপর হইয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কো পুনরায় এই অঞ্চলে সৈন্য-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ জার্ম্মাণ ঘাঁটী রেজভ্ পুনরধিকারই সোভিয়েট বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক সাফল্য। গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে জার্ম্মাণী এই স্থানটি অধিকার করে এবং ইহার রক্ষার জন্য সুদৃঢ় ব্যূহশ্রেণী রচনা করে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে জেনারল ঝুকভ্ রেজভ্ আক্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে' আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তাহার পর, শীতকালে সোভিয়েট বাহিনী রেজভ্‌কে পশ্চাতে রাখিয়া উহার পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংসন

ভেলিকাই-লুকি অধিকার করে। কিন্তু পশ্চাতে রেজ্‌ভ্ অনধিকৃত থাকায় ভেলিকাই-লুকি সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় না। এখন মস্কোর পশ্চিমে লাটভিয়ার ১০ মাইল পূর্ব্বে ভেলিকাই-লুকি পর্য্যন্ত অঞ্চলে রুশ সেনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইতোমধ্যে তাহারা রেজ্‌ভের দক্ষিণে ঘ্যাটস্ক অধিকার করিয়া ভিয়াস্‌মা বিপন্ন করিয়াছে। ভিয়াস্‌মার পতন হইলে মধ্য-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটা স্মলেনস্ক বিপন্ন হইবে। ভেলিকাই-লুকি হইতে স্মলেনস্কের ৭০ মাইলের দূরেও রুশ সেনা অগ্রসর হইয়াছে।

গত ১৯শে নভেম্বর সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন অভিযান আরম্ভ হইবার পর গত সাড়ে তিন মাসে রুশ সেনা যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর চরম পরাজয় এখনও আসন্ন নহে। সোভিয়েট দূত মঃ মেইস্কি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"নাৎসী জার্ম্মাণীকে ধ্বংসোন্মুখ মনে করিলে ভুল হইবে।" মঃ ষ্ট্যালিনও পুনরায় অনুযোগ করিয়াছেন—"য়ুরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গণ" না থাকায় সোভিয়েট বাহিনী একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতেছে।" লর্ড বীভারব্রুকের সতর্কবাণী—"সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণের ফল কল্পনাতীত হইলেও অত্যধিক আশা পোষণ করা উচিত নহে; জুন মাসে পুনরায় জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে।"

বলা বাহুল্য, নাৎসী জার্ম্মাণী যখন বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-য়ুরোপে বিশেষ ভাবে বিপন্ন, সেই সময় তাহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে সজোর আঘাত করিতে পারিলে তাহার বিশাল সামরিক যন্ত্র এই বৎসরই সম্পূর্ণরূপে অচল হইতে পারে। তাই, মঃ মেইস্কির সঙ্গত আবেদন —"আসুন, আমরা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দকে নাৎসী জার্ম্মাণীর ও তাঁহার তাঁবেদারদিগের চরম পরাজয়ের বৎসর করিয়া তুলি।" বস্তুতঃ, এই বৎসরের সুবর্ণ সুযোগ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে আগামী বৎসর অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে।

রুশ সেনার শীতকালীন সাফল্যের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, আগামী গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণ সেনাপতিরা যদি যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হন, তাহা হইলে তখন সোভিয়েট বাহিনী নূতন সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হইবে। শীতকালে রুশ সেনা যে বিশাল অঞ্চল পুনরধিকার করিয়াছে, যুধ্যমান উভয় পক্ষের ধ্বংসাত্মক কার্য্যের ফলে উহা এখন শ্মশানক্ষেত্র মাত্র। গত বৎসর সোভিয়েট সেনা এই অঞ্চল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কারখানাগুলি যথাসম্ভব উরল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাহার পর, সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্য্য চলে। গত এক বৎসরে ইউক্রেণ প্রদেশে যদি জার্ম্মাণীর কোন গঠনমূলক কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বৎসর নাৎসী বাহিনী প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নিশ্চয়ই তাহা অক্ষত রাখিয়া যায় নাই। কাজেই, আগামী গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট সেনাকে যদি পুনরায় নাৎসী-আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে তখন তাহারা ডোনেৎস অববাহিকার শ্রমশিল্পকেন্দ্রের এবং কুবানের কৃষিসম্পদের (রুশিয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য চলে) দ্বারা উপকৃত হইবে না। ইউক্রেণ-কৃষিক্ষেত্রের দগ্ধ মৃত্তিকার তাপও তখন জুড়াইবে না। এমন কি, ভল্‌গার তীরবর্ত্তী শ্রমশিল্পকেন্দ্র তখনও পরিপূর্ণরূপে কার্য্যোপযোগী হইবে না। আমরা এখন জার্ম্মাণ-সেনার পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে রুশ সেনার পুনরধিকৃত অঞ্চলে গঠনমূলক কার্য্যের কথা শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু এই গঠনমূলক কার্য্য নিশ্চয়ই 'রাতারাতি' শেষ হইতে পারে না। কাজেই, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যেই যদি জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তখন রুশ সেনা নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে সরবরাহের সুবিধায় বঞ্চিত হইবে; সেতু ও রেল-ষ্টেশন ধ্বংস হওয়ায় উরল অঞ্চল হইতে দ্রব্যাদির দ্রুত সরবরাহেও অসুবিধা ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণীর সরবরাহ-সূত্র সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সে অধিকতর সুবিধা পাইবে। তাহার এই সরবরাহ-সূত্র বৎসরাধিক কালের চেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে কার্য্যোপযোগীও হইয়াছে।

আগামী গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণের সময় রুশ সেনার এই সম্ভাবিত অসুবিধার কথা স্মরণ করিলে রুশিয়ার সাম্প্রতিক সাফল্যে অধিক উৎসাহিত হওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে—আগামী গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণ সম্ভাব্যতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে; অনতিবিলম্বে যদি তাহাকে য়ুরোপের অন্য কোন স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আগামী গ্রীষ্মকালে পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার আক্রমণ প্রবলতর— হয় ত ব্যাপকতরও হইবে। আমরা জানি, জার্ম্মাণী তাহার অবশিষ্ট শক্তি সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে তাহার শক্তির এক নগণ্য ভগ্নাংশ নিয়োজিত মাত্র।

টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্র—

টিউনিসিয়ায় চরম শক্তি-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। ইতোমধ্যে মধ্য-টিউনিসিয়ায় সম্মিলিত পক্ষ বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া কতকগুলি স্থান ত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন; পুনরায় উঁহারা সে সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে জেনারল মণ্টগোমারী ম্যারেথ লাইনে আঘাত করিতেছেন; তবে, উহা চূর্ণ হইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। উত্তর-টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণীর সামান্য তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ, টিউনিসিয়ার সকল রণক্ষেত্রেই এখন যে সামান্য সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, উহা স্থানীয় সঙ্ঘর্ষ মাত্র। তবে, ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে মধ্য-টিউনিসিয়ায় সম্মিলিত পক্ষ যখন পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন, তখন সে যুদ্ধে তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। সম্মিলিত পক্ষ পরে যখন মধ্য-টিউনিসিয়ায় সাফল্য অর্জ্জন করেন, তখন শত্রুর অধিক ক্ষতিসাধন সম্ভব হয় নাই; শত্রুসৈন্য প্রায় সর্ব্বত্র বিনা যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ কমন্স সভায় সমর-সমালোচনা কালে মিঃ চার্চ্চিল বলেন—যদিও পূর্ব্বাহ্নে অতিরিক্ত আশা প্রকাশ তাঁহার স্বভাব নহে, তবুও তিনি এই কথা বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না যে, ষ্টালিনগ্রাডে যেরূপ দক্ষ রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, টিউনিসিয়ায়ও সেইরূপ রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই পরিচয় কবে ও কি ভাবে প্রকট হইবে, তাহা এখনও দুর্ব্বোধ্য। অবশ্য, মিঃ চার্চ্চিল আগামী ৯ মাসের মধ্যে আফ্রিকায় তাঁহাদের সমরায়োজনের ফল পাইবার কথা বলিয়াছেন। তিনি কি মনে করিয়া ৯ মাস—অর্থাৎ আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু টিউনিসিয়ার স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে সম্মিলিত পক্ষকে আটক রাখিয়া জার্ম্মাণী যদি আর একটি গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে উহার ফল শুভ হইবে না। জার্ম্মাণী এখন তাহার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন; সে নিশ্চয়ই এই গ্রীষ্মকালে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিবে। এই সময় কেবল পূর্ব্ব-য়ুরোপে নহে—অন্যত্রও তাহার সমর-প্রচেষ্টা প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। জার্ম্মাণী টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে বিলম্বই চাহিতেছে; সম্মিলিত পক্ষ যদি তাহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে উহা হয় ত অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ হইবে।

৮।৩।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালায় খাদ্য-সঙ্কট

বাঙ্গালায় যে দারুণ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। নানা স্থান হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায়, বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই যেন দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়া প্রসারিত। মোটা চাউলের মূল্য কোথাও পনর কুড়ি টাকা মণের কম নহে। এ দরও ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরকার শুধু চোরা বাজারের দোহাই দিয়াই সকল দায়িত্ব এড়াইবার প্রয়াস পাইতেছেন। ১৪ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সরকারের প্রধান-সচিব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এইরূপ সঙ্কটকালে চোরা বাজার সর্ব্বত্রই দেখা দিয়া থাকে। অনেক স্থানে ধান্য প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইতেছে। রাজসাহী—বরিশাল—পটুয়াখালি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে নৌকা-বোঝাই চাউল লুণ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলায় যাইয়া প্রায় এক সহস্র বুভুক্ষু লোক খাদ্যের প্রার্থনা করিয়াছিল। তন্মধ্যে শিশুসন্তানসহ জননীও অনেক ছিল। সর্ব্বত্রেই চুরি, ডাকাতি এবং রাহাজানি অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ২০শে ফাল্গুন রাত্রিতে রাজসাহী জিলার বীবকুৎসা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কাবুলীবেশধারী ৫০।৬০ জন ডাকাত বহু টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। সরকার ক্রমাগতই বলিতেছেন যে, চোরা বাজারে সব মাল গোপন করা হইতেছে। ইহার প্রতিকার কি সরকারের পক্ষে কঠিন? সরকার কি করিয়া বলিলেন যে, চোরা বাজারই সব মাল গিলিয়া ফেলিতেছে? তাঁহাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা ত' কেবল কৃষিবিভাগের হিসাব। সে দিন মিষ্টার লসন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন যে, কৃষি বিভাগের হিসাব আন্দাজী। আমরাও সে কথা অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু সরকার তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দেশের লোকের কথা উপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই বিচিত্র। বাঙ্গালায় ধান্যাদির মূল্য দিন দিন অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া মনে হয়, হয় ত' চাষীরা ঐ সকল পণ্য বিক্রয়ার্থ সম্পূর্ণভাবে বাজারে উপস্থিত করিতেছে না; ইহা সম্ভব, কিন্তু বাজারে তাহা যে প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া যাইতেছে না, তাহা সত্য। যদি বাজারে ক্রমাগতই খাদ্যশস্যের মূল্য বাড়িয়াই যাইতে থাকে, তাহা হইলে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া সরকারের খাদ্যশস্যের উচ্চতম মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। মার্কিণের ন্যায় ধনাঢ্য দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভারতের ন্যায় অতি দরিদ্র দেশে ইহার ফল সাংঘাতিক। ২০শে ফাল্গুনের দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া হইতে লক্ষাধিক মণ গম আমদানী হইয়াছে—কলিকাতা—বোম্বাই মাদ্রাজ প্রদেশ প্রচুর গম পাইয়াছে; কিন্তু তাহা কি সামরিক বিভাগের প্রয়োজনেই নিঃশেষিত হইয়া গেল? বাজারে আটা-ময়দার চিহ্নও ত' আমরা দেখিতে পাইতেছি না। বাঙ্গালায় চাউলের অভাব গোধুমের দ্বারা মিটিবে না—চাউল চাই, আজ বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই চাউলের অভাবে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। ২৭শে ফাল্গুন বাঙ্গালা সরকারের আদেশে বর্দ্ধমান, বীরভূম, ২৪ পরগণার ডায়মণ্ড-হারবার-বসিরহাট, মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, রাজসাহী প্রভৃতি চাউল ও ধান্য সমধিক মজুতের ১৪টি জেলা হইতে ২০ মণের অধিক চাউল বা ৩০ মণের অধিক ধান্য খাদ্যশস্য ক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিনানুমতিতে চালান দেওয়া ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং মোটা ও মাঝারি চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাতিল হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে লক্ষ মণ চাউল আমদানী হইবে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাই কি বাঙ্গালার ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট হইবে?

বোম্বাইয়ের মত খাদ্য-বণ্টন কার্ড দিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পরিমিত খাদ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা হইতেছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি বিক্রয়-কেন্দ্রে জনস্রোতের বিড়ম্বনা ভোগ দেখিয়া তাহা কত দূর সুফলপ্রদ হইবে, বলা দুষ্কর। ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার রক্সবার্গ সম্প্রতি ডিরেক্টার অফ সিভিল সাপ্লাইজ নিয়োজিত হইয়াছেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার খাদ্য-সমস্যা সমাধান জন্য নবগঠিত পরামর্শদাতৃসমিতির সভাপতি মনোনীত এবং এক জন খাদ্য-সচিবও নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়—নিয়ন্ত্রণাধীনে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে, এমন আশা দুরাশায় পরিণত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালায় চাউলের ভীষণ অভাব

বাঙ্গালায় যে ধান-চাউলের বিশেষ অভাব হইয়াছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে ক্রমাগতই বলা হইতেছে যে, বাঙ্গালায় ধান-চাউলের বিশেষ অভাব ঘটে নাই। এ কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা আমরা বহু বার বলিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত উদয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সরকারী হিসাব হইতে সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় প্রতি জিলাতেই এবার ধানের অভাব হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক জিলায় যত লোকের বাস এবং তাহাদের বাৎসরিক খাইবার জন্য যত ধান্যের প্রয়োজন, কোন জিলাতেই তত ধান্য উৎপন্ন হয় নাই। আমরা তাঁহার প্রদত্ত হিসাব হইতে বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলায় কত ধান্যের অভাব, তাহা না দিয়া প্রত্যেক বিভাগে কত মণ ধান্যের অভাব, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিভাগের নাম	কত ধানের অভাব				
বর্দ্ধমান বিভাগ	৩ কোটি	৯২ লক্ষ	৪৯ হাজার	৬ শত	৮১ মণ
প্রেসিডেন্সী "	৬ "	৫৯ "	৫৩ "		১ "
রাজসাহী "	৫ "	৩৪ "	৩৭ "	৬ "	৫১ "
ঢাকা "	৬ "	৭২ "	২৬ "	২ "	৮১ "
চট্টগ্রাম "	২ "	৯৫ "	২৯ "	৪ "	৩০ "
মোট	২৫ কোটি	৫৯ লক্ষ	১৬ হাজার		৪৪ মণ

যদি প্রতি একরে (তিন বিঘায়) ১৮ মণ ৩২ সের করিয়া ধান জন্মে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালায় ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ২ শত ৬২ মণ ধানের অভাব ঘটিয়াছে। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেশের অধিকাংশ কৃষক যে চাউল উৎপন্ন করে, তাহা তাহাদের সম্বৎসর খাইতেই কুলায় না। অনেক কৃষক

বৈশাখ মাস হইতে ধান কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অল্পসংখ্যক কৃষকই উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করিয়া থাকে। যে অল্প সংখ্যক কৃষকের জোতে ১০ বিঘার অধিক জমি আছে, তাহারাই ধান বিক্রয় করে। অবশিষ্ট কৃষকরা অল্পাধিক ধান বা চাউল কিনিয়া খায়। যাহারা ধান বেচিয়া থাকে, তাহারা হয় ত' এবার ধান কিছু হাতে রাখিয়া বেচিতেছে। এবার চাউলের মূল্য দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া তাহারা ঐরূপ করিতেছে। সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাঙ্গালার প্রতি একর জমিতে গড়ে ২০ মণ ধান্য জন্মে ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গড়ে প্রতি একরে ১৬ মণ ধানও জন্মে না। ভূমির রাজস্ব-কমিশন প্রতি একরে ১৮·৮ মণ ধান জন্মে ধরিয়াছেন, কিন্তু ভারত সরকার প্রতি একরে ১৫ মণের কিছু অধিক ধান্য জন্মে স্বীকার করিয়াছেন। এ দেশের লোকেরও ধারণা প্রতি একরে গড়ে ১০ মণ চাউলের অর্থাৎ প্রায় ১৫ মণ ধানের অধিক জন্মে না। এ দেশের কৃষির যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রতি বৎসরই বারিপাতের বৈলক্ষণ্য হেতু এবং পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ও ঝড়-ঝঞ্ঝায় প্রচুর শস্য নষ্ট হয়। কোন বৎসরই সম্পূর্ণ ধান্য জন্মে না। কাজেই আমাদের মনে হয়, খাদ্য বিষয়ে সঠিক হিসাব নিরূপণ করিতে হইলে প্রতি একরে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১০ মণের অধিক ধরা উচিত নহে। তাহা হইলে বাঙ্গালায় চাউলের অনটন যে আরও সাংঘাতিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য-সমস্যা

২৫শে ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় সরকারের বাণিজ্য এবং শ্রমিক বিভাগের সচিব ঢাকার নবাব বাঙ্গালা প্রদেশের খাদ্য-সমস্যা এবং কি প্রকারে তাহার সমাধান সম্ভব, তৎসম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সরকারের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের নূতন পরিকল্পনা অনুসারে সরকারই কেবল খাদ্য-শস্যের একমাত্র ক্রেতা হইবেন। সরকার কোন এক স্থানে ধান বা চাউল জমা রাখিয়া যেখানে যেমন পরিমাণ তণ্ডুলাভাব ঘটিবে, সেই বাজারে কতকটা অবাধ বাণিজ্য-নীতির পদ্ধতি হিসাবে অল্প দরে সেই ধান্য ছাড়িবেন। ভারত সরকার সমস্ত বৃটিশ-শাসিত ভারতে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের এক পরিকল্পনা করিতেছেন,—সেই পরিকল্পনা যখন কার্য্যক্ষেত্রে চালান হইবে, তখন বাঙ্গালা যে পরিমাণ খাদ্য পাইবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই পরিমাণ খাদ্য পাইবে। বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রধান-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত তাঁহারা খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যতগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই নিষ্ফল হইয়াছে। আমাদের ধারণা, সরকার আপাততঃ যে নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও নিষ্ফল হইবে,—ইহাতে লোকের কষ্ট বাড়িবে এবং লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে। সরকার ত' খাদ্যশস্য বণ্টনের পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করিয়া নিষ্ফল হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই পরিকল্পনা-প্রতীক্ষায় সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যে লোকের খাদ্যাভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল, তাহার কি? পরিকল্পনা ত' অনেক হইল, এখন সত্বর সমস্যার সমাধান হইলে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়।

বাঙ্গালার বাজেট

৪ঠা ফাল্গুন বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার বর্ত্তমান বৎসরের সালতামামি হিসাব এবং আগামী বৎসরের বাজেটের হিসাব পেশ করিয়াছেন। এবার বাঙ্গালার বড়ই দুঃসময়। দৈবী এবং মানুষী আপদে বাঙ্গালা ঘোর বিড়ম্বনাগ্রস্ত! শত্রুও বাঙ্গালায় হানা দিতেছে। অন্নাভাবে সোনার বাঙ্গালা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক কারণে দেশে ঘোর অশান্তি দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক মত করা কঠিন। এবার ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া তবে বর্ষশেষে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা স্থিতি করা হইল। আগামী বর্ষে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে, কিন্তু ঋণ বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ধরিলে আগামী বর্ষশেষে ৮৭ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিবে। আগামী বর্ষশেষে ভারত সরকারের নিকট বাঙ্গালা সরকারের ঋণের পরিমাণ ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে যে ঘাটতি হইবে, তাহা পূরণের জন্য প্রধান সচিব এই কয় দফা কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন—(১) আমোদ-প্রমোদ কর, (২) জুয়া খেলার কর, (৩) ঘোড়দৌড়ের বাজী সম্পর্কিত কর, এবং (৪) বিদ্যুৎ কর বৃদ্ধি করিয়া ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উপস্থিত দুই বৎসরের জন্য এই করগুলি বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাই বঙ্গীয় বাজেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

যখন এত টাকার ঘাটতি, তখন আর সামান্য ৩৩ লক্ষ টাকার জন্য আমোদ-প্রমোদ এবং বিদ্যুতের উপর কর বৃদ্ধি করিয়া লোককে কষ্ট না দিলেই সঙ্গত হইত। বাঙ্গালার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর অধিক কর দিবার শক্তি নাই। দুর্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালীর জীবনে বিরক্তি-প্রশমন—চিত্তবিনোদনের উপায় আমোদ-প্রমোদের সুবিধা সঙ্কোচ বিধান করা শোভন ও সঙ্গত নহে। বিদ্যুতের উপর করের হার বৃদ্ধি করিলে সাধারণের বিশেষতঃ বিদ্যুচ্চালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রভূত ক্ষতি হইবে। সুতরাং এই দুই বাবদ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব সমীচীন হইবে না। যুদ্ধের সময় ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াই থাকে, ঋণও করিতে হয়। এরূপ স্থলে এই দুর্দ্দিনে ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার জন্য সাধারণের অসুবিধা করা কর্ত্তব্য নহে। ভারত সরকারের কাছে যখন আগামী বর্ষশেষে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণই হইবে, তখন ৫ কোটি বা তাহার উপর কিছু অধিক টাকা ঋণ করিতে এত সঙ্কোচ কেন? বাঙ্গালা সরকারের বাজেট এবার নানা কারণে অসন্তোষজনক। শিক্ষা, শিল্প এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে টাকা অধিক দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। শিক্ষা বাবদ ৪ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য বাবদ ৮ লক্ষ টাকা এবং শিল্প বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। কোন সভ্য দেশেই এরূপ করা হয় নাই। রুশিয়া, চীন এবং মার্কিণ এই তিন দেশই বর্ত্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন দেশ ঐ তিনটি জনহিতকর ব্যাপারে ব্যয় সঙ্কোচ করিবে বলিয়া জানা যায় নাই। মৌলবী ফজলুল হকের জন্য আমরা বাস্তবিক দুঃখিত। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার ক্ষমতা

যেরূপ সঙ্কুচিত, তাহাতে তাঁহার কাছে আর কিছুই আশা করা যায় না। দেশের লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে,—৪ টাকা মণ চাউল ২০।২২ টাকা মণে কিনিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতিকার-কল্পে যে সকল লোক নিযুক্ত হইতেছেন, তাহাতে ফল সুবিধাজনক হইবে না, ইহাই সকলের বিশ্বাস। অথচ অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন চালাইবার জন্য পৌণে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কি লাভ হইল, তাহা বুঝা যায় না। মৌলবী ফজলুল হকই বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে তিনি যান-বাহন কার্য্যের সঙ্কোচ সাধন ফলে সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি কাতর ভাবে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে পারি যে, যদি আমি এই প্রদেশের লোকের প্রতি যথাকর্ত্তব্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।" তাঁহার এ প্রার্থনা কি নিতান্ত নিরুপায়-অসহায়ের প্রার্থনা ?

রেলওয়ে বাজেট

৩রা ফাল্গুন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেলওয়ে কমিশনার সার লিওনার্ড বর্ত্তমান বর্ষের রেলওয়ের সালতামামি এবং বাজেটের যে হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। গত চারি বৎসরের মধ্যে ভারত সরকারের রেলপথের আয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর বাজেট করিবার সময় রেলওয়ে বিভাগে যত আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আয় ১৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়া ১৪১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হইবে বলিয়া আশা হইয়াছে। গত বৎসর সরকারী রেলে যত আয় হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ১৪ কোটি টাকা বেশী আয় হইবে। সার এডওয়ার্ড বেন্থল্ হিসাব করিয়া বুঝিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ আগামী ৩১শে মার্চ্চ যে সরকারী বৎসর শেষ হইবে, খরচ-খরচা বাদে সেই বৎসর সরকারী রেলওয়েগুলিতে ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসর সেই স্থানে ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য রেলপথগুলির সামরিক প্রয়োজনে অনেক সৈন্য, রসদ, সমর-সম্ভার প্রভৃতি বহন করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্যই রেলওয়ের আয় অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক কার্য্যসাধন জন্য দেশের লোককে কার্য্যতঃ যথাসম্ভব রেলপথে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, নাগরিক যাত্রীদিগের যাতায়াতের ট্রেণগুলি যত দূর পারিয়াছেন কমাইয়া দিয়াছেন,—এবং মাল-বহনের কার্য্যও প্রয়োজনানুরূপ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সাধারণের কার্য্যে রেলওয়ে বিভাগ বিশেষ অবহিত হন নাই বরং ভাড়া কমানো (Reduced rates) সুবিধাদান (Concession) প্রভৃতি রহিত এবং পার্শেলে, লগেজে, অল্প জিনিষ প্রেরণের উপর অধিক ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও রেলওয়ের এই আয় বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায় যে, রেলপথগুলি কিরূপ একাগ্রভাবে সরকারের সামরিক প্রয়োজন সাধনে রত হইয়াছে। দেশের লোককে সে জন্য বাধ্য হইয়া অনেক অসুবিধা সহিতে হইতেছে। ক্ষয়াদি পূরণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে খরচার দিকে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ফলে খরচার পরিমাণ হইয়াছে ৮৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধ হেতু দুর্ম্মূল্যতার জন্য কর্ম্মচারী-দিগকে ভাতা প্রদান প্রভৃতি এবং পূর্ব্বভারতে রেলপথগুলিকে সামরিক নিয়মে চালিত করা এবং বন্যা, বাত্যা ও রেলধ্বংস প্রভৃতি ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অতিরিক্ত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া রেলওয়ে রাজস্ব ৬৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। সুদ বাবদ ২৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের থাকিবে ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, দেনা ও সুদ দিয়াও সরকারী রেলপথ এবার স্বতন্ত্র করিবার সর্ত্তমতে যত টাকা ভারত সরকারকে দিবার কথা, তাহা অপেক্ষা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক দিবেন। এই আয়ের প্রধান কারণ রেলওয়ের মাশুল বৃদ্ধি। অল্প পরিমাণ খাদ্যশস্য চালান বাবদ মাশুল ও অন্য কতকগুলি মালের উপর শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে এবং এক টাকার ব্যতীত যাত্রী-মাশুলের উপর শতকরা সাড়ে ৬ টাকা হারে মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা প্রকারান্তরে কর-বৃদ্ধি। এই বাবদ ১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় রেলওয়ে এঞ্জিন এবং ৪২ লক্ষ টাকার প্লাটি ভারত হইতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। ভারতকে উহা আবার অধিক মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে। ইহার জন্য যে অধিক ব্যয় হইবে, তাহা আর হিসাবের মধ্যে থাকিবে না।

আগামী ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে খাতে ১৪০ কোটি টাকা আয়, আর ৮৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং ৬১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা স্থিতি হইবে, ইহাই সার এডওয়ার্ড বেন্থলের অনুমান। আগামী বারে রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা রাখিলেও ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। রেল বিভাগে যখন এইরূপ অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা, তখন দেশের লোকের পক্ষে ভাড়া ও মাশুল কমিবে এরূপ আশা করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। ভাড়া বৃদ্ধি করা হইল না বলিয়া রেলওয়ে সদস্যের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। রেলওয়ের এই অতিরিক্ত আয় একটা মিথ্যা মায়াজাল হইতেও পারে। দেশের লোক এই আয়ের অনেকটা দিয়াছে আর সামরিক প্রয়োজনেও যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছে। যুদ্ধ থামিলে এই আয়ও কমিবে। তবে রেলের ভাড়া একবার বাড়িলে সহজে কমিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন যে, সামরিক কার্য্য বৃদ্ধি হেতু অনাবশ্যক দ্রব্যাদি বহনের সঙ্কোচ করা হইয়াছে এবং ট্রেণের সংখ্যা শতকরা ৩৭খানি হিসাবে কমানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু খাদ্য-শস্য বহন বিষয়ে শৈথিল্য করা হয় নাই। খাদ্যদ্রব্য রেলওয়েগুলি সর্ব্বাগ্রে বহন করিবে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ দেশে সত্য সত্যই চাউলের নিদারুণ অভাব ঘটিয়াছে। মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ বাহাদুরের পুস্তিকায় তাহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সার এডওয়ার্ড বেন্থল স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশে খাদ্যশস্যের কিছু অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বণ্টনের দোষেই সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রমাণ তিনি

কি পাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম!

রেলবিভাগে আশাতিরিক্ত লাভ হওয়া সত্ত্বেও যাত্রীগাড়ীর বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না—স্থানাভাবে যাত্রিগণের অসুবিধার সীমা নাই। পর্ব্ব-উৎসবে তীর্থদর্শনের জন্য অতিরিক্ত ট্রেণ দিবার ব্যবস্থাও রহিত হইয়াছে—যাত্রিসমাগম প্রশমন জন্য ক্রমাগত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেবদর্শন জন্য তীর্থগমন কি প্রমোদ-ভ্রমণের পর্য্যায়ভুক্ত?

মেদিনীপুরের দুর্দ্দশা

৩রা ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুর্গতিগ্রস্ত মেদিনীপুরের অনাচার সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। পরিষদের সুযোগ্য সদস্য ডক্টর শ্রীযুত নলিনাক্ষ সান্যাল এক মুলতুবী-প্রস্তাবে নির্ভীক ভাবে মেদিনীপুরের রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের ও ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান হইলে তাঁহার উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রাকৃতিক দুর্গতি ঘটিবার বহু দিন পরেও লোক সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ছাড়পত্র ব্যতীত কাঁথি হইতে অন্যত্র যাইতে পারিত না; এমন কি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকেও তাঁহাদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর নিকট যাইতে দেওয়া হয় নাই—তাঁহারা দুর্গতি-গ্রস্ত লোককেও সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাহার পর ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অনাচার সম্বন্ধে উদাত্ত স্বরে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের অন্যতম সচিব ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নির্ভুল তথ্য জানা সম্ভব। তাঁহার ন্যায় সুবিবেচক এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভিযোগ কোন মতেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। ইহা ভিন্ন পরিষদের অন্যান্য বহু অভিজ্ঞ সদস্য এই ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই সকল ভীষণ অভি-যোগের নিরপেক্ষ তদন্তের আর বিলম্ব করা কোন মতেই উচিত নহে। অভিযোগে প্রকাশ,(১) কংগ্রেসের আন্দোলন প্রথমে বিশেষ উগ্র ভাব ধারণ করে নাই,—কিন্তু পরে সরকারের কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগের ফলেই উহা উগ্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। (২) আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব্বেই সামরিক প্রয়োজনে নৌকা এবং সাইকেল ইত্যাদি যানগুলি অপসারিত করা হইয়াছিল এবং কয়েক শত নৌকার মালিকরা যথাসময়ে নৌকা কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে পারে নাই বলিয়া সেগুলি পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ১০ হাজার সাইকেল লোকের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যে লোকের মনে অত্যন্ত অসন্তোষ এবং ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ফলেই আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। (৩) ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইলে সে সংবাদ অকারণ চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৫ দিন পরে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র প্রকাশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই ঝড়ের ও তজ্জনিত ক্ষতির সংবাদ সামরিক কারণে প্রকাশিত করা হয় নাই। (৪) স্থানীয় রাজপুরুষরা ঝড়ের পরও সরকারকে ঝড়ের গুরুত্ব বুঝিতে দেন নাই। (৫) রাজনৈতিক কারণেই সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রথমে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৬) ঐ অঞ্চলের পুলিশ শান্তি এবং শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য অত্যুৎকট নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা অতিমাত্র বলপ্রয়োগ, এমন কি, লোকের গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংস—অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন এবং নারী ও পুরুষদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছিল। (৭) স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দিয়া সেবাকার্য্য পরিচালিত করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সেবাকার্য্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইত্যাদি অনেক গুরু অভিযোগও করা হইয়াছে। এই সকল অভিযোগের কোন উত্তরই দেওয়া হয় নাই। প্রধান-সচিব মিঃ ফজলুল হক মেদিনীপুরবাসীদিগের কৃত অনাচারের কথাও বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু সে কথা অস্বীকার করেন নাই। শৃঙ্খলা যে বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় নারী-নির্য্যাতনের অভিযোগও করিয়াছেন। ইহার অনুসন্ধান করিতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

ইহার নয় দিন পরে য়ুরোপীয় সদস্যদিগের দলপতি বাজেট-বিতর্ক উপলক্ষে বলেন, "পরিষদ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইয়া প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই অভিযোগগুলি সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না।" কিন্তু য়ুরোপীয় সদস্যদিগের এ কথা সঙ্গত নহে। প্রধান-সচিব যখন নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, তখন যত শীঘ্র সম্ভব, এই তদন্ত প্রকাশ্য ভাবে শেষ করা কর্ত্তব্য। সেই তদন্ত-সমিতির সদস্যগণ যাহাতে নিরপেক্ষ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন, তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। মেদিনীপুরে যে ঘোর অনাচার—অশান্তি—নির্য্যাতন চলিয়াছিল, হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তিকায় সে বিবরণ পাঠ করিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অশান্তি এবং অসন্তোষের প্রতিকার দায়িত্বপূর্ণ শাসন (Responsible Government), ইহা রবার্ট হার কুটেরও কথা। এই অনুসন্ধান রদ করিবার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। সত্বর তদন্ত না করা হইলে তাহার ফল আরও মন্দ হইবে।

সংবাদপত্রের মূল্যবৃদ্ধি

'ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।' সরকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন—(১) বর্ত্তমান মূল্যে সর্ব্বশ্রেণীর সংবাদপত্র যত পৃষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন, পৃষ্ঠা-সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক করিতে হইবে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ সংবাদপত্রের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (২) পূর্ব্ব হইতে কেন্দ্রী সরকারের সম্মতি না লইয়া একই স্থানে একই দিনে কোন সংবাদপত্র একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে পারিবেন না। (৩) অবিক্রীত সংবাদপত্রের শতকরা ৫খানি পর্য্যন্ত ফেরত লইবার যে নির্দ্দেশ ছিল, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইল। এই আদেশের ফলে এজেণ্টদিগকে অল্পসংখ্যক সংবাদপত্র দিতে হইবে,—ফলে সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্কোচ ঘটিবে। (৪) ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন-মূল্যের যে হার ছিল, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল হইতে সংবাদপত্রগুলি তাহার শতকরা ৫০ টাকা অধিক মূল্য লইতে পারিবেন। (৫) বিভিন্ন প্রকার

সংবাদপত্রে—সংবাদ এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অনুপাতে কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন থাকিবে, সরকার তাহারও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই মূল্য-বৃদ্ধি এবং আকার-সঙ্কোচের ফলে সংবাদপত্রের প্রচার নিতান্তই সঙ্কুচিত হইবে। সরকার সুলভ সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্কোচ-বিধানের নির্দ্দেশ দিয়া যে, দেশের সর্ব্বস্তরে জাতীয় ভাবধারা প্রসারের—শিক্ষা-বিস্তারের—সরকারী কার্য্যের যথাযথ সমালোচনা প্রচারের পথ রোধ করিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বর্দ্ধমান প্রাদেশিক কনফারেন্সে স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, পরাধীন জাতির রাজনীতিক চর্চ্চার অধিকার নাই (A subject nation has no politics)। কথা যে সত্য, তাহা এদেশের লোক মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। ভারতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতিবিধানের অজুহাতে সরকার এত দিন যে বিলাতী আমদানী কাগজের উপর উচ্চ হারে রক্ষাশুল্ক আদায় করিয়াছেন, তাহা কি দেশবাসীর পক্ষে ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য ফলপ্রদ হইয়াছে? এ দেশে সংবাদপত্র-মুদ্রণোপযোগী সুলভ মূল্যের কাগজ প্রস্তুত কি এত দিনেও সম্ভবপর হইল না? সংবাদপত্রের জন্য সরকার কি কানাডা হইতে কাগজ আনাইবার কোনো ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না?

সর্ব্বদল-সম্মিলন

৭ই ফাল্গুন দিল্লীতে সার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে সর্ব্বদলের নেতৃগণের সভায় সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, "ভারতের সর্ব্বদলের এবং সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের এই সংসদ এই মত ব্যক্ত করিতেছেন যে, ভারতে ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষার জন্য এবং আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক। যদি গান্ধীজীকে সময় থাকিতে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে যে ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা ভাবিয়া সভার ব্যক্তিগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। অতএব অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হউক।" সভার পক্ষ হইতে ডক্টর জয়াকর এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থন করেন ভারতীয় খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সার মহারাজ সিং, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সার হাজি কাশেম, মাষ্টার তারা সিং, বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ম্যাকেঞ্জি, সার এ এইচ গজনভী, শ্রীমতী সরলা দেবী, সিন্ধুদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আলাবক্স, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মিঃ এন এম যোশী, জমায়েৎ উল-উলেমার সম্পাদক মৌলানা আমেদ সৈয়দ, মোমিন সমিতির সভাপতি মিষ্টার জহির উদ্দীন, সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদিগের প্রতিনিধি আবদুল কায়ুম, মিঃ হুমায়ুন কবীর, মিঃ জি এল মেটা, কমিউনিষ্ট দলভুক্ত মিঃ রণদীভ প্রভৃতি। সুতরাং প্রস্তাবটি যে সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাবের নকল লর্ড লিনলিথগো, মিষ্টার চার্চ্চিল, মিষ্টার আমেরী প্রভৃতিকে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, না—তাহা হইবে না। ইহাতে তাঁহাদের মনের ভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। কোন সময়েই তাঁহারা দেশের লোকের মত হইয়া কাজ করিতে চাহেন না। সার তেজবাহাদুর বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সরকারের বিশেষ বুদ্ধি এবং কল্পনাশক্তি যখন পর্য্যাপ্ত নয়, তখন মহাত্মাজীকে সরকার মুক্তি দিবেন, এমন দুরাশা তিনি করিতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিলে ভারতবাসীর সহিত কর্ত্তৃপক্ষের পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের প্রাথমিক সোপান রচিত হইত। ভারতীয় ব্যুরোক্রেসী মহাত্মা গান্ধীকে বিদ্রোহী বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে সার তেজবাহাদুর বলিয়াছেন যে, ইংরেজরা সেনাপতি স্মাটসকেও বিদ্রোহী বলিতেন, কিন্তু তিনিই এখন সাম্রাজ্যের বিশেষ উপকারী বন্ধু। এক-কালে বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত ডি ভ্যালেরাকেও বৃটিশ সরকার এখন সাম্রাজ্যমধ্যে রাখিতে চাহেন। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদিগের সহিত সর্ব্বদা আপোষ করিয়াছেন, রাজভক্তদিগের সহিত করেন নাই। বৃটিশ সরকার এই ব্যাপারেও তাঁহাদের জিদ ছাড়েন নাই। ইহাতে অধিক ক্ষতি কাহার হইল?

হাঙ্গামার জন্য দায়িত্ব কাহার?

গত ৬ই আশ্বিন লর্ড লিনলিথগোকে মহাত্মাজী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, বড়লাট তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া সার তেজবাহাদুর সরকারকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রকাশ করিলে সকলে বুঝিত যে, মহাত্মা পূর্ব্বের ন্যায় অহিংসার উপর আস্থাবান্। তাহা হইলে হয় ত' এ হাঙ্গামা ঘটিত না। এই হাঙ্গামার জন্য যদি মহাত্মাজীকে দায়ী করা হয়, তাহা হইলে সরকারও সে জন্য কম দায়ী নহেন। সার তেজবাহাদুর আরও বলেন যে, "এই দায়িত্ব কাহার, তাহা অবধারণ করিতে হইলে কোন নিরপেক্ষ কমিশন বা স্বাধীন আদালতের হস্তে তাহার নির্দ্ধারণ-ভার দেওয়া উচিত।" এই হাঙ্গামায় কোন কোন কংগ্রেসওয়ালা যোগদান করিলেও কংগ্রেস যে ইহার জন্য দায়ী, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কংগ্রেস বা সরকার কাহারও মত তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্যাপারটা রহস্যময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রাণদণ্ড কি অপরিহার্য্য?

আসতী ও চীমুরের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যার মামলা বলিয়া পরিচিত মামলাসমূহে যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, ডাক্তার খারে, মিষ্টার দেশমুখ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসামীরা তরুণবয়স্ক—ভাবপ্রবণ—প্রচারকার্য্যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া মধ্যপ্রদেশের সরকারকে ক্ষমাশীল হইয়া দণ্ড হ্রাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আসতী মামলায় ১ শত ১৪ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। স্পেশাল জজের বিচারে ১০ জনের প্রাণদণ্ড, ৫৫ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড, ১ জনের লঘু দণ্ড, অবশিষ্ট আসামীদের খালাস দিবার আদেশ হইয়াছিল। মিষ্টার জাষ্টিস পোলক ১০ জনের প্রাণদণ্ড ও ৫৪ জনের নির্ব্বাসন দণ্ড এবং চীমুর মামলায় ১৪ জনের প্রাণদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন—নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৭ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছেন। কেবল এই দুইটি মামলায় ২৪ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং অনুগ্রহ ব্যবস্থা না হইলে প্রাণ হারাইবে। ইহার সহিত অন্যান্য মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের কথাও বলিতে হয়।

কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী যে জনতার হিংসাত্মক কার্য্যে জীবন হারাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়;

কিন্তু এই সকল ঘটনা অস্বাভাবিক অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেইরূপ অবস্থার জন্য যে সকল আইন রচিত হইয়াছিল, সেই সকল আইনেই তাহাদিগের বিচার হইয়াছে। সে অবস্থায় সরকার যদি বিশেষ অধিকারে দয়া প্রদর্শন করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দণ্ড হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহাতে যেমন আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না, তেমনই দুর্ঘটনার ক্ষত দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্ত্তনও সহজসাধ্য হইবে।

এই দুইটি মামলায় যে বিচার হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ দোষ আরোপ না করিয়াই বলা যায়—এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য মামলায় যে সকল আইন অনুসারে বিচার হইয়াছে, সে সকল আইনে সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা আছে এবং বিচারকরা আসামীপক্ষের বহু সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নহে—মনে করিয়াছিলেন।

অনেক দেশে প্রাণদণ্ড বর্ব্বর-যুগের উপযুক্ত বলিয়া বর্জ্জিত হইয়াছে; ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রুমেনিয়ায়—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নরওয়েতে ও সুইটজার-ল্যাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হইয়াছে। প্রাণদণ্ডাদেশ পালিত হইলে আর তাহা ফিরান যায় না।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে আয়ারল্যাণ্ডের নয় জন যুবকের আদালতের বিচারে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বহু লোকের আবেদনে মহারাণী করুণাবশে তাহাদের প্রাণদণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তে অষ্ট্রেলিয়ায় যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আন্দামানের মত অষ্ট্রেলিয়া তখন নির্ব্বাসন-দ্বীপ ছিল। বন-জঙ্গলপূর্ণ অসভ্য জাতির আবাস-ভূমি অষ্ট্রেলিয়া প্রধানতঃ নির্ব্বাসিতগণের প্রচেষ্টায়—সাধনায় নবরূপ পরিগ্রহ করিয়া বৃটেনকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। মহারাণী শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, ২৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অনুকম্পায় প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত নির্ব্বাসিত নয় জনের মধ্যে চার্লস ডাফি ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রধান-সচিব—টমাস মিগার মোন্তানা প্রদেশের গভর্ণর—অন্য দুই জন সেনাবাহিনীর জেনারল—রিচার্ড ওগোরম্যান নিউ ফাউনল্যাণ্ডের গভর্ণর—মরিস লাইয়েন এটর্ণী জেনারল—ম্যাকগি কানাডার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। প্রাণদণ্ডে অব্যাহতি প্রদান কিরূপ শুভ ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করিয়া আমরা মধ্যপ্রদেশের সরকারকে অনুকম্পা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

পদত্যাগ

৫ই ফাল্গুন ভারত সরকারের শাসন পরিষদের তিন জন সদস্য···শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনি—সার এইচ, পি মোদি—শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন। তিন জন একযোগে বিবৃতি দিয়াছেন—কোন মুখ্য ব্যাপার সম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা পদত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর উপবাস সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা লইয়াই মতভেদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, যত দিন তাঁহারা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের সহিত বড়লাট খুব সদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার স্বতন্ত্র বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যদি দেশের কোন উপকার করিতে পারেন, এই জন্যই সদস্যপদ লইয়াছিলেন। সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি-বাণিজ্য, খাদ্য বিভাগের ভার তাঁহার হস্তে প্রদত্ত ছিল। তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কুচিত হইলেও তাহার মধ্যেও তিনি দেশের কাজ করিবার অবকাশ পাইবেন—যুদ্ধের সময় তাহা করা বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষতঃ, যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখন শাসন পরিষদে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা না থাকিলে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে,—ইহাই সরকার মহাশয়ের কৈফিয়ৎ। আমাদের বিশ্বাস, সচিবদিগের ক্ষমতা এত অল্প এবং সঙ্কুচিত যে, তাঁহারা চেষ্টা করিলেও এ দেশবাসীর জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারেন না। বড়লাটই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বে-সর্ব্বা। সচিবরা কিছুই করিতে পারেন না, কারণ, দেশের সহিত তাঁহাদের যোগ নাই,—তাঁহাদের বহাল বরতরফ দেশের লোকের মতামত অনুসারে হয় না, বড়লাটের মত লইয়াই হয়। তাঁহাদের শাসন পরিষদ রাখিবার একমাত্র প্রয়োজন যে, সরকার দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদিগের মতামত লইয়া এই দেশ শাসন করিতেছেন,—ইহা মার্কিণ প্রভৃতি দেশের নিকট প্রচার করা। মিষ্টার আমেরী তাহা যত দূর সম্ভব করিতেছেন। মিষ্টার সরকার ব্যবস্থা পরিষদে থাকিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বাহির করিতে পারিয়াছেন কি? না, সিংহলে চাউল চালান বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন? বরং বাঙ্গালার ১৩ লক্ষ টন চাউল অধিক জন্মিয়াছে বলিয়া সিংহলে চাউল রপ্তানীর সমর্থনই কি তাঁহাকে করিতে হয় নাই? সরকারী কাজ করিতে গেলেই এরূপ করিতে হয়।

মহাত্মাজীর অনশন

ভগবান্ পুনরায় গান্ধীজীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ২৭শে মাঘ হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ২১ দিন প্রায়োপবেশনের অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘজীবী হউন।

চারি মাস পূর্ব্বে গান্ধীজী তাঁহার অনশন-সঙ্কল্পের কথা বড়লাটকে জানাইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে বড়লাটের সহিত তাঁহার যে সকল পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপসার এইরূপ:—গত ৩১শে ডিসে-ম্বরের পত্রে গান্ধীজী লর্ড লিনলিথগোকে লিখিয়াছিলেন—"আপনি আমার সদভিপ্রায়ে সন্দেহ করিয়াছেন।···আমার বক্তব্য শুনিতে চাহেন নাই।···আমার মুমূর্ষু বন্ধু প্রায়োপবেশনরত অধ্যাপক ভাঁসালীর সহিত আমাকে সংযোগ স্থাপন করিতে দেন নাই।··· আপনি আশা করেন যে, আমি হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করিব।··· কঠোর সেন্সার করা সংবাদপত্রের সংবাদ আমি বিশ্বাস করি না।··· আমার সহিষ্ণুতা শেষ হইতে চলিয়াছে।···অনশন দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিব, তবে আমায় ভুল বুঝাইয়া দিলে তাহার প্রতিকার করিব।"

১৩ই জানুয়ারী বড়লাট উত্তরে জানাইয়াছিলেন—"ভাবিয়াছিলাম, সংবাদপত্রের বিবরণীগুলি পাঠ করিয়া আপনি সুস্পষ্ট ভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যের নিন্দা করিবেন, কিন্তু তাহা করেন নাই।···আপনি যদি পশ্চাদ্গমন করিতে চাহেন, কংগ্রেসের গত গ্রীষ্মকালের অবলম্বিত কার্য্যক্রমের সম্পর্ক হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাকে জানাইবামাত্র এ বিষয়ে আরও বিবেচনা করিব।··· আপনি আমার নিকট কি প্রস্তাব করিতে চাহেন, তাহাও জানাইবেন।"

গান্ধীজী ১৯শে জানুয়ারী বড়লাটের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আপনার পত্রের মধ্যে বুঝিলাম, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া যেন

ঠিক কাজই করিয়াছেন।···দেশব্যাপী অভাব। লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখ-দুর্দ্দশার, তথা দেশে বর্ত্তমানে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাকে তাহার অসহায় সাক্ষিমাত্র হইয়া থাকিতে হইতেছে।···সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব করিতে বলিয়াছেন। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদিগের মধ্যে থাকিলে উহা করিতে পারিতাম।···আমি ভুল করি নাই। ৯ই আগষ্ট হইতে যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তজ্জন্য অবশ্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এ সকল ঘটনার জন্য কি সরকার দায়ী নহেন?··· যে সকল ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, যে সকল ব্যাপার সম্বন্ধে আমি এক তরফা বিবরণ মাত্র পাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। তবে প্রকাশ্য ভাবে আমি ঘোষণা করিতে পারি যে, অহিংসার প্রতি আমার আস্থা পূর্ব্ববৎ অবিচল।"

হিংসামূলক ও বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলীর জন্য, পরবর্ত্তী পত্রে বড়লাট গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ দায়ী করিয়া বলেন—"আপনি যদি জানান যে, ৯ই আগষ্টের প্রস্তাব ও ঐ প্রস্তাবের নীতির সহিত আপনি এক-মত নহেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি আপনি যথোপযুক্ত আশ্বাস দেন, তবে আমি সে সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিব।"

২৯শে জানুয়ারী (১৯৪৩) গান্ধীজী বড়লাটকে জানান—"কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরে দেশব্যাপী হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত; তবু বলিবেন, ইহার জন্য কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবই দায়ী?···সরকারের অপ্রয়োজনীয় কঠোর আচরণই কি এজন্য দায়ী নহে? আগষ্ট প্রস্তাবের কোন্ অংশ আপনার নিকট আপত্তি-কর? এ প্রস্তাবে কংগ্রেস অহিংসনীতি-বিচ্যুত হয় নাই।···আইন অমান্যের কথায় আপত্তি হইতে পারে না, গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে আইন অমান্য আন্দোলনের নীতি পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। এ কথা আমি দৃঢ় ভাবেই বলিব, সুস্পষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সরকারকেই আপন আচরণের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, আমাকে নহে। সরকারই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছেন।···ব্যাপক গ্রেপ্তারে সরকার সিংহবিক্রম দেখাইয়াছেন! এক জনের অপরাধে ১০ হাজার লোককে দোষী করা হইয়াছে।···যীশুখৃষ্টের অপ্রতিরোধ নীতির কথা উল্লেখ করিয়া লাভ নাই।···ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নর-নারীর অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করুন।···এ সময় জনসাধারণের আস্থা-সমৃদ্ধ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এই দুঃখ-দুর্দ্দশার কতকটা অন্ততঃ লাঘব হইত।···আমার এই মনঃকষ্ট দূর করিবার যখন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না, তখন ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে আমি ২১ দিনের জন্য অনশন করিব।···আমরণ অনশন আমার উদ্দেশ্য নহে। ভগবানের ইচ্ছায় পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে চাহি।"

মাত্র অনশনকালের জন্য সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিতে চাহিলে গান্ধীজী জানান—তাঁহার সুবিধার জন্য সাময়িক সর্ত্তাধীন মুক্তি তিনি চাহেন না। সরকারের সুবিধার জন্য মুক্তির প্রস্তাব করা হইলেও তিনি সরকারের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবেন না। মুক্তি দিলে তিনি অনশন করিবেন না। ইহার উত্তরে সরকার জানান যে, এ অনশনের দায়িত্ব সরকারের নহে। তবে গান্ধীজীর চিকিৎসকগণকে তাঁহার চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সরকারের অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবামাত্র ভারতের জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেও লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্র সরকারের নীতির সমর্থন করিয়া মন্তব্য করেন—"জাতীয় জাগরণের স্রষ্টারূপে গান্ধীজী স্বদেশের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন, এ কথা সত্য হইলেও দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লয় নাই। তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য আপোষের বিন্দুমাত্র সহায়ক হইবে না।" 'ডেলি টেলিগ্রাফ' বলিয়াছিলেন—"এ অনশন সস্তায় আত্ম-জাহিরের চেষ্টা মাত্র। গ্রেপ্তারের পর মিঃ গান্ধীর নাম আর কেহ করিত না, সরকারের কড়া ব্যবস্থায় কংগ্রেস-দলও হতবীর্য্য। অনশন উভয়ের সুনাম প্রতিষ্ঠার কৌশল।" 'ডেলি মেল' লিখিয়াছিলেন—"হিটলার, মুসোলিনী ও তোজো যে জাতিকে ভীত করিতে পারিলেন না, তাহারা কখনও মিঃ গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না।"

২৭শে মাঘ দিবা দ্বিপ্রহর হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী মহা বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। স্থানে স্থানে ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রাদি করে। আমেদাবাদের মিলসমূহ বন্ধ হয়। ভারতীয় বণিক্ সমাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু মহাসভা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমিতি, কলিকাতার টাউন হলের বিরাট জনসভা এবং ভারতের প্রতি প্রদেশ, নগর ও গ্রামের নরনারী ও প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করেন। যাহাতে বিক্ষোভ প্রবল-তর হইতে না পারে, তজ্জন্য সরকার অনশন-সম্বন্ধীয় সংবাদ ও মন্তব্য সম্পর্কে সেন্সর ব্যবস্থা করেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে সেন্সর করাইয়া লইতে 'বোম্বে ক্রনিকল' ও 'ফ্রীপ্রেস জার্ণাল' অসম্মত হন। 'মাতৃভূমি' প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দ মার্কিণ-মধ্যস্থতার প্রত্যাশায় ভারতে মার্কিণ সরকারের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দিল্লীতে সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর, শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলা, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েক জন ভারতীয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সিংহল রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বঙ্গীয় আইন-সভাগুলি গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করেন। কেন্দ্রী ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইলে সেগুলি নিষ্ফল আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়। সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদ-কল্পে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রগ্রেশিভ দলের ডেপুটী নেতা পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ৬ জন সদস্যসহ পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনি, সার হোমি মোদি, সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং ও সার সুলতান আহমেদ অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার জন্য বড়লাটকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তাহা ব্যর্থ হয়। সরকারের নীতির প্রতিবাদস্বরূপ ৫ই ফাল্গুন (অনশনের ৮ম দিবসে) শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত এনি ও সার হোমি মোদি শাসন পরিষদের সদস্য-পদ ত্যাগ করিলে বড়লাট অবিলম্বে তাহাতে সম্মত হন। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নির্দ্দেশে শ্রীযুত শ্রীবাস্তব সদস্য-পদ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন কামনায় শ্রীবাস্তব-পত্নী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। গ্রেট বৃটেনের ৪০৫ জন প্রবাসী ভারতবাসী ও তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্নদিগের পক্ষ হইতে লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী এই সঙ্কটে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়া মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট, মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মসিয়ে ষ্ট্যালিনের নিকট তার প্রেরণ করিলে তাহার উত্তর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

পুণায় আগা খানের প্রাসাদে অনশন-কালে মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া চিকিৎসকগণ ব্যস্ত ছিলেন। বন্দিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীমতী মীরা বেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বন্দী ডাঃ গিল্ডার প্রভৃতি তাঁহার কষ্ট লাঘব করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অনশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে গান্ধীজীর অবস্থায় সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া গান্ধীজীর বদন প্রফুল্লতা-অনুরঞ্জিত হইলেও তাঁহার কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, ওজন হ্রাস পাইতেছিল, মূত্রবিকার দেখা দিয়াছিল, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বলতর হইতেছিল। অনশনের ত্রয়োদশ দিবসে (১০ই ফাল্গুন) অপরাহ্ণ ৪টায় চিকিৎসকগণ হতাশ হন। নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; গান্ধীজী প্রায় সংজ্ঞাহীন হন, ঘন-ঘন বমনোদ্রেক হইতে থাকে। চিকিৎসকগণ অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে মহাত্মাজী একটু হাসেন মাত্র।

আগা খানের প্রাসাদের ভিতরে চিকিৎসকগণের দারুণ উৎকণ্ঠা, বাহিরে তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য দেশী বিদেশী সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ দিনের পর দিন ধূলিপূর্ণ পুণা-আমেদনগর রোডে দাঁড়াইয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একটি রাত্রি যেন অনন্তকাল বলিয়া মনে হইতেছিল। পরদিবস (১১ই ফাল্গুন) রাত্রির সঙ্কট অবস্থা কতকটা শান্ত ছিল।

৭ই ফাল্গুন দিল্লীর এক সর্ব্বদল-সম্মিলনে সার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাঃ জয়াকর, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী-প্রমুখ প্রায় ৪ শতাধিক নেতা সমবেত হন। মুসলেম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না সম্মিলনে আমন্ত্রিত হইলে বলেন, রাজনৈতিক দাবী আদায়ের জন্য অনশনের হুমকী সফল হইলে মুসলমানদিগের দাবী নষ্ট হইবে; এ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হিন্দুরাই করুন, মুসলমানদিগের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া সম্মিলনে গৃহীত সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব বড়লাটের নিকট প্রেরণ করা হইলে বড়লাট সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। নিরুপায় হইয়া নেতৃ-সম্মিলন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিলের নিকট নিম্ন মর্ম্মে তার করেন—অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি না দিলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বাধীন মানুষ হিসাবে বর্ত্তমান পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা এবং তদনুসারে জনসাধারণকে পরামর্শ দানের জন্য গান্ধীজী মুক্তি চাহেন। তিনি স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলিতেছেন না।…তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিরপেক্ষ বিচারকগণের দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই।…বড়লাটের সহিত তাঁহাকে দেখা করিতে দেওয়া এবং গান্ধীজী যে ভাবে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।… কঠোর দমন-নীতি অপেক্ষা উদার রাজনীতিক সুবিবেচনাতেই ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই তারের উত্তরে মিষ্টার চার্চ্চিল জানান…"গত আগষ্টে ভারত সরকার মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাকে আটক রাখিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সকল কারণের অবসান হয় নাই।…অনশন দ্বারা বিনা সর্ত্তে মুক্তি পাইবার জন্য মিঃ গান্ধী যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভারত সরকার যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, বৃটিশ সরকার তাহার সমর্থন করেন। মিঃ গান্ধী এবং অপরাপর কংগ্রেসী নেতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সমস্ত দায়িত্ব মিঃ গান্ধীর।" এই সময় মিষ্টার চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট অসুস্থ হইয়া শয়ন-কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

অনশনের তৃতীয় সপ্তাহে এ অগ্নি-পরীক্ষায় গান্ধীজী উত্তীর্ণ হইবেন এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। দেশব্যাপী তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা চলিতে থাকে। ইহা শুনিয়া এক দিন জনৈক দর্শককে গান্ধীজী আশ্বাস দেন, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব, আপনাদের কোন চিন্তা নাই। এক দিন এক জন মার্কিণ সাংবাদিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন দৈবশক্তির বলে কি গান্ধীজী সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেন?" ডাঃ বিধানচন্দ্র বলেন—"ঐরূপ কোন শক্তি আছে কি না জানি না, তবে তাঁহার এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ব্যাপার অলৌকিক সন্দেহ নাই!" ইহার পর গান্ধীজী কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতে থাকেন।

এই সময় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, ও শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনির সহিত তাঁহার প্রত্যহ সুদীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। অনশনের বিংশতি দিবসে ৪৫ মিনিট আলোচনা চলে, রাজাজী তাহা ব্যক্ত করিতে অসম্মত। ১১শে ফাল্গুন প্রাতে ৮টায় গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। উৎকণ্ঠিত ভারত নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে। বিলাতের 'টাইমস্' মন্তব্য করিয়াছেন—"সন্ন্যাসিরূপে গান্ধীজী ভারতের চিত্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই অনশনের ফলে ভারতের পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইল।" দক্ষিণ আফ্রিকার 'ষ্টার' পত্র মন্তব্য করিয়াছেন—"গান্ধীজী রক্ষা পাইবার ফলে বড়লাটও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।" মার্কিণ 'নেশন' পত্র বলিয়াছেন—"গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ভারতের জাতীয়তাবাদীদিগের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ এই ব্যাপারে যেরূপ প্রকটিত, সেরূপ আর কিছুতেই হয় নাই। সরকার সুবিবেচক হইলে নূতন ভাবে আপোষ আলোচনা আরম্ভ করিতেন।"

শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, সার তেজবাহাদুর, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ ৩৫ জন নেতা সরকার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও হতাশ হন নাই। ২৬শে ফাল্গুন বোম্বাই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহারা এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, গান্ধীজীকে মুক্তি দিলে অচল অবস্থার সমাধানের জন্য তিনি পরামর্শ ও সাহায্য দান করিতে চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপোষ চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে। আপোষের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিবেন। এই প্রচেষ্টা সফল হইবে কি না, তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারে।

ব্রত-উদ্‌যাপনান্তে মহাত্মাজীকে তান্‌-য়ুন্‌ শাং "বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধ" এবং পার্লামেণ্টের তিনজন সদস্য ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী এথেল ম্যানিন্ "প্রকৃত খৃষ্টান" বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

জনরব—গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করা হইবে। জনরব নির্ভরযোগ্য নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—"বড়লাট যে এইরূপ উগ্র ব্যবস্থার কথা মনে করিতে পারেন, এমন মনে হয় না। লোক অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে; এ সময় গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করিলে শান্তির পথ সুগম করা হইবে না। অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু এখনও শান্তির ও মীমাংসার সম্ভাবনা আছে। প্রভাতের পূর্ব্বেই অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হয়। এখন গান্ধীজীকে দল ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আস্থাভাজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া প্রয়োজন।"

আমরা শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর এই উক্তিতে বিস্মিত হইয়াছি বলিলে ভুল হইবে। ইহাতে বিরক্তির উৎপত্তি অনিবার্য্য। মিষ্টার চার্চিল ও মিষ্টার আমেরীর সহিত একমত হইয়া প্রায়োপবেশন-কালেও লর্ড লিন্‌লিথগো গান্ধীজীকে মুক্তি দেন নাই এবং তাঁহার প্রায়োপবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আটকের সব পুরাতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

সে দিন ডাক্তার বরদারাজলু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় —সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার যখন বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য, সেই সময় তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তাঁহার সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাহার পর ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বাঙ্গালার অন্যতম সচিব, তখন যেমন তিনিও সে সুবিধায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন—শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীকেও তেমনই তাহাতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। কাজেই এখন যে লর্ড লিন্‌লিথগো গান্ধীজীকে অন্যান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন, এমন মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারাগারে কর্কের মেয়র মিষ্টার ম্যাকসুইনীর প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের কথা আয়ার্লাণ্ডের ইতিহাস পাঠকের সুবিদিত।

ভারত সরকার যখন দেশের লোকের নিকট কৈফিয়তের দায়ীও নহেন, তখন তাঁহারা, যত দিন স্বৈর ক্ষমতা পরিচালন ও লোকমত অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, করিবেন; সুতরাং ভারত সরকার যদি গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করেন, তবে তাহা যতই বেদনাদায়ক হউক,—বিস্ময়ের কারণ হইবে না!

কাগজ-সঙ্কট

শিক্ষা-বিস্তারে কাগজের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কেন্দ্রী পরিষদে প্রকাশ, বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ভারতে ৯৬ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হয়; যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩ বৎসর প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টন হিসাবে প্রস্তুত হইত—বিদেশ হইতে সংবাদপত্রের কাগজ ও পুরাতন সংবাদপত্র প্রতি বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন আমদানী হইত। অর্থাৎ ভারতের প্রতি বৎসরের প্রয়োজন প্রায় ৩ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে অর্দ্ধেক কাগজ ভারতে উৎপন্ন হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকার প্রায় ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করিতেন, বর্ত্তমানে প্রায় ৮৬ হাজার ৩ শত টন আপনাদের প্রয়োজনে সংগ্রহ করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকারের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় ২ লক্ষ ৮১ হাজার টন কাগজ ভারতের জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগিত। বর্ত্তমানে বিদেশী কাগজের আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে উৎপন্ন ১৬ হাজার টন কাগজের উপর সরকার এবং জন-সাধারণকে নির্ভর করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রায় ৯ হাজার ৭ শত টন কাগজ থাকে। ইহার উপর আবার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৫ মাসে সাড়ে ৭ হাজার টন কাগজ মধ্য-প্রাচীতে প্রেরণের কথা। ভারতীয় কাগজ-কল সমিতি সরকারের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উৎপন্ন কাগজের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সাধারণের জন্য প্রদান করিতে অনুমতি প্রদান করা হউক। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ভারত সরকার সমিতিকে জানাইয়াছিলেন, ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালার মুদ্রাকরসঙ্ঘ প্রস্তাব করেন যে, জনসাধারণের জন্য ভারতীয় কাগজের শতকরা ৭৫ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কাগজের নিদারুণ অভাবে বহু সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থপ্রকাশ বন্ধ,—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে; এমন কি, ব্যবসায়ীগণের নূতন খাতার কাগজেরও অভাব। সরকার ভারতে প্রস্তুত শতকরা দশ ভাগের স্থানে ত্রিশ ভাগ কাগজ সাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়াছেন। ইহা তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম প্রতিভাত হইবে।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

২১শে মাঘ কেন্দ্রী পরিষদে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য জানান, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জনতার আক্রমণে পুলিশ-দলের ৪১ জন নিহত ও ১৩৬৩ জন আহত হয়। ১১২টি থানা ও পুলিশের ঘাঁটা ৪১৪টি সরকারী ভবন, ৩১৮টি রেলওয়ে ষ্টেশন ও ৩০১টি ডাকঘর ধ্বংস হয়। জনতার আক্রমণে ১৪ জন সৈনিক নিহত ও ৭০ জন আহত হয়। দেশের বর্ত্তমান বিক্ষোভ সম্পর্কিত পুলিশ ও সৈন্যদিগের জুলুমের অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য এক তদন্ত-কমিটীর দাবী করা হইলে স্বরাষ্ট্র সদস্য মিঃ ম্যাক্সওয়েল বলেন—সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সর্ব্বথা সমর্থন করিবেন। তদন্তের ব্যবস্থা হইলে আইন ও শৃঙ্খলা লোপ পাইবে।

৬ই ফাল্গুন ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে জানান যে, জন-আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতে মোট ১০২৮ জন নিহত ও ৩২১৫ জন আহত হয় ও ৯৫৮ জনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দিন কেন্দ্রী পরিষদে সমর-সংক্রান্ত যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন—রাজনৈতিক হাঙ্গামার ফলে বি এণ্ড এন ডবলু রেলওয়ের ১৬ লক্ষ টাকা এবং ই-আই রেলওয়ের ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষপত্রের ক্ষতি হইয়াছে। বি এণ্ড এন ডবলু রেলওয়ের ষ্টেশনগুলিতে আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের চালানী মাল লুঠ হয়।

লুণ্ঠন—৫ই ফাল্গুন খুলনা জিলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ডুমুরিয়া হাট সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত। ৯ই বেলগাঁওএর হুবলী গ্রামে কয়েকটি শস্য-গোলা লুণ্ঠিত। ৮ই দৌলতপুর (খুলনা) হাটে জনতা কর্ত্তৃক চাউল লুঠ। ৯ই ফকিরহাট বাজারে কতকগুলি চাউলের দোকান লুঠ। ১০ই পাঁজরভাঙ্গার (রাজসাহী) পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার অধিবাসী কর্ত্তৃক ১১ খানি চাউল-বোঝাই নৌকা লুঠ। জনতার উপর পুলিশের গুলীচালন। জনতা কর্ত্তৃক পুলিশ-দল আক্রান্ত। কীর্ত্তিপুর ও পার্শ্ববাড়ী হাট হইতে ধান ও চাউল লুঠ। নওগাঁ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় সহস্রাধিক লোকের অভিযান। খাদ্যের দাবী। ১১ই গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের শস্যভাণ্ডার লুঠ।

কম্যুনিষ্টদলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা—শিউড়ীতে কমরেড নরহরি দত্ত গ্রেপ্তার। ঢাকানিবাসী হরিদাস ভট্টাচার্য্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০১ ধারানুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ৫ই ফাল্গুন বোম্বাই প্রাদেশিক ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের নেতা সার আর, পি, মাসানীর পুত্র কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের

ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ এম, আর, মাসানীর নেতৃত্বে এক জনতা আগা খানের (যেখানে গান্ধীজী অনশনে রত ছিলেন) প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলে মিঃ মাসানী ও অপর ৪৩ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার। ১৩ই কলিকাতায় সমাজতন্ত্রীদলের ৭ জন কর্ম্মী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কেন্দ্রে আহূত। ২৩শে চট্টগ্রামের সাম্যবাদী কর্ম্মী শ্রীহাসি দত্ত গ্রেপ্তার। ২৪শে দিল্লীর সাম্যবাদী দলের দুই জন কর্ম্মীর ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড।

বাঙ্গালা—৭ই ফাল্গুন বাঙ্গালা সরকারের প্রধান-সচিব বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদকে জানান যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত জনবিক্ষোভ সম্পর্কে ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ১০৯১ জন এবং ২৬ বিধি অনুসারে ১২১০ জন আটক ও ১৫৫৯ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা—১লা ফাল্গুন ৪ স্থানে তল্লাসী, ২ জন গ্রেপ্তার, শ্রীযুত হীরালাল লোহিয়াকে এক মামলার অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার। ৫ই—দক্ষিণ কলিকাতায় শোভাযাত্রা-পরিচালনার জন্য ৬ জন গ্রেপ্তার। ৭ই শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য আশুতোষ কলেজের ৭ জন ছাত্র গ্রেপ্তার। দুই স্থানে তল্লাসী। ৯ই উত্তর-কলিকাতায় এক স্থানে তল্লাসী, ১ জন ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার। ১১ই দক্ষিণ কলিকাতায় ১ স্থানে তল্লাসী ১ জন গ্রেপ্তার; ১৪ই ৮ স্থানে তল্লাসী, বহু আপত্তিকর কাগজ প্রাপ্ত। ১৬ই হ্যারিসন রোডে গোয়েন্দা সাব ইনস্পেক্টর জগদীন্দ্রনাথ মজুমদার ছুরিকাহত। এ সম্পর্কে নির্ম্মলচন্দ্র ভঞ্জ গ্রেপ্তার, তাহার গৃহে তল্লাসীর ফলে তিনটি বোমা প্রাপ্তি। গোয়েন্দা নির্ম্মলের অনুসরণ করিতেছিল। ১লা জানুয়ারী পুলিশ কলিকাতার এক বাড়ী তল্লাসী করিয়া বোমার খোল, হাতবোমা, কার্ত্তুজ, বারুদ, নানা প্রকার এসিড, "রক্তরবিবার" শীর্ষক আপত্তিকর প্রচারপত্রাদি পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে নীলরতন বসু, নির্ম্মলচন্দ্র বসু ও নীলকৃষ্ণ বসু নামক তিন ভ্রাতা গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ অভিযুক্ত। ২২শে মধ্য-কলিকাতার এক স্থানে তল্লাসী করিয়া আপত্তিকর কাগজপত্র প্রাপ্তি। ২৩শে ফাল্গুন রাসবিহারী এভিনিউএর 'জলযোগ' খাবার দোকানে আক্রমণ, বোমানিক্ষেপ, প্রায় ৫ শত টাকা লুণ্ঠন।

ঢাকা—২১শে মাঘ শ্রীনগর থানার দারোগাকে চাকরী ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিতে পত্র লিখিবার অভিযোগে অমূল্যপ্রসাদ চন্দ অভিযুক্ত। ৩রা ফাল্গুন গেণ্ডারিয়া ষ্টেশন লুঠ, সশস্ত্র হাঙ্গামা, প্রভৃতির অভিযোগে ২২ জন অভিযুক্ত, ১০ জন পলাতক। ১৪ই ঢাকার মুক্ত রাজবন্দী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, 'নবভারতী'র সম্পাদক শ্রীযুত অনিলচন্দ্র ঘোষ গ্রেপ্তার।

বীরভূম—বোলপুর শান্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত সুধীন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার।

বরিশাল—২১শে মাঘ—বরিশাল জেলের হাঙ্গামা (৫ই অক্টোবর, অপরাহ্ণ ৫টায়) সম্পর্কে রাজনীতিক বন্দী অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী এম-এ, শ্রীযুত মাণিক ঘোষ, শ্রীযুত দিলীপ দত্ত; শ্রীযুত গোপাল নাগ, শ্রীযুত সুধীর আইচ, শ্রীযুত নীরেন্দ্র দত্তমজুমদার, শ্রীযুত সুধীর শেঠ, শ্রীযুত শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিনোদ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুত সুহৃদ দত্ত ও শ্রীযুত সুশীল ঘোষ অভিযুক্ত। ২২শে ফাল্গুন ভূতপূর্ব্ব আটক বন্দী শ্রীঅমিয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকিরণচন্দ্র রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার।

ময়মনসিংহ—২২শে ফাল্গুন টাঙ্গাইলের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র গ্রেপ্তার।

হুগলী—খানাকুল পুলিশ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন সামন্ত ও প্রফুল্ল দোলুই গ্রেপ্তার। রঘুনাথপুরের যামিনী বাগ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার। এক ইউনিয়ন বোর্ডের কাগজপত্র পুড়াইবার অভিযোগে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কালীপদ ধাড়া, সেক্রেটারী ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল দণ্ডিত।

নোয়াখালী—৩রা ফাল্গুন—নোয়াখালী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী গ্রেপ্তার। কংগ্রেস কমিটির স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি পুলিশের হস্তগত। ১৪ই আপত্তিকর পুস্তিকা রাখিবার জন্য ফেণীর শচীন্দ্র পাল গ্রেপ্তার। আটক বন্দী অবলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর ১ বৎসর কারাদণ্ড।

বর্দ্ধমান—রেলপথ ধ্বংসের অভিযোগে গোপাল মুখোপাধ্যায়, রতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

দিনাজপুর—১৩ই ফাল্গুন—বালুরঘাট হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত কুমুদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, সুধীর সেন, অধীর বিশ্বাস, নির্ম্মল রায়, সরকারী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার বিনয়ভূষণ চন্দ ও অমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লোকের গৃহ তল্লাসী, বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার। বালুরঘাটে এক দল সশস্ত্র পুলিশ আমদানী। বালুরঘাটের হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার।

আসাম—২১শে মাঘ—প্রাঙ্গণে বোমাবিস্ফোরণের ফলে নলবাড়ী ডাকঘর ভবনের ক্ষতি। ১ জন ছাত্র গ্রেপ্তার। শ্রীহট্টের ফরওয়ার্ড ব্লকদলের কর্ম্মী নলিনী গুপ্ত, সুর্ম্মা উপত্যকার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী, মৌলভীবাজারে রাজনগরের সুকুমার ভট্টাচার্য্য, শিলচরে কৃষক ও শ্রমিক দলের কর্ম্মী গৌহাটীর ব্যবসায়ী ভূপেন্দ্রনাথ মহান্ত গ্রেপ্তার। কামরূপ বিক্ষোভ মামলা সম্পর্কে ৪৩ জন প্রত্যেকে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। এই মামলায় ৯২ জন অভিযুক্ত হয় ৫ জন ফেরার। অভিযোগ—২৫শে আগষ্ট ইহাদের পরিচালনে ৩ সহস্রাধিক লোক ডাকঘর, সার্কেল আফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন ধ্বংস করিয়া কামরূপে সমবেত হয়। ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীহট্টের কংগ্রেস নেতা শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী ৪ মাস, ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী শ্রীকিরীটিভূষণ চৌধুরী ৬ মাস, নওগাঁর হংসধর হাজারীকা ও উকীল শ্রীমোহনচন্দ্র মোহান্ত ৬ মাস, শ্রীবিরজাকান্ত গোস্বামী দেড় বৎসর, শ্রীরাজেন্দ্র মোহান্ত ও হরেন্দ্র সিং ৫ মাস ও অমূল্যকুমার লাহিড়ী ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ৩রা ফাল্গুন রাত্রিতে একদল পুলিস কর্ত্তৃক রূপাহী এলাকার (নওগাঁ) এক গৃহ হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ হাজারিকা, শ্রীবেণুধর ডেকা, শ্রীভদ্র হাজারিকা, শ্রীআনন্দেশ্বর ভূইঞা, শ্রীমঙ্গলেশ্বর গজেকে গ্রেপ্তার। শ্রীমহেন্দ্র হাজারিকার গ্রেপ্তারের জন্য ১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। আসামে ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র দাস কামরূপ জিলা হইতে বহিষ্কৃত। ৬ই—উত্তর লখিমপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহ এবং পি-ডবলু-ডি আফিসের ভবনে অগ্নি-সংযোগ; সান্ধ্য আদেশ জারী। ৯ই—২ মাসের জন্য শিবসাগর জিলায় সভা, শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ। ২২শে—নলবাড়ী থানার

কয়েকখানি গ্রাম হইতে বন্দুক চুরি। বন্দুক উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিস ফৌজ প্রেরণ। ২৬শে—বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীকুমুদ-রাম বোরাকে গ্রেপ্তার; পুলিস তাঁহার সন্ধান করিতেছিল।

বোম্বাই—২৭শে মাঘ—আমেদাবাদে এক স্থানে পুলিসের গুলীবর্ষণ। তিন স্থানে পুলিসের প্রতি সোডাওয়াটারের বোতল নিক্ষেপ। ধুলকা হাই স্কুলের লেবরেটারীতে বিস্ফোরণ, নাদিরা পুলিস-চৌকীতে বোমা নিক্ষিপ্ত, নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে ৪ জন গ্রেপ্তার। ২৫।৩০ জন সশস্ত্র লোক কর্ত্তৃক জামখান্দি রাজ্যের এক থানা আক্রান্ত। ২৯শে মাঘ—মধ্যরাত্রিতে গিরগাঁওয়ে এক দর্জ্জির দোকানে বিস্ফোরণের ফলে ৩ জন আহত। আমেদাবাদে জনতার উপর পুলিশের লাঠীচালন ও গুলীবর্ষণ। পদাপোলে পুলিশের উপর এসিড নিক্ষেপ। দুই দিন হরতাল। খোলা দোকানগুলি আক্রান্ত। ১লা ফাল্গুন—পদাপোলের নিকট পুলিশের গুলীবর্ষণ। সানকাজীশেরীতে পুলিশ বাহিনীর উপর বোমা নিক্ষেপ। বেলগাঁও—বাগলকোট রাস্তায় পাথরের সেতু ধ্বংস। ৩টি মদের দোকান ভস্মীভূত। নাসিকের পুলিশ-চৌকিতে অগ্নিদান। সুরাটের কোঠামণ্ডি ও পাসর গ্রামের চৌরাগুলি, খারশাদের তাড়ির দোকান, কোঠামণ্ডির বিদ্যালয়, চন্দ্রভাসান গ্রামের ১১ হাজার ৪ শত 'তড়পা' ঘরে অগ্নিদান। ৩রা—সুরাটের চৌরাশি তালুকে বোমা বিস্ফোরণ। ৪ঠা—বান্দোলি তালুকে ৪ দিনে ৪টি বোমা বিস্ফোরণ, পুলিশ-লাইনে দুইটি বোমা নিক্ষেপ। ৭ই—রিভলভার, কার্ত্তুজ ও ধ্বংসাত্মক অপর যন্ত্রপাতিসহ সুরাটে তিন জন ফেরার গ্রেপ্তার। সুরাটের নিকটবর্ত্তী আদাজানে, কুম্ভরাব তালুকের অধীন আনন্দ চৌরায় শোভাযাত্রা বাহির করিবার অভিযোগে পুণায় ১২ জন গ্রেপ্তার; বেলগাঁও-এর অধীন গাম্পেগাঁও ডাকঘর আক্রমণ ও অগ্নিদান। মাতোলী হইতে ১টি রিভলভার, ৩ খানি তরবারি; বেদবেল ও চাপগাঁও হইতে ৪টি রাইফল ও অপর দুইটি অস্ত্র অপসারিত। ৯ই সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক বেলগাঁও নূতন সাউগুালগীর অস্থায়ী টেলিগ্রাফ বিভাগে কর্ম্মচারীরা আক্রান্ত, শিবিরে অগ্নি-সংযোগ। ১০ই—আমেদাবাদের গান্ধী রোডে ৫০ জন বালকের পুলিশ প্রহার। যাববেদা জেল হইতে পলাতক রাজনৈতিক বন্দী ছান্নু সিং ও কল্যাণ সিং গ্রেপ্তার। ১১ই—ববোচে পেটিট বালিকা-বিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ। ১৩ই, সুরাট জৈন হাইস্কুলের নিকট এক সাইকেল-আরোহী কর্ত্তৃক বোমা নিক্ষেপ, ১টি স্ত্রীলোক আহত। নাসিকে তল্লাসী করিয়া সুভাষচন্দ্র বসুর চিত্রাদি প্রাপ্তি। ১৮ই—১৫ দিনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বোম্বাই সহরে চলাফেরা নিষিদ্ধ। ২১শে—বোম্বাইএ আপত্তিকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ৮৫ জন গ্রেপ্তার। ২২শে—বেলগাঁওএর মোহন রাও দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার। বোম্বাই ছাত্র য়ুনিয়নের ৫ জন কর্ম্মী দণ্ডিত। হংস বেন গ্রেপ্তার। রুদ্রপুর ও হোলিপুর (বেলগাঁও) হইতে কয়েকটি রাইফল অপহৃত। পুণায় মিঃ এম, আর মাসনী, ১৪ জন তরুণী ও অপর ছয় জন দণ্ডিত। ২৫শে ফাল্গুন—পশ্চিম খান্দেশে ৭ শত লোকের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, ৩৫ জন নিহত, ৩৫ জন আহত। জনতার পুলিসের উপর তীর নিক্ষেপের অভিযোগ, ৩ জন কনষ্টেবল আহত, ৩০০ জন গ্রেপ্তার।

মাদ্রাজ—৭ই ফাল্গুন—সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে শ্রীমতী ভাবতী, শ্রীযুক্তা অমুস্বামী নাথন, শ্রীযুক্তা মঞ্জুবাসিনী, ও ৪জন ছাত্র গ্রেপ্তার। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিযোগে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত পি, পার্থসারথির কারাদণ্ড।

বিহার—পুরুলিয়ার বড়বাজার থানায় অগ্নিদান ও অস্ত্রাদি লুণ্ঠনের অভিযোগে ২৮ জনের ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ৬ই ফাল্গুন সাঁওতাল পরগণার সারাথ থানা, ডাকঘর ও শস্যগোলা দগ্ধ করিবার ও লুণ্ঠনের অভিযোগে ১৫ জনের ৭ হইতে ৯ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড। তুমকার অন্তর্গত বড় পলাশীর লাঠিপাহাড়ে তীর ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রসজ্জিত একদল লোকের সহিত পুলিস-দলের তুমুল লড়াই, ৫ জন পুলিশ অফিসার আহত। পুলিশের গুলীচালন। তুমকার সরায়াস্থিত দ্বারভাঙ্গা রাজকাছারীতে অগ্নিদান; কয়েক জন হতাহত। ১২ই ফতোয়া ষ্টেশনে আর-এম-এসএর দুই জন অফিসারকে হত্যা করিবার অভিযোগে ৮ জনের প্রাণদণ্ড, ৫ জনের নির্ব্বাসন দণ্ড; প্রধান আসামী রাম-নারায়ণ মোহান্ত নিরুদ্দেশ। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত ভোলানাথ মজুমদার, শ্রীযুত বিশ্বনাথ সাউ, শ্রীযুত শক্তিপদ দাস, শ্রীযুত রামলাল সেরাউলী গ্রেপ্তার। রাঁচী সহরের দুই স্থানে তল্লাসী, ১ জন গ্রেপ্তার। ২২শে সরকারী শিল্প ইনষ্টিটিউট লুঠ করিবার অভিযোগে ৩ জনের ১ হইতে ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। পীর পাইতি ও মীর্জাচৌকী রেল-ষ্টেশনের নিকট অপরাধজনক কার্য্য করিবার অভিযোগে কতিপয় ব্যক্তির ৬ মাস হইতে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির অধিনায়ক শ্রীযুত নাথুনি সিং দীঘাঘাটে গ্রেপ্তার।

যুক্ত-প্রদেশ—২২শে—হরিদ্বারে সরকারী ভবন আক্রমণ, পুলিসের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কয় জন পুলিস কনষ্টেবলকে আহত ও সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের অভিযোগে ২ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড এবং ১৪ জনের বিভিন্ন মিয়াদে কারাদণ্ড।

মধ্য-প্রদেশ—২৮শে মাঘ মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের সংবাদ পাইয়া অধ্যাপক ভাঁসালীর পুনরায় অনশন আরম্ভ, কিন্তু গান্ধীজী উদ্বিগ্ন হইয়াছিল সংবাদে ১লা ফাল্গুন রাত্রিতে অনশন ভঙ্গ।

পঞ্জাব—পঞ্জাব পরিষদে জানান হয়, পরিষদের ১১ জন কংগ্রেসী সদস্য আটক।

সিন্ধু—২৬শে মাঘ করাচীর প্রধান রাজপথ ফেরীরোডে এক টহলদারী পুলিসের উপর বোমা নিক্ষেপ। এই পুলিসদল মৈহাব দেবী স্কুলের নিকট পৌছিলে পুনরায় তাহাদিগের উপর বোমাবর্ষণ।

দিল্লী—১০ই ফাল্গুন—দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, ১ জন আহত, একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের বিশেষ ক্ষতি। ১৪ই—জমিয়ৎ-উল-উলেমার সহকারী সভাপতি মৌলানা আমেদ সৈয়দ গ্রেপ্তার। মধ্যরাত্রিতে কে কাজির বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক প্রভূত পরিমাণ বিস্ফোরিত পদার্থ আবিষ্কার।

সামন্তরাজ্য—২৮শে মাঘ কোলাপুরের লক্ষ্মীপুর থানা ও সিটিপোষ্ট আফিসে বোমা বিস্ফোরণ। সাঙ্গলী রাজ্যের এক স্থানে বহু লোকের কতকগুলি বাড়ী তল্লাসী করিয়া তরবারি, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি সংগ্রহ। কোটকোলমহল আফিসে অগ্নিসংযোগ; শাপুরীতে বোমাবিস্ফোরণের ফলে ৩ জন আহত। ৩রা ফাল্গুন টাউনহলের নিকটে বোমাবিস্ফোরণ, ১ জন আহত। ৯ই কোলাপুর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ও এক দোকানের সম্মুখে বিস্ফোরণ, ১ জন কনষ্টেবল ও অপর এক জন আহত; কাটকোল মহলের কাছারীতে সশস্ত্র জনতার আক্রমণ ও অগ্নিদান, ১৩ই শাংলি রাজ্যের শ্রীহাটি গ্রামে জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ ১ জন নিহত, ১ জন আহত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত
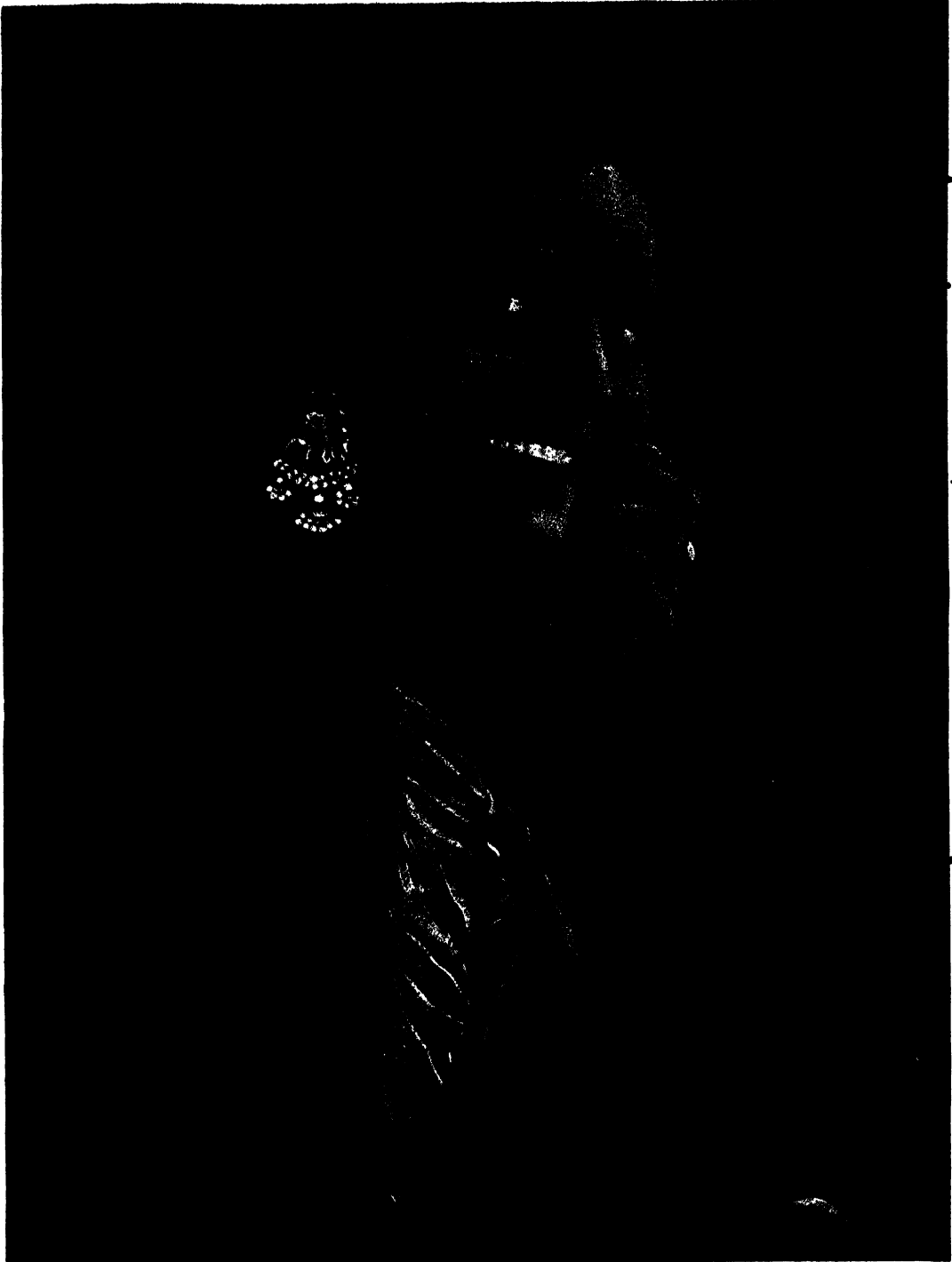
"আমার অঙ্গমাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-মালার সাজে।"—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

২১শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

: সংস্কৃত-নাট্যে প্রহসন :

আমাদের জাতীয় জীবনের আনন্দধারা ক্ষীণ-স্রোতা নদীর মত দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দুঃখ-দুর্দ্দশার শৈবালদামে আনন্দ-স্রোতঃ রুদ্ধপ্রায়, দুশ্চিন্তার পঙ্কিলতায় পূর্ব্বাগত আনন্দপ্রবাহ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তাহার উপর বৈদেশিক সভ্যতা কচুরিপানার মত সমস্ত জাতির জীবন-রস শোষণ করিয়া ভাব-পরিসরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এ দুর্দ্দিন হইতে ভারত কত দিনে যে মুক্ত হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু চির দিন এরূপ নিরানন্দপুরীর মত ভারতভূমি বিশ্বের সম্মুখে ম্লান—নিস্তব্ধ—নিরুদ্যম ছিল না। এই ভূমির কৃতী সন্তানগণ জগৎকে বহুবিধ অবদানে উজ্জ্বল ও আনন্দে মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিন এই অবদানের উপহারে সমগ্র দেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানী করা ভাবসম্পৎ যখন এ দেশে দুর্লভ ছিল, তখনও যে শিল্পকলা-কৌশলের বিবিধ বিকাশ এই ভারতের অঙ্গেই সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরকীয় নাটক ও প্রহসন আজ ভারতের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের নিজ সম্পদের পরিচয় দিনের পর দিন বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি।

আজ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে,—প্রাচীন অভিনয়-কলার সম্যক্ আদর এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, অথচ এই সমস্ত কলা-সাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ আজও বিদ্যমান। আমাদের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের জন্যই হউক, অথবা সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইবার পর তাহার উদ্ধার-বিষয়ে উদ্যমের অভাবপ্রযুক্তই হউক, সে বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করিবার মত আমাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না।

সংস্কৃত-নাট্যের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতমুনি, তাঁহারই রচিত নাট্য-শাস্ত্র—পরবর্ত্তী সকল আলঙ্কারিকের অবলম্বন। এ জন্য দশরূপক গ্রন্থের রচয়িতা ধনঞ্জয় লিখিয়াছেন,—

দশরূপানুকারেণ যস্য মাদ্যন্তি ভাবকাঃ।
নমঃ সর্ব্ববিদে তস্মৈ বিষ্ণবে ভরতায় চ॥

বিষ্ণু ও ভরতকে প্রণাম করিতেছি, বিষ্ণু দশরূপ মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশাকৃতি ধারণ করায়—এবং ভরতমুনি দশরূপ—নাটক-প্রকরণাদি দশবিধ দৃশ্যকাব্য প্রকাশ করায় উভয়েই ভাবুকগণের পরম আনন্দপ্রদ হইয়াছেন। বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ—ভরতমুনিও সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, এই ভাবে—ভরতমুনিকে বিষ্ণুসদৃশ পূজ্য জ্ঞানে সম্মানিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে জাতীয় জীবনে আনন্দবোধ আনয়ন করিবার জন্যই যে নাট্যের সৃষ্টি, তাহাও ধনঞ্জয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধু
স্তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়॥

নাটকাদি রূপক পরম আনন্দের নিদান। কিন্তু যে ইহার দ্বারা ভাষার ব্যুৎপত্তিমাত্র প্রয়োজন বোধ করে—সে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি, আর যে ব্যক্তি ইতিহাসের ন্যায় মনে করেন, তিনি ত' সাধুপুরুষ—তাঁহাকে নমস্কার। কেন না, স্বাদু (আকর্ষক) রস হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াই তিনি থাকিলেন। ইহা যে ব্যঙ্গ—তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে রূপকের প্রয়োজন নির্ম্মল আনন্দ-সম্ভোগ।

রূপক অর্থে নাটকাদি সমস্ত দৃশ্যকাব্যকে বুঝায়। রূপ যেমন প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, সেইরূপ নাট্য দর্শনের যোগ্য হয় বলিয়া তাহা রূপ। যাহাতে সেই রূপের আরোপ থাকে, তাহাই রূপক। রূপণ অর্থে আরোপণ—নাট্য-ভূমিকায় নটে রামচন্দ্রের লীলা আরোপিত হইতেছে, এই জন্য সেই নটপ্রযোজ্য অভিনের বস্তুকে রূপক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভরত বলিয়াছেন,—

দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং লোকস্য চৈব হি।
পূর্ব্ববৃত্তানুচরিতং নাটকং নাম তদ্ভবেৎ ॥

রামচন্দ্র ত' কোন্ যুগে ধরাধাম হইতে লীলাসংবরণ করিয়াছেন, কিন্তু নাটকে সেই পূর্ব্ববৃত্তের অনুকরণে আজিও রাম-লীলা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়।

সমস্ত নাট্যের মধ্যে নাটকই প্রধান। (১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) ভাণ, (৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, (৬) ডিম, (৭) বীথী, (৮) অঙ্ক, (৯) ঈহামৃগ ও (১০) প্রহসন—এই দশটি রূপকের ভেদ। প্রত্যেক রূপকের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নাটক ও প্রকরণ প্রসিদ্ধ আছে;—পূর্ব্বকালে এই দশবিধ রূপকেরই যে প্রচলন ছিল, তাহা সাহিত্য-দর্পণে উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। ভাণের উদাহরণ 'লীলা-মধুকর'। ব্যায়োগের উদাহরণ 'সৌগন্ধিকা-হরণম্'—ভাসের 'মধ্যম ব্যায়োগ' উল্লিখিত না হইলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহাও গ্রহণীয়। সমবকারের উদাহরণ—'সমুদ্রমন্থন'। ডিম নামক রূপকের উদাহরণ—'ত্রিপুরদাহ'। ঈহামৃগের উদাহরণ—'কুসুমশেখর-বিজয়'। অঙ্ক নামক রূপকের উদাহরণ—'শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি'। বীথীর উদাহরণ—'মালবিকা'। প্রহসনের উদাহরণ—তিনটি; শুদ্ধপ্রহসন—'কন্দর্পকেলি'। সঙ্কীর্ণ প্রহসন—'ধূর্ত্তচরিত' এবং মতান্তরে সঙ্কীর্ণ প্রহসন—'লটকমেলক'। উল্লিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে বহু গ্রন্থ অপ্রচলিত অথবা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রূপক ও নাট্যশব্দ প্রায় তুল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে উভয়ের ব্যুৎপত্তিগত একটু পার্থক্য আছে। ধনঞ্জয় নাট্য ও রূপকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

অবস্থানুকৃতির্নাট্যং রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে।
রূপকং তৎসমারোপাদ্ দশধৈব রসাশ্রয়ম্ ॥

অবস্থানুকরণের নাম নাট্য, তাহা দৃশ্য হইলে রূপ, সেই রূপ নটাদিতে আরোপিত হইলে, তাহা রূপক; রূপক দশবিধ, রূপক রসকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। ধনঞ্জয় এই দশবিধ রূপক ব্যতীত আরও দৃশ্যকাব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের টীকাকার (ধনিক) সেরূপ সাতটি নাম করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-দর্পণকার ১৮টি উপরূপকের * উল্লেখ করিয়াছেন। এই যে উপরূপক, ইহা নাট্য নামে অভিহিত হইবে না—ইহার নাম হইবে নৃত্য। নৃত্য ও নৃত্ত দুইটি ভিন্ন। নৃত্য শব্দে পদার্থ বিষয়ের অভিনয়, আর নৃত্ত শব্দে তাল-লয়ের আশ্রয়ে যাহা নির্ব্বাহিত হয়, অর্থাৎ যেমন যাত্রা ও 'নাচ'। নৃত্য ভাবের আশ্রিত, নাট্য রসের আশ্রিত, আর নৃত্ত তাল ও লয়ের আশ্রিত,—এইরূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

নৃৎ ধাতুর অর্থ গাত্রবিক্ষেপ (গাত্রের চালনা-বিশেষ) সুতরাং আঙ্গিক অভিনয়ের আধিক্য যাহাতে আছে, তাহাই নৃত্য। নট ধাতুর অর্থ স্পন্দন, অল্পমাত্রায় অঙ্গচালনা অর্থাৎ বাক্যার্থ-বোধক অভিনয়ের প্রাধান্য এবং অঙ্গচালনার অপ্রাধান্য নাটকাদিতে থাকে বলিয়া তাহা নাট্য। নৃত্য ও নৃত্ত একই নৃৎ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রথমটিতে অনুকরণ-প্রধান গাত্রবিক্ষেপ, দ্বিতীয়টিতে তালযুক্ত গাত্রবিক্ষেপ মাত্র বুঝাইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণে নাট্যের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে,—

ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্ব্বিধঃ।

অভিনয় হইল অবস্থার অনুকরণ। ধনঞ্জয়মতে যাহা নাট্যের সংজ্ঞা, সাহিত্যদর্পণে তাহাই অভিনয় নামে কথিত হইয়াছে।

রামচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণে রূপক দ্বাদশবিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নাটিকা ও প্রকরণী—ইহাও রূপকের মধ্যে গণিত হইয়াছে।

নন্দিকেশ্বরকৃত অভিনয়দর্পণে নটন যে ত্রিবিধ, তাহার উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—এই প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ জাতীয় নটন প্রযুক্ত হইবে, তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে।

পর্ব্বকালে নাট্য ও নৃত্য উভয়ের প্রয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্তু নৃপতিদিগের অভিষেক-মহোৎসবে নৃত্ত (নাচ) অনুষ্ঠেয়। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে পর্ব্বদিনে—দেবযাত্রায়—বিবাহে—প্রিয়জন-সম্মেলনে—নগর বা গৃহপ্রবেশ কালে—পুত্রজন্মোৎসবে নাট্যাদির প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই ত্রিবিধ নটনই মঙ্গলকার্য্যবিশেষ। সংক্ষেপে ইহাদের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে,—যাহাতে ইতিহাসের সমাবেশ আছে, তাহা নাট্য বা নাটক। যাহাতে ভাবাভিনয় নাই, তাহা নৃত্ত; আর যাহা রসভাবের ব্যঞ্জনাযুক্ত অভিনয়—তাহাই নৃত্য, রাজা-মহারাজাদিগের সভায় এই নৃত্যের প্রয়োগ করিতে হয়।

সমস্ত রূপক বা নাট্যের মধ্যে নাটক নামক রূপকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাটকেরই বিস্তৃত লক্ষণ আলঙ্কারিকগণ দিয়াছেন, আর কোন রূপকের এত বিশদ বিশ্লেষণ নাই; তবে যেখানে যেখানে প্রভেদ আছে—সেইটুকু মাত্র উল্লেখ করিয়া অন্যান্য অংশে নাটকের তুল্য, এই কথা বলাতেই সমস্ত রূপকের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকরণও নাটকের মতই কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে; তবে প্রকরণ সংখ্যায় অল্প, অবয়বে নাটকাপেক্ষা বৃহত্তর এবং কবি-কল্পিত ঘটনাযুক্ত বলিয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্ত অধিকার তেমন ভাবে করিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়।

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ অথবা ঐতিহাসিক পুরুষগণের জীবন-যাত্রা চিত্রিত হইলে, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের যতটা আকর্ষণ হয়, কল্পিত নায়ক-নায়িকার সমাবেশে তত গভীর রসসৃষ্টি হয় কি না, তাহা সহৃদয়বেদ্য।

লোকরঞ্জকতায় প্রকরণের পরই প্রহসনের স্থান। প্রহসনের লক্ষণ এই যে,—কবিকল্পিত ঘটনার সমাবেশে নিন্দনীয় চরিত্র অঙ্কন ইহাতে থাকিবে; এক জন ধৃষ্ট ব্যক্তি অথবা বহু ধৃষ্টের মিলনে প্রহসন চিত্রিত হইতে পারে। কিন্তু হাস্যরসই প্রধান বা অঙ্গী। বিপ্র, তপস্বী, ভগবান্ (পরিব্রাজক) প্রভৃতি ইহার নায়ক হইবে। প্রহসন ভরতমতে দ্বিবিধ, ধনঞ্জয়মতে ত্রিবিধ, রামচন্দ্রমতেও দ্বিবিধ। সাহিত্যদর্পণকার উভয় মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ—এই দ্বিবিধ প্রহসন ভরতোক্ত বলিয়া অনেকেই ইহার পক্ষপাতী। ধনঞ্জয় 'বিকৃত' নামক আর এক প্রকার প্রহসনের ভেদ স্বীকার

---

* নাটিকা (১) ত্রোটক (২) গোষ্ঠী (৩) সট্টক (৪) নাট্য-রাসক (৫) প্রস্থান (৬) উল্লাপ্য (৭) কাব্য (৮) প্রেক্ষণ (৯) রাসক (১০) সংলাপক (১১) শ্রীগদিত (১২) শিল্পক (১৩) বিলাসিকা (১৪) দুর্ম্মল্লিকা (১৫) প্রকরণী (১৬) হল্লীশ (১৭) ভাণিকা (১৮)। ধনিকের উল্লিখিত সাতটি এই আঠারটির অতিরিক্ত নহে।

করিয়াছেন। একটি ধূর্ত্ত দ্বারা প্রহসন নির্ব্বাহিত হইলে—তাহা শুদ্ধ, বহু ধূর্ত্ত সমাবেশ হইলে—তাহা সঙ্কীর্ণ, এবং ক্লীব, কঞ্চুকী, তাপস, বিট, চারণ, সৈন্ত প্রভৃতির বিকৃত বেশ ও বিকৃত বাক্য যাহাতে থাকিবে, তাহাই 'বিকৃত' নামক প্রহসন।

অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে,—সংস্কৃত সাহিত্যে বড় বড় রাজা-মহারাজা বা ব্রাহ্মণ-সজ্জন ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদিগকে লইয়া কোন চরিত্র অঙ্কন নাই এবং art for art's sake এ নীতিও তখনকার সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। এ সকলের আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কৃত প্রহসনের মধ্যে এই সকল অভিযোগের যে উত্তর আছে, তাহা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলা যায়।

অবশ্য সাধারণ কাব্যের নীতি অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, প্রহসনে যদি নিন্দিত চরিত্রগুলিই অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' কাব্যের সে সার্থকতা রহিল কোথায়? এ বিষয়ে আর কেহ প্রশ্ন তুলেন নাই বটে, কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার নাট্যদর্পণে জানাইয়া দিয়াছেন,—"বৈমুখ্যকার্য্যম্······প্রহসনং দ্বিধা" "বৈমুখ্যং বহুমানাভাবঃ কার্য্যং প্রয়োজনং যস্য। প্রহসনেন হি পাষণ্ডিপ্রভৃতীনাং চরিতং বিজ্ঞায় বিমুখঃ পুরুষো ন ভূয়স্তান্ বঞ্চকানুপসর্পতি।" বৈমুখ্য অর্থে অনাদর—ইহাই প্রহসনের প্রয়োজন। প্রহসনের দ্বারা পাষণ্ডী প্রভৃতির চরিত জ্ঞাত হইয়া লোক বিমুখ হইবে এবং আর কখনও সেইরূপ ধূর্ত্তদিগের নিকটে যাইবে না, সুতরাং দুষ্ট—নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের কার্য্যে অনাদর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রহসনে মাত্র একটি অঙ্ক, * মতান্তরে দুইটি অঙ্ক থাকিতে পারে। অথবা দুইটি সন্ধি লইয়া একটি অঙ্কও হইতে পারে।* কাহারও কাহারও মতে সঙ্কীর্ণ প্রহসনে—একাধিক অঙ্ক সন্নিবেশ ঘটিতে পারে—ইহা রামচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসনের সংখ্যা বড় কম নহে, তবে এখনও বহু প্রহসন অমুদ্রিত আছে।

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বোধায়ন কবি-বিরচিত "ভগবদজ্জুকীয়ম্" নামক একখানি প্রহসন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে ইহা অভিনীতও হইয়াছিল। এই প্রহসনখানি টীকাসহিত প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থকারের নাম জানিতে পারা গিয়াছে, † নতুবা গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই। ভাস কবির নাটকচক্রে যেমন গ্রন্থকারের নাম নাই, ঠিক্ সেইরূপ রীতির অনুবর্ত্তনে প্রহসনখানি রচিত। (পরবর্ত্তী কালে নাটক বা প্রহসনের আরম্ভে কবি-পরিচয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের বা ভবভূতির নাট্য-সাহিত্যে তাহা দেখা যায়)। এ জন্য উক্ত প্রহসনখানি খুব প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। যখন বৌদ্ধ-প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইহার রচনা-কাল হইতে পারে। এই প্রহসনের নায়ক একটি ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক। অনেকে বলেন,—পরিব্রাজক তাঁহার শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে যে সকল বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকার ভাবার্থ জ্ঞাপন করে—ইহাতে মনে হয়, এই কবি গৌড়পাদের পরবর্ত্তী এবং ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভাষার রীতি ভাসের অনুরূপ হওয়ায় প্রাচীনতায় সন্দেহ নাই। Dr. M. Winternitz মনে করেন যে,—আচার্য্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্য গ্রন্থে বৃত্তিকার বোধায়নের অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি আচার্য্য শ্রীশঙ্করেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই বৃত্তিকার বোধায়ন এবং এই প্রহসন-লেখক এক ব্যক্তিও হইতে পারেন। অবশ্য এ বিষয়ে অন্য কোন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'ভগবদজ্জুকীয়ম্' এই নামটির মধ্যে ভগবান্ শব্দে পরিব্রাজক ও অজ্জুকা শব্দে গণিকা এই অর্থ প্রকাশ করেতেছে। নাটকের পরিভাষানুসারে অজ্জুকা শব্দটি গণিকা অর্থে ব্যবহৃত হইবে, ইহাই নিয়ম।

ভরতমুনি

[রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরিকল্পনা অনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত।]

যাহা হউক, এই প্রহসনখানির আপাত দৃষ্টিতে আখ্যান-বস্তু এইরূপ—একটি পরিব্রাজক, তাঁহার শিষ্যসহ একটি গ্রামে আসিতেছিলেন, পথে শিষ্যটিকে দেখিতে না পাইয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন; তখন শিষ্য আসিতে আসিতে নিজ পরিচয় দিতেছে যে,—আমি ত জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, গলায় একগাছা পৈতা ছিল, কিন্তু বাড়ীতে অন্নাভাব, প্রাতরাশের লোভে বৌদ্ধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারাও এক-বেলা খাইয়া থাকে, কাজেই সেখান হইতে পলায়ন করিয়া এই দুষ্ট আচার্য্যের হাতে পড়িয়াছি। সম্মুখে আচার্য্যকে দেখিয়া শিষ্য চুপ করিল। আচার্য্য তাহাকে অভয় দান

---

* বৃত্তং বহূনাং ধূর্ত্তানাং সঙ্কীর্ণং কেচিদূচিরে।
তৎপুনর্ভবতি দ্ব্যঙ্কমথবৈকাঙ্কনির্ম্মিতম্। সাঃ দঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ ২৭১
সঙ্কীর্ণমনেকাঙ্কং কেচিদনুস্মরন্তি (নাট্যদর্পণ ৮৫ শ্লোক-টীকা)

† বোধায়ন কবি-রচিতে
বিখ্যাতে "ভগবদজ্জুকাভিহিতে"

করিলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—ভগবান্, কি উপায়ে ভিক্ষাটা ভাল রকম জুটান যায়, তার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলিলেন,—কামনা ত্যাগ কর, সহিষ্ণু হও, এ সংসার হ্রদের মত ভীষণ, যেমন প্রমাদশূন্য ব্যক্তি হ্রদ সন্তরণ করিয়া পার হইয়া যায়, সেরূপ সংসারও পার হওয়া যায়। শিষ্য বলিল,—আমি ধর্ম্মলোভে আসি নাই, অন্নলোভে এই দণ্ডধারণ করিয়াছি।

পরিব্রাজক বলিলেন,—সে কি কথা? তৎপরে তাহাকে নানা সদুপদেশ দিতে দিতে যাইতেছেন। অনন্তর একটি উদ্যানে উভয়ে প্রবেশ করিলেন, উদ্যান হইতে সঙ্গীতের স্বর উত্থিত হইল। শিষ্য শাণ্ডিল্য দেখিল যে, এক গণিকা তাহার দাসীসহ উপবিষ্ট এবং তাহার প্রণয়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এবং সেই গণিকা গান গাহিতেছে। শাণ্ডিল্য আচার্য্যকে বলিল,—কি মধু বর্ষণ হইতেছে, আপনি একটু শুনুন। আচার্য্য একটু ক্রোধসহকারে তাহাকে তিরস্কার করিলেন। শিষ্য বলিল—আপনি সন্ন্যাসী, রাগের বশীভূত হইবেন না। আচার্য্য আত্মভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। এ দিকে যমদূত সেই গণিকার প্রাণবায়ু হরণ করিতে আসিল। তৎপরেই গণিকার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। যমদূত চলিয়া গেল। এ দিকে শিষ্য গণিকার মৃত্যুতে আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরিব্রাজক সেইরূপ উদাসীন হইয়া রহিলেন। শিষ্য তখন পরিব্রাজককে 'নিষ্ঠুর' প্রভৃতি শব্দে গালি দিয়া নিজেই সেই মৃত গণিকার নিকট আসিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং গণিকার অঙ্গে হাত দিয়া তাহার জীবৎকালে হাত দিবার সুযোগ না পাওয়ায় দুঃখ করিতে লাগিল। গণিকার দাসী গণিকার মাতাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য চলিয়া গেল। এ দিকে আচার্য্য শিষ্যকে যোগশক্তি দেখাইবার জন্য সেই মৃত গণিকা-দেহে নিজ প্রাণকে প্রবেশ করাইলেন। গণিকা উঠিয়া বসিল এবং ডাকিল—শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য! শিষ্য গণিকাকে জীবন প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইল। কিন্তু গণিকা তখনই বলিল যে, তুমি হাত-পা না ধুইয়া আমাকে স্পর্শ করিও না। শিষ্য ভাবিল—গণিকার বড় আচার নিষ্ঠা! তখনই গণিকা বলিল—বৎস, অধ্যয়ন কর। শিষ্য মনে করিল—এ কি—আমার এখানেও সেই অধ্যয়ন? তদপেক্ষা অধ্যাপকের নিকটেই যাই না কেন? গিয়া দেখিল, অধ্যাপকের মৃত-দেহ পড়িয়া আছে। শিষ্য তাহাতেও দুঃখ করিতে লাগিল।

এ দিকে দাসী গণিকার মাতাকে লইয়া আসিল। মা আসিয়া দেখিল, গণিকা উঠিয়া বসিয়া আছে। সে মা'কে বলিল—তুমি আমায় ছুঁইও না। তাহার মা ভাবিল, বিষক্রিয়ার ফলে বিকার হইয়াছে—এ জন্য সে বৈদ্য আনিতে ছুটিল। বৈদ্য আসিয়া বিষ ঝাড়াইতে নানা মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াও ফল পাইল না; তখন বৈদ্য [illegible] করিল। এ দিকে যমদূতের ভুলে বসন্তসেনা নামে আর এক গণিকার স্থলে এই গণিকার প্রাণ যমালয়ে লইয়া যাওয়ায় যম ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সেই গণিকার প্রাণবায়ু সহ যমদূতকে পাঠাইয়া দিলেন। যমদূত আসিয়া দেখিল—গণিকা জীবিতা হইয়াছে। একটু বিচার করিয়া দেখিতেই বুঝিতে পারিল যে,—পরিব্রাজকের প্রাণ গণিকা-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন যমদূত আর কি করিবে—সেই গণিকার প্রাণ ব্রাহ্মণের মৃতদেহে প্রবেশ করাইয়া দিল। পরিব্রাজক-দেহ উঠিয়া বসিল এবং গণিকার মত কথা কহিতে লাগিল। তখন তাহার কথা শুনিয়া শিষ্য শাণ্ডিল্য বলিল—আপনি কি সে ভগবান্ও নহেন, অজ্জুকাও (গণিকাও) নহেন, দেখিতেছি,—আপনি ভগবদজ্জুকা হইয়াছেন। ইহাই নাটকের নামকরণ। পরিব্রাজক তখন গণিকোচিত ব্যবহার-বার্ত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। এ দিকে রোজার নিকট হইতে বড়ী আনিয়া বৈদ্য আবার আসিল। গণিকার মুখে তখন সংস্কৃত কথার কি জোর! বৈদ্য ত' হতভম্ব হইল এবং গণিকাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে যমদূত দেখিল, তাহার বিলম্ব হইতেছে। যমের আদেশ—গণিকার প্রাণ গণিকা-দেহে দিতে হইবে। কাজেই যমদূত তখন উভয়ের শরীর হইতে উভয়ের প্রাণ-বিনিময় করিয়া দিল। শিষ্য চমৎকৃত হইল। এইখানেই প্রহসন সমাপ্ত হইয়াছে। এই প্রহসনে হিন্দু পরিব্রাজকের উৎকর্ষ এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের তাৎকালিক অবনতির চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে অশ্লীলতা দোষ নাই, বরং গভীর হাস্যরসের সহিত একটি অপূর্ব্ব তত্ত্ববিশ্লেষণ মিশ্রিত আছে।*

মহেন্দ্রবিক্রম-বর্ম্মার রচিত 'মত্তবিলাসম্' নামক প্রহসনেও একটি ভণ্ড বৌদ্ধভিক্ষু ও কাপালিকের বিচিত্র ব্যবহারের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'লটকমেলক' প্রহসনখানিও খুব প্রসিদ্ধ। লটক শব্দে দুর্জ্জন, যত প্রকার দুর্জ্জন হইতে পারে, সকলের সম্মেলনে একটি অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা শঙ্খধর কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন—ইঁহার সময় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক। ধূর্ত্ত-সমাগম নামক প্রহসন জ্যোতিরীশ্বর কবি-প্রণীত। কবি জগদীশ্বর-প্রণীত হাস্যার্ণব নামক প্রহসন—এই কয়খানিই এক রীতিতে লিখিত। ইহাতে নানাবিধ হাস্যকর চিত্র আছে—arts for art's sake দেখিলে আধুনিক তরুণচিত্তেও বিস্ময় উৎপন্ন হইবে।

হাস্যার্ণবের নায়ক রাজা অনয়সিন্ধু, তাঁহার কুলপুরোহিত বিশ্বভণ্ড। বিশ্বভণ্ডের স্বরূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

> দিনোপবাসী তু নিশামিষাশী
> জটাধরঃ সন্ কুলটাভিলাষী।
> অয়ং কষায়াম্বর-চারুদণ্ডঃ
> শঠাগ্রণীঃ সর্পতি বিশ্বভণ্ডঃ।

এই রাজার সহিত কুমতিবর্ম্মা নামক মন্ত্রী এবং ব্যাধিসিন্ধু নামক বৈদ্য সর্ব্বদা সহচররূপে বর্ণিত। কৌতুকার্ণব নামক প্রহসনও এই রীতিতে লিখিত।

[ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

---

* Among the published Prahasanas the Bhagovadajjukiyam 'the comedy of the saint and the courtezan', holds a some what unique position. It is certainly quite different from the Mattavilasa Prahasana···rather a comedy in our sense of the word than a farce.

—(Dr. M. Winternitz.)

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

সারা রাত্রি ধরিয়া দুর্য্যোগ চলিয়াছে। আকাশের বুকে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্র-বিদ্যুৎ মিলিয়া এমন কাণ্ড সুরু করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, মানুষের কর্ম্ম-চক্রকে অচল করিয়া দিতে তাহারা যেন ভীষণ ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে। এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সে মত্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। বর্ষণের বেগ মন্দা, বাতাসের গর্জ্জন কমিয়াছে এবং মেঘের ঘন-কৃষ্ণতা ফিকা হইয়া আসিয়াছে।

রমেশের শয়ন-ঘরের ঘড়িতে সশব্দে এ্যালাম বাজিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণ আওয়াজ কাণে লাগিবামাত্র রমেশের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল। স্প্রীংএর মত লাফাইয়া তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। কর-তলে দুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে খাট ছাড়িয়া মাটিতে নামিয়া অর্গল-মুক্ত কপাট খুলিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিলেন। রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া একতলার পানে চাহিতেই দেখিলেন, নীচে গৃহিণী অমলা!

অমলা সদ্য স্নান সারিয়াছে। আর্দ্র বসন, সিক্ত-কেশ। গত রাত্রের ঝড়ে তুলসী-মঞ্চের বেড়াটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অমলা তাহার সংস্কার করিতেছিল।

উপর হইতে হাঁকিয়া রমেশ বলিলেন—"রত্নাকে ডেকে দেছ ?"

স্বামীর কণ্ঠ শুনিয়া অমলা মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, "সকাল হোক!"

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—"সকাল হোক, মানে? সকাল হয়নি না কি? আটটায় ট্রেণ—তা মনে আছে?"—বলিয়া ক' পা অগ্রসর হইয়া একটা রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "রত্না, রত্না, উঠে পড়, মা! কাল অত করে বলে রাখলুম—"

ঘরের ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর আসিল, "উঠ্‌চি বাবা, এই তো সবে পাঁচটা।"

রমেশ বিরক্ত হইলেন! কহিলেন, "হ্যাঁ, এই সবে পাঁচটাই বটে! সব সমান!"

সকাল হইতে এই যে-বকুনি সুরু হইল, বেলা বাড়িয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অমলা জানে। তাই অঙ্কুরেই এ বকুনির উচ্ছেদ করিতে নীচে হইতে অমলা গজ্‌-গজ্ করিয়া উঠিল! কহিল,—"সকাল না হতেই আরম্ভ হয়েছে! পোড়া আকাশ মানুষের সঙ্গে বাদ সাধছে, তার সঙ্গে ঘরের মানুষও আবার কোমর বেঁধে পাল্লা সুরু করলে!"

রমেশ একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বোধ করি, এরূপ ভাষণের জন্য! ইহার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কহিলেন,—"পাল্লা সুরু কি রকম? আকাশের সঙ্গে আমি ষড় করেছি! তোমরা ঘুমোতে পাওনি, আর আমিই ঘুমিয়ে কাতর হয়েছিলুম!"

অমলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"ঘুমোওনি কেন? কি রাজ্য-জয়ের মন্ত্রণা করছিলে? মানুষকে তো মেরে ফেলেছিলে! এ-ফরমাস্, সে-ফরমাস্! কারুর মেয়ে তো আর পাশ করেনি—কেউ কখনো কলেজে ভর্ত্তিও হয়নি! তোমার মেয়েই যা—"

কথাটা শেষ হইল না। উপর হইতেই হাত-মুখ নাড়িয়া রমেশ প্রতিবাদ তুলিলেন,—"পাশ করেনি তো! আমার মেয়ের মত ক'টা মেয়ে পাশ করেছে? এই চব্বিশ হাজার ছেলে এগজামিন দিলে—হুঁঃ! পঁচিশ টাকা জলপানি—এ কি সাধারণ কথা! এর দাম যদি বুঝতে, তাহলে কি আর রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে!"

ব্যঙ্গের সুরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করতুম, শুনি? ইস্কুলে মাষ্টারনীগিরি!" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সদ্য অগ্নি-সংযোজিত উনানের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিনা-কলহে মার-খাওয়ার মত পত্নীর প্রচ্ছন্ন শ্লেষ রমেশকে হতভম্ব করিয়া দিল। বিমূঢ়ের মত অন্ধকার ঘরে অদৃশ্যপ্রায় পত্নীর দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই প্রচণ্ড ক্রোধে পদ-নখ হইতে কেশাগ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণে পরাভূত করিবার মত তীক্ষ্ণ কঠিন শর নিজের তূণে রমেশ হাতড়াইয়া পাইলেন না। নিষ্ফল রোষে অগ্নি-দৃষ্টি হানিয়া শুধু বলিলেন, "হুঁ!"

এমন সময়ে পৃথিবীর বুকে প্রভাতের আগমনের মত রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া রত্না বাহিরের বারান্দায় আসিল; এবং উঠানের ধূমরাশির পানে চাহিতেই পূব-আকাশের রক্ত-রাগ তাহার সুগৌর মুখখানিকে লজ্জার আভার মত রঞ্জিত করিয়া তুলিল!

মা'কে উদ্দেশ করিয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্না কহিল, "ইস্! তোমার উনুন ধরে গেছে মা! তুমি চায়ের জল চড়িয়ে দাও। আমি এখনি কাপড় ছেড়ে আসচি।"

আক্রোশের পাত্র যখন হাতছাড়া হইয়া যায়, তখন সম্মুখে যাহাকে পাওয়া যায়, তপ্ত-চিত্ত তাহারই উপরে ঝাল মিটাইয়া লইতে চায়!

অপ্রত্যাশিত ধমকের সুরে রমেশ কন্যাকে কহিলেন, "খুব হয়েছে! তোমাকে আর চা করতে যেতে হবে না! যার কাজ সে পারে, হবে—নয়তো পড়ে থাকবে। কাল তো তুমি থাকবে না। যাও, এখন স্নান করে এসো, এখন অনেক কাজ তোমার বাকী।"

রত্না অবাক্! এই বাদলায় প্রাতঃস্নান, এ যেন যূপকাষ্ঠে নীত হইবার পূর্ব্বে অবগাহনের মতই আতঙ্ককর! ভীত হরিণ-শিশুর মত বিস্ফারিত চোখের চকিত দৃষ্টি পিতার মুখে ন্যস্ত রাখিয়া মৃদু স্বরে সে কহিল, "স্নান করবো বাবা?" স্বরে তাহার একরাশ অনিচ্ছা!

কন্যার মুখখানাকে চোখে না দেখিলেও অমলা রান্নাঘরে বসিয়া সেই বিপন্ন মুখের চেহারার আভাস পাইলেন। গম্ভীর সুরে তিনি কহিলেন, "আজ যাবার দিন স্নান করে না! স্নান করে যাত্রা করতে নেই।" স্বরে আদেশের ইঙ্গিত।

বর্ষার আকাশে শরতের আলো আসিয়া পড়িল। রত্নার বিপন্ন মুখ পলকে আনন্দ-দীপ্ত হইল। নিষ্কৃতির উল্লাস মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে-কুণ্ঠিত স্বরকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। পিতার পানে চাহিয়া সে কহিল, "তবে আজ আর নাইবো না বাবা—"

মেয়ের মুখে যে আনন্দের ছোপ লাগিয়া আছে, রমেশের

পিতৃ-হৃদয়ও যেন তাহার আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। শান্ত-মুখেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তিনি কহিলেন,—"বেশ, তোমার মা যখন বারণ করছেন—"

হৃষ্ট মনে ত্বরিতপদে রত্না হাত-মুখ ধুইতে গেল। বলিয়া গেল, "আমি এখনি এসে চা করবো, মা!"

২

কাপড় ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া মিনিট দশেকের মধ্যে রত্না প্রস্তুত হইয়া আসিল। রান্নাঘরের রোয়াকে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ছোট কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া রত্না চা করিতে বসিতেই অমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ঠাকুর-ঘরে নমস্কার করতে গেলিনি, খুকী?"

কাঁচু-মাচু মুখে রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। "যাচ্ছি মা" বলিয়া পা বাড়াইতেই রমেশ বাধা দিয়া কহিলেন, "পরকালের কাজ করতে আর বৃষ্টিতে ভিজে ছুটতে হবে না! যিনি সে-চিন্তা নিয়ে আছেন, তিনিই তা করুন।'

এতক্ষণে রমেশের মনের উষ্ণতার হেতু বুঝা গেল। সকালে ঘুমভাঙার সঙ্গে পত্নীকে বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখিয়াই যে মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে, ইহাতে এতটুকু সংশয় ছিল না। তাই দ্বিতীয় বার পিতার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া ভিজিয়া ছাদের উপর ঠাকুর-ঘরে যাইতে রত্নার সাহস হইল না। ধপ্ করিয়া কাঠের পিঁড়িটায় বসিয়া অধোমুখে পিতার জন্য সে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

নিকটেই বেতের মোড়ার উপর রমেশ বসিয়াছিলেন। মেয়ের হাত হইতে চায়ের কাপ্‌টা লইয়া তিনি কহিলেন, "তোমার চা আজ না করলে নয়? জানো, কত কাজ বাকী! নাও, চট্ করে খেয়ে নাও।"

চকিত নেত্রে রত্না হেঁশেলের দিকে তাকাইল। অমলা তখন স্বামী ও কন্যার দিকে পিছন করিয়া উনানে বাতাস দিয়া ডাল-ভাত ফুটাইতে ব্যস্ত। রত্না দেখিতে পাইল না, সে-মুখে অনুমতি বা অসম্মতি—কিসের চিহ্ন!

রমেশ চা খাওয়া শেষ করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "ও কি, এখনো তুই চুপ করে বসে! তোর চা যে জুড়িয়ে গেল।"

"খাচ্ছি" বলিয়া রত্না উষ্ণ বাষ্প-উত্থিত গরম চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজিতেই বাড়ীতে চাঞ্চল্য জাগিল। কন্যার চা হইতে ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কাজগুলা নিষ্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও রমেশের হাঁক-ডাক, সোরগোলের অন্ত রহিল না। এটা টানিয়া ওটা নামাইয়া গোছালো কাজটাকে অগোছালো করিয়া, অগোছালোকে গোছ করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন যে, সামান্য ত্রুটি ঘটিলেই সমস্ত বাড়ীখানা যেন রসাতলে যাইবে! যাহাকে সামনে পাইলেন, তাহাকেই বড়-গলায় শুনাইয়া দিলেন, সে পাড়াগেঁয়ে ইস্কুল নয়। কলকাতার নামজাদা কলেজ,—ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া সেখানে হাজিরা দিতে হয়।

গোপাল কৃষাণ জানিতে আসিল, ইষ্টিশানে দিদিমণি পায়ে হাঁটিয়া যাইবে—না, অকলু মোড়লের গো-যান আসিবে?

রমেশ আকাশের দিকে চাহিলেন। দিবালোক স্ফুটতর হইলেও মেঘ-ভার কাটে নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে আকাশ ফুঁড়িয়া বর্ষণ হইতে পারে। সেই সম্ভাবনাই যেন বেশী। কিন্তু কালই তিনি রত্নার জন্য বর্ষাতি-কোট কিনিয়া আনিয়াছেন,—গ্রামের লোকের সম্মুখে সেই অ-দৃষ্টপূর্ব্ব জামা গায়ে দিয়া মেয়ে যদি পথ হাঁটিতে না পাইল, তবে দু'-কুড়ি টাকা খরচ করিয়া ও-জামা কিনিবার সার্থকতা কি?

ইতস্ততঃ করিয়া রমেশ কহিলেন, "অকলুর গাড়ীতে আর কি হবে গোপাল? পোয়াটাক পথ তো!"

গোপাল মাথা নাড়িল,—"সে কি বড়বাবু, এই জল-কাদায় রত্নাদিদি হেঁটে যাবে কি! না, না, ও গরুর গাড়ীই ভালো।"

"তা ভালো! জুতোটা নতুন! তবে জলের জন্য ভাবি না, চল্লিশ টাকা খরচ করে কাল ওয়াটারপ্রুফ কিনে এনেছি। এ তো আমাদের এখান নয় গোপাল যে, টোকা মাথায় দিয়ে মাঠ পার হবে—চলতে বাধবে না! এ হলো কলকাতা সহর, বুঝলে কি না!"

প্রতিবেশী রামময় বসিয়াছিল। গৃহস্থ প্রতিবেশী। রমেশের আনুকূল্যে পুষ্ট। অভাবের সংসার। রমেশের কৃপায় অনেক অভাব মোচন হয়। সকাল হইতে গোটা দশেক মুদ্রা কর্জ্জের প্রত্যাশায় সে আসিয়া বসিয়া ছিল। সোৎসাহে রমেশের কথার সমর্থন করিয়া সে কহিল,—"নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে বড়বাবু? সে-বার কলকেতায় গেছনু! ইস্, কি ভীড়! মানুষকে যেন চিঁড়ে-চেপ্টা করে দিচ্ছে! মোটর, টেরাম, বাস—কোন্ মুখ দিয়ে কোন্‌টা কখন ছুটে ঘাড়ে এসে পড়ে, তার ঠিকেনা নেই। ব্যাটাদের প্রাণে ভয় নেই যে, শ্রীকৃষ্ণের একটা জীব হত্যা হবে! আর ভগবানকে কি তোয়াক্কা করে? সে সব কায়দা-কানুনই আলাদা!"

রমেশ কহিলেন, "মিথ্যে বলোনি রমেশ! তোমাদের মত মানুষ কি সেখানে থাকতে পারে? তবে রত্নার কথা আলাদা! এই দেখ না, আমার ইস্কুল থেকে তো দশটা ছেলে পাঠিয়েছিলুম, ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হলেও জলপানি পেলে না কেউ! আর রত্না একেবারে কুড়ি টাকা করে জলপানি পাবে।"

রামময় কপালে হাত ঠেকাইয়া কাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইল, ঠিক বুঝা গেল না। উল্লসিত কণ্ঠে সে কহিল, "রত্না-মাকে আপনি এখনো ঠিক চেনেননি বড়বাবু, আমি চিনেছি! মা আমাদের স্বয়ং মা-সরস্বতী! আপনার মেয়ে হয়ে এসেছেন! উনি কি সাধারণ মেয়ে! এমন পিরতিমের মত মুখ, আর দুধে-আল্‌তা রং—এ কি মানুষের হয় গা!"

কন্যা-গর্ব্বে রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সস্মিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—"তা তুমি কিছু মিথ্যে বলোনি রামময়! কলকাতার সবচেয়ে বড় কলেজ—বুঝেছো কি না, সরকারী কলেজ—রত্নার দরখাস্তখানি আগে নিয়েছে। এই ত্যাখো না, চিঠি দিয়েছে—" বলিয়াই বুক-পকেট হইতে একখানা কার্ড টানিয়া বাহির করিলেন, করিয়া কহিলেন, "কি রকম লিখেছে, একবার ত্যাখো" —তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে পাইল না!

অ-দৃষ্টপূর্ব্ব ছাঁদে সাজিয়া রত্না পিতৃসান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। তাঁতের একখানা রঙিন শাড়ী বেড় দিয়া ঘুরাইয়া নূতন ছন্দে পরিয়াছে, কিন্তু আনাড়ী হাতে শাড়ী পরিবার সুনিপুণ কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই! তাহাতেই সে মহা-খুশী! নূতন-কেনা হিল্-উঁচু জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ে বর্ষাতি-কোট—এ-সবে যতখানি উল্লাস, গর্ব্ব এবং গৌরব তার চেয়ে অনেক বেশী!

মেয়ের পানে হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া রমেশ কহিলেন, "এই যে, রেডি? এসো, অকলু গাড়ী এনেছে।"

গাড়ীর নাম শুনিয়া রত্নার মুখে মেঘের ছায়া পড়িল। সে কহিল, "গরুর গাড়ীতে যাবো বাবা?"

পিতা কন্যার মন বুঝিলেন। তাঁহারও আন্তরিক ইচ্ছা, এই ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বিবর্ণ আকাশ—এ বৃষ্টি-মেঘ অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামশুদ্ধ নর-নারীর বিস্মিত কৌতূহলী ঈর্ষা-কাতর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া পিতা-পুত্রী পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিবেন! সে চলায় একটা সুখ আছে, গর্ব্ব আছে। কিন্তু বিপদ বাধাইল করুণা-প্রত্যাশী রামময়।

হাত জোড় করিয়া জিদ ধরিয়া রামময় কহিল, "সে হয় না বড়-বাবু। কথা রাখুন, এমন মেম-সাহেব সেজে মা-লক্ষ্মী কি ভিজতে পারে? মাকে আপনি ওই ছাউনী-গাড়ী করেই নিয়ে যান।"

গো-যানে চড়িবার রুচি রত্নার ছিল না। রমেশও গো-শকটে চড়িবার পক্ষপাতী নন। তথাপি ঢেঁকি-গেলার প্রবচনের মত সময়ে সময়ে অন্যের অনুরোধে জোয়ালে মাথা গলাইতে হয়! হাজার স্বাধীন হইলেও মানুষ সব সময়ে নিজের ইচ্ছায় না চলিয়া অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়! ইহা মানুষের ধর্ম্ম।

মা'কে প্রণাম করিতে রত্না রান্না-ঘরের দিকে গেল। রমেশ কোটের পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া রামময়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। "এই নাও রামময়! এর বেশী এখন পাচ্ছি না! আর তোমাকে দেওয়াও তো অনেক হয়ে গেল।"

ত্রস্ত হস্তে নোটখানা গ্রহণ করিয়া রামময় কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া ফেলিল। কহিল, "কি করি বলুন বড়বাবু! মেয়েটার সূতিকা-রোগের জন্যই। জামাই যা পায়, নিজের মেস-খরচা রয়েছে—পঞ্চাশ টাকা মাইনে! হদ্দ দশ টাকা পরিবারের রোগের খরচা বলে দেয়,—অথচ আমার নিজের অত কাচ্ছা-বাচ্ছা, মেয়েটারও ছানাপোনা—"

রামময়ের বহুবার-বর্ণিত-দুঃখের কাহিনী আর এক বার শুনিবার স্পৃহা রমেশের ছিল না। তার অবকাশও নাই! ত্বরিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"বুঝেছি সব। আরো কিছু দিতুম! কিন্তু এখন বড্ড টানাটানি—রত্নার জন্যে অনেক টাকা—"

মাথা নাড়িয়া কৃতার্থ কণ্ঠে রামময় কহিল, "সে তো নিশ্চয়,—আমরা তাই বলাবলি করি বড়বাবু, যে আপনি সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ,—রত্না-মা আমাদের হাকিম হয়ে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

এক-গাল হাসিয়া রমেশ কহিল,—"কি যে বলো রামময়! মানুষের উপকার করা ভাগ্য! তা রত্না—হ্যাঁ, সে কথা খুব ফেল্‌না বলোনি। ওর বুদ্ধি যা—বড় হলে দেখো, ও বাংলাদেশের এক জন মন্ত্রী হবে। ওর ঠিকুজিতেই লেখা আছে—"

"এ্যাঁ! তাই না কি? বলেন কি বড়বাবু। আহা, ভগবান্ যেন দয়া করে সে-দিন পর্য্যন্ত আমায় বাঁচিয়ে রাখেন!"

রমেশ হাঁকিলেন, "হলো রে রত্না?"

"যাই বাবা" বলিয়া রত্না ডাকিল, "মা"!

অমলা আসিল না। সকরুণ স্নেহ-কণ্ঠে কহিল,—"এই চচ্চড়িটা সাঁত্‌লে নিচ্ছি রে, তোর কাকা-কাকীকে ততক্ষণ নমস্কার করে আয়।"

কথাটা রত্নার মনঃপূত হইল না। উষ্মার সহিত সে কহিল, "দেরী হয়ে যাবে মা!"

অমলা বলিল,—"না, না, দেরী হবে না। শুভ কাজে যাত্রা মা—প্রণাম করবে বৈ কি!"

মায়ের কথায় অজনের শেষে বাঁশের-বেড়া-দিয়া-ভাগ-করা উঠানের আগড় ঠেলিয়া রত্না খুল্লতাত-গৃহে পদার্পণ করিল।

হরিশের গৃহে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার। গরম খিচুড়ীটাকে উঃ-আঃ করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। রত্নাকে দেখিয়া কহিলেন, "ইস্, আমার বীণাপাণি মা যে!" পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া হাঁকিলেন, "ওগো, ভাখো, কে এসেছে!"

প্রতিভা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রত্নাকে দেখিয়া সস্নেহ হাস্যে কহিলেন, "চল্‌লি মা! আটটার গাড়ী বুঝি? তবু রোজ এক বার কোরে আসতিস্, ছেলেমেয়েগুলোকে পড়াতিস্, কত উপকার হতো।"

ক্লিষ্ট হাস্যে রত্না কহিল, "তোমাদের সকলের জন্য বড্ড মন কেমন করবে কাকিমা!"

কাকিমা কহিল, "ও মা, তা আর করবে না? তবে পড়ার চাপে মা-কাকিকে চিঠি দিতে ভুলো না বাছা!"

রত্না কহিল, "হরিমতী কোথায় কাকিমা?"

"এই যে ভাঁড়ারে পান সাজচে মা! ও মতি, ওরে, তোর রত্নাদি' এসেছে যে!"

ক্ষুদ্র আহ্বান-ধ্বনি কাণে পৌঁছিবামাত্র হরিশের ছেলে-মেয়েরা হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া অসিল। সমস্বরে সকলেই কহিতে লাগিল, "রত্নাদি' চল্‌লে?"

"হ্যাঁ ভাই, চল্‌লুম"। রত্নার স্বর আর্দ্র।

বুলু কহিল, "রত্নাদি', ওটা কি জামা পরেছো?"

বিজ্ঞের মত ঈষৎ হাস্য করিয়া হরিশ কহিলেন, "হুঁঃ, দেখেছিস্ কখনো অমন জামা? একে ওয়াটার-প্রুফ বলে। বৃষ্টিতে গায়ে জল লাগবে না।"

"সত্যি রত্নাদি'"? উৎসুক চক্ষে ভাই-বোনেরা রত্নার জামায় হাত বুলাইতে লাগিল।

হরিশ কহিলেন, "ওটা তো আমিই দেখে সে-দিন দাদাকে কিনে দিলুম। চল্লিশ টাকা দাম পড়লো।"

হরিমতী অবাক্ হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে কহিল,—"ওঃ বাবা!"

প্রতিভা কহিল, "সেখানে কোথায় থাকবি রত্না?"

"হোষ্টেলে থাকবো কাকিমা। মেয়েদের হোষ্টেল আছে কি না! তা গোটা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা আমার সবশুদ্ধ মাসে খরচ পড়বে।"

হরিমতী দুই ভ্রূ ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিল, "এত টাকা!"

হরিশ কহিলেন, "তা মানুষ হতে যাচ্ছে মেয়ে কেমন! কুড়ি টাকা করে জলপানি পেলে! চালাকি না কি?"

রত্না কহিল, "হরিমতীকে আপনি পড়তে দিলেন না, কাকাবাবু, বড় হয়েছে বলে! কিন্তু ও আমার চেয়ে এক বছরের ছোট।"

হাসিয়া হরিশ কহিলেন, "ও কালো মেয়ে। ওর এতখানি বিদ্যেতে কি হবে? তুমি জন্মেছ সরস্বতী-প্রতিমা হয়ে, তোমার কথা আলাদা!"

কথায় কথায় বিলম্ব হইতেছিল, সহসা ও-দিক্ হইতে রমেশের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। "তোর হোলো রে রত্না? সব-তাতে দেরী কর্‌বি!"

রত্না ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "কাকাবাবু, তোমাকে নমস্কার করবো না?"

"আমি থাচ্ছি। তুই হাত তুলে নমস্কার কর্ মা, তাতেই হবে। আমি আশীর্বাদ করছি, তুই এবার ফার্ষ্ট হবি।"

রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—"এঁ্যা, এখনো হয়নি?" বলিয়া নূতন-কেনা হাত-ঘড়িটার পানে চাহিলেন, "ইস্! ভয়ানক লেট্ হচ্ছে।"

হরিশকে প্রণাম করিয়া রত্না ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিল,—"কাকিমা!"

কপালের উপর মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া কাকিমা কহিল,—"পায়ে জুতো! ছুঁসনি মা! রান্নাঘরে যাবো, অমনিই নমস্কার কর্।"

আর এক বার তাড়া দিয়া রমেশ কহিলেন, "কুইক্! কুইক্! ও কি, জুতো খুলছিস্ কেন রত্না? না, না, অমনি সেরে নাও। দামী মোজা-জোড়া নষ্ট হয়ে যাবে! উঃ, বড্ড লেট্ হচ্ছে!"

পিতার কথায় রত্না থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জুতা আর খোলা হইল না।

রমেশ কন্যাকে কহিলেন, "নাও, গাড়ীতে উঠে বসো।"

কুণ্ঠিত মুখে রত্না কহিল, "মাকে নমস্কার করে আসি বাবা!"

বিরক্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "খুব হয়েছে! আর নমস্কার করতে হবে না। ট্রেণ মিস করবো শেষে!"

মিনতি-ভরা কণ্ঠে রত্না কহিল, "এখুনি ছুটে আসবো বাবা।"

রমেশ রাগিয়া উঠিলেন, "না, না। আর এক-মিনিট দেরী নয়।"

৬

রেলগাড়ীতে বসিয়া সারা পথ রত্নার মনে এই চিন্তাটাই কাঁটার মত খচ্-খচ্ করিতে লাগিল যে, আসিবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া আসা হইল না! শ্রাবণের মেঘ-মেদুর আকাশের মত দারুণ বিষণ্ণতা তাহার চিত্তে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া রত্না আজ মায়ের মলিন মুখ দেখিয়াছে! এখন মানস-নেত্রে দেখিতে লাগিল, সেই ম্লান মুখ কন্যা-বিরহ-বেদনায় আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বর্ষণোন্মুখী হইয়াছে! কামরার জানালার দিকে মুখ করিয়া রত্না চাহিয়া ছিল,—সম্মুখে পলকে-অপস্রিয়মান বর্ষার বারিস্ফীত নদী, প্রান্তর, শস্য-শ্যামল মাঠ, সবুজ তৃণাচ্ছন্ন গোচারণ-ভূমি! আর্দ্র বায়ু তাহার উপর দিয়া বেগে প্রবাহিত! দিবালোক যেন বেদনাতুর! আকাশ যেন এই মাত্র কাঁদিয়া-কাটিয়া চোখ মুছিয়াছে; কিন্তু ক্রন্দনের কালিমা-রেখা মুখ হইতে মুছিয়া যায় নাই! সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া রত্নার দুই চোখ সলিলার্দ্র হইয়া উঠিল। নির্ব্বাসিতের চক্ষে যেমন আজন্মের স্নেহদাত্রী ধরিত্রীর প্রতি-ধূলিকণা অকস্মাৎ পবিত্র হইয়া ওঠে, সুখ-দুঃখের বাস জন্মভূমির শুষ্ক গুল্ম-লতা অবধি অপূর্ব্ব মমতা-রসে সিক্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তরকে আপ্লুত করিয়া তোলে, তেমনি এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য ভালোবাসার পারাবারে স্নান করিয়া গ্রাম, পথ, শস্য, ক্ষেত্র সব-কিছু আচম্বিতে তাহার সহিত নিবিড় সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া বসিল! এবং এই স্নেহের আদান-প্রদান ঐখানেই শেষ হইল না! রত্নার চোখের সম্মুখে তাহারা যেন রত্নার স্মৃতিস্থিত মাতৃ-মুখের বিষণ্ণতা মাখিয়াই করুণ চোখে চাহিয়া রহিল। একা শূন্য গৃহকোণে ম্লান সন্ধ্যার মত স্তব্ধ মূর্ত্তিতে মা বসিয়া আছেন! সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের কাতরতা রত্না সব-কিছুর মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল! গাড়ীর চাকার ঘর্ষণের ছন্দানু-গতির কলরব যেন অস্ফুট কান্নার সুরে তাহার দুই কাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল!

উদ্ভ্রান্ত চিত্তে মনে মনে একাধিক বার সে কহিল, বড্ড ভুল! বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা! আসবার সময় একটিবার তোমাকে দেখা—

এমনি উতল আবেগের অশ্রুপ্রবাহ তাহার নবীন জীবনের রাঙা ঊষাকে মেঘাবৃত করিয়া রাখিল! আনন্দের দ্যুতিতে চরাচর সমুজ্জল না হইয়া নিগূঢ় অভিমানের বেদনায় যেন মুখ ঢাকিয়াছে!

বহুক্ষণ রত্না এমনি আবিষ্টের মত বসিয়াছিল। আরও হয়তো কতক্ষণ থাকিত, আবেশ ভাঙ্গিল পিতার কণ্ঠস্বরে!

ব্যস্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—"লিলুয়া পার হয়ে এলুম রে! গাড়ী হাওড়ায় পৌঁছুলো বলে'।"

পথে ছোট-বড়-মাঝারি ষ্টেশনগুলাতে গাড়ীর গতিতে নিমেষ-বিরতি ঘটিতেছিল। এ-সব ষ্টেশনে যাহারা উঠিতেছিল-নামিতেছিল, তাহাদের ভীড়—কোলাহল-কলরব রত্নার তন্ময়তাকে ডিঙ্গাইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই! অত্যন্ত অবহেলায় সব-কিছু তাহার মনের বাহিরে পড়িয়াছিল, এতটুকু কৌতুক বা আগ্রহ সংগ্রহ করিতে পারে নাই!

অসংখ্য রেল-লাইনের লেখাজোখার মধ্য দিয়া লাইনের দু'পাশে রাশীকৃত গাড়ীর ভীড় পার হইয়া রত্নার ট্রেণ হাওড়ায় আসিল। গাঢ় নিদ্রার মাঝে স্বপ্নের জমজমাটি-ভাঙ্গার মত আকস্মিক আঘাতে রত্নার চিন্তাও নিমেষে নিঃশেষ হইয়া গেল।

বিরাট্ প্ল্যাট্ফর্মে গাড়ী প্রবেশ করিতেই রত্না যেন চমকিয়া উঠিল! কুয়াসা ভেদ করিয়া সূর্য্য ও-দিকে অজস্র আলোক-ধারায় দশ দিক্ যেন প্লাবিত করিয়া দিয়াছে!

রত্নার দেহ-মনের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত বিপুল বিরাট্ ষ্টেশনের প্রচণ্ডতার মাঝখানে তাহার বিস্ময়াহত অন্তর নিমেষে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। বিমূঢ়-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রুদ্ধনিশ্বাসে সে শুধু চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই! এখানকার মানুষ-জন যেন কাজের নেশায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! এই বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিরাম-বিরতি-হীন উৎকণ্ঠা সময়ের প্রতি পল-অনুপলের উপর নির্ম্মম ভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছে! তাহার অদৃশ্য উগ্র তাড়নায় প্রত্যেকেই যেন অস্থির, চঞ্চল! কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ ছুটিতেছে! পৃথিবীর কত জাতি কি ব্যস্তসমস্ত ভাবেই না যাতায়াত করিতেছে! পাশের অপরিচিতের প্রতি কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই! কে আসিল, কোথা হইতে আসিল, কে কোথায় চলিয়াছে,—জানিবার এতটুকু ঔৎসুক্য নাই! দৈবাৎ যদি কোনো নেত্র-কোণ হইতে এতটুকু কৌতুক বা বিস্ময়-দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য কোথাও ন্যস্ত হয়, সে ঐ পলক-মাত্র! বাতাসে-ওড়া ধূলার মত চকিতে আবার তাহা গুলাইয়া সরিয়া যায়! এতটুকু মনের স্পর্শ পায় না!

আত্মবিস্মৃতির বিভোরতায় রত্না বীচি-বিক্ষুব্ধ বারিধির মত এই অখণ্ড চঞ্চলতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবনের নূতন

অধ্যায়ের প্রবেশ-পথে হঠাৎ এই কর্ম্ম-ছবির অচিন্তনীয় বিরাট্ রূপ তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে কেমন আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

পিতার স্পর্শে রত্নার হুঁস হইল। চকিতে মনে হইল, উদ্ভ্রান্তের মত এমন করিয়া চাহিয়া থাকা শোভন নয়!

ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, "চলো।"

রমেশ কহিলেন,—"তাইতো ডাকচি!" বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে কুলীর মাথায় লগেজ-পত্র। রমেশ কহিলেন,—"একখানা ট্যাক্সি ধরা যাক, কি বলিস্? হাজার হোক, অত-বড় কলেজে গিয়ে উঠতে হবে। এঁ্যা!"

—"বেশ, তাই চলো।" বলিয়া রত্না পিতার সহিত প্ল্যাট-ফর্ম্মের বাহিরে আসিল।

ট্যাক্সিতে চাপিয়া রমেশ কহিলেন, "কলকাতা হলো বড়লোকের জায়গা, বুঝলি! এখানে কঞ্জুষপনা করলে লোকে হাসবে। না হলে আমাদের এই সামান্য মালপত্র একখানা রিক্সা কি ঘোড়ার গাড়ী হলে চলে যেতো। কিন্তু তাতে প্রেস্‌টীজ থাকে না।"

মাথা নাড়িয়া রত্না পিতার কথার অনুমোদন করিল।

উৎসাহিত হইয়া রমেশ কহিলেন,—"তোমার মা'র মাথায় এ-সব ঢোকে না। বলে, আমরা যেমন! আরে বাপু, তা বললে কি চলে! যেখানে যে-রকম দস্তর! তা ছাড়া মানুষকে সব সময়ে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে' নিজেকে গড়ে তুলতে হয়! পাঁচ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা পাবার কোন সুযোগই ত্যাগ করতে নেই। বরং সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণটুকু খুঁজে বেড়াতে হয়। আমার বাবা দিন-মজুরী করতো, আমি কেন সদর-আলা হবার স্বপ্ন দেখবো? হুঁঃ! এ সব কথা অচল।"

রত্না নীরব রহিল। তাই বলিয়া রমেশের কথা বন্ধ হইল না।

তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন,—"আমার ইস্কুলের ছেলেগুলো কলকাতায় পড়তে এলো,—আর আমার মেয়ে স্কলারশিপ হোল্ড করে নন-কলেজিয়েট হয়ে লেখাপড়া করবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না! এ আমি ভাবতে পারিনি রত্না! হুঁঃ! তোমার মা, দু'দিন তাঁর কষ্ট হবে! তার পর সয়ে যাবে। সইতে হবে।"

মৃদু স্বরে রত্না কহিল,—"মা বড় একা! ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে!"

"আরে বোকা মেয়ে, সে কথা কি বুঝি না! তুমি আমার শুধু মেয়ে নও! ছেলে নেই—তোমাকে দিয়ে ছেলের অভাব আমি পূরণ করতে চাই! কাজেই নিজেদের সুখের দিকে চেয়ে তোমার ভবিষ্যৎ দেখবো না? নিজের একটুখানি তৃপ্তির জন্য এত বড় গৌরব হারাবো, এ কোনো মতেই হতে পারে না মা!"

ট্যাক্সি আসিয়া কলেজের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। অগত্যা রমেশের বাক্যস্রোত বন্ধ হইল।

কন্যাকে লইয়া রমেশ যেখানে ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, তার বাঁ-দিকে লনের মধ্য দিয়া সরু পথ—সেই পথে খানিকটা গিয়া সোপান-শ্রেণী। রত্নার পা কাঁপিতেছিল, বুকের মধ্যেও দুরু-দুরু স্পন্দন! কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রমেশ মৃদু হাস্য করিলেন। রত্না আর একটু সরিয়া পিতার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

একদল মেয়ে ভর্ত্তি হইয়া বাহিরে আসিল, উৎসাহে দীপ্ত তাহাদের মুখ-চোখের পানে চাহিয়া রত্নার ভিতরের আড়ষ্টতা শিথিল হইয়া আসিল। অভিভূত মন ধাক্কা খাইয়া নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া লইল।

মেয়েকে লইয়া রমেশ অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। জানাই-লেন, কার্ড পাইয়া তিনি আসিয়াছেন।

হেড ক্লার্ক বলিলেন, "ও! হ্যাঁ, আপনার মেয়ের সীট কলেজে আছে। হোষ্টেলেও থাকবার সুবিধা হবে। আপনিতো সেখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার?"

রমেশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "হ্যাঁ! আমি এ-বার দশ জন ছাত্র পাঠিয়েছিলুম, সকলেই ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।"

হেড ক্লার্ক কহিলেন, "তার চেয়ে বলুন আপনার মেয়ের কথা—উনি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছেন।"

রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সোৎসাহে তিনি কহিলেন, "আমি ওকে কোচ্ করতুম। ফার্ষ্ট ই হতো! তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এগজামিনের আগের দিনে হলো ভয়ানক জ্বর—একেবারে বেহুঁস!"

রত্না ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া বাপের পানে তাকাইয়া রহিল। মনের অলিগলি খুঁজিয়াও সে মনে করিতে পারিল না, কবে তাহার জ্বর হইয়াছিল! তবে বছর দুই পূর্ব্বে দিন কয়েক সর্দ্দিজ্বরে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল বটে! কিন্তু সেটাকে কোন মতেই পরীক্ষার ফলাফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অথচ সত্যানুরাগী বলিয়া পিতার মনে বিশেষ গর্ব্ব আছে!

হেড ক্লার্ক মাথা নাড়িলেন। "দুঃখের বিষয়! আশা করি, আগামী পরীক্ষায় আপনার কন্যা আমাদের কলেজের নাম রাখবেন।"

রমেশ কহিলেন, "সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার মেয়ে বলে বলছি না, আমি তো জানি ওর শক্তি!"

হেড ক্লার্ক কহিলেন, "খুবই আনন্দের কথা। হ্যাঁ, তাহলে আপনার কন্যার এখানকার অভিভাবক কে হবেন? তাঁর নাম দিতে হবে। মানে, লোকাল গার্জ্জেন! এখানে আপনার কোন আত্মীয়?"

"আত্মীয়!" রমেশ চমকিত হইলেন! এত বড় সহরে এমন কেহ নাই, যাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন, এ চিন্তা যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার মত মনে বিঁধিল! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুঞ্চিত ভ্রূতে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। নাম মনে পড়িল। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চয় আছেন! তিনি হলেন মিষ্টার এস, সি, গোস্বামী বার-এট্-ল! তাঁর নাম লিখে নিন, তিনিই আমার মেয়ের লোকাল গার্জ্জেন।"

হেড ক্লার্ক বলিলেন, "ও! তা মিসেস্ গোস্বামীর সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপালের বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। মিষ্টার গোস্বামী আপনার কি-রকম আত্মীয় হন?"

রমেশের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইল। একটা ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, "তিনি আমার বাল্য-বন্ধু।"

ভর্ত্তির নজর-আনা, মাহিনা, হোষ্টেলের চার্জ্জ—সব-কিছু দিয়া খাতায় সই দিয়া বিধিমত ব্যবস্থাগুলা সুসম্পন্ন করিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তার পর রত্নার দিকে চাহিলেন। বুকখানা ধক্ করিয়া উঠিল! খোদিত প্রতিমার মত রত্না বসিয়া আছে। এত দিন স্নেহে, শাসনে, আদরে, উৎসাহে গড়িয়া-পিটিয়া যাহাকে তিনি বড় করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কন্যাহীন শূন্য পুরীতে তাঁহাকে ফিরিতে হইবে! রমেশের দু' চোখ সজল হইয়া উঠিল। কন্যাকে ছাড়িয়া একটি দিনও তিনি কখনও দূরে থাকেন নাই!

আর্দ্র কণ্ঠে রমেশ ডাকিলেন,—"রত্না—"

রত্না পিতার হাত চাপিয়া ধরিল। এই পরিচয়হীন নূতন আবাসে পরের সহিত এখন হইতে তাহাকে বাস করিতে হইবে পিতামাতাকে ছাড়িয়া, ঘর-দ্বার ছাড়িয়া! এ কথা মনে হইতেই এক অজানা আতঙ্কে বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইল! মুখে একটুও স্বর ফুটিল না। শুধু অদম্য রোদন-বেগকে ভিতর দিকে ঠেলিতে দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া কাঠের মত সে কঠিন হইয়া রহিল।

নিরুদ্ধ স্বরকে পরিষ্কার করিয়া রমেশ কহিলেন,—"কোন ভয় নেই, খুকী! অনেক বন্ধু পাবি। বেশ মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। আর আমাদের নিয়মিত চিঠি দিতে ভুলিস্‌নে! সাবধানে থাকবি। বুঝলি! এখানে দেখবার বা বলবার আপন-জন তো কেউ নেই।"

নতমুখে ঘাড় হেলাইয়া রত্না জানাইল, সে সব বুঝিয়াছে।

রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ, এখানকার গার্জ্জেন তোমার করে গেলুম এস, পি, গোস্বামীকে। তিনি খুব ভালো লোক। মস্ত বড় ব্যারিষ্টার।"

সবিস্ময়ে প্রশ্নভরা নেত্রে রত্না পিতার মুখের পানে তাকাইল।

রমেশ সে চাহনির অর্থ বুঝিলেন। কহিলেন, "সত্যপ্রসাদ রে! তোর সুকুদিদির ছেলে। ওঃ, আমার সঙ্গে কি ভাবই না ছিল,—ছোটবেলায় মামার বাড়ী যখন আসতো, আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতো না। সে বকুলতলাও গেছে! সুরেন অধিকারীও মরেছে!" রমেশ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

রত্না কিন্তু পিতার দীর্ঘ বক্তব্যের এতটুকু অর্থ ভেদ করিতে পারিল না। বিমূঢ়ের মত তাঁহার পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

রমেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন,—"সে থাকে ওই উড্‌বার্ণ পার্কে। মস্ত-বড় বাড়ী করেছে। তিনিই তোমার দেখাশোনা করবেন।"

সত্যপ্রসাদ সম্বন্ধে এই বিশদ পরিচয়েও রত্নার বোধোদয় হইল না।

রমেশ একটু অপ্রতিভ হইলেন। মেয়ে বুঝিতে না পারুক, বুঝিবার ভাণ করিলেও সম্ভ্রম বজায় থাকিত!

রমেশ কহিলেন, "ভুলে গেছ মা! আমাদের জ্যোতিষ বাবু—বড় তরফের ভাগ্নী—তোমার সুকুমারী দিদি—তাঁর স্বামী। তিনি কলকাতায় মস্ত এটর্ণী ছিলেন না?"

এতক্ষণে রত্না পিতার বাল্যবন্ধুর হদিস পাইল।

সুকুমারী দিদি? অর্থাৎ জমিদারদের বড় সরিকের মেয়ে! ছেলেবেলায় মায়েদের সঙ্গে একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। এবং গৃহে ফিরিয়া মা ও পাড়া-পড়শীর দল যখন সমস্বরে সুকুমারী ঠাকুরাণীর সৌভাগ্য-ঐশ্বর্য্যের জয়-গানে গৃহকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন পৃথিবীর এক-ভাগ স্থল ও তিন-ভাগ জল পড়া-মুখস্থ ভুলিয়া হাঁ করিয়া রূপকথা শোনার মত সুকুমারী দিদির অদৃষ্ট-বৈভবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে তার তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! প্রাচীনারা মন্তব্য করিয়াছিলেন, জন্মান্তরের সুকৃতি! কেবল জন্ম-মুহূর্ত্তে শুভলগ্নের সংযোগ থাকিলে মানুষ এমন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে! রত্নার তখন শুধু মনে হইয়াছিল, এমনিতর একটা নক্ষত্র কি তাহার জন্ম-কুণ্ডলীতে নাই? সে কি সুকুমারী দিদির মত বিভবশালিনী হইতে পারে না? এখন পিতার কথায় বিদ্যুতের চকিত-আলোয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিমেষে দেখিয়া লওয়ার মত অতীতের সেই সব ঘটনা চোখের সাম্‌নে নিমেষের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সাগ্রহে রত্না কহিল, "হ্যাঁ, মনে আছে! তাঁকে তুমি আমার অভিভাবক করে দিলে?"

খুশী-ভরা কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ মা। তিনিই এখানে তোমার খবরাখবর নেবেন।"

রাত্রির মেঘাবৃত আকাশ সকালের উজ্জ্বল আলোতে হাসিয়া-ওঠার মত রত্নার বিষাদ-মলিন মুখের উপরে আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল।

রত্না কহিল, "তাঁকে বলে দিয়ো, তিনি যেন মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে যান!"

"বলবো মা! এখন তবে আসি।"

রত্না নত হইয়া পিতার পদধূলি লইল। রমেশ সে-ঘর ত্যাগ করিলেন।

রত্না বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পথে ঐ চলিয়াছেন পিতা! পিতার মূর্ত্তি যতক্ষণ না দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল, নিষ্পলক নেত্রে খোদিত প্রতিমার মত স্থির হইয়া রত্না সে চলন্ত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল।

খোলা জানালার দিক্ দিয়া ম্লান রৌদ্রের ঝলক আসিয়া রত্নার পাশের দেওয়ালের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সেই মৃদু আভা রত্নার অবয়বে পড়িয়া তাহাকে যেন নিপুণ শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ব্রোঞ্জের পুতুলের মত অপূর্ব্ব-সুন্দর করিয়া তুলিল!

ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। রত্নাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমিই হোষ্টেলে থাকবে? তোমারই আসবার কথা ছিল?"

অস্ফুট কণ্ঠে রত্না কহিল—"হ্যাঁ।"

"তোমার নাম?"

"রত্নাবলী।"

লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ গুহ রত্নার দিকে চাহিয়া সপ্রশংস-নেত্রে কহিলেন,—"গ্রামের মেয়ে এমন সুন্দর হয়! আশ্চর্য্য!"

রত্নার লজ্জা করিতে লাগিল। গ্রামে নিজের গৃহে আত্মীয়-স্বজনের মুখে বহু বার সে তাহার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছে! কিন্তু এমন করিয়া সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন শোনে নাই। নত মুখে সে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মিস্ গুহ কহিলেন, "এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।—তুমি টেনিস খেলতে জানো?"

মৃদু কণ্ঠে রত্না কহিল, "না।"

"আচ্ছা, দু'দিনে শিখে নেবে'খন। এসো।"

কারারুদ্ধ বন্দী যেমন নিঃশব্দে প্রহরীর অনুগমন করে, তেমনি ভারাক্রান্ত চিত্তে নিরুৎসাহ মুখে রত্না মিস্ গুহর অনুসরণ করিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর *]

চতুর্দ্দশ—এই বার তিনি শ্রৌত ব্রহ্মবাদের কথা পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের উপর নিপতিত হইলেন, কেবল তাহাই নহে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকেও নিষ্কৃতি দান করিলেন না। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার একটা যুক্তির নিদর্শন এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিলে তাঁহার ন্যায়মার্জ্জিত বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তিনি বলিতেছেন—"শঙ্কর কৌষীতকি উপনিষদের ভাষ্য করেন নি, সুতরাং এ পড়েছিলেন কি না তাই সন্দেহ।" আচ্ছা, দুইটি কোটির সম্ভাবনা থাকিলেই সন্দেহ হয়। এখানে কি তাহা আছে? পড়িতে গেলে কি ভাষ্য করিতে হয়? ভাষ্য না করার সঙ্গে পড়ার ত কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধই নাই। পড়িয়া ভাষ্য করিতেও পারা যায়, না-ও পারা যায়। অতএব ভাষ্য করেন নাই বলিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন কি না—এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নহে। তাঁহার এই সন্দেহের সুর হইতে ধ্বনিত হইতেছে যে, তিনি কৌষীতকি পড়েন নাই। আচ্ছা, তাহা হইলে তিনি কৌষীতকির কথা উদ্ধৃত করেন কিরূপে? কৌষীতকির বাক্য বিচার করিলেন কিরূপে? প্রতর্দ্দনাধিকরণে কৌষীতকির বাক্যই ত বিচার্য্য বিষয়। আর অন্যত্র যে কৌষীতকি সংক্রান্ত বিচার আছে, তাহা পড়িলে চমৎকৃতই হইতে হয়। অতএব তিনি কৌষীতকি পড়েন নাই, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অস্বাভাবিক কল্পনাই বলিতে হইবে। অথবা এই কথাটি তাঁহার অলৌকিক ন্যায়ের কথা বলিয়া বুঝিলেও চলিতে পারে না কি? শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ মনোভাব—ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কথা আলোচনা করিলে, ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আমাদের অল্প হইবার কথা।

তাহার পর তিনি শ্রুতিমধ্যেও পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা পাইয়াছেন। যাহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা থাকে, তাহা কি প্রমাণ-পদবাচ্য হয়? লৌকিক বিষয় হইলে পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ কথার এক পক্ষ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে পরীক্ষা চলে না, অতএব—হয় একবাক্যতা করিয়া বিরোধের পরিহার করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা একবাক্যতা অসম্ভব হইলে তাহা পরিত্যাগই করিতে হইবে। এই একবাক্যতা-সাধনের কৌশল সহস্র প্রকারে মীমাংসাদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে। অলৌকিক বিষয়ে কতক গ্রাহ্য, কতক ত্যাজ্য করা যায় না। ইহাই লোকবেদসাধারণ মীমাংসাশাস্ত্রের রীতি। তিনি কিন্তু উপনিষদের যে স্থলটি নিজ মতের অনুকূল, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, আর যাহা প্রতিকূল, তাহাই ভ্রম বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন। তিনি একই ছান্দোগ্যের ভিতর আরুণির কথায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ দেখিলেন এবং রাজর্ষি প্রবাহণ ও দেবর্ষি প্রজাপতির কথায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দেখিলেন। তাহার পর বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী দেখিতেছেন। সুতরাং একই ছান্দোগ্যের ভিতর পরস্পর বিরোধ এবং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের মধ্যেও বিরোধ। আর ইহা অলৌকিক বিষয়েই বিরোধ, অতএব এই সব উপনিষদ্ প্রমাণই হইতে পারে না, বিরুদ্ধ কথার দ্বারা অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। আচ্ছা, ইহা যদি হয়, তবে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্ত্য ব্রহ্মবাদকে "সদৃশ" বলা হইল কিরূপে? অথবা উক্ত মতবাদ দুইটি মূলতঃ অভিন্ন হইল কিরূপে? আর এইরূপ উপনিষদ্ লইয়া এত আলোচনাই বা কেন? আর বেদাচার্য্যের দ্বারা সংশোধন করানই বা কেন? তাহার টীকা, অনুবাদ প্রভৃতি করিয়া বেদাচার্য্যের অনুমোদিত বলিয়া প্রচার করাই বা কেন? ইহা কি বেদবিশ্বাসী হিন্দুদিগকে কৌশলে স্বমতে আনয়নের চেষ্টা-বিশেষ নহে? ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির বেদাদি শাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্য যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, ইহাকে কি সেইরূপ বলিতে হইবে? তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

তাহার পর তিনি ঋষিগণের উপরও আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদেরও মতভেদ তিনি দেখাইতেছেন। বেদকে ঋষি-প্রণীতও বলিতেছেন। এখন তত্ত্ববিষয়ে ঋষিদের মতভেদ থাকিলে কাহারও কথাই আর প্রমাণ হয় না। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার মতে ভ্রান্ত।

তিনি বলিতেছেন—"যাজ্ঞবল্ক্য-প্রদত্ত প্রমাণাভাস" শঙ্কর ব্যাখ্যা করেন নি, "আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রম যেমন চিত্র ও ইন্দ্র কৌষীতকিতে দেখিয়েছেন, প্রবাহণ ও প্রজাপতি তেমনি ছান্দোগ্যে তাই দেখিয়েছেন" ইত্যাদি।

এই সব বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রমের কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্যের যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে "ইন্দ্র, চিত্র, প্রবাহণ ও প্রজাপতি" ইঁহাদের কি ভ্রম হইতে পারে না? তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইঁহাদের ভ্রম দেখিলেন না, তাহার কারণ কি, তাঁহাদের মত শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতের সহিত মিলে বলিয়া কি? এগুলি সঙ্গত কথা বলিয়া ত মনে হয় না। বেদোক্ত ঋষি প্রভৃতি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ নহেন। তাঁহারা বেদোক্ত আখ্যায়িকার অঙ্গবিশেষ। বেদ কোন পুরুষবিশেষের বুদ্ধি-প্রসূত নহে বা কাহারও অনুভূত বিষয়ের বর্ণনা নহে। ইহাতে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখাদি নাই—এ কথা শ্রুতিতেই কথিত হইয়াছে। ইহা কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তার কথাও নহে। যথা "নাচিকেতম্ উপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্" কঠ ১।৩।১৬ দ্রষ্টব্য। এ জন্য ইহাকে অপৌরুষেয় বলা হয়। বেদের এই প্রকৃতি না জানিয়া বা অমান্য করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা হিন্দু বেদপ্রামাণ্যবাদীর নিকট অগ্রাহ্য। বেদ নিত্য শব্দরাশি, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সদা বর্ত্তমান, প্রতি সৃষ্টিকালে সম্প্রদায়ক্রমে ইহার প্রচার হয় মাত্র। ইহাতে ঐতিহাসিকতাদর্শন, অবৈদিক সম্প্রদায়ের [illegible] সুতরাং বেদে মতভেদ বা বেদোক্ত ঋষিদের মতভেদ কল্পনা, বৈদিক-গণের দৃষ্টিতে বাতুলতামাত্র। এ জন্য এ সব কথা আমাদের নিকট সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। *

ইহার পর তিনি শঙ্করাচার্য্যের উপর নিপতিত হইলেন এবং

* ১৩৪৯ কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"এর প্রতিবাদের অনুবৃত্তি।

* শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই সব কথার প্রতিবাদ, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় দুই তিন মাস পূর্ব্বে উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

বলিলেন,—(১) "শঙ্কর বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যস্ত নন, শ্রুতির দোহাই দিয়াই সন্তুষ্ট। (২) তাঁহারা যুক্তি যা দেন, তা তখনকার বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের সন্তোষকর হয়ে থাকতে পারে, এখনকার সন্দেহপ্রবণ এবং বিজ্ঞানদর্শনে প্রতিষ্ঠিত লোকদের পক্ষে তা কিছুই সন্তোষকর নয়। (৩) শঙ্কর কৌষীতকি পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ? (৪) শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ঋষিদের এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ঋষিদের মতের প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই, (৫) শঙ্কর ঋষিদের এই মতভেদ কিছুই দেখতে পান নাই (৬) আত্মবাদ সম্বন্ধেই তাঁর স্থির মত নেই, (৭) স্পষ্টই দেখা যায়—শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নাই, (৮) ঋষিদের সঙ্গে যে মতভেদ থাকতে পারে, তা শাস্ত্রবাদী শঙ্কর বোধ হয় মুহূর্তের জন্ত ভাবিতে পারেন নি, সুতরাং রাজর্ষি ও দেবর্ষিদের দার্শনিক মত মনোযোগপূর্ব্বক সমালোচনার সহিত (critically) পড়ে ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে তাঁদের উক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারেন নি"—ইত্যাদি কথার উত্তর না দিলেই ভাল। যে শঙ্করের প্রসাদে আজ বৈদিক ধর্ম্ম জীবিত, যাঁহার প্রসাদে আজ সহস্রাধিক বৎসর ব্যাপিয়া মহা মহা আচার্য্যগণ বেদার্থ বুঝিয়া আসিলেন, যিনি উপনিষদ্-ভাষ্য না করিলে উপনিষদের কোন সঙ্গত অর্থ কেহ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, যাঁহার ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য আর পাওয়া যায় না, যাঁহার প্রসাদে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও উপনিষদ্ দেখিলেন এবং উপনিষদের উপর "শঙ্করকৃপা" টীকা লিখিলেন, তাহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ করিলেন, সেই শঙ্কর উপনিষদ্ বুঝিলেন না, আর শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় বুঝিলেন—এই কথাগুলি কিরূপ? হিন্দুদিগের পক্ষে এই কথাগুলি কিরূপ মর্ম্মভেদী, তাহা সুধী পাঠকবর্গ ই বিবেচনা করিবেন।

শঙ্করের আত্মবাদ সম্বন্ধে কোন স্থির মত নেই—এই কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিতেছেন—"কোন কোন স্থানে, যেমন ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে, বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদীর সঙ্গে তর্ককাণ্ড নিয়ে, তিনি জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্পষ্টই দেখা যায় যে, শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি। ঋষিরা আত্মবাদী ব'লে স্থানে স্থানে আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাত্র।" ইতি।

কথাগুলি যেমন অযৌক্তিক, তেমনি দাম্ভিকতাপূর্ণ হইয়া পড়িল না কি? যে Dogmatism-এর এত নিন্দা করা হইল, এখানে তাহাই করা হইল না কি? জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের কথার উত্তরে বলা হইয়াছে। কারণ, বৌদ্ধের বিজ্ঞান ক্ষণিক, তাহা আমাদের বৃত্তিজ্ঞান। "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" পদোক্ত বিজ্ঞান ইহা নহে। এই বৃত্তিজ্ঞানের বাহিরে বিষয় থাকে, এবং বিষয়ানুরূপ এই বৃত্তিজ্ঞান হয়। এ জন্ত এ স্থলে শঙ্করাচার্য্য কিছুই অন্তায় কথা বলেন নাই। আমাদের মনে হইতেছে, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের শঙ্করাচার্য্যের কথা বুঝিবার প্রবৃত্তিই নাই। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, তাহার অন্তরে বা বাহিরে অন্ত কিছুই নাই, অর্থাৎ তদ্ভিন্ন কোনও বস্তুই নাই, এ কথার বিরোধ শঙ্করের উক্ত কথার দ্বারা হয় নাই।

"শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি"—এটা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের স্ববিরুদ্ধ অলৌকিক স্তায়ের কথা বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য অথবা উপভোগের যোগ্য। "ঋষিরা আত্মবাদী বলে স্থানে স্থানে আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাত্র"—তাঁহার এই কথায় মনে হয়, শঙ্করাচার্য্য বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আত্মবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এরূপ কথা আমরা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট একেবারেই আশা করিতে পারি না। তবে ইহাতে শিক্ষা হইল এই যে, নাম করে দেশপূজ্য মহামান্ত ব্যক্তিকে অমুক কিছু বুঝেন নাই বলিলে অশিষ্টাচার হয় না। পূর্ব্বে আচার্য্যেরা মতবাদেরই নিন্দা করিতেন, নাম করে মতবাদীর নিন্দা করিতেন না। বর্ত্তমানে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অভিমত "বিজ্ঞান-দর্শনে প্রতিষ্ঠিত" সমাজে তাহার আবশ্যকতা নাই। তিনি যদি নাম করিয়া আমাদের শাস্ত্র, ঋষি এবং পরমাচার্য্যকে নিন্দা না করিতেন, আমরাও তাঁহার নাম করিয়া এ সব কথা বলিতাম না! তাঁহার এই প্রতিবাদ আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই করিলাম, কেবল আত্মরক্ষার্থই করিলাম।

পঞ্চদশ—অতঃপর তিনি বলিতেছেন—"উপনিষদ্ ঋষিদের উক্তিতে এই প্রণালীর আভাসমাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মন্ত্রদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই প্রণালীতেই এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণ উপনিষদ্-লেখকেরা, যাঁরা স্পষ্টতঃই শোনা কথা লিখেছেন, তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি।"

এতদুত্তরে বলিব—শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সম্মত সত্য-নির্ণয়ের প্রণালীর আভাসমাত্র পাইয়া "ঋষিগণ সত্যে উপনীত হইলেন, আর সেই প্রণালীতে অভিজ্ঞ হইয়াও শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় স্ববিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন! ইহার বহু নিদর্শন, যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। অগত্যা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় অপেক্ষা ঋষিরা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান্ ছিলেন না—বলিতে হইবে? যে সব উপনিষদ্ লেখকেরা "শোনা কথা লিখতে গিয়ে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি" তাঁহাদের সঙ্গে মাননীয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নচেৎ তিনি এত ভিতরের খবর কোথা হইতে পাইলেন? এরূপ কল্পনা করিয়া হাস্যাস্পদ না হইলেই কি শোভন হইত না? শ্রুতির বক্তা একদল ঋষি; আর লেখক আর একদল ঋষি—এই কল্পনায় বাহাদুরী আছে বটে। কিন্তু যুক্তি না দিয়া বলায় ইহা কি Dogmatism হইল না? অথচ শ্রুতি—অনাদি শোনা কথা বলিয়া শ্রুতি নামে অভিহিত হয়—ইহাই—শ্রৌতগণের কথা।

ষোড়শ—এইবার তত্ত্বভূষণ মহাশয় নিজ মতবাদের পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি বলিতেছেন—"অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও আস্বাদ এবং এ সমুদয়ের আকার দেশকালকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত আত্মস্বরূপান্তর্গত বলে বুঝা যায়। এইভাবে এ সকলকে বুঝলে জগৎ ও আত্মার বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত বোধ চলে যায়। এরূপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ এই সত্য প্রতিভাত হয়।"

এখানেও স্ববিরুদ্ধ কথা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ভূতপঞ্চকের গুণ, ইহাদের আশ্রয় পঞ্চভূত, আর ইহাদের আকার দেশ ও কালকে আত্মস্বরূপান্তর্গত বলিলে ইহারা আত্মপদবাচ্য হইয়া যায়। কারণ, যে যাহার স্বরূপের অন্তর্গত, সে তদ্ভিন্ন হয় না। অথচ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "সবই আত্মিক অনাত্মা জড় বলে কোনও বস্তু নেই", আচ্ছা, এই শব্দাদি কি জড় নহে? ভূতাদি দেশকাল কি জড় নহে? ইহারা যদি আত্মভিন্ন না হয়, তবে ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকে কি করিয়া? শব্দ ত স্পর্শ নহে, আকাশ

ত বায়ু নহে, দেশ ত কাল নহে। ইহারা আত্মার স্বরূপের অন্তর্গত হইলে ইহারাও পরস্পরে অভিন্ন হয় এবং ভিন্ন হইলে আত্মাও এক অখণ্ড বস্তু হয় না। আর এক অখণ্ড বস্তু না হইলে তাহা নশ্বর হইতেই বাধ্য। সুতরাং আত্মা অখণ্ড হইলে ইহারাই "নাই" বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগেরও সত্তা স্বীকার করা হইতেছে। অতএব ইহা বিরুদ্ধ কথা।

আর "আত্মার স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া শব্দাদিকে বুঝিলে জগৎ ও আত্মার, বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত-বোধ চলে যায়" ইহা বলায় আত্মা অখণ্ডই হয় বটে, কিন্তু আর ইহারাই থাকে না বলিতে হয়। স্বরূপান্তর্গত হইলে কোন বস্তু আর কোন রূপেই অত্যল্পও ভিন্ন হয় না। হইলে আর স্বরূপত্ব থাকে না। বস্তুতঃ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া পরবর্ত্তী বাক্যে "ভেদ-বোধ" শব্দে "একান্ত" একটি বিশেষণ দিয়া তিনি তাঁহার ত্রুটী সংশোধন করিয়া বলিতেছেন—"এরূপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ, এই সত্য প্রতিভাত হয়।" ইহাতে কি বলা হইল না যে, একান্ত ভেদ না থাকিলেও অল্প ভেদ থাকে? উপরে বলা হইল, "দ্বৈত-বোধ চলিয়া যায়" আর এখানে বলা হইল, "একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়"। আচ্ছা, সংশোধিত হইলে দ্বৈত-বোধ কি চলিয়া যায় কি যায় না? দ্বৈত-বোধ অল্প মাত্রায় চলিয়া গেলে কি দ্বৈত-বোধ থাকিল না? অতএব একান্ত—দ্বৈতবোধ চলিয়া গেলে তাহা সংশোধিত হইল বলা যায় না?

তাহার পর জীবাত্মা, পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ বলা কেন? অংশ যদি অচ্ছেদ্য হয়, তবে তাহাকে অংশ বলা কি উচিত? বলিলে কি তাহা মিথ্যা কল্পনার সাহায্যে বলা হয় না? অংশ অচ্ছেদ্য হইলে তাহা স্বরূপই হয়। কল্পনা করিয়া তাহাকে অংশ বলা হয় মাত্র। কল্পনা মিথ্যাই হয়। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ছাড়াছাড়ি হয় না বলিয়া তাহারা এক হয় বলা হইয়াছে, আর এখানে অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ কল্পনা করা হইতেছে! ইহা স্ববিরুদ্ধ কথা নহে! আর এতদ্দ্বারা পরমাত্মার কি অসীমত্ব রক্ষিত হয়? অসীমের কি অংশ থাকে? অসীমের উদরে অন্য কিছু থাকিলেও কি সেই স্থলে অসীম সসীম হইল না? ইহাকেই ত বস্তুগত পরিচ্ছেদ বলে। বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকিলে তাহার কি অসীমত্ব রক্ষিত হয়? অথবা তাহাদের অভেদ বলিতে পারা যায়? এইরূপে দেখা যায়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অলৌকিক ন্যায়ের প্রভাবে তাঁহার নিকট বিরোধ বলিয়া কিছুই নাই, এবং লোকশিক্ষার কালেও এই বিরোধ-বুদ্ধি তাঁহার অন্তর্হিত হইয়া যায়। তিনি স্ববিরুদ্ধ কথা বলিতেই প্রবৃত্ত হইতেছেন।

সপ্তদশ—এইবার তিনি নির্বিশেষ অদ্বৈত খণ্ডনার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া একটি যুক্তির কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"ব্রহ্মর্ষিরা সুষুপ্তিতে জগৎ ও জীবাত্মার অপ্রকাশ দেখে ভাবেন, নির্বিশেষ পরমাত্মাই সত্য, জীব ও জগৎ অসৎ। কিন্তু নির্বিশেষ পরমাত্মা তাঁহারা কোথায় পান? সুষুপ্তিতে কেবল জীবাত্মা নয়, বিশ্বাত্মাও অপ্রকাশিত হয়। তাতে কি তিনি অসৎ হয়ে যান? বস্তুতঃ, জীবের সুষুপ্তির অবস্থায় চিরজাগ্রত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার ত জীব ও জগৎ স্থায়িভাবে বর্ত্তমান না থাকলে জাগ্রদবস্থায় এ সব পুনঃ প্রকাশিত হতে পারত না। জাগ্রদবস্থায়ও জীবের জ্ঞান আংশিক ভাবে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে সমস্ত জ্ঞান স্থায়িভাবে থাকাতে স্মৃতির পুনরুদয়ে তা প্রকাশিত হয়।"

ইহার উত্তরে বলিব—সবিশেষ থাকিলেই নির্বিশেষ পাওয়া যায়। যাহা বিশেষযুক্ত হয়, তাহাই সবিশেষ। অতএব বিশেষ ও যাহা বিশেষযুক্ত হয়, তাহারা পৃথক্ বস্তু হয়, আর বিশেষ হইতে পৃথক্ সেই বস্তু হয় বলিয়া তাহা নির্বিশেষ বলিতে হয়। যে যদ্‌যুক্ত হয়, সে তদ্‌ভিন্ন হয়—ইহাই নিয়ম। অতএব নির্বিশেষ এই শব্দ হইতে তাহা পাওয়া গেল। আচ্ছা, সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা অপ্রকাশিত হন কে বলে? ইহা ত ঋষিরা বলেন না। জীবসাক্ষী ও ঈশ্বর ত থাকেন। তাহার পর এখানে পরমাত্মা শব্দ ত্যাগ করিয়া বিশ্বাত্মা শব্দ গ্রহণ করা হইল কেন? যাহা হউক, ইহার অভিসন্ধির বিষয় আর আলোচনা করিলাম না। সুষুপ্তিতে যে সাক্ষী প্রকাশিত থাকেন, তাহা বেদান্তের কোনও গ্রন্থে কি তত্ত্বভূষণ মহাশয় পান নাই? অপ্রকাশিত হলে অসৎ হয়, ইহা ত বেদান্তের কথা নয়। যাহা কস্মিন্ কালে প্রকাশের যোগ্য নহে, তাহাকেই অসৎ বলা হয়, যেমন, বন্ধ্যাপুত্র। ইহাও কি তিনি দেখেন নাই? আচ্ছা, সুষুপ্তিতে যদি পরমাত্মায় জীব, জগৎ স্থায়িভাবে থাকে, তবে তাহার পরিবর্ত্তন হয় কেন? স্থায়ী বস্তুর কি পরিবর্ত্তন হয়? আর যাহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার স্বরূপ কি, তাহা কি বলা যায়? ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বলা যায় না, যেহেতু, ধর্ম্ম কখনও ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে না। ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তন বলিলে স্থায়িভাবে থাকা হইল কোথায়? জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহা কি ঠিক পূর্ব্বের বস্তু? এ সব প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা নহে কি? নির্বিশেষবাদী ইহার যে উপপত্তি করেন, তাহা পরমাত্মার এক অনির্ব্বচনীয় মায়া-শক্তির দ্বারা। ইহা "আছেও" নয়, "নাইও" নয়, ইহা "আছে-নাই" উভয়াত্মাও নহে। ইহা অনাদি, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠানের জ্ঞানে, ভ্রমের ন্যায়, ইহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। এ কথা এখন থাকুক, ইহার এখন প্রসঙ্গ নহে।

তাহার পর পরমাত্মার নিত্য অচ্ছেদ্য অংশ যে জীবাত্মা ও জগৎ, তাহা সিদ্ধ কি করিয়া হয় দেখা যাউক। আমরা যাহারই সত্তা স্বীকার করি, তাহাই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞানের আকারে ভাসমান হয় বলিয়া স্বীকার করি। জ্ঞান যাহার আকার ধারণ করে না, তাহার সম্বন্ধে আমরা "হাঁ" "না" "তাহা" প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারি না। 'আমরা যাহা "জানি না" বলি, সে স্থলে জ্ঞান "জানি না"-রূপে তাহার আকার- ধারণ করে বলিয়াই, আমরা তাহা জানি না বলি। জগৎ বা পরমাত্মার আকার যখন আমাদের জ্ঞান ধারণ করে, তখনই আমরা জগৎ বা পরমাত্মা "আছে" বা "নাই" এরূপ কিছু বলি। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে যদি এইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ হইল, তবে কোন এক অনির্ব্বচনীয় কারণে জ্ঞানই জীব, জগৎ ও পরমাত্মার আকার ধারণ করিতেছে, কেন বলিব না? দেশ, কাল সম্বন্ধেও সেই কথা। এইরূপে যাবৎ বিষয়ের কারণ, এই জ্ঞানবস্তু ও উক্ত অনির্ব্বচনীয় কারণ,—ইহারাই ত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। অনির্ব্বচনীয়কেই মিথ্যা বলা হয়, ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে,

সদসৎ নহে। এ জন্য এই অনির্ব্বচনীয় কারণ দ্বারা আত্মবস্তুর ভেদ সত্য হয় না।

তাহার পর পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ জীবাত্মা, এ কথা কোথা হইতে আসে? এ কথা যিনি বলেন, তিনি কি পরমাত্মা ও জীব, উভয়কে একসঙ্গে দেখেন বা অনুভব করেন? তাহাও সম্ভব নহে। জীবের মধ্যে যে জ্ঞানবস্তুটি আছে, তাহার সত্তারই অধীন ত যাবদ্ বস্তু। পরমাত্মা জীবের জ্ঞেয় হইলে তাহাও সেই জীবের জ্ঞানস্বরূপের অধীন সত্তাসম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাহা আর পরমাত্মাই হইলেন না। অতএব পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ জীব, এ কথার কোন প্রমাণ নাই।

তাহার পর শব্দস্পর্শাদি বিষয় ও এ সমুদায়ের আকার দেশ-কালকে "আত্মপ্রতিষ্ঠিত আত্মস্বরূপান্তর্গত" কি করিয়া বলা যায়? জ্ঞানে এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকলই আকারিত হয়, অথবা ভাসমান হয়। হয় বলিয়াই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা স্বীকার করা হয়। অতএব এক জ্ঞানবস্তু ও সেই অনির্ব্বচনীয় কারণ, এতদ্‌ভিন্ন আর কোন কিছুই স্বীকার করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

তাহার পর আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি দেখিয়া যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে কেবল জাগ্রতের জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝাইলে চলিবে কেন? স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞানেরও বিশ্লেষণ করিয়া তাহা করা উচিত নহে কি? জাগ্রতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্থায়িরূপে বোধ হয়, স্বপ্ন সকলই অস্থায়িরূপে জাগ্রতেই প্রতিভাত হয়, সুষুপ্তিতে কিছুই অনুভূত হয় না—ইহাও জাগ্রতেই প্রতিভাত হয়। এ জন্য এ সব কথাই জাগ্রতের অবস্থার কথা। স্বপ্নকালে স্বপ্নটাই জাগ্রৎ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সেই স্বপ্নকালে তদন্তর্গত স্বপ্নকে জাগ্রতের তুলনায় অস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়। এ জন্য জাগ্রতের দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে বিষয়, বিষয়ী, জ্ঞান, জ্ঞেয় উভয়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে স্থিত" বলিতে হয়। ইহা নৈয়ায়িকগণের পথ। কিন্তু স্বপ্নের দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে সকলই জ্ঞানের আকার, সুতরাং নশ্বর এবং ভ্রম বা কল্পনা-বিশেষ বলিতে হয়—ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের পথ। আবার সুষুপ্তির দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে সবই অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন; জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় সবই অজ্ঞানের পরিণাম, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতির পথ। কিন্তু যদি সত্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে এই অবস্থাত্রয়সাধারণ অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞানের প্রকৃতি বিচার করিতে হয় না কি? কিন্তু এই অবস্থাত্রয়সাধারণ কোন অবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে সেই সুষুপ্তিকেই গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, সুষুপ্তি অবস্থাটি স্বপ্ন ও জাগ্রতের কারণীভূত অবস্থা। যেহেতু, কারণ কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত হয়। এই কারণে সুষুপ্তি-দৃষ্টান্তে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই অবস্থাত্রয়-সাধারণ অবস্থা বলা যায়। আর সেই অবস্থায় কিছুই জ্ঞাত হয় না বলিয়া এবং 'কিছুই জ্ঞাত হয় না' এই জ্ঞানটি থাকে বলিয়া সেই জ্ঞানকে নির্বিশেষ বস্তুর দৃষ্টান্ত-স্থল বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তির ভঙ্গ হয় বলিয়া তাহা নির্বিশেষ নহে বলিলে তাহা জাগ্রতের দৃষ্টান্তের কথা হইল। কেবল সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সেই সৌষুপ্ত অজ্ঞানের আশ্রয় নির্বিশেষ জ্ঞানবস্তুর স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিলে এই জাগ্রৎকালে সুষুপ্তির অবস্থাটি কল্পনা করিয়া আনিতে হইবে, আর তাহা করিলে কোনও বিশেষের জ্ঞানকে পাওয়া যাইবে না। তখন যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, সেই অজ্ঞানেরও সত্তা তখন অনুভূত হয় না। অতএব কেবল জ্ঞানই থাকে বলিতে হইবে। যদি বলা হয়, সুষুপ্তি যে ভাঙ্গিয়া যায়? অতএব সুষুপ্তি-ভঙ্গের হেতু সেই অজ্ঞানে থাকে, তাহাই বিশেষ? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, সুষুপ্তিভঙ্গ জাগ্রতের কথা। উহা সুষুপ্তির অবস্থার কথা নহে। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান আছে কি নাই, ছিল কি ছিল না—এ সব কোনও কথাই চলে না। এ জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধশ্চিদানন্দরূপঃ শিবঃ কেবলোঽহম্" ইত্যাদি। অতএব এ স্থলে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলা যায় না। সুষুপ্তি-দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্ব্বিশেষ বস্তু সিদ্ধি হইতে কোন বাধা হয় না।

উক্ত অনির্ব্বচনীয় কারণকে মায়া বা অচিন্ত্য শক্তি বলা হয়। উহারই দ্বারা সেই জ্ঞানবস্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অল্পজ্ঞ ও সসীম জীব, তাহার ঘটপটাদি বৃত্তিজ্ঞান, তাহার না-জানা-রূপ অজ্ঞান ও এই জড় জগৎ সমস্তই হইয়াছে বলিতে পারা যায়। যেমন স্বপ্নে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও ঈশ্বরাদি সবই সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। এই জ্ঞানই পরমাত্মা, মায়ারূপ উপাধিযোগে নিয়ম্য জীব ও জগৎ এবং নিয়ন্তা ঈশ্বর হন। পর-মাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ জীব, ইহা বলিবার ত কোনও হেতু দেখা যায় না। আর জ্ঞান ভিন্ন জীব, জগৎ ও পরমাত্মা স্বীকার করিলে কত অধিক বস্তুই স্বীকার করা হইল। অলৌকিক বিষয়ে স্বীকার্য্য যত অল্প হয় ততই ভাল, অধিক স্বীকারে গৌরব-দোষ হয়। জ্ঞান আমরা সকলেই অনুভব করি, পরমাত্মার অনুভব করি না, উহা কল্পনা করি মাত্র। অতএব এই বৃত্তিজ্ঞান বৃত্তিশূন্য হইলে ইহাকেই নিত্য অখণ্ড পরমাত্মবস্তু বলা হয়। পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা, জীবাত্মা—ইহারা নিত্য—এ সব ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র। বৃত্তি উক্ত মায়াশক্তিরই রূপান্তর। সেই মায়াশক্তির আশ্রয় বা অবলম্বন এই জ্ঞানবস্তু মাত্র। অতএব এই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা এবং উক্ত সদসদ্‌ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞাননাশ্য অবস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার্য্য নহে। এই মায়ার জন্যই এই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সবিশেষ হন বলিয়া নির্বিশেষ বস্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্বীকার করেন, আর তাহার দৃষ্টান্ত কতকটা সুষুপ্তিতে দেন। উহাতে কোন বিশেষ অনুভূত হয় না। এই জন্যই উহাকে নিদর্শনস্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। দৃশ্য বিস্মরণরূপ নির্বিশেষ অংশে উহার উল্লেখ।

"মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে।"

ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। সম্পূর্ণ নির্বিশেষ কি দুইটা আছে যে, তাহার দৃষ্টান্ত হইবে? এ সব চিন্তা করিবার ইচ্ছা, বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নাই।

অষ্টাদশ—এইবার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় অবতারবাদ লইয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন,—"জীবের জীবনরূপ প্রকাশই তাঁর অবতরণ, তিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হন, সাধারণ জীব তাঁহার অবতার নয়" এই মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ। সত্য অবতারবাদ উপনিষদাদিতে আছে, শঙ্কর তাহা মানিতেন। আমাদের বোধ হয়, এই শাস্ত্র শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে অনুমোদিত

বেদাদি শাস্ত্রের অংশমাত্র। যিনি শাস্ত্রের এক অংশ মানেন, অন্য অংশ মানেন না, তাঁহার আবার শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কেন? তাঁহার আবার—ভ্রান্ত শঙ্করের দোহাই দেওয়া কেন? তিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হন—ইহা অস্বীকার করিলে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়, হেগেল এবং যীশুখৃষ্ট কি সমান হন না? "জীব-মাত্রেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ" বলিয়া তন্মধ্যে বিশেষ না মানিলে বামনের চাঁদে হাত দেওয়া হয় না কি? শঙ্কর যে গীতাভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের বিশেষ অবতারই বলিয়াছিলেন। অতএব বিশেষ অবতারবাদ অস্বীকার করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় হইতে অনভিজ্ঞ শঙ্করের প্রমাণ দেওয়া কি তাঁহার পক্ষে হাস্যভাজন হইবার প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইল না?

পরিশেষে দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতও শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কৃপাকটাক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তিনি বলিলেন,—"গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন ব্রহ্মের পূর্ণাবতার। এ মতও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ।" তত্ত্বভূষণ মহাশয় দেখিতেছি, বার বার শাস্ত্রের দোহাই দিতে ছাড়েন না। আচ্ছা, এ বিড়ম্বনা তাঁহার কেন? যিনি শাস্ত্র মানেন না, তাঁহার এ সব কথা কেন? দেখিতেছি, পূর্ব্বজন্মের শাস্ত্রমান্যের সংস্কার তাঁহার কিছুতেই যাইতেছে না। পূর্ণাবতার শব্দের অর্থ কি অন্বেষণ করিলে ভাল হইত না?

উনবিংশ—এইবার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতের শেষ কথা। তিনি বলিতেছেন—"আমরা সকলেই মূলে তাঁর সঙ্গে এক, অথচ আমরা অপূর্ণ। তাঁর পূর্ণ জ্ঞানশক্তি প্রেমপুণ্য দেশে কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বরূপে, আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্চে। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ভেদ। এই ভেদাভেদ অনন্তকালই চলবে। আমরা সসীম ভোক্তা, তিনি অসীম ভোগের বস্তু। অনন্তকালই এই ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধ চলবে। আমাদের সমক্ষে এই মধুর সম্বন্ধ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে ঈশ্বর আমাদের জীবন ধন্য করুন।"

এতদুত্তরে আমরা বলি—"আমরা মূলে তাঁর সঙ্গে এক। এ কথার আলোচনা আমরা করিয়াছি। আচ্ছা, তাঁর পূর্ণ জ্ঞানাদি আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্চে" ইহা বলিয়াও আমরা অপূর্ণ—ইহা কি করিয়া বলা যায়? মূলে একই হয়েও অপূর্ণ—ইহা কি সঙ্গত কল্পনা? মূলে যে বস্তু একই হয়, তাহা যদি কোন কারণে ভিন্ন দেখায়, তাহা হইলে সেই ভেদ-দর্শন কি মিথ্যা নহে?

তিনি অংশী, আমরা যদি অংশ হই, তবে অংশীর ধর্ম্ম অংশে ত' প্রকাশিতই রহিয়াছে, তাহার আবার নূতন প্রকাশ কিরূপ হইবে? যাহা আছে, তাহার আবার হওয়া কিরূপ? তাহার পর কি কারণেই বা সেই ধর্ম্ম অপ্রকাশিত হইল? আর কেনই বা সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধকের অপসরণ হইবে? এ সব কথার কোন উত্তর না দিয়া অপরের দার্শনিকতাকে নিন্দা করা কি বিড়ম্বনার নামান্তর নহে? "এই ভেদাভেদ অনন্তকালই চলবে" ইহার অর্থ আমাদের অপূর্ণতা কস্মিন্‌কালে যাইবে না, ইহাই ত বুঝায়। আচ্ছা, তাহা হইলে শান্তিও আমাদের জীবনে পূর্ণরূপে কখনই ঘটিবে না, আর তাহা যদি না ঘটে, তবে এই সাংসারিক মর্ত্ত্য-জীবন কি দোষ করিল? বলী দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, এক জন এক জনকে প্রবঞ্চিত করিতেছে—ইহাতেই বা দোষ কোথায়? "আমরা সসীম ভোক্তা, তিনি অসীম ভোগের বস্তু, অনন্তকালই এই ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্বন্ধ চলবে" এই কথায় মনে হয়—কি ভীষণ ভোগের স্পৃহা! এই ভোগ কেবল অসীম ব্রহ্মবস্তুর ভোগ নহে; কারণ, তিনি কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ দেশ-কাল প্রভৃতি সবই আত্মস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত।" সুতরাং তাহারাও ব্রহ্মসম নিত্য, অতএব অসীম ব্রহ্মবস্তুভোগের সঙ্গে এই নিত্য পঞ্চভূতগুণেরও ভোগ চলিবে। এই সব কথা হইতে মনে হয়, এই ভেদাভেদ দর্শন আত্মবিড়ম্বনা আত্মপ্রবঞ্চনার চরম পরাকাষ্ঠা। মনে হয়, যেন এখানে ভোগ চিরস্থায়ী হয় না বলিয়া নিত্য ব্রহ্মে কল্পনার সাহায্যে সেই ভোগের ব্যবস্থা। এই ভেদাভেদ দর্শনের উৎপত্তিই মনে হয়, এই কল্পিত ভোগের জন্য। এতদপেক্ষা দার্শনিকতার অধঃপতন আর কল্পনা করিতে পারা যায় কি?

বিংশ—আচ্ছা, সসীম আমরা যদি মূলে অসীমের সঙ্গে এক হইয়াও আমাদের এই অবস্থা, তবে তাহার কারণ কি—অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান; জ্ঞান হইলেই যাহার নাশ হয়, অথবা ঈশ্বরের লীলারূপ স্বতন্ত্র ইচ্ছা, কিম্বা জীবাদৃষ্ট-পরতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিতে হইবে? প্রথম কল্প ব্যতীত দ্বিতীয় কল্পে ঈশ্বরেরই স্বেচ্ছাচারিতা হয়। আর তজ্জন্য নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি বহু দোষের সম্ভাবনা। তৃতীয় কল্পে ঈশ্বরেরই ঈশ্বরত্বে হানি হয়। প্রথম কল্পে অজ্ঞানকে অনাদি বলিয়া তাহার নাশ-কল্পনাও দোষাবহ কি না—এ সব কথা তত্ত্বভূষণ মহাশয় এ স্থলে আলোচনা না করায় তাঁহার ভেদাভেদ দর্শনের অপূর্ণতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই কি?

পরিশেষে বক্তব্য—তিনি যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির উপর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া—"তাঁহারা কিছু বুঝেন না—ইত্যাদি" বলিলেন, আমরাও তদ্রূপ শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এই সব কথা বলিলাম। আশা করি যে, ইহা পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইবে। *

চিদ্‌ঘনানন্দপুরী।

* এই প্রবন্ধের একটি অতি সংক্ষিপ্ত-সার (যাহা ছাপিলে প্রবাসীর এক পৃষ্ঠার অধিক হইত না) প্রবাসীতে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় তাহা ফেরত দিয়াছেন। হিন্দু-মতবিরোধী প্রবন্ধ ছাপিয়া তাহার উত্তর ছাপিবার উদারতা পত্রিকা-সম্পাদকের থাকা উচিত বলিয়া মনে করি। আশা করি, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধের প্রতিবাদ ছাপিয়া অতঃপর সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করিবেন।

মহর্ষির মতে—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতিক ও উৎসাহাত্মক। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—উত্তম শ্রেণীর জনগণের প্রকৃতি (অর্থাৎ স্বভাব) উৎসাহ-পূর্ণ। বীর-রসেরও স্বভাব উৎসাহ-ময়; কারণ, বীর-রসের স্থায়িভাব উৎসাহ। যদি উহার কাব্যে বা নাট্যে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উত্তম হেতু (আলম্বন-উদ্দীপন) ব্যতীত বীর-রসের উদ্ভব হয় না। বিচারমুখে অভিনব আরও বলিয়াছেন—যাঁহারা উত্তম-প্রকৃতিক, তাঁহাদিগের সর্ব্বত্রই উৎসাহ-ভাবের আস্বাদন হইয়া থাকে; এই কারণে চতুর্ব্বিধ নায়কের (ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত) মধ্যে ধীরত্ব গুণটি অনুযায়ি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধীরত্ব বা ধৈর্য্যই দৃঢ় প্রযত্নের মূল—উহাই উৎসাহের নিদান। কর্ম্মে অসাফল্য-বশতঃ যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় অথবা কর্ম্ম-প্রযত্নের অভাব ঘটে, তাঁহাকে উৎসাহী বলা যায় না। পক্ষান্তরে, পুনঃ পুনঃ অসাফল্য সত্ত্বেও যিনি অটল প্রযত্ন-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তিনিই ধীর—তিনিই উৎসাহী। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—উৎসাহ ত সকল ব্যক্তিরই অল্প-বিস্তর থাকে, তবে সকলেই বীর-রসের আলম্বন বলিয়া কথিত হয় না কেন? উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—যে কোন ব্যক্তি অল্প-বিস্তর উৎসাহের অধিকারী হইলেই তাঁহাকে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বলা চলে না—সকলের চরিত্রই কিছু কবির উপদেশ-যোগ্য হয় না। যাঁহার চরিত্র উপদেশার্হ, যথাযোগ্য অবসরে তাঁহার উৎসাহের অভিব্যক্তি কবি-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে রস-সৃষ্টির অনুকূল হইয়া থাকে। রস-নিষ্পত্তির নিমিত্ত অবসরের এই ঔচিত্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ঔচিত্য-নির্দ্ধারণ কিরূপে করা যাইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন, অসম্মোহাদি সম্পত্তিই এই ঔচিত্য সূচিত করিয়া থাকে। এই কারণেই—অসম্মোহ প্রভৃতিকে মহর্ষি বিভাবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (১)।

অসম্মোহ-অধ্যবসায়-নয়-বিনয়-বল-পরাক্রম-শক্তি-প্রতাপ-প্রভাব প্রভৃতি বিভাব-দ্বারা বীর-রসের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে (২)।

স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য-শৌর্য্য-ত্যাগ-বৈশারদ্য প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (৩)।

ধৃতি-মতি-গর্ব্ব-আবেগ-ঔগ্র্য-অমর্ষ-স্মৃতি-রোমাঞ্চ-প্রতিবোধ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিবিধ অর্থবিশেষের অভিসন্ধিবশে—বিষ-বিস্ময়-মোহের অভাব-বশে—উৎসাহে যে অধ্যবসায় (নিশ্চয়) তাহা হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে (৪)।

---

(১) "উত্তমবর্ণানাং হি সর্ব্বত্রোৎসাহ আস্বাদ্যো ভবতি। অতএব চতুর্ষ্বপি নায়কেষু ধীরত্বমনুযায়িত্বেন বক্ষ্যতে ধীরোদাত্ত ইত্যাদি। তত্র সর্ব্বো জন উৎসাহবানেব কিন্তুবিষয় ইত্যনুপদেশ্যচরিততা। যদীয়ং তু চরিতমুপদেশার্হং তেষামুচিত এবাবসরে উৎসাহাভিব্যক্তিঃ, উচিতত্বং চাবসরস্য অসম্মোহাদিসম্পত্তিরিতি সৈব বিভাবত্বেনোপদিষ্টা"।—অভিনবভারতী, নাট্যশাস্ত্র, প্রথম ভাগ, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৩২৫।

(২) অসম্মোহাধ্যবসায়—Dr. Mukherjee অনুবাদ করিয়াছেন—"Clearness of mind, perseverence"; কিন্তু অভিনব অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—"অসম্মোহেন অধ্যবসায়ো হি বস্তুতত্ত্বনিশ্চয় ইতি—মন্ত্রশক্তির্দর্শিতা" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫)। অসম্মোহ-হেতু-অধ্যবসায়, অর্থাৎ—মোহের অভাব-বশতঃ বস্তুতত্ত্বের নিশ্চয় [বস্তুতঃ, অধ্যবসায়, সংস্কৃত ভাষায় নিশ্চয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে—perseverence অর্থে প্রযুক্ত হয় না]। ইহাতে 'মন্ত্রশক্তি' সূচিত হইতেছে। [শক্তি (রাজশক্তি) ত্রিধা বিভক্ত—প্রভুশক্তি (কোষ ও দণ্ডের তেজঃ), মন্ত্রশক্তি (মন্ত্রণার শক্তি) ও উৎসাহ-শক্তি।] মন্ত্রশক্তি উৎসাহের অন্যতম কারণ। এই প্রসঙ্গে অভিনব বিচার তুলিয়াছেন। 'অসম্মোহ' বলিতে বুঝায় সদ্বস্তুতে অভিনিবেশ। কিন্তু রাবণাদির পক্ষে ত ইহা ছিল না; কারণ, তাঁহাদিগের অসদ্-বস্তুতেই অভিনিবেশ দেখা যাইত। অতএব রাবণাদির পক্ষে অসম্মোহ—অসদ্বস্তুতে অভিনিবেশ—উহাই তাঁহাদিগের উৎসাহ-জনক। এইরূপ যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অভিনবের মতে তাঁহারা যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করেন নাই। রাবণাদির ক্ষেত্রেও পরাক্রম-নয় প্রভৃতিই বীর-রসের বিভাব। "অসদ্বস্ত্বভিনিবেশাৎসম্মোহো রাবণাদিগত উৎসাহকারীত্যসৎ অশব্দার্থত্বাৎ। তত্রাপি পরাক্রমনয়াদিরেব বিভাবঃ" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫)। নয়—good behaviour (Dr. Mukherjee); সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন (স্থান)-সংশ্রয়-দ্বৈধ (দ্বৈধীভাব)—নীতিশাস্ত্রোক্ত এই ছয়টি গুণের যথাযথ প্রয়োগ (অভিনব)। বিনয়—ইন্দ্রিয়-জয়; gentleness (Dr. Mukherjee). বল—strength (M.); হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতি-চতুরঙ্গসেনা (অভি)। পরাক্রম—power (M.); পরকীয় রাষ্ট্র (মণ্ডল) আক্রমণাশ্রিত ব্যাপার। শক্তি—force (M.); যুদ্ধাদির সামর্থ্য (অভি)। প্রতাপ—influence (M.); শত্রুদিগের সন্তাপ-জনক প্রসিদ্ধি (অভি); প্রভাব—masterfulness (M.); উচ্চবংশ-ধন-জন-সম্পত্তি (অভি)। প্রভৃতি বলিতে বুঝায়—যশঃ ইত্যাদি। এই সকল বিভাব সমষ্টিগত ভাবে বীর-রসের জনক হইয়া থাকে। উত্তমপ্রকৃতির নায়কের চরিত্রে ইহাদিগের মধ্যে কোনটির কখনও অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়াই ইহাদিগের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ, সমগ্র ভাবে এই সকল বিভাবের একমাত্র আশ্রয়-রূপে রামচন্দ্রাদির ন্যায় নায়কের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর যথায় সিদ্ধি সচিবাধীন (যথা—বৎসরাজ উদয়নের সিদ্ধি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, বিদূষক ও সেনাপতি রুমণ্বানের প্রযত্নাধীন), তথায় এই সকল বিভাব সচিব-গত বলিয়াও বুঝিতে হইবে। এমন কি, প্রতিনায়ক-গত হইলেও এই সকল বিভাব প্রতিনায়কের উৎসাহ-ব্যঞ্জক হইয়া থাকে।

(৩) স্থৈর্য্য—অচলতা। ধৈর্য্য—গাম্ভীর্য্যবশতঃ সংবরণ। শৌর্য্য—যুদ্ধাদি ক্রিয়া। ত্যাগ—দান। বৈশারদ্য—সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—রাজনীতির এই চারিটি উপায়ের যথাযথ প্রয়োগ।

(৪) মূলে আছে—"অবিষাদিত্বাদবিস্ময়ামোহাৎ"। Dr. Mukherjee অনুবাদ করিয়াছেন—absence of melancholy,

স্থিতি-ধৈর্য্য-বীর্য্য-গর্ব্ব-উৎসাহ-পরাক্রম-প্রভাব ও আক্ষেপ-প্রধান বাক্য প্রভৃতি দ্বারা বীর-রসের সম্যগ্‌রূপে অভিনয় কর্ত্তব্য (৫)।

নাট্যশাস্ত্রের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে বিবৃত হইয়াছে—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতিক (৬), উৎসাহ-স্থায়িভাব-সঞ্জাত, মহেন্দ্র-দৈবত ও হেমবর্ণ। যাহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, সেই বিজেতব্যগণ আলম্বন-বিভাব। বিজেতব্যগণের চেষ্টা ইহার উদ্দীপন-বিভাব (৭)। সহায়-অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাব। ধৃতি-মতি-গর্ব্ব-স্মৃতি-তর্ক-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব (৮)।

বীর-রস চতুর্দ্ধা বিভক্ত—দান-বীর, ধর্ম্ম-বীর, দয়া-বীর ও যুদ্ধ-বীর। দান-বীরের দৃষ্টান্ত পরশুরাম—যিনি সপ্তসমুদ্র-মুদ্রিতা মহী অকাতরে দান করিয়াছিলেন। ত্যাগে উৎসাহই পরশুরাম-গত বীর-রসের স্থায়ি-ভাব। সম্প্রদান-ভূত ব্রাহ্মণগণ আলম্বন-বিভাব। দাতার সত্ত্বগুণোদ্রেক প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। দাতার সর্ব্বস্ব-ত্যাগ-রূপ কার্য্য অনুভাব। দাতার হর্ষ-ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব। ইহাদিগের সকলের সংযোগে পুষ্টিপ্রাপ্ত দানে উৎসাহ-রূপ স্থায়ি-ভাব দান-বীরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বীরের দৃষ্টান্ত যুধিষ্ঠির। বৈদিক কর্ম্মে (ধর্ম্মে) উৎসাহ তাঁহার স্থায়ি-ভাব। যুদ্ধ-বীরের দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র। যুদ্ধে উৎসাহ তাঁহার স্থায়ি-ভাব। আর দয়া-বীরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রখ্যাতনামা জীমূতবাহন—যিনি সর্প শঙ্খচূড়ের জীবন-রক্ষার্থ অবলীলাক্রমে স্বদেহ গরুড়ের ভোজনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সর্পের দুঃখনাশে (দয়াতে) উৎসাহ তাঁহার স্থায়ি-ভাব (১)।

সাহিত্যদর্পণের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বলিয়াছেন—উৎসাহ-স্থায়ি-ভাব বীর-রসের উপাদান-হেতু। সকল কার্য্যে ত্বরাযুক্ত যে মানসী ক্রিয়া তাহাই উৎসাহ। উগ্রতা তন্দ্রাকে যাহা অভিভূত করে, তাহাই উৎসাহ। সহজ (স্বাভাবিক) ও আহার্য্য (আহরণীয়—কৃত্রিম) ভেদে উৎসাহ দ্বিবিধ (১০)।

আবেগ-হর্ষ-গর্ব্ব অসূয়া-উগ্রতা-তর্ক-ধৃতি-বোধ-স্মৃতি-মতি-মদ-স্বেদ-রোমাঞ্চ—এইগুলি বীররসের অনুকূল ব্যভিচারি-ভাব—কোন কোনটি কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীর-রসের বিভাবগুলি 'স্থির' নামে কথিত হয়। যে সকল বিভাব শ্রুত-দৃষ্ট-স্মৃত-ধ্যাত হইলে স্থৈর্য্যের হেতু হইয়া থাকে, তাহাদিগেরই পারিভাষিক সংজ্ঞা 'স্থির'—উহারা বীররসের পরিপোষক (১১)। এই সকল স্থির বিভাব যখন স্বযোগ্য সাত্ত্বিকাদি ভাব সহ নাট্যাভিনয়ে সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়ি-ভাবে (উৎসাহে) বর্ত্তমান থাকে, তখন, প্রেক্ষকগণের মন সত্ত্ববৃত্তি রজোময়ি সাভিমান অবস্থায় বিরাজ করে। ঐরূপ অবস্থা-গত মনের যে পরিণাম বা বিকার, তাহারই নাম বীর-রস (১২)।

ইহা ত গেল বাসুকি-মত। অতঃপর শারদাতনয় নারদ-মতেও রসোৎপত্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। বাহ্যবিষয়াশ্রিত অহঙ্কার-রজঃ-সত্ত্ব-যুক্ত মনের যে বিকার তাহাই বীর (১৩)। অতএব, রৌদ্র-রস হইতে বীরের পার্থক্য এই যে, বীররসে সত্ত্বের অস্তিত্ব—তমোগুণের প্রভাব নাই, আর রৌদ্রে সত্ত্বের প্রভাব নাই—তৎপরিবর্ত্তে আছে তমঃ।

---

absence of astonishment or confusion." অভিনব কোন অর্থ করেন নাই। তবে বোধ হয়, এ স্থলে 'বিব' বলিতে কোনরূপ 'আপদ্' বুঝিতে হইবে। বিবিধার্থবিশেষাদ্ - ইহার অর্থ এইরূপ—বিবিধ (ধর্ম্ম প্রভৃতি) অর্থ (অর্থনীয়—প্রার্থনীয়)-বিশেষের অভিসন্ধিবশতঃ। আকাঙ্ক্ষিত নানাবিধ ধর্ম্মাদি বিষয়-বিশেষের অভিসন্ধিবশে—বিস্ময়—মোহ প্রভৃতির অভাব হেতু যে নিশ্চয় জন্মে, তাহাই উৎসাহের কারণ বলিয়া 'উৎসাহ'-ভাব-রূপে কথিত হইয়াছে। আপদে অভিভূত হওয়া (বিব) স্থলে অসন্তোষ (বিস্ময়), মিথ্যা জ্ঞান (মোহ) প্রভৃতি দূর করিয়া যে তত্ত্ব-নিশ্চয় দেখা দেয়, তাহাই সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া উৎসাহের হেতু। পক্ষান্তরে, রৌদ্র-রসে তমঃ-প্রাধান্য হেতু অনুচিত অশাস্ত্রীয় বধ-বন্ধনাদি দৃষ্ট হয় —এই কারণে রৌদ্রে মোহ-বিস্ময়ের প্রাধান্য থাকে। ইহাই আচার্য্য অভিনবগুপ্তের অভিমত।

(৫) স্থিতি—স্থৈর্য্য। বীর্য্য—শৌর্য্য। গর্ব্ব—ইহার অনুভাবও সূচিত হইতেছে। উৎসাহ—বিষণ্ণ বলহীনকে উত্তেজিত করা। পরাক্রম—পরাক্রম প্রদর্শন। প্রভাব—অধীনগণের উপর প্রভাব-বিস্তার। আক্ষেপ—বস্তুন্তরের সূচনা। আক্ষেপ-প্রধান বাক্য—গম্ভীর দুরবগাহ বাক্য; "words expressive of challenge" (M).

(৬) রামতর্কবাগীশ সাহিত্যদর্পণের টীকায় বলিয়াছেন—'উত্তমপ্রকৃতি' পদের অর্থ—উত্তম (অর্থাৎ—ধীরোদাত্ত) প্রকৃতি (অর্থাৎ—নায়ক) যাহাতে; অথবা, চমৎকারের আতিশয্যহেতু রসান্তর হইতে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি (স্বভাব) যে রসের।

(৭) বিজেতব্যগণের চেষ্টা—দানবীরে—সত্ত্বোদ্রেকাদি; ধর্ম্মবীরে —শাস্ত্রাধ্যয়নাদি; দয়াবীরে—দীনের কাতরোক্তি প্রভৃতি।

(৮) সহায়—সহকারী। যুদ্ধবীরে—সৈন্য, দানবীরে—বিত্ত, ধর্ম্মবীরে—দ্রব্য-মন্ত্রাদি ও দয়াবীরে—ত্যাগাদিই সহায়। রোমাঞ্চ—ইহা সাত্ত্বিকভাব। অতএব, এ স্থলে 'রোমাঞ্চ' বলিতে বুঝিতে হইবে—রোমাঞ্চ-জনক হর্ষ।

(৯) কেবল স্থায়ি-ভাবগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথাযোগ্য বিভাবানুভাব-সঞ্চারিভাবগুলি যোগ করিয়া লইতে হইবে।

(১০) "উৎসাহঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সত্বরা মানসী ক্রিয়া। সহজাহার্য্য-ভেদেন স দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতঃ"।—শারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৩৫। "উত্তন্দ্রতামভিভবত্যত উৎসাহনির্ব্বহঃ" —ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৩৫।

(১১) "শ্রুতা দৃষ্টাঃ স্মৃতা. ধ্যাতা ভবন্তি স্থৈর্য্যহেতবঃ। তে স্থিরা ইতি বিজ্ঞেয়া বীরাখ্যরসপোষকাঃ"।—ভাঃ প্রঃ, ১ম অধি, পৃঃ ৫।

(১২) "স্থিরা বিভাবাস্তু যদা স্বযোগ্যৈঃ সাত্ত্বিকাদিভিঃ। ভাবৈঃ স্থায়িনি বর্ত্তন্তে স্বীয়াভিনয়সংশ্রয়াঃ। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং সত্ত্ববৃত্তি রজোময়ি। সাভিমানশ্চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স বীররসনামা স্যাদ্রস্তত্তে চ স তৈরপি"।—ভাবপ্রকাঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৪। সত্ত্ববৃত্তি রজোময়ি সাভিমানশ্চ (মনঃ)—এ স্থলে অবশ্য সাভিমানঞ্চ হইলে অন্বয়টি ভাল হইত। ইহার অর্থ এই যে—এইরূপ অবস্থায় মনে সত্ত্বগুণ মুখ্যরূপে বর্ত্তমান থাকে—রজোগুণ, অপ্রধান ভাবে তৎসংসৃষ্ট (অন্বিত) থাকে—আর অভিমানেরও সংযোগ উহাতে দৃষ্ট হয়। অভিমান—'অহং' (আমি) বা 'মম' (আমার) এইরূপ মনোভাব। মনে সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ উৎসাহের দীপ্তি জন্মে; আর রজোগুণের ও অভিমানের অল্পমাত্রায় সংযোগে অহম্ভাব-যুক্ত ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। তখন 'আমি এই উৎসাহব্যঞ্জক বীরকর্ম্মে রত হইব বা হইতেছি'—এবংবিধ মনোভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন মনের বিকার বা পরিণামের পারিভাষিক সংজ্ঞাই বীর-রস।

(১৩) "অহঙ্কাররজঃসত্ত্বযুক্তাদ্বাহ্যার্থসঙ্গতাৎ। মনসো যো বিকারস্তু স বীর ইতি কথ্যতে।" ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭। অতএব এ প্রসঙ্গে বাসুকি-মত নারদ-মত হইতে অভিন্ন।

বীর-শব্দের নির্ব্বচন শারদাতনয় বহু প্রকারে করিয়াছেন—(১) 'রা'-ধাতুর অর্থ 'দান'; কিন্তু উহার 'হনন' অর্থও সম্ভব (এ স্থলে মূলের কয়েকটি অক্ষর ত্রুটিত আছে—আন্দাজে অর্থটি বুঝা যায় মাত্র) বিরুদ্ধগণকে (শত্রুদিগকে) হনন করে (রাত্তি—হন্তি) বলিয়াই ইহার নাম 'বীর'। অথবা, (২) 'লা'-ধাতুর অর্থ 'দান,' 'জ্ঞান' ও 'খণ্ডন'। বিবিধ বিচিত্র বস্তু জ্ঞানে বা ছেদন করে বলিয়াই ইহার নাম 'বীর'। এ স্থলে 'র' ও 'ল'এর অভেদ বোধ করিতে হইবে। অথবা, (৩) বিদ্বিষ্টগণের প্রেরক বলিয়া ইহার নাম 'বীর' (১৪)।

বীর-রসোৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ব্রহ্ম-সভায় 'ত্রিপুরদাহ' নামক রূপকের প্রয়োগকালে নটগণ-কর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে ত্রিপুরমর্দ্দনের অভিনয় দর্শনে ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্ত্বতী বৃত্তির উদ্ভব হয়। বীর-রস এই সাত্ত্বতী-বৃত্তি-সঞ্জাত (১৫)। পুরাকালে ত্রিপুরমর্দ্দনের আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও শারদাতনয় দিয়াছেন। ত্রিপুর—অসুরদিগের তিনটি পুরী—অয়ঃ (লৌহ) রজত-কাঞ্চন-নির্ম্মিত। উহাদিগের মধ্যে প্রথম পুরীর রক্ষার ভার ছিল শত-সহস্র-কোটি অসুরের উপর। দ্বিতীয় পুরীর রক্ষক ছিল ইহার দ্বিগুণ অসুর, ও তৃতীয় পুরীর রক্ষার্থ তাহারও দ্বিগুণ অসুরসেনা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এতগুলি অসুরের শরবর্ষণ অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে করিতে অসিতাপাঙ্গী অম্বিকাকে অপাঙ্গে অবলোকন-পূর্ব্বক স্মরহর হাস্য সহকারে একটি মাত্র শর-প্রয়োগে তিনটি পুরীই যুগপৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন (১৬)।

বীর-রসের বিভাবাদি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতি ও উৎসাহাত্মক। উৎসাহ—সত্ত্ব-সম্পত্তি শৌর্য্য ত্যাগাদি গুণ হইতে সম্ভূত। অবিস্ময় অসম্মোহ অবিষাদিত্ব প্রভৃতি হইতেও ইহা জন্মিয়া থাকে (১৭)।

বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থে কার্য্যতত্ত্বার্থনিশ্চয়, পরাক্রম, প্রতাপ, দুর্দ্ধর্ষপ্রৌঢ়সৈন্যতা, যশঃ, কীর্ত্তি, বিনয়, নয়, প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি, সম্পন্ন-ধনাভিজনমিত্রতা প্রভৃতি ইহার বিভাব (১৮)।

স্থৈর্য্য, শৌর্য্য, প্রতাপ, ধৈর্য্য, আক্ষেপপূর্ণ বচন, সামাদি নীতি-শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলির যথাকালে প্রয়োগ, ভাব-গম্ভীর উক্তি—অনুভাব (১৯)।

প্রবোধ, অমর্ষ, গর্ব্ব, উগ্রতা, মদ, হর্ষ, স্মৃতি, ধৃতি, ঔৎসুক্য, তর্ক, অসূয়া প্রভৃতি ব্যভিচারী।

মদ-হর্ষাদি সম্ভূত স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক।

আর ত্যাগাদি গুণাবলীও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুভাব-রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

শারদাতনয়ের মতে—বীর-রস ত্রিবিধ—(১) যুদ্ধবীর, (২) দয়া-বীর ও (৩) দান-বীর।

যুদ্ধবীরের লক্ষণ—আয়ুধবিহীন, পরিচ্ছদ-শূন্য ও একাকী হইলেও বহুর সহিত যুদ্ধে ভয়াভাব, রণে দৃঢ়নিশ্চয়, মদ, শস্ত্রাস্ত্রঘাতে হর্ষ, যুদ্ধে অপলায়ন, ভীতকে অভয়-প্রদান, শরণাগতের আর্ত্তি-দূরীকরণ ইত্যাদি। দান-বীরের লক্ষণ—অর্থিগণকে তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত অর্থ অপেক্ষা অনেক অধিক বস্তু প্রদান করিবার পরও পুনরায় প্রার্থিরূপে সমাগত স্বজন ও পরজনগণকে দান ও মধুর বাক্যের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন। দয়া-বীরের লক্ষণ—ব্যাধি-দারিদ্র্য-শস্ত্র-অস্ত্র-ক্ষুধা-পিপাসাদি-দ্বারা পীড়িত জনগণকে প্রীতিপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রদর্শন। সাহিত্যদর্পণে উক্ত ধর্ম্ম-বীর ভেদটি শারদাতনয় স্বীকার করেন নাই।

বীর-রসের আঙ্গিক-বাচিক-মানস-নেপথ্যজ প্রভৃতি ভেদের উল্লেখ শারদাতনয় করেন নাই।

বীর-রসের দেবতা মহেন্দ্র। বীরের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ধৈর্য্য। মহেন্দ্র অতি ধীর—তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বীর। এই কারণে বীর-রসের অধিদেবতা মহেন্দ্র।

বীর-রসের বর্ণ গৌর—মহেন্দ্রের দেহকান্তির তুল্য।

শারদাতনয়ের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে মম্মট ভট্ট একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে উৎসাহ স্থায়িভাব হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হইতে পারে। উৎসাহের লক্ষণ গোবিন্দ ঠক্কুর কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপে দিয়াছেন—কার্য্যারম্ভ-কালে যে স্থায়ী ত্বরা-জনক চিত্তবৃত্তি-বিশেষ দৃষ্ট হয়, উহাই উৎসাহ। তৎপ্রকৃতিক বীর-রস (২০)। গোবিন্দ ঠক্কুরের মতে বীর-রস ত্রিবিধ—যুদ্ধ-বীর, দান-বীর, দয়াবীর। কিন্তু নাগোজী ভট্ট প্রদীপোদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—মতান্তরে বীর-রস চতুর্দ্ধা বিভক্ত, এই মতে অতিরিক্ত ভেদটি—ধর্ম্ম-বীর। দান-বীর বলি প্রভৃতি। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির। দয়া-বীর জীমূতবাহন। আর যুদ্ধবীরের দৃষ্টান্ত স্বয়ং

---

(১৪) "রা দান ইতি যো ধাতুর্বা···দে চ বর্ত্ততে। লা দান ইত্যয়ং ধাতুর্জ্ঞানখণ্ডনয়োরপি। রলয়োরবিশেষোঽপি কথিতঃ শব্দ-বাদিভিঃ। বিরুদ্ধান্ রাতি হন্তীতি বীরশব্দস্য নির্ব্বহঃ। বিবিধং চ বিচিত্রং চ লাতি জানাতি কৃন্ততি। এবং রা বীরশব্দার্থঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। প্রেরয়ত্যত্র বিদ্বিষ্টানিতি বীরো নিরুচ্যতে" ।—ভাবপ্রঃ, দ্বিতীয় অধিঃ পৃঃ ৪৮। (১) বি—রা+ক (বিরুদ্ধান্ রাতি হন্তি)। (২) বি—লা+ক (বিবিধং বিচিত্রং চ লাতি জানাতি কৃন্ততি রলয়োরভেদঃ)। (৩) বি—ঈর+অচ্ (বিদ্বিষ্টান্ ঈরয়তি)।

(১৫) "তস্মিংস্ত্রিপুরদাহাখ্যে কদাচিদ্ব্রহ্মসংসদি। প্রযুজ্যমানে ভরতৈর্ভাবাভিনয়কোবিদৈঃ। তদেতৎ প্রেক্ষমাণস্য মুখেভ্যো ব্রহ্মণঃ ক্রমাৎ। বৃত্তিভিঃ সহ চত্বারঃ শৃঙ্গারাদ্যা বিনিঃসৃতাঃ" ।···"যদাভি-নীতং ভরতৈঃ সম্যক্ ত্রিপুরমর্দ্দনম্। সাত্ত্বতীবৃত্তিতো জজ্ঞে বীরো দক্ষিণতো মুখাৎ" ।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭।

(১৬) "পুরাণি ত্রীণি ঘটিতান্যয়োরজতকাঞ্চনৈঃ। একৈকস্য তু রক্ষার্থমসুরাণাং তরস্বিনাম্। কোট্যঃ শতসহস্রাণি স্থাপিতানি ততস্ততঃ। দ্বিগুণোত্তরবৃদ্ধানি বলান্যতিবলানি চ। অম্বিকামসিতা-[illegible]পাঙ্গেনাবলোকয়ন্। বিষহ্য শরবর্ষাণি স্ময়মানঃ স্মরান্তকঃ। শরেণৈকেন তান্যেকো ভস্মসাদকরোৎ···।"—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭।

(১৭) সত্ত্বসম্পত্তি—দুইরূপ অর্থ হতে পারে—(১) সত্ত্বগুণই ও সম্পত্তি; অথবা, (২) সত্ত্বগুণ-রূপ সম্পত্তি। অবিষাদিত্ব—বিষ প্রয়োগে (বিষদিগ্ধ শরপ্রয়োগে) ক্রূরতার অভিব্যক্তি উহাতে রৌদ্র-রসের নিষ্পত্তি। পক্ষান্তরে, বিষহীন শস্ত্র প্রয়োগে বীর-রসের অভিব্যক্তি।

(১৮) বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থে কার্য্যতত্ত্বার্থ নিশ্চয়—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ (বা পুরুষের প্রয়োজন)। কোন্ কোন্ পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে—তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ। দুর্দ্ধর্ষপ্রৌঢ়সৈন্যতা—'প্রৌঢ়'-শব্দের অর্থ—অতিশয় পরিপক্ক-সুশিক্ষিত। দুর্দ্ধর্ষ-অভিজ্ঞ-সুশিক্ষিত সৈন্যগণের আধিপত্য। সম্পন্ন-ধনাভিজন-মিত্রতা—'অভিজন' অর্থে উচ্চবংশে জন্ম। সম্পন্ন-সম্পদ্-বিশিষ্ট। প্রচুর ধন, উচ্চবংশ, অকৃত্রিম সুহৃৎ—এই ত্রিবিধ সম্পত্তির অধীশ্বরত্ব।

(১৯) আক্ষেপপূর্ণ বচন—'আক্ষেপ'—শ্লেষপূর্ণ তিরস্কারসূচক বাক্য। উপায়-চতুষ্টয়—সাম-দান-ভেদ-দণ্ড।

(২০) "কার্য্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ানুৎসাহ উচ্যতে। তৎপ্রকৃতিকো বীরঃ"।—প্রদীপ।

কাব্যপ্রকাশ-কারই দিয়াছেন—মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ। তাঁহার যুদ্ধে উৎসাহ স্থায়ি-ভাব—রামচন্দ্রের অন্বেষণে প্রকটিত। এ স্থলে রামচন্দ্র আলম্বন-বিভাব। রাম-কর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গীলীলায় সমুদ্র-বন্ধন উদ্দীপন-বিভাব। ক্ষুদ্র বানরগণের প্রতি উপেক্ষা ও রামে প্রতিস্পর্দ্ধা অনুভাব। ঐরাবত-কুম্ভ ভেদ করার স্মৃতি মেঘনাদকে বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লজ্জা দিতেছে—এইরূপ বাক্য হইতে অনুমিত গর্ব্ব-ভাব ব্যভিচারী।

এই প্রসঙ্গে নাগোজী ভট্ট বলিয়াছেন—কাহারও কাহারও মতে উপপদ-বিহীন (অর্থাৎ কেবল) 'বীর'-শব্দটি প্রযুক্ত হইলে যুদ্ধ-বীরকেই বুঝাইয়া থাকে। দান-বীরাদি বস্তুতঃ বীর-রসের বিভিন্ন ভেদ নহে—পরন্তু ভাব-বিশেষ মাত্র। নাগোজী বীর ও রৌদ্রের প্রভেদ অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—বীর ও রৌদ্রের বিভাবাদির সাম্য-সত্ত্বেও স্থায়িভাবের ভেদ-হেতু রসের ভেদ হইয়া থাকে। বীর-রসে উৎসাহ স্থায়ি-ভাব—উহার মূলে আছে বিবেক বা বিবেচকত্ব। ইন্দ্রজিৎ যে ক্ষুদ্র বানরগণকে উপেক্ষা-পূর্ব্বক—এমন কি, লক্ষ্মণকেও তুচ্ছ করিয়া—কেবল এক রামকেই তাঁহার প্রতিপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন—ইহাতে ইন্দ্রজিতের বিবেচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব, কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত ইন্দ্রজিতের উক্তিটি বীর-রসের ব্যঞ্জক। পক্ষান্তরে, তিনি যদি এইরূপ বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিচারে সকলকেই নিহত করিতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে রৌদ্রের অভিব্যক্তি ঘটিত (২১)।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের নাট্যদর্পণে বলা হইয়াছে—পরাক্রম-বল-ন্যায়-যশঃ-তত্ত্বনিশ্চয় প্রভৃতি হেতু-দ্বারা বীরের উৎপত্তি। আর ধৈর্য্য-রোমাঞ্চ-দানাদি দ্বারা তাহার অভিনয় কর্ত্তব্য। পরাক্রম—বলিতে বুঝায় পরকীয় মণ্ডল (রাষ্ট্র) প্রভৃতি আক্রমণের সামর্থ্য। বল—হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতি-মন্ত্রি-ধন-ধান্যাদি সম্পত্তি, অথবা শারীরিক শক্তি। ন্যায়—সাম-দানাদি নীতিশাস্ত্রোক্ত উপায়গুলির যথাযথ প্রয়োগ। ইন্দ্রিয়জয়ও এই প্রসঙ্গে সংগ্রহণীয়। যশঃ—সর্ব্বত্র শৌর্য্যাদিগুণের খ্যাতি। এই প্রসঙ্গে শত্রুর সন্তাপকর প্রতাপও সংগ্রহযোগ্য। তত্ত্ব—যাথাত্ম্যভাব। এই সকল বিভাব হইতে উৎসাহ-স্থায়ী বীর-রসের উৎপত্তি। নাট্যদর্পণের মতে বীর-রস কেবল ত্রিধা বা চতুর্দ্ধা বিভক্ত নহে—কিন্তু যুদ্ধ-ধর্ম্ম-দান-গুণ-প্রতাপাদি উপাধি-ভেদে বহুধা ভিন্ন। ধৈর্য্য—বিপক্ষের বহু সৈন্য বা বিপদে অকাতরতা। এই প্রসঙ্গে—সৈন্যগণকে উত্তেজিত করা, পরের প্রতি আক্ষেপ (তিরস্কারাদি) করা প্রভৃতি অনুভাবও সংগ্রহযোগ্য। দান বলিতে প্রমোদ, মধ্যস্থতা, শান্তচেষ্টা প্রভৃতির সংগ্রহ কর্ত্তব্য। ধৃতি-মতি-গর্ব্ব-আবেগ-উগ্রতা-অমর্ষ-স্মৃতি-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ব্যভিচারী। বীর-রসে যুদ্ধাদিভাব থাকা সত্ত্বেও রৌদ্র-রসের স্ফুরণ হয় না; কারণ, বীর-রসে উৎসাহ ও ন্যায়ের প্রাধান্য। পক্ষান্তরে, রৌদ্রে মোহ-অহঙ্কার-অপন্যায় প্রভৃতির প্রাবল্য। অতএব, বীর ও রৌদ্রের সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা নাই (২২)।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতি, উৎসাহ-স্থায়িভাব-সঞ্জাত। বিনয়-প্রতাপ-বল-বিক্রম—ইহার বিভাব। গুরুসেবা, সদ্বৃত্তি, ধর্ম্মসম্পাদন, শক্তি, ত্যাগ বৈশারদ্য, আক্ষেপ, শুচিতা, শৌর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়। স্মৃতি, গর্ব্ব, রোমাঞ্চ, হর্ষ, অমর্ষ, ধৃতি প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। সাগরনন্দী বীর-রসের অবান্তর ভেদের উল্লেখ করেন নাই।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে বলিয়াছেন—উৎসাহ-স্থায়িভাব স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগে সদস্যগণের আস্বাদ্য হইলে বীর-রসে পরিণত হয়। ইহার ত্রিধা ভেদ—দান-বীর, যুদ্ধ-বীর, দয়া-বীর। দান-বীরে—ধৃতি-হর্ষ-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী; স্মিতপূর্ব্ব বাক্য-প্রয়োগ, স্মিতপূর্ব্ব-নিরীক্ষণ, প্রসন্নভাবে বহুদাতৃত্ব, (দানের) অনুমোদন, গুণাগুণ-বিচার প্রভৃতি অনুভাব। যুদ্ধ-বীরে—হর্ষ, গর্ব্ব, মোদ (মতি) প্রভৃতি ব্যভিচারী; অপরের সাহায্য না পাইলেও যুদ্ধে ইচ্ছা, যুদ্ধস্থল হইতে অপলায়ন, ভীতগণকে অভয়-প্রদান—ইহার বিকার (অনুভাব)। দয়া-বীরে—ধৃতি-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী; নিজের অর্থ ও প্রাণ ব্যয় করিয়াও বিপন্নকে ত্রাণ করিতে প্রয়াস, আশ্বাসোক্তি-প্রয়োগ, স্থৈর্য্য প্রভৃতি ইহার বিকার বা অনুভাব।

বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

ইহার পরই ভয়ানক-রস। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ভীতকে অভয়-প্রদান দ্বারা বীর-রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই কারণে বীর-রসের পরই ভয়ানক-রসের স্থান। ভীত ব্যক্তিকে অভয়-প্রদানে বীর-রস জন্মে—ইহা সত্য। এখন এই ভীত ব্যক্তির ভয় কোথা হইতে জন্মিল—তাহার উত্তর দিতে হইলে ভয়ানক-রসের স্বরূপ-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে (২৩)।

মহর্ষি বলিয়াছেন—ভয়ানক-রসের স্থায়িভাব ভয়। বিকৃত-রব, বিকৃত-প্রাণিগণের দর্শন, শিবা, উলূক, ত্রাস, উদ্বেগ, শূন্য-আগার ও অরণ্যে গমন, স্বজনের বধ-বন্ধন-দর্শন-শ্রবণ বা তৎসম্বন্ধীয় কথা-স্মরণ প্রভৃতি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে (২৪)।

---

(২১) "কেচিত্তু নিরুপপদবীরপদস্য যুদ্ধবীর এব প্রয়োগঃ।··· দানাদ্যুৎসাহস্ত ভাব এবেত্যাহুঃ"—উদ্দ্যোত। "এতেন বিভাবাদিসাম্যে বীররৌদ্রয়োঃ কথং ভেদ ইত্যপাস্তম্। স্থায়িভেদাৎ। বিবেচকত্ব-তদভাবাভ্যাং ভেদাচ্চ। ক্ষুদ্রান্ বিহায় রামমাত্রান্বেষণেন বিবেকস্য স্ফুটত্বাৎ"।—নাগোজী, উদ্দ্যোত।

(২২) "বীররসে যুদ্ধাদিভাবেঽপি ন রৌদ্রত্বম্, উৎসাহন্যায়প্রধানত্বাৎ। রৌদ্রে তু মোহাহঙ্কারাপন্যায়প্রাধান্যমিত্যনয়োর্ন সাঙ্কর্য্যম্"—নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১৬৮।

(২৩) "তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্ব্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্ব্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ। নিরপেক্ষ-স্বভাবত্বাৎ তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ, স চার্থপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্ম্মমূলত্বাদ্বীরঃ, স হি ধর্ম্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ তদনন্তরং ভয়ানকঃ"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬১। "বীরস্য ভীতাভয়প্রদানত্বাদ্ভয়ানকং লক্ষয়তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৭।

(২৪) মূলে দুই প্রকার পাঠ পাওয়া যায়—(১) "বিকৃতরস-সত্ত্বদর্শনশিবোলূকত্রাসোদ্বেগশূন্যাগারারণ্য-গমনস্বজনবধবন্ধনদর্শনশ্রুতি-কথাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে"। বিকৃত-রস—'রস' অর্থে শব্দ। বিকৃতরস—অট্টহাসাদি। সত্ত্ব—পিশাচাদি। ত্রাস—উদ্বেগ—পরগত। দর্শন—প্রত্যক্ষভাবে। শ্রুতি—শ্রবণ-নির্ভরযোগ্য আপ্তজনের মুখে শ্রবণ ("শ্রবণমাগমের"—অঃ ভাঃ)। আর এই সকল (বধ-বন্ধনাদি ব্যাপার) দীর্ঘদিন অতীত হইলেও তাহাদিগের বিষয় অনুসন্ধান বা স্মরণ—কথা-স্মরণ। (২) "বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনশিবোলূকোত্রাসোদ্বেগ-শূন্যাগারারণ্যশ্মশান-শূন্যভবনগমনমরণ-স্বজনবধবন্ধদর্শনশ্রবণকথাভি-বিভাবৈরুৎপদ্যতে।" Dr. Mukherjee বিকৃতরব ও বিকৃতসত্ত্বদর্শন এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'strange sounds, the sight of deformed beings.' Dr. Mukherjee—"শূন্যাগারারণ্য-গমন" ইহার পর "স্মরণ" এই কথাটির নিবেশ ধরিয়াছেন। "শ্রুতি-কথাদি" ইহার ভাবান্তর করিয়াছেন "from hearing the narrative of···" (বস্তুতঃ "কথা-শ্রবণ" এইরূপ পাঠান্তর থাকিলে তাঁহার ইংরেজীটি নির্দ্দোষ হয়, নতুবা নহে।)

প্রবেপিত-কর-চরণ, নয়ন-চাপল্য, পুলকোদ্গম, মুখ-বৈবর্ণ্য, স্বর-ভেদ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয়-প্রয়োগ কর্ত্তব্য (২৫)।

ইহার ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ, রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, শঙ্কা, মোহ, দৈন্য, আবেগ, চাপল্য, জড়তা, ত্রাস, অপস্মার, মরণ প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি চারিটি আর্য্যাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিকৃত রব (শ্রবণে), বিকৃত (অঙ্গযুক্ত) প্রাণিদর্শনে (অথবা পিশাচাদি প্রাণিদর্শনে), সংগ্রামে, অরণ্যে ও শূন্যগৃহে গমনে ও গুরু-নৃপ প্রভৃতির নিকট অপরাধ-হেতু কৃত্রিম ভয়ানক-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে (২৬)। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন—ভয় স্ত্রী-বালক-নীচ প্রকৃতির স্বভাব-গত—উত্তম-প্রকৃতির নহে। কিন্তু উত্তম-প্রকৃতির জনগণেরও গুরু বা রাজার নিকট হইতে ভয় উৎপন্ন হয়—ইহা কবি বর্ণনায় দেখাইতে পারেন। যাহার এই প্রকার গুরু-নৃপাদি হইতেও ভয় জন্মে না—তিনি অত্যুত্তম-প্রকৃতি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজ্যের কর্ণধার-স্বরূপ মন্ত্রিগণও রাজার নিকট হইতে ভয় পাইয়া থাকেন—যেহেতু, তাঁহাদিগের প্রভুত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই। তাই রত্নাবলীতে বর্ণনা আছে—প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিতেছেন—'স্বেচ্ছায় কর্ম্ম করিতে যাইয়া প্রভুর ভয় করিতেছি' ("স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্ত্তুঃ"—রত্নাবলী ১।৭)।

গাত্র-মুখ-দৃষ্টির ভেদ (অর্থাৎ—গাত্রাদির বর্ণ-কর্ম্ম-সংস্থানাদির উপর্য্যয়) উরুস্তম্ভ, অতিবীক্ষণ, (দিশাহারা হইয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিপাত) উদ্বেগ, (গাত্রাবয়ব-সমূহের) অবসন্নভাব, মুখের (অর্থাৎ—তালুর) শোষ, হৃদয়ের (অতিবেগে) স্পন্দন, রোমোদ্গম প্রভৃতি (অনুভাব-দ্বারা) ভয়ের (অর্থাৎ— ভয়ানক-রসের) অভিনয় কর্ত্তব্য।

স্বভাবতঃ ভয়ের উৎপত্তি-প্রকার এইরূপ। অভিনয়ে প্রদর্শনীয় ভয়ানক-রস সত্ত্ব (অর্থাৎ—মনের একাগ্রতা) হইতে জন্মে; আর উহা স্বাভাবিক ভয়ের যত দূর অনুরূপ হওয়া সম্ভব, তত দূর স্বভাবানুগ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত প্রাচীন টীকাকারের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকার-মতে—ভয় সত্ত্ব (অর্থাৎ—মনঃ-সমাধান) হইতে সম্ভূত—ইহা নটের শিক্ষা। অর্থাৎ—মনের একাগ্রতা-দ্বারা নটগণ অভিনয়ে প্রদর্শিত ভয়ানক-রসটিকে স্বাভাবিক ভয়ের যত দূর সম্ভব অনুগামী করিয়া প্রদর্শন করিবেন। আর এই শিক্ষা, সকল রসের অভিনয়েই প্রযোজ্য। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ইহা ঠিক নহে। সমগ্র রস-প্রকরণটিই কবি ও নট উভয়েরই শিক্ষাদানার্থ সংগৃহীত হইয়াছে—কারণ, সাধারণতঃ লোকসমাজে বিভাব-অনুভাব-অভিনয় প্রভৃতি ব্যবহার অজ্ঞাত। অতএব মোটামুটি এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই—ভয় স্বভাবতঃ রজস্তমঃ-প্রকৃতিক নীচজনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা সত্ত্ব-প্রধান উত্তম-প্রকৃতিক, তাঁহারা স্বাভাবিক ভয় অনুভব করেন না। তবে তাঁহারা ভয়ানক-রসের অভিনয় (বা অনুকরণ-পূর্ব্বক প্রদর্শন) করিতে পারেন। এই অভিনয় তাঁহাদিগের সত্ত্বগুণসম্ভূত—প্রযত্ন-সাধ্য, অর্থাৎ—এক কথায়—স্বাভাবিক নহে কৃত্রিম। পূর্ব্বোল্লিখিত অনুভাবগুলির সাহায্যে তাঁহারা ভয়ানক-রসের অভিনয় দেখাইতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিক নহে বলিয়াই গাত্রভেদাদি চেষ্টা (অনুভাব-গুলি) মৃদুভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (২৭)। এই মৃদুতাই উহা-দিগের কৃত্রিমতার পরিচায়ক। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, অভিনয়ে প্রদর্শিত রসমাত্রেই কৃত্রিম, কেবল ভয়ানক-রসটিই কৃত্রিম নহে। ধনার্থিনী বেশ্যা যখন কৃত্রিম রতিভাব প্রদর্শন করে, তথায়ও শৃঙ্গার-রসের অভিনয় প্রদর্শিত হয় মাত্র—যথার্থ শৃঙ্গার-রস উৎপন্ন হয় না। অতএব অভিনয়-দ্বারা প্রদর্শিত রসমাত্রেই কৃত্রিম (২৮)।

ভয়ানক-রস কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, কর-চরণ-বেপথু, গাত্র-স্তম্ভ, গাত্র-সঙ্কোচ, হৃৎকম্প, শুষ্ক ওষ্ঠ-তালু-কণ্ঠাদি-দ্বারা অভিনেয়।

নাট্যশাস্ত্রের ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

---

(২৫) মূলে আছে "প্রবেপিতকরচরণ…"। প্রবেপিত—যাহা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে (আদি-কর্ম্মে ক্ত)। "বেপিতুং প্রবৃত্তং যৎ করচরণম্ আদিকর্ম্মেব"।—অ: ভাঃ, পৃঃ ৩২৫। স্বরভেদ—স্বরের ভাববিপর্য্যয়।

(২৬) "কৃত্রিম—বহুক্ষণ ভয়ের ভাব প্রদর্শিত হইতে থাকে, যাহাতে লোকের প্রতীতি হয় যে, হাঁ, সত্যই বুঝি ভীত হইয়াছে। এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া ভয়ের ভাব প্রদর্শন করার ফলে ভয়ানক-রসের অবস্থান হয় বলিয়াই ইহাকে কৃত্রিম বলা হইয়াছে। যদি স্বাভাবিক ভয়ের মত অল্পক্ষণ মাত্র ভয়ের ভাব প্রদর্শিত হয়, তবে উহা রস-রূপে আস্বাদন-যোগ্য না হইয়া ব্যভিচারি-ভাবরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে—"অনু ভাবাশ্চ তথা শ্লিষ্টাস্তত্র ক্রিয়ন্তে লোকে যেন সত্যত এব ভীতোঽয়মিতি গুর্ব্বাদীনাং প্রতীতির্ভবতি। অস্বাভাবিকত্বাচ্চ কৃতকত্বং বহুতর-কালানুবর্ত্তনেনাস্বাদত্বাচ্চ রসত্বং ন চ ব্যভিচারিত্বম্। তদ্ধি তদা স্যাদ্ যদি স্বভাবত এব কিঞ্চিৎকাললবমুৎপদ্যতে" অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৭-২৮।

(২৭) "সত্ত্বং মনঃসমাধানং তজ্জন্যকমিতি নটস্যেয়ং শিক্ষা। সা চ সর্ব্ববিষয়েতি টীকাকারঃ। তদিদমসৎ কবিনটশিক্ষার্থমেব সর্ব্বমিদং প্রকরণং, লোকে বিভাবানুভাবাভিনয়াদিব্যবহারাভাবাৎ। তস্মাদয়-মত্রার্থঃ—এতত্তাবত্তয়ং স্বভাবজং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং নীচানামিত্যর্থঃ, যেঽপি চ সত্ত্বপ্রধানাস্তেষাং সত্ত্বসমুত্থং প্রযত্নকৃতমেভিরেবানুভাবৈঃ কার্য্যম্। কিন্তু মৃদুচেষ্টিতৈর্যতস্তৎ কৃতকম্"। অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৮।

(২৮) তবে এই ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। বেশ্যা-প্রদর্শিত কৃত্রিম শৃঙ্গারের কোনরূপ পুরুষার্থ (অর্থাৎ—পুরুষ-প্রয়োজন ধর্ম্ম বা অর্থ বা কাম বা মোক্ষ) সাধনের সামর্থ্য নাই। পক্ষান্তরে, কৃত্রিম ভীত-ভাব প্রদর্শনেরও কিছু সার্থকতা আছে। ভীত-ভাব-প্রদর্শনে গুরুজনাদি বুঝিতে পারেন—ভীত লোকটি বিনীত; তাহা ছাড়া উহার মৃদু চেষ্টা দ্বারা মনে করেন, এ লোকটি অধম-প্রকৃতির নহে। এইরূপে কৃত্রিম ভয় দ্বারাও কিছু না কিছু প্রয়োজন (পুরুষার্থ) সাধিত হইয়া থাকে। আর যথায় রাজা কৃত্রিম (ভীত) ভাব প্রদর্শন করেন না, পরন্তু অকৃত্রিম ক্রোধ-বিস্ময়াদি ভাব প্রদর্শন করেন, তথায় ঐ ভাবগুলি ব্যভিচারী বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে, স্থায়িরূপে পরিগণিত হয় না। "ননু চ রাজাদি কিমিতি গুর্ব্বাদিভ্যো ভয়ং কৃতকং দর্শয়তি? দর্শয়িত্বা কিমিতি মৃদূন্ গাত্রকম্পাদীন্ প্রদর্শয়তি? কিমিতি চ ভয়ানক এব কৃতকত্বমুক্তম্? সর্ব্বস্য হি কৃতকত্বমুক্তং ভবতি। যথা বেশ্যা ধনার্থিনীতি কৃতকাং রতিমাদর্শয়-তীত্যাশঙ্ক্য সাধারণমুত্তরমাহ।…ভয়ে হি প্রদর্শিতে গুরুর্বিনীতং জানাতি। মৃদু-চেষ্টিততয়া চাধমপ্রকৃতিমেনং ন গণয়তি। কৃতক-শৃঙ্গারাদ্ বেশ্যোপদিষ্টানাং ন কাচিৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ। তেন হ্যনেন প্রকারেণ কার্য্যঃ পুরুষার্থবিশেষো লভ্যতে। যত্র তু রাজা ন কৃতকং পরানুগ্রহায় ক্রোধবিস্ময়াদীন্ দর্শয়তি তত্র ব্যভিচারিত্বৈব তেষাং ন স্থায়িতা…"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৮-২৯।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-প্রকৃতি

ভারতের অর্থ-সচিব, গত ১৫ই ফাল্গুন, তাঁহার বাজেট-অভিভাষণের মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—এ যুদ্ধে ভারতের অর্থ বিধানে বহু অঘটন বা প্রতিকূল ফল ফলিয়াছে সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট দেখা যাইবে, প্রতিকূল অপেক্ষা অনুকূল ফলের গুরুত্ব অনেক বেশী। যুদ্ধ তখন ভারত হইতে বহু দূরে চলিতেছিল, তথাপি শান্তি-শৃঙ্খলা হইতে যুদ্ধবিগ্রহে নিমজ্জিত হইলে নানা দিকে আনুষঙ্গিক যে সব অসুবিধা ঘটে, তাহা না ঘটাইয়া এ যুদ্ধের প্রভাবে ভারতে উৎপাদন, কর্ম্ম-নিয়োগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হইয়াছিল। সমুদ্র-পারবর্ত্তী কয়েকটি বাজার আমরা হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু তেমনই আবার বহু নূতন বাজার আমরা লাভ করিয়াছি।

আমাদের এই লাভ-ক্ষতি বহির্ব্বাণিজ্যে কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহা কিরূপ গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করিয়াছিল, সংখ্যা-সাহায্যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইব। ঘটনার পরে হইলেও, অতীতের আলোচনা নিষ্ফল নহে—ইষ্টপ্রদ। কারণ, অতীতের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ হইতে আমরা বর্ত্তমানের গতি-প্রকৃতি এবং ভবিষ্যতের ধারা সম্বন্ধে প্রচুর ইঙ্গিত লাভ করিতে পারি। সংখ্যা-বিশ্লেষণ সৌখীন পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ নীরস হইলেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু অভিজ্ঞের পক্ষে রুচিকর।

এই স্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরের ব্যবসা-বাণিজ্যের সরকারী সংখ্যা-সঙ্কলন এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণতঃ পরবর্ত্তী বৎসরের মধ্যভাগ ব্যতীত পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয় না। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু বর্ত্তমানে তাহার প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ বিপর্য্যয়ের।

যুদ্ধের অভিঘাতে গত সার্দ্ধ তিন বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পরে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যুদ্ধের অধিকতর ব্যাপ্তি, প্রচণ্ডতা ও প্রগাঢ়তার সহিত ১৯৪০-৪১ আর্থিক বৎসরে তাহা মন্দীভূত হয়; এবং রপ্তানী ও আমদানী উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্যের একুন মূল্যপরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। য়ুরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিসরবৃদ্ধি হেতু কয়েকটি দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছিল, এবং তখনও নির্বিরোধী, অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত নহে, এমন দেশগুলির সহিত মাল-চালানী জাহাজের অভাব এবং জাহাজ-ভাড়া ও বীমা-হারের অসম্ভব বৃদ্ধি, মুদ্রা-বিনিময়ের বর্দ্ধমান জটিলতা, তাহার উপর প্রায় প্রত্যেক দেশে ব্যবসায়-স্বাধীনতা সঙ্কোচন হেতু, এবং সর্ব্বোপরি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পেঁচ-পাকের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, মূল্যমান বৃদ্ধিহেতু রপ্তানীর সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল।

য়ুরোপের ন্যায় শিল্পে অত্যুন্নত মহাদেশে, বাণিজ্যের অবরোধ হেতু, কাঁচা মালের চাহিদা শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাহত হইয়াছিল। অধিকন্তু, রপ্তানী-মূল্যের বহির্ভূত জাহাজ-ভাড়া ও বীমাকর আমদানী-মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে, আমদানী-পণ্যের মূল্য-তুলনায়, রপ্তানী-পণ্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল। রপ্তানী-পণ্যের মূল্য-হ্রাসের আরও একটি কারণ ছিল। রপ্তানী-পণ্যের অধিকাংশই কাঁচা মাল; সুতরাং শিল্পজাত আমদানী-পণ্যের তুলনায় মূল্যের অনুপাত-অনুযায়ী, রপ্তানী-মালের পরিমাণ বেশী। এই নিমিত্ত মাল-চালানী জাহাজের অপ্রতুলতা, রপ্তানী-পণ্যের সঙ্কট বৃদ্ধি করিয়া তাহার মূল্যকে নিম্নগামী করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধারম্ভের পর ভারত হইতে সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত যুদ্ধোপকরণের অঙ্ক বাণিজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না। কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত বহু পণ্য প্রেরণ করিতেছে। এই সকল যুদ্ধ ও খাদ্যোপকরণের অঙ্ক ধরিলে, ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের যথার্থ মূল্য সরকারী বাণিজ্য-হিসাবে প্রদত্ত সংখ্যা-সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হইবে। আরও একটি বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। আলোচ্য বর্ষে য়ুরোপের বিপণি-বন্ধ-হেতু ক্ষতি সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত অধিকতর পরিমিত রপ্তানী-পণ্যের দ্বারা বহুলাংশে পূরণ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মূল্য পূর্ব্ব-বৎসরের ১১৪·০৬ কোটি এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৮৫·৩৭ কোটি টাকার তুলনায়, ১১৬·৬৪ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩·৮৮ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ২৪·৪২ কোটি হইতে, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ২৫·১০ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। চীনে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মূল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে পূর্ব্ব-বৎসরের ৮·৫০ কোটি এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ২·৪৭ কোটি হইতে, আলোচ্য বৎসরে ৯·১৬ কোটিতে স্থান লাভ করিয়াছিল। দেশাভ্যন্তরীণ চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষতঃ কাঁচা তুলার। ফলে, এই সকল পণ্যের উৎপাদকেরা বর্দ্ধিত আভ্যন্তরিক চাহিদার দ্বারা বিদেশী বাজার-বিচ্যুতির ক্ষতি কিয়দংশে সামলাইয়া লইয়াছিল।

কাঁচা-মালের রপ্তানী বন্ধ হইবার ফলে ভারতীয় শিল্প কিছু লাভবান্ হইয়াছিল। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রপ্তানী বন্ধ হইবার জন্য দেশাভ্যন্তরে কাঁচা মালের কাট্‌তি স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি পায়; তাহাতে শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পরিণত পণ্যের আমদানী কমিয়া যাওয়াতে ভারতীয় শিল্পের প্রচেষ্টা বহিরাক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রক্ষণ-শুল্ক এবং রাষ্ট্র-প্রদত্ত অর্থসাহায্য হইতে এ-সুবিধা অতিরিক্ত লাভ। তৃতীয়তঃ, যে সব কাঁচা মালের রপ্তানী বন্ধ, সেগুলির মূল্যহ্রাস শিল্প উৎপাদনের লাভের অঙ্ক কিছু বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মোটের উপর, যদিও ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের একুন-মূল্য ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কম হইয়াছিল, তথাপি ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সর্ব্বদেশে প্রেরিত ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যের তুলনায় অন্যান্য দেশ হইতে আনীত আমদানী-বাণিজ্যের মূল্যের গুরুত্ব স্বল্পতর, হইয়াছিল। চারি বৎসরের অঙ্ক পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

	রপ্তানী	আমদানী
১৯৩৭-৩৮	১৮১ কোটি টাকা	১৭৪ কোটি টাকা
১৯৩৮-৩৯	১৬৩ " "	১৫২ " "
১৯৩৯-৪০	২০৪ " "	১৬৫ " "
১৯৪০-৪১	১৮৭ " "	১৫৭ " "

উপরে উদ্ধৃত অঙ্ক-তালিকায় আমরা ব্রহ্মদেশের সংস্রব পরিত্যাগ করি নাই। এইবার ব্রহ্মদেশকে বর্জ্জন করিয়া পৃথক্ ভাবে আমরা ভারতের রপ্তানী ও আমদানী-বাণিজ্যের বিস্তৃত আলোচনা করিব। উক্ত চারি বৎসরে ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বণিজদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল :—

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা
ধান্য-গোধূমাদি, মটরকলাই ও আটা-ময়দা	৯·৪৯	৭·৭৪	৫·০৯	৫·৯২
চা	২৪·৩৯	২৩·২৯	২৬·৩১	২৭·৭৫
তৈল-বীজ (তৈলের জন্য বাদাম সমেত)	১৪·১৯	১৫·০৯	১১·৯০	১০·০৫
তূলা (কাঁচা ও ত্যক্ত)	২৯·৭৭	২৪·৬৭	৩১·০৪	২৪·৪৬
পাট (কাঁচা)	১৪·৭২	১৩·৪০	১৯·৮৩	৭·৮৫
পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি	২৯·০৮	২৬·২৬	৪৮·৭২	৪৫·৩৮
অন্যান্য	৫৪·২৪	৪৮·৪৯	৫৬·৯২	৬২·৩১
মোট	১৮০·৯২	১৬২·৭৯	২০৩·৯২	১৮৬·৮৬

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী হ্রাস ঘটিয়াছিল কাঁচা পাটে; ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ২০ কোটি হইতে ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮ কোটিতে। এই হ্রাস ঘটিয়াছিল, চাষী যখন অত্যধিক ফসল জন্মাইয়াছিল এবং পাট-শিল্পে উৎপাদনের প্রতিরোধ হেতু তাহার বিক্রয় কমিয়াছিল। পাটোৎপন্ন পণ্যের রপ্তানী হ্রাস অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল—কাঁচা পাটের ১২ কোটি ঘাটতির তুলনায় মাত্র ৩ কোটি। ইহার কারণ, কাঁচা মালের অর্দ্ধেকের অধিক ঘাটতি মহাদেশিক য়ুরোপের বাজারে (Continental markets); কিন্তু পাটোৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় ঐ সকল বাজারে অতি অল্প। কাঁচা ও ত্যক্ত তূলার রপ্তানীও যুদ্ধের অভিঘাতে আলোচ্য বর্ষে অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকায়; অর্থাৎ পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় শতকরা ২১ অংশ। তৈল-বীজের মধ্যে রেড়ী, রাই ও মসিনার রপ্তানী পূর্ব্ব-বৎসরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু চীনাবাদামের চালান শতকরা ৩৮ অংশ কম হইবার জন্য মোটের উপর তৈলবীজের রপ্তানী শতকরা ১৭ ভাগ কম হইয়াছিল। তৈলবীজ-রপ্তানীর এই ঘাটতি কিয়দংশে পূরণ হইয়াছিল উদ্ভিজ্জ-তৈলের (vegetable oils) অধিকতর রপ্তানীর দ্বারা, কিন্তু খইলের রপ্তানী পূর্ব্ব-বৎসরের ২·০৩ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৩·০১ কোটি হইতে মাত্র ৮৪ লক্ষে অবনতি লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধের অভিঘাতে আর একটি পণ্যের রপ্তানী অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। কফির চালান শতকরা ৭০ অংশ হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৮৫,০০০ এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬৮,০০০ হন্দরের পরিবর্ত্তে, আলোচ্য বৎসর মাত্র ৫২,০০০ হন্দর কফি বৃটিশ-ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।

কাঁচা চামড়ার রপ্তানীও পূর্ব্ব-বৎসরের ১২,০০০ টন ও তৎপূর্ব্ব বৎসরের ১৫,০০০ টনের তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৭,০০০ টনে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগলের চামড়ার কাট্‌তি কমে নাই, কারণ, ইহার ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। বিস্ময়ের বিষয় যে, যুক্তরাজ্য অধিকতর পরিমাণে চা লইলেও, বৃটিশ-ভারত হইতে প্রেরিত চা-এর পরিমাণ ১০ মিলিয়ন (নিযুত) পাউণ্ড কমিয়াছিল; তবে, মূল্য-বৃদ্ধি হেতু পূর্ব্ব-বৎসরের চেয়ে ১·১৪ কোটি টাকা অধিক আদায় হইয়াছিল। কাঁড়া চাউল পরিমাণে কম রপ্তানী হইলেও তাহার মূল্যে অধিকতর অর্থাগম হইয়াছিল। গমের রপ্তানী যেমন পরিমাণে, তেমনি মূল্যে কম হইয়াছিল। ইহার কারণ, ভারতের নিকটবর্ত্তী প্রাচ্যদেশ সমূহে গমের রপ্তানী পরিমাণে সাড়ে পাঁচ গুণ, এবং মূল্যে পাঁচ গুণ বেশী হইয়াছিল।

কাঁচা মালের রপ্তানীর তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের চালান বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল। য়ুরোপের বাজার হইতে শিল্পজাত পণ্যের আমদানী বন্ধ হওয়াতে, প্রাচ্য দেশ-গুলিকে বাধ্য হইয়া ভারতের শরণ লইতে হইয়াছিল। ফলে, কোন কোন পরিণত পণ্যে রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সূতি বস্ত্রের রপ্তানী সাড়ে চারি কোটি টাকা অধিক হইয়া ১০·৬৪ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। এই অঙ্ক দশ বৎসরের অধিক কালের মধ্যেও সর্ব্বোচ্চ। এতদ্ব্যতীত জুতা, ইমারতি ও যন্ত্র-কারিগরী (Engineering) উপাদান, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাগজ ও পিজবোর্ড, রবার ও তামাক দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছিল। একমাত্র পাটোৎপন্ন দ্রব্যাদিই অধোগতি লাভ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাড়িয়াছিল।

আমদানী-ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বণিজ্-দ্রব্যসম্ভার উল্লেখযোগ্য :—

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
ভক্ষ্য ও প্রসাধনদ্রব্য	২·৬০	২·৪৮	২·৬৩	২·২৬
চিনি	০·১৯	০·৪৬	৩·৩২	০·৩৬
কাঁচা ও ত্যক্ত তূলা	১২·১৩	৮·৫১	৮·০৫	৯·৪৭
রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য এবং ঔষধাদি	৬·০৬	৫·৬২	৭·৫০	৮·০৭
ছুরি, কাঁচি, লোহা লক্কড় ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক ব্যতীত)	৬·৮৪	৫·৮১	৫·৫৭	৫·০৫
রঞ্জনদ্রব্য ও রঙ	৪·৯৯	৪·০৬	৪·৬৭	৬·৩৭
বৃহৎ যন্ত্রপাতি	১৭·৯৮	১৯·৭২	১৫·৩৭	১১·৮৪
কাগজ, পিজ্‌বোর্ড ও লিপিসজ্জা	৪·৯৬	৩·৯০	৪·১১	৪·৫১
কার্পাসসূতা ও সূতিবস্ত্র	১৫·৫৫	১৪·১৫	১৪·০৫	১১·৩৫
অন্যান্য সূতা ও বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্যাদি	১১·৭৪	৭·০৮	৮·৭৫	৯·৮৫
মোট	১৭৩·৭৯	১৫২·৩৭	১৬৫·২৮	১৫৬·৭৯

এই তালিকায় যে যে ক্ষেত্রে মূল্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ স্থলে হয় তাহা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, নতুবা বর্দ্ধিত

পরিমাণের সহিত অসামঞ্জস, অর্থাৎ সমানুপাত-বিহীন। বস্ত্র-বয়ন শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু আফ্রিকা হইতে কার্পাস-তুলা আমদানী করিতে হইয়াছিল। রাসায়নিক বিভাগে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম্ বাই-ক্রোমেট্, সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্, সোডিয়াম্ হাইড্রো-সালফেট্ এবং গন্ধক আনিয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী কমিয়া গিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যুদ্ধারম্ভের প্রথম কয়েক মাসে আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত রঞ্জন-দ্রব্যের সরবরাহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে বিশেষ উদ্বেগগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বয়ন-শিল্পের প্রয়োজনে ইহা একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। যুদ্ধ-পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ইহা প্রচুর পরিমাণে ভারতে রপ্তানী করিত। যাহা হউক, জাপান তখনও যুদ্ধ-ঘোষণা করে নাই; সুতরাং জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে, পূর্ব্ব-বৎসরের ১২'৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ১২ মিলিয়ন পাউণ্ডের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মোট আমদানী ঘটিয়াছিল ১৩'৩ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই পরিমাণ বৃদ্ধির সমানুপাতে মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল অত্যধিক, কারণ, আলোচ্য বর্ষের আমদানীর একুন-মূল্য ৪'৫৫ কোটি টাকা, পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৫৯ অংশ, এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৭৩ অংশ অধিক হইয়াছিল। একমাত্র যুক্তরাজ্য ব্যতীত অধিকাংশ সরবরাহ-কারী দেশ প্রচলিত-মুদ্রা-মূল্য বিষয়ে প্রতিকূল ছিল। এই নিমিত্ত ঐ শেষোক্ত দেশ-সমূহ হইতে রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে লাইসেন্‌স্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের অভিঘাতে কাগজ ও পিজবোর্ডের অভাব আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে ঐ দুইটি দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হওয়াতে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে কাগজ ও পিজবোর্ড পাঠাইয়াছিল, তথাপি আলোচ্য বর্ষের মোট আমদানী পূর্ব্ব-বৎসরের ২'৭ মিলিয়ন হন্দরেব তুলনায় মাত্র ২'১ মিলিয়ন হন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিমাণের লঘুত্ব মূল্যের গুরুত্বে আত্মগোপন করিয়াছিল। মোট আমদানীর একুন-মূল্য পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ৪৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছিল।

যে সকল প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানী আলোচ্য বর্ষে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, লৌহ ও পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি, কার্পাস-সূত্র ও তন্নির্ম্মিত বস্ত্রাদি এবং চিনি উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ যন্ত্রপাতির আমদানী ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ২০ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ কোটির তুলনায় মাত্র ১২ কোটিতে নিম্নগামী হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে, বৃহৎ যন্ত্র-পাতির মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; সুতরাং আমদানীর ন্যূনতা অঙ্কের পরিচয় অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। ফলে, ভারতের বহু শিল্প উপযুক্ত যন্ত্র ও কলের অভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, কার্পাস-সূতা ও সুতিবস্ত্রের আমদানীর হ্রাস ভারতের বয়ন-শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। অন্যান্য বয়ন-শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে পূর্ব্ব ও তৎপূর্ব্ব বৎসরে জাপান কৃত্রিম রেশমের সূতা বহুল পরিমাণে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬'৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ২১'১ মিলিয়ন পাউণ্ডে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে এবং ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ঊর্দ্ধতর ৩২'৫ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই পরিমাণাধিক্য মূল্যের উচ্চতায় সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্পাস ব্যতীত অন্যান্য বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানী-মূল্য ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ১'১০ কোটি টাকা অধিকতর হইয়াছিল। আমদানী-পণ্যের এই সকল উচ্চাবচ পরিবর্ত্তনের ফলে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে একুন-মূল্য ৮'৪৯ কোটি টাকা কম হইয়াছিল!

আমরা উভয়বিধ বহির্ব্বাণিজ্যের প্রধান প্রধান পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে শেষ করিয়াছি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, যে চারি বৎসরের অঙ্ক-সমষ্টি আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেই চারি বৎসর ভারতের শিল্পোন্নতি-প্রচেষ্টা-কল্পে দ্রুত পরিবর্ত্তনের কাল। বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের ফলে স্বদেশজাত পরিণত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির সহিত বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ন্যূন; এবং বিদেশজাত কাঁচা মালের অধিকতর আমদানীর সহিত স্বদেশজাত কাঁচা মালের রপ্তানী কম হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, স্বদেশজাত শিল্পপণ্যের বৃদ্ধি, প্রত্যেক দেশকেই, বিদেশী শিল্পপণ্যের প্রয়োজন পরিহারে সমর্থ করে, এবং স্বদেশজাত কাঁচা মালের স্বদেশী শিল্পে অধিকতর ব্যবহার এবং ঐ সকল শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত স্বদেশে প্রাপ্তব্য নহে—এমন বিদেশী কাঁচা মালের অধিকতর আমদানী অবশ্যম্ভাবী। আমরা নিম্নে একটি আমদানী-রপ্তানীর তুলনা-মূলক অঙ্ক-তালিকা দিতেছি, তাহাতে এই গতি-পরিবর্ত্তন সহজেই পরিলক্ষিত হইবে।

আমদানী

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
খাদ্য, পেয় ও তামাক	২১'৯	২৪'০	৩৫'৩	২৩'৮
কাঁচা মাল	৪০'৯	৩৩'২	৩৬'১	৪১'৯
শিল্পজাত পণ্য	১০৮'১	৯২'৭	৯১'৮	৮৯'৫
জীবন্ত প্রাণী	৬'৩	'৩	'২	'১
ডাকসংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী	২'৬	২'১	১'৯	১'৫
মোট	১৭৩'৮	১৫২'৩	১৬৫'৩	১৫৬'৮

রপ্তানী

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
খাদ্য, পেয় ও তামাক	৪১'২	৩৯'১	৩৯'৬	৪১'৭
কাঁচা মাল	৮১'৪	৭৩'৩	৮৬'০	৬১'৯
শিল্পজাত পণ্য	৫৫'৩	৪৭'৬	৭৬'০	৮১'২
জীবন্ত প্রাণী	'১	'১	'১	'১
ডাকসংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী	২'৯	২'৭	২'২	২'০
মোট	১৮০'৯	১৬২'৮	২০৩-৯	১৮৬'৯

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায়, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ৯১'৮ কোটি হইতে ৮৯'৫ কোটি টাকায় অবনত হইয়াছিল; কিন্তু উহার রপ্তানী ৭৬'০ কোটি হইতে ৮১'২ কোটিতে উন্নত হইয়াছিল। ঐ একই কালে কাঁচা মালের আমদানী ৩৬'১ হইতে ৪১'৯ কোটিতে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল; কিন্তু উহার রপ্তানী ৮৬'০ হইতে ৬১'৯ কোটিতে নিম্নগামী হইয়াছিল।

এই গতি-পরিবর্ত্তন ভারতের শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প-প্রসারণ নীতির সাফল্যসূচক।

যুদ্ধের অভিঘাতে আলোচ্য বর্ষে, বিভিন্ন দেশ হিসাবে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। নিম্নে প্রদত্ত অঙ্ক-তালিকা হইতে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বর্ম্মা	১১	২৪	১৩	৩১	১৮	২৮
অন্যান্য বৃটিশ-অধিকার	২১	১৮	৩১	২০	৩৮	২৬
মোট সাম্রাজ্যিক	৯০	৮৮	১১৯	৯৩	১২১	৯০
য়ুরোপ	৩২	২৮	২৪	২০	৭	৫
মার্কিণ	১৪	১০	২৭	১৫	৩২	২৭
জাপান	১৫	১৫	১৪	১৯	৯	২২
অন্যান্য পররাষ্ট্র	১৮	১১	২৯	১৮	৩০	১৩
মোট বৈদেশিক	৭৯	৬৪	৯৪	৭২	৭৮	৬৭
সর্ব্ব-সমষ্টি	১৬৯	১৫২	২১৩	১৬৫	১৯৯	১৫৭

আলোচ্য বর্ষে যদিও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ যুক্তরাজ্যের আয়ত্তে ছিল, তথাপি আমদানী ও রপ্তানী—উভয়ই পরিমাণে অত্যন্ত ন্যূন হইয়াছিল। সুখের বিষয়, যুক্তরাজ্যের বাজারে কম-কাট্‌তি এবং তথা হইতে আমদানীর ঘাটতি অন্যান্য সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহের দ্বারা পূরণ হইয়াছিল। যুদ্ধের অগ্রগতির সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য নানা কারণে গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশের সহিত তাহার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৫২ ভাগ; ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৫৩ অংশ ও ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৫৬ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে বৃটিশ-সাম্রাজ্য ভারতের সমস্ত রপ্তানীর শতকরা ৬১ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত আদান-প্রদানে ভারতের বাণিজ্য-জমা-খরচের উদ্‌বৃত্ত জমা ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ৪ কোটি ও ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ২ কোটি হইতে, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ২৬ কোটি এবং আলোচ্য বর্ষে ৩১ কোটিতে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল।

পররাষ্ট্রগুলির প্রতি দৃষ্টি দান করিলে পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, যদিও য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য কিঞ্চিৎ অধোগতি লাভ করিয়াছিল, তথাপি মার্কিণের সহিত তাহার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে রপ্তানী-বাণিজ্যের গুরুত্বের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান যুক্তরাজ্যের অব্যবহিত পরে; এবং আমদানী-বাণিজ্যে তাহার স্থান যুক্তরাজ্য ও বর্ম্মার পরে। যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে জাপানকে অতিক্রম করিয়াছে। জাপান গত কয়েক বৎসর ধীরে ধীরে ভারত হইতে তাহার আমদানী কমাইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে জাপান কর্ত্তৃক গৃহীত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ১৯ কোটি টাকা ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৯ কোটিতে নামিয়াছিল। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, আমদানী-শাসন সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই দুইটি দেশ হইতে আমাদের আমদানী, আমাদের প্রেরিত রপ্তানী অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল। ফলে, ইহাদের সহিত আমাদের বাণিজ্য-জমা-খরচে উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক অধোগামী হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আদান-প্রদান আমাদের উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬ কোটি ও ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ কোটি হইতে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ১২ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৫ কোটিতে নামিয়া আসিয়াছিল। জাপানের সহিত বাণিজ্যে আমাদের ঘাট্‌তি ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ কোটি আলোচ্য বর্ষে ১৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে আমরা জাপানের নিকট ঋণী হইয়াছিলাম। কেবল মাত্র ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ধনরাশি ও ঋণরাশি সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে বণিজ্‌পণ্যে ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্য-জমাখরচে উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক পূর্ব্ব-বৎসরের ৪৮·৮২ কোটি হইতে ৪২·১৩ কোটিতে অবনত, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ২৪·৭৫ কোটি অধিক হইয়াছিল। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু সংরক্ষণ সঙ্কল্পে সরকারী আমদানী-রপ্তানীর অঙ্ক-প্রকাশ নিষিদ্ধ। এই অভাব আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণের পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক। যুদ্ধ সাময়িক বিপ্লব, সুতরাং বে-সরকারী বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিই ভারতের বাণিজ্য-বিচারের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্যের আগম-নিগম অবশ্য বিবেচ্য।

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রেরিত স্বর্ণের মোট রপ্তানী মূল্য ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩·০৬ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৩৪·৬৮ কোটির তুলনায় ১১·৪৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ বৎসর রৌপ্যের আমদানী ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১·৭৫ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৪·৭৪ কোটির তুলনায় ১·৬২ কোটিতে স্থান পাইয়াছিল। ফলে, ধন-রত্নের আদান-প্রদানের জমা-খরচে জমার উদ্‌বৃত্ত ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১১·৮৯ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৩০·২৮ কোটির তুলনায় ১০·১৭ কোটিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এখন বণিজ্-পণ্যের উদ্‌বৃত্তের সহিত ধন-রত্নের উদ্‌বৃত্ত যোগ দিলে, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের উদ্‌বৃত্ত ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৯·২৭ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৭৯·১০ কোটির তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে ৫২·৩০ কোটিতে আমাদের অনুকূলে ছিল।

মোটের উপর, যুদ্ধের প্রথম দুটি বৎসর বহির্ব্বাণিজ্য-জমা-খরচে ভারতের অনুকূল ছিল। কিন্তু যাহা প্রতিকূল-গতি-পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বহু দিন প্রতিকূল থাকিবে। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি একবার অভ্যস্ত-পথ পরিত্যাগ করিলে কদাচিৎ তাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে প্রতিকূল প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে আলোচনা ভবিষ্যতের।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রসিকগঞ্জের হাট

রাজনগর, হরিরামপুর আর রসিকগঞ্জ—পাশাপাশি তিনটি গ্রাম। 'পি-ডবল্যু-ডি'র কাঁচা রাস্তা যেন একই দড়ি দিয়া তিনটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! তিনটি গ্রামের তিনটি স্বতন্ত্র হাট দেড় মাইল দু' মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। সেই কাঁচা পথ দিয়া গোরুর গাড়ী যাতায়াত করে। গ্রীষ্মকালে তাহারই চাকার চাপে উঠিয়া-পড়া মেটে-ধূলা উড়িয়া বাতাসে ঘূর্ণাবর্ত্ত রচনা করে, আর বর্ষায় আনে আবিল পঙ্কিলতা! কখনও বা বন্যার জলে সে-পথের চিহ্ন মুছিয়া যায়। তিনটি গ্রামেরই মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ছোট নদী কাঁকি। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তাহাতে জল থাকে না,—অথবা এক-হাঁটু জল। নদীর ওপারের বাসিন্দারা হাঁটিয়া এপারে হাট করিতে আসে। কিন্তু বন্যা যখন আসে, সে-সময়ে সাল্‌তির দরকার হয়।

পাশাপাশি তিনটি হাট সপ্তাহের তিনটি বিভিন্ন দিনে আসর জমায়। কত বৎসরের পুরাতন কাঠামো এই তিনটি হাটের বুকে জড়ানো, সে ইতিহাস অজ্ঞাত। অতীত দিনের মানুষের পায়ের ধূলা নূতন নূতন মানুষের পদরেণুতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে,—কে জানে তাহার জন্ম-ইতিহাস!

নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতা আছে—তাহাতেই যেন তাহার আনন্দ! হৃদয়ের মাঝে আছে বিদ্রোহের যে আগুন, সে আগুন সব সময়ে জ্বলে না—জ্বলে অকস্মাৎ। এমনি ওলট-পালট সত্যই এক দিন সংঘটিত হইল। তিন হাটের সাধারণ জীবন-যাত্রার গতিপথের দ্বার কে যেন সহসা সুকঠিন লৌহ-কপাটে অবরুদ্ধ করিয়া দিল!···নির্দ্দিষ্ট হাটের দিনে রসিকগঞ্জের হাটের পথে লোক-চলাচল সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেল। কেবল কয়েকটি চেনা লোকের পদশব্দ যেন কোন্ সুদূর অতীত হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। পথ কাঁদিয়া উঠিল।···উহারা এই হাটের পুরাতন পসারী!

পুরাতন বটগাছের ঝুরি নামিয়া অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই ছায়া-শীতল পথের ধারে নিমাই আশের মুদির দোকান। দোকানের সামনে সুপারি-গাছের গুঁড়ি চ্যালা করিয়া কয়েকখানি বেঞ্চি বাঁশের খুঁটির উপরে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেখানে বসিয়া হাট উঠিয়া-যাওয়ার আলোচনা চলিতেছিল।

ভট্টাচার্য্য মশায় এ গ্রামের সব চেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। এ দুঃখ তাঁহারই বুকে বেশী বাজিয়াছে! কারণ, বিগত সত্তর বৎসরের মধ্যে এমন কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। শেষ কালে কি-না দীনু মুকুয্যের এই কীর্ত্তি! অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটায় শেষ টান দিয়া তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, আমরাও আছি।

—সে আর বল্‌তে?—সমজদারের মত এ কথা বলিলেন চক্রবর্ত্তী খুড়া। তার পর নাকের ডগায় ঝুলিয়া-পড়া দড়ি-বাঁধা চশমা-সহ গম্ভীর মুখখানা যথাসম্ভব উত্তোলন করিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন,—"কই হে নিমাই! আমার হিসেবটা একবার দ্যাখো না!"

এই যে হয়ে গেল বলে'! বসুন না খুড়োমশাই—এত তাড়া কিসের?—ছোলার ডাল ওজন করিতে করিতে নিমাই বলিল, —ওরে ও ঘোটে, দ্যাখ্‌তো খুড়োমশায়ের ও-মাসের হিসেবটা। অতঃপর সে বাটখারায়-সাজানো মালের হিসাবে মনোনিবেশ করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, তোর হলো গিয়ে ন' পয়সা, আর নুণ আড়াই পয়সা—তাহলে সাড়ে এগারো পয়সা। আর ডালের দাম হলো গিয়ে পাঁচ পয়সা। মোট চার আনা আধ্ পয়সা।·পুরোপুরি চার আনাই দে তুই!

আব্‌দারের সুরে গোকুল দাসের ছোট ছেলে ঠং করিয়া একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া ঠোঙায়-বোঝাই সওদা উঠাইতে উঠাইতে বলিল, —নিমাই মামা, একটা ল্যাবেঞ্চুস দাও না।

—তোর খালি ন্যাবেঞ্চুস! মৃদু ভর্ৎসনার সুরে এই কথা বলিয়া উপরের শিশি হইতে একটা ল্যাবেঞ্চুস বাহির করিয়া নিমাই তাহার হাতে দিল। দিয়া বলিল,—এই নে, যা। পালা।

আলোচনার ঝাঁজ একটু কমিয়া আসিয়াছিল।

ইতিমধ্যে জেলা-বোর্ডের প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাষ্টার আসিয়া পড়াতে ভট্টাচার্য্য মশায় সুর খুঁজিয়া পাইলেন। বলিলেন,—দেখ্‌লেন তো মাষ্টার মশায়! এটা কি আর হরিরামপুরের ভালো হলো?

হরিরামপুরের ভালো হইয়াছে কি না, মাষ্টার মশায় তাহা চিন্তা করেন নাই। তথাপি তাঁহাকে সায় দিতে হইল,—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

—তবেই বলুন! 'পবলিকের' কে কি বলেচে না বলেচে, আর তোরা এলি কি না গায়ে পড়ে হাঙ্গাম করতে? বলুন না ম্যাষ্টার মশায়, আপনিই বলুন না!—রাগে তিনি ট্যাঁক হইতে একটা পয়সা বাহির করিতে করিতে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, —দাও তো হে নিমাই, এক পয়সার বিড়ি।

ওদিকে 'ঘোটে' অর্থাৎ দোকানের মুহুরী ঘণ্টাকর্ণ খেরো-বাঁধা খাতা হইতে চোখ তুলিয়া বলিল,—চোদ্দ টাকা বারো আনা সাড়ে তিন পয়সা। চক্কোত্তি মশায়ের চোদ্দ টাকা—

—এ্যাঁ! বলো কি হে?—এতো হলো কি করে? চক্রবর্ত্তী খুড়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।

"আজ্ঞে তা হবে বৈ কি,—অধর্ম্ম করবো না! বিনয়ে অভিভূত হইয়া নিমাই মুদি দুই হাত কচলাইয়া বলিল,—ও-মাসে আপনার জামাই আসায় ঘী একটু বেশীই গেছে। কৈ রে, চক্কোত্তি-খুড়োকে একটু তামাক-টামাক দিলি? ঘণ্টাকর্ণকে আবার এই আদেশ হইল।—আজ বিশ বছর দোকান চালাচ্ছি, পাই-পয়সার ভুল-চুক হবার জো নেই!—হেঁ-হেঁ, এ কি আর হরিরামপুরের দোকান?

অদূরে সড়কের উপর দিয়া একখানা গোরুর গাড়ী আসিতেছিল। চাকার ক্যাঁ-কোঁ-শব্দের সঙ্গে গোরুর গলার ঘণ্টার ঠুং-ঠাং শব্দ ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারেও যতটুকু দেখা গেল, মহিম মণ্ডলের গাড়ী। ছইয়ের ভিতরে সওয়ার ছিল কি না ঠাহর হইল না, তবে ছইয়ের বাহিরে ঝোড়ায় সাজানো লেবু, বেগুন, ও কুমড়ার বোঝা।

—কার মাল ওগুলো, মণ্ডলের পো?—ভট্টাচার্য্য মশায় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সম্মুখে ঝুঁকিয়া দুই হাতে গোরুর লেজ ডলিয়া মণ্ডলের পো উত্তর দিল,—এজ্ঞে, ঐ ভুবন পাঁজার।

গাড়ীর ভিতর সওয়ারীকে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কথাবার্ত্তা কাণে আসিতেই সে একবার উঁকি মারিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। ভট্টাচার্য্য মশায়ের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট!

—চিনি রে, চিনি! চোখে এখনো চাল্‌শে ধরেনি! লুকিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। দেখেছেন তো ম্যাষ্টার, অ্যাঁ? বলিয়া ভট্টাচার্য্য মশায় হেডমাষ্টার মশায়কে সাক্ষী মানিলেন,—বলি ওরে ও ভুব্‌নে, দীনু মুকুয্যে কত টাকা দিয়েচে রে তোদের, অ্যাঁ? তা সত্যি কথা বল্‌লেই পারতিস্, অত ছল-চাতুরীর কি দরকার ছিল? দেখো চক্কোত্তি, দেখো, ব্যাটার বজ্জাতিটা একবার বুঝে দেখো। আমি ভাবি, 'সত্যিই বা! সকাল বেলা যখন গেলুম, তখন বল্লে কি না, আমার জ্বর হয়েচে। আর এ বেলা তো দেখচি বাপু দিব্যি ঘুট্‌-ঘুট্‌ করে বার হয়েছো। ও-সব ভিরকুটি কি আমি বুঝি না? তবে এও বলে রাখলুম চক্কোত্তি, ঐ দীনু মুকুয্যের দর্প যদি আমি চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম খারিজ করে দিয়ো। ক্রোধে তিনি জোরে জোরে বিড়িতে টান দিতে লাগিলেন।

ভুবন পাঁজা সত্যই ছলনার আশ্রয় লইয়াছিল। বেলা দশটা পর্য্যন্ত যখন হাট জমিল না, তখন ভট্টাচার্য্য মশায় এ গাঁয়ের জানা-শোনা ব্যাপারীদের বাড়ীতে একবার খোঁজ-খবর লইবার চেষ্টা করেন। ভুবনের বাড়ীতে তিনি প্রবেশ করিতে না করিতেই সে বিছানায় শুইয়া কম্বল মুড়ি দিয়া হি-হি করিয়া কাঁপিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মশায় ভাবিয়াছিলেন, সত্যই বেচারার জ্বর হইয়াছে! সে-ও যে দীনু মুকুয্যের ঘুষ খাইয়া এত বড় একটা প্রতারণার আশ্রয় লইবে, তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না—যদি মাল লইয়া এ বেলা তাহাকে হরিরামপুরের দিকে যাইতে না দেখিতেন!

কথায় বলে—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! ভুবন লুকাইয়া মাল সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরন্তু হরিরামপুরের হাট। কিছু পূর্ব্বে পৌঁছাইতে না পারিলে আবার কি গণ্ডগোলে পড়িতে হইবে ভাবিয়া সন্ধ্যার ঘুলিতে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পথে ভট্টাচার্য্য মশায়ের সহিত এ ভাবে দেখা হইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পায় নাই! কিন্তু ধরা যখন তাহাকে পড়িতে হইল, তখন যা হোক একটা কৈফিয়ৎ না দিলে চলে কি করিয়া?

—আজ্ঞে, লুকিয়ে আর যাবো কোথাকে? আপনাদের পায়ে ঠাঁই দিয়েচেন বলেই না! তবে মালপত্তরগুলো বৃথা নষ্ট হবে, তাই। মাইরি বলচি ঠাকুর মশায়, ও-বেলা আমার সত্যি কাঁপুনি দিয়ে জ্বর—

—থাক্ রে ভুবন, থাক্! সন্ধ্যেবেলায় বামুনের সামনে দিব্যি করে আর মিথ্যে কথা কতকগুলো বলিস্‌নে। বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মশায় আবার বলিলেন,—ও বোঝা গে যা তোর দীনু মুকুয্যেকে। শুনলে চক্কোত্তি, ব্যাটার কথাগুলো একবার!

চক্রবর্ত্তী খুড়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,—তা হলে নিমাই, দামটা না হয় দু'দিন পরেই নিয়ো।

নিমাই হাসিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তা আপনার দয়া! কিন্তু অদেষ্টে যাই থাক, অধর্ম্ম করবো না! এই দেখুন না, ঐ রকম কত আধ্‌লাই হামেশা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে সে গোকুলদাসের পুত্রের নিকট চার আনা লইয়া আধ পয়সা তাহাকে রেহাই দিয়াছিল, অধিকন্তু একটা ল্যাবেঞ্চুস ফাউ দিতে কার্পণ্য করে নাই, এত বড় উদারতার কথা না জানাইয়া সে কি করিয়া স্থির থাকে?

রসিকগঞ্জের প্রাচীন হাটটি এ-সপ্তাহে সত্যই জমে নাই এবং ইহার মধ্যে যে হরিরামপুরের হাট ছিল—সে কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা না হইতেও পারে! তবে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য মশায় যে সকল গুজব রটাইয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সবই হয়তো সত্য নয়! প্রথমতঃ, হরিরামপুরের দীনু মুকুয্যের কথা ধরা যাক্। রসিকগঞ্জের হাট উঠিয়া যাইবার মূলে তাঁহার কোন হাত আছে কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে তিনি যে ঘুষ দিয়া ব্যাপারীদের বশীভূত করিতেছেন—এ অভিযোগ অমূলক। দীনু মুকুয্যে আর যাহাই করুন, ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার অভ্যাস তাঁহার নাই! বিশেষতঃ, কঞ্জুস বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

তবে ইতিমধ্যে রসিকগঞ্জ এবং হরিরামপুরের মধ্যে না কি কতকগুলি সন্দেহজনক ব্যাপার পর-পর ঘটিয়া গিয়াছে। এবং তাহার প্রধান উদ্যোক্তাই না কি স্বয়ং দীনু মুকুয্যে! তাই সেই আক্রোশ ভট্টাচার্য্য মশায় আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। এমন কি, চার-পাঁচ মাস পূর্ব্বে একটি পুষ্করিণী-খনন ব্যাপারে দীনু মুকুয্যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ কিছুতেই এমন সংকার্য্যটি সম্পন্ন হইতে দেন নাই—আজ হাট বসিতে না দেওয়ায় যে তিনিই এমন গোপন ইঙ্গিত করিয়াছেন—ইহাই ভট্টাচার্য্য মশায়ের দৃঢ়বিশ্বাস!

সে যাহা হউক, যাহাকে লইয়া এই দুই গ্রামের মধ্যে এত বড় একটা আন্দোলন চলিয়াছে, সেই রতন হাজরা এ পর্য্যন্ত এক বারও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না! এত বড় বিরাট্ কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাজন-বাক্যের অনুসরণে সেই যে সে ফেরার হইয়াছে, তাহার পর আর তাহার সন্ধান নাই!

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল—রতন আর হরিরামপুরের দুলালীকে লইয়া! দু'জনের মধ্যে অবৈধ প্রণয় ছিল কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন, আর জানে তাহারা! তবে গত বারের হাটে রতন যখন তরী-তরকারী লইয়া দোকান পাতিয়াছিল, তখন দুলালী কি একটা জিনিষের দর করিবার অছিলায় তাহার সামনে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতে থাকে। রতন না কি তাহাতে উৎসাহ দিয়াছিল অর্থাৎ দুলালীর আঁচলটা ধরিয়া একটু টানিয়া দিয়াছিল। প্রকাশ্য হাটের মাঝে এমন একটা কুৎসিত ব্যাপার ভট্টাচার্য্য মশায়ের কথিত 'পবলিক' কি করিয়া সহ্য করিবে? বিশেষ জানিয়া-শুনিয়া তো আর রসিকগঞ্জের মুখে কালি লেপিয়া দেওয়া যায় না! সুতরাং তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইল। আশ-পাশের গ্রামের লোকের সহিত হরিরামপুরের লোকেরাও হাট করিতে আসিয়াছিল। রতন আর দুলালী ধরা পড়িল বটে, তবে আসল দোষ কাহার—ছেলেটির, না মেয়েটির, তাহার মীমাংসা হইল না।

রসিকগঞ্জের লোকরা বলিল,—দোষ দুলালীরই! কারণ, সে-ই প্রথমে হাসিয়া কথা বলিয়াছে।

কিন্তু হরিরামপুরের লোকগুলি এ কথা মানিতে চাহিল না, বলিল—রতনের দুষ্টবুদ্ধি ছিল, নহিলে সে দুলালীর আঁচল ধরিয়া টানিবে কেন ?

মৌখিক তর্ক অবশেষে হাতাহাতিতে গড়াইল। এবং তাহা শুধু 'পবলিকের' ঘাড়ে পড়িয়াই নিবৃত্ত হইল না—ব্যাপারীদের মধ্যেও তাহার বীজ ছড়াইয়া পড়িল। স্বেচ্ছায় কেহই স্ব স্ব গ্রামের দোষ স্বীকার করিতে রাজী নয়। অবশেষে বিরোধ থামিলে দেখা গেল, আলু-পটল, কুমড়া-বেগুন প্রভৃতি আনাজ-পত্রাদি গড়াগড়ি যাইতেছে। কৈ মাছের দঙ্গল চারি দিকে চলিয়া বেড়াইতেছে ! কাহারও দোকানের ঝাঁপের লাঠি নাই—দোকানপত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে ! কাহারও মাথা ফাটিয়াছে, কেহ বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, রতন বা দুলালী কেহই সেখানে উপস্থিত নাই ! হাতাহাতির সুযোগে কখন যে তাহারা পলাইয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই ! শুধু নিষ্ফল আক্রোশে কতকগুলি লোক তখনও আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। কারণ, তখন তাহাদের আর করিবার কিছু ছিল না। গ্রামের চৌকিদারের মধ্যস্থতায় ইতিমধ্যেই রসভঙ্গ হইয়াছিল, চরম-সমাপ্তি আর ঘটিতে পারিল না !

ভট্টাচার্য্য মশায় বলিলেন,—এ ঐ দীনু মুকুয্যেরই কারসাজি ! অর্থাৎ তিনিই না কি এমন নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন !

রসিকগঞ্জের লোকরা দাবী করিল, আমরা ইহার বিহিত চাই.

কথাটা দীনু মুকুয্যে শুনিলেন, শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। ভট্টাচার্য্যকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতেন না; তথাপি রসিকগঞ্জের লোকগুলা তাঁহার নামে এমন দুর্নাম রটায় ! তিনিও তাহাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়া তবে জলগ্রহণ করিবেন !

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন,—আমিই যে এমন করেচি, তার প্রমাণ ?

এ কথা শুনিয়া রসিকগঞ্জের চক্ষুস্থির ! তাই তো, তিনিই যে এমন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায় ?

কিন্তু ভট্টাচার্য্য মশায় বে-হিসাবী লোক নহেন। এরূপ কার্য্যে তিনি মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন ! আর ঐ দীনু মুকুয্যে সেদিন-কার কাঁচা ছেলে !

প্রমাণ ? প্রমাণ রতনই দিবে। অর্থাৎ সে শপথ করিয়া বলিবে, দীনু মুকুয্যের পরামর্শেই দুলালী তাহাকে ঐ ভাবে অপদস্থ করিয়াছে, নহিলে তাহার কি মাথা-ব্যথা হইয়াছিল, ইত্যাদি।

অতঃপর উভয় গ্রামই নিস্তব্ধ। বেশ, তাই হোক ! প্রকাশ্য সভায় তাহারা শুনিতে চায় যে, সকল দোষ ঐ দীনু মুকুয্যের !

হুঁকা টানিতে টানিতে ভট্টাচার্য্য মশায় কথাটার আগাগোড়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। ভাবিলেন, তাই তো, বলিয়া ভুল করিলাম না কি ? না, ভুলই বা কিসের ? দীনু মুকুয্যেকে শায়েস্তা করিতেই হইবে। কিন্তু রতন যদি জেরার মুখে সব বেফাঁস করিয়া বসে ? যদি সে জবাব দেয়,—না, দুলালী তাহাকে কিছুই বলে নাই ? তখন ?···নাঃ ! তাঁহাকে উঠিতে হইল। যে-উপায়ে হোক, রতনকে দিয়া স্বীকার করাইতেই হইবে, দুলালীই প্রথম তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল ! কিন্তু তাহাকে পাকড়াইবার উপায় ? ক'দিন হইতে সে বাড়ী নাই যে !

ভট্টাচার্য্য মশায়ের সৌভাগ্যক্রমে রতন সেদিন বাড়ীতেই ছিল। এ ক'দিন সে কোথায় ছিল, সে-ই জানে।

—রতন, বাড়ী আছিস্ ? বলিতে বলিতে তিনি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

—আসুন, আসুন ! কি সৌভাগ্য আমার, গরীবের বাড়ী আপনার পায়ের ধূলো পড়লো ! রতন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিবেদন করিল।

—কিন্তু এদিকে আমার দুর্ভাগ্যের যে অন্ত নেই ! তিনি বসিয়া আলাপের সূচনা করিলেন।—তার পর ব্যাপার কি, বল্ তো ? দুলালীই তা হলে শেষটা তোকে—

কথাটা আর শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। রতন তখনই বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

—আজ্ঞে, তাই তো ! সেই তো আমাকে—সত্যি দা-ঠাকুর, আমি কিছু জানতুম না। রতনের কণ্ঠে রোদনের সুর !

—থাক্ থাক্, আর কাঁদতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করবো। এখন ঠিক-ঠিক সব তুই বলতে পারবি তো ?

—আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মিথ্যে কখনও আমি বলিনি দা-ঠাকুর। তাহার দু'চক্ষু সলজ্জ মিনতিতে ভরিয়া উঠিল।

—তা কি আমি জানিনে রে ? বেশ ! বেশ ! আমিও দেখে নেবো, দীনু মুকুয্যেটা কত বড় ধড়িবাজ ! বলিয়াই তিনি উঠিলেন।—তা হলে ঐ কথাই রইলো। তিনি আশ্বস্ত চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রে রতনের চোখে ঘুম নাই। সে দো-টানায় পড়িয়াছে ! এক দিকে দুলালী, অপর দিকে গ্রামের মর্য্যাদা ! এবং তাহার চেয়েও বড় তাহার প্রাণ ও সম্মান। যদি সে বলে যে, সে কিছু জানে না, তবে দুলালীর প্রতি অবিচার করা হয়। কারণ, দুলালীকে সে-ই এ পথে টানিয়া আনিয়াছে। যাহাকে সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখাইয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বিনা-অপরাধে ধূলায় ফেলিয়া পলাইবে ? অপর দিকে মিথ্যা তাহার না বলিয়া উপায় নাই ! কারণ, মাথার উপরে গ্রামের গুরু-দায়িত্ব ! তার উপর গ্রামে মুখ দেখানো ভার !

সহসা ঘরের কপাট নড়িয়া উঠিল ঝন্-ঝন্ শব্দে। ধড়মড় করিয়া রতন উঠিয়া বসিল। তাহার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে !

—ও রতনদা, রতনদা ! ওঠো ওঠো, দরজা খোলো।

এ যে দুলালীর গলা ! এত রাত্রে দুলালী ?

রতন দরজা খুলিয়া দিতেই দুলালী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—এখানে আর নয় !

—কেন রে, কি হলো ?

—ওরা আমায় বাঁচ্‌তে দেবে না রতনদা' ! দুলালী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—দীনু মুকুয্যে আজ সারাদিন আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে ! বলে, গাঁয়ের সবার সামনে তোমার নামে মিথ্যে কথা বলতে হবে। সে আমি পারবো না, রতনদা' ! মরে গেলেও না।—রতনের দুই পা দুলালী নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল।

অন্ধকার রাত্রি ফিকে জ্যোৎস্নায় মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। বাঁকি নদীর পাশে পাশে বাঁধের উপর দিয়া দু'জনে চলিয়াছে। রসিকগঞ্জ, হরিরামপুর, রাজনগর সব পিছনে পড়িয়া। দুলালীর মুখে আজ আনন্দের হাসি। রতন তখনও ভাবিতেছিল, কাজটা তাহার ভালো হইল কি না!

—মা-গো! ভয়ে দুলালী রতনকে জড়াইয়া ধরিল।

—কি রে, কি হলো? রতন বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল।

—দ্যাখো না, আমার গায়ের উপর কি পড়লো।

—ও কিছু না, একটা গঙ্গাফড়িং! ফড়িংটাকে টুস্‌কি মারিয়া সরাইয়া দুলালীকে আরও কাছে টানিয়া রতন বলিল,—এ হাটে তোরই লাভ হলো রে!

ফিকে জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি আজ দুলালীর সারা মনে!

পরদিন বিচার-সভায় আসামীর জন্য আকুল প্রতীক্ষায় উভয় গ্রাম যখন উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে, তখন কল্যকার রাত্রির এই দুঃসংবাদ একটা ভারি দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় ভাসিয়া আসিল। রাখাল আসিয়া সংবাদ দিল,—না, দুলালী আর রতন বাড়ী নেই! কোনো তল্লাটে তাদের পাওয়া গেল না!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দীনু মুকুয্যে অকারণে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মশায়ও হাসিলেন! কিন্তু এ যেন কেমন হাসি!

চক্রবর্ত্তী খুড়া নিমাইয়ের দোকানের পাওনা মিটাইয়া দিতেছিলেন। তাদের দু'জনের মধ্যেও মৃদু হাসির বিনিময় হইল। অথচ কেহ বুঝিল না ইহার অর্থ!

শ্রীঅনিল দাস।

ইতিহাসের অনুসরণ

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

তৃতীয় প্রস্তাব

মাধাইনগর ও রাজাবাড়ী (ভাওয়াল) শাসনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

১। মাধাইনগর শাসনে প্রাপ্তব্য তথ্যাবলি

প্রথম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাবনা জেলায় চলনবিলের পূর্ব্বপারে মাধাইনগর গ্রামে লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন প্রায় অর্দ্ধশতাব্দপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। এই শাসনখানির পদ্যাংশেও তেরটি শ্লোক আছে এবং আলোচ্য রাজাবাড়ী (ভাওয়াল) তাম্রশাসনেও অবিকল সেই তেরটি শ্লোকই আছে। কিন্তু মাধাইনগর শাসনখানি ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের মত ক্ষয়িত। তাই উহার শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোক পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কর্ত্তাগণ অধিকাংশ স্থলেই পড়িতে পারেন নাই। মাধাইনগর শাসনের গদ্যাংশেরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত ছত্র পড়া যায় নাই। ফলে যতটুকু পড়া গিয়াছে, তাহা হইতেও অদ্যাবধি ঐতিহাসিক তথ্যাবলি সঙ্কলনের উপযুক্তরূপ চেষ্টা হয় নাই। নিম্নে আমরা যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করিয়া দেখাইব, মাধাইনগর শাসন হইতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাবলির উদ্ধার সম্ভবপর।

তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তির অল্পকাল পরে সিরাজগঞ্জের এক কবিরাজ মহাশয় উহার এক ভ্রমপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের সম্পাদনে ঐতিহাসিক চিত্র নামে একখানি পত্রিকা প্রচারিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম বৎসরে পাবনার উকীল প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এই শাসনখানির একটি বিশুদ্ধতর পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ফিরিয়া ইহার সম্পাদন করেন, কিন্তু পাঠের বিশেষ উন্নতি-সাধন করিতে পারেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণে বরং এক গুরুতর গলদ ঢুকিয়া পড়ে। চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, শাসনখানির প্রথম পৃষ্ঠে ২৯ ছত্র এবং ২য় পৃষ্ঠে ৩০ ছত্র লেখা আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভুল করিয়া লিখিলেন, উভয় পৃষ্ঠেই ২৯ ছত্র লেখা আছে। ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তদীয় Inscriptions of Bengal, Vol. III নামক গ্রন্থে যখন ফিরিয়া এই শাসনখানির সম্পাদন করেন, তখন তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভুলেরই অনুসরণ করেন। এই ভুলের ফল বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে।

ভাওয়াল শাসন সম্পাদনকালে পাঠ মিলাইবার জন্য মাধাইনগর শাসন আমার দেখিবার প্রয়োজন হয়। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত টি, এম্, রামচন্দ্রম্ আমার অনুরোধে মাধাইনগর শাসনের (বর্ত্তমানে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত) দুই পিঠেরই চমৎকার ছাপ আমার ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেন। এই ছাপের সাহায্যে আমি অল্পায়াসেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ ছত্রের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। তাম্রশাসনগুলির শেষ ছত্রেই তারিখ থাকে। মাধাইনগর শাসনের শেষ তিন ছত্র নিতান্ত অস্পষ্ট। কিন্তু ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের সহিত তুলনা করিয়া ত্রিংশৎ ছত্রের শেষে যে, ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের অনুরূপ স্থানেই, মাধাইনগর শাসনেও তারিখটি খোদিত আছে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে তারিখ আছে—সং ২৭ কা দিনে ৬। মাধাইনগর শাসনের তারিখ পড়িয়াছি,—সং ২৫ ভাদ্র দি—। ইহার পরে "নে" অক্ষরটি এবং মাসের তারিখের অঙ্কটি বা অঙ্ক দুইটি ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাধাইনগর শাসনটি যে তারিখ-হীন নহে এবং উক্ত তারিখ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৫

সম্বৎসরের ভাদ্র মাসের কোন দিন, এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সহজই উপলব্ধ হইবে।

Indian Historical Quarterly পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে ১৮৬ এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা-সমূহে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু মূলবান্ প্রবন্ধে লক্ষ্মণসেনের সিংহাসন প্রাপ্তির বৎসর নির্ভুলরূপে নিরূপণ করেন। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্ধারণ স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় প্রত্নবিভাগের নিয়ামক রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় পৃথক্ ভাবে জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (Epigraphia Indica, XXI, PP. 215—16, Editorial Note এবং Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1934-35, P. 69 দ্রষ্টব্য)। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্ধারণ এই যে, লক্ষ্মণসেন ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। এই হিসাবে তাঁহার রাজত্বে পঞ্চবিংশ সম্বৎসর ১২০৩ খৃষ্টাব্দ। এই স্থানে মনে রাখা আবশ্যক, বক্তিয়ার-পুত্র ইক্তিয়ারুদ্দিন মহম্মদের বঙ্গদেশ আক্রমণ ও নদীয়া লুণ্ঠনের তারিখ ১২০২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমার একটি প্রবন্ধে সপ্রমাণ হইয়াছিল। (মদীয় Determination of the epoch of the Parganati Era নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Indian Antiquary, 1923)। লক্ষ্মণসেনের ৬ষ্ঠ রাজ্য-সম্বৎ পর্য্যন্ত প্রদত্ত ৫খানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। উহাদের দ্বারা প্রদত্ত ভূমির ফিরিস্তি নীচে দিলাম।

১। নদীয়া জেলার আনুলিয়া গ্রামে প্রাপ্ত শাসন। তৃতীয় সম্বৎসর। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল। ব্যাঘ্রতটীর অবস্থান এখনও ঠিকমত নির্ণীত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে উহা বাগড়ীর অর্থাৎ ভাগীরথী-মধুমতীর অভ্যন্তরস্থ প্রদেশের সংস্কৃত নাম।

২। ২৪ পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসন। এই শাসন দ্বারা বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিমখাটিকায় অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেতড্ড চতুরকের অন্তর্গত ভূমি প্রদত্ত। বেতড় বর্ত্তমান হাওড়া সহরের অন্তর্গত, শিবপুরের লাগ উত্তর। দ্বিতীয় সম্বৎসর।

৩। দিনাজপুর জেলায় তপন-দীঘিতে প্রাপ্ত শাসন। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল। তৃতীয় সম্বৎসর।

৪। ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত। প্রাপ্তিস্থানেই বর্ত্তমান খাড়ী পরগণায় প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল। এই শাসনখানিও সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সম্বৎসরের।

৫। মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসন। শাসন-খানি ৬ষ্ঠ সম্বৎসরের। বীরভূম জেলায় মোর বা ময়ূরাক্ষী নদীর পারে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল।

এই শাসন পাঁচখানিই শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত। প্রদত্ত গ্রামগুলিও ভাগীরথীর দুই ধারে মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে এবং গঙ্গার উত্তরে উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত।

মাধাইনগর শাসন এবং ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে যথাক্রমে ২৫ ও ২৭ সম্বৎসরে নূতন রাজধানী ধার্য্যগ্রাম হইতে প্রদত্ত। প্রথমখানি দ্বারা পূর্ব্ব-বরেন্দ্রীতে পাবনা জেলায় চলনবিলের পারে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি দ্বারা ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় বানার নদের তীরে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। ১২০২ খৃষ্টাব্দে ইক্তিয়ারুদ্দীনের আক্রমণের ফলে যে লক্ষ্মণসেন পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশ এবং উত্তর-বঙ্গের পশ্চিমাংশ হারাইয়াছিলেন, তবকত্-ই-নাদিরী পাঠে তাহা আমরা জানি। রাজত্বের প্রথম ভাগে মধ্য-পশ্চিম-উত্তরবঙ্গে ভূমি দান এবং শেষ ভাগে রাজ্যের পূর্ব্বাংশে ভূমি দানে তবকত্-ই-নাদিরীতে সমর্থিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সমর্থন পাওয়া গিয়াছে তাম্রশাসনের অভ্যন্তরে।

মাধাইনগর শাসনের ভূমিদানের উদ্দেশ্য এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, বুঝিতে পারেনও নাই। পঞ্চবিংশ সম্বৎসরে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত শাসনখানিতে লিখিত আছে যে, শ্রীগোবিন্দ দেব-শর্ম্মা লক্ষ্মণসেনের শান্ত্যাগারাধিকৃত ছিলেন, অর্থাৎ শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করিতেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্য কিছু দৈব-ক্রিয়া-কর্ম্ম করিয়া-ছিলেন, তাহারই দক্ষিণাস্বরূপ ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৪১শৎ ছত্র।···সপ্তবিংশশ্রাবণদিবসে·········পূর্ব্বকমূল্মভিষেকঃ
৫০শৎ ছত্র।···ঐন্দ্রীমহাশান্তি···ত্যাতি···নিকাদি···৫১শ ছত্র।···সমকালং···উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কক্ষিতি।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রম্ আমাকে মাধাইনগর শাসনের যে ছাপ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে মজুমদার মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ নিম্নরূপে সংশোধিত করিতে সমর্থ হইলাম :—

সপ্তবিংশ শ্রাবণ দিবসে অকৃত পূরকমূলাভিষেকঃ

বুঝা যাইতেছে যে, মূলাভিষেকের কোন দোষ সংশোধনের জন্য এবং ঐন্দ্রী মহাশান্তি নামক বৃহৎ শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা ভূমি দান করা হইয়াছিল। ঐন্দ্রী মহাশান্তি কি, মাধাইনগর শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক ও আলোচক-গণ কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। মজুমদার মহাশয় দুই কথায় সারিয়াছেন—"ঐন্দ্রী মহাশান্তি কি ব্যাপার, বুঝা যায় না।" ঐন্দ্রী মহাশান্তি কি, তাহা বুঝিতে না পারায় পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাম্রশাসন প্রদানের মূল উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই, তাম্রশাসনখানির ঐতি-হাসিক গুরুত্বও ঐ সঙ্গেই অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, শান্তিকর্ম্মের উদ্দেশ্যই আগত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ চেষ্টা এবং অনাগত বিপদ নিবারণ। কাজেই ভাবিলাম,—লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালসেন-কৃত এবং লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক সম্পূর্ণীকৃত ও প্রচারিত অদ্ভুতসাগর নামক গ্রন্থে ঐন্দ্রী মহাশান্তির বিবরণ হয় ত মিলিলেও মিলিতে পারে। অদ্ভুতসাগরে বহুবিধ অদ্ভুত দৈব-বিপত্তি এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় লিখিত আছে। কাশী হইতে পণ্ডিত মুরলীধর ঝা জ্যোতিষাচার্য্যের সম্পাদনে প্রভাকর কোম্পানী নামক পুস্তক-প্রকাশকগণ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানির একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বুলান্দসহর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বরাট মহাশয়ের কৃপায় এই পুস্তকের এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হই। বরাট মহাশয় দেবনাগর অক্ষরে লিখিত অদ্ভুতসাগরের একখানি চমৎকার পুথিও আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। নানারূপেই অদ্ভুতসাগর একখানি অসাধারণ গ্রন্থ। ভূমিকায় লিখিত আছে, ১০৮৯ শকে (১১৬৭ খৃঃ)

গ্রন্থখানি আরব্ধ হয় এবং গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া বল্লালসেন স্বর্গত হন। পুত্র লক্ষ্মণসেন গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া প্রচারিত করেন। গ্রন্থের শেষাংশ তাই লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হওয়াই খুব সম্ভব। এই শেষাংশে মৎস্যপুরাণ হইতে কতকগুলি অদ্ভুত ও তাহার শান্তিপ্রক্রিয়া উদ্‌ধৃত হইয়াছে। মুদ্রিত অদ্ভুতসাগরে এবং বঙ্গবাসী সংস্করণের মৎস্যপুরাণে এই অংশে কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে।. এই স্থানটিতেই ঐন্দ্রী মহাশান্তির উল্লেখ আছে। সামান্য সংশোধনের পর শ্লোকটি নিম্নরূপ ধারণ করে—

ভবিষ্যত্যভিষেকে চ পরচক্রভয়েষু চ।
স্বরাষ্ট্রভেদেঽরিবধে ঐন্দ্রীশান্তিস্তথেষ্যতে।

অনুবাদ।—"অভিষেক কালে, শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়, নিজের রাজ্যভঙ্গ হইলে পর অথবা শত্রুবধ কামনায় ঐন্দ্রী মহাশান্তি বিহিত এবং অভীপ্সিত হইবে।

ঐন্দ্রী মহাশান্তির অনুষ্ঠান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অনতিপূর্ব্বে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভঙ্গ হইয়াছিল, শত্রুর আরও আক্রমণ তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং শত্রুবধ তাঁহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই যে ইক্তিয়ারুদ্দিন কর্ত্তৃক আক্রমণ,—যে আক্রমণে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ লক্ষ্মণসেনের হস্তচ্যুত হইয়াছিল; এবং যে আক্রমণের জের তখন পর্য্যন্ত মিটে নাই, এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

কি ঘটিয়াছিল, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ঐন্দ্রী মহাশান্তির অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আমার "পরগণাতিসনের আরম্ভ-নির্ণয়" (Indian Antiquary, 1923) নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই সন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভঙ্গ বৎসর হইতে গণিত এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে ইহা আরব্ধ। ১২০২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসেই ইক্তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণ সঙ্ঘটিত হয়। লক্ষ্মণসেনের বয়স তখন তবকত্-ই-নাসিরি মতে ৮০ বৎসর। এই আক্রমণে পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশ এবং উত্তর-বঙ্গের পশ্চিমাংশ হারাইয়া লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিক্রমপুর হইতে ধার্য্যগ্রামে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইল। পরবর্ত্তী ২৭শে শ্রাবণ তারিখে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের ২৫শ সম্বৎসরে দৈবশান্তির উদ্দেশ্যে ঐন্দ্রী মহাশান্তি অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হয়। পূর্ব্ব-বরেন্দ্রীতে চলনবিলের পারে যাজক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের মধ্যে যেন একটু সাক্রোশ রসিকতার আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান-অধিকারের প্রায় সীমান্তে পুরোহিতকে গ্রাম দক্ষিণা দিয়া রাজা যেন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, পুরোহিতের শান্তি অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের জোর কত।

এই স্থানে মাধাইনগর শাসনের প্রাপ্তিস্থান মাধাইনগর গ্রামের অবস্থান প্রণিধান করা আবশ্যক। বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের সারা-সিরাজগঞ্জ লাইনটি সুপরিচিত। এই লাইনের উপর চাটমোহর ষ্টেশনটিও সুপরিচিত। প্রকৃত চাটমোহর কিন্তু ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল উত্তরে। চাটমোহর হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে তাড়াশ নামক বিখ্যাত স্থান। এই গ্রামটি চলনবিল নামক সুবিখ্যাত বিলের পূর্ব্বপারে অবস্থিত। তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান মাধাইনগর তাড়াশ হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। চাটমোহর হইতে তাড়াশ পর্য্যন্ত রাস্তাটিকেই চলনবিলের পূর্ব্বপার বলা যায়। মাধাইনগর গ্রামটি সিরাজগঞ্জের ঠিক ২৪ মাইল পশ্চিমে। পশ্চিম দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, নাটোর হইতে সোজা পূর্ব্বে ১৬ মাইল গেলে চলনবিলে উপস্থিত হওয়া যায় এবং চলনবিলের উপর দিয়া সোজা মাপিয়া তাড়াশ নাটোর হইতে ঠিক ২৪ মাইল পূর্ব্বে।

মাধাইনগর শাসনে প্রদত্ত গ্রামটির পরিচয় নিম্নরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্র্যাং কান্তাপুরাবৃত্তৌ রাবণসরসি ক্ষিস্থানে (?)···দাপণিয়া পাটকঃ।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রদত্ত গ্রামের নাম ছিল দাপণিয়া! উহা কান্তাপুর আবৃত্তির অন্তর্গত এবং বরেন্দ্রী প্রদেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত গ্রামটি রাবণ নামক হ্রদের নিকটবর্ত্তী ছিল, ইহাও বুঝা যাইতেছে। তাম্রশাসনের প্রাপ্তি-স্থানের অদূরেই প্রদত্ত গ্রামটি প্রথম খুঁজিতে হয়। দেখা যায়, তাড়াশ থানার পশ্চিমপ্রান্তে রাজসাহী জেলার সীমার মধ্যে চলনবিলের পারে কাঁটাবাড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। উহার চৌদিকস্থ পরগণা কাঁটারমহল নামে খ্যাত। ইহাই যেন প্রাচীন কান্তাপুর আবৃত্তি বলিয়া মনে হইতেছে। পাবনা জেলা খুঁজিয়া তিন স্থানে তিনটি দাপণিয়া নামক গ্রাম পাইয়াছি, কিন্তু কাঁটাবাড়ীর নিকটে কোন দাপণিয়া গ্রাম পাইলাম না। যাঁহাদের সুযোগ আছে, স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। বড় মৌজার নামের মধ্যে অনেক সময়ই ছোট গ্রামের পৃথক্ নাম সেটেলমেণ্ট বিভাগের মানচিত্র সমূহে প্রদর্শিত হয় না। এই অঞ্চলে রাবণ নামক একটি হ্রদের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, উহা চলনবিলেরই প্রাচীন নাম। দাপণিয়া খুঁজিয়া পাইলে সমস্তই ঠিক মত মীমাংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু ঐ অঞ্চলে যাইয়া নিজে অনুসন্ধান না করিলে দাপণিয়া খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মাধাইনগরের দুই মাইল উত্তরে নিমগাছি নামে পরিচিত একটি বিখ্যাত স্থান। এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরস্থ গোতীথা এবং ক্ষীরতলা নামক স্থানদ্বয় পর্য্যন্ত জুড়িয়া প্রাক্‌মুসলমান যুগে যে একটি বৃহৎ নগর ছিল, তাহার নানা প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই পরিধির মধ্যে প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক অনেকগুলি বিরাট্ বিরাট্ দীঘি খনিত দেখা যায়। একটি দীঘি প্রায় অর্দ্ধ মাইল লম্বা। আর গুটি পাঁচেক দীঘিও আয়তনে প্রায় অনুরূপ বিশাল। এই সকল দীঘির পরে প্রাচীন আমলের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক পাথরের মূর্ত্তি এই স্থানে মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি এই ধ্বংসাবশেষ সমূহের দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় প্রবাদ এই, সেনবংশের অচ্যুতসেন নামক ব্যক্তির ইহা অধিষ্ঠান ছিল। সম্ভবতঃ মুসলমান-অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে সেনরাজ এখানে অচ্যুতসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন।

২। ভাওয়াল শাসনে প্রাপ্তব্য তথ্যাবলি

(ক) লক্ষ্মণসেনের রাণীগণের নাম

ভাওয়াল-রাজাবাড়ী তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনের দুই জন রাণীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা শূয়া দেবী এবং কল্যাণ দেবী। শূয়া দেবী নামটি একটু অসাধারণ, বাঙ্গালা দেশে এই নাম পরিচিত নহে।

লক্ষ্মণের পিতা বল্লালসেনের নামটিও অমনি বাঙ্গালা দেশের সাধারণ প্রচলিত নাম নহে। উভয় নামই দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের তিনখানা শাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনের শাসনে দেখা যায়, তাঁহার মায়ের নাম তাড়া দেবী। লক্ষ্মণপুত্র বিশ্বরূপসেনের একখানা তাম্রশাসনে দেখা যায়, তাঁহার মায়ের নামও তাড়া দেবী। কিন্তু এই রাজারই অপর একখানা তাম্রশাসনে দেখা যায়, তাঁহার মায়ের নাম অহ্লনা দেবী। একই মানুষের দুই জন মা থাকা সম্ভবপর নহে, কাজেই এই শেষ দুইখানি তাম্রশাসনের পাঠে ও ব্যাখ্যায় কিছু গলদ রহিয়া গিয়াছে নিশ্চয়। মোট কথা এই যে, এই শাসন তিনখানি হইতে লক্ষ্মণসেনের আরও দুই জন রাণীর নাম আমরা জানিতে পারিলাম, যাঁহাদের পুত্রগণ লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কাজেই লক্ষ্মণসেনের মোট চারি জন রাণীর নাম আমরা জানিতে পারিলাম, যথা—তাড়া, অহ্লনা, শৃয়া এবং কল্যাণ দেবী।

খ। লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিকগণ

সান্ধিবিগ্রহিক পদ প্রাচীন আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। প্রথম ভাগে ছিলেন নারায়ণ দত্ত। চারিখানা শাসনে তাঁহারই নাম পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ সম্বৎসরের শক্তিপুর শাসনে ত্রিপুরারিনাথের নাম পাওয়া যায়। মাধাইনগর শাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নামাঙ্কনের স্থানটি ক্ষয়িয়া গিয়াছে, কাজেই নামটি পাঠ করা যায় না। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম শঙ্করধর। নামটি দেখিয়া মনে হয়, উমাপতিধর নামের সহিত ইহার সাদৃশ্য স্পষ্ট। উভয় ভ্রাতা হওয়া অসম্ভব নহে।

গ। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের তারিখ

ভাওয়াল-শাসনের তারিখ অতি স্পষ্ট—২৭ রাজ্য-সম্বৎসর, ৬ই কার্ত্তিক। ইহা খৃষ্টাব্দের ১২০৪এর অক্টোবর-নবেম্বর। ইক্তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণে ১২০২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে লক্ষ্মণসেন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ হারাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেও তিনি যে অন্ততঃ আরও দুই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন তাহার অকাট্য প্রমাণ। শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের "রসৈকবিংশে" অর্থাৎ ২৭ সম্বৎসরে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া যে উক্ত পুস্তকের পুষ্পিকায় লিখিত আছে, এত কাল সেই উক্তি সসন্দেহে গৃহীত হইত। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের তারিখ দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইল। লক্ষ্মণসেন আর কত দিন বাঁচিয়াছিলেন, বলিবার উপায় নাই। এই সময় লক্ষ্মণসেনের বয়স ৮২-৮৩ বৎসর হইয়া থাকিবে। সেন-রাজগণের বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণ—তিন জনেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিজয়ের ৬১ বৎসর রাজত্বে পুত্র-পৌত্র উভয়কেই প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিতে হয়।

তাম্রশাসনের শেষে নিবন্ধন বা রেজিষ্ট্রেশন এবং দাতা ও সাক্ষিগণের সাঙ্কেতিক নামাঙ্কন থাকে। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে এই সমস্ত নিবন্ধনাদির একটু আতিশয্য দেখিয়া মনে হয়, গ্রহীতা তাঁহার দলিলখানিকে বিশেষরূপে পোক্ত করিয়া লইয়াছিলেন,—কারণ, রাজা যে আর বেশী দিন বাঁচিবেন, সে ভরসা তাঁহার ছিল না। নিবন্ধনাদি নিম্নরূপে খোদিত আছে।

শ্রী নি মহাসাং নি। শ্রীমদ্রাজ নি। শ্রীমদনশঙ্কর নি। শ্রীমত্‌ সাহসমল্ল নি।

প্রথম নিবন্ধনে কাহারও নাম বা উপাধি নাই। উহা সম্ভবতঃ দেবতার উল্লেখ। সমস্ত দলিলেই তিনিই প্রধান সাক্ষী। পরে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নিবন্ধন। পরে রাজার ব্যক্তিগত নিবন্ধন। পরে তাহার উপাধিগত নিবন্ধন। পরে সাহসমল্লের নিবন্ধন। সম্ভবতঃ যুবরাজের উপাধি ছিল সাহসমল্ল।

ঘ। ভাওয়াল-শাসনে ঐতিহাসিক তথ্যাবলি

ভাওয়াল ও মাধাই-নগর শাসনে পদ্যাংশে কোন প্রভেদ নাই। গদ্যাংশে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মাধাই-নগর শাসনের গদ্যাংশের পাঠ আজিও সম্যক্ উদ্ধৃত হয় নাই। পদ্যাংশে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলির উল্লেখ আছে :—

১। তাঁহার "কৌমারকেলি" ছিল—"দৃপ্যদ্গৌড়েশ্বর—শ্রীহঠহরণ কলা"—অর্থাৎ কুমারকালে, প্রথম যৌবনে, ১১।২০ বছর বয়সে, তিনি অহঙ্কার ও বলদৃপ্ত গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ পালরাজের শ্রী বা সমৃদ্ধি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের দেওপাড়া বা প্রদ্যুম্নেশ্বর শাসনে আছে, তিনি "গৌড়েন্দ্রমদ্রবৎ"—গৌড়েন্দ্রকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগরে লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালের বাহুকে—"গৌড়েন্দ্রকুঞ্জর"কে বাঁধিবার "আলানস্তম্ভ" বা খুঁটা বলা হইয়াছে। বিজয়সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। বল্লালের রাজত্বকাল ১১৬০ হইতে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে শেষ পালরাজ গোবিন্দপাল বল্লালসেন কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হ'ন। বিজয়সেনও পালরাজের নিকট হইতে বরেন্দ্রীর কতক অংশ নিশ্চয়ই অধিকার করিয়া থাকিবেন, কারণ, তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের অবস্থান দেওপাড়া গ্রাম রাজসাহী সহরের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। বিজয়সেনের সহিত ১১৪০ খৃষ্টাব্দে নিমদীঘি গ্রামে পালবংশীয় তৃতীয় গোপালের যে মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় (বসুমতী,—শ্রাবণ, ১৩৪৯ মদীয় "বাঙ্গালার মহশ্মশান নিমদীঘি" দ্রষ্টব্য), লক্ষ্মণসেনের কৌমারকেলিতে দৃপ্ত গৌড়েশ্বরের শ্রী বলপূর্ব্বক হরণ সেই যুদ্ধেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবে।

২। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী, ও মাধাইনগর শাসন মতে লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় কীর্ত্তি—লক্ষ্মণসেনের যৌবনে (পরাজিত ও ভীত) কলিঙ্গরাজ যুবতীগণ উপঢৌকন দিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষবিধান করিতেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতেও কলিঙ্গ নৃপতিকে দ্রুত পরাজিত করার কথা আছে। এই ঘটনা লক্ষ্মণসেনের ২৫।২৬ বছর বয়সে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিলে ইহাই তাঁহার "যৌবনকেলি," এবং ইহা ১১৪৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী ঘটনা।

৩। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন এবং মাধাইনগর শাসন মতে তৃতীয়তঃ লক্ষ্মণসেন কাশীরাজকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন বরেন্দ্রী ও বিহার অধিকার করিয়া পাল-রাজবংশের রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধন করিলে, কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজগণের সহিত সেন-রাজগণের

সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সেন-শাসনাবলিতে গাহড়বাল রাজগণকেই কাশীরাজ বলা হইয়াছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র ১১৫৪ হইতে ১১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপুত্র জয়চন্দ্র ১১৭০ হইতে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া সিহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। লক্ষ্মণসেন কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শাসনে এবং তাঁহার পুত্রগণের শাসনে কাশীরাজের সহিত যুদ্ধে জয়ের সদম্ভ দাবী সত্ত্বেও বুঝা যায়, যুদ্ধের ফলাফল সেনরাজগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই। ইক্তিয়ারুদ্দিনের হস্তে অতি সহজে বিহারের পতন দেখিয়া মনে হয়, সেন-গাহড়বাল দ্বন্দ্বের ফলে বিহার অরাজক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিহারের রক্ষাকর্ত্তা কেহ ছিল না, গ্রাসেচ্ছু ছিল বহু। কাজেই বিবদমান পশুরাজদ্বয়ের শিকারের মত বিহারকে আগন্তুক ইক্তিয়ারুদ্দিন যখন অসহায় মৃগের মত গ্রাস করিলেন, তখন সেনরাজ বা গাহড়বাল-রাজ, কেহই বিহারের রক্ষার্থে অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

৪। এই শাসনদ্বয় মতে লক্ষ্মণসেনের চতুর্থ গৌরব,—তাঁহার তরবারিভীত প্রাগ্জ্যোতিষেন্দ্র আসিয়া তাঁহার শরণ লইয়াছিলেন। মাধাইনগর শাসনে অধিকন্তু আছে, লক্ষ্মণসেন ছিলেন "বিক্রমবশীকৃত কামরূপ।" কামরূপ-রাজের সহিত বর্ম্মদের আমল হইতেই বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। পাল, বর্ম্ম ও সেনরাজ, সকলেই কামরূপ রাজকে পর্য্যায়ক্রমে জয় করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। বিজয়সেন "অপাকৃত কামরূপ।" পৌত্র লক্ষ্মণসেন "বিক্রমবশীকৃত কামরূপ।" কামরূপ রাজ্য এই সময় যেন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের আমলেও কামরূপরাজ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

৫। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে লক্ষ্মণসেনের প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণাবলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট বিশেষণ নিম্নলিখিত দুইটি :—

ক। নিজভুজমন্দরামন্দরপ্রমথিতাসীমসমরসাগরসমাসাদিতগৌড়লক্ষ্মীঃ। অর্থাৎ নিজের বাহুরূপ মন্দর দ্বারা অমন্দর অর্থাৎ ভীমবেগে অসীম সমরসাগর মন্থন করিয়া তিনি গৌড়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খ। বীরসকলকুশেশয়বিকাশবাসরংকর। অর্থাৎ তিনি বীররূপ কমল সমূহের বীরত্ব বিকাশে ভাস্করের সদৃশ ছিলেন।

এই দুইটি বিশেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইক্তিয়ারুদ্দিনের ১২০২ খৃষ্টাব্দে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া নদীয়ালুণ্ঠন এবং সেন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাঢ়া ও বরেন্দ্রীর কতক কতক অংশ অধিকার অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য, সন্দেহ নাই। তবকত্-ই-নাসিরি পাঠে মনে হয় না যে, ইক্তিয়ারুদ্দিন বিশেষ বাধা পাইয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমান-শাসন যে ইক্তিয়ারুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে শত বর্ষকাল আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ঐ সীমানা ছাড়াইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, উহাও অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য। এ পর্য্যন্ত আমরা এই ঘটনার মুসলমান-ঐতিহাসিক লিখিত বিবরণই পাঠ করিয়া আসিতেছি। সমগ্র উত্তর-ভারত যখন মুসলমানের অধীনে চলিয়া গিয়াছে, তখন ৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ রাজার পক্ষে কতকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা প্রকাশ করা স্বাভাবিক। প্রথম আঘাতের বিহ্বলতায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বিশেষণগুলি দেখিয়া বুঝা যায়, পরে "গর্গযবনান্বয়প্রলয় কালরুদ্র" পুত্রগণের সহায়তায় বিষম সমরসাগরের মন্থনদণ্ড বাহু এই বীর-ভাস্কর রুখিয়া দাঁড়াইয়া নিজের অবশিষ্ট রাজ্যাংশ রক্ষা করিয়া প্রশংসনীয় শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন,—উত্তর-ভারতের অন্য কোন রাজা শেষ পর্য্যন্ত এই পরিচয় দিতে পারেন নাই। নদীয়ালুণ্ঠনের দশ মাস মাত্র পরে মাধাইনগর তাম্রশাসন দ্বারা মুসলমান-রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে চলনবিলের পারে ব্রাহ্মণকে ভূমি দান দেখিয়া মনে হয়, সেনবংশীয় অচ্যুতসেন যেন নিমদীঘিতে সদম্ভে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া মুসলমানগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিলেন। ক্ষণবিজয়ী মুসলমান-বিজেতা ঐ সীমা পার হইতে পারে নাই। তিব্বত জয় করিতে যাইয়া ইক্তিয়ারুদ্দিন কামরূপরাজের হস্তে ১২০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে গুরুতর পরাজিত হইয়া সমস্ত সৈন্য হারাইয়া দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষ্মণাবতীর ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য, মুসলমান আক্রমণের আদিযুগের সিন্ধুরাজ্যের মত, আর বাড়িবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই লক্ষ্মণসেনের ক্ষণিক পরাজয় সত্ত্বেও, নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে,—এই non-martial raceপূর্ণ বাঙ্গালী রাজ্যে আসিয়াই সেই বন্যাকে প্রতিহত হইতে হইয়াছিল,—যাহা উত্তর-ভারতের মহা মহা বীরপূর্ণ রাজ্যসমূহকে গ্রাস করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে অল্পায়াসেই সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এম-এ, পি-এইচ-ডি)

দ্বন্দ্বের দান

দ্বন্দ্বেরি মাঝে আপনারে মোরা চিনি,
বিরোধীরে জিনে নিজেরেই মোরা জিনি।
সুপ্ত শক্তি তাহাতেই পায় প্রাণ,
তাহা যে কতটা জানি তার পরিমাণ।
দ্বন্দ্ব-বিরোধে যে জন এড়ায়ে চলে,
লভি জড়ত্ব মরে সেই পলে পলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কোষ্ঠীফল ও ভাগ্যবল

[গল্প]

১

"পড়িতে পারে," "পড়িবার সম্ভাবনা," "পড়িবে"—নানা মতের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া অবশেষে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের এক রাত্রিতে কলিকাতায় সত্য সত্যই জাপানী বিমান হইতে বোমাপাত হইল। বিপদের বাঁশী পূর্ব্বেও দুই দশ বার বাজিয়াছিল—কিন্তু বিপদ দেখা দেয় নাই, এ বার বিপদ দেখা দিল। এক বৎসর পূর্ব্বে—ব্রহ্ম আক্রান্ত হইলে যখন কলিকাতা হইতে লোকাপসরণের চেষ্টা হইয়াছিল, তখন যাঁহারা "ডরে বড়ে" স্থান ও অস্থান বিচার-বিবেচনাও না করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নতার সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা—প্রথম রাত্রিতে বোমাপাতের পর—মনে করিলেন, এ বার আর কোথাও যাইবেন না। তাহার কারণ, যাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ধনে বা প্রাণে অথবা ধনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কেহ বা দুই মাস, কেহ বা ছয় মাস, কেহ বা নয় মাস পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতে কলিকাতায় ভয়ের আর কোন কারণও ঘটে নাই। কিন্তু প্রথম দিনের বোমাপাতে যাঁহারা বিচলিত হয়েন নাই, পরদিন তাঁহাদিগের সঙ্কল্প শিথিল হইল এবং পর পর তিন রাত্রিতে যখন বোমাবর্ষণ হইল এবং তৃতীয় রাত্রিতে কলিকাতার উত্তরাংশে কয়টি বোমা পড়িল, তখন অনেকেরই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল। সর্ব্বপ্রথম দুই সম্প্রদায়ের অবাঙ্গালী স্থানত্যাগে প্রবৃত্ত হইল—তাহারা মনে করিল, কলিকাতায় আগমন ত অর্থার্জ্জনের জন্য; প্রাণ যদি থাকে, তবেই অর্থার্জ্জন সম্ভব হয়—সুতরাং প্রাণ বিপন্ন করিয়া অর্থার্জ্জনের কোন প্রয়োজন নাই। মাড়বারী ব্যবসায়ী ও পশ্চিমা—যুক্ত-প্রদেশ, বিহার প্রভৃতির অধিবাসীরা "বোম্‌পাট" হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমেই "ঝড়ের আগে শুকনা পাতার" মত ব্যবহার করিল। উড়িয়ারা তাহাদিগের অনুসরণ করিল। প্রথমে দুই শ্রেণীর লোক কলিকাতা ত্যাগ করিল—ধনী ও দরিদ্র। তখনও ট্রেণে লোকাপসারণের ব্যবস্থা হয় নাই বলিলেই হয়, সেই জন্য ধনীরা—নানা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উপায়ে—টিকিট সংগ্রহ করিতে পারিলেও দরিদ্ররা পারিল না; তাহারা কেহ বা আপনাদিগের গোযানে—অনেকেই পদব্রজে যাত্রা করিল। হাওড়ার সেতু অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইল—মোটর যান, ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, রিক্‌সা—সর্ব্ববিধ যানের ভাড়া চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ হইল। রেল-ষ্টেশনে প্রবেশ করা অসাধ্য-সাধন হইয়া উঠিল।

যাঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নারায়ণচন্দ্র অন্যতম। তিনি যে বংশের—এক শাখার একমাত্র উত্তরাধিকারী, সে বংশের বংশপতি এ দেশে বৃটিশ শাসনের আরম্ভ-কালে কার্য্যব্যপদেশে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পৈত্রিক গ্রামের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করেন নাই এবং তথায় রাজবাড়ী, দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের ঐশ্বর্য্যের ও অর্থের সদ্ব্যবহার-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু কর্ম্মকেন্দ্র ও বিলাসকেন্দ্র কলিকাতাও তাঁহাদিগের দ্বিতীয় বাসস্থান ছিল এবং দ্বিতীয় হইলেও তাহাই আদরে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ববার যখন কলিকাতা ত্যাগের হিড়িক হইয়াছিল, তখন নারায়ণচন্দ্রের পরিবারস্থাগণ গ্রামে গিয়াছিলেন—গৃহ-দেবতার "নিয়ম সেবা" ও বার মাসে তের পর্ব্বের জন্য সকলেই ফিরেন নাই, তবে একাংশ কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। নারায়ণচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। তিনিই সেই পরিবারের কেন্দ্র এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পিতামহী, মাতা প্রভৃতি তাঁহার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনের মত পাত্রীর সন্ধান পাইতেছিলেন না। কোন পাত্রী "বড় রোগা", কেহ বা "বেঁটে", কেহ বা "ঢ্যাঙ্গা" প্রভৃতি "ত্রুটি"তে বর্জ্জিত হইতেছিল—বর্ণের জন্য যে অনেক বাছাই হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। বিগত শত বর্ষে যাঁহারা এই পরিবারে বধূরূপে গৃহীতা হইয়াছেন, তাঁহারা কুলের ও রূপের ছাড়-সমন্বয়েই আসিয়াছেন। তাহার উপর আবার কোষ্ঠীবিচার ছিল। যদিও কোষ্ঠীবিচার এই পরিবারে বধূদিগকে বৈধব্য হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, তবুও তাহা প্রথায় দাঁড়াইয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নারায়ণচন্দ্রের পক্ষে—বিশেষ তাঁহার পরিবারস্থাদিগের পক্ষে কামরা নিজস্ব না করিয়া ট্রেণে ভ্রমণ চলিত হয় নাই। সেই জন্যই সোমবার, মঙ্গলবার দুই দিন যাইবার উপায় হয় নাই! কারণ, পূর্ব্ব হইতেই যেরূপ কামরা ভাড়া হইয়াছিল, তাহাতে অপেক্ষা করা ব্যতীত উপায় ছিল না।

যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। নারায়ণচন্দ্র পরিবারের একমাত্র পুত্র হইলেও পরিবারের সনাতন প্রথানুসারে বিধবা পিসী, পিতামহীর ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি তাঁহাদিগের সন্তানাদিসহ সেই সংসারভুক্তই ছিলেন এবং তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিও শিক্ষালাভার্থ কলিকাতায় নারায়ণচন্দ্রের গৃহেই থাকিতেন। লোক তাঁহাদিগের কথায় বলিত—"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহেন।"

বুধবারেও যখন কামরা ভাড়ার উপায় হইল না এবং রেলের কর্ম্মচারীরা কবে কামরা পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে কোন স্থির-সিদ্ধান্ত জানাইলেন না, তখন চেষ্টার মাত্রা-বৃদ্ধি করিতে হইল এবং বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে সংবাদ পাওয়া গেল, পরদিন অপরাহ্ণে যে ট্রেণ যাইবে, তাহাতেই নারায়ণচন্দ্রের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাযুক্ত গাড়ী এবং ভৃত্যাদির জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকলে স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন। সুখের বিষয়, বুধবার রাত্রিতে জাপানী বিমান দেখা যায় নাই—বোমাপাত ত পরের কথা, বিপদবাঁশীও বাজে নাই! শীতের রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই। সকলেই ভাবিলেন—বাঁচা গেল! কোনরূপে একটা রাত্রি কাটিলেই বিপদের স্থান হইতে যাইতে পারিবেন।

২

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর অনেক সময় হয় অন্যরূপ। বৃহস্পতিবার দিন ভালয়-ভালয় কাটিল বটে, কিন্তু রাত্রির সম্বন্ধে তাহা বলা

গেল না। সেই কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর সুযোগ জাপানী বিমান অবহেলা করিল না—সদলে অভিসারে বাহির হইল। রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময়, যখন অনেক গৃহেই গৃহস্থরা আহারে বসিয়াছেন বা বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বিপদবাণী বাজিয়া উঠিল; আর তাহার পরেই বোমার বিস্ফোরণধ্বনি ও বিমান-বিধ্বংসী কামানের মুখ হইতে ধ্বনি ও অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। সে দিনের আক্রমণের তুলনায় পূর্ব্বের তিন দিনের আক্রমণ ক্ষীণ প্রতীয়মান হইল এবং আক্রমণের কালও অধিক হইল। সে রাত্রিতে বিপদ-বারণ-বাণী মধ্যরাত্রিরও পরে বাজিল।

সে রাত্রিতে অনেক গৃহের মত নারায়ণচন্দ্রের কলিকাতার গৃহেও নিদ্রার শুভাবির্ভাবে বাধা ঘটিল এবং বিনিদ্র রাত্রির দীর্ঘ অবসরে আশঙ্কায় বিপদের সম্ভাবনা কেবল অতিরঞ্জিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। বালক-বালিকারা কান্দিতে লাগিল—মহিলারা প্রভাতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—"কালরাত পোহাইলেই হয়—কলিকাতার যমপুরীতে আর বাস নহে।"

প্রভাত হইল, কিন্তু যাইবার উপায় কি? সত্য সত্যই ত আর বোমার ভয় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়া যায় না! কিন্তু নারায়ণচন্দ্র নানারূপে বুঝাইয়াও তাঁহাদিগকে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত করিতে পারিল না। শেষে তাহার সুপরামর্শে উদ্দেশ্যের আরোপ হইতে লাগিল—কোন কোন মহিলা বলিতে লাগিলেন, "আজকালকার ছেলে—এদের কথা শুনলে সবংশে নিধন হ'বে।" কিন্তু উপায় কি? তাঁহারা বলিলেন, "উপায় হয় না! 'কড়িতে বাঘের দুধ মিলে' আর ট্রেণে কামরা পাওয়া যায় না?" কামরা যে পাওয়া যায় না, তাহা যত সত্যই কেন হউক না, যাঁহারা তাহা বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে কে তাহা বুঝাইতে পারে? সমস্ত দিনে কি ট্রেণ নাই? দেখা গেল, বেলা একটায় একখানি ট্রেণ ঐ পথে যায়। তখন কলরব উঠিল, ঐ ট্রেণে যাইতেই হইবে। বন্যার জল যখন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হয়, তখন হাত দিয়া তাহার গতিরোধ করা যেমন অসম্ভব, নারায়ণচন্দ্রের পক্ষে তেমনই যুক্তি দিয়া সেই অসম্ভব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করা অসম্ভব হইল। যাঁহারা পারিবারিক প্রথানুসারে পাল্কীতে প্ল্যাটফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ট্রেণের কামরায় উঠেন, তাঁহারাও যখন যোদ্ধার উপযোগী সাহসের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহারা যেমন করিয়াই হউক যাইয়া গাড়ীতে উঠিবেন—বিপদে নিয়ম নাই—তখন আর কি বলা যায়? সে ক্ষেত্রে যুক্তির অবকাশ থাকে না।

বাধ্য হইয়া নারায়ণচন্দ্রকে সম্মতি দিতে হইল। তবে সে জানিত, হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং তাহা জানিয়া সে কি করিবে তাহাও স্থির করিয়া লইয়াছিল।

তখন রন্ধনের আয়োজন হইল এবং ও দিকে গোযানে মালপত্র পাঠান চলিতে লাগিল। স্থির হইল, সকলে বেলা এগারটায় ট্যাক্সীতে বাহির হইয়া বালী-সেতুর পথে ঘুরিয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিবেন; কারণ, বুধবারে এক ভদ্রলোকের দুর্দ্দশার সংবাদ সহরে রটিয়া গিয়াছিল। হাওড়ার সেতুর মুখে কলিকাতার দিকে যান হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি যখন ৩২টি কুলীর মাথায় মাল চাপাইয়া সপরিবারে হাওড়ার দিকে অগ্রসর হয়েন, তখন তাঁহাকে জনতায় গৃহিণী ও পুত্রবধূদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হওয়ায় একটি কুলী যে বাক্স লইয়া অদৃশ্য হয়, তাহাতে প্রায় দুই হাজার টাকার জিনিষ ছিল। সে বাক্সও পাওয়া যায় নাই—বাক্সের অধিকারীরা ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেও পারেন নাই।

গৃহের মহিলাদিগের—বিশেষ তাহার মা, পিসীমা ও পিতামহীর ভীরুতাজনিত দৌর্ব্বল্য ও অভ্যাসজনিত জড়ত্ব নারায়ণচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা তাহাকে যে ভাবে "মানুষ করিয়াছেন" তাহাতে অনেক সময় তাহার হাসি পাইয়াছে; সেকালে যখন কাবুল হইতেই আঙ্গুর আমদানী হইত, তখন যে ভাবে তুলায় দ্রাক্ষাফল ঢাকিয়া বাক্সে রাখা হইত, তাহাকে তাঁহারা যেন সেই ভাবে "মানুষ করিয়াছেন।" তাহার আলজিহ্বার বৃদ্ধি নিবারণের জন্য তাঁহারা কিছুতেই অস্ত্রোপচার করিতে দেন নাই। তাঁহারা যে জনারণ্যে কখনই প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং অপরিচিত যাত্রীদিগের সহিত ট্রেণের কামরায় যাইতে পারিবেন না, তাহা সে জানিত। কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া কয় ঘণ্টাকাল কলিকাতায় রাখা অসাধ্যসাধন বুঝিয়া সে, সে বিষয়ে চেষ্টা করে নাই।

ষ্টেশনের নিকটে যখন তাঁহারা জনতা ও সেই জনতাকে সংযত করিবার জন্য পুলিসের লাঠি-চালনা লক্ষ্য করিলেন, তখন মহিলারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিলেন। কিন্তু উপায় কি? তখন সেই অবস্থায় তাঁহারা শেষ সম্বল বাহির করিলেন—অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া নারায়ণচন্দ্র যাহা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিল—ট্যাক্সীতেই সকলে বাদশাহী সড়কে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে যাইবেন এবং তথায় অপরাহ্ণের যে ট্রেণে তাঁহাদিগের জন্য কামরা থাকিবে, তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

প্রস্তাব শুনিয়া মহিলারা তখন অকূলে কূল পাইলেন।

ট্যাক্সী-চালকগণ সুযোগ পাইয়া যে টাকা ভাড়া চাহিল, তাহা যত অসঙ্গত অধিক হউক না কেন, তাহাতেই সম্মত হওয়া ব্যতীত গতি ছিল না।

অনেক জিনিষ দ্বারবানের দল গো-যানের বা মহিষ-যানের সঙ্গে থাকিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। কয় জন ভৃত্য ও দাসী অপরাহ্ণের ট্রেণে, সে উপায়েই হউক, যাইবে স্থির রহিল।

কাহারও লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইল না যে, আহার্য্যের পাত্রগুলি, এমন কি জলের কুঁজাও সঙ্গে লওয়া হইল না।

পথে জনতা—অতি সাবধানে, গতি সংযত করিয়া ট্যাক্সী-চালকগণ যান চালাইয়া অবশেষে ব্যাণ্ডেল রেলষ্টেশনে উপনীত হইয়া যাত্রা নামাইয়া যে ভাড়া চাহিয়াছিল, তাহা লইয়াও আবার বক্সিসের জন্য হাত পাতিল। সঙ্গে ম্যানেজার বাবু ছিলেন। তিনি তখন যেন "উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে"—যানচালকদিগকে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "অনেক ঠকাইয়াছ—আর এক পয়সাও পাইবে না!"

৩

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে উপনীত হইয়া সকলের নানা দ্রব্যের অভাব অনুভূত হইল; বালক-বালিকারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আসিবার সময় ভাত আর ডাইল ব্যতীত কিছুই রন্ধন হয় নাই। কিন্তু উপায় কি? ষ্টেশনে যে আহার্য্য পাওয়া যায়, তাহা খাইতে বা কাহাকেও খাইতে দিতে নারায়ণচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল—সে সকল রোগ

ডাকিয়া আনে। শেষে ষ্টেশনে যতগুলি কমলালেবু ছিল, সবগুলি কিনিয়া লইয়া তাহাই বালক-বালিকাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া সকলে সন্ধ্যার ট্রেণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইল—চন্দ্রালোক বোমার ভয়ে আপনাকে নির্ব্বাপিত করে না। আর ষ্টেশনে কলিকাতার আলোক নিয়ন্ত্রণের নিয়ম না থাকায় বহু দিনের পর যেন একটা নূতনত্ব অনুভূত হইতে লাগিল।

ম্যানেজার বাবু ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, সকলকে সুষ্ঠুভাবে কামরায় তুলিয়া দিতে যদি ট্রেণ দুই চারি মিনিট বিলম্বে ছাড়িতে হয়, তিনি তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

দুঃখ, দুর্দ্দশা, আশঙ্কা, বিপদ—সময়কে দীর্ঘ অনুভব করায়, অপেক্ষার যেন শেষ নাই এমনই অনুভব করায়। কিন্তু সময়ের শেষ আছে—অপেক্ষার অন্ত হয়। সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রে কি বাজিয়া উঠিল। ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া নারায়ণচন্দ্রের ম্যানেজার বাবুকে বলিলেন, ট্রেণ আসিতেছে—সকলে প্রস্তুত হউন।

সকলে ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন। ছেলেরা প্রায় সমস্ত দিন অনাহারে ও আতঙ্কে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। তাহাদিগকে ধমকাইয়া ও অনুরোধ করিয়া সজাগ করা হইল। তাহার পর সকলে প্লাটফর্ম্মে আসিলেন। সকলেরই যে যথেষ্ট আবরণ-বস্ত্র ছিল, তাহাও নহে—যে বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল, তাহা কেহ পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই।

শেষে দূরে এঞ্জিনের আলোক দেখা গেল এবং শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—বিদীর্ণ করিয়া এঞ্জিনের বাঁশী শুনা গেল। ট্রেণ অগ্রসর হইল—রেলের শ্রমিক ও বেসরকারী শ্রমিক সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল—অন্য যাত্রীরাও কলরব করিতে লাগিল।

ট্রেণ আসিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন—নারায়ণচন্দ্রের সহযাত্রীরা উঠিতে না পারা পর্য্যন্ত ট্রেণ ছাড়িতে দিলেন না। মহিলাদিগের মধ্যে কয় জন জীবনে কখন এই ভাবে ট্রেণে উঠেন নাই; তাঁহাদিগের উঠিতে বিলম্বও হইল। দাসদাসী যাহারা মধ্যাহ্ন হইতে অপেক্ষা করিয়া অপরাহ্ণের এই ট্রেণে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি দ্রব্যাদি প্রভুদিগের কামরায় আনিয়া তুলিয়া দিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া সকলকে শীঘ্র যে যাহার কামরায় যাইতে বলিলেন—ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব হইলে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। তাঁহার সেই কথা ম্যানেজার বাবুকে তাঁহার প্রতিশ্রুত ব্যবস্থার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল।

ম্যানেজার বাবু নারায়ণচন্দ্রের নিকট বিদায় লইলেন; তিনি কলিকাতাগামী ট্রেণে ফিরিয়া যাইবেন। তথায় ভৃত্যগণ প্রভুদিগের যে অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যে আর সহজে কলিকাতায় থাকিতে চাহিবে না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—নারায়ণচন্দ্রেরও সেই আশঙ্কা ছিল। অথচ বিরাট্ গৃহে বিশাল ভৃত্যবাহিনী; তদ্ভিন্ন দুগ্ধের জন্ত অনেকগুলি গবী ছিল এবং মোটরযানের পেট্রল নিয়ন্ত্রণের ফলে গাড়ীর ঘোড়ার সংখ্যাও বাড়াইতে হইয়াছিল। এই বিপদে যে সব সম্পদ্ আপদ বলিয়া মনে হইতেছিল। সে সকল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল।

নারায়ণচন্দ্র ম্যানেজার বাবুকে অবাঞ্ছিত নির্দ্দেশ দিল—ভৃত্যদিগের বেতন যেরূপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তিনি যেন তাহাই করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কাযে রাখেন।

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, "ভগবান্ যা' করেন, ভালর জন্তই করেন। আগের বার যাবার সময় যে শ্রীধরকে বাড়ীতে পাঠিয়েছিলাম, সে তাঁরই ইচ্ছায়; নহিলে আজ কি বিব্রত হ'তেই হ'ত।"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আপনার কথাই ফলুক, কর্ত্তামা। কিন্তু কি জানি—বড় হিন্দুস্থানী ম্যানেজার বাবু বলছিলেন, যুদ্ধের কাযে সরকার বড় বড় বাড়ী 'গোরাদের' জন্ত নিচ্ছে; সে বাড়ী নিতে চেষ্টা করেছিল, কেবল তা'তে ঠাকুর থাকায় তাঁ'রা অব্যাহতি পেয়েছেন।"

পিতামহী উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তিনিই অব্যাহতি দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত ভাবনার কথা হ'ল ?"

এই সময় ট্রেণ চলিবার শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইল—ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা চীৎকার করিয়া সকলকে সতর্ক করিল—ট্রেণ ছাড়িতেছে।

বৃহদাকার সরীসৃপ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর কোন শব্দে চমকিত হইলে যেমন ভাবে চলিতে থাকে, ট্রেণ সেই ভাবে চলিতে লাগিল।

পিতামহী ম্যানেজার বাবুর কথার জের টানিয়া পৌত্রকে বলিলেন, "শুনলে ত ম্যানেজারের কথা ? এখন উপায় কি হ'বে ?"

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "কি হ'বে বলা দুষ্কর।"

"কোন উপায় করবে না ?"

পূর্ব্বরাত্রি হইতে এ পর্য্যন্ত তাহাকে যে ঝঞ্ঝাট "পোহাইতে" হইয়াছে, তাহাতে—এইরূপ অবস্থায় অনভ্যস্ত নারায়ণচন্দ্র বিরক্ত হইয়াছিল। সে বলিল, "উপায় করা ত আমার হাত নহে। বলছ, ঠাকুরের ইচ্ছায়ই তাঁ'কে কলিকাতা থেকে সরিয়েছিলে। হয়ত তাঁ'রই ইচ্ছা, বাড়ী সরকার দখল করে।"

পিতামহী যেন শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বল কি সর্ব্বনাশের কথা ?"

"এই যুদ্ধে কত দেশে কত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা' ত অনুমান করতে পার।"

"আমরা কি যুদ্ধ করছি ?"

"না। কিন্তু জানই ত, 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?' উপায় কি ?"

"তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত দেখছি।"

"উপায় যে নাই, ঠাকুরমা।"

"ও হিন্দুস্থানী ত অব্যাহতি পেয়েছে।"

"এক জনের যা' হয়, সকলেরই ত তা' হয় না। 'মরকতকুঞ্জ'ও যে সংস্কার নিয়েছে; মহারাজা ঠেকা'তে পারেন নাই।"

"চেষ্টা ত করতে হ'বে।"

"আমি তোমাদের রেখে ফিরে গিয়ে দেখি, কি করা কর্ত্তব্য।"

নারায়ণচন্দ্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'র মানে ?"

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "যে তাড়াতাড়ি করতে হ'ল, তা'তে ত কলিকাতার বাড়ীর ও দপ্তরের কোন ব্যবস্থাই করা হয়ে উঠে নাই।"

পূর্ব্ববার সকলের কলিকাতা ত্যাগের সময় দপ্তরের জন্যে দলিলপত্রাদি গ্রামের বাড়ীতে লওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু

সম্পত্তির দলিলপত্রাদি কলিকাতায় ছিল এবং কয় মাসে আবার কতকগুলি কাগজপত্র কলিকাতায় জমিয়াছে।

মা মনে করিলেন, তাঁহারা যে তাড়াতাড়ি করিয়াছেন, পুত্রের কথায় তাহার দিকে ইঙ্গিত ছিল। তিনি বলিলেন, "বিকেলে এলে যখন বাড়ী থেকে বেরুতে হ'ত, আমরা না হয়, তা'র চার পাঁচ ঘণ্টা আগেই বেরিয়েছি; তা'তেই কি ব্যবস্থার যত দেরী হ'ল?"

পিসীমা বলিলেন, "সে তুমি যা'-ই কেন বল না, তোমার এখন কলিকাতায় ফিরা হ'বে না। তোমার জীবনের দাম আর সকলের জীবনের দামের চেয়ে বেশী।"

তিনি তাঁহার মাতার দিকে চাহিলেন। তিনি তখনও কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতই সে গৃহে আদেশ। সেই জন্য তিনি বিবেচনা না করিয়া মত প্রকাশও করিতেন না।

তিনি মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই—তাঁহাকে সে অবসর না দিবার অভিপ্রায়ে—নারায়ণচন্দ্র বলিল, "আগে যাই। তা'র পরে আসবার কথা হ'বে।"

মা বলিলেন, "তুমি যা'-ই বল, এখন তোমার কলিকাতায় ফিরা হ'বে না।"

"কাষ?"

"ম্যানেজার বাবুকে লিখে দিলেই হ'বে।"

"তাঁ'র বুঝি প্রাণের ভয় থাকতে পারে না?"

কেহ সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কর্ম্মচারী কাষ করিবে।—তাহার প্রাণের ভয়?

মহিলাদিগের মধ্যে এক জন তত্ক্ষণে বালকবালিকা প্রভৃতির জন্য খাবার বাহির করিতেছিলেন। তিনি নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, "সারা দিন ত কিছু খাও নাই—এখন খেয়ে নাও।"

সারা দিন যে তাহার খাওয়া হয় নাই, তাহা তাহার ক্ষুধা নারায়ণচন্দ্রকে জানাইয়া দিতেছিল। সে বলিল, "হাতে মুখে জল দিয়ে আসি।" ভৃত্য তাহার দুইখানি তোয়ালে বাক্স হইতে বাহির করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতে গেল। দ্বারকর্ণ ঘুরাইয়া সে বুঝিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। সে বিস্মিত হইল, বলিল, "এ কি? এ কি ভিতর থেকে বন্ধ, না কি!"

সে সবলে দ্বারে আঘাত করিল।

মা বলিলেন, "কাষ নাই, হয়ত চোর লুকিয়ে আছে। পরের ষ্টেশনে দ্বারবানদের ডেকে খুলালেই হ'বে; বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?"

নারায়ণচন্দ্র কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে দ্বারে পদাঘাত করিল—হয়ত বলে আঘাত করিলেই দ্বার খুলিয়া যাইবে।

সে দুই বার পদাঘাত করিলেই ট্রেণের গমনশব্দের মধ্যে শুনা গেল, নারীকণ্ঠে কে বলিল, "আমি খুলে দিচ্ছি।"

সকলেই বিস্মিত হইলেন! মা'র আশঙ্কা বিস্ময়কে অভিভূত করিল; তিনি উঠিয়া যাইয়া পুত্রের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "চলে এস, নারায়ণ, আমি ভাল বুঝছি না—দ্বার বন্ধ—স্ত্রীলোকের গলা। কে জানে, কে কি ছলে ফিরছে?"

পিসীমা বলিলেন, "লক্ষ্মী বাবা, মার কথা শুন।" তিনি আর এক জনকে বলিলেন, "পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই দ্বারবানদের ডাকবে।"

তিনি বলিলেন, "তা'রা ত আসবেই।"

সে পরিবারের প্রথা, ট্রেণ ষ্টেশনে আসিলেই দ্বারবান এক বা দুই জন আসিয়া কামরার দ্বারে দাঁড়াইত।

ঠিক সেই সময়ে স্নানাগারের দ্বার খুলিয়া গেল—কামরার উজ্জ্বল আলোকে প্রভাতালোকে ফুলের মত এক তরুণী বাহির হইয়া আসিল।

৪

মা পুত্রের হাত ধরিয়া ছিলেন—ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া যাইলেন। পিসীমা শেষ কথা কখন আপনি না বলিয়া ছাড়িতেন না—তাঁহারও সঙ্গিনীকে কথা বলা হইল না। সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের কারণ—অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আবির্ভাব; মুগ্ধ হইবার কারণ—তাহার অসামান্য রূপ। সকলেই মনে মনে স্বীকার করিলেন—যে পরিবারে পুরুষানুক্রমে সুন্দরী বধূ-বরণের প্রথাহেতু পরিবার সুন্দর পরিবারে পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই পরিবারেও এমন সুন্দরী এখন কেহ নাই—পূর্ব্বেও যে অনেক আসিয়াছেন এমন খ্যাতি নাই। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী কল্পনার যুগ নহে—সে যুগে মানুষ যে বিজ্ঞানকেও মৃত্যুর ও ধ্বংসের রথে যুক্ত করে, তাহা কলিকাতায় বোমাপাতে সকলে বুঝিয়াছেন—যে সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আবির্ভাব, তখন সকলে যে যানে যাইতেছেন তাহা যাদুকরের সৃষ্টি নহে—বিজ্ঞানের আবিষ্কার-নৈপুণ্য ঘোষণা করিতে করিতে নৈশনিস্তব্ধতা নষ্ট করিয়া চলিতেছে; যে বিস্ফোরকপাতের জন্য তাঁহারা কলিকাতা হইতে পলাইতেছেন, তাহা পুষ্পক হইতে বর্ষিত হয় নাই—কলচালিত জাপানী বিমান হইতে পড়িয়াছে। এ সকল না হইলে সকলে মনে করিতেন—ব্যাপারটি অতিপ্রাকৃত—কোন দেবকন্যা তাঁহাদিগকে বর ও অভয় দিতে আসিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র।" কথা সত্য। কিন্তু কুসুম যেমন প্রস্ফুটিত হইলে যে সৌন্দর্য্যে শোভা পায়, প্রস্ফুটোন্মুখ অবস্থায় তদপেক্ষাও সুন্দর দেখায়, তেমনই কিশোরীর কোমল সৌন্দর্য্য যুবতীর বিকশিত সৌন্দর্য্যকেও অতিক্রম করে। আর যে কিশোরী সুন্দরী সে যদি সাশ্রুনয়না হয়, তবে—প্রভাতশিশিরসিক্ত ফুলের মত তাহার সৌন্দর্য্যে আর কোন অভাবই থাকে না। এই তরুণী যে কাঁদিয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন—সে তখনও কাঁদিতেছিল—তাহার চক্ষুতে অশ্রু প্রভাতপবনান্দোলিত কুসুমে শিশিরের মত টল টল করিতেছিল—তাহার দেহ রোদনোচ্ছ্বাসে সেই কুসুমেরই মত আন্দোলিত হইতেছিল।

সর্ব্বাগ্রে বুঝি নারায়ণচন্দ্রের মনে হইল, তাহাকে উপবিষ্ট হইতে বলা সঙ্গত, শোভন—হয়ত প্রয়োজন। কিন্তু অপরিচিতা কিশোরী সুন্দরীকে সর্ব্বাগ্রে কথা বলিতে সে লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিল। তাহার পিতামহীই সর্ব্বাগ্রে বলিলেন, "তুমি ব'স।" নারায়ণচন্দ্র স্বস্তি অনুভব করিল।

এক পার্শ্বের বেঞ্চে যে স্থানে নারায়ণচন্দ্র বসিয়াছিল, তথায় স্থান শূন্য দেখিয়া তরুণী সেই স্থানে বসিবার জন্য অগ্রসর হইলে পিতামহী বলিলেন, "এদিকে এস।" নারায়ণচন্দ্রের মাতা শাশুড়ীর

পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন, শাশুড়ী তরুণীকে তাঁহার শূন্যস্থান দেখাইয়া দিলেন। তরুণী আসিয়া তথায় বসিল।

মা পুত্রের হস্ত ছাড়িয়া দিলেন; পুত্র যে স্থানে বসিয়াছিল, আপনি যাইয়া যথায় বসিলেন—কিশোরীর সম্মুখে বসিলে তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিলেন; বলিলেন, "আমার কাছে বসিবে—এস।"

নারায়ণচন্দ্রের মনে হইল, বলে—তথায় ত অধিক স্থান নাই; সে দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিন্তু রহস্যময়ী তরুণীর সম্বন্ধে কৌতূহল তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। পিসীমা তাহাকে যে স্থানে বসিতে বলিলেন, তথায় বসিলে—স্থানের কিছু অভাব হইলেও, সে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে। সকলেই মনে করিলেন—যে পিতামহী এক সময়ে সমগ্র পরিবারে সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন—বয়স ও শোকও যাঁহার দেহ হইতে রূপ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, কেবল তাহাতে গাম্ভীর্য্যের স্নিগ্ধতাসঞ্চার করিয়াছে—জরাও যাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে যাইয়া—যেন দেবমূর্ত্তি অপহরণ করিতে যাইয়া অপহরণকারীর মত ইতস্ততঃ করিতেছে, এই তরুণীকে তাঁহার পার্শ্বেই শোভা পায়। নদীতে যখন জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়া তাহাকে পূর্ণ করে, তখন তাহার অবস্থা যেরূপ হয়—তরুণীর সেই অবস্থা; তাহার যে বয়স, তাহাতে যৌবন তাহার দেহে পরিপূর্ণতার লাবণ্য দিতেছে—কিন্তু কৈশোর তখনও তাহার অধিকার ত্যাগ করে নাই, যৌবনও আপনার অধিকার অনুভব করিতে পারিতেছে না। উভয়েরই অবস্থা সেই—"ন যযৌ ন তস্থৌ।" তাহার পরিধানে একখানি রক্তবর্ণের রেশমী শাড়ী—তাহার বর্ণের আভা তাহার মুখে পতিত হইয়া তাহার বর্ণের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে—সেই বর্ণের জামা তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া আছে; অঙ্গে অলঙ্কার অধিক নহে—কিন্তু সেগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, নক্সা সুরুচির পরিচায়ক। অলঙ্কারগুলিতেও বেশের মত, তাহার পিতৃগৃহের স্বচ্ছল অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশ কবরীমুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কেশের আতিশয্য ও দৈর্ঘ্য উভয়ই লক্ষ্য করিবার মত। সীমন্তে সিন্দুরের ও প্রকোষ্ঠে "লৌহের" অভাবে বুঝাইতেছিল, সে অবিবাহিতা।

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

তরুণী বলিল, "সাগরিকা।"

"'সাগরের' স্নানের দিন বুঝি তুমি জন্মেছিলে?"

"না। সমুদ্রতীরে পুরীতে জন্মেছিলাম ব'লে বাবা আমার ঐ নাম দিয়েছিলেন।"

"পুরীতেই তোমাদের বাড়ী?"

"না। আমাদের বাড়ী বীরভূম জিলায়; ঠাকুরদাদা প্রতি বৎসর ক' মাস সপরিবারে পুরীতে থাকতেন।"

"তাঁ'র নাম কি?"

"তাঁ'র নাম ধনদাকিশোর ঘোষ চৌধুরী।" সাগরিকা এতক্ষণ কথায় কথায় অন্যমনস্ক ছিল। বাড়ীর কথায় তাহার কত কথা মনে পড়িল। রোদনোচ্ছ্বাসে তাহার কথা পার্শ্বে উপবিষ্টা নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী ব্যতীত আর কেহ শুনিতেই পাইলেন না।

পিতামহী বলিলেন, "কাঁদছ কেন? তুমি ত আমাদেরই স্বজাত; হয়ত খুঁজলে সম্বন্ধও বেরুবে। নিশ্চয় জেন, তুমি বিপদে বা জলে পড় নাই। কাল বাড়ীতে পৌঁছেই তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাফ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করব; তাঁ'রা তা'র পেলেই নিশ্চয় চলে আসবেন। তাঁ'রা নিশ্চয়ই তোমার চাইতেও বেশী ভাবছেন।"

যিনি ছেলেদিগের জন্য আহার্য্য ভাগ করিতেছিলেন, তিনি এই ব্যাপারে তাঁহার কায যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাহা তাঁহার মনে পড়ায় তিনি বলিলেন, "ছেলেরা সব এস।" তিনি নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, "যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস।"

নারায়ণচন্দ্র তোয়ালে লইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিতে যাইবার জন্য উঠিল। তাহার মাতা বলিলেন, "ঘরটা ভাল ক'রে দেখে ঢুক।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কি ভয় হচ্ছে, আরও কেহ আছে?"

নারায়ণচন্দ্র স্নানের ঘরে গেল।

তাহার পিতামহী সাগরিকাকে বলিলেন, "তোমারও ত এতক্ষণ অনাহারে গেছে। এ বার তুমি গিয়ে মুখে-চখে জল দিয়ে এস; কিছু খাও।"

নারায়ণচন্দ্র স্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতামহী সাগরিকাকে বলিলেন, "তুমি যাও।" তিনি তাঁহার কন্যাকে বলিলেন, "একখানা গামছা কি তোয়ালে দে।"

কন্যা আপনি যেমন কাহারও গামছা ব্যবহার করিতে তেমনই আপনার গামছা কাহাকেও দিতে ভালবাসিতেন না। তিনি মা'র কথা অবজ্ঞা করিতেও পারেন না; সেই জন্য অব্যাহতি লাভের আশায় নারায়ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দু'খানা তোয়ালেই ব্যবহার করেছ?"

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "না, পিসীমা—একখানাই ব্যবহার করেছি।"

সাগরিকা সেই প্রথম নারায়ণচন্দ্রের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, সে চক্ষুতে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি—সে সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার পরেই দৃষ্টি নত করিল। তাহার পর সে স্নানের ঘরে গেল।

সাগরিকাকে, নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর কথায়, কিছু আহার করিতে হইল, নহিলে অশিষ্টতা প্রকাশ করা হয়; কিন্তু আহারে তাহার রুচি ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল—এ কি হইল?

৫

সাগরিকা কিরূপে ট্রেনের কামরায় স্নানের ঘরে গেল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহলের অন্ত ছিল না—তাহার পরিচয় জানিবার জন্য কৌতূহলও অল্প ছিল না। কিন্তু নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর জন্য কেহ তাহাকে সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে বলিতে পারিতেছিলেন না। সে কিছু আহার করিবার পর পিতামহীই সে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন।

সাগরিকা বলিল, তাহার পিতামাতা বৎসরের অধিকাংশ কাল বীরভূম জিলায় তাঁহাদিগের পৈত্রিক গৃহেই থাকেন। তথায় তাঁহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তির এবং ধানের ও মানের রক্ষা-কার্য্যে পিতাকে ব্যাপৃত রাখে। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতেও হয়। কারণ, তাহার অগ্রজ দুই ভ্রাতার এক জন কলিকাতায় ওকালতী করিতেছে, আর এক জন এই বার ডাক্তারী

শেষ পরীক্ষা দিতেছে। এবার পিতামাতা দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রী স্থির করিবেন—এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে নহে ?"

সাগরিকা সে প্রশ্নের উত্তর দিল না বটে, কিন্তু লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

তাহার পর পিতামহীর কথায় সে আবার বলিল, কয় দিন কলিকাতায় বোমাপাতের পর পিতা সকলকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, মাতা বড়ই ভীতা হইয়াছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে জনতার বিষয় তাঁহারা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কিরূপ, তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে দুইখানি যানে আসিয়াছিলেন, সে দুইখানি যখন হাওড়া সেতুর কলিকাতার দিকস্থ মুখে আসিল, তখন পুলিস যান আর অগ্রসর হইতে দিল না। বাধ্য হইয়া সকলে অবতরণ করিলেন। সঙ্গে যে জিনিষ ছিল, তাহা ভারবাহীকে দিয়া সকলে জনাকীর্ণ সেতু অতিক্রম করিলেন। সে যেন জনসমুদ্র! এক ভ্রাতা পূর্ব্বে ট্রেণের টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করা সম্ভব হইল। কিন্তু সে কি কষ্টে!

সকলে ষ্টেশনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন; কিন্তু যে প্ল্যাটফর্ম্মে ট্রেণ, তাহাতে উপনীত হইবার দ্বারপথে—একে একে যাইবার সময়—জনতায় সে আর সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অতি কষ্টে—তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের ও তাহার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে সে আর তাঁহাদিকের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিল না।

সে জানিত, ঐ প্ল্যাটফর্ম্মেই ট্রেণ; সেই জন্য ট্রেণে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূকে পাইবেই জানিয়া, যত চেষ্টা সম্ভব করিয়া, ট্রেণের নিকটে উপনীত হইল। প্রথমে যে সব কামরা, সেগুলির নিকটে দাঁড়াইয়া কয় জন রেলের উর্দ্দীপরা কর্ম্মচারী জনতায় যেন পিষ্ট হইয়া যাইতে যাইতে কেবল চীৎকার করিতেছিলেন—"এ গাড়ী নহে—আগের ট্রেণ আগে ছাড়িবে।" লোক তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল।

সেই সময় এক দল গোরা ও বহু পাঠান সৈনিক—বলে সকলকে সরাইয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা প্রাণ দিতে ও প্রাণ লইতে যায়, তাহারা কি মানুষের মান ও প্রাণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে? অগ্রসর হইবার প্রয়োজনে ও আগ্রহে তাহারা অবাধে লোককে প্রহারও করিতে লাগিল। লোক ভীত হইয়া পড়িল। যেন স্বভাবতঃ চঞ্চল সমুদ্র প্রবল বাত্যায় বিক্ষুব্ধ হইল। রেলের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে সংযত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সে চেষ্টা আর করিল না—তাহারাও আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল না। তাহাদিগের—বিশেষ পাঠানগুলির ব্যবহার এত অশিষ্ট ও তাহাদিগের কথার ইঙ্গিত এত ইতর যে, তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায়, অনন্যোপায় হইয়া সে যে ট্রেণ পরে যাইবে তাহার যে কামরার নিকট দিয়া যাইতেছিল তাহাতেই উঠিয়া পড়িল এবং তাহাতে সৈনিকদিগের মধ্য উচ্চ হাস্যরব শুনিয়া ভীত হইয়া স্নানের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

নারায়ণচন্দ্রের পিসীমা বলিলেন, "ভগবান্ রক্ষা করেছেন—বিপদে তিনি ছাড়া গতি নাই; আমরা সেই কথাই বিপদে না পড়া পর্য্যন্ত ভুলে থাকি। কিন্তু তিনি কাযে তা' বুঝিয়ে দেন। কথা শুনে ভয়ে আমারই বুক কাঁপছিল।"

নারায়ণচন্দ্রের মাতা বলিলেন, "কি বিপদই না ঘটতে পারত!"

তিনি সে-ই প্রথম সহানুভূতিব্যঞ্জক কথা বলিলেন। সাগরিকার যে কথা ইতঃপূর্ব্বেই আর সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে কেবল তিনিই এতক্ষণ সহানুভূতির প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

তাহার পর সাগরিকা যাহা বলিল, তাহাতে জানা গেল, সে ভীতিসঞ্জাত যে শক্তিতে আত্মরক্ষার প্ররোচনায় ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া স্নানের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, সে শক্তি তাহার দ্বার রুদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর কি হইয়া ছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিল, তখন সে দেখিল, সে স্নানের ঘরের মেঝেয় বসিয়া আছে—তাহার মস্তক ঘরের কাষ্ঠপ্রাচীরে। সে কতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; সময় দেখিবার জন্য হাত-ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ঘড়ী চলিতেছে না। কিন্তু সেই সময় ষ্টেশনের ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। সে বুঝিল, তাহার যে ট্রেণে যাইবার কথা, তাহা তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার পিতামাতা?

স্নানের ঘর হইতে বাহির হইবার সাহস তাহার হইল না। সে যে ভয়ে তথায় প্রবেশ করিয়া লুকাইয়াছিল, সে ভয় তখনও "মুখ-চাপার" মত অনুভূত হইতেছিল। অতিকষ্টে উঠিয়া সসঙ্কোচে সে সেই ঘরের জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—প্ল্যাটফর্ম্মে তখনও তেমনই জনস্রোতঃ—বন্যার জলে তরঙ্গের মত এ উহাকে ঠেলিয়া যাইতেছে। সেই জনারণ্যে সে কাহাকে ডাকিবে? ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। তাহার মধ্যে সে তাহার পিতামাতাকে কি আর দেখিতে পাইবে? সে কি আর তাঁহাদিগের দেখা পাইবে?—বলিতে বলিতে যখন সাগরিকা কাঁদিয়া ফেলিল, তখন নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি ভয় ক'র না। আমি ত বলেছি, কাল বাড়ীতে গিয়েই তোমার বাবাকে তার করবার ব্যবস্থা করব; তুমি দেখবে, তিনি তা'র পরদিনই আসবেন।"

তাহার পর সাগরিকা বলিল, সে কি করিবে, তাহার কর্ত্তব্য কি—সে ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না; সবই কেমন অস্পষ্ট মনে হইতে লাগিল। ভয়—চিন্তা যেন তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল—সে-ই জনস্রোতঃ। কলিকাতায় কি এত লোক ছিল? লোক কি কলিকাতা শূন্য করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে? কিন্তু এখন যদি জনস্রোতঃ শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলেই বা সে কি করিবে? সে কোথায় যাইবে?—কাহাকে সে বিশ্বাস করিতে পারে? কাহার কাছে তাহার কথা বলিলে সে প্রতীকার পাইতে পারে? সে ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

এই ভাবে আরও সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর প্ল্যাটফর্ম্মের ঘড়ীতে ৫টা বাজিল। সে শুনিতে পাইল, সে যে

কক্ষের স্নানাগারে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে কাহারা বলিতেছে—সে গাড়ী "রিজার্ভ"—কেহ যেন তাহাতে না উঠে। মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, তাঁহাদিগের ভৃত্যগণই সেই কক্ষে প্রবেশার্থী যাত্রীদিগকে সেই কথা বলিয়া সে কক্ষে তাহাদিগের প্রবেশে বাধা দিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল—এই বার ত কেহ কামরায় আসিবেন। তখন সে কি করিবে?

ষ্টেশনের মধ্যে দিবালোক যেরূপ ম্লান হইতে লাগিল, তাহাতে বুঝা গেল, দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। এই বার রাত্রি—তাহার অবস্থারই মত অন্ধকার—ভয়ানক! সে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর সহসা ট্রেণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সাগরিকা বুঝিল—এঞ্জিন ট্রেণে যুক্ত হইল; এই বার ট্রেণ চলিবে। ট্রেণ কোথায় যাইবে?

সত্যই ট্রেণ চলিল। কক্ষে আলোক জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মে আলোক-নিয়ন্ত্রণ-হেতু আলোক স্বল্প। তখনও প্ল্যাটফর্ম্মে সেই জনতা—সেই কোলাহল—তাহার মধ্যে সে চীৎকার—আর্ত্তনাদ করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না।

ট্রেণ চলিলে সে এক বার সাহস করিয়া স্নানাগারের দ্বার অতি সন্তর্পণে একটু খুলিয়া কামরার দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, ভৃত্যগণ কতকগুলি দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে—কিন্তু কক্ষে কেহ নাই।

ট্রেণ চলিতে লাগিল—কক্ষে আলোক ক্রমে উজ্জ্বল হইল।

তাহার পর কাহারা কক্ষে প্রবেশ করিলেন—সে তাঁহাদিগের কথা শুনিতে পাইল। কিন্তু সে কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

তাহার পর যে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল, তাহাতে কয় জন দাসদাসী প্রভুদিগের কক্ষে উঠিল—শয্যা রচনা করিয়া দিয়া যাইবে। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী নির্দ্দেশ দিলেন—নারায়ণচন্দ্রের শয্যা উপরের একটি আসনে রচিত হইবে; বড় বড় ছেলেরা ঐরূপ আর একটি আসনে শয়ন করিবে; নিম্নের আসনদ্বয়ে যথাক্রমে নারায়ণচন্দ্রের মাতার ও পিসীমার শয্যা হইবে। আর সেই আসনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে শয্যা রচিত হইবে, তাহাতে তিনি সাগরিকাকে আর যাঁহারা সে কক্ষে ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া শয়ন করিবেন। তাঁহার কথার উপর কেহ কথা বলিতে পারেন না।

ব্যবস্থা ছিল, কামরা তাঁহাদিগের গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখা হইবে, প্রাতে তাঁহারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাঁহাদিগের জন্য যান তথায় আসিবে।

বড় কষ্টে এবং ভীতি ও চিন্তাজনিত শ্রান্তিতে সাগরিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

৬

গৃহে উপনীত হইয়াই নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাহাকে বলিলেন, সাগরিকার পিতাকে টেলিগ্রাফ করিয়া তাহার বিষয় জানান হউক—তাঁহাকে কোন্ ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে, তাহা যেন জানান হয় এবং তিনি কবে আসিবেন, তাহা জানাইতে বলা হয়।

নারায়ণচন্দ্রকেই সাগরিকার নিকট হইতে তাহার পিতার নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল।

পরিবারের যাঁহারা গ্রামের গৃহেই ছিলেন, তাঁহারা এই অপরিচিতাকে দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর "মেজদিদিই" সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। এই মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিতামহদিগের কয় ভ্রাতার মধ্যে মধ্যমের বিধবা। পিতামহরা চারি ভ্রাতা ছিলেন—সকলেই পরলোকগত। জ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্রের পুত্ররাই বড় হিস্যা নামে পরিচিত। মধ্যম যখন যুবক, তখন অশ্ব হইতে পতনের ফলে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া কয় মাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন—পৈত্রিক গৃহের এক চতুর্থাংশ ও মাসিক ৭ শত ৫০ টাকা আয় তাঁহার বিধবা যাবজ্জীবন সম্ভোগ করিবেন; সম্পত্তি তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হইবে। তৃতীয় ভ্রাতা যুক্তপ্রদেশে জমিদারী পরিদর্শনে যাইয়া বিসূচিকায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তখন সন্তান-সম্ভবা ছিলেন—রক্তশূন্যতাহেতু প্রসবকালে প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই প্রাণবিয়োগ ঘটে। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী কনিষ্ঠের বিধবা। তাঁহার দুই পুত্র হইয়াছিল; কনিষ্ঠ বিবাহের পূর্ব্বেই অবিরাম জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল—জ্যেষ্ঠও আজ আর নাই; নারায়ণচন্দ্র তাহার একমাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠের ও কনিষ্ঠের পুত্রদিগের মৃত্যুর পর মেজদিদি আর প্রায় গ্রামের গৃহে থাকেন না। গৃহ ও সম্পত্তি বিভাগের সময় তিনি গৃহে তাঁহার অংশ দুই অংশের অধিকারীদিগকে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন—আপনি কখন বৃন্দাবনে, কখন জগন্নাথক্ষেত্রে থাকেন, কখন বা দ্বারকাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেবতার কোন উৎসবানুষ্ঠানের সময় গ্রামের গৃহে আসিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত সকলেরই বিশেষ সদ্ভাব—কারণ, তিনি সকলকে ভালবাসিয়াই সুখী। যখন জাপান ইংরেজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন তিনি পুরীতে ছিলেন; নাতীরাই জিদ করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে গ্রামের গৃহে আনিয়াছে।

তাঁহার জিজ্ঞাসায় নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, "চল মেজদিদি—আগে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর-প্রণাম ক'রে আসি; তা'র পর সব বলব।"

তিনি স্নান শেষ করিলে দুই জা' ঠাকুর বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল। ততক্ষণে গৃহের আর সকলে পিসীমা'র নিকট হইতে সাগরিকার কথা শুনিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ী হইতে ফিরিবার সময় নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী মেজদিদিকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এ যে একেবারে রূপকথার কাণ্ড, ছোটবৌ!"

ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদ আসিলে উভয়ে তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং আহারের পরে মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিসীমাকে বলিলেন, "ডাক্ ত, মা, মেয়েটিকে—ভাল ক'রে দেখতে পাই নাই।"

সাগরিকা আসিয়া তাঁহাকে ও সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীকে প্রণাম করিল। মেজদিদিই তাহাকে তাঁহার কাছে বসিতে বলিলেন এবং তাহার পরিচয় লইতে লইতে বার বার তাহার দিকে চাহিয়া শেষে বলিলেন, "আমি যেন তোমাকে কোথায় দেখেছি—মুখ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!"

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, "ওরা ত পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ক' মাস ক'রে পুরীতে থাকত—সেখানে নহে ত?"

যাহা মনে পড়ে-পড়ে পড়ে না, তাহা মনে পড়িলে লোকের যেমন হয়, মেজদিদির তেমনই হইল। তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছিস, ছোটবৌ, ঠিক বলেছিস্। মন্দিরে দেখেছি। কি বলব, ছোটবৌ, আমি ত পুরী গিয়ে মন্দিরে যেতাম আর ঠাকুর দেখেই চ'লে আসতাম; কিন্তু ওর ঠাকুরমা যখন নাতীনাতনী সব নিয়ে বসে আছেন দেখতাম, তখন মনে হ'ত যেন চাঁদের মেলা বসেছে—আমি না দেখে রেতে পারতাম না। ক' দিন তাঁর পরিচয় নিয়েছিলাম; তাই ত বলি, ও রূপ আর ও মুখ—ও যে আমার চিনা।"

"তুমি ত বলেই থাক, মেজদিদি, ধোপ কাপড়ের নেকড়াও ভাল।"

"সে আর বলতে? আমি পরিচয়ও নিয়েছিলাম; মনে করেছিলাম, তোকে বলব, নাৎবৌ করবার মত মেয়ে পেয়েছি—নারায়ণের বিয়ে দে। কিন্তু ছাই আর কি মনে থাকে? একে ত বয়সের গাছ-পাথর নাই—ভুষণ্ডী ব'সে আছি—তাইতে আবার কখন্ কোথায় থাকি ঠিক নাই। নিজের সাধ, আহ্লাদ সে সব ত কবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—বড়দিদির আর তোর দু'টোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি; তা' তা'ও অদৃষ্টে সহিল না। সেই অবধি স্রোতের শেয়ালার মতই ভেসে ভেসে বেড়াই। কবে যে শেষ হ'বে!"

বিবাহের কথায় সাগরিকার দৃষ্টি লজ্জায় নত হইল। মেজদিদির কথা শুনিয়া তাহার মনে পড়িল, শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে দেখিয়াছিল—তিনি এমন ভাবে মুড়ী দিয়া আসিতেন যে, তাহাতেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত।

কথাগুলি বলিবার সময় মেজদিদির কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী জানিতেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত সত্য।

মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিসীমা'কে বলিলেন, "নিয়ে যা, মা, মেয়েটিকে—কত ভাবনায় ছিল, একটু ঘুমিয়ে সুস্থ হক।"

উভয়ে চলিয়া যাইলে মেজদিদি জা'কে বলিলেন, "ছোটবৌ, যেমনটি খুঁজছিলি, তেমনটিই ত পেয়েছিস—নারায়ণের বিয়ে দে।"

জা' বলিলেন, "খোঁজ নিতে হ'বে ত, মেজদিদি।"

"কি আর খোঁজ নিবি? খোঁজ আমি তখনই নিয়েছিলাম; আর মেয়ের কাছেও ত পরিচয় পেয়েছিস্। বুঝতে পারলি না—ও যে সেজ-বৌয়ের মামার বাড়ীর লোক।"

"কিন্তু—"

"আর কিন্তুতে কায নাই। কম্বলের লোম বাছতে বাছতে, শেষে আর কম্বলই থাকে না। এখন ত দেখি, সব কুলে পোকা ধরেছে।"

"সে কথা সত্য, মেজদিদি। তবুও বড় হিস্তাদের এক বার জানা'তে হ'বে ত?"

"আর জ্বালাস না, ছোটবৌ; তুই কি এখনও কণে বৌটি আছিস যে—অত ভয়? আর বড় হিস্তার কা'কে জানাবি? বড়দিদি কি বেঁচে আছে? এখন ত বৌ-ই গৃহিণী; শাশুড়ী হয়ে কি বৌকে মানতে হ'বে না কি? আমি ত সকলের বড়—আমি যা' বলব, তা'তে কে আপত্তি করতে পারবে?"

"কোষ্ঠীর বিচার?"

"না—ও সাধ আর করিস না। কোষ্ঠীর বিচার ক'রে বিয়ে আমারও হয়েছিল, সেজবৌ'রও হয়েছিল। কি সম্পদই হয়েছে! তোর নিজেরই বা কি? এক বড়দিদি ভাগ্যবতী যেতে পেরেছে। কথায় বলে—'বাচা মেয়ে আর কাচা কাপড় ত্যাগ করতে নাই।' এ মেয়ে বাচারও বাড়া—ভগবানের দান—ফিরাস না, ফিরাতে নাই, ছোটবৌ। কি রূপ! যেন জগদ্ধাত্রী! তোর পাশে বসবার উপযুক্ত।"

"এখনও আমার তুলনা দিবে, মেজদিদি?"

"তা' দিব—তুই যে আমার ছোট বোন।"

"ভাল, ওর বাপ আসুন—কথা বলা যা'বে।"

"কথা আবার কি? মেয়ের ভাগ্য ভাল হ'লে—এ সম্বন্ধ পা'বে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি একটু গড়া'বি?"

জা' উত্তর দিলেন, "না, মেজদিদি, ঠাকুরবাড়ীতে যা'ব।"

"তবে চল।"

৭

নারায়ণচন্দ্রের সহিত সাগরিকার বিবাহ দিবার ইচ্ছা যে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর মনে উদিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু একটা বড় সংসার পরিচালনের ফলে তাঁহার মনে কোন ইচ্ছা হইলে তিনি বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন না—জহুরী যেমন হীরা পাইলে তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, তেমনই তিনি চারি দিক্ হইতে তাহা বিবেচনা করিতেন। মেজদিদির কথায় তিনি ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার কারণ পাইলেন। কিন্তু তিনি যে পরিবারের বধূ, সেই পরিবারের সম্ভ্রম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন; কি ভাবে কথাটা উত্থাপিত করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, সাগরিকার পিতা আসিলে পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়া কথাটা উত্থাপিত করাইবেন—মেজদিদি পুরোহিত ঠাকুরকে সে কথা বলিবেন।

দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিতে মেজদিদি সাগরিকাকে বলিলেন, "আমি, তুমি আর ছোটবৌ—একই বয়সী ত—তিন জন এক ঘরে থাকব; কি বল?"

সেই ব্যবস্থাই হইল এবং রাত্রিতে শুইয়া নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর আর যে সব কথা জানিবার ছিল, সে সব তিনি সাগরিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন। বিবাহে আপত্তির কোন কারণ দেখা গেল না।

পরদিন সাগরিকার পিতার টেলিগ্রাম আসিল, তিনি সেই দিন রাত্রিতে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে আসিয়া উপনীত হইবেন।

আরও এক দিন সাগরিকা সেই গৃহে সকলের আদর ও যত্ন সম্ভোগ করিল।

তাহার পরদিন সাগরিকার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাপুত্রীতে সাক্ষাতের কি আনন্দ! পিতা আশা করিতে পারেন নাই যে, আর কন্যাকে পাইবেন। কন্যাও ভাবিতে পারে নাই যে, আবার পিতামাতার কাছে যাইতে পারিবে। তাই এ সাক্ষাৎ আশারও অতীত ছিল।

সাগরিকার পিতা জ্ঞানদাকিশোর কন্যার নিকট সকল কথা শুনিলেন এবং শুনিয়া যেমন ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জানাইলেন, তেমনই নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী প্রভৃতিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—তাঁহাদিগের ঋণ তিনি ও তাঁহার পরিবার কখন শোধ করিতে পারিবেন না।

তাঁহার কথা শুনিয়া নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাঁহাকে জানাইলেন—তিনি কেন অত কুণ্ঠিত হইতেছেন? তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা না করিলেই মানুষের অপরাধ হয়—করায় কোন প্রশংসা নাই। তিনি আরও জানাইলেন—কয় দিনে সাগরিকা তাঁহাদিগের সকলেরই বিশেষ আদরের হইয়াছে—তাঁহাদিগকে মায়ায় জড়াইয়াছে।

পুরোহিত ঠাকুরের মধ্যস্থতায় যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন তিনি জ্ঞানদাকিশোরকে বলিলেন, "আমি ছোটমা'কে বলছি, মেয়েটির উপর যখন ওঁদের অত মায়া পড়েছে, তখন ওকে নাতবৌ করুন—নাতীর বিয়ের ত উদ্যোগও হচ্ছে। বিশেষ আমাদের মেজমা বলেন, তিনি পুরীতে আপনার মেয়েকে দেখেই মনে করেছিলেন, ছোটমা'কে ঐ কথা বলবেন। তবে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরেন—বলতে ভুলে গিয়াছিলেন।"

জ্ঞানদাকিশোর সে কথায় সাধারণ শিষ্টাচারসঙ্গত উত্তর দিলেন, "সে ত আমার পরম ভাগ্য।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, সাগরিকার মাতা কন্যার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—তিনি কন্যাকে দেখিয়া একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে এ কথা জানান যাইবে। তবে তিনিও যে এই সম্বন্ধ কন্যার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জ্ঞানদাকিশোর সেই দিনই কন্যাকে লইয়া গৃহে যাইবার প্রস্তাব করিলে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিয়া পাঠাইলেন, তাহা হইবে না—তাঁহাকে সে দিন থাকিয়া যাইতে হইবে—দিনটা "ভাল" নহে।

জ্ঞানদাকিশোরকে তাঁহার কথায় সম্মত হইতে হইল। তিনি গৃহে টেলিগ্রাফ করিয়া সংবাদ জানাইলেন এবং সে দিন—সময় পাইয়া—নারায়ণচন্দ্রের সম্বন্ধে সব সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন সংবাদ লইবার যে প্রয়োজন ছিল না, তাহা তিনি জানিতেন।

পরদিন জ্ঞানদাকিশোর কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিবেন। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন—"বাপকে পেয়ে মেয়ের মুখে হাসি ফুটেছে!"

তাঁহার মেজদিদি বলিলেন, "মেয়ের মুখে ত হাসি ফুটেছে দেখলি; ছেলের মুখে যে হাসি শুকিয়ে গেল!"

"তা'-ও তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"তা' করব না? আমি যে 'না বিয়িয়েই কানাইয়ের মা'। ওরাই ত আমার সব আশা—মুখে আগুন দিবে।"

তিনি নারায়ণচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে বলিলেন, "তোর হাত-ঘড়ীটা আমায় দে না, নারায়ণ।"

নারায়ণচন্দ্র সেটি হাত হইতে খুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "মেজ ঠাকুরমা'র কি আবার হাত-ঘড়ী পরবার সখ হ'ল?"

তিনি বলিলেন, "পরবার নহে রে—পরাবার। সাগরিকার হাত-ঘড়ীটা ভেঙ্গে গেছে—গাঁট-ছড়া বাঁধার আগে আমি তোর ঘড়ীটা তা'র হাতে বেঁধে দিব। তা' হলে বাঁধন আর কাটতে পারবে না।"

নারায়ণচন্দ্র লজ্জা লুকাইবার জন্য সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পিতামহী বলিলেন, "মেজদিদি, তুমি এত-ও জান?"

যাত্রার পূর্ব্বে সাগরিকা যখন সকলকে প্রণাম করিল, তখন মেজদিদি তাহার হাতে নারায়ণচন্দ্রের হাত-ঘড়ীটি পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দড়ী দিয়ে না বেঁধে ঘড়ী দিয়ে বাঁধলুম—মাঘ মাসেই ফিরে আসতে হ'বে।"

তিনি সাগরিকাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে গমন করিলেন এবং তথায় তাহাকে ঠাকুর প্রণাম করাইয়া ঠাকুরের ফুল-তুলসী পুরোহিত ঠাকুরের নিকট হইতে লইয়া তাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন।

* * * *

গৃহে ফিরিয়া জ্ঞানদাকিশোর নারায়ণচন্দ্রের পরিবারের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া এবং নারায়ণচন্দ্রের সহিত সাগরিকার বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তার করিলেন।

তখন দৈবজ্ঞ ঠাকুরের ডাক পড়িল। তিনি প্রতি বৎসর নারায়ণচন্দ্রের কোষ্ঠী বিচার করিয়া বর্ষফল গণনা করিয়া দিতেন। তিনি মনে করিলেন বর্ষফল-গণনা দিবার জন্যই তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে। তিনি আসিয়া যখন পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন, তাঁহার বর্ষফল-গণনা শেষ হইয়াছে—কেবল লিখিতে বাকি আছে, তবে যদিও এ বৎসর নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ হইল না, তবুও আগামী বৎসরে বিবাহযোগ আর ব্যর্থ হইবার নহে।

পুরোহিত ঠাকুর হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সে যোগ গণনা আর করতে হ'বে না; কোষ্ঠীফল না ফললেও ভাগ্যবল প্রবল হয়েছে। আপনি এখন লগ্নপত্রের আর বিয়ের দিন দেখুন—মাঘ মাসেই দেখতে হ'বে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সত্য পরিচয়

আর কিছু নয়—
তুমি যে ভারতবাসী—
এই তব সত্য পরিচয়!
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শিখ, জৈন কি খৃষ্টান
বৌদ্ধ, মুসলমান—
যাই হও; এ-ভারত যদি তব জন্মভূমি হয়,
তুমি যে ভারতবাসী, এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
তোমারে লালন করি তুলিয়াছে যেই জন্মস্থান
তাহার সম্মান,
বাড়াবারে নাহি ক' আগ্রহ—
করো দেশদ্রোহ!
এসো—এসো—ভ্রান্ত বন্ধু মোর
আত্মঘাতী ঘোর
বিবাদের পঙ্ক-শয্যা ছাড়ি'
দাও পাড়ি
প্রীতির পঙ্কজ-লোকে
অমৃতের সিন্ধু সেই হিরণ্য-আলোকে!
আর দেরী নয়—
তুমি যে ভারতবাসী, এ তব গৌরব,
এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয়!

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়।

বৌদ্ধভারতে বিবাহ-বিধি

বিবাহ-সংস্কার সমাজের একটি স্থিতিকারক সংস্কার। এই সংস্কারের উপর সামাজিক মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতে যে বিবাহ-পদ্ধতি ছিল,—তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়ও হিতকর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লবের পর এই বিবাহ-পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে যে সকল বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর তাহার অনেকগুলি প্রবর্ত্তিত বা প্রচলিত করা হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থাদি পাঠ করিলে তাহার কতকগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুযুগে,—এমন কি, স্মরণাতীত বৈদিক যুগ হইতে—হিন্দু সমাজে স্বগোত্রমধ্যে এবং সনাভিদিগের মধ্যে বিবাহ-ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। এমন কি, বৌদ্ধযুগে সহোদরা-বিবাহ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। 'সুমঙ্গলবিলাসিনী' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে কপিলবাস্তু নগরের পত্তন কাহিনী যে ভাবে বিবৃত আছে,—তাহা হইতে অনেক আধুনিক গবেষণাকার সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাচীন বৌদ্ধযুগে সহোদরা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আসল কাহিনীটি এইখানে বিবৃত করিব।

রাজা ওক্কাবার পাঁচ মহিষী ছিল। প্রথম এবং প্রধানা মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারিটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা জন্মে। প্রথমা মহিষীর মৃত্যু হইলে রাজা একটি সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ হইবার পূর্ব্বে যুবতী রাজাকে এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, রাজাকে তাঁহার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহের পর তিনি প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র এবং কন্যাদিগকে তাঁহার রাজ্যের এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজমহিষীর গর্ভজাত চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমাচলের পাদমূলে এক নিবিড় জঙ্গলে গমন করেন। তথায় তাঁহারা একটি নগর পত্তনের সঙ্কল্প করিয়া স্থান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সেইখানে কপিল নামক এক জন মুনির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। কপিল তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে স্থানে তাঁহার আশ্রম, সেই স্থানে নূতন নগর স্থাপন করাই উচিত। কপিল মুনির আদেশ অনুসারে তথায় তাঁহারা নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কপিলের স্মৃতির সহিত জড়িত করিয়া সেই নগরের নাম রাখিলেন কপিলবাস্তু। কালে চারি ভ্রাতা চারিটি ভগিনীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠাকে তাঁহারা বিবাহ করেন নাই। সেই জন্য ইঁহাদিগের নাম শাক্য হইয়াছিল। হিন্দুদিগের প্রদত্ত বিবরণেও শাক্যবংশীয়দিগের শাক্য নাম দিবার কারণ এইরূপ দেখা যায় যে, ইঁহারা ইক্ষ্বাকুবংশীয়। কপিল মুনির শাকসঙ্কুল আশ্রমে ইঁহারা বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদের নাম হয় শাক্য। যথা—

শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাৎ ইক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।

এই কপিল মুনি কে? ইনি গৌতমবংশজাত মুনিবিশেষ।

এই আখ্যান হইতে বৌদ্ধ-সমাজে যে সহোদরা-বিবাহ চলিত ছিল,—ইহা সপ্রমাণ হয় না। কারণ, নিবিড় অরণ্যমধ্যে সমাজ-বিরহিত স্থানে নিরঙ্কুশ যুবকযুবতীরা যে সমাজবিধি লঙ্ঘন করিয়া যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু উহাকে সামাজিক ব্যবস্থা বলা যায় না। হিন্দুদের প্রদত্ত বিবরণে ইঁহারা গৌতমবংশীয় কপিলের শাকপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগকে শাক্য বলা হইত—এ কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা যে সহোদরা-বিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ কথার উল্লেখ নাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, পিতৃশাপে রাজপুত্ররা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কন্যারা নির্ব্বাসিতা হন নাই। যাহা হউক, এই ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় সহোদরা-বিবাহ করিয়াছিলেন, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও ইহাকে সামাজিক বিবাহ বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতির তাড়নায় অন্ধ হইয়া মানুষ অনেক ঘোর কুকর্ম্ম করিয়া বসে,—কিন্তু তাহা নিয়ম বলিয়া মনে করা অত্যন্ত অসঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় গুরুতর আপত্তি আছে। এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সময়ে কপিলবাস্তু নগরের পত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহা যখন ঘটে, তখন বৌদ্ধবিপ্লব ত দূরের কথা, গৌতম বুদ্ধদেবই জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধদেব যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন ঐ কপিল মুনির অধ্যুষিত নিবিড় অরণ্য বিস্তৃত জনপদে এবং কপিলবাস্তু সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধবিপ্লবের বহু পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল। তখন হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোকের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল কি না, বলা কঠিন। সেই জন্য এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর যদিই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—তাহা হইলে উহা তদানীন্তন সমাজের নিয়ম নহে,—ব্যভিচার। এরূপ দৃষ্টান্ত আর প্রায় পাওয়া যায় না। মহাবংশে লিখিত আছে যে, লালহা রাজ্যের অধিপতি সিংহবাহু তাঁহার ভগিনী সিহাসীবলীকে নিজ মহিষী করিয়াছিলেন (১)। এই লালহা রাজ্য কোথায় এবং তথাকার রাজবংশ কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে প্রাচীন মিশরে সহোদর-সহোদরার বিবাহ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না (২)। কাজেই এই সিংহবাহুর বিশেষ পরিচয় না জানিলে কোন কথাই বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সিহাসীবলী সিংহবাহুর সহোদরা ছিলেন কি না, তাহাও স্পষ্ট বলা নাই।

---

(১) মহাবংশ (Geiger's Edition) ৬০ পৃষ্ঠা।

(২) **Among the ancient Egyptians, brothers and sisters were allowed to marry.—Marriage and Heredity by J. B. Nisbet, p. 5.**

কপিলবাস্তুর উল্লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, শাক্যসিংহ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ক্ষত্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশের শাক্যশাখা,—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ তিনি শকজাতীয় (Scythion) বলিয়া যে অনুমান করেন, তাহা ভ্রান্ত। কারণ, হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় প্রাচীন সাহিত্যে ঐ একই কথা পাওয়া যায়।

তবে এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধ-যুগে হিন্দু-আচারের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু জাতি কখনই পিতৃব্য-কন্যা, মাতুলকন্যা, পিতৃষ্বসার কন্যা, মাতৃষ্বসার কন্যা প্রভৃতি বিবাহে অনুমোদন করেন না। বৌদ্ধ-সমাজ কিন্তু ঐরূপ বিবাহ অনুমোদন করিতেন। সম্রাট্ অজাতশত্রুর মহিষী ভজিরা অজাতশত্রুর পিতৃষ্বসার কন্যা। আনন্দ তাঁহার পিসির কন্যার উলঙ্গাবস্থায় প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-যুগে নর-নারীর একটু অধিক বয়সে বিবাহ হইত এবং বিবাহের কতকগুলি নিয়ম শিথিল করা হইয়াছিল বলিয়া নিতান্ত নিকট-সম্বন্ধযুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রণয় এবং বিবাহ হইত। বৌদ্ধদিগের জাতক গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহাবংশে লিখিত আছে যে, লঙ্কার রাজা পাণ্ডুবাসুদেবের কন্যা চিত্রা পরমাসুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। সেই জন্য তাঁহাকে লোক উন্মাদচিত্রা বলিত। জনৈক জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে, চিত্রার গর্ভজাত পুত্র চিত্রার সমস্ত ভাইদিগকে মারিয়া ফেলিবে, সেই জন্য রাজপুত্রগণ তাহাদের একমাত্র ভগিনীকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই গৃহে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার ছিল। রাজার গৃহের ভিতর দিয়া ঐ গৃহে যাইবার একটিমাত্র পথ। একটিমাত্র পরিচারিকা চিত্রার পরিচর্য্যা করিত। এক দিন চিত্রা তাহার মাতুল-পুত্রকে দেখিয়া তাহারই প্রতি আকৃষ্টা হয়। ঐ মাতুল-পুত্রের নাম দীঘ্‌ঘগামণি। পরিচারিকার সহায়তায় দীঘ্‌ঘগামণি চিত্রার প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে চিত্রার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পরিচারিকা সে কথা রাণীকে জানাইল। রাণী রাজাকে কহিলেন। রাজা তখন অনন্যোপায় হইয়া পুত্রদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া চিত্রার সহিত দীঘ্‌ঘগামণির বিবাহ দিয়াছিলেন। মহাবংশ পাঠে আরও জানা যায় যে, পাণ্ডুকাভয় নামক রাজা সুবন্নপালীকে তাহার রাণী করিয়াছিলেন। সুবন্নপালী পাণ্ডুকাভয়ের মাতুল-কন্যা ছিলেন। মাতুল-কন্যা বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ভারতের কোন কোন প্রদেশে এখনও উহা চলিত আছে।

বৌদ্ধসমাজে সগোত্র বিবাহ অল্প প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যখন পিতৃব্য-কন্যাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল, তখন সগোত্রে বিবাহ যে চলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে উহা অত্যন্ত অল্প হইত বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুসমাজের বিবাহ আট প্রকার; যথা—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। তন্মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহের ন্যায় বিবাহ বৌদ্ধসমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধদিগের মধ্যে স্বয়ম্বরপ্রথা এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহও ছিল। রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহও অনেক হইত। প্রবৃত্তিতাড়িত মানব-সমাজ হইতে ইহা নির্ব্বাসিত করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধসমাজে যে সাধারণ বিবাহ বিশেষ ভাবে চলিত ছিল, তাহা অনেকটা প্রাজাপত্য বিবাহের অনুরূপ হইলেও উহা প্রাজাপত্য বিবাহ নহে। প্রাজাপত্য বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসাধন। উহা এইরূপ—"তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর" এই কথা বর-কন্যা উভয়কে বলিয়া বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। বৌদ্ধদিগকে ঠিক সে কথা বলিতে হইত না। তবে সাধারণ গৃহধর্ম্ম সাধনের জন্য যে প্রকার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত তাহা হিন্দুদিগের প্রাজাপত্য বিবাহের অনেকটা অনুরূপ। সমাজে উহাই অধিক চলিত ছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বিবাহ হইত, তাহা বর এবং কন্যা উভয়ের অভিভাবক দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। ইহাতে বর এবং কন্যা উভয়েই সমান জাতির হইত। আর্থিক অবস্থার সমতা দেখিয়া হইত না। এরূপ বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত জাতক গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর মিগারা নামধেয় কোষাধ্যক্ষ প্রথমেই শাকেতপুরের কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের জাতি কি, তাহা জানিয়া তবে তাহার নিজপুত্র ধর্ম্মপদের সহিত বিশালার বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন। বাব্বু জাতকে শ্রাবস্তীর কীনা নাম্নী কন্যাকে অন্য গ্রামের তাহার সমজাতীয় পাত্রকে দান করিবার কথা আছে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাই ছিল সাধারণ ব্যবস্থা। তাহার কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত। বৌদ্ধ-সমাজ হিন্দু-সমাজের অঙ্গজ। কাজেই স্থিতিশীল জনসাধারণের মধ্যে এই সাধারণ প্রথাই অনুবর্ত্তিত হইত। এই বিবাহে বর বরযাত্রিসহ কন্যার গৃহে আসিয়া কন্যা গ্রহণ করিতেন। কন্যার পিতামাতা এবং অভিভাবকবর্গ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া ভোজ্যাদি প্রদান করিতেন। হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত। আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ নিন্দিত এবং ইহার ফল ভাল হয় না বলিয়া কথিত আছে। বৌদ্ধসমাজে সেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তবে এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধযুগে অসবর্ণ বিবাহ অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। মহাবংশে জাতকগ্রন্থে থেরীগাথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেক সময় রাজা-রাজড়া এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন। অশোক ক্ষত্রিয় হইলেও দেবী নামক একটি বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দেবীর গর্ভেই তাঁহার বিখ্যাত পুত্র মহিন্দ এবং কন্যা প্রথিতকীর্ত্তি সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৩)। এই মহিন্দ এবং সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। চাপা বর্চকহারের এক ব্যাধের কন্যা ছিলেন। তাঁহার সহিত উপক নামক (৪) এক সন্ন্যাসীর বিবাহ হইয়াছিল। একদা এই ব্যাধ শিকার করিতে যাইয়া সাত দিন অন্যত্র অতিবাহিত করেন। উপক বর্চকহারের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। তিনি ঐ ব্যাধরাজের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করেন। চাপা আসিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি মন্মথশরে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া সাত দিন উপবাস করিয়াছিলেন। ব্যাধ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন। তখন তিনি উপকের হস্তে চাপাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন (৫)। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তখন এইরূপ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে হইত। ব্যাধরাজ সন্ন্যাসীর

---

(৩) মহাবংশ।

(৪) ধর্ম্মপদ ২ খণ্ড।

(৫) মহাবংশ, Geiger's Edition, ch. 9

প্রভৃতি সম্মানবুদ্ধিতে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে অধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধদিগের দিব্যাবদান গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চণ্ডালরাজ ত্রিশঙ্কুর পুত্র শার্দ্দুলকর্ণ বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জনৈক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। প্রতিলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহের ইহা ভিন্ন অন্য দৃষ্টান্ত আর প্রায় পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ সমজাতির মধ্যে বিবাহই অধিক হইত। ইহাতে অনুমিত হয় যে, মানুষ তাহার পূর্ব্বজগণের সংস্কারের এবং আচারের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে না। হিন্দুসমাজে বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে অনুলোম বিবাহও নিন্দিত ছিল। বৌদ্ধসমাজে সেই অনুলোম বিবাহের বড় বাড়াবাড়ি এবং তাহার ফল মন্দ হইয়াছিল। সেই জন্য বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর যখন আবার হিন্দু-সমাজ পুনর্গঠিত হইয়াছিল, তখন অসবর্ণ বিবাহ একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কলির প্রথম যুগে মনীষীরা সমাজ-হিতৈষণার জন্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। ইহা আদিপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় (৬)।

বৌদ্ধসমাজে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু-সমাজেও উহা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অর্জ্জুনকে কার্য্যতঃ স্বয়ং পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, যদিও দৃশ্যতঃ অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেন। দময়ন্তী নলকে স্বয়ং বরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-যুগেও স্বয়ম্বর-প্রথা ছিল। এই স্বয়ম্বর-সভায় স্বজাতীয় পাত্রদিগকে আহ্বান করা হইত এবং কন্যা তাহাদিগের মধ্যে যে কোন এক জনকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কন্যা যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে দেখা যায় যে, সময় সময় পিতা কন্যার মনোনীত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন। নব্ব জাতকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক রাজকন্যা তাঁহার পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ংবরা হইবেন। পিতা তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তদনুসারে রাজা এক স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করেন। তথায় সকল দেশের রাজপুত্রগণ আহূত হইয়াছিলেন। রাজকন্যা সভায় যাইয়া একটি যুবকের গলে মাল্য অর্পণ করেন, কিন্তু পরেই বুঝা যায় যে, যুবকটির শ্লীলতার অভাব ছিল, সেই জন্য রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। হিন্দু-স্বয়ম্বরায় কখনই এইরূপ হইত না। কন্যা যাহার গলদেশে মাল্যদান করিতেন, কন্যার পিতা তাহা আর প্রতিবিদ্ধ করিতে পারিতেন না।

জাতক গ্রন্থে কতকগুলি অদ্ভুত কথা আছে। যথা—কুণাল জাতকে রাজকন্যা কুণহার স্বয়ম্বর-কথা। উহা দ্রৌপদীর বিবাহের নকল। রাজকুমারী কুণহা স্বয়ম্বরসভায় পাণ্ডু রাজার পাঁচ পুত্রকে সমাগত দেখিয়া পাঁচ জনের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং একটি মালা পাঁচ জনের গলায় জড়াইয়া দেন। ঐ পাঁচ জনের নাম মহাভারতোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের নাম। যথা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, যুধিষ্ঠির এবং সহদেব। এই কাহিনীটি মহাভারত হইতে গৃহীত বলিয়াই মনে হয়। বলা বাহুল্য, কুণহা, দ্রৌপদীর ন্যায় পঞ্চস্বামীরই পত্নী হইয়াছিলেন। এক দ্রৌপদী-বিবাহ ভিন্ন ভারতের ইতিহাসে এক-সঙ্গে পঞ্চস্বামী বা একাধিক স্বামী বিবাহের আর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। জাতক গ্রন্থে গান্ধর্ব্ব বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক উল্লিখিত আছে।

নারীদিগকে ফুসলাইয়া বা কুলের বাহির করিয়া ঘর-সংসার করিবার কথা জাতক গ্রন্থে অনেক আছে। পরে যে উহাদের অনেকের বিবাহ হইত, এমন কথা জাতক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠিকন্যা পথাচারকে তাহার পিতা তাঁহার গৃহের সপ্তম তলে অতি সাবধানে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহার বালক ভৃত্যের প্রণয়ে পড়িয়াছিল। পরে পথাচারকে বিবাহ দিবার জন্য তাহার পিতা আর একটি তাঁহার স্বশ্রেণীর পাত্র ঠিক করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন পথাচার তাঁহার প্রণয়ীর সহিত উধাও হইয়া দুরস্থ এক গ্রামে যাইয়া বাস করে। কালক্রমে ইহাদের একটি সন্তান জন্মে। কিন্তু বৌদ্ধমতেও ইহাদের বিবাহ হয় নাই। জাতক গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। নারীদিগের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ফলে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিত। যাহাতে এরূপ অনাচার না ঘটে, সেই জন্য বৌদ্ধযুগেই নারীদিগের অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধম্মপদ ব্যাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে, ধনীদিগের কন্যাগণ বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের পিতামাতা তাহাদিগকে সপ্ততল হর্ম্ম্যের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করিতেন। সেই হর্ম্ম্যে পুরুষ-কিঙ্করের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নারী-কিঙ্করীরাই তাহাদের সকল কার্য্য করিত (৭)। অভিজাত বংশের নারীরা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত না করিয়া কখনই বাড়ীর বাহির হইতেন না। যখন বাহির হইবার প্রয়োজন হইত, তখন তাঁহারা শকটে করিয়া বাহির হইতেন। সাধারণ লোক সাধারণ যানে করিয়া যাইতেন আর মস্তকে একটি তালবৃন্তের ছত্র ধরিতেন। তাহা না হইলে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিতেন (৮)। সুতরাং পর্দ্দাপদ্ধতি বা নারীদিগের অবরোধ-প্রথা বৌদ্ধযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিল। মুসলমান আমলে হয় নাই।

আমাদের দেশে যেমন বিবাহের পর বধূ প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় অবগুণ্ঠন না দিয়া আসেন, বিবাহের পর বৌদ্ধযুগেও কন্যারা সেইরূপ আসিতেন। বিবাহকালে কন্যাকে যৌতুক এবং ধন-রত্ন দিবার প্রথাও বৌদ্ধযুগে ছিল। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগার তাঁহার কন্যা বিশাখার বিবাহে অনেক যৌতুক দিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। তবে সাধারণ লোকের মধ্যে যৌতুক দিবার বিধি যে প্রবল ছিল, তাহা মনে হয় না। অন্ততঃ বরপক্ষ বরপণের দাবী করিতেন, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কন্যার বিবাহকালে কন্যার পিতাকে কন্যার স্নানের এবং সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহারের জন্য অর্থ বা বিষয় দিতে হইত। মগধের রাজা অজাতশত্রু কোশলরাজ পসেনদীর কন্যা বাজীরাকে বিবাহ করেন। পসেনদী কন্যার স্নান এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের জন্য একখানি তালুক দিয়াছিলেন। বিম্বিসারও কোশল দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কোশল দেবীও তাঁহার পিতার নিকট হইতে ঐ বাবদ কাশী অঞ্চলে একখানি গ্রাম

(৬) দ্বিজানামসবর্ণানাং কন্যাসুপযমস্তথা।—বৃহন্নারদীয়
আদিত্যপুরাণেও ঐ কথা আছে।

(৭) Dhammapada Commentary, vol III, page 24.
(৮) Do. vol I, p. 391.

পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিবাহকালে কন্যার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ সকলেই বর-কন্যাকে প্রীতি-উপহার দিতেন। মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যার বিবাহে এক শত গ্রামের লোক বর-কন্যাকে অনেক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের ভিতরও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধযুগে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে বিধবা-বিবাহ কতকটা নিন্দিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেরী ঋষিদাসীর তিন বার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ধর্মিষ্ঠা এবং সেবাপরায়ণা ছিলেন। তখন পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারিত এবং অনেক সময় করিত। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। উপরে লিখিত কুণাল জাতকের যে রাজকুমারী কণহার পঞ্চস্বামী একসঙ্গে বিবাহ করার কথা আছে, তাহা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীকে একসঙ্গে বিবাহ করার কথার প্রতিধ্বনি মাত্র, অন্য কোথাও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিত। ঋষিদাসীর স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। তবে পত্নী ত্যাগ করিবার জন্য কোন আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল কি না, অথবা কোন অনুষ্ঠান করিতে হইত কি না, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তাহা করিতে হইত না।

বৌদ্ধযুগে বিবাহ-বন্ধন কতকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে সমাজে নানা অনাচার ঘটে। তথাগত যেরূপ পবিত্র ভাবে সমাজ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহার ঘোর অবনতি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম সেই জন্য ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এবং পরে হিন্দুধর্ম যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন পুনর্গঠিত হিন্দু-সমাজে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কতকগুলি অতি কঠিন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন সাগরপথে বিদেশযাত্রা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, কমণ্ডলু ধারণ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, মধুপর্কে পশুবধ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্রমধ্যে দাস, গোপালকুল, মিত্র এবং অর্দ্ধসীরীর প্রস্তুত অন্নভোজন, দূরদেশে তীর্থযাত্রা, শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া ইত্যাদি পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার অর্থাৎ সমাজরক্ষার জন্য কলির আদিতে ব্যবস্থাপূর্ব্বক রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। নারী জাতির চরিত্রস্খলন হেতু যৌবন-বিবাহ রহিত করিয়া বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত এই সময় হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে পতিতা নারীদিগকে সমাজে গ্রহণ করা হইত। অর্দ্ধ-কাশী প্রভৃতির ন্যায় যাহারা সমাজে গৃহীত হইয়াছিল,—পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের ন্যায় নিয়ন্ত্রণকারীর অভাবে তাহার ফলে ঐরূপ ব্যবস্থার জন্য অনেক অনাচার ঘটে। সেই জন্য আদিত্যপুরাণ, আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনকালীন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শন ও উপদেশ লাভ

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রঘুনাথের হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, রঘুনাথ একান্ত ভাবে তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে লাগিলেন। কালে ভক্তি-লতা অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তকে কি প্রকারে শ্রীচৈতন্য-মহাকল্পবৃক্ষে সংযুক্ত করিল, তাহাই এখন উপলব্ধি করিবার বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে, পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে এবং শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্যকে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—দুই ভ্রাতা বড়ই ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সকল সময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে যে জগন্মঙ্গল অবতার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ও রঘুনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। প্রেম-পয়োধি শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশের অলৌকিক বিবরণ শুনিয়া রঘুনাথ তাঁহার পদে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের গুণগ্রামের বর্ণনা তাঁহার চিত্তকে তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পিতামাতা ও পিতৃব্যের নয়নের মণি—তাঁহাদের আদরের দুলাল রঘুনাথ কি প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার চিন্তায় বিভোর হইলেন। ভোগবিলাসে রঘুনাথের মন নাই, বৈষয়িক কার্য্যেও তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেও তিনি তাহাতে উদাসীন। পণ্ডিত যদুনন্দন আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। এই যদুনন্দন আচার্য্য মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের কুলগুরুর বংশে আবির্ভূত। বালক রঘুনাথকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সম্ভবতঃ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পরামর্শে পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে যদুনন্দন আচার্য্যের দ্বারা দীক্ষা দিলেন। কিশোর বয়সেই, সম্ভবতঃ ১৪ বৎসর বয়সে রঘুনাথ দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষার পর গুরুদেবের নিকট হইতে আরও সুন্দররূপে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যও শিষ্যের এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইলে রঘুনাথ শান্ত হইবেন।

হঠাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিলেন। সংসারের সুখে বঞ্চিত হইয়া, বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণে সকলেই ব্যথিত হইলেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্বেষ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই মর্ম্মস্পর্শী ঘটনায় দুঃখিত হইলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ও জগন্নাথ মিশ্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও এই ব্যাপারে যেমন দুঃখিত হইলেন, তেমনই শঙ্কিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের ধন রঘুনাথও যদি এই আদর্শ গ্রহণ করে, এই জন্যই

শন্তা। সকলেই অনতি কাল পরে শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেই শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, যদুনন্দন আচার্য্যের পরামর্শ অনুসারে সম্ভবতঃ তাঁহারই সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বহুবিধ উপহারসহ রঘুনাথকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু রঘুনাথের পরম গুরু এবং তিনি মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের চিরহিতৈষী। তিনি নিজেও দুই পত্নী লইয়া গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তিনি কিছুতেই—রঘুনাথ যদি বাতুল হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে চাহে, তবে তাহাতে উৎসাহ দিবেন না, এই বিশ্বাসেই রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে আচার্য্য-প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য-প্রভুও এই সৌম্যদর্শন বিনীত ভক্ত বালককে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে লইয়া গেলেন। রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভুবন-মঙ্গল স্মিত হাস্যে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। রঘুনাথ শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া আচার্য্যপ্রভুর কৃপায় মহাপ্রভুর পাত্রাবশেষ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। যে কয় দিন মহাপ্রভু অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই কয় দিন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার প্রাণের দেবতাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার পাত্রশেষ প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া শরীর পবিত্র হইল এবং শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির প্রতিকূল সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল মনে করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের যাবতীয় ভক্তগণের সমাগম দেখিয়া তাঁহার নয়ন ও মন তৃপ্ত হইল। কালক্রমে এই চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন; রঘুনাথও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া শূন্যপ্রাণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবর্ষি নারদ পূর্ব্ব-জন্মে দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সাধু-সেবার ভগবানে তাঁহার ভক্তি হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি ভগবল্লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করেন। এক বটবৃক্ষমূলে পদ্মপলাশলোচন ভগবানের ধ্যানে যখন তিনি বিভোর হইয়াছিলেন, তখন চকিতের ন্যায় ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। নারদ সেই রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সেই রূপের দর্শনলাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্ দৈববাণীর দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন যে, "একবার যে তোমাকে দর্শন দান করিলাম, সে আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য, আমি কুযোগিগণের দর্শনীয় নহে। তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া এই শরীর পরিত্যাগ করিবার পর আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" রঘুনাথের এইরূপ হইল। শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করা অবধি তিনি যেন আপনাকে ভুলিয়া গেলেন—সেই ভুবন-মঙ্গল বিগ্রহের মধুর রূপ তাঁহার সমস্ত চিন্তা—সমস্ত ভাবনা অধিকার করিয়া বসিল। এখন তিনি নিরবধি শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সেই ভুবনমোহন রূপের চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাধু ও গুরু-নির্দিষ্ট পন্থাই যে ইঁহাকে পাইবার পথ, কখনও তাহা মনে করিয়া তিনি মন্ত্রজপে ও কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন, কখনও বা আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়েন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দেখিলেন, রঘুনাথের সংসারাসক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে। তাঁহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিলেন, সুন্দরী সুশীলা পত্নীর সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিলে রঘুনাথ সংসারে আসক্ত হইবে। এই মনে করিয়া রঘুনাথের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বৎসরে তাঁহাকে একটি পরমাসুন্দরী কিশোরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। সপ্তগ্রাম মুলুকের অধিকারীর একমাত্র পুত্রের বিবাহ; অতএব তাহাতে রাজকুমারের বিবাহের উপযোগী আড়ম্বরের কোনও অভাব হইবে না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন স্বভাবতঃই দানশীল ছিলেন, এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহাদের ভাণ্ডারের দ্বার ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও দরিদ্রের জন্য উন্মুক্ত হইল। কিন্তু যাঁহার জন্য এই সমারোহ—সেই রঘুনাথের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই—তিনি ভাবিলেন, এই আবার একটি বন্ধন পড়িল। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাশক্তির উপর তাঁহার তখন অগাধ বিশ্বাস আসিয়াছে—তাই তিনি নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে এই ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা সাজিলেন। কিন্তু তাঁহার বিষণ্ণমুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল না। পিতা-মাতা ভাবিলেন, নববধূ বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে রঘুনাথ সুন্দরী পত্নীর সাহচর্য্যে সুখী হইবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কালক্রমে সে আশাতেও নিরাশ হইতে হইল।

তখন রঘুনাথ যাহাতে গৃহ হইতে পলায়ন না করেন, তজ্জন্য তাঁহারা পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দিতে জগতে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কোনও পার্থিব বস্তুর নাই। পিতা-মাতা ও পিতৃব্য রঘুনাথের শরীরকে একরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা ধ্যানে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলের মকরন্দ পানে বিভোর হইয়া থাকিল, কত দিনে কিরূপে আবার তাঁহার পুনরায় দর্শন পাইবেন, এই চিন্তাতেই তিনি দিবারাত্রি মগ্ন থাকিতেন। রঘুনাথের এই বন্দিজীবন দুঃসহ বোধ হইলে—কয়েক বার তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা ও পিতৃব্যের প্রেরিত পাইক তাঁহাকে পথ হইতে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। এইরূপে বাহিরের বাঁধন যতই কঠোর হইতে লাগিল, ভিতরের আকর্ষণ ততই বাড়িতে লাগিল। ভক্তগণের এই আকর্ষণই এত শক্তিশালী যে, জগতে ইহার আর তুলনা নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদের এই আকর্ষণেই ভগবান্‌কে আসিতে হইয়াছিল। শ্রীরূপ-সনাতনের ও রঘুনাথের প্রবল আকর্ষণে মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন গমনের ছল করিয়া অবশেষে রামকেলিতে ও শান্তিপুরে আগমন করিতে হইল। শ্রীরূপ-সনাতনকে আত্মসাৎ করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যদেব কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পথে অগণিত ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলেন। রঘুনাথ আবার গৌরাঙ্গরূপী গোবিন্দের দর্শনের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হইলেন। গুরুর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি পিতাকে বলিলেন—

"আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন।"

—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

আচার্য্য যদুনন্দন বাজিক ব্রাহ্মণ-পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে বুঝাইলে শ্রীরঘুনাথের প্রার্থনা—

"শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া॥"
—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

এইবার দশ দিন মহাপ্রভু শান্তিপুরে ছিলেন, ইহার মধ্যে রঘুনাথ সাত দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে শান্তিপুরে যাপন করিলেন এবং নিরন্তর মনে মনে মহাপ্রভুর নিকট এই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, "কি করিয়া আমি রক্ষকগণের হস্ত হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব?" অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া এবার তাঁহাকে পাইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া যে উপদেশ দিলেন, তাহা জগতের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব সার্ব্বভৌম দান। গীতা ও ভাগবতের সাররূপী ঐ অমূল্য উপদেশ-বাক্য এই—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য * না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

জগদ্বরেণ্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে যামলের এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

অর্থাৎ—বেদপুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিসম্মত সদাচার বা পাঞ্চরাত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া যে আত্যন্তিকী হরিভক্তি দেখা যায়, তাহা আচরণকারীর নিজের ও জগতের উৎপাতেরই কারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

অতএব ভক্তিসাধনের পথে শাস্ত্রই একমাত্র পথপ্রদর্শক। শ্রুতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেই ভক্তির বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে—এই সমস্ত শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অনুরাগের সাময়িক প্রভাবে যে মনঃকল্পিত ভক্তিসাধনায় পথ আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে জীবের ও জগতের অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। আজ ভক্তি-সাধনের নামে আউল বাউল সহজিয়া কিশোরীভজা ও কর্ত্তাভজার মনঃকল্পিত শাস্ত্রবিরোধী পন্থায় দেশ ভরিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে দেবমন্দিরে ও মঠে মোহান্ত ও মঠাধিকারীরাও উদাসীনের আসনে বসিয়া মর্কটবৈরাগ্যের অভিনয় করিতেছে। যেখানে মঠস্থাপনও 'মহারম্ভ' বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণ বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও গোস্বামীদিগের নামে মঠ-প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়া ভক্তের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত, সে স্থানে প্রভুপাদ ও মহাপ্রভুপাদ, গোস্বামী ও আচার্য্য, পরমহংস ও পরিব্রাজকাচার্য্য সাজিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অন্তরে নিষ্ঠার ঐকান্তিক অভাবে আজ বঙ্গদেশ প্রপীড়িত। অনাসক্তি এখন বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং মর্কটবৈরাগ্য প্রকৃত সাধুর লক্ষণরূপে দেখা গিয়াছে। অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও ধর্ম্মাভাস এখন ধর্ম্মজগতে প্রভুত্ব করিতেছে। কত দিনে আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রঘুনাথকে প্রদত্ত এই উপদেশ বুঝিবার ও পালন করিবার সময় ফিরিয়া আসিবে, তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথকে বাহিরের ব্যাকুল ভাব ত্যাগ করিয়া অন্তরের ঐকান্তিক আকর্ষণকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন—

"অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।"

লোকব্যবহারের বিরোধী কাজ করিলেই সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। তাহাতে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ বিরোধী হইয়া উঠে। ইহাতে হরিভজনের পক্ষে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। এই জন্য ভজনের প্রথমাবস্থায় এইরূপ বিরোধী ভাবের জনক কার্য্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। অন্তরে অনাসক্ত হইয়া স্বয়মাগত বৈষয়িক সুখভোগে অন্তরের কামনা-বহ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় না; ভোগের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলে—আসক্তিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে বা ভগবানের দানরূপে বিষয় ভোগ করিলে তাহাতে সংসারের বন্ধন দৃঢ় হয় না - পরন্তু, তাহাতে কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া ভগবৎলাভের পথই প্রশস্ত হইয়া থাকে। তাহার পর ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যতই সুদৃঢ় হইতে থাকে, বাহিরের বন্ধন ততই খসিয়া আসে। ফল পাকিলে বোঁটা আপনি খসিয়া পড়ে; যখন ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে প্রবলতর হয়, তখন আপনিই সংসার তাহাকে পরিত্যাগ করে। কর্ম্মক্ষয়ের উপায় বলপূর্ব্বক বা আলস্যবশে কর্ম্মত্যাগ নহে; পরন্তু, অন্তরে সুতীব্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যেরূপ ধনু হইতে শর এক বার নিক্ষেপ করিলে তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না—সেইরূপ যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে কর্ম্ম আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মেরও বিনষ্ট ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ, যিনি সকল কর্ম্মের মূল—সকল কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কর্ম্মক্ষয় করিতে পারেন না—ইহা মনে করিলে তাঁহার শক্তিকে নিতান্তই সীমাবদ্ধ করা হয়। অতএব একমাত্র সুতীব্র ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম ও সর্ব্বকর্ম্মের বীজ নিঃশেষে দগ্ধ করিতে সমর্থ।

শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথকে যে উপদেশ দিলেন, এখন হইতে রঘুনাথ তাহা পালনের জন্য সংকল্প করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সংসারের প্রতি বাহিরে আসক্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও নবপরিণীতা পত্নীর প্রতি ঔদাস্য ত্যাগ করিলেন। সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পিতা ও পিতৃব্যের সাহায্য করিতে লাগিলেন—কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূজা ও আহ্নিকের ব্যপদেশে যখন তিনি বিরলে অবস্থান করেন, তখন চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে থাকে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের স্বর্ণোপম কান্তির ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়েন। অথচ বাহিরের ব্যাপারে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল পিতামাতা ও পি-

* বানরের ন্যায় বৈরাগ্য। বাহিরে অনাসক্তির ভান, কিন্তু অন্তরে প্রবল আসক্তি থাকিলে তাঁহাকে "মর্কটবৈরাগ্য" কহে।

তাঁহার এই ভাব দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সাধ্বী পত্নীও পতিসেবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু শান্তিপুরে রঘুনাথকে উপদেশ দিবার সময় অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিরূপে রঘুনাথ নীলাচলে তাঁহার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধেও তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন—

বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিও কোন ছলে।
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে।

রঘুনাথের ইহাই এখন ধ্যানের বিষয় হইল, শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে কত দিনে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, কত দিনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, রঘুনাথ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ লইতে লাগিলেন। [ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

যোগ্যং যোগ্যেন

[নক্সা]

আমাদের দেশে প্রথা আছে, ক'নে দেখিবার সময় বৃদ্ধ লোককে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। বৃদ্ধদের দৃষ্টি-শক্তি বেশী, তা নয়! বয়সের সঙ্গে সে-শক্তি বরং কমিয়া আসে। আসল কথা, বৃদ্ধদের চোখে নেশা লাগে না, তাঁরা থাকেন দর্পণের মত! দর্পণে ছায়া পড়ে, ছবি আঁকে না। সুতরাং সুনীলের বিয়ের ক'নে দেখিতে এক জন বৃদ্ধ খুঁজিতে হইল। আমি সুনীলের বড় ভাই। ক'নে-পছন্দর ব্যাপারে আমারও সে দিক্ দিয়া কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিবার কথা।

পাড়ার পাকড়াশি-মশাইকে পাকড়ানো গেল। বৃদ্ধ বলিয়া বটে, তা ছাড়া বৃদ্ধের রস-জ্ঞান এবং রুচিবোধ দুই-ই বেশ প্রখর। কিন্তু আমার সহিত বিয়ের ক'নে দেখিতে যাইবার প্রস্তাবে পাকড়াশি রাজি হইলেন না, বলিলেন,—ঐ বস্তুটি ভায়া সযত্নে পরিহার করে চল্‌ছি। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

বেলতলার কথায় একটা বিগত কাহিনীর আভাস পাওয়া গেল। কথাটা চাপা দিয়া পাকড়াশি বলিলেন,—বিয়ের ক'নে দেখবার উদ্দেশ্যই হলো 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ!' অর্থাৎ কি না—

অর্থ দুরূহ নয়! বলিলাম,—আপনার কাহিনীটা শোনা যাক্!

পাকড়াশি গলা সাফ করিয়া কহিলেন,—কাহিনী কি একটা হে ভায়া, বিস্তর! সংক্ষেপে বল্‌ছি। কিন্তু সর্ব্বশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচি যে, প্রজাপতির নির্বন্ধই হচ্ছে যোগ্যং যোগ্যেন! না হয়ে উপায় নেই। ধরো, এই আমার ব্যাপার! কোন্ ত্রেতা-যুগে বিয়ে হয়েছিল, সে-বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ সে সময়েও নির্ভুল ছিল। তাই ত্যাখো না, আজ আমার অম্বল, আর ব্রাহ্মণীর চোঁয়া-ঢেকুর! আমার পা ব্যথা, তাঁর মাজা-কন্‌কনানি,—এ হতেই হবে। সাধে বলি যোগ্যং—

বাধা দিলাম। বলিলাম,—আপনার ক'নে-দেখার কাহিনী শোনান্। পাত্রীটি কি নিজের জন্য? না, অপরের জন্য দেখতে গিয়েছিলেন?

—রামঃ, নিজের জন্য ক'নে কেউ নিজে দেখতে যায়? ও সব বাপু তোমাদের আজকালকার ফ্যাসান হয়েচে। আমাদের কালে ছিল না। অভিভাবকরা ক'নে পছন্দ করতেন আর আমরা বন্ধু-বান্ধবের মুখে চুট্‌কি-চাটুকি শুনে মনে-মনে ধ্যান করতাম নোলক-পরা একখানি লজ্জানত মুখ! তার ঘোমটায় ঢাকা মুখ—ভাবতেই কেমন কাব্য জাগতো! তার পর শুভদৃষ্টির সময় যাঁকে দেখা যেতো, তিনি হুবহু সেই স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যা! তাঁর নাকের নোলক আর সীঁথির সিঁদুর—

আবার বাধা দিতে হইল। বলিলাম—কিন্তু আবার আপনার নিজের কথা এসে যাচ্ছে! আপনার ক'নে দেখার কাহিনী শুনতে চাই!

—বলছি। পাকড়াশি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন:

আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তার ছিল। তার নাম এখন আর বলতে চাইনে! আমি নাম দিয়েছিলাম অশ্বিনীকুমার! তার চিকিৎসানৈপুণ্যে ডক্টর অব ডিভিনিটি উপাধি! ছোকরা খাস্ কলকাতার পাশ এইচ্-এম্-বি। এইচ্‌টা প্যাডে, নোটিশ-বোর্ডে—সর্ব্বত্রই ছোট হরফে লেখা। মফঃস্বল হলে কি হবে, ভুলেও সে স্যুট না পরে রোগী দেখতে বেরুতো না। এক বার টাইয়ের গিঁট ফস্‌কে গিয়েছিল বলে রোগীর বগলে থার্মোমিটার এঁটে রেখে বাড়ী চলে এসেছিল টাই টাইট্ করতে,—এমন স্মার্ট, এমন বিচক্ষণ চিকিৎসক!

সুতরাং অশ্বিনীকুমার যখন বিয়ে করবে, তখন সে মেয়ে যে শুধু-সুন্দরী হবে না, তার সঙ্গে নীরোগ, সুস্থ, সবল হবে,—এ তো জানা কথা! অশ্বিনীর আর কোন অভিভাবক ছিল না, অগত্যা আমাকেই তার ক'নে দেখতে যেতে হলো।

মেয়ে দেখতে যাবার সময় অশ্বিনী পথে আমায় তালিম দিয়ে নিলে,—বিয়ে করা মানে কি জানো খুড়ো, একটা ফরেন্ বডি ইনজেক্ট করে ফ্যামিলি-শরীরে ঢোকানো! ফল একটা কিছু হয়ই। ভালো-মন্দ কলহ-মনান্তর নানা উপসর্গ ঘটতে থাকে। ঘটতে ঘটতে ইনার সেল বডিতে যখন ইয়ে হয়, মানে, দু'-চারটি কুপুষ্যি হাত-পা মেলে দেখা দেয়, তখন সব আবার ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে আসে! তদ্দিন পর্য্যন্ত সহ্য করতে হবে! সুতরাং সেই ফরেন্ বডিটি সিলেক্ট করতে একটু—

ব্রাহ্মণীর কথা তুলতে চাইছিলাম, বাধা দিয়ে অশ্বিনী বললে, —আরে রাখো, তাঁরা সব সতীলক্ষ্মী! ও-রকম মেয়ে কি আর আজকাল পাবে?

কাগজ।

বলতে বলতে নেবুতলায় এসে পড়লাম এবং অচিরে এক ভদ্র-ভবনের বৈঠকখানায় সাদর-অভ্যর্থনা-সহ আমাদের উপবেশন।

মেয়েটির নাম শুনলাম অণিমা। চেহারা চেয়ে চেয়ে দেখবার মত। আমি তখন বিয়ে করেছি, সত্য বলতে কি, অল্প বয়সে ব্রাহ্মণীরও কিছু সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। হলে হবে কি, আমার ভিতরের শাশ্বত পুরুষটি বার-বার আড়-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল।

আমার ভিতরের শাশ্বত পুরুষটি বার-বার আড়-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল

পরিহিত বসনে অজস্র প্রফুল্ল কমল শোভা পাচ্ছে, চরণে অলক্ত-রাগ। সে রাঙ্গা চরণ লাভ করলে বুঝি কাঙ্গালেরও স্বর্গ-লাভ হয়! এমন ইণ্ডিয়ান আর্ট-মার্কা কিশোরীর ভালে যে ভাগ্যবান্ সিঁদুর ছোঁয়াবে, সে নিশ্চয় কোনো দুর্গম গহনে সাধনা করছে!

পাকড়াশি মহাশয়ের উচ্ছ্বাসে চমকিত হইলাম! ভদ্রলোকের নিশ্চয় কবিতা লেখার ব্যারাম ছিল বা আছে! নচেৎ পরস্ত্রীর ব্যাপারে এত উচ্ছ্বাস কেন? অথবা পরস্ত্রীর রূপ-ব্যাখ্যানই হইল রীতি! যাই হোক, শুনিতে লাগিলাম, পাকড়াশি মশাই বলিয়া চলিলেন—

অশ্বিনীর ভাগ্যে আমার হিংসা হতে লাগলো, তবু সঙ্গীর কানে কানে বললাম—মূঢ়, মতি-স্থির হলো?

অশ্বিনীর যেন সত্যই নেশা লেগেছে! কিসের নেশা—বোঝবার আগেই সে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বললে—অ্যা-নে-মি-আ!

অভিভাবক নিকটে ছিলেন। বললেন,—না না, অণিমা! অণিমারাণী রায়।

পরিচারিকা অণিমারাণীকে অন্তরালে নিয়ে গেল।

অশ্বিনী এবার গম্ভীর ভাবে অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে বললে,—কিন্তু কেস্ যে অ্যা-নে-মি-আ! পারনিসাস অ্যা-নে-মি-আ! কি চিকিৎসা করাচ্ছেন? কবরেজি? না এলোপ্যাথি? হেমোগ্লোবিন প্রিপারেশান খাইয়েছেন কখনো? ও কাজটি করবেন না! ভেরি ব্যাড আফটার-এফেক্ট! এই তো তিনকড়ি চক্কোত্তির মেজো শ্যালির ছোট মেয়ে, বুঝেচেন কি না—

—তারও অ্যানেমিআ? তা কিসে সারলো বলুন তো? অণিমার চেহারা তো দেখলেন! চেহারায় কিছু মালুম হয় না! মাস ছয় আগে এক বার ভুগেছিল ডিসেণ্ট্রিতে।

—ঠিক ধরেছি, পারনিসাস্ অ্যানেমিআ! গায়ে এক-বিন্দু রক্ত নেই, চোখের কোণে কালি। কত বয়স হলো? জিভ সাফ আছে কি না জিজ্ঞেস করুন তো!

অভিভাবক বাড়ীর মধ্য থেকে শুনে এসে বললেন,—জিভ সাফ আছে। গায়ের রং দেখেই তো বুঝেচেন, ওর সবই সাফ! পায়ের নখ থেকে চোখের তারা পর্য্যন্ত!

—তারা পর্য্যন্ত! আমি জিজ্ঞেস করলাম,—চোখের তারা সাদা না কি আপনার মেয়ের?

—আজ্ঞে, আমার মেয়ে নয়। আমার মাস্-শাশুড়ীর মেয়ে, মানে, বুঝে আর কি! তা চোখের তারা সাদা হবে কেন? ঐ কথার কথা বললাম আর কি! এমন সাফ-সাফাই স্বভাব আর পাবেন না!

অশ্বিনী একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে কলম কামড়ে মাথা চুলকে অনেকক্ষণ ভেবে প্রেস্‌কৃপসান লিখলে। আমি ভাবছিলাম, মেয়েটির চোখের কথা! আহা, একেবারে যাকে বলে কালো হরিণ চোখ, চোখের কোলে স্বভাব-কজ্জল রেখা! সকালবেলার সোনালী আলো নদীর তরঙ্গে যেমন কাজলের রেখা আঁকতে থাকে, ঠিক তেমনি! আর পাষণ্ড অশ্বিনী বলে কি না, অ্যানেমিয়া! রক্তশূন্য হলে বুঝি চোখ অমন হয়? অ্যানেমিয়া, না, তার মাথা!

আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। দেখি, অণিমার ভগ্নীপতি মহাশয় অশ্বিনীর হাত থেকে প্রেসকৃপসান নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, অশ্বিনীও উঠেছে! অগত্যা আমিও উঠলাম। আর-এক বার অণিমাকে দেখার সুযোগ হলো না!

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—শীগ্‌গিরই সেরে যাবে, আশা করেন, কেমন?

অশ্বিনী গম্ভীর হয়ে বললে—কেস্‌টা পারনিসাস্, আই একটু সময় নেবে।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন,—তার পর মেয়ে কেমন দেখলেন? আপনাদের মতামত কি?

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, অশ্বিনীই উত্তর দিলে—কেস্‌টা পারনিসাস্ কি না—একটু টাইম নেবে।

প্রথম বারে বলেছে 'সময়'! এবার বললে 'টাইম'! পার্থক্যটা অভিভাবক হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন—আমরা পথে বেরুলাম।

এমন সাংঘাতিক ঘটনার পর দ্বিতীয় বার আর অশ্বিনীর সঙ্গে মেয়ে দেখবার উদ্দেশ্যে যাবো না, স্থির করলাম। কি কাজ এই সব ঝ

নয় তাই খাঁটাখাঁটি করে! আছি বাপু নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপিস, আড্ডা আর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে। কিন্তু অশ্বিনী গোল বাধালো আবার। সোজা পথে হলো না দেখে ধরে বসলো ব্রাহ্মণীকে এবং তাঁর রেকমেণ্ডেসন এড়াতে না পেরে আবার যেতে হলো অশ্বিনীর সঙ্গে। তবে এবার আর ইণ্ডিয়ান আর্ট নয়, একেবারে স্মার্ট আর স্মাইলিং! অশ্বিনীর মুখে কথা শুনে মনটা ব্যাজার হয়ে গেল। স্মার্ট মেয়ের সামনে সার্ট পরে যাওয়া বিধি! আমার সনাতন দোলাই-খানা মনকে পীড়া দিতে লাগলো।

পথে অশ্বিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মনটা ধাতস্থ হলো। সত্যি, আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছিনে, আমায় নাই বা পছন্দ করলে! আর আমরা যাচ্ছি পরীক্ষক, তবে আর অত জুজু-বুড়ীর ভয়ই বা কেন! অশ্বিনীর আগু মেণ্টটা ফ্যালনা নয়। মন্ত্রই পড়ো, আর নারায়ণ-অগ্নিকেই সাক্ষ্য করো,—বিয়ে যে একটা আসন্ন শারীরিক সম্বন্ধের ব্যাপার, যত গল্পই শোনাক্—সবল লোকই এ কথা স্বীকার করবেন। অথচ বিয়ের ব্যাপারে আমরা মেয়ের রূপ দেখি, হয়তো কিছু গুণও দেখি, সব চেয়ে বেশী করে দেখি পণ আর বর-সজ্জাদির বহর! আজকাল আবার বংশ-মর্য্যাদার প্রশ্ন গৌণ হয়েছে! বিধবা বা অসমশ্রেণীর হলেও দোষ নেই! কিন্তু যাকে নিয়ে সারা জীবন গোঁয়াতে হবে, তার শারীরিক সামর্থ্যের বিষয়ে—তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নেবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিনে! বিয়ের জল গায়ে পড়ে শরীর সারবার ভরসায় কত রুগ্ন দুর্ব্বল অযোগ্য কন্যার বিবাহ হচ্ছে! ফলে যত গহনাই মিলুক, ঘরের যতখানিই বর-সজ্জায় ভরে থাকুক, বিবাহিত জীবন বিষময় হয়ে ওঠে! অণিমার মায়া ফিকে হয়ে এসেছিল, বুঝলাম, অশ্বিনী ঠিক বলেছে, —যাকে বিয়ে করবে, তাকে একটু বুঝে নেবে না?

আমরা গন্তব্য গৃহে পৌঁছুলাম। মূল্যবান্ আসবাব-পত্রে গৃহস্বামীর ধনবত্তার ও আধুনিক মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পাত্রীর ভ্রাতাই আমাদের 'আস্তাজ্ঞা হোক' 'বোসতে আজ্ঞা হোক' করে আহ্বান করে বসিয়ে ভিতরে গেলেন। তাঁর আপ্যায়নের ভাষায় আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে অশ্বিনীর কাণে কাণে প্রশ্ন করলাম—এ এ একেবারে আলালি ভাষা হে!

অশ্বিনী বললে,—অতি পুরাতন প্রথা-প্রচলনই আজকাল চরম বিলাস।

ভাই-বোন বাইরে এলেন এবং ভদ্রলোক তাঁর ভগিনী শ্রীকৌশিকী দেবী আই-কম্-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কৌশিকী কুমারী। তবে কিঞ্চিৎ কমনীয়তাশূন্য! সেটা কমার্স পড়বার দরুণ কি না, বোঝা গেল না। কৌশিকীকে আমি ভুল করে জিজ্ঞেস্ করে ফেলেছিলাম—কত দূর পড়াশুনা করেছেন, বললেন? বিরক্ত গম্ভীর-স্বরে উত্তর এলো,—আই-কম্!

অশ্বিনী মৃদু স্বরে বললে,—আয় কম হবে কেন? আয়ু কম।

কথাটা বোধ হয় তাঁরা শুনতে পেলেন না।

সত্যি বলতে কি, কৌশিকীর বয়স হয়েছে। পঁচিশের কম মনে হলো না! গায়ে বহু-বিখ্যাত কাননবালা ব্লাউশ! তবে ঘাড়ের কাছটা একটু লীলা দেশায়ী আর হাতার কাছটা একটু সাধনা বসুর ঢং মিশিয়ে ব্লাউশটিকে অতি-আধুনিক করা হয়েচে মনে হলো! ওরিজিনাল কাননবালা-ব্লাউশ ব্রাহ্মণীরও একটা দেখেছি কি না!

কৌশিকীর ভ্রাতা বল্লেন—কৌশিকী এবার টপ্পা আর জারি গানে অল-বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েচে। আর ওর কানাই ধামালী গান শুনে তো য়ুনিভার্সিটীতে হুলুস্থুল বেধে গেছে। সেই জন্যই ওকে কমার্স ছাড়িয়ে আর্ট পড়াবার কথা উঠেচে—পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে গানের লেক্‌চারার হবার জন্য। তবে আপনারা যদি খেয়াল পছন্দ করেন, তাতেও ও হার মানবে না! খেয়ালেই লাখ্‌নৌ থেকে মেডেল পেয়েছে কি না!

একটি খেয়াল গেয়ে আমাদের শ্রবণ শীতল করবার অনুরোধ পাবা মাত্র কৌশিকী অর্দ্ধোল্লম্ফনে অর্গান অধিকার করলেন এবং তারস্বরে সংগীত সুরু হলো—

আ—রে মেরি ননদিয়া—

আ—রে মেরি ননদিয়া—

বিবাহের পূর্ব্বে ননদিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কি কথা বলতে পারেন, মনে মনে তাই কল্পনা করছিলাম, এমন সময় অশ্বিনী বাধা দিয়ে বললে,—দেখুন, সংসার করতে সঙ্গীত না হলেও এক-রকম চলে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য না হলে—

কৌশিকী নিজেই বললে,—কেন, আমার স্বাস্থ্য খারাপ?

—না, তা বলছিনে। তবে কোনো অসুখ-বিসুখ আছে কি না—

—অসুখ! ফুঃ! কৌশিকীর মুখ-বিকৃতিতে আমারও মুখ যেন বিকৃত হয়ে গেল। তার দাদা বল্লেন,—লেকে রোয়িং-এ কৌশিকী এবার উইন করেছে, জানেন না? দেখেননি ছবি কাগজে? তা ছাড়া লং জাম্প, হাই জাম্প, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট-বল—যাতে দেবেন, তাতেই ফার্ষ্ট। ও যদি মেয়ে না হতো, তাহলে মোহনবাগান কি আজ এরিআন্সের কাছে হারতো? হাফ্-ব্যাকে ও চমৎকার খেলে!

অশ্বিনী বললে—কিন্তু এ সব ওভার-একসারসাইজে হার্টের ব্যারাম হয়। আপনার ব্লাডপ্রেসার কত?

কৌশিকী কুটিল নয়নে তাকালো—এক বার আমাদের দিকে, তার পর তার দাদার দিকে। অশ্বিনী অত লক্ষ্য করেনি, যেই বলেছে,—তাছাড়া ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় মেয়েদের মাতৃত্বের সম্ভাবনাও নষ্ট হতে পারে—

আর বলতে হলো না! ভাই-বোন যুগপৎ গর্জ্জন করে উঠলো—শাট্ আপ্!

কৌশিকীর হাতের কঠিন আঙুলগুলি যেন নিশ্‌পিশ্ করতে লাগলো, আর তার দাদা অর্দ্ধচন্দ্র দেখিয়ে বল্লেন—গেট আউট ইউ স্কাউনড্রেলস্!

—গেট আউট ইউ স্কাউনড্রেলস্

আমি তখনও ননদিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত রাগিণীটুকু মনে মনে গুঞ্জন করছিলাম, এখন চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আসবার সময় চা খেয়ে আসা হয়নি! ব্রাহ্মণী বলেছিলেন, মেয়ে-বাড়ী অন্ততঃ এক-কাপ চা অবশ্য দেবে! কেবল তারই মৌতাত মনে-মনে জমিয়ে তুলছিলাম, এমন সময়—শাট্ আপ! তার পরেই গেট্ আউট এবং স্কাউন্ড্রেলস্! নেহাৎ গুরু-বল ছিল, তাই অর্দ্ধচন্দ্র গলদেশ স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই পথে পা বাড়ালাম।

পথে অশ্বিনীর সঙ্গে আর স্পিক্-টি-নট্, সোজা ঘরে ফিরে এলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—অশ্বিনীকুমার চিরকুমার রইলেন?

হাসিয়া পাকড়াশি মশাই বলিলেন,—রামঃ, বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! অণিমার না হয় অ্যানেমিআ হয়েছিল, কৌশিকীর স্বাস্থ্যচর্চ্চার কথাও না হয় বাদ দিলাম, তাই বলে অশ্বিনীর যোগ্য পাত্রী কি আর জুটবে না? গোড়ায় বলেচি তো যোগ্যং যোগ্যেন—

বলিলাম—সে কাহিনী শোনবার জন্য অধীর আগ্রহ হচ্ছে।

পাকড়াশি মশাই বলিলেন—এবার কিন্তু আর কারো রেকমেণ্ডেসনেই শর্ম্মা পা বাড়ায়নি। শেষে কি স্ত্রীলোকের হাতে নির্য্যাতিত হয়ে পৈত্রিক প্রাণটাকে খোয়াবো? অশ্বিনী একা গিয়েছিল। মেয়ের নাম মন্দোদরী। অর্থাৎ মন্দ মন্দ মানে কি না ঈষৎ উদরী বা অনুরূপ-রোগগ্রস্তা। অশ্বিনী সব জিজ্ঞাসাবাদ করে রোগ স্থির করলে ওবেসিটি অর্থাৎ মেদ-বাহুল্য। সেই কথা বলেই উঠতে যাচ্ছিল, মন্দোদরী বললে, এবার আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—সেটা অবশ্য আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তার পর অকুণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—মহাশয়ের হজম-শক্তি কিরূপ? রাত্রে ভাত রোচে? না, লুচি? কম করে খেলে হজম হয়? মাসে ক'বার সর্দ্দি লাগে? অম্বলের উদ্গার ওঠে কি না? চোখের লং-সাইট উভয় দৃষ্টিই অক্ষুণ্ণ আছে কি না? এটা সেটা নানা কথা বলতে বলতে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটি বললে—আপনার জিভ বের করুন তো।

অশ্বিনী জিভ বের করবে কি না ভাবছে, এর মধ্যে ভিতর থেকে মেয়েটির অভিভাবক খাবার নিয়ে প্রবেশ করলেন। মেয়েটিও উঠে চলে গেল। এমন অপমানিত অশ্বিনী জীবনে কখনও হয়নি। সে একটা রীতিমত পাশ-করা ডাক্তার, আর তাকেই কি না জিভ বের করতে বলা! এ অপমানের সমুচিত শাস্তি দিতে সে বদ্ধ-পরিকর হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকা কথা দিয়ে এলো।

পাকড়াশি মশাই হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন,—আপাত-দৃষ্টিতে এদের একটু বিসদৃশ দেখায়, যেন পাহাড়ের পাশে দেবদারু গাছ! কিন্তু ইনার সোলটি ঠিক আছে, অর্থাৎ যোগ্যং যোগ্যেন হয়েছে।

পাকড়াশি মশাই আমার সঙ্গী হইলেন না, কিন্তু তাঁর অমূল্য উপদেশ আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল। শুনিয়া সুখী হইবেন, পছন্দ

যোগ্যং যোগ্যেন
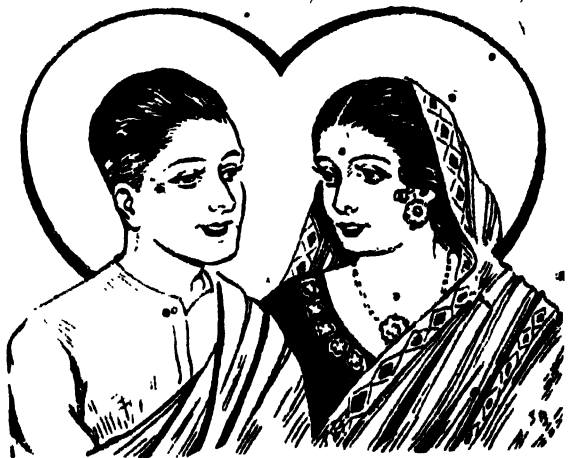
করিয়া যাঁহাকে আনিয়াছি, সুনীলের তিনি যোগ্য হইয়াছেন। স্বাস্থ্যের বিচারেও কেহ তাঁকে নিন্দা করিতে পারিবে না।

শ্রীসন্তোষকুমার দে।

ছোটদের আসর

অর্থে অনর্থ

[রূপকথা]

বহু কষ্ট সহ্য করে গরুর গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি চড়ে শেষ পর্য্যন্ত মামার বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। আজবপুর দেশটা আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে, আমার মামা গোবিন্দ বাবু আজবপুরের সব চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। মা মরবার সময় বলেছিলেন, "আজবপুরের তোর মামার কাছে যাস্, একটা হিল্লে হয়ে যাবে।"

আমাদের বিশেষ কিছুই ছিল না, তবু সামান্য যা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাই বেচে পাথেয় জোগাড় করে আজবপুরে চললুম। জীবনে পূর্ব্বে কখনও মামার বাড়ী যাইনি। আজবপুরে ঢুকে এক জনকে গোবিন্দ মামার সন্ধান জিগ্‌গেস করতেই দু'চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, "অ্যাঁ, বলেন কি? গোবিন্দ বাবুর বাড়ী চেনেন না। দশ-বিশটা সহরের মধ্যে গোবিন্দ বাবুর নাম জানে না, এমন লোক নেই। অমন ধনী, অমন মজলিসি লোক দেখা যায় না। এই সহরের উত্তর-সীমায় প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ী যেন রাজার প্রাসাদ! এই রাস্তা ধরে নাকের সিধে চলে যান।"

ভদ্রলোকের নির্দ্দেশ মত কিছুক্ষণ পরে মামার বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। বাড়ীটা সত্যই বিরাট্, রাজপ্রাসাদকেও বোধ হয় হার মানিয়ে দেয়! ফটকে দারোয়ানকে জিগ্‌গেস্ করলুম, "গোবিন্দ বাবু কোথায়?"

সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললে, "ঐ যে বাগানে বেড়াচ্ছেন।"

তার নির্দ্দেশ মত বাগানে মামার কাছে গেলুম, মামা এক বার আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। আমি শঙ্কিত হয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে রইলুম, এক জন পারিষদ ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটায় হাত কেটে ফেললে, মামা বললেন—"আহা, বড্ড রক্ত পড়ছে যে, একটু মলম আর পটী পেলে হতো।"

বলায় সঙ্গে সঙ্গে ময়লা কাপড়-পরা আধ-ময়লা আলখাল্লা গায়ে রোগা বয়স্ক একটি লোক এগিয়ে এলো, তাকে আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, সে এসেই নিজের পকেট থেকে মলম আর পটী বার করে দিলে।

একটু পরে আর এক জন পারিষদ বলে উঠল, এই নরম ঘাসে একটা কার্পেট পেতে বসে পাশা খেললে মন্দ হয় না।"

মামা বললেন—"যা বলেছ, এ সময় একটা কার্পেট আর পাশা—"

কথা শেষ হতে না হতেই সেই রোগা ভদ্রলোকটি আলখাল্লার পকেট থেকে প্রকাণ্ড কার্পেট বার করলে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! এত বড় কার্পেট ঐটুকু পকেটে কি করে ছিল! কার্পেটটি ঘাসের ওপর পেতে ভদ্রলোক আবার জেবে হাত দিয়ে বার করলেন চমৎকার একটি পাশার ছক। আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম, পকেটটা ওর দোকান না কি! কিন্তু মামা বা তার পারিষদদের মুখে বিস্ময়ের কোনও চিহ্নই দেখতে পেলুম না। যেন এটা অতি সাধারণ ব্যাপার!

নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁরা পাশা খেলতে বসলেন। একটু পরে এক জন পারিষদ বলে উঠল—"পাশার সঙ্গে তামাক আর সরবৎ না হলে জমে না।"

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন—"ঠিক বলেছ, সরবৎ আর তামাকের বিশেষ প্রয়োজন।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগা ভদ্রলোকটি আলখাল্লার পকেট থেকে কয়েকটি সুদৃশ্য গেলাস এবং সরবতভরা ভৃঙ্গার, সেই সঙ্গে সুগন্ধ তামাক আর গড়গড়া বার করে তাদের সামনে সাজিয়ে রাখলে! তখন আমি শুধু বিস্মিত নয়, ভীতও হয়ে পড়েছি। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার! এঁরা কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত না করে তামাক আর সরবতে পান এবং পাশা খেলতে লাগলেন। ততক্ষণে রৌদ্র উঠেছে, খিদেয় আমার নাড়ী জ্বলছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে, কিন্তু মামা আমার দিকে মোটে নজরই করছেন না। রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত হয়ে মামা শেষে বললেন—"একটা তাঁবু হলে বেশ হতো হে।" বলা মাত্রই সেই রোগা ভদ্রলোক আলখাল্লার পকেটে হাত চালিয়ে বার করলে একটা বিরাট্ তাঁবু, তাঁবু খাটানো হলো, মামাদের খেলা চলতে লাগলো।

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলুম, খিদের তাড়নায় রৌদ্রের তাপে কষ্ট হচ্ছিল, একটু ইতস্ততঃ করে মামাকে বললুম,—"মামা, বেলা হয়ে যাচ্ছে—"

মামা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললেন—"তাই তো, আচ্ছা কাল সকালে এসো।" এর পর কি বা বলব, শ্রান্ত পদে তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পান্থশালার খোঁজে চললুম।

নতুন জায়গা, কোথায় যাব, কি করব, ভাবতে ভাবতে চলছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল—"ও মশাই, শুনছেন?"

চম্‌কে পিছন ফিরে দেখি, মামার বাড়ীর সেই রোগা ভদ্রলোক। আমার কাছে এসে তিনি বললেন—"বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কোথায় চললেন?"

আমি উত্তর দিলুম—"থাকবার আর খাবার জায়গা খুঁজছি।"

তিনি প্রশ্ন করলেন—"গোবিন্দ বাবুর কাছে এসেছিলেন কি উদ্দেশ্যে?"

আমি বললুম—"গোবিন্দ বাবু আমার মামা হন। একটা কোন কাজ-কর্ম্মের আশায় তাঁর কাছে এসেছিলুম।"

তিনি বললেন—"তাঁর কাছে বড় সুবিধা হবে, এমন মনে হচ্ছে না। তবে দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।"

আমি বললুম—"মনে করব কেন! বলুন না, কি বলবেন।"

তিনি মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন—"আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা ছিল।"

আমি বিস্মিত হলুম। যার পকেটের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তিনি আমার মত লোকের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন! নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। অবিশ্বাসের সুরে বললুম—"আমার কাছে প্রার্থনা! কি বলছেন আপনি! আমার কি আছে?"

তিনি অতি বিনীত ভাবে বললেন—"আপনার কাছে যা আছে, এমন জিনিবই চাইব। যদি অনুমতি দেন ত বলি।"

আমারও কৌতূহল হচ্ছিল খুব। কি এমন জিনিষ? তাই

ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করলুম—"কি জিনিষ, বলুন। আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই দেব।"

প্রৌঢ়টি গদগদ কণ্ঠে বললেন—"আপনার এই চমৎকার ছায়াটি আমার বড় ভাল লেগেছে। আপনি যদি দয়া করে আপনার ছায়াটি নেবার হুকুম দেন, তা হলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। অবশ্য আমি তার বদলে আপনাকে এই থলেটি দিচ্ছি। এই থলির মধ্যে যখনই হাত দেবেন, তখনই দশটি করে মোহর পাবেন। আপনার বিশ্বাস না হয়, থলেটি হাতে নিয়ে পরখ করে দেখুন।"

আমি থলেটি নিয়ে ভেতরে হাত চালিয়ে দিলুম। হাত বার করতেই দেখলুম—মুঠোয় দশটা মোহর! আবার হাত দিলুম, আবার বার হ'ল দশটা মোহর, আবার—আবার! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! এই থলে আমার হবে! বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রশ্ন করলুম—"এই থলেটি কি সত্যই আমাকে দেবেন?"

তিনি হেসে বললেন—"নিশ্চয়, যদি আপনি অনুগ্রহ করে আপনার ছায়াটি আমায় দেন।"

ছায়া দেব! এ আবার কি প্রস্তাব! লোকটা পাগল না কি! বললুম—"ছায়া নেবেন কি করে? ছায়া আর কায়া তো অবিচ্ছেদ্য। কায়া ছাড়া তো ছায়া হয় না।"

তিনি মুচকে হেসে বললেন—"সে আমি নিতে পারব। আপনি দয়া করে আদেশ দিন।"

বুঝলুম, পাগলের পাল্লায় পড়েছি। ছায়া কখনও নেওয়া সম্ভব? আর এই তুচ্ছ ছায়ার জন্য এমন মহামূল্য থলে কেউ হাতছাড়া করে? যাক্, থলেটা যখন পাওয়া গেছে, তখন ছায়া দিতে আপত্তি কি। এই ভেবে উত্তর দিলুম—"বেশ তো, যদি নিতে পারেন নিন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" মূল্যহীন ছায়া—নিতে পারে নিক না।

লোকটি প্রীত কণ্ঠে বললেন—"ধন্যবাদ!"—এই বলে তিনি হাঁটু গেড়ে পথের উপর অতি সন্তর্পণে ছায়ার তলায় হাত দিলেন। ও-মা, এ কি। কাপড়ের মত আমার ছায়াটাকে গুটিয়ে পকেটে পুরে ফেললেন! তার পর আর একপ্রস্থ ধন্যবাদ দিয়ে—"আবার দেখা হবে"—বলে প্রস্থান করলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! এ স্বপ্ন না সত্য? ভদ্রলোক তৎক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন। কতক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙ্গল কয়েক জনের বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠস্বরে! শুনলুম, এক জন আর এক জনকে বলছে—"ও ভাই, লোকটির ছায়া নেই।" বুঝলুম, স্বপ্ন নয়, সত্য! এই তো হাতে সেই থলে রয়েছে! ওদিকে চারিধার থেকে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি আর শেষ! তাড়াতাড়ি এক গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু পরে একটা গাড়ী যাচ্ছে দেখে তাতে চেপে বসলুম এবং গাড়োয়ানকে সব চেয়ে ভাল হোটেলে নিয়ে যাবার হুকুম দিলুম। পকেটে তখন প্রায় বাটটি মোহর এবং সেই সর্ব্বধনের খনি থলে! আমায় পায় কে!

হোটেলের সামনে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই ক'জন লোক আমাকে ঘিরে বলে উঠল—"ওরে দেখ দেখ, লোকটির ছায়া হারিয়ে গেছে!"—সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাসির ধুম! আমি তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানের হাতে একটা মোহর গুঁজে দিয়ে ছুটে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

আমার তখন পয়সার অভাব নেই! হোটেলের সব চেয়ে ভাল ঘর থাকবার জন্য বেছে নিলুম। ঘরের দরজা বন্ধ করে থলের মধ্যে হাত পুরে দিলুম, বার হল দশটা মোহর। আবার ক্রমাগত থলের হাত পুরি, আর দশটা করে মোহর বার হয়, দেখতে দেখতে মেঝের ওপর মোহরের পাহাড় গড়ে উঠল। মোহরগুলি আমি ঘরময় ছড়াতে লাগলুম। মোহরের ঝন্-ঝন্ আওয়াজ কানে যেন অমৃত বর্ষণ করতে লাগল। টাকার নেশায় তখন আমি মত্ত—উদভ্রান্ত! মোহরগুলি পা দিয়ে মাড়িয়ে চারি ধারে ছুঁড়ে, তার ওপর শুয়ে কিছুতেই যেন মনে তৃপ্তি পেলুম না! অবশেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উত্তেজনায় কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন গভীর রাত্রি! পৃথিবী নিস্তব্ধ, প্রাণি-জগৎ সুষুপ্তির কোলে নিমগ্ন! আমি একা মোহরের পাহাড়ের ওপর জেগে বসে। ঘরের কোণে একটা খালি সিন্দুক ছিল। মোহরগুলি সেই সিন্দুকের মধ্যে ভরে বিছানায় বসে নিদ্রাহীন চোখে ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে করতে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

ভোর হতেই হোটেলের এক ভৃত্যকে ডেকে যত রকম উৎকৃষ্ট খাদ্য সম্ভব, আনিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগলুম। পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহারের পর এক মুঠো মোহর পকেটে ফেলে বাজারে বার হলুম—পোষাক-পরিচ্ছদ আর কয়েকটি দরকারী জিনিষ-পত্তর কিনতে। সকালের দিকটা মেঘলা করেছিল, আর আমার যে ছায়া নাই, সে কথা মনেও ছিল না। দোকানের কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড রোদ উঠে পড়ল। সেই সময় এক দল স্কুলের ছেলে যাচ্ছিল। আমাকে ঘিরে তারা চীৎকার করতে লাগল—"ও মশাই, ছায়া কোথায় ফেলে এসেছেন?" যে ছায়ার কথা এতক্ষণ ভুলেছিলুম, তাদের চীৎকারে সেই কথা মনে পড়ে গেল। আমি প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলুম। "ও মশাই, ছায়া কোথায়" বলতে বলতে তারাও আমায় তাড়া করলে—শেষে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি একটা দোকানে ঢুকে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করলুম। ছেলেরা কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পর দোকানদারের তাড়া খেয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

দোকানের সব চেয়ে ভাল এবং দামী কাপড়-জামা, জিনিষ-পত্তর কিনে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে পথ পরিষ্কার দেখে দোকানদারকে একটা গাড়ী ডেকে দিতে বললুম। পথ দিয়ে হাঁটতে সাহস হ'ল না! কে জানে, আবার কি ফ্যাসাদ ঘটবে! গাড়ী করে হোটেলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তার পর গাড়ী থেকে নেমেই এক ছুটে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। হোটেলের ভৃত্যকে দিয়ে জিনিষ-পত্তর আনালুম আর গাড়োয়ানের ভাড়া পাঠিয়ে দিলুম।

সেই ঘটনার পর শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে দিন-দুই ঘর থেকে বার হইনি।

কিন্তু দিন-রাত ঘরে বন্ধ থেকে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে? অথচ বেরুই কোন্ সাহসে? অনেক ভেবে-চিন্তে এক উপায় বার করলুম। সব সময় যদি এক জন সঙ্গী নিয়ে বেরুই, তাহলে এক ছায়াতে দু'জনের চলে যেতে পারে! আমার যে ছায়া নেই, সেটা চট করে ধরা পড়বে না। তখনই হোটেলের কর্ম্মকর্ত্তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললুম—"দেখুন, আমার নিজের জন্য একটি চাকর চাই,

মাথায় যতটা সম্ভব আমার মত হবে, আর খুব বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। আপনার সন্ধানে যদি এমন লোক থাকে তো দিন, মাইনের জন্ত আটকাবে না।"

আমার আমিরী চাল-চলনের জন্য ম্যানেজার আমায় খুবই খাতির করতেন। তিনি সেই দিনই একটি লোক জোগাড় করে দিলেন, তার নাম কানাই। চেহারা দেখে এবং কথাবার্ত্তা শুনে তাকে আমার খুবই পছন্দ হল। তখনই বেশ মোটা মাইনে দিয়ে কাজে বহাল করলুম। একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মনটা প্রসন্ন হলো! এবার পথে বেড়ানো চলবে।

পরদিন সকালে হোটেলের সঙ্গে লাগাও যে বাগান—সেই বাগানে কানাইয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এক ছায়ায় কি করে দু'জনের চলতে পারে, অভ্যাস করছি—দেখি, কানাই ক্রমাগত চক্ষু ছানাবড়া করে আমার মুখের দিকে চাইছে! আমি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"বার বার মুখের দিকে অমন করে চাইছ কেন?"

কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বেহায়ার মত সে বললে—"আজ্ঞে, আপনাকে দেখছি।"

আমি ভয়ানক চটে গেলুম। বেয়াদব বলে কি! রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম—"আমায় দেখছ, তার মানে? মানুষ দেখনি কখনো?"

সে সেই রকম নির্লজ্জের মতই উত্তর দিলে—"ছায়া নেই, এমন মানুষ জীবনে আজ এই প্রথম দেখলুম।"

বুঝলুম, ধরা পড়ে গেছি! এখন রাগারাগি করলে ফল খারাপ হবে! কৌশলে মিষ্ট কথায় কাজ উদ্ধার করতে হবে। তখনই তাকে ঘরে এনে তার হাতে দু'টো মোহর গুঁজে দিয়ে বললুম—"এক সন্ন্যাসীর শাপে আমার এই দশা হয়েছে। এ কথা কাউকে তুমি বলো না। আমি তোমায় বড় লোক করে দেবো।"

দু'টো চকচকে মোহর হাতে পেয়ে একান্ত বিনীত ভাবে কানাই বললে—"আজ্ঞে, আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কথা আমি ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেব না।"

যদিও সে বললে নিশ্চিন্ত হতে, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। কখন্ কাকে বলে দেবে, কে জানে?

কয়েক দিন এই রকম ধুক-পুকানির মধ্যে কেটে গেল। কিন্তু সে কাউকে কিছু বললে না দেখে মন অনেকটা শান্ত হ'ল।

তাকে নিয়ে সন্ধ্যার পর প্রায়ই বেড়াতে যাই। দিনে বেরুই না, বলি, চোখের অসুখ। রৌদ্রে বার হওয়া নিষেধ।

এক দিন সন্ধ্যায় কানাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, কি একটা দরকারে কানাইকে পাঠিয়েছি কাছের এক দোকানে, এমন সময় আকাশে চাঁদ উঠলো। আমি ধীরে ধীরে হাঁটছি। ছায়ার কথা ভুলে গেছি—চাঁদ উঠেছে লক্ষ্য করিনি। এক জন ভদ্রলোক একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—"ও বাবা, দেখ, লোকটির ছায়া নেই!" তিনি আমার দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে মেয়েকে বললেন—"চলে আয়, ও মানুষ নয়। মানুষ মাত্রেরই ছায়া থাকে।"—এই কথা বলে মেয়ের হাত ধরে হন্-হন্ করে তিনি চলে গেলেন। আমি লজ্জায় অপমানে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলুম!

কানাইকে নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে হোটেলে ফিরে গেলুম। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলুম। আজ আমার অর্থের অভাব নেই! কিন্তু সুখ কই? তুচ্ছ ছায়ার দামও এই অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারের চেয়ে বেশী! নিজের অজ্ঞাতে চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল! কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ দেখি, সামনে প্রকাণ্ড এক পাহাড়—সোনা, হীরা, জহরত দিয়ে গড়া। এক জন সাধু সেই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সামনে সেই পাহাড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—"পাপ, পাপ! অর্থই অনর্থের মূল!"—এই কথা বলে দ্রুতপদে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। কিছুক্ষণ পরে সেইখানে তিন জন চোর এসে উপস্থিত। ধনরত্নের পাহাড় দেখে তাদের সে কি আনন্দ! কিন্তু সে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। প্রত্যেকেরই মনে হতে লাগল, কি করে অপর দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে সে একলা সমস্ত ধনরত্ন ভোগ করতে পারবে! এক জন বললে—"ভাই, ভয়ানক ক্ষিধে পেয়ে গেছে। গ্রাম থেকে কিছু খাবার নিয়ে এলে ভাল হয়।" কিন্তু কে যাবে? কারুরই যাবার ইচ্ছা নাই! শেষে লটারী করে যার নাম উঠল, তাকেই যেতে হ'ল। অপর দু'জন ঠিক করলে, তারা লুকিয়ে থাকবে। যেই খাবার নিয়ে তাদের বন্ধু ফিরবে, তখনি তারা পিছন থেকে আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলবে! তা হলে এই ধন-রত্নের এক জন অংশীদার কম হবে! তাদের ভাগও অনেক বেড়ে যাবে!

ওদিকে যে খাবার আনতে গেছে, সে করেছে কি, নিজে পেট ভরে খেয়ে অপর দু'জনের খাবারে বিষ মিশিয়ে নিয়ে চলেছে! ভাবছে, ওরা খাবার খেয়ে অক্কা পাবে, আর তখন সে একলাই সমস্ত ধনরত্নের মালিক হবে! সে মনের আনন্দে গান করতে করতে চলেছে। রত্নের পাহাড়ের কাছাকাছি পৌছুতেই অপর দু'জন তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এমন প্রচণ্ড প্রহার দিলে যে, তখনই তার পঞ্চপ্রাণ গেল বাতাসে মিশিয়ে! তখন দু'জনে খুশী মনে খাবার খেতে বসল! কিন্তু খাবারে যে বিষ-মেশানো, তা ত' তারা জানত না! কাজেই খাওয়া মাত্রই দু'জনের ইহজন্মের লীলাখেলা শেষ! দেখতে দেখতে ধনরত্নের পাহাড় কোথায় মিলিয়ে গেল! পড়ে রইল শুধু তিনটি মৃতদেহ!

ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম! ঘুম ভেঙ্গে গেল। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে! মনে হ'তে লাগল—হায়, হায়, কি কুক্ষণে এই মহা অনর্থকারী থলেটি নিয়েছিলুম! জীবনের সব সুখ-শান্তি জন্মের মত উবে গেল!

ভোর হতেই হোটেলের চাকর আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। খুলে দেখি, তাতে দু'টি মাত্র ছত্র লেখা—

"এখনও আপনার অনুশোচনা সম্পূর্ণ হয়নি। এখন আমি বহু দূরদেশে যাত্রা করছি, এক বৎসর পরে আবার দেখা হবে। সে দিন হয়ত' আপনাকে আরও ভাল জিনিষ দিতে পারব।

বিনীত শ্রী—

তলায় নামসহি ছিল না। কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনি সেই রোগা ভদ্রলোক—যিনি আমাকে থলে দিয়ে আমার ছায়া নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুখ-শান্তি সব হরণ করেছেন!

এক বৎসর কবে পূর্ণ হবে, কবে আবার তাঁর দেখা পাব, বসে বসে শুধু দিন গুণছি!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

ছোটর জোর

(ইভান্ ক্রাইলভের ছন্দ-কাহিনীর মর্ম্মানুবাদ)

ছোটরে করো না তুচ্ছ, করো না কো হেলা !
ছোটরে পীড়ন করা—অগ্নি নিয়ে খেলা !
যত শক্তি থাক্ তব কঠিন নিষ্ঠুর—
ছোট যদি ক্ষেপে ওঠে—সব হবে চুর !

বনে এক সিংহ ছিল। ভারী দম্ভ তার !
সকল-প্রাণীর 'পরে করে অনাচার !
সবে বলে, পশু-রাজ ! ভয়ে ভক্তি করে।
কেশর ফুলায় সিংহ অতি-দর্প-ভরে !
বনে থাকে ক্ষুদ্র মশা—তারে তুচ্ছ গণে ;
দেখিলে ফিরায় মুখ নাসিকা-কুঞ্চনে !
শ্লেষ করে, ব্যঙ্গ করে, হাসে কি কৌতুকে !
অপমান-শেল বাজে মশকের বুকে !
মশার হইল রোষ—এত তুচ্ছ করো !
ছোটরে আঁটিতে তুমি কত শক্তি ধরো !
ঝাঁজিয়া কহিল মশা,—যুদ্ধ দাও, দেখি !
হেসে সিংহ কয়,—ক্ষুদ্র মশা বলে এ কি !
মশা বলে,—বাক্য রাখো, দেখাও বিক্রম !
আমি মশা, হতে পারি কালান্তক যম !
রণে মাতে মশা পোঁ-পোঁ ভেঁপু-রব তুলে,
সিংহেরে ঘিরিয়া ফেরে রাগে ফুঁশে ফুলে !
মজা পেয়ে হাসে সিংহ। মশা আরো রোখে !
উড়ে বসে সিংহের নাকে-মুখে-চোখে।
ভেঁপু না থামায় তিল, বিরাম না মানে—
পিঠে-পেটে হুল ফোটে, যেন ছুঁচ টানে !
কেশর ফুলায় সিংহ, ল্যাজ নাড়ে জোরে,
থাবা মারে ! মশা উড়ে চারি দিকে ঘোরে,
পোঁ-পোঁ ভেঁপু ! ফাঁক খোঁজে বসিবে কোথায় !
হেথায় বিঁধিছে হুল, বিঁধিছে হোথায় !
নাকে বেঁধে, কাণে বেঁধে। কামড়ের ঠেলা !
সিংহের টুটিল ধৈর্য্য। মারাত্মক খেলা !
ফুলিল কেশর ঘাড়ে, করিল গর্জ্জন !
সে-ডাকে আকাশ কাঁপে ! কাঁপে সারা বন !
নখরে ছিঁড়িল মৃত্তি, দাঁতে ঘসে দাঁত।
বনে যত পশু-পক্ষী,—ভয়ে ছাড়ে ধাত্ !
বন ছেড়ে ছুট দেয়, লুকায় বিবরে—
ভাবে, বাণ ? ভূমিকম্প ? অগ্নিবৃষ্টি ঝরে ?
মশার বিরাম নাই ! সিংহ-দেহে চড়ে'
অস্থির-অধীর করে কামড়ে-কামড়ে !
গর্জ্জনে-হুঙ্কারে সিংহ করে লাফালাফি,
গড়াগড়ি খায়। ক্ষেপে কি সে দাপাদাপি !
কামড়ে-কামড়ে সিংহ ব্যথায় কাতর
নিরুপায়ে লোটে শেষে ভূমির উপর !
মিনতি ভরিয়া কণ্ঠে কহে,—মশা ভাই,
ক্ষমা কর্ ! - জ্বলে মরি ! খুব শিক্ষা পাই !
নাকে-কাণে খৎ দিই, লুটাই কেশর !
তুচ্ছ তুই নোস্ ভাই, যমের দোসর !
মশার থামিল রোষ—থামায় কামড়।
সিংহ বলে,—শক্তিমান্, করি তোরে গড় !
মশা বলে,—ছোটরে করিস্ অবহেলা ?
ছোট যদি রুখে ওঠে, সাম্লাবি ঠেলা ?
সিংহ বলে,—কাণ মলি ! বুঝিয়াছি সার—
ছোট, ছোট নয় ! শক্তি খুব আছে তার !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আত্ম-পরীক্ষা

পরের দোষ-ত্রুটি দেখতে আমরা যেমন বিশ-জোড়া চোখ মেলে' চাই, তেমনি সে দোষ-ত্রুটির কীর্ত্তনে হই সহস্র-মুখ ! কিন্তু নিজের বেলায় একেবারে অন্ধ থাকি ! তার ফলে হয় এই যে, পরের দোষ-ত্রুটি দেখতে দেখতে এবং তার ব্যাখ্যানা করতে করতে আমাদের *নিজেদের দোষ-ত্রুটি সারানো চলে না ; সেগুলো বেড়ে ওঠে !* এবং আমাদের বুদ্ধি হয় ভোঁতা এবং ছিদ্রান্বেষী।

পরের দোষ-ত্রুটি চোখে পড়লে তা না দেখে উপায় নেই, মানি ! কিন্তু সে দোষ-ত্রুটির কথা কইতে যাবার আগে নিজেদের মনের মধ্যে একবার সন্ধান নিলে ভালো হয় না ? পরের যে-দোষ দেখে গা জ্বালা করে, ও-দোষ যদি আমার থাকে ? থাকলে আমাকে দেখে পরের গা-ও তো এমনি জ্বালা করবে !

এ জন্য উচিত, নিজের মনের সন্ধান নেওয়া। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একটি চমৎকার গান লিখে গেছেন—

"অপরকে চিনবে যদি, আপনাকে চেনো আগে !"

এ-চেনা যে চিনেছে, জীবনে তার সাফল্য-লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না !

নিজের মনের সন্ধান পেতে হলে নিজের মনকে একান্তে প্রশ্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কি প্রশ্ন ?

গোটাকতক নমুনা দিচ্ছি।

ধরো, ছুটীর দিন। একলা-একলা এ-দিনটি কাটাতে পারো ? সারা দিনে কারো অভাব বোধ করবে না ? এমন কিছু ভাল কাজ বা লেখা-পড়া করবার মতো ধৈর্য্য এবং শক্তি আছে ? তা যদি থাকে, তাহলে জেনো, মানুষ হবার পক্ষে এ-স্বভাব তোমাকে বহু সাহায্য করবে ! ছুটীর দিনটা ঘুমে কাটানো, কোনো কাজ না করে তাস-পাশা খেলে, বা পরচর্চ্চা করে কাটানোর পর মনে যদি অনুশোচনা জাগে যে, তাই তো, সারাটা দিন মিথ্যা নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে বুঝবে, আলস্যে তোমার রুচি নেই ! এবং সাবধান হয়ো, এ ভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক নয় !

কোনো একটা সমস্যা উপস্থিত—দো-টানায় পড়েছো—এ কাজ করবে, কিম্বা করবে না ! সেখানে যাবে, কিম্বা যাবে না !—এ রকম সমস্যায় দ্বিধা-সংশয়ে বিচার-বিবেচনা করতে যদি না পারো, তাহলে বুঝবে, তোমার চরিত্রে দৃঢ়তা নেই ! চরিত্রে যার দৃঢ়তা নেই, কোনো দিন সে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে না।

সমস্যা ঘটলে চটপট তার সমাধান করতে পারা চাই। ছোটবেলা থেকে এদিকে যদি হুঁশিয়ার থাকতে পারো, তাহলে দেখবে, জীবনে বড় বড় বিপদ এসে পাহাড়ের মতো বাধা তুলে দাঁড়ালে সে বিপদ-বাধা অনায়াসে ঠেলে ঠিক পথে নিজের লক্ষ্য ধরে চলে যেতে পারবে।

নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর বিশ্বাস আছে তোমার? না, পরের ভালো-মন্দ-বিচারের উপর নির্ভর করো? নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর যদি আস্থা বা বিশ্বাস করতে অথবা নির্ভর রাখতে না পারো, তাহলে জগতে কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, জেনো।

পরের মতামত ধার করে চলার মতন বিড়ম্বনা আর-কিছুতে নেই! সব-ব্যাপারে 'অমুক এই বলেছেন' এমন মনোভাবকে কদাচ বাড়িয়ে তুলো না। নিজে বিচার করতে শেখো। নিজের বিচার-বুদ্ধি তাহলে শাণ পেয়ে ধারালো হবে! তুমি কেন পরের মতামত ধার করে চলবে? বিচার-বুদ্ধিতে শাণ দিয়ে এমন করা চাই যে, তোমার মতামত অপরে শিরোধার্য্য করুক! সাহিত্য, আর্ট—এ-সব ক্ষেত্রে অনেক লোককে দেখি, তারা পরের কোটেশন্ ধরে দাঁড়াতে চায়! জেনো, এ-সব লোক পর-গাছার মতন কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না—পরের মনের আওতার মাটীতে নেতিয়ে এদের জীবন কাটবে!

যে-কাজ করতেই হবে, সে-কাজে আনন্দ পাওয়া চাই। তা যদি না পাও, তাহলে কাজ ভালো হবে না। এবং কাজ যদি ভালো না হয়, তাহলে কখ্‌খনো কাজের লোক হতে পারবে না!

জীবনে আমরা আশা করি অনেক—সে-সব আশা কতখানি সফল হয়? মনকে তৈরী করতে হবে এমন করে যে, ছোট-বড় নৈরাশ্যের আঘাত যেন সহ্য করতে পারো—সে-আঘাতে মুষড়ে বিচলিত হলে চলবে না! Try Try Try again—এ-কথা খুব দামী।

যারা অনাত্মীয়, যারা বন্ধু নয়, যারা অপরিচিত—তাদের সহ্য করতে পারো? যদি বলো 'না', তাহলে এ বদভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে। কারণ, পৃথিবীতে শুধু আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মেলা-মেশা করেই দিন কাটবে না! বহু অনাত্মীয়ের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হবে! সুতরাং সকলকেই সইয়ে নিতে হবে। কাকেও অসহনীয় মনে করে চললে বিপদ ঘটবে!

পরের গুণ দেখলে সে-গুণকে আদর করতে হবে! শ্রদ্ধা করতে হবে! পরের খুঁৎ না খুঁজে গুণ দেখবার চেষ্টা করো। গুণগ্রাহী হতে পারলে তুমিও গুণী হবে। যারা ছিদ্রান্বেষী, তারা কোনো দিন সমাজে কারো প্রীতি-ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা-সম্মান পায় না।

পরের যে-আচরণ বা কাজ দূষণীয় মনে করো, নিজে তেমন আচরণ বা কাজ করতে লজ্জা বোধ করো। সাবধান, পরকে যে-দোষে দোষী করছো, সে-দোষ যেন তোমার না থাকে!

আত্ম-পরীক্ষার অর্থাৎ নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে করতেই মনের সব জঞ্জাল সাফ হবে; মানুষ তার ক্ষুদ্রতাকে বর্জ্জন করে মানুষ হতে পারবে। তাছাড়া মানুষ হবার আর অন্য উপায় নেই!

——

ময়-দানবের পুরী

মহাভারতে পড়িয়াছি, রাজা যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দানব-শিল্পী ময় তখন ইন্দ্রপ্রস্থকে একেবারে মায়াপুরী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন! সে পুরী কেমন, মহাভারতে বর্ণনা আছে, পড়িয়া দেখিয়ো।

একালে রুশ-জাতিও দানব-শিল্পী ময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সাইবেরিয়ার উত্তরে তুষারের বুকে এমনি পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজ সেই পুরীর কথা বলিতেছি।

সাইবেরিয়া বা এশিয়াটিক-রাশিয়ার উত্তরে চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর-মেরু। এই হিম-দুর্গম প্রদেশে কি আছে জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহল যেমন সীমাহীন, তেমনি সে-কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মরণ-পণ করিয়া বহু সাহসী ব্যক্তি এ-পথে বহু বার যাত্রা করিয়াছেন! তাঁদের মধ্যে অনেকে আর ফিরিয়া আসেন নাই। যাঁরা ফিরিয়াছেন, তাঁরা যত দূর যাইতে পারিয়াছিলেন, ততখানি পথের রোমাঞ্চকর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব বৃত্তান্ত পড়িয়া ছ'-সাত বৎসর পূর্ব্বে পাঁচ জন রাশিয়ান কম্মবীর—জাহাজে নয়—বিমান-পোতে চড়িয়া উত্তর-মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন। তাঁদের

বুলুন—ঘর-বাড়ী

উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে কি আছে, তাহার সন্ধান লওয়া এবং বসতি-স্থাপনার ব্যবস্থা হয় কি না, তাহা নির্ণয় করা।

মস্কো হইতে উত্তর-মহাসাগরের উপর দিয়া তাঁরা পূর্ব্ব দিকে আলাস্কা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এ-পথে যাত্রী-হিসাবে তাঁরাই সকলের পুরোবর্ত্তী। তাঁহাদের পরে ক'জন যাত্রী বিমান-পোতে চড়িয়া কালি-ফোর্ণিয়া হইতে নোকি, আলাস্কা এবং আর্কেঞ্জেল প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দৈব-দুর্বিপাকে কোথাও কোনো অস্থানে যদি নামিতে হয়, এ জন্য তাঁরা তাঁবু, শয্যা-থলি, বরফে তাপ রক্ষা করিয়া বাঁচিবার সরঞ্জাম-পত্রাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। বিমান-পোতের পুচ্ছে তাঁরা জলের ট্যাঙ্ক রাখিয়াছিলেন; সে ট্যাঙ্ক হইতে পাম্প করিয়া ইচ্ছামত জল লইবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিরও অভাব ছিল না।

উপর্য্যুপরি এমনি ভাবে মেরু-পরিক্রমণের ফলে রুশ-জাতি দুর্গম মেরু-প্রদেশের পথ নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সেখানে তুষারের বুকে বসতি এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে-সব স্থানে জন-মানবের চিহ্ন ছিল না, এখন সে সব জায়গায় ঘন বসতির সঙ্গে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া কোথাও মিলিয়াছে সোনার খনি, কোথাও কয়লা, কোথাও খনিজ তৈল, কোথাও বা নিকেল, কাঠ, তামা; তার উপর লবণ-গিরিও পাওয়া গিয়াছে।

এ-সব প্রদেশে আসিবার জন্ত বিমানপোতই এখন একমাত্র অবলম্বন নয়। জমাট কঠিন তুষার-স্তূপ ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে পারে, এমন বহু বাষ্পীয়-পোত বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গম
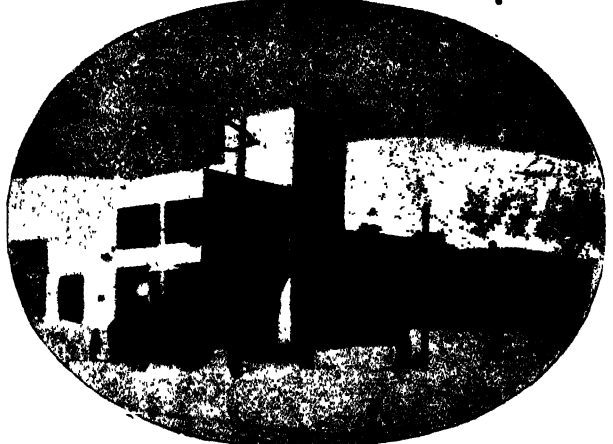
এত বড় মূলা!

মেরুপ্রদেশকে নানা দিক্ দিয়া বাসোপযোগী এবং বাণিজ্যোপযোগী করিয়া তুলিতে সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্টের অধ্যবসায়ের সীমা নাই! সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে কোলিমা-প্রদেশে যে সোণা মিলিয়াছে, আলাস্কার সোণার চেয়ে তাহা বহু-গুণ পরিশুদ্ধ ও দামী। তাছাড়া তুষার-বক্ষ ভেদ করিয়া মোটর-বাহী বড় বড় পথ তৈয়ারী হইয়াছে, সে পথের দৈর্ঘ্য -- মাইলের অধিক।
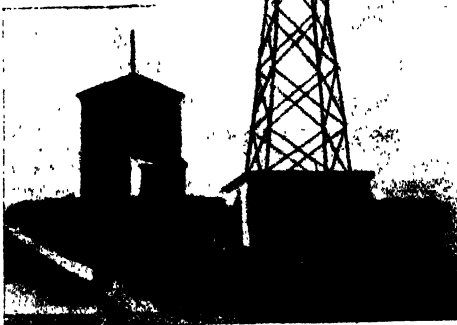
বাতাসের জোরে মিল্ চলে!

উত্তর-মেরুর গায়ে পেট্রোল এবং কেরোসিনের বিপুল খনি মিলিয়াছে। পশ্চিমে নভি প্লোর্টো হইতে পূর্ব্বে কোলিমা পর্য্যন্ত কয়লা-খনির সুদীর্ঘ প্রসার। এ-সব খনি হইতে বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন করিয়া কয়লা উঠিতেছে।

জমির সারের জন্ত রাশিয়া পূর্ব্বে বিদেশ হইতে ফশ্‌ফেট

সিনেমা-হাউস্—উত্তর-মেরু

আনাইত। এখন তার প্রয়োজন নাই। এখন নবাবিষ্কৃত মার্-মান্স হইতে প্রচুর ফশ্‌ফেট মিলিতেছে। এত ফশ্‌ফেট যে, নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া সারা পৃথিবীকে রাশিয়া এখন ফশ্‌ফেট জোগান দিতে পারে!

মেরু-বক্ষে মোটর-বোট

বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-সব প্রদেশ জনবসতি-বহুল হইয়াছে; এবং অসংখ্য ঘর-বাড়ী, স্কুল, কলেজ হাসপাতাল, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির সমাবেশে সমৃদ্ধির আজ অন্ত নাই! এখানে ছ'মাস রাত্রি, ছ'মাস দিন। এই ছ'মাস-দিন-ছ'মাস-রাত্রির দেশের লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। তুলোমা নদীর মোহনায় বৈদ্যুতিক প্ল্যাণ্ট বসানো হইয়াছে। তার সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আনিয়া এ প্রদেশে পথ-ঘাট ঘর-বাড়ী আলোকিত করা হইতেছে; কল-কারখানা এবং রেল-গাড়ী চলিতেছে সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের জোরে।

ম্যাপে ভাখো টিক্‌শি উপসাগর। এই সাগরের কূলে টিক্‌শি প্রদেশ। সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে এ প্রদেশ ছিল তুষার-সমাধির নীচে, লোক-লোচনের অন্তরালে! এখন এই প্রদেশটি এ-অঞ্চলের বিশাল বন্দররূপে পরিগণিত। এখানকার কাঠের চমৎকারিত্ব এবং বৈচিত্র্য

উত্তর-মেরু

বিপুলতার সীমা নাই। টিকশিতে প্রায় ২৫০ পরিবারের বাস। প্রশস্ত পথ-ঘাট, কাঠের তৈয়ারী সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী, হাসপাতাল, বেতার-ষ্টেশন—কোন-কিছুর অসদ্ভাব নাই! হিমেল বাতাসে অসহ্য বেগ। সে হিম-বায়ুকে সোভিয়েট-গবর্ণমেণ্ট আজ আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই! সে বায়ু-বেগকে আয়ত্তাধীন করিয়া তাহা দিয়া আলো জ্বালা, জল তোলা, মিল্‌-চালানোর কাজ করাইয়া লইতেছেন।

এখানে রোগের বালাই নাই। সকলের স্বাস্থ্য ভালো। দেহ-মনে অবসাদ বা জড়তার-বৈলক্ষণ্য বড় একটা দেখা যায় না। তবে এখানকার লোকজন যদি এ হিমের দেশ ছাড়িয়া নিম্ন-মালভূমিতে তাপের দেশে যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে চট্ করিয়া আক্রান্ত হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, হিমেল হাওয়ায় রোগ-বীজাণু থাকে না! কাজেই এ দেশের লোকের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি তেমন গড়িয়া ওঠে না; এবং তাহারি জন্য তপ্ত-প্রদেশে গেলে তাদের পক্ষে রোগ-বীজাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়; এবং তাহারি ফলে হয় রোগ!

তোমরা ভাবিতেছ, সব তো বেশ! বরফের বুকে সোণা, তামা, তেল ও কয়লার খনি মিলিয়াছে! কিন্তু গাছপালা? তৃণ, শস্য, ফল, ফুল ফলে? ফলে। রুশ বৈজ্ঞানিকদের সাধনায় এ সব তুষার-প্রদেশে চাষবাসের সুব্যবস্থা হইয়াছে। আলু, গাজর, বীট, কপি, কলাই-শুঁটি, শসা, কুমড়া, শালগম, মূলা প্রভৃতি ফশল অজস্র ফলিতেছে। তাছাড়া নানা ফলমূলের বীজ আনাইয়া সে সবের ফলনেও তাঁদের সাধনার সীমা নাই। এ সব ফশল ফলানো হইতেছে হট-হাউসের মধ্যে! তার উপর বিভিন্ন ফল-ফুলের বীজ মিলাইয়া-মিশাইয়া (cross-breed) তাঁরা নব-নব বিচিত্র ফল-ফুল ফলাইতেছেন!

সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট সবচেয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন মেরু-পথকে সুগম করিয়া। যে-পথের সম্ভাব্যতা সাত বৎসর পূর্ব্বেও মেরু-বিশেষজ্ঞেরা "অসম্ভব কল্পনা" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট সেই "অসম্ভব কল্পনা"কে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়াছেন, উত্তর-মেরু ডিঙ্গাইয়া আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত-মহাসাগরে (নর্থ-শী-রুট্) সোভিয়েট-শক্তির নৈপুণ্যে আজ জাহাজ চলিতেছে নিরাপদে নিরুপদ্রবে।

জমাট তুষারে পথ রুদ্ধ হইলেও এ পথে জাহাজকে অচল হইয়া ভাগ্যের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না! পথ রুদ্ধ হইবামাত্র বেতারের মারফৎ মেরু বন্দরে সে-সংবাদ পাঠানো হয়। সংবাদ পাইয়া বিমান-পথে আসিয়া উদয় হয় গাইড্-প্লেন; তাহার সঙ্গে থাকে তুষারভেদী অস্ত্র: সে অস্ত্রে জমাট তুষার ভাঙ্গিয়া পথ দেখাইয়া জাহাজকে নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

তুষার-মরুকে সোভিয়েট-রাশিয়া যে ভাবে পরাভূত করিয়াছে, সে কাহিনী শুনিয়া বুঝিতে পারি, মানুষের অসাধ্য কিছু নাই! এবং উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী উপেক্ষা করেন না,—করিতে পারেন না।

হাউই-প্লেন

মার্কিণ রণতরী-বিভাগের জন্য ছোট-ছোট বিমানপোত অজস্র-সংখ্যায় তৈয়ারী হইতেছে। এগুলির নাম "স্কাই-রকেট" (হাউই)! এ বিমানপোতে দু'খানি মোটর সংলগ্ন আছে। পোতখানি আকারে ছোট;
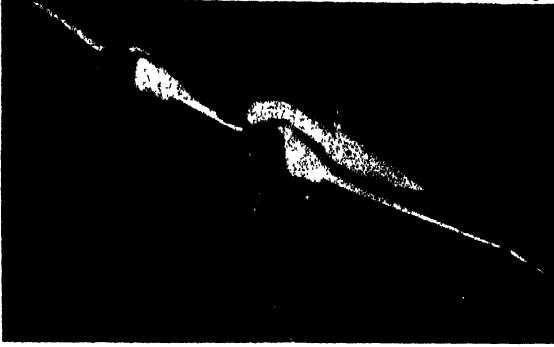
হাউই-প্লেন উপরে উঠিতেছে

দু'খানি মাত্র পাখ্‌না। এবং এক জন মাত্র লোক অর্থাৎ শুধু পাইলট্ এ পোতে বসিতে পারেন। অস্ত্রশস্ত্রে এ বিমানপোত বিপুল ভাবে সজ্জিত; এবং ইহার সম্মুখ-ভাগ হইতে অবিরাম গুলী-বর্ষণ করিবার সুব্যবস্থা আছে। এ পোতে অজস্র-পরিমাণ পেট্রোল ধরে। এঞ্জিন

সিধা গতি

তাতিতে জানে না। বিপক্ষ-প্লেন ও বমারকে দেখিবামাত্র ঘণ্টায় ৪৫০ মাইল বেগে এ-পোত বহু-মাইল উর্দ্ধে শূন্যপথে উঠিয়া বিপক্ষের প্লেন ও বমারকে ধ্বংস করিবে, এই উদ্দেশ্যেই এ হাউই-প্লেনের সৃষ্টি।

শস্যকীট-সংহার

ফলকে আশ্রয় করিয়া তক্ষক-সাপ যেমন রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়া ব্রহ্মশাপের মর্য্যাদা রাখিয়াছিল, নিউ-জার্সির প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর ওয়াক্‌স্‌ম্যান ও উড্রো বলেন, শাকসব্জী এবং ফলমূলকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ রোগের বীজাণু-কীট তেমনি আমাদের দেহে আসিয়া প্রবেশ করে; তাদের বিষে আমাদের স্বাস্থ্যহানি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এ সব বীজাণু-কীট ঐ টাইফয়েড, বসন্ত, আমাশয়, কলেরা, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া রোগের বীজাণু-কীটের সগোত্র! ইহাদের বিনাশের জন্য তাঁহারা 'মৃত্যু-দণ্ড' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ দণ্ডের মধ্যে কীট-বিধ্বংসী রাসায়নিক দ্রাবক ভরিয়া দণ্ডটি মাটীর বুকে বিঁধিয়া খাড় করানো হয়; তার পর দণ্ড-সংলগ্ন টিপ-কলে (trigger) চাপ দিলে বিধ্বংসী রাসায়নিক

টিপ-কলে চাপ

দ্রাবক নিষ্কাশিত হইয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে; এবং মাটীর মধ্য দিয়া মাটীর রসে মিশিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হয়। এই রাসায়নিক দ্রাবকের বলে মৃত্তিকাস্থিত লক্ষ-লক্ষ অলক্ষ্য রোগ-বীজাণু-কীটের ধ্বংস সংসাধিত হয়। কাজেই এ-মাটীর তৃণ-শস্য-গ্রহণে রোগের ভয় থাকিবে না।

বিলাসিনীর ছত্র

যুদ্ধের হাঙ্গামায় শুধু আমাদের এ দেশেই নয়, য়ুরোপ-আমেরিকাতেও অনেককে গাড়ীর মায়া ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া পথ-চলার কাজ সারিতে হইতেছে। এ জন্য বিলাসিনীদের অসুবিধার সীমা নাই! গাড়ীতে বসিয়া পথ-বিচরণে রৌদ্র-তাপ লাগিয়া কান্তি মলিন হইবার কিম্বা বাতাসের বেগে রুজ-প্রলেপ খসিবার তেমন আশঙ্কা ছিল না! এখন পদব্রজে পথ চলিতে রৌদ্র-বাতাসের উপদ্রব,—সে-উপদ্রব নিবারিত হয় শুধু ছত্রতলে শির রক্ষা করিলে! কিন্তু হাতে হাত-ব্যাগ—তার উপর আবার ছাতা,—সে বড় দায়! এ দায় হইতে বিলাসিনীদের রক্ষা করিতে মার্কিণ শিল্পীরা নূতন যে-সব হাত-ব্যাগ তৈয়ারী করিতেছে, সে হাত-ব্যাগের এক দিকে ছাতা

রাখিবার খোল আছে। সেই খোলে ছাতা রাখিতে পাইয়া বিলাসিনীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন! হাত-ব্যাগের

হাত-ব্যাগে ছাতা

খোলে ছাতা বহা—বোঝার উপরে শাকের আঁটি! কাজেই গায়ে লাগে না!

বমারের কার্য্যপদ্ধতি

দিনে-দিনে বমারের যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহাতে কালান্তক যমের হাতে যদি বা পরিত্রাণ মেলে, বমারের হাতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকিবে না! পাইলট ছাড়া বমার-প্লেনে যে-সব কর্ম্মী থাকে, তাদের কাজ যেমন বিভিন্ন ভাবে নির্দ্দিষ্ট, পরস্পরে সহযোগিতাও তেমনি আবার চরম রকমের। সুইচ-সঙ্কেতে পরস্পরের মধ্যে বার্ত্তার আদান-প্রদান চলে। যেখানে বোমা ফেলিতে হইবে সে স্থানের নির্দ্দেশ দিবামাত্র বমারের মেঝেয়-শায়িত গোলন্দাজ কর্ম্মী (aimer)
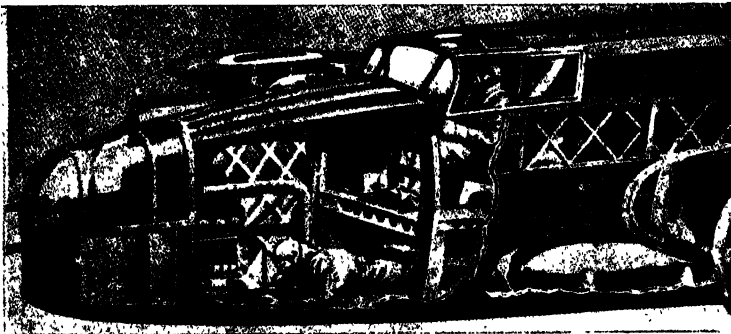
"ওয়েলিংটন" বমার; উপরে শুইয়া 'এমার'

কনট্রোলে চাপ দিয়া সংরক্ষিত বোমা মুক্ত করিয়া দেয়। যে-ব্যক্তি স্থান নির্দ্দেশ করে, বমারের অবস্থান-উচ্চতা, গতি-বেগ, বাতাসের গতি—মীটারের সাহায্যে এ-সব সে সঠিক ভাবে নির্ণয় করিয়া দেয়। হিসাবে একটু ভুল-চুক হইলেই বমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাশে বৃটিশ বমার ওয়েলিংটন এবং তিন-রকম বোমার ছবি দেওয়া হইল।

তিন রকম বোমা

ফিঙা-বমার

কাকের পিছনে ফিঙা লাগিলে কাক যেমন বিপন্ন হয়, বমার-প্লেনকে বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তেমনি বাধা-স্রষ্টা (interceptor) ফিঙা-পোতের সৃষ্টি হইয়াছে! মার্কিণ অবিষ্কারকের বুদ্ধি-কৌশলে এই ফিঙা-প্লেনের উদ্ভব। বমারের আক্রমণ ঘটিবামাত্র এই ফিঙা-বমার
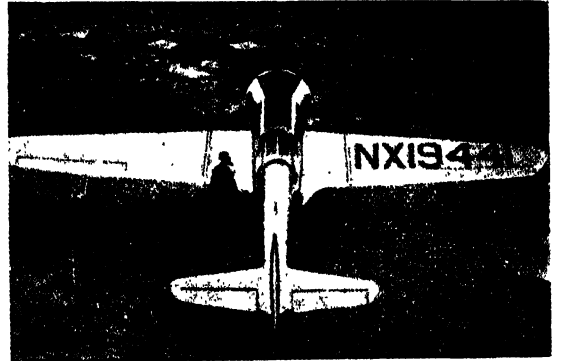
যেন কাকের পিছে ফিঙা!

শোঁ করিয়া নিমেষে শূন্য-পথে উঠিয়া বমারকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। ফিঙা-বমারের গতিবেগ মিনিটে পাঁচ হাজার ফুট—ঘণ্টায় ৩০০ মাইল। বমারকে ধ্বংস করিবার উপযোগী সর্ব্ব-সরঞ্জামে সুসজ্জিত এই ফিঙা-বমারের শক্তিও অসামান্য।

বমার-বাহী জাহাজ

বহু দূরস্থিত বিপক্ষের আস্তানাকে এবং বিপক্ষ-সৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য এ-যুগের যুদ্ধে বমার-প্লেনের শক্তি অমোঘ, তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু বমারের বলে বিপক্ষ ও বিপক্ষের দেশ ধ্বংস করিতে হইলে হাজার-হাজার বমারের প্রয়োজন। কারণ, ঘুঘু ধরিবার জন্য যেমন ফাঁদ আছে, তেমনি দু'-চারখানি বমার

বিপক্ষ-প্রদেশে হানা দিতে গেলে বিপক্ষ-পক্ষের বমার-বিধ্বংসী ফাইটাররা বমারের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবে! এ জন্য বমার-আক্রমণ সফল করিতে হইলে এক-সঙ্গে বহু বমারের সমাবেশ করিতে হয়। অসংখ্য বমার লইয়া

জাহাজ-ভরা বমার

নাগালের সীমানায় সেগুলিকে জড়ো করিয়া তবে হানা-পর্ব্ব সুরু করা চাই। তাই বহুসংখ্যক বমার বহিবার জন্য মার্কিণ রণতরী-বিভাগ সম্প্রতি চারখানি অতিকায় জাহাজ তৈয়ারী করিয়া রণ-সায়রে ছাড়িয়াছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিতে অসংখ্য বমার-প্লেন সাজানো থাকে। নির্দ্দিষ্ট আস্তানায় এ-জাহাজ পৌঁছিবামাত্র আতস-বাজির মতো হুশ-হুশ করিয়া বহু বমার-প্লেন আকাশ-পথে ওঠে অভিযানের উদ্দেশ্যে!

কামান-স্তম্ভ

কামান-স্তম্ভ

নক্ষত্রলোকে তত্ত্ব-সন্ধানী অভিযান চালাইবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণীর পশ্চিম-সীমান্তে গভীর বনমধ্যে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকেরা ১২ ফুট উঁচু এক অতিকায় কামান সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু নক্ষত্রলোকে জার্ম্মাণীর অভিযানের সুযোগ কোনো দিন ঘটে নাই! বিগত মহাযুদ্ধের সময় এ কামানে গোলা ভরিয়া জার্ম্মাণী সে-গোলা সুদূর প্যারিসের বুকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এবারকারের এ যুদ্ধেও এই কামান ফ্রান্সকে গোলা-বর্ষণে বিধ্বস্ত করিতে ছাড়ে নাই!

জলে জীবনরক্ষা

শুধু নদীর বুকে নয়, ঢেউ-ওঠা সাগর-জলেও আর ডুবিবার ভয় নাই! মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা এক-রকম ধাতব 'জীবন-রক্ষক' কলার
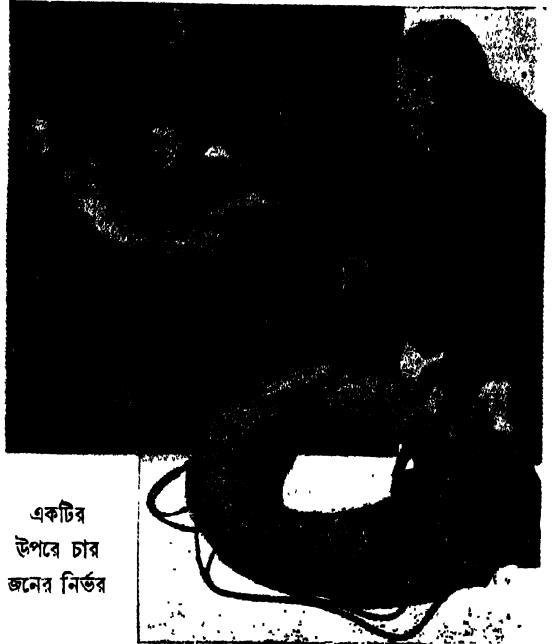
একটির উপরে চার জনের নির্ভর

খোলে খাদ্য-পানীয় ভরা

তৈয়ারী করিয়াছেন, তার একটিকে আশ্রয় করিয়া চার জন লোক ঢেউ-ওঠা সাগর-জলে অবলীলায় ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন! এ রক্ষককে সহায় করিলে জলে ডুবিবেন না! রক্ষকের ধাতব খোলের মধ্যটা ফাঁপা—শীল-আঁটা। এই খোলের মধ্যে ছ'জন লোকের জন্য এক দিনের উপযোগী খাদ্য-পানীয় ভরিয়া রাখা চলে। তার উপর এ রক্ষক হইতে আগুন জ্বালিয়া বা ঘন ধূম্রবাষ্প আকাশে তুলিয়া বহির্জ্জগৎকে সঙ্কেত-বার্ত্তা দিবার সুব্যবস্থা আছে।

প্রবাল

[প্রাণিতত্ত্ব]

জীব-জগতে ক্রম-বিকাশের ফলেই এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব। উদ্ভিদও যে জীব, এ বিষয়ে আজি আর কাহারও কিছুমাত্র সংশয় নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে উদ্ভিদেও প্রাণপ্রবাহ ও অনুভব-শক্তি আবিষ্কার করিয়া মানুষের চিন্তা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন। সৃষ্টির প্রত্যূষে শুধু উদ্ভিদই ছিল, পরে উদ্ভিদ হইতে ক্রম-বিকাশের ফলে কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম। এমন প্রাণী আছে, যাহারা উদ্ভিদ বা কীটপতঙ্গ—কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। সহসা দেখিলে উদ্ভিদ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোযোগ সহকারে কিছু কাল তাহাদের কার্য্যাবলী বা জীবিকানির্ব্বাহের প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, তাহারা উদ্ভিদধর্ম্মী নহে। বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত কোরাল (প্রবাল) এইরূপ প্রাণী। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র উদ্ভিদ-জাতীয় বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া সকল দেশের লোকই ইহাদিগকে বিচিত্রকায় উদ্ভিদ বলিয়া বিবেচনা করিত। পরে বৈজ্ঞানিকগণের সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণে ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

কাপ্-কোরাল বা পেয়ালা প্রবাল (অভ্যন্তর ভাগ)

ভারতবাসীরা প্রবালের কথা সুদূর অতীত হইতে অবগত ছিল এবং রত্নরূপে ও ভেষজরূপে ইহার ব্যবহারও প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তবে অন্যান্য দেশবাসীর ন্যায় ভারতবাসীরাও ইহাকে আশ্চর্য্যজনক বা অদ্ভুত উদ্ভিদ বলিয়াই ভাবিয়াছে। জৈনশূরী হেমচন্দ্র তাঁহার "অভিধানচিন্তামণি" নামক কোষগ্রন্থে—বিদ্রুম, রক্তাঙ্ক, রক্তকন্দ ও হেমকন্দল—প্রবালের এই চারিটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রত্নাকার ও লতামণি—এই নামগুলি আমরা সংস্কৃত শব্দকোষসমূহে দেখিতে পাই। কোষগ্রন্থে ইহা হীরকাদি বহুমূল্য রত্নরাজির সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গারকমণি, লতামণি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহার মণিত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রবালকে আরোগ্যকর ও শক্তি-সঞ্চারক ভেষজে পরিণত করিয়া অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদমতে বিদ্রুম বা প্রবাল মধুর, অম্ল ও কষায়রসশালী। ইহা শীতল, সারক, বমনকারক, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তাদি দোষনাশক, কান্তিবর্দ্ধক (বিশেষতঃ নারীদিগের), বীর্য্যকারক এবং (ধারণে) বিশেষ কল্যাণজনক। অবশ্য, সকল প্রবালই ধারণোপযোগী নহে।

বিদ্রুমকে এক প্রকার বিচিত্রাকার বৃক্ষ বলিয়া মনে করা হইত—এই সত্য আমরা মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের ত্রয়োদশ শ্লোকে বুঝিতে পারি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর পুষ্পকরথে সীতাসহ লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খ-যূথম্।"
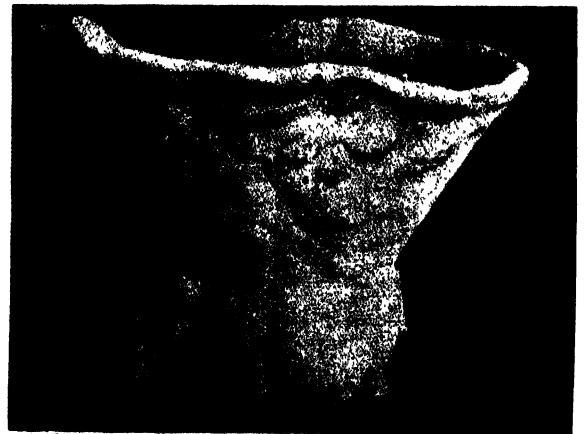
পেয়ালা-প্রবাল (বহির্ভাগ)

কবির এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে, বিদ্রুম বা প্রবাল তৎকালে বৃক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগগুলি কণ্টকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, এইরূপও মনে করা হইত। 'অম্ভোধিবল্লভ

প্রভৃতি নাম হইতে জানা যায়, ইহা শুধু সমুদ্রেই উৎপন্ন হয় ; তাহা প্রাচীনগণ জানিতেন।

প্লিনি এবং ডিয়োস্কোরোইডিস প্রভৃতি (প্রতীচীর) প্রাচীন লেখকগণ প্রবালকে বৃক্ষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। টুর্নিভিলে তাঁহার বৃক্ষবিষয়ক পুস্তকে প্রবালকে এক প্রকার অদ্ভুত সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার পুষ্পসম্পর্কীয় তত্ত্ব অজ্ঞাত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে কাউণ্ট মার্সিগলি ঘোষণা করেন—তিনি প্রবাল-পাদপের পুষ্প আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সমুদ্র হইতে কতিপয় প্রবাল-কীট আনিয়াছিলেন। সেই সদ্য-সংগৃহীত পুষ্পাকার পদার্থগুলিকে জলে ডুবাইবামাত্র উহারা অষ্টদলবিশিষ্ট পুষ্পবৎ প্রতীয়মান হইল বলিয়া কাউণ্ট মার্সিগলির কথায় তৎকালে সকলের প্রতীতি জন্মিল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এক জন অখ্যাতনামা ফরাসী ভিষক্ উত্তর আফ্রিকার (বার্কারী) উপকূলের পার্শ্বে প্রসারিত 'কোরাল ফিশারী'গুলি পরিদর্শন করিবার সময় কাউণ্ট মার্সিগলির আবিষ্কৃত প্রবাল-পুষ্পগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগলাভ করিলেন। এই ডাক্তারের নাম পীসোনেল। ইনি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, এই পুষ্প বলিয়া বিবেচিত বস্তুগুলি এক প্রকার জীবন্ত 'পোলিপ-জাতীয়' কীট ছাড়া অন্য কিছু নহে। যে প্রস্তরবৎ পদার্থ কোরাল বা প্রবাল বলিয়া পরিচিত, এই সকল কীট উহাদিগের রচয়িতা।

অর্গান-পাইপ কোরাল অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের নলের ন্যায় প্রবাল

ট্রি-কোরাল বা বৃক্ষ-প্রবাল

এই কীট লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি নয়, গণনাতীত সংখ্যায় সম্মিলিত হইয়া অসীম সমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র—দেখিলে মনে হয়, রুদ্র সমুদ্র ইহাদিগকে মুহূর্ত্তে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় বিরাট্ বক্ষে বিলীন করিয়া ফেলিবে ; কিন্তু অবশেষে বুঝা যায়, ইহাদের প্রতিকূল প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করিবার সামর্থ্য সমুদ্রের মতই সুমহান্। দেখিতে ছোট বটে, কিন্তু শক্তিতে বিরাট্। দানবীর দধীচির ন্যায় ইহারা অবিরাম আপনাদের অস্থি পরার্থে দান করিতেছে।

পীসোনেলের বিস্ময়কর আবিষ্কার সকলের দ্বারা স্বীকৃত হইবার পর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ প্রবাল-কীটের আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী মনোযোগসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ইহারা স্থাণুর ন্যায় এক স্থানে অবস্থান করে না—প্রায়ই স্থান-পরিবর্ত্তন করা ইহাদের স্বভাব। ইহাদের 'পজিশান' বা পরিস্থিতির (অবস্থান করিবার ভঙ্গীর) পরিবর্ত্তনও পণ্ডিতরা লক্ষ্য করিলেন। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে ইহাও বুঝিলেন, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে রহিয়াছে রাক্ষসী বুভুক্ষা এবং সেই বুভুক্ষা নিবারণের জন্য ইহারা নানাপ্রকার কুটিল কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের শিকার ধরিবার ও গলাধঃকরণ করিবার কৌশল বৈজ্ঞানিকবর্গকে বিস্মিত করিল। ইহাদের আর একটি বিস্ময়কর শক্তি আছে। ইহারা আপনার বাহুসমূহ এবং শরীরকে ইচ্ছামত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। এমন কি, সময়ে সময়ে এইরূপ প্রসারণের ফলে ইহাদের দেহ সাধারণ বা স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দশ বা দ্বাদশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে কিরূপ—এইরূপ প্রশ্ন পাঠকগণের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বে আকৃতি দেখিয়াই ইহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলিয়া মনে করা হইত সন্দেহ নাই। ইহাদের দেহ-যন্ত্রে বিশেষ

কোন জটিলতা লক্ষিত হয় না। ইহাদের দেহকে দুইটি অংশে বিভক্ত (স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট) একটি লম্বা নল বলা চলে। ঐ দুইটি অংশের মধ্যস্থলে অবস্থিত স্থানটি স্বচ্ছ। উদর-প্রদেশ বা বক্ষঃস্থল যাহাকে বলা চলে, সেরূপ কোন অঙ্গ বা যন্ত্র ইহাদের দেহে নাই। মাথাটা একটা গোলাকার পিণ্ডবৎ পদার্থ। চক্ষুর কোন চিহ্ন ঐ পিণ্ডবৎ মুণ্ডের সহিত সংযুক্ত নাই। ঐ পিণ্ডের একটা স্থান বিদীর্ণ হইয়া মুখ-গহ্বরের পরিণতি পাইয়াছে। এই বদনবিবরের চারি ধারে ৬ হইতে ৮টি পর্য্যন্ত বাহু (টেণ্টাকলস্) বিস্তৃত রহিয়া ইহাদিগকে অতি অদ্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। এই বাহুগুলির ক্রমশঃ বা অকস্মাৎ বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবার যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত অদ্ভুত বটে! প্রবাল-কীটের জন্মিবার ও বিস্তারলাভ করিবার কাল মে হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত। এই সকল কোটি কোটি প্রবাল-শিশু অসীম সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। তখন ইহাদের চক্রবৎ আকার এত সূক্ষ্ম যে, আণুবীক্ষণিক বলিলেও চলিতে পারে। এই গোলাকার প্রবাল-শিশুদিগের গায়ে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম লোম থাকে। সমুদ্রের ভিতর চলিতে চলিতে সেই কীট-শিশুগুলি ক্রমশঃ অন্ত আকার ধারণ করে। এই আকার কতকটা 'ফ্লাস্ক' বা বোতলের ন্যায়। এই বোতলাকৃতি প্রবাল-বালকদিগের অদ্ভুত দেহের প্রশস্ততর প্রান্তটি পুরোভাগে থাকে। পশ্চাতে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অংশটিতে মুখটি দেখা যায়। কিছু কাল এইরূপ বোতলাকার থাকিবার পর পুনরায় আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। এবারের আকার কতকটা রোলারের মত। এইবার প্রবাল-বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া বংশবিস্তারের উপযুক্ত অবস্থায় প্রায়ই উপনীত হইয়াছে। আর ইহাদিগকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলা চলে না। শরীরের বেড় অপেক্ষাকৃত অনেক বাড়িয়াছে এবং পিণ্ডাকার মুণ্ডের গাত্রে ও মুখের চারি ধারে পুরুভুজের ভুজলতার ন্যায় বাহুসমূহ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, প্রবালের বংশবিস্তার করিবার বিচিত্র প্রণালী। পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রবাল-কীটের দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে—বৃক্ষকাণ্ড হইতে উদ্গত শাখা-প্রশাখা-সমূহের মত যে সকল উপাঙ্গসমূহ বাহির হয়, উহাদের প্রত্যেকেরও স্বতন্ত্র বাহুসমূহ থাকে। পরে প্রত্যেক উদ্গত অংশ খসিয়া গিয়া স্বতন্ত্র প্রবাল-কীটে পরিণত হয়! ইহা ছাড়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোরাল-পলিপ বা প্রবাল-কীটের মুখ হইতেও সন্তান বাহির হয়। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিস্ময়কর বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। নিত্য নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভারত মহাসমুদ্রে এবং প্রশান্ত মহাসাগর-বক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রবাল-দ্বীপ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র কীটগুলি একটা বিশাল মহাদেশ গড়িয়া তুলিয়াছে বলিলেও ভুল হয় না। প্রবাল-দ্বীপ ছাড়া যে কোরাল-রীফ বা প্রবাল-শৈল ইহাদিগের দ্বারা সমুদ্রগর্ভে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যানিরূপণ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা সাধারণতঃ প্রবাল বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, সেই শিলাসম সুকঠিন পদার্থের সহিত এই কোমলকায়
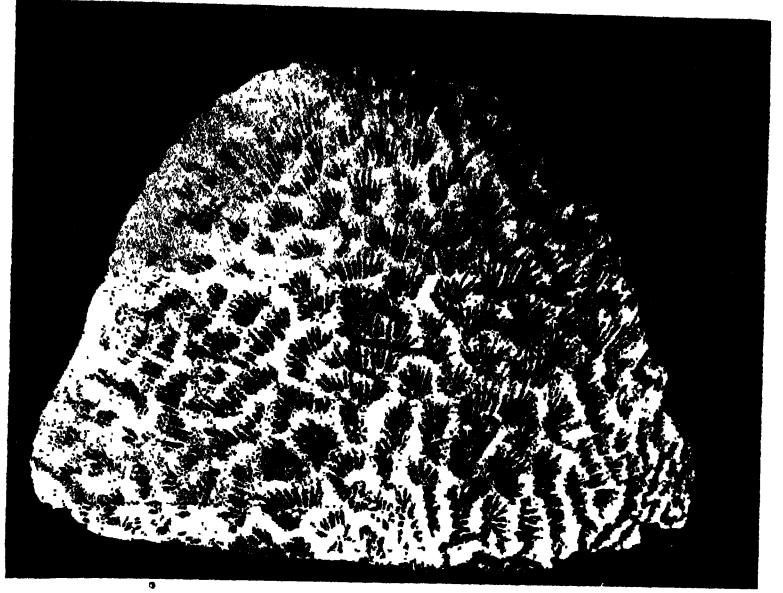
ব্রেণ-কোরাল বা মস্তিষ্ক-প্রবাল

কীটের সম্পর্ক কি? প্রবাল বলিলে আমরা সেই লালবর্ণ পলার কথাই ভাবি, যাহার মালা গাঁথিয়া কেহ কেহ গলায় ঝলায়—যাহা মুঙ্গা (মুগা) নাম ধারণ করিয়া অঙ্গুরীয়কের সঙ্গে ধনীর অঙ্গে উঠে,
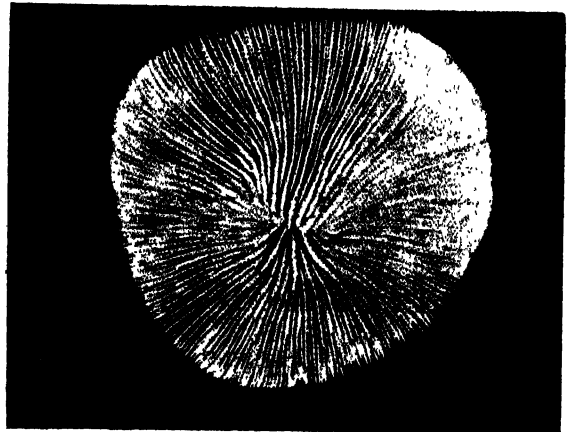
'মাশরুম কোরাল' বা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় প্রবাল

যাহা ভস্ম করিয়া ভিষক্‌গণ ভেষজ প্রস্তুত করেন, যাহা কোষগ্রন্থকার-দিগের দ্বারা মূল্যবান্ মণির মর্য্যাদা লাভ করিয়া সেইরূপ পর্য্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা যাহাকে প্রবাল বা পলা বলি, সেই

প্রস্তরবৎ পদার্থের একটি ক্ষুদ্র খণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিলে উহাতে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চক্রাকার চিহ্ন বা ছিদ্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ছিদ্রগুলিকে প্রবালের পলিপ বা কীটগুলির বাস-গৃহের দ্বার বলিলে ভুল হয় না। সমুদ্র-সলিল হইতে চূর্ণ-জাতীয় এক প্রকার (কার্ব্বোনেট অফ লাইম) পদার্থ গ্রহণ করিয়া পরে সেই পদার্থটিকে নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট গৃহে পরিণত করিবার বিস্ময়কর শক্তি ইহাদের রহিয়াছে। কালক্রমে গৃহী সরিয়া যায়, কিন্তু সমুদ্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যে গৃহ সে গড়িয়া তুলে, তাহা যুগের পর যুগ স্থায়িত্ব লাভ করে। আমরা যাহাকে প্রবাল বা পলা বলি, তাহাকে প্রবাল-কীটের দ্বারা কার্ব্বোনেট অফ লাইমে প্রস্তুত সেই গৃহের অংশ বা খণ্ড বলা যাইতে পারে। অবশ্য এমন প্রবাল আছে—যাহারা কীটের গৃহ না হইয়া দেহাবশেষ। এই বিচিত্র কীটের দেহ এবং গেহ দুইই কার্ব্বোনেট অফ লাইমের পরিণতি। প্রবাল তখনকার জীব—যখন উদ্ভিদ্ সঞ্চরণশীল প্রাণিত্বে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর এবং সৃষ্টির প্রারম্ভের প্রাণী হইলেও ইহারা স্থপতিরূপে যে অতি আশ্চর্য্যজনক শক্তির পরিচয় দেয়, তাহা সৃষ্টির অন্য কোন প্রাণী প্রদান করিতে পারে না।

প্রবাল নামক যে প্রস্তরবৎ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা প্রবাল-কীটের দেহ এবং গৃহ উভয় হইতেই গৃহীত। আমরা সকলে কার্ব্বনেট অফ লাইমের বিস্ময়জনক পরিণতি এই দেহ ও গেহগুলিই দেখিতে পাই, যে উদ্ভিদাকার অদ্ভুত পোলিপ বা কীট এই আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করে, তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। কারণ, জল হইতে তুলিলে এই সকল কুসুম-কোমল-কান্তিবিশিষ্ট পোলিপের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাঁহারা প্রবাল-কীটকে জীবিত অবস্থায় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে প্রবালের বাসস্থল কোন শান্তসলিল হ্রদের বক্ষ লক্ষ্য করিতে হইবে। জল হইতে তুলিলে ইহারা শুধু যে বাঁচিয়া থাকে না কেবল তাহাই নহে, ইহাদের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য বা বর্ণৈশ্বর্য্যও বিলোপপ্রাপ্ত হয়। ইহাদের নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতি বর্ণরাজির অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি—বিচিত্র সম্মিলন আমাদিগকে বিমোহিত করে। ইহাদের আকৃতির বৈচিত্র্যও কম চিত্তাকর্ষক বা বিস্ময়জনক নয়। কোনটা মৃগের শৃঙ্গের মত আঁকা-বাঁকা শাখা-প্রশাখাসমন্বিত, কোনটা কারুকার্য্য-কমনীয় কাপ বা পেয়ালার ন্যায়, কোনটা মনুষ্যের মস্তিষ্কের মত, কেহ বৃক্ষ বা ব্রততীর অনুরূপ।

বর্ত্তমানে প্রবালকীট গ্রীষ্মমণ্ডল ব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় না, প্রধানতঃ লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, এবং প্রশান্ত মহাসাগরই ইহাদের বর্ত্তমান বাসস্থল। জাপান সাগরে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপাবলীর পার্শ্বে প্রসারিত পারাবারে প্রবালকীট পরিদৃষ্ট হয়। তবে লোহিত সাগর বা রেড-সীতে যত প্রবাল আছে, তত আর কোথাও নাই। এখানে তাহারা যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তীরবাসীরা সেগুলিকে আপনাদিগের গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণরূপে ব্যবহার করে। সিংহলের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে, ভারতবর্ষের কোরমণ্ডল উপকূলের পার্শ্বে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে লাক্ষাদ্বীপ এবং মালদ্বীপের পার্শ্বস্থ সমুদ্রে, দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলের পুরোভাগে প্রবাল-কীট ও তাহাদের প্রস্তুত পাহাড়সমূহ দেখা যায়।

প্রবাল-কীটগুলিকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী বা পরিবারে বিভক্ত করা চলে। কোন কোন স্থানে কেবল একটি শ্রেণীই দেখা যায়। কোন কোন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণী একত্র অবস্থান করিয়া দূর-প্রসারিত প্রবাল-শৈলসমূহ প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থানে মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছেদ বা অবকাশগুলি জলতলবাসী অন্যান্য জীব পূর্ণ করিয়া থাকে। পরে প্রবালকীটের দেহাবশেষ বা গৃহগুলির দ্বারা সেই শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপে প্রবাল-নির্ম্মিত সুদূর-বিস্তৃত নিরবচ্ছিন্ন পাহাড়-শ্রেণী জলতলে সংগঠিত হইতে থাকে। এই প্রবাল-রচিত পাহাড়-শ্রেণী বা 'রীফ'গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর প্রবাল-পাহাড় উপকূলের অতি নিকটে লক্ষিত হয়। এই প্রবালগিরিগুলি জোয়ারের সময় জলমগ্ন থাকে, কিন্তু ভাটার সময় বাহির হইয়া পড়ে। আন্দামানের পাশে এইরূপ প্রবাল-পাহাড় প্রায় দেখা যায়। ইংরেজীতে ইহাদিগকে 'ফ্রিঞ্জিং রীফস' নামে অভিহিত করা হয়। আর এক প্রকার প্রবাল-পাহাড় তীরভূমি হইতে দূরে দেখা যায়। ইহারা সমুদ্রতল হইতে সোজাসুজি মস্তক উত্তোলন করিয়া উচ্চশীর্ষ পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদের অঙ্গ ভুঙ্গ হইলেও বহু গুহা উহাতে রহিয়াছে। সিন্ধুতলে বিরাজিত এই সকল অন্ধকার বন্দরে নানা প্রকার বিচিত্রাকার সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। এই প্রবাল-শৈলমালা উপকূল হইতে ১ শত মাইল পর্য্যন্ত দূরে দেখা যায়। ইহাদিগকে ইংরেজীতে 'বেরিয়ার রীফ' বলা হয়। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার পাহাড় প্রবাল-কীটরা ভূভাগ হইতে বহু দূরে উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে প্রস্তুত করে। ইহাদিগকে পাহাড় না বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বলা চলে। অসংখ্য প্রবাল-দ্বীপ বা কোরাল-আইল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবালের মধ্যে 'মাদ্রেপোরারিয়া' নামক প্রবাল-কীটরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত। ইহারা এবং ষ্টার ও ব্রেন কোরাল (অর্থাৎ তারকার ন্যায় এবং মনুষ্য-মস্তিষ্কের মত) আখ্যায় অভিহিত প্রবালবর্গই বড় বড় রীফ বা পাহাড় রচনা করিয়া থাকে। এই সকল প্রবালের কঙ্কাল বা দেহাবশেষগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উহাদিগের কাঠিন্যও অন্য জাতীয় প্রবাল অপেক্ষা অধিক। মাদ্রে-পোরারিয়া এবং তারকা ও মস্তিষ্ক-প্রবাল কেবল উষ্ণ সমুদ্রসলিলে বাস করিতে পারে। শৈত্যের সামান্য স্পর্শও ইহারা সহ্য করিতে পারে না। যেখানে টেম্পারেচার বা উত্তাপ ৬৮ ডিগ্রির নীচে কখনও নামে না, সেইরূপ স্থানেই ইহাদের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব। শুধু উষ্ণতা নয়, জলের গভীরতাও ইহাদের জীবনের পক্ষে প্রয়োজন। যে সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুঞ্জ জীবিত থাকিয়া এবং মরিয়া বিরাট্ জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়া থাকে, উহাই ইহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। ইহারা এই সকল জঞ্জাল ভক্ষণ করিয়া বারিধির ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদারের কার্য্য সাধন করে, এই ধারণা অসঙ্গত নহে। বিশ্ববিখ্যাত বিবর্ত্তবাদী ডারউইন প্রবাল-শৈলগুলির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কারণ—সমুদ্রতলের কম্পন; দ্বিতীয় কারণ—ভূমিকম্পের জন্য সমুদ্রতলের আকস্মিক স্ফীতি; তৃতীয় কারণ—প্রবাল-কীট। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ হইতে সমুদ্রতল কিছু উচ্চ হইয়া উঠে এবং পরে প্রবাল-কীট সেই উচ্চতার উপর অদ্ভুত ইমারত রচনা করিয়া তাহাকে উচ্চতর করিয়া তুলে। প্রশান্ত মহাসাগরে এমন বহু মনুষ্য-অধ্যুষিত মায়াপুরী সদৃশ ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, যাহা প্রবাল-কীটের বিস্ময়কর কীর্ত্তি।

এক প্রকার প্রবাল আছে, যাহারা অন্যান্য প্রবালের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস না করিয়া নিঃসঙ্গভাবে বাস করিতে ভালবাসে। ইহাদিগকে 'সলিটারী কোরাল' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রবালকীটরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই পাহাড় প্রস্তুত করে; সুতরাং 'নিঃসঙ্গ প্রবাল'গুলি স্থপতিরূপে কোন বিস্ময়কর কীর্ত্তি রচনা করে না। শুধু তাহাদের দেহাবশেষগুলিই থাকে। ভারতবর্ষীয় সমুদ্র-সলিলে 'ফাঙ্গিঙ্গো' শ্রেণীর প্রবালই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইহাদের সমতল শরীর সময়ে সময়ে ১২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। মাশরুম বা 'ব্যাঙের ছাতা' জাতীয় উদ্ভিদের সহিত ইহার বিস্ময়কর সাদৃশ্য। সেই জন্য ইহাদিগকে 'মাশরুম কোরাল'ও বলা হয়। ইহারা সৃষ্টির আদিম যুগের জীব, সে বিষয়ে সংশয় নাই। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সহিত ইহাদের সাদৃশ্যও আশ্চর্য্যজনক। কে বলিবে, ইহারা কোমল ও কমনীয়কায় কুসুম নয়—কদর্য্য কীট। ইহারা জীবিত অবস্থায় জলধির তলদেশে অবস্থান করে এবং তথায় তাহাদিগকে দেখিলে 'ক্যাকটাস দাহলিয়া' নামক বর্ণ-বিচিত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ইহার সর্ব্বশরীরব্যাপী সঙ্কীর্ণ কিন্তু সুদীর্ঘ টেণ্টাকল বা বাহুগুলির রঙ অত্যন্ত মনোরম। শরীরের অভ্যন্তরস্থ শক্ত অংশটি এই রঙীন বাহুগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে। চক্রাকার দেহের কেন্দ্রস্থলে মুখ এবং সেই মুখকে কেন্দ্র করিয়া রেখার মত বাহুগুলি সারি সারি প্রসারিত। এই জাতীয় প্রবাল যত দিন অল্পবয়স্ক থাকে, তত দিন পুষ্পের বৃন্তের মত একটি অঙ্গ শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই বৃন্তের সাহায্যে প্রবাল-বালক কোন আশ্রয়ের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই বৃন্তবৎ প্রান্তটি খসিয়া পড়ে।

পত্র-প্রবাল বা 'লীফ-কোরাল' মাশরুম কোরালের আত্মীয় বা জ্ঞাতি। দেখিতে ঠিক বৃক্ষের পত্রের মতই। ইংলণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে 'এগুাইভ' নামক যে প্রবালজাতীয় প্রাণী দেখা যায়, উহাবাও এই শ্রেণীর। গাছের পাতা কর-পিষ্ট হইলে উহার আকার যে প্রকার হয়, এই প্রবাল-কীটগুলিব আকার অনেকটা সেই রকম। প্রবালগিরি-গুলির অথবা জলতলস্থ সাধারণ শৈলের গুহায় বা ফাটলে এই প্রবাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাপ্-কোরাল বা পেয়ালা প্রবাল এবং টার্ব্বিনারিয়া নামক প্রবাল-কীটকেও পত্র-প্রবালের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে 'ক্যারিয়োফাইলি' আখ্যায় অভিহিত এক জাতীয় মনোরম প্রবাল প্রচুর দৃষ্ট হয়। লাক্ষাদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে 'এম্বোজিয়া'জাতীয় যে সকল প্রবাল আছে, তাহারা আরও অধিক সুদৃশ্য। ইহাদের সংখ্যা সেরূপ অধিক নহে। এক সময় ইহারা অধিকতর দুর্ল্লভ ছিল।

আমরা পূর্ব্বে যে 'তারকা প্রবাল' বা ষ্টার-কোরালের নাম উল্লেখ করিয়াছি, উহারা বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দূরপ্রসারিত উপনিবেশসমূহ রচনা করিয়া বাস করে। ইহাদের প্রকৃতি 'সলিটারি কোরাল' বা 'নিঃসঙ্গ প্রবাল'দের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারকা-প্রবালশ্রেণীর পলিপ বা কীটগুলিও বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের বা বর্ণৈশ্বর্য্যের অধিকারী। আর এক প্রকার প্রবাল 'আব্দিতা' আখ্যায় অভিহিত। ইহাদের মুখটি উজ্জ্বল লাল রঙে এবং বাহুগুলি প্রীতিপ্রদ পীতবর্ণে রঞ্জিত। 'এলাজ' আখ্যায় অভিহিত প্রবালকীটগুলির প্রান্তভাগ কমলাবর্ণে (অরেঞ্জ) রঞ্জিত এবং মুখটির রঙ তুষার-শুভ্র। এই জাতীয় কোন কোন প্রবালের বাহু সবুজ এবং মুখ চোকোলেট রঙের। আমরা ব্রেণ-কোরাল বা মনুষ্য-মস্তিষ্কের মত আকৃতিশালী প্রবালের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা গোলাকার—কতকটা গ্লোব বা ভূমণ্ডলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। মানুষের মস্তিষ্কের গাত্রে যেরূপ বিচিত্র চিহ্নসমূহ বা রেখাবলী দৃষ্ট হয়, এই সকল প্রবালকীটের শরীরে সেইরূপ রহিয়াছে। বৃক্ষের অঙ্কুরবৎ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুর এক একটি কীটের শরীর হইতে উদ্গত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই সকল অঙ্কুরের সঙ্গে এক একটি স্বতন্ত্র মুখ উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হইয়া পড়িলে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি খসিয়া স্বতন্ত্র প্রবালকীটে পরিণতি পাইয়া অসীম সমুদ্র-সলিলে অদ্ভুত অভিযান আরম্ভ করে।

লোহিত সাগরে এক জাতীয় প্রবালকীট লক্ষিত হয়—নলাকার আকৃতির জন্য যাহাদিগকে 'পাইপ-কোরাল' বা 'নল-প্রবাল' বলা হয়। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও ইহাদিগকে দেখা যায়। জীবিত অবস্থায় ইহারা যেরূপ মনোহর, মৃত্যুর পর ইহাদের দেহাবশেষও সেই প্রকার পরম রমণীয়। এই সুদৃশ্য দেহাবশেষ বা কঙ্কালগুলি দেখিতে প্রস্তরবৎ বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ। একটু চাপ দিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জাতীয় প্রবালকীটের শরীর অর্গান নামক বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্গত টিউব বা নলের মত অংশসমূহে পূর্ণ বলিয়া ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'অর্গান-পাইপ কোরাল' বলা হয়। এই নলাকার অঙ্গগুলি লম্বভাবে বা দণ্ডায়মানের ভঙ্গীতে সারি সারি বিরাজিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেপটা (আড়া-আড়ি বিরাজিত) এই সকল নলকে বিভক্ত করিয়া ইহাদিগের আকৃতিকে আরও অদ্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। যে সেতুর ন্যায় অঙ্গ বা অংশ কোন বৃক্ষ-ফলের বা প্রাণিদেহের দুইটি কোষ বা রন্ধ্রকে পৃথক্ করিতেছে, বোটানি বা উদ্ভিদতত্ত্বে এবং এনাটমি বা দেহ-তত্ত্বের ভাষায় তাহাকে 'সেপ্টাম্' (বহুবচনে সেপটা) বলা হয়। এই নলগুলির রঙ প্রায় উজ্জ্বল লাল হইয়া থাকে। ইহাদের বাহুগুলি অল্প বা ফিকে লাল এবং অবশিষ্ট অঙ্গ উজ্জ্বল সবুজ।

ষ্ট্যাঘর্ণ-কোরাল' নামক প্রবালের শরীর বহু শৃঙ্গাকার অঙ্গে বিভক্ত। এই সকল অঙ্গে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান। জীবিত অবস্থায় এই জাতীয় প্রবালের পোলিপ বা কীটগুলির দেহে উজ্জ্বল রক্তরাগ দেখা যায়। 'সী-ফ্যান' বা 'সমুদ্র-পাখা' আখ্যায় অভিহিত প্রবাল-কীটগুলির কুসুম-কোমল কমনীয় কান্তি অত্যন্ত মনোরম।

যে সকল রক্তবর্ণ প্রবাল বা পলা মূল্যবান্ রত্নসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই 'রেড-কোরাল বা 'লাল-প্রবাল' শ্রেণীর প্রবাল-কীট হইতে প্রাপ্ত। প্রধানতঃ ভূমধ্য সাগরে এই জাতীয় প্রবাল পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশেও লাল প্রবাল দেখা যায়। সাগরের সুগভীর অংশে বিরাজিত গিরি-গাত্রে 'কুঞ্চন-কমনীয়' বা 'রেখা-কমনীয়' রক্তরাগ-রঞ্জিত বৃন্তগুলি সংলগ্ন করিয়া ইহারা উল্টা হইয়া অবস্থান করে। দেখিলে ঠিক লাল ফুল ঝুলিতেছে বলিয়া মনে হয়। সিসিলি, মেজরকা, মাইনরকা প্রভৃতি ভূমধ্য সাগর-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে এবং আফ্রিকার উত্তরস্থ আলজিরিয়ার উপকূলে 'লাল-প্রবাল' আহরণের জন্য ফিশারীসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পার্শ্বে প্রসারিত সমুদ্র-সলিলে 'আইসিস্ হ্যাপিউরিস্' নামক এক জাতীয় প্রবাল দৃষ্ট হয়। ইহাদের বৈশিষ্ট্য—চারি দিকে প্রসারিত শৃঙ্গবৎ অঙ্গসমূহ।

মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় বিদ্রুম-বৃক্ষের গাত্রে যে উর্দ্ধমুখ সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুর বা শাখার উল্লেখ আছে এবং যাহা হইতে শঙ্খসমূহ অতি কষ্টে আপনাদিগকে ছাড়াইয়া লইতেছে বলিয়া বর্ণিত, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, এ সকল প্রবাল লালবর্ণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এই 'আইসিস্ হ্যাপিউরিস্'জাতীয়। এই শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বৃক্ষবৎ প্রবাল-কীটগুলি বিশেষ দৃঢ়-দেহ বলিয়া কোন জলচর জীব ইহাদের দেহের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলে উহাদের পক্ষে মুক্তিলাভ করা সহজ হয় না।

'সী-পেন' বা 'সমুদ্র-কলম' আখ্যায় অভিহিত প্রবাল-কীটগুলির আকার অনেকটা কুইলের বা পাখার কলমের মত। ইহাদের বৃন্তটিও কার্বোনেট অফ লাইম নামক পদার্থে প্রস্তুত বলিয়া শক্ত। ইহাদের নিম্নাংশ (কুইল বা পাখার মতই) আপেক্ষাকৃত রিক্ত এবং উর্দ্ধাংশ পালকবৎ পদার্থে পূর্ণ। কোন কোন 'সী-পেন' জাতীয় প্রবালকীট এক ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের রঙ সাধারণতঃ লাল হইতে দেখা যায়। তবে কেহ গাঢ় বা উজ্জ্বল লাল, কেহ ফিকে লাল, কেহ ঈষৎ বেগুণী বর্ণবিশিষ্টও হইয়া থাকে। কোন কোন শ্রেণীর 'সী-পেন' প্রবালের দেহ হইতে এক প্রকার দীপ্তি নির্গত হয়। এক রকম প্রবালকে 'ভ্রমণকারী কোরাল' আখ্যা দেওয়া হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, ইহারা কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রবালকীট নহে। আমরা পূর্ব্বে যে সলিটারি কোরাল বা 'নিঃসঙ্গ প্রবালে'র কথা বলিয়াছি, এক প্রকার কীট তাহাদের ভিতর বাসা বাঁধিয়া এবং তাহাদিগকে ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত করিয়া 'ভ্রমণকারী' নামক অভিনব শ্রেণী বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। এক প্রকার কীটের ইচ্ছায় পরিচালিত অন্য প্রকার কীট ! আশ্চর্য্যজনক অবস্থা বটে !

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

ক্ষুধা নাই—হজম হয় না !

সভ্যতার যুগে নানা-রকম বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও আমাদের মনে সুখ নাই, তার কারণ খাদ্যে রুচি আছে, অথচ যা খাই হজম হয় না ! ইহার ফলে দেহে-মনে অবসাদ, বিমলিন কান্তি !

স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেরই প্রায় এক দশা ! তবে পুরুষ-মানুষকে অন্ন-সংস্থানের জন্য খানিকটা ছুটাছুটি করিতে হয়, তাই তাঁদের স্বাস্থ্য মেয়েদের মতো অতখানি ভঙ্গুর হয় না ! সম্প্রতি মেয়েদের আবার দু'টি বিরাট্ উপসর্গ জুটিয়াছে—ডিস্‌পেপসিয়া এবং ব্লাডপ্রেসার।

মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই আজ হাই-ব্লাডপ্রেসার কিম্বা লো-ব্লাডপ্রেসার। এমন শরীর লইয়া সংসার-পরিচালনা বা ছেলেমেয়েকে মানুষ করিয়া তোলা চলে না ! তাছাড়া 'শরীরমাদ্যং !'

অনেকে সংসারে দেখি, জোলাপ এবং হজমী বড়ি প্রায় চাল-ডালের মত নিত্য-প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর আছে মাথা-ধরা-উপসর্গ সারাইতে নানা রকমের পেটেণ্ট বড়ি !

ভালো কথা নয়। দেহ এমন কেন, তার কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণকে অপসারিত করিতে হইবে। বড়িতে দু'দিন সুফল লাভ করিলেও তিন দিনের দিন বড়ি গা সহিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় !

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের দেহ-যন্ত্রটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, তার বিবিধ কল-কব্জাগুলি স্বভাবতঃ আপনা হইতেই চলে ; এবং সে চলার দরুণ দেহ-যন্ত্রের বিগড়াইবার কথা নয়। এখন যে পদে-পদে বিগড়াইতেছে, তার কারণ জীবন-যাত্রার স্বাভাবিক ধারা ছাড়িয়া নানা দিক্ দিয়া আমরা নকল সমাবেশে তাকে আক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছি ! তাহারি ফলে এত উপসর্গ।

ঋতুভেদে প্রকৃতি এই যে বিভিন্ন ফল-মূল উপহার দিতেছে, সে সব ফল-মূলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখিতে হইবে—রাখিলে সুফল মিলিবে। প্রকৃতি-দত্ত স্বাভাবিক খাদ্যকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের সৌখীন রুচি-মাফিক সে-খাদ্যকে নানা ভেজাল দিয়া এমন করিয়া তুলিতেছি যে, সেগুলা আমাদের দেহমধ্যে গিয়া পুষ্টির ও দেহযন্ত্র-পরিচালনার সহায় হইতে পারিতেছে না—ভেজালের সংসর্গে উপসর্গ ঘটাইতেছে। এ ভেজালের বিষে আমাদের পাকস্থলীর সূক্ষ্ম তন্তুগুলি ক্লেদ-বিজড়িত হইতেছে, বিকল হইতেছে ; তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া-শক্তি লোপ পাইতেছে। সে জন্য আহার করি, খাদ্য হজম হয় না ; উদরে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার হইতেছে ! পাকস্থলী সে-বায়ুর চাপে রীতিমত জখম হইয়া নানা রোগের সূতিকাগারে পরিণত হইতেছে। ইহার জন্য কাহারো পাকস্থলী শুকাইয়া যায়। এই বায়ু ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়া হৃদ্‌যন্ত্রকে জখম করে ; অধো-দিকে নামিয়া গাসট্রোপটোশিস্ বা 'গ্যাসট্রিক আলসার' রোগ ঘটাইতেছে। এ-রোগের আজ এমন প্রাদুর্ভাব ঘটিবার কারণ, খাদ্যকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ না করিয়া নানা ভেজালের সমাবেশে তার গুণরাশির বিনাশ করিয়া গ্রহণ !

আলস্যে শুইয়া বসিয়া যাঁরা দিন কাটান, কাজের পরিশ্রমে যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের সৌভাগ্য ভাবিয়া অনেকে তাঁদের হিংসা করেন। কিন্তু এ আলস্য-বিলাস সৌভাগ্য নয়—ঘোর দুর্ভাগ্য ! এ আলস্যের জন্য তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পেশীগুলি যথাযথ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। বাহির হইতে দেহের বিকার দেখা না গেলেও দেহের ভিতরটা বিকৃতিতে ও বৈকল্যে ভরিয়া ফোঁপরা হইয়া যায়। এবং সেই জন্যই ঘী-দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেও সে-খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি লোপ পায়।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, শরীর যদি এমন হইয়া থাকে, যে কোনো খাদ্য হজম হয় না—ক্ষুধা কাহাকে বলে ভুলিয়া গিয়াছেন,—তাহা হইলে বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন করুন। এ ব্যায়াম-পালনে দেহের সমস্ত ক্লেদ বিদূরিত হইবে, দেহ-যন্ত্রের বিকৃতি সারিয়া দেহের পেশী,

সমস্ত শিরা-উপশিরা প্রভৃতি তাদের স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া পাইবে; ক্ষুধা হইবে, খাদ্য-পরিপাকেও এতটুকু গোলযোগ ঘটিবে না। এবং ঐ সঙ্গে পুষ্টি লাভ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন সুছাঁদে ভরিয়া উঠিবে, দেহের কান্তিও আপনা হইতে সুশ্রী ও প্রদীপ্ত হইবে! বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—অজীর্ণতা বা অগ্নি-মান্দ্যে কদাচ পেটেন্ট ঔষধ খাইবেন না। বড়ি খাইয়া খাদ্য-হজমের চেষ্টা করবেন না। এ-সব বড়ি পেটে গিয়া ফুলিয়া পাকস্থলীর গায়ে জোরে চাপ দেয়। সে চাপে প্রথম-প্রথম কোষ্ঠবদ্ধতা সারিতে পারে; কিন্তু নিত্য এই বড়ির চাপ পড়িলে পাকস্থলী নানা রোগে জীর্ণ হইবে। এবং যাহাকে বলে, **intestinal tuberculosis** (নাড়ীর ক্ষয়রোগ) তাহা ঘটা বিচিত্র হইবে না! পেটে বায়ু জন্মিয়া অনেকে হার্টফেল হইয়া মারা গিয়াছেন—এ কথা মনে রাখিবেন।

এই সব উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসা করাইবেন। সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞেরা বলেন—নিম্নলিখিত ব্যায়াম-বিধি পালন করিতে হইবে। বাড়াবাড়ি অসুখের উপর অবশ্য ব্যায়াম নয়—চিকিৎসায় উপসর্গ সারিলে ব্যায়াম করিবেন। এ ব্যায়ামের অভ্যাস থাকিলে দেহের স্বাস্থ্য ফিরিবেই। তাছাড়া ভবিষ্যতে অস্বাস্থ্যের আশঙ্কা থাকিবে না—নষ্ট রূপ-যৌবন ফিরিয়া পাইবেন, এবং যৌবনের দীপ্তি কান্তিতে কোনো দিন বঞ্চিত হইবেন না। এ-সব উপসর্গ যদি না থাকে—এ ব্যায়ামে ও-সব উপসর্গ দেহকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—যৌবনশ্রী অটুট এবং কান্তি কমনীয় কোমল থাকিবে।

১। বুক চিতাইয়া সিধা খাড়া

এবার সেই বিশেষ ব্যায়ামের কথা বলি।

১। সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান—বুক চিতাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধে তুলুন। ১ নং ছবির মত হাতের আঙুলগুলিকে ফাঁক-ফাঁক রাখিবেন। তার পর বেশ জোরে-জোরে হ্যাঁচকা টান দিয়া দুই হাত নামান—নামাইয়া পরক্ষণেই তেমনি জোরে আবার দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলুন, অমনি ভঙ্গীতে। পনেরো-ষোল বার এমনি হাত তোলা-নামা করিতে হইবে।

২। ২ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে চিৎ হইয়া শুইয়া দু'হাত ঐ ছবির মত প্রসারিত করিয়া দিন। এবার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত দেহের

২। বাইসিকেল্ চালাইবার মত

নিম্নাংশ তুলিয়া দুই পা বাইসিকেল-চালাইবার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রভাবে সামনে-পিছনে নাড়িতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পাঁচ-সাত মিনিট। এ ব্যায়ামে পাকস্থলীর বিকৃতি সারিবে এবং পাকস্থলীর বিকৃতি জীবনে কখনো ঘটিবে না; কাজেই হজম-না-হওয়ার ভয়ও থাকিবে না।

৩। মাথার পিছনে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত

৩। ৩ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। দুই হাত মাথার পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করুন। এই ভাবে থাকিয়া বেশ জোরে-জোরে বিশ-পঁচিশ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। এমন ভাবে নিশ্বাস লইবেন, পেট যেন ভিতর-দিকে ঢুকিয়া যায় এ ব্যায়াম দিনে দু'-তিন বার করিতে পারিলে ভালো হয়। খাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে কিম্বা খাওয়ার আগে এ ব্যায়াম করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট করিয়া। এ ব্যায়ামে পেটে কখনো বায়ু জমিতে পারিবে না।

৪। ৪ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। এবার দু' হাত ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে পিছন-দিকে কোমরের উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখুন—রাখিয়া জোরে-জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন পাঁচ মিনিট কাল: এ ব্যায়ামে পেশীর গড়ন মজবুত এবং অবিকৃত থাকিবে, অজীর্ণতার সকল আশঙ্কা বিদূরিত হইবে।

এ কয়টি ব্যায়ামের নিত্য-নিয়মিত-পালনে ডি স্ পে প-সিয়ার স্পর্শ লাগিবে না কোনো কালে। স্বাস্থ্য ভালো, শ্রী অটুট এবং রূপ থাকিবে উজ্জ্বল মসৃণ!

৪। দু'হাত পিছনে কোমরের উপর

—

ঘর-কর্ণার কথা

আমাদের মধ্যে অনেক মায়ের বিশ্বাস, ছেলে-মেয়েকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করালে কিম্বা গায়ে জামা না দিইয়ে আদুড়-গায়ে রাখলে হাওয়া লেগে ছেলে-মেয়ের অসুখ হবে! এ বিশ্বাস শুধু যে ভুল, তা নয়! এতে ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট হয়।

পৃথিবীতে আঙুরের বাক্সে বন্ধ হয়ে কারো থাকবার উপায় নেই! ছোট বয়সে ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে, জামাজোড়ায় ঢেকে ছেলে-মেয়েদের রাখা চলে! আকাশে একটু মেঘ দেখলে ছেলে-মেয়েকে বন্ধ ঘরের মধ্যে পোরা সম্ভব হয়! কিন্তু এর পরে ছেলে-মেয়ে যখন ডাগর হবে, ইস্কুলে-কলেজে যাবে, তখন ?

বড় বড় ডাক্তাররা বলেন—এবং এ সম্বন্ধে সকলের এক-মত যে ঠাণ্ডা জল-বাতাস সইতেই হবে; আদুড় গায়ে বাতাস লাগাতে দিতেই হবে, তাতে করে ঠাণ্ডা জল-বাতাস সহ্য করার মত দেহের শক্তি-সামর্থ্য হবে—এর পরে ঠাণ্ডা জল-বাতাস লাগামাত্র সর্দ্দি-কাশি হবার ভয় থাকবে না।

অসুখ হয় নোংরা থেকে। স্নান করলে বা গা-হাত-মুখ ধুয়ে সাফ রাখলে দেহে ক্লেদ জমতে পারে না, দেহ পরিষ্কার থাকে। এবং যে মানুষ পরিষ্কার থাকতে পারে, তার অসুখ-বিসুখ বড় একটা হয় না! ঠাণ্ডা খোলা বাতাস এবং পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে স্নান—এ দু'টি হলো স্বাস্থ্য ভালো রাখার পক্ষে প্রধান সহায়। স্নান করে গামছা কিম্বা তোয়ালে দিয়ে গা-মোছার যে-বিধি আছে, সে-বিধি-পালনে দেহ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ষণে দেহের সর্ব্বত্র রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হয়। শীতকালে গায়ে যারা খুব বেশী জামা-কাপড়ের ভার চাপায়, তাদেরই হয় অসুখ। যারা শীত-কাতুরে নয়, তাদের স্বাস্থ্য-হানি বড় একটা দেখা যায় না! অতএব শীত-গরম-জল, এ-সব ছেলেবেলা থেকেই ধীরে ধীরে সওয়াতে শেখাবেন। তাতে ছেলে-মেয়ে ভালো থাকবে।

রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে আনাজ-তরকারী, ঘী, তেল অনেকে আল্‌গা রাখেন, ঢাকা দিয়ে রাখেন না; তার ফলে সে-সবে মাছি বসে, আর্শু্লা এসে পড়ে। মাছি-মশার, আরসুলার ছোঁয়ায় ও-সবে রোগের বীজ মেশে; এ জন্য খাবার-দাবার কদাচ আলগা রাখবেন না।

ভাত খেতে বসে এখনো গাল-গল্পে অনেক বাড়ীতে মেয়েদের খাওয়া শেষ করতে সময় লাগে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা। হয়তো তরকারীতে মাছি বসছে, হাত নেড়ে মাছি তাড়িয়েই অনেকে দায়ে খালাস হন! এতে মহা-অনিষ্ট হতে পারে। মাছি কোন্ নোংরা জায়গা থেকে নোংরা নিয়ে ভাতের পাতে বসলো, তরকারীতে বা জলের গ্লাসে বসলো, তার ফলে রোগের কত বীজাণু-কীট রেখে গেল, তার সংখ্যা নেই! এ জন্য মাছি আর্শু্লা খাবারে বসলে সে খাবার-দাবার মুখে তুলবেন না—ফেলে দেবেন। এ অভ্যাসকে মজ্জাগত করে তোলা চাই। তাহলে বহু যাতনা, বহু মারাত্মক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

খাওয়া-দাওয়ার কথা যখন তুললুম, তখন এই সঙ্গে আরো ক'টি কথা বলতে চাই। অনেক বাড়ীতে দেখি, দাসী-চাকরে ভাতের থালা ছুঁয়ে দিলে কিম্বা বামুন-ঠাকুর ভাতের থালা বা তরকারী নিয়ে আসছে দাসী-চাকরের ছোঁয়া লেগে গেল, অমনি সে ভাত সে তরকারী ফেলা যায়! কেন না, শূদ্দুরের ছোঁয়া লেগেছে! অথচ খাবার-দাবারে রাজ্যের মাছি বসছে, পোকা বসছে—তার বেলা কোনো দোষ হয় না! এর ফলে রোগের আক্রমণ ঘটে! ছোঁয়ায় খাবার নষ্ট হয় কখন ?—যখন কোনো দূষিত পদার্থের ছোঁয়া লাগে। বামুন-ঠাকুরকে যতই শুচি-শুদ্ধ মনে করি না কেন, তার গায়ের ময়লা জামা, পরণের ময়লা চামচিকুটি কাপড়ে তার সে শুদ্ধির সমর্থন চলে না।

শুদ্ধির আসল মানে, পরিচ্ছন্নতা। ধূলায় ধোঁয়ায় ময়লায় নানা রোগের বীজাণু; তাই ধুয়ে মুছে শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা! নোংরা হাতে অন্ন-পরিবেষণ যেমন দোষের—নোংরা হাতে খাওয়াও তেমনি দোষের। অনেক বাড়ীতে খাবার-দাবারের সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা দেখি না—অথচ সাজ-পোষাকে কি সমারোহ! বহু ধনী ও সৌখীন পরিবারে কথায়-কথায় যে টাইফয়েড-ডিপথিরিয়া রোগের আক্রমণ দেখি, খাবার-দাবার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা নেই, তারি জন্য!

অন্ন-ব্যঞ্জন তৈরী করতে পরিচ্ছন্নতা চাই। বাজারের আল্‌গা খাবার, পথের ধারের কাটা ফল—এ-সব রোগ-বীজাণুতে ভরা—অথচ শিক্ষিত নর-নারী অম্লান বদনে তা খাচ্ছেন! খেয়ে যাঁরা বাঁচেন, রোগ ভোগ করেন না, তাঁদের নেহাৎ বরাত জোর!

বাজার থেকে তরী-তরকারী ফলমূল কিনে এনে তা বেশ করে ধুয়ে তবে ব্যবহার করা উচিত—না হলে যে-জমিতে এ-সব শাকসব্জী ফল-মূলের জন্ম, সে-মাটীর বীজাণু-কীট থেকে আমাদের দেহে বহু রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

বামুন-ঠাকুরকে রান্নার ভার দিয়ে পিয়ানো-রেডিয়ো বা নাটকের রিহার্শাল নিয়ে মত্ত থাকলে গৃহ হাসপাতাল হবে। বামুন-ঠাকুর যাতে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রান্না-বান্না ও পরিবেষণের কাজ করে, সে দিকে কড়া নজর রাখবেন।

মরক্কো

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট্ দেহ লইয়া মরক্কো পড়িয়া আছে—জিব্রালটারের কোলে মরক্কোর মাথা এবং পা সেই সাহারার বুকে !

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মিশরে ফরাসী-জাতি ইংরেজের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে ইংরেজও মরক্কোয় ফরাসী-প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে। ইহাতে জার্ম্মাণীর হয় ক্রোধ; এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাইজার সসৈন্যে ট্যাঞ্জিয়ারে আসিয়া মরক্কোর উপর জার্ম্মাণ-দাবী জানাইয়া বিরোধের প্রয়াস পান। কিন্তু জার্ম্মাণীর সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ফেজ মাথার উপর ট্যাঞ্জিয়ার-অঞ্চল (২২৫ বর্গ-মাইল)। এ অঞ্চলের উপর আন্তর্জ্জাতিক অধিকার। তার পর মাথার বাকী অংশটুকু এবং বাঁ-কাঁধের একটুখানি-মাত্র অংশ (১৩১২৫ বর্গ-মাইল) স্পেনের; এবং বাকী অংশ (প্রায় ২০০০০০ বর্গ-মাইল) ফ্রান্সের অধিকারে।

মরক্কোর অধিবাসীরা মূর নামে পরিচিত। মূরের শিরায় আছে আরব এবং বার্বারের রক্ত। মূরেরা যেন জলের পোকা! য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকায় তাদের তুল্য জল-বিহারী জাতি কোনো কালে আর ছিল না!

মরক্কোয় এক জন সুলতান আছেন। তাঁর আইন-কানুনই মরক্কোয়
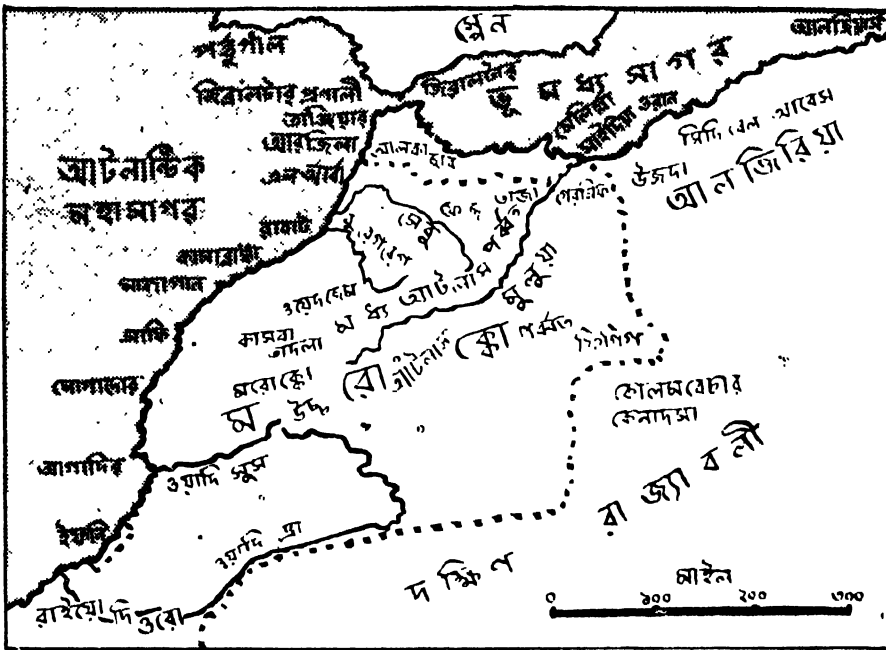
মরক্কো

অধিকার করে। তার পর নানা বিরোধের পর মরক্কোয় ফরাসী-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্স মরক্কো ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। স্পানিশ-মরক্কোর শাসন-ভার সুলতান-নির্ব্বাচিত খলিফার উপর ন্যস্ত আছে। স্পেন যে-ব্যক্তিকে খলিফার পদে নির্ব্বাচিত করে, সুলতানের মঞ্জুরনামা পাইলে তবেই তাঁর নিয়োগ হয় কায়েমি, নচেৎ নয়।

মরক্কোর যে অংশ ট্যাঞ্জিয়ার-জোন্ (zone) নামে অভিহিত, সে-অংশ আন্তর্জ্জাতিক নীতি-অনুযায়ী শাসিত হয়। এ কয়টি শাসক-জাতির মধ্যে আছে বৃটিশ, ফরাসী, স্পানিশ, এবং ইতালীয়ান্।

কাজেই মরক্কোর ভাগীদার সংখ্যায় তিন জন। ম্যাপে দেখুন, মরক্কোর চলিতেছে, তবু তিনি শুধু নামেই সুলতান। অর্থাৎ আসলে ফ্রান্স এবং স্পেনের নির্দ্দেশেই তাঁর আইন-কানুন বাহাল আছে।

মরক্কোয় দীর্ঘ-তুঙ্গ দু'টি পর্ব্বতশ্রেণী আছে—রিফ এবং এ্যাটলাশ। এ দুই পর্ব্বতে পাহাড়ী দস্যুর বাস। সুলতান বা রোমের সীজারও কখনো শাসনে তাদের আঁটিতে পারে নাই! এখন ফরাসী এবং স্পানিশ ফৌজের পাহারাদারীতে এবং শিক্ষায় দৌরাত্ম্য ছাড়িয়া তারা সুলতানের প্রচলিত আইন-কানুন মানিয়া চলে।

রিফ-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়াছে একেবারে সেই ভূমধ্য-সাগরের তীর হইতে। জিব্রালটারের দিকে সে যেন চাহিয়া আছে—জিব্রালটারের প্রহরীর মত। রিফ-গিরিশ্রেণীর দক্ষিণে তাজ সহর—সুলতানের আমলে এ সহরের সৃষ্টি হয়। এখানকার পথ-ঘাট,

ঘর-বাড়ী দেখিলে সুলতানদের প্রাচীন বিভব এবং শত্রু-হস্তে সে বিভবের দুর্দ্দশা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

দক্ষিণে এ্যাটলাশ গিরিশ্রেণী। রিফের মত এ গিরিশ্রেণীও পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এ্যাটলাশ গিরির সর্ব্বোচ্চ যে শিখর, সেটির উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট।

মরক্কোর পশ্চিম-দিক্‌কার অর্দ্ধাংশে বিস্তীর্ণ জলা এবং উপত্যকা-ভূমি আছে। এ ভূমির উর্ব্বরতা অপরিসীম। এবং এ ভূমি পশ্চিমে সুদূর আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। আটলাণ্টিকের তীরে ফরাশীরা চমৎকার একটি বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছে—বন্দরের নাম কাশাব্লাঙ্কা। এই কাশাব্লাঙ্কাতেই চার্চ্চিলের সঙ্গে রুজভেল্টের রাজনীতি ও সমরনীতি সম্বন্ধে প্রচণ্ড আলোচনা চলিয়াছিল।

কাশাব্লাঙ্কার ঈষৎ উত্তরে রাবাট—মরক্কোর মস্তিষ্ক; অর্থাৎ প্রাচীন সুলতানের রাজধানী। এই রাবাটেই মরক্কোর প্রকৃত দণ্ড-মুণ্ডধর ফরাশী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের আস্তানা। রাবাটকে যদি মরক্কোর মস্তিষ্ক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ফেজকে বলিতে হয় মরক্কোর হৃদয়। কারণ, মরক্কোর প্রাণের পরিচয় মেলে ফেজে। আটলাণ্টিক এবং ভূমধ্য-সাগর হইতে ফেজের দূরত্ব প্রায় সমান। অর্থাৎ দু' দিক্ হইতেই একশো মাইল দূরে ফেজ অবস্থিত। রাজনীতি এবং ধর্ম্ম-নীতির দিক্ দিয়া ফেজই হইল মরক্কোর প্রধান সহর।

ফেজের প্রাচীন মাদ্রাশা—মূর-শিল্পকলাঙ্কিত দেওয়াল

৮০০ খৃষ্টাব্দে মরক্কো-বিজয়ী আরব-জাতি এই ফেজ সহরের প্রথম পত্তন করে। তার পর দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুশলিম্-শক্তির প্রভাবে সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি এবং ধর্ম্ম—সকল দিক্ দিয়া ফেজের গৌরব-মহিমার সীমা ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে একমাত্র এই ফেজ সহরেই মসজেদের সংখ্যা ছিল ৭৮৫; সরাইখানা ছিল ৪৮০; এবং সাধারণ বসত-বাড়ী ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার।

আজ ফেজের সে গৌরব নাই! সুলতান গিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন রাবাটে এবং পুরানো ফেজের গায়ে নূতন ফেজ গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন ফেজের নাম লা ভিলা নুভে। নূতন ফেজে অসংখ্য হোটেল, দোকান, সিনেমা এবং বহু ফরাশী নর-নারীর বাস।

মরক্কোর অঙ্গ ভেদ করিয়া এখন অজস্র রেল-লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। সে লাইন ধরিয়া ট্রেণে চড়িয়া পশ্চিমে আটলাণ্টিকের তীর হইতে সুরু করিয়া মরক্কো এবং আলজিরিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর টিউনিশিয়া পর্য্যন্ত যাতায়াত চলে।

সুলতানী-আমলে পথ-ঘাট নিরাপদ ছিল না—চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য ছিল সীমাহীন। এখন দস্যুভয় ঘুচিয়াছে—মানুষের ধন-প্রাণ নিরুপদ্রব হইয়াছে। এ পথে ট্রেণে বা মোটরে চড়িয়া যেখানে খুশী মানুষ যাইতে পারে, চোর-ডাকাত বা কোনো রকম দৌরাত্ম্যের ভয় আর নাই!

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বার্বার দস্যু-প্রজার দল মরক্কো অবরোধ করিয়া সুলতান মৌলে হাফিদকে বিপন্ন করিয়া তুলিলে সুলতান হাফিদ ফরাশীর কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন। সুলতানের প্রার্থনায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ তারিখে ফরাশী-সৈন্য আসিয়া বার্বার-দস্যুদের পরাভূত করিয়া হটাইয়া দেয়। তার পরের বৎসর বার্বার-দস্যুরা আসিয়া ফরাশীদের আস্তানায় হানা দিয়া বহু অফিসারকে

হত্যা করিলে ফরাশীরা দস্যু দমন করিয়া মরক্কোয় নিজদের সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও মরক্কোর সম্বন্ধে ফরাশী এতটুকু ঔদাস্য বা শৈথিল্য প্রকাশ করে নাই।

ফেজ এখানকার মস্ত সহর। বার্বার দস্যুদের পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া মৌলে ইদরিশ্ সর্ব্বপ্রথম ফেজ-সহরের পত্তন করেন; এবং এই ফেজ-সহরকে লইয়াই ক্রমে বিরাট্ মরক্কো-সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে।

ফেজের সমৃদ্ধি এখনো অতুলনীয়। এখানকার লোক-সংখ্যা এখন পনেরো লক্ষের উপর। এই পনেরো লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। এখানকার মুসলমান ও ইহুদীরা যেদিদ মহল্লায় বাস করেন। য়ুরোপীয়ানদের মধ্যে বেশীর ভাগ বাস করেন ভিল্লা নুভে নামক নব-নির্ম্মিত সহরে। য়ুরোপীয়ের সংখ্যা প্রায় এগারো হাজার। ফরাশীর সংখ্যাই বেশী। সেই সঙ্গে আছে দু'-তিন হাজার স্পানিয়ার্ড এবং ইতালীয়ান।

ফেজের পুরানো পথ-ঘাটে নূতনত্ব আছে। পথ প্রায় গলি-ঘুঁজি। পথের দু'ধারে শুধু দোকান আর দোকান। দোকানকে মূর-ভাষায় বলে, সৌক্। মরক্কো, আলজিরিয়া এবং টিউ-নিশিয়া—তিনটি প্রদেশেই দোকান সম্বন্ধে এই এক বিধি দেখা যায়। এক এক মহল্লায় এক এক রকম পণ্যের দোকান। সৌক্ এল আতরিণ অর্থাৎ আতর-ওয়ালার গলি। এ গলির দু'ধারে শুধু আতরের দোকান। সৌক্ এল খিয়াতিন অর্থাৎ দর্জীর দোকান। এ সব দোকানে দিনের বেলায় সমা-রোহে কারবার চলে; রাত্রে দোকানী-পশারীর দল দোকান বন্ধ করিয়া স্বতন্ত্র মহল্লায় তাদের বাড়ীতে চলিয়া যায়। মণিহারীর দোকানে নানা রকমের পণ্য বিক্রয় হয়। নহিলে অন্য সব দোকানে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা। যে ফেজ-টুপির নাম আমরা শুনি, সে টুপির জন্ম এই মরক্কোয়।
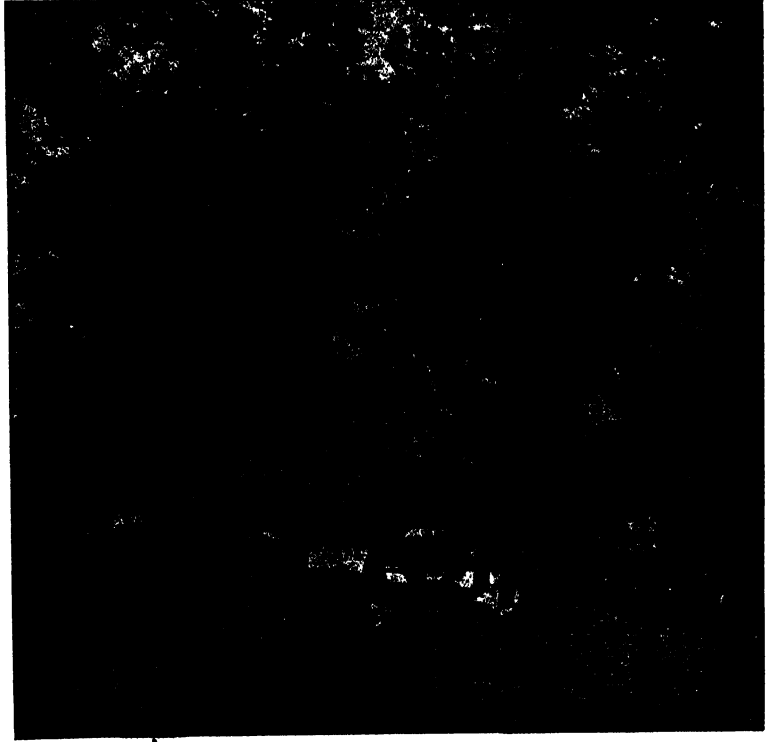
তুষার-ঝটিকার পরক্ষণে—ত্‌লেম্‌সেন্

পশমের হাট—ফেজ
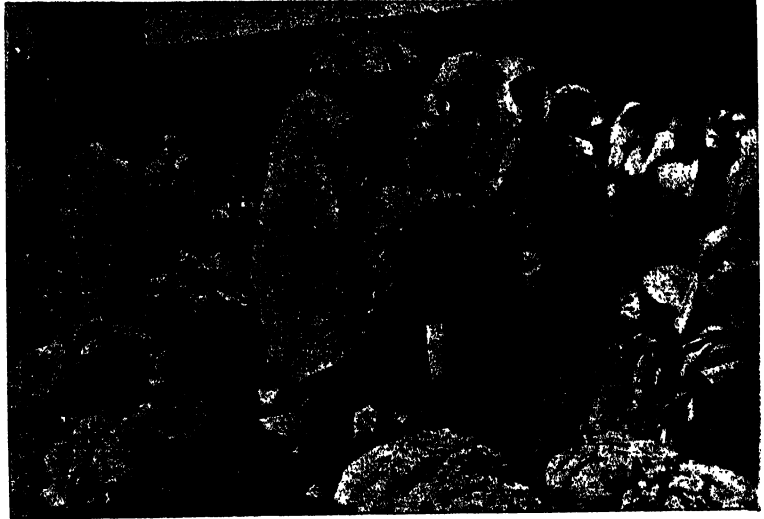
পথ সঙ্ক—কিন্তু এখানে রৌদ্রের তাপ খুব অসহ্য বলিয়া পথের উপরে লতা-পাতা কাঠি দিয়া ছাদ তৈয়ারী করা হয়। ছাদের জন্য রৌদ্র-তাপ অনেকখানি নিবারিত হয়।

পথে রকমারি লোকের ভিড়ে বৈচিত্র্যের সীমা নাই। ছিন্ন মলিন বেশে ভিখারী-মজুর; দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমান পুরুষ; লম্বা কালো
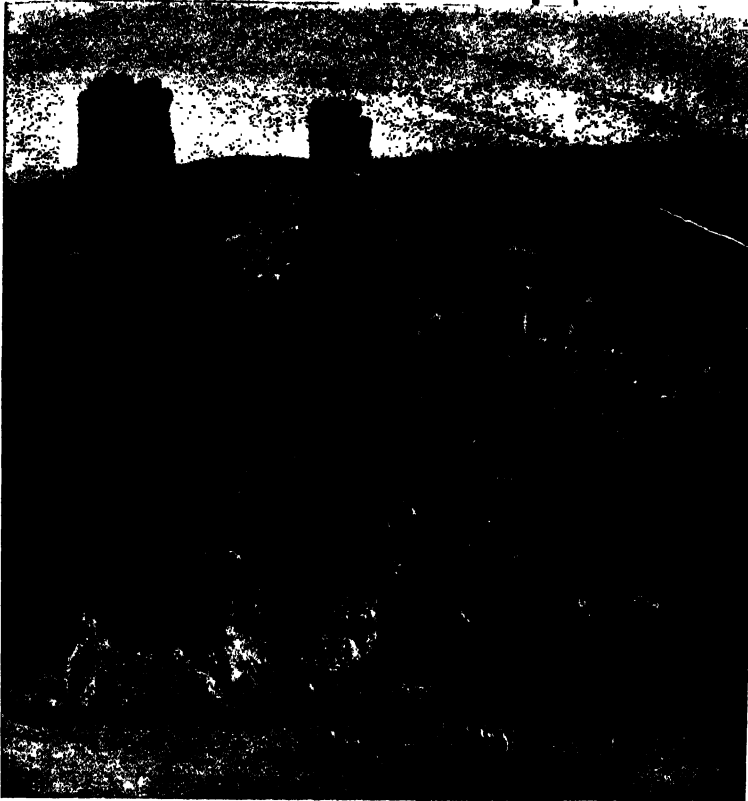
গাবশিখ, হইতে দূরে ফেজ-সহরের দৃশ্য

ট্যাঞ্জিয়ার-সহরের খোলা ফটক

কুর্তাধারী ছাত্রের দল ; মোটা সাদা বোর্খায় আপাদ-মস্তক ঢাকা রমনী-বৃন্দ ; মাথা-কামানো বালক, ফ্রকপরা বালিকা—ভিড়ে পথ একেবারে পরিপূর্ণ ! এত ভিড়েও কিন্তু হট্ট-গোল নাই ! নিঃশব্দে যে যার কাজে চলিয়াছে। এ ভিড়ের মধ্যে পদে পদে আসিয়া দেখা দিতেছে গাধার-পিঠে-চড়া সম্ভ্রান্ত ধনী পথিক। গাধার আদর এবং খাতির এখানে প্রায় ঘোড়ার মত। মোট-বাহী গাধার পিঠে সওয়ার হইলে ধনীর ধন-মর্য্যাদা বা সম্ভ্রম এখানে নষ্ট হয় না !

পথে-ঘাটে এই বিচিত্র জনতা দেখিয়া এক জন ফরাসী কবি লিখিয়া গিয়াছেন, মরক্কোর পথে বিচরণ-কালে মনে হয়, যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী-বর্ণিত পথে বেড়াইতেছি ! মনে তেমনি বিভ্রম জাগে ! এ বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায় দোকানের দিকে চাহিয়া যখন দোকানে দেখি, সুইড দেশলাইয়ের পাহাড়-প্রমাণ প্যাকেট আর টিনে-ভরা ফল ও বিস্কুটের বিপুল সম্ভার !

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফেজ সহরের বাহিরে পাওয়ার-ষ্টেশন তৈয়ারী হইয়াছে। একটি ঝর্ণার জলকে সহায় করিয়া এই ষ্টেশনের সৃষ্টি। এই ঝর্ণার জলের জোরে সহরে এবং সহরের বাহিরে প্রায় বিশ মাইল পরিমিত জনপদে বিজলী আলো-পাখা এবং কল-কারখানা বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতেছে।

শিল্পে মরক্কোর কুশলতা অসাধারণ। চামড়ার রকমারি কাজে কারুকারিতার অন্ত নাই ! মেয়েদের জন্য যে চামড়ার কোমর-বন্ধ তৈয়ারী হয়, তার উপর সোনালি নক্সা-কাজের চমৎকারিত্ব অতুলনীয়। ফেজে পশমের যে হাট বসে, এত-বড় হাট পৃথিবীর আর কোথাও নাই। তাছাড়া ছোট-বড় নানা আকারের যে সব ব্যাগ তৈয়ারী হয়, সে সব ব্যাগে রকমারী নক্সায় এত বাহার যে, পৃথি-বীর আর কোন দেশের শিল্পীর হাতে তেমন জিনিষ তৈয়ারী হয় না। জুতাও নানা ফ্যাসনের তৈয়ারী হয়। এখানকার সুবিখ্যাত মরক্কো-স্লিপার পৃথিবীর সকল সৌখীন সমাজে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে।

তার উপর এখানকার তামা-পিতলের নানা রকম তৈজস এবং সৌখীন আসবাব-পত্রাদিও পৃথিবীর সর্ব্ব-সমাজে আদর পাইয়াছে। তামার ও পিতলের তৈয়ারী কেটলি,

ছাউান-পথের ছ'ধারে দোকান-পাট

সম্ভ্রান্ত-ঘরের বধূ—ফেজ

প্লেট, ডিশ-পেয়ালা, ঢাকনিদার গ্লাস, বাতিদান অজস্র ছাঁদে তৈয়ারী হয়; সে সব চালান দিয়া অর্থও প্রচুর আসিতেছে। রঙের কাজেও মরক্কোর পটুতা খুব। শুধু কাপড়-চোপড় বা পোষাক রঙানো নয়, তৈজস-পত্রাদিও নানা রঙে রঞ্জিত করা হয়। তৈজস ভাঙ্গিলেও তার সে-রঙ কখনো নষ্ট হয় না,—রঙের কাজে মুর-শিল্পীদের এমনি দক্ষতা।

মৌলে ইদ্রিশের মসজেদে দরিদ্র-ভাণ্ডারে অর্থ-দান—ফেজ

গান গেয়ে ভিক্ষা করে

ছেলের মাথায় টিকির গোছা

শাল গায়ে ইহুদী মহিলা—মাবাকেশ

ফেজে বহু-ধর্মী বহু নর-নারীর বাস এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহারো অনুরাগ বা নিষ্ঠা এতটুকু শিথিল নয়। অথচ শাসন-কৌশলে ধর্ম্ম লইয়া পরস্পরে বিদ্বেষের চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। মসজেদে বা মুশ্লিম-তীর্থে পদার্পণ করিবে,' খৃষ্টানের সে-অধিকার নাই। এখানে থিওলজিকাল্ কলেজ আছে। সে কলেজ যদি কোনো অ-মুসলমান ব্যক্তি দর্শন করিতে চান, সে জন্ম তাঁহাকে অনুমতি লইতে হয়।
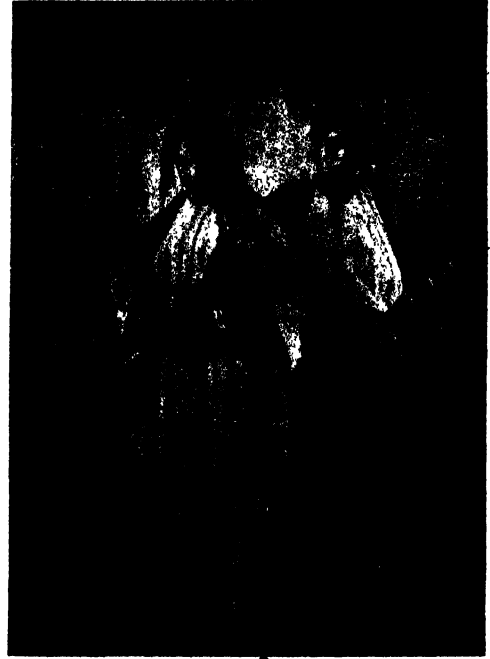
সরাইখানা—ফেজ
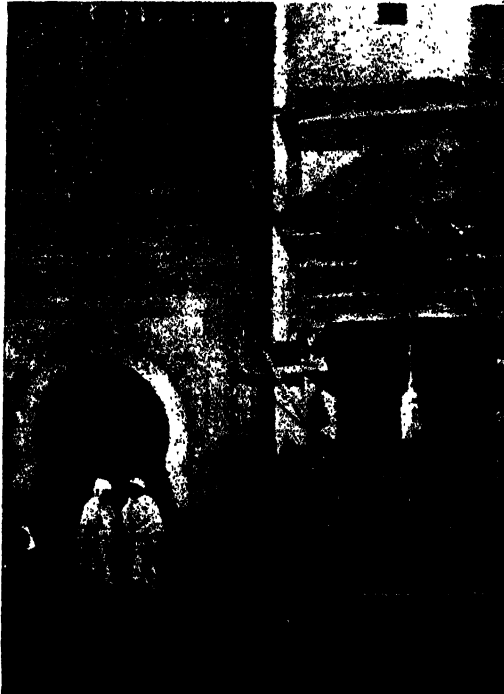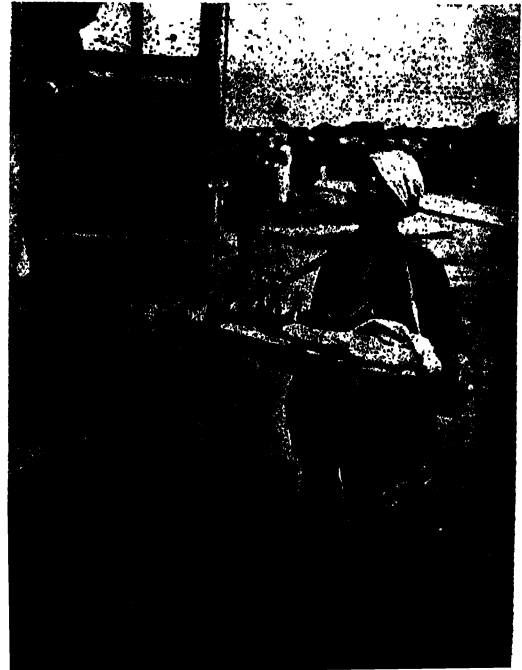
রেল-ষ্টেশনের সরবৎওয়ালা—মেকিনেজ

জুম্মার দিনে অর্থাৎ শুক্রবার মসজেদগুলি উপাসকের ভিড়ে ভরিয়া ওঠে। মেয়ে-পুরুষের ভিড়। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি কঠিন বিধি-নিয়ম আছে। মসজেদের বিশিষ্ট স্থানটুকুতে ছাড়া অন্যত্র মেয়েদের প্রবেশাধিকার নাই।

মরক্কোয় সব চেয়ে বড় মসজেদের নাম কারুইন মসজেদ। এ মসজেদটি ফেজ সহরে অবস্থিত। নবম শতাব্দীতে সুরু হইয়া এ মসজেদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় একাদশ শতাব্দীতে। তার পর নানা সুলতান মসজেদটির বিচিত্র সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন। এ মসজেদের একটি ফটক ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে আগাগোড়া ব্রোঞ্জ দিয়া আচ্ছাদিত করা হয়। উপাসনা ছাড়া এ মসজেদের একাংশে আছে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এখানে ব্যাকরণ, অধ্যাত্মদর্শন হইতে কোরাণের অধ্যাপনাও হইতেছে।

মরক্কোয় বহু মাদ্রাসা বা বিদ্যাপীঠ আছে। সব চেয়ে বড় মাদ্রাসা ফেজের ইলানিয়া। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই গৃহে কলেজ ও মসজেদ অবস্থিত। আগাগোড়া ব্রোঞ্জ ও পোর্শিলেনের কাজ করা; দরজা-জানালাগুলিতে বহু বিচিত্র নক্সা এবং মেঝে মার্ব্বেলে মণ্ডিত।

ফেজ সহরে প্রাচীন সুলতানদিগের বহু প্রাসাদ এখনো বিদ্যমান আছে। সব চেয়ে বড় প্রাসাদ দর বেদিয়া বা শ্বেত গৃহ (White House) উনবিংশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সুলতান মৌলে এল্ হাশান্। এখন এটি ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদের সঙ্গে বড় বাগান আছে।

দর বেদিয়ার কাছে আর একটি প্রাসাদ—দর বাথা। এখন এ বাড়ীটিতে মিলিটারী ক্লাব এবং মিউজিয়াম আছে। মিউজিয়ামে প্রাচীন মূর শিল্প-কলার বহু বিচিত্র সমাবেশ। মাটীর ও কাচের রকমারি আসবাব, জুয়েলারি এবং লেশের বিচিত্র সংগ্রহ—দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। পুরাকালের অস্ত্র-কামানাদিও আছে। এই প্রাসাদের একটি কক্ষে বিদ্রোহী ব্যু হামারাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ব্যু হামারা নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী হইয়াছিলেন। বন্দী করিয়া রাখার পর তাঁহাকে প্রাসাদের চিড়িয়াখানায় জীবন্ত সিংহের মুখে নিক্ষেপ করা হয়।

মরক্কোর বর্ত্তমান সুলতান বাস করেন দর এল মাখজেন নামক প্রাসাদে। পূর্ব্বে এ গৃহে ইহুদী মোল্লারা বাস করিতেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহাদিগকে এ গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হয়। শিক্ষার দিকে মূরদিগের অনুরাগ এবং অধ্যবসায় দিনে দিনে বাড়িতেছে। স্কুল-কলেজ ছাড়া বহু গৃহে ছোট-ছোট মখ্তব বা

আঙ্গুর-বাজার—ট্যাঞ্জিয়ার

স্পেনের রিফিয়ান ফৌজ—জাতে বার্বার

পাঠশালা আছে। সেখানে বিনামূল্যে গরীব-দুঃখীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা চমৎকার।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন মার্কিন মহিলা আলজিরিয়া হইতে মরক্কোয় গিয়াছিলেন। মরক্কোর স্পানিশ ও ফরাসী-অধিকৃত সর্ব্বস্থান দেখিয়া তিনি যে মনোজ্ঞ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া আমরা মরক্কো-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন,—ভূমধ্য-সাগরের তীরে আলজিরিয়ার ওরান্ হইতে আমি মরক্কো ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। মরক্কোর যে-অংশ ফরাসীর অধিকারে, ফরাসীরা সে অংশের নাম দিয়াছে মারোক;

স্পানিশ-অধিকৃত অংশের নাম মারুইকোস্। ওরান্ হইতে ট্রেণে চড়িয়া আমি উজদায় আসিয়া নামিলাম। রেলে আট ঘণ্টার পথ। রেল-লাইনের দু'দিক ধানের ক্ষেত, ফলের বাগান আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের

চক-বাজার—পথের মাথায় ছাউনি—ফেজ
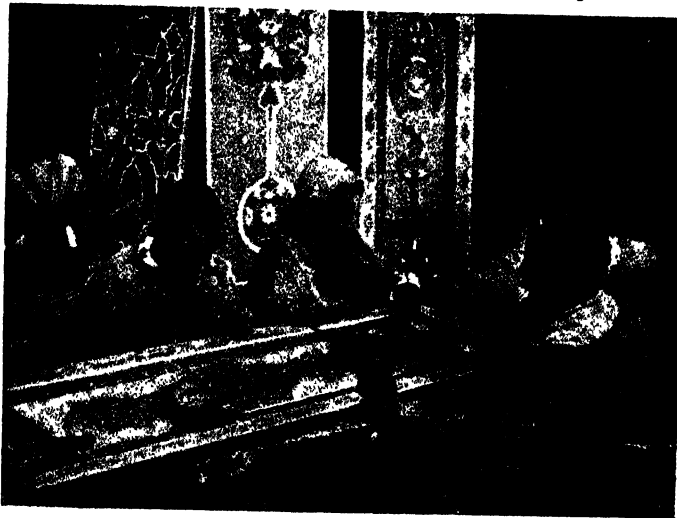
চিত্রাঙ্কন-শিক্ষা—রাবাট

প্রাচুর্য্যে ঘন শ্যামল। আর কত জাতের কত রঙের বন-ফুল দেখিয়াছি! মনে হইতেছিল, মরক্কোয় প্রকৃতি দেবী যেন সুদৃশ্য গালিচা পাতিয়া সে-গালিচায় হাসি-মুখে বসিয়া আছেন! ক্ষেতে পাগড়ী-মাথায় কৃষকের দল। ক্ষেতে উট দিয়া লাঙ্গল টানা হইতেছে।

ওরান্ হইতে উজদার মধ্যে দু'টি বড় ষ্টেশন আছে—সিদি বেল আবেশ এবং ত্‌লেমসেন। সিদি বেল আবেশে বিদেশীয় সেনা-বাহিনীর ডিপো আছে। এখানে নানা-জাতীয় লোকের বাস। ত্‌লেমসেন প্রাচীন মুশলিম্ সহর—পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। জলপাই ও নানা জাতীয় গাছে ঘেরা যেন কুঞ্জ-গৃহ! আশে পাশে প্রাচীন সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষে সহস্র স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে! পশ্চিম দিক্ হইতে বার্ব্বার দস্যুর দল এই ত্‌লেমসেন হইয়া স্পেনে গিয়া স্পেন আক্রমণ করিয়াছিল।

উজদা হইতে আমরা মোটরে চড়িয়া মরক্কোর দিকে পাড়ি সুরু করিলাম।

শেষ রাত্রে উজদা ছাড়িলাম। ভোরের দিকে পথে দেখা উষ্ট্রারোহী যাত্রীদের সঙ্গে! তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বার্ব্বার জাতীয়। দাড়িহীন মুখ দেখি নাই। শুনিলাম, দাড়ির উপর এখানকার মুসলমানের একান্ত নিষ্ঠা! প্রাণ দিবে তবু দাড়ি ছাঁটিবে না! দাড়ি বিসর্জ্জন দেওয়ার মত অপমান আর-কিছুতে নাই! যাত্রীর দলে বার্ব্বার রমণীও ছিল। তাদের সুদীর্ঘ অবয়ব এবং মুখে বিচিত্র নক্সা আঁকা—ছেলেদের মাথায় টুপি নাই—মাথা কামানো এবং ব্রহ্মতালুতে সুদীর্ঘ টিকির গোছা! শুনিলাম, এত বড় টিকি রাখিবার কারণ, মৃত্যুর পর দেবদূত ঐ টিকির গোছা ধরিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে! টিকি থাকিলে দেবদূতের ধরিবার সুবিধা হইবে, তাই!

উজদার পর তাওরিত গ্রামে আসিলাম। এখানে এক ফরাসী হোটেলে কফি পান করিলাম। গ্রামখানি এ্যাটলাশ-গিরিশ্রেণীর কোলে। পাহাড়ে দেখি, অসংখ্য মেষ! লোমে ঢাকা আর কি সব পুষ্ট-নধর দেহ!

তাওরিত ছাড়িয়া রেলোয়ে-যোগে মুলুয়া নদী পার হইলাম। নদীটি নামিয়াছে এ্যাট-লাশ গিরি হইতে—নামিয়া মিশিয়াছে গিয়া ভূমধ্য-সাগরের বুকে। এই নদীটি ফরাসী এবং স্পানিশ মরক্কোর সীমানা রচিয়া রাখিয়াছে।

নদী পার হইয়া পাইলাম গারশিফ গ্রাম। এখানে সেনিগালীজ ফৌজের আস্তানা। ফরাসীরা এখানে বাহিনী গড়িয়াছে—আরব, বার্ব্বার, মুর এবং সেনিগালীজদের লইয়া। বিভিন্ন দলের মধ্যে সেনিগালীজদের বীরত্ব, সাহস এবং পটুত্বের সীমা নাই।

মরক্কো অধিকার করিলেও ফরাসীরা এখানকার মুসলমান ও ইহুদী জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতিতে আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই। মরক্কোর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল সমস্যা-বিরোধের মীমাংসা-ভার পাশার উপর ন্যস্ত। পঞ্চায়েতী-রীতিতে মহল্লার সর্ব্ব-বিরোধের বিচার-মীমাংসা হয় কোরাণের বিধি মানিয়া। মরক্কোর রেসিডেণ্ট

জেনারেল বলেন—মূর-জাতি কোনো বিষয়ে ফরাসীর চেয়ে হীন নয়। আমরা চাই মূর জাতি ভালো হোক, ধন-সম্পদে সম্পন্ন হোক। ফরাসীর নকল করিয়া বেচারী নকল-ফরাসী হোক, এমন কথা আমাদের মনে উদয় হয় না! এ-কথায় বুঝা যায়, মূর-জাতিকে জয় করিলেও ফরাসীরা মূরকে হীন চক্ষে দেখে না, আত্মতুল্য বিবেচনা করে।

গারশিখ হইতে পথ চড়াই। এ পথে পাহাড়ের বুকে তাজ গ্রাম—প্রহরীর মত খাড়া আছে! এই পথে প্রাচীন রোমানরা মরক্কোয় আসিয়াছিলেন। এখানে এই পাহাড়ের বুকে অধিকার-প্রমত্ততায় কত যুদ্ধ হইয়াছে, তার সংখ্যা নাই! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই তাজ ছিল দুর্দ্ধর্ষ বার্ব্বার দস্যুদলের প্রধান আস্তানা এবং দুর্গ। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই তাজার যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া ফরাসী মরক্কোয় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তাজের পর হইতে উত্তরে রিফ্ গিরিশ্রেণী চোখে পড়ে। শীতকালে পাহাড় বরফে ঢাকা থাকে; অন্য ঋতুতে শ্যামল শস্যে সবুজের চমৎকার বাহার!

তাজ ছাড়িয়া খানিকটা আসিবার পর দেখি, দূরে ফেজের সমৃদ্ধির আভা! সাদা রঙের অসংখ্য বাড়ী-ঘর! অসংখ্য মসজেদর আকাশ-চুম্বী চূড়া! যেন ঘুমন্ত বিরাট্ এক দৈত্য অলস দেহে পড়িয়া আছে! ফেজের প্রবেশ-মুখে ক'জন আমীর লোকের দেখা মিলিল—তাঁদের মধ্যে কেহ সাদা খচ্চরের পিঠে, কেহ বা গাধার পিঠে চড়িয়া পথ চলিয়াছেন। খচ্চর বা গাধার পিঠে চড়ায় মরক্কোয় গৌরব ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়—আজো। মরক্কোয় মূর-ঘরের মেয়েরা পথে-ঘাটে বড় একটা বাহির হন না—পর্দ্দাপ্রথার বেশ কড়াক্কড় আছে। মেয়েদের স্থান শুধু অন্দরে—মাতৃত্বই তাঁদের জীবনের ধর্ম্ম! মাতা ও কন্যারূপেই নারীর সম্মান। পথে-ঘাটে যে সব দাসী, ক্রীতদাসী ও গরীবের ঘরের মেয়েদের দেখিলাম, তারাও বোর্খায় মুখ এবং সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বাহির হয়। বোর্খার চোখের কাছে সাদা ব্যাণ্ড সংলগ্ন আছে; তাহারি ফাঁকে এক জোড়া করিয়া কালো চোখ! চোখের আচ্ছাদনী এমন যে, চোখের দীর্ঘ কালো পল্লব ঢাকা পড়ে না! এ সব দাসী বা গরীবের ঘরের মেয়েরা চটি জুতা পায়ে দিয়া পথে চলে।

ইহুদী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দার প্রথা নাই। বড়-মাঝারি-ছোট সকল ইহুদী-ঘরের মেয়েরা পথে বাহির হন—গায়ে দেন পারসী শাল কিম্বা রেশমী স্কার্ফ। ফেজ এবং আরো কয়েকটি প্রধান সহরে রেশমীর লেশের বহু কারখানা আছে। তাছাড়া চামড়ার বিবিধ ছাঁদের জুতা, ঘোড়ার জিন, লাগাম, বাদ্যযন্ত্রাদি তৈয়ারীর বহু কারখানা; গ্লেজ্ টালি; এবং রঙীন তৈজসপত্রাদির বিচিত্র সমারোহ দেখিয়াছি। এখানকার এই গ্লেজ-টালির প্রচলন য়ুরোপেও খুব বাড়িতেছে। সেলে নানা রকমের মাদুর-পাটী তৈয়ারী হইত এবং বহু গ্রামে চমৎকার র‍্যাগ হইত; এখন ফরাসীর যত্নে এ-সব শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন ও সমাদর হইতেছে।

কাশাব্লাঙ্কা সহরটি ফরাসীর হাতে নির্ম্মিত। প্রথমে য়ুরোপীয় ষ্টাইলে এখানে ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু এ-ষ্টাইলের ঘর-বাড়ী মরক্কোর জল-বাতাসের উপযোগী নয়; তাছাড়া মরক্কোয় সে ঘর-বাড়ী অত্যন্ত বেমানান লাগিল বলিয়া কাশাব্লাঙ্কায় মরক্কোর প্রাচীন ছাঁদে ঘর-বাড়ী পথ-ঘাট তৈয়ারী হইতেছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা—ফেজ

চা-খাওয়ার সময়—ফেজ

মরক্কোর বাড়ী—সব দোতলা। বাহিরে চূণকাম-করা—সাদা রঙ। দেওয়াল চূণকাম-করা, নয়, বেলে পাথরের তৈয়ারী। ঘরের দ্বার-জানালা বেশ বড়। খিলান প্রভৃতির কাজে বিচিত্র কারিগরি।

স্পেন, পোর্ত্তুগাল এবং লাটিন-আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে মরক্কোর কাহিনী যেন সোনার শিকলে বাঁধা! একদা এই মরক্কোর মূর জাতি স্পেন জয় করিয়া গ্রানাডায় রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; এবং মূর ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ললিত-কলা ও রীতি-নীতি পোর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইতালীয়ান ভাষা-সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছিল—সে সংযোগ আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

লেখিকা লিখিতেছেন—ফেজ হইতে ট্রেণে চড়িয়া আমরা আসিলাম মেকিনেজ সহরে। প্রাচীন যুগে এ সহরের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। এখানকার ঘোড়ার শক্তি অসাধারণ। সওয়ার লইয়া এক-টানে এক শত মাইল পাড়ি দিতে কাতর বা শ্রান্ত হইতে জানে না। এখানকার ঘোড়া লইয়া গিয়া প্রাচীন রোমান জাতি রোমের দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী ফৌজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এ্যাটলাশ-গিরি-সন্নিহিত বনে এ ঘোড়ার বিপুল আস্তানা। ইহারা যেন বায়ু-ভুক্! দানাপানি না খাইয়া অবিশ্রাম সওয়ার বহিতে পারে। এই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মূর জাতি শীকার করে।
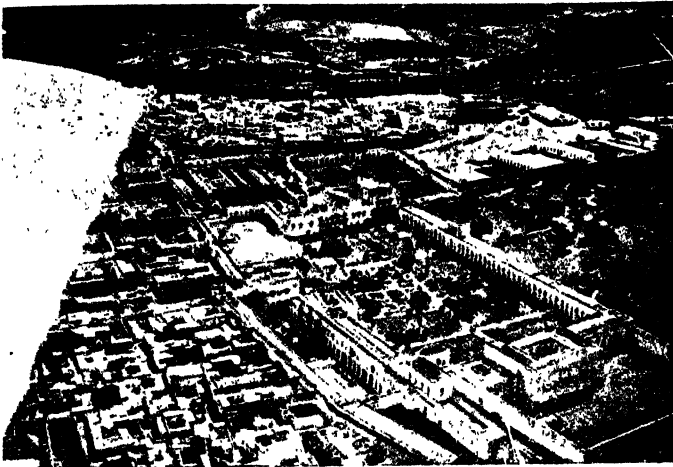
আকাশ হইতে দেখা সুলতানের প্রাচীন প্রাসাদ—ফেজ

মেকিনেজে ফরাশী হোটেলের উঠানে একটি পীরের আস্তানা আছে। বহু শত বৎসর হইতে এ আস্তানাটি বিদ্যমান। এখনো এখানে এক জন সাধু মোল্লা বাস করেন। তাঁর কাছে বহু নর-নারী আসিয়া প্রার্থনা-মানসিক নিবেদন করে—সাধু তাদের দুশ্চিন্তা মোচন করেন।

মেকিনেজের উত্তরে জারহুন পর্ব্বতের সানুদেশে প্রাচীন রোমান নগর ভলুবিলিশ। এখানে রোমান গৌরবের বহু ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে; এবং সে সব ধূলি-জঞ্জাল ঘাঁটিয়া রোমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদের ঐতিহাসিক তথ্যাবিষ্কারে অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। মেকিনেজের পূর্ব্বে ওক এবং সুগন্ধি দেবদারুর ঘন জঙ্গল। এ দিকে আটলাণ্টিক হইতে এ্যাটলাশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়িয়া ওকের বন। মরুরা এ-অঞ্চলকে বলে ব্লেড। বসন্তকালে এ বনে নানা জাতের আইরিশ-ফুল ফোটে অজস্র—নানা জাতের পাখীর কূজনে বন সারাক্ষণ মুখরিত থাকে। ফরাশীরা এ বন-সম্পদের দাম বুঝিয়া তার প্রসার সাধন করিতেছে; গিরি-বক্ষ উর্ব্বর করিয়া সেখানে ফশল ফলাইতেছে; নদী-খাল-বিলের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছে।

মেকিনেজ হইতে আমরা রাবাটে আসিলাম। রাবাটে বু রেগরেগ নদী। নদীর ওপারে শেল সহর। রাবাটের আকাশ বাতাস যেমন প্রাচীন যুগের পুণ্য-স্মৃতিতে ভরিয়া আছে, নদীর অপর পারে শেলের আকাশ-বাতাসে তেমনি হত্যার রক্তবিন্দু মিশিয়া আছে। এই শেল এক দিন বার্ব্বারি বোম্বেটেদের আস্তানা ছিল। কত খৃষ্টান বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শেলে আনিয়া এখান হইতে বু রেগরেগ নদীর জলে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তার সংখ্যা হয় না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই রাবাটেই ফরাসীর মরক্কো-বিজয় প্রথম সূচিত হয়। রাবাট অধিকারের পর জেনারেল লিয়াউতিকে রেসিডেণ্ট জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তার পর রাবাট হইতে ফরাসী-বাহিনী গিয়া ফেজ অধিকার করে। বিশ হাজার বার্ব্বার সেনাকে পরাস্ত করিয়া ফেজ অধিকার; সঙ্গে সঙ্গে মরক্কো ফরাসীর করতলগত হয়।

কাশাব্লাঙ্কার দক্ষিণে মাজাগান এবং সাফী—এখানে পোর্ত্তুগীজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে পোর্ত্তুগালের উচ্ছেদ ঘটে। এখানে তাহারা দুর্গ এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। এখন দুর্গের চূর্ণাবশেষমাত্র পড়িয়া আছে। মাজাগানের দক্ষিণে মারাকেশ—মরক্কোর সবচেয়ে বড় সহর। সহরটি এ্যাটলাশ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। সাহারা মরু হইতে উষ্ট্রবাহী যাত্রীরা আসিয়া এই-খানেই প্রথম লোকালয়ের দেখা পায়; এবং দ্রা, ড্রিজ, নীর ও শুস্ প্রভৃতি গ্রামের কৃষকের দল এখানে আসে ফশল বেচিতে।

সার্কাসের অসম-সাহসিক ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে শুস্বাসীদের জোড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু সার্কাশ কোম্পানী এই সব খেলোয়াড়ের খেলা দেখাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করে। ভিতরকার গ্রাম হইতে উটের পিঠে মারাকেশের বাজারে ভারে-ভারে আসে বার্লি, গম, বীন, উটের লোম, চামড়া, বাদাম, মধু এবং মোম। ট্রেণে এবং গাধার পিঠেও এ সব দ্রব্য আসে।

মরক্কোয় উটের সংখ্যা লক্ষাধিক।

এখান হইতে বহু মেষ চালান যায় স্পেনে, আলজিরিয়ায় এবং ফ্রান্সে। মরক্কোর মুর্গী অজস্র ডিম দেয়। এ সব ডিম মরক্কো হইতে প্রতি মেলে য়ুরোপে-আমেরিকায় চালান যাইত, এখন চালানী বন্ধ আছে। মরক্কোয় চা নাই—বিদেশ হইতে এখানে চা আসে।

আলজিরিয়া এবং টিউনিশিয়াকে স্ববশে আনিতে গিয়া ফরাশী ব্যর্থকাম হইয়াছিল—বিরোধ-বিগ্রহের সীমা ছিল না। এ জন্য ফরাশী জাতি মরক্কোয় প্রভুত্ব ফলায় নাই। মূরদিগের সঙ্গে মনে-প্রাণে মিশিয়া তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সহযোগিতা করিয়া তাদের কল্যাণ সাধন করিতেছে। মূরদিগকে ফরাসী জাতি

সৈন্য-বিভাগে পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়াছে—তবে ফৌজ মূর হইলেও প্রতি দলের অধ্যক্ষ ফরাসী। মূর সমাজকে ফরাসী জাতি শিক্ষিত করিয়াছে। হাসপাতালে ধর্ম্মের ছুঁৎ-বাধা-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নাই!

মরক্কোয় প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক বাস করে বড় বড় সহরগুলিতে।

বার্ব্বার জাতি চাষ-বাস করে। চাষের কাজে তাদের পটুতা অসামান্য রকম। মরক্কোর মাটী খুব উর্ব্বর। এখানকার মাটীতে জলপাই, আঙ্গুর, কমলা লেবু, বড় বড় ফিগ যেমন ফলে, তেমনি ফলে আখ, ধান এবং তুলার ফশল। কুলাও খুব। তাছাড়া কাশাব্লাঙ্কার দিক্‌টা ফশফেট-সম্পদে সমৃদ্ধ।

কাশাব্লাঙ্কা হইতে মোটরে এক দিনের পথে ট্যাঞ্জিয়ার। আলজিরিয়া হইতে ফেজ পর্য্যন্ত রেলোয়ে-লাইন আছে। তাছাড়া পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া মোটরের পথও যেমন প্রশস্ত, তেমনি স্বচ্ছন্দ-নিরুপদ্রব।

ফরাসী মরক্কোর সীমায় আর্ব্বাওয়া গ্রাম। এখানে কাষ্টম অফিস আছে। এ গ্রামের পর স্পানিশ্ সীমানা।

স্পানিশ-অধিকারে প্রধান সহর আলকাজার—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সহর। এখানে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মুশলিম মূরের হাতে পোর্ত্তুগীজ ডন্ সেবাস্তিয়ানের পরাজয় ঘটে।

লেখিকা লিখিতেছেন, আলকাজার হইতে সমুদ্রাভিমুখে লারাশি এবং আটিলা—দু'টি প্রাচীন পোর্ত্তুগীজ সহর। লারাশিতে লৌকোশ নদীর অপর পারে ট্যাঞ্জিয়ার! তার পর স্পার্টেল অন্তরীপ। স্পার্টেলের পূর্ব্ব দিকে কিউটা এবং মেলিলা। দু'সহরে দু'টি দুর্গ—ভূমধ্যসাগরের গায়ে রিফ-পর্ব্বতের পক্ষপুটাশ্রয়ে অবস্থিত। তার ওপারে জিব্রালটার।

বার্ব্বার দস্যু স্পেনকে মানিয়া লইয়াছে। দস্যুতা ছাড়িয়া স্পেনের আশ্রয়ে তারা এখন চাষ-বাস লইয়া শান্তিতে বাস করিতেছে! স্পানিশরা তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-রীতির কৃষি-কাজ শিখাইয়াছে।

উট দিয়া মাঠ চষা

মরক্কোর সম্বন্ধে অনেকের মনে ধারণা আছে, মরক্কো বুনোর দেশ, অশিক্ষিতের দেশ—সে ধারণা যে ভুল, মরক্কোর বিবরণী পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায়।

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা

যুদ্ধ দূরস্থই হউক আর নিকটস্থই হউক, বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যাই আজ তাহার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আমরা ইতিহাসে ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠ করি, তখন—"লোক আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল; তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল।" তাহার পর দেশে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এ দেশে রেল-পথ বিস্তারে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের সমর্থনে বলা হইয়াছে, রেল-পথ বিস্তারের ফলে আর দুর্ভিক্ষ হইতে পারিবে না। সে কথার আলোচনা না করিয়াও বলা যায়—যদি খাদ্য-শস্য না থাকে, তবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কি আনা সম্ভব হইতে পারে?

এ বার বাঙ্গালায় ধান্যের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাই প্রথমে বিবেচ্য। কারণ, প্রধানতঃ দুই কারণে খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়:—

(১) খাদ্য-শস্যের অভাব।

(২) দেশে অর্থের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় কারণ স্বাভাবিক না হইলেও কৃত্রিম হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যখন গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনও দেখা গিয়াছিল, কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রা বা মুদ্রার পরিবর্তে "নোট" অধিক প্রচলিত হইলে যখন আবার স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার বর্দ্ধিত করা হয়, তখনই গমের মূল্য কমিয়াছিল। এ দেশে যে তাহা হইয়াছে, সে কথা মাদ্রাজের গভর্ণরের পরামর্শদাতা—ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে

চাকরীয়া ইংরেজ মিষ্টার আইন—অসতর্ক অবস্থায়—স্বীকার করিয়াছেন—ব্যবসায়ীদিগের লাভ করিবার চেষ্টা অপেক্ষা পণ্যের স্বল্পতা ও প্রচলিত অর্থের বাহুল্য পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধিতে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে!

খাদ্য-শস্যের স্বল্পতা সম্বন্ধে মতভেদ নাই। বিশেষ চাউল বহু দেশ হইতে পূর্ব্বে আসিত না—এখন বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়াছে। প্রধানতঃ তিনটি দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইত :—

(১) ব্রহ্ম

(২) শ্যাম (নূতন নাম থাইল্যাণ্ড)

(৩) ইন্দো-চীন

ব্রহ্মে বৎসরে প্রায় ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইত। উহার মধ্যে লোকের আহারার্থ ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন ও বীজের জন্য এক লক্ষ ৮৫ হাজার টন বাদ দিলে প্রায় ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টন রপ্তানী করা যাইত। ঐ প্রায় ৩০ লক্ষ টন চাউলের অর্দ্ধাংশ ভারতে আসিত। বাঙ্গালায় বিদেশ হইতে আমদানী চাউলের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ২৭ টন ছিল। উহার অধিকাংশই ব্রহ্ম হইতে আনীত চাউল।

সে যাহাই হউক, যে তিনটি দেশ হইতে চাউল আমদানী হইত ও হইতে পারিত, সেই দেশত্রয় আজ জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত। সুতরাং তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সেই অবস্থায় বাঙ্গালায় চাউলের অভাব অনিবার্য্য এবং পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ও সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। তিন বৎসর হইতে সেই অভাবের জন্য চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছিল। প্রথমে সে বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হইলে বাঙ্গালা সরকার বলেন, ত্রিবিধ কারণে মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে—

(১) বন্যায় কোন কোন জিলায় শস্যহানি

(২) সামরিক প্রয়োজনে জাহাজে স্থানাভাবহেতু ব্রহ্ম হইতে চাউল আনাইবার অসুবিধা

(৩) বর্ষার সময় প্রতি বৎসরই চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায় এবং আশুধান্য সংগৃহীত হইলেই তাহা কমিয়া যায়।

ইহার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই বাঙ্গালা সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয় :—

স্বাভাবিক অবস্থায় চাউল সম্বন্ধে বাঙ্গালা স্বাবলম্বী নহে এবং প্রতি বৎসর সেই জন্য ব্রহ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গালার নানা স্থানে শস্যহানিহেতু এ বার বাজারে মজুদ চাউলের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সেই জন্য —ব্রহ্ম হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন। অথচ বৎসরের প্রথম ৫ মাসে—পূর্ব্ব-বৎসরের এই কয় মাসের তুলনায় ব্রহ্ম হইতে শতকরা ৫০ ভাগ কম চাউল আমদানী হইয়াছে। যুদ্ধজনিত অবস্থায় জাহাজের অসুবিধাই ইহার প্রধান কারণ।

সেই বিবৃতিতেই বলা হয়—ব্রহ্ম হইতে চাউল আনিবার সুব্যবস্থা হইলেও চাউলের মূল্য বাঙ্গালায় হ্রাস পাইবে কি না, সন্দেহ; কারণ, জাপান, ষ্ট্রেটস ও হংকং ব্রহ্মে বহু পরিমাণ চাউল ক্রয় করায় তথায় চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় ব্রহ্মে সিদ্ধ চাউলের মূল্য প্রতি মণ এক টাকা ১৩ আনা বাড়িয়াছে। তাহার সহিত—ষ্টীমার ভাড়া ৪ আনা বৃদ্ধি ও ব্রহ্ম সরকারের মণ-করা ২ আনা এক পয়সা শুল্ক যোগ করিলে—প্রতি মণে ২ টাকা ৩ আনা এক পয়সা মূল্য-বৃদ্ধি হইবে। কাযেই ব্রহ্মের যে চাউল কলিকাতার বাজারে ৩ টাকা ২ আনা হইতে ৩ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রীত হইত, তাহা ৫ টাকা ৮ আনা হইতে ৫ টাকা ১০ আনা দরে বিক্রীত হইবে! ইহা অতিরিক্ত লাভ বলা যায় না।

ইহাতেই বুঝা যায়—বাজারে চাউল মজুদ ছিল না।

চাউল মজুদ রাখাও যে সহজসাধ্য নহে, তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সরকারের হিসাবেই প্রকাশ, এ দেশে বৎসরে প্রায় ৩ কোটি টাকার চাউল নষ্ট হয়। প্রায় ১৫ হাজার টন ধান্য ও এক লক্ষ টন চাউল—চাউলের পোকায় নষ্ট করে। অন্যান্য পোকায়ও চাউল নষ্ট হয় এবং "ধ্বসায়" অর্থাৎ আর্দ্রতা-জনিত বিকৃতিতেও অল্প চাউল নষ্ট হয় না।

সুতরাং সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া যে প্রথমে বাঙ্গালার অর্থ-সচিব ও পরে গভর্ণর বলিয়াছিলেন, চাউলের অভাব হইবে না, তাহা আজ ক্ষুধিত বাঙ্গালীরও বড় দুঃখে হাস্যের উদ্রেক করিতেছে। তাহাতে সরকারী হিসাব কিরূপ ভ্রান্তিজনক হইতে পারে, তাহাই বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

যখন জাপান ব্রহ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল ক্রয় করিতেছিল, তখনই তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া ভারত সরকারের পক্ষে সঙ্গত ছিল এবং যে কোন উপায়ে এ দেশে অধিক চাউল আনিয়া মজুদ রাখা প্রয়োজন ছিল। তখনও জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই এবং বঙ্গোপসাগর তখনও বিপজ্জনক হয় নাই। সুতরাং চেষ্টা করিলে তখন ঐ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারিত।

একান্ত পরিতাপের বিষয়—

(১) সরকার চাউলের অভাবের গুরুত্ব যত দিন সম্ভব স্বীকার করেন নাই এবং

(২) যে সময় বাঙ্গালায় চাউলের একান্ত অভাব, সেই সময়েও বাঙ্গালা হইতে অন্যান্য দেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ না করিয়া তাহা সঙ্কুচিতও করেন নাই। বাস্তবিক সিংহলে ভারত সরকার যে চাউল দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত না হওয়ায় সিংহল সরকারের প্রতিনিধিরূপে সার ব্যারণ জয়তিলক এ দেশে না আসা পর্য্যন্ত এ দেশের লোক তথায় কিরূপ চাউল প্রেরিত হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

যে সময় বাঙ্গালা হইতে বিদেশে চাউল প্রেরিত হইতেছিল, সে সময় বঙ্গোপসাগরে জাপানের যুদ্ধের জাহাজ বিচরণ করায় ও জাপানী বিমানের আক্রমণে যদি কোন কোন চাউলের জাহাজ জলতলগত হইয়া থাকে, তবে তাহাতেও বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ভারত সরকার ও বাঙ্গালা সরকার যাহাই কেন বলুন না—ব্রহ্ম হইতে চাউল আনয়ন বন্ধ হওয়ায় যে ভারতে অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহা বিলাতে ভারত-সচিব যেমন অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তেমনই মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে যাইয়া লর্ড হেলীও গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীকার করিয়াছেন—ভারতে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম হইতে আমদানী বন্ধের জন্য চাউলের অভাবসঞ্জাত। অর্থাৎ যে বিক্ষোভ ভারত সরকার সর্ব্বতোভাবে রাজনীতিক বলিয়া ভারতরক্ষা আইনের

প্রয়োগে সমধিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহার অর্থনৈতিক কারণও উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, ইংরেজীতেই বলা হয়—যে ক্ষুধিত, সে ক্রুদ্ধ হয়। আমাদিগের দেশের কথা—বুভুক্ষিতের পক্ষে কোন্ পাপ করা অসম্ভব ?

সরকারের আর এক কথা—লোক ভয় পাইয়া বা অধিক লাভের লোভে মাল "বাঁধাই" করিতেছে। আমরা পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, সে সকল হইতেই প্রতিপন্ন হয়—"বাঁধাই" করিবার মত অধিক চাউল বাঙ্গালায় নাই। পূর্ব্বে গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত ছিল—বর্ত্তমানে তাহা অপরাধে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু সঞ্চয়ও যে অধিক থাকে না, তাহা অনায়াসে বলা যায়। হোরেস বেল রেলপথের প্রবর্ত্তনকে সে জন্য দায়ী করিয়াছেন। তিনি ভারত সরকারের পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাতে কোন সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলিয়াছিলেন, আর ১০ হাজার মাইল রেল-পথ রচিত হইলেই দেশে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না—খাদ্য-দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য হইতে পারিবে না। সেই ১০ হাজার মাইল রেলপথ রচিত হইয়াছে, কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব হয় নাই। পরন্তু বলা যায়, উৎকৃষ্ট পথ রচিত ও সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় এখন ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যশস্য ভিন্ন দেশসমূহে রপ্তানী হইতেছে এবং বিদেশী ক্রেতৃগণ যেরূপ ধনী, তাহাতে তাহারা অনায়াসে অনেক শস্য পাইতে পারে; আর যে সকল জমিতে পূর্ব্বে কেবল খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইত, সে সকলেও বিদেশের শিল্পোপকরণরূপে তৈলের শস্য, তুলা, পাট প্রভৃতির চাষ হইতেছে। দেশে খাদ্য-শস্যের সঞ্চয় থাকিতেছে না।

এই সকলের সহিত ভারত সরকারের ও বাঙ্গালা সরকারের ব্যস্ত হইয়া—বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কৃত কার্য্যের ফলও দেখিতে হয়।

আমরা প্রথমে বাঙ্গালা সরকারের কাযের উল্লেখ করিব। বাঙ্গালা সরকার তৎকালীন সচিবদিগের সহিত পরামর্শও না করিয়া :—

(১) কতকগুলি অঞ্চল হইতে নৌকা অপসারিত করেন।

(২) সহসা এক জন বিদেশী ব্যবসায়ীকে সরকারের জন্য, বোধ হয়, কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ধান্য ও চাউল কিনিতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

বাঙ্গালার সচিবরা এই সকল কার্য্যের দায়িত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সামরিক কর্ম্মচারীদিগের পরামর্শ লইয়া বাঙ্গালার গভর্ণর—স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীদিগের সহযোগে—সামরিক প্রয়োজন মনে করিয়া—এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কার্য্যে সরকারেরও আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে—এমন কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। সর-কারের আর্থিক ক্ষতির অর্থ—এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র অধিবাসীদিগের ক্ষতি; ক্ষতির টাকা বিদেশ হইতে আসিবে না।

সহসা নৌকাপসারণে ধান্য ও চাউলের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আনয়ন-প্রেরণের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়। এমন কি, কোন কোন অতি-বুদ্ধি রাজকর্ম্মচারী স্থানে স্থানে নৌকা দগ্ধও করেন।

আর সহসা সরকার ধান্য ও চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় এক দিকে যেমন ধান্যের ও চাউলের মূল্য অকারণ বৃদ্ধি পায়, তেমনই লোক ভয় পাইয়া—আর ঐ সকল পাওয়া যাইবে না, মনে করিয়া—"আপনাদিগের জন্য বা লাভের লোভে যথাসম্ভব মাল "বাঁধাই" করিতে থাকে। শেষে "গুপ্ত বাজারের" উদ্ভব হয়।

জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে—সরকার যখন লোকের প্রয়োজনের জন্যই খাদ্য-শস্য ক্রয় করেন, তখন লোক ভয় পাইবে কেন—পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধিই বা হইবে কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—

(১) সরকার দেশের লোকের জন্যই ঐ সকল ক্রয় করিতেছেন না, লোকের সেই সন্দেহ যে ভিত্তিশূন্য নহে, তাহাও পরে—সিংহল প্রভৃতি স্থানে চাউল প্রেরণে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(২) যখন বাজারে চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য থাকে এবং সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অধিক থাকে না, তখন ক্রয়ের সামান্য বৃদ্ধিতেও পণ্যের মূল্য ক্রয়াতিরিক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হয়। কাযেই সরকার যখন—কত ধান্য ও চাউল ক্রয় করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, তখন সরকারের ক্রেতৃরূপে বাজারে আবির্ভাবে ধান্যের ও চাউলের মূল্য অতিরিক্তরূপ বর্দ্ধিত হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তাহার পর ভারত সরকারের কার্য্যের উল্লেখ করিতে হয়। পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

(১) বাঙ্গালা হইতে যে বিদেশে প্রভূত পরিমাণ চাউল প্রেরিত হইয়াছে, সে জন্য কি বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘকে দায়ী করা যায়?

(২) প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যে ধান্য ও চাউল ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার জন্যও বাঙ্গালার সচিবগণ দায়ী নহেন।

তিনি এ সকলের জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—সামরিক প্রয়োজনে অনেক জমি হইতে লোককে অপসারিত করা হইয়াছে—সে সকল জমিতে চাষ হয় নাই এবং বহু সৈন্যের আহার যোগাইতে হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে বাঙ্গালায় ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ২১ টন চাউল আমদানী হইয়া-ছিল। ঐ বৎসর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আনীত চাউলের হিসাব :—

জলপথে নীত—১ হাজার ১০ টন

স্থলপথে নীত—২৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত ১০ মণ। ইহার মধ্যে বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি জিলা হইতে আমদানী ও উড়িষ্যা হইতে আমদানী চাউল এবং পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশ হইতে আমদানী গম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চাউল ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে ধান্য আসিয়াছিল, তাহার হিসাব :—

জলপথে নীত—১৮ হাজার ৬ শত ৩১ টন

স্থলপথে নীত—১১ লক্ষ ১০ হাজার ৭ শত ২২ মণ

ইহা ভিন্ন স্থলপথে (অর্থাৎ প্রধানতঃ রেলে) অন্যান্য প্রদেশ হইতে

৩৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫ শত ২২ মণ গম

৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৪১ মণ ময়দা ও আটা আসিয়াছিল।

বাঙ্গালার দুর্দিনে অন্যান্য প্রদেশ যে তাহাকে সাহায্য করিবার মত উদারতার পরিচয় না দিয়া বিশেষ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কেবল প্রাদেশিক হিসাবে—পাছে আপনার অভাব ঘটে, সেই

আশঙ্কায় নহে—ভারত সরকারই আন্তঃপ্রাদেশিক রপ্তানী বন্ধ করিয়াছিলেন।

অথচ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১২ মাসে ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালা হইতে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। আর গত ফেব্রুয়ারী মাসেই ৭ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের হিসাবে এ বার বাঙ্গালার ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত টন চাউলের প্রয়োজন হইলেও এ বার উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ—৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত টন ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা প্রয়োজন অপেক্ষা ২৩ লক্ষ টন অল্প চাউল পাইব। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কম চাউল পাওয়া যাইবে। চাহিদায় ও সরবরাহে এই প্রভেদ কিরূপে দূর করা যাইবে? অভাব পূরণ করিতে না পারিলে লোকের পক্ষে অনাহার বা অল্পাহার অনিবার্য্য। তাহাতে সরকারের সামরিক প্রচেষ্টাও ক্ষুণ্ণ হইবে।

কারণ, বর্ত্তমান যুগে সকল সভ্য দেশই সর্ব্বাগ্রে দেশের লোককে সন্তুষ্ট, সুস্থ ও সবল রাখা যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া থাকে। সে জন্য দেশের লোকের আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের লোককে সুস্থ ও সবল না রাখিতে পারিলে তাহাদিগের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সমরোপকরণের কলকারখানায় সম্পূর্ণ আশানুরূপ কাযও পাওয়া যায় না। আমরা খাদ্য পরিপাক করিয়া তাহা হইতে শরীরের জন্য শক্তি বা বীর্য্যলাভ করি এবং সেই শক্তি বা বীর্য্য অনুসারেই আমরা কার্য্য করিতে পারি। বয়সভেদে যেমন কার্য্যভেদে তেমনই এই শক্তির পরিমাণের তারতম্য হয়। ইংরেজীতে ইহাকে "ক্যালরী" বলে। কাহার কিরূপ "ক্যালরী" প্রয়োজন, পরীক্ষায় ও গবেষণায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, সাধারণ পুরুষের পক্ষে প্রয়োজন :—

(১) যে কাযে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে—২ হাজার ৪ শত "ক্যালরী"

(২) স্বল্প দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে—৩ হাজার "ক্যালরী"

(৩) অধিক দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে—৩ হাজার ৬ শত "ক্যালরী"।

আমাদিগের দেশ উষ্ণপ্রধান। সেই জন্য আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অল্প শক্তিপ্রদ আহার্য্যের প্রয়োজন হয়।

জাতিসঙ্ঘ যে হিসাব করিয়াছেন, তদনুসারে বিলাতের লোকের প্রত্যেকের গড় ৩ হাজার "ক্যালরী" প্রয়োজন হইলেও বিলাতের সরকার প্রত্যেকে যাহাতে অতিরিক্ত ২ শত "ক্যালরী" লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে এই যুদ্ধকালে বৃটেনের লোক যত সুস্থ, তত তাহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল না এবং তাহারা এখন যেরূপ আহার্য্য লাভ করে, যুদ্ধের পূর্ব্বে সেরূপ পাইত না।

এ দেশে অবস্থা বিপরীত। বর্ত্তমানে এ দেশ কৃষি-প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার কৃষক-সম্প্রদায় যে বৎসরের সকল সময়ে সপরিবারে পূর্ণাহার পায় না, তাহা আমাদিগের ইংরেজ শাসকরাও স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজ ডাক্তার সার ফ্রেডরিক ট্রিভস বলিয়াছেন, দারিদ্র্য সকল দেশেই দুঃখজনক; কিন্তু যখন লোক শবদাহের জন্য কাষ্ঠও সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন তাহার দারিদ্র্য একান্তই দুঃখের কারণ। তিনি ভারতবর্ষে সেই দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর মার্কিণের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ব্রায়েন বলিয়াছেন, এ দেশের লোকের আকার দেখিলেই দুঃখের উদ্রেক হয়। অর্থাৎ তাহারা "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ।" 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' এ দেশে য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র। তাহাতে কোন লেখক লিখিয়াছেন—যুদ্ধে ৭ লক্ষ গ্রামে শতকরা ৯০ জন পরিশ্রম-ক্লান্ত কৃষকের কেবল দুঃখই বর্দ্ধিত হইয়াছে। হয়ত ব্যবসায়ীরা লাভবান হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এ দেশের লোকের শতকরা অর্দ্ধ জন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশিষ্ট—(১) শতকরা আড়াই জন নাগরিক শ্রমিক, (২) শতকরা ২ জন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, (৩) শতকরা ৫ জন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা নির্দ্দিষ্ট বেতনভুক্, তাহাদিগের অবস্থাও শোচনীয়।

বিলাতে শ্রমিকদিগের আয় যুদ্ধ-পূর্ব্ব আয়ের তুলনায় শতকরা ৪৭ টাকা বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় শতকরা ২০ টাকার অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। আর এ দেশে শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিক যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় তদপেক্ষা অনেক গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার কোনরূপ প্রতীকার হয় নাই। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালায় মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কেবল ব্যর্থই হয় নাই, পরন্তু তাহাতে লোকের কষ্টের লাঘব না হইয়া কষ্ট বর্দ্ধিতই হইয়াছে। কাহারা তাহাতে লাভবান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান আমরা প্রয়োজন মনে করি।

কি জন্য "গুপ্ত" বাজার সৃষ্ট হওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহাও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতে গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন যে সকল ব্যবসায়ী অধিক লাভের লোভে বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পণ্য ক্রয় করে এবং যাহারা পণ্য কিনিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ব্যবস্থা হয়। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের এক জন ব্যবসায়ীকে যখন মামলা-সোপর্দ্দ করিয়া দণ্ড দান করা হয়, তখন প্রধান বিচারক লর্ড কেনিওন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জুরারদিগকে বলিয়াছেন—তাঁহারা লোকের বিশেষ উপকার করিলেন। এ দেশে—ভারতরক্ষা আইনের নিয়ম রাজনীতিক কারণে অনেক স্থলে অসঙ্গতরূপে প্রযুক্ত হইলেও তাহা "গুপ্ত" বাজার পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় নাই কেন? সে রহস্য কি ভেদ করা যায় না? "ছাড়" প্রদানে যে সকল অনাচারের অভিযোগ সময় সময় সংবাদপত্রে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সে সকলের প্রতীকার হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে লোক কি মনে করিবে?

যে সময় চাউলের একান্ত অভাব, সেই সময় যদি বণ্টন-ব্যবস্থা অনাচারদুষ্ট হয়, তবে তাহা যে স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই অভাব কিরূপ তীব্র, তাহা সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মাতাব গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেখাইয়াছিলেন। তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনানুসারে প্রতি জিলায় লোক-সংখ্যা ধরিয়া প্রত্যেকের জন্য

১ মণ ধান্য ও প্রতি একর জমিতে এক মণ হিসাবে বীজ-ধান্য হিসাব করিয়া কত ধান্যের প্রয়োজন ও সরকারী হিসাবানুসারে কত ধান্য এ বার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন জনপ্রতি ১ মণের অধিক প্রয়োজন বলিলেও মহারাজাধিরাজ অন্য সরকারী হিসাবানুসারে উহাই প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং মন্তের জন্য যে চাউল ব্যয়িত হয়, (১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেই ঐ জন্য ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১ শত ৭৩ মণ চাউল অর্থাৎ ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১ শত ৫২ মণ ধান্য ব্যবহৃত হইয়াছিল) তাহা হিসাবে না ধরায়—যে সকল লোক ভাত খায় না, তাহাদিগের সংখ্যাও বাদ দেন নাই।

এই হিসাবে তিনি দেখাইয়াছিলেন, এ বার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ধান্যের পরিমাণ প্রয়োজন-তুলনায় এইরূপ অল্প—

বিভাগ	কত মণ ধান্য কম
বর্দ্ধমান	৩ কোটি ১২ লক্ষ ৪১ হাজার ৬ শত ৮১
প্রেসিডেন্সী	৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ১
রাজসাহী	৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৫১
ঢাকা	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৬ হাজার ২ শত ৮১
চট্টগ্রাম	২ কোটি ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৪ শত ৩০
মোট	২৫ কোটি ৫১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৪ [অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ]

অক্টোবর মাসের হিসাবে উহা দেখা যাইলেও ডিসেম্বর মাসের হিসাবে ঘাটতীর পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ হয়। এই বৃদ্ধির কারণ সরকার নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব-হিসাব প্রকাশের পর বন্যায় (বিশেষ পশ্চিম-বঙ্গে) আশু ধান্যের ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। অতিবৃষ্টি, বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে আমন ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে।"

কোন কোন অঞ্চলে যে বাজারে ধান্য বিক্রীত হইতেছে, তাহা কি কারণে উদ্বৃত্তের পরিচায়ক নহে, তাহাও মহারাজাধিরাজ দেখান। তিনি বলেন—যাহাদিগের আহার্য্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান্য থাকে, তাহারা যেমন ধান্য বিক্রয় করে, তেমনই আবার এক শ্রেণীর লোক খাজনা ও দেনা মিটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রয়োজনের ধান্যও বিক্রয় করে এবং পরে আবার মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া ধান্য ক্রয় করিয়া খাদ্যের অভাব মিটায়। সরকারের ধান্য ও চাউল সম্বন্ধে তদন্ত সমিতি স্বীকার করিয়াছেন—বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃষকের আহার্য্যের জন্য প্রয়োজন বা বিক্রয়যোগ্য ধান্য থাকে না। সুতরাং উচ্চ মূল্যের লোভ দেখাইয়া লোককে ধান্য বিক্রয়ে প্ররোচিত করায় উদ্বৃত্ত ধান্যের কথা উঠিতেই পারে না।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব দিয়া মহারাজাধিরাজ বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য এ বার চাউলের অভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে :—

(১) লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি (প্রায় শতকরা ১০ জন)

(২) বাঙ্গালা জলপথে, স্থলপথে ও বিমানে শত্রুর আক্রমণ-লক্ষ্য হওয়ায় এই প্রদেশে রক্ষিত বিরাট সৈন্যবাহিনী

(৩) সামরিক প্রয়োজনে শিল্পে যে সকল অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে

(৪) জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশসমূহ হইতে আগত ব্যক্তিগণ

(৫) আশু ধান্য ব্যতীত ঐ সময়ের অন্যান্য খাদ্য-শস্যের ফলনের অল্পতা

(৬) অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে গম আমদানীর স্বল্পতা-হেতু পূর্ব্বে গম ব্যবহারকারীদিগের চাউল ব্যবহার

(৭) বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলায় কীটের উপদ্রবে শস্যহানি।

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় লোক অনেক ধান্য ও চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া যে কথা প্রচার করা হয়, তাহা অসার ও ভিত্তিহীন।

মহারাজাধিরাজের বিবৃতি প্রকাশের এক মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল পরে কুমার শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন, বিদেশে পণ্য প্রেরণ যত বিপজ্জনকই কেন হউক না—১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দেও ভারতবর্ষ হইতে খাদ্য-দ্রব্য বিদেশে প্রেরণে কোনরূপ শৈথিল্য হয় নাই। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে নভেম্বর এই ৮ মাসে এ দেশ হইতে ৩২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ শত ১৩ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও তামাক রপ্তানী করা হইয়াছে ; আর রপ্তানী-শস্য, দ্বিদল ও ময়দার মূল্য ৫ কোটি ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬ টাকা হইয়াছে।

আমরা বিদেশে পণ্য প্রেরণের অসুবিধার কথা বলিয়াছি। অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা তাহা প্রমাণ করিতে পারি। যে সময় ভারতে গমের অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতেছে এবং ময়দায় বাজরা প্রভৃতি মিশ্রিত করা হইতেছে, সেই সময় অষ্ট্রেলিয়ায় গত ফসলের সাড়ে ৯ কোটি বুশেল (এক বুশেল ৩০ সের ধরা যায়) গম মজুদ রহিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তখনই নূতন ফসল সংগৃহীত হইয়াছে—পুরাতন মাল মজুদ থাকায় নূতন ফসল সংগ্রহ করিয়া রাখার অসুবিধা ঘটিতেছে। বলা বাহুল্য, মাল পাঠাইবার অসুবিধা অত্যন্ত অধিক না হইলে এই গম বিক্রয় করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যেমন লাভবান হইত, ভারতবর্ষের তেমনই খাদ্যদ্রব্যাভাবজনিত দুঃখ প্রশমিত হইতে পারিত। অথচ আমরা দেখিতেছি—বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষ হইতে এই অবস্থায়ও খাদ্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে।

রপ্তানী বন্ধ করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় যে সকল অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের অভাব অধিক, সে সকল স্থানে অবশিষ্ট স্থানসমূহ হইতে ধান্য ও চাউল প্রেরণের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সে জন্য যানের প্রয়োজন। কিন্তু লোক যানের সুবিধায় বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে। নৌকা অপসারণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রেলের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। কারণ, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে (এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে) খাদ্যশস্য বহনের জন্য ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১ শত ২৭খানি মালগাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছিল, আর পরবৎসর ঐ সময়ে

ব্যবহৃত মালগাড়ীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৩ শত ১৬খানি—অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২১খানি কম।

যদি বলা হয়, শস্যের অল্পতাই গাড়ীর সংখ্যা-হ্রাসের কারণ, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—কয়লারও কি স্বল্পতা ঘটিয়াছিল? প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসর শতকরা ১৭ খানি কম মালগাড়ী কয়লা বহনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে কলিকাতার লোক সাড়ে ৪ টাকা মণ দামে জ্বালানী কয়লা কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা অব্যবস্থা ব্যতীত আর কি বলা যায়?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচিবদিগের মতে বাঙ্গালার লোকের জন্য এ বার ৯২ লক্ষ টন অর্থাৎ ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ মণ চাউল প্রয়োজন। কুমার বিমলচন্দ্র এই মতের সমর্থন করেন না। কারণ, বৎসরে প্রত্যেক লোকের জন্য ৩৩ শত ৪৪ পাউণ্ড (পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের) চাউল প্রয়োজন ধরিয়া ঐ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু মহারাজাধিরাজ দেখাইয়াছেন, সরকারী হিসাবেই প্রত্যেকের বৎসরে ৯ মণ ধান্য প্রয়োজন এবং প্রতি একরে বীজ-ধান্যের জন্য এক মণ প্রয়োজন। সচিবদিগের হিসাবে প্রয়োজন অকারণ কম ধরা হইয়াছে। এমন কি, মহারাজাধিরাজও প্রয়োজন কম ধরিয়া হিসাব করিয়াছেন। সূক্ষ্ম হিসাবে দেখা যায়, এ বার বাঙ্গালার চাউলের প্রয়োজন ৩৬ কোটি ৯৫ লক্ষ মণের কম হইতে পারে না। সুতরাং অভাবের পরিমাণ আরও অধিক এবং সেই অভাব পূরণ করিবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই। কেবল—এত দিনে—অন্যান্য প্রদেশ হইতে কিছু চাউল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কুমার বিমলচন্দ্র বলিয়াছেন, যাহাতে শত্রুর হস্তগত হইতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে সরকার কতকগুলি জিলা হইতে উদ্‌বৃত্ত ধান্য ও চাউল সরাইয়া লইয়াছেন। ফলে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে—সামরিক প্রয়োজনে অনেক জমি অধিকৃত হওয়ায় লোককে সরিয়া যাইতে হইয়াছে—অথচ যানের অভাব দূর করা হয় নাই। ফলে স্থানে স্থানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব তীব্র হইয়াছে এবং মূল্য বাড়িয়াছে। যদি কেবল বিদেশে প্রেরণ বা সম্প্রদায়-বিশেষকে প্রদান করিবার জন্যই সরকার খাদ্যশস্যাদি কিনিয়া রাখেন, তবে তাহাতে জনসাধারণের অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। সরকার যেন কোন কোন দেশের ও কোন কোন অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের কামদার হইয়া কায করিতেছেন! তাঁহারা যে মূল্যে মাল কিনিয়া যে মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে লাভ করিতেছেন, ইহাও বিস্ময়ের বিষয়।

বহু কারণসমন্বয়ে এ বার বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্যের সমস্যা জটিল ও লোকের পক্ষে ভয়াবহ হইয়াছে। লোকের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যদি সেই সমস্যার সমাধান করা না হয় এবং সে কায অবিলম্বে না করা হয়, তবে বাঙ্গালার অবস্থা কি হইবে, তাহা মনে করিতেও আতঙ্ক হয়।

প্রবন্ধের আরম্ভে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' বাঙ্গালার তৎকালীন জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংসকারী "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছি। তখন বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসনের চিতাধূম আকাশ মলিন করিতেছে এবং ইংরেজ দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে আপনার শাসনের ভিত্তি রচিত করিতেছে। সেই সময়ে ইংরেজ যুবক জন শোর চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি পরে প্রতিভাবলে উচ্চপদ লাভ করিয়া লর্ড টেনমাউথ হয়েন। তিনি ঐ সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একটি কবিতায় তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি—

"এখন(ও) মানস-নেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ—
নয়ন কোটরগত, শীর্ণ দেহ, শবের বরণ।
শুনি—মাতৃ-আর্ত্তনাদ, শিশু-কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন,
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন।
মৃত ও মরণাহত এক সাথে গড়াগড়ি যায়;
শিবার অশিব রবে শকুনির চীৎকার মিশায়;
কুক্কুর ডাকিয়া ফিরে—দিবাভাগে খর রবিকরে
স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করে মৃত ও মুমূর্ষু স্তরে স্তরে।
সে দৃশ্য লেখনী-মুখে বর্ণনায় ব্যক্ত নাহি হয়,
কালে তাহা স্মৃতি হ'তে কোন দিন মুছিবার নয়।"

সেই দুর্ভিক্ষ শোরের মনে এমন প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথা শুনিলে চাঞ্চল্য বোধ করিতে পারিতেন না। তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশবাসীকে এ দেশে বহু বার দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সে সকল সংগ্রামে যে সময় সময় ইংরেজ শাসকদিগের ভ্রান্তি ও ত্রুটি হয় নাই (১৮৭৭ খৃঃ মাদ্রাজে লোকক্ষয়—৫২ লক্ষ ৫০ হাজার) এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াছেন, তাহা বিহারের দুর্ভিক্ষে (১৮৭৪ খৃঃ) গভর্ণর-জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের নির্দ্দেশে সপ্রকাশ—অনাহারে যেন একটি লোকও মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।

আমাদিগের আশা ও বিশ্বাস, বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সরকার সেই উদ্দেশ্যেই কায করিবেন এবং বাঙ্গালার লোক যাহাতে আহার্য্যের অভাবে মৃত বা জীবন্মৃত না হয়, অচিরে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

কলিকাতায় অল্প পরিমাণ চাউলের জন্য লোক কি ভাবে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন—ভদ্র পরিবারের মহিলারাও নিরুপায় হইয়া সে দলী বৃদ্ধি করেন, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাতে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা অসাধারণ। আর কলিকাতার অবস্থা হইতে মফঃস্বলের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ অবস্থা কোনরূপেই দীর্ঘকাল চলিতে পারে না এবং চলিলে তাহার ফল অতি শোচনীয় হয়। এ কথা যে সরকার বুঝেন না, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, চাহিদা ও সরবরাহ হিসাব করিয়া—সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। অন্য পথ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

৬

দু' মাস পরের কথা।

সন্ধ্যার পর কারখানা হইতে ফিরিয়া দিলু ডাকিল,—মা!

সুভাষিণী ছিল রান্না-ঘরে। রান্না-ঘর হইতেই সাড়া দিল,—কেন রে?

দিলু বলিল—পিশিমার চিঠি এসেছে।

—গৌরী পিশিমা?

—হ্যাঁ।

—সব ভালো আছেন?

—আছেন। কৌমুদীর বিয়ে। তোমার চিঠি···

সুভাষিণী বাহিরে আসিল। মার হাতে দিলু চিঠি দিল, বলিল—খামখানা আমি ছিঁড়েছিলুম। কলকাতার পোষ্ট-অফিসের ছাপ···কে লিখেছে, দেখতে।

সুভাষিণী চিঠি পড়িল। গৌরী ঠাকুরাণী লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়াসু

ভাই সুভা, কাশীতে ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়াছি। কৌমুদীর বিবাহের সব ঠিক। এ মাসের ২৭ তারিখে বিবাহ। দশ দিন বাকী। সুপ্রসন্ন রাঁচি গিয়াছে—সরকারী কাজে। ফিরিবার সময় বাসন্তী হইয়া আসিবে—সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। তোমাদের ওখানেও যাইবে। আমার এবং কৌমুদীর একান্ত ইচ্ছা, তোমরা ক'জনে এ বিবাহে আসিবে। সুপ্রসন্নকে বলিয়া দিয়াছি, সে তোমাদের লইয়া আসিবে। কোনো মতে যেন অন্যথা না হয়।

পাত্রটি ভালো। মেডিকেল কলেজ হইতে মেডেল লইয়া পাশ করিয়াছে। মেডিকেল কলেজেই ভালো চাকরি পাইয়াছে। কলিকাতায় বাড়ী। ছেলের বাপ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পশারও বেশ ছিল।

আশা করি, তোমরা ভালো আছো।

তোমাদের আশায় পথ চাহিয়া থাকিব জানিবে। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে।

কৌমুদীর দিদিমার ইচ্ছা, তিনি এ বিবাহ দেখিবেন। বাতে তিনি পঙ্গু, নড়িবার ক্ষমতা নাই; কাজেই বাসন্তীতে তো তিনি যাইতে পারিবেন না। সেই কারণে কলিকাতায় তাঁর বাড়ী হইতেই বিবাহ হইবে।

শুভার্থিনী
গৌরী দেবী

চিঠি পড়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতীত দিনের শত স্মৃতি মনের উপরে ভাসিয়া উঠিল! সেই গৌরী ঠাকুরাণী···সেই কৌমুদী!

তাদের পাইয়া সে দিন মনে হইয়াছিল, দুর্দিন বুঝি ঘুচিল, নহিলে অজানা বিদেশে আসিবামাত্র এত স্নেহ, এত মমতার স্পর্শ এমন অযাচিত ভাবে মিলিবে কেন! কিন্তু···

যাঁকে লইয়া জীবনের নূতন অধ্যায় ভালো করিয়া গড়িয়া তুলিবে ভাবিয়াছিল, সেই স্বামী···আজ কোথায় তিনি! সামনে আঁধারের পারাবার···কোথাও কূল দেখা যায় না!

দিলু বলিল—যাবে?

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—যাওয়া উচিত। যেতে মন চায়, বাবা!

দিলু বলিল—তবে?

সুভাষিণী বলিল—এ মুখ নিয়ে শুভ-কাজে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে, দিলু!···তোমরা যেয়ো···দু'ভাইয়ে। সুপ্রসন্ন বাবু নিজে আসছেন···তোমার পিশিমা এমন আগ্রহ করে চিঠি লিখেছেন। না গেলে মনে ব্যথা পাবেন!

তিন দিন পরে সুপ্রসন্ন আসিলেন। বাসন্তীর এ-পল্লীতে রীতি-মত কলরব বাধিয়া গেল। এ বিবাহে সুপ্রসন্ন সকলকে কলিকাতায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। যাতায়াতের খরচ তিনি দিবেন! পরের পয়সায় সহর কলিকাতা-ভ্রমণ! বিবাহের আমোদ···তার উপর সুপ্রসন্ন বলিলেন, বাড়ীতে নাচ-গান-থিয়েটার হইবে! কৌমুদীর দিদিমার সখ! মা-মরা মেয়ে···আহা!

দিলুকে সুপ্রসন্ন বলিলেন,—জানকী বাবু তোমার ছুটী মঞ্জুর করেছেন। মাকে বলো, যেতে হবে। দিদি আমাকে অনেক করে বলে দেছেন, তোমাদের আমি নিয়ে যাবো।

দিলু বলিল—মার যাওয়ায় অসুবিধা আছে।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—কিসের অসুবিধা! না, না···মার যাওয়া চাই।

অগত্যা তখন সুভাষিণীকে সবিনয়ে জানাইতে হইল, তার যাইবার উপায় নাই! এ দুর্ভাগ্যের পর লোকালয়ে বাহির হইতে সে যেন মরমে মরিয়া যায়! দয়া করিয়া সুপ্রসন্ন যেন তাকে ক্ষমা করেন! এখানে থাকিয়া সুভাষিণী ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে, মেয়ে-জামাই দীর্ঘজীবী হোক···সকল সৌভাগ্য-সম্পদে তাদের জীবন ভূষিত হোক!

সুভাষিণীর মিনতিতে সুপ্রসন্নকে থামিতে হইল। সুপ্রসন্ন বলিলেন—ছেলেরা যাবে কিন্তু।

সুভাষিণী কহিলেন—ওরা যাবে বৈ কি! তবে এত আগে থেকে কাজ-কামাই করে যাওয়া···

সুপ্রসন্ন বলিলেন—বিয়ের আগের দিন গায়ে-হলুদ। সে দিন বাড়ীতে থিয়েটার হবে। গায়ে-হলুদের দিন সকালে গিয়ে ছেলেদের পৌছুনো চাই। গাড়ী-ভাড়ার টাকা-কড়ি আমি রেখে যাচ্ছি। এতে 'না' বলবেন না!···

সুভাষিণী কোন জবাব দিল না।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—আর একটি মিনতি আছে···

সুভাষিণী বলিল—বলুন···

সুপ্রসন্ন বলিলেন—দয়া করে কোনো রকম যৌতুক দেবেন না। জানি তো আজকালকার দিনে মানুষের অবস্থা! এমন হয়েছে যে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীতে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে শুনলে ভয়ে যেন

কাটা হয়ে যেতে হয়! মান-ইজ্জৎ থাকবে, এমন কিছু দিতে হলে যার নাম বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ! মানুষের চারি দিকে আজ কতখানি অভাব!···চিঠিতে সকলকে তাই মিনতি জানানো হচ্ছে, দয়া করে কেউ যেন লৌকিকতা না দেন···শুধু আশীর্বাদ জানাবেন, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হবো। আপনি দয়া করে কিছু দেবেন না যেন!

সুভাষিণীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। হায় রে, কৌমুদীর বিবাহ···কৌমুদী তাকে কতখানি ভালোবাসে, কতখানি মানে! তাদের ভুলিয়া যায় নাই! মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়া খোঁজ-খপর লয়! চিঠিতে কতখানি মায়া-মমতা ফুটিয়া ওঠে! সে কৌমুদীকে এমন দিনে কিছু দিবে না?

কিন্তু দিবার মতো সঙ্গতিই বা কোথায়? দারিদ্র্যের দুঃখ এই সময়েই সব-চেয়ে বড় হইয়া বাজে! মন যখন প্রিয়জনকে কিছু দিবার জন্য অধীর আকুল হয়, অথচ যা দিতে চাই, দিবার সামর্থ্য নাই!···নহিলে দারিদ্র্যে কি-বা এমন বেদনা? সমাজে উঁচু আসন নাই, তাহাতে কি আসিয়া যায়!

সুভাষিণী কোনো জবাব দিল না।

সুপ্রসন্ন কহিলেন—এ কথা রাখতেই হবে। দিদিও বিশেষ করে বলে দেছেন···কৌমুদীও তাই বলেছে···আমারো মিনতি!

সন্ধ্যার সময় অন্নদার স্ত্রী মহামায়া আসিয়া উপস্থিত। ডাকিল,—নীলুর মা···

কণ্ঠ শুনিয়া সুভাষিণী বাহিরের উঠানে আসিল। কহিল—মহামায়া দিদি!

চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া কণ্ঠ মৃদু করিয়া মহামায়া বলিল,—ছেলেরা কোথায়?

সুভাষিণী বলিল—দিলু জানকী বাবুর বাড়ী। নীলু ঘরে বসে পড়ছে।

মহামায়া বলিল—বড্ড বিপদে পড়েছি, ভাই···

বিপদ! সুভাষিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মহামায়ার পানে!

মহামায়ার বিপদ···সে বিপদে মহামায়া আসিয়াছে সুভাষিণীর কাছে! আশ্চর্য্য! মহামায়া বলিল—সুপ্রসন্ন বাবুর মেয়ের বিয়ে! কাল আমরা যাচ্ছি···

সুভাষিণী বলিল—বিয়ের এত আগে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। মেয়ে সরোর বায়না। কৌমুদীর সঙ্গে এক দিন খুব ভাব ছিল তো···সই পাতিয়েছিল তার সঙ্গে!

মহামায়া চুপ করিল। আসল বক্তব্য বলিবে, তার জন্য যেন নিজেকে তৈয়ারী করিয়া লইতেছে!

সুভাষিণী বলিল—ও···সুপ্রসন্ন বাবু চলে গেছেন? না, তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছো?

মহামায়া বলিল,—সুপ্রসন্ন বাবু আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাচ্ছেন। আমরা কাল দিনের বেলায় যাবো।

—অন্নদা বাবুও যাচ্ছেন?

—না। ওঁর কি এত আগে থেকে যাওয়া চলে! আপিস রয়েছে। উনি যাবেন বিয়ের দিন। কাল জগৎ বাবুর বাড়ীর সকলে যাচ্ছে···সেই সঙ্গে আমরাও যাবো। ওদের সঙ্গে পুরুষ-মানুষ থাকবে···আমাদের সুবিধা হবে'খন!···সরো সব খপর নিয়ে এসেছে···যাবার জন্য সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে!

সুভাষিণী কহিল,—তা বন্ধুর বিয়ে···আমোদ-আহ্লাদ করবে বৈ কি!

মহামায়া বলিল,—সব বুঝি ভাই, কিন্তু আমার হয়েছে মুস্কিল; সে মুস্কিলে যদি আসান্ করো, তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি ছাড়া এ দায়ের কথা আর-কাকেও বলতে মাথা কাটা যায়, নীলুর মা!

সুভাষিণী কোনো জবাব দিল না···মহামায়ার পানে শুধু চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে চিন্তার দোলা। সে আবার মানুষ···তার কাছে আসিয়াছে সরস্বতীর মা বিপদে রক্ষা পাইবার উপায় সংগ্রহ করিতে!

মহামায়া আর এক বার চারি দিকে চাহিল···বেশ সতর্ক দৃষ্টি! এবং কণ্ঠ যথাসম্ভব মৃদু করিয়া বলিল—গহনা-গাঁটি কিছু নেই। মেয়ের ছিল একছড়া সোনার নেকলেশ আর আটগাছা চুড়ি—সেগুলি সে বারে সেই যে বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারলুম না তো! কি করে পারবো? সংসারের জন্য যে-টাকা ধরে দেন, তাই থেকে ঐ ভাটিয়া শাড়ীওলাকে দিতে হয় মাসে-মাসে,—তা কম টাকা নয় ভাই, দশটা করে টাকা! উনি জানেন না। পুরুষ-মানুষের স্বভাব, বলে, টাকা এনে দিচ্ছি, খাও-দাও থাকো, ব্যস্! কিন্তু তা কখনো হয়? বিশেষ পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়···পাঁচ বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন আছে···সিনেমায় যাওয়া আছে···ভালো শাড়ী-ব্লাউশ নহিলে মান থাকবে কেন আজ-কালকার দিনে? তা তো উনি বুঝবেন না! না বুঝুন, আমাদের তো মান-সম্ভ্রম রেখে চলতে হবে···ওঁদের মান-সম্ভ্রম! কাজেই···

সুদীর্ঘ বিস্তারে মহামায়া যে-বিবরণ দিল, সে যেন এক পর্ব্ব মহাভারত! একান্ত মনোযোগে সুভাষিণী শুনিল। সে কাহিনীর মধ্যে মিলিল মহামায়ার পিতৃগৃহে সুরুচি ও শিক্ষার পরিচয়; এবং সে আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্য মহামায়া 'শূকর-পেটে' দু'টি গিলিয়াই কোনো মতে প্রাণধারণ করিতে অসমর্থ—তার উপর মেয়েটা পাইয়াছে মায়ের টেষ্ট···অগত্যা ইত্যাদি।

কর্ত্তা অন্নদাচরণ যে এ-সব বোঝেন না, তা নয়,—বোঝেন! তবু পুরুষমানুষ কিনা, বলেন, সকলের সঙ্গে মিশিতে চাও, মেশো···গান-বাজনা-পার্টি করিতে হয়, করো···কিন্তু পয়সা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার! রাগে মহামায়ার গা জ্বলিয়া যায়। তা'ও না কি হয়? এ-সবে কঞ্জুষপণা করিলে কখনো চলে! যে কালে যেমন দস্তুর হইয়াছে···অগত্যা এ সবের ব্যয় সঙ্কলান করিতে নিজের বালা-তাগা, মেয়ের চুড়ি ও নেকলেশ বাঁধা পড়িয়াছে! প্রতি মাসের শেষে ভাবেন, সামনের মাস হইতে একটু চাপিয়া-চুপিয়া খরচ করিয়া দু'পয়সা জমাইবেন, কিন্তু হইবার জো নাই ঐ হতভাগা ভাটিয়া শাড়ীওলার জন্য! এমন ভালো ভালো শাড়ী আনিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দেয়! আর কি বা সে সব শাড়ীর দাম···

কাহিনী-জালের মধ্যে বিজড়িত হইয়া সুভাষিণীর মন আবদ্ধ রহিল। এমন জটিল বন্ধন যে তার মধ্য হইতে, সে কোনো-কিছুর হদিশ পাইল না!

প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া মহাভারতের কাহিনী বলিয়া মহামায়া অসঙ্কোচে উপসংহারে জানাইল, ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানে সুভাষিণীর

গহনা গায়ে দেওয়ার সব আশা যখন নির্ম্মূল হইয়াছে, তখন ক'দিনের জন্য বিবাহ-বাড়ীতে মান রক্ষা করিতে সুভাষিণী যদি তার গহনাগুলি ব্যবহার করিতে দেয়···বাসন্তীতে ফিরিয়া সুভাষিণীর গহনা সুভাষিণীর হাতে আগে ফিরাইয়া দিয়া তবে মহামায়া গিয়া নিজের বাড়ীতে পদার্পণ করিবে···এত-বড় আশ্বাসও মহামায়া দিতে ভুলিল না !···

কথা শুনিয়া সুভাষিণী ক্ষণেকের জন্য কাঠ হইয়া রহিল। তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার কি-বা আছে দিদি! ওঁর এত দিনের চিকিৎসায় সামান্য যা-কিছু ছিল···সব গেছে! থাকবার মধ্যে সেকেলে দু'টো মাকড়ি, মাথার কাঁটা, আর হাতের সোনা-বাঁধানো নোয়াগাছা।···

মহামায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সারা বৈকাল ধরিয়া মায়েতে-মেয়েতে জল্পনা করিয়াছে···গহনা কি করিয়া মিলিবে? এখানে কাহারো কাছে এ গহনা-ধারের কথা প্রকাশ পাইবে না··· অথচ কলিকাতার ধনী-গৃহে মর্য্যাদা রক্ষা হয়! ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুভাষিণীর কথাই দু'জনের মনে হইয়াছে। বিধবা মানুষ··· গহনায় তার কি কাজ···বাক্সে পড়িয়া আছে বৈ ত নয়···তা ছাড়া, নীলুর মা কাহারো সাতে নাই, পাঁচে নাই···কথাটা প্রকাশ পাইবে না!

তাই মনে আশার পাহাড় লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া মহামায়া আসিয়াছে সুভাষিণীর কাছে···

এখন সুভাষিণীর কথা শুনিয়া নৈরাশ্যের বেদনার চেয়ে রাগ হইল অনেক বেশী! রাগ নিজের উপর! এ-কথা জানা থাকিলে নিজের অভাব-দৈন্যের কথা এমন ভাবে দুম্ করিয়া বলিবার জন্য পা বাড়াইত না তো!···

এ কথা বলিবার পর সুভাষিণীর সামনে এখন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কি!

কিন্তু হাতের তীর ছুটিয়া গিয়াছে, সে-তীরকে আর ফেরানো চলে না!···উপায়?

অবস্থার চেয়ে উঁচু আসনে যে-লোক নিজের জীবনকে তুলিয়া ধরিতে চায়, সে-আসনকে উঁচু রাখিবার জন্য তার বুদ্ধিতে বিধাতা শাণ দিয়া সে বুদ্ধিকে একটু বেশী ধারালো করিয়া দেন!··· মহামায়ার বুদ্ধিতে সে-ধার ছিল···তাই মহামায়া তখনি বলিল,—ও মা, তাই না কি! তাহলে দেখি, ওঁকে ধরে সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে গহনাগুলো ছাড়িয়ে আনাবার ব্যবস্থা করি। নেমন্তন্ন যখন যেতেই হবে, কুলি-হাতে দিয়ে মেয়েটা তো সেখানে গিয়ে এক-বাড়ী লোকের সামনে দাঁড়াতে পারে না!···

এ-কথা বলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া মহামায়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইল।

৭

ভাটিয়া-শাড়ীর ব্যাপার ঐ রাত্রেই শেষ হইল না—সে-জের আবার দেখা দিল অন্যত্র পরের দিন সকালে।

বেলা তখন আটটা। পাশে গঙ্গাপদর বাড়ী। সে-বাড়ীতে হঠাৎ কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল।

দিলু স্নান করিয়া ভাত খাইতে বসিয়াছে, ও-বাড়ীতে গঙ্গাপদর কণ্ঠে রুদ্র চীৎকার জাগিল; এবং সে চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম্ করিয়া জিনিষপত্র-ফেলার শব্দ শুনিয়া দিলু চমকিয়া একেবারে কাঠ! সুভাষিণীও নিস্পন্দ নিশ্চল···

পাশের বাড়ী হইতে গঙ্গাপদর ভীম-ভৈরব গর্জ্জন মুহূর্ত্তে যেন বাতাসে ঘূর্ণীচক্র রচনা করিয়া তুলিল!

গঙ্গাপদ বলিল—দু'-দু'মাস মুদিকে তার হিসাবের টাকা দাওনি! আজ সকালে সে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল!··· কোথায় গেল তার টাকা, শুনি? মাইনে পেয়েই গুণে মুদির টাকা আলাদা কাগজের বাণ্ডিলে জড়িয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি···কিসে সে টাকা খরচ করলে, বলো?

এ গর্জ্জনের উত্তরে অপর-পক্ষ কি জবাব দিল, শুনা গেল না। উত্তরে গঙ্গাপদ কিন্তু আবার কামান দাগিল! গঙ্গাপদ বলিল,—বাপের বাড়ীতে টাকা পাঠিয়েছো, কি, কার বাড়ীতে পাঠিয়েছো, সে-হিসাব আমি চাইছি না। তবে আমার সঙ্গে কথা, ও-টাকা যেখান থেকে পারো, যেমন করে পারো, জোগাড় করে মুদির পাওনা মেটাবে। দু'-দু'বার করে মুদির দেনা আমি দিতে পারবো না। এতে তোমাদের সংসার চলুক, বা বন্ধ হোক!

দিলু চাহিল সুভাষিণীর পানে···সুভাষিণী বলিল—ঐ যে ভাটিয়া-শাড়ীওলা এসে ঘর-ঘর শাড়ী দিয়ে যাচ্ছে—তাই। গঙ্গাপদ বাবুর স্ত্রী সে-দিন বলছিল শাড়ীওলার কথা। বলছিল, যে-সব শাড়ী পরবার স্বপ্নও দেখিনি ভাই, সে-সব শাড়ী এমন সুবিধা-দরে দিচ্ছে, নেবো না? মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন, সখ-সাধ তখন তো একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারি না!

দিলু বুঝিল, বলিল—এরা ব্যবসার তুক জানে মা···এই ভাটিয়ারা। তবে গরীব গৃহস্থর পক্ষে কিস্তীবন্দীতে বাঁধা পড়া···ভয়ের কথা!

সুভাষিণী বলিল—উনি বলতেন, পুরো দাম দিয়ে জিনিষ কিনতে পারি, কিনবো। ধারে কিম্বা ঐ শস্তা কিস্তীর হারে কোনো-কিছু কিনতে নেই!···বলতেন, ধারে হাতী কিনতে-কিনতে আমাদের দেশের বনেদী বড়মানুষরা সে-হাতীর পায়ের চাপে পিষে মরে গেল··· আমাদের মতো গরীবের ঘরে ও-চাল সর্ব্বনেশে!

দিলু এ কথার জবাব দিল না। কারখানায় ঢুকিয়া বহির্জগতের যেটুকু সে দেখিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, বড়লোকের সখ আর সামগ্রীর নকল করিতে গিয়া গরীব-দুঃখীর দুঃখ-কষ্ট দিনে-দিনে কতখানি আরো বাড়িয়াছে উঠিতেছে!

নিঃশব্দে আহারাদি সারিয়া কাজে সে বাহির হইয়া গেল। গঙ্গাপদর গৃহে যুদ্ধের তীব্রতা তখন কমিয়া আসিয়াছে, একেবারে থামে নাই!···

কারখানায় ঢুকিতে দিলু সামনে দেখে, পিনাকী···সাহেবী-সাজে! দিলুর পানে পিনাকী ফিরিয়াও চাহিল না। ফ্যাক্টরির ফোরম্যানের সঙ্গে পিনাকী কথা কহিতেছিল। বিনয়ে জড়োসড়ো ফোরম্যানের মূর্ত্তি! আর পিনাকী···ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, সে যেন প্রবীণ ফোরম্যানের আদেশ-ও-অন্নদাতা মনিব!

পিনাকীর শুভাগমনের কারণ সে শুনিল বয়লার-রুমে দাশুর মুখে। কথাটা দাশু তার সঙ্গী কার্ত্তিককে বলিতেছিল···

বলিতেছিল, বড় ছেলেকে চাটুয্যে সাহেব আজ হইতে সিণ্ডিকেটে ঢুকাইয়া দিলেন। তিনি ম্যানেজার, তাঁর নীচেই পিনাকী সাহেবের

আসল। সিণ্ডিকেটের কাজ-কর্ম দেখার, কাজ শিখিতে হইবে তো? এক দিন উনিই হইবেন এ সিণ্ডিকেটের দণ্ড-মুণ্ডধর।

কার্ত্তিক বলিল—কেন? বাবুর ছেলে মণিময় বাবু?

দাশু বলিল—ছেলের রোগা শরীর! মাথা তেমন পরিষ্কার নয় তো! তাঁর উপরে বাবু তেমন ভরসা রাখেন না! শুনেছি, বাবুর মেয়ে···যেই মেয়ের সঙ্গে না কি ঐ পিনাকী সাহেবের বিয়ে হবে!

বাধা দিয়া কার্ত্তিক বলিল—বলিস্ কি! ঐ ষাঁড় ছেলে। য্যাঃ! কি ওর বিদ্যা-বুদ্ধি, শুনি!

দাশু বলিল—ম্যানেজারীর কাজে কি এমন বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হবে, শুনি? বাবু সব গড়ে-পিটে মজুত মাল ধরে দিচ্ছেন। এঁর দাবীর মধ্যে উনি বড় লোকের ছেলে···তার উপরে হবেন মালিকের জামাই! বলে, কাজ যখন চলে, তখন একটা কাঠের পুতুল খাড়া রাখলেও আপ সে সে চলে যায়!

কার্ত্তিক বলিল—এই জন্যই বাঙালীর কারবার দু'পুরুষ ধরে বাঁচে না। জামাই-সম্বন্ধী-ভাগনেরা মিলে বারবার নিয়ে দক্ষযজ্ঞ করে' সব ভেস্তে যায়।

দাশু বলিল,—পোষাকের বাহার দেখেছিস্! মাসে যেন দু'-তিন হাজার টাকা কামায়। মালিক যিনি, তাঁকে কখনো ধুতি ছেড়ে কোট-পেন্টুলেন পরতে দেখলুম না! আর উনি বাপের পয়সায় বখামি করে বেড়ান, সেজে এসেছেন যেন বিলিতী বড়-সাহেব!

হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল—আসল বড় সাহেবরা সাজে না রে দাশু! কলকাতার সাহেবী ফ্যাক্টরিতে আমি কাজ শিখেছি—দেখেছি, জানি। সাজে তারা, যাদের কাজের মুরোদ নেই।

এ সব কথা দিলু শুনিতে চায় না। এ সব কথা তার ভালো লাগে না! এ সব কথায় রুচি নাই। তবু উপায় ছিল না···

দিলু ভাবিতেছিল, শুনিতে খারাপ হইলেও কথাগুলো সত্য! মনে পড়িল বাড়ীর পাশে গঙ্গাপদ বাবুর ওখানে সকালেই শুনিয়া আসিয়াছে শাড়ী লইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গাপদ বাবুর সেই বিবাদ কলহ!

এ সব কথাবার্ত্তায় তার মানস-চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল এক নূতন পৃথিবী। এ পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় নাই। নিজের গৃহে শান্তি ও প্রীতির আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্য এ-পৃথিবীর কল্পনাও সে কোনো দিন করে নাই!

দাশু আর কার্ত্তিকের এ-আলোচনা বিস্তারিত হইয়া হয়তো আরো কত অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটিত করিত···কিন্তু আলোচনা বন্ধ হইল, দাশুর ডাক আসিল এঞ্জিনীয়ার ডিপার্টমেন্টে।

কার্ত্তিক একা···কাহার কাছে বিদ্রোহী মনের ঝাঁজ ফুটাইবে? তবু দিলুর পানে চাহিয়া শেষ টিপ্পনী কাটিল,—নতুন ম্যানেজার-সাহেবকে দেখেছেন দিলু বাবু?

কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা···বুঝিলেও দিলু বলিল—ম্যানেজার-সাহেব?

হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল—ম্যানেজার চাটুয্যে সাহেবের ছেলে! বিলেত না গেলেও বিলেত-ফেরতের ছেলে সাহেব হবে না তো কি বাঙালী হবে? হুঁঃ···

দিলু কথার জবাব দিল না···কাজ করিতে লাগিল।

বৈকালে কারখানায় ছুটির পর কাটায় কাটায় দিলু আসিল জানকী বাবুর গৃহে···মণিময়ের কাছে।

গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী দাঁড়াইয়াছে।

দিলুকে দেখিয়া মণিময় বলিল—আজ পড়া নয়, মাষ্টার-মশাই, বেড়াতে বেরুবো। বাবা সঙ্গে যাবেন।

দিলু বলিল—আমি তাহলে আসি!

মণিময় বলিল—না, না, আপনিও সঙ্গে যাবেন। বাবা বলেছেন, তোমার মাষ্টার-মশাই এলে একসঙ্গে সকলে বেরুবো।

দিলু অবাক্! কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই মণিময় বলিল—আপনি বসুন, জলটল খান্, বাবাকে আমি বলে আসি, আপনি এসেছেন।

বিমূঢ়ের মতো দিলু আসিয়া ঘরে বসিল। জোগু আসিল চায়ের পেয়ালা, লুচি-তরকারী-মিষ্টান্ন জল-খাবার লইয়া। যে দিন হইতে মণিময়ের পড়াশুনা দেখা সুরু, সে দিন হইতেই এ বাড়ীতে দিলুর জল-খাবারের ব্যবস্থা কায়েমি হইয়া আছে।

মুখ-হাত ধুইয়া দিলু জল-খাবার খাইল এবং তার খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানকী বাবু আসিলেন। তাঁর পিছনে মণিময় এবং মণিময়ের পিছনে পিনাকী। পিনাকীর সেই সাহেবী বেশ!··

দিলুর পানে চাহিয়া জানকী বাবু বলিলেন—আজ মণির ছুটি··· বুঝলে দিলীপ। আমার একটু কেনা-কাটা আছে। সুপ্রসন্ন বাবুর মেয়ের বিয়ে। তাকে মণিময় কিছু উপহার দিতে চায়। কি উপহার দেবে, ও ঠিক করতে পারছে না···বলছিল, মাষ্টার-মশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে' বলবো। আমি বলেছি, বেশ—তোমার মাষ্টার-মশাই যা বলবেন, তুমি তাই দিয়ো!···তা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে?

এত বড় সম্মান! দিলুর পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিয়া উঠিল। গৌরবের লজ্জায় দিলুর মুখ রাঙা হইল···দিলু বলিল—আজ্ঞে, না।

মণিময় বলিল—কথা বলবার এখনো সময় পাইনি বাবা। মাষ্টার-মশাই যেমন এলেন, অমনি আমি তোমাকে খপর দিতে গেলুম।

জানকী বাবু বলিলেন,—ও···আচ্ছা। বেরুবার আগে তাহলে ঠিক হয়ে যাক, কি জিনিষ দেওয়া হবে। পিনাকী···তুমি আছো, তুমি বলো···কি দেওয়া যায়? মানে, মণিময়ের তরফ থেকে···সুপ্রসন্ন বাবুর মেয়েকে?

দিলুকে এতখানি খাতির পিনাকীর ভালো লাগে নাই···কিন্তু না লাগিলেও নিরুপায়। এখানে নিজের মান লইয়া অবজ্ঞায় সাজে না···অভিমানও না!

জানকী বাবুর কথায় সে বলিল—বেশ ভালো কোনো রকম লেটেষ্ট ষ্টাইলের শাড়ী···না হয় নতুন ফ্যাশনের রিষ্ট-ওয়াচ?

জানকী বাবু চাহিলেন মণিময়ের দিকে···বলিলেন,—তোমার পছন্দ হয় মণি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মণিময় বলিল—না।

জানকী বাবু চাহিলেন দিলুর পানে···কহিলেন—তুমি কি বলো দিলীপ?

যেন অগ্নি-পরীক্ষা। দিলু বলিল,—আজ্ঞে···আমি তো কিছুই জানি না···বড় মানুষের ঘরের কায়দা-কানুন···

জানকী বাবু বলিলেন—বড় লোক গরীব লোক নিয়ে কথা নয়, দিলীপ। মণিময়···এখন ওর এমন সামর্থ্য হতে পারে না যে, গহনা-গাঁটি কিনে দেবে! দিলে সেটা হবে বাপের পয়সায় অহঙ্কারের দান! তাছাড়া শাড়ী, রিষ্ট-ওয়াচ—ওর বয়সের বন্ধুরা যদি এ সব উপহার দিতে যায়, তাহলেও তাতে ভালোবাসা প্রকাশ পাবে না, প্রকাশ পাবে জাঁক! অর্থাৎ কি না ছাখো, আমি কত দামের জিনিষ দিয়েছি! তা নয়! ওর দেবার সামর্থ্য থাকবে, ওর দেওয়া চলবে···অথচ কৌমুদীর কাছে সে-উপহারের আদর হবে···এমন কিছু উপহার দেওয়া চাই।

দিলু মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, তার পর বলিল—ভালো দেখে ক'খানি বই যদি দেওয়া হয়? কিম্বা···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন,—'কিম্বা' শুনবো পরে। এখন এসো, আমরা দোকানে যাই, চোখে দেখে পছন্দ করা যাবে'খন! তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলুম। এসো···

ক'জনে আসিলেন গাড়ীর সামনে। মোটর-গাড়ী। জানকী বাবু উঠিলেন। তার পর পিনাকী। দিলুর পা কাঁপিতেছে···দিলুকে মণিময় বলিল—উঠুন মাষ্টার-মশাই···

দিলু উঠিতে যাইতেছিল সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশের শীটে ···জানকী বাবু বলিলেন,—ভিতরে এসো দিলীপ···সামনের শীটে মণিময় বসবে!

কম্পিত বক্ষে দিলু উঠিয়া পিনাকীর পাশে বসিল। মণিময় বসিল সামনের শীটে ড্রাইভারের পাশে।

রাগে পিনাকী জ্বলিয়া লাল! কিন্তু উপায় কি!

ক'খানা দোকান ঘুরিয়া কেনা হইল টয়লেট-শেট, সেন্ট, সাবান···এগুলা ছিল সুরুচির ফরমাশ এবং সেই সঙ্গে কেনা হইল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের একসেট করিয়া বই···এগুলি কেনা হইল দিলুর কথায়।

জানকী বাবু বলিলেন,—তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েকে দেবার মতো উপহার যদি কিছু থাকে তো তা এই বই! এর চেয়ে দামী উপহার আর নেই! শাড়ী-গহনা—এ-সব মনকে বড় করে না, এ-সবের সঙ্গে অহঙ্কার গাঁথা থাকে! শুভ দিনে কৌমুদীকে অহঙ্কার-চর্চ্চার অনেক আসবাব আত্মীয়-স্বজনে দেবে! যারা সমবয়সী বন্ধু, তাদের দেওয়া উচিত এমন জিনিষ, মন যাতে চিরদিন আনন্দ পাবে। সে জিনিষ হলো বই, ফুল,···এই সব! I admire your taste (তোমার রুচির আমি সুখ্যাতি করি) দিলীপ।

জানকী বাবুর মুখে এত বড় কথা···গৌরবের লজ্জায় দিলীপ আবার মুখ নত করিল···তার মুখ-চোখ আবার তেমনি রক্ত-রাঙা হইল।

তার পর কলিকাতায় কৌমুদীর বিবাহের দিন। সন্ধ্যা বেলা। বর আসিবে···বাড়ীর প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ সজ্জিত মণ্ডপ···আমের পাতায় দেবদারু-পাতায় ফুলে-লতায় মনোহর কুঞ্জ! নহবৎখানায় নহবতে বিচিত্র মধুর রাগিণী···

নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতের বিপুল ভিড়। গাড়ীর পর গাড়ী আসিতেছে ···লোকের পর লোক···

কন্যাপক্ষের তরফ হইতে অভ্যর্থনার সমারোহ! সুপ্রসন্ন নিজে বিনম্রাবনত হইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। দিলু-নীলু বাড়ীর ছেলের মতো কোমর বাঁধিয়া সকলকে চা, সরবৎ, পাণ, সিগার, সিগারেট পরিবেষণ করিতেছে। এ কাজে দু' ভাইয়ে যেন দশখানা করিয়া হাত বাহির করিয়াছে!

একখানা ট্যাক্সি আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে নামিল পিনাকী-দেবকী-শুক্লাদের সঙ্গে জয়া দেবী, চ্যাটার্জ্জী সাহেব।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—সত্যই নেমন্তন্ন খেতে এলেন চ্যাটার্জ্জী-সাহেব! বিয়ে দেখেই বোধ হয় ফিরে যাবেন?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কিছুতেই আগে আসার সুবিধা হলো না। নতুন প্ল্যাণ্ট এসেছে···ফিট্ না করে আসা সম্ভব হলো না!

সুপ্রসন্ন কহিলেন—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীও বুঝি ঐ কারণেই দু'দিন আগে আসতে পারলেন না?

সলজ্জ হাস্যে জয়া বলিল—কাল আসবার ঠিক ছিল। হঠাৎ ওঁর জন্য বিভ্রাট ঘটলো···লাষ্ট মোমেণ্টে!

সুপ্রসন্ন বলিলেন—কাল ভোরেই দু' জনে ফিরছেন, বোধ হয়?

সলজ্জ হাস্যে জয়া বলিল—না, না, বরের বাড়ীতে ফুলশয্যা-বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তবে ফিরবো।

সুপ্রসন্ন বলিলেন,—আমার সৌভাগ্য!

দিলু দেখিল···নীলু দেখিল···এই জয়া দেবী! তাদের পিশিমা! বেশেভূষায় কি সমারোহ! তাদের কত আপন-জন···অথচ তাদের চেনেন না! তারাও চেনে না, জানে না তাদের পিশিমাকে!

সুপ্রসন্ন বলিলেন—আপনারা বসুন মিষ্টার চাটার্জ্জী। পিনাকী, তোমরা বসো বাবা···মেয়েদের আমি বাড়ীর মধ্যে পৌছে দিয়ে আসি।

জয়াকে উদ্দেশ করিয়া সুপ্রসন্ন বলিলেন,—আসুন···

সুপ্রসন্নর পিছনে জয়া চলিল অন্দরের দিকে···দিলু-নীলুর পাশ দিয়া···

সহসা কে ডাকিল—জয়াদি'!

সে-কণ্ঠ শুনিয়া জয়া চমকিয়া উঠিল! এ কণ্ঠ যেন···

কণ্ঠের উদ্দেশে জয়া চোখ তুলিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র যে-মূর্ত্তি চোখে পড়িল···জয়া কাঠ!

এ রাজীব···জ্যাঠা সুপ্রসন্নর খাশ্-ভৃত্য···শেষ-জীবনের সঙ্গী-সহচর···সেই রাজীব!

কিন্তু এ-বাড়ীতে রাজীব আসিয়া উদয় হইল···হঠাৎ···কোন্ অদৃশ্য অতীত লোক হইতে!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শীত উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বভাবতঃ মনে হইয়া থাকিবে—আপাততঃ পূর্ব্ব দিক্ হইতে বাঙ্গালার বিপদ উত্তীর্ণ হইল। গত বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে ব্রহ্ম-অভিযান শেষ করিবার জন্য জাপান ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিল। প্রাকৃতিক অবস্থায় ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের সহিত ব্রহ্মদেশের মিল আছে। কাজেই সঙ্গত ভাবেই মনে হইতে পারে—ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানের কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকিলে তাহার পক্ষে শীতকালেই তদনুযায়ী অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। অথচ, শীত নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইল; আবার ঠিক ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের জন্য জাপানের ব্যাপক আয়োজন! সুতরাং আপাততঃ বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষ জাপানের আক্রমণ-বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইল মনে করা অযৌক্তিক নহে।

কিন্তু বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে জাপানের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় জাপানের বিমান-আক্রমণও অকস্মাৎ প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। গত তিন মাস আরাকান্ অঞ্চল সম্বন্ধে জাপান একরূপ উদাসীন ছিল; কিন্তু মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগ হইতে সে ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত তৎপর। সম্মিলিত পক্ষের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী জাপ-সৈন্যের এই আকস্মিক আক্রমণে পশ্চাদ্বর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছে। ঠিক এই সময়ে জাপান কক্স-বাজার, ফেণী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা স্থানে বিমান আক্রমণ করিতেছে। আক্রমণ যেমন পুনঃ পুনঃ চালিত হইতেছে, তেমনই এই সকল আক্রমণের প্রাবল্যও অত্যন্ত অধিক। ইতঃপূর্ব্বে জাপান কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব-ভারতের কোথাও এত অধিক বার এবং এরূপ প্রচণ্ড ভাবে বোমা বর্ষণ করে নাই। আরাকান অঞ্চলে জাপানের তৎপরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল বিমান-আক্রমণে আবার হয়ত অনেকের মনে হইতেছে—শীত অতীত হইলেও বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষের বিপদ উত্তীর্ণ হয় নাই; না জানি, জাপানের মনে কি আছে!

আরাকানে তৎপরতা—

প্রথমতঃ আরাকান্ অঞ্চলের তৎপরতা। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান বিনা যুদ্ধে বুথিডং ও মংড ত্যাগ করিয়া যায়; সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য তখন ঐ দুইটি স্থান অধিকার করিয়া রথেডং পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পর জাপানের প্রতিরোধ প্রবল হওয়ায় সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আরাকান্ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের এই তথাকথিত সাফল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অশোভন প্রকার কার্য্য চলিয়াছিল। সীমান্তের বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে এই গুরুত্বহীন তৎপরতাকে ব্রহ্ম-অভিযান বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। এই অসঙ্গত প্রচারকার্য্যের ফলেই গত মার্চ্চ মাসে জাপানের প্রতি-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য যখন পশ্চাদ্বর্ত্তনে বাধ্য হয়, তখন উহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রচারকারীরা অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল বর্ত্তমানকে লইয়াই অভিভূত হইয়া পড়েন; ইহাতে অনেক সময় তাহাদের প্রচারকার্য্যের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়।

বস্তুতঃ, গত ডিসেম্বর মাসে আরাকানের বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যের সীমান্ত অগ্রগতি যেমন গুরুত্বহীন, মার্চ্চ মাসে জাপানের সাফল্যের গুরুত্বও তেমনই অধিক নহে। ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যের অগ্রগতি যেমন ব্রহ্ম-অভিযান নহে, তেমনই মার্চ্চ মাসে জাপানের প্রতি-আক্রমণ ও সাফল্যও তাহার ভারত অভিযানের নিশ্চিত দ্যোতক নহে। মার্চ্চ মাসে জাপান যেখানে পৌঁছিয়াছে, গত ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে সে সেই স্থানেই—বরং তাহারও পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেছিল। কাজেই, জাপ-সৈন্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে ভারতের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ১০ মাস ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল সেই বিপদের সম্মুখেই ছিল।

জাপান তাহার এই সাফল্যে ভারতে বিমান-আক্রমণ পরিচালনেরও অধিকতর সুবিধা লাভ করে নাই। আকিয়াব এখনও পশ্চিম-ব্রহ্মে জাপানের সর্ব্বশেষ বিমানঘাঁটী।

অবশ্য, সীমান্ত অঞ্চলের এই সংঘর্ষের ফলাফল সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। প্রধানতঃ শত্রুর গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং শত্রুসৈন্যকে সর্ব্বদা বিব্রত রাখিবার জন্যই সীমান্তে সংঘর্ষ চলিয়া থাকে। কিন্তু এই সময় সীমান্তের নিকটবর্ত্তী শত্রুর ঘাঁটীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়; এই ঘাঁটী অধিকার করা সম্ভব হইলে ভবিষ্যৎ অভিযানের পথ সুগম হয়। এই জন্য সীমান্ত-সংঘর্ষকে নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রসারিত হইতে দেওয়া যায় না। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান বুথিডং ও মংড নির্ব্বিরোধে ত্যাগ করিলেও রথেডংএ যাইয়া জাপ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হয়; কারণ, রথেডং ত্যাগ করিয়া আকিয়াব বিপন্ন করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তেমনই পশ্চিম দিকেও জাপ-সৈন্যকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, তাহাতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের বৃটিশ ঘাঁটী বিপন্ন হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিমান-আক্রমণ—

তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গে জাপানের বর্দ্ধিত বিমান-আক্রমণ। জাপানের এই আক্রমণ দুইটি বৈকল্পিক উদ্দেশ্যে চালিত হওয়া সম্ভব। জাপান হয়ত মনে করে—পূর্ব্ববঙ্গের বিমানঘাঁটীগুলি হইতে ব্রহ্মদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হয়; দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের বিমানঘাঁটী, জাহাজঘাট এবং সরবরাহ-সূত্র আরাকান্ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে শক্তি যোগায়; ভবিষ্যতে এই সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানই ব্রহ্ম-অভিযানের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই জন্য—প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্যেই জাপান হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। অবশ্য, বেসামরিক অঞ্চল সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়া কেবল

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাত করা সম্ভব নহে। এই জন্য আমরা পূর্ব্ববঙ্গে সামরিক অঞ্চলের ক্ষতি ও বেসামরিক অধিবাসীর হতাহতের কথা—দুই-ই শুনিতেছি। জাপান মনে করিতে পারে—বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে উহার দ্রুত সংস্কার সম্ভব হইবে না; সে আগামী কয়েক মাস সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে।

জাপানের উদ্দেশ্য প্রতিরোধমূলক না-ও হইতে পাবে; সমগ্র বাঙ্গালায় বিমান-আক্রমণ পরিচালনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে উপযুক্ত ঘাঁটী অধিকারে প্রয়াসী হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বোমাবর্ষণ কালে আমরা বলিয়াছিলাম—ইহা জাপানের পর্য্যবেক্ষণমূলক আক্রমণ; অর্থাৎ কলিকাতা অঞ্চলের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই জাপান এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। সেই সময় জাপানী সমরনায়কদিগের এই অভিজ্ঞতা হওয়াই স্বাভাবিক যে, পশ্চিম-ব্রহ্মের ঘাঁটী হইতে কলিকাতা অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে সাফল্যের সহিত বোমাবর্ষণ চলে না। এই অভিজ্ঞতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের কতকাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ অঞ্চলের বিমানঘাঁটী হইতে সমগ্র বাঙ্গালার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে প্রবল আঘাত করিতে আকাঙ্ক্ষী হওয়া জাপানের পক্ষে অসম্ভব নহে। জাপানী সমরনায়কগণ যদি সত্যই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহা হইলে ফেণী, কক্সবাজার এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে জাপানের বর্ত্তমান বোমা বর্ষণ স্থল ও জলপথে তাহার অভিযানের পূর্ব্ব সূচনা। কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে স্থলপথে বা জলপথে অভিযান-পরিচালনের পূর্ব্বে সেই অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি বোমাবর্ষণে চূর্ণ করা আধুনিক যুদ্ধের নীতি।

সংক্ষেপে, হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন চূর্ণ করিবার জন্য, নতুবা ঐ অঞ্চলের ঘাঁটী অধিকার করিয়া সমগ্র বাঙ্গালায় প্রবল বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের আকাশে জাপানের এই তৎপরতা।

তবে, সমগ্র ভারতের উদ্দেশে জাপানের ব্যাপক অভিযান আপাততঃ সম্ভব ও স্বাভাবিক নহে; সে যদি সত্যই দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে অভিযান আরম্ভ করে, তাহা হইলে কেবল ঐ অঞ্চলের কয়েকটি ঘাঁটী অধিকারের উদ্দেশ্যেই সে অভিযান চালিত হইবে। পরে যদি অবস্থা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তখন অধিকৃত অঞ্চলের আরও বিস্তারসাধনের জন্য জাপান উদ্যোগী হইতে পারে। তবে, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বর্ষার ধারা ও বন্যা জাপানের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন নহে। বর্ষাকালে সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান অসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু যে জাপ-সৈন্য ইতঃপূর্ব্বে হিংস্র জন্তু ও বিষধর সর্পসঙ্কুল বন ও ভয়ঙ্কর কুম্ভীরপূর্ণ নদী অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে, তাহার পক্ষে বর্ষাকালে যুদ্ধ পরিচালন সাধ্যাতীত নহে। যদি অন্যান্য কারণে বর্ষাকালে ভারত-অভিযান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে জাপানী সেনাপতির পক্ষে তাঁহার সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের স্কন্ধে এক একখানি করিয়া রবারের নৌকা দিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেওয়া অসম্ভব নহে। তবে, বর্ত্তমানে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নৌবাহিনী বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত, চীনের সমস্যার সমাধান অদূরবর্ত্তী নহে এবং পশ্চিম দিকে জার্ম্মাণী অত্যন্ত বিব্রত, তখন জাপানের পক্ষে একাকী ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক নহে।

চীনের সমস্যা—

সমরোপকরণের অপ্রাচুর্য্যে এবং খাদ্য-সামগ্রীর অভাবে চীন এখন অত্যন্ত বিপন্ন। অবশ্য, জাপান এখন চীনে ব্যাপক যুদ্ধে ব্যাপৃত নহে; কাজেই, চীনাদিগের সামরিক বিপর্য্যয়ের কথা আপাততঃ শ্রুত হয় নাই। তবে, অবরুদ্ধ চীন বর্ত্তমানে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি হোনান প্রদেশের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র চীনা অন্নাভাবে গাছের পত্র-পল্লব পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই। এই প্রদেশ ব্যতীত চীনের অন্যান্য অঞ্চলেও দারুণ অন্নাভাব। গত ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনস্থিত চীনা দূতের পত্নী মাদাম কু ফিলাডেল্‌ফিয়ায় এক বক্তৃতায় বলেন—China is on the verge of economic collapse. The danger is so serious that America cannot long delay to equip and supply China and the Chinese army. মাদাম চিয়াং-কাই-সেক্ সম্প্রতি আমেরিকায় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় চীনের দুঃখ ও জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত পক্ষের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও সিদ্ধান্ত হইয়াছে—জাপানের সম্বন্ধে আপাততঃ দুশ্চিন্তার কারণ নাই; হিটলার পরাজিত হইবার পর জাপানকে "শিক্ষা দেওয়া" হইবে। মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আগামী বৎসর অথবা তাহার পরের বৎসর হিটলার পরাজিত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারও পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেরও পরে তাঁহারা ২নং শত্রু জাপানের প্রতি অবহিত হইবেন! ইতোমধ্যে ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও আপাততঃ "শিকায়" উঠিল। কারণ, ব্রহ্ম-অভিযানের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা পুনরায় সৃষ্টি হইতে এখনও ১০ মাস বাকী। সম্মিলিত পক্ষ কেবল "পাঁয়তারা" কষিয়াই গত শীতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

চীনের এই দুরবস্থা এবং সম্মিলিত পক্ষের এই অদূরদর্শী নীতির ফলে জাপান অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া থাকিবে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, জাপান তাঁহার তাঁবেদার নান্‌কিং সরকারের সাহায্যে চীনের সমস্যার সমাধান করিতে আগ্রহান্বিত। সম্প্রতি জেনারল টোজোর নান্‌কিং পরিদর্শন এবং জাপান কর্ত্তৃক চীনে অতিরিক্ত অধিকার ত্যাগের প্রতিশ্রুতি আমাদের এই অনুমানের সমর্থক। জাপান এখন নান্‌কিং সরকারকে পুষ্ট করিয়া এবং তাহাকে সম-ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়া চুংকিংএর সমর্থকদিগকে আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছে। সে হয়ত আশা করে—এই ভাবে চুংকিংএর শক্তি হ্রাস করান সম্ভব হইবে এবং তথায় নান্‌কিংএর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধির আগ্রহ দেখা দিবে। অবশ্য ইহা সত্য, চুংকিংএর সমর্থকদিগের কতকাংশ কিছুতেই নান্‌কিংকে স্বীকার করিতে চাহিবে না। তবে, চুংকিংএ এরূপ লোকের অভাব না হওয়াই স্বাভাবিক; যাহারা ছয় বৎসর-ব্যাপী দুঃখ-কষ্টে এখন ক্লান্তি বোধ করিতেছে, সম্মিলিত পক্ষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যাহারা জাপানের নিকট হইতে সামান্য আশ্বাস পাইলেই এখন অস্ত্রত্যাগে সম্মত হইবে। আর জাপানের পক্ষেও এখন চীনের প্রতি সাময়িক ভাবে কপট উদারতা প্রদর্শনও স্বাভাবিক। সে এখন দুইটি প্রবল শত্রুর সম্মুখীন; এখন চুংকিংকে বৃটিশ ও আমেরিকার সহিত সম্বন্ধশূন্য করা তাহার চরম স্বার্থ। অবশ্য, জাপানের এই অভিসন্ধি সফল হইবে কি না, তাহা বলা যায় না; তবে, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় এবং চীনের মিত্রদিগের ব্যবহারে সে এখন এই নীতির সাফল্য সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের আয়োজন কমে নাই; বিসমার্ক সাগরে পরাজয়ে জাপানের উৎসাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস

পায় নাই। জাপান যে অতি সত্বর অষ্ট্রেলিয়াকে শক্তিহীন করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়াই সম্মিলিত পক্ষের প্রধান আক্রমণ-ঘাঁটী; এই ঘাঁটীকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন করা জাপানের একান্ত প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইয়াই হউক, আর অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে অধিকার-বিস্তার করিয়া আমেরিকার সহিত উহাকে বিচ্ছিন্ন সংযোগ করিয়াই হউক, জাপান অতি সত্বর এই দ্বৈপায়ন মহাদেশকে হীনবল করিতে প্রয়াসী হইবেই।

টিউনিসিয়ায় যুদ্ধ—

সম্মিলিত পক্ষ সম্প্রতি টিউনিসিয়ায় উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন; জেনারল মণ্টগোমারীর সেনাবাহিনী ম্যারেথ্ লাইন ভেদ করিয়া মার্শাল রোমেলের সেনাদলকে মধ্য-টিউনিসিয়া পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছে। তবে টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির সহিত সম্মিলিত পক্ষের চরম শক্তি-পরীক্ষা এখনও হয় নাই। উত্তর অঞ্চলে মার্শাল রোমেলের ও ফন্ আর্ণিমের সেনাবাহিনী স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে প্রচণ্ড প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে। উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থাও প্রবল প্রতিরোধ চালনের উপযোগী। সম্মিলিত পক্ষ রোমেলের সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যুদ্ধ পরিচালন করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। দক্ষিণ দিক্ হইতে মণ্টগোমারীর সৈন্যের অগ্রগতির সময় মার্কিণী সেনাবাহিনী যদি গাফ্সা-গ্যাবেস্ পথ ধরিয়া মধ্য-টিউনিসিয়ায় পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিত এবং রোমেলের সেনাদলকে দুই দিক্ হইতে নিষ্পিষ্ট করা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের পরবর্ত্তী সমর-প্রচেষ্টা আর দুঃসাধ্য হইত না। টিউনিসিয়া-যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে সম্মিলিত পক্ষের এই বিফলতায় এই অঞ্চলের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—অক্ষশক্তি সম্মিলিত পক্ষকে টিউনিসিয়ায় যথাসম্ভব অধিক কাল আটক রাখিতে চাহে; এই অঞ্চলে রণক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া সম্মিলিত পক্ষের সহিত ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। টিউনিসিয়ায় বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যকে আটক রাখিয়া জার্ম্মাণী গ্রীষ্মকালে রুশিয়ার বিরুদ্ধে শেষ অভিযান চালাইতে চাহে। জার্ম্মাণী জানে—টিউনিসিয়ায় তাহার প্রতিরোধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পশ্চিম-য়ুরোপ সম্বন্ধে তাহার উৎকণ্ঠার কারণ নাই। এখন পর্য্যন্ত টিউনিসিয়ার যুদ্ধ রুশ-রণাঙ্গনে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ও মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণী পশ্চিম-য়ুরোপ হইতে নূতন সৈন্য স্থানান্তরিত করিয়া দক্ষিণ-রুশিয়ায় প্রতি-আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলে কেবল পরিবর্ত্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার জন্যই রুশ-সেনা অসুবিধায় পড়ে নাই—য়ুরোপের অন্য প্রান্ত হইতে জার্ম্মাণীর নিরুদ্বেগে সৈন্য অপসারণের সামর্থ্যও রুশ সেনার বিপন্ন হইবার অন্যতম কারণ।

রুশ-রণাঙ্গন—

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে আশা হইয়াছিল—সোভিয়েট বাহিনী এবার দক্ষিণ-রুশিয়ায় নীপারের তীর পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু ঐ অঞ্চলে অসময়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হওয়ায় এবং জার্ম্মাণ-সৈন্যের সংখ্যা ও শস্ত্রশক্তি দ্রুত পুষ্ট হওয়ায় অকস্মাৎ যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। শীতকালে সোভিয়েট সেনাবাহিনী অতি দ্রুত পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল; পুনরধিকৃত অঞ্চলে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় তাহারা পায় নাই। রণক্ষেত্র দূরবর্ত্তী প্রান্তে স্থানান্তরিত হওয়ায় সরবরাহ-সূত্র দীর্ঘ হইয়া পড়ে; বিদগ্ধ অঞ্চলে উত্তম সরবরাহ-পথ গড়িয়া তুলিতেও সময়ের প্রয়োজন। তাই, অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থায় জার্ম্মাণ-সেনা অকস্মাৎ প্রতি-আক্রমণ করিলে রুশবাহিনী তখন পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী খারকভ এক মাসের মধ্যেই পুনরায় সোভিয়েট বাহিনীর হস্তচ্যুত হইয়া যায়, খারকভের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ রেলষ্টেশন বিয়েলগোরোডও জার্ম্মাণ-সেনা পুনরধিকার করিয়াছে। তবে, এখন ডোনেৎস্ নদীর তীরে তাহাদের পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি প্রতিহত।

দক্ষিণ-রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে রুশ সমর-নায়কগণ মধ্য-রণাঙ্গনে অবহিত হন। এই অঞ্চলে রেজভ ও ভিয়াস্মা অধিকার করিয়া রুশ সেনা স্মলেনস্ক অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করে; স্মলেনস্কের ৩০ মাইল দূরে তাহাদিগের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রুশ-সৈন্য কর্ত্তৃক ভেলিকাই-লুকি অধিকৃত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতেও স্মলেনস্ক নিরাপদ ছিল না। শীতকালে দক্ষিণ-রুশিয়ায় সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতির তুলনায় মধ্য-রণাঙ্গনে তাহাদের সহযোদ্ধৃগণের গতি মন্থর। কাজেই, জার্ম্মাণী এখানে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার প্রচুর সময় পাইয়াছে। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলেও বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে; ফলে, এখানে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীই এখন একরূপ নিষ্ক্রিয়।

কুবানে রুশ সেনা কৃষ্ণসাগরের অন্যতম প্রধান পোতাশ্রয় নভরোসিস্কের পূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়াছে।

আসন্ন গ্রীষ্মে দক্ষিণ-রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর শেষ অভিযানের আয়োজন এখন দ্রুত চলিতেছে। জার্ম্মাণী এই বৎসরও সমগ্র দেড় হাজার মাইল রণাঙ্গণে তৎপর না হইয়া কেবল দক্ষিণ-রুশিয়াতেই প্রচণ্ড আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে বলিয়া মনে হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ও মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণ সমর-নায়কগণ দক্ষিণ-রুশিয়ায় যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা তাঁহাদিগের হইয়াছে। ডোনেৎস্ নদীর পশ্চিম দিকে যে অঞ্চল জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্ধারে বিলম্ব না হওয়ায় জার্ম্মাণী তথায় সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে; তাহার সরবরাহ-সূত্রও দৃঢ় হওয়া সম্ভব। অভিযান-পরিচালনের উপযোগী বিশাল ঘাঁটী খারকভ এখন জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত। হিট্‌লার তাঁহার গত ২১শে মার্চ্চের বক্তৃতায় আশা প্রকাশ করিয়াছেন—"**We have stabilised the front and taken steps to ensure that in the months to come we shall achieve success.**"

বর্ত্তমানে রুশিয়ার সমর-নেতৃবর্গ এক দিকে যেমন ডোনেৎস্ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর আরও পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি প্রতিরোধে ব্যস্ত, তেমনই অন্য দিকে তাঁহারা পূর্ব্বাঞ্চলে আপনাদিগকে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে এবং ককেসাস্ অঞ্চলে যে সকল স্থান শীতকালে রুশ-সেনার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তথায় এখন শত্রুর পরবর্ত্তী আক্রমণ-প্রতিরোধের আয়োজন দ্রুত চলিতেছে। শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিয়া, সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এবং প্রতিরোধ-ব্যূহগুলি দৃঢ় করিয়া সোভিয়েট সমর-নায়কগণ এখন আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অভিযান-প্রতিরোধের ব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে অবহিত।

৫।৪।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যর্থ চেষ্টা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৩ই চৈত্র মুস্লিম লীগের সহায়তায় য়ুরোপীয়-দল তদানীন্তন সচিবমণ্ডলীকে অপসারিত করিবার যে দারুণ অপচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-প্রদেশে যে ভীষণ খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই য়ুরোপীয় দলের সদস্য মিষ্টার কে, এ, হামিল্টন বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটে সচিবমণ্ডলী বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই বলিয়া এই ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সচিবমণ্ডলীকে অপসারিত করিবার জন্য ইহার পূর্ব্বে আরও দুই বার য়ুরোপীয় ও মুস্লিম লীগের সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। অথচ ইহার পূর্ব্বতন সচিবমণ্ডলীর অপসারণ জন্য পূর্ব্বে য়ুরোপীয় দলের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। হক-বন্দ্যোপাধ্যায়-বসুসমন্বয়ে গঠিত সচিবমণ্ডলীর আমলে বাঙ্গালায় এই খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণে উত্তেজিত এবং উত্যক্ত—সাধারণের সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ-কল্পেই য়ুরোপীয় ও মুস্লিম লীগদল এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সভাস্থলে বাক্যের ছটা, হাত-নাড়ার ঘটা এবং এই সম্পর্কে সকল দোষ সচিবমণ্ডলীর উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিয়াছিল। মুস্লিম লীগের পক্ষ হইতে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বাগ্‌বিলাস-বহুল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করিয়া সকল নিরপেক্ষ লোকের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। উক্ত সচিবমণ্ডলীর উপর এই অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে, তাঁহারা এই সমস্যা সমাধানে অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা চোরা বাজার বন্ধ করিতে পারেন নাই; ফাট্‌কাবাজী রহিত করিতে এবং খাদ্য-শস্যের গোপন-সঞ্চয় নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা অযোগ্য! আস্থাহীনতার এই গর্হিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই উক্ত সচিবমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হইত। মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর বক্তৃতার উত্তরে শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে এমন কতকগুলি রহস্য নিহিত আছে,—যাহার উপর সচিবমণ্ডলীর কোন হাতই নাই। খাদ্য-সমস্যার সমাধান অত্যন্ত কঠিন। কারণ, অনেকগুলি ব্যাপার সম্মিলিত হইয়া এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—(১) ব্রহ্মদেশ পরহস্তগত হওয়াতে তথা হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে, সে দোষ কি সচিবদের? (২) ব্রহ্মদেশ পরহস্তগত হওয়াতে বহু লোক এই প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, সে জন্য কি সচিবরা দায়ী? (৩) সামরিক সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে অনেক লোক সরাইতে হইয়াছিল, সে দোষও কি সচিবদের? (৪) এই প্রদেশের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, সে জন্য কি সচিবরা দায়ী? (৫) ভারত সরকার নৌকা এবং যান-বাহন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য মাল-চলাচলের অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহাও কি সচিবদিগের দোষ? (৬) এ দেশ হইতে অন্য দেশে চাউল রপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সে দায়িত্বও কি সচিবদিগের? (৭) যুদ্ধের জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যকে খাওয়াইতে হইতেছে, সে জন্যও কি সচিবরা অপরাধী? (৮) ঝড়, জল, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপপ্লবে এ দেশের শস্যহানি ঘটিয়াছে, সে দোষ কি সচিবদিগের স্কন্ধে চাপানো হইবে? (৯) এবার যে শীতের ফসল হইল না, তাহাও কি সচিবদিগের দোষ? (১০) এতগুলি অসুবিধা যে জটলা পাকাইয়া বাঙ্গালায় এই ঘোর দুর্দ্দৈব ঘটাইয়াছে, সে দোষও কি সচিবদিগের? (১১) দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে পণ্য খরিদ করা হইয়াছিল, তাহার উপর সচিবদিগের কোন হাত ছিল না,—সে জন্যও কি সচিবদিগকে দায়ী করিতে হইবে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তির কেহ কোন জবাব দিতে পারেন নাই! তাহার পর ভারত সরকার কর্ত্তৃক নাগরিকদিগের খাদ্য-সরবরাহের জন্য এক জন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ত্তাও নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সচিবদিগের কথা বলিবার অধিকার ছিল না। এরূপ অবস্থায় সচিবমণ্ডলীকে এই খাদ্য-সঙ্কট সম্বন্ধে কোন মতে দায়ী করা সঙ্গত হইতে পারে না। বিস্ময়ের বিষয়, এই দিন মুস্লিম লীগের কয়েক জন সদস্য অসুস্থ অবস্থাতেও পরিষদে উপস্থিত, কিন্তু জাতীয় দলের কয়েক জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের অনুপস্থিতির অন্তরালে কোন রহস্য নিহিত ছিল না ত? যাহা হউক, ভোটে সচিবমণ্ডলীই জয়লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত সচিবমণ্ডলী ত্রুটি-শূন্য না হইতে পারেন—সে ত্রুটির জন্য ভারত-শাসন আইনই অনেকটা দায়ী। বাঙ্গালায় উক্ত সচিবদিগের যতই ত্রুটি থাকুক, লীগপন্থীদিগের দ্বারা গঠিত সচিবমণ্ডলী যে বিশেষ ভাবে ত্রুটি প্রকাশ করিবেন, দেশের লোকের মনে সে সম্বন্ধে সুগভীর আশঙ্কা আছে। সেই জন্য য়ুরোপীয় দল-সনাথ লীগ দলকে লোকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এই সচিবমণ্ডলী যে দেশের জন-সাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই কি তাঁহারা য়ুরোপীয়দিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন?

সম্মিলিত ভারতীয় বণিক্-সভা

১৪ই চৈত্র শনিবারে নূতন দিল্লী সহরে ভারতের সম্মিলিত বণিক্-সভায় যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি শ্রীযুত গগন-বিহারীলাল মেটার অভিভাষণে এ দেশের রাজনৈতিক এবং আর্থিক বিষয়ের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গুরুত্বে এবং প্রয়োজনীয়তায় আলোচ্য বিষয়গুলি মূল্যবান্। রাজনৈতিক বিষয়-গুলি সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন, (১) ভারত সরকার অবিলম্বে ভারতবাসীর হস্তে কার্য্যকরী ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন, ঘোষণা করুন। (২) রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে অন্যান্য দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাতীয় সরকার গঠন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই দফা রাজনৈতিক দাবী যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে ইনি বলিয়াছেন, জনসাধারণের অবস্থার উপরই আর্থিক উন্নতি অপরিহার্য্যরূপে নির্ভর করে। অধিকন্তু, দেশের লোক যে আর্থিক ব্যাধিতে পীড়িত হইতেছে, তাহাকে একটা সমস্যা বলিয়া 'ধামা-চাপা' না দিয়া—উহা হইতে দেশকে মুক্ত করা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি আরও বলিয়াছেন—ভারতবাসীরা আর বিদেশী শ্রমশিল্পজ পণ্যের ক্রেতা মাত্র হইয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা "কেবল শ্রমশিল্পজ পণ্যের উপকরণগুলির উৎপাদক ও যোগানদার হইয়াও থাকিতে প্রস্তুত নন।

তিনি মার্কিণের সহিত সরাসরি চুক্তি করিবার পক্ষপাতী ; ইজারা এবং ঋণদান সম্পর্কে সকল স্বীকৃত তথ্যের যথার্থ রহস্য তিনি জানিতে চান, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের ব্যবসায়ী-সমাজের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সকল কথা প্রকাশ করা হইতেছে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং মধ্যপ্রাচী অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালাইবার জন্য ইজারা এবং ঋণদান ব্যবস্থা অনুসারে যে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা পরিশোধের গুরু দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া ভারতের মেরুদণ্ড ভগ্ন করা সঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতের যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহাতে ভারতের আর্থিক শ্রমশিল্প-সম্পর্কিত, এবং ভারতীয় শাসনযন্ত্রের গঠনগত যেরূপ দশা,—তাহাতে সরকারের ভারতের উপর আর অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপান সঙ্গত নয়। তাঁহার এই কথার সহিত কোন বিচক্ষণ ভারতবাসীই ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে পারেন না। ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—ভারতের নামে যে ষ্টার্লিং ব্যালান্স জমা হইতেছে, উহা কি ভাবে ব্যয় বা নিয়োগ করা হইবে, সে বিষয়ে ভারতবাসীর কোন হাত নাই। ভারত সরকার বলিতেছেন,—ও-সব কথা যুদ্ধের পরে হইবে। সভাপতি মহাশয় বলেন, অবিলম্বে ভারতবাসীর সংগঠনমূলক এবং সম্পদ্ রক্ষাকল্পে উহা ব্যয় করা উচিত। বণিক্-পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা উহার দ্বারা বৈদেশিক ঋণ শোধ করিবার কথা বলিয়াছেন। আমরাও সেই কথা বলিয়া আসিতেছি। ঐ প্রস্তাব সার চুণিলাল মেটা উপস্থাপিত করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে বণিক্-সভায় উহা গৃহীত হয়।

সরকারী শ্বেতপত্র

মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী অন্যান্য জননায়কদিগকে গ্রেপ্তার করাতে নিখিল ভারতের স্থানে স্থানে যে অশান্তি-উপদ্রবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সকল দায়িত্ব মহাত্মাজী এবং কংগ্রেসের স্কন্ধে চাপাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত সরকার একখানি পুস্তিকা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা সে পুস্তিকা সম্বন্ধে তখন কোন কথাই বলি নাই। কারণ, আমরা জানি, "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে! কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে!" যাঁহারা ভারতের ইদানীন্তন রাজনৈতিক গতি নিরপেক্ষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিতেছেন—মহাত্মাজী প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে হিংসাত্মক কার্য্যের উত্তেজনা প্রদানের অভিযোগ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা একেবারেই মিথ্যা। এই মিথ্যা বা ভ্রান্ত তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার ভূমিকায় সার রিচার্ড টটেন্‌হাম এক মন্তব্য দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন যে, সরকারের সংগৃহীত তথ্যগুলির সমস্ত এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উহাতে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ অথবা ইচ্ছাকৃত বিকৃত, অনেকেই তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। 'হরিজন' প্রভৃতি হইতে যে সব উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পূর্ব্বাপর সঙ্গতিশূন্য করিয়া তাহাকে সুকৌশলে বিকৃত করা হইয়াছে। এ দেশে ঐ পুস্তিকা অগ্রাহ্য হইলেও কর্ত্তারা এবার ছয় হাজার মাইল দূরবর্ত্তী ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিলাতী জনসাধারণের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানিতে ৫০ হাজার শব্দ আছে। পুস্তিকাখানির আসল কথা, কংগ্রেস ভারতে বিশৃঙ্খলার এবং কোন কোন অঞ্চলে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, লর্ড লিন্‌লিথগোর আমলে এই পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশোধাত্মক ক্রিয়া এইরূপেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রতিপক্ষকে বৃথা কলঙ্কিত করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগের চিরন্তনী নীতি। এই পুস্তিকায় মহাত্মা গান্ধীকে এবং কংগ্রেসকে হিংসাসূচক কার্য্যের প্রেরণাদাতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এরূপ ভিত্তিশূন্য এবং অপ্রামাণ্য যে, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রমাণ বলিয়া তাহা দাখিল করিতে পারেন, ইহা কল্পনা করা কঠিন। ভারত সরকারের প্রচারিত পুস্তিকায় এবং বিলাতে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের একই উদ্দেশ্য—কংগ্রেসকে এই অশান্তি এবং হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্য দায়ী প্রতিপন্ন করা। প্রকৃত তথ্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, সরকারের সে চেষ্টা নিষ্ফল। কংগ্রেস কখনই হিংসাত্মক কার্য্যের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু সরকারী পুস্তিকায় এবং শ্বেতপত্রে এই অশান্তির পসরা কংগ্রেসের স্কন্ধে বিনা প্রমাণে চাপাইয়া সরকার সরাসরি সিদ্ধান্ত করিতে চান যে, কংগ্রেস এই অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা বলিতেছেন, "এই অশান্তি বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকটিত করিতেছে। অতএব তাঁহাদের ন্যায়তঃ সিদ্ধান্ত এই বিদ্রোহের স্রষ্টা কংগ্রেসকে দমন করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তের আগাগোড়াই ভুল। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "ভারতের স্বাধীনতাই তাঁহাদের লক্ষ্য এবং কংগ্রেস গম্ভীর ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, পূর্ণ স্বরাজলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অহিংস ভাবেই সেই আন্দোলন পরিচালনা করিবেন।" সে সিদ্ধান্ত হইতে কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত বিচলিত হন নাই। কংগ্রেস যে শত্রুপক্ষের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন, এ কথা বলা উৎকট মিথ্যাচার। কারণ, গত ১৪ই জুলাই ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহারা অতি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষের লোকের সম্মিলিত শক্তি এবং ইচ্ছা দিয়াই ভারতকে শত্রুপক্ষের আক্রমণে বাধা দানে সমর্থ করাই কংগ্রেসের একান্ত বাসনা।" ইহার উপর কংগ্রেসকে বিদ্রোহের অধিনায়ক প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিবার পর তাঁহার নামে প্রচারিত কয়েকটা হিংসার উত্তেজক ইস্তাহার না কি সরকার পাইয়াছেন! উহা যে মহাত্মাজীর লেখা, এ পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণিত হয় নাই। জয়প্রকাশ লালের ইস্তাহার যে জয়প্রকাশের লিখিত বা জানিত, তাহারও একান্ত প্রমাণাভাব। উহা যে উঁহাদিগের শত্রুপক্ষের লিখিত এবং প্রচারিত নয়, তাহার অকাট্য প্রমাণ সরকার পাইয়াছেন কি? 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' যথার্থই বলিয়াছেন, "সরকারের শ্বেতপত্রখানি ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের বক্তৃতা।" আমাদের মনে হয়, উহা নিতান্ত ছেঁড়া উকিলের বক্তৃতা! পর্য্যাপ্ত চাউল কিনিয়া সে-চাউল গোপনে বিদেশে চালান দিয়া যে দেশে তারস্বরে "চোরা বাজার" "চোরা বাজার" বলিয়া ঘোষণার চীৎকারে আকাশ-মেদিনী প্রকম্পিত হয়, সে দেশে সবই সম্ভব। এই সম্পর্কে একটা বিষয় শুধু বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। যে সময় উপবাসজনিত কষ্টে মহাত্মাজীর

প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেই সময়ে ভারত সরকারের পুস্তিকা এ দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার যে সময়ে বড়লাট সর্ব্বদলের প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সেই সময় বিলাতে এই শ্বেতপত্র প্রচারিত হইয়াছে! ইহাতে বুঝ লোক যে জান সন্ধান!

—

পদত্যাগ

বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মিষ্টার ফজলুল হক পদত্যাগ করিয়াছেন বা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপক সভায় তিন বার তাঁহার উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল, তিন বারই তিনি ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার উপর ব্যবস্থাপক সভা এবং দেশের জনসাধারণের আস্থা কতখানি! যখন বুঝা গেল, ভোটে তাঁহাকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না, তখন বাঙ্গালার সর্ব্বশক্তিমান্ শাসনকর্ত্তা সার জন হার্ব্বার্ট তাঁহাকে পদত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। এমন কি, মিষ্টার হকের পদত্যাগ-পত্রও তাঁহার স্বাক্ষর-প্রতীক্ষায় লাটভবনে টাইপ করিয়া প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল! পত্র-স্বাক্ষরের পূর্ব্বে সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য মিষ্টার হক সময় চাহিয়াছিলেন, সে সুযোগও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই—ইহা তাঁহার উক্তি হইতেও প্রকাশ পাইয়াছে। ১৪ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যার সার জন হার্ব্বার্ট মিষ্টার হককে লাটপ্রাসাদে আহ্বান করেন। রাত্রি সাড়ে ৭টার সময় তিনি লাটভবনে গিয়াছিলেন এবং রাত্রি ১টার পর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বঙ্গীয় লাটের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। লাট বাহাদুর তাঁহার নিকট যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই। পরদিন এই কথা প্রকাশ পাইবার পর ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এমন কি, প্রতিপক্ষ দলের নেতা সার নাজিমুদ্দীনও সে-সভায় একটি কথা বলিতে পারেন নাই! লাট বাহাদুর জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু যে ভাবে তিনি সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মিষ্টার হক তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে বাঙ্গালা দেশে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সাধারণ জনসভায় সে বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। মিষ্টার ফজলুল হক স্বাধীন ভাবে কায করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্থায়ী রাজ-পুরুষগণ সচিবদিগের তোয়াক্কা না রাখিয়াই সকল কাজ চালাইতেন—তিনি এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া অনেক য়ুরোপীয় সদস্যের বিরাগভাজন হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—য়ুরোপীয় দল মিষ্টার হকের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উক্তি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে মিষ্টার হকের কার্য্যের সমর্থন করিবেন। কিন্তু যাহা সত্য, মিষ্টার হক তাহা অস্বীকার করিতে অসম্মত হন। সেই জন্য তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছে। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি এ কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবে। অকস্মাৎ সাধারণের আস্থাভাজন সচিবকে এই ভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা অত্যন্ত অসঙ্গত ও অশোভন হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার ভারতেই সম্ভব!

ইহা হইতে ভারতের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের স্থায়িত্ব কিরূপ অনিশ্চিত এবং উহার বনিয়াদ কত ভঙ্গুর, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বুরোক্রেসী আপন সুবিধামত অনায়াসে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। উহা তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসনের একটা রঙ্গীণ কাগজের প্রদর্শনধারী এবং শূন্যগর্ভ মূর্ত্তিমাত্র। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সরকারের সহিত কংগ্রেসের মতভেদ ঘটিলে কংগ্রেস-দলভুক্ত সদস্যগণ যখন সাতটি প্রদেশের সচিবত্ব বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন সরকার পুনর্নির্ব্বাচনে সাহসী না হইয়া ঐ সাতটি প্রদেশের গভর্ণরের হস্তেই স্বৈরিতার সঙ্কুচিত শাসন-কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পরিকল্পিত শাসন যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট ছিল চারিটি প্রদেশ। তাহার পর যখন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মৌলভী সার মহম্মদ সাদুল্লার সচিবত্ব ভাঙ্গিয়া আসামের গভর্ণর ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে কিছু দিনের জন্য শাসন-যন্ত্র চালাইতে থাকেন, এবং শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীকে সচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অস্বীকার করেন, তখনই আসামের শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর সার মহম্মদ সাদুল্লাকে প্রধান-সচিব করিয়া আবার আসামে সচিবসঙ্ঘ সংগঠিত করা হইয়াছে। ইহার পর বড়লাটের নির্দ্দেশে সিন্ধুপ্রদেশে প্রধান-সচিব আল্লাবক্সকে পদচ্যুত করা হইলে সিন্ধুদেশের শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সেখানে জোড়াতালি দিয়া মুসলিম লীগের সার গোলাম হুসেন হিদায়েৎউল্লাকে সচিব করিয়া কোনরূপে কাজ চালান হইতেছে। এবার বাঙ্গালার পালা। সার জন হার্ব্বার্ট ব্যবস্থা পরিষদের এবং সর্ব্বসাধারণের আস্থা-ভাজন মৌলভী ফজলুল হককে কার্য্যে ইস্তফাদানে বাধ্য করিয়া বাঙ্গালার শাসনভার স্বনেতৃত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে হয়ত সার হার্ব্বার্ট মুস্লিম লীগের দলভুক্ত এবং য়ুরোপীয় সদস্যদিগের প্রীতিভাজন সার নাজিমুদ্দীনকে প্রধান-সচিব-পদ দিতে পারেন।—কিন্তু দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশে গঠিত বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যেরূপ ছিল, তাহার অধিক উৎকর্ষ সাধন সহজ-সাধ্য নয়। এই নাজিমুদ্দীনী দলের প্রাদুর্ভাব-কালে ঢাকায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে ঘোর অশান্তি হইয়াছিল, বাঙ্গালী নিশ্চয় এত শীঘ্র তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই! এখন লাটপ্রাসাদে সার নাজিমুদ্দীনের ও সুরাওয়ার্দ্দী সাহেবের ঘন ঘন ডাক পড়িতেছে—এত ডাক নিষ্ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না! বঙ্গীয় লাট ভারত-শাসন সংস্কার আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে স্বৈরক্ষমতা-বলে বাঙ্গালার বাজেট পাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ!

—

বাঙ্গালা প্রদেশ "লাল এলাকা" বলিয়া বিঘোষিত

১৬ই চৈত্র সরকার সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশকে লালমার্কা বা বিপদ-জনক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থাৎ এই প্রদেশে পূর্ব্ব দিক্ হইতে যে কোন স্থান শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক বিমান-পথে আক্রান্ত হইতে পারে। সরকার আচম্বিতে এই ঘোষণা কেন করিলেন, বুঝা কঠিন। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। জাপান যে দিন আরাকান্-বিজয় শেষ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই আসাম এবং বাঙ্গালায়

এই বিপদের আশঙ্কা সূচিত হইয়া আছে। জাপানী বিমান চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলের যে সকল স্থান আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে কোথাও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই বলিয়া সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া লোককে আতঙ্কিত করা সঙ্গত হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কিত ব্যয় সঙ্কোচ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার তাহাতে আপত্তি করেন; সেই জন্য ভারত সরকার সহসা এই ঘোষণা করিয়াছেন। যাহা হউক, সরকার পরে তাঁহাদের বিবৃতি সংশোধন করিয়া ১১শে চৈত্র যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন—"বিপদ্‌জনক অঞ্চল শব্দের কোন বিশেষ অর্থ নাই। বাঙ্গালা সম্পর্কে এই কথার প্রয়োগে এরূপ বুঝায় না যে, গত ১২ মাসের তুলনায় বাঙ্গালা প্রদেশের বা তাহার কোন অঞ্চলের পক্ষে আকস্মিক আক্রমণের শঙ্কা বাড়িয়াছে।—কক্সবাজার এবং ফেণীতে কয়েক জন লোক মরিয়াছে ও কিছু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।" যুদ্ধে—বিশেষ বর্ত্তমান কালের যুদ্ধে—এরূপ ঘটিবেই। সে জন্য আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন?

গান্ধীজীকে কি অভিযুক্ত করা হইবে?

মহাত্মা গান্ধীজীকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়া একটা প্রবল গুজব উঠিয়াছিল। বড়লাট গান্ধীজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ একটা ইঙ্গিত ছিল। ১০ই চৈত্র নয়া-দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সভায় রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহ প্রশ্ন করেন যে, মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কোন আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে কি? সরকার পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিষ্টার কনরান্ স্মিথ উত্তরে বলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে সরকার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না।" মিষ্টার এইচ, ইমাম জিজ্ঞাসা করেন, "এই উত্তরে কি বুঝিতে হইবে যে, সরকার এ বিষয়ে মামলা উপস্থিত করিবেন না?" উত্তরে মিষ্টার স্মিথ বলেন, "আমি যে উত্তর দিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ

বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ-সাধন এবং শাসকবর্গের সহিত প্রকৃত কৃষীবলের সরাসরি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই কথা বঙ্গীয় রাজস্ব বিভাগের বিদায়প্রাপ্ত সচিবের মুখে ১লা চৈত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে সরকার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহারই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন করা হইবে। ইহার জন্য জমিদারগণকে ষ্টেটের অবস্থানুসারে নিট্ মুনাফার দশ গুণ হইতে পনর গুণ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। নবগঠিত বিশেষ আদালত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য্য করিবেন এবং সেই সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য হইবে। ফরিদপুর জিলায় প্রথম জমিদারী কিনিয়া সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক পরিষদে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষে কেহ অধিক কথা বলেন নাই; তবে অধিকাংশ সদস্যই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, বিষয়টির গুরুত্ব-বিবেচনায় যুদ্ধান্তে ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় সরকার যদি সমস্ত জমিদারী সর্ত্ত খরিদ করেন, তাহা হইলে বিশেষ ভুল করিবেন। বাঙ্গালার সমস্ত জমিদারীর মোট আয় ১৩ কোটি টাকা হইবে। তাহা হইতে খরচ-খরচা বাদ দিলে নিট্ মুনাফা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। উহা যদি সরকার ১০ গুণ পণে অর্থাৎ জলের দরেই কিনিয়া লন, তাহা হইলে উহার পণ বাবদ ৭৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইবে। তাহার উপর বকেয়া খাজনার জন্য ১৩ কোটি ধরিতে হইবে। রেকর্ড সংশোধন বাবদ ব্যয় হইবে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা; এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা তহশিল আফিস এবং আমলাদিগের বসত-বাটী নির্ম্মাণ বাবদ খরচ পড়িবে। সর্ব্বসমেত ৯৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বা প্রায় ৯৮ কোটি টাকা খরচ পড়িবে। সরকার যদি ঐ টাকাটা ঋণ করিয়া লন, তাহা হইলে সে বাবদ শতকরা ৪ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইলে বার্ষিক ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় চাপিয়া বসিবে। ইহা খুব কম করিয়া ধরা হইল। এই যুদ্ধের সময় সরকারের এত টাকা ঋণ ঘাড়ে লওয়া কি কর্ত্তব্য? তাহার পর দশ গুণ পণে জমিদারী কিনিলে জমিদারদিগের উপর ঘোর জুলুম করা হইবে। উহা ১৫ গুণ পণেই কেনা উচিত। কমিশনের হিসাব মতে ১৫ গুণ পণে জমিদারী কিনিলে সরকারের বিশেষ লাভ হইবে না। তাহাতে বার্ষিক ৩৩ লক্ষ টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা। ইহার জন্য এত টাকা সরকারের দেনা করা উচিত হইবে না। বিশেষ এই যুদ্ধজনিত দুর্ম্মূল্যতার সময়ে লোকে যখন খাইতে না পাইয়া হাহাকার করিয়া মরিতেছে, তখন এ প্রস্তাব কোন মতেই লাভজনক মনে করা যাইতে পারে না। মৌলভী ফজলুল হক যুদ্ধের সময়ে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই। কর্জ্জ করিয়া ঐ টাকা লইতে হইলে কত দিন ধরিয়া সুদ টানিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সে দেনা কত দিনে পরিশোধ হইবে, তাহাও বলা কঠিন। ইহাতে কৃষীবল বা জনসাধারণ কোন পক্ষেরই মঙ্গল হইবে না।

মরীচিকা

কেবল আশায় যদি ক্ষুধা মিটিত এবং নগ্নতা দূর হইত, তবে আমাদিগের আর অভাব কি? সরকার বলিয়াছেন, প্রতিদিন কলিকাতায় গাড়ী-গাড়ী চাউল—জাহাজ-বোঝাই গম আসিতেছে। কথা হয়ত সত্য, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই সকল মাল-গাড়ী খালি করিয়া কোথায় পর্ব্বতের সৃষ্টি হইতেছে, সে খবর জনসাধারণ পায় নাই। মূল্য এবং অভাব সমতালেই মারাত্মক ভাবে বিরাজ করিতেছে।

বর্ষকাল ধরিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পাইবার আশায় মজিয়া তালি দিয়া গেরো বাঁধিয়া লোকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কোন মতে লজ্জা-নিবারণ করিতেছে। পূজার পূর্ব্বে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু দোল-দুর্গোৎসব পার হইয়া চৈত্র-সংক্রান্তিও অতীত হইল, কিন্তু সেই লজ্জা-নিবারণ বস্ত্র আর আসিল না। এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশের দুঃখ অবসানের আর বিলম্ব নাই। ২৮ লক্ষ ১৩ হাজার ১ শত ১৭ গজ কাপড় মিলে প্রস্তুত হইতেছে—এমন কি, কলিকাতার এক জন ভাগ্যবান্ ব্যবসায়ীর নিকট না কি বহু-আকাঙ্ক্ষিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আসিয়াছে। সে

কাপড়ে ধুতি ও শাড়ীর পাড়ের তারতম্য নাই—সবই ফিতে পাড়—ইহা হয়ত সাম্যবাদ প্রসারের প্রচেষ্টা! কিন্তু এ-কাপড়ে আশা-পূরণের সম্ভাবনা কোথায়? বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা সামন্ত রাজ্য বাদে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ২৫ জন। হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকের ভাগ্যে দেড় ইঞ্চিরও কম বস্ত্র জুটিয়াছে বা মিলিতে পারে! ইহাতে কৌপীনও সম্ভব নয়—ঘুন্সী হইতেও পারে! তবে কি সরকার এ দেশে নগ্নতা সম্বন্ধে পুলিসের নিয়ম শীঘ্রই অর্ডিনান্স জারি করিয়া পরিবর্ত্তিত করিবেন?

বাজেটে বৈষম্য

কেবল বাঙ্গালা দেশেই আগামী বর্ষের বাজেটে টাকার ঘাটতি ঘটিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রদেশেই অর্থের বেশ স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। পঞ্চনদ প্রদেশে আগামী বর্ষের বাজেটে ৬ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশে বর্ত্তমান বৎসরান্তে ৮ লক্ষ টাকা, বিহারে এই বর্ষশেষে ৬১ লক্ষ টাকা এবং মধ্যপ্রদেশের বাজেটেও ৭ লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে। বোম্বাই প্রদেশেও উদ্‌বৃত্ত অর্থের পরিমাণ অল্প নহে। এই সকল প্রদেশের প্রয়োজনীয় খরচের বরাদ্দ কমাইয়া এই টাকা উদ্‌বৃত্ত দেখান হয় নাই। কংগ্রেস সচিবমণ্ডলী যে সকল বিষয়ে যে ব্যয় বরাদ্দ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিশেষ কমান হয় নাই। পক্ষান্তরে মধ্যপ্রদেশের সরকার যুদ্ধের পরবর্ত্তী সংগঠনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই কেবল "নাই-নাই" রব এবং অভাবের ক্রন্দন! শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ কমান হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতেই হইবে

সম্প্রতি মিষ্টার ওয়েণ্ডেল উইলকি "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যদি কথায় কাজে ঠিক রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতে হইবে এবং যে সকল জাতি আত্মশাসনে সমর্থ, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে।" তিনি এই পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বলিয়াছেন, "যদি ভারতবাসীকে স্বাধীন ক'রয়া দিতে বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে সে জন্য বৃটেন নিন্দিত হইবে না,—মার্কিণই নিন্দাভাজন হইবে।" মিষ্টার ষ্টিল ভারত হইতে মার্কিণে ফিরিয়া গিয়া 'সিকাগো ডেলী নিউজ' পত্রে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বৃটেন যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল তথ্য হইতে কংগ্রেসের নেতাদিগের সহিত জাপানীদিগের সম্বন্ধ কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না।" প্রকৃত কথা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। প্রতারণাই সাম্রাজ্যবাদীদিগের নীতির মূলমন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কথায় ও কাজে মিল দেখাইতে বলা বৃথা।

পরলোকে সত্যমূর্ত্তি

স্বদেশ-সেবায় আত্মনিবেদিতপ্রাণ এস, সত্যমূর্ত্তি ৫৭ বৎসর বয়সে কার্ব্বাঙ্কল অস্ত্রোপচারের পর মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে ১৩ই চৈত্র রাত্রি ১টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। সত্যমূর্ত্তি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাদুকোটা ষ্টেটের সিরুমায় এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাদুকোটা রাজ-কলেজ, মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, ও মাদ্রাজ ল কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মাদ্রাজে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ পক্ষের সদস্যরূপে তিনি বিলাতে যান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, পরে কংগ্রেস দলের ডেপুটী লিডার হন। পরিষদে বক্তৃতা

এস্, সত্যমূর্ত্তি

অখণ্ডনীয় যুক্তি-তর্কের প্রভাবনৈপুণ্যে তিনি দেশবাসীর সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইতে ফিরিবার পথে তিনি আরকোনাম রেল-ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হন। প্রথমে ভেলোরে পরে অমরাবতী জেলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইখানে অসুস্থ হইলে ২৫শে পৌষ চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হয়। ১১শে মাঘ মুক্তিদানের আদেশ প্রদত্ত হইলেও তিনি হাসপাতালে থাকিয়াই চিকিৎসিত হন এবং সেইখানেই তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী এক জন শক্তিশালী কর্ম্মী, আদর্শ যোদ্ধা, নির্ভীক দেশভক্তকে হারাইল।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

১১ই চৈত্র কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য জানাইয়াছেন, কংগ্রেসে আন্দোলন আরম্ভের পর হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতে মাত্র ১৮ হাজার ১২০ জনকে জেলে আটক রাখা হয়। এই দিন শ্রীযুত টি, টি, কৃষ্ণমাচারী বন্দীদিগের সম্বন্ধে এক প্রস্তাব প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেন। ১৫ই—মহাত্মা গান্ধীর সহিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাক্ষাতের অনুমতি দিতে বোম্বাই সরকারের আপত্তি। ২৬শে ফাল্গুন সংবাদপত্রে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর নির্ব্বাসনের সম্ভাবনা; শ্রীযুত রাজাগোপালাচারির

উৎকণ্ঠা। গান্ধীজী ও তাঁহার সমর্থকগণ লিখিত ভাবে কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া বিলাতী সংবাদপত্র মহলের অভিমত প্রকাশ। কিন্তু লণ্ডনের বিশিষ্ট ভারতীয় ও বৃটিশ রাজনীতিক মহলের আলাপ হইতে জানা যায়, যুদ্ধ যত দিন চলিবে, তত্দিন গান্ধীজীকে বন্দী হইয়াই থাকিতে হইবে।

বাঙ্গালা—২৮শে ফাল্গুন, মেদিনীপুরের বন্যা ও বাত্যা সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগ-লিখিত এই উত্তর মুদ্রিত হয়—"মেদিনীপুরের এই বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বে সমগ্র তমলুক মহকুমার টেলিগ্রাফের তার সমূহ, ডাক ব্যবস্থা, রাস্তা, নদীপথ বা অন্যান্য উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদানের পন্থাগুলি কংগ্রেসী আন্দোলনকারীরা ধ্বংস করে। প্রধান সচিব পরিষদে বলেন, "স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক যে ভাবে উত্তরটি লেখা হইয়াছে, আমি ঠিক সেই ভাবে উহা পাঠ করিতে পারি না। যান বাহন চলাচল ব্যবস্থা ও সংবাদাদি আদান-প্রদান পন্থাগুলি নষ্ট করা হইয়াছিল ইহা ঠিক, কিন্তু কাহারা উহা করে, তৎসম্বন্ধে সঠিক কোন প্রমাণ নাই।" ১১শে চৈত্র, তমলুক মহকুমার এক চাউলের কল হইতে প্রায় ২ হাজার লোক কর্ত্তৃক ১ হাজার মণ ও ছয় বস্তা চাউল লুণ্ঠন। কয় জন গ্রেপ্তার।

কলিকাতা—১২ই চৈত্র, উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার কয়েক স্থানে তল্লাসী, কয়েকজন গ্রেপ্তার। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর এক গৃহ হইতে রিভলভার, কার্ত্তুজ ও আপত্তিকর কাগজপত্রপ্রাপ্তি; এ সম্পর্কে জগবন্ধু বসু, অবনীশ্বর মিশ্র, বিষ্ণু নাগ, সুধাংশু মিত্র, রাজেন্দ্র সিংহ, বীরেন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যনাথ পাণ্ডে ও হরিপদ মজুমদার গ্রেপ্তার। ১৪ই, উত্তর কলিকাতার দুই স্থানে তল্লাসী, ৭ জন গ্রেপ্তার। ১৭ই, চারি স্থানে তল্লাসী, কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ও প্রচারপত্র হস্তগত। ১৮ই, উত্তর কলিকাতায় তল্লাসী করিয়া কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ও আপত্তিকর প্রচারপত্র হস্তগত। অস্ত্র আইন অনুসারে মোহনলাল মুরালা, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র সেন গ্রেপ্তার। ২০শে চৈত্র, বিস্ফোরক পদার্থ রাখিবার অভিযোগে একজনের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ২৩শে ২৪শে, কয়েক স্থানে তল্লাসীর ফলে কতকগুলি আপত্তিকর কাগজপত্র প্রাপ্তি, ৬ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—৩০শে ফাল্গুন, টিপসই না দিবার জন্য বন্দী ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা আশলতা সেন, শিবানন্দ দত্ত, বীরেন গুহ, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, নিস্তারণ চক্রবর্ত্তী দণ্ডিত। ১৪ই চৈত্র, লুতাবদী বয়রাগাদি ও সালিশী বোর্ড অফিসের নথিপত্র পুড়াইবার অভিযোগে মুন্সীগঞ্জের মোক্তার অমূল্যকুমার দাস, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, জিতেন্দ্রচন্দ্র দাস বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী দণ্ডিত। ১৬ই, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত অমূল্যচন্দ্র সেন ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, তাঁতিবাজারের লোকনাথ বসাক গ্রেপ্তার, শ্রমিক কর্ম্মী নৃপেন্দ্র সেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ১৭ই, ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণে এক স্কুলের ছাত্র গ্রেপ্তার। ২১শে—দিল্লী হইতে প্রেরিত ১৮ শত বড় ছোরাপূর্ণ এক রেলওয়ে পার্শেল প্রাপ্তি, ১ জন গ্রেপ্তার। ২৫শে, শ্রীনগর থানার শোলাগড়ে গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবলকে মারপিট করিয়া একজন ধৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার, ৫০ জন যুবক গ্রেপ্তার, কংগ্রেসকর্ম্মী মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার।

ময়মনসিংহ—২৪শে ফাল্গুন, টাঙ্গাইল মহকুমার এক গ্রামে গ্রামবাসীদিগের সহিত দুই যুবকের সংঘর্ষ, বন্দুক ও রিভলভার ব্যবহার, ৪ জন আহত। আহত অবস্থায় রিভলভার সমেত যুবকদ্বয় (এক জন পলাতক বন্দী) গ্রেপ্তার।

ত্রিপুরা—১১ই চৈত্র, ত্রিপুরা জিলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক আশুতোষ মাইতি দশ মাস দণ্ডভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়ে পুনরায় গ্রেপ্তার।

বর্দ্ধমান—১৩ই চৈত্র, ৬ মাস কারাদণ্ডের পর কংগ্রেস নেতা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার মুক্তিলাভ। জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর আত্মসমর্পণ।

দিনাজপুর—৫ হাজার লোক কর্ত্তৃক বালুরঘাট সহরে ডাকঘর, আদালত ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আক্রমণ ও অগ্নিদানের সম্পর্কে ৩৭ জন ২ হইতে ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

আসাম—৪ঠা চৈত্র আসাম পরিষদে জানান হয় যে, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত আসামের বিভিন্ন জেলে প্রায় ২২১ জন আটক। সর্ত্তাধীনে কিছু দিনের জন্য এ সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে সরকার প্রস্তুত নহেন। ২৮শে ফাল্গুন—ধুবড়ীর এক গৃহে বোমা বিস্ফোরণ ১ জন যুবক নিহত, ১ জন আহত। গৌহাটী কটন কলেজে বোমা বিস্ফোরণ। ধুবড়ীর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস-গৃহ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ১ জন ছাত্র অভিযুক্ত। সরুপাথার ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল দূরে ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটাইবার অভিযোগে ৪ জনের প্রাণদণ্ড, ২ জনের ১০ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড; ২৩ জনকে মুক্তিদানের পর গ্রেপ্তার। ২১শে—সুতিয়ায় (তেজপুর) একটি বন্দুক চুরি। বিশ্বনাথ গ্রামের বাংলায় অগ্নি-সংযোগ। শ্রীহট্টে আটক বন্দী ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী নলিনী গুপ্ত দশ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১লা চৈত্র, পুলিস কংগ্রেসকর্ম্মী বৈকুণ্ঠ সিং ও গোলাঘাটের অপর ৩ জন কর্ম্মীর সন্ধানে ছিল, কুমারবন্দে তাঁহারা ধৃত। নওগাঁর ভোগেশ্বর নিয়োগ ও নলিনীকুমার সাইকিয়া অভিযুক্ত হইয়া অব্যাহতি পাইবার পর পুনরায় গ্রেপ্তার। কালিয়াবাদের টুকিল লীলাকান্ত বেরা গ্রেপ্তার। ১৩ই—বাটাবাড়ী (বড়পেটা) বন-বিভাগের ভবনে অগ্নিদানের অভিযোগে দুই যুবক দণ্ডিত। তেজপুরে ধ্রুবানন্দ চালিহা ও অজয়ানন্দ চালিহা ভাঃ রঃ বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, আসাম কংগ্রেসের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র ভুইঞাকে মুক্তিদানের পর আটক। ১৮ই—দরং জিলার ৩৮ খানি গ্রামের অধিবাসীদিগের উপর ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। ২২শে—কংগ্রেসকর্ম্মী মাণিকচন্দ্র দত্তকে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ধুবড়ী ত্যাগ করিতে আদেশ।

সিন্ধু—৭ই চৈত্র ও ৮ই চৈত্র, করাচীতে অস্ত্রশস্ত্রসহ পথে চলা নিষিদ্ধ। ২৩শে চৈত্র, সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য রইস রসুল বক্স তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মামলায় একজিবিট রূপে একটি ট্রাঙ্ক দায়রা আদালতে লইয়া যাইবার সময় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, দুই জন পেয়াদা বিষম আহত।

বোম্বাই—২৮শে ফাল্গুন—বেলগাঁওয়ের সত্তরতলী খালা-কাওয়াড়ীর পুলিশচৌকীতে অগ্নিদান। সিদিনী ষ্টেটের শিরহট্টি তালুকের এক গ্রাম্য চৌরা ভস্মীভূত। বরমতী ডাকঘর ও রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে ১ জন দণ্ডিত। ৫ই চৈত্র—নিমবাগ ষ্টেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে ৬ জনের প্রত্যেকের ৫ বৎসর কারাদণ্ড। ৭ই, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে অসুস্থতার জন্য মুক্তিদান। ১০ই, আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি, ভারত রক্ষা বিধি বলে দুই জন গ্রেপ্তার। ১৩ই, আমেদাবাদে এক ছাত্র সম্মেলন সম্পর্কে ২৫ জন গ্রেপ্তার। ১৪ই আমেদাবাদে বনভোজনের জন্য নদীর ধারে সমবেত ১৬ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার। ১৫ই, আমেদাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে একবাক্সে ৪টি বোমা ও ১০ পাউণ্ড বারুদ প্রাপ্তি। বেলভেদা গ্রামের (সুরাট) চৌরা ভস্মীভূত। ১৬ই, জলপবাদ থানার (খান্দি) সন্ধ্যাগ দুই বার এবং এক ধর্ম্মশালায় ১ বার বিস্ফোরণ।

২ জন নিহত, ৬ জন আহত। আলানওনারে (বেলগাঁও) এক ব্যাঙ্ক লুঠ সম্পর্কে ২৬ জন গ্রেপ্তার। দুই ব্যক্তির পুলিশের হেফাজত হইতে পলায়ন। কোলাপুরে সংগৃহীত রাজস্বের কিয়দংশ লুণ্ঠিত। রেলপথে লাইন অপসারণের ফলে ডাকগাড়ী লাইনচ্যুত করিবার অভিযোগে জলগাঁওয়ে ৫জন দণ্ডিত। ১৯শে নদিয়াদের এক বিদ্যালয়ে অগ্নিদানের অভিযোগে এক জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড, ১ জনের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ২০শে, আমেদাবাদে পুলিশদল আক্রান্ত, একজন পুলিশ আহত; দুইটি মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ে অগ্নিদান। কোলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে বিস্ফোরণ, ৩ জন আহত। কানাওয়াড়ে গ্রামের চাবাদি হইতে আদায়ীকৃত খাজনা লুণ্ঠনের নিষ্ফল চেষ্টা। ব্রোচ জিলার সরভন গ্রামের এক পুলিশ-চৌকীতে অগ্নিদান। বেলগাঁওয়ের সাহাপুর সরাফগুলিতে বিস্ফোরণ। হুবলি গ্রাম হইতে ৫ জন গ্রেপ্তার। কুমারী গ্রামে সকল গৃহে তল্লাসী। ২৩শে বেলগাঁও মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ডাঃ টি, জি, যোশী ও অপর ৪ জন গ্রেপ্তার।

যুক্ত-প্রদেশ—২৭শে ফাল্গুন, আন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলে প্রাদেশিক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রকে বারাণসী ডিভিসন হইতে বহিষ্করণ। জনৈক ছাত্র গ্রেপ্তার। ৫ই চৈত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন ছাত্রের প্রতি স্থান-ত্যাগের আদেশ। সরকারের ২৫ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়। ২৮ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। আন্দোলন সম্পর্কিত বন্দীদিগের জন্য প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়। আগষ্টে বালিয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে ট্রেজারীতে রক্ষিত ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার কারেন্সী নোট পোড়ানো হয় বলিয়া প্রকাশ, পরে জানা যায় যে পোড়ানোর সার্টিফিকেট দেওয়া হইলেও কিছু নোট বাজারে চলতি; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নোটগুলির মূল্য পরিশোধের অনুরোধ। ২০শে বিনা লাইসেন্সে পিস্তল রাখার অভিযোগে বারাণসীতে বাবুলাল নামে এক জন দণ্ডিত। পিস্তল-নির্ম্মাণ কালে (বারাণসীতে) শিবপ্রসাদ নামে এক জন অস্ত্র আইন অনুসারে ধৃত—দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২১শে—পুলিস-দখলে বারাণসীর গান্ধী-আশ্রম।

সীমান্ত-প্রদেশ—কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য বলেন—২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সীমান্ত-প্রদেশে ৪৭৩ জন আটক। ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৪৩২ জন দণ্ডিত। ১লা চৈত্র—সীমান্ত প্রাদেশিক পরিষদে কংগ্রেস-দলের সদস্য, খান বাহাদুর জারিন খান গ্রেপ্তার।

মাদ্রাজ—২৬শে ফাল্গুন, রাজমহেন্দ্রীর সরকারী উকীল মিঃ ডি ভি, সুব্বারাওন পদত্যাগ করায় ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৩০শে, মাদুরার কংগ্রেস নেতা মিঃ পারিয়া আম্বালাম, মিঃ টি, জি কৃষ্ণমূর্ত্তি গ্রেপ্তার। ১০ই চৈত্র—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মারকারা হইতে উতকামণ্ডে স্থানান্তরিত। ১৩ই—শ্রীযুত এস, সত্যমূর্ত্তির মৃত্যু। ২১শে—এক লবণগোলা লুণ্ঠন ও আবগারী ইনস্পেক্টরকে হত্যা করিবার অভিযোগে ২ জনের প্রাণদণ্ড, ২১ জনের ৩ হইতে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

পঞ্জাব ও কাশ্মীর—২৮শে ফাল্গুন, পঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান সচিব জানান, এক গোপন ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত এবং বহু অস্ত্র ও ক্ষতিকর কার্য্যের যন্ত্রাদি হস্তগত, এক মহিলার নিকট ৩টি রিভলভার প্রাপ্তি। ১লা চৈত্র—শ্রীনগরে এক দর্জ্জির দোকানে বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, ২ জন আহত। ১৭ই চৈত্র অখণ্ড হিন্দুস্থান সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি ও আকালীদলের সভাপতি বাবা খড়্গ সিং, সর্দ্দার ভগবান সিং এবং সর্দ্দার তেজসিং গ্রেপ্তার।

দিল্লী—২৮শে ফাল্গুন অবৈধ শোভাযাত্রার জন্য ৩ জন তরুণী গ্রেপ্তার।

উড়িষ্যা—২০শে চৈত্র পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় ৩ শত ৫৪ জন আটক, বিক্ষোভ সম্পর্কে ১২ শত ৬৬ জন দণ্ডিত। উড়িষ্যা পরিষদে প্রকাশ, ১৫ই নভেম্বর একদল সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিসকে বহরমপুর জেলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহারা জেলের রাজনৈতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চার্জ্জ করে. কয়েক জন বন্দী আহত হয়। ১১ই চৈত্র—কোরপুট জিলায় দেবগাঁও থানা আক্রমণ, অবৈধ ইস্তাহার বিলি, পাহাড়িয়াদিগের সহিত সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট করা, সংরক্ষিত বনের ক্ষতি করা, সরকারী ভবনগুলিতে অগ্নিসংযোগ, খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন করা, সেতু ভাঙ্গিয়া গাছ ফেলিয়া জয়পুরের রাস্তা অবরোধ প্রভৃতির অভিযোগে ১৩৭ জনের মধ্যে ৮৯ জন ৩ মাস হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

মধ্য-প্রদেশ—১২ই চৈত্র মধ্যপ্রাদেশিক সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী সাংবাদিকগণকে জানান যে, কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে সাড়ে এগার লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হয়। রামটেক সাব ট্রেজারী হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত। প্রায় ১ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট পরে উদ্ধার হয়। পাইকারী জরিমানা করিয়া ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আদায় হয়। আন্দোলনের জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। পুলিশবাহিনীর সম্প্রসারণের জন্য ১৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বন্দীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় জেলের জন্য ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হয়।

বিহার—১লা চৈত্র, মজঃফরপুরে এক গৃহ হইতে কতকগুলি রিভলভারের তাজা কার্ত্তুজ প্রাপ্তি, বাড়ীর মালিক গ্রেপ্তার। ১৫ই চৈত্র ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে অতুলচন্দ্র মিশ্র রাঁচিতে গ্রেপ্তার। ১৭ই—মুঙ্গের জিলার ৮ খানি গ্রামের উপর ৮৭৬০ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। ২৩শে—বানগাঁও থানার ১৩ খানি গ্রামের উপর আড়াই হাজার টাকা ও বাঁকা থানার ৪ খানি গ্রামের উপর ১৩ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। ২৬শে, হাজারিবাগ জেল হইতে পলাতক (৯ই নবেম্বর) জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা।

সংবাদপত্র ও মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান—২৭শে ফাল্গুন পুণার লোকসানগড় ছাপাখানার নিকট ১৫০০ টাকা জমানৎ তলব। ২৯শে, লাহোরের উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের' নিকট ১ হাজার টাকা জমানৎ তলব, পত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ। ১লা চৈত্র, বিহার সরকার কর্ত্তৃক 'সার্চ্চ লাইট' পত্র প্রকাশের নিষেধ আদেশ প্রত্যাহার। ৪ঠা, অনন্তপুরমে (মাদ্রাজ) সাধনা প্রিণ্টিং প্রেস তল্লাসী, কয়েকখানি পুস্তক পুলিশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ১০ই, বাঙ্গালা-সরকার কর্ত্তৃক সাম ফ্যাক্টস এবাউট মিডনাপুর ট্র্যাজিডি (মেদিনীপুরের শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য কথা) নামক হিন্দু মহাসভার প্রকাশিত পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত। ১২ই মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র 'বেলগাঁও সমাচারের' সম্পাদক শ্রীযুত শঙ্কররাও পাক্‌লেকার গ্রেপ্তার।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।